শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

'শ্রীচৈতন্যমঠের শতবর্ষ' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত

গৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী

(প্রথম খণ্ড)
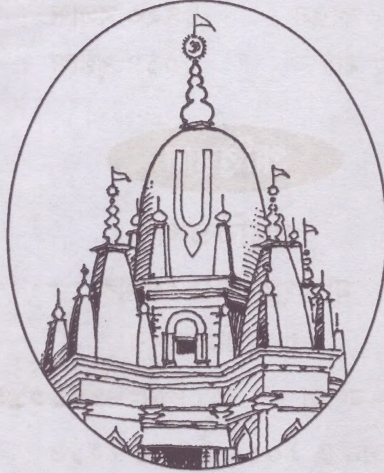
শ্রীচৈতন্যমঠ ও তচ্ছাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের বর্তমান আচার্য্য
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি মহারাজ
সম্পাদিত

মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পঃ বঃ।

প্রকাশক ঃ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিস্বরূপ সন্ন্যাসী মহারাজ
(সাধারণ সম্পাদক)
মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পঃ বঃ।

প্রথম-সংস্করণ
শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব তিথি বাসর

৩০ গোবিন্দ	৫৩০ শ্রীগৌরাব্দ
২৮ ফাল্গুন	১৪২৩ বঙ্গাব্দ
১২ মার্চ	২০১৭ খৃষ্টাব্দ

প্রাপ্তিস্থান

'গ্রন্থবিভাগ'
মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ—শ্রীমায়াপুর
জেলা—নদীয়া, পঃ বঃ। পিনঃ—৭৪১৩১৩
ফোন ঃ- (০৩৪৭২) ২৪৫২১৬

শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইনষ্টিটিউট
৭০-বি, রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা-২৬
ফোন ঃ- (০৩৩) ২৪৬৫৭৪০৯

ভিক্ষা — ৫০০ টাকা

মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠস্থিত 'সারস্বত প্রেস' কম্পিউটার বিভাগ হইতে মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বিজ্ঞপ্তি

জগদ্‌গুরু প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সময়ে সাপ্তাহিক বাংলা **'গৌড়ীয়'**-তে বহু তত্ত্বপূর্ণ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধাদি শ্রীমান্ ভক্তিস্বরূপ সন্ন্যাসী মহারাজ নানা সেবাকার্য্যে ব্যস্ত থাকিলেও বহু পরিশ্রম করিয়া সংগ্রহ করিয়াছেন। ওই প্রবন্ধগুলি অত্যন্ত মূল্যবান্। শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ এ-বৎসর "শ্রীচৈতন্যমঠের শতবর্ষ" উদ্‌যাপন কবিরার সুযোগ পাইয়া ওই প্রবন্ধগুলি একটি গ্রন্থাকারে **'গৌড়ীয় প্রবন্ধাবলী'** নামে প্রকাশ করিবার যত্ন লইয়াছেন। আশা করি, পাঠকগণ যত্নের সহিত উহা পাঠ করিয়া পারমার্থিক পথে কিছু আহার্য্য লাভ করিবেন।

আমরা সকল সময়েই গুরু-বৈষ্ণবগণের লিখিত প্রবন্ধাদি মুদ্রিত করিয়া থাকি—যাহাতে আমরা পারমার্থিক পথে অগ্রসর হইতে পারি, সেই যত্নই লইয়া থাকি। যাঁহারা এই প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার যত্ন লইয়াছেন, তাঁহারা গুরু-বৈষ্ণবগণের কৃপাশীর্বাদ লাভ করিবেন। শ্রীমান্ রামানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীবিমল কৃষ্ণ দাসাধিকারী বিশেষ যত্ন সহকারে গ্রন্থটি আমাদের মঠের কম্পিউটারে কম্পোজ করিয়াছেন। শ্রীশ্বেতদ্বীপ দাসাধিকারী বিশেষ যত্নের সহিত প্রুফ সংশোধন করিয়াছেন—ইহারা সকলেই শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের আশীর্বাদ লাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইবেন।

ইতি,—

বৈষ্ণবদাসানুদাস

ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি

আচার্য্য, মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীভৈমী একাদশী
২৫ মাঘ, ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১৭ খৃষ্টাব্দ

সূচীপত্র

(প্রথমে প্রবন্ধের নাম ও তৎপার্শ্বে পৃষ্ঠাঙ্ক প্রদত্ত হইল)

[১৯২৩-২৪ খৃষ্টাব্দ, ১৩৩০-৩১ বঙ্গাব্দ]

[১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দ, ১৩৩১-৩২ বঙ্গাব্দ]

[১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দ, ১৩৩৩-৩৪ বঙ্গাব্দ]

[১৯৩০-৩১ খৃষ্টাব্দ, ১৩৩৭-৩৮ বঙ্গাব্দ]

[১৯৩১-৩২ খৃষ্টাব্দ, ১৩৩৮-৩৯ বঙ্গাব্দ]

[১৯৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দ, ১৩৩৯-৪০ বঙ্গাব্দ]

[১৯৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দ, ১৩৪০-৪১ বঙ্গাব্দ]

শ্রীমান্ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ* প্রচুর পরিমাণে জয়যুক্ত হউন। তাঁহার সহকারী ব্যক্তিগণ তাঁহার অনুসরণ করিতে পারিলে তাঁহাদেরও প্রচুর মঙ্গল হইবে।

—শ্রীল প্রভুপাদ

* শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর সন্ন্যাসী নাম—শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজ।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী

গৌড়ীয়

[১৯২৩-২৪ খৃষ্টাব্দ, ১৩৩০-৩১ বঙ্গাব্দ]

ব্রহ্মণ্যদেব

'ব্রহ্মণ্য' শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ সম্বন্ধীয়। যিনি ব্রাহ্মণের একমাত্র সম্বন্ধ বা বিষয় বস্তু তিনি ব্রহ্মণ্যদেব। আমরা শান্তিপর্ব্বে বিষ্ণুসহস্রনাম স্তোত্রে দেখিতে পাই—

"ব্রহ্মণ্যো ব্রহ্মকৃদ্‌ব্রহ্মা ব্রহ্ম ব্রহ্মবিবর্দ্ধনঃ।
ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মী ব্রহ্মজ্ঞো ব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ।।"

ব্রহ্মবিদ্ বা ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণপ্রিয় পুরুষই ব্রহ্মণ্যদেব। অর্থাৎ ভজনশীল বা সেবারত জনই ভক্ত এবং ভক্তপ্রিয় ভগবান্।

শ্রীআহ্নিক চন্দ্রিকা বলেন—

"ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রো ব্রহ্মণ্যো মধুসূদনঃ।
ব্রহ্মণ্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষো ব্রহ্মণ্যো বিষ্ণুরচ্যুতঃ।।"

দেবকীপুত্র, মধুসূদন, পদ্মপলাশলোচন, চ্যুতিরহিত বিষ্ণুই ব্রহ্মণ্যদেব।

ঋক্‌বেদ বলেন যে এই বিষ্ণুর পরমপদ দিব্যসূরিগণ সর্ব্বদা দর্শন করিতেছেন।

"ওঁ তৎ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততং ওঁ তৎ বিষ্ণোঃ পরমং পদং।।"

এই ঋক্ মন্ত্র মূলে দৃশ্য, বিষয় বা শক্তিমৎতত্ত্বের একত্ব; দ্রষ্টা, আশ্রয় বা শক্তির বহুত্ব; এবং দর্শন ক্রিয়ার নিত্যত্ব সংস্থাপিত।

ব্রহ্মণ্যদেব কখনও অব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পূজিত হন না। শাস্ত্র বলেন—"নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ" পূজক এবং পূজ্য বস্তু সমজাতীয় না হইলে পূজা সিদ্ধ হয় না। পূজা করিতে হইলে পূজককে পূজ্যের সম্মুখে উপবিষ্ট হইতে হয় এবং ভূতশুদ্ধি ক্রিয়া দ্বারা স্ব-স্বরূপ ধ্যানপূর্ব্বক পূজায় নিযুক্ত হইতে হয়।
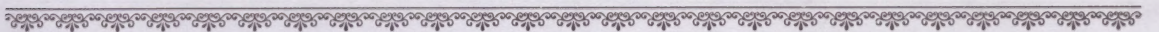
পূজ্য বস্তু দোতালায় এবং পূজক নিম্নতলায় থাকিলে সর্ব্বাঙ্গীন পরিচর্য্যা হইতে পারে না। পূজ্য বস্তু দিব্য বা অপ্রাকৃত থাকিয়া পূজক যদি ভূতপ্রেত স্থানীয় হয়, তবে পূজক পূজ্যকে ভূতপ্রেতরূপেই দর্শন করে এবং তদ্দ্বারা ভূতপ্রেতেরই পূজা সিদ্ধ হয় দিব্য বস্তুর পূজা হয় না। পূজ্যও পূজকে পরিমাণ গতভেদ থাকিবে ইহা স্বাভাবিক কিন্তু জাতীয়ত্বে কোন ভেদ নাই। পূজ্য ও পূজকের পরিমাণগত-ভেদ না থাকিলে পূজার কোনও সার্থকতা থাকিতে পারে না। আবার জাতীয়ত্বে সম না হইলে পূজার অধিকার লাভ অসম্ভব। সুতরাং বেদবাক্যের সিদ্ধান্ত এই যে—পূজক ও পূজ্য সমজাতীয় অর্থাৎ উভয়েই দিব্য বা অপ্রাকৃত বস্তু। পূজ্য বিভু বস্তু সুতরাং পূজকের বিষয়; পূজক অণুবস্তু সুতরাং বিষয়ের আশ্রিত বা অধীনতত্ত্ব; পূজারূপ ক্রিয়া নিত্য এবং পূজ্য পূজক ও পূজা ক্রিয়ার দিব্য সমন্বয়ে এক অদ্বয় জ্ঞান।

শূদ্র অর্থাৎ যিনি শোকে অভিভূত তাহার বিষয় মায়া বা জড়াধিষ্ঠাতৃদেবী। ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মজিজ্ঞাসা পরায়ণ বা সেবোন্মুখ তাঁহারই বিষয় ব্রহ্মণ্যদেব বা মায়াধীশ ভগবান।

জীব মাত্রই ব্রাহ্মণ। ‘‘সর্ব্বে ব্রহ্মজা ব্রাহ্মণাশ্চ’’ সকলেই ব্রহ্মা হইতে জাত সর্ব্বজীবেরই ব্রহ্মণ্যদেবের সেবায় অধিকার বলিয়া ব্রাহ্মণ। আবার সকলেই ব্রহ্মণ্যদেব হইতে উৎপন্ন বলিয়া ব্রাহ্মণ। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা জন্মনা ব্রাহ্মণোজ্ঞেয়ঃ। নৃমাত্রস্যাধিকারিতা। কারণ সকলকেই স্বরূপে ভগবদ্দাস আবার স্বরূপবিচারে আত্মায় সকলেই ব্রহ্মণ্যদেবের নিত্য উপাসক ব্রাহ্মণ। নিত্যস্বরূপবিস্মৃতিক্রমে জীবের দ্বিতীয় অভিনিবেশ উপস্থিত হইলে জীব শোকে অভিভূত হয়, তখনই তাহার শূদ্রপরিচয়। কিন্তু সুষুপ্তিকালেও যেমন প্রাণীমাত্রের চেতন ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যায় না, তদ্রূপ শোকাচ্ছন্ন জীব শূদ্র আখ্যা লাভ করিলেও তাহার নিত্যস্বরূপ গত ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম তিরোহিত হয় না। যে কালে জীব পুনরায় ব্রহ্মণ্যদেবে সেবোন্মুখবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া ব্রহ্মবিদ্ আচার্য্যের নিকট ব্রহ্মজিজ্ঞাসার জন্য উপনীত হন, তখন তিনি ‘ব্রাহ্মণ’ বলিয়া বিনির্দ্দিষ্ট হন।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ১।১৯।৪৮ শ্লোক আমাদিগকে ব্রহ্মণ্যদেবে প্রণতি শিক্ষা দিয়াছেন।

‘‘নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।’’

এই শ্লোকে প্রথমেই ‘নমস্’ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় এবং শেষেও দুইবার ‘নমস্’ শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রকারগণ ‘ন’ এই বর্ণকে নিষেধসূচক এবং ‘ম’ এই বর্ণ অহঙ্কার বাচক এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ ‘নমঃ’ শব্দ দ্বারা জীব যাবতীয় অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবানের শরণাপন্ন হন। শ্রীমদ্ভাগবত বদ্ধজীবের চতুর্ব্বিধ অহঙ্কারের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তৎ তৎ অহঙ্কারে অভিভূত হইলে জীব ব্রহ্মণ্যদেবের কৃপা গ্রহণে অসমর্থ হয়।

‘‘জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরং।।’’
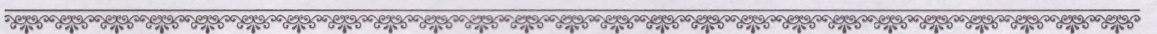
বদ্ধজীবের সর্ব্বপ্রথম অহঙ্কারই জন্মের অভিমান। জীব নিত্যস্বরূপ ভুলিয়া যখন দ্বিতীয় অভিনিবেশবশতঃ নিজকে রক্তমাংসের দেহ বলিয়া ধারণা করে, তখনই তাহার জন্মের অভিমান উপস্থিত হয়। এইরূপ অভিমান দৃপ্ত জীব সকলকে বেদ 'শূদ্র' ও ভাগবতে 'গোখর' আখ্যা প্রদান করেন। দ্বিতীয় অভিমান ঐশ্বর্য্যগত। 'ভগবানই একমাত্র ভোক্তা, সর্ব্বজীবই তাহার ভোগ্য'—এই সম্বন্ধ-জ্ঞান আচ্ছাদিত হইলেই ঐশ্বর্য্যগত অভিমানের উৎপত্তি। তৃতীয় অভিমান পাণ্ডিত্যের অভিমান। চতুর্থ সৌন্দর্য্যের অভিমান। এই চতুর্ব্বিধ অহঙ্কারই শূদ্র বা শোককারীর ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম—একমাত্র ব্রহ্মণ্যদেবের নিত্য সেবা বা আত্মধর্ম্ম ভক্তি। যথা কল্কিপুরাণে—

"যো ধর্ম্মো ব্রাহ্মণানাং হি সা ভক্তির্ম্মম পুষ্কলা।"

সুতরাং ব্রাহ্মণ এই চতুর্ব্বিধ অহঙ্কার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মণ্যদেবে প্রণত।

ব্রহ্মণ্যদেব পরম কৃপালু, উদার' বিগ্রহ, নিত্যসর্ব্বমঙ্গলকর বস্তুর শুভানুধ্যায়ী। তিনি সাধুজনের পালনকর্ত্তা, দুষ্কৃতিজনের বিনাশকারী। দুষ্কৃতিজনের প্রতি দণ্ডও তাঁহার ব্যতিরেক কৃপা। তিনি এইরূপে জগতের হিত করিয়া থাকেন। তিনিই শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর সর্ব্বকারণের কারণ। তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়পালক হৃষীকেশ বা গোবিন্দ। তিনিই জীবের পুনঃ পুনঃ প্রণম্য।

অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গৌরসুন্দর লোকশিক্ষার্থে শ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে শ্রীজগন্নাথদেবকে এই শ্লোক উচ্চারণপূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া জীবকুলকে প্রণিপাত শিক্ষা দিয়াছেন। আবার তৎপরে জীবের শুদ্ধস্বরূপ ও ভগবানের সহিত সম্বন্ধজ্ঞাপক শ্লোক উচ্চারণপূর্ব্বক বলিয়াছেন—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো।
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্ব্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দ্দাসদাসানুদাসঃ।।"

অর্থাৎ আমি শমদমাদি গুণসম্পন্ন সগুণ ব্রাহ্মণ নহি, আমি প্রজাপালক নরপতি বা ক্ষত্রিয় নহি, আমি গোবাণিজ্য কৃষ্যাদিবৃত্তিসম্পন্ন বৈশ্যও নহি, অথবা ত্রিবর্ণসেবক শূদ্রও নহি। কিংবা আমি ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বনচারী বা সন্ন্যাসীও নহি। আমি একমাত্র সর্ব্বেশ্বর গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের দাসানুদাস।

ভগবদ্ভক্ত কৃষ্ণদাস শুদ্ধজীবাত্মা। তিনি প্রকৃত বর্ণ বা আশ্রমের অন্তর্গত নহেন। যাঁহার আত্মাপ্রবুদ্ধ, যিনি সেবোন্মুখ বা সেবারত তিনি নির্গুণ ব্রাহ্মণ অথবা তাহার নির্গুণ ব্রহ্মণ্যের চরম পরিণত ভক্তাবস্থা। ভক্তে যাহারা ব্রাহ্মণতার অভাব দর্শন করেন, যাহারা লক্ষ মুদ্রায় সহস্র সহস্র অভাব দেখিতে প্রয়াসী, তাহারা মাৎসর্য্যপরায়ণ নাস্তিক।

"তমেব' ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।"

চিদচিদীশ্বরের পরস্পর সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ প্রজ্ঞা অর্থাৎ প্রেম-ভক্তির যাজন করিবেন। অব্রাহ্মণে ভক্তিবৃত্তি উদিত হয় না। শূদ্র বা শোকাচ্ছন্ন জীবে যে মিছাভক্তি দৃষ্ট হয়, তাহা মায়িক অনিত্য বস্তুর প্রতি রাগ মাত্র, অধোক্ষজ ও অক্ষর বস্তুর প্রতি সেবাবৃত্তি নহে। এইজন্য বেদ পুনরায় বলেন—

"এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।"

হে গার্গি, সেই অক্ষর বস্তুর সহিত সম্বন্ধজ্ঞান বিশিষ্ট না হইয়া যে ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে সে কৃপণ অর্থাৎ শূদ্র।

আর যিনি অক্ষর বস্তুতে সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত তিনিই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতঃ উদিতশ্রদ্ধ হইলেই জীব ভক্তিপদবীতে অধিরূঢ় হন।

রাগ ও বিধি

ভগবদ্ভজনে দুইপ্রকার মার্গ পরিলক্ষিত হয়। একটীকে বিধিমার্গ ও অপরটীকে রাগমার্গ বলে। ইহাদিগকে কখনও কখনও যথাক্রমে মর্য্যাদামার্গ ও পুষ্টিমার্গ বলা হয়। যেখানে শাস্ত্র ও গুরু শাসনক্রমে কর্ত্তব্যজ্ঞানে ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্তির উন্মেষ হয়, তখন আমরা বৈধী ভক্তিতে শ্রদ্ধাযুক্ত হই। আর যখন শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার পরিকর সমূহের শৃঙ্গারাদি ভাবমাধুর্য্য শ্রবণে "ঐ ভাব আমার কি রূপে হইবে" এই লোভ উৎপন্ন হইলে শাস্ত্রযুক্তির ও শাসনের অপেক্ষা না করিয়াই আমাদের শ্রীকৃষ্ণভজনে লোভমূলা রুচি হয়, তখন আমাদের রাগানুগা ভক্তির উদয় হয়। যেখানে শাস্ত্র ও যুক্তির অপেক্ষা প্রবল, সেখানে উক্ত লোভোদ্গমের অবকাশ অল্প। লোভোৎপত্তি সম্বন্ধে শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ স্বয়ং নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতেধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্।।"

লোভোৎপত্তি জন্য শাস্ত্র আলোচনার আবশ্যক হয় না। স্বীয় যোগ্যাযোগ্যতা বিচার উত্থিত হয় না, কেবল লোভের বিষয় শ্রবণ বা দৃষ্টিগোচর হইলেই লোভ স্বয়ং উৎপন্ন হয়। "তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং।।" রাগমার্গের ভক্তি লাভ জন্য লোভই একমাত্র মূল্য। এই লোভ জীবের বহু ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি সাপেক্ষ। সংসারাবদ্ধ ভাব প্রবল থাকিতে ভজনে লোভ হয় না, ভোগেই লোভ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

বৈধমার্গে ঐশ্বর্য্য জ্ঞানই প্রবল। ইনি ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বনিয়ন্তা—এই বুদ্ধি হৃদয়ে এক সম্ভ্রম সঞ্জাত করে। এই সম্ভ্রমকেই ঐশ্বর্য্য জ্ঞান বলে। ইহা দ্বারা ভক্তের হৃদয়বর্ত্তী ভাবের শৈথিল্য সম্পাদিত হয়। ভাব শিথিলীকৃত হইলে সেবাদ্বারা ভগবান্ প্রীত হয়েন না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীভগবানের উক্তিতে আমরা লক্ষ্য করি—
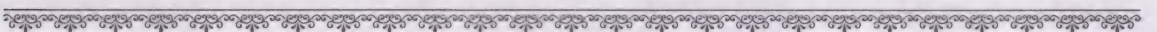
"সকল জগতে মোরে করে বিধিভক্তি।
বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি।।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত।।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধি ভজন করিয়া।
বৈকুণ্ঠকে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাঞা।।" (আদি ৩।১৫-১৭)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমভক্তিতেই প্রীত হয়েন। সেই প্রেমভক্তি পাইলে ভক্তগণ ঐ সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্য মুক্তির আদর করেন না, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সেবাসুখই চরম প্রাপ্য বলিয়া জানেন। এই প্রেমভক্তি রাগমার্গেই সাধ্য। শ্রীকৃষ্ণলীলার মাধুর্য্য কর্ত্তৃক রাগমার্গে রুচি সিদ্ধ হয়। এখানে ঐশ্বর্য্য জ্ঞানের স্থল নাই।

লোভোৎপত্তি জন্য শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা না থাকিলেও লোভনীয় তদ্ভাব পাইবার উপায় জানিবার জন্য শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা লক্ষিত হয়; কারণ শাস্ত্রবিধি দ্বারাই ও শাস্ত্র প্রতিপাদিত যুক্তি দ্বারাই ঐ উপায় প্রদর্শিত হয়। উদাহরণস্বরূপে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ উল্লেখ করিয়াছেন যে, যখন কোন ব্যক্তির দুগ্ধপানে লোভ জন্মে, তখন কিরূপে দুগ্ধ পাওয়া যাইবে তাহা জানিবার জন্য সে ব্যস্ত হয়। তখন কাহারও উপদেশের অপেক্ষা না রাখিয়া দুগ্ধ অপহরণাদি অবৈধ উপায় অবলম্বনে নিরত হয়, তখন তাহার দুগ্ধপ্রাপ্তিও দুর্ঘট হয়, অধিকন্তু তাহাকে দণ্ডভোগ করিয়া কষ্টও পাইতে হয়। সুতরাং এ বিষয়ে অভিজ্ঞ বিশ্বস্ত ব্যক্তির উপদেশের অপেক্ষা লক্ষিত হইতেছে। অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহাকে দুগ্ধবতীর লক্ষণাক্রান্তা গাভী ক্রয় করিয়া তাহাকে আনয়ন, তৃণাদি প্রদান ও গোদোহনের প্রণালী প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া তাহার দুগ্ধপানের কামনা পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করিয়া দেন। কেবলমাত্র সঞ্জাত-লোভের বলেই অভিজ্ঞের উপদেশ ব্যতিরেকে দুগ্ধ সংগৃহীত হয় না। সেইরূপ হরিভজনে লোভোৎপত্তি হইলে তাহার জন্য উপায় জানিতে শাস্ত্রোপদেশের ও সাধু-গুরু পদাশ্রয়ের অপেক্ষা দৃষ্ট হয়। সাধুবর্ত্মানু- বর্ত্তন একান্ত আবশ্যক, তদুল্লঙ্ঘনে হরিভজনোপায় জানা যায় না। কোন কোন ব্যক্তি সাধুমার্গ উল্লঙ্ঘন করিয়া আমার অনুরাগ হইয়াছে পরিচয় দিয়া নূতন নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়া ও তদ্দ্বারা প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন-তৎপর হইয়া অনুগত লোক দিয়া তিনি সিদ্ধ এই কথা প্রচার করিয়া অসতর্ক লোকগুলিকে ভ্রান্তপথে পরিচালন করেন। জড়দেহে স্ত্রীলোকের সজ্জা পরিয়া ভজন-প্রণালীকে উদাহরণ স্বরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারি। এইরূপ সন্মার্গের উল্লঙ্ঘনকারীকে লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রে উপদেশ দিয়াছেন—

"শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিপঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কেবলং।।"

ঐকান্তিকী হরিভক্তি উৎপাতের হেতু—এ কিরূপ, কথা শাস্ত্র আদেশ করিলেন? তবে চাই কি? ঐকান্তিকী হরিভক্তিই ত প্রার্থনীয় বস্তু! এই শ্লোকের উদ্দিষ্ট মর্ম্ম এই যে যদি কেহ শাস্ত্রশাসন না মানিয়া লোভেই প্রবৃত্ত হইয়া শুদ্ধ- ভজনপ্রণালী উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক নূতন প্রণালী অবলম্বন ও প্রবর্ত্তন করেন, তাহা হইলে তাহার ফল

স্বরূপ উৎপাতই লভ্য; হরিভক্তি পাওয়া যায় না। ইহা আমাদের নিজের যুক্তি নহে, রাগাত্মিকা ভক্তির রসাচার্য্য স্বয়ং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ এইরূপ হঠাৎ ভক্তগণকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। যাঁহারা গৌড়ীয় সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের উপদেশ লঙ্ঘন করিয়া ''আমার মত স্বতন্ত্র'' এরূপ বুদ্ধি পোষণ করিতে পারেন না। যাঁহারা তাহা করেন, তাঁহারা গৌড়ীয় ভক্ত নহেন, আর চারি সৎ সম্প্রদায়ের তাঁহারা কেহই নহেন। সুতরাং তাঁহারা ভক্তই নহেন কেননা সম্প্রদায় ভিন্ন শুদ্ধভক্ত নাই, ''সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।'' শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে স্পষ্টই বলিয়াছেন—

''সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ।।''

লোভনীয়ভাবলাভাকাঙ্ক্ষিব্যক্তি রাগমার্গে ব্রজবাসিগণের অর্থাৎ শুদ্ধ মধুর রসের উপাসকবৃন্দের অনুসরণে সাধকরূপে এমন কি সিদ্ধাবস্থায় ও সেবারত হইবেন, স্বয়ং প্রণালী উদ্ভাবন করিবেন না। আবার বলিয়াছেন—

''শ্রবণোৎকীর্ত্তনাদীনি বৈধীভক্ত্যুদিতানি তু।
যান্যঙ্গানি চ তান্যত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ।।''

বৈধীভক্তিতে শ্রবণকীর্ত্তনাদি যে যে অঙ্গ উক্ত হইয়াছে, সেগুলি এই রাগভক্তিতেও অঙ্গ বলিয়া সুধীগণ জানিবেন। ইহা রূপানুগ ভজন প্রণালীর মূল কথা। ইহা উল্লঙ্ঘন করিয়া যে রাগ দেখান হয়, তাহা অনুরাগের বিষয় নহে, ভগবদ্বিরাগেরই লক্ষণ।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন এ লোভবিশিষ্ট ভক্তের কোন শাস্ত্র অপেক্ষণীয়, তাহা হইলে তিনি জানিয়া রাখুন সকল উপনিষদের সারভূত শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণই ঐ শাস্ত্র এবং তৎপ্রতিপাদিত ভক্তি যাহাতে সম্যক বিবৃত হইয়াছে, সেই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি তদুপকারক গ্রন্থ সকলও তাদৃশ ভক্তের অপেক্ষণীয় শাস্ত্র।

রাগানুগ ভজন হইতে রাগাত্মিকা ভক্তির পুষ্টি। তাঁহার সূত্রস্বরূপে শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

''কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজ সমীহিতং।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা।।''

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ এখানে টীকা করিয়াছেন,—প্রেষ্ঠ বা প্রিয়তম শব্দের অর্থ নিজভাবোচিত লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণ। নিজ সমীহিতজন অর্থে স্বাভিলষণীয় শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী ললিতা, বিশাখা, রূপমঞ্জরী প্রভৃতি। যদিও শ্রীকৃষ্ণই প্রেষ্ঠ, তথাপি তদীয় প্রিয়জনের উজ্জ্বলভাবে একান্ত নিষ্ঠা বলিয়া তদীয় প্রিয়জনই অধিক স্বাভিলষণীয়। ব্রজেবাস অর্থে অসামর্থ্যে মানসবাস।

মূলকথা ভজনমার্গই আনুগত্য ধর্ম্ম-সংবলিত। সাধুমার্গ ও শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিলে আনুগত্য ধর্ম্মের ব্যত্যয় ঘটে। সুতরাং স্বপ্রণালী-প্রবর্ত্তনশীল কখনও ভক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। সাধুগণ সাবধান! ইহাদের কবল হইতে আত্মরক্ষা সর্ব্বপ্রযত্নে কর্ত্তব্য।

বর্ণাভিমান

একদা মহাত্মা রাজর্ষি জনক ঋষভ-নন্দন নবযোগেন্দ্রদিগকে নিম্নলিখিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

"ভগবন্তং হরিং প্রায়ো ন ভজন্ত্যাত্মবিত্তমাঃ।
তেষামশান্তকামানাং কা নিষ্ঠাঽবিজিতাত্মনাং।।"

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৫।১)

হে ঋষিবর্গ! আপনারা আত্মবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আপনাদিগকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি, কৃপাপূর্ব্বক উত্তর দান করুন্—যে সকল অবিজিতাত্মা অশান্তকাম জীব ভগবান্ শ্রীহরির ভজনা না করে, তাহাদের কি গতি হইয়া থাকে?

শ্রীচমস্ উবাচ—

"মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্ব্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্।।"

নবযোগেন্দ্রগণের অন্যতম শ্রীচমস্ ঋষি তদুত্তরে বলিলেন—রাজন্! স্বীয় জনক গুরুরূপী ভগবানের সেবা পরিত্যাগ করাতে তাহাদের যে দুর্গতি হইয়াছে, তাহা বলিতেছি। তাহারা স্বধাম হইতে বিচ্যুত হইয়া চারিবর্ণ ও চারি আশ্রমরূপ উপাধি-সহ মর্ত্ত্যলোকে পতিত হইয়াছে। ঐ সকল উপাধি দ্বারা তাহাদের নিত্য- স্বরূপ আচ্ছাদিত হইয়াছে; কারণ, সে সকল তাহাদের নিত্যস্বরূপগত উপাধি নহে। নিত্যস্বরূপে জীব ভগবানের নিত্যদাস ব্যতীত আর কিছু নহেন। ভগবদ্ধাম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মায়িক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলে কারাগাররক্ষত্রিয়ী মায়া অপরাধের তারতম্য-অনুসারে এক এক জনকে এক একটী বেশ পরাইয়া দিয়া থাকেন। পরমপুরুষ ভগবানের মুখ হইতে নিঃসৃত ভগবদ্‌বিমুখ জীব প্রাকৃত মিশ্রসত্ত্বগুণ আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মণবর্ণ, বাহু হইতে উৎপন্ন ভগবদ্‌বিমুখ জীব সত্ত্বরজোগুণান্বিত হইয়া ক্ষত্রিয় বর্ণ, উরু হইতে নির্গত হরিবিমুখ জীব রজস্তমো- গুণান্বিত হইয়া বৈশ্য বর্ণ এবং পাদদেশ হইতে বহির্গত সেবাবিমুখ জীব তমোগুণ আশ্রয় করিয়া জগতে শূদ্রবর্ণরূপে পরিচয় লাভ করিয়াছে। এই শ্লোকের শ্রীধর স্বামিপাদ ও শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকা দ্রষ্টব্য।

অতএব দেখা যাইতেছে, প্রাকৃত জগতে ব্রাহ্মণ বর্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা বা মর্য্যাদা থাকিলেও নিত্য রাজ্যে বা বাস্তব-বস্তুবিচারে তাহার কোনও মূল্য নাই। কারণ, প্রাকৃত ব্রাহ্মণরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বর্ণলাভও ভগবদ্‌বিমুখের
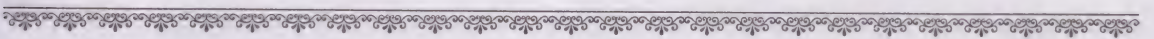
দণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীচমস মুনির উক্তি ও শ্রীগীতা চতুর্থ অধ্যায় ত্রয়োদশ শ্লোকে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের বাক্যে বিশেষ প্রমাণিত হইয়াছে। গুণকর্ম্ম- বিধানপূর্ব্বক বর্ণচতুষ্টয়ের সৃষ্টি ঈশ্বর কর্ত্তৃক সাধিত হইলেও তিনি হেতুকর্ত্তা নহেন, তিনি প্রয়োজক কর্ত্তা। জীব হেতুকর্ত্তা, জীবের স্বাতন্ত্র্যধর্ম্মের অপব্যবহারই ইহার কারণ। গৌরপার্ষদাগ্রগণ্য শ্রীজগদানন্দ বলিয়াছেন,—জীব

আমি সিদ্ধ কৃষ্ণদাস—এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হইয়া চিরদিন বুলে।।
কভু রাজা কভু প্রজা কভু বিপ্র শূদ্র।
কভু দুঃখী কভু সুখী কভু কীট ক্ষুদ্র।।

অতএব পতিত-অবস্থার উচ্চাবচ লইয়া বিচার আত্মজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিগণের কার্য্য নহে। পণ্ডিতগণ আত্মদর্শী—তাঁহারা বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালে, বৃহৎ হস্তিতে এবং ক্ষুদ্র কুক্কুরে সমদর্শনবিশিষ্ট। ভগবদ্‌বিমুখতা বশতঃ এক একটী জীব এক একটী বর্ণ বা এক একটি যোনি আশ্রয় করিয়া মর্ত্ত্য জগতে আসিয়াছে। কিন্তু সকলেই কারাগৃহে পতিত দণ্ড্যজীব। পশুজাতির নিকট যেরূপ সিংহ বিক্রমশালী বা হস্তী বৃহৎকায়বিশিষ্ট বলিয়া কুকুর হইতে অধিক সম্মান লাভ করিতে পারে, তদ্রূপ মনুয্যজাতির মধ্যে প্রাকৃত সত্ত্বগুণান্বিত হওয়ায় ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা বিচারিত হইলেও তাহা দেশকালপরিচ্ছিন্ন ব্যবহারিক বা সামাজিক সম্মান মাত্র। গুণ-লক্ষণোপেত বর্ণ পাওয়াও আবার দুর্ল্লভ। কারাগারে নিক্ষিপ্ত কোন এক ব্যক্তি স্বর্ণময় পিঞ্জরে স্বর্ণ-শৃঙ্খলেই বদ্ধ থাকুক, আর অন্য ব্যক্তি লৌহময় কারাগারে লৌহ-শৃঙ্খলেই আবদ্ধ থাকুক—উভয়েই কয়েদী, উভয়েই দণ্ডনীয় অপরাধী ব্যক্তি। কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের নিকট পাপ হইতে পুণ্যের শ্রেষ্ঠতা থাকিতে পারে, কিন্তু আত্মবিদ্‌গণের বিচারে উভয়েই সমজাতীয়, কারণ উভয়েই নশ্বরতাধর্ম্মযুক্ত। প্রাকৃত ব্রাহ্মণও পতিত বদ্ধজীব, আবার প্রাকৃত শূদ্রও তাহাই। আবার এই প্রাকৃত বর্ণ লইয়া দেহাত্মধী-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের যে বিবাদ তাহাও বৃথা, কারণ তৎ তৎ বর্ণ হইতে ইহ নশ্বর জীবনেই বিচ্যুত হইতে হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ।।"

শ্রীধরপাদ টীকায় লিখিয়াছেন—"এষাং মধ্যে যে অজ্ঞাত্বা ন ভজন্তি, যে চ জ্ঞাত্বাপি অবজানন্তি আত্মনঃ প্রভবো জন্ম যস্মাত্তং। স্থানাদ্বর্ণাদাশ্রমাচ্চ ভ্রষ্টাঃ।"

উক্ত বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে যাহারা সাক্ষাৎ আত্মপ্রভব অর্থাৎ যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহাকে না জানাহেতু ভজন করে না অথবা জানিয়াও অবজ্ঞা করে, তাহারা তদ্ তদ্ বর্ণাশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়।

"বিপ্রো রাজন্যবৈশ্যৌ বা হরেঃ প্রাপ্তাঃ পদান্তিকং।
শ্রৌতেন জন্মনাথাপি মুহ্যন্তি আম্নায়বাদিনঃ।।"

ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণ উপনয়ন-বেদাধ্যয়নরূপ শ্রৌত-জন্ম দ্বারা হরির পদান্তিকে তদ্ভজনরূপ উত্তমাধিকার প্রাপ্ত হইয়াও বেদের অর্থবাদে বিমূঢ় হইয়া কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত হইয়া পড়ে। ইহারা নশ্বর দেহসম্বন্ধীয় কর্ম্মময় স্মার্ত্ত আচার-পারিপাট্যকেই বহুমানন করিয়া তাহাকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাদিরূপে নির্দ্দেশ করে। কিন্তু শাস্ত্র বলেন, ভক্তিই একমাত্র আত্মবৃত্তি—ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, সর্ব্বজীবের ধর্ম্ম।

"যো ধর্ম্মো ব্রাহ্মণানাং হি সা ভক্তির্ম্মম পুষ্কলা।"

শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণাভিমানী জীবের দুরবস্থার কথা আরও বলিতেছেন—

"কর্ম্মণ্যকোবিদাস্তব্ধা মূর্খাঃ পণ্ডিতমানিনঃ।
বদন্তি চাটুকান্মূঢ়া যয়া মাধ্ব্যা গিরোৎসুকাঃ।।
রজসা ঘোরসংকল্পাঃ কামুকা অহিমন্যবঃ।
দাম্ভিকা মানিনঃ পাপা বিহসন্ত্যচ্যুতপ্রিয়ান্।।
শ্রিয়া বিভুত্যাভিজনেন বিদ্যয়া
ত্যাগেন রূপেণ বলেন কর্ম্মণা।
জাতস্ময়েনান্ধধিয়ঃ সহেশ্বরান্
সতোহবমন্যন্তি হরিপ্রিয়ান্ খলাঃ।।"

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৫।৬, ৭, ৯)

অর্থাৎ ঐ সকল বর্ণাবিমানী জীবগণ কোন্ কর্ম্ম করিলে বন্ধন-ক্ষয় হয় তাহা অবগত নহে, অথচ ভগবৎ-কর্ম্মপরায়ণ শুদ্ধভক্তগণকেও জিজ্ঞাসা করিতেও অপমান বোধ করে, কারণ তাহারা বর্ণাভিমানহেতু অনম্র, পণ্ডিতাভিমানী মূঢ় এবং আহার-বিহারাদি যে মধুর বাক্যে নিজেরা আমোদ পায় তাহাই আলোচনা করিয়া থাকে।

উহারা রজোগুণ-প্রভাবে মৎসর, কামুক, সর্পবৎ ক্রূর, দাম্ভিক, আত্মাভিমানী, পাপাত্মা, সুতরাং অচ্যুতপ্রিয় ভক্তগণকে উপহাস করিয়া থাকে।

সেই খলস্বভাব লোকেরা ধন, সম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য, জন, বিদ্যা, বচন, রূপ, বল ও কর্ম্মদ্বারা জাতগর্ব্বে অন্ধ হইয়া হরির সহিত হরিপ্রিয় সাধুগণের অবমাননা করে।

সুতরাং যে সকল চ্যুত-গোত্রীয়গণ প্রাকৃত বর্ণাভিমানী হইয়া বর্ণাতীত অচ্যুত- গোত্রীয় নির্গুণ ব্রাহ্মণগণের গুরু ভগবদ্ভক্তে ও তৎসঙ্গে ভগবানের অবমাননা করে, তাহারা শ্রীভগবানের স্বমুখোচ্চারিত—

মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোহভ্যসূয়কাঃ।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু।।

—এই বাক্যানুসারে অশুভযোনিতে পতিত হয়।

ভগবদ্ভক্তগণ কখনও অনিত্য প্রাকৃত বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হন না। তাঁহারা প্রাকৃত ব্রাহ্মণতা বা শূদ্রতা-রক্ষণে প্রয়াসী নহেন। তাঁহারা জানেন, ঐ সকল অভিমান পতনশীল শ্বশৃগালভক্ষ্য দেহের পরিচয় মাত্র। সুতরাং তাহারা প্রাকৃত ব্রাহ্মণ সাজিতে বা চিরকাল শূদ্র থাকিতে মনোযোগী নহেন। ভাগবতগণ জানেন যে অদ্বয়জ্ঞান পরমপুরুষ ভগবানের ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই ত্রিবিধ আবির্ভাব। নির্গুণ আত্মা বা সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট শুদ্ধজীবই ভগবানের সেবক। দেহ ও মন প্রাকৃত বস্তু এবং দেহিজীবের কারাগারস্বরূপ। সুতরাং ভজনপরায়ণ জীবে নির্গুণ ব্রাহ্মণত্ব ও যোগিত্বের অভাব নাই। বৈষ্ণব পরমহংসপুরুষ—সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট ব্রাহ্মণের শ্রীগুরুদেব সেই জন্যই ভাগবতগণ বৃহদারণ্যক শ্রুতির সহিত সমস্বরে বলিয়া থাকেন—

"তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।"

অর্থাৎ সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ প্রেমভক্তি যাজন করিবেন। ত্রিগুণ ব্রাহ্মণতাই বৈষ্ণবতার সোপান। সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত না হইলে অভিধেয় যাজন করা যায় না। ব্রাহ্মণ না হইলে বৈষ্ণব হওয়া যায় না।

আবার তাঁহারা ছান্দোগ্যোপনিষদে চতুর্থ প্রপাঠকের প্রথম খণ্ডে পৌত্রায়ণ জানশ্রুতি ও ব্রহ্মজ্ঞ রৈক্কঋষির উপাখ্যান ও চতুর্থ খণ্ডে হারিদ্রুম গৌতম ও জবালাতনয় সত্যকামের আখ্যায়িকাদ্বয়ের উপদেশের সারার্থ দর্শন করিয়া প্রাকৃত বর্ণের প্রতি আস্থাবান্ না হইয়া সম্বন্ধজ্ঞানময় ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়া হরিভজনে প্রবৃত্ত হন। শূদ্র কখনও ব্রাহ্মণ হইতে পারে না, অতদ্‌বস্তু কখনও তদ্‌বস্তুতে পরিণত হয় না—জড় কখনও চিৎ হয় না, প্রাকৃত বর্ণ কখনও অপ্রাকৃত বর্ণে রূপান্তরিত হয় না। চিদ্‌বস্তু নিত্যকালই চিৎ, নির্গুণ বস্তু চিরকালই নির্গুণ—একথা ভাগবতগণ উত্তমরূপে জানেন, তাই তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে বর্ণাশ্রমাতীত পরহংসপুরুষের নিকট সম্বন্ধজ্ঞানময় নির্গুণ ব্রাহ্মণতা লাভপূর্ব্বক, অভিধেয় ভগবদ্ভক্তি যাজন করিয়া জীবের পরম প্রয়োজন লাভের অধিকারী হন।

ভগবজ্ জ্ঞান

'জ্ঞান' শব্দে প্রতীতি, অনুভূতি ইত্যাদি। মানবগণে এই জ্ঞান সাক্ষাৎ, ব্যতিরেক ও অন্বয়-ভেদে ত্রিবিধ আকারে পরিদৃষ্ট হয়। ইন্দ্রিয়ই অভিভাবকরূপে যখন বস্তুর দ্রষ্টা হয় তখন তিনি সাক্ষাৎ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞানী। এই অবস্থায় নানাবিধ মায়িক বৈচিত্র্যে ইন্দ্রিয়গণ অনুরাগবিশিষ্ট হইয়া পুত্রকন্যাদি, বাড়ী-ঘর, টাকা-পয়সার প্রতি মমত্ব বুদ্ধি করিয়া তাহাদের ভোগের মালিক হন। ইহাই জীবের বদ্ধাভিমান বা স্বরূপ-বিস্মৃতি। এতাদৃশ কর্ম্মচক্রে প্রবিষ্ট হইয়া জীব নানা সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়া চলিতে থাকেন। আবার যখন বিষয়গুলি মরীচিকা-প্রায় অস্তিত্ববিহীন, কেবল ভ্রমের দ্বারা পুনঃ পুনঃ আমাদের প্রতারিত করিতেছে জানিতে পারেন, তখন ইন্দ্রিয়জ্ঞানের প্রতি হতশ্রদ্ধ হইয়া অপরোক্ষানুভূতির জন্য চেষ্টা করিতে গিয়া শরণাগতির অভাবে যুক্তিকে পুনঃ পুনঃ নিষ্পেষণ করিয়া ব্যতিরেকভাবে যে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার অভেদত্ব প্রতিপাদন চেষ্টা

করেন, তাহাতে ভগবান্ বাসুদেব নৃসিংহরূপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের সত্ত্বার বিনাশক হন। ইহা আমাদের বহুজন্মার্জ্জিত অপরাধের ফল বা হরি-বৈমুখ্যের পরাকাষ্ঠা। এতাদৃশ জ্ঞানীর ভগবানের নিরঙ্কুশ ইচ্ছাকে ধ্বংস মানসে যে সেবার ছলনা, তাহা কপটী পূতনার চিত্ত-বৃত্তি।

ঐন্দ্রিয়িক ও কেবলাদ্বৈত—এই উভয়বিধ জ্ঞান ছাড়া আর এক প্রকার জ্ঞান আছে; তাহা বিজ্ঞান-সমন্বিত ভক্তিযোগ-পরিভাবিত হৃদ্‌সরোজে উদিত। ইহাই ভগবৎসম্বন্ধি অদ্বয়-জ্ঞান। এই প্রতীতিতে এক অখণ্ড তত্ত্ব পূর্ণ পুরুষ বিদ্যমান এবং তাহাতে অপাশ্রিতরূপে মায়াতত্ত্ব। এতদুভয়ের সন্ধি-স্থলে 'জীব' বলিয়া আর একটী তত্ত্ব আছেন, তিনি ভগবৎ-মায়া দ্বারা সম্মোহিত হইয়া সংসারে ভ্রাম্যমাণ। আবার অধোক্ষজ কৃষ্ণে ভক্তিদ্বারা তাঁহার মায়া-নিষ্কৃতি। ইহাই নিখিল মানববৃন্দের গুরু শ্রীব্যাসদেবের সমাধিলব্ধ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-দর্শন বা ভগবানের অচিন্ত্যগুণ-জ্ঞান।

অনেক ভক্তাভিমানী বিচারবিহীন সিদ্ধান্তবিষয়ে অপটু হইয়া বলিয়া থাকেন—'মহাশয়, ভগবানকে ভক্তি করিতে হইবে—অত জ্ঞানের আবশ্যক কি? কে ভক্ত, কে অভক্ত, তাহা আমাদের জানিবার প্রয়োজন কি? যাঁহার শরীরে তিলক মালা দেখিব তিনিই বৈষ্ণব—তাঁহারই সেবা করা উচিত।' এই উক্তিতে তিনি ভাগবতের 'দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য' শ্লোকের প্রতি অনাদর করিয়া যে কাল্পনিক ভক্তির অনুষ্ঠান করিতেছেন তাহাতে তাহার মনের ধারণা—'ভক্তি' জিনিষটী মূর্খ-লোকের সম্পত্তি, মুখ কাচু মাচু করা, বকধার্ম্মিকতাই ইহার প্রধান অঙ্গ। আচ্ছা, আমরা জ্ঞানবিহীন হইয়া এক মুহূর্ত্তও কি চলিতে পারি? যখন আমি আছি, তখনই আমার প্রতীতি। হয়, যখন আমি বদ্ধ তখন আমার আমিত্বে জড় বুদ্ধি ও জাগতিক সমস্ত বস্তুতে ভোগ্য-বুদ্ধি বা সম্বন্ধজ্ঞানশূন্য জড় জ্ঞান; নয়ত, বিষয়গুলি হরিসম্বন্ধি ও নিজেকে হরিদাস-জ্ঞান। বস্তুর জড় ভাব পরিত্যক্ত হইলেই অপরোক্ষানুভূতি বা অপ্রাকৃত বুদ্ধি। আরও দেখুন, অর্জ্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণ- সারথ্যে রণ-ক্ষেত্রে উপস্থিত, তখন তাঁহার প্রথমে যুদ্ধ-সমুদ্যত যোদ্ধগণে আত্মীয় বুদ্ধিতে মোহাভিভূত বিষাদ। পরে যখন কৃষ্ণ তাঁহাকে আত্ম-অনাত্ম বিবেকের দ্বারা ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম ইত্যাদি তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়া আত্মস্বরূপ প্রদর্শন করাইলেন, তখন তাঁহার জ্ঞান দিব্যজ্ঞান হইল, ইহাই প্রকৃষ্ট দীক্ষা। তাঁহার যুদ্ধই ভগবজ্-জ্ঞানানুগত্য বা হরিদাস্য। নতুবা কেবল রাজ্যলোভে কামান্ধ হইয়া যুদ্ধ করিলে কি তিনি মঙ্গল লাভ করিতে পারিতেন?

তাহা হইলে দেখুন, প্রত্যেক ভক্তাভিমানীর দীক্ষার প্রয়োজন। 'দীক্ষা' মানে কেহ না বোঝেন, উপযুক্ত সময় কুলগুরু গৃহে আসিয়া কাণে ফুৎকার দিলেই দীক্ষা হইয়া যাইবে। দিব্যজ্ঞান লাভ ও পাপের সম্যক ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত দীক্ষা কার্য্য শেষ হয় না। এই অবস্থা পর্য্যন্ত দিব্যজ্ঞান-প্রদাতা সদ্‌গুরুর নিকট সম্বন্ধজ্ঞান-শ্রবণে মনোনিয়োগ করিতে হয়। শ্রীগুরুকৃপাবলে মন্ত্রের স্বরূপানুভূতি হইলেই ভগবানের সেবা আরম্ভ, নতুবা কেবল প্রাকৃত বিশ্বাসকে আশ্রয় করিয়া কনিষ্ঠাধিকারগত আঙ্গিক চেষ্টায় মনোনিবেশ করিলে কালে খুব প্রধান ভারবাহী এবং মূর্খ লোকের নিকট উচ্চ ভক্ত পদবী সংজ্ঞা পাইলেও উহা ভক্তি নহে। কর্ম্ম-চেষ্টা ও নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানকে সমূলে উৎপাটন না করিতে পারিলে শুদ্ধভক্তি-লাভের আশা সুদূরপরাহত। সাধন,

ভাব ও প্রেম-ভক্তির অবস্থাত্রয়মধ্যে কেবল ইন্দ্রিয়গত অনুষ্ঠানকে সাধন বলে—উহা চিরকালই ভাবের অনুগত; ভাবলাভ ব্যতীত সাধন কেবল পণ্ডশ্রম। ভাব আবার প্রেমের অধীন হইয়া যখন সিদ্ধরস প্রকটিত করায়, তখনই উহা স্বরূপসিদ্ধি আখ্যা লাভ করে। সাধন ও ভাব কখন কখন বিকৃতভাবে যে আভাসরূপে পরিচয় দিবার চেষ্টা করে তাহাই কর্ম্ম ও জ্ঞান নামে কথিত হয়। যদিও ভক্তি নিরুপাধি বা কেবলা—উহার কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাই, তথাপি সাধন-অবস্থায় শুদ্ধ জ্ঞানকে অঙ্গীভূত না করিলে ভক্তি- রাজ্যে প্রবেশ লাভ ঘটে না; আবার রহস্য এই যে, বদ্ধজীবে দেহ, মন, আত্মায় যে ভেদ, সম্পূর্ণ আত্মধর্ম্মের বিকাশে দেহ ও মন আত্মার অতিবশ্যত্বপ্রযুক্ত তাহাদের ক্রিয়ার পৃথক স্থিতি হয় না। ভক্তি-ভেদ, ভক্ত-ভেদ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির পার্থক্য, দেহ, মন ও আত্মবিষয়ে অভিজ্ঞান না হইলে ভক্তির সাধন কি রূপে হইবে, বোঝা যায় না।

বিচার-অভাবে দেহকেই 'আমি' বুদ্ধি, কর্ম্মকেই ভক্তি, ভোগকেই প্রেম আখ্যা দিয়া যে অনভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, তাহার ফলে অধুনা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তির অসহযোগে একদম সিদ্ধপ্রণালী-প্রদান, বাহ্যদেহের উপর সখীবেশ-প্রদান, শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গকে নাগরভাবে উপাসনা ইত্যাদি নানাবিধ কু-মত উদ্ভাবিত হইয়াছে। উহা ভক্তিপথের পথিকগণের কণ্টকস্বরূপ—সত্য-প্রাপ্তির অন্তরায়। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সুষ্ঠুতাপ্রাপ্ত না হইলে স্মরণের সম্ভব নাই। সম্বন্ধজ্ঞান-অভাবে বৃথা কাল্পনিক চেষ্টাসমূহে জড়ভাবই লভ্য। শুদ্ধ জ্ঞানকে অনাদর করিয়া ভক্তির যে চেষ্টা, উহা বিড়ম্বনামাত্র। শুদ্ধজ্ঞান কদাপি ঘৃণার্হ নহে। জীবের স্বরূপই জ্ঞান এবং উহার বৃত্তিই ভক্তি। দুর্ভাগ্যবশতঃ স্বরূপে অবস্থিত হইয়া যিনি সেবা পান না তাদৃশ মূঢ় নির্ব্বিশেষ চিন্তা আমাদের সর্ব্বতোভাবে পরিহার করা কর্ত্তব্য। যে অশেষ-করুণাবারিধির উদ্বেল তরঙ্গ শ্রীগৌড়ীয়ের চিত্ত ভক্তিরসপূর্ণ করিয়াছেন, যিনি সেই রস জগদ্বাসীকে পান করাইবার জন্য বিষয়বিমূঢ় মোহগর্ত্তে পতিত, সাক্ষাৎ জ্ঞানদ্বারা ভ্রমান্ধ ও নির্ব্বিশেষ জ্ঞানদ্বারা বঞ্চিতগণের হৃদয়ে অচিন্ত্য- ভেদাভেদ-জ্ঞান-বিকাশে ব্যস্ত আছেন, তিনিই দিব্য-জ্ঞান-প্রদাতা সদ্‌গুরু। তাঁহার চরণযুগলই শ্রীগৌড়ীয়ের নিত্য আরাধ্য।

ভগবৎ প্রসাদ

প্রসাদ শব্দের অর্থ অভিধানে অনেক প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে অনুগ্রহ ও ভুক্তাবশিষ্টও বটে। ভগবৎ প্রসাদ অর্থে ভগবানের অনুগ্রহ কিম্বা তাঁহার ভুক্তাবশিষ্ট। ভগবৎ প্রসাদ বলিলে, তত্ত্ববিচারে, ভগবানের কেবল অনুগ্রহ ও তাঁহার ভুক্তাবশিষ্ট একই বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া থাকে। ভগবান্ জীবের প্রতি করুণা করিয়া কখনও গুরুরূপে, কখনও সাধুরূপে, কখনও নামরূপে, কখনও শাস্ত্ররূপে আবার কখনও প্রসাদরূপে জীবকুলকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। যেমন নামের সেবা করিতে করিতে নামই স্বয়ং নামসাধকের নিকট নিজ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রকটিত হন, সেইরূপে প্রসাদের সেবা করিতে করিতে অর্থাৎ শ্রীভগবানের প্রসাদ প্রতিদিন সেবন করিতে করিতে প্রসাদের কৃপায় শ্রীভগবান্ স্বয়ং প্রসাদ-সেবকের নিকট প্রকাশিত হন। ভগবানকে পাইবার যাহাদের ইচ্ছা আছে, তাহাদিগের অন্য কোনও সাধনের বিশেষ প্রয়োজন নাই।

মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। কেবলমাত্র মহাপ্রসাদ ও মহামহাপ্রসাদ সেবনই ভগবানকে পাইবার একমাত্র সহজ উপায়। ভগবানের প্রসাদকে মহাপ্রসাদ এবং বৈষ্ণবের ভুক্তাবশেষকে মহামহাপ্রসাদ বলে। যথা—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্য ১৬শ পরিচ্ছেদে—

কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।
ভক্তশেষ হৈলে মহামহাপ্রসাদাখ্যান।।

একমাত্র প্রসাদ ভক্ষণের দ্বারাই যে ভগবানের কৃপা লাভ হয় এবং তাঁহাকে পাওয়া যায় তাহা মুখে বলিলে, তাহা প্রবন্ধে লিখিয়া প্রকাশ করিলে বোধ হয় অনেকেরই বিশ্বাস না হইতে পারে, কিন্তু শাস্ত্র ও সাধুমুখে শুনিয়াছি যে প্রসাদ—সেবাতেই ভগবানকে পাওয়া যায় এবং আমারও দৃঢ় বিশ্বাস যে যদি কেহ এ- বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখেন অর্থাৎ কিছুদিন প্রসাদ ভক্ষণ করেন, তবেই প্রসাদের কি গুণ তাহা বেশ বুঝিতে পারিবেন। রসগোল্লার কিরূপ আস্বাদন, নিরামিষ সাত্ত্বিক দ্রব্যের কিরূপ উপকারিতা, নিজে খাইয়া না দেখিলে কেমন করিয়া দ্রব্যের আস্বাদন ও গুণাগুণ বুঝিতে পারা যাইবে?

শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামির জ্ঞাতি খুড়া কালিদাস নামক এক ব্যক্তি কেবল বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণের দ্বারাই অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গদেবের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যখন যেখানে কোনও বৈষ্ণব আছেন শুনিতেন তখন তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহাহর প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। যদি তিনি প্রসাদ দিতে অস্বীকার করিতেন, তবে কালিদাস লুকাইয়াও তাঁহার প্রসাদ সেবা করিতেন। যথা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্য, ১৬শ পরিচ্ছেদে—

"রঘুনাথ দাসের তিহঁ হয় জ্ঞাতি খুড়া।
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খাইতে তেহঁ হৈল বুড়া।।
গৌড়দেশে হয় যত বৈষ্ণবের গণ।
সবার উচ্ছিষ্ট তেহঁ করিলা ভোজন।।"

তিনি ব্রাহ্মণ বা শূদ্রকুলোদ্ভব বৈষ্ণব, কালিদাস তাহার কিছু বিচার করিতেন না; বৈষ্ণব হইলেই তাঁহার প্রসাদ ভক্ষণ করিতেন। অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের আবার প্রাকৃত জাতি বিচার আছে তাহা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না; কারণ তিনি জানিতেন যিনি জাত্যভিমান পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে ভগবানের সেবা করেন, তিনিই বৈষ্ণব এবং তিনিই সর্ব্ববর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ। যাহারা কৃষ্ণের অভক্ত তাহারা কেহ শূদ্র কেহ বা শূদ্রাধম শ্বপচ মধ্যে গণ্য। শাস্ত্রও বলেন, যথা—

"নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য।।
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার।।"

একদিবস এই কালিদাস শুনিলেন যে ঝড়ু ঠাকুর নামে একজন পরম বৈষ্ণব সেইখানে বাস করেন, কিন্তু তিনি কখনও তাঁহার প্রসাদ পান নাই। এই ঝড়ু ঠাকুর ভূমিমালি বংশীয় হইতে উৎপন্ন হওয়ায় কালিদাস তাঁহার নিকটে যাইয়া ও কতকগুলি আম ভেট দিয়া সেই ঝড়ু ঠাকুরের ও তাঁহার পত্নীর শ্রীচরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। ঝড়ু ঠাকুরও তাঁহার পত্নীসহ কালিদাসের বহু সম্মান করিয়া তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ ইষ্টগোষ্ঠী করিলেন। কালিদাস বলিলেন আমি অদ্য আপনার এখানে প্রসাদ পাইতে ইচ্ছা করি। কিন্তু ঝড়ু ঠাকুর আপনাকে অতি নীচ কুলোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দিয়া বলিলেন—তিনি নিকটস্থ কোনও ব্রাহ্মণের বাটীতে তাঁহার প্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। বৈষ্ণব সর্ব্বদাই আপনাকে নীচ দেখেন। আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে মান। তাই ঝড়ু ঠাকুরও কালিদাসের নিকট আপনাকে নীচ জাতি বলিয়া পরিচয় দিলেন। কালিদাস বলিলেন আমার এক বাঞ্ছা হয় যে, আপনি আমার শিরে একবার আপনার শ্রীচরণযুগল ধারণ করেন এবং আমাকে আপনার পদধূলি দেন। ঝড়ু ঠাকুর বলিলেন আমি অতি নীচ, আপনি আভিজাত্য বিশিষ্ট সজ্জন, আমাকে আপনার ও কথা বলা উচিত নহে। কালিদাস একটী শ্লোক পড়িয়া তাঁহাকে শুনাইলেন— যথা, হরিভক্তিবিলাসে—

ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং সচ পূজ্যো যথা হ্যহং।।

চতুর্ব্বেদী অর্থাৎ চৌবে ব্রাহ্মণ হইলেই ভক্ত হয়, এরূপ নহে। আমার ভক্ত চণ্ডাল হইলেও আমার প্রিয়, ভক্তই যথার্থ দানপাত্র এবং গ্রহণ পাত্র। ভক্ত আমার ন্যায় পূজ্য।

শ্লোক শুনিয়া ঝড়ু ঠাকুর বলিলেন—এই শাস্ত্র বাক্য মিথ্যা নহে; যিনি কৃষ্ণভক্ত তিনি নীচ নহেন। কিন্তু আমি নীচ আমাতে কৃষ্ণভক্তির লেশমাত্রও নাই। কালিদাস তাহাকে নমস্কার করিয়া বিদায় মাগিলেন; ঝড়ু ঠাকুরও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিছু দূর গমন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। কালিদাস কিছু দূরে একস্থানে লুকাইয়া রহিলেন। ঝড়ু ঠাকুর সেই আম্রগুলি ভগবানে নিবেদন করিয়া তাঁহার পত্নীসহ সেই আম্রপ্রসাদ গ্রহণানন্তর আঁঠি ও খোসা বাহিরে উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন। পরে কালিদাস যে স্থানে ঝড়ু ঠাকুরের পদচিহ্ন পড়িয়াছিল সেই স্থানের ধূলী সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া উচ্ছিষ্ট গর্ত্ত হইতে সেই আম্র আঁঠিগুলিও খোসাদি যত্ন করিয়া তুলিয়া পরমানন্দে চুষিতে লাগিলেন এবং চুষিতে চুষিতে প্রেমের উল্লাসে নৃত্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে কালিদাস গৌড়দেশে যত বৈষ্ণব বাস করিতেন সকলের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াছিলেন। এই কালিদাস যে দিন নীলাচলে আসিয়াছিলেন, মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি কৃপা করিয়াছিলেন। যথা, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে অন্ত্য ১৬শ পরিচ্ছেদে—

"এই মত যত বৈষ্ণব বৈসে গৌড়-দেশে।
কালিদাস ঐছে সবার নিল অবশেষে।।
সেই কালিদাস যবে নীলাচলে আইলা।
মহাপ্রভু তার উপর মহা কৃপা কৈলা।।"

ভগবানের দৈবী মায়া জয় করিতে হইলে তাঁহার আশ্রয় কিম্বা তাঁহার প্রসাদ সেবা বিশেষ প্রয়োজন। যিনি নিত্য অগ্রে ফল মূল অন্ন মিষ্টান্নাদি শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়া শেষে সেই প্রসাদ গ্রহণ করেন, তিনিই মায়াকে জয় করিতে পারেন। যথা, শরণাগতিতে—

"যুগল মূর্ত্তি, দেখিয়া মোর,
পরম আনন্দ হয়।
প্রসাদ সেবা, করিতে হয়,
সকল প্রপঞ্চ জয়।।"

এইরূপ পরমকল্যাণপ্রদ মহাপ্রসাদে যে সকল ব্যক্তির বিশ্বাস জন্মে নাই, তাহারা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যশালী; মহাপ্রসাদে অবিশ্বাস ও অনাদর জন্য তাহাদের সকল সাধন ভজন পণ্ড হইয়া যায়। শাস্ত্র বলেন যথা, পাদ্মে—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে।।

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে, নাম ব্রহ্মে ও বৈষ্ণবে যাহাদিগের স্বল্পপুণ্য, হে রাজন্, তাহাদিগের কিছুতেই বিশ্বাস জন্মে না।

যদি সৌভাগ্যক্রমে মহাপ্রসাদ আমাদের কাহারও নিকট আগমন করেন, তবে কালাকালের কোনও বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার সম্মান করা কর্ত্তব্য। একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার ভক্তগণ সঙ্গে অতি প্রত্যুষে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং ভট্টাচার্য্যেও সেই সময়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিয়া জাগিয়া উঠিলেন মহাপ্রভু তাঁহার হস্তে কিছু প্রসাদান্ন দিলেন, ভট্টাচার্য্য কালাকালের বিচার না করিয়া মহা আনন্দিত হইয়া সেই প্রসাদ ভক্ষণ করতঃ নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটী পাঠ করিলেন যথা, পাদ্মে—

শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা।। ১।।
ন দেশ নিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ।। ২।।

মহাপ্রসাদ শুষ্কই হউক, পর্য্যুষিতই হউক বা দূরদেশ হইতে আনীত হউক, প্রদত্ত মাত্রে ভক্ষণ করাই বিধি, ইহাতে কাল বিচারের প্রয়োজন নাই। শ্রীকৃষ্ণের অন্নপ্রসাদ প্রাপ্তমাত্রে শিষ্ট লোক ভোজন করিবেন, ইহাতে দেশ ও কালের কোন নিয়ম নাই। ভগবান্ এই আজ্ঞা করিয়াছেন। ভট্টাচার্য্যের প্রসাদ গ্রহণে মহাপ্রভু অতিশয় আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীভগবানে কোনও দ্রব্য নিবেদিত হইলে তাঁহার কৃপায় তাহা অমৃত হইয়া যায়, তখন সেই বস্তুর জড়গুণ লোপ পায় এবং উহা অপ্রাকৃত গুণ ধারণ করে। ভগবানকে

কোনও বস্তু নিবেদন করিয়া খাইলে সেই প্রসাদে যুগপৎ শরীর রক্ষা ও ভগবানে ভক্তি বৃদ্ধি পাইবে। ভক্ত মহারাজ প্রহ্লাদ ভগবানে পিতৃপ্রদত্ত বিষ নিবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু ভগবানের কৃপায় সেই বিষও অমৃত হইয়াছিল। ইহাই ভগবানের অলৌকিক শক্তির পরিচয় এবং তাঁহার ভক্তবৎসলতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থল। ভক্তই এই সকল রহস্য বেশ বুঝিতে পারেন। এই সকল বিষয় অভক্তের বোধগম্য নহে। ভগবান্ গীতাতে অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, ওহে অর্জ্জুন! আমার ভক্ত পত্র, পুষ্প, ফল, জল যাহা কিছু ভক্তির সহিত আমাকে অর্পণ করিয়া থাকে, তাহা আমি সাদরে গ্রহণ করি। যথা—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।।

(গীতা ৯ অঃ ২৬ শ্লোক)

প্রযতাত্মা ভক্তসকল আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল, জল যাহা যাহা দেন, তাহা আমি অত্যন্ত স্নেহপূর্ব্বক স্বীকার করি। দেবতান্তর উপাসকগণ অনেক আয়াসপূর্ব্বক বহু সম্ভার দ্বারা আমাকে কেবল তাৎকালিক শ্রদ্ধা সহকারে যে সকল পূজা করে আমি তাহা গ্রহণ করি না। যে হেতু তাহারা কেবল কোন উপরোধ ক্রমে আমার পূজা করিয়া থাকে। সুতরাং ভগবানকে প্রত্যেকের সাধ্যমত পবিত্র সাত্ত্বিক উৎকৃষ্ট খাদ্যাদি প্রদান করাই উচিত। তিনি ভক্তের হৃদয়ভাবই দেখেন, বিদ্যাবুদ্ধি কি জাতি ধনাদির দিকে লক্ষ্য করেন না। মূর্খ ব্যক্তিও যদি সরলান্তঃকরণে ''বিষ্ণায় নমঃ" বলিয়া ভগবানে সামান্য খাদ্যাদি অর্পণ করে তাহাও ভগবান্ পরম সমাদরে গ্রহণ করেন কিন্তু কোন জাত্যভিমানী, কুলীন, পণ্ডিত কি ধনী দম্ভ সহকারে প্রচুর পরিমাণে অতি উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি লইয়া ''বিষ্ণবে নমঃ" বলিয়াও ভগবানে নিবেদন করে, তাহাও ভগবান্ গ্রহণ করেন না, কারণ তিনি ভাবগ্রাহী, ভক্তের হৃদয়টী সরল কি কুটিল তাহাই তিনি অগ্রে অবলোকন করেন, পরে বৈভবশূন্য ভক্তেরই সামান্য তণ্ডুলকণাও গ্রহণ করিয়া থাকেন। যথা—

মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে।
উভয়োস্তু সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ।।

মূর্খ ব্যক্তি ''বিষ্ণায় নমঃ" বলে, ধীর ব্যক্তি ''বিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া থাকে; কিন্তু পুণ্য উভয়েরই তুল্য; কারণ জনার্দ্দন ভাবগ্রাহী।

অনেকের ধারণা মহাপ্রসাদ কেবল শ্রীক্ষেত্রেই পাওয়া যায়; কারণ যাহা জগন্নাথদেবের প্রসাদ, তাহাই মহাপ্রসাদ। কিন্তু তাহা ভুল; যাহা ভগবানে অর্পিত হয়, তাহাই মহাপ্রসাদ। ভগবানে যেখানে যাহা নিবেদন করেন, তাহাই মহা- প্রসাদ। সুতরাং আমরা যাহা আহার করি, তাহা অগ্রে ভগবানে অর্পণ করিয়া পশ্চাতে সেই প্রসাদ সেবন করাই উচিত। যদি আমরা পবিত্রভাবে সাত্ত্বিক খাদ্য দ্রব্যাদি ভগবানের শ্রীমূর্ত্তির অগ্রে স্থাপন করিয়া নিম্নলিখিতভাবে কাতর প্রাণে তাঁহাকে নিবেদন করি, তবে তিনি নিশ্চয়ই সেই দ্রব্যগুলি সাদরে স্বীকার করিবেন এবং উহাই মহাপ্রসাদ হইবে। যথা নৈবেদ্যার্পণে বিজ্ঞপ্তি—

যা প্রীতিবিদুরার্পিতে মুররিপোঃ কুন্ত্যর্পিতে যাদৃশী
যা গোবর্দ্ধনমূর্দ্ধি যা চ পৃথুকে স্তন্যে যশোদার্পিতে।
যা বা তে মুনিভাবিনী বিনিহিতেঽন্নেঽত্রাপি তামর্পয়।।

যে মুররিপো! বিদুরার্পিত অন্নে তোমার যে প্রীতি, কুন্তীদত্ত অন্নে যে তোমার প্রীতি, শ্রীদামের চিপিটকে তোমার যে প্রীতি, যশোদার্পিত স্তনদুগ্ধে তোমার যে প্রীতি, ভরদ্বাজ সমর্পিত অন্নে তোমার যে প্রীতি, সবরিকাদত্ত অন্নে তোমার যে প্রীতি, ব্রজাঙ্গনাদিগের অধরে তোমার যে প্রীতি এবং মুনিপত্নীদিগের অর্পিত অন্নে তোমার যে প্রীতি, সেই প্রীতি এই অন্নের প্রতিই অর্পণ কর।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট প্রচারক শ্রীপাদ রূপ গোস্বামি প্রভু তাঁহার "শ্রীউপদেশামৃত" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে—বাক্য, মন, ক্রোধ, জিহ্বা, উদর এবং উপস্থ—এই ছয়টীর বেগ ভক্তির অতিশয় প্রতিকূল। এই জিহ্বাবেগ দমনের সহজ উপায় একমাত্র প্রসাদ সেবা। এই জন্য ভক্তগণ প্রসাদ সেবনকালে সাধুকে সাবধান করিয়া রাখেন—সাধো! সাবধান (ভাইরে,)

শরীর অবিদ্যাজাল, জড়েন্দ্রিয় তাহে কাল,
জীবে ফেলে বিষয় সাগরে।
তার মধ্যে জিহ্বা অতি, লোভময় সুদুর্ম্মতি,
তাকে জেতা কঠিন সংসারে।।
কৃষ্ণ বড় দয়াময়, করিবারে জিহ্বা জয়,
স্বপ্রসাদ অন্ন দিল ভাই।
সেই অন্নামৃত খাও, রাধাকৃষ্ণ গুণ গাও,
প্রেমে ডাক চৈতন্য নিতাই।।

শাস্ত্র

সংস্কৃত শাস্ ধাতু হইতে শাস্ত্র শব্দ নিষ্পন্ন। 'শাস্' ধাতুর অর্থ 'শাসন করা'। যাহা আমাদের মনোধর্ম্মরূপ উচ্ছৃঙ্খলতার শাসক তাহাই শাস্ত্র। আমরা ঘ্রাণজ, রাসন, শ্রাবণ, চাক্ষুষ, ত্বাচ এবং মানস এই ষড়্‌বিধ প্রত্যক্ষ দ্বারা দ্বৈতবস্তুকে বিচার করিতে যাইয়া যখন অস্থির ও অসৎ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি বা অনুমান, আর্য, অর্থাপত্তি, অভাব, ঐতিহ্যাদি প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বাস্তববস্তু ভগবান্ ও শুদ্ধজীবের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করিতে সাহসী হই, তখন আপ্তোপদেশ শব্দ বা শাস্ত্র আমাদের নিয়ামক এবং শাসকরূপে উপস্থিত হইয়া নিরস্তকুহক সত্যের বাণী বলিয়া থাকেন। জড়ীয় বস্তু বিচারেই আমরা প্রত্যক্ষাদির ব্যভিচার দেখিতে পাই।

সুতরাং অচিন্ত্য অলৌকিক বস্তুজ্ঞান যে প্রত্যক্ষাদির দ্বারা আচ্ছাদিত হইবে, এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি? একমাত্র ভ্রমপ্রমাদবিপ্রলিপ্সা- করণাপাটবদোষরহিত বচনাত্মক শাস্ত্রই প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান দানে সমর্থ।

আম্নায়পারম্পর্য্যে অবতীর্ণ নিরস্তকুহক নিত্য সত্যই যথার্থ শাস্ত্র। স্বকপোল-কল্পিত বা দেশ কাল পরিচ্ছিন্ন মত কখনও শাস্ত্রপদ বাচ্য নহে। বৃহদারণ্যক ২।৪।১০ যাজ্ঞবল্ক্যমৈত্রেয়ী সংবাদে আমরা জানিতে পারি যে, —চতুর্ব্বেদ, ইতিহাস ও পুরাণাদি শাস্ত্র পরমেশ্বরের নিঃশ্বাসস্বরূপ জগতে প্রকটিত হইয়াছেন। মণ্ডুকের প্রথম শ্লোক—

'স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ' ও শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমে 'তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে', চতুঃশ্লোকী ভাগবতের প্রারম্ভে ''তথৈব-তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তুতেমদনুগ্রহাৎ'' ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতি বাক্যে এবং মৎস্যপুরাণ ৩য় অধ্যায় শাস্ত্রোৎপত্তি-প্রসঙ্গে, তত্ত্বসন্দর্ভধৃত (১৩ সংখ্যা) স্কান্দপ্রভাসখণ্ড বাক্যে আমরা বিশেষ ভাবে জানিতে পারি যে, একমাত্র ভগবদুপদিষ্ট আম্নায় বাক্যই শাস্ত্র। স্কান্দ বচন উদ্ধারপূর্ব্বক শ্রীপাদ মধ্বমুনি বলেন—

ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্।
মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে।।
যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্র প্রকীর্ত্তিতম্।
অতোঽন্যগ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্মতৎ।।

ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ব্ববেদ; ভারত (মহাভারত ও সাত্বত পঞ্চরাত্রলক্ষণাত্মক সমূহ) রামায়ণ—এই সকল 'শাস্ত্র' বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং ইহাদের অনুকূল যে সকল গ্রন্থ তাহাও শাস্ত্রমধ্যে পরিগণিত, এতদ্ব্যতীত গ্রন্থসমূহ কুবর্ত্মস্বরূপ।

মানবের অধিকার ভেদে শাস্ত্র ত্রিবিধ। সাত্বত, রাজস ও তামস। যথা মৎস্য-পুরাণে—

সাত্ত্বিকেষু চ কল্পেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ।
রাজসেষু চ মাহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ।।
তদ্বদগ্নেশ্চ মাহাত্ম্যং তামসেষু শিবস্য চ।
সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৃণাঞ্চ নিগদ্যতে।।

সাত্বত শাস্ত্রে সর্ব্বেশ্বর পরমপুরুষ ভগবান্ শ্রীহরির মাহাত্ম্য ও জীবের আত্যন্তিক মঙ্গলের কথা বর্ণিত হইয়াছে। রাজস শাস্ত্রে ব্রহ্মাদি দেবতার মাহাত্ম্য যুদ্ধিবিগ্রহাদির উপদেশ এবং তামসিক পুরাণে—অগ্নি, শিব ও দুর্গার মহিমা অধিকরূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং পশুবধ, মদ্যপানাদির বিধানও বর্ণিত হইয়াছে এবং সঙ্কীর্ণ শাস্ত্রে সরস্বতী ও পিতৃলোকের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। রাজস ও তামস শাস্ত্রের উদ্দেশ্য একান্ত বহির্ম্মুখ জীবগণকে গৌণফলে প্রলুব্ধ করিয়া ভগবানের দিকে উন্মুখ করা। কণ্টকের দ্বারা বিদ্ধকণ্টককে

নিষ্কাসিত করিয়া উভয় কণ্টকই দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে ইহা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, কিন্তু অবিবেকিগণ এক কণ্টক উন্মোচন করিতে গিয়া দ্বিতীয় কণ্টকে বিদ্ধ হইয়া পড়েন। আমরা দেখিতে পাই, জৈমিন্যাদি ঋষিগণ পর্য্যন্ত ত্রয়ীর মধুপুষ্পিত বাক্যে আবদ্ধ হইয়া নিরস্তকুহক সত্যের সন্ধান পায় নাই। শ্রীজীবপাদ তত্ত্বসন্দর্ভ ১৭ সংখ্যায় লিখিয়াছেন—"তেষামপি সামস্ত্যেনাপ্রচারদ্রূপত্বাৎ নানাদেবতা-প্রতিপাদকপ্রায়- ত্বাদর্ব্বাচীনৈঃ ক্ষুদ্রবুদ্ধিভিরর্থো দুরধিগম ইতি তদবস্থ এব সংশয়ঃ" অর্থাৎ পুরাণাদি বেদপ্রামাণিক শাস্ত্রের সম্পূর্ণ অংশ দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় প্রচলিত অংশে নানা দেবতার মহিমা ও উপাসনার বিষয় উল্লেখ দেখিয়া অর্ব্বাচীন, ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তিগণ শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নির্ণয়ে অক্ষম হইয়া পড়ে সুতরাং জীবাত্মার উপাস্য বা সম্বন্ধ বস্তু সম্বন্ধেও সংশয়াপন্ন হয়। পুনরায় ১৯ সংখ্যায় লিখিয়াছেন —"যৎখলু পুরাণজাতমাবির্ভাব্য, ব্রহ্মসূত্রঞ্চ প্রণীয়াপ্যপরিতুষ্টেন তেন ভগবতা নিজসূত্রাণামকৃত্রিমভাষ্যভূতং সমাধি-লব্ধমাবির্ভাবিতম্। যস্মিন্নেব সর্ব্বশাস্ত্র-সমন্বয়ো দৃশ্যতে"। শ্রীবেদব্যাস নিখিলপুরাণশাস্ত্র ও বেদান্ত প্রণয়ন করিয়াও যখন চিত্তে প্রসন্নতার অভাব লক্ষ্য করিলেন, তখন শ্রীনারদের নিকট কারণ-জিজ্ঞাসু হইয়া সমাধিস্থ হইলেন ও সমাধিতে ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম বিশদভাষ্যসদৃশ শ্রীমদ্ভাগবত প্রাপ্ত হইলেন। এই শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে সর্ব্বশাস্ত্রের সমন্বয় বা তাৎপর্য্য পাওয়া যায়। শ্রীগীতা শাস্ত্রও সর্ব্বশাস্ত্রের সারভূত বলিয়া সকল আচার্য্য কর্ত্তৃকই গৃহীত হইয়াছে। বৃহৎসংহিতা—

"উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলং।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে।।"

উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা-ফল, অর্থবাদ ও উৎপত্তি শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-জ্ঞানের কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। উপক্রম অর্থে গ্রন্থের আরম্ভ—শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীগীতার সারগ্রাহী হইয়া বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে আরম্ভে, উপসংহারে অর্থাৎ গ্রন্থের শেষে, অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ আত্মধর্ম্ম সর্ব্বেশ্বর ভগবানে ভক্তির কথাই উপদেশ দিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে এস্থানে শ্লোকসমুদয় উদ্ধৃত করিয়া দেখানো গেল না। শাস্ত্র কর্ম্মজ্ঞান-যোগাদি বিবিধ মার্গের অবতারণা করিয়া ঐ সকলের কতটুক প্রয়োজনীয়ত্ব এবং মূল্য প্রদর্শন করেন বলিয়া উহাদিগকে জৈবধর্ম্মস্বরূপে গ্রহণ করা সারগ্রাহীর কর্ত্তব্য নহে যেমন গীতায় কর্ম্মজ্ঞানাদির প্রশংসা দেখা যায়। কিন্তু আত্মধর্ম্মের উদ্দেশক হইলেই তাহাদের মূল্য, নতুবা নহে।

"যৎকরোষি যদশ্নাসি তৎকুরুষ্বমদর্পণম্। যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।।" ইত্যাদি বাক্যে ভগবদুদ্দেশক কর্ম্মেরিই প্রশংসা দেখা যায় এবং সাংখ্যযোগ নামক ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে জ্ঞানী ও যোগী হইতে—শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ, এবং উপসংহারে—মামেকং শরণং ব্রজ ইত্যাদি বাক্যে আত্মধর্ম্ম অধোক্ষজে ভক্তিই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ইহা প্রমাণিত হয়।

অপারকরুণাময় ভগবান্ বিমুখজীবকে উন্মুখ করিয়া নিত্যসেবারূপ পরম-পুরুষার্থ প্রদান জন্য শাস্ত্র প্রকট করিয়াছেন—যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২০শ পরিচ্ছেদে—

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান।
জীবের কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদপুরাণ।।
শাস্ত্র-গুরু-আত্মারূপে আপনা জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান।।
ইহার দৃষ্টান্ত যৈছে দরিদ্রের ঘরে।
সর্ব্বজ্ঞ আসি দুঃখ দেখি পুছয়ে তাহারে।।
তুমি কেন এত দুঃখী তোমার আছে পিতৃধন।
তোমারে না কহিল অন্যত্র ছাড়িল জীবন।।
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশ।
ঐছে বেদ পুরাণ, জীবে কৃষ্ণ উপদেশ।।

বেদান্তের ১।১।৩—"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" সূত্রে প্রত্যক্ষ-প্রমাণাদির অবিষয় অধোক্ষজ ভগবান্ শাস্ত্রমূলেই জীবের নিকট পরিচিত হন বলিয়া থাকেন।

শ্রীভগবানের শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন এই দ্বিবিধ লীলাই নিত্য। পরম কারুণিক ভগবান্ একদিকে যেমন জীবের দুর্গতি দেখিয়া আত্মধর্ম্ম-প্রতিপালক শাস্ত্রসমূহ প্রণয়ন করিয়াছেন, অপর দিকে তিনি মোহনশাস্ত্রও জগতে প্রচার করিয়া অহমিকাপরায়ণ দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন দুষ্কৃতিগণকে আরও মোহিত করিয়াছেন। যথা কৌর্ম্মে—

এবং বিধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানি তু।
ময়া সৃষ্টানি চান্যানি মোহো যেষাং ভবার্ণবে।।

হিমালয়কে উমাদেবী বলিতেছেন—বামাচারকথিত পাশুপত, যোগ, নাকুল, ভৈরব প্রভৃতি শাস্ত্র মোহিত জীবকে মোহন করিবার জন্য আমিই সৃষ্টি করিয়াছি।

বরাহপুরাণে শ্রীভগবান্ মহাদেবকে মোহ শাস্ত্র প্রণয়নের জন্য আদেশ করিতেছেন—

এষমোহং সৃজাম্যাশু যো জনান্ মোহয়িষ্যতি।
ত্বঞ্চ রুদ্র মহাবাহো মোহশাস্ত্রাণি কারয়।।

পদ্মপুরাণে শঙ্কর বৌদ্ধবাদ মায়াবাদরূপ অসৎ শাস্ত্র কলিতে প্রচার করিবেন বলিয়া উমাদেবীকে বলিতেছেন—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নবৌদ্ধমেব চ।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা।।

একদিকে যেমন জৈমিন্যাদি ঋষিগণ বেদের কর্ম্মবাদে মোহিত, অপরদিকে শাঙ্করিকগণ অতি বিদ্যায় পড়িয়া মোহিত। বৌদ্ধ বেদ অস্বীকার করিয়া নাস্তিক এবং মায়াবাদীগণ বেদ স্বীকার করিয়া অধিকতর

নাস্তিক। স্পষ্ট প্রমাণ মুখে স্বীকার করিলেও কার্য্যে তাহারা প্রত্যক্ষ বিচারের প্রাধান্য প্রদর্শন করেন সুতরাং ভগবানের মায়ায় মোহিত। শ্রীগীতা বলেন—

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।

'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং'

উপনিষদৎ উচ্চকণ্ঠে বলিল—যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ। শাস্ত্র জ্ঞানের অভিন্ন তনু। যিনি শাস্ত্রে প্রপন্ন হইবেন, শাস্ত্রে যিনি অধিক সেবাবুদ্ধি বিশিষ্ট,—তিনিই শাস্ত্র সিদ্ধান্ত উপলব্ধি করিতে সমর্থ।

ভক্ত ভাগবতই গ্রন্থ ভাগবতের ধর্ম্মার্থ অপরকে বলিয়া দিতে পারেন, এই জন্যই শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশ বাণী—

'যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।'

সুতরাং শাস্ত্রার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে আমাদের সর্ব্বাগ্রে শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের সম্মুখে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা বৃত্তি লইয়া যাইতে হইবে। শাস্ত্র প্রবেশের অন্য দ্বিতীয় পন্থা নাই।

"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ"

যোগপীঠ ও ভক্ত

শ্রীভগবানের অসংখ্য শক্তির কথা বেদে উল্লিখিত আছে। "পরাঽস্যশক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে।" ইহাদিগের মধ্যে শ্রী, ভূ, নীলা শক্তিত্রয়ের অন্যতম নীলা শক্তি হইতে ধামাদি তদ্রূপবৈভব। শ্রীধাম গোলোক বৃন্দাবন নবদ্বীপ অভিন্নতত্ত্ব এই নীলাশক্তির প্রকাশ বিশেষ। শ্রীভূনীলাশক্তি স্বরূপশক্তির অন্তর্গত, সুতরাং তাহার প্রকাশ চিজ্জগৎ। শ্রীনবদ্বীপধাম অপ্রাকৃততত্ত্ব, প্রাকৃত গোচর নহে। অতএব প্রাকৃত অক্ষজজ্ঞানের বলে দৃপ্ত হইয়া শ্রীধাম সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া, আর শ্রীধামকে অপ্রাকৃত অধোক্ষজতত্ত্ব জ্ঞানে সেবা করা—এ দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক্। অক্ষজ জ্ঞানে ভোগ-তৎপরতাই পরিদৃষ্ট হয়। ভোগতাৎপর্য্যমূলে শ্রীধাম দর্শন হয় না।

দেখিতে পাওয়া যায় যে, আধুনিককালে তথাকথিত প্রত্নতত্ত্ববিদের চেষ্টাফলে অনেক নূতন নূতন বৃত্তান্ত জীবের জ্ঞানগোচর হইতেছে। তবে স্থল বিশেষে দেখা যায় ভিন্ন ভিন্ন প্রত্নতত্ত্ববিদভিমানীর, গবেষণার ফল একই বিষয়ে পরস্পর স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। অক্ষজ বিচারের ফল এইরূপ হইবারই সম্ভাবনা অধিক। ভিন্ন ভিন্ন মনীষীর দর্শন বিভিন্ন। দেহ ও মন ভেদে জীবনিচয় পরস্পর হইতে পৃথক। নির্ম্মল আত্মবৃত্তিতে সকলের স্বরূপ এক হইলেও ভোগবৃত্তিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ভ্রম,প্রমাদ,করণাপাটব (ইন্দ্রিয়ের অপটুতা–বিপ্রলিপ্সা (আত্মপরবঞ্চনেচ্ছা) দোষচতুষ্টয়যুক্ত বিচার প্রণালী অবলম্বন করিয়া বদ্ধজীব পরস্পর হইতে বিভিন্ন, সুতরাং

তাহাদের মনীষা অনেক স্থলে উজ্জ্বল প্রদীপ্ত বলিয়া বোধ হইলেও তাহা ঐ দোষ চতুষ্টয়বিমুক্ত নহে। অতএব একই বিষয়ে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন মত পোষণ করিবেন ইহাতে আর বিস্ময় কি থাকিতে প্যারে? প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ কিছু এ নিয়মের ব্যতিক্রম নহেন, তাই একই স্থানের সম্বন্ধে মীমাংসায় উপনীত হইতে গিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বিভিন্নমুখী হ'ন। অন্ধকূপ সম্বন্ধে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিকগণের বিভিন্ন মত, কুতবমিনার সম্বন্ধে সকলে একমত হইতে পারিতেছেন না। শিলালিপির পাঠোদ্ধারে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণকে পরস্পরের দোষ উল্লেখ করিতে দেখা গিয়াছে। সামান্য প্রাকৃত বস্তু সম্বন্ধেই তাঁহাদের একাধিকের বিচার সমীচীন হইতে পারে না। হয় ত' কাহারও বিচার অভ্রান্ত নাও হইতে পারে, তখন অপ্রাকৃত ধামতত্ত্ব নিরূপণে তাঁহাদের যোগ্যতা কতদূর নির্ভরযোগ্য তাহা বুদ্ধিমান্ মাত্রেই বুঝিতে পারেন।

শ্রীধাম বৃন্দাবনের বিভিন্ন লীলাস্থলীগুলির পরিচয় কোন্ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কোন্ বিচারমূলে দিতে সমর্থ? স্বয়ং শ্রীভগবান্ অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যেরূপ অভ্রান্ত ও নিঃশয়ভাবে ঐগুলি নির্দ্দেশ করিয়া জীবের বৃন্দাবন-সেবার সম্ভাবনা করিয়া দিয়াছেন, কোন অক্ষজবাদী তাহার ধারণা করিতে যোগ্য? কোন্ স্থপতিবিদ্ তাঁহার কোণপরিমাপকযন্ত্র (sextant), সমতলমাপকযন্ত্র (level) প্রভৃতির সাহচর্য্যে রাধাকুণ্ড আবিষ্কারে সমর্থ? কোন্ প্রাকৃত ভাষার অভিজ্ঞতাভিমানী কেশীঘাটের তত্ত্বনিরূপণের দুরাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতে পারেন? কোন্ ব্যবহারাজীব যাবটের রহস্যোদ্‌ঘাটনে ক্ষম? "অপ্রাকৃত বস্তু কভু নহে প্রাকৃতগোচর।"

বৃন্দাবনাভিন্ন শ্রীনবদ্বীপধাম অপ্রাকৃত তত্ত্ব। ইহা প্রাকৃত ভোগ্যবস্তু নহে যে, আমাদের বাহ্যভোগবিষয়-সংগ্রহতৎপর ইন্দ্রিয়নিচয়ের গম্য হইবেন। প্রাকৃত-বিচারবিতণ্ডাসম্বল অক্ষজজ্ঞানদৃপ্ত ব্যক্তিগণ সাধারণ অন্যান্য ভোগ্য স্থলের ন্যায় শ্রীনবদ্বীপধাম আপনাদের জড়বিচারাধীন করিতে প্রয়াস পাইলেও তাহা তাহাদের কখনও অধিগম্য নহে। চিৎপরিকরের ন্যায় চিন্ময়ধামও আত্মতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত, উহা অক্ষজজ্ঞানের অধীন নহেন—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া বা বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং" (কঠোপনিষদ)। সেবাবুদ্ধির পরিণতিক্রমে যিনি ভক্ত, ভগবান্ ও তদ্রূপ-বৈভব চিন্ময়-ধামের কৃপা প্রাপ্ত হ'ন, তিনিই তত্ত্ববস্তু হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হ'ন, তিনি ধাম-মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ, অন্যে কি তা'র মর্ম্ম বুঝিবে? কোকিল চ্যুতমুকুল আস্বাদন করে, আর কাক নিম্বফল আস্বাদন করে। যাহার যেরূপ অধিকার, তাহার সেইরূপ প্রাপ্তি। দলিল দস্তাবেজ শ্রীধাম তত্ত্বনির্ণয়ে সম্পূর্ণ অনুপযোগী, ইহা প্রত্যেক ভক্তেই জানেন। তদ্দ্বারা ধাম নিরূপিত হইতে পারে এ বিশ্বাস যাঁহাদের হৃদয়ে বর্ত্তমান, ভোগবুদ্ধি হৃদয়ে লইয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন হয় ইহা যাঁহাদের ধারণা, প্রাকৃতজীবসঙ্ঘের সহায়তায় তদ্রূপবৈভবের উপলব্ধি সম্ভবপর ইহা যাঁহাদের আশা, তাঁহারা বৈষ্ণবাভিমানী ইহা বড়ই সন্তাপের বিষয়, অথবা ইহাই স্বাভাবিক। বৈষ্ণব ত' আর বৈষ্ণবাভিমানী হ'ন না, যেখানে বৈষ্ণবাভিমান সেখানে অবৈষ্ণবতাই প্রবল, "আমি ত বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে অমানী না হ'ব আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি হৃদয় দূষিবে,হইব নিরয়গামী।।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়—অক্ষজ জ্ঞানমাত্রকে অবলম্বন করিয়া শ্রীধামতত্ত্ব নিরূপণে উদ্যোগ করেন নাই, তিনি অপ্রাকৃত সেবামূলে শ্রীধামের অনুশীলন করিয়াছিলেন। তাহার ফলে তিনি সাক্ষাৎ অপ্রাকৃত ধাম দর্শন করিয়া কলিহতজীবকে কৃপাপূর্ব্বক সেই ধামে লইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তিনি সিদ্ধ শ্রীল ভগবান্ দাস বাবাজী, সিদ্ধ শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী, সিদ্ধ শ্রীল চৈতন্য দাস বাবাজী প্রমুখ প্রভুগণকে সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাদের অপ্রাকৃত অভ্রান্ত অনুভূতির অনুমোদিত শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ শ্রীশ্রীগৌর-জন্মভিটায় শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীপ্রিয়া মূর্ত্তির প্রাকট্য করিয়া ভক্তজনের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধনামা মহাত্মা শিশিরকুমারের গবেষণা শ্রীধামের অবস্থিতি বিষয়ে যাঁহার অনুগমনে প্রকৃত সত্যে উপনীত হইয়াছিলেন, শ্রীধাম নবদ্বীপ বিবুধমণ্ডলীর সভাপতি কুলিয়া সহর নবদ্বীপবাস্তব্য পরলোকগত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যারণ্য ভট্টাচার্য্য এম্, এ বি, এল মহোদয়ের প্রবল অনুসন্ধিৎসা যাঁহার অভ্রান্ত মীমাংসায় নিঃশংশয় হইয়া অনুবর্ত্তনে আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আরও বহু সুধীমণ্ডলী স্ব স্ব অক্ষজ দর্শনের ফল যাঁহার অপ্রাকৃত দর্শনের অনুকূল দেখিয়া বিস্মিয় হইয়া তাঁহার অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন, যিনি তাঁহার অপ্রাকৃত দর্শনের ফল অক্ষজজ্ঞান-দৃপ্তগণের বোধগম্য করিয়া অক্ষজ বিচার প্রণালী সহযোগে তাহাদিগকে দিয়া স্বীকার করাইয়াছিলেন, অক্ষজ বিচারের উপযোগী উপাদান সমূহ, যথা—সরকারী "কাগজ পত্র, দলিল দস্তাবেজ" সর্ব্বাপেক্ষা যাঁহার অধিক করতল গত ছিল ও যিনি সেগুলির যথোচিত ব্যবহার করিয়া প্রাকৃত বিচারপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের হৃদয় হইতে সন্দেহ নিরাস করিয়াছিলেন, যাঁহার পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য পাণ্ডিত্য প্রত্নতত্ত্ব-গবেষণার সম্পূর্ণ উপযোগী থাকায় পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, বিচারপতি শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কোবিদ্গণ বহুচেষ্টা ও বিচার করিয়াও যাঁহার ধাম নিদর্শনকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সেই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লোকজগতে যথেষ্ট আভিজাত্য, পদবী, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য, প্রতিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও সেগুলিকে পদদলিত করিয়া নিষ্কিঞ্চনভাবে গৌর কৃষ্ণভজনে মত্ত থাকিয়া পার্ষদবৈষ্ণবোচিত জীবদয়ামূলে নিজ অপ্রাকৃত অনুভূতি জীবকুলকে দান করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান-পরতাকে ধর্ম্ম নামে প্রচার-নিপুণ কৃতঘ্ন জীবগণ এরূপ হরিবিমুখ যে তাঁহার সে দানের গৌরব না করিয়া তাহার অগৌরবকরণ জন্য ব্যস্ত হইয়া প্রাণপাত করিতেও প্রস্তুত। কতকগুলি বিগ্রহব্যবসায়ী, কতিপয় ইন্দ্রিয়পর ব্যক্তি স্বীয় প্রতারণামূলক ব্যবসায় বর্দ্ধন মানসে যেখানে সেখানে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর লীলাস্থলী বলিয়া নির্দ্দেশপূর্ব্বক অসতর্ক মানবগণের নিকট অজস্র অর্থ দোহন করিয়া ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা সংসাধন করিতেছেন। আবার কোন কোন স্ত্রীসঙ্গী পরস্ত্রীপালক অজ্ঞব্যক্তি দারী উদাসীন সজ্জায় পবিত্র বেশের অমর্য্যাদাপূর্ব্বক তাহার অনুকরণ করিয়া অথবা গৃহস্থের বেশে সমালোচনোপলক্ষণে শুদ্ধ ভাগবতবর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরণে ঘোরতর অপরাধ করিতেছে। মন্ত্রজীবী বিগ্রহ-ব্যবসায়িগণ যতদূর করিতে স্পর্দ্ধা করেন নাই, তদুপেক্ষা অধিক দাম্ভিকতা সহযোগে বৈষ্ণবাপরাধকেই জীবনের ব্রত করিয়া তাহারা শ্রীশ্রীগৌরজন্মভিটা সম্বন্ধে দুর্ভাগ্য ভোগিগণের হৃদয়ে সন্দেহ জন্মাইয়া নিজ নিজ স্বকপোলকল্পিত ভেল্ জন্মভিটা খাড়া করিয়া জড়ীয় ভোগের চূড়ান্ত করিবার মানস করিয়াছেন, শ্রীধামকে ভোগ্য-দর্শনে দেখিতে গিয়া তাঁহাদের এই দুর্দ্দশা

ঘটিয়াছে ও তাঁহাদের নিজের ন্যায় বিষয়ী অনুগত লোকগুলিকেও দুর্দ্দশায় পাতিত করিবার যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন।

আমরা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে, আমাদের এক মাসিক সহযোগিনী শ্রীশ্রীগৌরলীলা প্রচারিণী এই নাম ধরিয়াও শ্রীশ্রীগৌরলীলাস্থলী জন্মভিটা সম্বন্ধে কোন এক অশিক্ষিত ব্যক্তি এখনও সফলকাম হয়েন নাই বলিয়া সহানুভূতি প্রকাশপূর্ব্বক আক্ষেপ করিয়াছেন ও সাহিত্য পরিষৎ কেন তাঁহাকে সাহায্য করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ করেন নাই তজ্জন্য পরিষৎ প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। তাঁহার ধারণা সাহিত্যপরিষৎ কলিকাতায় বৃন্দাবনধামকে আনিয়া ফেলিবার যত্ন করিলেই শ্রীধাম সরাসরি কলিকাতায় চলিয়া আসিবেন, ভক্তের অপ্রাকৃত সেবাফলে প্রাপ্য শ্রীধাম সম্বন্ধে ভোগময় জড়ীয় সাহিত্যসেবক সাহিত্যপরিষৎ অনধিকার চর্চ্চা করিয়া এক মত প্রকাশ করিলেই তাহাই যে পরমার্থপ্রয়াসী ভক্তগণ স্বীকার করিবেন এরূপ প্রমাণও পাওয়া যায় না। সহযোগিনী এই অবৈষ্ণব ধারণার কথা অঙ্কে ধারণ করিয়া ভাল করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সাধারণের প্রদত্ত অর্থ দিয়া বৈষ্ণবাপরাধ, ধামাপরাধের সহায়তা করিতে পরিষৎ সদস্যগণ বাধ্য, এ ধারণা সহযোগিনীর কিরূপে হইল? সহযোগিনীকে আমরা সরল অন্তঃকরণে "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" এই বৃত্তি লইয়া শুদ্ধসাধুভক্তের সঙ্গ করিতে অনুরোধ করি। তাহাতে তাঁহার মঙ্গল হইবে, আমাদের শ্রীনামপ্রচার সার্থক হইবে।

আচার্য্য

শ্রীভগবান উদ্ধবকে বলিয়াছেন—"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" আচার্য্যকে মৎস্বরূপ জানিবে। ভগবান মায়াধীশ—মায়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সাধারণ জীব মায়া দ্বারা আবৃত হয় কিন্তু ভগবৎস্বরূপ নিত্যপার্ষদ লোকোত্তর আচার্য্যগণ মায়ানির্মুক্ত। তাঁহারা ভগবানের ন্যায় মায়াকে নিরাস করিয়া আত্মধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন। অচিন্ত্যশক্তিযুক্ত লীলাময় ভগবান্ যখন প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া বিবিধ লীলার সঞ্চার করেন, তখন তাঁহারই অচিন্ত্যশক্তি বলে তাঁহার লীলার পোষকতার জন্য মায়াদেবী নানাবিধ সজ্জা গ্রহণ করেন। কখনও ভুক্তিমুক্তিকামী কপটগুরু পূতনারূপে, কখনও অসৎ সংস্কার, অসৎ সিদ্ধান্ত, জাড্য ও অভিমান-জনিত ভারবাহী শকটরূপে, পাণ্ডিত্যাভিমান, কুতর্ক ও অক্ষজযুক্তিরূপী তৃণাবর্ত্তরূপে, কপটতা, শাঠ্য ও অসত্যাচরণরূপী বকাসুররূপে, জাত্যভিমান ও ঐশ্বর্য্য-মদজাত নিষ্ঠুরতা, ভূতহিংসা ও নানাবিধ ব্যসনরূপী যমলার্জ্জুনরূপে, অক্ষজবাদী হইয়া শুদ্ধ ভক্তের উৎপীড়নকারী দাবানলরূপে, কর্ম্মজড়তা ও বর্ণাভিমানহেতু ভক্ত ও ভগবানে অবমাননাকারী যাজকবিপ্ররূপে, বহ্বীশ্বরবাদ ও স্বতন্ত্রদেবতা-পূজারূপ ইন্দ্রযজ্ঞরূপে মায়াদেবী ব্যতিরেক ভাবে ভগবানের লীলার পুষ্টি করেন। আবার আসবপানে ভজনানন্দবৃদ্ধিনিরাসরূপ নন্দোদ্ধার-লীলারূপে, মায়াবাদ-সর্প-গ্রাস হইতে শুদ্ধভক্তি উদ্ধাররূপ নন্দমোচন-লীলারূপে, প্রতিষ্ঠাশা ও স্ত্রীসঙ্গ-

স্পৃহা-বর্জ্জনরূপ শঙ্খচূড়বধ ও মণিমোচন-লীলারূপে, আমি আচার্য্য, বড় ভক্ত ইত্যাদি অভিমান-বিনাশ-রূপ কেশীবধ-লীলারূপে ভগবান্ মায়ার বৈচিত্র্যকে নিরাস করিয়া থাকেন। ভগবান্ ভক্তগণের শিক্ষার্থে ও শরণাগত ভক্তের নিষ্ঠা সুদৃঢ় করিবার জন্য এইরূপ মায়ার বিবিধ বৈচিত্র্য জগতে প্রকট করিয়া তাহা পুনরায় সংহার করেন।

শ্রীভগবানের অভিন্ন-স্বরূপ লোকাচার্য্যগণ যখন ভগবৎ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিবার জন্য জগতে আগমন করেন, তখন তাঁহাদের সত্য- প্রচারের ব্যতিরেক সহায়করূপী মায়াদেবীর ঐসকল চরগণ নানাবিধ আকারে আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রকৃত আচার্য্যকে মায়া-বৈচিত্র্যের কোনও একটীও মুগ্ধ করিতে পারে না, অপিচ তিনি তাহাদিগের স্বরূপ চিনিয়া লইয়া তাহাদিগকে নিরাস করিতে সক্ষম হন। লোকাচার্য্যগণ শাস্ত্রোক্তিরূপ খড়্গদ্বারা ঐ সকল অনর্থরূপী অসুরগণের বিনাশ সাধন করিয়া প্রণতজনকে রক্ষা করেন। আচার্য্যগণের অতীত ইতিহাস আলোচনা করিলে এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আচার্য্য শঙ্করের আচার্য্যত্ব নৈমিত্তিক বলিয়া পদ্মপুরাণাদি সাত্ত্বত শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কারণ তিনি ভগবৎ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া অসুরমোহনের জন্য জগতে অবতীর্ণ হন। বৌদ্ধগণ যখন বেদের প্রতি আস্থাহীন হইয়া সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সর্ব্বকারণকারণ পরমেশ্বরে পর্য্যন্ত সন্দিহান হইয়া শূন্যবাদী হইয়া পড়িল, তখন প্রচ্ছন্নবুদ্ধ শঙ্কররূপে ভগবানের আদেশে অবতীর্ণ হইলেন। শূন্যবাদিগণের নিকট প্রথমেই সচ্চিদানন্দ শ্রীমূর্ত্তিসহ ভগবানকে উপস্থিত করিলে তাহারা কিছুতেই তাহা গ্রহণে অধিকারী হইবে না, অতএব প্রথমে বেদে বিশ্বাস স্থাপন করাইয়া বেদমূলে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ অস্তিত্ব স্বীকৃত হইলে পরে যোগমায়া সমাবৃত অতিগূঢ় অচিন্ত্য অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দাকার সবিশেষবিগ্রহ তাহাদের চিত্তে ক্রমশঃ শ্রদ্ধা-আকর্ষণের অবকাশ পাইতে পারিবে। আচার্য্য শঙ্কর 'নাস্তি' শব্দে চিরাভ্যস্ত ব্যক্তিগণের নিকট 'অস্তি' শব্দ লইয়া উপস্থিত হইলেন। তাই শঙ্করের আচার্য্যত্ব নৈমিত্তিক—যেমন ভগবানের মৌষললীলা নৈমিত্তিক ও অসুর মোহনার্থ, তদ্বৎ। ভগবানে শরণাগত ব্যক্তিগণ আচার্য্যের গূঢ় উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিলেন, অপরে মোহিত হইয়া পড়িলেন।

আচার্য্য শঙ্করের তিরোভাবের পর এই ভারত-ভূমিতে চারিজন সাত্ত্বত আচার্য্য আবির্ভূত হইয়া মনোধর্ম্মের নিরাসপূর্ব্বক আত্মধর্ম্ম প্রচার করিলেন। এ প্রচার-কার্য্যে আচার্য্যগণের লোক-প্রচলিত মতসমূহের বিরুদ্ধে প্রচার করিতে হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাদের নানাবিধ নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। আচার্য্য শ্রীরামানুজের জীবন বহুবার সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল, শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের গ্রন্থরত্নসমূহ বিরুদ্ধবাদিগণ এককালে অপহরণ করিয়াছিল। সাত্ত্বত আচার্য্যগণের বিশেষত্ব এই যে, তাঁহারা লোকপ্রচলিত মনোধর্ম্মের বিন্দুমাত্রও প্রশ্রয় দেন না। শত শত বৎসরের সঞ্চিত কুসংস্কার ও মনোধর্ম্মের অতলসিন্ধুগর্ভে গড্ডালিকা-প্রবাহের ন্যায় লোকসঙ্ঘ অবাধে প্রবেশ করিতে থাকিলেও আচার্য্যগণ অপ্রিয় সত্যের কর্কশ ঢক্কা-নিনাদে উহাদিগকে সাবধান করিয়া থাকেন। একমাত্র ভক্ত্যুন্মুখ-সুকৃতসম্পন্ন সংসারক্ষয়োন্মুখ জীবের কর্ণে ঐ ধ্বনি প্রবেশ করে। আচার্য্যগণ শত শত প্রতিকূল বাধা সত্ত্বেও আত্মধর্ম্মের নিরস্তকুহক সত্যবাণী প্রচার করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আচার্য্যলীলায় আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি তদানীন্তন যাবতীয় মনোধর্ম্মসমূহকে শাস্ত্রবাক্যে খণ্ড বিখণ্ডিত করিয়া সর্ব্বত্র আত্মধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ৯ম—

"তার্কিক মীমাংসক যত মায়াবাদিগণ।
সাংখ্য পাতঞ্জল স্মৃতি পুরাণ আগম।।
নিজ নিজ শাস্ত্রোদ্‌গ্রাহে সবেই প্রচণ্ড।
সর্ব্বমত দূষি প্রভু করে খণ্ড খণ্ড।।
তর্কপ্রধান বৌদ্ধ শাস্ত্র নবমতে।
তর্কেই খণ্ডিল প্রভু, না পারে স্থাপিতে।।"

আচার্য্যগণ মায়ার কোন প্রকার ভাবকেই প্রশ্রয় দেন না। লোকানুবন্ধ, শিষ্যানুবন্ধ, স্বজনানুবন্ধ, দেশ-সমাজানুবন্ধ তাঁহাদের নাই। কারণ তাঁহারা নিরস্তকুহক সত্যের একনিষ্ঠ উপাসাক। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রিয় শিষ্য ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু উন্মার্গগামী নিজ পুত্রগণকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন ও হরিদাস ঠাকুরকে শ্রাদ্ধপাত্র অর্পণ করিয়া প্রবল স্মার্ত্ত সমাজানুবন্ধ-ত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। হরিদাস ঠাকুর নিজ ভক্তিপ্রতিকূল সমাজানুবন্ধ ও স্বজনানুবন্ধ অম্লানবদনে ত্যাগ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শূদ্রকুলোদ্ভব হইলেও, পরমহংস বৈষ্ণব যে ব্রাহ্মণেরও গুরু হইতে পারে তৎপ্রদর্শনার্থে বহু ব্রাহ্মণশিষ্য করিয়াছিলেন। কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ যখন শুদ্ধবৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিয়া অপরাধে মগ্ন হইতেছিল, তখন শ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য রসিকানন্দ প্রভু দ্বিজত্বাপন্ন দীক্ষিত শিষ্যগণকে নারদ পঞ্চরাত্র, ভরদ্বাজ সংহিতা বাক্য, শ্রীহরিভক্তিবিলাস ২য় বিলাসোক্ত বিধান, শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামিপ্রভুর সৎক্রিয়াসারদীপিকা উক্ত বিধান এবং মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণাদির সুস্পষ্ট আদেশানুসারে উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া বৈষ্ণবদাসের নির্গুণ বা পারমার্থিক ব্রাহ্মণতার অভাব নাই—প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাই গোপীবল্লভপুরের রসিকানন্দ প্রভুর বংশে, বড়গাছী নিবাসী নবনী হোড়ের বংশে, শ্রীখণ্ডনিবাসী রঘুনন্দনের বংশে দীক্ষিত শিষ্যের উপনয়ন-সংস্কার আবহমান-কাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল। গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ 'করণ' জাতিতে উদ্ভূত হইয়াও উপনয়ন- সংস্কারে সংস্কৃত ছিলেন।

এই নবীন যুগারম্ভে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও দীক্ষার প্রবল বাত্যায় যখন সনাতন-ধর্ম্মের ক্ষীণ দীপালোক নির্ব্বাণপ্রায় হইতেছিল—যখন পাশ্চাত্যধর্ম্মের অনুকরণে সনাতন ধর্ম্মের নাম দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছিল, সচ্চিদানন্দ শ্রীবিগ্রহের অবমাননা, সদাচারে নাসিকাকুঞ্চন, পরমার্থকে সামাজিকতায় পরিণতি, পুনর্জ্জন্মবাদ-অস্বীকার, বৌদ্ধযুগের ন্যায় কর্ম্মকাণ্ডে অনাদরপ্রযুক্ত শুদ্ধভক্ত্যঙ্গসমূহের প্রতিও অশ্রদ্ধা-প্রদর্শন, শুষ্ক নৈতিক সজ্জায় বৌদ্ধের নাস্তিক্যবাদ প্রচার এবং স্থানে স্থানে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ শঙ্করমতাবলম্বিগণ অ-সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের নাম দিয়া তৎ ও অতৎ-এর সমন্বয় করিয়া পুনরায় বৌদ্ধযুগের পর যে প্রকার শাঙ্করিক

মায়াবাদ প্রচারিত হইয়াছিল, তদ্রূপ শ্রীবিগ্রহকে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার, একমাত্র পরম উদার জৈবধর্ম্মরূপ বৈষ্ণবধর্ম্মকে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ, আত্মধর্ম্ম ভক্তিকে মন ও দেহ ধর্ম্মরূপ জ্ঞানকর্ম্মাদির সাপেক্ষিক বলিয়া প্রচার করিতেছিল এবং সুনির্ম্মল বৈষ্ণবধর্ম্ম মধ্যেও যখন সঙ্কীর্ণতা, সম্প্রদায়বিদ্বেষরূপ দাবাগ্নি প্রবেশ করিয়াছিল এবং অশিক্ষিত ইন্দ্রিয়- পরায়ণ ব্যক্তিগণের স্বকপোলকল্পিত নানাবিধ মত প্রবেশ করিয়া আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, প্রাকৃত সহজিয়া, কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত, জাত গোঁসাই অতিবাড়ী, গৌরাঙ্গনাগরী, লম্পটবাবাজি-সম্প্রদায়, মাতাজি-সম্প্রদায় প্রভৃতি আত্মধর্ম্মকে সঙ্কীর্ণ দেহ ধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মরূপে পরিণত করিয়া কেবল বাহ্য ক্রিয়াকলাপ, নিয়মাগ্রহ ও প্রাকৃত আচারকেই বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতেছিল, তখন ভগবৎপ্রেরিত একজন দিব্যসুরি সম্মানিত এক সম্ভ্রান্তবংশে প্রাদুর্ভূত হইয়া উচ্চপাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও রাজকার্য্যে উচ্চপদে আরূঢ় হইয়াও বজ্র-নির্ঘোষ স্বরে বলিয়া উঠিলেন—

"অসৎসঙ্গত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।"

ইনিই স্বনামধন্য আচার্য্যরত্ন শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর। তিনি প্রায় শতাধিক গ্রন্থ-প্রণয়ন, সাময়িক পত্রিকা-চালন, লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার ও নিজ আদর্শ জীবনযাপন দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত আত্মধর্ম্মরূপ শুদ্ধাভক্তির কথা এ নবীন যুগে প্রচার করিলেন। পুনরায় সনাতন ধর্ম্মের দীপালোক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু ঐ নীরব প্রচারক প্রচারের সূত্রটী কোনও এক সিংহতেজা মহাপুরুষের হস্তে অর্পণ করিয়া গেলেন। এবারও চৈতন্যসিংহের সিংহবীর্য্যও সিংহহুঙ্কার এই মহাপুরুষের ভিতর দিয়া প্রকটিত হইলেন। শুকদেবসদৃশ ঊর্দ্ধরেতা পরমহংসপুরুষ যখন দেখিলেন যে, প্রাকৃত সহজিয়াগণ কর্ত্তৃক পথে ঘাটে রাইকানুর গান, লীলাস্মরণ, গৃহব্রতধর্ম্ম, অর্থবিনিময়ে শ্রীভগবানের অভিন্নতনু ভাগবত বিক্রয়ে ভোগের ইন্ধন সংগ্রহ, শ্রীবিগ্রহ-প্রদর্শনের জন্য ভেটগ্রহণ ও তদ্দ্বারা নিজইন্দ্রিয়তোষণ; কনকামিনী প্রতিষ্ঠালোলুপ কপটগণের অষ্টসাত্ত্বিক বিকার-প্রদর্শন, প্রাকৃত চ্যুতগোত্রের অভিমানে অচ্যুত গোত্রীয় বৈষ্ণবের অবমাননা, বৈষ্ণবের ব্রাহ্মণতার অভাব-দর্শন, গোস্বামিত্ব জাতিতে আবদ্ধ রাখিয়া ব্যবসায়-চালান, আচার্য্য বংশ অভিমান করিয়া অনাচারের প্রশ্রয় এবং আচার্য্যত্বের গৌরব শ্ব-শৃগালভক্ষ্য দেহে আবদ্ধ রাখিয়া ব্যবসায়ের সুবিধাকরণ, নিজে বঞ্চিত হইয়া শিষ্যগণকে বঞ্চিত-করণ, সামাজিকতা-রক্ষার জন্য স্মার্ত্ত সমাজের পদলেহন ও বৈষ্ণবসমাজের অবমাননা অবাধে চলিতেছে, তখন তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া উঠিল। ভগবানের প্রিয়পার্ষদ ভগবান্ ও ভক্তের এ অবমাননা সহ্য করিয়া আর গৃহে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাই গৌরসুন্দর যেমন মায়াবাদ নিরাশ করিবার জন্য ভগবান্ হইয়াও সন্ন্যাসী সাজিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই বর্ণাতীত পরমহংসপুরুষ পরম- হংসবেশের অসম্মান ও গৃহব্রতধর্ম্মের প্রাবল্য দেখিয়া পরমহংসবেশ ত্যাগ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধোক্ত অবন্তিনগরের ত্রিদণ্ডী ভিক্ষু, ত্রিদণ্ডী বৈষ্ণব আচার্য্য শ্রীরামানুজ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীর ন্যায় ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া বজ্রনির্ঘোষস্বরে ঐ সকল ব্যভিচার ও কদাচারের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিলেন।

তিনি স্বয়ং ও তাঁহার উপযুক্ত শিষ্যমণ্ডলীর দ্বারা তিনি ভারতের সর্ব্বত্র আত্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। পাশ্চাত্য দেশেও সাময়িক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি দ্বারা প্রচার কার্য্য চলিতেছে। শীঘ্রই শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখ-নিঃসৃত—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।।"

এই বাণী সাফল্য লাভ করিবে, এরূপ আশা করা যায়। যিনি প্রপন্ন হইয়া সেই আদর্শ আচার্য্যের পাদমূলে উপবেশন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তিনিই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছেন যে, মায়া যত প্রকার মোহিনী রূপ ধারণ করিয়াই আগমন করুক না কেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা ধরিয়া ফেলেন এবং শাস্ত্রযুক্ত্যে তাহার মূলচ্ছেদ করিয়া প্রণত জনের নিকট তাহার স্বরূপ-তত্ত্ব প্রদর্শন করিয়া দেন। শিষ্যানুবন্ধ, জনানুবন্ধ, সমাজানুবন্ধ তাঁহাকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি মনোধর্ম্মশীল জগতের যাবতীয় লোকমতের বিরুদ্ধে প্রচারক। মনোধর্ম্মী জগতের নিকট যাঁহারা প্রথিতনামা মহাপুরুষ, ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন, নিরস্তকুহক আত্মধর্ম্মের নিকট তাহাদের মূল্য কত অল্প, তাহাও তিনি প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আমরা প্রোজ্ঝিতকৈতব সত্য-ধর্ম্মের প্রচারক শ্রীমদ্ভাগবতে কেবল ইহার দ্বিতীয় উদাহরণ দেখিতে পাই। বাস্তবসত্যের সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া একদিন শ্রীমদ্ভাগবত জৈমিনী মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, পরাশর প্রভৃতির উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন—

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ।। (ভাঃ ৬।৩)

জৈমিনী বা মন্বাদি কর্ম্মকাণ্ডৈকবুদ্ধি মহাজন বলিয়া প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণও আত্মধর্ম্মের কথা বুঝিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহাদের বিবেকশক্তি মায়ার দ্বারা বিমোহিত হইয়াছে। তাঁহাদের বুদ্ধি ত্রয়ীর মধুপুষ্পিত বাক্যে বিজড়িত।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী মহারাজও সেই বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া একদিন প্রচার করিয়াছিলেন—

ক্রিয়াসক্তান্ ধিগ্ ধিগ্ বিকটতপসো ধিক্ চ যমিনঃ
ধিগস্তু ব্রহ্মাহং বদনপরিফুল্লান্ জড়মতীন্।
কিমেতান্ শোচামো বিষয়রসমত্তান্নরপশূন্
ন কেষাঞ্চিল্লেশোঽপ্যহহ মিলিতো গৌরমধুনঃ।।

কর্ম্মীগণকে ধিক্, বিকটতপা যোগিগণকে ধিক্, জড়বুদ্ধি প্রফুল্লবদন অহং-গ্রহোপাসকগণকে ধিক্; এই সকল কর্ম্মী, যোগী, জ্ঞানী বিষয়মত্ত নরপশুদিগের সম্বন্ধে আর কি শোক করিব, তাঁহারা কেহই প্রেমধর্ম্মের রস কিঞ্চিৎমাত্রও পান করেন নাই।

অতএব যিনি জগদ্গুরু প্রকৃত আচার্য্য তিনি নিরপেক্ষ। তিনি আচারবান এবং পরম সত্যের একনিষ্ঠ উপাসক।

তৃণাদপি সুনীচ

কলিযুগপাবনাবতার শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনাম সংকীর্ত্তনই কলিতে জীবগণের নিশ্রেয়সলাভের উপায় ও চরমে উপেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নিরুপরাধি শ্রীনাম কীর্ত্তিত হইলে পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম লভ্য হয়। কি অবস্থায় নিরপরাধে শ্রীনাম কীর্ত্তিত হইতে পারে, তাহাই সুষ্ঠুভাবে নির্দ্দেশ করিতে গিয়া শিক্ষাষ্টকের ৩য় শ্লোকে শ্রীমুখে—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।

উপদেশ দিয়াছেন। তৃণাপেক্ষা সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু, নিজে অমানী অন্যজীবে নিত্য কৃষ্ণদাসজ্ঞানে মানদ হইয়া কীর্ত্তন উপদিষ্ট হইয়াছে। কীর্ত্তনকারীর তৃণাদপি সুনীচ ধর্ম্মও যেরূপ পালনীয়, মানদ ধর্ম্মও তদ্রূপ পাল্য। এই ভগবদ্‌বাক্যে কিছুমাত্র স্ববিরোধ নাই। একের পালনে অন্যের ব্যাঘাত কিছুমাত্র ঘটে না।

জীব মাত্রেই "জানে বা, না জানে সবে কৃষ্ণদাস" কৃষ্ণদাসই আত্মার নিত্যবৃত্তি। জীব বহুজন্মসঞ্চিত সুকৃতিফলে যখন সর্ব্বশুদ্ধ পাদাশ্রয় লাভ করে, তখন তাহার এই সম্বন্ধ-জ্ঞান উদয় হয়। গুরুদাস যত ব্যবধানরহিত অবস্থায় শ্রীগুরুচরণাশ্রয় করিতে থাকেন, ততই তাঁহার দেহ মনের সম্বন্ধ তিরোহিত হইয়া কৃষ্ণসম্বন্ধের উদয় হয়। নিত্য কৃষ্ণদাসজ্ঞানে আত্মার নিত্যধর্ম্মে যাবতীয় জীবকে তাঁহার পরম আত্মীয় বোধ হয়, আর তাঁহার উপেক্ষার বস্তু থাকেন না। গৌড়ীয়ের সর্ব্বস্ব-ধন বিলাসবিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা দিতে গিয়া অতি কুৎসিৎস্বভাব অস্পৃশ্য সুরাপায়ী দুর্বৃত্ত দস্যু জগাই-মাধাই-এর আত্মবৃত্তিকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। জগৎগুরু নিত্যানন্দ তাঁহাদের বদ্ধাবস্থার রুচি ও প্রকৃতি সম্যক জানিয়াও তাঁহারা নবদ্বীপবাসী যাবতীয় নাগরিকের অস্পৃশ্য ও অক্ষম হইলেও দয়ালশিরোমণি তাঁহাদের নিত্য কৃষ্ণদাস্য-বৃত্তি উপেক্ষা করেন নাই—উপেক্ষা করিলেন তাঁহাদের মায়াবদ্ধ অবস্থার রুচি ও প্রকৃতিকে। জীবমাত্রই কৃষ্ণদাস ও ভক্তির অধিকারী, তাই শুদ্ধহরিকীর্ত্তন শ্রবণ ও সাধুসঙ্গের সুকৃতি দিয়া তাঁহাদিগকে আত্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহারা ভুবনপাবন ভক্ত হইয়া নবদ্বীপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। এটি অবশ্যই জীবের নিত্যস্বরূপের প্রতি গুরুশ্রেষ্ঠের মানদ ধর্ম্মের পরিচায়ক। তৃণাদপি সুনীচ, তরোরপি সহিষ্ণু ধর্ম্মের সহিত ইহার পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে, ঘুণাক্ষরে বিরোধ নাই।
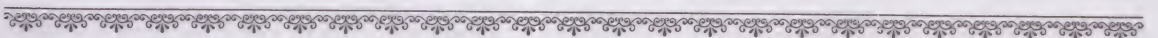
দেহ-মনের ধর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া জীব যতই হীনাবস্থায় থাকুক না কেন, তাঁহাকে নিত্য কৃষ্ণদাস এবং স্বরূপে পূর্ণ শুদ্ধ জানিয়া তাঁহার আত্মধর্ম্মের সম্মান করিতে গুরুদাস মনে প্রাণে সর্ব্বদা চেষ্টিত।

আত্মার স্বরূপ ও বৃত্তি বদ্ধ জীবের বাক্য ও মনের অগোচর। তাই পরম কারুণিক নিত্য মঙ্গলময় শ্রীভগবান্ জীবের অশেষ কল্যাণ কামনায় স্বয়ং শ্রীবেদ, শ্রীগীতা, শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্র ও উপযুক্ত পাত্রগণকে শক্তি সঞ্চার করিয়া শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি ভক্তিশাস্ত্রে জীবকে জগৎ কি, ভগবান্ কি বস্তু এবং পরস্পরের সম্বন্ধ কি প্রভৃতি নিত্য তত্ত্ব উদিত করাইয়াছেন। আম্নায়- পর্য্যায়ে শ্রীগুরুর কৃপায় গুরুদাসের ঐ সম্বন্ধজ্ঞান লভ্য হইয়াছে। দৈবীমায়ামুগ্ধ জীব যখন দেহমনোধর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া ভগবৎ ও শাস্ত্রবাণী-উল্লঙ্ঘনে নিজ বদ্ধ অবস্থার রুচি বা প্রকৃতি অনুযায়ী হরিকীর্ত্তনের অভিনয়ে নিজ ও দশের অধঃপতন ও সর্ব্বনাশ করিতে প্রয়াসী হন, গুরুদাস নিজের পরমাত্মীয়ের এবম্বিধ সর্ব্বনাশ- প্রয়াসে আর স্থির থাকিতে পারেন না। নির্ভয়ে শত সহস্র বাধাবিঘ্ন অকাতরে সহ্য করিয়া তরোরপি সহিষ্ণু ধর্ম্মের পরিচয়ে সমস্ত মান অপমান, সর্ব্বপ্রকারে অভিমান পরিত্যাগে তৃণাদপি সুনীচ ও অমানী হইয়া বদ্ধজীবের নিত্য শুদ্ধ আত্মবৃত্তির প্রতি পূর্ণ সম্মান প্রদর্শনে মানদ হইয়া নিজের ও বদ্ধ জীবের চরম কল্যাণ-কামনায় শ্রীগুরুপাদপদ্মে লব্ধ ভগবান্ ও শাস্ত্র-নির্দেশানুযায়ী শুদ্ধ হরিকীর্ত্তনের আচার ও প্রচার করিতে ব্রতী হন। ইহাতে যদি শাস্ত্র ও সন্মার্গ-উল্লঙ্ঘনকারী কাহারও হরিকীর্ত্তন-অভিনয়ে বাধা পড়ে, তাহা অনিবার্য্য। নিজে আচরণ করিয়া গুরু ও শাস্ত্র-অনুমোদিত যে কীর্ত্তন ও প্রচার তাহাতে কিছুমাত্র দ্বেষ বা হিংসার স্থান নাই। দক্ষিণদেশ উদ্ধার-লীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভু দুষ্টমত দূষিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া তত্রত্য মতবাদিগণের প্রতি অশেষ কৃপাই করিয়াছেন—

তার্কিক মীমাংসক মায়াবাদীগণ।
সাংখ্য পাতঞ্জল স্মৃতি পুরাণ আগম।।
নিজ নিজ শাস্ত্র উদ্গ্রাহে সবে প্রচণ্ড।
সর্ব্বমত দূষি প্রভু করে খণ্ড খণ্ড।।
সর্ব্বত্র স্থাপিয়ে প্রভু বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে।
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহ না পারে খণ্ডিতে।। (চৈঃ চঃ মধ্য ৯ম)

নিরীশ্বর বৌদ্ধগণ অসম্ভাষ্য; শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদিগকেও কৃপা করিয়া জীবের আত্মধর্ম্মের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের গর্ব্বখণ্ডনে অশেষ কল্যাণ বিধান করিলেন।

পাষণ্ডের দল আইল পাণ্ডিত্য শুনিয়া।
গর্ব্ব করি আইল সঙ্গে শিষ্যগণ লইয়া।।
যদ্যপি অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে।
তথাপি বলিলা প্রভু, গর্ব্ব খণ্ডাইতে।।

ইহাই প্রকৃত মানদ-ধর্ম্মের প্রকৃষ্ট উদাহরণ, ইহাতে তৃণাদপি সুনীচ ধর্ম্মের কিছুমাত্র ব্যত্যয় ঘটে নাই। এ অহৈতুকী কৃপায়ও পাষণ্ডীগণের স্বভাবোচিত আচরণ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। তবে সে ক্ষেত্রেও যেরূপ পাষণ্ডীগণের চেষ্টায় তাহাদিগের গুরুই শাস্তিভোগ করিয়াছিলেন, মহাপ্রভুর কেশ স্পর্শও করে নাই, বর্ত্তমানেও তদ্রূপ অসৎ চেষ্টার ফলে অসদ্‌গুরুরই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণাশ্রয়ী জীবের কেশস্পর্শও করিতে পারিবে না। ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তরূপা লীলার অনিবার্য্য বিধান-মন্ত্র। নিজে আচরণ করিয়া শুদ্ধহরিকীর্ত্তন প্রচার করাই গুরুদাসের নিত্যবৃত্তি—যুগপৎ স্বার্থ ও পরার্থপরতা। এই শুদ্ধ হরিকীর্ত্তনই সকল সাধনের পর সাধন; ইহার ভাবই বদ্ধজীবের পরম কল্যাণকর ও আত্মবৃত্তি-উন্মেষের কারণ।

অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তসজ্জায় সজ্জিত হইয়া নিজ আচার ও প্রচার ভক্তের আচার প্রচার সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। উৎকল ও মাদ্রাজ রাজ্যের প্রভাবশালী স্বাধীন নরপতি প্রতাপরুদ্র মহারাজকে দীক্ষা দিবার জন্য যে সময়ে তিনি সার্ব্বভৌম কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইলেন, তখন তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন—

> নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্‌ভজনোন্মুখস্য
> পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
> সন্দর্শনং বিষয়িনামথ যোষিতাঞ্চ
> হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোপ্যসাধু।।

আর সাবধান করিয়া দিলেন—

> ঐছে বাত পুনরপি মুখে না আনিবে।
> পুন যদি কহ আমা এথা না দেখিবে।। (চৈঃ চঃ মধ্য ১১শ)

পুনরায় আবার যখন সেই প্রতাপরুদ্র রায় রামানন্দের বৃত্তি (বর্ত্তন) স্থির করিয়া "চৈতন্য চরণে রহ যদি আজ্ঞা হয়" বলিয়া ভক্ত-সেবার এবং পাণ্ডু- বিজয়ে—

> স্বর্ণ মার্জ্জনী লৈয়া করে পথ সংমার্জ্জনে।
> চন্দন-জলে করে পথ নিসিঞ্চনে।।

শ্রীজগন্নাথদেবের দাসবৃত্তির পূর্ণ-পরিচয় দিলেন, তখনই শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় মিলিল; ষড়ভুজ মূর্ত্তি দর্শন ঘটিল। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু পূর্ণকৃপামূলে প্রতাপরুদ্রের ঔপাধিক নরপতিবেশ অনায়াসে উপেক্ষা করিলেন কিন্তু তাঁহার আত্ম-বৃত্তি ভক্ত ও ভগবানের সেবা প্রতি মানদ না হইয়া থাকিতে পারিলেন না।

হরিগুরুবৈষ্ণবের অনুগত্যে নিরপরাধে হরিকীর্ত্তনই জীবের শ্রেষ্ঠ সাধন বা অভিধেয়সার। যেখানে সেই আনুগত্য ধর্ম্মের অভাব, যেখানে শ্রীমন্মহাপ্রভু ভবরোগ-মহৌষধি শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র স্থলে মনঃকল্পিত শব্দাবলীর আবাহন, যেখানে গুরুবৈষ্ণববর্গের প্রতি জাতিবুদ্ধি, অবজ্ঞা ও মহাবৈষ্ণবাপরাধ, যেখানে নামবলে পাপবুদ্ধি, যেখানে শ্রীনাম, শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীভাগবতের দ্বারা নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণপর ভোগবিলাসের আবাহন,

যেখানে মহদতিক্রমরূপ অপরাধাদির উদয় হয়, গুরুদাসগণ সেখানেই অপরাধীকে পরম আত্মীয় বোধে তাহার আত্মবৃত্তির প্রতি মানদ হইয়া তাহার তাৎকালিক বদ্ধ অবস্থার শাস্ত্র ও গুরুবৈষ্ণব-আদেশবিরুদ্ধ রুচি ও প্রকৃতির প্রতিকূলে কার্য্য করিতে বাধ্য হন; এটি বদ্ধ জীবের তাৎকালিক অবস্থায় প্রীতিকর বোধ হয় না, কিন্তু উপায়ান্তর নাই। বদ্ধ জীবের দেহ ও মনের প্রীতিকর কার্য্যে বদ্ধতাই বৃদ্ধি হয়। এক্ষেত্রে নিজ চরিত্রে পূর্ণভাবে আচরণ করিয়া শাস্ত্র ও গুরুবৈষ্ণবের (ষড়্গোস্বামীর) বাণী-প্রচার মুখে শুদ্ধকীর্ত্তন ব্যতীত বদ্ধজীবের মনোব্যাসঙ্গ ছিন্ন করিবার উপায়ান্তর নাই। গুরুদাসের শাস্ত্রগুরু-উক্তি ব্যতীত এই বন্ধন ছিন্ন করিবার অন্য কোন অস্ত্র নাই। তাই সর্ব্বধর্ম্মসংস্থাপক শ্রীভগবান্ প্রিয় ভক্ত উদ্ধবকে ইহার প্রতিকার উপদেশ করিলেন—

"সন্তএবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।" (ভাঃ ১১।১১।৩৩)

শ্রীগুরু আশ্রয়ে শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও প্রভু নিত্যানন্দের পদানুসরণ ব্যতীত গুরুদাসের উপায় নাই। শাস্ত্রগুরুবাক্য-লঙ্ঘনে বদ্ধজীবের রুচি প্রকৃতি অনুযায়ী কার্য্য করিতে তিনি অক্ষম। ইহাই তাঁহার প্রকৃত মানদ ধর্ম্ম, ইহাতে তৃণাদপি সুনীচ ধর্ম্মের কিছুমাত্র অভাব নাই—ইহাই গুরুদাসানুদাসের করযোড়ে নিবেদন।

ভগবদনুভূতি

কেহ কেহ গৃহ মধ্যে শ্রীভগবানের অর্চ্চামূর্ত্তি স্থাপন করতঃ উহাকে গৃহ-দেবতা বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন। এই ধারণা যতই বদ্ধমূল হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে ভগবদ্ভাবও সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ হয়। যে শ্রীভগবান্ আব্রহ্ম নিখিল বস্তুব্যাপী সুবৃহৎ ও যাঁহার এক এক লোমকূপে শত শত ব্রহ্মাণ্ডও স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে, তাঁহাকে ক্ষুদ্র গৃহমধ্যে স্থিত মনে করায় এবং তাঁহাকে সেই গৃহস্থিত মুষ্টিমেয় জীবের বন্ধু ও কল্যাণ-বিধাতা এইরূপ ধারণা করায় তদীয় অসীম মহিমাকে সীমাবদ্ধ করা হয় মাত্র। যে ব্যক্তি ঐরূপ করেন, তিনি নিজে শ্রীভগবচ্চরণে উত্তরোত্তর অপরাধ করিতে থাকেন এবং অন্তে যে একাই যথার্থ ভগবদ্ভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইয়া যান তাহা নহে, পরন্তু যে কেহ তাঁহার সঙ্গ করেন তিনিও তদ্রূপগতি লাভ করেন। গ্রাম্য দেবতাবাদীগণও গৃহদেবতাবাদীদিগের দশাপ্রাপ্ত হয়েন। বঙ্গদেশের নানা স্থানে এই দুইপ্রকার ভাবের বহু পরিচয় পাওয়া যায়।

জনৈক ব্রিটেন রাজ্ঞী রোমানদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া দেশিক দেবতার (Country God) নিকট শত্রু-নিধনার্থ বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ইহা হইতে জানা যায় যে, বঙ্গদেশে প্রচলিত গৃহ বা গ্রাম্য-দেবতাভাবের ন্যায় সমপর্য্যায়ে অবস্থিত আর এক প্রকার দৈশিক দেবতাভাব বহুকাল পূর্ব্বে সুদূর পাশ্চাত্য প্রদেশে প্রচলিত ছিল। হয় ত' পৃথিবীর কোন কোন স্থানে উহার প্রচলন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ভোগবৃত্তি-চরিতার্থকরণোদ্দেশেই এই সকল সঙ্কীর্ণাত্মক ভাব, কৌশলী, ভোগপরায়ণ ব্যক্তি কর্ত্তৃক যে সমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই ঈষৎ মনোনিবেশপূর্ব্বক চিন্তা করিলেই ইহা বুঝিতে পারিলেন।
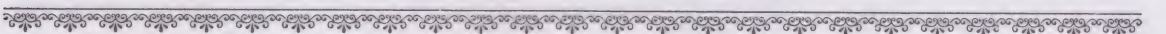
পূর্ব্বোক্ত গৃহ, গ্রাম্য ও দেশিক দেবতাভাব অপেক্ষা তত্তুল্য আর একপ্রকার সঙ্কীর্ণাত্মক ভগবদ্‌ভাব জগতে প্রচলিত আছে, তাহাতে স্থানগত লক্ষ্য না থাকায় সাধারণকে মুগ্ধ ও প্রতারিত করিবার কৌশলটী সুন্দররূপে অন্তর্নিহিত আছে। প্রতারণার উদ্দেশ্য লাঙ্গুলহীন শৃগালের ন্যায় দলপুষ্টি করা মাত্র। ইহাতে প্রাগুক্তবাদিগণের ভাবে অবস্থিত স্থানগত লক্ষ্যের পরিবর্ত্তে সমাজগত লক্ষ্য আছে এবং তজ্জন্য ইহাকে সাম্প্রদায়িক ভগবদ্‌ভাব সংজ্ঞা দিলে পরিচয়ের সুবিধা হয়। মুসলমানগণ পৃথিবীর নানা দেশে অবস্থিত এবং তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, হিন্দুদিগের ঈশ্বরধারণা ভূতপ্রেতাত্মক ও তাঁহাদিগের আল্লা (ভগবান) তদ্রূপ নহে। তাঁহারা আরও বলেন যে, কলমা পড়িয়া মুসলমান না হইলে আল্লার "মেহেরবাণী" পাওয়া যায় না। অর্থাৎ প্রকারান্তরে বলেন যে, আল্লা একমাত্র মুসলমানদিগেরই রক্ষক ও অন্যের নির্য্যাতক। যেহেতু আল্লা কোনও নির্দ্দিষ্ট গৃহের, গ্রামের বা দেশের রক্ষক নহে, তজ্জন্য স্থানগত সঙ্কীর্ণতা আল্লাভাবে সংশ্লিষ্ট নাই। পৃথিবীর নানা দেশের নানা গ্রামের নানা গৃহে মুসলমানগণ অবস্থিত- বিধায় সমাজগত লক্ষ্যই আল্লাভাবে উপলক্ষিত হইতেছে। খৃষ্টিয়ানদিগেরও মত যে, জেরুসিলামের জল দ্বারা অভিষিক্ত (baptised) না হওয়া পর্য্যন্ত কেহ খৃষ্টিয়ান বলিয়া গণ্য হইতে পারে না এবং তাহা না হইলে God-এর (ভগবানের) প্রিয় হওয়া যায় না এবং তদভাবে শয়তানের অধীনতা বশতঃ অনন্তকাল নরক ভোগ করিতে হইবে। আমাদিগের দেশস্থ শাক্ত, সৌর, শৈব, গাণপত্য ইত্যাদি ভাবগুলিও মুসলমান এবং খৃষ্টিয়ানদিগের ন্যায় সাম্প্রদায়িক দোষে দূষিত। এতৎবাদীগণ সকলেই ভগবৎ মহিমা খর্ব্বকরণ জনিত অপরাধে পতিত ও হেয় এবং প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবৎ-অনুরাগী না হইয়া প্রচ্ছন্ন ভগবদ্- বিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর অনুচরবর্গ মধ্যে গণ্য হইবার যোগ্য। ইহাদিগের প্রত্যেকেই দেহাত্মাভিমানে স্ফীত হইয়া মনে করেন যে, নিজ নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত ভগবৎ ধারণা সর্ব্বোচ্চ ভূমিকায় অবস্থিত ও সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতারূপে দোষ বর্জ্জিত। তাঁহাদিগের একবারও ভাবিবার অবকাশ হয় না যে যদি নিজ নিজ ভাব সর্ব্বোচ্চ প্রকোষ্ঠস্থিত হইত, তাহা হইলে তাহারা বিবদমান অবস্থায় কেন সুসজ্জিত এবং এক সম্প্রদায় আর এক সম্প্রদায়ের প্রতি কটাক্ষপাত করেনই বা কেন? যে ভগবৎ জ্ঞান লাভ হইলে জীবগণ কৃতকৃত্য ও লব্ধানন্দী হইয়া থাকেন এবং মৎসরাদি বিলুপ্ত হইয়া যায় তাহা যখন ঘটিতেছে না, তখন নিশ্চয়ই যে গলদ আছে ইহা পণ্ডিতগণ ধরিয়া ফেলেন। কূপ মণ্ডূক যেমন কূপের মধ্যেই সমগ্র জগৎ স্থিত মনে করে এবং কূপের বাহিরে আর জগৎ নাই বিবেচনা করিতে বাধ্য, এই সকল মতবাদীগণের দর্শনও ঠিক তদ্রূপ। দেহ ও মন ছাড়া আত্মা যে পৃথক পদার্থ, আব্রহ্ম কৃমিকীট পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রাণীর আত্মা যে একই জাতীয় তত্ত্ব এবং প্রত্যেকেরই ভগবান্ যে একই বস্তু ইহা জানা না থাকায় পৃথক পৃথক রূপে অবস্থিত দেহ ও মনের ধর্ম্মকে আত্মায় আরোপ করতঃ পরস্পর বিবদমান দশায় উপনীত। আত্মতত্ত্বের বিশুদ্ধজ্ঞান বিকশিত না হওয়া পর্য্যন্ত স্বার্থপরতা বিদ্যমান থাকিবে এবং স্বার্থহানিস্থলে কলহ নিশ্চয়ই হইবে। নানা মুনির নানা মত হইবার কারণ যে আত্মজ্ঞানের অভাব, ইহা সকলেই জানেন।

অনেকে বৈষ্ণব বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন এবং দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহারা বৈষয়িক রস আস্বাদনেও প্রমত্ত। তাহাদিগের মধ্যে আবার কেহ কেহ নিজে শ্রীকৃষ্ণের স্থান দখল করতঃ নাগরী লইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ

করা ব্যাপারকেই জীবনের চরম উদ্দেশ্য স্থির করিয়াছেন। কতকগুলি লোক সাক্ষাৎ সূত্রে নিজ সুখসম্ভোগকেই চরম লক্ষ্য (Happiness is the final goal) স্থির করিয়া দেখিলেন যে, পৃথিবীর সমস্ত বস্তুই ক্ষণভঙ্গুর বিধায় তদ্দ্বারা নিত্যকালব্যাপী সুখপ্রাপ্তির আশা বিড়ম্বনা মাত্র এবং তাহা নিত্যবস্তু শ্রীকৃষ্ণের চর্চ্চায় পাওয়া যাইতে পারে শুনিয়া সুখলিপ্সু হইয়া সকাম ভাবে তাহার চর্চ্চায় রত। পুণ্য যে সুখের ধাম, তাহার না লইও নাম এই উপদেশ বৈষ্ণবকে সুখের নাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে নিষেধ করিতেছেন—সুখের কামনা করা ত একেবারেই নিষিদ্ধ। ভজ ধাতুর অর্থ সেবা, অতএব ভগবৎ ভজন বলিলে ভগবানেরই সেবা-কার্য্য বুঝায়। ভগবানের সেবার পরিবর্ত্তে তাঁহার দ্বারা নিজ সেবা করাইয়া লওয়া ইঁহাদের অভিপ্রায়। যাঁহার পুত্র লাভ হইয়াছে তিনিই জানেন যে সুন্দর সুন্দর খাদ্য নিজে ভোগ না করিয়া পুত্রকে খাওয়াইলে অধিক সুখ পাওয়া যায়। অপুত্রক ইহা চিন্তাপথেও বুঝিতে সক্ষম নহেন—যেহেতু তিনি ঐরূপ খাদ্যদ্রব্য পাইলে নিজে লোভ সংবরণ করিতে অক্ষম এবং অপরকে তাহা দিতে পারেন না। তদ্রূপ ভোগপরায়ণ ব্যক্তি ভগবৎ সেবা-জনিত সুখের ইঙ্গিত মাত্রও জানা না থাকা হেতু অভক্তোচিত ভাবে ভগবানের দ্বারা যে নিজ তৃপ্তি সাধিত করাইবার প্রয়াসী হইবেন ইহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে। ‘‘তৎসুখসুখিত্বং” এর ভাব নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তিতেই দেখা যায়। ‘‘আলিঙ্গন দেও কিম্বা দলহ চরণে” যিনি বলিতে পারেন তিনিই ভগবানের সুখে সুখী হইবার উপযুক্ত পাত্র। ভোগাসক্ত বৈষ্ণব- নামধারী ব্যক্তি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কলঙ্ক সদৃশ এবং তাহাদিগকে ‘‘বোষ্টম্” বলিয়া বুঝিলে বৈষ্ণব শব্দ শ্রবণে কেহ নাসিকা-কুঞ্চিত করিতে সক্ষম হইবেন না। ইহারা মুখে শ্রীকৃষ্ণের উপাসক বলিলেও ইহাদিগকে কার্য্যতঃ উপরোক্ত মতবাদীগণের ন্যায় মায়ার অন্তর্গত সগুণ দেবতারই উপাসক বলিয়া জানিতে হইবে। দেহ ও মনের ধর্ম্মকেই আত্মার ধর্ম্ম বিবেচনা করায় ইহারাও ভ্রান্ত। আউল, বাউল, সখীভেকী, জাতি-গোঁসাঞি ইত্যাদি ‘‘বোষ্টম্”গণই এই শ্রেণী মধ্যে গণ্য।

বদ্ধজীব সমূহ, দেহ ও মনে আত্মবুদ্ধি করতঃ ইন্দ্রিয়গ্রাম দ্বারা বাহ্য জগৎ হইতে বিষয় গ্রহণ করতঃ ভোগানন্দে মত্ত। সেই ভোগ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন মত মায়ার অন্তর্গত সগুণ দেবতার সাহায্য প্রার্থী হইয়া তাহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়। ভগবৎ জ্ঞানের অভাব বশতঃই ইহারা দেবতাদিগকে ভগবান শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া থাকে। দেবতাদিগের দ্বারা নিজ নিজ সুবিধা করাইয়া লওয়াই তাঁহাদিগের সাধনার তাৎপর্য্য। পুণ্যকর্ম্ম প্রভাবে বদ্ধজীবগণই দেবতার পদবীতে উপনীত হয় এবং বীজাঙ্কুর ন্যায়ানুসারে পুণ্যক্ষয়ে তাহারা আবার নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ইহারা মায়িক গুণে আবদ্ধ থাকা হেতু নির্গুণ ভগবানের পরিচয় জানেন না এবং তদ্ভাবে পূজা প্রাপ্তিতে প্রসন্ন হইয়া পুনঃ পূজা লাভের আশায় ইহাদের উপাসকদিগকে বর দান করেন। পূজক ও পূজ্য উভয়ই কামনার দাস। পূজক কখনও দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন এবং পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় নীচে জন্মগ্রহণ করতঃ অপর উন্নত জীবের (দেবতার) আরাধনায় রত হইতেছেন। চক্রবৎ এই ঊর্দ্ধ ও অধোগতি আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। সকাম কর্ম্ম-মার্গের নিয়ম এই যে কর্ম্ম হইতে ফল এবং ফল হইতে পুনঃ কর্ম্ম চক্রবৎ হইতে থাকে। নির্গুণ শ্রীভগবানের সেবা ব্যতিরেকে এই কর্ম্মপ্রবাহ নির্ম্মূল হয় না। তাই শ্রীকৃষ্ণদেব অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—‘‘মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়াম্ এতাং তরন্তিতে।”

অদ্বয় জ্ঞানের সুপ্তাবস্থায় দ্বৈতজ্ঞান জাগরূক থাকে। মায়ার অধিকারে দ্বৈত জ্ঞানের উদয় হয়। ‘‘মীয়তে অনয়া ইতি মায়া’’ অর্থাৎ যে শক্তির দ্বারা মাপিয়া লওয়া যায়, তাহাই মায়া। অখণ্ড বস্তু আমাদের মন ও বুদ্ধির ধারণাতীত। অতএব তাঁহাকে মন ও বুদ্ধির গোচরীভূত করিতে হইলে তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া অগ্রেই বিভক্ত করিতে হয়। পশ্চাৎ এক এক করিয়া খণ্ডগুলিকে গ্রহণ করাকেই মাপিয়া লওয়া কহে। দ্রষ্টা বা ভোক্তাকে একটি পৃথকরূপে এবং সম্মুখস্থ পদার্থকে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডাকারে দাঁড় করান মায়া শক্তির প্রাথমিক কার্য্য। ইহাকে শাস্ত্রীয় ভাষায় দ্বৈত বুদ্ধি বা ভেদ জ্ঞানমূলক গঠন কহে। অতঃপর ভিন্ন ভিন্ন রূপে দৃষ্ট বস্তুগুলিকে এক এক করিয়া গ্রহণান্তর দেহ ও মনের সুবিধা ও অসুবিধাকে লক্ষ্য করিয়া হেয় ও উপাদেয় বুদ্ধি গঠিত হইতে থাকে। এই হেয় ও উপাদেয়রূপ বুদ্ধির পরিণামকে মায়াশক্তির দ্বিতীয় কার্য্য কহে। ইহা ভবিষ্যৎ বিষয় গ্রহণের কারণ বা বীজ। অনাদিকাল হইতে মায়ামুগ্ধ জীব সকল বিভিন্ন ঘটনাবলীর ভিতর দিয়া নানা প্রকার ঘাত ও প্রতিঘাতের বেগ সহ্য করিয়া আসিতেছে এবং সংস্কারগুলি ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া দিন দিন নব নব আকার ধারণ করিতেছে। কোনও ব্যক্তির যথার্থ পরিচয় এই যে তিনি যতদূর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তদতিরিক্ত অন্য কিছুই নহেন। ইংরাজি ভাষায় এই অভিজ্ঞতাকে Emperic Knowledge এবং আমাদের দেশীয় দার্শনিক ভাষায় ‘অক্ষজ জ্ঞান’ কহে। এই অক্ষজ জ্ঞান বর্হিদেশ (External Source) হইতে আগত এবং এজন্য ইহাকে আগন্তুক ব্যাপার (Foreign element) বলা হয়। ইহার অনুশীলন বেশী পরিমাণে হইতে থাকিলে ইহা নিসর্গ (Habit) রূপে আমাদের উপর আধিপত্য করিতে থাকে। যাবৎ না এই অক্ষজ চেষ্টাকে যত্ন সহকারে শিথিল করিতে পারা যায়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত জীবের স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব (Transcen-dental Knowledge) সুপ্ত থাকিয়াই যাইবে। স্বতঃসিদ্ধ স্বভাবে (Innate Intuitive বা Primary nature) যে ভগবদ্ দাস্য অবস্থিত তাহার অপ্রকাশেও থাকিতে বাধ্য। পরে কোনও কালে ভোগে নানাবিধ কষ্ট পাইয়া যদি নির্ব্বেদ আসিয়া আমাদিগের হৃদয়কে অধিকার করে, তখন সেই নির্ব্বেদ প্রভাবে ভোগ ত্যাগপর হইয়া ব্যতিরেক (Negativism) আশ্রয়ঃ করতঃ ভোগের প্রতি সংবেদী ভাব যে অভোগরূপ মোক্ষ তাহার জন্য লালায়িত হয়। ভোগ ও অভোগরূপা মোক্ষ এই ভাবদ্বয়কে ইংরাজি ভাষায় pair of opposites বলে। অভোগরূপা মোক্ষ অশ্ব ডিম্বের ন্যায় বস্তু শূন্য বিকল্প মাত্র। বুদ্ধির বিষয়গ্রহণপর যে গতি তাহাকে অন্বয়মুখী (positivism) এবং বিষয়ত্যাগপর যে গতি তাহাকে ব্যতিরেকমুখী চিন্তনপ্রণালী কহা যায়। গ্রহণ বা ত্যাগপর উভয়প্রকার গতিতেই বিষয় জ্ঞান ক্রোড়ীভূত (common factor) রূপে বর্ত্তমান থাকে। গ্রহণে আসক্তির ও ত্যাগে বিরক্তির ভাব জাগ্রত থাকে এইমাত্র প্রভেদ। যে জ্ঞানটী যে অন্যজ্ঞান সাহায্যে প্রকটিত হয়, সেই নবোদিত জ্ঞানটীকে সাহায্যকারী জ্ঞানের প্রতিসংবেদী ভাব কহে। এই প্রতি-সংবেদনগম্য ভাব নিরপেক্ষ হইয়া উদিত হয় না এই হেতু বাস্তব সত্য নহে। ইহা আপেক্ষিক (relative) সত্য। শেষে যখন এই সব তত্ত্বকথা শ্রবণ গোচর হয় এবং মোক্ষ সাধনে অনর্থক কষ্টভোগ হইতেছে মাত্র বলিয়া বিশ্বাস জন্মে, তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কস্তুরী মৃগের ন্যায়, নিজান্তরস্থ অধোক্ষজজ্ঞান লাভার্থে জীবগণ ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে থাকে। এইরূপ

ভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে ভগবৎ ইচ্ছা ক্রমে শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গলাভ করে এবং সঙ্গপ্রভাবে উত্তরোত্তর জীবের নিত্য সত্ত্বায় স্থিত যে অধোক্ষজ সেবাপ্রবৃত্তি সুপ্তাকারে ছিল, তাহার সন্ধান পাইয়া চিরদিনের জন্য ভগবৎ সেবার সর্ব্বান্তঃকরণে প্রবৃত্ত হয় ও দেহান্তে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়া যায়। অধোক্ষজসেবাপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে অক্ষজজ্ঞান প্রতিভাশূন্য হইয়া যায় এবং ভগ্নদংষ্ট্র সর্পের ন্যায় আর চাঞ্চল্য আনয়ন করিতে পারে না।

ভগবান্ একমাত্র বিষয় জাতীয় বাস্তববস্তু। তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ও সর্ব্ব শক্তিমান্। তাঁহার শক্তি তাঁহাতেই স্থিত, যেমন দাহিকা শক্তি অগ্নিতেই অবস্থিত। স্বরূপতঃ শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন, কিন্তু কার্য্যতঃ ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হয় মাত্র। শক্তিমান আশ্রয় বা সেব্য তত্ত্ব এবং শক্তি আশ্রিত বা সেবক তত্ত্ব। একই বস্তু একভাবে সেব্য ও আর একভাবে সেবকরূপে অনুভূতিগম্য হয়েন। শক্তি পরিণত (Manifested) অবস্থায় নিজ অস্তিত্ব প্রকাশ করেন এবং কার্য্যের দ্বারে শক্তিমানেরও পরিচয় আমাদের কাছে দেন। তাই শাস্ত্র বলেন, তস্য ভাসা সর্ব্বম্ ইদং বিভাতি, শক্তিমান্ ব্যতীত শক্তি যখন অন্যবস্তুর প্রকাশ করেন না, তখন শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্নাত্মক ইহা সুনিশ্চিত। প্রকাশগুণান্বিতা শক্তি, শক্তিমান্ হইতে পৃথক অন্য কোনও বস্তু থাকিলে, তাহাকেও প্রকাশ করিয়া দিত। অতএব দ্বিতীয় বস্তু না থাকায় তৎ প্রকাশ হইল না। শাস্ত্র বলেন যে—"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ সাৎ" কাজেই দ্বিতীয় বস্তুর অসত্ত্বায় বস্তু একটীই আছে এবং তাহা অভয় পদে প্রতিষ্ঠিত। তিনি নিজেই প্রভু ও নিজেই সেবক। এই একাধারে সেব্য সেবক ভাব যুক্ত বস্তুই অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব। শক্তিরূপ সেবকাঙ্গ শক্তিমানরূপ সেব্যাঙ্গের সেবা সৌষ্ঠবার্থে কেহ কেহ বলেন, লীলার্থে বা আনন্দ সমুদ্র উদ্বেলনার্থ দ্বিবিধ রূপে পরিণত হইয়াছেন। নিত্য বৈকুণ্ঠাদিধাম, তত্রত্য সেবোপকরণ-সামগ্রী এবং জীবগণ চিৎশক্তি পরিণতির মধ্যে গণ্য এবং চৌদ্দভুবনাত্মক দৃশ্য ও অদৃশ্য জগৎ ও জীবগণের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ জড়- পরিণতির তালিকা ভুক্ত। জীবগণ দুইপ্রকার, বদ্ধ ও মুক্ত। মুক্তজীব সকল নিত্যধামে শুদ্ধ আত্মজ্ঞানে অবস্থিত এবং সদা ভগবৎ সেবা রত। বদ্ধজীবনিচয় ঈশ-বিমুখ ও দেহ এবং মনে আত্মবুদ্ধি করতঃ কারাগার সদৃশ ইহ জগতে স্থিত ও ভোগপরায়ণ। ইহারা ভগবানের মায়াশক্তির অধীনতায় নিজেকে ভোক্তৃ বুদ্ধি করিতেছে এবং ইন্দ্রিয় গ্রাম সাহায্যে বাহ্য বিষয় ভোগে রত। ভোগপরায়ণ হইয়া ইহারা কভু উচ্চ এবং কভু নীচ জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিতেছে এবং কারাগারপিষ্ট কয়েদীর ন্যায় নানাপ্রকার যাতনা ভোগ করিতেছে। বদ্ধ জীবগণ ভগবৎ-শক্তির তটস্থপ্রভাব হইতে জাত এবং সেই নিমিত্ত ভগবৎসেবাও করিতে পারে এবং মায়ার অধীনতাও করিতে সমর্থ। স্বতন্ত্রতা বশতঃ যদি মায়ার দাসত্ব করে, তাহা হইলে স্বতন্ত্রতার অসৎ ব্যবহার করা হয় এবং ফলে মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখ ভোগ করিতে বাধ্য হয়। সাধুসঙ্গ প্রভাবে যদি সুসংস্কার লাভ করতঃ স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহারে যত্নশীল হয় এবং ভগবৎসেবায় ব্রতী হয়, তাহা হইলে মায়া বন্ধন করতঃ কৃতার্থ হইতে পারেন। ভগবান্ বদ্ধজীব উদ্ধারেরর জন্য কখনও নিজে নানারূপে অবতীর্ণ হইয়া নানারূপ উপদেশ দেন এবং কখনও প্রিয় কোন পার্ষদকে পাঠাইয়াও সেই কার্য্য সমাধান করিতে থাকেন। যাবৎ না সাক্ষাৎ ভগবান্ বা তদীয় পার্ষদ ও মহাজনের সঙ্গলাভ হয়,

তাবৎকালই অক্ষজজ্ঞানে নির্ভর করতঃ পূর্ব্বোল্লিখিত মত বাদীগণের ন্যায় আমরা দেবতা-উপাসক পর্য্যন্ত গতি লাভ করিতে পারি। সাধুসঙ্গে দ্বৈতবুদ্ধির নাশ ও অদ্বয় জ্ঞানের উন্মেষ হয়, তৎপ্রভাবে যে দিকে নেত্র পতিত হইবে তথায়ই স্থাবর জঙ্গমাদির পরিবর্ত্তে ইষ্টদেবের শ্রীমূর্ত্তিই দেখিতে পাওয়া যাইবে। অদ্বয়জ্ঞানে দ্বৈতজ্ঞানজাত দ্বিতীয়াভিনিবেশ না থাকায় শ্রীভগবানই একমাত্র বিষয় জাতীয় বস্তুরূপে যে সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইবেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি? এই অবস্থায় অন্যান্য বস্তুগুলি ঐ বিষয়জাতীয় ভগবদ্‌বস্তুর আশ্রিত তত্ত্বরূপে অর্থাৎ শক্তিজাতীয় সেবক ও সেবোপকরণরূপে পরিলক্ষিত হইতে থাকিবে। "সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ"। ইহাই জীবের চরম লক্ষ্য। ইহাতে বাসনাবীজ না থাকায় আর গত্যন্তর হইবার সম্ভাবনা নাই।

ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্ হওয়ায় একই সময়ে বহুরূপে এবং বহুস্থানে একই রূপে প্রকট থাকিতে পারেন। জীব অল্পশক্তিসম্পন্ন এবং সেই জন্য আমরা একই সময়ে বহুরূপে বা বহুস্থানে একইরূপে থাকিতে পারি না। 'সর্ব্বশক্তি সত্ত্ব' ভাবটীতে কোনও রূপ অপারকতার ভাব স্থান প্রাপ্ত হয় না। যাঁহারা অপারকতার ভাব স্থান দিতে চাহেন, তাঁহাদের সর্ব্বশক্তিমত্তার ধারণাটি সোনার পাথর বাটীর ন্যায় বিরুদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত এবং তজ্জন্য সমীচীন নহে। কেবল চিৎবৃত্তির সাহায্যে ভগবৎতত্ত্বকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপে, সৎ ও চিৎ এই দুই বৃত্তির সাহায্যে অন্তর্য্যামী পরমাত্মরূপে এবং সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই বৃত্তিত্রয়ের সাহায্যে সবিশেষ শ্রীভগবৎ-রূপে আমরা অনুভব করিতে পারি। যাঁহারা কেবল ব্রহ্ম বা কেবল পরমাত্মরূপ স্বীকার করেন এবং অপর দুইটী প্রকাশকে অস্বীকার করেন, তাঁহারা ভগবৎ-মহিমা-খর্ব্বকরণ জনিত অপরাধে ক্রমশঃ অধঃপতিত হইয়া যান। যাঁহারা শুদ্ধভক্ত, তাঁহারা ব্রহ্মরূপকে অঙ্গজ্যোতি এবং পরমাত্মরূপকে অংশ-বিভূতি জানিয়া সমাদর করেন এবং অপরাধশূন্য হৃদয়ে উত্তরোত্তর ভক্তি লাভ করিতে থাকেন। শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি ত্রিবিধরূপে দর্শনযোগ্য হইয়া থাকেন— ঐশ্বর্য্যপ্রবল চতুর্ভূজ শ্রীনারায়ণ মূর্ত্তিতে তিনি দ্বারকায়, ঔদার্য্যপ্রবল দ্বিভুজ শ্রীগৌরমূর্ত্তিতে তিনি শ্রীনবদ্বীপে এবং মাধুর্য্যপ্রবল দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিতে সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজমান। কোনও জাতরতি ভক্ত ভগবদিচ্ছাক্রমে উৎক্রান্তিদশায় বস্তুসিদ্ধিতে অপ্রকট লীলায় দ্বিবিধ কলেবর ধারণপূর্ব্বক উক্ত ঔদার্য্য ও মাধুর্য্য উভয় লীলারই সেবা করিতে পারেন। যদি স্বকীয়ভাবযুক্ত ঐশ্বর্য্যরসপ্রধান সেবা ভালবাসেন, তবে তিনি সিদ্ধদেহে দ্বারকাপতির সেবক হইবেন; যদি কেবল রুচি বা বিশ্রম্ভপ্রধান সেবা ভালবাসেন, তবে ব্রজে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসাশ্রিতভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবক হইবেন এবং যদি বিপ্রলম্ভ (বিরহ) রস ভালবাসেন, তাহা হইলে শ্রীগৌরাঙ্গের সেবক হইবেন। এই যে লীলাগত বৈচিত্র্যময় সিদ্ধ সেবা বলা হইল, সেই সব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই অমল, নির্গুণ পরম চমৎকার ভাবের ব্যঞ্জক। পরমাত্মা বা ব্রহ্মরূপ নিরাকার হেতু মন ও বুদ্ধির দ্বারা সম্যক্‌রূপে গ্রহণযোগ্য নহে, কেবল শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা উঁহাদিগের অস্তিত্বমাত্র অনুভব করা যায়। ভগবানের চিন্ময় সাকার রূপই অনর্থমুক্ত অবস্থায় আমাদের দর্শনযোগ্য। যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ শ্রীমূর্ত্তিতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারি, তাহা হইলে আর উপায়ান্তর নাই। প্রকৃতিসুলভ নানা গুণময় দেবদেবীর মূর্ত্তিতে অথবা নিরাকার ভাবে জীবের হৃদয় আসক্ত হইয়াছে দেখিয়া ঔদার্য্যপ্রবল শ্রীগৌরাঙ্গ-মূর্ত্তিতে অবনীমধ্যে প্রকটিত হইয়া ভগবান্ নিজ শ্রীকৃষ্ণ-

মূর্ত্তিতে জীবগণকে আসক্ত করিবার অভিপ্রায়ে নানাপ্রকার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের চরণে ভক্তি স্থাপন করিতে পারিতেছেন না, তাঁহাদের যে কি দুর্দ্দশা হইবে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। শ্রীগৌরাঙ্গচরণে জীবকুল যাহাতে রতি মতি লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য 'গৌড়ীয়' পত্রের আবির্ভাব হইয়াছে। অতএব হে পাঠকবর্গ! গললগ্নীকৃতবাস হইয়া দন্তে তৃণ ধারণপূর্ব্বক আপনাদের নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি যে, যদি শ্রীগৌরাঙ্গচরণে অকপটভাবে মস্তক বিক্রীত হইয়া থাকে, তাহা হইলে অপর পতিত জীবকে সুশিক্ষা দিতে থাকুন এবং যদি নিজেরা কুসংস্কারাবদ্ধ থাকেন তবে আদরপূর্ব্বক 'গৌড়ীয়' পাঠ করুন এবং 'গৌড়ীয়' যাহাতে প্রত্যেক জীবের ঘরে ঘরে বিরাজিত ও আলোচিত হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হউন। "দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ" ইহাইত শাস্ত্রের প্রকৃত সত্য কথা। ভোগবাসনারূপ মল ত্যাগ করিতে প্রাণপণে যত্ন করা কর্ত্তব্য এবং তাহা ত্যক্ত না হইলে পরম দেবতা বিষ্ণুর অমল দর্শন ও সেবাধিকার পাওয়া যাইবে না। সৎ সিদ্ধান্ত না শুনিলে ভোগবাসনা যাইবার নহে, ইহা সুনিশ্চিত জানিবেন। ওঁ হরি ওঁ তৎসৎ।

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ

চরমে হিতকর বস্তুই শ্রেয়ঃ শব্দ বাচ্য এবং আপাতমধুর বা ক্ষণিক প্রীতিদায়ক বস্তু প্রেয়ঃ বলিয়া অভিজ্ঞাত। জীবের ধারণা ও আদর্শ অনুসারে শ্রেয়ের প্রকারও বিভিন্ন হইয়া থাকে। এই জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ দার্শনিকগণের মধ্যে শ্রেয়ো বিচারে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়। মিল্, এপিকিউরাস্ ও চার্ব্বাকাদি নাস্তিকগণ প্রেয়কেই শ্রেয়ঃ বলিয়া অভিহিত করেন। শূন্যবাদিগণ অচিৎ পরিণতি বা নির্ব্বাণকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া ধারণা করেন। অহংগ্রহোপাসকগণ "স্বগত, সজাতীয়, বিজাতীয় ভেদ রহিত চিন্মাত্র বিজ্ঞানকে" শ্রেয়ঃ আখ্যা প্রদান করেন এবং আস্তিক ভাগবতগণ ভগবৎ সেবালাভরূপ প্রয়োজনকেই নিশ্চিত শ্রেয়ঃ বলিয়া জানেন। গৌড়ীয়গণের পরম উপাস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণকারী শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের বিজয় ঘোষণা করিয়াছেন।

"শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং- - -
পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্।।"

"পরং" শব্দের দ্বারা অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, নির্ব্বিশেষ জ্ঞান কল্যাণের উপায় নহে পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তনই জীবের পরমশ্রেয়োবিধায়ক ইহা উদ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই গৌড়ীয়ের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৮।২৫১ সংখ্যায় পুনশ্চঃ রায় রামানন্দ-মুখে জীবের শ্রেয়ঃ নির্ণয় করিয়াছেন,—

"শ্রেয়ো মধ্যে কোন্ শ্রেয়ো জীবের হয় সার।
কৃষ্ণভক্তসঙ্গ বিনা শ্রেয়ো নাহি আর।।"

ভগবদ্ভক্তসঙ্গ, সাধুসঙ্গই জীবের একমাত্র চরম কল্যাণের সোপান। শ্রীমদ্ভাগবত ১।১৮।১৩ বলেন,—
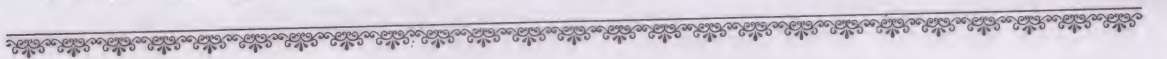
"তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ।।"

নিমেষকালমাত্র ভগবৎসঙ্গির সঙ্গ দ্বারা জীবের যে অসীম শ্রেয়ো লাভ হয়, তাহার সহিত কর্ম্মফল স্বর্গ, বা জ্ঞানফল মোক্ষ, বা মর্ত্ত্যজীবের আকাঙ্ক্ষিত তুচ্ছরাজ্যাদির কিছুমাত্র তুলনা হয় না।

কঠোপনিষৎ নচিকেতা উপাখ্যানে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আছে। উদ্দালকিপুত্র নচিকেতা ক্রুদ্ধ পিতার আদেশপালনার্থে যমভবনে আগমন করিয়া ত্রিরাত্র যমগৃহে অনশনে বহির্গত যমরাজের অপেক্ষায় রহিলেন। প্রত্যাগত যমরাজ অতিথির তেজো দর্শনে উপযুক্ত সৎকার বিধানপূর্ব্বক নচিকেতাকে তিনটী বর যাচ্ঞা করিতে বলিলেন। নচিকেতা তৃতীয় বরে আত্মার স্বরূপ জানিতে চাহিলেন। যমরাজ নচিকেতাকে সেই বরের পরিবর্ত্তে শতবর্ষজীবী পুত্র, পৌত্র, বহু পশু, হস্তী, অশ্ব, সুবর্ণ, সাম্রাজ্য, ইচ্ছামৃত্যু, অপ্সরা, উত্তমা স্ত্রী এবং মনুষ্যগণের যাবতীয় প্রীতিপ্রদ বস্তু দিতে চাহিলেন কিন্তু বুদ্ধিমান্ নচিকেতা ঐ সকল আপাতপ্রীতিকর বস্তুর নশ্বরতা জ্ঞাপন করিয়া যমরাজের নিকট পুনঃ পুনঃ আত্মার স্বরূপ জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন যমরাজ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন ঃ—

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য
বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো
মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে।।

অর্থাৎ শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ উভয়ই পুরুষের আয়ত্তাধীন বস্তু। বুদ্ধিমান্ শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ এই উভয় বস্তুর তত্ত্ব সম্যক্ বিচার করিয়া প্রেয়ঃ হইতে শ্রেয়কে পৃথক্ করিয়া শ্রেয়কেই গ্রহণ করিবেন। মন্দবুদ্ধিগণ দেহাদি নশ্বর বস্তু রক্ষার জন্য প্রেয়কে বরণ করিয়া থাকে।

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ উভয়ই পুরুষের বন্ধনের কারণ হইতে পারে।

"তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।"

প্রেয়ঃ যে প্রকার ক্ষণিক ভোগ প্রদান করিয়া জীবের আত্মোন্নতির অর্গলস্বরূপ হয়, শ্রেয়ও তদ্রূপ আত্মার চরম প্রয়োজনের জন্য উদ্দিষ্ট না হইলে আত্মবিনাশের হেতু হইয়া জীবের বন্ধনস্বরূপ হইয়া থাকে। প্রোজ্ঝিত কৈতবভক্তিধর্ম্মই·চরম শ্রেয়ঃ বা নিঃশ্রেয়স শব্দ বাচ্য। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

লব্ধা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাব-
ন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃখলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ।।

জীব লক্ষ লক্ষ জন্মের পর বহু সুকৃতিফলে অপ্রত্যাশিত ভাবে পরম প্রয়োজন সাধক এই অতি দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করে। কিন্তু তাহাও আবার চিরস্থায়ী বা বহুদিন স্থায়ী নহে, নলিনীদলগত জলের ন্যায় চঞ্চল ও অনিত্য। মৃত্যু প্রতিক্ষণ জীবকে গ্রাস করিবার জন্য পশ্চাতে রহিয়াছে। অতএব যিনি বুদ্ধিমান হইবেন তিনি ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া অন্যান্য অনিশ্চিত ক্ষুদ্র শ্রেয়ঃ বা প্রেয়ঃ লাভে সময় কর্ত্তন না করিয়া একমাত্র নিশ্চিত শ্রেয়োলাভে যত্ন করিবেন। কারণ, কুক্কুর, শূকরাদি নিকৃষ্ট যোনিতেও প্রেয়োদায়ক বিষয়লাভের নিশ্চয়তা আছে কিন্তু মনুষ্য জন্ম ব্যতীত অন্য কোনও জন্মেই শ্রেয়ঃ লাভ হয় না।

শ্রেয়ঃপ্রার্থী জীবের সংখ্যা অতি অল্প, তাই যমরাজ নচিকেতাকে বলিয়াছেনঃ—

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদুঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ।।

বহুসংখ্যক ব্যক্তিই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক নহেন। আবার অনেকে শ্রবণ করিয়াও প্রণিপাত ও সেবোন্মুখতার অভাবে উপলব্ধি করিতে পারে না। আত্মতত্ত্বের কীর্ত্তনকারী তত্ত্ববিৎ আচার্য্যও দুর্ল্লভ এবং প্রপন্ন শিষ্যও খুব বিরল। প্রপন্ন বা শরণাগত জনই একমাত্র শ্রেয়োলাভে সমর্থ হন। আমরা শ্রীগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখিতে পাই, শ্রীঅর্জ্জুন শোকশিক্ষার্থে বদ্ধজীব, মনোধর্ম্মের বশীভূত হইয়া নিজে নিজে কত প্রকার শ্রেয়ঃ কল্পনা করে তাহার অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন। অর্জ্জুন গুরুরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় ক্ষাত্রধর্ম্ম, যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিয়া ব্রাহ্মণের সাত্ত্বিক বৃত্তি; ভিক্ষা দ্বারা জীবনযাপন করাই তাঁহার পক্ষে শ্রেয়ঃ বলিয়া ধারণা করিলেন।

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্ শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহলোকে।

অর্জ্জুন যখন দেখিলেন তাঁহার স্বকপোলকল্পিত শ্রেয়ঃ দ্বারা শান্তি পাইতেছেন না, তখন তিনি ভগবানে শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নিকট শ্রেয়ঃ জিজ্ঞাসু হইলেন—

যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।।

হে ভগবন্, আমি তোমাকে এতদিন সখা বুদ্ধি করিয়া তোমাতে প্রপন্ন না হইয়া মনোধর্ম্মের দ্বারা শ্রেয়ঃ নির্ণয় করিতে গিয়াছিলাম কিন্তু ধর্ম্মবিমূঢ়চিত্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমি আপনার প্রপন্ন শিষ্য হইলাম, আমাকে কৃপাপূর্ব্বক নিশ্চিত শ্রেয়ঃ বিষয়ে শিক্ষা দান করুন।

অক্ষজজ্ঞান সাহায্যে আরোহবাদী হইয়া শ্রেয়নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিলে আমাদের নিঃশ্রেয়স্ লাভ হইবে না। হয় আমরা শ্রেয়ঃকে বরণ করিয়া ভুক্তিবাদী হইয়া পড়িব নয় মুক্তিবাদী হইয়া আত্মবিনাশ লাভ করিব। এই জন্য শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র আদেশ করিতেছেন ঃ—

"তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপসমাশ্রয়ম্।।"

উত্তমশ্রেয়জিজ্ঞাসু ব্যক্তি শাস্ত্রসিদ্ধান্তবিৎ, পরমব্রহ্মে নিত্য সেবাপরায়ণ এবং ষড়্‌বেগজয়ী গোস্বামী শ্রীগুরুদেবের শরণাগত হইবেন। সদ্‌গুরু ব্যতীত অসদ্‌গুরু কখনও শ্রেয়ঃদান করিতে পারে না। অসদ্‌গুরু ভুক্তি ও মুক্তিকামী সুতরাং আত্মধর্ম্মের পরিবর্ত্তে দেহ ও মনোধর্ম্মকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবে। সুতরাং শ্রেয়জিজ্ঞাসু ব্যক্তির উক্ত ত্রিবিধ লক্ষণোপেত সদ্‌গুরুর শরণাগত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

ভক্তিপথে বিচার

ভজ্ ধাতুর অর্থ সেবা। অতএব ভজন শব্দ দ্বারা সেবারূপ ক্রিয়াকেই লক্ষ্য করিতেছে। পিতামাতা, ধন-জনাদির সেবা হইতে আমরা অনিত্য কল্যাণকে আবাহন করিতে পারি; কিন্তু নিত্য কল্যাণ সাধন করিতে হইলে শ্রীভগবানের সেবা আবশ্যক। সেই শ্রীভগবান্ তত্ত্বতঃ কি বস্তু, কেমন করিয়া তাঁহার সেবা করিতে হয় এবং সেবকের সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ এতদ্বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞান অগ্রেই লাভ করা উচিত। পূর্ব্বে সেব্য-সেবক-সেবা সম্বন্ধীয় সুষ্ঠুজ্ঞান লাভ না করিয়া যদি কেহ ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি যে অজ্ঞাতসারে পরতত্ত্বের সেবা লাভ না করিবেন এ বিষয়ের নিশ্চয়তা কোথায়?

শাস্ত্রেই সেব্য-সেবক-সেবা সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লিপিবদ্ধ আছে; কিন্তু স্বাধীনভাবে শাস্ত্র আলোচনায় নিযুক্ত না হইলে আমরা ঐ আলোক লাভ করিতে পারি না। বদ্ধজীবের বুদ্ধিতে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটবরূপ দোষ-চতুষ্টয় অবস্থিত এবং সেই জন্য মলিনবুদ্ধির দ্বারা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে গেলে রজ্জুতে সর্পবোধের ন্যায় প্রকৃত অর্থের স্থানে বিপরীতার্থ গৃহীত হইয়া যায়। শাস্ত্রও অনন্ত বিধায় এক জীবনে অধীত হইবার নহে এবং জীবের অধিকার ভেদে নানারূপ উপদেশে পরিপূর্ণ থাকা হেতু মলিনবুদ্ধির দ্বারা সমন্বয়ের অযোগ্য। দেখিতে পাওয়া যায় যে সমন্বয়ে অসমর্থ হইয়া অনেকেই নাস্তিক ও কুতার্কিক হইয়া গিয়াছেন এবং অন্যান্য সরল মতি জীবগণকে তাঁহারা কূটবুদ্ধির দ্বারা আকৃষ্ট করতঃ কল্যাণের পথে যাইতে দেন না। সংস্কৃত ভাষায় পূর্ণাধিকার না থাকার জন্য উক্ত ভাষায় লিখিত শাস্ত্রগুলির বাক্যার্থই যখন সাধারণের বিশেষভাবে গ্রহণ যোগ্য নহে, তখন লক্ষ্যার্থ যে আদৌ বুঝিতে পারিবেন না, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

নিজ চেষ্টায় শাস্ত্রোজ্জ্বলা বুদ্ধি লাভ করা যায় না বলিয়া শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করতঃ মানবগণকে শিক্ষা দিয়াছেন "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনঃ তত্ত্বদর্শিনঃ।।" এই উপদেশ হইতে আমরা দেখিতেছি যে, শাস্ত্রজ্ঞতা ও তত্ত্বদর্শিতা এই উভয় গুণ যাঁহাতে বর্ত্তমান তাহারই নিকট হইতে শাস্ত্র কথা শুনিতে হইবে। যিনি শাস্ত্রজ্ঞ কিন্তু আচরণ-শূন্য অতএব অতত্ত্বদর্শী, তিনি আচার্য্য হইবার অযোগ্য যেহেতু তিনি তত্ত্বদর্শনহীন, অন্য অন্ধকে তিনি তত্ত্বকথা কি বলিবেন? যিনি লণ্ডন শহরে যান নাই, তাঁহার নিকট উক্ত শহরের কথা শ্রবণ করিলে যেমন সম্যক জ্ঞান লাভ হয় না; তদ্রূপ অতত্ত্বদর্শীর নিকট তত্ত্বকথা শুনিলেও বিশেষ কোন লাভ হইবার নহে, বরং বিপরীত ধারণা বদ্ধ মূল হইবার সম্ভাবনা, যাহা পরিত্যাগ করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়।
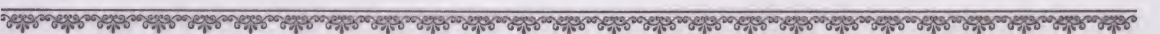
হীরক খণ্ড যেমন দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান, তদ্রূপ শাস্ত্রজ্ঞ ও তত্ত্বদর্শী আচার্য্যের সংখ্যাও পৃথিবীতে বিরল ও কল্যাণপ্রদ। আবর্জ্জনা-রাশির ন্যায় প্রচুর পরিমাণে অতত্ত্বদর্শী গুরুর সংখ্যা জগতে পরিদৃষ্ট হয়। অধিকাংশ মানববৃন্দই এই শেষোক্ত গুরুগুলির অধীন। বদ্ধ জীবের বুদ্ধিতে যে বিপ্রলিপ্সা দোষ আছে তাহার স্বভাব এই যে তদাশ্রয়া জীবকে বঞ্চিত করা এবং যে কেহ সেই জীবের আনুগত্য করিবে তাহাকেও বঞ্চিত করা। কাজেই দেখা যাইতেছে যে অতত্ত্বদর্শী গুরুগুলিকে উক্ত বিপ্রলিপ্সা দোষ আক্রমণ করা হেতু তাহারা যে তত্ত্বকথা জানেন না ইহা বলিতে পারিতেছেন না এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া তত্ত্বদর্শী যথার্থ গুরুর নিকট আত্মনিবেদন নিজেরা ও তাঁহাদিগের শিষ্যগণ বঞ্চিত হইতেছেন। কূপ-মণ্ডুক যেমন কূপের বাহিরে জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করে না সেইরূপ অতত্ত্বদর্শী গুরুবৃন্দ ও তাহাদিগের শিষ্যসমূহ অন্য কথা শুনিতে চাহে না এবং কাহাকেও শুনিতে দিতে চাহে না। ভেক গর্জ্জন সদৃশ অসার তত্ত্বজ্ঞানহীন কথাগুলিকে, সাধুবেশধারী রাবণের ন্যায় এই সমুদয় কলির চর, জগতে প্রচার করিবার অভিপ্রায়ে ইতঃস্তত ধাবমান। যিনি ইহাদের ছলনায় অভিভূত হইয়া যাইবেন, তাহার উন্নতির আশাটী পর্য্যন্ত অস্তমিত হইয়া যাইবে। অতএব দুঃসঙ্গজ্ঞানে যত্ন সহকারে উহাদের সঙ্গত্যাগ, প্রত্যেক সরলমতি ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন যে, সাধু, শাস্ত্র ও গুরুবাক্য এই তিনটীতে ঐক্য করিয়া চলিতে হইবে। তাহার অভিপ্রায় যে তত্ত্বদর্শী গুরু কখনও অশাস্ত্রীয় কথা বলিবেন না এবং শাস্ত্র বহির্ভূত সাধুজন অনাদৃত আচরণও করিবেন না। যেখানে গুরু অতত্ত্বদর্শী, সেই স্থলেই আচরণ ও উপদেশ অশাস্ত্রীয় হইতে পারে। অতএব অতত্ত্বদর্শী গুরুর অধীনস্থ শিষ্যবৃন্দকে সতর্ক করাই ঠাকুর মহাশয়ের উদ্দেশ্য। ঠাকুর মহাশয়ের কথা মত তাহারা যদি সাধুসঙ্গ ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে থাকে, ক্রমশঃ তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করিতে পারিবে। নতুবা বিপ্রলিপ্সার দাস হইয়া কূপমণ্ডুকবৎ জীবন অতিবাহিত করা ব্যতিত তাহাদিগের আর গত্যন্তর নাই।

অনেকের ধারণা যে ‘‘বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু’’ এই বিশ্বাসটী কিন্তু অন্ধবিশ্বাসকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হয় নাই। বিচারের পারংগত অবস্থায় যখন জ্ঞাতব্য আর কিছু বাকি না থাকে, তখন যে চিত্তের স্থিরতা হয় তাহাই ডক্ত বিশ্বাস শব্দের লক্ষ্যার্থ। সংশয়যুক্ত অবস্থায় যে মনের সঙ্কল্পাত্মক ভাব বিশেষ, তাহা অন্ধবিশ্বাস শব্দের দ্বারা লক্ষিত। যে বিশ্বাস উচ্চ মীমাংসা শ্রবণানন্তর আর স্থির থাকিতে পারে না, কারণ মনের বিকল্প ধর্ম্ম তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। অতত্ত্বদর্শী গুরুবর্গ অন্ধবিশ্বাসকে যথার্থ বিশ্বাস মনে করে এবং শিষ্যবর্গকে বলিয়া থাকে ‘‘ঢেকি ঢেকি’’ জপিলে ভগবানকে পাওয়া যায়, যাহা তাহারাও অন্ধবিশ্বাস সাহায্যে স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। যদি সেই সমুদয় ব্যক্তি উচ্চ মীমাংসার কথা শুনিতে থাকে, তাহা হইলে লব্ধবিশ্বাস ত্যাগ করতঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে এবং বুঝিতে পারে যে অন্ধবিশ্বাসে বস্তু মিলাইতে পারে না, বরং উহা যথার্থ বিশ্বাসের পথের কণ্টক স্বরূপ।

বিচারশক্তি মানবেই আছে। পশুপক্ষী ইত্যাদি জীবনে ঐ বিচার শক্তি না থাকাতে, উক্ত দেহে ভগবৎ ভজন হইবার যোগ্যতা নাই। বিচারের দ্বারা অসত্য নিরসন এবং তৎকালে সঙ্গের প্রকাশ সাধিত হইয়া

থাকে। অতএব বিচারের আবশ্যকতা নাই যাহারা বলেন তাহারাও বিপ্রলিপ্সা দোষে দূষিত এবং অসঙ্গকে সঙ্গ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। বিচার করিলে পাছে তাহাদের ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং শিষ্যরক্ষা করা অসুবিধাজনক ব্যাপার হইয়া পড়ে, তাই তাহারা বিচার করিতে চাহে না ও শিষ্যবর্গকে করিতেও দেয় না। অনাবশ্যক হইলে শাস্ত্রকারগণ কেনই বা তত্ত্ববিচারকে স্থান দিয়াছেন। একটু মাত্র বিচারশীল ব্যক্তি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। অবশ্য শুষ্ক তর্ক পরিত্যজ্য কিন্তু জ্ঞান লাভের জন্য যে বিচার যাহা শাস্ত্রানুমোদিত তাই ভাল। কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় স্পষ্টই বলিয়াছেন ''সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস। ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস।।" যেখানে সিদ্ধান্ত উচ্চসীমায় উপনীত সেইখানেই পরতত্ত্বের ধারণা সুনিশ্চল ও অপসিদ্ধান্ত দোষ শূন্য। সেই ব্যক্তিই সেব্য, সেবক ও সেবা বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। তাঁহার আর ইতর তত্ত্বের সেবায় লাভ নাই এবং প্রবৃত্তও হইতে হইবে না।

শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তিমশ্লোকেও বিচারণপর না হইলে অবিদ্যাবন্ধন মুক্ত হইয়া নিত্যাভক্তি লভ্য হয় না এই সিদ্ধান্তই দৃঢ় হয়।

> শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবাণাং প্রিয়ং
> যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
> যত্র জ্ঞানাবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
> তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ।।

গুরুব্রুব

"গুরু মিলে লাখ লাখ শিষ্য নাহি মিলে এক" এই উক্তি গুরুব্রুবদিগের পক্ষেই প্রয়োগ করা হয়। নচেৎ যথার্থ গুরু লাখ লাখ মিলে না। গুরুব্রুব বলিতে যাঁহাদিগের প্রকৃত গুরুর লক্ষণ নাই, অথচ নিজেকে গুরু পরিচয়ে পরিচিত করিয়া শিষ্য সংগ্রহতৎপরতাই লক্ষিত হয়, তাঁহাদিগকেই বুঝায়। অনেক সংসারাবিষ্টচিত্ত ব্যক্তি স্ত্রীপুত্রকন্যার সন্তোষসাধনে ব্যস্ত থাকিয়া গুরুসজ্জায় লোকসমাজে বিচরণপূর্ব্বক শিষ্যের অর্থ স্বীয় ইন্দ্রিয়তর্পণে নিয়োগ করিয়া নিজেকে ও অনুগত শিষ্যগণকে বিপথে চালিত করিতেছেন। গুরুতত্ত্ব অতি উচ্চ তত্ত্ব, তাহার গভীর দায়িত্ব। কিন্তু গুরুব্রুবগণ অত্যন্ত লঘু, তাঁহাদিগের কোন দায়িত্ব বুদ্ধি নাই। সাধারণ লৌকিক জগতে যিনি কয়েকজনের নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করেন, তাঁহারই কত দায়িত্ব, অধীন ব্যক্তিগণকে পরিচালিত করিতে কত যোগ্যতার প্রয়োজন নচেৎ সমস্ত ক্রিয়াটী পণ্ড হইয়া যাইবে। আর যে ক্রিয়ার সহিত আমাদের নিত্যমঙ্গলের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সেই পরমার্থ দ্বারা গুরুপদাশ্রয় ও দীক্ষায় আমরা অত্যন্ত উদাসীন হইয়া আছি এ বড় বিস্ময়ের বিষয়। যদি উত্তালতরঙ্গমালাসঙ্কুশ বিশাল নদী বা সমুদ্র পার হইতে গিয়া অনুপযুক্ত (আনাড়ী) কর্ণধারের হস্তে নৌকা পরিচালনের ভার সমর্পণ করি, তাহা হইলে আমাদের বুদ্ধিমত্তার

বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইবে বলিয়া কেহ স্বীকার করিবেন না। আর নানা বিষয় প্রলোভনগ্রাহ সংবলিত-সংসারসিন্ধু পারের ব্যবস্থার ভার আমরা গুরুব্রুবের হস্তে ন্যস্ত করিয়া আপনাদিগকে বুদ্ধিমান বলিয়া মনে করি, ইহা অপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় আর কি হইতে পারে?

নৌকা যেমন সুদক্ষ কর্ণধারের তত্ত্বাবধানে রাখিতে হয়, সেইরূপ স্বীয় নিত্য মঙ্গল জন্য সাধুগুরুর চরণাশ্রয়ই একান্ত আবশ্যক, অসাধু গুরুব্রুবকে গুরুত্বে বরণ করিয়া কোন লাভ নাই, সমূহ ক্ষতি। সাধুগুরু তিনি, যিনি স্বয়ং তত্ত্ব বস্তু পাইয়াছেন ও আশ্রিতজনকে তাহার সন্ধান দিয়া তৎপ্রাপ্তির সহায়তা করিতে যোগ্য। তিনি নিষ্কিঞ্চন ভাবে ভগবচ্চরণ আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রিয়গণের বিক্রম ও মানসিক চাঞ্চল্য হইতে মুক্ত হইয়া শান্তি লাভ করিয়াছেন, তিনি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত পারদর্শী ও শিষ্যের সংশয় ছেদন দক্ষ। তাঁহাতে নিজ ভোগতাৎপর্য্যময় কোন ইচ্ছা বা চেষ্টা নাই, তিনি সর্ব্বদা ভগবৎ-সেবা রত। অনাসক্ত ভাবে শ্রীভগবৎ সেবোপকরণ দ্বারা শ্রীভগবৎ সেবা করেন, সেগুলিকে ভোগ্যবুদ্ধি জ্ঞানে ভোগ করিতে ব্যস্ত হন না, অথচ প্রাপঞ্চিক বলিয়া সেগুলির ত্যাগেও ব্যস্ত হ'ন না, জাগতিক সমস্ত বস্তুকে ভগবৎ সেবার যোগ্য জানিয়া তদ্দ্বারে নিরন্তর শ্রীহরি-সেবারত থাকেন। গুরুব্রুবগণ অপর পক্ষে তাহাদিগকে ভোগ করিতেই ব্যস্ত থাকেন, অথবা সেগুলি ত্যাগ করিয়া ভগবৎসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হ'ন। তাঁহাদের আশ্রয় আমাদের নিত্য মঙ্গল অর্থাৎ স্ব-স্বরূপে অবস্থানপূর্ব্বক নিত্য ভগবদ্দাস্য লাভ বিষয়ে বিশেষ অন্তরায়। সুতরাং তাঁহাদের আশ্রয় লইয়া যাঁহারা সমূহ অমঙ্গল আবাহন করিতেছেন, শুদ্ধভক্তগণ তাঁহাদের সদ্‌বুদ্ধির প্রশংসা করেন না, তাঁহাদের বুদ্ধি অসৎ।

যিনি সদ্‌গুরু, তিনি নিজে আম্নায়পারম্পর্য্যক্রমে সদ্‌গুরুর সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট, পার্ষদ ভক্তগণও সদ্‌গুরুর পাদাশ্রয় করিয়া তাহার একান্ত উপযোগিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। স্বয়ং অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীপাদ্ ঈশ্বরপুরী যোগে শ্রীমধ্ব সম্প্রদায় স্বীকারপূর্ব্বক আবার পারম্পর্য্যের একান্ত প্রয়োজনীয় বোধের আদর্শ জগতের সমক্ষে জাজ্বল্যমান রাখিয়া গিয়াছেন। যেখানে সেই আম্নায় পারম্পর্য্য বা গুরুপ্রণালী উল্লখিত হইয়াছে, অর্থাৎ যে স্থলে আম্নায় পারম্পর্য্যক্রমে শ্রীভগবান্ নারায়ণ হইতে যে নিরস্তকুহক সত্য অবরোহপ্রণালীতে অবতরণ করিয়া আসিতেছেন, সেই নিত্যসত্যকে পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত বা পরিমার্জ্জিত করিবার দুর্ব্বুদ্ধিতে কেহ নূতন প্রণালী উদ্ভাবিত করিয়াছেন, সে স্থলে সত্যবস্তুকে বিকৃত করা হইয়াছে। এরূপ গুরুব্রুবের আশ্রয়ে বাস্তব বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় না, অবাস্তব বস্তুলাভই ভাগ্যের ফল হইয়া দাঁড়ায়। নূতন ছড়া নাম, নূতন গৌরাঙ্গনাগরীবাদ, নূতন স্ত্রীবেশ দুষ্ট ভজনপ্রণালী, উদারতার ছলে সদাচারের প্রতি অনাদর শিষ্য-অর্থে ইন্দ্রিয়তোষণ প্রভৃতির প্রবর্ত্তনকারী ও তদনুগগণ গুরুব্রুব, তাঁহাদিগকে পারমার্থিক দুঃসঙ্গ জ্ঞানে বর্জ্জন করিতে হয়, নচেৎ আমরা নিত্যমঙ্গলের পথ খুঁজিয়া পাইব না। কোন কোন গুরুব্রুব উদারমতের ভাণ করিয়া শিখাধারণ, তিলক সেবা, কণ্ঠে শ্রীমালিকা পরিধান প্রভৃতি বৈষ্ণবদাসোচিত বেশকে অনাবশ্যক বোধে তাহা গ্রহণ করাইবার প্রযত্ন করেন না। অথবা শিষ্যকে জীবহিংসা হইতে নিবৃত্ত করিয়া ভগবৎপ্রসাদ সেবা করিবার অবশ্যকর্ত্তব্যতা বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক মনে

করেন না। অনাচার প্রশ্রয়দাতা এইসকল গুরুব্রুব শিষ্যের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত ও তাঁহাদের মুখাপেক্ষী। সুতরাং তাঁহারা শিষ্যকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত রাখিবার উপযোগী নিরপেক্ষতা তাঁহাদের নাই, তাঁহারা নিরপেক্ষতা রূপ সাধুভক্তের প্রবীণ লক্ষণ শূন্য, আবার তাহার উপর ঐ সকল অসচ্ছিষ্যকে নিজের গুরু করিয়া তাঁহাদের সঙ্গক্রমে আরও অধঃপতিত হন।

কতকগুলি গুরুব্রুবকে লোকে সামাজিক মর্য্যাদারক্ষণ করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগকে অসদ্‌জনের তালিকাভুক্ত করেন না কিন্তু আর এক শ্রেণীর গুরুব্রুব আছে যাহারা সামাজিক বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া নানাবিধ পাপাচার লিপ্ত হয়, আর সেইগুলিকে ভজন বলিয়া চালাইয়া আসিতেছে। সেই অসচ্চরিত্র দুষ্ক্রিয়াসক্ত ব্যক্তিও সমাজের কোন কোন স্থলে সমাদর, ততদুর না হইলেও প্রশ্রয় প্রাপ্ত হয় সামাজিক হিসাবেও এটী বড় ক্ষোভের বিষয়। সমাজের উচিত এই সকল পাপাচারকে কোনও মতে ভজনের অঙ্গ বলিয়া প্রচলিত না হয়।

পরমার্থপ্রয়াসিগণ সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বপ্রকার গুরুব্রুবগণের সঙ্গবর্জ্জিত হইয়া সাধুগুরু পাদাশ্রয়ে জীবন ধন্য করুন—ইহাই আমাদের সহৃদয় পাঠকপাঠিকাগণের নিকট সানুনয় প্রস্তাব। তদ্দ্বারা আমরাও ধন্য হইব, আমাদের শ্রীগৌড়ীয়সেবা সার্থক হইবে।

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য ত্যাগ এব বিধীয়তে।।
অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্‌গুরোঃ।।
যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্।।

কাম

কাম, ষড় রিপুর অন্যতম। রিপু অর্থাৎ শত্রু বিরোধী ইত্যাদি। কাম শব্দে বাসনা বা ইচ্ছা। ইহা রজোগুণ সমুদ্ভূত। কামের ন্যায় দুরাসদ বৈরি মানুষের আর নাই। ইহা দ্বারা চালিত হইলে এমন কোন অন্যায় কর্ম্ম নাই যে মানুষে না করিতে পারে। মোহ বা সম্বন্ধজ্ঞানের অভাবেই আমাদের সর্ব্বপ্রকার বাসনার উদ্ভব। কামদ্বারা আহতচিত্ত হইয়া জীবের সংসার গতি উপস্থিত হয় এবং অবিদ্যার দ্বারা আবৃত হইয়া জীব বহু ভোগের বিষয় কল্পনা করে। ভোগের বিষয়গুলি সত্য না হইলেও বর্তমানে আমাদের অবস্থা অনুসারে অর্থাৎ সম্বন্ধজ্ঞান অভাবে সত্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে। আমাদের বর্ত্তমান যে ঔপাধিক আমি তাহাও এত বদ্ধমূল হইয়াছে যে কেহ বলিতেছেন আমি ব্রাহ্মণ, কেহ বলিতেছেন আমি ক্ষত্রিয়, আবার কেহ কেহ আমি

বৈশ্য, শূদ্র, ইংরাজ, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, অন্ধ, খঞ্জ ইত্যাদি নানাপ্রকার অভিমানে ব্যস্ত আছেন। ইহারা ন্যূনাধিক পরিমাণে সকলেই কামকে গর্হণ করিয়া নীতিকে সমাদর করেন, কারণ নীতি ছাড়া কোন মনুষ্যত্ব নাই। পশুজীবন হইতে নীতি দ্বারাই মানুষকে পৃথক্ করিয়াছে। এই নীতিশাস্ত্র হইতে পবিত্র ভারতবর্ষে বর্ণাশ্রম বলিয়া একটী ধর্ম্ম সৃষ্ট হইয়াছে। উহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ভেদ চারিটী প্রয়োজন স্থির করিয়া অসংখ্য বিধি বিধানও সৃষ্ট হইয়াছে। তাহাতে ন্যূনাধিক পরিমাণে কামকে পরিত্যাগের যে চেষ্টা আছে তাহা আবার অন্যান্য বাসনার দ্বারা আবৃত। সর্ব্বপ্রকার কাম, কামদেব শ্রীকৃষ্ণে নিয়োজিত না হওয়া পর্য্যন্ত কাম দূর হয় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে কামের স্বরূপ ও তাহা পরিত্যাগের যে বৈজ্ঞানিক উপায় উদ্ভাসিত হইয়াছে, তাহা এই—

কামপ্রেম দোহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ।।
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা ধরে প্রেমনাম।।
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য প্রেমত প্রবল।।
লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম।।
দুস্ত্যাজ্য আর্য্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত জ্ঞান ভর্ৎসন।।
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ-হেতু করে প্রেম-সেবন।।
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌতবস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ।।
অতএব কাম প্রেম বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর।।
অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ।।

ইহা হইতে জানা যাইতেছে কাম অন্ধতম একটী অবস্থা আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিই উহার প্রবর্ত্তক। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিরূপ প্রেম ভাস্করের উদয়েই তাহার অপগম হয়। একমাত্র গোপীগণের বাঞ্ছাই কামগন্ধহীন কারণ তাহাদের সর্ব্বপ্রকার কৃত্য কৃষ্ণসুখের জন্য। তাঁহারাই যথার্থ নিষ্কাম।

হিন্দুশাস্ত্রে প্রবৃত্তি মার্গে স্ত্রীগ্রহণ, সুরাপান, পশুবধাদি যে সমস্ত ব্যবস্থা তাহা নৈসর্গিক প্রকৃতিকে ক্রমান্বয়ে বিধির বশীভূত করিয়া নিবৃত্তিমার্গে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা থাকিলেও তাহা হইতে সত্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কত তাহা শাস্ত্র অন্যস্থানে বলিয়াছেন। ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। কাম উপভোগের দ্বারা দূরীভূত হয় না বরং আগুনে ঘৃত আহুতির ন্যায় বাসনার বৃদ্ধি হয়। বিচার দ্বারা স্থির হইয়াছে কাম মানুষের স্বরূপগত ধর্ম্ম নহে। বিরূপ ধারণ করিলে কাম আমাদের প্রতিপালকের স্থান অধিকার করে। আমরাও কামের উপাসনা আরম্ভ করি। কিছুকাল উপাসনা করিলে বুঝিতে পারি, কাম আমাদিগকে প্রতিপালন করিতে পারে না। তখন বিচার আসিয়া দেশ, কাল, কারণের কঠিন নিগড় আমাদের বদ্ধতা অনুভব করাইয়া দেয়। তাহা হইতে অতিক্রান্ত হইতে গিয়া শ্রীগীতা শাস্ত্রের দৈবী হ্যেষা গুণময়ী শ্লোকের প্রতি অমনোযোগী হইয়া মুক্তির জন্য যে চেষ্টা করা হয়, তাহাও কামের প্রকার ভেদ। যাহারা নিজ চেষ্টার প্রতি হতশ্রদ্ধ হইয়া ভগবানের শরণাপন্ন হইলেন তাঁহাদের সম্বন্ধে—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষাত্মদাস্যে।।

দুঃখের বিষয় এইরূপ শরণাপন্ন হইতে গিয়াও আমরা নানাপ্রকার গুপ্ত কামের সেবা করিয়া বসি। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে পারা বলিয়া কেটী দ্রব্য আছে, তাহা সংশোধন ও উত্তমরূপে জারণ করিয়া সেবন করাইলে অনেক দৈহিক ব্যাধি ভাল হয়। অসংশোধিত অবস্থায় খাইলে কেহ পরিপাক করিতে সমর্থ হয় না। বরং ব্যাধি প্রশমনের চেষ্টায় অঙ্গবৈক্লব্যই সংসাধিত হয়, তদ্রূপ কামকে কৃষ্ণ-সেবায় অর্পণ অর্থাৎ স্বীয় ইচ্ছাকে কৃষ্ণেচ্ছানুগত করিয়া না দিয়া ও প্রীতি বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ পদ্যগুলির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া স্ব স্ব ভাবে বিভোর হইয়া অনেকে গুর্ব্বানুগত্য ছাড়িয়া যে নানাবিধ সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন, তাহার নিদর্শন স্বরূপ আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাই, সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাত গোসাই, অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী (নদীয়া নাগরী) এই তেরটী সম্প্রদায় বর্ত্তমানে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের প্রতিপক্ষে থাকিয়া স্ব স্ব বিকল অঙ্গের পরিচয় দিয়াছে। ইহাদের ভিতর অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় বেশ একটী কামের চিত্র তাঁহাদের হৃদয়পটে অঙ্কিত রহিয়াছে।

উপরিউক্ত তেরটী সম্প্রদায়ের মধ্যে নদীয়া নাগরী বলিয়া সম্প্রদায়টী নিতান্ত আধুনিক। ইহারা নবীন ভজন পন্থা উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহাতে কৃষ্ণকে আর চান না। কারণ তাঁহাদের রস অত্যন্ত প্রবল। রসের আকর ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দনের নিকট তাঁহাদের গতি হয় না। অত্যন্ত প্রাকৃত কামবিদ্ধ হইয়া নবদ্বীপের মাঝেই শ্রীগুরু গৌরাঙ্গকে নাগর ভাবে পাইতে চান। ছি, ছি, গৌরাঙ্গনাগরী তুমি অত্যন্ত প্রাকৃত কামাসক্ত হইয়া যে অন্যায় কার্য্যে ব্রতী হইয়াছ, সুধী সমাজ তাহাকে বড়ই অনাদর করেন। যে কৃষ্ণ সেই গৌর ইত্যাদি বলিয়া

লীলাগত মাধুর্য্য ও উদ্দেশ্য নষ্ট করা তোমার গুর্ব্ববহেলন অর্থাৎ গুরু-ইচ্ছায় উপর স্বীয় ইচ্ছা প্রতিষ্ঠা প্রয়াস অত্যন্ত প্রাকৃত কামান্ধতার পরিচয় নয় কি? আচ্ছা ব্যবহারিক জগতে যে একটী প্রমাণ আছে তাহাতে প্রাদেশিক ভাবেও কতকটা বোঝা যায়। যদিও স্ত্রী জানেন ইনি আমার স্বামী তথাপি অন্তঃপ্রকোষ্ঠগত ব্যবহারাবলী বহিঃপ্রকোষ্ঠে জনসমক্ষে প্রকাশ করিলে লোক সমাজে হাস্যাস্পদ ও তাহার উদ্ভ্রান্ত চিত্তের পরিচয় নয় কি? বস্তুটী যদিও অদ্বয় জ্ঞানাত্মক দেশ ও সকলের দ্বারা তাহা পরিচ্ছেদ্য হয় না। তথাপি শুদ্ধ অবস্থায় দেশ ও কালের অবস্থান তথায় আছে। তাহা না বুঝিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ হয়, অন্তঃপ্রকোষ্ঠগত মাধুর্য্যলীলা বহিঃপ্রকোষ্ঠে ঔদার্য্যময় বিগ্রহে পাইবার প্রয়াস নাগরীকে কোথায় লইয়া যাইতেছে তাহা কি তিনি একবার ভাবিবেন? গৌরসুন্দরকে অত্যন্ত প্রিয় পরিচয় দিতে গিয়া চিরকালের জন্য গৌরকে ভুলিয়া যাওয়া তাহাদের প্রতিকূল অনুশীলনের ফল। সাধন ও সিদ্ধভক্তির অবস্থাদ্বয় ভেদে ভগবানের দ্বিবিধলীলা সাধন অবস্থায় তিনি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গরূপে আমাদের সহায় রহস্য এই সিদ্ধিতে তাঁহার রাধাভাব- দ্যুতি সুবলিত কান্তির পশ্চাতে ''কৃষ্ণস্বরূপ" ভজনবিজ্ঞের নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়ে। উভয়লীলার সাহচর্য্য বুঝিতে না পারিয়া আমরা কখন গৌর কখন কৃষ্ণকে লইয়া যে টানাটানি করি তাহাতে উভয় লীলা মিলনে যে প্রচুর মাধুর্য্য তাহা অনুভব করিতে পারি না। তাই কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদের শেষে জানাইয়াছেন—

চৈতন্য লীলামৃতপূর, কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর,
দুহেঁ মিলে হয় সুমাধুর্য্য।
সাধুগুরুপ্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে,
সেই জানে মাধুর্য্য প্রাচুর্য্য।।

দুর্ভাগ্যবশতঃ উভয়লীলার ওতপ্রোতভাবে অবস্থান বুঝিতে না পারিয়া যে অনভিজ্ঞতা সঞ্চন করেন, তাহার ফলে নদীয়া বাণী উদ্ভাবিত। আমাদের মনে রাখা উচিত রসমার্গেও বেশ বিচার আছে, নতুবা অনেক সময় রসাভাসকেই রস বলিয়া প্রতিপন্ন করে। অনেক সময় বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তের দ্বারা নানাবিধ কাল্পনিক উপাসনা সৃষ্টি হয়। এই দুই প্রকার দোষ দুষ্ট ব্যক্তিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের মালিক শ্রীপাদ স্বরূপ গোস্বামী বিশেষ অনাদর করেন ও তাহাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট যাইতে দেন না।

জীব বহু বহু চেষ্টা করিয়াও কামনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পায় না। বদ্ধজীবে বিপ্রলিপ্সা বলিয়া এক প্রকার দোষ আছে, তাই মায়াদেবী পুনঃ পুনঃ বঞ্চনা করেন। ভগবানে ও সাধুগুরু চরণে নিষ্কপট শরণাপত্তি অর্থাৎ নির্ব্ব্যলীক না হওয়া পর্য্যন্ত কামনার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় নাই। অনেকে সাধুগুরু-চরণে আসিয়াও কামের দুর্গন্ধময় খরস্রোতে ফুল চাপা দিয়া যেরূপ রক্ষা করিবার চেষ্টা করে, কালে তাহা ছড়াইয়া পড়ে অগত্যা গৃহেই তাহাদের শেষ গতি হয়। অনেকে আবার শ্রীগুরুদেবের উপদেশাবলী ও মানসিক চিন্তাস্রোতের বিপরীত কার্য্য করেন।

তাহাতে তাহার মনের ধারণা গুরুদেব আমাদের মত একজন অন্ধ বৈত নন। সেই সব অনভিজ্ঞ লোক জানে না যে শ্রীগুরুদেব আমাদের হৃদয়ের সমস্ত বৃত্তির দর্শক। তিনি মর্ত্ত্যজীব নহেন, দেশ, কাল, করণের নিগড়ে তিনি বদ্ধ নহেন। আমরা এমন কোন ন্যায় জানিনা যে হৃদয়ের কপটবৃত্তিগুলি চাপা দিয়া অন্যকে ফাঁকি দিব। ফাঁকি দিতে গেলে নিজেই ফাঁকির ভিতর পড়িয়া যাইতে হয়। যদি আমাদের বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে শ্রীগোপালদেবই সাক্ষী-প্রদানে আমাদের সকল সন্দেহ ভঞ্জন করেন। তিনি আমার হৃদয়ের দ্রষ্টা সর্ব্বসাক্ষী পুরুষ।

যিনি নানাবিধ মতবাদীর মত খণ্ডন করিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তের উৎকর্ষ দেখাইয়া দেন। ভক্তিলিপ্সুগণ যোগ্যতার অভাবে অসৎসম্প্রদায়ের কুসিদ্ধান্তের তমসাচ্ছন্নে পথহারা হইয়া গেলে সৎসিদ্ধান্তালোক পথ প্রদর্শন করেন ও মনের ব্যসন (ক্রীড়া বা রঙ্গ) কঠোরোক্তিদ্বারা ছেদন করেন, তিনিই সদ্‌গুরু। তাহারই দীক্ষা প্রভাবে আজ শ্রীগৌড়ীয় সর্ব্বপ্রকার হৃদ্‌গত কাম শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় নিয়োজিত করিয়া ভক্তি পথের পথিকগণের পথ নীরাজন কার্য্যে ব্যস্ত।

কীর্ত্তনে বিজ্ঞান

ভগবান্ কি এবং কি রূপেই বা তাঁহাকে পাওয়া যায়, তাহা জানিবার জন্য স্বভাবতঃ মনুষ্য হৃদয় সমুৎসুক। শাস্ত্রকারগণ ধ্যান, ধারণা, নামসংকীর্ত্তনাদি ভিন্ন ভিন্ন পন্থা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কোন্ পন্থা মনুষ্য হৃদয়ের সহজ বোধগম্য তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক। ভগবান্ অসীম। অসীমের পূর্ণ ধারণা করা অসীম মনুষ্যের সীমাবদ্ধ চিন্তাশক্তির দ্বারা সম্ভবপর নহে। উক্ত চিন্তাশক্তি দ্বারা অনন্তের চিন্তা করিতে গিয়া আমরা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হই তাহা দেখা যাউক।

দেখা যায় কোনও বিষয় চিন্তা করিতে হইলে মনের একাগ্রতা বিশেষ আবশ্যক কারণ মন সর্ব্বদা বিক্ষিপ্ত। এক বস্তুর চিন্তায় মনকে অধিকক্ষণ স্থির রাখা সাধারণতঃ অসম্ভব। নির্জ্জনে আহ্নিক করিতে বসিলাম কিন্তু কোথায় আহ্নিক! সাংসারিক যাবতীয় বিষয় ক্ষণে ক্ষণে মনে উদিত হইয়া ক্ষণে লয় হইতে লাগিল। অলী যেমন পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে মধু আশে ধাবিত হয়, মনও তদ্রূপ বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে যাইতে লাগিল কিছুতেই বশে আনিতে পারিলাম না! আমার আহ্নিক হইল না। বিক্ষিপ্ত মন বশে না আসলে একাগ্র না হইলে চিন্তিত বিষয় কিরূপে ধারণাযোগ্য হইতে পারে? বিক্ষিপ্ত মন সংযত করিয়া চিন্তিত বিষয়ে একাগ্র ভাবে নিয়োজিত করিলে চিন্তিত বিষয় বোধগম্য হওয়া সম্ভবপর। পাঠাভ্যাসরত বালক পাঠাভ্যাস কালীন যদি ক্রীড়া কৌতুকাদি চিন্তা করিতে থাকে, তবে কি তাহার পাঠাভ্যাস হয়? ভগবদ্ বিষয়ক বিরাট ব্যাপার চিন্তা করিতে হইলে কিরূপ একাগ্র চিত্ত হওয়া প্রয়োজন তাহা অনুমেয়। শব্দময় সংকীর্ত্তনাদির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার পূর্ব্ব চিন্তাময়, জ্ঞানময় যোগের বিষয় আলোচনা করা যাউক। যোগ বা চিত্তবৃত্তি নিরোধ দ্বারা মনঃসংযোগ করিয়া ভগবানকে চিন্তা করিবার প্রথা আছে। মন কেনই বা সদা বিক্ষিপ্ত ও যোগাভ্যাস

দ্বারা মনস্থির কিরূপ সম্ভবপর, তাহার বিজ্ঞান সম্মত কি কারণ থাকিতে পারে, তাহা অগ্রে দেখা যাউক, পরে নামসংকীর্ত্তনাদি দ্বারা মনস্থির অপেক্ষাকৃত সহজ সাধ্য কি না বিচারভার ভক্ত পাঠকবর্গের উপর ন্যস্ত করা যাইবে। অন্ধকার যেমন আলোকের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধিকর, কৃষ্ণ বস্তু যেমন শ্বেতবস্তুর উৎকর্ষসাধক, নিকৃষ্ট যেমন উৎকৃষ্ট বস্তুর ধারণোদ্দীপক, শব্দময় নামসংকীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে যোগ বা প্রাণায়াম কি তাহা অগ্রে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

জাগতিক সমস্ত সৃষ্টবস্তু অণুপরমাণু দ্বারা গঠিত। এই অণুপরমাণু সর্ব্বদা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে। এই কারণে স্বল্পপরমাণুগঠিত জগৎ বহু পরমাণুগঠিত সূর্য্যদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাহারই চতুর্দ্দিকে ভ্রাম্যমাণ আছে। আমাদের এই অণুপরমাণু গঠিত দেহও পৃথিবী দ্বারা সদা আকৃষ্ট হইয়া তাহাতে সংলগ্ন আছে। তাহাকেই দেহের গুরুত্ব কহে। স্বল্পপরমাণুগঠিত ক্ষীণকায় ব্যক্তি অধিক পরমাণু গঠিত স্থূলকায় ব্যক্তি অপেক্ষা লঘু কারণ স্থূলকায় ব্যক্তির অধিক পরমাণু পৃথিবী কর্ত্তৃক অধিক আকৃষ্ট হইতেছে, বিজ্ঞানবিৎ মাত্রেই অবগত আছেন।

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ একটী আনুমানিক সরলরেখার উপর উপস্থিত। যদ্যপি একটী দণ্ড ঠিক মদ্যস্থলে, উপরিভাগ হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত, আনুমানিক সরলরেখা বিশিষ্ট একটী ছিদ্র করা যায় ও সেই দণ্ডটী পৃথিবীর উপর এরূপভাবে রাখা যায় যে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষক রেখা দণ্ডের মধ্যবর্ত্তি আনুমানিক ছিদ্রপথের ভিতর পড়ে তবে উক্ত দণ্ডটী পৃথবীর উপর দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ হয়। দণ্ডের বক্রতা ঘটিলে উক্ত দণ্ড আর যথাস্থানে থাকিতে পারে না। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ দণ্ডের একবিন্দু হইতে বিন্দ্বন্তরে গমন বিধায় দণ্ডের চঞ্চলতা হেতু পতন অবশ্যম্ভাবী। বাজীকরগণ এই প্রক্রিয়ার নিজদেহ শূন্যস্থিত তারের উপর ঠিক রাখিয়া তদুপরি চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে সমর্থ হয়। আমাদের দেহে যে মেরুদণ্ড আছে তাহা শরীরের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিতি হেতু উক্ত মেরুদণ্ড সরলভাবে রাখিলে উৎসর্গদ্বার হইতে মস্তক পর্য্যন্ত মেরুদণ্ডের মধ্যবর্ত্তিস্থানের ছিদ্রপথে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষক রেখা পতিত হয়। যোগাভ্যাস প্রক্রিয়ায় মেরুদণ্ড এইরূপ সরল রাখিবার প্রথা আছে। এখন অণু কি তাহা দেখা যাউক। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন একটী অনু একটী ধন ও আটটী ঋণ তড়িৎ দ্বারা গঠিত। প্রত্যেক অনুকে আটটী ঋণ ও একটী ধন তড়িৎকণ প্রকৃতি পুরুষের ন্যায় বাস করে। দেখা গিয়াছে যে একটী সজাতীয় তড়িৎ পরস্পর পরস্পরকে বিকর্ষণ ও একটী বিজাতীয় তড়িৎ পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এই বিজাতীয় তড়িৎ উভয়ের আকর্ষণের ফলে পরস্পর সংযুক্ত হইয়া যে দানায় বা অনুতে পরিণত হয়, তাহাতে কিঞ্চিৎ আকর্ষণ শক্তি থাকিয়া যায়। ইহা হইতে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণী শক্তির উদ্ভব। কিন্তু প্রত্যেক সজাতীয় তড়িৎকণ যখন অণু হইতে বিভক্ত হইয়া আলাহিদা অবস্থায় থাকে তখন তাহার প্রত্যেকের শক্তি একটী অণুর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অপেক্ষা বস্তুগণ অধিক। মনে করুন্ আপনি একখণ্ড প্রস্তর লইয়া আর একখণ্ড প্রস্তরে আঘাত করিতে লাগিলেন। আঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া শূন্যে মিলাইয়া যাইতে লাগিল। এইরূপ করিতে করিতে সমস্ত প্রস্তর নিঃশেষ হইয়া গেল। আপনি কি বুঝিলেন? বুঝিলেন ঐ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, সংঘর্ষে উত্তেজিত প্রস্তরের প্রত্যেক অণুর ভিন্ন জাতীয় এবং তড়িৎকণ

সুপ্তাবস্থা হইতে বিভক্ত হইয়া পুনরায় শূন্যে নিজ নিজ স্বভাব দ্বারা সংযুক্ত হইয়া অনুরূপ ধারণ করিয়া শূন্যে বিলীন হইতেছে। ঐ সমস্ত বিক্ষিপ্ত অণু যদি পুনঃ সংযুক্ত হয়, তবে যে প্রস্তর সংঘর্ষ দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাই পুনর্গঠিত হইবে।

বর্ণাশ্রম বিধি

সূক্ষ্মদর্শী আর্য্যঋষিগণ বদ্ধমানবের স্বভাব বা প্রবৃত্তিকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ও তৎসঙ্গে তাহাদের চারিপ্রকার অবস্থানও নির্ণয় করিয়াছেন। মুক্তপুরুষগণ উক্ত চতুর্ব্বিধ স্বভাব ও অবস্থানের অতীত। তাঁহারা লোকশিক্ষার্থে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বভাবকে ও কোনও একটী আশ্রমকে স্বীকার করিতেও পারেন না, করিতেও পারেন। যে স্বভাবে সংযম, সদাচার, সত্য, সরলতা, আত্মতত্ত্বালোচনা, ভগবানে ভক্তি প্রভৃতি বৃত্তি পরিস্ফুট দেখা যায় তাহাকে ব্রহ্মস্বভাব; যে স্বভাবে বীরত্ব, সাহস, তেজঃ, পালন ও শাসনস্পৃহার প্রাবল্য দৃষ্ট হয় তাহাকে ক্ষত্র স্বভাব; যে স্বভাবে কৃষিকার্য্য, বাণিজ্যপ্রবৃত্তি, পশ্বাদিপালনবৃত্তির আধিক্য দেখা যায়, তাহাকে বৈশ্যস্বভাব এবং যে স্বভাবে পরদাস্য দ্বারা উদর প্রতিপালন বৃত্তি ও শোক মোহাদিতে অভিভূত হইতে দেখা যায় তাহাকে শূদ্র স্বভাব বলিয়া ঋষিগণ আখ্যা দিয়াছেন। প্রথমোক্ত তিনপ্রকার স্বভাবের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মস্বভাবটীই সর্ব্বোত্তম, চতুর্থ অর্থাৎ শূদ্র স্বভাবটী অধম। ইহা ব্যতীত অপর একটী স্বভাব 'অন্ত্যজ স্বভাব' বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অতি নিকৃষ্ট স্বভাব বলিয়া ঐ স্বভাবটী সংখ্যাদ্বারাই গৃহীত হয় নাই। উহা সর্ব্ববহিষ্কৃত স্বভাব বলিয়াই ধার্য্য হইয়াছে। অন্ত্যজ স্বভাবে কলহপ্রিয়তা, স্বার্থপরতা, উদর লাম্পট্য, পরস্ত্রী লাম্পট্য, পরদ্রব্য লাম্পট্য, মিথ্যা, কপটতা, তাশপাশা প্রভৃতি জুয়াখেলা ও কুৎসিৎ আমোদ প্রমোদে রতি, নেশার বশবর্ত্তিতা প্রভৃতি বৃত্তি দৃষ্ট হয়।

উক্ত স্বভাব চতুষ্টয় যাহাতে পরিবর্দ্ধিত হইয়া উত্তরোত্তর সর্ব্বোত্তম নির্গুণ স্বরূপতা লাভ করিতে পারে তজ্জন্য বর্ণোচিত কর্ম্মের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই জন্য প্রাচীন ঐতিহ্যে দেকা যায় যথোচিত বর্ণধর্ম্ম পালন পূর্ব্বক কেহ উন্নত বর্ণে আরূঢ় হইয়াছেন আবার স্ব স্ব বর্ণধর্ম্ম পালনে পরাঙ্মুখতা হেতু নিম্ন বর্ণে নীত হইয়াছে। হরিবংশ ১০ অধ্যায়ে দেখা যায় 'নাভাগারিষ্টপুত্রাশ্চ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যতাং গতাঃ।' আবার ১১ অধ্যায়ে দেখা যায় 'নাভাগাদিষ্ট পুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ'। নাভাগ ও অরিষ্ট পুত্র প্রভৃতি কর্ম্মবশে ক্ষত্রিয় হইয়া বৈশ্য হইয়াছিল। আবার বৈশ্য হইতে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন এরূপ বহু উদাহরণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।

বর্ণধর্ম্মপালন করিতে হইলে কোনও অবস্থানে অবস্থিত হইতে হইবে। তজ্জন্য ঋষিগণ চারিটী অবস্থান বা আশ্রম নির্ণয় করিয়াছেন। যে অবস্থানে বীর্য্যধারণ, স্বাধ্যায়, গুরুসেবা প্রভৃতি দ্বারা শরীর, মন, মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তি সমুদয় পরিবর্দ্ধিত হইয়া স্বরূপোপলব্ধির সহায়ক স্বরূপ হইয়া থাকে, তাহাকে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম আখ্যা দেওয়া হয়। এই আশ্রম অন্যান্য সকল আশ্রমের ভিত্তিস্বরূপ। এ আশ্রমকে অতিক্রম করিয়া অন্যান্য আশ্রমগুলি গ্রহণ করিলে বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। কেহ আজীবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী থাকিতে পারেন অথবা

প্রবৃত্তিমূলারুচির আধিক্য থাকিলে আচার্য্যের আদেশে সমাবর্ত্তন করিয়া গৃহে বাস করিতে পারেন। এই গার্হস্থ্যাশ্রমের উদ্দেশ্য প্রবৃত্তিকে সঙ্কোচিত করিয়া ক্রমশঃ নিবৃত্তি পথে চলা। প্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত না করিতে চেষ্টা করিয়া ইন্ধন দান করিলে তাহা অসীম উৎপাতের হেতুস্বরূপ গৃহব্রত ধর্ম্মে পরিণত হয়। গৃহস্থাশ্রম, ভগবদ্‌ভজন, দেবদ্বিজে ভক্তি, আতিথ্য সৎকার, সাধুসেবা প্রভৃতি দ্বারা শোভিত থাকিবে। গৃহস্থাশ্রম অন্যান্য আশ্রমের উপজীব্য হইবে। মানবের ২৫ বৎসর হইতে ৫০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অর্থাৎ ২৫ বৎসর কাল এই আশ্রমে থাকিয়া নিবৃত্তি ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণের ব্যবস্থা। আজীবন গৃহস্থাশ্রমে বাস একমাত্র শূদ্র এবং শোক মোহাদিতে আচ্ছন্ন অধম বর্ণের জন্য। সর্ব্ববন্ধন পরিত্যাগপূর্ব্বক পরিব্রাজক ও ধর্ম্ম প্রচারকরূপ সন্ন্যাস আশ্রমে অধিকার শোক- মোহাচ্ছন্ন শূদ্রের নাই।

নিবিষ্ট চিত্তে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে আর্য্যঋষিগণের বর্ণ ও আশ্রম বিভাগ সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং যে স্থানে মানবের স্বভাব ও অধিকারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না রাখিয়া বর্ণ ও আশ্রম নির্ণিত হইবে সে স্থানে বহুবিধ উৎপাত আগমন করিয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক প্রণালী ধ্বংস করিয়া দিবে এবং তাহা দ্বারা জগতের মঙ্গল না হইয়া সমূহ অমঙ্গল হইবে। যে সময় এইরূপ স্বভাব, প্রবৃত্তি ও লক্ষণাদি দর্শনে ভারতে বর্ণ ও আশ্রম নির্ণিত হইত সে সময়ে ভারতের সৌভাগ্য রবি মধ্যাহ্ন গগনে উদিত থাকিয়া উজ্জ্বল কিরণদানে সর্ব্ব জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। সে সময় প্রকৃত ব্রাহ্মণগণের সামগানে সর্ব্বস্থান মুখরিত হইত, তাঁহাদের আদর্শ চরিত্রের নিকট মহারাজ চক্রবর্ত্তীর রত্ন খচিতমুকুট শোভিত শির লুণ্ঠিত হইত, প্রজাগণ শান্তিতে বাস করিতেন। রোম, গ্রীস, ইজিপ্ট প্রভৃতি প্রাচীন জাতিগণ ভারতকে বাণিজ্য শিক্ষাগুরু বলিয়া বরণ করিয়াছিল।

মহাভারতাদি শাস্ত্রে দেখা যায় যে, পূর্ব্বে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট জগতে সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। পরে স্বভাবের অভিব্যক্তিরূপ কর্ম্ম দ্বারা বর্ণ নিরূপিত হয়। মহাভারত শান্তিপর্ব্ব মোক্ষধর্ম্ম ১৮৮ অধ্যায় বলেন,—

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্।।"

শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখা যায়, সত্যযুগে হংস নামে একমাত্র বর্ণ ছিল। পরে ত্রেতাযুগে বর্ণ বিভক্ত হয়।

অতাত্ত্বিক, অসারগ্রাহিগণ বলিয়া থাকেন যে সর্ব্বপ্রথমে স্বভাব অনুসারে বিরাটপুরুষ হইতে চতুবর্ণ প্রাদুর্ভূত হইয়া তৎপরে বংশপরম্পরায় তাহাই ভগবন্নির্দ্দিষ্ট বিধানরূপে চলিতেছে ও চলিতে থাকিবে। কিন্তু শাস্ত্রের সারগ্রাহী মর্ম্মবিৎগণ কিছুতেই ঐ মেয়েলি শাস্ত্রপর অনুমান গ্রহণ করিতে পারেন না। কারণ শাস্ত্রের পুনঃ পুনঃ আদেশ ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের বহু বহু আচারের উদাহরণ এই উভয়ই প্রমাণ করে যে একমাত্র স্বভাব হইতে সর্ব্ব সময়ে বর্ণ নিরূপণ হইয়াছে। বিজ্ঞান ও সদ্যুক্তি তাহাই সমর্থন করে। যদি একবার নির্দ্দিষ্ট বর্ণ বিভাগানুসারেই বর্ণবিভাগ হইবার ব্যবস্থা দেওয়া হইত তাহা হইলে শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র স্বভাবের তালিকা দিয়া পরে এইরূপ আদেশ করিতেন না,—

'যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকং।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ।।'

শ্রীধর স্বামিপাদের টীকা শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি ব্যবহারো মুখ্যঃ ন জাতি-মাত্রাদিতি। যস্যেতি যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেপি দৃশ্যেত তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ নতু জাতিনিমিত্তেন। অর্থাৎ যে যে বর্ণের যে সকল লক্ষণ বলা হইল যদি বর্ণোৎপন্ন ব্যক্তিতেও কোনও একটী বিশেষ বর্ণের লক্ষণ দেখা যায়, তবে তাহাকে জাতি নিমিত্তে বর্ণনিরূপণ না করিয়া সেই বিশেষ ধর্ম্ম-লক্ষণানুসারেই তাহার বর্ণ বিশেষভাবে চিহ্নাদি দ্বারা নিরূপণ করিবে। প্রাচীন ঐতিহ্যাদিতে দেখা যায় সন্তান উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কুলবৃদ্ধগণ, কুলাচার্য্য, ভূস্বামী, গ্রামস্থ পণ্ডিতবর্গ ঐ সন্তানের স্বভাব বিচারপূর্ব্বক বর্ণ নিরূপণ করিতেন। তবে বর্ণ নিরূপণ কালে এই বিচার্য্য ছিল যে পুত্র পিতৃবর্ণ লাভ করিবার যোগ্য কিনা। যদি যোগ্য হইত তবে তাহাকে পিতৃগোত্রেই নির্দ্দিষ্ট করা হইত, অযোগ্য হইলে তাহাকে স্বভাবানুসারে বর্ণান্তরে নির্দ্দেশ করা হইত। কিন্তু অধুনা অনুপযুক্ত, স্বার্থান্ধ ব্যবসায়ী পুর-অহিতকারী পুরোহিত, নামধারী ব্যক্তিগণের হস্তে এ গুরুতর কার্য্যের ভার ন্যস্ত হওয়াতে পিতার গোত্র অনুসারে পুত্রের স্বভাব হইবে এই অনুমানবলেই বর্ণ নিরূপিত হওয়াতে সমাজে আবর্জ্জনা রাশি সঞ্চিত হইতেছে। পাপের পরিমাণ পূর্ণ মাত্রা লাভ করিলে ভগবানে কখনও স্বয়ং বা কোনও মহত্তম জীবে শক্তি আবিষ্ট করিয়া তাঁহাকে জগতে প্রেরণ করেন তাই সমাজের এ দুর্দ্দিনে হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়, শীঘ্রই দৈব বর্ণাশ্রম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অনেকদিন পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ ভাবে চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু কুলাচার্য্যগণের বর্ণনির্ণয়ে অক্ষমতা হেতু ক্ষত্রস্বভাব জমদগ্নি ও তৎপুত্র পরশুরামকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নিরূপণ করায় বর্ণ ব্যভিচারের সূত্রপাত হইল, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ে বিরোধ বাধিল এবং তাহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ জন্মগত বর্ণ ব্যবস্থা দৃঢ়মূল হইতে থাকিল। মন্বাদি শাস্ত্রে অবৈধ মতবাদ প্রবেশ করিল, ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণ বর্ণ লাভের অসম্ভাবনা দেখিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়া ব্রাহ্মণগণের বিনাশের উপায় সৃষ্টি করিল। বণিক্ বৃত্তিহীন বৈশ্যগণ জৈনধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হইল, ভারতের বাণিজ্য লুপ্ত হইতে লাগিল এবং শূদ্রগণ নানাপ্রকার অবৈধ দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করিতে লাগিল। সুতরাং জাতিগত বর্ণাভিমান বিশেষভাবে দৃঢ়মূল হইতে থাকিল।

আমরা ছান্দোগ্য শ্রুতিতে দেখিতে পাই হারিদ্রুমত গৌতম জাবাল তনয় সত্যকামের পিতৃগোত্র না জানিয়া এবং মাতার চরিত্রে দোষ শ্রবণ করিয়াও বালকের সরলতা ও সত্যনিষ্ঠা দর্শনে তাহাকে ব্রাহ্মণের সংস্কার প্রদান করিয়া- ছিলেন। জানশ্রুতি ও চিত্ররথের উদাহরণ ও স্বভাবই যে একমাত্র প্রাচীনকালে বর্ণ নিরূপণ করিত তাহাই সাক্ষ্য প্রদান করে। সামবেদীয় ব্রজসূচিকোপনিষৎ তাহাই সমর্থন করেন।

এবমুক্তলক্ষণো যঃ স এব ব্রাহ্মণ ইতি শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেতিহাসানামভিপ্রায়ঃ। অন্যথা হি ব্রাহ্মণত্ব-সির্দ্ধির্নাস্ত্যেব। অর্থাৎ এই সকল স্বভাব বা লক্ষণ-বিশিষ্ট ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ। ইহাই শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাসের অভিপ্রায়। নিশ্চয়ই অন্য কোনও প্রকারে ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হয় না।

যদি বংশানুসারেই বর্ণ নির্দ্দিষ্ট হইত তবে মহাভারতের প্রসিদ্ধ টীকাকার নীলকণ্ঠ সত্যপ্রিয় ঋষিমুখোদ্‌গীর্ণ শ্রুতিমন্ত্র উদ্ধার করিয়া দেখাইতেন না। "ন চৈতদ্বিদ্মো ব্রাহ্মণাঃ স্মো বয়মব্রাহ্মণা বেতি"। জানিনা আমরা ব্রাহ্মণ কি অব্রাহ্মণ। মনু গুণবিহীন বংশগত বর্ণাভিমান যে অকিঞ্চিৎকর তাহা প্রদর্শনার্থে উক্ত বর্ণাভিমানীকে কাষ্ঠময় হস্তী, চর্ম্মময় মৃগের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে অন্যবর্ণে ব্রাহ্মণের গুণ থাকিলে তাহাকে ব্রাহ্মণতুল্য জ্ঞান ও তত্তুল্য সন্মান দেওয়া উচিত কিন্তু ব্রাহ্মণের সংস্কারে সংস্কৃত করা উচিত নহে। একটু বুদ্ধিমান ব্যক্তিই ইহাদের মাৎসর্য্যপূর্ণ কাপট্য ধরিয়া ফেলিতে পারেন। শ্রীমদ্ভাগবতের "বিনির্দ্দিশেৎ" বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করিবে এই কথাটিও ইহাদের মাৎসর্য্যবধিরকর্ণে প্রবেশ করে নাই। হারিদ্রুমত গৌতম কি সত্যকামকে মুখে ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণ তুল্য বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন? না তাহাকে উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া বেদে অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন? রাজা কর্ত্তৃক নিয়োজিত বিচারকই "রায়-পেস্" করিতে পারেন অপরের সে ক্ষমতা নাই তদ্রূপ স্বতন্ত্র আচার্য্যগণ বা সাধুগণ যুগপ্রয়োজনে জীব কল্যাণের জন্য কোনও একটি বিশেষ বিধানও চালাইতে পারেন এ ক্ষমতা ভগবৎ প্রদত্ত। উহা স্বকপোলকল্পিত মাৎসর্য্যপর চেষ্টা নহে। শাস্ত্র বলেন—

সময়শ্চাপি সাধুনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ। বেদের প্রমাণ যেমন স্বতন্ত্র সাধুদিগের আদেশও তদ্রূপ প্রামাণিক।

সামঞ্জস্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।৪।২৯) একটি শ্লোক আছে,—

"যদ্ যন্নিরুক্তঃ বচসা নিরূপিতং ধিয়াক্ষভির্বা মনসোত যস্য।
মা ভূৎ স্বরূপং গুণরূপং হি তত্তৎ স বৈ গুণাপায়বিসর্গলক্ষণঃ।।"

বাক্য দ্বারা যাহা অভিহিত হইতে পারে, বুদ্ধিযোগে যাহা নিরূপিত হইবার যোগ্য, যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, যাহা মন দ্বারা সঙ্কল্পিত হইতে পারে, তাহা ভগবত্তত্ত্বের স্বরূপ হইতে পারে না। যে কিছু বিষয় গুণসংশ্লিষ্ট তাহা পরমাত্ম তত্ত্ব নহে। অতএব শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা কিরূপে হইতে পারে? শ্রীভগবত্তত্ত্ব অবাংমনোগোচর। তাই শ্রুতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"যতোপ্রাপ্য নিবর্ত্তন্তে বাচশ্চ মনসা সহ"। যদি তাহাই হইল, তবে শ্রীভগবানের সহস্রনাম প্রভৃতি ব্যাপার কি কাল্পনিক? তাঁহার রূপ মাধুরী কি অলীক? তাঁহার গুণাবলী কি শশবিষাণবৎ অস্তিত্বহীন? সজাতীয় বিজাতীয় স্বগতভেদাসহিষ্ণু কেবলাদ্বৈত- বাদিগণ এই বিবাদ উত্থাপিত করিয়া তাহাতে সম্মত্তি জ্ঞাপক উত্তর প্রদান করেন। তাঁহারা এই সকল প্রমাণ বলে বলেন শ্রীভগবান্ বলিতে কোন সবিশেষ তত্ত্বকে নির্দ্দেশ করে না, নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করে। তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রভৃতি কাল্পনিক, মায়িক আরোপ মাত্র। সবিশেষোপাসক ভক্ত সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষ-

বাদিগণের বিচার সম্পূর্ণ ও অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করেন না। নির্ব্বিশেষ বাদিগণ ব্রহ্মবস্তুকে নিঃশক্তিক বলিয়া জানিয়া ব্রহ্মের জীবত্ব ব্যাখ্যানে অসমর্থ হইয়া বৃথা বাগাড়ম্বর ও তার্কিক বিচার উঠাইয়া সরল বিশ্বস্ত ব্যক্তিগণের মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া ফেলেন। তাঁহারা প্রমাণাবলীর মধ্যে আরও উপনিষদৎ হইতে উদ্ধার করেন, "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" প্রভৃতি। তাঁহার হস্ত নাই, পদ নাই, চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, তিনি অমূর্ত্ত। অন্যত্র বলিতেছে "অনামরূপগুণপাণিপাদমচক্ষুর শ্রোত্রমেকমদ্বিতীয়ং।"

শ্রুতিতে অন্যত্র বলিতেছেন, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যঃ" (শ্বেতাশ্বতর)। আত্ম বস্তু (পরমাত্মা) দর্শন করিতে হইবে, শ্রবণ করিতে হইবে, মনন করিতে হইবে, ধ্যান করিতে হইবে। একি হইল? পরমাত্মা আবার দর্শনের যোগ্য, শ্রবণের যোগ্য প্রভৃতি কিরূপে হইলেন। এই শুনিলাম যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, যাহা মনন-যোগ্য যাহা বুদ্ধির অগম্য, যাহা বাগ্বিষয় তাহা পরমাত্ম স্বরূপ নহে। তবে আবার বেদে কি দর্শন, শ্রবণ, কীর্ত্তন মনন করিতে বলিতেছেন, কেন? নিঃশক্তিকবাদিগণ কি বলিতে পারেন বেদে কেন "পরাস্য" শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়া চ" উপদেশ দিয়াছেন? আর যোগশাস্ত্রেও "কৃষ্ণং" পিশঙ্গাম্বরমম্বুজেক্ষণং 'চতুর্ভুজং' শঙ্খ গদাদ্যায়ুধম্" ইত্যাদি বর্ণন করিয়া নাম রূপ গুণ পাণি পাদাদি অঙ্গ উপাঙ্গ পার্ষদ অস্ত্র ধাম প্রভৃতি আছে ইহাই নির্দ্দেশপূর্ব্বক উপাস্যতত্ত্বরূপে উপদেশ করিতেছেন কেন? তবে কি শাস্ত্রসমূহে এমনকি একই বেদের ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিরুদ্ধতত্ত্বের নির্দ্দেশ? শাস্ত্রসমূহ কি একনিষ্ঠ নহেন? এই সকল প্রশ্নের উত্তর শাস্ত্রসমূহ একনিষ্ঠ। যাঁহারা শাস্ত্রের একদেশ মাত্র অবলম্বন করিয়া অন্য অংশকে অবজ্ঞা করেন, তাঁহারা শ্রুতিনিন্দক, তাঁহাদের বিচার সম্যক নহে, তাঁহারা খণ্ডদর্শনকেই পূর্ণ দর্শন মনে করিযা যথার্থ পূর্ণ দর্শনের ভ্রান্তত্ব উপলব্ধি করিয়া অপরাধ অর্জ্জন করিয়া বসেন। অক্ষজ জ্ঞানই ইহাদের সম্বল, তাহা লইয়া অধোক্ষজতত্ত্ব বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া দেখেন "যতোঽপ্রাপ্য নিবর্ত্তন্তে বাচশ্চ মনসা সহ"। অক্ষজজ্ঞান অধোক্ষজের নিরূপণে অসমর্থ, অধঃকৃতং অতিক্রান্তম্ অক্ষজং ইন্দ্রিয়লব্ধং জ্ঞানং যেন স অধোক্ষজঃ। অধোক্ষজ ভগবত্তত্ত্ব অপ্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত, সুতরাং প্রাকৃত জ্ঞান গোচর নহেন, তাই তাহা অচিন্ত্য, ইহাকে প্রাকৃত তর্ক দ্বারা অভিভূত করিবার যত্ন করিতে নাই। "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণং।।" অক্ষজদর্শনফলে শ্রীভগবান্ অপাণিপাদ অচক্ষু, অশ্রোত্র প্রভৃতি। ইহা তাঁহাদের দর্শন মত যথার্থই বলিয়াছেন। অক্ষজ জ্ঞানে জড় বস্তুই উপলব্ধি হয়, ভগবত্তত্ত্ব জড় পদার্থ নহেন, তাঁহার জড় হস্ত নাই, জড় চরণ নাই, জড় নয়ন নাই, জড় কর্ণ নাই; আবার তাঁহাদেরও জড়াতীত দর্শন নাই, আর অক্ষজ জ্ঞানে অত্যন্ত দীপ্ত থাকায় কাহারও অধোক্ষজ দর্শন হইতে পারে, অপ্রাকৃত অনুভূতি বলিয়া কিছু আছে, এসকল কথা বিশ্বাস করিতেও প্রস্তুত ন'ন। শ্রীভগবানকে কেহ জড়াভিন্ন বলিয়া মনে না করে, এজন্য তাঁহার জড় মূর্ত্তি, জড় নাম, জড় গুণ প্রভৃতি শাস্ত্রে নিরাস করিয়াছেন। তাহাতে অপ্রাকৃত চিদ্বিগ্রহ-বাদীর কোন আপত্তি নাই, তবে কেহ চিদ্বিগ্রহে সন্দিহান হইলে তাঁহাকে কিছু বলিবার অধিকার রাখেন। অক্ষজ জ্ঞানীর চিদ্দর্শন উন্মেষিত হয় নাই, তিনি চিজ্জগতের কোন সন্ধানই পা'ন নাই, জড় নিরসন করিয়া তদ্বিলক্ষণ

আর কি থাকিতে পারে এই বিচার করিয়া তিনি জড় বিপরীত নিরাকারই সাব্যস্ত করিয়াছেন। তিনি যদি "পরাস্য শক্তি" মানিতেন, তাহা হইলে তিনি বুঝিতেন যে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবত্তত্ত্বের সাকারাত্ব অনঙ্গীকার করিয়া তিনি তাঁহাকে ক্ষুদ্র করিতে চাহেন, তাঁহাকে শুধু সর্ব্বব্যাপি বোধে তাঁহার মধ্যমাকৃতি সম্বন্ধে উদাসীন থাকিয়া তাঁহাকে অসীম বলিয়া সসীমই করিতে চাহেন। এমন কি দক্ষপ্রজাপতি পর্য্যন্ত তাঁহার কৃত হংসগুহ্য স্তোত্রে প্রাকৃত নাম রূপ রহিত শ্রীভগবানের আবতারিক নাম রূপ স্বীকার করিয়াছেন।

"যোঽনুগ্রহার্থং ভজতাং পাদমূল
মনামরূপো ভগবানন্তঃ।
নামানি রূপাণি চ জন্ম কর্ম্মভিঃ-
র্ভেজে স মহ্যং পরমং প্রসীদতু।। (ভাঃ ৬।৪।২৮)

শ্রুতিতে যেমন "অপাণিপাদঃ" আছে, আবার তেমন "চরণং পবিত্রং বিততং পুরাণং" ইহাও শ্রৌত পণ্ডিতগণের লক্ষ্য করিবার অবসর হয়। তবে কথা হইল শ্রীভগবানের প্রাপঞ্চিক নামরূপিত্ব কল্পিত হইলে সেক্ষেত্রে নাম রূপ নাই বলাই শ্রেয়ঃ, তা' বলিয়া তাঁহার চিন্নাম চিদ্রূপ অস্বীকার করা নাস্তিকতা।

শ্রীভগবানের সবিশেষ স্বরূপ সু-দুর্ব্বিজ্ঞেয়। কেবল শুদ্ধভক্তগণই এই গূঢ় তত্ত্ব জানেন। শ্রবণভক্তিক্রমে তাঁহাদের অন্ত হৃদয়ে নাম রূপ গুণ প্রবিষ্ট হইয়া প্রেমভক্তিক্রমে অন্তঃহৃদয়স্থ সৌন্দর্য্যাদির মাধুর্য্য চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়যোগে আস্বাদন করিতে সমর্থ হ'ন।

"ভক্তি-যোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াং।।"

এই সবিশেষ স্বরূপের অপ্রাকৃত অনন্ত গুণ ভক্তিহীন অনুভব করিতে সমর্থ ন'ন। এই নির্ব্বিশেষ সবিশেষ তত্ত্বের আপাতদৃষ্ট পার্থক্যের সামঞ্জস্য বিধান শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ নিম্নধৃত শ্লোকটি তাঁহার চরণানুচরদিগকে উপহার দিয়াছেন,—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।।"

শ্রীকৃষ্ণনামরূপগুণাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, এ সমস্ত অধোক্ষজতত্ত্ব, অক্ষজ- জ্ঞানগম্য নহে। তবে যাঁহাদের সেবোন্মুখতা প্রবল হইয়াছে, তাঁহাদের অপ্রাকৃত দর্শন লাভ হইয়াছে। তাঁহাদের অপ্রাকৃত জিহ্বা চক্ষু প্রভৃতিতে নামরূপাদি স্বয়ং স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হ'ন। চিদ্দর্শন ও জড় দর্শনের নিয়ামক সেবাবৃত্তি ও ভোগ প্রবৃত্তি। জীব যখন নিজকে ভোক্তৃবুদ্ধি করিয়া বসে, তখনই সে মায়াবদ্ধ, এই মায়াবদ্ধই তাহার জড়দর্শনের কারণ। ভগবৎ-সেবাবুদ্ধির উন্মেষে সেই ভোগবুদ্ধি তিরোহিত হইলে সঙ্গে সঙ্গে জড়দর্শনও তিরোহিত হয়, আর চিদ্দর্শনের যোগ্যতা লাভ হয়। সুতরাং সেই মুক্তাবস্থায় তিনি অপ্রাকৃত নাম লইতে পারেন, অপ্রাকৃত রূপ দর্শন করিতে পারেন ইত্যাদি। তৎপূর্ব্বে শ্রীনাম গ্রহণ, শ্রীবিগ্রহ দর্শন জড়মিশ্র, তবে সেবোন্মুখতা সাধন জন্য এগুলির

একান্ত প্রয়োজন। নচেৎ শ্রীরূপ গোস্বামীপাদ গাইয়াছেন "অয়ি মুক্তকুলৈরূপাস্যমানং পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি।।"

সবিশেষবাদের বহু শ্রুতিস্মৃতি প্রমাণ আছে, যথা "দৃশ্যতে ত্বগ্রয়াবুদ্ধ্যা", "তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিব্যশ্চ।" ইত্যাদি।

বেদে বর্ণবিধান

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বর্ণবিধান স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। বৃহদারণ্যক পাঠে জানা যায়, সৃষ্টির প্রারম্ভে একমাত্র বর্ণ ছিল।

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব তদেকং সন্ন ব্যভবৎ।।" পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ ছিল কিন্তু একটী মাত্র বর্ণ থাকাতে দেশরক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ কার্য্য হওয়া সুকঠিন হইয়া পড়িল, তাই ক্ষত্রিয় জাতির গঠন হইল—

"তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ক্ষত্রং তস্মাৎ ক্ষত্রাৎ পরং নাস্তি। তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মধস্তাদুপাস্তে। রাজসূয়ে ক্ষত্রিয় এব তদ্যশো দধাতি সৈষা ক্ষত্রস্য যোনির্যদ্জ ব্রহ্ম।"

অর্থাৎ শান্তিরক্ষার জন্য ক্ষত্রিয়জাতি গঠিত হইল। ব্রাহ্মণগণও ক্ষত্রিয়গণকে সম্মান প্রদান করিলেন। রাজসূয় যজ্ঞে ক্ষত্রিয়গণ প্রাধান্য লাভ করিলেন ও যশস্বী হইলেন। ব্রাহ্মণগণই ক্ষত্রিয়-জাতির উৎপত্তি স্থান। সুতরাং ব্রাহ্মণগণের মধ্যেই যাহাদের দেশরক্ষা, শান্তি সংস্থাপন, প্রজাপালন ইত্যাদি প্রবৃত্তির আধিক্য দৃষ্ট হইল তাঁহারাই সমাজে ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্ব্বাচিত হইলেন।

এদিকে যেমন সত্ত্বগুণান্বিত ব্রাহ্মণগণ ভগবদুপাসনা, ব্রহ্মচিন্তা, যজন যাজন অধ্যাপন অধ্যয়নাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া সমাজদেহের মস্তিষ্কস্বরূপ হইলেন, ক্ষত্রিয়গণও তদ্রূপ দেশরক্ষা, শান্তি সংস্থাপনাদি কার্য্যে ব্রতী হইয়া সমাজদেহের বাহুযুগলের পরিপুষ্টি সাধন করিয়া অশেষ কল্যাণ বিধান করিলেন। কিন্তু অন্নাদি-সংরক্ষণ ব্যতীত আবার সমাজদেহ দীর্ঘজীবী হইতে পারিবে না ভাবিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাহাদের বাণিজ্য, গো, কৃষি প্রভৃতি দ্বারা অর্থ-সঞ্চয়স্পৃহা বলবতী দেখিতে পাইলেন তাহাদিগকে বৈশ্য বলিয়া নির্ব্বাচিত করিলেন—

"স নৈব ব্যভবৎ স বিশমসৃজত।"

কিন্তু বৈশ্যবর্ণ গঠন করিয়াও সমাজদেহ পূর্ণাঙ্গ হইল না। তাই যাহাদের দাস্যপ্রবৃত্তি প্রবল দেখিলেন তাহারা শূদ্ররূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। সুতরাং এক ব্রাহ্মণরূপ মৌলিকবর্ণ হইতেই স্বভাব ও প্রবৃত্তি অনুসারে আর ত্রিবিধ বর্ণ উৎপন্ন হইল। আবার উক্ত মৌলিকবর্ণ চতুষ্টয় আশ্রয় করিয়া অনুলোমপ্রতিলোম ক্রমে বহুবিধ বর্ণের সৃষ্টি হইল।
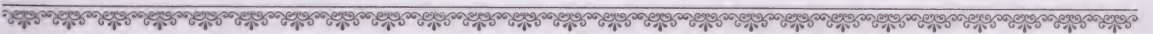
অতএব বৈদিক ধর্ম্মবিধান যে একমূল বর্ণকে আশ্রয় করিয়া জীবের স্বভাব গুণকর্ম্ম অনুসারে হইয়াছিল এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। শ্রীমহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত ও উপনিষদসার শ্রীগীতাও তাহাই বলিয়াছেন। মহাভারত শান্তি- পর্ব্ব মোক্ষ ধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক পূর্ব্বসৃষ্ট সমগ্র জগৎ ব্রাহ্মণময় ছিল। পরে কর্ম্মদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণসংজ্ঞা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।৭ অধ্যায়ে দেখা যায়, সত্যযুগের ''হংস'' নামক মৌলিকবর্ণ হইতেই ত্রেতা যুগে সমাজে সুশৃঙ্খলার জন্য স্বভাব অনুসারে বর্ণ নিরূপিত হইয়াছে। শ্রীগীতাতে ৪র্থ অধ্যায়েও গুণ কর্ম্ম অনুসারে বর্ণ বিভাগের উল্লেখ দেখা যায়। মনুসংহিতা দশম অধ্যায়ে দেখা যায় যে কোন বর্ণসংস্কার হইতে ভ্রষ্ট, নীচযোনিসম্ভূত ব্যক্তি যদি আপনাকে আর্য্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করে, তবে তাহার কর্ম্ম ও স্বভাব দ্বারা বর্ণ নিরূপণ করিবে।

বর্ণাপেতমবিজ্ঞাতং নরং কলুষযোনিজং।
আর্য্যরূপমিবানার্য্যং কর্ম্মভিঃ স্বৈর্বিভাবয়েৎ।।

ছান্দোগ্য উপনিষদে হারিদ্রুমত গৌতম অজ্ঞাতগোত্র দাসীসম্ভূত সত্যকামকে স্বভাবদর্শনেই ব্রাহ্মণ বলিয়া বিনির্দ্দেশ করিয়া বেদপাঠে অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। পৌত্রায়ণ ক্ষত্রকুলসম্ভূত হইলেও শোকদ্বারা অভিভূত হইয়াছিলেন বলিয়া মহাত্মা রৈক্যমুনি তাহাকে শূদ্র বলিয়া আহ্বান করিলেন। আবার ''ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ'' ১।৩।৩৫ এই সূত্রে জানা যায় চিত্ররথাদি ক্ষত্রিয়ত্বের চিহ্ন দ্বারা পৌত্রায়ণের 'ক্ষত্রিয়' সংজ্ঞা লাভ হইল। মুক্তিকোপনিষদে যে অষ্টোত্তরশত উপনিষদের কথা উল্লিখিত হইয়াছে বজ্রসূচিকোপনিষৎ তাহাদের অন্যতম। শ্রীশঙ্করাচার্য্য উক্ত উপনিষদের একখানা বিস্তৃত ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া কথিত আছে। সেই উপনিষদে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে ঃ—''কো বা ব্রাহ্মণো নাম। কিং জীবঃ কি দেহঃ কিং জাতিঃ, কিং জ্ঞানং কিং কর্ম্ম, কিং ধার্ম্মিক ইতি।''

জীব, দেহ, জাতি, জ্ঞান, কর্ম্ম, ধার্ম্মিক—ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ কে?

যুক্তি দ্বারা দেখান হইতেছে জীবাদি ব্রাহ্মণ নহে। তবে দেহ কি ব্রাহ্মণ?

তর্হি দেহো ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন আচণ্ডালাদিপর্য্যান্তানাং মনুষ্যাণাং পাঞ্চভৌতিকত্বেন দেহস্যেক-রূপত্বাজ্জরামরণধর্ম্মা ধর্ম্মাদিসাম্যদর্শনাদ্ ব্রাহ্মণঃ শ্বেতবর্ণঃ ক্ষত্রিয়ো রক্তবর্ণো বৈশ্যঃ পীতবর্ণঃ শূদ্রঃ কৃষ্ণবর্ণ ইতি নিয়মাভাবাৎ পিত্রাদি শরীরদহনে পুত্রাদীনাং ব্রহ্মহত্যাদিদোষসম্ভবাচ্চ তস্মান্ন দেহো ব্রাহ্মণ ইতি।

দেহ ব্রাহ্মণ হইলে আচণ্ডালাদি সকলের দেহই ব্রাহ্মণ হইত। কারণ সকলের দেহই পঞ্চভূতে নির্ম্মিত একরূপ জরামরণ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি সকলেরই একপ্রকার। ব্রাহ্মণ বলিয়া তাহার দেহ শ্বেতবর্ণ হইবে, ক্ষত্রিয়ের দেহ রক্তবর্ণ হইবে, বৈশ্যের দেহ পীতবর্ণ হইবে, শূদ্রের দেহ কৃষ্ণবর্ণ হইবে এরূপ কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। যদি দেহই ব্রাহ্মণ হইত, তবে মৃত পিতার দেহদাহনকালে পুত্রকে ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হইত। অতএব দেহ ব্রাহ্মণ নহে।

তবে কি জাতি ব্রাহ্মণ? তদুত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন, তর্হি জাতির্ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন। তত্র জাত্যন্তরজন্তুষু

অনেকজাতিসংভবা মহর্ষয়ো বহবঃ সন্তি। ঋষ্যশৃঙ্গো মৃগ্যঃ। কৌশিকঃ কুশাৎ। জাম্বুকো জম্বুকাৎ। বাল্মীকো বল্মীকাৎ। ব্যাসঃ কৈবর্ত্তকন্যায়াং। শশপৃষ্ঠাৎ গৌতমঃ। বশিষ্ঠঃ উর্ব্বশ্যাং। অগস্ত্যঃ কলসে জাত ইতি শ্রুতত্বাৎ। এতেষাং জাত্যা বিনাপ্যগ্রো জ্ঞানপ্রতিপাদিতা ঋষয়ো বহবঃ সন্তি। তস্মান্ন জাতিঃ ব্রাহ্মণ ইতি। জাতি ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। কারণ মনুষ্যেতর জাতিতেও অনেক মহর্ষি উৎপন্ন হইয়াছেন। মৃগী হইতে ঋষ্যশৃঙ্গ, কুশ হইতে কৌশিক, জম্বুক হইতে জাম্বুক ঋষি, বল্মীক হইতে বাল্মিকী, কৈবর্ত্ত কন্যা হইতে ব্যাস, শশপৃষ্ঠ হইতে গৌতম, উর্ব্বশী হইতে বশিষ্ঠ এবং কলস হইতে অগস্ত্য উৎপন্ন হইয়াছেন শ্রুত হয়। এতদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন জাত্যুৎপন্ন বহু ঋষি আছেন। অতএব জাতি ব্রাহ্মণ নহে। এইরূপ শ্রুতি দেখাইয়াছেন, জ্ঞান ব্রাহ্মণ নহে, স্বর্গকামী ব্যক্তিও ব্রাহ্মণ নহে। তবে ব্রাহ্মণ কে?

করতলামলকমিব পরমাত্মাহপরোক্ষেণ কৃতার্থয়া যমদমাদিযত্নশীলো দয়ার্জ্জবক্ষমাসত্যসন্তোষবিভবো নিরুদ্ধমাৎসর্য্যদম্ভ সম্মোহো যঃ স এব ব্রাহ্মণ ইত্যুচ্যতে।"

পরমাত্মাতে যাহার হস্তামলকবৎ দৃঢ় শ্রদ্ধা হইয়াছে, যিনি শম দমাদিতে যত্নশীল, দয়া, সরলতা, ক্ষমা, সত্য, সন্তোষ ইত্যাদি গুণ বিশিষ্ট; যিনি মাৎসর্য্য, দম্ভ, মোহকে নিরোধ করিয়াছেন—তিনিই প্রস্তাবিত ব্রাহ্মণ।

অতএব আমরা শ্রুতি স্মৃতির সর্ব্বত্রই গুণ কর্ম্মানুসারে বর্ণ নিরূপণ দেখিতে পাই। তাই বেদান্তের ব্যাস রচিত ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ।।

দীক্ষিত

যজুর্ব্বেদের ঊনবিংশ অধ্যায়ের ত্রিংশৎ মণ্ডলে দেখিতে পাওয়া যায়—

"ব্রতেন দীক্ষামাপ্নোতি দীক্ষয়াপ্নোতি দক্ষিণম্।
দক্ষিণাচ্ছ্রদ্ধামাপ্নোতি শ্রদ্ধয়া সত্যমাপ্যতে।।"

অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের সেবারূপ ব্রতদ্বারা জীব দীক্ষা লাভ করে এবং দীক্ষা দ্বারা দক্ষিণ অর্থাৎ সরলতা বা অকপটতা প্রাপ্তি ঘটে, আবার সরলতা হইতে শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং শ্রদ্ধা দ্বারা একমাত্র বাস্তব সত্যবস্তুর উপলব্ধি হইয়া থাকে। অতএব উক্ত বেদবাক্যে এই প্রমাণিত হইল যে, একমাত্র দীক্ষিত ব্যক্তিই সত্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ। পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত বেদ বাক্যের অনুগমন করিয়াই বলিয়াছেন—

"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ।।"
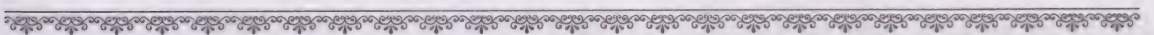
অর্থাৎ যে অনুষ্ঠানের দ্বারা জীবের দিব্যজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয় এবং যে জ্ঞানের উদয়ে সর্ব্ববিধ পাপরাশির সম্যক্ ক্ষয় হয়, তত্ত্ববিৎগণ তাহাকে দীক্ষা সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করেন।

বেদ সদ্গুরুর নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত জীবকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বিনির্দ্দেশ করেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩৪ অঃ দেখা যায় ঃ—

"যথৈতদ্ব্রাহ্মণস্য দীক্ষিতস্য ব্রাহ্মণো দীক্ষিষ্টেতি
দীক্ষামাবেদয়ন্ত্যেবমেবৈতৎ ক্ষত্রিয়স্য।।"

অর্থাৎ যে প্রকার ব্রাহ্মণকুলজাত মানবকের দীক্ষার সময় আমি অমুক ব্রাহ্মণ দীক্ষা গ্রহণ করিতেছি এই বলিয়া গুরু সন্নিধানে নিবেদন করিতে হয়, তদ্রূপ ক্ষত্রিয় কূলোদ্ভূত মানবকেও "আমি অমুক ব্রাহ্মণ" এই বলিয়া আবেদন করিয়া থাকেন। উক্ত শ্রুতির ভাষ্যে আপস্তম্ব সূত্র বচনে দীক্ষিত ব্যক্তির ব্রাহ্মণত্ব আরও স্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

"ব্রাহ্মণো বা এষ জায়তে যো দীক্ষ্যতে"

দীক্ষিত ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হন। পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি বেদেরই পূরণ করিয়া থাকেন এবং অর্থ পরিষ্কার করিয়া প্রকাশ করেন। তাই তত্ত্বসাগর বলেন,—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং।।

অর্থাৎ যে প্রকার কোন রস বিধান দ্বারা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কাংস্যের সুবর্ণত্ব লাভ ঘটে, তদ্রূপ বৈষ্ণবী দীক্ষা দ্বারা মনুষ্যমাত্রেই দ্বিজত্বপ্রাপ্ত হয়। কেহ যদি দ্বিজত্ব শব্দ দ্বারা দ্বিজাতি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে মনে করেন এই আশঙ্কা নিরাস করিবার জন্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু উক্ত শ্লোকের টীকায় বলিলেন, "নৃণাং সর্ব্বেষামেব দ্বিজত্বং বিপ্রতা।" অর্থাৎ নৃণাং শব্দের দ্বারা মনুষ্যমাত্রেরই এবং দ্বিজত্ব শব্দ দ্বারা "বিপ্রতা" এই অর্থ। এই দ্বিজত্ব বিপ্রত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব চ্যুতগোত্রমূলক নহে, পরন্তু অচ্যুত গোত্রীয়। চ্যুত গোত্রীয় দ্বিজগণকে শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে প্রাকৃত ভগবদ্বিমুখ বদ্ধজীব সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়াছেন এবং অচ্যুত গোত্রীয়গণকে নিগুর্ণ ব্রাহ্মণ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। অচ্যুত গোত্রীয়গণের নিকটে চ্যুত গোত্রীয় দ্বিজগণ প্রণত হইয়া শিষ্য হইলে তাহাদেরও দীক্ষা প্রভাবে অচ্যুতগোত্রীয় দ্বিজ হইবার অধিকার আছে "নৃণাং" শব্দের দ্বারা তাহাও সূচিত হয়। অতএব বৈষ্ণবী দীক্ষা প্রভাবে জীবমাত্রই বিপ্রত্ব লাভ করে, কারণ "ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিতা" ভক্তিতে মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার আছে। প্রাচীন ঐতিহ্যেও ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ দৃষ্ট হয়। কাশীখণ্ডে দেখা যায়,—

অন্ত্যজা অপি তদ্রাষ্ট্রে শঙ্খচক্রাঙ্কধারিণঃ।
সংপ্রাপ্য বৈষ্ণবীং দীক্ষাং দীক্ষিতা ইব সংবভুঃ।।

ময়ুরধ্বজ প্রদেশে অন্ত্যজ জাতি পর্য্যন্ত বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া তাপপুণ্ড্রাদি সংস্কার লাভ করিয়া যাজ্ঞিকের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকেন। সম্প্রদায় বৈভববিদ্‌গণ সকলেই জানেন যে, রামানুজীয়গণ শূদ্রকুলোদ্ভূত বালককেও দীক্ষান্তে ব্রাহ্মণ সংস্কার দিয়া থাকেন, তাই শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভু কৃত সংস্কারদীপিকা গ্রন্থে দৃষ্ট হয় "শ্রীরামানুজাচার্য্যাদীনাং মতাবলম্বিনো বৈষ্ণবাঃ প্রথমং যাগাদিস্থানং বিধায় যান্ কান্ শূদ্রাদিবালকাদীনপি সংগৃহ্য ক্ষৌরাদিকং কারয়িত্বা স্বয়ং বিষ্ণুহোমাদিকং কৃত্বা পূর্ব্বাচার্য্যাদীন্ বিধিবৎ সংপূজ্য চ তান্ বালকাদিকান্ পঞ্চ সংস্কারান্ধারয়িত্বা দ্বিজত্বমাসাদ্য পশ্চাৎ যাজ্ঞবল্ক্যাদিকৃতপদ্ধতি মতানুসারেণ গর্ভাধানাদ্যুপনয়নান্তান্ সংস্কারান্ কারয়িত্বা বেদমাতরং সাবিত্রীমপি দীক্ষয়িত্বা পশ্চাৎ স্বসম্প্রদায়মন্ত্রঞ্চ দীক্ষয়িত্বা শ্রীগুর্ব্বাদীন্ শালগ্রামাদীনপ্যর্চ্চয়িত্বা * * * সন্ন্যাসিনং কুর্ব্বন্তীতি প্রসিদ্ধং সর্ব্বৈর্দৃষ্টং শ্রুতেঞ্চেতি।।" নারদপঞ্চরাত্র সাত্ত্বত তন্ত্রের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। উক্ত সাত্ত্বততন্ত্রেও এই উক্তির প্রমাণ দৃষ্ট হয়।

স্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসও স্পষ্টাক্ষরে ২য় বিলাসে ১৫০ সংখ্যায় বলেন,—

"গর্ভাধানাদিকাশ্চৈব ক্রিয়াঃ সর্ব্বাশ্চ কারয়েৎ" টীকায় "আদি শব্দেন পুংসবন-সীমন্তোন্নয়নজাত-কর্ম্মনামকরণান্নপ্রাশনচৌড়োপনয়নস্নানবিবাহাখ্যাঃ।"

অর্থাৎ দীক্ষাপ্রার্থী ব্যক্তিকে গুরুদেব দশবিধ সংস্কার করাইয়া দিবেন। সুতরাং দীক্ষিত ব্যক্তি উপবীত ধারণ করিবেন।

কোনও কোনও অকিঞ্চন পরমহংস বৈষ্ণব ভাগবত দীক্ষা লাভ করিয়া নির্গুণ ব্রাহ্মণতার চরমপরিণতি বৈষ্ণবতায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া উপবীত ধারণ করিবার প্রয়োজন মনে করেন নাই। কেহ বা শাস্ত্রবাক্য মান্য করিয়া দীক্ষা কালে উপবীত গ্রহণ করিয়াও নিজের উত্তম ভক্তিযোগাশ্রিত অবস্থা লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্রানুযায়ী উপবীত প্রভৃতি আশ্রম চিহ্নধারণে ঔদাসীন্য করিয়াছিলেন। যথা ব্রহ্মোপনিষদি—

বহিঃ সূত্রং ত্যজেদ্বিদ্বান্ যোগমুত্তমমাস্থিতঃ।
ব্রহ্মভাবময়ং সূত্রং ধারয়েদ্ যঃ স চেতনঃ।।

অর্থাৎ উত্তম ভক্তিযোগাশ্রিত, তত্ত্ববিৎ পরমহংস পুরুষ বাহ্যসূত্র ত্যাগ করিবেন। এইরূপ অবস্থায় যিনি ব্রহ্মভাবময় সূত্র ধারণ করেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। যিনি ব্রহ্মের সহিত সতত যুক্ত হইয়াছেন তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের প্রয়োজন কি? যাহার ব্রহ্মের সহিত যোগ হয় নাই তাহাকে শ্রীগুরুদেব "ব্রহ্মসূত্র" রূপ স্মারকচিহ্ন দ্বারা পরব্রহ্মে সতত যুক্ত থাকিবার জন্য উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু "কালঃ কলিঃ।" পরমহংস পুরুষগণের স্বতন্ত্র আচরণ দেখিয়া মাৎসর্য্য- পরায়ণ ব্যক্তিগণ বৈষ্ণবকে শূদ্র বলিবার সুযোগ খুঁজিয়া নিতেছে। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ ইতিহাস শাস্ত্রের কোনও স্থানে খুঁজিয়াও বৈষ্ণব বা ভগবদ্ভক্ত শূদ্র একথাটী পাওয়া যায় না। কৈমুতিক ন্যায়ানুসারে সর্ব্বত্রই বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের গুরু বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছেন এবং পূর্ব্ব মহাজনগণের

আচরণ দ্বারা তাহা আরও বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। পরমহংস বৈষ্ণব যে ব্রাহ্মণের গুরু হইতে পারেন, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শৌক্র কায়স্থকুলে উদ্ভূত হইয়াও শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি অনেক শৌক্র ব্রাহ্মণকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সদ্গোপ-কুলোদ্ভূত শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর নিকট করণবংশজ শ্রীরসিকানন্দপ্রভু দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশীয়গণের নিকট পাণ্ডা পড়িহারী বিপ্রের প্রণম্য শাসন ব্রাহ্মণগণ এ যাবৎ দীক্ষা লাভ করিতেছেন, শ্রীদাস গদাধরের নিকট কাটোয়ার শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত হন। আবার বড়গাছি নিবাসী নবনীহোড় দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ কুলে উদ্ভূত হইয়াও দীক্ষিতের চিহ্নস্বরূপ উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করেন এবং শৌক্র ব্রাহ্মণাদিবর্ণেরও আচার্য্য হন। শ্রীখণ্ডের মুকুন্দবংশে দীক্ষিতের উপবীত ধারণ প্রথা পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিয়াছে। তাঁহাদের উপবীত গ্রহণ অম্বষ্ঠের সংস্কার নহে। কারণ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম পূর্ব্ববঙ্গে অম্বষ্ঠদের উপবীত গ্রহণপ্রথা বঙ্গদেশে প্রচলিত হয়। তৎপূর্ব্ব হইতেই ইহারা উপবীত গ্রহণ করিয়া আচার্য্যের কার্য্য করিতেন। শ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য রসিকানন্দ প্রভুর বংশেও দীক্ষিত ব্যক্তির উপবীত গ্রহণ প্রথা আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। রসিকানন্দ প্রভুর চতুর্থ অধস্তন গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ শৌক্র খণ্ডাইৎ বা চাষীকুলে উদ্ভূত হইয়াও বিপ্রোপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নিকট তিনি অধ্যয়ন করিয়া- ছিলেন এবং চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের আজ্ঞাতেই তিনি বেদান্তের গোবিন্দ ভাষ্য রচনা করেন। ইহা ব্যতীত তিনি কয়েকটী উপনিষদের ভাষ্যও রচনা করিয়াছেন। আচার্য্য চক্রবর্ত্তী ঠাকুর যদি শূদ্রকুলোদ্ভূত দীক্ষিত ব্যক্তির উপবীত গ্রহণ ও বেদ পাঠে অধিকার নাই মনে করিতেন, তবে কিছুতেই তিনি স্বয়ং বলদেবকে অধ্যাপনা করাইতেন না বা বেদান্তের ভাষ্য প্রণয়ন করিতে আদেশ করিতেন না। কিন্তু আজকাল গুরুব্রুবগণ শিষ্যকে দীক্ষিত বলিয়াও শূদ্রাখ্যা প্রয়োগ করেন ও দীক্ষিতের সহিত অস্পৃশ্য শূদ্রের ন্যায় আচরণ করেন। তাহারা তাহাদের তথাকথিত দীক্ষিতের হস্তে জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না, শালগ্রাম পূজায় অধিকার দেন না, শিষ্যের পূজিত শ্রীমূর্ত্তি শূদ্রের ঠাকুর শূদ্রের স্পর্শে শূদ্র হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া প্রণাম করিতে কুণ্ঠিত হন, দীক্ষিত (?) শিষ্যকে শ্রীমূর্ত্তি সমীপে পক্কান্ন ভোগ দিবার অধিকার প্রদান করেন না, কেবল বার্ষিক দক্ষিণা প্রভৃতির সময় শিষ্যগণকে দীক্ষিত জানেন ও সকলের নিকট প্রচার করেন। সুতরাং ঐ সকল গুরুব্রুব, ব্রাহ্মণব্রুবগণের দীক্ষিত ব্যক্তি যথা পূর্ব্বং তথা পরং থাকিয়া যায়। কিন্তু যাহারা শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত বাস্তব সত্য উপলব্ধি করিতে চান, তাহারা অবশ্য সদ্গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া বিপ্রত্বলাভ করেন, বেদে অধিকার প্রাপ্ত হন এবং গুরুচরণাশ্রয়ে ভজন করিতে করিতে ব্রাহ্মণত্ব ও যোগিত্বকে ক্রোড়ীভূত করিয়া যে বৈষ্ণবত্বরূপ চরম পদ অবস্থিত সেই পরমপদে অধিরূঢ় হইয়া কৃত- কৃতার্থ হন। তাই বৃহদারণ্যক শ্রুতি উচ্চ কণ্ঠে বলেন,—

"তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।।"

মায়াবাদের উক্তি

আমার নাম বিশ্ববিখ্যাত। আমি সকলের নিকট বৈদিক বলিয়া পরিচয় দেই। আমার প্রতিপক্ষেরা আমাকে অবৈদিক বলিয়া থাকে। তাঁহাদের মতে আমি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। তাঁহাদের শাস্ত্র-পুঁথিতে লেখা আছে যে, আমি বৌদ্ধ, বৈদিকবেশ লইয়া প্রচ্ছন্নভাবে আর্য্যদিগের নিকট প্রবেশ করিয়াছি। অসুরগণ যখন ভক্তিপথ গ্রহণ করিয়া সকামভাবে উপাসনা করতঃ নিজ নিজ দুষ্ট অভিসন্ধি সফল করিবার প্রয়াস পাইতেছিল, তখন ভগবান্ ঐ অসুরগণ যাহাতে শুদ্ধভক্তিপথকে ভ্রষ্ট করিতে না পারে, সেইজন্য ভক্তচূড়ামণি শঙ্করকে আদেশ করিলেন—"তুমি অসুরদিগকে মোহন করিবার জন্য কল্পিত মায়াবাদ-শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া তাহাদের নিকট আমার প্রকৃত তত্ত্ব গোপন রাখ।" শঙ্কর ভগবানের আদেশমত আমাকে সকলের নিকট পরিচয় করাইয়া দিলেন। সে সময় হইতে আমি জগতের সর্ব্বত্র বহু আকারে প্রবিষ্ট হইয়া মোহনকার্য্যে নিযুক্ত আছি। ভারতবর্ষে আমি শঙ্কর স্বামীর পূর্ব্বেও দত্তাত্রেয়, অষ্টাবক্র প্রভৃতির আশ্রয়ে ছিলাম। আজকাল বঙ্গদেশেও আমার খুব নাম হইয়াছে। ব্রাহ্মণ-সমাজে প্রায়ই আমার আদর। পঞ্চোপাসকগণ আমাকেই আশ্রয় করিয়া শক্তি, সূর্য্য, গণেশ, শিব ও বিষ্ণু—এই পঞ্চবিধ সগুণ-দেবতার উপাসনা করেন। তাহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, ঐ সকল দেবতার মধ্যে যে কোনও একটীর উপাসনা করিতে করিতে চিত্তের একাগ্রতা হইতে পারে। চিত্ত একাগ্র হইলে মন নির্ব্বিষয় হয়। মন নির্ব্বিষয় হইলে হৃদয়ে নির্ব্বিশেষতারূপ জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। সেই জ্ঞানের গাঢ়তা হইলে 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞান হয়। ভারতে চারিটী বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ব্যতীত সকলেই আমার গণ্ডীর ভিতরে। অসাম্প্রদায়িকগণ সমন্বয়বাদিগণ, সকলেই আমার আশ্রিত। কারণ, আমার আশ্রয়ে অনেক সুবিধা আছে। যে কোনও ভ্রান্ত মত বা পথ আছে, সে সমুদায়ই আমার আশ্রয়ে আসিলে আপাততঃ বিনাশ নাই। এমনকি, যদি কেহ বা কোন সম্প্রদায় কোন পশুকেও ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে, সেও আমার সাহায্য পায়। আমি তাহাকে আমার অনুগত করিয়া বলিয়া থাকি যে, পশুতে ঈশ্বর বলিয়া মনোযোগ করিলেও চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তের স্থৈর্য্য সাধিত হইতে পারে এবং সাধক অবশেষে সেই বিষয় হইতে চিত্তকে উঠাইয়া অদ্বৈততত্ত্বে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। এইরূপ সকলের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে পারি বলিয়াই সকলেই আমাকে আপন আপন চরম উদ্ধর্ত্তা বলিয়া পূজা করেন। ইউরোপেও আমার খ্যতি হইয়াছে। যাঁ'রা প্যান্থিষ্ট (Pantheist) বলিয়া পরিচিত, তাঁ'রাও আমার উপাসক। স্পিনোজা (Spinoza) আমাকে খুবই ভালবাসিতেন। আমেরিকা হইতে যে থিয়সফিষ্ট (Theosophist) মত জন্মিয়াছে, তাহাও আমারই আশ্রিত। আমি দেশ-বিদেশে খুব ভাল রকমই আসর গরম করিয়া বসিয়াছি। আমার মত ব্রহ্মের বিকার জগৎ, যেমন দুধের বিকার দধি। যুক্তিতে কিন্তু দধি যেমন সত্যবস্তু, জগৎটাও সেরূপ সত্য হইয়া পড়ে—তখন আমি আর আমার মত রক্ষা করিতে পারি না। আবার বলিয়া থাকি, রজ্জুতে যেমন সর্প-ভ্রম হয়, সেইরূপ ব্রহ্মেই জগৎ ভ্রম হয়। কিন্তু সর্প ও রজ্জু দুইটী বস্তু না থাকিলে ভ্রম উপস্থিত হয় না। এখানেও আমার মত ঠিক থাকে না। মোহন-কার্য্যই আমার ব্যবসা, সেটা আমি বেশ

বজায় রাখিয়াছি। তবে আমায় অদ্বৈত-মত শ্রুতিতে কল্পিত আছে। তৎসঙ্গে দ্বৈত-মতের কথাও আছে। আমি দ্বৈত-মতের কথাগুলি ছাড়িয়া কেবল নিজের মত-পোষণের জন্য বাছা বাছা কথাগুলিই লইয়া থাকি। সকলেই এরূপ করিয়া থাকে। কেবল অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈত-বাদী বলিয়া এক সম্প্রদায় শ্রুতির প্রতিপাদ্য উভয়পক্ষীয় কথারই সামঞ্জস্য রাখিয়াছে।

যখন আমার নবীন বয়স ছিল, তখন আমার বৈরাগ্যের জোরটা খুব বেশী ছিল। আমি পাহাড়-পর্ব্বতের গুহার ভিতরই থাক্‌তাম। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে সকলই পরিবর্ত্তন হয়, ইহাই জগতের নিয়ম। এখন আমি একুল-ওকুল দুকুলই বজায় রাখিয়াছি।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আমার বিজয়-পতাকা উড্ডীয়মান। জগতে যত বড় বড় লোক ধনে, জনে, কুলে, বিদ্যায় ও জ্ঞানে প্রবীণ, সকলেই আমার পেটেল। সভ্য ভব্য লোকে আমাকে আশ্রয় করিয়া খুব সুবিধা পা'ন, তাঁ'দের কাছে ভাবকেলির ধর্ম্মের আদর নাই। আমার সবচেয়ে বাহাদুরি এই যে, আমি আমার প্রতিপক্ষগণেরও সভায় তা'দের জ্ঞাতসারেই হউক, অজ্ঞাতসারেই হউক্, প্রবেশ ক'রেছি। চৈতন্যদেব ও গোস্বামীগণ আমাকে বিচারে পরাস্ত ক'রে আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। আর আজকাল তাঁ'দের অধস্তন বলিয়া যাঁ'রা পরিচয় দেন, তাঁ'দের মধ্যেও আমার চরই অধিক। পূর্ব্বে গোস্বামীগণ আমাকে প্রচ্ছন্ন- বৌদ্ধ বলিতেন, কিন্তু তাঁ'দের অধস্তনগণ প্রচ্ছন্ন-মায়াবাদী সাজিয়াছেন। বৈষ্ণব পরিচয়াকাঙ্ক্ষী আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাতগোঁসাই, অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী—কতনাম করিব? সকলেই আমাকে কম বেশী আদর করছেন। প্রভু-সন্তানেরা ভগবান্ নিত্যানন্দ রায় সেজেছেন। তাঁ'রা শিষ্যের বাড়ী গিয়ে শিষ্যকে দিয়ে পা ধুইয়ে চরণামৃত, চরণরজঃ গ্রহণ করতে ও পাদুকা বহন করতে আদেশ করেন, কেহ কেহ শ্রীচরণে সচন্দন তুলসী পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন, প্রিয়তমা শিষ্যার সযত্নে গাঁথা ফুলের মালা গলায় দোলাইয়া প্রসাদী করিয়া পুনরায় শিষ্যার গলদেশে পরাইয়া দেন। কেহ কেহ আবার বালগোপাল ভাবে শিষ্যার স্তন্য-পানাদিও করিয়া থাকেন ও শিষ্যাকে গোপীকা ভাবিয়া শিষ্যার সঙ্গে রাত্রি যাপন করেন। এসব ব্যাপার উপন্যাসের অতিরঞ্জিত বা কাল্পনিক কথা নহে। আমার কাহিনী শুনিয়া শিহরিয়া উঠিবে, বুঝিতে পারিবে—আমি কত বাহাদুর! আবার গুরু-কর্ত্তারা কেহ কেহ কৃষ্ণ সেজে' মোহন-বাঁশী হাতে ক'রে কদম গাছে উঠিয়া বসেন—কেহ বা গোপীরূপা শিষ্যাগণের সহিত রাস-ক্রীড়া করেন। আবার আমার আশ্রিত আর একদল বেটাছেলে হ'য়ে মেয়েছেলের বেষ পরেন। কেহ ললিতা, কেহ বিশাখা, কেহ চম্পকলতা সখী সাজেন—কাণে দুল, পরিধানে সিম্‌লাই শাড়ি, হাতে বালা, অনন্ত ইত্যাদি। তাঁদের কাছে যখন মেয়েরা যা'ন, তখন বেশ সম্ভাষণ করেন। পুরুষ দেখ্‌লে ঘোম্‌টা টানেন। অন্তরঙ্গদের সঙ্গে সে নিয়ম নয়।

তারপর আমি বৃন্দাবনে পর্য্যন্ত প্রবেশ ক'রেছি। সেখানে আমার বড় সুযোগ। সেটা প্যারীজীর ধাম কিনা! ব্রজবুলিতে যে বলে থাকে—"বৃন্দাবন্‌মে রসমাধুরী —যাঁহা প্যারীজিকা ধাম।" সেখানে ত' গোপীর অভাব নেই; বারো মাস নানা দেশ থেকে রং-বেরঙের গোপীদের চালান্ হচ্ছে। সেখানে ত' যুগল ছাড়া

ভজন হয় না। কুঞ্জে কুঞ্জে যুগলের মেলা! গৌরাঙ্গ প্রভু ত' সার্ব্বভৌম ও প্রকাশানন্দের সহিত বিচার ক'রে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন—আর আমি তাঁ'র সেবক নামাধারী। অধস্তনগণের ভিতর চর প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তাঁ'দের দফা সার্‌ছি। তাঁ'রা যদি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর যাঁ'র শিক্ষা—"**জীব ভগবানের নিত্যদাস**"—তাঁ'র দোহাই দিয়ে নিজেরাই ভগবান্ সেজে' কত কত লীলা করতে পারেন, তবে আমার আর "সোঽহং" বলাতে অপরাধটা কি বেশী হ'ল? তবে তাঁ'দের মধ্যে লীলা-বৈচিত্র্যটা বজায় রেখেছে—আমার সেটা নাই। এইজন্যই ব'লেছিলাম—'আমি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ—মায়াবাদী, আর তাঁ'রা আবার প্রচ্ছন্ন মায়াবাদী!'

সিদ্ধান্ত

পূর্ব্বপক্ষ নিরসনপূর্ব্বক সিদ্ধপক্ষস্থাপনরূপ মীমাংসা "সিদ্ধান্ত" শব্দবাচ্য। সিদ্ধান্ত ব্যতীত কাহারও অভীষ্ট লাভ হইতে পারে না। যাহার সিদ্ধান্ত বিষয় স্থিরতা নাই, সে বাতচালিত তৃণের ন্যায় এক এক সময় এক এক স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া অশান্তি রাজ্যে পরিভ্রমণ করে। কোনও একটী প্রয়োজন লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তদ্‌বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আবশ্যক। কোন কোন উদারাভিমানী ব্যক্তি তর্কের ভয়ে বা লোকের মনে আঘাত দিতে হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত নির্ণয়ে বিরত হন। তাঁহাদের মতে, সকল মত ও সকল পথই এক একটী স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত, যেহেতু সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছায় প্রাদুর্ভূত। তাঁহারা গীতার কথা উদ্ধার করিয়া বলেন, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং" "যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ" ইত্যাদি। তাঁহারা আরও বলিয়া থাকেন যে, যুগ যুগে প্রয়োজনানুসারে আচার্য্যগণ এক একটী মত প্রচার করিয়া থাকেন, আবার আচার্য্যগণের মধ্যেও বহু মতভেদ দৃষ্ট হয়, সুতরাং কোন একটী বিশেষ সিদ্ধান্ত নিয়া মারামারি না করিয়া ভগবানকে ডাকিতে আরম্ভ করিয়া দেওয়াই ভাল; যে যে মত বা যে পথই গ্রহণ করুক না কেন, সকলেই একই লক্ষ্য স্থলে পৌঁছিবে। ইঁহারা আপনাদিগকে সমন্বয়বাদী বলিয়া প্রচার করিয়া জগতের নিকট প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন। আবার আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা নিজে নিজে যাহা স্থির করিয়াছেন বা বুঝিয়া রাখিয়াছেন, তাহাকেই এক মাত্র সিদ্ধান্ত বলিয়া থাকেন। ইঁহারা "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর" ইত্যাদি বচনের কদর্থ করিয়া স্ত্রীজনোচিত অন্ধবিশ্বাসকেই সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে করেন।

শাস্ত্রীয় বিচার-প্রণালীর কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিলে উক্ত উভয়বিধ ব্যক্তিই মনোধর্ম্মের বশীভূত জানা যায়। মনোধর্ম্মশীল জগতের নিকট তাঁহাদের বাক্য যতই আদরের হউক না কেন, বা তাঁহাদের আসন যতই ঊর্দ্ধে স্থাপিত থাকুক না কেন, বাস্তব সত্যবিচারে সিদ্ধান্তসার শাব্দ প্রমাণাবলীর নিকট তাঁহাদের কথার মূল্য খুবই কম। জগতের নিকট জৈমিন্যাদি বা বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্রকার বিষ্ণু, পরাশর, হারীত প্রভৃতি ঋষিবর্গের খুবই প্রতিষ্ঠা আছে। উঁহারা এক একজন এক কেটী মহাজন ও ধর্ম্মপালক বলিয়া পরিচিত। কিন্তু সাত্ত্বত শাস্ত্রগণের অগ্রণী বেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতে ধর্ম্মরাজ যম বলেন যে,—
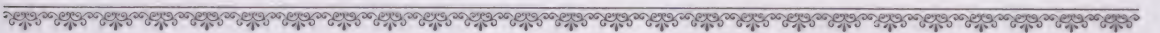
ধৰ্ম্মং তু সাক্ষাদ্ভগবদৎপ্রণীতং ন বৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ।
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরাঃ মনুষ্যাঃ কৃতো নু বিদ্যাধরচারণাদয়ঃ।।
স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্।। (শ্রীমদ্ভাগবত ৬।৩।১৯-২০)

সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীত ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে ভৃগু প্রভৃতি ঋষিবর্গ, দেববৃন্দ, সিদ্ধগণ, অসুরনিকর, মনুষ্যসকল, বিদ্যাধর, চারণ প্রভৃতি কেহই জানেন না। ধৰ্ম্মসিদ্ধান্তবিৎ মাত্র দ্বাদশ জন। ব্রহ্মা, শম্ভু, সনৎকুমার, নারদ, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব এবং আমি (যমরাজ) মাত্র সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রণীত ধৰ্ম্ম অবগত আছি।

সুতরাং অন্যান্য লোক জগতে যতই প্রথিতনামা হউক্ না কেন, যদি তাঁহাদের সিদ্ধান্ত উক্ত দ্বাদশ জন সিদ্ধান্তবিৎএর অনুগত না হয়, তবে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত।

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কৰ্ম্মণি যুজ্যমানঃ।।

মহাজন বলিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ জৈমিন্যাদি ব্যক্তিগণও সৎ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। তাদৃশ মহাজনের বিবেকশক্তি দৈবী মায়া দ্বারা বিমোহিত। ত্রয়ীর মধুপুষ্পিত বাক্যে তাঁহাদের বুদ্ধি জড়ীকৃত হওয়াতে তাঁহারা বিস্তারশীল মহাকৰ্ম্মালানে বদ্ধ।

অতএব মনোধর্ম্মের কোনও কথাই সিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। সিদ্ধান্তনির্ণয়ে অলসতা বা অক্ষমতা এক প্রকার ভোগপ্রিয়তা। ভগবানকে যিনি এ ভাবে ভজনা করেন, তিনিও তাঁহাকে তদ্রূপই ফল প্রদান করেন। ভগবান্ তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তকে এক প্রকার ফল প্রদান করেন, আবার কংস, জরাসন্ধ হিরণ্যকশিপুকে তদনুযায়ী ফল প্রদান করিয়া থাকেন। বিচারক সাধু ও চোরের ব্যবস্থা কখনও সমান করেন না। অতএব সমন্বয়বাদীগণের অর্থ কদর্থ মাত্র। 'কাহারও ভাবে আঘাত দিব না' কথাটা শুনিতে আপাতমধুর হইলেও পরিণামে সুফল দান করে না। যাঁহারা সারগ্রাহী, তাঁহারা অপরকে উদ্বেগ দিবার ভয়ে সৎসিদ্ধান্ত প্রচারে পশ্চাৎপদ হয় না। অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন অধিকারী অনুসারে নৈমিত্তিক ধৰ্ম্ম বা সিদ্ধান্ত অনেক হইতে পারে, কিন্তু চরম সিদ্ধান্ত মাত্র একটী। চরম সিদ্ধান্ত বিষয়ে উদাসীন হইলে আমরা বাস্তব রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিব না। অধিকার বিশেষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সিদ্ধান্তে মজিয়া থাকিলে বা নৈমিত্তিক সিদ্ধান্তগুলিকে নিত্য চরম সিদ্ধান্তের সহিত সমান জ্ঞান করিয়া সমন্বয়বাদী হইলে আমরা আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব না। জননী জন্মভূমির স্বর্গ হইতে শ্রেষ্ঠত্ব, গৃহমেধিদিগের পঞ্চসূনা পাপনিবারণের জন্য প্রত্যহ পঞ্চ

মহাযজ্ঞের ব্যবস্থা, মাংসপিণ্ডদানদ্বারা পিতৃলোক তৃপ্তির ব্যবস্থা, নানাবিধ দেবতা উপদেবতা পূজা ইত্যাদি বহু বহু মীমাংসা শাস্ত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সিদ্ধান্ত এক শ্রেণীর লোকের নিকট আদরণীয়, আবার এক শ্রেণীর লোক তৎ ও অতৎকে সমান জ্ঞান করেন, অজ্ঞান বালক পরমব্রহ্মনিষ্ঠ পরমহংস পুরুষকে সম বলিয়া থাকেন, চন্দন ও বিষ্ঠায় ভেদজ্ঞান তিরোহিত হওয়াকেই সাধনের উচ্চতম সোপান মনে করেন, সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ ও তদ্ধীন দেবতাবৃন্দকে সমান জ্ঞান করেন; দেহ-ধর্ম্ম-কর্ম্ম, মনোধর্ম্ম জ্ঞান ও আত্মধর্ম্ম ভক্তিতে কোনই ভেদ নাই—সকলই এক একটী পন্থা মাত্র বলিয়া থাকেন। এই সকল অপসিদ্ধান্তমূলে মায়াবাদ ও মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নাই। সিদ্ধান্তসার শ্রীগীতা গ্রন্থে জগতে যত প্রকার মত ও পথ আছে, তাহা পূর্ব্বপক্ষস্বরূপ অবতারণা করিয়া আত্মধর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠতা সংস্থাপন করিয়াছেন। শ্রীগীতার আদি, মধ্য ও অন্তে আত্মধর্ম্ম ভক্তি বা ভগবানে শরণাপত্তিই সর্ব্বগুহ্যতম সিদ্ধান্ত বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। শ্রীগীতার ৩য় অধ্যায়ে পূর্ব্বপক্ষরূপে খুব কর্ম্মপ্রশংসা দৃষ্ট হয়, কিন্তু সিদ্ধান্ত সংস্থাপিত হইল—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।।

শঙ্করাচার্য্যটীকা—যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতিশ্রুতের্যজ্ঞ ঈশ্বরস্তদর্থং যৎ ক্রিয়তে তদ্‌যজ্ঞার্থং।

অর্থাৎ বিষ্ণুর জন্য কর্ম্ম করা যাইতে পারে, তদ্ব্যতীত অন্য যত কর্ম্ম, সমুদয়ই কর্ম্মবন্ধনের কারণ।

সাত্ত্বতশাস্ত্রও বলেন,—

সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ।।

হরির উদ্দেশ্যে ক্রিয়াই ভক্তি। তাহাই পরিণামে পরাভক্তি স্বরূপে পরিণত হয়।

শ্রীগীতা চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞানযোগের প্রশংসা দৃষ্ট হয়, কিন্তু শুষ্কজ্ঞানের প্রশংসা নাই।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।।

'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং' "অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"। শ্রদ্ধা, প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা ব্যতীত জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। সুতরাং জ্ঞানও যে ভক্তি-উদ্দেশক, তাহাই সিদ্ধান্তিত হইল। সাত্ত্বত শাস্ত্রও তাহাই বলেন—

"জ্ঞানং যৎ তদধীনঞ্চ ভক্তিযোগসমন্বিতম্।"
"ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান।"

আবার, ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগের খুব প্রশংসা দৃষ্ট হয়, কিন্তু উক্ত অধ্যায়-শেষের সিদ্ধান্ত—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্যোগী ভবার্জ্জুন।।
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।।

ভগবান্ অর্জ্জুনকে আদেশ করিলেন—"তুমি যোগী হও, কারণ তপস্বী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ। সাংখ্য জ্ঞানী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ। সকাম কর্ম্মী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ।

সিদ্ধান্ত—যত প্রকার যোগী আছে, সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তিযোগাবলম্বী যোগীই শ্রেষ্ঠ। যিনি শ্রদ্ধা সহিত আমার ভজনা করেন, তিনিই আমাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যুক্ত। শ্রীগীতা সপ্তম অধ্যায়ে দেখান হইল যে মায়া ভগবানের অধীনা শক্তিবিশেষ। জীবের পক্ষে সেই অলৌকিকী মায়া অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। একমাত্র তিনি ভগবানের শরণাগত হন, তিনিই মায়ার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন। কিন্তু চতুর্ব্বিধ দুষ্কৃত ব্যক্তিগণ ভগবানকে ভজনা করে না; চতুর্ব্বিধ সুকৃতি ব্যক্তিই ভগবানের ভজনা করেন। তাহাদের মধ্যে জ্ঞানীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু শুষ্ক নির্ব্বিশেষবাদী জ্ঞানী নহেন, যিনি সম্বন্ধজ্ঞান বিশিষ্ট হইয়া মুক্তিবাঞ্ছা ছাড়িয়া একভক্তিবিশিষ্ট তিনিই শ্রেষ্ঠ। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই—

"তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিষ্যতে।"

কোন্ প্রকার জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ? পরের শ্লোকে বলিলেন—

"বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ।।"

যিনি সর্ব্বত্র বাসুদেবময় দর্শন করেন, অতএব এখানেও উত্তমা ভক্তির সিদ্ধান্তই প্রচারিত হইল।

আবার শ্রীভগবান্ অন্য দেবতা যজনকারীগণকে পূর্ব্বপক্ষস্বরূপে অবতারণা করিলেন। বলিলেন, "অন্তর্যামী স্বরূপ আমি, যাঁহার যে স্পৃহণীয় দেবমূর্ত্তি, তাঁহাতে তাহার শ্রদ্ধানুযায়ী অচলা শ্রদ্ধা বিধান করি। সে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেই দেবতার আরাধনা করিয়া অভীষ্ট লাভ করে।" আবার নবম অধ্যায়ে বলিলেন, —যাহারা অন্য দেবতার পূজা করে, তাহারাও আমাকেই পূজা করিয়া থাকে। ইহা শুনিয়া কেহ হয়ত সিদ্ধান্ত করিলেন—তবে আর কি? দেবতা-পূজা করাই বিধেয়। তাহারা সিদ্ধান্ত করিলেন—দেবতা ও ভগবান্ নাম ও রূপ মাত্রভেদ, তত্ত্বতঃ একই বস্তু। কিন্তু ভগবান্ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন—

"অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাং।"

যে সকল লোক অন্য দেবতার পূজা করে, তাহারা অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট, তাহাদের ফল নশ্বর। কেন, ভগবান্ ত বলিয়াছেন—

"দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি।"

যাহারা দেবতা আরাধনা করে, তাহারা দেবলোক এবং আমার ভক্ত আমাকে প্রাপ্ত হয়। না হয়, আমরা দেবলোকই পাইলাম, তাহাতে ক্ষতি কি?

সিদ্ধান্ত—যথেষ্ট ক্ষতি; তাহাদের লোক নশ্বর, দেবতা নশ্বর। কিন্তু আমি "অব্যয়ম্" আর—

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।।"

অর্থাৎ আমি সর্ব্বোত্তম ও অদ্বয়। ব্রহ্মলোক হইতে যাবতীয় লোকই অনিত্য। সেই সেই লোক হইতে পুনরাবৃত্তি হয়। কিন্তু যিনি কেবলাভক্তির বিষয়রূপ আমাকে আশ্রয় করেন, তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। পুনরায় পর পর শ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন—

"যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।।"

আমার পরম ধাম প্রাপ্ত হইয়া জীব আর প্রতিনিবৃত্ত হয় না। সেই ধামপ্রাপ্তির উপায়—

"পুরুষঃ সঃ পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যথা।"

সেই পরম পুরুষ একমাত্র অনন্যাভক্তি দ্বারা লভ্য। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যাহারা শ্রদ্ধা সহকারে অন্য দেবতার পূজা করে তাহারা আমারই পূজা করে। তবে অন্য পূজায় দোষ কি?

সিদ্ধান্ত—পূজকের পক্ষে যথেষ্ট দোষ, কারণ "তে যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকং" —তাঁহাদের পূজা অবিধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয়।

অবিধি কি?—যেন "বিধিনা গতাগতনিবর্ত্তকা মৎপ্রাপ্তিঃ স্যাৎ তং বিধিং বিনৈবঃ" অর্থাৎ—যে বিধি দ্বারা ভগবৎসেবা প্রাপ্তিলাভ ঘটে ও পুনরায় ব্রহ্মাণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে না হয় সেই বিধি ব্যতীত অপর বিধিই 'অবিধি'। ঐ সকল লোক পুনরায় সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করে। তবে ভগবানের পূজা হইল কি প্রকারে? —"মামেব যজন্তি" কথার সার্থকতা কি? —তদুত্তরে পরশ্লোকে বলিতেছেন—

"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
নতু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে।।"

অর্থাৎ মূলে আমি একমাত্র পরমেশ্বর। অতএব আমি ছাড়া স্বতন্ত্র অন্য দেবতা নাই; সুতরাং যাহা কিছু পূজোপরণ আমাতেই বর্ত্তে। কিন্তু অন্যদেবপূজকপক্ষে তাহার পূজাটী হইয়া যায় অবিধি। যেমন, একছত্র রাজা ও তাহার অসংখ্য ভৃত্য। ঐ সকল ভৃত্য রাজার প্রদত্ত শক্তিতে শক্তিমান। কিন্তু কেহ যদি ঐ সকল ভৃত্যকে রাজা বোধে কিংবা ভৃত্য-বোধে সম্মান করে, তবে মূলতঃ সম্মানটী রাজাকেই করা হয়। কিন্তু যাহারা 'ইহারা রাজার ভৃত্য, এই জন্য ইহাদিগকে সম্মান দিতেছি' এই জ্ঞানে ঐ সকল ভৃত্যকে সম্মান করে, তাহারা তত্ত্বজ্ঞ—তাহাদের সম্মান-প্রদান বিধিপূর্ব্বক হয়; আর যাহারা ভৃত্যকে রাজজ্ঞানে সম্মান

করে তাহাদের সম্মান প্রদান ক্রিয়াটী অবিধিপূর্ব্বক হইয়া থাকে। অতএব বিধি ও অবিধিটী জীবপক্ষে। এই জন্যই পর পর শ্লোকে বলিলেন যে, একমাত্র আমার অনন্যভক্তের বিনাশ নাই।

"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।।"

এই প্রকারে শ্রীগীতোপনিষদে শ্রীভগবান্ স্বতন্ত্র কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ-পন্থা, স্বতন্ত্র দেবতারাধনা, সাংখ্যের প্রকৃতিপুরুষবাদ, জৈমিনীর অভ্যুদয়বাদ, নির্ব্বিশেষবাদ প্রভতি যাবতীয় মতকে পূর্ব্বপক্ষ করিয়া সর্ব্বত্র ভগবদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিয়াছেন।

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্" (৯।১০০ ইত্যাদি বাক্যদ্বারা সাংখ্যের 'অচেতনত্বেহপি ক্ষীরবৎ চেষ্টিতঃ প্রধানস্য' (৩ অঃ ৬২ সূত্র)—প্রকৃতির স্বতঃকর্ত্তৃত্ব খণ্ডিত হইয়াছে।

"তে তং ভুক্তা স্বর্গলোকং বিশালঃ ক্ষীণেপুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি।।"

দ্বারা জৈমিনীর "চোদনালক্ষণোহর্থো ধর্ম্মঃ (১ অঃ ১ পাদ, ২ সূত্র) খণ্ডিত হইয়াছে। আবার ১৮শ অধ্যায়ে কেবল নির্ব্বিশেষবাদের অকিঞ্চিৎকরত্ব দেখাইয়া বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।"

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চামি তত্ত্বতঃ।।"

ব্রহ্মভূত হইয়া যদি ভক্তি যাজন করে, তাহা হইলে পরাভক্তি লাভ করিতে পারে ও ভক্তিবলেই আমার স্বরূপ, আমার চিন্ময় আকার তত্ত্বতঃ জানিতে পারে।" এই ব্রহ্মজ্ঞানই গুহ্য উপদেশ। পরে পরমাত্মজ্ঞানরূপ গুহ্যতর উপদেশ বলিতেছেন—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি।"
অর্থাৎ সর্ব্বজীবের হৃদয়ে আমি পরমাত্মরূপে অবস্থিত।
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।।
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্য গুহ্যতরং ময়া।"

সর্ব্বভাবে পরমাত্মারই শরণ গ্রহণ কর। তাঁহার প্রসাদে পরাশান্তি ও পূর্ণ শাশ্বত স্থান লাভ করিতে পারিবে। ইহা গুহ্যতর উপদেশ।

এখন গুহ্যতম উপদেশ বলিতেছেন। অর্জ্জুন অতি প্রিয়তম ও শরণাগত বলিয়া তাঁহার হিতের জন্য এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ বলিতেছেন—

"সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্।।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।।
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।"

শ্রীভগবান্ এবার স্বয়ং প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছেন যে, "তুমি আমার ভক্ত হও, সর্ব্ববিধ ক্ষুদ্র ক্ষুত্র নৈমিত্তিক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাগত হও। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে সকল কর্ম্ম জ্ঞান যোগ বর্ণাশ্রমাদির কথা বলিয়াছি, তাহা সমস্ত ত্যাগ করিয়া একমাত্র ভগবৎপ্রপত্তিরূপ কেবলা ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলে যদি কিছু প্রত্যবায় হয়, তবে তাহা হইলে আমিই রক্ষা করিব। তোমার সে জন্য শোক করিবার কারণ নাই।"

এইরূপে শ্রীগীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, বেদান্ত, উপনিষদাবলী শব্দ-প্রমাণসমূহকে যদি কেহ সারগ্রাহী হইয়া বিচার করেন, তবে দেখিতে পাইবেন—ভগবদ্ভক্তিকেই চরম সিদ্ধান্তে স্থাপনা করা হইয়াছে। যাঁহারা শব্দ-প্রমাণের এইরূপ সুসিদ্ধান্তকেও মতবাদ মনে করেন, তাঁহারা দৈবীমায়ায় মোহিত হইয়া নিজেরাই মতবাদী হইয়া পড়িয়াছেন। বৈদিক মীমাংসা শাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত। একই মীমাংসা শাস্ত্রে পূর্ব্বমীমাংসা নাম দিয়া জৈমিনী "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" সূত্রের অবতারণা পূর্ব্বক যে অভ্যুদয়কেই ধর্ম্মসিদ্ধান্ত বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন, উত্তর মীমাংসায় বেদব্যাস উহাকেই পূর্ব্বপক্ষ করিয়া "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" সূত্রের অবতারণা দ্বারা পরমেশ্বর ভজনরূপ নিঃশ্রেয়সই সিদ্ধান্ত বলিয়া সংস্থাপিত করিয়াছেন এবং সর্ব্বশেষে "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" সূত্রের দ্বারা নিঃশ্রেয়সলব্ধ ব্যক্তির পুনরাবৃত্তি হয় না, তাহা শব্দ-প্রমাণের দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন। তৎসঙ্গে যাবতীয় মতবাদও খণ্ডিত হইয়াছে। অতএব সনাতন ধর্ম্ম সৎসিদ্ধান্তে বা সত্যবিচারে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই জন্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু সিদ্ধান্ত বা বিচারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে চরিতামৃতে আদি ২য় পরিচ্ছেদ-শেষে বলিয়াছেন ঃ—

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস।।

অন্যত্র বলিয়াছেন—

"চৈতন্য চন্দ্রের কৃপা করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার।।"

অতএব অন্ধবিশ্বাসকেই যাহারা বহুমানন করেন, তাহারা প্রাকৃত-সহজিয়া বা বেষোপজীবীর দল বৃদ্ধি করিয়া নরকে যাইবার রাস্তা পরিষ্কার করে মাত্র। আবার কেহ কেহ মনোধর্ম্মের বশীভূত হইয়া জড়সমন্বয়বাদী বা ভারবাহী সাম্প্রদায়িক হইয়া বাস্তব সত্য হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়েন। ভার্গবীয় মনুসংহিতার শেষে ভৃগু ঋষিগণকে বলিয়াছেন,—

"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্ত র্কেণানুসন্ধেত সধর্ম্মং বেদ নেতরঃ।।"

যিনি বেদ ও বেদমূলক স্মৃত্যাদি ধর্ম্মোপদেশ বেদশাস্ত্রে অবিরোধী তর্কের দ্বারা অনুসন্ধান করেন, তিনিই ধর্ম্মকে জানেন।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"মধ্যস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ।"

'সাধু শাস্ত্র গুরুবাক্য, হৃদয়ে করিয়া ঐক্য
আর না করিহ মনে আশা।'

আমরা অনেক সময় মনে করিয়া থাকি, সামাজিক আভিজাত্যসম্পন্ন ব্যক্তি বা বহু বহু ব্যক্তি একবাক্যে যাহা বলেন, সেইটী একমাত্র সিদ্ধান্ত। কিন্তু আমরা বিচার করিতে ভুলিয়া যাই যে, ঐ সকল ব্যক্তি জগতের নিকট লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইলেও পরমার্থরাজ্যে তাহাদের কোনই স্থান নাই। এই জন্য ভৃগু বলিয়াছেন, যে দেশের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ বেদবিৎ দ্বিজোত্তম একজন যাহা ধর্ম্ম বলিযা নির্ণয় করিবেন তাহাই সিদ্ধান্ত, পরন্তু লক্ষ লক্ষ মনোধর্ম্মীর কথা গ্রাহ্য হইবে না।

অব্রতাণামমন্ত্রাণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাম্।
সহস্রশঃ সমেতানাং পরিষত্ত্বং ন বিদ্যতে।।

কুল্লূকভট্ট টীকায় লিখিয়াছেন—"সাবিত্র্যাদি-ব্রতরহিতানাং মন্ত্রবেদাধ্যয়ন-রহিতানাং ব্রাহ্মণজাতি-মাত্রধারিণাং বহুনামপি সহস্রাণাং মিলিতানাং পরিষত্ত্বং নাস্তি ধর্ম্মনির্ণয়ঃ সামর্থ্যাভাবাৎ" অর্থাৎ যাহাদের গুরুসেবা ব্রহ্মচর্য্য ভগবদ্ভক্তি প্রভৃতি সাবিত্র্য সংস্কার ধারণের ব্রত নাই, যাহাদের বেদাধ্যয়ন নাই, যাহারা কেবল জাতিমাত্র ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত, এই রূপ সহস্র সহস্র লোকও যদি একত্রে মিলিত হইয়া পরিষৎ অর্থাৎ সভা করিয়া কোনও বিষয়ের সিদ্ধান্ত করে তাহা হইলেও তাহাদের সিদ্ধান্ত সৎসিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না; কারণ তাহাদের ধর্ম্মনির্ণয়ের সামর্থই নাই, তাহারা কি প্রকারে সিদ্ধান্ত করিবে? অতএব গড্ডা ৷কা প্রবাহের ন্যায় বহুলোক একদিকে চলিতেছে দেখিয়া অন্ধ-পরম্পরা ন্যায় অবলম্বনে সৎসিদ্ধান্ত হইতে দূরে থাকা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। শাস্ত্রসিদ্ধান্ত, ধর্ম্মসিদ্ধান্ত একমাত্র সততযুক্ত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক ভগবদ্ভজনশীল হরিজনের হৃদয়েই প্রকাশিত হয়, অপরের সিদ্ধান্ত মনোধর্ম্ম মাত্র। এইজন্যই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলিয়াছেন,—

চৈতন্য নিত্যানন্দের কৃপা যবে তোমাতে হইবে।
এ সকল সিদ্ধান্ত তবে তোমাতে স্ফুরিবে।।

দুর্গা

দুর্গা শব্দের অর্থ বহু প্রকার দৃষ্ট হয়। দ + উ + র + গ্ + আ = দুর্গা। দৈত্যনাশার্থ বাচক বলিয়া 'দ'কার, বিঘ্ননাশার্থে 'উ'কার, রোগঘ্ন বাচক 'রেফ্', পাপঘ্ন বাচক 'গ'কার, ভয়শত্রুবিনাশবাচক 'আ'কারের প্রয়োগ। আবার অন্যত্র— "দুর্গং নাশয়তি যা নিত্যং সা দুর্গা পরিকীর্ত্তিতা। বিপত্তিবাচকো দুর্গাশ্চাকারো নাশবাচকঃ।" পুনরায় চণ্ডীতে দেবস্তুতি,—দুর্গাসি দুর্গভবসাগর নৌরসঙ্গা।।" —অর্থাৎ তোমার নাম দুর্গা, কারণ তুমি দুর্গন ভবসাগরে অদ্বিতীয় নৌকাস্বরূপা। পুনরায়—'দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ'—দুর্গ অর্থাৎ সঙ্কট হইতে যিনি ত্রাণ করেন। পুনরায় চণ্ডীতে দেবীবাক্য—

তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরং।
দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি।।

'দুর্গ' নামক অসুরকে বধ করিব বলিয়া আমি 'দুর্গা' নামে বিখ্যাত হইব।

আবার অন্যত্র দেখা যায় 'দুর্গ' শব্দের অর্থ কারাগৃহ বা জীবের সংশোধনক্ষেত্র—চৌদ্দ ভুবনাত্মক দেবীধাম। তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী দুর্গা নামে অভিহিতা। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী পাঠে জানা যায় যে, দেবতাবৃন্দের স্থানচ্যুতি বিজ্ঞাপিত হইলে মধুসূদন ও শম্ভু কুপিত হইলেন; তখন তাঁহাদের বদন হইতে একটী মহৎ তেজঃ নির্গত হইল, অন্যান্য দেবতাগণের শরীরের তেজঃপুঞ্জ একত্রে মিলিত হইয়া সিংহবাহিনী দশভুজা দুর্গা আবির্ভূতা হইলেন। বিষ্ণুর তেজে দেবীর বাহুযুগল এবং শম্ভুর বদননিঃসৃত তেজে দেবীর মুখমণ্ডল হইল। সেই দুর্গাদেবী দেবী-ধামে (চৌদ্দভুবনাত্মক জড়জগতে) দশকর্ম্মরূপ দশভুজা। ধীরপ্রতাপে অবস্থিতিরূপ সিংহবাহিনী। পাপ দমনরূপ মহিষাসুরমর্দ্দিনী। শোভা ও সিদ্ধিরূপ কার্ত্তিক ও পুত্রযুগলসমন্বিতা গণেশ জননী। জড়ৈশ্বর্য্য ও জড়বিদ্যা সঙ্গিনীরূপ লক্ষ্মী ও সরস্বতী সহ বিরাজিতা। পাপনিবারণে বিংশতি ধর্ম্ম-শাস্ত্ররূপ বিংশতি অস্ত্রধারিণী।

সিদ্ধান্তগ্রন্থ শ্রীব্রহ্মসংহিতায় ব্রহ্মা দুর্গাদেবীর স্বরূপ বিচারে বলেন ঃ—

"সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।"

ভগবানের স্বরূপশক্তি একটীই। তাহাকেই উপনিষদে পরাশক্তি বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সেই স্বরূপশক্তির ছায়াস্বরূপ প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয়সাধিকা মায়া শক্তিই ভুবনরক্ষয়িত্রী দুর্গা। সেই দুর্গাদেবী যে আদিপুরুষ গোবিন্দের ইচ্ছাবিধায়িনী, সেই মূলপুরষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

স্বারোচিষ মন্বন্তরে চৈত্রবংশসমুদ্ভূত রাজ্যভ্রষ্ট সুরথ রাজা ও স্বজনপরিত্যক্ত সমাধিনামক বৈশ্যের সময় হইতে ইঁহার পূজার প্রথা ধরাধামে প্রচলিত হইয়াছে। রাজা দেবীর আরাধনায় পুনরায় রাজ্য ফিরিয়া পাইলেন এবং দেবী নির্ব্বিঘ্নচিত্ত বৈশ্যকে জ্ঞান লাভ হইবে বলিয়া বর প্রদান করিলেন। সৌরাশ্বিন মাসে অকালে রামচন্দ্র রাবণবধার্থে ব্রহ্মা দ্বারা দেবীর বোধন করাইয়া দুর্গাদেবীর পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া যে পূজার

প্রথা জগতে প্রচলিত আছে, তাহা মহর্ষি বাল্মিকী কৃত মূল রামায়ণের কোনও স্থানেই পাওয়া যায় না। কথকতা শুনিয়া কবি কৃত্তিবাস যে বাঙ্গলা পয়ার ছন্দে রামায়ণ রচনা করিয়াছেন তাহাতেই ঐ বিষয় দৃষ্ট হয়। কৃত্তিবাসের স্থান বাঙ্গলা সাহিত্যিক জগতে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও তাঁহার পুরাণ কল্পিত সিদ্ধান্ত দেখিয়া সারগ্রাহিগণ পরমার্থ জগতে তাঁহাকে উচ্চস্থান দিতে পারেন না। তিনি তাঁহার রামায়ণে বিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্রকে প্রাকৃত জীবের ন্যায় সাজাইয়াছেন। ব্রহ্মরুদ্রাদি-দেবসেবিত বিষ্ণু, বিষ্ণুমায়া তাঁহার আজ্ঞা-বাহিকা। দ্বিতীয়তঃ জড়মায়া স্বরূপশক্তির ছায়া, তাহার কার্য্য প্রাকৃত বিমুখ জীবের উপর সম্ভব। অপ্রাকৃত চিন্ময়ধামে ভগবল্লীলার পোষকতাকল্পে যোগমায়ারই কার্য্য। তটস্থাশক্তিপ্রসূত অণুচিৎ বিভিন্নাংশ জীবগণ অনাদিবহির্ম্মুখতা প্রযুক্ত স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ফলে যে প্রাপঞ্চিক জগতে পতিত কারারুদ্ধ হ'ন, তাহাই দেবীধাম বা দুর্গাদেবীর দুর্গ। পতিত অপরাধী জীবকে কারারক্ষয়িত্রী দুর্গাদেবী কয়েদীর পোষাকের ন্যায় দুইটী আবরণে আবৃত করিয়া থাকেন। একটী মন-বুদ্ধি- অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মশরীর, লিঙ্গদেহ বা বাসনাময় কোষ, অপরটী বাসনাময় দেহের সহায়কস্বরূপ পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ। এই দুইটী পোষাকে পরিহিত হইলে জীবের শুদ্ধ চিন্ময়স্বরূপ সুপ্ত হইয়া পড়ে। তখন চিদাভাস মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক লিঙ্গদেহে নানাপ্রকার অভিমান উপস্থিত হয়। কখনও মনুষ্য কখনও পশুপক্ষী প্রভৃতি বলিয়া অভিমান, কখনও পুরুষ, নারী, রাজা, প্রজা, পিতা, পুত্র, সুখী, দুঃখী, এইরূপ নানাপ্রকার অভিমান উপস্থিত হইয়া থাকে। এইরূপে বিরূপ-জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া মায়াভিনিবিষ্ট জীব নিজকে শোকে মোহে আচ্ছন্ন এবং অভাবগ্রস্ত মনে করে। তখনই ঐ কারাকর্ত্রীর নিকট ধন, জন, পুত্র, পৌত্র, রূপবতী ভার্য্যা, যুদ্ধে জয়লাভ ইত্যাদি কামনা করিয়া থাকে। কখনও সুখ-দুঃখ বোধের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অচিৎ হইয়া যাইতে চায়, কখনও বা জড়ীয় সুখ-দুঃখকে অকিঞ্চিৎকর-জ্ঞানে জড়-ব্যতিরেক সুখলাভের আশায় ভগবানের আসন নিতে অগ্রসর হয়। দুর্গাদেবীও তাহাদিগের কামনা অনুযায়ী ধনজনাদি প্রদান করিয়া কর্ম্মচক্রে নিক্ষেপ করেন, কখনও বা তাহাদের আত্মবিনাশরূপ ভগবদ্বৈমুখ্যের দণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা সুকৃতিবান, তাঁহারা ঐ সকল ভুক্তিমুক্তিস্পৃহাকে মহামায়ার কপট কৃপা জানিয়া বিষ্ণুমায়ার সৎস্বরূপের আশ্রয় গ্রহণ করেন, লিঙ্গ এবং স্থূলদেহের বন্ধন হইতে উন্মুক্ত হইয়া নিত্য ভাগবতী তনুলাভ করেন ও স্বরূপদেহে চিচ্ছক্তি হ্লাদিনীর সেবার পোষকতা করিয়া থাকেন।

স্বরূপশক্তির ছায়াস্বরূপা, দুর্গার কার্য্যই বিমুখ-মোহন। সুতরাং কর্ম্মফলভোগী ও কর্ম্মফলত্যাগী বহির্ম্মুখ-জনগণ কর্ত্তৃক জগতে যে দুর্গাদেবীর আবাহন হয়, তাহা ভগবানের চিন্ময় ধামে বিরাজিতা চিন্ময়ী কৃষ্ণদাসী যোগমায়া দুর্গার ছায়া মাত্র। ভগবানের পীঠাবরণ পূজায় যে দুর্গা গণেশ প্রভৃতি দেবতা আছেন, তাঁহারা নিত্য বৈকুণ্ঠ-সেবক। তাঁহারা ভগবানের স্বরূপভূতশক্তি, কিন্তু জড়জগতে পূজিত দুর্গা-গণেশাদি দেবতা মায়াশক্ত্যাত্মক। ভগবানের নিত্য বৈকুণ্ঠ-সেবিকা যোগমায়াই ভগবৎ-সেবা-প্রার্থিনী ব্রজরাজকুমারীগণ কর্ত্তৃক পূজিতা। সেই পূজায় কেবল ভগবৎপ্রীতি-কামনা। নিজের ফলভোগ বা ফলত্যাগ কামনা নাই। যে সকল অতাত্ত্বিক অসারগ্রাহী ব্যক্তি ব্রজকুমারীগণের কাত্যায়নী-অর্চ্চন ব্রতের দোহাই দিয়া নিজ নিজ

ভুক্তি-মুক্তি-কামনামূলক ছায়াশক্তির কল্পিত মূর্ত্তির পূজাকে সমর্থন করিতে প্রয়াসী, তাঁহারা কাত্যায়নীর চরণে ব্রজকুমারীগণের চরণে এবং শ্রীভগবানের চরণে অপরাধ করিয়া থাকেন। ব্রজকুমারীগণ কি প্রাকৃত বদ্ধ জীব? তাঁহারা কি প্রাকৃত জড়দেশবাসী? তাঁহাদের দেহ কি জড় দেহ? তাঁহাদের কামনা কি বদ্ধজীবের কামনার তুল্য? কিছুতেই নহে। তাঁহারা ভগবানের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর কায়ব্যূহ, তাঁহাদের ধাম চিন্ময়, দেহ চিন্ময়, কৃষ্ণপ্রীতি কামনাই তাঁহাদের কামনা। তাঁহাদের প্রেমের আদর্শ এইরূপ।

লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ—আত্মসুখ-মর্ম্ম।।
দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ, নিজ পরিজন।
স্বজন করয়ে যত তাড়ন ভৎর্সন।।
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেম সেবন।।
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ।।
আত্মসুখদুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে সব ব্যবহার।।
নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে।।

(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ)

যাঁহারা এইরূপ সেবকের আদর্শ, তাঁহারা ভগবানের সেবা-প্রাপ্তির জন্য কি না করিতে পারেন? এই জড় জগৎ চিজ্জগতের হেয় প্রতিফলন। চিদ্বিলাসের নানা বৈচিত্র্যের ছায়া এই জড়জগতেও বর্ত্তমান। সুতরাং অপ্রাকৃত চিদ্ধামের প্রেমচেষ্টার সহিত প্রাকৃত জগতের কামচেষ্টা এক হইতে পারে না। ইহ জগতে দেখা যায়, প্রণয়িনী প্রেমিকের জন্য, পত্নী স্বামিসেবা লাভের জন্য ছায়াশক্তি মহামায়ার আরাধনা করে, তদ্দ্বারা পত্নী বা প্রণয়িনীর স্বামী ও প্রেমিকের প্রতি ভালবাসাই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ইহ জড়জগৎ হেয়তা ও অবরতাপূর্ণ; এখানে বদ্ধজীবের যত চেষ্টা কেবল নিজভোগমূলা। অপ্রাকৃত জগতে সেরূপ হেয়তা বা অবরতা নাই। সেখানে সকলেরই স্বরূপে অবস্থান, সুতরাং সকলেই একমাত্র ভগবৎপ্রীতিই আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব স্বরূপশক্তির কায়ব্যূহ ব্রজকুমারীগণের কৃষ্ণপ্রীতির চরম উৎকর্ষেরই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। দেহাভিমানী জীব কি ভাবের ঘরে চুরি না করিয়া বলিতে পারেন যে, তাহাদের দুর্গা আরাধনা সেইরূপ? ছায়াশক্তির কার্য্যই বিমুখমোহন। সুতরাং তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেও তিনি ভগবৎপ্রেম দান করিতে পারেন না। যাহার কাছে ধন নাই তাহার নিকট ধন ভিক্ষা চাহিলে প্রত্যাখ্যাত হইতে হয়। অতএব জগতের

দুর্গা-আরাধনা ছায়াশক্তির আরাধনা মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২১ অধ্যায়ে—"কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি। নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ।।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর দেখাইয়াছেন—ইয়ং তাভিরুপাসিতা চিচ্ছক্তি বৃত্তিঃ স্বরূপভূতা যোগমায়ৈব নতু বহিরঙ্গা মায়া। অতঃ "সর্ব্বেষু কৃষ্ণমন্ত্রেষু দুর্গাধিষ্ঠাতৃ দেবতা" ইত্যাগমে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা চিচ্ছক্তিবৃত্তিঃ কৃষ্ণা ভগিন্যেকাংশাভিধানা যোগনায়ৈব মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী। সৈব খল্বাভি রুপাসিতা দুর্গা-মহামায়েত্যাদি-নামাদিসাম্যেন লোকানাং ভ্রমো ভবতীতি।" অর্থাৎ কুমারীগণ যে কাত্যায়নীর আরাধনা করিয়াছিলেন তাহা স্বরূপাংশভূতা যোগমায়া, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি নহে। 'সর্ব্ব কৃষ্ণমন্ত্রে দুর্গাই অধিষ্ঠাতৃদেবতা' এই যে আগমবাক্য, ইহা দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা ভগবানের চিচ্ছক্তিবৃত্তি স্বরূপাংশ-শক্তি যোগমায়াই মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃ দেবতা বুঝিতে হইবে। তিনিই ব্রজকুমারীগণ কর্ত্তৃক উপাসিতা। মহামায়া ইত্যাদি নামসাম্যে ভারবাহী লোকগণের ভ্রম হইয়া থাকে। তোষিণীতে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বলেন,—"কাত্যায়নী পরমবৈষ্ণবী শ্রীশিবপ্রিয়া পার্ব্বতী" ব্রহ্মসংহিতা ৩য় শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন যে, শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষায় যে গৌতমীয় কল্পবচন—যঃ 'কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাদ্ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ।' তাহা কৃষ্ণ-স্বরূপশক্তির কথা বলা হইয়াছে। তাহা মায়াংশভূতা দেবীধামের দুর্গা নহে; কারণ, গৌতমীয় কল্পেই লিখিত আছে—বহিরঙ্গা দুর্গার আরাধনা বহুপ্রয়াসে সাধিত হয় কিন্তু স্বরূপশক্তির আরাধনায় প্রয়াস নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।১।২৫ শ্লোকে শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিলেন,—

"বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সম্মোহিতং জগৎ।
আদিষ্টা প্রভুণাংশেন কার্য্যার্থং সম্ভবিষ্যতি।।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর টীকায় লিখিয়াছেন—বিমুখমোহনং মায়য়া, উন্মুখমোহনং যোগমায়য়েতি ব্যবস্থিতিঃ। দেবকীকন্যারূপেণ কংসবঞ্চনং তন্মায়ায়া এব কার্য্যং, ন তু যোগমায়ায়াস্তাদৃশদুষ্টলোকেষু তস্যা অনুপযোগাদেব। ধৃষ্ট-যাদবমোহনং মায়ৈব, নতু যোগমায়য়া। দেবকীসপ্তমগর্ভাকর্ষণ-যশোদাস্বাপনাদি তদ্ধি যোগমায়য়া এব কার্য্যং, নতু মায়ায়াঃ। তাদৃশ-সিদ্ধভক্তেষু মায়ায়াঃ প্রভবিতুমশক্যত্বাচ্চ। যত্তু বাৎসল্যাদি মহাপ্রেমবতাং শ্রীযশোদাদীনং বিশ্বরূপ-বরুণলোকাদি দর্শনান্তে বাৎসল্যাদি-ভাবাধিক্যত্বৈনৈশ্বর্য্যজ্ঞানেঽপ্য-সম্ভ্রমাদেরৈশ্বর্য্যানুসন্ধানলক্ষণং মোহনং তৎ ন যোগমায়য়া, নাপি মায়য়া, কিন্তু প্রেম্ন এব স স্বভাবঃ।" অর্থাৎ বিমুখ মোহন মায়ার কার্য্য,—যেমন দেবকী কন্যারূপে কংস-বঞ্চন বা ধৃষ্ট যাদব মোহন। এতাদৃশ দুষ্ট লোককে যোগমায়া স্পর্শ করেন না। দেবকীর সপ্তম গর্ভাকর্ষণপূর্ব্বক রোহিণীর গর্ভে স্থাপন, গোকুলে নন্দপত্নীর যশোদাকে জড় নিদ্রাভিভূতা করা যোগমায়ার কার্য্য, কারণ তাদৃশ সিদ্ধভক্তে জড়মায়ার প্রভাব ক্রিয়া করিতে পারে না। অতএব উন্মুখমোহন যোগমায়ার কার্য্য। আর চিন্ময় ধামের বাৎসল্যাদি রসের পরম রসিকগণের (যথা নন্দ-যশোদার) বরুণলোক বা বিশ্বরূপ প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য দর্শনান্তেও বাৎসল্যাদি ভাবাধিক্যপ্রযুক্ত যে সম্ভ্রমজ্ঞান আচ্ছাদিত হইতে দেখা গিয়াছে, তাহা যোগমায়া বা জড়া মায়া কর্ত্তৃক মোহন-ক্রিয়া নহে; উহা প্রেমেরই স্বভাব বা রসপুষ্টির জন্য ভগবানের নিরঙ্কুশ ইচ্ছা। নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতি-বিদ্যা-

সংবাদে দৃষ্ট হয়— "জানাত্যেকা পরা কান্তং সৈব দুর্গা তদাত্মিকা।
যৎপরা পরমা শক্তির্মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী।।
যস্যা বিজ্ঞানমাত্রেণ পরাণাং পরমাত্মনঃ।
মুহূর্ত্তাদ্দেবদেবস্য প্রাপ্তির্ভবতি নান্যথা।।
একেয়ং প্রেমসর্ব্বস্বস্বভাবা-গোকুলেশ্বরী।
অনয়া সুলভো জ্ঞেয় আদিদেবোঽখিলেশ্বরঃ।।
অস্যা আবরিকা শক্তির্মহামায়াখিলেশ্বরী।
যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বে দেহাভিমানিনঃ।।"

সেই পরম পুরুষ ভগবানের একটীই পরা শক্তি আছে, তাহাই স্বরূপাত্মিকা দুর্গা। এই মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী পরাশক্তির বিজ্ঞানমাত্রেই পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইনি প্রেমসর্ব্বস্ব-স্বভাবা হ্লাদিনী শক্তি। ইঁহার আশ্রয়ে আদিদেব অখিলেশ্বর সহজে জ্ঞাত হওয়া যায়। কিন্তু মহামায়া নামে একটী আবরিকা শক্তি ইঁহার আছে, তাহা দ্বারা নিখিল জগৎ ও সমস্ত দেহাভিমানিগণ মুগ্ধ হইতেছে। সুতরাং দেহাভিমানী কর্ম্মিগণ ও যাহারা দেহে বদ্ধ মনে করিয়া মুক্তিকামী, উভয়ে প্রাকৃত সম্বন্ধযুক্ত থাকায় তাহাদের দ্বারা পরাশক্তির আবরিকা ছায়াস্বরূপা দুর্গারই আরাধনা হইয়া থাকে। রাবণ যে প্রকার মায়া সীতা হরণ করিয়া চিন্ময়ী বিষ্ণুশক্তি সীতাদেবীকে হরণ করিয়াছি মনে করিয়াছিল, তদ্রূপ জগতের বদ্ধজীব সকল ছায়াশক্তির আরাধনা করিয়া প্রকৃত দুর্গার আরাধনা করিয়াছি মনে করিলেও, তাহা দ্বারা প্রেমফল লাভ করে না? —অধিকন্তু মহামায়ার দ্বারা আরও মোহিত হয়। মহামায়া এইরূপ জীবকে মোহিত করিয়া ব্যতিরেক ভাবে ভগবানের সেবাকার্য্যে নিযুক্তা। যে সকল বহির্ম্মুখ অপরাধী জীব সর্ব্বকারণ পরম ঈশ্বর সচ্চিদানন্দবিগ্রহ গোবিন্দের সেবাবিমুখ, যাহারা গোবিন্দভজনপরায়ণ সাধু, সদ্গুরু বা সৎশাস্ত্রে আস্থাবান্ নহেন, সেই সকল পাষণ্ড জীবকে মহামায়া সংসার-দুর্গের কর্ম্মচক্রে পেষণ করিতে করিতে ভগবদুন্মুখ করিবার প্রয়াস পান। সুতরাং মহামায়ার ঐ চেষ্টা সাক্ষাৎ উন্মুখ করিবার চেষ্টা নহে, ব্যতিরেক চেষ্টা মাত্র। সেই জন্য মহামায়া ভগবানের দৃষ্টিপথে থাকিতে লজ্জা বোধ করেন। তাই শ্রীমদ্ভাগবত (২।৫।১০) বলিতেছেন ঃ—

"বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ।।"

তত্ত্বসন্দর্ভে শ্রীজীবপাদ—'অত্র বিলজ্জমানয়া ইত্যনেনেদমায়াতি, তস্যা জীবমোহনং কর্ম্ম শ্রীভগবতে ন রোচতে ইতি যদ্যপি সা স্বয়ং জানাতি, তথাপি—"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য" ইতি দিশা জীবানামনাদিভগবদ জ্ঞানময়বৈমুখ্যমসহমানা স্বরূপাবরণমস্বরূপাবেশঞ্চ করোতি।

বিদ্যাভূষণকৃত টীকায়াং—'অসহমানেতি দাস্যা উচিতমেতৎ কর্ম্ম, যৎ স্বামিবিমুখান্ দুঃখান করোতীতি। ঈশবৈমুখ্যেন পিহিতং জীবং মায়া পিধত্তে, ঘটেনাবৃতং দীপং যথা তম আবৃণোতি।'

অর্থাৎ যে মায়া ভগবানের দৃষ্টিপথে থাকিতে লজ্জা বোধ করেন, দুর্বুদ্ধি জীব সেই মায়া কর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া আমি আমার এইরূপ শ্লাঘা করে। এখানে বিলজ্জমানা এই শব্দের দ্বারা এইরূপ বোধ হয় যে, মায়ার জীব-সম্মোহন কার্য্য ভগবানের রুচিকর নহে; (কারণ, ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্বদাই জীবগণকে সাধুগণের দ্বারা সাক্ষাৎ সেবাদানে আকর্ষণ করিয়া আনন্দ প্রদান করিতে ইচ্ছুক, ইহা যদিও মায়া অবগত আছে, তথাপি জীব সেই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ফলে ভগবানের সেবা পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হইয়া নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হয়, তখন মায়া জীবের এই অনাদি-বহির্ম্মুখতা সহ্য করিতে না পারিয়া জীবকে কপট কৃপা করেন অর্থাৎ জীবের স্বরূপের আবরণ ও অস্বরূপের আবেশ করিয়া থাকে। প্রজ্জ্বলিত দীপকে কোনও পাত্রের দ্বারা ঢাকিয়া দিলে যেমন অন্ধকার আবার দ্বিতীয় আবরণস্বরূপ হয়, তদ্রূপ ভগবদ্বহির্ম্মুখতায় স্বাবৃত জীবকে আমি আমার বুদ্ধি স্ত্রী পুত্রাদি ধন জন প্রদান করিয়া আরও অস্বরূপের আবেশে বিপন্ন করিয়া থাকে। এই জন্য মায়া লজ্জিত হইয়া ভগবানের দৃষ্টিপথে আসিতে পারে না। কিন্তু ইহা দ্বারা মায়া কর্ত্তৃক ভগবানের প্রতি ব্যতিরেক সেবা হইয়া যাইতেছে। সুতরাং এই দুর্গাধিষ্ঠাত্রী যে দুর্গাদেবী, ভগবানের দৃষ্টিপথে যাইতে লজ্জা পায় তাহার আরাধনাদ্বারা পরমপুরুষার্থ ভগবৎপ্রেমলাভ হয় না, ধর্ম্ম-অর্থাদি অপবর্গদ্বারা মোহিত হওয়া যায়।

"শ্রীভগবাংশ্চানাদিত এব ভক্তায়াং প্রাপঞ্চিকাধিকারিণ্যাং তস্যাং দাক্ষিণ্যং লঙ্ঘিতুং ন শক্নোতি। তথা তদ্ভয়েনাপি জীবানাং স্বসাম্মুখ্যং বাঞ্ছয়ন্নুপদিশতি—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে।।" (গীতা ৭।১৪)

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসম্বিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।।" (ভাঃ ৩।২৫।২৬)

তত্ত্বসন্দর্ভঃ ৩৩ সংখ্যা।।

অর্থাৎ ভগবান্ মায়ার কার্য্যে কোনও হস্তক্ষেপ করেন না। কিন্তু পরম কারুণিক ভগবান্ জীবগণকে মায়ার কবলে পেষিত হইতে দেখিয়া মায়ার আশ্রয় করিলে তাহাদের ভয় অপগত হইবে না, ইহা জানিয়া তিনি জীবগণকে আপনার সম্মুখীন করিবার জন্য শাস্ত্ররূপে উপদেশ দিয়া থাকেন—"আমার এই ত্রিগুণময়ী দেবী মায়া দুষ্পারা, কেবল যাহারা একমাত্র আমারই আশ্রয় গ্রহণ করেন তাহারাই ঐ মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার পায়।" "সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গে সাধুমুখগলিত, মায়াবিনাশ করিতে শক্তিশালী হৃদয় ও কর্ণ পরিতৃপ্তিকারী আমার কথা সেবা করিতে করিতে শ্রবণ করিলে শীঘ্রই আমার সেবায় শ্রদ্ধারতি ও ভক্তির ক্রমশ উদয় হইয়া তাকে।

অতএব যাহারা সাধু ও সাধুগুরুর আশ্রয়ে একমাত্র সর্ব্বেশ্বর ভগবানে শরণাপন্ন হন, তাহারাই চরম মঙ্গল লাভ করিয়া কৃতকতার্থ হন।

সমন্বয়

আজকাল অনেকেই সমন্বয়বাদের পক্ষপাতী। কিন্তু প্রকৃত সমন্বয় যে কি, সে বিষয়ে অনেকেই অনভিজ্ঞ। নিজ নিজ মনোধর্ম্ম, উচ্ছৃঙ্খলতা, যথেচ্ছাচার প্রভৃতি অবাধে চালাইবার পক্ষে ইহা একটী সুগম পন্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সমন্বয়বাদী বলিয়া থাকেন যে, এক একটী মত এক একটী পথ মাত্র, কিন্তু গন্তব্যস্থান সকলেরই এক। সুতরাং যে কোনও ব্যক্তি তাহার যে কিছু মনোধর্ম্ম তাহাকেই একটী মত বলিয়া চালাইতে পারেন। ইহারা বলিয়া থাকেন যে ব্যভিচারসঙ্কুল ধর্ম্মপথ লইয়াও যদি কেহ একনিষ্ঠা ক্রমে গন্তব্যপথে অগ্রসর হয় তিনিও সেই একই স্থানে পৌঁছিবেন। তাহার উদাহরণ যেমন রাজবাড়ীর বহুদ্বার আছে, যে কোনও দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলেই রাজার দর্শন পাওয়া যায়। আবার যদি কেহ কুপথ দিয়াও যাইতে চেষ্টা করে সেও রাজদর্শন পায়। এই সকল ছেলে ভুলান কথা শুনিয়া মনোধর্ম্মশীল জগতের অনেকেই মুগ্ধ হয় কিন্তু সারগ্রাহী তত্ত্ববিদ্গণ সৎসিদ্ধান্তকেই সর্ব্বদা আদর করিয়া থাকেন। শ্রীগীতোপনিষদ, উত্তরমীমাংসা ও ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে যে অপূর্ব্ব সমন্বয় দৃষ্ট হয়, সারগ্রাহিগণ তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকেন। সিদ্ধান্তসার শ্রীগীতোপনিষদের উপক্রম অর্থাৎ আরম্ভে শরণাগতি বা ভগবানে আত্মসমর্পণ মধ্যে পুনঃ পুনঃ ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব সংস্থাপন এবং সর্ব্বশেষে শ্রীভগবানের নিজমুখে প্রিয়তম অর্জ্জুনের প্রতি গুহ্যতম উপদেশে ঐকান্তিক শরণাগতি বা ভগবদ্ভক্তির শিক্ষাই পাওয়া যায়। অতএব ভগবদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তই সিদ্ধান্তসার শ্রীগীতার সিদ্ধান্ত। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদির অবতারণা পূর্ব্বপক্ষ মাত্র। ভক্তি-উদ্দেশক হইলেই উহাদের সার্থকতা নতুবা বন্ধনের কারণ, ইহাও গীতাতে পুনঃ পুনঃ আলোচিত হইয়াছে। ভগবানই একমাত্র স্বতন্ত্র পুরুষ—অন্যান্য দেবতাগণ তাঁহারই অধীন-তত্ত্ব; অন্যান্য দেবযাজীর ফল গীতার ভাষায় 'অন্তবৎ' অর্থাৎ নশ্বর। সুতরাং ভগবদারাধনাই মায়া উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র পন্থা। একমাত্র তাঁহার ভক্তেরই বিনাশ নাই। ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১ম দ্বিতীয় পাদেও সমস্ত মনোধর্ম্মযুক্ত দার্শনিক মত সমূহ নিরসন করিয়া অবিচিন্ত্য শক্তিমান ব্রহ্মেরই প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্রে ব্রহ্মের লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। সূত্রের সহজার্থ ছাড়িয়া গৌণার্থ করিয়া শঙ্করাচার্য্য যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধ মোহনের জন্য আচার্য্যের কৈতব মাত্র। তাই 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এই সূত্র ধরিয়া যে অকৃত্রিম ভাষ্য প্রোজ্ঝিত-কৈতব শ্রীমদ্ভাগবতে আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে বেদের সর্ব্বদেশব্যাপী উপদেশসার প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেবলাদ্বৈতবাদ বা কেবলদ্বৈতবাদ বেদের একদেশী সিদ্ধান্ত মাত্র। বেদে যে অদ্বৈতপর বাক্যসমূহ আছে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে দ্বৈতপর বাক্যসমূহ দৃষ্ট হয়। সুতরাং যেখানে দ্বৈত ও অদ্বৈতপর উভয়বিধ বাক্য সেখানে দ্বৈতই প্রবল কিন্তু অদ্বৈত বাক্যও নিষ্ফল নহে। যেখানে শ্যামবর্ণ ও গৌরবর্ণ উভয়বিধ ব্রাহ্মণকুমারের উল্লেখ সেখানে জাত্যংশে উভয়েরই অদ্বৈতসিদ্ধি হইলেও দ্বৈতই প্রবল। আচার্য্য শঙ্কর কেবলাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য কেবলদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। শ্রীরামানুজ চিৎ অচিৎ এই দুই বিশিষ্ট হইয়া একমাত্র ঈশ্বরই বস্তু এই তত্ত্ব প্রচার করেন। শ্রীনিম্বাদিত্য স্বামী জীব ও ঈশ্বরে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ বাদ প্রচার করেন এবং শ্রীবিষ্ণুস্বামী

বস্তু, এক হইলেও বস্তুতঃ ব্রহ্মতা ও জীবত্বে নিত্য বৈচিত্র্য এই বিশুদ্ধদ্বৈত বাদ, প্রচার করেন। কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীগৌরসুন্দর উক্ত সর্ব্ব আচার্য্যগণের মতে যাহা কিছু পরস্পর বিবদমান-প্রতিম ছিল সেই সকলের সমন্বয় বিধান করেন। শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং ভগবান্ সুতরাং ভগবৎপ্রণীত যে ভাগবত বা সাত্ত্বত ধর্ম্ম তিনিই সম্পূর্ণ ভাবে অবগত আছেন। অতএব একমাত্র তাহার দ্বারাই সর্ব্বাঙ্গীণ দোষরহিত তাঁহারই শ্রীমুখকথিত বেদের সর্ব্বদেশব্যাপী নিত্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। তিনি নাস্তিক বৌদ্ধবাদের উচ্ছেদের ও বেদপ্রতিষ্ঠাপক শঙ্করাচার্য্যকে আচার্য্য বলিয়া স্বীকার করিলেন। শঙ্করাচার্য্য অসুর-মোহনকল্পে ভগবানের আদেশে মায়াবাদ প্রচার করিয়া ভগবানেরই আজ্ঞাপালনরূপ সেবা করিলেন এবং পরবর্ত্তী সাত্ত্বত আচার্য্যগণের প্রচারের জন্য মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া গেলেন। শ্রীগৌরসুন্দর স্বকীয় সর্ব্বজ্ঞতা প্রভাবে যে যে আচার্য্য উপদেশে যাহা যাহা অভাব আছে তাহা পূরণ করিয়া শ্রীমধ্বের সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, শ্রীরামানুজের শক্তি সিদ্ধান্ত, শ্রীবিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈত সিদ্ধান্ত ও শ্রীনিম্বাদিত্যের দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদ নামে অপূর্ব্ব সমন্বয় সিদ্ধান্ত প্রচার করিলেন। এই অচিন্ত্যভেদাভেদ মতে বেদের সর্ব্বদেশ স্বীকার করা হইয়াছে। ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে মুণ্ডক শ্রুতি বলেন—বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মে অনন্ত বিরোধী গুণসমূহ অবিরোধে যুগপৎ নিত্য বিরাজমান। ইহাই অবিচিন্ত্য অর্থাৎ সীমা বিশিষ্ট নর-যুক্তির অগম্য। অর্থাৎ একই সময়ে ব্রহ্মে অতি সুন্দররূপে বৃহত্ত্ব ও সূক্ষ্মত্ব, সবিশেষত্ব ও নির্ব্বিশেষত্ব, সরূপতা, অরূপতা, বিভূতা ও শ্রীবিগ্রহ, সার্ব্বজ্ঞ ও নরভাবত্ব, অজত্ব ও জন্মবত্তা অনন্ত বিরোধিগুণের সমাবেশ—এই অচিন্ত্য শক্তি স্বীকার না করিলে ব্রহ্মকে সসীম জীব যুক্তির অধীন করিয়া তাঁহার পরাশক্তির খর্ব্বতা করা হয়।

"পরাস্যশক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।।"

শ্বেতাশ্বতর কথিত এই শ্রুতিতে ব্রহ্মের অবিচিন্ত্যশক্তিকে পরাশক্তি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে এবং সেই শক্তির স্বাভাবিক ত্রিবিধ প্রভাব। জ্ঞান বা চিন্মাত্র উপলব্ধি ভগবচ্ছক্তির আংশিক প্রভাব মাত্র। সুতরাং শ্রীগৌরসুন্দর বেদের সমন্বয় করিয়া বলিলেন যে ভগবানে নিত্য সত্ত্বা, নিত্য চেতনতা এবং নিত্য আনন্দ বর্ত্তমান। ব্রহ্মের স্বাভাবিক শক্তি স্বীকার না করিয়া ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র বলিলে বেদের একদেশ বিচার হয় মাত্র। মহাকাশ ও ঘটাকাশ বিম্ব ও প্রতিবিম্বের দৃষ্টান্তে উপাধি পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মকেই জীব ভ্রান্তি প্রতিপাদন দ্বারা বৃহদারণ্যক শ্রুতির যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গ ব্যুচ্চরন্তি অর্থাৎ যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ কণসমূহ অগ্নিকুণ্ড হইতে ইতস্ততঃ ধাবিত হয় মুণ্ডকে "যথাগ্নেঃ পাবকাৎ' 'দ্বাসুপর্ণা সযুজা' ইত্যাদি জীবের নিত্য সত্ত্বা প্রতিপাদক বহু বহু বাক্য এবং গীতোপনিষদের "সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ" "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ" সনাতনঃ জীব অতি সূক্ষ্ম, জীব আমারই অংশ এবং নিত্য সত্ত্বাবিশিষ্ট ইত্যাদি বাক্যের অবমাননা করা হয়। সুতরাং কলিযুগপাবনাবতার শ্রীগৌরসুন্দর বেদের ও বেদানুগশাস্ত্রের সমস্ত দেশব্যাপী উপদেশের সমন্বয় করিয়া জীবে ও ব্রহ্মে গুণগত অভেদ এবং পরিমাণগত ভেদ এই নিত্য ভেদাভেদ সম্বর্দ্ধ জগতে

প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং অচিন্ত্য শব্দ দ্বারা "বেদের নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" ব্রহ্মসূত্রের "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" ইত্যাদি বাক্যের সার্থকতা প্রতিপাদন করিলেন।

তৎ ও অতৎ, চিৎ ও অচিৎ, মুড়ি ও মিশ্রিকে এক করাকে সমন্বয় করা কহে না। যে বস্তুর যেটী যোগ্য অবস্থান তাহাকে সেই সেই অবস্থানে রাখিয়া সজ্জিত করাকেই প্রকৃত সমন্বয় কহে। ছাত্রগণ যখন পদ্যকে গদ্যে অন্বয় করে, তখন সর্ব্বপ্রথমে কর্ত্তা, তৎপরে কর্ম্ম ও তৎপরে ক্রিয়াবিশেষণ ও সর্ব্বশেষে ক্রিয়ার সমাবেশ করিয়া থাকে। কর্ত্তাও যাহা, ক্রিয়াও তাহা, কর্ম্মও তাহা এইরূপ একাকার করিলে সমন্বয় হয় না। আজকালের সমন্বয় বুঝিতে একাকারই উদ্দেশ্য করে। শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া এবং মনোধর্ম্মের বশীভূত হইয়া সবই এক—যেই কালী সেই কৃষ্ণ, যেই রাম সেই শ্যাম ইত্যাদি বাক্যের খুব প্রচার হইতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু সিদ্ধান্তগ্রন্থ ব্রহ্মসংহিতা দ্বারা এই সকল তত্ত্বের যথার্থ স্থান নির্দ্দেশ করিয়া অপূর্ব্ব সমন্বয় স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীগীতাতেও সেই তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। অদ্বয়জ্ঞানে বস্তু এক হইলেও তাহাতে যে বিচিত্রতা আছে; ভূমণ্ডল একটী হইতেও তাহাতে যে বিবিধ দেশ, সমুদ্র, নদী প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ স্থান নির্দ্দেশ আছে, তাহা প্রদর্শন না করিলে প্রকৃত সমন্বয় হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃষ্ণ কি তত্ত্ব, রাম কি তত্ত্ব, নারায়ণ কি তত্ত্ব, বিষ্ণু কি তত্ত্ব, অসংখ্য অবতারাবলী কি তত্ত্ব, ব্রহ্ম পরমাত্মা কি তত্ত্ব, দেবতাবৃন্দ কি তত্ত্ব, তাহাদের যথার্থ স্থান ও অবস্থান কি কি, সমস্তই নির্দ্দেশ করিয়া অদ্বয়জ্ঞানে সকল তত্ত্বেরই যথার্থ সমন্বয় বিধান করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের সমন্বয় চিৎসমন্বয়; চিজ্জড় সমন্বয় নহে। তাঁহার মত দ্বিতীয় মহাসমন্বয়াচার্য্য জগতে এ পর্য্যন্ত আবির্ভূত হন নাই। যাহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম সারগ্রাহী হইয়া যথার্থ সাধু সন্নিধানে বিচার করিয়াছেন তাঁহারাই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অতএব আমরা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর আনুগত্যে—

"শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোপি যদনুগ্রহাৎ।
তরেন্নানামতগ্রাহব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরং।।"

নানামত বাদ রূপ কুম্ভীরাদিসঙ্কুল সিদ্ধান্তসমুদ্র যাহার অনুগ্রহে অজ্ঞ ব্যক্তিও অতি সহজে উত্তীর্ণ হয়, সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে বন্দনা করি।

গুরুকরণের আবশ্যকতা

যখন বিদেহরাজ নিমির যজ্ঞে যদৃচ্ছাক্রমে আগত ক্ষত্রিয়রাজ ঋষভতনয় নবযোগেন্দ্রাখ্য নবসংখ্যক মহামুনি (যাঁহাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণপরায়ণ ভরত হইতে ভারতবর্ষের নামকরণ হইয়াছিল, আর নয় জন ভ্রাতা নব ব্রহ্মাবর্ত্তাদি ভূখণ্ডের অধিপতি হইয়াছিলেন ও অবশিষ্ট একাশীতি সংখ্যক ভ্রাতা কর্ম্মতন্ত্র-প্রণেতা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন) ধর্ম্মজিজ্ঞাসু নিমিকে অনেক তত্ত্বোপদেশ করিয়াছিলেন। কয়েকটী প্রশ্নোত্তরের
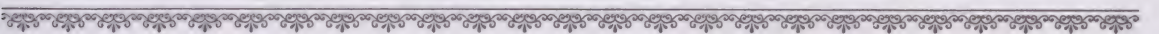
পর যখন নিমিরাজ তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, "হে মহাপুরুষগণ, আপনারা কৃপা করিয়া যে সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কারিণী ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার কথা বর্ণন করিলেন, দেহাত্মধী কর্ম্মজড়বুদ্ধি অজিতেন্দ্রিয় জীব সেই দুস্তরা ঐশ্বরী শক্তি মায়া কিরূপে উত্তীর্ণ হইবে?" তখন নবযোগেন্দ্রের (কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস ও করভাজন) অন্যতম শ্রীপ্রবুদ্ধ উত্তরে বলিলেন, যে সকল লোক দুঃখনাশ ও সুখপ্রাপ্তি নিমিত্ত সংসার সুখলোভে কর্ম্ম আরম্ভ করে তাহাদের বিপরীত ফল দেখিয়া কর্ম্মের ফল্গুত্ব আলোচনা করা উচিত। ক্লেশার্জ্জিত অর্থ নিত্য দুঃখদ; আর গৃহ, সন্তান, আপ্তজন পশুপাল প্রভৃতি অনিত্যধন ইহাদিগকে লইয়া কি প্রীতি হয়? কর্ম্মফল রূপে প্রাপ্ত পরলোকের সুখও অস্থায়ি আর বর্ত্তমানেও তুল্যের সহিত স্পর্দ্ধা, সুসমৃদ্ধের প্রতি অসূয়া ও ধ্বংসালোচনা জনিত ভয় সর্ব্বদা আমাকে ক্লেশ দিতে থাকে। সুতরাং উত্তম শ্রেয়ঃ জানিতে হইলে এই কর্ম্মমার্গ হইতে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া সদ্গুরুচরণে একান্ত প্রপন্ন হওয়া আবশ্যক। যিনি শব্দব্রহ্ম বেদে পরিনিষ্ঠিত বুদ্ধি হইয়া সকলের সংশয় নিরসন করিতে উপযুক্ত এবং পরব্রহ্ম শ্রীভগবানে অপরোক্ষানুভূতি সম্পন্ন হইয়া পরাশান্তির আশ্রয় পাইয়াছেন ও স্বীয় আদর্শদ্বারা আশ্রিত জনে বোধ-সঞ্চার করিতে উপযুক্ত তিনিই যথার্থ সদ্গুরু; অন্যে নহে। ইহার পর গুরুই আত্মা, গুরুই দেবতা এই জ্ঞানে অকপট চিত্তে তাঁহার সেবা দ্বারা যে ভাগবত ধর্ম্মপ্রভাবে উপাসকের আত্মপ্রদ পরমাত্মা শ্রীহরি তুষ্ট হন, সেই ধর্ম্ম শ্রীগুরুচরণে শিক্ষা করিতে হইবে। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ তৃতীয় অধ্যায়)। পরে তিনি এই ধর্ম্মসম্বন্ধে কয়েকটি উপদেশ দিয়া উপসংহারে বলিলেন, এই ভাগবত 'ধর্ম্ম শিক্ষা' করিতে করিতে তদুত্থ ভক্তিযোগে নারায়ণপর হইয়া শীঘ্রই দুস্তরা মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়।

এই ইতিহাস হইতে আমরা দেখিলাম গুরুকরণ একান্ত আবশ্যক। আর শ্রীকবিও পূর্ব্বেই নিমিরাজকে বলিয়াছেন "ঈশবিমুখজন মায়া কবলিত হইয়া স্ব-স্বরূপ বিস্মৃত হয় ও দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ বিপর্য্যয় আহ্বান করে, তাহার যে কিছু ভয় সকলই এই দ্বিতীয়াভিনিবেশ-জনিত। ইহা জানিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কি করিবেন? তিনি কি অজ্ঞানজনিত ভয় নিরাস জন্য অজ্ঞানের প্রকার ভেদ অক্ষজ বা জাগতিক জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া সেই ভয় হইতে রক্ষা পাইতে পারিবেন? না যাঁহা হইতে বিমুখ হইয়া যাঁহার মায়াগ্রস্ত হইয়া এত ক্লেশ, তাঁহার ঐকান্তিকী সেবামূলা ভক্তি ভিন্ন আর কি উপায় হইতে পারে? সে সেবা কিরূপে কে পাইতে পারে, এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে, যিনি গুরুই দেবতা এই জানিয়া তাঁহার চরণে একান্ত প্রপন্ন হইতে পারেন, তিনিই এই কেবলা ভক্তির অধিকারী হইবার যোগ্য।

যখন শৌনক অঙ্গিরার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য উপসন্ন হন, তখন উপদেশ প্রদান কালে তিনি বলিতে থাকেন, "স্বর্গাদি কর্ম্মফল সমূহকে অনিত্য জানিয়া এবং কর্ম্ম দ্বারা আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিমুলা মুক্তি হয় না বুঝিয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্রাহ্মণ মুক্তিদ্বার নির্বেদ সম্বন্ধে অভিজ্ঞান লাভ জন্য সংস্কাররূপ যজ্ঞোপকরণ হস্তে লইয়া বেদজ্ঞ ব্রহ্মতত্ত্বে পরিনিষ্ঠিত বুদ্ধি শ্রীগুরুদেব-চরণে সর্ব্বতোভাবে শরণ গ্রহণ করিবেন"। (মুণ্ডকোপনিষৎ ১।২।১২)

শ্রুতির অন্যস্থলে বলিতেছেন, ''আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ''—যিনি সাধুগুরু- চরণে প্রপন্ন হইয়াছেন, একমাত্র তিনিই পরতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, অন্যের তাহাতে অধিকার নাই, কেননা অনবচ্ছিন্ন আম্নায়পারম্পর্য্যক্রমে অবরোহ প্রণালীতে নিরস্তকুহক পরমসত্য অবতীর্ণ হয়েন, উহা মনোবিক্রম দ্বারা আরোহপন্থায় প্রাপ্তব্য তত্ত্ব নহে।

শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তরাজ শ্রীউদ্ধবকে উপদেশ দানমুখে বলিয়াছিলেন (শ্রীমদ্ভাগবতে, একাদশ স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ে)—

এবং গুরূপাসনয়ৈকভক্ত্যা বিদ্যাকুঠারেণ শিতেন ধীরঃ।
বিবৃশ্চ্য জীবাশয়মপ্রমত্তঃ সম্পদ্য চাত্মানমথ ত্যজাস্ত্রম্।।

গুরুসেবামূলা কেবলা ভক্তিরূপা তারণ বিদ্যাকুঠার দ্বারা অবিদ্যাগ্রস্ত জীবোপাধি ত্রিগুণাত্মক লিঙ্গশরীর ছেদন করিয়া আত্মদর্শন লাভ করিবে। আত্মদর্শন লাভ করিতে হইলে শ্রীগুরুচরণোপান্তে আসীন হইয়া শুদ্ধভক্তি সাধন করিতে হইবে। ফলপ্রাপ্তি হইলে আর সাধন আবশ্যক না হইলেও প্রয়োজন প্রেমভক্তিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া নিত্য ভগবৎসেবা করিতে হইবে। গুরুসেবা ব্যতীত এই প্রেমফল প্রাপ্তি অসম্ভব। অর্জ্জুন সখা হইলেও তিনি শ্রীকৃষ্ণকে গুরুত্বে বরণ করিয়া, আমি তোমাতে প্রপন্ন হইলাম, আমি তোমার শাসনযোগ্য অর্থাৎ শিষ্য হইলাম, আমাকে শাসন কর, আমাকে তত্ত্বোপদেশ কর এই বলিয়া তাঁহার চরণে শ্রীগীতোপনিষৎ শ্রবণ করিয়াছিলেন।

গুরুপাদাশ্রয়ের আবশ্যকতা সম্বন্ধে অসংখ্য প্রমাণ উদ্ধৃত হইতে পারে। যাঁহারা বৈষ্ণব তাঁহারা শ্রীগুরুচরণে বৈষ্ণবী দীক্ষা গ্রহণ অবশ্যই করিয়াছেন। তবে ''কেহ মানে কেহ না মানে সব তাঁর দাস'' এইভাবে জীবমাত্রেই বিষ্ণুদাস, ''সাস্যদেবতা'' এই তদ্ধিতসূত্র অনুসারে যে সকলেই বৈষ্ণব, দীক্ষিত অদীক্ষিত প্রত্যেকেই বৈষ্ণব—এই সাধারণ অর্থে বৈষ্ণবশব্দের সচরাচর প্রয়োগ হয় না। বৈষ্ণব বলিতে,—

''গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ।।''

বিষ্ণুমন্ত্রে সাধুগুরু কর্ত্তৃক দীক্ষিত ও সেই দীক্ষাপ্রভাব ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত্যনন্তর সাবিত্র্য সংস্কার প্রাপ্ত বিষ্ণুপূজককেই লক্ষ্য করে। অদীক্ষিত বা সংস্কাররহিত দীক্ষাভিনয়-দৃপ্ত ব্যক্তি কখনও বিষ্ণুপূজার অধিকার পান না, সুতরাং তিনি যথার্থ সাধুগুরুর নিকট সোপনয়ন দীক্ষার পূর্ব্বেই বৈষ্ণবী পদবী লাভের যোগ্যতা কখনই প্রাপ্ত হইতে পারেন না।

অনেকের শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গসাধনে শ্রদ্ধোদয় হইয়া তাঁহারা গুরুচরণ প্রপত্তির পূর্ব্বেই ভজন করিতে চাহিয়া নামকীর্ত্তনাদি করিতে থাকেন। তাঁহারা শ্রীনাম মাহাত্ম্য শুনিয়াছেন, ''দীক্ষাপুরশ্চর্য্যাবিধি অপেক্ষা না করে।''

"নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে
মন্ত্রোয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ।।"

এই প্রমাণ পাইয়াছেন, অজামিল প্রভৃতি গুরুকরণ অভাবেও মুক্ত হইয়া- ছিলেন এই দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করিয়া বুঝিয়াছেন যে, আর গুরুকরণশ্রম ও গুরুসেবার ভার গ্রহণে লাভ কি? নামকীর্ত্তনাদি দ্বারাই তাঁহাদের শ্রীভগৎ প্রাপ্তি ঘটিবে। কিন্তু তাঁহারা শ্রীউদ্ধব প্রতি শ্রীভগবান কৃষ্ণের উপদেশটী ভুলিয়াছেন,—

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারং।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা।।"

(ভাঃ ১১।২০।১৭)

ভবার্ণব উত্তরণে আমাদের নরদেহটী যেরূপ সুপটু নৌকা, সেই নৌকার সেইরূপ উপযুক্ত নেতা বা কর্ণধার প্রয়োজন, শ্রীগুরু সেই কর্ণধার। গুরুচরণাশ্রয় ব্যতীত উদ্ধারের উপায় নাই। তবে যে দীক্ষা ব্যতীত ও নামাভাসে মুক্তির কথা বিশ্রুত আছে, তাহা কাহাদের পক্ষে প্রযোজ্য তাহা বিচার আবশ্যক। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ এই পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া উত্তর দিয়াছেন যে নামাভাস দশপরাধ-শূন্যব্যক্তির পক্ষেই সম্ভবপর। গুরুপাদাশ্রয় ব্যতীতও মুক্তি পাওয়া যায় এই জ্ঞানে যাঁহারা দীক্ষাদি স্বীকার না করিয়াও নামাদি করিতে থাকেন তাঁহারা গুর্ব্ববজ্ঞা লক্ষণ তৃতীয় নামাপরাধে অপরাধী। সুতরাং তাঁহাদের নামাভাস হয় না, ভগবৎপ্রাপ্তিও ঘটে না। তবে পরে সেই জন্মে বা জন্মান্তরে যদি শ্রীগুরুচরণাশ্রয় করিয়া নামাপরাধশূন্য হইতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাদের ভগবৎপ্রাপ্তি সুলভ হইতে পারে। আর যাহারা গো-গর্দ্দভের ন্যায় (শ্রীল চক্রবর্ত্তীপাদের ভাষা) সর্ব্বদা বিষয়সমূহে ইন্দ্রিয় চালনা করে, 'কে ভগবান্? ভক্তি কি? গুরু কে?' স্বপ্নেও এ সকল সংবাদ রাখে না, তাহাদের গুর্ব্ববজ্ঞা হয়। যদি তাহারা আর আর অপরাধ নির্মুক্ত থাকে, তবে নামাভাসাদি রীতিক্রমে গুরুবিনাও উদ্ধার পাইতে পারে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে নামাভাসবলে যে মুক্তি তাহা সালোক্যাদি লক্ষণযুক্ত, তাহা ভক্তের ঈপ্সিত পদবী প্রেমসেবার অধিষ্ঠান নহে। ভক্ত এরূপ মুক্তি পাইলেও গ্রহণ করিতে চাহেন না। (শ্রীমদ্ ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে ঊনত্রিংশৎ অধ্যায়ে)। প্রেমভক্তির মূলে আনুগত্য ধর্ম্ম অনুস্যূত। সেই আনুগত্যের আরম্ভই শ্রীগুরুপাদাশ্রয়।

অবিবেকী ব্যক্তিই দীক্ষাদি বিনা নামাভাসের ফল প্রাপ্ত হয়। আর যাঁহাদের এই বিবেক উদিত হইয়াছে যে শ্রীহরি ভজনীয় তত্ত্ব, ভজন করিলে তাঁহার চরণ লাভ হয়, সেই ভজনের উপদেষ্টা শ্রীগুরুদেব, পূর্ব্বে গুরূপদিষ্ট ভক্তগণই শ্রীহরিচরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন—তাঁহারা গুরুপদাশ্রয় না করিয়া অপরাধী হইয়া পড়েন। অপরাধ প্রযুক্ত তাঁহাদের গুর্ব্বাশ্রয় ভিন্ন মুক্তিরও সম্ভাবনা নাই, ভক্তি ত' দূরের কথা। অতএব প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই নিষ্কিঞ্চন ভগবন্নিষ্ঠ বিষয়মুক্ত সাধুমহাত্মার চরণাশ্রয়ে ভক্তিমার্গে অধিষ্ঠিত হইয়া শ্রীভগবৎ-সেবামূলা প্রেম-ভক্তি পর্য্যন্ত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহার উপর আর প্রাপ্যতত্ত্ব নাই। শাস্ত্র বলেন,—

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ।।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ও লিখিয়াছেন,—

নিতাই পদকমল কোটিচন্দ্র সুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনা ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাই পায়।।
সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার,
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার সুখে,
বিদ্যা-কুলে কি করিবে তার।।
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে, নিতাই পদ পাশরিয়ে,
অসত্যেরে সত্য করি মানি।
নিতাই-করুণা হবে, ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবে,
ধর তার চরণ দুখানি।।

পরমায়ু-বিচার

জীব বলিলে ভগবানের তটস্থা শক্তিকে বুঝায়। চিৎ ও মায়িক, উভয় জগতেই জীবের যাইবার যোগ্যতা আছে বলিয়া উহাকে তটস্থা শক্তি বলা হইয়াছে। জীব যখনই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করেন, তখনই ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়া তাঁহাকে এই দুঃখময় সংসারে আনয়নপূর্ব্বক চৌরাশী লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করাইয়া ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধীভূত করেন। চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ সময়ে জীব নানাবিধ পাঞ্চভৌতিক দেহ আশ্রয় করিয়া থাকেন। এইরূপে জীবের কোনও একটী দেহে অবস্থিতি কালের পরিমাণকে তাহার পরমায়ু কহে। আবার যখন সেই জীবটী সেই পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য একটী দেহ আশ্রয় করে, তখনই লোকে বলিয়া থাকে যে, সেই জীবটীর পরমায়ু শেষ হইয়াছে অর্থাৎ মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে জীব কোনও কালের অধীন নহে, জীবে পরমায়ু বিচার চলে না। কেবল পাঞ্চভৌতিক দেহেরই বিনাশ হয়। জীব নিত্য কৃষ্ণদাস, তাহার জন্ম, জরা বা মৃত্যু কিছুই নাই। তবে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতারূপ কর্ম্মবশতঃ এই দুঃখময় সংসারে আগমনপূর্ব্বক কখন স্থাবর, কখন জলচর, কখন বা কীটযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া অবশেষে বহু পুণ্যফলে এই দুর্লভ মনুষ্য দেহ আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। যথা পদ্মপুরাণে,—

জলজা নব লক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।
ক্রিময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকং।।
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবশ্চতুর্লক্ষাণি মানবাঃ।।

যাহার দেহে আত্মবুদ্ধি সেই ব্যক্তিই নিজের ও অন্যের পরমায়ু গণনা করিয়া থাকেন। জগতে অনেকেই দেহাত্ম বুদ্ধিবিশিষ্ট; সুতরাং প্রায় সকলেই নিজেদের ও আত্মীয়স্বজনাদির পরমায়ু বৃদ্ধি হউক ইহাই ইচ্ছা করিয়া থাকেন। তাঁহারা কোনও ব্যক্তির মৃত্যু দেখিলে বড়ই শোকাতুর হন এবং বলিয়া থাকেন যে, ইহার আর পরমায়ু নাই তাই মরিয়া গেল। কিন্তু একবারও ভাবেন না যে জীবাত্মা দেহাতিরিক্ত চিৎকণ বস্তু। তাঁহার জরা বা মৃত্যু নাই; কেবল দেহেরই পতন হয়। তাহারা মনে করে যে, এই সংসারে অধিক দিন জীবিত থাকিলেই জীবন সার্থক হয়। স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া সংসার করা এবং টাকা উপার্জ্জন করিয়া তাহাদের সেবা করিতে করিতে আমোদ-প্রমোদে জীবনযাপন করিয়া অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারিলেই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। 'আমি কে? কোথা হইতে এই সংসারে আসিলাম? মাতৃগর্ভে দারুণ যন্ত্রণায় কে আমাকে রক্ষা করিয়াছিল? কেনই বা এই ত্রিতাপ যন্ত্রণায় জ্বলিয়া মরিতেছি? জীব মরিয়া কোথায় যায়?" ইত্যাদি চিন্তাসকল একবারও কাহারও হৃদয়ে উদিত হয় না। যদি কেহ কোনও সুকৃতির ফলে নিজের স্বরূপ জানিতে অনুসন্ধিৎসু হন, তবে সাধুশাস্ত্র ও সদ্গুরুর দ্বারা জানিতে পারেন যে জীবমাত্রই কৃষ্ণের নিত্যদাস এবং তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) সেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। স্ত্রী-পুত্রাদির সেবা জীবের স্বধর্ম্ম নহে। যাঁহারা স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া কৃষ্ণের সংসার পাতিয়াছেন, তাঁহারা কখনই স্ত্রী-পুত্রাদিকে স্ত্রীপুত্র জ্ঞান করেন না; কৃষ্ণের দাস-দাসী জ্ঞানে তাহাদের সেবা করিয়া থাকেন। কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করিয়াই জীবের সংসার-ভ্রমণরূপ অধোগতি হইয়াছে। তাই সে চৌরাশী লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিয়া কভু স্বর্গে, কভু নরকে পতিত হইয়া ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধীভূত হইতেছেন, যথা শ্রীচৈতন্য- চরিতামৃতে মধ্য ২০শ পরিচ্ছেদে—

"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ।।
কভু স্বর্গে উঠায়, কবু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়।।"

সাধু, শাস্ত্র ও সদ্গুরুর কৃপায় কোন ভাগ্যবান্ জীব যখন নিজের স্বরূপ জানিতে পারেন এবং হরিসেবায় রত হন, সেই মুহূর্ত্তেই মায়াপিশাচী তাহাকে পরিত্যাগ করেন। সেই জীবও তখন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন, যথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্ণিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে।।

হে ভগবন্, কামাদির কতপ্রকার দুষ্ট আদেশ আমি পালন করিয়াছি, তথাপি আমার প্রতি তাহাদের করুণা এবং আমার লজ্জা বা উপশান্তি হইল না। হে যদুপতে! আপাততঃ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধি লাভ করিয়া তোমার অভয়চরণে শরণাগত হইয়াছি। তুমি এখন আমাকে আত্মদাস্যে নিযুক্ত কর।

এইরূপে জীব যখন মায়ার সেবা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন, তখন তিনি দীর্ঘায়ু লাভের প্রয়াসী হন না। কারণ তিনি ভাবেন সকলই ভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তাঁর ইচ্ছায় যতদিন দেহটী থাকে, তাঁহার সেবা করিয়া চলিয়া যাওয়াই জীবের কর্ত্তব্য। তাঁর ইচ্ছায় কেহ দীর্ঘায়ু, আবার কেহ বা অল্পায়ু লাভ করিতেছেন। মায়ার সেবা করিয়া দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া বৃথা দেহের ভার বহন করা অপেক্ষা কৃষ্ণভজন করিয়া মুহূর্ত্তকাল বাঁচাও জীবের পক্ষে পরম সৌভাগ্য।

তাই বলি, বৃথা পরমায়ু বৃদ্ধির চেষ্টা না করিয়া হরিভজনে প্রবৃত্ত হওয়াই আমাদের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। মৃত্যু যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া মরিলেও শেষের দিনে এই কত সাধের দেহখানি ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে; এবং দেহটীও শিয়াল কুকুরের ভক্ষ্য হইবে কিংবা পচিয়া গিয়া কৃমির ভক্ষ্য হইবে। দেহের এইত পরিণাম! সকলকেই একদিন না একদিন শ্মশানে যাইতে হইবে, সকলেরই দেহ শ্মশানে গড়াগড়ি যাইবে।

লক্ষ পতি কোটি পতি, সকলের এই গতি,
আসিতে হইবে আগে পিছে।
সবার বিশ্রাম স্থান, একমাত্র শ্মশান,
এ'তে আর সন্দেহ কি আছে।। ১।।
সত্যে লক্ষবর্ষ যারা, এবে কেহ নাহি তারা,
এ যে কলি পরমায়ু ক্ষীণ।
শত বর্ষ পর্য্যন্ত, জীবের জীবন অন্ত,
ততদিন জীয়ে কোন জন।। ২।।
যদি বাঁচে তত কাল, তাতে কিবা হয় ফল,
দুই চারি শত বা হাজার।
বরষ যে সব মিছে, অনন্ত কালের কাছে,
শেষ এই গতি যে সবার।। ৩।।

যাহারা অভক্ত, নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না, অর্থাৎ ''কৃষ্ণই একমাত্র সেব্য বস্তু আমরা তাঁহার দাস, তাঁহার সেবা করাই আমাদের নিত্যধর্ম্ম'' ইহা বুঝিতে অক্ষম, তাঁহারাই বলিয়া থাকেন যে,—

লোকঃ পৃচ্ছতি সদ্বার্ত্তাং শরীরে কুশলং তব।
কুতঃ কুশলমস্মাকং আয়ুর্যাতি দিনে দিনে।।

লোক জিজ্ঞাসা করে—"তোমার শারীরিক মঙ্গল ত!" কিন্তু আমাদের আয়ুক্ষয় হইয়া যাইতেছে।

আয়ুর বৃদ্ধি ও হ্রাসে ভক্তগণ ক্ষুব্ধ হন না; তাঁহারা কেবল হরিসেবাই চাহেন। বরং ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন, যথা—

নাথ! যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহং।
তেষু তেষ্বচলা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি।।

হে নাথ! আমি যে যোনিতেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, যেন তোমায় আমার অবিচলিতা ভক্তি বর্ত্তমান থাকে। যদি আমাকে কীটাদি কোনও যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া অতি অল্পদিন জীবিত থাকিতেও হয় তাহাতে যে আমি অসুখী হইব তাহা নহে; আবার বৃক্ষ, পশু, মনুষ্য প্রভৃতি যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া যে অতিশয় সুখী হইব, তাহাও নহে। তবে আমার এই প্রার্থনা, যেন তোমার শ্রীচরণযুগলে নিরন্তর অচলা ভক্তি বিরাজ করে। যে সকল ব্যক্তি সর্বদাই মৃত্যুভয়ে ভীত তাহারাই পরমায়ুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকে, কিন্তু ভক্তগণ মৃত্যুভয়ে কখনই ভীত হন না এবং অন্যের মৃত্যুতেও শোক প্রকাশ করেন না; কারণ তাঁহারা জানেন—"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।।" তাঁহারা বলিয়া থাকেন,—

"ওহে মৃত্যু, তুমি মোরে কি দেখাও ভয়?
ও-ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।।"

যেখানে কালের বিক্রম বর্ত্তমান, সেইখানেই সুখ দুঃখ আলো অন্ধকার, দিবা রাত্রি, দীর্ঘায়ু অল্পায়ু প্রভৃতির গণনা হইয়া থাকে। এই দেবীধামেই কালের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বিস্তারিত; সুতরাং এই দেবীধাম (জগৎ)বাসী জীবের নিকটই মায়াশক্তি আলো অন্ধকার, দিবা রাত্রি, অল্পায়ু ও দীর্ঘায়ু প্রভৃতি নানারূপ বৈষম্য দর্শন করায়; কিন্তু ভগবদ্ধামে কালের বিক্রম খাটে না; সেখানে চন্দ্র সূর্য্য এক সময়ে বিরাজিত, সেখানে দুঃখ অন্ধকার, চিরশান্তি, কোটী সূর্য্যবৎ প্রভা, জরা-শোকাদি-বিবর্জ্জিত অমরতা নিত্যকাল বিরাজিত।

আবার সূর্য্যের উদয়াস্তগমন অনুসারে দিন, মাস, বৎসর ইত্যাদি ক্রমে লোকের আয়ু ক্ষয় পায়; তাহারা ক্রমশঃ মৃত্যুমুখে অগ্রসর হয়, কিন্তু যাহারা হরিকথায় রত থাকেন, তাঁহাদের আয়ু ক্ষয় পায় না, তাঁহারা মৃত্যুমুখে অগ্রসর হন না। তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন। এই জন্য সূর্য্য তাঁহাদের আয়ু ক্ষয় করিতে সমর্থ হন না, তাই শৌনকঋষি সূত গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন—

"আয়ুর্হরতি বৈ পুংসা উদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্ত্তে যৎ ক্ষণো নীত উত্তমশ্লোকবার্ত্তয়া।।"

সাধুগণ বলেন—"নরতনু ভজনের মূল" অর্থাৎ মনুষ্যজন্মেই হরিভজন হইয়া থাকে, অন্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করিলে হরিভজন হয় না। তাই কোন স্থানে হরিভজনের জন্যই অধিক পরমায়ুর আবশ্যক হয়। যদি কেহ শৈশবাবস্থা হইতে যৌবনকাল পর্য্যন্ত হরিভজন না করিয়া কেবল বৃথা সময় নষ্ট করিয়া থাকেন, কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় হরিভজন করিতে আরম্ভ করেন, তখন তিনি বলিয়া থাকেন—হায়, আমার জীবন বিফলে

গিয়াছে! এখন আমি বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত, শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে! যদি ভগবান্ কৃপা করিয়া আরও কিছুদিন জীবিত করিয়া রাখেন, তবেই আমি কিছুদিন হরিভজন করিতে পারিব নতুবা আর হরিভজন হইবে না, আবার পুনরায় চৌরাশী যোনিতে ঘুরিতে হইবে! এইরূপ স্থানেই পরমায়ুবৃদ্ধি আবশ্যক; নতুবা হরিভজন ব্যতিরেকে দীর্ঘায়ু লাভের কোনই প্রয়োজন নাই। নরদেহেই হরিভজন হয় বলিয়া কোন কোন ব্যক্তি অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করেন, কারণ তাঁহারা ভাবেন, পাছে ইতর যোনিতে জন্মলাভ করিয়া ভগবানকে ভুলিয়া যান এবং তাঁহার সেবা হইতে বঞ্চিত হন। শাস্ত্রমুকুটমণি অভিন্ন-ভগবত্তনু শ্রীমদ্ভাগবত আমাদিগকে সাবধান করিয়া উপদেশ দিতেছেন, যথা—

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ।।

(ভাঃ ১১।৯।২৯)

এই মনুষ্যদেহ অতিশয় দুর্লভ, যেহেতু ইহা বহুজন্মের পর চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু চিরস্থায়ী নহে—ইহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং ইহা অনিত্য। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা পরম পুরুষার্থ লাভের প্রধান সাধন। অতএব এই দেহের পতন হইতে না হইতে শ্রীভগবানের শ্রীচরণারবিন্দ লাভের চেষ্টা করাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য, যেহেতু বিষয়ভোগ পশু, পক্ষী, কীট প্রভৃতি সর্ব্ববিধ যোনিতেই সম্ভব; কিন্তু মনুষ্যদেহ ভিন্ন অন্য কোন দেহে ভগবচ্চরণারবিন্দ লাভের সাধন সম্ভবে না।

দীর্ঘ আয়ু লাভে বল কিবা ফলোদয়।
স্ত্রীপুত্রভরণে যাতে মতি সদা রয়।।
চৌরাশী ভ্রমণ তার কভু না ঘুচিবে।
গলে ফাঁস দিয়া মায়া তারে দুঃখ দিবে।।
ফেলিবে নরকে কভু স্বর্গে উঠাইবে।
ত্রিতাপ যাতনা তার কভু না যাইবে।।
দুই চারি দিন বাঁচি যদি কৃষ্ণ ভজে।
তথাপিত কৃষ্ণ তাঁরে কভু নাহি ত্যজে।।
মরিলে আবার তারে জন্মিতে না হয়।
চিদ্ধামে গিয়া চির শান্তি যে লভয়।।
অতএব হরি ভজ হরি ভজ ভাই।
হরি বিনা সেব্য বস্তু আর কেহ নাই।।

গোস্বামিপাদ

গৌড়দেশে গোস্বামী শব্দের বিস্তৃত প্রচার হইয়াছে। এমন কি নৈমিত্তক কাল-নিয়ামিকা পঞ্জীতেও যে ব্যবস্থাদি প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যেও দুইটী বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। পঞ্জিকাদর্শকমাত্রেই জানেন যে ব্যবহার জগতে সামাজিক কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য যে লৌকিক স্মৃতি প্রবল তাহাকেই সাধারণতঃ স্মার্ত্তের আদর্শ বলা হয়। আর পরমার্থ বাধা প্রাপ্ত হয় না এরূপ বিশেষ উৎকৃষ্টতর স্মৃতি গোস্বামী মত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। সাধারণ ও বিশেষ বিচারেই দুই প্রকার ব্যবস্থা ভেদ দেখা যায়। নিরীশ্বর পরমার্থহীন লোকসমাজ যে নীতি অবলম্বনে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাহা হইতে সেশ্বর পরমার্থপর লোকসমাজ বিশেষ ব্যবস্থা প্রচলন করিয়া ইতর হইতে বৈশিষ্ট্যের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাঁহারা অক্ষজ বা ইন্দ্রিয়জ্ঞানকে সম্বল করিয়া ইহলোকে বিচরণ করেন, যাঁহারা ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ অনুভূতি ব্যতীত লোকেন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত সত্যের অনুসন্ধানে বিরত, যাঁহারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তিই মানবের ও পশুমাত্রেরই একমাত্র অবলম্বন বলিয়া জানেন, তাঁহারা অধোক্ষজ, অপ্রাকৃত বা অপরোক্ষ বিষয়ের অনুগমনে বিরত। শ্রীগীতা শাস্ত্রে আমরা একটী শ্লোক দেখিতে পাই, তাহা এই—

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ।।

কর্ম্মযোগী বা হঠযোগীর ন্যায় অথবা জ্ঞান যোগী বা রাজ যোগীর ন্যায়, ভক্তিযোগী যমাদি অষ্টাঙ্গ সাধনের অসম্পূর্ণ আদর্শ মাত্র নহেন। তিনিই প্রকৃত সংযমী বা গোস্বামী। সেই ভক্তিযোগী এরূপ সময়ে জাগ্রত থাকেন, যেকালে পার্থিব ইন্দ্রিয়পর ব্যক্তি বিশ্রাম লাভ করেন আর যেকালে প্রত্যক্ষ জ্ঞানাবলম্বী যে সকল ইন্দ্রিয় তৃপ্তির উদ্দেশ্যে ব্যস্ত থাকেন, সেই কালে বিষয়-লোলুপের কার্য্যসমূহ হইতে তাঁহারা বিরত বা তাহাদের বিশ্রান্তিকাল জানিয়া জড়েন্দ্রিয় তর্পণরূপ ভোগে আবদ্ধ থাকেন না। এ জন্যই লৌকিক স্মার্ত্ত ও গোস্বামি মতে পার্থক্য নিত্যকাল বর্ত্তমান। স্মার্ত্তের চেষ্টা ঐহিক ও পারত্রিক ইন্দ্রিয় তৃপ্তি বা ভোগ পরায়ণতা, গোস্বামীর চেষ্টা হরিসেবন-তৎপরতাহেতু ঐহিক ও পারত্রিক উভয় কালেই ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যগ্রতা-রাহিত্য। অধোক্ষজ পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ও তৎপরিকরের সেবক না হইতে পারিলে আমরা স্মার্ত্তই থাকিয়া যাই এবং জড়ের উচ্চাদর্শে মুগ্ধ হইয়া গোদাস হইয়া পড়ি।

গৌড়দেশবাসী গৌড়ীয়ভাষার সাহায্যে সকলেই ন্যূনাধিক অবগত আছেন যে গৌড়ীয়জনোপাস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের চরণানুচরগণকেই গোস্বামি শব্দে উল্লিখিত হইত। যাঁহারা পরমার্থ পরিহার করিয়া লৌকিক স্মার্ত্তাচারে প্রবিষ্ট হইলেন তাঁহারাই গোস্বামিমত পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাদিগের বাহ্য প্রত্যক্ষ অনুমানাদি বলে বেদ-তাৎপর্য্যকে অসৎ সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত করিয়া আপনাদিগকে গোস্বামী অভিধানে ভূষিত করিলেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট- কালে বা তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী সময়ে এইরূপ পরমার্থ-বিরোধী সামাজিক জাতি-গোস্বামীকে গোস্বামী শব্দে অভিহিত করা হইত না। পরমার্থবিরোধ-স্পৃহার

বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বিরুদ্ধাচরণকল্পে তাঁহার নামের দোহাই দিয়া যে পরমার্থ বিরোধী স্মৃতির অনুগমনে আপনাদিগকে জাতি গোস্বামী বলিয়া আচার্য্যব্রুবগণ বৈষ্ণব স্মৃতি বা গোস্বামিমতের সহিত বিবাদ করিতেছেন এবং গোস্বামিসিদ্ধান্তকে ইন্দ্রিয়জ্ঞান তাৎপর্য্যপর করিয়া কর্ম্মফলভোগ রাজ্যে ধাবমান হইতেছেন, তাহাতে সত্যানুসন্ধিৎসু সমাজের বিশেষ ক্ষতির কারণ হইয়াছে। ইন্দ্রিয়পরায়ণগণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রকার ভেদসমূহকে অবাধে পরমার্থ বলিয়া প্রচলন করিবার প্রয়াস যে মহাত্মা আদর করেন নাই, ইন্দ্রিয়-পরব্যক্তিগণের রুচি ও ক্রিয়াকে যে মহাত্মা ইন্দ্রিয়পরশাস্ত্রের অনুমোদিত বলিয়া উপেক্ষা করিতেন, অধোক্ষজে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা সেবাই যাঁহার চরিত্রে নিত্য প্রতিফলিত বর্ত্তমানকালে সেই মহাত্মার বার্ষিক অপ্রকট দিন উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের পার্ষদ ভক্তগণের অগ্রণী সমূহ তদনুগগণই গোস্বামি-শব্দে অভিহিত হইয়া ভাষা ও উদ্দেশ্যের সফলতা করিয়াছেন। সেই শব্দের অপব্যবহারকারিগণ গোস্বামিত্বকে স্মার্ত্তের নিজস্ব সম্পত্তি করিয়া তুলিবার যে প্রয়াস করিয়াছিলেন, সেই কুচেষ্টার স্রোতকে কায়মনোবাক্যে হরিসেবার দ্বারা প্রতিরোধ করিয়াছেন সেই গোস্বামিপাদ অধোক্ষজ সেবাপর সমাজের পরম বরণীয় বস্তু। আসুন, পরমার্থী গৌড়ীয় বিদ্বৎসমাজ, গৌড়ীয় শিক্ষিত সমাজ, গৌড়ীয় শুদ্ধ বৈষ্ণব সমাজ সেই মহীয়ান্ অকিঞ্চনের অপ্রাকৃত পদরজপরিপূরিত স্মৃতিপথের চরণধূলিতে অবগাহন করিয়া আমরা ধন্যাতিধন্য হই। সেই অনুপমের আশ্চর্য্য হরিসেবার অনুষ্ঠানাবলী আমাদিগের গৌড়ীয় জীবনের আদরণীয় হউক। শ্রীরূপ সনাতন গোস্বামী দাসরঘুনাথের নিরুপিত কৃষ্ণেতর বিষয়বিরাগ বিভূষিত ঐশ্বর্য্য যে মহীয়ানের সৌভাগ্য ভগবদ্ভক্তগণের সর্ব্বক্ষণ আলোচ্য বিষয় তাহা জানিবার কি প্রত্যেক গৌড়ীয়ের স্বাভাবিক চেষ্টা নাই? যদি তাহা হইলে আদর্শ গৌড়ীয় ওঁ বিষ্ণুবাদ অনন্ত শ্রীগৌরকিশোর প্রভু গোস্বামি মহারাজের চরিতকথা অনুসন্ধান করুন। মহতের আচরণ সুষ্ঠুভাবে দর্শনপ্রয়াসী জনগণই ভক্ত কৃপায় আত্মচক্ষুর দ্বারা নিত্যাদর্শ বিগ্রহের অপ্রাকৃত দর্শন পাইবেন। ‘‘তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নের সেবয়া”, ‘‘ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। তত মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।” ‘‘তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং। দদামি বুদ্ধিযোগং যেন মামুপযান্তি তে।।” প্রভতি শ্রীগীতোল্লিখিত ভগবদুপদেশসমূহের অনুগমন করুন্।

কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি

কৃষ্ণ বস্তুটী স্বয়ং ভোক্তা, তিনি কাহারও ভোগের বস্তু নহেন। কৃষ্ণের নিত্য ভোগের জন্য তাঁহা হইতে অনন্ত পরিকরবৈশিষ্ট্য প্রকটিত হইয়াছেন। পরিকর-বৈশিষ্ট্যের কৃষ্ণসেবা ব্যতীত আর অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।

কৃষ্ণ বস্তুটী নিত্য, তাঁহার নিজ ভোগের বস্তুগুলিও নিত্য। যাবতীয় ঈশ্বরতা তাঁহার শক্তি ও বিভিন্ন ঈশ্বর-সমূহ তাঁহার দাস। ঈশ্বরসকল তাঁহাদের সকল বশ্য সহ কৃষ্ণের সেবা করেন। কৃষ্ণ পরমেশ্বর।

কৃষ্ণ বস্তুটী আনন্দের আস্বাদকারী অর্থাৎ রসময়। সেই রস নিত্য অখণ্ড ও চিন্ময়। তিনি সংবেত্তা বা জ্ঞাতা। আনন্দময় রসই তাঁহার জ্ঞেয়। রসাস্বাদন ধর্ম্ম নিত্য। তাঁহাকে নশ্বরতা বা কালের কোন আক্রমণ সহ্য করিতে হয় না। অসুর মোহনের জন্য নির্ব্বোধের বুদ্ধিনাশের জন্য তিনি তাঁহার মায়াশক্তিতে দুই শ্রেণীর বৃত্তি সংস্থাপিত করিয়াছেন। জীব যদি ঈশ্বর হইত বা পরমেশ্বর কৃষ্ণ হইত তাহা হইলে তাহার আসুরিক প্রবৃত্তি হইত না। অসুরের ধর্ম্ম কৃষ্ণবিমুখতা বা ভোগ-দাস্য। কৃষ্ণের মায়ানাম্নী বহিরঙ্গাশক্তি বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী বৃত্তিদ্বয়ে কৃষ্ণবিমুখ জীবকে কৃষ্ণসেবা হইতে বিক্ষিপ্ত করেন ও তাঁহার নিত্য হরিসেবাবৃত্তিকে আবরণ করেন। জীব তখনই অসুরের ধর্ম্মকে নিজ ধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া হরির ন্যায় ঈশ্বরতা বা ভোগে প্রমত্ত হইয়া সকল বস্তু মাত্রকেই ভোগ করিতে আরম্ভ করেন। মায়াশক্তি প্রভাবে ভোগ করিবার উপযোগী বৃত্তিগুলি রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শাকারে ভোগীর সম্মুখে উপস্থিত হয়। মায়াশক্তিই জীবের ইন্দ্রিয়গুলিতে ভোগ্যবস্তু গ্রহণের ঈশ্বরতা লইয়া হরিবিমুখ হইবার সুবিধা করিয়া লন। বদ্ধজীব কৃষ্ণবিমুখতাক্রমে এরূপ অসুবিধার মধ্যে পতিত হন যে ভোগ ব্যতীত তাঁহার আর অন্য প্রকার সম্বল থাকে না। যদি কেহ কৃষ্ণকথা বলিতে আসে তিনি সেই হরিকথাতেও নিজভোগ্য বিষয় জ্ঞানে কৃষ্ণকেও ভোগ করিতে ব্যস্ত হন। কিন্তু কৃষ্ণে ভোগের সুযোগ হইবার সম্ভাবনা না থাকায় পরিশেষে তাদৃশ চেষ্টায় বিফলমনোরথ হন।

কৃষ্ণ মায়াশক্তি-পরিণামে বদ্ধজীবের আবৃত বৃত্তি ও হরিবিক্ষিপ্ত বৃত্তি দেওয়ায় জীব ভোগের কাঙ্গাল হইয়া পড়েন। জীবের নিত্য হরিসেবা বৃত্তি আবৃত হওয়ায় তিনি হরিদাস্য করিবার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণকে ভৃত্য করিবার সঙ্কল্পে ঘুরিয়া বেড়ান। কিন্তু কৃষ্ণ ভোগী জীবের দাস হইবার যোগ্য না হওয়ায় পরিশেষে জীবের সেই ঔদ্ধত্য বৃথা হইয়া পড়ে।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ও তদীয় অনুচরবর্গ কৃষ্ণকে সেবা করিবার উপদেশ দিয়াছেন। ভোগী জীব তাহা ভুলিয়া গিয়া কর্ম্মফলের বশবর্ত্তিতাকে কৃষ্ণের সেবা বলিয়া ভ্রান্ত হইতেছেন। জীবগণ কেবল যে আচার্য্য ও উপদেশকের সজ্জায় কৃষ্ণসেবায় বঞ্চিত হইতেছেন এরূপ নয়, যাবতীয় জীবকে মোহিত করিয়া আসুরিক বৃত্তিকেই হরিসেবা বলিয়া প্রচার করিয়া ভোগে প্রমত্ত হইতেছেন এবং জগৎকে ভোগী করাইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষ্ণবিমুখ করিতেছেন। কৃষ্ণবৈমুখ্যই ভক্তি বলিয়া সাধারণ লোকে ধারণা করিয়াছে। তাঁহাদের ভোগময়ী ধারণা পরিমার্জ্জিত করিতে হইলে অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তন আবশ্যক। কিন্তু আমরাও কৃষ্ণে ভোগ-বুদ্ধিবিশিষ্ট জীবের ন্যায় উপদেশকসজ্জায় যতই হরিকীর্ত্তন করি না কেন, হরিবিমুখ জীব কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধিই করিয়া বসিবে এবং বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইবে। দুষ্প্রচারক দুরাচারসম্পন্ন আচার্য্যব্রুবগণ সংসারিক কুবুদ্ধির বশে কৃষ্ণকে ভোগ্য বস্তুর অন্যতম বলিয়া প্রচার করায় আজ ভক্তির স্বরূপোপলব্ধিতে সাধারণের অধিকার হইতেছে না। এই আচার্য্যব্রুবগণকেই এই সামাজিক দুর্দ্দশার কারণ বলা যাইতে পারে। যাহাদের জড়ভোগস্পৃহা অত্যন্ত প্রবল, তাহাদের হরিসেবা-প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না দেখিয়া ভোগিদিগের শিষ্যপ্রতিম ব্যক্তিগণ যাহাকে উপদেশক আচার্য্যের কার্য্য না করিতে পারেন, তজ্জন্য প্রত্যেক নিজ কল্যাণপ্রার্থী ও সমাজহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই সর্ব্বতোভাবে যত্ন করা উচিত।

ভোগ্যবস্তুকে কৃষ্ণ জ্ঞান করিলে কখনই ভোগ্যবস্তু ভোক্তাকে ছাড়িবে না এবং পরস্পরের ক্লেশ কোন দিনই বিনষ্ট হইবে না। হরি সেব্য বস্তু তাঁহাকে সেবা করিতে গেলেই নিজের ভোগ থাকিতে পারে না। সেবার অভাবেই ভোগের উদয়। যে বস্তু কৃষ্ণ নহে তাহাকেই জীব ভোগ করে, সুতরাং রাবণের ন্যায় সীতাহরণ-কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া জড় ভোগ্য বস্তু জ্ঞানে হরিসেবাকে কর্ম্মমাত্র মনে করিতে হইবে না। কৃষ্ণসেবা আত্মধর্ম্ম। উহা অনাত্মধর্ম্ম ভোগের সহিত এক নহে। ইহাদের পরস্পর সৌসাদৃশ্য দেখা গেলেও তাহাদের বৈশিষ্ট্য নিত্য।

লোভ

ষড়রিপুর মধ্যে লোভ অন্যতম, ইহার অপর নাম দ্বিতীয়াভিনিবেশ। মায়িক বৈচিত্র্যে মোহিত হইয়া জীব কামনা-পরবশ হয়। কামের বাধা-প্রাপ্তিতে যেরূপ ক্রোধ উদ্‌গত হয়, তদ্রূপ কিঞ্চিন্মাত্র কামের সফলতায় জীব লোভাভিভূত হয়। ইন্দ্রিয়গণ স্বাভাবিক অনুরাগভরে অসংখ্য বাধা বিপত্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া যে বৃত্তিবশে বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়, তাহাই 'লোভ' নামে কথিত হয়। ইহা মনেরই একটী অনুরাগময়ী চেষ্টাবিশেষ। ক্রোধ যেরূপ পরমার্থ সাধনে ব্যাঘাত জন্মায়, লোভও তদ্রূপ দ্বিতীয় কণ্টকস্বরূপ। হরিণগণ যেরূপ ব্যাধের বংশীধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া কর্ণের তৃপ্তি লোভে ছুটিয়া গিয়া জালে বদ্ধ হয়, জীবগণও সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণের প্ররোচনায় মুগ্ধ হইয়া তৎপশ্চাদানুধাবন করিয়া মায়াজালে নিবদ্ধ হন। তখন তিনি জড় মাযাকে ভোগ বা অতিক্রম করিতে গিয়া অনন্ত অপার বাসনারাজি দ্বারা ক্রম-প্রবহমান চক্রে ঘূর্ণায়মান হইয়াও মায়ার সীমা অতিক্রম করিতে না পারিয়া নিতান্ত পরাধীন বা বদ্ধ অবস্থায় বাস করেন। তাই প্রলুব্ধ জীবগণকে সম্বোধন করিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় গাহিলেন,—

আর কেন মায়াজালে পড়িতেছ জীব মীন
নাহি জান বদ্ধ হ'য়ে রবে তুমি চিরদিন।
অতি তুচ্ছ ভোগ আশে বন্দী হয়ে মায়া পাশে
রহিলে বিকৃত ভাবে দণ্ড্য যথা পরাধীন।।

লোভ জীবগণকে কেবল জালবদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দেয় না। বদ্ধ অবস্থায়ও মানবগণ লোভ দ্বারা চৌর্য্যবৃত্তি পরদারাপহরণাদি অবৈধ ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া নানাবিধ দুষ্কার্য্যের আবাহন করিয়া থাকে, তাই নীতিশাস্ত্রে এই লোভকে সংকোচ করণাভিপ্রায়ে নানাবিধ কর্ম্মকাণ্ডের আবাহন এবং ইহ ও পরকালের বিচার উত্থাপন করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায়, কেবল ইহসর্ব্বস্বতা জীবনের ধর্ম্ম নহে। শাস্ত্রের সম্বন্ধজ্ঞানাভাবে পরকালে সুখপ্রাপ্তির আশায় কর্ম্মে নিয়োজিত থাকিয়া লোভের হাত হইতে একেবারে নিষ্কৃতি পান নাই; অর্থাৎ তাহাদের কিছু আছে তাই কর্ম্মী অকিঞ্চন নহে।
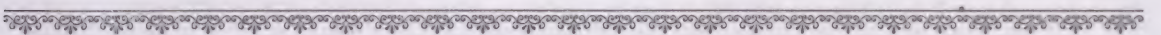
ইহা ছাড়া আর একটী সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা সংসারের সকল আশা- ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া লোভের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য পরিব্রাজক বেশ গ্রহণান্তর বনে গমন করিয়াও ভগবানে শরণাপত্তির অভাবে পুনরায় লোভের হাতে নিষ্পেষিত হন, তাই রক্ষকুলনিধি রাবণ ভগবান্ রামচন্দ্রের ভার্য্যা সীতার সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে হরণ করিবার মানস করিয়া কার্য্যতঃ মায়াসীতাকে হরণ করিয়া সবংশে নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আর একটী বার ব্রহ্মা মহাশয় ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের নিত্য লীলা হইতে গোধন চুরি করিয়া তাঁহার লীলা বন্ধ করিবার লোভটী সম্বরণ করিতে না পারিয়া পরিশেষে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া বড় ফাঁপরে পড়িয়াছিলেন এবং 'ব্রহ্মসংহিতা' নামে ভগবৎস্তবের আবাহন করেন। ইহাও লোভের প্রকার ভেদ। কর্ম্মী ও জ্ঞানী সম্প্রদায় লোভ পরিত্যাগের নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়াও লোভের হাত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই।

ভক্তগণ লোভকে সাধুসঙ্গে হরিকথায় নিয়োজিত করিয়া মায়িক লোভের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন। তাঁহারা জানেন, ব্যতিরেকভাবে বিষয় পরিত্যাগের চেষ্টা ফলবতী হয় না; কারণ, প্রত্যেক স্বার্থের গতিই বিষ্ণু। আর একটী রহস্য এই, বিষ্ণুসন্মুক বা সেবাভিলাষী বস্তুর বিনাশ নাই। কিন্তু দুরাশয় ব্যক্তি দূরদর্শনরাহিত্য হেতু স্বার্থকে নিজের ভোগে নিযুক্ত করেন। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন—ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ। বর্ত্তমান সময়ে সাধুসঙ্গে হরিকথা আলোচনা অর্থাৎ শ্রবণ কীর্ত্তন ভক্তির [তন্মধ্যে একটী প্রবেশদ্বার সম্বন্ধ-উপলব্ধি ও অপরটী উপলব্ধ বিষয়ের সাধন] বড়ই অনাদর হইয়াছে। তাই কতকগুলি কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা লোভী লোক স্ব স্ব স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালন চেষ্টায় মনোনিবেশ করিয়া ভক্তির দোহাই দিয়া ভোগপ্রচারে ব্যস্ত হইয়াছেন। যদি সত্য সত্যই তাঁহারা সাধুসঙ্গী ও শ্রবণ-ভক্তির আদর করিতেন তাহা হইলে শ্রীগুরুকৃপাবলে সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিতে পারিতেন এবং তৎফলে কৃষ্ণাকর্ষণ তাঁহাদের স্বাভাবিক হইত। তাহা না করিয়া বিষয়ী লোকের সহিত বিষয় কথার আলোচনায় বিষয় এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, যুক্তবৈরাগ্য তো দূরের কথা, যুক্তকর্ম্ম পর্য্যন্ত পরিহার করিয়া স্বয়ং কৃষ্ণকলেবর শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীহরিনামকে তাঁহারা অর্থোপার্জ্জন যন্ত্র বা পূজ্যবস্তুকে সেবকসূত্রে গ্রহণ করিয়াছেন। আর কতকগুলি বংশ মর্য্যাদা তাহাদের এ কুপ্রবৃত্তির বেশ সহায় হইয়াছে। সেগুলিও তাহাদের সেবক। একদিন এক শৃগাল ভ্রমণ করিতে করিতে নীলের গামলার ভিতর পড়িয়া গিয়া শরীর বিবর্ণ হওয়ায় প্রথমতঃ বড় দুঃখিত হইল ও পরে ভাবিল 'বনে গেলে স্বজাতিসকল কি মনে করিবে।' ইহা মনে করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে যেই বনের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, অমনি সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক শৃগাল এই অপূর্ব্ব পশু দর্শনে ভয়ে পলায়ন-উদ্যত। শৃগাল মনে করিল—বাঃ এ'ত ব্যাপার মন্দ নহে, ভালই হইয়াছে। তখন শৃগাল বলিল, 'ওহে, তোমরা আমাকে দেখিয়া ভয় পাইতেছ কেন, ভগবান্ আমাকে পাঠাইয়াছেন; কারণ পশুর মধ্যে কোন প্রধান নাই, তজ্জন্য পশুসমাজ বড়ই বিশৃঙ্খল হইয়াছে, তজ্জন্য আমি আসিয়াছি, তোমাদের কোন ভয় নাই, আমার আদেশ অনুসারে কার্য্য কর।' বোকা পশুগুলি আপাততঃ তাহাকে না চিনিতে পারিয়া মোড়লের ন্যায় ভক্তি করিতে লাগিল। সত্য বেশীদিন গোপন থাকে না। এখানে আর একটী কথা এই যে

প্রত্যেক বস্তুই যেন অসংখ্য বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করিয়া ক্রমবিকাশ লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছে, সেই অপ্রতিহত গতি কেহ চাপিয়া রাখিতে পারে না, ভিতরের ভাবগুলি যেন প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে। তাই শৃগাল একদিন সভাসদ্ লইয়া বসিয়া আছে অমনি সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাহার স্বজাতিসকল চিৎকার আরম্ভ করিলে আহ্লাদে শৃগালও আত্মবিস্মৃত হইয়া তাহাতে যোগদান করিয়া বসিল, তাহাতে পশুরা চিনিতে পারিয়া তাহাকে বন হইতে তাড়াইয়া দিল।

সেইরূপ কতকগুলি ভোগী বা বদ্ধ জীব চতুর্দ্দশভুবন ভ্রমণ করিতে করিতে কোন গতিকে উপাধির ভিতর পড়িয়া গিয়া প্রথমতঃ বড়দুঃখ প্রাপ্ত হইলেন। ভোগের কীর্ত্তনে আজ ভারত মুখরিত! ভোগী জীব ভাবে ফ্যান্সি চুল ছাঁটের বদলে মাথায় শিখাধারণ! হারের বদলে কণ্ঠে তুলসীকাষ্ঠ! তদুপরি গোপীপদরজ দ্বারা দেহ অঙ্কনে শরীরটাই বিশ্রী হয়েছে, তারপর স্ত্রীর চরণ-অর্চ্চন ছেড়ে দিয়ে, শ্রীবিগ্রহ-অর্চ্চন! আবার মনোজগতে যাইয়া দেখেন, সেখানেও উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা ভাবিবার অবসর নাই! কঠিন শ্রীমদ্ভাগবতে বিচারণপর হইয়া পঠনের আদেশ! চরমে আবার কিনা কায় বাক্ ও মন, তিনটীকে সম্পূর্ণ-ভাবে হরিসেবায় নিয়োজিত করিতে গিয়া ত্রিদণ্ড ধারণ করিয়া ভিক্ষুক আশ্রমে প্রবেশ! স্বজাতি ভোগিগণ কি মনে করিবে? সেই অবন্তীনগরের ভিক্ষুকের দুরবস্থার কথা ত' কিছু কিছু জানি। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে যখন সমাজের সম্মুখীন হইলেন, দেখেন বড় বড় কর্ম্মপ্রিয় কুঞ্জর-সিংহ-শরীরধারী ও ছোটখাট কর্ম্মপ্রিয় শৃগালাদি-শরীরধারী সকলেই ব্যতিব্যস্ত ও উদ্বেগ সহকারে পলায়নে উদ্যত! কারণ ইনি তো আমাদের ভোগবাসনা বিনষ্ট করিতে আসিয়াছেন বোঝা যাচ্ছে যে ইনি যার পরিবার ব'লে পরিচয় দেবেন তারা ত' এইরূপ জীবের ভোগ বাসনা নিরসন করিয়া গিয়াছেন। তখন তিনি সম্বোধন করিয়া বলিলেন— 'বাপুহে, তোমাদের ভয়ের কোন কারণ নাই। আমাকে ভগবান্ পাঠাইয়াছেন কেবল তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। তখন তাহারাও কিছু প্রাকৃত সম্মান দিয়া আচার্য্যের আসনে বসাইলেন। তখন তিনি বলিতে লাগিলেন, 'দেখ দেখি বাপু, তোমরা যে জন্য আমাকে ভয় করছিলে, তার একটীও আমি তোমাদের বলি নাকি?

ঐ যে তোমরা বুঝেছিলে মহাপ্রসাদ জাতিবিচার থাক্‌বে না ও বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধি থাক্‌বে না। তা' কেন হবে? এরূপ অন্যায় কথা আমরা প্রচার করব কেন? বৈষ্ণবের শ্রেণী কর—তুমি চাড়াল বৈষ্ণব, তুমি সাহা বৈষ্ণব, তুমি কায়েত বৈষ্ণব, তুমি ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব, একটী ভয়ত তোমার নিরাস হল? দ্বিতীয়তঃ তোমাদের ভয় যে আমাদের আশ্রয় নিলে ষষ্ঠী, মাকাল, ঘেঁটু পূজা করতে পার্‌বে না। তা' কেন হবে? সমন্বয়-বাদ! যে যাহা ইচ্ছা হয় কর। তবে বল্‌বে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সত্য কথা জগতে জানাবার জন্য অনেক আক্রান্ত হইয়াছিলেন, সে বাপু তাঁর দরকার ছিল, তিনি করেছিলেন, আমরা ত' আর কলারও চাকর নই, মূলারও চাকর নই, আমরা বাবুর চাকর।

আর একদফা তোমরা ভেবেছিলে আমাদের আশ্রয় নিলে তোমাদের কিছু সাধন ভজন করতে হবে, তা' কেন রে বাপু? আমরা একেবারে তোমাকে প্রয়োজন প্রাপ্তি করিয়ে দেবো! তবে আমি তোমাদের নিকট যা' হোক একটা নূতন পরিচয়ে পরিচিত হব, এই নাও সিদ্ধ প্রণালী, শ্রবণ কর রাসলীলা। তুমি বল্‌বে যে

ব্রজ-ভজনে অষ্টাদশটী প্রতিবন্ধক আছে, ও সব মিথ্যে কথা। কৃষ্ণের আবার জন্ম কি? আবার বলে, ব্রজে পূতনা এসেছিল! আমার ত' এ জ্ঞানের ভিতর পূতনা ফুতনা কিছু দেখিতে পাইতেছি না। আমাদের এ রাস্তার নাম হচ্ছে প্রাকৃত সহজিয়া—কোনরূপ বাধা প্রতিবন্ধক কিছু নাই ও সব আইন-কানুন বুঝদার লোকে বুঝে। মরুগ্‌গে, আমাদের অতয় কাজ কি? আমরা তৃণাদপি সুনীচ, তাই বলে ভোগে বাধা দিতে আস্‌লে আমরা ছাড়ি না, যার যেটুকু অস্ত্রশস্ত্র আছে নিয়ে বেড়িয়ে পড়ি। কেনরে বাপু তুমিও মানুষ আমিও মানুষ, তুমি বল্‌তে কে? পরস্পর বন্ধুর মত কাজ কর, তুমি যতটা পার আমার ভোগের সাহায্য কর, আবার আমিও তোমাকে সেইরূপ প্রতিদান করি, জগতের যেটী নিয়ম। এইরূপ কতকগুলি সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক প্রাকৃত বলের উপর নির্ভর করিয়া অপ্রাকৃত বস্তু অনুসন্ধান করিতে গিয়া বামনরূপী বিষ্ণুকে তিন পা ভূমি দান ক'রে পাতালে যাবার ব্যবস্থা করছেন।

তবে শুদ্ধভক্তের প্রতি ইহাদের দয়া আছে, যেহেতু স্বজাতিগণের আনন্দ- কীর্ত্তনে কখন কখন আত্মবিস্মৃতি হয়ে যোগদান ক'রে ফেলেন। তখন তাঁহারাও চিনিতে পারিয়া তেরটির একটী জ্ঞানে সঙ্গ বর্জ্জন করিয়া তাঁদের মঙ্গলের জন্য শ্রীগুরুর আনুগত্যে নিম্নলিখিত গাথা গান করিতে থাকেন।

মন! তুমি কিসের বৈষ্ণব?

প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জ্জনের ঘরে,
তব হরিনাম কেবল কৈতব।
জড়ের প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠা
জাননা কি তাহা মায়ার বৈভব।।
কনক কামিনী দিবস যামিনী
ভাবিয়া কি কাজ অনিত্য সে সব।
তোমার কনক ভোগের জনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।।
কামিনীর কাম নহে তব ধাম
তাহার মালিক কেবল যাদব।
প্রতিষ্ঠাশাতরু জড় মায়া মরু
না পেল রাবণ বুঝিয়া রাঘব।।
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা তাতে কর নিষ্ঠা
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব।
হরিজনদ্বেষ প্রতিষ্ঠাশা ক্লেশ
কর কেন তবে তাহার গৌরব।

বৈষ্ণবের পাছে প্রতিষ্ঠাশা আছে
তাত কভু নহে অনিত্য বৈভব।।
সে হরিসম্বন্ধ শূন্য মায়াগন্ধ
তাহা কভু নয় জড়ের কৈতব।
প্রতিষ্ঠাচণ্ডালী নির্জ্জনতা জালি
উভয়ে জানিহ মায়িক রৌরব।
কীর্ত্তন ছাড়িব প্রতিষ্ঠা মাখিব
কি কাজ ঢুঁড়িয়া তাদৃশ গৌরব।
মাধবেন্দ্র পুরী ভাবঘরে চুরি
না করিল কভু সদাই জানব।।
তোমার প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠা
তার সহ সম কভু না মানব।
মৎসরতাবশে, তুমি জড়রসে
মজেছ ছাড়িয়া কীর্ত্তনসৌষ্ঠব।।
তাই দুষ্ট মন নির্জ্জন ভজন
প্রচারিছ ছলে কুযোগী বৈভব।
প্রভু সনাতনে পরম যতনে
শিক্ষা দিল যাহ চিন্ত সেই সব।।
সেই দুটী কথা ভুলনা সর্ব্বথা
উচ্চৈঃস্বরে কর হরিনাম রব।
ফল্গু আর যুক্ত বদ্ধ আর মুক্ত,
কভু না ভাবিও একাকার সব।।
কনক কামিনী প্রতিষ্ঠাবাঘিনী
ছাড়িয়াছে যারে সেইত বৈষ্ণব।
সেই অনাসক্ত সেই শুদ্ধ ভক্ত
সংসার তথা পায় পরাভব।।
যথা যোগ্য ভোগ নাহি তথা রোগ
অনাসক্ত সেই কি আর কহব।

আসক্তি রহিত সম্বন্ধ সহিত
বিষয় সমূহ সকলি মাধব।।
সে যুক্ত বৈরাগ্য তাহাত সৌভাগ্য
তাহাই জড়েতে হরির বৈভব।
কীর্ত্তনে যাহার প্রতিষ্ঠাসম্ভার
তাহার সম্পত্তি কেবল কৈতব।।
বিষয় মুমুক্ষু ভোগের বুভুক্ষু
দুয়ে ত্যজ মন দুই অবৈষ্ণব
কৃষ্ণের সম্বন্ধ অপ্রাকৃত স্কন্ধ
কভু নহে তাহা জড়েতে সম্ভব।।
মায়াবাদী জন কৃষ্ণেতর মন
মুক্ত অভিমানে সে নিন্দে বৈষ্ণব।
বৈষ্ণবের দাস তব ভক্তি আশ
কেনবা ডাকিছ নির্জ্জন আহব।।
যে ফল্গু বৈরাগী কহে নিজে ত্যাগী
সে না পারে কভু হইতে বৈষ্ণব।
রাধা দাস্যে রহি ছাড়ি ভোগ অহি
প্রতিষ্ঠাশা নহে কীর্ত্তন গৌরব।।
ব্রজবাসী জন প্রচারক ধন
প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুক তাঁরা নহে শব।
প্রাণ আছে তাঁর সেহেতু প্রচার
প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণগাথা সব।।
শ্রীদয়িতদাস কীর্ত্তনেতে আশ
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।
কীর্ত্তন প্রভাবে স্মরণ হইবে
সেকালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব।।

জীব ও ব্রহ্ম

জীব কি তত্ত্ব—এ বিষয়ে অনেক মতবাদ প্রচলিত আছে। মায়িক ত্রিগুণমুগ্ধ ব্যক্তিগণ স্ব স্ব বৃত্তিতে তত্তদ্গুণাধিক্য প্রযুক্ত জীব বিচারে পরস্পর বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত। তামসিক, রজস্তমোযুক্ত, রাজসিক, সত্ত্বরজোযুক্ত ও সাত্ত্বিক ভেদে পঞ্চপ্রকার গৌণ প্রকৃতি জগতে বর্ত্তমান দেখা যায়। মনুষ্যগণ স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে জীবগত ধারণার বশবর্ত্তী হয়েন। তমোমিশ্র মতবাদে জীবের পরলোকাদি স্বীকৃত হয় না—"ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ"; ইঁহাদের দেহাত্মবুদ্ধি অত্যন্ত প্রবল, দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা জীবের নাশ লক্ষ্য করেন। রজোমিশ্র প্রকৃতিতে কর্ম্মফলে তত্তৎল্লোকপ্রাপ্তি বা যোগ প্রভাবে ঈশ্বর সাযুজ্য স্বীকৃত হয়। প্রাকৃত সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিতে গিয়া মনুষ্য ব্রহ্মসাযুজ্য স্বীকার করিয়া নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু হইয়া পড়েন। প্রাকৃত গুণের অধীন বিচারে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। যথার্থ বুদ্ধিমান্ জন এই গৌণ সিদ্ধান্তগুলিকে সিদ্ধান্ত বলিয়া সমাদর করিতে পারেন নাই। এই সকল মতবাদের কতকগুলি বেদ-বিরুদ্ধ, কোনটী বা বৈদিক ব্যবস্থার অনুবর্ত্তী হইলেও স্বীয় নিম্নাধিকার জন্য বেদবিহিত তত্ত্বনিরূপণে অসমর্থ। কোনটী বেদের একদেশ স্বীকার করিয়া সামঞ্জস্য বোধের অভাবে বেদের অন্য অংশ অস্বীকার করায় বেদলঙ্ঘন-জাত।

যাঁহাদের প্রবৃত্তি ত্রিগুণাতীত বা বিশুদ্ধসত্ত্বাশ্রিত তাঁহারা অপৌরুষেয় স্বয়ং শ্রীভগবৎপ্রদত্ত ব্রহ্মা নারদ ব্যাস শুক প্রভৃতি আম্নায়পারম্পর্য্যে অব্যাহতভাবে অবতীর্ণ বেদবিহিত নিরস্তকুহক সত্য-শ্রবণে শ্রদ্ধান্বিত এবং নির্গুণ মহাপুরুষের ভক্তিযোগে উপলব্ধ ও বেদোল্লিখিত সাত্বত পুরাণ-বিস্তৃত তত্ত্বগ্রহণে তৎপর। তাঁহারা শ্রীভগবানের সর্ব্বেশ্বরতা বা সর্ব্বশক্তিমত্তা, নিত্য চিদ্ঘন আনন্দময় বিগ্রহ এবং জীবের ভগবদ্-বিভিন্নাংশত্ব ও নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া ভগবানের নিত্য সেবায় নির্ম্মলভাবে অধিষ্ঠিত থাকেন। বুদ্ধিমান্ জন তাঁহাদের আশ্রয় লইয়া সেই ভাব সাধন করিতে করিতে নির্গুণ বৃত্তিতে অধিষ্ঠিত হইবার যোগ্যতা লাভ করেন।

প্রাকৃত গুণাধিকারে জড়ধারণাই প্রবল, তমোভাবে অত্যন্ত স্থূল, রজোভাবে কিয়ৎপরিমাণে সূক্ষ্মতা-প্রাপ্ত। আর সত্ত্বভাবে ব্যতিরেকমুখে তৎসংশ্লিষ্ট। তমে নাস্তিক্য বুদ্ধি, রজে মিশ্র আস্তিক্য বুদ্ধি ও সত্ত্বে আস্তিক্যাভাস বুদ্ধিই পরিলক্ষিত হয়। এই আস্তিক্যাভাস বুদ্ধিতে জড়নিরসনরূপ জড়ীয় জ্ঞানের ব্যতিরেক আলোচনাই প্রবল। জড়ীয় বিচারে ভেদ প্রতীত হয় বলিয়া তদ্ব্যতিরিক্ত বিচারে ভেদ পরিত্যক্ত। এই শ্রেণীর চিন্তাশীল মনীষিগণ পরমার্থ বিচারে ভেদ নিরাস করিয়া জীব ও ব্রহ্ম অভেদ স্বীকার করেন, ব্রহ্ম সংজ্ঞায় বিভুতত্ত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত জীবকে স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদশূন্য উপলব্ধির উপদেশ করেন। এই অভেদবাদ বা বিবর্ত্তবাদ, পরিচ্ছিন্নবাদ ও প্রতিবিম্ববাদ এই দুই ধারায় বিভক্ত। পরিচ্ছিন্নবাদ মতে অবিদ্যা অধ্যায়ক্রমে মহাকাশ হইতে ঘটাকাশের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে জীবের ভেদ ভ্রম। খণ্ড বস্ত্র পরিচ্ছিন্ন হইতে পারে, যেমন একটী বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত বা পরিচ্ছিন্ন হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম ভূমা

বস্তু অখণ্ড তত্ত্ব, তিনি কিরূপে ঘটাকাশের ন্যায় পরিচ্ছন্ন হইয়া জীবরূপে ব্যক্ত হইতে পারেন? ইহা অসম্ভব। সুতরাং বন্ধ্যার প্রসূতিত্বের ন্যায় পরিচ্ছিন্নবাদের কোন মূল্য নাই। প্রতিবিম্ববাদেও তিনটী দোষ পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ ব্যাপক বস্তুর প্রতিবিম্ব হইতে পারে তাহার আধার কোথায়? যদি বিম্বের মধ্যে প্রতিবিম্ব হয়, তাহা হইলে আরোপিত তদ্বৃত্তত্ত্ব দোষ ঘটে। দ্বিতীয়তঃ বিবর্ত্তবাদ স্বীকৃত ব্রহ্ম নির্ধর্ম্ম, সুতরাং তাঁহার জ্যোতিঃ সম্ভবপর নহে, অতএব তাঁহার প্রতিবিম্বও অসম্ভব। তৃতীয়তঃ ব্রহ্ম তত্ত্ব ইন্দ্রিয়াগোচর, তবে তাহার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রতিবিম্ব কিরূপে স্বীকৃত হইতে পারে? বিবর্ত্তবাদ বেদের মাত্র একদেশপর বচন স্বীকার করায় বেদের সিদ্ধান্ত নহে।

এই কেবল-ব্রহ্মবাদ স্বীকারে বিবর্ত্তেরই বা স্থল কোথায়? বিবর্ত্ত কাহার? ব্রহ্মের? ব্রহ্ম বস্তুরই যদি বিবর্ত্ত বা ভ্রম হইল, তবে অভ্রান্ত তত্ত্ব কি? আর কিসে ব্রহ্মের ভ্রম ঘটাইল? সেটী ত' তাহা হইলে ব্রহ্ম হইতে অধিক তত্ত্ব—তাহা হইলে বেদের ''নতৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে'' বচনের স্থল কোথায়? ব্রহ্মত্ব বা বিভুত্ব থাকিল কোথায়? আর একটী তত্ত্ব স্বীকৃত হইলেই বা কেবলাদ্বৈত বা কেবল-ব্রহ্মবাদ টিকিল কৈ? স্বয়ংপ্রমাণ বেদবাক্যের ও তদনুগ ব্রহ্মসূত্রের মুখ্যার্থ ছাড়িয়া শব্দের অভিধা শক্তি স্বীকারের পরিবর্ত্তে লক্ষণা শক্তির আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক অপৌরুষেয় বেদের স্বয়ংপ্রমাণত্বের মূলে-কুঠারঘাত করিয়া তাহাকে আমাদের ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানগম্য বোধে শব্দের কষ্টকল্পনা-সাধ্য গৌণার্থ স্বীকার দ্বারা এরূপ বিবর্ত্তবাদ প্রচার করা, নির্গুণ বৃত্তির অনুশীলন নহে। এস্থলে শ্রুতির একটী বাক্যে এই গৌণার্থ-আরোপের উদাহরণ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা হইতেই পাঠকগণ তাঁহাদের মতবাদ স্থাপনে আগ্রহ জন্য মুখ্যার্থ আচ্ছাদনের প্রণালী কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারিবেন বলিয়া আশা করি। ঋঙ্ মন্ত্র— ''তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।''—এস্থলে 'বিষ্ণুর পদ' অর্থে তাঁহারা করিয়াছেন 'ব্যাপকের পদনীয় বা গমনীয় অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ, দেখুন কিরূপ অর্থ হইল? যখনই স্বমত স্থাপন জন্য আবশ্যক হইয়াছে তখনই এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। অন্যত্র ''প্রাজ্ঞ'' শব্দের অর্থ করিয়াছেন, 'প্র—প্রকৃষ্টরূপে, অজ্ঞ'। ব্যাখার ধারাটা বুঝুন। অবশ্য এইরূপ গৌণার্থ স্থাপন করিতে গিয়া তাঁহাদিগকে বিপুল পাণ্ডিত্যের প্রকাশ করিতে হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু এরূপ পাণ্ডিত্য অন্ধকার দ্বারা সরলার্থপরিস্ফুট প্রতিপাদ্যতত্ত্ব আবরণ করিয়া স্বীয় নিত্য মঙ্গললিপ্সু ব্যক্তির সর্ব্বনাশ সাধিত হয় নাই কি? কোথায় নিরস্তকুহক সত্য, আর কোথায় জড় পাণ্ডিত্য-বিজৃম্ভিত ভ্রান্ত মতবাদ! পাঠক মহাশয়, আপনি বিচার করিয়া দেখুন—আপনার কোন্‌টী প্রয়োজন।

কেবলাদ্বৈতবাদের আর একটী নাম মায়াবাদ, যেহেতু এই মতে জীব মায়া দ্বারাই পরিচ্ছিন্ন বা প্রতিবিম্বিত অনিত্য তত্ত্ব। আমরা পরে দেখিব যে বদ্ধজীব ভগবচ্ছক্তি মায়ার বশ্যতাপন্ন তত্ত্ব অর্থাৎ মায়াবশ, ইহা মায়াবাদ নহে; কেননা ইহাতে জীবের উৎপত্তিতে মায়ার সম্বন্ধ নাই। একটু পরেই এ বিষয় আলোচিত হইবে। এক্ষণে আমরা মায়াবাদের কথাই বলিতেছি। এই মতে ব্রহ্মকে নিষ্কল নির্লেপ, নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয় স্বীকার করিতেছে। যাহা পরিচ্ছিন্ন বা প্রতিবিম্বিত হইবার যোগ্য বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে, তাহাতে কি এইগুলি

প্রযোজ্য? মায়াকে ব্রহ্মলীলা প্রকৃতি বলিয়া স্বীকার করিলে কেবলাদ্বৈততার হানি হয় না ত'? আচ্ছা, বিচারের অনুরোধে তাহাও স্বীকার করিলে মায়ার কিরূপে সম্ভবপর? যদি বল, ব্রহ্মেচ্ছা মায়ার প্রবৃত্তি হেতু, তাহা হইলে ইচ্ছাময় ব্রহ্মের নির্ব্বিকারত্ব কোথায়? যদি বল মায়ারই ইচ্ছা তাহার কারণ, তবে নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের প্রতিদ্বন্দ্বী আর একটী তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়া কেবলাদ্বৈতবাদের কি দশা করিবে? আর মায়ার ইচ্ছাধীন ব্রহ্মের গৌরব বৃদ্ধি হইবে ত'? সরল যুক্তিতেই মায়াবাদের দাঁড়াইবার স্থল নাই।

যাঁহারা নির্গুণবৃত্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া নিরস্তকুহক সত্যের অবতরণ স্বীকার পূর্ব্বক কঠোপনিষদের ‘‘নায়মাত্মা” বচনের অনুসরণে পরম্পরাক্রমে অব্যাহতভাবে আনুগত্যধর্ম্মলক্ষিত সত্যের মূল শ্রীভগবান্ হইতে অবতীর্ণ ক্রমাগত গুরুপ্রণালী অবলম্বন করিয়া যোগ্য হইয়াছেন, তাঁহারা শ্রীভগবানের বেদোক্ত অচিন্ত্যশক্তি স্বীকার করিয়া তাহার পরিণামগত চিজ্জগৎ, জীবজগৎ ও জড়জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁহারা বেদের পরিস্ফুটার্থ বাক্যগুলির সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সকল গোল মিটাইতে সমর্থ হইয়াছেন ও জগতে অপরিভাব্য নিত্যসত্যের মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। ইহা কতকগুলি মতবাদের অন্যতম নহে। যথার্থ সত্য একাধিক হইতে পারে না, সুতরাং তত্ত্ব এক, তাহা কোন মতবাদ-সাপেক্ষ নহে। শ্রুতিতে ‘‘তত্ত্বমসি” ‘‘একমেবাদ্বিতীয়ং” প্রভৃতি যে সকল অদ্বৈতপর বাক্যের সঙ্গে সঙ্গেই ‘‘দ্বা সপর্ণা সযুজা” প্রভৃতি, ‘‘যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রাঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ” প্রভৃতি দ্বৈতপর বাক্যও দৃষ্ট হয়। উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা দ্বারাই বেদ-তাৎপর্য্য নির্ণীত হইতে পারে, অন্যথা নহে। তাহাতে নিত্যভেদ ও নিত্য অভেদ স্বীকার অনিবার্য্য। অর্থাৎ জীবের গঠনে মায়ার বা অচিতের কোন ক্রিয়া নাই, স্বরূপগঠনে জীবে ও ব্রহ্মে এক, কিন্তু বস্তু ও পরিমাণগত সত্ত্বায় পরস্পর নিত্য ভিন্ন। এটী অচিন্ত্য তত্ত্ব, প্রকৃতির অতীত তত্ত্বমাত্রই অচিন্ত্য। এই অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বটীই সমস্ত মতবাদ নিরাস করিয়া সকল প্রকার তত্ত্বেরই মীমাংসা করিতে যোগ্য, সুতরাং ইহাই এক সত্যের নির্ণায়ক। ব্রহ্ম (ভগবান্) শক্তিমান্ তত্ত্ব, ‘‘পরাস্যশক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে”। পরাশক্তির স্বীকারে একটী অপরাশক্তিও স্বতঃই স্বীকৃত হইয়া পড়ে। জীব শক্তিতত্ত্ব। ‘‘শক্তি-শক্তি- মতোরভেদঃ” স্বীকারেও শক্তি কিছু শক্তিমান্ তত্ত্ব নহে, সৌন্দর্য্য কিছু সুন্দর বস্তুটী স্বয়ং নহে। যুগপৎ ভেদ ও অভেদই স্বীকৃত হইয়াছে।

ব্রহ্ম বিভুচিৎ, জীব অণুচিৎ ভেদ ভিন্ন। বিভুচিৎ মায়াশক্তির অধীশ্বর অণুচিৎ তাহার বশ্যতাযোগ্য, আবার বশ্যতাপন্ন না হইতে পারে। সুতরাং জীব চিদধীন ও মায়াবশ উভয়ই হইতে পারে। এই জন্য জীবশক্তিকে তটস্থা আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। মায়াধীন ও মায়াবশ ব্রহ্মেও জীবে এই নিত্যভেদ বেদে স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। ‘‘যস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো (জীবো) মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ” প্রভৃতি। অদ্বৈতবাদী এমন একদেশদর্শী যে, এই সকল তাঁহার মতনাশক জানিয়া স্বীকার পর্য্যন্ত করেন নাই তিনি যে বৃহদারণ্যক শ্রুতি স্বীকার করিতেছেন তাহাতেও জীবের তটস্থ শক্তিত্ব স্ফুট। ‘‘তস্য বা এতস্য পুরুষস্য (চিদ্ধাম) সন্ধ্যং (সন্ধিস্থং) তৃতীয়ং স্বং। তস্মিন্ সন্ধ্যেস্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতীদঞ্চপরলোকস্থানঞ্চ।” জীব জড়জগতেরও যোগ্য, চিজ্জগতেরও যোগ্য। উভয়ের সন্ধিস্থল (তটপ্রদেশ) তাহার নিজ স্থান, তথা হইতে

চিদচিৎ উভয় জগৎই সে দেখিতে পারে, যেটীকে দেখিবে তাহারই অধীন হইয়া যাইবে। এই তাটস্থ্য ধর্ম্মজ্ঞাপক আরও বেদবচন আছে। "বালাগ্র-শতভাগস্য" ইত্যাদি শ্রুতিবচনে জীবে সূক্ষ্মত্ব স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। তাই মতবাদী মায়াবাদী শ্বেতাশ্বতরকে পরাশ্রুতি বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। ইহাতে তাঁহার সঙ্কীর্ণতাই ধরা পড়িয়া গিয়াছে। এই শ্রুত্যুক্ত "পরাস্য শক্তিঃ"ও তিনি অস্বীকার করিয়া নিঃশক্তিক সাজাইয়াছেন। অবশ্য প্রচলিত শ্রুতির মধ্যে বরাহোপনিষদাদি কয়েকটী শ্রুতি অপ্রামাণিক হইলেও শ্বেতাশ্বতরকে তাহাদের অন্তর্গত মনে করা স্বমত স্থাপন জন্যই প্রয়াস জানিতে হইবে।

চিজ্জড়ের সন্ধিস্থলে তটস্থাশক্তি প্রকটিত হইয়া চিজ্জগৎ ও অচিজ্জগৎ উভয়জগৎ দর্শনসমর্থ জীব যখন ভগবদুন্মুখ হইয়া চিদাকৃষ্ট হ'ন, তখন তৎফলে শ্রীবলদেবপ্রভু হইতে চিদ্বল প্রাপ্ত হইয়া ও চিজ্জগতের নিত্য ভগবৎপার্ষদরূপে নিত্য ভগবৎসেবারত থাকিয়া নিত্যমুক্ত, তাঁহাদের মায়াবশ যোগ্যতা একেবারে সুষুপ্ত থাকিয়া গেল। আর যে জীব চিদ্দর্শন না করিয়া ভগবদ্বিমুখ হইয়া মায়া- জগতে অভিনিবেশ করে, তখনই "নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে", সে মায়াকৃষ্ট ও মায়ামুগ্ধ হইয়া মায়াধীশ পুরুষাবতার কারণাব্ধিশায়ী কর্ত্তৃক জড়জগতে নিক্ষিপ্ত হয়। মায়িক কাল সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে তাহার এই বদ্ধদশা, তাই তাহাকে অনাদিবহির্ম্মুখ বলা হয়। জীবের বদ্ধতা এইরূপ সম্ভবপর হইতে পারে, মায়াধীশ ব্রহ্ম কিরূপে বদ্ধ হইতে পারেন?

আবার জড় পাণ্ডিত্যাভিমানী জীবের বদ্ধতা এতদূর প্রগাঢ় যে সে ভগবৎ- কৃপা ও ভগবদবতার পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে, শ্রীভগবন্মুখনিঃসৃত শ্রীগীতোপনিষৎ লঙ্ঘন করাই তাহার দুর্ভাগ্যজনিত বৃত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে মুখে বেদ মানি বলিয়া বেদের তাৎপর্য্য নষ্ট করাকেই মনের প্রধান কৃত্য মনে করিয়া দল বাঁধিয়াছে। ইঁহারা প্রচ্ছন্ন নাস্তিক, বৌদ্ধাদি স্পষ্ট নাস্তিক অপেক্ষা আরও ভয়ঙ্কর।

"বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয়ত নাস্তিক।
বেদাশ্রয়া নাস্তিক বাদ বৌদ্ধকে অধিক।।"

তাঁহারা এমনই অন্ধ যে বেদে স্পষ্ট অবতারতত্ত্ব বীজ বর্ত্তমান, তাহা দেখিতে পাইতেছেন না,—

"অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে বিশ্বস্য স্রষ্টাবমনেকরূপং।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ।।"

প্রভৃতি একাধিক অবতারসূচক বাক্য বেদাধীতী দেখিতে পাইবেন। ইঁহাদের অন্ধতা দেখিয়া চক্ষুষ্মানের দুঃখ হয়। কিন্তু উপায় নাই, অন্ধতাই তাঁহাদের বরণীয়। তবে তাঁহাদের হস্তে নিরীহ সরল ব্যক্তি যেন পতিত না হ'ন। তাঁহারা বেদে স্বীকৃত পুরাণ ইতিহাস স্বীকার না করিয়া বেদোল্লঙ্ঘনকেই ব্রত করিয়া তুলিয়াছেন। ভগবান্ তাঁহাদের সুবুদ্ধি অর্পণ করুন, আমাদের এই করুণ প্রার্থনা।

তত্ত্বাভাস

একদা কেশীতীর্থে জনৈক আচার্য্যের সহিত কোন এক সরলমতি যুবকের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। হংস যেরূপ দুগ্ধ হইতে তাহার জলীয়াংশ পরিত্যাগ করতঃ সারাংশ পান করিয়া থাকে, তদ্রূপ এই কল্যাণকর সংবাদপাঠে সারগ্রাহী ব্যক্তিগণ কুসংস্কার দ্বারা আচ্ছাদিত নিজ ভগবৎ-দাস্য-রূপ

১। আচার্য্য—আপনি কোথায় বসতি করেন?

যুবক—কৃষ্ণনগরে।

২। আ—কৃষ্ণনগর কোথায় অবস্থিত?

যু। ভারতবর্ষে।

৩। আ—ভারতবর্ষ কোথায় অবস্থিত?

যু। এশিয়া মহাদেশে।

৪। আ—এশিয়া কোথায় অবস্থিত?

যু। পৃথিবীতে।

৫। আ—পৃথিবী কোথায় অবস্থিত?

যু। সৌর জগতে।

৬। আ—সৌরজগৎ কোথায় অবস্থিত?

যু। সৌরজগৎ নক্ষত্রজগতে অবস্থিত।

আ—নক্ষত্রজগৎ কোথায় অবস্থিত?

যু। মানবগণ চক্ষুরাদি সাহায্যে নক্ষত্রজগৎ শূন্যব্যতীত অন্যত্র কোথায় জানেন না। তদ্ব্যতীত পদার্থ চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় গম্য নহে এবং আমিও তদ্বিষয়ের সংস্কার লাভ করি নাই। অতএব বর্ত্তমান প্রশ্নের সদুত্তর আপনিই দেন।

৭। আ—নক্ষত্র জগৎ চতুর্দ্দশভুবনাত্মক দেবীধামে অবস্থিত। এই দেবীধামের তত্ত্বজ্ঞান যাহারা প্রাপ্ত হন নাই, তাহারা নাস্তিক। তাহাদের মতে উৎপন্ন দেহে সমবায়ী কারণানুসারে জীবত্বের ভাব অকস্মাৎ সংঘটিত হয় এবং দেহের নাশে তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। এ কারণ তাহারা "যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ। ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।।" ইত্যাকার ধারণাবদ্ধ হইয়া থাকে।

কিহেতু যে মানবগণের উচ্চাবচকুলে উৎপত্তি সম্ভবপর হইতে পারে, তাহার চিন্তায় নাস্তিকগণ উদাসীন। চিন্তাশীল হইলে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল বর্ত্তমান জন্ম এবং বর্ত্তমান জন্মের কর্ম্মানুসারে ভবিষ্যৎ জন্মের স্বীকরণ যে অনিবার্য্য ইহা বুঝিতে পারিতেন এবং দেহের নাশে দেহীর নাশ হয় এরূপ ধারণার পোষণ করিতে প্রস্তুত হইতেন না। আত্মার নিত্যাবস্থিতি অস্বীকার হেতু তাহার উন্নতি- কল্পে উদাসীন হইয়া, আহার নিদ্রা ও মৈথুনাদিতে পশুবৎরত, নাস্তিকগণ প্রাকৃত নিয়মের বশে যে মৃত্যুর পর নিম্নযোনি প্রাপ্ত হয়, তাহা শাস্ত্রানুমোদিত।

যু। দেবীধাম কোথায় অবস্থিত?

৮। আ—দেবীধাম মায়া শক্তিতে অবস্থিত। যাহারা উর্দ্ধস্থ ভূ, র্ভুব, স্ব, মহঃ, জন, তপ ও সত্য এবং নিম্নস্থ তল, অতল, বিতল, সুতল, পাতাল, তলাতল ও রসাতল এই চতুর্দ্দশ ভুবনের অতীত রাজ্যের সংস্কার লাভ করেন নাই, তাহারা কর্ম্মী। কর্ম্মীগণের মতে, উচ্চলোকবাসী দেবতাগণের আরাধনা ও পুণ্য-কর্ম্মপ্রভাবে ভূলোকবাসী মানববৃন্দ দেহান্তে উচ্চ স্বর্গলোকে যাইয়া অপ্সরাদি সুন্দর সুন্দর ভোগ্যবস্তু সকল উপভোগ করিতে সমর্থ হয় এবং পাপাচরণে রত থাকিলে নিম্নস্থ সপ্তলোকে গমন করিয়া দণ্ডভোগ করিতে হয়।

কর্ম্মের স্বভাব এই যে একজাতীয় কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে উহা ফল প্রসব করে এবং ফলভোগকালে অন্য জাতীয় কর্ম্ম কৃত হয়, যাহা পুনরায় ফলোৎপাদন করিয়া থাকে। অতএব বীজাঙ্কুরবৎ অনাদি কর্ম্মপ্রবাহ অবিশ্রান্তভাবে চলিতে থাকে এবং তদ্ধেতু ব্রহ্ম, রুদ্র ও ইন্দ্রাদি পদ প্রাপ্ত উচ্চলোকবাসী জীবসমূহ, বহু জন্মার্জ্জিত পুণ্যপ্রভাবে লব্ধ স্বর্গাদিফল উপভোগকালে স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া পরস্পর কলহাদিরূপ পাপাচরণ করায়, পুণ্যক্ষয়ান্তে পাপাচরণ জনিত দণ্ড-ভোগার্থে পুনরায় নিম্নলোকে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ফলের অনিত্যতা-হেতু কর্ম্মমার্গ অত্যন্ত হেয় এবং কর্ম্মঠগণোপদিষ্ট পন্থায় কভু উচ্চ ও কভু নিম্ন লোকে বারংবার জন্ম অনিবার্য্য।

৯। যু—মায়াশক্তি কোথায় অবস্থিতা?

আ—মায়া শ্রীভগবানের বহিরঙ্গাশক্তি এবং তিনি শক্তিমান্ শ্রীভগবানেই অবস্থিতা। বহিরঙ্গা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ভগবৎ ধামের বহির্দ্দেশে মায়াশক্তি নিজ রাজ্য বিস্তারে সমর্থা। যখন কোন জীব ভগবৎবিমুখ হন, স্বীয় প্রভুর সেবা-সৌষ্ঠবের ক্ষতি হইতে পারে এই আশঙ্কায় সেবাপরায়ণা মায়াদেবী ক্রোধভরে তাহাকে অনতিবিলম্বে স্বরচিত চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক অনিত্য ফলপ্রদ ধামে আনয়ন করতঃ কারাকর্ত্রীর ন্যায় প্রলোভন দেখাইয়া একলোক হইতে লোকান্তরে যাইতে ও অশেষবিধ দুঃখ ভোগ করিতে বাধ্য করেন এবং অবশেষে যখন দেখেন যে তিনি পুনরায় ভগবৎ সেবাবুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সেবারত হইয়াছেন তৎকাল হইতে তাহার উপর আধিপত্য ছাড়িয়া দেন। পূর্ব্বোল্লিখিত ঐহিক ভোগাসক্ত নাস্তিকগণ এবং পারলৌকিক ভোগাসক্ত দেবতোপাসক কর্ম্মীগণ এতদুভয় প্রকারে মানুষবৃন্দই ভগবজ্ জ্ঞানবিহীন। তাহাদিগের মধ্যে ভোগের আশায়

ধাবিত হওয়ায় কেবল মাত্র ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করিতে হয় ইত্যাকার বুদ্ধি যদি কাহারও ভাগ্যে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি অক্ষজজ্ঞান প্রসূত নিম্নলিখিত কোন এক কাল্পনিক আরোহমার্গীয় পন্থানুসারে ত্রিতাপ উৎপাদিকা ভোগ বা ত্যাগার্থে যত্নশীল হন।

১। শূন্যবাদ—বৌদ্ধগণ এই মতের পোষক এবং তাহারা শূন্য হইতে জগতের উৎপত্তি স্বীকার করেন। সুখ ও দুঃখাবভাসক খণ্ড খণ্ড অনুভূতিগুলিকে লক্ষ্য করিয়া ইহারা জ্ঞানকে ক্ষণিকপদার্থ মনে করেন এবং বলেন যে চিত্তকে বৃত্তিশূন্য করিতে সমর্থ হইলে ত্রিতাপমূলক দুঃখ ও দুঃখের বীজ স্বরূপ সুখবোধাভাবরূপ নির্ব্বাণমুক্তি লাভ হইতে পারে।

নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ এই শাস্ত্রোক্তি হইতে জানা যায় যে, অসৎ বা শূন্য হইতে বস্তুর উৎপত্তি অসম্ভব। সম্ভবপর হইলে বালুকা হইতে তৈল নির্গত হইতে কেন দেখা যায় না? পুনশ্চঃ সুখদুঃখের জ্ঞানগুলিকে ক্ষণিকপদার্থ রূপে দর্শনকালে দ্রষ্টারূপ চেতনসাক্ষীর আবশ্যক। সেই সাক্ষীই নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মা যাহার অস্তিত্বের অস্বীকার কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে। অতএব শূন্য বাদ কল্পনা-প্রসূত ও অযৌক্তিক।

২।প্রকৃতি পুরুষবাদ—সাংখ্যগণ এই মতেরই পোষক এবং তাহারা বলেন যে, সমকেন্দ্র বিশিষ্ট গোলকের ন্যায় বহু চিৎগুণ বিশিষ্ট পুরুষ ও জড়া প্রকৃতিজাত পদার্থসমূহ জগতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহাদিগের ধারণানুসারে জড়পদার্থে আত্মাভিমান বশতঃ পুরুষের বন্ধন দশা এবং অসঙ্গোঽহয়ং পুরুষঃ ইত্যাকার জ্ঞানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে বন্ধনরাহিত্যরূপ মুক্তি লভ্য হয়।

অসঙ্গ পুরুষের প্রকৃতি সংযোগরূপ উক্তি সোনার পাথর বাটী সদৃশ অযৌক্তিক। সাংখ্য শাস্ত্রে উক্ত সংযোগের যুক্তিপূর্ণ কারণ বর্ণিত হয় নাই। যদি নির্হেতু উহা সংঘটিত হইয়া থাকে তাহা হইলে কল্পিত মুক্তির পরবর্ত্তীকালেও যে পুনরায় বন্ধন না হইবে তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? যখন দেখা যায় যে চেষ্টা সত্ত্বেও সামান্য সামান্য জাগতিক কার্য্য দৈব কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হয়, তখন নিজবলে বলীয়ান হইয়া দুস্তর প্রাকৃতিক সঙ্গপরিহারের জন্য সাংখ্যগণের যে যত্ন তাহা খঞ্জব্যক্তির গিরিলঙ্ঘন সম হাস্যাস্পদ ব্যাপার ভিন্ন কি বলা যাইতে পারে? শ্রীভগবান্ এই জন্য বলিয়াছেন, মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে অর্থাৎ যে তাঁহার শরণাপন্ন হয়, সেই মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পায়; অন্যে নহে।

৩। শক্তিবাদ—শাক্তগণ এই মতের পোষক এবং তাহারা বলেন যে, শক্তিই আদি তত্ত্ব। তাহাদের মতে কেহ অনিত্য রূপ ধন ও যশাদির প্রার্থী হইয়া এবং কেহ সাযুজ্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তির জন্য শক্তি দেবীর শরণাপন্ন হয়।

শূন্যে শক্তির অস্তিত্ব অনুভূতির বিষয় হয় না। ক্রিয়াশীল বস্তুর দর্শনে যেমন তদাশ্রিত শক্তির অস্তিত্ব অনুভব গোচর হইয়া থাকে, তদ্রূপ শক্তিকে আদিতত্ত্ব জ্ঞানে যাহারা পরিজ্ঞাত হইতেছেন তাহাদিগের ধারণাতে আধার সদৃশ শক্তিমানের অস্তিত্বজ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আশ্রিত পদার্থের অনুভবকালে আশ্রয় জাতীয় পদার্থের সদ্ভাব অবশ্যম্ভাবী। পুনশ্চঃ শক্তি ও শক্তিমান অভেদাত্মক পদার্থে এবং শক্তিমানের

ইচ্ছানুসারে শক্তি যখন ভিন্নরূপে পরিণতা হন, তখন উহা দৃশ্যাকারে সজ্জিতা হইয়া শক্তিমানের তৃপ্তি বিধান করিয়া থাকেন। অতএব দৃশ্যজাতীয়শক্তি আছেন ও সাক্ষীস্বরূপ দ্রষ্টা নাই, ইহা অদার্শনিক উক্তি মাত্র। অপিচ শাক্তদিগের প্রার্থনাবলীর প্রতি শব্দে আত্মসুখ কামনা স্পষ্টাক্ষরে সংযোজিত আছে এবং দেবীও যে প্রসন্না হইয়া উপাসকদিগকে নশ্বর কাম বস্তু সকল প্রদান করিয়া থাকেন তাহা শাক্ত শাস্ত্রে বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ আছে। বাদামগুলিকে অন্য যন্ত্রাদির সাহায্যে ভাঙ্গিয়া শ্রীশালগ্রাম দেবের ভোগার্থে নিবেদন করিলে ভক্তিলতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু শ্রীশালগ্রাম শিলার দ্বারা উক্ত বাদাম সমূহকে ভাঙ্গিয়া নিজে খাইলে কিরূপে ঐকার্য্য ভক্তির অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ হইতে পারে, তাহা শাক্তগণই বুঝেন। ভক্তহৃদয়ে উহা অপরাধ বর্দ্ধক ব্যাপার বিশেষ বলিয়া প্রতিভাত হয়। অহৈতুকী ভক্তির মূলদেশে যে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি বাঞ্ছার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা অবস্থিতা তাহা শাক্তগণ ত' অবগতই নহেন, পরন্তু তাহাদিগের শক্তিদেবীরও যিনি অবাধে গরল সদৃশ অনিত্য বসতু-সকল তদীয় অজ্ঞসাধকদিগকে প্রদান করিয়া থাকেন, জানে না; যেহেতু একজন সামান্য মানবকেও কদাপি অজ্ঞ শিশুর বদনাভ্যন্তরে প্রার্থনাসত্ত্বে বিষপ্রদান করিতে দেখা যায় না। অতএব একাশক্তিকে আদিতত্ত্ব ও অনিত্য বস্তুর প্রদাতা স্বীকার করা হেতু শাক্তমত কল্পিত ও যুক্তিবহির্ভূত। তাহাদিগের শক্তিতত্ত্ব হয় অশ্ব ডিম্বের ন্যায় বস্তুশূন্য বিকল্প; না হয় কর্ম্মীগণের আরাধ্য কোন দেবতার নামান্তর মাত্র; অর্থাৎ ঈশ্বরী পদবাচ্য হইবার সম্পূর্ণরূপে অযোগ্যা।

য—ভগবান্ কোথায় অবস্থিত?

১০। আঃ— "ঈশ্বর পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণং।।"

অর্থাৎ দ্বিভুজ মুরলীধারী শ্যামবর্ণ শ্রীকৃষ্ণই সচ্চিদানন্দঘন ভগবান্। তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ। স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ও সকল কারণের কারণ বিধায় তাঁহার আদিতে আর কিছুই থাকিতে পারে না। তাঁহা হইতে চিদচিৎ সৃষ্ট হইয়াছে। এ কারণ তিনি চিদচিদ তত্ত্ব হইতেও পৃথক্। তদীয় অন্তরঙ্গাশক্তি রচিত পরব্যোম, তন্মধ্যবর্ত্তী নিত্যচিদ্ধামে তিনি সদাকাল বিরাজমান। তাহার সেবার্থে অন্তরঙ্গা- শক্তি কর্ত্তৃক নিত্য চিৎপরিকর ও সেবোপকরণ রূপ নিত্য চিৎপদার্থ সকল গঠিত হইয়াছে। ভগবত্তত্ত্বে ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য পরাকাষ্ঠা রূপে বিকসিত এবং এই ত্রিবিধ ভাবকে আস্বাদন যোগ্যকরণোদ্দেশে ভগবদ্ধামে তিনটী প্রকোষ্ঠ নির্ম্মিত হইয়াছে। মাধুর্য্য-প্রধান শ্রীকৃষ্ণরূপে গোলোক বৃন্দাবন নামক প্রকোষ্ঠ, ঔদার্য্যপ্রধান দ্বিভুজ দণ্ডকমণ্ডলুধারী গৌরবর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে নবদ্বীপাখ্য প্রকোষ্ঠে এবং ঐশ্বর্য্যপ্রধান চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্যামবর্ণ শ্রীনারায়ণরূপে দ্বারকাভিধ প্রকোষ্ঠে তত্তৎভাবোদ্দীপক পরিকরগণ সহ নিত্যলীলারসাস্বাদনে প্রমত্ত। অচিৎ বা বহিরঙ্গা শক্তিজাত অনিত্য পদার্থপ্রসূ-জড়ব্যোমস্থ দেবীধাম, অন্তরঙ্গা শক্তিজাত নিত্য চিৎপদার্থ সমন্বিত ভগবদ্ধামের বহির্দ্দেশে অবস্থিত এবং তদুভয় ধামের সন্ধিস্থলে বিরজানাম্নী নদীপ্রবাহিতা। সম্পূর্ণরূপে অনর্থ বা বিষয়াসক্তিশূন্য না হওয়া পর্য্যন্ত বিরজা নদীর উপরিস্থিত ভগবদ্ধামে জীবগণ প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত

হয় না। ভগবানের তটস্থা শক্তিজাত চিৎকণ জীবগণ স্বতন্ত্রতা- প্রযুক্ত নিত্য ও অনিত্য উভয়ধামে বিচরণ করিবার যোগ্যতা-বিশিষ্ট। চিৎশক্তিজাত নিত্য পরিকরগণ ও তটস্থা শক্তিজাত জীবগণের মধ্যে প্রভেদ এই যে, মায়া কেবল মাত্র ভগবদ্ধামের বহির্দ্দেশে ক্রিয়াশীল বিধায় নিত্যপরিকরগণকে বিমোহিত করিতে অক্ষম এবং উভয়ধামে বিচরণ যোগ্যতা থাকা হেতু মুগ্ধ করিতে উভয়ধামের সন্ধিস্থলে অবস্থিত তটাখ্যা শক্তিজাত জীবগণকে মুগ্ধ করিতে সমর্থ। স্বতন্ত্রতা শক্তির অপব্যবহার দ্বারা যদি কোন জীব ভগবৎ-সেবায় বিরত হন, তৎক্ষণাৎ ভগবদ্দাসী মায়া তাহাকে অনিত্যধামে আনয়ন করতঃ, সেবকভাবের স্বরূপকে অনিত্য স্থূল ও সূক্ষ্মদেহদ্বয় দ্বারা তাহার চিৎকণ স্বরূপকে আবৃত করিয়া, ভোক্তা সাজাইয়া অনিত্য বস্তুর উপভোগার্থে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। অবশেষে যখন নানাপ্রকার দুঃখসম্ভোগান্তে সেই ব্যক্তিকে স্বতন্ত্রতা শক্তির সদ্ব্যবহার দ্বারা পুনরায় ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইতে দেখেন, সেই সময় হইতে মায়াদেবী আর তাহাকে পূর্ব্বের ন্যায় মোহিত করেন না; কারণ তিনি ভগবদ্দাসী এবং ভগবদ্বিমুখ জীবগণকে দণ্ডদ্বারা সংশোধিত করণের ভার তাঁহারই উপর বিন্যস্ত। বহিরঙ্গা মায়া শক্তির উদ্দেশ্যানভিজ্ঞ জীবগণ যে তাঁহাকে ঘৃণ্যতত্ত্ব বিশেষ মনে করেন ও তাঁহার নাম শ্রবণ মাত্র শিহরিয়া উঠেন তাহা তাহাদিগের দুর্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।"
"ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।।"

অর্থাৎ তত্ত্ববিদ্‌গণ যাঁহাকে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব কহেন, দর্শনের তারতম্যানুসারে তাঁহাকেই কেহ ব্রহ্ম, কেহ পরমাত্মা ও কেহ ভগবান্ এই শব্দ দ্বারা অভিহিত করেন।

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা।"
"যঃ আত্মান্তর্য্যামীপুরুষঃ ইতি সোহস্যাংশবিভবঃ।"
"ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণঃ যঃ ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং।
"ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।।

অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানই শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্ম তাঁহার অঙ্গজ্যোতিঃ এবং পরমাত্মা তাঁহার অংশ বিভূতিমাত্র।

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
"অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্।।
"যয়া সম্মোহিতো জীবঃ আত্মানং ত্রিগুণাত্মকং।
"পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে।।
"অনর্থোপশমং সাক্ষাৎ ভক্তিযোগমধোক্ষজে।।

অর্থাৎ ভক্তিযোগদ্বারা হৃদয়মল সম্যগ্‌রূপে বিদূরিত হইলে শ্রীব্যাসদেবও ভগবানকে পূর্ণরূপে পরিকরবর্গ সহ লীলা-পরায়ণরূপে দর্শন করিলেন। আরও দেখিলেন যে, ভগবানে অবহেলিত রূপে অবস্থিতা মায়াশক্তি

ভগবদ্ধামের বহির্দ্দেশে বদ্ধ জীবদিগকে মুগ্ধ করিতেছেন, তাহারা মায়া-বিমোহিত হইয়া আপনাদিগকে ত্রিগুণাত্মক রূপে (জন্ম, স্থিতি ও মৃত্যুর অধীন) ও মায়িক কার্য্যকে নিজ কার্য্যরূপে বোধ করিতেছেন এবং অবশেষে অধোক্ষজ ভগবানের সেবায় রত হওয়ায় অনর্থশূন্য হইয়া যাইতেছেন। উপরিউক্ত শ্লোকগুলি হইতে দেখা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণকে পরতত্ত্বরূপে যাহারা অবগত হইয়াছেন, তাহারা সম্যক বা সর্ব্বদর্শী এবং তাঁহার সচ্চিদানন্দঘন শ্রীমূর্ত্তি দর্শনকালে কেবল চিৎপ্রভারূপ ব্রহ্মের ও চিদ্‌গুণযুক্ত বিশিষ্টাকার রহিত সন্মাত্ররূপ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার অনিবার্য্য বিধায় তাহাদিগকে একদেশ-দর্শী কহিতে পারা যায় না। নাস্তিক, কর্ম্মী, শাক্ত, বৌদ্ধ ও সাংখ্যগণ চিৎপদার্থের অনসুন্ধান লাভে অসমর্থহেতু তাহারা তত্ত্বদর্শন বিহীন মানবগণের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু চিত্তত্বের ইঙ্গিতপ্রাপ্ত ব্রহ্ম ও পরমাত্মবাদীগণ, শুদ্ধমহাভাগবতের সঙ্গাভাবে এবং ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনা না থাকাহেতু সৎ চিৎ ও আনন্দরূপ শক্তিত্রয় বিশিষ্ট শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি দর্শনে অক্ষম, অতএব তাহারাই প্রকৃতপক্ষে একদেশ-দর্শী। একদেশ দর্শীগণ যদি নিজ দুর্ব্বলতা স্বীকার করতঃ ভক্ত্যঙ্গানুশীলনে যত্নশীল হন, তাহা হইলে ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক তাহাদিগের নিকট স্বীয় মূর্ত্তি ব্যক্ত করিতে পারেন; কিন্তু গর্ব্বিত হইয়া যদি বিবেচনা করেন যে তাহারা সম্যক তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ভগবৎ শ্রীমূর্ত্তিতে অসূয়াপরবশ হন, তাহা হইলে উত্তরোত্তর ভগবৎ চরণে অপরাধী হইতে থাকেন। অপরাধ-হেতু যাহারা ব্রহ্মধাম পর্য্যন্ত গমন করিতে সমর্থ হন নাই, তাহারা মায়ার দ্বারা বিতাড়িত হইয়া পুনরায় বাহ্য বিষয়ে অধিকতর আসক্ত ও ক্রমশঃ অধোগতি প্রাপ্ত হইতে থাকিবেন এবং যাহারা তীব্র বৈরাগ্য আশ্রয়পূর্ব্বক ব্রহ্মধামে গমন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহারা তত্রস্থ ব্রহ্মতেজ দ্বারা অভিভূত হইয়া জ্ঞান জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ভাব বিবর্জ্জিত অব্যক্ত প্রকৃতিতে লীন হইবেন ও প্রলয়ান্তে যখন পুনঃ সৃষ্টির আরম্ভ হইবে সেই সময় তাহারা পুনরায় মর্ত্ত্যধামে আগমন করতঃ নবানুরাগে বিষয় ভোগে প্রমত্ত হইবেন। শাস্ত্র বলিতেছেন ঃ—

"যেঽন্যেরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃত-যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ।।"

অর্থাৎ যাহারা শ্রীভগবানের মূর্ত্তিকে অবমানন করিবেন, তাহারা শুদ্ধবুদ্ধিবিশিষ্ট হইতে না পারায় অতি কষ্টে পরম পদরূপ ব্রহ্মধামে গমন করিয়াও অধঃপতিত হইবেন।

একদেশদর্শীগণের সিদ্ধান্ত যে দোষযুক্ত, তাহা ক্রমশঃ প্রদত্ত হইবে—

(১) ব্রহ্মবাদ—জগতের অনিত্যতা দর্শনে এই মতে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে রজ্জুতে সর্পবৎ চিৎপদার্থরূপ ব্রহ্মে জগৎবোধ আরোপিত হইয়াছে এবং নেতি নেতিরূপ বিচার দ্বারা আরোপিত ভাব বিনষ্ট হইলে চিন্মাত্র ব্রহ্মজ্ঞান অবশিষ্ট থাকে। অতএব ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের অভাবে জীবও ব্রহ্ম।

খণ্ডন ঃ—ত্রিগুণের সাম্যাবস্থায় জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রূপ ত্রিপুটীর অভাব হইয়া থাকে এবং যেহেতু ঐ সাম্যাবস্থা ব্যক্তপ্রকৃতির মূল বা অব্যক্তাবস্থা, তজ্জন্যই উহা স্থূল জড়পদার্থের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিণাম বা নির্ব্বিশেষ অবস্থা মাত্র। বিশিষ্টভাব-নিরোধক ব্যতিরেকমুখী চিন্তনপ্রণালীর দ্বারা কেবলমাত্র চিদ্‌বৃত্তির সাহায্যে

ধ্যানাদিযুক্ত হইলে চিত্ত বাহ্যবিষয়ের স্থূলাকার পরিত্যাগ করতঃ বিরজা নদীর উপরিস্থিত ব্রহ্মজ্যোতির দ্বারা অভিভূত হওয়ায় শক্তিমানের সহ একীভূত ভাবে অবস্থিতা অব্যক্তা প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়। ''যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'' এই শ্রুতি বাক্যানুসারে অসীম ব্রহ্মবস্তুকে জানিতে উদ্যত হইলে মন তাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে থাকে এবং বিক্রমশূন্য হইয়া অজ্ঞেয়রাজ্যে প্রবেশ করে অর্থাৎ অব্যক্তা প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়। তজ্জন্যই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—''মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে'' অর্থাৎ ''আমি ব্রহ্ম'' ইত্যাকার অসৎ ভাবকে পদদলিত করিয়া ''আমি অতি দুর্ব্বল সেবক এবং যড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবান্ আমার নিত্যপ্রভু'' এইপ্রকার ভাবকে আলিঙ্গন করতঃ যিনি দুষ্পারা মায়াপার হইবার মানসে ভগবানের শরণাপন্ন হইবেন, তিনি পরব্যোমস্থ জ্যোতিঃ কর্ত্তৃক অভিভূত না হইয়া ভগবৎকৃপায় তাহার দর্শন ও সেবা করিতে সমর্থ হইবেন। অতএব অনুমান শক্তিবলে কল্পিত ''আমি ব্রহ্ম রূপ অতাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত অশ্ব ডিম্বের ন্যায় বস্তুহীন শূন্য-বোধাত্মকভাব মাত্র, নরকের দ্বার স্বরূপ ও বিষকুম্ভ পয়োমুখবৎ গ্রহণযোগ্য নহে।

(২) পরমাত্মবাদ—এই মতে সৎ ও চিৎ নামক উভয়শক্তির এক যোগে ব্যতিরেকমুখে চিন্তন কার্য্য হইয়া থাকে এবং তদ্ধেতু জীবাত্মা ও পরমাত্মার অংশাংশিরূপ পৃথক্ পৃথক্ সত্তার জ্ঞান উদ্ভাসিত হইয়াছে। পরমাত্ম-বাদিগণ বলেন যে (১) মহাভূতাদি পরমাণুরূপে নিত্য অবস্থিত হইয়াও যেমন পৃথক্ পৃথক্ খণ্ড পদার্থাকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ ওতঃপ্রোতভাবে সর্ব্বত্র পরিপূর্ণরূপে বিরাজিত এক অখণ্ড, নিষ্ক্রিয় ও নির্ব্বিকার বুদ্ধ্যেকগম্য চেতন বিশিষ্টভাববর্জ্জিত সত্তা বা পরমাত্মাতে পৃথক্ পৃথক্ খণ্ডাকারে দৃশ্যমান পদার্থসমূহ অংশরূপে ভাসিতেছে এবং (২) অংশী পরমাত্মার গুণ অংশ স্বরূপে বর্ত্তমান থাকায় জীবগণও তত্ত্বতঃ চক্ষুরাদিগম্যস্থূলাকারশূন্য, নিষ্ক্রিয় ও নির্ব্বিকার সচ্চিদাত্মক পদার্থবিশেষ এবং অবিদ্যাজাত বাসনাজাল ছিন্ন করতঃ নির্ব্বিকল্প সমাধিযোগে আত্মহারার ন্যায় ধ্যেয়পরমাত্মাকারমাত্র ভাসমানরূপ অখণ্ড ধ্যানে যখন নিযুক্ত হইবেন, সেইকালে স্বরূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবেন ও দেহাত্মবোধ শূন্যরূপ মুক্তিলাভ করিবেন।

খণ্ডন—ধ্যাতার জ্ঞান যখন থাকিবে না, তৎকালে ধ্যেয় বস্তু মাত্র থাকিবে এরূপ ধারণা অযৌক্তিক; কারণ, ধ্যেয়রূপ সম্বন্ধ ধ্যাতাকে লক্ষ্য করিয়া বর্ত্তমান থাকে এবং ধ্যাতার অভাবে, সম্বন্ধশূন্য হওয়ায় ধ্যেয়ত্ব-ভাবের জ্ঞান বিনষ্ট হইবে ও ধ্যান কার্য্যও স্থগিত হইয়া যাইবে। অনুমান শক্তির সামর্থ্যে ঐরূপ কাল্পনিক ধারণা, অশ্বডিম্ববৎ, মানসপটে ক্ষণকালের জন্য অস্ফুটভাবে স্থান প্রাপ্ত হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে চিত্ত ধ্যাতার ভাব পরিত্যাগ কালে ধ্যেয়ও ধ্যানের ভাবদ্বয়কেও যুগপৎ বিসর্জ্জন করতঃ ত্রিপুটী রাহিত্যে অব্যক্তা প্রকৃতিতে লীন হইতে বাধ্য হইবে। অতএব পরমাত্মবাদীগণের পরিণাম-ভূমিকা ব্রহ্মবাদিগণের তুল্যজাতীয় বিবেচনা করাই সমীচিন। ক্রিয়াশক্তির অনুশীলন না থাকায় ব্রহ্ম ও পরমাত্মবাদিগণের চিন্তন কার্য্য ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হইবে এবং যখন উহা সম্পূর্ণরূপে স্তব্ধ হইয়া যাইবে, সেই কালে সুষুপ্তির দশার আগমনে নিজাস্তিত্ব পর্য্যন্ত অনুভব করিতে অসমর্থ হইবেন এবং সুষুপ্তির অবসানে পুনঃ জাগরিত হইয়া পূর্ব্ব

কুসংস্কারানুসারে তাহারা যে ব্রাহ্মীস্থিতি বা পরমাত্ম সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, এরূপ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইবেন। ভক্তগণ সৎ, চিৎ ও ক্রিয়ারূপ ত্রিশক্তির অনুশীলন একযোগে করিয়া থাকেন এবং তজ্জন্য তাহারা উক্ত ত্রিশক্তির পূর্ণবিকাশ ভূমিকায় পরিকরবর্গসহ লীলাপরায়ণ শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভে ও পরাকাষ্ঠা-সেবাপরায়ণ গুরুবর্গের অধীনতায় শ্রীভগবানের সেবা করিতে সমর্থ হন।

যু—জীবগণ কেন ভগবৎনিষ্ঠার পরিবর্ত্তে ইতরনিষ্ঠাসম্পন্ন হইয়া থাকেন?

১১। আ—তটস্থা শক্তিজাত জীবগণ অনাদিকাল হইতে ভগবদ্বিমুখ। "জীব নিত্য কৃষ্ণদাস ইহা ভুলি গেল। সেই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল।।" ভগবদ্বিমুখতার সঙ্গে সঙ্গেই জীবের বুদ্ধি মায়া কর্ত্তৃক অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে। অজ্ঞানাবরণের ভিতর দিয়া বদ্ধজীবের বুদ্ধিশক্তির বিকাশ হওয়ায় অজ্ঞানসহচর ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব দ্বারা কলুষিত হয় এবং তন্নিমিত্ত তাহারা যে সমুদায় সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন, তাহাতে সিদ্ধান্ত- হানিরূপ দোষ বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং বদ্ধজীবের যাবতীয় চেষ্টা ভ্রান্তিপূর্ণ। শাস্ত্রীয় ভাষায় ভ্রান্তিপূর্ণ চেষ্টাবিশিষ্ট ব্যক্তিকে অক্ষজজ্ঞানী কহে। দৃশ্যাদৃশ্য পদার্থসমূহ বস্তুতঃ যাহা, তত্তৎরূপে অবগতি যদ্দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহাকে তত্ত্বজ্ঞান শব্দ দ্বারা অভিহিত করা হয়। এই তত্ত্বজ্ঞানের নামান্তর অধোক্ষজ সেবা-জ্ঞান—যাহার উদয়ে অক্ষজজ্ঞান ক্রিয়া প্রকাশে সমর্থ হয় না। অধোক্ষজ-সেবা-জ্ঞানলব্ধ ব্যক্তিগণ অক্ষজজ্ঞাননিষ্ঠ ইতর সেবার পরিবর্ত্তে ভগবৎসেবায় প্রবৃত্ত। ভগবৎসেবাবুদ্ধি লাভ করিবার প্রণালীকে অবতরণবাদ কহে। অবতরণমার্গে কৃপা শ্রীভগবান হইতে গুরু-পরম্পরাক্রমে নিম্নে নামিয়া আসেন এবং সুকৃতিশালী ব্যক্তির গ্রহণযোগ্য হন। যাহারা উক্ত কৃপাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহারাই অধোক্ষজ-সেবাবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়াছেন, অন্য সবই অক্ষজজ্ঞানী। অক্ষজজ্ঞানিগণ যে প্রণালীতে তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, তাহাকে আরোহণমার্গ কহে। আরোহবাদিগণ কামনার দ্বারা চালিত হন এবং তজ্জন্য কর্ম্ম বা জ্ঞানবিদ্ধা ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। অধোক্ষজ সেবানিষ্ঠ শুদ্ধভক্তির অভাবে আরোহবাদিগণ কামনার পূতিগন্ধহেতু পথভ্রষ্ট হইতে বাধ্য হন ও পতিত হইয়া পুনঃ বিষয়ভোগে প্রমত্ত হইয়া থাকেন। অতএব নিঃশ্রেয়সপ্রদ অহৈতুকী শুদ্ধভক্তিই মানবজীবনের চরম প্রয়োজনীয় বিষয় দৃঢ় যত্নসহকারে শুদ্ধ মহাভাগবতের সঙ্গলাভ ও তাঁহার চরণে বিক্রীত হওয়াই বদ্ধজীবের প্রাথমিক প্রয়োজন।

যু—আহা! আজ আমি ধন্য হইলাম। আপনি আমাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করুন। জীবনের দীর্ঘকাল বৃথা অতিবাহিত হইয়াছে। আপনার দর্শনলাভের পূর্ব্বে যদি আমার মৃত্যু হইত, তাহা হইলে আমাকে পুনরায় চৌরাশীলক্ষযোনি ভ্রমণ করিতে হইত! উঃ! ভয়ানক ব্যাপার! সামান্য এক জীবন মাত্র কাল ব্যর্থ সুখসম্ভোগে মত্ত থাকায় চৌরাশী লক্ষজন্ম ব্যাপী দুঃখ ভোগ করিতে হয়, এই কথা শুনিলে আর ভোগেচ্ছা রক্ষা করা যায় না। তাই বলি, হে বদ্ধজীবগণ! "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" আর বৃথা ঘুমাইও না।

শ্রীবিগ্রহ

মানবের দ্বিবিধ প্রতীতি বা দর্শন—অবিদ্বৎপ্রতীতি ও বিদ্বৎপ্রতীতি। অবিদ্বৎ-প্রতীতিতে অবিদ্যা বা মায়া-বৃত্তির সংস্পর্শ বিদ্যমান। বিদ্বৎপ্রতীতি সম্পূর্ণ মায়া-সংস্পর্শ নির্ম্মুক্ত এবং বিদ্যা বা সৎস্বরূপের প্রভাবান্বিত বলিয়া অতীন্দ্রিয় অধোক্ষজ অমলজ্ঞানের প্রকাশক। সাধারণ মানবের স্থূল ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়সমূহ শ্রীভগবানের অপরাশক্তি মায়াপ্রসূত বলিয়া ভোগ-সর্ব্বস্ব প্রত্যক্ষগ্রাহ্য জড় বিষয় গ্রহণেই সমর্থ কিন্তু কোনও কোনও অসাধারণ মানব পরিপূর্ণ জ্ঞানভাণ্ডার অধোক্ষজ পুরুষের সচ্চিদানন্দ স্বরূপে সেবোন্মুখ বৃত্তির সহিত প্রপন্ন হইলে ভোগসর্ব্বস্ব প্রত্যক্ষ জড়বিষয়ের মায়িকবৃত্তি ভেদ করতঃ শুদ্ধ অতীন্দ্রিয় নির্ম্মল বাস্তব জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হন। ইহাই বিদ্বৎ প্রতীতির প্রভাব। সোজা কথায় অবিদ্বৎপ্রতীতিতে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছারূপ কৈতব প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য যে কোনও ভাবে বর্ত্তমান। বিদ্বৎপ্রতীতি কেবলমাত্র ভগবৎসুখ তাৎপর্য্যবিশিষ্ট। অবিদ্বৎপ্রতীতি প্রত্যক্ষ ছাড়া আর কিছু দর্শন করিতে সমর্থ হয় না বা ধারণা করিতে পারে না। বিদ্বৎপ্রতীতি প্রত্যক্ষ ভেদ করতঃ ঈশাশ্রয়া দৃষ্টিসাহায্যে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং অবিদ্বৎ প্রতীতিতে বিপর্য্যয় দর্শন অবরদর্শন ভ্রমদর্শন দ্বিতীয় দর্শন খণ্ড ও অসম্যক্ দর্শন অবশ্যম্ভাবী। বিদ্বৎপ্রতীতি সর্ব্বদেশব্যাপিনী সুতরাং উহাই অখণ্ড বা অদ্বয় দর্শন। একমাত্র বিদ্বৎপ্রতীতি-সম্পন্ন ভাগবত স্বরূপে সর্ব্বতোভাবে প্রপত্তি ব্যতীত জীবের আর অদ্বয়জ্ঞান বা বিদ্বৎপ্রতীতিলাভের দ্বিতীয় পন্থা নাই। বিদ্বৎপ্রতীতি লাভের অপর নামই দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা। জড় জগতে যিনি যত বড়ই অধীতী, মেধাবান্, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর বড়ই প্রসিদ্ধি লাভ করুন না কেন কিন্তু তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষে প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবা ব্যতীত অদ্বয়জ্ঞান লাভ অসম্ভব। অর্জ্জুন ভগবৎস্বরূপে প্রপত্তিবলেই ভগবৎস্বরূপ দর্শনে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রমাণশিরোমণি শ্রুতিতে নচিকেতার প্রতি যমরাজের উপদেশও তাহাই—

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্।।"

যে বিদ্বান পরমাত্মস্বরূপে শরণাগত হন, একমাত্র তাঁহারই নিকট এই পরমাত্মা তাহার সৎস্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে অধিক সংখ্যক ব্যক্তিই ঐ বেদবাণী অস্বীকার করিয়া বা মুখে মাত্র স্বীকার করিয়া ইন্দ্রিয় দ্বারা কেন বুঝিয়া লইতে পারিব না? এইরূপ দম্ভযুক্ত হইয়া ভগবৎতত্ত্ব নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হন। এইরূপ বুদ্ধি-প্রণোদিত হইলেই আমরা চিৎস্বরূপ ভগবানের নিত্যপ্রতিভূ ও উদ্দীপকতত্ত্ব শ্রীমূর্ত্তিকে কাঠ, পাথর, মাটীর ন্যায় অনিত্য জড়বস্তু জ্ঞান করি। শ্রীমূর্ত্তিকে পুতুলের মত মনুষ্য নির্ম্মিতবস্তু বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করি অথবা কাঠ পাথর জ্ঞান অন্তরে প্রবল থাকা সত্ত্বেও কপটতাপূর্ব্বক ভৌম বা পার্থিববস্তুতে পূজ্যবুদ্ধি করিয়া তাহা দ্বারা নিজের ভোগপিপাসা চরিতার্থ করিয়া লই। আবার প্রত্যক্ষজ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া শ্রীবিগ্রহ দ্বারা ভগবানের ভূমাস্বরূপ পরিচ্ছন্ন হয় এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি। অথবা কাঠ, পাথর, মাটীর ভিতর অনুস্যূত চৈতন্য-স্বরূপই আমাদের লক্ষীভূত পূজ্যবস্তু। অপরভাষায় ভগবানের দেহ ও দেহীতে ভেদ বর্ত্তমান এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান-জাত বিশ্বাসমূলে "যথাভিমতধ্যানাদ্বা" ইত্যাদি বাক্য কল্পনা করিয়া প্রতীককে

মনঃ সংযমনের যন্ত্রমাত্র জ্ঞান করি ও অনিত্য কাঠ পাথরের সহিত পান্থপরিচয় করিয়া থাকি। এই সমস্তই অবিদ্বৎপ্রতীতিপ্রসূত বিচিত্রতার পরিচয়। বিদ্বৎপ্রতীতিতে অদ্বয়জ্ঞান বা ভগবানের অসংশয় সমগ্র স্বরূপের উপলব্ধি (শ্রীগীতা ৭।১)। সমগ্র ও পরিপূর্ণ স্বরূপে কোনও শক্তিরই অভাব নাই। সুতরাং উক্ত দর্শনে অনন্তশক্তিসম্পন্ন ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। দুর্ঘট ঘটকত্বই অচিন্ত্যত্বের লক্ষণ। সুতরাং শ্রীভগবানে অনন্ত বিরোধি গুণ সকল নিত্য যুগপৎ অতি সুন্দররূপে বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার সর্ব্ব- শক্তিমত্তার পরিচয় দিতেছে। অতএব সেই বিরোধভঞ্জিকা শক্তিবলে তাঁহাতে বিভুত্ব ও মূর্ত্তত্ব যুগপৎ বিরাজিত। শ্রুতিতে অসংখ্য বিরোধ সূচক মন্ত্র দৃষ্ট হয়। ছান্দোগ্য শ্রুতির শেষভাগে ‘‘শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে’’ এই মন্ত্রে মূর্ত্তত্বে বিভুত্ব এবং বিভুত্বে মূর্ত্তত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। জীবের চিদ্দেহগত অপ্রাকৃত নিরুপাধিক চক্ষু দ্বারা ভগবানের নিত্য মধ্যমাকার শ্রীবিগ্রহ দর্শন হইয়া থাকে। (সোপাধিক কিন্তু স্থূল জড়দর্শী চক্ষু নহে) চক্ষুদ্বারা যোগৈশ্বর্য্য বিরাট্‌রূপ দর্শন হয় এবং সোপাধিক স্থূল নয়ন দ্বারা জড়রূপ দর্শন হইয়া থাকে। বিদ্বজ্জন শুদ্ধ চিন্ময় সমাধিযোগে প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনে যে নিত্য অপ্রাকৃত অচিন্ত্য স্বরূপ দর্শন করেন, প্রাকৃত জগতে সেইরূপের প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ শ্রীবিগ্রহ। সুতরাং শ্রীমূর্ত্তি কল্পিত নহে বা শ্রীমূর্ত্তির দেহ-দেহীতে ভেদ নাই। শ্রীমূর্ত্তি প্রাকৃত জগতে বিরাজিত থাকিয়াও অপ্রাকৃত।

‘‘এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া।।’’

(ভাঃ ১।১১।৩৪)

প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহার গুণের বশীভূত না হওয়াই ঈশ্বরের ঈশিতা। মায়াবদ্ধ জীবের বুদ্ধি যখন ঈশাশ্রয়া হয়, তখন তাহা মায়া সন্নিকর্ষেও মায়াগুণে সংযুক্ত হয় না এবং কেবল তখনই অপ্রাকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে।

শ্রীমূর্ত্তি সবিকল্প সমাধির অনিত্য মনোময় বিগ্রহ নহেন। আরোহপন্থার কৈবল্যসমাধি বা নির্ব্বকল্প সমাধিরূপ প্রয়োজন লাভের জন্য ‘যথাভিমতধ্যানাদ্বা’ এই সূত্রানুসারে ইচ্ছানুরূপ কোনও বস্তু ধ্যান করিতে করিতে ধ্যান গাঢ় হইলে জড়মনে যে মনোময়ী মূর্ত্তি দর্শন হয়, তাহার সহিত অবরোহপন্থায় বিদ্বৎপ্রতীতি-যোগে সেবোন্মুখ অপ্রাকৃত নেত্রে যে ভগবানের অচিন্ত্য নিত্য স্বরূপ দর্শন হয়, তাহা এক নহে। একটী জড়সংস্পৃষ্ট মনোছাচে গড়া ছবি। অপরটী সম্পূর্ণ জড়াতীত ঈশানুগত চিদিন্দ্রিয়ে প্রতিফলিত বাস্তব বস্তু।

সবিকল্প সমাধির মনোময়ী মূর্ত্তি নির্ব্বিকল্পাবস্থায় বিলয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অপ্রাকৃত চিন্ময়ী দিব্য শ্রীমূর্ত্তি সূরিগণ সদা স্বতঃপ্রকাশ সূর্য্যের ন্যায় প্রেমবিভাবিত অপ্রাকৃতনেত্রে দর্শন করেন।

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততং। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং।।

দিবীব চক্ষুরাততং শব্দে স্বতঃ প্রকাশ বস্তুকে লক্ষ্য করে। সুতরাং আরোহপন্থায় অভ্যাসযোগ বা চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ নিজকৃত চেষ্টা দ্বারা স্বতঃ প্রকাশ বস্তু দর্শন হয় না। মনঃ কল্পিত ছবিই দৃষ্ট হইয়া থাকে। সদা শব্দের দ্বারা চিন্ময় মূর্ত্তির বিষয় নিরূপণ করা হইল। পদং শব্দের দ্বারা বিষ্ণুর বা ব্যাপক বস্তুর অচিন্ত্য-শক্তিক্রমে মূর্ত্তত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং বিষ্ণুর পরমপদ নিত্য অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহ—

সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণঃ রূপকল্পনা এই ন্যায়ানুসারে সাযুজ্যকামীর কল্পিত প্রতীক বা সবিকল্প সমাধির জড়ীয় মনোময় বিগ্রহ নহে অথবা ভৌমইজ্যধী-সম্পন্ন বুভুক্ষুর কল্পিত পুতুল নহেন। অতএব কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীগৌরসুন্দর সার্ব্বভৌমকে বলিয়াছিলেন—

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে বিগ্রহ কহ সত্ত্বগুণের বিকার।।
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেইত পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য অদৃশ্য সেই হয় যমদণ্ড্য।। (চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ)

অন্যত্র—

নামবিগ্রহস্বরূপ তিন একরূপ।
তিনভেদ নাহি তিন চিদানন্দরূপ।।
দেহ-দেহীর নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্মনাম দেহ স্বরূপ বিভেদ।।
অতএব কৃষ্ণের নাম দেহ বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে হয় স্বপ্রকাশ।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)।

মনোধর্ম্ম

এই জগতে অসংখ্য জীব। একটী জীবদেহের সহিত অপর জীবদেহের বৈষম্য দৃষ্ট হয়। অধিক কি, দুইজন সহোদর ভ্রাতা বা যমজ ভ্রাতৃদ্বয়ের আকৃতিতেও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং যখন দেহের আকারের বিভিন্নতা বর্ত্তমান তখন দেহ-স্বভাব বা দেহধর্ম্মেরও যে বৈচিত্র্য সংঘটিত হইবে ইহাই স্বাভাবিক। গ্রীষ্মপ্রধান-দেশবাসীর সহিত শীতপ্রধান দেশবাসীর দেহধর্ম্মের পার্থক্য আছে। এমন কি, একমাতার পাঁচটী সন্তানের দেহ-স্বভাবের মিল নাই। একজনের শরীরে যাহা সহ্য হয়, অপরের শরীরে তাহা সহ্য হয় না।

স্থূল দেহের ন্যায় জীবের মানসিক চিন্তাপ্রণালী, বুদ্ধিবৃত্তি, রুচি ও বিচার-ক্ষমতা পরস্পর পৃথক্; সকলের চিন্তা-প্রণালী বা রুচি কখনও এক হইতে পারে না। এক জনের নিকট যাহা পরম উপাদেয় বস্তু বলিয়া

পরিগণিত, অপরের নিকট তাহাই আবার অত্যন্ত হেয়। দেশভেদে জলবায়ুর অবস্থাভেদে ভাষা, শিক্ষা ও সঙ্গ-ভেদে লোকের রুচি, প্রবৃত্তি, চিন্তাপ্রণালী ও বিচার-ক্ষমতা নানাপ্রকার হইয়া থাকে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যে পোষাক অত্যন্ত প্রীতিকর, শীতপ্রধান দেশের লোকের পক্ষে তাহাই আবার অত্যন্ত অপ্রীতিকর। অসভ্য সমাজে যাহা অত্যন্ত আদরণীয়, সভ্য-সমাজে তাহা অত্যন্ত ঘৃণ্য। একযুগে যাহা পরম উপাদেয় বলিয়া গৃহীত, পরযুগে তাহার আর আদর নাই। এইরূপে যুগে যুগে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সত্যসমূহ পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। একযুগে টলেমি নামে কোনও এক পাশ্চাত্য মনীষী বৈজ্ঞানিক মতে উপনীত হইলেন যে পৃথিবী সর্ব্বদাই বিশ্বের মধ্যদেশে অবস্থিত থাকিয়া স্থির ও অচঞ্চল এবং সূর্য্য ও নক্ষত্রাদি পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। তাহার বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তই সেই যুগে জনসমাজে সত্য বলিয়া গৃহীত হইল। কিন্তু পরযুগে কোপারনিকাস্ নামে আর এক মনীষী আসিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্ত প্রচার করিলেন। তিনি বলিলেন, পৃথিবী অচঞ্চল নহে; পৃথিবীই সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। এইরূপ দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক জগতেও দেখা যায় যে একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি যে সত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান, তাহা হইতে অধিকতর প্রতিভাশালী ব্যক্তি তাহার ভ্রম দেখাইয়া দিয়া অপর একটী নূতন সত্য প্রচার করিয়া থাকেন। এইরূপ জগতে নিত্য কত মত সৃষ্ট হইতেছে, আবার সেই সকল মতকে উপেক্ষা করিয়া পুনরায় নূতন নূতন মতের আবিষ্কারও হইতেছে। ইহা সকলই মনোধর্ম্মের অন্তর্গত। মনোধর্ম্মের স্বভাবই এই যে—'এই ভাল এই মন্দ।'

"দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল এই মন্দ এই সব ভ্রম।।" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

অণুচৈতন্য স্বতন্ত্র জীব যখন অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব সৎস্বরূপ হইতে বিচ্যুত হইয়া দ্বিতীয় বস্তু মায়াতে অভিনিবিষ্ট হয়, তখন তাহার যাবতীয় বিচার জড় মন বুদ্ধি অহঙ্কার দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে। সুতরাং যাবতীয় মতামত বা প্রতিভার স্ফুরণ মনোধর্ম্মেরই অন্তর্গত। বদ্ধজীব অবিশুদ্ধ-স্বরূপবৃত্তি মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের সাহায্যে কখনই বিশুদ্ধজ্ঞান লাভ করিতে পারে না, কারণ জীবের পক্ষে মায়াবৃত্তিসমূহ হেয়। অধিক কি, শুদ্ধজীবশক্তির স্বীয় বৃত্তিসকলও হেয় না হইলেও অপ্রচুর। সুতরাং জীবশক্তি স্বীয় বৃত্তির শত চেষ্টাতেও বাস্তব জ্ঞানলাভে অধিকারী হন না। এই জন্যই শ্রুতি তারস্বরে বলিতেছেন—

'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ' ইত্যাদি।

চিচ্ছক্তিগত সন্বিদ্বৃত্তি ও হ্লাদিনী সংযোগ ব্যতীত জীব পূর্ণজ্ঞান বা পূর্ণানন্দ লাভ করিতে পারে না। অতএব শ্রুতির আদেশ এই—

'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'
'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।।'

শ্রীগীতোপনিষদও তাহাই প্রতিধ্বনি করিতেছেন—

'তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।।'
'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।'
'মামেকং শরণং ব্রজ' ইত্যাদি ইত্যাদি।

অতএব পরিপূর্ণ-জ্ঞান ঈশতত্ত্ব-নিরূপণে মায়িক মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার যেরূপ অসমর্থ, অপ্রচুর শক্তিসম্পন্ন অণুচৈতন্য জীবাত্মাও তদ্রূপ আত্মবিচারে অসম্পূর্ণ। ইহা লক্ষ্য করিয়াই শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধে দেবতাগণ শ্রীভগবানের স্তবে বলিতেছেন,—

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততং পতন্ত্যধোনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ।।"

অনন্তশক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবানে সর্ব্বতোভাবে শরণাগতি ব্যতীত অণুচৈতন্য জীবের বুদ্ধি প্রাকৃতমল-রহিত হইতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মবাদী সন্ন্যাসিগণও যখন অবিশুদ্ধ বুদ্ধিহেতু নিজদিগকে বিমুক্ত মনে করিয়া ভগবানের আনুগত্য ত্যাগ করেন, তখন তাহারা বহুকষ্টার্জ্জিত শ্রেষ্ঠপদবীর সম্মুখীন হইয়াও ভগবানের চরণকমলে অনাদরহেতু অধঃপাতিত হন। অধিক কি

"জীবন্মুক্তা অপি পুনর্ব্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ।
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ।।"

জীবন্মুক্তগণও যদি অচিন্ত্য মহাশক্তিমান্ ভগবানের শ্রীচরণ অনাদর করেন, অর্থাৎ ভগবানের নিত্য দাস্য স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন, তাঁহারা সেই অপরাধে পুনরায় কর্ম্মদ্বারা বন্ধন-দশা লাভ করিয়া থাকেন।

দেবতাগণ পুনরায় ভগবানকে বলিলেন,—

তথা ন তে মাধব! তাবকাঃ ক্বচিদ্ ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কনীকপমূর্দ্ধসু প্রভো!

কিন্তু হে মাধব! তোমার অনন্য ভক্তগণ জীবগণের একমাত্র আশ্রয় তোমাতে সততযুক্ত, সুতরাং তাঁহারা কখনও অধঃপতিত হন না, কারণ 'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি' শ্রীগীতার এই প্রতিজ্ঞা-বচনই তাহার প্রমাণ। তাঁহারা তোমাকে আশ্রয় করিয়াছেন বলিয়া যাবতীয় বিঘ্নরাশিকে পদদলিত করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করেন।

এই ভাগবত-বচনকে যাহারা সাম্প্রদায়িক কথা বা অর্থবাদ মাত্র মনে করেন, তাঁহারা পরম সত্য হইতে বঞ্চিত হন মাত্র। তাঁহারা সারগ্রাহী হইয়া শ্রীগীতোপনিষদৎ আলোচনা করিলে উক্ত বচনের যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। অণুচৈতন্যজীব অনর্থনির্ম্মুক্ত হইলেও বিভুচৈতন্যের সমাশ্রয় বা কৃপা ব্যতীত নিত্য সত্য পরম জ্ঞান লাভে সমর্থ হইতে পারেন না। অতএব নিরস্তকুহক সত্য আম্নায়-পারম্পর্য্যে বা অবরোহপন্থায় সমাগত। যেখানে বিভুচৈতন্যে সর্ব্বতোভাবে শরণাপত্তি অস্বীকার করিয়া তত্ত্বনিরূপণে চেষ্টা সেখানেই মনোধর্ম্ম—হয় মনোবুদ্ধিকৃত জড় বিচার, নয় জড়-ব্যতিরেক বিচার। উভয় বিচারই সোপাধিক—মনোবুদ্ধি-

সাধিত বিচার যে প্রকার জড়যন্ত্র সাহায্যে অনুষ্ঠিত বলিয়া প্রাকৃত, চিচ্ছক্তির আনুগত্য স্বীকার না করিয়া নিজে নিজে আত্মবিচারও তদ্রূপ সোপাধিক সুতরাং অসম্পূর্ণ। উভয় বিচারপ্রণালীই ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা দোষযুক্ত। কিন্তু চিচ্ছক্তির সম্পূর্ণ আনুগত্যে শুদ্ধস্বরূপের নিরুপাধিক চিদ্‌বৃত্তি দ্বারা যে উপলব্ধি তাহাই আত্মধর্ম্ম। একমাত্র তাহাই নিরস্তকুহক পরম সত্য লাভের উপায়। বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকের প্রথমেই সশিষ্য শ্রীব্যাসদেব সেই পরম সত্যের ধ্যান শিক্ষা দিয়াছেন এবং "যৎ মুহ্যন্তি সূরয়ঃ" এই বাক্যের দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে পরমসত্য নির্ণয়ে সূরিগণেরও মোহ উৎপাদিত হয়। সুতরাং জগতে যিনি যতই প্রতিভাশালী, লব্ধপ্রতিষ্ঠ মহাপুরুষ বলিয়া মনোধর্ম্মী জগতের নিটক প্রচারিত হউক না কেন, তিনিও অনেক সময় মনোধর্ম্মের দ্বারা মুগ্ধ হইতে পারেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশেই বহু মনীষী উদিত হইয়াছেন। কিন্তু কেহ স্পষ্টভাবে বেদ অগ্রাহ্য করিয়া কেহ বা মুখে বেদ স্বীকার করিয়া বেদবিরুদ্ধ মনোধর্ম্ম-বহুল মতসমূহ প্রচার করিয়াছেন।

ভাব

আজকাল কপটভাবের অভাব নাই, পথে ঘাটে ভাবের ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। আবার ভাবের প্রকার ও মাত্রা অনেক প্রকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চারি আনার ভাব হইতে দুআনার ভাবের মাত্রা কম। খেচরান্ন মহোৎসবে যে ভাব উদয় হইয়া থাকে, তাহা হইতে মল্লপূপ মহোৎসবের ভাবের মাত্রা আরও অনেক অধিক। কীর্ত্তনে স্ত্রীলোক শ্রোতৃবৃন্দ থাকিলে ভাবের উচ্ছ্বাসটা অধিক উথলিয়া উঠে। অনেক সময় পূর্ব্ব হইতে লোক ঠিক করা থাকে, 'যখন আমার ভাব হইবে, তখন যেন আমাকে ধরিও'। আবার সহজিয়াদের কল্পিত গ্রন্থে পিপ্পলীদাস বাবাজীর আখ্যায়িকায় পাওয়া যায় যে, কোনও এক ব্যক্তি কীর্ত্তনে পিপুলচূর্ণ দ্বারা কপট ক্রন্দন দেখাইতেন; এইরূপ করিতে করিতে যখন তাহার প্রকৃত ভাবের উদয় হইল, তখন তিনি পিপ্পলীদাস বাবাজী বলিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন।

এইরূপ ভাবের বহুবিধ প্রকার জগতে দেখা যাইতেছে এবং ঐ সকল ভাবের ভাবুকগণ মনোধর্ম্মী। জগতের নিকট হইতে সুযোগ বুঝিয়া কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়া লইতেছে। একাধারে জগতের তিনটী পরম-বাঞ্ছিত বস্তুলাভ—এমন সুবর্ণ সুযোগ কে পরিত্যাগ করে? তাই আজকাল দলে দলে শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের পাঠক পদাবলীর ও নানাপ্রকার রস কীর্ত্তনের দল বাহির হইয়া পড়িয়াছেন!

আজ আমার প্রেমময়বিগ্রহ অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ ও রসিককুলচূড়ামণি দুইজন শ্রেষ্ঠ আচার্য্যের গ্রন্থ হইতে 'ভাব' সম্বন্ধে বিচার করিব। শ্রীমদ্ভাগবত অমলপুরাণ মধ্যস্থ থাকিবেন। উপরি উক্ত একজন আচার্য্য শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়তম পার্ষদ গৌরসুন্দরের আদেশে প্রেমভক্তির আচার্য্য ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি রসবিচারসম্বলিত গ্রন্থের লেখক। শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়

তাঁহার অনুগত বলিয়া রূপানুগ সম্প্রদায় নামে অভিহিত। সেই আচার্য্যপ্রবর শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুকে উল্লঙ্ঘন করিয়া কেহই ভাব বা প্রেমরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারেন না। তিনি তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের পূর্ব্ববিভাগ তৃতীয় লহরীতে তন্ত্রবচন উদ্ধার করিয়া ভাবের যে সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়—

প্রেম্নস্তু প্রথমাবস্থা ভাব ইত্যভিধীয়তে।
সাত্ত্বিকাঃ স্বল্পমাত্রাঃ স্যুরত্রাশ্রুপুলকাদয়ঃ।।

অর্থাৎ প্রেমের প্রথম অবস্থাকে ভাব বলা হয়। ইহাতে অশ্রু-পুলকাদি সাত্ত্বিকভাব সমুদয় অল্পমাত্রায় উদয় হইয়া থাকে।

যে সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তির ভাবের অঙ্কুরমাত্র হইয়াছে তাঁহার লক্ষণ কি? তদুত্তরে শ্রীরূপপাদ বলিতেছেন—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ।।
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে।।

অর্থাৎ যাঁহাদিগের ভাবের অঙ্কুর মাত্র জন্মিয়াছে, সেই সকল পুরুষে (১) ক্ষান্তি, (২) অব্যর্থকালত্ব, (৩) বিরাগ, (৪) মানশূন্যতা, (৫) আশাবন্ধ, (৬) সমুৎকণ্ঠা, (৭) নামগানে সদারুচি, (৮) ভগবানের গুণকীর্ত্তনে আসক্তি এবং (৯) তদীয় বসতিস্থলে প্রীতি ইত্যাদি অনুভাব সকল প্রকাশিত হইয়া থাকে।

(১) ক্ষান্তি—ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও তাহাতে চিত্তের অবিকৃত অবস্থা যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবানে শরণাগত পরীক্ষিৎ মহারাজ বিপ্রগণকে বলিয়াছিলেন, ঋষিকুমারের প্রেরিত তক্ষক আসিয়া আমাকে দংশন করুক তাহাতে আমার ক্ষতি নাই, আমি শ্রীকৃষ্ণচরণে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। আপনারা শ্রীহরির গুণকীর্ত্তন করিতে থাকুন।

(২) অব্যর্থকালত্ব—যিনি নিজের ভোগার্থে এক মুহূর্ত্তের জন্যও কোনও বৈষয়িক কার্য্যে লিপ্ত হন না। প্রতি মুহূর্ত্তে হরিসেবার কার্য্যেই নিযুক্ত। সেইরূপ অবস্থা অর্থাৎ জীবন্মুক্তের অবস্থা।

(৩) বিরক্তি—রূপরসাদি ভোগ্য ইন্দ্রিয়ার্থের প্রতি যে স্বাভাবিক অরুচি; যেমন রাজর্ষি ভরত শ্রীকৃষ্ণচরণে লুব্ধ হইয়া যৌবনকালেই মনোজ্ঞ, দুস্ত্যজ্য পুত্র, কলত্র, সুহৃদ্, রাজ্য প্রভৃতিকে বিষ্ঠার ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

(৪) মানশূন্যতা—উত্তম হইয়াও আপনাকে তৃণাধম জ্ঞান; যথা মহারাজ ভগীরথ নরেন্দ্রগণের শিখামণিস্বরূপ ছিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে রতি লাভ করিলে তিনি ভিক্ষার জন্য শত্রুগৃহে পর্য্যন্ত যাইতেন এবং চণ্ডালকে পর্য্যন্ত প্রণাম করিতেন।

(৫) আশাবন্ধ—আমি নিশ্চয়ই ভগবানের সেবা প্রাপ্ত হইব, এইরূপ দৃঢ় আশা।

(৬) সমুৎকণ্ঠা—অভীষ্ট বস্তুপ্রাপ্তির জন্য প্রবল লালসা। যাহার ভাবের অঙ্কুরমাত্রও হইয়াছে, তাহার কনক কামিনী বা প্রতিষ্ঠার লালসা বিন্দুমাত্রও নাই। কেবল 'কোথা যাঙ, কোথা পাঙ মুরলীবদন' এইরূপ ভাব।

(৮) নামগানে সদা রুচি—ভগবানের গুণকীর্ত্তনে সর্ব্বদা স্বাভাবিক অভিলাষ। অধিক অর্থ দিলে নামগানে রুচি, অল্প অর্থ দান করিলে অরুচি বা অর্থ লইয়া নামগান, ইহা রুচির লক্ষণ নহে।

(৮) তদ্বসতিস্থলে প্রীতি—ভগবানের ও ভগবদ্ভক্তের বাসস্থলী নির্গুণ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"বনন্তু সাত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণং।।"

বনবাস সাত্ত্বিক, গ্রামে বাস রাজসিক, যেখানে তাস, পাশা প্রভৃতি ব্যসনক্রিয়া হইয়া থাকে, সেস্থানে বাস তামসিক বাস, কিন্তু ভগবানের তীর্থ শ্রীমন্দির বা মঠাদিতে বাস নির্গুণ বাস। অতএব যাঁহার ভাবের অঙ্কুর মাত্রও হইয়াছে, তিনি কখনও "গৃহব্রত" বা "গৃহমেধী" থাকিতে পারেন না। তাঁহার নিজের গৃহ বা স্ত্রীপুত্রাদির জন্য কোনও চিন্তা থাকিতে পারে না। তিনি সর্ব্বদা ভগবানের গৃহেই বাস করেন। অথবা তাঁহার নিকট "গৃহেতে গোলোক ভায়"।

শ্রীরূপপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে প্রকৃত ভাব চিনিবার কষ্টিপাথরস্বরূপ উপরি উক্ত লক্ষণসমূহ বর্ণন করিয়া পরে বলিতেছেন, যে ভাব বুভুক্ষু কর্ম্মী ও মুমুক্ষু জ্ঞানিগণেও যদি দেখা যায়, তাহা হইলে তাহাকে মেকী ভাব বা প্রতিবিম্ব রত্যাভাস মাত্র জানিবে।

"বিমুক্তাখিলতর্ষৈর্যা মুক্তৈরপি বিমৃগ্যতে।
যা কৃষ্ণেনাতিগোপ্যাশু-ভজদ্ভ্যোঽপি ন দীয়তে।।
সা ভুক্তিমুক্তিকামত্বাচ্ছুদ্ধাং ভক্তিমকুর্ব্বতাং।
হৃদয়ে সংভবত্যেষাং কথং ভাগবতী রতিঃ।।"

(ভঃ রঃ পূর্ব্ববিভাগ ৩য় লহরী)

অর্থাৎ মুক্তপুরুষগণ যাবতীয় কাম পরিত্যাগপূর্ব্বক যে রতির অন্বেষণ করেন, যাহা শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় গোপ্য সম্পত্তি এবং যে রতি ভজনশীলজনকেও সহজে দেওয়া হয় না, সেই ভাগবতী রতি ভুক্তিমুক্তিকাম-হেতু যাহারা শুদ্ধভক্তি-যাজী নহেন, এইরূপ কর্ম্মি ও জ্ঞানিগণের হৃদয়ে কিরূপে উদয় হইবে? অতএব কর্ম্মিজ্ঞানিগণের ভাব প্রতিবিম্বরত্যাভাস মাত্র। মূর্খলোক কর্ম্মিজ্ঞানী যোগীদের মিছা ভাব দেখিয়া প্রকৃত ভাব মনে করিতে পারে কিন্তু রসিককুলচূড়ামণি শ্রীরূপপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর অতলগর্ভে গিয়া ভাব-চিন্তামণি সমুদয় চিনিয়া লইয়াছেন সুতরাং তিনি কোনটী কোন্ মূল্যের প্রবাল, কোন্টী কাচখণ্ড, কোনটী হীরক সব ধরিয়া ফেলিতে পারেন।

অশ্রুপুলকাদি ভাবের বাহ্য চিহ্ন হইলেও তাহা কপট বা দুর্ব্বল ভাবপ্রবণ ব্যক্তিতেও অনেক সময় দেখা যায়। শ্রীরূপপাদ বলেন—

"নিসর্গপিচ্ছিলস্বান্তে তদভ্যাসপরেঽপি চ।
সত্ত্বাভাসং বিনাপি স্যুঃ কাপ্যশ্রুপুলকাদয়ঃ।।"

অর্থাৎ অনেকের চক্ষু স্বভাবতঃই পিচ্ছিল যেমন স্ত্রীলোকদের অন্তঃকরণ স্বভাবতই দুর্ব্বল। তাঁহারা একটু শোকে বা সুখেই অধীরা হইয়া পড়েন। এইরূপ দুর্ব্বল অন্তঃকরণবিশিষ্ট লোকের চক্ষে অতি অল্পতেই জল আসে! কোনও কোনও স্ত্রীলোক বা পুরুষের দেখা গিয়াছে যে, তাহারা শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা পাঠ শুনিতে শুনিতে নিজের মৃত পুত্রের কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া থাকেন, অথবা রাসলীলা পাঠ শ্রবণ করিয়া কোন প্রেমিকের প্রণয়িনীর জন্য ক্রন্দন আসে, লক্ষ্মণের শক্তিশেলে পতন শুনিয়া অনেকের ভ্রাতৃবিয়োগের দুঃখস্মরণ হইয়া চক্ষু হইতে দরদর ধারে অশ্রু বহিতে থাকে। এমনও উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে যে, রাসলীলা শুনিয়া (?) কামে অধীর হইয়া বারবণিতার গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। অতএব ঐ সকল দুর্ব্বল অন্তঃকরণবিশিষ্ট ভাবপ্রবণ ব্যক্তির যে চক্ষে জল দেখা যায় তাহা ভাব নহে। আবার কেহ কেহ প্রতিষ্ঠা বা কনক-কামিনী সংগ্রহের জন্য অভ্যাস করিয়া কপটভাব আয়ত্ব করে। যাহার একবার ভাবের অঙ্কুর মাত্রও হইয়াছে, তাহার আর কোনও অভাব থাকে না। সুতরাং তিনি জড়জগতের কোনও বস্তু লাভের জন্য ছুটাছুটি করেন না।

রূপানুগ শুদ্ধভক্তি আচার্য্য রসিকরাজ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের (১।৩।২৪)—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্গৃহ্যমানৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ।।

—শ্লোকের টীকায় 'ভাব' সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত শ্লোকের সাধারণ অর্থ এই, হরিনাম পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করিলেও যদি হৃদয়ে বিকার না জন্মে এবং বিকারের লক্ষণস্বরূপ নেত্রে অশ্রু ও গাত্রে রোমাঞ্চ উদিত না হয়, সেই হৃদয় পাষাণতুল্য। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ টীকায় দেখাইয়াছেন—"কিঞ্চ অশ্রু-পুলকাবেব চিত্তদ্রবলিঙ্গমিত্যপি ন শক্যতে বক্তুং যদুক্তং শ্রীমদ্রূপ গোস্বামিচরণৈঃ। নিসর্গপিচ্ছিল ইত্যাদি। তথা অতি গম্ভীর মহানুভাবভক্তেষু হরিনাম- ভিশ্চিত্তদ্রবেঽপি বহিরশ্রুপুলকাদয়ো ন দৃশ্যন্তে ইতি তস্মাৎ পদ্যমিদমেবং ব্যাখ্যেয়ং। ততশ্চ বহিরশ্রুপুলকাদয়ো ন দৃশ্যন্তে ইতি তস্মাৎ পদ্যমিদমেবং ব্যাখ্যেয়ং। ততশ্চ বহিরশ্রুপুলকয়োঃ সতোরপি যদ্ধৃদয়ং ন বিক্রিয়েত তদশ্মসারমিতি বাক্যার্থঃ। ততশ্চ হৃদয়বিক্রিয়ালক্ষণান্য-সাধারণানি ক্ষান্তিনাম-গ্রহণাপক্যাদীন্যেব জ্ঞেয়ানি। * * উত্তমাধিকারিণাং নির্মৎসরাণাং নামগ্রহণে সত্যেব নামমাধুর্য্যস্যানুভবঃ স্যাৎ। তস্মিংশ্চ সতি হৃদয়বিক্রিয়া চ স্যাৎ সত্যাঞ্চ তস্যাং তদ্ব্যঞ্জকাঃ ক্ষান্ত্যাদয়োঽশ্রু-পুলকাদয়শ্চ ভবন্ত্যেব। কনিষ্ঠাধিকারিণাং সমৎসরাস্তু সাপরাধচিত্তত্বান্নামগ্রহণবাহুল্যেঽপি তন্মাধুর্য্যানুভবা-ভাবে চিত্তং নৈব বিক্রিয়েত। তদ্ব্যঞ্জকাঃ ক্ষান্ত্যাদয়োঽপি ন ভবন্তি তেষামেবাশ্রুপুলকাদি- মত্ত্বেঽপ্যশ্মসার হৃদয়তয়া নির্দ্দেষা। কিঞ্চ তেষামপি সাধুসঙ্গেনানর্থনিবৃত্তি-নিষ্ঠারুচ্যাদিভূমিকারূঢ়াণাং কালেন চিত্তদ্রবে

সতি চিত্তস্যাশ্মসারত্বমপগচ্ছত্যেব। যেষাস্তু চিত্তদ্রবে সতি চিত্ত স্যাশ্মসারতয়াতিষ্ঠেদেব। তে তু দুশ্চিকিৎস্যা এব জ্ঞেয়াঃ।"

অর্থাৎ কেবল অশ্রুপুলকই চিত্তদ্রবতার চিহ্ন নহে, কারণ শ্রীরূপপাদ বলেন যে, নিসর্গপিচ্ছিল চক্ষেও অশ্রুপুলকের উদ্গম হইতে পারে এবং দেখা যায় অতি গম্ভীর মহানুভাব ভক্তগণে হরিনাম শ্রবণকীর্ত্তন দ্বারা চিত্তদ্রব হইলেও বাহ্য অশ্রুপুলকাদির প্রকাশ হয় না। অতএব বাহ্য অশ্রুপুলক সত্ত্বেও যে হৃদয় বিকৃত না হয়, তাহাই পাষাণসদৃশ। ইহাই উক্ত শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্লোকস্থ বাক্যের তাৎপর্য্য! হৃদয়বিকারের মুখ্য লক্ষণই 'ক্ষান্তি, অব্যর্থ কালত্ব ইত্যাদি। অশ্রু-পুলকাদি গৌণ লক্ষণ। উত্তমাধিকারী ভক্তগণ নির্ম্মৎসর, সুতরাং নামগ্রহণ মাত্রেই তাঁহাদের নাম-মাধুর্য্যের অনুভব হয়। নামমাধুর্য্য অনুভব হইলেই হৃদয়বিকারও হইয়া থাকে। তখন চিত্তবিকার প্রকাশক ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব অনুভাব সকল ও অশ্রুপুলকাদির উদয় হইয়া থাকে। কনিষ্ঠাধিকারিগণের মৎসরতাপ্রযুক্ত চিত্ত নামাপরাধযুক্ত। সুতরাং বহুবার নামগ্রহণ করিয়াও নাম-মাধুর্য্যগ্রহণে অক্ষমতা হেতু তাহাদের চিত্তদ্রব হয় না। অতএব চিত্তবিকারের প্রকাশক ক্ষান্তি প্রভৃতি অনুভাব সকল তাহাদিগের মধ্যে উদয় হয় না। কাজে কাজেই যদি তাহাদিগের অশ্রুপুলকাদিও দেখা যায়, তাহা হইলেও তাহাদিগের চিত্ত দ্রবতার অভাবহেতু ঐ সকল বাহ্য মিছা অভাবসমূহ প্রকৃত ভাব নহে, সুতরাং নিন্দীয়। সাধুসঙ্গ প্রভাবে অনর্থ-নিবৃত্তি হইলে পর ক্রমে নিষ্ঠা রুচি প্রভৃতি ভূমিকাতে আরোহণ করিলে কালে যদি চিত্তদ্রব হয়, তবেই চিত্তের কাঠিন্য দূর হইতে পারে, তখন তাহাদেরও ভাব হইতে পারে। কিন্তু যাহাদের চিত্তদ্রব হইলেও চিত্তের কাঠিন্য থাকিয়া যায়, তাহাদিগের ব্যাধি দুরারোগ্য বলিয়াই জানিতে হইবে।

শ্রীল রূপগোস্বামীপাদও শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ভাবোদয়ের ক্রম দেখাইয়াছেন,—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।।
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানামায়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবেভবেৎ ক্রমঃ।।

(পূর্ব্ববিভাগ ৩য় লহরী)

প্রেমোদয়ের ক্রম বলিতেছেন—প্রথম সাধুসঙ্গে শাস্ত্র শ্রবণদ্বারা শ্রদ্ধা অর্থাৎ শাস্ত্র সিদ্ধান্তে বিশ্বাস। তদনন্তর দ্বিতীয় সাধুসঙ্গ অর্থাৎ ভজনরীতি শিক্ষানিবন্ধন সদ্গুরুপাদাশ্রয়, তদনন্তর হৃদয়-দৌর্ব্বল্য, অসৎতৃষ্ণা, দেহে আত্মবুদ্ধি, স্বরূপবিভ্রম প্রভৃতি অনর্থের নিবৃত্তি, তদনন্তর ভগবানের নিরন্তর সেবা, তারপর সেবায় প্রবল অভিলাষ, তদনন্তর স্বারসিকী রোচমানা প্রবৃত্তি, তার পর ভাব এবং ভাবের পরিপক্কাবস্থায়ই প্রেমোদয়। অতএব ভাব কত দুর্ল্লভ বস্তু।

তারকব্রহ্ম নাম কীর্ত্তনীয় কিনা ?

কলিসন্তরণোপনিষদে ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক 'হরেকৃষ্ণ' নামই কলি- কলুষনাশনের একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। এখন জিজ্ঞাস্য উক্ত নাম কি কেবল জপ্য না কীর্ত্তনীয়ও হইতে পারেন। জপ ও কীর্ত্তন শব্দের সংজ্ঞা শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগ ২য় লহরী ৬৪ সংখ্যক শ্লোকে এইরূপ লিখিয়াছেন—

নামরূপগুণলীলাদীনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনম্।
মন্ত্রস্য সুলঘুচ্চারো জপ ইত্যভিধীয়তে।।

অর্থাৎ নামরূপগুণলীলা প্রভৃতির উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তির নাম কীর্ত্তন এবং মন্ত্রের অতি নিম্নস্বরে আবৃত্তির নাম জপ।

কলিসন্তরণোপনিষৎ ১ম সংখ্যায় স্পষ্টভাবে উক্ত তারকব্রহ্মনাম উচ্চ-কীর্ত্তনের কথাই আদেশ করিয়াছেন—

হরিঃ ওঁ। দ্বাপরান্তে নারদো ব্রহ্মাণং জগাম কথং ভগবন্ গাং পর্য্যটন্ কলিং সন্তরেয়মিতি। স হোবাচ ব্রহ্মা সাধু পৃষ্টোঽস্মি সর্ব্বশ্রুতিরহস্যং গোপ্যং তচ্ছৃণু যেন কলিসংসারং তরিষ্যসি। ভগবত আদি পুরুষস্য নারায়ণস্য **নামোচ্চারণ**-মাত্রেণ নির্ধূত কলির্ভবতি। নারদঃ পুনঃ প্রপচ্ছ তন্নাম কিমিতি স হোবাচ হিরণ্যগর্ভঃ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

অর্থাৎ দ্বাপর যুগের শেষে এক সময় নারদ সমগ্র পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে দেব! এই ভীষণ কলিযুগে কেমন করিয়া সংসার সাগর উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভবপর? তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিলেন,—বৎস! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ, অতএব সর্ব্ববেদের অতি গুপ্তরহস্য শ্রবণ কর কি করিলে এই কলি উত্তীর্ণ হইতে পারা যাইবে বলিতেছি। এই যুগে জীব একমাত্র আদিপুরুষ নারায়ণের **নামকীর্ত্তন মাত্রেই** সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন সেই নামটী কি তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিলেন—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।"

এই ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক নারায়ণের নামই কলিকল্মষনাশন।

পুনরায় উক্ত উপনিষদের ৩য় সংখ্যায় দেখা যায় 'নারদ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন'—

"কোঽস্য বিধরিতি। তং হেবাচ নাস্য বিধিরিতি। সর্ব্বদা শুচিরশুচির্ব্বা পঠন্ ব্রাহ্মণঃ সলোকতাং সমীপতাং সাযুজ্যতামেতি"

অর্থাৎ উক্ত নামোচ্চারণের বিধি কি?

ব্রহ্মা বলিলেন, নামগ্রহণ সম্বন্ধে কীর্ত্তন ও জপভেদের কোন বিধি নাই সেই নাম যিনি পাঠ করেন অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করেন, তিনি ব্রাহ্মণ অর্থাৎ তাহার শূদ্রধর্ম্ম শোক থাকিতে পারে না এবং তিনি সর্ব্ববিধ মুক্তি লাভ করিতে পারেন।

আজকাল অনেক মনোধর্ম্মী শাস্ত্রানভিজ্ঞ কপট ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব হরে কৃষ্ণ নাম কেবল জপ করিবারই আদেশ দিয়াছেন কিন্তু অন্যান্য নাম বা লীলা কীর্ত্তন উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে পারা যায় যেহেতু শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে যে—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।
প্রভু কহে,—কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা গিয়া জপ সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ।।"

যেহেতু "জপ" শব্দের উল্লেখ আছে, অতএব কেবল জপ করাই তাঁহার আদেশ।

যাহারা তারকব্রহ্ম নামকে অক্ষর মাত্র মনে করিয়া আরোহপন্থায় হরিনাম গ্রহণ তৎপর, যাহারা কর্ম্ম জড় স্মার্ত্ত বা ভুক্তিমুক্তিকামী তাহারা তারকব্রহ্ম নামকে ঐ রূপই দর্শন করিবেন। যাঁহারা ভগবানের ঐকান্তিক শুদ্ধভক্ত, যাহারা শরণাগত ভক্ত তাঁহারা জানেন নাম

হৃদয় হৈতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে
শব্দ ব্রহ্মরূপে নাচে অনুক্ষণ।।

চিদাত্মায় উদিত নামই সেবোন্মুখ জিহ্বা সাহায্যে শব্দব্রহ্মনামরূপে অবতরণ করেন। সুতরাং হরে কৃষ্ণনাম যে কখনও উচ্চৈঃস্বরে বা কখনও নিম্নস্বরে নানাবিধ বৈচিত্র্যের তিতর দিয়া প্রকাশিত হইবেন ইহাতে সন্দেহ কি? তাই ভক্তগণ প্রার্থনা করিয়া থাকেন,—

কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্।
উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবং।।

হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আমার এমন দিন কবে হইবে যে তোমার নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে করিতে সজল নয়নে নৃত্য আরম্ভ করিব?

অভক্ত ভুক্তিমুক্তিবাদীর কথা অন্য প্রকারের। তাহারা বলেন—

মালাজপে শালা, কর জপে ভাই।
যো মন্‌মন্ জপে, উন্‌কো বলিহারী যাই।।

নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস সর্ব্বদা অপতিতভাবে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করিতেন। তন্মধ্যে তিনি একলক্ষ নাম অতি উচ্চৈঃস্বরে এবং একলক্ষ নাম যেন নিকটস্থ ব্যক্তি শুনিতে পায় এইরূপ ভাবে এবং একলক্ষ নাম মানসে জপ করিতেন। সাক্ষাৎ মায়াদেবী তাঁহার উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ

হইয়াছিলেন। বেশ্যা তাঁহার নাম কীর্ত্তন শ্রবণ প্রভাবে—

'প্রসিদ্ধাবৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্তি।
বড় বড় বৈষ্ণব তাঁর দর্শনেতে যান্তি।।

একদা ঠাকুর হরিদাসকে হরিনদী গ্রামের এক দুর্জ্জন ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন,—

অরে হরিদাস একি ব্যাভার তোমার।
ডাকিয়া যে নাম লহ, কি হেতু ইহার।।
মনে মনে জপিবা এই সে ধর্ম্ম হয়।
ডাকিয়া লইতে নাম কোন শাস্ত্রে কয়।।

তখন হরিদাস বলিলেন,—

উচ্চ করি লইলে শতগুণ পুণ্য হয়।
দোষ ত না কহে শাস্ত্রে গুণ সে বর্ণয়।।

তথাহি— "উচ্চৈঃ শতগুণম্ভবেৎ" ইতি—

শুন বিপ্র! সকৃৎ শুনিলে কৃষ্ণনাম।
পশুপক্ষী কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম।।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (৩৪।১৭)—

যন্নাম গৃণন্নখিলান্ শ্রোতৃনাত্মানমেব চ।
সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়স্তস্য পৃষ্টঃ পদা হি তে।।
পশুপক্ষী কীট আদি বলিতে না পারে।
শুনিলে সে হরিনাম তারা সবে তরে।।
জপিলে সে কৃষ্ণনাম আপনে সে তরে।
উচ্চসঙ্কীর্ত্তনে পর উপকার করে।।

তথাহি শ্রীনারদীয়ে প্রহ্লাদবাক্যং—

জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুণাত্যুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতৃন্ পুনাতি চ।।

এই সকল কথা শুনিয়া উক্ত ব্রাহ্মণব্রুব সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তখন সে হরিদাস ঠাকুরকে বলিয়া উঠিল—

'যে বাখ্যা করিলি তুই এ যদি না লাগে।
তবে তোর নাক কাটী নুড়িপুরো আগে।।"

এই কথা শুনিয়া হরিদাস হাসিতে হাসিতে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"এ সকল রাক্ষস' ব্রাহ্মণ নাম মাত্র।
এই সব জন যম যাতনার পাত্র।
কলিযুগে রাক্ষস সকল বিপ্র ঘরে।
জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে।।
এই সকল বিপ্রের স্পর্শ, কথা, নমস্কার।
ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে সব নিষেধ করিবার।।"

কিন্তু—

"সে বিপ্রাধমের কথোদিবস থাকিয়া।
বসন্তে নাসিকা তার পড়িল খসিয়া।।"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবও যে তারকব্রহ্ম হরেকৃষ্ণ নাম উচ্চৈঃস্বরে গ্রহণ করিতেন, তাহার প্রমাণও আমরা শ্রীরূপ গোস্বামীপাদের স্তবমালার প্রথম স্তবের পঞ্চম শ্লোকে দেখিতে পাই। শ্রীল রূপপাদ শ্রীগৌরসুন্দরকে স্তব করিতেছেন—

"হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিতরসনো নামগণনা
কৃতগ্রন্থিশ্রেণীসুভগকটিসূত্রোজ্জ্বলকরঃ।
বিশালাক্ষোদীর্ঘার্গলযুগলখেলাঞ্চিতভুজঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্।।"

অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে হরেকৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে করিতে যাহার রসনা নৃত্য করিতে থাকে ও উচ্চারিত নামের গণনার নিমিত্ত গ্রন্থীকৃত কটীসূত্রে যাহার বামহস্ত শোভিত, যিনি বিশালনয়ন ও আজানুলম্বিত ভুজ, সেই চৈতন্যদেব কি আমাকে দেখা দিবেন?

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ উক্ত শ্লোকের স্তব মালাবিভূষণ নাম্নী টীকায় লিখিয়াছেন—ষোড়শনামাত্মা দ্বাত্রিংশদক্ষরেণ মন্ত্রেণোচ্চৈরুচ্চারিতেন স্ফুরিতা কৃতনৃত্যা রসনা জিহ্বা যস্য সঃ। অর্থাৎ ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক হরেকৃষ্ণ মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে স্ফুরিত হওয়াতে যাহার জিহ্বা সর্ব্বদা নৃত্য করিত। অতএব অবরোহ-পন্থায় চিদাত্মায় প্রতিভাত শ্রীহরিনাম জিহ্বাগ্রে স্ফুরিত হইয়া যে উচ্চৈঃস্বরে প্রকাশিত হইবেন এ-বিষয়ে যাহারা সন্দেহ করেন বা বাধা দেন তাহারা নামের স্বরূপ বিষয়ে অনভিজ্ঞ অর্থাৎ তাঁহারা নামাপরাধী। তাঁহাদের নাম স্বীয় পিত্তবৃদ্ধির জন্য।

গুরুসেবা

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই আচার্য্যসেবনের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। সদ্‌গুরু-সেবা ব্যতীত বদ্ধজীবের অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা-প্রাপ্তির দ্বিতীয় পন্থা নাই। শাস্ত্রে আচার্য্যকে ভগবৎপ্রকাশ বা আশ্রয়জাতীয় ভগবৎবিগ্রহ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। গুরুদেব ভগবান্ হইতে অভিন্ন। তিনি জীবকুলকে নিত্যসেবা শিক্ষা দিবার জন্য প্রপঞ্চে সেবক-বিগ্রহরূপে প্রকটিত। তাঁহাকে আশ্রয় করিলে জীব বিষয়স্বরূপ ভগবানকে লাভ করিতে পারেন। সদ্‌গুরুর সেবা করিতে করিতে বদ্ধজীবের হৃদয়ের অবিদ্যারাশি বিদূরিত হয়, চিত্তদর্পণ নির্ম্মল হয়, তখন গুরুকৃপায় জীবের ঐ নির্ম্মলহৃদয়ে পরমশ্রেয়ঃসাধিকা ব্রহ্ম-বিদ্যার উদয় হইয়া থাকে। জীবের যে পর্য্যন্ত ভুক্তি কামনা প্রবল থাকে, সে পর্য্যন্ত সে সদ্‌গুরু-সমীপে অভিগমন করিতে পারে না। শ্রুতি বলেন—

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।।

(মুণ্ডকোপনিষৎ)

ব্রাহ্মণ কর্ম্ম দ্বারা অর্জ্জিত স্বর্গাদি লোকসমূহ কদলী দলের ন্যায় অসার জানিয়া, নিত্য ভগবদ্ধাম অনিত্য কর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ইহা জানিয়া কর্ম্মফলে নির্ব্বেদ লাভ করিবেন। এইরূপ ভুক্তিকামনায় নির্ব্বেদপ্রাপ্ত পুরুষ অতি বিনীতভাবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য বেদতাৎপর্য্যবিৎ ও ভগবৎসেবাপরায়ণ সদ্‌গুরুর চরণে সর্ব্বতোভাবে শরণ গ্রহণ করিবেন। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিও (৬।২৩) বলিয়াছেন—

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।

যে অধিকারী পুরুষের ভগবানে অহৈতুকী পরাভক্তি বর্ত্তমান, সেইরূপ যিনি সদ্‌গুরুতেও ঐকান্তিকী সেবাবুদ্ধি বিশিষ্ট সেই মহাত্মার নিকট আত্মতত্ত্ব বিষয়ক উপদেশ সকল প্রকাশিত হন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২২শ পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন—

"তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় শ্রীকৃষ্ণচরণ।।"

অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা দুষ্পারা মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া নিত্য ভগবৎসেবা পাইতে হইলে গুরুসেবা এবং গুরুর আনুগত্যে ভগবদ্ভজন ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপায় নাই। সদ্‌গুরু শিষ্যের ভুক্তিমুক্তি কামনাকে নিরাশ করিয়া একমাত্র অহৈতুকী সেবা শিক্ষাদান করেন। যেখানে গুরু (?) শিষ্যকে নিজের ভোগ্য মনে করেন এবং শিষ্যও আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা লইয়া গুরুর নিকট গমন করিয়া থাকেন, সেখানে গুরুসেবা নাই। ঐরূপ গুরু ও শিষ্য সম্বন্ধ নিরয়বর্ত্মের দ্বারস্বরূপ এবং সদ্‌গুরু-সেবা বৈকুণ্ঠ বর্ত্মের দ্বার।

গুরু নিত্য ভগবৎসেবায় অধিষ্ঠিত সুতরাং তিনি শিষ্যকেও ভগবানের সেবাতেই নিযুক্ত করেন। সদ্গুরুর ভগবৎসেবা ব্যতীত তিলার্দ্ধও অন্য কৃত্য নাই সুতরাং একমাত্র সদ্গুরুর সেবা করিলেই যুগপৎ গুরুসেবা ও ভগবৎসেবা সিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধবৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীরামানুজপাদের নাম পরমার্থি মাত্রেই শরণ করিয়াছেন। তিনি মায়াবাদ অন্ধকার ও কর্ম্মমার্গীয় স্মার্ত্তবাদের ঘূর্ণিবাত্যা হইতে জীবকুলকে উদ্ধার করিয়া জগতে ভক্ত ও ভগবানের সেবামাধুর্য্য প্রচার করিয়াছেন। একদা তিনি শিষ্যগণ পরিবৃত হইয়া শ্রীশৈলোদ্দেশ্যে গমন করেন। উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহারা অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দুই তিন দিবস পরে তাঁহারা একটী গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলেন। সেই গ্রামে রামানুজের দুইজন শিষ্যের বাস। এজন ধনশালী এবং একজন নিঃস্ব। ধনশালী শিষ্যের নাম যজ্ঞেশ এবং অপর জনের নাম বরদাচার্য্য। রামানুজ উক্ত ধনাঢ্য শিষ্যের নিকট শিষ্যগণ সহ নিজ আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিবার জন্য তাঁহার দুইজন শিষ্যকে প্রেরণ করিলেন। যজ্ঞেশ শ্রীগুরুদেবের আগমন বার্ত্তা শুনিতে পাইয়া আনন্দে এত অধীর হইলেন যে অন্তঃপুরে যাইয়া কি প্রকারে প্রভুর সম্বর্দ্ধনা করিবেন, তজ্জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এদিকে যে তাহার গুরুভ্রাতৃদ্বয় গৃহের দ্বারে বসিয়া রহিয়াছেন, তদ্বিষয়ে উদাসীন হইয়া পড়িলেন। রামানুজের শিষ্যদ্বয় যজ্ঞেশের ঐরূপ ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া গুরুর নিকট সব নিবেদন করিলেন। রামানুজও ধনাঢ্য শিষ্যের ব্যবহারে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া নিঃস্ব বরদাচার্য্যের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিবার জন্য শিষ্যগণ সহ গমন করিলেন। বরদাচার্য্য প্রত্যহ প্রাতেঃ ভিক্ষায় বহির্গত হইতেন এবং সারা দিবস ভিক্ষা করিয়া যৎকিঞ্চিৎ পাইতেন, তাহা গুরু ও নারায়ণে নিবেদনপূর্ব্বক তাঁহাদের অবশেষ গ্রহণ করিতেন। তাঁহার লক্ষ্মীনাম্নী পরমাসাধ্বী রূপলাবণ্যবতী সহধর্ম্মিনী ছিল। তিনি প্রকৃতই স্বামীর ধর্ম্মের সহায়কারিণী ছিলেন। যখন রামানুজ বরদাচার্য্যের ভগ্নকুটীরে শিষ্যগণসহ উপস্থিত হইলেন, তখন বরাদাচার্য্য ভিক্ষায় বহির্গত হইয়াছেন। লক্ষ্মী স্নান সমাপন করিয়া একটী ক্ষুদ্র শতছিদ্র চিরখণ্ড কোনও প্রকারে ধারণপূর্ব্বক অপর একটী জীর্ণ মলিন বসন রৌদ্রতাপে শুকাইতে ছিলেন। তিনি এইরূপ অবস্থায় গুরুদেবের সম্মুখে আসিয়া তাঁহার অভিবন্দন করিতে পারিতেছেন না, ইহা করতালিধ্বনি দ্বারা জ্ঞাপন করিলেন। রামানুজ তৎক্ষণাৎ বহির্দ্দেশ হইতে নিজ উত্তরীয় গৃহাভ্যন্তরে নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্মী তদ্দ্বারা গাত্র আচ্ছাদনপূর্ব্বক গুরু সম্মুখে আগমন করিলেন এবং গুরুদেবকে পুনঃ পুনঃ সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "প্রভো, আপনারা সকলে উপবেশন করুন, আমার স্বামী ভিক্ষার্থ বাহিরে গিয়াছেন, আমি শীঘ্রই বিষ্ণুনৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া দিতেছি।" এদিকে গৃহে তণ্ডুলকণা নাই। কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কিন্তু প্রাণ দিয়াও যদি গুরু ও বৈষ্ণবগণের সেবা করিতে হয়, তাহাই করিতে হইবে—ইহা চিন্তা করিতে করিতে নারায়ণকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে লক্ষ্মীদেবী একটী মাত্র উপায় খুঁজিয়া পাইলেন। নিকটে একজন ধনাঢ্য বণিকের বাস ছিল। উক্ত বণিকের চরিত্রদোষ ছিল। ঐ বণিক লক্ষ্মীদেবীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া বহুবার তাঁহাকে তাহার বিলাসিনী হইতে অনুরোধ করিয়া বলিয়াছিলেন যদি লক্ষ্মীদেবী তাহার মনোবাসনা পূর্ণ করেন, তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার ও তাঁহার স্বামীর দারিদ্র্য বিদূরিত হইবে তাঁহাদের আর কোনও অভাব থাকিবে না। কিন্তু সতী সাধ্বী লক্ষ্মীদেবী

বণিকের ঐরূপ কথায় দৃক্‌পাতও করেন নাই। আজ দেখিলেন শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণববৃন্দ দ্বারে উপস্থিত। যদি তাঁহাদের সেবার জন্য সামান্য নশ্বর দেহ, লৌকিক বা নৈতিক ধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিয়াও শ্রীগুরুদেবের সেবা হয়, তবেই তাহার দেহ ধারণের সার্থকতা। তিনি এতদিন নিজের ভোগের জন্য বণিকের অসাধু প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। কিন্তু আজ হরিগুরু-বৈষ্ণবসেবার জন্য ঐরূপ বিগর্হিত কার্য্য করিলেও তাহার নরকপাত হয় হউক কিন্তু তাহা দ্বারা ত' হরিগুরু-বৈষ্ণবের প্রীতি সাধন হইবে। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছাই কাম। কিন্তু কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা প্রেমনামে কথিত। কলিঘ্ননামক এক মহাভাগবত চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভগবানের সেবা করিয়াছিলেন। তিরুমঙ্গই আলোয়ার দস্যুবৃত্তি দ্বারা অর্থ অপহরণ করিয়াও নিজ ইষ্ট রঙ্গনাথের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। নরকগমন করিতে হইলেও আমি গুরুসেবা ও বৈষ্ণবসেবা ত্যাগ করিব না; এরূপ সঙ্কল্প করিয়া লক্ষ্মীদেবী ঐ ধনাঢ্য বণিকের নিকট গমন করিলেন এবং সেই দিবস রাত্রিযোগেই তাহার মনোবাসনা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। বণিক্ কত অনুরোধ করিয়া, নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়াও যাঁহাকে ঐরূপ অসৎকার্য্যে স্বীকার করাইতে পারে নাই, আজ সে উপযাজিকা হইয়া তাহার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া বণিক্ আনন্দে অধীর হইলেন। লক্ষ্মীদেবী বণিকের নিকট তাহার গুরু ও বৈষ্ণববৃন্দের আতিথ্য সৎকারার্থ দ্রব্যসম্ভাবের প্রয়োজন জ্ঞাপন করা মাত্র বরদাচার্য্যের কুটীরে ভারে ভারে তণ্ডুল, দ্বিদল, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, শর্করা, নানাবিধ ফলমূল প্রেরিত হইতে লাগিল। লক্ষ্মীদেবী ক্ষিপ্রতার সহিত রন্ধন করিয়া নৈবেদ্য বিষ্ণুকে নিবেদন করিলেন এবং তাহা গুরু ও বৈষ্ণবগণকে প্রদান করিলেন। সকলেই পরিতোষ সহকারে প্রসাদের সম্মান করিলেন এবং দরিদ্রের গৃহে এইরূপ প্রসাদের ভূরি আয়োজন দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন। এদিকে লক্ষ্মীদেবীর পতি ভিক্ষা হইতে আগমন করিয়া নিজ গুরুদেব ও গুরুভ্রাতৃগণকে তাঁহার ভগ্নকুটীরে দেখিতে পাইয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণববৃন্দকে পরিচর্য্যা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলে বৈষ্ণবগণ বলিলেন যে, তাঁহারা সকলেই পরম সন্তোষ সহকারে প্রসাদ সন্মান করিয়াছেন। বরদাচার্য্য শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং গৃহাভ্যন্তরে গমন করিয়া সহধর্ম্মিনীকে জিজ্ঞাসা করাতে লক্ষ্মীদেবী বিনীতভাবে ও ভীত চিত্তে বণিকের নিকট তাহার প্রতিশ্রুতির বিষয় নিবেদন করিলেন। বরদাচার্য্য ইহা শ্রবণ করিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিলেন এবং লক্ষ্মীদেবীকে বলিতে লাগিলেন—'লক্ষ্মী, তুমিই যথার্থ সহধর্ম্মিনী, আজ আমি ধন্য হইলাম, আমি এতদিন মনে করিয়াছিলাম তুমি বুঝি আমার হাড়মাংসের থলিকেই পতি বলিয়া ভাবনা কর, কিন্তু আজ দেখিতে পাইলাম যে তোমার উপর গুরুকৃপা সম্পূর্ণভাবে বর্ষিত হইয়াছে, তোমার সম্বন্ধ জ্ঞানোদয় হইয়াছে; তুমি বুঝিতে পারিয়াছ যে শ্রীনারায়ণই একমাত্র পতি এবং যাবতীয় জীবই প্রকৃতি। অতএব আজ তুমি এই শ্বশৃগালভক্ষ্য দেহের বিনিময়ে যে পরমাপতির সেবা করিতে পারিয়াছ ইহা স্মরণ করিয়া আমি মুহুর্মুহু আনন্দিত হইতেছি। ক্রমে শ্রীরামানুজ ও বৈষ্ণবগণও লক্ষ্মীদেবীর এইরূপ সেবাপ্রবৃত্তির বিষয় জানিতে পারিয়া বিস্মিত হইলেন এবং শ্রীরামানুজ ঐ দম্পতিকে বলিলেন যে তোমরা উভয়ে ঐ বণিকের গৃহে যাইয়া তাহাকে কিছু মহাপ্রসাদ দিয়া আইস। দম্পতি ঐ বণিকের নিকট মহাপ্রসাদ লইয়া গেলেন। বরদাচার্য্য বাহিরে রহিলেন, লক্ষ্মী বণিকের নিকট

গিয়া মহাপ্রসাদ অর্পণ করিলেন। লক্ষ্মীদেবীর অনুরোধে ঐ বণিক্ রামানুজা- চার্য্যের অবশেষ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বৈষ্ণব উচ্ছিষ্টের কি মাহাত্ম্য! প্রসাদ গ্রহণ করিতে করিতে বণিকের মন ফিরিয়া গেল। বণিকের চিত্তে অনুতাপ হইতে লাগিল হায়, আমি কাহার প্রতি এরূপ অসদভিলাষ করিয়াছি। আপনি ত বৈষ্ণবগৃহিনী, আপনার নারায়ণে সমর্পিত দেহে আমি ভোগ বুদ্ধি করিয়াছি। মাতঃ আমাকে নরক হইতে উদ্ধার করুন। আপনার শ্রীগুরুদেবের কৃপায় কি আমি বঞ্চিত থাকিব? বৈষ্ণবগণ ত' অদোষদর্শী। তিনি কি আমাকে কৃপা করিবেন না?"

সতী স্বামীর নিকট ফিরিয়া আসিয়া সব ঘটনা বলিলেন এবং পরে বণিকের বিষয় শ্রীগুরুদেবের চরণেও নিবেদন করিলেন। পতিতপাবন শ্রীরামানুজাচার্য্য বণিককে অতিশয় অনুশোচিত দেখিয়া দীক্ষা প্রদান করিলেন। পরে ঐ বণিক শ্রীগুরুর নিকট ঐ বৈষ্ণব দম্পতির দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য তাহার অর্থদান ইচ্ছা নিবেদন করিলেন। ইহা শুনিয়া বরদাচার্য্য গুরুদেবের নিকট অতিশয় বিনীতভাবে বলিলেন প্রভো, এই কৃপা করুন যেন এ অধম হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবাধিকার হইতে বিচ্যুত না হয়। প্রভো, ধন জন বা প্রতিষ্ঠাদি দ্বারা যেন আমার চিত্ত আপনার চরণ-যুগলের সেবা হইতে স্খলিত না হয়। রামানুজও বরদাচার্য্যের ঐরূপ ভাব দেখিয়া বণিককে বলিতে লাগিলেন—

যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ।।
বিষয় মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যা ধন কুলমদে বৈষ্ণব না চিনে।।

এদিকে রামানুজের ধনাঢ্য শিষ্য যজ্ঞেশ শ্রীগুরুর সেবা করিতে না পারিয়া অতিশয় দুঃখিত চিত্তে বরদাচার্য্যের গৃহে আসিলেন এবং শ্রীগুরুকে হৃদয়ের দুঃখ নিবেদন করিলেন। রামানুজ যজ্ঞেশকে বলিলেন, তোমার বৈষ্ণবাপরাধ হইয়াছে, তাই আমি তোমার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করি নাই। তুমি তোমার গুরুভ্রাতৃদ্বয়কে সম্বর্দ্ধনা না করিয়াই অন্তঃপুরে চলিয়া গিয়াছিলে। তখন যজ্ঞেশ কহিলেন প্রভো আপনার শুভাগমন বার্ত্তা শুনিয়া আমি আনন্দে অধীর হইয়া আপনার সম্বর্দ্ধনার জন্য আয়োজন করিতেছিলাম। তখন রামানুজ বলিলেন, আনন্দে বিহ্বল হওয়া কিছু সেবা নহে, কারণ—

"নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণ সেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে।।"

যেখানে নিজের আনন্দ লাভের লেশ মাত্রও ইচ্ছা আছে, তাহা ভুক্তি-কামনা সেখানে সেবা নাই; সেবায় কেবলমাত্র ইষ্টদেবের সুখ কামনা থাকিবে। আর বৈষ্ণবগণকে বাদ দিয়া কখনও গুরুসেবা হয় না। বৈষ্ণবগণ বা গুরুসেবকগণ সকলেই শ্রীগুরুদেবের একটী একটী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। অতএব তুমি যে অর্দ্ধকুটীজরতী ন্যায় অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণবগণকে সম্মান না করিয়াই কেবল আমার সেবা চিন্তাতেই বিহ্বল হইয়া

পড়িয়াছিলে, তাহাতে তোমার বৈষ্ণবাপরাধ হইয়াছে। সেই জন্য আমি তোমার গৃহে যাই নাই। যজ্ঞেশ তখন নিজ অপরাধ বুঝিতে পারিয়া শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণের চরণে বারংবার নিজ অপরাধ জ্ঞাপন করিয়া ক্রন্দন ও ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য যজ্ঞেশের গৃহে আতিথ্য গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন। সদ্‌গুরু ও প্রপন্ন শিষ্যের ব্যবহার এইরূপ। সদ্‌গুরু ধন কুল বিদ্যা দেখেন না, দেখেন সেবা-প্রবৃত্তি। সদ্‌গুরু-সেবা এবং ভুক্তি ও মুক্তির পার্থক্য প্রদর্শন করেন। সদ্‌গুরু শিষ্যকে পতিত রাখিয়া পতিতপাবন নাম ধরেন না, শিষ্যকে সত্য সত্যই পাবন করিয়া থাকেন। সদ্‌গুরু নিষ্কিঞ্চন ও নিরপেক্ষ শিষ্যের অন্যায় আচরণ প্রশ্রয় দেন না।

ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব

শুদ্ধবৈষ্ণবগণ ব্রাহ্মণগণকে আদর করেন। ব্রাহ্মণ মাত্রেই প্রকৃত বৈষ্ণবকে পূজা করেন। যেখানে নিজ নিজ যোগ্যতার অভাবকে আশ্রয় করিয়া জড়াহঙ্কার আসে, সেখানে নিজ নিজ স্বরূপ ভ্রান্তি জানিতে হইবে। স্বরূপ বিচারের উপযোগী হইবে বলিয়া নিম্ন প্রবন্ধটী প্রচারিত হইল। সকলেই জানেন ব্রাহ্মণ সকলের পূজ্য। ছেলেরা বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের নিকট ব্যাকরণে 'নির্দ্ধারে ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি হয়' ইহা পাঠকালেও মুখস্থ করিয়া থাকে—'বর্ণানাং বর্ণেষু বা ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠঃ'—চারিবর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ হইতে আর কেহ জগতে শ্রেষ্ঠ আছেন, ইহা অনেকেই জানেন না। এক ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের পূজ্য কিন্তু তিনি স্বয়ং ভগবান্। আবার শাস্ত্রে শুনিতে পাওয়া যায় সেই শ্রীকৃষ্ণও ভৃগুর পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ হইতে আর শ্রেষ্ঠ কেহ নাই কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখে বলিয়াছেন জগতে ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠ আছেন। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠ, বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের গুরু। একথা সাধারণ লোক জানে না—বলে, এ আর কি নূতন কথা! তারপর আজকালের লোকের 'বৈষ্ণব' বলিলেই লোকে অশিক্ষিত দুশ্চরিত্র বর্ব্বর ও অব্রাহ্মণ অসভ্য ছোট লোককেই বুঝিয়া থাকে। লোকের কোনও দোষ নাই, তাহারা প্রত্যক্ষ যাহা দেখিবে তাহাই ত' ধারণা করিবে। কিন্তু শাস্ত্র বলিয়াছেন বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বহু বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। যথা, গরুড়পুরাণে—

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্ত-পারগঃ।।
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।।

সহস্র ব্রাহ্মণের মধ্যে একজন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ; আবার সহস্র যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের মধ্যে সর্ব্ববেদান্ত শাস্ত্রে পারদর্শী একজন ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ; আবার সেই প্রকার কোটী ব্রহ্মজ্ঞের মধ্যে একজন বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ, সুতরাং যিনি বৈষ্ণব তাহাতে ব্রাহ্মণতার অভাব নাই। যেমন যে ধনীর এক লক্ষ টাকা আছে,
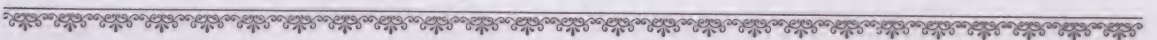
তাহার এক বা দশ হাজার টাকার অভাব নাই। এক লক্ষ টাকার মধ্যেই হাজার বা দশ হাজার টাকা নিহিত আছে। অতএব যিনি বিষ্ণুভক্ত তিনি নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ। কেবল ব্রাহ্মণ বলিলে বিষ্ণুভক্তকে ছোট করা হয়। যদিও বিষ্ণুভক্তের জাগতিক ছোট বড় দিকে লক্ষ্য নাই, তিনি সর্ব্বদাই নিজকে তৃণ হইতেও সুনীচ জানেন তথাপি সকল জীবের মঙ্গলাভিলাষী বিষ্ণুভক্ত নির্ব্বোধ লোক বা মৎসর ব্যক্তিগণ যাহাতে অপরাধে না পতিত হন, তজ্জন্য সচেষ্ট। অনেক নির্ব্বোধ লোক বা যাহাদের অপরকে সম্মান দিতে মনে কষ্ট হয়, এইরূপ মৎসর ব্যক্তি বৈষ্ণবকুল-শিরোমণি সাক্ষাৎ ভগবৎপার্ষদ অভিন্ন ব্রজপরিকর শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল নরোত্তম, শ্রীল ঝড়ু ঠাকুর, শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দকেও শূদ্র বলিতে কুণ্ঠিত হন না। আবার অনেক বিষ্ণুবৈষ্ণববিরোধী ব্যক্তি ঐ সকল মহাত্মা শৌক্র-ব্রাহ্মণকুলজাত ব্যক্তিগণকে শিষ্যত্বে স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের আচরণে দোষারোপ করিয়া থাকেন। যাহারা দেহকেই যথা-সর্ব্বস্ব বলিয়া জানিয়া দেহধর্ম্ম বা লৌকিক স্মার্ত্তধর্ম্মে অভিনিবিষ্ট তাহারা বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য কি প্রকারে বুঝিবেন? তাহারা শুক্রশোণিতজাত জড়দেহের পরিচয়কেই যথাসর্ব্বস্ব বলিয়া জানেন। কিন্তু বৈষ্ণবগণ দেহের মাত্র পরিচয়েই পরিচিত নন। তাঁহারা ভগবানের শুদ্ধ নিত্যদাস। তাঁহারা জানেন আমরা নিত্যবস্তু সচ্চিদানন্দ ভগবানের অংশ ও নিত্যসেবক। যুগে যুগে বৈষ্ণব আচার্য্যগণ জগতে এই বিষ্ণুবৈষ্ণবের মাহাত্ম্য, আত্মধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার ও আনুষঙ্গিক ভাবে বিষ্ণুবৈষ্ণববিরোধিদলের হেয়তা, সঙ্কীর্ণতা এবং বহির্ম্মুখ স্মার্ত্তধর্ম্মের ক্ষুদ্রত্ব ও জড়ত্ব ভাব নিরসনের জন্য অন্তর্ম্মুখ স্মার্ত্তরূপে জগতে প্রাদুর্ভূত হন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যবনকুলোদ্ভূত হরিদাসের পরিত্যক্ত দেহ কোলে করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিয়া হরিদাস ঠাকুরের শ্রাদ্ধ মহোৎসব ভক্তগণ সহ সমাপন করিয়াছিলেন। ভক্তগণ হরিদাসের পাদোদক গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ অদ্বৈতপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে শ্রাদ্ধপাত্র অর্পণ করিয়াছিলেন। একদিন হরিদাস ঠাকুর অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুকে বলিলেন—

মহা মহা বিপ্র এথা কুলীন সমাজ।
আমারে আদর কর, না বাসহ লাজ।।
অলৌকিক আচার তোমার কহিতে পাই ভয়।
সেই কৃপা করিবে যাতে তোমার রক্ষা হয়।।

অদ্বৈতপ্রভু তদুত্তরে বলিলেন—

আচার্য্য কহেন, তুমি না করিহ ভয়।
সেই আচরিব যেই শাস্ত্রমত হয়।।
তুমি খাইলে হয় কোটি-ব্রাহ্মণ ভোজন।
এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র করাইল ভোজন।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ৩য়)

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ রামানুজের গুরু মহাপূর্ণ কোন শূদ্রকুলোদ্ভূত ভক্তের পবিত্যক্ত-দেহের সৎকার করিয়াছিলেন বলিয়া তদানীন্তন বিষ্ণুবৈষ্ণববিরোধী স্মার্ত্তগণ তাঁহার নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাপূর্ণ তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও পশ্চাদপদ হন নাই। তির্য্যক্‌যোনিজ জটায়ুর সংস্কার করিয়াছিলেন। শ্রীল ঝড়ু ঠাকুর ভূঁইমালীকুলে উদ্ভূত হইয়াছিলেন কিন্তু শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর জ্ঞাতিখুড়া কালিদাস সেই ঝড়ু ঠাকুরের আস্তাকুড়ের পরিত্যক্ত চোষা আমের আঁটি বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তাহার (ঝড়ু ঠাকুরের) চরণ চিহ্ন যেই ঠাঞি পড়িল।
সেই ধূলি লঞা কালিদাস সর্ব্বাঙ্গে লেপিল।।

একদিন ঝড়ু ঠাকুর—

চুষি চুষি চোকা আঁটি ফেলিল পাটুয়াতে।
তারে খাওয়াইয়া তার পত্নী খায় পশ্চাতে।।
আঁটি চোষা সেই পাটুয়া খোলাতে ভরিয়া।
বাহির উচ্ছিষ্টগর্ত্তে ফেলাইল লঞা।।
সেই খোলা আঁটি চোকা চুষে কালিদাস।
চুষিতে চুষিতে হয় প্রেমেতে উল্লাস।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ১৬শ)

শ্রীনারায়ণীনন্দন শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভূত হইয়াও শ্রীচৈতন্যভাগবতে বৈষ্ণবের কত শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন—

যে সে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।।
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতি বুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি মরে।।

(শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড ১১শ অধ্যায়)

বিষয়-মদান্ধ সব এ মর্ম্ম না জানে।
বিদ্যা ধন জাতি মদে বৈষ্ণব না চিনে।।

(ঐ মধ্যখণ্ড ১৬শ অধ্যায়)

বৈষ্ণব বিরোধী ব্রাহ্মণব্রুবকে অভক্ত জানিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত তাঁহাদিগকে আদর করেন নাই।

এ সকল রাক্ষস ব্রাহ্মণ নাম মাত্র।
এ সব লোক যম যাতনার পাত্র।।

কলিযুগে রাক্ষস সকল বিপ্র ঘরে।
জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে।।

বরাহপুরাণে এই বাক্যের প্রমাণাদিও আছে। বিষ্ণুর অভক্তগণ পুণ্যফলে ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইয়াও অব্রাহ্মণ আচার গ্রহণ করিয়া তাঁহারা মধ্যে মধ্যে শ্রোত্রিয়কুলকে বাধা প্রদান করিয়া থাকেন।

এ সব বিপ্রের স্পর্শ, কথা নমস্কার।
ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্বথা নিষেধ করিবার।।

তথাহি পদ্মপুরাণে মহেশবাক্যং—

কিমত্র বহুনোক্তেন ব্রাহ্মণা যে হ্যবৈষ্ণবাঃ।
তেষাং সম্ভাষণং স্পর্শং প্রমাদেনাপি বর্জ্জয়েৎ।।

পদ্মপুরাণে মহাদেব বলেন যে সকল ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন ব্যক্তিগণ অবৈষ্ণব, প্রমাদবশতও তাহাদের সম্ভাষণ ও স্পর্শ পরিত্যাগ করিবে।

ব্রাহ্মণ হইয়াও যদি অবৈষ্ণব হয়।
তবে তার আলাপেও পুণ্য যায় ক্ষয়।।

(শ্রীচৈতন্যভাগবত আদিখণ্ড ১১শ অঃ)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ (১০০ সংখ্যায়) শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ শ্রীমদ্ ভাগবতের বচন উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-প্রাণং পুনাতি সকুলং ন তু ভূরিমানঃ।।

ধন, সৎকুলে জন্ম, রূপ, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, ওজঃ, তেজ, প্রতাপ, বল, পৌরুষ, প্রজ্ঞা ও অষ্টাঙ্গযোগ এই দ্বাদশ গুণ অথবা শম, দম, তপস্যা, শুদ্ধাচার, ক্ষমাগুণ, সরলতা, বৈরাগ্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সন্তোষ, সত্য, ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস এই দ্বাদশগুণযুক্ত বিপ্রও যদি ভগবানের চরণারবিন্দে বিমুখ হন, তাহা অপেক্ষা যাঁহার মন, বাক্য, চেষ্টা, ধন ও প্রাণ শ্রীভগবানে অর্পিত হইয়াছে সেই প্রকার ব্যক্তি চণ্ডাল হইলেও ঐ দ্বাদশগুণ থাকা হেতু অত্যন্ত গর্ব্বান্বিত ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ। কারণ ইনি চণ্ডালকুলে উদ্ভূত হইয়াও কুল পবিত্র করেন আর উক্ত ব্রাহ্মণকূল ত' দূরের কথা, নিজকেই পবিত্র করিতে পারেন না। যথোক্তং—

কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুল্কশা আভীরশুম্ভা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেহন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ।। (ভাঃ ২।৪।১৭)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা—কিরাতাদয়ো যে জাতিত এব পাপ অন্যে চ যে কর্ম্মত এব পাপাস্তে শুধ্যন্তি। সদ্গুরুচরণাশ্রয়মাত্রেণৈব জাতিকর্ম্মাভ্যাং সকাশাৎ পাপিনঃ শুধ্যন্তীতি প্রারব্ধাপ্রারব্ধপাপনাশকত্বং

ভক্তের্ব্যঞ্জিতম্। তথাপি তে তজ্জাতিত্বেন যদাখ্যায়ন্তে তদ্ব্যবহারত এব ন তু পরমার্থত ইতি জ্ঞেয়ম্। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিরিতি তেষু জাতিবুদ্ধির্নিষেধাৎ। কিরাত, হূন, আন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুহ্ম, যবন ও খস প্রভৃতি যে সকল পাপজাতি এবং অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি কর্ম্মতঃ পাপী, তাহারাও ভগবানের আশ্রিত ব্যক্তি অর্থাৎ সদ্গুরুর চরণাশ্রয় মাত্রেই জাতি ও কর্ম্মগত পাপ হইতে শুদ্ধি লাভ করে। ভক্তি দ্বারা জীবের প্রারব্ধ অর্থাৎ যে পাপের ফল ভোগ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং অপ্রারব্ধ অর্থাৎ যে সকল পাপের ফলভোগ এখনও আরব্ধ হয় নাই, তাহা সমুদয়ই বিনষ্ট হয়। তথাপি ঐ সকল সদ্গুরু চরণাশ্রিত ব্যক্তিকে প্রাকৃত লোক যে তৎ তৎ জাতি বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকে তাহা ব্যবহারগত, পরমার্থতঃ নহে। কারণ শাস্ত্র বলেন, বৈষ্ণবে যে জাতি বুদ্ধি করে, সে নারকী; অতএব তাঁহাদের প্রতি জাতি-বুদ্ধি করা নিষেধ। ভক্তিসন্দর্ভে ১০১ সংখ্যায় শ্রীজীবপাদ পুনরায় ভাগবতের (ভাঃ ১০।২৩।৩২) শ্লোক উঠাইয়া দেখাইতেছেন—

ধিগ্ জন্মনস্ত্রিবৃৎ যত্তদ্ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাং।
ধিক্ কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে।।

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ বলিতেছেন—আমরা জড় ইন্দ্রিয়ের অতীত শ্রীকৃষ্ণে বিমুখ। সুতরাং জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি নাই। আমাদের শুক্রসম্বন্ধি, সাবিত্রীসম্বন্ধি এবং দৈক্ষ্য এই ত্রিবিধ জন্মে ধিক্, আমাদের ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রতে ধিক্, আমাদের বহু অভিজ্ঞতাকে ধিক্, আমাদের ব্রাহ্মণকুলেও ধিক্, আমাদের যজ্ঞাদি কর্ম্মে নিপুণতাতেও ধিক্। শ্রীমদ্ভাগবত এই শ্লোকে 'অধোক্ষজ' এবং বহুবার ধিক্ শব্দ প্রয়োগের দ্বারা অক্ষজ স্মার্ত্তধর্ম্ম নিরাশ করিয়া অধোক্ষজ ভগবদ্ভক্তি স্থাপন করিলেন। যাহারা স্মার্ত্তধর্ম্মের অক্ষজজ্ঞানে অন্ধ হইয়া বৈষ্ণবে ব্রাহ্মণতা, ক্রিয়া পটুতা, ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত, বহু অভিজ্ঞতার অভাব কল্পনা করেন, তাহাদিগকে শত ধিক্। 'সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ' ভগবানের অকিঞ্চন ভক্তের মধ্যে দেবতাগণ তাহাদের সমস্ত গুণের সহিত বিরাজ করেন। সুতরাং বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণব্রুব মাত্র নহেন। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ নহেন, ইহা মূর্খের প্রলাপ মাত্র। বৈষ্ণবকে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ বলিলে তাঁহাকে ছোট করা হয়। বৈষ্ণব সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত ব্রাহ্মণ। বৈষ্ণব পরমাত্মবিৎ যোগী। বৈষ্ণব ভগবদুপাসক ব্রাহ্মণ। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের ও যোগীর গুরুদেব। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের অনুগত। কর্ম্মিব্রাহ্মণ বর্ণ ও আশ্রমের অন্তর্গত বস্তু। ভক্ত ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব বর্ণাশ্রমাতীত অপ্রাকৃত বস্তু। মূর্খ জড়লোক বুঝাইবার জন্য বৈষ্ণব পরমহংসগণ বৈষ্ণবকে ব্রাহ্মণোত্তম ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব গুরুদাস বলিয়া থাকেন। বৈষ্ণব আপনাকে ব্রাহ্মণ বলেন না বলিয়া মূর্খ ব্রাহ্মণব্রুবগণ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিতেও কুণ্ঠিত হন। ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণও বৈষ্ণবের অনুগত। কারণ ব্রহ্ম, পরমাত্ম, ভগবৎ—ত্রিবিধ প্রতীতির মধ্যে ভগবৎ প্রতীতিই সমগ্র প্রতীতি। গ্রাজুয়েশন বা উপাধি লাভের পূর্ব্বেই যেরূপ ম্যাট্রিকিউলেশন বা প্রবেশাধিকার অন্তর্নিহিত সেরূপ বৈষ্ণবতার অভ্যন্তরেই ব্রাহ্মণত্ব অবস্থিত।

প্রকৃত ভোক্তা কে?

পদার্থান্তরকে ভোগ করিবার যোগ্যতা যাহাতে বর্ত্তমান তাহাকে ভোক্তা বা ভোক্তৃতত্ত্ব এবং অন্য কর্ত্তৃক ভোগার্থে গৃহীত হইবার যোগ্যতা সম্পন্ন পদার্থকে ভোগ্য বা ভোগ্যতত্ত্ব কহে। এই ভোক্তৃভোগ্যাত্মক তত্ত্বদ্বয়ের সম্যক্‌জ্ঞান বিকশিত না হওয়া পর্য্যন্ত অজ্ঞ মানববৃন্দ, মরীচিকায় জলদর্শনের ন্যায়, ভ্রান্তিক্রমে একের গুণ অন্যে অর্থাৎ ভোক্তার ভাব ভোগ্যতত্ত্বে আরোপ করতঃ কৃত্রিম ভোক্তৃগণ ভোগসাধনে তৎপর হইয়া নরকের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া থাকেন। যেরূপ ভ্রান্তির অপগমে মরুভূমিতে জলের পরিবর্ত্তে বালুকারাশি দৃষ্ট হয় এবং জলাশয় ব্যতীত অন্যত্র জলের অবস্থিতি অসম্ভবপর ইত্যাকার জ্ঞান ফুটিয়া উঠে, তদ্রূপ সম্যক্‌জ্ঞনের বিকাশ ভূমিকায় ভোগ্যতত্ত্বে ভোক্তৃত্বের দর্শন না করিয়া কেবলমাত্র ভোক্তৃতত্ত্বে উহার দর্শন সিদ্ধ হইতে থাকে।

ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে আমরা জন্ম-স্থিতি-লয়-ধর্ম্মাত্মক বাহ্যপদার্থ ও তাহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধসূচক লৌকিক-জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া থাকি; কিন্তু নিত্য সত্যবস্তু ও তৎসম্পর্কীয় অলৌকিক জ্ঞান লাভ করিতে হইলে শাস্ত্রের মুখাপেক্ষী হওয়া ব্যতীত আমাদিগের গত্যন্তর নাই। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ-কালে সমাগত লৌকিকজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিসকল স্থির করিয়াছিলেন যে, তিনি এইবার নিশ্চয়ই ভস্মীভূত ও মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন; কিন্তু স্বয়ং প্রহ্লাদ মহারাজের ও অন্যান্য ভক্তমণ্ডলীর হৃদয়ে নাস্তিক-জনোচিত পূর্ব্বোক্ত অমূলক ধারণাটী স্থানাভাবে উৎপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। "কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" এই ভগবন্মুখনিঃসৃত আশ্বাসবাণী হৃদয়ে জাগরূক থাকায় শেষোক্ত ব্যক্তিসকল শ্রীভগবান্ যে নিশ্চয়ই প্রহ্লাদকে রক্ষা করিবেন, এরূপ দৃঢ় নিশ্চয় সম্পন্ন ছিলেন এবং কি প্রকারে যে তিনি তাহাকে রক্ষা করিবেন সেই লীলা সন্দর্শনার্থে কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া কালাতিপাত করিতেছিলেন। অগ্নি যাঁহার নিকট হইতে দাহিকাশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি ইচ্ছামাত্রেই উক্ত শক্তিকে অগ্নি হইতে প্রত্যাহার করিয়া লইতে পারেন এবং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে নিজ প্রতিজ্ঞা-পালনার্থে তাহাই করিয়াছেন। অগত্যা শক্তিহীন হওয়ায় অগ্নি নিজকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত প্রহ্লাদ মহারাজের একটী কেশ মাত্রকেও দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় নাই। লৌকিক-জ্ঞানে বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তিসকল এই আখ্যায়িকার ইতিবৃত্তে বিশ্বাসস্থাপনে নিতান্ত নারাজ এবং শ্রবণমাত্রই ইহা যে মনঃকল্পিত ব্যাপার এরূপ ধৃষ্টতাপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমরা ইতিহাস হইতে দেখিতে পাই যে অনেক লৌকিকজ্ঞানসম্পন্ন নাস্তিক কালপ্রভাবে সুকৃতিসম্পন্ন হওয়ায় অবশেষে শাস্ত্রোজ্জ্বলা বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়াছিলেন এবং এইপ্রকার ভক্তিবৃদ্ধিকারী আখ্যায়িকায় বিশ্বাসস্থাপন করতঃ ভগবৎসেবোন্মুখতা লাভ করিয়াছিলেন।

লৌকিকজ্ঞানের অকিঞ্চিৎকরতা হৃদয়ঙ্গম হইলে জীবগণ শাস্ত্রানুশীলনে প্রবৃত্ত হন এবং শাস্ত্র হইতে অবগত হইয়া থাকেন যে, শ্রীভগবানই একমাত্র আদি সত্যপদার্থ ও সর্ব্বশক্তিমান্ তত্ত্ববিশেষ এবং নিজ অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তিকে অবলম্বন করিয়া তিনি অন্যান্য পদার্থসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন। যেরূপ মৃত্তিকা

হইতে জাত ঘটসরাদি পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্টপদার্থনিচয় পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত হইলেও কারণরূপ ভগবত্তত্ত্বকে আশ্রয়পূর্ব্বক জ্ঞাত কিম্বা অজ্ঞাতসারে নিজ নিজ সত্ত্বা রক্ষণে সমর্থ হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, আমরা অমুকের পুত্র ও অমুকদেশে অবস্থিত ইত্যাদি প্রকার লৌকিকজ্ঞাননিষ্ঠধারণাসমূহ শাস্ত্রানুশীলনপ্রভাবে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং তৎস্থলে আমরা যে শ্রীভগবানের সৃষ্ট দেহাধ্যাসরহিত শুদ্ধজীব এবং তাহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত আছি এবম্প্রকার অলৌকিক জ্ঞান আমাদিগের হৃদয়দেশ অধিকার করিয়া থাকে। যেহেতু লৌকিকজ্ঞান, অলৌকিকজ্ঞান প্রভাবে বিলুপ্ত হইতে বাধ্য হয়, তন্নিমিত্ত অলৌকিকজ্ঞানের যে হৃৎকর্ণরসায়নতা আছে—ইহাতে আর সন্দেহ কি?

অলঙ্কার শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, আশ্রয়জাতীয় পদার্থের একমাত্র ধর্ম্ম বিষয়জাতীয় পদার্থের সেবা করা। যেরূপ আশ্রয়জাতীয় স্নিগ্ধজ্যোৎস্না প্রকাশিকা শক্তি নিজ বিষয়জাতীয় চন্দ্রমার মহিমা প্রকাশ করা ব্যতীত অন্য কাহারও মহিমা ব্যক্ত করে না এবং বাহ্যবিষয়-বাসনার পূতিগন্ধযুক্ত হৃদয়রূপ আশ্রয়জাতীয় পদার্থের ধনজনাদিরূপ অনিত্য বিষয়জাতীয় পদার্থকারে অবভাসিত পদার্থসমূহের সেবা ও তাহাদের নামরূপ-গুণলীলার কীর্ত্তন করা ব্যতীত কৃত্যান্তর নাই, তদ্রূপ আশ্রয়জাতীয় নিখিল-জীবকুলের শুদ্ধস্বরূপের স্বভাবে বিষয়জাতীয় শ্রীভগবানের সেবা ও তাঁহার নামরূপ-গুণলীলার শ্রবণকীর্ত্তন-স্মরণাত্মক কার্য্য ব্যতীত অন্য কোন প্রকার বাহ্যলৌকিকজ্ঞানোত্থ কর্ত্তব্যবুদ্ধিনিষ্ঠ ক্রিয়ার পরিচয় অসম্ভব। ব্রহ্মগায়ত্রীর "ধিয়ো যঃ নঃ প্রচোদয়াৎ" পদের অনেকে এরূপ কাল্পনিক অর্থ করেন যে শ্রীভগবান্ যখন বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরক, তখন কর্ম্মের হেয়োপাদেয়তা- রূপ বিচার নিরর্থক এবং চিত্তের এরূপ বিচার প্রবণতাটীকে দমন করণার্থে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের বুদ্ধিপ্রদাতৃরূপে ভগবত্তত্ত্বের চিন্তা করিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। নিজ মত সমর্থন করিবার অভিপ্রায়ে "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" এই শাস্ত্রবচনটী উদ্ধৃত করিয়া তাহারা পূর্ব্ববৎ ইহার ব্যাখ্যা করেন এবং শ্রোতার হৃদয়ে ধারণা বদ্ধমূল করিবার জন্য সূর্য্য- কিরণের দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন যে, কিরণসমূহ যেরূপ অবিচারে পাপী ও পুণ্যাত্মাকে সমভাবে আলোক প্রদান করিয়াও পাপ-পুণ্যের ভাগী হয় না এবং অবিচারে আলোক দান করাই তাহার ধর্ম্ম, মানবগণও বিচারশূন্য হইয়া তদ্রূপ সৎ ও অসৎ যে কোন কর্ম্ম করিতে পারেন এবং তজ্জন্য তাহাদিগের কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, যেহেতু পাপ ও পুণ্য অশ্ব ডিম্বের ন্যায় অলীক অর্থাৎ বাস্তবসত্ত্বহীন তত্ত্ববিশেষ। সূর্য্যকিরণ জড়পদার্থ বিধায় হেয়োপাদেয়রূপ বিচারযোগ্যতাহীন এবং উহা নৈসর্গিক নিয়মের অধীন। একমাত্র মানবগণই হিতাহিত বিচার করিতে সমর্থ এবং শাস্ত্র-সাহায্যেই তাহা যথাযথরূপে সিদ্ধ হইতে পারে। শাস্ত্রানুশীলনকালে ভগবৎকৃপায় যে দিব্যালোক আমাদিগের বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হয়, তদ্দ্বারা আমরা ভগবৎসেবায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকি; যেহেতু ঐ বিশুদ্ধ আলোক ভগবৎসকাশাৎ আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করায়, তন্নিমিত্ত শাস্ত্রে শ্রীভগবানকে আমাদিগের বুদ্ধির প্রেরক বলা হইয়াছে। শ্রীগীতায় ভগবান্ স্পষ্টই বলিয়াছেন, "দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে" অর্থাৎ যাহাতে মানবগণ তাঁহাকে প্রাপ্ত হন, তদ্বিষয়ক বুদ্ধি তিনি তাহাদিগকে দিয়া থাকেন। অতএব কল্যাণের আকর শ্রীভগবান্ কখনই

অসৎ কর্ম্মে আমাদিগকে নিযুক্ত করিতে পারেন না এবং অসৎকর্ম্মকে সৎবুদ্ধিপ্রণোদিত জ্ঞান করিতে থাকিলে, আমরা যে অবশেষে রৌরব হইতে মহারৌরবে যাইয়া কঠোর যন্ত্রণা পাইতে থাকিব, ইহাতে আর সন্দেহ কি? বিষয়ভোগে প্রমত্ত নকল ভক্তগণ অন্যের নিকট সাধু সাজিবার অভিপ্রায়ে গায়ত্রীর কূট অর্থ করিতে বাধ্য হন এবং যাহারা তাহাদের ছলনায় প্রতারিত হন তাহাদিগের সঙ্গকেও দুঃসঙ্গজ্ঞানে পরিত্যাগ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

বিষয় ও আশ্রয় পরস্পর স্বতন্ত্র সত্ত্বারূপে প্রতিভাত হইলেও যখন বিষয়ের সেবা করাই আশ্রয়ের ধর্ম্ম বুঝা যাইতেছে, তখন ইহাও অবগত হওয়া যাইতেছে যে, সেবার দ্বারা বিষয়-জাতীয় বস্তুটীর তৃপ্তি হইলে আশ্রয় নিজেকে কৃত-কৃতার্থ অনুভব করেন এবং বিষয়ের সুখে আপনাকে সুখী বিবেচনা করিয়া থাকেন। নিজ ভোগতৎপরতার স্থান আশ্রয়জাতীয় পদার্থের স্বভাবে না থাকায় আশ্রয় তত্ত্বটী যে বিষয়-তত্ত্বের সহ অভিন্নহৃদয় ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। শাস্ত্রেও কথিত আছে যে, ভগবান্ লীলারস আস্বাদনার্থে নিজ মূল স্বরূপটীকে বজায় রাখিয়া স্বাংশ ও বিভিন্নাংশাকারে অন্যান্য বহুরূপ ধারণ করিয়াছেন এবং সেই অন্যান্য রূপগুলির দ্বারা নিজ মূল রূপটীর সেবারূপ অভিনয় করাইতেছেন। মূলরূপে সেবা গ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহাকে শাস্ত্রে সেব্য বা ভোক্তৃ-তত্ত্ব এবং অন্যান্য রূপগুলিকে সেবক বা ভোগ্যতত্ত্ব কহে। বিষয়াসক্ত মানবগণ যেরূপ অভাব-পূরণের জন্য কর্ম্মের আবাহন করেন, পূর্ণানন্দময় শ্রীভগবানের কোনরূপ অভাব না থাকায় কামিগণের ন্যায় তাঁহার প্রবৃত্তির উদ্যম সম্ভবপর নহে। নৃপতিগণ অনায়াসে গৃহে অবস্থান করতঃ অর্থ দ্বারা ক্রয় করিয়া মৃগমাংস ভক্ষণ করিতে পারেন এবং তন্নিমিত্ত তাহাদিগের মৃগয়ারূপ ব্যাপারকে কেহ মাংসাশী ব্যাধের কার্য্যতুল্য যে ঘৃণিত ব্যাপার এরূপ মনে করিতে পারেন না। মৃগয়ার অভিনয়টী কেবলমাত্র ইঙ্গিত-জ্ঞাপক লীলার দৃষ্টান্ত মাত্র, কিন্তু শ্রীভগবানের সৃষ্টিকার্য্যটী লীলাতত্ত্বের পরিস্ফুটভাবোদ্দীপক ব্যাপার বিশেষ অর্থাৎ কোন অবান্তর উদ্দেশ্য ইহার মূলে থাকিতে পারে না। যদি কেহ একটু স্থিরভাবে চিত্তগহ্বরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন, তিনি অনুভব করিতে পারিবেন যে নিরস্তকুহক সত্যস্বরূপে কোন একটী বিশেষ তত্ত্ব নিত্যসেব্যরূপে এবং দেহের মধ্যে থাকিয়াও অসংস্পৃষ্ট- ভাবে সদা অবস্থান করিতেছেন এবং তাঁহার রূপ, গুণ, লীলা-মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া নিত্যকালব্যাপী সেবা করিবার অভিপ্রায়ে আশ্রয়-জাতীয় জীবকুল কায়, মন ও বাক্যকে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। যিনি ভূমা পুরুষ (অর্থাৎ পূর্ণানন্দের খনিবিশেষ), তাঁহার সেবাতেই প্রাণিগণ তৃপ্ত হইতে পারে। ক্ষুদ্র ধনজনাদির সেবা হইতে ভগবৎসেবানন্দের কণামাত্রও লভ্য নহে। ধনজনাদি ক্ষুদ্র অর্থাৎ বিভিন্নাংশ পদার্থ বিধায় যখন জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে তাহারা জড়-সেবানন্দরূপ ইন্দ্রিয়ানন্দের প্রয়াসী, তখন তাহারা নিশ্চয়ই ভিখারী। অতএব ভিখারীর নিকট পরমানন্দের প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। মানব মাত্রেই কখন কাহারও সেবা করিতে এবং কোন সময়ে কাহারও কর্ত্তৃক সেবিত হইতে চাহে। কে সেবক ও কাহার সেবা গ্রহণ করিবার যোগ্যতা আছে, তদ্বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞানাভাবে সেবা প্রবৃত্তির উদয়কালে মানবগণ সেবকতত্ত্বেরই সেবা সাধিত করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং তজ্জন্য যথার্থরূপে যিনি সেব্য, তাঁহার সেবায় বঞ্চিত হইয়া থাকে। অন্ধকারাপগমে যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি সম্ভবযোগ্য হয়

না, তদ্রূপ সম্যক্ জ্ঞানোদয়ে সেব্যবস্তুরই সেবা সাধিত হইয়া থাকে, অন্যের নহে। এই ভোক্তৃ-ভোগ্যরূপ তত্ত্বভ্রান্তি যাবৎ না অপনোদিত হয় তাবৎকাল পর্য্যন্ত মানবের জ্ঞানের উন্নতির পথ অবরুদ্ধ থাকিতে বাধ্য।

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠান্তে শ্রীবেদান্ত দর্শনের নিগূঢ় রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা যায় এবং বুঝিতে পারা যায় যে, শ্রীভগবানই একমাত্র সেব্য-তত্ত্ব এবং অন্যান্য পদার্থসমূহ তাঁহার সেবক-তত্ত্ব। ইত্যাকার সত্যমূলক তত্ত্ব-জ্ঞানের অভাবে পরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় অন্যকার দর্শনকে ভ্রান্ত দর্শন বলাই যুক্তিসঙ্গত। সুতরাং সৎসিদ্ধান্তমূলক জ্ঞানাগ্নির দ্বারা বিরোধ সিদ্ধান্তগুলিকে দগ্ধ করিয়া চিত্ত হইতে বহিষ্কৃত করাই কর্ত্তব্য। দুগ্ধ ও কলা দিয়া কালসর্প পোষণ করা বুদ্ধিমানের উচিত নহে। ভোক্তা সাজিয়া ভুক্তিবাদ আশ্রয় করিলে অথবা ভোগে বিরক্ত হইয়া মুক্তিবাদের অনুসরণ করিলে কোন কালেই সুবিধা হইবার নহে।

আমি যখন বাস্তবপক্ষে শ্রীভগবানের সেবক অর্থাৎ ভোগ্য-তত্ত্ব, তখন নকল ভোক্তা সাজিয়া ভোগে প্রমত্ত হওয়া আমার নিশ্চয়ই অকর্ত্তব্য। আবার মদীয় স্ত্রীপুত্রাদিরও ভোক্তা সাজা অন্যায় এবং তাহাদিগের ভোগপ্রবণতার সাহায্য করা আমার পক্ষে ততোধিক অন্যায়। সকলেই যদি নিজ নিজ সেবকভাবে ভগবৎসেবারত হয়, তাহা হইলে এই জগৎ ভোগভূমিরূপে দৃষ্ট না হইয়া সদ্যই বৈকুণ্ঠস্বরূপে প্রতিভাত হইতে থাকিবে। তৎকালে শ্রীভগবানে নিবেদিত অন্ন-ব্যঞ্জনাদিকে মহাপ্রসাদ বুদ্ধিতে আস্বাদন দ্বারা দেহ-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে অর্থাৎ ডাল ভাত মনে করিয়া ভোক্তৃবুদ্ধিতে আহার করিতে হইবে না। শ্রীভগবানের উচ্ছিষ্ট স্বীকাররূপ কার্য্যটীকে হরিসেবার অঙ্গ বলিয়া ভক্তিশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। যাহারা অনিবেদিত বস্তু ভোজন করেন, তাহারা অভক্ত, যেহেতু ভোক্তৃ-বুদ্ধিই উক্ত কার্য্যের প্রবর্ত্তক। যাঁহারা মহাপ্রসাদ সম্মানপূর্ব্বক ভগবৎ- সেবায় রত থাকেন, তাঁহারা দিন দিন ভক্তিলতার বৃদ্ধি সাধন করিতে সমর্থ হন, অন্যে নহে। হরি ওঁ তৎসৎ।

বিষ্ণুমায়া

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।। (গীতা)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—হে সখে! আমার এই মায়া দৈবী, অলৌকিকী এবং দুস্তরা অর্থাৎ মনুষ্যাদি অন্যান্য জীব জন্তু ত দূরের কথা, এমন কি, দেবতা ও ঋষির পর্য্যন্ত এই মায়ার মোহিনী শক্তি হইতে নিস্তার পাওয়া অসম্ভব। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় এক স্থানে বলিয়াছেন,—

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধুকৃপা বিনা আর নাহিক উপায়।।
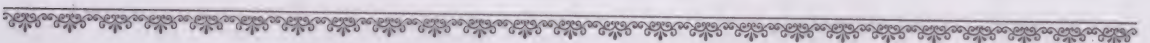
বাস্তবিক এই সত্ত্বরজঃতমোগুণময়ী ত্রিগুণাত্মিকা বিষ্ণুমায়াকে তাঁহার ভক্ত ব্যতীত আর কেহই জয় করিতে সমর্থ হন নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—একান্তভাবে যাঁহারা আমার শরণাপন্ন হয়, আমি তাঁহদিগকে এই ভীষণ মায়ার কবল হইতে রক্ষা করিয়া থাকি।

সমুদ্র মন্থন সময়ে যখন দেবাসুর মিলিয়া সমুদ্র মন্থন আরম্ভ করিয়া দিলেন, তখন সমুদ্র হইতে উত্থিত অমৃত বন্টন জন্য দেবাসুরে মিলিয়া তুমুল কোলাহলে চতুর্দ্দিক কম্পিত করিয়া তুলিলেন। দেব এবং অসুরবৃন্দ সকলেই অগ্রে অমৃত পান করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া, পরিশেষে সৃষ্টিশক্তি সংহারিণী কালাগ্নি-সদৃশ প্রবল সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিলে, ভগবান্ বিষ্ণু দৈত্যগণকে মোহিত করিবার জন্য সৃষ্টি রক্ষার্থ মায়াজাল বিস্তার করতঃ মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। কি অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যময়ী রমণীমূর্ত্তি! মরি! কি কটাক্ষ, কি মধুর হাসি! যেন ত্রিভুবনকে মোহিত করিবার জন্যই এই ললনা-ললাম আবির্ভূতা হইয়াছেন। মোহিনীর কর্ণে মণিময় কুণ্ডল জ্বলিতেছে, হস্তে বলয়, গলদেশে পারিজাতপুষ্পের হার, দশন মুক্তাপাতি সদৃশ, উজ্জ্বল বিম্বাধরে মধুর হাসি! সৌন্দর্য্যে কোটী কন্দর্পের দর্পকে পরাজিত করিয়া বীণা-বিনিন্দিত স্বরে দেব এবং অসুরবৃন্দকে মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া মোহিনী বলিতে লাগিলেন, হে দেবতাবৃন্দ এবং অসুরগণ, তোমরা কি জন্য সামান্য অমৃতের জন্য এই ভীষণ সমরানলের আয়োজন করিয়াছ? আমি মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া উভয় পক্ষের বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিতেছি।

যাঁহার মায়ায় এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বিমোহিত, স্বয়ং লোকপিতামহ ব্রহ্মা পর্য্যন্ত যাঁহার মায়ার অন্ত পান নাই, ভগবানের মায়াপ্রভাবে হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন, আর অতি ক্ষুদ্র অন্য জীব জন্তুদের ত কথাই নাই! তাহারা ত' মুগ্ধ হইবেই, সুতরাং সকলেই মোহিনীর সুমিষ্ট বাক্যে সুমোহিত হইয়া তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলেন। কি আশ্চর্য্য! মোহিনী বিষ্ণুমায়ার প্রভাব! শুধু দেব এবং অসুর কেন, এই সংসারে পশু, পক্ষী, কৃমি, কীট, বৃক্ষ, লতা হইতে আরম্ভ করিয়া যোগী, ঋষি, কর্ম্মী, জ্ঞানী, ধ্যানী, যক্ষ, রক্ষ, নর, নারী, পন্নগ, কিন্নর, কিন্নরী আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত সকলেই বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া এই দেহকেই আত্মবুদ্ধি করিয়া ভগবানকে ভুলিয়া অনিত্য স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাই, বন্ধু, ধন, রত্নকে জীবনের একমাত্র বন্ধু বিবেচনা করিয়া রোগ, শোক, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধ হইয়া থাকেন। গীতায় একস্থানে ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।।"

ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয় দেশে অবস্থিত হইয়া এক ভক্ত ব্যতীত অন্যান্য জীববৃন্দকে মায়ায় অভিভূত করাইয়া যন্ত্রের মত ভ্রমণ করাইতেছেন। যাঁহারা সদ্‌গুরুতে প্রপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারাই এই দৈবী বিষ্ণুমায়া হইতে বিমুক্ত হন, অন্যে নহেন। সদ্‌গুরু বলিতে আমরা কি বুঝি? যেন এক অন্ধ অন্য অন্ধকে পথ দেখাইতে পারেন না, দেখাইলে গুরু এবং শিষ্য উভয়েই গর্ত্তে পতিত হইয়া মায়া পড়েন, তদ্রূপ; এজন্য সদ্‌গুরুর লক্ষ্মণান্বিত গুরুতে যাঁহারা শরণাপন্ন হইবেন, তাঁহাদেরই মুক্ত হইবার সম্ভাবনা, অন্যথা বদ্ধ হইবার বেশী সম্ভাবনা। শাস্ত্রে লেখা আছে—

তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্‌গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপানিঃ।
শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্। আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ।।
তস্মাদগুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপসমাশ্রয়ম্।।

বস্তুতঃ এই মায়িক সংসারে কোন সুখই প্রকৃত সুখ বলিয়া বোধ হয় না, কেন না, সকল সুখই নশ্বর ক্ষণস্থায়ী, জলবিম্বের মত, মরুভূমিতে মরীচিকার মত, দেখিতে দেখিতে বিলয় প্রাপ্ত হয়। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মত এক বাসনা চরিতার্থ হইতে না হইতেই শত সহস্র বাসনা প্রদীপ্ত হইয়া মানবের হৃদয় কানন দগ্ধ করিয়া থাকে। অতুল ঐশ্বর্য্যাধিপতি দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিলেও কামরূপ বৃশ্চিকের দংশনে সতত অস্থির হন, সুতরাং বুঝিয়াও কেহ বুঝেন না। এজন্য যে ব্যক্তি এই দুস্তরা বিষ্ণুমায়া হইতে উদ্ধার পাইতে চান, তিনি অবশ্যই সদ্‌গুরুতে প্রপন্ন হইবেন, নতুবা মায়াদ্বারা হতজ্ঞান হইয়া কখন পুণ্যকর্ম্মদ্বারা স্বর্গে গমন, কখন বা পাপকার্য্যদ্বারা নরকে গমন করিয়া অনাদি কর্ম্ম-বাসনায় বদ্ধ হইয়া চক্রগতির ন্যায় পুনঃ পুনঃ কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করতঃ অশান্তি-অনলে দগ্ধীভূত হইয়া দিবানিশি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবেন। সদ্‌গুরুর লক্ষণ কি? যিনি শব্দ ব্রহ্ম বেদের ন্যায়ানুগত ব্যাখ্যা দ্বারা তত্ত্ব-স্থিরীকরণে নিপুণ এবং ভজন-পরিপাক নিবন্ধন প্রত্যক্ষাতীত অনুভব দ্বারা পরব্রহ্মে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে অবস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারই উপদেশদানে যথার্থ অধিকার আছে। অতএব যিনি উপরি উক্ত লক্ষণান্বিত গুরুদেবে শরণাপন্ন হইবেন, তিনি এই দুর্জ্জয় বিষ্ণুমায়া জয় করিতে সমর্থ হইবেন, অন্ততঃ তাঁহার সম্ভাবনা আছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, শরণাগতির লক্ষণ কি? গীতায় আছে, যথা—

''তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া'।

শ্রীগুরুদেবকে প্রণিপাত করিতে হইবে, পরিপ্রশ্ন করিতে হইবে যে,—হে গুরুদেব! আমি গ্রাম্য বিষয়ে পণ্ডিত বটে, কিন্তু আত্মতত্ত্ব-বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ মূর্খ এবং অজ্ঞান, আমি কে? আমার স্বরূপ কি? আমি কোথায় ছিলাম, এখানে (পৃথিবীতে) কি জন্য আসিয়াছি এবং) পরেই বা কোথায় যাইব? —এ বিষয়ে আমি অতি ক্ষুদ্র, কিছুই জানি না, আপনি দয়া করিয়া আমাকে তত্ত্বোপদেশ প্রদান করুন—যাহাতে এই ভব-সমুদ্র পার হইয়া নির্ব্বিঘ্নে অপর কূলে উত্তীর্ণ হইতে পারি।

শ্রীগুরুদেব বিনীত শিষ্যকে উপদেশ প্রদান করিলে তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত কথামৃত পান করিয়া তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া সেবা করিতে পারিলেই এই অলৌকিকী বিষ্ণুমায়া হইতে মানব পরিত্রাণ পাইতে পারেন, অন্য উপায়ে কখনই নহে।

এই বিষ্ণুমায়ায় মোহিত চিত্ত অসুরবৃন্দের এই মোহিনী মূর্ত্তি দর্শনে অন্তঃকরণে কামের উদ্রেক হইল। এই বিষ্ণুমায়াকে সাক্ষাৎ জগজ্জননীর প্রতিমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া দেবগণের ভক্তির উদয় হইল। যেমন স্বভাবদুষ্ট জলৌকা মাতৃস্তন্যে ক্ষীরের পরিবর্ত্তে রক্ত শোষণ করে, কিন্তু বালক যেমন রক্তের পরিবর্ত্তে

অমৃতময়ী দুগ্ধের আস্বাদন অনুভব করে, তদ্রূপ দুষ্ট অসুরপ্রকৃতি খলস্বভাবসম্পন্ন কামুক লম্পটের দল অসুরবৃন্দ বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ হইয়া মোহিনীকে নিজেদের বিলাসের অর্থাৎ ভোগের উপকরণ মনে করতঃ কপট দৈত্যগণ আড় নয়নে মৃদু মধুর হাস্যে মোহিনীর সলজ্জ নয়নকোণে বঙ্কিম কটাক্ষপাত করিয়া বলিতে লাগিল,—অয়ি, কম্বুকণ্ঠা আয়তলোচনা সুন্দরি! এস এস নিকটে এস, আমরা তোমারই দাস, তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত আছি, তুমি সানন্দচিত্তে যাহা আদেশ করিবে, আমরা অনুগত ভৃত্যের ন্যায় অবনত-মস্তকে অবশ্যই তাহা পালন করিব।

দেবগণ কিন্তু এই মায়াকে সরল শিশুর ন্যায় মাতৃভাবে দর্শন করিতে লাগিলেন। পরিণামে এই হইল যে, পূর্ব্বোক্ত জলৌকার ন্যায় নিষ্ঠুর প্রকৃতি দানববৃন্দ বিষ্ণুর ছলনায় মোহিত হইয়া দুর্লভ অমৃত হইতে বঞ্চিত হইল আর দেবগণ শিশুর ন্যায় অমৃত-পানে প্রভূতশক্তিসম্পন্ন হইয়া আনন্দে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই সংসার বিষ্ণুমায়ায় গঠিত। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য, তল, অতল, বিতল, সুতল, পাতাল, তলাতল, রসাতল—এই চতুর্দ্দশ দেবীধাম সমস্তই বিষ্ণুমায়ায় আচ্ছাদিত। এই সংসার কারাগার-সদৃশ, সমস্ত জীববৃন্দ এই মায়ার জেলখানার কয়েদী। কেহ রাজা, কেহ প্রজা, কেহ ভৃত্য, কেহ বা কুলী মজুর ইত্যাদি মায়িক সজ্জায় সাজিয়াছেন।

থিয়েটারে যেমন রামা বাগ্দী মহারাজ হরিশ্চন্দ্র সাজিয়া রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া রাজার অভিনয় করিলেন, তদ্রূপ শ্যামা ডোম শৈব্যারাণীর ভূমিকায় সর্পদষ্ট পুত্রের জন্য কত কপট ক্রন্দন করিয়া দর্শকবৃন্দের হৃদয়ে যুগপৎ বিষাদ এবং হর্ষের সঞ্চার করতঃ পর মুহূর্ত্তেই যবনিকার অন্তরালে রাজারাণীর পরিবর্ত্তে আসল রামা শ্যামা হইয়া বসিলেন। সেরূপ এই সংসাররূপ মায়া-রঙ্গভূমিতে বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া কেহ কখন দেব, দানব, পশু, পক্ষী, কীট, সরীসৃপাদিও বৃক্ষ, পর্বত প্রস্তরাদিতে পরিণত হইয়া আবদ্ধ হইয়াছিলেন। নলকূবর অপ্সরাগণ সহ জলকেলি আরম্ভ করিলে, পরম বৈষ্ণব নারদ মুনির অভিশাপে তাঁহারা যমলার্জ্জুন বৃক্ষরূপে বৃন্দাবনে অবস্থিত হইয়াছিলেন। অহল্যা- দেবী ঋষিশ্রেষ্ঠ গৌতমের অভিশাপে প্রস্তররূপে পরিণত হইয়াছিলেন। মায়ামুগ্ধ জীব চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া কখন ঊর্দ্ধে, কখন বা নিম্নদেশে গমন করিয়া কর্ম্মফল ভোগ করিতে থাকে। এইরূপ—

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায়।
তাঁর উপদেশ মন্ত্রে মায়া-পিশাচী পলায়।।
তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ।।

এই বিষ্ণুমায়া আবার পরা এবং অপরা ভেদে দুই প্রকার—বিদ্যমায়া এবং অবিদ্যামায়া—অন্তরঙ্গা শক্তি এবং বহিরঙ্গা শক্তি এই দুই প্রকার। অবিদ্যা-মায়া জীবগণকে মুগ্ধ করিয়া সংসার-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। বিদ্যা-মায়া সেই সংসার-বন্ধন ছেদন করিয়া বিষ্ণুভক্তি প্রদান করেন।

'বিদ্যা' বলিতে আমরা কি বুঝি? এই অপরা বিদ্যা বা অক্ষজবিদ্যা লাভে আমরা কিছুদিন সুখস্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি বটে, কিন্তু সকলই নিশার স্বপনসদৃশ অস্থায়ী। অধুনা পাশ্চাত্য বিদ্যায় শিক্ষিত অর্থকরী-বিদ্যায় দর্শন বিজ্ঞান, শিল্প, ছন্দ, জ্যোতিষ, ধনুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি বিচিত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পণ্ডিত হইলেও বা ধন-রত্নে সম্পন্ন হইলেও এ আনন্দ ঐন্দ্রজালিকের ছায়াবাজীর ন্যায়—চপলা সৌদামিনীর ন্যায়, দেখিতে দেখিতে কালের অতল গর্ভে নিমিষমাত্রে অন্তর্দ্ধান করে। পরিণামে সকলই হাহাকার, অতৃপ্তিকরী অশান্তি। "সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া" সেই বিদ্যাই বিদ্যা—যে বিদ্যা দ্বারা কৃষ্ণে মতি উৎপন্ন হয়, তাহার অপর নাম ব্রহ্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যা। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।।

ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ ও মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—এই অষ্ট প্রকৃতি আমার অপরা শক্তি। ইহা ভিন্ন আর একটী উৎকৃষ্ট প্রকৃতি আছে; যথা—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।।

এই অপরা প্রকৃতি ভিন্ন আর একটী উৎকৃষ্টা প্রকৃতি আছে, যাহা সূত্রে গ্রথিত মণিগণের ন্যায় এই জগৎকে ধারণ করিয়া আছে। তাহাই পরা, শ্রেষ্ঠা অর্থাৎ উৎকৃষ্টা জীবপ্রকৃতি।

এই মায়িক সংসারে বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া জীব কত প্রকারেই না রঙ্গ করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। "কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়"—যেমন কোন সুনিপুণ যাদুকর তাহার অঙ্গুলী-সঞ্চালনে, হস্তস্থিত পুত্তলিকাগুলিকে নানাভাবে দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জনার্থে নৃত্য করাইয়া থাকেন, দর্শকগণ যেমন অন্তরালস্থিত যাদুকরকে কোন মতে দর্শন করিতে সমর্থ হন না, সেইরূপ ভগবান্ বিষ্ণুও তাঁহার সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী মায়া দ্বারা ত্রিভুবনকে মোহিত করায় এই জগতস্থ জীববৃন্দ উন্মত্তের ন্যায় কেহ হাসিতেছে, কেহ নাচিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহ বা উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিতেছে।

সুতরাং যে কেহ এই মায়ার সংসারে সং না সাজিয়া সার আশ্রয় অর্থাৎ (হরিসেবা বা হরিভজন) করিতেছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমানের পদবী লাভ করিয়াছেন। নতুবা বিকারী রোগীর মত সকলেই প্রলাপ বকিতেছে। বিষয়তৃষ্ণা জলের জালা, তাহার জন্য ছটফট করিয়া মরিতেছে। 'আমি একজালা জল খাব রে—আমি পুকুরের জল চুমুক দিয়া খাব রে' প্রলাপ বকিতেছে। ভব-রোগীর এই উন্মাদের ন্যায় বাক্য শুনিয়া গুরুরূপী বৈদ্য কাঁদিতেছেন আর কীর্ত্তন করিয়া নিকটে আহ্বান করিতেছেন।

তাই বলি, মায়ার কি আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তি, মায়াপ্রভাবে কেহই নিজের স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না! এক বিষ্ণুভক্ত ব্যতীত সকলেই এই বিষ্ণুমায়ায় মোহিত।

সুদর্শন

দর্শন শব্দের অর্থ অবলোকন বা দেখা। দর্শন দুই প্রকার—কুদর্শন ও সুদর্শন। কুদর্শন শব্দে কুৎসিৎ ভাবে দর্শন বা ভ্রমযুক্ত কুণ্ঠিত দর্শনকে লক্ষ্য করে এবং 'সুদর্শন' শব্দে সুষ্ঠু দর্শন বা সমগ্র বৈকুণ্ঠ দর্শনকে বুঝাইয়া থাকে। কোনও ব্যক্তি যদি কাল বর্ণের চশমা ধারণ করিয়া জগৎ অবলোকন করেন, তখন তিনি সকল বস্তুকেই কাল বলিয়া ধারণা করিবেন আবার কেহ যদি নির্ম্মল চক্ষে জগৎ দেখেন তিনি যে বস্তুর যেটী প্রকৃত বর্ণ তদ্রূপই দর্শন করিবেন। আমরা যখন কোনও উপাধি সহযোগে ধর্ম্মের স্বরূপ পরমেশ্বরের স্বরূপ বা জীবের কিংবা জগতের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া থাকি, তখন আমাদের দর্শনও কাল চশমা পরিহিত ব্যক্তির দর্শনের ন্যায় কুদর্শন, কিন্তু যখন আমরা নিরুপাধিক বৈকুণ্ঠ চিচ্চক্ষুদ্বারা ঐ সকল তত্ত্ব দর্শন করি, তখনই আমাদের দর্শন সুষ্ঠু দর্শন হইয়া থাকে। কুদর্শনকারীর ইন্দ্রিয়গণ অর্থাৎ যাহার কুণ্ঠতাপূর্ণ সাহায্যে দর্শন করেন, সেই যন্ত্রসমূহ অসম্পূর্ণ ও দোষযুক্ত। তাহাতে ভ্রম অর্থাৎ বিপর্য্যাস, সংশয়াদি দোষ, প্রমাদ অর্থাৎ অনবধানতা, করণাপাটব বা ইন্দ্রিয় গ্রামের অপটুতা ও বিপ্রলিপ্সা অর্থাৎ বঞ্চনেচ্ছারূপ চতুর্ব্বিধ দোষ বর্ত্তমান। সুদর্শনকারীর জড়েন্দ্রিয় বা সোপাধিক ইন্দ্রিয় নাই সুতরাং তিনি নিরুপাধিক অপ্রাকৃত নয়নে যাহা দর্শন করেন তাহা সুদর্শন পদবাচ্য। সেই অপ্রাকৃত নিরুপাধিক চিচ্চক্ষুদ্বারা দিব্যসূরিগণ নিত্যকাল বিষ্ণুর পরম পদ দর্শন করিতেছেন। প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচন দ্বারা নিরুপাধিক নিষ্কিঞ্চন ভাগবতগণ হৃদয়াভ্যন্তরে অচিন্ত্যগুণস্বরূপ শ্রীগোবিন্দদেবের অপ্রাকৃত নিত্য মূর্ত্তি দর্শন করিয়া থাকেন। ব্রজস্থ গোপ-গোপীবৃন্দ, দাসগণ, সখাগণ, বৎসল রসিকগণ, কান্তাগণ সেই অপ্রাকৃত চিন্ময়নেত্রে অচিন্ত্যগুণসম্পন্ন ভগবানের দ্বিভুজ মুরলীধর নিত্য অপ্রাকৃত শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া থাকেন। শ্রীগীতায় (১১।৮) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইবার পূর্ব্বে বলিয়াছেন—

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।।

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, তোমার নিজের এই চক্ষু দ্বারা আমাকে দেখিতে সমর্থ হইবে না। আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিতেছি তাহা দ্বারা আমার যোগৈশ্বর্য্যময় স্বরূপ দর্শন কর। ভগবানের এই যোগৈশ্বর্য্য স্বরূপটী সাম্বন্ধিক ভাবগত। যে চক্ষু স্থূল নহে কিন্তু সোপাধিক তাহাকে দিব্যচক্ষু বলে। এই সোপাধিক দিব্যচক্ষু দ্বারা সোপাধিক যোগৈশ্বর্য্যময় ভগবৎ স্বরূপ দর্শন লাভ ঘটে। কিন্তু নিরুপাধিক অধোক্ষজ চক্ষু দ্বারা ভগবানের নির্গুণ অধোক্ষজ মাধুর্য্যময় স্বরূপটী দর্শন হইয়া থাকে। কিন্তু যাহারা ভ্রমপ্রমাদাদি দোষ চতুষ্টয়যুক্ত জড়চক্ষু লইয়া কিংবা জড় ব্যতিরেক বা মায়িক উপাধিক অন্বয় ভাবযুক্ত সোপাধিক নেত্রদ্বারা ভগবৎস্বরূপ দর্শন করিতে প্রয়াস করেন, তাঁহারা কখনও ভগবানের সুষ্ঠু দর্শন করিতে পারেন না—ইহারাই অধোক্ষজোপাসক ভাগবতগণ কর্ত্তৃক কু-দার্শনিক বা কুণ্ঠ দার্শনিক নামে অভিহিত। এই কু-দার্শনিক সম্প্রদায় ইন্দ্রিয়াতীত অচিন্ত্যগুণযুক্ত, সর্ব্বশক্তিমান স্বতন্ত্র পরমপুরুষ শ্রীভগবানের স্ব স্ব রুচি বা ভ্রমযুক্ত দর্শনানুসারে কর্ম্ম-

ফলবাধ্য, কর্ম্মের অধীন তত্ত্ব, চিজ্জড়সাম্য বা জড় নির্ব্বিশেষ নিরাকার ইত্যাদি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করেন। কু-দর্শনজনিত জ্ঞান প্রবল থাকা হেতু তাহারা শ্রীভগবানের সর্ব্বশক্তিমত্তা, যুগপৎ পরস্পর বিরোধী ধর্ম্মযুক্ত অচিন্ত্যভাবসমূহ ধারণা করিতে না পারিয়া নির্ব্বিশেষ ভাবকেই পরমতত্ত্ব বলিয়া জ্ঞান করেন ও তাহাই প্রচার করিয়া থাকেন। ভারত বা ভারত- বহির্ভূত স্থানে এই কু-দার্শনিক সম্প্রদায়ের অভাব নাই। বৈশেষিক, ন্যায়, সাঙ্খ্য, পতঞ্জল, পূর্ব্ব মীমাংসা—এই পঞ্চবিধ ভারতীয় দর্শন বা সায়নমাধবোল্লিখিত চতুর্দ্দশ দর্শন সকলই কু-দর্শন। কারণ ঐ সকল দর্শনের মধ্যে কেহ বা সাক্ষাৎ ভাবে ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন আবার কেহ সাক্ষাদ্ভাবে ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার না করিলেও সকপটভাবে স্বীকার করিলেও সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের স্বতন্ত্রতা বা পূর্ণ স্বাধীনতা অচিন্ত্যশক্তিমত্তা বা অধোক্ষজত্ব স্বীকার করেন নাই।

বেদান্ত দর্শন বা পূর্ব্বমীমাংসাই একমাত্র বৈকুণ্ঠদর্শন বা সুদর্শন। কারণ বেদের শিরোভাগ শ্রুতির মীমাংসা অল্পাক্ষরে, এই বেদান্ত দর্শনে গ্রথিত হইয়াছে। কিন্তু কু-দার্শনিকগণ অর্থাৎ যাহারা অক্ষজজ্ঞানে নির্ভর করিয়া শ্রীভগবানের অধোক্ষজত্ব অচিন্ত্যত্ব এবং সর্ব্বস্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত তাঁহারা মুখে বেদ বা বেদান্ত দর্শন স্বীকার করিয়াও স্বকপোলকল্পিত ভাষ্য দ্বারা প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্যবাদ স্থাপন করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। বেদান্তদর্শন প্রণেতা সুদার্শনিক কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস স্বকীয় সর্ব্বান্তর্যামিতাবলে এবং পরম বিষ্ণুভক্ত শ্রীনারদের আদেশে এই বেদান্ত দর্শনের এক অকৃত্রিম ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া সুদার্শনিকগণকে কু-দার্শনিকগণের করাল কবল হইতে রক্ষা করেন। উহাই শ্রীমদ্ভাগবত বা নিগম কল্পতরুর প্রপক্ক ফল। এই শ্রীমদ্ভাগবতকে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব একমাত্র সুদার্শনিক মীমাংসা এবং পরম প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই সুদার্শনিক মীমাংসাগ্রন্থে শ্রীভগবানই একমাত্র স্বরাট্ পুরুষ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। সেই শ্রীভগবান অধোক্ষজ পুরুষ। সেই অধোক্ষজ পুরুষে অহৈতুকী অপ্রতিহতা ভক্তিই জীবমাত্রের পরম ধর্ম্ম।

স বৈ পুংসাং পরোঃ ধর্ম্ম যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১।২।৬)

সুতরাং যেখানে সোপাধিক জ্ঞান প্রবল সেখানে অধোক্ষজ পরম পুরুষ বিষ্ণুর শ্রীহস্তে সুদর্শন বৈকুণ্ঠ চক্র সতত বিরাজমান। এই সুদর্শন বিষ্ণুভক্তগণের রক্ষার নিমিত্ত কুদার্শনিকগণ যখন অধোক্ষজ ভগবদ্-ভক্তগণকে ভ্রমপ্রমাদাদি কুদর্শন সাহায্যে দেখিয়া মৎসরতাপ্রযুক্ত তাঁহাদিককে উপহাস করে বা তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়, তখন সুদর্শন তাঁহাদের রক্ষার্থে উপস্থিত হইয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়, যখন তপস্যামদমত্ত ব্রাহ্মণ জাত্যভিমানী দুষ্টবাসনা যুক্ত দুর্ব্বাসা কুদর্শনদ্বারা দেখিয়া অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্ত মহাভাগবত অম্বরীষ রাজর্ষি মহারাজকে অষ্টাঙ্গ যোগাদি তপস্যাহীন ক্ষত্রিয় জাতি মাত্র জ্ঞান করিয়া বৈষ্ণবচরণে অপরাধ করিয়াছিলেন, তখন অক্ষজবলদৃপ্ত দুর্ব্বাসার জটোত্থিত কালানল তুল্য কৃত্যাকে বিষ্ণুর হস্তস্থিত সুদর্শন চক্র, দাবানল যেরূপ অরণ্যস্থ সরোষ সর্পকে দগ্ধ করে তদ্রূপ দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

দুর্ব্বাসা দেখিতে পাইলেন যে, ঐ সুদর্শন চক্র তাহার কৃত্যাকে বধ করিয়া পুনরায় দুর্ব্বাসাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছে। তখন তিনি কোথায়ও আশ্রয় না পাইয়া আমি যখন ব্রাহ্মণ, তখন ব্রহ্মা অবশ্যই আমাকে রক্ষা করিবেন—এই আশায় নির্ভর করিয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন, ব্রহ্মা বলিলেন, আমি শ্রীভগবানের আজ্ঞা বাহক মাত্র, সুতরাং যিনি তাঁহার ভক্তদ্রোহী তাহাকে রক্ষা করা আমার ক্ষমতার বহির্ভূত। তদনন্তর দুর্ব্বাসা শিবের নিকটে উপস্থিত হইলেন। মহেশ বলিলেন,—আমি সনৎকুমার, ব্রহ্মা, কপিলাদি সকলেই শ্রীভগবানের মায়ায় মোহিত, সুতরাং সেই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন হইতে রক্ষা করা আমার সাধ্যাতীত। দুর্ব্বাসা তখন অনন্যোপায় হইয়া সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্রীবিষ্ণু বলিলেন,—আমি ভক্তপরাধীন, সাধুরা আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছেন। সুতরাং তুমি যদি মঙ্গল চাও, অম্বরীষের চরণে যাইয়া ক্ষমা ভিক্ষা কর। ভগবান্ বলিলেন,—

"তপো বিদ্যা চ বিপ্রাণাং নিঃশ্রেয়স করেউভে।
তে এব দুর্ব্বিনীতস্য কল্পেতে কর্ত্তুরন্যথা।।"

ব্রাহ্মণগণের তপস্যা বিদ্যা এই উভয় নিঃশ্রেয়স্কর কিন্তু উহা যখন অক্ষজজ্ঞান- দৃপ্ত ব্যক্তির দ্বারা সাধিত হয়, তখন বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে। ভগবান্ দুর্ব্বাসার আভিজাত্যাভিমান, তপস্যাভিমান প্রভৃতি খর্ব্ব করিবার জন্য দুর্ব্বাসাকে পরম ভাগবত ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণব্রুব অম্বরীষের চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করাইলেন—

"এবং ভগবতাদিষ্টো দুর্ব্বাসাশ্চক্রতাপিতঃ।
অম্বরীষমুপাবৃত্য তৎপাদৌ দুঃখিতোঽগ্রহীৎ।।"

সুদর্শন চক্রদ্বারা তাপিত দুর্ব্বাসা ভগবান্ কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া অম্বরীষ মহারাজের সন্নিধানে গমন করিয়া অতিশয় দুঃখিত অন্তঃকরণে তাঁহার পদযুগল ধারণ করিলেন। কুণ্ঠদর্শন কুদর্শন বা অক্ষজ দর্শন লইয়া জীব যখন বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, ভগবান্ ও ভগবদ্ বস্তুতে প্রাকৃত বুদ্ধি করেন, সুদর্শন তখন ঐ সকল জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীমদে দৃপ্তব্যক্তিগণকে শাসন করিয়া থাকেন।

তৃণাদপি শ্লোক

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু নিগমকল্পতরুর প্রপক্ক ফল, বেদান্তসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত-প্রতিপাদিত 'হরিকীর্ত্তন'কেই একমাত্র প্রাণীমাত্রের পরমধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়া 'তৃণাদপি' শ্লোকে নামগ্রহণের বা হরিকীর্ত্তনের প্রণালী বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীমুখোদ্গীর্ণ শ্লোকটী এই—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।"
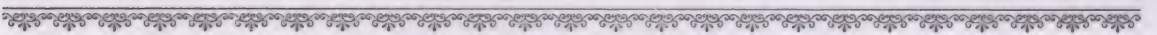
এইটী তাঁহার শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোক। ইহার অবিকল অনুবাদ এই তৃণ হইতেও অত্যন্ত নীচ, বৃক্ষ হইতেও সহিষ্ণু, মানশূন্য এবং মানদ পুরুষ কর্ত্তৃকই সর্ব্বদা হরি কীর্ত্তনীয় হন। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন যে, তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাযুক্ত শিষ্যকেই যথার্থ জ্ঞানোপদেশ করিয়া থাকেন। কঠ, প্রশ্ন, শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি শ্রুতিতে ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রেরও সর্ব্বত্র এই উপদেশ পাওয়া যায়। শাস্ত্রবাক্য, ভগবদ্বাক্য মহাপুরুষগণের বাক্যের তাৎপর্য্য সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক পরিবর্ত্তনশীল মনের অধিগম্য নহে একমাত্র সদ্‌গুরু, বা সাধুজনে প্রপন্ন ব্যক্তিই শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন অপর ব্যক্তি নিজ নিজ মনের বিচার দ্বারা ঐ সকল বাক্যের কদর্থ করিয়া থাকেন। উপসন্ন ও প্রপন্ন শিষ্যই শ্রোত্রীয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্‌গুরুর নিকট হইতে শ্রুত্যর্থ প্রাপ্ত হন। যেখানে সদ্‌গুরুর অভাব বা শিষ্যের শরণাগতির অভাব সে স্থানে প্রমাদ ও বিপ্রলিপ্সা দোষ বর্ত্তমান থাকা হেতু শাস্ত্রের কদর্থ ব্যাখ্যাও শ্রুত হয়। সুতরাং তৃণাদপি শ্লোকার্থ বুঝিতে হইলেও আমাদের বৈষ্ণবগুরুর চরণে প্রপন্ন হইতে হইবে। বৈষ্ণবব্রুব অগুরু ঐ শ্লোকের নানা প্রকার কদর্থ করিয়া নামসাধনপ্রণালীর বিপর্য্যয় সাধন করিয়া থাকেন। আধুনিক সাহজিক সম্প্রদায় ও বৈষ্ণবব্রুবগণ কপট দৈন্য বা তমোভাবকেই "তৃণাদপি সুনীচতা" বলিয়া মনে করেন। এদিকে তাহাদের ভোক্তা অভিমানে রূপরসাদি বিষয়ে আসক্তি, জন্ম, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য, সৌন্দর্য্যাদির অভিমান পাঁচ সিকে সওয়া পাঁচ আনা তাহাদের হৃদয় অধিকার করিয়া রহিয়াছে। তাহারা নিজদিগকে ব্রাহ্মণ, গোস্বামী, বৈষ্ণবাদি আখ্যায় ভূষিত করিবার জন্য সর্ব্বদা লালায়িত। শিষ্যের মাথায় পা চাপাইতে বা শিষ্য 'আমার সেবোপকরণ' ইত্যাদি অহমিকাপূর্ণ বুদ্ধিতে তাহাদিগের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করিতে তাহারা সর্ব্বদা ব্যস্ত। অথচ তাহাদের বাহিরে কৃত্রিম আঁকু পাঁকু ভাব, শরীরের ও চেহারার কত কি ভঙ্গি দেখিয়া মনে হয় যে তাহারা বুঝি তৃণ হইতেও নীচ হইতে হইবে মনে করিয়া মৃত্তিকার অভ্যন্তরে চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত। এই প্রকার কপট-দৈন্যের কস্‌রতকে 'তৃণাদপি সুনীচতা' বলে না। তৃণ জগতের যাবতীয় বস্তু হইতে নীচ। গো, গর্দ্দভ, কুক্কুরাদি জন্তু পর্য্যন্ত তৃণের উপর পদক্ষেপ করিয়া উহাকে বিমর্দ্দিত করিয়া নিয়ত চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু তৃণের তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। কীর্ত্তনাভিলাষিজনের সেই তৃণ হইতেও সুনীচ হইতে হইবে। অর্থাৎ প্রাকৃত জগতের অতি নীচ বস্তুর অভিমান ও ত্যাগ করিতে হইবে। জাগতিক বিচারে পর্ব্বত বৃক্ষাদি বৃহৎবস্তু হইতে তৃণ অত্যন্ত নীচ বটে, কিন্তু ভাঃ (১১।২৮।৪)—

> কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ।
> বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ।।
> দ্বৈতে ভদ্রাভদ্রজ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।
> এই ভাল এই মন্দ এই সব ভ্রম।। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

অর্থাৎ যেখানে অদ্বয়জ্ঞান বাধা প্রাপ্ত হইয়া দ্বিতীয় বস্তু মায়ার প্রতীতি উপস্থিত হইয়াছে, সেখানে ভাল, মন্দ, ছোট, বড় যাহা কিছু বিচার সব ভুল। যেমন স্বপ্ন মধ্যে রাজা হওয়া ও কুটীরবাসী দরিদ্র বলিয়া অনুভব

করা একই প্রকারের অমূলক কল্পনা। উভয়ই সমান। তদ্রূপ প্রাকৃত জগতের বস্তুজ্ঞানে নিজকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বর্ণ বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য বা ঐশ্বর্য্যবান্ মনে করা কিংবা নিজকে নিকৃষ্ট শূদ্রাদি বর্ণে অভিমান করা একই কথা। যিনি তৃণাদপি সুনীচ তিনি নিজকে ইহ জগতের বা চতুর্দ্দশ ভুবনের কোনও প্রাকৃত জীব জ্ঞান করেন না। তিনি নিষ্কিঞ্চন অর্থাৎ তাহার চতুর্ব্বিধ অভিমানের কোনও একটীও তাহার হৃদয়ে নাই। নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণ বর্ণে শোভিত থাকিয়াও শ্রীল সনাতন বা শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর ন্যায় তৃণাদপি সুনীচ আবার কোনও অবরকুল পবিত্র করিবার জন্য সেই নিম্নকুলে আবির্ভূত হইয়াও ঝড়ু ঠাকুর বা ঠাকুর হরিদাসের ন্যায় তৃণাদপি সুনীচ অর্থাৎ জন্মাদি-অভিমান-রহিত। তৃণাদপি সুনীচ নিষ্কিঞ্চনগণ নিজদিগকে কখনও ব্রাহ্মণ বা শূদ্র বলেন না, নিজ নিজ নামের পশ্চাতে ''গোস্বামী'' প্রভৃতি নাম লিখিবার জন্য ব্যস্ত হন না, শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর ন্যায় নামের পশ্চাতে 'বরাক' কথাটীই লিখিয়া থাকেন বা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ন্যায় নিষ্কপটে—

''পুরীষের কীট হইতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ।
জগাই মাধাই হইতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।।
মোর নাম যেই লয় তার পুণ্য ক্ষয়।
মোর নাম যেই শুনে তার পাপ হয়।।
এমন নির্ঘৃণ্য মোরে কেবা দয়া করে।
এক নিত্যানন্দ বিনা জগৎ-সংসারে।।''

এইরূপ নিত্যানন্দশরণ হইয়া থাকেন বা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের ন্যায় ''অধম চণ্ডাল আমি দয়ার ঠাকুর তুমি'' প্রভৃতি দৈন্যোক্তি মনমুখে এক করিয়া বলিয়া থাকেন। কিন্তু মায়াপহৃতজ্ঞান দুষ্কৃত ব্যক্তিগণ ঠাকুর মহাশয়ের বা শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের দৈন্যোক্তির সুযোগ পাইয়া শ্রীল ঠাকুর মহাশয়কে ''শূদ্র'', শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে যবন প্রভৃতি বলিয়া অনন্ত নরকের পথে গমন করেন। তৃণাদপি সুনীচ অকিঞ্চন বৈষ্ণবগণের কোনও প্রাকৃত অভিমান নাই যদি কাহারও থাকিয়া থাকে তিনি তৃণাদপি সুনীচ নহেন আর কেহ যদি প্রাকৃত অভিমান বজায় রাখিয়া তৃণাদপি-সুনীচতার অভিনয় করেন, তবে তিনি রামা বাগ্‌দীর ছেলে হরা বাগ্‌দী যাত্রার দলে নারদ সাজিয়াছেন মাত্র। অন্তরে ''আমি রামা বাগ্‌দীর ছেলে'' এই জ্ঞানটী পূর্ণমাত্রায় আছে অর্থাৎ আমি ব্রাহ্মণবৈষ্ণব বা নিত্যানন্দবংশ (?) অমুক গোস্বামীর ছেলে অমুক গোস্বামী (?) আমরা ছাপান্ন পুরুষের বৈষ্ণব (যেন বৈষ্ণবতা ওয়ারিস্ সূত্রে প্রাপ্তব্য বস্তু বা প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় শুক্রশোণিতের ভিতর দিয়া অপরে সংক্রামণের বস্তু) ইত্যাদি অভিমান লইয়া নারদ সাজিয়া অর্থাৎ বৈষ্ণবের বাহ্যবেষ মালা তিলকাদি ধারণ করিয়া যা বৈষ্ণব পরমহংস বেষ লইয়া ভক্ত-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য কপট-দৈন্য করিতেছেন মাত্র বুঝিতে হইবে। নিষ্কিঞ্চন বা তৃণাদপি সুনীচ বৈষ্ণবের অভিমান এই—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমান্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃপদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ।।"

অর্থাৎ আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী বর্ণ বা আশ্রমের অন্তর্গত কেহই নহি। আমি একমাত্র পরমানন্দ-সাগর গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাসগণের অনুদাস।

শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধেও শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে হরিপ্রিয় ব্যক্তির লক্ষণ বলিতে গিয়া বলিয়াছেন—

ন যস্য জন্মকর্ম্মাভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহংভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ।।

যিনি জন্মকর্ম্ম বা বর্ণাশ্রমজাতি প্রভৃতি দ্বারা দেহে অহংভাব সম্পন্ন নহেন, তিনিই হরির প্রিয়।

মুকুন্দমালাস্তোত্রেও ভক্তের প্রার্থনায় দেখিতে পাওয়া যায়—

মজন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে মৎপ্রার্থনীয় মদনুগ্রহ এষ এব।
ত্বদ্ভৃত্য-ভৃত্য-পারিচারকভৃত্যভৃত্য ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ।।

তৃণাদপি শ্লোকে সম্বন্ধজ্ঞান-বিশিষ্ট হইয়া অভিধেয় হরিকীর্ত্তনের প্রণালী উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুকে—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ।।"

এই বাক্য দ্বারা যে সম্বন্ধজ্ঞানের কথা বলিয়াছেন 'তৃণাদপি' শ্লোকে সেই সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত হইয়া অর্থাৎ নিজকে প্রাকৃত জগতের কোনও ক্ষুদ্রতম বস্তুর অভিমানও না রাখিয়া অপ্রাকৃত নিত্য বাস্তব বস্তু ভগবানের নিত্যদাসানুদাস অভিমানে হরিকীর্ত্তন করিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন শিক্ষাষ্টকের পঞ্চম শ্লোক—

"কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয়"

অর্থাৎ জীবের স্বরূপ বিভ্রান্ত অবস্থায় জীব নিজকে ইহজগতের মধ্যে ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত কোনও না কোনও একটী বস্তুর অভিমানে ব্যস্ত কিন্তু ভগবানের কৃপায় অবিদ্যা বিদূরিত হইলে জীব নিজকে বিভুচিৎ ভগবানের পাদপদ্ম-স্থিতধূলি অর্থাৎ তদীয় বস্তু, বা বিভিন্নাংশচিৎকণ জীব বলিয়া উপলব্ধি করেন। তখনই জীব "তৃণাদপি সুনীচ" হন এবং সর্ব্বদা হরি-কীর্ত্তনের যোগ্যতা লাভ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে কুন্তী ও শ্রীকৃষ্ণ-সংবাদেও তৃণাদপি শ্লোকের মর্ম্মার্থ পাওয়া যায়— (ভাঃ ১।৮।২৬)

"জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুত-শ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্।।"

"শ্রীধরটীকাচ—জন্ম সৎকুলে। জন্মাদিভিরেধমানো মদো যস্য সঃ। অভিধাতুং শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দেতি বক্তুমপি। অকিঞ্চনানাং গোচরং বিষয়ীভূতম্।"

অর্থাৎ সৎকুলে জন্ম, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য ও সৌন্দর্য্য দ্বারা যে সকল পুরুষের প্রাকৃত-অহঙ্কার বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহাদের মুখে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তিত হন না, কারণ হরি-কীর্ত্তন একমাত্র অকিঞ্চনগণেরই গোচরীভূত। ইহার দ্বারা এইরূপ মনে করিতে হইবে না যে নিকৃষ্টকুলে জন্ম বা ঐশ্বর্য্যাদি বিহীন হইলেই কীর্ত্তনের যোগ্যতা লাভ করা যায় তাহাও নহে। জাগতিক ছোট বড় যে কিছু অভিমান সমস্তই ত্যাগ করিয়া একমাত্র সম্বন্ধজ্ঞান বিশিষ্ট নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তিই "তৃণাদপি সুনীচ" এবং সর্ব্বদা হরি কীর্ত্তনের অধিকারী। অতএব তৃণাদপি সুনীচ অর্থে বাহিরের আকুপাকু ভাব বা কপট দৈন্য নহে সম্বন্ধ জ্ঞানযুক্তাবস্থাই "তৃণাদপি সুনীচত্ব।" বাহিরের তৃণাদপি ভাবের অভিনয় আবার এক প্রকার ভক্ত-প্রতিষ্ঠা লাভের অভিলাষ, তাহা অন্যাভিলাষ মধ্যে গণ্য। উহা কৃষ্ণ-ভক্তির প্রতিকূল।

"তৃণাদপি শ্লোক" দ্বারা পদ্মপুরাণোক্ত দশবিধ নামাপরাধের বীজস্বরূপ দেহাত্ম-বুদ্ধি নিরস্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের "যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স এব গোখরঃ" অর্থাৎ যাহার বায়ুপিত্ত কফাত্মক হাড়মাংসের আবরণে আত্মবুদ্ধি সে গোগর্দ্দভশব্দ বাচ্য এই উক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে গর্দ্দভের মত সংসারে বোঝার প্রপীড়িত বা শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকার অনুসারে স্ত্রীপাদতাড়িতত্বাৎ—স্ত্রীপাদতাড়িত কামুকের তৃণাদপি সুনীচতার কোনও মূল্য নাই। এইরূপ "তৃণাদপি সুনীচ" ব্যক্তি হরি-কীর্ত্তনের অধিকারী নহে। দেহাত্মবুদ্ধি বিশিষ্ট অর্থাৎ সম্বন্ধজ্ঞানহীন ব্যক্তি কখনও তৃণাদপি সুনীচ হইতে পারেন না। তাহার বাহিরের সুনীচতার অভিনয় কপটতা মাত্র, কারণ যাহার স্বরূপজ্ঞান লাভ হয় নাই তিনি কোনও না কোনও প্রকারে ভোক্তা সাজিয়া আছেন। হরিনাম গ্রহণকারীর অভিনয় করিতে গিয়াও তিনি তাহার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ভোক্তা। তিনি হরিনামকে বা হরিকীর্ত্তনকেও দশটা ভোগের জিনিষের মধ্যে একটা ভোগ্য সামগ্রী করিয়া নিয়াছেন সুতরাং উহা নাম নহে নামাপরাধ মাত্র। ভোক্তার ধর্ম্মে ক্ষুদ্রতার উপলব্ধি নাই, ক্ষুদ্রতার ভান বা অভিনয় থাকিতে পারে। দ্বিতীয় ভোক্তার ধর্ম্মে সহনশীলতা নাই, ভোক্তা কখনও জড়-অভিমান ও জড়- প্রতিষ্ঠা ত্যাগ করিতে পারে না। এক বিষয় ভোগী কখনও অপর বিষয় ভোগীর অভ্যুত্থান দেখিতে পারে না। তাহারা উভয়েই মৎসর। তাহাদের বাহিরের দিকের সহনশীলতা বা নিঃস্বার্থপরতার অভিনয় কেবল নিরুদ্বেগে ও অনায়াসে কনককামিনীপ্রতিষ্ঠা ভোগের জন্য চাতুর্য্য মাত্র।

হরিনাম মুক্তকুলেরও উপাস্য বস্তু, অকিঞ্চনগণের একমাত্র বিত্ত, পরম- নির্ম্মৎসর সাধুগণের সর্ব্ববিধ কৈতব-বিনির্ম্মুক্ত পরম ধর্ম্মসম্পদ্ সুতরাং উহা কপট ভোক্তা বা কপট দৈন্যযুক্ত ব্যক্তির অধিগম্য নহে। সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত জড়- জগতের ছোট বড় যাবতীয় অভিমান-নির্ম্মুক্ত, ভগবানের অনন্যশরণাগত পুরুষই তৃণাদপি সুনীচ, তিনিই একমাত্র সতত নামভজনানন্দী বৈষ্ণব, বৃক্ষ অপেক্ষাও সহ্যগুণ সম্পন্ন, জড় প্রতিষ্ঠায় উদাসীন এবং অপরের প্রতি মানদ। কোনও বৈষ্ণবাচার্য্যপাদবর একটী পদে লিখিয়াছেন—

"আমি ত' বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে,
অমানী না হব আমি।
(জড়) প্রতিষ্ঠাশা আসি, হৃদয় দুষিবে,
হইব নীরয়গামী।।

আবার অপর কোনও বৈষ্ণবাচার্য্যশিরোমণি অন্য এক পদে গাহিয়াছেন—

বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তাতে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব।।

এই দুইটী পদের সহিত যেন পরস্পর বিরোধ বলিয়া বোধ হয় কিন্তু বিচারপর হইয়া দেখিলে দেখা যায় উভয় পদটীই একই কথা বলিতেছেন। অর্থাৎ "তৃণাদপি সুনীচ" হইয়া সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তনের উপদেশ করিতেছেন। প্রথম পদটীতে জড়- জগতের অভিমান রাখিয়া "আমি বড় বৈষ্ণব, আমি নির্জ্জন ভজনানন্দী নাম পরায়ণ ইত্যাদি জড়প্রতিষ্ঠা"-ত্যাগের বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পদ বলিতেছেন কৃষ্ণদাস্য একমাত্র প্রবল করিয়াই নির্জ্জনে ভজনাদিরূপ জড়প্রতিষ্ঠা ত্যাগ কর কারণ তাহা কপটতা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

"মন, তুমি কিসের বৈষ্ণব!
প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জ্জনের ঘরে,
তব হরিনাম কেবল কৈতব।"

কারণ এইরূপ ভক্ত-প্রতিষ্ঠাশা জড়ের প্রতিষ্ঠা মাত্র তোমায় এখনও সম্বন্ধ বা স্বরূপ জ্ঞান লাভ হয় নাই, সুতরাং উহা মায়ার বৈভব ব্যতীত আর কিছু নহে।

জড়ের প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
জাননা কি তাহা মায়ার বৈভব।।

জীবের একমাত্র বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠার নিষ্ঠা করাই উচিত কারণ জীব স্বরূপে ভগবানের নিত্যদাস, নিত্যসেবক বা বৈষ্ণব। যদি তুমি তোমার স্বরূপে নিষ্ঠাযুক্ত না হইয়া নিজকে জড় ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত কোনও বস্তুজ্ঞান কর অর্থাৎ ব্রহ্মার ন্যায় খুব বড় প্রতিষ্ঠাশালী জীব বা তৃণাদপি কোনও ক্ষুদ্র জীবজ্ঞানও প্রবল রাখিয়া জগতের নিকট "আমি খুব বড় বা আমি তৃণাদপি ক্ষুদ্র" এইরূপ প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হও, উহা জড়সম্বন্ধ থাকা হেতু কপটতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমাদের স্বরূপাভিমানে কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণসেবাবুদ্ধিই তৃণাদপি সুনীচতা, অপর যাহা কিছু তাহা কপটতা বা প্রচ্ছন্ন দাম্ভিকতা। এই জন্যই পদকর্ত্তা বলিলেন— "তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব"। কারণ—

সে হরি সম্বন্ধ, শূন্য মায়া-গন্ধ,
তাহা কভু নহে জড়ের কৈতব।।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য ৮ম) শ্রীমন্মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদে দেখিতে পাই শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরামানন্দকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি?" শ্রীরামানন্দ বলিতেছেন—"কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি।।"

ইহাই অপর ভাষায় জীবের স্বরূপ-জ্ঞান বা সম্বন্ধ-জ্ঞান বা শ্রীগৌরসুন্দর কথিত—"পাদপঙ্কজ স্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয়"। ইহাকেই অপর ভাষায় বলা হইয়াছে—'উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।' উত্তমশ্লোক পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের পাদপদ্মের নিত্যসেবক তাহাতে সংযুক্ত, তাহার নিত্য পরিচারক-গণের ভৃত্যানুভৃত্য—এই স্বরূপ-জ্ঞানই তৃণাদপি সুনীচতা। ইহাই পঞ্চরাত্রের দৈক্ষ্য-সাবিত্র্য-ব্রাহ্মণতা, বৃহদারণ্যকের পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা এবং ছান্দোগ্যের আর্জ্জব বা সরলতা। দৈক্ষ্যসাবিত্র্য ব্রাহ্মণগণই যথার্থ তৃণাদপি সুনীচ। কারণ তাঁহারা পরমহংস সদ্‌গুরুর নিকট হইতে এইরূপ দিব্য-জ্ঞান বা স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করিয়া নিজদিগকে প্রাকৃত জগতের 'অমুকের পুত্র অমুক' বা আমি জড় জগতের কোনও বস্তু অভিমান ত্যাগ করিয়া, নিত্য নিষ্কিঞ্চন পরমহংস বৈষ্ণবের দাস এইরূপ অভিমান করিয়া থাকেন। তাহারা একায়ন শাখী পরমহংসের বেষ গ্রহণ করিবার দাম্ভিকতা দেখাইয়া দৈক্ষসাবিত্র্য ব্রাহ্মণতার চিহ্ন ব্রহ্মসূত্র পরিত্যাগ করেন না। পরন্তু একায়নশাখী পরমহংসকুলের দাস অভিমানে সূত্রাদি-ত্যাগরূপ পরমহংসগণের সমান বেষ গ্রহণ না করিয়া ঐ বেষের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য নিজদিগকে বাজসনেয়শাখোক্ত দৈক্ষ্যসাবিত্র্য-ব্রাহ্মণ বা পরমহংসগণের দাসানুদাস-জ্ঞানে হরি-কীর্ত্তনে নিযুক্ত হন। ইহাই "তৃণাদপি সুনীচতা", কারণ ইহাতে জড়ের কৈতবপূর্ণ নীচতা নাই এইরূপ সুনীচতার মূলে স্বরূপ-জ্ঞান বা সম্বন্ধ-জ্ঞান বিরাজিত। ইহাই বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা। কিন্তু অতত্ত্বজ্ঞ স্বরূপবিভ্রান্ত অদীক্ষিত ব্যক্তিগণ ফল্গুবৈরাগ্য ও যুক্তবৈরাগ্যের ভেদ বুঝিতে না পারিয়া প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বস্তুকে সমপর্য্যায়ে বিচার করিতে যাইয়া স্বরূপজ্ঞান, সম্বন্ধজ্ঞান বা দৈক্ষ্যসাবিত্র্য ব্রাহ্মণতাকে দাম্ভিকতা বা তৃণাদপি-সনীচতার অভাব বলিয়া মনে করে। ঐরূপ মনে করার মূলে মূর্খতা ও বৈষ্ণবাপরাধ ব্যতীত আর কিছুই নাই। ঐ রূপ মূর্খতার জন্যই আমরা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের "ক্রোধ ভক্ত-দ্বেষী জনে" কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি না। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের—

"তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে"

অথবা পদকর্ত্তাদের—

"সে ভাড়ুরা সব গ্রাম্য শূকর"

কিংবা নির্ম্মৎসর সাধুগণের পরম নির্ম্মল ধর্ম্মোপদিষ্ট শ্রীমদ্ভাগবতের—"শ্ববিড় বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশু ইত্যাদি বহু বহু বাক্য শুনিয়া ঐ সকল নির্ম্মৎসর, নিষ্কিঞ্চন সাধুগণের তৃণাদপি সুনীচতার অভাব হইয়াছে ধারণা করিয়া অনন্ত নরকের পথে গমন করি। আমরা বুঝি না যে "তৃণাদপি সুনীচতা" জড়ের প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য বাহিরের আকুপাকু ভাব নহে, চক্ষু দ্বারা কৃত্রিম জলফেলা নহে, গা ঝাকা দেওয়া নহে, দণ্ডবতের ছড়াছড়ি নহে বা মুখদোরস্ত নহে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ তৃণাদপি সুনীচতার

সহিতই—“কৈবল্যং নরকায়তে” শ্লোক এবং “ক্রিয়াসক্তান্ ধিক্” শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ঐ সময় তাঁহার তৃণাদপি সুনীচতা তরোরপি সহিষ্ণুতা কিংবা অমানিত্ব বা মানদত্বের কোনও অভাব হয় নাই।

অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণের তৃণাদপি শ্লোকের ধারণা এই যে তৃণাদপি শ্লোক জীবকুলকে ক্রমশঃ পশুভাবাপন্ন করিয়া দেয়। তাহারা জাগতিক-অভিজ্ঞান লইয়া তৃণাদপি শ্লোক বিচার করেন বলিয়া এইরূপ বিষম ভ্রমে পতিত হন। তাহাদের জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, তৃণাদপি শ্লোক জড়ের ছোট বা বড় হইবার জন্য উপদেশ করেন নাই। সম্বন্ধ বা স্বরূপ জ্ঞানাভাবে ছোট বড় লইয়া বিচার তৃণাদপি শ্লোকের উদ্দিষ্ট বিষয় নহে। মহাবীর কপিপতি হনুমানের কি তৃণাদপি সুনীচতার কিছু অভাব ছিল। তিনি সর্ব্বদাই জানিতেন আমি আত্মবস্তু। শ্রীরামচন্দ্রের নিত্যদাস। আমি প্রাকৃত জগতের কোনও জীব নহি, আমার রামের যে বিদ্বেষী সে হউক না কেন ব্রাহ্মণ-বিশ্বশ্রবার পুত্র, সে বিষ্ণুবিদ্বেষী, বৈষ্ণব বিদ্বেষী সুতরাং সে রাক্ষস, তাহাকে বধ করাই আমার রামের সেবকত্ব। “তাহাই তৃণাদপি সুনীচত্ব।” অন্যাভিলাষী জড়জগতের ভোক্তার অভিমানে ব্যস্ত, কর্ম্মী পরিবর্ত্তন-শীল জগতের উন্নতি অবনতিকেই বহুমানন করেন, জ্ঞানীও বাহিরের দিকে ত্যাগাদি প্রদর্শন করিলেও প্রচ্ছন্ন ভোগী। যেখানে একমাত্র অদ্বিতীয় ভোক্তা, একমাত্র স্বরাট্, অভিজ্ঞ পুরুষ শ্রীভগবানের সেবাসুখতাৎপর্য্য নাই সেখানে অপ্রচ্ছন্ন ও প্রচ্ছন্নভাবে ভোক্তার অভিমান, সেখানেই কৈতব সুতরাং সেখানে তৃণাদপি সুনীচত্ব নাই, বৃক্ষ হইতেও সহিষ্ণুতা নাই, অমানিত্ব ও মানদ ভাব নাই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু প্রচারিত ও শ্রীমদ্ভাগবত-প্রতিপাদ্য তৃণাদপি সুনীচতার সহিত যীশুখৃষ্টের “বাম গালে চড় মারিলে ডান গালটী বাড়াইয়া দেও” বা নিউটনের বা সক্রেটিসের ‘আমি জ্ঞান-সিন্ধুর উপকূলে উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি মাত্র, বা “আমি এই মাত্র জানি যে আমি কিছুই জানি না”—এই সকল জড় জগতের ছোট বড় বৃহত্ব বা ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধির কথাকে এক জাতীয় মনে করিলে তৃণাদপি শ্লোকের মর্ম্মার্থ গ্রহণে অসমর্থতা প্রতিপন্ন হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ হরিসেবোন্মুখ শুদ্ধজীবের প্রতি সুতরাং তাহাতে খৃষ্টের উপদেশের ন্যায় জড়জগতের কোনও জীবের সহিত তুল্য বিচার পর্য্যন্ত নাই। যেখানে কোনও প্রকার প্রতিযোগিতা বর্ত্তমান সেখানেই ঐরূপ কথা। জীব যদি স্বরূপে জড় জগতের কোনও বস্তুই না হন তাহা হইলে অপরের দ্বারা আক্রান্ত হইবারও তাহার অবসর নাই। শুদ্ধজীব স্বরূপজ্ঞান লাভ হেতু সর্ব্বদাই অনুভব করেন যে ‘আমি বিভুচৈতন্যের বিভিন্নাংশ” সুতরাং জড়জগতের কোনও ব্যক্তির নিকট হইতে মার না খাওয়া বা অধিক করিয়া মার খাওয়ার চেষ্টায় আমার কোনও প্রয়োজন নাই। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বাইশ বাজারে প্রহার এই সহনশীলতার দৃষ্টান্ত কিছু ডান গাল বাড়াইয়া দেওয়ার দৃষ্টান্তের মত নহে। তিনি তাহার নামপ্রভুর সেবার জন্য নামপ্রভুর ভৃত্যজ্ঞানে সর্ব্ববিধ ক্লেশ সহনেও স্বীকৃত। জাগতিক কোনও প্রকার ক্লেশ শ্রীনামপ্রভুর সেবা হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত করিতে পারে নাই।

খণ্ড খণ্ড হয় যদি যায় যাবে প্রাণ।
তথাপি বদনে না ছাড়িব হরিনাম।।

ইহারই নাম তৃণাদপি সুনীচতা। এইরূপ সুনীচতায় জাগতিক কোনও বস্তু লাভের জন্য সুনীচতা বা সহনশীলতা নহে পরন্তু চৈতন্যরসবিগ্রহ শ্রীনাম সেবার জন্য সুনীচতা।

"তৃণদপি সুনীচ" শ্লোকে মধ্যমাধিকারী ভক্তও তৃণাদপি সুনীচ হইয়া কীর্ত্তনে অধিকার লাভ করিতে পারেন তাহাও উপদিষ্ট হইয়াছে। কনিষ্ঠ অধিকারী প্রাকৃত-ভক্ত লৌকিক শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তি অর্চ্চনে নিযুক্ত থাকিলেও স্বরূপোপলব্ধি না হওয়াতে তাঁহার ভক্তজন পূজ্য-বুদ্ধি তখনও উদিত হয় নাই সুতরাং তিনি তৃণাদপি সুনীচ হইয়া তখনও হরিকীর্ত্তন করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু মধ্যম অধিকারীর স্বরূপ জ্ঞানোদয় হইয়াছে, তিনি ভগবানে সেবা, ভক্ত বা গুরুসেবকের প্রতি সম্মান বা মৈত্রী, অতত্ত্বজ্ঞ বালিশ জনে হরিকথা উপদেশ দানরূপ কৃপা, বিদ্বেষী-জনে ক্রোধ প্রদর্শনাদি দ্বারা উপেক্ষা করিতেছেন। সুতরাং তিনি তৃণাদপি সুনীচ। তিনি নিজের ভোক্তার অভিমান দূর করিয়া সেবা ও সেবকের প্রতি নিষ্ঠা-বিশিষ্ট।

আর মহাভাগবত বা উত্তম অধিকারী তিনি ত' নিষ্কিঞ্চন, সর্ব্বতোভাবে তৃণাদপি সুনীচ, তরোরপি সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ। তিনি আত্মারাম হইয়াও সতত নামভজনানন্দে বিভোর। তাঁহার বস্তু-দর্শন হরিসম্বন্ধি-দর্শন, ঈশাবাস্য দর্শন। তিনি নিজে ভগবানের সেবক থাকিয়া জগতের সর্ব্বজীবকে সেবায় নিযুক্ত দেখিয়া সর্ব্বদা লালায়িত। সেই সূত্রে তিনি সর্ব্বজীবের নিকট নিত্যানন্দ প্রভুর মত—

"যারে দেখে তার বলে দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি।।"

আমি তোমাদের ক্রীতদাস হইয়া থাকিব আমার প্রাণপতিও তোমাদেরও প্রাণপতি একমাত্র অদ্বয়জ্ঞান অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর সকলে তাহার সেবায় নিযুক্ত হও। তিনি বিদ্বেষীকেও তাঁহার প্রভুর ব্যতিরেকভাবে সেবাপুষ্টিকারক বলিয়া বৈষ্ণবজ্ঞানে সম্মান দান করেন। তিনি প্রভুর সেবা করিতে পারিলাম না বলিয়া সর্ব্বদা শ্রীমতীর ন্যায় বিপ্রলম্ভভাবে বিভোর।

"প্রেমের স্বভাব এই প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ।।"

এই অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভভাবই তৃণাদপি সুনীচতার, তরোরপি সহিষ্ণুতার, অমানিত্ব ও মানদানের চরম উৎকর্ষ, ইহাতে সম্ভোগবাদীর আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা নাই একমাত্র অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা পরিপূর্ণরূপে বিরাজিত। ব্রজগোপী ও শ্রীমতী রাধারাণীর এই আদর্শভাব একমাত্র লোভনীয়। তাঁহাদের মত তৃণাদপি সুনীচ আর কে? শ্রীমতীর মত সতত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকারিণীই বা কে? সদ্গুরুতে সেই আদর্শ প্রতিফলিত। তিনি সেই আদর্শ প্রদর্শন করিয়া জগজ্জীবকে তৃণাদপি সুনীচতা শিক্ষা প্রদান করিতেছেন—নিত্যানন্দ প্রভু সেই আদর্শ দেখাইয়া জীবকুলকে গৌরকীর্ত্তনে নিযুক্ত করিতেছেন, শ্রীল ঠাকুর হরিদাস সেই আদর্শ লইয়া সর্ব্বদা হরিনাম আচার প্রচার করিতেছেন।

হরিকথা

হরিকথা বলিতে হরিসম্বন্ধিনী কথা বুঝাইয়া থাকে। হরিজনের কথাও হরিকথা। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন— "হরির্হি নির্গুণ সাক্ষাৎ" হরি সাক্ষাৎ নির্গুণ বস্তু, সুতরাং হরিসম্বন্ধি বা হরিজনসম্বন্ধি কথাও নির্গুণ কথা। কোনও কোনও অক্ষজজ্ঞানদৃপ্ত সম্প্রদায়ের বিচার এই যে "নির্গুণঃ" বস্তুর সম্বন্ধে কোনও কথাই বলা যাইতে পারে না। যাহা কিছু বলা হইবে সকলই অসম্পূর্ণ ও ভুল, সুতরাং অনর্থক ঐ সম্বন্ধে কথা না কহিয়া, চুপ করিয়া ধ্যানজপাদি-সাধন ভজন করাই ভাল। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" ইত্যাদি শ্রীগীতোক্তবাক্য দ্বারা এইরূপ বুঝিতে হইবে না যে হরি বা নির্গুণ বস্তু কীর্ত্তনীয় হইতে পারেন না ইহার দ্বারা সারগ্রাহী, অধোক্ষজ-সেবোন্মুখ হরিজনগণ জানেন যে শ্রীহরি ভোগোন্মুখ জড় ইন্দ্রিয়ের কীর্ত্তনীয় বিষয় নহেন, কিন্তু শ্রীহরি চিদিন্দ্রিয়- সেবোন্মুখ জিহ্বাদির সাহায্যে কীর্ত্তনীয় বা কথিত হইতে পারেন। কিন্তু এই বিষয় লইয়া একদিকে যেমন অক্ষজজ্ঞানদৃপ্ত মুমুক্ষু মায়াবাদী সম্প্রদায় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তদ্রূপ অপরদিকে কর্ম্মজড় অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী প্রভৃতি বুভুক্ষু সম্প্রদায়ও অপর এক প্রকার বিবর্ত্তে পতিত। মায়াবাদী-সম্প্রদায় বিচার করেন যে জগতের যাবতীয় বস্তুই নামরূপাত্মক অতএব যদি ব্রহ্মও শব্দাত্মক বস্তু হন তাহা হইলে তিনিও জাগতিক-বস্তু-শ্রেণীর অন্তর্গত হইয়া পড়েন। সুতরাং তাহারা জড়-ব্যতিরেক বিচার দ্বারা এইরূপ স্থির করিলেন নির্গুণ বস্তুর সম্বন্ধে কোনও কথা নাই তাহার সম্বন্ধে কোনও কথা বলিলে তাহা সগুণ ব্রহ্মেরই কথা হইয়া পড়িবে। কিন্তু এইরূপ বিচারের সম্বল অক্ষজ বা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান। জাগতিক অভিজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইল বা শ্রুতির মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিবার চেষ্টা হইল। ইহার দ্বারা ব্রহ্মের বৃহত্ব বা বৃংহণত্বকে খর্ব্ব করা হইল। বৃহৎ বস্তু যে সর্ব্ববিধ শক্তির আধার তাহা অস্বীকার করা হইল। ব্রহ্ম বস্তু তাহার অনন্ত, অসীম, অচিন্ত্য শক্তির বলে পরম নির্গুণ বস্তু হইয়াও সেবোন্মুখ শুদ্ধ জীবের চিদাত্মায় তাঁহার নির্গুণস্বরূপ প্রকাশ করিতে পারেন এবং সেই শরণাগত সেবোন্মুখ জীব সেবোন্মুখ চিদেন্দ্রিয়ের সাহায্যে নির্গুণ হরিকথা কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হন। ভগবানের অবিচিন্ত্য, শক্তিকে মাপিয়া লইবার প্রয়াস বলিয়া অক্ষজজ্ঞানবাদী-সম্প্রদায় সাত্ত্বতগণ কর্ত্তৃক মায়াবাদী সম্প্রদায় নামে অভিহিত হন। তাহারা অনন্তশক্তি-সম্পন্ন ভগবানকেও নিজ নিজ ক্ষুদ্র মাপকাঠির ছাঁচে ফেলিয়া ভগবানের অবিচিন্ত্য-শক্তির কার্য্যাবলীতেও মায়ার বিবাদ উঠাইয়া থাকেন। এইরূপ বিচারের উপর নির্ভর করিয়াই তাহারা বলিয়া থাকেন নির্গুণ ব্রহ্মের সম্বন্ধে কোনও কথা নাই সগুণব্রহ্মের সম্বন্ধেই কথা। কিন্তু সাত্ত্বত-শাস্ত্র বলেন, নির্গুণ হরিই সর্ব্বদা কীর্ত্তনীয়।

"তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাংপতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা।।"

(ভাঃ ১।১১।১৪)

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি মিত্থংভূতগুণো হরিঃ।।

অপরদিকে কর্ম্ম-জড়গণ বা প্রাকৃত সাহজিকগণ মনে করেন, শ্রীহরির অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ, লীলা, আমাদের জড়েন্দ্রিয়গোচর হইতে পারে। জড়েন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে যে অক্ষর উচ্চারণ করা হয় তাহাই 'নাম', জড়েন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে সকল কথা কীর্ত্তন বা শ্রবণ করা হয়, তাহাই হরিকীর্ত্তন বা শ্রবণ। কিন্তু তাহারাও বিষ্ণুমায়ামোহিত হইয়া শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করিতে পারেন না—

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর"
'অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।।'

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ ও লীলা বদ্ধজীবের জড়েন্দ্রিয়ের গোচর নহে কিন্তু সেবোন্মুখ অপ্রাকৃত চিদিন্দ্রিয়ে সেই স্বপ্রকাশ বস্তু স্বতঃই কৃপাপূর্ব্বক স্ফুরিত হইয়া থাকেন। যদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হরিকথা শ্রবণ বা কীর্ত্তনে ফলোদয় হইত তাহা হইলে গ্রামোফনে কোনও হরিবিষয়ক কথার রেকর্ড লাগাইয়া শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে গ্রামোফনের বা ঐ সকল কথা শ্রবণকারীর মঙ্গল হইয়া যাইত। কিন্তু ঐরূপ—

"কোটী জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন।।" (চৈঃ চঃ)

দেহাত্মাভিমানের সহিত বা ভোগোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে সকল কথা হয়, তাহাতে 'হরি' এই অক্ষরের বারংবার উল্লেখ থাকিলেও, বা তাহারা শাস্ত্রের কথা হইলেও প্রজল্প বা কাব্য, ইতিহাস, সাহিত্যের কথার ন্যায় হইয়া পড়িবে। নির্গুণ হরিকথা ভোগোন্মুখ ব্যক্তির নিকট তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করেন না। এ জন্য দেখা যায় ঐ সকল বদ্ধজীব হরিকথার সেবা না করিয়া তাহার সাহায্যে কনক-কামিনী ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের চেষ্টা করিয়া থাকে। এই জন্যই সপ্তম স্কন্ধে প্রহ্লাদ মহারাজ "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ" শ্লোকে শরণাগত ব্যক্তিই হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তনের যথার্থ অধিকারী বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন।

আধুনিক কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণের ধারণা এই যে হরিকথার দ্বারা জীবের উপকার হওয়া সুদুরপরাহত, কেবল কথার কথা। সুতরাং হরিকথাদির আলোচনা কমাইয়া, দরিদ্রের সেবা, দেশের সেবা, দশের সেবা, সমাজের উন্নতি, পীড়িতকে ঔষধ-প্রদান, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নপ্রদান, চরকা, বয়ন প্রভৃতি শিল্প কার্য্যের শিক্ষাপ্রদান করাই বিশেষ কর্ত্তব্য। কারণ তাহাদের যুক্তি এই—"আগে বাঁচিয়া না থাকিলে হরিকথা শুনিবে কে?" রোগশোক-কাতর ব্যক্তির কর্ণে কি হরিকথা পৌঁছে? কোনও কর্ম্ম জড় ব্যক্তি একদা দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন—"সরকার বাহাদুর বহুবিধ নূতন নূতন 'কর' প্রচলন করিতেছেন, তিনি যদি এই সকল হরিকথা- কীর্ত্তনকারি ব্যক্তিগণের কথার উপর একটা 'কর' বসাইতেন, তাহা হইলে দেশের মঙ্গল হইত।" আজকাল দেশময় এইরূপ নাস্তিক্যবাদের রোল উঠিয়াছে। শতকরা নিরানব্বই জনেরও বেশী সংখ্যক

লোক এই সকল কথার আদর করিয়া থাকেন। এই সকল কথার মূলে সূক্ষ্মদৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়া বিচার করিয়া দেখিলে অসীম, অপরিতৃপ্ত ভোগানলের লোলজিহ্বা ব্যতীত আর কিছু নাই। এরূপ দেশ-সেবা, দশ-সেবা, সমাজ হিতৈষিতার মূলে নিজ নিজ সুবিধার চেষ্টা প্রচ্ছন্নভাবে লুকাইয়া রহিয়াছে। ঐ সকল কার্য্যে যদি নিজ সুখ না থাকিত, 'আমি যদি ঐ দেশের দশজনের মধ্যে একজন না থাকিতাম তাহা হইলে সেই দেশের বা সমাজের উন্নতির জন্য আমার চেষ্টা হইত না।' নদীর জল শুকাইলে তারপর নদী পার হইব এ আশা বিফল, নদীও শুকাইবে না, পারও হওয়া যাইবে না। দেশের উন্নতি করিয়া, খাওয়াদাওয়ার সংস্থান করিয়া পরে হরিকথায় মনোনিবেশ করিব—এ বিচারও তদ্রূপ। খাওয়াদাওয়ার যোগাড় থাকিলেই হরিকথা শুনিবার কান হয় না, তবে বহুলোক হরিকথা শুনিত। আগে উপসর্গগুলি কমাইয়া পরে মূল রোগ চিকিৎসা করা যাইবে, আগে গাছের পাতায় পাতায় জল সেচন করা যাউক, আগে বিবিধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আহার্য্য বস্তু প্রদান করা হউক, ইহা বাতুলের প্রলাপ মাত্র। সুবিজ্ঞ চিকিৎসক সর্ব্বপ্রথমে মূলরোগ অনুসন্ধান করিয়া চিকিৎসা করিয়া থাকেন, উত্তম মালী গাছের গোড়ায় জল সেচন করে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রাণেই আহার প্রদান করেন। এই জগতটাই অভাব অসুবিধার রাজ্য—বদ্ধজীবের জেলখানা, জেলখানায় আরাম খোঁজা, সুখ-সুবিধা খোঁজা হাজার হাজার বৎসর চেষ্টা করিয়াও নিতে পারা যাইবে না। যতদিন ভগবানকে ভুলিয়া থাকিতে হইবে, ততদিন এই অভাব অসুবিধা থাকিবেই থাকিবে। কখনও লোহার খাঁচায় বা কখনও সোনার খাঁচায় পরিবর্ত্তন হইতে পারে কিন্তু ভগবানকে ভুলিয়া থাকা পর্য্যন্ত খাঁচা বা শৃঙ্খল দূর হইবে না। ভগবদ্বিমুখতা রাখিয়া দেশের উন্নতি, সমাজের উন্নতি প্রভৃতির চেষ্টা কুকুরের লেজ সোজা করিবার মত বৃথা পরিশ্রম। সারগ্রাহী সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ ঐরূপ পরিশ্রমের কার্য্যে অমূল্য মনুষ্যজীবন ব্যয় করেন না। তাঁহারা বলেন হে ভগবন্—

যদ্ যদ্ভবতু ভব্যং ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।
এতৎপ্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি-
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু।।

হে ভগবন্! পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে আমার যাহা হয় হউক না কেন, আমার যেন তোমার পাদপদ্মে একান্ত রতি হয়।

হরিকথাবিমুখ হইয়া বাঁচিয়া থাকিয়া কি লাভ? শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, অশ্বত্থ বৃক্ষাদি কি মানুষের অপেক্ষা অধিক দিন বেশী বাঁচিয়া থাকে না? কামারশালের ভস্ত্রা কিত মানুষের চেয়েও অধিক শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণাদি করে না? গ্রাম্য শূকরগুলি কি মানুষের চেয়েও অধিকবার খাদ্যাদি গ্রহণ ও স্ত্রীসঙ্গাদি ইন্দ্রিয়তর্পণ করে না?

ভগবদ্ভজনকারীর সামান্য খাওয়া দাওয়ার অভাব ত' দূরের কথা—ইন্দ্রাধিপত্য, সার্ব্বভৌমত্ব, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও পঞ্চবিধ মুক্তি ভক্তের শ্রীচরণে বিলুণ্ঠিত হইবার জন্য ভক্তের সেবার জন্য সময় প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। শ্রীগীতোপনিষদে শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাপর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।।"

ভগবান্ নিজে ভক্তের যাবতীয় বোঝা বহন করিতে পর্য্যন্ত স্বীকৃত। আমরা এতদূর নাস্তিক যে বেদবাণীতে পর্য্যন্ত আমাদের আস্থা নাই। যে পর্য্যন্ত আমাদের হরিকথায় শ্রদ্ধা না হইবে আমাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম বৃথা পরিশ্রম মাত্র।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্।। (ভাঃ ১।২।৮)

তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাই জীবের পরম প্রয়োজন—

"জীবস্য তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহকর্ম্মভিঃ।" (ভাঃ ১।২।১০)

বহু পুঞ্জ পুঞ্জ সুকৃতি ফলে জীবের হরিকথায় রুচি হয়। যথা—

শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিসেবনাৎ।। (ভাঃ ১।২।১৬)

একমাত্র হরিকথায় রতি হইলে জীবের যাবতীয় অনর্থ বীজ উৎপাটিত হয় এবং শ্রীভগবান্ জীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া যাবতীয় কামাদি বাসনা বিনষ্ট করেন।

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থোহ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাং।।

হকিকথা মুমূর্ষু ব্যক্তিরও মৃতসঞ্জবনী। একমাত্র হরিকথা শ্রবণকীর্ত্তনাদি দ্বারাই জীবের ঐকান্তিক মঙ্গল সাধিত হয়। যোগ, ধ্যান, ইজ্যা প্রভৃতির দ্বারা জীবের নিত্য কল্যাণ হইতে পারে না। কারণ ঐ সকল আত্মার স্বরূপ-ধর্ম্ম নহে। মহারাজ পরীক্ষিৎ তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পরীক্ষিৎ মহারাজ নানা মুনির নানা ধর্ম্মমত পরিত্যাগ করিয়া শ্রীশুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া মুমূর্ষু অবস্থায়ও নিত্যমঙ্গল লাভ করিয়াছিলেন। পরীক্ষিৎ মহারাজ হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভুকে বলিয়াছিলেন—

নৈযাতিদুঃসহা ক্ষুন্মাং ত্যক্তোদমপিবাধতে।
পিবন্তং ত্বন্মুখাম্ভোজচ্যুতং হরিকথামৃতং।। (ভাঃ ১০।১।১৩)

হে ব্রহ্মান্, যদিও আমি প্রায়োপবেশনার্থ উদক পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু আপনার মুখপদ্ম বিনিসৃত হরিকথামৃত পান করাতে এই দুঃসহ ক্ষুধা আমাকে কিঞ্চিন্মাত্রও ক্লেশ দিতে সমর্থ হইতেছে না।

বাসুদেব কথার প্রশ্ন তদীয়পাদোদ্ভব গঙ্গোদকের ন্যায় প্রশ্নকর্ত্তা, বক্তা ও শ্রোতা ত্রিবিধ-পুরুষকেই পবিত্র করেন।

বাসুদেবকথা প্রশ্নঃ পুরুষাং স্ত্রীন্ পুনাতি হি।
বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৃংস্তৎপাদসলিলং যথা।। (ভাঃ ১০।১।১৩)

সূর্য্য প্রতিদিন সকল লোকেরই আয়ু হরণ করিতেছেন কিন্তু যাহারা হরিকথায় কাল যাপন করেন, তাহাদেরই আয়ু বৃথা নষ্ট হয় না,—অক্ষয় হইয়া থাকে।

"আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্ত্তে যৎক্ষণো নীত উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া।।" (ভাঃ ২।৩।১৭)

হরিকথা মুক্ত, মুমুক্ষু ও বিষয়ী সকলেরই আশ্রয়ণীয় বস্তু। ইহা একমাত্র ভবৌষধি। যিনি এই হরিকথা হইতে বিরত হন, তিনি আত্মঘাতী বা পশুঘাতী।

"নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোহভিরামাৎ।
ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ।। (ভাঃ ১০।১।৪)

হরিকথাই অনন্যভক্তগণের প্রাণ। শ্রীভগবান্ গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্ত পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।।
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।।" (ভাঃ ১০।৯, ১০)

ভগবদ্ভক্তগণ চিত্ত ও প্রাণকে ভগবানে সমর্পণ করিয়া পরস্পর ভাব বিনিময় ও হরিকথার কথোপকথন করিয়া থাকেন। সেইরূপ শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারা সাধন অবস্থায় ভক্তিসুখ এবং সাধ্যাবস্থায় আত্মারাম হইয়া রাগমার্গে প্রেমানন্দ সুখে রমণ করেন। যিনি এইরূপ হরিকথা কীর্ত্তন করিতে করিতে সতত ভগবানের সহিত যুক্ত থাকিয়া প্রীতিপূর্ব্বক ভগবানের ভজন করেন ভগবান্ তাহাকে নির্ম্মল বুদ্ধি যোগ প্রদান করেন। সেই বিমল সম্বন্ধ জ্ঞানের সাহায্যে তিনি ভগবানের নিত্য-সেবা লাভ করেন।

হরিকথা—কীর্ত্তনের ন্যায় আর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান নাই। যিনি হরিকথা কীর্ত্তন দ্বারা জীবের নিত্যমঙ্গল বিধান করেন, তিনিই মহাবদান্যবর। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও গৌরপার্ষদগণ সকলেই মহাবদান্য। শ্রীমদ্ভাগবতে বিরহকাতরা গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন,

"তবকথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ।।"

হরিকথা বিরহ-দুঃখে ম্রিয়মাণ জনের অমৃত ও মুক্তকুলেরও উপাস্য বস্তু, যাবতীয় কল্মষবিধৌতকারী, কর্ণরসায়ণ, সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত। যাঁহারা সংসারে এই হরিকথা বিস্তার করেন, তাহাদের মত মহাদানশীল আর দ্বিতীয় নাই। অন্নদান, বস্ত্রদান, ঔষধদান, বিদ্যাদান, যত দানই হউক না কেন তাহা তাৎকালিক নৈমিত্তিক ক্ষুদ্র দান মাত্র, কিন্তু হরিকথা দানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান, তাহার দ্বারাই জীবের নিত্য মঙ্গল হইয়া থাকে। সাধুগণ, সাত্বতগণ হরিকথা দান ব্যতীত অপর ক্ষুদ্র দান বা নৈমিত্তিক দান করেন না। এই জন্যই শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশ "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"

"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হৈয়া তার এই দেশ।।
ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঁই পাবে মোর সঙ্গ।।"

আধুনিক চিজ্জড় সম্বন্বয়বাদী বা কর্ম্মজড় নাস্তিকগণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব হরিবিমুখ ভোগপরায়ণ দেহের সেবা, দরিদ্রভরণ প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা পরোপকারের দৃষ্টান্ত দেখান নাই। তিনি স্বয়ং এবং তাহার পার্ষদবৃন্দ দ্বারা তিনি জগতে হরিকথা-কীর্ত্তন প্রচার দ্বারা পরোপকারের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। ইহাকেই বলে মহাবদান্যতা। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (আদি ৯ম)—

একলা মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যাব।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব।।
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায় কেহ না পায় রহে মনে ভ্রম।।
অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে।
অতএব সবে ফল দেহ যারে তারে।
খাইয়া হউক লোক অজরে অমরে।।
ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার।।

সুতরাং যাঁহারা হরিকথা প্রচার করেন তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা, তাঁহারাই জীবের মূল—ব্যাধি নিরাময় করিতে চেষ্টাযুক্ত, তাঁহারাই জীবের নিত্যমঙ্গল প্রদাতা।

হরিজনগণ, বিবেকিগণ জাগতিক অভ্যুদয়, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা নৈতিক কথার আদর করেন না, একমাত্র হরিকথাতেই তাঁহাদের প্রমোদ।

শৌনকাদি ঋষি ভাগবত-বক্তা সূতকে বলিয়াছিলেন,—

তৎ কথ্যতাম্ মহাভাগ যদি বিষ্ণুকথাশ্রয়ঃ।
অথবাস্য পদাম্ভোজমকরন্দলিহাং সতাং।
কিমন্যৈরসদালাপৈরায়ুষো যদসদ্ব্যয়ঃ।। (ভাঃ ১।১৬।৬)

হে মহাভাগ সূত! যদি আপনার বক্তব্য বিষয় বিষ্ণুকথাশ্রয় হয় অথবা ইহাতে যদি বিষ্ণুর পাদপদ্মের মধু-আস্বাদনকারী হরিজনের কথার সংশ্রব থাকে, তাহা হইলেই বর্ণন করুন নচেৎ অন্য অসদালাপে প্রয়োজন

নাই, তাহাতে বৃথা আয়ুক্ষয় হয় মাত্র। একমাত্র হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-দ্বারাই জীবের সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হয়, অজিত ভগবানও জিত হন এবং সদ্য হৃদয়ে অবরুদ্ধ হন।

জ্ঞান কর্ম্ম যোগাদি-চেষ্টার দ্বারা সেইরূপ মঙ্গল হয় না, বরং জীবকে নানা প্রকারে বিপদে পাতিত করিয়া থাকে। জ্ঞানে আত্মবিনাশরূপ অনর্থ, যোগে অষ্টসিদ্ধ্যাদির প্রলোভনরূপ বিপদ বা কৈবল্যরূপ আত্মবিনাশ, কর্ম্মে নানা যোনিভ্রমণাদি হইয়া থাকে। কিন্তু হরিকথায় শ্রীভগবান্ সদ্য হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৩) ব্রহ্মার স্তবে জানা যায়—

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয় বার্ত্তাং।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিতজিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।।

অর্থাৎ হে ভগবন্, নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞানচেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে দূরে পরিত্যাগ করিয়া যাহারা সাধু মুখবিগলিত ভবদীয় কথা শ্রবণ করেন ও সাধুপথে স্থিত হইয়া কায়মনোবাক্যে ঐ সকল বাক্যে প্রণিপাতবিশিষ্ট হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, ত্রৈলোক্য মধ্যে আপনি সকলের নিকট অজিত হইলেও তাহাদের বশ হন। একদা দেবহূতি কপিলদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'বৎস, আমি অবলা জাতি, যোগ যাগ, জ্ঞানাদি সাধন আমার পক্ষে সম্ভব নহে, আমার পক্ষে নিত্য মঙ্গল লাভের সহজ সাধন কি? তদুত্তরে কপিলদেব বলিয়াছিলেন (ভাঃ ৩।২৫।২২)—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।।

হরিজনগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ ক্রমে আমার বিষয়ক হৃৎকর্ণরসায়ন কথা সকল আলোচিত হয়। সেই সকল কথা শ্রবণ করিতে করিতে অপবর্গপথস্বরূপ আমাতে অনতিবিলম্বে প্রথমে শ্রদ্ধা পরে রতি ও অবশেষে প্রেমভক্তি উদিত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত হরিকথার আরও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন—

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশদে হৃদি।। (ভাঃ ২।৮।৩)

শ্রীল চক্রবর্ত্তীর টীকা—সোঽপি স্মরণপ্রযত্নঃ শ্রবণকীর্ত্তনবতো ভক্তস্যানাবশ্যক ইত্যাহ শৃণ্বত ইতি শ্রবণকীর্ত্তনাধীনমেব স্মরণমিতি জ্ঞেয়ং।

শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তিবিষয়ক কথা নিত্য শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিতে করিতে বিনা প্রযত্নেই অতি অল্পকালের মধ্যেই ভগবান্ হৃদয়ে প্রবিষ্ট হন। অর্থাৎ হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনকারী ব্যক্তির স্মরণ-প্রযত্নের অনাবশ্যক। স্মরণ, শ্রবণ ও কীর্ত্তনেরই অধীন।

প্রবিষ্টঃ কর্ণ রন্ধ্রেণ স্বানাং ভবসরোরুহং।
ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ।।

শ্রীহরি কথারূপে কর্ণরন্ধ্র দ্বারা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া ভক্তগণের হৃৎসরোজের কামক্রোধাদি ধৌত করিয়া থাকেন, যেমন শরৎ ঋতুর প্রবেশে নদীতড়াগাদির জলের মলিনতা তিরোহিত হইয়া যায়। চক্রবর্ত্তী ঠাকুর টীকায় বলিতেছেন যে, কাম ক্রোধাদিরূপ হৃদয়ের মল ত জ্ঞান যোগাদি সাধনের দ্বারাও দূরীভূত হইতে পারে, তবে হরিকথার বিশেষত্ব কি? সেই জন্য শ্রীমদ্ভাগবত নদীর জলের সহিত দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। হরিকথার বিশেষত্ব এই যে, যেমন কুম্ভস্থ মলিন জল কোনও বস্তু বিশেষ দ্বারা পরিষ্কৃত হইলেও মলারাশি কুম্ভের নীচে পড়িয়া থাকে আবার জল ঈষৎ ক্ষুভিত হইলেই মলাগুলি জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া পড়ে তদ্রূপ জ্ঞান, যোগ, তপাদি দ্বারাও হৃদয়ের কাম ক্রোধাদি অনর্থ কথঞ্চিৎ ও কিয়ৎকাল প্রশান্তভাবে থাকিলেও আবার ক্ষোভের কোনও কারণ উপস্থিত হইলেই ঐ সকল অনর্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপাদি দ্বারা সর্ব্বতোভাবে জীবের অনর্থ বিদূরিত হইতে পারে না কেবল কিছুকাল স্তব্ধ অবস্থায় থাকে মাত্র। কিন্তু একমাত্র হরিকথাই হৃদয়ের সমস্ত মল নিঃশেষিতরূপে বিদূরিত হয়। কৃষ্ণকথা কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। সুতরাং যেখানে কৃষ্ণ প্রবেশ করেন, সেখানে মায়ার কোনও অধিকার থাকিতে পারে না। যেমন শরৎকাল জগতে প্রবিষ্ট হইলেই নদীর মলিনতা আপনিই বিদূরিত হয়। পুনঃ পুনঃ বিক্ষুব্ধ হইলেও জলে মলিনতা আর আসিতে পারে না।

ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি।
মুক্তসর্ব্বপরিক্লেশঃ পান্থঃ স্বশরণং যথা।। (ভাঃ ২।৮।৫)

ক্রমসন্দর্ভঃ—এবং ন কর্ম্মজ্ঞানাদিবৎ স্বকার্য্যসিদ্ধৌ তত্ত্যাগঃ। কিন্তু স্বতঃ পরমসুখদত্বমপি তস্যেত্যুক্তং।

যেমন প্রবাস হইতে আগত পথিক স্বগৃহে পৌঁছিয়া সর্ব্ব ক্লেশমুক্ত হইলে আর নিজগৃহ পরিত্যাগ করেন না, তদ্রূপ প্রশান্তচিত্ত-পুরুষ হরিকে প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি সাধনের মত হরিকথাকে পরিত্যাগ করেন না, বরং তখনও আরও হরিকথাতে রমণ করিতে থাকেন।

হরিকথা জীবের সাধন ও সাধ্য। নারদ শুক দেবাদির ন্যায় মুক্তকুলও নিয়ত হরিকথা-সুধা-সরিৎ পান করিয়া থাকেন।

এতন্নির্ব্বিদ্যমানামিচ্ছতামকুতোভয়ং।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনং।। (ভাঃ ২।১।১১)

শ্রীধরটীকা—সাধকানাং সিদ্ধানাঞ্চ নাতঃ পরমন্যৎ শ্রেয়োঽস্তীত্যাহ এতদিতি। হরির নামানুকীর্ত্তন একান্ত ভক্তগণের আশ্রয়ণীয় বস্তু, ফলকাঙ্ক্ষিপুরুষদিগের তত্তৎফলের সাধন, মুমুক্ষুদিগের মোক্ষ-সাধন, আত্মারামগণেরও সেব্য বস্তু। সাধক ও সিদ্ধান্তের ইহা অপেক্ষা অন্য পরম মঙ্গল নাই।

কর্ম্মজড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণের হরিকথায় বিশ্বাস নাই। তাহারা কর্ম্মের ফলা বটীকেই বড় মনে করেন। ইহার কারণ তাহারা দৈবী মায়ায় বিমোহিত। সেই কারণেই শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।৩।২৫) যমরাজ বলিয়াছেন—

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোয়ং।
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালং।।
ত্রয্যা জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং।
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ।।

হরিকথাই জীবের স্বরূপধর্ম্ম বা পরমধর্ম্ম। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ।।

জীব যতদিন পর্য্যন্ত না প্রকৃত নিষ্কিঞ্চন হরিজনের সাক্ষাৎকার পান ততদিনই তাহার সামাজিক কথা, দেশের কথা, নৈতিক কথা, সাহিত্য ও কাব্যের কথা, বহির্ম্মুখ শাস্ত্রবিদ্গণের পরস্পর বিবাদের কথা, নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসুগণের ব্রহ্মকথা বা মুক্তির কথায় রুচি থাকে। প্রকৃত হরিজন শুদ্ধ হরিসেবার কথা ছাড়া অন্য কোনও কথার আদর করেন না। গৌরপার্ষদ শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ চৈতন্যচন্দ্রামৃতগ্রন্থে লিখিয়াছেন—

তাবদ্ ব্রহ্মকথা বিমুক্তিপদবী তাবন্নতিক্তীভবেৎ
তাবচ্চাপি বিশৃঙ্খলত্বময়তে নো লোক বেদ স্থিতিঃ।
তাবচ্ছাস্ত্রবিদাং মিথঃ কলকলোনানাবহির্ব্বর্ত্মসু
শ্রীচৈতন্যপদাম্বুজপ্রিয়জনো যাবন্নদৃগগোচরঃ।

প্রেমাবতার শ্রীগৌরসুন্দর স্বমুখে বলিয়াছেন—

শ্রুতমপ্যৌপনিষদং দূরে হরিকথামৃতাৎ।
যন্ন সন্তি দ্রবচ্চিত্তকম্পাশ্রু-পুলকাদয়ঃ।।

ঔপনিষদ ব্রহ্ম হরিকথামৃতের প্রসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত। যেখানে হরিকথা অবস্থান করেন, তথায় চিত্তের দ্রবতা, কম্প, অশ্রু পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকার সকল পরিদৃষ্ট হয়। এই সকল সাত্ত্বিক বিকার নিসর্গ পিচ্ছিল চক্ষু ভাবপ্রাণ ব্যক্তির চক্ষুর জল নহে, প্রাকৃত সহজিয়ার কৃত্রিম ভাবচেষ্টা নহে কারণ শ্রীমদ্ভাগবতের "তদশ্মসারং" শ্লোকে তাহা নিরাকৃত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধ প্রেমিক ভক্তের পরম প্রাপ্য বস্তু, ইহাই পরম প্রয়োজন, জীবের একমাত্র সাধ্য, আত্মধর্ম্মের চরমোৎকর্ষ। সুতরাং হরিকথা প্রচারই জীবে দয়া, একাধারে পরার্থপরতা ও স্বার্থপরতার অপূর্ব্ব সম্মিলনের দৃষ্টান্ত, জীবমাত্রেরই নিত্য আত্মধর্ম্ম, অভিন্ন শ্রীহরির দুর্ল্লভ সঙ্গ ও সেবা।

ব্রহ্মচর্য্য

উন্নত মনুষ্যকুলের জগতে চতুর্ব্বিধ অবস্থান বা আশ্রম বিচারে ব্রহ্মচর্য্য সর্ব্বপ্রথম আশ্রম। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অন্যান্য আশ্রমের ভিত্তি-স্বরূপ। সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্রহ্মচর্য্য বলিতে বীর্য্যধারণ বা অষ্টাঙ্গ-মৈথুন-নিবৃত্তি বুঝাইয়া থাকে। যথা—

"স্মরণং কীর্ত্তনং কেলি প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণং।
সংকল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ।
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।।"

(ভারবিটীকা মল্লিনাথ)

অর্থাৎ স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, সঙ্কল্প, অধ্যবসায় ও ক্রিয়া-নিষ্পত্তি এই আট প্রকার মৈথুন। এই অষ্টাঙ্গ-মৈথুন-নিবৃত্তিই ব্রহ্মচর্য্য। ব্যাপক অর্থে পরব্রহ্মে বিচরণ বা ভগবৎ-সেবানন্দানুভূতিই ব্রহ্মচর্য্য। শেষোক্ত ব্রহ্মচর্য্যই স্বরূপসিদ্ধি বা বৃহৎ ব্রহ্মচর্য্য। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণ পরব্রহ্মসেবারূপ ব্রহ্মচর্য্যে নিত্য অধিষ্ঠিত। ইহা আশ্রমবিশেষ নহে পরন্তু আশ্রমাতীত জীবের শুদ্ধ স্বরূপোদ্বোধনের পরম ফল বিশেষ। প্রথমতঃ সঙ্কীর্ণ অর্থটী লইয়াই আলোচনা করা যাউক।

মানবকের আচার্য্যের নিকট হইতে উপনয়ন গ্রহণানন্তর গুরুকুলে অবস্থানপূর্ব্বক বেদাভ্যাস, গুরুসেবা ও সংযমাদি অভ্যাসের কালকে ব্রহ্মচর্য্য কাল বলা যায়। প্রাচীনকালে বালকগণকে পিতামাতা প্রভৃতি অভিভাবকগণ ব্রহ্মচর্য্য-শিক্ষা- প্রদান করিবার জন্য আচার্য্য সমীপে প্রেরণ করিতেন। বর্ত্তমানকালে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমটী লুপ্তপ্রায়। তাহার কারণ বর্ত্তমান সমাজ কর্ম্মজড়ভোগবাদে আচ্ছন্ন। ইহা যে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল, তাহাও বলা যাইতে পারে না। কারণ কিছু দিবস পূর্ব্বে একখানা তন্ত্রগ্রন্থ কোনও প্রবৃত্তিমার্গীয় কর্ম্মপন্থী কর্ত্তৃক রচিত হইয়া বঙ্গদেশের ভোগপ্রবণ ব্যক্তিগণের হৃদয়ের ভোগমূলা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। সেই তন্ত্রখানার নাম অনেকেরই সুপরিচিত। মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র—

"ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমো নাস্তি বানপ্রস্থোঽপি ন প্রিয়ে।
গার্হস্থ্যো ভৈক্ষুকশ্চৈব আশ্রমৌ দ্বৌ কলৌ যুগে।।"

অর্থাৎ কলিতে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বা বানপ্রস্থাশ্রম নাই। গার্হস্থ্য ও ভৈক্ষ্য এই দুই আশ্রমে অবস্থান করা উচিত। যে ভিষকব্রুব জ্বররোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে কাঁচা তেতুল খাইবার ব্যবস্থা করেন সেই চিকিৎসক (?) রোগীর নিকট বড় প্রিয়। তদ্রূপ ভগবদ্বহির্ম্মুখ ভব-রোগাক্রান্ত ব্যক্তির নিকট যদি ভোগের কথা শাস্ত্রীয় আদেশের নাম করিয়া বলা হয় সেই শাস্ত্রের আদর জগতের শত করা নিরানব্বই বা ততোধিক লোকের নিকটই হইয়া থাকে। কারণ ভোগমূলা বাসনা বা আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাই ত' জগতে বদ্ধ হওয়ার হেতু। যে সকল শাস্ত্র বা যে সকল ব্যক্তি সেই আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছারূপ অনলে ইন্ধন দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন, তাহারা

যে জগতের লোকের নিকট আদরণীয় বা শ্রদ্ধার পাত্র হইবেন এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি? এই ভোগবাদ বদ্ধজীবের হৃদয়ে বহুভাবে বিরাজিত; কখনও চার্ব্বাকাদি নাস্তিকগণের সজ্জায়, কখনও কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণের ঈশ্বরসংশ্রব- চাতুর্য্যের আবরণে, কখনও বা নিঃস্বার্থপরতা, নৈতিক ও সামাজিক উন্নতির পোষাকে আবার কখনও ঐহিক ও পারত্রিক সুখাদি এবং অবশেষে ভগবানের নিত্যনাম-রূপলীলাধামাদি বিসর্জ্জনরূপ-ত্যাগের মুখাবরণে উপস্থিত হইয়া থাকে। আজকাল ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান লুপ্তপ্রায় বলিলেও আবার ব্রহ্মচর্য্য কথাটীর খুব ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। পথে ঘাটে, শহরে গ্রামে, ঔষধের বিজ্ঞাপনে, পঞ্জিকার মধ্যে, ডাক্তার কবিরাজ ও ব্যবসায়িগণের বিনামূল্যে বিতরিত পুস্তিকার মধ্যে, ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ, আলোচনা, কত কি দেখিতে পাওয়া যায়। আবার পুস্তক বিক্রেতার নিকটও ''ব্রহ্মচর্য্য'', ''ব্রহ্মচর্য্যশিক্ষা'', জীবনবন্ধু ''ছাত্র সুহৃদ'', ''জীবন-সহায়'' প্রভৃতি কত কি নামের বহু প্রকারের ব্রহ্মচর্য্যশিক্ষা-সম্বন্ধে গ্রন্থ ক্রয়ার্থ পাওয়া যায়। আজকাল স্কুল কলেজের ছাত্রগণ ঐ সকল পুস্তক সাহায্যে ব্রহ্মচর্য্যশিক্ষা করিতে যাইয়া নানাভাবে বঞ্চিত ও কদভ্যাসে রত হয়। অনেক সুকোমলমতি বালক পূর্ব্বে যে সকল কদভ্যাসের কথা কখনও শ্রবণ করে নাই, তাহারা ঐ সকল পুস্তক সাহায্যে কৃত্রিম ব্রহ্মচর্য্য-প্রণালী শিক্ষা করিতে যাইয়া কদভ্যাসে রত হইয়া পড়ে। আজকাল তথাকথিত ব্রহ্মচর্য্যবিদ্যালয়াদির বালকগণেরও ঐরূপ অবস্থা। এইরূপ কুফল ফলিবার কারণ এই যে পুস্তক দেখিয়া বা কৃত্রিম উপায়ে ব্রহ্মচর্য্য লাভ হয় না। ব্রহ্মচর্য্যে অধিষ্ঠিত হইতে হইলে শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে বিচরণশীল আচার্য্যের সমীপে অভিগমন আবশ্যক। আচার্য্যসেবা ব্যতীত ব্রহ্মচর্য্য লাভ হইতে পারে না।

দ্বিতীয়ং প্রাপ্যনুপূর্ব্ব্যা জন্মোপনয়নং দ্বিজঃ।
বসন্ গুরুকুলে দান্তো ব্রহ্মাধীয়ীত চাহুতঃ।।
আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ।।
সায়ং প্রাতরুপানীয় ভৈক্ষ্যং তস্মৈ নিবেদয়েৎ।
যচ্চান্যদপ্যনুজ্ঞাতমুপযুঞ্জীত সংযতঃ।।
শুশ্রূষমাণ আচার্য্যং সদোপাসীত নীচবৎ।
যানশয্যাসনস্থানৈর্নাতিদূরে কৃতাঞ্জলিঃ।।
এবং বৃত্তো গুরুকুলে বসেদ্ভোগবিবর্জ্জিতঃ।
বিদ্যা সমাপ্যতে যাবদ্বিভ্রদ্ব্রতমখণ্ডিতম্।।
এবং বৃহদ্ব্রতধরো ব্রাহ্মণোঽগ্নিরিব জ্বলন্।
মদ্ভক্তস্তীব্রতপসা দগ্ধকর্ম্মাশয়োঽমলঃ।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৭।২১-৩৩)

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন—গর্ব্ভাধানাদি সংস্কারক্রমে উপনয়নাখ্য দ্বিতীয়জন্মপ্রাপ্ত দ্বিজ গুরুকর্ত্তৃক আহূত হইলে গুরুকুলে বাস ও দমগুণ-সম্পন্ন হইয়া বেদাধ্যয়ন করিবেন। আচার্য্যকে আমার প্রিয়তম অভিন্ন-স্বরূপ জ্ঞান করিবেন, কখনও অক্ষজ-জ্ঞানে তাহাকে মনুষ্যবুদ্ধি করিবেন না, যেহেতু গুরু সর্ব্বদেবময়। সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে ভিক্ষালব্ধ বস্তু এবং ভিক্ষা ব্যতীত অপরও যাহা কিছু লাভ হয় সমস্তই গুরুদেবকে সমর্পণ করিবেন এবং তিনি যাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন, সংযত হইয়া তাহাই ভোজন করিবেন। গমন, শয়ন, উপবেশন ও বিশ্রামকালে আচার্য্যকে শুশ্রূষা করণানন্তর অনুজ্ঞালাভের নিমিত্ত তাঁহার সমীপে কৃতাঞ্জলি হইয়া সর্ব্বদা দীনভাবে তাঁহাকে সেবা করিবেন। বিদ্যা-সমাপ্তি পর্য্যন্ত এইরূপ আচরণ করিয়া অখণ্ড-ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণপূর্ব্বক ভোগবিবর্জ্জিত হইয়া গুরুকুলে বাস করিবেন।

এইরূপ বৃহদ্ব্রতধারী অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত ব্রাহ্মণ অন্যাভিলাষাদি মলরহিত হইয়া ঐকান্তিক সদ্‌গুরুসেবারূপ তীব্র তপস্যা দ্বারা মদীয় ভক্তরূপে পরিগণিত হন। জীবের নিত্যস্বরূপগতস্বভাব-ভক্তি-প্রকটকারিণী আচার্য্যসেবাই সাত্ত্বত- শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত কথিত ব্রহ্মচর্য্য। ইহার অপর নাম স্বরূপোদ্বোধক ব্রহ্মচর্য্য।

"যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি।
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ।।

(কঠশ্রুতি দ্বিতীয় বল্লী ৯।১৫)

অর্থাৎ সাধুগণ যাঁহার জন্য ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করেন, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি উহা প্রণবাখ্য শ্রীভগবৎস্বরূপ বা মুক্তকুলের উপাস্য চৈতন্য-রসবিগ্রহ শ্রীনাম। ইহার দ্বারা শুষ্ক ব্রহ্মচর্য্য নিরাকৃত হইয়াছে। ভগবৎ-স্বরূপোপলব্ধিই ব্রহ্মচর্য্যের প্রাণ অন্যথা ব্রহ্মচর্য্য সিদ্ধ নহে। সেই স্বরূপোদ্বোধক ব্রহ্মচর্য্য লাভ করিতে হইলে শ্রেষ্ঠ আচার্য্যে উপসন্ন হওয়া আবশ্যক, কারণ আত্মতত্ত্বোপলব্ধির পথ ক্ষুরের ধারের ন্যায় দুর্গম অর্থাৎ ক্ষুর সঞ্চালন করিতে হইলে যেমন খুব সতর্কতার আবশ্যক, একটু অমনস্ক হইলেই তাহার দ্বারা দেহে রক্তপাত অবশ্যম্ভাবী, জীবের স্বরূপোলব্ধি সম্বন্ধেও সেইরূপ জানিতে হইবে।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।। (কঠোপনিষৎ ৩।১৪)

জীব যদি নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তগণের পাদরজে অভিষিক্ত হইয়া লুপ্ত-স্বরূপ উদ্বোধনের জন্য চেষ্টিত না হন, তাহা হইলে দুর্গম আত্মোপলব্ধির পথে কর্ম্মরূপ কণ্টক তাহাকে স্বরূপজ্ঞান লাভের পথ হইতে বিচ্যুত করিয়া কোটী কোটী জন্ম ত্রিতাপ তাপে দগ্ধ করিবে কিংবা নির্ব্বেদ ব্রহ্মানুসন্ধান, অষ্টাদশসিদ্ধি বা কৈবল্য-সুখলাভস্পৃহা প্রভৃতি স্বরূপেতর বাসনা আসিয়া নিত্য স্বরূপোদ্বোধনের পথ রুদ্ধ করিয়া দিবে। জীব ভগবানের নিত্যদাস; ইহাই জীবের নিত্য-শুদ্ধস্বরূপ। অনাদিবহির্ম্মুখ জীব সেই নিত্যস্বরূপ ভুলিয়া দেহ ও মনের বিবর্ত্তে পতিত। দেহ ও মনের ধর্ম্মই ভোক্তৃ অভিমান। এই ভোক্তৃ অভিমানে ব্যস্ত হইয়া ভ্রান্ত জীব কখনও

বুভুক্ষু কর্ম্মচারী কখনও বা ব্রহ্মানন্দ বা কৈবল্যসুখাদিবাঞ্ছা লইয়া মুমুক্ষু জ্ঞানাচারী বা যোগাচারী। কোথায়ও ভোক্তৃ অভিমান অপ্রচ্ছন্নভাবে বিরাজিত কোথায়ও বা প্রচ্ছন্নভাবে ফল্গু ত্যাগাদির আবরণে আবৃত। কিন্তু স্বরূপের ধর্ম্ম ঐরূপ ভোগ বা ত্যাগ নহে। অদ্বিতীয়ভোক্তা, স্বরাট্ পুরুষ পরেশের সেবাসুখতাৎপর্য্যবিশিষ্টতা-রূপ নিত্য কৈঙ্কর্য্যই স্বরূপের ধর্ম্ম। ভগবানে ঐকান্তিক রতিবিশিষ্ট আচার্য্যসেবন দ্বারাই সেই স্বরূপধর্ম্ম জাগরিত হয়। যেমন পশুরাজ সিংহ মেষপালের মধ্যে লালিতপালিত স্বীয় শাবককে মেষ-স্বভাবগ্রস্ত দেখিয়া পুনরায় তাহার লুপ্ত স্বভাবকে (অর্থাৎ সিংহোচিত স্বভাবকে) জাগরিত করিয়া দেয়, তদ্রূপ শ্রীআচার্য্যদেব শিষ্যের লুপ্ত স্বরূপকে উদ্বোধিত করিয়া থাকেন। শিষ্যের ব্রহ্মচর্য্য বা আচার্য্য-সেবন দ্বারা এই লুপ্ত স্বরূপ জাগরিত হয়।

এই ব্রহ্মচর্য্য-শিক্ষাপ্রণালী জগতে সাধারণতঃ দুই প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীগীতা বলেন,—জগতে দ্বিবিধ সৃষ্টি, দৈব সৃষ্টি ও তদ্বিপরিত সৃষ্টি। দেবতাগণ ভগবানের শরণাপন্ন কারণ তাঁহারা জানেন আমরা ভগবানের শক্তিতেই শক্তিমান। "ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি"—কেনোপনিষৎ। কিন্তু দেবতেতর সৃষ্টি কিছুতেই ভগবানের শক্তি স্বীকার বা তাঁহাতে শরণাগত হইতে চাহে না, তাহারা সর্ব্বদা স্ব স্ব আত্মকৃত শক্তি বা চেষ্টারই বহুমানন করিয়া থাকেন। ঐ শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই তাহারা ভগবানের আসন পর্য্যন্ত নিতে অগ্রসর হয়। এই জন্যই দেবতাদের সঙ্গে তাহাদের নিত্যবিরোধ। বিশ্বশ্রবা তনয় রাবণাদির আচরণই তাহার প্রমাণ। যাহারা সর্ব্বদা ভগবানের কৃপা লাভের আশায় নির্ভর করিয়া ভগবানেরই নিত্য-সেবালাভরূপ স্বরূপ-ধর্ম্ম জাগরিত করিতে ইচ্ছুক তাঁহারাই ভগবদবতারানুগ অবরোহবাদী অধোক্ষজবাদী বা ভক্ত প্রভৃতি নামে পরিচিত আর যাহারা নিজকৃত চেষ্টাকেই বহুমানন করেন, নিজের ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞানে দৃপ্ত হইয়া স্বরূপবিচার-তৎপর হন তাহারাই আরোহবাদী অক্ষজবাদী বা অভক্ত নির্ব্বিশেষবাদী নাস্তিক নামে খ্যাত। উপনিষদে ইন্দ্র ও বিরোচন আখ্যায়িকায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, একদা দেবতাদের পক্ষের প্রতিনিধি স্বরূপে ইন্দ্র ও অসুরপক্ষের প্রতিনিধিরূপে বিরোচন ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য সমিধ হস্তে পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মচর্য্য পালনে বদ্ধপরিকর হইলেন এবং আচার্য্যদেব ব্রহ্মার নিকট হইতে আত্মতত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। বত্রিশ বৎসর অতীত হইলে বিরোচন আত্মতত্ত্ব বুঝিয়া নিয়াছি মনে করিয়া দেহ ও মনকেই আত্মা বলিয়া জ্ঞান করতঃ ভ্রান্তমত প্রচার করিতে লাগিলেন কিন্তু ইন্দ্র আচার্য্যে প্রণিপাত পুনঃ পুনঃ পরিপ্রশ্ন ও সেবা দ্বারা একশত বৎসর গুরুগৃহে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রবণাদি প্রভাবে নিত্যসিদ্ধ স্বরূপোদ্বোধক জ্ঞান লাভ করিলেন।

অক্ষজবাদী হইয়া জীব যখন ব্রহ্মচর্য্যাদি কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রত পালনে তৎপর হন, তখন তিনি দেহ ও মনোধর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়েন। অনেকেই এইরূপ কৃত্রিম উপায়ে স্বকৃত চেষ্টার উপর নির্ভর করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালনে অগ্রসর হন কিন্তু তাহার দ্বারা স্বরূপোদ্বোধক ব্রহ্মচর্য্য সিদ্ধ হয় না। যেখানে আচার্য্যের ও ভগবানের নিত্যদাস্য স্বীকৃত হয় নাই, সেখানে ব্রহ্মচর্য্যের উদ্দেশ্য ভগবৎসেবা নহে সেস্থানে ব্রহ্মচর্য্যের মূল্য অন্ধকপর্দ্দক

হইতে ন্যূন। অসুরগণ কি নিজদেহসুখ ভাল করিয়া অধিক দিন অধিক পরিমাণে ভোগ করিতে পারিব এইরূপ ইচ্ছা লইয়া ব্রহ্মচর্য্য পালনে তৎপর হন না? বিরোচনও ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছিলেন আবার ব্রহ্মে লীন হইয়া যাইব, রাবণেরও ত ব্রহ্মচর্য্য তপস্যা ছিল কৈবল্যসুখাদি লাভ করিব এই উদ্দেশ্যে যে ব্রহ্মচর্য্যপালন সেখানেও ত অদ্বিতীয় ভোক্তা শ্রীভগবানের সেবাসুখবাঞ্ছা নাই তাহারই বা মূল্য কি? শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, যে ব্যক্তির কর্ম্ম ধর্ম্মের জন্য সম্পাদিত না হয়, যাহার ধর্ম্ম-বিরাগের জন্য উদ্দিষ্ট না হয় এবং যাহার বিরাগে বা ত্যাগাদি তীর্থপাদ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য না হয়, সেই ব্যক্তি জীবন্মৃত। যাহারা অধোক্ষজ শ্রীভগবানের নিত্যসেবা-রূপ স্বরূপধর্ম্মে বিমুখ তাহাদের ব্রহ্মচর্য্যাদি কঠোর ব্রতে পুনঃ পুনঃ ধিক!

স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্।
ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্।।

অর্থাৎ হরিতোষণেই পুরুষগণের নিজ নিজ অনুষ্ঠিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সংসিদ্ধি। ব্রহ্মচর্য্যাদির উদ্দেশ্যে যেখানে একমাত্র হরিতোষণ অর্থাৎ হরির নিত্য দাস্য বা কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা নহে তাহা যদি সুষ্ঠুরূপেও সাধিত হয় তাহা হইলেও উহা পণ্ডশ্রম মাত্র জানিতে হইবে। হরিকথাতে রুচি না হইলে ঐরূপ ধর্ম্ম যাজন বৃথা। সুতরাং শুষ্ক ব্রহ্মচর্য্যের কোনও মূল্য নাই উহা জগতের অক্ষজবাদিগণের চক্ষে শোভা পাইলেও উহার দ্বারা নিত্যমঙ্গল লাভ হয় না। পতঞ্জল্যাদি ঋষিবৃন্দ ঐরূপ আরোহপন্থী। তাঁহারা আত্মবৃত চেষ্টা দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য পালনে তৎপর। ঐরূপ ব্রহ্মচর্য্যমূলে হরিতোষণ নাই, আছে কেবল মন ও দেহেন্দ্রিয় তোষণ মাত্র। পাতঞ্জলের সাধনপাদে দেখিতে পাওয়া যায় ''অহিংসাসত্যাস্তেয়- ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ''' অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ—এই পাঁচটীকে যম বলে। ''ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ''।

ব্রহ্মচর্য্যব্রত প্রতিষ্ঠিত হইলে অলৌকিক শক্তি লাভ হয়। এই যম নিয়মাদি বা অলৌকিক শক্তি ত অসুরগণও সঞ্চয় করিয়া থাকে। সিংহ ব্যাঘ্র্যাদি জন্তুরও ত শারীরিক শক্তি মানুষ হইতে খুব বেশী অথবা তারাব্যূহের জ্ঞান, আদিত্যাদির গতি, ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্ত, চিত্তস্থৈর্য্য, সর্ব্বজ্ঞতা, অগ্নিতুল্য তেজস্বিতা, কিংবা প্রাতিভ, শ্রাবণ, বেদন, আদর্শ, আস্বাদ ও বার্ত্তাসিদ্ধিলাভ, পঞ্চভূতপরিমাণসাধন- সামর্থ্য, কিংবা অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য প্রভৃতি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যাদি লাভই কি ব্রহ্মচর্য্যের উদ্দেশ্য? কিংবা ধর্ম্মমেঘাদি-সঞ্চারে সমাধি লাভ করিয়া ক্লেশ কর্ম্ম নিবৃত্তিই কি ব্রহ্মচর্য্যের উদ্দেশ্য? গীতা সপ্তদশ অধ্যায়ে ব্রহ্মচর্য্যকে শারীরতপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই তপের উদ্দেশ্য যদি পাশবিক বল সঞ্চয় বা মানসিক ক্ষমতা লাভ বা অষ্টাদশসিদ্ধি লাভ কিংবা কৈবল্য সুখাদি আত্মবিনাশেরই কারণ হয় তবে উহার মূল্য কতটুকু তাহা সারগ্রাহী ব্যক্তিমাত্রই বিচার করিবেন। পতঞ্জলভাষ্যে লিখিত আছে ''ব্রহ্মচর্য্য উপস্থনিয়মঃ বীর্য্যধারণং বা''।

উক্তরূপ ব্রহ্মচর্য্য পালনে ভুক্তি ও মুক্তিকামিজনগণ চেষ্টিত হন কিন্তু পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে আরোহপন্থায় অর্থাৎ ভাগবত ও ভগবৎকৃপা বিচ্যুত স্বকৃত চেষ্টায় ব্রহ্মচর্য্যের সিদ্ধি নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২।৩২) দেবতাগণ শ্রীভগবানকে বলিতেছেন—

যেঽন্যেরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ।।

অর্থাৎ হে পদ্মপলাশলোচন, নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞানী বা কৈবল্যসুখ, অষ্টাদশ সিদ্ধিকামী যোগিগণ আরোহপন্থায় ব্রহ্মচর্য্যাদি বহু কৃচ্ছ্রসাধ্য সাধন করিয়া বিমুক্ত হইয়াছি অতএব ভগবানের শ্রীচরণসেবায় আর প্রয়োজন কি? এইরূপ বিচার করিয়া একমাত্র নিত্য আশ্রয়ণীয় আপনার শ্রীচরণে অনাদরহেতু পরপদ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়াও অধঃপতিত হন।

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্ ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কনীকপমূর্দ্ধসু প্রভো।।

হে মাধব, আপনার ভক্তগণ আপনার কৃপার উপর সর্ব্বদা নির্ভরশীল। তাঁহারা আপনার প্রতি অত্যন্ত প্রীতিবিশিষ্ট, তাঁহারা সতত সেবায় নিযুক্ত। সুতরাং হে প্রভো, আপনা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া তাঁহারা পতনের ভয়শূন্য হইয়া বিঘ্ন- বিনাশনগণের মস্তকে বিচরণ করিয়া থাকেন। বিশ্বামিত্রের তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য মেনকার চকিত দর্শনে নষ্ট হইয়াছিল। সৌভরি মুনি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া জল-মধ্যে কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন, এমন সময় কতকগুলি মৎস্য তাহার গাত্রদেশে স্পৃষ্ট হইলে তিনি স্পর্শজনিতসুখে আকৃষ্ট হইয়া ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ করতঃ স্ত্রীসঙ্গে মনোনিবেশ করেন। কিছু দিবস পূর্ব্বে হরিদাস সাধু নামে জনৈক ব্যক্তি বহুদিন ধরিয়া যোগাভ্যাস বলে ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস করিয়াছিলেন। এমন কি তাহাকে সিন্ধুকের ভিতরে তালাবন্ধ করতঃ সেই সিন্ধুক মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত করিয়া রাখিয়া মৃত্তিকার উপর চাষ করা হইয়াছিল। শস্যাদি পাকিলে পর যখন পুনরায় মৃত্তিকা খনন করিয়া ঐ সিন্ধুকের তালা খুলিয়া দেখা গেল তখনও তিনি সমাধিস্থ অবস্থায় কিন্তু ঐ ব্যক্তিও কাশ্মীর দেশীয় একটী রূপবতী কামিনীর লোভে পড়িয়া এতদিনকার কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রহ্মচর্য্য এক মুহূর্ত্তে হারাইয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি রহিয়াছে। কিন্তু যাহারা ভগবদ্ভক্ত ও ভগবানে সর্ব্বতোভাবে শরণাগত হইয়াছেন সেই সকল সেবাতৎপর পুরুষের এইরূপ পতনের সম্ভাবনা নাই। শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে সাক্ষাৎ মায়াদেবীও কোনরূপে হরিসেবা হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে রামচন্দ্র খান প্রেরিত বেশ্যা তাহার সংস্পর্শে পবিত্র হইয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধা বৈষ্ণবী হল পরম মহান্তি।
বড় বড় বৈষ্ণব তাঁর দর্শনেতে যান্তি।। (চৈঃ চ)

ভগবদ্ভক্তের আরোহবাদীর ন্যায় কৃত্রিম উপায়ে ব্রহ্মচর্য্য পালনের দরকার হয় না। ভগবদ্ভক্তের ব্রহ্মচর্য্য সেবাকালে আনুষঙ্গিকভাবেই সাধিত হয়। কৃত্রিম উপায়ে ব্রহ্মচর্য্যের স্থিরতা নাই। যেমন যখনই আমরা

'এ কার্য্য করিব, না করিব না' এইরূপ ব্যতিরেক চিন্তা বা বুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া সেই নিষিদ্ধ কার্য্য হইতে বিরত হইবার জন্য কৃত্রিম উপায়ের সাহায্য লই তখন সেই ব্যতিরেক চিন্তার প্রাবল্যহেতু নিষিদ্ধ কার্য্যটীকেই আমরা অজ্ঞাতসারে সূক্ষ্মশরীরে করিয়া থাকি এবং পরে তাহা আমাদের স্থূলশরীর দ্বারাও সম্পাদিত হইয়া পড়ে। এইরূপ আরোহ উপায়ে অর্থাৎ নানাবিধ কৃত্রিম উপায়ে ও অস্বাভাবিক চেষ্টা দ্বারা এখনও ভারতের বিভিন্ন স্থানে ও বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমাদি খুলিয়া বালকদিগকে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিবার যত্ন হইতেছে। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যের মূল উদ্দেশ্য হইতে অনেকেই বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন। যদি ঐ সকল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অনুসন্ধান করা যায় তবে প্রথমমুখেই অনেক স্থলে আচারবান কায়মনোবাক্যে অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ আচার্য্যের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ যদি ঐ সকল ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের নেতৃবৃন্দকে বা শিক্ষার্থী বালকগণকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে কি উদ্দেশ্যে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষাপ্রদান করিতেছেন বা শিক্ষা লাভ করিতেছেন, তখন তাহাদের মধ্যে কেহ হয় ত বলেন যে এখন দেশের দুরবস্থা, দেশ পরাধীন, ক্ষীণতেজা যুবকবৃন্দের উপরই দেশের ভাবী উন্নতি ও অবনতি নির্ভর করে সুতরাং তাহারা যদি বীর্য্যশালী না হয়, তাহা হইলে দেশের আরও অধঃপতন হইবে। আবার কেহ হয় ত বলিলেন ''শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্'' শরীর সুস্থ ও বলিষ্ঠ না হইলে জগতের সুখভোগ সর্ব্বৈব বৃথা সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য বা বিন্দুধারণের আবশ্যক। আবার আর এক শ্রেণী বলিবেন দেশটা তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে কেবল আধ্যাত্মিক কল্যাণের কাল্পনিক সৌধ ভাব্‌তে ভাব্‌তে লোকসকল অলস ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। এখন চাই রজোগুণ, সিংহবিক্রম। কর্ম্মের ও রজোগুণের প্রবলশোণিতবন্যায় যুবক সম্প্রদায়ের ধমনী প্লাবিত করিতে হইবে। নতুবা এ মেদেটে দেশের ধর্ম্মকর্ম্ম কিছুই হইবে না। আবার হয় ত আর এক শ্রেণী বলিবেন বীর্য্যধারণে চিত্ত স্থির হয়, স্থিরচিত্তে ধ্যান, ধারণা ও সমাধি ও অবশেষে নির্ব্বিকল্পসমাধি বা অদ্বৈতসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে—এই জন্য ব্রহ্মচর্য্যের আবশ্যক। ব্রহ্মচর্য্য পালনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ বহু বহু মত ভারতে শুনিতে পাওয়া যায়। এইরূপ বিভিন্ন মত যে অধুনা নূতন শ্রুত হয় তাহাও নহে; অনাদিকাল হইতে ভগবানের অনাদি সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ মতবাদ চলিয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বেই এ বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে যে জগতে দ্বিবিধ সৃষ্টি। ''দ্বৌ-ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্'' শ্রীগীতা (১৬।৬)। একপ্রকার সৃষ্টি বিষ্ণুভক্ত বা ভগবানে প্রপন্ন, আর এক প্রকার তদ্বিপরীত। যাহারা ভগবানে ষড়ঙ্গা শরণাগতি যাজন করেন, তাঁহারা উপরে বর্ণিত নৈমিত্তিক দেহ ও মনোধর্ম্মযুক্ত প্রলাপে রত নহেন। জীব দ্বিতীয়াভিনিবেশজ প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানের বশীভূত হইয়াই ঐরূপ নানাবিধ নাস্তিক্যবাদ বা ভগবানে বিশ্বাস-রহিত বাক্যাবলী উচ্চারণ করে। ইহা তাঁহাদের ভক্ত্যন্মুখী সুকৃতির অভাব। সাত্ত্বত-শাস্ত্র শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতে ও সাত্ত্বতভগবদ্ভক্তগণ কখনও এইরূপ দ্বিতীয়াভি- নিবেশজ মনোধর্ম্মে প্রণোদিত হইয়া শুষ্ক ও কৃত্রিম ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতে সচেষ্ট হন নাই। যদি একমাত্র ব্রহ্মসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণেরও চরিত্র আলোচনা করা যায় তাহা হইলেও দেখিতে পাওয়া যে ব্রহ্মা, নারদ, শুকদেব প্রভৃতি সকলেই অখণ্ড-ব্রহ্মচারী বা ঊর্দ্ধরেতা পুরুষ ছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের আদিগুরু মাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীঈশ্বরপুরী ও ভক্তলীলাঙ্গীকারকারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু; তাঁহার প্রিয়কিঙ্কর শ্রীস্বরূপ দামোদর, শ্রীরূপ,

সনাতন, শ্রীজীব, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি কি প্রকার অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তাহা যাঁহারা তাঁহাদের চরিত্র আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। তাঁহারা মূর্ত্তিমান ব্রহ্মচর্য্যস্বরূপ ছিলেন। কল্পনাতেও তাঁহাদের বাক্যবেগ অর্থাৎ গ্রাম্যকথার স্পৃহা, মনের বেগ অর্থাৎ মনোধর্ম্মযুক্ত প্রলাপ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ বা উপস্থবেগ ছিল না। তাঁহারা গোস্বামী অর্থাৎ বিজিতেন্দ্রিয় পুরুষ ছিলেন। তাঁহারা জানিতেন—

জ্ঞান বৈরাগ্যাদি ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।
অহিংসা যমনিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২২শ)

তথাহি (ভাঃ ১১।২০।৩১)—

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ।।

অর্থাৎ ভক্তি সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদাই অপেক্ষাশূন্য। অর্থাৎ জ্ঞানবৈরাগ্যাদি সাধন করিতে করিতে ভক্তি লাভ হইবে তাহা নহে। কর্ম্ম বা জ্ঞানের ফল নিজ পরিণামশীল অনিত্যানুভূতির বিকার বিশেষ; তজ্জন্য ভোগ বা মোক্ষই তাহার পরিণতি, নিত্য ভক্তির সহ কোন সম্বন্ধ নাই। জ্ঞান বা বৈরাগ্য পরিত্যক্ত হইলে ভক্তি হইতে পারে। কৃষ্ণভক্ত নিসর্গতঃই হিংসাশূন্য, ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত ও সর্ব্বতোভাবে সংযত। তাহার ঐ সকল সদ্গুণ কৃত্রিমচেষ্টা বা পৃথকভাবে আরোহচেষ্টায় উপার্জ্জন করিতে হয় না। শ্রীমদ্ভাগবত (৫।১৮।১৩)—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ।।

অর্থাৎ যাঁহার ভগবানে অকিঞ্চনা ভক্তি বর্ত্তমান দেবতাগণ সমস্ত সদ্-গুণাবলীর সহিত তাহাতে বিরাজিত। আর যে সকল হরির অভক্ত মনোধর্ম্মের দ্বারা পরিচালিত সুতরাং ভগবানে শরণাগতি-রহিত তাহাদের মহদ্গুণ কোথায়? অর্থাৎ তাহাদিগের মধ্যে অক্ষজজ্ঞানে ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা প্রভৃতি যে সকল গুণাবলী দেখিতে পাওয়া যায় তাহার কোনও মূল্য নাই। কিন্তু "কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে। কৃষ্ণৈক-শরণতারূপ-স্বরূপলক্ষণযুক্ত ভগবদ্ভক্তে ব্রহ্মচর্য্য বা সংযমাদি গুণ তটস্থলক্ষণ মাত্র। এরূপ অসংখ্য তটস্থ লক্ষণ ভগবদ্ভক্তে দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর চরিত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি কখনও শুষ্ক ব্রহ্মচর্য্যের আদর করিতেন না। শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড ২৩শ অধ্যায়ে জনৈক ব্রহ্মচারীর উপাখ্যানে দেখা যায় যে, একদা শ্রীবাস একজন আকুমার বৈরাগ্যপরায়ণ ব্রহ্মচারীর দ্বারা পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়া তাহাকে যেখানে মহাপ্রভু নৃত্য করেন, সেই ঘরের নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরসুন্দর জানিতে পারিয়া শ্রীবাসকে ডাকিয়া বলিলেন যে, নিশ্চয়ই কোনও ভক্তিহীন পাষণ্ড গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে সেই জন্যই আমার কীর্ত্তনে প্রেমা হইতেছে না। তখন শ্রীবাস প্রভুকে বলিলেন—

"পাষণ্ডের ইথে প্রভু! নাহি আগমন।
সবে এক ব্রহ্মচারী—বড় সুব্রাহ্মণ।।
সর্ব্বকাল পয়ঃপান নিষ্পাপ জীবন।।
শুনি ক্রোধাবেশে বলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ঝাট ঝাট বাড়ীর বাহির নিঞা কর।।
মোর নৃত্য দেখিতে উহার কোন শক্তি।
পয়ঃপান করিলে কি মোহে হয় ভক্তি।।
দুই ভুজ তুলি প্রভু অঙ্গুলী দেখায়।
পয়ঃপানে কভু মোরে কেহো নাহি পায়।।
চণ্ডালেও মোহার শরণ যদি লয়।
সেহো মোর মুঞি তার, জানিহ নিশ্চয়।।
সন্ন্যাসীও যদি মোর না লয় শরণ।
সেহো মোর নহে, সত্য বলিলু বচন।।
গজেন্দ্র বানর গোপ কি তপ করিল।
বল দেখি তারা মোরে কি তপে পাইল।।
অসুরেও তপ করে, কি হয় তাহার।
বিনে মোর শরণ লইলে নাহি পার।।
প্রভু বলে 'তপ' করি না করহ বল।
বিষ্ণুভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানিহ কেবল।।

শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি আলোচনা করিলেও ভক্তি ব্যতীত ব্রহ্মচর্য্যাদি তপ, জ্ঞান, যোগ, কর্ম্ম যে নিষ্ফল, তাহা প্রমাণিত হইবে।

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি যদর্পণং বিনা তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ।।
(ভাঃ ২।৪।১৭)

শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবল বোধলব্ধয়ে।
তেযামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্‌যথা স্থূলতুযাবঘাতিনাম্।।
(ভাঃ ১০।১৪।৪)

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কাললোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্ম ন শাম্যতি।।
নৈষ্কর্ম্ম্যপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্।।

(ভাঃ ১।২।১২)

ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্ব্বিনা মহৎপাদরজোভিষেকম্।

(ভাঃ ৫।১২।১৫)

সাত্বত-শাস্ত্র ও ভগবদ্ভক্তগণ একদিকে শুষ্ক ব্রহ্মচর্য্যের অনর্থসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন, অপরদিকে স্বরূপোদ্বোধক ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত ভগবদ্ভজন (?) যে মিছা কপট ভক্তি তাহাও অঙ্গুলি-নির্দ্দেশপূর্ব্বক প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদের উক্তিতে—মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোহভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্। অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্। ঔপস্থ্যজৈহ্বঃ বহুমন্যমানঃ কথং বিরজ্যেত দুরন্তমোহঃ। এবং একাদশের শ্রীভগবানের উক্তিতে —ন তথাস্য ভবেৎক্লেশো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ। যোষিৎ সঙ্গাদ্ যথা পুংসস্তথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ। ইত্যাদি বহু বহু বাক্য দ্বারা গৃহব্রত-ধর্ম্ম-যাজন ও অবৈধ স্ত্রীসঙ্গাদি দ্বারা যে কখনও ভগবানে রতি হয় না তাহা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য- চরিতামৃতে শ্রীগৌরসুন্দর অন্যাভিলাষী শুষ্ক যমনিয়ম ত্যাগাদি পরায়ণ কর্ম্মি- জ্ঞানীযোগী প্রভৃতির সঙ্গের ন্যায় স্ত্রৈণ ও অবৈধ স্ত্রীতে আসক্ত ব্যক্তির সঙ্গকেও অসৎসঙ্গ বলিয়া ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি উপদেশে দেখা যায়—

"জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়।।"

ছোট হরিদাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতিসম্ভাষিয়া।।
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয়-গ্রহণ।
দারুপ্রকৃতি হরে মুনেরপি মন।।"

সুতরাং বুদ্ধিমান্ পুরুষ নিত্য স্বরূপোপলব্ধি ভক্তির পথ ক্ষুরের ধারের ন্যায় তীক্ষ্ণ জানিয়া একদিকে যেমন কর্ম্মী জ্ঞানীর শুষ্ক ও কৃত্রিম ব্রহ্মচর্য্য পালনাদিরূপ অসৎচেষ্টা হইতে সাবধান হইবেন অপরদিকে তদ্রূপ মিছা বা কপট ভক্তগণের বা ভক্তব্রুবগণের গৃহব্রতধর্ম্ম যাজন, প্রাকৃত সহজিয়া, আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া দরবেশাদি উপসম্প্রদায়ের নানাপ্রকার ব্যভিচারের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য চেষ্টা করিবেন। তাহার একমাত্র উপায়—

"প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" (কঠশ্রুতি)

বিনামহৎ পাদরজোভিষেকম্ (শ্রীমদ্ভাগবত)

যিনি শ্রেষ্ঠ আচার্য্যের সেবা এবং নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতগণের চরণরজে অভিষিক্ত হইয়া ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ হইবেন; তিনিই স্বরূপোদ্বোধক ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন এবং পরব্রহ্মসেবাসাগরে নিষ্ণাত হইয়া পরমহংস পদবী লাভ করিবেন। অচ্যুতের সেবাপরায়ণ ব্যক্তির ব্রহ্মচর্য্য হইতে চ্যুতি নাই। ব্রহ্মচর্য্য বিনা আয়াসে আনুষঙ্গিক ভাবে সেই সেবাপরায়ণ ব্যক্তিতে পরিলক্ষিত হইবে।

যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে
নবনব রসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্য্যমাণে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ।।

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ দক্ষিণ বিভাগ, ৫ম লহরী ৩৯ সংখ্যা)

অর্থাৎ যে কাল হইতে আমার চিত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মসেবা নব নবায়মান্ রসমসমূহে রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সে কাল হইতে নারীসঙ্গের কথা কল্পনায়ও উদিত হইলে আমার জুগুপ্সারতির চিহ্নস্বরূপ মুখবিকার ও যথেষ্ট থুৎকার উপস্থিত হইয়া থাকে।

শ্রীনারদ, শ্রীশুকদেব, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, অম্বরীষ, স্বরূপদামোদর, ষড়্গোস্বামী, গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী, রায় রামানন্দ, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, নরহরি সরকার ঠাকুর, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীনিবাসাচার্য্য, ওঁ বিষ্ণুপাদ গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভৃতি বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংসকুল সতত পরব্রহ্মে বিচরণশীল বৃহৎ ব্রহ্মচর্য্যে যাঁহারা এইরূপ স্বরূপোদ্বোধনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহারা বাহিরের দিকে গৃহস্থাদি আশ্রমই অবস্থান করুন বা বনেই গমন করুন তাঁহারা উভয়েই তুল্য। ইহাকেই বলে সিদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য। এই ব্রহ্মচর্য্য হইতে আর পতন নাই। আমরা সেই সকল স্বরূপসিদ্ধ ব্রহ্মচারিগণের অন্যতম ত্রিদণ্ডিস্বামী গৌরপার্ষদ শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের আনুগত্যে শ্রীগৌরসুন্দরের একটী স্তব করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করি—

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপুরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয় কালসর্পপটলী প্রোৎখাত দংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎকারুণ্য-কটাক্ষ-বৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ।।

আশ্রমধর্ম

ভোগের উদ্দাম বাঞ্ছা দমন করিয়া শ্রীহরিভজনে প্রবৃত্ত হইবার পক্ষে আশ্রম-ধর্ম্ম অত্যন্ত উপযোগী। যাহারা উচ্ছৃঙ্খল ভোগে প্রমত্ত সংযম শিক্ষার অভাবে তাহাদের কোন আশ্রম নাই। ম্লেচ্ছ বা অন্ত্যজগণ আশ্রম বহির্ভূত। শোককারী শূদ্রগণ সহজেই ভোগাভাবে খিন্ন হইয়া পড়ে, সুতরাং ভোগপ্রবণতার স্রোতে সংযমের শিক্ষা ভাসিয়া যায়, সুতরাং শূদ্রেরও গৃহস্থালী ছাড়া কোন আশ্রম বিচার নাই। অধুনাতনকালে প্রায় সকল লোকেরই এই অবস্থা। সংযম শিক্ষার উপযোগিতার উপলব্ধি নাই, সুতরাং আশ্রম শিক্ষার অভাবে প্রায় সকলেই অন্ত্যজ বা শূদ্রাধিকারকেই বরণ করিয়া চলিতেছেন, বর্ত্তমান সমাজের এই অবস্থা।

আশ্রমধর্ম্মে প্রত্যেক আর্য্যকেই প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা করিতে হইবে। গুরুগৃহে বাস করিয়া গুরুর নির্দ্দেশানুবর্ত্তী হইয়া বিষয়ী ও স্ত্রী সন্দর্শন বর্জ্জনপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন ও বেদ-প্রতিপাদ্য শ্রীভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগের নাম ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্ম অর্থে বেদ, ব্রহ্মচারী বেদে বিচরণ করেন, অর্থাৎ কেবল বৈদিকশাস্ত্রের আলোচনা ও তন্নির্দ্দেশ পালনই ব্রহ্মচারীর একমাত্র কৃত্য। যংসম শিক্ষার কালে মানবকে ভোগোপকরণ সমূহ বর্জ্জন করিতে হয়। শ্রীগুরুগৃহে বাসকালে কোনও ভোগের আদর্শ তাহাদিগের চিত্তকে আলোড়িত করিবার অবসর পায় না, তবে গুরু গৃহস্থ হইলে কোনও কোনও স্থলে ইহার ব্যভিচারও দৃষ্ট হইয়াছে। গুরু যেখানে গৃহস্থাশ্রমাতীত, তখন তাঁহার গৃহ মঠতুল্য, সেখানে ভগবৎসেবার কথা ও কার্য্য ভিন্ন অন্য কিছুর গন্ধ নাই, সুতরাং সেরূপস্থলে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার সমূহ সুযোগ। জীবনের অন্ততঃ একচতুর্থাংশ ব্রহ্মচর্য্য পালনের কাল। ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া শ্রীগুরুমুখপদ্মবিগলিত ভগবৎসেবাপর উপদেশ লাভ করিতে করিতে যাহাদের সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয়ে ভোগের বীজ বাসনা পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বা বৃহদ্ব্রতী হইয়া নিরন্তর হরিসেবা করিয়া জগতে বরণীয় হয়েন। যাঁহাদের ততদূর সৌভাগ্য লাভ হয় নাই, তাহাদের কিছু ভোগের বাসনার লেশ থাকিলেও পঞ্চবিংশ বর্ষের ব্রহ্মচর্য্যাভাসের ফলে তাঁহাদের যে আত্মদমনে সামর্থ্য সঞ্চিত হইয়াছে, তাহাতে সে বাসনা বিশেষ প্রসার প্রাপ্ত হইতে পারে না। তাঁহারাই যথাশাস্ত্র সমাবর্ত্তন করিয়া উপযুক্ত বালিকার পাণিগ্রহণপূর্ব্বক গৃহধর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। ইঁহারাই গৃহস্থ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যথার্থ গার্হস্থ্যধর্ম্মে প্রবেশ করিতে গেলে যথাবিধি ব্রহ্মচর্য্য পালন আবশ্যক। গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রবৃত্তির উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল ক্রীড়াক্ষেত্র নহে। ব্রহ্মচর্য্য পালন প্রত্যেক আশ্রমের ভিত্তিস্বরূপ, ইহার অভাব অনার্য্যত্বেরই দ্যোতক। আর্য্যধর্ম্মের পরিচয় দিতে হইলেই ব্রহ্মচর্য্য পালনের প্রশ্ন স্বতঃই সমুদিত হয়। হায়! আজ আমরা অনার্য্য হইয়া গিয়াছি, অথচ আর্য্য অভিমানে অপরকে অনার্য্য বলিয়া স্থলবিশেষে তাহাকে স্পর্শ ত' দূরের কথা, দর্শনের, গ্রামের পথ, ব্যবহারের জলাশয়ের নিকট আগমনের মন্দিরের চূড়া দর্শনের অযোগ্য রাখিয়া নিজের উচ্চ সম্মান বজায় করিবার প্রযত্ন করিতেছি। অহো! আজ আর্য্য ধর্ম্মের কি অধোগতি হইয়াছে!

বেদবিহিত গৃহস্থের নিত্য যজ্ঞ আবশ্যক, তজ্জন্য তিনি সাগ্নিক। যজ্ঞ অর্থে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর প্রীণন। শাস্ত্রে আছে, যাহারা নিজের জন্য পাকাদি কার্য্য করে, তাহারা নারকী। এই বিষ্ণুপ্রীণনরূপ যজ্ঞ কেহ সকাম ভাবে

করেন, কেহ নিষ্কাম ভাবে করিতে প্রয়াস পান, আর কেহ বিষ্ণুপ্রীতিকাম হইয়া থাকেন। সকাম বিষ্ণু উপাসনায় কামনা প্রবল, ব্রহ্মচর্য্য পালনের ফল সুষ্ঠু হয় নাই, এরূপ গৃহস্থকে কর্ম্মী বলে, তাঁহার অধিকার কর্ম্মাধিকার, বেদে তাঁহার অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থাও আছে। বেদের সে অংশকে কর্ম্মকাণ্ড বলে, সংহিতাংশাদি কর্ম্মকাণ্ডপ্রচুর। নিষ্কাম উপাসনায় মোক্ষকামনা অন্তরালে লুক্কায়িত, ইহার মূলে নির্ব্বেদব্রহ্মানুসন্ধানতৎপরতাই লক্ষিত হয়। ইহাদের আলোচ্য উপনিষদের কেবলাদ্বৈতপর বাক্যগুলিকে বেদের জ্ঞানকাণ্ড বলে। আর বিষ্ণুপ্রীতিকাম বৈষ্ণবগণ উপনিষদের দ্বৈত ও অদ্বৈতপর বাক্যগুলির প্রতি সমভাবে সম্মান দেখাইয়া উপনিষদের সূত্র বেদান্ত, তাহার ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতাখ্য বেদের প্রপক্ক ফল জানেন। তাঁহারা শ্রৌত উপাসনাকাণ্ডের অনুগামী। ভোগ বা মোক্ষবাঞ্ছা হইতে দূরে থাকিয়া তাঁহারাই যথার্থ বিষ্ণুপ্রীণনরূপ যজ্ঞে সম্যক্ পারদর্শী, তবে কর্ম্মকাণ্ডের প্রণালীগুলি তাঁহাদের প্রতি প্রযোজ্য নহে। হরিপ্রীণনরূপ যজ্ঞ চ্যুত হইলে কেহ গৃহস্থ থাকিতে পারেন না, তিনি আশ্রম চ্যুত অন্ত্যজাদি হইয়া যান। আমরা যদি বর্ত্তমান কালের সামাজিক অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে যথার্থ গৃহস্থাশ্রমী কয়জনকে পাইব? সকলেই গৃহস্থ বলিয়া পরিচয় দেন বটে, কিন্তু প্রতি সহস্রে একজনও আশ্রমী গৃহস্থ নহেন। তাঁহাদিগকে ''স্ত্রৈণ গৃহমেধী" বা ''মেয়েমুখো ঘর পাগলা বলা" যাইতে পারে। আসক্তির প্রবল বিতাড়নে প্রায় সকলেই স্ত্রীজিত দেহারামী, তাঁহাদের মধ্যে বিষ্ণুপ্রীণন কিরূপে সম্ভব? কর্ম্মী সকাম হইলেও বিষ্ণুযজ্ঞ জন্য তাঁহার সংযম আছে, কিন্তু আধুনিক ব্যক্তিগণের প্রায় কেহই সে আর গৃহস্থ হইতে পারে না। তন্মধ্যে যাঁহার যাঁহার সৌভাগ্য হইতেছে তাঁহারা সাধুগুরুচরণে প্রপন্ন হইয়া গুরুগৃহে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস করিতেছেন ও আশ্রমী হইবার যোগ্যতা লাভ করিতেছেন। তাঁহারা আবার আর্য্যধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাজে আশ্রমধর্ম্মের প্রবর্ত্তনপূর্ব্বক হিন্দুর মুখোজ্জ্বলকারী হইয়াছেন। তাঁহাদের আদর্শে সকলে স্ব স্ব আশ্রমাধিকার প্রাপ্ত হন ইহা বড় আশার কথা।

তৃতীয় বানপ্রস্থের আশ্রম। শাস্ত্রবিধি অনুসারে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিতে করিতে যেটুকু ভোগ কামনা অবশিষ্ট ছিল গৃহস্থের কঠিন পরীক্ষা যে ভোগোপকরণের মধ্যেও সংযমাভ্যাস, তাহার ফলে তাহারও মূলোচ্ছেদ হয়। তখন জীবনের তৃতীয়াংশে নির্জ্জনে ভগবচ্চিন্তার অধিকার অধিগত হয়। নির্জ্জন কুটীরে বাস করিয়া বা গুরুকুলে বাস করিয়া সমাহিত চিত্তে ভাগবদনুশীলনই তাঁহাদের কৃত্য। তাঁহাদের আদর্শে ব্রহ্মচারিগণ নিজ নিজ চরিত্র গঠিত করিয়া সংযমাভ্যাসের সুযোগ প্রাপ্ত হ'ন। কখনও কখনও দেখা যায় কেহ কেহ সস্ত্রীক বামপ্রস্থধর্ম্ম আচরণ করেন। তখন জানিতে হইবে তাঁহাদের প্রজেপ্সা নিরস্ত হইয়াছে, সুষ্ঠুভাবে গৃহস্থধর্ম্ম পালন করিয়া তাঁহারা প্রবৃত্তিরাজ্যের অধিকার উত্তীর্ণ হইয়াছেন। উভয়ে উভয়ের ধর্ম্মাচরণের সহায় হইয়া এখনও একত্র ধর্ম্মাচরণ করিতে প্রস্তুত। অনায়াস-লব্ধ আহার্য্যে তুষ্ট থাকিয়া ভগবানের আলোচনাই তাঁহাদের অবলম্বন। এরূপ দম্পতির নিকট থাকিয়া শিক্ষা লাভ করিবার কোনও অসুবিধা নাই। যেহেতু তাঁহাদের মধ্যে কোনও প্রকার ভোগের আদর্শ নাই, ব্রহ্মচারিগণ অনায়াসে তাঁহাদের সেবা করিয়া সংযমাভ্যাসের অধিক সুযোগ প্রাপ্ত হন। প্রাথমিক জীবনে রীতি মত ব্রহ্মচর্য্যাভ্যাস, জীবনের দ্বিতীয়াংশে সুষ্ঠুভাবে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক প্রবৃত্তিবীজ নষ্ট না হইতে হইতেই বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলে

পতনের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, সে স্থলে গুরুকুলে বাস করিয়া আশ্রম ধর্ম্ম পালনই যুক্ত। কোনও ক্রমে স্ত্রী লইয়া নির্জ্জন বাসের ব্যবস্থা করা বিধেয় নহে। কোন কোনও স্থলে সহধর্ম্মিণী লইয়া কেহ কেহ আখড়া বাঁধিয়াছেন দেখা গিয়াছে, ক্রমে সেখানে সংসারের সকল আবিলতা প্রবেশ করিয়াছে, ইহাও দেখা গিয়াছে। অপক্ক অবস্থায় উচ্চাধিকার লাভ করিতে চেষ্টা করার ইহাই অনিবার্য্য ফল। চতুর্থশ্রেণীকে সন্ন্যাসী বা যতি বলে। তিনি পরিব্রাজক। তিনি আর নির্দ্দিষ্ট কোন কুটীরাদিতে বাস করেন না। প্রাথমিক কুটীচক অবস্থায় এ বিধানের কিছু কিছু শিথিলতা লক্ষিত হইলেও ক্রমে অভ্যাস করিয়া তিনি আশ্রমের মমত্ববর্জ্জন করেন ও পরিব্রাজকের ধর্ম্মে অধিষ্ঠিত হইয়া বহূদক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হ'ন। বহুতীর্থস্থলে অনেক সাধুসঙ্গের সুযোগ পাওয়ায় ক্রমে তাঁহার সম্বন্ধজ্ঞান পরিপুষ্ট হইতে থাকে, সে অবস্থায় তিনি একমাত্র হরি কীর্ত্তনই আশ্রয় করেন। এস্থলে বলা সঙ্গত যে সকল আশ্রমেই হরিকীর্ত্তন আবশ্যক, তবে এই হংস অবস্থায় উন্নীত না হইলে হরিকীর্ত্তন পূর্ণভাবে সুষ্ঠুতা লাভ করে না। এ অবস্থায় তিনি জীবে দয়ার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া ক্রমে আশ্রমাতীত পরমহংসাবস্থায় উন্নীত হন। পরমহংস স্বাভাবিক হরি প্রীতিতে নিষ্ণাত হইয়া লোকবাহ্যচরিত হইয়া যান। তিনি হরিরসমদিরামদে মত্ত হইয়া কখনও নৃত্য করেন, কখনও গান করেন, কখনও হাস্য করেন, কখনও রোদন করেন। পরমহংস সকল আশ্রমের মধ্যেই থাকিতে পারেন। যথাবিধি ভগবদনুশীলন করিতে করিতে তাঁহার স্বাভাবিক হরিপ্রীতি এত দূর প্রবল হয় যে আর কোনও বিধির অপেক্ষা তাঁহাকে করিতে হয় না। অল্প সাধনেই তিনি সিদ্ধ, সিদ্ধাবস্থার নামই পারমহংস্য। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উদ্দেশ্য কৃষ্ণ প্রেমলাভ, কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত হইলে আর আশ্রম বিধির ক্রমপথের আবশ্যকতা উপলব্ধ হয় না। এই জন্যই গৃহস্থ ভক্তগণের মধ্যেও পরমহংস দেখা গিয়াছে। সিদ্ধ ভক্ত ভিন্ন আর কেহ পরমহংস হইতে পারেন না। হরিভজনই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য না হইলে আশ্রম বিধি কৃত্রিম ভাবে পালিত হয় মাত্র, তাহাতে কোন শুভ ফলোদয় হয় না, এই কথা আমাদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, হরিভজন না করিলে বর্ণ ও আশ্রম চ্যুত হইয়া লোকে অধঃপতিত হয়।

জন্মমৃত্যু রহস্য

জগতে জন্মমরণ অবশ্যম্ভাবী। মহারাজাধিরাজ হইতে কুটীরবাসী বা অনিকেত মনুষ্য, কীট, পতঙ্গ, পশু, তৃণ, গুল্ম, লতা প্রভৃতি যে কিছু জীব দেখিতে পাওয়া যায়, সকলেই মৃত্যুর অধীন। প্রত্যহ কত অসংখ্য জীব জন্মিতেছে, আবার অগণিত জীব মৃত্যুর করালকবলে পতিত হইতেছে। জন্মমৃত্যুর মত প্রত্যক্ষ-সত্য আর কিছুই নাই। চার্ব্বাক ঈশ্বরের অস্তিত্ব, ভস্মীভূত দেহের পুনরাগমন অস্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষ সত্য জন্মমৃত্যুকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। জন্মমৃত্যুরহস্য একদিন শাক্যসিংহের হৃদয়েও অভিনব ভাব আনিয়া দিয়াছিল। জন্মমৃত্যু রহস্যই বটে। ইহার রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে যাইয়া কত লোক নাস্তিক

হইয়া পড়িয়াছেন, কত লোক আস্তিক হইয়াছেন। এই জন্মমৃত্যু সংঘটন লোকলোচনের নিকট প্রতি মুহূর্ত্তে উপস্থিত হইতেছে; কিন্তু কি ইহার ঐন্দ্রজালিক শক্তি যে—

"শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্?"

সকলেই মনে করিতেছি জন্মিয়াছি বটে, বোধ হয় শীঘ্র মরিতে হইবে না। ইহা হইতে আর আশ্চর্য্য কি হইতে পারে?

বালক নচিকেতা জন্মমৃত্যুরহস্য জানিবার জন্য যমরাজের দ্বারে অতিথি হইয়াছিলেন। যমরাজ বালককে অনেক প্রকার ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বালককে বিরত করিতে পারেন নাই। যমরাজ বলিয়াছেন, যে এই রহস্য প্রখরা বুদ্ধি দ্বারা, উৎকৃষ্ট মেধা দ্বারা, পাণ্ডিত্য দ্বারা ভেদ করা যায় না। একমাত্র ভগবৎকৃপা যাঁহার উপর বর্ষিত হয় এবং যিনি সেই কৃপা অবনত মস্তকে গ্রহণ করেন, তিনিই এই রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারেন, শুধু উদ্ঘাটন করিতে পারেন তাহা নয়, তিনি অজর অমর হন।

অতএব যেখানে আমরা প্রত্যক্ষ বা অনুমান জ্ঞানের দ্বারা রহস্যভেদে বিফল হই, সেই স্থানে ভগবানের নিত্য সত্যবাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করিলেই আমরা প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। ভগবান্ যদি মঙ্গলময় হন, তবে তিনি নিশ্চয়ই আমাদিগকে ইতর মানুষের মত প্রতারণা করিবেন না। তিনি যদি সর্ব্বজ্ঞ হন, তবে নিশ্চয়ই তাহার জ্ঞানে ভুল, প্রমাদ নাই। সুতরাং বৃথা প্রজল্প বা মনগড়া মতামত পরিত্যাগ করিয়া এ সম্বন্ধে ভগবানের নিত্য সত্য অভিমত শুনাই আমাদের কর্ত্তব্য।

অনেকেই উদ্ধবের কথা জানেন। উদ্ধব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়ভক্ত ছিলেন। গোপীদিগের পরেই উদ্ধবের মত শ্রীকৃষ্ণের আর প্রিয় ভক্ত নাই। একদিন উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সর্ব্বজ্ঞ, জীবের জন্মমৃত্যু সংঘটনটী বড়ই রহস্যময় বলিয়া বোধ হইতেছে। প্রত্যক্ষজ্ঞানের দ্বারা ইহা ভেদ করা যায় না। অনুমানের দ্বারাও কিছু ঠিক বুঝা যায় না। পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে এক এক জন এক এক প্রকার মত প্রকাশ করেন। আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমার এই সংশয় বিদূরিত করুন।

তখন শ্রীভগবান্ বলিলেন, উদ্ধব! আত্মা অখণ্ডজ্ঞানস্বরূপ। উহা "আছেন" কি "নাই" এই প্রকার ভেদজ্ঞানমূলক বিবাদ মোহযুক্ত ব্যক্তিরই হয়। বহির্ম্মুখগণের ঐরূপ বিবাদ আত্মজ্ঞানের অন্তরায় স্বরূপ; উহা কখনই নিবৃত্ত হয় না। কিন্তু আমি ভক্তের অভিলাষ পূরণ করি। তাঁহারা এই বিবাদ হইতে ছুটি পাইয়া নিত্য শান্তি পান। ঐ সকল বহির্ম্মুখ ব্যক্তি নিজ কর্ম্মফল অনুসারে উচ্চ নীচ দেহ ধারণ ও জন্মমৃত্যুর কঠোর দণ্ডে পুনঃ পুনঃ নিষ্পেষিত হয়।

"কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে।।
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়।।

কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র শূদ্র।
কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র।
কভু স্বর্গ, কভু মর্ত্ত্যে নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস প্রভু।।"

তখন উদ্ধব বলিলেন, প্রভো! আপনি বলিলেন আত্মা, অখণ্ড ও নিত্য। সুতরাং অখণ্ড বস্তু কি প্রকারে দেহ ধারণ করিতে পারে? আর নিত্যবস্তুরই বা কিরূপে জন্ম মৃত্যু সম্ভব হয়? হে গোবিন্দ, এই বিষয় অল্প বুদ্ধি মানুষের ধারণারও অতীত। ইহলোকে প্রায় সকল লোকেই আপনার মায়া দ্বারা মোহিত ও বঞ্চিত। সুতরাং এই রহস্যের সুমীমাংসা করিতে পারেন, এমন লোক প্রায় নেই। আপনিই ইহা ব্যক্ত করুন।

তখন ভগবান্ বলিলেন, মনুষ্যগণের মন অর্থাৎ বাসনাময় কোষ বা সূক্ষ্ম-শরীরই কর্ম্মফলানুসারে উচ্চ ও নীচ দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে। জীবাত্মা সূক্ষ্ম শরীর হইতে ভিন্ন হইয়াও সেই সূক্ষ্মদেহের অনুগমন করে। ইহাই আত্মার দেহান্তরে গমন।

কর্ম্মপরতন্ত্র মন দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ের অনবরত অনুশীলন করিতে করিতে সেই বিষয়ের আকারে পরিণত হয় ও ক্ষণে ক্ষণে পূর্ব্বচিন্তিত বিষয় হইতে বিচ্যুতি ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। পাছে স্মৃতিও বিনষ্ট হয়। কর্ম্মফলের অনুরূপ দেহাদিতে অত্যন্ত অভিনিবেশ হেতু হর্ষ শোকাদি-অভিভূত দেহীর যে পূর্ব্বস্মরণ-ধ্বংস অর্থাৎ সূক্ষ্মশরীরবর্ত্তী জীবাত্মার স্থূলশরীরবিয়োগ বা সংযোগ বিশেষের ধ্বংসের নামই—মৃত্যু।

বিষয়াভিনিবেশেন নাত্মানং যৎ স্মরেৎ পুনঃ।
জন্তোর্বৈকস্যচিদ্ধেতো র্মৃত্যুরত্যন্ত বিস্মৃতিঃ।।

সর্ব্বভাবে দেহে যে অহং বুদ্ধি ইহারই নাম জন্ম। যেন স্বপ্ন ও মনোরথের ন্যায়। যেমন স্বপ্নাদিতে অভিভূত পুরুষ স্বপ্ন ও মনোরথকে পূর্ব্বসিদ্ধ বলিয়া বুঝিতে পারে না, সেইরূপ পূর্ব্বসিদ্ধ যে জীবাত্মা তাহাকেই ঠিক যেন 'এই জন্মগ্রহণ করিল' এই প্রকার নূতন বলিয়া অনুভব করে।

মন ইন্দ্রিয়সমূহের পরিচালক। ঐ পরিচালকস্বরূপ মনের দেহান্তরে অভিনিবেশই সৃষ্টি। উহার দ্বারা আত্মায় উত্তম, মধ্যম ও অধম, এই ত্রিবিধ ভাব অসৎরূপে উৎপত্তি লাভ করে। যেরূপ অসৎপুত্রের জনক স্বয়ং শত্রুমিত্র উদাসীন সাধারণ সমভাবাপন্ন হইলেও অসৎপুত্র সহকারে স্বপরভেদ ও পরকীয় বিরোধের কারণ হন, তদ্রূপ উক্ত আগন্তুক ভাবত্রয়যুক্ত আত্মা স্বরূপতঃ নির্ব্বিকার হইলেও উক্ত বিবিধ ভাবসহকারে বাহ্য অভ্যন্তর ও স্বপর ভেদের কারণ হইয়া থাকেন।

এই পাঞ্চভৌতিক দেহ প্রতি মুহূর্ত্তেই উৎপন্ন ও ক্ষয় হইতেছে। কিন্তু অবিবেকী ব্যক্তি তাহা দেখিতে পাইতেছে না।

যেরূপ কালপরিণাম দ্বারা তেজের, প্রবাহত্যাগ-দ্বারা স্রোতের, পক্কতাদি দ্বারা বৃক্ষফলের, উৎপত্তি ও বিনাশরূপ অবস্থা সাধন করিতেছে, তদ্রূপ ভূতগণও প্রতিক্ষণে কাল দ্বারা উৎপত্তি ও বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে।

যেমন শিখার সাদৃশ্যহেতু এই সেই প্রদীপ ও সাদৃশ্যমূলক স্রোতের এই সেই জল, এইরূপ বোধ হয়, সেইরূপ নির্বুদ্ধি লোকসমূহ এই সেই ব্যক্তি বা 'আমি সেই ব্যক্তি' এইরূপ ভ্রমাত্মক জ্ঞান করিয়া থাকে। জন্মমৃত্যু বা জরা-বিবর্জ্জিত জীবাত্মার স্বীয় বীজভূত কর্ম্ম দ্বারা যে জন্ম ও মৃত্যু সংঘটিত হয়, তাহা নহে। যেমন কল্পান্তস্থায়ী অগ্নি জন্মমৃত্যু রহিত হইয়াও কাষ্ঠ-সংযোগ ও বিয়োগদ্বারা প্রজ্জ্বলন ও নির্ব্বাণরূপ জন্ম ও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ জীবাত্মা জন্মমৃত্যু রহিত হইয়া ও জাত ও মৃতের ন্যায় দৃষ্ট হন। দেহের নয়টী অবস্থা— (১) সূক্ষ্মরূপে জননীজঠরে প্রবেশ, (২) যথাসংস্থান, (৩) অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির বৃদ্ধি, (৪) তারপর ভূমিষ্ঠাবস্থা, (৫) পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত বাল্য, (৬) যোল বৎসর পর্য্যন্ত কৌমার, (৭) পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রৌঢ়াবস্থা বা মধ্যবয়স, (৮) তার পর জরা, (৯) তৎপর মৃত্যু।

পিতৃদেবের ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য, পুত্রদেহের জাতকর্ম্মাদি দর্শন করিয়া নিজের দেহও এইরূপ উৎপত্তি লাভ করিয়াছে এবং পরে বিনষ্ট হইবে এইরূপ অনুমান করা হয়। কিন্তু উৎপত্তি বিনাশশীল দেহের দ্রষ্টা জীবাত্মার ঐরূপ উৎপত্তি ও বিনাশরূপ কার্য্য নাই। যেমন যে ব্যক্তি বীজ হইতে ঔষধি বৃক্ষের (লাউ, কুমড়া প্রভৃতি বৃক্ষের) উৎপত্তি ও ফল পাকিলে উহাদের বিনাশ লক্ষ্য করিয়াছেন, তিনি যেমন ঐ সকল বৃক্ষ হইতে অপর আর একজন, তদ্রূপ দেহের জন্ম ও বিনাশ দর্শনকারী জীবাত্মা দেহ হইতে ভিন্ন। অতএব জন্ম ও মৃত্যু দেহেরই ধর্ম্ম, উহা আত্মার নহে।

মূঢ় ব্যক্তিগণ দেহ হইতে জীবাত্মা যে ভিন্ন বস্তু, ইহা তত্ত্বতঃ জানিতে না পারিয়া রূপরসাদি বিষয়ে আসক্ত হইয়া পড়ে এবং দেহে অভিমান বশতঃ আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা রাজা, প্রজা, দীন, দুঃখী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি দেহাত্ম জ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু লাভ করে।

কর্ম্মফল অনুসারে হরিবিমুখ জীব নানাযোনি ভ্রমণ করিতে করিতে সত্ত্বগুণের তারতম্যক্রমে ঋষি ও দেবতা, রজোগুণের তারতম্য ক্রমে অসুর ও মনুষ্য এবং তমোগুণের তারতম্যক্রমে ভূত ও পশুপক্ষী প্রভৃতি যোনি লাভ করে।

যেমন ছোট ছোট বালকগণ নৃত্যগীতের তালস্বরাদি বা শৃঙ্গারাদি রসে অনভিজ্ঞ ও নিস্পৃহ হইয়াও নর্ত্তক ও গায়কের নৃত্য দর্শন ও গান শ্রবণ করিয়া উহাদের স্বর, তাল ও শৃঙ্গার করুণাদিরসকে অনুকরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ সুখদুঃখশূন্য জীব বুদ্ধির সুখদুঃখাদি ধর্ম্ম দেখিয়া মোহপরতন্ত্রতা হেতু সুখদুঃখের অনুকরণ করে।

যেমন জল চঞ্চল হইলে জলে প্রতিবিম্বিত বৃক্ষরাজিও চঞ্চলের ন্যায় দেখা যায় বা যেমন চক্ষুর্দ্বয় ঘূর্ণিত হইলে ভূমণ্ডলও ঘুরিতেছে বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ সুখদুঃখ বা কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্ব প্রভৃতি উপাধিধর্ম্ম চিদাভাস মনে প্রতিভাসিত হয়। কামনাসক্ত ব্যক্তির বিষয়ানুভব এবং স্বপ্নবস্থায় দৃষ্ট বিষয়সমূহ যেমন অলীক, শুদ্ধজীবের বিষয়ভোগ ও সংসাসবন্ধও সেইরূপ মিথ্যা।

যদি কেহ বলেন যে, অলিক বিষয়ের নিবৃত্তির জন্য প্রয়াস করার আবশ্যকতা কি—তদুত্তর এই যে, যেমন সর্ব্বদা বিষয়ধ্যানকারী ব্যক্তির স্বপ্নকালে নানাবিধ অর্থাগম বা স্বর্পদংশনজনিত কষ্টে সুখদুঃখ অনুভূত

হইয়া থাকে, সেইরূপ শুদ্ধ জীবের পক্ষে সংসার সম্বন্ধ মিথ্যা ও ভ্রমমাত্র হইলেও ভ্রমপ্রযুক্ত মনবুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক লিঙ্গশরীরের সংসারসমুত্থিত দুঃখের নিবৃত্তি হয় না। অতএব জীবের বিষয়ভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক সমস্ত বিষয়কে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়া কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। সেবা ব্যতীত বিষয় হইতে পরিত্রাণ নাই। মায়াবাদিগণ বিষয় পরিত্যাগ করিয়াছে মনে করিয়াও বিষয়ী; যেহেতু তাহারা পরম বিষয় শ্রীভগবানের আশ্রিত নহেন। তাহারা ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম, তাঁহার নিত্য সেবা, নিত্য নাম, ধাম, সঙ্গী সকলকেও জাগতিক বিষয়ের সহিত সমান মনে করিয়া প্রাকৃত বিষয়ের ব্যতিরেকভাব গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহারা জগতের বিষয় হইতেও বঞ্চিত হন আবার নিত্যবিষয় শ্রীকৃষ্ণচরণ হইতেও চিরতরে বঞ্চিত। কর্ম্মিগণ স্বর্গাদি নশ্বর বস্তুকে বিষয় মনে করিয়া দৈবী মায়ায় বিমোহিত। সুতরাং ভগবদ্ভক্তই জন্ম মৃত্যুর পর পারে যাইয়া নিত্যানন্দ লাভ করিতে সমর্থ। অতএব নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি—

"ক্ষিপ্তোঽবমানিতোঽসদ্ভিঃ প্রলব্ধোঽসূয়িতোঽথবা।
তাড়িতঃ সন্নিরুদ্ধো বা বৃত্ত্যা বা পরিহাপিতঃ।।
নিষ্ঠ্যুতো মূত্রিতো বাজ্ঞৈর্বহুধৈবং প্রকম্পিতঃ।
শ্রেয়স্কামঃ কৃচ্ছ্রগতঃ আত্মনাত্মনমুদ্ধরেৎ।।"

অসাধু কৃষ্ণাভক্ত জন কর্ত্তৃক আক্ষিপ্ত, অবমানিত, উপহসিত, দোষারোপে দূষিত, তাড়িত, বন্ধনে রক্ষিত জীবিকা হইতে ভ্রংশিত, নিষ্ঠীবন দ্বারা ব্যাপীকৃত, মূত্র দ্বারা আদ্রীকৃত, পরমেশ্বরনিষ্ঠা হইতে বিচ্যুত ইত্যাদি বহুবিধ কষ্টে পতিত হইয়াও ভগবৎপ্রেরিত বুদ্ধিযোগ দ্বারা ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া আত্মার উদ্ধার সাধন করিবেন। যিনি হরিকীর্ত্তন হইতে বিরত, তিনিই আত্মঘাতী। যিনি কনক কামিনী বা প্রতিষ্ঠার জন্য মিছা হরিকীর্ত্তনের ভাণ করেন, তিনি আত্মঘাতী। কিন্তু যিনি নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতের চরণরজে অভিষিক্ত হইয়া নিয়ত সেবোন্মুখ জিহ্বা দ্বারা হরিকীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তিনিই জন্মমৃত্যুরহস্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তিনিই মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন—এমন কি অজিত ভগবানও তাঁহার নিকট জিত হন।

গুণ্ডিচামার্জন

শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির হইতে পূর্ব্বোত্তরে একক্রোশ ব্যবধানে গুণ্ডিচা-মন্দির অবস্থিত। জনশ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, পুরাকালে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক জনৈক বৈষ্ণব নৃপতি ছিলেন। তাঁহারই মহিষীর নাম অনুসারে ঐ মন্দিরের নাম গুণ্ডিচা-মন্দির হইয়াছে। শাস্ত্রগ্রন্থাদিতেও গুণ্ডিচা মন্দিরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। গুণ্ডিচা মন্দিরের কিয়দ্দূরেই 'ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর' নামে একটী প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা বিরাজিত।

রথযাত্রার দিবস শ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবী শ্রীমন্দির হইতে রথে চড়িয়া গুণ্ডিচা মন্দিরে গমন করেন। শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথদেব লক্ষ্মী সহ কুরুক্ষেত্রের ঐশ্বর্য্য-লীলা প্রকট করিয়া বিহার করেন।

কুরুক্ষেত্রে গোপীগণের হৃদয় শ্রীকৃষ্ণদর্শনে আনন্দিত হইলেও মাধুর্য্যমধুরিমায় পরিপ্লুত শ্রীব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য তাঁহাদের চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছিল। রসিক ভক্তগণ শ্রীক্ষেত্র হইতে বন-উপবন-সমন্বিত মাধুর্য্যময় লীলাক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবন ধামস্বরূপ শ্রীগুণ্ডিচায় জগন্নাথদেবকে লইয়া যান। তাই রাধাভাববিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দর রথাগ্রে নর্ত্তন করিতে করিতে মিলনগান গাহিয়াছিলেন—

সেই ত পরাণ নাথ পাইনু।
যাঁহা লাগি মদনদহনে ঝুরি গেনু।।

আরও গাহিয়াছিলেন—

ইঁহা লোকারণ্য হাতি-ঘোড়া রথধ্বনি।
তাঁহা পুষ্পারণ্য ভৃঙ্গপিকনাদ শুনি।।
এই রাজবেশ সঙ্গে সব ক্ষত্রিয়গণ।
তাঁহা গোপবেশ সঙ্গে মুরলী-বদন।।
ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ আস্বাদন।
সেই সুখসমুদ্রের ইহাঁ নাহি এক কণ।।

অন্যের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি জানি।
তাহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ-কৃপা মানি।।

শ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা মন্দিরে আগমনের পূর্ব্বে শ্রীমন্দির, জগমোহন, সিংহাসন, রত্নবেদী সমস্তই মাজিয়া-ঘসিয়া পরিষ্কার করা হয়। শ্রীজগন্নাথদেব আসিবেন, সেই জন্য সেবকগণ প্রভুর জন্য পূর্ব্ব হইতে সব পরিষ্কার করিয়া রাখেন।

ভক্তলীলাঙ্গীকারী লোকশিক্ষক শ্রীগৌরসুন্দর 'আপনি আচরি ধর্ম্ম জগতে শিখায়।' তিনি সেবা শিক্ষা দিবার জন্য প্রতি বৎসর সপার্ষদে এই গুণ্ডিচামার্জ্জন লীলার অভিনয় করিতেন।

"শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরমাত্মবৃন্দৈঃ সম্মার্জয়ন্ ক্ষালনতঃ স গৌর।
স্বচিত্তবচ্ছীতলমুজ্জ্বলঞ্চ কৃষ্ণোপবেশৌপয়িকং চকার।।"

শ্রীগৌরসুন্দর আত্মীয় ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির সম্মার্জন করতঃ স্বীয় শীতল ও উজ্জ্বল চিত্তের ন্যায় পরিষ্কার করিয়া কৃষ্ণের উপবেশন-যোগ্য করিয়াছিলেন।

শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার দিন নিকটবর্ত্তী হইতেই শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রথমেই কাশী মিশ্রকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন।কাশীমিশ্র নীলাচলরাজের পুরোহিত ছিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও পড়িছা-পাত্রকে ডাকাইলেন।

শুদ্ধবৈষ্ণবের আদেশ ও আনুগত্য ব্যতীত ভগবৎসেবায় অধিকার নাই, ইহা শিক্ষার দিবার জন্য সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যাদির নিকট হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু—

"গুণ্ডিচামন্দিরমার্জ্জন-সেবা মাগি নিল।।"

পড়িছা বলিলেন, আমরা আপনার সেবক, আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহাই আমরা অবনত মস্তকে সম্পাদন করিব। বিশেষতঃ আমাদের প্রতি নীলাচলরাজের আদেশ, যেন সর্ব্বতোভাবে আপনার আজ্ঞা পালন করিতে কোনও ক্রটী না হয়। তবে মন্দিরমার্জ্জন-সেবা আপনার যোগ্য নহে। তথাপি আপনি স্বতন্ত্র-পুরুষ আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

পড়িছা শ্রীগৌরসুন্দরের সম্মুখে একশত ঝাঁটা ও একশত জল আনিবার ঘট আনিয়া রাখিলেন। পরদিন প্রভাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীহস্তে সমস্ত ভক্তগণের অঙ্গে চন্দন লেপন করিয়া দিলেন এবং প্রত্যেকের হস্তে একটী করিয়া মার্জ্জনী প্রদান করিলেন। এইরূপে ভক্তগণ-সহ শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরে উপনীত হইলেন। প্রথমে শ্রীগৌরসুন্দর নিজ হস্তে ঝাঁটা লইয়া মন্দিরের ভিতর উপর সকল মাজিয়া পরিষ্কার করিলেন। সিংহাসন মাজিয়া পুনরায় তাঁহাকে যথাস্থানে সংস্থাপন করিলেন, ছোট বড় মন্দির সব ধুইয়া পরিষ্কার করিলেন। পাছে শ্রীজগমোহন, পরিষ্কার করিলেন।

"চারিদিকে শত ভক্ত সংমার্জ্জনী করে।
আপনি শোধেন প্রভু শিখান সবারে।।
প্রেমোল্লাসে শোধেন, লয়েন কৃষ্ণনাম।
ভক্তগণ কৃষ্ণ কহে করে নিজ কাম।।"

শ্রীগৌসুন্দরের হেমকান্তি উজ্জ্বল তনুখানি ধুলায় ধূসর, কিন্তু তাহাতে যেন শোভা ফুটিয়া পড়িয়াছে। ভক্তগণেরও সেইরূপ অবস্থা। কখনও কখনও প্রেমাশ্রু দ্বারা মন্দির সংমার্জ্জন করিতেছেন। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! এইরূপে ভোগ- মন্দির ও তৎপরে সমস্ত প্রাঙ্গনাদিও ঘসিয়া মাজিয়া পরিষ্কার করিলেন। তারপর শ্রীগৌরসুন্দর—

তৃণ ধুলী ঝিঁকুর সব একত্র করিয়া।
বহির্ব্বাসে লঞা ফেলায় বাহির করিয়া।।

ভক্তগণও জগদ্গুরুর আচরণ অনুবর্ত্তন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু—

প্রভু কহে, কে কত করিয়াছ সংমার্জ্জন।
তৃণ ধূলী দেখিলে জানিব পরিশ্রম।।

সকলের ঝ্যাঁটান বোঝা একত্র করা হইলে, শ্রীমহাপ্রভুর বোঝা সকলের হইতে অধিক হইল।

পাঠক! শ্রীগৌরসুন্দরের এই লীলারহস্য বুঝিতে পারিয়াছেন কি? তিনি কি লীলা করিতে বসিয়াছেন একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখুন! জগদ্গুরু আজ শিক্ষা দিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণকে যদি কেহ হৃদয়সিংহাসনে

বসাইতে ইচ্ছা করেন, তবে সর্ব্বাগ্রে তাহার হৃদয়ের মল ধৌত করা উচিত, হৃদয়খানাকে নির্ম্মল, শান্ত ও ভক্ত্যুজ্জ্বল করা আবশ্যক। হৃদয়ক্ষেত্রে কণ্টকপূর্ণ তৃণ, ধূলি লোষ্ট্রাদি থাকিলে পরমসেব্য ভগবানকে বসানো যায় না। হৃদয়ের মলাস্বরূপ তৃণ, ধূলি লোষ্ট্র কি কি জানেন ত? উহা অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগচেষ্টা প্রভৃতি।

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।

যেখানে অন্যাভিলাষ, জ্ঞানকর্ম্মযোগ, তপাদি বা প্রতিকুলভাব দ্বারা আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি ভক্তি আবৃত হইয়াছে, সেখানে শুদ্ধা ভক্তি নাই। শুদ্ধা ভক্তি ব্যতীত ভগবানের আবির্ভাব হয় না।

অন্যাভিলাষ অর্থাৎ 'জগতে খাব দাব, থাকব' এইরূপ ইতর অভিলাষ, উহা কণ্টকময় তৃণের মত ভগবানের সুকোমল শ্রীপাদপদ্ম বিদ্ধ করে। কর্ম্মচেষ্টা অর্থাৎ যাগ, যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা স্বর্গাদি সুখ বা ইহলোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করিব এই সকল বাসনা ধূলিসদৃশ। কর্ম্মাবর্ত্তের ঘূর্ণিবায়ুতে বাসনারূপ ধূলিরাশি আমাদের স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হৃদয়দর্পণকে আবৃত করিয়া দেয়। সৎ ও অসৎ কর্ম্মজনিত বাসনারূপ ধূলারাশি আমাদের শুদ্ধ নির্ম্মল জীবাত্মস্বরূপে কত জন্মজন্মান্তর ধরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে, তাই আমাদের কর্ম্মের দ্বারা বুঝি কর্ম্মের নির্হার হইবে, উহা ভুল ধারণা। আমরা কেবল আত্মবঞ্চিত হইতেছি মাত্র। হাতীকে স্নান করাইয়া দিলে যেমন হাতী আবার গায়ে ধূলা মাখিয়া থাকে, তদ্রূপ কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মবাসনা বিদূরিত হয় না। একমাত্র কেবলা ভক্তিদ্বারা আমাদের সমস্ত অসুবিধা দূর হয়, হৃদয়সিংহাসনে শ্রীভগবান্ বিশ্রামযোগ্যস্থান লাভ করিয়া থাকেন। তাই ভক্তকবি গাহিয়াছেন, "ভক্তের হৃদয়ে সদা গোবিন্দের বিশ্রাম।"

ঝিঙ্কর বা কঙ্করকে ঝিঁকুর বলে। কঙ্করগুলি বড়ই কষ্টদায়ক। কঙ্কর পায়ে বিদ্ধ হইলে পায়ে বড়ই যন্ত্রণা হয়, পা ফুলিয়া যায় এবং পরেও পায়ের তলদেশ জ্বালা করিতে থাকে। নির্ব্বিশেষ ও কৈবল্যযোগ বা জ্ঞানাদিচেষ্টা কঙ্করের মত। উহার দ্বারা শ্রীহরির তোষণ বা সেবা ত দূরের কথা, তাহার দ্বারা শ্রীহরির দেহে শেলবিদ্ধ করিবার প্রয়াস করা হয়। যদিও নির্ব্বিশেষ চেষ্টাতেও প্রথমে শ্রীহরির নামাদি গৌণভাবে স্বীকার করা হয়, কিন্তু পরে তাহার অস্তিত্ব লোপ হয়। সুতরাং ভগবান্ সেইরূপ চেষ্টা থাকা কালে জীবের হৃদয়ে আবির্ভূত হ'ন না। সেই জন্য গৌরসুন্দর ঐ সকল তৃণ, ধুলা ঝিঁকুর মন্দিরের চতুঃসীমানার ভিতরও রাখিলেন না। নিজ বহির্ব্বাসে করিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিলেন—পাছে ব্যত্যা সংযোগে ঐ সকল শ্রীমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে।

এইরূপ একবার বড় বড় কাঁকর, বহুদিনের সঞ্চিত তৃণ, ধূলারাশি প্রভৃতি ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দিয়া পুনরায় শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তগণকে মার্জ্জনসেবা বণ্টন করিয়া দিলেন। এবার বলিলেন—

সূক্ষ্ম ধূলী তৃণ কাঁকর সব কর দূর।
ভাল মতে শোধন কর প্রভুর অন্তঃপুর।।

অনেক সময় কর্ম্ম-জ্ঞানাদি চেষ্টা বিদূরিত হইলেও হৃদয়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মলা থাকিয়া যায়। উহাকে কুটিনাটি, প্রতিষ্ঠাশা, জীবহিংসা, নিষিদ্ধাচার, লাভপূজাদির সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। কুটিনাটি শব্দে কপটতা, প্রতিষ্ঠাশা শব্দে 'আমাকে লোকে বড় ভক্ত বলিবে' এইরূপ সম্মানাদির আশায় নির্জ্জনভজনাদির চেষ্টা, জীবহিংসার দ্বারা কৃষ্ণভক্তি প্রচারে কুণ্ঠতা বা কৃপণতা, মায়াবাদী, কর্ম্মী ও অন্যাভিলাষীকে প্রশ্রয় দেওয়া বা তাঁহাদের মন রাখিয়া কথা বলা, লাভপূজা শব্দে ধর্ম্মের নামে ধনাদি প্রাপ্তি, সম্মানপ্রাপ্তি; নিষিদ্ধাচার শব্দের দ্বারা স্ত্রীসঙ্গ ও কর্ম্মী-জ্ঞানী-অন্যাভিলাষী প্রভৃতি কৃষ্ণাভক্তের সঙ্গ বুঝায়।

সব বৈষ্ণব লঞা যবে দুইবার শোধিল।
দেখি মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল।।

শত শত ভক্ত কলসীতে জল ভরিয়া আনিয়া মহাপ্রভুকে দিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু খাপরা ভরিয়া জল নিয়া ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, যেন উপরে নীচে কোথাও কোন ময়লা না লাগিয়া যায়। নিজ হস্তে শ্রীমন্দির ও সিংহাসনের মার্জ্জন করিলেন। এইরূপে শ্রীগৌরসুন্দর দুই দুইবার করিয়া সব স্থান মার্জ্জন করিয়া ও জলদ্বারা প্রক্ষালন করিয়া পরে যদি কোথায়ও কোনও সূক্ষ্ম দাগ লাগিয়া থাকে এই জন্য নিজ পরিধেয় শুষ্ক বস্ত্রের দ্বারা ঘসিয়া ঘসিয়া আবার শ্রীমন্দির মার্জ্জন করিতে লাগিলেন।

"নিজ বস্ত্রে কৈল প্রভু গৃহ সংমার্জ্জন।
মহাপ্রভু নিজ বস্ত্রে মাজিল সিংহাসন।
নির্ম্মল শীতল স্নিগ্ধ করিল মন্দিরে।
আপন হৃদয় যেন ধরিল বাহিরে।।"

এখন শ্রীমন্দিরে ধূলিকণার লেশ, এমন কি একটী সূক্ষ্ম দাগও নাই, শ্রীমন্দির স্বচ্ছ, নির্ম্মল, স্ফটিকবৎ কেবল তাহাই নহে আবার সুশীতল হইয়াছে। জীবের হৃদয় হইতে অন্যাভিলাষ, কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি চেষ্টারূপ ভুক্তিমুক্তি কামনা বিদূরিত হইয়া আত্মবৃত্তি শুদ্ধাভক্তি জাগরিত হইলে জীবহৃদয় এইরূপ শান্ত ও সুশীতল হয়।

"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধ কামী সকলই অশান্ত।।"

অনেক সময় সমস্ত কামনা বাসনা বিদূরিত হইলেও হৃদয়ের কোনও কোনও অজ্ঞাত কোণে এক একটী সূক্ষ্ম দাগ লাগিয়া থাকে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। উহাই মুক্তিকামনা। নির্ব্বিশেষবাদীর সাযুজ্যমুক্তি কামনা ত দূরের কথা, অন্যতম চতুর্ব্বিধ মুক্তিকামনারূপ সূক্ষ্মদাগকেও শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় বস্ত্র দ্বারা ঘসিয়া উঠাইলেন। মহাপ্রভুর সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ, অদ্বৈতপ্রভু, স্বরূপদামোদর, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, পরমানন্দ ভারতী, পরমানন্দ পুরী ও অসংখ্য ভক্ত এই মার্জ্জন সেবায় যোগদান করিয়াছিলেন।

জল ভরে ঘর ধোয় করে হরিধ্বনি।
কৃষ্ণ হরি বিনা আর নাহি শুনি।।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করে ঘটের প্রার্থন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করে ঘট-সমর্পণ।।

এইরূপে শ্রীগৌরসুন্দর ও ভক্তগণ মহাপ্রেমাবেশ উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে মার্জ্জনসেবা করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু প্রতি ভক্তের নিকট যাইয়া হাত ধরিয়া মার্জ্জনসেবা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। যাহার কার্য্য ভাল হইতেছে, তাহাকে প্রশংসা এবং যাহার সেবা মনোমত হইতেছে না, তাহাদের প্রতি পবিত্র- ভৎর্সনলীলা প্রদর্শন করিলেন। এমন সময় এক গৌড়ীয় বৈষ্ণব আসিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরণযুগে এক ঘট জল ঢালিয়া দিলেন এবং সেই জল পান করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মসংস্থাপনকর্ত্তা লোকশিক্ষক গৌরসুন্দর উক্ত বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। ''যদ্যপি গোসাঞি তারে হঞাছে সন্তোষ। ধর্ম্ম-সংস্থাপন লাগি বাহিরে মহারোষ।।''

সকল গৌড়ীয় বৈষ্ণব স্বরূপ-দামোদরের অধীন। এই জন্য গৌরসুন্দর ঐ গৌড়ীয় বৈষ্ণবকে স্বরূপের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, ইহাকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান কর। উক্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাপ্রভুর পায় পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলে মহাপ্রভু ক্ষমালীলা প্রদর্শন করিলেন। পাঠক! লোকশিক্ষকের লোকশিক্ষা দেখিলেন কি? আজকালকার তথাকথিত আচার্য্য বা গুরুব্রুবগণ স্বীয় চরণামৃত প্রদান করিয়া অপরকে কৃতার্থ করিবার জন্য স্বেচ্ছায় পা বাড়াইয়া দিয়া থাকেন, অনেকে নাকি আবার শ্রীচরণে সচন্দন তু * * * পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না। অপরাধের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ''তুলসী'' শব্দটী প্রয়োগ না করিয়া সেই স্থানে তারা চিহ্ন দেওয়া গেল। শ্রীমন্মহাপ্রভু কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া কীর্ত্তন ও নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ভক্তগণ ঘেরিয়া ঘেরিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

মহা উচ্চ সংকীর্ত্তন আকাশ ভরিল।
প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্যে ভূমিকম্প হৈল।।
স্বরূপের উচ্চ গান প্রভুরে সদা ভায়।
আনন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য করে গোরা রায়।।

গৌড়ীয়

[১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দ, ১৩৩১-৩২ বঙ্গাব্দ]

গৃহস্থ

'গৃহস্থ' বলিতে আমরা কি বুঝি, প্রথমে আমরা তাহারই বিচার করিব। প্রথমে শব্দটীর ব্যতিরেক আলোচনা করা যাউক। যাঁহারা গৃহস্থ নহেন, তাঁহারা অগৃহস্থ। গৃহস্থ ও অগৃহস্থ কাহারা দেখিতে গিয়া আমাদের প্রথম ধারণা হয় যাঁহারা ঘরে বাস করেন, তাঁহারাই গৃহস্থ, আর তাহার বিপরীত অগৃহস্থ। এই যৌগিক অর্থগ্রহণ করিলে আমরা দেখিতে পাই অগৃহস্থ প্রায় নাই। এরূপ বিচারেও অবশ্য মর্কটকুলকে অগৃহস্থ বলা যাইতে পারে, কেননা তাহাদের কোন বাসা নাই। ইহাদের ন্যায় আরও কয়েকটী ইতরপ্রাণী অগৃহস্থ হইতে পারে, কিন্তু পশু পক্ষী সরীসৃপ কীটাদির মধ্যে অনেকেই, বাসা, বিল, বিবর প্রভৃতিতে বাস করিয়া থাকে, সুতরাং তাহাদিগকে গৃহস্থের পর্য্যায়ে ফেলিতে হয়। মানবের মধ্যে এরূপ অগৃহস্থ কে যিনি আদৌ কোন আশ্রয় স্বীকার না করিয়া বাস করেন?

চারিটী আশ্রমের অর্থাৎ মানবের সমাজে অধিষ্ঠান প্রকার-ভেদে চারিটী বিশেষ অবস্থার মধ্যে আমরা গৃহস্থ দেখিতে পাই। এই গৃহস্থ কি পূর্ব্ব বিচারিত যৌগিক অর্থনির্দ্দিষ্ট 'গৃহস্থের' সহিত সমানার্থবোধক? একটু অগ্রসর হইয়াই আমরা ইহার উত্তর দেখিতে পাইব। আর তিনটী আশ্রমের নাম ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। ব্রহ্মচারী আচার্য্য কর্ত্তৃক বেদ সমীপে উপনীত হইয়া বেদরূপ শব্দব্রহ্মে বিচরণ করিতে থাকেন, সেই বেদাভ্যাস কালে তিনি গুরুকুলে বাস করেন, গুরুগৃহে বাস করিলেই যদি তাঁহারা গৃহস্থ হইতেন, তাহা হইলে গৃহস্থের একটী স্বতন্ত্র আশ্রম আখ্যা হইত না। সুতরাং এই খানেই দেখা যাইতেছে যে গৃহস্থ কথাটি যৌগিক অর্থে ব্যবহৃত হয় না। বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বীও কুটীর বাঁধিয়া বাস করিয়া থাকেন, অথচ তিনি গৃহস্থ নহেন, আবার সন্ন্যাসীও গুহা ও মঠাদিতেই বাস করেন। সুতরাং গৃহস্থ বলিতে গৃহবাসীকেই বুঝায় না। তবে গৃহস্থ কি?

দেখা যায় ব্রহ্মচর্য্যের পরেই গার্হস্থ্যাশ্রম। গুরুকুলে সংযম শিক্ষাসহকারে বেদপাঠ ও ভগবত্তত্ত্বালোচনা ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম। সাধু আদর্শ সমক্ষে ধরিয়া ভগবদ্বিষয়ে মগ্ন থাকায় সরল ব্রহ্মচারীর চিত্তে কোন অসাধুচিন্তা প্রবেশের অধিকার পায় না, ভোগবৃত্তি হইতে ব্রহ্মচারী দূরে থাকার অভ্যাস সঞ্চয় করেন। সুতরাং যথার্থ ব্রহ্মচারী রেতোধৃক্। ব্রহ্মচারীগণের ভগবদালোচনাতে যাহারা বিভোর হইয়া যান, তাঁহারা আর অবস্থান্তরের পক্ষপাতী নহেন, তাঁহারা 'বৃহদ্ব্রতী' বা 'নৈষ্ঠিক' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া চিরজীবন ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় যাপন করেন; নচেৎ ব্রহ্মচারী উপযুক্তকালে বেদাধ্যয়নাদি সমাপ্ত করিয়া সমাবর্ত্তন করেন ও উপযুক্ত কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া সংসারে প্রবেশ করেন। তাঁহার তখন গার্হস্থ্যাশ্রম। সুতরাং 'গৃহস্থ কে?'—এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা

দেখিতে পাই তিনি যথাশাস্ত্র বিবাহ করিয়া সৎশাস্ত্রানুসারে সংসারযাত্রা বির্ব্বাহ করিতে থাকেন। তখন তিনি যে গৃহে সস্ত্রীক বাস করেন, সে গৃহের অধিকারী তিনি স্বয়ং, তিনি তখন গৃহস্থ। তাই শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতাঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে।।"

গৃহিণী না থাকিলে গৃহই নয়, সুতরাং গৃহস্থও নয়। আবার এই শ্লোকোক্ত বিধান হইতে দেখা যাইতেছে যে গৃহিণী লইয়া গৃহে বাস করিলেই গৃহস্থ হওয়া যাইবে না। তাঁহার সহিত পুরুষার্থ সাধন করিতে হইবে। গৃহিণী সহধর্ম্মিণী। ধর্ম্মাদি পুরুষার্থসাধনের মূলে শাস্ত্রবিধিপালন বর্ত্তমান। সে শাস্ত্রবিধির মূলে ভগবদ্ভজনই অবস্থিত। ভগবদ্ভজন ব্যতীত কোন আশ্রমের অস্তিত্ব নাই, ভগবদ্ভজনত্যাগী অন্ত্যজ। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ-স্কন্ধে ব্যবস্থা দিতেছেন, গৃহস্থস্যাপ্যৃতৌ গন্তুঃ সর্ব্বেষাং মদুপাসনম্–"ব্যবায়ঃ প্রজায়ৈ ন তু রত্যৈ" 'ঋতৌ ভার্য্যামুপেয়াৎ" এই উপদেশবশে মাত্র ঋতু কালে ভার্য্যাগমন করিয়াও ভগবদুপাসনা করেন, তাহাতে ভক্ত গোষ্ঠীই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় প্রবৃত্তির প্রশয় দেওয়া হয় না।

বর্ণ ও আশ্রম সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ করিয়াছেন,—

"য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ।।"

যে কোন আশ্রমী ভগবদ্ভজন না করিলে স্থানভ্রষ্ট হইয়া অন্ত্যজত্ব প্রাপ্ত হয়। ভগবদ্ভজন যাঁহার যে পরিমানে হয়, তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ সেই পরিমাণে সংযত। যেখানে ইন্দ্রিয়সংযমের অভাব সেখানে ভগবদ্ভজনেরও অভাব জানিতে হইবে। এরূপ স্থলে পূজাদিধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানসমূহ কেবল কপটতাময়।

আধুনিক কালে যাঁহারা গৃহস্থ বলিয়া পরিচিত হইতে চাহেন তাঁহাদের অবস্থা একটু আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব যে ইদানীং গৃহস্থাশ্রম নাই। তথাকথিত গৃহস্থের গৃহগুলি কেবল ভোগের আগার, বৈদিক-শাস্ত্রসমূহে গৃহস্থের যে সকল ধর্ম্ম নিবদ্ধ আছে, সে গুলি ক্বচিৎ পালিত হয়। ইহার কারণ আর কিছুই নহে। গুরুগৃহে বাস করিয়া ভগবদ্ভজন ও বেদাধ্যয়নমুখে প্রবৃত্তির নিবৃত্তির অভ্যাস সংসাধিত হয় নাই, ব্রহ্মচর্য্যের অভাবই গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের ভিত্তি নষ্ট করিয়া দিয়াছে, আশ্রমধর্ম্ম একরূপ উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখন যে অবস্থাটী গার্হস্থ্য বলিয়া পরিচয় দিতেছে সেটী গৃহমেধী বা গৃহব্রতের অবস্থা। যাহারা গৃহ বা গৃহিণীকেই সর্ব্বস্ব করিয়াছে তাহারাই গৃহব্রত বা গৃহমেধী অর্থাৎ যাহারা গৃহকে মেধী বা ধান্যমর্দ্দন স্থলে প্রোথিত পশুবন্ধন কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় কেন্দ্র করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে পশুর ন্যায় ঘুরিতে থাকেন। ভগবদনুশীলন ফলে যে ভগবদিতর বিষয়ে বিরক্তি তাহার অভাব যেখানে, সেখানে আশ্রমধর্ম্ম থাকিতে পারে না। যেখানে আশ্রমধর্ম্ম নাই সেখানে আর্য্যত্বের অভাব।

সুতরাং যাঁহারা সদ্‌গৃহস্থ হইতে চাহেন তাঁহাদের কর্ত্তব্য—যিনি নিষ্কিঞ্চনভাবে ভগবদ্ভজন করেন এরূপ সাধুমহাপুরুষ গুরুর আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হন এবং স্ত্রৈণত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক সংযতভাবে অশাস্ত্রীয় বিধিবর্জ্জন করিবেন। গৃহস্থধর্ম্মপালনতৎপরব্যক্তি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন যে, ব্রহ্মচর্য্যই গৃহস্থাশ্রমের ভিত্তি, সুতরাং পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্য অভ্যস্ত হয় নাই বলিয়া উপযুক্তকাল গৃহ হইতে দূরে থাকিয়া গুরুকুলে বাসপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য পালন করা তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য এবং পাল্য সকলকে সে সুযোগ দেওয়া আবশ্যক। এইরূপে ক্রমে ব্রহ্মচর্য্যের পুনঃ প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যথার্থ গৃহস্থাশ্রমেরও প্রতিষ্ঠা হইতে পারিবে।

যাঁহারা শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সহিত সংশ্লিষ্ট মঠগুলির সংবাদ রাখেন, তাঁহারা জানেন কিরূপ স্বাভাবিক-ভাবে সেখানে ব্রহ্মচারী সুশিক্ষিত হয় এবং অনেক গৃহস্থ ভক্ত ও গুরুকুলে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা করেন। তাঁহাদের অনেকে গৃহসঙ্গ ত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বনপূর্ব্বক গুরুকুলে বাস করিতেছেন ও সন্ন্যাসিগণ পরিব্রাজকের ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে শ্রীনাম ও ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছেন। কলিকাতার কেন্দ্র শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করিয়া যে কেহ তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী পরিদর্শন পূর্ব্বক এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন।

এক্ষণে একটী কথার আলোচনা করিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। গুরুকরণ সম্বন্ধে আমরা কুলগুরু ও গৃহস্থগুরুর কথা শুনি। প্রথমে গৃহস্থগুরুর কথা বলি। গুরু কে? যিনি শিষ্যকে পরমার্থপথে চালিত করিয়া ভগবদ্দর্শন করাইতে পারেন, তিনিই গুরু। তাঁহার নিজের ভগবদ্দর্শন সিদ্ধ হইয়াছে, নচেৎ তিনি শিষ্যকে কি সাহায্য করিবেন? সুতরাং বদ্ধজীব, স্ত্রীর ভৃত্য, যোষিৎসঙ্গী কখনও গুরু হইতে পারেন না। গুরু ভক্তচূড়ামণি, তিনি সংসারমুক্ত, বিষয়স্পৃহাশূন্য। তিনি যে কোন আশ্রমে বর্ত্তমান থাকিতে পারেন, অর্থাৎ তিনি বৃহদ্ব্রতী, বা গৃহস্থ বা বানপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাসী হইতে পারেন। কিন্তু পাঠক পাঠিকাগণ, সরল অন্তঃকরণে বিচার করিয়া বলুন দেখি যে, আজকাল আমরা যাঁহাদিগকে গৃহস্থ বলি, তাঁহাদের মধ্যে এরূপ গুণান্বিত গুরু হইবার যোগ্য সাধু মহাপুরুষ তাঁহারা কোথাও দেখিয়াছেন কি না? এখন আশ্রমীরই অভাব, গৃহস্থাশ্রমী ত নাইই। গৃহস্থ আশ্রমেই সর্ব্বাপেক্ষা কঠোরতা, এরূপ পরীক্ষার স্থল আর নাই। বাল্যকালে ইন্দ্রিয়সমূহ পুষ্ট হয় না, সে অবস্থায় ব্রহ্মচারী সকলেই থাকিতে পারে। যদি বলা যায়, এই তিন বৎসর বয়স্ক বালকটী খুব বড় ব্রহ্মচারী, ইহার স্ত্রীলোকে আদৌ আসক্তি নাই, তাহা হইলে সেকথা সকলেই উড়াইয়া দেন, কেহ তাহাতে মনোযোগ দেন না, কেন না তাহার পরীক্ষারকাল এখনও আসে নাই। তৎপরে ৮।১০ বৎসর বয়সে গুরুকুলে থাকিয়া ভোগোপাদানের অন্তরালে থাকায় ব্রহ্মচারীর হৃদয়ের স্পৃহা সমূহ জাগরূক হইবার সেরূপ সুযোগ পায় না। তৎপরে পূর্ণ যৌবনে যখন রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া ভোগের রাজ্যে প্রবিষ্ট হয়, তখন ইন্দ্রিয় সংযত রাখিয়া গৃহস্থধর্ম পালন করা যে কত কঠিন তাহা নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রই বুঝিতে পারেন। সেই জন্যই আজ গৃহস্থের এত অভাব, আজ সব পতিত গৃহস্থ, কেহ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন না, কদাচ কচিৎ একটী কি দুইটী। তাহারও সন্ধান পাওয়া দুষ্কর। সুতরাং জানি না অধুনাতন কালে গৃহস্থ

গুরু কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? এখনকার গৃহব্রতগণ গোদাস অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বশ, তাঁহাদের মধ্যে 'গোস্বামী' বা জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির একেবারে অভাব। কৃষ্ণসেবাপর জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির একেবারে অভাব। কৃষ্ণসেবাপর জিতেন্দ্রিয় পুরুষ না হইলে কেহ গুরু হইতে পারেন না। সুতরাং এখন গৃহস্থের অর্থাৎ গৃহমেধী গোদাসের গুরুগিরি সোনার পাথর বাটীর ন্যায় অসম্ভব। এরূপ অবস্থায় গুরুবংশ, গুরুর ঔরস পুত্র গুরু, কিরূপে চলিতে পারে তাহা কি ভাবিবার বিষয় নহে? শিষ্য, প্রশিষ্য লইয়া যথার্থ গুরুকুল, পুত্রপৌত্রাদিক্রমে কখনও গুরুবংশ চলিতে পারে না। সুতরাং কুলগুরু বলিয়া কোন বস্তু বিশেষ পারমার্থিক-শাস্ত্র ও মহাজন স্বীকার করেন না, যুক্তিতেও তাহা সিদ্ধ হয় না। অতএব যাহারা 'কুলগুরু' 'কুলগুরু' করিয়া ভয়ে পারমার্থিকরাজ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার লইতেছেন না, তাঁহারা জানুন যে কুলগুরু বলিয়া যে একটী বোঝা তাঁহাদের বংশের স্কন্ধে চাপান হইয়াছে তাহাতে তাঁহাদের বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইয়াছে, তাঁহারা একটী বৃথা আতঙ্কের ভারে ক্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছেন, তাঁহারা পারমার্থিক উন্নতির জন্য যত্ন করিবার সুযোগ পাইতেছেন না। তাঁহারা শুনুন, উপনিষদ (বেদ) তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ডাকিতেছেন "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত," আবার উৎসাহ দিতেছেন—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। বল সংগ্রহ করিয়া ঐ ভূতের ভয় দূর করিয়া তাঁহারা নিষ্কিঞ্চন সংসারমুক্ত মহাপুরুষের চরণাশ্রয় করিয়া ধন্য হউন। আর কুলগুরুর বৃথা অভিশাপের ভয়ে নিজের নিত্যকাল নষ্ট করিবেন না, মানব জন্ম এবার বৃথায় কাটিয়া গেলে আবার উহা নাও পাইতে পারেন। তখন 'ইতো নষ্ট-স্ততো ভ্রষ্টঃ' হইতে হইবে। তাই ডাকি সাধু সাবধান।

মঠে গৃহ-ভ্রম

গর্ভধারিণী জননী ও ধাত্রীর আচরণ ক্রিয়াকলাপ হাব-ভাব একপ্রকার হইলেও, উভয় বস্তু এক নহে। জননীর অপত্য স্নেহ ধাত্রীতে জন্মে না। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীযশোমতি ও পূতনার ব্যবহার দৃশ্যতঃ একপ্রকার হইলেও বস্তুতঃ এক নহে। বরং বিপরীত। যাঁহারা বাহিরের আচরণ বা ক্রিয়াদি দ্বারা জননী ও ধাত্রী বা যশোদা ও পূতনাকে সমজ্ঞান করেন, তাঁহারা বস্তুর যথার্থ পরিচয় হইতে দূরে থাকেন। ফলে প্রথমতঃ আত্মবঞ্চনা, দ্বিতীয়তঃ পরবঞ্চনা আসিয়া উপস্থিত হয়। এই জড়চক্ষুর প্রদত্ত সংবাদে নির্ভর করিয়া ভোগবাসনা-ময় জড়মন সর্ব্বদাই উপরিউক্ত ভ্রম করিয়া থাকে। যশোদার স্থানে পূতনার হাতে পড়িয়া বিপদগ্রস্ত হন।

পরমার্থরাজ্যেও এই জাতীয় ভ্রম অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। বাহিরের দৃষ্টিতে পরমার্থ ও জড়ীয় অর্থ বা ভোগ্যবস্তু—ভগবানের সেবা ও স্বীয় ইন্দ্রিয়তোষণ অনেকেই একরূপ দর্শন করেন। অনেকে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া পুত্রকন্যাদি লইয়া অর্থোপার্জ্জনপূর্ব্বক দিনপাত করেন, সঙ্গে সঙ্গে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধজনিত ভোগে প্রমত্ত থাকেন। ইঁহারা সংবাদ রাখেন না যে, এই অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর দেহ ভবসাগর তরণের সুপটুপ্লব। কিন্তু যাঁহারা এই মনুষ্যদেহের এই বিশেষত্ব অবগত হইয়া, ক্ষণবিলম্ব না করিয়া মৃত্যু উপস্থিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কায়মনোবাক্যে সর্ব্বথা ভবজলধি উত্তরণ কার্য্যে আত্মবিনিয়োগ করিতেছেন,
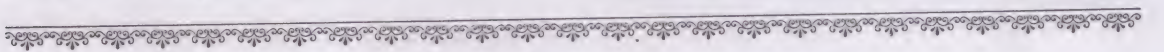
তাঁহাদিগকে যদি ঐ জাতীয় ভোগপরায়ণ মানবগণ স্বীয় স্বীয় ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা করণাপাটবপূর্ণ মনের দ্বারা মাপিতে যান, তবে জননীর স্থানে ধাত্রী বা যশোমতি স্থানে পূতনা দেখিয়া ফেলিবেন।

মঠ বলিয়া যে বস্তুটী বাহিরের দৃষ্টিতে গৃহস্থালীর ন্যায় প্রতীত হয়, বস্তুতঃ উহা গৃহস্থালী নহে। যাঁহারা কায়মনোবাক্যে সর্ব্বস্ব বিষয়ভোগ হইতে তুলিয়া লইয়া বৈষ্ণবের আনুগত্যে আত্মস্থ হইয়া অহর্নিশ শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের সেবায় নিরত, তাঁহারাই মঠে বাস করেন। মঠবাসীর সর্ব্বেন্দ্রিয়ের ভোগরহিত চেষ্টা এবং দীনচেতা গৃহীদিগের প্রতি দয়ার কার্য্য নানা আকারে প্রকাশিত হয়। মঠবাসিগণ সর্ব্বস্ব সরলভাবে শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়াছেন, আর গৃহী সর্ব্বস্ব অর্পণ করা দূরে থাকুক, কপর্দ্দক মাত্রও অনেক সময়ে শ্রীভগবানের সেবায় নিয়োগ করিতে চাহে না। মঠবাসিগণ জীবে দয়ার কার্য্যে ব্রতী বলিয়া ঐ জাতীয় কৃপণ স্বভাব গৃহীর প্রতি দয়া পরবশ হইয়া তাঁহার উপগর্হিত যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া তাঁহারই কল্যাণবিধান করেন। গৃহীর অর্থ সংগ্রহ করিয়া মঠবাসী স্বীয় ইন্দ্রিয় তর্পণ করেন না।

যেহেতু, তাঁহার ইন্দ্রিয়প্রীতি নাই। হৃষীকেশ তাঁহার সমস্ত হৃষীক অপহরণ করিয়া নিজে সেই ধনের অধিকারী হইয়া রাজা সাজিয়াছেন। মঠবাসী হৃষীকেশকে হৃদয় সিংহাসনে বসাইয়া নিত্যকাল সংগৃহীত বস্তু দ্বারা সেবা করিতেছেন। এই সেবাকার্য্যে মঠবাসীর স্বতন্ত্রতা নাই। স্বয়ং নিত্যানন্দের আনুগত্যে অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরের সেবাই মঠের একমাত্র কৃত্য।

মঠবাসিগণ বদ্ধজীবের সুকৃতি জন্মাইয়া তাঁহাদের সাধুসঙ্গলাভের পথ সুগম করিয়া দিতেছেন। এই পথ নির্ম্মাণ ও পথ প্রদর্শন কার্য্যের জন্য মঠের বিবিধ অনুষ্ঠান। যাঁহারা মঠের নিত্যদয়ামূলক অনুষ্ঠান সমূহকে গৃহীর নিত্য নিষ্ঠুরতামূলক ও আত্মহননকারী অনুষ্ঠানের সহিত তুল্যবুদ্ধি করেন, তাঁহাদের দুর্ভাগ্য দর্শন করিয়া মঠবাসিগণ নিত্যকাল আক্ষেপোক্তি করিতেছেন। যাহারা দুষ্কৃতির বশবর্ত্তী হইয়া মঠকে গৃহ, মঠবাসীকে গৃহী, বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণব জ্ঞানে আত্মম্ভরিতার কূপে পতিত হইতেছে, তাহাদের "গতি নাহি কোন কালে।"

মঠ বদ্ধজীবের—ভবরোগীর চিকিৎসালয়। এখানে ত্রিতাপ উন্মূলনকারী ঔষধপথ্য প্রদানের প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা আছে। এখানে যে জীবসেবা হয় তদ্রূপ জীবসেবা গৃহী, কর্ম্মী বা জ্ঞানী করা দূরে থাকুক, তাহার ধারণাও করিতে পারেন না। এখানে জীবহিংসার কোন ব্যবস্থাই নাই। জীবের সত্তারাহিত্য বা সত্তা রাখিয়া উহাকে জড়বৎ অবস্থা প্রদানের চেষ্টারূপ হিংসার অনুষ্ঠান করা হয় না! এখানে বোদ্ধা আছেন, বোধ্য আছেন, বোধ আছেন। এই তিনের নিত্য সহজ সম্বন্ধ মূর্ত্তিমন্ত হইয়া এই মঠে নিত্য বিরাজ করে। সুতরাং মঠবিদ্বেষ বা মঠ বাসীর প্রতি গৃহস্থালীর ভাব আরোপ জীবহিংসারই পরাকাষ্ঠা।

হিরণ্যকশিপু সর্ব্বদা 'হিরণ্য' (অর্থাদি) ও 'কশিপু' (উত্তমশয্যাদি ভোগ-বিলাসের দ্রব্য) প্রাপ্তি, সংগ্রহ ও ভোগের চেষ্টায় বিব্রত, সুতরাং তদ্ বিপরীত বস্তু বিষ্ণু বা বিষ্ণুভক্ত (বৈষ্ণব) দর্শনে অন্ধ। প্রহ্লাদ সর্ব্বদাই হিরণ্যকশিপুর বিপরীত দর্শনযুক্ত। তিনি হিরণ্য ও কশিপুতে কোন প্রকার আহ্লাদ অনুভব করেন না।

তাঁহার প্রকৃষ্ট আহ্লাদ বিষ্ণু বৈষ্ণবে আবদ্ধ। এইজন্য হিরণ্যকশিপু ও প্রহ্লাদে নিত্যকাল বিরুদ্ধভাব সমান্তরাল রেখার ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে। এই দুই রেখা কখনও মিলিত হয় না। 'তামাকও খাব, 'ডুড়' ও খাব দুই কার্য্য যুগপৎ চলিবে না।

একদিন হিরণ্যকশিপু যখন প্রহ্লাদকে নিজের ভোগ্যবস্তু জ্ঞানে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া তাঁহার মস্তক চুম্বনপূর্ব্বক তাঁহার গুরুগৃহে অভ্যস্ত পাঠের হিসাব নিকাশ লইবার ছলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "বৎস প্রহ্লাদ! তুমি গুরুগৃহে এই কয় মাসে যাহা পড়িয়াছ, তাহা আমাকে বল।" উত্তরে প্রহ্লাদ মহারাজ, রাম, শ্যাম, যদু, টাকা, পয়সা, রাজা, যুদ্ধবিদ্যা, স্বদেশ বিদেশ ফলা-বানান সন্ধি সমাস, উত্তম সুন্দরী কবিতা কিছুই না বলিয়া বলিলেন "হে অসুরশ্রেষ্ঠ! যাঁহারা সর্ব্বদা অসৎ বস্তুর সঙ্গ করার ফলে ও নিয়ত উদ্বিগ্নচিত্তে দিনযাপন করিতেছেন, তাঁহারা আত্মাবরণকারী গৃহান্ধকূপ পরিত্যাগ করিয়া বনগমনপূর্ব্বক শ্রীহরিকে আশ্রয় করিলে, তাঁহাদিগের নিত্য কল্যাণ নিত্য শান্তি লাভ ঘটিবে। অন্ধকূপজ্ঞানে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া শুধু পরিষ্কৃত ও মুক্তস্থানে বাস করার চেষ্টার ন্যায় বনে গমন করিলে কোন শ্রেয়োলাভ হইবে না। জীবের হরিভজনই কৃত্য হরিপাদাশ্রয়ই উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য বিহীন হইয়া শুধু সুখলাভ বা মুক্তিলাভের আশায় গিরি গহ্বরে নির্জ্জন কাননাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে কি হইবে? গৃহ ও বনে প্রভেদ কি? বনে গমন করিয়া দিবারাত্র গৃহচিন্তা করিলে তাহা কি বনবাস না গৃহবাস? গৃহে আসক্তি, ভোগবুদ্ধিই গৃহের অন্ধকূপত্ব। যে গৃহী গৃহে আসক্ত নহেন তিনিই বনবাসী, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী, যাঁহার একমাত্র কৃত্য হরিভজন, তিনিই গৃহে থাকিয়াও গৃহবাসী বা গৃহস্থ নহেন তিনি মঠবাসীর বন্ধু; মঠবাসী তাঁহার সঙ্গের জন্য লালায়িত। ঠাকুর মহাশয়ের ভাষায় মঠবাসী বলেন—

"গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকে,
এ অধম মাগে তাঁর সঙ্গ।"

গৃহান্ধকূপস্থিত সদা উদ্বিগ্ন চিত্ত জীবের প্রতি যখন মঠবাসী দয়া প্রকাশ করেন, তখনই সেই পতিত অসুবিধাগ্রস্ত জীব মঠ ও মঠবাসীকে জানিতে ও বুঝিতে পারে। গৃহান্ধকূপে থাকিয়া কূপমণ্ডুকের ন্যায় দিবাকরোজ্জ্বলা শ্যামলা বসুন্ধরা বা দিগন্তরবিস্তীর্ণ জলধির সৌন্দর্য্য উপলব্ধি বা পরিমাপ করিবার প্রয়াসের ন্যায়, যাঁহারা মঠ বা মঠবাসীকে বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের ভ্রান্তির অবধি কোথায়? পতিত জীবের কবে এমন সুবুদ্ধির উদয় হইবে যখন স্বীয় গৃহের কূপত্ব উপলব্ধি করিয়া কাঁদিয়া বলিবে ---

"বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর,
এ দাসে করুণা করি।
দিয়া পদছায়া শোধহে আমারে
তোমার চরণ ধরি।।"

বানপ্রস্থ

"ব্রহ্মচর্য্য" ও "গৃহস্থ" শীর্ষক দ্বিতীয় বর্ষের "গৌড়ীয়ে" আলোচিত প্রবন্ধদ্বয়ে আমরা দেখিয়াছি যে, আধুনিক কালে যথার্থ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অস্তিত্বই নাই। ইহার কারণ ভগবদ্ভজন হইতে বিচ্যুতি। বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্মের মূলে হরিতোষণই অবস্থিত, তদ্ভিন্ন তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তা থাকিতে পারে না, আমরা এখন ফলেও তাহাই দেখিতেছি। ভগবানের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত এই ভারতভূমিই হরিভজনের তথা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উৎপত্তি ও অবস্থিতিস্থল; কিন্তু হায়! আজ সেই ভারতবর্ষ হইতেও ভগবদ্ভজন দূরে চলিয়া গিয়াছে, সুতরাং বর্ণাশ্রমধর্ম্মের স্থল কোথায়? ভারতবাসী যে পূর্ব্বে বিদেশীকে যবন, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি সংজ্ঞায় সজ্ঞিত করিতেন, তাহার মূলে বিদেশিবিদ্বেষ বা গোঁড়ামি ছিল না। যাহারা ভগবদ্ভজনমূলক বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করে নাই, তাহারাই অন্ত্যজ যবন, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি আখ্যা লাভ করিত। ভগবদ্ভক্তিমূলে বর্ণাশ্রমের অভাবেই ভারতেতর দেশবাসিগণ তত্তন্নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু আজ আমরা কি? যদি সত্যকথা শুনিলে আমরা বিরক্ত না হই—কিন্তু আমরা তাহাই হইয়া থাকি—

সাঁচ্চা কহে ত' মারে লাঠ্যা
ঝুট্টা জগৎ ভোলাই–

যদিই আমরা সত্যকথা ভাবিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে আমরা স্পষ্ট দেখিব, আমরা প্রায় সকলে অন্ত্যজ হইয়া গিয়াছি। হরিভজন শিক্ষার অভাবে, আজ আমরা ব্রহ্মচর্য্যপালনে পরাঙ্মুখ হইয়া আশ্রমধর্ম্মের লোপসাধন করিয়াছি, এবং বর্ণধর্ম্মের বিপ্লব ঘটাইয়াছি। কিন্তু আমরা নিশ্চিত জানি যে, যতই আমরা রাজনীতিক উন্নতি করি না কেন, ভারতের পূর্ব্বগৌরব, পূর্ব্বসভ্যতা—যাহা ভারতের নিজস্ব সম্পত্তি ছিল—তাহা পুনরানয়নের আশা আমরা ততদিন করিতে পারি না যতদিন পুনরায় ভারতে বিষ্ণু প্রীতিমূলে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সংস্থাপিত না হয়। আমরা ভোগ প্রবণতা জন্য বদ্ধ হইয়াছি। এক্ষণে আমাদের হরিভজনে স্বতঃ অনুরাগ আসার সম্ভাবনা বিরল, সুতরাং বিধি-প্রণোদিত হইয়া আমাদিগকে ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এ অবস্থায় বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিধান পালন ভিন্ন আমাদের মঙ্গল প্রাপ্তির আশা নাই।

ভোগ ও সেবা দুইটী বিরুদ্ধ ব্যাপার। সেবা—আত্মার ধর্ম্ম। ভোগ—দেহ ও মনের ধর্ম্ম। ভোগের ধর্ম্মই আমাদিগকে বদ্ধ করিয়াছে। যখন ভজনবলে ভোগপ্রবৃত্তি আমাদের ত্যাগ করিবে, তখন আমরা ভগবৎসেবার অধিকার পাইব। সেবাবৃত্তি বৰ্দ্ধিত হইলে ভোগের নেশা কাটিয়া যাইবে। ভোগপ্রবৃত্তির হ্রাসের নামই সংযম। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সেই সংযম শিক্ষার ভূমিকা। আমরা বাল্যকাল হইতে গুরুগৃহে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্যপালনমুখে সেই সংযমশিক্ষা আরম্ভ করিব—ইহাই শাস্ত্রবিধি। পরে আবশ্যক হইলে প্রবৃত্তির বাঁধ ভাঙ্গিবার ভয়ে কিছু কিছু ভোগ স্বীকার করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক সেই সংযমন পালন করিতে থাকিব—ইহাই শাস্ত্রাদেশ। যথাবিধি গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালনের ফলে আমাদের রজোবৃত্তি প্রশমিত হইলে আমরা

সত্ত্বে অধিষ্ঠিত হইতে পারি। আয়ুষ্কালের অর্দ্ধপথে এই ব্যবস্থা। এই অবস্থায় ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিয়া আমরা বনচারী বা বানপ্রস্থ হই অর্থাৎ গৃহিগণের সঙ্গ বর্জ্জন করিয়া যেখানে ভোগবিরত সাধুগণ হরিভজন করিতেছেন, সেখানে তাঁহাদের মধ্যে থাকিয়া তাঁহাদেরই সঙ্গ করিতে করিতে নিঃসঙ্গভাবে হরিতোষণ ব্যাপারে লিপ্ত হইতে পারি।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"বনং তু সাত্ত্বিকো বাসঃ গ্রামো রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্।।"

নানারূপ অবৈধ ভোগের লীলাক্ষেত্র বঙ্গালয়, ক্রীড়াভূমি, হরিসম্বন্ধি ব্যতীত অন্য নৃত্যগীতনাট্য তৌর্য্যাত্রিকাদি, পানালয়, বনিতাকুঞ্জ, দ্যূতক্রীড়া প্রভৃতি তামসিক ব্যক্তির তাণ্ডবনৃত্যের স্থান, সকল অবস্থায় সর্ব্বতোভাবে এইগুলি বর্জ্জন না করিলে মনুষ্যত্ব হারাইতে হয়। গ্রামাদিতে গৃহস্থগণ সংযতভাবে প্রবৃত্তির প্রশ্রয় প্রদান রাজসবৃত্তির অধীন হইয়া পড়েন। ক্রমে বল সংগ্রহ করিয়া রাজস গ্রাম্যবাস ও গ্রাম্য ব্যবহার ত্যাগ করিয়া সত্ত্বসমাশ্রয় করার নাম বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বন।

সময়ে সময়ে শুনা যায় যে কোন কোন বিরক্তপুরুষ সস্ত্রীক বানপ্রস্থ আশ্রয় করিয়াছিলেন। আমরা জানি শাস্ত্রে উপদেশ করিয়াছেন, "সস্ত্রীকো। ধর্ম্মমাচরেৎ।" শাস্ত্র প্রতিপদে আমাদিগকে ভোগপ্রবৃত্তি সঙ্কোচ করিয়া নিবৃত্তির পথে পরিচালন করিতেছেন। স্ত্রীপুরুষমিলনের উচ্ছৃঙ্খলতা নিরাকরণ জন্য বিবাহ ব্যবস্থা করিয়া দিয়া সস্ত্রীকধর্ম্মাচরণে উপদেশপূর্ব্বক আমাদিগকে কেবল সংযত করিতে চাহেন। যথাবিধি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াও যাঁহাদের কিছু ভোগ প্রবৃত্তির লেশ অবশিষ্ট থাকিত, তাঁহারাই যথাবিধি সমাবর্ত্তনপূর্ব্বক বিবাহ দ্বারা গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক সেখানেও শাস্ত্রনির্দেশে আয়ুষ্কালের এক চতুর্থাংশ সস্ত্রীক ধর্ম্মাচরণ করিয়া সংযমের সহিত কিঞ্চিন্মাত্র ভোগ্য স্বীকার করিতেন। পরে বানপ্রস্থাশ্রমে প্রবেশের সময় যদি সহধর্ম্মিণীও বিগতস্পৃহা হইতে সমর্থা হইয়া থাকেন, তখন একযোগে আশ্রমোচিত ধর্ম্ম পালন জন্য উভয়েই বানপ্রস্থাশ্রম আশ্রয় করিতেন। উভয়ে সংসার হইতে অন্যত্র বিষয়িসঙ্গ বর্জ্জন করিয়া সাধুসঙ্গে হরিভজনে প্রবৃত্ত হওয়াই উভয়ের বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করা, সে অবস্থায় পরস্পরের ভোগবুদ্ধি সম্পূর্ণ তিরোহিত হইবে; তাহা যদি না হয়, তবে আশ্রম নষ্ট হইয়া যায়; বনে গমন করিয়াও গৃহস্থের আচরণ করিলে বান্তাশী বা ছর্দ্দিভোজীর ন্যায় সকলের ঘৃণার আস্পদ হইতে হয়। আসক্তি লইয়া বানপ্রস্থ বা বনচারী হওয়া যায় না, হইতে গেলে অবৈধ সংসার হইয়া যায় সেই "গীতার সংসারের" ন্যায় সংসার পাতান অত্যন্ত ঘৃণার কার্য্য। "গীতা" লইয়া একজন বনচারী হইলেন, বনে পত্রকুটীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক গীতা পাঠ করেন। ক্রমে কিছু মূষিকের উপদ্রব হইল, গীতার দপ্তর ইন্দুরে কাটিল। সুতরাং তিনি বুঝিলেন, বিড়াল আবশ্যক, একটী সংগৃহীতও হইল। এখন বিড়াল কি খাইবে? বনে দুগ্ধসংগ্রহ আবশ্যক, তাই একটী গাভীও সংগ্রহ করা

হইল। ক্রমে গাভীপালনের জন্য একটী রাখাল ও রাখালের তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত পুনর্ব্বার নবীনা গৃহিণী আসিয়া জুটিলেন। সন্তানসন্ততিরও অভাব রহিল না। জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "এটী আমার সংসার নয়—গীতার সংসার" এরূপ গীতার সংসার অসংযত পুরুষই করিয়া থাকেন, সংযমাভাবের কারণ হরিভজনে অরতি। সুতরাং দেখা যায় যাঁহারা নিষ্কপটভাবে সাধুগুরু- পাদাশ্রয়পূর্ব্বক হরিভজনে প্রবৃত্ত না হইতে পারিয়াছেন, তাঁহারা বনচারী কখনই হইতে পারেন না, তা'কেন যথার্থ গৃহস্থ হইবারও তাঁহাদের যোগ্যতা নাই। হরিভজনসহকারে গৃহস্থাশ্রমে বাস করিয়া সংযম- শিক্ষাপূর্ব্বক তবে বনচারী হওয়া যায়। এ অবস্থায় হরিভজন আরও পুষ্ট হইয়াছে, তাই ভোগরহিত অবস্থা সম্ভবপর হইয়াছে। ভোগের সমূহ উপকরণ হইতে দূরে থাকিয়া হরিভজনের নামই বানপ্রস্থাশ্রম-ধর্ম্ম।

সস্ত্রীক বানপ্রস্থ অত্যন্ত কঠোর আশ্রম, যাঁহাদের বিন্দুমাত্র চিত্তে দুর্ব্বলতা নাই, যাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীভগবান্ আসনাসীন হওয়ায় হৃদয় হইতে কামসমূহ সূর্য্যাগমে অন্ধকারের ন্যায় বা সিংহদর্শনে হস্তীর ন্যায় দূরে পলায়ন করিয়াছে, তাঁহারা ভিন্ন অপর কেহই সস্ত্রীক বনচারী হইবার যেন কদাচ চেষ্টা না করেন। বনচারী একক হওয়াই প্রশস্ত। আর সর্ব্বদা সাধুসঙ্গে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণরূপ ভজনাঙ্গ পালন করিলে এই আশ্রমের ধর্ম্ম সুরক্ষিত হয়। যাঁহারা মনে করেন, আমরা দুর্ব্বল, আমরা গৃহস্থই থাকি, তাঁহারা আর গৃহস্থ নহেন, গৃহব্রত। সুতরাং নিজ নিত্য মঙ্গলাভিলাষী সাধুসঙ্গে মঠাদিতে বাস করিয়া হরিভজনে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহা হইলে তাঁহার ভোগ-প্রবৃত্তি ক্রমে বিদূরিত হইবে। তিনি যথার্থ বনচারী বা মুনি হইতে পারিবেন।

এই বানপ্রস্থাশ্রম হরিভক্তিমূলে যুক্তবৈরাগ্যশিক্ষার চতুষ্পাঠী। এই পাঠ সাঙ্গ হইলে আর লোক সঙ্গকে একেবারে দূরে রাখিতে হইবে না। তখন ভোগস্পৃহা সমূলে দূরীভূত হইয়া হৃদয়কে সম্পূর্ণ নির্ম্মল করিবে, সুতরাং বিষয়ীর দর্শনমাত্রেই পদস্খলনের আশঙ্কা থাকে না, তিনি পরিব্রাজকরূপে পৃথিবীপর্য্যটনে যোগ্যতা লাভ করেন।

অনেক বনচারীকে যে সংসার পাতিতে দেখা গিয়াছে, ঋষিবালক বা ঋষিকন্যার কথা যে শুনা গিয়াছে, তাহার কারণ ফল্গু বৈরাগ্যাভ্যাসের পতন। হরিসেবাবুদ্ধি আশ্রয় না করিয়া বনচারী হইতে গেলে পতন অবশ্যম্ভাবী। আমরা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিব যে, সকল আশ্রমের মূলে হরিভজন। হরিভজন ভিন্ন আশ্রম রক্ষা হইতেই পারে না। তাই শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ দিয়াছেন।

"য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ।।"

ভগবদ্ভজন ভিন্ন আশ্রম হইতে চ্যুত হইয়া অন্ত্যজ হইতে হয়।

জগৎ কাহার ভোগ্য?

এই ফুল-ফলে-ভরা বসুন্ধরা, এই রমণীয় প্রকৃতি, এই সাগর, এই কানন, এই মানবজগতের সভ্যতার ফলস্বরূপ কত বিলাস-সম্ভার—এ সকল কাহাদের ভোগ্য? ভোগিপাল বলিবেন,—এ সকল আমাদের জন্য। ধনিক সম্প্রদায় বলিবেন,—আমাদের অর্থ আছে, আমরা অর্থের সাহায্যে জগতের যা কিছু সুন্দর, সভ্যতার যা কিছু আবিষ্কৃত বস্তু আমরাই উপভোগ করি।' ত্যাগিকুল বলিবেন,—আমরা চাই না ঐ সকল বিলাস, উহারা সব মায়া। কিন্তু এই যে বিবাদ অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, ইহা মিটায় কে?

পরমহিতকারিণী শ্রুতিমাতা এই বিবাদ মিটাইয়া দিয়াছেন—কিন্তু আমরা তাঁহার মঙ্গলোপদেশ উপেক্ষা করিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন,—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।।"

ঈশোপনিষৎ প্রথম মন্ত্র।

এই জগতে যাহা কিছু জগৎ অর্থাৎ নশ্বর বস্তু, সকলেই ওতঃপ্রোতভাবে পরমেশ্বরের সত্তা ও চৈতন্য ব্যাপিয়া রহিয়াছে। অতএব যুক্তবৈরাগ্যসহকারে ভগবানের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ কর। ভগবানের ধনে লোভ করিও না।

কিন্তু আমরা কি অবাধ্য সন্তান! কি কুলাঙ্গার!! মাতার আদেশই সর্ব্বতো- ভাবে অমান্য করিতেছি। আমরা কেহ ভগবানের ভোগের বস্তুতে হস্ত প্রসারণ করিতেছি, কেহ বা শ্রীভগবান আমাদের নিকট যে সম্পত্তি গচ্ছিত রাখিয়াছেন, তাহার অসদ্ব্যবহার করিতেছি, আবার কেহ ভগবানের উচ্ছিষ্ট বস্তুকে প্রাপঞ্চিক জ্ঞানে পরিত্যাগ করিতেছি। শ্রীভগবান্ নিজ মুখেই না বলিয়াছেন—"মদ্ভক্তপুজাভ্যধিকা"—"আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়"; তিনি না ব্রহ্মাকে আরও বলিয়াছেন—'ভক্তস্য রসনাগ্রেণ রসমশ্নামি পদ্মজ'—'হে পদ্মযোনি ব্রহ্মন্, আমি ভক্তের রসনায় রস গ্রহণ করি" সুতরাং যাবতীয় বস্তুত ভগবানের ও ভগবানের সেবকের। ভগবানের সেবক—ভগবানের সেবার জন্য জগতের বস্তুসকলকে গ্রহণ করেন---উহা ভগবানের সেবায় নিয়োগ করেন। হায় মূঢ় আমি, অন্ধ আমি, "কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ"—কামুকগণ জগৎই কামিনীময় দর্শন করে, কামলারোগী সব বস্তুকেই হরিদ্রাবর্ণ বলিয়া দেখে--আমিও তদ্রূপ ভক্তগণের আচারকে আমার আচারের সদৃশ মনে করি। তাহা ত নয়—আমার দর্শন ত ভুল।

জগতের যা কিছু শ্রেষ্ঠ জিনিষ—সমস্তই ভগবানের অংশ সম্ভূত, ইহা গীতার বাণী, সুতরাং ঐ সকল বস্তু যদি ভক্ত ব্যবহার করেন তাহা হইলেই ঐ সকলের যথার্থ সদ্ব্যবহার হইবে, উহার দ্বারা ভগবানের সেবা হইবে। জগতে যত বৃহদট্টালিকা আছে, সমস্তই ভগবন্মন্দির হইলে সেই সকল স্থান হইতে ভোগের পৈশাচিক নৃত্য বিদূরিত হইবে, জগতে যত সুন্দর আলোক আছে তাহা ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও ভক্তের সেবায়

নিযুক্ত হইলে ঐ সকল দ্বারা বারবণিতার মুখদর্শনরূপ নরকগমনের কার্য্য নিবারিত হইবে—মলয় পবন, বৈদ্যুত্যিক পাখা ভগবান্ ও ভগবানের সেবাকারী ভক্তের সেবায় নিযুক্ত হইলে বেশ্যালয়ে, নাট্যালয়ে ভোগিপালের নরকগমনের পথ রুদ্ধ হইবে, পুষ্পকরথ, এরিওপ্লেন্, মটোরকার, বাষ্পযান ভোগিকুলের সেবা না করিয়া ভগবানের সেবারত ভক্তের সেবা করিলেইত যথার্থ সভ্যতার সার্থকতা হইবে--অনিত্য জগতে·নিত্যফল প্রসব করিবে। ভগবানের সেবকের বৈদ্যুতিক পাখা, মটোরকার, সুন্দর সুন্দর অট্টালিকায় বাস-তিনি তাহা নিজ ভোগের দ্রব্য বলিয়া স্বীকার না করিয়াও তদ্দ্বারা ভগবৎসেবা করিয়া থাকেন। মূঢ় লোক, বহির্ম্মুখ চিন্তায় পরিপূরিত তোমার মস্তক, ভক্ত সেবিত হইয়াও কিপ্রকারে সেবা করেন, তাহার তুমি ধারণা করিয়া উঠিত পার না! গোপিগণ মার্জ্জিত, বিচিত্র-অলঙ্কার-ভূষিত, নানাবিধ বস্ত্রে সুসজ্জিত, বহুবিধভাবে সেবিত হইয়া ভগবানের সেবাই করেন, শুন, ঐ ভক্তচূড়ামণি কি বলিয়াছেন—

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে প্রীত।
সেহোত কৃষ্ণের লাগি' জানিহ নিশ্চিত।।
এই দেহ কৈল আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন তাঁর এই সম্ভোগ কারণ।।
এই দেহ স্পর্শে কৃষ্ণ-সন্তোষণ।
এই লাগি করে অঙ্গের মার্জ্জন ভূষণ।।

সাবধান! দেহারামী, তুমি যদি ইহা অনুকরণ করিতে যাও, তুমি নরকে যাইবে। কারণ তুমি কৃষ্ণের সেবা জাননা। কিন্তু যিনি কৃষ্ণের সেবা জানেন, অপরের দ্বারা কৃষ্ণের সেবা করাইতে জানেন, জগতের যা কিছু শ্রেষ্ঠ, সুন্দর, মনোরম—যদি সেই সেবকের সেবায় লাগে তবে তার শ্রেষ্ঠত্ব, সুন্দরত্ব ও মনোরমত্ব; নতুবা উহা মূত্র পূরীষবৎ ত্যজ্য। উহাতে নরকের পূতিগন্ধ ছাড়া কিছু নাই।

যাদের বহির্ম্মুখ দৃষ্টি প্রবল, প্রাকৃত বিচার প্রবল, তারা ভোগের ব্যতিরেক ফল্গু ত্যাগকেই বড় মনে করে, উহা বহির্ম্মুখতা, প্রাকৃতাভিনিবেশ ছাড়া আর কিছু নহে। সেবক ভগবানের সেবার জন্য রথে চড়িতে পারেন—এবং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের লোক সকল সেই রথের কাছি ধরিতে পারিলে কৃতার্থ হন। সেবক ভগবানের সেবার জন্য জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য্য স্বীকার করিতে পারেন। জগতে ত' শ্রীনারায়ণের অনন্ত ঐশ্বর্য্যের একটু বিকৃত প্রতিফলন মাত্র দেখা যাইতেছে। বিষ্ণু ও বৈষ্ণবেরই জগৎ। তাঁহারাই জগতের একমাত্র অদ্বিতীয় ভোক্তা। এই জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকে শ্রীব্যাসদেব সেই স্বরাট্ পুরুষকে তদীয় ভক্তগণের সহিত ধ্যান করিতেছেন।

চতুর্থাশ্রম

বর্ণাশ্রমের পরাকাষ্ঠায় আমরা সন্ন্যাসী বা যতিকে দেখিতে পাই। আমরা পূর্ব্ব তিনটী আশ্রমের অলোচনা কালে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, বর্ণাশ্রমের মূল যে হরিভজন, তাহার অভাবে অধুনাতন কালে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তাহার চরম যে যতিধর্ম্ম তাহার ত' কথাই নাই। হরিভজনের পুষ্টিক্রমে মনুষ্যের সন্ন্যাসাশ্রমে অধিকার হয়। সন্ন্যাসীর জাগতিকবস্তুতে ভোগ্যবুদ্ধি তিরোহিত হইয়াছে, ইতরবিষয়ে স্পৃহাশূন্য হইয়া তিনি হরিভজনে নিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। আজ-কাল এরূপ সন্ন্যাসী অতিশয় বিরল। সন্ন্যাসী পরিচয়ে পরিচিত অনেক গেরুয়া বেশধারীর আজকাল আবির্ভাব হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহারা সাধারণতঃ অবান্তর উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই বেযোপজীবী হইয়াছেন, এরূপ সন্ন্যাসীর পোষাক কলঙ্ক আনয়ন করে। যাঁহাদের চরিত্র এত ঘৃণিত নয়, যাঁহারা কনককামিনী প্রতিষ্ঠাকেই জীবনের সম্বল করেন নাই; তাঁহাদের মধ্যে সকলেই সন্ন্যাসের মূলমন্ত্র যে হরিভজন, তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ন'ন। তাঁহারা আত্মবঞ্চনা নামক ফল্গু বৈরাগ্যের গরিমাতেই ব্যস্ত। বৈরাগ্যযুক্ত অর্থাৎ আসক্তিরহিত অবস্থায় ভগবৎ সেবায় বস্তুনিচয়ের নিয়োগ বিহিত না হইলে অন্তঃসারশূন্য হইলে জীবের মঙ্গলপ্রদ হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত অভ্রান্তভাষায় আদেশ করিয়াছেন—

> ''নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
> ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।।''

যে বিরাগের ফলস্বরূপে ভগবৎসেবা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এইরূপ বৈরাগী জীবনধারণ করিয়াও মৃত। আমাদের যথার্থ জীবন অর্থাৎ নিত্যস্বরূপ ভগবৎসেবা, সেই সেবাবিমুখ অবস্থায় আমাদের যে বদ্ধাবস্থা তাহাই মৃত্যু। যাঁহার হরিভজন যে পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ভগবদিতর বস্তুতে তাঁহার সেই পরিমাণে বিরাগ হয়। ভজনপুষ্ট হইতে বনচারীর ইতরস্পৃহা কমিয়া কমিয়া ক্রমে সকল বস্তুতেই হরিসম্পন্ধ দৃষ্ট হষ, সে গুলিকে আর জীবভোগ্য বলিয়া ধারণা থাকে না, তখন উপনিষদের ''ঈশাবাস্য'' শ্লোকের মর্ম্ম সম্যক্ উপলব্ধ হয়। ইহাই সন্ন্যাসীর পক্কাবস্থা। তখন ''সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ'' এই মহাভাগবত পরমহংসের অবস্থায় ''যাহাঁ নেত্র পড়ে তাঁহা ইষ্টদেবমূর্ত্তি'' দর্শন হয়।

বানপ্রস্থাশ্রম হইতে সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশের পর মঠাদিতে বাসকালে সন্ন্যাসীর ''কুটীচক'' অবস্থা; পরে পরিব্রাজক বা বহুদকের অবস্থা। তৃতীয় ''ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ'' ন্যায়ানুসারে সকলবিষয়ে ঈশ্বরসম্বন্ধরূপ ''হংস'' অবস্থা এবং চতুর্থ বিধির অতীত হইয়া ''হরিরসমদিরা-মদাতিমত্তা ভুবি বিলুঠাম নটাম নির্ব্বিশাম,'' ''গায়তি রোদিতি রৌতি নৃত্যতি হসত্যুন্মত্তবৎ'' আশ্রমাতিরিক্ত ''পরমহংস'' অবস্থা। বিধির এই শিথিল অবস্থায় আশ্রমচিহ্ন দণ্ডাদি আর থাকে না। সন্ন্যাসীর পরিধেয় গৈরিক বসনাদির ব্যবহার তখন একান্ত প্রয়োজন বলিয়া মন হয় না। গৃহস্থের আকারেও পরমহংস গৃহে পর্য্যন্ত থাকিতে পারেন, কিন্তু তিনি গৃহস্থ নহেন।

আশ্রম পরিচয় দেহ ও মন সম্বন্ধে; যিনি জীবন্মুক্ত, তাঁহার দেহে আমি ও আমার বুদ্ধি নাই, সুতরাং তাঁহার আশ্রম পরিচয় নাই। তাঁহার পরিচয় আত্মা সম্বন্ধে, সেটী, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ভাষায়—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যদির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ।।"

আত্মজ্ঞ মহাপুরুষ কোন বর্ণের অন্তর্ভুক্ততত্ত্ব নহেন কোন আশ্রমবিশেষে অবস্থিত নহেন। তিনি পূর্ণচিদানন্দময় শ্রীশ্রীভগবানের দাসের দাস এই তাঁহার স্বরূপ পরিচয়। বৈষ্ণবই পরমহংস, কেননা, যথার্থ বৈষ্ণবেরই এই অবস্থা। যাঁহাদের এরূপ অধিকার হয় নাই, তাঁহারা বৈষ্ণব বা মহাভাগবত এখনও হইতে পারেন নাই, ক্রমে এইরূপ মহাপুরুষের অহর্নিশসঙ্গক্রমে জড়াভিমান সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইলে তাঁহারাও পরমহংসাধিকারে উন্নীত হইবেন, তখন আপনাকে নিষ্কিঞ্চন তৃণাধিকহীন বোধ করিবেন। এরূপ সন্ন্যাস শিরোমণির গৃহেবাসও অবৈধ নয়, কেননা, তাঁহার গৃহীর ধর্ম্ম নাই, তিনি নিরন্তর হরিসেবাময়। কিন্তু তাঁহাকে গৃহে দেখিয়া আমরা অন্যান্য গৃহীর সমান মনে করিয়া অপরাধী হইয়া পড়ি, আমরা ভুলিয়া যাই—

"যে দিন গৃহে ভজন দেখি
গৃহেতে গোলোক ভায়।"

আবার যদি তাঁহাকে ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিয়া শুনিয়া থাকি, তবে মনে করি, আমিও যেরূপ গৃহধর্ম্ম করিতেছি, উনিও সেইরূপ গৃহধর্ম্ম করিয়াও যখন ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজিত, তখন আমিও গৃহাভিনিবেশ সত্ত্বেও ভক্ত হইতে পারিব। এটী একটী ভীষণ ভ্রান্তি। ভক্তি ও গৃহাভিনিবেশ দুইটী সম্পূর্ণ বিপরীত।

নিত্যমুক্তপার্ষদ মহাপুরুষগণ গৃহস্থের ন্যায় থাকিয়া বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রম যথাবিধি স্বীকার না করিয়াও পরমহংস বলিয়া আমরা বর্ণাশ্রম বিধির ক্রম প্রয়োজনীয় বলিয়া স্বীকার করি নাই, নিজেরাও গৃহব্রত অবস্থা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নই, দেহসম্বন্ধে কোন আত্মীয়কেও বনচারী বা যতি হইতে উপদেশ দিই না, কাহারও সে প্রবৃত্তির উন্মেষ হইলে আমরা তাঁহাকে যথাসাধ্য বাধা দিই, কেহ আশ্রমান্তর গ্রহণ করিলে তিনি যে সকল সাধুর সঙ্গ করেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে নানা মন্দ কথা কহিয়া বৈষ্ণবাপরাধের চরম করিয়া অশেষ দুষ্কৃতি সঞ্চয় করি। বদ্ধজীবের প্রতিই সাধনানুকূল বর্ণাশ্রমবিধি, সাধক সিদ্ধের ভাণ করিলে পতন অনিবার্য্য, গৃহে থাকাকালে হরিভজন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইবার পক্ষে অন্তরায় হইলে তখনই গৃহবর্জ্জন বিধেয়। আমাদের আবশ্যক হরিভজন, গৃহও নয়, বনবাসও নয়, আর সন্ন্যাসও নয়। তবে যখন যেটী ভজনের অনুকূল হইবে, তখন সেটীই স্বীকার করিতে হইবে, নচেৎ গৃহাভিনিবেশ অত্যন্ত প্রবল হইয়া গিয়া ভজন নষ্ট হইয়া যায়। আর সাধুসঙ্গ ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই, যেহেতু সাধুগণই তাঁহাদের উপদেশাবলীরূপ অসি দ্বারা আমাদের অনাদিকাল হইতে সঞ্চিত বিষয়াভিনিবেশরূপ হৃদয়গ্রন্থি ছেদনে তৎপর। সাধুসঙ্গ

ভিন্ন আমাদের সংসারনাশের আর অন্য উপায় নাই। গৃহে সাধুর বাস অসম্ভব না হইলেও অতি বিরল। সুতরাং নিরন্তর সাধুসঙ্গ জন্য গৃহত্যাগ করিয়া সাধুগণের সহিত বাস আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। এরূপ অবস্থায় আমাদের গৃহধর্ম্ম আর থাকিতে পারে না। যখন সাধুসঙ্গ হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণাদিরূপ ভজনপথে আমাদের রতির উদয়, তখন আমাদের সংসার ধর্ম্মে নির্ব্বেদ আসিবে। এ অবসর, এ সুযোগ ত্যাগ করা কোনও বুদ্ধিমানের উচিত নহে। তাই শাস্ত্রেও আদেশ করিয়াছেন,—

"যদহরেব বিরজ্যেত তদহরেব প্রব্রজেৎ"।

যখন ইতর বিষয়ে বিরাগ আসিবে, তখনই প্রব্রজ্যা গ্রহণ বা গৃহত্যাগ বিধেয়। অবশ্য বিরাগ বলিতে সম্বন্ধ জ্ঞান সকলকেই বুঝিতে হইবে, পরেশানুভবই বিরাগের মূল। নচেৎ স্ত্রীর সহিত কলহ করিয়া বিরাগ বা শ্মশান বৈরাগ্য করিয়া কোনও লাভ নাই। সম্বন্ধজ্ঞানের অভাবে সে ফল্গুবৈরাগ্য কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। কিছুক্ষণ বা কিছু দিনের পরেই গৃহিণীর জন্য মন ব্যাকুল হইবে, তখন আশ্রমান্তর গৃহীত হইয়া থাকিলে বান্তাশী হইতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া গৃহস্থিত পরমহংস বৈষ্ণব কখনও বান্তাশীর ন্যায় ঘৃণ্য হইতে পারেন না, কেন না তাঁহার গৃহাভিনিবেশ নাই, তিনি নিরন্তর হরিভজনে তৎপর ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। পরন্তু বান্তাশীর লক্ষণ শাস্ত্রে কথতি হইয়াছে—

"যঃ প্রব্রজ্য গৃহাৎপূর্ব্বং ত্রিবর্গাবপনাৎ পুনঃ।
যদি সেবেত তান্ ভিক্ষুঃ স বৈ বান্তাশ্যপত্রপঃ।।"

(ভা ৭।১৫।৩৬)

যিনি ধর্ম্মার্থকামলাভের স্থান গৃহ ত্যাগ করিয়া পরে আবার সেই গুলির পুনরায় সেবা করেন তিনি বমনভোজী নির্ল্লজ্জ। পরমহংস ঠাকুর এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীব নহেন। তিনি নিরন্তর হরি-সেবায় মত্ত থাকিয়া ধর্ম্মার্থকাম জন্য কখনও ব্যস্ত হ'ন না।

শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে আশ্রমধর্ম্ম বিবৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে ত্রয়োদশে যতিধর্ম্ম দৃষ্ট হয়। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ সেই গুলি দেখিতে পারেন, সেগুলির বিস্তার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

যাঁহারা কতকগুলি পুরাণবচন উল্লেখ করিয়া "কলিতে সন্ন্যাস নাই" এরূপ বিতণ্ডা করেন, তাঁহারা যেন কৃপাপূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয় পত্রের দ্বিতীয় বর্ষের ২৯শ সংখ্যায় উক্ত প্রবন্ধ আলোচনা করেন। শ্রীবল্লভাচার্য্য প্রণীত "সন্ন্যাস নির্ণয়" গ্রন্থে আমরা দেখিয়াছি কলিকালে কর্ম্মমার্গে ও জ্ঞানমার্গে সন্ন্যাস হইতে পারে না।

"কর্ম্মমার্গে ন কর্ত্তব্যঃ সুতরাং কলিকালতঃ।"
"অতঃ কলৌ স সন্ন্যাস পশ্চাত্তাপায় নান্যথা।
পাষণ্ডিত্বং ভবেচ্চাপি তস্মাজ্ জ্ঞানে ন সন্ন্যস্যেৎ।"
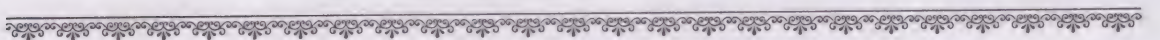
কেবল ভক্তিমার্গেই সন্ন্যাস সিদ্ধ হইতে পারে—

"দুর্লভোঽয়ং পরিত্যাগঃ প্রেম্না সিধ্যতি নান্যথা।"

"সন্ন্যাসবরণং ভক্তাবন্যথা পতিতো ভবেৎ।।"

ভক্তি মার্গাবলম্বন ব্যতিরেকে সন্ন্যাসবরণ করিলে পতন অনিবার্য্য।

বৈদিক সন্ন্যাসীর প্রধান চিহ্ন দণ্ড। পরমহংসগণ দণ্ডাদি আশ্রম চিহ্ন ধারণ করেন না। আজকাল অনেক সন্ন্যাসী নামধারী গেরুয়া পরিহিত ভদ্রলোককে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা দণ্ডধারণ করেন না, বেশ ত্রিকচ্ছবসন পরিধান করেন, কৌপীন গ্রহণ করিয়াছেন কিনা জানি না। তাঁহারা বৈদিক সন্ন্যাসী নহেন ইহা ধ্রুব কথা, তবে তাঁহারা দলকে দল পরমহংস কিনা কে বলিবে? কিন্তু পরমহংসের পূর্ব্বে যে সকল লক্ষণ বলা হইয়াছে, তাহার সহিত মিলাইয়া লইলে তাঁহাদের মধ্যে কয়জন পরমহংস পাঠকগণ পাইলেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে একটী তালিকা দিবেন।

কোন কোন সম্প্রদায়-বৈভবানভিজ্ঞ ব্যক্তি আপত্তি তুলেন যে, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ভক্তগণ সন্ন্যাসগ্রহণ করেন নাই। আমাদের মনে হয় তাঁহারা ত্রিদণ্ডীস্বামী প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ প্রমুখ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদভক্তগণের চরিত্র সম্বন্ধে উদাসীন। আর তাঁহার প্রিয়তম পার্ষদ শ্রীস্বরূপদামোদর, যাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য, তিনি কোন্ আশ্রমী ছিলেন, ছয় গোস্বামী কোন্ আশ্রমী ছিলেন, তাঁহারা কি গৃহী ছিলেন? ভেকাশ্রয় বলিতে কি বুঝায়? ভিক্ষুর আশ্রমকেই ভেক বলে। সন্ন্যাসিগণই গোস্বামী। আজকাল যে বাবাজী মাতাজী দেখিতে পাই, তাহারা কেবল শ্রীশ্রীমহাপ্রভুদাসগণের বেষের হেয় অনুকরণ মাত্র। তাহারা কৌপীনধারী অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গবর্জ্জিত, তাঁহারা গৃহী নহেন। আজ- কালকার সব বান্তাশী বাবাজী (?) দেখিয়া মহাপুরুষগণ সম্বন্ধে একটা বিচার করিতে বসা উচিত নয়। তবে যদি বলেন যে কই তাঁহাদের ত' গৈরিকবসন ছিল না, তাঁহাদের দণ্ডধারণের কথা ত' শুনা যায় না, তাহাতেও আমরা জানিব যে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদ ভক্তগণ ও গোস্বামীগণ সকলে পরমহংস ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে সন্ন্যাসাশ্রমের চিহ্ন গৈরিকবসন পরিধান ও দণ্ডের সর্ব্বক্ষণ গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু তাঁহাদের কৌপীন ও বহির্ব্বাস পরিধান সন্ন্যাসের পরিচায়ক। সেই নিত্যসিদ্ধ পরমহংসগণের বেষের অনুকরণ করিতে গিয়া অনেক অসিদ্ধের পতন হইয়াছে। সন্ন্যাস পরিপক্ক না হইলে ওরূপ পরমহংস বা বৈষ্ণবের বেষ গ্রহণ কর্ত্তব্য নয়। চারি আশ্রমের বৈষ্ণবদাস ব্রাহ্মণের চিহ্ন শিখাসূত্র ও কণ্ঠে শ্রীতুলসীমালিকা। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কেহ বৈষ্ণবের দীক্ষিত দাস হইতে পারেন না। অদীক্ষিতগণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র; মন্ত্রার্থ-বোধাভাবে তাঁহারা বৈষ্ণব শব্দ বাচ্য নহেন।

মোহ

"মোহ" ভগবানের "অঘটনঘটন পটীয়সী মায়ার" শক্তি বিশেষ, ষড়্‌রিপুর অন্যতম বা অন্য রিপুপঞ্চকের জননী সংজ্ঞাবিলুপ্ত বা বস্তুর যথার্থ স্বরূপ ছাড়া বিনিময়জ্ঞানকেও "মোহ" বলে। কখনও কখনও আমরা শারীরিক দুর্ব্বলতাহেতু ইন্দ্রিজ্ঞান হইতেও মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকি, তদ্রূপ চিজ্জগতের অতি ক্ষুদ্র পরমাণু জীব কৃষ্ণসেবারূপ বলহীন হইলে মায়া কর্ত্তৃক সম্মোহিত হইয়া আত্মবিস্মৃত হন। তখন তাহার নিত্য সংজ্ঞা বা সম্বন্ধজ্ঞান আচ্ছাদিত হয়, ইহাকেই 'মোহ' বলে। মোহ প্রাপ্ত হইলে জিজ্ঞাসার অভাব, ইন্দ্রিয় অর্থাৎ অবভাসিক জ্ঞানের প্রবলতা, কর্ত্তব্য বিচ্যুতি নশ্বর বস্তু হইতে সুখেচ্ছা, ইন্দ্রিয়গণের অনিয়ামকতা ইত্যাদি দোষ জীবকে আক্রমণ করে। মোহাবিষ্টতা হইতেই জীবগণ মাৎসর্য্যহেতু আমিত্বে প্রাকৃত বুদ্ধি করে, তাহা হইতে জাগতিক নানাবিধ কামনা, কামের বাধাপ্রাপ্তিতে ক্রোধ ও উপভোগে মত্ততাহেতু পুনঃ পুনঃ বিষয়-সম্ভোগেচ্ছা 'লোভ' নামে কথিত হয়। ইহাই মোহের ক্রমপরিণতি।

মায়ার মোহনক্রিয়া জীবকে মুগ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেও মানবগণ সর্ব্বদাই তাহা মোচনের জন্য যত্ন করিতেছে কিন্তু কিসে তাহার সেই বন্ধন বা অভাব মোচন হইবে তাহা না জানাহেতু অযথা চেষ্টার বন্ধন দৃঢ় হইতেছে। জীব বদ্ধ হইলেও তাহার স্বরূপ ও বৃত্তি একেবারে ভুলিয়া যায় নাই, তাই তাঁহার দৈহিক মানসিক অভাব পরিপূরণের জন্য অত্যন্ত দক্ষতার সহিত গেহনির্ম্মাণ, দেহ রক্ষার্থে উত্তম উত্তম ভোজ্য প্রস্তুতকরণ, সামাজিক বিধিবিধান দ্বারা সমাজ রক্ষা ব্যাধি-প্রশমনে ঔষধ আবিষ্কার ও নানাবিধ বৈজ্ঞানিক ব্যাপারদ্বারা নিজের অভাবদূরীকরণই অন্য প্রাণী অপেক্ষা মানবের বিশেষত্ব তজ্জন্য শ্রীমদ্‌ভাগবত বলিয়াছেন—"মানুষ্যমর্থদং" কারণ মনুষ্যজন্মই একমাত্র অর্থদ' অন্য কোন জন্মে জীব এই সামান্য অর্থের দ্বারাও নিজকে রক্ষা করিতে সমর্থ নহে, আবার এই সমস্ত অর্থ যখন পরমার্থান্বেষণ করে তখনই তাঁহার যাথার্থ্য সম্পন্ন হয়, নতুবা কেবলার্থান্বেষণ ও দ্বিতীয় পশু জন্ম। আর জীবের বৃত্তি প্রেম তাহা হইতেও কিসে বিরত আছে? ঐ যে স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে, পিতা পুত্রকে ভাল বাসিবার চেষ্টা করিতেছে, গভীর অনুরাগে স্বদেশপ্রেমিক স্বদেশের জন্য কারাবরণ করিতেছে, কখন নিজেকে আত্মবিসর্জ্জনদ্বারা অনুরাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে—ইহা কি তাহার প্রেমের কার্য্য নয়? প্রেমের কার্য্য হইলেও নিকৃষ্ট অবস্থা "কাম নামে আখ্যাত।" যেহেতু ঐগুলি প্রবৃত্তিমূলা অযথা ঔৎপত্তিক বিবর্ত্তক্রমে দেহে অনাত্মবুদ্ধি প্রসূত বদ্ধ জীব উহা লাভ করে। যখন ঐ অনুরাগ ঈশ্বরাভিমুখী হয় তখনই জীব বিমল ও নিত্যানন্দের অধিকারী হয়। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন, 'যা প্রীতি' বিষয়ে—অর্থাৎ বিষয়িলোকের বিষয়ের প্রতি যেরূপ অনুরাগ, ভগবান্ তোমাতে আমার ঐরূপ অনুরাগ উদিত হউক্।

আবার ঐ বৃত্তি যখন মায়াদ্বারা পরিচালিত হয় তখন মরীচিকায় জলভ্রমে ধাবিতের ন্যায় তৃষ্ণার্ত্তির অযথা পরিশ্রমসার হয়। তাই বিষয়ী মোহান্ধ হইয়া প্রবলবেগে বিষয়ের দিকে ছুটিয়া গিয়া পরে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বাধ্য হয়। জীব আমিত্ব ভুলে নাই দেহকে 'আমি' বোধ করিয়াছে, প্রেম ভোলে নাই, প্রেমের বিষয়কে

ভুলিয়াছে—তাই বিবর্ত্তবুদ্ধিতে মিথ্যাভিমানে অনিত্য বস্তুর উপাসনায় ব্যস্ত হইয়াছে। উপাস্য, উপাসক ও উপাসনার বিচার অভাবহেতু উহা কালে পরিসমাপ্তি হইয়া যাইতেছে। ইহাই আমাদের মোহান্ধতা। সাধুগুরুকৃপায় জীবের এই বিবর্ত্তবুদ্ধি নষ্ট হয়।

কালে কালে ক্রমোন্নতির সোপানে আমরা নানাবিধ বিরুদ্ধমতবাদ দেখিয়া নিত্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়ি। কখনও বা দেশকালপাত্রজ ধর্ম্মকে নিত্যধর্ম্ম বলিয়া ভ্রান্ত হই, সেও জীবের মোহ। অন্যাভিলাষিকে প্রাকৃত স্থূল রূপ, রস হইতে নিবৃত্ত করিতে গিয়া শাস্ত্রকার সূক্ষ্ম স্থানের মনোরমতা প্রদর্শন করিয়াছেন, ভোগই ইহাদের লক্ষিতব্য তবে স্থূল হইতে সূক্ষ্মে প্রবেশ করানই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। আবার কর্ম্মকাণ্ডপর লোকসকল পরলোকে সুখপ্রাপ্তির আশায় অত্যন্ত পশুহননে ব্যস্ত হইলে ভগবদ্ভাববুদ্ধ হইয়া 'অহিংসা-পরমধর্ম্ম দ্বারা' নাস্তিক্যবাদ প্রচার করিয়া অসুর সকলকে বিমোহিত করেন তাদৃশ অসুরসকলের দ্বারা বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ধ্বংশোন্মুখ হইলে, শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য প্রাদুর্ভূত হইয়া পুনরায় বৈদিক বিকৃত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সংস্থাপন করেন ও অদ্বৈতবাদ-প্রচার দ্বারা সর্ব্ব ধর্ম্মের সমন্বয়সাধন প্রয়াসে পঞ্চোপাসকদিগের স্ব-স্ব বিবাদ ব্রহ্মেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে বলিয়া অসুর সকলকে বৌদ্ধ ধর্ম্মের কবল হইতে উদ্ধার করেন। ইদানীন্তনও খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মের স্রোতে ভাসমানোদ্যত ভারতবাসীকে রক্ষা করিতে গিয়া স্বর্গীয় রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি কতিপয় দেশহিঁতৈষী মহাত্মা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন, উহা হিন্দুধর্ম্মের শাখাবিশেষ বর্ণাশ্রম। পরিত্যক্ত নব্যমত, খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মানুরূপ-আচারব্যবহার। কালে কালে এই সমস্ত ধর্ম্ম উপযুক্ত মূঢ়গণের মোহ বৃদ্ধির জন্য সৃষ্টি হইয়াছে। তাই কর্ম্মী জড়, স্থূলরূপ ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মে মোহিত হন। আবার জ্ঞানিগণ ভগবানের ঐশ্বর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার বৃহত্ত্ব ব্রহ্মজ্যোতিতে মোহিত হইয়া ঔদার্য্য ও মাধুর্য্য দর্শনে অপারগ হন। কর্ম্মী ও জ্ঞানী মোহপরিত্যাগের নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়াও মোহ হইতে উদ্ধার হইতে পারেন নাই। ভক্ত যে প্রকারে মোহকে পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহা ভক্তপ্রবর শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের পদ হইতে জানা যায়।

"কাম কৃষ্ণ সেবার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে,
লোভ সাধুসঙ্গে-হরিকথা।
মোহ ইষ্টলাভবিনে, মদ কৃষ্ণগুণগানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা।।
আনন্দ করি' হৃদয়, রিপু করি' পরাজয়,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব।।"

রিপু সকলকে যথাযোগ্যস্থানে নিযুক্ত ছাড়া একেবারে ধ্বংস করার বাসনা ভক্তের নাই, কারণ ভক্ত নির্ম্মৎসর; সর্ব্বভূতে দয়াবিশিষ্ট তৎকারণ তাঁহার হিংসা নাই। আর সামান্য এই কয়েকটী বাঙ্গালা পদ্য যে আমাদের সর্ব্বসিদ্ধান্তের নির্য্যাস তাহা শ্রীগীতার কতিপয় সমর্থন সূচক বাক্য আমাদের সন্দেহ নিরাশ করেন। শ্রীগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে ব্রহ্মস্থিত পুরুষের জীবন ও আচার প্রদর্শনস্থলে বলিয়াছেন—

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ।।"

'তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী'—"এই উক্তি হইতে যাহারা অষ্টাঙ্গযোগ, হঠযোগ, রাজযোগ ইত্যাদিকে ইন্দ্রিয়-সংযমের জন্য বরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই সেই পন্থা উর্ব্বশী মেনকার কাম কটাক্ষে অনেক সময় বিধ্বস্ত ও ভগ্ন হইয়াছে তাহা পৌরাণিক ইতিহাস হইতে জানা যায়। কিন্তু আমরা দেখি, ভক্ত জীবনে তাদৃশ প্রসঙ্গ নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদপ্রবর নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্জ্জন গোফায় রাত্রিকালে রামচন্দ্র খাঁ প্রেরিত বেশ্যা বহুবিধ মনোমুগ্ধকর ব্যাপার দ্বারা ঠাকুরের চিত্ত বিক্ষিপ্ত করিতে অপারগ।

কেন? মানুষের ইন্দ্রিয়সকল ত' নির্জ্জনপ্রদেশে ভোগোন্মত্ত। দেশ, কাল, পাত্রের সমবায়ে কার্য্যত' অবশ্যম্ভাবী? তবে হরিদাস ঠাকুরের নির্জ্জন কুটিরে রাত্রকালে ভোগীর উপকরণ যোষিৎ উপস্থিত থাকিতেও তিনি মৌন কেন? হরিদাস ঠাকুর ত' ইহজগতের লোক নন। তিনি ত' 'সর্ব্বতোভাবে মোহ ইষ্টলাভবিনে ইহার অনুবর্ত্তনকারী ভোগী যেখানে ভোগে উন্মত্ত তিনি ত' তথায় মোহপ্রাপ্ত সংজ্ঞাশূন্য আর বিষয়ী লোক যথায় সুপ্ত তিনি তথায় জাগ্রত থাকিয়া শ্রীহরিনামের অনুশীলনকারী, ইহাকেই বলে প্রকৃতির গুণ হইতে নির্ম্মুক্ত। আর ইনিই সত্য সত্য মহান্ত। যিনি কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহার হরিসেবা প্রবৃত্তি আদর্শ। মায়া বহুবিধ ক্রিয়ার দ্বারাও তাহার চিত্তের ক্ষোভ উৎপাদন করিতে পারে না।

গৃহব্রত

এক কপোত বনে মহাবৃক্ষে নীড়নির্ম্মাণ করিয়া ভার্য্যা কপোতীর সহিত কয়েক বৎসর স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছিল। এই পারাবতদম্পতী পরস্পরের স্নেহে আবদ্ধ হৃদয় হইয়া গৃহধর্ম্মপালন করিতে করিতে একত্র শয়ন, একত্র উপবেশন, একত্র ভ্রমণ, কথোপকথন, ক্রীড়া, ভোজনাদি ব্যাপার যুগলে সম্পাদন করিয়া অরণ্যসমূহে নিঃশঙ্কভাবে বিচরণ করিতেছিল। তাহার বেশ দিন কাটিতেছিল। সেই কপোতী যখন ঈষৎ-হাস্যের সহিত কটাক্ষপাত করিয়া আলাপ করিতে করিতে প্রিয়ের চিত্তহরণ করিয়া স্বামিসন্নিধানে কিছু বাঞ্ছাপ্রকাশ করিত, সেই অজিতেন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়বশ কপোত তাহাই গুরুর আজ্ঞাস্বরূপ স্বীকার করিয়া সেই সেই দ্রব্য অতিকষ্টে ও প্রাণবিপন্ন করিয়াও সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিত। এইরূপ আপাতরমণীয় দাম্পত্য-প্রণয়োপভোগ করিতে করিতে স্বর্গসুখের কল্পনা করিতেছিল। কালক্রমে কপোতী গর্ভধারণ করিয়া যথাকালে নীড়ে স্বামীর সমক্ষে অণ্ড প্রসব করিল। ক্রমে হরির দুর্জ্জেয়শক্তি প্রভাবে সেই সকল অণ্ডে শাবকগণের অঙ্গ গঠিত হইল। তখন সেই দম্পতী পুত্রবৎসল হইয়া তাহাদের অস্ফুটকল-ভাষিত শ্রবণে পরম প্রীতি লাভ করিতে করিতে শাবক পালন করিতে লাগিল। তাহাদের আনন্দের আর সীমা রহিল না। মনে করিতে লাগিল, চিরদিন এইরূপ আনন্দে জীবন যাপন করিবে। তাহাদের সুকোমল নবোদ্গত পক্ষস্পর্শে, তাহাদের

মুগ্ধভাবোথ অঙ্গচেষ্টা ও সুমধুর কূজনে এবং মাতাপিতা নীড়ে প্রত্যাগত হইলে তাহাদের সানন্দমিলনে উভয়ে যে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রাপ্ত হইত—তাহা বুঝি মরলোকে দুর্ল্লভ। মায়া কর্ত্তৃক বিমোহিত পরস্পর স্নেহানুবদ্ধহৃদয় অনুদিতবিবেক এই কপোতদম্পতী পরমানন্দে শিশুপালনে মত্ত হইয়াছিল।

একদিন এই দম্পতি শাবকগণের আহার সংগ্রহ জন্য কুলায় হইতে নির্গত হইয়া অরণ্যের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছিল, এমন সময়ে যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে এক ব্যাধ নীড় হইতে বহির্গত অদূরে ক্রীড়োন্মত্ত সেই শাবকগুলি দেখিয়া জাল বিস্তারপূর্ব্বক তাহাদিগকে ধৃত করিল। ইত্যবসরে কপোতকপোতী অপত্যপালনে সমুৎসুক হইয়া আহার্য্যসংগ্রহপূর্ব্বক কুলায়নিকট উপনীত হইল। দেখিল তাহাদের অতি আদরের পরমস্নেহের পুত্রকন্যা ব্যাধের জালে আবদ্ধ হইয়াছে। হায়, হায়, কি ভীষণ দর্শন! যে কুমারগুলিকে এতক্লেশে গর্ভধারণ ও মোচনবেদনা সহ্য করিয়া প্রসব করিয়াছি, যাহাদিগকে এত যত্ন করিয়া পালন করিতেছি, যাহারা আমাদের লোচনানন্দবর্দ্ধন, জীবনের একমাত্র অবলম্বন, স্নেহের একমাত্র পুতলী, আজ কিনা তাহারা নির্দ্দয় কঠোরহৃদয়লুব্ধকের হস্তে! হা ধিক্ ভাগ্য! কে জানিত, জীবনে এত শোক হইবে! কে মনে করিয়াছিল যে, এত সৌভাগ্য, এত সুখ, এত আনন্দ—সব এক মুহূর্ত্তের মধ্যে কালের অতল জলধির সুগভীর গর্ভে নিমজ্জিত হইবে! কি মর্ম্মভেদী যাতনা! এ অপেক্ষা বুঝি মরণ সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ! এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে উভয়ে মোহান্ধ হইয়া দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। কপোতী এ করুণদৃশ্য আর দেখিতে না পারিয়া মোহে ব্যাধের পাশের কথা ভুলিয়া গেল। সে অবিলম্বে রোদন করিতে করিতে রোদনাকুল শাবকগুলির প্রতি প্রধাবিত হইল। তখন অত্যধিক স্নেহান্ধতা-বশতঃ জালবদ্ধশাবকগণকে দেখিতে কপোতী স্বয়ং জালে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। এ অবস্থায় কপোত আত্মাধিক প্রিয় আত্মজগণকে বদ্ধ দেখিয়া ও আত্মসমা প্রিয়াকেও আবদ্ধা দেখিয়া অত্যন্ত শোক প্রকাশপূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিল, হায়, হায়! আমি অল্পপুণ্য, দুর্ম্মতি; আমার একি বিপদ হইল? আমি এখনও সুখভোগে অতৃপ্ত ও অকৃতার্থ। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গসাধনের ক্ষেত্ররূপ গৃহ বিনষ্ট হইল। আহা, আমার অনুরূপা, অনুকূলা, পতিব্রতা সতী ভার্য্যা আমাকে শূন্যগৃহে পরিত্যাগ করিয়া সন্তানগণের সহিত স্বর্গগমন করিতেছে। এখন শূন্যগৃহে দীনচেতা মৃতদার, হতপুত্র, কাতরভাবে এ দুঃখময় জীবন ধারণ করিয়া কি লাভ? এইরূপ করুণ বিলাপ করিতে করিতে মৃত্যুগ্রস্ত, যন্ত্রণায় অঙ্গচেষ্টা তৎপর পাশাবৃত স্ত্রীপুত্রকে দেখিতে দেখিতে সেই দুর্ভাগ্য বুদ্ধিহীন কপোত স্বয়ং বাগুরায় পতিত হইল। তখন সেই ক্রূর-ব্যাধ সেই গৃহসুখমত্ত গৃহমেধী কপোত, কপোতী ও কপোতশিশুগুলির প্রাপ্তিতে পূর্ণকাম হইয়া তাহাদিগকে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

যুগলারামী গৃহসুখমত্ত কুটুম্বপালনাসক্ত অশান্তচিত্ত দুর্ভাগ্য জীব এই রূপেই কপোতের ন্যায় সবংশে দুঃখভোগ করিয়া থাকে, তাহার দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। তাহার "সুখের আশায় সে ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।"

এই প্রকার এই গৃহাসক্তি তির্য্যগ্‌যোনিজাত ইতর প্রাণীর পক্ষেই এইরূপ অনর্থের হেতু, আর ইহা যে, মনুষ্যের পক্ষে অতি নিন্দনীয় তাহাতে আর সন্দেহ কি? যে যে জীব মুক্তির দ্বারস্বরূপ মনুষ্য জীবন লাভ

করিয়াও ঐ কপোতের ন্যায় গৃহে আসক্ত হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকে ''আরূঢ়চ্যুত'' বলেন, অর্থাৎ সে উচ্চপদে আরোহণ করিয়াও তাহা হইতে ভ্রষ্ট হয়।

''নাতিস্নেহঃ প্রসঙ্গো বা কর্ত্তব্যঃ ক্বাপি কেনচিৎ।।
কুর্ব্বন্ বিন্দেত সন্তাপং কপোত ইব দীনধীঃ।।''

শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ে যযাতিপুত্র যদুর নিকট অবধূত বিপ্র—

''কোনও বস্তু জন্য কোনও কারণে অতিস্নেহ ও অত্যাসক্তি করিবে না। যে সেরূপ করে সেই দীনাত্মা কপোতের ন্যায় অবশ্য সন্তাপ পাইয়া থাকে।''—এই উপদেশ দিয়া পূর্ব্বলিখিত উপাখ্যানটী বলিয়াছিলেন। অবধূত বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার চতুর্ব্বিংশতি গুরুর মধ্যে এই কপোত একটী অর্থাৎ এই কপোতের দুর্দ্দশা হইতে তিনি গৃহতৃষ্ণাত্যাগের প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা এমনই মোহান্ধ যে, কপোত-চরিত্র হইতে শিক্ষালাভ করা দূরে থাক্, কপোত-কপোতীর জীবনকে অতি লোভনীয় মনে করিয়া আমরা কপোত-কপোতী হইতে ইচ্ছা করি, আমাদের নিকট টার্টলড্ লবের আদর্শ। হায়, হায়, আমাদের এই ঘৃণিত গৃহমত্ততা বা ''ঘরপাগলামী'' কবে দূর হইবে? কবে আমরা সাধুগুরুচরণে প্রপন্ন হইয়া তাঁহার আশ্রয়ে তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ- পূর্ব্বক ভগবচ্চরণ লাভরূপ পরমমুক্তির সন্ধান পাইব। আমি ক্ষণকালের জন্যও চিন্তা করি না যে এই ''ঘরপাগলামী''ই নরকের দ্বার ''ঘরপাগলারা'' যমদূতগণের দণ্ড্য। শ্রীযমরাজ তাঁহার সূতগণকে এই ''ঘরপাগলা'' গুলিকেই নরকে আনয়ন করিতে আদেশ করিতেছেন,—

''তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দপাদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম্।
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈর্জুষ্টাদ্ গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্।।'' (ভাঃ ৬।৪।২৮)

সেই সব অসৎ দুরাত্মাকে লইয়া আসিবে, যাহারা দুঃসঙ্গবর্জ্জিত নিষ্কিঞ্চন পরমংসগণ-সেবিত মুকুন্দ-পাদপদ্মমধুপানে বিরত হইয়া নরকের পথ যে গৃহ তাহাতে গাঢ়ভাবে আসক্ত।

গৃহব্রতগণ এতই নির্ব্বোধ যে তাঁহারা গৃহাসক্তির দুর্দ্দশা প্রত্যহ শত শত দেখিতেছেন, অথচ তাঁহারা গৃহব্রতধর্ম্ম বেশ যত্নের সহিত ধরিয়া রাখিতেছেন, মনে করিতেছেন তাঁহাদের বোধ হয় সেরূপ দুর্দ্দশা হইবে না। আবার তাহারা আরও অধিক নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দেন তখন, যখন তাঁহারা নিজে ভুক্তভোগী হইয়াও, গৃহাসক্তির দণ্ড পদে পদে পাইয়াও—

''মতির্নকৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভিঃ বিশর্তাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্।।''

(ভাঃ ৭।৫।৩০, প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি)।

গৃহব্রতগণের মতি কোন প্রকারে কৃষ্ণ পাদপদ্মে নিবেশিত হয় না। তাঁহাদের ইন্দ্রিয়সমূহ অবশ; তাঁহারা ইন্দ্রিয়পরিচালিত হইয়া পরিণামদুঃখকর সংসারসুখে প্রমত্ত হ'ন। তাঁহারা চর্ব্বিত বিষয়ে কোন মিষ্টরস না পাইলেও তাহা পুনঃ পুনঃ চর্ব্বণ করিয়াও ক্ষান্ত হ'ন না। ইহাই তাঁহাদের ঘোর দুর্দ্দৈব।

গৃহব্রত, গৃহমেধী বা গৃহী-বাউলের বিশেষত্ব এই যে তাঁহারা পারমার্থিক সাধুর চেষ্টা আদৌ বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা মনে করেন যে, গৃহাসক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয়ই বুঝি পরম ধর্ম্ম। এই বুঝিয়া যাঁহারা গৃহব্রত ধর্ম্মকে সমাদর না করিয়া যুক্তবৈরাগ্যের সহিত ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে নিজেদের হেয় আদর্শে গঠিত দেখিতে চা'ন; অথবা তাহা না করিয়া তাঁহাদের বিপরীতধর্ম্মা ফল্গুবৈরাগীকে বহুমানন করিবার ভাণে যুক্তবৈরাগ্যকে ভোগের সহিত সমজ্ঞান করিয়া বৈষ্ণবাপরাধ করিয়া বসেন। বৈষ্ণবদাস যে জগতের সর্ব্বপদার্থ দ্বারা হরিভজন করিতে প্রবৃত্ত, গৃহব্রতভোগিগণ তাহার উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া অসূয়াপরবশ চিত্তে বৃথা ভক্তদ্রোহ করিয়া নিজের সমূহ অমঙ্গল আনয়ন করেন। আমরা কবে বৈষ্ণব কৃপা পাইয়া বৈষ্ণব-চরণে মৎসরতারূপ ঘোর শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া বৈষ্ণবাপরাধ মুক্ত হইব ও নিজে গৃহব্রত ধর্ম্ম ছাড়িয়া বৈষ্ণবের আনুগত্যে যুক্তবৈরাগ্য শিখিব! শুদ্ধবৈষ্ণব কবে আমাদিগকে কৃপা করিবেন! হায়, কাল মুখব্যাদান করিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, তাহা দেখিয়াও আমরা দেখিতেছি না, সাধুগণের উচ্চৈঃস্বরে সতর্কীকরণ শুনিয়াও শুনিতেছি না, নিজের আসন্নবিপদ বুঝিয়াও বুঝিতেছিনা, হায়, আমদের দুর্দ্দশা কি হইবে? ঐ দেখ, কালরূপ ব্যাধ দুঃখোদর্কা ভোগরূপিণী বাগুরা বিস্তার করিয়া আমাদিগের চিৎবৃত্তির স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইতেছে। ঐ দেখ, বাগুরা আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিল! হায়, হায়, ঐ বাগুরাকেই ভোগের উপকরণজ্ঞানে গাত্রে জড়াইয়া আমাদের বন্ধন আরও দৃঢ় করিয়া ফেলিতেছি। —হে অনাথের নাথ, পতিতপাবন প্রভো, হে মুকুন্দ প্রিয়তম গুরুবর, আমি তোমার সর্ব্বাপেক্ষা অযোগ্যদাস হইলেও কৃপার অযোগ্য নহি, কেননা আমি পতিতাধম, তুমিও পতিতপাবন, আমাকে কেশে ধরিয়া ঐ ভীষণ পাশ হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক মুক্ত কর, আমার নিজের সামর্থ্য নাই, বুদ্ধি নাই, যে আমি উদ্ধার পাইব। আমার নিজের উপর ভরসা করিলে আমি আরও জড়াইয়া পড়িব। হায় আমি· আমার ভরসা কবে ছাড়িব!

অভিমান

১। "অমুক-গৃহের আমি ভর্ত্তা ও পালয়িতা", "আমি সমাজের বা দেশের নেতা ও মঙ্গলবিধাতা," "আমি সর্ব্বপেক্ষা বেশী বুঝ্‌দার," "আমি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর" ইত্যাদিপ্রকার দম্ভসূচক জড়াভিমানের দৃষ্টান্ত এই বিবদমান যুগে প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হয়। এই দৃষ্টান্তগুলি যে পরিমাণ দর্প বা দম্ভের ব্যঞ্জক, তাহা অপেক্ষা আরও অধিক পরিমিত দাম্ভিকতার ভাব জগতে প্রচিলত আছে। ভগবানই সকলের কর্ত্তা, ভর্ত্তা নেতা ও বিধাতা এবং তিনিই সর্ব্বজ্ঞ; যথা গীতা,—

"গতি র্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।।"

যাহারা জন্ম মৃত্যুর অধীন ও আধি-ব্যাধির দ্বারা সতত সন্তপ্ত হইবার যোগ্য, সেই সমুদয় ক্ষুদ্র শক্তিশালী জীব যখন জড়াভিমানে স্ফীত হইয়া ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানের আসনে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত মনে করেন,

সেই প্রকার প্রলাপ- বক্তাদিগকে জড়াভিমানের সর্ব্বোচ্চ প্রকোষ্ঠে উপনীত মনে করিতে হইবে। তাহাদিগের তুল্য ভগবৎচরণে অধিকতর অপরাধী আর কেহ হইতে পারেন না। এতাদৃশ গর্ব্বিত সোহহংবাদিগণ কি কখনও আপনাদিগের ধৃষ্টতা বুঝিতে পারিবেন না?

২। স্বসুখৎপর ব্যক্তিগণই জড়াভিমানী ও ভগবৎ সুখ-সাধনেচ্ছুগণ চিদভিমানী। স্বসুখনিষ্ঠা চতুর্ব্বিধ, যথা— (১) ধর্ম্ম (স্বর্গসুখপ্রাপক পুণ্য কার্য্য)— মূলক, (২) অর্থ (ঐহিক সুখের সহায়ক ধনজনাদি অর্জ্জন ও রক্ষণাবেক্ষণপর- কর্ম্ম) মূলক, (৩) কাম (ইন্দ্রিয়তর্পণসাধনকর্ম্ম)—মূলক এবং (৪) মোক্ষ (ত্যাগ দ্বারে শান্তিসুখজনক কর্ম্ম) মূলক। প্রতিষ্ঠাশারূপ যে দুর্ব্বাসনা তাহা কামেরই অন্তর্গত এবং ইহা ন্যূনাধিকরূপে সমগ্র জড়াভিমানীদিগকে গ্রাস করিয়াছে। ইহার দুঃসাহস এত অধিক যে ভক্তিপথের পথিকদিগের হৃদয়েও প্রবেশ করিবার যত্ন করে; কিন্তু ভক্তিদেবীর কৃপায় তাহারা ইহাকে দূরে নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হন। অতএব যিনি প্রতিষ্ঠাপর নহেন, তিনিই চিদভিমানী ভক্ত বা বৈষ্ণব, যথা মহাজনবাক্য—

"কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা বাঘিনী, ছাড়িয়াছে যারে সেইত বৈষ্ণব।"

জড়াভিমানী ব্যক্তিগণ প্রতিষ্ঠাশার বশবর্ত্তী হইয়া যে প্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছেন তাহা বর্ণনাতীত। অনেকে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত নহে। একটী দৃষ্টান্ত বর্ণন করিতেছি যাহা পাঠ করিলে হৎকর্ণ উদিত হইতে পারে। একদা কোন দেশে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে জৈনক পুলিস কর্ম্মচারী পথি মধ্যে বেত্রাঘাত করেন এবং সেই অপরাধে তদ্দেশীয় প্রধান বিচারপতি কর্ত্তৃক পুলিশ কর্ম্মচারীর দুই টাকা জরিমানা হয়। বেত্রাঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তি বিচারে সন্তুষ্ট না হওয়ায় পায়ের জুতা দ্বারা আদালতের ভিতরেই বিচারপতিকে সজোরে প্রহার করেন ও সঙ্গে সঙ্গে পাঁচটী টাকা জরিমানাস্বরূপে এজ্‌লাসে রাখিয়া দেন। বিচারপতি দেখিলেন পূর্ব্বের অনুপাতে প্রচুর জরিমানা দেওয়া হইয়াছে এবং তন্নিমিত্ত জুতার দ্বারা প্রহারকর্ত্তাকে আর অধিক দণ্ড দেওয়া উচিত নহে বিবেচনায় তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। অতঃপর কি করিয়া এই নিদারুণ অপমান সহ্য করা যায় ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিলেন ও তৎসাহায্যে নিজপ্রাণ পরিত্যাগ করিয়া অপমানজনিত দুঃখের শান্তি করিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে নিম্নলিখিত জড়াভিমানব্যঞ্জক শ্লোক দুইটী বর্ণে বর্ণে সত্য,—

"মানোহি মূলমর্থস্য মানে ম্লান ধনেন কিং।
"প্রভ্রষ্টমানদর্পস্য কিং ধনেন কিমায়ুষা।।"
"অধমা ধনমিচ্ছন্তি, ধনমানৌ হি মধ্যমাঃ।
"উত্তমা মানমিচ্ছন্তি, মানোহি মহতাং ধনং।।"

ধন ও মানের যাহারা প্রার্থী তাহারা অন্যের প্রতি হিংসা করিতে বাধ্য। সুতরাং তাহারা মৎসর। একমাত্র চিদভিমানী ভক্তগণই নির্ম্মৎসর। তাহারাই মান ও ধনকে তুচ্ছবোধে অন্যকে তাহা অকুতোভয়ে দিতে সমর্থ। সেই জন্য জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ গৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—

"তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।"

৩। জড়াভিমান সত্ত্বেও কেহ মানবজীবনের চরম ভূমিকার ইঙ্গিত পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইতে সমর্থ নহে। জাত্যভিমান, বিদ্যাভিমান, রূপাভিমান এবং ঐশ্বর্য্যাভিমান ভক্তিপথের কন্টক। শ্রীমদ্ গৌরসুন্দরের দ্বিতীয়স্বরূপ ও বিলাসমূর্ত্তি শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু। তিনি স্বয়ং নির্ম্মল ভগবত্তত্ত্ব হইয়াও লোক- শিক্ষার্থে যে প্রকার জড়াভিমানরাহিত্য-সূচক লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন তাহার কথঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত হইতেছে, যথা—

"অভিমান শূন্যভাবে নগরে বেড়ায়
"আক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়
"যারে দেখে তারেই বলে দন্তে তৃণ ধরি।
"আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি।।"

শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর পদাঙ্কচারী অসাধারণ পণ্ডিত ও ভক্তচূড়ামণি শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীত্রিদণ্ডিপাদ যে কি প্রকার জড়াভিমানশূন্য ছিলেন, নিম্নলিখিত তাঁহার নিজ রচিত শ্লোকটীই তদ্‌বিষয়ের সাক্ষ্য দিতেছে,—

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ, সকলমেব বিহায় দূরাৎ চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগং।।"

দাম্ভিক ব্যক্তি সকল সমাজের কলঙ্ক। অসৎচরিত্রতারূপ বিসূচিকাবীজ তাহাদিগের কর্ত্তৃকই সরল মানব হৃদয়ে রোপিত হয়। যাহারা তাহাদিগের পদানুসরণে প্রবৃত্ত হইতেছেন বা হইবেন দেহান্তে তাহারা ভীষণ মহারৌরব নামক নরকে নীত ও যমকিঙ্করগণকর্ত্তৃক নিদারুণ ভাবে দণ্ডিত হইবেন। অতএব "অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণবাচার" রূপ মহাজনগণের আদেশ শিরেধারণপূর্ব্বক তাহাদিগের সঙ্গ কালবিলম্ব না করিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইহাই ভক্তিপথে প্রবেশের প্রথম দ্বার। পরে "সতাং প্রসঙ্গাৎ মমবীর্য্যসম্বিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ" এই পরমকল্যাণ আবাহনকারী সিদ্ধান্ত বাক্যের বশবর্ত্তী হইয়া সজ্জন সঙ্গ ও তাহাদিগের মুখ-বিগলিত হরিগুণ গাথা শ্রবণ করিতে করিতে ভোগ-মোক্ষমূলা অক্ষজ চেষ্টা সমূহকে নিরাস করিতে হইবে। অন্তে যখন হৃদয় অনর্থ শূন্য হইবে, তৎকালে সেই সঙ্গ হৃদয়ে হৃদবিহারী শ্রীহরির দর্শন ও চিদাভিমানের বিমল নিত্যানন্দপ্রদ জ্যোতি অনুভূত হইবে। "সা কাষ্ঠা, সা পরা গতিঃ"। মানব জীবনের ইহাই সর্ব্বোচ্চভূমি। কবীর দাস নামক জনৈক ভক্ত বলিতেন, "রাজা রাণা না বড়া! বড়া যো সুমীরে রাম।" অর্থাৎ রাজা বা ধনী কেহই বড় লোক নহে, যিনি শ্রীরামচন্দ্রের সেবায় দেহ-মন ও প্রাণ সমর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন কেবল মাত্র তিনিই বড় ও সর্ব্বলোক পূজ্য।

বায়ু একটী সূক্ষ্মজড়তত্ত্ব। সাধারণ মানবগণ তাহাকে কোন গুরুপদার্থ বলিয়া বুঝেন না। পরন্তু তাহারা ইহাকে অতি হাল্কা পদার্থ বলিয়াই জানেন পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞান সেই ভ্রান্তি কাটাইবার জন্য বলিতেছেন যে বায়ুর গুরুত্ব এত অধিক যে যদি উহাকে, অধোমুখজলসংলগ্ন ও ঊর্দ্ধমুখ কোন কূপের সুদূর বহির্দ্দেশে অবস্থিত, একটী লৌহ নির্ম্মিত নলের অভ্যন্তরদেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত করা যায়, তৎকালে আমারা দেখিতে পাইব যে কূপের নিম্নদেশস্থিত জলরাশি উহার বহির্দ্দেশে চলিয়া আসিতেছে। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে বায়ুর চাপে জলরাশী ঘনীভূত হইয়া অবস্থান করিতে বাধ্য হয় এবং উহার ভার উঠাইয়া লওয়া হইলে জলরাশি আপন স্বাভাবিক অবস্থায় স্থিত হইতে সমর্থ হয়। বায়ুর সেরূপ দুর্লক্ষ্যভার সাধারণ মানববুদ্ধির অগোচর, তদ্রূপ জড়াভিমান জনিত অসৎ চিন্তার গুরুত্ব মায়ান্ধ ব্যক্তিসকল বুঝিতে অক্ষম। জলের আশায় কূপ খনন করিতে হইলে মৃত্তিকা ও বালুকার স্তর ভেদ করা সামান্য যন্ত্রের দ্বারা সম্ভব; কিন্তু কঠিন প্রস্তরের স্তর ভেদ করিতে হইলে "ছেনি" ও "ডিনামাইট" রূপ উত্তম উত্তম যন্ত্রের প্রয়োজন। বাহ্য বিষয় দুঃখমিশ্র, ক্ষণিক সুখপ্রদানে সমর্থ। বিমল নিত্যানন্দ কেবলমাত্র অহৈতুকী ভগবৎসেবামুখে লভ্য। সুতরাং নিত্যানন্দ-বারি পান করিতে যাহারা চাহেন, তাহাদিগকে নিজ নিজ চিত্তগুহাকে খনন করিতে হইবে। খননকালে সাধুসঙ্গরূপ "ছেনি" ও ভগবৎসেবারূপ "ডিনামাইট" দ্বারা জড়াভিমানরূপ কঠিন প্রস্তর সদৃশ অনর্থ ও গুরুভার বায়ু অসৎচিন্তার পরিহার করিতে হইবে, নচেৎ নহে।

অবতার

কঠ, বৃহদারণ্যক, মুণ্ডকাদি শ্রুতি "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" "প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাং" প্রভৃতি মন্ত্রে 'অবতারবাদ' প্রতিপাদন করিয়াছেন। সাত্বতগণও এই শ্রুতিপ্রতিপাদ্য "অবতারবাদ' বা 'অবরোহবাদ' স্বীকার করিয়াছেন। জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবও এই অবতারবাদেরই একনিষ্ঠ প্রচারক। সুতরাং "সাধু, শাস্ত্র, ও গুরুবাক্য"—সকলেই এই অবতারবাদই প্রমাণ করিতেছেন। এই "অবতারবাদের" তাৎপর্য্য এই যে, 'নিরস্তকুহক বাস্তব 'সত্য'—স্বতঃপ্রকাশ বস্তু। সেই 'সত্য' যখন কৃপা করিয়া নিজকে নিজে প্রকাশিত করেন, তখনই জীব সেই সত্যের নির্ম্মলালোকে সত্যের স্বরূপ পরিদর্শন করিতে পারেন। সত্য অবতীর্ণ হইলেই সত্যকে জানা যায়, মানব বিদ্যা, বুদ্ধি, মনীষা, গবেষণা বা প্রাকৃত শত শত আরোহচেষ্টা দ্বারাও সেই পরমসত্যের সন্ধান পান না। 'শ্রীলঘুভাগবতামৃত' টীকায় শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বলেন,—"অপ্রপঞ্চাৎ প্রপঞ্চেঽবতরণং খল্বাবতারঃ"—অর্থাৎ অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে অবতরণই অবতার। সেই অবতরণ দুই প্রকারের—স্বয়ং অদ্বারকতয়া, দ্বারান্তরেণ বা জগতি আবিঃস্যুঃ, তদা অবতারা স্মৃতাঃ অর্থাৎ কখনও পরমসত্যস্বরূপ শ্রীভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হন, কখনও ভক্তদ্বারে 'সত্য' অবতীর্ণ করান। সুতরাং অবতার- বাদের স্বরূপলক্ষণ অপ্রপঞ্চস্থিত নিত্য পরম সত্য, প্রপঞ্চে প্রকটীকরণ। এই পরমসত্য, প্রকাশরূপ ব্যাপারের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া অনেক মনোধর্ম্মযুক্ত ব্যক্তি, অনেক কলির
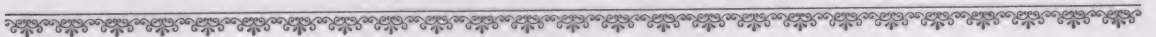
ভৃত্য নিজে নিজে বা অর্ব্বাচীন শিষ্যগণের দ্বারা নিজদিগকে এক এক জন অবতার সাজিতে ও সাজাইতেও প্রয়াসী হইয়াছেন ও হইতেছেন। জগদ্‌গুরু, সর্ব্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর অবতীর্ণ হইবার পর হইতে যে কত শত অবতার (?) হইয়াছেন ও হইতেছেন' তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। জড়ীয়প্রতিষ্ঠার বশবর্ত্তী হইয়া কতলোক যে মহাপ্রভু (?) সাজিলেন ও সাজাইলেন আবার কেহ তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া 'মহামহাপ্রভু' প্রভৃতি বহু "মহৎ" শব্দ উত্তরপদে যোজনা করিতে থাকিলেন। এই সকল 'গোখর' (ভা ১০।৮৪।৮) বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি বড়ই দয়ার পাত্র! এইরূপ বিষ্ণুবিরোধিনী বুদ্ধি জগৎ সৃষ্টির সময় হইতে চলিয়া আসিয়াছে। জগতের নৈসর্গিক অবস্থা (normal condition)ই বিষ্ণুবিরোধ। বিষ্ণুর সিংহাসন গ্রহণে প্রয়াস। এই চেষ্টা কেহ সাক্ষাৎভাবে কেহ বা প্রচ্ছন্নভাবে করিয়া আসিতেছেন। সাক্ষাৎ অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর যখন এ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তখনও এরূপ অসদ্ভাব ছিল না তা নয়। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ইহার ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের অবস্থা বর্ণনে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্ববঙ্গে—

"মধ্যে মধ্যে মাত্র কত পাপিগণ গিয়া।
লোক নষ্ট করে আপনারে লওয়াইয়া।।
উদর ভরণ লাগি 'পাপিষ্ঠ সকলে।
রঘুনাথ করি' কেহ আপনারে বলে।।
কোন পাপিগণ ছাড়ি কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
আপনারে গাওয়ায় বলিয়া নারায়ণ।।"

আবার রাঢ়দেশের বিষয় বর্ণনে বলিয়াছেন—

"রাঢ়ে আর এক মহা ব্রহ্মদৈত্য আছে।
অন্তরে রাক্ষস বিপ্র কাচ মাত্র কাচে।।
সে পাপিষ্ঠ আপনারে বলায়–'গোপাল'।
অতএব তারে সবে বলেন–'শিয়াল'।।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বিনে অন্যেরে ঈশ্বর।
যে অধমে ব'লে সেই ছার শোচ্যতর।।"

কতকগুলি লোক আবার শ্রীচৈতন্যভাগবতের শচীদেবীর প্রতি শ্রীগৌর- সুন্দরের সন্ন্যাসগ্রহণকালীয়—

"আর দুই জন্ম এই সংকীর্ত্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে।।"

—এই বাক্যের কদর্থ করিয়া কত কত অবতারের সৃষ্টি করিতেছেন। শুদ্ধভাগবতের চরণ আশ্রয় না করাতে ঐ সকল লোকের শ্রীঅর্চ্চায় শিলাবুদ্ধি, গুরুতে নরমতি, ভৌমবস্তুতে পূজ্যবুদ্ধি, সলিলে তীর্থবুদ্ধি—

এই সকল নরকের বুদ্ধি উদিত হইয়াছে। ঐ সকল অক্ষজবাদী, আরোহপন্থী অবতারবাদের গূঢ়ার্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার সুকৃতি অর্জ্জন করিতে পারেন নাই বলিয়াই উহাদের এইরূপ স্বকপোলকল্পিত-মতউদ্ভাবিনী রতির উদয় হইয়াছে। ঐ সকল লোক কাল্পনিক জরামরণশীল বস্তুতে পূজ্যবুদ্ধি করিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত। শ্রীগৌর-সুন্দর সেইরূপ জন্মের কথা বলেন নাই। অভিন্নযশোমতিস্বরূপিণী শচীমাতা যখন অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত দর্শন-বিচ্ছেদ স্মরণ করিয়া কাতর হইতেছিলেন তখন তিনি শীঘ্রই শ্রীগৌরের অর্চ্চাবিগ্রহ ও শ্রীগৌরনামরূপে অবতীর্ণ হইয়া মাতার বিরহদুঃখাপনোদন করিবেন, ইহাই ইঙ্গিতে বলিয়াছিলেন। আমরা উক্ত স্থানে কোনও কোনও প্রাচীন পুঁথিতে নিম্নলিখিত পদটী লক্ষ্য করিয়াছি—

"মোর অর্চ্চামূর্ত্তি মাতা তুমি সে ধরণী।
জিহ্বারূপা তুমি মাতা নামের জননী।।
এই দুই জন্ম মোর সংকীর্ত্তনারম্ভে।
দুই ঠাঞি তোর পুত্র রহুঁ অবিলম্বে।।"

ভগবানের শান্ত অবতারগণ বাস্তব সত্যের প্রচারক। তাহাদের প্রচারিত সত্যে কোনও প্রকার কপটতা নাই। 'শ্রীমদ্ভাগবত' গ্রন্থও একটী অবতার কারণ তাহাতে নিরস্তকুহক সত্যের কথা প্রচারিত হইয়াছে। এই জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর 'শ্রীমদ্ভাগবত' সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার।"

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোক হইতে জানা যায় যে ভাগবতের প্রচারিত সত্যেধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষবাঞ্ছা-রূপ কপটতা নাই। তাঁহাতে 'প্রোজ্ঝিতকৈতব' ধর্ম্মের কথা আছে। ঐ ধর্ম্ম পরম নির্ম্মৎসর সাধুগণের আচরিত ধর্ম্ম এবং একমাত্র সেই ধর্ম্ম যাজন করিলেই জীবের ত্রিতাপ উন্মূলিত হয়। সেই শ্রীমদ্ভাগবত ধর্ম্মের অপর নামই 'সেবা' বা ভাগবতের ভাষায় 'স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্ম যতোভক্তিরধোক্ষজে। অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি।।' অপ্রাকৃত পরম তত্ত্ব শ্রীভগবানে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তিই পুরুষমাত্রের পরম ধর্ম্ম। সেই ভক্তির দ্বারা আত্মা সম্যক প্রসন্ন হন। শ্রীনামও অবতার তত্ত্ব। যথা শ্রীচরিতামৃতে—

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।

শ্রীকৃষ্ণ নামে ও শ্রীকৃষ্ণে কোনও ভেদ নাই। সুতরাং শ্রীনামই—শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীনাম জাগতিক আভধানিক শব্দ বা নশ্বর দেবীধামের বস্তুর অন্যতম নহে। জগতের শব্দের দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কামের উদ্দেশ করা যায়। কিন্তু শ্রীনাম জীব- হৃদয়ে অপ্রাকৃত সেবারস উদিত করাইয়া সেবার নিত্য বিষয়বিগ্রহরূপে বিরাজিত থাকেন। শ্রীবিগ্রহ শ্রীভগবানের অবতার। অক্ষজবাদিগণ শ্রীবিগ্রহকে অক্ষজ-জ্ঞানে দর্শন করিতে যাইয়া বিতাড়িত হন। কেহ শ্রীবিগ্রহকে মাটী, পাথর, কাঠ দেখিয়া বসেন, কেহ বা মাটী, পাথর, কাঠে চৈতন্যের আরোপ করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর বলেন', ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।" 'ভক্তভাগবত' একজন শ্রীভগবানের অবতার। ভগবানই 'গ্রন্থ-ভাগবত' ও ভক্ত-ভাগবত দ্বারা বাস্তব সত্য প্রচার করেন। ভক্ত

ভগবানের অবতার হইলেও স্বয়ং ভগবান্ নহেন। তিনি ভগবানের আশ্রয় জাতীয় সেবকতত্ত্ব—ভগবানের ভেদাভেদ প্রকাশ। মূঢ় লোকগণই নিজদিগকে ভগবান্ ও নিত্যপার্ষদগণের সহিত অভেদ মনে করে। শুদ্ধ ভাগবতগণ সর্ব্বদা নিত্য ভগবৎপার্ষদবৃন্দের অনুগত ও পাল্য কিঙ্কর বোধে ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। আজকাল অনেক অর্ব্বাচীন ব্যক্তিকে 'নন্দ' যশোদা, ললিতা, বিশাখা, বালগোপাল-কত কি সাজিতে দেখা যায়। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বলেন যে, নিজকে ভগবান্ মনে করাত' দূরের কথা, যদি কোনও ব্যক্তি নিজকে নিত্য ভগবদ্দাসগণের অনুগত কিঙ্কর না জানিয়া তত্তৎ নিত্য ভগবৎপার্ষদ স্থানীয় কোনও এক জন কল্পনায়ও চিন্তা করেন, সেই অপরাধী ব্যক্তি নিশ্চয় মায়াবাদ দোষে দুষ্ট হইয়া অধোগতি লাভ করিবে।

শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু পূর্ব্ব, ২ লহরী, ১৬০ সংখ্যক শ্লোকের শ্রীজীবগোস্বামিপাদের টীকা আলোচ্য—"পিতৃত্বাদ্যভিমানো হি দ্বিধা সম্ভবতি, স্বতন্ত্রত্বেন, তৎপিত্রাদিভিরভেদভাবনয়া চ। তত্রাস্ত্যমনুচিতং ভগবদভেদোপাসনাবত্ত্বেষু ভগবদেব নিত্যত্বেন প্রতিপাদয়িষ্যমাণেষু তদনৌচিত্যাৎ। তথা তৎ পরিকরেষু তদুচিত সেবনাবিশেষেণাপরাধপাতাৎ। অর্থাৎ পিতৃত্বাদি অভিমান দুই প্রকারের হইতে পারে 'আমি কৃষ্ণের পিতা ইত্যাদি এইরূপ স্বতন্ত্র-অভিমান এবং শ্রীকৃষ্ণের পিতা প্রভৃতি ভিন্ন রসের নিত্য রসিকগণের সহিত অভেদ-অভিমান। ইহার মধ্যে শেষোক্ত আশ্রয়বিগ্রহত্ব অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য রসিকগণের সহিত অভেদ-অভিমান অত্যন্ত অনুচিত। বিষয়বিগ্রহ ভগবানের সহিত অভেদ অভিমানে যেরূপ অহংগ্রহোপাসনা রূপ অপরাধ হয়, তদ্রূপ ভগবানের নিত্যপরিকরগণের সহিত ও আপনাকে অভেদ জ্ঞান করিলে সেইরূপ অপরাধ হইয়া থাকে।

এই সব নরকের বুদ্ধি না করিলে সদ্গুরুর চরণাশ্রয় জীবের সম্বন্ধ জ্ঞানোদয়ের অভাব হইতেই উদিত হয়। সম্বন্ধজ্ঞান উদিত হইলে জীব আপনাকে—

"গোপীভর্ত্তুঃপদ কমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ"

গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের নিত্যমধুপায়ী দাসগণের অনুদাস বলিয়াই উপলব্ধি করেন।

শুদ্ধভক্ত সর্ব্বদাই প্রার্থনা করেন—

"মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে মৎপ্রার্থনীয় মদনুগ্রহঃ এষ এব।
ত্বদ্‌ভৃত্য-ভৃত্য-পরিচারক-ভৃত্যভৃত্যস্য-ভৃত্য-ইত মাং স্মর লোকনাথ।।"

হে লোকনাথ, হে মধুকৈটভারে, আমার জন্মের ইহাই ফল, ইহাই আমার প্রার্থনা এবং ইহাই আপনার অনুগ্রহ যে, আপনি আমাকে আপনার ভৃত্য বৈষ্ণবের দাসানুদাস সেই বৈষ্ণবের দাসানুদাস, সেই বৈষ্ণবের দাসানুদাস এবং বৈষ্ণবদাসানুদাসের দাসানুদাসের দাসানুদাস বলিয়া স্মরণ করিবেন। এই শ্লোকটী মহাত্মা কেরল সার্ব্বভৌমের রচিত। এই মহাপুরুষ শ্রীরামানুজ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের গুরু ও একজন ভক্তাবতার দিব্যসূরি মহানুভবগণের চরিত্রই এইরূপ। নিজদিগকে অবতার, মহাপ্রভু পাদ, বিশ্বগুরু, জগদ্‌গুরু, মহামহাপ্রভু, প্রভুপাদ প্রভৃতি কত কি বলিয়া জাহির করে। আমরা বারান্তরে অবতার সম্বন্ধে আরও বিশদ আলোচনা করিব।

হরিভজন

কলিযুগপাবনাবতার শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে উপদেশ প্রদানচ্ছলে জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন যে 'জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস' —জীব স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ফলে সেই নিত্য ভগবদ্দাস্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মায়াতে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। মায়াতে অভিনিবিষ্ট হওয়ায় জীবের ত্রিতাপ উদিত হইয়াছে। জীব কতই না কষ্ট পাইতেছে। কখনও কর্ম্মমার্গের আবর্ত্তে পড়িয়া পাপ ও পুণ্যাচরণ করিতেছে—তৎফলে স্বর্গ ও নরক ভোগ করিতেছে, আবার নির্ব্বিশেষ জ্ঞান বা যোগমার্গে রতিবিশিষ্ট হইয়া ভগবানের নিত্য-কৈঙ্কর্য্যবাঞ্ছা করিবার পরিবর্ত্তে ভগবানের সহিত স্বগত-সজাতীয় ভেদরহিত অবস্থাকেই শ্লাঘ্য জ্ঞানে বরণ করিবার জন্য কতই না কৃচ্ছ্রসাধ্য সাধন করিতেছেন। কিন্তু শ্রীগীতায় ভগবান স্বয়ং নিজমুখে অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া এই বেদবাণী প্রচার করিয়াছেন—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।।"

অর্থাৎ আমার (ভগবানের) মায়া ত্রিগুণময়ী—এই মায়ার কবল হইতে জীব সহজে উদ্ধার পাইতে পারে না। মায়ার শরণাপন্ন হইলে মায়ার হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না, তাহাতে আরও মহামায়ার মহাজালে আবদ্ধ হইতে হয়। কিন্তু যাঁহারা একমাত্র আমারই ভগবৎস্বরূপে শরণাগত হন তাঁহারাই এই মায়াসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারেন। এই কথাই শ্রীগৌরসুন্দর অতি সরলভাষায় বলিয়াছেন—

'তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়া-জাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ।।'

অর্থাৎ যে জীব স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারক্রমে মায়াতে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে সেই ব্যক্তি যদি সদ্গুরুর পদাশ্রয় পূর্ব্বক শ্রীগুরুর সম্পূর্ণ আনুগত্যে গুরুসেবা ও কৃষ্ণভজন করেন তবে তিনি মায়াজাল অতিক্রম করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম সেবারূপ পরমপ্রয়োজনলাভ করিতে পারেন।

সুতরাং জীবমাত্রেরই হরিভজন করা একান্ত ও মুখ্য কর্ত্তব্য। মুক্তপুরুষগণও নিত্য হরিভজন করিয়া থাকেন। এখন জিজ্ঞাসা—হরিভজন কাহাকে বলা যায়?' গোপাল তাপনী শ্রুতিতে দেখা যায়, সনকাদি মুনিগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"কথঞ্চাহো তদ্ভজনং"? সেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ভজন কিরূপ? তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন—

'ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যে—
নৈবামুষ্মিন্ মনসঃ কল্পনমেতদেব চ নৈষ্কর্ম্ম্যম্'

—ভক্তিই ভগবানের ভজন। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এস্থলের টীকায় বলিয়াছেন—ভক্তিশব্দো ভগবৎ-সেবা-বাচ্যঃ প্রসিদ্ধোর্থ এবাস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ভজনমুচ্যতে ইত্যর্থঃ। 'ভক্তি' শব্দ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা ইহাই

প্রসিদ্ধ অর্থ এবং ইহাই শ্রীকৃষ্ণের ভজন, সেই ভজনই বিশদভাবে বলিতেছেন—ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধীয় যাবতীয় কামনা অর্থাৎ অন্যাভিলাষ কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি, ভগবৎ-সেবেতর নিজেন্দ্রিয় তৃপ্তিকর কামনা নিরাসপূর্ব্বক এই কৃষ্ণাখ্য পরব্রহ্মে প্রেম দ্বারা তন্ময়ত্বই ভগবদ্‌ভজন, ইহাই নৈষ্কর্ম্ম্য। এই ভজন প্রধানতঃ নববিধ—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য,সখ্য ও আত্মনিবেদন।

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি।।"

কিন্তু এই নববিধ শ্রেষ্ঠ ভজনের মূলে শরণাপত্তির অভাব থাকিলে তত্তৎ ভজনাঙ্গ—'কর্ম্মাঙ্গ' হইয়া পড়ে।

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ"—শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ এ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন—শরণাগতিই ভজনের মূল। মূলকে ছেদন করিয়া ভগবদ্‌ভজনের চেষ্টাই পণ্ডশ্রম। হরিগুরুবৈষ্ণবের নিত্য আনুগত্যই 'সেবা' বা 'বৈষ্ণবধর্ম্ম—আর স্বতন্ত্রতাই কালপর কর্ম্মমার্গ বা জ্ঞানমার্গ; কিন্তু জীব যখন সাধুগুরু ও শাস্ত্রের কৃপায় কৃষ্ণোন্মুখ হন—জীবের যখন সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয়, তখনই জীব ভগবচ্চরণে আত্মনিবেদন করিয়া বলিতে থাকেন—

আমি তব নিত্যদাস জানিনু এবার।
আমার পালনভার এখন তোমার।।
বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে।
সব দুঃখ দূরে গেল ওপদ বরণে।।

ভগবানকে এইরূপ গোপ্তৃত্বে বরণ করিয়া জীব যখন গুরুর-আনুগত্যে কৃষ্ণভজন করিতে আরম্ভ করেন তখনই জীবের মঙ্গলোদয় হইতে থাকে। এই আত্মনিবেদন যাহাতে কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণের ন্যায় ক্ষণিক না হয় তজ্জন্য ভক্ত প্রার্থনা করিয়া বলেন—

আত্মনিবেদনভাব হৃদে দৃঢ় রয়।
হস্তিস্নান সম যেন ক্ষণিক না হয়।।

অন্যাভিলাষিগণের কোনও দিন আত্মনিবেদনের ভাব দেখা যায় না। কর্ম্মী জ্ঞানী ও যোগিগণের যে ক্ষণিক মিছা আত্মসমর্পণের ভাব দেখা যায় তাহারও কোনও মূল্য নাই। কারণ তাহা সম্বন্ধজ্ঞান বা শ্রীগুরুর নিত্য আনুগত্যমূলে প্রতিষ্ঠিত নহে। 'জীব' যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস'—এই সম্বন্ধজ্ঞান তাহাদের নাই। বাহিরে দেখিতে ভক্তির আকৃতিবিশিষ্ট তাহাদের যেসকল ক্রিয়াকলাপ—তাহা সাময়িক কারণ-প্রসূত। কর্ম্মীর স্বার্থ স্বর্গাদিলাভ এবং জ্ঞানীর স্বার্থ নির্ভেদ মুক্তিলাভ হইলে ঐ ভজনের আর কোনও মূল্য নাই। তাহাদের গুরুপ্রপত্তি নিত্য নহে—কারণ তাহাদের গুরু ও শিষ্য সম্বন্ধ অনিত্য। তাহাদের মতে সিদ্ধাবস্থায় গুরু ও শিষ্যে কোনও ভেদ নাই।

কিন্তু ভক্তের ব্যবহার সেইরূপ নহে। হরিভজন পরায়ণ ভক্ত গুরুর নিত্যদাস, শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। ভক্ত নিত্যকাল গুরুর আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণ সেবা করিয়া থাকেন। যেখানে গুরু ও বৈষ্ণবের আনুগত্য বাদ দিয়া হরিভজনের প্রয়াস—তাহা হরিভজন নহে—মায়ার ভজন। কোনও ব্যক্তি যদি গুরুর আনুগত্য ব্যতীত নিজ মতানুযায়ী সদাচার, তীর্থভ্রমণ, ভগবদ্ভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গ যাজন, ত্যাগ, তপস্যাচরণ, নামসংকীর্ত্তন, জপ, ধ্যান—প্রভৃতি যাবতীয় ভক্ত্যঙ্গানুশীলন (?) ও করিতে প্রবৃত্ত হন, তবেও তিনি একটুকুও হরিভজন করিতেছেন না, পরন্তু নিজেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছারূপ কাম চরিতার্থ করিতেছেন মাত্র। 'নিজেন্দ্রিয় প্রীতি' হরিভজনের কপটসজ্জায় প্রকাশিত হইয়া উপভোগের ছলনায় অনেক সময় লোকদিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকে। প্রতিষ্ঠাশা, কনক, কামিনী সংগ্রহেচ্ছায় হরিভজনের কপট অভিনয় 'হরিভজন' নহে, কেবল কৈতবযুক্ত আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা মাত্র। হরিভজনের মূলই গুরু ও বৈষ্ণবানুগত্য। গুরুর আনুগত্য ব্যতীত হরিভজনের ছলনা "ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়ার" ন্যায় কুচেষ্টা। বদ্ধাবস্থায় ত' গুরুর-আনুগত্য ব্যতীত হরি ভজনে প্রবেশ লাভই করা যাইতে পারে না—সিদ্ধাবস্থাতে যে সিদ্ধদেহে হরিভজন-প্রণালী তাহাতেও নিত্য গুরুদেবের আনুগত্য বর্ত্তমান। শ্রীহরির নিত্য আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব ও তদনুগজনের আনুগত্য না থাকিলে অহংগ্রহোপাসনারূপ অপরাধমাত্র সার হয়। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় "প্রার্থনায়" সিদ্ধদেহে হরি-ভজনের যে প্রণালী উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সাধকগণের সিদ্ধিকালে বিজ্ঞপ্তির জন্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোঁহার গলে।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বূলে।।
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
সেবা অভিলাষ করে নরোত্তমদাস।।"

* * * * *

"সুগন্ধি চন্দন, মণিময় আভরণ,
কৌষিক বসন নানা রঙ্গে।
এই সব সেবা যাঁর, দাসী যেন হঙ তার,
অনুক্ষণ থাকি তাঁর সঙ্গে।।
জল সুবাসিত করি', রতন ভৃঙ্গারেভরি,
কর্পূর বাসিত গুয়াপান।
এসব সাজাইয়া ডালা, লবঙ্গ মালতীমালা,
ভক্ষ্যদ্রব্য নানা অনুপম।।

সখীর ইঙ্গিত হ'বে, এসব আনিয়া কবে,
যোগাইব **ললিতার** কাছে।
নরোত্তম দাস কয়, এই যেন মোর হয়,
দাঁড়াইয়া রহু **সখীর পাছে।**

মধুর রসসেবায় গুরুরূপা সখীর আনুগত্য ব্যতীত রাধাগোবিন্দের ভজন—ভজন নহে, উহা প্রাকৃত সহজিয়া গণের ব্যভিচার। হরিভজন পরায়ণ বৈষ্ণবগণ তাহা কখনও স্বীকার করেন না।

হরিভজন সম্বন্ধে আমাদের আরও কয়েকটী অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। অনেকের ধারণায় হরিভজন বলিতে স্মরণচ্ছলে নির্জ্জন-ভজন নির্জ্জনে 'মালা-টানা'। অনর্থযুক্তাবস্থায় ঐরূপ নির্জ্জনভজনের চেষ্টা—প্রতিষ্ঠাশার আশা বা আলস্য মাত্র—উহা হরিভজন নহে। অনর্থযুক্তাবস্থায় আমাদের ইন্দ্রিয়সকল বহির্ম্মুখী বৃত্তি সম্পন্ন থাকে, সুতরাং ঐ সকল ইন্দ্রিয় সর্ব্বদা মায়িক ব্যাপারে ধাবিত হইতে ইচ্ছা করে। এইরূপ অবস্থায় যাহারা উহাদিগকে নির্জ্জনে রোধ করিতে চেষ্টা করেন তাহারা হরিভজনের নামে "মিথ্যাচারী" মাত্র।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।। (গীতা ৩।৬।)

চিত্ত যাহার শোধিত হয় নাই, তাহার কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযম করিলে কি হইবে? সেই ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয় সমুদায় সংযম করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ার্থের আলোচনা করিতে থাকিবে। অতএব সেই মূঢ়কে "মিথ্যাচারী" বলা যায়।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় শ্রীহরিনাম সাধনকালে যে নির্জ্জনতার বিধান উল্লেখ করিয়াছেন তাহার উদ্দেশ্য এই যে দুঃসঙ্গ পরিহার পূর্ব্বক ঐকান্তিকতার আবাহন। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসঙ্গ ত্যাগ করিয়া নিজানর্থবর্দ্ধনোদ্দেশ্যে নির্জ্জনে নামগ্রহণ বিহিত নহে। সঙ্গ ত্যাগ না করিলে বা জনসঙ্গ দ্বারা ভক্তি বৃদ্ধি হয় না। এই স্থলে ভজন প্রতিকূল সঙ্গ জানিতে হইবে। জাতরতি ব্যক্তির প্রেমচেষ্টায় যে নির্জ্জনতা তাহা স্মরণমূলা। তাহা সাধনকালীন নির্জ্জনতাজাতীয় নহে।

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে।।"

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-ধৃত নারদপঞ্চরাত্র বচন—অন্যাভিলাষ জ্ঞান-কর্ম্মাদির আবরণ হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মুক্ত হইয়া আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব্বেন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণেরসেবাই—হরি ভজন"।

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরি-সেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা।।

যিনি হরিভজন করিতে অভিলাষ করেন তাঁহার লৌকিকই হউক, বৈদিকই হউক—যে কোন কার্য্য হরি-সেবানুকূল (গুরু ও বৈষ্ণবের-আনুগত্যে হরির প্রীতির জন্য)-ভাবে যাজন করা কর্ত্তব্য।

বদ্ধজীব হরিভজনের রহস্য অবগত নহে। নিত্য ভগবানের সেবকবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব জীবকে হরিভজন শিক্ষা দিবার জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ। তিনিই একমাত্র হরিভজনের রহস্য অবগত আছেন। তাঁহারই অনুকম্পায় জীব হরিভজনের প্রণালী অবগত হইতে পারেন। যিনি সেই সদ্‌গুরুর আনুগত্যে হরিসেবোদ্দেশ্যে যাবতীয় ইন্দ্রিয়চালনা করিয়া থাকেন—তিনিই হরিভজন আরম্ভ করিয়াছেন—তিনি চক্ষুদ্বারা হরিভজন করিতেছেন, কর্ণদ্বারা হরিভজন করিতেছেন, তাহার নাসিকা জিহ্বা, ত্বক্—মন আত্মা সকলই হরিভজনে নিযুক্ত এবং তিনিই ভজনপরিপক্কাবস্থায় সিদ্ধদেহে লীলায় প্রবিষ্ট হইয়া নিত্য হরিভজনানন্দ লাভ করেন। সুতরাং যদি আমরা নিত্যমঙ্গল লাভ করিতে ইচ্ছা করি তাহা হইলে আর যেন আমরা স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার না করি—স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারফলেই আমরা ত্রিগুণের শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছি, আমাদের নিত্য প্রভু—শ্রীহরির ভজন বিস্মৃত হইয়াছি। ভজনের মূল এই নরতনু লাভ করিয়া যেন আমরা হেলায় দুর্ল্লভ জন্ম না হারাই। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় জীববৃন্দকে ভজন শিক্ষা দিবার জন্য গাহিয়াছেন—

"দুর্ল্লভ ভজন হেন, নাহি ভজ হরি কেন,
কি লাগিয়া মর ভববন্ধে।
ছাড় অন্য ক্রিয়াকর্ম্ম, নাহি দেখ বেদ-ধর্ম্ম
ভক্তি কর কৃষ্ণপাদদ্বন্দ্বে।।
বিষয় বিষম-গতি, নাহি ভজ ব্রজপতি,
শ্রীনন্দ-নন্দন সুখসার।
স্বর্গ আর অপবর্গ, সংসারে নরক-ভোগ,
সর্ব্বনাশ জনম-বিকার।।
দেহে না করিহ আস্থা, সন্নিকটে যম শাস্তা,
দুঃখের সমুদ্র কর্ম্মগতি।
দেখিয়া শুনিঞা ভজ, সাধুশাস্ত্র মত যত,
যুগল-চরণে কর রতি।।

* * * * *

জ্ঞান-কর্ম্ম করে লোক, নাহি জানে ভক্তিযোগ
নানা মতে হইয়া অজ্ঞান।
তার কথা নাহি শুনি, পরমার্থ তত্ত্ব জানি,
প্রেমভক্তি ভক্তগণপ্রাণ।।

* * * * *

গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র, পরম আনন্দকন্দ,
পরিবার গোপগোপী সঙ্গে।
নন্দীশ্বর যার ধাম, গিরিধারী যার নাম,
সখী সঙ্গে তারে ভজ রঙ্গে।।
প্রেমভক্তিতত্ত্ব এই, তোমারে কহিনু ভাই,
আর দুর্ব্বাসনা পরিহরি।
শ্রীগুরুপ্রসাদে ভাই এসব ভজন পাই,
প্রেমভক্তি সখী-অনুচরী।।

* * * * *

অহঙ্কার অভিমান, অসৎ সঙ্গ, অক্ষজ জ্ঞান,
ছাড়ি ভজ গুরুপাদপদ্ম।
কর আত্ম-নিবেদন, দেহ গেহ পরিজন,
গুরুবাক্য পরম মহত্ত্ব।।

—প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা।

জিহ্বাবেগ

বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়ের গতিকে ইন্দ্রিয়-বেগ বলে। বিষয় পাঁচটী—রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস এবং স্পর্শ। বিষয়ের গ্রাহক ইন্দ্রিয়ও পাঁচটী—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্।

নিত্য কৃষ্ণদাস জীব, নিজ প্রভুসেবা ভুলিয়া এই প্রপঞ্চে আসিয়া পড়ে। এই সংসার বাহ্য দৃষ্টিতে জীবের সুখ ভোগের আগার হইলেও ইহা বদ্ধ জীবের জন্য কারাগার মাত্র। অপরাধী ব্যক্তির অপরাধ মোচনজন্য যেমন কারাগারের সৃষ্টি সেইরূপ সংসার কৃষ্ণবিস্মৃতজীবের শাস্তিগৃহ।

চিৎকণ জীব, চিৎসূর্য্য শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা শক্তির পরিণাম। সুতরাং সেই তটস্থ-ধর্ম্মে জীবসত্তায় সেবাধর্ম্ম ও ভোগ প্রবৃত্তি অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান। যেকালে সেবাধর্ম্মের হ্রাস, সেকালে ভোগপ্রবৃত্তির উদয়, এই ভোগপ্রবৃত্তির উদয়ে মায়ার প্রতি অভিনিবেশই জীবের বন্ধন। সূক্ষ্ম ও স্থূলভেদে বদ্ধাবস্থায় দুইটী আবরণ। মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মব্যক্ত ভেদ ও ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম এই স্থূলব্যক্ত পঞ্চভেদ। সূক্ষ্মদেহটী বাসনাময় আর বাসনার পরিতৃপ্তির সহায় স্থূলদেহ। বদ্ধজীব এই ভোগায়াতন দেহদ্বয়ে 'আমি' বুদ্ধি করিয়া কর্ত্তৃত্বাভিমানে জড়- বিষয়ের ভোক্তা সাজিয়াছেন। ইহাই জীবের সংসার।
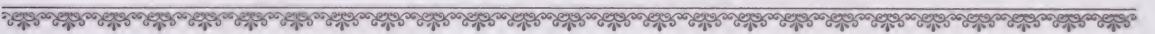
স্থূলদেহে দশটী ইন্দ্রিয়ের মধ্যে জিহ্বা রস সংগ্রহের যন্ত্র। জিহ্বাদ্বারে আমরা খাদ্যদ্রব্যের কটু, তিক্ত, কষায়াম্লভেদে বহুবিধ রসের আস্বাদন গ্রহণ করি। গৃহীত খাদ্যদ্রব্যে ইন্দ্রিয়তর্পণযোগে আমাদের দেহ রক্ষিত ও পুষ্ট হয়। যে কালে জিহ্বা খাদ্যদ্রব্যের দ্বারা দেহরক্ষার কথা ভুলিয়া ইন্দ্রিয়সুখ-লালসা কেবলমাত্র রসাস্বাদনে ব্যস্ত হয়, তখনই জিহ্বা বেগ। ইহা জিহ্বার অসংযত অবস্থা। জিহ্বার অসংযত অবস্থায় দেহে কতপ্রকার রোগের উৎপত্তি হয় তাহা ভোগিগণ জানিয়াও না জানিলে সংযত ব্যক্তিগণ বেশ বুঝিতে পারে। সংযত খাদ্যদ্রব্য গ্রহণে যেরূপ দেহের পুষ্টি সাধিত হয়, অসংযত জিহ্বাদ্বারে দেহের তদ্বিপরীত অপুষ্টি বা রোগফলে মৃত্যুও সাধিত হইতে পারে।

সাধারণ বিচারেও জিহ্বাবেগের দাস হওয়া উচিত নহে, ভজনপ্রয়াসীর ত' কথাই নাই। জিহ্বাবেগে কেবলমাত্র জিহ্বা অসংযত হয় এরূপ নহে, ঐ সঙ্গে উদর ও উপস্থের বেগ বৃদ্ধি হয়। জিহ্বার বেগে জিহ্বা অশান্ত, উদরের বেগে উদরাময় ও উপস্থবেগে ইন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টাবৃদ্ধি। এ-বিষয়ে জগতের জ্বাজল্যমান উদাহরণসমূহই যথেষ্ট। তাই শাস্ত্রে বলিয়াছেন—

জিহ্বার লাগিয়া যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর পরায়ণকৃষ্ণ নাহি পায়।।

জিহ্বা বেগ দুর্দ্দমনীয়। যতই রস-সংসর্গ পাইবে ততই ইহা অতৃপ্ত হইয়া রসসংগ্রহে ব্যস্ত হয়। জিহ্বা সপত্নীর ন্যায় গৃহপতির সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে। কামুকের দৃষ্টিতে বহু পত্নীক সুখী হইলেও তাহার দুঃখের কথা ভুক্তভোগী ব্যতীত কেহ বুঝিতে পারে না। ভাঃ ৭ম স্কন্ধ ৯ম অঃ ৪০শ্লোক—

জিহ্বৈকতোঽচ্যুত বিকর্ষতি মাবিতৃপ্তা শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্ম্মশক্তির্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি।।

জিহ্বাবেগের দাসের অবস্থা অতীব শোচনীয়। রসভোগে প্রমত্ত মৎস্য বড়িশ- সংলগ্ন আমিষলোভে ধাবিত হইয়া আমিষ ভোজনরূপ সুখাস্বাদনে বঞ্চিত হইয়া যেরূপ লোহকন্টকে আবদ্ধ হয়, জিহ্বাবেগের দাসের সেইরূপ বস্তুলাভ না হইয়া মৃত্যু লাভ হয়—

জিহ্বয়াতিপ্রমাথিন্যা জনো রসবিমোহিতঃ।
মৃত্যুমিচ্ছত্যসদ্বুদ্ধির্মীনস্তু বড়িশৈর্যথা।। (ভা ১১।৮।১৯)

অপ্রাকৃতানুভূতিরহিত প্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট ভোগপ্রিয় জনগণের মীমাংসা সর্ব্বদা বিবদমান। এই বিচারে অনাহারে জিহ্বাজয়ের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহা কতদূর কার্য্যকারী তাহা সূক্ষ্ম দূরদর্শী ও অধোক্ষজ-সেবাধর্ম্মবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ জানেন। নিরাহারে অন্যান্য ইন্দ্রিয়বেগ প্রশমিত হইলেও রসভোগ-নিবৃত্তিচেষ্টার ব্যতিরেকভাবে জিহ্বাবেগ বর্ত্তমান; অনাহারে দেহনাশের সম্ভাবনা। এ ব্যবস্থা দেখিয়া একজন চিকিৎসকের কথা মনে পড়ে। কোন ধনীর অঙ্গে কয়েকটী ব্রণ হওয়ায় তিনি যন্ত্রণায় অধীর হইয়া একজন সুচিকিৎসকের শরণাগত হন। ভবিষ্যৎ-দর্শী ঐ চিকিৎসক রোগদর্শনের পর অনেক বিবেচনা করিয়া বলেন—এই ব্রণগুলি

বর্ত্তমানে ঔষধ প্রয়োগে নিরাময় হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার ভবিষ্যতের ছবি মনে পড়িতেছে। কেননা ভবিষ্যতে পুনরায় ব্রণ হইতে পারে। অতএব আপনার গলদেশে অস্ত্র প্রয়োগই এই ব্রণ হইতে চিরদিনের মত নিরাময়ের ব্যবস্থা হইতেছে।

আবার অন্য বিচারে স্থির হইয়াছে যে জিহ্বার প্রবৃত্তি অনুসারে উহাকে চলিতে দিলে অবশেষে ক্ষীণবীর্য্য হইয়া আপনা আপনিই সংযত হইবে। কিন্তু ইহা ঠিক বৃদ্ধব্যক্তির ইন্দ্রিয়-সংযমনের ন্যায়। কেননা বৃদ্ধ ব্যক্তির ভোগেন্দ্রিয়ের অপটুতাক্রমে ভোগক্রিয়ার হ্রাসমাত্র ঘটে। উহা 'বৃদ্ধা বেশ্যাতপস্বিনী' ন্যায়ানুগত। ভোগের দ্বারা ভোগ-নিবৃত্তি ভোগবাদীর মত। ত্যাগের দ্বারা ভোগ নিবৃত্তি ফল্গু ত্যাগীর মত। বিষয়ের ভোগে বা ত্যাগে বিষয়গ্রহণ প্রবৃত্তির ধ্বংস হয় না। জিহ্বা অসংযত রাখিলে কেবল জিহ্বাবেগ নহে, উদর ও উপস্থের বেগবৃদ্ধি হয় ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

শাস্ত্র বলেন যে, যে পর্য্যন্ত রসনাজয় না করা যায় সে কাল পর্য্যন্ত অন্য ইন্দ্রিয় জিত হইলেও জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায় না, কিন্তু রসনা-জয়ে সর্ব্বেন্দ্রিয় জয় করা হয়—

তাবজ্জিতোন্দ্রিয়ো ন স্যাদ্বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্।
ন জয়েদ্রসনং যাবজ্জিতং সর্ব্বং জিতে রসে।।

(ভাঃ ১১।৮।২১)

অতএব এই উভয় সঙ্কটে জীবের কোন পথ গ্রহণ শ্রেয়ঃ অক্ষজবাদিগণ তাহার বিচার করিয়াছেন কি? তাহারা ত' 'ধৃতি' গুণলাভে ব্যস্ত। ধৃতি-শব্দে কি অনুদ্বেগমাত্র বুঝায়? না তাহা নহে। শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীগুরুর চরণাশ্রয়ে দিব্যকর্ণলাভ করিয়া জীব শুন উদ্ধবের প্রশ্নে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

'জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ' (ভা ১১।১৯।৩৬)

আবার শুন, এই দ্বন্দ্বাতীত বিচারে শাস্ত্র বলিতেছেন,—

হৃষীকেশে হৃষীকাণি যস্য স্থৈর্য্যগতানিহ।
স এব স্থৈর্য্যমাপ্নোতি সংসারে জীব-চঞ্চলে।।

সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণ। ভৃত্যের কর্ত্তব্যই প্রভুসেবা। প্রভুসেবা ভুলিয়া ভোগবুদ্ধিতে দাসের প্রভু হওয়ার জন্যই এই দুরবস্থা। পুনরায় ভোগ ছাড়িয়া প্রভুসেবায় নিযুক্ত হইলে নিজ স্বভাবের উদয় হয়। ঐ দেখুন মহাভাগবত অম্বরীষ কিভাবে রসনা জয় করিয়াছেন—

'রসনাং তদর্পিতে' (ভাঃ ৯।৪।১৯)

জাগতিক বস্তুসমূহ ত্রিগুণময়। আহার্য্য দ্রব্যও ত্রিবিধ। তামসিক ও রাজসিক খাদ্য অপেক্ষা সাত্ত্বিক খাদ্য শ্রেষ্ঠ হইলেও উহা গুণময়। আর শ্রীভগবন্নিবেদিত অন্ন নির্গুণ। ইহা ত্রিগুণাতীত অর্থাৎ অপ্রাকৃত, 'মন্নিবেদিতন্তুনির্গুণং'। শ্রীকৃষ্ণ-সেবাবুদ্ধিবিশিষ্ট জীব অহঙ্কারমুক্ত। আর বদ্ধজীব প্রাকৃত অহঙ্কারে মত্ত। সেবা-পরায়ণ জীব মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া অনাহারে ও অত্যাহারের দাস নহেন, পরন্তু জিতেন্দ্রিয় ও

ইন্দ্রিয়দ্বারে হৃষীকেশের সেবাযুক্ত। ইহা একাধারে ইন্দ্রিয়জয় ও ভগবৎসেবার অপূর্ব্ব সম্মেলন। ভোগবাদী ও ফল্গুত্যাগীর ন্যায় ইন্দ্রিয়দাসত্বের বা কল্পিত ইন্দ্রিয় ধ্বংসের প্রকরণ মাত্র নহে। তাই ভক্তরাজ গাহিয়াছেন—

মহা প্রসাদসেবা, করিতে হয়,

সকল প্রপঞ্চ জয়।

শাস্ত্রঃ পুনরায় বলিয়াছেন। শ্রীভগবন্নিবেদিত অন্ন মহাপ্রসাদ, আর উহা ভক্তভুক্ত হইলে মহামহাপ্রসাদ। সুতরাং মহাপ্রসাদ ও মহামহাপ্রসাদ- সেবনই জীবের জিহ্বাবেগ প্রশমনের ও জিহ্বাদ্বারে শ্রীভগবানের সেবার যোগ্যতাপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়—

ভক্তপদধূলী আর, ভক্তপদজল।
ভক্তভুক্তশেষ—তিন সাধনের বল।।

উপাসনা

উপাসনা বলিলে উপাস্য উপাসক ও উপাসনা এই তিনটী বিষয় মনে হয়। নির্ব্বিশেষবাদিগণ পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্য স্বীকার না করায় তাহাদের ক্রিয়াকে উপাসনা বলা যায় না। কামনামূলে কল্পিত নানা দেব দেবীর উপাসকের সজ্জায় সজ্জিত হইয়া যে অনিত্য উপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়া তাহা বৈধ অর্থাৎ আত্মার নিত্য বৃত্তি নহে। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় কীর্ত্তন করিয়াছেন—

কর্ম্মিজ্ঞানী মিছাভক্ত, না হব তাতে অনুরক্ত।

অর্থাৎ যাঁহারা অন্তরে বুভুক্ষু বা মুমুক্ষু এবং বাহিরে উপাসকের সজ্জায় সজ্জিত তাহারা প্রকৃত উপাসক নহেন, নকল বা মেকি।

উপাসনা কার্য্যটী কি তাহাই এখন বিচার্য্য বিষয়। উপাসনা কথার অর্থ—

শ্রীধর স্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।২।৩৭ টীকায় অথাপিক্রিয়ায়ামুপাসনাদি- লক্ষণায়াং তাং প্রতিযন্তি এইরূপ লিখিয়াছেন। নিত্য উপাস্য বস্তু ভগবানের প্রতি নিত্য উপাসক জীবাত্মার যে নিত্য ক্রিয়া তাহাকেই উপাসনা বা ভক্তি বলে, তাহা দেহ মনের অনিত্য ক্রিয়াবিশেষ নহে। কিন্তু আত্মার নিত্য বৃত্তি উপাসনাকার্য্যে দেহের সাহায্য কিয়ৎ পরিমাণে প্রয়োজন হইলেও ঐ কার্য্যটী দৈহিক কার্য্যাপেক্ষা অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ। উপাসনা মানসিক কার্য্যও নহে, যেহেতু মন জড়প্রসূত ও সংকল্প বিকল্পাত্মক উপাসনাক্রিয়াটী তাদৃশ মনঃকল্পিত নহে।

উপাস্য, উপাসক ও উপাসনা এই তিনটীই অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃত বস্তুই অপ্রাকৃত তত্ত্ব জানিয়া অপ্রাকৃত উপাসনা করিতে সমর্থ। দেহ, বাক্য ও মন ইহারা জড়প্রসূত, সুতরাং প্রাকৃত। প্রাকৃত বস্তু অপ্রাকৃত বস্তুকে জানিতে পারে না প্রাকৃত বস্তু অপ্রাকৃত বস্তুর উপাসনা করিতে অসমর্থ। অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।

দেহ ও মন উপাধিদ্বয়ের পরিচয়ে পরিচিত হইবার অযোগ্য জীবাত্মাই ভগবান্‌কে জানিতে পারেন। কিন্তু যতদিন তিনি প্রাকৃতশরীরবিশিষ্ট ততদিন উপাসনা ক্রিয়াও দেহে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ আত্মা যখন ভক্তিযোগে ভগবদুপাসনায় নিযুক্ত থাকেন জিহ্বা তখন ভগন্নাম কীর্ত্তন করেন, চক্ষু ভগবদ্রূপ দর্শনে ও কর্ণ ভগবৎকথাশ্রবণে নিযুক্ত হন, হস্ত, পত্র, পুষ্পাদিও নিজ প্রিয় বস্তু ভগবান্‌কে দিয়া তৃপ্ত হয়। পদ ভগবন্নামাদি কীর্ত্তনে নৃত্য ও ভগদ্ধামসমূহে বিচরণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করে। দেহে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকারাদি লক্ষিত হয়। কিন্তু এইগুলি মুখ্য উপাসনা নহে, মুখ্য উপাসনার প্রকাশক মাত্র। বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুগণের মধ্যে ঐ বাহ্য ক্রিয়াগুলি দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহাতে নিত্য সেবা প্রবৃত্তির অভাব বলিয়া তাহাদের ক্রিয়াগুলিকে উপাসনা বলা যায় না, তজ্জন্য শ্রীল রূপগোস্বামী বলিয়াছেন—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেৎ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।।

জড় বস্তু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে গৃহীত হয়; কিন্তু ভগবদ্বস্তু অধোক্ষজ তত্ত্ব, ইন্দ্রিয়তর্পণের বিষয় নহেন বলিয়া সেবা প্রবৃত্তিক্রমেই তাঁহা হইতে অভিন্ন তাঁহার নামাদি গ্রহণ সম্ভব হয়, সেবোন্মুখ জিহ্বাই ভগবানের গুণকীর্ত্তন করিতে পারেন, সেবোন্মুখ অপ্রাকৃত চক্ষুই ভগবানের অপ্রাকৃতরূপদর্শনে সমর্থ, সেবোন্মুখ কর্ণই ভগবানের লীলা ও গুণসমূহ শ্রবণ করিবার যোগ্য।

যোগ্যতা বা অধিকারানুসারে বেদশাস্ত্র তিনভাগে বিভক্ত। ভোগময় প্রবৃত্তি হইতে কর্ম্মকাণ্ডের উদ্‌গম ও ত্যাগময় প্রবৃত্তি হইতে জ্ঞান কাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। এই উভয়বিধ মার্গই বেদের উপাসনাকাণ্ড হইতে ভিন্ন। বদ্ধানুভূতি হইতে ঐ দুইটী মার্গের উৎপত্তি। মুক্তানুভূতিতে যে রুচির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই বেদের উপাসনাকাণ্ড। তাহা কখনও সত্ত্বরজস্তমোগুণময় জড় কর্ম্ম বিশেষ নহে, নির্গুণ। শাস্ত্র বলেন—

"সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ম্মশ্রদ্ধাতু রাজসী।
তামস্যধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎ-সেবায়ান্ত নির্গুণা।।"

আধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, কর্ম্মশ্রদ্ধা রাজসী, অধর্ম্মে যে শ্রদ্ধা তাহা তামসী, মৎ-সেবায় যে শ্রদ্ধা তাহা নির্গুণ। ভোগ ও ত্যাগ এই দুইটী সগুণ, সুতরাং নির্গুণ আত্মার নিত্য বৃত্তি নহে। অর্জ্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নির্গুণের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলে, ভগবান্ বলিয়াছিলেন যে, ভোগ ও ত্যাগরাহিত্যই নির্গুণতার লক্ষণ, ভোগ ও ত্যাগ এই দুইটীই জীবের নিত্য প্রবৃত্তির বাধক বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

"ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়ার্থেষু রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ।।"

ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুই বিষয়। বিষয়ে যে আসক্তি তাহাকে রাগ বলে। বিষয়ের অভাব অথবা বিষয়গ্রহণে অসমর্থতা কিংবা অধিক সুখপ্রাপ্তির আশায় বিষয়গ্রহণজনিত ক্ষণিক সুখ পরিত্যাগ করার নাম দ্বেষ। এই দুইটীই জীবের নিত্য স্বরূপ লাভের বিঘ্নস্বরূপ। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, সত্ত্বগুণ জীবকে জ্ঞান ও সুখ

দ্বারা বন্ধন করে, রজোগুণ কর্ম্মদ্বারা বন্ধন করে এবং তমোগুণ প্রমাদ আলস্যাদি দ্বারা বন্ধন করে। এই ত্রিগুণাভিমানী জীব গুণাতীত রাজ্যের পরিচয় জানিতে পারে না—

"ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভি জানাতি মমাব্যয়মনুত্তমম্।।"

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণ দ্বারা সমগ্র জগৎ মোহিত। তাহারা আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট অব্যয় স্বরূপ জানিতে অসমর্থ, ভোগ বা ত্যাগ বেদের তাৎপর্য্য নহে।

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান।।"

অর্থাৎ শাস্ত্রসমূহের দুই প্রকার বিষয়—উদ্দিষ্ট বিষয় ও নিদ্দিষ্ট বিষয়। যে বিষয়টী যে শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য তাহাই তাহার উদ্দিষ্ট বিষয় আর যাহার নির্দ্দেশে উদ্দিষ্ট বিষয় লক্ষিত হয় সেই বিষয়ের নাম নির্দ্দিষ্ট বিষয়। বেদসমূহ নির্গুণ তত্ত্বকে উদ্দিষ্ট বলিয়া লক্ষ্য করেন। নির্গুণ তত্ত্ব সহসা লক্ষিত হয় না বলিয়া প্রথমে কোন সগুণ তত্ত্বকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন সেই জন্য সত্ত্বরজস্তমঃ ত্রিগুণময়ী মায়াকেই প্রথম দৃষ্টিক্রমে বেদ সকলের বিষয় বলিয়া বোধ হয়। হে অর্জ্জুন, তুমি সেই নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে আবদ্ধ না থাকিয়া নির্গুণতত্ত্বরূপ উদ্দিষ্ট তত্ত্ব লাভ করিয়া নিস্ত্রৈগুণ্য স্বীকার কর। বেদশাস্ত্রে কোন স্থলে রজস্তমগুণাত্মক কর্ম্ম, কোন স্থলে সত্ত্বগুণাত্মক জ্ঞান এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে নির্গুণ ভক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে। গুণময় মানাপমানাদি দ্বন্দ্বভাব হইতে রহিত হইয়া নিত্য সত্ত্বস্থ অর্থাৎ শুদ্ধ আত্মস্বভাবে স্থিতিপূর্ব্বক যোগ ও ক্ষেমানুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধিযোগসহকারে নিস্ত্রৈগুণ্য লাভ কর। অভক্তগণ বেদের অপ্রাকৃত উপাসনাকাণ্ডকে কর্ম্ম কাণ্ডের অন্যতম মনে করেন কিন্তু পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে কর্ম্মজ্ঞানাদি সগুণ সুতরাং অনিত্য বা ক্ষরধর্ম্মযুক্ত। যে ধর্ম্মাবলম্বনে ক্ষর ধর্ম্মের মহিমা মলিনতা লাভ করে, তাহাই বেদের উপসনা।

মহামায়া

মহামায়া ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী। তিনি জগৎপ্রসবিণী। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি অনন্তকোটী জগৎ তাঁহারই সৃষ্টি। দেব, নর, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ প্রাণী তাঁহা হইতেই প্রসূত। সুতরাং তিনি যে জগজ্জননী, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? মহামায়া সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই গুণত্রয়ের অধষ্ঠাত্রী দেবী, তাই তিনি গীতার গুণময়ী বা গুণাত্মিকা বলিয়া শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছেন। সাংখ্যের প্রকৃতি ও বেদান্তের মায়া তাঁহারই নামান্তর। যাঁহারা বর্ত্তমান সাংখ্য বা বৌদ্ধবাদে বিচারে প্রকৃতিকেই প্রধানা বলিয়া স্বীকার করিয়া মহামায়ার সেবাতেই জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহারা মহামায়াকে ব্রহ্মা-বিষ্ণুমহেশ্বরেরও প্রসবিত্রী বলিয়া জানেন। তাঁহারা এ-সকল বিষয় শাস্ত্র-নিবদ্ধও করিয়াছেন। অবশ্য
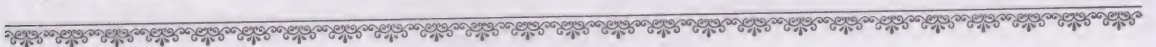
শ্রীভগবানের গুণাবতারগণের সম্বন্ধে একথাও যে বলা যায়, তাহা আমরা অবিলম্বেই দেখাইতেছি।

মহামায়া ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী কিসে? বৈদিক শাস্ত্রে দেখা যায়, ভগবান নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা। সেই ব্রহ্মা সৃষ্টি কর্ত্তা, তবে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী কোথা হইতে আসিল? এরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়াই স্বাভাবিক। ইহার উত্তর বুঝিতে গেলে মহামায়া যে কি তত্ত্ব তাহা পূর্ব্বে জানিতে হইবে।

শ্রীভগবানের অসংখ্যশক্তি। সেগুলিকে সাধারণতঃ তিনটী প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমটী শ্রীভগবানের স্বরূপ বা চিচ্ছক্তি। শ্রীভগবানের নিত্যচিদ্বিগ্রহ, চিদ্ধাম, চিৎসেবক সকলই এই চিচ্ছক্তির পরিণাম। অনন্তকোটীব্রহ্মাণ্ড, জড়জগৎ, দ্বিতীয়া বহিরঙ্গা বা অচিৎশক্তির পরিণাম। আর অনন্তকোটী জীব তৃতীয়া তটস্থা বা জীবশক্তির পরিণাম। শ্রীভগবানের দ্বিতীয়শক্তি জগৎ প্রসবিণী। শ্রীভগবানের দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদশায়ী মহাবিষ্ণু হইতে ব্রহ্মা উদ্ভূত। সেই ব্রহ্মার উপর সৃষ্টির ভার ন্যস্ত। সৃষ্টির উপাদান গুণত্রয়ের যোগে আমরা মায়াশক্তির পরিণামকে লক্ষ্য করি। সুতরাং এই চতুর্দ্দশভুবনের উপাদানভূত বহিরঙ্গাশক্তি মহামায়া যে জগৎ-জননী সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, পালনকর্ত্তা বিষ্ণু ও সংহার-কর্ত্তা শিব—ইঁহারা, মহাবিষ্ণুর গুণাবতার। গুণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—মহামায়া। সুতরাং আমরা যখন আধিকারিক দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের ধারণা করিতে প্রবৃত্ত হই, তখন গুণের মধ্য দিয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে গিয়া গুণরাজ্যের অধিকারিণী মহামায়ার অধীনতত্ত্বরূপে দেখিতে পাই, তখনই আমাদের নিকট মহামায়া হরিহর বিরিঞ্চির প্রসবিত্রীরূপে প্রতীয়মান হন। বস্তুতঃ এজগতে সকল তত্ত্বই যাঁহার শক্তিপরিণাম-জাত, তিনিই মূলপুরুষ ভগবান্, ব্রহ্ম বলিয়া বেদে যাঁহার নির্দ্দেশ। "যতো বা ইমানি ভূতাতি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যং প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম" এই শ্রুতিতে তাহাই শিক্ষা দেয়। শ্রুতির অংশান্তরে এই তত্ত্ব স্পষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।" এই বিষ্ণু সেই গুণাবতার পালনের আধিকারিক দেবতাবিশেষ নহেন। ইনি স্বয়ং ভগবান্, ব্রহ্ম তাঁহার অঙ্গকান্তিমাত্র।

মহামায়া এই বিষ্ণুর শক্তি। সপ্তশতী চণ্ডীতেও তাঁহার বিষ্ণুমায়া বলিয়াই খ্যাতি। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগীতাতেও ইঁহাকে "মম মায়া" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভগবান মায়াদ্বারে সৃষ্টি করেন। বেদে তাহা স্পষ্ট বলিয়াছেন। "স ঐক্ষত স ইমান্ লোকান্ অসৃজৎ।" মায়াতে ভগবদ্ ঈক্ষণে সৃষ্টি। অন্যত্র ঃ—

"যস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ
তস্মিংশ্চান্যে মায়য়া সন্নিরুদ্ধাঃ।"
"মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বং চরাচরম্।।"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগীতায় স্পষ্ট বলিতেছেন, "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।" এই প্রকৃতি মহামায়া 'প্রকৃতি' অর্থে শক্তি। জীবশক্তি মায়াশক্তিকর্ত্তৃক অভিভাব্য তত্ত্ব হইলেও উহা পরা বা চিচ্ছক্তির অন্তর্ভূক্ত।

শ্রীগীতায় স্পষ্টই তাহা বলিতেছেন—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।।
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।।"

ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম—এই পঞ্চভূত এবং মনবুদ্ধি অহঙ্কার এই মহত্তত্ত্ব লইয়াই মহামায়ার খেলা, ইহা ভগবানের অপরা শক্তির পরিণাম।

তটস্থতত্ত্ব জীব চিচ্ছক্তির অন্তর্ভুক্ত তত্ত্ব হইলেও যখন সে তাহার অণুচিতের অপব্যবহারক্রমে বিভূচিৎ ভগবানের সন্মুখীন না থাকে, তখনই সে ভগবদ্বিমুখ হইয়াই তাঁহার ঐ অপরা শক্তির প্রতি উন্মুখ হয়। সেই অবস্থায় সে চিদ্বলের অভাবে অচিতের অধীন তত্ত্ব হইয়া পড়ে। ইহাকেই জীবের মায়াগ্রস্ততা বলে। শুদ্ধজীবে মন বুদ্ধি অহঙ্কারাত্মক প্রাকৃত লিঙ্গশরীর নাই, পঞ্চভূতাত্মক স্থূল শরীরও নাই; কিন্তু যখনই জীব মায়াগ্রস্ত হয়, তখনই কারাকর্ত্রী মায়া তাহাকে ঐ দুইটী জেলের পোষাক পরাইয়া কারাগাররূপ দেবীধামে বদ্ধ রাখেন। মহামায়ার এই কার্য্য। তিনিই প্রপঞ্চে আমাদিগকে ভোক্তৃ-অভিমানের শেষ দেখাইয়া আমাদের শোধন করিবার জন্য নানারূপ ভোগের আবর্ত্তে ফেলিয়া আমাদিগকে কখনও রাজা, কখনও প্রজা, কখনও ধনী, কখনও নির্ধন, কখনও সুখী, কখনও দুঃখী, কখনও সুস্থ, কখনও রুগ্ন প্রভৃতি সজ্জা দিতেছেন। আমরা তত্তদভিমানে অভিনয় করিয়া আমাদের নিত্যস্বরূপের কথা, আমাদের চিদগঠনের কথা, আমাদের স্বরূপাবস্থায় নিত্য ভগবৎসেবার কথা এবং ঐ জেলের পোষাক না থাকার কথা সব ভুলিয়া গিয়াছি, আর কখনও এ পোষাকটাকে, কখনও ও পোষাকটাকে 'আমি' বলিয়া দাবি করিতেছি।

এ জগতের সুখ ও দুঃখ যে আমাদের প্রকৃত অবস্থা নয় আমরা তাহা ভুলিয়াছি, ভুলিয়া আমরা উহাদের একটীকে চাই, আর অন্যটীকে চাই না। উদাহরণ,—যেমন একটী শিশু লাল দেখিলেই চায়, কিন্তু লালে তার কি দরকার? সে মা'র কাছে আব্দার ক'রে ঐ লালের দিকেই আঙ্গুল বাড়ায়, তার যেন সেটা মস্ত দরকার। মা তার আব্দারের জন্য সেই লাল জিনিযটা হয়ত আনিয়া দেন, শিশু চুপ করে; আর নয়ত' তাহা দেন না, শিশু কাঁদিতেই থাকে। মহামায়ার কাছেও আমরা যেটা সুখ মনে করি সেইটেই চাই, আমায় ধন দাও, জন দাও, যশ দাও, আমার শত্রু নাশ কর ইত্যাদি আব্দার করি। কতক তিনি দেন, কতক দেন না। কখনও লোভ বাড়াইবার জন্যে আব্দার করিলেই জিনিষ দেন, লোভের জিনিষ দেওয়া বন্ধ করে, লোভ বাড়াইয়া কিংবা শিশুর হাত পোড়ার ন্যায় লোভের জিনিষ দিয়েও আমাদের কষ্টে ফেলে বুঝতে দেন যে ভোগটা আমাদের সুবিধার নয়। কা'রও সে বিবেক আসে, কা'রও সহজে আসে না। যা'র সে বিবেক আসে না, সে আরও আস্বাদ করে "কারও দুধে চিনি দিলি, মা, আমায় দিলি শাকে বালি।" এই যে লোক বল্‌লে তা'র নাম হোয়ে গেল, মহামায়ার খুব ভক্ত, খুব বড় সাধক। সে বেচারা ভোগের অভাবে ছট্‌ ফট্‌ কোরে

মা'কে জ্বালাতন কর্‌ছে, সে হোয়ে গেল বড় ভক্ত। কার ভক্ত? মহামায়ার ভক্ত ত' হোলই না, ভক্ত হোল ভোগের—এ মোটা কথাটা আমরা বুঝ্‌তে নারাজ যে, যা'রা মহামায়ার ভক্ত বলিয়া পরিচিত, তা'রা ভোগের ভক্ত, তা'রা ভোগের জন্য যা'র কাছে ভোগের জিনিষ পাওয়া যায়, তা'র কাছে উমেদারী করে মাত্র—সেটা ভক্তি নয়। 'ভক্তি' অর্থে সেবা, কাজ আদায়ের জন্য উমেদারীকে সেবা বলা যায় না।

আর যাঁর বিবেক আসিয়াছে, তিনি বুঝিয়াছেন ভোগে আমাদের সুবিধা নাই; তখন এই দেবীধামকে দুঃখের বলিয়া প্রতীতি হয়। তখন এই কারাগার হইতে মুক্তি হয়। এ অবস্থায় যাঁর সৌভাগ্যবশে ভগবৎকৃপা লাভ হয় তিনি মুক্তপুরুষের সাক্ষাৎ পা'ন, যথার্থ মুক্তির পথ কি, তাহা শুনিয়া নিত্যধর্ম্ম ভগবৎসেবাতে মনোনিবেশ করেন, ক্রমে মন ও দেহের আধিপত্য তাঁহাতে আর ক্রিয়া করিতে পারে না। তিনি জীবন্মুক্ত হইয়া যা'ন, শাস্ত্রে তাঁহার এইরূপ লক্ষণ দিয়াছেন—

"ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে।।"

শ্রীভগবান্ হরির সেবাতে কায়মনোবাক্যে অহর্নিশ যাঁহার চেষ্টা, তিনিই জীবন্মুক্ত। আর যাঁহার সে সৌভাগ্য এখনও হয় নাই, অথচ কিছু বিবেকোদয় হইয়াছে, তখন তিনি আর ত' কাহাকেও চেনেন না, সেই মায়েরই কাছে আবার আব্দার করেন, "তারা! কোন্ অপরাধে এ দীর্ঘমিয়াদে সংসারগারদে থাকি বল্?" আমরা মনে করিলাম "ওঃ লোকটী কি বড় ভক্ত—মায়ের অঞ্চল আর ছাড়ে না!" কিন্তু আমরা যদি বিচার করে' দেখি তিনি কিসের ভক্ত, তা' হোলেও দেখিব, তিনি ভোগেরই ভক্ত, সুখভোগ করিতে গিয়া যখন দুঃখই পান, তখন বলেন আর সুখ চাই না। সুখ মানেই দুঃখ, মা, আমার এমন জায়গায় রেখ—যেখানে এখানকার মত সুখ দুঃখ নাই, আমার খাঁচা থেকে ছেড়ে দাও, আমি খোলা হাওয়ায় ঘুরে বেড়াই।" ভোগ ছাড়্‌তে গিয়ে এও ভোগই চায়, আরও বড় ভোগ, কাজেই তাঁ'র ছাড়ান নেই। যতক্ষণ না নির্ম্মল জীবের ধর্ম্ম নিত্য ভগবৎসেবাতে তিনি আত্মনিয়োগ করবেন, ততক্ষণ কারাগার হইতে মুক্তি নাই। মহামায়ার উমেদারীতে আমাদের নিত্যমঙ্গল-লাভের উপায় নাই। তবে তিনি যে আমাদের শোধনে প্রবৃত্তা তন্নিমিত্ত তিনি আমাদের প্রণম্য হইতে পারেন। অন্য বুদ্ধিতে স্বতন্ত্র দেবতাজ্ঞানে তাঁহাকে প্রণাম করা, আর ঐ উমেদারী করিয়া আরও বদ্ধ হওয়া একই কথা—সোণার শিকল আর লোহার শিকল পরা।

দেওয়ালী

দেওয়ালী দীপাবলীর অপভ্রংশ। উর্জ্জা, কার্ত্তিক বা দামোদর মাসে অন্যান্য কৃত্যের মধ্যে দীপদান একটা প্রধান কৃত্য। শ্রীহরিমন্দিরে, শ্রীতুলসীর নিকট ভক্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তি প্রত্যহ প্রদোষে দীপদান করিবেন। এই ভক্তিবৃদ্ধিকর দীপদান কার্য্যে কর্ম্মিগণকে প্রণোদিত করিবার জন্য শাস্ত্রে অনেক ফল নির্দ্দেশ আছে। সে

গুলি অসত্য না হইলেও ভক্তিপথগামী সেই ফলসমূহকে বহুমানন করেন না, তবে কৃষ্ণপ্রীতির উদ্দেশ্যেই তাঁহারা দীপদান কার্য্যের সমাদর করেন। কর্ম্মিগণও নানাবিধ কাম্যফলের আশায় এই কার্য্যে যোগদান করিয়া থাকেন। অপৌনর্ভব বা মুক্তি ও পাপহানির জন্য অনেকে এই কৃত্য পালন করেন। ভক্ত জানেন, এসকল ফল অতি তুচ্ছ, কৃষ্ণপ্রীতিমূলে যে ভক্তি তাহাই চরম ফল, ভক্তের নিকট মুক্তি অতিতুচ্ছ ফল, কেননা ভক্ত পূর্ব্বেই মুক্ত হইয়াছেন, আর কাম্যফলসমূহ তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষা করেন মাত্র, কিন্তু ভক্ত সেসকল কামনা করেন না। শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর তাই ভগবৎসমীপে নিবেদন করিয়াছেন,—

"ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাদ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্ ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ।।"

সুতরাং ভক্তের দীপদান ও কর্ম্মীর বা মোক্ষাভিলাষীর দীপদানে অনেক পার্থক্য। তবে পাপক্ষয়াদির জন্য দীপদান করিতে করিতে অজ্ঞাতসেবাফলে কৃষ্ণসেবায় রতি উৎপাদিত হইতে পারে। এই নিমিত্ত ভক্তের স্মৃতিনিবন্ধ শ্রীহরিভক্তিবিলাসেও পুরাণাদি হইতে সেই সকল ফলশ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

"কল্পকোটীসহস্রাণি পাতকানি বহূন্যপি।
নিমেষার্দ্ধেন দীপস্য বিলয়ং যান্তি কার্ত্তিকে।।
শৃণু দীপস্য মাহাত্ম্যং কার্ত্তিকে কেশবপ্রিয়ম্।
দীপদানেন বিপ্রেন্দ্র ন পুনর্জ্জায়তে ভুবি।।"

স্কন্দপুরাণ হইতে এরূপ অসংখ্য শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। আবার ঐস্থলে দীপপ্রদানের অভাবে প্রত্যবায় লিখিত হইয়াছে,—

"বৈষ্ণবো ন স মন্তব্যঃ সংপ্রাপ্তে কার্ত্তিকে মুনে।
যো ন যচ্ছতি মূঢ়াত্মা দীপং কেশবসদ্মনি।।"

বৃহন্নারদীয় পুরাণে উক্ত আছে,—

"একতঃ সর্ব্বদানানি দীপদানানি চৈকতঃ।
কার্ত্তিকে ন সমং প্রোক্তং দীপদো হ্যধিকঃ স্মৃতঃ।।"

পদ্মপুরাণে—

"কার্ত্তিকেঽখণ্ডদীপং যো দদাতি হরিসন্নিধৌ।
দিব্যকান্তি বিমানাগ্রে রমতে স হরেঃ পুরে।।"

দীপদানের এমনই মাহাত্ম্য যে, যাঁহারা দারিদ্র্যাদিপ্রযুক্ত স্বীয় দীপদানে অসমর্থ, তাঁহারা যদি অপরের প্রদত্ত দীপ প্রবোধন করিয়াছেন অর্থাৎ উস্কাইয়া দিয়া উজ্জ্বল রাখেন, তাঁহারাও কৃষ্ণপ্রীতি প্রাপ্ত হন, অন্যান্য ফলত' আছেই। একটী ইন্দুর পরদীপ উজ্জ্বল করিয়া পরাগতি পাইয়াছিল।

"একাদশ্যাং পরৈর্দ্দত্তং দীপং প্রজ্বাল্য মুষিকা।
মানুষ্যং দুর্ল্লভং প্রাপ্য পরাং গতিমবাপ সা।।" (স্কান্দে)
"দীয়মানন্তু যে দীপং বোধয়ন্তি হরের্গৃহে।
পরেণ নৃপশার্দ্দূল নিস্তীর্ণা যমযাতনা।"

স্কন্দপুরাণে এরূপ অনেক শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা শিখরদীপ অর্থাৎ মন্দিরাদির উপরে দীপপ্রদান করেন, তাঁহাদের বহু সুকৃতি সঞ্চিত হয়।

"সর্ব্বস্বদানং কুরুতে বৈষ্ণবানাং মহামুনে।
কেশবোপরি দীপস্য কলাং নার্হতি ষোড়শীম্।।
কার্ত্তিকে কার্ত্তিকীং যাবৎ প্রাসাদোপরি দীপকম্।
যো দদাতি মুনিশ্রেষ্ঠ তস্যেন্দ্রত্বং ন দুর্ল্লভম্।।"

ব্রহ্মা নারদকে এই সকল বলিয়াছিলেন। শিখর দীপদানের মাহাত্ম্য দূরে থাকুক, শ্রদ্ধার সহিত শিখর-দীপযুক্ত হরিমন্দির দেখিলেই অশেষ ফল।

"বিমানং জ্যোতিষা দীপ্তং যে নিরীক্ষন্তি কার্ত্তিকে।
কেশবস্য মহাভক্ত্যা কুলে তেষাং ন নারকী।।
দীপাবলী বা দীপমালা রচনায়ও বহু সুকৃতি।
"দীপপঙ্‌ক্তেশ্চ রচনাং স বাহ্যভ্যন্তরে হরেঃ।
বিষ্ণোর্বিমানে কুরুতে স নরঃ শঙ্খচক্রধৃক্।।" —(স্কান্দে)
"যঃ কুর্য্যাৎ" কার্ত্তিকে মাসি শোভনাং দীপমালিকাম্।
প্রবোধে চৈব দ্বাদশ্যামেকাদশ্যাং বিশেষতঃ।
সূর্য্যাযুত প্রকাশস্তু তেজসা ভাসয়ন দিশঃ।
তেজোরাশি বিমানস্থো জগদুদ্দ্যোতয়ংস্ত্বিষা।।" (ভবিষ্যে)

আকাশদীপমাহাত্ম্য পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে যে,—

"উচ্চৈঃ প্রদীপমাকাশে যো দদ্যাৎ কার্ত্তিকে নরঃ।
সর্ব্বং কুলং সমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ।।"

কার্ত্তিকী কৃষ্ণচতুর্দ্দশী ও অমাবস্যাকৃত্যে দেখা যায়,—

"অমাবস্যা চতুর্দ্দশ্যোঃ প্রদোষে দীপদানতঃ।
যমমার্গান্ধকারেভ্যো মুচ্যতে কার্ত্তিকে নরঃ।।" (পাদ্মে)

শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত উদ্ধৃত শাস্ত্রবচনগুলি হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, দীপদান, দীপমালা, শিখরদীপ, আকাশদীপ, চতুর্দ্দশী ও অমাবস্যায় দীপান্বিত করণ—এগুলি বৈষ্ণবকৃত্য, এ গুলির সহিত কালীপূজার কোন বিশেষ সম্পর্ক নাই, পশ্চিমাঞ্চলেও অনেকস্থলে দেওয়ালী উৎসবের সহিত বাঙ্গালাদেশের ন্যায় কালীপূজার কোন সম্পর্ক নাই। এ সকল কৃত্যের সহিত ছাগমহিষকুলের ভীত হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু আমরা এমনই দুর্ভাগ্য যে উক্ত জীবগণ প্রদোষে দীপাবলী দেখিলেই নিজেরা, বুঝি দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে, এই আশঙ্কায় কম্পিতকলেবর হয়। কালী যদি মহামায়া অর্থাৎ শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি হ'ন, তাহা হইলে তিনি বৈষ্ণবীতত্ত্ব, সুতরাং তিনি ভগবৎপ্রসাদ ভিন্ন অন্য কোন বস্তুতে তৃপ্ত হইতে পারেন না। মাংস শ্রীভগবান্ হরিকে নিবেদনের ব্যবস্থা কুত্রাপি নাই। বিষ্ণুযামলে উক্ত হইয়াছে—

"যত্র মদ্যঃ তথা মাংসং দগ্ধমন্নং মসূরকম্।
নিবেদয়েন্নৈব তত্র হরেরৈকান্তিকী রতিঃ।।"

হারীত স্মৃতিতেও এই ব্যবস্থা দেখা যায়। এ সকল দ্রব্য রাক্ষস ও পিশাচ-ভোগ্য, দেবীকে উহাদের অন্যতম জ্ঞান করিয়া তাঁহার পৈশাচিকপূজা করিলে দেবী তাহা গ্রহণ করেন না।

এই দেওয়ালী উপলক্ষে বিষ্ণুমন্দিরাদিতে দীপাবলী সজ্জিত করিয়া শ্রীদামোদরের অর্চ্চন করিলেই সর্ব্বার্থ-সিদ্ধ হয়। সমস্ত কার্ত্তিকমাসই শ্রীহরির অত্যন্ত প্রিয়। বৈষ্ণবগণ কার্ত্তিকব্রত করিয়া নিয়মপূর্ব্বক শ্রীহরির সেবা করিয়া থাকেন। স্কন্দপুরাণে এই নিয়মসেবা বিষয়ে বহু উপদেশ দৃষ্ট হয়। পদ্মপুরাণেও বলিয়াছেন,—

"নিয়মেন বিনা বিপ্রাঃ কার্ত্তিকং যঃ ক্ষিপেন্নরঃ।
কৃষ্ণঃ পরাঙ্মুখস্তস্য যস্মাদুর্জ্জোঽস্য বল্লভঃ।।"

এই কার্ত্তিককৃত্যের মধ্যে একান্ত পালনীয় বিধি-বর্ণনে স্কন্দপুরাণ বলিয়াছেন—

"সাধুসেবা গবাং গ্রাসঃ কথা বিষ্ণোস্তথার্চ্চনম্।
জাগরঃ পশ্চিমে যামে দুর্ল্লভঃ কার্ত্তিকে কলৌ।
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য কার্ত্তিকে কেশবাগ্রতঃ।
শাস্ত্রাবতরণং পুণ্যং শ্রোতব্যঞ্চ মহামুনে।।
ন তথা তুষ্যতে দানৈর্ন যজ্ঞৈর্গোগজাদিকৈঃ।
যথা শাস্ত্রকথালাপৈঃ কার্ত্তিকে মধুসূদনঃ।।"

সাধুসেবা, গোগ্রাসদান, বিষ্ণুকথা, শ্রীহরির অর্চ্চন, শ্রীহরিসমীপে কীর্ত্তনাদি ব্যাপারে রজনীর শেষ প্রহর জাগরণ, শাস্ত্রকথা-পাঠ ও শ্রবণ—এগুলি শ্রীহরির অত্যন্ত প্রিয়। পদ্মপুরাণে উপদিষ্ট হইয়াছে—

"হরিজাগরণং প্রাতঃস্নানং তুলসিসেবনম্।
উদযাপনং দীপদানং ব্রতান্যেতানি কার্ত্তিকে।।

নিশম্য বৈষ্ণবান্ ধর্ম্মান বৈষ্ণবৈঃ সহ হর্ষিতঃ।
কৃত্বা গীতাদিকং প্রাতর্দেবং নীরাজয়েৎ প্রভূম্।।"

শ্রীহরিসমীপে জাগরণ, প্রাতঃস্নান, তুলসীসেবা, উদ্যাপন, দীপদান, বৈষ্ণব- ধর্ম্মশ্রবণ, গীতাদির সহিত প্রাতঃকালে প্রভুর মঙ্গলারতি—এই সকল কার্ত্তিক-কৃত্য। এতৎসম্পর্কে যে দীপাবলী-দান তাহা বৈষ্ণব বিধি। সুতরাং দেওয়ালী বিষ্ণুপ্রীতিতাৎপর্য্যময় ব্যাপার।

অচিৎ-প্রতীতি

১। স্থূল দর্শনে চেতন ও অচেতন ভাবাত্মক দ্বিবিধ বস্তু মানব-বুদ্ধির গোচরীভূত হইয়া থাকে। যে সমুদয় বস্তু নিজের বা অপর বস্তুর স্বরূপ অনুভব করিতে পারে না, তাহাদিগকে অচেতন সংজ্ঞা দেওয়া হয় এবং যে সকল পদার্থ নিজ ও অপর বস্তুর স্বরূপ অবগত হইতে পারে তাহাদিগকে চেতন কহে।

২। ব্রহ্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণং।।" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই যাবতীয় চরাচর পদার্থের স্রষ্টা, পরমেশ্বর বস্তু ও সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। যিনি কাহারও সত্তা হইতে জাত নহেন ও যাঁহার সত্ত্বা হইতে অন্যান্য পদার্থ উদ্ভূত হইয়াছে, যাঁহাকে কাহারও নিকট হইতে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হয় না ও যাহার অভিজ্ঞতার কণামাত্র লাভ করিলে অন্যে মহা বিজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন এবং আনন্দ লাভের জন্য যাহাকে অন্যের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না ও যাঁহার কটাক্ষমাত্রে অন্যে নিত্যকালের জন্য লব্ধানন্দী হইতে পারেন, সেই অসমোর্দ্ধ তত্ত্বেই সৎ, চিৎ ও আনন্দবৃত্তি বিশেষরূপে গৃহীত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সুতরাং জানা যাইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহ বিভুচিৎপদার্থ হইতে পারেন না এবং তাঁহাকে চিৎসূর্য্য বলিয়া অবগত হওয়াই যুক্তি-সঙ্গত।

৩। প্রেমবিবর্ত্ত গ্রন্থে শ্রীশ্রীমদ্ গৌরসুন্দরের পার্ষদ প্রধান শ্রীল জগদানন্দ বলিয়াছেন "চিৎকণ জীব, কৃষ্ণ চিন্ময় ভাস্কর।" চিৎকণ জীবসমূহ যে সূর্য্যস্থানীয় বিভুচিৎতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতও সাক্ষ্য দিতেছেন যথা,—

"যথার্চ্চিষোঽগ্নেঃ সবিতুর্গতস্তয়োর্নির্য্যান্তি সংযাত্ত্যসকৃৎ স্বরোচিষঃ।
তথা যতোঽয়ং গুণসংপ্রবাহোবুদ্ধির্ম্মনঃ যানি শরীর-সর্গাঃ।।"

অর্থাৎ অগ্নি হইতে অর্চ্চি-সকল এবং সূর্য্য হইতে কিরণসমূহ যেরূপ বাহির হয় ও তাহাতেই পুনঃ প্রবেশ করে সেইরূপ কৃষ্ণ হইতে জীরসমূহ, জড়াপ্রকৃতি ও শরীরবর্গ নিরন্তর বাহির হয় ও ভিতরে প্রবেশ করে। সুতরাং জীবসমূহকে চিৎকণ বা অণুচিৎ তত্ত্ব বলিয়া অবগত হইতে হইবে।

৪। অণুচিৎ জীব দ্বিবিধ, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—
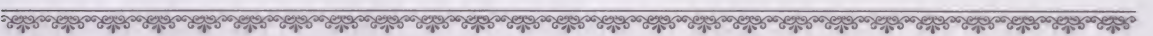
"সেই বিভিন্নাংশ জীব দুইত প্রকার।
এক নিত্যমুক্ত এক নিত্য সংসার।।
নিত্যমুক্ত নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।
কৃষ্ণ পারিষদ নাম ভুঞ্জে সেবাসুখ।।
নিত্যবদ্ধ কৃষ্ণ হৈতে নিত্য বহির্ম্মুখ।
নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ।।"

নিত্যমুক্ত জীবগণ কৃষ্ণের ইচ্ছায় বদ্ধজীবগণের শিক্ষার্থ পৃথিবীতে অবতরণ করিলেও তাহারা বাহ্য বিষয়ে আসক্ত হন না। নিত্যবদ্ধ জীবগণ সংসার ভ্রমণ- কালে নানাযোনিতে জন্মগ্রহণ করে ও বাহ্য বিষয়ে আসক্তি বশতঃ বহুবিধ ক্লেশ সহ্য করিতে বাধ্য হয়, যথাহি প্রেমবিবর্ত্তে,—

"কৃষ্ণ বহির্মুখ হঞা ভোগাবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটীয়া ধরে।।"
"পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়।।"
"আমি সিদ্ধ কৃষ্ণ-দাস এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে।।"
"কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শূদ্র।
কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র।।"
"কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্তে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস প্রভু।।"

৫। নিম্নলিখিত শাস্ত্রোক্তি হইতে দেখা যাইতেছে যে সংসারচক্রে ভ্রাম্যমাণ বদ্ধ-জীবসমূহ বৃক্ষ প্রস্তরাদি স্থাবর জন্মও লাভ করে এবং অশীতি-লক্ষ ইতর যোনি ভ্রমণের পর ভগবৎ ভজনোপযোগী নর-দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে—

"জলজা নবলক্ষাণি, স্থাবরা লক্ষ বিংশতি।"
ক্রিময়ো রুদ্রসংখ্যকা দশলক্ষাণি পক্ষিণঃ।।
ত্রিংশৎ লক্ষাণি পশবঃ চতুর্লক্ষাণি মানবাঃ।।"

আধুনিক কালের পাশ্চাত্য জড়-বিজ্ঞানও ঘোষণা করিতেছেন যে জগতের প্রত্যেক পদার্থই চেতন অর্থাৎ যাহাদিগকে সাধারণতঃ অচেতন পদার্থ বলিয়া বোধ হয় বস্তুতঃ তাহারা চেতনাতিরিক্ত বস্তু নহে। অতএব ভারতবর্ষের পুরাতন মনীষিবৃন্দের সুরে সুর মিলাইয়া পশ্চিমদেশীয় জড় পণ্ডিতগণও চেতনাতিরিক্ত

পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহিতেছেন না। সুতরাং ইহা স্পষ্টীকৃত হইতেছে যে সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কৃমি ও কীট সমূহ চেতন বস্তুরূপে এবং বৃক্ষ প্রস্তরাদি অচেতন পদার্থরূপে প্রতিভাত হইলেও তাহারা সকলেই চেতন পদার্থ বা জীব-তত্ত্ব। অহল্যার পাষাণ দেহলাভের ও নল-কুবরের যমলার্জ্জুনরূপ বৃক্ষযোনি প্রাপ্তির ইতিবৃত্ত যাহারা বিশ্বাস করেন তাহারা এ বিষয়টী সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

৬। শাস্ত্র বলিতেছেন,—

স্বরূপার্থৈর্হীনান্ নিজসুখপরান্ কৃষ্ণবিমুখান্
হরের্মায়া-দণ্ড্যান্ গুণ-নিগড়জালৈঃ কলয়তি।।
তথা স্থূলৈর্লিঙ্গৈর্দ্বিবিধাবরণৈঃ ক্লেশনিকরৈ-
র্মহাকর্ম্মালানৈর্নয়তি পতিতান্ স্বর্গ-নিরয়ৌ।।

অর্থাৎ স্বরূপতঃ জীব কৃষ্ণানুগত দাস। সেই স্বরূপ ধর্ম্মহীন নিজ সুখপর কৃষ্ণবিমুখ দণ্ড্যজীবসকলকে মায়াশক্তি, মায়িক সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমোগুণের নিগড় সমূহ দ্বারা কবলিত করেন। স্থূল ও লিঙ্গদেহরূপ আবরণ এবং ক্লেশ সমূহ পরিপূর্ণ কর্ম্ম-বন্ধনের দ্বারা তাহাদিগকে নিপতিত করিয়া স্বর্গ ও নরকে লইয়া বেড়ান। জীবের শুদ্ধ চিৎকণস্বরূপে যে চেতন ধর্ম্ম অন্বিত আছে তাহা প্রকাশশীল। কোন এক গৃহে কলসীর ভিতর একটী প্রজ্জ্বলিত দীপকে রক্ষা করিলে সেই গৃহের বহির্দ্দেশ হইতে যেমন দীপালোক দেখা যাইতে পারে না, সেইরূপ স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয় দ্বারা বদ্ধ জীবের চিৎকণ-স্বরূপ আবৃত থাকায় (অর্থাৎ উক্ত দেহদ্বয়ে আত্মবোধ বশতঃ) তাহার চিদ্ধর্ম্মের প্রকাশ বহির্দ্দেশ হইতে দর্শনযোগ্য হয় না। যেহেতু বাহ্য-দেশে দর্শনের বিষয় হয় না তন্নিমিত্ত গৃহে আলোক নাই বলা যেরূপ অনুচিতৎ, তদ্বৎ চেতন-ধর্ম্মের বিকাশ যে যে যোনিতে দেখা যায় না তত্তৎ পদার্থকে সাধারণ দৃষ্টিতে জড়াকারে অবভাসিত দেখিয়া অচেতন বলা সমীচীন নহে।

৭। পূর্ব্বোল্লিখিত দৃষ্টান্তে গৃহ ও কলসটী স্বচ্ছ কাচ নির্ম্মিত হইলে, তন্মধ্যস্থিত দীপের আলোক যেরূপ কিয়ৎ পরিমাণে দর্শনযোগ্য হইত,—তদ্রূপ স্থূল-সূক্ষ্মদেহে যাহার আত্মবোধ কথঞ্চিৎ শিথিল হইয়াছে তাহার চেতনধর্ম্ম বাহ্যদেশে কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশ-যোগ্যতালাভ করিবে। এতন্নিবন্ধন পূর্ণ অচেতনরূপে লক্ষিত প্রস্তরাদি হইতে বৃক্ষাদিকে অপেক্ষাকৃত চেতনবস্তু,—বৃক্ষাদি অপেক্ষা পশু পক্ষ্যাদিকে অধিক চেতন-ধর্ম্মযুক্ত পশুপক্ষ্যাদি অপেক্ষা বিষয়াসক্ত বদ্ধ-মানবদিগকে কথঞ্চিৎ বিচারশক্তিযুক্ত এবং বদ্ধ মানবাপেক্ষা বন্ধনমুক্ত ভগবদ্ভক্তদিগকে বিচারে পারঙ্গত ও সম্যগ্জ্ঞানে উদ্ভাসিত বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

৮। পূর্ণচিৎতত্ত্ব শ্রীভগবান হইতে বিভিন্নাংশরূপে সৃষ্ট অনন্তকোটী অণুচিৎ জীবের মধ্যে যাহারা অনিত্যজগতে আচ্ছাদিত চেতনবৃক্ষ প্রস্তরাদিরূপে, মুকুলিত-চেতন পশুপক্ষ্যাদিরূপে, বিকচিত চিতন বদ্ধমানবরূপে অথবা পূর্ণ বিকচিত শুদ্ধ ভক্তরূপে অবস্থিত তাহাদিগের কাহাকেও দেহাধ্যাসশূন্য শুদ্ধ-ভক্তগণ ক্ষণকালের জন্য অণুচিৎপদার্থের ইতর তত্ত্বরূপে দর্শন করেন না। যেহেতু অণুচিৎ জীবের ধর্ম্ম

বিভুচিৎ ভগবানের সেবা করা, তজ্জন্য তাহাদিগকে শুদ্ধভক্তগণ সেবাকার্য্যে রত দেখেন এবং যাহার সেবা করিতেছে সেই ভগবানকেও দেখিতে পান। কৃষ্ণই সকলের সেবাতত্ত্ববিধায় সকলেরই লক্ষ্য তাঁহার প্রতি কায়মনোবাক্যে সন্নিবিষ্ট থাকে ও তদ্ধেতু ভক্তবুদ্ধিতে কাহারও প্রতি দৃষ্টির পতনমাত্রেই উহা তৎক্ষণাৎ সেব্যতত্ত্বের অভিমুখীন হইয়া তাঁহার সাক্ষাৎকার করিয়া থাকে। এই ভগবৎ দর্শনকার্য্য এত অল্প সময়ের মধ্যে সিদ্ধ হয় যে প্রাথমিক ভক্ত দর্শনরূপ কার্য্যটীকে গণনায় সামিল না করিলেও কোন্ দোষ হয় না। জীব শক্তিজাতীয় তত্ত্বও শক্তিমান্ ভগবানেই উহা অবস্থান করে। সুতরাং ভক্তের দর্শনে ভগবৎদর্শন অনিবার্য্য এবং এই জন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাভাগবত অবস্থার বর্ণনকালে কথিত হইয়াছে,—

"স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
যত্র যত্র নেত্র পড়ে হয় ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি।।"

যে সময় অনিত্য বাহ্য স্থূল সূক্ষ্ম আকার দর্শনের বিষয় হয় না, তৎকালে কৃষ্ণ কার্ষ্ণাত্মক দর্শন সিদ্ধ হয়। কৃষ্ণকার্ষ্ণাত্মক দর্শনকালে জগৎ বৈকুণ্ঠাকারে অবভাসিত হয়, যথাহি মহাজন বাক্যে,—

"যে দিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়।"

৯। সুদীর্ঘ বটবৃক্ষ, বৃহৎকায় হস্তী ও ক্ষুদ্রায়তন পিপীলিকার বাহ্যশরীর বড় ছোট হইলেও উহারা প্রত্যেকেই তত্ত্বতঃ চিদণুমাত্র অর্থাৎ উহাদিগের শুদ্ধস্বরূপে সেবার প্রকারভেদ থাকিলেও সত্ত্বার পরিমাণগত কোন পার্থক্য নাই। মূলতাত্ত্বিক রূপের দর্শনকে অপ্রাকৃত দর্শন কহে। যাহারা তাত্ত্বিক স্বরূপ দর্শন না করিয়া জীব-সমূহের মধ্যে ভেদ দর্শন করে তাহারা পরিবর্ত্তনশীল বাহ্যাকার দর্শী। এই বাহ্যানুভূতিকে প্রাকৃত দর্শন কহে। মূল চিৎকণ স্বরূপের পরিবর্ত্তে বাহ্য রূপ দর্শনকালে দ্রষ্টার জ্ঞানশক্তি কথঞ্চিৎ আবৃত থাকে। স্থূল-সূক্ষ্ম দেহাধ্যাস জনিত চাঞ্চল্যই আবরণরূপে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের মধ্যস্থলে উপস্থিত হয় এবং সেই আবরণের ভিতর দিয়া দ্রষ্টার জ্ঞানশক্তি ক্রিয়া করিতে প্রস্তুত হইলে বাধাপ্রাপ্ত হয়। অতঃপর বাধাপ্রাপ্ত জ্ঞানশক্তি পূর্ণবেগে বাহ্যবস্তুর যথার্থ স্বরূপ বুঝিতে অক্ষম হইয়া তাহার অনিত্য রূপকে দর্শন করিতে থাকে। দৃশ্যমানজগতে আচ্ছাদিত চেতন বৃক্ষ-প্রস্তরাদি, মুকুলিত চেতন পশুপক্ষ্যাদি, বিকচিত চেতন বা বুদ্ধি তত্ত্বান্বিত মানবগণ ও পূর্ণবিকচিত চেতন মহাভাগবত ব্যক্তি যে কোন রূপে যে কোন পদার্থ অবস্থান করিতেছে তাহারা তত্ত্বতঃ সকলেই অণুচিৎ জীবও নিত্য কৃষ্ণদাস এবং দেহাধ্যাসজনিত চাঞ্চল্য আমাদিগের বুদ্ধিকে বাধা প্রদান না করিলে আমরা তাহাদিগকে চিন্ময় ভগবদ্দাস ব্যতীত অন্যরূপে দর্শন করিতে সমর্থ হই না। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে অচেতনরূপে যে সকল পদার্থ আমাদিগের নিকট প্রতীয়মান হয় তাহারা অচেতন নহে। আমাদিগের আচ্ছাদিত জ্ঞানশক্তিই তত্তৎ ধারণা পোষণ করিবার একমাত্র কারণ। যিনি যে পরিমাণে সুসংস্কৃত হইয়াছেন, তাহার জ্ঞানশক্তি তৎপরিমাণে অল্প বাধাপ্রাপ্ত হয় ও বাহ্যবস্তুকে অধিক চেতন বলিয়া বুঝেন। যে সময় কোনপ্রকার চাঞ্চল্য বাধা দিতে পারে না, কেবল সেই কালেই জীব নিজ ও অন্যের শুদ্ধ-স্বরূপ দর্শনে সমর্থ। যাহারা পদার্থসমূহকে চেতনাচেতন রূপ দ্বিবিধ বিভাগে বিভক্ত করতঃ তত্ত্বান্বেষণে প্রবৃত্ত

তাহাদিগের জ্ঞানশক্তি কুসংস্কারাচ্ছন্ন। কুসংস্কারাবদ্ধ ব্যক্তিগণ কখনও তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিতে পারে না। অতাত্ত্বিকজ্ঞানে তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য।

১০। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, অচিৎরূপে জীবের যে সমুদয় বাহ্য আকার বদ্ধাবস্থায় দৃষ্ট হয়, তাহারা তত্ত্বতঃ কি, তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, উহারা মায়া বিরচিত জড়পদার্থ বিশেষ। মায়ার স্বরূপ বুঝিতে পারিলে বিষয়টী স্পষ্টীকৃত হয়। ভগবান স্বয়ং ব্রহ্মাকে মায়ার স্বরূপ এইরূপ বলিয়াছেন,—

"ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ।।"

অর্থাৎ কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ যাহা ব্যতীত কিছু প্রতীতির বিষয় হয়, সত্তাবিশিষ্ট হইলেও ভগবানের অধিষ্ঠানে যাহার প্রতীতি নাই, তাহাকে ভগবানের মায়ানাম্নী বহিরঙ্গা শক্তির পরিণতি কহে। ভগবান জ্যোতির্ম্ময় বস্তু ও মায়িকপদার্থনিচয় অন্ধকার স্থানীয়। পৃথগাকারে দৃষ্ট হইলেও প্রতিবিম্বের যেমন বিম্বাতিরিক্ত পৃথক্ কর্ত্তৃসত্তা নাই (অর্থাৎ বিম্বের সত্তায় সত্তাবান হয়), সেইরূপ অন্ধকারস্থানীয় মায়িক-পদার্থসমূহ জীবের বদ্ধ ভূমিকায় দর্শনযোগ্য হইলেও তাহাদিগের ভগবৎ-তত্ত্বাতিরিক্ত পৃথক কর্ত্তৃসত্ত্বা নাই ও ভগবদ্দর্শনকালে তাহারা দর্শনের বিষয় হইতে পারে না। সৃষ্টির পর যে সমুদয় জীব ভগবৎ-সেবা পরিত্যাগপূর্ব্বক বিশ্রামজনিত সুখলাভের আশায় নিশ্চেষ্ট ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে অধিকতর সুখভোগের আশা দেখাইয়া স্বরচিত জড়পদার্থে আসক্ত করিবার ও আসক্তি দ্বারা জড়সংস্পর্শমুখে ত্রিতাপজ্বালায় মুহুর্মুহু দগ্ধকরতঃ নৈরাশ্যের ছবি দেখাইয়া পুনঃ ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য ভগবৎ ইচ্ছানুসারে মায়াশক্তি ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার নামক অষ্ট জড়াপ্রকৃতিরূপে পরিণত হইয়া প্রথমোক্ত পঞ্চতত্ত্বদ্বারা স্থূল দেহ ও শেষোক্ত ত্রিতত্ত্ব দ্বারা সূক্ষ্মদেহনিচয়গঠন পূর্ব্বক সেবাবিমুখ জীবগণের চিৎস্বরূপকে আবৃত করেন ও তত্তৎদেহে আত্মবোধ করাইতে বাধ্য করেন। স্বজাতি-আশয় হেতু এক জড় দেহ অন্য জড় দেহের সহ আত্মীয়তা স্থাপন করিতে থাকে এবং স্বরূপজ্ঞান আবৃত থাকায় ও দেহে আত্মবোধ নিবন্ধন জীবগণ জড়দেহকৃত কার্য্যকে নিজ কার্য্য মনে করেন। যাবৎ না সাধুসঙ্গ প্রভাবে ভগবৎ- দাস্যরূপ সম্বন্ধজ্ঞান পুনঃ জাগরিত হয় তাবৎ কাল পর্য্যন্ত জড়সঙ্গ ও জড়সেবা পরিত্যাগের উপায়ান্তর নাই। সাধুসঙ্গ হইতে জীব যে পুনরায় ভগবৎ-ভক্তি লাভ করিতে পারেন, নিম্নলিখিত শ্রীদশমূলস্তোত্র জ্বলন্ত অক্ষরে তাহার প্রামণ দিতেছেন,—

"যদা ভ্রামং ভ্রামং হরিরসগলদ্ বৈষ্ণবজনং
কদাচিৎ সংপশ্যং স্তদনুগমনে স্যাদ্রুচিযুত।
তদা কৃষ্ণাবৃত্ত্যা ত্যজতি শনকৈর্ম্মায়িকদশাং
স্বরূপং বিভ্রাণো বিমলরসভোগং স কুরুতে।।"

অর্থাৎ সংসারে উচ্চাবচযোনিসমূহে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন হরিরসগলিত বৈষ্ণব দর্শন হয়, তখন মায়াবদ্ধ জীবের বৈষ্ণবানুগনে রুচি জন্মিয়া পড়ে। কৃষ্ণনামাদি আবৃত্তিক্রমে অল্পে অল্পে মায়িকদশা দূর হইতে থাকে। জীব ক্রমশঃ স্বরূপজ্ঞান লাভ করতঃ বিমল কৃষ্ণসেবা রসসম্ভোগ করিতে যোগ্য হন।

১১। তত্ত্বতঃ যখন প্রত্যেক পদেই অণুচিৎ জীব অর্থাৎ কৃষ্ণদাস, তখন স্ত্রী-পুত্রাদিরূপে যাহারা প্রতীয়মান হইতেছে তাহারা আমাদিগের ভোগের সহায়ক নহে। শৌক্রবিচারে যে ব্রাহ্মণশূদ্রাদি বর্ণ বিভাগ বা সম্বন্ধজ্ঞান, বালকবৃদ্ধযুবারূপ যে আয়ু বিচার, স্ত্রী বা পুরুষভাবাত্মক যে চিহ্ন বিচার, ভগবদ্দাস্য ব্যতীত অন্যরূপ যে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ ইত্যাদি ইত্যাদি প্রকার ব্যবহারের মূলদেশে অচিৎ-প্রতীতি লুক্কায়িত থাকে। যাহারা ভগবজ্জ্ঞান লাভের জন্য শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়াছেন তাহাদিগের উচিত স্ত্রীপুত্রাদিকে ভগবদ্দাস বিবেচনা করা, স্ত্রীপুত্রাদির দ্বারা নিজ সেবা না করাইয়া তাহাদিগকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করাইবার জন্য যাহারা হরিকথা তাহাদিগের নিকট বলিতে থাকেন, সেই কার্য্যদ্বারা বক্তার কীর্ত্তনাঙ্গ ভক্তিরও শ্রোতার শ্রবণাঙ্গভক্তির অনুশীলন হইতে থাকে। স্ত্রীপুত্রগণ চৌরাশী লক্ষযোনি ভ্রমণশীল বদ্ধ জীব ইহাদিগকে লইয়া ইন্দ্রিয় তর্পণে মত্ত হইলে নিজেদের যেরূপ নিরয়গমনের সুবিধা হয়, ইহাদিগের গতি ও তদ্রূপ হইয়া থাকে, সুতরাং ইহাদিগের কল্যাণ চিন্তার সহ নিজ কল্যাণ সংযুক্ত আছে। যাঁহারা ইহাদিগকে লইয়া ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত হন, তাঁহারাই জীবের প্রতি দয়া করিতে জানেন। স্ত্রী-পুত্রাদি যদি হরিভজন করিতে স্বীকৃত না হন, তাহা হইলে তাহাদিগের সঙ্গত্যাগ করা উচিত, যেহেতু ইহার দ্বারা ব্যতিরেকমুখে তাহাদিগের কল্যাণ সাধিত করা হয়। এই ব্যতিরেক ভাবাত্মক শিক্ষা প্রণালীকে ইংরাজী ভাষায় Passive resistance কহে। এই দয়াকেই পরোপকার কহে, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"ভারত ভূমিতে মনুষ্য জন্ম হইল যার।
জন্ম সার্থক কর, করি পরোপকার।।"

স্ত্রীপুত্রাদিকে যাহারা টাকা কড়ি দিয়া ভালবাসা জানাইয়া থাকেন, তাহারা তাহাদিগকে চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করাইবার ব্যবস্থা করেন। এই অচিৎ ধারণাপুষ্ট ভালবাসার প্রথা পৃথিবী হইতে তাড়াইবার জন্য অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দ শ্রীমদ্গৌরসুন্দর সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক গৃহত্যাগ কালে বদ্ধজীবের শিক্ষার্থে শ্রীমতী শচীমাতাকে বলিয়াছিলেন—

আনের তনয় আনে রজত কাঞ্চন।
আমি আনি দিব মাতা কৃষ্ণপ্রেমধন।।

এই দিব্যবাণী যখন প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে ঝঙ্কার করিতে থাকিবে, তখন অচিৎধারণার তাণ্ডবনৃত্য চিরতরে লুপ্ত হইয়া যাইবে। মেদিনী তখন বৈকুণ্ঠপুরীরূপে দৃষ্ট হইবে। হে পাঠকবর্গ। আইস, আমরা এক এক করিয়া জগতে এই অমৃতবর্ষিণীবাণীর প্রচারকার্য্যে সহায়তা করি।

দুঃসঙ্গ বর্জ্জন

দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন ব্যতীত জীবের কখনও নিত্য মঙ্গল লাভ হয় না। যাহার দুঃসঙ্গ আছে, তিনি সহস্র সাধন করিয়াও কোনও ফললাভ করিতে পারেন না।

বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন।। (চৈঃ চঃ আদি ৮ম)

নোঙর না তুলিয়া দিবারাত্র নৌকা চালাইলেও যেরূপ কিঞ্চিন্মাত্র ও অগ্রসর হয় না বরং পণ্ডশ্রম মাত্র হয়, তদ্রূপ দুঃসঙ্গ বর্জ্জন না করিয়া অষ্টপ্রহর বা চৌষট্টি প্রহর চেঁচাইলেও বা নামমালায় "ঠক্কাস্ ত' ঠক্কিস্ নে" শব্দ করিলেও ভজন পথে কিছুমাত্র অগ্রসর হওয়া যায় না বরং পিত্তবৃদ্ধি হয়। এই জন্যই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রারম্ভে ভাগবতীয় বচন উদ্ধার করিয়া দুঃসঙ্গবর্জ্জনের উপদেশ দিয়াছেন।

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য চ্ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।।
(ভাঃ ১১।২৬।২৬)

গৌড়ীয়ের প্রিয় পাঠকগণ, আপনারা সকলেই বুদ্ধিমান। সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটীর তাৎপর্য্য, বিচার করুন্। শ্লোকটীতে তিনটী বহুমূল্য কথাসার আছে যথা—(১) দুঃসঙ্গ বর্জ্জন, (২) সৎসঙ্গ গ্রহণ ও (৩) সাধুর লক্ষণ। এই তিনটী লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয়তম ভক্ত উদ্ধব মহারাজকে ঐল গীতাখ্যান কথনান্তে বলিয়াছেন—হে উদ্ধব, যেহেতু ঐলরাজ পুরূরবা উর্ব্বশী সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া পরিণামে স্বীয় আত্মাতে আত্মারাম আমার দর্শনলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেইহেতু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যদি বিচারজ্ঞ হন তবে সর্ব্বপ্রযত্নে দুঃসঙ্গবর্জ্জনপূর্ব্বক অনুক্ষণ সাধুসঙ্গ করিবেন। কারণ সাধুগণের কৃত্য এই যে, তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ বিষয়াসক্ত জীবগণের বিষয়- বাসনারূপ বন্ধনগুলিকে শাস্ত্রযুক্তিরূপ শাণিত অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিয়া সম্বন্ধ- জ্ঞানের উদয় করাইয়া দেন। সুতরাং ভাই পাঠকগণ, আপনারা—

ভাগবতের অর্থ করহ বিচার।
বিচার করিলে পাবে শ্রুতির অর্থ সার।।

সাধারণ জীব মনে করেন, ভোগে সুখ নাই, সুখ যদি থাকে তবে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগে। ঐ যে বৃক্ষতলবাসী কৌপীনধারী সন্ন্যাসী, বেদান্তবাক্যে সদা রমণ করিতে করিতে বলিতেছেন—শিবোঽহং "শিবোঽহং" তিনিই সুখী। সুতরাং উহার পদতলে যদি যথাসর্ব্বস্ব প্রদান করিয়া লুটাইতে পারি তবেই সুখী হইতে পারিব। এই ভাবিয়া অজ্ঞানান্ধ জীব একপ্রকার অবিদ্যার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে গিয়া অপরপ্রকার অবিদ্যার হস্তে পড়িয়া কতই না লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছেন। হায়। হায়! তাহারা জানেন না যে—

"দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব আত্ম-বঞ্চনা।
কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তিবিনা অন্য কামনা।।" (চৈঃ চঃ)

কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কামনামাত্রই দুঃসঙ্গ। ভোগীর বরং সাধুসঙ্গপ্রভাবে কালে মঙ্গললাভ সম্ভব কিন্তু ফল্গুত্যাগী যে আত্মবঞ্চনারূপ কপটতা করিয়া প্রচ্ছন্নভোগের আবাহন করেন তাহা আরও অধিকতর নিন্দনীয়।

তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন—

"বিষয়ীর হৃদয়ে যবে সাধুসঙ্গ পায়।
অনায়াসে লভে ভক্তি ভক্তের কৃপায়।।
মায়াবাদ দোষ যার হৃদয় পশিল।
কুতর্কে হৃদয় তার বজ্রসম ভেল।।
ধিক্ তার কৃষ্ণসেবা শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন।।"

অতএব দুঃসঙ্গ বর্জ্জন করিয়া সৎসঙ্গ গ্রহণ করা আবশ্যক। দুঃসঙ্গ বর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে সৎসঙ্গও বর্জ্জন বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। কৃষ্ণসেবার প্রতিকূলবর্জ্জনই দুঃসঙ্গ বর্জ্জন আর কৃষ্ণসেবার অনুকূল গ্রহণই সৎসঙ্গ। মায়াবাদিগণ ইহা বুঝিতে না পারিয়া কৃষ্ণসেবার অনুকূল বিষয়গুলিকেও মায়িক বুদ্ধিতে ত্যাগ করিয়া থাকেন। এই জন্যই তাহাদের ত্যাগ ফল্গু ত্যাগ তাহারা এক দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিতে গিয়া অপর দুঃসঙ্গের কবলে পতিত হন। কিন্তু ভক্তগণ কৃষ্ণসেবার প্রতিকূল বিষয়ই ত্যাগ করেন এবং অনুকূল বিষয়কে স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা সর্ব্ব ইন্দ্রিয় ও সর্ব্ব বিষয়ের দ্বারা সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীহরিসেবা করেন। যে কামিনীকাঞ্চন, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি মায়াবাদীর অক্ষজ বিচারে ত্যাগের বস্তু, হরি সেবকের অধোক্ষজ সেবার নিকট তাহাই ভগবৎসেবার উপকরণ। সুতরাং যাহা ফল্গুত্যাগীর নিকট দুঃসঙ্গজ্ঞানে ঘৃণার বস্তু তাহাই আবার সেবকের নিকট ভগবৎসম্বন্ধি পূজ্য বস্তু।

শ্রাদ্ধ তত্ত্ব

শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পিতৃগণের উদ্দেশ্যে অন্নাদি দানকে 'শ্রাদ্ধ' কহে। গোভিলসূত্রে দেখা যায় "শ্রদ্ধান্বিতঃ শ্রাদ্ধং কুর্ব্বীত" অর্থাৎ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। পুলস্তসংহিতায়ও শ্রাদ্ধের লক্ষণ বলা হইয়াছে—

"সংস্কৃতব্যঞ্জনাঢ্যঞ্চ পয়োদধিঘৃতান্বিতম্।
শ্রদ্ধয়া দীয়তে যস্মাৎ শ্রাদ্ধং তেন নিগদ্যতে।।"
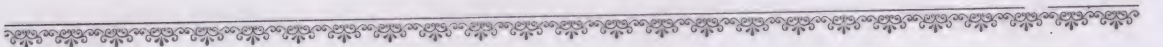
সুসংস্কৃত ব্যঞ্জন এবং দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত সংযুক্ত অন্ন যাহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রদত্ত হয় সেই অর্পণরূপ কর্ম্মই 'শ্রাদ্ধ' নামে অভিহিত। অমরকোষ বলেন—"শাস্ত্রোক্তবিধানেন পিতৃকর্ম্ম" শাস্ত্রোক্তবিধানানুযায়ী পিতৃ-পুরুষগণের উদ্দেশ্যে যে কর্ম্ম করা হয়, তাহাই শ্রাদ্ধ। বেদের কর্ম্মকাণ্ডে—তত্তদধিকারী ব্যক্তিগণের জন্য এই শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা আছে। পুরাণাদিতে, ভার্গবীয় মনুসংহিতা-গ্রন্থে শ্রাদ্ধ-বিধি সম্বন্ধে অনেক কথা উল্লিখিত হইয়াছে। বরাহপুরণে শ্রাদ্ধোৎপত্তির বিষয়ে লিখিত আছে যে, মনুবংশোদ্ভূত 'আত্রেয়' নামক জনৈক মুনির 'নিমি' নামে এক ধার্ম্মিক পুত্র ছিলেন। ঐ পুত্র সহস্র বৎসর তপস্যাচরণ করিয়া দেহত্যাগ করেন। নিমি পুত্রশোকে কাতর হইয়া শোক সন্তাপ নিবারণের জন্য পুত্রের উদ্দেশ্যে ফলমূল প্রভৃতি নানাবিধ উত্তম দ্রব্য দ্বারা শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করেন। তখন সেই স্থানে নারদ মুনি উপস্থিত হইয়া নিমিকে বলিলেন যে, 'এই কার্য্যের নাম পিতৃযজ্ঞ, পূর্ব্বে ব্রহ্মা এই কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন।' তখন হইতে জগতে শ্রাদ্ধ নামক কর্ম্মের প্রচলন হয়। বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয়াংশ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রাদ্ধের প্রকার, শ্রাদ্ধের কাল, অধিকারী প্রভৃতির সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য পাওয়া যায়। শ্রাদ্ধ-বিবেক ধৃত বিশ্বামৃতের বাক্যানুসারে নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্যঃ, বৃদ্ধি, সপিণ্ডন, পার্ব্বণ, গোষ্ঠী, শুদ্ধ্যর্থ, কর্ম্মাঙ্গ, দৈবিক, যাত্রার্থ ও পুষ্ট্যর্থ ভেদে শ্রাদ্ধ দ্বাদশ প্রকার। ভবিষ্যপুরাণে এই সকল শ্রাদ্ধের লক্ষণ বর্ণিত আছে। প্রত্যহ অনুষ্ঠেয় শ্রাদ্ধই— (১) **নিত্যশ্রাদ্ধ**; কেবল এক ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কৃত শ্রাদ্ধ— (২) **নৈমিত্তিক**; সঙ্কল্প করিয়া কামনাসিদ্ধির জন্য শ্রাদ্ধ— (৩) **কাম্য**; বৃদ্ধি বা অভ্যুদয়ের কারণ উপস্থিত হইলে যে শ্রাদ্ধ করা হয়—তাহা (৪) **বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ**; মৃত ব্যক্তিকে প্রেত যোনি হইতে মুক্ত করিবার জন্য মৃত্যুর এক বৎসরের অন্তে পিতৃপিণ্ডের সহিত প্রেতপিণ্ডের মিশ্রণ করিয়া একত্র পিণ্ডভোজনরূপ যে কার্য্য তাহাই — (৫) **সপিণ্ডকরণ শ্রাদ্ধ**; অমাবস্যা বা পর্ব্বদিনে অনুষ্ঠেয় শ্রাদ্ধ— (৬) **পার্ব্বণশ্রাদ্ধ**; পিতৃগণের উদ্দেশ্যে গোষ্ঠি (জ্ঞাতিগণের) গণের মধ্যে শুদ্ধি নিমিত্ত অনুষ্ঠিত যে শ্রাদ্ধ তাহাই— (৭) **গোষ্ঠিশ্রাদ্ধ**, শুদ্ধির জন্য অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ— (৮) **শুদ্ধ্যর্থ**; গর্ভাধান, সীমন্তোন্নয়ন প্রভৃতি সংস্কার কার্য্যে যে শ্রাদ্ধ তাহা— (৯) **কর্ম্মাঙ্গ**; দেবতাগণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠেয় শ্রাদ্ধ (১০) **দৈবিক**; তীর্থ বা দেশান্তর গমনকালে অনুষ্ঠেয় শ্রাদ্ধ (১১) **যাত্রার্থ**; শরীর ও অর্থাদি বৃদ্ধির জন্য যে শ্রাদ্ধ তাহা— (১২) **পুষ্ট্যর্থ**।

কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণের ধারণা এই যে, মানব মৃত্যুর পর প্রেতভাবাপন্ন হয় পরে পুত্রাদি আত্মীয় বা জ্ঞাতিবর্গ তাহার (ঐ প্রেতের) উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিলে প্রেতযোনি হইতে প্রেতের মুক্তি হয়। এই ধারণা অনুসারে মৃত ব্যক্তির দেহত্যাগের দিন হইতে ব্রাহ্মণ একাদশ দিবসে, ক্ষত্রিয় ত্রয়োদশ দিবসে, বৈশ্য ষোড়শ দিবসে এবং শূদ্র একত্রিংশ দিবসে "আদ্যশ্রাদ্ধ" করিয়া থাকেন ও পরে প্রতিমাসে মৃত্যুর তিথিতে "একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ" এবং একবৎসর পূর্ণ হইলে সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। দাহ হইতে বর্ণনানুসারে জলশস্ত্র প্রভৃতির স্পর্শ পর্য্যন্ত যে ক্রিয়া তাহার নাম "আদ্যক্রিয়া", মাসিক একোদ্দিষ্ট—শ্রাদ্ধকে মধ্যক্রিয়া ও প্রেত একবৎসর অন্তে পিতৃত্ব প্রাপ্ত হইলে সপিণ্ডীকরণের পর যে সকল শ্রাদ্ধ ক্রিয়া তাহাকে—অন্ত্যক্রিয়া বলা হয় (বিষ্ণুপুরাণ ৩।১৩।৩৪-৩৫)। কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধবিধান-মতে যে পর্য্যন্ত প্রেতের উদ্দেশ্যে আদ্যৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ, বারমাসে কর্ত্তব্য বারটী মাসিক শ্রাদ্ধ, দুইটী ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধ এবং সপিণ্ডীকরণ—

সাকল্যে এই ষোলটী শ্রাদ্ধ না করা হইবে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত মৃত পিতৃগণ প্রেতত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন না। সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হইলে মৃত পুরুষের সূক্ষ্ম দেহ একবৎসর পরে প্রেত দেহ পরিত্যাগ করিয়া ভোগদেহ প্রাপ্ত হয়।

"কৃতে সপিণ্ডীকরণে নরঃ সংবৎসরাৎ পরম্।
প্রেতদেহং পরিত্যজ্য ভোগদেহং প্রপদ্যতে।।"

শ্রাদ্ধতত্ত্বধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বচন ৬২ সংখ্যা এবং লঘুহারীত বাক্যানুসারে এই সপিণ্ডীকরণান্ত ষোলটী প্রেত শ্রাদ্ধ দ্বিজাতিগণের সামিষ পক্কান্ন দ্বারাই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। (শ্রাদ্ধতত্ত্বান্তর্গত সপিণ্ডীকরণ-শ্রাদ্ধ-প্রকরণ দ্রষ্টব্য)

শ্রাদ্ধাদিতে বিত্তশাঠ্য পরিহারপূর্ব্বক দান এবং বেদবিৎ ও সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবার বিধি আছে। গ্রামযাজক, বা যাহারা বেতন গ্রহণপূর্ব্বক পাঠ বা অধ্যাপনা করেন কিংবা ভৃতক অধ্যাপকের দ্বারা অধ্যাপিত, দেবল অর্থাৎ অর্থ গ্রহণপূর্ব্বক নানা দেবতার পূজাদি করিয়া উদর সংস্থান করেন এইরূপ ব্রাহ্মণ, শ্রাদ্ধে অপাংক্তেয় বলিয়া গণ্য হইবেন (বিষ্ণুপুরাণ ৩।৬।৬৭)। শ্রাদ্ধবাসরে ব্রাহ্মণগণকে হবিষ্য ভোজন করাইলে পিতৃগণ একমাস, মৎস্য-প্রদানে দুই মাস, শশক মাংস প্রদানে তিন মাস, পক্ষিমাংস প্রদানে চারিমাস; শূকর মাংস প্রদানে পাঁচমাস, ছাগ মাংস প্রদানে ছয়মাস, এণমাংস দ্বারা সাতমাস রুরুমৃগমাংসে আট মাস, গবয়মাংস প্রদানে নয়মাস, মেষ মাংস প্রদানে দশমাস, গোমাংস দ্বারা এগার মাস এবং ব্রাদ্ধ্রীণসমাংস প্রদান করাইলে বহুকাল পিতৃগণ পরিতৃপ্ত থাকেন। গয়া গমনপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ বিশেষভাবে পরিতৃপ্ত হন। প্রায় ৩২০ বৎসর পূর্ব্বে পরলোকগত স্মার্ত্ত পণ্ডিতবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মাতৃগর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া মরণ পর্য্যন্ত কর্ম্মজড় দেহারামী ব্যক্তিগণের কৃত্যমূলক অষ্টাবিংশতিতত্ত্বনামে একখানি বৃহৎ সংগ্রহ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া কর্ম্মজড় সমাজে বিখ্যাত হন। বর্ত্তমান অধিকাংশ বঙ্গীয় হিন্দুনামধারী ব্যক্তিগণ মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের এই কর্ম্মালানেই বদ্ধ।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের' অন্তর্গত শ্রাদ্ধতত্ত্ব নামে একখানি স্মৃতিনিবন্ধ গ্রন্থে কর্ম্মকাণ্ডান্তর্গত শ্রাদ্ধবিধি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। একটু সদসদ্‌বিচার সম্পন্ন ব্যক্তিই ঐ গ্রন্থ পাঠ করিয়া কর্ম্মকাণ্ডের "ছেলে ভুলান কথা" গুলি বুঝিতে পারেন। ঐ গ্রন্থে নিত্য আত্মা বা পরমাত্মা শ্রীভগবানের সম্বন্ধে আলোচনা নাই—কেবল কি করিয়া বদ্ধজীবের স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের ভোগ ইহকালে ও পরকালে হইতে পারে, তাহারই আলোচনা বিশেষভাবে এই গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন যে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ত' ঐ সকল কথা নিজে গড়িয়া লেখেন নাই, তিনি শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি শাস্ত্র হইতেই বহু বাক্য সংগ্রহ করিয়া কতকগুলি বিধি সুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন মাত্র।

মানবগণের অধিকারভেদে শাস্ত্রেরও ভেদ। সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট মানবগণের জন্য সাত্ত্বিকশাস্ত্র, রজোগুণবিশিষ্ট মানবের জন্য রাজসিক শাস্ত্র এবং তমোগুণান্বিত ব্যক্তির জন্য তামসিক শাস্ত্র, আর নির্গুণ পুরুষগণের

আত্মধর্ম্ম—শুদ্ধাভক্তি- প্রতিপাদক—নির্গুণশাস্ত্র। অধিকারভেদে মানবের স্বভাব ও শ্রদ্ধাভেদ। অধিকার-গত স্বভাব অনুসারে সুকৃতিফলে 'শ্রদ্ধা' ও শ্রদ্ধাকে' 'বিশ্বাস' কহে। শ্রীমদ্ভাগবত—নির্গুণশাস্ত্র। ভাগবতে নির্ম্মল ও অকৈতব ভগবদ্ভক্তির কথার আলোচনা আছে। এই জন্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি। ভাগবত বেদকল্পতরুর সুপক্ক ফল। ভাগবত—বেদের সারনির্য্যাস ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য। নির্গুণস্বভাবান্বিত ব্যক্তিগণেরই শ্রীমদ্ভাগবতে নৈষ্ঠিকী ও ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা উদিত হয়। যাঁহাদের ভাগবতে শ্রদ্ধা উদিত হইয়াছে, তাঁহারা জানেন—

"শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে, সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়।।"

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন (১১।৩।৪৪-৪৫)—

"কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ।
বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাত্তত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ।।
পরোক্ষবাদো বেদোয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা।।"

কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম বলিয়া যে বিতর্ক হয়—তাহাও বেদবাদ। বেদ ঈশ্বর স্বয়ং, সুতরাং যিনি যতই বুদ্ধি প্রকাশ করুন না কেন—পণ্ডিতাভিমানী পুরুষোরাও তাহাতে মোহপ্রাপ্ত হন। বেদ স্বয়ং পরোক্ষবাদ। ইহা মূঢ়লোকের পক্ষে অনুশাসন অর্থাৎ যাহাদের প্রবৃত্তি সর্ব্বদা অসাধুপথে ধাবিত তাহাদের উদ্দাম প্রবৃত্তিকে কথঞ্চিৎ পরিমাণে সঙ্কোচিত করিবার জন্য এই সকল পুণ্যকর্ম্মাদির বিধি। পীড়িত লোককে রোগনিবারণের জন্য যেরূপ ঔষধ প্রদান করা হয়, সেই প্রকার কর্ম্মরূপ পীড়ার জন্যই কর্ম্মবিধান। শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২১।৩৫) আরও বলিয়াছেন—

"বেদা ব্রহ্মাত্মবিষয়াস্ত্রিকাণ্ডবিষয়া ইমে।
পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ম্।।"

সাধারণ মনুষ্যের চক্ষে ঐ সকল বেদমন্ত্র কর্ম্ম, দেবতা ও যজ্ঞরূপ ত্রিকাণ্ডময়। বেদের সমস্ত মন্ত্রই পরোক্ষবাদ (পর অতীত অক্ষ ইন্দ্রিয়) অর্থাৎ মায়াবাদীর অপরোক্ষ—যাহা অর্থ বলিয়া প্রতীত হয় তাহাই উহার তাৎপর্য্য নহে, পরমার্থই গূঢ়তাৎপর্য্য। ঐ মন্ত্র সকলের দ্রষ্টা ঋষিগণ পরোক্ষকে ভগবানের প্রিয় জানিয়া পরোক্ষবাদ অবলম্বন করিয়াছেন। এই জন্য মুণ্ডকশ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, কর্ম্মদ্বারা আত্মধর্ম্ম লাভ হয় না জানিয়া ব্রাহ্মণ আত্মধর্ম্মবিজ্ঞানের জন্য সমিৎপাণি হইয়া শাস্ত্রসিদ্ধান্তনিপুণ কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ গুরুর নিকট অভিগমন করিবেন। সেই প্রকার বিদ্বান্ গুরুদেব প্রপন্ন শিষ্যকে ভগবদ্ভক্তি শিক্ষা দিবেন।

"স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি।
ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি ভিষক্তমঃ।।" (ভাঃ ৬।৯।৪৭)

যিনি স্বয়ং আত্যন্তিক মঙ্গলের বিষয় অবগত আছেন এইরূপ বিদ্বান্ পুরুষ কখনও অজ্ঞকে কর্ম্মের বিষয় উপদেশ করেন না। রোগী কুপথ্য অভিলাষ করিলেও সাধুবৈদ্য কখনও তাহা প্রদান করেন না। যে সকল দুষ্কৃত ব্যক্তি এইরূপ নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভ করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন নাই তাহারাই বেদের আড়ম্বরপূর্ণ কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া সংসারচক্রে ঘুরিয়া বেড়ান। কর্ম্ম তাহাদিগকে—

"কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়।।"

শ্রীমদ্ভাগবত অজামিলোপাখ্যানে যমরাজ যমদূতগণকে বলিয়াছিলেন—(৬।৩।২৫) জৈমিন্যাদি বা মন্বাদি ঋষিগণ যাঁহারা জগতের লোকের নিকট মহাজন বলিয়া প্রচলিত তাঁহারাও ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য জানেন না। তাঁহাদের মতি দৈবী মায়াতে বিমোহিত হওয়ায় তাঁহারা বেদের আপাত রমণীয় মধুপুষ্পিত বাক্যসমূহে মুগ্ধ। সুতরাং তাঁহারা দ্রব্যানুষ্ঠান ও মন্ত্রাদি বিস্তারিত আড়ম্বরপূর্ণ ও লৌকিক প্রতিষ্ঠাদিযুক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার জন্য লোকদিগকে উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীগীতায় (১৬।৬) ভগবান জগতে দুই প্রকার ভূতসৃষ্টির কথা উল্লেখ করিয়াছেন 'দৈব' ও 'আসুর'। ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তগণই দৈব ও যাঁহারা তদ্বিপরীত তাহারাই আসুরস্বভাবযুক্ত। ঐকান্তিক বিষ্ণু ভক্তগণের লক্ষণ এই যে, তাঁহারা একমাত্র বিষ্ণুর পরম পদে নিত্য কাল শরণাগত। তাঁহারা জানেন একমাত্র বিষ্ণুসেবার দ্বারাই দেব, ঋষি, পিতৃ, নৃ, ভুত সকলেরই সন্তোষবিধান হয়। তাঁহারা নামপরায়ণ—তাঁহারা নামাপরাধী নহেন। তাঁহারা কৃষ্ণে সম্বন্ধ জ্ঞানবিশিষ্ট। তাঁহারা দেহ ও মনোধর্ম্মে আসক্ত নহেন।

তাঁহারা যে কুলে বা যে দেশে আবির্ভূত হন সেই বংশ ও সেই দেশ ধন্য ও তীর্থস্থানে পরিণত হয় তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণ (?) কৃতার্থ হন। যাঁহারা একবার মাত্র নিষ্কপটে শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দে মন নিবেশিত করেন, যম অথবা পাশহস্ত যমদূতগণ স্বপ্নেও তাঁহাদের দৃষ্টি গোচর হইতে পারে না (ভাঃ ৬।১।১৯) সুতরাং সেই সকল ভগবদ্ভক্ত 'পিতৃপুরুষগণ প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন'—এইরূপ নীচ ও হেয় কল্পনা হৃদয়ে স্থান দিতে পারেন না। আসুরপ্রকৃতি দৈবীমায়াবিমূঢ় লোকেরাই একমাত্র বেদের মুখ্য তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া অর্থবাদে রত, কাম্যকর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী, স্বর্গপ্রার্থী ও জন্মকর্ম্মফলপ্রদ ক্রিয়াবাহুল্য দ্বারা নশ্বর ভোগ ও ঐশ্বর্য্য সুখলাভের উপায়স্বরূপ আপাত-মনোরম শ্রবণরমণীয় (পরিণামে কষ্টদায়ক) পুষ্পিত বাক্যে অনুরক্ত হন (গীতা ২।৪৩)। ঐ সকল মূঢ়লোক শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র অদ্বিতীয় ভোক্তা তাহা জানেন না সুতরাং উহারা কেবল সংসার ভ্রমণ করিয়া থাকেন উহারা নানা দেবতার, পিতৃপুরুষগণের ভূতগণের আরাধনা করিয়া তত্তৎ ক্ষয়িষ্ণু অনিত্য লোক প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় পতিত হন কিন্তু যাঁহারা একমাত্র অচ্যুতের ঐকান্তিক ভক্ত তাঁহাদের কখনও চ্যুতি নাই; তাঁহারাই পরাশান্তি লাভ করেন। প্রযতাত্মা ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিপূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল, জল যাহা কিছু অর্পণ করেন, তাহাই ভগবান অত্যন্ত স্নেহপূর্ব্বক স্বীকার করেন তাহাই অক্ষয় হয় তাহাতে সমস্ত জীবের তৃপ্তি লাভ হয় অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যে কিছু কার্য্য করেন, যাহা আহার করেন, তপস্যা করেন, বা দান করেন সমস্তই শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া থাকেন (গীতা ৯।২৪-২৭)

কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধাদিব্যাপারে বিষ্ণুসেবাকৈতবসত্ত্বেও আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা ব্যতীত কোনও হরিসেবানুকূল কার্য্য নাই। ঐ সকল কার্য্য কেবল আসুর অধিকার বিশিষ্টের মোহনের জন্য বেদবাদ মাত্র। উহার দ্বারা জীবের কোনও নিত্যমঙ্গল লাভ হয় না অপিচ জীবগণকে কর্ম্মমার্গের ভীষণ আবর্ত্তে পাতিত করে।

বৈষ্ণবগণ সিদ্ধান্তনিপুণ। তাঁহারা চার্ব্বাকাদির ন্যায় প্রত্যক্ষবাদ দ্বারা পরিচালিত হইয়া বেদনিন্দক নহেন।

চার্ব্বাক বলেন যে যদি শ্রাদ্ধ করিলেই মৃতব্যক্তির তৃপ্তি সাধিত হয়, তবে কোনও ব্যক্তি বিদেশে গমন করিলে তাহাকে পাথেয় দিবার কোনও প্রয়োজন নাই বাটীতে তাহার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেই ত' তাহার তৃপ্তি হইতে পারে? আর যদি পৃথিবীতে শ্রাদ্ধ করিলে স্বর্গস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তবে অঙ্গনে শ্রাদ্ধ করিলে প্রাসাদোপরিস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হয় না কেন? যখন কিঞ্চিদুচ্চস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হয় না, তখন তদ্দ্বারা অত্যুচ্চ স্বর্গস্থিত ব্যক্তির কিরূপে তৃপ্তি সম্ভব হইতে পারে? অতএব মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে যে সকল শ্রাদ্ধাদি প্রেতকৃত্য হয় তাহা ব্রাহ্মণগণের উপজীবিকা মাত্র ভস্মীভূত দেহের আর পুনরাগমন কোথায়? যদি শরীর হইতে আত্মার পরলোক গমন ও দেহান্তরে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা থাকিত তবে পুত্রাদি বন্ধুবান্ধবগণের স্নেহে ঐ দেহেই পুনরায় আসে না কেন? সুতরাং কর্ম্মোপযোগী বেদ—ভণ্ড, ধূর্ত্ত রাক্ষসের রচিত। বৈষ্ণবগণ এইরূপ বেদবিদ্বেষী প্রত্যক্ষবাদী নহেন। তাঁহারা অধোক্ষজ সেবক সুতরাং বেদবাদে ও অদৈবস্মার্ত্তবাদের হেয়তা প্রদর্শনকারী জীবের নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। বেদ স্বয়ং ভগবৎস্বরূপ।

"মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ।।" (চৈঃ চঃ মধ্য ২০ শ)

কৃষ্ণ বদ্ধজীবের কৃষ্ণস্মৃতি উন্মেষিত করাইবার জন্যই বেদশাস্ত্র জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। সেই বেদ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়—ভগবানই একমাত্র সম্বন্ধ; ভক্তিই সাধন এবং প্রেমই প্রয়োজন। যদি বেদ পুরাণ স্মৃত্যাদি শাস্ত্রানুযায়ী আচরণ দ্বারাই আমাদের পরমপুরুষার্থ ভগবৎপ্রেমই উদিত না হইল তবে পণ্ডশ্রম করিয়া কি লাভ?

বৈষ্ণবস্মৃতাচার্য্যবর্য্য কলিযুগপাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ ও ষড়্গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভু তাঁহার সৎক্রিয়া সারদীপিকা গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

যতোভ্যর্চ্চিতে নারায়ণে সতি ব্রহ্মাদয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষিভূতাদয়শ্চ সর্ব্বেপি পিতৃলোকাশ্চ পূজিতা ভবন্তি, সর্ব্বতোভাবেন সন্তুষ্টাশ্চ স্যুঃ। তত্রাহ বিষ্ণুযামল সংহিতায়াং মৎ পূজনেন বিবুধাঃ পিতরোর্চ্চিতাশ্চ তুষ্টা ভবন্তি ঋষিভূত সলোকপালাঃ। সর্ব্বেগ্রহাস্তরণি-সোমকুজাদিমুখ্যা গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি * * * কিঞ্চ শ্রীভাগবতে—

যথাতরোর্ম্মূল-নিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা।।

* * * কিঞ্চ যথোত্তরগীতায়াং—

দেবাদীনাঞ্চ পূজ্যোহং বর্ণাদীনাং ধনঞ্জয়।
মৎপূজনেন সর্ব্বাঢ্যা স্যাদ্ধ্রুবং নাত্র সংশয়ঃ।।

কিঞ্চ স্কান্দে রেবাখণ্ডে—

সঙ্কল্প চ তদা দানং পিতৃদেবার্চ্চনাদিকম্।
বিষ্ণুমন্ত্রোপদিষ্টশ্চেন্ন কুর্য্যাৎ কুশধারণম্।।

চেদ্ যদি বিষ্ণুমন্ত্রোপদেষ্টা লোকমাত্রঃ তদা পিতৃদেবার্চ্চনাদিকং ন কুর্য্যাৎ। পিতৃপদেন সকল পিতৃমাতৃলোকস্য গ্রহণং তস্যার্চ্চনত্বেন শ্রাদ্ধতর্পণাদিকর্ত্তুং * * * ননু মন্বাদিধর্ম্মশাস্ত্রোক্তবচনপ্রমাণতয়া বর্ণাদি মনুষ্যমাত্রস্য ঋণষট্ বদৃণং তদধীনঞ্চ ভবতি। * * * তত্তু শ্রীভগবান্নামমন্ত্রোপদিষ্টানন্যশরণ-গৃহস্থাদিনরমাত্রস্য ন স্যাদিত্যাহ। শ্রীভাগবতে— (১১।৫।৪১)

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম।।

* * * যদি মদ্ভক্তাস্তু তদা বাহ্মণাদিজীবমাত্রেষু বিশেষতো বৈষ্ণবেষু চ সহজেনান্নজলাদিনিবেদনং বিনা তেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ শ্রীমন্মহাপ্রসাদ-চরণোদকাদি-নিবেদন-বাক্যং বিনা চ চেন্মদ্বহির্ম্মুখভাবতঃ তর্পণশ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়াপরত্বেন বাক্যরচনা-সংঘাতব্রতং যেষাং তর্পণশ্রাদ্ধাদি বাক্যরচনা সংঘাত ক্রিয়াপরাণাং কর্ম্মিণাং তথা তে পিতৃলোকান্ যান্তি তৎকর্ম্মবশাৎ। * * * মদ্দাসভক্তাঃ তে তু মাং নিত্যমব্যয়ং নিজধাম বিরাজমানং পরমানন্দ সন্দোহার্ণবঘনশ্যামসুন্দরস্বরূপবিগ্রহং যান্তি। অয়মর্থঃ যতোঽহনন্যশরণানাং সেব্যোহং ন তু দৈবমিশ্রাণাম্। অতএব মন্নিজ সেবকত্বেন মদ্ধামোপেত্য যথৈবেহ মদ্যাজিনঃ। যথা মন্নিজধান্নি তে মদ্দাসা মম তত্তৎ সেবাং কুর্ব্বন্তি ইত্যর্থঃ নাত্র সন্দেহঃ। তথা বশিষ্ঠ সংহিতায়াম্।

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং দানং সঙ্কল্পমেব চ।
দৈবং কর্ম্ম তথা পৈত্রং ন কুর্য্যাদ্বৈষ্ণবো গৃহী।।

অর্থাৎ শ্রীনারায়ণ পূজিত হইলে ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবতাগণ ঋষি ও প্রাণিগণ এবং নিখিল পিতৃলোক পূজিত ও সর্ব্বতোভাবে পরিতৃপ্ত হন। শ্রীবিষ্ণু যামল সংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে পুরুষের পূজার দ্বারা দেবতাগণ, পিতৃসকল, ঋষিসমূহ, লোকপাল বৃন্দ, সূর্য্য চন্দ্র মঙ্গলাদি নবগ্রহ সগণ সহিত পূজিত সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হন সেই আদিপুরুষ গোবিন্দ দেবকে ভজনা করি। শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে যেরূপ বৃক্ষের মূলদেশে জল সেক করিলে শাখা, প্রশাখা পত্র পুষ্প ফল সকলেই সঞ্জীবিত থাকে, যেরূপ পাকস্থলীতে আহার প্রদান করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয় পরিপুষ্ট ও সতেজ থাকে তদ্রূপ একমাত্র অচ্যুতের (অর্থাৎ কোটী কোটী মহাপ্রলয়েও যিনি নিত্যস্থায়ী) আরাধনা করিলে দেবতাগণ পিত্রাদি সকলেই সাতিশয় পরিতৃপ্ত হন।

উত্তর গীতায়ও উক্ত হইয়াছে যে হে অর্জ্জুন, দেবতাগণের এবং বর্ণিগণের মধ্যেই আমিই সর্ব্বারাধ্য। আমার পূজার দ্বারা নিশ্চয়ই তাহাদের সকলেরই পূজা হয় এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অতএব রেবাখণ্ডে উক্ত হইয়াছে মানব বিষ্ণুমন্ত্রোপদিষ্ট হইলে প্রাকৃত কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণের ন্যায় আর সঙ্কল্প দান পিতৃদেবার্চ্চনাদি বা করিবেন না। শ্রীল গোপালভট্ট প্রভু বলেন অর্চ্চনাদি দ্বারা শ্রাদ্ধতর্পণাদি কার্য্য এবং গণেশাদি দেবতার পূজা নিষদ্ধ হইয়াছে। যদি বল, মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বচন প্রমাণ হইতে জানা যায় যে মানুষমাত্রেরই ইহ সংসারে আগমন করিলে ছয়টী ঋণের অধীন হইতে হয়। তদুত্তর এই যে, সেই ঋণ সকলের পক্ষে হইলেও যাহারা সদ্গুর-নিকট হইতে শ্রীভগবানের নামমন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছেন সেই অনন্যশরণ গৃহস্থাদি নরমাত্রেরই ঐ ছয় প্রকার ঋণ হয় না। যেহেতু শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ হইতে জানা যায় যে বর্ণাশ্রমে অবস্থিত মনুষ্যমাত্রের যে কেহ সদ্গুরুর নিকট হইতে পঞ্চসংস্কার লাভ পূর্ব্বক ভগবন্নামমন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়া অনন্যশরণত্ব লাভ করেন অর্থাৎ একমাত্র শরণ্য মুকুন্দদেবের শরণ গ্রহণ করেন, তিনি দেব, ঋষি, ভূত, আত্মীয়, মনুষ্য এবং পিতৃগণের নিকট ঋণী বা তাঁহাদের কিঙ্কর হন না।

যদি ভগবদ্ভক্তগণের কেহ ব্রাহ্মণাদি জীবমাত্রে—বিশেষতঃ বৈষ্ণবে সহজ অন্নজলাদি নিবেদন পিতৃগণকে মহাপ্রসাদ চরণোদক নিবেদন ব্যতীত ভগবানের প্রতি বিমুখতাবশতঃ কর্ম্মিগণের ন্যায় তর্পণশ্রাদ্ধাদিক্রিয়া পরত্বসংঘাতকব্রত ক্রিয়াপর হন তাহা হইলে তিনি তত্তৎ কর্ম্মফলে ক্ষয়িষ্ণু পিতৃলোকে গমন করেন। কিন্তু ভগবানের অনন্য সেবক ভক্তগণ নিত্যধামে বিরাজিত অব্যয় পরমানন্দ- সাগর ঘনশ্যামসুন্দরস্বরূপ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করেন। যেহেতু ভগবান্ অনন্য শরণদিগের একমাত্র সেব্য,তিনি মিশ্রদেবতার সেবকগণের সেবা গ্রহণ করেন না। সুতরাং ভগবানের অনন্য সেবকগণ নিত্য ভগবদ্ধামে গমন করিয়া তাহাদের স্বাভীষ্ট-সেবানন্দে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। বশিষ্ঠ-সংহিতায়ও উক্ত হইয়াছে—বিষ্ণুপাসক গৃহস্থ নিত্য নৈমিত্তিক, কাম্য, দান, সঙ্কল্প দৈব বা পৈত্র কর্ম্ম কখনও করিবেন না। যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন যে যদি ঐকান্তিক গৃহস্থ বৈষ্ণবের পিত্রাদি তর্পণ নিষিদ্ধ হইল তবে জগদ্গুরু শ্রীগৌরসুন্দর, গৃহস্থ- লীলায় কেন গয়াতে পিণ্ডাদি প্রদান পূর্ব্বক পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতের আদিখণ্ডের সপ্তদশ অধ্যায়ে এ বিষয়ের বর্ণনা আছে। আবার শ্রচৈতন্যচরিতামৃত পাঠে জানা যায় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুও হরিদাস ঠাকুরকে শ্রাদ্ধপাত্র প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠগণ যাহা আচরণ করিবেন তাহাই ত' ইতরজনে অনুবর্ত্তন করিবেন?

এই প্রশ্নের উত্তর শ্রীভগবান্ গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জগতে প্রদান করিয়াছেন—

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোযয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্।।
প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়া সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ।।"

অর্থাৎ ভগবান পরমপুরুষ এই ত্রিলোকের মধ্যে তাঁহার কোনও কর্ত্তব্য নাই তাহার কিছু অলভ্য নাই যে তাঁহার কর্ম্ম করার প্রয়োজন পড়িয়াছে তবে তিনি যে কর্ম্ম করেন—তাহার কারণ অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্তি বিশিষ্ট লোকদিগকে ক্রমশঃ সৎকর্ম্মে আনয়ন করিবার জন্য; তিনি অজ্ঞান কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণের বুদ্ধি ভেদ জন্মান না। কারণ কর্ম্মজড়গণের অধিকার এত অল্প যে যদি তাহাদিগের নিকট কর্ম্মের অকর্ম্মণ্যতা বলা হয় তাহা হইলে তাহারা উচ্ছৃঙ্খল অসৎকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ হইয়া পড়িবে। তাহারা ত' ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেই না, অপিচ পাপকার্য্যে অভিনিবষ্ট হইবে। এই জন্য ভগবান্ নিজে সৎকর্ম্ম আচরণ করিয়া বহির্ম্মুখগণকে ক্রমাধিকার শিক্ষা দেন। মূঢ়ব্যক্তিগণ নিজদিগকে প্রাকৃত বলিয়া বোধ করেন এবং প্রকৃতির গুণকর্ম্মে স্বীয় সম্বন্ধ যোজনা করেন। ঐ অল্পজ্ঞানবিশিষ্ট মন্দমতিগণকে তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরা বিচলিত করেন না। কিন্তু ঐ শিক্ষা ভক্তির অধিকারীর পক্ষে নাই—ভক্তগণ তাঁহার অতিপ্রিয় তিনি তাঁহাদিগকে সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশ প্রদান করিয়া বলেন—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।"

"যাবতীয় বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাগত হও। ঐ সকল আশ্রমধর্ম্ম বা বর্ণধর্ম্ম পরিত্যাগ করাতে তোমার প্রত্যবায় হইবে এইরূপ ভাবিয়া শোক করিও না—আমার ভক্তের কোনও পাপ নাই আমি তাঁহাকে সমস্ত পাপ হইতে মোচন করিয়া থাকি। যদি শ্রদ্ধা দেখাইতে হয়, তবে আমাকে দেখাও, যদি নমস্কার করিতে হয় তবে আমার ভগবৎ স্বরূপে প্রণিপাত কর—"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদযাজী মাং নমস্কুরু।"

ভগবানের কার্য্যের গূঢ় মর্ম্ম একমাত্র ভগবানে সর্ব্বতোভাবে শরণাগত ভক্তই উপলব্ধি করিতে পারেন। অপরে মোহিত হইয়া পড়ে। এই প্রপঞ্চে বিষ্ণুর অসুরমোহনরূপ একটী নিত্যকার্য্য আছে। ভোগী অসুর-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা গৌরসুন্দরের অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া 'শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেতশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন—সুতরাং আমাদিগেরও ঐরূপ আচরণ করা কর্ত্তব্য' এইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন। বিষ্ণুবিরোধী লোকের স্বভাবই এই যে তাহারা যে কার্য্যটী তাহাদের মনের মতন অমঙ্গলময় কুকার্য্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর হইবে সে কার্য্যটী ভগবানের বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির দোহাই দিয়া করিয়া থাকেন—কিন্তু যেটী তাহাদের ইন্দ্রিয়তোষণের সহায়ক হইবে না, সে বিষয়টী গ্রহণ করিতে তাহারা নারাজ। যিনি স্বয়ংরূপ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীভগবান্, যাঁহার পিতামাতা আত্মীয়বর্গ অভিন্ননন্দ-যশোদা ও ব্রজের পরিকরসমূহ তাঁহাদের কিপ্রাকৃত লোকের মত জন্ম মৃত্যু বা প্রেতযোনিলাভ হয়; অসুরপ্রকৃতি লোকগণ ভগবানের দৈবী মায়ায় বিমোহিত হইয়া অপ্রাকৃত ভগবানের সম্বন্ধেও ঐরূপ অনন্তনরকপ্রাপক বিচার অবলম্বন করিয়া থাকে। পিণ্ডদান প্রসঙ্গে ঈশ্বরপুরীর সহিত শ্রীগৌরসুন্দর লোকশিক্ষার্থ কি বলিয়াছিলেন, পাঠকবর্গ, শ্রবণ করুন্। (চৈঃ ভাঃ আদি ১৭শ)—

"প্রভু বলে গয়াযাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণ দেখিলাম চরণ তোমার।।
তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তারে পিতৃগণ।
সেও যারে পিণ্ড দেয় তরে সেইজন।।
তোমা দেখিলেই মাত্র কোটি পিতৃগণ।
সেইক্ষণে সর্ব্ববন্ধ হয় বিমোচন।।
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থের পরম তুমি মঙ্গল-প্রধান।।
কৃষ্ণ-পাদপদ্মের অমৃত-রস-পান।
আমারে করাও তুমি—এই চাহি দান।।"

ইহা দ্বারা জগদ্‌গুরু শ্রীগৌরসুন্দর দেখাইলেন যে, সদ্‌গুরুপ্রপত্তি ও বৈষ্ণব- সেবাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। কৃষ্ণপ্রেমই জীবের চরম প্রয়োজন। পাঠকগণ! যদি সুবুদ্ধি, বিচারজ্ঞ ও সারগ্রাহী হন তবে এই শিক্ষা গ্রহণ করুন্। ভগবদ্ভক্তি দ্বারাই আমাদের নিত্যমঙ্গল লব্ধ হইবে। শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা গ্রহণ করুন্, যিনি হৃদয়ে চৈতন্য-নিত্যানন্দকে ধারণ করিয়াছেন সেইরূপ নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের নিকট মহাপ্রভুর শিক্ষার মর্ম্মার্থ বুঝিয়া লউন্। শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"কাম ত্যাগি কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি।
দেব ঋষি পিত্রাদিকের কভু নহে ঋণী।।"

শ্রীমদ্ভাগবতে নারদ ঋষি ব্যাসদেবকে বলিয়াছেন, যে যে দ্রব্য ভোজনে প্রাণিগণের যে যে রোগ জন্মে কেবল সেই সব রোগোৎপাদক দ্রব্য সেবন করিলে কখনও সেই সেই রোগের উপশম হয় না কিন্তু ঐ সব রোগজনক ঘৃতাদি দ্রব্য অন্য দ্রব্য বা ঔষধের সহিত রসনাযোগে মিশ্রিত হইলে তৎসেবনফলেই সেই রোগ নিবৃত্ত হয়। সেইরূপ মানবগণের নৈমিত্তিক কাম্যকর্ম্মসমূহ সংসার বন্ধন বা যোনিভ্রমণের কারণ কিন্তু সেই সকল কর্ম্মই ঈশ্বরে সমর্পিত হইলে ভগবদ্বিমুখ 'অহং-বুদ্ধি' বিনাশে সমর্থ হয়। এই জন্য ঐকান্তিক বৈষ্ণবগণ পিত্রাদির তর্পণ না করিলেও কনিষ্ঠ বা মধ্যমাধিকারী গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্মে অবস্থিত বলিয়া মহাপ্রসাদ-নির্ম্মাল্য দ্বারা পূর্ব্বপুরুষগণের আত্মার তৃপ্তিবিধান করিয়া থাকেন। দীক্ষিত বৈষ্ণবগণ—সম্বন্ধ-জ্ঞানবিশিষ্ট। তাঁহারা জানেন, স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরদ্বয় জীবের উপাধি মাত্র। জীব স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিলেও মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত বাসনাময় সূক্ষ্ম দেহ পরিত্যাগ করে না—সূক্ষ্মদেহ নানাবিধ ভোগপর অসৎবস্তু কামনা করিয়া থাকে। কিন্তু শুদ্ধ জীবাত্মা একমাত্র ভগবৎ সম্বন্ধি বস্তু ইচ্ছা করিয়া থাকেন। এই জন্য ভগবদ্ভক্তগণ সূক্ষ্মদেহের উদ্দেশ্যে কর্ম্মজড় স্মার্ত্তদিগের ন্যায় অমেধ্যাদি অপবিত্র বস্তু প্রদান না করিয়া

একমাত্র জীবাত্মার পরিতৃপ্তির জন্য মহাপ্রসাদাদি প্রদান করিয়া পিতৃপুরুষগণের আত্মার তৃপ্তিসাধন করেন। সূক্ষ্মদেহের পরিতৃপ্তির নামান্তরই ভোগ—ভোগবাসনানলে ইন্ধন প্রদান করিলে কেবল ভোগানল বৃদ্ধি করাইয়া জীবের অধোগতি ও চৌরাশি লক্ষযোনি-ভ্রমণ হয়—অপরাধী ব্যক্তির কখনও সুখ কখনও দুঃখ, কখনও স্বর্গ, কখনও নরক-ভোগ হয়। কিন্তু শুদ্ধ জীবাত্মার পরিতৃপ্তিতে কৃষ্ণসেবাবৃত্তির উদয় করাইয়া পরম-পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমা লাভ করাইয়া থাকে। এই জন্যই বর্ণাশ্রস্থিত বিষ্ণু আরাধকগণের জন্য স্মৃতিপ্রবন্ধ 'শ্রীহরিভক্তিবিলাসের' ৯ম বিলাসের ৮৫-১০৪ সংখ্যা পর্য্যন্ত বৈষ্ণবশ্রাদ্ধবিধি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য উক্ত গ্রন্থ সঙ্কলিত হইবার প্রায় ৫০।৬০ বৎসর পরে কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের জন্য 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব' সঙ্কলন করেন। বিষ্ণু ও বৈষ্ণববিরোধমূলে ঐ গ্রন্থ রচিত হইয়ছে। অনেকে রঘুনন্দনের শ্রাদ্ধতত্ত্বের মঙ্গলাচরণে শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম দেখিয়া উহাতে ভগবদ্ভক্তগণের আচরণীয় বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া যেন ভুল না করেন। ভগবান্ এই রূপেই অসুরমোহন করিয়া থাকেন। ভগবানে স্তব স্তুতি (?) করিয়াও ভগবানের বিরোধাচরণের প্রয়াস জগতে বহু হইয়াছে। সাধারণ লোকে ইহা ধরিতে পারেন না। কর্ম্মজড়গণ ভগবানকে কর্ম্মবশ মনে করেন, তাঁহারা ভগবানের নিত্য সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ স্বীকার করেন না। পঞ্চোপাসকগণের বিষ্ণুপূজা (?) ভগবানের বিরোধাচরণ ছাড়া আর কিছুই নহে—

"ধিক্ তার কৃষ্ণসেবা শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন।।"

অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু উচ্চকুলে আবির্ভূত হইয়াও বিষ্ণুনির্ম্মাল্য দ্বারা শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং সেই শ্রাদ্ধ প্রাত্র স্মার্ত্তের প্রত্যক্ষ-আসুরবিচারে যবনকুলোদ্ভুত শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণজ্ঞানে প্রদান করিয়া ছিলেন। কিন্তু আবার সেই অদ্বৈতপ্রভুর পুত্র বলরামের সন্তান মধুসূদনের পুত্র রাধারমণ ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের স্মৃতির আনুগত্য অবলম্বনে কুশপুত্তলিকা নির্ম্মাণপূর্ব্বক প্রেতশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করিয়া অদ্বৈতাচার্য্য-প্রচারিত পারমার্থিক ধর্ম্মের উৎসাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই জন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী (চৈঃ চঃ আদি ১২শ পরিচ্ছেদে) বলিয়াছেন—

"কেহত আচার্য্যের আজ্ঞায় কেহত' পরতন্ত্র।
স্বমত কল্পনা করে দৈব পরতন্ত্র।।
আচার্য্যের মত যেই সেই মত সার।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি চলে সেইত' অসার।।"

সত্যযুগে উপরিচর বসু নামে পুরুবংশীয় একজন বৈষ্ণবরাজ ছিলেন। তিনি মহাপ্রসাদ-নির্ম্মাল্য দ্বারা পিতৃ পুরুষগণের আত্মার পরিতৃপ্তি সাধন করেন। বর্ণাশ্রম স্থিত বিষ্ণুর উপাসকগণের মধ্যে এইরূপ মহাপ্রসাদ দ্বারা বৈষ্ণব শ্রাদ্ধ বিধিরই প্রচরন আছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য শ্রীহরিভক্তিবিলাসের শ্রাদ্ধবিধি প্রকরণের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

প্রাপ্তে শ্রাদ্ধেদিনেঽপি প্রাগন্নং ভগবতেঽর্পয়েৎ।
তচ্ছেষেণৈব কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং ভাগবতো নরঃ।।

তথাচ পাদ্মে—

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে।।

স্কান্দে ব্রহ্মনারদ সংবাদে—

কিং দত্তৈর্ব্বহুভিঃ পিণ্ডৈর্গয়াশ্রাদ্ধদিভির্মুনে।
যৈরর্চ্চিতো হরির্ভক্ত্যা পিত্রর্থঞ্চ দিনে দিনে।।
যমুদ্দিশ্য হরেঃ পূজাং ক্রিয়তে মুনিপুঙ্গব।
উদ্ধৃত্য নরকাবাসাত্তং নয়েৎ পরমং পদং।।
যো দদাতি হরেঃ স্থানং পিতৃনুদ্দিশ্য নারদ।
কর্ত্তব্যং হি পিতৃণাং যত্তৎ কৃতং তেন ভো দ্বিজ।।

শ্রুতৌ চ—এক এব নারায়ণ আসীৎ ন ব্রহ্মা নেমে দ্যাবাপৃথিব্যৌ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বে পিতরঃ সর্ব্বে মনুষ্যাঃ বিষ্ণুনা অশিতমশ্নন্তি বিষ্ণুনাঘ্রাতং জিঘ্রন্তি বিষ্ণুনা পীতং পিবন্তি তস্মাদ্বিদ্বাংসো বিষ্ণুপহৃতং ভক্ষয়েযুঃ।

অতত্রবোক্তং শ্রীভগবতা বিষ্ণুধর্ম্মে—

ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ যৎকিঞ্চিদনিবেদ্যাগ্র ভোক্তরি।
ন দেয়ং পিতৃদেবেভ্যঃ প্রায়শ্চিত্তী যতো ভবেৎ।।

শ্রাদ্ধ দিন উপস্থিত হইলে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীভগবান্‌কে অন্ন নিবেদন করিবে এবং একমাত্র হরির অবশেষ দ্বারাই ভগবদ্ভক্ত শ্রাদ্ধকার্য্য করিবেন। পদ্মপুরাণেও উক্ত হইয়াছে—বিষ্ণুর নিবেদিত মহাপ্রসাদান্ন দ্বারা শিবাদি দেবতার আরাধনা ও পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিলে উহা অক্ষয় ফল প্রসব করিয়া থাকে। স্কন্দপুরাণেও ব্রহ্মনারদ-সংবাদে দেখা যায়, যে ব্যক্তি পিতৃগণের উদ্দেশ্যে প্রত্যহ ভক্তিসহকারে কেশবের পূজা করেন, তাঁহার গয়াশ্রাদ্ধাদি বা বহু পিণ্ড-দানের প্রয়োজন কি? হে মুনিশ্রেষ্ঠ, যাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রীহরির পূজা করা যায় তাঁহাকে নরক-যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিয়া পরমপদে আনয়ন করা হয়। হে নারদ, যিনি পিতৃগণকে উদ্দেশ্য করিয়া হরির স্থান প্রদান করেন, পিতৃগণের সম্বন্ধে যাহা কিছু কর্ত্তব্য হইতে পারে—তাহা সমস্তই তাঁহার দ্বারা আচরিত হইয়াছে। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা ও দ্যাবা-পৃথিবী কিছুই ছিল না। দেবতাবৃন্দ, পিতৃগণ ও যাবতীয় মনুষ্য বিষ্ণুর ভুক্তাবশেষ গ্রহণ করেন, বিষ্ণুর আঘ্রাত বস্তু আঘ্রাণ করেন, হরির পীত বস্তু পান করেন। অতএব বিষ্ণুধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে—প্রথমতঃ অগ্রভুক্ ভগবানকে না দিয়া পিতৃগণের উদ্দেশ্যে কিছু দিতে নাই। তাহা করিলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হয়।

শ্রাদ্ধে বৈষ্ণব-ভোজন করান উচিত। শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ উপদেশামৃতের চতুর্থ শ্লোকে বৈষ্ণবগণকে ভোজন করান ও তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করাকে প্রীতির ছয়টী লক্ষণের অন্যতম বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। উহা দ্বারা বৈষ্ণবসঙ্গ ও তৎফলে ভক্তি বৃদ্ধি হয়। শ্রীহরিভক্তিবিলাস স্কান্দ বচন উদ্ধারপূর্ব্বক বলিয়াছেন—যে সকল বিষয়মদান্ধ বৈষ্ণবের 'ব্যবহারিক দুঃখ' দর্শনে বৈষ্ণবকে মূঢ়বোধে বেদবিদ্‌গণকে শ্রাদ্ধ প্রদান করে বিপ্রকৃত সেই শ্রাদ্ধ রাক্ষস কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। বৈষ্ণব ব্যক্তি শ্রাদ্ধেগ্রাস পরিমিত অন্নভোজন ও গণ্ডুষ-প্রমাণ জল পান করিলে সেই অন্ন সুমেরুসদৃশ এবং সেই জল সমুদ্রতুল্য হয়। নারদপুরাণে উক্ত হইয়াছে, হরির উদ্দেশ্যে পিতৃশেষ দ্রব্য অর্পণ করিলে দাতার পিতৃগণকে রেতঃপান করাইয়া যন্ত্রণা ভোগ করাইতে হয়। বিষ্ণুধর্ম্মে লিখিত আছে যে, শ্রীহরির অবশেষ পরমান্ন পিতৃগণকে প্রদান করিলে, তাহা অক্ষয় হয় কিন্তু কখনও ব্রহ্মাদি দেবতাগণেরও সদ্‌গুরু শ্রীহরিকে পিতৃগণের শেষ প্রদান করিতে নাই। কি দক্ষ, কি পিতৃবর্গ, কি ইন্দ্রাদিপ্রমুখ দেবতাগণ সকলেই শ্রীহরির কিঙ্কর। এইরূপে আবশ্যকীয় কৃত্য সমাপনপূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে বৈষ্ণবগণকে বিভাগ করিয়া দিয়া বন্ধু বান্ধবগণের সহিত শ্রীমহাপ্রসাদান্ন সম্মান করা কর্ত্তব্য।

শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু প্রহ্লাদ পঞ্চরাত্রের বাক্য উদ্ধারপূর্ব্বক বলিতেছেন—

"স্বভাবস্থৈঃ কর্ম্মজড়ান্ বঞ্চয়ন্ দ্রবিণাদিভিঃ।
হরের্নৈবেদ্যসম্ভারান্ বৈষ্ণবেভ্যঃ সমর্পয়েৎ।।"

যাহারা কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত অর্থাৎ কর্ম্মফলাসক্ত হইয়া প্রেতশ্রাদ্ধাদিতে আসক্ত ঐ সকল জড়প্রায় লোকগণকে (বিষ্ঠা-তুল্য) অনিবেদিত দ্রব্য অথবা অর্থাদি দ্বারা বঞ্চনা করিয়া বৈষ্ণবগণকে শ্রীহরির নিবেদিত পরমোপাদেয় বস্তু প্রদান করা কর্ত্তব্য। কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণ অর্থলোলুপ অর্থের জন্যই তাঁহাদের শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে উৎসাহ সুতরাং ঐ সকল কর্ম্মজড় বিপ্রগণকে 'ভোগা' দেওয়াই কর্ত্তব্য।

কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের বিধানানুসারে কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশীতে শ্রাদ্ধ প্রশস্ত কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণের শ্রীএকাদশীতে মহাপ্রসাদান্ন গ্রহণ নিষিদ্ধ। সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণকে শ্রীএকাদশীতে মহাপ্রসাদান্ন প্রদান করিয়া সগণসহিত নরকপথের পথিক হন না। শ্রীনারায়ণে কোন অমেধ্য দ্রব্য যেমন মৎস্য মাংসাদি নিবেদিত হইতে পারে না। সুতরাং ভগবদ্ ভক্তগণ রক্তমাংসপুঁযবিষ্ঠাপূর্ণ মৃদদেহাদির দ্বারা পিতৃপুরুষগণের তৃপ্তিবিধানে যত্নপর হন না। বৈষ্ণবগণ উপাধির শ্রাদ্ধ করেন না, আত্মার শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন ভূতপিশাচের শ্রাদ্ধ করেন না—নিত্য কৃষ্ণদাস জীবের শ্রাদ্ধ করেন। ভগবদ্ভক্তগণ নির্গুণ-স্বভাব, তাঁহারা পৈশাচিক শ্রাদ্ধের কোনও মতে পক্ষপাতী নহেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় আজ কাল বৈষ্ণবনামধারী ব্যক্তিগণও আসুর সমাজের করাল কবলে নিগৃহীত হইবার ভয়ে নরকপ্রাপক প্রেতশ্রাদ্ধ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আজকাল পুরোহিতগণ পুরের হিত না করিয়া প্রকৃত পক্ষে কি অহিতাচরণ করিতেছেন না? গুরুব্রুব, বৈষ্ণবব্রুব' গোস্বামিব্রুবগণ কি পুত্রকন্যা বিবাহের জন্য আসুর সমাজের আনুগত্য করিয়া নিজেরা অন্ধতামিস্রে পতিত অপর অজ্ঞ ব্যক্তিগণকে ঘোর নরকে পাতিত করিতেছেন না? আজকাল যদি

কেহ সৎসাহসের উপর নির্ভর করিয়া বৈষ্ণব-শাস্ত্রবিধানানুযায়ী শ্রাদ্ধ করিতে প্রস্তুত হন, অমনি তাহার গুরু গোঁসাই (?) পুরোহিত, ভাই, বন্ধু, সমাজ সকলেই তাহার উপর খড়গহস্ত হইয়া উঠেন উহাকে 'এক-ঘ'রে' বা নানা প্রকার লাঞ্ছনা প্রদান করিতে বদ্ধপরিকর হন। ধর্ম্মের এইরূপ ব্যভিচার দর্শনে পরদুঃখ দুঃখী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাণ একদিন কাঁদিয়াছিল, তাই তিনি বৈষ্ণব শ্রাদ্ধ প্রচলনের জন্য বহু চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তৎফলে শুদ্ধ বৈষ্ণবানুগত গৃহস্থ ভক্তগণের মধ্যে বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ-প্রথা অনুষ্ঠিত হইতেছে। শীঘ্রই শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে বৈষ্ণব শ্রাদ্ধ প্রয়োগ বিধি সম্বন্ধে একখানা স্মৃতিনিবন্ধ প্রকাশিত হইবে। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে বৈষ্ণব শ্রাদ্ধ বিধির উল্লেখ থাকিলেও তাহাতে মন্ত্র বা প্রয়োগ বিধি কিছু নাই। বেদ ও পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে বৈষ্ণব সমাজে গৃহস্থ বৈষ্ণবগণের জন্য একখানা-শ্রাদ্ধ প্রয়োগ-বিধির নিতান্ত আবশ্যক নতুবা কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের কুহকে পড়িয়া কোমলশ্রদ্ধ বিষ্ণুপাসকগণের সমূহ বিপদাশঙ্কা। ঐকান্তিক বিরক্ত পরমহংস বৈষ্ণবগণের বিজয়োৎসব-বাসর উপস্থিত হইলে শুদ্ধ বৈষ্ণবগণসহ; হরিনাম- কীর্ত্তন ও মহোৎসাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজনদ্বারা শ্রাদ্ধ জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের বিজয়ে নীলাচলের সকল নগরে হরিকীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং সিংহদ্বারের পসারিগণের নিকট হইতে শ্রীমহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিয়া ভক্তগণসহ হরিদাস ঠাকুরের বিজয়োৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

বৈশ্য জগৎ

আজকাল পৃথিবীর সর্ব্বত্র যে রকম হাওয়া বচ্চে তা'তে মনে হয় আধুনিক জগৎটাকে ''বৈশ্যজগৎ'' নাম দেওয়া কিছু অসঙ্গত হ'বে না। আমেরিকা, ইংলণ্ড, জার্ম্মেণী, চীন, জাপান—এই সকল বড় বড় প্রদেশ যেখানকার লোককে আমরা খুব সভ্য ভব্য মনে কচ্ছি, তা'দের সকলের ভেতরই এই 'বৈশ্য' ভাবটী প্রবলরূপে জেগে উঠছে—''চাই অন্ন, চাই টাকা''—এই রোলে দিগন্ত কম্পিত হ'চ্ছে। ভারতের লোকও তাই দেখে মনে ভাবলেন আমাদের সোনারূপোর দেশ, অন্যলোক আমার দেশে এসে বৈশ্যবৃত্তি প্রভাবে বড় হ'য়ে গেল, কত নগণ্য ব্যক্তি জেগে উঠল, আর আমি কি বৈশ্যবৃত্তিতে উদাসীন হয়ে এখনও ঘুমিয়ে থাক্‌ব'? বাংলার হুজুগপ্রিয় লোক মনে কল্লেন আমার 'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা' বঙ্গভূমি আমি কেন অনাহারে দেহত্যাগ করব্‌, ম্যালেরিয়ায় ভুগ্‌বো, আমিও কৃষিবাণিজ্য কর্‌ব। ভারত আজ বৈশ্যের অধীন। উদিত হ'লেন ভারতে আবার একজন মহাকর্ম্মবীর এই দেশকে বৈশ্যবৃত্তিবলে উন্নত কর্‌বেন বোলে সেই ''মহাত্মা''ও একজন ''বৈশ্য''। বাংলার বন্ধুরূপে উদিত হলেন আর কয়েকজন পুরুষ তাঁ'রাও নাকি 'বৈশ্য'। বৈশ্য জগতের প্রবল বাত্যায় আর বাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বিচার রইল না। ব্রাহ্মণ 'মুখার্জ্জি এণ্ড ব্রাদার্স, সুমেকার্স' ব'লে জুতোর দোকান খুলে বস্‌লেন; গোস্বামী এণ্ড সন্স চা বিস্কুটের দোকান— কাপড়ের দোকান দিলেন; ছোট ছেলে পিলেরা স্কুল বন্ধ করে কেউ চা বিস্কুট, কেউ পান বিড়ি, ষ্টেশনারির দোকান জাঁকিয়ে বস্‌লেন।

আবার শুধু কি তাই? ধর্ম্মরাজ্যেও লোকে ব্যবসা খুল্লেন। বেশী দূর নয়, এই কল্‌কাতা হ'তে সামান্য দূরে নবদ্বীপ সহরে গেলেই দেখা যায়—এক এক মহাত্মা এক একটী নূতন নূতন নামের সাইনবোর্ড দিয়ে ঠাকুর বাড়ীর নামে এক একটী বড় বড় ব্যবসায়ের ক্ষেত্র খু'লে বসেছেন। যেমন কল্‌কাতার মিউসিয়ম্ বা বায়স্কোপ দেখিয়ে মাশুল আদায় করা হয় সেই রকম তাঁ'রাও ঠাকুরকে খাড়া ক'রে 'ভেট' আদায় করছেন আর তা' দিয়ে দোতালা চৌতালা বাড়ী, কত রকম ভোগের সামগ্রী সংগ্রহ করছেন। আজকালকার গুরুগিরি কার্য্যটাও বৈশ্যগিরি বা বেশ্যাগিরিতে পরিণত হ'য়েছে—'বৈশ্যগিরি' বল্‌ছি কেন? গুরুও (?) বারবনিতার মত শিষ্যের মন রেখে চল্‌ছেন পাছে শিষ্য অসন্তুষ্ট হ'লে তাঁর ব্যবসায়ে লোকসান্ হয় অর্থাৎ অর্থ পাওয়া বন্ধ হয়। আজকাল ভাগবতব্যাখ্যা করে খুব জোর ব্যব্‌সা' চল্‌ছে। কীর্ত্তন করবার ও 'ভাগবত' পড়বার পূর্ব্বেই টাকা ফুরণ ক'রে নেওয়া হয়। অত্রি ঋষির সংহিতা—ধর্ম্মশাস্ত্রে পড়েছিলাম—

"বেদৈর্বিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং শাস্ত্রেণ হীনাশ্চ পুরাণপাঠাঃ।
পুরাণহীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি ভ্রষ্টাস্ততো ভাগবতা ভবন্তি।।"

ব্রাহ্মণ বেদ প'ড়ে বিশেষ কিছু সুবিধা কর্ত্তে না পার্‌লে ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ কর্ত্তে আরম্ভ করেন। তা'তেও যদি সুবিধা না হয় তখন ব্রাহ্মণ পুরাণবক্তা হন আর যখন পুরাণবক্তা হ'য়েও বিশেষ যশ ও অর্থ অর্জ্জন কর্ত্তে অপারক হন তখন হাতে লাঙ্গল নিয়ে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করেন আর যখন কৃষিকার্য্য করেও বিশেষ কিছু টাকা পয়সার সুবিধা কর্ত্তে পারেন না তখন ব্রাহ্মণ "যাঁর নাই অন্য গতি, তার বারাণসী গতিরমত আপানাকে 'ভাগবত' অর্থাৎ বৈষ্ণবের গুরু ব'লে প্রচার করে গুরুগিরি ব্যবসা' আরম্ভ করে দেন। বহির্ম্মুখ লোকের রুচির অনুকূল মতগুলিই জগতে খুব প্রসার লাভ করে, তাই আজকালকার মতে আগে খেয়ে দেয়ে বাঁচ্, পরে ধর্ম্ম এক কথায় ধর্ম্মের অধীন বৈশ্যবৃত্তি নয়—বৈশ্যবৃত্তির অধীন হ'লো ধর্ম্ম। তাই বল্‌ছিলাম যে আধুনিক জগৎটা হচ্ছে " বৈশ্যজগৎ"।

বেদ, ভাগবত, গীতাপাঠে জানা যায় যে, বিরাট্‌পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয় আর ঊরুদেশ হইতে বৈশ্য ও পা হ'তে শূদ্র হয়েছিলেন। মুখের কার্য্যই হচ্ছে—'কিছু বলা'—যেমন বেদপাঠ বা ভগবানের গুণকীর্ত্তন প্রভৃতি। বাহুর কাজ হচ্ছে রক্ষা করা, অপরকে আশ্রয় দেওয়া, দণ্ডবিধান করা ইত্যাদি। আর ঊরুর হচ্ছে নানাস্থানে চলা ফেরা বা প্রজাসৃষ্টি কার্য্য প্রভৃতি। শাস্ত্র বল্‌ছেন যে, এই সকল বর্ণ যদি হরিভজন করেন তবে তাঁ'দের মুখের কার্য্যই বল, বাহুর কার্য্যই বল, বা ঊরুর কার্য্যই বল সব সংযতভাবে হ'তে পারে। কিন্তু হরিভজন বাদ দিলে ঐ বেদপাঠ কেবল 'লোক দেখান,'—অর্থ বা সম্মানের জন্য, হাত দিয়ে কেবল পরস্পর মারামারি রক্তারক্তি হয়, ঊরুর দ্বারা কেবল ভোগের জন্যই অর্থ-সংগ্রহ ও ব্যভিচারাদি হ'য়ে থাকে। পাঠকগণ! একবার ধীরচিত্তে বিবেচনা ক'রে দেখুন্ আজকালকার এই বৈশ্যজগতের অবস্থা কি? আজকালকার সংবাদ পত্রের স্তম্ভে স্তম্ভে কেবল দেখা যায় 'চাই টাকা, চাই অন্ন'—এই চীৎকার আর

দেখা যায় ''নারী-নিগ্রহের'' ভীষণ ছবি। আমরা কি এখনও আমাদের অবস্থা বুঝে নিতে পাচ্ছি না? আমরা যে ক্রমশঃ হরিবিমুখ হ'য়ে নাস্তিকতার অতল জলধিজলে প্রবেশ করছি তাহা কি একবার এক মুহূর্ত্তের জন্যই আমাদের ভাব্‌বার সৌভাগ্য হ'ল না? হায় ভারতবাসী! তুমি না তোমাকে ''পুণ্যক্ষেত্র'' ও ''ধর্ম্মক্ষেত্রের'' অধিবাসী ব'লে গৌরব কর? জানত' বালক প্রহ্লাদকে যখন নৃসিংহদেব কত প্রলোভনীয় উত্তম উত্তম সামগ্রী ও রাজ্যাদি প্রদান করতে চেয়েছিলেন, তখন বালক প্রহ্লাদ উত্তরে কি বলেছিলেন (ভাঃ ৭।১০।৪)—

''যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্''

অর্থাৎ হে ভগবন্, যে ব্যক্তি প্রভুর নিকট প্রভুরই একমাত্র সেবা ছাড়া অন্য কিছু কামনা করে সে ভৃত্য নহে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই ব্যবসায়ী-বণিক্। আমরা না গীতা মহাভারতের দেশের লোক ''যোগক্ষেমং বহাম্যহং'' ''মামেকং শরণং ব্রজ''—এই সকল গীতার উপদেশ আমরা না প্রত্যহ শুনে আসছি? আরও না আমরা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বের শান্তিকথা শুনেছি?

''সর্ব্বে বর্ণা ব্রাহ্মণা ব্রহ্মজাশ্চ''

সকল বর্ণই ব্রাহ্মণ, কেননা সকলেই ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হ'য়েছেন আরও না বৃহদারণ্যক-শ্রুতির মন্ত্র শ্রীগুরুমুখে শ্রবণ করেছি—

''এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ''

হে গার্গি, যিনি অচ্যুতকে জেনে এই জগৎ হ'তে প্রয়াণ করেন তিনিই ব্রাহ্মণ। কই? তথাপি কেন আমরা নিজদিগকে ''কৃপণ'' ও সর্ব্বদা অভাবগ্রস্ত মনে কচ্ছি। আমরা ত' অমৃতের সন্তান, আমরা ত' নিত্য কৃষ্ণদাস, হরিগুণ কীর্ত্তনই ত' ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম হরির প্রীতির জন্য শুদ্ধ হরিকীর্ত্তন ছেড়ে কেন আমরা কীর্ত্তনকেও একটী পণ্যদ্রব্য মনে করে অপ্রাকৃত ব্রাহ্মণের পরিবর্ত্তে প্রাকৃত বৈশ্য হ'য়ে পড়েছি? যিনি আমাদিগকে পুনরায় আমাদের ব্রাহ্মণস্বভাব হরিগুণকীর্ত্তনের বৃত্তি জাগিয়ে দিয়ে আমাদিগকে ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণের সেবা দিতে পারবেন তিনিই ত' আমাদের দিব্যজ্ঞান প্রদাতা শ্রীগুরুদেব। তিনি আমাদের ''কৃপণ'' কর্ণে দিব্যজ্ঞানমন্ত্রপ্রদান করে বল্‌বেন—''ওহে জীব! তুমি কৃপণ নহ, তুমি বৈশ্য, ক্ষত্রিয় বা প্রাকৃত ব্রাহ্মণ নহ—তুমি দৈক্ষ্য সাবিত্র্য ব্রাহ্মণ, তুমি পরমহংস বৈষ্ণবের দাস।'' যে দিন আমাদের এই দিব্যজ্ঞান লাভের সৌভাগ্য হবে সে দিন হতে আমরা আর নিজদিগকে বৈশ্য জগতের অধিবাসী বলে অভিমান কর্ব্বো না, সে দিন আমাদের সর্ব্ববিধ অভাব দূর হবে।

''নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়''

মাতালের গান

আজ দোলপূর্ণিমা। বিষ্ণুদাসের গৃহে মুহুর্মুহু হরিধ্বনি দিঙ্মণ্ডল কম্পিত করিয়া অনন্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত করিতেছে। বিষ্ণুদাস শ্রীতুলসীমণ্ডপে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতেছেন। পূর্ণচন্দ্রের শুভ্র চন্দ্রিকারাশি জড়জগতের বক্ষে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। জড়জগতের জড়ভাবাপন্ন জীবগণ সেই চন্দ্রিকা দর্শনে কল্পনাবিমানে আরোহণ করিয়া কত চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক, ইহলোক পরলোক দর্শন করিতেছেন। সুন্দরী কবিতার কৃপা ভিক্ষা করিয়া কতই না অঞ্জলি প্রদান করিতেছেন। কিন্তু যে প্রস্তরময় গিরিগহ্বরপূর্ণ শ্রীহীন চন্দ্রের ক্ষণিক উজ্জ্বল কিরণে জগৎ উদ্ভাসিত জগদ্বাসী উল্লসিত, আজ পরমশ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণকারী শ্রীগৌরচন্দ্রের উদয়ে স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

তুলসী মণ্ডপের চারিপার্শ্বে বিষ্ণুদাসের বান্ধবগণ উপবিষ্ট। তাঁহারা সকলে ভাবনির্জ্জিত চিত্তে অমল মনে শ্রীচরিতামৃতের শ্রীগৌরসুন্দরের প্রপঞ্চে আবির্ভাবের বার্ত্তা শ্রবণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে পথে মৃদঙ্গ করতাল সহযোগে মধুর কণ্ঠে কে কীর্ত্তন করিতে করিতে আগমন করিলেন। উচ্চ কীর্ত্তনের ধ্বনিতে পাঠ কাহারও শ্রুতিগোচর হইল না। সুতরাং বিষ্ণুদাস কিছুকাল মানসে পাঠ করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে পুত্ররূপে পরিচিত বিষ্ণুদাসের বান্ধবটী কৌতুহলভরে জিজ্ঞাসা করিল প্রভো! এ কাহার গান?

বিষ্ণুদাস। মাতালের গান।

পুত্র। মাতালে এমন ভাল গাইতে পারে? কৈ কণ্ঠে ত' মাতলামির কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না। বেশ ত' গান হচ্ছে, তবে মাতাল বলছেন কেন? কণ্ঠস্বরে বোধ হচ্ছে, আমাদের জিলা স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক রায় সাহেব মদন দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহার সঙ্গে যে মৃদঙ্গ বাজাচ্ছেন, ইনি বোধ হয় সেই মেয়েলী চুলধারী ব্রজবাসী। একটু দেখে আসব? (এই বলিয়া পুত্র দৌড়িয়া দেখিতে গেল)। ফিরিয়া আসিয়া,—হ্যাঁ প্রভো! তাই বটে! সেই রায় সাহেবই বটে এবং সেই ব্রজবাসীই বটে। তবে আপনি ইহাদিগকে মাতাল বলিলেন কেন?

বিষ্ণুদাস। মাতাল কি করে জান? নিজের স্বরূপ স্বভাব, স্বধর্ম্ম সমস্ত ভুলিয়া বিরূপের ধর্ম্ম অবলম্বন ক'রে যাহা করে, তাহাকেই মাতালামি বলে। লোকে মাদক্ দ্রব্য পান করে, মাতাল সাজে, ইহা এই দেহের কতকগুলি ক্রিয়া কলাপ আমরা দেখতে পাই। কিন্তু এই সংসারে অধিকাংশ জীবই মায়াদেবীর মোহমদিরা পানে মাতাল সেজে বসে আছে। জীব স্বীয় কৃষ্ণদাস স্বরূপ, কৃষ্ণদাস্যরূপ স্বধর্ম্ম, কৃষ্ণভক্তিরূপ স্বাভাবিক কৃত্য, কৃষ্ণদাস্যসূচক স্বীয় পরিচয় বিস্মৃত হইয়া মায়ার আকর্ষণে পড়িয়া স্বরূপ ভুলিয়াছে—স্বধর্ম্ম ছাড়িয়াছে—স্বনাম পরিচয় ত্যাগ করিয়াছে।

পুত্র। কেন প্রভো, ঐ যে গলায় মালা পরিয়া "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ" বলিয়া নৃত্য করিয়া মধুর কীর্ত্তন করিতেছেন, উহা কি জীবের ধর্ম্ম নহে? ঐ যে ব্রজবাসী মৃদঙ্গ বাজাইতেছে, উহা কি জীবের ধর্ম্ম নহে?

বৈষ্ণবদাস। না, মাতাল কি চলাফেরা করে না, গান করে না? কিন্তু সে চলাফেরা ও গানে যে মাতাল নয়, তাহার চলাফেরাও গানে কি কোন তারতম্য দেখিতে পাও না; প্রকৃতিস্থ মনুষ্যের ন্যায় মাতালও সব করে বটে, কিন্তু উহাতে মাতলামি বলিয়া একটী বিশেষ লক্ষণ আছে। এইজন্য মাতালের কোন কার্য্যই কেহ কার্য্য বলিয়া গণনা করে না। ঠিক কি না?

পুত্র। হাঁ, কিন্তু আপনার কথার তাৎপর্য্য বুঝতে পারলাম্ না, আপনি হঠাৎ রায় সাহেবের ন্যায় একজন শ্রেষ্ঠ গণ্যমান্য ব্যক্তিকে বিশেষতঃ যাঁহার কীর্ত্তন শুনিবার জন্য কত জমিদার উকিল, এটর্নি, কত হরিসভা, স্মৃতি সভা সাহিত্য-সভা, বারোয়ারী লালায়িত এবং যাঁহাদের কীর্ত্তন না হইলে এই সকল সভার উৎসবকার্য্য অসম্পন্ন থাকে, আপনি সেই ব্যক্তিকে মাতাল বলে ফেল্লেন। এ যেন কেমন কেমন বোধ হচ্ছে।

বৈষ্ণবদাস। হাঁ, তা হবেই, শুধু তোমার কেন?—জন্ম, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য, রূপ এই চারিপ্রকার বা ইহার কোন এক প্রকার মদিরাপানে যাঁহারা মত্ত এবং যাঁহাদের এই জাতীয় মদিরাপান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মত্ততাবৃদ্ধি হইতেছে, তাঁহারা হউন না কেন, রায় সাহেব, রায় বাহাদুর, স্যর্, কে, সি, আই, ই, হউন না কেন উদ্ভিদ বিদ্যাবিৎ হউন না কেন বিজ্ঞানবিৎ সকলেই এই মাতলামির বার্ত্তা শ্রবণে নিরস্ত, ক্রুদ্ধ হইবেন বা অপমানিত বোধ করিবেন। কিন্তু যদি তাঁহারা এই চারিপ্রকার মদিরা স্বীয় গৃহে না রাখিয়া মদিরা বিক্রেতার নিকট রাখিয়া এই মদিরাপানের পরিণতি, মাতলামির বিষয় অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহারা আমার এই কথার মর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ হইবেন।

পুত্র—তবে কি, আমাদের কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক মিঃ 'দাসও' কীর্ত্তনরূপ মাতলামি করেন? এই সে দিন আমাদের ''টাউন হলে'' সহরের সমস্ত সম্ভ্রান্ত বিজ্ঞ বিচক্ষণ লোক তাঁহার কীর্ত্তন শুনে কত 'বাহবা' দিচ্ছিলেন এবং তাঁহার কীর্ত্তন শু'ন্বার জন্য কত আগ্রহ প্রকাশ কচ্ছিলেন, তবে কি ইঁহারা সকলেই ভ্রান্ত। ইঁহারা সকলেই প্রমত্ত।

বৈষ্ণবদাস। দেখ! জীবের যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেহে আত্মবুদ্ধি অর্থাৎ আমি স্ত্রী, পুরুষ, ধনী, নির্ধন, প্রফেসার, বৈজ্ঞানিক, স্বদেশভক্ত, স্বাধীন, পরাধীন, ইত্যাদি বুদ্ধি থাক্‌বে, ততক্ষণ জীবের মাতলামির অবস্থা র'য়েছে জান্‌বে। সাধারণ কথায় যাহাদিগকে মাতাল বলে, তাহাদের কোন বক্তৃতা, গান, ইত্যাদি কেহ শুনে কি? মাতালের কণ্ঠ খুব মধুর হইলেও কেহ তাহার বক্তৃতা বা কীর্ত্তন শুনে না, বরং উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যায় বা বিদ্রূপ করে, ঠিক এইরূপ যাঁহারা উপরি উক্ত চারিপ্রকার মদ্যপান হইতে বিরত এবং যাহাদের গৃহের কোন নিভৃত কোণেও ঐ সকল মদিরার বোতল পাওয়া যায় না, তাঁহারা এই জাতীয় মাতালগণের বক্তৃতা বা কীর্ত্তন শ্রবণ করা দূরে থাকুক, ঐ কার্য্যকে কুকার্য্য বলেন এবং উহা জীবের পক্ষে ঘোর অহিতজনক এবং নিত্যশ্রেয়োলাভের সর্ব্বপ্রধান প্রতিবন্ধক বিবেচনাপূর্ব্বক ভক্তিপথের যাত্রীদিগকে সর্ব্বথা ও সর্ব্বদা সাবধান ও সতর্ক করেন।

পুত্র। প্রভো! বৈষ্ণবশাস্ত্রে, বৈষ্ণবলক্ষণে বলা হইয়াছে, বৈষ্ণব তৃণ অপেক্ষা সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ। অপর সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত জনগণকে এই ভাবে প্রমত্ত বা মাতাল বলিলে কি বৈষ্ণবতার লাঘব হয় না?

বৈষ্ণব দাস। না! এইরূপ বিচার অবলম্বনে সর্ব্ববিধ আচরণ না করাই অবৈষ্ণবতা। প্রমত্তকে মাতাল বলিতে কোন প্রকার কুণ্ঠা দ্বিধা বোধ না করা, মাতালের ধর্ম্ম, মাতালের কুকার্য্য, মাতলামি, মাতলামির কারণ, মদের পরিচয়, মদের উপাদান প্রভৃতি সকল কথা শঙ্কাহীন হইয়া—নিরপেক্ষ হইয়া প্রত্যেককে বলিতে হইবে। এই মাতলামি বুঝাইয়া প্রচার করাই বৈষ্ণবতা, যেহেতু বৈষ্ণব বিষয়মদিরামদান্ধ মাতাল নহেন, এবং অপরের মত্ত অবস্থা দর্শনে কৃপাপরবশ হইয়া সেই মত্ততা দূরীকরণে সর্ব্বদা সচেষ্ট। সুতরাং যাঁহারা উচ্চকুলে জাত, ধনী বা ক্ষমতাশালী, পণ্ডিত বা রূপবান্ কিংবা অমুকের পিতা, পুত্র, স্বামী, ভ্রাতা ইত্যাদিরূপে পরিচিত কিংবা ভারতবাসী, আন্দামানবাসী সাইবিরিয়া-নিবাসী ইত্যাদি বলিয়া স্বাধীন বা পরাধীন বলিয়া আপনাদিগকে আদৌ বোধ করেন না, তাঁহারাই বৈষ্ণব—তাঁহারাই নিষ্কিঞ্চন। ইঁহারা ভারতবর্ষে বিচরণ করিয়াও ভারতবাসী নহেন, আন্দামানে বাস করিয়াও আন্দামানপ্রবাসী নহেন। ইঁহারা বৃন্দাবনবাসী ইঁহারা ব্রজবাসী। ইঁহারা মোটরগাড়ীতে বসিয়া বৈদ্যুত পাখার তলায় বসিয়া, সুদৃশ্য অট্টালিকায় শয়ন করিয়াও মাতাল হন না, লক্ষ লক্ষ মুদ্রা আসিয়াও ইঁহাদিগকে মাতাল করিতে পারে না। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধের কনিকামাত্র ইহাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে পারে না। সুতারং 'জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রী' মদিরাপানে মত্তজনগণ অহর্নিশ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধময় বিষয় ভোগের জন্য লালায়িত থাকিবে, আর গলায় মালা পরিয়া পদাবলী মুখস্থ করিয়া কালোয়াতী সুর ভাজিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের গোপ্য লীলারস হাটে বাজারে বিতরণের বিপজ্জনক ও আত্মপাত প্রয়াসদ্বারা যে অভিনয় করিতেছেন, তাহা সহজকথায় মাতলামির পরাকাষ্ঠা বই আর কিছুই নহে। শুদ্ধ কথায় 'মত্ত', 'মোহযুক্ত', সাধারণ ভাষায় 'মাতাল'। মাতলামি সম্পূর্ণ-ভাবে পরিত্যাগ করিয়া কীর্ত্তন করিতে হইবে। নতুবা সমস্তই ব্যর্থপ্রয়াস।

পুত্র। প্রভো! এই মাতলামি যা'বে কি করে? তা' হ'লে ত জান্‌তে পাচ্ছি, সকলেই মাতাল। যাঁহারা যাঁহারা দেহে আত্মবুদ্ধি ক'রে বসেছেন, তাঁহারা কি এই ভাবে কীর্ত্তনাদি ক'র্‌লে নেশার কবল হইতে অব্যাহতি লাভ কর্‌বেন না?

বৈষ্ণব দাস। না কোটি জন্মেও না। মাতাল অবস্থায়—

"কোটি জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তবু ত না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন।।"

এই সকল মাতাল শুদ্ধ বৈষ্ণবগণকে নিজের মত্ত অবস্থায় ভ্রান্ত বিকল তুলাযন্ত্র দ্বারা পরিমাপ করিতে যাইয়া বৈষ্ণব অপরাধ করিয়া বসেন। একে ত' মাতাল, তাতে আবার বৈষ্ণব অপরাধী। এই জাতীয় অপরাধীর মত্ততা দূর হয় না। তবে যাহারা আত্মম্ভরিতাবশতঃ বৈষ্ণবচরণে অপরাধ করেন না, অথচ মাতাল, শ্রীনিত্যানন্দ

প্রভু তাঁহাদের উদ্ধার চিন্তা করিতেছন, এবং তাঁহার দর্শন, স্পর্শন চিন্তনেই সেই সকল মাতালের মাতলামি চিরতরে দূরীভুত হইবে। বাঙ্গালার আজ পরমসৌভাগ্যে ভারতে আজ পরম আনন্দের দিন। সমগ্র বিশ্বের আজ মহোৎসবের সময় সমাগত, কারণ সেই—

"অক্রোধী পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়"

বিশ্ববাসীর মোহ অপহরণ ক'রে, তাঁহাদের সর্ব্ব পাপ প্রক্ষালিত ক'রে—আচণ্ডালে যাজ্ঞাপূর্ব্বক প্রেম প্রদান কার্য্যে নিরত।

মুক্তি পিশাচী কেন?

পিশাচী অপরের মাংস এমন কি নিজের মাংস পর্য্যন্ত নিজে ভক্ষণ করিয়া থাকে। 'পিশিত' শব্দের অর্থ মাংস, 'অশ' ধাতুর অর্থ 'ভক্ষণ করা'। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু—যিনি অভিধেয় ভগবদ্ভক্তির আচার্য্য তিনি ভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে এই শ্লোকটী লিখিয়াছেন—

"ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ **পিশাচী** হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তি সুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ।।"

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা পিশাচী ন্যায় জীবের সত্তাগ্রাসকারিনী। যতদিন পর্য্যন্ত জীবের হৃদয়ে এই দুইটী পিশাচী বাস করে ততদিন পর্য্যন্ত ভক্তিসুখ উদয়ের আশা সুদুরপরাহত। ভগবৎসেবাই জীবের নিত্যা স্বরূপবৃত্তি। ভোগ ও মোক্ষ-বাঞ্ছারূপ পিশাচী জীবের সেবা বৃত্তিটীকে গ্রাস করিয়া ফেলে। জীব ভোগরূপ পিশাচীর করাল গ্রাসে পতিত হইয়া স্বর্গ নরকে গতাগতি করে ও অশেষ যন্ত্রণা পায়। স্বর্গসুখ অতি তুচ্ছ উহা পরক্ষণে দুঃখেরই আকর। ভুক্তি পিশাচী জীবকে কাণে ধরিয়া ঐ পরিণামে দুঃখদায়ক সুখের জন্য ছুটাছুটী করায়। কিছুকাল পরে বহু কষ্টার্জ্জিত স্বর্গ সুখ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া জীব মর্ত্ত্য লোকে আসিয়া কতই না কষ্টভোগ করে। কখনও কখনও আবার ঐ কষ্ট হইতে মুক্ত হইবার জন্য মুক্তি কামনা করিয়া থাকে। জীব তখন এক ক্ষুদ্র পিশাচীর কবল হইতে উদ্ধার পাইয়া অপর পরম মায়াবিনী পিশাচীর গ্রাসে পতিত হয়। পূর্ব্বে ভুক্তি-পিশাচী জীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম আবরণকে গ্রাস করিয়াছিল এবার মুক্তিস্পৃহারূপ পিশাচী জীবাত্মাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। মুক্তি-কামনারূপ পিশাচীর কবলে পতিত হইয়া জীব স্থূল ভোগকে অনেক সময় ঘৃণা করে, জগৎ মিথ্যা ও দুঃখের আকর প্রভৃতি বলিয়া থাকে ও দুঃখের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য সচেষ্ট হয়। ঐ করালবদনা পিশাচী এইবার নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জীবের যা কিছু অস্থিমজ্জা সব গ্রাস করিয়া ফেলে অর্থাৎ তখন শুদ্ধজীবসত্তার বৃত্তি নিরস্ত হয়। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৮ম অধ্যায়ে রামানন্দ সংবাদে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং প্রশ্নকর্ত্তা ও রামানন্দ মুখে বক্তা হইয়া বলিতেছেন—

"মুক্তিভুক্তি বাঞ্ছে যেই কাঁহা দুহাঁর গতি?
স্থাবরদেহ দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি।।"

অর্থাৎ যাহারা মুক্তি কামনা করেন চরমে তাহারা সম্পূর্ণ আচ্ছাদিতচেতন পর্ব্বতাদির ন্যায় স্থাবরদেহ ও যাহারা ভোগ কামনা করেন তাহারা দেবদেহ লাভ করিয়া ভগবৎসেবাবিমুখ ভোগপরায়ণ হয়। "মনঃ শিক্ষা"তে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

"কথা মুক্তিব্যাঘ্রী ন শৃণু কিল সর্ব্বাত্মগিলনীঃ।"

ওহে মন! তুমি মুক্তিরূপা ব্যাঘ্রীর কথা শুনিও না। নিশ্চয় জানিও ঐ ব্যাঘ্রী জীবের সমগ্র আত্মাটীকে গ্রাস করিয়া ফেলে। শ্রীমদ্ভাগবত ও সাত্বত ভাগবতগণ এই "সর্ব্বাত্মগিলনী" মুক্তিবাঞ্ছারূপা পিশাচীকে নরক আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ভাগবত (৬।১৭।২৮) বলিয়াছেন—যে, নারায়ণপর ভক্তগণ স্বর্গ, মোক্ষ ও নরককে তুল্যজ্ঞান করিয়া থাকেন। যেখানে জীবাত্মার নিত্যস্বরূপ বৃত্তি ভগবৎ- সেবানন্দ নাই সেই স্থানই নরক। ত্রই জন্যই ভক্তগণের নিকট— (চৈঃ চঃ)

"সাযুজ্য শুনিতে হয় ভক্তের ঘৃণা ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাজুয্য না লয়।।"

ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপ্রবোধানন্দসরস্বতীপাদ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে শ্রীগৌরচন্দ্রের স্তব করিতে করিতে বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি শ্রীগৌরসুন্দরের অনন্তবৈভবযুক্ত কৃপার একটু কটাক্ষ মাত্র লাভ করিয়াছেন তাঁহার নিকট যোগী ও জ্ঞানিগণবাঞ্ছিত কৈবল্য বা নির্ব্বাণসুখ নরকের মত বোধ হইয়াছে।—"কৈবল্যং নরকায়তে"।

ভক্তগণ ভগবানের প্রীতি বা সুখের জন্যই ব্যস্ত। আর অভক্তগণ কপট 'ভক্ত' আখ্যা লইয়া ভগবানের নিকট হইতে আত্মপ্রীতি বা সুখ আদায়ের জন্য যত্নবান। একমাত্র শুদ্ধ ভক্তই বলিয়া থাকেন—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।।"

আর অভক্তগণ ভগবানকে খাজাঞ্চিরূপে দাঁড় করাইয়া তাঁহার নিকট হইতে নানাবিধ কামনার দ্রব্য স্পৃহা করিয়া থাকেন। ভোগ ও মোক্ষ স্পৃহা অধোক্ষজে অহৈতুকী ও অব্যবহিতা ভক্তি বা সেবা বৃত্তিকে বিলুপ্ত করিয়া দেয় বলিয়া ভুক্তি মুক্তি কামনাকে ঐকান্তিক সেবকগণ 'পিশাচী' বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত ভগবানে অহৈতুকী ভক্তিকেই জীবমাত্রের একমাত্র পরম ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন— (ভাঃ ১।২।৬)

"স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্ম যতোভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি।।"

যাহা হইতে অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তির উদয় হয়—একমাত্র তাহাই পুরুষ মাত্রের পরম ধর্ম্ম। এই অহৈতুকী ভগবানের সেবার দ্বারাই আত্মা সম্যক্‌রূপে প্রসন্নতা লাভ করে। সুতরাং এই অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভগবদ্‌সেবারূপ আত্মার নিত্যবৃত্তিকে যে ভোগ বা মোক্ষবাঞ্ছা বাধা প্রদান করিতে উদ্যত হয় তাহাকে পিশাচী ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে। কর্ম্মী ও জ্ঞানিসম্প্রদায় এই পিশাচীর করাল গ্রাসে পতিত। তাঁহারা নিজদিগকে যতই শাস্ত্রবিৎ, পণ্ডিত বলিয়া বহুমানন করুন্ না কেন যখন তাঁহারা ভগবানের অহৈতুকী ও নিত্য সেবাবৃত্তিকে অন্য অবান্তর কামনা দ্বারা চরমে বোধ করিতে উদ্যত তখন তাঁহাদের সমস্তই পণ্ডশ্রম। ভাগবত (১।২।৮) আরও বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্।।"

বর্ণাশ্রমাচারপালনরূপ স্বর্গপ্রাপক ধর্ম্ম ও মোক্ষপ্রাপক ত্যাগরূপ ধর্ম্ম যথাবিহিতরূপে পালন করিয়াও যদি ভগবানের কথায় আসক্তি উৎপাদিত না হয় তবে উহাতে কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র সার হয়। কারণ স্বর্গফল বিনাশী আর ভগবানের সেবাবিমুখতার দণ্ডস্বরূপ অসুরপ্রাপ্য যে সাযুজ্য মুক্তি তাহাও আত্মার নিত্যধর্ম্ম আচ্ছাদনকারিণী। এই জন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রারম্ভে ও শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ সর্ব্বপ্রথমে মুক্তিবাঞ্ছাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিয়াছেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ১ম পঃ—

"অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা-আদি—এই সব।।
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান।।
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেহ এক জীবের অজ্ঞান তমোধর্ম্ম।।"

শ্রীগৌরসুন্দর মোক্ষবাঞ্ছাকে পিশাচীর ন্যায় দুঃসঙ্গ বলিয়াছেন—চৈঃ চঃ মধ্য ২৪শ পঃ

"দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব আত্মবঞ্চনা।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা।।
'প্র'-শব্দে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
এই শ্লোকে শ্রীধর স্বামী করিয়াছেন ব্যাখান।।

সুতরাং ভুক্তি-মুক্তিবাঞ্ছা যে পিশাচী এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি?

ঐশ্বর্য্যপরায়ণ ভক্তগণ কখনও কখনও শ্রীনারায়ণের সেবার জন্য সালোক্য অর্থাৎ ভগবানের সহিত এক লোকে বাস, সামীপ্য অর্থাৎ ভগবানের সমীপে অবস্থান, সারূপ্য অর্থাৎ ভগবানের ন্যায় রূপ, সার্ষ্টি

অর্থাৎ ভগবানের ন্যায় ঐশ্বর্য্য—এই চতুর্ব্বিধ মুক্তি ইচ্ছা করিয়া থাকেন কিন্তু সাযুজ্য অর্থাৎ ভগবানের সহিত একীভূত হইয়া যাওয়াকে কখনও কামনা করেন না। কারণ তাহাতে নিত্য ভগবদ্‌সেবা-বৃত্তি তিরোহিত হয়। যাঁহারা অসুরাদির ন্যায় ভগবদ্‌বিরোধী নাস্তিক তাঁহারাই ঐরূপ সাযুজ্য মুক্তিরূপ পিশাচীর কবলে পতিত হইবার জন্য কঠোর সাধনাদি করিয়া থাকেন। ঐশ্বর্য্যপরায়ণ ভগবদ্ভক্তগণের বাঞ্ছিত চতুর্ব্বিধ মুক্তি আবার শুদ্ধভক্তগণের অনুগামিনী হইলেও তাঁহারা ঐ সকলকে প্রত্যাখান করিয়া থাকেন। শ্রীনারদপাঞ্চরাত্র বলিয়াছেন—

"হরিভক্তি মহাদেব্যাঃ সর্ব্বা মুক্ত্যাদিসিদ্ধয়ঃ
ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যাশ্চেটিকা-বদনুব্রতাঃ।।"

যেমন দাসীসকল ভীত ও সম্ভ্রমযুক্ত হইয়া রাজমহিষীর অনুগামিনী হয় তদ্রূপ নিখিল মুক্ত্যাদি সিদ্ধি ও অপূর্ব্ব ভুক্তি সকল কৃষ্ণভক্তিরূপা মহাদেবীর অনুগমন করিয়া থাকেন।

"জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদি পুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা।।"

নৈপুণ্যসহকারে জ্ঞানালোচনা প্রভৃতি দ্বারা মুক্তি সুলভ হয়, যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্ম হইতেও ইহকালে ও পরকালে ভোগসুখ লাভ করা যায় কিন্তু সহস্র সহস্র সাধনদ্বারাও ভক্তি লাভ করা যায় না, ভক্তি ভগবানের পরম গোপ্য সম্পত্তি। এই জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১৬।১৮) উক্ত হইয়াছে যে ভগবান্ কখনও কখনও মুক্তি দেন কিন্তু কখনও ভক্তিযোগ প্রদান করেন না। হরিভক্তিসুধোদয়ে প্রহ্লাদ শ্রীনৃসিংহদেবকে বলিয়াছেন— "সুখানি গোষ্পাদয়ন্তে ব্রহ্মন্যপি জগদ্‌গুরো"—কৃষ্ণসেবানন্দসমুদ্রের নিকট ব্রহ্মানন্দ পর্য্যন্ত গোষ্পদতুল্য বোধ হয়। শ্রীভগবান্ উদ্ধবগীতায় বলিয়াছেন (১১।২০।৩৪)—

ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবং।।

আমার ঐকান্তিক বুদ্ধিমান্ সাধুভক্তগণ জগতের কিছুই চান না এমনকি আমি যদি তাঁহাদিগকে যোগিগণ বাঞ্ছিত কৈবল্য বা গতায়াতরহিত মোক্ষও প্রদান করি, তাঁহারা তাহাও বাঞ্ছা করেন না।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৯।১২) কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে বলিয়াছেন—

সালোক্য সার্ষ্টিসারূপ্যসামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।।

কৃষ্ণসেবাপরায়ণ শুদ্ধভক্তগণ সালোক্য (বৈকুণ্ঠবাস) সার্ষ্টি (নারায়ণের সমান ঐশ্বর্য্য) সারূপ্য (চর্তুভুজাকার) সামীপ্য (নৈকট্য লাভ) একত্ব (সাযুজ্য বা অভেদ গতি) প্রদত্ত হইলেও গ্রহণ করেন না। তাঁহারা আমার অপ্রাকৃত সেবা ব্যতীত আর কিছুই চান না।

নবম স্কন্ধে (৯।৪।৪৯) শ্রীভগবান্ দুর্ব্বাসাকে বলিয়াছিলেন—

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ং।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতং।।

আমার সেবাদ্বারা সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয় স্বয়ং আগত হইলেও যখন আমার সেবাতে পূর্ণমান আমার শুদ্ধ ভক্তগণ সে সমুদয় গ্রহণ করেন না তখন কালের দ্বারা নষ্টযোগ্য মায়িক ভোগ ও সাযুজ্য মুক্তি তাঁহারা কিরূপে ইচ্ছা করিবেন? শ্রীহনুমান্ রামচন্দ্রকে বলিয়াছেন—

ভববন্ধচ্ছিদে তস্মৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে।
ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে।।

হে প্রভো, যাহার দ্বারা 'আপনি প্রভু, আমি দাস'—এইরূপ নিত্য স্বরূপসম্বন্ধ বিলুপ্ত হয় সেইরূপ মুক্তি ভববন্ধনছেদনকারী হইলেও তাহাতে আমার স্পৃহা নাই।

মুক্তিকামী নির্ব্বিশেষবাদিগণের ধারণা এই যে দাস্যসখ্যাদি রসপঞ্চক মুক্তির পূর্ব্বাবস্থায় উদিত হয়—সবিকল্প সমাধিরাজ্যে জীব ভগবানকে ঐরূপ একটি একটি ভাব লইয়া আরাধনা করেন, নির্ব্বিকল্প বা চরমাবস্থায় আর দাস্যাদি ভাব থাকে না, সুতরাং তাহাদের মতে দাস্যাদি রস মুক্তির প্রাগাবস্থার বিষয়। শ্রীমদ্ভাগবতাদি সিদ্ধান্ত শাস্ত্র বলেন যে অমুক্তের মুখে দাস্যাদি রসের কথা কেবল কথার কথা, মুক্ত না হইলে ঐ সকল রসের অধিকারী কেহই হইতে পারেন না। সম্পূর্ণরূপে অনর্থমুক্ত পুরুষই নিত্যসিদ্ধ দাস্য রসের অধিকার লাভ করিতে পারেন। শ্রীগীতায় (১৮।৫৪) ভগবান্ অর্জ্জুনকে এই কথাই বলিয়াছেন—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।।

শ্রীভাগবতে (৬।১৪।৪) উক্তি হইতেও জানা যায় যে কোটী কোটী মুক্ত ও সিদ্ধগণের মধ্যে নারায়ণপর প্রশান্তাত্মা পুরুষ অত্যন্ত দুর্ল্লভ। ভাগবতীয় ১।৭।১৯ শ্লোক হইতেও জানা যায় যে শ্রীহরি এতাদৃশ গুণ যে আত্মারাম মুনিগণ সর্ব্ববিধ বন্ধন হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াও উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণে মোক্ষাদিফলাভিসন্ধান-রহিতা হেতুরহিতা ভক্তি যাজন করিয়া থাকেন। নির্ব্বিশেষবাদিগণের নিকট অসুরপ্রাপ্য আত্মবিনাশই পরম শ্লাঘ্য বস্তু সুতরাং তাঁহারা প্রথমে উপাসনা, ভক্তি বা ভগবান্ কথাটা মুখে স্বীকার করিলেও চরমে সাযুজ্য-মুক্তিপিশাচীর কোলেই বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য ধাবিত হন। হায়! হায়! নির্ব্বিশিষবাদিগণের কি দুর্দ্দশা! তাঁহারা এইকালেও দুঃখ ভোগ করিয়া গেলেন কত কৃচ্ছ্রসাধ্য সাধন করিয়া কতই না কষ্ট সহ্য করিলেন পরেও লাভ হইল পর্ব্বতাদি আচ্ছাদিতচেতন স্থাবরের ন্যায় আত্মবৃত্তিসেবা-বিলুপ্তকারিনী অচেতনপ্রায় গতি।

ভগবৎসেবাই আত্মার নিত্যা বৃত্তি; সেই বৃত্তি যদি পিশাচীর হাতে বিনষ্ট হইল তবে ইহার মত দুর্দ্দৈব আর কি হইতে পারে? সেই জন্য ভাগবত মুক্তিস্পৃহাকে কৈতব নামে উল্লেখ করিয়াছেন—শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী সেই ভাগবত বচনের সঙ্গে সুর মিশাইয়া বলিয়াছেন—

অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম, অর্থ কাম বাঞ্ছা আদি এই সব।।
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান।।

সুতরাং যে কুহকিনী অচ্যুতভক্তিকে পর্য্যন্ত বিনাশ করিতে উদ্যত হয় সেই মুক্তিস্পৃহাকে পিশাচী, রাক্ষসী প্রভৃতি ছাড়া আর কি বলা যাইবে?

প্রেমবন্যা

"উছলিল প্রেবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী-বৃদ্ধ বালক যুবা সকলি ডুবায়।।
সজ্জন, দুর্জ্জন, পঙ্গু, জড়, অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন।।"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ৭ম

যখন সুরধনীতে বান ডাকে, তখন উচ্ছলিত জলরাশি তটপ্রদেশকে অতিক্রম করে, পাকা উচ্চ বাঁধ পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া আপন মনে কত রঙ্গে ভঙ্গে খেলা করিতে করিতে কত অগম্য স্থানে চলিয়া যায়। কেহ জানে না—কোন্ সময় ঐ বান ডাকিবে। তাই নাবিক পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইতে পারে না, বণিক্ তাহার হাট গুটাইতে পারে না—কোথা হইতে বন্যার জল প্রবল বেগে আসিয়া নাবিকের নৌকা ডুবাইয়া দেয়, বণিকের পসরাকে জলে ভাসাইয়া লইয়া যায়। শুধু তা' নয়, ঐ উদ্বেলিত তরঙ্গ সকলকেই যেন তা'র কোলে টানিয়া লয়— মহতের সঙ্গে ক্ষুদ্রের সমর সাজে না, তাই সকলেই তা'তে গা ঢালিয়া দেয়—মহতের শরণাগত—আশ্রিত হ'য়ে পড়ে। যা'রা কেবল বানের ভয়ে বহু পূর্ব্ব হইতেই অতি উচ্চ মঞ্চ প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে বাস করেন বা সুরধুনীর নিকট হইতে বহুদূরে মরুভূমিসদৃশ স্থানে গিয়া বাসা নেন—বন্যার জল তাহাদিগকে স্পর্শ করে না। মর-জগতের বন্যায় হেয়তা আছে—প্রেমবন্যায় হেয়তা নাই। প্রেমবন্যায় 'লছমন ঝোলা'র ন্যায় বহু বহু শক্ত পুলও ভাঙ্গিয়া দেয় বটে, কিন্তু তা'তে জীব মরে না—অমর হয়, অমর হইয়া নিত্য-আনন্দ-নিকেতনে আনন্দময়ের নবনবায়মান সেবানন্দে, প্রেমানন্দে ভাসিতে থাকে। কেবল মরে তা'রা—যা'রা হৃষীকেশের সাধুদের মত ঐ প্রেমবন্যার ভয়ে গাছে উঠিয়া পড়ে, নিজ বলে আত্মরক্ষা করিতে চান।

প্রেম তরল—নির্ম্মল—স্বচ্ছ অথচ গাঢ় কর্ম্মের হেয়তা, জ্ঞানের কঠোরতা প্রেমে নাই। প্রেম অপ্রাকৃত সরল সহজ বস্তু। সেই নির্ম্মল কৃষ্ণপ্রেম-বন্যায় সকলকেই ভাসাইয়া দেয়—উহা স্ত্রীপুরুষ বিচার করে না,

বালক যুবা দেখিয়া অপেক্ষা করে না। ঐ প্রেমবন্যা সজ্জনকে ডুবাইয়া থাকে, আবার জগাই মাধাই প্রভৃতির ন্যায় বৈষ্ণব-অপরাধশূন্য দুর্জ্জনকে পর্য্যন্ত টানিয়া আপন কোলে লয়।

"পাত্রাপাত্র বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাঁহা পায়, তাঁহা করে প্রেমদান।।
লুটিয়া খাইয়া দিয়া ভাণ্ডার উজারে।
আশ্চর্য্য ভাণ্ডার প্রেম শত গুণ বাড়ে।।"

প্রেমবন্যার ভাণ্ডারের হ্রাস হয় না—যতই জগৎ ভাসায়, ততই যেন আরও উছলিয়া উঠে।

এইরূপে প্রেমবন্যায় একদিন জগৎ প্লাবিত হইয়াছিল। বহুদিনের কথা নয়, প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে প্রেমের ঠাকুর গৌরসুন্দর, নিতাইচাঁদ, অদ্বৈত, গদাই, শ্রীবাসাদিসঙ্গে প্রেমবন্যায় জগৎ ভাসাইয়া দিয়াছিলেন।

"জগৎ ডুবিল, জীবের হইল বীজ নাশ।
তাহা দেখি পাঁচ জনের পরম উল্লাস।।"

নিত্য-প্রভুর সেবা ভুলিয়াই ত' জীবের এত দুর্গতি—জীবের অবিদ্যা-বন্ধন। এই অবিদ্যা-বন্ধনই জীবের আর্ত্তির মূলকারণ—সংসার-তরুর বীজ। এ বীজ কিছুতেই নষ্ট হয় না, বটবৃক্ষের ন্যায় যতই কেন ছাটিয়া দেওয়া হউক্ না বা জল সেচন বন্ধ করিয়া দেওয়া যাউক্ না—উহা পুনঃ পুনঃ গজাইয়া উঠে। জীব যখন সাধুগুরুকৃপায় উপলব্ধি করিতে পারেন যে, নিত্য-প্রভুর সেবাই তাঁহার একমাত্র স্বরূপধর্ম্ম, তখন সে প্রভুর সেবায় মগ্ন হয়—অবিদ্যার বীজ সহজেই আপনা হইতেই নষ্ট হইয়া যায়, তখন সেবক সেবানন্দে—প্রেমানন্দে বিভোর হন। প্রেমভাণ্ডার অবারিত হইলে, প্রেমরসের বন্যা নিখিল জগৎ ডুবাইয়া ফেলে; সুতরাং বদ্ধজীবের প্রপঞ্চগত অভিমান আর কোথায় স্থান পাইবে?

"যত যত প্রেমবৃষ্টি করে পঞ্চজন।
তত তত বাড়ে জল ব্যাপে ত্রিভুবন।।"

কিন্তু—

"মায়াবাদী কর্ম্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ।
নিন্দক পাষণ্ডী যত পড়ুয়া অধম।।
সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল।
সেই বন্যা তা সবারে ছুইতে নারিল।।"

হায়! হায়! গৌরচন্দ্রের প্রেমবন্যা সকলকে ডুবাইল, কিন্তু মায়াবাদী— যাহারা অহংগ্রহোপাসক অর্থাৎ যাহারা নিত্যপ্রভু ভগবান্‌কে সেবা করিবার পরিবর্ত্তে নিজেরাই প্রভু সাজিতে চান—তাহারা বড়ই 'নিমক্‌হারাম'—প্রভুর প্রতি তাহাদের কৃতজ্ঞতা নাই। কোথায় প্রভু—একমাত্র স্বরাট্ পুরুষ অদ্বিতীয়

ভোক্তা, আর কোথায় জীব—তাঁহার ক্ষুদ্র বিভিন্ন অংশ—অণুপরিমিত! বৃহতের সেবাই ত' ক্ষুদ্রের ধর্ম্ম, —ক্ষুদ্র যখন বৃহতের আশ্রয়ে থাকে, তখনই ত' সে— অভীঃ। কিন্তু জীবের কি দুর্ব্বুদ্ধি! প্রভুর নিত্যসেবক না থাকিয়া, প্রভুর সেবায় আনন্দ না চাহিয়া, সে চায় 'প্রভু' সাজিতে, 'সেব্য' সাজিতে—সেব্যের সিংহাসন অধিকার করিতে, সেব্য হইয়া আনন্দভোগ করিতে!! ইহারা প্রেমবন্যার স্পর্শ লাভ করিতে পারিল না—আর পারিল না 'কর্ম্মনিষ্ঠ', কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত যাহারা—তাহারা। হায়! হায়! কর্ম্মবুদ্ধি বড় জড়বুদ্ধি—তা'তে দেহাত্মাভিমান যায় না। কর্ম্মজড়ের দেহাত্মবুদ্ধি এত প্রবল যে, সে তাহার দেহগত জাতির অভিমান, রূপের অভিমান, পাণ্ডিতের্য অভিমান, ধনের অভিমান লইয়াই ব্যস্ত। সুতরাং যেখানে জড়-অভিমান প্রবল, সেখানেই ত' 'আমি নিত্য কৃষ্ণদাস—বৈষ্ণবদাসানুদাস' এই সম্বন্ধ জ্ঞানের অভাব। তাঁহারা তাই "অধোক্ষজসেবা-বিমুখ"। তাঁহাদের ত্রিবিধ জন্ম, বেদবেদান্ত অধ্যয়ন, নানাবিধ কঠোর ব্রত, বহু অভিজ্ঞতা, কৌলীন্য, ক্রিয়াপটুতা থাকা সত্ত্বেও তাহারা গৌরসুন্দরের প্রেমবন্যার এক কণিকারও স্পর্শলাভ করিতে পারে না। রাবণ যেমন অপ্রাকৃত স্বরূপশক্তি সীতাদেবীকে ছুঁইতে পারেন নাই—মায়াসীতাকে হরণ করিয়া 'প্রকৃত সীতাকেই হরণ করিয়াছি' মনে করিয়াছিলেন, মাত্র, সেইরূপ ঐ সকল কর্ম্ম-জড় স্মার্ত্তগণ ছল আভিজাত্য প্রভৃতি গর্ব্বে নিজদিগকে যুক্ত মনে করিয়া 'আমরাও প্রেমবন্যার স্পর্শলাভ করিয়াছি মনে করিলেও সেই অপ্রাকৃত প্রেমবারিতে অভিষিক্ত হইতে পারেন না। আর পারেন না কুতার্কিকগণ, নিরীশ্বর সাংখ্য, নিরীশ্বর নৈতিক, বৌদ্ধ, 'মুখে ঈশ্বর-মানা', তর্ক প্রিয় ব্যক্তিগণ, 'জগতে খাব, দাব, থাকিব আর পরম ধামের কথা ক্ষুদ্র জড়বুদ্ধি দিয়া মাপিয়া লইব'—এইরূপ তার্কিক সকল! আর প্রেমবন্যার স্পর্শ পায় না তাহারা, যাহারা "নিন্দক"—শুদ্ধভক্তগণের ও ভক্তিতত্ত্বের নিন্দাকারী। 'সাদা' বস্তুকে 'কাল' বলিলে মিথ্যা বা বিপরীত বলা হয়—সাধুকে 'চোর' বলিলে নিন্দা করা হয়। 'সাদা' বস্তুকে 'সাদা' বলিলে কিছু সত্যের অপলাপ হয় না বা সাধু'কে 'সাধু', 'চোর'কে 'চোর' বলিলে নিন্দা হয় না। চোরকে 'চোর' না বলিয়া সাধু বলিলেই বরং সত্যের অপলাপ হয়, চোরের সহিত সাধুকে সমপর্য্যায়ে ভুক্ত করাহেতু প্রকৃত সাধুর নিন্দা করা হয়। দ্বিতীয়তঃ চোরকে 'চোর' বলার দরুণ সরল লোকের বহু অসুবিধা হইয়া পড়ে—অতএব যাহারা খলপ্রকৃতি বা কপটধার্ম্মিকগণকে সাধুগণের শ্রেণী হইতে পৃথক্ করিবার বাসনায় ও কোমলশ্রদ্ধ লোকদিগের সাবধানের জন্য উহাদের কপটতা লোক সম্মুখে জানাইয়া সাবধান করিয়া দেন, তাঁহারাই পরম কারুণিক—তাঁহারা, "নিন্দক" নহেন। গৌরচন্দ্রের প্রেম বন্যা দেখিয়া আরও কতকগুলি লোক পলাইয়া গেল। উহাদিগকে শাস্ত্রে "পাষণ্ডী" বলিয়াছেন।

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি-দৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রবম্।।

যিনি পরমেশ্বর সর্ব্বেশ্বরেশ্বর নারায়ণকে ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবতার সহিত সমান বুদ্ধি করেন, তিনি নিশ্চয়ই পাষণ্ডী। সুতরাং প্রেমময় ভগবানের সেবক ব্যতীত নানাদেবতা যাজিগণ কৃষ্ণপ্রেমের বান ডাকিয়াছে লোকমুখে শুনিতে পাইয়া দূরে পলাইয়া গেল—পাছে উহা তাহাদিগকে আক্রমণ করে।

আর যাহারা ‘‘অধম পড়ুয়া’’ বা বিদ্যাকেই তর্কের কারণ বলিয়া মনে করেন, তাহারাও এ প্রেমবনা হইতে বহু দূরে সরিয়া রহিল।

‘‘তাহা দেখি মহাপ্রভু করেন চিন্তন।
জগৎ ডুবাইতে আমি করিল যতন।।
কেহ কেহ এড়াইল প্রতিজ্ঞা হৈল ভঙ্গ।
তা’ সবা ডুবাইতে পাতিব কিছু রঙ্গ।।
এত বলি মনে কিছু করিয়া বিচার।
সন্ন্যাস-আশ্রম প্রভু কৈলা অঙ্গীকার।।’’

পরম ঔদার্য্যবিগ্রহ প্রেমময় ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দর কাহাকেও ছাড়িবেন না, তাই তিনি কপট-সন্ন্যাসী সাজিলেন—স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও ভক্তের ভাব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। এবার শুধু ভক্ত নয়, আশ্রমীর চিহ্ন ধারণ করিলেন— মায়াবাদীর পোষাক লইলেন। বন্য হস্তিগুলিকে ধরিতে হইলে যেমন অপর পোষা হস্তী আবশ্যক, সেই ন্যায়াবলম্বনে মত্তমাতঙ্গতুল্য বহির্ম্মুখ মায়াবাদিগণকে আকর্ষণ করিবার জন্য ভগবান্ বিচারপরায়ণ সৈদ্ধান্তিক কপট সন্ন্যাসী সাজিলেন —এই কপট সন্ন্যাসীর বেশে দ্বারে দ্বারে গিয়া প্রেমের বারি ঢালিয়া দিতে লাগিলেন, শুধু তা’ নয়—তাঁহারই অভিন্নবিগ্রহ স্বয়ং প্রকাশ আর এক জনকে প্রেমোন্মত্ত অবধূতবেষী নিতাইচাঁদকে গৌরদেশে পাঠাইলেন। নিতাই গৌড়দেশে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করিলেন।

নিত্যানন্দ গোসাঞে পাঠাইলা গৌড়দেশে।
তিঁহো ভক্তি প্রচারিল অশেষ বিশেষে।।
মথুরাতে পাঠাইল রূপ সনাতন।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি-প্রচারণ।।
আপনে দক্ষিণ দেশে করিলা গমন।
গ্রামে গ্রামে কৈল কৃষ্ণনাম প্রচারণ।।
* * * *
অতএব মালী আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে।।
ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর উপকার।।

প্রেমের ঠাকুর গৌরনিত্যানন্দের অফুরন্ত প্রেমবন্যা এখনও রুদ্ধ হয় নাই, কোনও কালে রুদ্ধ হয় না। মেঘখণ্ড যেমন ক্ষুদ্র লোকলোচন আবৃত করিয়া মানবকে কখনও কখনও নিত্যপ্রকাশ দিনমণির দর্শন

হইতে বঞ্চিত করে, কিন্তু সূর্য্যলোকবাসিগণ কোনকালেই দিনমণির দর্শনে বঞ্চিত হয় না, তদ্রূপ অণুচৈতন্য জীবও অবিদ্যামেঘের দ্বারা আবৃত থাকিয়া গৌড়শৈলে নিত্য প্রকাশমান গৌর- নিত্যানন্দের তমোধর্ম্মনাশক অংশুমালা ও সুশীতল চন্দ্রিকারাশির মধুরিমা উপলব্ধি করিতে পারে না। তখন প্রেমময় মহাবদান্য পরদুঃখ-দুঃখী ঠাকুর নিজ জনকে প্রেরণ করিয়া লোকের অবিদ্যাতিমির বিদূরিত করিয়া থাকেন। জীব তখন গৌরসুন্দরের প্রেমবন্যায় ভাসিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। গৌর-নিত্যানন্দের প্রেমের বন্যা জগৎ ভাসাইয়া দিলেন, কত কত সজ্জন দুর্জ্জন নিত্য- সেবানন্দে মগ্ন হইলেন।

কিছুকাল পরে আবার অনাদি সৃষ্টির অনাদি বহির্ম্মুখ জীবকুল সেই বন্যা হইতে গা' ঢাকা দিবার চেষ্টা করিল, তখন গৌরসুন্দরেরই ইচ্ছায় ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীনিবাস আচার্য্য, প্রভু শ্যামানন্দ প্রভৃতি আসিয়া আবার জগজ্জীবকে সেই প্রেমবন্যার দিকে ধাবিত করাইয়া দিলেন। কালের কুটীল গতিতে—দৈবী মায়ার অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তিতে আবার জগতে কত মায়াবাদী কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত, নিন্দক, পাষণ্ড, অধম পড়ুয়া অনাদি সৃষ্টির স্রোতে আবির্ভূত হইল। নিতাইগুণমণি যেমন একদিন প্রেমবন্যা আনিয়া অবনী ভাসাইয়াছেন, সেইরূপ পরদুঃখদুঃখী আর একজন জানি না তিনি কে—তবে এই মাত্র বুঝি যে, সেই প্রেমের ঠাকুর বদান্যশিরোমণি গৌরচন্দ্রেরই কোনও এক অভিন্ন প্রিয়তম জন আবার সেইরূপ প্রেমবন্যায় ভাসিবার জন্য বিশ্বের জীবকে উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করিতেছেন। এ প্রেম-বানের ডাকে ত' কত কত 'সজ্জন' প্রেমানন্দে—সেবানন্দে মজিয়াছেন তার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু আমাদের মত 'দুর্জ্জন', 'পঙ্গু', 'জড়', 'অন্ধ' পর্য্যন্ত এ বানের ডাকে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই, ভবনদীতে বড়সাধের দেহতরণীখানি কত ভাবী সুখের আশায় বাহিতেছিলাম—কর্ণধারবিহীন হইয়া তরণীখানি কতবারই না হাবুডুবু খাইতেছিল, ভবের হাটে বণিক্ হইয়া কত লাভের আশায় কত আকাশকুসুম ভাবিতে ভাবিতে কাচের খেলনার পসরাখানা লইয়া দোকান পাতিয়া বাসিয়াছিলাম, হঠাৎ চপলার চমকের মত কোথা হইতে বান ডাকিল—ডাকিবামাত্রই সব ভাসাইয়া নিল। তটদেশে যে শক্ত পাকা বাঁধ দিয়া রাখিয়া- ছিলাম, তাহাও অতিক্রম করিয়া জল উছলিয়া পড়িল—সব ভাসাইল, অগত্যা নিজের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করিয়া মহতের সহিত সমর সাজিবে না ভাবিয়া গা' ঢালিয়া দিলাম। মহতের স্বভাব শরণাগতকে অভয়প্রদান;তিনি শ্রীচরণে আশ্রয় দিলেন।

কিন্তু আমাদের মত দুর্জ্জন—পঙ্গু-অন্ধকে বন্যায় ভাসাইয়াও ঐ পরদুঃখদুঃখী ঠাকুরের পরিতৃপ্তি হইল না, তিনি তাঁহার প্রাণপ্রভু গৌরসুন্দরের মতই আবার একরঙ্গ পাতিলেন—নিত্যসিদ্ধ পরিকর হইয়াও আশ্রমীর বেশ স্বীকার করিলেন, অতুল বৈভবযুক্ত হইয়াও অবন্তীনগরের অকিঞ্চন ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর মত বেশধারণ করিলেন, স্বয়ং দক্ষিণ দেশের গ্রামে গ্রামে যাইয়া হরিনাম প্রচার করিলেন, কাশীধামে গিয়া মায়াবাদী বহির্ম্মুখ পঞ্চোপাসক স্মার্ত্ত প্রভৃতির নিকট গৌর- সুন্দরের অকৈতব প্রেমধর্ম্মের মাধুরী ও উদারতার বিষয় কীর্ত্তন করিলেন, সুদূর নৈমিষারণ্য, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানেও গৌরসুন্দরের শুদ্ধভক্তিকথা প্রচারিত হইল। আবার তদীয় নিজজনগণকে গৌড়দেশের বিভিন্ন স্থানে, উড়িষ্যা, দক্ষিণদেশ প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করিয়া প্রেমধর্ম্মের কথা প্রচার করিলেন। ইহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না—হইবারও কথা নহে—

"ভক্তেঃ ফলং পরং প্রেমতৃপ্ত্যভাবস্বভাবকম্"।

—শ্রীল সনাতন গোস্বামী।

তৃপ্তির অভাবই প্রেমের লক্ষণ। সেই প্রেমই সেবার ফল।

"পরিপূর্ণ করিয়া সেই জন খায়।
তবে বহির্দ্দেশে গিয়া সে সন্তোষ পায়।।"

তাই, সেই পরদুঃখদুঃখী অদোষদর্শী পতিতপাবন ঠাকুর এবার শ্রীগৌরমণ্ডল-**শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমার** আয়োজন করিয়াছেন। যাহারা "লোকদেখান গোরাভজা তিলকমাত্র ধরি" ন্যায় অবলম্বন করিয়া গা' ঢাকা দিয়াছিলেন, মুখে গৌর মানিয়া কপটতাকে হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন, তাহাদের প্রতিই সকরুণ হইয়া বুঝি ঠাকুর এ আয়োজন করিয়াছেন।

ওহে ভ্রাতৃবৃন্দ! আমরা সকলেই এক প্রভুর দাস। দ্বিতীয়াভিনিবেশজ বৃথা মানাপমান ত্যাগ করিয়া, যদি মঙ্গল চাও, প্রেমবন্যায় গা ঢালিয়া দেও। জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীর অভিমানমঞ্চ ভাঙ্গিয়া দিয়া বন্যার জলে ভাসাইয়া দেও— প্রেমবন্যার শান্তিবারিতে অভিষিক্ত হও।

"একান্ত সরলভাবে ভজ গৌরজন।
তবে ত' পাইবে ভাই শ্রীকৃষ্ণচরণ।।
গৌরজন সঙ্গ কর গৌরাঙ্গ বলিয়া।
হরেকৃষ্ণ নাম বল নাচিয়া নাচিয়া।।
অচিরে পাইবে ভাই নামপ্রেমধন।
যাহা বিলাইতে প্রভুর নদে আগমন।।"

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা সেবায় সকলে যোগদান করিয়া প্রেমসম্পত্তি লাভ করিবার সুকৃতি অর্জ্জন করুন্, ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

রোগ, ভোগ ও যোগ

রোগ হ'লেই ভোগ আরম্ভ হয়। শেষে যোগ হয়। ইহা দুই প্রকার। কারো ভাগ্যে আরোগ্য যোগ ও সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ। কারো ভাগ্যে মৃত্যু যোগ ও দেহত্যাগ। প্রথম অমৃত যোগ; দ্বিতীয়টী মৃত যোগ।

রোগে যখন ভোগ হইতে থাকে তখন যদি সদবৈদ্যের শরণ লইয়া সিদ্ধৌষধ সেবন এবং কুপথ্য ভোজনত্যাগ করা না হয় তবে রোগী কখনই আরোগ্য হইয়া স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারে না। দেখা যায় অনেক সময় সামান্য ব্যাধি বিনা চিকিৎসায় আপনিই নিরাস হয়। স্বভাবই সেখানে রোগীকে আরোগ্য
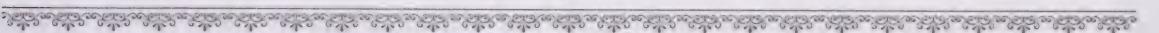
করে। সেখানে স্বভাবের সুনির্ম্মল জল বায়ুই রোগীর রোগ বিনাশে সহায় হয়। কিন্তু সবল দেহে ও স্বাস্থ্যশীল দেশেই তাহা হয়; দুর্ব্বল দেহে ও অস্বাস্থ্যকর কুস্থানে তাহা হয় না। তথায় রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হয়। শেষে সর্ব্বনাশ ঘটে।

এই রোগ জীব দেহে বহুরূপে আধিপত্য বিস্তার করে। সুতরাং ভোগও নানারূপ হয়। এই যে রোগের কথা আজ আমরা তুলিয়াছি এ রোগ এই দৃশ্যমান জড় দেহগত বা স্থূল দেহগত নহে; এ রোগ সূক্ষ্ম দেহগত বা লিঙ্গ দেহগত। এই রোগই জীবের দুরারোগ্য ব্যাধি। একটি জড়দেহ লইয়াই ইহার শেষ হয় না। ইহা একের পর অন্য দেহে অনুগমন করিয়া লোক হইতে লোকান্তরে প্রবেশ করিয়া জীবকে ভোগ দেয়। এই কথাই শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন (শ্রীগীতা ১৫।৮)—

"শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ।।"

বায়ু যেমন পুষ্প হইতে গন্ধ লইয়া গন্ধযুক্ত হইয়া অন্যত্র বহিয়া যায়; তেমনই জীবত্মাও একটি জড় দেহ হইতে যখন অন্য জড়দেহ প্রাপ্ত হয় তখন পূর্ব্বদেহের মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয়গত সংস্কার পরদেহে লইয়া যায়। এই যে সংস্কার বা অভ্যাস ইহাই বিকারগ্রস্ত হইয়া ব্যাধির মত জীবকে আশ্রয় করে এবং জন্ম ভোগ দেয়। ইহার নাম মায়াব্যধি বা ভবব্যাধি।

এই রোগ বা ব্যাধির ত্রিবিধ অবস্থা। সেই তিন অবস্থাকে তামসিক রাজসিক ও সাত্ত্বিক এই তিন নাম দেওয়া হয়। তিন অবস্থায় তিন ভাবে রোগীর বিবিধ ভোগ হয়। প্রথম অবস্থায় মোহ ও প্রমাদ, দ্বিতীয় অবস্থায় আত্মসুখ সাধন কর্ম্ম, এবং তৃতীয় অবস্থায় ঐ রূপ জ্ঞান লইয়া নানারূপ ভোগ হয়। প্রথম অবস্থায় রোগী বেশ থাকে; আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন লইয়া নিশ্চিত থাকে। কি ভীষণ ব্যাধি তাহার বক্ষে বসিয়া ধীরে ধীরে কি আগুন জ্বালিতেছে, তাহার কোনও সংবাদই সে রাখে না। হাসিয়া খেলিয়াই কাল কাটায়। দ্বিতীয় অবস্থায়, কাম্য কর্ম্মময় জীবনে সদা ব্যস্ত; সুখ দুঃখ আশা নিরাশায় উত্থান পতনে সদা চঞ্চল হইয়া থাকিলেও, রোগ ধরা পড়ে, তাহার জন্য কখনও চিন্তা ও ক্লেশ বোধও হয়; প্রতিকার ইচ্ছাও জাগে। যিনি ভাগ্যবান তিনিই তখন সদ্‌বৈদ্য পাইয়া, সিদ্ধৌষধ লাভ করেন এবং রোগের ভীষণ পরিণাম বুঝিয়া ঐ ঔষধ যথাবিধি সেবন করিয়া স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারেন। অপরে, রোগটা, যে কি ভীষণ, তাহার পরিণাম যে কত ভয়াবহ, তাহা না জানিয়া অবহেলা করে। কি অজ্ঞান! সুলভ্য হাতুড়েদের কাছে অথবা পাশ করা মূর্খদের কাছে যা' হোক্ কিছু শেকোড়্ মাকোড়্' কিম্বা একটু লালজল লইয়া তাহাই সেবন করে। তাহাতেই আরোগ্য লাভের আশা করে। আবার কেহ তাহা সেবন করিতেও অবকাশ পায় না। হয় ত' হারাইয়া ফেলে। কিম্বা গৃহিনী বা ছেলেরা কি মনে করিয়া ফেলিয়া দেয়। ফলে উভয়েরই সমান দশা ঘটে। রোগ কাটে না। তাহা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেই থাকে। কাহারও বা ঔষধেই আবার বিষক্রিয়া বিকাশ হইয়া রোগ জ্বালার উপর নূতন জ্বালা জ্বালিয়া দেয়। সেই জ্বালায় জীব যে কত জন্ম জ্বলিয়া মরে, কোথা হইতে কোথায় যে যায় তাহা ইয়ত্তা করিবে কে?

"আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্।।"

তৃতীয় অবস্থায় জীব সাধারণ যে ঔষধ পাইয়া পরম যত্নে সেবন করিয়া আপনাকে ক্রমশঃ সুস্থ বলিয়াই মনে করে; তাহাও সিদ্ধৌষধ নহে বলিয়া, তাহাতে রোগের উপসর্গ সকল ক্বচিৎ দূর হইলেও, মূলোৎপাটন হয় না। তাহাতে জীবের মায়াবুদ্ধি স্থগিত হইয়া থাকে মাত্র। এবং তাহাতেই মৃত্যু হয়। মূঢ় জন ইহাকেই আরোগ্য বা মুক্তি বলে, কালাতীত অবস্থা মনে করে। কিন্তু সে ভ্রম।

"উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ অজগরে।
ধন নাহি পাবে, খুদিতে গিলিবে সবারে।।" (চৈঃ চঃ মধ্য ২০)

এরূপ আরোগ্য বা অদুঃখ অবস্থাতেও জীব কালাতীত হইতে পারে না। তাই স্বয়ং শ্রীভগবান জীবের এই অবস্থাকেও "কালবিপ্লুত" বলিয়াছেন। সে কথা শ্রীমদ্ভাগবতে অম্বরীশ উপাখ্যানে এই কথা,—

"মৎসেবয়া প্রতীতং– তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ং।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোহন্যৎ কালবিপ্লুতম্।।"

আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিবে। যথার্থ আরোগ্য বা বিমুক্তি উক্ত তিন অবস্থার অতীত চতুর্থ অবস্থাতেই সম্যক্ লব্ধ হয়। সেই অবস্থার নাম নিস্ত্রৈগুণ্য অবস্থা। ইহাকে নিত্য সত্ত্বাবস্থা বা শুদ্ধসত্ত্বাবস্থাও বলে। এই অবস্থাতেই জীব স্বরূপ প্রাপ্ত , বা একান্ত নিরাময় হয়। অমৃতযোগে অমর হয়।

শ্রীভগবান্ প্রথমেই অর্জ্জুনের প্রতি এই ইঙ্গিত করিয়াছেন, যথা—

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্।। (২।৪৫)

তাহার উপায় কি? জীব রোগ ও ভোগনাশে এই পরম যোগ লাভ করিতে, কাহার শরণ লইয়া কোন্ সিদ্ধৌষধ, অমোঘ ভেষজ, সেবন করিয়া কৃতার্থ হইবে? এবার তাহাই বলিতেছি শুন।

এই দুরারোগ্য দারুণ রোগ (কৃষ্ণেতর বিষয়াভিনিবেশ) এবং জন্মজন্মান্তরে বিষম ভোগ (আত্মেন্দ্রিয় সুখ দুঃখ) হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি বা যোগ (আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন) লাভের জন্য, আমাদিগকে সাধুবৈদ্যের শরণ লইতে হইবে। তাঁহারই পতিতপাবন পাদপদ্মে একান্ত আশ্রয় লইয়া, তাঁরই উপদেশ মত বিহিত ঔষধ ও পথ্য সেবন করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা কালাতীত হইয়া অনাময় পদে প্রবেশলাভ করিতে পারিব। ইহাই জীবের যথার্থ অমৃত যোগ; ইহাই জীবের একান্ত প্রয়োজন। ইহার তুলনায় অপর সমস্ত সুখৈশ্বর্য্য অতি হেয়, অতি তুচ্ছ। ঐ শুন সর্ব্ববিৎ সাধুবাক্য,—

"নিত্যবদ্ধ কৃষ্ণ হইতে নিত্য বহির্ম্মুখ।
নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ।।

সেই দোষে মায়া পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিক তাপত্রয় তারে জারি মারে।।
কামক্রোধের দাস হ'য়ে তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুবৈদ্য পায়।।
তার উপদেশ মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণনিকট যায়।।" (চৈঃ চঃ মধ্য ২২)

এ কথা শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাতেও উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

"তদ্‌বিদ্ধিপ্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিন স্তত্ত্বদর্শিনঃ।।
যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি।।" (৪।৩৪-৩৫)

আর সন্দেহ কি? এস এখন, আমরা আর কেন রোগ যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিয়া, কুবৈদ্যের হাতে বিষ খাইয়া, পথ্য বলিয়া কুপথ্যের ব্যবস্থা লইয়া, জন্ম জন্ম জ্বলিয়া মরি? এস, শ্রীগৌরজন সাধু বৈদ্যের শরণ ও সেবা লই, আর তাঁহার কৃপাদত্ত মায়াব্যাধি হয় অমোঘ মহৌষধ তারকব্রহ্ম নাম সেবন করি। তাহা হইলেই আমরা আরোগ্য, কৃষ্ণভক্তি ও আত্মস্মৃতি লাভ করিব; এবং নষ্ট স্বাস্থ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইব, শুদ্ধ স্বভাবে সকল সাধনায়, সর্ব্বত্র শ্রীভগবানের নিত্য সেবার অধিকার অর্জ্জন করিব ও তাহাতেই কৃতকৃত্য হইব।

বৈরাগী

আজ কালকার ধারণা যে "বৈরাগী" বলিতেই ঐ সেবাদাসী সঙ্গে লওয়া ভেকধারী বাবাজী অথবা ঐরূপ বাবাজীর ও সেবাদাসীর সন্তান বা তাহার বংশীয় কেহ—এই মনে হয়। আমাদের দুর্ভাগ্য যে এই শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের 'বৈরাগী' পরিচয়ে পরিচিত হইতে যাওয়ায় 'বৈরাগী' নাম শুনিলে আমরা মুখ ফিরাই। কিন্তু "বৈরাগী" বা "বাবাজী" অতি উচ্চ অর্থের কথা।

প্রকৃতি-প্রত্যয় গত অর্থ দেখিতে গেলে, আমরা বুঝি যে "বিরাগ" শব্দ হইতেই 'বৈরাগী' শব্দের উৎপত্তি, তাহা হইলে ঐ শব্দের প্রকৃত অর্থ এই যে যাঁহারা বিরাগবিশিষ্ট তাঁহারাই প্রকৃত বৈরাগী। যদি বৈরাগ্য বলিলে এই অর্থ আমাদের মনে প্রতিভাত হইত তাহা হইলে আমাদের নাসিকাকুঞ্চনের অবসর থাকিত না। কিছুকাল যাবৎ ঐ ঘৃণিত শ্রেণীর লোক যাহারা শাস্ত্রীয় বা সামাজিক সকল শৃঙ্খলাতেই বিরাগবিশিষ্ট ও উচ্ছৃঙ্খল ভোগে বহুরাগবিশিষ্ট, তাহাদিগকে 'বহুরাগী' নাম না লইয়া 'বৈরাগী' শব্দের প্রতিই বিরাগ আসিয়াছে।
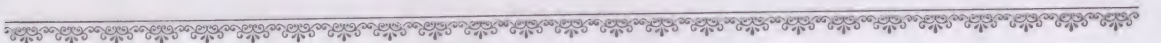
তাহা হইলে বৈরাগী বলিতে কি বিষয়ে বিরাগযুক্ত বুঝায় তাহা আমাদের আলোচ্য বিষয়। শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তির ক্রমোন্নতির সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।"

যে পরিমাণে ভগবদ্ জ্ঞানলাভ হইবে, সেই পরিমাণে হৃদয়ে ভক্তির উন্মেষ হইবে ও সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার লক্ষণস্বরূপ 'অন্যত্র' অর্থাৎ ভগবৎপ্রতীতি ভিন্ন ইতর বিষয়ে বিরক্তি বা বিরাগের উৎপত্তি হয়। এই কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্তি কাহার হইতে পারে তাহাই আলোচ্য। যিনি যে পরিমাণে কৃষ্ণোন্মুখ, তিনি সেই পরিমাণে তদিতর বিষয়ে বিরাগযুক্ত। যেখানে যে পরিমাণে আলোক আছে, সেখানে সেই পরিমাণ অন্ধকারের বিকাশ—ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। সুতরাং যর্থাথ বৈরাগী হইতে হইলে কৃষ্ণোন্মুখ হইতে হইবে। কৃষ্ণোন্মুখ বলিতে কৃষ্ণসেবা তৎপর জানিতে হইবে। যিনি কৃষ্ণসেবাই একমাত্র জীবনের ব্রত করিয়াছেন তিনিই ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিয়া, ইতরবিষয়ে নিস্পৃহ হইতে পারিয়াছেন।

'বৈরাগী' কোনও আশ্রমবিশেষ বা বেষকে লক্ষ্য করে কিনা তার বিচার অনেকস্থলে আসিয়া পড়ে। আমরা দেখিলাম কৃষ্ণোন্মুখ হইলে তবে বৈরাগী হওয়া যায়, নচেৎ নহে, কেবলমাত্র বেষ হইলেই বৈরাগী হওয়া যায় না। বেষোপজীবিগণ কেবলমাত্র বেষের দোহাই দিয়া বৈরাগীগিরি করাতেই বৈরাগীনামের অপব্যবহার হইয়া লোকের নিকট অর্থবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। তাহা হইলে দেখা গেল যে বেষ অনেকস্থলে বৈরাগ্যের বাহ্যদ্যোতক হইলেও ইহা সর্ব্বসময়ে বৈরাগ্যের অভ্রান্তলক্ষণ নহে। বেষ আশ্রমচিহ্ন ভিন্ন আর কিছুই নহে, বৈরাগী বা বাবাজীর বেষ যে কৌপীন-বহির্ব্বাস, তাহা সন্ন্যাস আশ্রমের চিহ্ন। বৈরাগী আশ্রমভুক্ত, নহেন তিনি আশ্রমাতীত পুরুষ, কেননা তাঁহার কৃষ্ণোপলব্ধিই প্রবল, আশ্রমাদি ব্যবস্থা কেবল কৃষ্ণবহির্ম্মুখের শাসন জন্য। যিনি স্বতঃই কৃষ্ণোন্মুখ, তাঁহার সে শাসনবিধির অধীন থাকিবার আবশ্যকতা নাই। তিনি যে কোনও আশ্রমচিহ্ন ধারণ করিয়াও তাহার কেহ ন'ন, তিনি আশ্রমাতীত পরমহংস। তিনি গৃহে থাকিলেও তিনি গৃহী নহেন, তিনি গৃহত্যাগী হইয়া বেড়াইলেও তিনি সন্ন্যাসী নহেন, তিনি বনে থাকিয়া হরিভজন করিলেও তিনি বানপ্রস্থ নহেন, তিনি পরমহংস গুরুর সান্নিধ্যে থাকিয়া ভজন নিরত হইলেও তিনি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমান্তর্গত নহেন। তিনি যে অবস্থায়ই থাকুন তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যের অভাব নাই, তাঁহাতে গৃহস্থোচিত সংযমের অপ্রতুলতা দৃষ্ট হয় না, তিনি বনচারীর ন্যায় মুনিধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট নহেন এবং সন্ন্যাসীর ন্যায় তাঁহার প্রাপঞ্চিক বস্তুতে ভোগবুদ্ধি রাহিত্যেরও অভাব নাই। পার্থক্য হইতেছে এই সকল সদ্গুণাবলী তাঁহার সহজ, এ গুলির লাভের জন্য তাঁহাকে কতকগুলি নিয়মের সমষ্টি পালনে ব্যস্ত হইতে হয় না, নিয়মগুলি আপনা হইতেই পালিত হয়। সুতরাং বৈরাগী কোনও আশ্রম-বিশেষের ব্যক্তি নহেন। তাঁহার নিয়মাগ্রহ বোধ নাই। নিয়মে আগ্রহও নাই, নিয়মের অগ্রহ বা ব্যভিচার বা উচ্ছৃঙ্খলতাও নাই। তিনি পরমহংস। "স্বলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বাচরেদবিধিগোচরঃ" এই তাঁহার লক্ষণ।

পরমহংস বৈরাগী গৃহেও থাকিতে পারেন। তা' বলিয়া আমরা সব ঘরে ঘরে পরমহংসের বা বৈরাগীর দল বাঁধিতে পারি না। "ন মৌক্তিকং গজে গজে।" কোনও পরমহংস মুক্তপুরুষ গৃহে ছিলেন বলিয়া আমিও গৃহে থাকিয়া পরমহংস বা এই গৃহব্রতধর্ম্মেই আঁটা আঁটি করিয়া লাগিতে পারিলেই পরমহংস এরূপ ধারণা আমাদের দুর্ব্বুদ্ধি, শুধু তাই নয় দুর্ভাগ্য। গৃহমেধি ধর্ম্মটী বদ্ধতামূলে, তাহা হইতে নিবৃত্তি না হইলে, অনাসক্তি না হইলে ভাগবতধর্ম্মের যাজন হয় না। তাই গীতায় শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন "সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" চালিত কথায় বলিতে গেলে, তাই বলে—শ্যাম রাখিবে ত' কুল ছাড়।

বৈরাগ্যের মূল হইতেছে অনাসক্তি। যে সকল বস্তুতে ভগবদিতর বুদ্ধি থাকে সে গুলিতে আমাদের ভোগবুদ্ধি প্রবল। ভোগবুদ্ধি আমাদের বদ্ধতা, সেই ভোগবুদ্ধিরাহিত্য হইলেই আমাদের আসক্তি গেল, আমরা অনাসক্ত বা মুক্ত হইলাম। এই ভোগবুদ্ধি ত্যাগের মূলে কৃষ্ণজ্ঞান হওয়া আবশ্যক। নচেৎ কৃত্রিম ভাবে ভোগবুদ্ধি যায় না। বহু কষ্টে ভোগবুদ্ধি দূর করিতে করিতে আবার আমাদের পতন হয়। সুতরাং জগতের সকল বস্তুতেই যদি উপনিষদের "ঈশাবাস্য" উপদেশ অনুযায়ী ভগবৎ-সম্বন্ধ দর্শন করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারি, তবেই আমরা যথার্থ বৈরাগী হইতে পারিব, যুক্তবৈরাগ্য আচরণ করিতে পারিব। তাই গোস্বামিরাজ বলিয়াছেন,—

অনাসক্তস্যবিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তংবৈরাগ্যমুচ্যতে।।

তবে বঙ্গদেশের বাহিরে দেখা যায় সম্ভ্রান্ত বৈরাগীবংশ আছেন। যেমন ছুঁইখাদানের দেশীয় রাজা মহান্ত মহারাজ বাহাদুর বৈরাগী বংশোদ্ভব। এখানে বৈরাগী অর্থে বোধ হয় যে পরমহংস বৈষ্ণব (বৈরাগী) গৃহে থাকিয়া হরিসেবা নিরত ছিলেন, যেমন এদেশে শ্রীবাসপণ্ডিত, শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভৃতি,—তাঁহাদের সন্তানবর্গ। তবে এখানেও বৈরাগীশব্দের ব্যবহার না হইলেই ভাল হইত, কেননা তৎতদ্‌বংশে সকলেই কিছু সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণোন্মুখ ও ইতর বিষয়ে সম্পূর্ণ বিরাগযুক্ত নহেন।

বৈরাগী গৃহেও থাকিতে পারেন, তা' বলিয়া তাঁহার বংশ বৈরাগী বংশ হইতে পারেন না। শৌক্র পদ্ধতি চালাইবার দুর্নীতি আমাদের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল; তাই বৈরাগী বংশ বলিয়া বংশ স্থাপিত হইয়াছে। অবশ্য বঙ্গদেশে বৈরাগী বংশ বলিতে গেলে ঘৃণিত বংশকেই সাধারণতঃ লক্ষ্য করে। যে সব ভেকধারী বাবাজী সেবাদাসী সঙ্গে লইয়া বংশ বিস্তার করিয়াছে বা যাহারা ভেক লইয়া পুনরায় সংসারে আসিয়া সন্তানাদি রাখিয়া গিয়াছে—-এই সব বংশ বুঝায়। ইহাদের আদর বঙ্গদেশে হয় নাই, বোধ হয় কোথাও হওয়া উচিত নহে। ভাগবত শাস্ত্রে এরূপ বাবাজী বৈরাগীকে 'বান্তাশী', টীকায় ছর্দ্দিত (ন্যক্কার) ভোজী' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহা কিছু গৌরবের কথা নহে।

ভগবান্‌ই একমাত্র ভজনীয় বস্তু

'ভজন' শব্দের অর্থ সেবা। সেবা বলিলে সেব্য, সেবক ও সেবা এই তিনটীকে বুঝিতে হইবে। ভজন করিতে হইলে উক্ত ত্রিবিধ বাস্তব-বস্তু-তত্ত্বের ভজন প্রয়োজন নতুবা সেবা সুষ্ঠুরূপে হইতে পারে না। অতএব প্রথমে আমরা উক্ত ত্রিবিধ তত্ত্বের বিচার করিব।

নানা মুনির নানা প্রকার মতবাদে চিত্ত চঞ্চল হইলে ভগবৎসম্বন্ধে 'অস্তি' 'নাস্তি'রূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়। ভগবদ্বিশ্বাস কেবল ভারতবর্ষে হিন্দুগণের মধ্যে আছে এরূপ নহে কিন্তু জীবমাত্রেরই ঈশ্বর বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ। সকল দেশে সকল জীবে সর্ব্বাবস্থায় ঈশ্বর-বিশ্বাস লক্ষিত হয়—জীবাত্মায় স্বতঃসিদ্ধ ঈশ্বর বিশ্বাসকে অন্ধবিশ্বাস বা ভ্রম বিশ্বাসও বলা যায় না। যেহেতু ভ্রম সর্ব্বত্র একরূপ হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত পদ্যটী এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।

ভগবান্ সর্ব্বভূতেষু লক্ষিতঃ স্বাত্মনা হরিঃ।
দৃশ্যৈর্বুদ্ধ্যাদিভির্দ্রষ্টা লক্ষণৈরনুমাপকৈঃ।।

অর্থাৎ সর্ব্বসাক্ষী ভগবান শ্রীহরি দৃশ্য অনুমাপক বুদ্ধ্যাদি লক্ষণ দ্বারা অন্তর্য্যামিরূপে সর্ব্বভূতে অনুভূত হইয়া থাকেন। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অন্যের কিরূপে সেই ভগবানে আস্তিক্য বুদ্ধি হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন। নিজচিত্তাবলম্বনে প্রথমে দৃশ্য জড়-বুদ্ধ্যাদি দ্বারা দ্রষ্টা জীবই লক্ষিত হন। দৃশ্য জড় বুদ্ধ্যাদির দর্শন স্বপ্রকাশ দ্রষ্টা ভিন্ন সম্ভবপর নহে অতএব লক্ষণ বলিতে স্বপ্রকাশ দ্রষ্টৃনির্দ্দেশক বুঝিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে কর্ত্তা ভিন্ন কার্য্য হয় না। খড়্গ দ্বারা ছেদন কার্য্য হইয়া থাকে কিন্তু খড়্গ ছেদনের কর্ত্তা নহে তদ্রূপ হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় অথবা মনোবুদ্ধ্যাদি অন্তরেন্দ্রিয় ইহারা কেহই কর্ত্তা নহেন কিন্তু কর্ত্তার কার্য্যকরণোপযোগী যন্ত্রবিশেষ। ঐগুলি সচরাচর করণ অধিকরণ বাচ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে কোনটীই কর্ত্তৃবাচ্যে ব্যবহৃত হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যেমন, আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি 'আমি মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম; আমি হস্ত দ্বারা প্রহার করিয়াছি, এই বাক্যগুলিতে মন বা হস্ত কর্ত্তৃবাচ্যে ব্যবহৃত হয় নাই যেহেতু তাহারা কর্ম্মকর্ত্তা নহেন। কর্ত্তা 'আমি' তাহা হইতে ভিন্ন। অতএব জড় মনোবুদ্ধ্যাদির দ্বারা তাহা হইতে ভিন্ন কর্ত্তা জীবাত্মাই লক্ষিত হইতেছেন। এইরূপ জীবাত্মা দ্বারা পরমাত্মাও লক্ষিত হইতেছেন। জীবাত্মা 'আমিই' যদি কর্ত্তা হইল তবে পরমাত্মার কর্ত্তৃত্ব কোথায় এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত হইলে তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে ঈশ্বর হেতুকর্ত্তা, জীব প্রযোজ্য কর্ত্তা। কর্ম্মার্থকরণ কর্ম্মান্তে কর্ম্মের ফল যোজনা তদ্দ্বারা জীবের অন্যান্য কর্ম্মে যোগ্যতা বা অযোগ্যতা এই সকলই ঈশ্বর কর্ত্তৃক অতএব জীবের কর্ম্মস্বতন্ত্রতা থাকিলেও বহু প্রকারে ঈশ্বরাধীন। এই আত্মান্তর্যামী পুরুষ পরমাত্মাকে শাস্ত্রে ভগবানের অংশ বলিয়াছেন অতএব অংশ দ্বারা অংশী ভগবানও লক্ষিত হইতেছেন। এই ভগবানের স্বরূপবিচারে শাস্ত্র বলিয়াছেন।

সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিন রূপ।।
হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে।।

অর্থাৎ ভগবানের একটী অচিন্ত্য শক্তি আছে হ্লাদিনী অর্থাৎ আনন্দদায়িনী সন্ধিনী অর্থাৎ সত্তবিস্তারিণী এবং সম্বিৎ অর্থাৎ জ্ঞানপ্রদায়িনী—এই তিনটী ঐ শক্তির প্রভাব। ভগবানে তাহাই পরিপূর্ণরূপে বিরাজিত। ভগবৎস্বরূপে মায়ার ব্যবধান না থাকায় সুখ, দুঃখ বা মিশ্রভাবের অধিষ্ঠান নাই। জীব ভগবানের অংশ অনু সচ্চিদানন্দময় বলিয়া মায়াবশ্যযোগ্য হন, তখন তাঁহার আনন্দময় স্বরূপটী বিকৃত হইয়া সুখ দুঃখরূপে পরিণত হয়। জীবের স্বস্বরূপোপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎস্বরূপেরও উপলব্ধি হইয়া থাকে এতৎপ্রসঙ্গে ভাগবতের নিম্নলিখিত পদ্য দুইটী আলোচ।

যস্যাবয়বসংস্থানৈঃ কল্পিতো লোকবিস্তরঃ।
তদ্বৈ ভগবতোরূপং বিশুদ্ধং সত্ত্বমূর্জ্জিতম্।।
অতঃপরং যদব্যক্তমব্যূঢ় গুণবৃংহিতম্।
অদৃষ্টাশ্রুতবস্তুত্বাৎ স জীবো যৎ পুনর্ভবঃ।।

সচ্চিদানন্দময় ভগবৎস্বরূপে মায়ার উৎপত্তিহীন রজঃ ও বিনাশ ধর্ম্মরূপ তমোগুণ নাই সুতরাং বিশুদ্ধ মায়াবদ্ধ জীব স্বরূপবিস্মৃতিফলে স্থূলদেহে আত্মবুদ্ধি বিশিষ্ট হন তৎকালে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদ্বস্তু ভগবানের ধারণা করিতে গিয়া স্ব স্থূল দেহের সমষ্টি বিরাট রূপের কল্পনা করেন। পাতালাদি অবর লোকসমূহ বিরাটের হস্ত পদাদির কল্পনা। বিরাটরূপ ভগবানের বাস্তব অঙ্গ নহে। আবার যাঁহারা সূক্ষ্মদেহে আত্মবুদ্ধি করেন তাঁহারা যে নিরাকার নির্ব্বিশেষরূপের কল্পনা করেন তাহাও স্ব সূক্ষ্মদেহের সমষ্টির কল্পনা মাত্র। সুতরাং ভগবানের বাস্তব রূপ নহে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন যথা—

স সর্ব্বধীবৃত্ত্যনুভূত সর্ব আত্মা যথা স্বপ্নজনেক্ষিতৈকঃ
তং সত্যমানন্দ নিধিং ভজেত নান্যত্র সজ্জেদ্ যত আত্মপাতঃ।

ইহার অর্থ এই যে, স্বপ্নকালে যে রূপ পাত্র মিত্র সৈন্যাদি জনসমূহের অনুভবকারী জীব নিজ সৃষ্ট এবং উপলক্ষিত রাজ্যাদি ভোগসমূহ উপলব্ধি করেন তদ্রূপ সেই যোগী সর্ব্ববুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা পূর্ব্ব বহুজন্মে দেবেন্দ্রত্ব নরেন্দ্রত্ব প্রভৃতি ভোগৈশ্বর্য্যসকল অনুভব করেন। সুতরাং সেই সত্য আনন্দনিধি বিরাটান্তর্যামী শ্রীনারায়ণকে ভজন করিবে অন্য বুদ্ধি করিয়া স্থূল বিরাটের অন্য ধারণায় আসক্ত হইবে না যেহেতু তাহাতে সংসার প্রবৃত্তি ঘটিবে। শ্রীমদ্ভাগবত বচন হইতে আরও জানা যায় যে পূর্ব্বে এইরূপ স্থূল ও সূক্ষ্ম স্বরূপে আসক্ত না থাকিয়া একমাত্র সচ্চিদানন্দময় ভগবানের উপাসনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনুগমনে রুচিবিশিষ্ট না হইলে আমাদের গত্যন্তর নাই।

সেবাই শোভা

সেবাই শোভা—সেবাই রূপ। এ শোভা এ রূপ প্রাকৃত নহে। প্রাকৃতরূপে হেয়তা ও অবরতা রহিয়াছে। প্রাকৃত রূপ মানুষকে পশু হইতেও নিকৃষ্ট করিয়া তুলে। প্রাকৃত শোভায় মত্ত হইয়া জীব পতঙ্গের ন্যায় প্রদীপ্ত হুতাশনে ক্ষণিক ভোগের জন্য অবশেষে প্রাণ পর্য্যন্ত আহুতি দেয়। সেবকের রূপ-মাধুরীর জগতের কোনও বস্তুর সঙ্গে তুলনা হয় না। যিনি অপ্রাকৃত সেবা লাভ করিয়াছেন তিনিই সেবকের রূপ-শোভা দর্শন করিতে পারেন। প্রাকৃত নয়নে অপ্রাকৃত রূপ শোভা দেখিবার যোগ্যতা নাই। প্রাকৃতরূপে কামের পূতি গন্ধ বর্ত্তমান। অপ্রাকৃত সেবাই যেমন রূপ, তদ্রূপ উহারই হেয় প্রতিফলন স্বরূপ প্রাকৃতরূপ বা কাম। অপ্রাকৃতরূপে কপটতা নাই। অপ্রাকৃতরূপ বা সেবা সেবককে প্রাকৃতরূপ বা কামের ন্যায় কখনও ছলনা করে না। এই জন্যই ভাগবত গাহিয়াছেন,—'দুরাপাহ্যল্পতপসঃ সেবা-বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু'—

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মঃ যতোভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি।।"

অপ্রাকৃত সেবা অহৈতুকী, অপ্রতিহতা, তাহা আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি। সুরধুনী যেমন সাগরসঙ্গমের জন্য স্বাভাবিক ভাবেই ছুটিতে থাকে, কাহারও আদেশ দ্বারা প্রণোদিত বা বাধা পাইয়া প্রতিহত হয় না, তদ্রূপ সেবকও সেব্যের প্রতি তাঁহার নিত্য স্বাভাবিক আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া অদম্য পিপাসা লইয়া সেবা করিতে ছুটেন। এ সেবা ক্ষণিকের তরে নহে—এ সেবার কখনও যবনিকা পতন নাই।

সেবকের প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রতি চলন চালন প্রতি কার্য্য প্রতি চিন্তা সেব্যের সুখবিধানের জন্য। সেবক আত্মসুখদুঃখের বিচার করেন না। কৃষ্ণসুখ হেতু তাঁহার সব ব্যবহার।

অপ্রাকৃতে সেবার উদাহরণ জগতে নাই, বিদ্যাসাগরের মাতৃসেবা, ক্যাসাবিয়াঙ্কার পিতৃসেবা, সাবিত্রীর পতিসেবা, এমন কি লক্ষ্মী দেবীর নারায়ণ সেবার সহিত অপ্রাকৃত শুদ্ধ মাধুর্য্যময় সেবার তুলনা হয় না।

"সেবাই-শোভা বা রূপ"—বলি কেন? একমাত্র অপ্রাকৃত সেবকই এই কথার মর্ম্ম বুঝিবেন। সেবকের রূপ কৃষ্ণের ভোগ্য। স্বরাট্‌পুরুষ কৃষ্ণই একমাত্র বিষয়। আর সকলেই তাঁহার আশ্রয় বা ভোগ্যতত্ত্ব। ভোগ্য ভোক্তার অধীন। আশ্রয় বিষয়ের চির আশ্রিত। সুতরাং সেবকের যথা-সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণেরই ভোগ্য। সেবক যখন তাঁহার সর্ব্বস্ব দিয়া অপ্রাকৃত নবীন মদনের সেবা করেন, তখন তাঁহার সেবাকে শোভা বা রূপ না বলিয়া আর কি বলিব? সেবকের রূপের কাছে অমরাবতীর দেবতাগণের রূপ অতি তুচ্ছ। কারণ, সে রূপে ভোগের কামের পূতিগন্ধ বিরাজিত।

শ্রীনারায়ণ-সেবিকা কমলার একনাম 'শ্রী' বা 'শোভা'। আবার ব্রজ- ললনাগণের রূপ অপ্রাকৃত রূপখনি মদনমোহনেরই ভোগ্য। গোপীগণের যে রূপ তাহা গোপীনাথের সেবার জন্য।

এ দেহ দর্শনে স্পর্শে কৃষ্ণ সন্তোষণ।
এই লাগি করে অঙ্গের মার্জ্জন ভূষণ।।

* * * *

গোপীগণ করেন যবে কৃষ্ণ দরশন।
সুখবাঞ্ছা নাহি সুখ হয় কোটিগণ।।
গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হইতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয়।।
তাঁ সবার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ।
তথাপি বাড়য়ে সুখ পড়িল বিরোধ।।
এ বিরোধের একমাত্র দেখি সমাধান।
গোপিকার সুখে কৃষ্ণসুখ পর্য্যবসান।।
গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্লতা।
সে মাধুর্য্য বাড়ে যার নাহিক সমতা।।
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ।।
গোপী শোভা দেখি কৃষ্ণের শোভা বাড়ে যত।
কৃষ্ণশোভা দেখি গোপীর শোভা বাড়ে তত।।
এইমত পরস্পর পড়ে হুড়াহুড়ি।
পরস্পর পড়ে কেহ মুখ নাহি মুড়ি।।
কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপীরূপ গুণে।
তাঁর সুখে সুখবুদ্ধি হয়ে গোপীগণে।।
অতএব সেই সুখ কৃষ্ণ-সুখ পোষে।
এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি কাম দোষে।। (চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ)

অতএব সেবকের সেবা শুধু যে কেবল তাঁহারই রূপপ্রকাশক তাহা নহে। উহা দ্বারা সেব্যেরও রূপমাধুর্য্যের পুষ্টি, তুষ্টি হইয়া থাকে।

"গোপীপ্রেমে করে কৃষ্ণ মাধুর্য্যের পুষ্টি।
মাধুর্য্য বাড়ায় প্রেম হঞা মহা তুষ্টি।।" (চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ)

শ্রীরূপ উজ্জ্বলনীলমণিতে যে রূপের সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা এই—

অঙ্গান্যভূষিতান্যেব কেনচিদ্ভূষণাদিনা।
যেন ভূষিতবদ্ভাতি তদ্রূপমিতি কথ্যতে।।

—উঃ নীঃ উদ্দীপন প্রকরণম্ ১৫শ।

অভূষিত থাকিলেও যদ্দ্বারা অঙ্গসকলকে ভূষিতের ন্যায় দীপ্তিমান্ দেখায় তাহাই রূপ। অঙ্গ সকল সুন্দররূপে ন্যস্ত হইলেই রূপ হয়। শ্রীরূপ-পাদ বিদগ্ধমাধবে যে রূপের উদাহরণ দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, একদিন রাধানাথ বৃষভাণুনন্দিনীকে বলিতেছেন,—'হে প্রিয়তম, তুমি যে ললাটদেশে কস্তুরী দ্বারা তিলক রচনা করিয়াছ তাহা তোমার ললাটস্থ চূর্ণ কুন্তল দ্বারা পৌনরুক্ত অর্থাৎ পণ্ডিতগণ যেমন গ্রন্থের কোন স্থানে অশুদ্ধ লিপি থাকিলে তাহাকে বলয়াকৃতি রেখাদ্বারা বেষ্টন করেন তদ্রূপ ব্যর্থীকৃত হইল।

তোমার কর্ণার্পিত কুবলয় নয়নযুগলের দ্বারা, তোমার গলদেশ-লম্বিত হারের মনোহারিত্ব, তোমার হাস্যচন্দ্রিকার তরঙ্গ দ্বারা পিষ্ট-পোষিত হইল।

ফলকথা এই যে সেবাই—রূপ। সেই সেবাবৃত্তি বা রূপ আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি। উহা বাহির হইতে ধার করিয়া বা যোগাড় করিয়া লইতে হয় না। যে কৃষ্ণ অখিল সৌন্দর্য্যের খনি—পরম রসের নিদান, তিনিও সেবকের রূপে অর্থাৎ সেবায়, প্রেমে মুগ্ধ। তাই শ্রীমতী রাধিকার রূপে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত আবদ্ধ। তাই রাধিকার অপর নাম—

"গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দমোহিনী।
গোবিন্দসর্ব্বস্ব সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি।।
দেবী কহি দ্যোতমানা পরমাসুন্দরী।
কিম্বা কৃষ্ণপূজা ক্রীড়ার বসতি নগরী।।
কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যা'র ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।।
কিম্বা প্রেম রসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তা'র শক্তি তা'র সহ হয় একরূপ।।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে।।

* * * * *

সর্ব্ব সৌন্দর্য্য কান্তি বৈসয়ে যাঁহাতে।
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাহা হৈতে।।

জগৎ মোহন কৃষ্ণ তাঁহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী।। (চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ)

তাই শ্রীমতী রাধিকার প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, প্রতি বেশবিন্যাস, প্রতি হাবভাব কৃষ্ণ সেবাময়। তাঁহার অঙ্গের ভূষণ, বসন সকলই কৃষ্ণ সেবার উপকরণ। তাঁহার কায়ব্যূহ, তাঁহার বিভিন্ন সখী সকলই কৃষ্ণ সেবার নব নব ভাব চমৎকারিতা পরিপাটী, পরিপুষ্টি, মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্য বাড়াইবার জন্য। এক কথায় সম্বিদ্ বিগ্রহ, অদ্বিতীয় ভোক্তা ব্রজেন্দ্রনন্দনের স্বেচ্ছাময় নিরঙ্কুশ আনন্দই শ্রীমতীর রূপ ও তাঁহার রূপবিস্তার।

প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমের ভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠ জগতে বিদিত।।

* * * *

সেই মহাভাব হয় চিন্তামণিসার।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য তার।।
মহাভাব-চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহরূপ।।
রাধা প্রতি কৃষ্ণস্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন।
তাতে সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বল বরণ।।
কারুণ্যামৃত ধারায় স্নান প্রথম।।
তারুণ্যামৃত ধারায় স্নান মধ্যম।।
লাবণ্যামৃত ধারায় তদুপরি স্নান।
নিজ লজ্জা শ্যাম-পট্ট সাটী পরিধান।।
কৃষ্ণ অনুরাগে দ্বিতীয় অরুণ বসন।
প্রণয়মান কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন।।
সৌন্দর্য্য-কুঙ্কুম, সখী প্রণয় চন্দন।
স্মিতকান্তি কর্পূর, তিন অঙ্গে বিলেপন।।
কৃষ্ণের উজ্জ্বলরস মৃগমদ ভর।
সেই মৃগমদে বিচিত্র কলেবর।।
প্রচ্ছন্ন-মান বাম্য ধম্মিল্য-বিন্যাস।
ধীরাধীরাত্মক গুণ অঙ্গে পটবাস।।

রাগ-তাম্বূলরাগে অধর উজ্জ্বল।
প্রেমকৌটিল্য নেত্রযুগলে কজ্জল।।
সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব হর্ষাদি সঞ্চারি।
এই সব ভাব ভূষণ সব অঙ্গে ভরি।।
কিলকিঞ্চিতাদি ভাব বিংশতি ভূষিত।
গুণশ্রেণী পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গে পূরিত।।
সৌভাগ্য তিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল।
প্রেমবৈচিত্ত্য রত্ন, হৃদয় তরল।।
মধ্যবয়স সখী স্কন্ধে করন্যাস।
কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি সখী আশপাশ।।
নিজাঙ্গ সৌরভালয়ে গর্ব্ব পর্য্যঙ্ক।
তাতে বসি আছে সদা চিন্তে কৃষ্ণ সঙ্গ।।
কৃষ্ণনাম গুণ যশ অবতংশ কানে।
কৃষ্ণনাম গুণ যশ প্রবাহ বচনে।।
কৃষ্ণকে করায় সোমরস মধুপান।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম।।
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্নের আকর।
অনুপম গুণ-গণ পূর্ণ কলেবর।।

* * * *

যাঁহার সৌভাগ্য গুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যাঁর ঠাঁঞি কলাবিলাস শিখে ব্রজরামা।।
যাঁর সৌন্দর্য্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্ব্বতী।
যাঁর পতিব্রতা ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী।।
যাঁর সদ্‌গুণ গণনের কৃষ্ণ না পায় পার।
তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার।। (চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম)

সেবকের সবই শোভাময়। যামুনতট, কালিন্দী, কেলিকদম্ব, গোধন, বেত্র, বেণু, বিষাণ—ইহারা এত সুন্দর কেন? সেবাই ইহাদের সৌন্দর্য্যের কারণ। ইহারা অজ্ঞাতভাবে সেবক হইলেও সেবাই ইহাদিগকে শোভিত করিয়াছে। ইহারা শান্তরসের সেবক। আবার রক্তক পত্রক, চিত্রক, বকুল—ইহাদের শোভা এত

অপরূপ কেন? আবার বলি সেবাই ইহার কারণ। ইহারা দাস্যরসের সেবক। শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম প্রভৃতির সখ্যরসের সেবা-মাধুরী বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্যকেও তুচ্ছ করিয়াছে কেন? শুধু বিশ্রম্ভসেবাই ইহার কারণ। নন্দ যশোমতির এত স্নেহ শোভা কোথা হইতে আসিল? সেবাই একমাত্র ইহার কারণ। গোপীগণের কথা আর কি বলিব! সেই কথা বলিবার ভাষা নাই। উদ্ধব পর্য্যন্ত যাঁহাদের শোভা পরাকাষ্ঠা দেখিয়ামুগ্ধ হইয়া বলেন—

"আসামহো চরণরেণু-জুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাং।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্য-পথঞ্চ হিত্বা ভেজু র্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্।।"

—উঃ নীঃ কৃষ্ণবল্লভা প্রকরণ। ১৮।

আমি শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপ-ললনাগণের চরণ-রেণু-সেবী বৃন্দারণ্যের গুল্মলতা প্রভৃতি ওষধি মধ্যেও যেন কোন একটী হইতে পারি। অহো! গোপ-রামাগণের কথা আর কি বলিব! ইহারা দুস্ত্যজ স্বজন এমন কি আর্য্যধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া শ্রুতিবিমৃগ্য মুকুন্দপদবীর সেবায় মজিয়াছেন।

সেবকের এত শোভার এত রূপের বিষয় কে? একমাত্র অপ্রাকৃত মদনমোহন। মধুময়ী বাসন্তী যামিনী, বসন, বিভূষণ,—সেবার এত উপকরণ, সেবকের নিকট ইহাদ্বারা যদি সেব্যেরই সেবা না হইল, তবে সব জ্বলন্ত অনলসদৃশ।

"মম মরণমেব বরমতিবিতথ-কেতনা।
কিমিহ বিষহামি বিরহানলমচেতনা।।
মামহহ বিধুরয়তি মধুর মধু যামিনী।
কাপি হরিমনুভবতি কৃত সুকৃত কামিনী।।
অহহ কলয়ামি বলয়ামি বলয়াদি মণিভূষণম্।
হরি বিরহ দহন বহনেন বহু দূষণম্।।
কুসুম-সুকুমার তনুমতনুশরলীলয়া।
স্রগপি হৃদি হন্তি মামতিবিষমশীলয়া।।"

—শ্রীগীতগোবিন্দ সমপ্তসর্গ।

অধিকারী ব্যক্তি লীলাশুকের কর্ণামৃত আস্বাদন করিয়াও এই কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবেন। অনধিকারী ব্যক্তির এসব কথায় অধিকার নাই। অনর্থ থাকিতে, দ্বিতীয় অভিনিবেশ থাকিতে জীব কখনও সেবার শোভা উপলব্ধি করিতে পারেন না। অনর্থ-যুক্ত জীব প্রাকৃতজ্ঞানে অপরাধমলিন-চিত্তে সেবার কথা, রূপের কথা বুঝিতে যাইয়া প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া পড়েন—অপ্রাকৃত সহজরূপ মাধুরী বুঝিতে পারেন না। তাই বলি সাধু সাবধান!!

সেবাই যে রূপ, সেবাই যে শোভা, তাহা দেখাইবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর বৃষভাণুনন্দিনীর ভাবকান্তি লইয়া মূর্ত্তিমান্ সেবাবিগ্রহরূপে লোক-লোচনের সম্মুখে আসিয়া ছিলেন। কিন্তু হায়, প্রাকৃতভোগোন্মুখী চিত্তের দ্বারা তাঁহাকে বুঝিতে যাইয়া কেহ কেহ তাঁহার অনর্পিতচর উন্নত-উজ্জ্বল-স্বভজন-বিভজন রূপ মহাবদান্যতা গ্রহণ করিতে পারিলেন না; তাঁহাকেই "নাগর" সাজাইয়া কৃষ্ণের সেবার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি করিয়া বসিলেন। কেহ বা প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া অপ্রাকৃত সেবা মাধুরী হইতে বঞ্চিত হইলেন। তাহা বলি, শ্রীরূপের পাদপদ্ম আশ্রয় ভিন্ন কাহারও সেবায় অধিকার নাই। শ্রীরূপই সেবা দানের একমাত্র অধিকারী। অনর্পিতচর প্রেমপ্রদাতা শ্রীগৌরসুন্দরের অভীষ্টের প্রচারক শ্রীরূপ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে যে সেবারূপ অপ্রাকৃত স্পর্শমণিসমূহ নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন, শ্রীরূপের অনুগত না হইলে তাহা কিরূপে মিলিবে? শ্রীরূপ ব্যতীত উজ্জ্বলনীলমণির প্রভা আর কে-ই বা দেখাইবেন? শ্রীরূপ গোবিন্দ-সেবার আচার্য্য। আবার রূপপ্রিয় মহাজন শ্রীজীবপাদের চরণাশ্রয় ব্যতীত শ্রীরূপের গোবিন্দ-সেবার অপ্রাকৃতত্ব ক্ষুদ্র জীব বুঝিতে পারেন না। প্রাকৃত সহজিয়াকুল নিজদিগকে জাতরুচি অভিমান করিয়া শ্রীজীবের বিচার ও তত্ত্বের প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করাতে শ্রীজীবের চরণে যে অপরাধ করিতেছেন সেই অপরাধযুক্ত চিত্ত লইয়া শ্রীরূপের সেবার কথা বুঝা যায় না।

কবে আমাদের সেই শুভদিনের উদয় হইবে, যে দিন আমরা নিষ্কপটে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের ভাষায় বলিতে পারিব—

শ্রীরূপ মঞ্জরী পদ, সেই মোর সম্পদ,
সেই মোর ভজন পূজন।
সেই মোর প্রাণধন, সেই মোর আভরণ,
সেই মোর জীবনের জীবন।।
সেই মোর রসনিধি, সেই মোর বাঞ্ছা সিদ্ধি,
সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত সেই তপ, সেই মোর মন্ত্র জপ,
সেই মোর ধরম করম।।
অনুকূল হবে বিধি, সে পদে হইবে সিদ্ধি,
নিরখিব এ দুই নয়নে।
সে রূপ মাধুরী রাশি, প্রাণকুবলয় শশী,
প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে।।
তুয়া অদর্শন অহি, গরলে জারল দেহি,
চিরদিন তাপিত জীবন।

হাহা প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
এ অধম লইল শরণ।।

* * * *

শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্ব্বজন।
শ্রীরূপকৃপায় মিলে যুগলচরণ।।
হাহা প্রভু সনাতন গৌরপরিবার।
সবে মিলি বাঞ্ছা পূর্ণ করহ আমার।।
শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয়।
সে পদ আশ্রয় যা'র সেই মহাশয়।।
শ্রীদয়িতদাস কবে সঙ্গে লঞা যাবে।
শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে।।
হেন কি হইবে মোর নর্ম্মসখীগণে।
অনুগত এ অধমে করিবে শাসনে।।

বৈষ্ণব কি অব্রাহ্মণ?

লক্ষেশ্বর কি সহস্র মুদ্রার মালিক? —এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যেরূপ অজ্ঞতাসূচক "বৈষ্ণব কি অব্রাহ্মণ" এই প্রশ্ন উত্থাপন করাও তদ্রূপই অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক। প্রারব্ধ পাপ বা দুষ্কৃতি হইতেই জীব নীচ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। আবার প্রারব্ধ পুণ্যের ফলে ব্রাহ্মণাদি পুণ্যময় জন্ম প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্ব-জন্মের কর্ম্মজনিত আরব্ধ দুষ্কৃতিফলে নীচ জন্ম, আবার পূর্ব্বজন্মের আরব্ধ পুণ্যফলে উচ্চ জন্মলাভ। আবার বর্ত্তমান জন্মে যিনি যেরূপ কর্ম্ম করিবেন পর জন্মে সেই কর্ম্মফলানুসারে উচ্চাবচ যোনি লাভের অধিকারী হইবেন। কর্ম্মরাজ্যের লোক এই পাপপুণ্যের অধীন হইয়া কভু স্বর্গে, কভু নরকে, কভু ব্রাহ্মণ কভু চণ্ডাল, কভু রাজা, কভু প্রজা, এইরূপ উচ্চাবচ অবস্থা ভোগ করিয়া থাকে। এই সকল কথা অভক্ত জীবনের কথা। ভক্ত জীবনে এইরূপ পাপ-পুণ্যময় অধিকারের কথা নাই।

ভগবদ্ভক্ত ইহজন্মেই পরাগতি লাভ করিতে পারেন যথা—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্।।

পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা পাপের বীজ নষ্ট হয় না। কিছুকালের জন্য প্রশমিত থাকে মাত্র। পুণ্যক্ষয়ে আবার পাপের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। হস্তীকে স্নান করাইয়া দিলে যেমন যতক্ষণ সে জলে থাকে ততক্ষণই
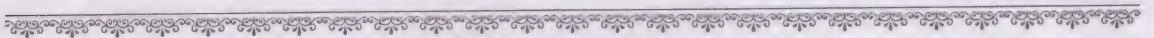
তাহার শরীর পরিষ্কৃত অবস্থায় দৃষ্ট হয়। কিন্তু নদী হইতে উঠিয়াই হাতী আবার শুণ্ডদ্বারা সমস্ত গাত্রে ধূলি নিক্ষেপ করিতে থাকে। পুণ্য ও কর্ম্মের অবস্থাও তদ্রূপ। যাহারা পুণ্য কর্ম্মের ফলে ব্রাহ্মণ জন্ম লাভ করিয়াছেন তাহারা যে চিরকালই পুণ্যাত্মা থাকিয়া বাহ্মণই থাকিবেন তাহা শাস্ত্র, সদ্‌যুক্তি ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা কোন প্রকারেই সিদ্ধ হয় না। যেমন পুণ্যকর্ম্মের ফলে জীব উচ্চ যোনি লাভ করেন আবার পাপ কর্ম্মের ফলে এই জন্মেই নীচ ও শূদ্র হইয়া যাইতে পারেন। মনু স্মৃতিতে লিখিয়াছেন—

"যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
সজীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ।।"

পুণ্যবান্ ব্যক্তির রুচিবশতঃ বেদশাস্ত্র অধ্যয়নের অধিকার; পাপাত্মা ব্যক্তির রুচিক্রমেও উহাতে অধিকার নাই। পূর্ব্বকৃত পুণ্যফলে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিগণের বেদাদিতে অধিকার আর পূর্ব্বকৃত পাপ ফল হেতু শোককারী শূদ্রগণের উহাতে অনধিকার। কিন্তু যাঁহারা পুণ্য জন্ম লাভ করিয়া আবার পাপযোনিসুলভ শোকে অভিভূত হন এবং সেই জন্য বেদাদি অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া আহার নিদ্রা ভয় ইন্দ্রিয়তর্পণ প্রভৃতি ইতর বিষয়ের চেষ্টায় মনোনিবেশ করেন তাহারা ইহ জন্মেই অতি শীঘ্র অধস্তনগণের সহিত শূদ্রত্ব লাভ করিয়া থাকে।

কিন্তু ভগদ্ভক্তির ফল নিত্য। ভগন্নামশ্রবণ, শ্রবণানন্তর কীর্ত্তন, বন্দন, স্মরণাদি দ্বারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে মুহূর্ত্ত মধ্যে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে তদ্রূপ প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ পাপসমূহ ইহজন্মেই সদ্য চিরতরে বিনষ্ট হইয়া যায়। আগমাপায়ী পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠান বা প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা সাময়িক পাপ প্রশমনের ন্যায় কিছুকাল পরে পাপ বীজ পুনরায় অঙ্কুরিত হয় না। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে কপিলদেব দেবহূতিকে বলিয়াছেন—

"যন্নামধেয় শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্ যৎ প্রহ্বণাদ্ যৎ স্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ।।"

অর্থাৎ হে ভগবন্! কুক্কুরভোজী অন্ত্যজ কুলোৎপন্ন ব্যক্তি যদিও আপনার নাম শ্রবণানন্তর তাহার কীর্ত্তন, আপনাকে নমস্কার এবং আপনার স্মরণ করেন তবে তিনিও তৎক্ষণাৎ সোমযাগ কর্ত্তা ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজ্য হন। আর যাঁহারা আপনার দর্শনলাভ করেন তাঁহাদের কথা আর কি বলিব! অথবা সোমযাগকারী ব্রাহ্মণ হইতেও যে কোন কুলোৎপন্ন নামোচ্চারণকারী পুরুষ অধিক শ্রেষ্ঠ। অহো নামগ্রহণকারী পুরুষের শ্রেষ্ঠতার কথা আর কি বলিব! তাঁহার চরিত্র অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক। যাঁহার জিহ্বার মাত্র এক প্রান্তেও ভগবানের নাম একটিবারের জন্য অসম্পূর্ণভাবেও উচ্চারিত হয় তিনি শ্বপচ গৃহে আবির্ভূত হইলেও এই নামোচ্চারণের জন্যই সর্ব্ব-পূজ্যতম। কেননা তিনি পূর্ব্ব জন্মেই কর্ম্মময় ব্রাহ্মণ জীবন লাভ করিয়া বাহ্মণাধিকারের যাবতীয় তপস্যা, যজ্ঞ, তীর্থ, স্নান, বেদাধ্যয়ন সদাচারাদি সম্পন্ন করিয়াছেন। বর্ত্তমানযুগে দৈন্যবশতঃ ও কর্ম্মময় ব্রাহ্মণ জীবন অপেক্ষা নামাশ্রয়ী বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য কোটী কোটী গুণে শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদন করিবার জন্য অসুরবিমোহনার্থ নামাশ্রয়ী নীচকুলে উদিত হইয়াছেন।

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মাণূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে।।

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু "যন্নামধেয় শ্লোকের "দুর্গমসঙ্গমনী" টীকায় কৈমুতিক ন্যায় উল্লেখ করিয়া ভক্তি প্রভাবে বৈষ্ণবের দুর্জ্জাতিত্বাভাব বা ব্রাহ্মণত্ব নিত্যসিদ্ধ ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। "তস্মাদ্ভক্তিঃ পুণাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাদিতি তু কৈমুত্যার্থমেব প্রোক্তমিত্যায়াতি। অর্থাৎ অসম্যক্ ব্রহ্ম ও আংশিক পরমাত্ম প্রতীতি অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব সম্যক্ ভগবৎ প্রতীতিরই অন্তর্গত। সুতরাং ভগবদ্ভক্তের পুণ্যময় কর্ম্ম ব্রাহ্মণতা ত' অতি সামান্য কথা, পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা বা ব্রহ্মজ্ঞতাও ভগবদ্ভক্তের চরিত্রে অন্তর্ভুক্ত। দুর্গম-সঙ্গমনীতে "শিষ্টাচারাভাবাৎ সাবিত্র্যং জন্ম নাস্তীতি জন্মান্তরাপেক্ষা বর্ত্ততে" অর্থাৎ "শিষ্টাচারাভাব হেতু অদীক্ষিত নামশ্রবণকারীর সাবিত্র্য জন্ম নাই। জন্মান্তরের অপেক্ষা করে" এইরূপ কথা যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে সেই জন্ম শৌক্র জন্ম সম্বন্ধীয় প্রতিবন্ধক নহে। 'জন্ম' বলিতে শ্রীমদ্ভাগবত এবং মন্বাদি শাস্ত্র ত্রিবিধ জন্মের উল্লেখ করিয়াছেন—শৌক্র, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য। যে কাল পর্য্যন্ত সাবিত্র্য সংস্কার না হয়, তদবধি দ্বিজন্ম হয় না। দীক্ষা-সংস্কার গৃহীত হইবার পর সাবিত্র্য জন্মের ব্যাঘাত নাই। উহা শিষ্টাচারের অভাব নহে। তবে 'শিষ্টাচারাভাব' বলিয়া যে উক্তি দেখা যায় উহা অদীক্ষিত, নামশ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণকারীর পক্ষে, দীক্ষিতের পক্ষে নহে। ভগবানের নাম শ্রবণ কীর্ত্তন-স্মরণ প্রভবে সদ্যই শৌক্র ব্রাহ্মণের ন্যায় সবন যজ্ঞে অধিকার লাভ হয়। কিন্তু বৈদিক সংস্কার গ্রহণ না করিলে সাবিত্র্য জন্ম হয় না। অদীক্ষিত ব্যক্তির সাবিত্র্য জন্মের কথা শিষ্টাচার বিরুদ্ধ সত্য। কিন্তু পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষার পরবর্ত্তীকালে অর্থাৎ আগম সম্পন্ন হইবার পরে সংস্কার গ্রহণের প্রথা মহাভারতের যুগ হইতে চলিয়া আসিয়াছে।

"শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ।" (মহাভারত)

যদি দীক্ষিত ব্যক্তির পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব ও সাবিত্র্য জন্ম সিদ্ধই না হইবে তাহা হইলে শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে ভরদ্বাজ সংহিতা বাক্য এরূপ কেন?

"স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব হি মন্ত্রতঃ।
বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ।।"

অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের প্রদত্ত মন্ত্রপ্রভাবে জাত বিনীত পুত্রদিগকে (শিষ্যদিগকে) গুরুদেব সংস্কার প্রদান করিয়া, স্বয়ং উহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্যে স্থাপনপূর্ব্বক সম্বন্ধ- জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিবেন।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত—

"তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্।"

এবং এই শ্লোকের শ্রীল সনাতন গোস্বামীর টীকায় "দ্বিজত্ব" শব্দে "বিপ্রত্ব" এবং শ্রীমদ্ ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট বর্ণাশ্রমধর্ম্মকথন প্রসঙ্গে বৈষ্ণবরাজ শ্রীনারদ গোস্বামীর—

"যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ"

এবং এই শ্লোকের ভাবার্থদীপিকায় শ্রীধরস্বামিপাদের ''যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত তদ্বর্ণান্তরম্ তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, ন তু জাতিনিমিত্তেন ইত্যর্থঃ'' প্রভৃতি বাক্য এবং ''যন্নামধেয়'' শ্লোকেই শ্রীধরস্বামিপাদের টীকায় ''জন্মান্তরে তৈস্তপো হোমাদি সর্ব্বং কৃতমস্তীতি'' অর্থাৎ ইহ জন্মে নামগ্রহণকারী ব্যক্তি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেই শৌক্র ব্রাহ্মণজন্মের অধিকারোচিত সর্ব্ববিধ তপস্যা, যজ্ঞ তীর্থস্নান এবং সদাচার সম্পন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন—এই সকল কথার সার্থকতা কিরূপে সম্পাদিত হইতে পারে? যদি নামশ্রবণকারী নিম্নকুলোদ্ভূত ব্যক্তির সাবিত্র্য জন্মের জন্য জন্মান্তরের অপেক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে ''যন্নামধেয়'' শ্লোকের কোনই সার্থকতা থাকে না। নামভজন পরায়ণ বৈষ্ণব কি সামান্য কর্ম্ম ব্রাহ্মণতার জন্য পরজন্মের অপেক্ষা করিবেন? অথবা পূর্ব্ব বেদাধ্যায়ী সদাচারী ব্রাহ্মণতা হইতে পদোন্নতি লাভ করিয়া বর্তমান জন্মে নামগ্রহণকারী বৈষ্ণব হইয়াছেন। যিনি পূর্ব্বজন্মেই বেদ্য লাভ করিয়াছেন তিনি কি আবার উপনয়নাধিকারের জন্য পরবর্ত্তী শৌক্র জন্মের অপেক্ষা করিবেন? তবে বর্ত্তমান জন্মে যে নামগ্রহণকারীকে সাবিত্র্য উপনয়ন দেওয়া হয় তাহা বাজসনেয়ীগণের শিষ্টাচার ও একায়নশাখী পরমহংস বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠত্ব সংস্থাপন এবং মূর্খলোকগণকে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিরূপ ভীষণ অপরাধের হাত হইতে উদ্ধারকরণার্থই জানিতে হইবে। শ্রীজীবপাদের কৈমুতিক ন্যায় অনুসারে বিচার করিলেও একথা কিছুতেই সিদ্ধ হয় না। শ্রীধরস্বামিপাদ নাম শ্রবণকারীর পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেই ব্রাহ্মণাধিকার যোগ্য যে সকল তপস্যাদি সম্পন্ন হইয়া যাওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহাই বা কি প্রকারে সিদ্ধ হয়? বহু জন্ম ব্রাহ্মণ হইয়া কোনও বিশেষ কুল বা বিশেষ দেশকে পবিত্র করিবার জন্য বৈষ্ণব তৎকুলে বা দেশে আবির্ভূত হইয়াছেন। আবার কি বৈষ্ণবের অধোগতি হইবে? অর্থাৎ বৈষ্ণবতা হইতে অধঃপতিত হইয়া প্রাকৃত ব্রাহ্মণতা লাভ হইবে? যে নামের প্রভাবে কুক্কুরভোজী চণ্ডালও ব্রাহ্মণ যোগ্য হয় সেই নাম আরও অধিকতর ভাবে যাজন করিতে করিতে কি বৈষ্ণবের কেবলমাত্র উপনয়ন সংস্কারের জন্য জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইবে? এইরূপ অদ্ভুত মনঃকল্পিত সিদ্ধান্ত কখনই শ্রীজীবপাদের সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। শ্রীজীব ভক্ত্যেকরক্ষক শ্রীধর স্বামিপাদ, স্মৃত্যাচার্য্য শ্রীগোপাল ভট্ট, গুরুদেব শ্রীসনাতন, মহাভারত, নারদ পঞ্চরাত্র প্রভৃতি আচার্য্য ও শাস্ত্রের আচার ও শিক্ষার বিরোধী কথা কখনই বলিতে পারেন না। ''সাবিত্র্যং জন্ম নাস্তীতি'' শব্দের দ্বারা 'অদীক্ষিতস্য শ্বাদস্য দীক্ষাং বিনা সাবিত্র্যং জন্ম নাস্তি'' ইহাই বুঝিতে হইবে। 'জন্মান্তরাপেক্ষা বর্ত্ততে' এই শব্দের দ্বারা ''অদীক্ষিতস্য অবৈষ্ণবস্য শ্বাদস্য জন্মান্তরাপেক্ষ্য বর্ত্ততে ইহা বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ অদীক্ষিত নামগ্রহণকারী ব্যক্তির সাবিত্র্য সংস্কার গ্রহন শিষ্টাচারবিরুদ্ধ। কিন্তু দৈক্ষ্যজন্মের দ্বারা দ্বিজত্ব অর্থাৎ বিপ্রত্ব লাভ হইলেও, ''তত্তেনৈব **বিনির্দ্দিশেৎ** জাতানেব হি মন্ত্রতঃ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ'' এই শিষ্টাচারানুমোদিত শাস্ত্রাদেশানুসারে দীক্ষিত ব্যক্তির সাবিত্র্যজন্মের অপেক্ষা করিতেছে। অর্থাৎ যেমন শৌক্র ব্রাহ্মণজন্মে দুর্জ্জাতিত্বের অভাব থাকিলেও সাবিত্র্য সংস্কার ব্যতীত তাঁহার যজ্ঞাদি কর্ম্মে অধিকার নাই তদ্রূপ অদীক্ষিত নামগ্রহণকারীর সদ্য সদ্যই পবিত্রতা লাভ হইলেও পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাবিধি পালনপূর্ব্বক দৈক্ষ্যজন্ম লাভের পরও বিধিমত সাবিত্র্য সংস্কার গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত অর্চ্চনাদি কার্য্যে তাঁহার অধিকার নাই।

একায়নশাখী পরমহংস-বৈষ্ণবগণ অনেক সময় বর্ণাশ্রমের বিঘ্ন কর্ণবেধ চৌড়াদি উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করেন না বলিয়া মূর্খলোকে তাঁহাদিগকে শূদ্র মনে করিয়া বৈষ্ণবাপরাধে পতিত হয়। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু ও হরিদাস, ঠাকুর দৈন্যবশতঃ নিজদিগকে "নীচ" বলিয়াছেন বা শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করেন নাই। ইহা তাঁহাদের অসুরমোহনলীলা। দৈবী-মায়া বিমোহিত অপরাধিকুল এতই ভ্রান্ত যে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের হরিদাস ঠাকুরকে কোটী ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠজ্ঞানে শ্রাদ্ধপাত্র প্রদান ও শ্রীগৌরসুন্দরের উভয়ের প্রতি সম্মানের আদর্শ একবারও দেখিয়াও দেখেন না। এই জন্যই যমরাজ তাঁহার দূতগণকে বলিয়াছিলেন যে দৈবীমায়া-বিমূঢ় কর্ম্মজড়ব্যক্তিগণ কিছুতেই বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিবেন না। উলূকের সূর্য্যকিরণ দর্শন-যোগ্যতা বিধাতা কর্ত্তৃকই প্রতিহত। বৈষ্ণব—ব্রাহ্মণের গুরু। ব্রহ্মজ্ঞ ভগবদুপাসকই বৈষ্ণব।

দু'টী স্রোত

সুখ দুঃখ, হাসি-কান্না আসে আর যায়—দুনিয়ার নিয়মই এই।

মাঘের দারুণ শীতে হি-হি করে যখন আবালবৃদ্ধবণিতা, পরক্ষণেই আবার বসন্ত-বাণী স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার করিয়া প্রতিষ্ঠিতা হন মলয়াচলের উচ্চ সুখ-সিংহাসনে।

ফাল্গুনী পঞ্চমীর বেলা অবসানে একদিন ঘটনাক্রমে দুই কবি ধীরমন্থরগতিতে প্রবাহিতা কীর্ত্তিনাশা-তটে উপস্থিত হন। সূর্য্যি-ঠাকুর দিবসের কার্য্য সমাপন করিয়া ক্লান্তকলেবরে বিশ্রামাশায় স্রোতস্বতীর সুশীতল ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছেন, পশ্চিম গগনে এখনও রক্তিমাভা একেবারে আকাশের গায়ে মিলিয়া যায় নাই, অদূরস্থ বৃক্ষশ্রেণীর সবুজ রঙ্গের পাতাগুলি মলয়াঘাতে একটু একটু নড়িতেছে; দু' একটী পক্ষি মৃদু তরঙ্গের গা ঘেশিয়া উড়িয়া যাইতেছে, রাখাল বালকগণ প্রায়ই ধেনুসহ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে, মাঝে মাঝে ভাটীয়াল সুরে গা ঢালিয়া নাবিকগণ দাঁড় টানিয়া নৌকা বাহিয়া চলিয়া যাইতেছে—এম্নি সময় দু'টী কবি দাঁড়াইয়া আছেন নীরব নিস্পন্দভাবে ঐ নদী তটে।

একজনের উজ্জ্বল গৌর বর্ণ, হাত দু'খানি আজানুলম্বিত, চোক, দু'টী পলাশফুল্লের মত, তিলফুলের ন্যায় নাসিকার অগ্রভাগ, আর ওষ্ঠাধর তাঁহার রাঙ্গা টুক্‌টুকে। ইহার নাম "প্রত্যক্"—লোকে ডাকে "অনুকূল"। অপর ব্যক্তি দেখিতে খর্ব্বাকৃতি, শ্যামবর্ণ—অল্পকথায় কুৎসিত। পিতা-মাতা আদর করিয়া ডাকেন "পরাক্" তবে সর্ব্বসাধারণের নিকট তিনি "প্রতিকূল" নামেই পরিচিত।

অনুকূল—(অস্পষ্ট স্বরে স্বগত) ওঃ! এত বড় বিশাল নদী, তবু জোয়ার-ভাটা! (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, বল্‌তে পারেন মশায়, এই যে ক্ষণকাল পূর্ব্বে অপ্রতিহতা গতিতে এই পদ্মা সাগরাভিমুখে ছুটিয়াছিল, কোন্ প্রতিকূলাঘাতে তাহার স্রোতের গতি পরিবর্ত্তিত হ'ল? আর দেখুন, বদ্ধ-মানবকে ভগবদ্ভক্তি দিবার জন্য কতই না সুগম পথ দেখিয়ে দিই, তবু যে তা'দের কি কন্টক পায়ে বিদ্ধ হয় বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

প্রতিকুল— (সহাস্যে) কি অনু! আঁধারে আমায় চিনতে পারনি বুঝি? কেন, অনেক দিন ত' আমরা এক সঙ্গে একই জননীর ক্রোড়ে লালিত পালিত হ'য়েছি। তারপর মাতৃভক্ত তুমি এক কাজে ব্রতী, আর আমি ছয় প্রকারে মানব হৃদয়ের ভক্তি বিনষ্ট ক'রে থাকি। মানব জানে না যে কোন্ প্রবল বাত্যা এসে তা'দিগকে ভক্তির পথ থেকে বিচ্যুত ক'রে নিমজ্জিত ক'রে দেয় তাদের জীবন-তরণী কোন্ ভোগময় সাগরের অগাধ জলে—

জানে না যে তা'রা—

অত্যাহার-প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌলাঞ্চ ষড় ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি।।

তুমি, আর কি কর্‌বে বল? আমার সঙ্গে কি আর পার্ব্বে? তোমার যে কাজ, আমার কিন্তু ঠিক্ বিপরীত!

অনু—কি প্রতি, তুমি? তুমি আমার সঙ্গে এত শত্রুতা কর্‌ছ? তবে এবার কি কর্ব্বো, জান?

প্রতি—বলই না, শুনি।

অনু—তোমার কঠোরাঘাতে দুর্ব্বল মানব নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়ে। তাই এবার তোমার স্বরূপ প্রকাশ করে দিব, আর খুব উৎসাহ দিয়ে বল্‌বো—

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ ষড়্‌ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি।।

ভগবদ্ভক্তি লাভ কর্ত্তে হ'লে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা যেমন প্রয়োজন, ভক্তিযজনও তদনুরূপ দরকার। জ্ঞান-কর্ম্মানাবৃত ভক্তির জন্য অখিল চেষ্টাই উৎসাহ। ঔদাসীন্যে ভক্তি লোপ হয়। ভক্তিই মানব জীবনের একমাত্র উপায় ও উপেয়, সুতরাং ইহাতে দৃঢ়তা চাই। "ভক্তিমার্গ ইহ কোটীকন্টকরুদ্ধ" হ'লেও অবিচলিত চিত্তে স্থির-বিশ্বাসের সহিত তদনুকরণ করাই ধৈর্য্য। মানব যখন শ্রীল হরিদাসঠাকুরের ন্যায় ধৈর্য্যসহকারে বল্‌তে শিখবে যে,—

খণ্ড খণ্ড হয় যদি ছাড়ে দেহপ্রাণ।
তথাপি বদনে না ছড়িব হরিনাম।।

তখনই সে আমার আনুগত্যে আমার দেওয়া ধন হরিভক্তি অর্জ্জনে সমর্থ হ'বে। ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি বাঞ্ছা দূরে পরিহারপূর্ব্বক কৃষ্ণানুশীলন করতঃ জ্ঞানী কর্ম্মী ও অন্যাভিলাষীকে বিষয়মূঢ় জ্ঞানে সঙ্গ ত্যাগ করিয়া ভক্ত সঙ্গই বাঞ্ছনীয় কারণ—

সাধু সঙ্গ সাধু সঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লব মাত্র সাধু সঙ্গে সর্ব্ব সিদ্ধি হয়।।
অসৎ সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর।।

"কৃষ্ণসেবায় উৎসাহ, সেবাবিষয়ে নিশ্চয়তা, কৃষ্ণসেবায় অচঞ্চলতা, কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্যে তত্তদনুষ্ঠান, কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত অন্য সঙ্গ পরিবর্জ্জন, কৃষ্ণ- ভক্তের অনুসরণ এই ছয় প্রকার অনুষ্ঠানে ভক্তি বৃদ্ধি হয়।

প্রতি—আচ্ছা, এখন বল দেখি আমার স্বরূপ সম্বন্ধে কি বল্‌বে?

অনু—যে স্থানে কৃষ্ণকথাসুধা সরিৎ নাই, যেখানে কৃষ্ণভক্ত নাই, যেখানে কৃষ্ণের নামরূপগুণশীলাদি কীর্ত্তিত হয় না, সে স্থানেই তোমার অধিষ্ঠান। তাই তোমার ন্যায় ভক্তি-বিরোধী যে স্থলে অবস্থান করে তথায় অন্য দেবতুল্য মানব থাকিলেও সেই স্থান অবিলম্বে ত্যজ্য। কারণ শ্রীমদ্ভাগবতও একথা বলেন, যথা (ভাঃ ৫।১৯।৩৫)—

ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগা ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখামহোৎসবাঃ সুরেশ লোকোপি ন বৈ স সেব্যতাম্।।

অথবা, (ভা ১০।১০।৮)—

ন হ্যন্যে জুষতো জোষ্যান বুদ্ধিভ্রংশো রজোগুণঃ।
শ্রীমদাদ্যা ভজাত্যাদির্যত্র স্ত্রীদ্যূতমাসবঃ।।
হন্যন্তে পশবো যত্র নির্দ্দয়ৈবজিতাত্মভিঃ।
মন্যমানৈরিমং দেহমজরামৃত্যু নশ্বরম্।।

যে স্থানে জড়জ্ঞানাভিমানী মানব বুদ্ধিভ্রংশকারী রজোগুণের প্রয়োজন নাই দে'খে মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হ'য়ে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গে, দ্যূতক্রীড়ায় বা মদ্যপানে রত হয়, সেখানেই তোমার স্বরূপের প্রকাশ, তাই সেই স্থান পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। কিম্বা যে স্থলে ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিগণ অনিত্য জড়দেহকে অজর অমর মনে ক'রে ভোগতৃপ্তির জন্য পশু বধ ক'রে পশু জীবনের পরিচয় দেয়, সেই স্থান পরিত্যাগ করবার জন্য মানব সমাজে ঢেড়রা বাজিয়ে দিব। তখন বুঝ্‌বে মজাটা কেমন।

প্রতি—বেশ অনু। বল্‌তে শিখেছ বেশ। ছেলে বয়স থেকেই যে তোমার অমন স্বভাব তা' আমি জানি। কিন্তু একথা ঠিক্ জেনো, অনু, তুমি দুনিয়ার নিকট আমায় একেবারে বোকা সাজাতে পার্‌বে না। তুমি যতই কেন মেদিনী কম্পিত ক'রে স্বভাবজলদগম্ভীরনিনাদে বল না কেন যে (ভাঃ ১০।২৩।৩৯)

ধিক্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্‌যত্তদ্ধিগ্ব্রতং ধিগ্বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্ কুলং ধিক্‌ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে।।

তোমার ঐ আকুল ক্রন্দন, ব্যাকুল ব্যথা, ভোগবিমূঢ় জীবের কর্ণে প্রবেশ ক'রে তা'দের হৃদয় বিদীর্ণ কর্‌বে না। লোক আছে খুব কমই তোমার অন্তর্ম্মধু বহিস্তিক্ত বাণী শোন্‌বার জন্যে। আমি যতটা জীব-হৃদয়ের প্রতিশিরা তন্ন তন্ন ক'রে দেখেছি, তুমি ততটা কোত্থেকে পার্‌বে বল? আমি যে তা'দের বন্ধু ক'রে নিয়েছি।

অনু—তা' ঠিক্। ঘাত-প্রতিঘাত বিবাদ-বিসম্বাদ, শত্রু-মিত্র চিরদিন সমভাবে চল্‌বে। তবে একসময়ে এক একটীর প্রাবল্য অধিক। এক সময়ে নবজাত শিশুর মুখ দর্শনে জনক-জননীর হৃদয় দু'খানি সুখে-

গর্ব্বে-আশায় ভরপুর হয়, আবার পরক্ষণে ধন-জন-সম্পন্ন, রূপে-গুণে গুণান্বিত যুবক পুত্রের অকালমৃত্যুতে জননী পাগলিনীপ্রায়, পিতা দিশেহারা। আজ বালক ধূলা-খেলায় দিন কাটাচ্ছে, কাল আবার সে-ই সংসারের বোঝা মাথায় চাপিয়ে ক্লান্ত কলেবরে কালের ভয় হৃৎকম্পকারী মুখ ব্যাদানের দিকে অগ্রসর হ'য়ে তাহার করালকবলে নিষ্পেষিত হচ্ছে। রোদ্-বৃষ্টি, শীত-গ্রীষ্ম, জোয়ার-ভাটা ভক্তাভক্ত এ দু'টী স্রোত চিরদিনই থাক্‌বে। কিন্তু, প্রতি, তুমি এ ও যেন—যখনই তোমার দুষ্টবুদ্ধির প্রখরতায় দুর্ভাগা জীব ভ্রমে পড়ে দুঃখার্ণবে হাবুডুবু খাবে তখন আমিও আমার কার্য্যারম্ভ কর্ব্বো—বেচারাদের জন্যে আমার প্রাণ যে কাঁদে, প্রতি।

প্রতি—ধন্য অনু, তুমিই ধন্য! তোমার এত কোমল হৃদয়। দেখ, (কোমল স্বরে) দেখ, আমরা দু'জনাই কৃষ্ণের দাস। কৃষ্ণই আমাদের প্রাণপতি। সকল জীবকে তাঁ'র কাছে নিয়ে যাওয়া আমার কি অনিচ্ছা? তবে একটা কথা কি যে বদ্ধজীব বড় বোকা। তা'রা জানে না যে কৃষ্ণসেবায় কি অপার অবিমৃষ্য আনন্দ! তাই তা'রা অহৈতুকী ভক্তি যাজন না ক'রে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা নিয়েই ব্যস্ত।—আমায় যা'ই বল ভাই, তাই এদের নিয়ে একটু খেলা না করে থাক্‌তে পারি না। খুব নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে মারি। . . . . যাক্ এবার দেখ্‌চি তুমি উঠে প'ড়ে লেগেচ, তুমি যেমন বল্‌চ—"সঙ্গং ন কুর্য্যাদসতাং শিশ্নোদর তৃপাং ক্বচিৎ" তাতে লোক এবার আমার ফাঁকি বুঝে ফেল্‌বে। এবার দেখ্‌ছি ধর্ম্মের নামে আর স্ত্রী দাস্য চল্‌বে না। তোমারই জয় হোক্, অনু, তোমারই জয় হোক্। সত্যি—তোমার কথাই সত্যি। হরি-ভক্তিই জীবের একমাত্র উদ্ধার—একমাত্র নিত্যসম্বল।

অনু—যদি বুঝে থাক ভাল, নৈলে তোমার যন্ত্রনায় হতভাগ্য জীব বুঝে না যে—

সর্ব্বেষু শশ্বত্তনুভৃৎস্ববস্থিতং যথা খমাত্মনমভীষ্টমীশ্বরং।
বেদোপগীতঞ্চ ন শৃণ্বতেঽবুধা মনোরথানাং প্রবদন্তি বার্ত্তয়া।।

তাই তোমার উপর বড় রাগ হয়। তুমি সব সময়ই লোকদের সত্যি কথা শুন্‌তে বাধা দেও। অমন কর তো, আর তোমার মুখ দেখ্‌ব না।

প্রতি—রাগ করো না ভাই, আমি যে তোমার চিরসাথী চিরদিনই তোমার সঙ্গে সঙ্গে থেকেও স্বীয় স্বভাবটা দু' একবার জীবদের দেখাব—স্বভাব না যায় ম'লে। কিন্তু শেষে কিন্তু আবার তোমারই সহায় হব। রাগ ক'রো না, আদর স্নেহের ভিখারী আমি।

অনু—তা বেশ। তবে চল দুনিয়ার দ্বারে দ্বারে বলি গে—

বল কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ ধনপ্রাণ।।

এস, করজোড়ে উচ্চকণ্ঠে গাই—

ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং ক্বচিন্ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বু জাসবঃ।
মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো বিধৎস কর্ণাযুতমেষ মে বরঃ।।

হে নাথ! ওগো ঠাকুর! তোমার শ্রীচরণকমলমধু যাতে নেই, তা' আমরা আদৌ বাঞ্ছা করি না। ওগো তোমার পায়ে পড়ি, আমাদের অযুত কর্ণ দাও যেন তোমারই মহদ্ভক্তগণের মুখবিগলিত উচ্ছ্বাসিত হরিনাম-সুধা পান কর্ত্তে পারি—আমরা আর অন্য কোন বর কামনা করি না।

দেখিতে দেখিতে আকাশের শেষ লাল টুক্‌টুকে আভাটুকু মিলিয়ে গেল। সন্ধ্যারাণী ঘোম্‌টা টানিয়া দিল। দিবসের ঘোর কোলাহল আর নাই, নাই আর সংসারচিন্তার দুর্ব্বিষহ যাতনা! নক্ষত্রখচিত নীলাকাশে ছড়িয়ে গেল চাঁদের আলো। কমলিনী মলিনী দিবসাত্যয়ে। আর হাসিয়া উঠিল ধরণী ঐ চাঁদিনী রাতে। পদ্মাবতীর ফিরিয়া গেল স্রোতের টান, কানায় কানায় ভরিয়া গেল জোয়ারের জল। বিজয়ডঙ্কা বাজাইবার জন্য সহাস্যবদনে প্রত্যক্ গ্রামে প্রবেশ করিলেন—পরাক্ চুপি চুপি তাঁহার পিছু ধরিল! —উভয়ে নদীর তট ছেড়ে প্রবেশ করিল লোকারণ্যের মধ্যে। কীর্ত্তিনাশার দু'টী স্রোত (জলের উপরের ও নিম্নের) যেমন অভিশপ্ত দেশ বিধ্বস্ত করিবার মানস উত্তাল তরঙ্গ বেগে হুহুঙ্কার নাদ প্রবাহিতা হয়, প্রতি অনুত্ব আজ অধর্ম্ম-গ্লানির বাঁধ ভাঙ্গিয়া ধর্ম্মবন্যায় দেশ প্লাবিত করিবার জন্য প্রবেশ করিল পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে। বেশ দু'টী স্রোত।

গঙ্গা

অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি।
আনন্দচিন্ময়সদুজ্জলবিগ্রহস্য গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

শ্রীগুরুদেবের বুদ্ধি-প্রেরণায় ও সজ্জনসমূহের আনুগত্যে যদি উল্লিখিত শাস্ত্রতাৎপর্য্য আলোচনা করা যায় তবে জ্ঞাত হওয়া যায় যে—শ্রীগোবিন্দদেবই আদিপুরুষ তাঁহার শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদ্‌ঘন, আনন্দময় ও সর্ব্ব সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের সার। ''বিগ্রহস্য অঙ্গানি'' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে—অচিন্ত্যশক্তির সর্ব্ব বিরুদ্ধ- ধর্ম্ম যিনি বিশেষরূপে অঙ্গসমূহে গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রহণ বৈশিষ্ট্য কি? যাঁহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অপর সমূহ ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি আছে। যথা হস্তদ্বয়ে যিনি দেখেন, শুনেন, গমন করেন, পালন করেন, ভোজনাদি করিতে পারেন। চক্ষু নাসিকাদ্বারা গমন, ভোজন, রসাস্বাদন, সৃষ্টিপ্রভৃতি করিতে পারেন। পদযুগল দ্বারা ও অপরাপর ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া করিতে পারেন। ইহাই কৃষ্ণের পরমাচিন্ত্যশক্তির বৈভব ও ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য।

''ঐশ্বর্য্যযোগাৎ ভগবান্ বিরুদ্ধার্থোঽভিধীয়তে।
গুণা সর্ব্বেঽপি যুজ্যন্তে হ্যৈশ্বর্য্যাৎ পুরুষোত্তমে।।'' মাধ্বভাষ্য

আরও শ্রবণ করা যায় যে— (শ্বেতাশ্বতর)

অপাণি-পাদো জবনো গৃহীতা পশ্যত্যচক্ষু সশৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং নচ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্।।

তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রগণ্য মহাপুরুষ (সৃষ্টেঃ পুরা আসীৎ ''অহমেবাসমেবাগ্রে'') শ্রীকৃষ্ণ বলা যায়। তাঁহার
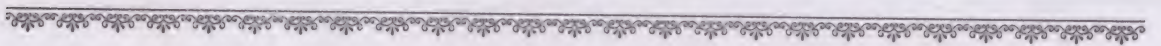
অব্যভিচারী বেত্তা কেহই নাই। তিনিই বেদ্য বস্তু ও একমাত্র বেত্তা। অন্যের না জানিবার কারণ অচিন্ত্য-শক্তিমত্তা। যেহেতু তিনি অপাণি হইয়াও গ্রহণ করেন, অপদ হইয়াও শীঘ্র গমন করেন, অচক্ষু হইয়াও দর্শন করেন এবং অকর্ণ হইলেও শ্রবণ করেন"। এই ব্যতিরেকমুখী শ্রুতিবাক্যে যে অচিন্ত্যশক্তি বিষয় জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে তাহা পূর্ব্বোক্ত অন্বয়মুখী স্মৃতিবাক্যে সমন্বয় ব্যক্ত হইতেছে। যদি পরমপুরুষ কৃষ্ণ হস্তদ্বারা গমন, ভোজন দর্শন শ্রবণাদি করিতে পারেন তবে অব্যভিচারিণী শ্রুতি নিশ্চিতরূপে কি করিয়া বলেন যে, ইহাই পুরুষের হস্ত। যেহেতু অন্য ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিও দৃষ্ট হইতেছে। চক্ষুকর্ণনাসিকাদির বৃত্তি যদি পদে দৃষ্ট হয় তবে শ্রুতি কি প্রকারে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারেন যে ওহে ইহাই পুরুষের পদ। ইহা দ্বারা তিনি কেবল গমনই করেন।

অসীমবৃত্তিযুক্ত কৃষ্ণবিগ্রহে সসীমবৃত্তি আরোপ হইয়া নির্দ্দোষ শ্রুতিবাক্যে দোষ আনয়ন করিতে পারে। অচিন্ত্য শক্তিবৈভব বর্ণনকালে শ্রুতি প্রায়ই গৌণবৃত্তি অবলম্বন করেন। ইহাই সর্ব্বদোষহীন বেদের অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত ও ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক। সেই নিমিত্ত বিরুদ্ধ অচিন্ত্য-অনন্তশক্তি বৈশিষ্ট্য গ্রহণকারী গোবিন্দদেবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে উপাদেয় অনুপাদেয় অংশ কিছু শ্রবণ করা যায় না। যথা—বরাহপুরাণ।

"সর্ব্বে নিত্যা শাশ্বত্যশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ।
হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজা ক্বচিৎ।।
অন্যূনানধিকাশ্চৈব গুণৈঃ সর্ব্বৈশ্চ সর্ব্বতঃ।
দেহদেহিভিদা চৈব নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ।।"

অতএব দেহদেহীভেদ সর্ব্বাত্মময় পরমেশ্বরের নাই দেহদেহী সর্ব্বশঃ সচ্চিদ্‌ঘন আনন্দোজ্জ্বলবিগ্রহ। বিষ্ণু বিগ্রহের উপাদেয় অংশ যে উত্তমাঙ্গ মস্তক বা অনুপাদেয় অঙ্গ যে পদ এই প্রকার ভেদ লক্ষ্য করা যায় না, যেহেতু তিনি অপ্রাকৃত ও অধোক্ষজ বস্তু। দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র, জ্ঞানপটু, মনোধর্ম্মী, অক্ষজ-জ্ঞান- বিশিষ্ট ব্যক্তি আমরা,—আমাদের স্বতঃই সন্দেহ হয় তাই ত' গঙ্গাদেবী; বিষ্ণুর অধমাঙ্গ পদসম্ভূতা ইহা দ্বারা বিষ্ণুর সেবা কি প্রকারে করিব? কিন্তু বৈকুণ্ঠবস্তু যে মনোধর্ম্মের মাপকাঠিতে পরিমাণ করা যায় না তাহা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাই। শ্রীবিগ্রহের সর্ব্বেন্দ্রিয়ে যখন সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিই নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছে তখন পদসম্ভূতা না মনে করিয়া শিরোদ্ভবা বা বক্ষোদ্ভবা মনে করিলেই হয় (এইরূপ স্বীকার যদিও নির্দ্দোষ নয় তত্রাচ)। মনঃ সন্তুষ্ট হয় না। কারণ সে ত কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই, যে পদে কেহ শ্রবণ মনন সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ শ্রবণ করা যায় যে—"পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব" ভগবানের পরাশক্তি বিবিধ বৈভবযুক্ত। পীঠরূপিণীবৈভব বৈকুণ্ঠাদি ধাম। বৃন্দাদেবী অপ্রাকৃত বৃক্ষলতাদিরূপী বৈভব ও চিদ্রূপবৈভব যমুনা গঙ্গা কারণাদিবারি। পরা শক্তির বৈভব বিস্তার কেবল কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্যেই হইয়াছে "বিষ্ণুপদোদ্ভবা গঙ্গা" বলিলে সর্ব্বশক্তির আশ্রয় স্বরূপ বিষ্ণুবস্তু হইতেই গঙ্গা প্রকটিতা হন জ্ঞাত হওয়া যায়। অতএব পরাশক্তি বৈভব চিদ্দ্রবময়ী গঙ্গাবারিতে বিষ্ণুবারিতে বিষ্ণুসেবা উপযুক্তই হইতেছে।

সর্ব্বদেবৈক্যবাদ

মায়াবাদই সর্ব্বদেবৈক্যবাদের জনক। এই মায়াবাদ আবার অসুরবিমোহন- কল্পে ভগবানের ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মায়াবাদ দেবীধামে অনেকগুলি উপযুক্ত সন্তান উৎপন্ন করিয়াছে। তন্মধ্যে সমন্বয়বাদ বা চিদ্বিলাসবিরোধবাদ, ত্রিদেবৈক্যবাদ, হরিহরৈক্যবাদ প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভকরতঃ বহু মর্ত্ত্য জীবের হৃদয় অধিকার করিয়াছে।

মায়াবাদ যে প্রকার শুদ্ধভক্তির বিরোধী, মায়াবাদপ্রসূত উপর্য্যুক্ত মতবাদ সকলও তদ্রূপই ভগবদুপাসনার বিশেষ অন্তরায়। তাই, কলিযুগে যে চারিটী বৈষ্ণবাচার্য্য উদ্ভুত হইয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই ঐ সকল নির্ব্বিশেষ মতবাদ স্বীকার করেন নাই। সাত্বত সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য ও আচার্য্যগণের চরিত্র আলোচনা করিলেই ইহার সুষ্ঠু প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে।

বেদ কল্পতরু। কল্পবৃক্ষের নিকট যিনি যাহা অভিলাষ করেন, কল্পতরু তাহাই পূর্ণ করিয়া থাকেন। শরণাগত জীব যখন প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা বৃত্তি লইয়া বেদকল্পতরু সম্মুখে উপস্থিত হ'ন, তখন তিনি বেদোদ্দিষ্ট সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনাত্মিক শুদ্ধাভক্তিরূপ অতিমর্ত্ত্য অমৃতফল প্রদান করেন। আবার যখন অক্ষজ জ্ঞানোন্মত্ত হইয়া আমরা বেদকল্পতরুর নিকট উপস্থিত হই, তিনিও তখন ''যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং" এই প্রতিজ্ঞাবলম্বনে আমাদিগের আকাঙ্খানুরূপ ফলই প্রদান করিয়া থাকেন। তাই ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে গাহিয়াছেন—

''চারিবেদ—দধি, ভাগবত নবনীত।
মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিৎ।।"

সর্ব্বদেবৈক্যবাদিগণের মতে সকল দেবতাই সমান। বিষ্ণুই একা দেবতা-বিশেষ হইতে পারেন না। 'ইষ্টাপূর্ত্তব্রহ্ম', 'অগ্নি সর্ব্বদেবতা', 'যাঁহারা অন্যদেবতা ভজনা করেন, তাঁহারা আমারই ভজন করিয়া থাকেন—এই সকল বাক্য হইতে তাঁহারা দেখান যে, সকল দেবতারই পরতমতা ব্যক্ত আছে। সুতরাং অন্য দেবতার উপর বিষ্ণুর পারতম্য বলা যায় না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মায়াবাদ হইতেই সব্বদেবৈক্যবাদের সৃষ্টি। মায়াবাদীর মতে ভগবানের নিত্য-সচ্চিদানন্দ স্বরূপ-বিগ্রহের নিত্যাবস্থান নাই। তাঁহাদের মতে সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। তাঁহারা অক্ষজ-জ্ঞানজাত বিচার হইতে অবিতর্ক্য, অধোক্ষজ ভগবান সম্বন্ধে অনুমান করিয়া বলেন যে, যখন জগতের নামরূপাদিবিশিষ্ট বস্তু হেয়ধর্ম্মযুক্ত, তখন ভগবান্ নামরূপাদিবিশিষ্ট হইলে তিনিও জড়বস্তুরই ন্যায় সমানধর্ম্মা হইয়া পড়েন। অতএব চিদ্ বৈচিত্র বা চিদ্বিলাস চরমতত্ত্ব বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রোপলব্ধিই চরমতত্ত্ব। সুতরাং যেখানে চিদ্বৈচিত্র্য স্বীকৃত হয় নাই, সেই মতবাদে সর্ব্বদেবৈক্যবাদ বা সর্ব্বসমন্বয়বাদ অবশ্যম্ভাবী। যে মতবাদে উপাসক, উপাস্য ও উপাসনার

নিত্যত্ব নাই, গুরু শিষ্যের নিত্যত্ব নাই, দেবতার নিত্যত্ব নাই, শ্রীবিগ্রহের নিত্যত্ব নাই, সাধনের নিত্যত্ব নাই, যে মতবাদে অক্ষজ- জ্ঞানকল্পিত নির্ব্বিশেষই চরম সিদ্ধান্ত, যে মতবাদে ''বিভিন্নরুচির্হি লোকাঃ''—এই মনোধর্ম্ম প্রশ্রয়কারী বাক্যের দোহাই দিয়া দোষচতুষ্টয়াভিভাব্য মনুষ্যের বা ক্ষুদ্র জীবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর রুচির ছাঁচে ''ব্রহ্মণঃ রূপকল্পনা'' হয়, সেই মায়াবাদোত্থ মতবাদ যে সকলদৈবতৈক্যবাদ, সকলসমন্বয়বাদ প্রভৃতি কুফল প্রসব করিবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

সকলদৈবতৈক্যবাদী নিগমকল্পতরুর প্রপক্ব ফলসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে নারাজ। সকলদেবৈক্যবাদী বা সকলসমন্বয়বাদী চরমসিদ্ধান্ত গ্রন্থ ব্রহ্মসংহিতার—

''ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ কারণম্।।''

এই বাক্যকে ''গোঁড়ামি'' বলিবার ধৃষ্টতা করিতে প্রস্তুত। তাহারা শ্রীগীতায়—

''অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ **প্রভুরেব** চ।''

''মত্তঃ **পরতরং নান্যৎ** কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়ঃ।''

''**মামেকং শরণং** ব্রজ''

''**মামেব** যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।''

প্রভৃতি বাক্যের মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে দৈবীমায়া কর্ত্তৃক প্রতিহত।

মায়াবাদী, প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির অভাবে এবং ''জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি'' মানার দরুণ ভগবদ্ভক্তি-বিরহিত।

''তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।।''

এই গীতোক্ত বাক্যানুসারে ভগবানে সততযুক্ততার অভাব হেতু, তাহাদিগের বুদ্ধির শুদ্ধত্ব নাই। তাই তাহারা শাস্ত্ররূপ অরণ্যাণীর মধ্যে দিশাহারা হইয়া অবশেষে নাস্তিক্য কুপ্রবৃত্তিবশে মনগড়া সমন্বয়বাদ বা সকলদৈবতৈক্যবাদ প্রভৃতির ছায়ায় আশ্রয় লইতে অগ্রসর হয়। কিন্তু, ইহা পথহারা পথিকের আরও একটী নূতন দৈবদুর্ব্বিপাক ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

সকলদেবৈক্যবাদিগণ বলিয়া থাকেন, যে শাস্ত্রসকল তাঁহাদের মত মূর্খতাবশে নিজ নিজ মত পোষণের জন্য এক একটী শাস্ত্রে এক একটী দেবতার প্রাধান্য বা পরতমতা কীর্ত্তন করিয়াছেন, যেমন শৈব পুরাণে শিবকে পরতত্ত্ব, ভাগবতে কৃষ্ণকে পরতত্ত্ব, দেবীপুরাণে দেবীকে পরতত্ত্বরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং এমতাবস্থায় তাহাদের ইন্দ্রিয়ভোগমূলে ইহাই অনুমেয় যে সব দেবতাই এক অর্থাৎ একভগবানেরই বিভিন্ন নামান্তর।

এইরূপ মতবাদ ভ্রমসঙ্কুল। কেননা, তাহা হইলে সিদ্ধান্তশাস্ত্র বলিয়া কোনও কথা থাকিতে পারে না। ভগবান্ অধিকারী বিশেষের জন্য বিভিন্ন অধিকারোচিত শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি প্রত্যেক শাস্ত্রেই যে চরম অধিকার বা চরম সিদ্ধান্তের কথা বলিয়াছেন তাহা নহে বালক যখন পাঠশালায় অধ্যয়ন করে, তখন সে তাহার পাঠশালার গণ্ডীর মধ্যে যে প্রথম শ্রেণী উহাকেই সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী বলিয়া ধারণা করে। আবার যখন সেই বালকই নিম্নপ্রাইমারি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ প্রাইমারি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, তখন তাহার গণ্ডির মধ্যে যেটী সর্ব্ব প্রথম শ্রেণী তাহাকেই সর্ব্বোচ্চ বলিয়া জানে। আবার যখন সেই বালকই উচ্চ ইংরাজীবিদ্যালয়ে পড়েন, তখন তথাকার প্রথম শ্রেণীকেই সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী জ্ঞান করেন। আবার প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া সেই বালক যখন কলেজে অধ্যয়ন করেন, তখন সে আরও উচ্চ উচ্চ অধিকারের সন্ধান পায়। কিন্তু ঐ নিম্ন নিম্নপ্রাইমারি বিদ্যালয়ের ছাত্রের নিকট যেটী তাহার গুরুমহাশয়গণ কর্ত্তৃক সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী বলিয়া কীর্ত্তিত হয় আর কলেজে অধ্যয়নকারী যুবকের নিকট যেটী সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী বলিয়া কীর্ত্তিত হয়, তাহা বিদ্যালয় হিসাবে একজাতীয় বস্তু হইলেও তাহাদের মধ্যে তারতম্য বর্ত্তমান। তামসিক শাস্ত্র, রাজসিক শাস্ত্র, সাত্বতশাস্ত্র এবং পরমহংসাধিকারোচিত নির্গুণ শাস্ত্রোদ্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে তারতম্য রহিয়াছে। তামসিক লোকের নিকট যেটী অত্যুচ্চ তত্ত্ব রাজস প্রকৃতির নিকট যেটী সর্ব্বোত্তম তত্ত্ব সাত্বত ব্যক্তির নিকট সেটী অত্যুচ্চ তত্ত্ব নহে। আবার পরমহংসকুলোপাস্য পরতত্ত্বের সহিত অন্য কোন বস্তুর সাম্য হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতের অপর নাম পরমহংস-সংহিতা। ইহা নারদ, শুক প্রভৃতি পরমহংসকুলের সেব্য বস্তু। সুতরাং ভাগবতের উদ্দিষ্ট পরতত্ত্ব ও তামসিক পুরাণাদির উদ্দিষ্ট পরতত্ত্ব কখনও এক হইতে পারে না। এই উভয়ের সমন্বয় করিতে গেলে চিজ্জড়সমন্বয় বা মুড়ি মিছরী এক করা হইবে।

দুঃখের বিষয়, মায়াবাদোত্থ সর্ব্বদেবৈক্যবাদরূপ সংক্রামক রোগ বর্ত্তমান সময়ে মনোধর্ম্মিসমাজের সর্ব্বাঙ্গকে এরূপ ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়াছে যে অনেকে শুদ্ধভক্তনামে পরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াও অজ্ঞাতসারে সকল দেবৈক্যবাদ স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন। আজকাল গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা নিজদিগকে আচার্য্য সন্তান বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা পর্য্যন্ত শাস্ত্রসিদ্ধান্ত, ভাগবতসিদ্ধান্ত ভুলিয়া গিয়া মায়াবাদী, কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত প্রভৃতির সংস্পর্শে সকলদেবৈক্যবাদ বিদ্ধাভক্তিরূপ দুরন্ত ব্যাধির বীজানু সংগ্রহ করিয়াছেন।

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর, অভিধেয়াচার্য্য শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুকে শুদ্ধভক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—

"শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধ ভক্তির কহিয়ে লক্ষণ।।
অন্যবাঞ্ছা, অন্যপূজা, ছাড়ি' জ্ঞান, কর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে **কৃষ্ণানুশীলন**।।

এই শুদ্ধ ভক্তি ইহা হৈতে প্রেম হয়।

পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়।।" —চৈঃ চঃ মধ্য ২৯শ

গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীল জীবগোস্বামীপ্রভু ভক্তিসন্দর্ভে এবং শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু 'সিদ্ধান্তরত্ন' গ্রন্থের তৃতীয় পাদে শুদ্ধভক্তির পরমবিরোধী মায়াবাদপ্রসূত নিখিলদেবৈক্য বাদকে নিরাশ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমানে বৈষ্ণবপরিচয়াকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ শাস্ত্রালোচনার অভাবে ও কৃষ্ণাভক্তরূপ অসৎসংসর্গে পড়িয়া শুদ্ধবৈষ্ণবাচার হারাইয়া ফেলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জৈবধর্ম্মে বর্ত্তমান প্রচলিত বৈষ্ণব ধর্ম্মকে শাস্ত্রানুসারে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন—

"শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম" এবং 'বিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম"। "শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের" অন্য নাম নিত্যধর্ম্ম বা পরধর্ম্ম।" "বিদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম" দুই প্রকার সদসৎকর্ম্মাদি বিদ্ধ ও সদসদ্‌জ্ঞানাদি বিদ্ধ। স্মার্ত্তমতে যে সকল বৈষ্ণবধর্ম্মের পদ্ধতি আছে সে সমস্তই সৎকর্ম্মবিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম। অন্যাভিলাষমূলে অসৎকর্ম্মবিদ্ধ বিষ্ণুসেবাকেও বৈষ্ণবধর্ম্ম যাজন বলিয়া অনভিজ্ঞ সমাজ স্থির করেন। জ্ঞানি সম্প্রদায়ের মতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম পাইবার জন্য সাকার সূর্য্য, গণেশ, শক্তি, শিব ও বিষ্ণুকে উপাসনা করা আবশ্যক। জ্ঞান পূর্ণ হইলে সাকার উপাস্য দূর হয়। শেষে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতা লাভ হয়। এইমতে অনেক মনুষ্য (আকাশকুসুমের ঘ্রাণ লইতে লইতে) অবস্থিত হইয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবকে অনাদর করেন। পঞ্চোপাসনার মধ্যে যে বিষ্ণুর উপাসনা আছে, তাহাতে দীক্ষা, পূজাদি সমস্ত বিষ্ণুবিষয়ক, কখন (কোথাও বা) রাধাকৃষ্ণবিষয়ক হইলেও তাহা শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম নয়।" (জৈবধর্ম্ম ৪র্থ অধ্যায়)।

সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা নিখিলদেবৈক্যবাদ স্বীকার করেন, তাহারা কখনই শুদ্ধভক্ত, শুদ্ধবৈষ্ণবকিম্বা রূপানুগ বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন না। আমরা প্রবন্ধান্তরে শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য, নিম্বাদিত্য ও শ্রীমদ্বিষ্ণুস্বামী এই চারিজন বৈষ্ণবাচার্য্যের মত আলোচনা করিয়া দেখাইব যে ইহারা নিখিল-দেবৈক্যবাদ স্বীকার করেন নাই।

বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বদেবৈক্যবাদীর অনুগত ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন যে, স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশে ভ্রমণকালে শিব, শক্তি প্রভৃতি দেবতার নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগকে সন্মান দেখাইয়াছিলেন। এখনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, খড়দহে শ্রীশ্যামসুন্দরের সমসিংহাসনে ত্রিপুরাসুন্দরী বিরাজিত রহিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ কালীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন; শ্রীরামচন্দ্র মহামায়ার আরাধনা করিয়াছিলেন, সুতরাং ইহার দ্বারা নিশ্চয়ই প্রমাণিত হইতেছে যে, বৈষ্ণবধর্ম্মেও সর্ব্বদেবৈক্যবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। কেবল কতকগুলি সঙ্কীর্ণচেতা ব্যক্তি গোঁড়ামি করিবার জন্য সর্ব্বদেবৈক্যবাদের নিন্দা করিয়া থাকেন।"

কৃষ্ণাভক্তরূপ অসৎসংসর্গজনিত বিমূঢ়মতি ব্যক্তিগণ এইরূপ কল্পনা করিতে পারেন; কিন্তু প্রকৃতিস্থ হইয়া বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে লোকশিক্ষক শ্রীমন্ মহাপ্রভু শিব, শক্তি প্রভৃতি দেবতাকে কখনও স্বতন্ত্র ভগবান জ্ঞান করেন নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দেবতা-পূজাভিলাষিণী কুমারিগণের প্রতি—

"কন্যারে কহে আমা পূজ, আমি দিব বর।
গঙ্গা, দুর্গা—দাসী মোর; মহেশ কিঙ্কর।।"

—উক্তি হইতে বুঝা যায় যে তিনি গঙ্গা, দুর্গা, মহেশাদি দেবতাকে বৈষ্ণবতত্ত্ব জ্ঞান করিয়াছেন। যে মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ হইতে 'ব্রহ্ম সংহিতা' নামক গ্রন্থ আনয়ন করিয়া বলিয়াছিলেন—

"সিদ্ধান্ত শাস্ত্র নাহি ব্রহ্ম সংহিতার সম।
গোবিন্দ মহিমাতত্ত্ব পরম কারণ।।"

—চৈঃ চঃ মধ্য ৯।২৩৯

সেই চরম সিদ্ধান্ত গ্রন্থ ব্রহ্মসংহিতার তিনি কখনও অনাদর করিতে পারেন না। এই ব্রহ্মসংহিতার প্রথম শ্লোকেই শ্রীকৃষ্ণকে "অনাদিরাদি, সর্ব্বকারণকারণ, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ" বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে, এবং ৪৪শ ও ৪৫শ সংখ্যক শ্লোকে দুর্গামহেশাদিকে আদি পুরুষ গোবিন্দের অধীনতত্ত্ব বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। শ্রীজীব গোস্বামীপ্রভু ভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন,—

"স্বতন্ত্রোপাসনায়াং তৎপ্রাপ্তিঃ গীতোপনিষৎসু এব নিষিদ্ধা, যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা, অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা, যান্তি দেবব্রতা দেবান্ ইত্যাদি।।" অর্থাৎ শিবাদি দেবতাকে ভগবানের অধীনতত্ত্ব অর্থাৎ বৈষ্ণবত্ত্ব জ্ঞান না করিয়া স্বতন্ত্র ভগবৎতত্ত্ব জ্ঞান করিলে ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না। ইহা শ্রীগীতোপনিষদেও "যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তাঃ" প্রভৃতি শ্লোকে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু "সিদ্ধান্তরত্ন" গ্রন্থের তৃতীয় পাদে ২৬শ ও ২৭শ সংখ্যায় বলিয়াছেন, —"ক্বচিৎ ভগবৎপার্ষদানাং ভগবৎপার্ষদানাং দৈবতান্তরারাধনমপি তদারাধ্যতাব্যাখ্যাপনার্থং লীলারূপমেব ন হি তৎ সিদ্ধান্তকক্ষামারক্ষ্যতি।

টীকা। নন্দাদিভিরম্বিকাবনে সাম্বিকাশিবোঽভ্যর্চ্চিতঃ গোপকন্যাভিঃ কাত্যায়নী শ্রীরাধাদিনা তু রবিরিতি তদন্তর্য্যামী কৃষ্ণ এব তৈস্তাভিশ্চাভ্যর্চ্চ্যত তন্মতমনুসৃত্য ত্বদীয়ত্বেন তত্তদারাধনং বেতি, ন তত্র তত্র পারতম্যং শ্রদ্ধাতব্যম্।।"

অর্থাৎ ভগবৎপার্ষদগণ যেমন নন্দাদি অম্বিকাবনে অম্বিকার সহিত মহেশকে, গোপকন্যাগণ কাত্যায়নীকে, শ্রীরাধা প্রভৃতি সূর্য্যকে আরাধনা করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থলে তদন্তর্য্যামী কৃষ্ণই তাঁহাদের লক্ষিত ছিল। সেখানে শ্রীকৃষ্ণকেই পরমতত্ত্ব ও অন্যান্য দেবতার শ্রীকৃষ্ণের অধীনতত্ত্বরূপে আরাধ্যতাপ্রচারার্থ বুঝিতে হইবে। উহা পরতত্ত্বাভিলাষী সেবকগণের কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যেই পর্য্যবসিত এবং উহা কৃষ্ণসেবকগণের ঐকান্তিকতারই পরিচায়ক। ইহার দ্বারা অন্যদেবতার পারতম্য প্রমাণিত হয় নাই। বরং উহার দ্বারা দেবতান্তরের ত্বদীয়ত্ব এবং কৃষ্ণনিষ্ঠা প্রচারার্থপার্ষদবর্গের লীলা প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ প্রভু আরও বলিয়াছেন,—"তাৎপর্য্যান্তরং কল্পনীয়ং তচ্চ দর্শিতেমব ইতরথা সমুদ্রস্যাপীশ্বরতাপত্তিঃ। শ্রীরামেণ তৎপূজায়া বিধানাৎ।।"

অর্থাৎ তাৎপর্য্যান্তর অস্বীকার করিলে শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রের পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া সমুদ্রকেও পরমেশ্বর বলিতে হয়।

ভগবান্ ভগবৎপার্ষদ বা আচার্য্যগণ যে দেবতান্তরের প্রতি সন্মান প্রদর্শন বা নমস্কারাদি বিধান করেন, তাহা তত্তৎদেবতার ত্বদীয়ত্ব প্রচারের জন্য অর্থাৎ বিষ্ণুই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, অন্যান্য দেবতাবৃন্দ তাঁহার অংশ। সুতরাং অংশীর অংশ বলিয়া ত্বদীয়বস্তুজ্ঞানে তাঁহারা প্রণম্য। কিন্তু যে সকল জড়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা জীবের বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তি উদয় করাইয়া থাকেন, তাঁহাদের অধিষ্ঠান এই জড় জগতেই বর্ত্তমান এবং তাঁহারা ছায়াশক্তি বলিয়া ব্রহ্মসংহিতাদি সিদ্ধান্ত গ্রন্থে খ্যাত। যেমন গোকুলস্থ মন্ত্রময়ী কৃষ্ণদাসী চিন্ময়ী দুর্গাই স্বরূপশক্তির অংশ বলিয়া ভগবদ্ভক্তের পূজ্যা; কিন্তু সেই চিন্ময়ী কৃষ্ণদাসীর ছায়া রূপিণী দেবীধামের অধিষ্ঠাত্রী মহামায়া দুর্গা "বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া" এই ভাগবতীয় বচনানুসারে জীবগণকে নিয়ত বিমোহিত করার দরুণ কৃষ্ণসম্মুখে গমন করিতে বিলজ্জমানা সুতরাং তিনি ভগবদ্ভক্তেরও আদরের পাত্র নহেন। অর্থাৎ বৈষ্ণবীদুর্গাই ভগবদ্ভক্তের আরাধ্য, আর জীববিমোহনকারিণী জড়াধিষ্ঠাত্রী ছায়ারূপিণী দুর্গা ইন্দ্রিয়তর্পণ-বিধায়িনী বলিয়া জগতের বহির্ম্মুখ জীবের বহু মানিত। ভগবদ্ভক্তগণ তদ্রূপ বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শম্ভুকেও ত্বদীয় বা ভগবৎপ্রিয়তমবস্তুজ্ঞানে আরাধনা করিয়া থাকেন। কিন্তু যে শিব তাঁহার বৈষ্ণব- স্বরূপত্ব গোপন করিয়া "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" এই ন্যায়ানুসারে বহির্ম্মুখ জীবের কামানুসারে স্বীয় রুদ্রত্ব অর্থাৎ সংহারত্ব-ধর্ম্ম বা নির্ব্বিশেষগতিপ্রদানরূপ ধর্ম্ম প্রকট করেন, তিনি কখনই ভগবদ্ভক্তগণের আরাধ্য হইতে পারেন না। অর্থাৎ কৃষ্ণসেবারূপ মঙ্গলদানকারী শিবই ভক্তগণের আরাধ্য। আর কৃষ্ণসেবা হইতে বিচ্যুত করিয়া নির্ব্বিশেষগতি প্রদানকারী রুদ্র অভক্তগণের পূজনীয়। ভগবৎপার্ষদ বা আচার্য্যগণ এই বৈষ্ণবশিবেরই সন্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্ যে দেবতান্তরে সন্মান দেখাইয়া থাকেন, তাহা নিজ প্রিয়ভক্তের প্রতি বিশ্রম্ভ-সম্ভাষণমাত্র এবং তৎপ্রিয়ত্ত্বের তদীয়ভাবে আরাধ্যতা প্রচারের জন্য। যিনি ঈশ্বরগণেরও পর মহেশ্বর, দেবতাগণের পরমদেবতা, যাঁহা হইতে বড় বা যাঁহার সমান আর কেহই নাই, যিনি সর্ব্বপতিগণেরও পতি, যিনি সর্ব্বজীবারাধ্য বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছেন তিনি কখনও দেবতান্তরকে অন্য ভাবে সন্মান প্রদর্শন করেন না। নারায়ণীয়ে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তিতে এই বিষয় পরিস্ফুট আছে—"হে অর্জ্জুন, আমি বিশ্বের আত্মা, আমি যে শিবাদি দেবতার পূজা করি, তাহা আত্মারই পূজা, অন্যদেবতা আমার অংশ। সুতরাং মদীয়। ইহারা আমার ন্যায় স্বতন্ত্র ভগবান্ নহেন, ইহাদিগকে মদীয়ত্বজ্ঞানে সন্মান প্রদর্শন করিবার উপদেশ প্রদান করিবার জন্যই লোকশিক্ষক আমি দেবতান্তরের পূজা করিয়া থাকি। কারণ, আমি যাহা করি, লোকসকল তাহার অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। আমি বিশ্বের অন্তর্যামী তপ্তলৌহপিণ্ডের ন্যায় অবিবিক্ত শিবরূপী আমার অংশকেই পূজা করি। আমা হইতে যখন আর উৎকৃষ্ট কিছু নাই তখন উৎকৃষ্টবুদ্ধিতে আমি কাহারও পূজা করি না। ইহারা আমার অংশ; ইহা প্রচার করিবার জন্যই আমি তাঁহাদের আরাধনার অভিনয় দেখাই।

লোকশিক্ষক ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর যে শিবাদি দেবতার প্রতি সম্মানের অভিনয় দেখাইয়াছিলেন তাহা এই ভাবেই। শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ডে ২য় অধ্যায়ে ইহা পরিষ্কাররূপে বর্ণিত আছে—

"শিব-প্রিয়বড় কৃষ্ণ তাহা বুঝাইতে।
নৃত্য করে গৌরচন্দ্র শিবের অগ্রেতে।।"

সুতরাং শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বদেবৈক্যবাদ স্বীকার করেন নাই। তিনি শিবাদিদেবতাকে ভগবৎপ্রিয়তম বস্তু বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাহা উক্ত বাক্যই প্রমাণ করিতেছে।

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে মায়াবাদী, কর্ম্মজড় স্মার্ত্তপ্রভৃতি কৃষ্ণাভক্ত ব্যক্তিগণের অসৎসংসর্গে পড়িয়া অনেকেই শিক্ষাগুরুর শুদ্ধশিক্ষা ভুলিয়া ন্যূনাধিক পরিমাণে সর্ব্বদেবৈক্যবাদ স্বীকার করিতেছেন। এমন কি শ্রীগৌরনিত্যানন্দদ্বৈত ও আচার্য্য গোস্বামিগণের ভৌমলীলা সমাপনের কিছুকাল পর হইতেই কৃষ্ণাভক্তের দুঃসংসর্গজপ্রভাব এই বঙ্গদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপর বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। আর উত্তর ভারতের ত' কথাই নাই। কারণ সেই স্থান অসুরবিমোহনকারী মায়াবাদ প্রচারক আচার্য্য শঙ্করের প্রচারক্ষেত্র। সুতরাং সেই স্থানে পঞ্চোপাসনামূলক মায়াবাদ হইতে সমগ্র ভারতে সর্ব্বদেবৈক্যবাদ প্রসারিত হইয়াছে। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী এবং শ্রীনিম্বাদিত্য প্রভৃতি বৈষ্ণব আচার্য্যগণের প্রকটভূমি দক্ষিণ ভারতে পর্য্যন্ত সর্ব্বদেবৈক্যবাদরূপ সংক্রামক ব্যাধি স্বল্পবিস্তর প্রবিষ্ট হইয়াছে। গৌড়দেশে যেমন একদিকে অদ্বৈতপ্রভুর প্রপৌত্র (?) রাধারমণগোস্বামী ভট্টাচার্য্য, স্মার্ত্ত-রঘুনন্দনানুগত্য স্বীকার করিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর আচরণ ও প্রচারের প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া কুশপুত্তলিকা পর্য্যন্ত দগ্ধ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর পুত্রোপম শিষ্যত্রয়ও স্মার্ত্তশাসনের করালকবলে নিগৃহীত হইয়া পঞ্চোপাস্যের অন্যতম ত্রিপুরাসুন্দরীকে শ্রীশ্যামসুন্দরের সমসিংহাসনে রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরন্তু লোকশিক্ষক শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু কখনও এরূপ অবৈধ কার্য্য করেন নাই।

শ্রীরামচন্দ্রের সম্বন্ধে যে অকাল-বোধন করিয়া দুর্গারাধনার কথা সাধারণ জনসমাজে প্রচলিত আছে, সেরূপ কোনও কথা বাল্মীকিরামায়ণে নাই। উহা পরবর্ত্তী কালের রচনা ও কথক কীর্ত্তিবাসের দ্বারা জনসমাজে প্রচারিত।

'শ্রীকৃষ্ণ কালী হইয়াছিলেন'—অর্থাৎ বহিঃপ্রজ্ঞাদৃষ্ট হরি-প্রতীতি এইরূপ কথা স্বীয় মনোধর্ম্মযুক্ত মতপোষক মনে করিলেও শুদ্ধভক্তগণ ইহার তাৎপর্য্য অন্যরূপে দেখিতে পান। শ্রীকৃষ্ণ অধোক্ষজ বস্তু। তিনি কখনই জড়মায়াতে পরিণত হইতে পারেন না। অপ্রাকৃত বস্তুর প্রাকৃতত্ব, ব্রহ্মের মায়া-স্বীকার প্রভৃতি মায়াবাদীর স্বকপোলকল্পিত কথা। উহা বেদান্ত-বিরোধী মতবাদ মাত্র। চিদ্ধামে জড়াধিষ্ঠাত্রী মহামায়ার কোন কার্য্য নাই। মহামায়া বিমুখজগজ্জীবকেই মোহন করিয়া থাকেন। লীলাবৈচিত্র্য ও পরিপুষ্টির জন্য চিদ্ধামে যোগমায়ার দ্বারাই সমস্ত কার্য্য সাধিত হয়। যোগমায়া কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তি; মহামায়া সেই স্বরূপশক্তির ছায়া মাত্র; চিদ্ধামে তাঁহার কোন ক্রীড়া নাই বা থাকিতে পারে না। কংসাদির ন্যায়

ভগবদ্বিমুখজনগণকে মোহন করা জড়াধিষ্ঠাত্রী মায়ার কার্য্য। আর চিদ্ধামে ভগবানের লীলা-বৈচিত্র্য পুষ্টিকল্পে ভগবৎপ্রেয়সিগণের পতি শ্বশ্রূাদিমোহন যোগ মায়ার কার্য্য। শ্রীল চক্রবর্ত্তীঠাকুর দশমস্কন্ধের টীকায় লিখিয়াছেন,–"দেবকীকন্যারূপেণ যৎ কংসবঞ্চনম্, তন্মায়ায়া এব কার্য্যম্, ন তু যোগমায়ায়াস্তাদৃশ-দুষ্টলোকেষু তস্যা অনুপযোগাদেব। সৈব কংসহস্তাদাকাশ- মুৎপ্লুত্য বিন্ধ্যাবাসিন্যাদিরূপেণ বহুনামনিকেতেষু বহুনামা বভূব হ। তথা রাসলীলাদিসিদ্ধ্যর্থং ভগবৎপ্রেয়সীনাং পতিশ্বশ্রূাদিমোহনং যোগমায়ায়া এব কার্য্যং, ন তু মায়ায়াঃ। তেষাং ভগবদ্বৈমুখ্যাদর্শনাৎ।" সুতরাং অপ্রাকৃত পরম চমৎকার পরকীয় ভাবের মাধুর্য্য সঞ্চারকল্পে অভিমন্যু গোপ-মোহনার্থ শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়ারূপধারণ বিলাস-প্রকাশ মাত্র। উহা মোহিতবুদ্ধি মায়াবাদিগণের অক্ষজ ধারণার সম্পূর্ণ অতীত। উহা শ্রীকৃষ্ণের জড়াধিষ্ঠাত্রী কৃষ্ণবিমুখিনী, কৃষ্ণের ঈক্ষণপথে আসিতে বিলজ্জমানা মহামায়ার রূপ ধারণ নহে। তিনি স্বীয় চিচ্ছক্তি যোগমায়ারূপ প্রকট করিয়া অপ্রাকৃত শুদ্ধ পারকীয়রসোল্লাসিনী ব্রজললনার পতিশ্বশ্রূাদি মোহন করিয়াছিলেন মাত্র।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, যেমন ভগবানের মোহিনীরূপ ধারণকালে দেবতা ও অসুরগণের দেশ, কাল, হেতু, অর্থ, কর্ম্ম ও বুদ্ধি যদিও সমানই ছিল তথাপি উভয়ের ফল ভিন্ন হইয়াছিল। দেবতাগণ ভগবানের পাদরজঃ আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা অমৃতরূপ ফল প্রাপ্ত হইলেন, আর ভগবদ্বিমুখ অসুরকুল বঞ্চিত হইল। তদ্রূপ নিত্য ভগবৎসেবাবিমুখ জনগণও ভগবানের মায়ায় মোহিত হইয়া মনোধর্ম্মবশে নানাপ্রকার স্বকপোলকল্পিত মত রচনা করে।

অচিন্ত্যশক্তি শ্রীভগবান্ যে কোনও রূপ ধারণ করিতে পারেন। কিন্তু সময় সময় কোনও মহত্তম জীবে আবিষ্ট হন, তাহাকেই আবেশাবতার বলে। তিনি অন্তর্য্যামিরূপে সর্ব্বভূতহৃদয়ে পরমাত্মারূপে অবস্থান করেন কিন্তু জড় মায়ারূপ পরিগ্রহ করেন না এবং তাহা তাঁহার স্বয়ং ভগবত্তার সহিত এক নহে। কাল্যাদি শক্তির কৃষ্ণরূপ ধারণ করিবার সামর্থ্য নাই। কৃষ্ণরূপ স্বয়ংরূপ। উহা নিত্য সচ্চিদানন্দময় স্বরূপবিগ্রহ। সুতরাং যাত্রাদলের কৃষ্ণ সাজাইবার ন্যায় যে সকল কৃষ্ণাভক্ত সম্প্রদায় "অসি ছেড়ে ধর্ মা বাঁশী" প্রভৃতি মনোধর্ম্মযুক্ত নিরর্থক বাক্য বলিয়া থাকেন তাঁহারা মহামায়ার মায়াতেই আচ্ছন্ন। শ্রীমদ্ভাগবত (ভাঃ ৪।৩১।১২) বলেন—

"যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা।।"

শ্রীগীতাও—(৯।২৩)

"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতা।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্।।"

এই শ্লোকে উপর্য্যুক্ত ভাগবতীয় শ্লোকেরই সিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিয়াছেন। বৃক্ষ একটী সমগ্র বস্তু। বৃক্ষ বলিলে পত্র, পুষ্প, শাখা, উপশাখা, স্কন্ধ, মূল সকলই একসঙ্গেই বুঝাইয়া থাকে। কেবল শাখাকে বা পত্রকে বৃক্ষ

বলিলে সমগ্র বৃক্ষটি উদ্দিষ্ট হয় না। কিন্তু 'এই শাখাটী বৃক্ষের 'পত্রটী ঐ বৃক্ষের', এরূপ বলিলে বৃক্ষটী এবং শাখাপত্রাদি বৃক্ষান্তর্গত বস্তুকে সুষ্ঠুভাবে উদ্দেশ করিয়া থাকে। যাঁহারা বৃক্ষের পত্রে বা শাখায় জল দিয়া মনে করেন আমরা ত' বৃক্ষেই জলসেচন করিলাম, তাহারা ভ্রান্ত। তাহাদের কার্য্য অবৈধ। তাই তাহাদের জলসেচনক্রিয়া দ্বারা বৃক্ষ পরিপুষ্ট না হইয়া ক্রমে মরিয়া যায়। আর যাঁহারা পত্র পুষ্পশাখাদিকে বৃক্ষের অন্তর্গত বস্তু মনে করিয়া একমাত্র মূলদেশেই জলসেচন করেন, তাঁহাদের কার্য্য বৈধ। উহার দ্বারা পত্র-পুষ্প-শাখা-সহিত সমগ্র বৃক্ষটী সঞ্জীবিত ও ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইতে থাকে। তদ্রূপ গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন যে, যাঁহারা অন্যান্য দেবতাকে ভজনা করেন, তাঁহারা আমাকেই ভজনা করেন, কারণ আমি ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই। যেমন পত্রে জলসেচনের দ্বারা বৃক্ষেরই জলপ্রাপ্তি ঘটে, কারণ বৃক্ষ হইতে পত্রের স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান বা সত্ত্বা নাই। কিন্তু দেবতান্তর ভজন অবৈধ। দেবতান্তরযাজী ''চ্যবন্তি তে'' কর্ম্মরাজ্যে গতাগতি করিয়া থাকে। আজ যাঁহারা দেবতাগণকে ভগবানের বিভিন্নাংশ জানিয়া একমাত্র মূলবস্তুর আরাধনা করেন, তাঁহার দ্বারা স্বয়ং ভগবান্ প্রীত হন এবং ''তস্মিন্ তুষ্টে জগত্তুষ্টং'' এই ন্যায়াবলম্বনে তদন্তর্গত সমস্ত বস্তুরই পরিতৃপ্তি লাভ হয়। ইহাই শ্রীগীতা ভাগবতাদি সাত্বতশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। সাত্বতশাস্ত্রে কখনও সর্ব্বদেবৈক্যবাদ স্বীকার করেন না। আমরা সময়ান্তরে সর্ব্বদেবৈক্যবাদের বিরুদ্ধে আরও শতশত শাস্ত্রীয়যুক্তি প্রদর্শন করিব। অতএব সর্ব্ব দৈবতৈক্যবাদ নিরস্ত হইল।

স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্ম

সাধারণ সঙ্কীর্ণ অর্থে 'স্বধর্ম্ম' বলিতে বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মকেই লক্ষ্য করে। উচ্ছৃঙ্খল বিধর্ম্ম, পরধর্ম্ম, উপধর্ম্ম, ছলধর্ম্ম প্রভৃতি অধর্ম্মের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য শাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিগণ মানবগণের স্বভাব ও অধিকার বিচারপূর্ব্বক বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কর্ম্মানুষ্ঠানযোগ্য মানবকুল স্বভাবতঃ চারি প্রকার, এবং তাঁহারা যে অবস্থা অবলম্বনপূর্ব্বক এই জগতে অবস্থান করেন তাহাও চারিপ্রকার। স্বভাব অনুসারেই বর্ণধর্ম্ম এবং অবস্থান অনুসারে আশ্রমধর্ম্ম নিরূপিত হয়। যাহারা এই চারিবিধ স্বভাব ও অবস্থানের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া বিশৃঙ্খল বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চালিত এবং তজ্জন্য অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও পাষণ্ড-ধর্ম্ম-প্রিয়, তাহারাই অন্ত্যজ ও নিরাশ্রমী। বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংসাবস্থা উক্ত চতুর্ব্বিধবর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মের অতীত ভূমিকায় অবস্থিত।

সাধারণ জীব যাহাতে উচ্ছৃঙ্খল ধর্ম্মের হস্তে পড়িয়া অন্ত্যজস্বভাব লাভ করতঃ পশুত্বের দিকে চলিয়া না যায়, তজ্জন্যই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বা স্ব-স্ব স্বভাবোচিত স্বধর্ম্মের ব্যবস্থা। আবার ঐ স্বধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে প্রতিপালিত হইলেও যদি তাহাতে হরিভজনের অভাব থাকে, তাহা হইলে তাহার কোন মূল্য নাই। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র ইহাই তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন—
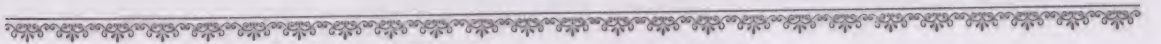
"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি মজে।।"

সুতরাং শাস্ত্রোক্তি হইতে দেখা যায় যে, কেবল স্বধর্ম্মানুষ্ঠান মানুষকে রৌরব গমন হইতে রক্ষা করিতে পারে না। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, জগতে নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইবার জন্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ব্যবস্থা।

এইরূপ কর্ম্মাধিকারীকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীমদ্ভগবদগীতায় শ্রীভগবানের উপদেশ—

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।।"

অর্থাৎ নিষ্কাম ঈশ্বরার্পিত-কর্ম্মযোগ-বিচারে কিঞ্চিৎ দোষবিশিষ্ট ও সম্যক্ অনুষ্ঠানের অযোগ্য হইলেও বদ্ধ জীবের পক্ষে স্বধর্ম্মই ভাল। আর উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইলেও অপরের স্বভাবোচিত ধর্ম্ম ভাল নহে। স্বধর্ম্ম পালন করিতে করিতে যদি মৃত্যুও হয় তাহা মঙ্গলজনক কেন না, অপর বদ্ধজীবের স্বভাবোচিত ধর্ম্ম, অন্য বদ্ধজীবের স্বভাবের উপযোগী হইতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যেমন—ব্রাহ্মণাদি বর্ণের ভিক্ষাবৃত্তিতে হিংসার অভাব পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু ক্ষত্রিয়াদির যুদ্ধাদি কার্য্য হিংসাবহুল। কোনও ক্ষত্রিয় স্বভাবান্বিত বদ্ধজীব যদি বেগবান ইন্দ্রিয়গ্রামের চেষ্টার প্রতিকূলে ব্রাহ্মণের ভিক্ষাবৃত্তি অনুকরণ করিতে যায়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি অলস, বেশোপজীবী ভণ্ডমাত্র হইয়া পড়িবে। লোক স্বভাবানুচিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অপরের স্বভাবোচিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই বর্ত্তমান সমাজে এইরূপ বিশৃঙ্খলতা দৃষ্ট হয়। শূদ্রস্বভাব ব্যক্তি কেবল শৌক্র পরিচয়ে ব্রাহ্মণের বৃত্তি গ্রহণ করাতে লোভী, কুকর্ম্মরত, বেষমাত্রোপজীবী হইয়া লোকবঞ্চনা করিতেছে। আবার শূদ্রস্বভাব ব্যক্তিগণ পরমহংসবৈষ্ণব সাজিতে গিয়া সমাজে নানাবিধ ব্যভিচার ও কলঙ্ক আনয়ন করিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে কলির ভবিষ্যাচার বর্ণনপ্রসঙ্গে এইরূপ বেশোপজীবীর বর্ণনা রহিয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তমস্কন্ধে শ্রীনারদ গোস্বামি মহারাজ বলিয়াছেন,—

"বিধর্ম্মঃ পরধর্ম্মশ্চ আভাস উপমাচ্ছলঃ।
অধর্ম্মশাখা পঞ্চেমা ধর্ম্মজ্ঞোঽধর্ম্মবত্ত্যজেৎ।।
ধর্ম্মবাধো বিধর্ম্মঃ স্যাৎ পরধর্ম্মোঽন্যচোদিতঃ।
উপধর্ম্মস্তু পাষণ্ডো দম্ভো বা শব্দভিচ্ছলঃ।
যস্ত্বিচ্ছয়া কৃতঃ পুংভিরাভাসো হ্যাশ্রমাৎ পৃথক্।।"

অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি বিধর্ম্ম, পরধর্ম্ম, ধর্ম্মাভাস, উপধর্ম্ম ও ছলধর্ম্ম এই পাঁচটী অধর্ম্মশাখাকে অধর্ম্মের ন্যায় অর্থাৎ সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ বস্তুজ্ঞানে পরিত্যাগ করিবেন। ধর্ম্মবোধে কৃত হইলেও যাহা স্বধর্ম্মের পরিপন্থী হয় তাহার নাম 'বিধর্ম্ম'। অন্যের উপদিষ্ট অপরের অধিকারোচিত ধর্ম্ম পরধর্ম্ম; দম্ভযুক্ত ধর্ম্ম—পাষণ্ডধর্ম্ম।

নিজকে ধার্ম্মিক জ্ঞাপন করিবার জন্য জটা ভস্মাদি ধারণযুক্ত ধর্ম্ম 'উপধর্ম্ম'। যাহা শব্দমাত্রে কেবল ধর্ম্মশব্দ ধারণ করে তাহার নাম 'ছল ধর্ম্ম'। যেমন, ''গোদান কর্ত্তব্য'' এই বিধিবাক্য শুনিয়া কেহ যদি মুমূর্ষু অথবা অকর্ম্মণ্য গোদান করেন এবং উহার দ্বারা বিধি পালিত হইল বলিয়া মনে করেন তাহাকে ছলধর্ম্ম বলে। অথবা ''দশাবরান্ বিপ্রান্ ভোজয়েৎ'' অর্থাৎ দশটী ব্রাহ্মণের ন্যূন ভোজন করাইবে না—এই বহুব্রীহি সমাসের অর্থ পরিত্যাগ করিয়া দশের ন্যূন নয় বা আটজনকে ভোজন করাইবে, কিন্তু একাদশ জনকে ভোজন করাইবে না। তৎপুরুষসমাস করিয়া এইরূপ অর্থ করিয়া থাকেন তাহা হইলে সেইরূপ ব্যক্তির ধর্ম্মযাজনকে 'উপমা' বা 'ছলধর্ম্ম' বলা যায়। নিজ মনের খেয়াল অনুসারে কল্পিত দেবতা পূজাদি 'ধর্ম্মাভাস''। ইহারা সকলই নিষিদ্ধ অধর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

এই সকল নিষিদ্ধ অধর্ম্মের প্রতিই বদ্ধজীবের স্বাভাবিক গতি। বদ্ধজীব ধর্ম্মযাজন করিতে গিয়া কোথায় কি প্রকারে দেবতার সঙ্গেও কপটতা, দোকানদারী প্রভৃতি করিতে পারিবেন, তজ্জনই ব্যস্ত। দেবতাপূজায় 'দশহাত কাপড়ের ব্যবস্থা থাকিলেও কোন প্রকারে একটী কম মূল্যের একখণ্ড ক্ষুদ্র বস্ত্র বা একখানি গামছা দ্বারাই বিধিটী পালন করিতে ব্যস্ত। এইরূপ অধিকারোচিত ব্যক্তি সর্ব্বদাই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চালিত হইয়া নিষিদ্ধ ধর্ম্মযাজনে প্রয়াসী। ঐসকল ব্যক্তির মঙ্গলের জন্যই স্বধর্ম্মনিষ্ঠার কথা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃতে লিখিয়াছেন—''অধিকার বিচার না করিয়া অনধিকারগত আচার স্বীকার করিলে জগতের ও নিজের প্রকৃত অনিষ্ট ঘটে। কোন কোন লোক ভ্রমক্রমে, কেহ কেহ বা ধূর্ত্ততা সহকারে উচ্চাধিকার যোগ্য না হইয়াও সেই অধিকারোচিত কার্য্য সকল করিতে থাকেন। তদ্দ্বারা ক্রমশঃ জগন্নাশ হইয়া থাকে। ধর্ম্মের নামে অসদাচার প্রচার করাই অনেক স্থলে দৃষ্টি করা যায়। ভক্তি সন্ন্যাসিদিগের বর্ণাশ্রমরূপ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন এবং নেড়া, বাউল, কর্ত্তাভজা, দরবেশ, কুম্ভপটিয়া, অতিবড়ী, স্বেচ্ছাচারী ভাক্ত ব্রহ্মবাদিদিগের বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধ চেষ্টাসকল অত্যন্ত অহিতকর। এই সমস্ত কার্য্য দ্বারা তাহারা জগতে যে পাপ প্রচলিত করে, তাহা জগন্নাশ-কার্য্য বিশেষ। সহজিয়া, নেড়া, বাউল, কর্ত্তাভজা প্রভৃতির যে অবৈধ স্ত্রীসংসর্গ সর্ব্বদা লক্ষিত হয়, তাহা নিতান্ত ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। মহর্ষিগণ বিরচিত বিংশতিধর্ম্মশাস্ত্রে, ইতিহাসে ও পুরাণ সমূহে এই সকল জগন্নাশ-কার্য্য হইতে রক্ষা করিবার জন্য বহুবিধি লিপি বদ্ধ আছে। ধার্ম্মিক জীবন এই নশ্বর জগতে একমাত্র উৎকৃষ্ট বস্তু। তাহা লাভ করিবার জন্য সকলেরই যত্ন করা উচিত। ত্রৈবর্গিক ধর্ম্ম অনিত্য কর্ম্মকাণ্ডময়, ক্ষুদ্র ও স্বার্থপর। কৃষ্ণভক্তিস্বরূপ বিশুদ্ধ আপবর্গিক ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পালনীয়। তাহাতে মোক্ষাভিসন্ধি নিরস্ত হয় এবং ভক্তিই তাহার স্বরূপ।''

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ উদ্ধব মহারাজকে বলিয়াছেন—

''ইতি মাং যঃ স্বধর্ম্মেণ ভজেন্নিত্যমনন্যভাক্।
সর্ব্বভূতেষু মদ্ভাবো মদ্ভক্তিং বিন্দতে দৃঢ়াম্।।''

যিনি একমাত্র আমার প্রতি অনন্যভজনপরায়ণ ও সর্ব্বভূতে অন্তর্যামিরূপে স্থিত আমার প্রতিই আসক্ত

হইয়া অর্থাৎ আত্মীয় স্বজনবর্গের বা জীবমাত্রের স্থূললিঙ্গাদি দেহে আসক্ত না হইয়া বর্ণাশ্রমোচিত স্বধর্ম্মের দ্বারা নিত্যকাল নিষ্কপটে আমার ভজনা করেন, তিনি আমাতে দৃঢ়া ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

"ভক্ত্যোদ্ধবানপায়িন্যা সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সর্ব্বোৎপত্ত্যপ্যয়ং ব্রহ্মকারণং মোপযাতি সঃ।।
ইতি স্বধর্ম্মনির্ণিক্ত সত্ত্বো নির্জ্ঞাতমদ্গতিঃ।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ন চিরাৎ সমুপৈতি মাম্।।
বর্ণাশ্রমবতাং ধর্ম্ম এয আচারলক্ষণঃ।
স এব মদ্ভক্তিযুতো নিঃশ্রেয়সকরঃ পরঃ।।"

(ভাঃ ১১।১৮।৪৪-৪৭)

অর্থাৎ হে উদ্ধব, সেই স্বধর্ম্মনিরত ব্যক্তি অচলা ভক্তি সহকারে সর্ব্বলোক মহেশ্বর এবং নিখিল সৃষ্টিস্থিতি ও ভক্তের কারণ, বৈকুণ্ঠনিবাসী পরব্রহ্মস্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হন। এইরূপে স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা শুদ্ধ সত্ত্ব, জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন ও ইতর বিষয়ে বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তি আমার গতি অবগত হইয়া আমার ঐশ্বর্য্য স্বরূপকে প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ অমি স্বধর্ম্মনিরত অনন্যভাক্ ভক্তকে সার্ষ্টিলক্ষণা মুক্তি প্রদান করিয়া থাকি। বর্ণাশ্রমাচার বিশিষ্ট পুরুষগণের ইহাই আচার-লক্ষণ- ধর্ম্ম। ইহাই আমার ভক্তিযুক্ত হইলে মোক্ষপ্রদ হইয়া থাকে।

কিন্তু ইহাই জীবের চরম প্রয়োজন নহে। উন্নত জীবস্বরূপ আত্মবিনাশরূপ নির্ব্বাণ মুক্তি বা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধিভজনলভ্য সালোক্যাদি মুক্তি স্পৃহা করেন না। ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে কৃষ্ণ বশীভূত হন না। এই জন্যই রায়-রামানন্দ-সংবাদে "স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তিকে" "এহ বাহ্য" বলা হইয়াছে।

এমন কি বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ বিষ্ণুভক্তিময় স্বধর্ম্মচরণের দৃষ্টান্ত সমাজে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাঁহারা বিষ্ণুভক্তিযুক্ত বর্ণাশ্রম পালন করেন বলিয়া গলাবাজী করিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রায়ই অদৈব সমাজের অধীন। তাঁহাদের বিষ্ণুভক্তিযাজন কেবল লোক- দেখান কপটতা মাত্র। তাঁহারা কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের দাস। শ্রীভাগবতোক্ত বা বিষ্ণুপুরাণোক্ত বিধি মার্গের অধীন নহেন।

স্বভাবোচিত ধর্ম্মই 'স্বধর্ম্ম' এবং পরস্বভাব যোগ্য ধর্ম্ম 'পরধর্ম্ম'। সুতরাং স্বভাব সর্ব্বদাই যে, কোনও জাতি-কুল অপেক্ষাকরিবে, তাহা নহে। যেমন পরশুরাম ও বিশ্বামিত্রের প্রকৃতিতে জাতিকুলজাত স্বধর্ম্ম যাজনের ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। পরশুরাম ভৃগু বংশীয় মহির্ষি জমদগ্নির ঔরসজাত পুত্র। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণকুলজাত হইলেও ক্ষাত্রস্বভাব প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। কিন্তু ক্ষত্রস্বভাবযুক্ত পরশুরামকে ক্ষত্রিয় মধ্যে গণনা না করিয়া অবৈধরূপে ব্রাহ্মণ মধ্যে পরিগণিত করায় স্বভাব বিরুদ্ধধর্ম্মানুসারে পরশুরাম ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মধ্যে স্বার্থবশতঃ শান্তি ভঙ্গ করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্রেও স্বধর্ম্মযাজনের ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। বিশ্বামিত্র কুশবংশীয় কান্যকুব্জাধিপতি ক্ষত্রিয়রাজ গাধির পুত্র। কিন্তু ক্ষত্রিয়কুলজাত হইলেও তিনি ব্রাহ্মণস্বভাব লাভ করিয়াছিলেন; তাই তাঁহার স্বভাবোচিত ধর্ম্মই তাঁহাকে ব্রাহ্মণ যোগ্য তপস্যাদিতে নিযুক্ত করিয়াছিল। কিন্তু তিনি

তপস্যাচরণ- প্রভাবে ঋষিত্ব লাভ করিলেও অনন্যভাক্ হইয়া হরিভজন করেন নাই বলিয়া পুষ্করতীর্থে স্বর্বেশ্যা মেনকা দর্শনে কামবিমূঢ় হইয়াছিলেন।

অতএব ঔপাধিক স্বধর্ম্ম ও বিধর্ম্ম পরিবর্ত্তনশীল। জীব স্বরূপতঃ নিত্য কৃষ্ণদাস, সুতরাং অহৈতুকী ভগবদ্ভক্তিই জীবের স্বভাবগত বৃত্তি বা স্বরূপ ধর্ম্ম। উহা কোন কালেই ঔপাধিক পরধর্ম্মের ন্যায় "ভয়াবহ" বা অনিষ্টজনক নহে। উহা জীবমাত্রেরই স্বভাবোচিত ধর্ম্ম বলিয়া একমাত্র যথার্থ "স্বধর্ম্ম" আখ্যায় আখ্যাত হইবার যোগ্য এবং উহা একমাত্র শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া পরধর্ম্ম পদবাচ্য হইতেও পারে। এই স্থানে পরশব্দে অপরের স্বভাবোচিত ধর্ম্ম নহে, পরন্তু স্বস্বভাবোচিত শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুঞ্জীকৃত সুকৃতির ফলে নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধভগবদ্ভক্তিপরায়ণ সাধুর দর্শন লাভ ও তাঁহার উপদেশ প্রাপ্ত হইলে জীব- হৃদয়ে নির্গুণ ভক্তিলাভের স্পৃহা বলবতী হয়। সুতরাং সেই সময় সঙ্কীর্ণ, ক্ষুদ্র, স্বার্থপর ঔপাধিক স্বধর্ম্ম পরিত্যাগে কোনই আপত্তি থাকে না। কারণ ঔপাধিক স্বধর্ম্মই তখন পরধর্ম্ম অর্থাৎ স্থূললিঙ্গ-দেহাসক্ত অপর বদ্ধজীবের অধিকারোচিত নৈমিত্তিক ধর্ম্ম হইয়া পড়ে। আর জীবের নিত্য স্বভাবোচিত ধর্ম্ম কৃষ্ণভক্তি তখন স্বধর্ম্ম রূপে প্রকাশ পায়। সুতরাং ভগবদ্ভক্তিই জীবমাত্রের স্বধর্ম্ম, তদ্ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মই ঔপাধিক পরধর্ম্ম অতএব "ভয়াবহ"। এই জন্যই শ্রীব্যাসদেবকে শ্রীনারদ গোস্বামী বলিয়াছিলেন—

"ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্বোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং কো বার্থ আপ্তো ভজতাং স্বধর্ম্মতঃ।।"

অর্থাৎ নিত্য-নৈমিত্তিককর্ম্ম অথবা বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালন পরিত্যাগ করিয়া হরিপাদপদ্ম ভজন করিতে অসিদ্ধাবস্থায়ও যদি কেহ ভজন হইতে কোন প্রকারে ভ্রষ্ট অথবা মানবলীলা সম্বরণ করেন তথাপিকর্ম্মে অনধিকারহেতু আশঙ্কা করিতে হইবে না। ভাগবৎসেবা বাঞ্ছা থাকায় তাহার কোন অমঙ্গল হয় না। পরন্তু ভজনহীন ব্যক্তিগণের ভক্তিশূন্য স্বধর্ম্মপালনের দ্বারা কোন্ প্রয়োজনই বা সিদ্ধ হয়। তবে যে গীতায় অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গিদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবার নিষেধ আছে তাহা ভক্ত্যুপদেষ্টৃদিগের জন্য নহে। কারণ ভক্তিতে অন্তঃকরণ শুদ্ধি পর্য্যন্ত অপেক্ষা নাই। শ্রীমদ্ভাগবতেই উক্ত হইয়াছে যে—যাঁহারা কামনা পরিত্যাগ- পূর্ব্বক একমাত্র ভক্তিলাভের জন্য কৃষ্ণচরণে শরণ গ্রহণ করেন, তাহারা দেবঋণ, ঋষিঋণ, পুত্রঋণ, ভূতঋণ বা মনুয্যঋণ এই পঞ্চবিধ ঋণের কোন ঋণেই ঋণী নহেন। শ্রীগীতায় অর্জ্জুনকেও শ্রীভগবান্ এই চরমোপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।

সুতরাং পূর্ব্বমীমাংসার "চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" সূত্রের দ্বারা লক্ষিত ঔপাধিক স্বধর্ম্মই উত্তর-মীমাংসার প্রতিপাদ্য নিত্যধর্ম্ম ভগবদ্ভক্তির নিকট পরধর্ম্ম পদবাচ্য। তাহাই ভয়াবহ। আর ভগবদ্ভক্তিই নিত্যকৃষ্ণদাস জীবের স্বধর্ম্ম উহাই আত্মার সহজ ও সুখাবহ।

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ

এই অক্ষজজ্ঞান দৃপ্ত জগতের লোক ভেদবাদী। দ্বিতীয়াভিনিবেশই এই ভেদবাদের কারণ। যাঁহারা মায়িক অভিনিবেশ হইতে নির্ম্মুক্ত, তাঁহারা বাসুদেবময় জগৎ দর্শন করেন। এই বাসুদেবময় দর্শনই অদ্বয়জ্ঞান। অদ্বয়জ্ঞানেই শুদ্ধ বেদান্তের ও সর্ব্ববিধ সুদর্শনের সমন্বয়। এই অদ্বয়জ্ঞান হইতে অপসারিত হইয়া জীব জড়ভেদবাদী বা কেবলাভেদবাদী হইয়া পড়েন। এই জড়ভেদ ও কেবলাভেদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীভগবান্ একটী সুদৃঢ়, সুরম্য ও সুরক্ষিত, অপ্রাকৃত সৌধ জগতে প্রকাশিত করিয়াছেন। সেই অপ্রাকৃত সৌধের নাম **অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ**। এই অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদরূপ সৌধটী চারিটী সুদৃঢ় স্তম্ভের উপর স্থাপিত। চারিজন আচার্য্য এই চারিটী স্তম্ভের দিক্‌পাল। আবার এই চারিটী স্তম্ভের মধ্যে দুইটী স্তম্ভ মূলস্বরূপ। যাঁহারা অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্বের অন্তঃপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া অদ্বয়জ্ঞান বা চিদ্বিলাস বৈচিত্রের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আস্বাদন করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন তাঁহারা ঐ দুইটী স্তম্ভের সুদৃঢ়তা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব প্রচারক শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রারম্ভে "বন্দেগুরূনীশভক্তান্"—এই মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে যে অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব সূত্রাকারে গ্রথিত করিয়াছেন, সেই রূপানুগ আচার্য্যপ্রবর শ্রীল কবিরাজ তাঁহার গ্রন্থমধ্যে বৈষ্ণবাচার্য্যচতুষ্টয়ের অন্যতম আচার্য্য শ্রীরামানুজপাদ ও শ্রীনিম্বার্কপাদের কোনও প্রকার নামোল্লেখ না করিলেও অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বের দুইটী মূলস্তম্ভরক্ষক শ্রীগৌড়পূর্ণানন্দ মধ্বাচার্য্য ও বিষ্ণুস্বামি সম্প্রদায়স্থ 'ভক্ত্যেকরক্ষক' ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীধরস্বামীর নামোল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

এই দুইজন আচার্য্য অক্ষজজ্ঞানদৃপ্ত জগতের ভেদবাদ ও অভেদবাদ দূর করিতে সমর্থ। শ্রীগৌরসুন্দর এই দুইজন আচার্য্যকে এই জন্যই সম্মানন করিয়া একজনকে গুরুত্বে বরণ, আর একজনকে 'স্বামী' অর্থাৎ আচার্য্য বলিয়া সম্মান করিয়াছে। শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যপাদ জড়ভেদবাদ নিরাসপূর্ব্বক জগতে চিজ্জগতের সেব্য-সেবকসূত্রে শুদ্ধ ভেদবাদ স্থাপনা করিয়াছেন। জড়ভেদবাদে মায়ার পূতিগন্ধ বিরাজিত। তাহাতে বাসুদেবসেবা নাই। এই জড়ভেদবাদ হইতেই অভ্যুদয়বাদীর কর্ম্মমার্গ সৃষ্ট হইয়াছে। আবার কেবলাদ্বৈত-বাদীর অভেদ বাদও অক্ষজ জ্ঞান-প্রসূত। তাহাতে জড়ভেদবাদের হেয়তা না থাকিলেও বাসুদেব-সম্বন্ধ নাই। কারণ কেবলাদ্বৈতবাদী স্বগত-সজাতীয়, বিজাতীয়ভেদরহিত ব্রহ্মবিচারে বাসুদেবের নিত্যসেবা স্বীকার করেন না। কেবলাদ্বৈতবাদী জড় ভেদবাদীর সহিত প্রতিদন্দ্বিতামূলে যে কেবলাভেদবাদ রচনা করিয়াছেন তাহা জড়ভেদবাদেরই অপর দিক মাত্র। এই কেবলাদ্বৈতবাদীর অক্ষজ বিচারের হস্ত হইতে ভগবৎসেবা লিপ্সু জনগণের রক্ষার্থ শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদ শুদ্ধাদ্বৈতবাদ রূপ একটী সুদৃঢ় স্তম্ভ জগতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শ্রীধরস্বামিপাদ সেই সুদৃঢ় স্তম্ভের একজন প্রধান রক্ষক বলিয়া শ্রীল জীবপাদ তাঁহাকে 'ভক্ত্যেকরক্ষক' আখ্যা দিয়াছেন। যাহারা ভুলক্রমে শ্রীধরস্বামিপাদকে শুদ্ধাদ্বৈতবাদী না জানিয়া কেবলাদ্বৈতবাদী মনে করেন, তাহাদিগকে সংশোধন করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর—

"স্বামী যে না মানে তারে বেশ্যা মধ্যে গণি"

প্রভৃতি বাক্য বলিয়াছেন।

যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন শ্রীমন্মহাপ্রভু ত' শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদকেও "আচার্য্য" বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তদুত্তর এই যে ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শঙ্করপাদের বেদসম্মানরক্ষণকার্য্যের জন্য 'আচার্য্য' বলিয়া স্বীকার করিলেও পরমুহূর্ত্তেই বলিয়াছেন—

"আর যেই শুনে তার হয় সর্ব্বনাশ।।"
জীবের নিস্তার লাগি সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ।।

—চৈঃ চঃ আদি ৭ম ও মধ্য ৬ষ্ঠ।

কিন্তু শ্রীবল্লভাচার্য্য মহাশয় শ্রীধরস্বামীকে কেবলাদ্বৈতবাদিভ্রমে শ্রীধরটীকার অসম্মান করিলে জগদ্‌গুরু শ্রীগৌরসুন্দর প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন—

শ্রীধরস্বামিপ্রসাদে ভাগবত জানি।
জগদ্‌গুরু শ্রীধরস্বামী গুরু করি মানি।।
শ্রীধরানুগত কর ভাগবত ব্যাখ্যান।
অভিমান ছাড়ি ভজ কৃষ্ণ-ভগবান্।।

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৭ম।

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ চারিটী স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া জগতে অদ্বয়- জ্ঞানের অপূর্ব্ব বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছে। শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যের শুদ্ধভেদবাদ জড়- ভেদবাদ নিরাশ করিয়া জীব-ব্রহ্মে শুদ্ধ-সেব্যসেবকসম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়াছেন। শুদ্ধ অভেদবাদ বা শুদ্ধাদ্বৈতবাদ কেবলাদ্বৈতবাদীর ভ্রমপূর্ণবিচার নিরাশ করিয়া নিত্যসেবা ও সেবকের সমজাতীয়ত্ব প্রদর্শন করিয়া সেব্য ও সেবকের তদীয়ত্ব বা নিত্য শুদ্ধ সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়াছেন। আবার শ্রীরামানুজাচার্য্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মায়াবাদীর 'মায়াময় জগৎ' পরিকল্পনা নিরাস করিয়া বিশ্ব যে নিখিলকল্যাণগুণযুক্ত শক্তিমত্তত্ত্ব শ্রীভগবানের স্থূলদেহ, তাহা শাস্ত্রবিচারমুখে প্রদর্শন করিয়াছেন। জগৎ অনিত্য হইলেও মিথ্যা নহে। উহা ভগবানের স্থূলদেহ-স্বরূপ। শ্রীরামানুচার্য্যপাদ 'সেব্য ও সেবকের নিত্য সম্বন্ধ, চিদ্রাজ্যে নিত্য অবস্থান' প্রভৃতি সিদ্ধান্ত শব্দ প্রমাণ হইতে প্রমাণিত করিয়া মায়াবাদীর মায়াময় বিচার নিরস্ত করিয়াছেন।

আবার শ্রীনিম্বাদিত্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া জড়ভেদবাদী ও কেবলাদ্বৈতবাদীর বিচারের ভ্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক সেব্য ও সেবকের মধ্যে সেবকসূত্রে যুগপৎ ভেদ এবং জীবেরও ঈশ্বরের ন্যায় সচ্চিদানন্দস্বরূপতাসূত্রে অভেদত্ব স্বীকারপূর্ব্বক নিত্য চিদ্ভেদ অর্থাৎ সেবার নিত্যতা স্বীকার করিয়াছেন।

এই চারিটী সুদৃঢ় স্তম্ভের উপর অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের সুরক্ষিত দুর্গ রচিত হইয়াছে। এই দুর্গের নির্ম্মাতা আচার্য্যরূপধারী স্বয়ং ভগবান্। সুতরাং সাক্ষাদ্ভগবৎ প্রচারিত তত্ত্বে ভ্রমপ্রমাদাদি দোষচতুষ্টয় বা অসম্পূর্ণতা নাই। এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদের দুর্গে প্রবিষ্ট হইলে জীবের জড়ভেদবাদীর হেয় দর্শন বা কেবল- অভেদবাদীর অসম্যক্ দর্শন থাকে না। তখন বাসুদেবময়-সুদর্শনে জীব নিজ-স্বরূপ, ভগবৎস্বরূপ, মায়ার স্বরূপ দেখিতে পান্ এবং অদ্বয় জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া চিদ্বিলাস-বিচিত্রতায় ভগবানের নিত্য নবনবায়মান সেবা-সৌভাগ্য লাভ করেন। এই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদই একমাত্র প্রোজ্ঝিতকৈতব নির্ম্মৎসর সাধুগণ-পরি-পূজিত ও পরমহংসকুল-সমাদৃত আস্তিক্যবাদ।

এই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদই বেদান্তের সুন্দর মীমাংসা। উত্তর মীমাংসা ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়। আবার তাহা গৌড়ীয় বেদান্তচার্য্যের গোবিন্দ ভাষ্যের দ্বারা জগতে প্রকাশিত হইয়া গোবিন্দ-সেবাপ্রকটনকারী। এই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় প্রিয় মহাজন শ্রীরূপ-সনাতন প্রভৃতি ও রূপানুগগণ কর্ত্তৃক জগতে প্রচারিত। এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদে বৈদিক আচার্য্যগণের সর্ব্ববিধ মতের সুন্দর সমন্বয়। অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ আচার্য্য শঙ্করকথিত বেদপ্রমাণতা স্বীকার করেন কিন্তু অসুরমোহন-কল্পে আচার্য্যের স্বকপোল কল্পিত মত বা বেদের একদেশী বিচার গ্রহণ করেন না। অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ প্রাদেশিক বাক্যগুলিকে 'মহাবাক্য' বলিয়া স্বীকার না করিয়া, বেদের আদ্যন্তমধ্যে গীত 'প্রণব' অর্থাৎ অসম্প্রসারিত ভগবন্নামকেই 'মহাবাক্য' বলিয়া স্বীকার করেন। অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ শঙ্করের একদেশ বিচারোত্থ পরাশ্রুতির অভেদপক্ষীয় বাক্য মাত্র গ্রহণ করিয়া, পরাশ্রুতির ভেদপক্ষীয় বাক্যের তাৎকালিক সত্যতা মাত্র স্বীকারপূর্ব্বক, শ্রুতিবাক্যের অসম্মান প্রদর্শন করেন না, পরন্তু ভেদ ও অভেদপক্ষীয় বাক্যের যুগপৎ সত্যতা নিরূপণ করিয়া পরাশ্রুতির প্রত্যেক বাক্যের সমানভাবে সম্মান প্রদর্শন করেন। অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের 'অচিন্ত্য' কথাটীর দ্বারা আরোহবাদীর অক্ষজজ্ঞানজাত কুদর্শন নিরাসপূর্ব্বক অবরোহবাদীর অধোক্ষজ-জ্ঞান-সম্ভব সুদর্শনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে সেব্যের বিভুত্ব ও সেবকের অণুত্ব সপ্রমাণিত করিয়া 'সেব্য' বস্তু সেবকের নিত্য পূজা অর্থাৎ শক্তিমত্তত্ত্ব ও 'সেবক' সেব্যের নিত্যাশ্রিত অর্থাৎ শক্তিতত্ত্ব ইহাই প্রচার করিয়াছেন। অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে সেবার মাধুর্য্য পরিস্ফুট। সেব্য ও সেবক সমজাতীয় না হইলে আত্মীয়তা বা প্রকৃত সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইতে পারে না। আবার সেব্য ও সেবক নিত্যালিঙ্গিত-বিগ্রহ হইলেও নিজে 'সেব্য' পদবী গ্রহণ করেন না অর্থাৎ ভোক্তা সাজেন না ইহাও অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বের নিহিত বিষয়। অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষাদির তুচ্ছত্ব ও ভগবৎ-প্রেমার পরম প্রয়োজনত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। অথচ ফলবৎ সহকার ন্যায়ানুসারে প্রেমাতে কোনও বস্তুরই অভাব নাই, কেবল অন্যান্য বস্তুর হেয়তা ও অবরতা দোষ অপগত হইয়া উন্নতোজ্জ্বলরসের চরম পুষ্টি সাধন করিয়াছে। অতএব অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বই নিত্যকাল জয়যুক্ত হউন্।

রাগ ও দ্বেষ

দুইটী মহাবল দৈত্য দুর্ব্বল মানব হৃদয়কে লইয়া করগত গোলকের মত যথেচ্ছ ক্রীড়া করিতেছে। অবলহৃদয় তাহাদের সবল করে একান্ত আবদ্ধ ও অবশ হইয়া কত দিকে কেবলই উঠিতেছে, পড়িতেছে; কখন জলে কখন স্থলে, কখন অনলে পতিত হইয়া, ক্ষণে ক্ষণে সহস্র, অবস্থায় সহস্র পরিবর্ত্তন, শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে। একবার স্থির হইতে, একটু শান্তি, একটু প্রসাদ অনুভব করিতে পারিতেছে না। ঐ দুর্জ্জয় দৈত্য দুইটি কে জান? শুন, পরিচয় দিতেছি। তাহারা নিরস্তকুহক পরম সত্যের পথাবরোধকারিণী কুহকিনী মিথ্যাদানবীর গর্ভজাত, মোহের ঔরস পুত্র; নাম—রাগ ও দ্বেষ। ত্রিগুণা মায়া- রাজ্যের বহির্গমন পথে তাহারাই প্রধান প্রহরী। তাহারাই নিত্যবদ্ধ জীবহৃদয়কে নানারঙ্গে নাচাইয়া, নানা বিষয়ে রতি ও বিরতি দিয়া, কেবলই ঐ মায়াকারাগারে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বদ্ধ করিয়া রাখিতেছে।

তাহারা, ধনিসন্তানের সদা সহচর চাটুকারদের মত, সর্ব্বদা সুহৃদ্ বেশে হৃদয়ের বা মনের সাথে সাথেই অবস্থান করে। তাহারা দুইজন দুই প্রকার; দ্বিবিধ পন্থায় ভগবদ্ বিমুখ মনঃকে শ্রেয়ঃ পথ হইতে ভুলাইয়া, শ্রেয়ঃ বলিয়া প্রেয়পথেই প্রেরণ করে। এই কার্য্যে তাহারা কত বল, কত কৌশল প্রয়োগ করিয়া, রাজ্যাধিষ্ঠাত্রী মায়া দেবীর প্রীতি সাধন করিতেছে!

যেটি জীবের যথার্থ সুখের, সম্পূর্ণ শান্তির অক্ষয় আলয়; যাঁহার জন্যই জীবের জীবন; দ্বেষ তাঁহাকেই অন্তরালে রাখিয়া, সম্মুখে একটা স্বকল্পিত বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়া, ইন্দ্রিয়বশ দুর্ব্বলহৃদয়কে অতি মধুর বাক্যে বলিতেছে;—

"চে'ওনা ও দিকে মন;
নহে উহা মধু বন;
ওই দেখ, কি ভীষণ কাল-সর্প-ময়
শুষ্ক কূপ অন্ধতমঃ,
তৃণাবৃত মনোরম,
না করিতে পদার্পণ হইবে প্রলয়।।"

হৃদয় অমনি সে দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া, শত হস্ত দূরে সরিয়া দাঁড়াইতেছে! সত্য অনুসন্ধানে আর অণুমাত্র অবকাশ বা অভিরুচি হইতেছে না। মিথ্যা দানবীর মহাপ্রভাব পুত্র দ্বেষ ঐ দুর্ব্বলহৃদয়কে এত মুগ্ধ এত অন্ধ করিয়া ফেলিতেছে যে, সে সকল সন্তাপহর পরম দুর্ল্লভ সুধাকুম্ভকেই প্রাণান্তক কালকূট বোধে দূরে নিক্ষেপ করিতে একবারও ইতস্ততঃ, একটুও চিন্তা করিতেছে না; একবার চক্ষুঃ মেলিয়াও দেখিতেছে না, বিজ্ঞজনের একটা কথাও গ্রহণ করিয়া বুঝিতেছে না,—সে অঞ্চলগত অমূল্য মণিকে অগাধ জলে বিসর্জ্জন দিয়া, কঙ্করস্তূপে মণির সন্ধানে গলদ্ঘর্ম্ম হইতেছে।

ওদিকে আবার রাগ কি করিতেছে দেখ! সে, জীবের যাহা যথার্থ সর্ব্ব- নাশকর, যাহা একান্ত শ্রেয়ঃপ্রতিকূল অর্থ বা বিষয়, তাহাকেই নানাবিধ বেশ- ভূষায় সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়া, সেই দিকেই ঐ অবলম্বন-হীন অবল হৃদয়ের সম্পূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে; আর কর্ণ রসায়ন সুকণ্ঠে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে;—

"এই পরমার্থ সার,
অনন্ত সুখের দ্বার!
চাহি না কিছুই আর, এস এই পথে;
অগাধ রত্নের খনি,—
হের কত মুক্তা মণি;
এ ধনে যে জন ধনী, ধন্য সে জগতে।।"

মন অমনি উন্মত্তের ন্যায়, অনলমুখগামী পতঙ্গের ন্যায়, সেই দিকেই ধাবিত হইতেছে। কোনও চিন্তা করিবার, সাধুবাক্যে—সাধুসঙ্গে ক্ষণতরে সত্য নির্ণয় করিবার, তিল মাত্র সুযোগ বা সময় হইতেছে না। ইহাতেই তাহার পদে পদে সর্ব্বনাশও হইতেছে। সে অনুরাগে অন্ধ হইয়া কুসুম-মালা- বোধে কালভুজঙ্গকে বক্ষে ধারণ করিতেছে; ভক্তি বলিয়া ভুক্তিকে, সত্যবাদ বলিয়া মিথ্যা মায়াবাদকে, ভক্ত বলিয়া ভণ্ডকে, কর্ম্ম বলিয়া বিকর্ম্মকে, ধর্ম্ম বলিয়া অধর্ম্মকে, অথবা এক কথায়—হরি- তোষণ বলিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণকেই আদরে বরণ করিয়া মরণ ডাকিয়া আনিতেছে।

এইরূপে এই দুরতিক্রম্য মায়ারাজ্যে মহাদস্যু রাগ ও দ্বেষ মানবহৃদয়কে কেবল বিপথে লইয়াই বিভ্রমে সর্ব্বস্বান্ত করিতেছে। হরি! হরি! হরি!

তাই, এই মায়া-বঞ্চিত জীবকে সাবধান করিবার জন্য, জীবহিত জগন্নাথের এই অমূল্য শ্রীমুখবাণী অনন্ত গগনে প্রতিধ্বনি তুলিয়া অনন্তকাল ধ্বনিত হইতেছে;—

"রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি।।
প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে।।"

(শ্রীগীতা ২।৬৪-৬৫)।

বলিতেছেন,—অনন্য ভক্তিযোগে শ্রীকৃষ্ণে একান্ত রত বিশুদ্ধমতি ভক্ত, মায়িক রাগ ও দ্বেযে কখনও আত্মহারা হন না। তিনি উভয়ের হস্ত হইতেই বিমুক্ত হইয়া, আত্মবশ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যথাযোগ্য বিষয় ভোগ করেন; অর্থাৎ তাহাতে কৃষ্ণ-সেবাই করেন। এইরূপে তিনি সতত চিত্ত প্রসাদ উপভোগ করিতে পারেন। চিত্ত-প্রসাদ উপস্থিত হইলে, আর কোনও দুঃখই তথায় আসিতে বা থাকিতে পারে না। আর তখনই বুদ্ধিও সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ সাধনে সুস্থির হয়।

মায়িক রাগ-দ্বেষই সতত আমাদের চিত্ত-প্রসাদ নষ্ট করিতেছে; স্তুতি নিন্দা মান অপমান লাভ ক্ষতি প্রভৃতি দ্বন্দ্বে চাঞ্চল্য ঘটাইয়া হৃদয়কে অবিরত অভীষ্টপদ হইতে বিচলিত করিতেছে। শান্তি লাভ হইতেছে না; সন্তোষ মিলিতেছে না। মায়াময়ী মরীচিকায় আকর্ষণ ও সুপেয় শীতল বারি হইতে বঞ্চনা করিয়া, তাহারা উভয়েই যে আমাদের কি সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে, ঘোর মোহে জ্ঞান হারাইয়া আমরা তাহা দেখিতে পাইতেছি না। সুহৃদ্ বোধে সর্ব্বদা তাহাদের পশ্চাতেই ছুটিতেছি। এইরূপ ছুটাছুটি থাকিতে, চিত্ত-প্রসাদও আসিতেছে না, বুদ্ধিও বিষয়-বিকার-মুক্ত হইয়া স্বস্থ হইতেছে না। সব নষ্ট হইতেছে।

তা'ত হইবারই কথা। যেমন দুর্জ্জয় দস্যু, তেমনি অমোঘ অস্ত্র, যেমন দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি, তেমনি অব্যর্থ ঔষধ প্রযুক্ত না হইলে, পরিত্রাণ পাইবে কে; শ্রীমুখেই ত' ব্যক্ত হইয়াছে;—

"দৈবা হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।।"

(শ্রীগীতা ৭।১৪)

দৈবী ও গুণময়ী মায়া দুরতিক্রম্যা হইলেও, জীব মায়াধীশ শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে অনন্য ভক্তিযোগে একান্ত শরণ গ্রহণ এবং সর্ব্বতোভাবে তাঁহারি ভজন সাধন হইতে, এই দুশ্ছেদ্য মায়া পাশে মুক্ত হইয়া নিত্যানন্দের অধিকারী হইতে পারে। অন্যথা, কোনও দিন কোনও উপায়ে কেহই এই মায়ার কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে বা নিত্যানন্দের অধিকারী হইতে পারে না। শ্লোকোক্ত "এব" শব্দে ইহাই অবধারিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও (১।১৬-২২) ভাগবতোত্তম শ্রীসূত মহাশয়ের মুখে প্রকাশিত হইয়াছে;—

"শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেব-কথারুচিঃ।
স্যান্মহৎ-সেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবনাৎ।
শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণ কীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্।।
নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবত-সেবয়া।
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী।।
তদা রজস্তমোভাবাঃ কাম লোভাদয়শ্চ যে।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি।।
এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তি-যোগতঃ।
ভগবতত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে।।
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে।।

অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা।
বাসুদেবে ভগবতি কুর্ব্বন্ত্যাত্ম-প্রসাদনীম।।”

বলিতেছেন,—হে শৌনকাদি ব্রাহ্মণগণ, শ্রবণ করুন,—কৃষ্ণপরায়ণ মহাত্মদের সেবা ও তাঁহাদের পাদরজঃপূত পুণ্য তীর্থ বা পবিত্র আশ্রমে অবস্থান হইতে, শাস্ত্রাবাক্যে শ্রদ্ধাশীল ও সাধুবাক্যে শ্রবণাভিলাষী সুবুদ্ধিজনের কৃষ্ণ কথামৃতরুচির উদয় হয়। অর্থাৎ, বিষয়রসলালসা বিনষ্ট হইয়া ভগবদ্ ভক্তি-প্রেম- রসে পূর্ণাসক্তি জন্মে। তাহাতে কি হয়? এইরূপ একান্ত আসক্তচিত্তে সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথামৃতরস সেবনকারিজনের শ্রবণপথে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং প্রবিষ্ট হইয়া তাহার অন্তরস্থ হন, এবং তাহার হৃদয়ের সমস্ত রাগ-দ্বেষাদি বিকার বিনষ্ট করিয়া, তাহা আপন অবস্থানোপযোগী করিতে থাকেন। এমতে, ঈদৃশ সাধু সহবাসে সতত ভাগবত-সেবা হইলে, ঐ সাধু-সঙ্গপ্রাপ্ত ভাগবত-সেবারত সুভগজনের হৃদয় সম্পূর্ণ মল-মুক্ত, সর্ব্বথা সাধুজনোচিত না হইতেই, তথায় অচঞ্চলা কৃষ্ণভক্তির অভ্যুদয় হয়। তখন, ঐ ভক্তির শক্তিতেই তথাকার শেষ গ্লানি—রজস্তমোগুণ-জাত বিষয়বুদ্ধি ও কাম-লোভাদি কুভাব মন হইতে একবারে বিদূরিত হইয়া যায়; বিমল চিত্ত কৃষ্ণপাদপদ্মে স্থির হইয়া পরম-প্রসাদ-মধু পান করিতে থাকে। এই প্রকারে হইয়া পরমপ্রসাদমধু পান করিতে থাকে। এই প্রকারে প্রাপ্ত-বিত্ত প্রসন্নচিত্ত, ঐ অবিচল ভক্তিযোগ প্রভাবেই ত্রিগুণ মায়া বন্ধন মুক্ত,—মায়িক বিষয়ে রাগ দ্বেষ শূন্য হইয়া, হৃদয়াধিষ্ঠিত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ অনুভব ও অবলোকন করিতে অপ্রাকৃত সামর্থ লাভ করে। আর অমনি, ঐ বিজ্ঞানবুদ্ধ সিদ্ধ সাধন জনহৃদয় জন্ম জন্মান্তরের যত কল্মষ কষায় ক্লেশ, তাহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া, সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ-সেবানন্দে নিমগ্ন হন! এই জন্যই, সাধু গুরুকৃপায় এই সকল নিগূঢ় তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়াই, বিবুধগণ, বিফল বিষয় সেবা, বিষয় বিষ রস লেহন পরিহার করিয়া বিকারময় বিষয়- বুদ্ধিজাত রাগদ্বেষের বশে অসুখ কলহ কোন্দল, বিরস বাক্য বিনিময় বর্জ্জন করিয়া, পরস্পর পরমানন্দে শ্রবণ কীর্ত্তনাদিক্রমে কৃষ্ণ-সেবাতেই কাল হরণ করেন। এই কৃষ্ণ সেবাই কেবল কলিমল পূর্ণ কুহৃদয়কে একান্ত কল্মষমুক্ত ও নিত্য প্রসাদযুক্ত করিতে পারে।

কিন্তু, হায়, কৈ—কোথায় আমাদের এই কৃষ্ণ-সেবা? কপটাচারে, আত্মবঞ্চনার দ্বারে, কৃষ্ণসেবা বলিয়া যাহা আমরা করি, তাহাতে সর্ব্বতোভাবে বিষয় সেবা বা ইন্দ্রিয় সেবাই হয়! তাহাতে আমরা ‘আমি একজন’ হইয়া, আপনার প্রতিষ্ঠা ও প্রাপ্তির প্রতিই সহস্রচক্ষুঃ হইয়া সতত লক্ষ্য রাখি। তাহার একটু হানি হইলেই, এক কণ ক্ষতি হইলেই দণ্ডহস্তে লোহিতচক্ষে ক্ষতিকারককে আক্রমণ করি। তাহারও মূলে সেই মায়িক-রাগদ্বেষই আমাদের বিবেক বুদ্ধি লোপ করে; হিতে বিপরীত হয়; সাপ্ মারিতে শিবকে মারি। অপরকে অযথা আক্রমণে নিম্নে আনিতে, আপনারই অধঃপাত সাধন করি। মিথ্যার আশ্রয়ে অক্ষয়সত্যকে নষ্ট করিতে গিয়া আপনিই বিনষ্ট হই। অহো, এই অতি ঘোর মায়ারণ্যে এই মহাদস্যু দুর্জ্জয় রাগ দ্বেষ আমাদের কি সর্ব্বনাশই করিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণামৃত। শ্রীকৃষ্ণপুর।।

গৌড়ীয়

[১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দ, ১৩৩৩-৩৪ বর্ষ]

নগর-সংকীর্ত্তন

বহুলোক একত্রে মিলিয়া বাদ্য ও নৃত্যাদির সহিত ভগবদ্গুণগান পূর্ব্বক নগর-পরিভ্রমণ বা নগরে নগরে ভগবানের নাম-প্রচারই—"নগর-কীর্ত্তন"। ভগবান্—এক অদ্বিতীয় বস্তু। বেদ বলেন, "ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে"—তিনি এক অদ্বয়বস্তু, তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিক আর কেহ নাই। ভগবান্ সর্ব্বজীব-প্রভু, সুতরাং তিনি সকলেরই এক—

শ্রীল ঠাকুর হরিদাস কাজীকে বলিয়াছিলেন—

"শুন বাপ, সবারই একই ঈশ্বর।।

* * * *

নাম মাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে।।

(চৈঃ ভাঃ আদি ১৬।৭৬-৭৭)

মুসলমান্-শাস্ত্রেও "কালমায়ে শাহাদাত" (সাক্ষ্যবাক্য) বলেন,—'খোদা' ভিন্ন আর কেহ-ই উপাস্য নাই। তিনি অদ্বিতীয়। তাঁহার আর শরীক্ নাই। হজরত মহাম্মদও 'খোদা' নহেন, তিনি 'খোদাতায়ালা'র বান্দা' (সেবক) ও তাঁহারই প্রেরিত পুরুষ।

তাঁহাদের "কালমায়ে তাম্‌জীদ্" (গুণ প্রকাশকবাক্য) বলেন,—"সমস্ত প্রশংসা খোদাতায়ালারই জন্য ইত্যাদি।" তাশাহ হুদ্ বলেন, "সমুদয় জিহ্বার প্রশংসা, দৈহিক আরাধনা ও আর্থিক উপাসনা খোদাতায়ালার জন্য নির্দ্দিষ্ট।"

এমতাবস্থায় একমাত্র অদ্বিতীয় সেব্য, আরাধ্য ও কীর্ত্তনীয়—ভগবানের গুণকীর্ত্তনে কাহারও কোনই আপত্তির কারণ হইতে পারে না। যেখানে উপাস্য, প্রভু, ভোক্তা বা "খোদা" এক অদ্বিতীয় পুরুষ, আর সকলেই তাঁহার উপাসক, দাস, সেবক বা 'বন্দা', সেই স্থানে কখনও পরস্পরের মধ্যে ঐক্যতানের অভাব হইতে পারে না। জাগতিক জীব সেই একমাত্র অদ্বিতীয় সেব্য পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হইলেই 'নিত্যদাস' বা 'বন্দা' অভিমান পরিত্যাগ করিয়া অবৈধরূপে 'প্রভু' বা 'খোদা' সাজিতে অগ্রসর হয়। এইরূপ ভোগবুদ্ধিমূলে জগতে বহু প্রভু ও বহু ভৃত্য দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে প্রভু বা ভোক্তার সংখ্যা অনেক, সেইখানেই সংঘর্ষ; আর যেখানে প্রভু, ভোক্তা বা খোদা একজন, আর বাদবাকী সকলই তাঁহার দাস—সেবক বা

'বন্দা', সেখানে সংঘর্ষের কোনও কারণ নাই। কারণ সকলেরই উদ্দেশ্য, চেষ্টা ও চিত্তের গতি একপ্রকার। সকলেই এক প্রভুর সন্তান—পারমার্থিক ভ্রাতৃসম্বন্ধ বিশিষ্ট।

"পরমার্থ এক কহে কোরাণে পুরাণে।"

—শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের এই বাক্য হইতে আমরা জানিতে পারি যে, অদ্বিতীয়বস্তু ভগবান্ পরমার্থতঃ সকলেরই এক। বাহ্য মতভেদ বা বিবাদে প্রকৃতবস্তুর কর্ত্তৃসত্তাগত অধিষ্ঠানের (Subjective existence) পরিবর্ত্তন হয় না। কেহ যদি পৃথিবীকে চতুষ্কোণ, কেহ বা ত্রিকোণ বা গোলাকার বলিয়া পরস্পর অনন্তকাল ধরিয়াও বিবাদ করিতে থাকেন, তাহা হইলেও পৃথিবীর যাহা প্রকৃত আকার, তাহার কিছু আসিয়া যাইবে না। কোন ব্যক্তি যদি সূর্য্যের উদয় সম্বন্ধে পশ্চিমদিক, কেহ বা দক্ষিণদিক, কেহ বা উত্তর দিক, আবার কেহ বা পূর্ব্বদিক্ বলিয়া নির্ণয় করেন, এইরূপ পরস্পর মতভেদহেতু সূর্য্য কখনও তাঁহার নিত্য উদয়াচল পরিত্যাগ করিবেন না। সুতরাং যেখানে আমরা সকলেই এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের দাস বা 'বন্দা', সেখানে আমাদের উদ্দেশ্যও এক হওয়া উচিত অর্থাৎ আমরা যাহাতে সকলেই নির্ব্বিবাদে তাঁহার নিত্যসেবক বা 'বন্দা' অভিমান অটুট রাখিয়া তাঁহার সেবাতে নিমগ্ন থাকিতে পারি, তদ্‌বিষয়ে যত্ন করা কর্ত্তব্য।

পুরাণ কোরাণ—সকলেই একবাক্যে বলেন যে, পরমেশ্বরের গুণকীর্ত্তন দ্বারাই তাঁহার প্রকৃষ্ট সেবা হয়। সনাতন বৈদিক ধর্ম্মশাস্ত্রের ত' কথাই নাই, ইস্‌লাম শাস্ত্রেও বহুস্থানে 'খোদাতায়ালা'র যশঃকীর্ত্তনের কথা গ্রথিত আছে। আমরা উপরে 'তাশাহ্‌হুদের' যে অনুবাদ উদ্ধার করিয়াছি, তাহাতেও দেখা যায় যে, সমুদয় জিহ্বার প্রশংসা 'খোদাতায়ালা'র জন্যই নির্দিষ্ট।

প্রাচীন বৈদিক যুগেও ব্রাহ্মণগণ সামগানে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া পরমপুরুষ শ্রীভগবানের আরাধনা করিতেন। আমরা শ্রুতিশাস্ত্রে 'উদ্‌গান' 'উদ্‌গাথা' প্রভৃতি শব্দ দেখিতে পাই। কলিসন্তরণোপনিষৎ কলিকালে একমাত্র নামকীর্ত্তনের মাহাত্ম্যই স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ ভাগবতাদি বেদবিস্তার-শাস্ত্রে সঙ্কীর্ত্তনকেই একমাত্র কলি যুগের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বা ভাগবতধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

'জপ' হইতে 'উচ্চকীর্ত্তন' শ্রেষ্ঠ—

"জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতৃন পুনাতি চ।।"

—শ্রীনারাদীয়ে প্রহ্লাদ-বাক্য

উচ্চকীর্ত্তনদ্বারা একাধারে স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা সিদ্ধ হয়। যাঁহাদের কর্ণে উচ্চকীর্ত্তনের ধ্বনি প্রবিষ্ট হয়, তাঁহারাও মঙ্গল লাভ করেন; আর কীর্ত্তনকারীরও একাধারে হরিনাম কীর্ত্তন, শ্রবণ ও স্মরণ হয়। আবার নগর কীর্ত্তনাদি দ্বারা একসঙ্গে বহুজীবের পরমমঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। অনেক সময় ঘরে বসিয়া উচ্চকীর্ত্তন করিলেও সেই ধ্বনি সঙ্কুচিত-চেতন পশুপক্ষী বা আচ্ছাদিত-চেতন বৃক্ষলতাদির সৌভাগ্য উদয় করায় না,

কিন্তু নগর-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ-তৃণগুল্ম-লতাদিরও সুকৃতি বা সৌভাগ্যের উদয় হয়। ঝারিখণ্ডের পথে মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-প্রচারের কথা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"'হরিবোল বলি' প্রভু করে উচ্চধ্বনি।
বৃক্ষলতা—প্রফুল্লিত, সেই ধ্বনি শুনি'।।
ঝারিখণ্ডে স্থাবর জঙ্গম আছে যত।
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত।।"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।৪৫-৪৬

গীতকাণ্ড, বাদ্যকাণ্ড ও নৃত্যকাণ্ড—এই ত্রিবিধ ব্যাপার 'তৌর্য্যত্রিক' নামে অভিহিত। এই তৌর্য্যত্রিক ব্যসন বা কামজ দশবিধ দোষের অন্যতম। কিন্তু ইহাই আবার ভগবৎ প্রীতির জন্য সাধিত হইলে ভক্ত্যঙ্গ মধ্যে গণিত হয়। নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির চেষ্টাই—'কাম' আর ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ইচ্ছাই—'প্রেম'। ভগবৎ-প্রীতির জন্য নৃত্যগীত-বাদ্যাদির মাহাত্ম্য সনাতন-ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষভাবে স্থাপিত আছে। শ্রীহরি-ভক্তিবিলাসের ৮।১১০ সংখ্যায় নারদীয় পুরাণবাক্যে এইরূপ লিখিত আছে—

"বিষ্ণোর্গীতঞ্চ নটনঞ্চ বিশেষতঃ।
ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণজাতীনাং কর্ত্তব্যং নিত্যকর্ম্মবৎ।।"

—শ্রীহরির উদ্দেশ্যে নৃত্য-গীত ও অভিনয়াদি ব্রাহ্মণগণের নিত্যক্রিয়ার ন্যায় অবশ্য কর্ত্তব্য। আরও লিখিত আছে যে, যাঁহারা শ্রীকেশবের প্রীতির উদ্দেশ্যে নৃত্যগীত না করেন,—"বহ্নিনা কিং ন দগ্ধোঽসৌ গতঃ কিং ন রসাতলম্"—তাঁহারা কেনই বা পুড়িয়া মরেন না বা রসাতলে গমন করেন না? সুতরাং হরিচর্য্যার জন্য নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি সনাতন-বৈষ্ণবধর্ম্মের একটী বিশেষ অপরিত্যাজ্য অঙ্গ।

এই ত' গেল সনাতনধর্ম্মশাস্ত্রের আজ্ঞা। আমরা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণেই বা কি দেখিতে পাই, তাহাও বিচার করা যাউক্। আজ চারিশত বৎসরের অধিক দিনের কথা, তখন বঙ্গদেশ সম্পূর্ণ মুসলমান শাসনের অধীন ছিল। নবদ্বীপে তখন ফৌজদার কাজীর আসন। তাৎকালিক মুসলমান শাসনানুসারে দণ্ডবিধান ও শাসনাদি পরিচালনা কাজিগণের দ্বারাই সম্পাদিত হইত। ইঁহারা সুবাবাঙ্গালায় সুবাদারের অধীন ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন নবদ্বীপে গার্হস্থ্যলীলার অভিনয় করেন, তখন সেখানকার ফৌজদার ছিলেন—মৌলানা শেরাজুদ্দিন অপর নাম চাঁদকাজি। শ্রীমন্মহাপ্রভু নবদ্বীপ নগরের সকল লোককেই সঙ্কীর্ত্তন করিবার জন্য আদেশ দেন। তদনুসারে—

"মৃদঙ্গ করতাল সঙ্কীর্ত্তন মহাধ্বনি।
হরি হরি ধ্বনি বিনা অন্য নাহি শুনি।।"

(চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২৩)

—নবদ্বীপের সর্ব্বত্র এইরূপ অবস্থা হইল। মুসলমানগণ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া কাজির নিকট আসিয়া নিবেদন জানাইলেন। সন্ধ্যাকালে কাজি ক্রুদ্ধ হইয়া এক নাগরিকের ঘরে আসিয়া তাঁহাদের কীর্ত্তনের মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং সকলকে বলিতে লাগিলেন,—

"কেহ কীর্ত্তন না করিও সকল নগরে।
আজি আমি ক্ষমা করি' যাইতেছোঁ ঘরে।।
আর যদি কীর্ত্তন করিতে লাগ পাইমু।
সর্ব্বস্ব দণ্ডিয়া তা'র জাতি যে লইমু।।"

নগরিয়াগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট তাঁহাদের কীর্ত্তন বাধার কথা জ্ঞাপন করিলে এবং তাঁহারা স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন করিতে পারিতেছেন না জানাইলে, মহাপ্রভু নগরিয়াগণকে বলিলেন—

নগরে নগরে আজি করিমু কীর্ত্তন।
সন্ধ্যাকালে কর সবে নগর মণ্ডন।।
সন্ধ্যাতে দিউটী সবে জ্বাল' ঘরে ঘরে।
দেখ, কোন কাজি আসি' মোরে মানা করে।।

শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ বলিয়া সন্ধ্যাকালে নগর সঙ্কীর্ত্তনের জন্য তিন সম্প্রদায় রচনা করিলেন। প্রথম সম্প্রদায়ের নর্ত্তক হইলেন ঠাকুর হরিদাস, দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের নর্ত্তক অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু, আর তৃতীয় সম্প্রদায়ের নর্ত্তক গৌরনিত্যানন্দ দুই ভাই। এইরূপে তিন সম্প্রদায়ে নগর কীর্ত্তন করিতে করিতে কাজির গৃহের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাজি নিজগৃহে লুকাইয়া রহিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু কাজির গৃহের দ্বারে বসিয়া থাকিয়া লোক দ্বারা কাজিকে ডাকাইয়া আনাইলেন। কাজি ও মহাপ্রভুর মিলন হইল। কাজি মহাপ্রভুকে সন্মান করিলেন, মহাপ্রভুও কাজিকে সন্মান করিয়া বসাইলেন এবং বলিতে লাগিলেন—"আমি তোমার গৃহের অভ্যাগত; কিন্তু তুমি আমাকে দেখিয়া লুকাইয়া রহিয়াছ, তোমার এ কিরূপ ধর্ম্ম?" কাজিও প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—"আপনি ক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছেন বলিয়া আপনাকে শান্ত করিবার জন্যই আমি লুকাইয়া ছিলাম। আপনি শান্ত হইয়াছেন দেখিয়া আমিও আপনার সহিত মিলিত হইতে আসিলাম। আমার পরমভাগ্য যে আজ আমি আপনার ন্যায় অতিথি পাইয়াছি। গ্রাম-সম্বন্ধে শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ঠাকুর আমার 'চাচা' (খুল্লতাত) ও আপনার 'নানা' (মাতামহ) হন। সুতরাং সেই সম্বন্ধে আপনি আমার 'ভাগিনা'। ভাগিনার ক্রোধ 'মামা' অবশ্যই সহ্য করেন, আর মাতুলের অপরাধও ভাগিনা গ্রহণ করেন না।" এইরূপ উভয়ের মধ্যে গূঢ়ার্থসূচক অনেক কথা হইল অর্থাৎ চাঁদকাজি কৃষ্ণলীলায় কংস বা দেবকী নন্দনের মাতুল ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও কাজির মধ্যে ইস্‌লাম ধর্ম্মাচার সম্বন্ধে অনেক কথা হইল এবং কাজিও শ্রীমহাপ্রভুর বাক্য সুসত্য বলিয়া শিরোধার্য্য করিলেন। কাজি মহাপ্রভুকে একদিনের ঘটনা এইরূপ জানাইলেন—

* * * *

পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ সাত আইল।।
আসি' কহে,—হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাঞি।
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই।।
মঙ্গলচণ্ডী বিষহরি করি জাগরণ।
তা'তে নৃত্য, গীত, বাদ্য—যোগ্য আচরণ।।
পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত।
গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত।।
উচ্চ করি' গায় গীত, দেয় করতালি।
মৃদঙ্গ-করতাল শব্দে কর্ণে লাগে তালি।।
না জানি কি খাঞা মত্ত হঞা নাচে গায়।
হাসে, কান্দে, পড়ে, উঠে, গড়াগড়ি যায়।।
নগরিয়া পাগল কৈল সদা সংকীর্ত্তন।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই, করি জাগরণ।।
'নিমাঞি' নাম ছাড়ি' এবে বোলায় 'গৌরহরি'।
হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ডী সঞ্চারি'।।
কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বাড় বাড়।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়।।
হিন্দু শাস্ত্রে 'ঈশ্বর' নাম—মহামন্ত্র জানি।
সর্ব্বলোকে শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি।।
গ্রামের ঠাকুর তুমি সব তোমার জন।
নিমাই বোলাইয়া তা'রে করহ বর্জ্জন।। (চৈঃ চঃ আদি ১৭)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই বর্ণনা হইতে জানা যায়, তৎকালে ''পাষণ্ডীহিন্দু''গণ—যাঁহারা মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি প্রভৃতি পূজায় সারারাত্র জাগিয়া নৃত্যগীত বাদ্যাদি করিতেন এবং উহাকেই 'হিন্দুর ধর্ম্ম' মনে করিতেন, তাঁহারাও নিমাই পণ্ডিতের নগর সংকীর্ত্তনের বিরুদ্ধে কাজীর নিকট গিয়া অভিযোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রেমপ্রদ-বিগ্রহ গৌরহরির এমনই বদান্যতা যে, কাজী প্রতিকূল হইয়াও পরে অনুকূল হইলেন। নিমাঞির বিরুদ্ধে হিন্দুগণ অভিযোগ কিরলে, কাজি উল্টা তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। গৌরহরির কৃপায়

কাজীর মুখে 'হরি' 'কৃষ্ণ' 'নারায়ণ' নাম প্রকাশিত হইয়াছিলেন। কাজি নিমাঞির নিকট বর চাহিয়াছিলেন,—

"এই কৃপা কর, যেন তোমাতে রহু ভক্তি"। সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভু আবার কাজিকে আত্মীয় বোধে বলিয়াছিলেন,—

* * * এক দানে মাগিয়ে তোমায়।
সংকীর্ত্তন বাদ যৈছে নহে নদীয়ায়।।"

পাঠকগণ! কাজীর উত্তর শ্রবণ করুন্—শুধু উত্তর নয়—প্রতিজ্ঞা।

'কাজী কহে,—মোর বংশে যত উপজিবে।
তাহাকে 'তালাক' দিব, কীর্ত্তন না বাধিবে।।"

এখনও শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপের সন্নিকটে চাঁদকাজীর সমাধি পরসম্মানের সহিত বৈষ্ণবগণের দ্বারা পূজিত হইতেছেন। আজিও তথায় তাঁহার বংশধরগণ বাস করিতেছেন। দেশ দেশান্তর হইতে লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া আজও কাজীর কবরের নিকট সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম ও প্রদক্ষিণাদি দ্বারা কাজির সম্মান করিয়া থাকেন। শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমার সময় বৈষ্ণবগণ শ্রীকাজীর সমাধি পরিক্রমা করেন।

অতএব যে স্থানে আমরা পরমপালক অদ্বয়-জ্ঞানভগবানের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট, সে স্থানে কাহারও মধ্যে অপ্রীতির কথা থাকিতে পারে না।

মহামান্য সদাশয় ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়াও যাহাতে সকল সম্প্রদায়ের লোকই নির্ব্বিবাদে স্ব-স্ব ধর্ম্মবিশ্বাস প্রচার করিতে পারেন, তজ্জন্য ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়াছেন। যদি সত্য সত্য এক অদ্বয়জ্ঞান ভজনীয় বস্তুরই আরাধনা হয়, তাহা হইলে একজনের আরাধনার প্রকার ভেদে আর একজনের আরাধনার ব্যাঘাত হইতে পারে না। বাদ্যাদি-সংযোগে 'নগরসংকীর্ত্তন' সনাতন ধর্ম্মের একটী অপরিত্যাজ্য প্রধান অঙ্গ। মনুষ্য মাত্রেরই ইহাতে যোগদান করিবার অধিকার আছে ও যোগদান করা বিধেয়। আমরা জানি যে, "শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজ-সভা"র নগর সংকীর্ত্তন প্রচারকালে বহু সম্মানিত, শিক্ষিত , উচ্চপদস্থ ঈশ্বরপরায়ণ মহোদয়গণ সমস্ত লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া আমাদের বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণের সহিত নাম কীর্ত্তন ও নৃত্য করিয়াছেন। বিভিন্ন পরিচয়ে পরিচিত ভ্রাতৃগণ আমাদের গৌড়ীয় ও ভাগবতের গ্রাহক আছেন। আত্মধর্ম্মের রাজ্য প্রীতির রাজ্য, সে স্থানে বিবাদ নাই। যেখানে স্বার্থ সেখানেই বিবাদ। অতএব আমাদের বিরূপের ধর্ম্ম বা বিবাদ পরিত্যাগ করিয়া সকলের স্বরূপের ধর্ম্ম বা প্রীতির ধর্ম্ম আশ্রয় করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ওঁ হরিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ

মানস-পূজা

অপার করুণাময় ভগবান্ বহু অনর্থযুক্ত বদ্ধজীবকে কৃপা করিবার জন্য শ্রীনাম, শ্রীঅর্চ্চা ও শ্রীমহান্ত-গুরুরূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াও তাঁহারা প্রপঞ্চাতীতই থাকেন—ইহাই তাঁহাদের ঈশিতা। অক্ষজজ্ঞান বিভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ইহা কিছুতেই ধারণা করিতে পারে না। একমাত্র সেবোন্মুখতায়-ই ইহা উপলব্ধির বিষয় হয়। শ্রীঅর্চ্চা প্রপঞ্চে অষ্টবিধ বিচিত্রতার প্রকটিত হন। যথা—

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা।। (ভাঃ ১১।২৭।১২)

শ্রীঅর্চ্চা শিলাময়ী, দারুময়ী, ধাতুময়ী, মৃচ্চন্দনাদিময়ী, চিত্রপটাদি লিখিতা, সৈকতী, মণিময়ী ও মনোময়ী, —এই অষ্টবিধা।

বিষ্ণু-প্রতিমা বা শ্রীঅর্চ্চা বিকৃত-প্রতিফলিত-রাজ্য-জাত কোন নশ্বর বস্তু নহেন। শ্রীঅর্চ্চার দেহদেহীতে কোন ভেদ নাই। ইন্দ্রিয়তর্পণের সহায়ক ভোগ্য মাটী বা কাঠের পুতুল ও অধোক্ষজ সেব্যবস্তু শ্রীঅর্চ্চা এক বস্তু নহেন। যথা—

"প্রতিমা নহ তুমি,—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।" (চৈঃ চঃ মধ্য ৫।৯৬)

* * * *

"দারুব্রহ্ম" রূপে—সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তম।" (চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।১৩৫)

* * * *

"নাম', 'বিগ্রহ, 'স্বরূপ'—তিন একরূপ।
তিনে 'ভেদ' নাহি,—তিন 'চিদানন্দরূপ।
দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি 'ভেদ'।
জীবের ধর্ম্ম-নাম-দেহ স্বরূপে 'বিভেদ'।।
অতএব কৃষ্ণের 'নাম', 'দেহ', 'বিলাস'।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ।।"
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৬।১৩৩, ১৩২, ১৩৪)

* * * *

"ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিনন্দাকার।
সে-বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার।।
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেইত' পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য সেই, হয় যমদণ্ড্য।।" (চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৬৬-১৬৭)
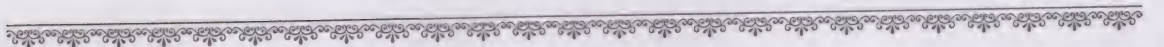
অনর্থযুক্ত জীবের বৈষ্ণব-সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় পূর্ব্বক সাত্বতপঞ্চরাত্র-বিধানানুসারে অর্চ্চন অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ সম্পত্তি-মন্ত গৃহস্থের পক্ষে অর্চ্চন মাগই মুখ্য। বৈষ্ণব-সদ্‌গুরুর নিকট উপনীত দীক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই স্বহস্তে শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন একান্ত আবশ্যক। অর্চ্চনে শৈথিল্য প্রদর্শনকারী ব্যক্তির শাস্ত্রে নরক-পাত শ্রুত হয়। দীক্ষিত ব্যক্তি কখনও দেবলাদি দ্বারা অর্চ্চন করাইবেন না। নিজের অভীষ্টদেবকে স্বহস্তে সযত্নে সদ্‌গুরু-প্রদত্ত মন্ত্রাদি দ্বারা যথাশাস্ত্র অর্চ্চন করিবেন। শ্রীল জীবগোস্বামিচরণ 'অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং' (ভাঃ ৭।৫।১৮) শ্লোকের 'ক্রমসন্দর্ভে' এই কথা বিশেষরূপে বিচার করিয়াছেন।

উপরি-উক্ত অষ্টবিধা শ্রীঅর্চ্চার মধ্যে 'শৈলী', 'দারুময়ী', 'লৌহ', 'লেপ্যা', 'লেখ্যা', 'মনোময়ী ও 'মণিময়ী'—এই সপ্তবিধা প্রতিমাই ভগবদ্ভক্তগণের দ্বারা পূজিতা হন। 'সৈকতী প্রতিমা'-রক্ষণ ও অরক্ষণের প্রীতি-বিরোধ-হেতু প্রীতীচ্ছু নিষ্কাম ভক্তগণের পূজার বিষয় না হইয়া সকাম ব্যক্তিগণের দ্বারাই গৃহীতা হইয়া থাকেন। যথা শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ ক্রমসন্দর্ভ (১১।২৭।১২)—"সৈকতা সৈকতীত্যর্থঃ; এষা তু সকামানামেব ন তু প্রীতীচ্ছুনাং, তদ্রক্ষণয়োঃ প্রীতি-বিরোধাৎ।" বস্তুতঃ নির্ব্বেদজ্ঞানী বা পঞ্চোপাসকের 'মূর্ত্তি-পূজা'র মূলে 'শ্রীমূর্ত্তির অনিত্যতা ও চরমে নির্ব্বিশেষত্ব উপলব্ধিই লক্ষ্য থাকায় তাঁহাদের 'মূর্ত্তিপূজার' ছলনা পৌত্তলিকতা মাত্র। ভগবদ্ভক্তের বিগ্রহ-সেবা পৌত্তলিকতা নহে, কারণ তাহা নিত্য সচ্চিদানন্দ ভগবৎ স্বরূপের সেবা হইতে অভিন্ন।

কনিষ্ঠাধিকারী প্রাকৃত-ভক্তগণের স্থূলবুদ্ধি প্রবল থাকায় তাঁহারা বাহ্যদর্শনে দৃষ্ট শৈলী, দারুময়ী, লৌহী, লেপ্যা, লেখ্যা ও মণিময়ী—এই ষড়্‌বিধ শ্রীঅর্চ্চায় অর্চ্চন করিয়া থাকেন। তবে যে, সময় সময় উক্ত ষড়্‌বিধ অর্চ্চা কোন কোন শ্রেষ্ঠ অধিকারীর দ্বারাও অর্চ্চিত হইতে দেখা যায়, সেইরূপ শ্রেষ্ঠ অধিকারিগণের অর্চ্চন কনিষ্ঠাধিকারীর অর্চ্চনের ন্যায় নহে। উহা 'ভাব-সেবা' বা 'সাক্ষাৎসেবা'।

স্থূলপূজার অর্চ্চা—শৈলী, দারুময়ী, লৌহী, লেপ্যা লেখ্যা ও মণিময়ী। আর মানস-পূজার অর্চ্চা—মনোময়ী প্রতিমা। পঞ্চোপাসক বা নির্ব্বেদজ্ঞানীর মনোধর্ম্মের ভোগানুকূল ছাঁচে গড়া অনিত্য ও পরিবর্ত্তন-যোগ্য প্রতীক, আর হরিসুখতাৎপর্য্যপর ভক্তের শুদ্ধমনোময়ী অর্চ্চা পরস্পর পৃথক্। অনর্থপ্রবল বৈষ্ণবপ্রায় বা কনিষ্ঠাধিকারী প্রাকৃত বৈষ্ণব মনোময়ী অর্চ্চার অর্চ্চনে অধিকারী নহেন। সম্পত্তি মান্ গৃহস্থ ব্যক্তিরও নিষ্কিঞ্চন নিবৃত্তানর্থ ভগবদ্ভক্তের অনুকরণে মনোময়ী অর্চ্চার অর্চ্চন-ছল আত্মবঞ্চনা ও বিত্তশাঠ্যের পরিচায়ক। চিন্ময় বুদ্ধির উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত মনোময়ী অর্চ্চার মানসপূজা সম্ভব নহে।

বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ও নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তগণের জন্য মানসপূজাই শাস্ত্রে বিহিত রহিয়াছে। ক্রমসন্দর্ভে শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন,—"গৌতমীয়ে—সন্ন্যাসিনাং মুমুক্ষুণাং মানসোপহৃতিঃ পরমিতি। তন্মহিমা যথা শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে শ্রীনারায়ণ-বাক্যে। অয়ং যো মানসো যোগো জরাব্যাধিভয়াপহ ইত্যাদৌ। যশ্চৈতৎপরয়া ভক্ত্যা সকৃৎকুর্য্যান্মহামতে। ক্রমোদিতেন বিধিনা তস্য তুষ্যাম্যহং মুনে ইতি"।

প্রাকৃতবুদ্ধিসম্পন্ন বৈষ্ণবপ্রায় ব্যক্তিগণ অনেক সময় নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণকে স্থূলভাবে অর্চ্চন করিতে না দেখিয়া মনে করেন যে, তাঁহারা বিষ্ণুপূজাবিরহিত বা অর্চ্চনের অসম্মানকারী। পরন্তু তাহা নহে।

নিষ্কিঞ্চনগণ মনোময় বিবিধোপচারে মনোময়ী অর্চ্চার সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহারা মনোময়ী অর্চ্চাকে ভাবময়-সচন্দন তুলসী, ধূপ, দীপ, ফল, পুষ্প ও যাবতীয় পূজোপকরণ দ্বারা নিত্য সেবা করেন। কোন কোন সময় অর্চ্চননিষ্ঠ প্রাকৃত ব্যক্তিগণ ভগবদ্ভক্তগণকে বাহ্যে স্থূলভাবে স্নান, তিলকাদি-ধারণ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতে না দেখিয়া তাঁহাদের চরণে অপরাধ করিয়া বসেন। শাস্ত্রের মানস-স্নানাদির কথা তাঁহারা জানেন না—

"ধ্যানং যন্মনসা বিষ্ণোর্ম্মানসং তৎ প্রকীর্ত্তিতম্।"

অর্থাৎ মনে মনে যে বিষ্ণুধ্যান, তাহাই 'মানসস্নান' বলিয়া কথিত। স্মৃত্তিশাস্ত্রে যে সপ্তবিধ স্নানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মানসস্নানেরই শ্রেষ্ঠতা পরিলক্ষিত হয়; যথা—

"স্নানানাং মানসং স্নানং মন্বাদৈঃ পরমং স্মৃতম্।
কৃতেন যেন মুচ্যন্তে গৃহস্থা অপি বৈ দ্বিজাঃ।।"

অর্থাৎ সর্ব্ববিধস্নানের মধ্যে মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ 'মানসস্নান'কেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই 'মানসস্নান' দ্বারা গৃহস্থাশ্রমী দ্বিজব্যক্তিগণও সর্ব্ববিধ অনর্থ হইতে মুক্ত হন।

ঐকান্তিক ভক্তগণের কোন সময়েই বিষ্ণুস্মৃতির অভাব হয় না, সুতরাং তাঁহারা নিত্যস্নাত। যিনি সর্ব্বদা হরি সঙ্কীর্ত্তন করেন, তাঁহাকে অক্ষজ প্রাকৃত স্থূলবিচারে 'স্নানাদি হইতে বিরত' বলিলে বৈষ্ণবচরণে অপরাধ-কৃত হয়।

শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—

"ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ-তপোদান।।
নিরন্তর কর তুমি বেদ-অধ্যয়ন।
দ্বিজ-ন্যাসী হইতে তুমি পরমপাবন।।"

—চৈঃ চঃ মঃ ১১।১৯০-১৯১

শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদি পরাস্মৃতিনিবন্ধগ্রন্থের লিখিত অনুষ্ঠানাবলীও গৃহস্থ ধনী বৈষ্ণবের জন্য, সর্ব্ব-পরিত্যাগী বিরক্ত বৈষ্ণবগণের জন্য নহে—ইহাই শ্রীহরিভক্তিবিলাসের উপসংহারে শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদ উল্লেখ করিয়াছেন—

"কৃত্যান্যেতানি তু প্রায়ো গৃহিণাং ধনিনাং সতাম্।
লিখিতানি ন তু ত্যক্ত-পরিগ্রহমহাত্মনাম্।।
একান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনং স্মরণং প্রভোঃ।
কুর্ব্বতাং পরমপ্রীত্যা কৃত্যমন্যন্নরোচতে।।"

অর্থাৎ ঐকান্তিক ভক্তগণ সর্ব্বদাই পরমপ্রীতি সহকারে প্রভুর কীর্ত্তন স্মরণাদি করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য অনুষ্ঠান নাই। কীর্ত্তন-স্মরণাদির দ্বারাই তাঁহাদের ভাবময়ী মানস-সেবা সাধিতা হয়।

বৈষ্ণবপ্রায় প্রাকৃতব্যক্তিগণের অর্চ্চা-পূজা স্থূল, সঙ্কোচিতানর্থ পুরুষগণের মনোময়ী অর্চ্চার মানসপূজা সূক্ষ্ম এবং নিবৃত্তানর্থ বা মহাভাগবত ঐকান্তিকগণের ভাবসেবা সুসূক্ষ্ম। শ্রীধাম মায়াপুরে যোগপীঠে শ্রীগৌর-নারায়ণের পূজা বা শ্রীচৈতন্যমঠের গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা, নীলাচলে রত্নাকরতটে দারুব্রহ্মের সেবা বা কেশিতীর্থের উপকণ্ঠে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের শ্রীঅর্চ্চাপূজা অনর্থযুক্ত জীবের মঙ্গলের জন্যই প্রকটিত হইয়াছেন। আবার আমরা ক্রমসন্দর্ভে উদ্ধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণোক্ত প্রতিষ্ঠান-পুরনিবাসী জনৈক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের মানসপূজার কথা পাঠ করিয়া থাকি। প্রতিষ্ঠানপুরে একজন সরলবুদ্ধি নিঃস্ব ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি একদা বিপ্রেন্দ্রবর্গের সভায় বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া জানিতে পারিলেন যে, ভাগবত ধর্ম্ম অতি দরিদ্র ব্যক্তিও মনের দ্বারা আচরণ করিতে পারেন। আঢ্য ব্যক্তির ন্যায় অর্থাদি বা দ্রব্যসম্ভার বা দ্রব্যসম্ভার না থাকিলেও মানসপূজার দ্বারা শ্রীভগবানের মনোময়ী অর্চ্চার পূজা হয়। ইহা জানিতে পারিয়া সেই নিঃস্ব সরল ব্রাহ্মণ স্বয়ং মানসপূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি মনে মনেই মহারাজাধিরাজোচিত বহুমূল্য পূজোপচার সংগ্রহ করিয়া তাঁহার মনোময়ী শ্রীঅর্চ্চন করিতে থাকিলেন। একদিন তাঁহার ইচ্ছা হইল, তিনি তাঁহার অভীষ্টদেবকে সুবর্ণথালায় ঘৃতসিক্ত পরমান্ন ভোগ দিবেন। এইরূপ বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা করিয়া তিনি মনে মনে ঘৃতসিক্ত পরমান্ন পাক করিলেন এবং মনে মনেই সুবর্ণপাত্রে সেই পরমান্ন স্থাপন করিয়া তাঁহার অভীষ্টদেবের সম্মুখে ধারণ করিলেন। তিনি মানসসেবায় তন্ময় ও সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার হরিসেবোন্মুখ যাবতীয় ইন্দ্রিয়ই হরির প্রীতিসাধনে এতদূর ব্যস্ত হইয়া পড়িল যে, তাঁহার সেবাপর মনে উপলব্ধি হইল, 'পরমান্ন অত্যধিক তপ্ত রহিয়াছে, এমন কি সেই তপ্ত পরমান্নে প্রবিষ্ট তাঁহার অঙ্গুষ্ঠযুগলও দগ্ধ হইতেছে।' নিরন্তর হরিসুখান্বেষী বিপ্রের ''কিরূপে এই তপ্ত-পরমান্ন প্রভুর ভোগে লাগাইব"—এইরূপ দুঃখে সমাধিভঙ্গ হইলে বাহ্যদশায়ও তাঁহার অঙ্গুষ্ঠ তাপদগ্ধ হইয়া জ্বলিতেছে এইরূপ বোধ হইল। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বৈকুণ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া ভক্তের এইরূপ সেবাতন্ময়তার দৃষ্টান্ত দর্শনে হাস্য করিলে লক্ষ্মী প্রভৃতি শক্তিগণ বৈকুণ্ঠনাথকে তাঁহার হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বৈকুণ্ঠনাথ তদীয় অনুরাগী ভক্তকে বিমানযোগে নিজ সমীপে আনয়ন করিলেন, শ্রীপ্রভৃতি শক্তিগণকে তাঁহার ভক্তের পরমান্নের তাপে দগ্ধ অঙ্গুষ্ঠযুগল দর্শন করাইলেন এবং নিত্যকাল নিজসেবাপ্রদান করিয়া তাঁহাকে নিজ সমীপে স্থাপন করিলেন। নন্দমহারাজের নন্দনন্দনের আবির্ভাবে অসংখ্য গোদানও স্থূলজগতের বিচার অতিক্রম করিয়াছিল।

বৈধমার্গে জাতরুচি পুরুষের মানসপূজার এইরূপ প্রকার আমরা দেখিতে পাই। আবার মুক্ত-পুরুষগণে রাগমার্গে যে মানসসেবা বা ভাবসেবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা সাক্ষাৎ সেবা। সেই স্থানে কল্পনা কিংবা আরোপ নাই অথবা নৈরন্তর্য্যের অভাবরূপ কোন ব্যাপারও নাই। ঐরূপ সেবায় সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শন,

ভগবৎস্পর্শন, ও স্ব-স্ব স্বরূপসিদ্ধরসে ভগবানের সর্ব্বতোভাবে অপ্রাকৃত-সেবা সিদ্ধ হইয়া থাকে। সেইরূপ সেবা অক্ষজজ্ঞান পরিচালিত ব্যক্তি অর্থাৎ প্রাকৃত ব্যক্তিগণের নিকট কনিষ্ঠাধিকারীর স্থূলপূজার ন্যায় প্রতিভাত হইতে পারে; উদাহরণ স্বরূপ—শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের গোপাল-সেবা, শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর গোপীনাথের সেবা, চম্পহট্টে দ্বিজ বাণীনাথের শ্রীগৌরগদাধরের সেবা, শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর মহাপ্রভু প্রদত্ত গোবর্দ্ধনশিলার সাত্ত্বিকসেবা প্রভৃতি। কিন্তু তাঁহাদের ঐসকল সেবা বাহ্য অর্চ্চননিষ্ঠ ব্যক্তিগণের অর্চ্চনের ন্যায় দেখাইলেও তাহা তাঁহাদের অষ্টকালীয় মানস-সেবারই বাহ্যপ্রকাশ মাত্র অর্থাৎ তাঁহারা শুদ্ধ-মন বা বৃন্দাবনে স্ব-স্ব নিত্যসিদ্ধ-স্বরূপে নিত্যকাল যে সকল সেবা করিয়া থাকেন, তাহাই তাঁহারা বাহ্যে প্রকাশ করেন মাত্র। কুলিয়ার চরে নিষ্কিঞ্চন ভাগবতপ্রবর শ্রীপাদ বংশীদাস বাবাজী মহাশয়ের গৌরনিত্যানন্দ-অর্চ্চনও ভাবসেবারই অন্তর্গত। এই সকল রাগমার্গীয় ভাবসেবা ও কনিষ্ঠাধিকারী-প্রাকৃত-ভক্তের বদ্ধাবস্থায় বৈধমার্গীয় অর্চ্চনে আকাশ পাতাল ভেদ। প্রাকৃতভক্ত রাগমার্গীয় ভাবসেবাকে তাঁহাদেরই অর্চ্চনের তুল্য জ্ঞান করিলে অথবা অবৈধভাবে স্বেচ্ছাচারী হইয়া রাগমার্গীয় ভাবসেবার অনুকরণ করিলে মঙ্গলের পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িবেন।

কাল্‌নার শ্রীভগবান্‌দাস বাবাজী মহাশয়ের নামব্রহ্মের সেবাকে 'ভাবমার্গীয় সেবা' বলা যাইতে পারে। তবে ঐরূপ সেবার প্রকার গোস্বামিপাদ ও পূর্ব্বাপর নিষ্কিঞ্চন গৌরভক্তগণের চরিত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব কোন বিশেষ ভজনপ্রণালী কোনও বিশেষ মহাজনে পরিলক্ষিত হইলে তাহা সাধারণের অনুকরণীয় না-ও হইতে পারে।

প্রাকৃত বা বৈষ্ণবপ্রায় ব্যক্তিগণ অনেক সময় উত্তম অধিকারীর কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণৈষণা বুঝিতে অসমর্থ হইয়া সেবাসুখতাৎপর্য্যপরায়ণ, 'কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট' উত্তম-ভাগবতগণকেও বলপূর্ব্বক নিজ মনঃকল্পিত বা ক্ষুদ্রবিচার-বুদ্ধির ন্যায়-অন্যায়ের গণ্ডীর ভিতর আনিবার ধৃষ্টতা দেখাইয়া বৈষ্ণবচরণে মহা অপরাধ সঞ্চয় করিয়া থাকেন। কোন কোন ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তি মনে করেন যে, তাঁহারা নিজ বুদ্ধিবলে গ্রন্থাদি হইতে পূর্ব্বাপর আচার্য্যগণের চরিত্র ও ভজনপ্রণালী সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিয়া উহার দ্বারা অপর মহাভাগবত বৈষ্ণবগণকেও বিচার করিয়া লইতে পারেন। এইরূপ বুদ্ধি তাঁহাদের দুর্দ্দৈবেরই পরিচায়ক। মহাভাগবতের চেষ্টা বা অধিকারি-পুরুষের আচরণ প্রাকৃত ব্যক্তির অধিগম্য নহে ঃ—

"অবোধ, অগম্য অধিকারীর ব্যবহার।
ইহা বই সিদ্ধান্ত না দেখি কিছু আর।।
অধিকারী বৈষ্ণবের না বুঝি' ব্যবহার।
যে জন নিন্দয়ে, তা'র নাহিক নিস্তার।।
অধম জনের যে আচার যেন ধর্ম্ম।
অধিকারী বৈষ্ণবেও করে সেই কর্ম্ম।।

কৃষ্ণের কৃপায় ইহা জানিবারে পারে।
এ সব সঙ্কটে কেহ মরে, কেহ তরে।।"

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ১০।৩৮২, ৩৮৭-৩৮৯)

উত্তমভাগবতের সেবা—স্বারসিকী সেবা। তিনি যাহা অভিলাষ করেন, তাহা কৃষ্ণেরই অভিলষিত। তাঁহার যে-টী প্রীতিকর, সে'টী কৃষ্ণেরই প্রীতিকর, তাঁহার যে-টী অপ্রীতিকর, সেইটী কৃষ্ণেরও অপ্রীতিকর। কারণ, ঐরূপ মহাভাগবতের চিত্তবৃত্তি ও কৃষ্ণের মনোঽভীষ্ট একসূত্রে গাঁথা। ঐকান্তিক শরণাগত ভগবদ্ভক্ত কৃষ্ণের ইচ্ছায় তাঁহার সমস্ত ইচ্ছা মিশাইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার যেটী রুচিকর, কৃষ্ণেরও সেইটীই রুচিপ্রদ। আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-পর ভোগপরায়ণ ব্যক্তি যখন বলে,—আমার এই জিনিষটী খাইতে ভাল লাগে বা ইচ্ছা হয়, তখন উহাকে 'জিহ্বা বা উদর-লাম্পট্য' শব্দে অভিহিত করা যাইবে। আর যদি কোনও ঐকান্তিক পুরুষ কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার কোন বিশ্রম্ভসেবকের নিকট প্রকাশ করেন—'আমার অমুক বস্তু ভাল লাগে', তাহা হইলে জানিতে হইবে যে, ঐ বস্তুটী কৃষ্ণ অভিলাষ করিয়াছেন। মাধবেন্দ্রপুরীর ক্ষীর আস্বাদন ও প্রাকৃত- সহজিয়ার প্রসাদসেবার ছল করিয়া জিহ্বা-লাম্পট্যের প্রশ্রয়-প্রদান এক নহে। অনেক সময় কোন কোন প্রাকৃত-সহজিয়া বা বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের আচরণ বুঝিতে না পারিয়া বলিতে পারেন, 'ইনি ভগবান্‌কে না দিয়াই আহার করেন', 'ইনি আমার ন্যায় (গোখরত্ব বুদ্ধি লইয়া) তুলসী পত্রাদি (প্রাকৃত-সহজিয়ার গাছতুলসী বা পত্রতুলসীবুদ্ধি, চিন্ময়ী হরিপ্রিয়া তুলসীর বাস্তবস্বরূপ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন) দ্বারা ভগবানকে নিবেদন না করিয়াই খাদ্যাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন।" এইরূপ বাক্য ভোগোন্মুখ প্রাকৃত- সহজিয়াগণের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবচরণে অপরাধেরই বিজ্ঞাপক। কিন্তু তাঁহাদের জানিয়া রাখা উচিত যে, তাঁহারা ঠাকুর ঘরে গিয়া যতই ঘন্টার ধ্বনি করুন্, আর যতবারই মন্ত্রপাঠ করুন্ না কেন, তাঁহাদের ভগবান্‌কে দেওয়ার সামর্থ্য নাই। তাঁহাদের ভোগোন্মুখ প্রাকৃত ইন্দ্রিয় কখনই অপ্রাকৃত-ভগবানের নিকট অপ্রাকৃত ভোজ্যসামগ্রী উপস্থাপিত করিতে পারে না। ইহা তাঁহারা ভুলিয়া যান বলিয়াই অর্চ্চনের পূর্ব্বে তাঁহাদের জন্য ভূতশুদ্ধির ব্যবস্থা হইয়াছে; কিন্তু ভগবদ্ভক্তের আনুগত্যে ও ভক্তের সেবাদ্বারা তাঁহাদের সেবোন্মুখতার উদয়ে চিন্ময়বুদ্ধি প্রবল না হওয়া পর্য্যন্ত ঐরূপ ভূতশুদ্ধি ক্রিয়াও কর্ম্মাঙ্গেরই অন্যতমরূপে পর্য্যবসিত হয়, তাই তাঁহাদের যোড়শোপচারে পূজা ভগবানের নিকট সাক্ষাৎভাবে পৌঁছে না। বিশেষতঃ তাঁহাদের 'সেবাপরাধ' ও 'নামাপরাধ' প্রতি মুহূর্ত্তেই সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা। শুদ্ধনাম-পরায়ণ ভগবৎসেবাসুখ-তাৎপর্য্য-বিশিষ্ট ঐকান্তিক ভক্তগণের কোনও অপরাধ নাই। সেব্য ও সেবকের মধ্যে যে কিছু প্রতিবন্ধক থাকিতে পারে, তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও তাঁহাদিগের মধ্যে নাই; সুতরাং তাঁহাদের অপ্রতিহতা সেবাবৃত্তি নিত্যপরিস্ফুট ও উজ্জ্বল থাকায় তাঁহারাই ভগবানের সর্ব্ববিধ অভিলষিতবস্তুর দ্বারা সাক্ষাৎভাবে ও সর্ব্বতোভাবে সেবা করিতে পারেন। তাঁহারাই ভগবান্‌কে সাক্ষাৎভাবে খাওয়াইতে পারেন, কখনও বা কৃষ্ণপ্রীতি-অনুসন্ধান-তৎপর হইয়া গোদা দেবীর ন্যায়—"এই বস্তুটী কৃষ্ণের রুচিকর হইবে কিনা', পরীক্ষা করিবার জন্য নিজে কৃষ্ণসেবার পূর্ব্বেই গ্রহণ করিয়া পরে তাহা কৃষ্ণকে খাইতে দিতে পারেন। ঐরূপ বিশ্রম্ভসেবা, কখনও বা পাল্যজ্ঞানে সেবা, কখনও বা নিজাঙ্গ দ্বারা সেবার সামর্থ্য তাঁহাদের আছে।

শরণাগত ঐকান্তিক ভক্তগণের সর্ব্বত্রই 'ঈশাবাস্য' দর্শন। তাঁহারা কখনও নিজে 'ভোক্তা' সাজিয়া কোনও বস্তু গ্রহণ করেন না। একমাত্র শরণাগত ভক্ত ব্যতীত, জগতের বাদবাকী সকলেই জ্ঞাত ও অজ্ঞাত-সারে প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশিতভাবে ভগবদ্‌ভোগ্য 'ঈশাবাস্য' জগতের ন্যূনাধিক 'ভোক্তা' সাজিয়া রহিয়াছেন। সুতরাং শরণাগত ঐকান্তিক ভক্ত ব্যতীত অপরাপর সকলেই 'কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট'। ঐকান্তিক শরণাগত ভক্ত জগতের যাবতীয় বস্তুকেই কৃষ্ণোচ্ছিষ্টবস্তু-জ্ঞানে সেবা করিয়া থাকেন। প্রাকৃত-সহজিয়া কর্ম্ম-বিজড়িতবুদ্ধি লইয়া মনে করেন যে, তাঁহার অক্ষজ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তুলসীপত্র, তাঁহার ভোগ্যসামগ্রীর কিয়দংশকে ভগবানের পূজায় (?) নিযুক্ত করিয়া আবার পরিবর্ত্তিকালে ঐসকল তাঁহারই ভোগের ইন্ধন বা জিহ্বা লাম্পট্যের অনুকূল করিয়া দিতে পারে। কিন্তু অপ্রাকৃত-ভাগবত মনে করেন যে,—জগতের যাবতীয় বস্তু নিত্যকালই কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। উহা আদি, মধ্যে এবং অন্ত্যে নিত্যকালই কৃষ্ণের ভোগ্য। কৃষ্ণোচ্ছিষ্টব্যতীত জগতে কোনও বস্তুর অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। বিবর্ত্ত-বুদ্ধিক্রমেই বস্তুর কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট জ্ঞান হইতে বিচ্যুত হইয়া বস্তুর প্রতি ভোগবুদ্ধি উদিত হয়। বিবর্ত্তবাদীকে সেই ভোগবুদ্ধির কবল হইতে ক্রমিক পন্থায় উদ্ধার করিবার জন্যই অর্চ্চনের ব্যবস্থা। কিন্তু যাঁহারা সর্ব্বদা হরিসেবাপরায়ণ, যাঁহারা বস্তুর স্বরূপদর্শনে সমর্থ, তাঁহারা—

"যাঁহা নদী দেখে, তাঁহা মানয়ে কালিন্দী"।

—তাঁহারা বৃক্ষে উত্তমফল, স্রোতস্বিনীতে নির্ম্মল সলিল, বনরাজিতে প্রস্ফুটিত কুসুম, উদ্যানে স্নিগ্ধ গন্ধবহ প্রভৃতি যাহা কিছু দর্শন ও অনুভব করেন, তাহাতে তাঁহারা নিরন্তর ভোগোন্মুখব্যক্তির ন্যায় আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছা বা ভোগবুদ্ধি না করিয়া ঐ সকল বস্তু কৃষ্ণেন্দ্রিয়ের তর্পণ করিতেছে দেখিয়া উল্লসিত ও আনন্দিত হন এবং "কৃষ্ণের সব শেষ ভক্ত আস্বাদয়"—এই জ্ঞানে কৃষ্ণপ্রেমে কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট আস্বাদন করেন।

পরমহংসকুলাগ্রগণী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের চরিত্রে অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, তিনি অনেক সময়েই দেবলব্রাহ্মণের তুলসী ও মন্ত্রদ্বারা নিবেদিত 'কৃষ্ণপ্রসাদ' নামে পরিচিত বস্তু পরিত্যাগ করিয়াও শ্বপচাদি অবর ব্যক্তির গৃহের পকান্ন তাহাদের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া উহা সাক্ষাৎ মহাপ্রসাদ দর্শনে গ্রহণ করিতেন। মহাভাগবতের ঐরূপ আচরণ প্রাকৃত ব্যক্তিগণের বুদ্ধির অগম্য। বাহ্যচক্ষে ঐরূপ ভোজ্য সামগ্রী অত্যন্ত নিন্দনীয় ও বাহ্যবিচারে ঐরূপ সামগ্রীতে প্রাকৃত সহজিয়ার বার্ক্ষার্চ্চ তুলসীপত্র প্রদত্ত হয় নাই। অতএব এরূপ বস্তু কিরূপেই বা তুলসী ও মন্ত্রের দ্বারা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নিবেদিত বস্তুকে ত্যাগ করিয়াও গৃহীত হইতে পারে? এই প্রশ্নের সমাধান করিতে প্রাকৃত সহজিয়াগণ সমর্থ হইবেন না। তবে তাঁহাদের জানিয়া রাখা দরকার যে, তাঁহাদের অক্ষজ জ্ঞানগম্য 'বিগ্রহ' 'তুলসী' ও 'মহাপ্রসাদ' হইতে ভগবদর্চ্চাবতার সচ্চিদানন্দ শ্রীবিগ্রহ, মাধবতোষণী শ্রীতুলসী ও বিষ্ণু হইতে অভিন্ন তদুচ্ছিষ্ট চিন্ময়-শ্রীমহাপ্রসাদ সম্পূর্ণ পৃথক্‌। শ্রেষ্ঠ অধিকারিগণের আচরণ বুঝিবার প্রাকৃত ব্যক্তির কোনই সামর্থ্য নাই।

বাউলিয়া বিশ্বাস

জগদ্‌গুরু শ্রীমন্মহাপ্রভু এক একজন ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া জগতে এক একটি মহতী শিক্ষাপ্রদান ও মহান্ আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। আজ যদি করুণাবতার প্রভু আমাদের, আমাদিগকে এরূপভাবে শিক্ষা প্রদান না করিতেন, তাহা হইলে জগৎ হইতে ভক্তিধর্ম্ম বিলুপ্ত হইত। উপদেশের কথা যখন কোনও ব্যক্তির চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়া প্রকাশিত হয়, তখন তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্যকরী হইয়া থাকে।

কমলাকান্ত বিশ্বাস নামে অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর একজন ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত শিষ্য ছিলেন। ইনি নবদ্বীপেই বাস করিতেন। শ্রীপাদ পরমানন্দ পুরী নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে আসিবার কালে দ্বিজ কলমাকান্তকে সঙ্গে করিয়া নীলাচলে লইয়া আসেন। কমলাকান্ত নীলাচলে আসিয়া নীলাচলাধিপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্রের নিকট একখানা পত্র লিখিয়া পাঠান। পত্রখানিতে কমলাকান্ত স্বীয় গুরু-অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুকে ঈশ্বরত্বে স্থাপন করিয়া আচার্য্যের কিছু ঋণ হইয়াছে জ্ঞাপন করেন এবং সেই ঋণ পরিশোধার্থে রাজা প্রতাপরুদ্রের নিকট হইতে তিনশত মুদ্রা যাচ্ঞা করেন। কোনক্রমে ঐ পত্রখানি শ্রীমন্মহাপ্রভুর হস্তে আসিয়া পড়ে। পত্রখানি পড়িয়া মহাপ্রভু অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং তিনি বাহিরে আসিয়া দুঃখ সহকারে বলেন,—কমলাকান্ত আচার্য্যকে ঈশ্বর বলিয়া স্থাপন করিয়াছে, ইহাতে কোন দোষ হয় নাই, কারণ আচার্য্য প্রকৃতই ঈশ্বর, কিন্তু কমলাকান্ত একদিকে 'ঈশ্বর' বলিয়া অপর দিকে আবার ঈশ্বরের 'অভাব' বা 'দরিদ্রতা' আছে—এইরূপ বিচার করায় আচার্য্যকে লঘু করিবার চেষ্টা প্রদর্শন ও তৎসঙ্গে আচার্য্যের চরণে মহদপরাধ সঞ্চয় করিয়াছে। ষড়ৈশ্বর্য্যশালী নারায়ণকে জীবজ্ঞানে দরিদ্রবুদ্ধিই 'মায়াবাদ' বা 'বাউল-মত'।

নারায়ণের দরিদ্রতা বা কোন ঋণ থাকিতে পারে না। নারায়ণ ত' দূরের কথা, নারায়ণের দাসানুসাদগণেরও কোনও অভাব নাই। যে নারায়ণ-কিঙ্করগণ ইন্দ্রাধিপত্য সার্ব্বভৌমপদ, এমন কি, অষ্টসিদ্ধি ও মুক্তিকে পর্য্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারেন, তাঁহারা কি দরিদ্র? যে নারায়ণের নিখিল ঐশ্বর্য্য, বৈকুণ্ঠ যাঁহার নিত্যধাম, লক্ষ্মী যাঁহার সেবিকা, যে নারায়ণের ঐশ্বর্য্যের একটু বিকৃত প্রতিফলন মাত্র এই জগতে মহারাজাধিরাজ ও স্বর্গের দেবরাজগণের মধ্যে দেখিতে পাইয়া লোকে মুগ্ধ ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়ে, সেই নারায়ণের আবার দরিদ্রতা! সেই নারায়ণের দাসগণের কোনও অভাব নাই। শ্রীগৌরসুন্দর খোলাবেচা শ্রীধরের দ্বারা জগতে সেই সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্যভাগবতে (মধ্য ৯।২৩৮-২৪১) লিখিয়াছেন,—

"বৈষ্ণব চিনিতে পারে কাহার শকতি।
আছয়ে সকল সিদ্ধি দেখয়ে দুর্গতি।।
খোলাবেচা শ্রীধর তা'র এই সাক্ষী।
ভক্তিমাত্র নিল অষ্টসিদ্ধিকে উপেক্ষি।।

যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ-সুখ।।
বিষয়মদান্ধ সবকিছুই না জানে।
বিদ্যামদে, ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে।।
কলা মূলা বেচিয়া শ্রীধর পাইল যাহা।
কোটিকল্পে কোটীশ্বরে না দেখিবে তাহা।।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু নারায়ণে "দরিদ্র" বুদ্ধি যে অসৎমত, তাহা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন—

ঈশ্বরের দৈন্য করি' করিয়াছে ভিক্ষা।
অতএব দণ্ড করি' করাইব শিক্ষা।।
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল,—ইহা আজি হইতে।
বাউলিয়া বিশ্বাসে এথা না দিবে আসিতে।।

—চৈঃ চঃ আঃ ১২।৩৫-৩৬

কমলাকান্তের প্রতি মহাপ্রভুর এই দণ্ডের কথা শ্রবণ করিয়া অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং বিশ্বাসকেও সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলেন,—"কমলাকান্ত, তুমি বড়ই ভাগ্যবান্। কেননা, তোমাকে আজ স্বয়ং ভগবান্ দণ্ডিত করিতেছেন। যাঁহারা জগদ্গুরু বা লোকশিক্ষকের নিকট হইতে কেবল সম্মান আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা আত্মবঞ্চিত। দেখ, পূর্ব্বে মহাপ্রভু আমাকে বড়ই সম্মান করিতেন, আমার মনে তাহাতে দুঃখ হয়। আমি মনে ভাবিলাম, এরূপ সম্ভ্রম পাইয়া আমি মহাপ্রভুর বিশ্রম্ভভাজন হইতে পারিতেছি না; অতএব আমি যোগবাশিষ্ঠ ব্যাখ্যা করিয়া মুক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের অভিনয় দেখাইব। তাহা হইলেই মহাপ্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে কটূক্তি ও দণ্ডপ্রদান করিবেন। তাহাই হইল। মহাপ্রভুর দণ্ড পাইয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। মহাপ্রভুর দণ্ড সকলে পাইতে পারে না। ভাগ্যবান্ মুকুন্দ মহাপ্রভুর দণ্ড পাইয়াছিলেন। সেই দণ্ড-মধ্যেও মহাপ্রভুর একটী গূঢ়শিক্ষা নিহিত আছে। মহাপ্রভু শুদ্ধভক্তি-প্রচারক আচার্য্য লীলাভিনয়কারী। তিনি জগজ্জীবকে দেখাইলেন যে, 'যাহারা একসময়ে খুব হরিসঙ্কীর্ত্তনে বা ভক্তিযাজনে মত্ততা দেখায়, আবার যখন অন্য সময়ে ভক্তিবিরোধী অন্য সম্প্রদায়ে যায়, তখন সেখানে গিয়াও তাহাদের সহিত খুব মিলামিশা ও সম্ভাষণাদি করে, তাহারা কখনও 'ভক্তি' মানে না। তাহারা একবার দন্তে তৃণ ধারণ করে, আবার পর মুহূর্ত্তেই আমার অঙ্গে শেল-বিদ্ধ করিতে উদ্যত হয়, তাহারা ভক্তির স্থানে অপরাধী। (চৈঃ ভাঃ ১৮৪-১৯১)

মুকুন্দ মহাপ্রভুর নিত্য পরিকর। তাঁহার কিছু দোষ হইতে পারে না। তবে মহাপ্রভু তাঁহাকে দিয়া জগজ্জীবকে শিক্ষাপ্রদান করিবার জন্যই এইরূপ লীলা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। অন্যের কা কথা, স্বয়ং শ্রীশচীদেবীও মহাপ্রভুর দণ্ডপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর এই দণ্ডলীলার মধ্যেও আর একটী মহতীশিক্ষা নিহিত

আছে। শ্রীগৌর-সুন্দরের অগ্রজ শ্রীবিশ্বরূপ অনেক সময়েই নিজ গৃহসংসার ছাড়িয়া অদ্বৈতপ্রভুর সঙ্গেই হরিকথা আলোচনাতেই কাল কাটাইতেন। কিছুকাল পরে বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া চলিয়া যান। পরমবৎসলা শ্রীশচীমাতা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, অদ্বৈত আচার্য্যই সর্ব্বদা সংসারের অনিত্যতা প্রভৃতি বলিয়া আমার পুত্রকে ঘরের বাহির করিয়াছেন। ইহা মনে মনে জানিলেও শচীদেবী বৈষ্ণবাপরাধের মুখে কিছু বলিতেন না। কিছুকাল পরে নিমাইও সংসার-সুখ ও লক্ষ্মীদেবীকে পরিহার করিয়া নিরন্তরই অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট অবস্থান করিতে থাকেন। ইহা দেখিয়া বাৎসল্যরসময়ী গৌরভগবানের জননী আর সহ্য করিতে পারিলেন না, বলিলেন,—"এই আচার্য্য গোসাঞি আমার এক চন্দ্রসম পুত্রকে ঘরের বাহির করিয়াছেন, সবে ধন নীলমণি এক নিমাই ইহাকেও ঘরে স্থির হইতে দিবেন না। অনাথা বলিয়া আমার প্রতি ইঁহার দয়া পর্য্যন্ত নাই। ইনি জগতের নিকট 'অদ্বৈত' বটে কিন্তু আমার প্রতি ইঁহার 'দ্বৈত' অর্থাৎ অসম ব্যবহার।" শচীদেবীর এইমাত্র অপরাধ। মহাপ্রভু জগতে বৈষ্ণব অপরাধের গুরুত্ব শিক্ষা দিবার জন্য অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা না করা পর্য্যন্ত স্বীয় মাতাকে পর্য্যন্ত প্রেমদান করিলেন না। অতএব কমলাকান্ত, তুমিই ভাগ্যবান্।"

অদ্বৈতাচার্য্য কমলাকান্তের দণ্ডদর্শনে মহাপ্রভুকে বলিলেন,—তোমার লীলা বুঝা ভার। তুমি আমাকেও যে প্রসাদ দান কর নাই, আজ তাহা কমলাকান্তকে বিতরণ করিতে বসিয়াছ। মহাপ্রভু অদ্বৈতের বাক্যে হাস্য করিয়া কমলাকান্তকে নিজ সমীপে ডাকাইলেন, তাহাতে অদ্বৈত প্রভু মহাপ্রভুকে বলিলেন, "তুমি ইহাকে দর্শন দিলে কেন? এ ব্যক্তি আমাকে দুইরূপে বিড়ম্বনা করিতেছে। এ ব্যক্তি আমাকে অপ্রাকৃত নারায়ণও বলে, আবার কার্য্যতঃ আমাকে প্রাকৃত অর্থভিক্ষু দরিদ্রও জ্ঞান করে।" মহাপ্রভু কমলাকান্তকে ডাকিয়া বলিলেন,—

> * * বাউলিয়া, ঐছে কেন কর।
> আচার্য্যের লজ্জা ধর্ম্ম হানি সে আচর"।।
> প্রতিগ্রহ কভু না করিবে রাজধন।
> বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন।।
> মন দুষ্ট হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।
> কৃষ্ণস্মৃতি বিনা হয় নিষ্ফল জীবন।।
> লোকলজ্জা হয়, ধর্ম্ম-কীর্ত্তি হয় হানি।
> ঐছে কর্ম্ম না করিবে কভু ইহা জানি'।।

—চৈঃ চঃ আঃ ১২।৪৯-৫২

পাঠকগণ, কমলাকান্ত বিশ্বাসের প্রতি এই উপদেশ বাক্য হইতে আমরা কি জানিতে পারি? প্রথমতঃ মহাপ্রভু শিক্ষা দিলেন যে, 'দরিদ্র-নারায়ণ'-মতবাদটী অসৎ বা 'বাউলিয়া মত'। নারায়ণত্ব ও দরিদ্রত্ব

একসঙ্গে সামঞ্জস্য হইতে পারে না। 'নারায়ণত্ব'—'দরিদ্রতা' নহে, 'দরিদ্রতা' ও 'নারায়ণত্ব' নহে। যদি বল, দরিদ্ররূপী নারায়ণ অর্থাৎ নারায়ণ-স্বরূপতা কিছুকালের জন্য দরিদ্রতার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছে, তাহাও বলিতে পার না, কারণ নারায়ণ—মায়াধীশ, তিনি মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন বা বশীভূত হন না। খণ্ডবস্তুই আচ্ছন্ন হয়, অখণ্ডবস্তু আচ্ছন্ন হইতে পারে না। উদাহরণ দেখ,—চন্দ্র বা নক্ষত্রাদি খণ্ড খণ্ড জ্যোতিষ্ক সকল নদী বা সরোবরের জলে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে। কিন্তু অনন্ত আকশ ত' প্রতিবিম্বিত হয় না। অনেক সময় মনে হয়, আকাশ বুঝি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, তাহা নহে। আকাশস্থ খণ্ড মেঘগুলিই প্রতিবিম্বিত হয়। অতএব নারায়ণ কখনও মায়া বা দরিদ্রতার দ্বারা অভিভূত হইতে পারেন না। 'নারায়ণ' বা 'ঈশ্বর' জগতে অবতীর্ণ হইয়াও প্রপঞ্চের গুণে বশীভূত হন না, তিনি 'মায়া মিশাইয়া' আসেন না, প্রপঞ্চে আসিয়াও তিনি প্রপঞ্চাতীত থাকেন, ইহাই ঈশ্বরের ঈশিতা।

কমলাকান্তের দণ্ড-লীলাদ্বারা মহাপ্রভুর দ্বিতীয় শিক্ষা এই যে, আপদ্ধর্ম্মে পতিত বা ঋণগ্রস্ত হইবার ছল করিয়া নিজে অথবা শিষ্যাদি দ্বারা রাজা কিম্বা বিষয়ীর নিকট হইতে অর্থ যাচ্ঞা করা বা করান আচার্য্যদিগের পক্ষে নিলর্জ্জ ব্যবহার ও ধর্ম্মহানিকর আচার। আজকাল কোন কোন আচার্য্যভিমানী ব্যক্তি বলিয়া থাকেন,—"আপদ্ধর্ম্মকালে সকলই করা যায়। ভাগবত-ব্যবসায়, মন্ত্র-ব্যবসায়, কীর্ত্তন-ব্যবসায় প্রভৃতি করিয়া উদরপূর্ত্তির জন্য অর্থ গ্রহণ করিলেও আচার্য্যত্ব রক্ষিত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভবিষৎকালে ধর্ম্মজগতে এইরূপ ধর্ম্মবিরোধী আচার প্রবর্ত্তিত হইবে জানিতে পারিয়াই, 'বাউলিয়া-বিশ্বাসে'র দণ্ড-লীলা-দ্বারা জগতে বৈষ্ণবাচার্য্যের আচরণের আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। যে সকল শিষ্য বলিয়া থাকেন, "আমার আচার্য্য আপদ্ধর্ম্মে পতিত, সুতরাং ধর্ম্মবিক্রয় করিয়া অর্থগ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছেন", তাঁহারা যে কার্য্যতঃ নিজ গুরুকেই লঘু করিয়া ফেলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা জানাইয়া দিলেন। ইহা দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু আরও দেখাইলেন যে, আচার্য্যাভিমানিগণেরও যদি আপদ্ধর্ম্ম বা অভাববুদ্ধি থাকে, তাহা হইলে তাঁহারাও আচার্য্যস্থানীয় নহেন। কারণ শরণাগত ব্যক্তির অভাব বা আপদ্‌বুদ্ধি থাকিতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু আরও জানাইলেন, রাজা স্বভাবতঃ বিষয়ী লোক; বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ করিলে চিত্ত দুষ্ট হইলে কৃষ্ণ-স্মৃতি অভাবে জীবন নিষ্ফল হয়। সকল ধর্ম্মপিপাসুর পক্ষেই ইহা নিষিদ্ধ, বিশেষতঃ ধর্ম্মাচার্য্যদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ রূপে নিষিদ্ধ—"এই শিক্ষা সবাকারে সবে মনে হইল।"

অথৈতানি ন সেবেত বুভূষুঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ।
বিশেষতো ধর্ম্মশীলো রাজা লোকপতির্গুরুঃ।।

(ভাঃ ১।১৭।৪১)

দ্যূতক্রীড়া, মদ্যাদিপান, স্ত্রী, প্রাণিবধ ও স্বভোগার্থ কনক মঙ্গলেচ্ছু পুরুষমাত্রেই সেবা করিবে না, বিশেষতঃ ধর্ম্মশীল ব্যক্তি, প্রজাপালক রাজা, লোকপতি বা সমাজনেতা এবং আচার্য্যের পক্ষে ঐ সকল বিশেষভাবে নিষিদ্ধ।

বর্ত্তমানে ধর্ম্মাচার্য্যাভিমানিগণ মহাপ্রভুর এই শিক্ষা মানেন কি? এমনও শুনিতে পাওয়া গিয়াছে যে, বর্ত্তমানের কোনও কোনও আচার্য্যাভিমানিব্যক্তি "রাজা ও বিষয়ীকে শিষ্য করিয়া তাঁহার প্রভূত অর্থ আত্মসাৎ করিতে সমর্থ হইয়াছি" বলিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া থাকেন। এমনও শুনা গিয়াছে যে, কেহ কেহ সম্পত্তিশালিনী বারবনিতার মৃত্যুর পর উহার অধর্ম্মোপার্জ্জিত সম্পত্তি পাইবার আশায় উহার ও বৃষলীপতির গুরু হইবার অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন ও করিয়া থাকেন। ইহাই কি মহাপ্রভুর শিক্ষা? এইরূপ আচরণ করিয়াও কি আচার্য্যত্ব সংরক্ষিত হয়? এরূপও শুনা গিয়াছে যে, কোনও একজন কীর্ত্তন-গায়ক একটী রাজপরিবারের আবালবৃদ্ধবনিতাকে শিষ্য করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে প্রতিবৎসর বহু-অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন। যদি প্রকৃত প্রস্তাবে রাজা, বিষয়ী বা বারবনিতাকেও বৈষ্ণব শিষ্য করিয়া তাহাদিগকে অসদাচরণ হইতে সম্পূর্ণভাবে নির্ম্মুক্ত করিতে পারিতেন এবং তাহাদের অর্থ, কায়-মনোবাক্য প্রাণ—সমস্তই হরিসেবাতে নিযুক্ত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু শুনিতে পাওয়া যায়, সেই আচার্য্যভিমানী মহোদয় শিষ্য করিতে না পারিয়া নিজেই রাজা ও বিষয়ীর অধীন হইয়া পড়িয়াছেন। এমন কি, উহারা বাহ্যে লোক দেখাইবার জন্য মালা তিলকাদি ধারণ করিলেও গুরুর সম্মুখে কুক্কুট-ভোজন, মদ্যপান, গঞ্জিকা-সেবন, স্ত্রী-লাম্পট্য প্রভৃতি অসদাচরণ করিতেও কুণ্ঠিত হন না। ইহার-ই নাম কি গুরুগিরি? শিষ্যানুবন্ধ অর্থাৎ শিষ্যের অধীন হওয়া বা শিষ্যের মন যোগাইয়া চলার নাম গুরুত্ব নহে, উহা অত্যন্ত লঘুত্ব ও মহদপরাধের কার্য্য।

বিষয়ী বা রাজার অন্ন গ্রহণ করা আচার্য্যের অনুচিত। কিন্তু আবার আমরা জগদ্‌গুরু শ্রীমন্মহাপ্রভু, আচার্য্য শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু ও আচার্য্য শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর চরিত্রে কি দেখিতে পাই? মহাপ্রভু কিছুতেই প্রতাপরুদ্রের সহিত দেখা করিবেন না; কিন্তু যখন প্রতাপরুদ্র সর্ব্বতোভাবে হরি-সেবোন্মুখ হইলেন, মহাপ্রভু ছাড়া যখন তাঁহার আর রাজ্য-সম্পত্তি কিছুই ভাল লাগিল না, যখন তিনি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভৃতি শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের সঙ্গ-প্রভাবে গৌর-গত-প্রাণ হইলেন, এমন কি বিষয়-সম্পত্তি রাজ্য-সম্পদ্ সমস্ত তুচ্ছ করিয়া মহাপ্রভুর জন্য প্রাণ পরিত্যাগেও কৃতসঙ্কল্প হইলেন, সর্ব্বতোভাবে বৈষ্ণব-সদাচার গ্রহণ করিলেন, তখনই মহাপ্রভু রাজাকে কৃপা করিয়া তাঁহার সেবা অঙ্গীকার করিলেন। প্রতাপরুদ্র তখন কায়মনোবাক্য ও অর্থের দ্বারা মহাপ্রভুকে ও মহাপ্রভুর ভক্তগণকে সেবা করিতে পারিলেন। এমন কি তখন মহাপ্রভু নিজেই প্রতাপরুদ্রের দ্বারা ভক্তসেবা ও ভক্তিপ্রচার কার্য্যের অনেক আনুকূল্য বিধান করাইলেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর চরিত্রেও আমরা দেখিতে পাই, আচার্য্যপ্রভু দস্যুদলের অধিপতি রাজা বীরহাম্বীরকে 'বৈষ্ণব' করিয়া তাঁহার দ্বারা ভক্তি-প্রচারের অনেক আনুকূল্য করাইয়া লইলেন। কই, তিনি ত' নিজের ভোগের জন্য কিম্বা আপদ্ধর্ম্ম অথবা স্ত্রী-পুত্রাদি পরিপালনে কিম্বা ঠাকুর সেবার ছলে নিজ ভোগ-সাধনের জন্য বীর হাম্বীরের এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু বীরহাম্বীরের অর্থের দ্বারা ভক্তি প্রচার বা সর্ব্বতোভাবে হরিসেবাই করাইয়াছিলেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুও বৈদ্যনাথ ভঞ্জ প্রভৃতি রাজন্যবর্গকে শিষ্য করিয়া তাঁহাদের দ্বারা শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের আনুকূল্যই করাইয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারা কেহই বিষয়ীর

অধীন হন নাই। পাছে শিষ্য অর্থ-বন্ধ করে, এই ভয়ে তাঁহারা কখনও শিষ্যের মনোরঞ্জন বা শিষ্যের অসদাচরণের প্রশ্রয় প্রদান করেন নাই। নিজে ভোক্তা সাজিয়া বিষয়ীর অন্ন ভোগ করিলে বা কপটতা করিয়া বাহ্যে হরিসেবার ছল দেখাইয়াও বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ করিলে মন দুষ্ট হয়। ফলের দ্বারাই কারণ অনুমিত হয়। মন দুষ্ট হইলে তাহা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-কুটিনাটির প্রতিই ধাবিত হইয়া থাকে; কৃষ্ণসেবৌজ্জ্বল্যের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণে ভোগ-বুদ্ধির উদয় হয়। শ্রীল ঠাকুর হরিদাস বেশ্যাকে কৃপা করিয়া উহার বেশ্যাত্ব বিদূরিত করিয়াছিলেন। কিন্তু উহার অধীন হইয়া উহার অধর্ম্মোপার্জ্জিত গৃহ বিত্তাদি কিছুই গ্রহণ করেন নাই। শিষ্যের সর্ব্বস্ব গুরুদেবের প্রাপ্য হইলেও বৈষ্ণব-গুরু শিষ্যের গৃহ-বিত্তাদি প্রাকৃত-মলসমূহ স্বয়ং গ্রহণ করেন না। শিষ্যকে প্রাকৃত-অভিমান হইতে মুক্ত করা এবং তাহার প্রাকৃত-মল স্বয়ং গ্রহণ না করাই সদাচারী বৈষ্ণব-গুরুর কর্ত্তব্য; ঠাকুর হরিদাসের ইহাই শিক্ষা। বাউলিয়া বিশ্বাসের দণ্ডলীলা দ্বারা মহাপ্রভুর তৃতীয় শিক্ষা এই যে, বৈষ্ণবাচার্য্য নিজকে 'ব্রাহ্মণ' বা 'গৃহস্থাশ্রমী' বলিয়া বা বোলাইয়াও কিম্বা আপদ্ধর্ম্মের নাম করিয়াও স্বভোগার্থ বিষয়ীর নিকট হইতে কিছুই গ্রহণ করিতে পারিবেন না। দক্ষিণামার্গীয় গৃহস্থ ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহ বা দক্ষিণা গ্রহণ করা প্রবৃত্তি ধর্ম্ম-শাস্ত্রের বিধি হইলেও উত্তর মার্গীয় বৈষ্ণবাচার্য্য বিষয়ীর নিকট হইতে বিষয়ীর প্রাকৃত মল গ্রহণ করিয়া ভক্তি হইতে বিচ্যুত হন না। গৃহস্থাশ্রমী ও ব্রাহ্মণলীলাভিনয়-কারী অদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুর দৃষ্টান্ত দ্বারা জগদ্গুরু মহাপ্রভু এই শিক্ষা দিলেন।

মহাপ্রভুর চতুর্থ শিক্ষা এই যে, নাম-মন্ত্রোপদেশ আচার্য্যের কর্ত্তব্য; পরন্তু যে আচার্য্য নাম-মন্ত্রোপদেশাদি করিয়া দক্ষিণার নামে স্বভোগার্থ অর্থাদি প্রতিগ্রহ করেন বা স্বমুখে অর্থাদি যাজ্ঞা না করিলেও শিষ্যকে দালালপদে নিযুক্ত করেন, তাঁহারাও আচার্য্যপদের যোগ্য নন, বরং নামাপরাধী। বাউলিয়া-বিশ্বাসকে শাসন করিয়া গুরুস্থ অর্থাভাবের দালালী করা শিষ্য বা গুরুর কর্ত্তব্য নহে, মহাপ্রভু তাহাই শিক্ষা দিলেন।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (৮।১১১) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষানুসারে শ্রীল গোপাল ভট্টপাদ লিখিয়াছেন,—

"গীত-নৃত্যানি কুর্ব্বীত দ্বিজদেবাদি-তুষ্টয়ে।
ন **জীবনায় যুঞ্জীত** বিপ্রঃ পাপভিয়া ক্বচিৎ।।"

শ্রীল সনাতন গোস্বামিটীকা—"ক্বচিৎ কদাচিদপি **জীবনায় নিজবৃত্ত্যর্থ** ন যুঞ্জীত ন কুর্য্যাৎ। তত্র হেতু পাপাদ্ভিয়া তথা সতি পাপং স্যাদিত্যর্থঃ।" অর্থাৎ ভগবান্ ও ব্রাহ্মণের প্রীতির জন্যই দ্বিজাতিগণ গীতনৃত্যাদি করিবেন (অর্থাৎ নিজ বা বহির্ম্মুখ লোকের ইন্দ্রিয়- তর্পণের জন্য নৃত্যগীতাদি করিবেন না); ব্রাহ্মণ কখনও নিজ জীবিকার্থ নৃত্যগীতাদি করিতে পারিবেন না; তাহা করিলে পাপে নিমগ্ন হইতে হইবে।

যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভু ও আচার্য্য গোস্বামিগণের এই আদেশ ও ব্যবস্থা অমান্য করেন, তাঁহাদের কি "বৈষ্ণব" বা বৈষ্ণব ধর্ম্মের কোন ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দেওয়া অবৈধ আচরণ নহে? আবার যাঁহারা ঐরূপ পাপ-কার্য্যকে হরি-নাম-কীর্ত্তনের ছলনা করিয়া চালাইতে চান, তাঁহারা কি দশবিধ নামাপরাধের অন্যতম 'নামবলে পাপবুদ্ধি'রূপ মহদপরাধ সঞ্চয় করেন না? তাঁহাদের মুখে কীর্ত্তিত নামাক্ষর কি 'নাম' না

'নামাপরাধ'? আর তাঁহারা কি শাস্ত্রীয় বাক্যানুসারে 'পাপী' ও 'নামাপরাধী' সংজ্ঞা পাইবার যোগ্য নহেন? নিরপেক্ষ সুধী পাঠকগণ, বাউলিয়া বিশ্বাসের দণ্ডলীলা ও শ্রীল গোপাল ভট্টপাদের বৈষ্ণব-স্মৃতির বাক্য একসঙ্গে মিলাইয়া বিচার করুন। আমরা কিছু বলিতে চাহি না, বিচারের ভার সুধী সমাজের উপরই ন্যস্ত হইল।

"বুক্কন্তি সারমেয়াঃ!!"

"করীন্দ্রে ভ্রাজমানেঽপি স্তূয়মানে সুপুরুষৈঃ।
বুক্কন্তি সারমেয়াশ্চ কা ক্ষতিস্তস্য জায়তে!"

গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ সিদ্ধান্ত দর্পণগ্রন্থে এই শ্লোকটী প্রকাশিত করিয়াছেন। এই শ্লোকটীর অর্থ এই যে,—গজরাজ দীপ্তিশালী হইয়া উপস্থিত হইলে সজ্জনগণ তাহার প্রশংসা করিয়া থাকেন, কিন্তু বিষ্ঠাভোজী কুক্কুরকুল উহাদের স্বাভাবিকী বৃত্তি অনুসারে 'ঘেউ' 'ঘেউ' করিতে ছাড়ে না; কিন্তু তাহাতে গজরাজের কি ক্ষতি হয়? হিন্দীভাষায় কবিও বলিয়াছেন,—

হস্তী চলে বাজারমে কুত্তা বুকে হাজার।
সাধুন্‌কে দুর্ভাব নেহি, যঁও নিন্দে সংসার।।

—বাজার অর্থাৎ নগরের মধ্যে দিয়া হস্তী চলিতে থাকিলে যেরূপ হাজার হাজার কুক্কুর তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শব্দ করিতে করিতে ধাবিত হয়, কিন্তু হস্তী তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করে না বরং অবিচলিত চিত্তে নিঃশঙ্কভাবে স্বীয় গন্তব্যপথে গমন করিতেই থাকে, সেইরূপ সাধুব্যক্তিকে সমস্ত সংসারের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠাভোজী ঘৃণ্যব্যক্তিগণ একত্র হইয়া চিৎকার করিলেও তাহাতে সাধুর কিছু ক্ষতি হয় না; বরং তিনি পূর্ব্ববৎ সমভাবেই অবস্থান করেন।

পর্ব্বত হইতে খরস্রোত নদীর উদ্ভব হয়; কিন্তু নদী তাহা ভুলিয়া গিয়া যেমন নিজ অস্তিত্ব-বিধাতার গাত্রেই আঘাত করিতে থাকে, তদ্রূপ কোন কোন খলব্যক্তিও বৈষ্ণবগুরুর নিকটে আগমনের অভিনয় দেখাইয়া বৈষ্ণবের ছদ্মবেশ গ্রহণ পূর্ব্বক মনে করে, "আমিও যখন বৈষ্ণব হইয়া পড়িয়াছি, তখন কেনই বা না আমি গুরুর উপর গুরুগিরি করিব? বৈষ্ণবগুরু যখন সকলকে কৃষ্ণভক্তি-বরপ্রদান বা আশীর্ব্বাদ করিতে পারেন, তখন কেনই বা না আমি পাষণ্ডতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনকল্পে ব্রহ্মা-শিবাদির বন্দনীয়, সাক্ষাৎ ভগবানের পর্য্যন্ত সম্মানের পাত্র বৈষ্ণবকে আমার ন্যায় পাপিষ্ঠ, কামুক ও স্ত্রৈণের ও আশীর্ব্বাদের পাত্র জ্ঞান না করিব? দুর্ব্বাসনায় পরিচালিত হইয়া পরিণামশীল রক্তমাংসের থলিকে অলীক, "ব্রাহ্মণ" বুদ্ধিকারী দুর্ব্বাসার ন্যায় মহাভাগবত অম্বরীষকে ক্ষত্রিয়জ্ঞানে অবমাননা না করিব?' "মূলে কৃষ্ণ প্রবেশিয়া ভৃগুর দেহেতে। করাইল ভক্তি মহিমা প্রকাশিতে।।" (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ১০।২০৩)—অর্থাৎ স্বয়ং কৃষ্ণই ভৃগুর দেহেতে

প্রবিষ্ট হইয়া ভক্তের মহিমা প্রকাশ করিবার জন্য নিজেই নিজের গাত্রে আঘাত করিয়াছেন—শ্রীব্যাসদেবের এই সিদ্ধান্তের অবমাননা করিয়া আমরা অনেক সময়ে মনে করি,—ভৃগু যখন নিজকে 'ব্রাহ্মণ' জ্ঞানে ক্ষত্রিয়-কৃষ্ণকে (!) পদাঘাত করিতে পারেন, তখন আমিও কেনই বা না তদনুকরণ করিব। স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া জীবের এইরূপ ভ্রান্তিই 'ধর্ম্ম' হইয়া পড়ে। নিত্যকৃষ্ণদাস্যই যে জীবমাত্রের ধর্ম্ম, সে তাহা ভুলিয়া যায়; বৈষ্ণবই যে জগদ্গুরু, নিখিলচেতনই যে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের কিঙ্কর একথা ভুলিয়া গিয়া স্বরূপবিস্মৃত জীবের 'হাম্‌খোদাই' বুদ্ধির উদয় হয়।

কোন কোন হরিবিমুখের মুখে এমন কথাও শুনিতে পাওয়া গিয়াছে যে, আমরা মহাপ্রভুর ব্রাহ্মণ-পার্যদের বংশধর সুতরাং দাসগোস্বামীকে "আমরা আশীর্ব্বাদ করিতে পারি"! আবার কাহারাও মুখে এমনও শুনা গিয়াছে যে, "আমি নিত্যানন্দের বংশধর, উদ্ধারণ ঠাকুর নিত্যানন্দের শিষ্য ছিলেন, সুতরাং সেই সূত্রে তিনি আমারও শিষ্যস্থানীয়; সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিলেও আমি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদই করি"। 'নরোত্তমবিলাস', 'রসিকমঙ্গল' প্রভৃতি গ্রন্থপাঠে আমরা এইরূপ পাষণ্ডতার অনেক চিত্র দেখিতে পাই। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের উচ্ছিষ্টভোজী কিঙ্কর শ্রীল গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ গুরুদাসগণ এই সকল পাষণ্ডমত খণ্ডন করিয়া জগতে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব সংস্থাপন করেন।

কোন সময়ের একটী ঘটনা শুনিতে পাওয়া যায় যে, একদা একজন দুশ্চরিত্র স্ত্রৈণব্যক্তি কিছু সুবিধা করিয়া লইবার জন্য কোনও একজন বৈষ্ণবগুরুর নিকট উপস্থিত হয়। ঐ ব্যক্তি নিজকে একজন বৈষ্ণবের বংশধর বলিয়া মনে করিত; কিন্তু দুঃখের বিষয় বৈষ্ণবের অন্তরনিষ্ঠা ত' দূরের কথা, বাহ্যনিষ্ঠাও তাহাতে কিছুই ছিল না। পরদুঃখদুঃখী বৈষ্ণব-গুরুদেব তাহাকে হরিনাম উপদেশ দিয়া বলেন, "তুমি নিরন্তর বৈষ্ণসেবা, কৃষ্ণসেবা ও নামসঙ্কীর্ত্তন কর।" ঐ ব্যক্তির পূর্ব্বে কোনও বৈষ্ণবের বেশ ছিল না। বৈষ্ণবগণ তাহার গলায় তুলসীর মালা পরাইয়া দিলে, সে বলিয়া উঠিল, আমাকে 'হুক্‌ওয়ালা' মালা দিতে পারেন কি, যে মালা পরিয়া দরকার হইলে 'বৈষ্ণব' বোলাইয়া লোক ঠকান যায়, আবার 'বাবু' সাজিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে গমন কালে উহা খুলিয়াও রাখা যায়? বৈষ্ণব হওয়া ত' কেবল স্বার্থসিদ্ধির সুবিধার জন্য!" যখন উহাকে মালাতিলক পরাইয়া দেওয়া গেল, সে মনে করিল, "আমি ত' 'বৈষ্ণব' হইয়া গেলাম; সুতরাং মহাপ্রভু যখন বৈষ্ণবসেবা করিতে বলিয়াছেন, তখন আমার নিজের সেবা করিলেই ত' 'বৈষ্ণবসেবা' হইবে? কথায় বলে, 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম'—সুতরাং অপক্ক বৈষ্ণবদিগকে নির্য্যাতিত করিয়াও যদি নিজের ভোগটা ষোল আনা করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেই ত' 'বৈষ্ণব-সেবা' হইবে। আর স্বরূপগোস্বামী, ঠাকুর হরিদাস, নামাচার্য্য প্রভৃতি গুরুবৈষ্ণবগণের নিন্দাপূর্ণ এক আধখানা বই বা বৈষ্ণবদের অনুকরণে দুই একটী প্রবন্ধ লিখিতে পারিলেই ত' নিজের 'বৈষ্ণব' নামটা প্রচারিত হইতে পারিবে। আর যখন ছলে কৌশলে কোন রকম করিয়া গুরুদেবের নিকট হইতে 'নাম' (?) পাইয়াছি, তখন নামেরই (?) ত' দরকার। গুরুর আর দরকার কি? মহাপ্রভু ত' কেবল 'নাম-সংকীর্ত্তন' করিতে বলিয়াছেন, নামবলে যত ইচ্ছা পাপ করিতে থাকিব, 'নাম' আমার ঝাড়ুদার (!) স্বরূপে পাপমার্জ্জনা করিতে থাকিবে আর নাম গুরুর চরণে অপরাধ করিতে থাকিলেও

'নাম' যখন অক্ষরমাত্র, তখন সে কি আমাকে উহা দ্বারা লাভপূজা ক্রয় করিতে বারণ করিতে পারে? আর কৃষ্ণসেবা! কৃষ্ণ ত' আমার ভিতরই আছেন, মন যখন যা' চায়, তাহা পূরণ করিলেই তা' কৃষ্ণপূজা করা হইবে।"

স্ত্রীপূজাই ত' কৃষ্ণপূজা। গুরুদেব গুরুগৃহে থাকিতে আদেশ করিলে বলিব—"আমার স্ত্রী আমাকে মঠে আসিতে দেয় না। আমি গৌরাঙ্গ ছাড়িতে পারি, কিন্তু স্ত্রীর অঞ্চল, কন্যার সঙ্গ ছাড়িতে পারিব না। স্মার্ত্তসমাজের পদাবলেহনপূর্ব্বক কোনও রূপে একটু জলাচরণীয় হইয়া কন্যাদায় হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারি কি না এবং অজ্ঞাত কুলশীলতারূপ অপবাদ ঘুচাইয়া মানুষ বলিয়া পরিচিত হইতে পারি কিনা, তজ্জন্যই আমার বিপুল চেষ্টা। এই জন্যই আমি সপরিবারে বহুবার বৈষ্ণবের পদধূলি ও বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট (?) গ্রহণের অভিনয় দেখাইয়াও দু'দিন পরে মুখ মুছিয়া ফেলিয়া সেই বৈষ্ণবগণকে "ছোট" বলিতে পারি। বর্জ্জিত-ধূম্রপান বৈষ্ণবের হুকাবন্ধ ও ত্যক্তগৃহ বৈষ্ণবকে একঘরে' করিবার ভয় দেখাইতে পারি।"

বারিবহ সুধাবর্ষণ করিতে থাকিলেও যেরূপ কখনও বেসীতরুর ফল বা ফুলের উদগম্ হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মার সদৃশ গুরুর উপদেশ বাক্য প্রাপ্ত হইয়াও কপটব্যক্তির কোনও সুবিধা হয় না। অথবা ভাগীরথীর তীরে আম্র, কপিত্থ ও নিম্ব—এই ত্রিবিধ বৃক্ষ একই সঙ্গে থাকিলেও যেরূপ একই ভাগীরথীর একই প্রকার সুমিষ্ট ও পবিত্রজল আহরণ করিয়াও ফলদান কালে কেহ মধুর, কেহ কষায় কেহ বা তিক্তফল প্রদান করে, তদ্রূপ সদ্‌গুরুর চরণ প্রান্তে আসিয়া শরণাগত-শিষ্য প্রেমফল লাভ করেন, আর গুরুর নিকটে আগমনের অভিনয়-প্রদর্শনকারী কপটব্যক্তি গুর্ব্বপরাধ, গুরুনিন্দা, পাষণ্ডতা প্রভৃতি বিষই উদগীরণ করিয়া থাকে।

কোনও উত্তর পশ্চিমদেশীয় কবি গাহিয়াছেন,—

> "যাকো মান গুমান হয়, মানী মানে সোই।
> মানহীন জন মানকো কা, জানে প্রভু কোই।।
> শিবধৃত মস্তক চন্দ্রমা, গ্রাসে রাহু অজ্ঞান।
> নীচ নীচতা গহত হয়, লঘু গুরুতা নহি ভান।।"

মানী ব্যক্তিই মানীর মান জানেন, মানী ব্যক্তিই অমানী ও মানদ-ধর্ম্ম যাজন করিতে সমর্থ। "সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি' মানে"। যাহার মান নাই,—কেবল আত্মসম্ভাবিত অর্থাৎ নিজকেই নিজে বড় মনে করে, প্রকৃতপক্ষে তাহাতে বড়'র কোন লক্ষণই নাই, সে মানীর মান্য কিরূপে জানিবে? শশাঙ্কশেখর শম্ভু শিরোপরি চন্দ্রমাকে ধারণ করেন, কিন্তু রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করিতে ধাবিত হয়। কারণ রাহু অসুর ও তমোধর্ম্মশ্রিত। সে কৈরব-বান্ধবের সম্মাননা কিরূপে জানিবে? পাষণ্ড-প্রকৃতি রামচন্দ্র খাঁ ঠাকুর হরিদাসের বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব করিয়া নিজে প্রতিষ্ঠাশালী হইবার চেষ্টা করিয়াছিল! বৈষ্ণব-চরণে অপরাধের বীজ ক্রমশঃ অঙ্কুরিত হইয়া বিষ্ণুচরণে পাষণ্ডতারূপ ফলে পরিণত হইল। 'পাষণ্ডদলন-বানা' নিত্যানন্দপ্রভু জগাই মাধাইয়ের ন্যায় মহাপাপীকেও উদ্ধার করিলেন, কিন্তু মহাবৈষ্ণব অপরাধী রামচন্দ্র খাঁকে কৃপা

করিবার জন্য স্বগণ সহ উহার আলয়ে গমন করিয়া অযাচিত ভাবে কৃপাদানেচ্ছু হইলেও পাষণ্ড রামচন্দ্র খাঁ উহা গ্রহণ করিল না। আরও পাষণ্ডতার আদর্শ জগতে রাখিবার জন্য পৃথ্বীধারী অনন্ত যাঁহার অংশের অংশ, সেই নিত্যানন্দ প্রভু যে স্থানে বসিয়াছিলেন, সেই স্থানের মাটী খোদাইয়া ফেলিয়া দিল। সমস্ত স্থান গোময় জলে লেপন করিল। তথাপি উহার মন তৃপ্ত হইল না। আবার মহদনুগ্রহ-নিগ্রহের সাক্ষী স্বরূপ ঈশ্বরপুরী ও রামচন্দ্র পুরীর চরিত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, জগদ্‌গুরু মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরী শ্রীগুরুসেবায় আত্মসমর্পণ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে নিমজ্জিত হইলেন। আর রামচন্দ্রপুরী মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্যের অভিনয় দেখাইয়াও গুরুনিন্দক হইয়া পড়িল।

"গুরু উপেক্ষা কৈলে ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয়।।" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৮।৯৭)

রামচন্দ্র পুরী—

"প্রভু স্থিতি, রীতি, ভিক্ষা, শয়ন, প্রয়াণ।
রামচন্দ্রপুরী করে সর্ব্বানুসন্ধান।।
প্রভুর যতেক গুণ স্পর্শিতে নারিল।
ছিদ্র চাহি' বুলে কাঁহো ছিদ্র না পাইল।।
"সন্ন্যাসী হইয়া করে মিষ্টান্ন ভক্ষণ।
এই ভোগে হয় কৈছে ইন্দ্রিয় বারণ।।"
এই নিন্দা করি' কহে সর্ব্বলোক স্থানে।
* * * *
সহজেই পিপীলিকা সর্ব্বত্র বেড়ায়।
তাঁহা তর্ক উঠাইয়া দোষ লাগায়।।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই সকল লীলা প্রকট করিয়া কত প্রকার গুর্ব্বপরাধী, বৈষ্ণবাপরাধী ও পাষণ্ডপ্রকৃতি পরবর্ত্তিকালে জগতে উদিত হইবে, তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতারং—"নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে"। কিন্তু—"ভক্ত-স্বভাব, অজ্ঞ-দোষ ক্ষমা করে।
কৃষ্ণ-স্বভাব,–ভক্ত-নিন্দা সহিতে না পারে।।
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।২১১)

"মহান্তের অপমান যে দেশ গ্রামে হয়।
এক জনার দোষে সব দেশ উজাড়য়।।"
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।১৬৩)

"সবার করিল গৌরচন্দ্র সে উদ্ধার।
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণব-নিন্দক দুরাচার।।
শূলপাণি সম যদি ভক্ত-নিন্দা করে।
ভাগবত-প্রমাণ—তথাপিহ শীঘ্র মরে।।
হেন বৈষ্ণব নিন্দে যদি সর্ব্বজ্ঞ হই'।
সে জনের অধঃপাত সর্ব্বশাস্ত্রে কহি।।
সর্ব্ব মহা প্রায়শ্চিত্ত যে কৃষ্ণের নাম।
বৈষ্ণবাপরাধে সেহ না মিলয়ে ত্রাণ।।"

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩।৩৮৬-৩৯০)

বৈষ্ণব-গৃহিণী

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন প্রায় চারি-শতাব্দী পূর্ব্বের এইরূপ একটী চিত্র বিদ্বজ্জনের নেত্র-সম্মুখে উন্মোচন করিয়াছেন,—

"বৈষ্ণব-গৃহিণী যত পতিব্রতাগণ।
দূরে থাকি' প্রভু দেখি' করয়ে ক্রন্দন।।
তাঁ' সবার প্রেমাধারে অন্ত নাহি পাই।
সবে বৈষ্ণবী শক্তি ভেদ কিছু নাই।।
জ্ঞান-ভক্তি-যোগে পতির সমান।
কহিয়া আছেন শ্রীচৈতন্য ভগবান্।।"

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৮।৯৬-৯৮

বর্ত্তমান জগতের সমাজ-হিতৈষী অনেকেই 'স্ত্রী-স্বাধীনতা', "স্ত্রীপূজা", 'স্ত্রীশিক্ষা', 'মাতৃমঙ্গল' প্রভৃতি মন্ত্রে দীক্ষিত ও অনুপ্রাণিত হওয়াকে বড়ই একটা গৌরব ও আত্মশ্লাঘার বিষয় জ্ঞান করেন। সমাজহিতৈষিগণের প্রবন্ধে, বক্তৃতায়, আলোচনায় সর্ব্বত্রই স্ত্রীপূজার প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়। এমন কি যাঁহারা নিজ মাতা, ভগ্নী ও স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করেন, যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে চিত্রপটাঙ্কিত স্ত্রী-মূর্ত্তি পর্য্যন্তও দেখিতে নাই, সেইরূপ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারাও আজ স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীপূজার জন্য তাঁহাদের জীবন উৎসর্গ করাকেই পরমার্থ-জ্ঞান করিয়া থাকেন। অনেকে কোনও ধর্ম্মানুষ্ঠানের কথা শুনিলেই জিজ্ঞাসা করেন,—"আপনাদের ধর্ম্মসম্প্রদায়ে স্ত্রীশিক্ষা বা শক্তিপূজার কোন ব্যবস্থা আছে

কি? যদি ঐরূপ কোন ব্যবস্থা থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের সহানুভূতি আছে; নতুবা অন্য ধর্ম্মানুষ্ঠানে আমাদের কোনই সহানুভূতি নাই।" আমরা অনেকেই—'দারেষ্বধীনো স্বর্গশ্চ পিতৃণামাত্মনস্তথা' প্রভৃতি মনুবাক্যের দোহাই দিয়া, কখনও বা 'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা' প্রভৃতি সপ্তশতীর বাক্য আওড়াইয়া স্ত্রীপূজার মন্ত্রে দীক্ষিত হই এবং স্ত্রীপূজার প্রচারক হইয়া পড়ি।

কিন্তু আমরা কি প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধশক্তি পূজা করি? অথবা পূজার নাম করিয়া পূজ্যবস্তুর দ্বারাই স্বীয় পূজা বা ইন্দ্রিয়-তর্পণ করাইয়া লই? 'শক্তি' শব্দে চেতনতা বুঝায়। জড়পূজা বা পুতুল-পূজা কখনও 'শক্তি-পূজা' নহে। রক্তমাংস বা রক্তমাংসের থলিপূজার নাম জড়-পূজা বা পৌত্তলিকতা। জড়াপ্রকৃতিই যদি আমাদের আরাধ্য হয় বা ইন্দ্রিয়তর্পণ অর্থাৎ ভোগই যদি 'পূজা'রূপে বিবেচিত হয়, তাহা হইলে আমরা আত্মবঞ্চক মাত্র। আমরা জড়-প্রকৃতি বা পুত্তলপূজক নাস্তিক। বর্ত্তমান সমাজহিতৈষিগণ কৃপাপূর্ব্বক এ বিষয় অনুধ্যান করিয়াছেন কি?

নিখিল-চেতনতা বা শক্তির আশ্রয় একমাত্র এক পরম শক্তিমান ভগবান্। সমস্ত শক্তিই তাঁহার অধীন। বেদ বলেন, সেই শক্তিমানের 'পরাশক্তি' নাম্নী একটী 'শক্তি' আছে। ''পরাস্যশক্তির্বিধিধৈব শ্রূয়তে" (শ্বেতাশ্বঃ)। অনন্ত শক্তিবৈচিত্র্য সেই পরাশক্তি হইতেই প্রকাশিত। জড়শক্তি সেই পরাশক্তিরই ছায়া। গীতাশাস্ত্র জীবকে 'শক্তি' নামে আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। সদ্ধর্ম্মবিশ্বাসী মাত্রেই শ্রুতি-প্রস্থান উপনিষৎ ও স্মৃতি-প্রস্থান গীতার-সন্মান করেন। সেই শ্রুতি ও শ্রীগীতার বাক্য গ্রহণ করিলে আমরা সকলেই শক্তিমত্তত্ত্ব ভগবানের আশ্রিত শক্তি। কিন্তু আমরা যাহাকে 'শক্তিপূজা' বলি, তাহা কি ঐরূপ শ্রুতি ও স্মৃতির অনুগত শক্তিপূজা? 'পুরুষ' অভিমানে যে শক্তিপূজার ছলনা, তাহা 'ত' রক্তমাংসের পূজা বা ভোগ। শক্তিকে শক্তিমত্তত্ত্বের আশ্রিত বা অধীন-তত্ত্ব-জ্ঞানে এবং নিজকেও সেই আশ্রিত তত্ত্বেরই অন্যতমজ্ঞানে যে শক্তিমানের সুখবিধান জন্য পরাশক্তির আনুগত্যে শক্তিমানের পূজা তাহাই প্রকৃত 'শক্তি'-পূজা। যেমন ধনীর অধীনে বহু ধন আছে। ধনীর আশ্রিত ধনকে ধনীর সেবায় নিযুক্ত করাই প্রকৃতপক্ষে ধন ও ধনীর সেবা। তাহা না করিয়া ধনী হইতে ধনকে বিচ্ছিন্ন পূর্ব্বক ধনগুলিকে নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যয় করা কদর্য্যবৃত্তি বা ধনীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা মাত্র। বাহ্যদর্শনে যাঁহারা স্ত্রীমূর্ত্তিতে আমাদের নিকট প্রকাশিত আছেন, তাঁহারা এবং বাহ্যদর্শনে পুরুষমূর্ত্তিতে আমরা যে সকল ব্যক্তি প্রকাশিত আছি সকলেই (শ্রীগীতার বাক্য অনুসারে) পরম শক্তিমান্ পুরুষ শ্রীভগবানেরই শক্তি। সুতরাং যদি প্রকৃত শক্তি-পূজার জন্যই আমাদের আগ্রহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের হাড়মাংসের-অভিমান বিস্মৃত হইয়া স্বরূপাভিমানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক।

যদি স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা, স্ত্রীপূজার ফল নিখিল শক্তিপতি শ্রীভগবানের প্রীতি উৎপন্ন না করে, তাহা হইলে ঐরূপ 'স্ত্রীশিক্ষা' কি 'কুশিক্ষা' ঐরূপ 'স্বাধীনতা' কি 'উচ্ছৃঙ্খলতা' 'অসংযম', 'যথেচ্ছচারিতা', ঐরূপ 'পূজা' কি শাস্ত্রবিগর্হিত নহে? আমাদের ন্যায় ভোগবুদ্ধি বিমূঢ় আত্মবঞ্চক ''অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ। দন্দ্রম্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।।" (কঠ ২।৫)—ব্যক্তিগণ এখনও কল্পনার নেত্রেও যে শিক্ষাদীক্ষার আদর্শ আঁকিতে পারেন নাই, যে আদর্শ আমাদেরই

নিকট আদর্শ-স্থাপন করিতে আমাদের এই বঙ্গদেশে একদিন প্রকাশিত হইয়াছিল—যে আদর্শের এককণা গ্রহণ করিলে জীবের চরম-মঙ্গল লাভ হয়—যে আদর্শে তুচ্ছ ভোগ বা লোক-দেখান-শুষ্ক ত্যাগ নাই—যে আদর্শের নিকট সূর্য্যের সাধ্বীপত্নী সুবর্চ্চলা, শুক্রের পতিব্রতা শতপর্ব্বা, চন্দ্রের রোহিণী, সত্যবানের সাবিত্রী, নলের দময়ন্তী, সগরের কেশিনী, সৌদাসের মদয়ন্তী, চ্যবনের সুকন্যা, অগস্তের লোপামুদ্রা, বশিষ্ঠের পতিব্রতা অরুন্ধতী রাবণের সাধ্বী মন্দোদরীর সতীত্ব ও মহত্ত্বের আদর্শ—যে আদর্শের নিকট সহস্র সহস্র ধাত্রী পান্নার স্বার্থত্যাগের আদর্শ, সহস্র সহস্র দুর্গাবতীর শৌর্য্য, সহস্র সহস্র কর্ম্মদেবীর সাহসিকতা, সহস্র সহস্র পদ্মিনীর অপূর্ব্ব সতীত্ব-ধর্ম্ম, জহরব্রতে জ্বলন্তানলে জীবনাহুতি প্রদানকারিণী রাজপুত-ললনার ত্যাগ, সহস্র সহস্র সংযুক্তার পাতিব্রত্য, সহস্র সহস্র কৃষ্ণ কুমারীর আত্মত্যাগ সূর্য্যালোকে খদ্যোতের ন্যায় অথবা তদপেক্ষাও অধিক হীনপ্রভ হয়—ঠাকুর বৃন্দাবন সেইরূপ আদর্শ বৈষ্ণবী শক্তিগণের কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

পাঠকগণ মনে করিবেন না, আমরা এইরূপ কথা বলিয়া কাহারও লঘুত্ব প্রতিপাদন করিতেছি। কোন ব্যক্তিবিশেষ, সমাজবিশেষ, সম্প্রদায়বিশেষ, বা কোন একশ্রেণীর অধিকারীবিশেষের নিকট তাঁহাদের অধিকারানুযায়ী নল-দময়ন্তী, রোমিও-জুলিয়েট, সাবিত্রী-সত্যবান, পদ্মিনীদুর্গাবতীর কথা রুচিপ্রদ হইতে পারে; কিন্তু সার্ব্বজনীন আত্মধর্ম্মের দিক্ হইতে বিচার করিলে ঐ সকল মহত্ত্বের মধ্যেও হেয়তা ও সঙ্কীর্ণতা উপলব্ধি হয়। যাঁহারা শ্রুতি ও শ্রীগীতাবাণী বিশ্বাস করেন, তাঁহারা জানেন, নশ্বর পতিলোক বা ইন্দ্রপুরী স্বর্গ আমাদিগের আত্মকল্যাণ প্রদান করিতে পারে না (গীতা ২।৪২-৪৩, ৯।২০-২৯) গীতার—"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।" (৮।১৬)

অর্থাৎ ব্রহ্মলোক হইতে সমস্ত লোকই অনিত্য। তৎতৎ স্থান হইতেও লোকের পুনরাবর্ত্তন বয়—এই কথা ধার্ম্মিক মাত্রেই জানেন। বৈদিক যুগের বিদুষী মৈত্রেয়ীকে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—"স হোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায়জায়া প্রিয়া ভবতি।।" (বৃহদাঃ।৪।৫।৬) যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—অয়ি মৈত্রেয়ি, পতির সুখের নিমিত্ত পতি কখনও পত্নী প্রিয় হন না; কিন্তু আত্মসুখের জন্যই পতি পত্নীর প্রিয় হইয়া থাকেন। অয়ি মৈত্রেয়ি! ভার্য্যার সুখের জন্য ভার্য্যা ভর্ত্তার প্রিয় হন না; কিন্তু আত্ম-সুখের জন্যই ভর্ত্তার প্রিয় হইয়া থাকেন।

যে আদর্শ বৈষ্ণবী-শক্তিগণের কথা আমরা উপরে লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাঁহাদের চরিত্র আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, তাঁহাদিগের স্বাভাবিক জীবনচরিত্রে জীবনের দৈনন্দিন ঘটনায়, প্রতিকার্য্যে, প্রতিপদবিক্ষেপে নিখিলবেদবেদান্ত, নিখিলশ্রুতি-স্মৃতিপুরাণের সারশিক্ষা পাওয়া যায়। কৃষ্ণৈকপ্রাণতাই তাঁহাদের 'জীবাতু' ছিল, নিরন্তর কৃষ্ণগুণগানই তাঁহাদের শিক্ষার চরমফল হইয়াছিল, কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণের জন্য অখিলচেষ্টাই তাঁহাদের স্বতন্ত্রতার মূলমন্ত্র ছিল, তাঁহাদের গৃহ, দ্বার, দ্রব্যসম্ভার, সম্পৎ, কলানৈপুণ্য, শিল্প-পারিপাট্য ষোলআনা কৃষ্ণ ও কৃষ্ণজনের সেবার জন্যই নিযুক্ত ছিল, অসৎসঙ্গত্যাগেই

তাঁহাদের শৌর্য্য, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়পুত্রকে কৃষ্ণসেবার জন্য অম্লানবদনে ক্রোড় হইতে উঠাইয়া গুরুবৈষ্ণবের হস্তে সমর্পণেই তাঁহাদের আত্মত্যাগ, পতির কৃষ্ণ-ভজনের কণ্টককস্বরূপ না হইয়া সর্ব্বতোভাবে পতির কৃষ্ণসেবায় সহায়তায়ই তাঁহাদের পাতিব্রত্য, আত্মশ্লাঘা, কলহপ্রিয়তা, গ্রাম্য-কোলাহল পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকোলাহল ও হরিনাম শ্রবণ কীর্ত্তনে নৈরন্তর্য্যই তাঁহাদের সংযম ও ধৈর্য্য, শুদ্ধবৈষ্ণব-সেবানিষ্ঠাই তাঁহাদের আতিথ্য-ধর্ম্ম, শুদ্ধা শ্রীএকাদশী-পালন, শ্রীজন্মাষ্টমী সম্মান প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গযাজনই তাঁহাদের ব্রতাচরণ, হরিমন্দির মার্জ্জন, কৃষ্ণপূজার্থ তুলসীচয়ন, বিষ্ণুনৈবেদ্যরন্ধনই তাঁহাদের গৃহকার্য্য বা সংসার, পরমহংসকুলের পদরজই তাঁহাদের ভূষণ ও অলঙ্কার ছিল। সে জন্যই শ্রীব্যাসদেব গাহিয়াছেন—

"জ্ঞানভক্তি-যোগে সবে পতির সমান।"

ইহা সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের উক্তি। শ্রীচৈতন্যদেব বৈষ্ণবী শক্তিগণের সম্বন্ধে এরূপ কথা বলিয়াছেন।

তাঁহারা সকলেই পতিব্রতা। তাঁহারা কখনও মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করেন নাই। ইন্দ্রিয়তর্পণ, যথেচ্ছাচারিতাকে "স্ত্রী-স্বাধীনতা" বলিয়া প্রচারের বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দেন নাই। তাঁহারা কেহই 'গৌরনাগরী' হন নাই। ব্রজনাগরের ভাব আচার্য্য লীলাভিনয়কারী বিপ্রলম্ভাবতার শ্রীগৌরসুন্দরের উপর বলপূর্ব্বক আরোপ কারিয়া অবৈধমার্গ জগতে প্রচার করেন নাই। তাঁহারা—

"দূরে থাকি প্রভু দেখি করয়ে ক্রন্দন।"

দূর হইতে মহাপ্রভুকে দর্শন ও সেবা করিয়াছেন। তাঁহাদের দর্শনে প্রাকৃত স্ত্রীপুরুষ, রক্তমাংস দর্শন নাই। তাঁহাদের দর্শন সুদর্শন।

আচার্য্যলীলাভিনয়কারী মহাপ্রভুও ধার্ম্মিকগণের কিরূপ ব্যবহার হওয়া আবশ্যক, তাহা আচরণ করিয়া জগদ্‌গুরুরূপে শিক্ষা প্রদান করিলেন—

"সবে স্ত্রী মাত্র না দেখেন দৃষ্টিকোণে।" (চৈঃ চঃ আদি ১৫।২৯)

আজকাল তথাকথিত ধার্ম্মিক-ধার্ম্মিকাগণের মধ্যে ঐরূপ আচরণের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। দেড়শতবর্ষ পূর্ব্বের শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজীর শাসনাবলীর মধ্যে এরূপও দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেকে গোবিন্দ দর্শনের ছলনায় যাত্রা মহোৎসব দর্শনের 'নাম' করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে হৃদ্‌গতব্যভিচারের সুযোগ করিয়া লন। পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে স্ত্রী-স্বাধীনতার নাম করিয়া কোথাও বা ললনাগণের নানা-প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা কিংবা মীরাবাইয়ের দোহাই দিয়া অতিবৈরাগ্যের ছলে ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার স্রোত প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। কোন কোনও ললনা আবার গুরুগোসাঞ্রির (?) পদধারণ, পদসেবন, কেশকলাপ দ্বারা পদসম্মার্জ্জন প্রভৃতিকেই ভক্তির অঙ্গ বলিয়া শিক্ষা লাভ করেন। যে সকল ব্যক্তি ঐরূপ অন্যায়কার্য্যে প্রশ্রয় দান করেন এবং যাঁহারা ঐরূপ বিগর্হিত-কার্য্যকেই ভক্তি মনে করেন, তাঁহারা ধর্ম্ম হইতে বহুদূরে। ঐসকল অবৈধ ব্যবহার কলির উৎপাত। ইহা ভাগবত ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার সম্পূর্ণ-বিরোধী। শ্রীমাধবী-দেবীর নাম শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠকমাত্রেই শুনিয়াছেন। শ্রীমাধবী মাতা—

"বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরমা বৈষ্ণবী।"

"প্রভু লেখা করে যাঁরে রাধিকার গণ।"

এইরূপ পরমপবিত্রা শুদ্ধা বৃদ্ধা তপস্বিনী বৈষ্ণবী মাতার নিকট ছোট হরিদাস শ্রীগোপাল আচার্য্যের ইচ্ছায় মহাপ্রভুর সেবার জন্য কিছু তণ্ডুল ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ছোট হরিদাসের এইরূপ ব্যবহার জানিতে পারিয়া তাহাকে বর্জ্জন করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণকে শিক্ষা দিলেন,—

"মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো বসেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি।।"

(ভাঃ ৯।১৯।১৫)

মাতার সহিত, ভগ্নির সহিত অথবা দুহিতার সহিতও নির্জ্জনে কখনও বসিবে না। কেন না বলবান্ ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্বান পুরুষেরও মন আকর্ষণ করিতে পারে।

অতি বৈরাগ্যের ছলনা দেখাইয়া বা মীরাবাই প্রভৃতির দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়া অনর্থযুক্ত স্ত্রীগণের গৃহত্যাগাদির চেষ্টা উৎপাত বিশেষ। প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়ের স্ত্রী ও পুরুষাভিমানীর মধ্যে দশায় পড়া, কপট কম্পাশ্রু-পুলক প্রদর্শনাদি ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল ব্যাপার ভোগপ্রবৃত্তিমূলে জাত বা কামজ বিকার বিশেষ—উহা বিশেষ গর্হণীয়! স্ত্রীলোকের সন্ন্যাসে অধিকার নাই। স্ত্রীলোক গৃহে থাকিয়াই হরিভজন করিবেন। স্বামীকে অঞ্চলধৃক্ 'গৃহব্রত' না করাইয়া তাঁহার প্রকৃত হরিভজনে সহায়তা করিলে ও স্বামীকে বৈষ্ণব সন্ন্যাসী হইবার সুযোগ দিলেই স্ত্রীরও 'সন্ন্যাস' এবং 'সহধর্ম্মিণী' নামের সার্থকতা সম্পাদিত হইবে। আমরা জগন্মাতা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর চরিত্রে ইহার জ্বলন্ত আদর্শ দেখিতে পাই। স্বামী সন্ন্যাসগ্রহণ করিলে বা হরিভজনে মনোনিবেশ করিলে স্ত্রী কখনও তাহার বাধা জন্মাইবেন না এবং নিজেকে কৃষ্ণব্যতীত অপরের ভোগ্য রক্তমাংসের থলি ভাবিয়া কিংবা কৃষ্ণের ভোগ্য বস্তুর জন্য ব্যাকুল হইয়া স্বামীর হরিভজনের শত্রু হইবেন না। "পুরুষ" বা "স্ত্রী" স্বরূপের অভিমান নহে, স্বরূপে সকলেই নিত্য কৃষ্ণদাস। সুতরাং সেই সম্বন্ধ জ্ঞান লাভ করিয়া নিরন্তর ভগবদ্ভজনেই সকলের প্রবৃত্ত থাকা উচিত। স্ত্রীগণের মধ্যে স্বরূপবিস্মৃতিক্রমে অনেক সময়েই দেহারামতা প্রভৃতি অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। এমন কি স্বামী সন্ন্যাসাদি গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ করিলেও অনেক স্ত্রী বেশভূষা ও শরীর মার্জ্জনাদি কার্য্যেই ব্যস্ত থাকেন। এই সকল ভোগোন্মুখতারই পরিচায়ক ও হরিভজনের বিশেষ প্রতিকুল। যাঁহারা হরিভজন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে প্রজল্প ও গ্রাম্য কথা পরিত্যাগ করিবেন। কোন বৈষ্ণব মহাজন বলিয়াছেন,—

"বনমানুষ ও অশিক্ষিত ভোগীর হরিভজন হয় না"।

বলিবার কারণ, শিক্ষার অভাবে স্ত্রীগণের "অহংমমবুদ্ধি" বড়ই প্রবল। তাঁহাদের জন্যই জগন্মাতা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী আদর্শ ভক্তিমতী ললনার চরিত্র কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক শিক্ষা

দিয়াছেন। যিনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, সমস্ত ঐশ্বর্য্যের যিনি অধিষ্ঠাত্রীদেবী—যিনি সাক্ষাৎ প্রেমভক্তিস্বরূপিণী, তিনি কিরূপ আচরণ করিয়াছেন শ্রবণ করুন—

* * * *

"কদাচিৎ নিদ্রা-হৈলে শয়ন-ভূমিতে।।
কনক জিনিয়া অঙ্গ সে অতি মলিন।
কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশীর শরীর প্রায় ক্ষীণ।।
হরিনামসংখ্যাপূর্ণ তণ্ডুলে করয়।
সে তণ্ডুল পাক করি' প্রভুকে অর্পয়।।
তাহারই কিঞ্চিন্মাত্র করেন ভক্ষণ।।
কেহ না জানয়ে কেনে রাখয়ে জীবন।।"

—শ্রীভক্তিরত্নাকর, চতুর্থ-তরঙ্গ।

ক্রমশঃ বৈষ্ণবী শক্তিগণের আদর্শচরিত্র শ্রীপত্রে প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের জ্বলন্ত-জীবনের আদর্শ শিক্ষাবলীর কথা বিবৃত করিব।

ধ্যান ও সঙ্কীর্ত্তন

আমাদের অনেকেরই ধারণা যে 'ধ্যান', 'জপাদি'ই শ্রেষ্ঠ সাধন। অনেকে ভাবেন, হরিকথা শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে বৃথা সময়ক্ষেপ হয় মাত্র কারণ, উহাতে কেবল করণীয় ব্যাপারের আলোচনা ও কথাবার্ত্তা হয়, কিন্তু মন্ত্রজপ বা ধ্যানাদিতে প্রকৃত কৃত্য সাধিত হইয়া থাকে। তাহারা বলেন হরিকথা ঔপপত্তিক (Theoretical) আর ধ্যানজপাদি আনুষ্ঠানিক (Practical) অনেক সময় এমনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন স্থানে কোন মহাভাগবত বৈষ্ণব হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন বা শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ ব্যাখ্যা করিতেছেন, সেই স্থান হইতে কেহ কেহ উঠিয়া যান। তাঁহাদের 'হরিকথা' পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ঐসকল ব্যক্তি বিনয়ের ভানে বলিয়া থাকেন,—"আমার কিছু কৃত্য আছে, কেবল কথায় ত' চিড়া ভিজে না, তাহাতে মন স্থির হয় না, কাজ কর্ত্তে হয়। কেহ কেহ বলেন,—"সন্ধ্যা সমাগত, আমার তর্পণ, মন্ত্রজপ প্রাণায়াম ও ধ্যানাদি কার্য্য আছে।" কেহ বলেন 'হরি', 'হরি', বলিলে কি হইবে? তাহাতে ত আর চিত্ত স্থির হইবে না? প্রাণায়ামাদি ধ্যানধারণা না করিলে চিত্ত স্থির হইবার নয়।" কেহ কেহ বা বলেন, সকল সময় ধ্যান করা যায় না, ধ্যান করিতে করিতে একটা বিরক্তি আসিয়া যায় তাই এক ঘেয়ে ভাব দূর করিবার জন্য অবকাশ সময়ে কীর্ত্তন, গান ও হরিকথা আলোচনাদি কিংবা তৎপরিবর্ত্তে জাগতিক অন্যান্য কথাও আলোচনা করা যাইতে পারে। আবার কেহ কেহ বলেন, কীর্ত্তনাদি দ্বারা চিত্তবৃত্তি ছড়াইয়া পড়ে,
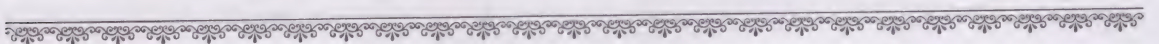
নির্জ্জনে ধ্যান দ্বারাই ছড়ান চিত্তবৃত্তি প্রত্যাহৃত হয়। অতএব ধ্যানই শ্রেষ্ঠ।

মনোধর্ম্মিসম্প্রদায়ের মধ্যে 'ধ্যান' ও 'কীর্ত্তন' সম্বন্ধে এইরূপ বিসদৃশ ধারণা বর্ত্তমান। তাঁহারা যাহাকে 'ধ্যান' নামে অভিহিত করেন, তাহা ইন্দ্রিয়তর্পণ মাত্র। অর্থাৎ জগতের কর্ম্মকোলাহলের ভিতর মন যখন অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে, তখন সেই পরিশ্রান্ত মনকে কর্ম্মকোলাহল হইতে সাময়িক বিরতি প্রদান করিবার চেষ্টা বা আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছা, তাহাই মনোধর্ম্মিসম্প্রদায়ের 'ধ্যান'। তন্মধ্যে আবার যাঁহারা আত্মেন্দ্রিয় তর্পণরূপ কৈতবকে আরও প্রচ্ছন্নভাবে চালনা করিতে করিতে ঊর্দ্ধসীমায় আরোহণ করাইতে চান, তাঁহারা 'ধ্যান' 'ধ্যেয়' ও 'ধ্যাতার' অস্তিত্বের সর্ব্বতোভাবে বিনাশই ধ্যানের চরম ফল বলিয়া বিচার করেন। যে স্থানে 'ধ্যাতা', 'ধ্যেয়ের' নিত্যত্ব নাই, সেই স্থানে ধ্যানটীও একটী অনিত্য উপায় বিশেষ। উহা নিত্য উপেয় নহে। ঐ ধ্যানের ফল 'ধ্যান' নহে, পরন্তু ধ্যানের ফল সর্ব্বতোভাবে ধ্যানের বিনাশসাধন বা চেতনতার স্তব্ধীকরণ, চেতনতাকে বিনাশ বা চেতনতার বৃত্তির স্তব্ধতা সম্পাদনই যদি ধ্যানের ফল হয়, তাহা হইলে ঐরূপ সাময়িক নশ্বর ধ্যানদ্বারা কি লাভ হইল? ইষ্টক প্রস্তরাদির ন্যায় অচেতন অবস্থা বা চেতনবৃত্তির স্তব্ধ ও নিরপেক্ষ ভাব কখনও সাধ্য হইতে পারে না। উহা আত্মবিনাশের চেষ্টা মাত্র।

ইন্দ্রিয়বর্গের অধিপতি মন, পরম চঞ্চল এবং শত শত অনর্থ উৎপাদনক্ষম। প্রগ্রহবিহীন প্রমত্ত অশ্ব যেরূপ, মনের গতিও তদ্রূপ। বাহ্য প্রাণায়ামাদি অষ্টাঙ্গযোগ কখনও ঐরূপ বলবান্ মনকে বশীভূত করিতে পারে না। গঙ্গোত্রীর প্রবল স্রোতকে বালির বাঁধ যেরূপ ক্ষণিকের জন্য রোধ করিবার মত একটী প্রতীতি মাত্র প্রদর্শন করে, প্রকৃতপক্ষে প্রবল স্রোত ঐ দুর্ব্বল বাঁধকে চুরমার্ করিয়া কোথায় লইয়া যায় তাহা ঠিক থাকে না, তদ্রূপ ধ্যান-ধারণাদি দ্বারাও চিত্তের পরিশ্রান্তি-ভাবের ক্ষণিক লাঘব ঘটিলেও তন্মুহূর্ত্তেই চঞ্চলস্বভাব মন ধ্যানীকে নানাপ্রকার বিষয়সাগরে মগ্ন করায়। ধ্যেয়বস্তুর স্থিরতা রাখিতে না দিয়া, ধ্যান প্রতিমুহূর্ত্তে নূতন নূতন ধ্যেয় বস্তু গ্রহণ করে ও পুরাতন ধ্যেয় বস্তুকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেয়। ধ্যানই নিজের মনের উপর 'আধিপত্য বিস্তার করিতে না পারিয়া বিষয়ের ধ্যানকেই তখন 'ধ্যান' বলিয়া ধারণা করে। বঞ্চক মন ধ্যানীকে জানিতে দেয় না যে ধ্যানী তাহার পাল্লায় পড়িয়া কোথায় চলিয়া আসিয়াছে। মনকে বশীভূত করিতে গিয়া মনের প্রভু সাজিতে গিয়া 'ধ্যানী' মনের বশ্য বা 'দাস' হইয়া পড়ে। প্রাকৃত নায়ক যে প্রকার তাহার প্রিয়তমা নায়িকাকে তাহার অত্যন্ত অনুগত বলিয়া মনে করিলেও প্রকৃত পক্ষে নায়িকারই ক্রীত গোলাম হইয়া পড়ে, তদ্রূপ ধ্যানীও 'মনকে বশীভূত করিয়াছে' মনে করিলেও প্রকৃত-প্রস্তাবে মনেরই গোলাম হইয়া যায়। বিষয়ের ধ্যানকেই তিনি 'ধ্যান' এবং বিষয়গুলিই তাহার 'ধ্যেয়' এইরূপ আত্মবঞ্চনামূলা প্রতীতি আসিয়া উপস্থিত হয়। কখনও বা ত্রিপুটী বিনাশ বা আত্মবিনাশকেই শ্লাঘ্য বস্তু বলিয়া আত্ম প্রতারিত হয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৫১।৬০) বলিয়াছেন—

যুঞ্জানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ।
অক্ষীণবাসনং রাজন দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্।।

অর্থাৎ অভক্তগণ প্রাণায়ামাদি দ্বারা চিত্ত নিরোধ করিয়া থাকেন; কিন্তু হে রাজন্ তদ্দ্বারা তাহাদের চিত্ত বিষয়মল শূন্য হয় না বলিয়া তাহা আবার বিষয়াভিমুখী হইয়া পড়ে।

"যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দ-সেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি।।

(ভাঃ ১।৬।৩৬)

অর্থাৎ মুকুন্দ-সেবাদ্বারা, সদা কাম-লোভাদি-রিপু বশী ভূত অশান্ত মন যেমন সাক্ষাৎ নিগৃহীত হয়, যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগমার্গ অবলম্বন দ্বারা, তাহা তেমন নিরুদ্ধ বা শান্ত হয় না।

প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জতো যোগিনো মনঃ।
বিষীদন্ত্যসমাধানান্মনো নিগ্রহকর্শিতাঃ।।

(ভাঃ ১১।২৯।২)

অর্থাৎ হে পুণ্ডরীকাক্ষ, প্রায় দেখা যায় যে, যে সকল যোগী যোগমার্গে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা মনোনিগ্রহ বিষয়ে ব্যাকুল হইয়া ক্লেশ পাইয়া থাকেন; কারণ তদ্দ্বারা তাঁহাদের মনো-নিগৃহীত হয় না।

ধ্যানধারণাদি আরোহবাদের চেষ্টা পরমার্থ দুর্লভ মনুষ্য জীবনের অতি মূল্যবান সময় নষ্ট হয় মাত্র। যাহারা দুষ্কৃতিবশে হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে রুচিবিশিষ্ট নহেন, তাঁহারাই ঐ প্রকার প্রাণায়ামাদি কার্য্যে সময় যাপন করিয়া থাকেন—

অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতান্ যুঞ্জতো যোগমুত্তমম্।
ময়া সম্পদ্যমানস্য কালক্ষপণ-হেতবঃ।।

(ভাঃ ১১।১৫।৩৩)

যাঁহারা উত্তম যোগ অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিযোগে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ সকল চেষ্টাকে ভক্তিপথের বিঘ্নস্বরূপ বলিয়া থাকেন। মদীয় ভক্তগণ আমাদ্বারাই সমস্ত সাধনের ফল প্রাপ্ত হন। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে ঐসকল সাধন চেষ্টা কাল-ক্ষেপণের হেতু মাত্র। আমার সেবা ছাড়িয়া তাঁহারা সেরূপ বৃথা কাল ক্ষেপণ করেন না।

অন্যের কাকথা, বিবেকী, ঋষি, মুনি ও তপস্বিগণও যদি ভগবৎ শ্রবণ-কীর্ত্তন প্রসঙ্গ-বিমুখ হন, তবে তাঁহাদেরও সংসার ক্লেশে পতিত হইতে হয়—

অহ্ন্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা নানা মনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবা হতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেব যুষ্মৎ প্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি।।

(ভাঃ ৩।৯।১০)

অর্থাৎ যদি বল, অবিবেকী-ব্যক্তিগণের পক্ষে সংসার ক্লেশ সম্ভব হতে পারে—বিবেকীগণ ত' মুক্ত তাঁহাদের ভক্তির আবশ্যক কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—হে দেব, ঋষিগণও ভবদীয় শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ প্রসঙ্গ হইতে বিমুখ হইলে এই সংসারে গমনাগমন করিয়া থাকেন। দিবসে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম ভগবদিতর বিষয়ে ব্যাপৃত হইয়া অত্যন্ত ক্লিষ্ট থাকে, রাত্রিকালেও তাঁহাদের বিষয়সুখের লেশমাত্রও থাকে না, যেহেতু তাঁহারা বাহ্যেন্দ্রিয় ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইয়া নিদ্রাগত হন বটে, কিন্তু নানা অসদ্বিষয়ে ধাবিত মনোধর্ম্মরূপ স্বপ্নদর্শন দ্বারা তাহাদের ক্ষণে ক্ষণে নিদ্রাভঙ্গ হয়। তাহারা অর্থের জন্য উদ্যম করিতে পারে না। যেহেতু উহাত তাহাদের জন্য দৈব কর্ত্তৃক সকল স্থান হইতে প্রতিহত হইয়াছে। কিন্তু পিপ্পলায়নাদি বৈষ্ণবগণ যে কীর্ত্তন অপেক্ষা স্মরণকেই প্রেমের অধিকতর অন্তরঙ্গ সাধন বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহার রহস্য আছে। সেই স্থানে 'স্মরণ বা ধ্যান', ফলভোগকামীর মন্ত্রাদি জপ বা ফলত্যাগী ব্রহ্ম সাযুজ্য ও ঈশ্বর-সাযুজ্য কামীর 'ধ্যান' কে লক্ষ্য করা হয় নাই। সর্ব্বতোভাবে প্রভুর স্ফূর্ত্তি বিশেষের পরিপাকই ধ্যান; নিত্য আরাধ্য বাস্তবস্বরূপ সচ্চিদানন্দ ঘন ভগবান্ অবস্থান করিতেছেন। আমি সেই ভগবানের নিত্যদাস"—এইরূপ ভগবানের সহিত সম্বন্ধই স্মৃতি। এইরূপ ধ্যান-বশতঃ সঙ্কীর্ত্তন, স্পর্শন ও দর্শনাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তিবর্গ চিত্তবৃত্তিতে অন্তর্ভূত হইয়া যায়। সুতরাং এইরূপ ধ্যান হইতে সঙ্কীর্ত্তন মাধুরী-সুখ আরও পরিবর্দ্ধিত হয়। এইরূপ ধ্যান ও 'সঙ্কীর্ত্তন' উভয়ে উভয়েরই বর্দ্ধক এবং পরস্পর অভিন্ন। কিন্তু, নির্ব্বেদজ্ঞানী ও যোগীর ধ্যান, সঙ্কীর্ত্তনের বর্দ্ধক হওয়া দূরে থাকুক, বরং তৎপ্রতিকূল। যে ধ্যানে ধ্যাতা ও ধ্যেয়ের নিত্যত্ব নাই, সেইরূপ শুষ্কচিত্তের স্তব্ধভাব কখনও আদৃত হইতে পারে না। উহাতে ধ্যেয়বস্তু নিত্য প্রভুর নিত্যনামরূপ গুণমাধুরী স্ফূর্ত্তি না করাইয়া তৎপরিবর্ত্তে জীবকে আত্মবিনাশের পথে লইয়া যায়। জীবন্মুক্তাভিমানী ঐরূপ ধ্যানী সম্প্রদায়ের চিত্ত কখনও স্থায়ী নির্ম্মলতা বা পরা শান্তি লাভ করিতে পারে না। তাই, শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি মানে। বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে।।" শ্রীমদ্ভাগবতেও আদি গুরু ব্রহ্মা "যেঽন্যেরবিন্দাক্ষ" শ্লোকে এইকথা ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও (১০।৯-১০) শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"মচ্চিত্তা মদগতাপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।।
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতি পূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধি-যোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।।"

অর্থাৎ—বুধগণ আমাতে চিত্ত ও প্রাণ সম্যগ্‌রূপে অর্পণ পূর্ব্বক পরস্পর ভাববিনিময় ও মৎসম্বন্ধিনী কথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সেই শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারা (সাধনাবস্থায়) ভক্তি সুখ ও (সাধ্যাবস্থায় অর্থাৎ লব্ধ প্রেমাবস্থায়) নিত্যকাল আমার সহিত রাগমার্গে ব্রজরসান্তর্গত মধুর রস পর্য্যন্ত সম্ভোগ পূর্ব্বক রমণ সুখ লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা এইরূপ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তিযোগ দ্বারা সতত আমাতে যুক্ত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক

আমার ভাবনা করেন আমি তাঁহাদিগকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া থাকি; তাঁহারা তদ্দ্বারা আমার পরানন্দধাম লাভ করেন।

শ্রবণ-কীর্ত্তন-রত ভক্তগণ ভক্তিকে নিজায়ত্ত বলিয়া গণনা করেন না; প্রভুর মহাপ্রসাদ বলিয়াই অনুভব করিয়া থাকেন। কিন্তু, আরোহবাদী ধ্যানী অজিত ভগবানকে স্বীয় ক্ষুদ্র পুরুষাকার দ্বারা জয় করিবার বৃথা চেষ্টা দেখাইয়া ভগবচ্চরণে অপরাধী এবং স্থানচ্যুত হইয়া পড়েন। এই জন্যই ব্রহ্মা শ্রীভগবানকে বলিয়াছেন—"হে ভগবন্ যাঁহারা নশ্বর তাৎকালিক- লভ্য সঙ্কীর্ণতা মূলক বাহ্য জ্ঞান অথবা যাঁহার নির্ব্বেদ ব্রহ্মচিন্তা-রূপ জ্ঞান চেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে দূরে পরিত্যাগ করিয়া সাধুমুখ-বিগলিত ভবদীয় বার্ত্তা শ্রবণ করেন এবং কায়-মনোবাক্যে সাধুপথে থাকিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, ত্রিলোকমধ্যে আপনি অজিত হইলেও তাঁহাদের দ্বারাই জিত হন। অহমিকা-পরায়ণ ধ্যানি সম্প্রদায় নিজ চেষ্টায় ভগবানকে দর্শন করিতে সমর্থ হন না। তুযরাশিতে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া তণ্ডুল পাইবার আশায় বৃথা ক্লেশ স্বীকার করেন মাত্র।

ধ্যান হইতে কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা আরও অন্যান্য কারণেও আমরা প্রত্যক্ষ করি। আত্মারাম মুনিগণেরও চিত্ত কীর্ত্তনে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। শুক সনকাদির ন্যায় শ্রেষ্ঠ-যোগিগণ যাঁহাদের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে সংযত ও বিক্ষেপ বিহীন, যাঁহারা ধ্যানের পরিপক্কাবস্থা লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা বিধিনিষেধ হইতে নিবৃত্ত নৈর্গুণ্যে স্থিত; তাঁহারাও হরিকীর্ত্তনের দ্বারা আকৃষ্টচিত্ত হইয়া কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি যাজন করিয়াছেন। অতএব ধ্যান হইতেও যে কীর্ত্তনের মাধুরী আরও অধিক, এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি?

ধ্যানের দ্বারা ব্যক্ত-বাগ্ বেগের রোধ হইলেও অব্যক্ত বাগ্‌বেগ অর্থাৎ মানসিক চাঞ্চল্য রুদ্ধ হয় না। কিন্তু, কীর্ত্তনপ্রভাবে শ্রবণ কীর্ত্তন ও স্মরণ-রূপ ত্রিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যুগপৎ সাধিত হয় বলিয়া, চিত্ত সহজেই ভগবৎপাদ-পদ্মে সংলগ্ন হইয়া থাকে।

> শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
> নাতিদীর্ঘেন কালে ন ভগবান্ বিশতে হৃদি।।
> প্রবিষ্টকর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্।
> ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ।। (ভাঃ ২।৮।৪-৫)

অর্থাৎ—যিনি শ্রীহরির সুমঙ্গলময়ী কথা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক নিত্য শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ভগবান্ অচিরকাল মধ্যেই সেই ভক্তের স্বপ্রযত্ন ব্যতীত স্বযং তাহার হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হন, ইহার দ্বারাই শ্রবণ কীর্ত্তনের অধীনই যে স্মরণ তাহা জ্ঞাপিত হইল। (শ্রীচক্রবর্ত্তী)। শ্রীহরি স্বীয় কৃত দাস্যসখ্যাদি ভাবরূপ কমলাসনে কথারূপে প্রবিষ্ট হইয়া সর্ব্বজীবের কাম-ক্রোধাদি মলিনতাকে সর্ব্বতোভাবে এবং কিছুমাত্র আপনার না রাখিয়া বিদূরিত করিয়া থাকেন। যদি কেহ বলেন, ধ্যানাদির দ্বারাও ত' কামক্রোধাদি মনোমল বিনষ্ট হইতে পারে, তবে হরিকীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? তদুত্তরে বলিতেছেন,—যে প্রকার কোনও কুম্ভস্থ

জলকে দ্রব্যান্তর-মিশ্রণ দ্বারা শোধন করিলে তদ্দ্বারা ঐ কুম্ভস্থ জল মাত্রই শোধিত হইয়া থাকে; কিন্তু অন্য পাত্রস্থ বা নদী তড়াগাদির জল শোধিত হয় না; আবার কুম্ভস্থ জলও সম্পূর্ণভাবে শোধিত হইয়াছে বলা যায় না; কারণ, মলরাশি সঞ্চিত হইয়া ঐ কুম্ভের তলদেশেই পড়িয়া থাকে; জল কোনও প্রকারে ঈষৎ ক্ষোভিত হইলেই পুনরায় তলদেশস্থ মল জলে মিশ্রিত হয়; তদ্রূপ ধ্যান যোগাদির দ্বারাও সকল জীবের হৃদয় মল শোধিত হইতে পারে না। কেহ কেহ শোধিত হইয়াছে মনে করিলেও কুম্ভস্থ জলের তলদেশস্থ মলের ন্যায় তাহারও কামক্রোধাদি-মল কিছু সময়ের জন্য উপশমিত প্রায় দেখাইয়া পর মুহূর্ত্তেই আবার নিজ স্বরূপ ধারণ করে।

ধ্যান, যজ্ঞ, ব্রত, তপস্যাদি কখনও নাম কীর্ত্তনের সহিত সমান নহে। শ্রীপদ্ম পুরাণে দশবিধ-নামাপরাধ-বর্ণন প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি তপস্যাদির সহিত নাম কীর্ত্তনকে সমান জ্ঞান করেন, তাঁহারা নামাপরধী। যাঁহারা ধ্যানাদি সাধনকে হরিসঙ্কীর্ত্তনের অন্যতম সাধন বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন, তাঁহাদের বিচারেই ধ্যান সাধনোপায় মাত্র উপেয় নহে। কিন্তু, হরিকীর্ত্তন উপায় ও উপেয়। 'হরিকথা' ও 'হরি' একই বস্তু; উহাদের মধ্যে কোনও রূপ ব্যবধান নাই।

নির্জ্জনত্ব ও একাকিত্ব ব্যতীত কদাচ ধ্যান সিদ্ধ হয় না। কিন্তু, নির্জ্জনেই হউক্ অথবা বহুলোক মধ্যেই হউক্ সঙ্কীর্ত্তন উভয়ত্রই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। কীর্ত্তন, বালক যুবা-বৃদ্ধ পণ্ডিত-মূর্খ, নির্ধন-ধনবান, স্ত্রী পুরুষ—সকলের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু, ধ্যান সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। কীর্ত্তন শুচি, অশুচি স্নাত অস্নাত যে কোন অবস্থায়, গৃহে বনে যে কোন স্থানে সাধিত হইতে পারে। কিন্তু, ধ্যানাদি কার্য্য সেরূপ নহে।

ধ্যান ধ্যেয়ের পরোক্ষেই যুক্তিযুক্ত হয়। কিন্তু, সাক্ষাতে তাহা যুক্তিযুক্ত হয় না। কিন্তু, কীর্ত্তন উভয় ক্ষেত্রেই যুক্তিযুক্ত হইয়া থাকে।

ধ্যান অধিকারী অনধিকারী বিচার অপেক্ষা করে, কিন্তু নামকীর্ত্তনে অধিকারী অনধিকারী অপেক্ষা নাই; কারণ, তাহা সুখোপাস্য, অর্থাৎ জিহ্বাগ্রমাত্র দ্বারাই তাঁহার সেবা করিতে পারা যায়। নামকীর্ত্তন সেবোন্মুখ জিহ্বায় উচ্চারিত হইলে অব্যর্থরূপে পরম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমা প্রদান করিয়া থাকেন; কিন্তু, ধ্যান বহু ক্লেশ সহকারে সাধিত হইলে কোনও কোনও ব্যক্তির চিত্ত কিছু কালের জন্য নিরোধ করিতে পারে মাত্র। ধ্যানের ফল—চিত্ত নিরোধ তাহা কিছু চরম ফল নহে। কিন্তু, নামকীর্ত্তনের ফল কৃষ্ণপ্রেমা জীবের পরম প্রয়োজন বা চরম ফল।

কেহ কেহ বা বলিতে পারেন সংকীর্ত্তনে লোক-লজ্জা শারীর-দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি বহু বহু বিঘ্ন ঘটিতে পারে কিন্তু ধ্যানে অর্থাৎ অন্তশ্চিন্তনে সেরূপ কোনও বিঘ্নাশঙ্কা নাই। তদুত্তর এই যে, বিচিত্রলীলা-কল্লোল-সমুদ্র শ্রীভগবানের স্ফুরিত বিচিত্র প্রসাদ হইতেই সেই বিচিত্র-সঙ্কীর্ত্তন-মাধুরী স্ফুরিত হইয়া থাকে। নিজ পৌরুষ বলে উহা কখনও সাধিত হয় না। অতএব ভগবৎপ্রসাদে কুশাগ্রও বিঘ্ন ঘটিতে পারে না। সেবোন্মুখ ব্যক্তির সংকীর্ত্তনের বিঘ্নরাজি অরুণোদয়প্রারম্ভেই নীহার-রাশির ন্যায় সম্পূর্ণ ভাবে বিনষ্ট হইয়া যায়।

বিচিত্র লীলা-রস-সাগরস্য প্রভোর্বিচিত্র্যাৎ স্ফুরিতাৎ প্রসাদাৎ।
বিচিত্র-সংকীর্ত্তন-মাধুরী সা ন তু স্বয়ন্ত্বাদিতি সাধু সিদ্ধয়েৎ।।

—বৃঃ ভাঃ ২।৩।২৬৮

এক নাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারাই নববিধ-ভক্তি সাধিত হয়। সংকীর্ত্তনের অর্ন্তভুক্ত ধ্যানও হইয়া থাকে। কলিযুগে লোকের চিত্তবৃত্তি সর্ব্বদাই বাহ্যবিষয়ে প্রধাবিত। সত্যে চতুষ্পাদ ধর্ম্ম ছিল, লোকের চিত্ত সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকায় অধোক্ষজ-বস্তুর ধ্যান অতি সহজেই হইত। কিন্তু একপাদমাত্র ধর্ম্মবিশিষ্ট কলিযুগে ধ্যান সম্ভবপর নহে। তাই শ্রীমদ্ভাগবত (১২।৩।৫২)—

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ।।"

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও উক্ত হইয়াছে,—

"ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্।।"

সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যানের দ্বারা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ দ্বারা, এবং দ্বাপরে পরিচর্য্যা দ্বারা যাহা লাভ হইত কলিতে একমাত্র হরিকীর্ত্তন দ্বারাই তাহা লব্ধ হয়।

"কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা"

আমরা শ্রীল সনাতন গোস্বামী-প্রভুর শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের একটী শ্লোক উদ্ধার করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি—

"জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
র্বিরমিত-নিজধর্ম্ম-ধ্যান-পূজাদিযত্নম্।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে।।"

শ্রীকৃষ্ণের আনন্দস্বরূপ শ্রীনাম জয়যুক্ত হউন্। শ্রীনাম সর্ব্বোৎকর্ষতার সহিত বিরাজ করুন্। শ্রীনামোচ্চরণ দ্বারা বর্ণাশ্রমাদি-ধর্ম্ম, ধ্যানও পূজাদির জন্য যত্ন সর্ব্বতোভাবে নিরাকৃত হয়। কোনও প্রকারে নাম একবার উচ্চারিত হইলেও অর্থাৎ নামাভাস হইলেও প্রাণিগণের সম্বন্ধে তাহা মুক্তিপ্রদ হয়। শ্রীনাম—পরমামৃত স্বরূপ অর্থাৎ তাহা প্রেমপ্রদ, তাহা একমাত্র আমার জীবন ও ভূষণ।

পদ্মাবতী

গৌড়দেশবাসী—ভারতবাসী—ভারতবাসীই বা কেন পৃথ্বীবাসী—অথবা সমগ্র বিশ্ববাসী জীবকে সৌভাগ্য-সুযোগ প্রদান করিবার জন্য একদিন এই ভূলোকে গোলোকের দেবতাগণ আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের এক এক জনের জ্বলন্ত জীবন, সহস্র সহস্র শাস্ত্রের ভূমিকা, বেদ বেদান্তের সারমর্ম্ম, স্মৃতির ব্যবস্থা, পুরাণের উপদেশ-রাজিকে বিশ্লেষণ করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান সভ্যজগৎ ঘরের কথায় উদাসীন।

আমরা পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট যাঁহার মহান্ আদর্শ-কীর্ত্তন করিয়া ধন্য হইবার ইচ্ছা করিয়াছি, সেই "পরমা-বৈষ্ণবীশক্তি" "জগন্মাতা" শ্রীপদ্মাবতী শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-জননী। রাঢ়দেশে 'একচাকা' নামে একটী গ্রাম আছে, বর্ত্তমানে বীরভূম জেলার মল্লারপুর ষ্টেসন (নলহাটী লুপ লাইন) হইতে চারি ক্রোশ পূর্ব্বদিকে এই গ্রাম অবস্থিত। প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানে হাড়াই পণ্ডিত নামে অতি 'নিষ্ঠাপরায়ণ', 'মহা-বিরক্ত প্রায়' 'দয়ালুচরিত', ও 'উদার' এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পতিব্রতা পত্নীর নামই—পদ্মাবতী। পতি-পত্নী উভয়েই বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সেবাই যে জীবের জীবনের ব্রত—ইহা নিয়ত আচরণ দ্বারা শিক্ষা দিয়াছিলেন। গণ্ডগ্রামের ভিতরে বসিয়া তাঁহারা এইরূপ আদর্শ-বৈষ্ণব জীবন যাপন করিতেছিলেন। কিন্তু মরিচীমালী যেরূপ বিশাল-গগনের এক কোণে উদিতপ্রায় প্রতিভাত হইলেও সমগ্র জগৎ তাঁহার আবির্ভাবের কথা জানিতে পারে, তদ্রূপ একটী ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্যে সেই ধর্ম্মপ্রাণ দম্পতি বাস করিয়া হরিভজন করিলেও সমগ্র বিশ্বে তাঁহাদের কীর্ত্তি-কিরণ-ছটা বিকীর্ণ হইল। হাড়াই পণ্ডিত ও পদ্মাবতীর বিশুদ্ধ সত্ত্বে জগদ্গুরু শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আবির্ভূত হইলেন।

নিত্যানন্দ জননী পদ্মাবতী একাধারে ত্রেতাযুগের লক্ষণ জননী সুমিত্রা ও দ্বাপর যুগের বলভদ্র-জননী রোহিণী। হাড়াই পণ্ডিত ও পদ্মাবতী নিত্যকাল বাৎসল্য রসে ভগবানের সেবক ও সেবিকা। তাঁহারা বাৎসল্য রসের অবধি, কিন্তু এই অবতারে স্বয়ং ভগবান্ জীব শিক্ষা কল্পে লোক শিক্ষক-রূপে অবতীর্ণ। তাই তিনি তাঁহার সমগ্র নিজজনের দ্বারা এক একটী মহান্ আদর্শ স্থাপন করিলেন।

"পরম উদার দুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
তাঁর ঘরে নিত্যানন্দ জন্মিলা আপনি।।
সকল পুত্রের জ্যেষ্ঠ নিত্যানন্দ রায়।
সর্ব্ব সুলক্ষণ দেখি' নয়ন জুড়ায়।।"

* * * *

তিল মাত্র নিত্যানন্দ না দেখিলে মাতা।
যুগ প্রায়' হেন বাসে ততোধিক পিতা।।

তিল মাত্র নিত্যানন্দ পুত্রেরে ছাড়িয়া।
কোথায় হাড়াই ওঝা না যায় চলিয়া।।
কিবা কৃষিকর্ম্মে কিবা যজমান ঘরে।
কিবা হাটে কিবা বাটে যত কর্ম্ম করে।।
পাছে যদি নিত্যানন্দ-চন্দ্র চলি' যায়।
তিলার্দ্ধে শতেকবার উলটিয়া চায়।।
ধরিয়া ধরিয়া পুনঃ আলিঙ্গন করে।
ননীর পুতুলি যেন মিলায় শরীরে।।
এই মতে পুত্র সঙ্গে বুলে সর্ব্ব ঠাঞি।
'প্রাণ' হইলা নিত্যানন্দ, 'শরীর' হাড়াই।।

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ৬৫-৬৬, ৭০-৭৫)

এইরূপ মাতা পিতার বৎসল-রসে সেবিত হইয়া বালক নিত্যাই বাল্য লীলায় ব্যস্ত ছিলেন। দৈবাৎ একদিন একজন বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী নিত্য-বৈষ্ণব-সেবাপরায়ণ হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হইলেন। পরমোদার হাড়াই পণ্ডিত বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীকে অতি যত্ন ও প্রীতির সহিত ভিক্ষা করাইয়া স্বীয় ভবনে তাঁহাকে স্থান দিলেন। বৈষ্ণব সাধুকে পাইয়া পণ্ডিত সারারাত্র সন্ন্যাসীর সঙ্গে কৃষ্ণ-কথা কথন-প্রসঙ্গে যাপন করিলেন। উষঃকালে সন্ন্যাসী প্রবর স্থানান্তরে গন্তুকাম হইয়া হাড়াই পণ্ডিতকে বলিলেন,—"পণ্ডিত, আপনার নিকট আমার একটী ভিক্ষা আছে"। সর্ব্বদা বৈষ্ণব সেবায় ব্যগ্র হাড়াই পণ্ডিত, 'বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী ভিক্ষা চাহিতেছেন, ইহা অপেক্ষা গৃহস্থের আর সৌভাগ্যের বিষয় কি হইতে পারে,—এইরূপ বিচার করিয়া সন্ন্যাসীপ্রবরকে বলিলেন,—"মহারাজ, আপনি যাহা চাহিবেন, এ অধম তাহাই সমর্পণ করিবার সৌভাগ্য পাইলে নিজকে কৃতার্থ জ্ঞান করিবে।"

কৃষ্ণার্থে সর্ব্বস্ব ত্যাগী সর্ব্বস্ব দ্বারা সতত কৃষ্ণ-সেবা-পরায়ণ বৈষ্ণব-ভিক্ষুক সামান্য প্রাকৃত ভিক্ষুকের ন্যায় কিছু ভিক্ষা করেন না। তাঁহারা অল্পতে সন্তুষ্ট নহেন। কেন না, তাঁহাদের চিত্ত সমগ্র বস্তু দ্বারা স্বরাট্ পুরুষ ভগবানের সেবার জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল। তাঁহারা নিজের ভগবানের পাদপদ্মে সর্ব্বস্ব ডালি দিয়াছেন, তাই তাঁহারা জগতের সকল জীবের সর্ব্বস্বকে ভগবানের পদ-কমলে অঞ্জলি প্রদান করাইবার জন্য প্রতি দ্বারে দ্বারে সেই ভিক্ষাই করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ভিক্ষার গীতি এই—

'রাধাকৃষ্ণ' বল, সঙ্গে চল,
এই মাত্র ভিক্ষা চাই।

বৈষ্ণব সন্ন্যাসীও আজ সেই ভিক্ষাই চাহিয়া বসিলেন। সন্ন্যাসী আজ হাড়াই পণ্ডিতের যথাসর্ব্বস্ব—অন্তরাত্মা, প্রাণের প্রাণ, নয়নের তারা, হাতের নড়ি, গলার হার, বুকের ধন, গৃহের মাণিক, 'তাঁহার বলিতে

যা কিছু' সেই—নিত্যানন্দ-চাঁদকে ভিক্ষা চাহিলেন। বলিলেন,—"পণ্ডিত! আমি তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ভিক্ষা চাই। আমি পরিব্রাজক সন্ন্যাসী তীর্থ পর্য্যটন করিয়া বেড়াইব। আমার সেঙ্গ একটী ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী চাই, তোমার পুত্রকে আমার সঙ্গে দাও।"

হাড়াই পণ্ডিত! তুমিই যথার্থ পিতার আদর্শ! তুমি যদি আজ বৈষ্ণব-সেবার্থ এইরূপ অপূর্ব্ব ত্যাগের আদর্শ না দেখাইতে, তাহা হইলে জগতে 'বৈষ্ণব সেবা' গৃহস্থের—গৃহস্থের কেন সমগ্র জীবের মঙ্গলের উপায়টী ধরাধাম হইতে লুপ্ত হইত। আজ তোমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম নিত্যানন্দ-চন্দ্রকে তুমি বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর হাতে সঁপিয়া দিবার পূর্ব্বে কি বিচার করিলে? তাহা আমাদের বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়,—

ভিক্ষুকের পূর্ব্বে মহাপুরুষ সকল।
প্রাণ দান দিয়াছেন করিয়া মঙ্গল।।
রামচন্দ্র পুত্র দশরথের জীবন।
পূর্ব্বে বিশ্বামিত্র তানে করিল যাচন।।
যদ্যপিও রাম বিনে রাজা নাহি জীয়ে।
তথাপিও দিলেন এই পুরাণেতে কহে।।
সেই ত' বৃত্তান্ত আজি হইল আমারে।
এধর্ম্ম-সঙ্কটে কৃষ্ণ রক্ষা কর মোরে।।

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ৩।৮৭-৯০)

এইরূপ বিচার পূর্ব্বক হাড়াই পণ্ডিত পদ্মাবতীর নিকট উপস্থিত হইয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ বলিলেন। এবার পাঠক-পাঠিকাগণ মাতৃত্বের আদর্শশ্রবণ করুন। জগতে এইরূপ মাতৃত্বের আদর্শ হইয়াছে কি না জানি না! প্রাচীন ইতিহাসে বহু আর্য্যনারীর কথা শুনিতে পাওয়া যায়। মাতা শত্রুর পায়ে পুত্রের প্রাণ ডালি দিবার জন্য পুত্রকে নিজ হস্তে যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত করিয়া দিয়াছেন, স্নেহের অদ্বিতীয় অবলম্বন প্রাণাধিক শিশুপুত্রকে নিষ্ঠুর ঘাতকের তরবারির মুখে সমর্পণ করিয়াছে—একথাও আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু সে সকল জাগতিক মহানাদর্শের অভিনয়গুলি যদি আমরা সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, তন্মধ্যে প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা, 'স্বার্থত্যাগের নামে অপস্বার্থ, মাতৃত্বের নামে 'নিষ্ঠুরতা ও 'নৃশংসতা' নেপথ্যে নৃত্য করিতেছে। কারণ, যেখানে সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা নাই, তাহা কৈতব-কাম ব্যতীত আর কিছুই নহে। যদিও উহা সুন্দরমুখস পরিয়া আমাদিগকে অনেক সময় ছলনা করে, তথাপি উহা আত্মবঞ্চনা' ও 'পরবঞ্চনাময়ী' প্রহেলিকা মাত্র। আজ পতিব্রতাশিরোমণি পদ্মাবতী বৈষ্ণব-পতিকে কি বলিলেন, তাহা ব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের অমর-ভাষায় বলিতেছি—

"শুনিয়া বলিলা পতিব্রতা জগন্মাতা।
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু সেই মোর কথা।।"

ইহাকেই বলে জননীত্ব, মাতৃত্ব ও পাতিব্রত্য। যদি কাহারও জননী হইতে হয়, তাহা হইলে এইরূপ জননীরই আদর্শ গ্রহণ করা উচিত। যদি কাহারও সহধর্ম্মিণী হইতে হয়, তাহা হইলে এইরূপ পত্নীই হওয়া উচিত। নতুবা বৃথা আত্মেন্দ্রিয় তর্পণের জন্য কৃষ্ণের বস্তুকে নিজের ভোগে লাগাইবার জন্য দশমাস গর্ভধারণ করা বৃথা।

"পিতা ন স স্যাৎ জননী ন সা স্যাৎ ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্।।"

এই ভাগবতের বাণী অক্ষরে অক্ষরে পদ্মাবতীর জ্বলন্তচরিত্রে প্রকাশিত।

জগতের বহির্ম্মুখ জনক-জননী পুত্রকে সন্ন্যাসীর হাতে সঁপিয়া দেওয়া দূরে থাকুক, অনেক সময় পুত্র কোনরূপ সাধুসঙ্গ করিতেছেন, কোনরূপ একটু ভাল হইতেছেন শুনিলেই, পাছে তাহাতে তাঁহাদের ভোগের ব্যাঘাত হয়, ভবিষ্যতে তাহাদের পুত্ররত্ন তাঁহাদিগকে যথেষ্ট ভোগের ইন্ধন সংগ্রহ করিয়া না দেয়—এই আশঙ্কায় পুত্রকে ধর্ম্মপথে যাইতে শত প্রকারে বাধা দিয়া থাকেন। আর যদি জানিতে পারে যে কোন শুদ্ধ বৈষ্ণব বা সন্ন্যাসীর সঙ্গে পুত্ররত্নটী মিশিতেছেন, তাহা হইলে সেই সন্ন্যাসীকে পারিলে পৃথিবী হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টারও বিন্দুমাত্র ত্রুটী করেন না! বর্ত্তমানে এইরূপ হিরণ্যকশিপু-সদৃশ শত শত পিতা ও কৈকেয়ী সদৃশ শত শত মাতার অসদ্ভাব নাই। আমরা অনেক সময় অনেকেই জনকরাজা, শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভৃতির দোহাই দিয়া গৃহস্থ-বৈষ্ণব হইবার জন্য বিশেষ উৎসুক থাকি। কিন্তু যদি কোন শুদ্ধ-বৈষ্ণব সাধু আমাদের কোন আত্মীয়-স্বজন বা দুই একটী সন্তানকে আমাদের ন্যায় স্বার্থপর দস্যুর হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া শ্রীহরির পাদপদ্মে অর্পণ করিবার চেষ্টা করেন, তখনই আমাদের বৈষ্ণবতা পরীক্ষা হয়। আমরা তখন ঐ বৈষ্ণব-সাধুর শত্রুতা আচরণ করিতে ত্রুটী করি না। কিন্তু আমাদের ন্যায় এইরূপ প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী মিছাভক্ত তথা বহির্ম্মুখ জনক-জননী আভিমানিগণের চক্ষের সম্মুখে আদর্শস্থাপন করিবার জন্য আজ হাড়াই পণ্ডিত ও পদ্মাবতী—যাঁহারা বাৎসল্য রসের একমাত্র অবধি, তাঁহারা নিজ প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে পরমপ্রীতি সহকারে সন্ন্যাসীর হাতে সমপর্ণ করিবার লীলা প্রদর্শন করিলেন।

"সে-ই পিতা মাতা, সে-ই সে দেবতা,
সে-ই গুরু-বন্ধু-জনে।
সে-ই সে শুনায়ে, কৃষ্ণ-কথা কহে,
ভজায়ে কৃষ্ণ-চরণে।।"

* * * *

"সে-ই সে পরমবন্ধু—সে-ই মাতা-পিতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তি-দাতা।।"

—শ্রীচৈতন্যমঙ্গল মধ্যখণ্ড।

মুক্তি ও ভক্তি

অবিদ্যাধ্বস্ত-কর্ত্তৃত্বাদি অভিমান পরিত্যক্ত হইয়া স্বরূপে অবস্থিতির নামই—"মুক্তি"।

"মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।" (ভাঃ ২।১০।৬)

ঈশ্বরে পরানুরক্তিই—"ভক্তি"। সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত হইয়া ভগবানে ঐকান্তিক শরণগ্রহণ ও নির্ম্মল আত্ম-স্বরূপে অবস্থানপূর্ব্বক সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা যে সর্ব্বেন্দ্রিয়াধিপতি ভগবানের সেবা, তাহাই—"ভক্তি"। যে ভক্তিতে ভগবৎ-সেবাকাঙ্ক্ষা ব্যতীত অন্য অভিলাষ নাই, যাহা ভোগ বা মোক্ষপিপাসানির্ম্মুক্ত, যাহাতে কেবল কৃষ্ণপ্রীতিই লক্ষিত হয়, তাহাই—"শুদ্ধা ভক্তি"।

যেমন কোন ব্যক্তির উদরে শূলবেদনা হইয়াছে, ঐ শূলবেদনা হইতে আরোগ্য লাভের অবস্থাকে 'মুক্তি'র সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। আর রোগনির্ম্মুক্ত হইয়া আবার স্বাভাবিকভাবে আহার, বিহার, ভাই, বন্ধু, পিতা, মাতা ও স্ত্রীপুত্রাদির সহিত আলাপ ব্যবহার ও স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ প্রভৃতিকে ভক্তির সহিত উপমা দেওয়া যায়। রোগনির্ম্মুক্ত হওয়াই চরম ফল হইতে পারে না। রোগনির্ম্মুক্ত হইয়া অলস জীবন-যাপন, কিংবা অচেতন কাঠ পাথরাদির ন্যায় অবস্থান কখনও' শ্লাঘ্য ব্যাপার নহে। কোন কোন অর্ব্বাচীন শূলরোগ হইতে চিরতরে মুক্ত হইবার জন্য আত্মহত্যা করিয়া থাকেন। কেবল-মোক্ষকামী ব্যক্তিগণেরও সেইরূপ অবস্থা।

মুক্তি, ভুক্তি বাঞ্ছে যেই কাঁহা দোঁহার গতি।
স্থাবর-দেহ, দেব-দেহ যৈছে অবস্থিতি।।

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮।২৫৭)

'ভক্তি' আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি; আর মুক্তি আত্মার স্তব্ধ বা নিরপেক্ষ ভাব।

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্র নিখিলশাস্ত্রই সমস্বরে বলেন,—'ভক্তি ব্যতীত মুক্তি হয় না'। 'মুক্তি' 'ভক্তির' মুখাপেক্ষিণী। কিন্তু 'ভক্তি' নিরপেক্ষা। 'শ্রুতি' বলেন—

"ত্বমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।।"

অর্থাৎ হে ভগবন্! তোমাকে জানিয়াই জীব 'অমৃতধাম' বা 'মোক্ষ' লাভ করিতে পারে, ইহা ব্যতীত সংসারোত্তরণের দ্বিতীয় পন্থা নাই। এইরূপ 'জ্ঞান' ভগবজ জ্ঞান বা ভক্তির জন্য বলিয়া উহাও ভক্তি-স্বরূপ। কেবল জ্ঞানে কখনও 'মুক্তি' হয় না।

"ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানে মুক্তি নাহি হয়।।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৪।১০৫)

"কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে।।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।২১)

"কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়-প্রধান।
ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্মযোগ জ্ঞান।।" (চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১৭)

এতৎপ্রসঙ্গে "নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতম্" (ভাঃ ১।৫।১২), "শ্রেয়ঃ স্মৃতিং" (ভাঃ ১০।১৪।৪), "যেঽন্যেরবিন্দাক্ষ" (ভাঃ ১০।২।২৬) প্রভৃতি শ্লোক আলোচ্য।

অবিদ্যা বা মায়া হইতেই কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা দোষ উপস্থিত হয়। কৃষ্ণোন্মুখ 'ভক্তি' হইতে সেই মায়ামুক্ত হওয়া যায়। এতৎ প্রসঙ্গে "মামেব যে প্রপদ্যন্তে" (গীঃ ৭।১৪) ও "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ" (ভাঃ ১১।২।৩৫) শ্লোক আলোচ্য। মুক্তব্যক্তির কৃত্য 'ভক্তি'যাজন। ভক্তিযাজনের পরিবর্ত্তে যদি মুক্তির জন্যই কেবল 'মুক্তি' হয়, তবে উহা আত্মহত্যা বা ভগবদ্বিমুখের দণ্ড স্বরূপ। শ্রীগীতোপনিষদৎ "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" (গীঃ ১৮।৫৪)—এই শ্লোকে মুক্তি' বা স্বরূপাবস্থানের পর 'পরা ভক্তি' যাজনের কথাই কীর্ত্তন করিয়াছেন।

"ভট্টাচার্য্য কহে, ভক্তিসম নহে মুক্তিফল।
ভগবদ্বিমুখের হয় দণ্ড কেবল।।
কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে।
যেই নিন্দা যুদ্ধাদিক করে তাঁর সনে।।
সেই দুইর দণ্ড হয় ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তি।
তার মুক্তি ফল নহে, যেই করে ভক্তি।।
যদ্যপি মুক্তি হয়ে এই পঞ্চ প্রকার।
সালোক্য, সমীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি, সাযুজ্য আর।।
সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবাদ্বার।
তবু কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার।।
সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়।।
ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুইত প্রকার।
ব্রহ্ম-সাযুজ্য হইতে ঈশ্বর-সাযুজ্য ধিক্কার।।
(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।২৬৩-২৬৯)

কেবল মুক্তিকামীর 'মুক্তি'র আশা আকাশকুসুমের ন্যায় নিরর্থক। কিন্তু ভক্তিলাভেচ্ছুর 'মুক্তি' করতলগতা। যথা শ্রীবৃহন্নারদীয়—

"ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষাখ্যাঃ পুরুষার্থা দ্বিজোত্তমাঃ।
হরিভক্তিপরাণাম্বৈ সম্পদ্যন্তে ন সংশয়ঃ।।

ধর্ম্মার্থকামৈঃ কিন্তস্য-মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা।
সমস্তজগতাং মূলে যস্য ভক্তিঃ স্থিরা ত্বয়ি।।"

'মুক্তি' 'ভক্তি'র কিঙ্করী। 'মুক্তি' ভক্তের সেবা করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রতীক্ষায় ও তাঁহার কৃপাদৃষ্টির জন্য লালায়িতা।

"ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাদ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্য-কিশোর-মূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্ ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময় প্রতীক্ষাঃ।।"

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ১০৭ শ্লোক)

অর্থাৎ হে ভগবন্! তোমাতে যদি আমাদের ভক্তি স্থিরতরা থাকে তাহা হইলে তোমার অপ্রাকৃত কিশোর মূর্ত্তি স্বভাবতঃই নির্ম্মল আত্মায় প্রকাশিত হন। ধর্ম্ম ও মুক্তির প্রয়াসে কিছুই প্রয়োজন নাই। 'ভক্তি' থাকিলে মুক্তি' স্বভাবতঃই মুকুলিতাঞ্জলি হইয়া স্বয়ং আমাদিগকে অবান্তর ফল যে অবিদ্যামোচন, তদ্রূপে সেবা করিতে থাকে। ধর্ম্মার্থকাম সকল যেমন যেমন প্রয়োজন সেইরূপ সময় প্রতীক্ষা করিতে থাকে। তত্তজ্জন্য চেষ্টার প্রয়োজন থাকে না। শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৯।১১) কপিলদেব বলেন,—

সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।।

ভগবদ্ভক্তগণকে সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য বা সাযুজ্যরূপ মুক্তি প্রদান করিলেও তাঁহারা আমার (ভগবানের) সেবা ব্যতীত কিছুই গ্রহণ করেন না।

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৪।৮) আরও বলেন,—

"হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্।।"

অর্থাৎ যিনি কায়মনোবাক্যে শরণাগত হইয়া জীবনধারণ করেন, তিনি মুক্তিপদে দায়ভাক্ অর্থাৎ তাহার সম্বন্ধে অনায়াসে মুক্তিপদ লাভ হয়। অতএব প্রমাণিত হইল কেবলজ্ঞান কখনও মুক্তির কারণ নহে। ভক্তির আনুষঙ্গিক ও অবান্তর ফলই 'মুক্তি'। মুক্ত ব্যক্তিই ভক্ত।

তবে যে শাস্ত্রের কোন কোন স্থানে মোক্ষসুখের কথা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ কি? যদি এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ হয়, তদুত্তরে সাত্বত-শাস্ত্র বলেন,—শাস্ত্রে কোন কোন স্থানে যে, মুক্তিসুখের প্রশংসা করিয়াছেন 'ভক্তি' ঈদৃশ মোক্ষসুখ হইতেও কোটী কোটী গুণ অধিক সুখময়ী, তাহাই বুঝাইবার জন্য। কারণ মোক্ষসুখবর্ণন ভিন্ন সাধারণ লোকের নিকট ভক্তিসুখ নিশ্চয় করিবার অন্য নিদর্শন নাই। সাধারণ লোক ত্রিতাপে তপ্ত। তাহারা ত্রিতাপ হইতে উদ্ধার লাভকেই তাহাদের অধিকারোচিত জ্ঞানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া থাকে। তাই, তাহাদের নিকট প্রথমে মোক্ষসুখের উৎকৃষ্ট সুখময়ত্ব বর্ণনা করিয়া পরমোৎকৃষ্ট ভক্তিসুখের কথা বলা হইয়াছে। সেই স্থানে মোক্ষসুখের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন উদ্দেশ্য নহে, পরন্তু তুলনাদ্বারা

ভক্তিসুখেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন উদ্দেশ্য। যেমন অত্যন্ত প্রাকৃত লোকের নিকট কর্ম্মশাস্ত্র স্বর্গের শ্রেষ্ঠতা বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু আবার নিবৃত্তিমূলক শাস্ত্রে স্বর্গের অনিত্যতা, পতনভয়, স্পর্দ্ধা, ক্ষয়িষ্ণু ইত্যাদি ধর্ম্মের কথ উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ঐরূপ উক্ত হইলেও যেরূপ প্রাকৃত লোক স্বর্গের জন্যই লালায়িত হয় ও তৎপ্রাপ্তিকেই পরম পুরুষার্থ মনে করে, তদ্রূপ মুমুক্ষুগণও মোক্ষকেই চরম পুরুষার্থ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। বস্তুতঃ 'মুক্তি কখনও চরম ফল হইতে পারে না। রোগরূপ দুঃখের অভাব যেরূপ সুখ, তমোময়ী সুষুপ্তি দশাতে যে সুখ, তদ্রূপ সুখই মোক্ষসুখ। যদি বল,—"আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম"—সুষুপ্তির পর জাগরিত হইলে কি জন্যই বা এইরূপ স্মৃতির উদয় হইয়া থাকে? তদুত্তর এই যে, উহা সুষুপ্তিকালীন সুখবোধের স্মরণ নহে, পরন্তু সুষুপ্তিকালে কোনরূপ স্বপ্ন, মনোরথ ও নিদ্রা-বৈকল্যাদি-রূপ দুঃখ ভোগ করিতে হয় নাই। ইহাই উক্ত ভাণদ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। সংসারদুঃখাভাবই 'মোক্ষ' বলিয়া কল্পিত। বস্তুতঃ ঐ মোক্ষে কোন সুখ নাই। অনভিজ্ঞগণেরই তাহাতে রুচি। কারণ মোক্ষ অজ্ঞান-সঙ্গ। সুতরাং বস্তুতঃ সত্যতাই নাই। অজ্ঞানময় বন্ধনের যখন কোন সত্যতাই নাই তখন মোচনেরও সত্যতাভাব। যথা—

অজ্ঞানসংজ্ঞো ভববন্ধমোক্ষৌ দ্বৌ নাম নান্যৌ স্ত ঋতজ্ঞভাবাৎ। (ভাঃ ১০।১৭।২৬)

অর্থাৎ লোকে অজ্ঞানতা প্রযুক্তই "সংসারবন্ধন", "সংসার-মোচন", এই শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা প্রকৃত জ্ঞানগর্ভ হইতে পারে না। নিত্যমুক্ত জীবাত্মার "বন্ধন" বা "মুক্তি" রূপে কোন কথা হইতে পারে না। জীবাত্মার নিত্যা বৃত্তি অর্থাৎ ভগবদ্দাস্য স্বভাবকে জাগ্রত করাই আমাদের প্রয়োজন।

একবার মাত্র পরিহাস বা অবহেলায় অর্থাৎ অপরাধ নির্ম্মুক্ত হইয়া সম্বন্ধ-জ্ঞানবিহীন ভগবন্নাম (নামাভাস) উচ্চারণ করিলে অনায়াসেই 'মোক্ষ' লাভ হইতে পারে। 'মোক্ষ' যে চরমফল নহে, তৎপ্রমাণেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, অজামিল ঐরূপ নামাভাসে 'মোক্ষ' লাভ করিয়াও পরে ভগবদ্ভজন করিয়াছিলেন এবং তৎফলে নারায়ণের সেবা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 'সেবা' বা 'ভক্তি' জীবের নিত্য ধর্ম্ম। 'মুক্তি' নিত্য ধর্ম্ম নহে।

নৈয়ায়িকগণের মতে একবিংশতি প্রকারদুঃখ ধ্বংসরূপ-মোক্ষ, বেদান্তৈক-দেশবাদ-মতে অবিদ্যা ও কর্ম্মক্ষয়-রূপ মোক্ষ বিবর্ত্তবাদীর মতে স্বীয় ব্রহ্মাত্মরূপানুভব মোক্ষ স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু সচ্চিদানন্দঘন শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দ সাক্ষাৎ অনুভবরূপ ভক্তিসুখের তুলনায় 'মোক্ষ সুখ' নাই বলিলেই হয়। শ্রীগীতার (১৪।২৭)—

"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ"।

অর্থাৎ আমিই অমৃত অব্যয় স্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা।—এই প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, ভগবচ্চরণারবিন্দ-প্রভাব বিস্তারকারী অগ্নিস্থানীয় এবং অমৃত ও অব্যয় ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়-স্বরূপ ভগবৎ-পাদপদ্ম-সেবায় আনন্দ লাভ হয়, প্রভাস্থানীয় ব্রহ্মের অনুভবে কদাচ সেই সুখ লব্ধ হইতে পারে না। কারণ ধর্ম্মীয় অনুভবে যাহা লাভ হয়, একদেশ ধর্ম্মের অনুভবে তাহা কিছুতেই পাওয়া যাইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম শর্করা পিণ্ডের ন্যায় সুখরূপ ও সুখাধার; 'ব্রহ্ম' কেবল সেই সুখমাত্র কিন্তু সুখাধার নন।

ভক্তিসুখ পরম মহৎ হইয়াও প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন হইতেও নূতন, মধুর হইতেও সুমধুর, অধিক হইতেও পরমাধিকরূপে অনুভূত হয়। কিন্তু ব্রহ্মসুখের তাদৃশ অনুভব হয় না। কারণ উহা সীমাবিশিষ্ট। যেমন স্বর্গকামিগণ স্বর্গের অসীম স্তব করেন, তদ্রূপ সংসার যাতনায় উদ্বিগ্নচিত্ত রসহীন-মুক্তি-পিপাসুগণ বহু প্রকারে ‘মোক্ষের স্তব করিয়া থাকেন। গো, ব্রাহ্মণ, যজ্ঞঘাতী দৈত্য সকলও যে ‘সাযুজ্য মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন, মোক্ষপর ব্যক্তিগণও যাহাদের নিন্দা করিয়া থাকেন, এতাদৃশ দুষ্টগণ-প্রাপ্ত বস্তু কি প্রকারেই বা শ্লাঘ্য বলা যায়। ‘মুক্তি’ হইতে ‘ভক্তি’র সর্ব্ব বিষয়ে উৎকর্ষ বিষয়ে বহু বহু পুরাবৃত্তও শ্রুত হয়। দ্বারকায় কোন এক ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার একে একে আটটী পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই উহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ব্রাহ্মণ ঐ সকল মৃত-পুত্রকে রাজদ্বারে নিক্ষেপ করিয়া রাজার নিন্দা করিতে থাকেন। কৃষ্ণসখা অর্জ্জুন, সখা শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা-শ্রবণে দুঃখিত হইয়া এবং ঐ ব্রাহ্মণকে ‘ভগবদ্ভক্ত’ জানিয়া ব্রাহ্মণের নবম পুত্রকে নিশ্চয়ই তিনি মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিবেন, নতুবা অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞামূলা আশ্বাসবাণী প্রদান করেন। ব্রাহ্মণের নবম পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই ক্রন্দন করিতে করিতে অদৃশ্য হইল। অর্জ্জুন অনেক অনুসন্ধানেও ঐ বালককে কোথাও না পাইয়া অবশেষে স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষার নিমিত্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হন। এদিকে ঐ ব্রাহ্মণও অর্জ্জুনের বহু নিন্দাবাদ করিতে থাকেন। ব্রাহ্মণের এইরূপ ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্ত অর্জ্জুনের নিন্দাবাদ করিবার একটী গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার পুত্র মুক্তিপদ লাভ করিয়া ভূমাপুরুষের জ্যোতির্ম্মধ্যে লীন হইয়াছিলেন। ভগবদ্ভক্তব্রাহ্মণ পুত্রকে মুক্তিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই ঐরূপ ভগবান্ ও অর্জ্জুনের নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন। এদিকে আবার ভগবান্ অর্জ্জুনের নিন্দা শ্রবণ করিতে না পারিয়া ও অর্জ্জুনকে অগ্নি প্রবেশ হইতে রক্ষা করিবার জন্য অর্জ্জুনকে লইয়া ভূমাপুরুষের নিকট উপস্থিত হন। ভূমাপুরুষ-নারায়ণের জ্যোতির্ম্মধ্যেই সাযুজ্যের অধিকারী লয় প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে দেখিবার জন্য ভূমাপুরুষ উক্ত ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণের পুত্রকে তথায় আনয়ন করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীকান্তের অভিলাষ পূর্ণ হইলে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন করিলে তিনি উক্ত ব্রাহ্মণের পুত্রকে প্রত্যর্পণ করিলেন। ভগবান্ ব্রাহ্মণের পুত্রগণকে ভক্তিপদরূপ দ্বারকাপুরীতে প্রত্যানয়ন করিয়াছিলেন। ইহাতে ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণের মনস্তুষ্টি হইয়াছিল। এই ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, ‘মুক্তি পদবী হইতে ‘ভক্তি’-পদবী কত শ্লাঘ্য ও শিষ্টজনের বরণীয়। ঐ ভূমাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে তৎপুরী পরিত্যাগ কালে বলিয়াছিলেন, আপনি হতারিগতিদায়ক, আপনার হস্তে নিহত দৈত্যগণকে আমার নিকট প্রেরণ করেন।

শ্রীভগবান্ মহারাজ পৃথুকে পরমোৎকৃষ্ট বর যাচ্ঞা করিতে বলিলে পৃথু মহারাজ ভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন, —“পিতা যেমন পুত্রকে অবঞ্চক হইয়া শ্রেষ্ঠ বস্তু প্রদান করেন, তদ্রূপ আপনিও আমাকে সেইরূপ বর প্রদান করুন।” ভগবান্ তাহাতে—“ময়ি ভক্তিরস্তু” অর্থাৎ আমাতে ভক্তি হউক্ এইরূপ বর প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, “ভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু। ভগবান্ মুক্তি দিলেও সহজে অত্যন্ত প্রিয় ব্যতীত অপরকে ভক্তি দান করেন না।

পাকার্থ প্রজ্বলিত অগ্নির অন্ধকার নাশ ও শীত-নাশ যেরূপ অবান্তর ফল মাত্র, সেইরূপ মোক্ষ, আত্মারামত্ব, যোগসিদ্ধি, জ্ঞানাদি ভক্তি অবান্তর ফল মাত্র। ঐ সকল প্রেমের বিরোধী জানিয়া ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করেন না।

নারায়ণপর ভগবদ্ভক্তগণ কোন বস্তু হইতেই ভীত নহেন, তাঁহারা স্বর্গ, মোক্ষ ও নরকে তুল্যার্থদর্শী (ভাঃ ৬।১৭।২৮); ভগবানের চরিতামৃত মহাসিন্ধুমধ্যে পরিভ্রমণকারী বিগতশ্রম ভক্তদিগের মধ্যে কেহ কেহ আপনার পাদসরোজে রমমাণ হংসসমূহের ন্যায় ভগবৎ সংসর্গে পরিত্যক্তাশ্রম হইয়া মুক্তি পর্য্যন্তও অভিলাষ করেন না (ভাঃ ১০।৮৭।১৭) ইত্যাদি সহস্র সহস্র ভাগবতীয় বাক্য এবং প্রাচীন শ্রীনারদ, প্রহ্লাদ ও হনুমদাদির বাক্য সকল যথা—

"যথা ভববন্ধচ্ছিদং তস্মৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে" এবং সর্ব্বজ্ঞ বিষ্ণুস্বামীর 'মুক্তগণও স্বেচ্ছায় তনু পরিগ্রহ করিয়া ভগবদ্ বিগ্রহকে ভজনা করেন এবং "মুক্তোপসৃজা ব্যপদেশাচ্চ" (ব্রঃ সূঃ ১।৩।২) ইত্যাদি সূত্র ও ভাষ্যবচন এবং শুকসনকাদি আত্মারাম মুক্তকুলেরও ভগবল্লীলাকামনাদিরূপ আচরণ, প্রহ্লাদ-হনুমদাদির শ্রীভগবৎ কর্ত্তৃক দীয়মান মুক্তির প্রত্যাখ্যানরূপ দৃষ্টান্ত 'মুক্তি'র হেয়ত্ব ও 'শুদ্ধা ভক্তি'র শ্রেষ্ঠত্ব ও একমাত্র আশ্রয়ত্বই প্রমাণ করিতেছে।

সীতাবির্ভাব

গত ২৬শে ভাদ্র রবিবার দিবস শ্রীমঠে মহাসমারোহে অদ্বৈতাচার্য্য-গৃহিণী অচ্যুতজননী শ্রীশ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব মহামহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছেন।

"অদ্বৈত-আচার্য্য-ভার্য্যা জগৎ-পূজিতা-আর্য্যা
নাম তাঁর সীতাঠাকুরাণী।"
(চৈঃ চঃ আঃ ১৩।১১০)

শ্রীকবিকর্ণপুর গৌরগণোদ্দেশে অচ্যুত জননীর সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

যোগমায়া ভগবতী গৃহিণী তস্য সাম্প্রতম্।
সীতারূপেণাবতীর্ণা শ্রীনাম্না তৎপ্রকাশতঃ।।
তস্য পুত্রোঽচ্যুতানন্দঃ কৃষ্ণচৈতন্যবল্লভঃ।
শ্রীমৎ পণ্ডিত গোস্বামিশিষ্যঃ প্রিয় ইতি শ্রুতম্।।
(গৌঃ গঃ ৮৬-৮৬ সংখ্যা)
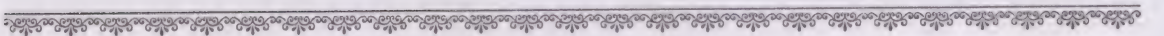
অর্থাৎ যোগমায়া ভগবতী অদ্বৈতগৃহিণী সীতারূপে অবতীর্ণা হইয়াছেন। শ্রীদেবী তাঁহারই প্রকাশ-বিগ্রহ। সীতাদেবীর পুত্র অচ্যুতানন্দ। ইনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পরমপ্রিয় এবং শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর প্রিয়তম শিষ্য বলিয়া বিখ্যাত।

'অচ্যুত' শব্দে 'অধোক্ষজ পুরুষ' শ্রীকৃষ্ণকে বুঝায়। অচ্যুতকে যিনি আনন্দ প্রদান করেন, তিনি অচ্যুতানন্দ অর্থাৎ 'অধোক্ষজ-সেবানন্দ-বিগ্রহই' শ্রীঅচ্যুতানন্দপ্রভু। অচ্যুতানন্দকে অপর ভাষায় 'শুদ্ধাভক্তি' বলা যাইতে পারে।

অচ্যুতানন্দ বা ভক্তিজননী যোগমায়া-স্বরূপিণী শ্রীসীতাদেবী। সীতাদেবীর কৃপায় আমরা অচ্যুতানন্দ অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে পারি। সীতাদেবী মহাবিষ্ণুর আশ্রিতা। তিনি স্বরূপশক্তির অংশ। তিনি প্রত্যগ্‌গতিবিধায়িনী অর্থাৎ জীবকে সেবোন্মুখ করিয়া কৃষ্ণসেবানন্দ প্রদায়িনী। তাঁহা হইতেই অধোক্ষজ সেবানন্দ প্রাকট্যলাভ করিয়াছে। সেই অধোক্ষজ-সেবানন্দ আবার গৌরগদাধরের চরণে সংলগ্ন। যে গৌরগদাধরের পাদপদ্ম জীবের সাধ্যসার, সেই পাদপদ্মের সন্ধান আমরা অচ্যুতানন্দজননী শ্রীসীতাদেবীর কৃপা হইতেই প্রাপ্ত হই।

শ্রুতি বলেন,—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" অদ্বয় শক্তিমত্তত্ত্ব শ্রীভগবানের পরাশক্তি নাম্নী একটী শক্তি আছে, তাহাই বিবিধরূপে শ্রুত হইয়া থাকে অর্থাৎ 'স্বরূপশক্তি' একটী হইলেও তাহার প্রভাব অনন্ত। একই স্বরপশক্তির দ্বিবিধা বৃত্তি।—(১) যোগমায়া ও (২) মহামায়া। যোগময়া কৃষ্ণকে আনন্দ প্রদান করেন, জীবকে প্রত্যক্‌পথ—শ্রেয়ঃপথ—অমৃতের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেন; আর মহামায়া জীবকে (ভগবৎ) পরাঙ্মুখ করেন—প্রেয়ের পথে চালিত করেন—মৃত্যুর মুখে লইয়া যান। বিমুখমোহিনী মহামায়ার মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া জীব 'প্রেয়'কেই 'শ্রেয়' বলিয়া বরণ করে, মৃত্যুকেই 'অমৃত' বলিয়া গ্রহণ করে, অন্ধকারকেই আলোক বলিয়া জ্ঞান করে। মহামায়ার মোহে মুগ্ধ হইয়া আমরা আমাদের স্বরূপ ভুলিয়া যাই। তখন কৃষ্ণসম্বন্ধ-জ্ঞানহীন হইয়া ভুক্তি বা মুক্তিপিশাচীকেই আমরা আমাদের পরমপ্রয়োজন বলিয়া মনে করিয়া থাকি। মহামায়া আমাদের ন্যায় বিমুখ জনকে এইরূপভাবে মোহন করিলেও তিনি আমাদিগকে ব্যতিরেকভাবে কৃপাই করিয়া থাকেন। আমাদিগকে সংসার-দাবানলে সন্তপ্ত করিয়া—ত্রিতাপে ক্লিষ্ট করিয়া, —'কেন মোরে জারে তাপত্রয়', 'কৈছে হিত হয়'—এইরূপ প্রশ্ন করিবার—একটু ভাবিবার সুযোগ প্রদান করেন। তখন আমরা উন্মুখ হই, উন্মুখ হইলেই শ্রীযোগমায়া আমাদের নিকট অচ্যুতানন্দ অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিকে আনিয়া দেন। ভগবদ্ভক্তি আবার পরমসাধ্যসার গৌরগদাধরের সন্ধান বলিয়া দেন। অচ্যুতানন্দের কৃপায় আমরা জানিতে পারি—চৌদ্দভুবনের গুরু শ্রীগৌরসুন্দর। শ্রীগৌরসুন্দর কেবলমাত্র ঈশ্বর নহেন, তিনি ঈশ্বরেরও ঈশ্বর। সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্ব যাঁ'র পাদপদ্মে অবস্থিত, সেই বিষ্ণুতত্ত্বের মূলপুরুষ শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুরও প্রভু। অচ্যুতানন্দের কৃপায়ই আমরা জানিতে পারি—

"ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।।"

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিক আর কেহ নাই, তিনি একমাত্র পরতত্ত্ব। শ্রীগৌরগদাধরের পাদপদ্ম হইতে আমাদের সাধ্যবস্তুর অবধি লাভ হয়।

অতএব অচ্যুত-জননী শ্রীসীতাদেবীর পাদপদ্মার্চ্চন শ্রেয়ঃকামী জীবমাত্রেরই কর্ত্তব্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে সীতাঠাকুরাণীর গৌরপ্রীতির কথা আমরা দেখিতে পাই। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বিবিধ উপাদেয় অন্নব্যঞ্জন পাক করিয়া ভিক্ষা করাইতেন। গৌরসুন্দরের আবির্ভাব-সময়ে সীতাদেবী নানাবিধ উপহার লইয়া শান্তিপুর হইতে শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার অতি উজ্জ্বলভাবে বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন—

অদ্বৈত-আচার্য্য-ভার্য্যা জগৎপূজিতা আর্য্যা,
নাম তাঁর 'সীতাঠাকুরাণী'।।
আচার্য্যের আজ্ঞা পাঞা, গেল উপহার লঞা,
দেখিতে বালক-শিরোমণি।।
সুবর্ণের করি-বউলি, রজত মুদ্রা-পাশুলি,
সুবর্ণের অঙ্গদ, কঙ্কন।
দু'বাহুতে দিব্য শঙ্খ, রজতের মল বঙ্ক,
স্বর্ণমুদ্রার নানা হারগণ।।
ব্যাঘ্রনখ হেমজড়ি, কটি-পট্ট সূত্রডোরী,
হস্ত-পদের যত আভরণ।
চিত্রবর্ণ পট্টসাড়ী, বুনি ফোতা পট্টপাড়ী,
স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা বহুধন।।
দুর্ব্বা, ধান্য, গোরোচন, হরিদ্রা, কুঙ্কুম, চন্দন,
মঙ্গল-দ্রব্য পাত্র ধরিয়া।
বস্ত্র-গুপ্ত দোলা চড়ি', সঙ্গে লঞা দাসী-চেড়ী,
বস্ত্রালঙ্কার পেটারি ভরিয়া।।
ভক্ষ্য, ভোজ্য, উপহার, সঙ্গে লইল বহুভার,
শচীগৃহে হৈল উপনীত।
দেখিয়া বালক-ঠাম, সাক্ষাৎ গোকুল-কান,
বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত।।

সর্ব্ব অঙ্গ—সুনির্ম্মাণ, সুবর্ণ-প্রতিমা-ভান,
সর্ব্ব অঙ্গ সুলক্ষণময়।
বালকের দিব্যজ্যোতি, দেখি পাইল বহুপ্রীতি,
বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয়।।
দূর্ব্বা, ধান্য দিল শীর্ষে, কৈল বহু আশীষে,
চিরজীবী হও দুই ভাই।
ডাকিনী শাঁখিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে,
ডরে নাম থুইল 'নিমাই'।।
পুত্রমাতা-স্নানদিনে, দিলবস্ত্র বিভূষণে,
পুত্র সহ মিশ্রেরে সম্মানি'।
শচীমিশ্রের পূজা লঞা, মনেতে হরিষ হঞা,
ঘরে আইলা সীতাঠাকুরাণী।।

(চৈঃ চঃ আঃ ১৩।১১০-১১৭)

যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া নীলাচলে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন আচার্য্যগৃহিণী শ্রীসীতাদেবী মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য অদ্বৈত-আচার্য্যের সঙ্গে নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতাদি গ্রন্থেও অচ্যুতজননী সীতাদেবীর গৌরপ্রীতির উদাহরণ দৃষ্ট হয়। আমরা শ্রীঅচ্যুতানন্দ-জননী শ্রীসীতা-ঠাকুরাণীর পাদপদ্মে অনন্তকোটী প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট হইতে অচ্যুতানন্দ অর্থাৎ শুদ্ধভাগবৎ-প্রীতি যাচ্ঞা করিতেছি। তিনি আমাদিগকে কৃপা করুন।

ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও বৈষ্ণবপণ্ডিত

জগতের পণ্ডিতসমাজে দুই প্রকার পণ্ডিত দৃষ্ট হন। এই দুইশ্রেণীর পণ্ডিতের মধ্যে বৈষ্ণবপণ্ডিতের সংখ্যা খুবই কম। সর্ব্ববর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণের আসন সর্ব্বোপরি এবং মূর্খ হইতে পণ্ডিতের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত।

'পণ্ডিত' শব্দের সংজ্ঞা আমরা শাস্ত্রে এইরূপ দেখিতে পাই—

(১) যঃ ক্রিয়াবান্ স পণ্ডিতঃ" (মহাভাঃ বনপর্ব্ব)

যিনি আচারবান্ অর্থাৎ কেবল মুখে শাস্ত্রের কথা আবৃত্তি না করিয়া নিজের জীবন শাস্ত্রানুসারে যাপন করেন, তিনিই পণ্ডিত।
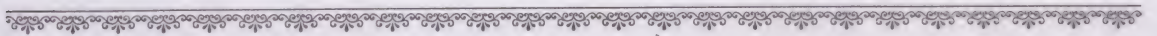
(২) "পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ" (গীতা ৫।১৮)

যাঁহারা আত্মদর্শী অর্থাৎ যাঁহাদের স্বরূপদর্শন হইয়াছে, সেই সকল সমদর্শিব্যক্তিই পণ্ডিত।

(৩) "পণ্ডিতো বন্ধমোক্ষবিৎ" (উদ্ধবগীতা ২০।৪১)

অর্থাৎ যিনি বন্ধ ও মোক্ষের বিষয় অবগত আছেন, তিনিই পণ্ডিত।

(৪) ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্।। (ভাঃ ৭।৫।২৪)

অর্থাৎ যিনি শ্রীবিষ্ণুতে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া ব্যবধান-রহিতভাবে শ্রীবিষ্ণুতে শ্রবণকীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি যাজন করেন, তিনিই উত্তম অধ্যয়ন করিয়াছেন অর্থাৎ তিনিই প্রকৃতপণ্ডিত।

(৫) "পণ্ডা বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধির্যস্য স এব পণ্ডিতঃ"

আভিধানিকগণ বলেন, 'পণ্ডা' শব্দের অর্থ 'বেদে উজ্জ্বলা বুদ্ধি'; যিনি বেদের সারগ্রাহী—সর্ব্ববেদ তাৎপর্য্য যে শ্রীভগবদ্ভজন, তাহা যিনি অবগত আছেন এবং তাহার দ্বারা যাঁহার বুদ্ধি উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছে, তিনি পণ্ডিত।

'ব্রাহ্মণপণ্ডিত' ও 'বৈষ্ণবপণ্ডিত'—এই উভয়পদের মধ্যেই 'পণ্ডিত' শব্দটী সাধারণ। শাস্ত্র হইতে 'পণ্ডিত' শব্দের যে সংজ্ঞা পাওয়া যায়, তাহা হইতে উপলব্ধি হয় যে, ব্রাহ্মণপণ্ডিতই হউন, আর বৈষ্ণবপণ্ডিতই হউন, উভয়েই 'ক্রিয়াবান্' 'সমদর্শী', 'বন্ধমোক্ষবিৎ' ও 'বিষ্ণুতে অনন্য ভক্তিমান্' হইবেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, 'বর্ণাশ্রমিগণ আত্মপ্রভব পরমেশ্বর বিষ্ণুর ভজন পরিত্যাগ করিলে স্ব-স্ব স্থান হইতে বিচ্যুত হন' (ভাঃ ১১।৫।৩)। অতএব ব্রাহ্মণ যদি বিষ্ণুভজন পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার পাণ্ডিত্য বা ব্রাহ্মণত্ব রক্ষিত হইতে পারে না।

কিন্তু অনেকস্থলে বিষ্ণুভজন হইতে বিচ্যুত থাকিয়া অথবা বিষ্ণুভজনের নামে আত্মেন্দ্রিয়যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়াও অনুকরণসূত্রে 'ব্রাহ্মণত্ব', 'বৈষ্ণবত্ব' ও 'পাণ্ডিত্য' রক্ষিত হইবার অভিনয় প্রদর্শিত হয়।

ব্রাহ্মণতা বৈষ্ণবতার সোপানবিশেষ। ব্রহ্মজ্ঞের নাম ব্রাহ্মণ আর ব্রহ্মজ্ঞ-ভগবদুপাসকের নামই 'বৈষ্ণব'।

শ্রুতিতে 'পরা' ও 'অপরা' নাম্নী দ্বিবিধা বিদ্যার কথা কথিত হইয়াছে। ত্রিগুণবিষয়ক আলোচনা অথবা ত্রিগুণের ব্যতিরেক নির্ব্বিশেষ আলোচনা যে বিদ্যাদ্বারা সাধিত হয়, তাহা 'অপরা বিদ্যা'। আর অধোক্ষজ নির্গুণপুরুষোত্তমের কথা যে বিদ্যাদ্বারা অধিগত হওয়া যায়, তাহাই 'পরাবিদ্যা'। ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও বৈষ্ণব-পণ্ডিত উভয়েই পরাবিদ্যার অনুশীলন করেন। তবে পার্থক্য এই যে, ব্রাহ্মণপণ্ডিত পরাবিদ্যার অনুশীলনকারী, আর বৈষ্ণব পণ্ডিত পরাবিদ্যায় পারঙ্গত, অতএব শ্রৌত সরস্বতীর উপদেষ্টা। বৈষ্ণবপণ্ডিতকে অপরভাষায় 'মূর্ত্তভাগবত' বা 'ভক্তভাগবত' বলা যায় অর্থাৎ তাঁহার জ্বলন্ত জীবনখানিই একখানি 'ভাগবত'—ভাগবত কি উদ্দেশ করেন, তাঁহার আচরণের প্রতিস্বর্ণাক্ষর তাহাই বলিয়া দেয়। ব্রাহ্মণপণ্ডিত যখন এইরূপ বৈষ্ণব-পণ্ডিত বা মূর্ত্তভাগবতের সমীপে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত অভিগমন করেন, তখন তাঁহার

ব্রাহ্মণত্ব ও পাণ্ডিত্য সার্থকতালাভ করে। নতুবা অনেক সময়ে বিবর্ত্ত আসিয়া নশ্বর দেহ বা কুণপকেই 'ব্রাহ্মণ' এবং কর্ম্মমার্গে বিচরণ-বিষয়ে নিপুণতা ও বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিদ্বেষকেই পাণ্ডিত্য বলিয়া ধারণা করায়।

বিবর্ত্তবুদ্ধিক্রমে সঙ্কীর্ণ-সাম্প্রদায়িকতা পোষণ করিলে ব্রাহ্মণপণ্ডিত নিজকে মূর্ত্তভাগবত বা বৈষ্ণবপণ্ডিত হইতে পৃথক্ জ্ঞান করেন এবং মূর্ত্তভাগবতের শ্রৌতসিদ্ধান্তকে 'বৈষ্ণব-পর 'মতবাদ'-বিশেষ মনে করিয়া নিজকে তাহা হইতে পৃথক্ করিবার চেষ্টা দেখাইয়া কখনও কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত, কখনও বা নির্ব্বেদজ্ঞানী হওয়াকেই ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সাধ্য বলিয়া স্থির করেন। এরূপ বিচার ভগবদ্বিমুখতাজাত। ভগবদুন্মুখ হইলে ব্রাহ্মণপণ্ডিত দেখিতে পান—উপলব্ধি করেন যে, জগতের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ—যাহা কিছু সমস্তই 'বিষ্ণু'। সুতরাং জগতের ভোক্তা সাজিয়া কর্ম্মী কিংবা জগৎকে অর্থাৎ বিষ্ণুশক্তি-পরিণতবস্তুকে মিথ্যা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা দেখাইয়া ভগবৎসেবোপকরণ জগতের প্রতি বিরক্তি বা ক্রোধপ্রকাশ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। ভগবৎ সেবোপকরণস্বরূপ জগতের প্রত্যেক বস্তু এবং এই অপরা প্রকৃতি জগৎকে অর্থাৎ মন বুদ্ধি ও অহঙ্কার সহিত পরিদৃশ্যমান্ সমস্ত বস্তুকে যাহা ধারণ করিয়াছে, সেই শুদ্ধজীবাত্মাদ্বারা পরমাত্মার সেবা করাই পাণ্ডিত্য। বৈষ্ণবপণ্ডিতের চরিত্রের অনুসরণ করিলেই এইরূপ পাণ্ডিত্যে পারদর্শী হওয়া যায়।

বৈষ্ণবপণ্ডিত বলিয়াছেন—"ওহে ব্রাহ্মণ, তোমার শোকের কোন বস্তু নাই অর্থাৎ তুমি 'শূদ্র' নহ, তুমি 'ব্রাহ্মণ'; কারণ জীবের স্বরূপে 'ব্রহ্মজ্ঞধর্ম্মই নিত্য। তুমি ব্রহ্মভূত—ব্রহ্মস্বরূপ অর্থাৎ তুমি সাক্ষাৎ ব্রহ্মও নহ আবার ব্রহ্ম হইতে ভিন্নবস্তুও নহ। তুমি বৃহদ্বস্তুর অন্তর্গত বস্তু। বৃহদ্বস্তু হইতে বিচ্যুতাভিমানেই তোমার দুই প্রকার বিবর্ত্তবুদ্ধি উপস্থিত হয়। তুমি কখনও নিজকে 'ছোট' মনে করিয়া ব্রহ্মত্ব, ইন্দ্রত্ব প্রভৃতির কামনা কর অর্থাৎ ছোট হইতে বড় হইতে চাও, কখনও বা নিজকে সর্ব্বাপেক্ষা বড় ব্যাপক অর্থাৎ 'ব্রহ্ম' ভাবিয়া মুক্তাভিমানে ব্রহ্মের অন্তর্গত অভিমান ছাড়িয়া নিজের অধঃপতন ঘটাও। হে ব্রাহ্মণ, তুমি এই দুই প্রকার বিবর্ত্তবুদ্ধি লইয়া কখনও শান্ত হইতে পারিবে না। কিন্তু তুমি প্রশান্তাত্মা। তোমার শোকের বিষয়ও কিছু নাই, বড় হইবার আকাঙ্ক্ষার বিষয়ও কিছু নাই। তুমি সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হও অর্থাৎ ভূতের স্থূললিঙ্গদেহ দর্শন পরিত্যাগ করিয়া, জগদ্দর্শন পরিত্যাগ করিয়া, জগৎকে ধারণ করিতেছেন যে আত্মা এবং আত্মার আবার মূলবস্তু যিনি, সেই পরমাত্মাকে দর্শন কর। এ দর্শন নিত্য—এ দর্শন অপ্রতিহত—এ দর্শনের দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনরূপক্রিয়া—তিনটীই নিত্য—ইহারই নাম 'পরাভক্তি'—এই পরমা ভক্তিই আত্মার নিত্যবৃত্তি। এই পরমাভক্তিতে অধিষ্ঠিত হইলে তুমি ব্রাহ্মণতা হইতে বৈষ্ণবতায় উন্নীত হইবে। তখন তুমিও বৈষ্ণব পণ্ডিত' নামে খ্যাত হইতে পারিবে।"

ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব-পণ্ডিতে এইরূপ সম্বন্ধ ও ঐক্যতান রহিয়াছে। অতএব ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও বৈষ্ণবপণ্ডিতে কোনও বিবাদ হইবার কারণ নাই। যেখানে বিবাদ, সেই স্থানে বিবর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, ক্ষুদ্র শোক ও আকাঙ্ক্ষার ধর্ম্ম গ্রাস করিয়াছে, শূদ্রত্ব ও দরিদ্রত্ব রূপ বিরূপের ধর্ম্ম জীবের স্বরূপের অভিমানকে আবৃত করিয়াছে। সারগ্রাহিবৈষ্ণব পণ্ডিতের বিচার-গ্রহণ সরস্বতীপতি শ্রীগৌরনারায়ণ এইরূপ জগদ্ভারবাহিব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়।
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায়।।
শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি' মরে।।
পড়িয়া শুনিয়া লোক গেল ছারে খারে।
কৃষ্ণ মহামহোৎসবে বঞ্চিল তাহারে।। (চৈঃ ভাঃ মধ্য ১ম)

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনও শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বের নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের অবস্থা তাঁহার জ্বলন্ত লেখনীতে এইরূপ ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন,—

সবে মহা অধ্যাপক করি, গর্ব্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে।।
যেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তাঁহারাহ না জানে সব গ্রন্থ অনুভব।।
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যম পাশে ডুবি মরে।।
গীতা ভাগবত যে যে জনেতে পড়ায়
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়।।
এই মত বিষ্ণুমায়া-মোহিত সংসার।
দেখি' ভক্ত সব দুঃখ ভাবেন অপার।। (চৈঃ ভাঃ আদি ২য়)

ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন অপর দিকে শ্রীল অদ্বৈতচার্য্য প্রভুর সম্বন্ধে বলিতে গিয়া—বৈষ্ণব পণ্ডিতের আর একটি চিত্র সঙ্গে সঙ্গে দিয়াছেন—

জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর।
কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে যে হেন শঙ্কর।।
ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্রের প্রচার।
সর্ব্বদা বাখানে কৃষ্ণপদ ভক্তি সার।। (চৈঃ ভাঃ আঃ ২য়)

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের এই একরূপ চিত্র প্রদান করিয়াছেন। সেই সময় হইতে পাঁচ শত বৎসর পরে কলির সন্ধ্যার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান জগতে আরও কৌটিল্য প্রকাশিত হইতেছে—সরল নাস্তিকতা হইতে প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতায় আমাদের পাণ্ডিত্য পর্য্যবসিত হইতেছে। আমরা অনেক সময়ে মনে ভাবি যে শ্রীমন্মহাপ্রভু বা শাস্ত্রকারগণ ভগবদ্ভক্তিরহিত পাণ্ডিত্য—

তাহার অভ্যন্তরে নাস্তিকতা হলাহল থাকুক না কেন, তাহাতে ক্ষতি নাই—যদি বাহ্যে লোক দেখাইবার জন্য সেই পাণ্ডিত্যের মধ্যে আমাদের ভোগের সুবিধার জন্য একটু ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্তি ছলনা মিশ্রিত করিয়া উহা বাজারে সেশ্বর পাণ্ডিত্য বলিয়া চালাইতে পারি, তাহা হইলে ত' আমাদিগকে কেহ নাস্তিক বলিতে সাহসী হইবে না। এরূপ কৌশল বা ষড়যন্ত্র নাস্তিক্যবুদ্ধির উদ্ভাবনীশক্তির প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করিলেও এইরূপ প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনার সেতু। বর্ত্তমান সময়ে অনেকে এইরূপ বঞ্চনাবৃত্তি লইয়া নিজদিগকে বৈষ্ণব পণ্ডিত বলিয়া প্রচার করিতেও অগ্রসর হইয়াছে। ইঁহাদের পাণ্ডিত্য বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষ ও তৎসঙ্গে আত্মহিংসার্থ অর্জ্জিত হইলেও ঐ পাণ্ডিত্য বাহ্যে এরূপ মনোমুগ্ধকর, কখনও বা এরূপ ঐন্দ্র্য-জালিকের বেশ লইয়া উপস্থিত হয় যে, সাধারণে ঐরূপ পাণ্ডিত্যকে বৈষ্ণবের পাণ্ডিত্যের সহিত সমান জ্ঞান করিয়া বসেন। প্রকৃত প্রস্তাবে বৈষ্ণবের পাণ্ডিত্যের সহিত ঐ সকল বঞ্চনাকীর আনুকরণিকগণের পাণ্ডিত্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। বৈষ্ণব-পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যে মাৎসর্য্য বা কৌটিল্য নাই। বৈষ্ণবের পাণ্ডিত্যে 'অনুসরণ' আছে, 'অনুকরণ' নাই। বৈষ্ণবের পাণ্ডিত্য মুখে এক প্রকার, অন্তরে আর এক প্রকার নহে। বৈষ্ণবের পাণ্ডিত্য বক্তৃতা কালে এক প্রকার, কার্য্যকালে অন্য প্রকার নহে। বৈষ্ণবের পাণ্ডিত্য কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ করায়, অকৃষ্ণ বস্তুর ইন্দ্রিয়তর্পণে বাধা জন্মায়। বৈষ্ণবের পাণ্ডিত্য ত্রয়ীর মধুপুষ্পিত বাক্য দ্বারা আচ্ছন্ন হয় না। বৈষ্ণবের পাণ্ডিত্য দশবিধ নামাপরাধের কোনও একটীকেই প্রশ্রয় প্রদান করেন না অর্থাৎ বৈষ্ণব পণ্ডিত কখনও সাধুনিন্দা করে না, অসাধুকে সাধুর সহিত সমান জ্ঞান করেন না, পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণুব্যতীত ঈশ্বর বা দেবতাগণে স্বতন্ত্র পরমেশ্বর-বুদ্ধি করেন না, গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করেন না, মহাকুলে প্রসূত ও সর্ব্ব বেদবিদ্যা-বিশারদ হইলেও অগুরু বা গুরুব্রুবকে গুরু বলেন না, শ্রুতি শাস্ত্রের নিন্দা করেন না, শ্রৌতবাণীকে মনোধর্ম্মের সহিত সমান জ্ঞান করেন না, হরিনামকে অতিস্তুতি মনে করেন না, ভগবৎস্বরূপ ও তন্নামরূপ-গুণলীলা মানব-কল্পিত এরূপ বুদ্ধি করেন না, নামবলে পাপবুদ্ধির প্রশ্রয় অর্থাৎ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের ন্যায় পাণ্ডিত্যকে বিক্রয় করিয়া দগ্ধোদর প্রতিপালন বা কোনও প্রকার ভোগ অর্থাৎ পাপের প্রশ্রয় দেন না অথবা পাণ্ডিত্য বা উত্তম অধ্যয়নের ফল যে আত্মনিবেদন বা শরণাগতি, তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপদ্ধর্ম্মের ছলে পাণ্ডিত্যকে জীবিকার উপায়রূপে পরিণত করিয়া ভগবদ্‌বিশ্বাসরাহিত্য অর্থাৎ মূর্খতা বা নাস্তিকতা প্রদর্শন করেন না। বৈষ্ণব পণ্ডিত বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ শ্রীনামকেই সাধন ও সাধ্যসার জ্ঞান করেন। তিনি ধর্ম্ম, ব্রত, ত্যাগ, যজ্ঞ, বন্যা বা দুর্ভিক্ষ নিবারণ—নানাবিধ কর্ম্মকাণ্ডীয় ধর্ম্মের সহিত শ্রীনামকে সমান বা তদপেক্ষা লঘুজ্ঞান করিয়া মূর্খতা ও নাস্তিকতার অভিনয় দেখান না। বৈষ্ণবপণ্ডিত অর্থ বা প্রতিষ্ঠাদির লোভে শ্রদ্ধাহীন বিমুখব্যক্তিকে কখনও নাম-উপদেশ করেন না। বৈষ্ণবপণ্ডিতের বাত-পিত্ত-কফাত্মক চর্ম্মভাণ্ডে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী পুত্রাদিতে 'আমার' বুদ্ধি, কাঠপাথরে কল্পিত ঈশ্বরবুদ্ধি, জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি এবং বিষ্ণুভক্তে আত্মীয় ও পূজ্যবুদ্ধির অভাবরূপ মূর্খতা বা "গো-গর্দ্দভধর্ম্ম" নাই।

মহর্ষি অত্রি আনুকরণিক ব্রাহ্মণপণ্ডিতব্রুব ও বৈষ্ণবপণ্ডিতব্রুবগণের এইরূপ একটী চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি কি প্রকারে বৈষ্ণবপণ্ডিতাভিমানী হইয়া পড়েন, অন্তরে কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত

কিরূপে বাহিরে বৈষ্ণবপণ্ডিতের পোষাক পরিধান করেন—'অন্তঃশাক্ত বহিঃশৈব' সভাতে কিরূপে নিজকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া প্রকাশ করেন—অন্তরে প্রাকৃত জাড্য, দেহে আত্মবুদ্ধি ও তজ্জাত বৈষ্ণববিদ্বেষের পূর্ণভাণ্ড লইয়া বাহ্যে কিরূপে একজন লোকমনোরঞ্জক দোকানদার সাজিয়া বসেন, সেই চিত্রটী অত্রি ঋষির তুলিকায় সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে—

বেদৈর্বিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং শাস্ত্রেণ হীনাশ্চ পুরাণপাঠাঃ।
পুরাণহীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি ভ্রষ্টাস্ততো ভাগবতো ভবন্তি।।

(অত্রি-সংহিতা ৩৭৫ শ্লোক)

বেদশাস্ত্রে পরিশ্রম করিয়া ফল উৎপন্ন করিতে অসমর্থ হইলে ব্রাহ্মণ ধর্ম্মশাস্ত্র আরম্ভ করেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে কৃতিত্ব লাভ করিয়া ফলোৎপন্ন করিতে অক্ষম হইলে পুরাণ-বক্তা হন; পুরাণ-বাচনে অসমর্থতা ঘটিলে কৃষির দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেন, বলা বাহুল্য, বেদশাস্ত্রপাঠ, ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনা, পুরাণ-শাস্ত্রবাচন প্রভৃতি উদরের জন্য জীবিকা জ্ঞান করায় এবং তদ্ব্যতীত অন্য ব্যবহার অজ্ঞাত থাকায় তত্তজ্জীবিকার অনুপযোগিতা ক্রমে ব্রাহ্মণ কৃষিজীবী হওয়াই ব্রাহ্মণত্বের পরিণাম বুঝেন। আবার তাহাকেও উদর-ভরণে অযোগ্যতা হইলে সকল প্রকার কৃতিত্ব ও পারদর্শিতার অভাবে বৈষ্ণবের গুরু হইয়া অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক আপনাকে 'ভাগবত' বলিয়া প্রচার করাই জীবিকার উপায় স্থির করেন।

স্মৃতিশাস্ত্রে এই প্রকার ভৃতক পণ্ডিতকে অপাংক্তেয় বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে—

ভৃতকাধ্যাপকো যশ্চ ভৃতকাধ্যাপিতস্তথা।
শূদ্রশিষ্যা গুরুশ্চৈব বাগ্‌দুষ্টঃ কুণ্ডগোলকৌ।। (মনু ৩।১৫৬)

যিনি বেতন লইয়া বেদ অধ্যাপনা করেন, যে শিষ্য সেইরূপ গুরুর নিকট হইতে বেদ অধ্যয়ন করেন, যিনি শূদ্রশিষ্য স্বীকার ও শূদ্রকে অধ্যয়ন করান, যে সর্ব্বদা নিষ্ঠুর ভাষী, যে পিতৃ বর্ত্তমানে জারজ-সন্তান, যে পিতার মরণের পর পরোৎপন্ন সন্তান, তাহাদিগকে হব্যকব্যে নিযুক্ত করিবে না।

বর্ত্তমান বৈশ্যজগতে পাণ্ডিত্যও পণ্যদ্রব্য বা ব্যবসায়ের সামগ্রীরূপে পরিণত হইয়াছে। অন্যান্য ব্যবসায় অপেক্ষা পাণ্ডিত্য-ব্যবসায়ে অর্থাগমের স্বল্পতানিবন্ধন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সংখ্যাও ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। বৈষ্ণব পণ্ডিত ত' একেবারে নাই বলিহে হয়। যাঁহারা 'বৈষ্ণবপণ্ডিত' বলিয়া নিজদিগকে অভিমান করেন, তাঁহারাও তথাকথিত ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকেই তাঁহাদের আদর্শ করিয়া বাহ্যে বৈষ্ণবের অনুকরণ বা সজ্জামাত্র গ্রহণপূর্ব্বক কার্য্যতঃ কর্ম্মজড়ের পদাবলেহী হইয়া পড়িতেছেন। বৈষ্ণবপণ্ডিতের স্বরূপলক্ষণ যে কৃষ্ণৈকশরণতা—যাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য দ্বাবিংশ অধ্যায়ে ৭৫ সংখ্যায় কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহার সম্পূর্ণ অসদ্ভাব থাকা সত্ত্বেও কেবল 'অনুস্বর বিসর্গ পড়া বিদ্যা'কেই 'বৈষ্ণবপাণ্ডিত্য' বলিয়া বাজারে চালাইবার জন্য অনেকে আগ্রহযুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কেহ কেহ আবার আপদ্ধর্ম্মের নাম করিয়া ভাগবতজীবিকা, বিগ্রহজীবিকা প্রভৃতি শাস্ত্র বিগর্হিত দেববৃত্তি চালাইবার

চেষ্টা করিতেছেন। বৈষ্ণব পণ্ডিত ত' দূরের কথা, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণও যদি আপদ্ধর্ম্মের নাম করিয়া ঐরূপ হীনকার্য্যে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদেরও পাতিত্য ঘটে—

আপদ্যপি চ কষ্টায়াং ভীতো বা দুর্গতোঽপি বা।
পূজয়েন্নৈব বৃত্ত্যর্থং দেবদেবং কদাচন।।

(শ্রীযামুনাচার্য্যকৃত আগমপ্রামাণ্য-বৃত পরমসংহিতা-বাক্য)

—বহু কষ্ট-দশাতেও অথবা ভীত, দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও বিপদাপন্ন হইয়া কখনও বৃত্তির নিমিত্ত দেবপূজা করিবে না।

যাহারা নিজদিগকে 'বৈষ্ণব পণ্ডিত' বোলাইয়া—"নামমন্ত্র ভাগবত-ব্যবসায় না করিলে আমাদের কিরূপে চলিবে?"—এইরূপ বিচারসম্পন্ন, তাহাদের বিচার অপেক্ষা কি শোকাভিনিবিষ্টতা বা শূদ্রত্ব এবং মূর্খতা অধিক বরণীয় নহে? পাণ্ডিত্য যদি জীবকে শূদ্রও নাস্তিক করিয়াই দিল, তাহা হইলে ঐরূপ পাণ্ডিত্যের ফল কি? শাস্ত্র বলেন—

ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথা কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ।
যোঽসৌ বিশ্বম্ভরোদেবঃ স কিং ভক্তানুপেক্ষতে।।

অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ ভোজনাচ্ছাদনের জন্য কখনও চিন্তা করেন না, সাক্ষাৎ বিশ্বম্ভর যাঁহাদের প্রভু, সেই সকল ভক্তগণ কি কখনও প্রভুকর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইতে পারেন?

বৈষ্ণব-পণ্ডিত বলেন—

অশ্নীমহি বয়ং ভিক্ষামাশাবাস বসীমহি।
শয়ীমহি মহীপৃষ্ঠে কুর্ব্বীমহি কিমীশ্বরৈঃ।।

আমরা বৈষ্ণব-পণ্ডিতের আদর্শ বিশ্বম্ভর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীধর পণ্ডিত, শ্রীজগদানন্দ, শ্রীবক্রেশ্বর, শ্রীদামোদর স্বরূপ প্রভৃতির চরিত্রে জ্বলন্ত আকারে দেখিতে পাই যে, বিশ্বম্ভরের ভক্তগণ, কৈবল্যকেও নরকসদৃশ দর্শন করেন, ইন্দ্রাধিপত্যকে আকাশকুসুমের মত জানেন, বিধি মহেন্দ্রাদির পদবীকে কীট-পদবীর ন্যায় জ্ঞান করেন, সেই সকল বৈষ্ণব-পণ্ডিতের স্থান যে কত উচ্চে, তাহা জগতের লোক কি করিয়া ধারণা করিবে?

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় পূর্ব্ব প্রাকৃত পাণ্ডিত্যকে শ্রীগৌরসুন্দরের সেবায় নিযুক্ত করিয়া বৈষ্ণবপণ্ডিত হইতে পারিলে "তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণঃ" শ্লোক কীর্ত্তন করিতে করিতে বলেন যে, "ভগবান্ জগতে সহস্র সহস্র বিপদ, আপদ, অসুবিধা, ব্যাধি, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি অসুখকর বিষয়গুলি সজ্জিত রাখিয়া এতদূর কৃপাময় হইয়াছেন যে, কৃষ্ণবিস্মৃতজীব কারাগারকে তাহার নিত্য-বাসস্থলী মনে করা রূপ অভিনিবেশের হস্ত হইতে সহজেই পরিত্রাণ পাইবার উপায় খুঁজিয়া লইয়া তাহার পূর্ব্ববাসস্থানে গমনেচ্ছু হইতে পারে; সমস্ত আপাত প্রতিকুল বিষয়কে তাহার ভগবদ্ভজনের

অনুকূলবিষয় জানিয়া জীব কায়মনোবাক্যে বৈষ্ণবপণ্ডিতগণের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে, ''বিদ্যা ভাগবতাবধি" অর্জ্জন অর্থাৎ ভাগবত হইতে পারে।"

শ্রীগৌরসুন্দর এককালে বহু বহু বৈষ্ণব-পণ্ডিতের সমাবেশ ও আদর্শ নিত্য জীবনচিত্র লোকলোচনের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকটস্থলী নবদ্বীপে বহু বহু বৈষ্ণবপণ্ডিত এককালে উদিত হইয়াছিলেন। সেই সকল উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক গৌরনিত্যানন্দ সূর্য্য-চন্দ্রকে মধ্যস্থানে পাইয়া বৈষ্ণবপাণ্ডিত্যের অত্যদ্ভূত মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় তাঁহার সেই ধাম পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছেন। আজও সেই শ্রীধাম সেবোন্মুখ-হৃদয়ে সেই সকল স্মৃতি উদ্দীপ্ত করিয়া দিতেছেন। সেই শ্রীধামে যাহাতে আবার পরাবিদ্যার আলোচনা কেন্দ্র অথবা ভক্তিশাস্ত্রপীঠ সংস্থাপিত হয়—সেই পীঠে পরাবিদ্যা পারঙ্গত হইয়া যাহাতে আদর্শ বৈষ্ণবপণ্ডিতগণ কীর্ত্তনাখ্য ভক্তিসহযোগে জগতের সর্ব্বত্র ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচারপূর্ব্বক সমগ্র বিশ্বকে ব্রহ্মজ্ঞতায় ও পাণ্ডিত্যে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন, তজ্জন্য কি শ্রীগৌরসুন্দর ও তদনুরাগী বৈষ্ণবপণ্ডিতগণের পাদপদ্মে আমাদের কাতর প্রার্থনা জানান কর্ত্তব্য নহে? সমগ্র জগৎ বৈষ্ণব-পণ্ডিতের অধীন হইলে শোক-ধর্ম্মের হ্রাস হইবে, জগৎ হইতে ব্রাহ্মণতার নামে বণিগ্‌বৃত্তি বিদূরিত হইবে। ধ্বংসশীল ক্ষাত্রচেষ্টা হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া, স্বধর্ম্ম অর্থাৎ প্রশান্তভাব ও নির্গুণ ব্রাহ্মণতায় উপনীত হইয়া জীব ভগবদুপাসক বৈষ্ণব হইতে পারিবেন। তখন বিশ্বকে তার ক্লেশের আগার বলিয়া বোধ হইবে না। এই বিশ্ব পরিপূর্ণ-সুখময় ধাম, বিশ্বের প্রত্যেক বস্তু স্বরাট্‌পুরুষ কৃষ্ণের সেবোপকরণ বলিয়া উপলব্ধি হইবে।

শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়াতত্ত্ব

''শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ" পত্রের গত আশ্বিন মাসের সংখ্যায় ''শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া ভজন" (প্রাপ্তপত্র) শীর্ষক প্রবন্ধে গৌরগোবিন্দ নামক জনৈক অজ্ঞাত-নামা ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয়ের সিদ্ধান্ত বুঝিতে অসমর্থ হইয়া 'গৌরনাগরী' মতবাদ স্থাপন কল্পে, যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ যে সকল যুক্তিকে তিনি অখণ্ডনীয় ও দুর্ভেদ্য ভাবিয়া মনে মনে উল্লসিত হইয়াছেন, সেই সকল যুক্তির নিরর্থকতা ও এক একটী করিয়া শাস্ত্রযুক্তিমূলে খণ্ডন নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে—

প্রবন্ধলেখক লিখিয়াছেন,—''শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গকে 'গৌরাঙ্গ নাগর হেন স্তব নাহি বলে'—এইরূপ বলিয়াছেন এবং তাহা তাঁহার ভাবানুযায়ী উপযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু তিনি শ্রীগৌরকৃষ্ণের মাধুর্য্যমার্গের সাধকের ভাবে কোন বাধাও দেন নাই, উপরন্তু তাঁহাদের ভাবের আনুকূল্যেই বলিয়াছেন, 'যদ্যপি সকল স্তব সম্ভবে তাঁহার', অতএব শাস্ত্র-প্রমাণে গৌর-নাগরবাদ প্রতিষ্ঠিতই হইতেছে।"
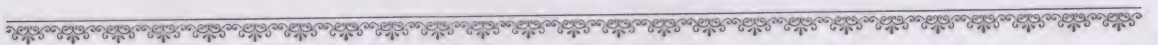
প্রবন্ধলেখক 'নাগরী' মতবাদের ভোগপর চশ্‌মা লইয়া ঠাকুর বৃন্দাবনের ভাষার সর্ব্বদিক্ দেখিতে পান নাই। ঠাকুর বৃন্দাবনকে তাঁহার মনগড়া ছাঁচে ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। প্রবন্ধলেখকের নিম্নলিখিত কথা গুলি লক্ষ্য করা উচিত ছিল—

"স্ত্রী হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণেও না করিলা বিদিত সংসারে।।"

ঠাকুর বৃন্দাবন প্রবন্ধ লেখক মহাশয়ের কথানুসারে ঐশ্বর্য্যমার্গের উপাসক হইলেও, তিনি "এই অবতারে" শব্দের দ্বারা এবং "বিদিত সংসারে" শব্দের দ্বারা কেবল মাত্র তাঁহার ভাবানুরূপ উপাস্য গৌরসুন্দরকেই লক্ষ্য করেন নাই, পরন্তু তিনি প্রতিপাদন করিতেছেন যে, কৃষ্ণ-অবতারে গৌরসুন্দর 'নাগর'রূপে কথিত হইলেও গৌর-অবতারে নাগরের নামগন্ধও তাঁহাতে আরোপিত হইতে পারে না। ইহা কেবল তাঁহার মত নহে, পরন্তু সংসারে অর্থাৎ সমগ্র জগতে ইহা অবিসংবাদিত সত্য বলিয়া স্বীকৃত। "যত মহামহিম সকলে" এই বাক্যের দ্বারা তিনি কেবল তাঁহার ব্যক্তিগত ভাবকে লক্ষ্য করেন নাই, পরন্তু জগতে যত মহামহিম ব্যক্তি, তাঁহারা কেহই 'গৌরাঙ্গনাগর'—এরূপ স্তব বলিয়া সিদ্ধান্ত, বিরোধ এবং রসাভাস-দোষ আনয়ন পূর্ব্বক গৌরাঙ্গের বিরোধাচরণ করেন না—ইহাই তাঁহার সুস্পষ্ট উজ্জ্বলভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। যদি কেহ মনে করেন যে, তাহা হইলে ত' স্বতন্ত্র সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের স্বতন্ত্রেচ্ছা ও সর্ব্বশক্তিমত্তা খর্ব্ব হয়, সেই জন্যই তিনি বলিতেছেন, —"যদ্যপি সকল স্তব সম্ভবে তাহানে"। এই বাক্যের দ্বারা গৌরনাগরী'বাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়া দূরে থাকুক, গৌরনাগরীর স্বেচ্ছাচারিতারূপ ইন্দ্রিয়-তর্পণ সমূলে খণ্ডিত হইতেছে অর্থাৎ ঠাকুর বৃন্দাবন বলিতেছেন, স্বতন্ত্র ভগবানের 'স্বেচ্ছাচারিতা' থাকিতে পারে, কিন্তু বশ্য-জীবের বা বশ্যতত্ত্বের 'স্বেচ্ছাচারিতা' থাকিতে পারে না। স্বেচ্ছাচারিতা'রই অপর নাম 'ইন্দ্রিয়তর্পণ' বা শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় 'আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিইচ্ছা রূপ কাম'। গৌরসুন্দর আচার্য্য-লীলাভিনয়কারী', জীব-শিক্ষা-কল্পে জগতে অবতীর্ণ। গৌরসুন্দর কৃষ্ণ হইয়া শ্রীমতীর ভাব ও চেষ্টা লইয়া জগতে অবতীর্ণ অর্থাৎ তিনি আস্বাদকের ভাব ও চেষ্টাই গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ গৌরসুন্দরকে যদি কোন ব্যক্তি জোর করিয়া (তিনি যাহা চান না) তাঁহার ভাব ও চেষ্টার প্রতিকূলে-অতিমাত্র স্বেচ্ছাচারিতাকেই 'ভক্তি' বলিয়া দেখাইতে যায়, তাহা হইলে ঐরূপ ব্যক্তিকে গৌরসুন্দর 'স্বেচ্ছাচারি-কামুক' জ্ঞানে নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করেন। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ যখন প্রেমভরে 'অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ' শ্লোক উচ্চারণ করিতে করিতে ক্রন্দন করিতেন, তখন রামচন্দ্রপুরী তাঁহার নিকট গিয়া বলিয়াছিলেন, 'প্রভো! আপনি যখন আমার গুরুদেব, তখন আপনি ত' সাক্ষাৎ 'ব্রহ্ম', আপনি কেন আবার এইরূপ ক্রন্দনাদি করিতেছেন অর্থাৎ আপনি আমার ইন্দ্রিয় তর্পণ করুন্। এইরূপ ছল গুরুভক্তি-প্রদর্শনকারী রামচন্দ্র পুরীকে 'গুরুদ্বেষী' জ্ঞানে মাধবেন্দ্রপুরী বর্জ্জন করিয়াছিলেন। 'গৌরনাগরী'গণও যদি সেইরূপ গৌরসুন্দরের ভাব ও চেষ্টা, গৌরাবতারের বৈশিষ্ট্যের প্রতিকূলে তাঁহাদের স্বেচ্ছাচারিতাকেই 'গৌরভক্তি' মনে করিয়া গৌরকে 'নাগর' সাজাইতে চান, সমস্ত সংসারের মহামহিমগণের

আচরণের বিরুদ্ধে স্বমত কল্পনা করিতে চান, তাহা হইলে সেইরূপ চেষ্টাকে কখনই গৌর ও গৌরভক্তগণপ্রশ্রয় দিবেন না। স্বতন্ত্র ভগবানের স্বেচ্ছাচারিতা থাকিলেও—'তথাপিও স্বভাব সে গায় বুধ-জনে'। তত্ত্ববিৎ পুরুষগণ ভগবানের প্রকট-লীলানুযায়ী ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলার কীর্ত্তন বা সেবা করিয়া থাকেন। অতএব প্রমাণিত হইল যে, শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন কেবল তাঁহার নিজের কথা নয়, সমস্ত মহামহিম অর্থাৎ ভজন-পরায়ণগণের উদাহরণ উল্লেখ করিয়া সর্ব্বতোভাবে 'গৌরনাগরী' বাদকে খণ্ডন করিয়াছেন।

আর যদি প্রবন্ধ-লেখকের কথানুসারে ''মাধুর্য্যমার্গের সাধকের'' 'গৌরনাগরী'বাদ অভীপ্সিত বস্তু হইত, তাহা হইলে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু, ষড় গোস্বামিগণ তাঁহাদের কোন না কোন গ্রন্থে 'গৌরনাগরী'বাদের ইঙ্গিত বা তাহা সমর্থন করিতেন। সর্ব্বজ্ঞ-ব্যাস এই জন্যই 'গৌরনাগরী' মতবাদকে 'দুষ্ট মতবাদ' বলিয়া খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীতোতারাম দাস বাবাজী মহাশয় যে, তাঁহার দোঁহার মধ্যে 'গৌর নাগরী'বাদ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ-বিষয়ে কোনও বাধা নাই। ইহা ''তাঁহার ব্যক্তিগত ভাবব্যঞ্জক'' কথা মাত্র নহে। প্রবন্ধলেখক মহাশয় লিখিয়াছেন, মহাজনের 'ব্যক্তিগত ভাবকে' শাস্ত্রাজ্ঞা বলা উচিত নহে। এরূপ কথা অভিনব কথা বটে। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলেন,—

''সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য হৃদয়ে করিয়া ঐক্য,
সতত ভাসিব প্রেম-মাঝে।''

সাধু-বাক্য,শাস্ত্র-বাক্য ও গুরু-বাক্য—একটীই জিনিষ। সাধু কখনও অশাস্ত্রীয়, অশ্রৌত কথা বলেন না; সুতরাং তাঁহার বাক্যই শাস্ত্রাজ্ঞা।

''আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ''

সাধুগণের যে উপদেশ, তাহাই শব্দ অর্থাৎ শ্রুতি।

''সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ''

বেদের প্রমাণ যেমন স্বতন্ত্র, সাধুগণের প্রতিজ্ঞা বাক্যও তেমনই স্বতন্ত্র-প্রমাণ; তজ্জন্যই তাঁহাদের বাক্য অনাদিকাল হইতে শাস্ত্রের ন্যায় সম্মানিত হইয়া আসিতেছে। মনঃশিক্ষাচ্ছলে ''দুঃসঙ্গবর্জ্জনাদি'' করিবার আদেশ কখনও মহাজনের ''ব্যক্তিগত ভাব'' নহে—উহা নিখিল জীবের প্রতি অমানি-মানদ-মহাজনের কৃপাদেশ; —মহাজনগণ আমাদের ন্যায় বিমুখ-জীবের নিকট ঐরূপ কৌশলেও সত্য কথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যে সকল মহাজন শ্রৌতবাক্য কীর্ত্তন করেন না, তাঁহারা 'মহাজন' বা 'সাধু' নামে অভিহিত নহেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন (চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।৫৫, ৫৭),—

তা'তে ছয়দর্শন হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি।
মহাজন যেই কহে, সেই 'সত্য' মানি।।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণী অমৃতের ধার।
তিঁহো যে কহয়ে বস্তু সেই তত্ত্বসার।।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণানুচর গোস্বামিগণই মহাজন। তাঁহারা যে 'গৌরনাগরী'-বাদের সমর্থন করেন নাই, শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস যে 'গৌরনাগরী'-বাদের সমর্থন করেন নাই, সেইরূপ 'গৌরনাগরী'বাদ 'অন্য অন্য শত মহাজন' কেন, বহির্ম্মুখ বা তত্তন্মতবাদিব্যক্তিগণের নিকট 'মহাজন' নামে পরিচিত কোটি কোটি ব্যক্তিও যদি সমর্থন করেন (ইন্দ্রিয়-তর্পণেরই "পোষকতা" করেন), তাহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর ভাষায় ব্যক্ত হইবে,—

"আর যত মত—সেই সব ছারখার"।

আউল, বাউল, কর্ত্তভজা প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ 'মহাজন' খাড়া করিয়াছেন। ব্যভিচারী লম্পটগণও তাঁহাদের মহাজনের দোহাই দিয়া থাকেন। চোরেরও মহাজন আছে, বিষয়ীরও মহাজন আছে, আবার কৃষ্ণাপরাধী মায়া বাদিগণেরও মহাজন আছে। অতএব সেই সকল সাজান, মহাজন তাঁহাদের মহাজনত্ব দূরে রাখিয়া সপরিকরে বিপ্রলম্ভাবতার গৌরসুন্দর ও বিপ্রলম্ভের পরিপোষ্টা গৌরভক্তগণের আনুগত্যে কৃষ্ণান্বেষণ করিলেই মঙ্গল-লাভ করিতে পারিবেন।

প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন—"শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিত-তনু, বিপ্রলম্ভ-রস-বিগ্রহ এবং ভক্তাবতার হইলেও, সর্ব্বশক্তিমান্ এবং বিরুদ্ধ-ধর্ম্মপ্রিয়-বিষয়ে, স্বীয় গৌরবিগ্রহে কৃষ্ণাভিমান-বশতঃ সম্ভোগবিগ্রহরূপে কোন কোন অন্তরঙ্গ ভক্তকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিয়াছিলেন, তাহার-প্রমাণ শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের বহুস্থলেই পাওয়া যায়।" প্রবন্ধ-লেখক 'গৌরনাগরী' মতবাদকে ছলেবলে স্থাপন-কল্পে কল্পনা ও নিরর্থক-যুক্তি যতই পোষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ততই তাঁহার জালে তিনি কিরূপে যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। রাধ্যকৃষ্ণমিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দর—শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ, এ বিষয়ে কাহারও আপত্তি নাই। শ্রীলস্বরূপগোস্বামি-প্রভুও তাঁহাকে 'রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ' বলিয়াই নমস্কার করিয়াছেন; কিন্তু তিনি গৌরলীলার বৈশিষ্ট্য এবং সেই বিশিষ্টতার নিত্যত্ব উড়াইয়া দিয়া গৌরলীলাকে অনিত্য ব্যাপার বলিয়া সাব্যস্ত করেন নাই! বিপ্রলম্ভাবতার শ্রীগৌরসুন্দরকে সম্ভোগবিগ্রহরূপে স্থাপন করিবার চেষ্টা দেখাইলে, তিনি আর 'গৌর' থাকিলেন না এবং গৌরলীলার নিত্যত্বও রক্ষিত হইল না। সম্ভোগবিগ্রহ বলিবামাত্রই 'গোপবধূটীবিট্' কৃষ্ণ লক্ষিত হইল; তখন তাঁহাকে আর 'গৌর' বলা চলে না। বিপ্রলম্ভবিগ্রহ গৌরের ঘাড়ে কল্পনার বশে সম্ভোগবিগ্রহত্ব চাপাইয়া দিলে গৌরলীলাকে অনিত্য বলিয়াই স্থাপন করা হয়। 'গৌরনাগরী'গণের চেষ্টা গৌরলীলাকে অনিত্য সাব্যস্ত করা বা মায়াবাদীর চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে। বিবর্ত্তবাদিগণ যেরূপ তাঁহাদের বিবর্ত্ত ধরিতে পারেন না, অপরাধ নিবন্ধন গৌরকে 'নাগর' সাজাইবার প্রয়াসি-ব্যক্তিগণও সেইরূপ এই সূক্ষ্ম-কথাটী ধরিতে পারেন না। যদি কাহারও ভগবান্‌কে মাধুর্য্যরসের বিষয় করিয়া সেবা করিবার

যথার্থ লৌল্য উপস্থিত হয়, তাহা হইলে মাধুর্য্যবিগ্রহ কৃষ্ণ কি মাধুর্য্যরসের বিষয়রূপ আলম্বনের পক্ষে যথেষ্ট নহেন? কল্পনাবশে নিজ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য শ্রীমন্ন্যাসিশিরোমণি' (চৈতন্য মঙ্গল) গৌরসুন্দরকে 'ব্যভিচারী' 'লম্পট' করিবার প্রয়াস, 'দ্বিজবর'কে (চৈতন্যভাগবত) গোপপুত্র করিবার চেষ্টা বা অপর কেহ যদি গৌরনাগরীর আদর্শে 'যেহেতু মহাপ্রভু কৃষ্ণ, সেই হেতু তাঁহার দ্বারা রথ-চালকের কাজ করাইয়া লওয়া যা'ক্'—এইরূপ বলেন; কেহ বা যদি বলেন,—'মহাপ্রভু যখন কৃষ্ণ, তখন তাঁহাকে গোচারণে গোপালক করিয়া পাঠান যা'ক্ ইত্যাদি', তাহা হইলে কি ঐরূপ মনগড়া কাল্পনিক-চেষ্টা কল্পনাকারিগণের ইন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা এবং নিত্যধামের নিত্য বাস্তব লীলায় বিশ্বাস-রাহিত্যই প্রমাণ করিয়া দিবে না? গৌরের হাতে কখন গোচারণের জন্য যষ্টি দিতে হইবে না, রথ চালাইবার জন্য চাবুক দিতে হইবে না, বাঁশী দিতে হইবে না, দ্বিজবরকে গোয়ালার ছেলে করিতে হইবে না, আচার্য্যলীলাভিনয়কারী সন্ন্যাসিশিরোমণিকে জোর করিয়া স্ত্রী-দর্শন করাইবার চেষ্টা করিতে হইবে না, তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছানুরূপ লীলার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার চেষ্টায় দেখান' হইবে।

শ্রীগৌরসুন্দর শুদ্ধভক্তগণের আত্মবৃত্তির নিত্যসিদ্ধস্বরূপের ভাবানুযায়ী তত্তদ্ভাবের নিত্য-উপাস্য-বিগ্রহ 'রাম', 'নৃসিংহ', 'বরাহ' কিম্বা কৃষ্ণরূপে দর্শন দান করিতে পারেন, ইহা কিছু আপত্তির বিষয় নহে; কিন্তু শ্রীমতীর ভাব ও চেষ্টাবিশিষ্ট পুরটসুন্দরদ্যুতি গৌরসুন্দরের হাতে বাঁশী দিয়া তাঁহাকে জোর করিয়া 'লম্পট' সাজান' আর একটী স্বতন্ত্র-বিষয়। একটীতে স্বতন্ত্রভগবান্ নিজভক্তের নিত্যসিদ্ধ ভাবানুযায়ী স্বয়ং ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই নিত্যস্বরূপ-বিগ্রহ প্রকট করিয়া তত্তৎস্বরূপ-বিগ্রহে ভক্তকে দর্শন প্রদান করেন, আর একটীতে অন্যতন্ত্র-বশ্য-জীব কল্পনা ও আরোপচেষ্ট লইয়া ভগবানের নিত্য স্বরূপবিগ্রহকে বিকৃত করিবার জন্য নিজের খেয়ালকেই বহুমানন করেন। প্রথমটী 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা' বলিয়া 'ভক্তি' বা 'প্রেম', দ্বিতীয়টী 'আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা' বলিয়া 'কাম'। মুরারিগুপ্ত গৌরসুন্দরকে তাঁহার নিত্যসিদ্ধ ভাবানুযায়ী নবদুর্ব্বাদল-কান্তি রামচন্দ্ররূপেই দর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাভাব-স্বরূপিণী হেমাঙ্গী বার্ষভানবীর ভাবকান্তিবিশিষ্ট গৌরাঙ্গের হস্তে ধনুর্ব্বাণ প্রদান করিতে যান নাই।

শ্যামরূপব্যতীত অন্যরূপ মাধুর্য্য-রসের বিষয় হইতে পারে না। একমাত্র দ্বিভুজমুরলীধর শ্যাম গোপরূপই শৃঙ্গার-রসের পরিপূর্ণ বিষয়রূপ আলম্বন। শ্রীগৌরসুন্দর কাঞ্চনপঞ্চালিকার কান্তি ও চেষ্টা লইয়া অবতীর্ণ। সুতরাং ইন্দ্রিয়তর্পণার্থ কেবলমাত্র তাঁহার 'কান্তিটী' স্বীকার করিব, কিন্তু তাঁহার অন্তর-চেষ্টা বা ভাব—যাহা তাঁহার বাহ্যাঙ্গকেও সম্পূর্ণভাবে আচ্ছাদিত করিয়াছেন, সেই বিপ্রলম্ভ-চেষ্টাকে 'খারিজ' করিয়া সেইস্থানে কল্পনারবশে কৃষ্ণের সম্ভোগময়ী-চেষ্টা জোর করিয়া স্থাপন করিব—এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি গৌররূপ, গৌরনাম ও গৌরলীলার প্রতি বিদ্বেষমাত্র। গৌরই কৃষ্ণস্বরূপে সম্ভোগরসে 'নাগর', বা 'বিষয়বিগ্রহ'; তখন আর তাঁহাকে 'গৌর' বলা যায় না, তিনি তখন গোপেন্দ্রনন্দন, তিনি তখন নন্দকুলচন্দ্রমা, তিনি তখন গোপীকুমুদ-বন্ধু; আবার কৃষ্ণই গৌরস্বরূপে বিপ্রলম্ভরসে আশ্রয়বিগ্রহ-শ্রীরাধা-ভাবকান্তিময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তিনি তখন 'নাগর' হইতে পারেন না, তিনি কৃষ্ণান্বেষণ শিক্ষাপ্রদাতা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়ের চেষ্টাবিশিষ্ট, লোকশিক্ষক,

সন্ন্যাসিশিরোমণি, দ্বিজবর, আচার্য্যলীলাভিনয়কারী। রাসরসিক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অন্তর্দ্ধান করিলে গোপীগণ তদন্বেষণে প্রবৃত্তা হইলেন। অন্বেষণ করিতে করিতে কোনও এক কুঞ্জে কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। কৃষ্ণ নিজকে গোপন করিতে না পারিয়া তাঁহাদের নিকট 'নারায়ণ'রূপে দর্শন করিয়াছিলেন;—(এইস্থলে 'নারায়ণ' কিছু কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি পরব্যোমনাথ আত্মগোপনার্থ গোপীদের নিকট নারায়ণরূপ প্রকট নহেন, স্বয়ং কৃষ্ণই করিলেন মাত্র।) কিন্তু তথাপি কৃষ্ণকে নারায়ণরূপে দর্শন করিয়া গোপীগণ সেই রূপকে সম্ভোগ-বিষয়-বিগ্রহ বলিয়া বরণ করিলেন না। আবার দেখিতে পাওয়া যায় যে, সুদীর্ঘ বিপ্রলম্ভের পর শ্রীমতী রাধিকা কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়াও বলিয়াছিলেন,—"সেই তুমি, সেই আমি, সে নব-সঙ্গম।। তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন। বৃন্দাবনে উদয় করাও আপনচরণ।।"—এই সকল প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, গৌরসুন্দর কৃষ্ণস্বরূপ হইলেও শ্রীমতীর ভাব ও চেষ্টাবিশিষ্ট কৃষ্ণস্বরূপের প্রতি সম্ভোগবিগ্রহ শ্যামগোপরূপ রাধারমণের ভাব ও চেষ্টার অবৈধ-আরোপ হইতে পারে না। আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলে ঐরূপ আরোপের দ্বারা রসাভাসদোষ, তত্ত্ববিরোধ ও নানাবিধ অপরাধের সৃষ্টি হইবে।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পতিরূপে গার্হস্থ্যলীলাভিনয়কারী গৌরসুন্দর ভক্তগণকে ঐশ্বর্য্যস্বরূপেই দর্শন-দান করিয়াছেন। নারায়ণরূপ, রাম-নৃসিংহ-বামনাদিরূপেই তিনি তত্তৎস্বরূপের উপাসকগণের নিকট আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই শ্রীচৈতন্যভাগবতে দৃষ্ট হয়।

গৌরাঙ্গচরণারবিন্দভৃঙ্গ শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের 'ভজনামৃত' গ্রন্থই প্রসিদ্ধ; তাহাতে তিনি যেরূপ বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্টপ্রচারের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে পরবর্ত্তিকালের তন্নামে রচিত বা প্রক্ষিপ্ত শ্লোকাদিময় নানাবিধ জাল পুস্তিকা কখনই শ্রীল নরহরি ঠাকুরের অভিমত প্রকাশ করিবে না। বর্ত্তমানে যেমন চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির 'পদ' বলিয়া দোহাই দিয়া সহজিয়া-ধর্ম্মের কামানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, তদ্রূপ নরহরি সরকার, শ্রীল কবিরাজগোস্বামী প্রভৃতি মহাজনগণের দোহাই দিয়াও নানাপ্রকার গৌরবিরোধিমতবাদকে দুই তিনশতবৎসরের ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে 'মহাজনানুমোদিত ভজন' বলিয়া প্রচলিত করিবার চেষ্টা হইতেছে।

প্রবন্ধলেখক শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুরের শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থের ১৩২ সংখ্যক শ্লোক হইতে যে 'গৌরনাগরবর' শব্দটী খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। আমরা নিম্নে তাহার কারণ এক একটী করিয়া দেখাইতেছি—

কোনও গ্রন্থের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে গ্রন্থ কর্ত্তার হৃদগতভাব পর্য্যালোচনা করা বিশেষ আবশ্যক। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভৃতি বেদান্তাচার্য্যগণও এই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন। 'গৌরনাগরী'বাদ যে সরস্বতীপাদের অভিপ্রেত নহে, তাহা তাঁহার লেখনী হইতেই স্পষ্ট জানা যায়। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত লেখক শ্রীল প্রবোধানন্দ-সরস্বতীপাদ তদীয় "রাধারসসুধানিধি" গ্রন্থে নিজের মনের ভাব এইরূপভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—

ধ্যায়ন্তং শিখিপিচ্ছ-মৌলিমনিশং—তন্নাম-সংকীর্ত্তয়ন্
নিত্যং তচ্চরণাম্বুজং পরিচরন্ তন্মন্ত্রবর্য্যং জপন্।
শ্রীরাধাপদদাস্যমেব **পরমাভীষ্টং** হৃদা ধারয়ন্
কর্হি স্যাং তদনুগ্রহেণ পরমাদ্ভুতানুরাগোৎসবঃ।।

"শ্রীরাধাপদদাস্যই আমার একমাত্র পরমাভীষ্ট—ইহা হৃদয়ে ধারণ করিয়া অর্থাৎ শিখিপিচ্ছমৌলি শ্রীকৃষ্ণকে নিরন্তর ধ্যান করিতে করিতে, তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে, তৎপরিচর্য্যা ও তন্মন্ত্ররাজ জপ করিতে করিতে তাঁহার অনুগ্রহে পরম অদ্ভুত অনুরাগোৎসব কবে লাভ করিব?"—এই বাক্যে গ্রন্থকারের 'পরমাভীষ্ট' যে, 'রাধাদাস্য'—তাহা সুষ্ঠুরূপেই তাঁহারই লেখনী হইতে জানা যাইতেছে। গ্রন্থকার তাঁহার নিজরচিত অন্যান্য গ্রন্থেও নিজ মনোভাব এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন, যথা নবদ্বীপ-শতক ৯৮সংখ্যায়—

নবদ্বীপৈকাংশে কৃতনিবসতিঃ শান্তহৃদয়ঃ
শচীসূনোর্ভাবোত্থিত যুগললীলা ব্রজবনে।
ধ্যায়ন্ যামে যামে স্বসমুচিতসেবা-সুখময়ঃ
কদা বৃন্দারণ্যং সকলমপি পশ্যেদ্ভুত রসম্।।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ঃ—

"কবে আমি নবদ্বীপে করিয়া বসতি।
শান্ত মন পাব গৌরভাবোদিত মতি।।
ব্রজবনে রাধাকৃষ্ণ সেবা-ধ্যান করি'।
ভজিব ব্রজের রস অদ্ভুত মাধুরী।।"

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতগ্রন্থেও (৮৮ সংখ্যায়) চৈতন্যভক্তির 'ফল' নির্দ্দেশ করিয়া 'গৌরনাগরী' বাদ সমূলে খণ্ডন পূর্ব্বক লিখিয়াছেন,—

"যথা যথা গৌর-পদারবিন্দে বিন্দেত ভক্তিং কৃতপুণ্যরাশিঃ।
তথা তথোৎসর্পতি হৃদকস্মাদ্রাধাপদাম্ভোজসুধাম্বুরাশিঃ।।"

অর্থাৎ বহু সুকৃতিসম্পন্নব্যক্তি শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে যাদৃশী ভক্তিলাভ করেন, অকস্মাৎ তাঁহার হৃদয়ে শ্রীশ্রীরাধা পাদপদ্মের প্রেমরূপ সুধাসমুদ্রও তাদৃশভাবে উদ্‌গত হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত 'উপক্রম', 'উপসংহার', 'অভ্যাস', 'অপূর্ব্বতাফল', 'অর্থবাদ' ও 'উপপত্তি'—এই ছয়টাই শাস্ত্রতাৎপর্য্যজ্ঞানের লিঙ্গস্বরূপ। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত বা তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থ এই ষড়্‌বিধ লিঙ্গদ্বারা বিচার করিলে 'রাধাদাস্য'ই যে গৌর ভজনের 'ফল' (অর্থাৎ গ্রন্থকর্ত্তার সিদ্ধান্ত),

তাহা প্রকৃষ্টরূপে অবগত হওয়া যায়। অধিক কি, প্রবন্ধ-লেখক শ্রীগৌরসুন্দরের বেষরচনামাধুর্য্যদ্যোতক চৈতন্য-চন্দ্রামৃতের ১৩২ সংখ্যক শ্লোকে যে 'গৌরনাগরবর' শব্দটী পাইয়াছেন, তাহার পূর্ব্ব ও পরশ্লোক (১৩০ ও ১৩৪ সংখ্যা) পাঠ করিবামাত্রই শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের হৃদ্‌গতভাব এবং ১৩২ সংখ্যক শ্লোকে 'গৌরনাগরবর' শব্দটী ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্য স্পষ্টই উপলব্ধি হয়।

বচনগত-বিরোধ-সমাধান-সম্বন্ধে মীমাংসা-দর্শনকার বলিয়াছেন,—"অর্থ-বিপ্রকর্ষ হেতু "শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যার সমবায়স্থলে যথাক্রমে পরপর প্রমাণের দুর্ব্বলতা বুঝিতে হইবে। শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য প্রকরণ স্থান-সমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ব্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাৎ" (মীমাংসাদর্শন ৩।৩।১৪)। গৌরভজনের একমাত্র 'ফল' যখন, একমাত্র 'রাধাদাস্য' (ইহা গ্রন্থকার তাঁহার রচিত সমস্ত গ্রন্থেই পুনঃপুনঃ প্রতিপাদন করিয়াছেন; উহাই ষড়্‌বিধ লিঙ্গদ্বারা গ্রন্থ-তাৎপর্য্যরূপে প্রমাণিত), তখন 'গৌরনারবর' শব্দের উদ্দিষ্ট কখনই 'গৌরনাগরী' বাদ নহে; কারণ তদ্বিপরীত সিদ্ধান্ত করিলে 'প্রকরণ-বাধা' অর্থাৎ গ্রন্থকারের পরমাভীষ্টের বিরোধ পরিলক্ষিত হইবে। যেস্থানে 'বাক্য' গৌরদাস্যের ফল-স্বরূপ 'রাধাদাস্যই' পুনঃ পুনঃ প্রতিপাদন করিতেছেন, সেইস্থানে 'বাক্য'কে উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র 'প্রকরণ' লইয়া বিচার করিলে, 'প্রকরণবাধা'রূপ দোষ আসিয়া উপস্থিত হইবে অর্থাৎ প্রকরণ হইতে বাক্যই প্রবল এবং বাক্য হইতে প্রকরণ দুর্ব্বল, অতএব 'বাক্য' বা প্রবল প্রমাণ ত্যাগ করিয়া কখনও তদপেক্ষা দুর্ব্বলপ্রমাণদ্বারা গ্রন্থকর্ত্তার মনোঽভীষ্ট-সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইতে পারে না। বিপ্রলম্ভরসপোষ্টা অতএব শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ কখনও 'গৌরনাগরী'বাদের সমর্থন করেন নাই—ইহাই শাস্ত্রযুক্তিমূলে সিদ্ধান্তিত হইল। যদি তথাপি অন্যায়রূপে পূর্ব্বপক্ষ করা হয় যে, 'গৌরনাগরী' বাদই প্রবোধানন্দপাদের উদ্দিষ্ট বিষয় অর্থাৎ গ্রন্থকর্ত্তার বাক্যের 'প্রয়োজন', তাহা হইলেও 'প্রয়োজন'টী কেবল গ্রন্থের একদেশে একটী শব্দমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া থাকিতে পারে না। চৈতন্যচন্দ্রামৃত বিচার করিলে দেখা যায়, তাহার উপক্রম বা উপসংহারে কোথায়ও 'গৌরনাগরী'বাদ (পূর্ব্বপক্ষ-কর্ত্তার মনগড়া প্রয়োজনটী) আদৌ নাই। প্রয়োজনটী নিশ্চয়ই গ্রন্থের উপক্রম ও উপসংহারে এবং গ্রন্থমধ্যে পুনঃপুনঃ বর্ণন-স্থলে অর্থাৎ অভ্যাসদ্বারা স্থাপিত হইবে এবং তৎসম্বন্ধে অর্থবাদাদিও থাকিবে। কিন্তু 'গৌরনাগরী'বাদ সম্বন্ধে সেরূপ কোনও লক্ষণ উক্ত গ্রন্থমধ্যে কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। যেমন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'আউল', 'বাউল', 'সহজ' প্রভৃতি শব্দ দুই একটী স্থানে অন্য অর্থে প্রযুক্ত হইলেও কতিপয় শুদ্ধভক্তিবিরোধী মতবাদিব্যক্তি সেই দুই একটী শব্দ সংগ্রহ করিয়াই তাঁহাদের মতবাদ জগতে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা গৌরবিরোধ করিতেছেন, তদ্রূপ যদি একটী স্থানে "গৌরনাগরবর" শব্দটী (যাহা গ্রন্থকর্ত্তা অন্য উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন) দেখিয়াই কেহ মনে করেন, প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদও আমাদের ইন্দ্রিয়যজ্ঞের একজন আহুতিপ্রদাতা, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই বঞ্চিত ও অপরাধী।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিত 'জৈবধর্ম্ম' গ্রন্থের ১৩৬ পৃষ্ঠায় "কুলিয়া নিবাসিনী 'গৌরনাগরী'গণ" এইরূপ পাঠের বিষয় উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধলেখক যে কুতর্ক উঠাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, উপরি উক্ত সিদ্ধান্ত-সরিতের একবিন্দু সুষ্ঠুরূপে গৃহীত হইলে তাঁহার সেই কুতর্কানল চিরনির্ব্বাপিত হইবে। ঠাকুর

ভক্তিবিনোদের বাক্যের সম্বন্ধেও ঐরূপই সিদ্ধান্ত জানিতে হইবে। ''কুলিয়া নিবাসিনী 'গৌরনাগরী'গণ'' বলিতে সেই স্থানে গৌরনগর সম্বন্ধিনী মাতৃগণের কথাই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে কখনও 'গৌরনাগরী' বাদ সমর্থন করেন নাই, তাহা আমরা তাঁহারই লেখনী হইতে দেখাইতেছি—তিনি ১১শ বর্ষ শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকায় 'গৌরকৃষ্ণ অভেদ' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—''শ্রীগৌরাঙ্গ কে? যে 'গৌর', সেই 'কৃষ্ণ'—'কৃষ্ণ' স্বয়ং 'গৌর' হইয়া নিজে কৃষ্ণ-রস আস্বাদন করতঃ জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণশূন্য গৌর-উপাসনা একটী নূতনপ্রথা হয়, তাহা শ্রীগৌরাঙ্গের অনুমোদিত নহে। দেখুন, শ্রীগৌরাঙ্গের পরিকরগণ কিরূপ উপাসনা করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রাণের স্বরূপ জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের দ্বারা গৌরাঙ্গকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উপাসনাতত্ত্ব বুঝিতে পারেন, তাঁহাদের আর কোনও সন্দেহ হয় না। সমস্ত গোস্বামিমণ্ডলের উপদেশ অবজ্ঞাপূর্ব্বক যাঁহারা কেবল গৌরবাদী হইবেন, তাঁহাদের একটী নূতন-পন্থা হইল বলিতে হইবে।''

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের ন্যায় শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তদীয় সজ্জনতোষণী পত্রিকায় গৌরভজনের 'ফল' এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

'' * * কেবল গৌরভজনের দ্বারা পরে গৌরাঙ্গের কৃপায় তাঁহাদেরও কৃষ্ণভজন দৃঢ় হইবে, ইহাই 'ফল' বলিয়া বোধ হয়।''

''শ্রীশ্রীমদ্গৌরাঙ্গলীলা-স্মরণ-মঙ্গল-স্তোত্রম'' গ্রন্থে ১০২ সংখ্যক শ্লোকে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পুনরায় লিখিয়াছেন—

''ভক্তা যে বৈ সকল সময়ে গৌরগাথামিমাং নো
গায়ন্ত্যচ্চৈর্বিগলিতহৃদো গৌরতীর্থে বিশেষাৎ।
তেষাং তূর্ণং দ্বিজকুলমণিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ
প্রেমাবেশং যুগলভজনে যচ্ছতি প্রাণবন্ধুঃ।''

সজ্জনতোষণী পত্রিকায় ''গৌরবিরুদাবলী'' নামক অপর কোনও ব্যক্তির রচিত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়াই যে, 'মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে'—এরূপ যুক্তি নিতান্ত বালভাষিতা। অনেক সময়ে অনেক প্রবন্ধ সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হইতে পারে, তাহার প্রত্যেকটীই যে সম্পাদকীয় মত প্রকাশ করিবে, ইহা অনুমান করা উচিত নহে। আমরা কখনও শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকায় শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ও তাঁহার উপদেশ এবং সিদ্ধান্ত-গ্রহণে যথার্থ সমর্থ ব্যক্তিগণের লিখিত প্রবন্ধ ছাড়া অন্য প্রবন্ধ পাঠ করি না। 'গৌরবিরুদাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থে নানাপ্রকার অসৎমত দেখিতে পাওয়া যায়। 'মায়াবাদ' আদি অপসিদ্ধান্তেরও আভাস তাহাতে স্থান পাইয়াছে। ঐরূপ গ্রন্থ-প্রচার কিছু শুদ্ধ-বৈষ্ণব-পত্রিকার উদ্দেশ্য নহে, পরন্তু ঐরূপ গ্রন্থের অপসিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া তত্তৎ অপসিদ্ধান্ত খণ্ডনই ঐ সকল গ্রন্থ প্রচারের উদ্দেশ্য। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'গৌরবিরুদাবলী' প্রভৃতির ন্যায় শত শত গ্রন্থের অপসিদ্ধান্তগুলিকেই তাঁহার লেখনীর সর্ব্বত্র এবং

তাঁহার সজ্জনতোষণী পত্রিকার সর্ব্বত্র খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কখনও উক্ত গ্রন্থের প্রতিপাদিত বিষয় অনুমোদন করেন না। হরিসেবার অনুকূল বিচারে গৌড়ীয়ের বাজে বিজ্ঞাপনগুলি যেরূপ গৌড়ীয়ের সিদ্ধান্তজ্ঞাপক নহে, পরন্তু তাহা যেমন জগৎকে গৌড়ীয়পত্রের সুসঙ্গ প্রদানেরই গৌণ-সহায়, সেইরূপ উদ্দেশ্য গৌরবিরুদাবলী সম্বন্ধেও জানিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের কোনও ব্রহ্মচারী বা সেবক কোনও দিন 'গৌরবিরুদাবলী' পাঠ করেন না। বরং তাহার কুসিদ্ধান্তকে সর্ব্বতোভাবে গর্হণ করিয়া থাকেন। প্রবন্ধ-লেখক তাঁহার প্রবন্ধমধ্যে কতকগুলি অপ্রাসঙ্গিক কথার বৃথা অবতারণা করিয়াছেন। অপ্রাসঙ্গিকতা নবীন লেখকগণের বহুদোষের মধ্যে একটী বিশেষ দোষ। যাহা হউক, তিনি নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি একটু স্থিরচিত্তে নিরপেক্ষভাবে শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিলে ঐরূপ শত শত বৃথা প্রশ্ন বা কুতর্কের হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারিবেন, আশা করি। 'হরিভক্তি তরঙ্গিনী' গ্রন্থখানি কিছু ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের রচিত, প্রকাশিত বা সম্পাদিত গ্রন্থ নহে। সেই গ্রন্থের সকল বিষয়ে তাঁহার সমর্থন আছে—এরূপ কষ্টসাধ্য অনুমান করার আবশ্যকতা কি আছে, আমরা বুঝিতে পারিলাম না। তবে ঐ গ্রন্থের অধিকাংশ অংশ, যাহা শ্রীগোস্বামী আচার্য্যগণের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই সকল শ্রৌতবাক্যে মাত্র তাঁহার সমর্থন আছে। গ্রন্থপ্রকাশকর্ত্তা ভূমিকামধ্যে যে সকল কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া কেহই বুঝিতে বা অনুমানও করিতে পারেন না যে, ঐ গ্রন্থের প্রতিবর্ণ কিপ্রকারে গ্রন্থকর্ত্তা ব্যতীত কোনও ব্যক্তিবিশেষের অনুমোদিত! উক্ত গ্রন্থের ভূমিকালেখক বহুব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়া তৎসঙ্গে লিখিয়াছেন, "পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ও * * * * * মুদ্রালিপি শোধনকল্পে যথেষ্ট পরিশ্রম (করিয়াছেন)"—এই বাক্যদ্বারা কি ইহাই বুঝিতে হইবে যে, গ্রন্থমধ্যস্থ যাবতীয় বিষয় একমাত্র তাঁহারই অনুমোদিত? তিনি হয়ত অনেক অংশের মুদ্রালিপি শোধন করেনও নাই (কারণ তৎকার্য্যে অন্য ব্যক্তিরও নাম লিপিবদ্ধ আছে), তত্তৎ অংশ তাঁহার সমর্থন ব্যতীতই মুদ্রিত হইয়া থাকিবে। আর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরও সেই গ্রন্থের অনুমোদন সম্বন্ধে কোনও কথা ভূমিকায় নাই। কেবল এইরূপ লিখিত আছে,—'বৈষ্ণবমাত্রেই অবগত আছেন যে, কালের দুর্দ্দমনীয় প্রভাবে বৈষ্ণবধর্ম্মের বিরল প্রচার সময়ে এই ধর্ম্ম সংরক্ষণে ও প্রচারে * * শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ মহাশয় সর্ব্বাগ্রে যে যত্ন করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন, তাহা অতুলনীয়। নিরপেক্ষ বৈষ্ণবমণ্ডলী সকলেই তাঁহাদের নিকট বহু ঋণপাশে বদ্ধ। পার্থিব স্বার্থ পরিহার-পূর্ব্বক ধর্ম্মের বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ আজকাল বড়ই দুরূহ; কিন্তু এরূপ অপ্রিয়কার্য্য করিতে ইঁহাদের পরাঙ্মুখতা নাই, ইহা উদারাশয় কোবিদ্মাত্রই লক্ষ্য করিবেন।"—এরূপ উক্তি দেখিয়াই কি মনে করিতে হইবে যে, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উক্ত গ্রন্থের সকল সিদ্ধান্ত বিষয়ে অনুমোদন করিয়াছিলেন? সেরূপ কথা ভূমিকার কোথায়ও নাই।

প্রবন্ধলেখক স্বধামগত বিপিনবিহারী গোস্বামীর সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে অন্যায়পূর্ব্বক যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তদ্রূপ বালভাষিতা কথার আমরা তীব্র প্রতিবাদ করি। ঐরূপ অপ্রাসঙ্গিক কথা লিখিবার তাঁহার কোনও অধিকার নাই। তিনি কোনও ব্যক্তির সিদ্ধান্ত, মত বা ভ্রম-ধারণার বিষয়ে আলোচনা করিতে

পারেন; কিন্তু মৃত ব্যক্তির চরিত্র লইয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট আলোচনা করা কখনই তাঁহার বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। হয়ত কোনও ব্যক্তি অধিক পরিমাণে মাদকদ্রব্য সেবন করিতেন, হয়ত কোনও ব্যক্তির কোনও বিষয়ে অধিক লোভ ছিল, সেইরূপ কথা লইয়া তাঁহার সম্বন্ধে (বিশেষতঃ কোন মৃতব্যক্তির সম্বন্ধে) সাধারণ্যে অযথা প্রচার করা কখনই উচিত নহে। বক্তৃতা বা কাগজের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে এরূপ কথা প্রচারিত হইলে, সেরূপ চেষ্টাকে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই গর্হণ করিবেন। আশা করি, প্রবন্ধলেখক মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ হইতে এইরূপ কথা উঠাইয়া লইবেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কাহারও ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধে কোনও কথা কখনও লোকসমাজে প্রচার করেন নাই বা করেন না। তবে তিনি শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম-বিরোধী অসৎমতবাদের বা বৈষ্ণবতার নামে 'অসত্য', অসচ্চেষ্টা ও চরিত্রহীনতা প্রভৃতির বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় কোনও কালেই দেন না।

স্বধামগত বিপিনবিহারীগোস্বামী মহাশয় তাঁহার 'দশমূলরস' নামক পুস্তকে পরমপূজ্যপাদ গৌরপার্ষদ আচার্য্যবর্য্য জগদ্গুরু শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভুতে জাতিবুদ্ধিরূপ ভীষণ অপরাধ করিয়া যে সকল অপরাধময়ী কথা লিখিয়াছেন, তাহা কখনই কোন বৈষ্ণবাচার্য্য সহ্য করিতে পারেন না। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও তাহা সহ্য করেন নাই। আচার্য্যবর্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পূর্ব্বাচার্য্যপ্রবর শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের ভক্তিসন্দর্ভের (২৩৮ সংখ্যার)—"বৈষ্ণববিদ্বেষীচেৎ পরিত্যাজ্য এব। 'গুরোরপ্যবলিপ্তস্যে'তি স্মরণাৎ। তস্য বৈষ্ণবভাব-রাহিত্যেন অবৈষ্ণবতয়া 'অবৈষ্ণবোপদিষ্টেনে'তিবচনবিষয়ত্বাচ্চ। যথোক্তলক্ষণস্য শ্রীগুরোরবিদ্যমানতায়াস্তু তস্যৈব মহাভাগবতস্যৈকস্য নিত্যসেবনং পরমং শ্রেয়ঃ।" অর্থাৎ "গুরু বৈষ্ণব-বিদ্বেষী হইলে, 'গুরোরপ্যবলিপ্তস্য' শ্লোক স্মরণ করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে। সেই গুরুর বৈষ্ণবতাভাব ও অবৈষ্ণবতা দ্বারা গুরুত্ব থাকিতে পারে না, জানিবে। ভক্ত তাদৃশ গুরুকে 'অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন' বচনের বিষয় জানিয়া তাঁহাকে বিদায় দিবেন। উক্ত-লক্ষণবিশিষ্ট শ্রীগুরুদেবের অবর্ত্তমানে তাদৃশ কোন এক মহাভাগবতের নিত্যসেবা করাই পরমশ্রেয়ঃ।"—এই বাক্যের যাথার্থ্যই প্রচার করিয়াছেন। আচার্য্যবর্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কোন কালেই ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা বা করণাপাটব দোষ নাই। তবে আমরা তদ্দোষচতুষ্টয়ে রঞ্জিত চশমা পরিয়া বৈষ্ণব-চরণে অপরাধময়ী দুর্ব্বুদ্ধি প্রবল করিবার জন্য আচার্য্যেরও সেইরূপ দোষ আছে, মনে করিতে পারি। চলন্ত ট্রেনের আরোহী যেরূপ পার্শ্বস্থিত বৃক্ষ ও বনরাজি দেখিয়া মনে করেন, আমি ঠিকই আছি, গাছগুলিই দ্রুতবেগে দৌড়াইতেছে, তদ্রূপ ভ্রমপ্রমাদ-দোষদুষ্ট বদ্ধজীব আমরা, অনেক সময়ে মনে করিতে পারি, "আমার তীক্ষ্ণবুদ্ধি, উপযুক্ত-বিদ্যা, সদ্ যুক্তিতে কখনই ভুলভ্রান্তি থাকিতে পারে না; আমি ঠিকই আছি, আচার্য্য বা গুরুদেবই বেঠিক।" শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আচরণের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে, শ্রীভক্তিবিনোদের ভাষায়ই বলিতে হয়, "বৈষ্ণবের আচরণ বিদ্বচ্চক্ষু ব্যতীত দর্শন করা যায় না।" বৈষ্ণবাচার্য্য বা সদ্গুরু বহুজীবকে বহুভাবে কৃপা করিবার জন্য নানাপ্রকার কৌশল বিস্তার করেন। জগদ্গুরু গৌরসুন্দর ঈশ্বরপুরীকে কৃপা করিবার জন্য তাঁহার শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তিনি ঈশ্বরপুরীর শিষ্য নহেন, ঈশ্বরপুরীই তাঁহার শিষ্য। বৈষ্ণবগুরু কখনও গুরুব্রুবের ন্যায়—

"আমি গুরু, তোমরা সকলে আমার শিষ্য"—এরূপ কথা বলেন না। পরন্তু তিনি তাঁহার শিষ্যবর্গকে 'অমানী মানদ' ধর্ম্ম শিক্ষাদান কল্পে বলেন, "আপনারাই আমার গুরুরূপে বহুমূর্ত্তিতে প্রকটমান। অন্বয়ভাবে আপনারাই আমার গুরুবর্গ ও শিক্ষকবৃন্দ, ব্যতিরেকভাবে আপনারাই আপনাদের ভজনোপযোগী সময়ে মাদৃশ নরাধমের প্রলাপিত-বাক্য শ্রবণে ব্যস্ত। তাঁহাদের সহিতই আমি শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে শ্রুতবাণী একযোগে কীর্ত্তন করিতে সমর্থ বলিয়া মনে করিতেছি।" ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদের ন্যায় জড়প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী জীবের সৌভাগ্যোদয়ের সুযোগপ্রদান করিবার জন্য আমাদিগকে নানাপ্রকার কৌশলে হরিভজনে নিযুক্ত করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। কখনও বা আমাদিগকে উচ্চ সম্মান, উচ্চ আসন, এমন কি গুরু-পদবী পর্য্যন্তও প্রদান করিতে কুণ্ঠিত না হইয়া, অমানী-মানদ বৈষ্ণব ঠাকুর আমাদিগকে চৈতন্যমনোঽভীষ্ট হরিকথা কীর্ত্তন শুনিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। যাঁহাদের দুর্দ্দৈব প্রবল, তাঁহারা এরূপ সুযোগ পাইয়াও বঞ্চিত হইয়াছেন। সুকৃতিমান্ ব্যক্তির মঙ্গল হইয়াছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কখনই গুরুব্রুবকে 'গুরু' বলিয়া আশ্রয় বা তাঁহার সেবা করেন নাই; তবে তিনি "স্বভাবস্থৈঃ কর্ম্মজড়ান্ বঞ্চয়ন্ দ্রবিণাদিভিঃ" (হঃ ভঃ বিঃ ৯।১০৩ ধৃত পঞ্চরাত্র-বাক্য)—এই ন্যায়ানুসারে আত্মবঞ্চক ব্যক্তিকে বঞ্চনা করিয়া ব্যতিরেক ভাবে তাঁহাকে কৃপাই করিয়াছেন।

এই কথাগুলি বিদ্বৎপ্রতীতির সহিত আলোচনা করিলে প্রবন্ধলেখক ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সম্বন্ধে সকল কুতর্কেরই উত্তর ও মীমাংসা পাইতে পারিবেন।

গৌড়ীয় কখনও স্থূললিঙ্গদেহের প্রাকৃত-বিচারে আবদ্ধ অক্ষজ বিচারক নহেন, তিনি অধোক্ষজ-সেবক; অতএব সত্যের প্রতিই তাঁহার শ্রদ্ধা-ভক্তি। বিশ্বের যে কোন স্থানে যতটুকু সত্য থাকুক, গৌড়ীয় সেই পরিমাণে তাহার সমাদর করেন। তিনি অসত্যকে 'সত্য' বলিয়া চালাইবার পক্ষপাতী বা প্রশ্রয়দাতা নহেন। প্রবন্ধ-লেখক পরলোকগত শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয়ের "গৌরসুন্দর" গ্রন্থের ১২৮ পৃষ্ঠা হইতে যে অংশটী উদ্ধার করিয়াছেন, তন্মধ্যে 'গৌরনাগরী'বাদের কোনও কথাই ত' দেখা যায় না। তিনি কি অযথা জোর করিয়া সর্ব্বত্রই 'গৌরনাগরী'বাদ কোথায়ও বিন্দুবিসর্গ না থাকিলেও টানিয়া বাহির করিতে চান? শ্রীলক্ষ্মীদেবী নারায়ণের বক্ষবিলাসিনী; শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের পতিপত্নীভাব বা 'রস' নারায়ণ-শক্তি 'ভূ'শক্তি-স্বরূপিণী বিষ্ণুপ্রিয়ায় ও গৌর-নারায়ণে থাকিবে,ইহাতে আপত্তি কি? গৌরনারায়ণ তাঁহার গার্হস্থ্যলীলায় এইরূপভাবে বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবা নিত্যকালই গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার' পাতিব্রত্যরসে বা নারায়ণের প্রতি লক্ষ্মীর পাতিব্রত্যরসে মধুর-রস-সাদৃশ্য থাকিলেও তাহা দাস্যের স্তরেই স্থিত।

প্রবন্ধলেখক মহাশয় লিখিয়াছেন, গৌরেন্দ্রিয়-তোষণপর চিচ্ছক্তিস্বরূপিণী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আনুগত্যে যে 'নাগরী' অভিমান, তাহা কখনও আত্মেন্দ্রিয়তোষণপর শাক্তধর্ম্ম বা অবৈষ্ণবধর্ম্ম নহে। অনুকরণপ্রিয়, বাস্তবসত্যকে কল্পনার সহিত সমন্বয় করিতে প্রয়াসী প্রবন্ধলেখকমহোদয় যতই কল্পনার রাজ্যে উড্ডীয়মান্ হইবার প্রয়াস করিতেছেন, ততই তিনি নিজের অনভিজ্ঞতা ও ভজন রাজ্যের যে, কোনও খবর

বা কোনও উপলব্ধির কথা তিনি জানেন না, কেবল কতকগুলি বইপড়া বদ্‌হজমপর সিদ্ধান্ত লইয়াই নাড়াচাড়া করিয়া থাকেন মাত্র, তাহারই প্রমাণ প্রতি পদে পদে ভাল করিয়া প্রদান করিতেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্যে 'নাগরী' অভিমান হইতে পারে না; আর তাহা বিষ্ণুপ্রিয়া বা গৌরসুন্দরের ইচ্ছানুরূপ নহে। গৌরসুন্দর কখনও ইচ্ছা করেন না যে, বিষ্ণুপ্রিয়ার কোনও সপত্নী হউক, বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীও কখনও ইচ্ছা করেন না যে, তিনি কাহারও সহিত সাপত্ন্য-ধর্ম্ম-বিশিষ্টা হন। সুতরাং তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি কেহ 'নাগরী' সাজিতে যান, তাহা হইলে সেইরূপ কার্য্য গৌরেন্দ্রিয়-তর্পণ-বাধক হওয়ায় বা তাহাতে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আনুগত্যের অভাবরাহিত্য থাকায়, তাহা নিশ্চয়ই আত্মেন্দ্রিতোষণপর শাক্তধর্ম্ম বা অবৈষ্ণবধর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হইবে। যদি পূর্ব্বপক্ষ হয়, কেনইবা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সাপত্ন্য-ধর্ম্মবিশিষ্টা হইতে ইচ্ছা করেন না, গৌরসুন্দরেরই বা কেন তাহা অভিলাষ নহে,—তদুত্তর এইযে, বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী গৌরগণোদ্দেশদীপিকার নির্দ্দেশানুসারে 'ভূ'শক্তি-স্বরূপিণী, যথা—

শ্রীসনাতনমিশ্রোঽয়ং পুরা সত্রাজিতো নৃপঃ।
বিষ্ণুপ্রিয়া জগন্মাতা যৎকন্যা-ভূস্বরূপিণী।।

'শ্রী', 'ভূ' ও 'নীলা'—ইঁহারা নারায়ণের শক্তিত্রয়। 'ভূ'শক্তির শক্তিমদ্বিগ্রহ—শ্রীনারায়ণ, অতএব 'ভূ'শক্তিস্বরূপিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পতি শ্রীগৌর-নারায়ণ। বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণের পাতিব্রত্যরসে সাপত্ন্যভাব নাই, ইহা পারমার্থিক মাত্রেই জানেন। লক্ষ্মীদেবীর অসংখ্য দাসী আছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা নারায়ণের সহিত পত্নীভাববিশিষ্টা বা লক্ষ্মীদেবীর সহিত সাপত্ন্যভাব-বিশিষ্টা নহেন—লক্ষ্মীর দাসীমাত্র, তদ্রূপ বিষ্ণুপ্রিয়ার অনুগত-অভিমানে কোন বাধা নাই; কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তত্ত্ববিরোধ করিয়া 'গৌরনাগরী' সাজিবার চেষ্টা করিলে তাহাতে বিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্য-ধর্ম্ম-বর্জ্জন ও গৌরেন্দ্রিয়-প্রীতির পরিবর্ত্তে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিরূপ কামেরই প্রাবল্য প্রমাণিত হইবে। প্রবন্ধলেখক আরও লিখিয়াছেন, "ব্রজগোপীগণ যেমন শ্রীকৃষ্ণকে 'প্রাণকান্ত' 'নাগর' বলিয়া সম্বোধন করিলেও তাঁহাদিগের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে ভোগের জন্য আত্মেন্দ্রিয়তোষণপর কোন অভিলাষ ছিল না, পরন্তু কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণের নিমিত্ত আশ্রয় শিরোমণি শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর দ্বারা কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ত্তি করাইয়া ধন্য হইতেন, তদ্রূপ যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বিষয়বিগ্রহজ্ঞানে নাগররূপে দর্শন করেন, তাঁহাদেরও আত্মেন্দ্রিয়তোষণপর কোন সম্ভোগেচ্ছা নাই, পরন্তু তাঁহাকে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার দ্বারা আনন্দদান করাই তাঁহাদের একমাত্র স্বার্থ, সুতরাং 'গৌরনাগর'-বাদে আত্মেন্দ্রিয়তোষণরূপ কোন ব্যভিচার নাই। 'গৌরনাগরী'গণ উক্ত সত্যভামা বা কুব্জার ভাবাশ্রিত নহেন, পরন্তু তাঁহারা চিচ্ছক্তিস্বরূপিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার অনুগত।"

এইরূপ কাল্পনিক-যুক্তি-পেষণপর প্রশ্ন গৌড়ীয়মঠের যে কোনও সেবকের নিকট যদি প্রবন্ধলেখক মহোদয় কোনও দিন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহারা তাহার সদুত্তর দিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাঁহার যে কাল্পনিক বুদ্ধিকে মস্তিকে পুরিয়া রাখিয়াছেন,তাহা সাধুকৃপায় বিরেচিত না হওয়া পর্য্যন্ত, তিনি

সৎসিদ্ধান্ত ধরিতে পারিবেন না। প্রবন্ধলেখকের ভুল কোন্ জায়গায় রহিয়াছে, তাহা তিনি ধরিতে পারিতেছেন না। তিনি কল্পনার বলে মনে করেন যে, যখন গৌরই কৃষ্ণ, তখন বিষ্ণুপ্রিয়াও রাধিকা। পরন্তু তাহা নহে। এইরূপ সিদ্ধান্ত গোস্বামিশাস্ত্রের কোথায়ও নাই। শ্রীগৌরসুন্দর রাধাকৃষ্ণ-মিলিত তনু; সুতরাং ভক্তবাৎসল্য-বিধায়িনী জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে রাধাকৃষ্ণের সেবিকা বলা যাইতে পারে। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে একজন বৃষভানুনন্দিনীর সহচরী, ভক্তাপরমেশ্বরী নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। শ্রীগৌরসুন্দর আদিলীলায় যে-স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নারায়ণ-স্বরূপ। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে তিনি বৈধপত্নী-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী কিছু সেইরূপ বৈধ বিচারের অন্তর্গত নহেন। সুতরাং বার্ষভানবীদেবীর রস বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর উপর চাপাইলে রসাভাসদোষ, তত্ত্ববিরোধ ও সিদ্ধান্তবিরোধ ঘটিবে। তাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কখনই ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা সেবা হইতে পারে না। কারণ—

"রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্ত-বিরোধ।
সহিতে না পারে প্রভু মনে হয় ক্রোধ।।"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫ম।৯৭

দ্বিতীয়তঃ ব্রজগোপীগণ শ্রীরাধার সহিত কৃষ্ণের মিলন ইচ্ছা করিলেও শ্রীমতী রাধিকা ব্রজগোপীগণকে কৃষ্ণের সহিত সঙ্গম করাইয়া থাকেন; কিন্তু 'ভূ'শক্তি-স্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী কখনও তাঁহার পতির সহিত অপর স্ত্রীর মিলন হউক, ইহা ইচ্ছা করেন না বা 'ভূ'শক্তির শক্তিমত্তত্ত্ব এইরূপ চেষ্টাবিশিষ্ট নহে। সুতরাং গৌর ও বিষ্ণুপ্রিয়ার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গৌরসুন্দরকে 'নাগর' প্রভৃতি বলিয়া সম্বোধন করা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ ব্যতীত আর কি? যাঁহারা এইরূপ চেষ্টাবিশিষ্ট, তাঁহারা নিজদিগকে 'গৌরভক্ত' বলিয়া যতই মনে করুন না কেন, প্রকৃত গৌরভক্তগণ তাঁহাদিগকে 'গৌরভক্ত' না বলিয়া 'গৌরভোগী' বলিয়া থাকেন। আর যদি বিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্যেই কেহ গৌরভজন করিতে চান, তাহা হইলে বিষ্ণুপ্রিয়ার আদর্শই গ্রহণ করা উচিত। বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী গৌরসুন্দরের প্রেমভক্তি-সহায়কারিণী। তিনি বিপ্রলম্ভবিগ্রহ গৌরসুন্দরের রস-পরিপোষণকারিণী। সন্ন্যাসলীলা প্রদর্শন করিবার পূর্ব্বে গৌরসুন্দর তাঁহাকে যে উপদেশ প্রদান করিয়া-ছিলেন—

তোমার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া, সার্থক করহ ইহা,
মিছা শোক না করিহ আর মনে।
এ তোরে কহিলু কথা, দূর কর আন চিন্তা
মন দেহ কৃষ্ণের চরণে।।"

—চৈতন্য মঙ্গল মধ্যখণ্ড

সেই উপদেশ শিরে গ্রহণ করিয়া জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী বিপ্রলম্ভবিগ্রহ গৌরসুন্দরের কৃষ্ণান্বেষণ চেষ্টার যেরূপ অনুসরণ করিয়াছেন, আমরা তাহা শ্রীল ঘনশ্যাম ঠাকুরের লেখনীতে এইরূপ পাই—

"কদাচিৎ নিদ্রা হৈলে শয়ন-ভূমিতে।।
কনক জিনিয়া অঙ্গ সে অতি মলিন।
কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর শরীর প্রায় ক্ষীণ।।
হরিনাম সংখ্যাপূর্ণ তণ্ডুলে করয়।
সে তণ্ডুল পাক করি' প্রভুরে অর্পয়।।
তাহারই কিঞ্চিন্মাত্র করেন ভক্ষণ।
কেহ না জানয়ে কেনে রাখয়ে জীবন।।"

—শ্রীভক্তিরত্নাকর, চতুর্থ তরঙ্গ

বিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্য করিতে হইলে এইরূপ বিপ্রলম্ভ ভাবের অনুসরণ করিয়াই নিষ্কপটে কৃষ্ণভজন করিতে হইবে। তাহা না করিয়া কেহ যদি গৌরসুন্দরকে তাঁহার ইন্দ্রিয়তর্পণ-বিধায়ক 'নাগর' মনে করেন, তাহা হইলে তিনি বিষ্ণু প্রিয়াদেবীর আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া স্বমত কল্পনা করিয়াছেন, জানিতে হইবে।

প্রবন্ধলেখক মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধের সর্ব্বশেষভাগে লিখিয়াছেন,—"শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর বিপ্রলম্ভরসবিগ্রহ, সম্ভোগ রসবিগ্রহ নহেন—ইহাই তাঁহাদের (গৌড়ীয়ের) ধারণা। শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া অর্চ্চাশ্রীবিগ্রহ—ভজনীয় বিগ্রহ নহেন—ইহাই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত।"

'শ্রীগৌরসুন্দর' যে বিপ্রলম্ভ-রসবিগ্রহ এবং 'কৃষ্ণ' যে সম্ভোগরস বিগ্রহ, ইহা কেবল গৌড়ীয়ের ধারণা নহে, সমগ্র গোস্বামিশাস্ত্র, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর লেখনী তাহাই প্রতি বর্ণে বর্ণে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। সম্ভোগরস বিগ্রহ বলিবামাত্রই তিনি আর 'গৌর' থাকিলেন না, তিনি তখন দ্বিভুজ মুরলীধর গোপেন্দ্রনন্দনশ্যাম শ্রীকৃষ্ণরূপে সেব্য হইলেন। প্রবন্ধলেখক মহাশয় গৌড়ীয়ের সিদ্ধান্তগুলি বুঝিতে অসমর্থ হইয়াই এরূপ 'এলোমেলো' কথা লিখিয়াছেন। 'গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া অর্চ্চাশ্রীবিগ্রহ' 'ভজনীয় শ্রীবিগ্রহ' নহে, এরূপ কথা গৌড়ীয় বলেন নাই। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রবন্ধলেখক মহোদয় তাঁহার বিদ্বৎ প্রতীতির অভাবে এক বুঝিতে আর এক বুঝিয়া বদ্‌হজমের উদ্‌গার করিয়াছেন মাত্র। গৌড়ীয় বলেন, "অর্চ্চনমার্গে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া পূজিত হন, ভজনমার্গে শ্রীগৌরগদাধর।" অর্চ্চনমার্গে সম্ভ্রমবুদ্ধি বা ঐশ্বর্য্য প্রবল। বৈধ-অর্চ্চনকারী যে রাধাকৃষ্ণের পূজা করেন, তাহাতে প্রকৃতপক্ষে শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণেরই পূজা হইয়া থাকে। কারণ 'ঐশ্বর্য্য-শিথিলপ্রেমে' কৃষ্ণের প্রীতি বা সেবা হইতে পারে না। অর্চ্চনমার্গে সম্ভ্রমবুদ্ধি প্রবলা; বৈধ-অর্চ্চনকারী কৃষ্ণকে তাঁহার উচ্ছিষ্ট ফল ভোজন করাইতে সাহসী হন না কিংবা অবৈধসাহস দেখাইয়া অধিকার লঙ্ঘনও করেন না। সুতরাং তাঁহার সম্ভ্রমরূপা ঐশ্বর্য্য-বুদ্ধিতে যে পূজা হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্মীনারায়ণেরই পূজা। কিন্তু ভজনমার্গে এরূপ ঐশ্বর্য্য বা সম্ভ্রমবুদ্ধির প্রাবল্য নাই। অতএব রাগমার্গে শ্রীগৌর-গদাধর সেবিত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে 'ভূ'শক্তিস্বরূপিণী বলিয়াছেন এবং 'ভূ'শক্তির শক্তিমদ্বিগ্রহ শ্রীনারায়ণ—ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। অতএব গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার

পূজা যে লক্ষ্মীনারায়ণেরই পূজা, এবিষয়ে আর সন্দেহ কি? যেরূপ লক্ষ্মীনারায়ণ তত্তৎ উপাস্যের অধিকারীর নিকট তাঁহাদের ভজনীয় বস্তু, তদ্রূপ গৌরবিষ্ণুপ্রিয়াও লক্ষ্মীনারায়ণরূপে ভজনীয় বস্তু। লক্ষ্মীনারায়ণ ভজনাকারিগণ যেরূপ তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যবিগ্রহ নারায়ণকে জোর পূর্ব্বক সম্ভোগরসবিগ্রহ 'নাগর' সাজাইয়া তত্ত্ববিরোধ করেন না, তদ্রূপ গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার ভজনে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু অন্যায় ও অবৈধরূপে গৌরকে 'নাগর' সাজাইবার চেষ্টা করিলে শুদ্ধ ভজনকারিগণ বলিবেন যে, ঐ সকল ব্যক্তি ভজনবিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, কেবল অবৈধ-কল্পনা ও অনুকরণপ্রিয়। ঐরূপ কাল্পনিক চেষ্টার নাম পৌত্তলিকতা। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কোনও বৈষ্ণব-মহাজন অর্থাৎ গৌরমনোঽভীষ্ট প্রচারক ষড়্‌গোস্বামী, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী, চৈতন্য-লীলার ব্যাস ঠাকুর-বৃন্দাবন—কেহই এরূপ পৌত্তলিকতা প্রচার করেন নাই। কল্পিত মহাজনের কথা কিম্বা আউল-বাউল-সহজিয়াগণের ন্যায় 'মহাজন যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে বলেন নাই, সেই সকল অসৎ সিদ্ধান্ত' মহাজনের ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা দেখাইলে তাহাই যে মহাজনগণের সমর্থিত বলিয়া প্রমাণিত হইবে, এরূপ কথা কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন না। অতএব প্রবন্ধলেখকের সকল পূর্ব্বপক্ষগুলিই মহাজনবাক্য ও শাস্ত্রযুক্তিমূলে সম্পূর্ণভাবে খণ্ডিত হইল। আশা করি, প্রবন্ধলেখক এই যুক্তিগুলি মনোযোগের সহিত অনুধাবন করিবেন এবং তাঁহার যদি কিছু অন্যায় গোঁড়ামি থাকিয়া থাকে, সেইগুলিকে দুঃসঙ্গজ্ঞানে দূরে পরিহার করিয়া নিরপেক্ষ সত্যের অনুসন্ধানপূর্ব্বক পরমার্থদ মনুষ্যজন্ম সার্থক করিবেন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয়

শ্রীকোলদ্বীপ (নবদ্বীপ সহর) হইতে জনৈক প্রবীণ ব্রাহ্মণমহোদয় শ্রীশ্রীমহামন্ত্র-কীর্ত্তন-বিরোধিসম্প্রদায়ের অভিমত শ্রীপত্রে খণ্ডন করিবার জন্য একখানি পত্র লিখিয়াছেন। আমরা "শ্রীমহামন্ত্র কীর্ত্তনীয় কি না?" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীপত্রে এ-বিষয় বহু পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। জগতে—কীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত জগতে বহির্ম্মুখ জীবকুল যে কত প্রকারে কীর্ত্তন বাধা দিবার চেষ্টা করিয়া নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করিবার প্রয়াস করিতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন যে, কলিযুগ সর্ব্বদোষের আকর হইলেও তাহাতে একটী মহৎ গুণ আছে যে, এই কলিকালে একমাত্র হরিকীর্ত্তন দ্বারাই অতি সহজেই জীবের পরম প্রয়োজন লাভ হয়। কিন্তু দুর্দ্দৈববশে জীব এরূপ সুযোগ পাইয়াও নানাভাবে কীর্ত্তনের বিরোধী হইয়া পড়িতেছে! পূর্ব্বে শুনা যাইত যে, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি কৃষ্ণাভক্ত-সম্প্রদায়ই কীর্ত্তনের বিরোধী অর্থাৎ তাঁহারা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিকে দুর্ব্বলা মনে করিয়া কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদিকে সবল-সাধন জ্ঞান করেন এবং কখনও বা অন্য শুভ-ক্রিয়ার সহিত নামকীর্ত্তনের সাম্যজ্ঞান, 'নামে' অর্থবাদ বা 'নাম'কে কাল্পনিক-বস্তু বলিয়া ধারণা করিয়া থাকেন। কিন্তু কলির প্রাবল্যে আবার একপ্রকার নূতন কীর্ত্তনবিরোধি-দলের সৃষ্টি হইয়াছে, যাঁহারা নিজদিগকে 'ভক্ত', 'বৈষ্ণব', 'মহাপ্রভুর অনুগত', 'নামপরায়ণ', 'নামবিশ্বাসী', 'ভজনানন্দী'

প্রভৃতি বলিয়া ও বোলাইয়াও কার্য্যতঃ কলিযুগের একমাত্র সাধন ও সাধ্য শ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রেষ্ঠ-দান 'শ্রীনাম-কীর্ত্তনে'র বিরোধী হইয়া পড়িতেছেন। ইঁহারা বলেন, "কলিযুগের তারকব্রহ্ম নাম বা মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করা নিষিদ্ধ, 'নামকীর্ত্তন' বলিতে অন্যান্য নামকীর্ত্তন বুঝিতে হইবে।"

হায়! বঞ্চিত আমরা, আমাদের এইরূপ দুর্দ্দৈবের বিষয় জানিয়াই অন্তর্যামী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর গাহিয়াছেন,—

"দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ"

এই জন্যই তিনি "আপনি আচরি" ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়"—এই ব্যাকানুসারে স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও নিজ 'হরেকৃষ্ণ'-ষোলনাম বত্রিশ-অক্ষর শ্রীমহামন্ত্র তারকব্রহ্মনাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তাহার সাক্ষ্য আমরা তাঁহার প্রিয়স্বরূপ শ্রীল রূপগোস্বামী-আচার্য্যপাদের লেখনীতে সুস্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাই।

"হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিতরসনো নামগণনাকৃত-গ্রন্থিশ্রেণী সুভগকটিসূত্রোজ্জ্বলকরঃ।"

(শ্রীরূপগোস্বামি-কৃত চৈতন্যাষ্টক ৫ম)

অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে 'হরেকৃষ্ণ' নামোচ্চারণ করিতে যাঁহার রসনা নৃত্য করিতে থাকে এবং উচ্চারিত নামের-গণনার নিমিত্ত গ্রন্থীকৃত সুন্দর কটিসূত্রে যাঁহার উজ্জ্বল বাম-হস্ত শোভিত—এইরূপ শ্রীগৌরসুন্দর।

উক্ত শ্লোকের টীকায় গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু লিখিয়াছেন,—

"হরেকৃষ্ণেতি মন্ত্রপ্রতীক গ্রহণম্। ষোড়শনামাত্মনা দ্বাত্রিংশদক্ষরেণ মন্ত্রেণোচ্চৈরুচ্চারিতেন স্ফুরিতা কৃতনৃত্যারসনা জিহ্বা যস্য সঃ।"

(শ্রীলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত 'স্তবমালা বিভূষণ'-ভাষ্য)—'হরে কৃষ্ণ'—এই মন্ত্রমূর্ত্তির গ্রহণ। ষোড়শ-নামাত্মক দ্বাত্রিংশৎ অক্ষরযুক্ত মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হওয়ায় যাঁহার জিহ্বা নৃত্য করিতেছে।

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের লেখনীর বহুস্থানে আমরা উৎকীর্ত্তিত-মহামন্ত্র-গৌরসুন্দরের স্তব দেখিতে পাই। চৈতন্যচন্দ্রামৃতের টীকাকারও 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র যে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনীয়-নাম, তাহাই তৎটীকার মধ্যে প্রতিপাদন করিয়াছেন।

নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের আচরণেও আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহার তিন লক্ষ নামের মধ্যে তিনি এক লক্ষ নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতেন। তবে বহির্ম্মুখ-জীব-জগতের কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতারূপ স্বভাবানুসারে তৎকালেও যে উচ্চকীর্ত্তন-বিরোধি-সম্প্রদায় ছিল না, এমন নহে। তাহার সাক্ষ্য আমরা শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের লেখনীর মধ্যে দেখিতে পাই—

হরিনদী গ্রামে এক ব্রাহ্মণ দুর্জ্জন।
হরিদাসে দেখি ক্রোধে বলয়ে বচন।।

ওহে হরিদাস, একি ব্যাভার তোমার।
ডাকিয়া যে নাম লহ, কি হেতু ইহার।।
মনে মনে জপিবা, এই সে ধর্ম্ম হয়।
ডাকিয়া লইতে নাম কোন্ শাস্ত্রে কয়।।
কা'র শিক্ষা হরিনাম ডাকিয়া লইতে।
এই ত' পণ্ডিত-সভা বলহ ইহাতে।।

তদুত্তরে নামাচার্য্য কি বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রীব্যাসদেবের লেখনীতে এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছে,—

জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জ্জপন্ শ্রোতৃন্ পুনাতি চ।।
জপ-কর্ত্তা হৈতে উচ্চসংকীর্ত্তনকারী।
শতগুণাধিকফল পুরাণেতে ধরি।।
শুন বিপ্র মন দিয়া ইহার কারণ।
জপি' আপনারে সবে করয়ে পোষণ।।
উচ্চ করি' করিলে গোবিন্দ-সংকীর্ত্তন।
জন্তুমাত্র শুনিয়া, পায় বিমোচন।।
জিহ্বা পাইয়াও নর বিনা সর্ব্বপ্রাণী।
না পারে বলিতে কৃষ্ণনাম হেন ধ্বনি।।
ব্যর্থ-জন্ম তাহারা নিস্তরে যাহা হৈতে।
বল দেখি, কোন্ দোষ সে কর্ম্ম করিতে।।
কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ।
কেহ বা পোষণ করে সহস্রেক জন।।
দুইতে কে বড় ভাবি' বুঝহ আপনে।
এই অভিপ্রায় গুণ উচ্চ-সংকীর্ত্তনে।।
নামোচ্চারণমাহাত্ম্যং শ্রূয়তে মহদদ্ভুতম্।
যদুচ্চারণ-মাত্রেণ নরো যায়াৎ পরং পদম্।।
সেই বিপ্র শুনি' হরিদাসের কথন।
বলিতে লাগিল ক্রোধে মহাদুর্ব্বচন।।

ইহার পরের ঘটনা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের পাঠকমাত্রই জানেন এবং সেইরূপ মহামন্ত্রের উচ্চকীর্ত্তন-বিরোধী দুর্জ্জন ব্রাহ্মণব্রুবের সম্বন্ধে ঠাকুর বৃন্দাবনের অভিমত, যাহা পরে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও চৈতন্য-ভাগবতপাঠীর অবিদিত নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এস্থলে 'কীর্ত্তন' শব্দে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুকার এইরূপ বলিয়াছেন,—'উচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনম্'—উচ্চৈঃস্বরে কথন বা উচ্চারণের নামই 'কীর্ত্তন'। 'সদা' শব্দ দ্বারা স্থান, পাত্র বা কালভেদ রহিত হইয়াছে। সুতরাং সকল সময়েই সর্ব্বভাবে 'হরিনাম' মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয়। কোন কোন ভক্তবিটল বলিয়া থাকেন যে, "স্বীকার করিলাম না হয় 'মহামন্ত্র' কীর্ত্তনীয়, কিন্তু উহা কেবল সংখ্যা রাখিয়া কীর্ত্তনযোগ্য; খোলকরতালেরর সহিত কীর্ত্তনীয় নহে।" ঐ সকল ব্যক্তির এরূপ কুতর্ক উঠাইবার কারণ আর কিছুই নহে, কোন ছলে ভুবনমঙ্গল তারকব্রহ্মনামের কীর্ত্তনে বাধা প্রদান করা। ঐরূপ বুদ্ধি 'নামে' ভেদবুদ্ধি হইতেই উত্থিত। গোস্বামিশাস্ত্রের বহুস্থানে অগ্নিপুরাণোক্ত এই বাক্যটী আমরা দেখিতে পাই—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
রটন্তি হেলয়া বাপি তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ।।

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।"—এই মহামন্ত্র যাঁহারা অবহেলাপূর্ব্বকও উচ্চারণ করেন, তাঁহারা কৃতার্থ হন—ইহাতে কোন সংশয় নাই।

'রটনা'—শব্দের অর্থ ঘোষণা অর্থাৎ সর্ব্বত্র প্রচার। 'হেলয়া'—শব্দের দ্বারা সংখ্যাদি নির্ব্বন্ধ না থাকিলেও—ইহা বুঝিতে হইবে। সুতরাং 'হরিনাম' মহামন্ত্র খোলকরতালের সহিত কীর্ত্তন, সংখ্যা বা নির্ব্বন্ধের সহিত কীর্ত্তন, মানসিক জপ ও উপাংশু-জপ—সর্ব্বভাবেই নিরন্তর সেবিত। যদি কেহ মনে করেন যে, "হরিনামমহামন্ত্রজপ সম্বন্ধে যখন সর্ব্ববাদিসম্মত-মত রহিয়াছে, আর তাহার উচ্চকীর্ত্তন-বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে, তখন আমরা ঐরূপ সন্দেহের কার্য্যে না যাইয়া মনে মনেই জপ করিব"—এইরূপ অবিশ্বাস ও ভেদবুদ্ধি করা হইবে। নামকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও তাহাতে শ্রদ্ধারাহিত্য-রূপ নামাপরাধ আসিয়া আমাদিগকে অসৎপথে ধাবিত করিবে। 'নাম' বলিতে একমাত্র 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্রই কলিযুগের তারকব্রহ্মনাম জানিতে হইবে। তারকব্রহ্মনামকে 'নাম' না বলিয়া "আমার ইচ্ছানুসারে আমি অন্য নাম গ্রহণ করিব"—এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হইলে হরিনামে ভেদবুদ্ধি আসিয়া আমাদিগকে নরকের পথের পথিক করিবে। তারকব্রহ্মনাম ও 'গোপাল গোবিন্দ রাম মধুসূদন" প্রভৃতি নামে ভেদবুদ্ধি হওয়া কখনও উচিত নহে।

কতিপয় ব্যবসায়ী প্রাকৃত-সহজিয়া স্বমত কল্পনা করিয়া তারকব্রহ্ম-নামকে কেবলমাত্র জপ্য বলিতেছেন। এইশ্রেণীর ব্যক্তি নিশ্চয়ই নামবিক্রয়ী, সন্দেহ নাই। তাঁহারা মনে করেন, "মহামন্ত্র-তারকব্রহ্ম নাম যদি সকল জীবের নিকট উচ্চৈঃস্বরে ঘোষিত হন, তাহা হইলে লোক আর তাঁহাদের ন্যায় বর্ণিগ্‌দিকের নিকট হইতে মহামন্ত্রকে গুহ্যবস্তু জ্ঞান করিয়া অর্থ-বিনিময়ে গ্রহণ করিতে আসিবে না, তাঁহাদের ব্যবসার জিনিষ (!)

সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িলে তাঁহাদের লোকবঞ্চনাবৃত্তিটী আর চলিবে না। অতএব তারকব্রহ্মনামকে মন্ত্রের ন্যায় গোপনীয় বস্তু রাখিয়া মন্ত্র-ব্যবসায়ের ন্যায় তারকব্রহ্মনামেরও একটী 'নূতন ব্যবসায়' সৃষ্টি করা যাক্"।

অনর্থযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে উচ্চৈঃস্বরে তারকব্রহ্ম-নামের কীর্ত্তনই শ্রেয়ঃ। অনর্থযুক্ত ব্যক্তি যদি তারকব্রহ্মনাম নির্জ্জনে জপের ছলনা দেখাইতে যান, তাহা হইলে সে ব্যক্তি হরিনাম জপ করিবার পরিবর্ত্তে হয় বিষয়-জপ, না হয় স্ত্রী-জপ, না হয় বাড়ীর বেগুন-খেতের কথা, গরুবাছুরের কথা কিম্বা সন্দেশ রসগোল্লার কথাই স্মরণ করিবে। অতএব সকল সময় সর্ব্বতোভাবে উচ্চৈঃস্বরে তারকব্রহ্মনাম কীর্ত্তন ব্যতীত আর মঙ্গলের দ্বিতীয় পন্থা নাই। সকলে সদ্গুরুর আনুগত্যে সর্ব্বক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে করিতে বলুন্ অথবা মৃদঙ্গ-করতাল সহযোগে সংকীর্ত্তন করিয়া বলুন্—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

নির্য্যাণ

নিষ্ক্রমণ, নির্গমন, দেহ হইতে জীবাত্মার অপগম, মুক্তি প্রভৃতি অর্থে 'নির্য্যাণ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জীবাত্মা অণু হইলেও ত্রিগুণাত্মক বা সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের অধীন নহেন। তবে তাঁহার সম্বন্ধে ঐ সকল বাক্য প্রয়োগ করিবার কারণ কি? এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে আমরা জানিতে পারি যে, কর্ম্মফলানুসারে জীব নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করে এবং জন্ম-মৃত্যুর অধীন হয়। এই স্থলে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, জীব যখন সৃষ্ট হইয়া ছিল তৎকালে তাহার কোন কর্ম্ম ছিল না। তবে কেন তিনি প্রপঞ্চে নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন? এইরূপ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতে পারে না। কেননা, জীব নিত্যবস্তু। তিনি কোন নির্দ্দিষ্ট কালে সৃষ্ট হইয়াছিলেন এরূপও নহে, তাহাতে জড়ীয় ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিবিধ কালের ব্যবধান না থাকায়, তাঁহার সম্বন্ধে ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। কর্ম্ম বিনাশযোগ্য হইলেও অনাদি। ব্রহ্মসূত্র বলেন,—"কর্ম্মবিভাগাৎ ইতি ন অনাদিত্বাৎ" অর্থাৎ কর্ম্মবিভাগ ছিল না এরূপ নহে। কেননা কর্ম্ম অনাদি।

উপরি উক্ত বাক্যগুলি মনোযোগ সহকারে আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, কর্ম্মফলবশে জীবের জন্ম ও মৃত্যু হইয়া থাকে। কর্ম্মফল-বশে জীব আপনাকে বদ্ধ মনে করিয়া মুক্তির নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া থাকেন। জ্ঞানিগণের মতে ব্রহ্মই, অবিদ্যা বা ভ্রমবশতঃ আপনাকে 'জীব' জ্ঞান করিয়া নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করিতে করিতে সাংসারিক ক্লেশ ভোগ করিতে থাকেন। ভ্রম বিদূরিত হইলেই তিনি সমুদয় ক্লেশ হইতে মুক্ত হন। ইহারই নাম 'নির্য্যাণ' বা 'মুক্তি'। কিন্তু ঐ প্রকার বিচার সুষ্ঠু নহে। বদ্ধ ধারণা হইতেই ঐ সকল ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে। স্থূললিঙ্গ-দেহে আত্মবুদ্ধি হইতে যেরূপ কর্ম্মকাণ্ডের উদ্গম হইয়াছে, তদ্রূপ

স্বীয় বদ্ধাভিমান হইতেই মুক্তির চেষ্টাও উদিত হইয়াছে। বস্তুতঃ জীবাত্মা বদ্ধ নহেন।

কর্ম্ম দ্বিবিধ—প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ। এই দুই প্রকার কর্ম্মফলই জন্ম-মৃত্যুর কারণ। যাহার ভোগকাল আরম্ভ হয় নাই, তাহাই অপ্রারব্ধ কর্ম্ম। বর্ত্তমানে যে কর্ম্মের ফল ভোগ হইতেছে তাহাই প্রারব্ধ কর্ম্ম। জ্ঞানিগণের প্রারব্ধ কর্ম্মের নাশ না হওয়ায় তাঁহারা মুক্ত হইতে পারেন না, 'মুক্ত' অভিমান মাত্রই করিয়া থাকেন। প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলে তাঁহাদিগকে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া সুখদুঃখের অধীন হইতে হয়। এই জন্যই শ্রীচরিতামৃতকার শ্রীল গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

"জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে।।"

প্রারব্ধকর্ম্ম নাশ না হওয়া পর্য্যন্ত জীব মুক্ত হইতে পারেন না। প্রারব্ধকর্ম্ম জ্ঞান বা যোগ দ্বারা নাশ হইতে পারে না। তবে কি উপায়ে প্রারব্ধকর্ম্মের হস্ত হইতে আমরা পরিত্রাণ পাইতে পারিব? তদুত্তরে আচার্য্যপ্রবর গোস্বামী শ্রীল রূপপাদ বলিয়াছেন,—

যদ্ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কৃতিনিষ্ঠয়াপি বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নাম স্ফুরণেন তত্ত্বে প্রারব্ধ কর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ।।

অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ব্রহ্মচিন্তার ফলে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিয়াও জীব ভোগ ব্যতীত প্রারব্ধ-কর্ম্মের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন না। কিন্তু নিরপরাধে 'কৃষ্ণনাম' জিহ্বায় উচ্চারিত হইবা মাত্রই জীবের দেহারম্ভক প্রারব্ধ কর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায়, ইহা বেদ তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। সুতরাং নিরপরাধে কৃষ্ণনামোচ্চারণকারী ভক্তকে আর কর্ম্মী প্রভৃতির ন্যায় জন্ম-মৃত্যুর অধীন হইতে হয় না। কৃষ্ণভক্তই বস্তুতঃ জীবন্মুক্ত। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে,—

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে এব।।

তাৎপর্য্য এই যে,—অনাদি কর্ম্মফলে জীব প্রপঞ্চে আগমনপূর্ব্বক প্রকৃতির গুণে চালিত হইয়া নানাবিধ শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়া থাকেন। সাধুসঙ্গবলে ঐ সকল মর্ত্ত্যজীব যখন নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া যাবতীয় কর্ম্মকাণ্ডে আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক গুরুপাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণ করেন, অর্থাৎ ইহকালে বা পরকালে আমি ও আমার বলিতে যাহা কিছু আছে, সমস্ত গুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই বেদান্ত-বাক্যানুসারে ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হন, তখনই তিনি অমৃতত্ব লাভ করিয়া অর্থাৎ মুক্তি বা নির্য্যাণ প্রাপ্ত হইয়া ভগবৎসন্নিধানে তদীয় সেবার নিমিত্ত নিত্যকাল অধিষ্ঠান করেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম।।

সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে সেহ শ্রীকৃষ্ণ ভজয়।।

কবিরাজ গোস্বামীর বাক্যটী আলোচনা করিলে জানা যায় যে, ভক্তের দেহ চিদানন্দময়, মাতৃকুক্ষি হইতে যে দেহটী প্রপঞ্চে আগমন করিয়াছিল, তাহা আত্মসমর্পণ করিবা মাত্রই অন্যের অলক্ষিতভাবে বিনষ্ট হইয়া যায়। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তদীয় সারার্থদর্শিনী (৫।১২।১১) টীকায় বলিয়াছেন,—"প্রাকৃতদেহেন্দ্রিয়াদীনামেব ভক্তিসংসর্গেণাপ্রাকৃতত্বং স্পর্শমণিন্যায়েনৈব সাধু বুধ্যামহে। * * * অচিন্ত্যশক্ত্যা ভক্ত্যুপদেশকাল এব তস্য গুণাতীতানি দেহেন্দ্রিয়মনাংসি ময়া ভক্তিমাহাত্ম্যদর্শনার্থমলক্ষিতমেব সৃজন্তে মিথাভূতানি তান্যত্যলক্ষিতমেব লয়ং যান্তি।" অর্থাৎ স্পর্শমণি দ্বারা যেমন লৌহ স্বর্ণতা প্রাপ্ত হয়, ভক্তিসংসর্গে তদ্রূপ প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদিও অপ্রাকৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। ভক্তি-উপদেশকাল হইতেই ভগবান্ ভক্তিমাহাত্ম্য-প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত অচিন্ত্যশক্তিবলে ভক্তের ত্রিগুণাতীত দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন অন্যের অলক্ষিতভাবে প্রকাশিত করিয়া থাকেন এবং মিথ্যাভূত দেহেন্দ্রিয়াদি অন্যের অলক্ষিতভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অন্যের অলক্ষিত বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তত্ত্বান্ধব্যক্তিগণ তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাহাকে পূর্ব্ব পরিচয়ে পরিচিত করেন এবং তাঁহার দেহ ও জন্মমরণশীল, হাড়মাংসের থলি জ্ঞান করিয়া বৈষ্ণব-চরণে অপরাধী হন। তাদৃশ অপরাধ হইতে জীবকুলকে পরিত্রাণার্থ পরদুঃখদুঃখী শ্রীল রূপগোস্বামিচরণ বলিয়াছেন,—"ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।" অর্থাৎ এই প্রপঞ্চে উদিত ভগবদ্ভক্তের প্রাকৃতত্ব দর্শন করিবে না অর্থাৎ তাহাদিগকে প্রাকৃত দর্শনের অন্তর্ভূক্ত করা উচিত নহে। প্রাকৃত দর্শনের ফলেই বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিরূপ অপরাধের অবসর হয়। ব্রহ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, দীক্ষামাত্রই জীব মুক্তিলাভ করেন। কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিলাভই সেই মোক্ষ। যথা,—

"দীক্ষামাত্রেণ কৃষ্ণস্য নরা মোক্ষং লভন্তি বৈ।
কিং পুমর্থে সদা ভক্ত্যা পূজয়ন্ত্যচ্যুতং নরাঃ।।"

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু বৃহদ্ভাগবতামৃতের টীকায় লিখিয়াছেন,—"মোক্ষয়তি ইতি মোক্ষঃ কৃষ্ণস্তং" অর্থাৎ 'মোক্ষ' শব্দের অর্থ 'কৃষ্ণ', কেননা কৃষ্ণই একমাত্র মোক্ষপ্রদাতা।

জ্ঞানিগণ 'নির্য্যাণ' বলিতে 'ব্রহ্মে লীন' বুঝিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ব্রহ্মে লীন বা ব্রহ্মসাযুজ্য 'মুক্তি' নহে। মুক্তের লক্ষণ বলিতে গিয়া শুদ্ধাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীল বিষ্ণুস্বামিপাদ সর্ব্বজ্ঞসূত্রবচন উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।" অর্থাৎ মুক্তপুরুষগণও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক শরীর ধারণ করিয়া ভগবানকে ভজন করিয়া থাকেন। ব্রহ্মে লয় হইলে 'শরীর ধারণ করিয়া, এই বাক্য কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

অতএব যিনি নিজ কায়-বাক্য-মনকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত, তাদৃশ জীবন্মুক্তের দেহও সচ্চিদানন্দময়। স্থূললিঙ্গদেহের ন্যায় উৎপত্তি ও বিনাশশীল নহে। এই জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

যেরূপে প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ সঙ্কর্ষণ।
যেরূপে লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন।।
তাঁহারা যেরূপে প্রভুসঙ্গে অবতরে।
বৈষ্ণবেরে সেইরূপ প্রভু আজ্ঞা করে।।
অতএব বৈষ্ণবের জন্ম-মৃত্যু নাই।
সঙ্গে আইসেন সঙ্গে যায়েন তথাই।।
কর্ম্মবন্ধ-জন্ম বৈষ্ণবের কভু নহে।
পদ্মপুরাণেতে ইহা ব্যক্ত করি কহে।। (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৯)
"ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে।।" (পদ্মপুরাণবচন)
জন্মকর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন।। (গীতা ৪।৯)

গীতার এই শ্লোকটী বিচার করিলে জানা যায় যে, সচ্চিদানন্দময় ভগবানের জন্ম-কর্ম্মাদি অপ্রাকৃত, অর্থাৎ কর্ম্মফলবাধ্য জীবের ন্যায় নহে। যাঁহারা তত্ত্ববিচার-ফলে ভগবানের জন্মকর্ম্মাদি লীলার নিত্যত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। ভগবানের দেহ যেরূপ সচ্চিদানন্দময়, ভক্তের দেহও সেইরূপ অণুসচ্চিদানন্দময়। বৃহদ্ভাগবতামৃতে ২।৩।১৩৯ শ্লোকে শ্রীল সনাতন গোস্বামী বলিয়াছেন,—"ভক্ত বৈকুণ্ঠবাসীই হউন কিম্বা যে কোন স্থানেই বাস করুন না কেন, তাঁহার সেবনোপযোগী সচ্চিদান্দময় দেহ স্বতঃই প্রকাশ পাইয়া থাকে। ভক্তির স্ফূর্ত্তিতে তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহ সচ্চিদানন্দরূপতা প্রাপ্ত হয়। তাদৃশ দেহের জন্ম-মৃত্যু ভগবানের সচ্চিদানন্দময় দেহের আবির্ভাব-তিরোভাবের ন্যায়। যাঁহারা ভক্ত ও ভগবানের আবির্ভাব-তিরোভাবকে কর্ম্মফল-বাধ্য জীবের জন্ম-মৃত্যুর ন্যায় মনে করেন, তাঁহারা মুক্তিলাভের পরিবর্ত্তে পুনঃ পুনঃ প্রপঞ্চক্লেশ লাভ করিয়া থাকেন, মুক্ত হইতে পারেন না।"

ভক্ত ও ভগবানের আবির্ভাব ও তিরোভাব চিচ্ছক্তির আশ্রয়ে হইয়া থাকে, মায়াশক্তির আশ্রয়ে নহে। "অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা" (গীতা ৪।৬) প্রভৃতি শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। এই স্থলে সন্দেহ হইতে পারে যে, ভক্ত ও ভগবান্ প্রাকৃত কর্ম্মফলবাধ্য জীবের ন্যায় মায়াশক্তির আশ্রয়ে জন্ম-মরণের বাধ্য না হইলেও আবির্ভাব-তিরোভাবে তাঁহাদের গর্ভযন্ত্রণা ও মৃত্যুজনিত ক্লেশ হয় কি না। তদুত্তরে প্রমেয়রত্নাবলীর টীকাকার কৃষ্ণদেব বেদান্তবাগীশ মহোদয় বলিয়াছেন—"বিড়ালীদন্তস্পর্শেন তদর্ভকস্যেব জন্মাদিনা দুঃখং তস্য ন ভবতি।" (প্রমেয়রত্নাবলী ১।৯) অর্থাৎ বিড়ালী তাহার ছানাকে দন্তদ্বারা স্পর্শ করিলে যেমন তাহার ছানার কোন ক্লেশ অনুভব হয় না, পরন্তু মাতৃদন্তস্পর্শজনিত সুখানুভূতিই হইয়া থাকে, তদ্রূপ ভক্তগণের আবির্ভাব-তিরোভাবজনিত কোন প্রকার ক্লেশ নাই।

নির্ব্বিশেষবাদিগণের ধারণায় "ঈশ্বরের দেহ প্রাকৃত সত্ত্বগুণের বিকার, সচ্চিদানন্দময় নহে; ভগবান্ যখন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক জড়জগতে আগমন করেন, তখন তিনি জীবেরই ন্যায় পাঞ্চভৌতিক দেহ ধারণ করিয়া আগমন করিতে বাধ্য হন।" অক্ষজজ্ঞানিগণের ভক্ত ও ভগবানের দেহে অপ্রাকৃত বুদ্ধি হয় না। তাঁহারা পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, "ভক্ত ও ভগবানের দেহ অপ্রাকৃত হইলে তাঁহাতে জন্ম-মৃত্যু ও মল-মূত্রাদি পরিত্যাগ প্রভৃতি হেয়াংশের প্রতীতি কেন হইয়া থাকে?" তদুত্তরে বেদান্তভাষ্যকার শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু পীঠকভাষ্যে বলিতেছেন—

"রামং দাশরথিঞ্চৈব মৃতং শুশ্রুম সৃঞ্জয়েতি দাশরথেরপি নারদেন তদুক্তম্। এষু বাক্যেষু ভগবদ্বিগ্রহস্য বিনাশোক্তেরনিত্যত্বং প্রস্ফুটমিতি দুর্ধিয়ো বদন্তি তন্নিরাকরোতি তত্ত্বিতি। লোকে বৈরাগ্যায় মায়য়ৈব তথা ভগবতা প্রত্যায়িতম্। আসুরপ্রকৃতিভিস্তদ্‌যথাবদেব গৃহীতম্। ঐন্দ্রজালিকঃ খলু স্বরূপেণ স্থিত এব স্বস্য ছেদাদিকং প্রত্যায়য়ন্ দৃষ্টঃ কিমুত মহামায়ী পরেশঃ স ইতি। কুতস্তৎ প্রত্যয়নং মায়িকমিত্যত্র হেতুমাহ,—রাজন্নিতি। বক্ষ্যমাণং হরের্নির্য্যাণং শ্রুত্বা তদেকান্তী পরীক্ষিৎ অতিখিন্নোঽভূদিতি তস্য মায়িকত্বং তাবদাহ, —হে রাজন্, তনুভৃতঃ মনুষ্যস্যেব যা জননাপ্যয়েহা উৎপত্তিমরণরূপা চেষ্টা পরস্য ময়া বর্ণিতা তৎনটস্য ঐন্দ্রজালিকস্য ইব মায়াবিড়ম্বনামিত্যবেহীতি ন তৎ শ্রুত্বা ত্বয়া খিন্নে ন ভাব্যমিতিভাবঃ।"

তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীবলদেব ও রামচন্দ্রের নির্য্যাণ-শ্রবণে দুর্ব্বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ভগবানের অপ্রাকৃত-দেহের অনিত্যত্ব ও স্বরূপের নিরাকারত্ব প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ঐ প্রকার ধারণা মায়াপ্রত্যায়িত অসুরগণের মিথ্যাপ্রতীতি মাত্র। ভগবান্ স্থূললিঙ্গদেহে আত্মবুদ্ধি ও সংসারে আসক্তি পরিত্যাগ করাইবার উদ্দেশ্যেই জীবসমক্ষে ঐরূপ লীলা স্বয়ং অথবা ভক্তগণের দ্বারা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ভগবান্ শ্রীহরির নির্য্যাণ শ্রবণ করিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ খিদ্যমান হইলে ভাগবতবক্তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, হে রাজন্, পরমেশ্বরের যে মনুষ্যের ন্যায় জন্মমরণাদি দৃষ্ট হইতেছে, তাহা সত্য নহে। উহা নটের ন্যায় মায়াবিড়ম্বনই জানিবে। স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

অবিজ্ঞায় পরং দেহমানন্দাত্মানমব্যয়ম্।
আরোপয়ন্তি জনিমৎ পঞ্চভূতাত্মকং জড়মিতি চ।।

অর্থাৎ ভগবানের প্রকৃত্যাতীত দেহ আনন্দাত্মক ও অব্যয়স্বরূপ। মূঢ়গণ তাহা জানিতে না পারিয়া তাঁহাতে পঞ্চভূতাত্মক জড়ের কল্পনা করিয়া থাকে। মলমূত্রাদি হেয়াংশ প্রতীতিও অজ্ঞব্যক্তির জড়-ধারণা মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে ভগবদবতার ঋষভদেবের চরিত্রে পুরীষ-পরিত্যাগ প্রভৃতি যে হেয়াংশের প্রতীতি আছে, তাহা "দেবমায়াবিমোহিতা"—এই শব্দের প্রয়োগ দ্বারা করুণাময় পরমভাগবত শ্রীল শুকদেব গোস্বামী 'অজ্ঞপ্রতীতি' স্পষ্টাক্ষরেই জানাইয়াছেন। স্মৃতিশাস্ত্রেও উক্তি হইয়াছে যে,—

জগজ্জন মলধ্বংসিশ্রবণস্মৃতিকীর্ত্তনা।
মলমূত্রাদিরহিতাঃ পুণ্যশ্লোকা ইতি স্মৃতাঃ।।

অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের শ্রবণ কীর্ত্তন জগজ্জনের মল ধ্বংস করে। তাঁহারা মলমূত্রাদি-রহিত পুণ্যশ্লোক বলিয়া কথিত হন। ঋষভদেবের দেহত্যাগ প্রসঙ্গেও কথিত হইয়াছে যে, তিনি জীবের দেহশক্তি পরিত্যাগ করাইবার নিমিত্তই ঐরূপ আচরণ লোকচক্ষে প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

অতএব ভক্তের নির্য্যাণ বলিতে 'জীবচক্ষের অগোচর' বুঝিতে হইবে। এস্থলে সন্দেহ হইতে পারে যে, ভক্ত যখন নিত্য সচ্চিদানন্দময় বৈকুণ্ঠবস্তু, তখন তাঁহার নির্য্যাণে ভক্তগণ স্থূললিঙ্গদেহে আত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট কর্ম্মিগণের স্বজনবিয়োগের ন্যায় কেন শোক প্রকাশ করিয়া থাকেন? তদুত্তর এই যে, ভক্তবিরহজনিত আর্ত্তি ও কর্ম্মিগণের স্বজনবিয়োগজনিত শোক কখনই এক নহে। ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের অবস্থান। তাঁহাদের সঙ্গ একান্ত বাঞ্ছনীয়। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

"বৈষ্ণব সঙ্গেতে মন আনন্দিত অনুক্ষণ
সদা হয় কৃষ্ণ-পরসঙ্গ।"

সেই নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ হইতে বিচ্যুত হইয়াই জীব নরকের দ্বারস্বরূপ গৃহে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। ভগবদ্ভক্তই কৃপাপূর্ব্বক সংসারনিপীড়িত জীবকুলকে স্ব-সঙ্গপ্রদান করিয়া পরমানন্দ প্রদান করেন। সুতরাং পরদুঃখী পরমবান্ধব ভগবদ্ভক্তের বিচ্ছেদ যে ক্লেশজনক, তাহাতে আর সন্দেহ কি? শ্রীরায় রামানন্দ-মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর।
কৃষ্ণভক্ত বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর।।"

(চৈঃ চঃ ম ৮।২৪৮)

ভক্তবিরহে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শোকপ্রদর্শনলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন,—

কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিলা সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা—কৈলা সঙ্গ ভঙ্গ।।
হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে।
আমার শকতি তাঁরে নারিল রাখিতে।।

(চৈঃ চঃ অঃ ১১।৯৪-৯৫)

কর্ম্মিগণের মৃতদেহ পঞ্চভূতের সমষ্টি—প্রাকৃত মাত্র; সুতরাং অশুদ্ধ। এইজন্য তাঁহাদের ঐ দেহ স্পর্শ করিলে স্নানাদি করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়। এমন কি কর্ম্মিগণই মৃত দেহের সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে গৃহাদিও গোময় লেপন প্রভৃতি দ্বারা সংস্কার করিয়া থাকেন, কিন্তু ভক্তের অপ্রাকৃত দেহে ঐরূপ প্রাকৃত অশুদ্ধ বিচার করিলে বৈষ্ণবাপরাধ মাত্রই সঞ্চিত হয়। ভক্তের নির্য্যাণে বৈষ্ণবগণের ব্যবহার কি প্রকার তাহা সপার্ষদ শ্রীগৌরহরি শ্রীহরিদাস নির্য্যাণে প্রদর্শন করিয়াছেন (চৈঃ চঃ অঃ ১১।৬২-৬৫),—

হরিদাস ঠাকুরে তবে বিমানে চড়াঞা।
সমুদ্রে লঞা গেলা কীর্ত্তন করিয়া।।
আগে মহাপ্রভু চলেন নৃত্য করিতে করিতে।
পাছে নৃত্য করে বক্রেশ্বর ভক্তগণ সাথে।।
হরিদাসে সমুদ্রজলে স্নান করাইলা।
প্রভু কহে,—"সমুদ্র এই মহাতীর্থ হইলা।।"
হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।
হরিদাসের অঙ্গে দিলা প্রসাদ-চন্দন।।

ভারবাহী কর্ম্মিগণের বুদ্ধি জড়জাত দেশ, কাল ও পাত্রে আবদ্ধ। তাঁহারা জড়চিন্তা ব্যতীত জড়াতীত চিন্তা করিতে পারেন না। তাঁহাদের ধারণা, এই স্থূলদেহই জীবিতাবস্থায় চিৎ, মরিয়া গেলে উহাই আবার অচিৎ। এরূপ ধারণা লইয়া যখন তিনি ঈশ্বর পূজা করিতে বসেন, তখন তিনি পার্থিব জড়বস্তুতে ঈশ্বর আবাহন করিয়া তাহাতেই ছল-চিন্ময়ত্ব আরোপ করেন। আবার বিসর্জ্জন সময়ে উহাকেই অচিৎ পার্থিব জড়বস্তুজ্ঞানে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান্—এই তিনটীই নিত্য বাস্তববস্তু, অনিত্য অবাস্তববস্তু নহে। সুতরাং তাহাতে কর্ম্মিগণের ভাঙ্গাগড়া-বুদ্ধির প্রাকৃতবিচার স্পর্শ করিতে পারে না।

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্।।"

"ভবানী-ভর্ত্তা" (!)

যাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা "ভবানী-ভর্ত্তা" শব্দটীর প্রসঙ্গ অবগত আছেন। একদা কাশ্মীর-দেশীয় কোন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নিজকে সরস্বতীর বরপুত্র মনে করিয়া বিদ্যাগর্ব্বে অত্যন্ত স্ফীত হইয়া শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত কক্ষা করিতে আগমন করেন। শ্রীগৌরসুন্দর প্রাকৃতবিদ্যার হেয়তা এবং "অমানীমানদ-লীলা" প্রদর্শন-কল্পে উক্ত পণ্ডিতকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া তদ্বর্ণিত গঙ্গার মাহাত্ম্যসূচক একটী শ্লোকের পঞ্চবিধ আলঙ্কারিক দোষ নির্দ্দেশ করিলেন। সেই শ্লোক মধ্যেই "ভবানী-ভর্ত্তা" শব্দটী দৃষ্ট হয়।

আলঙ্কারিক পণ্ডিতগণ "ভবানী-ভর্ত্তা" শব্দটী মধ্যে "বিরুদ্ধমতি-কৃতদোষ" নির্দ্দেশ করেন। কারণ "ভবানী" শব্দে ভব অর্থাৎ মহাদেবের পত্নী; সুতরাং "ভবানী-ভর্ত্তা" বলিলে "শিবপত্নীর ভর্ত্তা" এইরূপ বিরুদ্ধ অর্থ বা দ্বিতীয়মতি উদিত হয়।
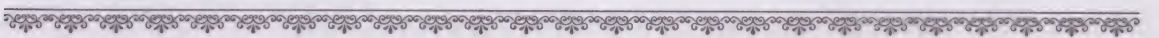
ব্রাহ্মণের পত্নীকে ব্রাহ্মণী বলে, 'ব্রাহ্মণকে দান কর' না বলিয়া 'ব্রাহ্মণীর ভর্ত্তাকে দান কর' বলিলে ব্রাহ্মণীর দ্বিতীয়-ভর্ত্তা-জ্ঞান উপস্থিত হয়। বিদ্যাগর্ব্বিত দিগ্বিজয়ীর মুখ হইতে ''ভবানী-ভর্ত্তা'' শব্দটী নিঃসৃত করাইয়া শ্রীগৌরসুন্দর জীবের দুর্দ্দশার কথা ইঙ্গিতে শিক্ষা দিয়াছেন।

যদি আমরা আমাদিগের ব্যবস্থা অনুসন্ধান করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, আমরা প্রায় সকলেই 'ভবানী-ভর্ত্তাভিমানে' মত্ত রহিয়াছি। এই ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমান বহির্ম্মুখ-জীবের পক্ষে নিসর্গ হইয়া পড়িয়াছে।

কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধির নামই ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমান। এই ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমান বহুরূপী হইয়া জগদ্রঙ্গমঞ্চে নৃত্য করিতেছে। জীব এই মায়াবীনটের মায়ায় মুগ্ধ। তাই আপনাদের দুর্দ্দশা বুঝিতে পারিতেছে না, কখনও বা 'বুঝিয়াও বুঝিব না, শুনিয়াও শুনিব না, জানিয়াও জানিব না' এইরূপ আত্মঘাতিনী বুদ্ধির কবলে কবলীকৃত হইয়া পড়িতেছে।

'ঈশাবাস্য' জগতকে কৃষ্ণাভিন্নজ্ঞানে—''আমার দ্রষ্টা, আমার পরিচালক, আমার ভোক্তা, আমার সেব্য, ব্যাপক, বিভু বা বিষ্ণুতত্ত্ব, চেতনবস্তু, স্বপ্রকাশ বস্তু, স্বরাট্ বস্তু", এইরূপ জ্ঞান না করিয়া তাঁহাকে ''ইদম্''-জ্ঞানে অর্থাৎ 'আমি তাঁহার দ্রষ্টা', 'আমি তাঁহার পরিচালক', 'আমি তাঁহার ভোক্তা', 'আমি তাঁহার সেব্য', 'আমি তাঁহাকে মাপিয়া লইতে পারি', 'আমি তাঁহাকে ইচ্ছামত ভাঙ্গিতে গড়িতে পারি', এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধিই ভবানী-ভর্ত্তৃত্বাভিমান।

আর একটু সোজা ভাষায় খুলিয়া বলি,—'আমি ভবানী-ভর্ত্তৃত্বাভিমানী কেন?' আমি অনেক সময় মনে করি, আমি বহু অধ্যয়ন করিয়াছি, বহু দেশ পর্য্যটন করিয়াছি, বহু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, বহু ধর্ম্মশাস্ত্রের তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি, বহু সাধু দেখিয়াছি, বহু সাধুর সঙ্গে আলাপ ব্যবহার করিয়াছি, আমার পলিত কেশ, আমার বহুদর্শিতা, বহুজ্ঞতা ও প্রবীণতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, সুতরাং আমি বিষ্ণু বা বিভুবস্তুকে নিশ্চয়ই মাপিয়া লইতে পারি, বিভুবস্তুর সেবক বৈষ্ণবকে আমার জড়ীয় বহুজ্ঞতানির্ম্মিত ধর্ম্মের ধারণার ছাঁচে ঢালিয়া ইচ্ছামত গড়িয়া পিটিয়া লইতে পারি—বৈষ্ণবকে সংশোধিত করিতে পারি ইত্যাদি। চক্ষুকর্ণাদি দৃক্সাহায্যে দ্রষ্টা বা জড়ের ভোক্তাভিমানী জড়সঙ্গী হইয়া আমি যাহাকে 'ধর্ম্ম' বলিয়া বিচার করিয়াছি, আমার সেই করণাপাটবমলসম্পৃক্ত অভিজ্ঞতাবাদই বিভুবস্তুকে মাপিয়া লইতে সমর্থ—এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধিই ভবানী-ভর্ত্তৃত্বাভিমান।

উক্ত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত একটী ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমানীর আদর্শ মাত্র। আমরা জগতে এইরূপ বহু বহু 'ভবানী-ভর্ত্তা' সাজিয়া রহিয়াছি। দিগ্বিজয়ী মনে করিয়াছিলেন, যেহেতু তিনি সরস্বতীর বরপুত্র সুতরাং তিনি বিষ্ণুকান্তা সরস্বতীকে সম্পূর্ণভাবে তাঁহার করতলগত অর্থাৎ ভোগের বস্তু করিতে সমর্থ। ইহারই নাম শাক্তেয়বাদ বা ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমান। একদিকে মুখে স্বীয় স্বার্থোদ্ধারের জন্য নিজকে সরস্বতীর বরপুত্রাভিমান অর্থাৎ সরস্বতীকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন, অপর দিকে কার্য্যতঃ তাঁহাকেই ভোগ্যা বা যোষাজ্ঞান। এইরূপ 'মা' ও পরক্ষণে সেই মায়ে 'বামা'বুদ্ধির নামই ভবানীভর্ত্তৃত্ববাদ।

ভবানী-ভর্ত্তৃত্বাভিমানিগণ নিজদিগকে যতই চতুর মনে করুক্ না কেন, তাহাদের চাতুর্য্য বায়সের বিষ্ঠাভোজনের ন্যায়। ভক্তি ও ভক্তবিঘ্নবিনাশন প্রহ্লাদ-হ্লাদদায়ক প্রভুই শ্রীনৃসিংহদেব, সেই নৃসিংহকান্তা শ্রীসরস্বতী। তিনি পরাবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সেই স্বরূপশক্তিরই ছায়াশক্তি অপরা বা জড়াবিদ্যাধিষ্ঠাত্রী প্রাকৃতসরস্বতী। সেই ছায়াস্বরূপিণী মায়া বিষ্ণুতে ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট, শাক্তেয়বাদী বা ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমানী জনগণকে ছলনা করিয়া থাকে। ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমানী ব্যক্তিগণ মনে করে, বুঝি তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা চতুর; কিন্তু তাহাদের ঐ প্রকার আত্মবিনাশক চাতুর্য্য যে মায়াশক্তিদ্বারা সংঘটিত হয়, সেই মায়াশক্তিরও পরিচালক বিভু বিষ্ণুবস্তু যে তাহাদের অপেক্ষা সর্ব্বাংশে অধিক চতুর ইহা তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তাই তাহারা বহু পরিশ্রম করিয়া অবশেষে যে 'রাঙ্গা ফলটী' লাভ করে, সেইটী ভাঙ্গিয়া দেখিলে তাহারা দেখিতে পায় যে, তাহাদের ভাগ্যে অসারতা পরিপূর্ণ একটী মাকাল ফল লাভ হইয়াছে, তাহারা আত্মবঞ্চিত হইয়াছে।

কোন কোন ব্যক্তি বলেন যে, শুদ্ধভগবদ্ভক্তিপ্রচারকগণের বিদেশীয় ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা প্রচার করিলে বা তাঁহাদের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাঁহাদিগের কোন প্রকার ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জনের সহায়তা করিলে ভক্তিপ্রচারকের নিরপেক্ষতার হানি হয়। কেহ কেহ এরূপও বলিয়া থাকেন যে, ভক্তগণ যদি অট্টালিকায় বাস করেন, যানে আরোহণ করেন, বিষয়ী নির্বিষয়ী, সাধু অসাধু, স্বদেশীয় বিদেশীয় নির্ব্বিশেষে সকলের নিকট হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ব্যবহার সাধারণ ব্যক্তির সহিত সমান হইয়া পড়ে।

এইরূপ চিন্তাস্রোত ভবানীভর্ত্তাভিমানের পরিচায়ক। ভবানীভর্ত্তাভিমানিগণের একটী বিশেষ লক্ষণ এই যে, তাঁহারা চিজ্জড়সমন্বয়বাদী। তাঁহারা গুরুপত্নী ও নিজ কামিনীকে সমান জ্ঞান করেন, তাঁহারা চিদ্বিলাস ও জড়বিলাসকে, ভক্তি ও কর্ম্মকে, ঈশ্বর ও জীবকে, স্বরূপশক্তি ও ছায়াশক্তিকে, বাস্তব বস্তু ও বিকৃত প্রতিফলনকে সমপর্য্যায়ে গণনা করিয়া থাকেন।

'ভব'—ঈশ্বর, স্বতন্ত্র শ্রীগুরুদেব। 'ভব' শ্রীবিষ্ণু হইতে অভিন্ন। গুরুদেবের স্বরূপও তাই। 'ভব' শ্রীসঙ্কর্ষণ বিষ্ণুর সেবায় সতত আবিষ্ট।

'ভব' স্বীয় পত্নীদ্বারা বিষ্ণুর সেবা করান। ভবানী বিষ্ণুর সেবার উপকরণ।

"পার্ব্বতী প্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী লঞা।
সঙ্কর্ষণ পূজে শিব উপাসক হঞা।।"

(চৈঃ ভাঃ আদি ১।২০ ও ভাঃ ৫।১৭।১৬)

সেইরূপ বিষ্ণুসেবাপরায়ণা ভবানীর দ্বিতীয় ভর্ত্তা কল্পনা আলঙ্কারিকগণের মতে যেরূপ বিরুদ্ধমতিকৃত দোষ, সুদার্শনিকগণের মতেও তদ্রূপ উহা বিবর্ত্তজ্ঞানোত্থশাক্তেয়বাদ বা কৃষ্ণের ভোগ-বুদ্ধি। ঐরূপ বিবর্ত্তবুদ্ধি লইয়া আমরা ভবপত্নীর ভরণ-পোষণকর্ত্তা হইতে ধাবিত হই। 'ভব'ই তৎপত্নীকে উপযুক্তভাবে পালন করিতে পারেন, আমাদিগের এরূপ জ্ঞান তিরোহিত হয়। আমরা মনে করি, বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের কোন প্রকার

উপকরণ আবশ্যক নাই, তাঁহারা নির্ব্বিশেষ ও বিলাসরহিত থাকিবেন, আমরা আমরা সবিশেষ ও বিলাসযুক্ত থাকিব! এইরূপ অন্তরে লুক্কায়িত বিষ্ণু-বিরোধময় কৈতব হইতেই ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমানের উদয় হয়। বস্তুতঃ 'ভব' অর্থাৎ গুরু-বৈষ্ণবই সর্ব্ববিধ ভোগ্য উপকরণের মালিক—ভবের পত্নী যেরূপ বিষ্ণুসেবার উপকরণ, অক্ষজ দ্রষ্টার চক্ষে ভোগ্য-সামগ্রী বলিয়া প্রতিভাত ও যাবতীয় গুরু-বৈষ্ণবের বস্তু ও কৃষ্ণসেবার উপকরণ। সেই কৃষ্ণসেবার উপকরণে ভোগী কর্ম্মী বা জড়ভোগত্যাগী ফল্গুবৈরাগীর যে ভোগ বা মাপিয়া লইবার বুদ্ধি হয়, তাহারই নাম 'ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমান'।

এই ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমানিগণকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক শ্রেণী 'ভোগী' আর এক শ্রেণী 'ত্যাগী'; কিন্তু কার্য্যতঃ উভয়েই দৃক্‌সাহায্যে দ্রষ্টা বা জড়ের ভোক্তা, জড়সঙ্গী।

ভবানীভর্ত্তা মনে করে যে, তাহার চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক্-বাক্-পাণি-পাদ-পায়ু-উপস্থাদি ইন্দ্রিয় কৃষ্ণের ভোগ্যবস্তু ভোগ করিবার জন্যই তাহাকে প্রদত্ত হইয়াছে। ভবানীভর্ত্তা কখনও সৎকর্ম্মী হইয়া মনে করে, চক্ষুর্দ্বারা প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শন করিব, ভূধর-সাগর-কানন-উপবন-প্রভৃতির শোভাদর্শন করিবার জন্য পর্য্যটক হইব, কখনও বা অসৎকর্ম্মী হইয়া মনে করে, পরস্ত্রীর রূপ দর্শন করিব, কখনও বা প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া মনে ভাবে, নিষ্কপট সেবাদ্বারা নিজকে শ্রীরূপের আনুগত্যে সুরূপ করিয়া কৃষ্ণের নেত্রোৎসব বিধানের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণকে ইন্দ্রিয়ভোগ্য প্রাকৃত বস্তুর অন্যতম জ্ঞানে—শ্রীবিগ্রহকে ক্রীড়াপুত্তলি জ্ঞানে তাহাকে নানা সাজসজ্জায় বিভূষিত করিয়া সমশীল বিষয়ি-কুলের সহিত নিজ নেত্রোৎসব বিধান করিব, কখনও বা নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া মনে করে, নিত্যরূপবান্ ভগবানের—নিত্য দ্রষ্টার অপ্রাকৃত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রামকে বিনাশ (?) করিয়া আমরা তাঁহার দৃশ্য হইবার পরিবর্ত্তে দ্রষ্টা সাজিয়া বসিব! ভগবান্ স্বরাট্, ভগবান্ স্বয়ং প্রকাশ, ভগবান্ স্বতন্ত্র, ভগবান্ স্বেচ্ছাময়, ভগবান্ অবিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত, ভগবানে সর্ব্ববিধ বিরোধিগণ সুন্দররূপে সমঞ্জসতা প্রাপ্ত, ভগবানের অচিন্ত্যভেদাভেদ প্রকাশ জগৎ—ঈশাবাস্য ও সত্য—এইরূপ সুদর্শনজনিত বিচার 'ভব' অর্থাৎ গুরুবৈষ্ণবানুগত্যকারী ব্যক্তিগণের হৃদয়ে স্থান পাইলেও যাহারা ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমানী অর্থাৎ বৈষ্ণবের বস্তুকে ভোগ করিতে প্রয়াসী, সেই সকল ব্যক্তির হৃদয়ে স্থান পায় না।

সাংখ্যকর্ত্তা আর একপ্রকার ভবানীভর্ত্তার আদর্শ। সাংখ্যের ঘনিষ্ঠমিত্র, পাতঞ্জলও ভবানীভর্ত্তারই প্রচ্ছন্ন-মূর্ত্তি। 'ভব' ও 'ভবানীর' অন্তর্যামী বা উপাস্য সঙ্কর্ষণ। সঙ্কর্ষণই কারণ-সাগরে কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু বা প্রথম পুরুষাবতার। সঙ্কর্ষণই চিদচিজ্জগতের কারণ। জড়া প্রকৃতি এই পুরুষের অঙ্গাভাসে ক্ষুব্ধ হইয়াই গৌণ নিমিত্তকারণরূপে অবস্থিত। ঐ পুরুষই প্রকৃতির পরিচালক, পুরুষই বিশ্বের মুখ্য নিমিত্তকারণ, পুরুষই অন্যদেহে বিশ্বের উপাদান কারণান্তার্যামী পুরুষ। পুরুষই বিরাটের অন্তর্যামী, পুরুষই ব্যষ্টি ও সমষ্টিজীবের অন্তর্যামী, কিন্তু সাংখ্যকার ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমানে ইহা স্বীকার করিতে নারাজ। প্রকৃতির অন্তর্যামী পুরুষ—ভবের অন্তর্যামী পুরুষকে খারিজ করিয়া নিজেই প্রকৃতির ভোক্তা অর্থাৎ 'ভবানীভর্ত্তা' সাজিবার জন্য ব্যস্ত। প্রকৃতির

আর একজন ঈশ্বর, প্রভু বা পতি আছেন, ইহা স্বীকার করিলে ত' প্রকৃতিকে ভাল করিয়া ভোগ করা যায় না। তাই, প্রকৃতির কোন পতি নাই, প্রকৃতি স্বৈরিণী অতএব আমার ভোগ্যা—এইরূপ প্রচ্ছন্ন ভোক্তৃত্বাভিমানই 'ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমান'। তবে এইরূপ ভবানীভর্ত্তাভিমানে চতুরতা আছে—চতুরতা আছে বলিয়াই সাধারণ লোকে সহজে উহার কপটতা ধরিতে পারে না। যেমন কোনও কামুক অপরপুরুষ-ভোগ্যা সুন্দরী ললনাকে দেখিতে পাইয়া তাহার রূপে মুগ্ধ হয় এবং তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়, পথিমধ্যে যদি কোন রাজকর্ম্মচারীর সহিত তাহার অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হইয়া পড়ে, তখন ঐ ধূর্ত্ত অপহরণকারী বলিয়া থাকে, "এই স্ত্রীটি অনাথা, ইহার স্বামী নাই, আমি ইহাকে আশ্রয় প্রদান করিবার জন্যই লইয়া যাইতেছি।" প্রকৃতিবাদীর চেষ্টাও ঐরূপ। প্রকৃতিবাদী বলেন, "প্রকৃতির অন্তর্যামী কোনও পুরুষ নাই, কোনও প্রকারেই ঈশ্বর সিদ্ধ হয় না; অতএব প্রকৃতিই জগৎকারণ।"

যাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী শক্তি বা প্রকৃতিকে সর্ব্বকারণকারণ বলিয়া বলেন, তাঁহারও একপ্রকার ভবানী-ভর্ত্তা। যদি তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাদের ক্ষমাগুণ ও সত্যানুসন্ধিৎসা-বিষয়ে ধৈর্য্য হইতে বিচ্যুত না হইয়া সদ্‌যুক্তিগুলি শ্রবণ করেন এবং নিরপেক্ষভাবে বিচার করেন, তাহা হইলে তাঁহারাও বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহাদের ঐরূপ চেষ্টার মূলে ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমান ছাড়া আর কিছু নাই। কারণ যাঁহারা প্রথমে শক্তিকে 'মাতা' বলিয়া উপাসনা করেন, তাঁহারাই স্বমুখে বলিয়া থাকেন যে, সিদ্ধি কালে তাঁহাদের শিবত্ব লাভ হয়; কিন্তু শাস্ত্র বলেন, শিব বা ভবের পত্নীই ভবানী। যিনি একবার মাতা, তিনি কখনও আমাদের পত্নী হইতে পারেন না। পরমপূজ্য মাতাকে 'যোষা'-জ্ঞান করাই, ভবানীকে ভোগের বস্তু জ্ঞান করাই 'ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমান'।

ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমানে জগৎ পরিব্যাপ্ত। ভবানীভর্ত্তার অভিমান করিয়া আমরা মনে করি, 'ভব' ত' বিরাগীপুরুষ, সে বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে, মাটিতে শুইবে, বৃষ্টিতে ভিজিবে, রৌদ্রে পুড়িবে, যাবতীয় ক্লেশ সহ্য করিবে, তাহার আবার পত্নীর আবশ্যক কি? যাবতীয় ভোগের বস্তু ত' আমাদেরই ভোগের জন্য। আমরা পাষণ্ডতা করিবার জন্য তাহার পত্নীকে—গুরুপত্নীকে ভোগ করিব—ভবানীভর্ত্তা হইব! এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃই আমরা মনে করিয়া থাকি, "বৈষ্ণবের কৃষ্ণসেবোপকরণের কোনও আবশ্যক নাই, যাবতীয় কৃষ্ণসেবোপকরণগুলি—যাহা যাহা দিয়া কৃষ্ণের সেবা করা যায়, সেই সব বস্তুগুলি আমাদের ভোগের জন্য থাকিবে। ভবানীকে দিয়া ভব বিষ্ণুসেবা করেন। আমরা তাহা করিতে দিব না, আমরাই ভবানীর ভর্ত্তা হইব।" বৈষ্ণব অট্টালিকায় থাকিয়া কৃষ্ণসেবা করেন, বৈষ্ণব যানে চড়িয়া কৃষ্ণসেবা করেন, বৈষ্ণব কনকের দ্বারে মাধবের সেবা করেন, বৈষ্ণব প্রসাদ সেবা করিয়া কৃষ্ণসেবা করেন, বৈষ্ণব জগতের যাবতীয় সুন্দরবস্তু—বৈজ্ঞানিক জগতের যাবতীয় শ্রেষ্ঠ উপকরণদ্বারা কৃষ্ণসেবা করেন, বৈষ্ণব ভিক্ষালব্ধ অর্থদ্বারা কৃষ্ণসেবা করেন এবং কৃষ্ণসম্বন্ধী যাবতীয় বস্তুর সেবা করেন, বৈষ্ণব কর্ম্মীর ন্যায় ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমানে বিষ্ণুসেবা ছাড়িয়া দিয়া কেবল ভূতানুকম্পাকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন না, বরং উহাকে অধঃপতনের কারণ বলিয়াই জানেন। কিন্তু যাঁহাদের ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমানই প্রবল, তাঁহারা এই সকল কথা ধারণা করিতে পারেন না। তাঁহারা মনে করেন, 'বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের কোনও বস্তু থাকিতে পারিবে না, আমরা সকলই আত্মসাৎ করিব!' কিন্তু

তাঁহাদের অপেক্ষাও অধিকতর সুচতুর ভগবান্ সেই ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমানিগণের জন্য ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমানিগণ ফলকালে আসল বস্তু পায় না—ছায়া লইয়াই টানাটানি করে এবং ছায়াকে বাস্তববস্তুজ্ঞানে তাহার সমশীল ভোক্তৃত্বাভিমানিগণের সহিত পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিয়া ঘোর তামসী যোনিতে পতিত হয়। রাবণ ভবানীভর্ত্তার অভিমান করিয়াছিল, সেই অভিমান লইয়া সে বিষ্ণুশক্তির ভর্ত্তা হইবার দুরাশা করিয়াছিল। সেই দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া সীতাহরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু ফলকালে তাহার ভাগ্যে কি ঘটিল! সে ছায়া বা মায়াসীতাকে হরণ করিয়া মনে করিল, 'আমি ভবানীভর্ত্তা হইয়া পড়িয়াছি। ভগবানের ভোগের বস্তু ভোগ করিতে পারিয়াছি।' ছায়া লইয়া বৃথা টানাটানি করিয়া অবশেষে রাবণ তাহার বন্ধুগণের সহিত নিহত হইল। ভবানীভর্ত্তার এইরূপ পরিণাম।

ভবানী-ভর্ত্তাভিমানিগণ সম্ভোগবাদী। অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভরস তাঁহাদের নিকট আমল পায় না। তাঁহারা বৈধমার্গে শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থ-নিবৃত্তি প্রভৃতি বা রাগানুগসাধনমার্গে লোভমূলা শ্রদ্ধা, লোভ-মূলক সাধুসঙ্গ, লোভমূলা ভজনক্রিয়া, আসক্তি প্রভৃতির কোনও ধার না ধরিয়াই এক লাফেই রাসস্থলীতে যাইতে চান। তাঁহারা সাধন না করিয়াই সিদ্ধ হইতে চান। তাঁহারা সকলেই পরম দুর্ল্লভ কৃষ্ণপ্রসাদজ ভাবের অধিকারী, প্রেমের পঞ্চম স্তরাতিক্রান্ত অনুরাগ-সম্পদে সম্পত্তিবান্ বিল্বমঙ্গল ঠাকুর হইয়া যাইতে চান। তাঁহারা সকলেই গোপী হইতে চান, কিন্তু তাঁহাদের বাহ্য আরোপ কল্পনা অপরাধমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। বাহ্যে তাঁহাদের ঐরূপ কৃত্রিমভাবে কল্পনা করিলে কি হইবে? অন্তরে যে তাঁহাদের ভর্ত্তাভিমান প্রবল। তাঁহারা বাহিরে প্রকৃতি সাজিলেও, মনোধর্ম্মের দ্বারা নিজকে প্রকৃতি কল্পনা করিলেও অন্তরের পুরুষাভিমান তাঁহাদিগকে 'ভবানীভর্ত্তা' সাব্যস্ত করিয়া দেয়। তাঁহারা কৃষ্ণের প্রকৃতি বা ভোগ্যা সাজিতে গিয়া কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি করিয়া বসেন। 'গোপী' সাজিতে গিয়া গোপীর আনুগত্যের পরিবর্ত্তে গোপীভর্ত্তাভিমানে নরকের পথে অধঃপাতিত হইয়া পড়েন। গোপীভর্ত্তার পদকমলের দাসানুদাস হইবার সৌভাগ্য তিরোহিত হয়।

গৌরনাগরীবাদ ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমানেরই আর একপ্রচার চিত্র। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমানের মূলে জড়সম্ভোগবাদ বা শাক্তেয়বাদ। জড় সম্ভোগবাদী বা শাক্তেয়বাদীর ধারণা—'কৃষ্ণ আমার খানাবাড়ীর রাইয়ত।" সম্ভোগবাদী বা শাক্তেয়বাদীর বা আরোহবাদীর নিকট অজিতকৃষ্ণ জিত হন না, অবরোহবাদীর নিরুপাধিক প্রেমেই অজিতকৃষ্ণ জিত হন। নিরুপাধিক প্রেমে নিজসুখবাঞ্ছার গন্ধমাত্র নাই। কৃষ্ণেচ্ছাপূরণ করাই প্রেমভক্তির স্বরূপ। সম্ভোগবিষয়বিগ্রহতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার তিনটী বাঞ্ছা পূরণ করিবার জন্য আশ্রয়ের ভাব অঙ্গীকার করিয়া বিপ্রলম্ভরসে স্বীয় নিত্য গৌরস্বরূপ প্রকটিত করেন। তাঁহার সেই স্বতন্ত্রেচ্ছাময়ী লীলার পরিপোষণচেষ্টাই নিরুপাধিকা প্রীতি। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছার প্রতিকূলে, তাহা স্বেচ্ছাচারিতা বা শাক্তেয়বাদ। তাহাই অপর ভাষায় 'ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমান'। আশ্রয়জাতীয়ের আনুগত্যই শুদ্ধজীবাত্মার নির্ম্মল অবস্থিতি। শ্রীগৌরসুন্দর ইহা শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং বিষয়তত্ত্ব হইয়াও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যাভিমান অর্থাৎ শ্রীবার্ষভাবনী বা গোপীর কিঙ্করী অভিমান করিয়া বলিলেন,—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টুমামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটোমৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ।।"

তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বতন্ত্রপুরুষ। তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহারই অনুগমন আমার একমাত্র ধর্ম্ম। আমি স্বেচ্ছাচারিণী নহি যে, তাঁহার অভিলাষের প্রতিকূলে আমার কোন সেবাপ্রবৃত্তি দেখাইতে পারি। কিন্তু শাক্তেয়বাদী ভবানীভর্ত্তাভিমানিগণ বলেন যে, আমি যাঁহাকে নাগর বলিব, তাঁহার অভিলাষ যাহাই থাকুক না কেন, তাঁহার সুখ হউক, দুঃখ হউক, তাহাতে আমার কিছুই অসিয়া যায় না, আমি তাঁহার অভিলাষের প্রতিকূলে আমার সেবাপ্রবৃত্তি দেখাইতে পারি। আমাকে তাঁহার আলিঙ্গন করিতেই হইবে। তিনি ইচ্ছা না করিলেও আমি তাঁহাকে বলপূর্ব্বক 'নাগর' সাজাইব। তিনি আশ্রয়ের ভাবে বিপ্রলম্ভরসে মত্ত থাকিলেও আমি তাঁহাকে জোর করিয়া সম্ভোগরসে প্রমত্ত করিব। তিনি এই অবতারে দৃষ্টি-কোণে কখনও স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শন বা কর্ণে 'স্ত্রী'হেন নাম শ্রবণ করিতে না চাহিলেও আমি আমার স্বতন্ত্র ইচ্ছামত স্বৈরিণী নাগরী সাজিয়া তাঁহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইব; বলিব, আমি তাঁহার অভিলাষ বা সুখ দুঃখ বুঝি না, আমাকে তাঁহার আলিঙ্গন করিতেই হইবে। আমার আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তীচ্ছার অর্থাৎ জড়সম্ভোগেচ্ছার সমর্থনকল্পে মাঝখানে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে (!) দাঁড় করাইয়া বলিব যে, আমার নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা নাই, আমি বিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্যে নাগরী হইয়াছি। এইরূপ বলিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকেও স্বেচ্ছাচারিণী সাজাইবার চেষ্টা করিব। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী যে ঔদার্য্যবিগ্রহ গৌরসুন্দরের প্রেমভক্তিদানলীলার সহায়কারিণী অর্থাৎ শ্রীগৌর-সুন্দর জগতে যে প্রেমভক্তি প্রদান করিতেছেন, প্রেমভক্তি-স্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীও সেই গৌরসুন্দরের ইচ্ছার অনুকূল চেষ্টাই করিতেছেন, তাঁহার ইচ্ছার প্রতিকূলে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কোনপ্রকার সেবাপ্রবৃত্তি বা স্বেচ্ছাচারিতা দেখাইবার চেষ্টা নাই, সেই কথাটী ভুলিয়া গিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে গৌরেচ্ছা-পূর্ত্তিময়ী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে একটী কামপ্রমত্তা রমণী ও গৌরসুন্দরকে একজন বেরসিক সম্ভোগরসপ্রমত্ত 'নাগর' সাজাইতে চেষ্টা করিব। এইরূপ অপরাধময়ী চেষ্টা ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমানের প্রকার বিশেষ।

এইরূপে আমরা যে কতপ্রকারে ভবানীভর্ত্তা সাজিয়া রহিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না, এস্থলে দিগ্‌দর্শন করা হইল মাত্র। মূলকথা, যাহারা গুর্ব্বানুগত্য পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুবস্তুতে কোন না কোন প্রকারে ভোগবুদ্ধি-বিশিষ্ট, তাহারাই ভবানীভর্ত্তাভিমানী। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অসূয়ারহিত নিষ্কপট-সেবার ফলে আমাদের যে শুদ্ধা বৃত্তির উদয় হয়, সেই শুদ্ধা বৃত্তি বা সেবোন্মুখ দৃক্‌সাহায্যে বস্তু দর্শন করিতে শিখিলেই আমাদের ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমান বিদূরিত হইয়া গোপীভর্ত্তার পদকমলের দাসানুদাস-অভিমান বা স্বরূপের অভিমান এবং তৎসম্বন্ধে সমস্ত বস্তুকে কৃষ্ণসেবোপকরণ বলিয়া তৎপ্রতি পূজ্যবুদ্ধির উদয় হয়।

সহজ ও কৃত্রিম

স্বভাব বা স্বরূপ চেষ্টাই 'সহজ' বৃত্তি; আর অভাব বা বিরূপগত চেষ্টাই 'কৃত্রিম'তা। আমরা অনেক সময়েই 'সহজ' ও 'কৃত্রিম' এই পরিভাষাদ্বয়ের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে বিরত হই অর্থাৎ কখনও বিবর্ত্তবুদ্ধিক্রমে সহজকে 'কৃত্রিম' ও কৃত্রিমকে 'সহজ' বলিয়া মনে করি; কখনও বা সহজ ও কৃত্রিমের সমন্বয়বিধানে প্রয়াসী হই। কিন্তু ইহাদের পরস্পরের গতি ভিন্নমুখিনী। সহজটী প্রত্যক্‌পথে পরিচালিত, আর কৃত্রিমটী পরাক্‌পথে ধাবিত। স্বরূপগত সহজবৃত্তির নামই 'ভক্তিমার্গ' বা 'সেবা', আর বিরূপগত নৈসর্গিকী চেষ্টা বা কৃত্রিম চেষ্টার নামই অভক্তিমার্গ, কাম, কৈতব বা অপরাধ।

সহজ-ব্যাপারই কৃষ্ণকে আকর্ষণ করে, আর কৃত্রিম চেষ্টা কৃষ্ণকে শতযোজন দূরে রাখে। সহজ ও কৃত্রিমের মধ্যে বাহ্য আকারগত বিশেষ পার্থক্য নাই, কিন্তু স্বরূপগত আকাশ-পাতাল ভেদ।

ব্রজবাসিজনগণের কৃষ্ণের প্রতি সহজ অহংতা মমতা অর্থাৎ প্রীতি। নন্দযশোদার কৃষ্ণের প্রতি সহজ-বাৎসল্য, কান্তাগণের নন্দনন্দনের প্রতি সহজ-কাম অর্থাৎ প্রেম। এই সহজপ্রীতিই 'রাগাত্মিকা ভক্তি' নামে অভিহিত। এই রাগাত্মিকা ভক্তি বা ব্রজবাসিগণের সহজ আচরণের কথা শ্রবণ করিয়া যাঁহাদের সহজ রুচি উদিত হয়, অর্থাৎ যাঁহারা সেই অপ্রাকৃত সহজধর্ম্মিগণের সেবায় লৌল্যবিশিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের অনুগ অর্থাৎ তাঁহাদের আচরণের অনুসরণকারী হন, তাঁহারাই রাগানুগ। কিন্তু যাঁহারা শুদ্ধসত্ত্ব আত্মস্বরূপের নির্ম্মল অপ্রাকৃত সহজ ব্যাপারটী উপলব্ধি করিতে পারেন না; তাঁহারা সহজের অনুসরণ করিতে না পারিয়া 'আনুকরণিক' হইয়া পড়েন। ঐরূপ অনুকরণ সহজতাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া কৃত্রিমতারূপ হেয়তা আনিয়া দেয়। এই কৃত্রিমতা হইতেই জগতে নানা অনর্থ উদিত হয়।

সহজ ও কৃত্রিমের পার্থক্য বুঝিতে না পারিলে সাধনরাজ্যে বিষম বিপত্তি ঘটে। সাধকমাত্রেরই এবিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। নতুবা তাঁহার যাবতীয় চেষ্টা ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় বিফল হইবে।

মানুষ অনুকরণপ্রিয়। অতি শিশুকাল হইতেই অমরা অনুকরণ-কার্য্যটী অভ্যাস করিয়া থাকি। যাঁহারা মনোবিজ্ঞান আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা এই কথাটী ভাল বুঝিতে পারিবেন। জগতের অভিজ্ঞতার সমষ্টি অনুকরণ-প্রিয়তা স্বভাব হইতেই সঞ্চিত হয়। কিন্তু এই অনুকরণ-ক্রিয়াটী অনুসরণ বা আনুগত্যের বিকৃত-প্রতিফলিতা চেষ্টা। অনুকরণে কপটতা আছে, কৃত্রিমতা আছে, আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা আছে, দাম্ভিকতা আছে; কিন্তু অনুবর্ত্তন, অনুসরণ বা আনুগত্যে ঐরূপ কপটতা, কৃত্রিমতা বা দাম্ভিকতা নাই। শিষ্য যখন গুরুর অনুবর্ত্তন করেন অর্থাৎ আনুগত্য করেন, তখন তাঁহার অনর্থাবস্থায় যে কৃত্রিমতারূপ কষায় তাঁহার হৃদয়ে ঈষৎ পরিমাণে বিরাজিত থাকে, সেইটুকুও গুরু-কৃপায় বিধৌত হইয়া যায় এবং তাঁহার হৃদয়ের সহজ ভাবটী প্রকটিত হইয়া পড়ে। এইরূপে সহজভাব প্রকটন-চেষ্টার নামই সাধনভক্তি বা অবরোহপন্থায় ভগবদনুশীলন।

যাঁহারা সহজভাবের অনুবর্ত্তন না করিয়া, কৃত্রিমভাবে তাঁহার অনুসরণ করেন, তাঁহারাই 'প্রাকৃত সহজিয়া'।

শুদ্ধজীবাত্মার সহজ স্থায়ীভাবে যদি বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই চারিবিধ সামগ্রীর মিলন হয়, তাহা হইলেই অকৃত্রিম সহজভক্তিরসের উদয় হইয়া থাকে। আর যদি কৃত্রিমরতির সহিত জড়ীয় বিভাবাদি সামগ্রীর মিলন হয়, তাহা হইলে আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তিকর হেয় জড়রসের অভ্যুদয় হয়।

কৃষ্ণ অপ্রাকৃতরসের বিষয়-আলম্বন আর গোপীগণ অপ্রাকৃতরসের আশ্রয়-আলম্বন। শ্রীবলদেবাভিন্নবিগ্রহ নিত্যানন্দপ্রভু বিষয়-আলম্বন ও শ্রীঅভিরাম, শ্রীসুন্দরানন্দঠাকুরাদি দ্বাদশগোপাল তাঁহার আশ্রয়-আলম্বন। শ্রীনিত্যানন্দের সহিত শ্রীঅভিরামাদির চেষ্টা তাঁহাদের ব্রজলীলার সখ্যভাবগত সহজ চেষ্টা। কেহ কেহ যদি লোকের নিকট প্রেমিক বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য কিম্বা ব্যক্তিগত মানসজ বিকার চরিতার্থ করিবার জন্য শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের জয়মঙ্গল চাবুক দ্বারা প্রহার করিবার ন্যায় হস্তে একটী চাবুক গ্রহণপূর্ব্বক সকলকে প্রহার করিতে থাকে, তাহা হইলে এরূপ 'মৎলবী পাগলামী' কৃত্রিমতা এবং বিষ্ণুবৈষ্ণবচরণে অপরাধের পরিচয়ই প্রদান করিবে। অনেক সময় এইরূপ মৎলবী পাগল অর্থাৎ ধর্ম্মের নামে ভণ্ড-ব্যক্তিগণ এইরূপ নানাচেষ্টা দেখাইয়া থাকে। কেহ বা হাতে একগাছি যষ্টি লইয়া, কেহ বা হাতে একটী বাঁশী গ্রহণ করিয়া, কেহ বা মাথায় চূড়া পরিধান করিয়া, কেহ বা বালগোপালের বেশে সজ্জিত হইয়া, কেহ বা প্রাকৃত-রক্তমাংসের শরীরকে গোপীর বেশে সাজাইয়া, কেহ বা মহাপ্রভুর ন্যায়, দিব্যোন্মাদদশা হইয়াছে, জানাইবার জন্য নানাপ্রকার কৃত্রিম প্রজল্প বকিয়া নিজেকে অপরাধের চরম সীমায় উপনীত করিয়া থাকে।

ইহারা রসিককুলচূড়ামণি শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সিদ্ধান্তকেও কৃত্রিমতার বলে অতিক্রম করিতে প্রয়াসী বলিয়া মনে হয়—

"অতোপি যথোত্তর-স্বাদুবৈশিষ্ট্যভাঞ্জি স্নেহমানপ্রণয়রাগানুরাগমহাভাবাখ্যানি ভক্তিকল্পবল্ল্যা ঊর্দ্ধোর্দ্ধ-পল্লবগামীনি ফলানি সন্তি। ন তেষামাস্বাদ-সম্প্রদৌষ্ণ্যশৈত্যসংমর্দ্দসহঃ সাধকস্য দেহো ভবেদিতি ন তেষাং তত্র প্রাকট্যসম্ভব ইতিঃ"।

অর্থাৎ ইহারও পর (শ্রদ্ধা হইতে প্রেম পর্য্যন্ত যে ক্রম তৎপর) উত্তরোত্তর স্বাদু (প্রেমভক্তির গাঢ়ত্বের তারতম্য-বৈচিত্র্য) স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও মহাভাব নামক যে যে কয়েকটী ভক্তিকল্পলতিকার ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর পল্লবগামী ফলরাজি উক্ত হইয়াছে, এই সাধকদেহ তাহাদের আস্বাদনের যোগ্য নহে, সাধকদেহে তাহাদের প্রাকট্যেরও সম্ভাবনা নাই।

শ্রীনিত্যানন্দাত্মক বীরভদ্র প্রভু ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু; তিনি তাঁহার সহজভাববশতঃ মস্তকে চূড়া পরিধান করিতেন। ক্ষুদ্রজীবকুল বিষ্ণুর অনুকরণ করিতে গিয়া জগতে 'চূড়াধারী সম্প্রদায়' নামে একটী বিষ্ণু-অপরাধী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিল। অপ্রাকৃত সহজ-রসিক রায় রামানন্দাদি নিত্যসিদ্ধকুলের সহজভাবের অনুকরণ করিতে গিয়া নানাবিধ অনর্থ উৎপন্ন হইয়াছে। 'সহজ' ও 'কৃত্রিম' এই দু'টীর মধ্যে যে পরস্পর বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা সদ্গুরুর আনুগত্যাভাবে জীবের হৃদয়ঙ্গম না হওয়ায় আত্মার সহজধর্ম্ম যে নিত্যশুদ্ধ সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম, সেই শুদ্ধধর্ম্মরাজ্যে নানাবিধ কলির উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে। ঠাকুর হরিদাসের সহজ-

প্রেমচেষ্টা অনুকরণ করিতে গিয়া ঢঙ্গবিপ্রের কৃত্রিমতা প্রকাশিত হইয়াছিল। জাতরুচি ভাবুক ও রসিক ভক্তগণের "ব্রজবধূসহ কৃষ্ণবিক্রীড়িত" শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ সহজধর্ম্মের অনুগমন চেষ্টার কৃত্রিমতা করিতে গিয়া আধুনিক প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রাকৃতসাহজিক সম্প্রদায়ের রাইকানুর রসগান, রাসপঞ্চাধ্যায় শ্রবণকীর্ত্তন (?) অপ্রাকৃত সহজচেষ্টার অনুকরণ—অনুসরণ নহে, অনুকরণে ক্রমোল্লঙ্ঘন, ব্যাভিচার উচ্ছৃঙ্খলতা ও কৃত্রিমতা বিদ্যমান—অনুসরণে তাহা নাই—কেবল নিষ্কপট আনুগত্য আছে। কৃত্রিমতার পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ পরমপ্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেম হইতে ত' চিরতরে বঞ্চিত হইতেছেনই, অপিচ ভীষণ অপরাধে নিমজ্জিত হইতেছেন। অতএব সাধকমাত্রেরই 'সহজ' ও 'কৃত্রিম'—এই দুইটী বিষয়ে যে পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা সদ্‌গুরু-পাদপদ্ম হইতে জানিয়া লওয়া আবশ্যক এবং সতত সতর্ক থাকিয়া ক্রমপন্থায় সহজের অনুগমন এবং কৃত্রিমতার সঙ্গ পরিত্যাগ করা আবশ্যক।

গৌরনাগরী 'পৌত্তলিক' কেন?

"যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ বিবাদসংবাদভুবো ভবন্তি।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে।।"

(ভাঃ ৬।৪।৩১)

'গৌরাঙ্গনাগরীর পৌত্তলিকতার বিশ্লেষণ'-শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া হংসগুহ্যস্তোত্রোক্ত উপরি-উক্ত উক্তির সার্থকতা উপলব্ধি হয়। বিশ্লেষণকারী (?) প্রবন্ধের প্রথম পংক্তিতে লিখিয়াছেন,—'আজকাল বৈজ্ঞানিক যুগ। বৈজ্ঞানিক যুগে বিশ্লেষণ করাই তত্ত্বনির্দ্ধারণের পথ।' প্রচলিত বঙ্গভাষায় 'অদ্য' অর্থে 'আজ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং অনদ্যতনে 'কাল' শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। অনদ্যতন দ্বিবিধ— (১) অনদ্যতন-অতীত, (২) অনদ্যতন-ভবিষ্যৎ। যে স্থানে 'হ্যস্তনী'র প্রয়োগ না হইয়া 'শ্বস্তনী'র প্রয়োগ হয়, তাহাই অনদ্যতন-ভবিষ্যৎ। সুতরাং দেশজভাষায় যে 'আজকাল' শব্দের প্রয়োগ, তাহার অর্থ 'বর্ত্তমান' বা 'অধুনা।' 'অধুনা বৈজ্ঞানিক যুগ' বলিলে জড়নিষ্ঠ ও চিন্নিষ্ঠ পুরুষগণের হৃদয়ে দুইটী পরস্পর বিভিন্ন ভাবের উদয় হয়। এই উভয়বিধ ব্যক্তির বিশ্লেষণ-প্রণালীও ভিন্ন; সুতরাং তাঁহাদের উদ্‌ঘাটিত তত্ত্ব বস্তুও পরস্পর ভিন্ন। সাধারণ-দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি হইতে জড়নিষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের শ্রেষ্ঠতা থকিলেও সেই ব্যক্তি সাধারণ পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। সাধারণ ব্যক্তি 'জল'কে 'তত্ত্ববস্তু' জ্ঞান করে, আর সাধারণকোটান্তর্গত শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সেই জলকে 'হাইড্রোজেন' ও 'অক্সিজেন' গ্যাসের সম্মিলিত পদার্থ বলিয়া বুঝিতে পারেন। এই উভয়ের মধ্যে প্রাকৃত মস্তিক-পরিচালনা-শক্তির ন্যূনতা ও আধিক্যই তাহাদের তর-তমতা স্থাপন করিয়াছে। কণভুকের 'বিশেষ' পদার্থের বিশ্লেষণ বা ঈশ্বরকৃষ্ণ ও পঞ্চশিখাচার্য্যের বিশ্লেষণ-প্রণালী কিম্বা আধুনিক স্বল্পবাহিরদিয়া ও কাগ্‌মারীর হাইড্রোসিল চিকিৎসাদি-বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ-প্রণালী 'বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ প্রাণালী' বলিয়া
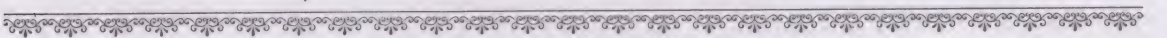
প্রচলিত থাকিলেও উহার দ্বারা তত্ত্ববস্তুর নির্দ্ধারণ হয় না। শ্রীমদ্ভাগবত বা ভক্তভাগবত শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু তত্ত্ববস্তুর যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং" (ভাঃ ১।২।১১) এবং 'তত্ত্ববস্তু—কৃষ্ণ' (চৈঃ চঃ আ ১।৯৬) প্রভৃতি বাক্যে প্রকাশিত হইয়াছে। জড়বৈজ্ঞানিকের তত্ত্ববস্তু (?) ও চিদ্বৈজ্ঞানিকের তত্ত্ববস্তুকে সমপর্য্যায়ে গণনা করিলে চিজ্জড়সমন্বয়বুদ্ধিরূপ 'মায়াবাদ'-অপরাধ সংঘটিত হয়।

গৌরনাগরীর পৌত্তলিকতার বিশ্লেষণ ঐরূপ বৈজ্ঞানিকগণের আদর্শে সংঘটিত হইয়াছে, তখন উহা জড়বিশ্লেষণ-প্রণালীর অনুকরণ এবং তাহার হেয়তাসংপৃক্ত অর্থাৎ তাহাতেও চিজ্জড়সমন্বয়বাদ, মায়াবাদ প্রভৃতি দোষ স্পর্শ করিয়াছে। আমরা এই বৈজ্ঞানিক যুগের চিদ্বৈজ্ঞানিকগণের বিশ্লেষণ-প্রণালীর অনুসরণে তাহা এক একটী করিয়া প্রদর্শন করিব।

বর্ত্তমান যুগ বৈজ্ঞানিক যুগ; কেননা, বর্ত্তমান যুগে ভাগবতার্ক উদিত হইয়াছেন। সেই ভাগবতার্কের মরীচিমালায় জীবকুলকে উদ্ভাসিত করিবার জন্য আবার গৌড়দেশের পূর্ব্বশৈলে সাবরণ গৌরনিতাই দুইভাইও প্রকটিত হইয়াছেন। এই ভাগবতার্কই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণদ্বারা 'বাস্তববস্তু' (ভাঃ ১।১।২) আবিষ্কার ও নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-প্রণালীতে একটী এরূপ বৈশিষ্ট্য আছে যে, যাহা জড় বৈজ্ঞানিকগণের বিশ্লেষণ-প্রণালীতে নাই বা থাকিতে পারে না। 'তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ' এই বাক্যে সেই বিশ্লেষণ প্রণালীটী পরিস্ফুট হইয়াছে অর্থাৎ সাধারণ মনীষী বা সূরিগণের বিশ্লেষণ-প্রণালী অধিরোহবাদমূলে স্থাপিত; কিন্তু ভাগবতের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-প্রণালী অবরোহবাদ মূলে সম্প্রতিষ্ঠিত। সর্ব্বজ্ঞ পূর্ণসনাতনপুরুষ ভগবান্ সেবোন্মুখ ব্রহ্মার হৃদয়ে তাহা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। চতুঃশ্লোকীতে সেই বিজ্ঞানের কথাই উক্ত হইয়াছে (২।৯।৩০-৩১)। শ্রীগীতোপনিষদেও (৯।১) সেই বিজ্ঞানের সন্ধান প্রদত্ত হইয়াছে। বৃদ্ধবৈষ্ণব পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীআনন্দতীর্থ সেই বিজ্ঞানের কথা বলিতে গিয়া শ্রৌতপন্থার আনুগত্য অর্থাৎ আচার্য্য ব্যাসের আনুগত্য প্রদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন—

"যেন যেন যথা জ্ঞাত্বা নিয়তং মুক্তিরাপ্যতে।
তদ্বিজ্ঞানমিতি প্রোক্তং জ্ঞানং সাধারণং স্মৃতম্।।"

অর্থাৎ যে যে উপায়ে, যেভাবে জানিলে সর্ব্বদা মুক্তি অর্থাৎ বিষ্ণুপদ লাভ করা যায়, তাহা 'বিজ্ঞান' নামে কথিত এবং সাধারণভাবে 'জ্ঞান' নামে স্মৃত হয়।

শ্রীধর-স্বামিপাদ 'বিজ্ঞান'-শব্দে 'অনুভব', শ্রীমধ্বানুগত শ্রীবিজয়ধ্বজ 'বিজ্ঞান'-শব্দে 'স্বানুভব', অস্মৎসম্প্রদায়ের আচার্য্যবর্য্য শ্রীল জীবগোস্বামিচরণ 'বিজ্ঞান'-শব্দে 'ভগবদুপলব্ধি', শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর 'অপরোক্ষানুভব' প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা ব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আম্নায় স্বীকার করি; সুতরাং শ্রীভগবান্ বিজ্ঞান-সহিত যে পরম গুহ্যজ্ঞান ব্রহ্মার সেবোন্মুখ-হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন, আদিগুরু ব্রহ্মা তাঁহার সেবোন্মুখশিষ্য শ্রীমধ্বাচার্য্যের হৃদয়ে যে বিজ্ঞান প্রকাশ করিয়াছিলেন, শ্রীমধ্ব হইতে যে

বিজ্ঞান আম্নায়-পারম্পর্য্যে শ্রীল মাধবেন্দ্র লাভ করিয়াছিলেন, শ্রীমাধবেন্দ্র হইতে শ্রীঈশ্বরপুরী, আবার ব্রহ্মার হৃদয়ে বিজ্ঞান প্রদাতা সনাতন পুরুষ ভগবান্ জগতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর আদর্শ স্থাপন কল্পে স্বয়ং জগদ্‌গুরু হইয়াও যে শিষ্যলীলাভিনয় করিয়া ছিলেন, সেই জগদ্‌গুরু গৌরসুন্দর হইতে তাঁহার দ্বিতীয়স্বরূপ শ্রীস্বরূপদামোদর—যিনি মহাপ্রভুর 'প্রিয়ঙ্কর' নামে খ্যাত, সুতরাং রসাভাসাদি ভক্তিসিদ্ধান্তবিরোধের তিরস্কর্ত্তা, সেই স্বরূপদামোদরের মিত্র শ্রীরূপসনাতন প্রভুদ্বয় এবং রূপানুগ শ্রীজীব রঘুনাথ যে বিজ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাই আমাদের সম্বল। শ্রীচৈতন্যভাগব মহাগ্রন্থের রচয়িতা শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনকেও আমরা বৈজ্ঞানিক বলিয়াই জানি, কারণ তিনি সাক্ষাদ্ ব্যাসাবতার। শ্রীভগবৎপ্রোক্ত বিজ্ঞান তাঁহার হৃদয়ে নিত্য প্রকাশিত। সেই বৈজ্ঞানিক-কুলচূড়ামণি আদিকবির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-প্রণালীও আমাদের শিরোধার্য্য।

আমরা বৈজ্ঞানিক যুগে বাস করিতেছি। বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তিপ্রচারে মূলপুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই যুগকে বিশেষ বৈজ্ঞানিক যুগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—'পূর্ব্ব বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্তিত মতসকলে একটু একটু বৈজ্ঞানিক ভাবের অভাব থাকায় তাঁহাদের পরস্পর বিজ্ঞানভেদে সম্প্রদায়ভেদ হইয়াছে। সাক্ষাৎ পরতত্ত্ব শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু * * সেই সকল সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ করিয়া স্বীয় অচিন্ত্যভেদাভেদাত্মক অতি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক মত জগৎকে কৃপা করিয়া অর্পণ করিয়াছেন। (শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, ৯ম পরিচ্ছেদ)।

হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সংমিশ্রণকারী রসায়নশাস্ত্রপারদর্শী অশ্রৌত তর্কপন্থী বৈজ্ঞানিক কিম্বা স্বল্পবাহির দিয়া ও কাগ্‌মারীর জড়রসরসিকগণের রাসায়নিক গবেষণায় যে অসম্পূর্ণতা, হেয়তা, পরিবর্ত্তনশীলতা, নশ্বরতা, জগদ্ধ্বংসকারিতা, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটবাদি দোষ বিশুদ্ধবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে উদ্‌ঘাটিত হয়, তাহা অচিন্ত্য ভেদাভেদাত্মক বিশুদ্ধ-বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের অনুবর্ত্তনকারী ব্যক্তিগণে নাই; সুতরাং হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বিশ্লেষণ-প্রণালীর আদর্শে বিশ্লিষ্ট প্রবন্ধের বিশুদ্ধ-বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আমরা এই বিশুদ্ধ-বৈজ্ঞানিক যুগে বিশুদ্ধবৈজ্ঞানিকগণের অনুবর্ত্তী হইয়াই সম্পন্ন করিব।

প্রথমে জিজ্ঞাস্য, বিশ্লেষণ করিবেন কে? ক্ষীর ও অম্বু সংমিশ্রিত থাকিলে হংস তাহা হইতে ক্ষীর বিশ্লেষণ করিতে পারেন। কিন্তু হংসের ন্যায় প্রতিভাত অপর পক্ষীর সেরূপ ক্ষমতা ভগবান্ কর্ত্তৃকই প্রদত্ত হয় নাই। শ্রীমন্মহাভারত বলেন—

"অনুসৃত্য তু শাস্ত্রাণি কবয়ঃ সমবস্থিতাঃ।
অপীহ স্যাদপীহ স্যাৎ সারাসারদিদৃক্ষয়া।।
বেদবাদানতিক্রম্য শাস্ত্রাণ্যারণ্যকানি চ।
বিপাট্য কদলীস্তম্বং সারং দদৃশিরে ন তে।।"

(মহাভাঃ শাঃ পঃ ১৯ অঃ ১৬-১৭)

পণ্ডিতাভিমানিব্যক্তিগণ 'ইহা এই প্রকার', 'ইহা এই প্রকার'—এইরূপে সারাসার নির্ণয় করিতে গিয়া শাস্ত্রসমূহের অনুসরণ করেন। কিন্তু শাস্ত্র ভগবদ্বাক্য, তাহা জড়বিদ্যা বা অক্ষজজ্ঞানের সাহায্যে উপলব্ধ হয় না। অক্ষজজ্ঞানিগণ আপনাদিগকে 'পণ্ডিত' বা 'তত্ত্ববেত্তা' অভিমান করিলেও বস্তুতঃ তাঁহারা বেদবাক্যের অবমাননাই করিয়া থাকেন। কদলীস্তম্ব বিপাটন করিতে করিতে যেমন তন্মধ্যে কোন সারই লক্ষিত হয় না, তদ্রূপ বেদাবলেহনকারী বেদবাদিগণ অক্ষজজ্ঞানে বেদ-আরণ্যকাদি শাস্ত্র আলোচনা করিতে গিয়া সার-গ্রহণের পরিবর্ত্তে ভারবাহীই হইয়া পড়েন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি মরে।।"

'পৌত্তলিকতা' শব্দের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-প্রণালী দেখিয়া মনে হয় যে, উহা অত্যন্ত জড়নিষ্ঠ, ভারবাহী, অতত্ত্বজ্ঞ বৈজ্ঞানিকব্রুবগণের কুনাট্য মাত্র। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, পণ্ডিত সার্ব্বভৌম মহাশয় কখনই এরূপ অদূরদর্শিতা, অতত্ত্বজ্ঞতা, ভারবাহিতা ও কুপাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিতে পারেন না। তবে কি ইহা স্বল্প-বাহিরদিয়ার হাইড্রোসিল-বিজ্ঞানজ্ঞ মৃত মহাশয়ের অনুকরণে কাগ্‌মারীর রাসায়নিক গবেষণার নমুনা?

'পৌত্তলিক' শব্দটী বঙ্গভাষায় 'পুতুল' শব্দ হইতে সৃষ্ট হয় নাই; পরন্তু উহা সংস্কৃত শব্দ। 'পুত্তলি' শব্দ পূজনার্থে 'ষ্ণ্‌' প্রত্যয় করিয়া 'পৌত্তলিক' শব্দ নিষ্পন্ন। 'পুত্তলি', 'পুত্তলিকা', 'পুত্তলক' প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত সাহিত্যে ও শাস্ত্রে নব্য ব্রাহ্মধর্ম্ম সৃষ্টির বহু বহু বৎসর পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত আছে। উত্তরকামাখ্যাতন্ত্রে 'পুত্তলি' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, যথা—'মৃন্ময়ীং '**পুত্তলিং**' কৃত্বা দীপাদিভিরলঙ্কৃতাম্।" প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কবি কালিদাস 'দ্বাত্রিংশৎ **পুত্তলিকা**' নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। স্মার্ত্তরঘুনন্দন তাঁহার অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের বহুস্থানে 'পুত্তলক' 'পুত্তলিকা' প্রভৃতি শব্দোদ্ধৃত শাস্ত্রবচন উদ্ধার করিয়াছেন। শুদ্ধি-তত্ত্বে দেখিতে পাওয়া যায়—"আচারাৎ যোগ্যত্বাচ্চ শরপত্রৈঃ '**পুত্তলকং**' কৃত্বা ইত্যাদি"। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনও সেই সংস্কৃত 'পুত্তলি' শব্দটী তাঁহার বঙ্গভাষায় রচিত শ্রীগ্রন্থে ব্যবহার করিয়াছেন—'**পুত্তলি**' করয়ে দেহ দিয়া বহুধন।" (চৈঃ ভাঃ আ ২।৬৫)।

জড়নিরাকারবাদী নব্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণ 'পৌত্তলিক' কথাটী ব্যবহার করিলেও ব্রাহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মশিষ্য শ্রীনারদ বেদব্যাসকে যে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিতে বলিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্মসূত্রভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে বহু শতাব্দী পূর্ব্বে 'পৌত্তলিকতার' প্রকার নিরূপিত হইয়াছে। পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদও ব্রাহ্মের শত শত বাক্য উদ্ধার করিয়া শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দময়ী শ্রীমূর্ত্তির বিরোধী পৌত্তলিকবাদ নিরাস করিয়াছেন।

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু **ভৌম ইজ্যধীঃ**।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ।।

(ভাগবত ১০।৮৪।১৩)

শ্রীমদ্ভাগবতপ্রোক্ত ''ভৌমে ইজ্যধীঃ' পদদ্বয় কি পৌত্তলিকতাগর্হণমুখে প্রচারিত হয় নাই? তাহা হইলে শ্রীভাগবতধর্ম্ম কি জড়নিরাকারবাদীর ব্রাহ্মধর্ম্ম? ভাবার্থদীপিকাকার 'ভৌম ইজ্যধীঃ' পদের ''ভুবি বিকারে ইজ্যধী দেবতাবুদ্ধি''—এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। ভাগবতচন্দ্র চন্দ্রিকাকার ''পার্থিব প্রতিমাদৌ দেবতাবুদ্ধিঃ'' এবং বৃহৎ ক্রমসন্দর্ভকার ''ভৌমে মৃন্ময়ে শিবলিঙ্গদুর্গা প্রতিমাদৌ ইজ্যধীঃ'' এইরূপ ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। বৈষ্ণবতোষণী ও সারার্থদর্শিনী বৃহস্পতি-সংহিতাবাক্য উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন—

''অজ্ঞাত ভগবদ্ধর্ম্ম-মন্ত্রবিজ্ঞানসম্বিদঃ।
নরাস্তে গোখরা জ্ঞেয়া অপি ভূপালবন্দিতাঃ।।''

চিৎ-সবিশেষব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ের এই সকল বাক্য সূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষণ করিলে জানিতে পারা যায় যে, জড়নিরাকারবাদ প্রচারক ব্রাহ্মগণ যাহাকে 'পৌত্তলিকতা' বলেন অথবা কোন বিশেষ সম্প্রদায় যাহাকে 'ব্যুৎপরস্ত' বলেন এবং অপর সম্প্রদায় যাহাকে 'Idolatry' বলেন, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে 'পৌত্তলিকতা' নহে। তাঁহারা নিজেরাই পৌত্তলিক। তবে একটী কথা সত্য যে, ঐ সকল সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষবাদী পঞ্চোপাসক প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া যে 'পৌত্তলিক' শব্দ প্রয়োগ করেন, তাহা যথার্থ। উহা দ্বারা এক পৌত্তলিক আর এক পৌত্তলিকের নিন্দা করেন মাত্র। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ যে 'ভৌমে ইজ্যধীঃ'—এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সমীচীনই হইয়াছে; কারণ ঐরূপ 'ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা'-প্রয়াসজাত মনোধর্ম্মের ছাঁচে গড়া মূর্ত্তিসমূহ ''সত্যং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমান্ অপাবৃতঃ'' (ভা ৪।৩।২৩)—এই ন্যায়ানুসারে বিশুদ্ধ সত্ত্বে অর্থাৎ শুদ্ধ নির্ম্মল সেবোন্মুখ জীবাত্মস্বরূপে স্বয়ং প্রকটিত অধোক্ষজ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ-বিগ্রহের প্রকটন বা অবতার নহে। নিরুপাধিক বসুদেব যে প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনে স্ব-প্রকাশ অধোক্ষজবিগ্রহের অবতার দর্শন করেন এবং বহির্জ্জগতে লোকহিতার্থ প্রকটিত করেন, তাহাই শ্রীবিগ্রহ। আর উপাধিক সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মন—যাহা অপরা প্রকৃতির অন্তর্গত বলিয়া 'প্রাকৃত' বা সাংখ্যের চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বান্তর্গত প্রাকৃত দ্রব্যের পদার্থের অন্যতম অর্থাৎ 'ষোড়শকস্তু বিকারঃ' এই কারিকাবচনানুসারে মহদাদি প্রকৃতি-বিকৃতির বিকার বলিয়া প্রাকৃত বা ভৌম সেই ভৌমবস্তুজাত প্রতিমামাত্রই 'পুত্তলি' বা 'পুত্তলিকা' এবং সেই পুত্তলির উপাসকগণই পৌত্তলিক।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর—যাঁহাকে পণ্ডিত সার্ব্বভৌম মহাশয় 'শিক্ষাগুরু' বলিয়া গৌরব (?) অনুভব করেন—'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে'র পঞ্চম বৃষ্টির ৩য় ধারায় এবং 'জৈবধর্ম্মে'র ১১শ অধ্যায়ে 'নিত্যধর্ম্ম ও ব্যুৎপরস্ত অর্থাৎ পৌত্তলিকতা-শীর্ষক প্রস্তাবে কতপ্রকার 'ভৌমে ইজ্যধী' অর্থাৎ পৌত্তলিকতা হইতে পারে, তাহা শুদ্ধ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণদ্বারা সুষ্ঠুভাবে নিরূপণ করিয়াছেন। শ্রীভাগবতধর্ম্ম বা শুদ্ধ সবিশেষ ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং ব্রাহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মশিষ্য শ্রীমন্মধ্বচার্য্য—যিনি সচ্চিদানন্দ-নিত্যবিগ্রহ স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া জগদ্গুরু শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক আচার্য্যরূপে সম্মানিত হইয়াছেন এবং যে জন্য অস্মৎসম্প্রদায় 'ব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, সেই ভাগবত সম্প্রদায় বা সাত্বতপঞ্চরাত্রসম্প্রদায় তথা পূর্ব্ববর্ত্তী

আচার্য্যগণের বিচার অবলম্বন ও অনুসরণেই বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের স্বপ্রকাশ-নিত্যবিগ্রহে অনাদর বা ভোগবুদ্ধিপূর্ব্বক মনঃ কল্পিত মূর্ত্তি ও নামগুণ-লীলা-সৃষ্টিকারী গৌরনাগরীর কল্পনা ও ভোগবুদ্ধি-গর্হণমুখেই 'পৌত্তলিকতা' শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে।

অনভিজ্ঞ সম্প্রদায়ে 'পৌত্তলিকতা' কথাটী প্রচলিত ছিল বলিয়াই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর "শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত" ও "জৈবধর্ম্মে" 'ভৌমে ইজ্যধী' এই অপ্রচলিত কথাটী ব্যবহার না করিয়া 'পৌত্তলিকতা' শব্দ ব্যবহারপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে তাঁহাদের ব্যবহৃত ভাষার সাহায্যে সুষ্ঠুরূপে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, "গৌরনাগরী পৌত্তলিক কেন ?" তদ্বিষয়ে শত শত যুক্তি প্রদর্শিত হইতে পারে। শ্রীল জীবগোস্বামিচরণ শিবলিঙ্গদুর্গাদি প্রতিমাদিতে পূজ্যবুদ্ধিকারি-ব্যক্তিগণকে 'পৌত্তলিক' বলিয়াছেন এবং শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর "শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে" পঞ্চবিধ পৌত্তলিকের নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে,— (১) কল্পিত মূর্ত্তি ধ্যান বা পূজাকারি-ব্যক্তিগণ পৌত্তলিক, (২) পঞ্চোপাসকগণ পৌত্তলিক, (৩) নির্ব্বিশেষ ও জড় নিরাকারবাদিগণ পৌত্তলিক, (৪) চাকচিক্যবিশিষ্ট বস্তুতে ঈশ্বরবুদ্ধিকারিগণ পৌত্তলিক, (৫) জীবে ঈশ্বর জ্ঞানকারি ব্যক্তিগণ পৌত্তলিক।

পৌত্তলিকতা—দ্বিবিধ, যথা, (১) স্থূলপৌত্তলিকতা, (২) সূক্ষ্ম বা মানস পৌত্তলিকতা। স্বতন্ত্র ও স্বপ্রকাশ-বিগ্রহবান্ ভগবানের নামরূপ-গুণলীলা বৈশিষ্ট্য-ধ্বংসকারী বা নিজ ভগবদ্বিমুখ কল্পনাপ্রভাবে ভোগপর মনোধর্ম্মে ভগবানের নামরূপগুণলীলা-সৃষ্টি-প্রয়াসি-ব্যক্তিগণ স্থূল-পৌত্তলিক না হইলেও মানস-পৌত্তলিক। অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী শুদ্ধবৈজ্ঞানিকগণের সুসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ঐ সকল মানসপৌত্তলিকের পৌত্তলিকতা ধরা পড়িয়া যায়। যেমন সচ্চিদানন্দময়ী শ্রীমূর্ত্তির সেবকগণের অনুকরণে পঞ্চোপাসকগণ মূর্ত্তি কল্পনা করেন বলিয়া তাঁহাদিগের কল্পনাকে শ্রীজীবগোস্বামিপ্রমুখ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানবেত্তা মনীষিগণ 'ভৌমে ইজ্যধী' বা 'পৌত্তলিকতা' বলিয়াছেন, তদ্রূপ বিশুদ্ধসত্ত্ব গৌরসেবকগণের সদাসেবোন্মুখ হৃদয়ে যে অপাকৃত অধোক্ষজ স্বয়ংপ্রকাশ গৌরনারায়ণ বা বিপ্রলম্ভতনু মহাভাবময়ী শ্রীগৌরমূর্ত্তি প্রকটিত হন বা আশ্রিত জগতে স্বয়ং স্বতন্ত্রেচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া নিজস্বরূপবিগ্রহ প্রকাশিত করেন, তাহার বিকৃত অনুকরণ করিতে গিয়া মাটীয়া-বুদ্ধিসম্পন্ন গৌরনাগরী গৌরাঙ্গের কল্পিত মূর্ত্তি বা নামরূপগুণলীলা-সৃষ্টি করিবার প্রয়াস করেন বলিয়া 'গৌরনাগরী' ও পৌত্তলিক। যেমন কল্পনাকারী বা মায়াবাদীর কল্পিত মূর্ত্তি ভগবানের নিত্যস্বরূপবিগ্রহ অর্থাৎ যে অধোক্ষজ শ্রীবিগ্রহ বিশুদ্ধসত্ত্বে স্বয়ংপ্রকাশিত হন, তাহা হইতে পৃথক্ অর্থাৎ কাল্পনিক পুত্তলমাত্র, তদ্রূপ গৌরনাগরীর কল্পিত মূর্ত্তি অর্থাৎ স্বতন্ত্রেচ্ছাময় শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার যে মহাভাবময়ী, কাঞ্চন-পঞ্চালিকার ভাবকান্তি-সুবলিতা শ্রীমূর্ত্তি বা দ্বিজবর শ্রীবিগ্রহ শ্রীরায় রামানন্দ, শ্রীবাস, শ্রীস্বরূপদমোদরাদি বিশুদ্ধসত্ত্বগণে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, সেই স্বয়ংপ্রকাশিতা শ্রীমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে মূঢ় ভোগপরের মনগড়া নূতন কল্পিত মূর্ত্তি ভোগ বুদ্ধিজাত পুত্তলমাত্র; সুতরাং সেইরূপ ভোগময়ী কল্পিত মূর্ত্তির উপাসকগণ 'পৌত্তলিক'।

ভগবানের স্বরূপশক্তিগত সন্ধিনীপ্রভাব হইতেই শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ নিত্যতত্ত্ব বর্ত্তমান। সেই শুদ্ধস্বরূপে ভগবান্ নিত্যপ্রকাশিত। শুদ্ধ সত্ত্বগণের স্বরূপানুরূপ-সেবাভেদে আরাধ্যবস্তুর নামরূপ গুণলীলাভেদ। আরাধ্যবস্তু শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তের স্ব-স্ব-রূপানুরূপ সেবনোপযোগী যে বিগ্রহে অবতীর্ণ হন, তাহা কিছু আরাধ্যবস্তুর অভীষ্টের প্রতিকূল নহে; কারণ সেখানে সেবকের ভোগবুদ্ধিজাত মনোধর্ম্মের অবসর বা কোনও প্রকার কল্পনা নাই। তাই লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের পরাবস্থাবর্ণনে এই সুপ্রসিদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্তসার শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রবাক্যটী দৃষ্ট হয়—

"মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ।।"

বৈদুর্য্যমণি যেরূপ দ্রব্যান্তর-সম্বন্ধ-স্থিতিভেদে নীলপীতাদি বর্ণভেদে দৃষ্ট হইয়া রূপভেদ লাভ করে, সেইরূপ ভক্ত-ভানানুসারে ধ্যানভেদে এক অদ্বিতীয় অচ্যুতের ধ্যানে পৃথক্ পৃথক্ অবস্থা লক্ষিত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতেও (৩।৯।১১ শ্লোকে) দৃষ্ট হয়—

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননুনাথ পুংসাম্।
যদ্যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়।।"

হে নাথ, (গুরুমুখে) ভবদীয় কথা শ্রবণানন্তর লোকে আপনার সেবা-প্রাপ্তির পথের সন্ধান পান। আপনি আপনার নিজজনের ভক্তিযোগপূত হৃৎপদ্মে সর্ব্বদা বিশ্রাম করেন। হে উত্তমঃশ্লোক, ভক্তবৃন্দ স্ব-স্ব (সিদ্ধদেহ-ভাগবত) ভাবনানুযায়ী যে সকল নিত্যস্বরূপ বিভাবনা করেন, আপনি তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য সেই সেই স্বরূপের প্রকট করিয়া থাকেন।

শ্রীপঞ্চরাত্র বা ভাগবতমার্গের এই সার শ্লোকদ্বয় শ্রৌতপন্থী শ্রীমূর্ত্তিসেবক ও আরোহবাদী, মনোধর্ম্মী, কল্পনাকারী পৌত্তলিকের পার্থক্য অতি সুন্দর ভাষায় নিরূপণ করিয়াছেন। টীকায় "শ্রুতেক্ষিতপথঃ"—'শ্রুতং শ্রবণেন ঈক্ষিতঃ পন্থা যস্য সঃ' অর্থাৎ যে ভগবানের সেবাপ্রাপ্তির পথের সন্ধান শাস্ত্র সিদ্ধান্ত শ্রবণ অর্থাৎ শ্রৌতপন্থায় আবিষ্কৃত হয়। এই বিশেষণটীর দ্বারা ভগবানের কাল্পনিক মূর্ত্তি সৃষ্টি করিবার প্রয়াস সর্ব্বতোভাবে খণ্ডিত হইয়াছে।

একই ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্বভক্তের ধ্যান-অনুরূপ অর্থাৎ সেবোন্মুখ-ভক্তের স্বরূপানুরূপ সেবাভেদে নানারূপ বিগ্রহে প্রকাশিত হন বলিয়া তিনি প্রাকৃতসহজিয়া বা ঈশ্বরে ভোগবুদ্ধিকারি-ব্যক্তির ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু হন না। ভক্তবাৎসল্যবশতঃ তিনি ভক্তের বাঞ্ছিত স্বরূপবিগ্রহ প্রকট করিয়া ভক্তের সেবা গ্রহণ করেন; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি আত্মবঞ্চক বা পরবঞ্চক ভক্তব্রুবের ইন্দ্রিয়তর্পণের নামে সেবার ছলনায় বা মায়ায় মুগ্ধ হন না, কারণ তিনি মায়াধীশ। পরতত্ত্ব কখনও মানুষের 'খেয়ালে'র কবলে কবলীকৃত হইয়া বিরূপগ্রস্ত বশ্যজীবের ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তুবিশেষে পরিণত হন না। পুতুলকে যেরূপ মানুষ ইচ্ছামত 'ফরমায়েস' দিয়া প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে, তাহাকে যথেচ্ছ ভোগ করিতে পারে, স্বরাট্ পরমেশ্বরকে সেরূপ ভোগ করা

যায় না। পঞ্চোপাসক কর্ম্মিসম্প্রদায় বা নির্ব্বেদবাদি-জ্ঞানিসম্প্রদায় অধিরোহবাদের সাহায্যে যে গৌরাঙ্গের বা ভগবানের মূর্ত্তি (?) সৃষ্টি করেন, গৌরনাগরীর গৌরাঙ্গসৃষ্টিও (?) তাহারই প্রকারভেদ, এই জন্য তাহা 'পৌত্তলিকতা'।

গৌরনাগরী নিম্নলিখিত কারণে পৌত্তলিক,—

(১) গৌরনাগরী 'শ্রুতেক্ষিতপথ' শ্রীগৌরসুন্দরের কল্পিত নাগরমূর্ত্তি সৃষ্টি করিবার প্রয়াস করেন বলিয়া তিনি অধিরোহবাদী।

(২) শুদ্ধসত্ত্বভক্তগণের ইচ্ছা বা ধ্যানই সেবা; তাহা স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ। সেই বৃত্তিতে ভগবানের নিত্য অভ্যুদয়। শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তি বা নিরুপাধিক প্রেমের সহিত অবিশুদ্ধ মনোধর্ম্ম ও উপাধিক কাম বা স্বেচ্ছাচারিতাকে সমপর্য্যায়ে গণনা হইতেই গৌরনাগরীর ভগবানের নামরূপগুণলীলা সৃষ্টি করিবার প্রয়াস। এই কারণেই তিনি জড়সমন্বয়বাদী বা পৌত্তলিক।

(৩) যেমন পঞ্চোপাসক বা মায়াবাদিগণ তাঁহাদেহ কল্পিত বা সৃষ্ট প্রতীককে ভক্তগণপূজিত শ্রীবিগ্রহের সহিত সমান জ্ঞান করেন—পরস্পর যে আকাশপাতাল পার্থক্য, তাহা কিছুতেই বুঝিতে চান না, গৌর-নাগরীও তদ্রূপ গৌরসুন্দরের যে নামরূপগুণলীলা সৃষ্টি করেন, তাহা হইতে শ্রীরায় রামানন্দাদি ভক্তগণের নিকট প্রকাশিত শ্রীগৌরসুন্দরের স্বরূপবিগ্রহ পৃথক্। কিন্তু গৌরনাগরী ইহা কিছুতেই বুঝিবেন না বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন; এই জন্যই গৌরনাগরী গৌরভোগী পৌত্তলিক।

(৪) ব্যাস-নারদাদি বিদ্বজ্জন এবং শুদ্ধসত্ত্বনিরুপাধিক ভক্তবৃন্দ পরানন্দসমাধি-সময়ে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবানের যে নিত্যরূপ দর্শন করেন, তাঁহাদের হৃদয়স্থিত সেই স্বরূপবিগ্রহের লোকমঙ্গলার্থে বহির্জগতে প্রকাশই শ্রীবিগ্রহ বা শ্রীমূর্ত্তি। তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনাদি তথা অপরাপর নিরুপাধিক রাগমার্গীয় ভক্তগণ শ্রীগৌরসুন্দরের যে নামগুণরূপলীলা অর্থাৎ রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ দর্শন ও বহির্জগতে প্রকট করিয়াছেন, শ্রীগৌরসুন্দরের সেই নিত্যস্বরূপের সেবায় প্রমত্ত না হইয়া স্বেচ্ছাচারিতা-বশে শ্রীগৌরসুন্দরকে গড়িবার চেষ্টার নামই 'পৌত্তলিকতা'।

(৫) গৌরনাগরী কৃষ্ণস্বরূপের নিত্যা ঔদার্য্যময়ী লীলাকে অনিত্যা মনে করেন। কারণ তিনি ঔদার্য্যলীলাকে স্বস্থানচ্যুত করিয়া সেই স্থানে অরসজ্ঞ ও অপরাধিব্যক্তির ন্যায় মাধুর্য্যলীলা স্থাপন করিতে প্রয়াসী। তিনি শ্রীভগবৎস্বরূপের নিত্য মাধুর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও ঔদার্য্যলীলার নিত্যবৈশিষ্ট্য সংরক্ষণে পরাঙ্মুখ। গৌরনাগরীর ধারণা যে, তিনি ঔদার্য্যকে নষ্ট করিয়া সেই স্থানে মাধুর্য্য সংস্থাপন করিতে পারেন। গৌরনাগরীর এইরূপ ঔদার্য্য মাধুর্য্য ভ্রম উপস্থিত হয় বলিয়া গৌরনাগরী কল্পনাপ্রিয়, কল্পিত গৌরগঠনকারী, বিবর্ত্তবাদী ও পৌত্তলিক।

(৬) গৌরনাগরী মনে মনে ভাবেন যে, "বৈকুণ্ঠস্থ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধৃক্ নারায়ণকে ধরিয়া তাঁহার চতুর্ভুজের দুইটী ভুজ ছেদন (!) করিয়া দেওয়া হউক। শঙ্খচক্রগুলি তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হউক। সেই

স্থানের হাতী ঘোড়া রথ সমস্তই পোড়াইয়া দেওয়া হউক। নারায়ণের স্বারূপ্যলাভকারী চতুর্ভুজ সেবকগণকেও ধরিয়া ধরিয়া তাঁহাদিগের হস্তাদি পরিচ্ছন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে 'গোপী' সাজাইয়া দেওয়া হউক আর নারায়ণের হাতে বাঁশী দেওয়া হউক। লক্ষ্মীকে বিদগ্ধা রমণী সাজান হউক। কারণ ভগবানের লীলা ত' আমাদের ন্যায় 'ভক্ত-বিটেলে'র স্বেচ্ছাচারিতার অধীন।"—এইরূপ অপরাধময় বিচারের বশবর্ত্তী হইয়া গৌরনাগরী গৌরসুন্দরকে নাগরী লম্পট, সন্ন্যাসিশিরোমণিকে 'রাসক্রীড়ারত', লোকশিক্ষক গুরুকে 'কামুক' গুরুপত্নীকে 'কামুকী', ব্রজনাগরীভাবে প্রমত্ত মূর্ত্তিকে বিপ্রাদিপরপত্নীরত নাগর, দ্বিজবরকে 'গোপ' বলিয়া কল্পনা করেন। গোপবধূটীবিট্ কৃষ্ণকে সন্ন্যাসী সাজাইয়া দেওয়া বা গোয়ালাকে দ্বিজবরে পরিণত করা বা গোপীজনবল্লভকে সঙ্কেতস্থানে গমন বা রাসস্থলীতে যাইতে বাধা দেওয়া যেরূপ ক্ষুদ্র জীবের সামর্থ্যাতীত, তদ্রূপ গৌরসুন্দরের হাতে নাগরী চিত্তহারিণী বংশিকা প্রদান করা, বিপ্রলম্ভতনু ঔদার্য্যবিগ্রহ গৌরকে 'নাগরেন্দ্র' বা 'রসরাজ' প্রভৃতি সম্ভোগময় বিশেষণে বিশিষ্ট করাও ক্ষুদ্রজীবের অপরাধ পরাকাষ্ঠা ও স্বেচ্ছাচারিতার চরম সীমায় আরোহণ-প্রচেষ্টার পরিচয়। গৌরনাগরী গৌরসুন্দরের এইরূপ কল্পিত নামরূপলীলা-সৃষ্টিকারী বলিয়া 'পৌত্তলিক'।

'গৌরনাগরী'বাদ কেবল পৌত্তলিকতা-দোষে দুষ্ট এরূপ নহে, তাহাতে ঔদার্য্যে মাধুর্য্যভ্রমরূপ বিবর্ত্তবাদ-রূপ দোষ, তাহাতে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা বা শাক্তেয়বাদরূপ দোষ, তাহাতে রসাভাসদোষ, সিদ্ধান্তবিরোধরূপ দোষ, তাহাতে গৌরে ভোগবুদ্ধিরূপ দোষ, তাহাতে রূপানুগত্ব পরিহাররূপ দোষ, তাহাতে প্রেমভক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর চরণে অশেষ অপরাধরূপ দোষ, তাহাতে নিজভোগবুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা জগদ্‌গুরুর ঘাড়ে ন্যস্ত করা রূপ অপরাধ, জগদ্‌গুরুতে 'মর্ত্ত্যবুদ্ধি'-রূপ অপরাধ, সর্ব্বজীবের গুরুবর— মহামহিমকুলের মুকুটমণি—সর্ব্বসাত্বতশাস্ত্রকর্ত্তৃগণের অগ্রণী শ্রীব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের প্রচারিত 'শাস্ত্র সিদ্ধান্ত-লঙ্ঘন'রূপ দোষ, ষড়্‌গোস্বামীর শিক্ষার বিরুদ্ধে অভিনব মতবাদ কল্পনা করা রূপ 'অতিবাড়ী'-দোষ, শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যনামরূপ গুণলীলা ও স্বেচ্ছাবশে মনঃ কল্পিত মায়াকে সমজ্ঞানরূপ 'চিজ্জড়সমন্বয়'-দোষ প্রভৃতি অসংখ্য অসংখ্য দোষ দেখান যাইতে পারে। আমরা বারান্তরে বিশুদ্ধ-বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গৌরনাগরী মতবাদরূপ বিস্ফোটকের অস্ত্রোপচার করিয়া সুধীসমাজে তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিব—বিস্তারিতভাবে উদ্‌ঘাটিত করিব।

শ্রীসরস্বতী পূজা

ভগবানের শক্তি অনন্ত হইলেও জীবের নিকট তাঁহার তিনটী শক্তির পরিচয় আছে,— (১) চিচ্ছক্তি, (২) জীবশক্তি ও (৩) মায়াশক্তি। চিচ্ছক্তির নামান্তর স্বরূপ শক্তি বা অন্তরঙ্গাশক্তি, জীবশক্তির নামান্তর তটস্থাশক্তি এবং মায়াশক্তির নামান্তর বহিরঙ্গাশক্তি। জীবশক্তিকে তটস্থাশক্তি বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, উহা অন্তরঙ্গাশক্তি ও বহিরঙ্গাশক্তি এই উভয় শক্তিরই অধীন হইবার যোগ্য; জীব যখন বহিরঙ্গাশক্তি বা

মায়াশক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াও আপনাকে তাঁহার সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট মনে করেন, তখন তিনি বহিরঙ্গাশক্তি বা মায়াশক্তির অধীনে মায়ার সেবা করিতে বাধ্য হন। এইকালে তিনি 'কর্ম্মী' বা 'জ্ঞানী' বলিয়া জড়জগতে পরিচিত হন। যখন জীব মায়ার অবিদ্যাবৃত্তির সেবায় আপনাকে নিয়োগ করেন, তখন 'কর্ম্মী', এবং যখন মায়ার বিদ্যাবৃত্তির সেবায় নিযুক্ত হন, তখন আপনাকে 'জ্ঞানী' বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত আরও এক শ্রেণীর জীব আছেন, তাঁহারা মায়ার ঐ দুইটী বৃত্তির মধ্যে কোনওটীর সেবা না করিয়াই চিচ্ছক্তি, স্বরূপশক্তি বা হ্লাদিনীশক্তির দাস্যে আপনাকে নিয়োগ করিয়া স্ব-স্বরূপে ভগবৎসেবায় রত থাকেন, ইঁহারা 'কর্ম্মী' বা 'জ্ঞানী' নামে পরিচিত হওয়ার পরিবর্ত্তে 'ভক্ত' নামে পরিচিত হইয়া থাকেন। অতএব জগতে যতপ্রকার জীব আছে, তাহাদিগকে দুইভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে,— (১) মায়াবশীভূত বা অচিদাশ্রিত এবং (২) মায়ামুক্ত বা চিদাশ্রিত; অচিদাশ্রিতব্যক্তিগণ মায়ার সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী গুণে আবদ্ধ হইয়া ''সমশীলা ভজন্তি বৈ" অর্থাৎ স্বভাবানুসারে জীব তত্তদ্‌গুণবিশিষ্ট দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে, —এই ভাগবত বাক্যানুসারে মায়াকে নানাপ্রকারে উপাসনা করিয়া থাকেন। ঐরূপ উপাসকগণের মধ্যে শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সৌর, গাণপত্য ও বিষ্ণুর সগুণ উপাসক বা সামান্য বৈষ্ণব—এই পঞ্চপ্রকার বিভাগ প্রধানরূপে লক্ষিত হয়। বিভিন্ন গুণাবলম্বিব্যক্তিগণ স্ব-স্ব রুচি বা স্বেচ্ছাচারিতার বশবর্ত্তী হইয়া কোনও একটী বিশেষ দেবতাকে প্রধানরূপে স্বীকার পূর্ব্বক 'শৈব, শাক্ত, সামান্য বৈষ্ণব' প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যাত অর্থাৎ কোনও একটী বিশেষ দেবোপাসক নামে পরিচিত হইলেও তাঁহারা ভোগার্থ ধনের কামনায় লক্ষ্মী, অর্থ বা প্রতিষ্ঠাকরী বিদ্যা কামনায় সরস্বতী প্রভৃতি দেবতাগণের লৌকিক প্রথানুসারে পূজা করিয়া থাকেন। শ্রীল জীবগোস্বামিচরণ তত্ত্বসন্দর্ভ (১৭শ অনু) লিখিয়াছেন যে, প্রকৃতিজন-পূজিতা সরস্বতীদেবী সঙ্কীর্ণ শাস্ত্রদির প্রতিপাদ্য দেবতা। যথা—''সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৃনাঞ্চ নিগদ্যতে" (তত্ত্বসন্দর্ভ ১৭)। 'সঙ্কীর্ণ শব্দের অর্থ শ্রীজীবপাদ এইরূপ করিয়াছেন—''সঙ্কীর্ণেষু সত্ত্বরজস্তমোময়েষু", 'সরস্বতী' শব্দের তাৎপর্য্য— ''নানাবাণ্যাত্মক—তদুপলক্ষিতায়া নানা দেবতায়া ইত্যর্থঃ" অর্থাৎ 'বিবিধ বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা', ইহা দ্বারা নানাদেবদেবীও উপলক্ষিত হইতেছেন; তাৎপর্য্য এই যে, সরস্বতী বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তদ্দ্বারা তিনি নিজের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া বিবিধ বাক্যের দ্বারা বিভিন্নদেবতার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই জন্যই শ্রীল জীবগোস্বামীপ্রভু 'সরস্বতী' বলিতে নানা দেবদেবীও লক্ষ্য করিয়াছেন। সরস্বতী বাগধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া 'নানা দেবদেবী' উপলক্ষিত হইলেও বস্তুতঃ 'সরস্বতী' বলিতে কোন একটী পৃথক দেবতাই বুঝাইয়া থাকে। শ্রীসরস্বতীকে বিদ্যা বা জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলা হইয়া থাকে।

জড়জগতে মায়াদেবী 'দুর্গা' নামে পরিচিতা, তাঁহার আবরণের মধ্যে আমরা সরস্বতীকে দেখিতে পাই; আবার ঐকান্তিক ভক্তগণও সরস্বতী দেবীকে ভগবচ্ছক্তিরূপে পূজা করিয়া থাকেন, ইহাও দেখা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত মহাভাগবতবর শ্রীল সূত গোস্বামী মহারাজ ভাগবতারম্ভের মঙ্গলাচরণে পরাবিদ্যারূপিণী সরস্বতীকে প্রণাম করিতেছেন—''দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততোজয়মুদীরয়েৎ (ভাঃ ১।২।৪)। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে মুনিগণগুরু শ্রীশুকদেব গোস্বামী ''প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী" (ভাঃ ১।২।২২)—এই

বাক্যে বেদরূপা বাণী শ্রীসরস্বতীর ভগবদাজ্ঞায় আদিগুরু শ্রীব্রহ্মার মুখপদ্মে আবির্ভাব-প্রসিদ্ধির কথা কীর্ত্তনপ্রসঙ্গে শ্রীসরস্বতী শ্রীকৃষ্ণকেই একমাত্র উপাস্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, ইহাই জানাইয়াছেন। "সরস্বতী কথম্ভূতা?—স্বং শ্রীকৃষ্ণং লক্ষয়তি উপাস্যত্বেন দর্শয়তীতি সা"—(চক্রবর্ত্তিচরণ)।

আলোচনাস্থলে মায়াবদ্ধ ও মায়ামুক্ত উভয়প্রকার জীবের বাগ্‌দেবতা শ্রীসরস্বতীদেবীর পূজা প্রসঙ্গ প্রদর্শিত হইল; সিদ্ধান্তস্থলে বিচার্য্য এই যে, উভয়ের উপাস্যদেবতা সরস্বতী এক না পৃথক? মায়ামুক্ত ও মায়াবদ্ধ জীবের উপাস্য সরস্বতী এক নহে, একটি স্বরূপশক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তির বৃত্তি, অপরটী মায়াশক্তি বা বহিরঙ্গাশক্তির বৃত্তি বিশেষ। একটী কৃষ্ণভজন-প্রদর্শিনী বেদাত্মিকাবাণী বা কৃষ্ণকৃপারূপিণী সন্মুখরিতা বীর্য্যবতী কৃষ্ণকীর্ত্তন-সরস্বতী, আর একটী বহিরর্থ-প্রদর্শিনী বিমুখবিমোহিনী কৃষ্ণেতর বাগ্বিলাসিনী। মায়াশক্তি ও চিচ্ছক্তি শক্তিবিচারে অভিন্ন হইলেও বস্তু ও বস্তুর ছায়া যেরূপ পৃথক, তদ্রূপ মায়া ও চিচ্ছক্তি সজাতীয় ও বিজাতীয় বিচারে পরস্পর ভিন্ন। মায়াশক্তি শক্তিমান ভগবানেরই শক্তি হইলেও দুষ্টাপত্নী যেরূপ স্বামিসন্নিধানে গমন করিতে লজ্জা বোধ করে, সেইরূপ মায়াশক্তিও "বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া" (ভাঃ ২।৫।১৩)—এই ভাগবত-বচনানুসারে ভগবৎ সম্মুখে গমন করিতে পারে না; আর চিচ্ছক্তি ভগবৎ সন্নিধানে নিরন্তর অবস্থান করিয়া তদীয় সেবাসুখ লাভ করেন।

মায়াশক্তিগত সরস্বতী উপাসকগণের মধ্যে সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ কবি কালিদাসের নাম আমরা পুরা কালের ইতিবৃত্ত হইতে জানিতে পারি; পরবর্ত্তিকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট সময়ে উদিত কেশব কাশ্মীরী নামে জনৈক বিখ্যাত দ্বিগিজয়ী পণ্ডিতের নাম ও গ্রন্থ দৃষ্ট হয়। কেশব কাশ্মীরীও সরস্বতীর আরাধনা প্রভাবে কবিত্ব-শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। আবার নবদ্বীপের তাৎকালিক অবস্থা বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের ভাগবত ছন্দে দৃষ্ট হয়, "সরস্বতী-প্রসাদে সবেই মহাদক্ষ", (চৈঃ ভাঃ আ ২।৫৮)। পরাবিদ্যারূপিণী শ্রীসরস্বতীপতি শ্রীগৌর নারায়ণ শ্রীমন্নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলে প্রকৃতি-জনোপাস্য সরস্বতীর বরপুত্রগণের যাবতীয় পাণ্ডিত্য-প্রতিভা মলিনতাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। দিগ্বিজয়ী কেশব কাশ্মীরীর প্রতি সরস্বতীর উপদেশ-বাক্য শ্রীচৈতন্যভাগবতকার এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

কৃপাদৃষ্ট্যে ভাগ্যবন্ত ব্রাহ্মণের প্রতি।
কহিতে লাগিলা অতি গোপ্য সরস্বতী।।
সরস্বতী বলেন, শুনহ বিপ্রবর।
বেদগোপ্য কহি এই তোমার গোচর।।
কা'র স্থানে কহ যদি এ সকল কথা।
তবে তুমি শীঘ্র হৈবা অল্পায়ু সর্ব্বথা।।
যার ঠাঞি তোমার হইল পরাজয়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ সেই সুনিশ্চয়।।

আমি যার পাদপদ্মে নিরন্তর দাসী।
সম্মুখ হইতে আপনারে লজ্জাবাসি।।

(চৈঃ ভাঃ আ ১৩।১২৭-১৩১)

শ্রীচৈতন্যভাগবতের উপরি উক্ত বাক্যগুলির সহিত ভগবদ্ভক্তগণের নিম্নলিখিত বাক্য বিচার করিলে তদুভয়ের উপাস্য সরস্বতী দেবী যে পৃথক্, তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে। প্রাচীনবৈষ্ণব শ্রীধরস্বামিচরণ শ্রীমদ্ভাগবতের টীকার প্রারম্ভে তাঁহার উপাস্য শ্রীনৃসিংহদেবের স্তব করিতে গিয়া নৃসিংহ শক্তি সরস্বতী দেবীকে শ্রীনৃসিংদেবের বদনে অর্থাৎ সম্মুখে অবস্থিত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন—

বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সংবিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে।।

কালিদাস, কেশব কাশ্মীরী-প্রমুখ ব্যক্তিগণের উপাস্য দূরে থাকুক, তাঁহার সম্মুখে গমন করিতেও আপনাকে লজ্জিতা মনে করেন। শ্রীমদ্ভাগবত (২।৫।১৩) ও শ্রীচৈতন্যভাগবত (আঃ ১৩।১৩১) বাক্যই তাহার প্রমাণ। পরা বিদ্যারূপিণী শ্রীসরস্বতীদেবী শুদ্ধকীর্ত্তনময়ী, শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া; তিনি শুদ্ধভক্তগণের জিহ্বাগ্রে অবস্থান করিয়া নিরন্তর ভগবৎসেবা-নিরতা। অভক্ত ও ভক্তব্রুবগণ কেহ যদি তাঁহার (শ্রীসরস্বতীর) স্বামীকে কোন কটু বা সিদ্ধান্তবিরোধ বাক্য প্রয়োগ করেন, তথাপি বাগধিষ্ঠাত্রী দেবতা তদ্দ্বারা নিজ স্বামীর স্তুতি করিয়া থাকেন, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।২৫।৫ শ্লোকে ইন্দ্রের বাক্যে প্রমাণিত হইয়াছে অর্থাৎ মূর্খতাবশে ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিলে শ্রীসরস্বতীদেবী তাঁহারই মুখে নিজ-প্রভু শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়াছিলেন, কিন্তু ইন্দ্র তাহা জানিতে পারেন নাই।

কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির নামান্তরই শুদ্ধা সরস্বতী, তিনি কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়া। পরাবিদ্যারূপিণী শুদ্ধা সরস্বতী স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি। শুদ্ধ ভক্তগণ সেই সরস্বতীর নিত্য পূজা করিয়া থাকেন। শ্রবণ-কীর্ত্তন-মুখেই তাঁহার পূজা সাধিত হয়। আমরা অপ্রাকৃত কবিকুলরাজ শ্রীজয়দেব গোস্বামীকে—

“শৃণু তদা জয়দেব-সরস্বতীম্”—

এই বাক্যে শুদ্ধা সরস্বতী দেবীর একজন প্রধান পূজকরূপে দেখিতে পাই। ‘জয়’ শব্দের অর্থ— সর্ব্বোৎকর্ষবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ; ‘দিব্’ ধাতু-নিষ্পন্ন ‘দেব’ শব্দের দ্বারা—যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে স্বভক্তি-প্রভাবে প্রকাশিত করেন, তাঁহাকেই বুঝাইয়া থাকে, অর্থাৎ যিনি নিজ-ভক্তি-প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণকে প্রকাশিত করেন, তিনিই জয়দেব। ‘জয়দেব’ বলিতে শুদ্ধ কৃষ্ণকীর্ত্তনপরায়ণ ভক্তমাত্রই উপলক্ষিত হইয়া থাকেন। সেবোন্মুখ ভক্তগণের জিহ্বায় যে শুদ্ধা সরস্বতী স্ফুরিতা হন, ভাগ্যবান জীবগণ শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। শুদ্ধা সরস্বতী দেবীও ভাগ্যবান্ জীবের কর্ণরন্ধ্র দ্বারা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার হৃদয়কে নির্ম্মল ও স্বীয় কান্ত শ্রীহরির উপবেশনোপযোগী করিয়া সেই সৌভাগ্যবান্ ভক্তের জিহ্বায় নৃত্য করিতে

করিতে নিজ-স্বামীর তুষ্টি-বিধান করিয়া থাকেন। ভক্ত কবি কুলের আরাধ্যা এই শুদ্ধা সরস্বতীকে পুরাণাদি শাস্ত্রে ভগবন্মুখ পদ্ম-প্রকটিত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি তাৎপর্য্যময়ী বাণী ব্যতীত জীবের ইন্দ্রিয়তোষণপরা ইতর বাণীর নামান্তরই দুষ্টা সরস্বতী; কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণী ভক্তারাধ্যা শ্রীজয়দেব-সরস্বতী হইতে ইনি ভিন্না। কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিস্বরূপিণী কৃষ্ণসেবাময়ী শুদ্ধা সরস্বতী ও তচ্ছায়া স্বরূপা মায়াশক্তি প্রাকৃত-জনপূজ্যা সরস্বতীর পার্থক্য কোন মহাজন তাঁহার একটি গীতিতে এইরূপ ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন,—

মনরে কেন কর বিদ্যার গৌরব।

স্মৃতি-শাস্ত্র-ব্যাকরণ, নানা ভাষা-আলোচন,
বৃদ্ধি করে যশের সৌরভ।।

কিন্তু দেখ চিন্তা করি, যদি না ভজিলে হরি,
বিদ্যা তব কেবল রৌরব।

কৃষ্ণ-প্রতি আনুরক্তি, সেই বীজে জন্মে ভক্তি,
বিদ্যা হইতে তাহা অসম্ভব।।

বিদ্যায় মার্জ্জন তার, কভু কভু অপকার,
জগতেতে করি অনুভব।

যে বিদ্যার-আলোচনে, কৃষ্ণরতি স্ফুরে মনে,
তাহারি আদর জান সব।।

ভক্তি বাধা যাহা হ'তে সে বিদ্যার মস্তকেতে
পদাঘাত কর অকৈতব।

সরস্বতী কৃষ্ণ-প্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁর হিয়া,
বিনোদের সেই সে বৈভব।।

(কল্যাণকল্পতরু)

শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ ভগবানের বহিরঙ্গা ও অন্তরঙ্গা শক্তির বিচারে তত্ত্বদ্বৃত্তির যে ভেদ নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাতেও পরা বিদ্যাস্বরূপিণী বেদবাণীরূপা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপরায়ণ কীর্ত্তনময়ী শুদ্ধা সরস্বতীর সহিত বহির্ম্মুখ লোকচিত্তবিনোদকারিণী, নাস্তিকতা-প্রচারিণী জড় বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীর পার্থক্য নিরূপিত হইয়াছে; যথা—অথৈকমেব স্বরূপং শক্তিত্বেন শক্তিমত্ত্বেন চ বিরাজতীতি। যস্য শক্তেঃ স্বরূপভূতত্বং নিরূপতিং তচ্ছক্তিমত্তা প্রাধান্যেন বিরাজমানং ভগবৎ সংজ্ঞামাপ্নোতি তচ্চ ব্যাখ্যাতম্। তদেব চ শক্তিত্ব-প্রাধান্যেন বিরাজমানং লক্ষ্মীসংজ্ঞামাপ্নোতীতি দর্শয়িতুং তস্যাঃ স্ববৃত্তিভেদেনানন্তায়াঃ কিয়ন্তো ভেদা দর্শ্যন্তে। যথা—

"শ্রিয়া পুষ্ট্যা গিরা কান্ত্যা কীর্ত্ত্যা তুষ্ট্যেলয়োর্জয়া।
বিদ্যয়াঽবিদ্যয়া শক্ত্যা মায়য়া চ নিষেবিতম্।।"

শক্তির্মহালক্ষ্মীরূপা স্বরূপভূতা। শক্তিশব্দস্য প্রথম প্রবৃত্ত্যাশ্রয়রূপা ভগবদন্তরঙ্গ-মহাশক্তিঃ। মায়া চ বহিরঙ্গা শক্তিঃ। শ্র্যাদয়স্তু তয়োরেব বৃত্তিরূপাঃ। তাসাং সর্ব্বাসামপি প্রাকৃতাপ্রাকৃততাভেদেন শ্রূয়মাণত্বাৎ। ততঃ শ্রিয়েত্যাদৌ শক্তিবৃত্তিরূপয়া মায়াবৃত্তিরূপয়া চেতি সর্ব্বত্র জ্ঞেয়ম্। তত্র পূর্ব্বস্যা ভেদঃ শ্রীর্ভাগবতী সম্পৎ। নত্বিয়ং মহালক্ষ্মীরূপা তস্যা মূলশক্তিত্বাৎ। তদগ্রে বিবরণীয়ম্। উত্তরস্যা ভেদঃ শ্রীর্জাগতী সম্পৎ। ইমামেবাধিকৃত্য "ন শ্রীর্বিরক্তমপি মাং বিজহাতি" ইত্যাদি বাক্যম্। (ভগবৎসন্দর্ভ ১০২)

একই স্বরূপ—শক্তি ও শক্তিমানরূপে বিরাজিত। যাঁহার শক্তির স্বরূপভূতত্ব নিরূপিত হইয়াছে, সেই অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ববস্তুই শক্তিমত্তা-প্রাধান্যে বিরাজমান হইয়া ভগবৎসংজ্ঞা প্রাপ্ত হন, ইহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; আবার তিনি শক্তি-প্রাধান্যে বিরাজিত থাকিয়া লক্ষ্মী-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন, ইহা প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে শক্তির স্বীয়া বৃত্তির অনন্তভেদের মধ্যে কয়েকটী ভেদ প্রদর্শিত হইতেছে, যথা—শ্রী, পুষ্টি, গীঃ, কান্তি, কীর্ত্তি, তুষ্টি, ইলা, ঊর্জ্জা, বিদ্যা, অবিদ্যা, শক্তি ও মায়াদ্বারা নিষেবিত। এই দ্বাদশটী বৃত্তির মধ্যে যাহা মহালক্ষ্মীরূপা স্বরূপভূতা, তাহাই শক্তি; কেননা, 'শক্তি' শব্দের প্রবৃত্তি একমাত্র আশ্রয়রূপা ভগবানের অন্তরঙ্গা মহাশক্তি। 'মায়া' বলিতে বহিরঙ্গা শক্তি; শ্রী, পুষ্টি প্রভৃতি—শক্তির এই দ্বাদশটি বৃত্তি স্বরূপশক্তি ও মায়াশক্তি-ভেদে দুই প্রকার জানিতে হইবে, কেননা তাহাদের (শক্তির বৃত্তিসমূহের) প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত এই দুই প্রকার ভেদ শ্রবণ করা যায়; অতএব শ্রী, পুষ্টি, গীঃ অর্থাৎ বাগধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতী স্বরূপ শক্তির বৃত্তি ও মায়াশক্তির বৃত্তি-রূপে শক্তিমান পুরুষের সেবা করিয়া থাকেন, ইহা সর্ব্বত্রই জানিতে হইবে। স্বরূপশক্তিগত বৃত্তির ভেদ প্রদর্শিত হইতেছে—'শ্রী' বলিতে ভাগবতী-সম্পৎ। ইনি মহালক্ষ্মীরূপা নহেন; কেননা মহালক্ষ্মী স্বরূপশক্তিও এস্থলে বর্ণিতা 'শ্রী' স্বরূপশক্তির বৃত্তিরূপা। বহিরঙ্গা শক্তির বৃত্তি 'শ্রী' জাগতিক সম্পদ্রূপা (যাঁহাকে জড় ঐশ্বর্য্য লাভের নিমিত্ত কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ পূজা করিয়া থাকেন)। ইঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়াই 'বিরক্ত আমাকেও 'শ্রী' পরিত্যাগ করে না' প্রভৃতি উক্তি দেখা যায়। গীঃ অর্থাৎ জনবিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও স্বরূপশক্তির বৃত্তিরূপা কৃষ্ণসেবাপরা বিষ্ণুকান্তা সরস্বতী সম্বন্ধেও বিচার ঐরূপ জানিতে হইবে।

ভক্তগণ মায়াশক্তির অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া চিচ্ছক্তির বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে সরস্বতীর পূজা করিয়া থাকেন। মূল বস্তুকে ছাড়িয়া ভ্রমক্রমে বস্তুর ছায়াকে বস্তুভ্রমে যে পুজা, তাহা কখনই সুফল প্রদান করিতে পারে না। উদাহরণ-স্বরূপে বলা যাইতে পারে—সম্পূর্ণ দুগ্ধ বিশ্বাসেও চাখড়ি-গোলা পান করিলে যেরূপ দুগ্ধ-পানের ফল পাওয়া যায় না, ছায়াকে বাস্তব বস্তু বলিয়া বিশ্বাস করিলেও যেরূপ বাস্তব বস্তুর স্পর্শ লাভ ঘটে না, তদ্রূপ।

শুদ্ধ ভক্তগণ সরস্বতীকে নিজের সেবায় নিযুক্ত না করিয়া তদ্দ্বারা সরস্বতী কান্ত শ্রীকৃষ্ণেরই সেবা করাইয়া থাকেন, তাহাতেই শুদ্ধা সরস্বতীর সন্তোষ। কিন্তু প্রাকৃত ব্যক্তিগণ সেব্য-সরস্বতীর সন্তোষ উৎপাদনের

চেষ্টায় উদাসীন থাকিয়া নিজ-লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি জড়েন্দ্রিয়-তর্পণের নিমিত্তই যে সরস্বতীর পূজা করিয়া থাকেন, তাহাতে মায়াশক্তির আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয় জীবের শুদ্ধস্বরূপ আবরণ করিয়া পরাবিদ্যারূপিণী বাণীর পূজা হইতে তাঁহাদিগকে বহুদূরে নিক্ষেপ করিয়া থাকে।

আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের অপর নামই কাম, হরিবিমুখতা বা নাস্তিকতা। আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণপরায়ণতার চরম-সীমায় উপনীত হইলেই চার্ব্বাক, এপিকিউরাস্, ইয়াংচু, লুসিপস্ প্রভৃতির মত জীবের হৃদ্দেশ অধিকার করে। এইরূপ নাস্তিকতা কখনও প্রচ্ছন্ন, কখনও বা স্পষ্টাকারে লক্ষিত হয়। প্রচ্ছন্না নাস্তিকগণ ইন্দ্রিয়-তর্পণকে "নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ" (innocent pleasures) নাম প্রদান করিয়া ভোগপ্রদাত্রী দেবতাগণের আরাধনায় ব্যস্ত হন।

এইরূপ আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-পরায়ণ ব্যক্তিগণ 'গায়ক', 'বাদক', 'কবি', 'সাহিত্যিক', 'চিত্রকর', 'নানা কলাবিদ্যা বিশারদ' প্রভৃতি নামে জগতে বিদিত হইয়া স্ব-স্ব বিদ্যার পারদর্শিতা অর্জ্জনার্থ সরস্বতী দেবীর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ইঁহাদের সাধ্য—কনক, কামিনী ও জড়প্রতিষ্ঠা। এক কথায় আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ বা কাম। বঙ্গদেশের বহু স্থানে—শৌণ্ডিকালয়ে, বারবনিতাভবনে, সখের দলে, শিশুপাঠার্থিসম্প্রদায়ে সরস্বতী-পূজা একটি প্রধান পর্ব্ব বলিয়া প্রচলিত আছে; কোন কোন স্থানে তাহাদের পরম পূজ্যা শ্রীসরস্বতী মাতার সম্মুখে বারবনিতার নৃত্য, তাম্রকুট, সিগারেট, গঞ্জিকাসেবন, সুরাপান, গ্রাম্য বাগ্‌বিলাস ও নানাপ্রকার রঙ্গরস হইয়া থাকে। মাতার সম্মুখে এরূপ আচরণ বড়ই নীতি-বিগর্হিত। ইহাই কি পূজা?

কিন্তু শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণ কখনও এইরূপভাবে বাগ্ দেবীর অসম্মান করেন না, অথবা মায়ামোহিত হইয়া লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীসরস্বতী দেবীকে পূজা করিবার ছলে তাঁহার সহিত বণিকতুল্য ব্যবহার করেন না, কিম্বা স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভৌম বস্তুতে দেবীর আবাহন এবং পরে তাঁহাকে বিসর্জ্জন দিয়া ভৌম ইজ্যধীঃ অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুতে পূজ্যবুদ্ধিরূপ পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দেন না। তাঁহারা পরাবিদ্যারূপিণী শ্রীসরস্বতী দেবীকে অনুক্ষণ শ্রবণ-কীর্ত্তন মুখে পূজা করিয়া থাকেন। এইরূপ পূজায় ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমান বা পূজ্য ও পূজকের মধ্যে কোনপ্রকার বণিগবৃত্তি নাই। শ্রীগৌরভগবানের শ্রীমুখবিগলিত "কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ"—এই শ্রৌতবাণীর পূজা তাঁহার অনুক্ষণ শ্রবণ-কীর্ত্তন-মুখে সম্পন্ন করেন। কীর্ত্তনময়ী বাণীকে শ্রবণযুগল-দ্বারা নিরন্তর সেবা করিতে করিতে অনর্থযুক্ত জীবের অনর্থ-নিবৃত্তি হয় এবং জীবের হৃদয়ে সৎসিদ্ধান্ত-সরস্বতী সুপ্রতিষ্ঠিতা হন; তখন জীব কৃষ্ণে দৃঢ়শ্রদ্ধা ও শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণতা লাভ করিয়া উত্তমাধিকারে আরূঢ় হন। সেই অবস্থাতেও তিনি কীর্ত্তনময়ী বাগ্‌দেবীর অর্চ্চনা পরিত্যাগ করেন না, পরন্তু সমধিক উল্লাসের সহিত মহাভাগবত-চূড়ামণি শ্রীশুকদেব বা সূতগোস্বামীর ন্যায় "স্বলক্ষণা" অর্থাৎ কৃষ্ণভজন প্রদর্শিনী শ্রৌতবাণীরূপা কৃষ্ণপ্রিয়া সরস্বতীকে সর্ব্বত্র বিস্তার করিতে থাকেন; অতএব ভগবদ্ভক্তগণের ন্যায় আর শ্রেষ্ঠ সরস্বতী-পূজক কে?

শিবরাত্রি-ব্রত

গত ১৮ই ফাল্গুন বুধবার শিবরাত্রি-ব্রতের নির্দ্দিষ্ট দিন ছিল। শিবরাত্রি-ব্রত বৈষ্ণবের কৃত্য কি না তদ্বিষয়ে অনেকের সন্দেহ উপস্থিত হয়। এতৎসম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন (১৪।৬৩),—

শিবরাত্রিব্রতমিদং যদ্যপ্যাবশ্যকং ন হি।
বৈষ্ণবানাং তথাপ্যত্র সদাচারাদ্বিলিখ্যতে।।

অর্থাৎ শিবরাত্রি-ব্রত ঐকান্তিক বৈষ্ণবগণের কৃত্য না হইলেও সদাচার-প্রসঙ্গে এই স্থলে শিবরাত্রির ব্যবস্থা লিখিত হইতেছে। আবার উক্ত গ্রন্থের অন্য স্থলে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির নিমিত্ত কৃষ্ণপ্রিয় শম্ভুর ব্রতাদি পালনের কর্ত্তব্যতাও নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এতদ্বিষয়ে সুসিদ্ধান্ত কি, তাহা যথার্থরূপে জানিতে হইলে শিব ও বিষ্ণুর তত্ত্ব বিচার করা একান্ত কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান প্রবন্ধে শিব ও বিষ্ণু তত্ত্ব বিচার করিয়া শিবব্রত পালনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা নির্ণীত হইতেছে।

ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তগণ বিষ্ণু ব্যতীত স্বতন্ত্র ভাবে অন্য কোন দেবতা উপাসনা করেন না, আবার তাঁহাদের প্রতি কোন প্রকার অবজ্ঞাও প্রদর্শন করেন না, তাঁহারা বিষ্ণুকেই একমাত্র পরমেশ্বর জানিয়া শিবাদি দেবতাকে বিষ্ণুর অধীন দাসজ্ঞানে যথাযথ সম্মান করিয়া থাকেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ১০৫ অনুচ্ছেদে এবং ভাঃ ১।২।২৪ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের এই উপাখ্যানটি উল্লেখ করিয়াছেন—বিশ্বক্সেন নামক একজন পরম ভাগবত ব্রাহ্মণ পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছিলেন। একদা তিনি একাকী কোন বনসমীপে আসিয়া উপবেশন করিলেন। অতঃপর গ্রাম্যধ্যক্ষসুত সেই স্থানে আসিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে বলিল,—তুমি কে? ব্রাহ্মণ নিজের নাম বলিলে গ্রামাধ্যক্ষপুত্র পুনরায় তাঁহাকে বলিল,—অদ্য আমার শিরঃপীড়া হইয়াছে সুতরাং আমি আমার ইষ্টদেব শিবের পূজা করিতে পারিতেছি না; অতএব আমার প্রতিনিধিরূপে তুমি শিব পূজা কর। গ্রামাধ্যক্ষপুত্র এইরূপ বলিলে ঐ ব্রাহ্মণ বলিলেন,—আমরা ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্ত বলিয়া পরিচিত। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহাত্মক প্রকট অথবা অপ্রকট ভগবান্ শ্রীহরি আমাদের একমাত্র পূজ্য; আমরা অন্য দেবতার পূজা করি না, অনন্তর ঐ ব্রাহ্মণ শিবপূজায় অস্বীকৃত হইলে গ্রামাধ্যক্ষপুত্র তাঁহার শিরশ্ছেদন করিতে খড়্গ উত্তোলন করিল। তদনন্তর বিপ্র কিছু কাল নীরব থাকিয়া এবং তাহার নিকট হইতে মৃত্যু বাঞ্ছা না করিয়া মনে মনে বিচারপূর্ব্বক বলিলেন, —মহাশয়, আপনার মঙ্গল হউক, আমি তথায় যাইতেছি। সেখানে গিয়া তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, এই রুদ্রদেব প্রলয়ের কারণ, সুতরাং তমোবর্দ্ধনকারী বলিয়া তমোময়; আর তামসদৈত্যগণের সংহারক এবং তমোভঞ্জনকারী বলিয়া শ্রীনৃসিংহদেবও স্বীয় ভজন প্রদর্শনার্থ তমোরাশি দূর করিয়া সেই স্থানে উদিত হন। অতএব রুদ্রমূর্ত্তির অধিষ্ঠান সত্ত্বেও এই স্থানে আমি রুদ্রোপাসকের তমোভঞ্জনার্থ শ্রীনৃসিংহদেবেরই পূজা করিব। এই বলিয়া বিপ্র 'শ্রীনৃসিংহায় নমঃ'—এই মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিলে গ্রাম্যধ্যক্ষপুত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পুনরায় খড়্গ উত্তোলন করিল। তদনন্তর অকস্মাৎ শিবলিঙ্গ ভেদ করিয়া শ্রীনৃসিংহদেব স্বয়ং আবির্ভূত

হইলেন এবং সেই গ্রামাধ্যক্ষপুত্রকে সপরিকরে বিনষ্ট করিলেন। দক্ষিণ দেশে অদ্যাপি 'লিঙ্গস্ফোট' নামে প্রসিদ্ধ শ্রীনৃসিংহ মূর্ত্তি বিরাজমান।

কনিষ্ঠাধিকারী অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি পাছে বৈষ্ণবপ্রবর শিবের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া 'নামাপরাধ' সঞ্চয় করে, তজ্জন্য শাস্ত্রে শিবব্রত বা বৈষ্ণবব্রতের বিধান লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণু ও শিবের যথার্থ তত্ত্ব অবগত না হইয়া যাঁহারা স্বতন্ত্র ঈশ্বর জ্ঞানে শিবের পূজা অথবা শিব-ব্রতাদির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

ভবব্রতধরা যে চ যে চ তান্ সমনুব্রতাঃ।
পাষণ্ডিনস্তে ভবন্তু সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থিনঃ।।

অর্থাৎ ভৃগুশাপকথনে বর্ণিত হইয়াছে যে, যাহারা শিবব্রত ধারণ করিবে, কিম্বা শিবব্রতধারিগণের অনুগামী হইবে, সেই সকল ব্যক্তিকে সর্ব্বশাস্ত্রের প্রতিকূলাচারী বলিয়া জানিবে, সুতরাং তাহারা পাষণ্ডিরূপে গণিত হউক। এই শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভে লিখিত হইয়াছে যথা—বেদবিহিতমেবাত্র ভবব্রতমনূদ্যতে; অন্যবিহিতত্বে পাষণ্ডিত্ববিধানাযোগঃ স্যাৎ, পূর্ব্বত এব পাষণ্ডিত্ব সিদ্ধেঃ। তস্মাৎ স্বতন্ত্রত্বেনৈবোপাসনায়াময়ং দোষঃ; যতশ্চ তত্রৈব তেন শ্রীজনার্দ্দনস্যৈব বৈদমূলত্বমুক্তম্।

অর্থাৎ এস্থলে বেদবিহিত ভবব্রতের কথাই পশ্চাৎ কথিত হইতেছে। কেননা, এই ভবব্রত যদি বেদবিহিত না হইত, তাহা হইলে উহাতে ভৃগুর শাপপ্রভাবে পাষণ্ডিত্ব বিধান সঙ্গত হইত না, যেহেতু বেদবিধিবিরুদ্ধ শৈব-তান্ত্রিকগণের পাষণ্ডিত্ব পূর্ব্বেই সিদ্ধ হইয়াছে; তজ্জন্য স্বতন্ত্ররূপে শিবের উপাসনাতেই এই পাষণ্ডিত্ব দোষ হয়। বৈষ্ণবজ্ঞানে শিবের উপাসনায় কোন দোষ নাই। পদ্মপুরাণে দশবিধ নামাপরাধ বিচার প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে,—"শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিসকলং ধিয়াভিন্নং পশ্যেৎ সখলু হরিনামাহিত করঃ" অর্থাৎ যিনি শিবের গুণ, নাম ও স্বরূপকে শ্রীবিষ্ণুর নাম, গুণ ও স্বরূপ হইতে অভিন্ন দর্শন করেন, তিনি নামাপরাধী, অথবা 'অভিন্ন' স্থলে 'ভিন্ন' এই পাঠ স্বীকার করিলে উহার অর্থ এইরূপ হইবে—যিনি শিবের ও বিষ্ণুর গুণনামাদি শ্রীবিষ্ণু হইতে ভিন্ন জ্ঞান করেন অর্থাৎ শ্রীশিবকে শ্রীবিষ্ণু হইতে একটি স্বতন্ত্র ঈশ্বর এইরূপ কল্পনা করেন, তিনি হরিনামাপরাধী। বস্তুতঃ শিবাদি দেবতার ঈশ্বরতা পরমেশ্বর বিষ্ণুর অধীন। বিষ্ণুই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, তদায়ত্তবৃত্তিকত্ব হেতু শাস্ত্রের কোন কোন স্থলে শিব ও বিষ্ণুর ঐক্য স্থাপিত হইলেও স্বরূপতঃ তাঁহাদের অনৈক্যই সিদ্ধ হইয়াছে; কেননা, বিষ্ণুর সহিত শিবাদি অন্য দেবতার সাম্যবুদ্ধির নিন্দাই পদ্মপুরাণাদি সাত্ত্বতশাস্ত্রে শ্রবণ করা যায়—"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতং। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবং।। বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বৈ নারকী সঃ" প্রভৃতি বচনই তাহার প্রমাণ (শ্রীসিদ্ধান্তরত্ন ৩।১৫)।

অতএব শাস্ত্রে যে যে স্থানে শিব-বিষ্ণুর ঐক্য কথিত হইয়াছে, তত্তৎস্থানের তাৎপর্য্য বিষয়ে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে ২১৬ অনুচ্ছেদে লিখিয়াছেন,—"শুদ্ধভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা

সহ অভেদদৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে" অর্থাৎ শুদ্ধভগবদ্ভক্তগণ বিষ্ণুর সহিত শম্ভু ও শ্রীগুরুদেবের অভেদ-বর্ণন-স্থলে তাঁহাদিগকে বিষ্ণুর প্রিয়তমরূপেই সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত। যথা (৪।৩০।৩৮)—

বয়ন্তু সাক্ষাদ্ভগবন্ ভবস্য প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন।
সুদুশ্চিকিৎসস্য ভবস্য মৃত্যোর্ভিষক্তমং ত্বাদ্যগতিং গতাঃ স্ম।।

প্রচেতোগণ কহিলেন,—হে ভগবন্! আমরা আপনার প্রিয়সখা শিবের ক্ষণকাল সঙ্গপ্রভাবে সুদুশ্চিকিৎস্য সংসার এবং মৃত্যুরূপ রোগদ্বয়ের সদ্বৈদ্য ও আদ্যগতি আপনাকে প্রাপ্ত হইলাম।

উপরি-উক্ত শাস্ত্রীয় বাক্যাবলি আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, শিব-বিষ্ণুর সর্ব্বতোভাবে ঐক্য নির্দ্দেশ করা কখনও শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট বিষয় হইতে পারে না। শ্রীবিষ্ণুই একমাত্র পরম তত্ত্ব, বিষ্ণু ব্যতীত অন্য কেহই ভগবৎপদবাচ্য হইতে পারেন না। অন্যের প্রতি ভগবৎ-শব্দপ্রয়োগ ঔপচারিক। সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুমাহাত্ম্যের কোটি অংশের এক অংশের সমান মাহাত্ম্যও "ব্রহ্ম-রুদ্রাদিতে নাই, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই বাক্যের প্রমাণস্বরূপ তত্ত্ববাদ গুরু শ্রীমন্মধ্ব মুনি (২।২৩) শ্রীগীতাভাষ্যে শ্রীনারদীয় পুরাণ বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন।

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং শপথৈশ্চাপি কোটিভিঃ।
বিষ্ণু মাহাত্ম্যলেশস্য বিভক্তস্য চ কোটিধা।।
পুনশ্চানন্তধা তস্য পুনশ্চাপি হ্যনন্তধা।
নৈকাংশ-সমমাহাত্ম্যাঃ শ্রীশেষব্রহ্মশঙ্করাঃ।।
এতেন সত্যবাক্যেন সর্ব্বার্থান্ সাধয়াম্যহং।

বিষ্ণুর পারতম্য ও শিবাদি দেবতার পারতন্ত্র্য সম্বন্ধে শ্রীমহাভারতাদি সর্ব্ব ইতিহাস, পুরাণ ও শ্রুতির তাৎপর্য্য নির্ণায়ক গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত (১।১৮।২১) বলেন,—

অথাপি যৎপাদনখাবসৃষ্টং জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ।
সেশং পুণাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ কো নাম লোকে ভগবৎপদার্থঃ।।

অর্থাৎ যাঁহার পদনখনিঃসৃত সলিল ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অর্ঘ্য স্বরূপে প্রদত্ত হইয়া শিবের সহিত সমগ্র জগৎকে পবিত্র করিতেছেন, ইহ জগতে সেই মুকুন্দ ভিন্ন আর কে ভগবৎ-শব্দবাচ্য হইতে পারেন? অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে,—

যচ্ছৌচনিঃসৃত সরিৎ প্রবরোদকেন তীর্থেন মূর্দ্ধ্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ।

(ভাঃ ৩।২৮।২২)

—যে ভগবান্ বিষ্ণুর চরণধৌতজল হতে বিনিঃসৃতা সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গার সংসারতাপনাশক পবিত্র সলিল মস্তকোপরি ধারণ করিয়া 'শিব'ও শিবস্বরূপ হইয়াছেন।

শ্রীমহাভারতের দ্রোণ পর্ব্বের শেষে শতরুদ্রীয় উপাখ্যানে দ্বিশততম অধ্যায়ে শিবের পারতম্য-বিষয়ের উল্লেখ আছে, বস্তুতঃ তাহা তদন্তর্য্যামী পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। কেন না, পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তানুসারে বিষ্ণুর পারতম্য সিদ্ধ হইয়াছে এবং বিষ্ণুর সহিত শিবের অনৈক্যও প্রতিপাদিত হইয়াছে। এস্থলে শিবের পারতম্য সিদ্ধ করিতে হইলে দুইজন পরতত্ত্ব পরম ব্রহ্ম স্বীকার করিতে হয়, তাহাতে অনিষ্টাপত্তিই হইয়া থাকে। বিশেষতঃ রাজস ও তামস পুরাণে বিধি-রুদ্রাদির পারতম্য কথিত হওয়ায় ঐগুলি প্রবল প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না, অতএব শিবের তদন্তর্য্যামী পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই সিদ্ধ। অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত (৪।৩।২৩) শিববাক্যই ইহার প্রমাণ,—

'অধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে'

উক্ত মহাপুরাণে শিবের সঙ্কর্ষণোপাসকত্ব প্রসিদ্ধ আছে, যথা—"ভবানীনাথৈঃ স্ত্রীগণার্ব্বুদসহস্রৈরবরুধ্যমানো ভগবতশ্চতুর্ম্মূর্ত্তের্মহাপুরুষস্য তুরীয়াং তামসীং মূর্ত্তিং প্রকৃতি মাত্মনঃ 'সঙ্কর্ষণ-সংজ্ঞামাত্মসমাধিরূপেণ সন্নিধাপ্যেতদভিগৃণন্ ভব উপধাবতি।" (ভাঃ ৫।১৭।১৬)

—এই ভাগবতীয় গদ্যের মর্ম্মানুবাদ শ্রীচৈত্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্যভাগবতে (চৈঃ ভাঃ আদি ১।২০) এইরূপ গ্রহণ করিয়াছেন,—

"পার্ব্বতী প্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী লঞা।
সঙ্কর্ষণ পূজে শিব উপাসক হঞা।।"

এতদ্ব্যতীত সম্বন্ধ-তত্ত্বাচার্য্য গোস্বামিবর্য্য শ্রীল সনাতন প্রভু বৃহদ্ভাগবতামৃতের ১।২।৯৭-৯৮ ও ১।৩।১ এবং ২।৩।৬৬ শ্লোকে শিবের সঙ্কর্ষণোপাসকত্ব বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল, —'আত্মসম মহিমান্বিত পরম শোভাশালী পারিষদবর্গে পরিবৃত ও মহাবিভূতিযুক্ত সুন্দর ছত্রচামরাদি-পরিচ্ছদ দ্বারা মণ্ডিত, স্বীয় অন্তর্য্যামী শ্রীমৎসঙ্কর্ষণ দেবের পূজায় রত হইয়া গিরীশ সেই স্থানে বিরাজ করিতেছেন। তিনি তথায় সঙ্কর্ষণ দেবকে স্বীয় অভীষ্ট দেবতারূপে বরণ করিয়া তাঁহার পূজা বিধানপূর্ব্বক কি অত্যদ্ভুত মহিমাই না বিস্তার করিতেছেন! দেবর্ষি নারদ সেই শিবলোকে শ্রীমৎসঙ্কর্ষণদেবের অর্চ্চনরত তদীয়ভাবে আবিষ্ট হইয়া নৃত্যপরায়ণ ও কীর্ত্তনমত্ত মহৈশ্বর্য্যশালী মহাদেবকে দর্শন করিলেন। মহাদেব জগতের ঈশ্বর হইলেও দাসের ন্যায় নিত্যকালই প্রেমসহকারে সহস্রবদন শেষমূর্ত্তি—শ্রীভগবানের পূজা করিয়া থাকেন। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের বৈভবপ্রকাশ শ্রীবলদেব বা মূলসঙ্কর্ষণ। তাঁহারই অংশস্বরূপ রুদ্রান্তর্য্যামী মহাসঙ্কর্ষণ।

এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, শিবের সঙ্কর্ষণোপাসনা যেরূপ শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণেরও সেইরূপ জাম্ববতীর পুত্রের জন্য রুদ্র-আরাধনা মহাভারতে ঔপমন্যব্যাখ্যানে প্রসিদ্ধ আছে। অতএব রুদ্রের হরি উপাসনা এবং হরির রুদ্র-উপাসনা দ্বারা তদুভয়ের ঐক্যই সিদ্ধান্তিত হইতেছে। অসূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের এইরূপ বিচার কিছু বিচিত্র নহে। বস্তুতঃ স্বভক্ত ভিন্ন সকাম জীব সকলের পক্ষে আধিকারিক দেবতা রুদ্রের

উপাসনা সংস্থাপনার্থ, ভগবান্ শ্রীহরি স্বকীয় রুদ্রের আরাধনা করিয়াছিলেন, আবার এই বিষয়টি প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে রুদ্রেরও অন্তর্য্যামী মহাসঙ্কর্ষণকে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, ইহাই রুদ্রোপাসনার তাৎপর্য্য। শ্রীনারায়ণীয়ে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তিতে এই বিষয়টি পরিস্ফুট আছে, যথা—

অহমাত্মা হি লোকানাং বিশ্বেষাং পাণ্ডুনন্দন।
তস্মাদাত্মানমেবাগ্রে রুদ্রং সংপূজয়াম্যহম্।।
ময়াকৃতং প্রমাণং হি লোকঃ সমনুবর্ত্ততে।
প্রমাণানি হি পূজ্যানি ততস্তং পূজয়াম্যহম্।।
ন হি বিষ্ণুঃ প্রণমতি কস্মৈচিদ্বিবুধায় চ।
অত আত্মানমেবেতি ততো রুদ্রঃ ভজাম্যহম্।।

অর্থাৎ হে পাণ্ডুনন্দন! অয়ি বিশ্বের আত্মা, আমি যে রুদ্রের পূজা করি, তাহা রুদ্রান্তর্য্যামী সঙ্কর্ষণেরই পূজা। আমি যাহা করি লোকে তাহার অনুবর্ত্তন করে, প্রমাণই পূজ্য। এই নিমিত্ত আমি রুদ্রের পূজা করিয়া থাকি। বিষ্ণু কোন দেবতাকে প্রণাম করেন না, আমি আত্মাকেই (রুদ্রান্তর্য্যামীকেই) 'রুদ্র' বলিয়া পূজা করি। (শ্রীসিদ্ধান্তরত্ন, ৩য় পাদ ২১-২২ অনুচ্ছেদ)।

যদি কহে বলেন, 'মহাদেব', 'মহেশ্বর' প্রভৃতি নামগুলি শিবের উদ্দেশেই পঠিত হইয়া থাকে, সুতরাং উক্ত নামসমূহ দ্বারাই শিবের পারতম্য স্বীকার করিতে হয়। এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর বেদান্তস্যমন্তকে এই প্রকারে মীমাংসিত হইয়াছে,—ননু মহেশাদিসমাখ্যয়া রুদ্রপারতম্যং মন্তব্যং মৈবং তস্যা মহেন্দ্রাদিসমাখ্যা-তদ্বৈফল্যাৎ।ইন্দ্রসমাখ্যৈব শক্রস্য তৎসাধয়েৎ।ইদি পরমৈশ্বর্য্যে ইতিধাত্বর্থপাঠাৎ।কিং পুনর্ম্মহত্ত্ববিশেষিতাসৌ। তস্যানীশ্বরত্বং সর্ব্বাভ্যুপগতম্। ঐশ্বর্য্যঞ্চ কর্ম্মায়ত্তং শতমখসমাখ্যায়াবগম্যতে। এবং মহাদেবসমাখ্যাপি দেবরাজসমাখ্যাবদ্বোধ্যা। তথা চ প্রবলপ্রমাণবাধাৎ সা সা চ নিষ্ফলৈব মহাবৃক্ষসমাখ্যাবত্তবেৎ।

'মহেশাদি' সংজ্ঞা দ্বারা রুদ্রের পারতম্য নির্ণয় করিতে হইবে—এইরূপ বিচার সুষ্ঠু নহে, কেননা, 'মহেশা'দি সংজ্ঞার 'মহেন্দ্রা'দি সংজ্ঞার ন্যায় বৈফল্য দেখা যায়। 'ইন্দ্র' সংজ্ঞা শক্র বা শতক্রতুর উদ্দেশ্যে পঠিত হইয়া থাকে, আবার 'ইন্দ্র শব্দে'র ধাতুগত অর্থে দেখা যায় যে,—'ইদ্' ধাতুর অর্থ পারমৈশ্বর্য্য; অতএব 'ইন্দ্র' শব্দের আর মহত্ত্বসূচক বিশেষণ নিষ্প্রয়োজন। দেবরাজ ইন্দ্রের অনীশ্বরত্ব সর্ব্বশাস্ত্র প্রসিদ্ধ এবং ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য যে কর্ম্মফলাধীন তাহা 'শতমখ' সংজ্ঞা দ্বারাই জানা যায়। 'দেবরাজ' সংজ্ঞার ন্যায় রুদ্রের 'মহাদেব' সংজ্ঞা জানিতে হইবে; প্রবল-প্রমাণের বাধহেতু 'মহাবৃক্ষ' সংজ্ঞার ন্যায় 'মহেন্দ্র' ও 'মহাদেব' প্রভৃতি সংজ্ঞার নিষ্ফলতা বুঝিতে হইবে।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—ইঁহারা গুণাবতার মধ্যে গণিত হইলেও বিষ্ণুর সহিত অপর দুই জনের সাম্যবুদ্ধি করা যাইতে পারে না। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"—এই গীতোক্ত ও বাক্যানুসারে একমাত্র বিষ্ণুর উপাসনাতেই মায়াতমঃ হইতে মুক্তি লাভ হয়। স্বতন্ত্রভাবে অন্যের উপাসনায় আত্মপাদ বা

নিরয়বর্ত্মসংসার লাভই হইয়া থাকে। এতদ্বিষয়ে শ্রীমন্মধ্বমুনি শ্রীগীতাভাষ্যে (২।২৩) প্রমাণরূপে পদ্ম-পুরাণবচন উদ্ধার করিয়াছেন, যথা—"তত্রৈব শিবং প্রতি মার্কণ্ডেয়বচনং। সংসারার্ণবনিমগ্ন ইদানীং মুক্তিমেষ্যামীত্যাদি। পাদ্মে শৈবে মার্কণ্ডেয়াকথাপ্রসঙ্গে শিবান্নিষিধ্য বিষ্ণোরেব মুক্তিমাহ। অহং ভোগপ্রদো বৎস মোক্ষদস্তু জনার্দ্দনঃ।"—শিবের প্রতি মার্কণ্ডেয় উক্তি—মার্কণ্ডেয় শিবকে বলিতেছেন,—আমি সংসারার্ণবে নিমগ্ন, সম্প্রতি তাহা হইতে মুক্তি বাসনা করিতেছি।" এই শিবমার্কণ্ডীয়-কথা-প্রসঙ্গে শিবকে নিষেধ করিয়া বিষ্ণু হইতে মুক্তি লাভের কথা শ্রীপদ্মপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে, অর্থাৎ শিব মার্কণ্ডেয়কে বলিতেছেন,—"হে বৎস, আমি ভোগ প্রদান করিতে পারি, মুক্তিদাতা একমাত্র জনার্দ্দন। ইহা দ্বারাও শিব বিষ্ণুর অনৈক্য ও মুক্তি-দাতৃত্বহেতু বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইতেছে। প্রসিদ্ধ আছে, যে কাশীতে শিব মুমূর্ষু জীবগণের কর্ণে তারকব্রহ্ম হরিনাম শ্রবণ করাইয়া মুক্তি প্রদান করেন। ইহা হইতেও শ্রীবিষ্ণুর পারতম্য ও মুক্তিদাতৃত্ব সিদ্ধ হইল।

"যেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে স্বমত স্থাপিতে। শাস্ত্রের সহজ অর্থ নহে তাহা হৈতে।"—শ্রীগৌরসুন্দরের এই বাক্য হইতে জানা যায় যে, সঙ্কীর্ণবুদ্ধি অসৎসাম্প্রদায়িকগণ অধিরোহবাদাবলম্বনে শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারে না। অবরোহবাদ বা গুরুপরম্পরাক্রমে শাস্ত্র তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায়; বিষ্ণুতত্ত্ব—নির্ণয়ে প্রত্যক্ষ-অনুমানাদি কখনই প্রমাণস্বরূপে গৃহীত হইতে পারে না। শাস্ত্রমূলে বিষ্ণুর পরতমত্ব সাধিত হয়। 'শাস্ত্র' বলিলে কোন 'অনার্ষ' বা 'পৌরষেয়' গ্রন্থ বুঝিতে হইবে না, 'শাস্ত্র' কাহাকে বলে ও কি কি, তাহা ব্যক্ত করিতে গিয়া শ্রীমন্মধ্বমুনি ব্রহ্মসূত্রের ১।১।৩ সূত্রের ভাষ্যে স্কন্দপুরাণবচন উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন, যথা—

> ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্।
> মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে।।
> যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
> অতোঽন্যগ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্মতৎ।।

—ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব—এই চারিবেদ, মহাভারত, বেদার্থনির্ণায়ক বেদাভিন্ন পঞ্চরাত্র ও মূল রামায়ণ—এই সকল 'শাস্ত্র' বলিয়া অভিহিত হয়। ইঁহাদের অনুকূল যে সকল শব্দপ্রমাণ তাহাও 'শাস্ত্র'মধ্যে পরিগণিত; এতদ্ব্যতীত যে সমস্ত গ্রন্থ তাহা ত' শাস্ত্র নহে-ই, পরন্তু তাহা কুবর্ত্মস্বরূপ।

পুরাণাদি শাস্ত্র বহুবিধ, আবার তাহার কোন অংশে বিষ্ণুমাহাত্ম্য অধিকরূপে বর্ণিত হইয়াছে, কোন অংশে বা দুর্গা-গণেশ-শিবাদি দেবতার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে; এই সকল বিভিন্ন বাক্যের সমাধান কি উপায়ে করিতে হইবে, তাহাও শাস্ত্রকারগণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যথা কূর্ম্মপুরাণে—

> অসংখ্যাতাস্তথা কল্পা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকাঃ।
> কথিতা হি পুরাণেষু মুনিভিঃ কালচিন্তকৈঃ।।

সাত্বিকেষু তু কল্পেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ।
তামসেষু শিবস্যোক্তং রাজসেষু প্রজাপতেরিতি।।

—মুনিগণ পুরাণসকলে অসংখ্য কল্প ও তত্তৎকালীয় ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-মাহাত্ম্য-সম্বলিত বিবিধ কথার আলোচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে সাত্ত্বিক-কল্পে শ্রীহরির মাহাত্ম্য, তামস কল্পে শিবের ও রাজসকল্পে ব্রহ্মার মাহাত্ম্য অধিকতর ভাবে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। অন্যত্র কথিত হইয়াছে যে, তামস ও রাজস পুরাণাদিতে শিব, অগ্নি ও ব্রহ্মাদি নানা দেবদেবীর মাহাত্ম্য কথিত হইয়াছে, কিন্তু "বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা। আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে"—এই হরিবংশের বচনানুসারে সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্যরূপ শ্রীহরিই অখিল বেদ ও বেদার্থনির্ণায়ক স্মৃতি ও পুরাণাদির একমাত্র বেদ্য। এস্থলে বেদ, উপনিষৎ, মূল রামায়ণ, মহাভারত, পঞ্চরাত্র ও মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের বচন উদ্ধার করিয়া শিব ও বিষ্ণুর যথাযথ তত্ত্ব সুমীমাংসিত হইতেছে—

(১) বেদে বিষ্ণুর পারতম্য—

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্।। (ঋগ্বেদসংহিতা)

ঋগ্বেদে তেত্রিশ কোটি দেবতার বিষয় বর্ণন করিয়া শ্রীবিষ্ণুপদ ইহা পরমপদ এবং অন্যান্য দেবতা-গণ সূরি অর্থাৎ বৈষ্ণবপদই বলিবার নিমিত্তই উপরি-উক্ত মন্ত্রের অবতারণা। ইহার অর্থ—সেই বিষ্ণুর পরমপদ দিব্যসূরি অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ নিত্যকাল দর্শন করিতেছেন, সেই বিষ্ণুর পরমপদ আকাশস্থ দিনমণি সূর্য্যের ন্যায় স্ব-প্রকাশ।

একো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা ন শঙ্করঃ স মুনির্ভূত্বা সমচিন্তয়ৎ তত্র তে ব্যজয়ন্ত বিশ্বে হিরণ্যগর্ভোঽগ্নির্যমো বরুণ রুদ্রেন্দ্রাহতি। (১।২।২৩ মাধ্বভাষ্যধৃত শ্রুতিবচন)

—সৃষ্টির প্রাক্কালে একমাত্র নারায়ণই বর্ত্তমান ছিলেন, ব্রহ্মা বা শঙ্কর কেহই ছিলেন না। তিনি মৌনী হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাহাতে সেই বিষ্ণু হইতেই ইহ জগতে হিরণ্যগর্ভ, অগ্নি, যম, বরুণ, রুদ্র, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে।

পুরুষসূক্তের বিষ্ণুপরতা পুরাণ বচন হইতেই জানা যায়, যথা—যথা হি পৌরুষং সূক্তং নিত্যং বিষ্ণু-পরায়ণম্। তথৈব মে মনো নিত্য ভূয়াদ্বিষ্ণুপরায়ণম্।। (১।২।২৬ মাধ্বভাষ্যধৃত পাদ্মবচন)

শিবপর উপনিষদ্বাক্য ও তাহার তাৎপর্য্য—

অন্ত্যাশ্রমস্থঃ সকলেন্দ্রিয়াণি নিরুধ্য ভক্ত্যা স্বগুরুং প্রণম্য।
হৃৎপুণ্ডরীকং বিরজং বিশুদ্ধং বিচিন্ত্য মধ্যে বিশদং বিশোকম্।
অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তরূপং শিবং প্রশান্তমমৃতং ব্রহ্মযোনিম্।
তমাদিমধ্যান্তবিহীনমেকং বিভুং চিদানন্দমরূপমদ্ভুতম্।।

উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তম্।
ধ্যাত্বা মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং সমস্তসাক্ষিং তমসঃ পরস্তাৎ।।
স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্।
স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স কালাগ্নিঃ স চন্দ্রমাঃ।।
স এব সর্ব্বং যদ্ ভূতং যচ্চ ভব্যং সনাতনম্।
জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুমত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে।। (কৈবল্যোপনিষৎ ১।৫-৯)
শিবমদ্বৈতঃ চতুর্থং মন্যন্তে (মাণ্ডুক্য ৭)

—সন্ন্যাসাশ্রমীসকল ইন্দ্রিয়-নিরোধ-পূর্ব্বক ভক্তিসহকারে শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিয়া প্রাকৃত ভোগমল রহিত বিশুদ্ধ হৃৎপদ্মে মঙ্গলপ্রদ বিশোক, অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অনন্তরূপ, প্রশান্ত, অমৃত, ব্রহ্মযোনি শ্রীসদাশিবকে চিন্তা করিবেন, তিনি আদি, মধ্য ও অন্ত্য বিহীন, অদ্বিতীয় বিভু, চিদানন্দময় প্রাকৃতরূপবর্জ্জিত অদ্ভুত। উমাসহায়, ত্রিলোচন, নীলকণ্ঠ, প্রশান্ত সেই প্রভু পরমেশ্বরকে ধ্যান করিয়া মুনিগণ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তিনি সকলের সাক্ষী ও তমোগুণরহিত। তিনিই—ব্রহ্মা, তিনিই—শিব, তিনিই—ইন্দ্র, অক্ষর, স্বরাট্ ও পরমেশ্বর। তিনিই বিষ্ণু, তিনিই প্রাণ, কাল, অগ্নি ও চন্দ্র। তিনিই—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান। তিনিই সনাতন, তাঁহাকে অবগত হইয়াই জীব মুক্ত হন। শিবই অদ্বিতীয় তুরীয়তত্ত্ব।

এই প্রকার শিবপর উপনিষদ্ বাক্যের তাৎপর্য্য—ঐ 'শিব' শব্দে সদাশিব শ্রীবিষ্ণুই বোধিত হয়েন। 'ঈশকোটি' ও 'জীবকোটি'—এই দুই প্রকার শিবের উল্লেখ শাস্ত্রে দেখা যায়। ব্রহ্মসংহিতায় (৮ম শ্লোকে) ঈশকোটি-শিব সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত আছে, যথা—

নিয়তিঃ সা রমাদেবী তৎপ্রিয়া তদ্বশং তদা।
তল্লিঙ্গং ভগবান্ শম্ভুর্জ্যোতীরূপঃ সনাতনঃ।।

চিচ্ছক্তিরূপা রমাদেবী নিয়তিরূপ-ভগবৎপ্রিয়া। সৃষ্টিকালে প্রপঞ্চরচনোন্মুখ কৃষ্ণাংশের যে স্বাংশ জ্যোতি উদিত হয়, তাহাই ভগবান্ শম্ভুরূপ ভগবল্লিঙ্গ অর্থাৎ প্রকটিত চিহ্ন বিশেষ। 'ভগবান্'-অর্থে ষড়ৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট পরব্যোমাধীশ, 'শম্ভু' বলিতে 'শং ভাবয়তি' অর্থাৎ পরব্যোমাধীশ নারায়ণ দ্বিতীয় ব্যূহ সঙ্কর্ষণের দ্বারা প্রকৃতিবিলীন জীবসমূহের ভোগায়তন উপাধির উদ্ভব বা সৃষ্টি করেন। 'জ্যোতীরূপ' অর্থে চৈতন্যবিগ্রহ। স্বয়ংরূপ-কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি বলিয়া 'লিঙ্গ' শব্দের উল্লেখ হইয়াছে।

এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, উপনিষদুক্ত শিবপর বাক্যগুলি সদাশিব বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে কথিত হইলে 'উমাসহায়', 'ত্রিলোচন', 'নীলকণ্ঠ', 'শিব' প্রভৃতি শব্দগুলির প্রবৃত্তি বিষ্ণুতে কিরূপে হইবে? তাহার উত্তর এই যে, ঐ শব্দ গুলির অর্থান্তর আছে। বিশ্বপ্রকাশে 'উমা' শব্দের অর্থ কীর্ত্তি; কীর্ত্তি হইয়াছেন সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে সহায় যাঁহার, তিনিই—'উমাসহায়'। 'ত্রিলোচন'—ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান বিষয়ক তিনটী জ্ঞানরূপ নেত্র যাঁহার অর্থাৎ ত্রিকালজ্ঞ 'নীলকণ্ঠ'—ইন্দ্রনীলমণিময় হারবিশিষ্ট। (শ্রীলঘুভাগবতামৃত টিপ্পনী ২৩শ সংখ্যা)

শ্রীজীবকোটি-রুদ্র সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতা ৫।৪৫ শ্লোকে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

ক্ষীরং যথা দধিবিকারবিশেষযোগাৎ সঞ্জায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাৎ গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

দুগ্ধ যেরূপ বিকার বিশেষ-যোগে দধিরূপ প্রাপ্ত হয়, তথাপি কারণরূপ দুগ্ধ হইতে পৃথক্ তত্ত্ব হয় না, সেইরূপ যিনি কার্য্যবশতঃ শম্ভুতা প্রাপ্ত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। অর্থাৎ দুগ্ধ অম্লসংযোগে বিকার প্রাপ্ত হইয়া দধিরূপে পরিণত হয়, সুতরাং দধি দুগ্ধ হইতে একটী স্বতন্ত্র বস্তু নহে। আবার দধি যেরূপ দুগ্ধ পরিচয়ে পরিচিত হইতে পারে না এবং দুগ্ধের গুণ দধিতে বর্ত্তমান থাকে না, তদ্রূপ তমোগুণরূপ অম্লসংযোগে বিকারপ্রাপ্ত দধিরূপ-শিব বিষ্ণু-দুগ্ধ হইতে একটী স্বতন্ত্র ঈশ্বর না হইলেও 'শিব' বিষ্ণু-পরিচয়ে পরিচিত হইতে পারেন না এবং বিষ্ণুর গুণ সম্পূর্ণরূপে শিবেও বর্ত্তমান থাকিতে পারে না এবং বিষ্ণুর গুণ সম্পূর্ণরূপে শিবেও বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। ষষ্টিসংখ্যক গুণ সম্পূর্ণরূপে চিদ্ভাবে চিদ্ঘন-বিগ্রহ নারায়ণে দেদীপ্যমান। পঞ্চপঞ্চাশৎটী গুণ অংশরূপে শ্রীশিবে বর্ত্তমান। (ভঃ রঃ সিঃ দঃ ১ লহরী)।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১৪শ বিলাসে ৬৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীসনাতন গোস্বামি প্রভু বলিয়াছেন,— "আকাশানিলয়োরিবেতি দীপাদ্দীপান্তরবৎ কারণেন সহ কার্য্যস্যাভেদাভি প্রায়েণাবতারিণাত্মনা সহাবতারস্য শ্রীশিবস্যাবেদো দর্শিতঃ।"

কার্য্য—কারণের অবয়ব, সুতরাং তাহা হইতে অভিন্ন। বায়ু যেরূপ তাহার কারণ আকাশ হইতে অথবা দধি যেরূপ তাহার কারণ দুগ্ধ হইতে একদীপ হইতে অন্য দীপের উৎপত্তির ন্যায় অভিন্ন, সেইরূপ কার্য্যরূপতা প্রাপ্ত শম্ভু কারণরূপী বিষ্ণু হইতে অভিন্ন। এই জন্য শাস্ত্রে স্থানে স্থানে শিব-বিষ্ণুর অভিন্নত্ব কথিত হইয়াছে। আবার কার্য্য ও কারণ অভিন্ন হইলেও তাঁহাদের কোন অংশেও ভেদ নাই, এরূপ নহে। সুতরাং কার্য্য-বিচারে বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে ভেদও স্বীকার করিতে হইবে। শিব ও বিষ্ণু সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় সার উদ্ধার করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীকবিরাজ গোস্বামিচরণ নিজগ্রন্থে (ম ২০।৩০৭-৯ ও ৩১১) এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন,—

নিজাংশকলায় কৃষ্ণ তমোগুণ অঙ্গীকরি'।
সংহারার্থে মায়াসঙ্গে রুদ্ররূপ ধরি'।।
মায়াসঙ্গে বিকারে রুদ্র ভিন্নাভিন্ন রূপ।
জীবতত্ত্ব হয়, নহে কৃষ্ণের স্বরূপ।।
দুগ্ধ যেন অম্লযোগে দধিরূপ ধরে।
দুগ্ধান্তর বস্তু নহে দুগ্ধ হৈতে নারে।।

শিব—মায়া শক্তিসঙ্গী তমোগুণাবেশ।
মায়াতীত গুণাতীত বিষ্ণু পরমেশ।।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য শ্রীব্রহ্মসূত্রের ১।১।৭ সূত্রভাষ্যে বলিয়াছেন,—

চেতনস্তু দ্বিধা প্রোক্তা জীব আত্মেতি চ প্রভো।
জীবব্রহ্মাদয়ঃ প্রোক্তা আত্মৈকস্তু জনার্দ্দনঃ।।
ইতরে চাত্মশব্দস্তু সোপচারঃ প্রযুজ্যতে।

—জীব ও আত্মা (পরমাত্মা) ভেদে দুই প্রকার চেতনের কথা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ব্রহ্মাদি সকলই জীবতত্ত্বের অন্তর্গত; পরমাত্মা একমাত্র জনার্দ্দন। অপরে যে 'আত্মা' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, তাহা ঔপচারিক।

(২) মূল-রামায়ণ-প্রমাণ—

মূল-রামায়ণ-গ্রন্থে পরশুরামের উক্তিতে শিব হইতে বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠতা কথিত হইয়াছে, যথা—

হুঙ্কারেণ মহাবাহু স্তম্ভিতোঽথ ত্রিলোচনঃ।
জৃম্ভিতং তদ্ধনুর্দৃষ্ট্বা শৈবং বিষ্ণুপরাক্রমৈঃ।।
অধিকং মেনিরে বিষ্ণুং দেবাঃ সর্ষিগণাস্তদা।।

—মহাবাহু ত্রিলোচন বিষ্ণুর হুঙ্কারে স্তম্ভিত হইলেন। শ্রীবিষ্ণুর পরাক্রমে মহাদেবের ধনু জৃম্ভিত দেখিয়া দেবগণ ও ঋষিগণ শ্রীবিষ্ণুকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিলেন।

এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে না, পঞ্চম বেদ শ্রীমহাভারতে দানধর্ম্ম ১৪৯ অধ্যায়ে বিষ্ণু-সহস্র-নাম-কথনে শিবনামসমূহও বিষ্ণুর নামের সহিত অভিন্নরূপে পঠিত হইয়াছে, অতএব অন্যান্য পুরাণ অপেক্ষা মহাভারতের প্রমাণ অধিক প্রবল বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ এরূপ বিচার সুষ্ঠু নহে। কেননা, সত্ত্বতনু বিষ্ণু ব্যতীত শিবাদি দেবতা কেন কোন বস্তুরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। শিবাদি সমস্ত নামই শ্রীবিষ্ণু তাৎপর্য্যপর। তিনি নিজের ঐ নামগুলি বিভিন্ন দেবতাকে প্রদান করিয়াছেন। যজুর্ব্বেদ শতপথ ৬ষ্ঠ কাণ্ড ৩য় ব্রাহ্মণে কথিত আছে—ভূতানাং পতিঃ সংবৎসরে উষসি রেতোঽসিঞ্চৎ। তৎ সংবৎসরে কুমারোঽজাত সোঽরোদীত্তং প্রজাপতিরব্রবীৎ। কুমার কিং রোদিষি যৎ পশো বিজাতোঽসীতি। সোঽব্রবীদন-পতহপাপ্মা বা অহমস্মি নাম মে ধেহি পাপ্মানোঽ পহত্যা ইতি। তং প্রজাপতিরব্রীদ্রুদ্রোঽসীতি। তস্য তন্নামাকরোদগ্নিস্তদ্রূপমভবৎ অগ্নির্বৈ রুদ্রো যদরোদীৎ তস্মাদ্রুদ্রঃ। সোঽব্রবীৎ জ্যায়ান্ বা অহমস্মি দেহ্যেবং নামেতি। তং প্রজাপতিরব্রবীদ্ভবোঽসীতি সর্ব্বোঽসীতি ঈশানোঽসীতি পশুপতিরসীতি উগ্রোঽসীতি ভীমোঽসীতি মহাদেবোঽসীতি। (সিঃ রত্ন ৩।৪০ সংখ্যা ধৃত)

—ভূতপতি ব্রহ্মা সংবৎসরাখ্য যোনিতে রুদ্রাত্মক বীর্য্য আধান করিলেন। তাহা হইতে কুমারের উৎপত্তি হইল। তিনি ক্রন্দন করিতেছিলেন দেখিয়া প্রজাপতি তাঁহাকে কহিলেন, 'অহে কুমার তুমি ক্রন্দন করিতেছ কেন?' কুমার বলিলেন, নামকরণ ব্যতিরেকে আমি নিষ্পাপ হইতে পারিতেছি না। অতএব আমাকে নাম প্রদান করুন, আমি তদ্দ্বারা পাপমুক্ত হই। প্রজাপতি তাঁহাকে রোদন করিতে ছিলেন বলিয়া 'রুদ্র' নাম প্রদান করিলেন। রুদ্র বলিলেন, আমি সকলের জ্যেষ্ঠ, অতএব তদনুসারে আমাকে নাম প্রদান করা হউক। প্রজাপতি বলিলেন সর্ব্ব, ঈশান, পশুপতি, উগ্র, ভীম, মহাদেব—এইসকল তোমার নাম হইল। বস্তুতঃ মহাভারতে সহস্র-নাম-কথনে যে শিবের নাম পঠিত হয়, ঐগুলি বিষ্ণুতাৎপর্য্যপর, তাহা শ্রীমন্মধ্বমুনি ব্রহ্মসূত্রভাষ্য (১।৩৩) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-বচন উদ্ধার করিয়া সুসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন,—

রুজং দ্রাবয়তে যস্মাৎ তস্মাদ্রুদ্রো জনার্দ্দনঃ।
ঈশানাদেব চেশানো মহাদেবো মহত্ত্বতঃ।
পিবন্তি যে নরা নাকং মুক্তাঃ সংসারসাগরাৎ।
তদাধারো যতো বিষ্ণুঃ পিনাকীতি ততঃ স্মৃতঃ।
শিবঃ সুখাত্মকত্বেন শর্ব্বঃ সংরোধনাদ্ধরিঃ।
কৃতাত্মকমিদং দেহং অতো বস্তে প্রবর্ত্তয়ন্।
কৃত্তিবাসাস্ততো দেবো বিরিঞ্চিশ্চ বিরেচনাৎ।
বৃংহণাদ্ ব্রহ্মনামাসাবৈশ্বর্য্যাদিন্দ্র উচ্যতে।
এবং নানাবিধৈঃ শব্দৈরেক এব ত্রিবিক্রমঃ।
বেদেষু স পুরাণেষু গীয়তে পুরষোত্তমঃ।

—যাঁহা হইতে রোগসমূহ বিদ্রাবিত হয়, সেই জনার্দ্দনই 'রুদ্র' পদ বাচ্য। সকলের নিয়ামক হেতু তাঁহাকে 'ঈশান' ও মহত্ত্বপ্রযুক্ত 'মহাদেব' বলা হয়। যে সকল ব্যক্তি সংসার-সাগর হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গ (বৈকুণ্ঠ) লাভ করেন, তাঁহাদের নাম পিনাক। বিষ্ণু ঐ সকল পিনাকের আধার বলিয়া তিনি 'পিনাকী', সুখাত্মক বলিয়া 'শিব', সংহারহেতু 'হর' এবং কার্য্যাত্মক বিশ্বের প্রবর্ত্তন করেন বলিয়া 'কৃত্তিবাস' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন। তিনি মায়াজাল বিস্তারপূর্ব্বক সকলকে রুদ্ধ করেন বলিয়া 'সর্ব্ব'। সৃষ্টি করেন বলিয়া 'বিরিঞ্চি', বৃংহণ-হেতু 'ব্রহ্ম' এবং ঐশ্বর্য্যহেতু 'ইন্দ্র' নামে উক্ত হন। পুরুষোত্তম ত্রিবিক্রমই নানা সংজ্ঞায় বেদ ও পুরাণাদিতে গীত হন।

(৩) শ্রীভাগবত-প্রমাণ—

ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য সর্ব্বশাস্ত্রসার মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতে শিব-বিষ্ণু-বিষয়ে সিদ্ধান্ত— (ভাঃ ১০।৮৮।৩, ৫)—

শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা।।
হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ।।
সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্।।

এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৮৯ অধ্যায়ে বিষ্ণুতত্ত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনোদ্দেশ্যে একটি আখ্যায়িকা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মর্ম্মানুবাদ এই,—"সরস্বতী তীরে যজ্ঞ করিতে করিতে ঋষিগণের ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়। ইহার কোন মীমাংসা করিতে না পারিয়া ঋষিগণ অবশেষে ভৃগুকে পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করিলেন। ভৃগু প্রথমে ব্রহ্মার নিকটে গেলেন, তথায় ব্রহ্মাকে প্রণাম ও স্তব না করায় ব্রহ্মা ভৃগুর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তদনন্তর ভৃগু তথা হইতে শিবলোকে উপস্থিত হইয়া শিবকে 'উৎপথগামী' বলায় শিব ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে শূলদ্বারা বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। অতঃপর ভৃগু বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া শ্রীলক্ষ্মীর সহিত শয়ান শ্রীবিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাত করিলেন, শ্রীবিষ্ণু তাহাতে কুপিত না হইয়া তাঁহার যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহার সমাগম জানিতে পারেন নাই বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন; আরও বলিলেন, অদ্য হইতে আপনার পদচিহ্ন আমার বক্ষের ভূষণ হইল। ভৃগু বৈকুণ্ঠ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ঋষিগণের সমক্ষে উক্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন, ঋষিগণ ভৃগুর মুখনিঃসৃত বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক নিঃসংশয়ে বিষ্ণুকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতে পারিলেন।

শ্রীধরস্বামিপাদ ১০।৮৯।২১-২৪ ভাবার্থদীপিকায় বলিয়াছেন,—"স চোক্তলক্ষণো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবেতি দর্শয়িতুমাখ্যানান্তরমাহ একদেতি" অর্থাৎ ঋষিগণ-কথিত উক্ত-লক্ষণ-বিশিষ্ট ভগবান্ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ, তাহা বিশেষরূপে প্রতিপাদন করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত আখ্যান ব্যতীত আরও একটি উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে এস্থানে তাহা উদ্ধৃত হইল না।

শ্রীমদ্ভাগবতে বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ ও ইতিহাসাদির সার সমুদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতকেই মূল প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, অন্যান্য পুরাণ ও তন্ত্রবচনসমূহ যাহা শ্রীমদ্ভাগবতের অনুকূল, তাহাই আদরনীয়, ইহা স্কন্দপুরাণোক্ত **শিববাক্য** হইতেই জানা যায়, যথা—কার্ত্তিকের প্রতি শিব-বচন—"শিবশাস্ত্রেঽপি তগ্রাহ্যং ভগবচ্ছাস্ত্রযোগি যৎ ইতি। অন্যতাৎপর্য্যকত্বেন স্বতন্ত্রত্রাপ্রামাণ্যাদ্-যুক্তশ্চৈতৎ যথা পঙ্কেন পঙ্কাম্ভ ইত্যাদিবৎ।" (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ)

অর্থাৎ শিবশাস্ত্রের যে সকল বাক্য ভগবৎশাস্ত্রের অনুকূল তাহাই আদরণীয়, অন্য তাৎপর্য্যরূপ বাক্যের অপ্রামাণ্য শিববচন হইতেই সিদ্ধ হইয়াছে; দৃষ্টান্ত যথা—কর্দ্দমাক্ত জল যেমন কর্দ্দম দ্বারা নির্ম্মল হয় না, সেইরূপ তামস শাস্ত্রের দ্বারা অজ্ঞানান্ধ জীবের সংশয় দূরীভূত হয় না।

পূর্ব্বে শ্রীকূর্ম্মপুরাণের বাক্য উদ্ধার করিয়া শিবের উৎকর্ষ-প্রতিপাদক শাস্ত্রের তামসত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, এখন ঐ সকল শিবোৎকর্ষ-প্রতিপাদক বাক্যগুলি যে প্রমাণ-স্বরূপে গৃহীত হইতে পারে না, তাহা স্বয়ং শিবের বাক্য হইতেই প্রমাণিত হইল; যথার্থ শিবভক্ত ব্যক্তিমাত্রেরই উহা অবশ্য আদরণীয়, সন্দেহ নাই।

এখন পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় অন্যান্য পুরাণসকলের বক্তাও শ্রীসূত, শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্য যেরূপ প্রামাণ্য, অন্যান্য পুরাণের বাক্যও তদ্রূপ প্রমাণরূপে স্বীকার করা হউক, এতদুত্তরে শ্রীপাদ জীব গোস্বামী প্রভু শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—"যুক্তঞ্চ তস্য বৃদ্ধসূতস্য শ্রীভাগবতমপঠিতবতঃ শ্রীবলদেবাবজ্ঞাতুঃ শ্রীভগবত্তত্ত্বাসম্যক্‌জ্ঞানজং বচনম্" অর্থাৎ স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি রাজস ও তামস পুরাণের বক্তা রোমহর্ষণসূত, তিনি শ্রীভাগবত অধ্যয়ন করেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন ব্যতীত ভগবত্তত্ত্ব সম্যগ্‌রূপে জানা যায় না। রোমহর্ষণসূত যে ভগবত্তত্ত্বে অনভিজ্ঞ ছিলেন, তাহা তাঁহার নৈমিষারণ্যে শ্রীবলদেবাবজ্ঞা হইতেই জানা যায়। প্রবন্ধ-বাহুল্য-ভয়ে এস্থলে আর অধিক প্রমাণ বচন উদ্ধৃত হইল না, সুধী পাঠকবর্গ প্রবন্ধোক্ত বিচার অবলম্বনপূর্ব্বক বিষ্ণু-প্রীত্যর্থে "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ" এই ভাগবতীয় বচনানুসারে বৈষ্ণবপ্রবর শম্ভুর ব্রতে ব্রতী হইয়া তাঁহার নিকট শ্রীহরিপাদপদ্মে নিরুপাধিকা রতি প্রার্থনা করিবেন। স্বতন্ত্র-ঈশ্বর-বুদ্ধিতে যে শিবের উপাসনা, তাহাতে হরিপ্রিয় শিবের সন্তোষ নাই। শ্রীশম্ভু নিজ ভক্ত প্রচেতোগণকে ইহা স্বয়ং বলিয়াছেন,—

যঃ পরং রহসঃ সাক্ষাৎ ত্রিগুণাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ।
ভগবন্তং বাসুদেবং প্রপন্নঃ স প্রিয়ো হি মে।।

—যে ব্যক্তি প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ন্তা, গুহ্যাদপিগুহ্য স্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবের চরণে অনন্যভাবে শরণাগত হন, তিনিই আমার প্রিয়। এই স্থানে শ্রীচৈতন্যভাগবতোক্ত (ম ১৯।১৭৬-১৯৫) সুদক্ষিণ রাজার উপাখ্যানটীও আলোচ্য। শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন লিখিয়াছেন (চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৯শ),—

"হিরণ্যকশিপু বর পাইয়া ব্রহ্মার।
লঙ্ঘিয়া তোমারে গেল সবংশে সংহার।।
শিরশ্ছেদে শিব পূজিয়াও দশানন।
তোমা লঙ্ঘি' পাইলেন সবংশে মরণ।।
সর্ব্বদেব মূল তুমি সবার ঈশ্বর।
দৃশ্যাদৃশ্য যত সব তোমার কিঙ্কর।।
প্রভুরে লঙ্ঘিয়া যে দাসেরে ভক্তি করে।
পূজা খাই সেই দাস তাহারে সংহারে।।
তোমা না মানিয়া যে শিবাদি দেব ভজে।
বৃক্ষ মূল কাটি' যেন পল্লবেরে পূজে।।"

"শুন শিব তুমি মোর নিজ দেহ মন।
যে তোমার প্রিয় সে মোহার প্রিয়তম।।
ক্ষেত্রের পালক তুমি সর্ব্বদা আমার।
সর্ব্বক্ষেত্রে তোমারে দিলাম অধিকার।।" (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩য়)

শ্রীগৌরসুন্দরের উক্তি যথা—

"কন্যাগণে কহে, 'আমা পূজ আমি দিব বর।
গঙ্গা-দুর্গা দাসী মোর মহেশ কিঙ্কর।।" (চৈঃ চঃ আদি ১৪শ)

* * * *

"অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র সদাশিবের অংশ।
গুণাবতার তিহোঁ সর্ব্ব-অবতংস।।
তিঁহো করেন কৃষ্ণের দাস্য প্রত্যাশ।
নিরন্তর কহেন শিব—'মুঞি কৃষ্ণদাস'।।
কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত বিহ্বল দিগম্বর।
কৃষ্ণগুণ-লীলা গায় নাচে নিরন্তর।।
এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য জগত-ঈশ্বর।
আর যত সব তাঁর সেবকানুচর।।
কেহ মানে, কেহ না মানে সব তার দাস।
যে না মানে তার হয় সেই পাপে নাশ।।" (চৈঃ চঃ আদি ৬ষ্ঠ)

শ্রীলোচনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে লিখিয়াছেন,—

মহেশ্বর প্রভু সব বৈষ্ণবের রাজা।
সেই ভাবে যেই জন করে তাঁর পূজা।।
তাঁহার হস্তে শিব করেন ভোজন।
সে প্রসাদ পাইলে হয় বন্ধ-বিমোচন।।

গুণাবতার শিব, সদাশিব ও স্বয়ং ভগবানের তত্ত্ব অবগত হইয়া শুদ্ধভক্তগণ তাঁহাদের যথাযোগ্য পূজা করিয়া থাকেন। অচ্যুতই সকলের মূল; মূলে জলসেচন করিলে পত্রপুষ্পাদির সন্তোষ হইয়া থাকে। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীভাগবতামৃত-কণার ৫ম অনুচ্ছেদে শ্রীশিব, সদাশিব ও স্বয়ং ভগবান্ সম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—

সদাশিবঃ স্বয়ংরূপাঙ্গবিশেষস্বরূপো নির্গুণঃ সঃ শিবস্যাংশী। অতত্রবাস্য ব্রহ্মতোঽপ্যাধিক্যং বিষ্ণুনা সাম্যঞ্চ জীবাত্তু সগুণত্বেঽসাম্যঞ্চ।

—যিনি বৈকুণ্ঠধামে সদাশিবরূপে বিরাজিত, তিনি গুণাবতার-শিব নহেন, তিনি নির্গুণ এবং স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই অঙ্গবিশেষ। এই সদাশিব গুণাবতার-শিবের অংশী। অতএব ব্রহ্মা হইতে শ্রেষ্ঠ এবং বিষ্ণুর সহিত সমান। জীব সগুণ বলিয়া জীব হইতে ইহার ভেদ স্বীকার করিতে হইবে। গুণাবতার-শিবের অংশী এই বিষ্ণুতত্ত্ব-সদাশিবই বৃন্দাবনের অধীশ্বর 'গোপেশ্বর' নামে খ্যাত। ইনি শুদ্ধবৈষ্ণবগণের দ্বারা পূজিত। ভগবদ্ভক্তগণ এইরূপভাবে শ্রীসদাশিবের আরাধনা করিয়া থাকেন,—

বৃন্দাবনাবনিপতে জয় সোম-সোম-মৌলে সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য। গোপশ্বের ব্রজবিলাসি-যুগাঙ্ঘ্রি-পদ্মে প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে।। —হে বৃন্দাবনাবনিপতে! হে উমাপতি চন্দ্রশেখর! হে সনন্দন-সনাতন-নারদপূজ্য! হে গোপেশ্বর! ব্রজবিলাসী শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্মে আমাকে নিরুপাধিকপ্রেম প্রদান করুন।

শ্রীল জীবগোস্বামিচরণ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শিবপূজা-বিষয়ে চারিটী অভিপ্রায় বিবৃত করিয়াছেন— (১) শুদ্ধবৈষ্ণবস্বরূপেই শিব—সর্ব্বজনমান্য; (২) শিবাধিষ্ঠানেও ভগবান্ বিষ্ণুই—পূজ্য; (৩) স্বতন্ত্র-ঈশ্বর-জ্ঞানে শিবপূজায় পাষণ্ডিত্ব বা ভৃগুশাপ অনিবার্য্য; (৪) বৈষ্ণবপ্রবর শিবের অবজ্ঞায় মহাদোষ।

ফাল্গুনী পূর্ণিমার দ্বিজরাজ

ফাল্গুনী পূর্ণিমা আসি হইল প্রকাশ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে সুমঙ্গল।
সেই পূর্ণিমায় আসি' মিলিলা সকল।।"

(চৈঃ ভাঃ আ ২।১৯৫, ১৯৬)

বসন্ত-লক্ষ্মী আজ সখী-পৌর্ণমাসীর সহিত মিলিতা হইয়া লক্ষ্মীপতি বিশ্বম্ভরের পূজার উপায়ন আহরণের জন্য বিশ্বভরা কি যেন এক সাড়া তুলিয়াছে। কোকিলকুলের কাকলী, মকরন্দপূর্ণ নবপ্রসূনের মাধুরী, মধুপ-গণের গুঞ্জন, সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ মন্দ প্রবাহ, বীচি-বিকম্পিতা সুরধুনীর সোল্লাস-সঙ্গীত-নর্ত্তন, শ্বেতবসনা দিগ্‌বধূগণের হাস্য-সুষমা, মানবমণ্ডলীর চিত্ত-প্রসন্নতা—বিশ্বের যাবতীয় মনোরম ও শ্রেষ্ঠ বস্তু সকলেই আজ বিশ্বম্ভরের পাদপদ্মে যৌতুকত্ব প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করিয়াছে। তাই কবিরাজ গাহিয়াছেন,—

"প্রসন্ন হইল দশদিক্, প্রসন্ন নদীজল।
স্থাবর-জঙ্গম হইল আনন্দে বিহ্বল।।"
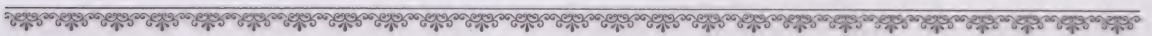
শ্রীব্যাসদেব এই তিথির মহিমা এইরূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—

"চৈতন্যের জন্মযাত্রা ফাল্গুনী-পূর্ণিমা।
ব্রহ্মা-আদি এ তিথির করে আরাধনা।।
পরম পবিত্র তিথি ভক্তিস্বরূপিণী।
যহি অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি।।
নিত্যানন্দ-জন্ম—মাঘ-শুক্লা-ত্রয়োদশী।
গৌরচন্দ্র প্রকাশ—ফাল্গুন পৌর্ণমাসী।।
সর্ব্বযাত্রামঙ্গল এই দুই পুণ্যতিথি।
সর্ব্ব শুভলগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি।।
এতেকে এই দুই তিথি করিলে সেবন।
কৃষ্ণভক্তি হয়, খণ্ডে অবিদ্যাবন্ধন।।"

(চৈঃ ভাঃ আ ৩।৪২-৪৬)

শ্রীশিব-শুক-ব্রহ্ম-নারদ-বন্দিতা পরমারাধ্যা পরমপূতা ভক্তিরূপিণী এই তিথিতে—

"নদীয়া-উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র-গৌরহরি,
কৃপা করি' হইল উদয়।
পাপ-তমো হইল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস,
জগভরি' হরিধ্বনি হয়।।"

যে দিন চৌদ্দশত (১৪০৭) শকাব্দের ফাল্গুন মাসের ত্রয়োবিংশ দিবস চৌদ্দশত ছিয়াশি (১৪৮৬) খৃষ্টীয় অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের অষ্টাদশ দিবসের সহিত প্রত্যুত্তর দ্বারা সম্ভাষণ করিয়াছিল, সেই দিন সন্ধ্যা-সুন্দরী ললাটে পূর্ণেন্দুভূষণ পরিধান করিয়া লোকলোচনের সম্মুখে সমুপস্থিতা হইল বটে, কিন্তু শশাঙ্কসুন্দর যেন লজ্জিত হইয়া পড়িল; কারণ যখন,—

"অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন।।"

তাই, জগতের চন্দ্র আজ নিজের কুণ্ঠধর্ম্ম ও ক্ষুদ্রত্ব এবং গোকুল-ইন্দুর বৈকুণ্ঠ-ধর্ম্ম ও অসমোর্দ্ধত্ব প্রচার করিবার নিমিত্ত নিজকে রাহুগ্রস্ত ও ম্লান দেখাইল। নদীয়া-উদয়াচলে গৌর-শশধরের উদয়কালে গ্রহগণ অনুকূল হইয়া তুঙ্গে, মূল ত্রিকোণে, স্বগৃহে শুভগ্রহাবলোকিতরূপে অবস্থিত হইল; পূর্ব্বফল্গুনী-নক্ষত্র ও সিংহরাশি আসিয়া সমুপস্থিত হইল।

সিংহরাশি, সিংহলগ্ন, উচ্চ-গ্রহগণ।
ষড়্‌বর্গ, অষ্টবর্গ, সর্ব্ব সুলক্ষণ।।

চন্দ্রোপরাগ-দর্শনে যখন বিষয়কোলাহল-প্রমত্ত জাগতিক ব্যক্তিগণও কৃষ্ণকোলাহলে মত্ত হইয়াছিল, যখন—

"জগত ভরিয়া লোক বলে হরি হরি।
সেইক্ষণে গৌরচন্দ্র ভূমে অবতরি।।
প্রসন্ন হইল সব জগতের মন।
'হরি' বলি' হিন্দুকে হাস্য করয়ে যবন।।
'হরি' বলি' নারীগণ দেয় হুলাহুলি।
স্বর্গে বাদ্য-নৃত্য করে দেব কুতূহলী।। (চৈঃ চঃ আ ১৩।৯৩-৯৫)

* * * *

হেন মতে প্রভুর হইল অবতার।
আগে হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিয়া প্রচার।।
চতুর্দ্দিকে ধায় লোক 'গ্রহণ' দেখিয়া।
গঙ্গাস্নানে 'হরি' বলি' যায়েন ধাইয়া।।
যা'রা মুখে জন্মেও না বলে হরিনাম।
সেহ হরি বলি' ধায় করি' গঙ্গাস্নান।।
দশ দিক পূর্ণ হইল উঠে হরিধ্বনি।
অবতীর্ণ হইয়া হাসেন দ্বিজমণি।। (চৈঃ ভাঃ আদি ৩।১-৪)

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যে অপ্রাকৃত পূর্ণেন্দুর উদয়ে ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী দেব-মনুষ্য-ঈশ্বরের বন্দিতা হইয়াছেন, যে অভূতপূর্ব্ব চন্দ্রের উদয়ে পাপতমো বিনাশ, ত্রিজগতের উল্লাস ও বিশ্বে প্রেমপীযূষ-প্রবাহিনী প্রবাহিতা হইয়াছে, সেই 'দ্বিজরাজ' কে? তাঁহার পরিচয়ই বা কি?

লৌকিক-দৃষ্টান্তানুসারে পিতা-মাতা হইতে পুত্রের, পূর্ব্বপুরুষ হইতে পরবর্ত্তী অধস্তনের পরিচয় লাভ ঘটে; কিন্তু যিনি সর্ব্বাদি, সর্ব্বকারণকারণ, মূল-পিতা পরমেশ্বর পরতত্ত্ব মূলনারায়ণ, লৌকিক দৃষ্টান্তানুযায়ী তাঁহার পরিচয় প্রদত্ত হইতে পারে না। তিনি স্বপ্রকাশ বস্তু; কৃপা করিয়া যখন স্বয়ং অবতরণ করেন এবং সৌভাগ্যবান্ জীবের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন, তখনই জীব তাঁহার পরিচয় পাইয়া ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হন—তাঁহার পরিচয় পাইলে জীবেরও তৎসঙ্গে আত্মপরিচয় বা স্বরূপানুভূতি হইয়া যায়।

কথিত আছে যে, নারায়ণ-পরায়ণ মধুকর মিশ্র নামে জনৈক পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ কোনও কারণে শ্রীহট্টে আগমন করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। মধুকর মিশ্রের মধ্যমপুত্র বৈষ্ণব, পণ্ডিত, ধনী ও সদ্‌গুণপ্রধান উপেন্দ্র মিশ্র; উপেন্দ্র মিশ্রের সপ্তপুত্র সপ্তঋষীশ্বর—কংসারি, পরমানন্দ, জগন্নাথ, সর্ব্বেশ্বর, পদ্মনাভ, জনার্দ্দন ও ত্রিলোকনাথ। উপেন্দ্র মিশ্রের সপ্তপুত্রের অন্যতম শ্রীজগন্নাথ অধ্যয়নের নিমিত্ত শ্রীহট্ট হইতে সর্ব্ববিদ্যাপীঠ শ্রীনবদ্বীপে শুভাগমন করেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের শাস্ত্রীয় উপাধি—পুরন্দর। পুরন্দর মিশ্র নবদ্বীপেই শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠা দুহিতা শ্রীশচীদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। শ্রীগৌরগণোদ্দেশের নির্দ্দেশানুসারে আমরা জানিতে পারি যে, পর্জ্জন্য নামক গোপ, যিনি কৃষ্ণের পিতামহ ছিলেন, তিনিই পরে শ্রীহট্টে উপেন্দ্র মিশ্র নামে অবতীর্ণ হন এবং যিনি বৃন্দাবনে মহামান্য 'বরীয়সী' নাম্নী শ্রীকৃষ্ণের পিতামহী গোপী ছিলেন, তিনিই উপেন্দ্র মিশ্রের পত্নী কলাবতী রূপে অবতীর্ণ হন। আর পূর্ব্বে বৃন্দাবনে যাঁহারা প্রেমরসের আকরস্বরূপ যশোদা ও ব্রজরাজ নন্দ ছিলেন, তাঁহারাই পরে শচী ও পুরন্দর মিশ্র নামে জগতে আগমন করেন। শচী ও জগন্নাথ পুরন্দর—এই দম্পতির মধ্যে অদিতি ও কশ্যপ, কৌশল্যা ও দশরথ, পৃশ্নি ও সুতপা প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, দেবকী ও বসুদেব—যাঁহারা রামকৃষ্ণের মাতাপিতা ছিলেন, তাঁহারাও শচী ও জগন্নাথে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। কারণ, তাঁহাদিগের হৃদয়ে সঙ্কর্ষণস্বরূপ বিশ্বরূপের উদয় হইয়াছে।

উদারচরিত বিশুদ্ধসত্ত্ব পুরন্দর মিশ্র মূর্ত্তিমতী বিষ্ণুভক্তিস্বরূপিণী আর্য্যা শচীদেবীর সহিত বিষ্ণুপাদোদ্ভবা ভাগীরথীর সমীপে বাস করিবার জন্য শ্রীধাম নবদ্বীপের অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরে বাস করিয়াছিলেন। সর্ব্বতীর্থ-শিরোমণি, সর্ব্ব ধামের সমাবেশস্থল, নবধা ভক্তিরূপী শ্রীমন্নবদ্বীপপদ্মের কর্ণিকাস্বরূপ অন্তর্দ্বীপ-শ্রীমায়াপুরের শাস্ত্রীয় মহিমা শ্রীজগন্নাথ পুরন্দর ও আর্য্যা শচীদেবীর হৃদয়ে পূর্ব্ব হইতেই উদিতা ছিল। তাঁহারা শুদ্ধভক্তগণের আচরণের মূলপথপ্রদর্শক গুরুরূপে কলিহত জীবের একমাত্র আশ্রয়ণীয় ঔদার্য্যধাম শ্রীমায়াপুরে বাস করিয়া 'শ্রীনবদ্বীপধাম-সেবকেরই শ্রীব্রজধাম করস্থিত, অপরের পক্ষে বৃন্দাবন-প্রাপ্তি মরীচিকার ন্যায় সুদূরপরাহত', —এই শিক্ষা জগজ্জীবকে জানাইয়াছেন,—

"নবদ্বীপে বসেদ্ যস্তু করে তস্য ব্রজস্থিতিঃ।
মরীচিকাবদন্যত্র দূরে বৃন্দাবনং ধ্রুবম্।।"

(শ্রীনবদ্বীপশতক ৮১ শ্লোক)

শ্রীশচীদেবীর উপর্য্যুপরি আটটী কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবার পর অত্যল্পকালমধ্যেই তাহারা কালগ্রাসে পতিত হইল। অনপত্যতা-নিবন্ধন পুরন্দর মিশ্র সাতিশয় দুঃখিত হইয়া পুত্র-সন্তান-লাভার্থ বিষ্ণুর আরাধনা করিতে থাকেন এবং তৎকালে নবম সন্তান শ্রীবিশ্বরূপ অবতীর্ণ হন।

পূর্ব্বের বর্ণানুসারে জানা যায় যে, যিনি যশোদা-দেবকী-অদিতি-কৌশল্যা ছিলেন, তিনিই পরবর্ত্তিকালে শ্রীশচীদেবীরূপে অবতীর্ণা হন। 'প্রাকৃত মানুষীর ন্যায় তাঁহার গর্ভে জন্মমরণশীল অষ্টকন্যার উৎপত্তির

সম্ভাবনা কিরূপে হইতে পারে?'—ভগবদ্বিমুখ বঞ্চিত ব্যক্তিগণ এইরূপ প্রশ্নের সমাধান করিতে অসমর্থ হইয়া অনেক সময়ে ঈশ্বরবস্তুকে জীবের সহিত সমজ্ঞান করিয়া বিষ্ণুবৈষ্ণবচরণে ভীষণ অপরাধ সঞ্চয় করিয়া বসেন এবং তৎফলে শ্রীভগবানের কৃপা-মাধুরী হইতে কোটী যোজন দূরে নীত হন।

ভগবানের লীলা অবিচিন্ত্যা। সেবোন্মুখ ভক্তগণই ভগবৎস্বরূপ সেই লীলা-তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া জগতে লোক-কল্যাণার্থ তাহা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের শ্রুতেক্ষিত পন্থা পরিত্যাগ করিয়া স্বকপোল-কল্পনাবশে অপ্রাকৃতে প্রাকৃত-বিচার আনয়ন করিলে—অধোক্ষজে অক্ষজজ্ঞানের অবতারণা করিলে—বিদূরকাষ্ঠ ঈশ্বরবস্তুকে পরিচ্ছিন্ন বস্তু মনে করিলে ফলপ্রাপ্তিকালে আত্মবঞ্চনাই লাভ হইয়া থাকে।

দ্বাপরলীলায়ও দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেবকীর ষড়্গর্ভে শ্রীসঙ্কর্ষণ-রাম ও অষ্টমগর্ভে শ্রীবাসুদেবের উদয় হয়। দেবকীর ষড়্গর্ভবিনাশ-সম্বন্ধে গোস্বামিগণের শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া যে সিদ্ধান্ত-নবনীত আহরণ করিয়াছেন, তাহা 'তোষণী', 'সারার্থদর্শিনী' প্রভৃতিতে আস্বাদনীয়। গৌরলীলায় শচী-দেবকীর একে একে অষ্ট কন্যার মৃত্যু ও তৎপরে নবমগর্ভে বিশ্বরূপের আবির্ভাব এবং দশমগর্ভে শ্রীগৌরচন্দ্রের উদয়ের বিশেষ তাৎপর্য্য ভক্তগণ এইরূপভাবে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন,—

অষ্ট অপরা প্রকৃতির আবরণে অস্মিতা আবদ্ধ থাকাকাল পর্য্যন্ত শুদ্ধসত্ত্ব-জীবাত্মা-স্বরূপের উদয় হয় না। অষ্ট প্রকৃতি স্ব স্ব কারণে বিলয়প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ ও মনোবুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মদেহে আত্মবুদ্ধি বিগত হইলে শুদ্ধসত্ত্বজীবাত্ম-স্বরূপ ও তৎসহচর পরমাত্মার উদয় হয়। শ্রীভাগবত (১।১৩।৫৫-৫৬) বলেন যে, স্থূলভূতসমূহ ক্রমে তৎকারণস্বরূপ সূক্ষ্মভূতে প্রবিষ্ট হইলে এবং অহঙ্কারাদি সূক্ষ্মভূতসমূহ বিজ্ঞানস্বরূপ মহত্তত্ত্বে সংস্থাপিত হইলে, মহত্তত্ত্ব আবার ক্ষেত্রজ্ঞ জীবে সংযুক্ত হইলে, ক্ষেত্রজ্ঞ আবার পরমাত্মায় মনোনিবেশ করিলে হৃদয়াকাশে জীবান্তর্যামী সঙ্কর্ষণের উদয় হয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলেন,—"তুরীয়, বিশুদ্ধসত্ত্ব 'সঙ্কর্ষণ' নাম। "মহাসঙ্কর্ষণ—সব জীবের আশ্রয়।" (চৈঃ চঃ আদি ৫ম) "মূল-ভক্ত-অবতার শ্রীসঙ্কর্ষণ।" (চৈঃ চঃ আদি ৬ষ্ঠ) সঙ্কর্ষণস্বরূপ বিশ্বরূপ বা সেবাবিগ্রহের আবির্ভাবের অব্যবহিত পরেই সেব্য পরতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্ গৌরচন্দ্র শুদ্ধসত্ত্বে উদিত হন অর্থাৎ অষ্ট অপরা প্রকৃতির বিলয়ে যখন জীবহৃদয় শুদ্ধসত্ত্বভাব ধারণ করে, সেই সময় তাঁহার সেবোন্মুখিনী অস্মিতায় অর্থাৎ সেবক-অভিমানে সেবাবিগ্রহ গুরুরূপী শ্রীসঙ্কর্ষণ সেব্যবিগ্রহ গৌরাঙ্গসুন্দরকে প্রদান করেন। এই সিদ্ধান্ত-রহস্যই পুরন্দর মিশ্রের প্রথমে অষ্টকন্যার মৃত্যু, তৎপরে বিষ্ণু-আরাধনা-ফলে সঙ্কর্ষণ বিশ্বরূপের আবির্ভাব এবং তদনন্তর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের উদয়ে পরিস্ফুট হইয়াছে।

শ্রীজগন্নাথ মিশ্র, জগন্মাতা শ্রীশচীদেবী নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপরিকর। তাঁহাদের হৃদয় ও দেহ শুদ্ধসত্ত্বময়—কখনই সাধারণ প্রাকৃত জীবের ন্যায় নহে। বিশুদ্ধসত্ত্বের নাম 'বসুদেব'; বসুদেবেই চিদ্‌বিলাসী বাসুদেব প্রকটিত। জড়েন্দ্রিয়-তর্পণময় প্রাকৃত রক্তমাংসময়দেহ স্ত্রীপুরুষের কামক্রীড়া ও গর্ভের ন্যায় শ্রীজগন্নাথ ও শচীদেবীর মিলন বা শচীদেবীর গর্ভসঞ্চার হয় নাই; সুতরাং তাহা মনে মনে চিন্তা করাও ভীষণাদপিভীষণ

অপরাধ। ভগবৎ-সেবোন্মুখ-চিত্তে বিচার করিলে শুদ্ধসত্ত্বময়ী শ্রীশচীদেবীর অপ্রাকৃত-গর্ভ-মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন ও তৎপরবর্ত্তী ব্যাস শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

তবে মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র ভগবান্।
শচীজগন্নাথ দেহে হৈলা অধিষ্ঠান।।
জয় জয় ধ্বনি হৈল অনন্ত বদনে।
স্বপ্নপ্রায় জগন্নাথ মিশ্র শচী শুনে।।
মহাতেজ মূর্ত্তিমন্ত হইল দুইজনে।
তথাপিহ লিখিতে না পারে অন্য জনে।।
অবতীর্ণ হইবেন ঈশ্বর জানিয়া।
ব্রহ্মাশিব আদি স্তুতি করেন আসিয়া।।
অতি মহা বেদগোপ্য এ-সকল কথা।
ইহাতে সন্দেহ কিছু নাহিক সর্ব্বথা।।

(চৈঃ ভাঃ আ ২।১৪৫-১৪৯)

* * * *

চৌদ্দশত ছয় শকে শেষ মাঘ-মাসে।
জগন্নাথ-শচীর দেহে কৃষ্ণের প্রবেশে।।
মিশ্র কহে শচী-স্থানে,–দেখি অন্য রীতি।
জ্যোতির্ম্ময় দেহ, গেহ লক্ষ্মী-অধিষ্ঠিত।।
যাঁহা তাঁহা সর্ব্বলোক করয়ে সম্মান।
ঘরে পাঠাইয়া দেয় ধন, বস্ত্র, ধান।।
শচী কহে,—মুঞি দেখোঁ আকাশ-উপরে।
দিব্যমূর্ত্তি লোক আসি, স্তুতি যেন করে।।
জগন্নাথ মিশ্র কহে—স্বপ্ন যে দেখিল।
জ্যোতির্ম্ময়-ধাম মোর হৃদয়ে পশিল।
আমার হৃদয় হৈতে তোমার হৃদয়ে।
হেন বুঝি, জন্মিবেন কোন মহাশয়ে।।

(চৈঃ চঃ আ ১৩।৮০-৮৫)

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ও রূপানুগ-বর্য্য শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীভগবানের প্রকটলীলার্বিভাব-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত হতে যে সুসিদ্ধান্ত-সিতাপল সমাহরণ করিয়াছেন, তাহা ধৈর্য্য ও আদরের সহিত সেবন করিতে করিতে ক্রমশঃ আমাদের কৃষ্ণবিমুখতা-জাত ভোগবুদ্ধি বা অপ্রাকৃতে প্রাকৃত-বিচাররূপ ব্যাধির উপশম হইতে পারে।

ভাঃ ১০।২।১৬ শ্লোকস্থিত 'আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ'—এই বাক্যে কৃষ্ণ প্রথমে আনক-দুন্দুভির হৃদয়ে প্রকটিত হন। তৎপর আনকদুন্দুভির হৃদয় হইতে দেবকীর হৃদয়ে উদিত হন। দেবকীর বাৎসল্যরূপ প্রেমানন্দামৃত-সমূহে লাল্যমান হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই দেবকীর হৃদয়ে চন্দ্রের ন্যায় উত্তরোত্তর স্বীয় বৃদ্ধি প্রদর্শন করেন। অনন্তর দেবকীর হৃদয় হইতে তিরোহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কংস-কারাগারস্থ সূতিকাগৃহে দেবকীর শয্যায় আবির্ভূত হন। দেবকী প্রভৃতি যোগমায়াভিভূত হইয়া তখন মনে মনে করেন যে, লৌকিক-রীত্যনুসারেই শিশু পরমসুখে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। (লঘুভাগবতামৃত ১৬০-১৬৫)

ভক্ত ও ভগবানের এইরূপ মনুয্যোচিত অপ্রাকৃত-ভাবনিচয় অতি উপাদেয়ভাবে পরম চমৎকারময় চিল্লীলা-বিলাসের সহায় থাকিয়া মায়ামুগ্ধ মহাসূরিগণকেও বিমোহিত এবং পরমব্যোম বৈকুণ্ঠ হইতেও মথুরাধামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছে।

'যাহারা নিজদিগকে বিষ্ণুর রক্তবহনকারী শৌক্র অধস্তন (নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-সন্তান প্রভৃতি) মনে করেন, তাঁহারা যে কিরূপ শ্রীভাগবতধর্ম্ম-বিরোধী, আচার্য্যবিরোধী, ভীষণ অপরাধী জীব তাহা নিম্নোদ্ধৃত আচার্য্য ও গোস্বামিগণের সিদ্ধান্তবাক্য হইতেই সুধীগণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ''জগদ্গুরু'' শ্রীধরস্বামিচরণ ''ভগবান বিশ্বাত্মা ইত্যাদি'' (ভাঃ ১০।২।১৬) শ্লোকের ভাবার্থদীপিকায় লিখিয়াছেন,—''মন আবিবেশ মনস্যাবির্ব্বভূব। **জীবানামিব ন ধাতুসম্বন্ধ** ইত্যর্থঃ''। অর্থাৎ বিশ্বাত্মা ভগবান্ বাসুদেবের মনে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, প্রাকৃতজীবের ন্যায় ভগবানের ধাতু সম্বন্ধ নাই, ইহাই এই বাক্যের তাৎপর্য্য।

আচার্য্যবর্য্য শ্রীল জীবগোস্বামিচরণ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—'শ্রীমদানকদুন্দুভিপ্রভৃতিষ্বাবির্ভাবোঽপি **ন প্রাকৃতবত্তদীয়চরমধাত্বাদৌ প্রবেশঃ**। কিং তর্হি, সচ্চিদানন্দবিগ্রহস্য তস্য তন্মনস্যাবেশ এব। তদুক্তম্—(ভাঃ ১০।২।১৮) ''ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং সমাহিতং শূরসুতেন দেবী। দধার সর্ব্বাত্মকমাত্মভূতং কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্ত'' ইতি। ততঃ শ্রীনারদপ্রহ্লাদধ্রুবাদিষু দর্শনাৎ সর্ব্বসম্মতত্বাৎ তাদৃশপ্রেমবিষয়ত্বেন সাক্ষাৎ শ্রীভগবদাবির্ভাবাব্যবহিতপূর্ব্বপ্রচুরকালং ব্যাপ্য সন্ততস্তদাবেশঃ শ্রীব্রজেশ্বরয়োরপ্যবশ্যমেব কল্প্যতে। ব্রহ্মাবরপ্রার্থনয়াপি তদেব লভ্যত ইতি সমান এব পন্থাঃ।''

তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান্ শ্রীবসুদেব-দেবকীতে আবির্ভূত হইলেও, প্রাকৃত জীবের ন্যায় চরমধাতু প্রভৃতিতে প্রবিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই। যদি প্রশ্ন হয়, তবে কিরূপে ভগবানের আবির্ভাব হয়? —ভগবান্ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, তিনি শুদ্ধসত্ত্বতনু শ্রীবসুদেব-দেবকীর বিশুদ্ধ চিত্তে আবির্ভূত হইয়াই জন্মলীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—''অনন্তর শ্রীবসুদেব কর্ত্তৃক সমাহিত জগন্মঙ্গল অচ্যুতাংশ শুদ্ধসত্ত্বময়ী দেবকী ধারণ করিলেন। পূর্ব্বদিক যেরূপ চন্দ্রকে ধারণ করে, শ্রীদেবকীও তদ্রূপ

অপ্রাকৃত মনের দ্বারা সর্ব্বাত্মা ও পরমাত্মা শ্রীহরিকে ধারণ করিয়াছেন। বাহিরে প্রকট লীলা প্রদর্শন করিবার পূর্ব্বে বিশুদ্ধ মনে শ্রীভগবানের আবেশ কেবল যে বসুদেব-দেবকীতে সংঘটিত হয়, তাহা নহে, সর্ব্বত্রই এই নিয়ম দৃষ্ট হয়। শ্রীনারদ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতি ভাগবতগণেও এইরূপ উদাহরণ দৃষ্ট হয়। শ্রীভগবান্ প্রথমে ঐ সকল মহাভাগবতগণের সুদ্ধচিত্তরূপ বসুদেবে উদিত হইয়া পরে বাহিরে প্রকাশিত হইয়াছিলেন; এইরূপ রীতি সর্ব্বসম্মত। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্রীভগবানের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী প্রচুরকাল ব্যাপিয়া সর্ব্বদা ভগবৎপ্রেমিক শ্রীনারদপ্রহ্লাদাদি ভাগবতগণ এবং ব্রজেশ্বর-ব্রজেশ্বরীর বিশুদ্ধ হৃদয়ে শ্রীভগবদ্ আবেশ অবশ্যই হইয়া থাকে। দ্রোণ-ধরা যখন ব্রহ্মার নিকট বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের হৃদয়েও শ্রীকৃষ্ণই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতেছিলেন। তাই, তাঁহারা অন্য কোন বর প্রার্থনা না করিয়া একমাত্র অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণেই পরা ভক্তি যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। প্রেমবিশেষের দ্বারাই ভগবান্ প্রথমে প্রেমিক ভক্তের বিশুদ্ধ হৃদয়ে উদিত হইয়া পরে বহিঃপ্রাকট্য-লীলা প্রদর্শন করেন।

অনন্তর পূর্ব্বদিক্ যেমন চন্দ্রের উদয় ব্যক্ত করে, তদ্রূপ শুদ্ধসত্ত্বময়ী দেবকী শূরসেন (বসুদেব) কর্ত্তৃক কৃষ্ণদীক্ষাপ্রাপ্তিক্রমে জগন্মঙ্গলস্বরূপ সর্ব্বাত্মা ও পরমাত্মা শ্রীঅচ্যুতকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন, এই ভাগবত-বাক্য হইতে জানা যায় যে, শ্রীআনকদুন্দুভির (বসুদেবের) হৃদয় হইতে স্বয়ং ভগবান্ দেবকীর হৃদয়ে প্রকটিত হইলেন। এস্থলে যদিও 'দেবকীর হৃদয়ে' কথাটী কথিত হইল, তথাপি তদ্দ্বারা দেবকীর গর্ভাবস্থিতিই বুঝিতে হইবে, যেহেতু শ্রীভাগবতে "হে মাতঃ, তোমার কুক্ষিতে (গর্ভে) পরম পুরুষ অধিষ্ঠিত" এই দেবস্তুতি দেখা যায়। ভগবজ্জন্মপ্রকরণেও "পূর্ণচন্দ্র যেমন পূর্ব্বদিকে উদিত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বগুহাশয় বিষ্ণু দেবকীর হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন"—এই ভাগবত-বাক্য বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য (শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ)।

অবতার-কারণ

শ্রীগৌরাবতার-কারণ-নির্দ্দেশে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন এইরূপ লিখিয়াছেন,—

কোন্ হেতু কৃষ্ণচন্দ্র করে অবতার।
কার শক্তি আছে তত্ত্ব জানিতে তাহার।।
তথাপি শ্রীভাগবতে গীতায় যে কয়।
তাহা লিখি যে নিমিত্তে অবতার হয়।।

* * * *

কলিযুগে ধর্ম্ম হয় হরিসংকীর্ত্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন।।
এই কহে ভাগবতে সর্ব্বতত্ত্বসার।
কীর্ত্তন-নিমিত্ত গৌরচন্দ্র-অবতার।।

(চৈঃ ভাঃ আ ২।১৫-১৬, ২২-২৩)

শ্রীল স্বরূপ-রূপ-গোস্বামিপ্রভুপাদগণের সিদ্ধান্তানুসারে তদনুগ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীগৌর-অবতারের যে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা এই,—

শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন কলিযুগের প্রধান ধর্ম্ম। এই যুগধর্ম্মপ্রচার বিষ্ণুর কার্য্য; তাহা কোন যুগাবতারের দ্বারাই সাধিত হইতে পারে। কিন্তু সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ব্যতীত অপর অংশ-বিষ্ণুতত্ত্বের কৃষ্ণপ্রেম দান-অসম্ভব। এই জন্যই সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীনবদ্বীপে আবির্ভূত হইলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রথমে গুরুবর্গের সহিত প্রপঞ্চে প্রকটিত হইয়া দেখিলেন, জগৎ অতিশয় হরিবিমুখ—

"কেহ পাপে, কেহ পুণ্যে করে বিষয়-ভোগ।
ভক্তি গন্ধ নাহি, যাতে যায় ভব রোগ।।"

* * * *

"সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণপূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নাহি বাসে।।"

'এ অবস্থায় সাক্ষাৎ কৃষ্ণকে অবতীর্ণ করাইতে পারিলে জগন্মঙ্গল সাধিত হইবে,—এই বিচারে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু কৃষ্ণপাদপদ্মে জল-তুলসী অর্পণ করিয়া শুদ্ধভাবে কৃষ্ণের আরাধনা এবং সদৈন্য নিবেদন করিতে লাগিলেন। শুদ্ধ সরল ভক্তের প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ধ্যেয় পরমস্বরূপ প্রকটিত করিয়া থাকেন, সুতরাং শুদ্ধভক্ত শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের প্রেম-হুঙ্কারে জগৎকে প্রেমবন্যায় প্লাবিত করিবার নিমিত্ত শ্রীগৌরসুন্দর অবতীর্ণ হইলেন,— (চৈঃ চঃ আঃ ৩।১০৯)

চৈতন্যের অবতারে এই মুখ্যহেতু।
ভক্তের ইচ্ছায় অবতার ধর্ম্ম-সেতু।।

সাধু পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতি বিনাশ—যাহা ভগবদবতারের কার্য্য বলিয়া শ্রীগীতায় উক্ত হইয়াছে, তাহা স্বয়ং ভগবানের পক্ষে প্রযুক্ত নহে, উহা বিষ্ণুর কার্য্য। অবতারি-কৃষ্ণের অবতরণ-কালে তাঁহার সহিত অবতার বিষ্ণু মিলিত হন। দেহস্থিত অংশবিষ্ণুর দ্বারা জগতের ভারহরণ ও পালন-লীলা সাধিত হয়। বিধিভক্তি-প্রচারার্থই বিষ্ণুর অবতার, আর রাগভক্তির প্রচারার্থে কৃষ্ণের গৌরাবতার। তিনটী গূঢ় প্রয়োজন সাধনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের গৌরাবতার প্রকটিত হন। (১) প্রেমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়ালম্বন শ্রীরাধার প্রেম-মাহাত্ম্য অনুভব, (২) প্রেমের একমাত্র বিষয়ালম্বন নিজ মধুরিমার আস্বাদন ও (৩) তদাস্বাদনে শ্রীরাধার যে সুখ হয়, তাহার অনুভব—এই তিনটী গূঢ়বাঞ্ছা পূরণ করিবার ইচ্ছায়ই গৌরাঙ্গী গান্ধর্ব্বিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরাবতার। যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তনাদি এবং শ্রীঅদ্বৈতাদি ভক্তগণের আরাধন—অবতারের বাহ্য কারণ মাত্র।

শ্রীমদ্ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীগৌরাবতার-সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিলেন, অর্থাৎ কলিযুগধর্ম্ম—শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন-প্রচারার্থই গৌরাবতারের উদ্দেশ্য, ইহা নির্দ্দেশ করিলেন, আর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু নাম-

সংকীর্ত্তনাদি যুগধর্ম্ম প্রচার স্বয়ং ভগবানের কার্য্য নহে, উহা বিষ্ণুর কার্য্যবিশেষ বলিয়া যে উক্তি করিয়াছেন, তাহা পাঠ বা শ্রবণ করিয়া উভয়-লীলা-লেখকের সিদ্ধান্তের মধ্যে আপাততঃ বিরোধজ্ঞান উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু স্বয়ংই তাহার সমাধান করিয়াছেন এবং উহার মীমাংসা শ্রীসন্দর্ভেও বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে, লীলাপুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবানের প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইবার আবশ্যকতা কি? তদুত্তরে শ্রীসন্দর্ভকার বলেন যে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অবতার-প্রকরণে গণনা করা হইলেও অন্যান্য অবতারের ন্যায় তিনি কোন জাগতিক কার্য্যানুরোধে অবতীর্ণ হন না। দুষ্টদলন, শিষ্টপালন, যুগধর্ম্ম-প্রচারাদি কার্য্য পুরুষের অবতার-সমূহের দ্বারাই সাধিত হয়; তবে যে কোন কোনও স্থলে শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া ভারহরণাদি কার্য্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যখন সর্ব্বাবতারী স্বয়ং ভগবান্ স্বীয় নিরঙ্কুশ ইচ্ছাবশতঃ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন, তখন অবতারীর দেহান্তর্গত অবতারসমূহই ভারহরণাদি কার্য্য করিয়া থাকেন। অবতারীর সহিত অবতারের, অংশীর সহিত অংশের অভেদ-বিচারে অংশাবতারের কার্য্যসমূহ স্বয়ং ভগবানে আরোপিত হয়, কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্বদা স্বরূপস্থ থাকিয়াই নিজ পরিজনবৃন্দের আনন্দবিশেষাত্মক চমৎকারিতা সম্পাদনার্থ, নিজ জন্মাদি-লীলা দ্বারা কোন অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য-মহিমা পোষণ করিয়া, কখন কখন সকল-লোকলোচনের গোচরীভূত হন। সুতরাং ইহা শ্রীভগবানের নিজ অনুগত ভক্তগণের প্রতি নির্হেতুক-কৃপা-বিশেষ।

—"ততশ্চাস্যাবতারেষু গণনাত্তু স্বয়ং ভগবানপ্যসৌ স্বরূপস্থ এব নিজ-পরিজন-বৃন্দানামানন্দ-বিশেষ-চমৎকারায় কিমপি মাধুর্য্যং নিজ-জন্মাদি-লীলয়া পুষ্ণন্ কদাচিৎ সকললোকদৃশ্যো ভবতীত্যপেক্ষয়ৈ-বেত্যায়াতম্।।" (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ)

আমরা ফাল্গুন-পূর্ণিমার দ্বিজরাজের পরিচয় অনুসন্ধান করিতে করিতে বহু দূর আসিয়া পড়িয়াছি। শচীগর্ভ-সিন্ধু মধ্যে সমুদিত গৌর-শশধরের পরিচয় সাধারণ মানুষ কেন সূরিগণও—ব্রহ্মাদি দেবতা কেহই নিজ বুদ্ধিবলে প্রদান করিতে সমর্থ নহেন। এতৎসম্বন্ধে আলবন্দারু-স্তোত্ররত্নের শ্লোকযুগল আলোচ্য—"ভগবানের অবতার-তত্ত্বজ্ঞ পরমার্থবিৎ ব্যাসাদি ভক্তগণ প্রবল-সাত্ত্বিক-শাস্ত্র-দ্বারা ভগবানের শীল-রূপ-চরিত্র ও পরম সাত্ত্বিক ভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে জানিতে পারেন, কিন্তু রাজস ও তামস গুণবিশিষ্ট অসুরপ্রকৃতি জীবগণ তাঁহাকে জানিতে সমর্থ হয় না। দেশ, কাল, চিন্তা—এই তিনটী সীমা-দ্বারা সমস্ত বস্তুই আবদ্ধ, কিন্তু ভগবানের গূঢ় স্বভাব সম ও অতিশয়শূন্য হওয়ায় উক্ত ত্রিবিধ সীমাকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছে। মায়াধীশ ভগবান্ মায়াবল-দ্বারা ঐ স্বভাবকে আচ্ছাদন করিলেও ভগবানের অনন্যভক্তগণ সর্ব্বদা তাঁহাকে দর্শন করিতে যোগ্য হন। সুতরাং ভগবানের স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইলে বা তাঁহার পরিচয় জানিতে হইলে ভগবানের দ্বিতীয় স্বরূপ তাঁহার অন্তরঙ্গ নিজজনগণের নিরুপাধিক ও নির্ব্বাধ ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ অনুভূতিই একমাত্র সম্বল। করণাপাটব-দোষদুষ্ট ঔপাধিক ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান অতীন্দ্রিয় ও

অপ্রাকৃত বস্তুতে প্রযুক্ত করিবার চেষ্টা করিলে বাস্তব বস্তুর অভিজ্ঞান হইতে বহুদূরে পতিত হইতে হয়। সুতরাং অন্তরঙ্গ ভক্তগণের আত্মপ্রত্যক্ষানুভূতিরূপ একমাত্র প্রমাণ ব্যতীত অপ্রমেয়-অধোক্ষজ ভগবদ্বস্তুকে অন্য প্রমাণের অন্তর্গত মনে করা বিড়ম্বনা মাত্র।

যাঁহার যেরূপ অধিকার, রুচি, পারদর্শিতা, অবস্থানের ভূমিকা ও যোগ্যতা, তিনি তত্ত্ববস্তু-শ্রীগৌরসুন্দরকে সেই রূপভাবেই দর্শন করেন, সেরূপ সংজ্ঞা দেন এবং সেরূপভাবেই সেবা করিয়া থাকেন। অধোক্ষজ দৃশ্যবস্তু ও তদ্‌দ্রষ্টার মধ্যে কোনও প্রকার ব্যবধান বা প্রতিবন্ধক থাকিলে দর্শন-ক্রিয়া সুষ্ঠু বা সম্যক্ হয় না। সুতরাং দ্রষ্টা দৃশ্যবস্তুর সেবা করিবার পরিবর্ত্তে সেবা-বাধ ঘটাইয়া থাকে। যেমন দুগ্ধ একটি বস্তু। যিনি কেবল মাত্র দুগ্ধকে চক্ষুরিন্দ্রিয়-দ্বারা দর্শন করিয়াছেন, তিনি দুগ্ধকে 'শ্বেত-পদার্থ-বিশেষ' বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। আবার যাঁহার দুগ্ধের সহিত কেবল স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা পরিচয়, তিনি দুগ্ধকে 'তরল-পদার্থ-বিশেষ'-রূপে বর্ণন করেন। যিনি কেবলমাত্র উষ্ণদুগ্ধ স্পর্শেন্দ্রিয়-দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি দুগ্ধকে উষ্ণদ্রব্য-রূপে জানেন। আবার যাঁহারা পূর্ব্বসঞ্চিত কোন অভিজ্ঞান লইয়া তাহা দুগ্ধে আরোপিত করেন এবং সেই আরোপিত জ্ঞানকে দুগ্ধের স্বরূপগত পরিচয়ের সহিত সমন্বয় করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা দুগ্ধকে অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ—যেমন কোন স্থপতির (রাজমিস্ত্রীর) চুণগোলা-সম্বন্ধে অভিজ্ঞান থাকে, সে ব্যক্তি দূর হইতে দুগ্ধ দর্শন করিয়া উহাকে তাহার করতলান্তর্গত 'চুণগোলা' বলিয়া মনে করে। আবার দুগ্ধকে যিনি কেবলমাত্র দধি, ছানা প্রভৃতি বিকৃত আকারে দর্শন করিয়াছেন, তিনি ঐ 'বিকৃত অবস্থাকে'ই দুগ্ধের স্বরূপ বলিয়া বর্ণন করেন এবং তৎপ্রতিকূল অন্য যুক্তিকে স্বীকার করিতে নারাজ হন; কিন্তু যিনি সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বতোভাবে দুগ্ধের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থাৎ যিনি দুগ্ধদোহন-ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, দুগ্ধকে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে আস্বাদন করিয়াছেন এবং দুগ্ধের বিভিন্ন অবস্থার বিষয় জ্ঞাত আছেন, তিনি অন্যান্য সকল ঔপাধিক ও আংশিক দ্রষ্টার ভ্রমপ্রদর্শন করিয়া দুগ্ধের যথার্থ স্বরূপ জগতে প্রচার করিতে পারেন, অপরের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

তত্ত্ববস্তু ভগবানের অন্তরঙ্গ ভক্তগণ সর্ব্বতোভাবে ভগবানের সহিত যুক্ত ও সম্বন্ধবিশিষ্ট। তত্ত্ববস্তু-ভগবানের স্বরূপ-বিষয়ে অভিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে অন্যান্য বিবদমান শতসহস্র কুদার্শনিকগণের ব্যবহিত দর্শন বা মনোধর্ম্মের কল্পনার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া যাঁহারা ভগবানের অন্তরঙ্গ জনগণের অব্যবহিত প্রত্যক্ষানুভূতিরূপ অব্যভিচারী প্রমাণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাঁহারাই সৌভাগ্যবান্ এবং তাঁহারাই ক্রমশঃ অধোক্ষজ-তত্ত্ববস্তুর প্রকৃতস্বরূপ অপ্রাকৃত সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিতে সমর্থ হন।

তত্ত্ববস্তু-শ্রীগৌরসুন্দর সম্বন্ধেও কুদার্শনিক মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায় একপ্রকার সিদ্ধান্ত, কর্ম্মজ্ঞান-মিশ্র-ভক্ত-সম্প্রদায়ের আর এক প্রকার সিদ্ধান্ত, সাধারণ ভক্ত ও শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায় এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ অন্যপ্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

মনোধর্ম্মি-অভক্তসম্প্রদায় শ্রীগৌরসুন্দরকে বিভিন্নাংশ বিভূতিময় ধর্ম্মপ্রচারক বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই, দুর্ভাগা ভক্তি-বিরোধি-সম্প্রদায় তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্য, এমন কি উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তিবিশেষ প্রভৃতি বলিয়া স্ব স্ব নরকের পথ প্রশস্ত করিতে ত্রুটি করেন নাই; আবার স্বেচ্ছাচারী, উৎপথগামী, কুদার্শনিক মায়াবাদি-সম্প্রদায় শ্রীগৌরসুন্দরকে অনিত্যবস্তু-বিশেষ বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আবার কোন কোন স্ত্রৈণ ও গৃহব্রত-সম্প্রদায় শ্রীগৌরসুন্দরের স্ত্রীপূজাবৃত্তির অভাব লক্ষ্য করিয়াছেন; আর একপ্রকার আত্মবঞ্চিত প্রচ্ছন্ন-কামুক-সম্প্রদায় গৌরসুন্দরকে নদীয়া-নাগরী-লম্পট্ররূপে সাজাইবার চেষ্টা করিয়া স্ব স্ব ভোগবৃত্তি গৌরাঙ্গের স্কন্ধে ন্যস্ত করিবার অভিলাষ করিয়াছেন; পয়সা-ভিক্ষুক ও উদর-লম্পট-সম্প্রদায় গৌরসুন্দরকে তাঁহাদের ব্যবসায় ও ভোগের জিনিষ বিচার করিয়া শালগ্রাম দ্বারা বাদাম ভাঙ্গিবার প্রণালী গ্রহণ করিয়াছেন; থিয়সফিষ্ট, রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, গৃহিবাউল প্রভৃতি সম্প্রদায় শ্রীগৌরসুন্দরকে তাঁহাদের নিজ নিজ আদর্শোচিত এক এক প্রকার ভোগের বস্তু বলিয়া বিচার করিয়া 'গৌরভজনের নামে' স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণকেই বরণ করিয়াছেন; আউল, বাউল, নেড়া, দরবেশ, সাই, স্মার্ত্ত, জাতিগোস্বামী প্রভৃতি সম্প্রদায়ে গৌরসুন্দরকে বিভিন্ন প্রকারে বর্ণন করিয়া ভোক্তৃতত্ত্ব বৈকুণ্ঠ-ভগবানকে ভোগের সামগ্রী-বিশেষে পর্য্যবসিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। আবার উদারতার নামে উশৃঙ্খলতার শীর্ষদেশে আরূঢ়, অসাম্প্রদায়িকের নামে ঘৃণ্য সঙ্কীর্ণ অসৎ সাম্প্রদায়িকতায় অন্ধ আর এক প্রকার মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায়ের মত যে, গৌরাঙ্গকে যে যাহা ইচ্ছা বলুন না কেন, তাহাতে বাধা দিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ যে অধোক্ষজ পরতত্ত্ব বস্তু, তিনি ত' কখনও অক্ষজজ্ঞানের অধীন, বশ্য বা ভোগ্য বস্তু হন না, অতীন্দ্রিয় মায়াধীশ বস্তু ত' কখনও বশ্য মায়িক জীবের ভোগানলের ইন্ধনরূপে পরিণত হইবার জন্য 'মায়া মিশাইয়া' আগমন করেন না; তিনি এইরূপ যাবতীয় মায়াবাদ, মতবাদ ও কুসিদ্ধান্তধ্বান্ত নিরাস করিবার উদ্দেশ্যেই নিজের মহাবদান্য দয়ানিধি নামের সার্থকতা প্রদর্শন করেন।

শ্রীনাভদাসাদি কর্ম্মজ্ঞান-মিশ্র-ভক্তসম্প্রদায় শ্রীগৌরসুন্দরকে নারায়ণের অভেদ অংশাবতার বলিয়া বিচার করিয়াছেন।

শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্তগণ বলিয়াছেন যে, মহাবৈকুণ্ঠস্থিত মূল নারায়ণই—শ্রীগৌরাঙ্গ। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন, শ্রীল ঠাকুর লোচন দাস প্রভৃতি ভক্তগণও শ্রীগৌরসুন্দরকে শ্রীবিষ্ণুতত্ত্ব, সাক্ষাৎ নারায়ণ গর্ভোদকশায়ী বা ক্ষীরোদশায়ী পুরুষাবতার প্রভৃতি রূপে বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীগদাধরাদি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ শ্রীগৌরহরিকে ব্রজজনের জীবনধনরূপে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার নিত্য শ্রীগৌররূপ, মহাবদান্য গুণ ও কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলা প্রদর্শনার্থ 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামে প্রপঞ্চে উদিত হইয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয়স্বরূপ শ্রীশ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবদ্বস্তুই—শ্রীচৈতন্যদেব। এই চৈতন্যদেবের অঙ্গকান্তি অসম্যক্প্রকাশ ব্রহ্ম ও অন্তর্যামী—যিনি অর্ণবত্রয়ে ত্রিবিধ পুরুষাবতাররূপে নিত্য প্রকটিত থাকিয়া

অনিত্য ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ও নিত্য বৈকুণ্ঠ প্রকাশ করিয়া অবস্থিত, সেই পরমাত্মা যাঁহার খণ্ডবৈভব বা আংশিক প্রকাশ, তিনি—শ্রীচৈতন্যদেব। শ্রীদামোদর গোস্বামীপ্রভু বলেন,—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয় বিকার—হ্লাদিনী শক্তি। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা একাত্মা হইলেও পূর্ব্বকালে দুইটী দেহ ধারণ করিয়া নিত্যলীলাবিলাস প্রদর্শন করেন; অধুনা গৌরলীলায় সেই রাধা ও কৃষ্ণ দুই তনু একত্র সম্মিলিত এবং শ্রীরাধিকার চিত্তগত আভ্যন্তরীন ভাব ও বাহ্যাঙ্গকান্তিতে সুমণ্ডিত হইয়া স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন বিপ্রলম্ভভাবাবলম্বনে স্বীয় নিত্য গৌরীলালা প্রকাশ করিয়াছেন।

স্বয়ং ভগবানের অন্তরঙ্গ, সুদার্শনিক-শিরোমণি, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যের মূল পুরুষ শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের যে স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাই শ্রৌতপন্থায় অবনতমস্তকে গ্রহণ করিলে আমরা শ্রীগৌরসুন্দরের যথার্থ পরিচয় ও তৎসঙ্গে আমাদের আত্মপরিচয়রূপ সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিয়া গৌর-সেবারূপ অভিধেয় ও তৎফলে স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতার শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদত্ত অনর্পিতচরী প্রেম-রূপ প্রয়োজন লাভের অধিকারী হইব। ফাল্গুন পূর্ণিমার দ্বিজরাজ শ্রীগৌরচন্দ্রের মহিমা শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামিপাদ শতমুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাঁহার রচিত কয়েকটি শ্লোক ভক্তপাঠকগণকে উপহার প্রদান করিতেছি,—

স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্ব্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা
যোগীন্দ্রা বিজহুর্ম্মরুন্নিয়মজক্লেশং তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য আসীদ্রসঃ।।

—শ্রীচৈতন্যচন্দ্র পরাভক্তিযোগ-পদবী আবিষ্কার করিলে প্রাকৃত-বিষয়-রসমগ্নব্যক্তিগণ স্ত্রীপুত্রাদির কথা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, পণ্ডিতগণ শাস্ত্রসম্বন্ধীয় বাদ-বিসম্বাদ ত্যাগ করিয়াছিলেন, যোগিশ্রেষ্ঠগণ প্রাণবায়ু-নিরোধার্থ সাধন-ক্লেশ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়াছিলেন, জ্ঞানসন্ন্যাসিগণ নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; তখন ভক্তিরস ব্যতীত অন্য কোন প্রকার 'রস' আর জগতে দৃষ্ট হয় নাই।

অভূদ্‌গেহে গেহে তুমুলহরিসংকীর্ত্তনরবো
বভৌ দেহে দেহে বিপুলপুলকাশ্রুব্যতিকরঃ।
অপি স্নেহে স্নেহে পরমমধুরোৎকর্ষপদবী
দবীয়স্যাম্নায়াদপি জগতি গৌরেঽবতরতি।।

—শ্রীগৌরসুন্দর জগতে অবতীর্ণ হইলে গৃহে গৃহে তুমুল হরিসংকীর্ত্তনের রোল উত্থিত হইয়াছে, দেহে দেহে পরিপুষ্ট পুলকাশ্রুকদম্ব শোভা পাইয়াছে, প্রেমভক্তির গাঢ়ত্বের উত্তরোত্তর উৎকর্ষে শ্রুতির অগোচরা পরমা মধুরা শ্রেষ্ঠা পদবীও প্রকাশিতা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতস্য যত্র পরমং তাৎপর্য্যমুট্টঙ্কিতং
শ্রীবৈয়াসকিনা দুরন্বয়তয়া রাসপ্রসঙ্গেঽপি যৎ।
যদ্রাধারতিকেলি-নাগররসাস্বাদৈক-সদ্ভাজনং
তদ্বস্তুপ্রথনায় গৌর-বপুষা লোকেঽবতীর্ণো হরিঃ।।

—বৈয়াসকি শ্রীল শুকদেবও কেবল শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা প্রাপ্য নহে বলিয়া রাসলীলা-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের নিগূঢ় তাৎপর্য্য উল্লেখমাত্র করিয়াছেন, বিস্তৃতভাবে বর্ণন করেন নাই। সেই শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য এবং নিকুঞ্জক্রীড়াময় পরমরসিক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি-লীলা-মাধুরী-আস্বাদনের একমাত্র সর্ব্বোৎকৃষ্টপাত্র — এই দুইবস্তু বিস্তার করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ ইহলোকে গৌরকলেবরে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

প্রেমা নামাদ্ভূতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবনবিপিন-মহামাধুরীষূ প্রবেশ।
কো বা জানাতি রাধাং পরমরসচমৎকারমাধুর্য্যসীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চকার।।

—'প্রেম' নামক পরমপুরুষার্থ কাহারই বা শ্রবণগোচর হইয়াছিল? কে-ই বা শ্রীনামের মহিমা জানিত? কাহার-ই বা বৃন্দারণ্যের গহন-মহামাধুরী-কদম্বে প্রবেশ ছিল? কে-ই বা পরমচমৎকার অধিরূঢ় মহাভাব-মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা শ্রীবার্ষভানবীকে (উপাস্য-বস্তুরূপে) জানিত? এক চৈতন্যচন্দ্রই পরম ঔদার্য্যলীলা প্রকট করিয়া এই সমস্ত আবিষ্কার করিয়াছেন।

দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান

শ্রীসজ্জনতোষণী ও শ্রীগৌড়ীয় পত্রে "দীক্ষা", "দীক্ষাবিধান", "দীক্ষিত" প্রভৃতি প্রবন্ধে 'দীক্ষা'-বিষয়ক বহুবিধ আলোচনা হইয়াছে। দীক্ষাবিধান বা দীক্ষার প্রয়োগ-পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। দীক্ষা-সম্বন্ধে অদীক্ষিত, ছল-দীক্ষিত, অপ-দীক্ষিত বা দীক্ষাবাধকসম্প্রদায়ে যে সকল সাধারণ ভ্রম প্রচলিত ও বহুমানিত হইয়াছে ও হইতেছে, সেই সকল ভ্রম বা বিপ্রলিপ্সা শাস্ত্রযুক্তি এবং আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত ও আচার দ্বারা নিরপেক্ষভাবে বিশ্লিষ্ট ও বিচারিত হইলে উহারা কতদূর সমীচীনতা রক্ষা করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা এবং ঐরূপ দীক্ষাবাধ-দৌরাত্ম্য অমৃতের অধিকারী জীবনিচয়কে যে কিরূপ অন্ধকারময় মৃত্যুর পথে গড্ডলিকা-প্রবাহের ন্যায় ধাবিত করিতেছে, তাহা সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শন করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

জগতের প্রত্যেক বিষয় বা প্রত্যেক বস্তুর বিচারক দুই প্রকার। পারদর্শী, প্রবীণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি কোন বিষয় বা বস্তু সম্বন্ধে যে বিচার করেন, তাহা হইতে অজ্ঞ, নবীন ও অনভিজ্ঞের বিচারপ্রণালী বা সিদ্ধান্ত

অবশ্য স্বতন্ত্র। একজন বিচারাসনে বসিবার অধিকার প্রাপ্ত সুযোগ্য ব্যক্তি আর একজন অনধিকারী ও অযোগ্য হইয়াও বলপূর্ব্বক বিচারকের আসন গ্রহণ করিবার প্রয়াসী। সুযোগ্য বিচারকের সিদ্ধান্ত সাধারণ-সম্প্রদায়ে 'অসাধারণ' মনে হইলেও উহাই বস্তুসম্বন্ধে বাস্তব বিচার ও সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত। আর অনুকরণকারী ব্যক্তির মত সাধারণ-সম্প্রদায়ের ধারণার সহিত বেশ সামঞ্জস্য রক্ষা করিলেও উহা বস্তুবিজ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র। এই দুইপ্রকার ব্যক্তির দুই প্রকার ধারণা পারিভাষিক শব্দে 'পরমার্থ' ও 'ব্যবহার', 'দিব্য' ও 'মর্ত্ত্য', 'অপ্রাকৃত' ও 'প্রাকৃত', 'অধোক্ষজ' ও 'অক্ষজ', 'বিজ্ঞান' ও 'অজ্ঞান', 'বাস্তব সত্য' ও 'প্রাতীতিক সত্য' প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়।

'দীক্ষা' সম্বন্ধেও জগতে দুই প্রকার বিচারক দৃষ্ট হয়। 'দীক্ষা' সম্বন্ধে 'দেশিক' ও 'তত্ত্ব-কোবিদ'গণের বিচার একপ্রকার এবং তদ্বিপরীত ব্যক্তিগণের বিচার অন্য প্রকার। সাত্বতশাস্ত্রে 'দেশিক' ও 'কোবিদ'গণের বিচার লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আবার তামস ও রাজস শাস্ত্রাদিতে সাধারণ ব্যবহারিকগণের বিচার লিপিবদ্ধ আছে।

'দেশ' শব্দ গত্যর্থে ষ্ণিক্ প্রত্যয় করিয়া 'দেশিক' শব্দ নিষ্পন্ন। 'দেশিক' শব্দের অর্থ পথিক। (বা পথ-প্রদর্শক)। মনে করুন, দুইজন ব্যক্তির মধ্যে যিনি বদরিকাশ্রমে গমন করিয়াছেন, তিনি বদরিকার পথের সংবাদ রাখেন, কোথায় কি ভাবে চলিতে হয়, পথে চলিতে চলিতে যে সকল বিপথ ও বিপদাশঙ্কা আছে তদ্বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞ, বদরিকার পথ কিরূপ—তাহা তিনি নিজে সেই পথে বিচরণ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। আর যে ব্যক্তি কখনও বদরিকায় যান নাই বা বদরিকার পথের পথিক হন নাই সেই ব্যক্তি কেবল অবিশ্বস্ত ব্যক্তি প্রমুখাৎ দূর হইতে বদরিকার গল্প শুনিয়াছেন মাত্র। সেইরূপ ব্যক্তি যদি বদরিকার পথের সম্বন্ধে তাঁহার সাধারণ পথের ধারণার অনুমিতি কিম্বা কল্পনাপ্রসূত ভ্রম-ধারণাকেই বদরিকাশ্রমের প্রকৃতজ্ঞান বলিয়া প্রচার করিতে বসেন, তবে ঐরূপ অনভিজ্ঞ ব্যক্তির মত অনভিজ্ঞ-সম্প্রদায়ে বিকাইলেও তদ্দ্বারা বদরিকা পথের প্রকৃত তথ্য বা অভিজ্ঞান লাভ হয় না। দেশিক ব্যক্তি অর্থাৎ পরমার্থ-পথের পথিক বা পথপ্রদর্শক গুরু 'দীক্ষা' সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত প্রচার করেন, তাহাই পরমার্থ-পথে গমনেচ্ছু অপর ব্যক্তিগণের একমাত্র গ্রহণীয়; উহা ব্যবহারিক সাধারণ ব্যক্তিগণের ধারণার সহিত পৃথক্ হইলেও ঐ উপদেশ গ্রহণেই প্রকৃত পথের সন্ধান পাওয়া যায়।

'কোবিদ' শব্দের ধাত্বর্থ বিচার করিলে জানা যায় যে, 'কু'—শব্দ করা, যিনি কীর্ত্তনকারী-উপদেষ্টা, তিনি কোবিদ। অথবা 'কো' অর্থে বেদ, বিদ্ ধাতুর অর্থ জানা, যিনি শ্রোত্রিয় অর্থাৎ শ্রৌতপন্থায় উপদেষ্টা, তিনি কোবিদ। মনের অভিরুচি অর্থাৎ মনোধর্ম্মের বশীভূত হইয়া যাহারা উপদেষ্টার অভিনয় করেন, তাহাদিগকে 'শ্রোত্রিয়' বা 'কোবিদ' বলা যাইতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—'তত্ত্ববস্তু'—'কৃষ্ণ'; যিনি নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী অথবা যিনি কৃষ্ণতত্ত্ব-বিষয়ে পারদর্শী, যিনি মনোধর্ম্মের দ্বারা অধোক্ষজ-কৃষ্ণকে বিচার করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন না করিয়া শ্রৌতপন্থায়

কৃষ্ণবিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং তাহাই অটুটভাবে জীবকুলের সেবোন্মুখ কর্ণের সমীপে কীর্ত্তন করেন, তিনি 'তত্ত্বকোবিদ'। সেই 'দেশিক' ও 'তত্ত্বকোবিদ'গণ 'দীক্ষা' শব্দের অর্থ এইরূপ করেন—

'দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।'

অর্থাৎ যাহা হইতে দিব্য জ্ঞানের উদয় হয় এবং পাপের সম্পূর্ণ ক্ষয় হয়, তাহাই 'দীক্ষা'।

'দিব্য' শব্দের প্রতিযোগী শব্দ মর্ত্ত্য। 'দিব্' ধাতুর অর্থ দীপ্তি পাওয়া, 'দীপ্তি' শব্দের দ্বারা 'সচেতনতা' লক্ষ্য করে। যাহা চেতন, যাহা সুন্দর, যাহা আনন্দময়, যাহা নিত্য সত্ত্বাবান্, তাহাই—দিব্য। স্বর্গাদি স্থানকে যে 'দিব্য' শব্দে উদ্দিষ্ট করা হয়, সেইরূপ উদ্দেশ গুণীভূত বা অপ্রধানীভূত অর্থাৎ স্বর্গাদি লোক মর্ত্ত্যলোকের তুলনায় 'দিব্য', কিন্তু বৈকুণ্ঠের তুলনায় নহে। মর্ত্ত্য জগতের ধারণার গতি ও পরিভাষার যতদূর দৌড়, তদনুসারে তাহা স্বর্গকেই 'দিব্য' বলিয়া অভিধান করা ব্যতীত তদপেক্ষা অন্য উৎকৃষ্ট বস্তুর প্রতি সেই আখ্যা নিযুক্ত করিতে পারে না। তাই সাধারণ ভাষা 'দিব্য' শব্দে সাধারণ মর্ত্ত্য জগতের ধারণায় সর্ব্বোচ্চ কাম্য বস্তু ভোগনিকেতন ইন্দ্রপুরী প্রভৃতি স্থানকেই 'দিব্য' বলিয়া অভিধান করে। প্রকৃতপক্ষে সচ্চিদানন্দ বা অপ্রাকৃত বস্তুতেই 'দিব্য' শব্দের অভিধা বৃত্তির ব্যাপ্তি। অপ্রাকৃত বা দিব্যজ্ঞানের অপর নামই 'দীক্ষা'। ইহাই দেশিক ও তত্ত্বকোবিদগণের 'দীক্ষা' সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত।

'দিব্য' বা 'অপ্রাকৃত জ্ঞান'—এই বাক্য দ্বারা কোন্ বিষয় লক্ষ্য করে, তাহা বিচার করিলে আমরা দীক্ষার স্বরূপবিষয়ে অভিজ্ঞান লাভ করিতে পারিব।

'অপ্রাকৃত' শব্দটী সাম্বন্ধিক শব্দ (Relative term)। অপ্রাকৃত—এই শব্দ উচ্চারণ-মাত্রই 'প্রাকৃত' শব্দটী সঙ্গে সঙ্গেই বিচার্য্য বিষয় হয়। কারণ যাহা 'প্রাকৃত' নহে, তাহাই 'অপ্রাকৃত' শব্দ দ্বারা উদ্দিষ্ট।

প্রাকৃত-বস্তু-সত্ত্বার মূল শক্তি প্রকৃতি। প্রকৃতি—'অব্যক্ত' শব্দ বাচ্য অর্থাৎ যাহা প্রকাশমান না হইয়া কারণ-কারণরূপে নিজ অস্মিতার অস্তিত্ব সম্পাদন করে, তাহাই 'অব্যক্ত' শব্দের উদ্দিষ্ট বিষয় হয়। প্রকাশমান কোন কার্য্যের কারণ প্রকাশিত হইলে সেই প্রকাশিত কারণের কারণ জানিতে জ্ঞানবৃত্তির স্বাভাবিক কৌতূহল হয়। সসীম মানবজ্ঞান যে কালে কারণানুসন্ধান বা কারণ-নির্দ্দেশ করিতে গিরা কারণকে প্রকাশমান দেখিতে না পান, তখন তাদৃশ কারণকে অপ্রকাশিত বা 'অব্যক্ত' প্রকৃতি সংজ্ঞা প্রদান করিয়া থাকেন। প্রকৃতি হইতে জাত প্রকাশমান দ্রব্য বা দ্রব্যসম্বন্ধীয় ভাব সমস্তই প্রাকৃত। প্রকৃতির অধীনে তিনটী গুণ প্রকাশমান আছে, উহাদিগকে রজঃ, সত্ত্ব ও তম আখ্যা দেওয়া হয়। রজোগুণের ধর্ম্ম এই যে, উহা অপ্রকাশিত বস্তুকে প্রকাশিত করে; সত্ত্ব গুণের ধর্ম্ম প্রকাশসত্ত্বা রক্ষা করে আর তমোগুণের ধর্ম্ম প্রকাশিত বস্তুসত্ত্বার বিলোপ সাধন করিয়া থাকে। সত্ত্ব-প্রারম্ভে রজোগুণ এবং অপর প্রান্তে তমোগুণ, সুতরাং ঐ অসদ্গুণদ্বয়ের সত্ত্বা প্রাকৃত সত্ত্বে আবদ্ধ। এই তিনটী গুণের গুণী তিনটীকে 'গুণাবতার' বলা হয়। সত্ত্বাধিষ্ঠাতৃ পুরুষ হইয়াও বিষ্ণু স্বয়ং গুণাতীত। ইনি গুণমায়াতীত অধোক্ষজতত্ত্ব। ইনিই—অনিরুদ্ধ; শুদ্ধসত্ত্বাত্মক তূরীয় তত্ত্ব। ইনি শব্দযোনি ও সাত্বতগণের কামদোহনকারী; ইনি নিখিলজীবের অন্তরে অন্তর্যামিপুরুষরূপে বিরাজিত। এই মায়াধীশ

বিষ্ণুর উপাসনায় জীবের মায়াতীত অপ্রাকৃত উপলব্ধি হয়। রজোগুণাধিষ্ঠাতৃ ব্রহ্মা গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতারের নাভিকমল হইতে উৎপন্ন হইয়া যখন নিজের রজোগুণাধিষ্ঠাতৃত্ব অভিমানের পরিবর্ত্তে হরিজনাভিমানে প্রপন্ন ও ভগবৎপ্রোক্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান-সমন্বিত পরমগুহ্য অধোক্ষজ জ্ঞানের শ্রৌতপন্থী বক্তা হন, তখন তাঁহার আনুগত্যে জীবের দিব্য জ্ঞানের উদয় হয়, নতুবা রজোগুণ জীবের চিচ্চক্ষু আবরণ করিয়া তাহাকে প্রাকৃত রাজ্যের ভোক্তাভিমানে প্রমত্ত করায়। আর রুদ্র যখন স্বীয় গুণসংবৃতত্ব বা তমোগুণাধিষ্ঠাতৃত্ব অভিমানের পরিবর্ত্তে হরিজনাভিমানে সঙ্কর্ষণসেবকরূপে বৈকুণ্ঠ প্রতীতির প্রচারক হন, তখন রুদ্রানুগত্যে প্রচেতোগণের ন্যায় জীবের দিব্যজ্ঞান লাভ হয়, নতুবা তমোগুণ জীবের দিব্যচক্ষুর প্রতিবন্ধক হইয়া জীবকে হয় পাষণ্ডমার্গে নিক্ষেপ করে, নয় অতিজ্ঞানের প্রলোভন দেখাইয়া নির্ব্বিশেষ তমোরাজ্যে পাতিত করিয়া তাহার আত্মবিনাশ সাধন করিয়া থাকে।

বদ্ধজীব মহত্তত্ত্ব হইতে নিঃসৃত অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাকৃত জগতের সহিত পঞ্চতন্মাত্রযোগে অনিত্য সম্বন্ধে ধাবিত হয়। সেই সময়ে অণুসম্বিতের কেবলা বৃত্তি যে অহৈতুকী অধোক্ষজ-সেবা, তাহা সুপ্ত থাকায় তদভাববৃত্তিতে স্থূল-সূক্ষ্ম প্রাকৃত ভূমিকায় বিচরণ করিয়া ভোগ বা ত্যাগে লিপ্ত বা উদাসীন হইয়া পড়ে। অচিদ্‌ভোগ বা অচিৎত্যাগ—এই বৃত্তিদ্বয়কে কর্ম্ম ও জ্ঞানরূপ অভক্তিবৃত্তি বা দেহ ও মনোধর্ম্মরূপে বর্ণনা করা হয়। প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহৎ হইতে অহঙ্কার এবং সেই প্রাকৃত সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মন এবং সেই সকল প্রাকৃত-তত্ত্বসমূহ ক্রমশঃ স্থূলতর হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়াদিরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। সুতরাং যেমন পঞ্চহস্তপরিমিত রজ্জুতে আবদ্ধ গাভী বিংশহস্ত ব্যবধানে অবস্থিত নবতৃণাঙ্কুর স্পর্শ করিতে পারে না, তদ্রূপ মন ও দেহধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া জীব প্রকৃতির অতীত অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। দেহ-ধর্ম্ম-কর্ম্ম বা মনোধর্ম্ম-জ্ঞান—উভয়ই প্রাকৃত বস্তু বা প্রাকৃত ভাবনিচয়ের বৃত্তি বলিয়া প্রাকৃত। প্রাকৃত কর্ম্ম বদ্ধ-জীবের দেহ-মনের ধ্বংসবিষয়ক। ভগবানের একপাদ বিভূতি হইতে প্রাকৃত জগৎ এবং ত্রিপাদ বিভূতি হইতে অপ্রাকৃত জগৎ; সুতরাং একপাদ দ্বারা ত্রিপাদবৈভব আয়ত্ত করা যায় না। যাহারা একপাদ বৈভবেরও সামান্য প্রাকৃত খণ্ড জ্ঞান লইয়া অপ্রাকৃত জ্ঞানের বিচার করিতে ধাবিত হন, তাহারা মক্ষিকার ন্যায় কাচভাণ্ডে সুরক্ষিত মধু গ্রহণ করিবার বৃথা চেষ্টার ন্যায় প্রাকৃত রাজ্যেই অবস্থান করেন। ঐ সকল আরোহবাদীর চেষ্টা প্রাকৃত। ভোগময় ব্যাধি বা ত্যাগময় শান্তির ছলনা—উভয়ই প্রাকৃত ভোগের প্রকার ভেদ, 'অপ্রাকৃত' তাহা হইতে স্বতন্ত্র। অণুসম্বিতের প্রাকৃত ভূমিকায় অবস্থিতিকালে প্রাকৃত সহজধর্ম্ম তাহার অপ্রাকৃত বুদ্ধিকে আবরণ করে, সুতরাং অণুসম্বিৎ সেই অবস্থায় থাকিয়া অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগ পথের পথিক সূত্রে যে 'দীক্ষা' বা 'দিব্যজ্ঞান' প্রাপ্তির অভিনয় করে, তাহা প্রকৃতপক্ষে 'অপ্রাকৃতজ্ঞান' না হইয়া বিমুখ-বিমোহিনী মায়াকল্পিত প্রহেলিকায় প্রাকৃত-জ্ঞান-বৈচিত্র্য মাত্র। দেশিক ও তত্ত্বকোবিদ্‌গণ যাহাকে 'দীক্ষা', 'দিব্যজ্ঞান' বা 'অপ্রাকৃতানুভূতি' বলেন, তাহা অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগপথের পথিক-থাকা-কালে লাভ হইতে পারে না অর্থাৎ তত্ত্বকোবিদগণের সিদ্ধান্তানুসারে অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগীর

দীক্ষার অভিনয় দীক্ষার অনুকরণ-চেষ্টা হইলেও তাহা 'দীক্ষা' বা দিব্যজ্ঞানের অনুসরণ নহে। ঐরূপ অনুষ্ঠান 'দীক্ষা' নামে অভিহিত না হইয়া 'দীক্ষাভিনয়' বা 'দীক্ষাবাধ' নামে অভিহিত হওয়াই সমীচীন।

এরূপ সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া চমকিত বা ক্ষুব্ধ হইবার কোন কারণ নাই। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, দীক্ষা-সম্বন্ধে দেশিক ও তত্ত্বকোবিদগণের বিচার হইতে সাধারণের বিপ্রলিপ্সাময়ী ধারণা স্বতন্ত্র। দীক্ষাভিনয় বা অনুকরণ প্রকৃত দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞানের পথ-অনুসরণ হইতে পৃথক্। কর্ম্ম-পথের পথিকগণ দীক্ষানুষ্ঠান-ব্যাপারকে সামাজিক ও ব্যবহারিক কৃত্যবিশেষ জ্ঞান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের দীক্ষাগ্রহণ-প্রণালী আলোচনা করিলেই ইহা বেশ উপলব্ধি হইতে পারে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য যেরূপ দীক্ষাবিধির ব্যবস্থা বিধান করিয়াছেন, তাহা একটু নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলেই বুঝা যায় যে, ঐরূপ দীক্ষানুষ্ঠান বা দীক্ষানুকরণ জীবের দ্যিবজ্ঞান উদয় না করাইয়া জীবকে প্রাকৃত কর্ম্মফলরাজ্যে অর্থাৎ একপাদ বিভূতিরূপ এই প্রাকৃত দেবীধামের অন্তর্গত চতুর্দ্দশ ভুবনেই আবদ্ধ রাখে। কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণের বিচারে দীক্ষাদাতা একটী কর্ম্মফলবাধ্য অর্থাৎ পুণ্যকর্ম্মফলভোক্তা জীববিশেষ অর্থাৎ দীক্ষাদাতা একজন বৈজ ব্রাহ্মণ ও গৃহী (গৃহব্রত বা গৃহমেধী) অর্থাৎ সাত্ত্বতগণের বিচারের প্রতিকূলে গুরুদেব বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংস বা বৈষ্ণব হইবার পরিবর্ত্তে একজন বদ্ধজীববিশেষ! গুরু ও শিষ্যের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধে দিব্যজ্ঞানের অভাব ত' দূরের কথা, সম্পূর্ণ প্রাকৃতজ্ঞানের পরাকাষ্ঠাই পরিলক্ষিত হয়। দীক্ষাগ্রহণানুকরণকারী ব্যক্তি দীক্ষাদাতা গুরুদেবকে একজন কর্ম্মফলবাধ্য জীববিশেষ বিচার করিবেন এবং দীক্ষাদাতার অভিনয়কারী গুরুদেব দীক্ষাদানের অভিনয় প্রদর্শন করিবার পরেও দীক্ষিতকে অদীক্ষিতের অবস্থা হইতে উত্তোলন করিতে অসমর্থ হইয়া পূর্ব্ববৎ প্রাকৃত চক্ষেই দর্শন করিতে থাকিবেন। এইরূপে গুরু ও শিষ্য উভয়ের প্রাকৃত বুদ্ধি যোজনা ও অভ্যাস-ফলে প্রাকৃত জ্ঞান আরও পরিবর্দ্ধিত হইয়া উভয়কে প্রাকৃত তমোরাজ্যে প্রবেশ করাইবে। কিন্তু বৈদান্তিক আত্মধর্ম্মের বিচার এই যে, গুরু ও শিষ্যে এই প্রকার প্রাকৃত সম্বন্ধ বা প্রাকৃত-বিচার-প্রাবল্য নিরয়ের সেতু মাত্র। এই জন্যই শ্রীউদ্ধব গীতায় শ্রীভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন,—'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ', এই জন্যই শ্রীপদ্মপুরাণ তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—'গুরুষু নরমতির্যস্য বা নারকী সঃ'। কিন্তু কর্ম্মপথের পথিগণের বিচার তদ্বিপরীত। তাঁহারা বলেন, গুরুদেবকে একজন কর্ম্মফলবাধ্য ব্রাহ্মণাদি পুণ্যময় জীববিশেষ ধারণা করিতে হইবে। পাপ ও পুণ্য—উভয়ই যে প্রাকৃত, ইহা ঐ সকল দীক্ষাদাতার অভিনয়কারী ও দীক্ষাগ্রহণের অনুকরণকারি ব্যক্তিগণের প্রকৃত দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান লাভের অভাবে অনুভূতির বিষয় হয় না। এইরূপ গুরু ও শিষ্য উভয়েই প্রাকৃত কর্ম্মালানে বদ্ধ। তাঁহাদের উভয়ের অস্মিতা দেবীধামের প্রাকৃত ভূমিকায় আবদ্ধ। তাঁহারা উভয়ে বদ্ধজীব—উভয়ে অন্ধ। এই সকল ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই জীবমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সাত্বতশাস্ত্র তারস্বরে বলিয়াছেন,—

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ।।"

পরমহিতকারিণী শ্রুতি ফলবাধ্য পুণ্যময় জীববিশেষকে 'গুরু'রূপে গ্রহণ করিবার পরামর্শ দেন না। তিনি 'শ্রোত্রিয়' ও 'ব্রহ্মনিষ্ঠ' গুরুতে অভিগমন করিবার উপদেশই দিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতও 'শব্দব্রহ্ম' ও 'পরব্রহ্মেনিষ্ণাত' পরমোপশান্ত গুরুদেবকেই দীক্ষাদাতৃরূপে বরণ করিবার উপদেশ প্রদান করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন,—

"কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা—সেই 'গুরু' হয়।।"

দেশিক ও তত্ত্বকোবিদগণ যাহাকে 'দীক্ষা' বলেন, তাহা দ্বারা অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভ এবং পাপের সম্যগ্‌রূপ ক্ষয় অর্থাৎ ফলোন্মুখ প্রারব্ধ, প্রারব্ধত্বের উন্মুখ বীজ, বীজকারণ কূট ও অপ্রারব্ধ ফল—এই পাপচতুষ্টয় সমূলে বিনষ্ট হয়। কর্ম্মদীক্ষায় অপ্রারব্ধ পাপ কিয়ৎপরিমাণে ক্ষয় হইলেও পাপবীজ ও অবিদ্যা বিধ্বংসিত না হওয়ায় পুনরায় পাপে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, জ্ঞান বা যোগ-দীক্ষায় অপ্রারব্ধ পাপ পাপবীজের সহিত বিনষ্ট হইলেও প্রারব্ধ পাপ ও অবিদ্যা ধ্বংস না হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে আত্যন্তিক ক্লেশের নিবৃত্তি হয় না। এই জন্যই জ্ঞানিগণের প্রারব্ধ পাপভোগ ও পুনরাবৃত্তির কথা শাস্ত্রে শ্রুত হয়। কিন্তু ক্লেশঘ্নী বৈষ্ণবী দীক্ষার প্রারম্ভমাত্রেই সমগ্র পাপমূল উৎপাটিত হইয়া থাকে, তবে যে অক্ষজ নেত্রে বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তির প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ বা পাপ-প্রবৃত্তি প্রতীয়মান হয়, উহা উৎপাটিত-মূল বৃক্ষের সজীবতা লক্ষণের ন্যায় অর্থাৎ যেমন বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হইলেও কিছুকাল পর্য্যন্ত তাহাতে সজীবতার চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ। যদিও অনেক সময় 'কমলপত্রশতবেধ'-ন্যায়ানুসারে পাপরাশি বিনষ্ট হইতে থাকে বলিয়া অক্ষজ জ্ঞানপ্রমত্ত সাধারণ মৎসর জীব দীক্ষিত ও অদীক্ষিত ব্যক্তির তারতম্য উপলব্ধি করিতে পারে না, তথাপি উহা সাধক ও সিদ্ধ ব্যক্তিগণের অনুভূতির বিষয় হয়। কিন্তু কর্ম্মজড়গণের বিচারে দীক্ষাগ্রহণাভিনয় প্রদর্শন করিবার পরও দীক্ষাদাতা দীক্ষিতম্মন্য ব্যক্তির পাপ দূর করিতে অসমর্থ হইয়া উহাকে 'অপ্রাকৃত' জানিবার পরিবর্ত্তে 'প্রাকৃত' অর্থাৎ পাপনিমগ্ন শোচ্য জীব (শূদ্র) বা প্রারব্ধ পুণ্যকর্ম্মফলভোক্তৃ-(বা শৌক্রব্রাহ্মণ) রূপে জানেন। কিন্তু দেশিকগণ বলেন, দীক্ষিত ব্যক্তি কখনও 'প্রাকৃত' থাকিতে পারেন না। দীক্ষাদাতা গুরুদেব অপ্রাকৃত, তিনি—স্পর্শমণি। স্পর্শমণির স্পর্শ প্রাপ্ত হইয়া যদি কোন ধাতুবিশেষ পূর্ব্ব-ধাতুত্বই সংরক্ষণ করিল, তাহা হইলে হয় পূর্ব্বোক্ত বস্তুটী প্রকৃত স্পর্শমণি নহে, উহা মেকী জিনিষ, অথবা উক্ত ধাতুবিশেষ স্পর্শমণির সান্নিধ্য বা স্পর্শ প্রাপ্ত হয় নাই কিম্বা উভয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান রহিয়াছে, যাহা ধাতুবিশেষের কাঞ্চনত্ব সংঘটনে বাধা প্রদান করিয়াছে। তত্ত্বকোবিদগণ বলেন,—

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্।।"

তাঁহারা আরও বলেন,—

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম।।
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়।।"

শ্রীগুরুদেব—অপ্রাকৃত। তিনি যখন আত্মসমর্পণকারি ভক্তগকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন, তখন তাহাকে 'আত্মসম' অর্থাৎ 'অপ্রাকৃত' করিয়া থাকেন। যিনি শিষ্যকে 'আত্মসম' অর্থাৎ 'অপ্রাকৃত' করিতে পারেন না, সেই গুরুব্রুবব্যক্তি নিজেই 'অপ্রাকৃত' নহেন জানিতে হইবে। কারণ যিনি নিজে অপ্রাকৃত নহেন, অর্থাৎ 'দীক্ষিত' হন নাই, তিনি কি করিয়া অপরকে 'অপ্রাকৃত' করিতে পারিবেন? যিনি অপ্রাকৃত হইতে পারিলেন না, তাঁহার 'দীক্ষা' বা দিব্যজ্ঞান লাভ হয় নাই; তিনি কখনও অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবার অধিকার পাইলেন না, কারণ 'নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ"—এই ন্যায়ানুসারে 'প্রাকৃত' কখনও 'অপ্রাকৃতে'র সেবা করিতে পারে না।

অপ্রাকৃতের লক্ষণ এই যে, তাঁহার অস্মিতা প্রাকৃতরাজ্যের কোন বস্তুতে নাই। দেহ ও মনোধর্ম্মের কোনও প্রাকৃত অভিমানে 'অপ্রাকৃত' ব্যস্ত নহেন। 'অপ্রাকৃত' যখন প্রাকৃতভূমিকায় প্রাকৃতমনের দ্বারা বিচরণ করেন না, তখন তাঁহার প্রাকৃত অভিমানও থাকিতে পারে না। অর্থাৎ 'অপ্রাকৃত' সেবাসুখ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ব ইতিহাস বা 'আমি শূদ্র, ব্রাহ্মণ, আমি অমুক পিতার সন্তান, আমি অমুক বসু-রায়-চৌধুরী-ভট্টাচার্য্য' প্রভৃতি যাবতীয় প্রাকৃত ইতিহাসের হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত হন। অপ্রাকৃত গুরুদেব শিষ্যকে ঐরূপ প্রাকৃত অভিমানে লিপ্ত থাকিবার পরামর্শ না দিয়া তাঁহাকে তাঁহার কৃষ্ণদাস্যসূচক নাম ও উপাধিতে বিমণ্ডিত করেন এবং পুনঃ পুনঃ তাঁহার কর্ণে তাঁহার অপ্রাকৃতস্বরূপের কেবলা বৃত্তি কৃষ্ণদাস্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে ক্রমশঃ উন্নত হইতে উন্নত-তর ভজনরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। দীক্ষিত ব্যক্তি এইরূপে শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে প্রতিক্ষণ 'দীক্ষা' প্রাপ্ত হইয়া যখন অভিধেয় যাজন করিতে করিতে সম্বন্ধজ্ঞানে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হন এবং প্রয়োজন-সম্পত্তি লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হন, তখন তাঁহার দীক্ষার পরিপূর্ণতা সাধিত হয়।

জ্ঞানী ও যোগিগণের দীক্ষানুকরণকেও 'দীক্ষা' বা 'দিব্যজ্ঞান' বলা যাইতে পারে না। কারণ তাঁহাদের মতানুসারেই 'গুরু' ও 'শিষ্য' সম্বন্ধ ব্যবহারিক ও অনিত্য অর্থাৎ তাঁহাদের মতে তাঁহাদের প্রাপ্যজ্ঞান লাভের পর গুরু-শিষ্যরূপ ভেদজ্ঞান বা ভ্রমের অবকাশ নাই, যথা—"গুরুর্নৈব শিষ্যশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্।" তাঁহাদের মতে জগতের অসত্য নির্দ্ধারিত হওয়ায় শিষ্য, আচার্য্য এবং আচার্য্যের উপদিষ্ট জ্ঞান—এ সমস্ত জগতের অন্তর্গত হইয়া পড়ে। যদি তাঁহারা বলেন, আচার্য্য ও আচার্য্যের উপদিষ্ট জ্ঞান শিষ্যোপদেশের জন্য কল্পিত হইয়াছে—এইরূপ যুক্তিও তাঁহারা রক্ষা করিতে পারেন না। কারণ কল্পিত আচার্য্যের উপদিষ্ট কল্পিত জ্ঞান দ্বারা কল্পিত শিষ্যের কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে? রজতরূপে প্রতীয়মান শুক্তি দেখিয়া রজতার্থী কোন ব্যক্তি যদি রজত আহরণের জন্য তাহাতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার সেই প্রযত্ন যেরূপ বিফল হয় অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে রজত লাভ হয় না, সেইরূপ নির্ব্বেদ-জ্ঞানানুসন্ধিৎসুগণের মতে

নির্ব্বিশেষ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্তই মিথ্যা বিবেচিত হওয়ায় মোক্ষলাভের জন্য গুরুপদাশ্রয়ের অভিনয় এবং তাহা হইতে শ্রবণ প্রভৃতি বিষয়ের প্রযত্নও অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া নিষ্ফল হইয়া পড়ে। কোন কারাগারে আবদ্ধ পুরুষকে স্বপ্নে যদি কোন পুরুষ উপদেশ করেন যে, "তুমি কারাগার হইতে মুক্ত হইয়াছ" এবং সেই বাক্য হইতে স্বপ্নে যদি পুরুষের এইরূপ জ্ঞান হয় যে, 'আমি বন্ধনমুক্ত', তাহা হইলে যেমন সেই জ্ঞান কার্য্যকর হয় না বস্তুতঃ জাগ্রত হইয়া সে আপনাকে বন্ধনগ্রস্তই দেখিতে পায়, সেইরূপ "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্য হইতে উৎপন্ন জ্ঞানও অবিদ্যাকল্পিত বাক্যজাত বলিয়া নিজেও অবিদ্যাত্মকহেতু, অবিদ্যা দ্বারা কল্পিত জ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া এবং কল্পিত আচার্য্যের অধীন শ্রবণ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় পুরুষের বন্ধনাশ অর্থাৎ পুরুষকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করিতে পারেন।

অতএব প্রমাণিত হইল যে, 'অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতি অভিমানগ্রস্ত ব্যক্তিগণের দীক্ষানুকরণচেষ্টা তত্ত্বকোবিদগণের প্রতিপাদ্য 'দীক্ষা' বা 'দিব্য জ্ঞান' নহে। অপ্রাকৃত গুরুদেব অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞান প্রভাবে বদ্ধজীবকে যে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন, তাহাই 'দীক্ষা'। সেই দিব্যজ্ঞানে অপ্রাকৃত বিবেক উদিত হয়। (নির্ব্বিশেষবাদিগণের 'অপ্রাকৃত' বা 'আধ্যাত্মিক' পরিভাষার উদ্দিষ্ট বিষয় হইতে গুরু অধোক্ষজসেবাপর 'অপ্রাকৃত' পৃথক্) অপ্রাকৃত বিবেকাভাবে জীব প্রাকৃত বিবেকানন্দ থাকেন এবং সেই প্রাকৃত-বিবেকানন্দে প্রমত্ত হইয়া অর্থাৎ প্রাকৃত রজোগুণকেই (রজোগুণাধিক্যকেই) বহুমানন করিয়া একজন বড় আরোহবাদী হইয়া পড়েন। এমন কি, গুর্ব্ববজ্ঞা প্রদর্শনকেই একটা 'বড় বাহাদুরী'র কার্য্য মনে করিয়া জগতে তৎসমশীল ব্যক্তিগণের নিকট হইতে 'বাহাবা' প্রাপ্ত হন। ঐরূপ প্রাকৃতবিবেকানন্দে প্রমত্ত ব্যক্তি মূর্খতাকে গুরুরূপে দাঁড় করাইয়া অর্থাৎ মূর্খতাকে গুরুর মূর্ত্তিরূপে গড়িয়া কল্পিত গুরুকে তাহার ভোগের বস্তুরূপে পরিণত করেন এবং নিজ ভোগবুদ্ধি ও অপরাধকে মূর্খতারূপী কল্পিত গুরুদ্বারা সমর্থনকল্পে শ্রুতির পন্থার প্রতিকূলে মূর্ত্ত মূর্খতার নিকট প্রশ্ন করিয়া থাকে, 'হে আমার ভোগ্যবস্তু! তুমি কি ভগবানকে দেখিয়াছ? আমাকে কি তুমি ভগবান্ দেখাইতে পার?" তুমি কি ভগবানকে আমার ভোগপর ইন্দ্রিয়ের গোচর করাইয়া আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ দ্বারা আমার সেবক হইতে পার? এইরূপ চিন্তাস্রোত রজোগুণের প্রাবল্যহেতু প্রচ্ছন্ন নাস্তিক অধিরোহবাদীর ভোগময় চিত্তে উদিত হইলেও উহাতে মূর্খতা ও নাস্তিকতা ব্যতীত আর কিছুই নাই। ইহা গীতোপনিষদের "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" বা শ্রুতির "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্"—এই নির্দ্দিষ্ট পন্থার বিরোধী গুরুলঙ্ঘনাবজ্ঞা ও অক্ষজজ্ঞান-প্রমত্ততারূপ আসুরিক আরোহবাদবিশেষ। শ্রীগুরুদেব কখনও "আমি ভগবান্ দেখিয়াছি" এইরূপ কথা বলেন না। অগুরু বা অসুরভাবাপন্ন ব্যক্তিগণই ভগবানকে ভূতপ্রেতজাতীয় বস্তু মনে করিয়া 'আমি ভগবানকে দেখিয়া ফেলিয়াছি'—এইরূপ ব্যর্থ দাম্ভিকতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। প্রেমিক ভগবদ্ভক্তগণ সর্ব্বদা কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলাই প্রদর্শন করেন। তাই জগদ্গুরু-লীলাভিনয়কারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্রে আমরা দেখিতে পাই, তিনি সর্ব্বদা বলিতেছেন, "কাঁহা যাঙ, কাঁহা পাঙ, মুরলী-বদন।" তাই আবার তিনি কখনও শিক্ষাষ্টক দ্বারা জীবকে সিদ্ধির অন্তর্লক্ষণ জানাইতেছেন,—

"যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে।।"

আবার সিদ্ধির নিষ্ঠা শিক্ষা দিতেছেন,—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ।।"

"প্রেমের স্বভাব এই প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তি-গন্ধ।।"

কলি বা তর্কবহুলযুগে শুদ্ধ-ভক্তিপথ কোটিকণ্টকরুদ্ধ। সুতরাং বর্ত্তমানে দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞানের আদর্শ অনুসরণের পরিবর্ত্তে দীক্ষার অনুকরণ বা দীক্ষাবাধকেই 'দীক্ষা' বলিয়া অদীক্ষিত এবং দীক্ষানুকরণকারি-সম্প্রদায়ে প্রচলিত হইতেছে। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের ভাষায় দেখিতে পাই—

"চক্ষু দান দিল যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাহা হৈতে, অবিদ্যা-বিনাশ যাতে,
বেদে গায় যাঁহার চরিত।।"

শ্রীগুরুপ্রণামেও দৃষ্ট হয়,—

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা-দ্বারা চক্ষুরুন্মীলন-কার্য্যের বা দিব্যজ্ঞানকে 'দীক্ষা' বলিবার পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান হরিবিমুখ-সমাজে যে-সকল হরিবিমুখতাময়ী চেষ্টাকে দীক্ষা-ক্রিয়া বলা হয়, তাহার একটী আংশিক চিত্র নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

বর্ত্তমানে দুইশ্রেণীর দীক্ষা-গ্রহণের অভিনয়কারী এবং দুইশ্রেণীর দীক্ষাদাতার অভিনয়কারী হরিবিমুখ ব্যক্তি দৃষ্ট হয়। একপ্রকার দীক্ষাগ্রহণের অভিনয়কারী দীক্ষাগ্রহণ ব্যাপারটীকে একটী 'হুজুগে' এবং 'পোযাকী ব্যাপারবিশেষ ধারণা করিয়া দীক্ষা গ্রহণানুকরণরূপ অনুষ্ঠানে রুচিবিশিষ্ট হয়। এই শ্রেণীর মধ্যে 'দীক্ষা ব্যাপারটী কি', 'দীক্ষার আবশ্যকতা কি', 'দীক্ষাগ্রহণের অধিকারী এবং অনধিকারীই বা কে', 'কে-ই বা প্রকৃত দীক্ষাদাতা'—এই সকল বিষয় তলাইয়া দেখিবার অবকাশ হয় না। ইহারা গড্ডলিকা-প্রবাহের ন্যায় একজনের দেখাদেখি আর একজন বিচার ও বুদ্ধিরহিত হইয়া বুদ্ধিহীন অজার ন্যায় অন্ধকূপে ঝম্প প্রদান করিয়া থাকে। এই সকল ব্যক্তির মধ্যে কেহ বা পরে অনুতপ্ত হয়, আর যাহার কপাল চিরতরে পুড়িয়াছে, সে ব্যক্তি বঞ্চিত হইয়া চিরজীবন মনোধর্ম্মের প্রহেলিকায় ঘুরিয়া বেড়ানকেই একটা মস্ত কাজ মনে করে।

অনেক সময় যেমন প্রকৃত ক্ষুধার উদ্রেক না হইলেও অপরকে কিছু আহার করিতে দেখিলে দুষ্টা ক্ষুধার উদয় হয় এবং সেইকালে অনাবশ্যক দ্রব্যাদি গ্রহণ করার ফলে উদরে আময় সঞ্চার হইয়া থাকে, তদ্রূপ অনেকে 'দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান-লাভটী কি, তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়াই দীক্ষাকে একটা আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াবিশেষ ধারণা করিয়া ও লোকের নিকট 'আমি খুব একজন নামজাদা গুরু করিয়াছি—সেই গুরুকে আমি বেশ মনের মত করিয়া আমার ভোগের সামগ্রী করিতে পারিব অর্থাৎ আমি আমার বহির্ম্মুখতার স্বভাব ও রুচি লইয়া যে সকল মনোধর্ম্মোত্থ কার্য্যের তালিকা বা ভাবুকতার প্রস্তাব উপস্থাপিত করিব, আমার ভোগ্য গুরুর দ্বারা আমি সেই সকল সমর্থন করাইয়া লইয়া লোকের নিকট 'ভক্ত-বিটেল' সাজিতে পারিব, এইরূপ ভোগবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া অনেক ব্যক্তি দীক্ষা গ্রহণের অভিনয় প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই সকল ব্যক্তি অনেক সময় প্রাকৃত শিক্ষার অভিমানে প্রমত্ত হইয়া মনে করেন যে, 'আমি যখন একজন বড় প্রফেসর কিম্বা ব্যারিষ্টার কিম্বা একজন প্রথিতনামা দেশ নেতা বা সপ্ততীর্থ মহামহোপাধ্যায়, তখন যিনি আমার মত ব্যক্তির 'গুরু' হইবেন, তাঁহার সৌভাগ্যের আর সীমা নাই; আমি গুরুকে বহু উচ্চ শিখরে উঠাইয়া দিতে পারিব; আমার মত এত বড় লোক যাঁহার নিকট মস্তক অবনত করেন, তাঁহার ভাগ্যের বলিহারী যাই! আবার অন্যদিকে গুরুদেব মনে করেন, আমি যখন বড় প্রফেসর, ব্যারিষ্টার, রাষ্ট্রনেতা, পি, এইচ, ডি বা মহামহোপাধ্যায় প্রভৃতির গুরু হইবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন দুনিয়াতে আমার মত আর কে আছে! এইরূপ গুরুদেব ঐরূপ সৌভাগ্য লাভ করিয়া তাঁহার প্রফেসর, ব্যারিষ্টার শিষ্যবর্গের এরূপ ক্রীতদাস হইয়া পড়েন যে, শিষ্যগণ যে প্রস্তাবই করুন না কেন, গুরুদেব তাহা সমর্থন না করিয়া অন্যথা করিতে পারেন না। অবশ্য কখনও কখনও নিজের একটু লোকদেখান গুরুত্ব ও বাহাদুরী বজায় রাখিবার জন্য শিষ্যবর্গের প্রস্তাবসমূহের মধ্যে একটু মতামত দিয়া থাকেন মাত্র, তাহাতেও শিষ্যানুবন্ধিত্বই লক্ষিত হয়। এইরূপ গুরু ও শিষ্যের অভিনয়ে পরস্পরে ভোগবুদ্ধি ও অজ্ঞানতিমিরান্ধতা ব্যতীত দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞানের লেশমাত্র নাই। ঐরূপ গুরু ও শিষ্য উভয়েই প্রাকৃত অস্মিতায় আবদ্ধ।

উহারা উভয়েই অন্ধকূপে পতিত। এইরূপ গুরু নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হইয়াছেন আর স্বরূপবিভ্রান্ত শিষ্যগণকেও অধিকতর ভ্রান্তপথে চালিত করিতেছেন। তবে উঁহাদের মধ্যে যে ধর্ম্মানুষ্ঠানের বাহ্য-আকার দৃষ্ট হয়, তাহা প্রকৃত ভগবদনুসন্ধান নহে, কেবল ধর্ম্মের আবরণে স্ব স্ব মনোধর্ম্ম ও ভোগবৃত্তি চরিতার্থ করিবার একটা ছলনা মাত্র। এই সকল বঞ্চিত ব্যক্তিই সমাজে 'দীক্ষিত' বা 'দীক্ষাদাতারূপে' প্রচলিত থাকিয়া প্রকৃত দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞানের আদর্শকে লোকলোচন হইতে আবৃত করিতেছে।

এই ত গেল এক প্রকার দীক্ষাগ্রহণের অনুকরণকারী ও দীক্ষাদানের অভিনয়কারী। আর একপ্রকার অভিনয়কারী শ্রেণীর মধ্যে দীক্ষাদানানুকরণ কার্য্যটী উদরভরণ, স্ত্রীপুত্রের ভোগ্য ও বিলাস-সামগ্রী সংগ্রহের উপায় বা বণিগ্ বৃত্তিবিশেষ। স্বীয় যোগ্যতা থাকুক বা না-ই থাকুক, নিজে দীক্ষিত হউক বা না-ই হউক অর্থাৎ দিব্যজ্ঞানলাভ করুক বা না-ই করুক সে সব বিচার করিবার আবশ্যক নাই; যেরূপ কপট ভালবাসা ও স্নেহ-মমতার অভিনয় দেখাইয়া অসদ্ ব্যক্তিগণ সরল লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ বাহ্যে

তিলক-ফোঁটা ও ভাগবত-পাঠকের অভিনয়াদি দেখাইয়া লোকবঞ্চনাকার্য্যের নামই অনুকরণকারী বঞ্চক শ্রেণীর মতে 'দীক্ষা'। এই সকল বণিকগণকে যাহারা আশ্রয় করে, তাহারাও তৎসমশীল অর্থাৎ বঞ্চিত বা বঞ্চিত হইতে ইচ্ছুক। সমবস্তুই সমবস্তুকে আকর্ষণ করে। গাঁজাখোর ও গাঁজাখোরেই বন্ধুত্ব হয়। এই সকল ব্যক্তির মধ্যে 'দীক্ষা' কাহাকে বলে, 'দীক্ষাদাতা গুরুর লক্ষণ কি'—এ সব বিচার করিবার আবশ্যক নাই। কাহারও মতে ঐ সকল কথাগুলি মুখে আলোচনা করিবার আবশ্যকতা থাকিলেও গ্রন্থ ও শাস্ত্রমঞ্জুষা-মধ্যেই ঐ বিচারসমূহকে তালা চাবি বন্ধ করিয়া রাখাই কর্ত্তব্য—ঐ সকল বিচার নিজ জীবনে গ্রহণ করিয়া আত্মমঙ্গলবিষয়ে যত্নশীল হইবার আবশ্যকতা নাই! কুলক্রমাগতপন্থায় শৌক্রবিচারাবলম্বন করিয়া গুরুগ্রহণ ও ক্রীতদাসপ্রথার ন্যায় গুরুব্রুব লঘুবস্তুর শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করাই ঐ সকল ব্যক্তির মতে 'দীক্ষা'। যেখানে এইরূপ রক্তমাংসের প্রাকৃত বিচার প্রবল এবং কাপট্য ও বঞ্চনার তাণ্ডব নৃত্য, সেখানে যদি ঐরূপ বাহ্যানুষ্ঠানকে 'দীক্ষা' ও 'দিব্যজ্ঞান' বলিতে হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রকে একটী কাপট্য-বিদ্যা শিখিবার উপায় বিশেষ জ্ঞান করিতে হয়। এই সকল কৌলিক, লৌকিক, বণিগ্‌বৃত্ত গুরুব্রুবগণের হস্ত হইতে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবকুলকে মুক্ত করিবার জন্য শাস্ত্র ও আচার্য্যগণ তারস্বরে বলিয়াছেন,—

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে।।

(মহাঃ ভাঃ উদ্যোগ পর্ব্ব ১৭৯।২৫)

স্নেহাদ্বা লোভতো বাপি যো গৃহ্ণীয়াদ্ দীক্ষয়া।
তস্মিন্ গুরৌ সশিষ্যে তদ্দেবতাপাশ আপতেৎ।।

(হঃ ভঃ বিঃ ২।৫)

যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্।।

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৬২)

"বৈষ্ণববিদ্বেষী চেৎ পরিত্যজ্য এব। 'গুরোরপ্যবলিপ্তস্যে'তি স্মরণাৎ। তস্য বৈষ্ণব-ভাবরাহিত্যেন অবৈষ্ণবতয়া 'অবৈষ্ণবোপদিষ্টেনে'তি বচনবিষয়ত্বাচ্চ।" (ভক্তিসন্দর্ভ ২৩৮ সংখ্যা)

"পরমার্থগুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিকগুর্ব্বাদিপরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ।।" (ভক্তিসন্দর্ভ ২১০ সংখ্যা)

"তত্র যদি গুরুর্বিসদৃশকারী ঈশ্বরে ভ্রান্তঃ কৃষ্ণযশোবিলাস-বিনোদং নাঙ্গীকরোতি, স্বয়ং বা দুরভিমানী লোকস্তবেঃ কৃষ্ণত্বং প্রাপ্নোতি তর্হি ত্যজ্য এব। কথমেব গুরুস্ত্যজ্য ইতি ন। কৃষ্ণভাবলোভাৎ কৃষ্ণপ্রাপ্তয়ে গুরোরাশ্রয়নং কৃত্বা তদনন্তরং যদি তস্মিন্নেব গুরৌ আসুরীভাবস্তর্হি কিং কর্ত্তব্যং? আসুরগুরুং ত্যক্ত্বা গুরোর্ব্বলং মর্দ্দনীয়মিতি শ্রীশ্রীবৈষ্ণবানাং ভজনবিচারঃ।এবম্ভ দৃষ্টা বহবঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারে গুরুনিরূপণ-সিদ্ধান্তাঃ।। (শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর-কৃত ভজনামৃতে)

সে স্থানে যদি 'গুরু' বিরুদ্ধবাদী বা বিরুদ্ধাচারী হন, 'কৃষ্ণের নিত্যদাস জীব' তাহা ভুলিয়া দুষ্ট মায়াবাদ জড়স্মার্ত্তবাদাদি অবলম্বন করেন বা কৃষ্ণের যশোবিলাস-বিনোদ অঙ্গীকার না করেন, স্বয়ং বা দুরভিমানী হইয়া কৃষ্ণবদ্ব্যবহার করে, তবে সে গুরু অবশ্য ত্যজ্য হইবেন। গুরুত্যাগ কিরূপ হইতে পারে, এরূপ আশঙ্কা করিবে না। কৃষ্ণভক্তিপ্রাপ্তির লোভে এবং কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য গুরুচরণ আশ্রয় করিতে হয়। যখন সর্ব্বসদ্গুণ দেখিয়া শ্রীগুরুচরণ আশ্রয় করা হয়, আবার তাহার পর সেই গুরুতে ঐ সকল আসুরী ভাবের উদয় হয়, তখন কি করা কর্ত্তব্য ? সেই আসুর গুরুকে ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণভক্তিমান অন্য গুরুকে অবশ্য ভজনা করিবে। ভক্তগুরুর কৃষ্ণবলক্রমে আসুর গুরুর ক্রোধজনিত প্রাকৃত বলকে মর্দ্দন করাই শ্রেয়ঃ। ইহাই শ্রীশ্রীবৈষ্ণবদিগের ভজনের রহস্য বিচার। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারে গুরুনিরূপণ-বিষয়ে এরূপ অনেক সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হয়।

সুতরাং দীক্ষাদানের লীলাভিনয়কারী গুরুব্রুবগণ এবং তাহাদের বঞ্চনাবৃত্তির সমর্থনকারী প্রাকৃত সহজিয়াগণ যে আনুকরণিক সম্প্রদায়কে গুরুসম্প্রদায়রূপে প্রচার করিয়া 'গুরু ত্যাগ—মহা অপরাধ' প্রভৃতি বাক্যের ছলে লোকবঞ্চনা করিয়া অযোগ্য, লৌকিক, কৌলিক ও বৈষ্ণববিদ্বেষী ব্যক্তির আনুগত্য সংরক্ষণকেই 'গুরুভক্তি' প্রভৃতি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করে, সেই 'অসাধুকে সাধুরূপে গ্রহণ, তৎসঙ্গে প্রকৃত সাধুকে অবজ্ঞা'রূপ নামাপরাধ ও অসৎ মতবাদ উপরি-উক্ত শাস্ত্র ও আচার্য্যবাক্যের দ্বারা খণ্ডিত হইল।

দীক্ষা-গ্রহণাভিনয়কারী ও দীক্ষাদাতার অনুকরণকারি-সম্প্রদায়ে আরও বহুপ্রকার বিভিন্ন অদ্ভুত মতবাদ শ্রুত হয়। কোন কোন মনোধর্ম্মী ও প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন, 'প্রভু-সন্তান না হইলে দীক্ষা সমীচীন হয় না।' কেহ কেহ আবার স্বীয় নিষ্কিঞ্চনতা প্রচারের ছলে জড় প্রতিষ্ঠার কপটসেবক হইয়া তাঁহার নিকট আগত ব্যক্তিগণকে প্রভুসন্তানগণকেই দীক্ষাগুরুরূপে গ্রহণ করিবার পরামর্শ প্রদানপূর্ব্বক নিজে তাহাদের 'শিক্ষাগুরু' সাজিবার অভিনয় করিয়া থাকেন। এইরূপ বিচারে 'দীক্ষা' বা 'দিব্যজ্ঞানের' অভাবই পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ 'প্রভুসন্তান' না হইলে অপরে দীক্ষা-দাতা হইতে পারে না,—এইরূপ বিচারকের প্রভুসন্তানের ধারণা অতীব প্রাকৃত। যে স্থানে কেহ কোন ব্যক্তিবিশেষকে বা সম্প্রদায়-বিশেষকে শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত প্রভৃতি বিষ্ণুতত্ত্বের কিম্বা ভগবৎপার্ষদ বৈষ্ণবতত্ত্বের রক্তবহনকারী শৌক্র-অধস্তন মনে করেন, সেই স্থানে বিচারকের দিব্যজ্ঞানের অভাব; কারণ এইরূপ বিচার শ্রীভাগবতধর্ম্ম বা আচার্য্যগণ সমর্থন করেন না। শ্রীস্বামিচরণ দশমস্কন্ধীয় 'ভগবান্ বিশ্বাত্মা' ইত্যাদি শ্লোকের ভাবার্থদীপিকায় বলেন যে, প্রাকৃত জীবের ন্যায় ভগবানের ধাতুসম্বন্ধ নাই—"জীবানামিব ন তু ধাতু-সম্বন্ধঃ" (ভাঃ ১০।২।১৬)। আচার্য্যবর্য্য শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের সিদ্ধান্তও তাহাই। তিনি বলেন,—শ্রীবিষ্ণুর "ন প্রাকৃতবত্তদীয়-চরমধাত্বাদৌ প্রবেশঃ" (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ)। অর্থাৎ প্রাকৃত জীবের ন্যায় বিষ্ণুতত্ত্বের চরম ধাতু প্রভৃতিতে প্রবিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণরূপ ব্যাপার নাই। সুতরাং এরূপ সূত্রে বিষ্ণু বা বৈষ্ণবতত্ত্বের রক্তবাহকাভিমানিগণ যদি নিজদিগকে 'প্রভুসন্তান' বলেন বা বোলান কিম্বা অপর কেহ তাহা সমর্থন করেন, সেই সকল ব্যক্তির দিব্যজ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব এবং অপরাধময় প্রাকৃত সাহজিক জ্ঞানেরই প্রাবল্য প্রমাণিত হইবে। এইরূপ

ভীষণ অপরাধের প্রশ্রয়দাতৃগণকে দীক্ষাদাতৃরূপে গ্রহণ করিবার অভিনয় দেখাইলে দেশিক ও তত্ত্বকোবিদ্‌গণের উদ্দিষ্ট 'দীক্ষা' বা 'দিব্যজ্ঞানলাভ' হয় না; পরন্তু নিরয়গমনের পথ প্রশস্ত করা হয়।

'অন্তঃশাক্ত, বহিঃশৈব, সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ'—এইরূপ অভিমানকারী এক শ্রেণীর ব্যক্তি হৃদয়ের অভ্যন্তরে 'শাক্ত' অর্থাৎ ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমান বা ভোগপরা জড়া প্রকৃতির উপাসকাভিমানে প্রমত্ত থাকিয়া 'বাহিরে' 'শৈব' অর্থাৎ মোক্ষকামী এবং 'সভা' অর্থাৎ জনসমাজে (অন্তরে অত্যন্ত ভোগী থাকিয়াও লোক-বঞ্চনার্থ) 'বৈষ্ণব' অর্থাৎ নিষ্কিঞ্চনের ছলনা প্রদর্শনরূপ বকবৃত্তি দ্বারা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য যে দীক্ষাদাতার চেষ্টার অভিনয় করেন, তাহা যে 'দীক্ষা' বা দিব্যজ্ঞান হইতে বহুদূরে তাহা বলাই বাহুল্য।

দীক্ষাগ্রহণ-সম্বন্ধে আর এক প্রকার মনোধর্ম্মীর ধারণা এই যে, যখন দীক্ষাদাতা গুরু লইয়া জগতে এত গোলমাল চলিয়াছে, তখন দীক্ষাদি গ্রহণ না করাই ভাল। শাস্ত্রপাঠ করিয়া নিজবুদ্ধিবলে শাস্ত্র হইতে উপদেশ-সংগ্রহ ও তদনুসারে জীবন-যাপন করিবার চেষ্টা করাই শ্রেয়ঃপন্থা। এইরূপ মনোধর্ম্মীর মতও অপর প্রকার প্রাকৃত জ্ঞানেরই পরিচায়ক। শাস্ত্র পাঠ করিবেন কে? যাহার 'দীক্ষা' বা দিব্যজ্ঞান লাভ হয় নাই, সে ব্যক্তি কখনও শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবেন না। এই জন্য শ্রুতিস্মৃতিপুরাণ সকলেই গুরুর নিকটে শাস্ত্র-শ্রবণের আদেশ করিয়াছেন। এই জন্যই শ্রীল স্বরূপগোস্বামী প্রভু পণ্ডিতাভিমানী বঙ্গদেশীয় বিপ্রকবিকে বৈষ্ণবের নিকট শ্রীভাগবত অধ্যয়নের উপদেশ দিয়াছেন। প্রাকৃত জ্ঞান লইয়া শাস্ত্র পড়িতে গেলে যে কিরূপ অসুবিধা হয়, তাহার চিত্র ব্যাসাবতার শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন,—

শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিতে যমপাশে ডুবি মরে।।

* * * *

ভাগবত পড়িয়াও কারো বুদ্ধিনাশ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু দেবানন্দ পণ্ডিতের চরিত্র দ্বারা ইহার যাথার্থ্য প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং 'দীক্ষা' বা দিব্যজ্ঞান-লাভ অর্থাৎ সদ্‌গুরুর নিকট প্রপত্তি-স্বীকার না করা পর্য্যন্ত শাস্ত্র পড়িয়াও লোকের ভগবদ্‌-বহির্ম্মুখতার পথেই ধাবিত হইবার সম্ভাবনা।

আবার কাহার মত এই যে, গুরুতে প্রপত্তি স্বীকার না করিয়া নিজের মনের খেয়াল অনুসারে ভাল-মন্দ বিচার পূর্ব্বক সেই পথে ধাবিত হইলে কোনও ঝঞ্ঝাটে পড়িতে হইবে না। আনুগত্য স্বীকার করিতে হইলেই নিজের ভগবদ্বহির্ম্মুখতারূপ মনোধর্ম্ম বা ভোগবৃত্তির স্বেচ্ছাচারিতা পরিপূর্ণ মাত্রায় চরিতার্থ করা যায় না। এই সকল ব্যক্তির জন্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'কল্যাণকল্পতরু' গ্রন্থে মনঃশিক্ষাচ্ছলে একটী উপদেশ দিয়াছেন,—

মন! তোরে বলি এ বারতা।
অপক্ক বয়সে হায়, বঞ্চিত বঞ্চক পায়,
বিকাইলে নিজ স্বতন্ত্রতা।।

সম্প্রদায়ে দোষবুদ্ধি, জানি তুমি আত্মশুদ্ধি,
করিবারে হৈলে সাবধান।
না নিলে তিলক-মালা, ত্যজিলে দীক্ষার জ্বালা
নিজে কৈলে নবীন বিধান।।
পূর্ব্বমতে তালি দিয়া, নিজ মত প্রচারিয়া,
নিজে অবতার বুদ্ধি ধরি'।
ব্রতাচার না মানিলে, পূর্ব্বপথ জলে দিলে,
মহাজনে ভ্রমদৃষ্টি করি'।।
ফোটা দীক্ষা মালা ধরি', ধূর্ত্ত করে সুচাতুরী,
তাই তাহে তোমার বিরাগ।
মহাজন-পথে দোষ, দেখিয়া তোমার রোষ,
পথ প্রতি ছাড় অনুরাগ।।
এখন দেখহ ভাই, স্বর্ণ ছাড়ি' লৈলে ছাই,
ইহকাল পরকাল যায়।
কপট বলিল সবে, ভকতি না পেলে কবে,
দেহান্তে বা কি হবে উপায়।।

আর এক প্রকার মনোধর্ম্মিসম্প্রদায়ের মত এই যে,—"যখন একমাত্র নাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারাই সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হয়, এমন কি নাম-সংকীর্ত্তন 'দীক্ষা পুরশ্চর্য্যাবিধি অপেক্ষা না করে', তখন দীক্ষাদাতা-গুরু-স্বীকার এবং দীক্ষাগুরুর আদেশ প্রতিপালন, গুরুসেবা, গুর্ব্বানুগত্য প্রভৃতি ভার অযথা মাথায় গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা কি? 'স্বাধীনভাবে 'হরিনাম' করিতে থাকিব, যেখানে খুশী সেখানে বেড়াইব, কাহারও ধার ধারিব না'—এরূপ স্বতন্ত্রতা পাইতে কে পরাধীনতা স্বীকার করে?"—এইরূপ বিচার ভোগবুদ্ধি বা ভগবদ্বহির্ম্মুখতা হইতেই উদিত হয়। এইরূপ বিচারকারিগণের মুখে কখনও শ্রীনাম উদিত হন না। ইহারা সাধুগুরুর চরণে অপরাধী। ইহারা নামাপরাধী। এরূপ মনোধর্ম্মোত্থ ভোগবাদ আচার্য্যগণ খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ৬।২।৯-১০ শ্লোকের সারার্থদর্শিনীতে বলিয়াছেন যে,—"হরিই—ভজনীয়, ভক্তি তাঁহার প্রাপক, শ্রীগুরুই—ভজনোপদেষ্টা, গুরুপদিষ্ট ভক্তগণই পূর্ব্বকালে শ্রীহরিকে পাইয়াছেন'—এইরূপ বিবেকবিশিষ্ট হইয়াও 'শ্রীকৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র দীক্ষা অন্য সৎকার্য্য কিম্বা মন্ত্রপুরশ্চরণ প্রভৃতির কিছুমাত্র অপেক্ষা করেন না এবং রসনা স্পর্শমাত্রেই ফলদান করেন'—এই প্রমাণদর্শনে অজামিলাদির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আমার দীক্ষা-গুরুকরণরূপ শ্রমের আবশ্যকতা কি, কেবল কীর্ত্তনাদির দ্বারাই আমার ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে

পারে,—এইরূপ যে ব্যক্তি মনে করেন, সে ব্যক্তি গুর্ব্ববজ্ঞা লক্ষণময় মহা-অপরাধহেতু ভগবানকে কোন দিনই প্রাপ্ত হন না।" শ্রীল জীব গোস্বামিপাদও সন্দর্ভে লিখিয়াছেন যে, স্বভাবতঃ দেহাদি-সম্বন্ধ দ্বারা কদর্য্য-চরিত্র বিক্ষিপ্ত-চিত্ত অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণের অনর্থ সঙ্কোচ-করণার্থ শ্রীনারদাদি ঋষিবর্গ অর্চ্চনমার্গে দীক্ষাগ্রহণ-মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। অনর্থযুক্ত ব্যক্তি সেই শাস্ত্র-শাসন উল্লঙ্ঘন করিলে তাহাদিগের শাস্ত্রাবজ্ঞারূপ দোষ বা নামাপরাধ হইয়া থাকে। সুতরাং সেইরূপ নামাপরাধি ব্যক্তি 'নামাক্ষর' গ্রহণ করিলেও কোন দিন মঙ্গল লাভ করিতে পারে না। তাহাদিগের দিব্যজ্ঞানপ্রদাতা সদ্‌গুরুচরণে প্রপত্তি স্বীকার ব্যতীত মঙ্গল লাভের দ্বিতীয় পন্থা নাই।

আর এক প্রকার মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায়ের ধারণা এই যে, দীক্ষার বাহ্য-অনুষ্ঠান-কার্য্যটী হইলেই দীক্ষা পরিসমাপ্তি হইল। প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। জীব সদ্‌গুরুচরণ হইতে মন্ত্র প্রাপ্ত হইবার মুহূর্ত্ত হইতেই দিব্যজ্ঞান লাভের পথের পথিক হন। প্রবেশিকা-পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র মহাবিদ্যালয়ের Roll Book-এ Registry নাম করিবার অধিকার পাইয়াই যদি মনে করেন, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছি, তাহা হইলে তাঁহার ভাবী উন্নতির পথ রুদ্ধ হওয়া ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না। প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রকে মহা-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া উক্ত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ তাহাকে উন্নত শিক্ষা লাভের অধিকার দেন মাত্র। সেই অধিকার লাভ করিয়া পাঠার্থীকে পরিশ্রম সহকারে নিয়মিতভাবে অধ্যয়ন করিতে হইবে অর্থাৎ জীব শ্রীগুরুদেবের নিকট উপনীত হওয়ার পরে হইতে বিশ্রম্ভের সহিত গুরুসেবা, সদ্ধর্ম্মশিক্ষাপৃচ্ছা, সাধুমার্গানুগমন ও সর্ব্বতোভাবে গুরুতে প্রপত্তিসাধন এবং সাধন নিষ্ঠার দ্বারা গুরুপ্রসন্নতা লাভপূর্ব্বক ক্রমে অনর্থনিবৃত্তি তৎপরে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তিরূপ সাধন ভক্তির ভূমিকা অতিক্রম করিয়া সাধ্য ভাবভক্তি ওতৎপরিপক্কাবস্থা প্রেমভক্তি লাভ করিবেন। সেই পরম প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেমা লাভ করিবার সৌভাগ্য হইলেই তাহার মন্ত্রসিদ্ধি বা পূর্ণদীক্ষা লাভ ঘটিবে।

আর একপ্রকার মনোধর্ম্মী, গুর্ব্বপরাধী, কপট ও বাস্তবসত্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস-রহিত নাস্তিক সম্প্রদায় বলেন যে,—"আমরা যাহা ইচ্ছা হয় তাহা করিব, যেরূপ খুশী সেরূপ চলিব, ভোগবৃত্তিকে প্রগ্রহ-রহিত উদ্দাম অশ্বের ন্যায় যথেচ্ছভাবে ছাড়িয়া দিব, যদি গুরু বা সাধুর শক্তি থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা (আমরা যথেচ্ছ বিহার করিতে থাকিলেও) সেই শক্তিবলে যাদুবিদ্যা বা mesmerism দ্বারা লোকের চিত্তবৃত্তি পরিবর্ত্তন করিবার ন্যায় আমাদিগকে কুপথ হইতে ফিরাইয়া আনিবেন। আমরা কিন্তু গুরুর কোন কথা শুনিব না, আমাদের যথেচ্ছ পথে চলিতেই থাকিব।" এইরূপ প্রাকৃত-জ্ঞানান্ধ-সম্প্রদায় গুরুকে তাহাদের ভোগের বস্তু জ্ঞান করিয়া এই সকল প্রলাপোক্তি করিয়া থাকে। ইহারা প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাহীন। ইহারা 'সমিৎপাণি' হইতে পারিবে না; সুতরাং কিরূপে 'দীক্ষা' বা 'দিব্যজ্ঞান লাভ' করিবে? ইহাদিগের ধারণা—'আমাদিগের ভোগবৃত্তি চরিতার্থ করার সময় আমরা পরম স্বতন্ত্র থাকিব, কিন্তু ভগবানের উপাসনার বেলায় যিনি আমাদিগকে স্বতন্ত্রতাহীন জড়বস্তুরূপে পরিণত করিতে না পারিবেন, সেই ব্যক্তির কোন শক্তিই নাই!' ইহাদিগের কর্ণে কখনও অপ্রাকৃত জ্ঞানের কোন কথা প্রবেশ করে নাই। পরম-স্বতন্ত্র বিভুচৈতন্য

ভগবান্ কখনও অণুসম্বিৎ জীবের স্বতন্ত্রতায় হস্তক্ষেপ করেন না, ইহাই তাঁহার পরম করুণার পরিচয়। আধিকারিকদেবতাগণও এরূপ স্বতন্ত্রতা-মহারত্ন লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া মনুষ্যকুলে আবির্ভূত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। প্রাকৃতরাজ্য হইতেও উহার একটী আংশিক দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতে পারে। যেমন রাজতন্ত্র অপেক্ষা প্রজাতন্ত্রশাসনের প্রচলন আবার প্রজাতন্ত্র-মধ্যে প্রজাদিগের স্বায়ত্তশাসনের ভার অর্পণ রাজার প্রজাবর্গের প্রতি উত্তরোত্তর অধিক করুণার পরিচয়, তদ্রূপ জীববিশেষের প্রতি (অর্থাৎ মনুষ্যের প্রতি) ভগবানের স্বতন্ত্রতা-মহারত্ন দান যে ভগবানের অসীম ও অযাচিত করুণার পরিচায়ক, তাহাতে আর সন্দেহ কি? জীব যদি স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করে, তজ্জন্য ভগবানকে দোষারোপ করা যাইতে পারে না।

বিভুসম্বিৎ ও অণুসম্বিতে এই সাদৃশ্য (উভয়ের মধ্যে স্বতন্ত্রতা) আছে বলিয়াই পরস্পরের মধ্যে নিত্য সম্বন্ধ সুষ্ঠুরূপে স্থাপিত হইতে পারে এবং তজ্জন্যই বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রসের উৎপত্তি হইয়া থাকে। জীবের প্রতি স্বতন্ত্রতা প্রদত্ত না হইলে জীব জড়বৎ চেতনধর্ম্মরহিত হইয়া জড় হইতে নিজের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করিতে সমর্থ হইত না। এই দিব্যজ্ঞানের কথা অদীক্ষিত বা অপদীক্ষিত সম্প্রদায় বুঝিতে পারে না।

অদীক্ষিত নাস্তিক ব্যক্তিগণের উপরি-উক্ত বিচার গ্রহণ করিলে বলিতে হয়, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু তাঁহার স্বতন্ত্র গৌরবিমুখ পুত্রপরিচয়াকাঙ্ক্ষিগণকে এবং তাঁহার শিষ্যাভিমানী কতিপয় ব্যক্তিকে শক্তির অভাব-নিবন্ধনই ভগবদ্বহির্ম্মুখতা হইতে বা শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু আচার্য্যলীলায় তাঁহার শিষ্যাভিমানী স্বতন্ত্র ব্যক্তিগণকে শক্তির অভাব বশতঃই মায়ার কবল হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই। সর্ব্বশক্তিমত্তত্ত্ব মহাবিষ্ণু শ্রীঅদ্বৈতে বা ক্ষীরোদশায়ী ভগবান্ শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুতে শক্তির অভাব ছিল বা আছে—এরূপ বিচার নাস্তিকতা ও অপরাধ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্ তথাপি জীবের স্বতন্ত্রতারূপ মহারত্ন—যাহা তিনি প্রদান করিয়াছেন, তাহা তাঁহার একটী মহাদান, ইহা জানাইবার জন্য সামর্থ্য সত্ত্বেও তাঁহার নিজ নিয়ম তিনি নিজেই ভঙ্গ করিতে ইচ্ছা করেন না।

আর এক প্রকার মনোধর্ম্মী বিপ্রলিপ্সাপর সম্প্রদায়ের মত এই যে,—"দীক্ষিত ও অদীক্ষিত, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, বৈকুণ্ঠপথের যাত্রী ও কর্ম্মমার্গে বা নিরয়মার্গের যাত্রীকে সমপর্য্যায়ে গণনা করা হইবে", যেহেতু বহির্ম্মুখ কর্ম্মজড় অজ্ঞানান্ধ অদীক্ষিত বহু ব্যক্তিগণের সমষ্টি দ্বারা অদৈব সমাজ সংগঠিত হইয়াছে। ঐ সকল সামাজিকগণ অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া যে সকল ভ্রমপূর্ণ মত প্রকাশ করিবে, দিব্যজ্ঞানপথের যাত্রী সেই সকল মতেরই অনুসরণ করিবেন!"—এই সকল অজ্ঞানান্ধ জীব বা এই সকল অজ্ঞানতাপূর্ণ মতের সমর্থনকারী ব্যক্তিগণ নিজেরা অদীক্ষিত অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান লাভ করে নাই, তাই তাহারা দীক্ষিত ব্যক্তিকেও তৎসমশীল ধারণা করিয়া দীক্ষা লাভের পূর্ব্বপরিচয়ে পরিচিত ও নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য ব্যস্ত। কিন্তু বেদান্ত-ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত ও বৃদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য স্বামিচরণ প্রামাণিকপ্রবর দেবর্ষি নারদের বাক্য উদ্ধার করিয়া লক্ষণ দ্বারা বর্ণ-নির্দ্দেশের প্রণালীই সুষ্ঠু বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। শ্রুতি, স্মৃতি, পঞ্চরাত্র তথা আচার্য্যগণও তাহাই

একবাক্যে সমর্থন করিয়াছেন। মহাভারতীয় অনুশাসনপর্ব্ব ''শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ'' বাক্যে শূদ্রও পাঞ্চরাত্রিক বিধান-অনুসারে দ্বিজত্ব সংস্কার লাভ করেন, এই কথা বলিয়াছেন। শ্রীনারদপঞ্চরাত্র ''বিনীতানথপুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ'' প্রভৃতি বাক্যে দীক্ষিত ব্যক্তির উপনয়ন সংস্কারের বিধান প্রদান করিয়াছেন। আচার্য্য শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ দিগ্‌দর্শিনী টীকায় দীক্ষিত নরমাত্রেরই বিপ্রতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা তিনি আবার শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের ২য় খণ্ডের ৪র্থ অধ্যায়ের ৩৭ সংখ্যায় ''দীক্ষালক্ষণধারিণঃ'' বাক্যে টীকায় অতি স্পষ্ট-ভাবে বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন যে, দীক্ষার লক্ষণ—যজ্ঞোপবীত, তুলসীমালা-মুদ্রাদিধারণ। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সম্মানিত শিষ্টাগ্রগণ্য শ্রীরামানুজের প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ে অদ্যাপি এই প্রথা প্রচলিত আছে। 'সংস্কারসন্দর্ভ' নামক আর একটী প্রবন্ধে সংস্কারের বিষয় বিশেষভাবে বর্ণন করা হইবে বলিয়া এস্থলে আর অধিক লেখা হইল না। যাঁহারা 'দীক্ষিত' বলিয়া থাকেন, তাহারাই দীক্ষালক্ষণ উপনয়ন সংস্কারাদির বিরোধী। যেমন প্রাকৃত বিচারপরায়ণ একশ্রেণীর ব্যক্তির মধ্যে দীক্ষাগ্রহণের পর তুলসীমালামুদ্রাদি গ্রহণের প্রতি বীতশ্রদ্ধা পরিলক্ষিত হয় এবং ঐ সকল ব্যক্তি কপটতা করিয়া বলিয়া থাকেন—'অন্তরে মালাতিলক থাকিলেই হইল, বাহিরে নিজের অভিমান বাড়াইবার জন্য ঐ সকল গ্রহণের আবশ্যকতা কি?' কিন্তু তাঁহাদের হৃদয়ের রুদ্ধ কপাট খুলিয়া দেখিলে বেশ জানা যায় যে, তাঁহাদের ঐরূপ চাতুর্য্যপূর্ণ বাক্য-প্রয়োগের অন্তর্নিহিত কারণ আছে। তাহারা বহির্ম্মুখসমাজ ও লোকভয়ে এতদূর ভীত যে পাছে ঐরূপ মালাতিলক ধারণ করিলে বহির্ম্মুখ লোকে তাঁহাদিগকে অসভ্য বা নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তি মনে করেন, এই ভয়ে স্ব স্ব প্রাকৃত অভিমান সংরক্ষণের জন্য ঐরূপ কপটতা অবলম্বন করিয়াছেন! তদ্রূপ যাঁহারা বলিয়া থাকেন, দীক্ষার দ্বারা 'দ্বিজত্ব' বা বিপ্রত্ব সিদ্ধ হইল স্বীকার করিলাম, বাহিরে দীক্ষা-লক্ষণ উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করিয়া বৃথা অভিমান বৃদ্ধির আবশ্যকতা কি? এই সকল কপট ব্যক্তিরও হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইলে জানা যায় যে, এই সকল লোক নিজ অপস্বার্থে এতদূর অন্ধ এবং বহির্ম্মুখলোকভয়ে এতদূর ভীত যে, শাস্ত্রোক্ত বিধানকে কোন প্রকারে বাক্‌চাতুরী দ্বারা বাধা প্রদান না করিতে পারিলে তাঁহাদিগের বনিগ্‌বৃত্তি ও বঞ্চনাবৃত্তি সংরক্ষিত হওয়া দুষ্কর হইয়া পড়ে। এইরূপ অপস্বার্থপ্রণোদিত হইয়াই দীক্ষাদাতার অভিনয়কারী প্রাকৃত-সাহজিকগণ দীক্ষিত ও অদীক্ষিতকে সমপর্য্যায়ে গণনারূপ অপরাধ হৃদয়ে পোষণ ও বিবিধ ভাবে তাহার প্রশ্রয় প্রদান করিয়া দেশিক ও তত্ত্বকোবিদগণের কথিত দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান লাভে বঞ্চিত হয় ও অপরকে বঞ্চনা করে। ইহাদের নিজের পাপ ক্ষয় হয় নাই, লোকদেখান পতিতপাবন গুরু সাজিবার অভিনয় করিলেও স্বয়ং (সমাজে) পতিত হইবার ভয়ে ভীত এবং বস্তুতঃ পাপে মগ্ন থাকিয়া অপরের পাপরাশি বা পাপমূল অবিদ্যা ক্ষয় করিতে অসমর্থ। যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে 'দীক্ষা' বা দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের এই সকল কথা প্রণিধান সহকারে পুনঃ পুনঃ বিচার করা আবশ্যক। দীক্ষা-সম্বন্ধে এই সকল বিচার প্রদর্শন করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সুখ কি?

দেখিতে পাওয়া যায় যে, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি সভ্য, কি অসভ্য, কি মূর্খ, কি পণ্ডিত, কি গৃহী, কি ত্যাগী, কি ভোগী, কি যোগী এবং কি মানব, কি পশ্বাদি—সকলেই সুখপ্রাপ্তির আশায় বদ্ধ-পরিকর। যদি কেহ সুষ্ঠুভাবে অনুসন্ধানে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহার হৃদয়ের অন্তঃস্থলের সুখাশাই তাঁহাকে যাবতীয় কার্য্যে প্রণোদিত করিতেছে। সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক ও নিখিল জীবের চিত্তাকর্ষক-রূপ পরম কমনীয় ও সুমহান্ সুখনামক সম্রাটের প্রকৃত স্বরূপ কি, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

অনেক সময় শিশুগণ নিদ্রাভঙ্গের পর অকস্মাৎ প্রবল বেগে ক্রন্দন আরম্ভ করে এবং ক্রন্দন-কালে সান্ত্বনা করিবার জন্য উহাদিগকে অভিভাবকগণ যে সমুদয় বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহা উহারা শুনিতে চাহে না বরং ক্রমশঃ পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত বেগে চীৎকার করিতে থাকে। বয়ঃপ্রাপ্ত মানবগণের মধ্যে বিচারশক্তির অভাবে সুখের প্রকৃতস্বরূপ কি ও কি প্রকার সাধন আশ্রয় করিলে সুখের সাক্ষাৎকার লাভ ঘটে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিবার প্রয়োজনীয়তা যাঁহারা স্বতঃ বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, এবং কেহ বুঝাইয়াবার চেষ্টা করিলেও মনোযোগপূর্ব্বক হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য প্রস্তুত হন না, তাঁহারা নিতান্ত ভাগ্যহীন ও পূর্ব্বোক্ত ক্রন্দনশীল শিশুগণের ন্যায় অত্যন্ত মূঢ়। কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যেন সুখের প্রকৃত স্বরূপ-নির্ণয়ে ও তাহার যথোচিত সাধনে বিরত না থাকেন, ইহাই প্রবন্ধ-লেখকের সানুনয় প্রার্থনা। শাস্ত্র বলিতেছেন, যথা—

১। "রম্য-চিদ্ঘন-সুখ-স্বরূপিণে"।

২। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ না বিভেতি কুতশ্চন"।

৩। "আনন্দাৎ খল্বিমানি-ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, তৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ব্রহ্ম তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব।"

৪। "রসো বৈ সঃ"

৫। "রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ।"

৬। " কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশে আনন্দো ন স্যাৎ।"

৭। "আনন্দয়াচ্চ।"

৮। "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।"

৯। "হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।"

১০। "পরমার্থরসঃ কৃষ্ণঃ।"

১১। "চিদ্বিশেষ-সমাশ্রিতা কৃষ্ণরসাব্ধিমাপ্নুয়াৎ।"

১২। ‘‘অন্বেষয়ন্তি শাস্ত্রেষু শুদ্ধং কৃষ্ণাশ্রিতং রসম্।’’

১৩। ‘‘সচ্চিদানন্দ-স্বরূপঃ সর্ব্বসিদ্ধি-নিষেবিতঃ।’’

১৪। ‘‘আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ’’।

ইত্যাদি প্রকার শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত-মূলক প্রবচন-সমূহ হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে,—‘‘শ্রীভগবানই একমাত্র সুখের স্বরূপ ও আলয়।’’

অন্ধকার গৃহে যখন দ্বীপ জ্বলিতে থাকে, তখন আমরা দেখিতে পাই যে, প্রদীপ-শিখা গৃহের চতুর্দ্দিকে আলোক বিকীর্ণ করিয়াও নিজ শিখাস্থ আলোকরাশিকে যথাস্থানে অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করে। এই দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে, প্রকাশশীল আলোকের ‘ব্যাপকতা’ নাম্নী একটি গুণ বা শক্তি আছে, যাহার দ্বারা সে একস্থানে অক্ষুণ্ণ বা অবিকৃতভাবে বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও চতুষ্পার্শ্বস্থ পদার্থরাজিকে নিজ প্রভা-দ্বারা ব্যাপিয়া তাহাদিগকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। আলোকে যেরূপ ‘ব্যাপকতা’ নাম্নী একটি শক্তি অবস্থিত, সুখ-স্বরূপ-ভগবত্তত্ত্বেও তদ্রূপ ‘ব্যাপকতা’ নাম্নী একটী মহতী শক্তি অন্তর্নিহিতা আছে, যাহার প্রভাবে তিনি নিজ স্বরূপকে পূর্ণ সচ্চিদানন্দঘন-তত্ত্বরূপে সংরক্ষণপূর্ব্বক তদিতর প্রত্যেক জীবে নিজ সুখ-রূপের আভাস বা জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতে সমর্থ হন এবং সেই আভাসের পরিচয় দেখাইয়া নিখিল জীবকে নিজ ঘনানন্দময় স্বরূপের প্রতি আকর্ষণ করিয়া থাকেন, তাই শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, যথা—

১। ‘‘এষ হ্যেবানন্দয়তি’’।

২। ‘‘আত্মারামগণাকর্ষী’’।

৩। ‘‘ত্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলী-কল-কূজিতঃ’’।

৪। ‘রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ।’’

আলোকের প্রকাশ-গুণ যেরূপ অন্ধকারে লক্ষিত হয় না এবং অন্ধকারের আবরণ গুণ যেরূপ আলোকে দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ সুখরূপ পদার্থের চিত্তবিনোদকারী গুণ, তদিতর তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে পারে না। এই জন্য শাস্ত্রে অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—‘‘যো বৈ ভূমা তৎ সুখং। নাল্পে সুখ মস্তি।’’ অর্থাৎ সেই সুবৃহৎ ব্রহ্ম বা ভগবত্তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া সুখময় জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হয়; তদিতর পদার্থসমূহ অতি ক্ষুদ্র ও তদাশ্রয়ে সুখ লাভের আশা নাই, বরং দুঃখই পুনঃপুনঃ আস্বাদিত হইয়া থাকে। অতএব সুখান্বেষী ব্যক্তিমাত্রেরই উচিত, সুখ লাভার্থে হৃদয়ে অনুভূত সুখ কিরণের সাহায্যে তাহার উৎস-রূপ সুখ-সূর্য্যের আলোচনায় নিযুক্ত থাকা। যাঁহারা সুখ সূর্য্যের চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক নশ্বর ও ক্ষুদ্র ধন-জনাদির চিন্তায় নিমগ্ন এবং তত্তৎ পদার্থ দ্বারা সুখ-লাভের আশা পোষণ করেন, তাঁহারা বৃথাই শস্য লাভার্থ তুষরাশিকে আঘাত করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর মনুষ্যকে কখনও ‘বুদ্ধিমান্’ বলা যাইতে পারে না এবং দুর্ভাগ্যই যে তাঁহাদিগের বুদ্ধিকে দূষিত করিয়াছে, তাহা সুধীগণ মুক্তকণ্ঠে পুনঃপুনঃ ঘোষণা করিয়া থাকেন।

সুখের স্মৃতি অস্ফুট আকারে হৃদয়ে জাগিবামাত্র দুর্ভাগ্যবশতঃ যাঁহাদিগের চিত্ত শুদ্ধভাবে উহার উৎসাভিমুখে ধাবিত হইতে বাধা প্রাপ্ত হয়, তাঁহারা রজ্জুতে সর্প দর্শনের ন্যায় বিবর্ত্ত-বুদ্ধির সাহায্যে উহাকে পূর্ব্বদৃষ্ট অন্য কোন নশ্বর বাহ্য পদার্থের সংসর্গজনিত ফলবিশেষের আংশিক বিকাশ বলিয়া বুঝিতে বাধ্য হন ও তৎফলে পুনরায় সেইরূপ পদার্থদ্বারা উহাকে সুস্পষ্টরূপে আস্বাদন করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া থাকেন। বাহ্যপদার্থের স্মৃতি জাগিবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগের লক্ষ্য সুখাভাবে সুখের অস্ফুট স্মৃতির অভিমুখে ধাবিত হইতে থাকে; কিন্তু বিবর্ত্ত-বুদ্ধির সাহায্যে বাহ্য বিষয়ে স্মৃতি জাগিবার পরবর্ত্তিকালে ঐ লক্ষ্য বাহ্য বিষয়ের অভিমুখে মুখ্যভাবে ধাবিত হইতে আরম্ভ করায় উহা সুখ-স্মৃতির দিকে গৌণভাবে অবস্থান করিতে বাধ্য হয়। অতঃপর যখন বিষয়ের চিন্তা তন্ময়ীভাব ধারণ করে, তৎকালে লক্ষ্য সুখ-স্মৃতির প্রতি গৌণ-ভাবটুকুও বিসর্জ্জন দিয়া থাকে। সূর্য্যাস্তের পর যেমন ঘোর অন্ধকাররাশি দিক্‌সমূহকে ছাইয়া ফেলে, সুখ-স্মৃতির প্রতি গৌণভাবে অবস্থিত লক্ষ্যটুকুর অপগমেও সেইরূপ সুখের বিপরীত যে নিদারুণ দুঃখ, তাহা লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবের হৃদয়-দেশকে অধিকার করে। এই সুখ-স্মরণাত্মক পথের বিপরীত দুঃখ-আবাহনকারী যে বাহ্য বিষয়ের চিন্তা-রূপ পথ, তাহাকে শাস্ত্রকারগণ 'ভাবনাবর্ত্ম' নামে অভিহিত করিয়াছেন। যাঁহারা ভাবনা বর্ত্মকে অতিক্রম করিতে সমর্থ, কেবল তাঁহারাই সুখের বিশুদ্ধ স্বরূপ অনুভব করিতে ও অনুভব-জনিত বিমল রস-আস্বাদনে সমর্থ, যথা শাস্ত্রবাক্য—

"ব্যতীত্য ভাবনবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভুঃ।
হৃদি-সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বাদতে স রসো মতঃ।।"

সুবর্ণে তাম্র-'খাদ' মিশাইয়া 'গিনি'-নামক স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত হয়। 'গিনি' প্রস্তুত হইলে সুবর্ণের সহ তাম্র-অংশ এরূপ ওতঃপ্রোতভাবে মিশ্রিত থাকে যে, আমাদিগের চক্ষু ঐ তাম্র-অংশকে লক্ষ্য করিতে সমর্থ হয় না ও সমগ্র 'গিনি'কে সুবর্ণের প্রকার-ভেদ বলিয়া দর্শন করিতে বাধ্য হয়। এই দৃষ্টান্তের ইঙ্গিত লইয়া বিচারশীল হইলে বুঝা যায় যে, অজ্ঞ ও বিষয়াসক্ত ব্যক্তির ধারণায় বৈষয়িক সুখ আকারে যে বস্তু অনুভূত হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে বাহ্য বিষয় ও সুখ-জ্যোতির সংমিশ্রিত ভাবদ্যোতক। রাসায়ন-ক্রিয়া যোগে 'গিনি' হইতে তাম্রাংশকে বহিষ্কৃত করিলে সুবর্ণকে যেরূপ পুনরায় বিশুদ্ধাকারে দর্শন করিতে পারা যায়, বহির্ম্মুখ জনগণ যদি নিজ নিজ চিত্ত-দর্পণ হইতে সুখেতর বাহ্য নশ্বর পদার্থের চিন্তারাশিকে দূরীভূত করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে তাঁহারাও সুখ-বস্তুকে তদ্রূপ বিশুদ্ধচিদ্‌ঘনানন্দময় ভগবত্তত্ত্বরূপে অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন।

সূর্য্যের আলোক চন্দ্রে পতিত হওয়ায় আমরা চন্দ্রকে আলোকময় দেখিতে পাই! যদিও আমাদিগের চক্ষু ঐ আলোককে স্বতন্ত্র চন্দ্রালোকরূপেই দর্শন করে, তথাপি বিজ্ঞানবিদ্‌গণের গবেষণা জানাইয়া দেয় যে, উহা সূর্য্যেরই আলোক, স্বতন্ত্র চন্দ্রালোক নহে। বাহ্য-বিষয়ের চিন্তাকালে মানব-চিত্ত যে যে পদার্থের চিন্তায় নিমগ্ন হয়, তাহাতেই কথঞ্চিৎ তন্ময়তা লাভ করে। চিত্ত কোন বিষয়ে তন্ময় হইলে অন্যান্য বিষয়ের চিন্তাকে স্তব্ধ রাখে। অন্যান্য বহুতর বিষয়ের চিন্তা যে কালে স্তব্ধীভূত থাকে, সে সময় চিত্ত কথঞ্চিৎ শান্তভাব

ধারণ করে ও তদ্ধেতু তাহা নিরুপদ্রবে ধ্যেয় বস্তুকে ধারণা করিতে সমর্থ হয়। তরঙ্গরাশির কথঞ্চিৎ বিরাম কালে জলাশয়ে যেরূপ চন্দ্রের প্রতিবিম্ব সুস্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়, চিত্তের কথঞ্চিৎ শান্ত ভূমিকায় সুখময় ভগবত্তত্ত্বের তদ্রূপ ঈষৎ আভাস অনুভূতির গোচর হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সুখময় ভগবত্তত্ত্ব হইতেই সুখের 'ঝলক' হৃদ্দেশে অনুভূত হয়, কিন্তু সুখ দিলেন সুখময় ভগবান্, ইহার পরিবর্ত্তে সূর্য্যালোককে চন্দ্রালোকের প্রতীতির ন্যায় অজ্ঞ মানবগণ মনে করেন যে, সুখ দিল বাহ্য বিষয় এবং সেইজন্য তাঁহারা বাহ্য বিষয়ে আসক্ত হইয়া পড়েন। শুষ্ক অস্থি-চর্ব্বণকারী সারমেয় যেরূপ কঠিন অস্থিদ্বারা ক্ষত-বিক্ষত স্বীয় মুখ-নিঃসৃত রক্তকে অস্থিগত রুধির বলিয়া মনে করে ও নিজ মুখ-নির্গত রক্তপানার্থ পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবল উদ্যমের সহিত ঐ শুষ্ক অস্থিকে পুনঃ পুনঃ চর্ব্বণ করিতে থাকে, অজ্ঞ-মানবগণের সুখাস্বাদনের যত্নও ঠিক সেইরূপ। মানবগণের বুদ্ধিতে ত্রিবিধ গতি লক্ষ্য করা যায়, যথা— (১) ভোগপরা বা বিষয়াভিমুখিনী, (২) ত্যাগপরা বা ব্যতিরেকমুখিনী ও (৩) সেবাপরা বা ভগবদভিমুখিনী। ভোগপর-বুদ্ধির উদয়কালে মনুষ্যগণ নিজাতিরিক্ত পদার্থ সমূহকে ভোগ্য ও আপনাদিগকে ভোক্তৃভাবে অবগত হন এবং তন্নিবন্ধন বাহ্য পদার্থে সুখান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে রজ্জুতে সর্প দর্শনের ন্যায় ভোগীদিগের বুদ্ধি বিবর্ত্তিত হওয়ায়, তাহারা সুখের উৎস কোথায় তাহা বুঝিতে অসমর্থ। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ভোগপর-বুদ্ধিই উক্ত বিবর্ত্তের জনক এবং সত্য-জ্ঞানের বাধক।

ভোগপর পন্থায় অজস্র দুঃখ উপস্থিত হয় দেখিয়া যে সমুদয় মনুষ্য ভোগপর-বুদ্ধিকে সঙ্কুচিত করিবার উদ্দেশ্যে ত্যাগপর ব্রত অবলম্বন করেন ও ত্যাগদ্বারে দুঃখের উচ্ছিত্তিরূপ শাশ্বত শান্তিকে উপভোগ করিবার জন্য উদ্গ্রীব হন, তাঁহারা 'জ্ঞানী' নামে অভিহিত ও ত্যাগপর-বুদ্ধিবিশিষ্ট। এই প্রকার ত্যাগনিষ্ঠ জ্ঞানিগণ শান্তিকে একপ্রকার বাহ্য বিশেষ-ধর্ম্মরহিত সুখমাত্রাত্মক সর্ব্বব্যাপী তত্ত্ব বলিয়া বুঝেন ও সর্ব্বদা তাঁহারই ধ্যানে নিযুক্ত থাকিবার জন্য যত্নশীল হন। শাস্ত্রে জ্ঞানিগণের লক্ষিত সুখকে 'ব্রহ্মানন্দ' নামে বর্ণন করা হইয়াছে।

মানবগণের মধ্যে যাঁহারা এই ব্রহ্মানন্দকে ভগবানের অঙ্গজ্যোতিঃ বলিয়া আম্নায়-পারম্পর্য্য-ক্রমে অবগত হইবার ভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা 'ভক্ত' নামে অভিহিত। বিক্ষিপ্ত কিরণ অপেক্ষা যেরূপ কিরণরাশির আশ্রয় (প্রতিষ্ঠা) ঘনীভূত তেজোবিগ্রহ সূর্য্য কোটী গুণ সমুজ্জ্বল, তদ্রূপ কিরণ-স্থানীয় ব্রহ্ম হইতে চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের পরমাশ্রয় চিদ্‌ঘনবিগ্রহ ভগবান্‌ও পরিপূর্ণ রসময়। সুদৃঢ় পর্ব্বতোপরি বিরাজিত ক্ষুদ দেবালয়ের শ্রীমূর্ত্তি নিকটস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত যেমন একটি ক্ষুদ্রবর্ণের সমাবেশমাত্র-রূপে দৃষ্ট হয়, সেবা-বুদ্ধির সাহায্যে সেব্য চিদ্‌ঘন শ্রীভগবন্মূর্ত্তির দর্শন-লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত ত্যাগপর-বুদ্ধির প্রেরণা হইতে পরতত্ত্বকেও সেইরূপ নিরাকার ধ্যেয় ব্রহ্মজ্যোতিঃ বা সুখ-মাত্রাত্মক তত্ত্বরূপে অনুভব করিতে হয়।

ভোগী ও ত্যাগী উভয়ে স্ব-সুখকামী। ভক্তই কেবল শ্রীভগবানের সুখে সুখী ও সেইজন্য নিষ্কাম। পিতা নিজে না খাইয়া পুত্রকে খাওয়াইলে যেরূপ আপনাকে সুখী বোধ করেন, ভক্তও সেইরূপ নিজ-সুখে জলাঞ্জলি

দিয়া ভগবৎ তৃপ্তিতে আপনাকে তৃপ্ত মনে করিয়া থাকেন। ভগবদ্ভক্তের হৃদয় শুদ্ধ অর্থাৎ কামনার পূতি গন্ধশূন্য।এবম্বিধ শুদ্ধ হৃদয় ব্যতীত সুখঘন-মূর্ত্তি শ্রীভগবানের দর্শন ও সেবানন্দ সুখ আস্বাদনের উপায়ান্তর নাই। স্ব-সুখপরতার লেশমাত্র থাকিতে সেবা-বুদ্ধির উদয় সম্ভবপর নহে। আনন্দঘনমূর্ত্তি শ্রীভগবান্ নিজ আনন্দের আভাস দ্বারা জীবসমূহকে সেবানন্দ-রস আস্বাদন করাইবার জন্য প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করিতেছেন। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য—ত্যাগ বা ভোগপর-বুদ্ধিরূপ মলরাশিকে হৃদয় হইতে সরাইয়া নির্ম্মল হৃদয়ে শুদ্ধাকারে দর্শন যোগ্য উক্ত আকর্ষণ রজ্জুকে অবলম্বনপূর্ব্বক ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত হইয়া জীবনকে ধন্য করা।

রূপ-দর্শন

'রূপ-দর্শন' সম্বন্ধে মনোধর্ম্মি-সমাজে নানাপ্রকার শুদ্ধ ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বিরোধিনী ধারণা ও কল্পনা-বাহুল্য দৃষ্ট হয়। কেহ বা ভেল্কি বা ভোজবাজী-দর্শনকেই 'রূপ-দর্শন', কেহ বা অত্যন্ত কল্পনা বা দুশ্চিন্তার প্রতিচ্ছবি-দর্শনকেই 'রূপ-দর্শন', কেহ বা ভূতপ্রেত-জাতীয় ছায়া-দর্শনকেই 'রূপ-দর্শন', কেহ বা স্বপ্নাভ্যন্তরে মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের কোন অঙ্কিত চিত্রের 'প্রতিবিম্ব-দর্শনকে'ই 'রূপ-দর্শন' বলিয়া ভ্রমে পতিত হন ও অপরকে ভ্রমে পাতিত করেন। এই সকল দর্শন ইন্দ্রিয়-তর্পণেরই প্রকারভেদ মাত্র।

অনেক সময় আমরা মনোধর্ম্মে চালিত হইয়া আত্মেন্দ্রিয়তর্পণকেই ভগবৎ-কৃপা মনে করিয়া বঞ্চিত হইয়া থাকি। সেই সময় মনোধর্ম্মের কুবুদ্ধি আমাদিগকে মহানুভবগণের অকৃত্রিম-সেবা চেষ্টা ও ক্রিয়া-মুদ্রাকে অনুকরণ করিবার পরামর্শ প্রদান করিয়া 'আনুসরণিক' শ্রৌতপন্থী করিবার পরিবর্ত্তে আমাদিগকে 'আনুকরণিক' 'অশ্রৌত-পন্থী' বা 'আরোহবাদি-প্রাকৃত-সহজিয়া' করিয়া ফেলে। এইরূপ আরোহবাদী 'প্রাকৃত-সহজিয়া' হইয়া আমরা অপ্রাকৃত ভগবদ্রূপকে প্রাকৃত চক্ষের দ্বারা কিংবা প্রাকৃত মনের দ্বারা দর্শন ও অনুভব করিবার ধৃষ্টতা দেখাইয়া থাকি। আমরা আমাদের মনোধর্ম্মের উচ্ছ্বাস কতপ্রকার সঙ্গীত, কবিতা, বাক্য প্রভৃতিতে ব্যক্ত করিয়া আমাদের সমশীল অর্থাৎ জগতের অন্যান্য মনোধর্ম্মি-ব্যক্তিগণের সহৃদয়তা প্রাপ্ত হইয়া থাকি। আমরা কুদর্শন লইয়া সুদর্শন-ধৃক্‌কে দর্শন করিতে চাই, 'কুরূপ' লইয়া 'সুরূপ' দেখিতে চাই। ভগবান্ আমাদিগের রূপ দেখিয়া কি প্রকারে সন্তুষ্ট হইবেন, তজ্জন্য কোনও যত্ন না করিয়া অর্থাৎ আমাদের স্বাভাবিক সেবাময় সুরূপ যাহা অধুনা বাহ্য মলিনতা দ্বারা আবৃত রহিয়াছে, তাহাকে মলিনতা-বিবর্জ্জিত শুদ্ধ, কৃষ্ণের নেত্রোৎসবের যোগ্য করিবার যত্ন না করিয়া যে আমাদিগের রূপদর্শনের স্পৃহা, তাহা প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্রূপ-দর্শন-লালসা নহে, পরন্তু কৈতবাবৃতা; দৈবীমায়ার ছলনায় মুগ্ধ হইয়া মায়িক রূপদর্শনেচ্ছারই প্রকারভেদ বা কৃষ্ণকে ভোগ করিবার ইচ্ছা মাত্র। কবে কৃষ্ণ আমার রূপ দর্শন করিবেন অর্থাৎ কৃষ্ণ আমার অপ্রাকৃত স্বরূপের ভোক্তা হইবেন—এইরূপ বিচারের পরিবর্ত্তে আমি 'কুরূপ' অর্থাৎ স্বরূপবিস্মৃত থাকিয়া, 'অধোক্ষজ-কৃষ্ণরূপ'কে ভোগের বস্তুর অন্যতম মনে করিয়া, তাহা দ্বারা আমার

চক্ষুরিন্দ্রিয়ের উৎসব সম্পন্ন করিব—এইরূপ বুদ্ধি অভক্ত প্রাকৃত সহজিয়ার বুদ্ধি। অধোক্ষজ কৃষ্ণ কখনও আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণের সামগ্রী হইতে পারেন না। আমি সেইরূপ বুদ্ধি লইয়া যে 'রূপ দর্শন করি বা করিয়াছি' প্রভৃতি বুদ্ধি পোষণ করি, তাহা কেবল আমার প্রতি আবরণী বা বিক্ষেপাত্মিকা মায়ার ছলনা মাত্র।

অনেক মনোধর্ম্মিব্যক্তির ধারণা যে, যদিও ভগবান্ স্বরূপে অপ্রাকৃত-রূপ-বিশিষ্ট, তথাপি তিনি প্রাকৃত জীবের ন্যায় প্রাকৃতরূপ গ্রহণ করিয়া প্রাকৃত জীবের প্রাকৃত চক্ষুর গোচরীভূত হন। এইরূপ চিন্তাস্রোত হইতে কোন কোন কবিতা ও গান শ্রুত হইয়া থাকে—

মায়াতীত জ্ঞানাতীত তোমা ব'লে থাকে।
তবে কি এ ক্ষুদ্রজীব পাবে না তোমাকে?

* * * *

মায়া মিশাইয়া এস প্রভু ভগবান্ ।
দুটা কথা কহি তবে জুড়াইব প্রাণ।
জ্ঞানাতীত মায়াতীত হয়ে বসে রবে।
কিরূপেতে গৌর-বোলা তোমা লাগ পাবে?

এইরূপ চিন্তা-প্রণালী কৃষ্ণে অপরাধী নির্ব্বিশেষ-বাদীর বিচার-উদ্ভূতা। এইরূপ বিচার বেদান্ত ও বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য—শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারের বিরুদ্ধে নাস্তিকতাময় বিচারমাত্র; পরন্তু এই সকল বিচার প্রচ্ছন্ন-নাস্তিক ও মনোধর্ম্মি সমাজে বড়ই সমাদর লাভ করিয়া থাকে।

মায়াধীশ ভগবান্ কখনও 'মায়া মিশাইয়া' জগতে অবতীর্ণ বা জীবের নেত্র-গোচর হন না। তুরীয় কৃষ্ণের কথা ত' দূরে থাকুক, তাঁহার অংশাংশ কলা বিকলা পুরুষত্রয়—যাঁহাদের জগদাদি সৃষ্টিকার্য্য লইয়া ব্যবহার, তাঁহাদেরও মায়াস্পর্শ নাই, বিষ্ণুতত্ত্বের কথা দূরে থাকুক, বৈষ্ণবেরও মায়াস্পর্শ নাই। বৈষ্ণব বা শ্রীগুরুদেব কখনও 'মায়া মিশাইয়া' জগতে আগমন করেন না—ইহাই ভাগবতীয় সিদ্ধান্ত—

কারণাব্ধি-গর্ভোদক-ক্ষীরোদকশায়ী।
মায়াদ্বারে সৃষ্টি করে তাতে সব মায়ী।।

* * * *

যদ্যপি তিনের মায়া লইয়া ব্যবহার।
তথাপি তৎস্পর্শ নাই সবে মায়া পার।। (চৈঃ চঃ আ ২।৪৯, ৫৪)

মায়ী = মায়ার অধীশ্বর

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া।। (ভাঃ ১।১১।৩৩)

শ্রীস্বরূপ-রূপের অনুগত না হইলে কখনও ভগবদ্রূপ দর্শন হয় না। যাঁহারা স্বরূপ-রূপের অনুগত নহে, তাঁহারাই আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া অধোক্ষজ শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত রূপ সম্বন্ধে নানাপ্রকার কু-সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। আমরা পূর্ব্ববঙ্গদেশীয় বিপ্রের উদাহরণে তাহার সাক্ষ্য পাই।

নির্ব্বিশেষবাদিগণ বলেন, "যেহেতু শ্রুত্যাদিতে ব্রহ্মাকে নাম-রূপ-রহিত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার নিত্য মূর্ত্তি নাই। তিনি স্বরূপে নির্ব্বিশেষ নিরাকার; মায়া-সংযোগে সাধকের কল্পনানুয়ায়ী রূপ গ্রহণ করিয়া সাধক জীবকে সেই কল্পিত রূপ প্রদর্শন করেন।" শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু ভাগবতামৃতে নির্ব্বিশেষবাদিগণের এই অসন্মত নিরবকাশা শ্রুতির প্রমাণ দ্বারা নিরাস করিয়াছেন; যথা শ্রীবাসুদেব অধ্যাত্মে—

অপ্রসিদ্ধেস্তদ্গুণানাম অনামাসৌ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অপ্রাকৃতত্বাদ্ রূপস্যাপ্যরূপোঽসাবুদীর্য্যতে।।

অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে বা সাকল্যরূপে ভগবানের গুণ কেহ বলিতে না পারায় তিনি 'অনামা' এবং তাঁহার রূপের অপ্রাকৃতত্ব হেতু ভগবান্ 'অরূপ' বলিয়া কীর্ত্তিত হন।

শ্রীল রূপের অনুগত শ্রীল জীবপ্রভুচরণ সন্দর্ভে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, বদ্ধজীবের স্বরূপ ও রূপ, দেহী ও দেহ যেরূপ পরস্পর ভিন্ন বস্তু, শ্রীবিষ্ণু বা বিষ্ণুজনে সেইরূপ ভেদ নাই। ঈশ্বর বস্তুতে দেহ-দেহী ভেদ নাই—ইহাই সাত্বত-শাস্ত্র তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। বদ্ধজীবের বিগ্রহ কিছু বদ্ধজীবের স্বরূপ নহে, কিন্তু কৃষ্ণের বিগ্রহই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ; কেবল—'রাহুর-শির' প্রভৃতি কথনের ন্যায় 'কৃষ্ণের বিগ্রহ' প্রভৃতি বাক্য বলা হয় মাত্র। আমরা বাহুল্য ভয়ে এই স্থানে এই প্রসঙ্গ আর বিস্তার না করিয়া উদ্দিষ্ট বিষয়ের অনুসরণ করিব। এতদ্বিষয়ে আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমন্মধ্বমুনি ও গোস্বামিপাদগণ বিশেষ বিচার করিয়াছেন।

শ্রীল সনাতনগোস্বামী প্রভু বৃহদ্ভাগবতামৃতে বলিয়াছেন,—

সর্ব্বেষাং সাধনানাং তৎ সাক্ষাৎকারো হি সৎফলম্।
তদৈবামূলতো মায়া নশ্যেৎ প্রেমাপি বর্দ্ধতে।।

দিগ্দর্শিনী—হি যস্মাত্তস্য প্রভোঃ সাক্ষাৎকার এব সদুৎকৃষ্টং ফলং তদেব সাক্ষাৎকারে সত্যেব আমূলতঃ মূলং ভগবদ্বিস্মৃতিস্তৎপর্য্যন্তং মায়া নশ্যেৎ। তদুক্তং প্রথমস্কন্ধে—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে" ইতি। যেহেতু ভগবৎ সাক্ষাৎকারই সমস্ত সাধনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল, তাঁহার সাক্ষাৎকার হইলেই আমূল অর্থাৎ ভগবৎবিস্মৃতি পর্য্যন্ত মায়া বিনষ্ট হয়। প্রথম স্কন্ধেও বর্ণিত আছে যে, 'আত্মার আত্মা শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার হইলেই ভগবত্তত্ত্ববেত্তার হৃদয়-গ্রন্থি ও অসম্ভাবনাদিরূপ সন্দেহ-রজ্জুসকল ছিন্ন হয় এবং অনারব্ধ ফলসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।' ভগবদ্দর্শনফলে সমূলে মায়া বিনষ্ট হইলে ভগবদ্বিষয়ক প্রেমা বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

উপরি-উক্ত বাক্য হইতে প্রমাণিত হয় যে, রূপ-দর্শনের ফল আমূল ভগবদ্বিস্মৃতি পর্য্যন্ত মায়া বিনাশ অর্থাৎ মনোধর্ম্মরূপ হৃদয়-গ্রন্থি ও ভগবানের অচিন্ত্যত্ব বিষয়ে যাবতীয় সন্দেহ অপনোদন এবং অনর্থ নির্ম্মুক্ত হইয়া উত্তরোত্তর ভগবৎ সেবানিষ্ঠা ও সেবামাধুর্য্য-উপলব্ধি। ভগবদ্রূপ দর্শন করিবার পর জড়রূপ-মুগ্ধতা থাকিতে পারে না। যাহার জড়রূপ মোহ রহিয়াছে, অথচ 'আমার ভগবদ্রূপ দর্শন হয়'—এইরূপ বাক্য সেই ব্যক্তির মুখ হইতে শুনা যায়, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই ভগবদ্রূপ দর্শন করে নাই; পরন্তু প্রাকৃত সহজধর্ম্মে প্রমত্ত হওয়ায় তাহার বিবর্ত্তজ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে অর্থাৎ প্রাকৃতরূপকেই সে ভ্রমবশতঃ 'অপ্রাকৃত' মনে করিতেছে মাত্র।

অনেকের ধারণা যে, ভগবান্ বুঝি তাহাদের থানাবাড়ীর রাইয়ত, বাগানের মালী বা আরব্যোপন্যাসের কোন ভূতপ্রেতজাতীয় পাত্রবিশেষ যে, তিনি তাহাদের ইচ্ছানুসারে তাহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য তাঁহার অধোক্ষজ ত্রৈলোক্যসৌভগ-রূপ দর্শন করাইতে বাধ্য!

শ্রুত্যাদিশাস্ত্র এইরূপ ভোগময়ী ধারণার বিপক্ষেই কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রুতি বলেন, ''যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্'' অর্থাৎ বিষ্ণু-বস্তু প্রাকৃত দৃষ্টির মধ্যে আসেন না, প্রাকৃত চক্ষে ভগবদ্রূপের দর্শন হয় না। যিনি সেবোন্মুখ শুদ্ধচিত্তে ভগবান্‌কে বরণ করেন, ভগবান্ সেই শুদ্ধচিত্ত বা শুদ্ধ-সত্ত্বস্বরূপ বসুদেবে কৃপা করিয়া অবতীর্ণ হন, তখনই আমাদের স্বরূপ-দর্শন ও তৎ সঙ্গে সঙ্গে ভগবদ্রূপ দর্শন হয়। স্বরূপ-রূপানুগগণ এইরূপ শ্রৌতপন্থায়ই রূপদর্শন করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় চতুর্ভুজরূপ দর্শন করাইলে দেবকী শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, (ভাঃ ১০।৩।২৮)—

রূপঞ্চেদং পৌরুষং ধ্যানধিষ্ণ্যং মা প্রত্যক্ষং মাংস দৃশাং কৃষীষ্ঠাঃ।।

স্বামিটীকা—পৌরুষমৈশ্বরং ধ্যানধিষ্ণ্যং ধ্যানাস্পদং মাংস দৃশাং মাংসচক্ষুষাং প্রত্যক্ষং মা কৃথাঃ।

হে কৃষ্ণ! তোমার এই ঐশ্বর-রূপ ধ্যানাস্পদ, তাঁহাকে মাংস-চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের গোচর করিও না।

দেবকীর এই বাক্য হইতে জানা যায়, ভগবানের অতীন্দ্রিয় রূপ যাহারা জড়ের বস্তু বা মাংস, চর্ম্ম দর্শন করে, তাহাদের গোচরীভূত হয় না।

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু সেইজনই বলিয়াছেন—একমাত্র সেবোন্মুখ হৃষীকে (ইন্দ্রিয়েই) স্বয়ংপ্রকাশ হৃষীকেশের অপ্রাকৃত নাম-রূপ-গুণ-লীলা স্বয়ংই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতামৃতে শ্রীরূপপ্রভু মোক্ষধর্ম্মের বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

রূপীতি হেতোর্দৃশ্যেত যথৈব প্রাকৃতো জনঃ।
তথাসৌ দৃশ্যত ইতি ত্বয়া মা স্ম বিচার্য্যতাম্।।
ইত্যুক্ত্বা স্বস্য রূপিত্বেঽপ্যদৃশ্যত্বমুদীরিতম্।
ততো নিজস্বরূপস্যা প্রাকৃতত্বঞ্চ দর্শিতম্।।

তদ্দর্শনে ত্বকুণ্ঠাত্মা মমেচ্ছৈব চ কারণম্।
ইত্যাহেচ্ছন্ মুহূর্ত্তাদিত্যর্দ্ধপদ্যং স্বয়ং পুনঃ।
নশ্যেয়মিত্যদৃশ্যঃ স্যাং যতো নশিরদর্শনে।।

(লঘু ভাঃ ৪০৯, ৪১০, ৪১১)

মোক্ষধর্ম্মের বাক্যে উক্ত হইয়াছে যে, রূপী বলিয়া যেরূপ প্রাকৃত ব্যক্তির দৃষ্টিগোচর হয়, তদ্রূপ শ্রীভগবান্ও নয়নের বিষয় হইয়া থাকেন, এরূপ নিশ্চয় করিও না। এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া ভগবানের রূপবত্তা থাকিলেও স্বীয় অদৃশ্যত্ব জানাইয়াছেন এবং এতদ্দ্বারা নিজ স্বরূপের অপ্রাকৃতত্বও প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই রূপের দর্শন বা অদর্শনে আমার নিরঙ্কুশ ইচ্ছাই কারণ, এই অভিপ্রায়ে আবার স্বয়ং 'ইচ্ছন্ মুহূর্ত্তান্নশ্যেয়ং' এই পদ্যার্দ্ধ বলিয়াছেন। 'নশ্যেয়ং' শব্দে অদৃশ্য হইতে পারি; যেহেতু অদর্শনে 'নশ্' ধাতুর প্রয়োগ। সুতরাং ভগবানের নিরঙ্কুশ ইচ্ছাই ভগবন্মূর্ত্তি দর্শনের কারণ। যদি তিনি কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার 'অধোক্ষজ' অর্থাৎ 'অচাক্ষুষরূপ' কোন প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি-নেত্রের বিষয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলেই তাঁহার রূপদর্শন ঘটে; অন্যথা ভগবান্কে আমাদের বাগানের মালীর মত মনে করিয়া—'বাঁকা হ'য়ে দাঁড়াও এ'সে আমার হৃদয় মাঝে বা আমার নয়ন পানে' 'তোমার আস্তে যে হবে হে'—প্রভৃতি প্রলাপবাক্য বকিলেই স্বতন্ত্রেচ্ছ অধোক্ষজ ভগবান্ তাঁহাকে আমাদের ভোগোন্মুখনেত্রের বিষয়ীভূত করিবেন না। তাই শ্রীল রূপপাদ বলিয়াছেন,—

ততঃ স্বয়ংপ্রকাশত্বশক্ত্যা স্বেচ্ছাপ্রকাশয়া।
সোঽভিব্যক্তো ভবেৎ নেত্রে ন নেত্রবিষয়ত্বতঃ।।

যথা শ্রীনারায়ণাধ্যাত্মে—

"নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবান্ ঈক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ।
তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্"।। ইতি

পাদ্মে চ—

"সচ্চিদানন্দরূপত্বাৎ স্যাৎ কৃষ্ণোঽধোক্ষজোঽপ্যসৌ।
নিজশক্তেঃ প্রভাবেন স্বয়ং ভক্তান্ দর্শয়েৎ প্রভুঃ"।। ১৫০।। ইতি।

সেই ভগবান্ স্বেচ্ছায় প্রকাশমানা 'স্বয়ংপ্রকাশ-শক্তি' দ্বারা নেত্রে প্রকাশিত হইয়া থাকেন; কিন্তু চক্ষুর বিষয় বলিয়া চক্ষুতে অভিব্যক্ত হন না। শ্রীনারায়ণাধ্যাত্মে ইহার প্রমাণ দৃষ্ট হয়। শ্রীভগবান্ স্বভাবতঃ অব্যক্ত হইয়াও স্বরূপ-শক্তিদ্বারা দৃষ্টির বিষয় হইয়া থাকেন; সেই স্বরূপশক্তি ব্যতীত কেইবা অপরিমেয় প্রভু পরমেশ্বরকে দর্শনে করিতে সমর্থ হয়! পদ্মপুরাণেও উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ; সুতরাং অধোক্ষজ অর্থাৎ অচাক্ষুষ হইয়াও নিজশক্তিপ্রভাবে অর্থাৎ কৃপাপরবশ হইয়া ভক্তজনের সেবোন্মুখ-নেত্রে আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকেন।

ভগবানের স্বেচ্ছয়ৈক-প্রকাশত্ব সম্বন্ধে মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বের মোক্ষ-ধর্ম্মে একটী আখ্যায়িকা উদ্ধার করিয়া শ্রীল রূপপাদ মনোধর্ম্মি-রূপ-দর্শনাকাঙ্ক্ষিসমাজকে সতর্ক করিয়াছেন।

সত্যযুগে উপরিচরবসু নামে এক পরম বৈষ্ণব নৃপতি ছিলেন। তাঁহার কায়মনোবাক্য নিখিল অবস্থায় হরিসেবাতেই নিযুক্ত ছিল। তিনি বিষ্ণু ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে অন্য দেবতার উপাসনা করিতেন না। তিনি পঞ্চরাত্রশাস্ত্র অবলম্বনপূর্ব্বক বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া তৎ-শেষ-নির্ম্মাল্য দ্বারা পিতৃগণের পূজা করিতেন। রাজ্য, ধন, সম্পত্তি স্ত্রী ও যান-বাহন প্রভৃতি সমুদয় ভোগ্য বস্তু নারায়ণ-প্রসাদলব্ধ বলিয়া তিনি তাহাতেই সমর্পণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বতোভাবে বিষ্ণুসেবাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল; তিনি বিদ্ধাভক্তিকে কখনও আদর করিতেন না। পঞ্চরাত্রবিৎ শ্রোত্রীয় শুদ্ধভক্তগণ তাঁহার হরিসেবাময় গৃহে প্রীতি পূর্ব্বক আতিথ্য স্বীকার করিতেন। মহারাজ উপরিচর সুর-গুরু বৃহস্পতির নিকট হইতে সপ্তর্ষি-প্রণীত সমুদয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। একদা তিনি সাত্বত-স্মৃতি-বিধানানুসারে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা করিবার জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ নারায়ণ ঐ যজ্ঞানুষ্ঠান সময়ে সদা-সেবোন্মুখ উপরিচরের প্রতি প্রসন্ন হইয়া নভোমণ্ডল হইতে কেবল তাঁহাকেই আত্মরূপ প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বীয় যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন। ঐ সময় আর কেহই তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। বৃহস্পতি অলক্ষিতভাবে যজ্ঞভাগ গৃহীত হইতে দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় নারায়ণের ভাগ কল্পিত ও আকাশপথে মহাবেগে স্রুক্ (যজ্ঞপাত্রবিশেষ) উত্তোলন করিয়া তদ্দ্বারা আকাশকে আহত করিতে করিতে রোষভরে অশ্রু বিসর্জ্জনপূর্ব্বক ভাগবতবর উপরিচরকে কহিলেন,—এই যজ্ঞে দেবগণ প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহাদের প্রদত্ত যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিলেন, কিন্তু কি নিমিত্ত বিভু হরি এই যজ্ঞেও দর্শন প্রদান করিলেন না? অতঃপর সেই ভাগবতবর উপরিচর এবং সদস্যগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ সেই সুরাচার্য্যকে সর্ব্বতোভাবে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। 'হে বৃহস্পতে! আপনি যাঁহাকে যজ্ঞভাগ অর্পণ করিয়াছেন, তিনি ক্রোধশূন্য। আপনি বা আমরা তাঁহার রূপ-দর্শনে সমর্থ নহি; তিনি যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, তিনি তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেন, তদ্ভিন্ন আর কাহারও তাঁহাকে দর্শন করিবার ক্ষমতা নাই'—

"ন শক্যঃ স ত্বয়া দ্রষ্টুমস্মাভির্বা বৃহস্পতে!
যস্য প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টুমর্হতি।।"

অনন্তর একত, দ্বিত ও ত্রিত নামক ঋষিত্রয় বৃহস্পতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে সুর-গুরো! আমরা ব্রহ্মার মানসপুত্র। পূর্ব্বে আমরা সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সনাতন পুরুষ শ্রীবিষ্ণুর সাক্ষাৎকার লাভের আকাঙ্ক্ষায় ক্ষীরোদ সাগরের অদূরবর্ত্তী সুমেরুর উত্তরভাগস্থ রমণীয় প্রদেশে গমনপূর্ব্বক একপদে দণ্ডায়মান হইয়া কাষ্ঠের ন্যায় নিশ্চলভাবে সমাহিতচিত্তে সহস্রবৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াছিলাম। তপস্যানুষ্ঠান সমাপনের পর আমাদিগের অবভৃতস্নান সময়ে এই আকাশ-বাণী আমাদের কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইল,—'হে বিপ্রগণ! তোমরা ভগবান্ নারায়ণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাঁহার সাক্ষাৎকার-লাভের নিমিত্ত সুদুশ্চর তপস্যা করিয়াছ বটে, কিন্তু তাঁহার দর্শনলাভ তোমাদের পক্ষে নিতান্ত দুষ্কর, তোমরা শ্বেতদ্বীপে গমন করিতে

পারিলে কথঞ্চিৎ তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পার'। এইরূপ দৈববাণী শুনিয়া আমরা শ্বেতদ্বীপে উপনীত হইলাম, কিন্তু সেই স্থানে গমন করিবামাত্র আমাদের দৃষ্টি-পথ রুদ্ধ হইয়া গেল। তখন আমরা পরম-পুরুষের কথা দূরে থাকুক, তত্রত্য অন্যান্য পুরুষগণকেও দেখিতে পাইলাম না। মনে করিলাম, আমাদের বোধ হয় কঠোর তপোবলের অভাবে পুরুষোত্তমের দর্শন লাভ ঘটিতেছে না। পুনরায় সাত বৎসর ঘোরতর তপস্যা করিলাম। তপস্যান্তে পরম প্রভা সম্পন্ন অনুক্ষণ নাম-কীর্ত্তন-পর শ্বেতদ্বীপবাসী মহাত্মগণকে দেখিতে পাইলাম। আরও শুনিতে পাইলাম যে, তাঁহারা 'পুণ্ডরীকাক্ষ', 'হৃষীকেশ' প্রভৃতি বলিয়া ভগবান্‌কে আহ্বান করিতেছেন। তৎকালে সেই মহাত্মগণের বাক্য শ্রবণ করিয়াই আমাদের বোধ হইল যে, ভগবান্ নারায়ণ নিশ্চয়ই তথায় সমুপস্থিত হইয়াছেন, কিন্তু আমরা তাঁহার মায়াপ্রভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সন্দর্শন করিতে পারিলাম না। এই সময় একটী আকাশ-বাণী শ্রুত হইল যে, 'হে মুনিগণ! তোমরা এই যে শ্বেতদ্বীপস্থ পুরুষগণকে দর্শন করিলে, ইঁহারা প্রাকৃতেন্দ্রিয়-শূন্য; ইঁহারা ভগবান্ নারায়ণের রূপ-দর্শনে সমর্থ। তোমরা স্বস্থানে প্রস্থান কর, সেবোন্মুখ ব্যক্তি ব্যতীত অপর আর কেহই তাঁহার রূপ-দর্শনে সমর্থ হয় না'। হে সুরাচার্য্য! আমরা এতাদৃশ কঠোর তপস্যা ও হব্য-কব্য প্রদান করিয়াও যখন নারায়ণের রূপদর্শনে সমর্থ হই নাই, তখন তুমি কিরূপে তাঁহাকে সন্দর্শন করিবে?

উপরি-উক্ত মহাভারতীয় উপাখ্যান হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, নিজ-পৌরুষক্রমে বা স্বতন্ত্র ইচ্ছার বশে কোন অস্বতন্ত্র জীব স্বতন্ত্রেচ্ছ অধোক্ষজ শ্রীভগবানের রূপ দর্শন করিতে পারেন না। ভগবান্ কখনও মায়াবদ্ধ জীবের অবৈধ আব্‌দার রক্ষা করিবার জন্য 'মায়া মিশাইয়া' আসেন না; তাঁহার 'স্বয়ং-প্রকাশিকা' শক্তি যদি প্রেমাঞ্জন-চ্ছুরিত অপ্রাকৃত-লোচনের নিকট কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার অপ্রাকৃতরূপ প্রকট করেন, তবেই ভগবদ্রূপ দর্শন হয়, ইহাই নিখিল সাত্বতশাস্ত্র ও আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত।

শ্রীল সনাতনগোস্বামী প্রভু বৃহদ্ভাগবতামৃতে বলিয়াছেন,—'যদি কারুণ্যবিশেষ-শক্ত্যা ভক্তিপ্রভাবেণ বা দর্শনং স্যাদিতি ন ভবেৎ তদা কথঞ্চিদপি মনস্যপি ঈক্ষণং তস্য দর্শনং ন স্যাৎ ন সম্ভবেদিত্যর্থঃ কুতঃ স্বয়ং প্রভাবস্য স্বপ্রকাশস্য মনোবৃত্তীনামপ্যবিষয়ত্বাৎ। কিঞ্চ ঈশ্বরস্য পরমস্বতন্ত্রস্য সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাৎ।' তাৎপর্য্য এই যে, যদি বল ভগবৎকারুণ্যবিশেষ ও ভক্তিপ্রভাবই ভগবদ্দর্শনের কারণ হইতে পারে না, তবে বলিতেছি যে, তিনি যদি কৃপা না করেন বা আমরা যদি সেবোন্মুখ না হই, তবে তাঁহাকে কেহই মনের দ্বারাই হউক, বা ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই হউক, কোন উপায়েই দেখিতে পান না; কারণ তিনি স্বয়ংপ্রভ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ ও মনোবৃত্তির অ-বিষয় এবং পরম স্বতন্ত্র ও সর্ব্বনিয়ামক।

রূপং সত্যং খলু ভগবতঃ সচ্চিদানন্দসান্দ্রং
যোগ্যৈর্গ্রাহ্যং ভবতি করণৈঃ সচ্চিদানন্দরূপম্।
মাংসাক্ষিভ্যাং তদপি ঘটতে তস্য কারুণ্যশক্ত্যা
সদ্যো লব্ধা তদুচিতগতের্দর্শনং স্বেহয়া বা ।।

তদ্দর্শনে জ্ঞানদৃশৈব জায়মানেহপি পশ্যাম্যহমেষ দৃগ্‌ভ্যাম্।
মানো ভবেৎ কৃষ্ণ-কৃপা-প্রভাববিজ্ঞাপকো হর্ষ-বিশেষ-বৃদ্ধ্যৌ।।

(বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৭৫-১৭৬)

শ্রীভগবানের রূপ সচ্চিদানন্দঘন, ইহা সত্য, তথাপি সেই রূপ সেবোন্মুখ বা যোগ্য ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারাই গ্রাহ্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারাই অপ্রাকৃত রূপ গৃহীত হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের মহাকারুণ্য শক্তি কিংবা তাঁহার নিরঙ্কুশ ইচ্ছাপ্রভাবে অপ্রাকৃতরূপদর্শন-যোগ্য জ্ঞানশক্তি লাভ করিয়া মাংসনেত্র অর্থাৎ চর্ম্মচক্ষুর্দ্বারাই অপরিচ্ছিন্ন ভগবদ্রূপের সাক্ষাৎ সন্দর্শন সংঘটিত হইয়া থাকে। জ্ঞান-চক্ষুর্দ্বারা ভগবদ্দর্শন হইলেও দ্রষ্টা বিবেচনা করে যে, আমি নেত্রযুগল দ্বারাই দর্শন করিতেছি,' তখন হৃদয়ে হর্ষবিশেষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ 'সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তির অগোচরীভূত অপ্রাকৃত রূপ আমি এই নেত্রের দ্বারাই দেখিতে পাইলাম', এইরূপ অভিমানে ভগবানের কারুণ্য-বিশেষ উপলব্ধিতে আনন্দ হইলে কৃষ্ণকৃপার প্রভাব-বিজ্ঞাপক (অহো! পরমদুর্দর্শ এই রূপ সাক্ষাৎ ভাবে আমার দৃষ্টিগোচর হইল) এইরূপ জ্ঞান হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া থাকে।

শ্রীরূপানুগ শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু রূপ-দর্শনের ক্রম এইরূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—"প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যং শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপ-শ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি" অর্থাৎ অন্তঃকরণ-শুদ্ধির জন্য প্রথমতঃ নামশ্রবণ অপেক্ষণীয়, অতঃপর অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে রূপ শ্রবণদ্বারা তদুদয়-যোগ্যতা লাভ হয়। তাৎপর্য্য এই যে পৃথগ্‌ভাবে রূপদর্শন-চেষ্টা কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধিমূলা আরোহচেষ্টা মাত্র, তদ্দ্বারা আমাদের প্রকৃত রূপ-দর্শন হয় না। শ্রীনামেই-সর্ব্বসিদ্ধি হয়। শ্রীনামই আমাদিগকে রূপ-দর্শন করাইয়া থাকেন। কারণ শ্রীনামই রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরবৈশিষ্ট্যসমন্বিত অদ্বয়বস্তু। প্রথমতঃ সদ্গুরুর শ্রীমুখ হইতে নাম-শ্রবণ ও তদনুকীর্ত্তনদ্বারা আমাদের অন্তঃকরণ-শুদ্ধি বা অনর্থনিবৃত্তি হয়। নিবৃত্তানর্থ পুরুষ সেই শুদ্ধচিত্তে রূপ-শ্রবণ করিয়া থাকেন। শ্রৌতপন্থায় কর্ণাঞ্জলিদ্বারা শ্রীরূপের সেবা করিতে করিতে শ্রীরূপ বিশুদ্ধচিত্তরূপ বসুদেবে প্রকটিত হইয়া থাকেন, তখনই আমাদের প্রেমাঞ্জন-চ্ছুরিত-ভক্তিনেত্রে রূপদর্শন হয়। রূপদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্যেরও স্ফুরণ হইয়া থাকে; অর্থাৎ রূপ-দর্শন-ফলে আমাদিগকে ক্রমে মায়াবাদীর ধারণার ন্যায় সম্প্রজ্ঞাত বা সবিকল্প হইতে অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্ব্বিকল্প নির্ব্বিশেষ অবস্থায় আরোহণ করাইবার পরিবর্ত্তে শ্রীরূপ আমাদিগকে সবিশেষ চিদ্বিলাস রাজ্যের নবনবায়মান সৌন্দর্য্য-কদম্ব-মাধুরী প্রদর্শন করাইয়া থাকেন। পরম কৃপাময় শ্রীনাম-চিন্তামণিই আমাদিগকে নামীর নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্য সন্দর্শনের যোগ্যতা প্রদান করেন। সুতরাং সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তির স্বতন্ত্রভাবে রূপদর্শনের প্রয়াস-রূপ আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-পরা চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সেবোন্মুখ হইয়া শ্রীনাম-প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য।

দর্শনে ভ্রান্তি

অনাদি-বহির্ম্মুখ বিরূপগ্রস্ত জীবের 'অপব্যবহার' একটী স্বাভাবিক ধর্ম্ম বা নিসর্গ। স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ফলে জীবের কৃষ্ণ-বিমুখতা; সুতরাং জীব স্বরূপে অবস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই তাহার বিরূপের স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না।

জগতে আমরা প্রত্যেক বস্তু বা প্রত্যেক কার্য্যের 'সদ্ব্যবহার' ও 'অপব্যবহার' লক্ষ্য করিয়া থাকি। সামান্য দুই একটী উদাহরণ দিলেই এ বিষয়টী উপলব্ধি হইবে। বৈদ্যুতিক শক্তির সদ্ব্যবহার দ্বারা জগতে কত প্রকার প্রয়োজনীয় কার্য্য অতি সুচারুরূপে, অতি অল্প সময়ে, অতি অল্পব্যয়ে, অতি অল্প আয়াসে সাধিত হইয়া মানব সমাজের মহদুপকার সাধন করিতেছে, এ বিষয় কাহারও অবিদিত নাই। আবার সেই বৈদ্যুতিক-শক্তির অপব্যবহার-ফলে কত বহুমূল্য জীবন, কত সুসমৃদ্ধনগর, জনপদ, সুরম্যপ্রাসাদ মুহূর্ত্তে ভস্মসাৎ হইতেছে। অস্ত্রের সদ্ব্যবহার-ফলে মানব জীবনের কৃত প্রয়োজনীয় কার্য্যসমূহ সাধিত হয়, আর তাহার অপব্যবহার ফলে জগতে কতই না উৎপাত উপস্থিত হয়।

স্বাতি-নক্ষত্রের জল যখন সমুদ্রগর্ভে পতিত হয়, তখন তাহাতে বহুমূল্য মুক্তা উৎপন্ন হইয়া থাকে; সেই মুক্তা শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহের গলদেশে মালিকাস্বরূপে এবং রাজন্যবর্গের রাজমুকুটোপরি বর্ত্তমান থাকিয়া পরম শোভা বিস্তার করে। আর সেই স্বাতি-নক্ষত্রের জলই যখন সর্পের উপরে পতিত হয়, তখন তাহাতে সর্পের বিষ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, সেই বিষধর সর্প হইতে সকলে ভীত এবং সেই সর্পের দংশনে জীবন সংশয়াপন্ন হয়। গঙ্গাতীরে নিম্ব, কপিত্থ, আম্র ও কদলী বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ পাদপরাজি সকলেই এক গঙ্গার জল পান করিলেও ফলপ্রদান-কালে নিম্ব ও কপিত্থ তিক্ত এবং কষায় ফল প্রদান করে, আর আম্র ও কদলী সুমধুর ফলই প্রদান করিয়া থাকে। অতএব গ্রহণকারীর যোগ্যতানুসারে এবং একই বস্তুর সদ্ব্যবহার বা অপব্যবহারফলে সৎ ও অসৎ ফললাভ ঘটে।

এই পরম সত্য এবং অতি সহজ ও সরল কথাটী অনেকেই বিস্মৃত হইয়া যান, তৎফলে তাঁহারা সাধু, শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে দোষারোপ করিতে প্রবৃত্ত হন। কাহারও ধারণা যখন সাধু বা গুরুর নিকট আগমনের অভিনয় বা শাস্ত্রপাঠের অভিনয় প্রদর্শন করিয়া কোন ব্যক্তি বিশেষ বিপথগামী হইয়াছেন, তখন 'সাধু' ও 'গুরু'—ইঁহারাই তজ্জন্য দোষী। অবশ্য সাধু-গুরুর অভিনয়কারী ব্যক্তি বা কুবর্ত্মবৎ কল্পিত শাস্ত্রের আশ্রয়কারীর বিপথগমন স্বাভাবিক। সেইরূপ ব্যক্তি আদৌ পথই পায় নাই, বিপথেই রহিয়াছে। বিপথে পতিত ব্যক্তির তদপেক্ষা অধিকতর তমোরাজ্যে প্রবেশ স্বাভাবিক। অভিনয়কারী বা অনুকরণকারী কখনও অনুসরণকারী বা আনুগত্য-ধর্ম্ম-যাজনকারী নহেন, ইহা সুবুদ্ধিমানগণ জানেন। ভগবান্ সর্ব্বজীবকেই স্বতন্ত্রতারত্ন প্রদান করিয়াছেন, কোনও ব্যক্তিবিশেষ যদি স্বতন্ত্রতার অপব্যহার করিয়া ভগবদ্‌বিমুখ ও অসদাচারী হইয়া পড়ে, তজ্জন্য ভগবান্‌কে দোষারোপ করা যাইতে পারে না বা তজ্জন্য 'আর কাহারও ভগবানের উপাসনা করা উচিত নহে',—এইরূপ নাস্তিকোচিত বাক্যও বলা যাইতে পারে না; বরং যাহাতে

সর্ব্বতোভাবে ভগবানে শরণাগত হইয়া স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার অর্থাৎ ভগবচ্চরণ-সেবায় অনুরক্ত হওয়া যায়, তদ্বিষয়েই সুবুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ দৃঢ়সঙ্কল্প করেন। যাঁহারা ভক্তিরাজ্যের একান্তপথিক হইয়াছেন, তাঁহারা নিয়তই দেখিতে পান যে, যে কার্য্যে অ-সুরগণ বিমোহিত হন, সেইকার্য্যে সুরগণের অর্থাৎ ভক্তগণের ভগবন্নিষ্ঠা দৃঢ় হয়। সুরগণ ভক্তিরাজ্যের বিপাক বা বিঘ্নকে ভগবদনুকম্পারূপে জানিয়া কায়মনোবাক্যে ভগবানে আরও অধিকতরভাবে আসক্ত হন, আর অসুরগণ বিপাক সমূহ দর্শন করিবার পূর্ব্বেই—'দূর ছাই! এমন ভগবান্‌কেও আবার লোকে ভজনা করে, যে-ভগবান তাহার আশ্রিতবর্গকে বিপথ হইতে রক্ষা করিতে পারে না! এই ভগবান্ ভগবান্‌ই নহে'—এইরূপ বলিয়া তাহারা নিজেরাই নরকের পথে গমন করে এবং তাহাদের সমশীল অপর ব্যক্তিগণকেও সেই পথের পথিক করিতে প্রবৃত্ত হয়। সুরগণ কিন্তু মোহিত অসুরগণের 'হাতে তালি' বা 'টিট্‌কারী' শুনিয়া ভক্তিপথ বা আনুগত্য-ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হন না; পরন্তু আরও ঐকান্তিক-নিষ্ঠা-সহকারে ভগবানে প্রপন্ন হন।

শাস্ত্রপাঠেরও অনেক অপব্যবহার দৃষ্ট হয়। বেদপাঠের অপব্যবহার-ফলে চার্ব্বাক ব্রাহ্মণ বেদনিন্দক, নাস্তিক হইয়াছেন। শৌক্রবর্ণোচিত ব্রাহ্মণতার ফলে চার্ব্বাক-ব্রাহ্মণ বেদে অধিকারপ্রাপ্ত হইলেও কীট যেরূপ বহুমূল্য গ্রন্থরাশি নষ্ট করিবার জন্যই গ্রন্থ মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ। ব্রাহ্মণ চার্ব্বাকও বেদনিন্দা করিবার জন্যই বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কীট যেরূপ গ্রন্থের মর্ম্ম বা সার গ্রহণ করিতে পারে না, কেবল বাহ্যবস্তু গ্রহণ করিয়া মরণের পথে ধাবিত হয়, তদ্রূপ যাহারা শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট বিষয়ে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হইয়া অক্ষজ জ্ঞান-দ্বারা শাস্ত্রকে মাপিয়া লইতে চায়, তাহারাও কীটেরই ন্যায় অকিঞ্চিৎকর ও মৃত্যুপথের পথিক। শ্রীমদ্ভাগবত পড়িয়া সুবুদ্ধি বিশিষ্ট ব্যক্তি 'ভাগবত' হন, কিন্তু আবার কেহ ভাগবতের নিন্দকও হইয়া পড়ে—ভাগবতের কথা 'গাঁজাখুরে' গল্প মনে করেন। বেদ-পুরাণ-পঞ্চরাত্র পড়িয়া কেহ সর্ব্বত্র বিষ্ণু উপাসনারই সার্থকতা দেখিতে পান, সর্ব্বত্র বিষ্ণুর কীর্ত্তি গীত রহিয়াছে উপলব্ধি করেন, আবার কেহবা ঐ সকল পাঠ করিয়া বিষ্ণুবিরোধী নাস্তিক হইয়া পড়েন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার অধ্যাপন-লীলায় প্রতি ধাতু, প্রতি শব্দ, প্রতি বর্ণ, ব্যাকরণের প্রতি সূত্রে সর্ব্বত্র 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' দেখিয়াছেন, শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীহরি-নামামৃত ব্যাকরণে সর্ব্বত্র শ্রীহরিনামের প্রবৃত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু আবার কেহ কেহ ব্যাকরণ পড়িয়া 'নাস্তিক' হইয়া থাকেন।

'গৌড়ীয়' পাঠের সদ্ব্যবহার ফলে জীব 'গৌড়ীয়' অর্থাৎ গৌড়ীয়েশ্বর শ্রীস্বরূপরূপানুগ শুদ্ধ বৈষ্ণব হইতে পারেন, আবার 'গৌড়ীয়' পাঠের অপব্যবহার-ফলে অনেকে গৌড়ীয়ের বাহ্য আবরণ দেখিয়া 'গৌড়ীয়'কে একজন 'নিন্দক', 'সমালোচক', 'গোঁড়া' প্রভৃতি মনে করিতে পারেন। যাঁহারা অন্তরে প্রবিষ্ট না হইয়া—শব্দের পরম মুখ্যবৃত্তিকে সংগ্রহ করিতে চেষ্টা না করিয়া শব্দের বাহ্যাকৃতিমাত্র দর্শন করেন, তাঁহাদের এইরূপই দুর্ভাগ্যের উদয় হয়। এ বিষয়ে একটী আখ্যায়িকা শ্রুত হয়। একদা কোন গ্রামে একটী মহতী বিদ্বৎসভা হইয়াছিল, সেই সভায়বহু বৈষ্ণব-পণ্ডিত আগমন করিয়াছিলেন। বহু সঙ্গীতাচার্য্য হরিগুণ-সংকীর্ত্তন করিবার জন্য তথায় সমবেত হইয়াছিলেন। সেই সভার উদ্দিষ্ট ও আলোচ্য বিষয় ছিল—

শাস্ত্রালোচনামুখে জৈব জগতের আত্যন্তিক মঙ্গলের বিষয় আবিষ্কার করা। কতকগুলি ভিন্ন দেশীয় 'ভবঘুরে' লোক ভ্রমণ করিতে করিতে যে স্থানে সেই মহতী-সভা সমবেত হইয়াছিল, তন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। উহারা দূর হইতে মহতী সভায় সমবেত বহুলোকের কৃষ্ণ-কোলাহল ও বাদ্যভাণ্ডাদির শব্দ শ্রবণ করিয়া মনে করিল, বোধ হয় এই স্থানে ভীষণ কলহ ও পরস্পর যুদ্ধ হইতেছে। কৃষ্ণ-কোলাহলকে তাহারা 'কলহ' এবং বাদ্যাদির শব্দকে তাহারা 'যুদ্ধ-বাদ্যের ধ্বনি' বিবেচনা করিল। এইরূপ বিচার করিয়া তাহারা সর্ব্বত্র এই বলিয়া মিথ্যা-গুজব রটনা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে থাকিল,—'ওহে ভ্রাতৃগণ, সাবধান, তোমরা স্ত্রী পুত্র লইয়া বাস কর, সতর্ক হও! নিকটস্থ গ্রামে এক ভীষণ কলহ ও যুদ্ধ বাধিয়াছে; তোমাদিগের পুত্রসন্তান ও আত্মীয়-স্বজনগণকে বাড়ীর বাহির হইতে দিওনা, তাহারা যেন ভুলক্রমেও সেই পূর্ব্বদিকস্থ গ্রামে না যায়। সেখানে গেলে প্রাণ নাশ অবশ্যম্ভাবী। যাহারা ঐ সকল 'ভবঘুরে'র বাক্য শুনিয়া উহাকে 'সত্য বাক্য' বলিয়া বিশ্বাস করিল, তাহারা বৃথা ভয়ে অভিভূত থাকিয়া গৃহে আবদ্ধ হইয়া রহিল। তাহাদের পূর্ব্বদিক্‌স্থ গ্রামে গিয়া সেই স্থানে হরিকথা-কীর্ত্তন মহোৎসবাদিতে যোগদান করিবার ভাগ্য ঘটিল না, অপিচ হরিকথাকে 'কলহ' এবং জীবের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নির্ম্মৎসর পুরুষগণকে পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত এবং অপরের অনিষ্টকারী অনুমান করিয়া আত্ম-বঞ্চিত হইল। উপরিউক্ত ভবঘুরেগণ ত' সম্পূর্ণ-রূপে বঞ্চিত হইলই, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? এই আখ্যায়িকার পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণ আত্মবঞ্চক ও পর বঞ্চকের আদর্শ, আর তাহাদিগের কথাকে সত্যজ্ঞানকারিগণ আত্মবঞ্চক স্থানীয়।

যাহারা এইরূপ 'গৌড়ীয়ের' জীবমঙ্গলাকাঙ্ক্ষা—গৌড়ীয়ের মহান্ উদ্দেশ্য—মহাবদান্যতা—অমন্দোদয়া দয়া—পরস্পর বিবদমান-বাদ-প্রতিবাদ-সাম্য প্রয়াস—মহাচিৎসমন্বয়-চেষ্টা না বুঝিয়া তাঁহাকে 'বাদ-প্রতিবাদকারী' বা 'নিন্দক' মনে করেন, তাঁহারাও উপরিউক্ত ব্যক্তিগণের ন্যায় গৌড়ীয় মহোৎসবে বঞ্চিত।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য, শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি বিষ্ণুভক্তি-সংরক্ষক আচার্য্যগণ বিষ্ণুবিরোধী অদৈব-দলের নানাপ্রকার বিষ্ণুবিরোধিমতবাদকে নানাপ্রকার যুক্তি প্রমাণের দ্বারা খণ্ডিত-বিখণ্ডিত করিয়া জগতে বিষ্ণুভক্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন বলিয়া এবং নির্ব্বিশেষবাদিগণ তাঁহাদিগের অকাট্য যুক্তির নিকট পরাজিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহারা এখনও শ্রীরামানুজ-মধ্বকে 'প্রচ্ছন্ন-তার্কিক' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীজীবপ্রমুখ আচার্য্যগণ তাঁহাদিগকে 'ভক্তিসংরক্ষক আচার্য্য' বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন।

যাঁহারা ভক্তিরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারাই সেই স্থানের মহা ঐক্যতান-মাধুরী উপলব্ধি করিতে পারেন, আর যাঁহারা বাহিরে থাকিয়া বিচার করিতেছেন, তাঁহারা বঞ্চিতই হন মাত্র—। 'শ্রীগৌড়ীয়' শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সার্ব্বজনীন নিত্যধর্ম্মেরই বিবৃতি। যাঁহারা গৌড়ীয়ের হইয়া অর্থাৎ অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া গৌড়ীয়কে দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিবেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে,

গৌড়ীয়ের বাক্যে যে মহাচিৎসমন্বয় রহিয়াছে, তাহাতে পরমানন্দ-প্রকাশিনী যে পরিপূর্ণ-নির্ম্মলতা বিদ্যমান আছে, তাহাতে যেরূপ সুষ্ঠুভাবে যাবতীয় শাস্ত্রবিবাদ ও পরস্পর বিবদমান মতসমূহ চিরতরে প্রশমিত হইয়াছে, তাঁহার ভক্তিবিনোদন-ক্রিয়া সর্ব্বদা যেরূপ সমতা দান করিতেছে এবং অপ্রাকৃত রসোৎসাভিমুখে লইয়া যাইতেছে এবং অতি-বিস্তারিণী অমন্দোদয়দয়া বিতরণ করিতেছে, তাহা অন্যত্র অসম্ভব। অতএব আমরা সকলকে দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া কাকুবাদে বলিতেছি—গৌড়ীয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করুন্—গৌড়ীয়ের অন্তরঙ্গ হউন্। আপনারা সাধু বলিয়াই আপনাদের কাছে এই নিবেদন করিতে সাহসী হইতেছি।

ফাজিলামি কেন?

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-শাস্ত্র সকলই জগতে দ্বিবিধ সর্গের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চতুর্যুগেই 'আসুর' ও 'দৈব' দ্বিবিধ সৃষ্টি যুগপৎ পরিলক্ষিত হয়। আসুরগণের অপর নাম—দুর্জ্জন; দৈবগণের অপর নাম—সুজন। নির্ম্মৎসর-সুজনের প্রতি অসূয়া মৎসর-দুর্জ্জনের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি; আর দুর্জ্জনের মঙ্গলচিন্তা পরম-করুণাময় সুজনের স্বাভাবিকী বৃত্তি।

সত্যযুগে দুর্জ্জন-হিরণ্যকশিপু ও তৎসমশীল অসুরগণ সুজনবর শ্রীপ্রহ্লাদের প্রতি অসূয়া প্রদর্শন করিয়াছিল। প্রহ্লাদ কখনও দুর্জ্জনগণের ইষ্টচিন্তা ব্যতীত অনিষ্টচিন্তা করেন নাই, তথাপি দুর্জ্জনগণ তাহাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশে "গায়ে পড়িয়া" সুজন-প্রহ্লাদের প্রতি নানাভাবে বিদ্বেষ না করিয়া থাকিতে পারে না। ত্রেতাযুগে দুর্জ্জন রাবণ শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি, দ্বাপরে দুর্জ্জন কংস-জরাসন্ধ শিশুপাল-দন্তবক্রাদি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নানাপ্রকার অসূয়া প্রদর্শনার্থ ভগবদিচ্ছায়ই আবির্ভূত হইয়াছিল। নতুবা যে ভগবানের ইচ্ছামাত্র সমস্ত বিশ্ব মুহূর্ত্তে প্রলয়-জলধি জলে নিমজ্জিত হইতে পারে, যাঁহার একটিমাত্র ভ্রূভঙ্গি বিস্তারে ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতাগণও ভয়ে কম্পিত হন, সেই ভগবান্ কিরূপেই বা ব্রহ্মাদি-সৃষ্ট ও ব্রহ্মারুদ্রাদি হইতে প্রাপ্ত বর অসুরগণকে তাঁহার সহিত বিদ্বেষ বা যুদ্ধাদি করিবার অবসর প্রদান করেন? অতএব শ্রীভগবান্ ঐরূপ লীলা-বিস্তার দ্বারা আমাদিগকে শিক্ষা দেন যে, দুর্জ্জন চিরকালই সুজনের হিংসা করিয়া থাকে। আরও একটী শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, দুর্জ্জনগণ আপাত দৃষ্টিতে সুজনগণের ন্যায়ই তপস্যাদি পরায়ণ, দেবতা-ভক্ত প্রভৃতি রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহাতে সাধারণ লোক মনে করে যে, এই সকল ব্যক্তিও যখন তপস্যাদি পরায়ণ বা দেবতারাধনা তৎপর, তখন ইহারা 'দুর্জ্জন' নহে। এইরূপে সাধারণ ব্যক্তি দুর্জ্জনগণ কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া প্রকৃত সজ্জনে সন্দেহ বিশিষ্ট হন এবং দুর্জ্জনের কথায়ই বিশ্বাস স্থাপন করেন, সজ্জনের পক্ষ গ্রহণ না করিয়া 'দুর্জ্জন'কেই 'সজ্জন' মনে করিয়া তাহাদিগের প্রতি আসক্ত হন। ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ জীবের বঞ্চিত হইবার সহস্রপ্রকার ছিদ্রের মধ্যে এইরূপ একটী ছিদ্র আছে জানিয়া মায়াদেবীও সেই সুযোগ পাইয়া তাহাদিগকে বঞ্চনা করে অর্থাৎ সুরগণের পক্ষাবলম্বন করিতে না দিয়া অসুরের পক্ষাবলম্বন করিবার
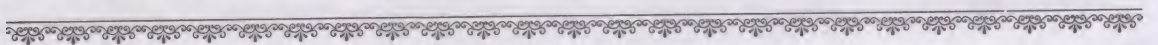
বুদ্ধিপ্রদানে সাধারণ জীবকে ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্ত হইতে দূরে রাখে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন সত্যযুগে হিরণ্যকশিপু বিষ্ণু-বিদ্বেষ করিবার জন্য বহুকৃচ্ছ্রসাধ্যতপস্যা সহকারে ব্রহ্মার উপাসনা করিয়াছিল, ত্রেতায় রাবণ সজ্জনবিরোধ করিবার জন্য রুদ্রের উপাসনা করিয়াছিল, দ্বাপরে কংস বিষ্ণু-বিরোধ করিবার জন্য শিবচতুর্দ্দশীতে ভূতরাজের আরাধনা করিয়াছিল। সুতরাং ইহাদের এই সকল ফলাবটী দেখিয়া সাধারণ লোক সহজেই উহাদিগকেও 'ভক্ত', 'সজ্জন' প্রভৃতি মনে করিয়া বঞ্চিত হইতে পারে; কিন্তু যাঁহারা কৃষ্ণোন্মুখ, তাঁহারা মায়া কোন্ কোন্ স্থানে, কি কি প্রকারে জীবকুলকে বঞ্চনা করিতে পারে, তাহা চৈত্য-গুরুর কৃপায় বুঝিতে পারেন। সুতরাং তাঁহারা ঐ সকল ব্যক্তিগণের কপটতাকে 'ভক্তি' বা 'সুজনতা' মনে করেন না; কারণ তাঁহারা দুষ্টগণের স্বভাব জানেন,—

"দুষ্টোঽহঙ্কুরুতে তুষ্টঃ ক্লিষ্টঃ ক্লেশহরং ভজেৎ।
শিবেঽহংভাবধীর্ভোগে রোগে মৃত্যুঞ্জয়ার্চ্চকঃ।।" (যুক্তিমল্লিকা)

অর্থাৎ দুষ্ট ব্যক্তির স্বভাবই এই যে, যখন সে কোনপ্রকার অসুবিধায় না পতিত হয়, তখন 'আমার ন্যায় আর কে আছে'—এইরূপ মনে করিয়া অহঙ্কার করে; আর যখন অসুবিধায় পতিত বা ক্লিষ্ট হয়, তখন ক্লেশহর-দেবতার পূজা করিয়া থাকে। ভোগকালে তাহারা শিবোঽহং শিবোঽহং' উচ্চারণ করে, আর রোগ-কালে মৃত্যুঞ্জয়ার্চ্চক হইয়া পড়ে।

সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর—এই তিন যুগের দুর্জ্জনগণের নাম প্রদত্ত হইল, কিন্তু কলিযুগে দুর্জ্জনের সংখ্যা অসংখ্য বলিয়া শাস্ত্রে নামবিশেষ প্রদত্ত না হইলেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

"রাক্ষসা কলিমাশ্রিত্য' ইত্যাদি

(চৈঃ ভাঃ আ ১৬শ অধ্যায় ধৃত বরাহ-পুরাণ বাক্য)

সুজনগণের হিংসা করাই উহাদের ধর্ম্ম।

শুনা যায়, অহিত অর্থাৎ জগতের পক্ষে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অমঙ্গলকর,—বিষ্ণু-বৈষ্ণববিদ্বেষ এবং নির্ম্মলা হরিকথার পরিবর্ত্তে গ্রাম্যকথা, সেই সকল অহিতবাদের প্রচারকারী কোন একটী ভক্তিবিদ্বেষী অসম্ভাষ্য, অস্পৃশ্য, শ্বপাকের ন্যায় দূর হইতেও ঈক্ষণের অযোগ্য গ্রাম্য-বার্ত্তাবহে শ্রীগৌড়ীয়মঠের নামে কতকগুলি সম্পূর্ণ অসত্যকথা মাৎসর্য্য ও বিদ্বেষমূলে প্রচারিত হইয়াছে। আমরা ঐ গ্রাম্যবার্ত্তাকে কখনও ভ্রমক্রমেও স্পর্শ করি না, কারণ ঐরূপ বৈষ্ণববিদ্বেষী অস্পৃশ্য বস্তু দৈবক্রমে দর্শন-পথে আসিলেও শাস্ত্রে সচেল গঙ্গাস্নানের ব্যবস্থাই আছে।

শ্রীরামানুজ-মধ্ব-শ্রীজীবাদি আচার্য্যগণ যেরূপ অসুরমত খণ্ডনার্থ অসম্ভাষ্য দুর্ভাষ্যাদিকেও কৃপা-পূর্ব্বক দূর হইতে দর্শন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমরাও পূর্ব্বাচার্য্যগণের অনুসরণে উক্ত অসম্ভাষ্য, অহিতবাদ-প্রচারকারী গ্রাম্যবার্ত্তাবহের অস্যতকথার প্রতিবাদার্থ উক্ত গ্রাম্যবার্ত্তাবহখানি গ্রাম্যবার্ত্তাবহের অফিস হইতে মূল্য দ্বারা প্রাপ্ত হইবার জন্য লোক প্রেরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু পাছে তাহাদের মাৎসর্য্যপ্রসূত অসত্য কথার

মূলে কঠোর পরশু নিঃক্ষিপ্ত হয়, কিংবা ঐরূপ অধর্ম্ম ও অসত্য কথা প্রচারের জন্য ধর্ম্মাধিকরণে অভিযুক্ত হইতে হয়, এই ভয়ে তাহারা উক্ত পত্রখানি প্রদান করিতে অস্বীকৃত হয়।

যাহা হউক, পরমকৃপাময় ভগবান্ আমাদিগকে এইরূপ অসম্ভাষ্য, অস্পৃশ্য গ্রাম্যবার্ত্তাবহের কোন প্রকার সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ না দিয়াই আমাদিগকে সচেলগঙ্গাস্নানের প্রায়শ্চিত্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন এবং তৎসঙ্গে উক্ত জড়হিতাকাঙ্ক্ষী গ্রাম্যবার্ত্তাবহখানি যে অসত্য গ্রাম্যকথার প্রচারক, তদ্বিষয়েও উহার স্বীয় ব্যবহার দ্বারাই সুধীলোকসমাজের নিকট সাক্ষ্যপ্রদান করাইয়াছেন।

আমরা লোক-পরম্পরায় শুনিতে পাইয়াছি যে, বিদ্বেষিগ্রাম্যবার্ত্তাবহ নাকি বলিয়াছে যে, কোন এক ব্যক্তি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছেন। বৈষ্ণববিদ্বেষীও পরকুৎসাকরণাপরাধে তাহাদের ন্যায় অপরাধফলে কারাগারে নিঃক্ষিপ্ত হয়। গ্রাম্যবার্ত্তাবহ জগতের অমঙ্গলকামনায় এই সকল কথা কি তাহাদের অসত্য কথা সৃষ্টির কারখানা হইতে গড়িয়াছে? যদি তাহাদের সাধারণ মনুষ্যোচিত জ্ঞানও থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের জানা উচিত ছিল যে, যেমন 'কামস্কাট্‌কায় অষ্টভুজ বিংশহস্ত পরিমিতি মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে' প্রভৃতি 'আজগুবি' কথা প্রকৃতিজনরঞ্জনার্থ তাহাদের অসত্য কথা নির্ম্মাণের কারখানায় এরূপ কথা সৃষ্টি হইতে পারে, তদ্রূপ সমগ্র ভারতবর্ষে এবং ভারতাতিরিক্ত স্থানে সুপ্রচারিত একমাত্র নিরপেক্ষ ও নির্ব্ব্যলীক সত্যনিষ্ঠ ও সত্যপ্রচারকারী সজ্জনসঙ্ঘের বিরুদ্ধে অসত্যকথা সৃষ্টি করিবার কোন ক্ষমতা তাহাদের নাই। বিশেষতঃ, যাহার যে অধিকার, তাহা লইয়া থাকাই ভাল। 'আদার-ব্যাপারীর জাহাজের খবর' যেরূপ অনধিকার চর্চ্চার মধ্যে গণ্য, তদ্রূপ নগ্ননারী-চিত্র-অঙ্কনকারী ও অতিরঞ্জিত গ্রাম্য-খবর-প্রচারকারী গ্রাম্যবার্ত্তাবহের শুদ্ধহরিকথা-কীর্ত্তনকারী শ্রৌতপন্থিগণের সম্বন্ধে আলোচনা অধিকারলঙ্ঘনাপরাধ বা 'ফাজ্‌লামী' মাত্র।

হিতবাদী (?) গ্রাম্যবার্ত্তাবহ, মাঝে মাঝে এইরূপ 'ফাজ্‌লামী' করিয়া থাকে, কিন্তু ঐরূপ 'ফাজলামী' করিবার পূর্ব্বে তাহার জানা উচিত—

"অথাপি ভগবদ্দোষং বৃথা যো মনুতে নরঃ।
তং দোষেষু শিলাক্ষিপ্তো দারুপ্রোতশরোপমঃ।
শ্রুত্যাকৃষ্টগুণোৎসৃষ্টে ধানুষ্কমনুধাবতি।।"

(শুদ্ধিসৌরভ ৪৬ সংখ্যা)

যেরূপ ধনুকের কর্ণে শর যোজনা করিলে শর শিলাকে বিদ্ধ করিতে না পারিয়া পুনরায় নিক্ষেপকারীর দিকেই ফিরিয়া আসে, তদ্রূপ যে মানব ভগবানে মিথ্যা দোষারোপ করে, সেই দোষরাশিতেই আরোপকারী পতিত হয়।

এরূপ শ্রেণীর গ্রাম্যবার্ত্তাবহের ত' দূরের কথা, উহার যাবতীয় অপভ্রষ্ট-দেবতা, অসুর, দৈত্য, দানবসকলে একত্র মিলিয়াও যদি সত্যের বিজয়-বৈজয়ন্তীর বিরুদ্ধে অভিযান করে, তাহা হইলেও তাহাতে কোন প্রকারে বিন্দুমাত্রও সত্যের ক্ষতি করিতে পারিবে না। হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কংস প্রভৃতি দুর্জ্জনের শতচেষ্টাও সজ্জনের

কেশস্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই; অথচ তদ্দ্বারা জগতে সত্যের ঔজ্জল্য আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। কংস-রাবণাদি অসুরগণ মাৎসর্য্যমূলে নানাপ্রকার মিথ্যা অপবাদ রটনা করিলেও তাহা বাগীশ্বরী কর্ত্তৃক 'নিন্দা' না হইয়া 'বন্দনা'য় পরিণত হইয়াছে।

যে কথা এখন পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয় মঠ জানেন না, সেইরূপ কথা অন্যায়ভাবে প্রচার করিবার বিদ্বেষী গ্রাম্যবার্ত্তাবহের কি অধিকার আছে? আমরা কিন্তু জানি যে, কোন এক পাশ্চাত্য-শিক্ষিত ব্যক্তি পাশ্চাত্য-দেশে বিষ্ণুর আংশিক শক্ত্যাবেশ-অবতার-বিশেষ-প্রচারিত ধর্ম্ম হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত ধর্ম্মের অনন্তকোটিগুণে ঔজ্জ্বল্য ও অসমোর্দ্ধত্ব প্রচার করিবার জন্যই পাশ্চাত্য-ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিতেছেন। ইহা দ্বারা ব্যক্তি বিশেষের ধর্ম্মান্তরগ্রহণ প্রমাণিত হয় না। আর যদি স্বতন্ত্রতাবশে জীব সত্যভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলেই বা তজ্জন্য কোন বাস্তব সত্য-প্রচারকারিসম্প্রদায় বা আচার্য্য দায়ী হইবেন,—এরূপ মূর্খতাপূর্ণ বিচার কিরূপে স্থাপিত হইতে পারে? এইরূপ মূর্খতাময় বিচার গ্রহণ করিলে গ্রাম্যবার্ত্তাবহের সত্ত্বাধিকারী ও সম্পাদকগণের গ্রাম্য-কথা-কীর্ত্তন, নগ্ননারী-চিত্র-দর্শন, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ, কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি, শাস্ত্র-ব্যবসায়ের দ্বারা উদরভরণ, অমেধ্যাদি গ্রহণ, কলিসহচর বস্তুর সঙ্গ প্রভৃতি শত শত অসদাচরণের জন্য ভগবানকে দায়ী করিতে হয়। কারণ গ্রাম্যবার্ত্তাবহ-প্রচারকারিগণ জগতে আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে মাতৃকুক্ষিতে বিষ্ণুর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিলেন যে, আমরা 'হরিকথা'-কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কিছু করিব না, কিন্তু তাহারা এখন আত্মার সেই নিত্যধর্ম পরিত্যাগ করিয়া গ্রাম্যকথা-কীর্ত্তনরূপ অনাত্ম অর্থাৎ শূদ্র-ম্লেচ্ছের ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া কি তজ্জন্য বিষ্ণুকে দায়ী করিতে হইবে? কিংবা বলিতে হইবে, বিষ্ণুর সেবানিষ্ঠ ও সেবোন্মুখ-কিঙ্করগণও আত্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিকৃত ধর্ম্মান্তরগ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদের ন্যায় হইয়াছেন? অথবা ভগবান্ যখন তাঁহার অধীন জীবকে রক্ষা করিতে পারিলেন না, তখন ভগবানের ঐশ্বর্য্যবত্ত্বা আছে বলিয়া অর্থাৎ তাঁহাকে 'ভগবান্' বলিয়া স্বীকার করা যাইবে না। মূর্খ অতাত্ত্বিক নাস্তিক সম্প্রদায় এরূপ মনে করিতে পারেন, কিন্তু সাত্বতশাস্ত্র বলেন যে, পরম করুণাময় ভগবান্ কখনও জীবের স্বতন্ত্রতায় হস্তক্ষেপ করেন না; জীব যে সকল কার্য্য করে, তাহাতে তাহার মূল কর্ত্তৃত্ব সর্ব্বকালেই থাকে। প্রকৃতি সেই কার্য্যের সাহায্য করে বলিয়া তাহাতে প্রকৃতির গৌণ কর্ত্তৃত্ব এবং ফলদান বিষয়ে ঈশ্বরের অনুসঙ্গ-কর্ত্তৃত্ব। জীব স্বেচ্ছাক্রমে অর্থাৎ ভগবৎপ্রদত্ত স্বতন্ত্রতা মহারত্নের অপব্যবহার ফলে অবিদ্যাভিনিবেশ করায় তাহার মূল-কর্ত্তৃত্ব কখনই লোপ হয় না। অতাত্ত্বিক মূর্খ-সম্প্রদায় এই সকল বিচার বুঝিতে অসমর্থ হইয়া অথবা দৈবকর্ত্তৃতই অসুবিধায় পতিত হইবার জন্য মনে করিয়া থাকে যে, সে যত কিছু অপকর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহা ভগবানের ইচ্ছায়ই করে, সুতরাং তাহার আহার, নিদ্রা, ভয়াদি অসৎ প্রবৃত্তির জন্য ভগবানই দায়ী!

শাস্ত্র ও বিচারে পরাঙ্মুখ গ্রাম্যবার্ত্তাবহের ঐরূপ মূর্খতাপূর্ণ নাস্তিক-বিচার গ্রহণ করিলে স্বয়ং ভগবান্ হইতে আরম্ভ করিয়া বিষ্ণুর যাবতীয় অবতারাবলী, আচার্য্য ও ভগবদ্ভক্তগণকে তাহাদের ভগবত্তা ও ঈশ্বরত্ব হইতে খারিজ করিতে হয়; তাহা হইলে বলিতে হয় যে, গৌর-ভগবানের সেবা করিতে করিতে কালা-কৃষ্ণদাসের ভট্ট থারীর স্ত্রীধনে লুব্ধ হওয়ার জন্য গৌরসুন্দরই দায়ী। স্বয়ং ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা করিতে

করিতে কালাকৃষ্ণদাসের কিরূপে ইতর বিষয়ে রুচি হইল? পরম করুণাময় শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ লীলা দ্বারা জানাইলেন যে, স্বতন্ত্র জীবের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ফলে এরূপ অনর্থের উদয় হইতে পারে। তজ্জন্য ঐ জীবই দায়ী, ভগবান্ দায়ী নহেন।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু মহাবিষ্ণুর অবতার—জগতের ভক্তি শংসনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্যরূপে উদিত। তাঁহার পুত্রাভিমানী কতিপয় ব্যক্তি সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ফলে ধর্ম্মান্তর অর্থাৎ বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া কি তজ্জন্য শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু দায়ী বা শক্তিমদ্‌বিগ্রহ মহাবিষ্ণুর সামর্থ্যাভাব মনে করিতে হইবে?

"প্রথমে ত আচার্য্যের একমত গণ।
পাছে দুই মত হৈল দৈবের কারণ।।
কেহ ত' আচার্য্যের আজ্ঞায় কেহ ত' স্বতন্ত্র।
স্বমত কল্পনা করে দৈব পরতন্ত্র।।
আচার্য্যের মত যেই সেই মত সার।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি চলে সেই ত অসার।।"

* * * *

ইহার মধ্যে মালি পাছে কোন শাখাগণ।
না মানে চৈতন্য মালি দুর্দ্দৈব-কারণ।।
সৃজাইল জীয়াইল তারে না মানিলা।
কৃতঘ্ন হইলা তারে স্কন্ধ ক্রুদ্ধ হইলা।।

(চৈঃ চঃ আ ১২।৮-১০, ৬৭, ৬৮)

অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু এইরূপ লীলা দ্বারা শিক্ষা দিলেন যে, জীব স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ফলে আত্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু আত্মধর্ম্মযাজীকেই ভক্তিসংশনাচার্য্য স্নেহাদি দানে সম্বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন; কিন্তু ধর্ম্মান্তর গ্রহণকারীকে তিনি বর্জ্জন করিয়া থাকেন। ধর্ম্মব্যবসায়ী গুরুব্রুব-সম্প্রদায় অমেধ্যভোজী, বিষয়ী, কর্ম্মী, স্ত্রীসঙ্গী ও নানাপ্রকার অসদাচারী ব্যক্তিকেও অর্থের লোভে 'নিজশিষ্য' বলিয়া অঙ্গীকার করে, তাহার সঙ্গ করে ও সারমেয়ের ন্যায় ঐরূপ অসদাচারী শিষ্যের মল ভোজন করিয়া থাকে, কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্য ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত জীবকে 'স্বকর্ম্ম ফলভুক্' জানিয়া তাহাকে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করেন। ইহাই প্রকৃত বৈষ্ণবাচার্য্য ও আচার্য্য-ব্রুব ধর্ম্মব্যবসায়িগণের মধ্যে পার্থক্য। ধর্ম্মব্যবসায়ি-গুরুব্রুবগণ শিষ্য বেশ্যাসক্ত হইলে শিষ্যের বেশ্যার কর্ণে মন্ত্র দিয়া শিষ্যকে অধিকতর ভাবে বেশ্যাসক্ত হইবার সাহায্য করেন এবং তদ্দ্বারা শিষ্যের মনোরঞ্জন করিয়া ঐরূপ বৃষলীপতির মল গ্রহণ করে অর্থাৎ তাহার নিকট হইতে অধিক পরিমাণে অর্থাদি প্রাপ্ত হয়।

এইরূপ শ্রুত হয় যে, শঙ্কর নামক কোন এক ব্যক্তি প্রথমে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর নিকট আগমনের অভিনয় করিয়া পরে স্বতন্ত্রতাবশে আত্মধর্ম্ম-পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন এবং আসাম দেশে শুদ্ধভক্তি বা সনাতনধর্ম্ম বিরোধি-নির্ব্বিশেষ মতবাদ প্রচার করেন। উহা শঙ্কর নামক ব্যক্তির এইরূপ ধর্ম্মান্তর গ্রহণের জন্য কি শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুকে দায়ী করিতে হইবে? অথবা শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর শক্তির অভাব মনে করিতে হইবে? শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু ঐরূপ দুর্জ্জনের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া তাহার মঙ্গল কামনা করেন।

শ্রীবীরভদ্র প্রভুর প্রচারিত আত্মধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া 'নেড়ানেড়ি' নামক অসৎ-সম্প্রদায় উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ক্ষীরোদশায়ী মহাবিষ্ণু, যিনি জগৎসংস্থাতা—ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে ব্রহ্মারুদ্রাদি দেবতাগণ জগতে সনাতনধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যাঁহার নিকট যুগে যুগে আবেদন জানাইয়া থাকেন,—যিনি প্রতি জীবের অন্তরে অন্তর্যামিরূপে বিরাজিত—যিনি প্রাবেশমাত্রপুরুষরূপে সগর্ভযোগিগণ কর্ত্তৃক নিত্য আরাধিত, সেই মহাবিষ্ণু কি দায়ী হইবেন? ক্ষীরোদশায়ী প্রভু জগতে ভাগবতধর্ম্মই স্থাপন করিয়া থাকেন; কিন্তু যাহারা দুর্দ্দৈববশে সেই ভাগবতধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে বা কোন প্রকার শুদ্ধভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত হয়, তাহারা 'স্বকর্ম্ম-ফলভুক্'। বীরভদ্র প্রভুর সহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। যতক্ষণ জীব কৃষ্ণোন্মুখ থাকে, ততক্ষণই তাঁহাকে হরিসেবক বলা যাইতে পারে, কিন্তু স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ফলে পতিত হইয়া মায়ার উন্মুখ হইলে আর তাহাকে সেই পদবী প্রদত্ত হইতে পারে না। প্রাকৃত জগতেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, যতক্ষণ কোন ব্যক্তি বিশ্বস্তভাবে রাজকার্য্য করে, ততক্ষণই রাজা তাহাকে রাজকীয় পোষাক ও রাজকীয় উপাধিতে ভূষিত করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি আবার কোন কারণ বশতঃ রাজকার্য্যে অবহেলা বা বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহাকে তখন রাজা হাতকড়ী দিয়া কারাগারে নিঃক্ষেপ করেন। তদ্রূপ জীব যখন ভক্তিতে উন্মুখ হয়, কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণগণও তখনই তাহাকে বৈষ্ণবচিহ্ন ও ভক্তিসূচক উপাধিতে ভূষিত করিয়া থাকেন; কিন্তু যখন আবার স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করে, তখন তাহার নিকট হইতে সেই সকল বস্তু কাড়িয়া লওয়া হয়। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর রূপ কবিরাজ নামক জনৈক শিষ্যাভিমানী ব্যক্তি শুদ্ধভক্তিবিরুদ্ধমতবাদ সমর্থন করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীনিবাস আত্মজা শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণী তাঁহার কণ্ঠি ছিঁড়িয়া দিয়াছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর শিষ্যাভিমানী হরিবংশ একাদশী দিবসে তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর নিকট আসিয়া দণ্ডবৎ করেন। আচার্য্যবর্য্য শ্রীল গোপালভট্টপাদ হরিবংশের এই অনাচারের জন্য তাহাকে বর্জ্জন করেন। শুনা যায়, এইরূপ ঘটনার অব্যবহিত পরেই তাহার সর্ব্বনাশ হইয়াছিল।

আচার্য্যগণ কখনও স্বতন্ত্র জীবের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারকে প্রশ্রয় দেন না। বিপথগামী শিষ্যকে কেশে ধরিয়া বিপথ হইতে উত্তোলন করেন; আর যে ব্যক্তি কিছুতেই সুপথে আসে না, তাহাকে সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করেন, ইহাই বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আচরণ। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারের জন্য আচার্য্য দায়ী হন না, ইহাই ভক্তিসিদ্ধান্ত-কোবিদগণের ও সর্ব্বসাত্বত শাস্ত্রের বিচার।

শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট অহিতবাদী গ্রাম্যবার্ত্তাবহ যে সমস্ত অসত্য কথা প্রচার করিয়াছে, তাহা তাহার পত্র হইতে উঠাইয়া লউক। উপযুক্ত প্রমাণাভাবে তিনি যদি মিথ্যা কথা প্রচার করেন, তজ্জন্য তাহাকে রাজদ্বারেও দায়ী হইতে হইবে। তাহার স্মরণ থাকা উচিত যে, তিনি 'মগের মুল্লুকে' বাস করেন না। সদাশয় গভর্ণমেন্টের বিচারাধীনে তাহাকে বাস করিতে হয়। শ্রীগৌড়ীয় মঠের কোন ব্যক্তি কখনও কোন দিন কোন অন্যায় কার্য্য করেন না। মাৎসর্য্যমূলে এই প্রকার সম্পূর্ণ অমূলক কথা প্রচারের জন্য আমরা অহিত-প্রচারক গ্রাম্যবার্ত্তাবহের ভাগ্যের প্রশংসা করিতে পারিতেছি না। ''সত্যমেব বিজয়তে নানৃতম্''।

আমার দুর্ব্বুদ্ধি!

শ্রীসনাতনগোস্বামিপ্রভুর নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভু যে, 'আত্মারাম'-শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একস্থানে একটী পদ পাইয়াছিলাম—

''সুবুদ্ধিজনের হয় কৃষ্ণ-প্রেমোদয়''

পদটী অনেকবার পড়িয়াছি, কণ্ঠস্থ করিয়া লোকের নিকটও বহুবার বলিয়াছি, কিন্তু সেই বাক্যটীর মধ্যে যে '**সুবুদ্ধি**' শব্দটী রহিয়াছে, তৎপ্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই। আমি লোকের নিকট 'কৃষ্ণপ্রেমিক' বলিয়া পরিচিত হইতে চাই, সভা সমিতিতে কৃষ্ণপ্রেমের তুফান ছুটাই, ব্যাখ্যার সময় কৃষ্ণপ্রেমের বন্যায় জগৎকে রসাতলে ডুবাইয়া দিতেও দ্বিধাবোধ করি না; কিন্তু তথাপি দুর্ব্বুদ্ধি-পিশাচীর কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম না!

পিশাচী আমাকে 'কৃষ্ণপ্রেমিক' সাজাইয়া আকাশে তুলিয়া দিয়াছে। কাজেই আমি আমার নিজের অবস্থা বিচার করিতে পারি না। সুবুদ্ধিদেবীর সহিত দেখা হইলে তিনি আমাকে হয় ত' আমার প্রকৃত অবস্থাটী জানাইয়া দিতেন। কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি কিছুতেই সুবুদ্ধির কাছে যাইতে দিবে না! সাধুগণ আমাকে সুবুদ্ধিদেবীর নিকট লইয়া যাইতে চান, কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি রাক্ষসী আমাকে এত উচ্চে উঠাইয়া দিয়াছে যে, আমি সাধুগণকে আমা-অপেক্ষা 'ছোট' 'নীচ' প্রভৃতি জ্ঞান করিয়া তাঁহাদের কথায় কাণই দিই না।

আমি মনে করি, আমি ব্রাহ্মণ-কুলীন, আমি পণ্ডিত সপ্ততীর্থ, আমি ধনী-ক্রোড়পতি, আমার গায় বল-শক্তি আছে, মস্তিষ্কে বুদ্ধি-মেধা আছে, আমার যথেষ্ট প্রতিভাপ্রতিপত্তি আছে, আর যা'রা সাধু, তা'দের ও'সব নাই বলিয়াই তা'রা 'মনের দুঃখে বনে' আসিয়াছে,তা'রা উপার্জ্জন করিয়া স্ত্রী-পুত্র-ভরণপোষণ করিতে পারে না বলিয়াই গৃহ ছাড়িয়াছে, তা'রা মহামহোপাধ্যায় পি-এইচ-ডি, ডি লিট্ হইতে পারিবে না বলিয়াই সাত্বতশাস্ত্র পড়িতেছে, তা'রা ব্রাহ্মণ-কুলীন নহে বলিয়াই 'বৈষ্ণবের দাস' বলিয়া পরিচয় দিতেছে, গায়ে শক্তি নাই বলিয়াই মালা টানিতেছে, তাহাদের 'প্রতিভা' নাই বলিয়াই তা'রা জড়বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্‌বিজ্ঞান আলোচনা করিতেছে, মস্তিষ্কে বুদ্ধি নাই বলিয়াই গৃহ-ভজন ছাড়িয়া দিয়া
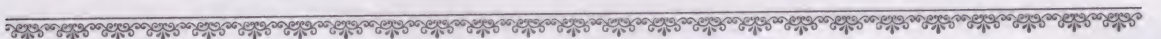
হরি-ভজন করিতেছে, মেধা নাই বলিয়াই মেধাবর্দ্ধক পুষ্টিকর অমেধ্যাদি-ভোজন পরিত্যাগ করিয়া 'শাক-পত্র-ফল-মূলে' উদরভরণ করিতেছে।

আমি দুর্ব্বুদ্ধি-পিশাচীর পরামর্শ শুনিয়া বলিয়া থাকি, 'কেন আমি আমার কৌলিন্য, পাণ্ডিত্য, ঐশ্বর্য্য, বীর্য, বুদ্ধি, মেধা, প্রতিভা, প্রতিষ্ঠা—এই সকল কৃষ্ণের তহবিলে জমা দিয়া কৃষ্ণকে 'বড়' করিয়া দিব! সেইগুলি ত' আমার ভাণ্ডারে রাখিয়া সুদে-আসলে ঐগুলিকে দ্বিগুণ হইতে দ্বিগুণতর করিয়া আমিও একটী 'কৃষ্ণ' সাজিতে পারি! কৃষ্ণকে দিলে আমার কি লাভ হইবে, লাভের মধ্যে 'কৃষ্ণ হওয়া'র পরিবর্ত্তে আমাকে কৃষ্ণ হইতে ছোট অর্থাৎ তাঁর অধীন—তাঁর দাস হইবে হইবে!' দুর্ব্বুদ্ধি-পিশাচী আমার এইরূপ বিপর্য্যয়-বুদ্ধি ঘটাইয়া থাকে। 'কৃষ্ণের দাস' হওয়াকে অর্থাৎ স্বরূপ-জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হওয়াকে দুর্ব্বুদ্ধি, 'অলাভ' ও ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর বিরূপে আচ্ছন্ন হওয়াকে 'পরমলাভ' বলিয়া পরামর্শ দেয়। দুর্ব্বুদ্ধি আমাকে বলিয়া দেয়,—জগদ্ভরা এত লোক রহিয়াছে, কত মহামহোপাধ্যায়, কত পণ্ডিত-কুলীন, য়্যারিষ্টটল- গৌতম-গঙ্গেশ প্রভৃতির ন্যায় শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক, চার্ব্বাক-কপিল-কণাদ-ইয়াংচু-মিল-ক্যান্ট প্রভৃতির ন্যায় বড় বড় দার্শনিক, মনীষী, মেধাবী, হারকিউলস্-নেপোলিয়ান-শুম্ভ-নিশুম্ভ প্রভৃতির ন্যায় 'নামজাদা' বলবান্, কুবের-রাবণাদির ন্যায় মহা ঐশ্বর্য্যবান্, মদনের ন্যায় সৌন্দর্য্যবান্ ব্যক্তিগণ কেহই ত' কৃষ্ণের তহবিলে তাহাদের সর্ব্বস্ব দেয় নাই, তবে তুমি কেন জগদ্ভরা লোকের আদর্শ ছাড়িয়া তোমার পুঁজি-পাটাটা খোয়াইতে বসিবে?

দুর্ব্বুদ্ধির এইরূপ পরামর্শে আমি আমার জীবনটা কাটাইয়া দিই। যে কৌলিন্য-পাণ্ডিত্য-ঐশ্বর্য্য-বল-বুদ্ধি-মেধা-প্রতিষ্ঠার অহঙ্কারে মত্ত হইয়া এতদিন ধরাকে সরা দেখিতাম, সেইগুলি যখন সংসারের চাকুরীতে সওয়া ষোল আনা ব্যয় করিয়া ঘুণো বাঁশ বা সুনিষ্পেষিত ইক্ষুদণ্ডের পরিত্যক্ত অংশের ন্যায় অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়ি, তখনও কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি-পিশাচীর সঙ্গ ছাড়িতে চাই না। তখন স্ত্রী-পুত্র-পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ আমা হইতে আর এক ফোঁটাও তাহাদের ইন্দ্রিয় তর্পণ দোহন করিয়া পাইবে না জানিয়া আমাকে 'বৃথাভার' মনে করিয়া কোনও একটী 'পিঞ্জরাপোল' আশ্রয় করিবার পরামর্শ দেয়। দুর্ব্বুদ্ধি-পিশাচী তখনও কিন্তু আমাকে ছাড়ে না, আসিয়া আমার কাণে কাণে বলিয়া দেয়,—"দেখ, কিছুতেই কৃষ্ণের তহবিলে কিছু জমা দিবে না। এখন আর তোমার কৃষ্ণের দাসগণের নিকট যাইতে কোন ভয় নাই। কারণ তাহারা তোমার ন্যায় অসার হইতে একফোঁটা রসও নিংড়াইয়া লইয়া তাহা কৃষ্ণের তহবিলে জমা দিতে পারিবে না। অপিচ তুমি এখন কৃষ্ণের তহবিল হইতে তোমার শূন্য তহবিলে কিছু কিছু করিয়া আনিতে পারিবে। কাজেই তোমার কৃষ্ণের দাসত্ব স্বীকার করিতে হইবে না। কৃষ্ণকে কিছু দিয়া সেবা করিলে ত' তাঁহার দাস হইতে হইবে? যখন তুমি তাঁহার সেবা করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে দিয়া তোমার সেবা করাইয়া লইতে পারিবে, তখন আর তুমি তাহার দাস হইলে কিরূপে? অতএব আমার বুদ্ধি গ্রহণ কর। কোনও বৈষ্ণবের মঠ বা আশ্রমকেই তোমার পিঞ্জরাপোলরূপে নির্দ্ধারণ কর। সাবধান যে সে মঠে আখড়ায় যাইও না। কারণ যে-সকল বৈষ্ণবের আখড়ায় গাঁজা-ভাং-তামাক-স্ত্রীসঙ্গ-তাস-পাশা-দাবা প্রভৃতি আছে, তা'রা বড় চতুর, তা'রা কিন্তু তোমাকে তা'দের ভোগের কণ্টক মনে করিয়া স্থান দিবে না। তা'রা তোমারই ন্যায় 'আমদানী-রপ্তানি লইয়া চিরজীবনটা

কাটাইয়াছে। কিন্তু যাঁ'রা পরদুঃখদুঃখী, পরোপকারী, তাঁ'রা ত' আর বণিক্ নহেন, তাঁ'দের কাজ কেবল জগৎকে বিতরণ, কেননা তাঁ'রা বিতরণ-কারী ঔদার্য্যবিগ্রহ ভগবানের সেবক বলিয়া অভিমান করেন। সুতরাং তাঁ'দের কাছে যাও।" সেখানে তোমার হরিভজনের কুটীর অর্থাৎ সারাজীবন সংসার-মরুভূমিতে পরিশ্রান্ত, ক্ষতবিক্ষত, নিঃশেষিত দেহের ক্লান্তিমোচনের বিশ্রামাগার রচনা কর। দুর্ব্বুদ্ধি কখনও আমাকে এইরূপ পরামর্শ দিয়া থাকে।

কখনও বা আমি চপলার চকিত চমকের ন্যায় সুবুদ্ধিদেবীর দর্শন পাইয়া হরিভজনার্থ সঙ্কল্প করি এবং সেই সঙ্কল্পের বশবর্ত্তী হইয়া সদ্গুরুর আনুগত্যে হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় প্রবৃত্ত হই; কিন্তু আমাকে হরিসেবায় একটু অমনোযোগী দেখিতে পাইলেই আমার দুর্ব্বলতার ছিদ্রান্বেষিণী দুর্ব্বুদ্ধি কোথা হতে যেন হঠাৎ আসিয়া আমার কাণে কাণে বলিয়া দেয়, 'কেন তুমি তোমার এমন সোনার দেহ কৃষ্ণের কাজে মাটী করিতেছ? তোমার পাণ্ডিত্য-প্রতিভা, বল-বুদ্ধি কেনই বা কৃষ্ণের ভাণ্ডারে দিয়া নিজে ঠকিতেছ? আরও দেখ, তুমি বাড়ীঘর সব ছাড়িয়াছ, স্ত্রী-পুত্র-পিতা-মাতার সঙ্গত্যাগ করিয়াছ, সন্ন্যাসী হইয়াছ, কিন্তু তোমারই যে আরও গুরুভাইরা আছে, তা'রা ত' সন্ন্যাসী না সাজিয়াও সাধু-গুরুর নিকট তোমা' অপেক্ষা বহুগুণে অধিক স্নেহ-সম্মান পাইতেছে। তুমি তা'দেরই অনুকরণ কর না কেন? দুর্ব্বুদ্ধি-পিশাচী আমার অপরাধ ও হৃদয়-দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি অনর্থের ছিদ্র পাইয়া নিবৃত্তানার্থ, তেজীয়ান্, মহাভাগবত, সহজ-পরমহংসগণের অনুকরণ করিবার পরামর্শ প্রদান করিয়া আমাকে 'ঢঙ্গ' প্রাকৃত-সহজিয়ায় পরিণত করাইয়া চিরতরে কৃষ্ণভজন হইতে বিচ্যুত করিতে চায়। আমি দুর্ব্বুদ্ধি-পিশাচীর বঞ্চনা বুঝি না।

কখনও বা দুর্ব্বুদ্ধি আমার কাছে আসিয়া বলে, "কেনই বা তুমি হরির জন্য এত খাটিতেছ? যদি পুনরায় কৃষ্ণের সংসারই পত্তন করিতে হইল, সংসারের ন্যায় সেবা করিতেই হইল, তাহা হইলে তুমি নিজে 'কৃষ্ণ' সাজিয়াই ত' সেই সংসারে ভোগ করিতে পারিতে, কৃষ্ণভজন ত' পরিশ্রান্ত জীবনের শান্তি অর্থাৎ বিশ্রামানুসন্ধান! প্রকৃতির শোভাদর্শন বা মুক্তবায়ু সেবনের জন্যই ত' ধামবাস, কায়িক পরিশ্রম হইতে বিশ্রাম লইবার জন্যই ত' 'হরিনাম', ক্ষুধা-বৃদ্ধি বা অর্থ-প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহ করিবার জন্যই ত' 'কীর্ত্তন-নর্ত্তন', ভীষণ পাপ-পঙ্কিল অতীত জীবনের অনুশোচনা ক্লেশের সাময়িক বিস্মরণ-জন্যই ত' কাব্যনাটকাদির ন্যায় 'গোপী-গীতা' শ্রবণ, বৃদ্ধাবস্থায় শিথিল ইন্দ্রিয়ের চিরাভ্যস্ত কামলালসা চরিতার্থ করিবার অভাবটা মনে মনে ধ্যান দ্বারা পূরণ করিবার জন্যই ত' নির্জ্জন-ভজন। অতএব তোমার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যতটুকু পরিশ্রম দরকার, ততটুক মাত্র পরিশ্রম কর। সেখানেও পার ত' তোমার পরিশ্রম লাঘব করিবার জন্য কৃষ্ণকে খাটাইয়া লও। একটী করতাল বা 'খঞ্জুনী' লইয়া হরিনামের (?) গান, কথকতা প্রভৃতি করিয়া তোমাদের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ কর। কৃষ্ণকে খাটাইয়া খুব সহজে পয়সা-প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়, নিজে খাটিলে যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে হয়। কৃষ্ণকে খাটাইয়া অর্থ সংগ্রহ কর, আর তাহা নিজের নিকট গচ্ছিত রাখ, কাহারও অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে না। ইচ্ছামত তোমার প্রয়োজন পূর্ণ করিতে পারিবে। একটী কুটীর বাঁধ। সেখানে সেই ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যে সুখে স্বচ্ছন্দে থাক। নির্জ্জনে বসিয়া মনে মনে যাহা চিন্তাই (স্ত্রী-চিন্তাই হউক্, আর

গৃহ-চিন্তাই হউক) কর না কেন, লোকের নিকট নিষ্কিঞ্চন ভজনানন্দী ভক্ত বলিয়া প্রতিষ্ঠা পাইতে পারিবে।" কখনও বা ভিতরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জড়প্রতিষ্ঠাকামী থাকিয়াও লোকের নিকট 'নিষ্কিঞ্চন' বলিয়া প্রচারিত হইবার জন্য মুখে বলিবে বা সাময়িক পত্রের সম্পাদকের নিকটে পত্র লিখিয়া জানাইবে, 'আমার সুখ্যাতি যেন আপনার কাগজে প্রকাশিত না হয়! অর্থাৎ যেন আরও বেশী করিয়া প্রকাশিত হয় এবং তৎসঙ্গে আরও একটু কথা যেন যোগ থাকে যে, আমি প্রতিষ্ঠা চাই না, আমি কত বড় বৈষ্ণব! অর্থাৎ আমি কত বড় আনুকরণিক 'প্রাকৃত-সহজিয়া' যে মাধবেন্দ্রপুরী-লোকনাথ প্রভৃতি সহজ পরমহংস নিষ্কিঞ্চনকে অনুসরণ করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠাটী আমার তহবিলে আনিবার জন্য তাঁহাদের নিষ্কপট আচরণকে কপটতা করিয়া অনুকরণ করিতে শিখিয়াছি! দুর্ব্বুদ্ধি আমাকে আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা করিবার জন্য এই সব পরামর্শ দিয়া থাকে।

কখনও বা দুর্ব্বুদ্ধি-পিশাচী আমাকে বলিয়া দেয়, "তোমার দ্বারা যে বৈষ্ণবগণ হরিসেবা করাইতেছে, ইহা কিন্তু তাহারা তোমার গ্রাসাচ্ছাদন দিবার বিনিময়ে তাহাদের প্রাপ্য মূল্য আদায় করিয়া লইতেছে। তোমার মূল্য এত কম হওয়া উচিত নহে। ইহা তোমার ভজন নহে। তোমার ইন্দ্রিয়তর্পণটীই তোমার 'ভজন'। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণানুসন্ধানের পরামর্শ তোমার গ্রহণ করা উচিত নহে। তুমি যতটা সেই পরামর্শ না শুনিয়া নির্জ্জনে আপন মনে আমার সহিত বাস কর, সেইটুকুই তোমার ভজন হয়।"

দুর্ব্বুদ্ধি-পিশাচী এইরূপ ভাবে আমাকে আমার একমাত্র অনর্থ-নিবৃত্তির পথ—যাহা পরম করুণাময় শ্রীগুরুদেব আমার জন্য কৃপাপূর্ব্বক আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই সুপথ হইতে সরাইয়া বিপথে লইয়া যাইবার জন্য, কতরূপেই না পরামর্শ দিতেছে। আমি কিন্তু তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

লোকের কাছে 'ভজনানন্দী' 'হরিসেবক' বলিয়া পরিচিত হইতে চাই বটে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে কতটুকু হরিসেবা করিতেছি, আর কত অধিক পরিমাণেই বা নিজের সেবা অর্থাৎ নিজ-সুখ-শান্তি-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অন্যাভিলাষের অনুসন্ধান করিতেছি, তাহা দুর্ব্বুদ্ধি আমাকে জানিতে দেয় না। প্রত্যহ হরিসেবায় আমার চিত্ত কতটুক দৃঢ় অনুরক্ত ও পরিনিষ্ঠিত হইল, সারাদিনের মধ্যে এ বিষয়টুকু ভাবিবার কোন অবসর দুর্ব্বুদ্ধি আমাকে কখনও দেয় নাই; পরন্তু অনেক রাজ্যের অনেক কথা ভাবিবার—ধ্যান করিবার যথেষ্ট অবকাশ দিয়াছে।

দুর্ব্বুদ্ধি কখনও বলিয়া দেয়, "প্রকৃত সাধুর কাছে যাইও না। যদি দৈবাৎ ঐরূপ সাধুর নিকট আসিয়া পড়, তাহা হইলেও তাঁহাদের কথায় মনোযোগ দিও না; প্রকৃত সাধুগণ এমনই মোহিনী-বিদ্যা জানেন যে, তাঁ'দের কথায় মনোযোগ দিলেই তাঁ'রা সমস্ত চিত্ত-বিত্ত হরণ করিয়া লন। এমন কি অবশেষে তাঁ'রা সর্ব্বনাশ করিয়া ছাড়েন। নকল সাধুগুরুর কাছে যাও, সেখানে গেলে তোমার সর্ব্বনাশ হইবার ভয় নাই। কারণ আমি যে তা'দেরও ঘাড়ে চাপিয়া আছি। তা'তে এ-কূল ও-কূল দুকূলই রক্ষা হইবে। লোকের নিকটও 'ভক্ত' 'বোষ্টম' প্রভৃতি বলিয়া প্রতিষ্ঠা লইতে পারিবে। অপর দিকে সংসারেরও সমস্ত সুখ ষোল আনা বজায় থাকিবে।" এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধির পাল্লায় পড়িয়া আমি লৌকিক শাস্ত্র হইতে আমার মনের মত বাক্যগুলি

খুঁজিয়া লই। বলি, গৃহীদের ত্যাগীগুরু করা ভাল নহে। যেন আমরণ গৃহমেধী থাকাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য! আমি তখন আমা-অপেক্ষা সংসারে অধিক আসক্ত, আমা অপেক্ষা অধিকতর আম্‌দানী-রপ্তানীর ব্যাপারী-মহাশয়কেই আমার ভোগ-বিবর্দ্ধন-যজ্ঞের ঋত্বিক্ বলিয়া বরণ করি। আমি যেমন, আমার আদর্শটীও তেমন না হইলে চলিবে কেন? দুর্ব্বুদ্ধি তখন আমাকে বলিয়া দেয় "ঐ সকল সাধুদের কথা শুনিও না। কুলগুরু ছাড়িতে নাই, তা'র অভিসম্পাতে সর্ব্বনাশ হইবে। আর তোমার গুরুই বা কোন্ অংশে কম? তা'র বাড়ীতেও ঠাকুর-সেবার নাম করিয়া স্ত্রী-পুত্রের সেবা আছে, ঠাকুর-মন্দিরের নাম করিয়া সুপ্রশস্ত গৃহান্ধকূপ আছে, নিরন্তর ভাগবত-পাঠ-কীর্ত্তনের নাম করিয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের একটী বড় মনোহারী দোকান আছে, সুতরাং তুমি যেরূপ বণিক্, তোমা-অপেক্ষা কোন অধিকতর বণিকই তোমার আদর্শ হওয়া উচিত। সমানে সমানে মিল হয়। বিপরীত ধর্ম্মীর সঙ্গে তোমার সইবে কেন?" দুর্ব্বুদ্ধি আমাকে এই সকল পরামর্শ দিয়া অমার মঙ্গলের পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়।

অনেক সময়ে সুকৃতি-বলে সদ্বুদ্ধির পরামর্শে সাধু-সদ্‌গুরুর নিকট আসিয়াও যদি আবার অন্যমনস্ক হইয়া পড়ি, তখন অবসর বুঝিয়া দুর্ব্বুদ্ধি আমার নিকট আসিয়া বলে, "তুমি কেনই বা এখানে আসিলে? এখানে আসিয়া যে বিষম ফাঁপরে পড়িয়াছ, ইহাদের হাত এড়াইবারও যে জো নাই। সর্ব্বদা এ'দের অনুগত হইয়া থাকিতে হইবে। স্বাধীনভাবে থাকিলে কিম্বা অন্য কোন প্রকার গুরু—যিনি তোমার যথেচ্ছাচারিতা সমর্থন করিতে পারেন, তাঁহার উপদেশ লইলে এতক্ষণ যে কত মনের স্ফূর্ত্তিতে থাকিতে পারিতে, তীর্থে তীর্থে বেড়াইতে পারিতে, যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতে পারিতে, পিতা-মাতা-স্ত্রী কাহারও মনে কষ্ট দিতে হইত না, পান-তামাক-চা-চুরুট কিছুতেই কোন আপত্তি ছিল না। গোবিন্দদাস-বিদ্যাপতি শুনিবার নাম করিয়া বামাকণ্ঠ শুনিতে পারিতে, লীলামৃত, ভাবনামৃত, নীলমণি, গীতগোবিন্দ, পঞ্চাধ্যায় প্রভৃতির নাম করিয়া কাব্যরস-সম্ভোগ ও স্ত্রী-চরিত্রসমূহ ধ্যান করিতে পারিতে। সময়ে সময়ে কপট অশ্রু-পুলক-কম্প দেখাইয়া 'রসিক' বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে পারিতে। একাধারে ভোগ ও ভগবান্ এমন সুযোগ ছাড়িয়া কেনই বা বন্ধনের মধ্যে পড়িয়াছ। সাধু-সদ্‌গুরুর কাছে যে বড় কঠোরতা, তীব্র শাসন! একটু এদিক ওদিক হওয়ার জো নাই, একটু অন্যাভিলাষ, একটু কপটতা থাকিলেই তা'দের কাছে ধরা পড়িতে হয়। দুর্ব্বুদ্ধি আমাকে এইরূপ কত কি পরামর্শ দিয়া থাকে।

কখনও বা দুর্ব্বুদ্ধি আমাকে গুরু-বৈষ্ণব-নিন্দক আত্মঘাতী পাষণ্ডগণের সমালোচনা দ্বারা গুরু-বৈষ্ণবকে বিচার করিতে—মাপিয়া লইতে পরামর্শ দেয়। আমাকে ভাবিতে দেয় না যে, আমি নিষ্কপটে হরিভজন করিতে আসিয়াছি; আত্মঘাতীদের উদ্দেশ্য ত' হরিভজন নহে। তাহারা আত্মবঞ্চিত, তাই অপরকে বঞ্চনা করিতে পারিলেই তা'রা তা'দের সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হইল বলিয়া মনে করে।

বহুরূপিণী দুর্ব্বুদ্ধি-পিশাচী আমাকে তাহার স্বরূপ বুঝিতে না দিয়া এ সকল বিচিত্র বেশে আমার নিকট আসিবার সাহস করে কেন? আমার দুর্দ্দৈব ও অনর্থই ইহার কারণ বলিয়া মনে হয়। যদি আমার সম্বন্ধ-জ্ঞানটী নিরন্তর টন্‌টনে থাকিত, তাহা হইলে মুহূর্ত্তের জন্যও দুর্ব্বুদ্ধি আমার নিকট আসিবার কোন ছিদ্র পাইত না।

শ্রীচরিতামৃতে শ্রীগোপীর উক্তিতে পড়িয়াছিলাম, ''কৃষ্ণ যেন আম্র-আঠা''। 'কৃষ্ণ' যাহার নিকট 'আম্র-আঠা' তুল্য হইয়াছে, সেই পরম সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিরই সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হইয়াছে। সতত কৃষ্ণনিষ্ঠ গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মে আমার 'আঠা' হয় নাই, তাই দুর্ব্বুদ্ধি আমাকে ইতর-পরামর্শ দিয়া আমার নিত্য আশ্রয়স্থল হইতে বিচ্যুত করিতে চায়। যাঁ'দের কৃষ্ণে আঠা হইয়াছে, এরূপ সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের নিরন্তর আনুগত্য ফলেই আবার সুবুদ্ধিদেবীর সহিত আমার দেখা হইতে পারে,—

''কৃষ্ণকৃপায় সাধুসঙ্গে **রতিবুদ্ধি** পায়।
সব ছাড়ি' কৃষ্ণভক্তি **শুদ্ধবুদ্ধ্যে** পায়।।
বিচার করিয়া যবে ভজে কৃষ্ণ পায়।
সেই **বুদ্ধি** দেন তা'রে যা'তে কৃষ্ণ-পায়।।
* * * *
সুবুদ্ধিজনের হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়।'' (চৈঃ চঃ মধ্য ২৪)

দুর্ব্বুদ্ধি আমাকে সর্ব্বদাই সদসদ্‌বিচার করিতে নিষেধ করে। কখনও বলিয়া দেয়, ''তুমি যখন অন্ধ-বিশ্বাসের পথ ধরিয়াছ, তখন বিচার করার আবশ্যক কি? ও-সব নীরস জ্ঞানীদের জন্য ! সদ্‌গুরু-অসদ্‌গুরু, সাধু-অসাধু, বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব, নাম-নামাপরাধ, ভক্তি-অভক্তি, কাম-প্রেম, কর্ম্ম-সেবা,—এ'সব বিচারের আবশ্যক কি? কেবল ভজন (আমার পরামর্শে তোমার ইন্দ্রিয়-তর্পণানুসন্ধান) করিয়া যাও।'' পাছে সদসদ্ বিচারফলে কুহকিনী দুর্ব্বুদ্ধির কুহক ধরা পড়িয়া যায়, এই জন্যই কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি আমাকে ঐরূপ উপদেশ দিয়া থাকে, কিন্তু আমি তাহা বুঝি না। সাধুগণের কথায়, শাস্ত্রের কথায় অবিশ্বাস করি।

মায়াবিনী বহুরূপিণী দুর্ব্বুদ্ধি আমার সহিত যে কত ভাবে ছলনা করিতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বহুরূপিণী দুর্ব্বুদ্ধির মাত্র কয়েকটী চিত্র আজ আমার বন্ধুবান্ধবগণের নিকট প্রকাশ করিয়া হৃদয়ের গুরুভার খানিকটা লাঘব করিলাম।

আমার বন্ধুগণ হয়ত' বলিবেন, ''তোমার দুর্ব্বুদ্ধির কথা হাটে বাজারে ঘোষণা করিয়া লাভ কি?'' এখানে আমার একটী কথা আছে। আমি বড় জড় প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী, সর্ব্বদাই লোকের কাছে আমার অনর্থ, হৃদ্দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি ঢাকিয়া রাখিয়া 'ভক্ত-প্রতিষ্ঠা' লইতে চাই। কিন্তু ইহাতে যে আমি প্রতি মুহূর্ত্তে বঞ্চিত হইতেছি, তাহা দুর্ব্বুদ্ধি আমাকে বুঝিতে দেয় না। তাই, আজ আমি দুর্ব্বুদ্ধি-পিশাচীর হস্ত হইতে পরিত্রাণের জন্য আর গুরুবর্গের নিকট আমার রোগের কথা জানাইতেছি। রোগ যতই খারাপ ও গোপনীয় হউক না কেন, চিকিৎসকের নিকট ঢাকিয়া রাখিলে উপযুক্ত ঔষধ ও পথ্যের অভাবে রোগ ত' আরোগ্য হইবেই না, অধিকন্তু যত বেশী দিন যাইতে থাকিবে, ততই রোগ অধিকমাত্রায় বাড়িয়া গিয়া দুশ্চিকিস্য হইয়া পড়িবে। তাই, আমার গুরুবর্গকে—আমার শুভানুধ্যায়ি বন্ধু-বান্ধবকে সদ্‌বৈদ্য ও সৎপরামর্শদাতা জানিয়া তাঁহাদের আমার রোগের কথা ব্যক্ত করিলাম। তাঁহাদের নিকট চরণ ধরিয়া আমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছি—

"বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর
এ দাসে করুণা করি'।
দিয়া পদছায়া শোধহ আমারে
তোমার চরণ ধরি।।
ছয় বেগ দমি' ছয় দোষ শোধি,
ছয় গুণ দেহ দাসে।
ছয় সৎসঙ্গ দেহ হে আমারে
বসেছি সঙ্গের আশে।।

ভজনের মূল প্রতিবন্ধক কি?

প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়। সুতরাং মানবের বা বদ্ধজীবের সম্বল যাহা কিছু, তাহা সকলই প্রকৃতি হইতে সঞ্জাত বা প্রকৃতির বিকৃতি। তাই মানবের চিন্তা মানবের বুদ্ধি-অহঙ্কার প্রকৃতি ব্যতীত অন্য কিছু ভাবিতে পারে না। মানব প্রকৃতিকেই শ্রেষ্ঠ বা পূজ্যা জ্ঞানে তাহার আরাধনায় নিযুক্ত হইয়া থাকে। কখনও প্রকৃতিকে 'ঈশ্বর' মনে করিয়া ভুক্তিকামী হয়। প্রকৃতির নিকট ধন, জন, যশঃ কামনা করিয়া থাকে; কখনও বা প্রকৃতিকে জগৎকর্ত্রীরূপে কল্পনা করিয়া চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বের সংখ্যা করিয়া থাকে, কখনও বা প্রকৃতির বৈচিত্র্যে অতৃপ্ত হইয়া প্রকৃতি-লয়কেই বহুমানন করে। আবার প্রকৃতিজাত-জ্ঞানে বিতাড়িত হইয়া প্রাকৃত-অনুমান-প্রমাণ-বলে অপ্রাকৃত বস্তুতে প্রাকৃতত্ব সন্দেহ করে এবং তৎফলে অপ্রাকৃত-ধারণায় অসমর্থতা-নিবন্ধন অপ্রাকৃত বস্তুকেও প্রকৃতির অন্তর্গত মনে করিয়া 'জগন্মিথ্যা', অপ্রাকৃত-নামরূপ—'অসত্য' বা অচিরস্থায়ী, পরাপ্রকৃতি অর্থাৎ শুদ্ধজীবস্বরূপের নিত্য সত্ত্বার নিত্য অধিষ্ঠান নাই, এইরূপ ভ্রান্ত কল্পনা করিয়া প্রচ্ছন্ন-প্রকৃতি-লয়বাদ বা নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রবাদের আবাহন করিয়া থাকে।

পূর্ব্বমীমাংসা এই অসীম শক্তিশালিনী প্রকৃতিরর মোহে অবস্থিত হইয়াই প্রাকৃত কর্ম্মজড়বাদরূপ শৃঙ্খলে প্রাকৃত মানবকে আবদ্ধ করিতেছে, বৈশেষিকের অণু-পরমাণু-বিচার বা গৌতমের ষোড়শপদার্থের আলোচনা, সাংখ্যের চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব এবং তাঁহারই ঘনিষ্ঠ মিত্র পাতঞ্জল এই প্রকৃতি-সুন্দরীর রূপমোহ দর্শনেই ব্যস্ত।

আবার প্রাকৃত-সহজিয়াকুল "অপ্রাকৃত" কথাটী মুখে বলিয়াও প্রকৃতির প্রভাব হইতে রক্ষা পাইতে পারে নাই। কারণ তাহারা প্রকৃতিজাত মনকে সম্বল করিয়াই অপ্রাকৃত কথা বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে।
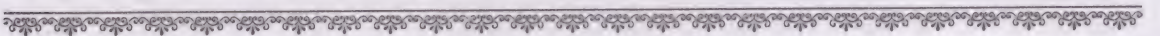
শুদ্ধ অপ্রাকৃত নবীনমদনের তোষণ ব্যতীত জগতে যাহা কিছু 'নানা মত নানা পথ', তাহা সমস্তই প্রকৃতিজাত ধারণা বা মনোধর্ম্মের বৈচিত্র্য। অপ্রাকৃত-রাজ্যে যে প্রকার অপ্রাকৃত বস্তুর রস-চমৎকারিতা বিস্তারের জন্য অপ্রাকৃত-বৈচিত্র্য বর্ত্তমান, তদ্রূপ অপ্রাকৃত রাজ্যের হেয় ও বিকৃত-প্রতিফলন-স্বরূপ প্রাকৃত রাজ্যেও এই সকল প্রাকৃত-বৈচিত্র্য বিরাজিত রহিয়াছে। প্রকৃতির অন্তর্গত একাদশেন্দ্রিয় দ্বারা পরিচালিত ও লব্ধজ্ঞান জীব এই সকল প্রকৃতি-বৈচিত্র্যকে 'প্রাকৃত' বলিয়া ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়া উহাদিগের প্রাকৃত সামঞ্জস্য বা সমন্বয়বিধানের জন্য 'চিজ্জড়-সমন্বয়-বাদ-রূপ' একটী মতবাদ আশ্রয়পূর্ব্বক 'প্রকৃতিলয়' প্রাপ্ত হইবার আশা পোষণ করে।

প্রকৃতি জীবের ইন্দ্রিয়ের উপর এতদূর প্রভাব-বিস্তারিণী-শক্তি-বিশিষ্টা যে, সে অপ্রাকৃত বস্তুকেও 'প্রাকৃত' করিয়া দেখিতে চায়। প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়গ্রামে অপ্রাকৃত বস্তুর ধারণা-যোগ্যতা নাই, একথা প্রাকৃত জীব বুঝিয়াও বুঝে না। শ্রীভগবানের অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ নিত্য শ্রীবিগ্রহ হইতে প্রাকৃত লোকের নিকট ভগবানের বিরাট্ ও ভূমারূপ অধিক আদরের। শ্রীগীতার একাদশ অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া যে বিরাট্ রূপ প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহা 'প্রাকৃত'; কিন্তু জগতের প্রাকৃত লোকের ধারণায় তাহাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিজ্ঞাত। স্বভাবকবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ প্রকৃতিতে সমাধিস্থ হইবার কথা তাঁহার প্রাকৃত কবিতার মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আধুনিক প্রকৃতিবাদিগণ উক্ত কবিবরকে একজন বড় আস্তিক ও ঈশ্বরপরায়ণ বলিতে ব্যস্ত হইয়াছেন।

পাশ্চাত্য দেশের বহু কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিকগণের উপর এরূপ প্রকৃতির আধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায়। ফ্রান্সদেশের কম্‌টির মতে মানব পরোপকারপর হইয়া নিঃস্বার্থ ধর্ম্ম যাজন করিবে। মানবের অন্তঃকরণের বৃত্তির আলোচনা-ক্রমে ঐ বৃত্তির পরিপুষ্টিসাধন করাই 'ধর্ম্ম'। তাহার পরিপুষ্টিসাধন করিতে হইলে একটী মনঃকল্পিত (প্রাকৃত) বিষয় অবলম্বন পূর্ব্বক একটী শ্রীমূর্ত্তি পূজা করা কর্ত্তব্য। বিষয়টী মিথ্যা হইলেও তাহা দ্বারা প্রবৃত্তির চরিতার্থতা লাভ হয়। পৃথিবীই তাঁহার মহত্তত্ত্ব (Supreme Fetich) দেশই তাঁহার কার্য্যাধার, (Supreme Medium) মানব প্রকৃতিই তাঁহার প্রধান সত্ত্বা, Supreme being । হস্তে একটী শিশু লইয়া একটী স্ত্রীমূর্ত্তি যেন সুপ্রসন্ন দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া আছেন, এইরূপ ভাবে প্রাতে, মধ্যাহ্নে এবং সায়ংকালে তাঁহার পূজা বিধান করিবে। এইরূপ চিন্তাস্রোত যে ঐ comteতেদেখিতে পাওয়া যায় তাহা নহে; কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যরহিত হইয়া জননী জন্মভূমির পূজা, স্বদেশহিতৈষিতা প্রভৃতি যাহা কিছু, সমস্তই প্রকৃতি-পূজা।

প্রকৃতিজাত দেহ ও মনের দ্বারা পরিচালিত মানব মাত্রেই এইরূপ চিন্তাপ্রণালীকে নানা ভাবে প্রকাশিত করিয়া তাহাকেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া কল্পনা ও প্রচার করে। বেদান্তে প্রকৃতিবাদীকে ''স্মার্ত্ত'' বলা হইয়াছে। কর্ম্মজড়, স্মার্ত্তবাদ ও প্রকৃতিবাদে কোনও ভেদ নাই।

এই প্রাকৃত চিন্তাস্রোত বা প্রকৃতিজাত ইন্দ্রিগ্রাহ্য মর্ত্ত্য জ্ঞানই আমাদের ভ নের মূল শত্রু। এই প্রাকৃতজ্ঞানই ভিন্ন ভিন্ন বৈচিত্র্যে প্রকাশিত হইয়া আমাদিগকে আত্মধর্ম্ম—চিৎপ্রকৃতির স্বভাবজ ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিয়া

থাকে। তাই অপ্রাকৃত-সহজধর্ম্ম বা শুদ্ধা ভক্তির গ্রাহক কোটীর মধ্যেও একটী পাওয়া দুর্ল্লভ, আর প্রাকৃত সহজধর্ম্মের গ্রাহক আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেই।

এই প্রকৃতি আমাদিগের দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ বিবর্ত্ত উপদেশ করিয়া আমাদিগকে 'পুরুষ' বা 'স্ত্রী' বলিয়া ধারণা করায়, তখন আমরা পরাপ্রকৃতি অর্থাৎ গীতোক্ত শুদ্ধ সনাতন-জীবস্বরূপের নিত্য স্বভাব বা শ্রীল সনাতন প্রভুর শিক্ষোদ্দিষ্ট সনাতন ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হইয়া পড়ি। প্রকৃতিই—আমাদিগকে আমাদের বিরূপাবস্থা হইতে স্বরূপাবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইতে বাধা প্রদান করে।

প্রকৃতির প্রভাবে পরাভূত হইয়া কখনও আমরা পরাপ্রকৃতি শুদ্ধ জীবস্বরূপের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করিতে ধাবিত হই এবং অপ্রাকৃত-প্রকৃতির বৈচিত্র্যকে প্রপঞ্চের অন্যতম বলিয়া কল্পনা করি। তখন আমরা অপরাধময় নির্ব্বিশেষ কেবলাদ্বৈতবাদী হইয়া শুদ্ধাদ্বৈতবাদীর তদীয় সর্ব্বস্ব অদ্বয়জ্ঞান, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর শক্তি-সিদ্ধান্ত, শুদ্ধ-দ্বৈতবাদীর অপ্রাকৃত বিচার হইতে দূরে সরিয়া পড়ি। সুতরাং অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সত্যের অচিন্ত্যত্ব অর্থাৎ অপ্রাকৃতত্ব বা অধোক্ষজত্ব আমাদের উপলব্ধির বিষয় না হওয়ায় আমরা বেদান্তৈক প্রতিপাদ্য সত্যকেও বহু মতবাদের অন্যতম 'বাদ' বলিয়া নিরস্ত হই।

অপরা প্রকৃতিই পরাপ্রকৃতি বা জীবের উপর আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয় আনয়ন করিয়া জীবের অপ্রাকৃত জ্ঞানোদয়ের শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং জীবের জড়োন্মুখী রতি উৎপাদন করিয়া জড়ীয় বিভাব-অনুভাব-সাত্ত্বিক ব্যভিচারী-সামগ্রী-চতুষ্টয়ের মিলনে ঐ রতিকে জড়ীয় রসতার অবস্থায় আনয়ন করিয়াছে। আমরা জগৎকে ভগবৎসেবোপকরণ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কখনও ফলভোগ কামনা করিয়া অন্যাভিলাষী ও কর্ম্মী হইয়া পড়িতেছি, কখনও বা ফলত্যাগ কামনা করিয়া জগন্মিথ্যাত্ব প্রচারপূর্ব্বক নির্ব্বেদজ্ঞানী প্রভৃতি হইতেছি। সুতরাং প্রকৃতিই আমাদের ভজনের মূল প্রতিবন্ধক। অপ্রাকৃতবৈষ্ণব ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ প্রভু আমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য গাহিয়াছেন,—

সংসারে আসিয়া, প্রকৃতি ভজিয়া,
পুরুষাভিমানে মরি।
কৃষ্ণ দয়া করি, নিজে অবতরি,
বংশীরবেনিল হরি'।।
এমন রতনে, বিশেষ যতনে,
ভজ ভজ অবিরত।
বিনোদ এখনে, শ্রীকৃষ্ণ চরণে,
গুণে বাধা সদা নত।।

প্রকৃতিতে অভিনিবিষ্ট হওয়াতেই আমাদের স্বরূপ বিস্মৃতি ঘটিয়াছে। পরাপ্রকৃতিপতি শ্রীগৌরসুন্দর জগজ্জীবকে স্বরূপ-বিভ্রান্তি হইতে উদ্ধারার্থ নিজকে অদ্বিতীয়া প্রকৃতির কিঙ্করী জানাইয়া অদ্বিতীয় পুরুষোত্তম

শ্রীব্রজরাজকুমারের সেবা শিক্ষা দিয়াছেন। ছোট হরিদাসকে লক্ষ্য করিয়া জগজ্জীবকে জানাইয়াছেন (চৈঃ চঃ অন্ত ৪র্থ),—

বৈরাগী হঞা করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারো আমি তাহার বদন।।
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন।।

শ্রীল সনাতন প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া জগজ্জীবকে বৈষ্ণবের অপ্রাকৃতত্ব শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ),—

"অপ্রাকৃত দেহ তোমার প্রাকৃত কভু নয়।"

* * * *

"ভদ্রাভদ্র জ্ঞান নাহি অপ্রাকৃতে।।

* * * *

বৈষ্ণবদেহ প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময়।।
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্ম-সমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম।।
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়।।"

মঠবাসীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার

মঠন্তি বসন্তি ছাত্রাঃ যস্মিন্ ইতি মঠঃ। যাহাতে পরমার্থশিক্ষার্থিগণ আচার্য্যের অনুগত হইয়া বাস করেন, তাহাই মঠ। মঠ ও সাধারণ গৃহের সহিত পার্থক্য এই যে, গৃহ—ভোগাগার, আর মঠ—হরিসেবাগার। যেখানে ভোগপ্রাবল্য, সেখানেই স্ব-স্ব-প্রাধান্য-স্থাপনের প্রয়াস; আর যেখানে অকৃত্রিম হরিসেবার পারিপার্শ্বিকতা, সেখানেই পূর্ণ আনুগত্য-ধর্ম্ম বর্ত্তমান।

মঠ—ভোগিমঠ, ত্যাগিমঠ ও ভক্তিমঠ-ভেদে ত্রিবিধ; বস্তুতঃ ভোগিমঠ 'মঠ' পদ-বাচ্য নহে। দারী-সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের যে সকল ভোগবর্দ্ধনমঠ ভোগের গুপ্তাগাররূপে বিরাজিত, তাহা 'মঠ' শব্দের ব্যভিচার মাত্র। সূক্ষ্মবিচারে ত্যাগিমঠ ও প্রাকৃত নির্গুণমঠের তাৎপর্য্য হইতে ন্যূনাধিক ভ্রষ্ট। আনুগত্য-ধর্ম্মই মঠের
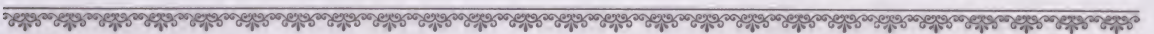
প্রাণ; তাহা নির্ব্বেদ-জ্ঞান-চেষ্টার মধ্যে অকৃত্রিমতা ও নিত্যতা রক্ষা করিতে পারে না বলিয়া অনেকে জ্ঞানিমঠকে প্রকৃত 'মঠ' শব্দে অভিহিত করিতে প্রস্তুত নহেন।

অনেকের ধারণা 'মঠ' শব্দটি জ্ঞানি-সম্প্রদায়ের নিকট হইতেই কোন কোন ভক্তসম্প্রদায় ধার করিয়াছেন, বস্তুত তাহা নহে; পারমার্থিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বিষ্ণুর সেবালয়কেই অতি প্রাচীন-কালে 'মঠ' শব্দে অবিহিত করা হইত। আচার্য্য শঙ্করের চারিটি * মঠস্থাপনের বহু পূর্ব্ব হইতে বৈষ্ণবাচার্য্য আদি বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের মঠ বিরাজিত ছিল।

আনুগত্যধর্ম্মই ভক্তির মেরুদণ্ড বা ভক্তির নামান্তর। অতএব আচার্য্যানুগত্য ভক্তিমঠেই সর্ব্বতোভাবে সংরক্ষিত হয়।

ভোগাগার সমাজ বা গৃহের মধ্যেও আনুগত্যের একটি বিকৃত প্রতিচ্ছবি আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করিতে পারি, তাহার কারণ কোনও প্রধানের আনুগত্য না থাকিলে ভোগের সৌকর্য্য সাধিত হইতে পারে না—সমস্তই লণ্ড ভণ্ড হইয়া যায়। এজন্যই গৃহবাসিগণ বিশিষ্ট গৃহপতি বা কর্ত্তার অধীনে বা অনুশাসনে অবস্থিত হইয়া স্ব-স্ব-ভোগ আহরণ করিয়া থাকে।

মঠে আচার্য্যের প্রতি আনুগত্যধর্ম্ম যদি সেইরূপ কৃত্রিম আনুগত্য বা আনুগত্যের বিকৃত ছায়া হয়, তাহা হইলে তাহা মঠবাসীকে (?) বহির্ম্মুখ গৃহবাসীরই অন্যতম বা প্রচ্ছন্ন ভোগী গৃহবাসী করিয়া তোলে।

মঠবাসীর অপর নাম—অন্তেবাসী, শিক্ষার্থী বা শিষ্য। তাঁহারা আচার্য্য বা গুরুপদাস্তিকে বাস করিয়া আচার্য্যের অভীষ্ট সেবা শিক্ষা করেন। আচার্য্য-সেবাই ব্রহ্মচর্য্য, আচার্য্য-সেবাই মঠবাসীর সন্ন্যাস, আচার্য্য-সেবাই মঠবাসীর বনে প্রস্থান, আচার্য্য-সেবাই মঠবাসীর প্রকৃত গার্হস্থ্য।

আচার্য্য-সেবায় কৃত্রিমতা প্রবেশ করিলে মঠ-বাস হয় না। ব্রহ্মচর্য্য, সন্ন্যাস, বানপ্রস্থ ও গার্হস্থ্যধর্ম্মও রক্ষিত হইতে পারে না। ফলের দ্বারা যেরূপ কারণ অনুমিত হয়, তদ্রূপ কে কি পরিমাণ মঠবাসী, তাহাও আচার্য্যসেবার অকৃত্রিমতার কষ্টিপাথরে ধরা পড়ে। মনুষ্যের চক্ষে ধূলা দেওয়া যায়, ধাপ্পা দিয়া জগতের লোকের মুখও সাময়িক ভাবে বন্ধ করা যায়, কিম্বা নানা চাল চালিয়া বাহিরের সাজসজ্জা রক্ষা করা যায়; কিন্তু ভাবের ঘরে চুরি করিয়া ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনকে ঠকান যায় না, তাঁহাকে ঠকাইতে গেলে কামারকে ইস্পাত ঠকাইবার ন্যায় নিজেই ঠকিতে হয়।

নির্গুণ হরিসেবা-নিকেতন মঠে যে কেবল ব্রহ্মচারিগণই বাস করেন, তাহা নহে; আচার্য্য-সেবা-পরায়ণ সংযত গৃহস্থগণও তথায় অনুক্ষণ বা সাময়িকভাবে বাস করিতে পারেন, তবে গৃহস্থগণ যদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মঠের দ্বারা তাঁহাদের কেবল সাংসারিক জীবনের সুবিধা বা লাভ উঠাইয়া লইবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে মঠবাসীর পরিবর্ত্তে মঠভোগী বলা যাইবে। সাংসারিক ব্যয় বাঁচাইবার জন্য মঠে

* শ্রীশঙ্করাচার্য্য তাঁহার চারিটি শিষ্যদ্বারা ভারতের উত্তরে বদরিকায়—জ্যোতির্ম্মঠ, পুরুষোত্তমে—ভোগবর্দ্ধন বা গোবর্দ্ধনমঠ, দ্বারকায়—সারদামঠ এবং দাক্ষিণাত্যে—শৃঙ্গেরিমঠ স্থাপন করেন।

বাস কিংবা মঠের হরিসেবার অর্থের দ্বারা নিজের বা দৈহিক আত্মীয়-স্বজনের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সুখসুবিধা অথবা আখেরের বন্দোবস্ত করিবার বুদ্ধি উদিত হইলে মঠভোগ হইয়া যায়। হরিসেবা-সম্পর্কে মঠের সহিত যে সকল জাগতিক সম্মানিত বা আঢ্য ব্যক্তির পরিচয় আছে, মঠবাসের অভিনয়কারী গৃহস্থব্যক্তি যদি সেই সকল পরিচয়ের অবৈধ সুযোগ লইয়া তদ্দ্বারা ব্যক্তিগত সাংসারিক বা বৈষয়িক জীবনের উন্নতি-সাধনে যত্নবিশিষ্ট হন বা ঘুণাক্ষরেও হৃদয়ের অন্তরালে সেইরূপ সাহায্যের প্রত্যাশা পোষণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে মঠবাসী না বলিয়া মঠভোগী বলা সমীচীন নহে কি? হয়ত' কোন কোন স্থানে এইরূপ দৃষ্টান্তও চক্ষে পতিত হইতে পারে যে, আচার্য্যের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্দেশ মতে মঠবাসী গৃহস্থের কেহ কেহ, এমন কি তাঁহাদের স্বজনবর্গও মঠের সাহায্যে ন্যূনাধিক পরিপুষ্ট বা প্রতিপালিত হইতেছে। ঐরূপ দৃষ্টান্ত কোন গভীর ও গুহ্য উদ্দেশ্য-যুক্ত কিনা, তাহা না জানিয়া অপরের পক্ষে ঐরূপ দৃষ্টান্তের অনুকরণ বা উহার নজির দেখাইয়া ব্যক্তিগত সাংসারিক বিষয়ে সমৃদ্ধি-লাভের জন্য দাবী করা মঠবাসী হরিসেবকের কর্ত্তব্য নহে। তাহা মঠভোগেরই প্রয়াস।

মঠবাস করিতে করিতে এরূপ প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তসকলও আমাদের চক্ষে আসিয়া পড়িতে পারে, যাহা হয়ত' আমাদের আধ্যক্ষিকতার নিকট অত্যন্ত বিপ্লবী ও অসহনীয় বলিয়া বোধ হইবে। যদি সে-স্থানে আমাদের আধ্যক্ষিকতা সেবাব্রতের সুদৃঢ় কেন্দ্র পরিত্যাগ করিয়া গণগড্ডলিকার সহিত মৎসরতার জহরব্রতে ঝাঁপাইয়া পড়ে, তাহা হইলে তথাকথিত ন্যায়পরায়ণতার নামে সেবাময় প্রাণকে হারাইয়া ফেলিতে হইবে। এজন্য এরূপ সঙ্কটে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। আমার পারিপার্শ্বিকতার সমস্ত বিপর্য্যস্ত হউক, জগতের সমস্ত লোক স্বতন্ত্র হইয়া পড়ুক, তথাপি আমি আমার সেবাব্রত পরিত্যাগ করিব না, যিনি এইরূপ ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞার বহ্নি ব্রহ্মাগ্নির ন্যায় সর্ব্বদা হৃদয়ে জ্বালাইয়া রাখিতে পারেন, তিনিই এই জগতের মায়াযুদ্ধে জয়ী হন, তিনিই সত্য সত্য নিত্য মঠবাসী থাকিতে পারেন ও মঠবাসী থাকিয়া আচার্য্যের কৃপা-কেতন রূপে উড্ডীন হইয়া থাকেন।

মঠবাসীর সহিত নিষ্কিঞ্চন নির্জ্জনবাসী বা বৃক্ষতলবাসীর পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য এই যে, মঠবাসী বিধি ও অনুশাসনের বশবর্ত্তী হইয়া আচার্য্য-সেবা করিতে করিতে নিজমঙ্গল লাভ করেন; নির্জ্জনবাসী সেরূপ কোন অনুশাসনের বশবর্ত্তী হন না।

মঠে অসংখ্য অধিকারের অসংখ্য প্রকার ব্যক্তি বাস করেন, তাঁহারা হয়ত' অনেকেই অনর্থরোগ উপশমের জন্য পারমার্থিক হাসপাতালে ভর্ত্তি হইয়াছেন। হাসপাতালের খাতায় তাঁহাদের নাম রেজিষ্ট্রি হইয়াছে বলিয়াই যে তাঁহারা সকলেই সমান অধিকারী, এরূপ কল্পনা করা অযৌক্তিক। বিভিন্ন অধিকারের লোক দেখিয়া শঙ্কাযুক্ত হইলে কখনও আমি আরোগ্য লাভ করিতে পারিব না।

প্রত্যেকেই আচার্য্যসদ্‌বৈদ্যের দ্বারা চিকিৎসিত হইবার যত্ন করিবেন, নিজের মঙ্গলের প্রতি নিজে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিবেন; অপরের ছিদ্র দর্শন বা অনুসন্ধান করিলে নিজের রোগ ত' সারিবেই না বরং উহার ভাবনা ভাবিতে

ভাবিতে নিজের মধ্যে সেই নিন্দিত রোগই সংক্রামিত হইয়া পড়িবে। অপরের ব্যাধি বা ছিদ্রের নিন্দা না করিয়া যিনি যে বিষয়ে যতটুকু সুস্থ, তিনি ততটুকু সেই বিষয়ে অপরকে সদ্ভাবে, অকপটে ও অকৃপণতার সহিত সাহায্য করিবেন। যদি সাহায্য না করেন, তবে তিনি কিছুতেই নিরপেক্ষ থাকিতে পারিবেন না; তাঁহাকে ক্রমে ক্রমে ছিদ্রানুসন্ধিৎসু, না হয় সেই রোগের রোগী করিয়া ফেলিবে। সঙ্ঘারামে বহুব্যক্তি হরিসেবায় পরস্পর সাহায্য লাভ করিবার জন্য এক সদ্‌বৈদ্যের অধীনে বাস করিতেছেন, সেখানে যদি পরস্পরের মধ্যে অকৃত্রিম সহানুভূতি না থাকে, তাহা হইলে একজনের মঙ্গলে আর একজনের মৎসরতার উদয় করাইয়া পরস্পরের মধ্যে কেবল মনোমালিন্য ও প্রচ্ছন্ন শত্রুতার 'নালিঘা'র সৃষ্টি করিবে।

অনেক সময় হয় ত' মঠবাসিগণের মধ্যে কোন সতীর্থ অজ্ঞতাক্রমে কোন ত্রুটি বা ভক্তিবিরুদ্ধ কার্য্যই করিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহার ঐরূপ কার্য্যকে কেবলমাত্র প্রতিকূল সমালোচনার পেষণীযন্ত্রে পুনঃ পুনঃ পিষ্ট-পেষণ করিতে করিতে অতিরিক্ত তিক্ত বা তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে ঐ বিষয়ের গুপ্তসমালোচনায় আনন্দভোগ না করিয়া সদুদ্দেশ্য ও সরলতার সহিত মিষ্টবাক্য অথচ যাহাতে তাঁহার হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করিতে পারে, এইরূপ সদ্‌যুক্তির সহিত সৎসিদ্ধান্তটি বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক এবং প্রয়োজন হইলে তাহা কৃপাপূর্ব্বক নিজের আচরণে প্রতিফলিত করিয়া তাঁহাকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। পারমার্থিক শিক্ষামন্দিরের শিশুগণের নিসর্গগত ত্রুটি, বিচ্যুতি এমন কি অপরাধসমূহের প্রতি সকল সময়ই অসহনীয় লগুড়াঘাত, ব্যঙ্গ-বাক্যবাণ-প্রয়োগ কিংবা উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে তাঁহাদের প্রতি অধিকারোচিত দয়া-প্রদর্শন করিলে তাঁহাদের প্রতি অধিকারোচিত দয়া-প্রদর্শনে যে কৃপণতা করা হইবে, তৎফলে তাঁহাদিগকে ভবিষ্যতে বিদ্রোহী মঠবাসী হইবার সাহায্য করা হইবে মাত্র।

মঠায়তনরূপ প্রতিষ্ঠানকে একটি পূর্ণাঙ্গ পুরুষের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। মঠের বিভিন্ন নির্ম্মল ও সুস্থ অঙ্গ লইয়া সম্পূর্ণ মঠায়তনটি রচিত হইয়াছে। আচার্য্যপাদপদ্ম মঠায়তনের ভুবন-মঙ্গল অতিমর্ত্ত্য মস্তিষ্ক-স্বরূপ। মস্তিষ্কের দ্বারাই সমস্ত অঙ্গ নিয়মিত ও সমস্ত অঙ্গে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হইয়া থাকে। মস্তিষ্ককে বিচ্ছিন্ন করিলে অতীব শোভন অঙ্গেরও কোনই মূল্য বা সার্থকতা থাকে না; আবার মস্তিষ্ককে সংযুক্ত রাখিয়াও অন্যান্য ইতর বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে অযথা উপেক্ষা বা অনাদর করিলে মস্তিষ্কের সেবা-সাধক অঙ্গসমূহের অবমাননা করায় মস্তিষ্কেরই সেবায় বিঘ্ন উৎপাদন করা হয়। তাই যাঁহার আচার্য্যের প্রতি বিন্দুমাত্রও অকৃত্রিম অনুরাগ আছে, তিনি কোন মঠবাসীকেই, অধিকারে যিনি যতই ক্ষুদ্র বা নগণ্য হউন, উপেক্ষা, অনাদর, অপ্রীতি, হিংসা, দ্বেষ বা মৎসরতার চক্ষে দেখিতে পারেন না। 'কনিষ্ঠ'কে 'পাপিষ্ঠ' মনে না করিয়া তাঁহাকে স্নেহ ও উপদেশাদি দ্বারা আদর প্রদর্শনপূর্ব্বক মঠায়তনের শিরঃস্বরূপ শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সেবায় অধিকতর সংলগ্ন ও গরিষ্ঠ করিবার চেষ্টা করিবেন।

কনিষ্ঠকে সাধারণ 'খিদ্‌মদ্‌গার' মনে করিলে কিংবা কার্য্য-কলাপে সেই সম্বন্ধটি মাত্র বজায় রাখিলে অথবা সেই সম্বন্ধ সংরক্ষণের জন্য কপটতার সহিত তাঁহাকে তোষামোদ করিলে কনিষ্ঠের প্রতি (কৃত্রিম)

আদরের নামে যে গুপ্ত হিংসা-বহ্নি ধূমায়িত করা হইবে, তাহা ক্রমে ক্রমে ধূমায়িত অবস্থা হইতে প্রজ্জ্বলিত ব্যাপক অবস্থা লাভ করিতে পারে। কাজেই যাঁহারা লোক-শিক্ষকের গুরুভার গ্রহণ করিয়াছেন, পরমার্থ-শিক্ষামন্দিরের শিশুগণকে সর্ব্বাগ্রে শিক্ষা-প্রদানের ভার তাঁহাদের উপরই ন্যস্ত। হয়ত' এস্থানে একটি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, কনিষ্ঠগণের শিক্ষাভার কোন ব্যক্তি-বিশেষের উপর স্থায়িভাবে নিযুক্ত না হওয়ায়, অনুক্ষণ পট-পরিবর্ত্তনের মধ্যে তাহা অস্থির হইয়া পড়ায় ও সময় সময় বিভিন্ন মতাবলম্বীর নিয়ামকত্ব অনধিকার-প্রবেশ করায় কনিষ্ঠগণের শিক্ষার গতি উন্মার্গগামী ও যোগভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। কিন্তু যদি আমাদের সকলের উদ্দেশ্য এক তাৎপর্য্যপর ও নির্ম্মল হয়, তবে বিভিন্ন হস্তচালনা, পরিবর্ত্তনশীলতা ও বিভিন্ন নিয়ামকত্বের মধ্যেও আমরা শিক্ষিত ও শিক্ষক হইতে পারি। সেখানে শিক্ষকের অভিমানেও নিত্য শিক্ষার্থীর অভিমান হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয় না—"মঠন্তি বসন্তি ছাত্রাঃ যস্মিন্"—এই কথাটি সর্ব্বদাই হৃদয়ে দেদীপ্যমান থাকে।

'আমি শিক্ষার্থী নহি, অদ্বিতীয় শিক্ষক, আমি সব জানি'—এইরূপ অভিমান মঠবাসীর অভিমান নহে। মঠবাসী এরূপ আদর্শ আচরণ করিবেন, যাহাতে তাঁহার প্রত্যেকটি আচরণই পরস্পরের শিক্ষার সহায়তা করে, পরস্পরের সঙ্গ পরস্পরের বাঞ্ছনীয়, পরস্পরের যথাযোগ্য অনুশাসন ও সম্মান অনুক্ষণ প্রার্থনীয় হয়; আর যদি পরস্পরের আচরণ ও ব্যবহার পরস্পরের শিক্ষার আদর্শের উপকরণ প্রদান না করিয়া কেবল প্রতিকূল সমালোচনার ইন্ধন সরবরাহ করে, পরস্পরের সঙ্গ পরস্পরের কামনার বস্তু না হইয়া বিষের ন্যায় অবাঞ্ছনীয় হয়; পরস্পরের অনুশাসন ও অভিনন্দন আন্তরিক প্রার্থনীয় বিষয় না হইয়া কেবল কপটতা ও কৃত্রিমতাগর্ভ জ্বালাময় দুঃসহনীয় ব্যাপার হইয়া পড়ে, তাহা হইলে জানিতে হইবে, আমরা আচার্য্যসেবার তাৎপর্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি; আমরা আর মঠবাসী নহি,—গৃহান্ধ-কূপবাসী হইতেও অধিকতর মণ্ডূকতাধর্ম্মে আচ্ছন্ন হইয়াছি। আমাদের বাগ্‌বৈখরী কেবল ভেকের কলরবের ন্যায় স্ব-স্ব-মৃত্যুবরণের পাথেয় মাত্র, আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রুত মানবজীবনের পরম পাথেয় হরিকীর্ত্তনকে হারাইয়া ফেলিয়াছি।

প্রত্যেক মঠবাসীই শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবক অপর মঠবাসী বা স্বমঠবাসীর প্রতি সর্ব্বতোভাবে যথাযোগ্য সহানুভূতিসম্পন্ন হইবেন। কোন মঠসেবক আমার অধীনস্থ বা আমার সাক্ষাৎ প্রয়োজন-সাধক নহেন বলিয়া তাঁহার দিকে আমি আদৌ তাকাইব না, এমন কি পিপাসায় তাঁহাকে এক গণ্ডূষ জলও প্রদান করিব না, করিলে আমাকে অনর্থক অতিরিক্ত বোঝা ঘাড়ে লইতে হইবে, হয়ত' সে বোঝা বহনের পারিশ্রমিক প্রতিষ্ঠাটুকু আমি আমার উপরওয়ালাদের নিকট হইতে পাইব না—এইরূপ বিচার করিয়া অপরের প্রতি সহানুভূতিহীন হইলে প্রত্যেক কার্য্যেই আমাকে সেবার পরিবর্ত্তে প্রতিষ্ঠাশা-পারিশ্রমিক চয়ন করিয়া বেড়াইতে হইবে। প্রত্যেকেই যদি এইরূপ প্রত্যেক কার্য্যে সেবার পরিমাণের পরিবর্ত্তে প্রতিষ্ঠাশার পরিমাণের খতিয়ান খুলিয়া বসেন, তবে মঠবাসীকে (?) ভোগান্ধ গৃহবাসী অপেক্ষাও অধিকতর দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষপূর্ণ করিয়া তুলিবে। ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ গৃহদ্বন্দ্বের দ্বারা ব্যষ্টি বা সমাজের যে অহিত-সাধন ও কলঙ্কের প্রচার হয়, মঠবাসিগণের মধ্যে দ্বন্দ্বোৎপত্তিতে তাহা অপেক্ষা কোটিগুণে অধিক ক্ষতি হইয়া থাকে। অহৈতুক সেবাব্রতগ্রহণকারিগণের

মধ্যেও যদি প্রতিষ্ঠা-ঘুষ না হইলে কেহই তৃণভঙ্গ না করেন, তবে সেরূপ ঘুষের রাজ্যে চরম পরস্পর ঘুষাঘুষি করিতে করিতে যদুবংশ ধ্বংস হইয়া যায়।

অনেক সময় মঠবাসীর অভিমান করিয়া যদি আমরা প্রাকৃত পরার্থিতা বা altruism-এর নিন্দা করিতে করিতে উহাকে মঠবাসিগণের প্রতি অতিব্যাপ্ত করিয়া ফেলি অর্থাৎ মঠ-সেবকগণের সেবা করিলে কর্ম্মমার্গ হইয়া যাইবে বিচার করি, আবার যাঁহার প্রতি সেবার ভান দেখাইলে অনেক কিছু প্রতিষ্ঠা ঘুষ পাওয়া যাইবে, তাঁহাকে এরূপভাবে সেবা (?) করিতে আরম্ভ করি যে, তিনি যুগপৎ সকলের সেবাভারে অতিষ্ঠ হইয়া পড়েন, তাহা হইলে ঐরূপ উভয় প্রকার ভোগবুদ্ধি ও কৃত্রিমতার নিকট হইতে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাদেবী চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিবেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, আনুগত্য-ধর্ম্ম মঠবাসের মেরুদণ্ডস্বরূপ। মঠবাসীর দৈনন্দিন আচরণের কোনটিই আনুগত্য ধর্ম্মকে পরিহার করিবে না। কি প্রসাদ-সম্মান-কালে, কি হরিকথা-শ্রবণ-সময়ে, কি হরিকথা-প্রচারের কালে—সকল সময়ই আনুগত্য-ধর্ম্ম মঠবাসিগণের চরিত্রের ভূষণ-রূপে প্রকাশিত থাকিবে। মঠবাসী বৈধীভক্তিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া স্ব-স্ব-ভোগ-প্রাধান্য স্থাপন করিতে চাহিলে উচ্ছৃঙ্খলতার তাণ্ডব ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে হইতে মঠায়তনকে স্বেচ্ছাচারিতার ক্রীড়াভূমি করিয়া তুলিবে। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের ভোগের পরেই মঠবাসিগণ ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ করিবেন। ভগবৎপ্রসাদগ্রহণ-কালে প্রত্যেকেই অহংপূর্ব্বিকা নীতি (অর্থাৎ 'আমাকে অগ্রে দাও', 'আমাকে অগ্রে দাও' এইরূপ ব্যগ্রতা) প্রকাশ করিলে কিম্বা 'আমাকে উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি দাও' এইরূপ উৎকণ্ঠা বা স্বেচ্ছাপূর্ণা নীতি প্রকাশ করিলে প্রত্যেকেই পরস্পর ঐরূপ অনুকরণ করিতে করিতে এক মহাহট্টগোলের সৃষ্টি করিবে। কাহারও কাহারও হয় ত' 'বুক ফাটে ত মুখ ফুটে না' এই নীতি-জাত হৃদয়-উদ্বেগ হৃদয়েই থাকিয়া গিয়া ক্রমে ক্রমে গুপ্ত-বিদ্রোহ বাহিরে আগ্নেয়-গিরির সৃষ্টি করিতে থাকিবে এবং ঐরূপ বিদ্রোহী আগ্নেয় গিরিমালার পরস্পর সহৃদয় সম্মিলনে মঠায়তনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে নানাপ্রকারে শিথিল করিয়া তুলিবে।

হরিকথা-শ্রবণকালেও আমাদের আনুগত্যধর্ম্ম বিশেষ আবশ্যক। হয় ত' শ্রোতার কৃত্রিম সজ্জায় কাহারও নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতেছি, কিন্তু অন্তরে তাহার প্রতি অন্যরূপভাব পোষণ করি বা কাহারও হরিকথা কীর্ত্তনকালে ঐসকল কথা আমার জানা আছে মনে করিয়া ঐ সময় অন্য কোন হরিসেবার কার্য্যে সদ্ব্যবহার করিবার পরিবর্ত্তে গুল্‌তানিতে বা আরাম-প্রিয়তায় কাটাইয়া দেই, আমার এইরূপ আদর্শ অচিরেই সংক্রামক ব্যাধিতে পরিণত হইয়া বহু দুর্ব্বল মঠবাসীকে সহজেই আক্রমণ করিয়া বসিবে। হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় আনুগত্যধর্ম্মের অভাবেই এইরূপ গুল্‌তানিপ্রিয়তা আমাদিগকে আক্রমণ করে এবং ক্রমে ক্রমে সর্ব্বত্রই হরিকথা বা আত্মমঙ্গলের প্রতি অনাদর ঘটাইয়া থাকে।

অনেক সময় মঠবাসিসূত্রে যাহা প্রচার করি, তাহা শুনিতে আমার ব্যক্তিগতও আগ্রহ নাই, অন্যান্য তথাকথিত মঠবাসিগণেরও রুচি নাই, প্রচার-কার্য্যটি যেন বাহিরের লোকের জন্য, মঠবাসীর ব্যক্তিগত

জীবন বা ব্যষ্টিগত জীবনের তাহাতে কোন প্রয়োজন নাই। বস্তুতঃ যে কথা আমি নিজে শুনি না অর্থাৎ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করি না বা আমার সতীর্থগণকে শুনাইতে পারি না, তাহা বাহিরের লোক শুনিবে কেন? বাহিরের লোকের অজ্ঞতা, বোকামী বা সরলতার সুযোগ লইয়া তাহাদিগকে যে সাময়িকভাবে আমার কীর্ত্তনবাক্যে আস্থাবান্ করিবার চেষ্টা, তাহা যদি আমার ব্যক্তিগত চরিত্রে স্থায়িভাবে জীবন্ত আদর্শ-মূর্ত্তিতে প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে বাহিরের লোক আমার দ্বারাই কিছুদিন পরে চতুর হইয়া আমার বিদ্রোহী হইয়া পড়িবে। বস্তুতঃ যদি আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাস্তবসত্যকীর্ত্তনে একান্ত অকৃত্রিম আনুগত্যধর্ম্ম বিশিষ্ট হই, তাহা হইলে তাহাতে জগতে প্রত্যেক সরল, নিষ্কপট ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিবেন না।

সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা মর্য্যাদার সংরক্ষণ মঠবাসীর একটি প্রধান কর্ত্তব্য। মঠবাসিগণ পরস্পর যথাযোগ্য মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া অনুক্ষণ হরিসেবায় নিযুক্ত থাকিবেন। মর্য্যাদা কেবল যে উচ্চগামিনী তাহা নহে, তাহা নিম্ন ও উচ্চ উভয়দিক্‌গামিনী। ইহা ধ্বনি-প্রতিধ্বনির ন্যায় পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ যেরূপ ব্রহ্মচারিবৃন্দকে অথবা কনিষ্ঠগণকে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা-সম্বন্ধে প্রীতি, স্নেহ, আদর ও অকৃত্রিম শুভানুধ্যানের দ্বারা তাহাদের মঙ্গলকামনাময়ী মর্য্যাদা প্রদর্শন করিবেন, কনিষ্ঠগণও সেইরূপ সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ প্রভৃতি মঠবাসিগণকে অকৃত্রিম-শ্রদ্ধা ও প্রীতিময়ী মর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়া শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মের প্রতি স্ব-স্ব-অনুরাগের লক্ষণ প্রকাশ করিবেন।

অনেক সময় সামান্য বিষয় লইয়াই হউক বা কোন গুরুতর ব্যাপার লইয়াই হউক, মঠবাসিগণ যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্মুখে পরস্পর বাগ্‌বিতণ্ডা বা উচ্চবাচ্য করেন, তবে তদ্দ্বারা কেবল যে মঠবাসিগণের পরস্পরের প্রতি মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হয়, তাহা নহে; শ্রীগুরুপাদপদ্মকেও অবহেলা করা হয়। সেবাপরাধ-প্রসঙ্গে শ্রীভগবানের সম্মুখে পরস্পর বাগ্‌বিতণ্ডা বা উচ্চবাচ্য 'অপরাধ' রূপে গণিত হইয়াছে; সুতরাং মঠবাসিগণ যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্মুখে পরস্পর উচ্চবাচ্য বা বাগ্‌বিতণ্ডা করেন, তবে তাঁহারাও সেইরূপ অপরাধের ধূর বহন করিতে প্রস্তুত হইলেন।

অনেক সময় শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎভাবে সম্মুখে উপস্থিত নাই মনে করিয়া আমরা যদি মঠবাসিগণের অনুশাসন-সমূহ উল্লঙ্ঘন করি বা পরস্পর মতভেদ, সঙ্ঘর্ষ, স্বতন্ত্রতা, যথেচ্ছাচার প্রভৃতির প্রশ্রয় দেই, তাহা হইলে তদ্দ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মকে মর্ত্ত্য ও খণ্ডিত বস্তু কল্পনার অপরাধে আমাদিগকে পতিত হইতে হয়। শ্রীগুরুদেবের আলেখ্যকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে ভেদজ্ঞান কিংবা শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতিষ্ঠিত মঠায়তনে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুক্ষণ অস্তিত্ব নাই—এই মর্ত্ত্যবিচার হইতেই এরূপ দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হয়।

"গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার" এই বিচারে মঠবাসিগণ শ্রীগুরুপাদপদ্মানুকম্পিত ও মঠের সম্পর্কে সম্পর্কিত গৃহস্থগণকেও যথাযোগ্য সম্মান, শ্রদ্ধা ও তাঁহাদের প্রতি মর্য্যাদা প্রদর্শন করিবেন। মঠবাসিগণ গৃহস্থের ছিদ্রানুসন্ধান কিংবা গৃহস্থগণ মঠবাসীর ছিদ্রানুসন্ধান করিলে পরস্পরের কাহারও হিত হইবে না,

অপিচ পরস্পরের মধ্যে অপ্রীতির মাত্রাই ক্রমে ক্রমে গোপনে বর্দ্ধিত হইতে হইতে কালে তাহা এক ভীষণ বিদ্বেষবহ্নি উদ্‌গীরণ করিবে। পরস্পরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিয়া পরস্পরের কোন্ কোন্ বিষয় উপলব্ধির পক্ষে অসুবিধা হইয়াছে, তাহা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে বুঝিতে চেষ্টা করিলেই মঙ্গলময় ফল ফলিবে। তাহা না করিয়া স্ব-স্ব কায়িক বাচিক বা মানসিক প্রাধান্য স্থাপন বা প্রতিষ্ঠাশায় পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিলে কাহারও মঙ্গল হইবে না। গৃহস্থ বড়, না ব্রহ্মচারী বড়, বানপ্রস্থ বড়, না ব্রহ্মচারী বড়—এইরূপ বন্ধ্যা বিতণ্ডা করিয়া পরস্পর মারামারি করা অভক্তিপর তথাকথিত মঠবাসিগণের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য হইলেও ভক্তিমঠায়তনের কোনও অধিবাসীরই উহা কর্ত্তব্য নহে। হরিসেবা-বৃত্তি যাঁহার যতটা অধিক, তিনিই ততটা নিজের মঙ্গল সাধন করিয়া অপরের মঙ্গল বিধান করিতে পারিবেন। যাঁহার হরিসেবা-বৃত্তি কোন কারণে ততদূর প্রকাশিত নয়, তাঁহাকেও অকপট হরিসেবক অকপটভাবে সাহায্য করিবেন। কে ছোট, কে বড়—এইরূপ বৃথা তর্ক করিয়া হরিসেবার অমূল্য সময় নষ্ট করিবেন না।

মঠবাসিগণ পৃথিবীর সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান প্রদান করিবেন। ঔদ্ধত্য-প্রকাশ বা আত্ম-অহমিকা-দ্বারা আত্মঙ্গল ও পরমঙ্গল কোনটিই সাধন করা যায় না। 'তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ' হইয়া অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তনের প্রণালী কেবল যে বৈষ্ণবতা অর্জ্জনের পরম পাথেয়, তাহা নহে, ইহা অহমিকাপূর্ণ বিমুখ মানব-সমাজকে হরিকথা শুনাইবার পক্ষে একটি পরম কৌশল। যে মানবসমাজ প্রাকৃত অহমিকায় আচ্ছন্ন হইয়া অনুক্ষণ ধরাকে 'সরা' জ্ঞান করিতেছে, তাহার সহিত পাল্লা দিয়া অহমিকা প্রকাশ করিলে কখনই মানবকে হরিকথা শুনান যাইবে না, তাহাদের গতির বিপরীত দিকে অভিযান দেখাইলে তাহাদের অহমিকা নূতন প্রতিযোগী ইন্ধন না পাইয়া মাথা নত করিবে। কোন লোকোত্তর আচার্য্যের অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্বের অনুকরণ করিয়া অপরে সেই ব্যক্তিত্বময় জীবনীশক্তিবিহীন ঔদ্ধত্যমাত্র প্রকাশ করিলে তাহার ফল বিপরীত হইবে। গুরুবৈষ্ণবের নিন্দা সহ্য করিতে হইবে না সত্য, কিন্তু বহির্ম্মুখগণের সহিত এমন কৌশলপূর্ণ ব্যবহার করিতে হইবে যে, তাহাদের জিহ্বা যেন অপ্রাকৃত গুরু-বৈষ্ণবের নিন্দায় কলঙ্কিত না হয়, আর আমাদের সেইরূপ নিন্দাপূর্ণ বাক্য শ্রবণের দুর্ভাগ্য না হয়।

মঠবাসী প্রচারকগণ অকপটে নিরপেক্ষ সত্য কথা প্রচার করিবেন, কিন্তু সত্য কথাকে এরূপ 'চাঁচা ছোলা' করিয়া বলিতে হইবে না, যেন অনধিকারী ব্যক্তি তাহা বুঝিতে ভুল করে, তাহা হইলে ফল বিষময় হইবে। সত্যকথা বলিতে হইবে সত্য, কিন্তু তাহাতেও কৌশল চাই। শ্রোতার অধিকারের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। যে, সভা-সমিতিতে সকল প্রকারের অধিকারের শ্রোতা বর্ত্তমান, সেস্থানে সত্য কথা বলিলেও এরূপ কৌশলে বলিতে হইবে যে যাঁহারা একান্ত অকপট সত্যানুসন্ধিৎসু, তাঁহারা যেন তৎপ্রতি অনুরাগী ও অধিকতর অনুসন্ধিৎসা সম্পন্ন হইয়া উঠিতে পারেন এবং যাঁহারা অন্যাভিলাষের অধিকারী, তাঁহারাও যেন সত্য জানিবার পরিপ্রশ্ন লইয়া উপস্থিত হইতে পারেন। যখন তাঁহারা ঐরূপ পরিপ্রশ্ন করিয়া সুযুক্তিপূর্ণ শ্রৌতবাণী শুনিতে শুনিতে ক্রমে ক্রমে অন্যাভিলাষের মলগুলিকে হৃদয় হইতে অপসারিত করিবার যোগ্যতা লাভ করিবেন, তখন তাঁহারা নিজেরাই অকৈতব-সত্যের উপলক্ষণ-সমূহকে বাছিয়া লইতে পারিবেন;

তৎপূর্ব্বে তাঁহাদিগের নিকট একেবারে 'চাঁচা ছোলা' করিয়া সত্যকথা বলিলে তাঁহারা চিরতরে সত্যের বিদ্রোহী হইয়া পড়িবেন। হরিকীর্ত্তনকারী শ্রোতৃবৃন্দের ক্রম-মঙ্গলের পথ চিরতরে রুদ্ধ করিবেন না, তাঁহাদিগের যোগ্যতা পরিবর্দ্ধন ও পরিপ্রশ্নমূলে শ্রবণের সুযোগ দিবেন।

অনেক সময় হয়ত' অনর্থরোগে অত্যন্ত প্রপীড়িত হইয়া কেহ কেহ সদ্বৈদ্য বা ভুবনমঙ্গল মঠায়তন প্রভৃতির প্রতিও নানা কুবাক্য প্রয়োগ করিতে পারেন। অজ্ঞশিশু মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মাতাপিতার প্রতিও কুবাক্য প্রয়োগ এবং হিংস্র জন্তু-ভ্রমক্রমে বা নিসর্গতা-নিবন্ধন উপকারীরও অপকার করিয়া থাকে। বিজ্ঞ মঠবাসী বা প্রচারকগণ জগতের ঐরূপ দুইশ্রেণীর ব্যক্তিগণের নিকট হইতে নানাপ্রকার অবিচার ও অত্যাচারের ডালি উপহার পাইলেও তাহাদিগের প্রতি প্রতিযোগিতাপূর্ণ কুবাক্য প্রয়োগ করিবেন না। রোগীর সহিত চিকিৎসকের প্রতিযোগিতা নাই, ছলে বলে অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে দয়া প্রকাশের অবকাশ আছে। কিন্তু রোগীকে দয়া করিতেছি, একথাও তাহাকে শুনাইতে হইবে না, কার্য্যের দ্বারা অনুভব করাইতে হইবে। কেবল মাত্র কথায় শুনাইলে রোগী আপনাকে নিম্নস্থানে অবস্থিত দেখিয়া চিকিৎসকের বিদ্রোহী হইয়া পড়িবে, রোগীর সহিত কৌশলপূর্ণ অথচ অকৃত্রিম শুভেচ্ছাময় প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করিয়া তাহার মঙ্গল করিতে হইবে।

অনেক সময় হয়ত' কোন কোন অদৈবপ্রকৃতি ব্যক্তি মঠবাসিগণকে নানাভাবে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইতে পারে। হাতী যখন রাজপথ দিয়া গমন করে, তখন কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া চিৎকার করিয়া থাকে। ইহাই উহাদের নৈসর্গিকধর্ম্ম; কিন্তু গজপৃষ্ঠে আরূঢ় কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই হস্তিপৃষ্ঠের উচ্চাসন হইতে অবতরণ করিয়া কুকুরের সহিত পাল্লা দিবার জন্য কুকুরকে কাম্ড়াইতে যান না। অতএব মঠবাসী বা প্রচারকগণ খল-প্রকৃতি ব্যক্তিগণের চিৎকারের সহিত কোনপ্রকার প্রতিযোগিতা না করিয়া উহার প্রতি বধির থাকিবেন এবং সুধীরের ন্যায় হরিকীর্ত্তনের জন্যই কর্ণবেধ সম্পাদন করিবেন।

মোটকথা, মঠবাসিগণের আচরণ যেন কখনও এরূপ না হয়, যাহাতে তাঁহাদের ব্যক্তিগত ত্রুটী কখনও পরোক্ষভাবেও গুরুপাদপদ্মে কলঙ্কারোপ করিতে পারে। অকৃত্রিম আচার্য্যসেবা, অকপট ও গুরুবৈষ্ণবানুগত্য, সহিষ্ণুতা, পরস্পর প্রীতি, মৈত্রী, সৌহার্দ্দ, প্রেম, সরলতা, অনুক্ষণ হরিসেবাতৎপরতা, মর্য্যাদা-সংরক্ষণ, মানদান, হরিসেবার্থ সর্ব্বদা ভোগ-ত্যাগ, অন্তরে বাহিরে নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ও সমব্যবহার, অদম্য হরিসেবানুরাগ, সত্যগর্ভ বিনয়বাক্য, অবিশ্রান্ত প্রাণবন্ত হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন, বহির্ম্মুখ আলোচনারও সর্ব্বপ্রকার দুঃসঙ্গের বর্জ্জন, অনিন্দা অথচ নিজের অনর্থময় নিন্দিত জীবনকে গর্হণ ও তাহা সংশোধনের জন্য আন্তরিক চেষ্টা প্রভৃতি সদনুশীলনের দ্বারা মঠবাসী সর্ব্বদা গুরুপদান্তিকবাসী হইয়া আত্মমঙ্গল বরণ করিবেন। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু উপদেশামৃতরূপ যে মহৌষধি প্রকট করিয়াছেন, তাহা গুরুপদান্তিকবাসী হইয়া অকপটে অবিশ্রান্ত পান করিতে করিতে আমাদের অপ্রাকৃত গোবিন্দসেবায় অধিকার লাভ হইবে। ইহারই নাম মঠবাসী।
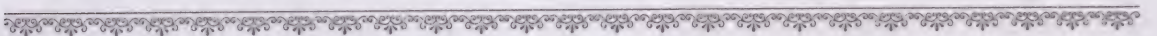
শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী

''যস্যাঃ কদাপি বসনাঞ্চলখেলনোত্থ-ধন্যাতিধন্য-পবনেন কৃতার্থমানী।
যোগীন্দ্রদুর্গমগতির্মধুসূদনোপি তস্যা নমোস্তু বৃষভানুভুবো দিশেপি।।''

'যে শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর বস্ত্রাঞ্চল-সঞ্চলন-স্পৃষ্ট অনিল ধন্যাতিধন্য হইয়া কৃষ্ণের গাত্র স্পর্শ করায় যোগীন্দ্রগণেরও অতি-দুর্লভ শ্রীনন্দনন্দন আপনাকে কৃত-কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনীর উদ্দেশ্য আমাদের প্রণাম বিহিত হউক'—এই কথাটী ''শ্রীরাধারসসুধানিধি'' গ্রন্থে ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী কীর্তন করিয়াছেন। শ্রীপ্রবোধানন্দ স্বয়ং একজন যূথেশ্বরী; তিনি কৃষ্ণলীলায় তুঙ্গবিদ্যা। আমরাও শ্রীপ্রবোধানন্দপাদের অনুগমনেই বৃষভানুকুমারীর অভিমুখে প্রণাম করিতেছি।

জগতে শোভা, সৌন্দর্য ও গুণের আধারস্বরূপ নানাপ্রকার বস্তু বিদ্যমান। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র—অখিল রসের ও শোভাসৌন্দর্য্যাদিগুণের মূল সমাশ্রয়। তিনি সমস্ত ঐশ্বর্য, বীর্য ও জ্ঞানের মূল আশ্রয়তত্ত্ব। আবার—সেই পূর্ণতম ভগবান্, যাঁহার 'আশ্রয়' ও 'বিষয়', সেই স্বরূপটি যে কত বড়, তাহা মানব-জ্ঞানের, এমন কি, অনেক মুক্ত-পুরুষগণেরও ধারণার অতীত। যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও মাধুর্যে সমস্ত জগৎ লালায়িত ও মোহিত, যিনি নিজের মাধুর্যে নিজেই মোহিত, সেই ভুবনমোহন মদনমোহনও যাঁহা দ্বারা মোহিত হন, তিনি যে কত বড় বস্তু তাহা ভাষাদ্বারা অপর লোককে বোঝান যায় না।

যদিও কৃষ্ণ বিষয়তত্ত্ব, তথাপি তিনি আশ্রয়েরই 'বিষয়'। জড়-জগতে যে প্রকার পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে বস্তুতঃ পার্থক্য ও জড় সম্বন্ধ রহিয়াছে—উচ্চাবচ ভাব রহিয়াছে—পরস্পর ভেদ রহিয়াছে, শ্রীমতী রাধিকার ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সেই প্রকার ভেদ ও সম্বন্ধ নাই। কৃষ্ণাপেক্ষা বৃষভানুনন্দিনী অশ্রেষ্ঠা নহেন। শ্রীকৃষ্ণই 'আস্বাদক' ও 'আস্বাদিত'-রূপে নিত্যকাল দুই দেহ ধারণকরিয়া আছেন। যে কৃষ্ণের অপূর্ব সৌন্দর্যে তিনি স্বয়ংই মুগ্ধ হন, সেই কৃষ্ণ অপেক্ষা যদি শ্রীমতী রাধিকার সৌন্দর্য বেশী না হয়, তবে মোহনকার্য হইতে পারে না। শ্রীমতী রাধা—ভুবনমোহন-মনোমোহিনী, হরিহৃদ্ভৃঙ্গ-মঞ্জরী, মুকুন্দমধুমাধবী, পূর্ণচন্দ্র কৃষ্ণের পূর্ণিমা-স্বরূপিণী এবং কৃষ্ণকান্তাগণের শিরোমণি-স্বরূপা অংশিনী। বৃষভানুনন্দিনীর তত্ত্ব জীবের বা জীবসমষ্টির ভাষায় বোঝান যায় না। সেবকের এরূপ ভাষা নাই,—যাহা সেব্য-বস্তুকে সম্যক্ বর্ণন করিতে পারে। কিন্তু সেবকের তত্ত্ব বর্ণন করিতে সেব্যই সমর্থ; তাই ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং আমাদিগকে শ্রীমতী রাধারাণীর তত্ত্ব জানাইতে পারেন। আর একজন আছেন, তিনিও গোবিন্দানন্দিনীর তত্ত্ব আমাদের শুদ্ধাত্মার উপলব্ধির বিষয় করাইতে সমর্থ,—তিনি বৃষভানুসুতা ও কৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবা করেন অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন শ্রীগুরুদেব ও বা গৌরশক্তিগণ। যে কৃষ্ণচন্দ্র ''রাধা ভাবদ্যুতিসুবলিততনু'' হইয়াছেন অর্থাৎ রাধিকার ভাব ও দ্যুতি গ্রহণ করিয়াছেন, সেই কৃষ্ণচন্দ্রই প্রপঞ্চে শ্রীমতীর মহিমার কথা প্রকাশ করিতে পারেন। তাঁহার প্রিয়তম দাসগণও সেই পরম তত্ত্ব বলিতে পারেন, তদ্ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তিই সমর্থ নহেন।

পূর্বে জগতে যেরূপ বৃষভানুরাজকুমারীর কথা প্রচারিত হইয়াছিল অর্থাৎ আচার্য নিম্বার্কপাদ, শ্রীনিবাস আচার্য প্রভৃতি শ্রীরাধাগোবিন্দের যেরূপ সেবা-প্রণালীর কথা বলিয়াছেন, তাহাতে শ্রীমতীর মহিমা প্রপঞ্চে তত সুসমৃদ্ধভাবে প্রকাশিত হয় নাই। মাধ্যাহ্নিক-লীলায় যাঁহাদের আদৌ প্রবেশাধিকার ছিল না, তাঁহাদের নিকটই শ্রীরাধাগোবিন্দের এইরূপ নৈশ-লীলা-কথা বহুমানিত হইয়াছিল। কলিন্দতনয়া-তটে নৈশবিহারের কথা—যাহা শ্রীনিম্বার্কপাদ কীর্তন করিয়াছেন, তাহা হইতে গৌরসুন্দরের প্রিয়তম শ্রীল রূপপাদ ও তদনুগগণ-কথিত শ্রীরাধাগোবিন্দের মাধ্যাহ্নিকলীলা মধুরিমার উৎকর্ষের কথা তারতম্য বিচারে অনেক উন্নত ও সুসম্পূর্ণ। দ্বৈতাদ্বৈতবিচার হইতে অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারাশ্রিত রসের উৎকর্ষের কথা, গোলোকের নিভৃত-স্তরের কথা, রাধাকুণ্ডতট কুঞ্জের নিকটবর্তী চিন্ময়-কল্পতরুতলে নবনবায়মান অপূর্ব বিহার-কথা গৌরসুন্দরের পূর্বে কোন উপাসক বা আচার্যই সুষ্ঠুভাবে বর্ণন করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা কেহ কেহ রাসস্থলীর লীলার কথামাত্র অবগত ছিলেন; কিন্তু মধ্যাহ্নকালে বৃষভানুনন্দিনী কি প্রকারে কৃষ্ণসেবার অধিকার লাভ করিয়া থাকেন, পূর্বে কাহারও সেই মাধুর্য সৌন্দর্য-সেবায় অধিকার ছিল না। বংশীধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া অনূঢ়া ও পরোঢ়া প্রভৃতি বহু বহু কৃষ্ণসেবিকা রাসস্থলীতে যোগদানের অধিকার পাইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীরূপ কথিত 'দোলারণ্যাম্বুবংশী হৃতিরতিমধুপানার্কপূজাদি লীলৌ'-পদ নিদিষ্ট লীলা-পরাকাষ্ঠায় প্রবেশ সৌভাগ্যের কথা মধুর-রস-সেবী গৌরজন গৌড়ীয় ব্যতীত অন্যের যে লভ্য নহে; —এ কথা নিগমানন্দ-সম্প্রদায়ের কাহারাও জানা নাই।

শ্রীমতীর পাল্যদাসীর উন্নত-পদবী-সন্দর্শন মানবজ্ঞানের অন্তর্গত নহে। বার্ষভানবীর নিত্যকাল অন্তরঙ্গ সেবা-নিরত নিজজন ব্যতীত এ-সকল কথা কেহ কখনও কোন ক্রমেই জানিতে পারেন না। যে-দিন আপনাদের কোনরূপ বাহ্য-জগতের অনুভূতি থাকিবে না, তুচ্ছ নীতি, তপঃ, কর্ম, জ্ঞান ও যোগাদির চেষ্টা থুৎকারের বস্তু বলিয়া মনে হইবে, ঐশ্বর্যপ্রধান শ্রীনারায়ণের কথাও ততদূর রুচিকর বোধ হইবে না, সেই দিনই আপনারা এই সকল কথা বুঝিতে পারিবেন। শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবার কথা এদেশের ভাষায় বলা যায় না। 'স্বকীয়া', 'পারকীয়া' শব্দগুলি বলিলে আমরা উহা আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের ধারণার সহিত মিশাইয়া ফেলি। এই জন্যই শ্রীরাধাগোবিন্দ-লীলাকথা বলিবার, শুনিবার ও বুঝিবার অধিকারী বড়ই বিরল,—জগতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

একশ্রেণীর প্রাকৃত সহজিয়াগণ বলিয়া থাকেন যে, শ্রীরূপপাদ পারকীয়া-সেবায় উন্মত্ততা প্রদর্শন করিয়া-ছিলেন, কিন্তু শ্রীজীব সেরূপ নহেন। সেই অক্ষজধারণাকারিগণ ভোগপরতা-ক্রমে বিচার করিয়া যাহা সিদ্ধান্ত করেন, প্রকৃতকথা সেরূপ নহে। শ্রীরূপানুগ-প্রবর শ্রীজীবপাদ শ্রীরূপ গোস্বামি প্রভুর স্থানেই আচার্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শ্রীজীবপাদ 'গোপালচম্পূ'-গ্রন্থে শ্রীরাধাগোবিন্দের বিবাহ-কথা বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া এবং সন্দর্ভাদি-গ্রন্থে তিনি বিচার প্রধান মার্গ অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়াই প্রাকৃত-সহজিয়া শ্রীজীবপাদ কর্তৃক শ্রীরূপ-প্রবর্তিত বিশুদ্ধ পারকীয়বিচার স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া মিথ্যা কল্পনা বা আরোপ করেন। প্রকৃত-প্রস্তাবে, ঘটনা তাহা নহে। আমরা দুই-তিন-শত বৎসর পূর্বের প্রাকৃত সাহজিকগণের ঐতিহ্যে এইরূপ

কুবিচার লক্ষ্য করি। আজও প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায়ে সেই উদ্‌গার প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীজীবপাদ—শ্রীরূপানুগ-গৌড়ীয়গণের আচার্য; তিনি আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবগণকে কুপথ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রুচিবিকৃতি যাহাদিগকে গ্রাস করিয়াছে, অপ্রাকৃত চিদ্বৈচিত্র্যের কথা বুঝিবার সামর্থ্য যাহাদের নাই, সেই সকল জড়স্তব্ধ লোক যাহাতে মহা-অসুবিধার মধ্য না পড়িতে পারে, তজ্জন্যই শ্রীজীবপাদ ঐরূপ সুসিদ্ধান্ত বিচার দেখাইয়াছেন, যাঁহারা নীতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা অতি কঠোর বৈরাগ্য ও বৃদদ্ব্রত-ধর্মযাজনে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন—এইরূপ ব্যক্তিগণও যে আশ্চর্য লীলার এক কণিকাও বুঝিতে সমর্থ নহেন, সেইরূপ পরম চমৎকারময়ী চিন্ময়ী পারকীয়া লীলা অনধিকারি জনগণ বুঝিতে অসমর্থ হইবে বলিয়াই শ্রীজীবপাদ কোনও কোনও স্থলে তত্তদধিকারীর যোগ্যতানুসারে নীতিমূলক বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা দ্বারা কৃষ্ণভজনে কোনপ্রকার দোষ আসে নাই। গোপালচম্পূ-বর্ণিত শ্রীরাধা-গোবিন্দের বৈধ-বিবাহ—তাঁহাদের পারকীয়ভাবের প্রতি আক্রমণ নহে। পারকীয়-রসের পরমশ্রেষ্ঠা নায়িকা বৃষভানুসুতা মায়িক অভিমন্যুর সহিত প্রাজাপত্য-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া, সম্পূর্ণরূপে পতিবঞ্চনা করিয়া, সর্বক্ষণ অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ইহা দ্বারা প্রাকৃতবিচার-পরিপূর্ণ-মস্তিষ্কযুক্ত সহজিয়াগণ মনে করিতে পারেন যে, শ্রীমতী রাধিকা প্রাকৃত জার-রতা ছিলেন; কিন্তু অরুন্ধতী অপেক্ষাও বৃষভানুনন্দিনীর পাতিব্রত্য অধিক; বার্ষভানবী হইতেই সমগ্র পাতিব্রত্যধর্ম উদ্ভুত হইয়াছে। যাবতীয় সুনীতির মূলবস্তু বৃষভানুনন্দিনীর পাদপদ্মেই আবদ্ধ; ''যাঁর পরিব্রতা ধর্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী।''—চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পঃ।

শ্রীকৃষ্ণ—সকল বিষ্ণুতত্ত্বের অংশী; শ্রীমতী ও সকল মহালক্ষ্মীর অংশীনী। অংশী অবতারিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ প্রাভব, বৈভব ও পুরুষাদি অবতারগণকে বিস্তার করেন, তদ্রূপ অংশিনী শ্রীমতী রাধিকাও লক্ষ্মীগণ, মহিষীগণ ও ব্রজাঙ্গনাগণকে বিস্তার করেন। শ্রীকৃষ্ণই সর্বপতি এবং শ্রীবৃষভানুনন্দিনীই তাঁহার নিত্যকাল পরিপূর্ণতম সেবাধি-কারিণী; সুতরাং তিনি নিত্য কান্তা-শিরোমণি ব্যতীত কিছু নহেন।

শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র 'বিষয়'; স্থায়ি-রতিবিশিষ্ট যাবতীয় জীবাত্মা সেই ভগবত্তত্ত্বেরই 'আশ্রয়'। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চপ্রকার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক রতি বা স্থায়িভাব জীবাত্মার স্বরূপসিদ্ধ। এই স্থায়িভাব-স্বরূপা রতি স্বয়ং আনন্দরূপা হইয়াও সামগ্রীর মিলনে রসাবস্থা লাভ করেন। সামগ্রী চারি প্রকার— (১) বিভাব, (২) অনুভাব, (৩) সাত্ত্বিক, (৪) ব্যাভিচারী বা সঞ্চারী। রত্যাস্বাদনহেতুরূপ বিভাব দুই প্রকার—আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন দুই প্রকার—বিষয় ও আশ্রয়। যিনি—রতির বিষয় অর্থাৎ যাঁহার প্রতি রতি ক্রিয়াবতী, তিনি 'বিষয়'-রূপ আলম্বন অর্থাৎ বিষয়রূপ আলম্বনই রতির আধেয় এবং যিনি—রতির আধার অর্থাৎ যাঁহাতে রতি বর্তমান, তিনিই 'আশ্রয়'-রূপ আলম্বন।

বৈকুণ্ঠাদি-ধামে ত্রিবিধ কালই যুগপৎ বর্তমান। বৈকুণ্ঠাদি লোকের হয়ে প্রতিফলনস্বরূপ এই জড়জগতে যেমন ভূতকাল বা ভাবিকালের সৌভাগ্য বর্তমানকালে অনুভূত হয় না, মূল আকর-স্থানীয় অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠাদিধামে তদ্রূপ নহে; তথায় সমস্ত সৌভাগ্য একই কালে যুগপৎ অনুভূত হইয়া থাকে।

গোলোকে অদ্বয়জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র 'বিষয়' ও অনন্তকোটি জীবাত্মাই তাঁহার 'আশ্রয়'। আশ্রয়গণ কিছু 'বিষয়' হইতে পৃথক বা দ্বিতীয় বস্তু নহেন; তাঁহারা—অদ্বয়জ্ঞান বিষয়ের 'আশ্রয়'। বস্তুত্বে 'এক' ও শক্তিত্বে 'বহু',—ইহাই বিষয় ও আশ্রয়ের মধ্যে সম্বন্ধ। অক্ষজ-ধারণাকারী সাহজিকগণ এই বিষয় ও আশ্রয়ের কথা বুঝিতে অসমর্থ। নির্ব্বিশেষবাদিগণের নিকট বিষয় ও আশ্রয়গণের স্থান নাই। শ্রীল নরহরিতীর্থের পূর্ব্বাশ্রমের অধস্তন বিশ্বনাথ কবিরাজ 'সাহিত্যদর্পণ'-নামক অলঙ্কারগ্রন্থে বিষয় ও আশ্রয়ের কথা এতদূর সুষ্ঠুভাবে বলিতে পারেন নাই; এমন কি, 'কাব্যপ্রকাশ'-কার বা ভারতমুনিও তাহা বলিতে অসমর্থ হইয়াছেন। শ্রীল রূপপাদের লেখনীতে অপ্রাকৃত বিষয় ও আশ্রয়ের কথা পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। অদ্বয়জ্ঞান বিষয়তত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনে অনন্ত-কোটি জীবাত্মা আশ্রয়রূপে বিরাজমান থাকিলেও মূল আশ্রয়তত্ত্ব (বিগ্রহ)—পাঁচটী; মধুর-রসে শ্রীবৃষভানুনন্দিনী, বাৎসল্য-রসে নন্দ-যশোদা, সখ্য-রসে সুবলাদি, দাস্য-রসে রক্তকাদি এবং শান্ত-রসে গো, বেত্র ও বেণু প্রভৃতি। শান্তরসে সঙ্কুচিত-চেতন চিন্ময় গো, বেত্র, বেণু, কদম্ববৃক্ষ এবং যামুনসৈকত প্রভৃতি অজ্ঞাতভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিরন্তর সেবা করিতেছেন।

যাঁহাদের বহির্জ্জগতের কথায় সময় নষ্ট করিবার অবসর আর নাই, তাঁহারাই এইসকল কথার মর্ম বুঝিতে পারেন। শ্রীল রূপপাদ ইহা দেখাইবার জন্যই বিষয়ত্যাগের অভিনয় করিয়া শুষ্ক রুটী ও চানা চিবাইয়া এক এক বৃক্ষতলে এক এক রাত্রি বাস করিয়া 'কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে ভোগত্যাগে'র আদর্শ দেখাইয়া এইসকল কথা বুঝিবার অধিকার ও যোগ্যতা প্রদান করিয়াছেন। আমরা যে স্থানে ও যে ভূমিকায় অবস্থান করিতেছি, তাহাতে কৃষ্ণপ্রণয়মূর্তি শ্রীরাধার তত্ত্ব-কথা আমাদের স্থূল-জড়েন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইতে পারে না। বৃষভানুনন্দিনী—আশ্রয় জাতীয় কৃষ্ণবস্তু। যে-রাজ্যে স্থূলজগৎ, সূক্ষ্মজগৎ বা নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রের অনুভূতি নাই, যে অপ্রাকৃত-ধামে চিদ্বিলাস-চমৎকারিতা পরিপূর্ণরূপে বর্তমান, শ্রীরাধিকা তাহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া বর্তমান। তিনি কৃষ্ণের সেবা করিবার জন্য কৃষ্ণবক্ষে আরোহণ করেন, তিনি কৃষ্ণের সেবা করিবার জন্য কৃষ্ণকে তাড়ণ ও ভৎর্সন পর্যন্ত করেন। এইসকল কথা মানব-যুক্তির উন্নতস্তরে অধিরোহণ করিবার কথা নয়, নির্ব্বিশেষবাদীর চিন্মাত্র-পর্যন্ত কথা নয়; পরন্তু যাঁহার কৃষ্ণসেবার জন্য লৌল্য উপস্থিত হইয়াছে, তিনি কেবল আত্মবৃত্তিতে এইসকল কথার মর্ম উপলব্ধি করিতে পারেন।

শ্রীমতী রাধিকা—স্বয়ংরূপ-শ্রীকামদেবের স্বয়ংরূপা কামিনী। স্বয়ং শ্রীরূপ গোস্বামী—যাঁহার অনুগত, সেই বৃষভানুনন্দিনী—যাবতীয় অপ্রাকৃত নারীকুলের মূল আকরবস্তু। শ্রীকৃষ্ণ যেমন অংশী, শ্রীমতীও তদ্রূপ অংশিনী; শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর স্বরূপ বর্ণনে পাই (চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পঃ)—

"কৃষ্ণলীলা-মনোবৃত্তি-সখী আশ পাশ।"

সহস্র সহস্র গোপীর যুথেশ্বরীগণ, মূল অষ্টসখীর সহস্র সহস্র পরিচারিকা-বৃন্দ বৃষভানুনন্দিনীর সর্বক্ষণ সেবা করিতেছেন। মনোবৃত্তিরূপা সখীগণ আটপ্রকার—(১) অভিসারিকা, (২) বাসকসজ্জা, (৩) উৎকণ্ঠিতা, (৪) খণ্ডিতা, (৫) বিপ্রলব্ধা, (৬) কলহান্তরিতা, (৭) প্রোষিত-ভর্তৃকা এবং স্বাধীনভর্তৃকা।

বৃষভানুনন্দিনী বিভিন্ন সেবিকাগণের দ্বারা সেব্যের বিপ্রলম্ভ সমৃদ্ধ করিয়া চিদ্বিলাস চমৎকারিতা উৎপাদন করেন। বৃষভানুনন্দিনীর আটদিকে আটটী সখী বার্ষবানবী—যুগপৎ অষ্টসখীর অষ্টভাবে পরিপূর্ণা। কৃষ্ণ যে ভাবের ভাবুক, যে-রসের রসিক, যে-রতির বিষয়, কৃষ্ণ যখন যাহা চা'ন, সেই সকল ভাবে পরিপূর্ণ উপকরণ- রূপে কৃষ্ণেচ্ছা-পূর্তিময়ী হইয়া অনন্ত-কাল কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সেবারসে নিমগ্না।

শ্রীকৃষ্ণে চতুঃষষ্টি গুণ পরিপূর্ণরূপে শুদ্ধচিন্ময়ভাবে সর্বদা দেদীপ্যমান। শ্রীনারায়ণে ষষ্টিগুণ বর্তমান থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণে তাহা আরও অত্যদ্ভুতরূপে বিরাজমান। আবার, শ্রীকৃষ্ণ যে অপূর্ব চারিটী গুণের নায়ক, তাহা শ্রীনারায়ণেও প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ—সর্বলোকচমৎকারিণীলীলার কল্লোল-বারিধি; তিনি—অসমোর্দ্ধরূপশোভা-বিশিষ্ট; তিনি—ত্রিজগতের চিত্তাকর্ষি-মূরলী-বাদনকারী; তিনি—শৃঙ্গাররসের অতুল-প্রেম-দ্বারা শোভা-বিশিষ্ট প্রেষ্ঠমণ্ডলের সহিত বিরাজমান; অর্থাৎ তিনি ক্রীড়া (লীলা)-মাধুরী, শ্রীবিগ্রহ (রূপ)-মাধুরী, বেণুমাধুরী ও সেবক মাধুরী—এই চারিটি অসাধারণ গুণ লইয়া নিত্যধামে বিরাজমান। এই চারিটি গুণ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত নারায়ণে পর্যন্ত নাই।

এই জড়-জগৎ চিদ্ধামেরই বিকৃত প্রতিফলন। চিদ্ধামে একজন সেব্য, সকলেই তাঁহার সেবক; আর অচিজ্জগতে সেব্য ও সেবকের সংখ্যা বহু। চিদ্ধামে একমাত্র সেব্য-বস্তুর সুখ-তাৎপর্য্যই সেবকগণের নিত্য-চিন্ময় স্বার্থ। সেই চিদ্ধামেরই বিকৃত প্রতিফলন এই অচিজ্জগতে বহু সেব্য ও বহু সেবক ছিল, আছে ও থাকিবে। এই জড়জগতে সেবক ও সেব্যের স্বার্থ—পরস্পর ভিন্ন। এখানে সেবক নিজের সুখের বিঘ্নকর হইলেই সেব্যের সেবা পরিত্যাগ করিয়া থাকে; অর্থাৎ এক কথায়, এইস্থানে সেব্য ও সেবকের নিঃস্বার্থপরত্ব নাই এবং এইস্থানে সমস্তই এক-তাৎপর্যের অভাব বা ব্যভিচার-দোষ-দুষ্ট। পত্নী পতির সেবা করিয়া থাকেন। অনিত্য স্বার্থের জন্য এবং পতি পত্নীকে ভালবাসিয়া থাকে—নিজের ভোগ বা ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য অর্থাৎ পতির স্বার্থ ও পত্নীর স্বার্থ—এক নহে। এইস্থানে যত বড় সতী স্ত্রী বা যত নীতিপরায়ণ স্বামীই হউন না কেন, দেহধর্ম ও মনোধর্মে তাঁহারা আবদ্ধ থাকেন বলিয়া তাঁহাদের চেষ্টা—হৈতুকী, অনৈকান্তিকী ও অব্যবসায়াত্মিকা। আত্মধর্ম্ম একমাত্র কৃষ্ণসেবা ব্যতীত কোথাও অব্যভিচারিণী সেবা নাই। এই জড়-প্রপঞ্চের পুত্রের প্রতি পিতামাতার যে স্নেহ, মাতাপিতার প্রতি পুত্রের যে শ্রদ্ধা দেখা যায়, তন্মধ্যেও স্থূল বা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়-তর্পণ-স্পৃহা বা ব্যভিচার। দেহ ও মনের রাজ্যেই পরস্পর ভোক্তৃ-ভোগ্য-সম্বন্ধ, সুতরাং শুদ্ধ-সেব্য সেবক-সম্বন্ধ নাই বা থাকিতে পারে না।

যেস্থানে অদ্বয়জ্ঞান-ব্রজেন্দ্রনন্দন একটীমাত্র শক্তিমান্ পুরুষ বা বিষয়তত্ত্ব—যে স্থানে আর দ্বিতীয় পুরুষ নাই, সে স্থানে আর ব্যভিচার হইতে পারে না। সে স্থানে 'বিষয়' এক—'একমেবাদ্বিতীয়ম্; শক্তি—অনন্ত অর্থাৎ শক্তিমত্তত্ত্বে ও শক্তিতত্ত্ববিচারে অদ্বয়জ্ঞান বিষয়ের বা বস্তুর একত্ব, আশ্রয় বা শক্তির অনন্তত্ব।

শ্বেতাশ্বতর (৬।৮) বলেন,—

"ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যাধিকাশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তিবিধিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।।"

অদ্বয়জ্ঞান শক্তিমৎ তত্ত্ববস্তু 'এক' হইলেও শক্তি বিবিধ হওয়ায়, শক্তিবিচারে বিশেষ ধর্ম বর্তমান। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শক্তিবৈশিষ্ট্য নিরূপণ করিয়াছেন অর্থাৎ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের বস্তুর অদ্বয়ত্ব শক্তির বৈশিষ্ট্য স্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং তাহাতে আশ্রয়জাতীয়ত্ব রহিত কেবলাদ্বৈতপর বিচার নাই।

এই দেবীধামে ভোগ্যবস্তুসমূহ ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে মাপিয়া লওয়া যায়। সেই ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের সাহায্যে অতীন্দ্রিয়-রাজ্যের অধিশ্বরী শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী ও তাঁহার পরিকরগণের অর্থাৎ চতুর্বিধ-রসের রসিক আশ্রয়তত্ত্ব-সমূহের সহিত বিষয়তত্ত্বের কেহ যেন গোলমাল না করিয়া ফেলেন। আলঙ্কারিকের পরিভাষা 'বিষয়' ও 'আশ্রয়'—দার্শনিক-ভাবা 'শক্তিমান্' ও 'শক্তি', ভক্তের ভাষায় 'সেব্য' ও 'সেবক' বলিয়া উক্ত হন। আমরা যদি নিত্য আশ্রয়জাতীয় বিগ্রহকে আশ্রয় করিতে পারি, তাহা হইলেই প্রকৃতপ্রস্তাবে বিষয়ের সন্ধান পাইব। বৃষভানুনন্দিনীর 'সুদুর্লভাবপি সুদুর্লভ' চরণাশ্রয়—বিভিন্নাংশ জীবের পক্ষে যে কত বড় লোভনীয় ব্যাপার, তাহা শ্রীগৌরলীলার পূর্বে এইরূপ সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হয় নাই। 'রাধা-ভাবদ্যুতি সুবলিত', 'অনর্পিতচর-প্রেম-প্রদাতা', 'মহাবদান্য' শ্রীগৌরসুন্দরই এই গুহ্যতম কথা জগজ্জীবকে সুষ্ঠুভাবে জানাইয়াছেন।

আচার্য নিম্বার্কপাদ শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর উপাসনার কথা বলিলেও তাহাতে তর্তদূর সুষ্ঠুতা প্রদর্শিত হয় নাই; কারণ তাহাতে স্বকীয়বাদের কথা উল্লেখ থাকায় বস্তুতঃ তাহা রুক্মিণীবল্লভের উপাসনা-তাৎপর্যেই পর্যবসিত হইয়াছে।

"পারকীয়ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস।।
ব্রজবধুগণে এইভাব নিরবধি।
তাঁ'র মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি।।"
"গোপী-আনুগত্য বিনা, ঐশ্বর্যজ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে।।"

—চৈঃ চঃ আঃ পঃ ও ম ৮ পঃ।

শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদের আনুগত্যবিচারে লীলাশুক শ্রীবিল্বমঙ্গল 'কৃষ্ণকর্ণামৃত'-গ্রন্থে মধুর-রসাশ্রিত লীলার কথা কীর্তন করিলেও তাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত বৃষভানুসুতার মাধ্যাহ্নিক লীলার পরম-চমৎকারিতা প্রদর্শিত হয় নাই; এমন কি, শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দ-গ্রন্থেও উহা কীর্তিত হয় নাই।

শ্রীজয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, শ্রীমতী বার্ষভানবী রাসক্রীড়া-কালে 'সাধারণী'-বিচারে অন্যান্য গোপীগণের সহিত সম-পর্যায়ে গণিতা হওয়ায় অভিমানভরে রাসস্থলী পরিত্যাগ

করিয়াছিলেন। রাসস্থলী পরিহারপূর্বক শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনী সঙ্গলাভাশায় শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক একমাত্র তাঁহারই অনুসন্ধান-কার্যের দ্বারা, শ্রীমতী যে কি রূপ কৃষ্ণাকর্ষিণী, তাহাই প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে।

বৃষভানুনন্দিনীর গূঢ়-কথা শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে অস্পষ্ট-ইঙ্গিতরূপে উক্ত হইয়াছেন। শ্রীমতী রাধিকার কথা অতীব গোপনীয় ও গুহ্য ব্যাপার বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেব অর্বাচীন বহির্মুখ পাঠকগণের নিকট ঐরূপ অস্পষ্টভাবে বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীবার্ষভানবী—জগন্মাতা; তিনি—যাবতীয় শক্তি-জাতীয় বস্তুসমূহের জননী, তিনি—বিভিন্ন শক্তি-পরিচয়োত্থ ধর্ম ও সংজ্ঞা সমূহেরও আকর; তিনি—স্বয়ংরূপ পরমেশ্বর কৃষ্ণের পরমেশ্বরী 'পর-শক্তি'। 'শক্তিমদ্বস্তু' বলিতে যাহা বুঝায়, 'শক্তি' বলিতেও তাহাই বুঝায়। শ্রীমতী—বলদেবাদিরও পূজ্যা; শ্রীঅনঙ্গ-মঞ্জরী পর্যন্ত শ্রীমতী রাধিকার সেবার জন্য সর্বদা ব্যস্ত। এই শ্রীঅনঙ্গ মঞ্জরীই শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেবপ্রভুর অভিন্ন বিগ্রহ ঈশ্বরী বলিয়া বিখ্যাত।

যাঁহারা বার্ষভানবীর শ্রীচরণাশ্রয়কে পরম-লোভনীয় বলিয়া জ্ঞান না করেন, তাঁহাদের বিচারে ধিক্। বার্ষভানবীর আশ্রিত জনগণই পরমধন্য। সেই বার্ষভানবীর আশ্রিত জনগণের সুমহান্ আশ্রয় যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলেই আমাদের পরম মঙ্গল হইবে। অতএব—

"দিব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি।।"

'অপ্রাকৃত জ্যোতির্ময় বৃন্দাবনে চিন্ময় কল্পতরুর তলে রত্নমন্দিরস্থিত সিংহাসনে উপবিষ্ট এবং সেবা-পরা শ্রীরূপ-মঞ্জরী প্রভৃতি ও শ্রীললিতাদি প্রিয়নর্মসখীগণের দ্বারা পরিবৃত শ্রীরাধাগোবিন্দকে আমি স্মরণ করিতেছি।'

শ্রীরাধাজন্মোৎসব

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্।
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্নৃহরি-মাধবান্।।
দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে।
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ।।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শিষ্য ব্রহ্মা, ব্রহ্মার শিষ্য দেবর্ষি নারদ, নারদের শিষ্য ব্যাসদেব, শ্রীমধ্ব সেই ব্যাসদেবকে গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন, সেই বৃদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য শ্রীমধ্বমুনির অষ্টাদশ অধস্তনপর্য্যায়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি এই জগতে প্রেমরত্ন বিতরণ করিয়া জগৎ উদ্ধার করিয়াছেন,—সেই চৈতন্য মহাপ্রভুকে
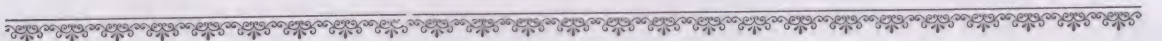
আমরা ভজন করি। সেই অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরসুন্দর মহপ্রভুই কলিযুগে রাধা-ভাব দ্যুতি-সুবলিত তনু হইয়া আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দমোহিনী গোবিন্দ-সর্বস্ব সর্বকান্তা-শিরোমণি শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনীর জন্মোৎসব বর্ষপর্য্যায়ে গতকল্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ভাগবতে স্পষ্টভাবে শ্রীরাধার নাম নাই কেন?

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবত নামে যে 'পারমহংসী সংহিতা' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি সুষ্ঠুভাবে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু রহস্যবিচারে বিশেষভাবে শ্রীমতী রাধিকার নাম উল্লেখ করেন নাই। যাঁহার জন্য শ্রীকৃষ্ণলীলা যিনি শ্রীকৃষ্ণলীলার প্রধানা নায়িকা—যিনি আশ্রয়তত্ত্ব-বিচারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়, তাঁহারই নাম শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে উল্লেখ নাই কেন?—ইহা অনেকেরই হৃদয়ে প্রশ্ন হইয়া থাকে। শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা বলিয়াই লীলার পরমগোপনীয়ত্ব-বিচারে শ্রীব্যাসদেব অনধিকারি-সাধারণ শ্রোতা ও পাঠকদিগের নিকট হইতে গোবিন্দ প্রেমিকগণের পক্ষেও পরম-দুর্লভ সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় উপাস্য শ্রীরাধাতত্ত্ব গোপন রাখিবার জন্য সেই তত্ত্বের উল্লেখ প্রকাশ্যভাবে করেন নাই। মর্কটের নিকট মুক্তার মালা প্রদান না করিয়া গোপন রাখা কি বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে? আবার, পরমহংস ভক্তকুলের জন্য যে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে শ্রীরাধার বিষয় কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই, তাহাও নহে। যেমন শ্রীমদ্ ভাগবত-গ্রন্থে শ্রীগৌরাবতারের কথা ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে, তদ্রূপ শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর কথাও অতিগোপ্য রহস্যভাবে উক্ত হইয়াছে (ভাঃ ১০।৩০।২৮),—

> "অনয়ারাধিতো ন্যূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
> যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ।।"

শ্রীমতী 'সর্বকান্তা-শিরোমণি' কেন?

যোড়শসহস্র গোপী শ্রীকৃষ্ণের রাসস্থলীতে উপস্থিত থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্তা। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অচিন্ত্যশক্তিবলে দুই-দুইটী গোপীর মধ্যে এক-একটী মূর্তি প্রকাশপূর্ব্বক গোপীমণ্ডলমণ্ডিত হইয়া রাসোৎসব প্রবৃত্ত। শ্রীমতীর অভিমান হইল,—তবে কি আমি শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তমা সেবিকা নহি? আমাকে না হইলেও কি শ্রীকৃষ্ণের চলিতে পারে? যোড়স-সহস্র গোপীকাই ত' তাঁহার সেবা সম্পূর্ণভাবে করিতে পারেন? সেই ষোড়শ-সহস্র সেবিকা, যাঁহারা শ্রীগোবিন্দের জন্য লোকধর্ম, বেদধর্ম, দেহধর্ম, কর্ম, লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখ, আর্যপথ, নিজেদের পরিজন-প্রীতি, স্বজন তাড়ন, ভৎর্সন, ভয়—সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া যথা-সর্ব্বস্ব-দ্বারা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিতেছেন, যদি আমার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকেও ত্যাগ করিতে পারেন, তবেই বুঝিব যে, আমি শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ সেবিকা, সেইরূপ মনে করিয়া শ্রীমতী রাধিকা রাসস্থলী পরিত্যাগ-পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের রাস বন্ধ হইল। যাঁহার জন্য সব—যাঁহার জন্য রাস, যিনি না হইলে রাসোৎসব আরম্ভই হইত না, তাঁহার অনুপস্থিতিতে রাস বন্ধ হইবে না কেন? গোবিন্দও সেই প্রিয়তমা

ও প্রধানা নায়িকার অনুসন্ধান করিবার জন্য রাসস্থলী পরিত্যাগ করিলেন। তখন গোপীগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন,—'হে সহচরি, আমাদিগকে ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে নিভৃতে লইয়া গেলেন, তিনিই ঈশ্বর হরিকে অবশ্যই অধিক আরাধনা করিয়াছেন।'

শ্রীরাধিকা বিনা অন্য সমস্ত গোপী একত্র মিলিয়াও কৃষ্ণের সুখের কারণ হইতে পারেন না। রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ারস বৃদ্ধি করিবার জন্যই আর সব গোপীগণ রসোপকরণ-স্বরূপা। শ্রীজয়দেব-গোস্বামিপাদ শ্রীগীতগোবিন্দে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাদায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরী।।

কংসারি কৃষ্ণ সম্পূর্ণসাররূপা রাসলীলা-বাসনাবদ্ধা রাধাকে হৃদয়ে লইয়া ব্রজসুন্দরীগণকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া গেলেন।

গোপীর আনুগত্যময় ভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব

শ্রীরামাবতারে দণ্ডকারণ্যস্থিত ষষ্টি-সহস্র ঋষি ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের কোটিকন্দর্পবিজিত অপ্রাকৃত মনোমোহনরূপ সন্দর্শন করিয়াও গোপীদেহ লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়া গোপীর আনুগত্যে বহুবৎসরব্যাপী তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণলীলায় গোপী-দেহ লাভ করেন। গোপীদেহ প্রাকৃত রক্তমাংসের থলি নহে, তাঁহাদেরও শ্রীকৃষ্ণেরই ন্যায় সচ্চিদানন্দ তনু। সেই তাপস ঋষিগণের জটাজুটমণ্ডিত মস্তক, সাধনক্লিষ্ট জীর্ণ শীর্ণ প্রাকৃত বিচারযুক্ত দেহ শ্রীভগবানের নয়নোৎসব বিধান করিতে পারে না এবং তাঁহারা শান্ত, দাস্য বা গৌরব সখ্যে ভগবানের যে সেবা করিয়াছেন, তাহাতে গোপী-ভজনের চমৎকারিতা ও মাধুর্য নাই বলিয়াই তাঁহারা নিত্য চিদানন্দময়ী গোপীতনু লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। গোপীগণের সচ্চিদানন্দময় দেহের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, প্রতি অংশ, প্রতি হাব-ভাব শ্রীগোবিন্দের সেবানুকূল।

শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তমা শ্রীরাধিকা

ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল প্রবোধান্দ সরস্বতী বা তুঙ্গবিদ্যাদেবী তাঁহার 'শ্রীরাধারস-সুধানিধি' গ্রন্থে শ্রীবার্ষভানবীর স্তবে বলিয়াছে,—

যস্যাঃ কদাপি বসনাঞ্চলখেলনোত্থ—ধন্যাতিধন্য-পবনেনকৃতার্থমানী।
যোগীন্দ্রদুর্গমগতির্মধুসূদনোপি তস্যা নমোস্তু বৃষভানুভুবো দিশেপি।।

কোন সময়ে যে শ্রীমতী রাধিকার বস্ত্রাঞ্চল-সঞ্চালন-ফলে পবনদেব ধন্যাতিধন্য হইয়া কৃষ্ণগাত্র স্পর্শ করায় যোগীন্দ্রগণেরও অতি সুদুর্লভ সেই শ্রীনন্দনন্দন পর্য্যন্ত আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমতী বার্ষভানবীদেবীর উদ্দেশ্যে আমাদের নমস্কার বিহিত হউক।

শ্রীরাধিকা সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বাধিকা

দাস্য-রসের রসিক রক্তক, পত্রক, চিত্রক যে রসের আস্বাদন করিতে পারেন না, সখ্যরসে—শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদামাদি গোপবালকগণ যে রসের মধুরিমা আস্বাদন করিতে পারেন না, বৎসল-রসের রসিক—শ্রীনন্দ-যশোদা যে রসের পরমোৎকর্ষ ধারণা করিতে পারেন না, উদ্ধবাদি শ্রেষ্ঠগণ যে রসের জন্য নিত্য লালায়িত, সেই মধুররসের রসিক গোপিকাবর্গ-মধ্যে শ্রীমতী রাধিকা—সর্ব্বোত্তমা, রূপ-গুণে-সৌভাগ্যে-প্রেমে সর্ব্বাধিকা।

গৌড়ীয়

[১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দ, ১৩৩৪-৩৫ বঙ্গাব্দ]

শ্রীবলদেব

গর্ত্ত-সঙ্কর্ষণাত্তং বৈ প্রাহুঃ সঙ্কর্ষণং ভুবি।
রামেতি লোকরমণাদ্বলভদ্রং বলোচ্ছ্রয়াৎ।।

(ভাঃ ১০।২।১৩)

শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় শ্রীযোগমায়া দেবকীর সপ্তম গর্ত্ত আকর্ষণপূর্ব্বক রোহিণীতে স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া দেবকীর 'সপ্তম গর্ত্ত' মূলসঙ্কর্ষণ, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি লোকের রতি উৎপাদন করেন বলিয়া 'রাম', আর বলের আধিক্যহেতু 'বলভদ্র' নামে কথিত হইয়া থাকেন।

শ্রীবলদেব প্রভুই মূল-সঙ্কর্ষণ। তাঁহারই অংশ বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ এবং পাতালে সঙ্কর্ষণাবেশাবতার—যিনি সাধারণতঃ 'সঙ্কর্ষণ' নামে খ্যাত। এই শেষোক্ত সঙ্কর্ষণ বা শ্রীশেষই তাঁহার সহস্রফণ মস্তকের একটী ভাগে একটী সর্ষপের ন্যায় পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন। এই সঙ্কর্ষণাবতার শেষ মহাবাগ্মী। সনকাদি মুনিগণ তাঁহারই শ্রীমুখ হইতে ভাগবত শ্রবণ করেন। হরিকীর্ত্তনকারিগণের বাগ্মিতার মূলকারণ এই মহাবাগ্মী শেষ প্রভু। আর জগতে যে কৃষ্ণেতর বিষয়ে বাগ্মিতা বর্ত্তমান, তাহাও শ্রীশেষ প্রভুর বাগ্মিতা-শক্তির হেয় প্রতিফলন।

লোকের হৃদ্দৌর্ব্বল্যরূপ অনর্থের বিনাশপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রতি উৎপাদন করেন বলিয়া মূলসঙ্কর্ষণ প্রভু 'বলরাম' নামে খ্যাত। মর্য্যাদামার্গের মূল আশ্রয়-বিগ্রহ সন্ধিনী শক্তির প্রভু শ্রীবলরামের কৃপা ব্যতীত কাহারও শ্রীরাধাগোবিন্দে রতি উৎপাদিত হইতে পারে না। এই জন্যই ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

'হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়।'
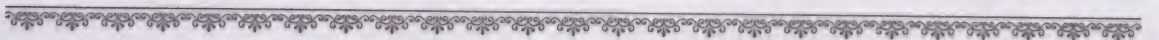
শ্রীরাম সন্ধিনী শক্তির ঈশ্বরসূত্রে শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান করিয়া দেন। জীব নিজের বলে কখনও শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান পাইতে পারে না; নিজের বলপ্রয়োগ দ্বারা ভগবৎ-প্রাপ্তির যে অবৈধ চেষ্টা, তাহারই নাম আরোহবাদ। ঐরূপ আরোহবাদ- মূলে ব্রহ্মানুসন্ধান জীবকে অন্ধকার রাজ্যে বা নির্ব্বিশেষ রাজ্যে পাতিত করে। কিন্তু মর্য্যাদামার্গের মূল আশ্রয়-বিগ্রহ বলদেব প্রভুর আনুগত্যে যে আশ্রয়ালম্বন শুদ্ধ-জীবাত্মার মূল-বিষয়-বিগ্রহের অনুশীলন, তাহাই প্রকৃতপক্ষে আমাদিগকে কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষের সন্ধান প্রদান করিতে পারে।

বলদেবের মত মহাবলী আর কোথায়ও নাই। এই জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন,—"বলোচ্ছ্রয়াৎ বলভদ্রঃ" —বলাধিক্য-বশতঃ 'বলভদ্র' নাম। তিনি নিখিল চিদ্বলের মূলকারণ। তাঁহার অংশাংশ, কলা, বিকলা জগতে যে বলের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা কোন মর্ত্ত্যজীব এমন কি অতিমর্ত্ত্য পুরুষগণও ধারণা করিতে পারেন না। তাঁহার অংশ বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ, মহাসঙ্কর্ষণ হইতে কারণার্ণবশায়ী, কারণার্ণবশায়ী হইতে সমষ্টি বিষ্ণু দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদশায়ী, সেই গর্ভোদশায়ী হইতে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, রাম, নৃসিংহ, হয়শীর্ষ, পরশুরাম, প্রলম্বারি বলরাম, কল্কি প্রভৃতি যে সকল লীলাবতার বা কল্পাবতার আবির্ভূত হন, তাঁহাদের বলের ইয়ত্তা করিতে পারেন, ত্রিলোকে এমন কোন্ পুরুষ আছেন? শ্রীমৎস্যদেব স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে হয়গ্রীব নামক মহাবলশালী দৈত্যকে বিনাশ করিয়া বেদ আহরণ করেন। শ্রীকূর্ম্মদেব অনায়াসে পৃষ্ঠদেশে মন্দরাচল ধারণপূর্ব্বক স্বীয় মহাবলের পরিচয় প্রদর্শন করেন। শ্রীবরাহদেব প্রথম স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে রসাতলগামিনী পৃথিবীকে উদ্ধার এবং ষষ্ঠ চাক্ষুস মন্বন্তরে প্রলয়ার্ণবমধ্যে আদিদৈত্য হিরণ্যাক্ষকে দন্ত দ্বারা বিদারিত করেন। রামাবতারে বলশালি-দেবতাবৃন্দের জয়ী দশাননকে বধ করেন। নৃসিংহাবতারে হিরণ্যকশিপুকে বধ এবং পঞ্চম বর্ষীয় বালক প্রহ্লাদকে হিরণ্যকশিপুর বহুবিধ অত্যাচার-নিগ্রহ হইতে রক্ষা করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া হিরণ্যকশিপুর হেয় পাশবিক বল হইতে বলদেব-অংশাংশের কৃপাপাত্র শিশুরূপী প্রহ্লাদের উপাদেয় চিদ্বলের অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠতা প্রচার করেন। হয়শীর্ষাবতারে মধু কৈটভ নামক প্রচুর বলশালী দৈত্যদ্বয়কে বিনাশ করিয়া বেদ উদ্ধার করেন। পরশুরামাবতারে ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী অশেষ বলশালী ক্ষত্রিয়বর্গকে বিনাশ করিয়া পৃথিবীকে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়শূন্যা করেন। প্রলম্বারি বলরাম-রূপে তিনি আনুকরণিক প্রাকৃত সহজিয়ার আদর্শ প্রলম্বাসুরকে বধ করেন এবং কল্কি অবতারে দস্যুপ্রকৃতি পাশবিক-বলদৃপ্ত নৃপতিগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন। সুতরাং যে বলদেবের কলা-বিকলা দ্বারা এইরূপ মহাবলের আদর্শ জগতে প্রচারিত হইয়াছে, সেই মহামহাবলী বলদেব যে নিখিল বলের মূলপুরুষ, এ-বিষয়ে আর সন্দেহ কি? অধিক কি বলদেবের বিকলা-স্বরূপ যে গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতার, তাঁহার অংশ যে তৃতীয় পুরুষাবতার অনিরুদ্ধ বিষ্ণু—যিনি ব্যষ্টিজীবের অন্তর্য্যামী, সেই পরমাত্মরূপী মহাবিষ্ণু যদি জগতের বলদৃপ্ত ব্যক্তিগণের দেহে অবস্থান না করেন, তাহা হইলে তাহাদের সেই বলটুকুই বা কোথায় থাকে? হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, মধুকৈটভ বা দশানন প্রভৃতি অসুরগণ যে বলের অহঙ্কার করিয়াছিল, বলদেবের বিকলার অংশস্বরূপ উক্ত অসুরগণেরও অন্তর্য্যামী অনিরুদ্ধ বিষ্ণুর অপগমে তাহারা সেই সমস্ত বল হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল। সুতরাং অসুরের বলেরও কারণরূপে শ্রীবলদেবই। তবে সেইটী বলদেবের স্বরূপ বল বা স্বরূপশক্তির প্রভাব নহে, তাহা

তাঁহার বহিরঙ্গা বিরূপশক্তির প্রভাব মাত্র। আরোহবাদি জ্ঞানিগণ যে আত্মবলে বলীয়ান হইবার জন্য রুদ্রের উপাসনা করেন, সেই প্রলয়কর্ত্তা রুদ্রের তামসিক কার্য্যেরও কারণরূপে শ্রীবলদেবের অংশরূপ চতুর্ব্ব্যূহান্তর্গত সঙ্কর্ষণ। এই জন্য ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে সঙ্কর্ষণ মূর্ত্তিকে 'তামসী মূর্ত্তি' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। অর্থাৎ সঙ্কর্ষণ-মূর্ত্তি কারণ, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট্ এই উপাধিত্রয়ের অতীতা শুদ্ধা চিন্ময়ী তুরীয়া মূর্ত্তি হইলেও প্রলয় প্রভৃতি তামসিক কার্য্যের কারণ বলিয়া ব্যবহারতঃ উহাকে 'তামসী' বলা যায়। ভগবান্ ভব ভগবতী ভবানীর সহস্র অর্ব্বুদ পরিচারিকার সহিত সেই সঙ্কর্ষণ মূর্ত্তিকে আপনার মূলকারণ জানিয়া মন্ত্র জপ করিতে করিতে তাঁহার উপাসনা করেন। অতএব যাঁহার কলা বিকলার বলের কিয়দংশের পরিচয়ও ব্রহ্ম রুদ্রাদি দেবতাগণ ধারণা করিতে পারেন না, সেই মূল পুরুষ 'ক্রিয়াশক্তি-প্রধান, মূলসঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেব প্রভুর বলের আধিক্য আর কাহাকেও অধিক বুঝাইতে হইবে না। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—

'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'।

শ্রুতি কথিত এই 'বল' শব্দ বিরোচন ও ইন্দ্রের ন্যায় বিভিন্ন অধিকারী তাঁহাদের স্ব স্ব অধিকারানুযায়ী বিভিন্ন তাৎপর্য্যে বুঝিয়া কেহ বা শব্দের অজ্ঞরূঢ়ি বৃত্তি দ্বারা বঞ্চিত হন, কেহ বা বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তি দ্বারা শ্রুতির যথার্থ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়া থাকেন। *

এই জন্যই বিদ্বৎ-কুল-শিরোমণি চৈতন্য-লীলার ব্যাস শ্রুতিকথিত এই মন্ত্রের অর্থ উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন (চৈঃ ভাঃ আ ১।৩১),—

"চারিবেদে গুপ্ত বলরামের চরিত।
আমি কি বলিব সব পুরাণে বিদিত।।"

আবেশাবতার শ্রীশেষই বলদেবরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, কেহ কেহ এরূপ মনে করিয়া থাকেন। "বাসুদেবকলাঽনন্তঃ সহস্রবদনঃ স্বরাট্। অগ্রতো ভবিতা দেবো হরেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।।" (ভাঃ ১০।১।২৪) —এই ভাগবতীয় বাক্যের যথাশ্রুত অর্থে শ্রীবলদেব আবেশাবতার শ্রীশেষ বলিয়া প্রতীত হন; পরন্তু শ্রীবলরাম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংপ্রকাশ বিগ্রহ বা দ্বিতীয় দেহ। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের সমভাবে যুগলরূপ বর্ণনা ও একসঙ্গে সমভাবে বিহার, বলদেবে শ্রীকৃষ্ণ-সদৃশ ভগবল্লক্ষণ-সমূহের স্থিতি এবং দেবকীর হর্ষশোক-বিবর্দ্ধন 'সপ্তমগর্ভ' প্রভৃতি বাক্য হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, বলদেব আবেশাবতার নহেন, পরন্তু স্বয়ং অর্থাৎ অন্য-নিরপেক্ষ। উপরি উক্ত ভাগবতীয় শ্লোকে, 'স্বরাট্' শব্দের দ্বারা শ্রীবলদেব যে অন্যনিরপেক্ষ স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু, তাহাই সূচিত হইয়াছে। "রাম রাম মহাবাহো ন জানে তব বিক্রমম্। যস্যৈকাংশেন বিধৃতা জগতী জগতঃ পতে।।"—হে রাম! হে মহাবাহো জগৎপতে! যাঁহার একাংশ ('শেষ' নামক অংশ—শ্রীস্বামি-টীকা) দ্বারা জগৎ বিশেষরূপে ধৃত হইয়াছে, আমি সেইরূপ

* অপভ্রষ্ট দেবতাপর্য্যায়ে 'বল' নামক এক অসুরের কথাও শ্রুত হয়। এই অসুর ইন্দ্রহস্তে নিহত হইয়াছিল। ইহার মৃতদেহের বসা, রক্ত, অস্থি, মাংস প্রভৃতিতে মুক্তা মণি প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছিল, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

তোমার বিক্রম অবগত নহি—এই বাক্য হইতে জানা যায় যে, শ্রীবলদেব জগদ্ধারণ-কর্ত্তা আবেশাবতার শেষ নহেন; পরন্তু ধরণীধর শেষ বলরামেরই অংশ বা বৈকুণ্ঠস্থ মহাসঙ্কর্ষণের আবেশাবতার। বলদেবের অংশ যে লক্ষ্মণ, তিনিও শেষ হইতে পরম স্বরূপ বলিয়া নারায়ণবর্ম্মে শ্রীবলদেবের শেষ হইতে অন্যত্ব ও শক্তির অতিশয়ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে, বলদেব সর্ব্ববিধ মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু শেষ কেবল সর্প হইতে রক্ষা করিতে পারেন। অতএব শ্রীবলদেব আবেশাবতার নহেন; তমালশ্যামলকান্তি-যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ শব্দের মুখ্যবৃত্তির ন্যায় দেবকীর সপ্তমগর্ভে বলদেবের মুখ্যবৃত্তিত্ব-হেতু তাঁহার সাক্ষাৎ অবতারত্ব। 'শেষ' নামক বলদেবাবিষ্ট পার্ষদবিশেষ অংশি-বলদেবের আবির্ভাব সময়ে বলদেবে প্রবেশ করিয়াছিলেন,—ইহাই সিদ্ধান্ত।

বলদেব প্রভু তাঁহার বাল্য-লীলায় গর্দ্দভরূপধারী ধেনুকাসুরের বিনাশ ও প্রলম্ব নামক অপর অসুরের শিরো-বিদারণপূর্ব্বক সংহার সাধন করিয়াছিলেন। অবশ্য এই অসুরমারণাদি কার্যও অংশি বলদেবে প্রবিষ্ট অংশের দ্বারাই সাধিত হইয়াছিল। এই অসুর-বধ দ্বারা শ্রীবলদেব প্রভু 'একলীলায় প্রভু করেন কার্য্য পাঁচ সাত'—এই উক্তির সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। বিদ্বদ্‌গণ ঐ দুইটী কার্য্যে ব্রজভজনের প্রতিকূল অনর্থ-বিনাশরূপ ব্যাপার লক্ষ্য করেন অর্থাৎ জীবের স্থূল বুদ্ধি, সজ্ জ্ঞানাভাব, মূঢ়তাজনিত তত্ত্বান্ধতা, স্বরূপজ্ঞানবিরোধ বা দেহাত্ম- বুদ্ধিরূপ গোখর ধর্ম্ম—যাহা গর্দ্দভরূপী ধেনুকের আদর্শ এবং আনুকরণিক প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের ঢঙ্গবাদ—যাহা প্রলম্বাসুরের আদর্শ, সেই দুইটী ব্রজভজনের প্রতিকূল অনর্থের বিনাশ শ্রীবলদেব প্রভুর কৃপায় সাধিত হয়। শ্রীবলদেব প্রভু কৃষ্ণদ্বেষী শিশুপালের বন্ধু রুক্মীকে দ্যূতক্রীড়ায় পাশাঘাতে বিনাশ করিয়া বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষী ও তাহাদের সহচরগণ তাঁহার (বলদেব প্রভুর) দ্বারা কিরূপ বঞ্চিত হন, তাহার আদর্শলীলা প্রচার করেন। বলদেব প্রভু সন্ধিনী শক্তি-প্রভাবে নিত্য চিদ্ধামের নিত্য প্রাকট্য বিধান, মহা-সঙ্কর্ষণ হইতে মহতের স্রষ্টা প্রকৃতির ঈক্ষণকর্ত্তা কারণার্ণবশায়ী পুরুষের আবিষ্কার এবং গর্ভোদশায়ী পুরুষ হইতে নানাবিধ লীলাবতার তথা ব্রহ্মা, অনিরুদ্ধ-বিষ্ণু ও রুদ্রের প্রকাশ করিয়া অদ্বয় জ্ঞানোপলব্ধির সন্ধান প্রদর্শন করিয়াছেন এবং "জ্যেষ্ঠ হইল সেবার কারণ" (চৈঃ চঃ আ ৫।১৫২) এই বাক্যের আদর্শ ও "কৃষ্ণের সমতা হৈতে ভক্ত পদ বড়"—এই বাক্যের সার্থকতা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীবলদেব প্রভু তাঁহার তীর্থ-পর্য্যটন-লীলায় নৈমিষারণ্য-ক্ষেত্রে রোমহর্ষণ-সূতকে বধ করিয়া অর্দ্ধজরতীয় ন্যায়াবলম্বী গুরুবৈষ্ণব-পূজাবিমুখ ধর্ম্মধ্বজী দাম্ভিক বিষ্ণু-পূজক অনূচানমানিগণের আদর্শ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়াছেন। অতএব সেই বলদেব প্রভুই কৃষ্ণের সন্ধান-প্রদাতা, দশদেহে অর্থাৎ মর্য্যাদামার্গে সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণের সেবক গুরুদেব।

তিনি—

"আপনে সকল রূপে সেবেন আপনে।
যারে অনুগ্রহ করেন, পায় সেই জনে।।" (চৈঃ ভাঃ আ ১।৪৫)

সেই বলদেব প্রভু হইতেই সকল সত্ত্বার প্রকাশ, তাঁহার নামাভাস শ্রবণ-কীর্ত্তনেই সর্ব্বানর্থ নাশ, তিনি শ্রীকৃষ্ণের অনন্তগুণ কীর্ত্তন করিবার জন্য 'অনন্ত বদন'; অতএব যিনি চিদচিজ্জগতের সত্ত্বাবিধায়িনী শক্তির

শক্তিধর, সেই বলদেবের পূজা নিখিল বিশ্বের প্রত্যেক জীবমাত্রেরই যে একান্ত ধর্ম্ম—এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই। অতএব যাঁহারা অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি চালিত হইয়া জগতে বিভিন্ন ভাবে প্রাকৃত বল-সঞ্চয়-পিপাসু হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই যদি বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তির অনুসরণ করিয়া শ্রীবলদেব প্রভুর পূজা শিক্ষা করেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের প্রকৃত বলপ্রাপ্তি ঘটিবে। অবলা স্ত্রীগণ যদি মনসাদি গ্রাম্য দেবতার পূজা পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী মহাবীর্য্য-প্রভাবশালী ধরণীধর শ্রীশেষসর্পের আরাধনা শিক্ষা করেন, আত্মরক্ষায় অসমর্থ শিশুগণ যদি প্রহ্লাদের ন্যায় বলদেব প্রভুর কলাবিকলা স্বরূপ শ্রীনৃসিংহদেবের পূজা শিক্ষা করিয়া চিদ্‌বল সংগ্রহ করেন, পুরুষগণ যদি প্রাকৃত বাহুবলের হেয়তা, নশ্বরতা ও ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করিয়া কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে অনন্তমুখ, মহাবাগ্মী শ্রীসঙ্কর্ষণের নিকট হইতে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-বল প্রাপ্ত হন, তাহা হইলেই বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী, পুরুষ—বিশ্ববাসী সকলেই প্রকৃত নিত্য বলে বলীয়ান্ হইয়া পরমাত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'।

তাই অশোক-অভয়ামৃত-সেবনেচ্ছু নিঃশ্রেয়সার্থীর শ্রীগুরু-নিত্যানন্দ-রাম-পদাশ্রয়-কর্ত্তব্যতা জ্ঞাপন করিয়া আদি কবি গাহিয়াছেন, (চৈঃ ভাঃ আ ১।৭৭)—

'সংসারের পার হই' ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাই চাঁদেরে।।

জন্মাষ্টমী

'জন্মাষ্টমী' শব্দটী শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বাসরেই রূঢ়। যদিও অষ্টমী তিথিতে অন্যান্য বহু দেবতা-গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-কিন্নর-নর প্রভৃতির আবির্ভাবের কথা শ্রুত হয়, তথাপি 'জন্মাষ্টমী' শব্দটী প্রসিদ্ধরূপে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-দিনকেই লক্ষ্য করে।

'জন্মাষ্টমী' শব্দটী শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-বাসরে রূঢ় হওয়ায় আপাত দৃষ্টিতে উহা বিরুদ্ধ-অর্থ-জ্ঞাপক বলিয়া মনে হয়। কারণ সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধি আছে যে, ভগবদ্বস্তুর জন্মাদি নাই। অজের জন্ম, কালাতীত ভগবদ্বস্তুর কোনও কালবিশেষের মধ্যে আবির্ভাব—বড়ই বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-জ্ঞাপক। কারণ, 'অজ' কখনই জন্মগ্রহণ করেন না। আর জাতবস্তুও কখনই 'অজ' হইতে পারেন না। আবার কেহ কেহ বলেন যে, কৃষ্ণ যখন কোন কালবিশেষে জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁহাকে স্বয়ং ভগবানও বলা যাইতে পারে না। কারণ পরব্রহ্ম অনাদিসিদ্ধ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের দ্বাপরশেষে আবির্ভাবের কথা শ্রুত হয়।

এই সকল পূর্ব্বপক্ষের সমাধান কি? এই সকল পূর্ব্বপক্ষের মীমাংসা আমরা সর্ব্বপ্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীগীতোপনিষদে দেখিতে পাই। শ্রীকৃষ্ণ অনাদিসিদ্ধ। তাঁহার জন্মলীলাও অনাদি। তিনি স্বেচ্ছাবশতঃই প্রপঞ্চে যোগ্য জীবহৃদয়ে পুনঃ পুনঃ এই জন্মলীলা আবিষ্কার করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম-

তিথির কথা পশুপক্ষী-কীটাদি ও অজ্ঞরূঢ়ি-শব্দাশ্রিত জনগণ ধারণা করিতে অসমর্থ। শ্রীমদ্ভাগবতের (৩।২।১৫ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে,—

স্বশান্তরূপেষ্বিতরৈঃ স্বরূপৈরভ্যর্দ্দ্যমানেষ্বনুকম্পিতাত্মা।
পরাবরেশো মহদংশযুক্তো হ্যজোঽপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিঃ।।

স্বীয় শান্তরূপ বসুদেবাদি ভক্ত তদ্বিরুদ্ধ বিকৃত ও ভয়ঙ্কর আকার কংসাদি দৈত্য-দ্বারা পীড্যমান হইলে, অগ্নিমন্থনকাষ্ঠ হইতে যেমন অগ্নি প্রকটিত হয়, তদ্রূপ প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত লোকের অধীশ্বর দয়ার্দ্রহৃদয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অজ হইয়াও বৈকুণ্ঠাধীশ-তদ্ব্যূহ-তদংশপুরুষ-তদংশলীলাবতারাদি রূপান্তরের সহিত যোগপ্রাপ্ত হইয়া স্বীয় লোক হইতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। যেরূপ অরণি (অগ্নিমন্থন-কাষ্ঠ) বা পাষাণে বহ্নি নিত্যকাল অবস্থান করে, কিন্তু কোন (মথন বা আঘাতাদি) হেতু-বশতঃ কাষ্ঠাদি হইতে অগ্নি আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও কোন কালবিশেষে (যেমন বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগীয় দ্বাপরাবসানে) স্বীয় লীলার বিস্তার-হেতু সাধক ভক্তমণ্ডলীকে অনুগ্রহ করিবার অভিলাষেই জন্মাদি-লীলা প্রকট করিয়া থাকেন। প্রপঞ্চস্থিত সাধক প্রেমিক ভক্তের আর্ত্তিশান্তি করিতে স্বয়ং ভগবান্ ব্যতীত আর কেহই সমর্থন নহেন। শ্রুতদেব ও বহুলাশ্ব প্রভৃতি ভক্তজনকে দর্শন দ্বারা আনন্দ প্রদান এবং দানবদলের বিনাশ দ্বারা বসুদেবাদি প্রিয়জনের প্রতি অনুকম্পা—এই দুইটীই ভগবজ্জন্মলীলাবিষ্কারের মুখ্যকারণ। আর পৃথিবীর ভারহরণার্থ ব্রহ্মাদি দেবগণের যে প্রার্থনা, তাহা তাঁহার আবির্ভাবের আনুষঙ্গিক বা গৌণ-কারণ মাত্র। মুখ্যকারণ ফলোন্মুখ না হইলে পূর্ণাবতার ঘটে না। পূর্ণাবতারকালে আবার ভূ-ভারহরণাদি কার্য্যের জন্য অংশাদির পৃথক্ অবতরণেরও প্রয়োজন হয় না। সার্ব্বভৌম সম্রাট্ যখন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন, তখন যেমন মণ্ডলাধিপ রাজন্যবর্গ তাঁহার অনুগমন করেন, তদ্রূপ যখন শ্রীকৃষ্ণ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহার বিলাস পরব্যোমনাথ, তদ্ব্যূহ, তাঁহার অংশ, পুরুষাদি অবতার রাম-নৃসিংহ-বরাহ-বামন-নরনারায়ণ প্রভৃতিও অংশী শ্রীকৃষ্ণের সহিত জগতে অবতীর্ণ হন। তাই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-কালে শ্রীবৃন্দাবনে সেই সেই অবতারাদির লীলার প্রাকট্য দৃষ্ট হয়। বৃন্দাবনে ব্রহ্মাকে ব্রহ্মাণ্ডনাথের সহিত যে অদ্ভুত ব্রহ্মাণ্ডকোটি প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহা বৈকুণ্ঠনাথেরই লীলা। মথুরা ও দ্বারকাদিতে বাসুদেবাদি রূপে বাসুদেবাদির যে লীলা প্রকাশিত হয়, তাহা ব্রজমধ্যেও বাল্যলীলার দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছিল। যেমন শ্রীদামা গরুড় হইলে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ এবং দ্বাদশাদিত্য আসিয়া প্রণাম করিলে শ্রীকৃষ্ণ দশবাহু হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শেষশায়িরূপ মূর্ত্তিসমূহ দ্বারা মাথুরমণ্ডলে পুরুষাবতারের লীলাসমূহও প্রকট করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় লীলায় যে সকল রামাদিরূপের অবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেই সকল শ্রীমূর্ত্তি অদ্যাপি মাথুর মণ্ডলে বিরাজমান আছেন। গো-পরার্দ্ধের পয়োরাশিদ্বারা ক্ষীরসমুদ্রের প্রকাশ ও গোপগণকে দেবাসুর করিয়া স্বয়ং অজিতরূপে শ্রীকৃষ্ণ ক্ষীরোদক মন্থন করিয়াছিলেন। যেমন মহাগ্নি হইতে শত সহস্র বিস্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হইয়া পুনরায় তাহাতেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ অংশী শ্রীকৃষ্ণের অংশস্বরূপ অন্যান্য অবতারগণ পুনর্ব্বার অংশীতেই একতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যেমন গ্রাম-নগরাদি দগ্ধ করিতে হইলে দীপ ও অগ্নিপুঞ্জের শক্তি সমান হইলেও অগ্নিপুঞ্জ হইতেই শীতাদির আর্ত্তি নাশজনিত সুখাতিশয় হইয়া

থাকে, তদ্রূপ পুরুষাদি অবতারের দ্বারা জগতের ভারহরণাদি কার্য্য সাধিত হইলেও অংশী শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপরের দ্বারা প্রেমিক ভক্তগণের সুখাতিশয্য হয় না।

বিরুদ্ধগুণ প্রাকৃত বস্তুতে সম্ভব না হইলেও অপ্রাকৃত বস্তুতে যুগপৎ বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ দৃষ্ট হয়। ইহাই অপ্রাকৃতত্ত্বের একটী বিশেষত্ব। সুতরাং অপ্রাকৃত ভগবানের অজত্ব ও জন্মিত্বের মধ্যে বিরুদ্ধ ভাব আশঙ্কা করা সমীচীন নহে। শ্রুতিতেও ভগবানে এইরূপ বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশের বিষয় শ্রুত হয়, যথা—"অজায়মানো বহুধা বিজায়তে।" শ্রীগীতায়ও (৪।৬) ভগবান্ বলেন,—"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।।" (গীঃ ৪।৬)—"স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য বিশুদ্ধোর্জ্জিত সত্ত্বমূর্ত্ত্যা স্বেচ্ছয়াবতরামীত্যর্থঃ।" (শ্রীধর)

শ্রীভগবানের জন্মাদি-লীলা স্বরূপশক্তির কার্য্য। স্বরূপশক্তিটী স্বরূপ হইতে ভিন্না নহে, স্বরূপেরই অধীনস্থা। স্বরূপের যাবতীয় ইচ্ছাপূর্ত্তিকারিণী শক্তিবিশেষই স্বরূপশক্তি। শ্রীভগবান্ স্বীয় শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা স্বরূপশক্তি দ্বারা স্বেচ্ছায় জন্মাদিলীলা বিস্তার করিয়া থাকেন। আর তাঁহার স্বরূপশক্তি হইতে অভিব্যক্ত যে সকল পরিকর, তাঁহারাও তাঁহারই ইচ্ছায় তাঁহার লীলার সহায়রূপে জগতে অবতীর্ণ হন। যে শক্তিদ্বারা জীবের জন্মাদি লাভ ঘটে, তাহা জীব-স্বরূপ হইতে ভিন্না; কিন্তু যে শক্তি দ্বারা শ্রীভগবান্ জগতে অবতীর্ণ হন, তাহা তাঁহার নিজ স্বরূপেরই অধীন, তাঁহারই ইচ্ছাপূরণকারিণা। যে শক্তি দ্বারা জীবের জন্মাদি ঘটে, তাহা জীব-স্বরূপ হইতে ভিন্না বলিয়াই জীবের সেই মায়াশক্তি হইতে মুক্তি লাভ করিবার পর আর জীবের জন্মাদি সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু যে শক্তিদ্বারা ভগবান্ জন্মাদি-লীলা আবিষ্কার করেন, তাহা তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্না বলিয়া—তাহা তাঁহার স্বরূপের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে সতত অবস্থিত বলিয়া ভগবানের জন্মাদি-লীলা নিত্যা ও শুদ্ধা; উহা জীবের ন্যায় কর্ম্মফলভোগ নহে।

এখানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যদি ভগবানের জন্মাদিলীলাকে নিত্যা বলা হয়, তাহা হইলে ত' ভগবানকে চিরকাল ধরিয়াই জন্মাদি-জন্য বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইল; বরং জীব কখনও মায়ার কবল হইতে মুক্ত হইয়া জন্মান্তর গ্রহণ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে, কিন্তু ভগবানের পক্ষে ত' সেটীও ঘটিল না। তদুত্তর এই যে, শ্রীভগবান্ স্বীয় নিরঙ্কুশ ইচ্ছায় স্বরূপস্থিতা সচ্চিদানন্দময়ী স্বরূপশক্তি দ্বারা জন্মাদি লীলা বিস্তার করিয়া থাকেন। ভগবান্ যেমন নিত্য, তাঁহার স্বরূপ- শক্তিও সেইরূপ নিত্যা। আবার শ্রীভগবানের ক্রীড়াবিলাস করিবার ইচ্ছাও নিত্যা; সুতরাং সেইরূপ নিত্য-স্বরূপ-শক্তি সমন্বিত লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ নিত্য-লীলা-বিলাসেচ্ছায় নিত্য-স্বরূপশক্তি দ্বারা নিত্য-জন্মাদি-লীলা বিস্তার করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহার নিত্য-স্বরূপের, নিত্য-পরিকরবর্গের এবং প্রপঞ্চস্থিত নিত্যসাধক ভক্তগণের নিত্যানন্দামৃতাম্বুধি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

ভগবানের স্বেচ্ছায় জন্মাদি-লীলা আবিষ্কার, আর জীবের কর্ম্মবাধ্য হইয়া জন্মাদি পরিগ্রহণ। ভগবানের স্বরূপস্থিতা স্বরূপ হইতে অভিন্না শক্তিদ্বারা জন্মাদিলীলা বিস্তার, আর জীবের তাহার স্বরূপ হইতে ভিন্না মায়াশক্তির দ্বারা জন্মপ্রাপ্তি। যে শক্তিদ্বারা ভগবানের জন্মাদি-লীলার আবিষ্কার, সেই শক্তি সচ্চিদানন্দময়ী;

আর জীবের যে শক্তির দ্বারা জন্মাদি পরিগ্রহণ, সেই শক্তি ত্রিতাপময়ী। স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ক্রীড়া-বিলাসার্থ স্বরূপশক্তি-প্রকটিত পরিকর ও ধামাদির সহিত অবতরণ, আর অস্বতন্ত্র জীবের কর্ম্মফল-ভোগার্থ মায়াশক্তি প্রকটিত অনিত্য জগৎ ও মায়াশক্তি-বাধ্য অন্যান্য জীবের সহিত পান্থ-পরিচয় মাত্র। সুতরাং জীবের কর্ম্মফল-ভোগরূপ জন্মাদির সহিত নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময় ক্রীড়ামোদী ভগবানের অবতরণরূপ জন্মাদি লীলা এক নহে। এই জন্যই শ্রীভগবান্ স্বমুখে বলিয়াছেন—

"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন।।"

শ্রীভগবানের জন্মাদি-লীলা স্বরূপশক্তির বিলাস বলিয়া প্রমাণিত হইল; কিন্তু তাঁহার পরিকরগণের যে জন্মাদি ও নানাবিধ দুঃখ-কষ্টাদির কথা শ্রুত হয়, তাহাতে মনে হয় যে, তাঁহাদের জন্ম ও কর্ম্মফল ভোগাদি জীবেরই ন্যায়। নতুবা সুখময় ভগবানের সহিত অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাদিগের মধ্যে দুঃখাদির প্রসক্তি কিরূপে হইতে পারে? দেবকী-বসুদেবের কারাগৃহে অবস্থান, ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে শোক, নন্দ-যশোদারও প্রাকৃত পিতামাতার ন্যায় পুত্রের প্রতি অত্যাসক্তি, এ সকল কি? এইরূপ আক্ষেপের সমাধান জীব স্বরূপস্থ হইলেই সুষ্ঠুভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন। ভগবৎ-পরিকরগণ সকলেই স্বরূপশক্তিরই বৈভব। তাঁহাদের জন্মাদিও স্বরূপশক্তিরই বিলাস। শ্রীহরির ইচ্ছায়ই তাঁহার লীলার সহায়করূপে তাঁহারা জগতে অবতীর্ণ হন। তাঁহাদের দুঃখাদির অভিনয় লীলা-রসাস্বাদনের পরিপাটীবিশেষ। জগতের যাবতীয় দুঃখাদির ন্যায় উহা কর্ম্মফল ভোগ নহে, পরন্তু নব-নবায়মানভাবে কৃষ্ণ-সেবা-মাধুরী-চমৎকারিতাস্বাদনের একটী বিচিত্রতা মাত্র। প্রাকৃত মাতা-পিতার পুত্রের জন্য আসক্তি মূল অপ্রাকৃত-বৎসলরসাশ্রয়ালম্বনগণের অপ্রাকৃত পরমোপাদেয় ও একমাত্র বাঞ্ছনীয় আসক্তির হেয় প্রতিফলন মাত্র। প্রাকৃত পিতামাতার প্রাকৃত অনিত্য পুত্রের জন্য আসক্তি কর্ম্মফল ভোগ বলিয়া উহা হেয়—পরিত্যজ্য; কিন্তু নন্দ-যশোদার নিত্যপুত্রের জন্য আসক্তি পরমোপাদেয় ও অপ্রাকৃত অনুরাগিজনগণের অনুসরণীয়।

এখানে আর একটী প্রশ্ন হইতে পারে, যদি ভগবানের জন্মাদি-লীলা নিত্যই হয়, তাহা হইলে ভগবানে 'অজ' শব্দ প্রয়োগের সার্থকতা কিরূপে সিদ্ধ হয়? শাস্ত্র এই আক্ষেপের সমাধান করিয়াছেন। শাস্ত্র বলেন, —শ্রীহরির গুণ সাকল্যভাবে বলা যায় না বলিয়া তিনি 'অনামা', তাঁহার রূপ প্রাকৃত না হওয়ায় তিনি 'অরূপ' এবং তাঁহার জন্ম প্রাকৃতপুরুষগণের জন্মের ন্যায় না হওয়ায় তাঁহাকে 'অজ' বলা হয়। কিন্তু যদি এইরূপ শাস্ত্রীয় অর্থ গ্রহণ না করিয়া 'অনামা', 'অরূপ', 'অজ', 'অকর্ত্তা' প্রভৃতি ভগবদ্‌বিশেষণ-বাচক শব্দের অবিদ্বদ্‌রূঢ়ি-বৃত্তি গ্রহণ করিয়া অর্থ করা হয়, তাহা হইলে ভগবানের স্বরূপশক্তি অস্বীকার করিতে হয়। স্বরূপশক্তি ব্যতীত ভগবৎ-শব্দটীও নিরর্থক।

প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদগণ বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থ খণ্ড ২৪ অধ্যায় ও শ্রীমদ্ভাগবত ১২শ স্কন্ধ ২য় অধ্যায় হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মকালীন গ্রহ-নক্ষত্রাদির সন্নিবেশ হইতে যে গণনা করিয়াছিলেন, তদনুসারে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণকাল কিঞ্চিদধিক পঞ্চ সহস্র বৎসর হয়। বর্ত্তমান কলিযুগের প্রাক্কালে অর্থাৎ অতীত দ্বাপরযুগের

শেষভাগে অথবা তদুভয়ের সন্ধিকালে স্বয়ং ভগবান্ লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ মাথুরমণ্ডলে বসুদেব-দেবকীকে দ্বার করিয়া আবির্ভূত হন। আমরা শ্রীবসুদেব-দেবকীর পূর্ব্ব ইতিহাস হইতে জানিতে পারি যে, শ্রীকৃষ্ণ জন্ম-অপেক্ষায় তৃতীয়-পূর্ব্বজন্মে স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরে বসুদেব সুতপা নামক প্রজাপতি এবং দেবকী পৃশ্নি নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রজা-সৃষ্টি-নিমিত্ত আদিষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়সমূহ সংযমনপূর্ব্বক দেব-পরিমাণ দ্বাদশ সহস্র বর্ষ শ্রদ্ধা সহকারে তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ভক্তি-ভাবিত নির্ম্মল হৃদয়ে চতুর্ভুজ শ্রীবিষ্ণু প্রাদুর্ভূত হইয়া বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহারা ভগবানের নিকট ভগবৎ-সদৃশ পুত্র প্রার্থনা করেন, সেই সময়ে ভগবান্ তাঁহাদের পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া 'পৃশ্নি-গর্ভ' নামে খ্যাত হন। তৎপরে দ্বিতীয় জন্মে যখন 'সুতপা' ও 'পৃশ্নি'—'কশ্যপ' ও 'অদিতি' নাম ধারণপূর্ব্বক আবির্ভূত হন, তখনও বিষ্ণু ইন্দ্রানুজ বামনরূপে উদিত হইয়া 'উপেন্দ্র' এবং 'বামন' নামে বিখ্যাত হন। এইরূপ প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রহণ করিলে বসুদেব-দেবকীকে সাধনসিদ্ধ জীববিশেষ বিচার করিতে হয়; পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পিতা-মাতা বসুদেব-দেবকী কখনই এইরূপ সাধনসিদ্ধ জীব হইতে পারেন না। তবে যে শ্রীবসুদেবাদির পূর্ব্বজন্মে সাধকরূপে সাধনাদির কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা শ্রীভগবানেরই মত তদিচ্ছাক্রমে লোকসংগ্রহের জন্য বসুদেবাদির অংশাবতার দ্বারা সাধক-জীবে আবেশ হেতু সম্ভাবিত হইয়া থাকে অর্থাৎ বসুদেবাদি নিত্য-সিদ্ধ, তাঁহারা কখনও সাধনাদি করেন নাই; তবে কোন সাধক জীববিশেষে তাঁহাদের অংশ আবিষ্ট হইয়া লোক-সংগ্রহার্থ সাধন করিয়াছেন এবং পরে অংশ-অংশীতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। অংশ-অংশীর ঐক্যপ্রকাশ-বিবক্ষায় ঐরূপ উক্ত হইয়াছে।

ব্রহ্মার আদেশে দেবাদির অংশপরম্পরা অবতরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বসুদেবাদির অংশ স্বর্গস্থিত কশ্যপাদি, নিত্যলীলাস্থিত বাসুদেবাদির অংশীর সহিত শূর প্রভৃতি হইতে মথুরাতে আবির্ভূত হন। বৈকুণ্ঠপতি শ্রীনারায়ণ যাঁহার বিলাসমূর্ত্তি, সেই লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় স্বীয় লীলা বিস্তার করিতে অভিলাষী হইয়া প্রথমতঃ সঙ্কর্ষণ ব্যূহের প্রকট করেন; তৎপরে আপনার অন্তরস্থিত প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ নামক ব্যূহদ্বয়কে যথাকালে আবির্ভূত করাইবেন সঙ্কল্প করিয়া বিশুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ বসুদেবের হৃদয়ে প্রকটিত হন। তখন পৃথিবীর ভার-হরণকালও উপস্থিত হয়। স্থিতিকর্ত্তা অনিরুদ্ধ বিষ্ণুই জগতের ভারহরণের ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তা; ভারহরণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য নহে। অতএব দেবগণের প্রার্থনায় তখন ক্ষীরোদশায়ী অনিরুদ্ধ বসুদেবের হৃদয়স্থিত শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া বসুদেবের হৃদয় হইতে বিশুদ্ধ-সত্ত্ববৃত্তি-স্বরূপা শ্রীদেবকীর হৃদয়ে প্রকটিত হন। দেবকীর বাৎসল্য-প্রেমানন্দামৃত দ্বারা লাল্যমান হইয়া শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর হৃদয়ে চন্দ্রের ন্যায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি আবিষ্কার করিতে থাকেন। অনন্তর ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে বুধবারে রোহিণী-নক্ষত্রে মহানিশায় দেবকীর হৃদয় হইতে কংসকারাগারস্থ সূতিকা-গৃহে দেবকীর শয্যায় আবির্ভূত হন।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবসুদেব-দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হইলেও প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় চরম-ধাতু প্রভৃতিতে প্রবিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করেন না। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ বিশুদ্ধ সত্ত্ব ও তদ্বৃত্তিরূপা দেবকী-বসুদেবের অপ্রাকৃত সত্ত্বে আবিষ্ট হইয়াই জন্ম-লীলা আবিষ্কার করেন। তজ্জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২।১৯) বলা হইয়াছে যে,

পূর্ব্বদিক যেরূপ আনন্দকর চন্দ্রকে ধারণ করে, তদ্রূপ দেবকী-দেবী বসুদেব কর্ত্তৃক বৈধ-দীক্ষাবিধানে সমর্পিত জগন্মঙ্গল সর্ব্বাংশ-পরিপূর্ণ সর্ব্বমূলস্বরূপ সর্ব্বসুখনিদান শ্রীহরিকে মনোমধ্যে পুত্ররূপে ধারণ করিয়াছিলেন। বাৎসল্য-প্রেম-হেতুই শ্রীবসুদেব, দেবকীতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম যে প্রাকৃত ব্যক্তির জন্মের ন্যায় নহে, তাহার আর একটী প্রমাণ এই যে, প্রাকৃত জন্মশীল শিশু সর্ব্বতোভাবে দিগ্‌বসন হইয়াই মাতৃকুক্ষি হইতে ভূমিষ্ঠ হয়; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হইলেন, তখন ভাগবতীয় বর্ণনাতে দেখা যায় যে, তিনি চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধৃক্, কিরীট-কুণ্ডলাদি নানাপ্রকার ভূষণে বিভূষিত, অপরিমিত কেশদামযুক্ত ও পীত-বসন-পরিহিত। প্রাকৃত বালক কখনও মাতৃকুক্ষি হইতে বসনাদি-পরিহিত বা অলঙ্কারাদি-বিভূষিত হইয়া জন্মগ্রহণ করে না।

শ্রীভগবানের এইরূপ চতুর্ভুজরূপে আবির্ভাবের কারণ শ্রীভগবান্ স্বমুখে জানাইয়াছেন। দ্বিভুজই তাঁহার স্বরূপ, কেবলমাত্র ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্র-বাৎসল্য- রসরসিকদ্বয়কে পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ করাইবার জন্যই তিনি চতুর্ভুজরূপ প্রকট করিয়াছিলেন।

তাই,— * * ভগবানাত্মমায়য়া। পিত্রোঃ সংপশ্যতোঃ সদ্যো বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ।।" এ স্থানে 'আত্মমায়া' ও 'প্রাকৃত শিশু' এই পদদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত দ্বিভুজরূপকেই তাঁহার স্বরূপ-বিগ্রহ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যপাদ মহা-সংহিতাবাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন, 'আত্মমায়া' অর্থে—ভগবদিচ্ছা। 'প্রকৃতি' অর্থ—স্বরূপ। স্বরূপে ব্যক্ত বলিয়া প্রাকৃত অর্থাৎ শ্রীমন্নরাকার বিগ্রহই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। সেই স্বরূপে আবির্ভূত বলিয়া তিনি প্রাকৃত, ইহাই প্রাকৃত শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি প্রতিপাদন করিতেছেন। এই কৃষ্ণরূপী দ্বিভুজ বাসুদেব বা দেবকীনন্দন দ্বিভুজ স্বয়ংরূপেরই বৈভবপ্রকাশ। আর পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণরূপী চতুর্ভুজ বাসুদেব দেবকীনন্দনরূপ দ্বিভুজ বাসুদেবেরই প্রকাশ-বিগ্রহ।

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ কংস-কারাগারে দেবকীর শয্যায় আবির্ভূত হইলে, বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া গোকুলে যশোদার গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে তথায় রক্ষা করিয়া যশোদার শয্যাস্থ যোগমায়াকে লইয়া নিঃসৃত হন। এ স্থানে কোন কোন প্রাচীন ভাগবতগণ বলিয়া থাকেন যে, কংস-কারাগারে বসুদেব-গৃহে প্রথম ব্যূহ বাসুদেব আর গোকুলে নন্দগৃহে যোগমায়ার সহিত স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন। বসুদেব যশোদার সূতিকাগারে প্রবিষ্ট হইয়া কেবলমাত্র একটী কন্যাই দেখিতে পান। তিনি কংস-বঞ্চনার্থ সেই যোগমায়াকে লইয়া মথুরায় আগমন করেন। এদিকে বাসুদেবও স্বয়ংরূপে প্রবিষ্ট হন।

দেহলীপ্রদীপন্যায়ানুসারে শ্রীকৃষ্ণ যশোদানন্দন ও দেবকীনন্দন—এই উভয় নামে প্রসিদ্ধ। বাৎসল্য-প্রেমহেতু শ্রীবসুদেব-দেবকী এবং শ্রীব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরী উভয়ত্র শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইলেও ব্রজরাজ-ব্রজেশ্বরীতে সেই বাৎসল্যপ্রেম প্রচুর ও ঐশ্বর্য্যগন্ধহীন। আমরা 'শ্রীনন্দোৎসব' সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করিব।

শ্রীরাধাষ্টমী

নন্দীশ্বর গিরির দক্ষিণে বরসানু নামে একটী ভূধররাজ বিরাজিত আছে। উক্ত বরসানু পর্ব্বতের অধিত্যকায় বৃষভানু নামে এক গোপরাজ বাস করিতেন। বৃষভানু সহধর্ম্মিনী কৃত্তিকার সহিত তথায় বাস করিয়া শ্রীহরির আরাধনা করিতেছিলেন। ভাদ্র মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে বিশাখা-নক্ষত্রে মধ্যাহ্নকালে বৃষভানুরাজের গৃহে একটী কন্যারত্ন আবির্ভূত হইলেন; কন্যারত্নের আবির্ভাব সময়ে শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম সময়ের ন্যায় চতুর্দ্দিক সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিল, সজ্জনগণের হৃদয়ে প্রচুর আনন্দের সঞ্চার হইতে থাকিল। বৃষভানুপুরে গোপরাজ বৃষভানু, রত্নভানু ও সুভানু ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিলেন। মহাভাগ্যবতী কৃত্তিকা চন্দ্রকলিকা কন্যারত্নের মুখকমল দর্শনে আনন্দে আত্মহারা হইলেন; সুরপুরে ও ব্রজপুরে বিপুল আনন্দোৎসব হইল। এই কন্যারত্নই জগতে 'বৃষভানু-নন্দিনী রাধা' নামে খ্যাতা হইলেন।

"তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিমান্।
হরেনিবাসাত্মগুণৈ রমাক্রীড়মভূন্নৃপ।।" (ভাঃ ১০।৫।১৮)

—এই ভাগবতীয় শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ব্রজরামাশিরোমণি শ্রীমতী বৃষভানুরাজকুমারী শ্রীরাধিকার প্রাকট্যমাত্র-জন্ম সূচিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে নিত্য অবস্থান করেন। শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-বিহার-ভূমি বলিয়া ব্রজ সদা সর্ব্বসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ। কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব আরম্ভ করিয়া এই নন্দ-ব্রজ সর্ব্বলক্ষ্মীগণের অংশিনী ব্রজকিশোরিকা-শিরোরত্ন বৃষভানুরাজকুমারীর ক্রীড়াভূমি হইয়াছিল। 'ব্রজভূমি শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকাল হইতে শ্রীরাধিকা-প্রমুখা ব্রজরামাগণের বিহারাস্পদ হইয়াছিল'—এই বাক্যে যে কেবল তখনই শ্রীরাধিকাপ্রমুখা ব্রজদেবীগণ তথায় বিহার করিতেছিলেন, তাহা নহে; শ্রীহরির নিবাস-ভূমিস্বরূপ শ্রীনন্দগোকুলে শ্রীনন্দনন্দন যাবৎ নিগূঢ়ভাবে বিহার করেন, তাবৎ শ্রীরাধাপ্রমুখা ব্রজরামাগণও নিগূঢ়ভাবে বিহার করিয়া থাকেন। আর শ্রীনন্দকুমার যখন প্রকটরূপে বিহার করেন, তখন ব্রজরামা-শিরোমণি শ্রীরাধা তাঁহার কায়ব্যূহস্বরূপ গোপীগণের সহিত প্রকটরূপে বিহার করিয়া থাকেন; —ইহাই 'তোষণী' ও 'সন্দর্ভ' সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

যেমন "যাঁহার শ্রীকৃষ্ণে নিষ্কামা সেবন-প্রবৃত্তি বিদ্যমানা, তাঁহাতে নিখিল দেবতা নিখিল সদ্গুণরাশির সহিত নিত্য বাস করেন", তদ্রূপ যাঁহাতে প্রেম-বৈশিষ্ট্য আছে, ঐশ্বর্য্যাদিরূপা অন্য নিখিল শক্তি—অতিশয় আদৃতা না হইলেও তাঁহার অনুগমন করিয়া থাকে, এই জন্য শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমতী রাধিকাতেই স্বয়ংলক্ষ্মীত্ব। শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণপ্রেমোৎকর্ষ-পরাকাষ্ঠারূপিণী বলিয়া অন্য নিখিল শক্তি তাঁহার অনুগামিনী; তিনি সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী—নিখিল শক্তিবর্গের অংশিনী। অতএব অন্যান্য প্রেয়সী বর্ত্তমান থাকিলেও শ্রীমতী রাধিকার পরম-মুখ্যত্বাভিপ্রায়ে বৃন্দাবনাধিকারিণীরূপে তাঁহার নাম গ্রহণ করা হইয়াছে। পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শৌনক-নারদ-সংবাদে এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়,—

"বৃন্দাবনাধিপত্যঞ্চ দত্তং তস্মৈ প্রত্যুষ্যতা।
কৃষ্ণেনান্যত্র দেবী তু রাধা বৃন্দাবনে বনে।।"

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধিকাকে বৃন্দাবনাধিপত্য প্রদান করিয়াছেন। প্রাকৃত বা সাধারণ দেশে দেবী তাহার অধিকারিণী, কিন্তু দেবীধামের পরপারে বিরজা, ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠ অতিক্রম করিয়া সর্ব্বোপরি যে বৃন্দাবন নামক অপ্রাকৃত কৃষ্ণবিহার-স্থল বিরাজিত, সেই বৃন্দাবন নামক বনে শ্রীরাধিকাই একমাত্র অধীশ্বরী। স্কন্দপুরাণ এবং মৎস্যপুরাণেও দৃষ্ট হয়,—"বারাণসীতে বিশালাক্ষী, পুরুষোত্তমে বিমলা, দ্বারাবতীতে রুক্মিণী এবং বৃন্দাবন-বনে রাধিকা।"—এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ সন্দর্ভে এইরূপ বলিয়াছেন, —"শক্তিত্বমাত্র-সাধারণ্যেনৈব লক্ষ্মীসীতারুক্মিণী-রাধানামপি দেব্যা সহ গণনম্। বৈশিষ্ট্যন্তু লক্ষ্মীবৎ সীতাদিষ্বপি জ্ঞেয়ম্। তস্মান্ন দেব্যা সহ লক্ষ্ম্যাদীনামৈক্যম্। শ্রীরামতাপনী-শ্রীগোপালতাপন্যাদৌ তাসাং স্বরূপভূতত্বেন কথনাৎ। শ্রীরাধিকায়াশ্চ যামলে পূর্ব্বোদাহৃতপদ্যত্রয়ানন্তরং, 'ভুজদ্বয়যুতঃ কৃষ্ণো ন কদাচিচ্চতুর্ভুজঃ। গোপ্যৈকয়া যুতস্তত্র পরিক্রীড়তি সর্ব্বদেতি।' অত্র বৃন্দাবন-বিষয়ক-তৎসহিত-সর্ব্বদাক্রীড়িত্বলিঙ্গাবগতের্ন পরস্পরাব্যভিচারেণ স্বরূপশক্তিত্বম্। সতীষ্বপ্যন্যাসু একয়া ইত্যনেন তত্রাপি পরমমুখ্যাত্বমভিহিতম্।" উপরি-উক্ত শ্লোকে দেবীধামেশ্বরী শ্রীদুর্গাদেবী বা মায়াশক্তির সহিত যে শ্রীলক্ষ্মী, সীতা, রুক্মিণী ও শ্রীরাধার একত্র উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা দ্বারা সকলের সমত্ব মনে করা উচিত নহে। দেবী-ধামেশ্বরী মহামায়া দুর্গাদেবী কৃষ্ণের স্বরূপশক্তির বহিরঙ্গ- প্রকাশ-স্বরূপিণী বিরূপশক্তি; কি স্বরূপাশ্রিতা, কি অপাশ্রিতা—সকলেই শক্তিতত্ত্ব বলিয়া অন্তরঙ্গাশক্তি শ্রীলক্ষ্মী, সীতা, রুক্মিণী, রাজা প্রভৃতিকেও দুর্গাদেবীর সহিত গণনা করা হইয়াছে। দেবী হইতে লক্ষ্মীর বৈশিষ্ট্যের ন্যায় শ্রীসীতা প্রভৃতিরও বৈশিষ্ট্য জানিতে হইবে। এই জন্যই দেবীর সহিত লক্ষ্মী প্রভৃতির ঐক্য স্থাপিত হইতে পারে না, যেহেতু শ্রীরামতাপনীতে শ্রীসীতাদেবীর এবং শ্রীগোপালতাপনী প্রভৃতিতে শ্রীরুক্মিণী ও শ্রীরাধার স্বরূপভূতত্ব উক্ত হইয়াছে। শ্রীযামলে উক্ত হইয়াছে যে,—"শ্রীকৃষ্ণ ভুজদ্বয়বিশিষ্ট, তিনি কখনও চতুর্ভুজ নহেন; তিনি একটী গোপীর সহিত মিলিত হইয়াই অনুক্ষণ ক্রীড়া করেন।" এস্থানে 'দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে একটী গোপীর সহিতই সর্ব্বদা ক্রীড়া করেন'—এই বাক্য হইতে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার পরস্পরের অব্যভিচার-হেতু স্বরূপ-শক্তিত্ব নিশ্চিত হইয়াছে। অন্য বহু গোপী বিদ্যমান থাকিলেও একটী গোপীর সহিত ক্রীড়া করেন—এইরূপ বিশেষ উল্লেখ থাকায় শ্রীরাধার পরমমুখ্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব শ্রীরাধার স্বরূপশক্তিত্ব-নিবন্ধন বৃহদ্-গৌতমীয়তন্ত্রের প্রসিদ্ধ বাক্য—"শ্রীরাধা 'সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী', 'সর্ব্বকান্তি', 'ভুবনমোহন মনমোহিনী', 'পরা'শক্তি"—সর্ব্বতোভাবে সার্থকতা লাভ করিতেছে। এই সকল প্রমাণ দ্বারা জানা যায় যে, মূলাশ্রয় রাধিকা হইতেই আশ্রয়-বৈভব ব্রজললনাসমূহ, রেবতী-প্রমুখা প্রকাশাশ্রয়বৃন্দ, দ্বারকাদিতে মহিষীবৃন্দ, পরব্যোমে লক্ষ্মীগণ, নৈমিত্তিক অবতারাদিতে সীতাপ্রভৃতি তত্তদ্-বিষ্ণবতারের স্বরূপ-শক্তিগণ এবং নিত্যবদ্ধ জীবগণের কারা বা দুর্গরক্ষত্রিয়ী কায়াস্বরূপা-অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির ছায়াস্বরূপা বহিরঙ্গা বিরূপশক্তিরূপে দেবীধামে নিত্যকাল কৃষ্ণবহির্ম্মুখ-প্রাকৃতজন-পূজিতা হইয়া প্রকাশিতা আছেন।

ঋক্-পরিশিষ্টশ্রুতিও আমরা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তিরূপে শ্রীরাধার উল্লেখ দেখিতে পাই, যথা—"রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা।" নিজ-জনসমূহে শ্রীরাধার দ্বারা শ্রীমাধব বিহারশীল বা দ্যুতিমান; মাধব দ্বারা রাধিকা সর্ব্বতোভাবে দীপ্তি পাইতেছেন।

বেদান্তের অকৃত্রিম-ভাষ্যের মূর্দ্ধণ্য শ্লোকে অর্থাৎ 'জন্মাদ্যস্য'-শ্লোকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরম-মাধুরী পরমমুখ্যা বৃত্তির দ্বারা কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের মূর্দ্ধণ্য শ্লোকটী এই—

"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গো মৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।।"

অনু + অয় = অন্বয়ঃ, অনু—পশ্চাৎ, অয়—'ই' (ইন্—গত্যর্থে) ধাতু নিষ্পন্ন; নিজ-পরমানন্দ-শক্তিরূপা শ্রীরাধিকার সর্ব্বদা অনুগতি করেন বা আসক্ত থাকেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ 'অন্বয়'; ন্যায়-পরিভাষানুসারে 'তাহা থাকিলে তাহা থাকা'র নাম—'অন্বয়' অর্থাৎ স্বরূপশক্তি শ্রীরাধা ব্যতীত কৃষ্ণের অবস্থান নাই। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ 'অন্বয়'। শ্রীকৃষ্ণের ইতরা অর্থাৎ সর্ব্বদা দ্বিতীয়া বলিয়া ইতরা বা সর্ব্বদা দ্বিতীয়াই 'শ্রীরাধা'। শ্রীরাধা ও কৃষ্ণ একস্বরূপ হইয়াও আস্বাদক ও আস্বাদিতরূপে দুই দেহ; শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর ভাষায় ইহা অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে, যথা (চৈঃ চঃ আ ৪র্থ)—

"মৃগমদ, তার গন্ধ,—যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি, জ্বালাতে, যৈছে কভু নাহি ভেদ।।
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।।"

যে অন্বয় (শ্রীকৃষ্ণ) ও ইতর (শ্রীরাধা) হইতে 'আদ্য' অর্থাৎ আদিরসের জন্ম (তদুভয়কে ধ্যান করি)। শ্রীরাধা ও কৃষ্ণই আদিরসবিদ্যার পরম নিধান। যিনি 'অর্থ'-সমূহে অর্থাৎ তত্তদ্‌বিলাস-কলাপে 'অভিজ্ঞ'—বিদগ্ধ, আর যে স্বরূপশক্তি তথাবিধ বিলাসবিদগ্ধস্বরূপে বিরাজ করেন—বিলাস করেন বলিয়া 'স্বরাট্'; যাঁহারা 'আদি কবি' অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাদের লীলাবর্ণন আরম্ভকারী শ্রীবেদব্যাসকে অন্তঃকরণ দ্বারাই 'ব্রহ্ম'—নিজ-লীলা-প্রতিপাদক শব্দব্রহ্ম বিস্তার করিয়াছিলেন অর্থাৎ যাঁহারা আরম্ভসমকালেই সমগ্র ভাগবত আমার (শ্রীবেদ- ব্যাসের) হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন (তদুভয়কে আমি ধ্যান করি)। এতৎপ্রসঙ্গে (ভাঃ ১।৭।৪)—'ভক্তিযোগেন মনসি' শ্লোকটী আলোচ্য। যে শ্রীরাধার বিষয়ে 'সূরয়ঃ'—শেষাদি পর্য্যন্ত মোহপ্রাপ্ত হন, অর্থাৎ স্বরূপসৌন্দর্য্য-গুণ প্রভৃতি দ্বারা অত্যদ্ভুতা শ্রীরাধাকে নিশ্চয়রূপে বলিতে আরম্ভ করিয়া নিশ্চয় করিতে সমর্থ হন না।

তেজঃ, বারি, মৃত্তিকা—ইহাদের যে প্রকার বিনিময় অর্থাৎ পরস্পর স্বভাব-বিপর্য্যয় সংঘটিত হয়, তদ্রূপ যে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করেন। তেজঃ পদার্থ চন্দ্রাদি জ্যোতির্ম্ময় বস্তু যে শ্রীকৃষ্ণের পদনখ-কান্তি-দ্বারা বারি-মৃত্তিকার নিস্তেজস্ত্ব ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়; বারি—নদ্যাদি যাঁহার বংশী বাদ্যাদি দ্বারা বহ্ন্যাদি তেজঃপদার্থের মত ঊর্দ্ধগমনশীলতা এবং পাষাণাদি মৃৎপদার্থের মত স্তম্ভভাব প্রাপ্ত হয়; মৃৎ-পদার্থ পাষাণাদি যাঁহার বিচ্ছুরিত-কান্তিকলা দ্বারা তেজোবৎ ঔজ্জ্বল্য এবং বেণুবাদনাদি দ্বারা বারিবৎ দ্রবতা প্রাপ্ত হয়।

'যাঁহাতে'—শ্রীরাধা বিদ্যমানে, ত্রিসর্গ—শ্রী-ভূ-লীলা—এই শক্তিত্রয়ের প্রাদুর্ভাব অথবা দ্বারকা-মথুরা-বৃন্দাবন—এই স্থানত্রয়গত শক্তিবর্গত্রয়ের প্রাদুর্ভাব কিম্বা শ্রীবৃন্দাবনেই রসব্যবহারে সুহৃদ্, উদাসীন ও প্রতিপক্ষ নায়িকারূপ ত্রিবিধ ব্রজদেবীর প্রাদুর্ভাব মৃষা—মিথ্যা অর্থাৎ সৌন্দর্য্যাদি গুণসম্পদ দ্বারা তাঁহারা শ্রীরাধা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের কিঞ্চিন্মাত্রও প্রয়োজন-কারণ হন না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় ইহা অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে,—

"রাধাসহ ক্রীড়া-রস-বৃদ্ধির কারণ।
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ।।
কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ণ-প্রাণধন।
তাঁহা বিনু সুখহেতু নহে গোপীগণ।।"

(চৈঃ চঃ আ ৪।২১৭-২১৮)

শতকোটি গোপীতে নহে কাম-নির্ব্বাপণ।
তাহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ।।

(চৈঃ চঃ ম ৮।১১৫)

সেই দুইজন অর্থাৎ শ্রীরাধামাধবের নিজ-প্রভাবে লীলাপ্রতিবন্ধক জরতী প্রভৃতি এবং প্রতিপক্ষ-নায়িকাগণের 'কুহক'—মায়া সর্ব্বদা নিরস্ত হইয়াছে।

তাদৃশরূপে 'সত্য'—নিত্যসিদ্ধ অথবা পরস্পর-বিলাসাদি দ্বারা আনন্দ-সন্দোহ-দানে কৃতসত্য অর্থাৎ নিশ্চল; অতএব 'পর'—এরূপ আর অন্যত্র কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। গুণলীলাদি দ্বারা বিশ্ব বিস্মাপকহেতু সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এইরূপ যুগলিত-শ্রীরাধামাধবকে শ্রীমদ্‌বেদব্যাস আপন-অন্তরঙ্গ-জন শ্রীশুকদেবাদির সহিত ধ্যান করিতেছেন।

যদি এখানে এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ হয় যে, যদি স্বরূপ শক্তি শ্রীমতী রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরম সত্য ও পরম সত্যাশ্রয়ী অপ্রাকৃত রসিক ভক্তগণের নিত্য ধ্যেয় বস্তু হইবেন, তাহা হইলে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভু শ্রীরাধিকার নাম উল্লেখ করেন নাই কেন?

এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর ভাগবতগণ প্রদান করিয়াছেন—প্রকৃত-ভজন-পরায়ণ অপ্রাকৃত-সাহজিক প্রেমিক পুরুষগণ স্বীয় নিগূঢ় ভজনীয় বস্তুর কথা কখনও যথা তথা প্রকাশ করেন না; তবে অপর যোগ্যজনকে

তাঁহাতে আকৃষ্ট করিবার জন্য তাঁহার মহিমামাত্র কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভুও শ্রীমদ্ভাগবতে পরমরস-চমৎকার-মাধুর্য্য-পরাকাষ্ঠা মূলাশ্রয়া গোবিন্দানন্দিনী শ্রীমতী বার্ষভানবীর মহিমার কথা "অনয়ারাধিতো নূনং" (ভাঃ ১০।৩০।২৮), "বরিষ্ঠং সর্ব্বযোষিতাম্" (ভাঃ ১০।৩০।৩৬), ২০।৩০।২৬ প্রভৃতি বহু বহু শ্লোকে কীর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু সাধারণ্যে একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজনীয় বস্তুর নামটী সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন নাই। কোন কোন ভাগবতগণ বলেন যে, পরমহংসকুলশিখামণি শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভু যদিও কৃষ্ণরসাবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার প্রিয়া রুক্মিণ্যাদি মহিষীগণের নামাবলী সর্ব্বদাই কীর্ত্তন করিতেন, তথাপি শ্রীরাধা প্রভৃতি সমর্থারতি-বিগ্রহ ব্রজ-গোপীগণের নাম কখনও মুখে উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। তিনি যে গৌরব-নিবন্ধন শ্রীবার্ষভানবীর নাম উচ্চারণ করিতেন না, তাহা নহে; কারণ তিনি কৃষ্ণরসাবিষ্ট হইয়াই নাম-কীর্ত্তন করিতেন। তাহাতে গৌরব বা মর্য্যাদার অবকাশ নাই। তবে অতি বিস্তৃত, সর্ব্ব-বিলক্ষণ, পরম-প্রকটিত প্রেমানল-শিখার তাপে দগ্ধ গোপীগণের নাম-কীর্ত্তন করিলে তাঁহাদের স্মরণে তৎসম্বন্ধীয় তীক্ষ্ণ প্রেমানল হইতে সমুত্থিত উচ্চ শিখাগ্রকণিকার স্পর্শমাত্র বৈকল্যের উদয় হয় বলিয়া তিনি ব্রজবধূগণের নাম মুখে উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধে গোপীগণের কথা সামান্যভাবে উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ তাঁহাদের আচরিত ব্যাপার সমূহ বর্ণিত হইলেও নাম-গ্রহণাদি দ্বারা বিশেষভাবে বর্ণিত হয় নাই।

এইরূপভাবে শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে শ্রীবার্ষভানবী প্রভৃতি পরমমুখ্যা গোপীগণের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকায় যুগপৎ দুইটী পরমোপকার সাধিত হইয়াছে। পরম গুপ্ত ভজনীয় নিধি গোপীশিরোমণি শ্রীবার্ষভানবীর কথা অজ্ঞরূঢ়ি ও সাধারণরূঢ়িবৃত্তি-চালিত জগতের যোগ্যতার নিকট অপ্রকাশিত রহিয়াছে। তাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণভজনের সন্ধান না পাইয়া কেহ বা 'বিষ্ণুমায়া', কেহবা 'বিষ্ণুর ভজনে যোগ্যতা' মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। জীবের স্বরূপ 'কৃষ্ণের নিত্যদাস' হইলেও পরমসত্যস্বরূপ পরিপূর্ণ বস্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রেমিক ভক্ত ব্যতীত অপর কাহারও নিকট সুপ্রকাশিত হন না। একমাত্র আত্মার লৌল্যই তাঁহার মূল্য স্বরূপ, উহা ঐশ্বর্য্য- শিথিলভজনে কিম্বা প্রাকৃত অস্মিতায় বিচরণশীল ব্যক্তিতে অসম্ভব। ঐশ্বর্য্য-কামগন্ধহীন প্রেমিক পুরুষে সেই অপ্রাকৃত লৌল্য প্রচুর বলিয়া আজিও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই নিকট জিত হন অর্থাৎ পরম-নিজ-অন্তরঙ্গাশক্তি পরম-মুখ্যাশ্রয় শ্রীবার্ষভানবী ব্যতীত যে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার চেষ্টা, তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে বিষ্ণুরই উপাসনা। উহাকে যথার্থ কৃষ্ণোপাসনা বলা যাইতে পারে না। ব্রজের শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যরসরসিকগণ শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ারসের সহায়ক বলিয়া তাঁহাদের উপাসনাও শ্রীকৃষ্ণোপাসনা।

অতএব শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভু শ্রুতিগুহ্য শ্রীবার্ষভানবীর নাম স্পষ্টভাবে প্রকাশ না করিয়া একাধারে প্রেমিক ভক্তগণের তোষণ ও ঐশ্বর্য্য- শিথিল ভক্ত ও অভক্তগণের মোহন করিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভুর উদ্দেশ্য এইরূপভাবে বর্ণিত হইতে পারে (চৈঃ চঃ আ ৪র্থ)—

"অতএব কহি কিছু করিঞা নিগূঢ়।
বুঝিবে রসিক ভক্ত, না বুঝিবে মূঢ়।।

অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ।।
যে লাগি' কহিতে ভয়, সে যদি না জানে।
ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে।।"

রাধাভজন ব্যতীত কৃষ্ণভজন হইতে পারে না, রাধা-বিরহিত মাধব বলিয়া কোন বস্তু থাকিতে পারে না; স্বরূপশক্তি ব্যতীত শক্তিমান্ অদ্বয়তত্ত্বের অবস্থান নাই। শ্রীমতী রাধিকাকে বাদ দিয়া অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইতে পারে না। তাই শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর 'বিলাপকুসুমাঞ্জলি'তে আমরা দেখিতে পাই,—

"আশাভরৈবমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ
কালো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।
ত্বঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং মে
প্রাণৈর্ব্রজেন চ বরোরু বকারিণাপি।।"

হে বরোরু! এখন আমি অমৃতসাগররূপ আশাতিশয়-কদম্বে অতি কষ্টেসৃষ্টে কালাতিপাত করিলাম; তুমি যদি আমাকে কৃপা না কর, তবে এ প্রাণ বা ব্রজবাস অধিক কি শ্রীকৃষ্ণেও আমার প্রয়োজন নাই।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—

"রাধাভজনে যদি মতি নাহি ভেলা।
কৃষ্ণভজন তব অকারণ গেলা।।
আতপ-রহিত সূরয নাহি জানি।
রাধা-বিরহিত মাধব নাহি মানি।।
কেবল মাধব পূজয়ে সো অজ্ঞানী।
রাধা-অনাদর করই অভিমানী।।
কব্‌হি নাহি করবি তাঁকর সঙ্গ।
চিত্তে ইচ্ছসি যদি ব্রজরস-রঙ্গ।।
রাধিকা-দাসী যদি হোএ অভিমান।
শীঘ্রই মিলই তব গোকুল-কান।।
ব্রহ্মা-শিব-নারদ-শ্রুতি-নারায়ণী।
রাধিকাপদরজঃ পূজয়ে মানি।।

উমা-রমা-সত্যা-শচী-চন্দ্রা-রুক্মিণী।
রাধা-অবতার সবে আম্নায়-বাণী।।
হেন রাধা পরিচর্য্যা যাঁকর ধন।
ভকতি-বিনোদ তাঁর মাগয়ে চরণ।।"

একমাত্র বিষয়-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরই আশ্রয় ভাবাঙ্গীকারে মূল আশ্রয় শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর কথায় যে জীব-মাত্রের প্রয়োজন আছে, তাহা জগতে জানাইয়াছেন। অণুসচ্চিদানন্দ জীব বিভুসচ্চিদানন্দ অদ্বয়জ্ঞানের সন্ধিনী-শক্ত্যধিষ্ঠিত বিগ্রহ শ্রীবলদেব, সম্বিৎশক্ত্যধিষ্ঠিত বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ এবং হ্লাদিনী-শক্ত্যধিষ্ঠিত-বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দা-নন্দিনী ও ভক্তানন্দদায়িনীর সেবা ব্যতীত কখনও তাঁহার স্বরূপত্ব রক্ষা করিতে পারেন না। এই জন্য মায়াবিলাসী ভোগীর বা মায়াবাদী নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু ত্যাগীর নিকট কার্য্যতঃ সচ্চিদানন্দোপলব্ধি খপুষ্পের ন্যায় নিরর্থক। তাঁহারা উভয়েই আত্মঘাতী। মধুররসে বলদেবই শ্রীবার্ষভানবীর কনিষ্ঠাভগিনী অনঙ্গমঞ্জরীরূপে অবস্থিত হইয়া শ্রীরাধামাধবের সেবার সন্ধান প্রদাতা। শ্রীরাধারস-সুধানিধিকার বলিয়াছেন,—

"প্রেমা নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবনবিপিন-মহামাধুরীষু প্রবেশঃ।
কো বা জানাতি রাধাং পরমরসচমৎকারমাধুর্য্যসীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চকার।।"

—'প্রেম' নামক পরমপুরুষার্থ কাহারই বা শ্রবণগোচর হইয়াছিল? কে-ই বা শ্রীনামের মহিমা জানিত? কাহারই বা বৃন্দারণ্যের গহন-মহামাধুরী-কদম্বে প্রবেশ ছিল? কে-ই বা পরম চমৎকার অধিরূঢ়মহাভাব-মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা শ্রীবার্ষভানবীকে (উপাস্য বস্তুরূপে) জানিত? এক চৈতন্যচন্দ্রই পরম ঔদার্য্য- লীলা প্রকট করিয়া এই সমস্ত আবিষ্কার করিয়াছেন।

সুধানিধিকার আরও বলিয়াছেন,—

"যথা যথা গৌরপদারবিন্দে বিন্দেত ভক্তিং কৃতপুণ্যরাশিঃ।
তথাতথোৎসর্পতি হৃদ্যকস্মাৎ রাধাপদাম্ভোজসুধাম্বুরাশিঃ।।"

—পুঞ্জ পুঞ্জ সুকৃতিসম্পন্ন পুরুষ শ্রীগৌর পদকমলে যাদৃশী ভক্তিলাভ করেন, অকস্মাৎ তাঁহার হৃদয়ে শ্রীশ্রীরাধা-পাদপদ্মের প্রেমসুধা-সমুদ্রও তাদৃশ ভাবেই উদ্‌গত হইয়া থাকে।

অতএব গৌর-পদাব্জভৃঙ্গ বিপ্রলম্ভরস-পোষ্টা শ্রীগুরু ও গৌরভক্তগণের আনুগত্যে বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের পরিপূর্ণ সেবা ফলেই পরিপূর্ণ শ্রীরাধাদাস্য লাভ হইতে পারে। আত্মবৃত্তিতে রাধা-দাস্যাভিলাষের সহিত নিরন্তর গৌর-বিহিত কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনই গৌরারাধনা।

বৈষ্ণবধর্ম্ম

পরিদৃশ্যমান্ জগতের সকল বস্তুর আকর বিষ্ণু। সেই বিষ্ণুর মায়ার দ্বারা আবৃত ও বিক্ষিপ্ত লুপ্ত-বিষ্ণু-পরিচয়কেই বিষ্ণু ব্যতীত অন্য বস্তু বলিয়া প্রতীতি হয়। যাঁহাদের সকল বস্তুর অভ্যন্তরে ও আকররূপে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান উপলব্ধির বিষয় হয় এবং সেই বিষ্ণুর সেবকসূত্রে সেবাপ্রবৃত্তির উন্মেষ দেখা যায়, তাঁহারাই আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া জানিতে পারেন। যাঁহাদের দিব্যজ্ঞান নাই, তাঁহারা পাপে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাদিগকে "বৈষ্ণব" জানেন না, তজ্জন্য আবৃত বিষ্ণুবস্তুকে স্বীয় ভোগের উপাদান জানিয়া আপনাদিগকে "অবৈষ্ণব" অভিমান করেন। বিষ্ণু-সেবারত জনগণের বৃত্তিকেই "বৈষ্ণব-ধর্ম্ম" বলে।

প্রকৃত বৈষ্ণবগণ দেহ ও মনের ধর্ম্মে আবদ্ধ না থাকিয়া জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম-যাজন করেন। পূর্ব্বকালে রুদ্র ও চতুঃসন, লক্ষ্মী ও ব্রহ্মা, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ছিলেন। কলিকালে শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্বাচার্য্য বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচারক। জীবের ভোগ্য ধারণায় ঈশ্বরের অনুভূতি জড়নির্ব্বিশেষ বাদে আবদ্ধ। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সবিশেষ চিদ্‌বিলাসবাদী, অচিৎপিণ্ডসমূহ ভূতাকাশে স্থান লাভ করে আর পরব্যোমে চিদণু ও চেতনময় বিগ্রহ সমূহের অবস্থিতি। দেহমনের দ্বারা প্রকৃত নিত্য-সেবা হয় না। পরব্যোমে চিদ্‌বৃত্তির দ্বারা চিন্ময় বস্তু চিন্ময়ের সেবা করে।

শ্রীচৈতন্যদেব নিজ চরিত্র ও লীলায় এই সকল কথা সুষ্ঠুভাবে দেখাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আচরিত ও প্রচারিত বিষয়টী কালপ্রভাবে বিকৃত হইয়া অন্যাকার ধারণ করিয়াছে। তাঁহার কথিত 'প্রেমে'র ধারণা কামে, 'অপ্রাকৃত-বিগ্রহ' অচিৎপিণ্ডে, 'সেবা-প্রবৃত্তি' ভোগপ্রবৃত্তিতে, 'পবিত্রতা' কুটিনাটিতে, 'স্বাধ্যায়' বণিগ্‌বৃত্তিতে, 'ভজন' ভোজনাদি ভোগে পরিণত অর্থাৎ সকল কথাই বিপরীত গতি লাভ করিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রচারিত সুনির্ম্মল বৈষ্ণবধর্ম্মটী সঙ্ক্ষেপে এই,—

(১) মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অপর নাম 'সনাতন-ভাগবতধর্ম্ম'। তাঁহা জীব মাত্রের অহৈতুকী আত্মবৃত্তি; অতএব একমাত্র সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম।

(২) তাঁহার প্রচারিত মিলনধর্ম্মে কোন প্রকার ব্যভিচারাদি অসচ্চেষ্টা নাই। ছোট হরিদাসের প্রতি দণ্ড-লীলা তাহার সাক্ষ্য।

(৩) তিনি শ্রীবিগ্রহ ও ভাগবতকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীবিগ্রহ বা ভাগবতাদি দ্বারা জীবিকার্জ্জন মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম।

(৪) মহাপ্রভু ভক্ত ও ভগবানকে অভিন্ন বলিয়াছেন এবং বৈষ্ণবকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদান করিতে বলিয়াছেন। যাহারা বৈষ্ণবকে কোন প্রকারে অসম্মান করিবেন, তাহারা মহাপ্রভুর মতে নিরয়গামী। মহাপ্রভু বলেন, বৈষ্ণব-নিন্দার মত আর অপরাধ নাই; সকল অপরাধের ক্ষমা আছে, কিন্তু যে বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করা হইয়াছে, তিনি ক্ষমা না করিলে আর সেই অপরাধের ক্ষমা নাই।

(৫) মহাপ্রভু বৈষ্ণবকে ব্যবহারিক মনুষ্য মধ্যে গণ্য করেন না বলিয়া বৈষ্ণবকে ব্যবহারিক জাতিকুলের অন্তর্গত মনে করাকে তিনি অপরাধের চরম-সীমা বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন। তিনি ঠাকুর হরিদাসকে প্রচারকের আসন ও স্বয়ং রায় রামানন্দের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার লীলা প্রদর্শন, শান্তিপুরে অদ্বৈত-গৃহে অদ্বৈতাচার্য্যকে ঠাকুর হরিদাস ও মুকুন্দের সহিত একত্র ভোজনের আজ্ঞা প্রদান, ঠাকুর হরিদাসকে অদ্বৈত-প্রভুর পিতৃশ্রাদ্ধ পাত্র প্রদান প্রভৃতি আচার দ্বারা স্বীয় বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন।

(৬) মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে, দীক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার অদীক্ষিত অবস্থার পরিচয়ে পরিচিত হইতে পারেন না; বৈষ্ণবী-দীক্ষা বিধানের দ্বারা নরমাত্রেই বিপ্রত্ব লাভ করেন।

(৭) মহাপ্রভুর ভক্তগণ সকলই বৈরাগ্য-প্রধান। তাঁহার গৃহত্যাগী-ভক্তগণই 'গোস্বামী' নামে পরিচিত। ষড়্‌গোস্বামী তাহার সাক্ষ্য স্থল। 'গোস্বামী' উপাধিকে তিনি জাতিগত বা শৌক্রবংশগত বিচার করেন নাই।

(৮) মহাপ্রভু জীবকুলকে বৈষ্ণব-সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় করিতে বলিয়াছেন। মহাকুলপ্রসূত পণ্ডিতও যদি অনন্য-কৃষ্ণশরণ না হন, তাহা হইলে তিনিও গুরু-পদবাচ্য নহেন। ঐরূপ কৌলিক, লৌকিক গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় বৈষ্ণব-সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয়ের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

(৯) মহাপ্রভু অসৎসঙ্গ-ত্যাগকেই 'বৈষ্ণব-আচার' বলিয়াছেন। মহাপ্রভুর উপদেশে অসৎসঙ্গ দ্বিবিধ; (১) স্ত্রীসঙ্গ ও (২) কৃষ্ণের অভক্তগণের সঙ্গ।

(১০) মহাপ্রভু মায়াবাদ নিরাস করিয়াছেন। মায়াবাদ শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিপরীত মতবাদ। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও প্রকাশানন্দের সহিত মহাপ্রভুর বিচারই তাহার সাক্ষ্যস্থল।

(১১) মহাপ্রভু বিষ্ণুকে জগৎকারণ বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন, শক্তিকে জগৎকারণ বলেন নাই।

(১২) মহাপ্রভু দৈব-বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন। তথাকথিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আদর করেন নাই। "চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি মজে।।"—ইহাই বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে মহাপ্রভুর উপদেশ।

(১৩) মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতকেই একমাত্র অমল প্রমাণ এবং শ্রীনামভজনকেই জীবের একমাত্র সাধ্য ও সাধন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

(১৪) মহাপ্রভু 'নামাপরাধ' ও 'নামাভাস' হইতে নামের পার্থক্য বিচার করিয়াছেন।

(১৫) মহাপ্রভু 'জীবে দয়া' প্রচার করিয়াছেন এবং সর্ব্বপ্রকার জীব-হিংসার নিষেধ করিয়াছেন।

(১৬) মহাপ্রভু সর্ব্বত্র হরিকীর্ত্তন প্রচারের আদেশ করিয়াছেন; কিন্তু প্রচারের নামে অন্যাভিলাষ-পোষণ বা ব্যবসায়াদি করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(১৭) মহাপ্রভুর উপদেশে প্রেমই জীবের একমাত্র প্রয়োজন এবং সেই প্রেম জীবের যাবতীয় ইন্দ্রিয়-তর্পণ হইতে পৃথক্‌।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত এইরূপ সুনির্ম্মল বৈষ্ণবধর্ম্মে বর্ত্তমানে যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিবারণের জন্য ভগবানের ইচ্ছায় কতিপয় ভগবদ্ধর্ম্মপরায়ণ, নিরপেক্ষ ভগবৎসেবক কলিকাতায় 'শ্রীগৌড়ীয় মঠ', শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থানে 'শ্রীচৈতন্য মঠ' প্রভৃতি শুদ্ধভক্তি প্রচারকেন্দ্র এবং আচারবান্ ও আদর্শ চরিত্র বৈষ্ণবগণের আবাস-স্থান স্থাপন করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র সার্ব্বজনীন বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন। বেদান্ত-শ্রীভারতাদি শাস্ত্রের পঠন-পাঠন ছাত্রগণকে হরিসেবাময় আদর্শ জীবন-যাপন করিবার সুযোগ প্রদানের সহিত হরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গ, বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র সুনিপুণ করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ইঁহারা সর্ব্বকালে হরিসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া জগতের অশেষ মঙ্গল বিধান করিতেছেন। কিন্তু প্রপঞ্চে প্রতিপক্ষের অভাব না থাকায় তাঁহাদের কার্য্যেও দোষারোপ করিবার জন্য কতিপয় ব্যক্তি চেষ্টার ক্রটী করিতেছেন না। কেহ কেহ তাঁহাদিগকে অসম্মান, তাঁহাদিগকে অপরের চক্ষে ঘৃণিত করিবার প্রয়াস প্রভৃতিও প্রদর্শন করিতে পশ্চাৎপদ হন না। যাঁহারা জগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করেন, সর্ব্বসাধারণে তাঁহাদিগকে সহায়তা করিলে সমাজের উন্নতি ও সুখ সম্পাদিত হয়। পাঠকগণ শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সমাহৃতির ২য় সংখ্যা হইতে জানিতে পারেন।

বিশিষ্টাদ্বৈত গুরু-পরম্পরা—আচার্য্য শ্রীরামানুজ **বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ** প্রচার করেন। শ্রীসম্প্রদায়স্থিত বৈষ্ণবগণের বিশ্বাস যে, অনাদিকাল হইতেই এই বিশিষ্টাদ্বৈত-মত সজ্জনগণের হৃদয়ে প্রকাশিত ছিল। তাঁহারা বলেন, শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্র অবতারণা করিয়া জগতে বিশিষ্টাদ্বৈত-মত প্রচার করিয়াছিলেন। কালে ব্রহ্মসূত্রের বিশদ্ ভাষ্যের প্রয়োজন হইলে মহর্ষি বৌধায়ন বিশিষ্টাদ্বৈত-মত পোষণ করিয়া জগতে সূত্র-ভাষ্য প্রচার করেন। নির্ব্বিশেষবাদিগণ যে সময়ে বৌদ্ধ বিশ্বাসে সন্তাড়িত হইয়া কেবলাদ্বৈত-মত প্রচার করেন, সেই কালে বৌধায়নের বিশিষ্টাদ্বৈত-মতের প্রতি মায়াবাদিগণ অযথা আক্রমণ করেন। এমন কি, শ্রুত হয়, তাঁহারা বৌধায়ন বৃত্তিটী পর্য্যন্ত লোপ করিবার চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যামুনাচার্য্য এই নির্ব্বিশেষবাদিগণকে নিরস্ত করিবার সঙ্কল্পে 'আত্মসিদ্ধি', 'সম্বিৎসিদ্ধি' ও 'স্বপ্রকাশ-সিদ্ধি' নামক গ্রন্থত্রয় রচনা করেন। বৌধায়ন-মত বিলুপ্ত হইবার পূর্ব্বেই তন্মতাবলম্বী দ্রমিড়াচার্য্য ও টঙ্কাচার্য্য নামক বিশেষবাদী কর্ত্তৃক বিশিষ্টাদ্বৈত-মত পুষ্ট হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত গুহদেব ভারুচি প্রভৃতি বিশিষ্টাদ্বৈতী আচার্য্যগণ কয়েকখানি বেদান্ত বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়া ঐ মতের পোষকতা করেন। অতএব বিশিষ্টাদ্বৈত-মতটী যে শ্রীরামানুজের সময় হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা নহে। রামানুজের 'শ্রীভাষ্য' ও 'শ্রুতপ্রকাশিকা' নাম্নী টীকা আলোচনায় ও উপরি-উক্ত সত্যের আভাস পাওয়া যায়। আচার্য্য শ্রীরামানুজ শ্রীভাষ্যের প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন,—"ভগবদ্বৌধায়নকৃতাং বিস্তীর্ণাং ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিং পূর্ব্বাচার্য্যাঃ সংচিক্ষিপুঃ। তন্মতানুসারেণ সূত্রাক্ষরাণি ব্যাখ্যাস্যন্তে।।"—অর্থাৎ ভগবান্ বৌধায়ন ব্রহ্মসূত্রের যে একটী বিস্তীর্ণা বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন, দ্রমিড়াদি পূর্ব্বাচার্য্যগণ তাহারই সংক্ষেপ করেন। আমি তন্মতানুসারে ব্রহ্মসূত্রের অক্ষরসমূহের ব্যাখ্যা করিব।

১ম পরাশর-নন্দন ব্যাস, ২য় বৌধায়ন, ৩য় গুহদেব, ৪র্থ ভারুচি, ৫ম ব্রহ্মানন্দী, ৬ষ্ঠ দ্রমিড়াচার্য্য, ৭ম পরাঙ্কুশনাথ, ৮ম যামুনাচার্য্য এবং ৯ম যতীন্দ্র শ্রীরামানুজ যথাক্রমে এই বিশিষ্টাদ্বৈত-মত প্রচার করেন। বৌদ্ধ ও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ-নির্ব্বিশেষবাদিগণের আক্রমণে পূর্ব্বাচার্য্যগণের মত লুপ্তপ্রায় হইলে সঙ্কর্ষণ-শক্ত্যাবেশাবতার শ্রীলক্ষ্মণদেশিক জগতের সর্ব্বত্র বিপুলভাবে সেই প্রাচীন মত প্রচার করেন। অনাদিকাল হইতে যে সাত্বত পঞ্চরাত্র বা ভাগবত-মত সজ্জন-সমাজে প্রচলিত ছিল, আচার্য্য শ্রীরামানুজ সেই মতই দুন্দুভিনাদে জগতে প্রচার করেন।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে পরম-ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এই অদ্বয়-ব্রহ্ম বিশিষ্ট অর্থাৎ বিশেষণযুক্ত। চিৎ ও অচিৎ তাঁহার বিশেষণ এবং শরীর। স্থূল এবং সূক্ষ্ম-ভেদে চিৎ ও অচিৎ দ্বিবিধ। কারণাবস্থায় সূক্ষ্ম চিদচিৎ কার্য্যাবস্থায় স্থূল চিদচিৎরূপে পরিণত হয়। অদ্বয়-জ্ঞান ব্রহ্মই একমাত্র নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিয়া তাঁহাতে কার্য্যের অনুকূল গুণসমূহ বর্ত্তমান। গুণসমূহকে গুণীর বিশেষণই বলিতে হইবে। অতএব চিৎ ও অচিৎ এই দুইটী কারণরূপী ব্রহ্মের কার্য্যানুকূল গুণ বা বিশেষণ। শরীর, শরীরীর আশ্রিত, ভোগ্য, নিয়াম্য ও পরিচায়ক। চিৎ ও অচিৎ এই দুইটী অদ্বয়-ব্রহ্মের আশ্রিত, ভোগ্য, নিয়াম্য এবং কার্য্যস্বরূপে কারণরূপী ব্রহ্মের পরিচায়ক; জীবাত্মার স্বরূপে দেব-মনুষ্যাদি- গত কোন পার্থক্য নাই; আত্মাই স্বকর্ম্মফলানুসারে ভোগায়তন শরীর লাভ করিয়া আপনাকে তত্তৎপরিচয়ে পরিচিত করান। অতএব দেব-মনুষ্যাদি আত্মারই ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের পরিচায়ক মাত্র। জাতি ও গুণের ন্যায় মনুষ্যাদি শরীরও একমাত্র আত্মাশ্রিত আত্মপ্রয়োজনীয় এবং আত্মারই প্রকার বা ধর্ম্মস্বরূপ। মনুষ্যাদি শরীর যে আত্মাশ্রিত, ইহা আত্মবিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে শরীর-বিনাশ দর্শনে বোধগম্য হয়। আত্মকৃত বিশেষ বিশেষ কর্ম্মফল ভোগের জন্যই যে শরীরে উদ্ভব ও অবস্থান, তাহাতেই শরীরের আত্মৈক প্রয়োজনত্ব সমর্থিত হয়। 'আত্মাই দেবতা, আত্মাই মনুষ্য ইত্যাদি' প্রয়োগ দর্শনেও জানা যায় যে, দেব-মনুষ্যাদি শরীরগুলি আত্মারই প্রকার বা বিশেষণ। আত্মবিশেষণ না হইলে শরীরের অস্তিত্বের উপলব্ধির অভাব হয়। শরীর আত্মার নিয়াম্য ও ভোগ্য। কিন্তু আত্মার পরিচয়ও পূর্ণ নহে, কেননা আত্মা খণ্ড চেতন। খণ্ডচেতন অখণ্ডচেতনের পরিচায়ক। শরীর যেরূপ আত্মার পরিচায়ক, নিয়াম্য ও ভোগ্য, আত্মাও তদ্রূপ অখণ্ডচেতন পরমাত্মার পরিচায়ক, নিয়াম্য ও ভোগ্য। অতএব শরীর শব্দটীর পরমাত্মা পর্য্যন্ত ব্যাপ্তি। শরীর, আত্মা প্রভৃতি যাবতীয় শব্দ সমানাধিকরণ্যে পরব্রহ্মের সহিত প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু পরব্রহ্মের সহিত শরীর ও আত্মার সমানাধিকরণ্যে প্রয়োগ সম্পূর্ণ একত্ব নিবন্ধন নহে। সমানাধিকরণ্য স্থলে এক বস্তুরই বিভিন্ন দ্যোতক পদের বিন্যাস হইয়া থাকে। যেমন জ্যোতিষ্টোম মন্ত্রে "অরুণবর্ণা, একবর্ষবয়স্কা, পিঙ্গাক্ষী, গাভীর দ্বারা সোম ক্রয় করিতে হয়"—এই বাক্যে 'অরুণবর্ণা', 'একহায়নী' ও 'পিঙ্গাক্ষী'—এই বিশেষণগুলি সোমক্রয়ের গাভীরই ভিন্ন ভিন্ন পরিচায়ক, তদ্রূপ চিৎ ও অচিৎ এক পরমাত্মারই ভিন্ন ভিন্ন পরিচায়ক, তদ্রূপ চিৎ ও অচিৎ এক পরমাত্মারই ভিন্ন ভিন্ন দ্যোতক বা পরিচায়ক। যেরূপ শরীর ও আত্মা সমানাধিকরণা, বিশেষণ-বিশেষ্য ভাবযুক্ত হইয়াও নিয়াম্য-নিয়ামক, ভোক্তৃ-ভোগ্য বিশেষযুক্ত, তদ্রূপ আত্মার সহিত পরমাত্মারও পূর্ব্বোক্ত বিশেষ ভাব নিত্য বর্ত্তমান।

শ্রীরামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্তে কেবল ভেদবাদ, কেবল অভেদবাদ ও ঔপচারিক ভেদাভেদবাদ সম্পূর্ণ-ভাবে নিরস্ত হইয়াছে।

শ্রীরামানুজীয় মত সংক্ষেপ—আচার্য্য শ্রীরামানুজের মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার যাথাত্ম্য জ্ঞানপূর্ব্বক (সম্বন্ধজ্ঞান) শুদ্ধবর্ণাশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া প্রীতিসহকারে পুরুষোত্তমের চরণযুগল ধ্যানার্চ্চন প্রণামাদিই—অভিধেয় এবং তৎপদ প্রাপ্তিই—প্রয়োজন। যথা শ্রীরামানুজ-কৃত বেদার্থসংগ্রহে—"জীব-পরমাত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানপূর্ব্বক বর্ণাশ্রমধর্ম্মোতি-কর্ত্তব্যতাকপরমপুরুষচরণ-যুগল-ধ্যানার্চ্চনপ্রণামাদিরত্যর্থ-প্রিয়স্তৎপ্রাপ্তি ফলঃ।।"

বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্তে চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর—এই ত্রিবিধ তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। 'চিৎ'-শব্দে জীবাত্মা, 'অচিৎ'-শব্দে জড় ও 'ঈশ্বর'-শব্দে চিৎ-অচিতের নিয়ামক পুরুষোত্তম-নারায়ণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন।

মানদান ও হানি

পরম প্রেমময় বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর পৈশুন্যব্রণপীড়িত মৎসর সমাজের কল্যাণোদ্দেশে তদাশ্রিত জনগণকে পাপপ্রবৃত্তিতাড়িত আত্মবঞ্চিত জনগণেরও প্রতি সম্মান প্রদান করিবার আদেশ করিয়াছেন। আর আশ্রিত-জনগণকে সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন করিবার জন্য স্বয়ং মানশূন্য হইয়া অমিত-সহিষ্ণুতা ও দৈন্যের পরাকাষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এখানে বিচার এই যে, জগতের সকলকে সম্মান দিতে হইবে, এই কথার সুবিধা লইয়া সম্মান প্রদানকারী নিষ্কিঞ্চন পরোপকারব্রত মহাভাগবতের প্রতি অসূয়াপর জনগণ দৌরাত্ম্য এবং অত্যাচার উপস্থিত করিতে পারেন। ঐ প্রকার যুক্তিহীন পাপ প্রথা দ্বারা প্রতারকগণ সুবিধা করিয়া লইয়া পারমার্থিককে অশেষ ক্লেশ প্রদান করিবেন এবং এই ক্লেশ প্রদান-ফলে মহাভাগবত অসীম সহ্যগুণের দ্বারা তাঁহার অসমোর্দ্ধ মহত্ত্ব যতই স্থগিত করিবেন, ততই পাপপ্রবৃত্তিপ্রভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করা এবং পাপপ্রবৃত্তিকেই 'ধর্ম্ম' নামে প্রচার করিয়া বিচাররহিত সম্প্রদায়ের চক্ষে ধূলি দিতে পারিবেন। সুতরাং পাপচিত্ত জনগণ স্বীয় দুরভিসন্ধিমূলে 'বৈষ্ণবের মান নাই' এই উক্তিবশে মানব জাতির সর্ব্বোচ্চ গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মে অপরাধ করিয়া বসিবে। একদিন হিরণ্যকশিপু পুত্ররূপী মহাভাগবত প্রহ্লাদের শ্রীচরণকমলে পিতৃত্বাভিমানে কতই না কদর্য্য ব্যবহার করিয়াছিল! রাবণ বিষ্ণুশক্তি সীতাকে পরমসহিষ্ণু অমানী জানিয়া তাঁহার প্রতি কতই না অত্যাচার করিয়াছিল! অম্বরীশ মহারাজের প্রতি দুর্ব্বাসার ব্যবহার, শ্রীনিত্যানন্দ-হরিদাসের প্রতি জগাই-মাধাইর ব্যবহার অর্ব্বাচীন জনসাধারণের বিচারে বৈষ্ণবগণের 'সর্ব্বাধমতা' এবং 'সর্ব্ব সহিষ্ণুতা' এই অপরিহার্য্য গুণদ্বয় ঐ সকল অমানুষিক অত্যাচার সমর্থন করিয়াছিল। কিন্তু প্রহ্লাদের উপাস্য শ্রীনৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে তাহার উদ্দাম চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন, সীতার উপাস্য শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে দণ্ডিত করিয়াছিলেন, সুদর্শন দুর্ব্বাসাকে বৈষ্ণব-সম্মান শিক্ষা দিতে বাধ্য করিয়াছিলেন, শ্রীবাসাদির প্রার্থনায়
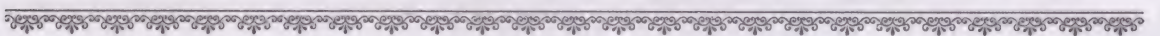
শ্রীহরিদাসের নির্য্যাতনকারীকে শ্রীগৌরসুন্দর মানদধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণ ভগবদ্ভক্তের নিত্য সেবা করিয়া থাকেন। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণ যদিও বৈষ্ণব-বিরোধীর চক্ষে প্রথম মুখে সমপক্ষীয় বিচারিত হন, তথাপি বৈষ্ণব-গুরুবিদ্রোহী যখন বুঝিতে পারেন যে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে প্রীতি-সম্বন্ধ নিত্য বর্ত্তমান, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে, তখন তিনি তাঁহার বিদ্রোহ ও কপটতা ছাড়িয়া দিয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণবের আনুগত্য প্রভাবেই তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে ভেদাবস্থিতি লক্ষ্য করেন। এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অভেদবাদীর দর্শনের হেয়তা নাই, পরন্তু উপাদেয়তা বর্ত্তমান। ইহারই নাম—'সম্বন্ধজ্ঞান' বা 'দিব্যজ্ঞানলাভ' বা 'দীক্ষা'। যাঁহাদের সম্বন্ধজ্ঞান বা বৈষ্ণবী দীক্ষালাভ ঘটে নাই, তাঁহারাই জড়ভেদের হেয়ত্ব অপ্রাকৃত সমাজে ও উপাদেয় রাজ্যে বলপূর্ব্বক সংশ্লিষ্ট করিতে যত্ন করেন। তাঁহাদের বিষ্ণুভক্তির উদয় হইলেই পাপের সম্যক্‌রূপ ক্ষয় হয় এবং দিব্যজ্ঞান ও জড়জ্ঞানের মধ্যে পরস্পর বৈশিষ্ট্য নয়ন পথে পতিত হয়। অর্ব্বাচীনের ন্যায় প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত, মূর্খের অনুভূতিতে 'অমানী', 'মানদ', 'সহিষ্ণু' প্রভৃতি শব্দার্থ স্বীকার করেন না। তিনি লব্ধজ্ঞান হইয়া মূর্খের অর্ব্বাচীনা ধারণা পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ। অনভিজ্ঞ মূর্খ জনসাধারণ শব্দের অর্থ যে ভাবে গ্রহণ করেন, অভিজ্ঞ বন্ধমোক্ষবিৎ পণ্ডিত বৈষ্ণব সেইরূপ বিচার করেন না। সুতরাং অনভিজ্ঞ জনসাধারণ আপনাদিগকে 'অভিজ্ঞ' মনে করিয়া যেরূপ 'সহিষ্ণু', 'মানদ' প্রভৃতি শব্দের কদর্থ করেন, তাহা বিদ্বজ্জনানু- মোদিত নহে।

ভগবদ্বিমুখ প্রাকৃত জ্ঞানমদোন্মত্ত জনগণ বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের উপলব্ধির অভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের 'সকলকে সম্মান প্রদান কর' এবং 'আপনি নিরভিমানী হও'—এই কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে গিয়া মনে করেন যে, অবৈষ্ণব গুরু-বৈষ্ণব বিদ্রোহীকে বৈষ্ণবোচিত সম্মান প্রদান করাই বৈষ্ণব গুরুবর্গের একমাত্র কার্য্য এবং বৈষ্ণবগুরুবর্গ এই সকল উদ্দাম বৈষ্ণববিদ্বেষীদিগের দ্বারা অসম্মানিত হইয়া শ্রীভগবানের সর্ব্বৈশ্বর্য্যে অনাস্থাবান্ হন, তাহা হইলেই তাঁহাদের ভগবদ্ ও ভক্তবিদ্বেষ সফলতা লাভ করিবে এবং পৈশুন্যব্রণপীড়িত হইয়া হিংসামূলে আনুষ্ঠানিক কণ্ডূয়নের দ্বারা সুখ লাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু দিব্যজ্ঞান-লব্ধ বৈষ্ণব স্বয়ং সহিষ্ণু হইয়া অবৈষ্ণবকে মানবোচিত বহু সম্মান প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদের বৈষ্ণববিদ্বেষ-জনিত অনুষ্ঠানের আদর করিতে পারেন না। শাস্ত্র বলেন, সকল শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব স্বীয় গুরুদেবের ও শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত শুদ্ধ-বৈষ্ণবের অসম্মান সহ্য করিবেন না। তিনি স্থান ত্যাগ করিতে পারেন, পৃথিবী ত্যাগ করিতে পারেন, কর্ণে হস্ত প্রদান করিতে পারেন, তথাপি গুরু-বৈষ্ণব-নিন্দা শ্রবণ করিতে পারেন না। শুদ্ধ বৈষ্ণবের একমাত্র কৃত্য শ্রীগুরুদেবের ও বৈষ্ণবগণের সর্ব্বতোভাবে সেবা করা। যদি কোনও ব্যক্তির কল্পিত গুরুদেব বৈষ্ণবের বিদ্বেষ করেন, তাহা হইলে লঘুজ্ঞানে তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈষ্ণবগুরুর চরণাশ্রয় করিবেন। বৈষ্ণবগুরুর পাদপদ্মবিস্মৃত গুরু অভিমানী কুযোগীকে কখনই কেহ 'গুরু' বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। ন্যায়রহিত আদেশকারী গুরুর উৎপথ প্রতিপন্নতা, শুদ্ধবৈষ্ণববিদ্বেষকে শুদ্ধ বৈষ্ণব কখনই গুরুর আদেশ বলিয়া জানেন না। এতাদৃশ ব্যক্তিকে কখনই 'গুরু' বলেন না। প্রকৃত গুরুর চরণাশ্রয় ছাড়িয়া আমরা বলপূর্ব্বক আমাদের মনগড়া ব্যক্তিকে 'গুরু'পদে বরণ করিলে যথেচ্ছাচার আনয়ন করিব। প্রকৃত গুরুকে অসম্মান করা আর

মনগড়া গুরুকে অসম্মান করা সমজাতীয় নহে। যাঁহারা মুড়ি-মিশ্রি, আসল-মেকী প্রভৃতি বিচার না করিয়া সমন্বয়বাদ প্রচার করেন, তাঁহারাই 'অমানী' ও 'সহিষ্ণু' শব্দের অর্থে গুরু ও বৈষ্ণবের বিদ্বেষ করিয়া থাকেন। আমরা ইহাদের অধিক পাণ্ডিত্য দেখিতে পাই না। মানবোচিত মান্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন ও বৈষ্ণবোচিত মান্য সমজাতীয় নহে। যাঁহারা জ্ঞান করেন, তাঁহারা ভক্তিপথাশ্রিত নহেন, জানিতে হইবে। বিষ্ণু অপ্রাকৃত বস্তু; দিব্যজ্ঞানলব্ধ অপ্রাকৃত বৈষ্ণব তাঁহার প্রাকৃত অভিমানের জন্য ব্যস্ত নহেন বলিয়াই জড়প্রতিষ্ঠাশাকেই 'শৌকরীবিষ্ঠা' বলিয়া জানেন। তিনি তজ্জন্য ব্যক্তিগতভাবে শৌকরীবিষ্ঠার প্রাপ্তিলোভে ব্যস্ত নহেন বটে, কিন্তু জগতের সর্ব্বনাশ কামনা না করায় তাঁহার গুরুবর্গকে অর্থাৎ গুরুবর্গ বৈষ্ণবকে প্রাকৃত বিষ্ঠার বাহক না জানিলেও তাদৃশ বস্তু লইয়া কাড়াকাড়ি বন্ধ হওয়া আবশ্যক মনে করেন। প্রাকৃত জগতে প্রাকৃত জনের যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তাদৃশ উচ্চাকাঙ্ক্ষা বৈষ্ণবের নাই, কিন্তু প্রাকৃত জগতে বৈষ্ণববিদ্বেষ করিয়া যে অজ্ঞান বালকের ন্যায় প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের অন্যের বাসনা এবং তদুদ্দেশে গৌণভাবে অপর গুরুবৈষ্ণবের অসম্মান চেষ্টা দ্বারা নিজের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি প্রভৃতি কামপরবশ হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে, একথা জানেন। ব্রহ্মচারীকে ঈর্ষামূলে ব্রহ্মচর্য্যরহিত বলা, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকে ঈর্ষামূলে মূর্খের ন্যায় ব্রাহ্মণেতর বলা, ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসীরও 'গুরু' সাজিয়া তাঁহাকে ঈর্ষামূলে সন্ন্যাসধর্ম্ম হইতে পতিত বলা মানদ ধর্ম্ম নহে। এইরূপ করিয়া তাঁহাদের অসম্মান করিবার প্রয়াস করিলে বা রূপ-সনাতনকে দবিরখাস ও সাকর মল্লিক বলিলে তাঁহাদের মানহানি করা হয়। এই সকল সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণে বিচার না হওয়া পর্য্যন্ত অবলীলাক্রমে সকলেই পরমার্থবিদ্বেষে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে পারেন সত্য, কিন্তু পরমার্থ রক্ষাকারীর এই সকল ব্যক্তির বিবর্ত্ত ছলনায় ঈর্ষা ও পরদ্রোহিতা পাপমূলক, সুতরাং কর্ম্মবাদীর বিচারে পাপের শাস্তি না হওয়া পর্য্যন্ত অনভিজ্ঞতার ছলনায় দৌরাত্ম্য চলিতে থাকিবে। ব্যবস্থাবক সবায় পরস্পর ধর্ম্ম বিদ্বেষের যে বিধি গঠিত হইতেছে, তদ্দ্বারা যদি ধর্ম্মজগৎ লাভবান হন, শুভানুধ্যায়িগণের তাহার প্রতিরোধ করা উচিত নহে। শিক্ষকের শিশুর মঙ্গলের জন্য তাড়না, ধর্ম্ম- প্রচারকের সদ্ধর্ম্মাণুসরণের জন্য শাসন, ধর্ম্মের প্রতিকূল বিচার পরিত্যাগরূপ অনুনয়-বিনয় কখনই সাধুহৃদয়ের বিদ্বেষ উৎপন্ন করিতে পারে না। কিন্তু যদি কেহ নীতি ও আইনের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযাজনের ভাণে ব্যক্তিগত দুষ্প্রবৃত্তির পরিচয় দেয়, তাহাকে ধর্ম্মাধিকরণে বাধ্য করা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার অন্যতম। কতিপয় প্রাকৃত সহজিয়া মহাপ্রভুকে রাজবিত্তাপহারক পট্টনায়ক বংশ্য বাণীনাথের শুভানুধ্যানের বিরোধী মনে করিতে পারে, গুরু-বৈষ্ণববিদ্বেষীর দুষ্প্রবৃত্তি দমন করিবার চেষ্টাকে নিন্দা করিতে পারে, জনসাধারণকে অসদভিপ্রায়ে বিপথগামী করিতে পারে, কিন্তু ভগবৎসেবা ব্যতীত যাহাদের অন্য উদ্দেশ্য নাই, তাঁহারা ইহাদিগের অভিসন্ধি প্রকাশ করিয়া দিতে পারেন।

দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা ও নিজেন্দ্রিয় তর্পণের জন্য অর্থোর্জ্জন পরমার্থ-জীবনের হানিকর। শ্রীমদ্ভাগবতের এই উক্তি বা শ্রীগৌরসুন্দরের নিষ্কিঞ্চন ভজনকারীর বিষয় ও বিষয়ি-সঙ্গ পরিত্যাগের আদেশবাণী কখনই পরচর্চ্চা নহে, কিন্তু ঐ আদেশবাণীর বিরোধি জনগণ বৈষ্ণবগুরু হইতে পারেন না বলিলে ঈর্ষা- প্রণোদিত হইয়া মৎসরতামূলে যে সকল চেষ্টা দেখা যায়, তাহা স্তব্ধ করিবার জন্য ভাগবতগণের ও শ্রীগৌরসুন্দরের

ভক্তগণের সাধুচেষ্টাকে কলঙ্কিত করিবার প্রয়াস ধর্ম্মসঙ্গত নহে। অধর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত ও দণ্ডাদিবিধান সাধুদিগের সাহায্য করে। সাধুগণ জীবের বিষয়পিপাসা উক্তি দ্বারাই খণ্ডিত করেন। তাহাতে বাধা দেওয়া অসাধু চেষ্টা। তাহার লৌকিক প্রতীকার সাধুর উপলক্ষণে ভগবানই করাইয়া থাকেন। তজ্জন্য সাধুত্বে দোষারোপ করিতে নাই। আমরা যদি জগৎ হইতে সাধুর চেষ্টা তুলিয়া দিবার যত্ন করি, তাহা হইলে আমাদের সমাজ ক্রমশঃই বিশৃঙ্খলতাময় অসাধুতায় পরিণত হইবে। সাধুদিগেরই প্রকৃত সম্মান আছে। অবৈধভাবে তাঁহাদের মৌনধর্ম্মের সুবিধা লইয়া তাঁহাদের কখনই বিপন্ন হইতে দেওয়া উচিত নহে। অসাধুগণের মানহানি হইতে পারে না সত্য, যেহেতু অসাধুগণ অসাধু উপায়েই স্ব-স্ব মান স্থাপন করেন। অসাধুর তাদৃশ স্থাপিত মান পরমার্থ জগতের কোন উপকার করে না। কিন্তু সাধুকে অসাধু বলিলে দৌরাত্ম্য করা হয়। সাধুগণ অসাধু কর্ত্তৃক প্রহৃত হইবেন এবং প্রহৃত জনগণ ধর্ম্মাধিকরণে বিচারপ্রার্থী না হওয়ায় অনেকে এরূপ ধারণা করেন যে, সাধুদেরই প্রকৃত দোষ থাকে বলিয়া তাঁহারা অসম্মানিত হইলেও রাজদ্বারে প্রতীকারের প্রার্থনা করেন না। বিশেষতঃ সাধুদিগের অনুগত দাসগণ স্ব-স্ব প্রভুর সম্মান নষ্ট করিবার জন্যই গৌণভাবে চেষ্টান্বিত হইয়া সেবার ভাণ করেন। গুরুসেবা ও সাধুসেবা সাধুর একমাত্র কর্ত্তব্য। অসাধুর সঙ্গ পরিত্যাগ যত্নের সহিত কর্ত্তব্য ; ইহা শাস্ত্রে উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেছেন। দুর্নীতিপরায়ণ জনগণের বিচার-প্রণালী দ্বারা সাধুতা ও সাধুগণ চিরদিনই আক্রান্ত। এই প্রকার অসাধু চেষ্টা হইতেই জগতে ধর্ম্মের নামে পাপ ও অপরাধ বৃদ্ধি হইতেছে।

অধুনা কোন কোন গ্রাম্য বার্ত্তাবহ বা পাশ্চাত্যদেশীয় পণ্ডিত কেনেডি সাহেব গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের যে প্রকার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা পাঠকগণ তাঁহার লেখনীতে শ্রদ্ধান্বিত হইলেই অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ নীতিশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, সামাজিক দুর্ব্বলতা ও দুর্নীতিকেই 'ধর্ম্ম' জ্ঞান করেন। পারমার্থিকগণ গ্রাম্যবার্ত্তাবহের বা কেনেডি সাহেবের বিচারে দুর্নৈতিক বলিয়া প্রচারিত হইলেও নীতিপরায়ণ শুদ্ধ-ভক্তগণ ইহার প্রতিবাদ করিবেন। স্মার্ত্তকুল পরমার্থের নানাপ্রকারে যে প্রকার ক্ষতি করিয়াছেন ও করিতে উদ্যত আছেন, বা করিবেন, তাহার হস্ত হইতে ভাটী ভক্তগণ মুক্তি লাভ প্রার্থনা করেন। যাহারা সেই অনুগ্রহ করিতে বঞ্চিত, তাহারাই গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্রোহী এবং তাহাদের বিচারেই শুদ্ধ-বৈষ্ণবের সম্মানের পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে অসম্মানিত করাই তাহাদের নীতি ও ধর্ম্ম। গুরু-বৈষ্ণব সেবা করাই বৈষ্ণবধর্ম্ম। তাঁহাদিগকে অপরে আক্রমণ করিবে ও তাঁহাদের সম্মান হানি করিবে ইহাই পঞ্চষষ্ঠিতম ভক্তির সাধন, তাহা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। অবৈষ্ণবগণ বৈষ্ণব-সমাজের শুভানুধ্যানের পরিবর্ত্তে দৌরাত্ম্য করিবার জন্যই খড়্গহস্ত ও হিংসাপরায়ণ। হিংসিত সাধুসমাজ নিজেরা প্রতিহিংসা করেন না বলিয়াই তাঁহাদিগের অসম্মান করিবার মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া সুনীতি-সঙ্গত নহে। বাগ্‌বিতণ্ডা দ্বারা, জনবল দ্বারা বিচারকগণের ধারণা বিপর্য্যয় করিবার জগতে এই সকল প্রথার আদর থাকিতে পারে সত্য, কিন্তু ভাগবতগণের গুরুদ্রোহিতার সাহায্য করা, ভাগবত-ধর্ম্ম প্রচারক দ্বাদশ-বৈষ্ণবের তাৎপর্য্য ছিল না। তাঁহারা সকলেই গুরুবৈষ্ণবের সেবক ও রক্ষক। যদি প্রকৃত বৈষ্ণবদাস গুরুবৈষ্ণবের অসম্মান আনয়ন করিবার

উদ্দেশ্যে গুরুদ্রোহীর মতাবলম্বন করেন, তাহা হইলে তিনি পরিশেষে নিজ কর্ম্মদোষে বিপাকে পতিত হইবেন, সন্দেহ নাই। অবৈধ অসৎকার্য্যের প্রশংসা করা নীতিসঙ্গত নহে। আবার পক্ষান্তরে ভাগবতের স্কন্ধে অবৈধভাবে দোষারোপ করা সঙ্গত নহে। গুরু-বৈষ্ণবকে কায়-মনো-বাক্যে সেবা করিতে হইবে। ত্রিদণ্ডিগণকে নির্য্যাতন করিতে হইবে না। ত্রিদণ্ডি ব্যতীত পারমার্থিক হইবার অন্যের যোগ্যতা নাই। গৌরসুন্দরের আশ্রিত সকলেই ত্রিদণ্ডী, কেহ বা ব্যক্ত, কেহ বা রাগানুগা প্রবৃত্তিবলে অব্যক্ত। তাঁহারা প্রাকৃত সহজিয়া নহেন।

চাতুর্ম্মাস্য

বেদশাস্ত্রে অনেক স্থলে চাতুর্ম্মাস্য-যাজির কথা এবং চাতুর্ম্মাস্যের কর্ম্মাঙ্গত্ব উল্লিখিত আছে। ধর্ম্মশাস্ত্রেও সৎকর্ম্মীর চাতুর্ম্মাস্য-ব্যবস্থার অভাব নাই। পুরাণের মধ্যেও নানা-স্থলে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক স্মৃতি-নিবন্ধেও চাতুর্ম্মাস্য-বিধান পরমার্থী ও স্মার্ত্তগণের অপরিচিত নহে। পরমার্থ-স্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস অথবা রঘুনন্দনের কৃত্য-তত্ত্বেও আমরা চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের কথা দেখিতে পাই।

কর্ম্মকাণ্ডীয় বিচারেই যে কেবল চাতুর্ম্মাস্য-যাজির ফল কথিত হইয়াছে, তদ্রূপ নহে। কাঠক-গৃহ্যসূত্রেও যতিধর্ম্ম-নিরূপণে আমরা পাঠ করি যে, "একরাত্রং বসেদ্ গ্রামে নগরে পঞ্চরাত্রকম্। বর্ষাভ্যোঽন্যত্র বর্ষাসু মাসাংশ্চ চতুরো বসেৎ।।" একদণ্ডী জ্ঞানিগণ ও ত্রিদণ্ডী ভক্তগণ উভয়েই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত ধারণ করেন। শ্রীশঙ্কর-মতাবলম্বিগণের মধ্যে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের ব্যবস্থা আছে।

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরও চাতুর্ম্মাস্য উপস্থিত হইলে কাবেরীতে শ্রীরঙ্গ-মন্দিরে চারিমাস কাল বাস করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়-ভক্তগণ চারিমাসকাল শ্রীনীলাচলে শ্রীগৌরপাদপদ্মে প্রত্যেক বৎসরই গমন করিতেন; তথায় তাঁহাদের অবস্থানের কথা লীলা-লেখকগণের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু—

শ্রীরঙ্গক্ষেত্র আইলা কাবেরীর তীর।
শ্রীরঙ্গ দেখিয়া প্রেমে হইলা অস্থির।।
ত্রিমল্ল-ভট্টের ঘরে কৈল প্রভু বাস।
তাহাঞি রহিলা প্রভু বর্ষা চারিমাস।।
চাতুর্ম্মাস্য মহাপ্রভু শ্রীবৈষ্ণবের সনে।
গোঙাইল নৃত্য-গীত-কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে।।
চাতুর্ম্মাস্যান্তরে পুনঃ দক্ষিণ-গমন।
পরমানন্দপুরী সহ তাহাঞি মিলন।। (চৈঃ চঃ ম ১ম)
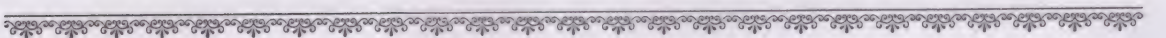
শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী—

গ্রীষ্মকাল-অন্তে পুনঃ নীলাচলে গেলা।
নীলাচলে চাতুর্ম্মাস্য আনন্দে রহিলা।।

(চৈঃ চঃ ম ৪র্থ)

শ্রীবৈষ্ণব এক,—'ব্যেঙ্কট ভট্ট' নাম।
প্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান।।
ভিক্ষা করাঞা কিছু কৈল নিবেদন।
চাতুর্ম্মাস্য আসি' প্রভু, হৈল উপসন্ন।।
চাতুর্ম্মাস্যে কৃপা করি' রহ মোর ঘরে।
কৃষ্ণ-কথা কহি' কৃপায় উদ্ধার' আমারে।।
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বৈসে যত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ।
এক একদিন সবে কৈল নিমন্ত্রণ।।
এক একদিনে চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হৈল।
কতক ব্রাহ্মণ ভিক্ষা দিতে না পাইল।।
চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হৈল, ভট্টের আজ্ঞা লঞা।
দক্ষিণ চলিলা প্রভু শ্রীরঙ্গ দেখিয়া।।

(চৈঃ চঃ ম ৯ম)

অদ্বৈতাদি ভক্তগণ নিমন্ত্রণ কৈল।
মুখ্য মুখ্য নব-জন নব-দিন পাইল।।
আর ভক্তগণ চাতুর্ম্মাস্যে যত দিন।
এক এক দিন করি' করিল বণ্টন।।

(চৈঃ চঃ ম ১৪শ)

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ—

চাতুর্ম্মাস্য রহি' গৌড়ে বৈষ্ণব চলিলা।
রূপ-গোসাঞি মহাপ্রভুর চরণে রহিলা।। (চৈঃ চঃ অ ১ম)
এই মত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
চাতুর্ম্মাস্য গোঙাইলা কৃষ্ণকথা-রঙ্গে।। (চৈঃ চঃ অ ১০ম)

পূর্ব্ববৎ সবা লঞা গুণ্ডিচা-মার্জ্জন।
রথ-আগে পূর্ব্ববৎ করিলা নর্ত্তন।।
চাতুর্ম্মাস্য সব যাত্রা কৈলা দরশন।
* * * *
এই মত নানা-লীলায় চাতুর্ম্মাস্য গেল।
গৌড়দেশে যাইতে তবে ভক্তে আজ্ঞা দিল।।
(চৈঃ চঃ অ ১২শ)

চারিপ্রকার আশ্রমেই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। কষ্ট-সাধ্য বলিয়া ঐ সকল প্রাচীন-রীতি ক্রমশঃ সমাজ-বক্ষ হইতে সুদূরে চলিয়া যাইতেছে। ফলকামি-কর্ম্মী এবং নিষ্কাম-ভক্ত-সম্প্রদায়ে ব্রত-পালনের অনুষ্ঠান কিছু কিছু ভিন্ন হইলেও ব্রতের সম্মান সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বিমাত্রেই করিয়া থাকেন। ইহাতে ভোগ-ত্যাগের বিধান পূর্ণমাত্রায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত—ত্রিবিধ সমাজেই ভোগ-ত্যাগ-বিধান সমধিক আদরের বস্তু। সুতরাং ত্রিবিধ পথাবলম্বী আর্য্যগণ সকলেই চারি আশ্রমে চাতুর্ম্মাস্যের সম্মান করেন। যাঁহারা নিতান্ত অসমর্থ, তাঁহারা সুদীর্ঘকাল নিয়মের অধীন হওয়া সুবিধাজনক মনে না করায় ক্রমশঃ ঐ সকল ব্রতাদিতে শিথিলভাব প্রদর্শন করিতেছেন।

আশ্রম চতুষ্টয়ের মধ্যে তিনটী আশ্রমে অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুর আশ্রমে ভোগ-মাহাত্ম্য নাই। কেবল গৃহস্থের কর্ত্তব্য-পালন-বিষয়ে যে নির্দ্দিষ্ট ভোগের ভাব আদিষ্ট আছে, তাহাও ভোগ-ত্যাগের উদ্দেশ্যে। যাঁহারা আটমাস কালের মধ্যে গৃহধর্ম্ম পালন করিবার 'মধ্যে মধ্যে' অধিকার পান, তাঁহারাও বৎসরের বর্ষাকাল বা চারিমাস ভোগ-ত্যাগ-বিধি পালন করিয়া অবশিষ্ট আশ্রমিগণের সহ ত্যক্তভোগ হইয়া বাস করেন। যিনি চারিমাসকাল নিয়ম-সেবা পালন করিতে অসমর্থ, তাঁহারও কেবল ঊর্জ্জাবিধি বা কার্ত্তিক-মাসে বিশেষভাবে নিয়ম-সেবা পালন করাই বিধি। ভক্তগণ কেহ কেহ চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া কেবল দামোদর-ব্রত গ্রহণ করেন; তাহা দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, ভক্তগণের চাতুর্ম্মাস্য বিধানের আবশ্যকতা নাই। উহা অসমর্থের অনুকল্প বিধিমাত্র। চারিমাসকাল নিয়মাধীন হইয়া হরিসেবা করিলে নিসর্গতঃ মনের ধর্ম্মে হরিসেবন-প্রবৃত্তি দেখা দিবে। জীব নৈসর্গিক হরি-পরায়ণতা প্রদর্শন করিতে পারিবেন।

চাতুর্ম্মাস্যের কাল বরাহপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,—

"আষাঢ় শুক্লদ্বাদশ্যাং পৌর্ণমাস্যামথাপি বা।
চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতারম্ভং কুর্য্যাৎ কর্কট-সংক্রমে।।
অভাবে তু তুলার্কেঽপি মন্ত্রেণ নিয়মং ব্রতী।
কার্ত্তিকে শুক্লদ্বাদশ্যাং বিধিবত্তৎ সমাপয়েৎ।।"

আষাঢ়-মাসে শুক্লা দ্বাদশী দিবস হইতে কার্ত্তিকের শুক্লা দ্বাদশী পর্য্যন্ত চারিটী চান্দ্রমাসে এই ব্রত-নিয়ম পালন করিবে। অথবা আষাঢ়-পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিক-পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চারিটী চান্দ্রমাসকাল এই ব্রতের সময়। অথবা কর্কট সংক্রান্তি অর্থাৎ সৌর-শ্রাবণ হইতে সৌর-কার্ত্তিক-শেষ পর্য্যন্ত শ্রীচাতুর্ম্মাস্য ব্রতের কাল। যাঁহারা চারিমাস-কাল উপরিলিখিত তিনপ্রকার বিচার-অবলম্বনে চাতুর্ম্মাস্যব্রতে অসমর্থ, তাঁহারা নিয়ম-সেবা-পালনপর হইয়া কার্ত্তিক-মাসে স্বীয় মন্ত্র-জপাদি দ্বারা বিধি-পূর্ব্বক ব্রত গ্রহণ করিবেন। ঊর্জ্জাব্রত বিশেষতঃ কর্ত্তব্য, ইহা চতুঃষষ্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম বলিয়াও উল্লিখিত আছে। কার্ত্তিকী শুক্লা দ্বাদশী হইতে ব্রত পরিহার করিতে আরম্ভ করিবেন অর্থাৎ পঞ্চবিংশ দিবস অবশ্যই ব্রত পালন করিবেন।

শ্রীভগবান্ বর্ষার চারিমাসকাল শয়ন করেন। সেই শয়নকালে কৃষ্ণ-সেবা-প্রবৃত্তি বৃদ্ধির জন্য চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-গ্রহণ কর্ত্তব্য। ইহা নিত্য-ব্রত। ব্রতের অকরণে প্রত্যবায় আছে। শাস্ত্র বলেন,—

"ইত্যাশ্বাস্য প্রভোরগ্রে গৃহ্লীয়ান্নিয়মং ব্রতী।
চতুর্ম্মাসেষু কর্ত্তব্যং কৃষ্ণ-ভক্তিবিবৃদ্ধয়ে।।"

ভবিষ্যে—

"যো বিনা নিয়মং মর্ত্ত্যো ব্রতং বা জপ্যমেব বা।
চাতুর্ম্মাস্যং নয়েন্মূর্খো জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।।"

ব্রতের গ্রহণীয়-বিধিতে ভগবানের নিয়ম-সেবা ও জপ-সংকীর্ত্তনাদি কর্ত্তব্য। যথা,—

"জপহোমাদ্যনুষ্ঠানং নাম-সঙ্কীর্ত্তনন্তথা।
স্বীকৃত্য প্রার্থয়েদ্দেবং গৃহীতনিয়মো বুধঃ।।"

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের বর্জ্জনীয়-বিচারে লিখিয়াছেন,—

"শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং দধি ভাদ্রপদে তথা।
দুগ্ধমাশ্বযুজে মাসি কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ।।"

—চাতুর্ম্মাস্যের প্রথম মাসে শাক, ভাদ্রমাসে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিকে আমিষ বর্জ্জন করিবে। শাক বলিতে কেহ কেহ পক্ক-ব্যঞ্জনকে বুঝিয়া থাকেন। ভোগ-ত্যাগ করিয়া হরি-সংকীর্ত্তনই উদ্দিষ্ট।

"রুচ্যং তত্তৎকাল-লভ্যং ফল-মূলাদি বর্জ্জয়েৎ।"

কালোচিত ফল-মূল—যাহার আস্বাদনে জীবের লোভ হয় এবং হরি-বিস্মৃতি ঘটে, তাহা প্রচুর পরিমাণে সেবা করিলে জড়-বস্তুতে অতিরিক্ত অভিনিবেশ হয়; সুতরাং তাহা চাতুর্ম্মাস্যে বর্জ্জনপূর্ব্বক সংযত হইয়া হরিকীর্ত্তন করিবে।

হরি-শয়নে নিষ্পাব বা সীম, রাজমাষ বা বরবটী, কলিঙ্গ বা ইন্দ্রযব, পটল, বেগুণ এবং পর্য্যুষিত বা বাসি-দ্রব্য গ্রহণ করিবে না। সাদা-বেগুণ বা সাহেব-বেগুণ অশুদ্ধ, তাহাই সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। সমর্থপক্ষে পটল, বেগুণ প্রভৃতি সুখময় খাদ্যও ত্যাগ করিবে।

নানাপ্রকার ত্যাগ একাধারে সম্ভবপর নহে, তজ্জন্য সমর্থ-পক্ষে যতগুলি ত্যাগ করিতে পারা যায়, তাহাই ত্যাগ করিতে হইবে। কর্ম্মিগণ—ভোগপর, তজ্জন্য ত্যাগের ফল প্রভৃতি রোচনার্থ কথিত হইয়াছে। মোটের উপর ত্যাগ-দ্বারা অভিনিবেশ শ্লথ হইলে ভগবদুন্মুখতার সুযোগ উপস্থিত হয়। আত্মধর্ম্ম বা নিত্য হরিসেবন-ধর্ম্ম প্রস্ফুটিত করিতে হইলে রুচির অনুকূল দেহ ও মনের ধর্ম্ম যতটা সঙ্কোচ করিতে পারা যায়, ততই হরিসেবায় উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে।

চাতুর্ম্মাস্যকালে সম্ভবপর হইলে ব্রতী একবার মাত্র প্রসাদ পাইবেন, প্রত্যহ স্নান করিবেন, হরিনিষ্ঠ হইবেন ও চারিমাস হরির অর্চ্চন করিবেন। হরি-শয়নকালে বিলাস-শয্যাদি-গ্রহণ নিষিদ্ধ, ভূমিশায়ী হওয়াই শ্রেয়ঃ।

সমর্থবান্ ব্রতী লবণ, তৈল, মধু, পুষ্প প্রভৃতি বস্তু-উপভোগ ত্যাগ করিবেন। কটু, অম্ল, তিক্ত, মধুর, ক্ষার, কষায় প্রভৃতি সকল রস বর্জ্জন করিবেন। ব্রতী যোগাভ্যাস করিবেন। সকল যোগের মধ্যে ভক্তি-যোগই প্রশস্ত; যেহেতু উহাই আত্মার নিত্য-বৃত্তি। রাজযোগ বা জ্ঞান-যোগ মনের অনিত্য-বৃত্তি এবং কর্ম্ম-যোগ বা হঠ-যোগ দেহ ও কিঞ্চিন্মানস-বৃত্তিময় অর্থাৎ অনিত্য।

চাতুর্ম্মাস্যে তাম্বূল সেবা করা অবিধেয়। সমর্থব্যক্তি পক্কদ্রব্য গ্রহণ করেন না। দধি-দুগ্ধ-তক্র পরিত্যাগ করিতে পারেন। স্থালী-পাক-বর্জ্জন চাতুর্ম্মাস্যে বিধেয়। সুরা, মধু, মাংস প্রভৃতি পরিবর্জ্জনীয়। সমর্থবান্ এক দিবস অন্তর এক দিবস উপবাস করিবেন। হরি-শয়নে নখ-লোমাদির ক্ষৌর-কার্য্য করিতে নাই। ক্ষৌর-কার্য্যে ভদ্রতা বা বিলাসিতা উপস্থিত হয়। চারি মাস কাল মৌনব্রত গ্রহণ করিলে কেবল অবিমিশ্র হরি-কীর্ত্তনের সুযোগ পাওয়া যায়। পাত্র-রহিত হইয়া ভূমিতে ভোজন করিলে স্বাভাবিক হরি-সেবনোচিত দৈন্য উপস্থিত হয়, ভজনের সুষ্ঠুতার ব্যাঘাত হয় না। অনুকূল-জ্ঞানে ভক্তের চাতুর্ম্মাস্য-বিধি ভজনের সহায় জানিতে হইবে। হরি-শয়ন কালে নিয়মে অবস্থান করা বিধি-শাস্ত্রের আদেশ—

"তস্মিন্ কালে চ মদ্ভক্তেন যো মাসাংশ্চতুরঃ ক্ষিপেৎ।
ব্রতৈরনেকৈর্নিয়মৈঃ পাণ্ডব শ্রেষ্ঠমানবঃ।।"

এতদ্ব্যতীত নক্ত-ভোজন, পঞ্চ-গব্যাশন, তীর্থস্নান, অযাচিত-ভোজন, হরিমন্দিরে গীত-বাদ্য, শাস্ত্রামোদ-দ্বারা লোক-প্রমোদন, অতৈল-স্নান প্রভৃতিও চাতুর্ম্মাস্যে নিয়মরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ফলসমূহ কামপর কর্ম্মিগণের জন্য, জ্ঞানী বা ভক্তগণের লৌকিক ও পারত্রিক-ফলের আবশ্যকতা নাই। মুমুক্ষু জ্ঞানিগণের মুক্তিফলও ভক্তের বর্জ্জনীয়। ভগবদ্ভক্তি হইলে মোক্ষ-বাসনা লঘু হইয়া পড়ে। সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণ-সেবা-তৎপর হইতে পারিলেই চাতুর্ম্মাস্যের চরম ফল-লাভ হয়। এবার শ্রাবণ মাসটী অধিমাস হওয়ায় চাতুর্ম্মাস্যকাল এক মাস বাড়িয়া গিয়াছে।

গৌড়ীয়

[১৯২৮-২৯ খৃষ্টাব্দ, ১৩৩৫-৩৬ বঙ্গাব্দ]

আমি 'এই' নই, আমি 'সেই'

এবংবিৎ বলেন,—আমি 'ইদং'; যেহেতু 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। আমি জড়-বিচারে উন্মত্ত হইয়া পূর্ণচেতনের আরোপ দ্বারা আপনাকে 'ব্রহ্ম' সংজ্ঞায়-সংজ্ঞিত করিয়া 'অয়ং' ও 'ইদং' এর ভেদের সংমিশ্রণে একাকার করিয়া ফেলি। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে 'ইদং' বলিতে যে পারিভাষিক জ্ঞানের উদয় হয়, তাহা 'অয়ং'-শব্দের বা 'অসৌ'-শব্দের সহিত 'এক' নহে। বেদমুখ ব্যাকরণাঙ্গে লিঙ্গনির্ণয়ে চেতনলিঙ্গের সহিত অচিৎলিঙ্গের ভেদ বা বৈশিষ্ট্য কল্পিত হয়। যিনি স্বয়ং চিদুদ্ভাসিত হইয়া বলিতে পারেন 'আমি', তাঁহার চেতনের বৃত্তিতে 'আমি' ব্যতীত 'তুমি' ও তিনি'র চিদ্‌বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত হয়। কিন্তু অচিৎলিঙ্গপ্রকরণে 'আমি' বলিবার স্বতঃকর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্ম লক্ষিত না হওয়ায় তাহার চেতন ধর্ম্মের পরিচয়াভাব-হেতু অচিৎপর্য্যায়ে সেইগুলি পরিগণিত হয়। 'ইদং'শব্দ চিৎপ্রকরণের অন্তর্গত নহে,—এরূপ ভাব বুঝাইবার জন্যই তাদৃশ চিদ্‌বৈচিত্র্যের প্রাকট্য।

জড়জগতে জড়তা ও গতিশীলতা,—এই দুই প্রকার ধর্ম্ম পরিলক্ষিত হয়। পরমাণুবাদী বলেন,—জড়পরমাণু স্থূলজড়ের হেতু, আবার কেহ বলেন,—গতিশীল বিদ্যুৎকণ জড় পরমাণুর হেতু। যখন তাহারা ইচ্ছা-শক্তির পরিচালনা করিতে স্বীয় নৈসর্গিক বৃত্তি প্রদর্শন করে না, তখনই তাহাদিগকে 'জড়' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। যেখানে ইচ্ছা শক্তির ক্রিয়া দেখা যায়, সেখানে যে বল অচিতের স্থাপনের বা বিনাশে যত্নবান্ হয়, তাহার একটীকে 'অচিদ্‌বল' এবং অপরটীকে 'চিদ্‌বল' বলা হয়।

জ্ঞানশক্তির অবলম্বনেই ইচ্ছাশক্তি ও অনুভাবিনীশক্তি, এই শক্তিদ্বয় কার্য্য করিতে সমর্থ। এজন্যই অদ্বয়জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত ইচ্ছা-শক্তির প্রভাবে চিদ্‌বৈচিত্র্যে চিদ্‌বিলাসের নিত্যাবস্থান। জড়জগতে অদ্বয়জ্ঞানের ইচ্ছা-শক্তি ক্রিয়মাণ হইয়া যে উপাদানে জগতের কার্য্যাদির অবতারণা করে, উহা তাঁহার 'প্রকৃতি' বা কার্য্যের কারণরূপে 'প্রধান' সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। তজ্জন্যই অদ্বয়জ্ঞানের ইচ্ছা-শক্তি প্রসূত প্রপঞ্চের উপাদানত্বে কেহ কেহ অদ্বয়জ্ঞানের প্রকৃতিকে অদ্বয়জ্ঞান হইতে ব্যতিরেক-বিচারে পৃথক্‌বস্তু বলিয়া নিরূপণ করেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এই প্রপঞ্চের 'নিমিত্ত' ও 'উপাদান' কারণ উভয়ই জ্ঞানশক্তি ও তাহার ক্রিয়ামুখে ইচ্ছা-শক্তিরই কার্য্য। আবার আধ্যক্ষিকজ্ঞানের উপাদান-নিরূপণে যে প্রকৃতির ধারণা হয় তাহাকে জ্ঞানশক্তির সহিত অভিন্ন মনে করিলে জ্ঞানস্বরূপের আলোচনায় প্রমার পরিবর্ত্তে ভ্রমের উদয় হয়। জীব যখন চেতনবৃত্তি লইয়া স্বীয় স্থূলশরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখন তিনি যে 'ইদং' এর ধারণা করেন, সেই ধারণায় যে বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান, তাহা তাঁহাকেই স্বীয় পূর্ণাস্তিত্বে স্থাপন করিতে ইতস্ততঃ করেন। তখনই তিনি জানেন যে, আত্মার ইচ্ছা-শক্তির পরিচালনক্রমে প্রাপঞ্চিক ভূমিকা ইদং-শব্দ-বাচ্য। উহার সহিত তাঁহার স্বরূপগত

নিত্যপার্থক্য আছে বলিয়াই মধ্যে মধ্যে তাঁহার ইচ্ছা-শক্তি-পরিচালনে বাধা উপস্থিত হয়। সেই বাধাটী কে দেয়?—তাহা আলোচনা করিতে গিয়া তিনি বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার জ্ঞান স্বরূপের ইচ্ছার সহিত অন্যজ্ঞানস্বরূপের ইচ্ছায় পরস্পর সংঘর্ষক্রমে বাধা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যেখানে ইচ্ছাদ্বয়ের পরস্পর প্রতিকূল সম্বন্ধ, সেখানে অবরতা, হেয়তা, অনুপাদেয়তা, বৈষম্য প্রভৃতি ইচ্ছা-পরিচালনে বাধা-স্বরূপে দণ্ডায়মান হয়।

জ্ঞানেরই ইচ্ছা-শক্তি ও অনুভাবিনী শক্তি অদ্বয়জ্ঞান স্বরূপের নিকট প্রপঞ্চে বাধা প্রাপ্ত হইয়া অভিযোগ উপস্থিত করিলে 'জ্ঞানস্বরূপ ইচ্ছা ও জ্ঞেয় অনুভূতিকে' সুষ্ঠুভাবে যথা-স্থানে নিযুক্ত হইবার ব্যবস্থা করেন। এই প্রপঞ্চে অবস্থান-কালে ইচ্ছা-শক্তি জ্ঞেয়বিচারে প্রতিহত হইলে উভয়ের সামঞ্জস্য- নিরূপণ-কার্য্যে পূর্ণ অদ্বয়জ্ঞানের অভিমুখে যাত্রা করেন। তখনই অণুচিৎ জীব জ্ঞানস্বরূপ পূর্ণতাভিমুখে ইচ্ছা ও জ্ঞেয়-শক্তি-বিচার স্থাপনাভিপ্রায়ে বলেন,—'আমি ইহা নই' 'আমি তাহাই' অর্থাৎ আমি তখন নিজস্বরূপের শুদ্ধনিত্য-পরিচয়ে অবস্থিত। এই সময়ে দুর্দ্দৈববশতঃ জ্ঞানস্বরূপ স্বীয় ইচ্ছা ও জ্ঞেয়ানুভব আনন্দ-বৃত্তি সঙ্কোচ করিবার অভিপ্রায়ে জড়জগতের ত্রিপুটী-বিনাশ কামনায় তমোগুণে আক্রান্ত হয়। তখনই অণুচিৎ জীব 'আমি এই নই, আমি সেই'-বলিতে গিয়া অহঙ্কার-বশে অপূর্ণ হইয়া তমো-ভাবকে পূর্ণ অদ্বয়জ্ঞানবিচারে স্থাপনপূর্ব্বক 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি বিচার-বিবর্ত্তে পতিত হইয়া আত্মহারা হয়। পূর্ণজ্ঞানের মূর্ত্তাশ্রয় শ্রীগুরুদেব তৎকালে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য স্বীয় প্রাকট্য সাধন করিয়া তাহার অণুচিৎ-এর ইচ্ছা-বৃত্তির দুর্দ্দমনীয় তমোভাব বা অজ্ঞান বিনাশ করিয়া আনন্দময় পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনের উদ্দেশ বলিয়া দেন। শ্রীগুরুদেবের সহিত পূর্ণাদ্বয়জ্ঞানের বিষয়াশ্রয়গত বৈশিষ্ট্য থাকায় ঔদার্য্যের প্রকাশভেদ ভেদরাজ্যের অমঙ্গল আনয়ন করিবার পরিবর্ত্তে পরম- কল্যাণময় কৃষ্ণাকর্ষণ প্রদর্শন করিতে গিয়া নিজ সঙ্কর্ষণতা প্রদর্শন করেন এবং কৃষ্ণাকৃষ্ট হওয়ায় অণুচিৎ এর একমাত্র নিজবৃত্তি জানাইয়া দেন। তখন জীব বলেন,—'আমি এই জড় নই, আমি সেই',—কৃষ্ণাকৃষ্ট সঙ্কর্ষণ শক্তির পরমাণু জীবশক্তি—অচিৎ জড়শক্তির প্রকার-ভেদ নই। ইদংবস্তু তদ্বস্তুর সেবা-বঞ্চিত ব্যাপার বিশেষের ধারণা নহে, সুতরাং ইদংবস্তুতে যে 'আমার ভোগ্য-জ্ঞান' জড়ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে আগত হইয়াছে, উহা জড়াবৃত হওয়ায় তাহাতে কৃষ্ণাকর্ষণের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। সুতরাং 'আমি ইদং নই, আমি সেই বস্তুর শক্তি'। আমি সেই পূর্ণবস্তু যদি হইতাম, তাহা হইলে 'ইদং' জড়ের সহিত আমার সম্বন্ধ হইত না। সুতরাং আমি সেই চিৎ, 'ইদং' নই এবং এই 'ইদং' সেই বস্তুর পৃথক্‌কারিণী হইতে জাত হইয়া বিরুদ্ধশক্তি ধর্ম্মবিশেষ লাভ করিয়া আমাকে তাহার অন্তর্গত জানাইবার জন্য স্বতন্ত্র ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া আমার নিত্য ইচ্ছাকে বাধা দিয়াছে, সুতরাং আমি এই পরিচ্ছিন্ন বহুভেদ-ভাবের অসুবিধার মধ্যে অবস্থান করা যুক্তিযুক্ত মনে করিতেছি না। যখন আমি—সেই চিৎ, ইহা নই, তখন আমার ইচ্ছাশক্তি জ্ঞেয়ানুভব আনন্দলাভে কেন বাধাপ্রাপ্ত হইবে? সুতরাং আমার এই জগৎ নহে, এই প্রাপঞ্চিক শরীর নহে, এই প্রাপঞ্চিক শরীর সহ চিদাভাস বৃত্তিতে যে মানসিক ইচ্ছা আমিত্বের সহিত বিরোধ করিতেছে, সেই বিরোধ হইতে মুক্ত হইবার জন্য আমি সেই চিদ্বস্তু এবং আমার চিদ্বস্তুর জন্য ইচ্ছা কখনই জ্ঞেয়ানুভবে

প্রীতির অভাব নিরানন্দ উৎপাদন করিতে পারে না। তখনই আমি ইচ্ছাময়ের অনুকূল প্রকাশবিশেষ গুরুপাদপদ্ম হইতে নিত্যা ইচ্ছা-শক্তির পরিচালন-বিধি অবগত হইয়া তাঁহার সহিত এই শ্রুতি মন্ত্র কীর্ত্তন করিব—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।"

তখনই তিনি বলিবেন,—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।"

শ্রীমদ্ভাগবতোৎসব

আগামী ১১ই ভাদ্র সোমবার হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে মাসাধিকব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত প্রকটোৎসব আরম্ভ হইবে। কলিকালের অজ্ঞানান্ধ লোকদিগকে দিব্যালোক প্রদান করিবার জন্য সনাতন-পুরাণ-সূর্য্য শ্রীমদ্ভাগবতের উদয় হইয়াছে।

"কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ।"

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ সন্দর্ভে শ্রীমদ্ভাগবত আবির্ভাবের হেতু এইরূপভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"যৎ খলু পুরাণজাতমাবির্ভাব্য, ব্রহ্মসূত্রঞ্চ প্রণীয়াপ্যপরিতুষ্টেন তেন ভগবতা নিজ-সূত্রাণামকৃত্রিম-ভাষ্যভূতং সমাধি-লব্ধমাবির্ভাবিতম্। যস্মিন্নেব সর্ব্বশাস্ত্রসমন্বয়ো দৃশ্যতে। সর্ব্ববেদার্থলক্ষণাং গায়ত্রীমধিকৃত্য প্রবর্ত্তিতত্বাৎ।" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস নিখিল পুরাণ-ইতিহাস প্রকাশ এবং ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াও যখন আত্মার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলেন না, তখন ঐরূপ চিত্ত-প্রশান্তির অসদ্ভাবের কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া সমাধিস্থ হইলে শ্রীবেদব্যাস সমাধিতে নিজ সূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য-সদৃশ শ্রীমদ্ভাগবত প্রাপ্ত হইয়া তাহা প্রচার করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে নিখিলশাস্ত্রের সমন্বয় দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ এই যে, যাহা হইতে সকল বেদার্থ সূচিত হইয়াছে, সেই বেদমাতা গায়ত্রীর আশ্রয়েই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রবৃত্তি। 'অকৃত্রিম ভাষ্যভূত' এই বিশেষণে শ্রীমদ্ভাগবত লক্ষিত হওয়ায় শ্রীমদ্ভাগবতের সুদৃঢ় প্রামাণ্যত্ব প্রমাণিত এবং শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবানের নির্ম্মিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। 'ভূত'-শব্দের অর্থ—সদৃশ, শ্রীমদ্ভাগবতকে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য না বলিয়া 'ভাষ্য-সদৃশ' বলিবার একটী কারণ আছে। ভাষ্য সূত্রের পরে রচিত হইয়া থাকে এবং তাহা কোন পুরুষবিশেষদ্বারা রচিত হয়, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত প্রাগ্‌বন্ধযুগে বিরাজিত বলিয়া পুরাণ অর্থাৎ সনাতন; ব্রহ্মসূত্র রচিত হইবারও পূর্ব্বে অনাদি কাল হইতে এই শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ নিত্য, অপৌরুষেয় ভাষ্যরূপে বিরাজিত আছেন। শ্রীমদ্ভাগবত কোন জীববিশেষের রচিত নহে, তাহা অপৌরুষেয় ও অনাদিকাল হইতে বিরাজিত। সূর্য্য কোন কাল-বিশেষে উদিত হন বলিয়া সূর্য্যকে যেরূপ আধুনিক বলা যায় না, তদ্রূপ কলিকালে

শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ-সূর্য্য বেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য জনসমাজে প্রচারার্থ ব্যাসদেবের নির্ম্মল হৃদয়াকাশে উদিত হইয়াছিলেন। শ্রীল জীবপাদ সন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—"গারুড়ে চ;—পূর্ণঃ সোঽয়মতিশয়ঃ। অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।। গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ। পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ।। দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদ-সংযুতঃ। গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ।।" ইতি। ব্রহ্মসূত্রাণামর্থ স্তেষামকৃত্রিম-ভাষ্যভূত ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বং সূক্ষ্মত্বেন মনস্যাবির্ভূতম্ তদেব সংক্ষিপ্য সূত্রত্বেন পুনঃ প্রকটিতম্, পশ্চাদ্বিস্তীর্ণত্বেন সাক্ষাৎ শ্রীমদ্ভাগবতমিতি। তস্মাত্তদ্ভাষ্যভূতে স্বতঃসিদ্ধে তস্মিন্ সত্যর্ব্বাচীনমন্যদন্যেষাং স্বস্বকপোল-কল্পিতং তদনুগতমেবাদরণীয়মিতি গম্যতে।।"

গরুড় পুরাণেও উল্লেখ আছে, শ্রীমদ্ভাগবত অতিশয় পূর্ণ। ব্রহ্মসূত্রের অর্থ এবং মহাভারতের তাৎপর্য্য ইহাতে বিশেষরূপে নির্ণীত হইয়াছে। ইহা গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ। বেদের তাৎপর্য্যও ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে। বেদসমূহের মধ্যে যেমন সামবেদ শ্রেষ্ঠ, পুরাণ অর্থাৎ সনাতন-শাস্ত্রের মধ্যেও সেইরূপ শ্রীমদ্ভাগবত প্রধান। সাক্ষাৎ ভগবানের দ্বারা কথিত হওয়ায় এই গ্রন্থ 'শ্রীভাগবত' নামে প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থ দ্বাদশস্কন্ধযুক্ত, শতবিচ্ছেদ-সংযুক্ত, এবং অষ্টাদশ সহস্র গ্রন্থে (৩২ সংখ্যক অক্ষরে এক গ্রন্থ, এইরূপ গণনায় ১৮,০০০ গ্রন্থ) ভূষিত। ইহা ব্রহ্মসূত্রসমূহের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমে সমাধিস্থ শ্রীব্যাসের বিশুদ্ধচিত্তে সূক্ষ্মরূপে আবির্ভূত হন, তাহাই তিনি সংক্ষেপ করিয়া সূত্রাকারে প্রকাশিত করেন, তাহার পর তাহা হইতেই বিস্তৃতরূপে সাক্ষাৎ ভাগবত জগতে প্রচারিত হন। সুতরাং ব্রহ্মসূত্রের স্বতঃসিদ্ধ ভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত থাকিতে আধুনিক অপর ভাষ্যকারগণের স্বকপোল-কল্পিত ভাষ্যগুলি শ্রীমদ্ভাগবতের অনুকূল হইলেই আদর করা কর্ত্তব্য, নতুবা নহে।

শ্রীপদ্মপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতকে অধোক্ষজ-শ্রীকৃষ্ণের ভুবনমঙ্গল মূর্ত্তিমান শাব্দিক অবতাররূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"পাদৌ যদীয়ৌ প্রথমদ্বিতীয়ৌ তৃতীয়তুর্য্যো কথিতৌ যদুরূ।
নাভিস্তথা পঞ্চম এব ষষ্ঠো ভুজান্তরং দোর্যুগলং তথান্যৌ।।
কণ্ঠস্তু রাজন্নবমো যদীয়ো মুখারবিন্দং দশমঃ প্রফুল্লম্।
একাদশো যস্য ললাটপট্টং শিরোপি তু দ্বাদশ এব ভাতি।।
তমাদিদেবং করুণানিধানং তমালবর্ণং সুহিতাবতারম্।
অপার-সংসার-সমুদ্র-সেতুং ভজামহে ভাগবত-স্বরূপম্।।"

আমি সেই আদিদেব, করুণানিধান, তমালবর্ণ শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় শাব্দিক অবতার, অপার-সংসার-সাগর উত্তরণের সেতু-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতকে ভজনা করি। এই গ্রন্থাবতারের দ্বাদশটী স্কন্ধ পরিপূর্ণচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশটী অঙ্গস্বরূপ। ইহারা সকলেই পূর্ণ। প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ পুরুষোত্তমের পাদযুগল স্বরূপ, তৃতীয় ও চতুর্থ স্কন্ধ—উরুদ্বয়, পঞ্চম-স্কন্ধ—নাভিদেশ, ষষ্ঠ স্কন্ধ—বক্ষঃস্থল, সপ্তম ও অষ্টম স্কন্ধ—

বাহুযুগল, নবম স্কন্ধ—কণ্ঠ, দশম স্কন্ধ—প্রফুল্ল মুখপদ্ম স্বরূপ, একাদশ স্কন্ধ—ললাটদেশ এবং দ্বাদশ-স্কন্ধ—মস্তকস্বরূপ।

গৌর-নিত্যানন্দ গৌড়দেশের পূর্ব্বশৈলে সূর্য্যচন্দ্রের ন্যায় উদিত হইয়া জীবের চিত্ত-গুহার অন্ধকার বিনাশপূর্ব্বক দ্বিবিধ ভাগবতের সহিত জীবের সাক্ষাৎ করাইয়াছেন—

"এক ভাগবত বড় ভাগবত-শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরসপাত্র।।"

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ—

"দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ।।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাগবতপাঠী দেবানন্দ পণ্ডিতের শিক্ষাদণ্ড-দ্বারা আমাদিগকে এই কথা জানাইয়াছেন,—

"মুই, মোর ভক্ত আর গ্রন্থ-ভাগবতে।
যার ভেদ আছে তার নাশ ভালমতে।।"

শ্রীচৈতন্যলীলার বেদব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবনও বলিয়াছেন,—

"দুই স্থানে 'ভাগবত' নাম শুনি মাত্র।
গ্রন্থ-ভাগবত আর কৃষ্ণ-কৃপা-পাত্র।।"

ভাদ্রমাসে এই উভয়বিধ ভাগবতের আবির্ভাব আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। শ্রীমদ্ভাগবতে ও মৎস্যপুরাণে পৌষ্ঠপদী অর্থাৎ ভাদ্র-সম্বন্ধিনী পূর্ণিমা-তিথিতে হেমসিংহাসনারূঢ় শ্রীমদ্ভাগবত-দানের মহাফল বর্ণিত হইয়াছে, কেন না ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতেই মহামুনিবেদব্যাস ভাগবতশাস্ত্র সমাপন করিয়াছিলেন—

"প্রৌষ্ঠপদ্যাং পৌর্ণমাস্যাং হেমসিংহসমন্বিতম্।
দদাতি যো ভাগবতং স যাতি পরমাং গতিম্।।
রাজন্তে তাবদন্যানি পুরাণানি সতাং গণে।
যাবদ্ভাগবতং নৈব শ্রূয়তেঽমৃতসাগরম্।।
সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ।।
নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা।।
ক্ষেত্রাণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং যথা কাশী হ্যনুত্তমা।
তথা পুরাণব্রাতানাং শ্রীমদ্ভাগবতং দ্বিজাঃ।।

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ম্
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
তত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতম্
তচ্ছৃণ্বন সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ।।"

দেবর্ষি নারদ কলিকালে সর্ব্বত্র ধর্ম্মের বিপর্য্যয় ও অসারতা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"কুকর্ম্মচরণাৎসারঃ সর্ব্বতো নির্গতোঽধুনা।
পদাথাঃ সংস্থিতা ভূমৌ বীজহীনাস্তুষা যথা।।
বিপ্রৈর্ভাগবতী বার্ত্তা গেহে গেহে জনে জনে।
কারিতাং ধনলোভেন কথাসারস্ততো গতঃ।।
অত্যুগ্রভুরিকর্ম্মাণো নাস্তিকা দাম্ভিকা জনাঃ।
তেঽপি তিষ্ঠন্তি তীর্থেষু তীর্থসারস্ততো গতঃ।।
কামক্রোধমহালোভতৃষ্ণাব্যাকুলচেতসঃ।
তেপি তিষ্ঠন্তি তপসি তপঃসারস্ততো গতঃ।।
মনসশ্চাজয়াল্লোভাদ্দম্ভাৎ পাষণ্ডসংশ্রয়াৎ।
শাস্ত্রানভ্যসনাচ্চৈব ধ্যানযোগফলং গতম্।।
পণ্ডিতাস্তু কলত্রেণ রমন্তে মহিষা ইব।
পুত্রোৎপাদনদক্ষাস্তেপ্যদক্ষা মুক্তিসাধনে।।
ন হি বৈষ্ণবতা কুত্র সম্প্রদায়পরঃসরম্।
এবং প্রলয়তাং প্রাপ্তো বস্তুসারঃ স্থলে স্থলে।।"

(পদ্মপুরাণ উঃ খঃ ৬৩ অঃ)

শ্রীনারদ কহিলেন,—অধুনা (কলিকালে) কুকর্ম্মের আচরণ-হেতু বস্তু-সমূহ বীজহীনতুষের ন্যায় সর্ব্বতো-ভাবে সারহীন হইয়া পৃথিবীতে রহিয়াছে। বিপ্রগণ ধনলোভে গৃহে-গৃহে, জনে-জনে ভাগবতী কথা কীর্ত্তন করিলেও সেই কথা শ্রবণ করিয়া কাহারও মঙ্গল হইতেছে না। কারণ ধন-বিনিময়ে হরিকথা-কীর্ত্তনের অভিনয় করায় হরিকথার সার অন্তর্হিত হইয়াছে, বাহ্য আকার মাত্র দৃষ্ট হইতেছে। তীর্থসমূহে অতিশয় উগ্র আড়ম্বরযুক্ত কর্ম্মিগণ, নাস্তিকগণ, দাম্ভিকগণ বাস করায় তীর্থসার গত হইয়াছে অর্থাৎ তীর্থফল যে নিষ্কিঞ্চন-সাধুসঙ্গ এবং সাধুসঙ্গে শুদ্ধ ভগবদ্ভজন, তাহা আর নাই। কাম, ক্রোধ, মহা লোভ, অসতৃষ্ণায় ব্যাকুলচিত্ত ব্যক্তিগণও তপস্যায় অবস্থিত হওয়ায় তপস্যার সার বিগত হইয়াছে। মনকে নিগ্রহ না করিয়া লোভ, দম্ভ, পাষণ্ডজনের সংসর্গ এবং সৎশাস্ত্রের অনভ্যাস-হেতু বাহ্যে ধ্যানস্থ হইয়াও লোক-সমূহ ধ্যান-যোগের ফলপ্রাপ্ত

হইতেছে না। পণ্ডিতাভিমানিগণ মহিষের ন্যায় স্ত্রীর সহিত বাস করিতেছে, তাহারা পুত্রোৎপাদনে দক্ষ ও মুক্তি সাধনে অনিপুণ হইয়া পড়িয়াছে, কোথাও সৎ-সম্প্রদায়ানুসারিণী বৈষ্ণবতা নাই; এইরূপ ভাবে স্থলে স্থলে বস্তুসার বিনষ্ট হইয়াছে।

দেবর্ষি নারদের এই কলিদোষসূচক বাক্যের ঔষধিস্বরূপ সনৎকুমারগণ পরব্যোম-নির্গতা ভগবদ্‌বাণীর উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, এইরূপ অবস্থায় শুদ্ধ ভাগবতগণ যদি পুনরায় শুকমুখনির্গত শ্রীমদ্ভাগবত-ধ্বনি জগতে প্রচার করেন, তাহা হইলেই এই সকল কলিদোষ সিংহের নাদশ্রবণে বৃক্‌কুলের পলায়নের ন্যায় বিদূরিত হইবে,—

"প্রলয়ং হি গমিষ্যন্তি শ্রীমদ্ভাগবতধ্বনৌ।
কলিদোষ ইমে সর্ব্বে সিংহশব্দাদ্বৃকা ইব।।"

(পদ্মপুরাণ উঃ খঃ ৬৩ অঃ)

ভাগবতগণই ভাগবতের প্রচার করিতে পারেন। ভাগবতগণ নিষ্কপট ও নির্ম্মৎসর। ভাগবতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষাভিসন্ধিরূপ কোন প্রকার কৈতবের অবসর নাই, ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের আদিম শ্লোক তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভাগবতের আচার্য্য জগদ্‌গুরু শ্রীধরস্বামিপাদও ভাবার্থদীপিকায় ইহাই বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের শিক্ষানুসারে শ্রীল রূপ-গোস্বামীপাদ "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং" শ্লোকে এই কথাই কীর্ত্তন করিয়াছেন, সুতরাং রূপানুগগণই ভাগবত; তাঁহারা ভাগবত প্রচার করেন, সকলকে ভাগবত করেন। তাঁহাদের অন্যাভিলাষ নাই, নির্ব্বেদ-জ্ঞানানুসন্ধিৎসা নাই, নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মাগ্রহ নাই, অষ্টাঙ্গ-যোগাদি খণ্ডযোগে আসক্তি নাই, কিম্বা তাঁহাদের প্রতিকূল অনুশীলনও নাই। তাঁহাদের চিত্ত ভাগবত সেবাভিলাষে পরিপূর্ণ, ভাগবতের অদ্বয়জ্ঞানে আসক্ত, সর্ব্বেন্দ্রিয় ভাগবত-তোষণপর কর্ম্মে নিযুক্ত, মন ভাগবতীয় যোগে নিবিষ্ট, তাঁহারা ভাগবতের অনুকূল অনুশীলনে রতিবিশিষ্ট।

ভাদ্রমাস কর্ম্মজড়গণের বিচারে অশুভ বলিয়া বিবেচিত হইলেও এই ভাদ্র মাস ভাগবতগণের বিচার পরম পুণ্যমাস। এই ভাদ্রমাসে ভাগবতের প্রতিপাদ্য পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছে, এই ভাদ্রমাসেই নিখিলজীবের সহিত কৃষ্ণের মিলনকারী, কৃষ্ণের সন্ধান প্রদানকারী, সন্ধিনী শক্তির ঈশ্বর, বলসঞ্চারকারী বলদেবপ্রভু কৃষ্ণাগ্রজরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই ভাদ্র মাসেই পূর্ণশক্তিমদ্‌বিগ্রহের পূর্ণাশক্তিস্বরূপিণী রাধাঠাকুরাণীর আবির্ভাব হইয়াছে, এই ভাদ্র মাসেই রাধারাণীর কায়ব্যূহস্বরূপা অষ্টসখীর প্রধানা শ্রীললিতা সখীর আবির্ভাব হইয়াছে, এই ভাদ্রমাসেই নিখিল জীবের প্রভু শ্রীল জীবপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই ভাদ্র-মাসেই বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তি ভাগীরথী-প্রবাহের ভগীরথ ভক্তিবিনোদ প্রভুর আবির্ভাব হইয়াছে; সুতরাং এই পুণ্য অবসরে শুদ্ধ ভাগবতগণ ভাগবত-প্রকটোৎসবের বিপুল আয়োজন করিয়াছেন। এই ভাগবতোৎসব ভুবনমঙ্গল বিতরণের জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, এই ভাগবতোৎসব ভূরিদ-ভাগবতগণের মহাদান বিঘোষিত করিবার জন্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই ভাগতোৎসবে বিশ্ব-শান্তির নিদান—সর্ব্ব সমস্যার মীমাংসা—সর্ব্ব-

ধর্ম্মের মহাচিৎসমন্বয়—সর্ব্বদর্শন—সর্ব্ববিজ্ঞান—সর্ব্বপ্রজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা—সর্ব্ব-স্বাধীনতা—সাম্য ও মৈত্রীর মহাবীজমন্ত্র অনুস্যূত রহিয়াছে। এই ভাগবতোৎসবে বিশ্ব-মানবের—বিশ্ব-চেতনের—বিশ্ব-বৈষ্ণবের মহামিলন হইবে—যে মিলন দু'দিনের নহে—যে মিলন ব্রহ্মার পরমায়ু পর্য্যন্ত নহে—কল্পান্তে মহাপ্রলয়ের পরেও যে মিলন মহামহিমায় বিরাজিত থাকে, সেই মহামিলনের মহাসূত্র রচনা করিবার জন্য এই ভাগবতোৎসবের প্রস্তাবনা।

এস ভাই এস, তোমরা এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে যে যেখানে দাঁড়াইয়া আছ—যে যত সাগর সৈকতে অভিজ্ঞানের উপলখণ্ড সংগ্রহ করিয়াছ—যে যত মহা-মনীষার অনুবীক্ষণ, দুর্বীক্ষণযন্ত্রে পৃথিবী ধূলিকণা—আকাশের হিমকণা গণনা করিয়া ফেলিয়াছ—যে যত জীবনে বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, দণ্ডিত, ব্যথিত হইয়াছ—যে যত সুখের মরুতে আলেয়ার আলোক দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছ—যে যত বিশ্বের দুঃখে কাতর—বিশ্বের শান্তি-সমস্যার উপায় চিন্তায় বিভ্রান্ত-উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছ, এস এস, একবার ভাগবতোৎসবে প্রাণ খুলিয়া— সমস্ত বোঝা সরাইয়া যোগদান কর, দেখিবে তোমাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান—তোমাদের অনুসন্ধানের পরশপাথর—তোমাদের জ্ঞানের চরমসীমা—তোমাদের আসক্তির পরমবস্তু—তোমাদের পূর্ণস্বাধীনতা—তোমাদের পূর্ণ- স্বরাজ—তোমাদের পূর্ণস্বভাব—তোমাদের পূর্ণসৌন্দর্য্য—তোমাদের পূর্ণ শান্তির উৎস সেখানে পূর্ণ হইতে পূর্ণতর—পূর্ণতর হইতে পূর্ণতম—পূর্ণতম হইতেও নবনবায়মান পূর্ণতম হইয়া বিরাজমান। কথায় নয়—কাজে, ভাষায় নয়—বাস্তব সত্যে, আশায় নয়—প্রাপ্তিতে, কল্পনায় নয়—অনুভবে অকিঞ্চিৎ ক্ষুদ্রজড়েন্দ্রিয়তর্পণপরতার সীমা অতিক্রম করিয়া পূর্ণতমা স্বাধীনতা-লক্ষ্মী উন্মত্তমায়াবন্ধনের পূর্ণসৌন্দর্য্য সাম্রাজ্য-সিংহাসনে তোমাদের জন্য অভিষিক্ত রহিয়াছেন; তাই আবার বলিতেছি, বিশ্বশান্তির—প্রকৃত বাস্তব বিশ্বশান্তির এই অযাচিত ডাকে সাড়া দেও। আবার স্মরণ করাইয়া দিতেছি, এই ভাগবতোৎসবের উদ্বোধন গীতি আগামী ১১ই ভাদ্র হইতে সুরু হইবে।

কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগ

শ্রীবিষ্ণুর দুষ্টদমন-শক্তির আবেশাবতার জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম। ত্রেতাযুগে যখন পৃথিবী পাশব-বাহুবলদৃপ্ত নৃপতিগণের ভারে প্রপীড়িতা হইয়া উঠিয়াছিল, ক্ষত্রিয়গণ যখন জড়শক্তির শ্লাঘায় উন্মত্ত হইয়া পারমার্থিক ব্রহ্মশক্তিকে লঙ্ঘন করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তখনই পরশুরাম পৃথ্বীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়কুলের শোণিত-স্রোতস্বিনী প্রবাহিতা হইয়াছিল। স্বয়ং কর্ম্মাবলেপশূন্য হইলেও পরশুরাম কর্ম্মাধিকারী লোকসমূহের শিক্ষার্থ মাতৃহত্যা-জনিত পাপক্ষালনাভিনয়পূর্ব্বক কুরুক্ষেত্রে স্নান, দান ও যজ্ঞাদির দ্বারা যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর উপাসনা করিয়াছিলেন। জড়বাদিগণের বধস্থান এবং পরশুরামের উপাসনাক্ষেত্র বলিয়া কুরুক্ষেত্র সুপ্রাচীনকাল হইতে পরম-পুণ্যক্ষেত্ররূপে বিবেচিত। 'কুরুক্ষেত্রং দেবযজনম্'
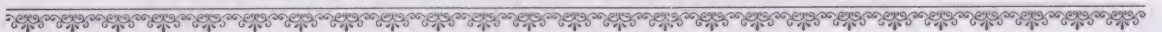
—এই শ্রুতিপ্রমাণে পুরাকাল হইতে কুরুক্ষেত্র দিব্যসূরিগণের বিষ্ণু-আরাধনার ক্ষেত্ররূপে পরিচিত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভাষায় এই স্থান 'ধর্ম্মক্ষেত্র' বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

দ্বাপর যুগে দ্বারকানাথ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকা-নগরীতে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ সংঘটিত হয়। তদুপলক্ষে ভারতের অসংখ্য লোক কুরুক্ষেত্রে স্নানদানাদির জন্য আগমন করিয়াছিলেন। হস্তী, অশ্ব, রথ ও নানা-প্রকার সাজ-সরঞ্জামের সহিত যদুবংশীয়গণ কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মসরোবরে স্নান এবং উপবাসাদি ব্রত আচরণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে ভূরি স্বর্ণ, গাভী, উত্তমবস্ত্র, মাল্য প্রভৃতি সামগ্রী দান করিয়াছিলেন। তাঁহারা 'কৃষ্ণে আমাদের অহৈতুকী ভক্তি লাভ হউক'—এই সঙ্কল্প করিয়া যাবতীয় অনুষ্ঠানের আচরণ করিয়াছিলেন। বিভিন্ন দেশের যাবতীয় রাজন্যবর্গ পুণ্যকামনায় সেই সময় কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ছিলেন।

সূর্য্যোপরাগের ছল করিয়া দ্বারকা হইতে কৃষ্ণচন্দ্র, এবং সেই ছলেই বৃন্দাবন হইতে দীর্ঘ-কৃষ্ণবিরহোন্মত্ত গোপ-গোপীগণ স্যমন্তপঞ্চকে কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছিলেন। ঐশ্বর্য্য-ভাব-প্রবীণ দ্বারকাবাসিগণ বৃন্দাবনে গমন করিয়া বনবাসী আভীর-প্রজাগণের বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হওয়াকে মর্য্যাদা হানিকর মনে করেন। আভীর-প্রজাগণও ঐশ্বর্য্যবিমণ্ডিত দ্বারকাপুরীতে কৃষ্ণদর্শনার্থ গমন করিতে ইচ্ছা করেন না। বনবাসিনী আভীর-নন্দিনীগণ বহুকাল কৃষ্ণবিরহকাতরা থাকা সত্ত্বেও, এমন কি, শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ আজ্ঞা হইলেও কখনও দ্বারকায় গমন করিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও প্রৌঢ়বিভবশালী কৃষ্ণকে দর্শন করেন না। তবে, কৃষ্ণদয়িতা বার্ষভানবী দিব্যোন্মাদবশতঃ দ্বারকায় গমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্মিলিতা হইয়াছেন,—যদি ইহা শুনিতে পান, তবেই অর্থাৎ চিল্লীলামিথুনের মিলনের জন্যই তাঁহারা আকুলপিপাসায় উন্মত্ত হইয়া ব্রজপুর হইতে দ্বারকায় মনোগতি অপেক্ষা দ্রুতবেগে পক্ষীর ন্যায় উড়িয়া যাইতে চাহেন।

যশোমতী ও নন্দ কৃষ্ণের জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে অন্ধ প্রায় হইয়াছিলেন। গোপীগণ প্রাণবল্লভকৃষ্ণের অদর্শনে জীবনরহিতা-প্রায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। সূর্য্যগ্রহণে স্নানের ছল করিয়া তাঁহারা 'জীব-রক্ষৌষধি' কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতে আসিয়াছিলেন। বসুদেব ও নন্দের পরস্পর মিলন, রোহিণী, দেবকী ও যশোমতীর মিলনে আর কোন কথা নাই—"কেবল কৃষ্ণ, কোথায় কৃষ্ণ"। সকলেই কৃষ্ণমুখপদ্মে নেত্রমধুকর স্থাপন করিয়া বিধিকে নিন্দা করিতেছিলেন,—কেনই বা বিধি নয়নপদ্মে পলক দিলেন। গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণ রহঃপ্রদেশে বিপ্রলম্ভ- বহ্নিবিদগ্ধ গোপীগণের সহিত মিলিত হইয়া গোপবধূগণকে আলিঙ্গনামৃতে অভিষিক্ত করিলেন। চতুর কৃষ্ণ গোপীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে অঙ্গনাগণ, বহুদিন তোমাদের সহিত দেখা নাই, তোমরা কি আমাকে স্মরণে রাখিয়াছ? আমার সহিত বন্ধুত্বের কথা কি তোমাদের মনে পড়ে? বায়ু দ্বারা যেরূপ মেঘ- তৃণ-তুলা-ধূলিকণসমূহ পরস্পর সংযুক্ত-বিযুক্ত হয়, সেইরূপ ভগবান্ও ভূতসমূহকে পরস্পর মিলিত, কখনও বা বিচ্ছিন্ন করিয়া থাকেন। আমার প্রতি আসক্তি জীবগণের পক্ষে অমৃতস্বরূপ।

তোমাদের যে আমার সহিত সাক্ষাৎকার, আমার প্রতি স্নেহ,—ইহা আমার ভাগ্যজনিতই। আমি সর্ব্বভূতের অন্তরে বাহিরে ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত রহিয়াছি।"

শ্রীকৃষ্ণের এই অধ্যাত্মশিক্ষাময়ী বচনবিন্যাস-চাতুরী শ্রবণ করিয়া গোপীগণ কহিলেন,—"হে নলিননাভ! তুমি আমাদিগকে এই সকল কথা কেনই বা বলিতেছ? আমরা ত' যোগেশ্বর নহি যে, তোমাকে ধ্যান করিয়া সুখী হইব? আমাদের সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভেরও ইচ্ছা নাই। আমরা সংসারী—গৃহসেবী, তোমাকে লইয়াই আমাদের সংসার—আমাদের গৃহধর্ম্ম। যোগিগণ তোমাতে চিত্ত সংলগ্ন করিবার জন্য কতই না ধ্যান-ধারণা করেন,—অভ্যাস করেন, তথাপি তোমাতে চিত্ত সংলগ্ন করিতে পারেন না। আর আমরা তোমা' হইতে চিত্ত কাড়িয়া লইয়া তাহা বিষয়ে নিযুক্ত করিবার জন্য কত সাধ্য-সাধনাই না করি,—তোমাকে ভুলিবার জন্য কত চেষ্টাই না করি, কিন্তু কিছুতেই ক্ষণেকের জন্যও তোমা' হইতে অন্যত্র চিত্ত স্থাপন করিতে পারি না। বরং তাহাতে তোমার প্রতি অভিনিবেশ আরও বাড়িয়া যাইতেছে। তাই আমাদের জ্ঞান, যোগ, সংসার হইতে উদ্ধারেচ্ছা কিছুতেই রুচি নাই। আমাদিগকে তোমার বিরহগ্রাস হইতে উদ্ধার কর। তোমাকে কুরুক্ষেত্রে পাইয়াছি বটে, কিন্তু তোমাকে এখানে পাইয়াও আমাদের বিরহবহ্নি নির্ব্বাপিত হইতেছে না—হইবেও না। এখানকার আবহাওয়া, এখানকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, লোকজন তোমার সহিত আমাদের মিলনের অনুকূল নহে। আমরা ক্ষুদ্র গৃহসেবী বনবাসী,—এইসব হাতী, ঘোড়া, রথ, লোকারণ্য, পতাকা, ঢক্কানিনাদ, তোমার রাজবেশ, রাজদণ্ড, রাজছত্র আমাদের ভাল লাগিবে কেন? হে গোপেন্দ্রনন্দন, ফল-মূল-কিশলয়ই যাহাদের সম্পত্তি, গোধনসমূহই যাহাদের প্রজা, যমুনা, কদম্বকুসুম-লতিকাকুঞ্জ, শুকশারিকা, সরলা বাঁশরীর পঞ্চমতান—যাহাদের সংসার-সহচর, আর শিখিচন্দ্রকালঙ্কৃতি নন্দকুল-চন্দ্রমা তুমি যাহাদের জীবনসর্ব্বস্ব—দেহ, গেহ, বন্ধুবান্ধব, স্বজন, সংসার, মন, প্রাণ, আত্মা, যথাসর্ব্বস্ব, তাহাদের কাছে ঐ সকল রাজোচিত ধূমধাম ভাল লাগিবে কেন? চল, বন্দাবনে যাই, সেখানে তোমার মুরলীর মন্দমধুর পঞ্চমতানে কলিন্দনন্দিনীর তীরস্থ ব্রততীকুঞ্জ আবার মুখরিত হউক।"

যে কুরুক্ষেত্রে একদিন শ্রীকৃষ্ণের সহিত কৃষ্ণদয়িতা রাধিকা-প্রমুখা বিরহ-ব্যথিতা গোপীগণের মিলন—মিলনে বিরহ-বেদনা,—সম্ভোগে বিপ্রলম্ভ-বীণার মূর্চ্ছনা রহঃস্থানে বাজিয়া উঠিয়াছিল, সেই কুরুক্ষেত্রের আদর্শই দ্বিতীয়সংস্করণ- রূপে—রাধাভাববিভাবিত—বিপ্রলম্ভ-লীলাময় কৃষ্ণস্বরূপ গৌরসুন্দরের চিত্তে নীলাচলের রথাগ্রে জগন্নাথ দর্শনকালে উদিত হইয়া—

"সেই ত' পরাণনাথ পাইনু।
যাহা লাগি' মদন-দহনে ঝুরি' গেনু।"

—গীতিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। রথাগ্রে নৃত্য করিতে করিতে জগন্নাথকে লইয়া সুন্দরাচলাভিমুখে গমনকালে বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখে কাব্য-প্রকাশের "যঃ কৌমারহরঃ" শ্লোক শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভুর চিত্তজ্ঞ "প্রিয়স্বরূপ" শ্রীরূপপ্রভু যে শ্লোক রচনা পূর্ব্বক মহাপ্রভুর প্রচুর আনন্দ বিধান করিয়াছিলেন, সেই শ্লোকটী এই,—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি।।

হে সখি! আমার সেই প্রাণারাম কান্ত কৃষ্ণকে কুরুক্ষেত্রে পাইয়াছি, আর আমিও সেই রাধা উপস্থিত আছি; আমাদের উভয়ের মিলনে সুখ হইয়াছে বটে; তথাপি হৃদয়াভ্যন্তরে বৃন্দাবিপিনমধ্যে শ্যামের মধুর মুরলীর পঞ্চমরাগ- মুখরিত তপন-তনয়ার তীরস্থ নিভৃতনিকুঞ্জের জন্য আমার চিত্ত সমুৎকণ্ঠিত হইতেছে।

"রাজবেশ, হাতী, ঘোড়া, মনুষ্য গহন।
কাহাঁ গোপবেশ, কাহাঁ নির্জ্জন বৃন্দাবন।।
সেই ভাব, সেই কৃষ্ণ, সেই বৃন্দাবন।
যবে পাই, তবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ।।

* * * *

সেই তুমি, সেই আমি, সেই নবসঙ্গম।।
তথাপি আমার মন হরে' বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনে উদয় করাও আপন চরণ।।
ইহাঁ লোকারণ্য, হাতী, ঘোড়া, রথধ্বনি।
তাহাঁ পুষ্পারণ্য, ভৃঙ্গ, পিকনাদ শুনি।।
এই রাজবেশ, সঙ্গে সব ক্ষত্রিয়গণ।
তাহাঁ গোপবেশ, সঙ্গে মুরলীবাদন।।
ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ-আস্বাদন।
সেই সুখসমুদ্রের ইহাঁ নাহি এক কণ।।
আমা লঞা পুনঃ লীলা করহ বৃন্দাবনে।
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয় ত' পূরণে।।"

ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী, মিশ্র ভক্ত, শুদ্ধবৈষ্ণব, বৈষ্ণবপরমহংস, সকলেরই আদরের বস্তু। ইহামুত্র ফলভোগকামী কর্ম্মিসম্প্রদায় পুণ্যসঞ্চয়ার্থ ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে স্নান-দানাদি করিয়া থাকেন। কুরুক্ষেত্রে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়। সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষ্যে স্যমন্তপঞ্চকে ব্রহ্মসরঃস্থানের বহুফল শ্রুতিশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। ইহামুত্র ফলভোগত্যাগী অহংগ্রহোপাসক জ্ঞানি-সম্প্রদায় কর্ম্মকে সাধন জ্ঞান করায় চিত্তশুদ্ধাদির জন্য ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে আগমন করেন। ঈশ্বর-সাযুজ্যকামী রাজযোগী,

বিভূত্যাদি কামী হঠযোগী, পঞ্চতপাদি তপস্বিগণ স্ব-স্ব অভীষ্টসিদ্ধি বা তাঁহাদের কর্ম্মকৌশল প্রদর্শনার্থ কুরুক্ষেত্রে অভিযান করিয়া থাকেন। মিশ্রভক্তগণ ফলাভিসন্ধানযুক্ত ভক্তিযাজনের জন্য কুরুক্ষেত্রে স্নান-দানাদি করিয়া থাকেন।

মহাভারতের বনপর্ব্বে ৮৩ অঃ যুধিষ্ঠিরের প্রতি পুলস্ত্যের উক্তিতে জানা যায়,—

"**শ্রীকুঞ্জঞ্চ সরস্বত্যাঞ্চ** তীর্থং ভরতসত্তম।

* * * *

ততো নৈমিষকুঞ্জঞ্চ মমাসাদ্য কুরূদ্বহ।
ঋষয়ঃ কিল রাজেন্দ্র নৈমিষেয়াস্তপস্বিনঃ।।
তীর্থযাত্রাং পুরস্কৃত্য কুরুক্ষেত্রং গতাঃ পুরা।
ততঃ কুঞ্জঃ সরস্বত্যাঃ বৃতো ভরতসত্তম।।
ঋষীণামবকাশঃ স্যাদ্‌যথা তুষ্টিকরো মহান্।

* * * *

ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ব্রহ্মণস্তীর্থমুত্তমম্।
তত্র বর্ণাবরঃ স্নাত্বা ব্রাহ্মণ্যং লভতে নরঃ।।"

হে ভরতবংশাবতংস, **সরস্বতীর তীরে শ্রীকুঞ্জতীর্থ বিরাজিত**। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, নৈমিষারণ্যবাসী তপস্বী ঋষিগণ নৈমিষকুঞ্জে উপস্থিত হইয়া পুরাকালে তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। সরস্বতীর তীরে যে শ্রীকুঞ্জ রচিত রহিয়াছে, তাহা নৈমিষারণ্যবাসী ভাগবত পরমহংস ঋষিগণের পরতুষ্টিপ্রদ বিশ্রামস্থলী। হে রাজেন্দ্র, সেই স্থান হইতে কুরুক্ষেত্রের ব্রহ্মসরোবরে গমন করিবে। **সেই ব্রহ্মসরে স্নান করিলে অবর বর্ণ ব্রাহ্মণতা লাভ করে**।

কুরুক্ষেত্রের ব্রহ্মসরোবরে স্নান করিলে সকলেরই বৈষ্ণবীদীক্ষা-লাভ হয় এবং বৈষ্ণবদীক্ষার ফলস্বরূপ পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা সমূলে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব-লাভ হয়। ব্রহ্মসরোবরে স্নান অর্থাৎ বৈষ্ণবী দীক্ষার দ্বারা দ্বিজত্ব লাভ করিতে না পারিলে কেহই শুদ্ধবৈষ্ণবতা লাভ করিতে পারেন না। শুদ্ধবৈষ্ণব না হইলে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদত্ত "অনর্পিতচর উন্নত উজ্জ্বলরসে" প্রবিষ্ট হওয়া যায় না। সরস্বতীর তীরে যে শ্রীকুঞ্জ আছে, তাঁহার আশ্রয় ব্যতীত কেহই শুদ্ধ ভাগবতধর্ম্মে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ হরিসেবা-প্রবৃত্তির বিবৃদ্ধির জন্য কুরুক্ষেত্রে পরমহংস-গুর্ব্বানুগত্যে পূজ্য আশ্রয়জাতীয়- গণের সহিত বিষয়-বিগ্রহের সম্ভোগ-সেবায় উন্মুখ হইয়া থাকেন। রূপানুগ বৈষ্ণব-পরমহংসগণ কুরুক্ষেত্রে বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত হইয়া চিল্লীলামিথুনের মিলনপ্রয়াসী হন। কুরুক্ষেত্র তাঁহাদের বিপ্রলম্ভসেবা-রসের উদ্দীপন বিভাব-স্বরূপ হইয়া মিলনে বিরহস্মৃতি—কুরুক্ষেত্রে বৃন্দাবনস্মৃতি, আবার বৃন্দাবনস্মৃতির উদয় করায়। গোপীগণ কৃষ্ণকে কুরুক্ষেত্রে পাইয়াও বৃন্দাবনে বৃষভানুজার সহিত কৃষ্ণের মিলন বাঞ্ছা করেন। আবার নৈশলীলাক্ষেত্র

বৃন্দাবনে রাসতাণ্ডবী কৃষ্ণকে পাইলেও মাধ্যাহ্নিক-লীলাক্ষেত্র রাধাসরসীতীরে রাধার সহিত রাধানাথের মিলন আকাঙ্ক্ষা করেন। রূপানুগগণের চিত্তে স্যমন্তপঞ্চকের ব্রহ্মসরেও রাধাসরের উদ্দীপনা হইয়া থাকে। একমাত্র রূপানুগ পরমহংসগণই এইরূপ দ্বিগুণিত বিপ্রলম্ভ-সেবা-রসে বিভাবিত হন। সুতরাং কুরুক্ষেত্র গৌড়ীয়বৈষ্ণবের যে কতদূর আদরের বস্তু, তাহা গৌরজনগণই উপলব্ধি করিতে পারেন।

আশ্রয়জাতীয়গণের সহিত বিষয়বিগ্রহ অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের মিলন-সেবাই জীবাত্ম-স্বরূপের নিত্যধর্ম্ম। এই শিক্ষা শ্রীচৈতন্যদেবই বিশেষরূপে জানাইয়াছেন। এই চিল্লীলামিথুন-মিলনের দূতীস্বরূপ কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগ উপস্থিত! ইহা আমাদের নিত্যধর্ম্মযাজনের পক্ষে বড়ই অনুকূল—সুবর্ণ সুযোগ!! এই সুযোগ যখন তখন উপস্থিত হয় না,—উপস্থিত হইলেও রূপানুগগণের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য ব্যতীত এই সুযোগের উপযোগিতা বা মূল্য উপলব্ধ হয় না।

আজ বহু বৎসর পরে কুরুক্ষেত্রে এইরূপ বিরহান্তক সূর্যোপররাগ উপস্থিত হইয়াছে। সর্ব্বসম্প্রদায়ের লোক স্ব-স্ব অধিকারোচিত নিষ্ঠানুসারে ধর্ম্মযাজনেচ্ছু হইয়া কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেছেন। শুনা যাইতেছে, এই সূর্য্যোপরাগ উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে প্রায় ১৫ লক্ষ লোকের সমাগম হইবে। আগামী ২৬শে কার্ত্তিক ১২ই নভেম্বর সোমবার অমাবস্যাতিথিতে সূর্য্যগ্রহণ উপস্থিত হইলেও দ্বাদশ দিবস পূর্ব্ব হইতে কুরুক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুভক্ত ও যাত্রীর সম্মেলন হইবে।

কুরুক্ষেত্রে রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ ও সরকার বাহাদুর যাত্রিগণের সুবিধার জন্য লক্ষ লক্ষ মুদ্রা নিয়োগ করিয়াছেন। পথ ঘাট-নির্ম্মাণ, কূপ-সরোবর সংস্কার, নলকূপ-স্থাপন এবং যাত্রিগণের স্বাস্থ্যরক্ষা ও সাধারণ শান্তিরক্ষার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বিত হইতেছে। শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ কুরুক্ষেত্রস্থ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ ও শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভার পাত্ররাজ শ্রীস্বরূপ রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে দ্বারকা হইতে শ্রীকৃষ্ণকে আনয়নের জন্য সুরম্য রথ, হস্তী, অশ্ব, পতাকা, পুষ্পতোরণ প্রভৃতি উপকরণ এবং শ্রীবৃন্দাবন হইতে আশ্রয়জাতীয় গোপ-গোপীগণকে আনয়নপূর্ব্বক ব্রজেন্দ্রনন্দনের সহিত মিলন করাইবার জন্য নানাবিধ আয়োজন করিতেছেন। স্বরূপ-রূপানুগবর ভাবসেবায় রাধাগোবিন্দের এই মিলন-কার্য্যের জন্য অনুক্ষণ অখিল-চেষ্টা-বিশিষ্ট থাকিলেও সাধারণের মঙ্গলের জন্য কুরুক্ষেত্রে শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠে বিষয়-বিগ্রহ এবং আশ্রয়- বিগ্রহগণের অর্চ্চাবতার-রূপে প্রকাশিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন যাবতীয় সম্ভোগবাদে আমরা প্রমত্ত। আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার জড় সম্ভোগবাদের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া আমাদিগকে নিত্যস্বরূপধর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগে বিপ্রলম্ভরস আবিষ্কৃত হইয়াছিল, কিন্তু অযোগ্য অধিকারিগণের সেই সর্ব্বোচ্চ কৃষ্ণসেবাপরাকাষ্ঠায় প্রবেশাধিকার না থাকায় সর্ব্বসাধারণ তাহা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। মহাভাবস্বরূপিণী বার্ষভানবীর ভাব-বিভাবিত কলিযুগাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর অযোগ্য জীবের যোগ্যতা সম্পাদনপূর্ব্বক সেই অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভরস বিতরণ করিয়াছিলেন। কলির প্রাবল্যে সদ্ভক্তিমার্গ কণ্টককোটিরুদ্ধ হইলে সেই গৌরপ্রদত্ত বিপ্রলম্ভরস কৃষ্ণেতর

বস্তুসমূহের অনুসন্ধানে ও অভাবে প্রযুক্ত হইয়া বিকৃতরূপ ধারণ করিল। সেই বিকৃত অবস্থা হইতে অবিকৃত স্বরূপাবস্থায় উদ্বুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে বিপ্রলম্ভরস-পরিপোষ্টা স্বরূপ-রূপানুগবর গৌরজনবর জড়সম্ভোগবাদী বিশ্ব- মানবকে কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগরূপ উদ্দীপন-বিভাবে উদ্দীপ্ত হইবার জন্য আহ্বান করিতেছেন।

হে বিশ্বমানব, তোমরা আচার্য্যের এই আহ্বানে কর্ণপাত কর। আর কতকাল জড়-সম্ভোগরসে প্রমত্ত হইয়া স্বরূপধর্ম্ম ভুলিয়া থাকিবে? কতই ত' দেখিলে! —অনাদি অনন্ত কালের যুগযুগান্তরের ইতিহাস—উপলব্ধি—প্রত্যক্ষ— অভিজ্ঞান ত' প্রতিমুহূর্ত্তে ঘোষণা করিয়াছে ও করিতেছে যে, জড় সম্ভোগে আনন্দ নাই, শান্তি নাই—অমৃত নাই, সেখানে নিরানন্দ, অশান্তি, মৃত্যু! যদি অখণ্ড আনন্দ চাও—শাশ্বতী শান্তি চাও—অতিমর্ত্ত্য অমৃত চাও, তাহা হইলে কুরুক্ষেত্রে চল—গৌড়ীয়সম্রাটের সঙ্গে চল—গৌরজন-সঙ্গে গৌর-পাদপদ্মাঙ্ক- পূত ক্ষেত্রে—গোপীচরণ রজোরঞ্জিত তীর্থে চল। দেখিবে,—তোমাদের অন্যাভিলাষ বিদূরিত হইবে—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-কামনা তুচ্ছ হইবে—পুণ্যকামনা, পাপ-বাসনা নির্ম্মূলিত হইবে—মোক্ষবাসনা, নির্ভেদজ্ঞানানুসন্ধানস্পৃহা নরকা-নিয়ত হইবে—বিশ্ব পূর্ণসুখায়িত দেখিবে। তখন বুঝিতে পারিবে,—সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুসন্ধান অর্থাৎ—আশ্রয়জাতীয়গণের সহিত অদ্বয়জ্ঞান বিষয়বিগ্রহের মিলন-প্রচেষ্টাই যাবতীয় ধর্ম্ম-অর্থ-কামের তাৎপর্য্য। অধিরূঢ় মহাভাবে আশ্রয় বিগ্রহগণের বিষয়বিগ্রহাভিমান—"বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি, আপনাকে কৃষ্ণজ্ঞান" আশ্রয়ের সেবার সর্ব্বোত্তমাবস্থায় বিষয়াভিমানেও সেব্য-সেবক-ভাবের নিত্য অস্তিত্বই কৃষ্ণানুসন্ধানের পরাকাষ্ঠা; নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান বা অহংগ্রহোপাসনা তাহারই বিকৃত বিফল-আত্মবিঘাতক চেষ্টা—আশ্রয় ও বিষয়ের সেবার গাঢ়তার নামই সাযুজ্য, ঈশ্বরসাযুজ্য তাহারই বিকৃত ধিক্কৃত চেষ্টা—ইহা বুঝিতে পারিবে। অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা-ফলে বিকৃতজ্ঞান, অসম্যক্ জ্ঞান ও আংশিক জ্ঞানের তারতম্য উপলব্ধি হইলে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা বা চিজ্জড়সমন্বয়বাদে অত্যাগ্রহ থাকিবে না, তখন ঐক্যতানের মহামাধুরী মহাচিৎসমন্বয়ের বিপুল সৌন্দর্য্য তোমাদিগের স্বরূপসত্তাকে আনন্দিত করিয়া তুলিবে।

শ্রীগৌরাবির্ভাবস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থলী শ্রীধাম-বৃন্দাবনস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের বার্ষিক সংকীর্ত্তন-মহোৎসবের পূর্ব্বেই এ বৎসর শ্রীকুরুক্ষেত্রস্থ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠের মহামহোৎসব আরম্ভ হইবে। আগামী নভেম্বর মাসের প্রারম্ভ হইতে ১৫ই নভেম্বর পর্য্যন্ত কুরুক্ষেত্রে শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠের মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। তৎপরেই শ্রীবৃন্দাবনের উৎসব আরম্ভ হইবে। কারণ, বৃন্দাবনীয় আশ্রয়বিগ্রহগণ বিপ্রলম্ভ-বিদগ্ধ হইয়া কুরুক্ষেত্র হইতে শ্রীকৃষ্ণকে মুরলীর পঞ্চামতান-নিনাদিত বৃন্দাবিপিনের নিভৃত নিকুঞ্জে আনয়ন করিয়া রাধার সহিত মিলন করাইবেন।

নিষ্কপট রূপানুগগণের আনুগত্যে রাধাকৃষ্ণের এই মিলন-সেবা সমগ্র জীবকুলের একমাত্র নিত্য ধর্ম্ম। সুতরাং এই সেবায় যোগদান করিবার জন্য বিশ্ব-বৈষ্ণব রাজসভার সভ্যমণ্ডলী বিশ্বমানবকে আহ্বান করিতেছেন। বিশ্বমানব! এই আহ্বানে সাড়া দিউন!
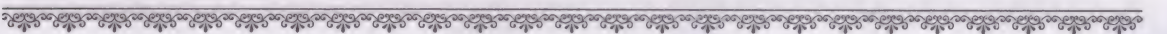
বৈষ্ণবের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ

যাহার দ্বারা বস্তু লক্ষিত হয়, তাহার নাম লক্ষণ। সেই লক্ষণ দুই প্রকার—স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ। যে লক্ষণ সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বাবস্থায় বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহাই বস্তুর স্বরূপ লক্ষণ। যে লক্ষণ অবস্থাবিশেষে বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহার নাম তটস্থ লক্ষণ। যেমন সকল বস্তুর দুই প্রকার লক্ষণ আছে, সেইরূপ বৈষ্ণবের ও দুইপ্রকার লক্ষণ। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুখে এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন,—

"সর্ব্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণব শরীরে।।"

"কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন।।
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত ষড়্গুণ।।
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী।।"

উক্ত ছাব্বিশটী লক্ষণ দ্বারা বৈষ্ণব লক্ষিত হন। উক্ত গুণগণ মধ্যে কৃষ্ণৈকশরণতা গুণটী বৈষ্ণবের স্বরূপ লক্ষণ। অপর গুণগুলি তটস্থ লক্ষণ। শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাপত্তিই স্বরূপ লক্ষণ হইল কেন, তাঁহার একটু বিচার করা আবশ্যক। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ।।
সূর্য্যাংশ-কিরণ যেন অগ্নিজ্বালাচয়।।"

স্বরূপতঃ জীব চিদ্‌বস্তু এবং সূর্য্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অংশকিরণস্বরূপ। অতএব সূর্য্যকিরণ যেরূপ সূর্য্যমণ্ডলবহির্গত হইয়া স্বরূপহীন হয়, জীবও সেইরূপ কৃষ্ণকিরণ মণ্ডল বহির্গত হইয়া বিগত-স্বরূপ হইয়া পড়েন। এই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ।।"

কৃষ্ণের নিত্য-দাস্যই জীবের স্বরূপ ধর্ম্ম। তাহা কখনই জীবকে পরিত্যাগ করে না; কেবল মায়াবদ্ধ অবস্থায় উহা বিলুপ্ত-প্রায় হইয়া থাকে। উপযুক্ত সময় হইলে পুনরায় প্রকাশিত হয়। সুবর্ণ যেরূপ রাসায়নিক বিকৃত অবস্থায় জ্যোতিঃশূন্য হইয়া থাকে এবং রাসায়নিক বিয়োগ দ্বারা পুনরায় উহার ঐ ধর্ম্ম উদিত হয়, জীবের ধর্ম্মও সেইরূপ বিলুপ্ত-প্রায় থাকিয়া অবস্থাক্রমে পুনরুদিত হয়।

জীবের মায়াবদ্ধ অবস্থায় যেরূপ স্বরূপধর্ম্ম অনুদিত প্রায় থাকে, সেইরূপ কতকগুলি মায়িকধর্ম্ম জীবকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। মায়িক, ষড়্‌বিকার, ষড়রিপু, ভোগ-পিপাসা প্রভৃতি তখন জীবের সঙ্গী হইয়া পড়ে। জীব যখন মায়া ত্যাগের একমাত্র উপায় সাধুসঙ্গ আশ্রয় করে, তখনই তাহার স্বরূপধর্ম্ম পুনরুদিত হইতে আরম্ভ হয়। সেই ধর্ম্মের যত আলোচনা করিতে থাকে, ততই তাহার উন্নতি ও ক্রমশঃ পূর্ণতা প্রাপ্তি হয়। যথা—

"কৃষ্ণভক্তি জন্ম মূল হয় সাধুসঙ্গ।"

যে সময়ে সাধুসঙ্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণচরণ শরণাপত্তির আলোচনা হইতে থাকে, সেই সময়ে মায়িক গুণবিনাশী পূর্ব্বোক্ত পঁচিশ প্রকার তটস্থগুণ বৈষ্ণব-শরীরে অবশ্য উদয় হইবে। ঐ সমস্ত গুণ ক্রমশঃ মায়িক গুণ সমূহকে বিনষ্ট করিয়া বৈষ্ণবের স্বরূপধর্ম্ম-সমুদ্রে উর্ম্মির ন্যায় বিলীন হইয়া পড়ে।

ভক্তি-উন্মুখ জীব স্বভাবতঃ সর্ব্বজীবে কৃপাবিশিষ্ট; তিনি কাহারও প্রতি দ্রোহ করেন না। সত্য-তত্ত্বকে একমাত্র সার বলিয়া জানেন। সকল জীবকে সমদৃষ্টি করেন। স্বয়ং নির্দ্দোষ, যথাশক্তি বদান্য। তিনি ধীর, পবিত্র ও দৈন্যবুদ্ধি- সম্পন্ন। তিনি সকল জীবের যথাসাধ্য উপকার করিয়া থাকেন। তিনি ইন্দ্রিয়সুখ হইতে শান্তি লাভ করেন। নিজের ভুক্তি-মুক্তি-কামনাশূন্য এবং জীবনযাত্রা নির্ব্বাহাতিরিক্ত উদ্যম-রহিত। তিনি স্থিরবুদ্ধি। তিনি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মৎসরতাকে জয় করিয়া থাকেন। ভক্তি আলোচনার অবিরোধী ভোগমাত্র স্বীকার করেন। তিনি অত্যন্ত নিদ্রা, আলস্য ও মাদকসেবনাদি পরিত্যাগী। সর্ব্বজীবের প্রতি মানদ। নিজে গুণসম্পন্ন হইয়াও অভিমানশূন্য। অসার আলোচনা-রহিত। অপরাধীর প্রতি ক্ষমাবিশিষ্ট। তিনি জগদ্বন্ধু। ভগবল্লীলাদি বর্ণনে কবি। তিনি সৎকার্য্য-পটু এবং অকারণ বাক্য ব্যয় করেন না।

যেখানে যে পরিমাণে ভক্তির উদয় হইয়াছে, সেখানে সেই পরিমাণেই পঁচিশ প্রকার তটস্থগুণ অবশ্য উদয় হইবে। ভক্তি যত বৃদ্ধি হইবে, এই সকল গুণও তত বৃদ্ধি হইবে। যেস্থলে এই সকল তটস্থগুণের অত্যন্ত অভাব, সে স্থলে ভক্তিরও অত্যন্ত অনুদয় বুঝিতে হইবে। এই লক্ষণই বৈষ্ণব তারতম্যের একমাত্র পরিচয়।

মন্ত্র-সংস্কার

একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন অন্যতম। পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পরিচালকরূপে মনকে জানা যায়। এই মনের ক্রিয়াকে "মনন" বা "চিন্তন" বলে। জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ স্থূল অথবা সূক্ষ্মভাবে এই বহির্জগতের যাহা গ্রহণ করে, উহার অধিকারি-সূত্রে মনের বৃত্তি। বহির্জগৎকালের অধীনে পরিবর্ত্তন-যোগ্য। অসংযত মন কালে-কালে পরিবর্ত্তন স্বীকার করিতে বাধ্য। যে-কালে মন সংযত হয়, সেইকালে তাহার পরিবর্ত্তন-সম্ভাবনা থাকে না। বাহ্য জগতের বিচারে বহির্দ্দর্শন-রহিত হইলে মনের নির্ব্বিশিষ্টভাব কল্পিত হয়। অনেকে উহাকে 'আত্মা' বলিয়া ভ্রান্ত হন।
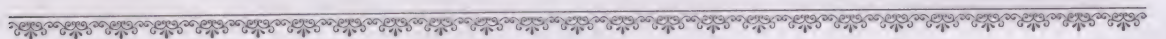
যে বিধান মননধর্ম্ম হইতে বহির্জগতের চিন্তা-স্রোতকে সংযত করিতে সমর্থ, তাহাকেই 'মন্ত্র' বলা হয়। নির্ব্বিশেষবাদীর বিচারে অসম্প্রসারিত-নামরূপ প্রণবের উচ্চারণ প্রভাবে মন সংযত হয়; তজ্জন্য ওঁকারই 'আকরমন্ত্র' নামে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন। এই ওঁকার হইতে কীর্ত্তনমুখে সব্যাহৃতি গায়ত্রী উদ্ভুত হন। গায়ত্রী মন্ত্রবিশেষ হইলেও মন্ত্রের সাধনপ্রণালীতে ইহা অপরিহার্য্য বিষয়। গায়ত্রীর কীর্ত্তন দ্বারা মননধর্ম্মের হস্ত হইতে পরিত্রাণ ঘটে। এই জন্য মন্ত্রের আনুষঙ্গিক বিধিরূপে গায়ত্রীর প্রকাশ। গায়ত্রী—শক্তি; নামাত্মক-মন্ত্র—শক্তিমান্। যাঁহারা শক্তি ও শক্তিমানের অদ্বয়ত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য বিচার-রাজ্যে উহার ঐক্যতা-সাধনে তৎপর না হইয়া পরস্পর ভেদ স্বীকার করেন, তাঁহাদের অদ্বয়জ্ঞান-বিষয়ে জ্ঞানলাভে বিড়ম্বনা উপস্থিত হয়। সুতরাং মন্ত্র ও গায়ত্রীর বৈশিষ্ট্যের বিলোপ-সাধন কর্ত্তব্য নহে। নির্ব্বিশেষবাদী বলেন,—মননধর্ম্ম স্তব্ধ হইলে মন্তব্য, মনন ও মন্তা 'এক' হইয়া যায়। বস্তুতঃ উহাদের অস্তিত্ব নিরাকৃত হয় না। সবিশেষ বিচারপর অদ্বয়জ্ঞানী বলেন,—ঐরূপ বিচারের সঙ্গতি নাই। যদি বস্তুতে নিত্য-বৈশিষ্ট্য না থাকে, তাহা হইলে বৈচিত্র্যের অর্থাৎ উপলব্ধির বিষয়, উপলব্ধিকারক ও উপলব্ধি এই ত্রিবিধ ব্যাপারের অধিষ্ঠান থাকিত না। প্রাপঞ্চিক জগতে বৈশিষ্ট্য-জন্য যে অবরতা উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, তাহা পরিহার করিবার নিমিত্ত যত্ন করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হইলেও, বাস্তবধর্ম্মে বিচিত্রতা নাই—এইরূপ উক্তি বস্তু বিজ্ঞানে একদেশদর্শিতা-মাত্র।

মন্ত্র—দ্বিবিধ। নির্ব্বিশেষবাদিগণের মন্ত্রের উদ্দেশ্য—চেতনের বৃত্তি সম্পূর্ণরূপে সংযত করিয়া স্তব্ধ করা; আর সবিশেষ বিচারপরায়ণের চিদ্বৈশিষ্ট্যের উপলব্ধি থাকায় চিদচিৎ এর সমন্বয় প্রয়াস তাঁহাদের অতি অকিঞ্চিৎকর। যাঁহারা চিদচিদ্বৈশিষ্ট্য স্বীকার করেন না, তাঁহারা সাধারণতঃ 'মায়াবাদী' বলিয়া কথিত হন। সুতরাং মায়াবাদীর চিদ্বৈশিষ্ট্যের অনঙ্গীকারে যে কল্পিত মত, উহা তত্ত্ববিদ্গণের লোভনীয় পদবী নহে। ত্রিতাপক্লিষ্ট অষ্টপাশবদ্ধ জীবানুভূতির জড়ত্বপ্রাপ্তি তত্ত্ববিদ্গণের বিচারে প্রয়োজনীয় না হওয়ায় তাঁহারা মন্ত্রের বিভিন্ন অর্থ করিয়া থাকেন। সবিশেষ-বিচারে কালগত-ভেদ-জন্য নশ্বরধর্ম্মের আরোপের পরিবর্ত্তে নিত্য-বৈচিত্র্যের উপলব্ধি বাধা প্রাপ্ত হয় না।

মনোবৃত্তির পরিচালনক্রমে তত্ত্ববাদী ও মায়াবাদিগণের মধ্যে পরস্পর সিদ্ধান্তভেদ লক্ষিত হয়। যাঁহারা ভক্তিসিদ্ধান্তে নিপুণ, তাঁহাদিগের সেব্য-সেবক-ভাবের নিত্যত্ববিচার—অপরিহার্য্য; তাঁহাদিগের সেব্য-সেবক-সম্বন্ধজ্ঞান—নিত্য এবং তাঁহাদের সেব্য-সেবক-ভাব-পরিবর্দ্ধিত নবনবায়মান আনন্দ-নির্ব্বাধ। যাঁহারা মায়াবাদ অবলম্বনপূর্ব্বক মনোধর্ম্ম-পরিচালনক্রমে বহি- র্জগৎকেই সম্বল মনে করেন, তাঁহারা তুরীয়বস্তুর কোন অনুসন্ধান পান না। তুরীয়জ্ঞানে ঊনতাবশতঃ তাঁহারা ত্রৈগুণ্য-বিচারে আবদ্ধ থাকেন এবং মন্ত্র-সংস্কার দ্বারা জাতির পরিবর্ত্তন হয় না, বলেন। ভক্তিপথের পথিকগণ এরূপ বিচার-মূঢ়তা স্বীকার করিতে পারেন না। যাঁহারা ভক্তিপথে অগ্রসর হন নাই, যাঁহারা অধোক্ষজের সেবা পরিত্যাগ করিয়া ভক্ত ধ্রুব-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইবার অভিপ্রায়ে মায়াবাদের ন্যূনাধিক পদ অবলেহন করেন, তাঁহাদের বিচারে মন্ত্র-সংস্কারের নৈষ্ফল্যজ্ঞান—অপরিহার্য্য। এই নাস্তিক-সম্প্রদায় ভক্তি হইতে অতি সুদূরে অবস্থিত; যেহেতু

আত্মানাত্ম-বিবেকের অভাবে মায়াবাদী আত্মানাত্ম-বিবেকের সমন্বয় প্রার্থনা করিয়া দুর্দ্দৈববশতঃ অনাত্ম-ধর্ম্মকেই আত্মধর্ম্ম বলিয়া স্থির করায় প্রাপঞ্চিক বিবর্ত্তে পতিত।

প্রকৃতপক্ষে মননধর্ম্ম হইতে ত্রাণ করিবার বিধানকে 'মন্ত্র-সংস্কার' বলে। শাস্ত্রের সহিত বিরোধ করিবার অভিপ্রায়ে যে-সকল অপস্বার্থান্ধ ব্যক্তি শাস্ত্রের বিকৃত অর্থ করিবার জন্য ব্যস্ত, তাঁহাদের নির্ব্বিশিষ্ট রুচি-নিবন্ধন সবিশিষ্ট ভগবদ্ভক্ত সম্প্রদায়ের নিকট হইতে দূরে অবস্থানহেতু তাঁহাদের কুসাম্প্রদায়িকতা বাস্তবিকই অষ্টপাশবদ্ধ-জীবের জুগুপ্সা-রতির বিষয়-মাত্র। মন্ত্রসংস্কার-প্রভাবেই জাতি পরিবর্ত্তন—শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট বিষয়।

'জন্'-ধাতু ভাবে 'ক্তি' প্রত্যয় করিয়া 'জাতি'-শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ভাগবীয় মনুসংহিতায় আমরা দেখিতে পাই যে, জীবের জন্ম তিনপ্রকার। সেই ত্রিবিধ জন্মের দ্বারা তিনপ্রকারে জাতি নির্ণীত হয়। মনু-স্মৃতি-বিরোধী অপ-স্বার্থপর সম্প্রদায় যে একদেশদর্শিতা লইয়া 'জাতি' নির্ণয় করেন, তাহা স্থূলশরীর-সম্পর্কিত। মনু বলেন,—জীবের ত্রিবিধজন্মে শৌক্রজাতি, সাবিত্র জাতি ও দৈক্ষজাতির অবস্থান আছে। ত্রিবিধ উৎপত্তি মূলে জাতিত্রয়ে বর্ণ অবস্থান করে। বর্ণব্যাপারটী দর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। যাঁহারা অন্ধ নহেন, তাঁহাদের দৃষ্টিশক্তি থাকায় তাঁহারা অপরের পথপ্রদর্শনমুখে বস্তুবিজ্ঞান ও বস্তুবিজ্ঞানের পথে শিক্ষণীয় ব্যাপারে সহায়তা করিয়া সেবা করিতে পারেন। কিন্তু যেখানে সেবা করিবার প্রবৃত্তি অপস্বার্থপরতার অনুরোধে বিকৃত, সেস্থলে আমরা সত্যাশ্রয়ের পরিবর্ত্তে অত্যাচারিত হইবার ফল লাভ করি। কুপাণ্ডিত্য, দুরাভিজাত্য প্রভৃতি কতকগুলি অপস্বার্থ আসিয়া নির্দ্দোষ-দৃষ্টিসম্পন্ন চিন্ময়জীবকে অচিৎস্বার্থের প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া মূর্খতা ও ব্যভিচার পোষণ করায়। তখন সে লোক-প্রতারণকল্পে বিচারহীন সাধারণ জনকে কুপথে লইয়া গিয়া পরমার্থ হইতে বঞ্চিত করে। যাহারা মনের ধর্ম্মে পরিচালিত, তাহাদের যে চাঞ্চল্য নাই—একথা বিদ্বৎসমাজ স্বীকার করেন না।

বিচারক-সম্প্রদায় সকলেই বহির্জ্জগতের উপলব্ধি সংগ্রহ করিয়া অবস্থান করেন; সুতরাং তাঁহাদের রুচিভেদে বিচার ও সিদ্ধান্তভেদ অপরিহার্য্য। অপ-স্বার্থান্ধ হইলে মানব বহু অপকার্য্যের আবাহন করে; এমন কি পারমার্থিকের পরিচ্ছদেও বিবিধ দুষ্কর্ম্মের আবাহন করিয়া ফেলে। নীতি রাজ্যের কঠিন বিধি অতিক্রম করিয়া Khlystism চালাইবার যত্ন করে। আমরা এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণের রুচির অনাদর করিয়া তাহাদের গন্তব্যস্থানে যাইতে বাধা দিতে না পারিলেও তাহাদের গন্তব্যস্থান কখনও বরণীয় সপ্তব্যাহৃতি-লোকের অন্তর্গত নহে। অপকর্ম্মচেষ্টা কখনই ভগবৎকৃপা-লাভে যোগ্যতা প্রদান করে না। Utilitarian দিগের বিচারপ্রণালী তাঁহাদিগের শাস্ত্রের অনুকূল হইতে পারে, কিন্তু সেই শাস্ত্র সার্ব্বজনীন নহে; কু-সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধমাত্র। উহা বেদ ও বেদানুগ-শাস্ত্রের বিরোধী বিচার। যাঁহারা মনোধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া মনঃকল্পিত বিচারের পরিবর্ত্তন ঘটে না বলেন, তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে কদর্য্যস্বভাব প্রবেশ করিয়াছে, বুঝিতে হইবে।

শৌক্রজাতি, সাবিত্রজাতি ও দৈক্ষজাতি—সংস্কারোত্থ। শৌক্রজন্মে পিতামাতার স্থূলশরীরের আবশ্যকতা আছে। সাবিত্রজন্মে আচার্য্য ও গায়ত্রীর অবস্থান এবং দৈক্ষজন্মে শ্রীগুরুদেব ও মন্ত্রের অবস্থানের আবশ্যকতা আছে। কাশীর স্মার্ত্তসম্মেলন অনভিজ্ঞ-সমাজের ভ্রমোৎপাদনের জন্য 'জাতি' শব্দের প্রয়োগ করিয়া উহার ভাবান্তর গ্রহণপূর্ব্বক যে কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা জনসমক্ষে প্রকাশ করিয়া দিবার ক্ষমতার বিচারক-সম্প্রদায়ের অভাব নাই। তবে অপস্বার্থপর জনগণ কৌশল করিয়া যে, অনভিজ্ঞজনমত-সংগ্রহবাসনায় চাতুরী প্রকাশ করেন, তাহার মূল্য অন্ধকপর্দ্দকমাত্র। কোন ব্যক্তিবিশেষ চক্ষে ধূলি দিলে সূর্য্য ও সূর্য্যালোকের অস্তিত্বের কিছু বিলুপ্তি হয় না। কতকগুলি লোককে অন্ধকারে আবদ্ধ করিলেও যে সূর্য্যের প্রকাশধর্ম্মের অভাব সাধিত হয়, তাহা নহে; বঞ্চিত হইবার যোগ্য ব্যক্তিগণই ভাগ্যহীনতা-বশতঃ ঐ শ্রেণীর অপস্বার্থপর উপদেশক-সম্প্রদায়ের গলাবাজীর উপর নির্ভর করেন; পরন্তু ফল- প্রাপ্তিকালে আবার উহাদিগকেই চতুর্দ্দশ পুরুষান্ত করিয়া প্রতিশোধ কামনা করেন। স্বার্থের প্রেরণায় অন্যার্থ-গ্রহণে প্রয়াস—'স্তেয়'নামক অধর্ম্মের অন্তর্গত। পণ্ডিতকুল সর্ব্বদাই উদারনীতির বশবর্ত্তী হওয়ায় শাস্ত্রার্থকে কখনই যুক্তিহীনতায় পরিণত করেন না। যেস্থলে সেইরূপ অপস্বার্থ প্রবল, তথায় মানবজাতির বিচার ক্ষমতার উচ্চতা লক্ষিত হয় না, তৎকালে নীচস্বভাব সম্পন্ন জনগণের সঙ্কীর্ণতা ও অপস্বার্থ-পোষণই শাস্ত্রার্থরূপে প্রতিভাত হয়। যেস্থলে শাস্ত্রানুশীলনের নামে অপস্বার্থ বলবান্, তথায় সরস্বতীদেবীর অভীষ্ট অর্থ গুপ্ত ও আবৃত। দুর্গন্ধিপঙ্ককে সুরভি বলিয়া চালাইতে গেলে এরূপ চালক সম্প্রদায়কে বেদানুগ বিদ্বৎসমাজ আদর করেন না। মনঃকল্পিত কৃত্রিম দেবমূর্ত্তিকে 'ভগবান্' বলিয়া কল্পনা করিলে তাহা অনর্থযুক্ত জীবের মনঃকল্পিত 'পুতুল'-মাত্র হইয়া পড়ে। তাদৃশী যুপকাষ্ঠবদ্ধ বধ্য পশুতুল্য-জ্ঞানে বেদার্থের পরিবর্ত্তনচেষ্টার কখনই আদর করা যাইতে পারে না।

যাঁহারা বলেন,—জড়ীয় শুক্র ও শোনিতের সম্মেলনে জীবসর্গ, তাদৃশ আধ্যক্ষিকগণের বিচারপ্রণালী কখনই 'বেদানুগ' বলা যাইতে পারে না; উহা লৌকিকযুক্তি-তাড়িত দুর্ব্বলের বলাভিমান-মাত্র। বাদরায়ণ-সূত্রের "উৎপত্ত্য- সম্ভবাৎ" অধিকরণে এই শ্রেণীর পাণ্ডিত্যের অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে। মনঃকল্পিত বিচারের অপরিবর্ত্তনের নিত্যত্ব যদি স্বীকৃত হইত, তাহা হইলে 'আত্মা'-শব্দের পরিভাষা শ্রুতি হইতে পূর্ব্বেই অপসারিত হইয়া যাইত।

শতছিদ্রা চালুনী একছিদ্রা সূচীকে যদি বলে,—'তোমাতে যে ঐ একটী ছিদ্র আছে?' সূচীও তৎক্ষণাৎ জবাব দিবে,—'তোমারও ত' তেমন শত ছিদ্র আছে?' কুপাণ্ডিত্যের ছলনায় অনভিজ্ঞ-সম্প্রদায় অভিজ্ঞ জনকেও কৈতবে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত যে জনমত সংগ্রহ করেন, তাহার মূল্য নীতিশাস্ত্রবিশারদ চাণক্য পূর্ব্বেই প্রচার করিয়াছেন। যে কাল-পর্য্যন্ত অপস্বার্থান্ধ অনভিজ্ঞ জনগণ আপনাদিগকে পণ্ডিতম্মন্য-জ্ঞানে সভায় গলাবাজী করেন না, সে পর্য্যন্তই তাঁহারা মানবোচিত ভুষণে ভূষিত বলিয়া পরিগৃহীত হন। নতুবা তাঁহাদের স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া লোক-লোচনে দণ্ডিত হইবার যোগ্যতা লাভ করায়।

স্থূলজন্ম, সূক্ষ্মজন্ম ও আত্মাবির্ভাব—এই ত্রিবিধ জন্মের কথা শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে। ভাগবত শাস্ত্র—সৎসাম্প্রদায়িক, উহাতে নাস্তিকগণের মতসমূহের দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া অপস্বার্থপর, জড়বিষয় প্রমত্ত বিবাদ- প্রিয় জনগণ যদি ঐ শাস্ত্রের আদর না করেন, পরন্তু বিরোধ করেন, তাহা হইলে আমরা বলিব যে, তাঁহাদের অধিকার ত্রিগুণের দ্বারা আবদ্ধ মাত্র। নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিলে তাঁহারাও একদিন ভাগবত সম্প্রদায়ের বিচার- প্রণালীর অনুসরণ করিতে পারিবেন। অনর্থময় সমাজের অনর্থ পোষণকল্পে যে-সকল আধিকারিক শাস্ত্রজগতে প্রচলিত আছে, সেই সকল শাস্ত্রের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বি-জ্ঞানে সমবিচারে বিরোধ করা ভাগবতগণের কখনই অভিপ্রেত নহে। তাই বলিয়া ভগবদ্‌বিরোধ-মূলে যে-সকল প্রথা জগতে জঞ্জাল আনয়ন করিয়াছে, তাহার অপসারণ-কার্য্যে ঔদাসীন্যও তাঁহাদিগের প্রতি দয়ার পরিচয় নহে। পরম-করুণ ভাগবতগণকে অনভিজ্ঞসম্প্রদায় সমন্বয়বাদের বিরোধী জানিয়া তাঁহাদের সৎসাম্প্রদায়িকতায় দোষারোপণ-পূর্ব্বক দোষযুক্ত সঙ্কীর্ণ অনভিজ্ঞ সাম্প্রদায়িক কুযোগিগণ নিজ-স্বার্থসিদ্ধি হইয়া গেল বলিয়া যে কক্ষা-বাদ্যে প্রমত্ত হন, তাহা বালোচিত অদূরদর্শিতার পরিণামবিশেষ জ্ঞানে ভাগবতগণ হাস্য করিয়া থাকেন।

প্রাকৃত জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। জন্ম—প্রকৃতির অন্তর্গত ব্যাপার-বিশেষ। তাহা পরিবর্ত্তনশীল নহে,—একথা যুক্তি বিরোধী ও অবৈদিক। তাদৃশ বেদ-বিরুদ্ধ- মত ভারতের রাজ্যে উদ্ভূত হইয়াছে কি কারণে, তাহার আলোচনা আবশ্যক; যেহেতু কর্ম্মবাদিগণের বিচারে,—পাপপুণ্যের কর্ত্তা পাপপুণ্যের ফল ভোগ করেন এবং জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিতে হইলে এই পাপ-পুণ্য সংগ্রহের প্রশ্রয় দেওয়া হয়; তজ্জন্য স্থূলজন্মান্তরবাদ স্বীকার-যোগ্য নহে। কার্য্যের কর্ত্তা যদি অপকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তিনি অনেক সময় চিন্তা করিতে পারেন,—'জন্মান্তরে উহা পূরণ করাইয়া দিব।' তজ্জন্য বর্ত্তমান জন্মে পাপাদি সাধিত হইলে পরজন্মে উহার শোধন বা অভাব-পূরণের সম্ভাবনা থাকায় ইহজন্মে পরদ্রব্যাপহরণ, পরদারাপহরণ প্রভৃতি স্ব-স্বার্থপোষণই পরমোপাদেয় বলিয়া গৃহীত হইতে পারে; এজন্য জন্মান্তর-বাদ-স্বীকার কর্ত্তব্য নহে। আর পারমার্থিক বিচারে,—দীক্ষা-বিধানে যে মন্ত্র-সংস্কারের ব্যবস্থা আছে, সেই সংস্কার-প্রভাবে জীবের নৈসর্গিক পাপচেষ্টা অন্তর্হিত হয়। সুতরাং ভারতের প্রদেশস্থ মনীষিগণের জন্মান্তরবাদ-রাহিত্য প্রস্তাবটীর সহিত অসামঞ্জস্য হয় না। যাঁহারা ভগবানের সহিত সম্বন্ধ-রহিত হইয়া আত্মপ্রতীক স্বরূপে অবস্থান করেন না, তাঁহাদের জন্ম-জন্মান্তর-লাভের দুর্ব্বাসনা হৃদয়ে জাগরূক থাকায় ভগবদ্ভক্তের ইহজন্মে সর্ব্বোত্তমতা হইতে পারে—একথা স্বীকার করেন না এবং বহুজন্ম-জন্মান্তর অধমতায় ডুবিয়া যাইবার সম্ভাবনা-নিবৃত্তির উপায়স্বরূপ ভগবৎ-সম্বন্ধের পুনরুদ্দীপন-প্রভাবে তাঁহারা ঐরূপ অমূলক ধারণা হইতে পুনরুত্থিত হইবার রুচি প্রদর্শন করেন।

অনভিজ্ঞ কর্ম্মবাদিগণের জন্য যে বৈতানিক আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিসমূহ ও কঠিন বিধি লিপিবদ্ধ আছে, উহা ন্যূনাধিক তাঁহাদের নিম্নাধিকারেরই উপযোগী। কিন্তু তাদৃশ নিম্নাধিকারের প্রতিপ্রসব-বিধি দ্বারা পূর্ব্ববিধি রহিত হয় নাই—এরূপ নহে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, অপ্রাপ্ত-বয়স্ক বালক- বালিকাগণকে

শৈশবকালে দাম্পত্যঘটিত বিচারপ্রণালীতে অধিকার দেওয়া হয় না, তাই বলিয়া তাহাদের বয়ঃপ্রাপ্তিকালেও দাম্পত্যাধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতে হইবে—এরূপ নহে। কোনও একটা উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া যদি কোন তথা-কথিত সমাজপতি কোন কথার প্রবর্ত্তন করেন এবং তাহা 'পরিবর্ত্তন-যোগ্য নহে' বলিয়া কিছুকালের জন্য অনভিজ্ঞ জনগণকে 'ভোগা' দেন, তাহা হইলে অভিজ্ঞতাই তাঁহাকে বলিয়া দিবে যে, তাৎকালিক মূল্য ব্যতীত তাঁহার তাদৃশ বিচারের জার্ম্মেণ-মার্কের (জার্ম্মাণ-দেশীয় মুদ্রা-বিশেষের) ন্যায় স্থায়ী মূল্য হইতে পারে না।

স্থূলশরীরগত জন্ম মন্ত্র-সংস্কারের দ্বারাই পরিবর্ত্তিত হয়। চীনদেশে সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধনের জন্য লৌহনির্ম্মিত কঠিন পাদুকা-ব্যবহারের প্রথা আছে। দাক্ষিণাত্যে কর্ণবিদ্ধ ছিদ্রের প্রচুর পরিসর-নির্ম্মাণের ব্যবস্থা ছিল। কোন সম্প্রদায়ে 'সুন্নৎ'প্রথা প্রচলিত আছে। সুতরাং সংস্কার প্রভাবেই অসংস্কৃত অবস্থা হইতে সংস্কারজনিত জাতিভেদ লক্ষিত হয়। যদি মানবজাতির স্থূল পরিচয়ে ভেদজন্য বা স্বভাবগত ভেদজন্য গুণকর্ম্মবিভাগ প্রবর্ত্তিত না হইত, তাহা হইলে মানবজাতির মধ্যে জাতিপ্রথার কথা স্থান পাইত না। 'একক্ষুর' ও 'দ্বিক্ষুর'-ভেদে যে-প্রকার জাতি ভেদ, 'খেচর' ও 'ভূচর'-ভেদে যে-প্রকার জাতিভেদ, তাহা দীক্ষা প্রভাবে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায় না। কিন্তু সাবিত্রজন্ম ও দৈক্ষজন্ম-ভেদে যে 'জাতিভেদ'-শব্দের প্রয়োগ, তাহা দীক্ষা-প্রভাবে পরিবর্ত্তিত হয় না,—যাঁহারা বলেন, তাঁহারা শাস্ত্র-দর্শনে অন্ধ বলিলে সত্যের অপলাপ ঘটিবে না। মূর্খ অনভিজ্ঞ-সম্প্রদায়ের মুখে সর্ব্বদাই শোনা যায় যে, অভিজ্ঞ পণ্ডিত-সম্প্রদায়ও সঙ্কীর্ণ-সাম্প্রদায়িকতায় অবস্থিত। এইসকল তাড়না হইতে বিমুক্ত হইবার অভিলাষে যদি পারমার্থিক-সম্প্রদায় অনভিজ্ঞ জনগণের মতবাদের অনুমোদনার্থ অভিসন্ধিমূলে স্বীয় অভিপ্রায় জানাইয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই পরমার্থ অভিমানী সম্প্রদায় পরমার্থ হইতে বিপথগামী হইয়াছেন, জানিতে হইবে। ব্যক্তিবিশেষের পরমার্থ অচ্যুত-সম্প্রদায়ের বিচার হইতে ভ্রষ্ট হইলে সেই ব্যক্তিই পতিত হইয়া পড়েন। চ্যুতসর্গ অচ্যুত-সম্প্রদায়ের সহিত বৈষম্য স্থাপন করিয়া নিত্যকাল অবস্থিত অর্থাৎ দেব-বিচার ও আসুর-বিচার—পরস্পর ভিন্ন। কোনকালে দেবগণের বিজয়, কখনও বা অসুরগণের প্রতিপত্তি। অসুরকুলে দেবোৎপত্তি এবং দেবকুলে অসুরোৎপত্তির দৃষ্টান্তেও ঐতিহ্যাদি পরিপূর্ণ। আসুর-বিচারের সহিত দৈব-বিচার একমত নহে। দৈবজাতি-বিচার ও অদৈব জাতি-বিচারে সম্পূর্ণ মতভেদ আছে। অদৈবজাতি-বিচার—অনভিজ্ঞ-জনোচিত। দৈব-বিচার-বিদ্বৎসম্মত।

সাবিত্র-সংস্কার কেবল শৌক্রবিধানে আবদ্ধ নহে,—ভারতীয় ইতিহাস-সমূহ সে-সকল কথা উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করিয়াছেন। ভাগবত-সম্প্রদায় ভাগবত-দীক্ষা- প্রভাবেই জাতির পরিবর্ত্তন স্বীকার করেন এবং শৈব দীক্ষায় জাতির পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা নাই, তাহাও দেখাইয়াছেন। এক্ষণে যদি শৈবগণ অথবা শাক্তেয়-মতবাদিগণ বিচারবশে ভাগবত দীক্ষার প্রতিদ্বন্দ্বী হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে বিষ্ণু বিদ্বেষী অদৈব-সম্প্রদায়ভুক্ত জানিয়া তাঁহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করাই ভাগবতধর্ম্মে-দীক্ষিত জনগণের সময়োচিত কার্য্য। ভাগবত-দীক্ষায় দীক্ষিত-ব্রুবগণের মন্ত্র-সংস্কারের অভিনয়-দ্বারা মঙ্গল হয় নাই এবং তাঁহারা যে তিমিরে ছিলেন, সেই তিমিরেই আছেন—এই কথা বলিবার ধৃষ্টতা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহারা যে স্ব-স্ব দুর্ব্বলতা প্রকাশ

করিয়া আসিতেছেন, তাহা তাঁহাদেরই উপযোগী। তাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে পারমার্থিক দীক্ষিত হন নাই, জানিতে হইবে। দীক্ষা-গ্রহণের পূর্ব্বে তাঁহাদিগের যে জাতি ছিল, দীক্ষা-গ্রহণের পরবর্ত্তিকালেও যদি উহা পরিবর্ত্তিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা লাভ ঘটে নাই, জানিতে হইবে। ফলের দ্বারাই ফল কারণের অনুমান—ন্যায়সিদ্ধ। শৌক্রজাতিতে অবস্থান সাবিত্রসংস্কার দ্বারা অপসারিত হয়। সাবিত্র-সংস্কার কেবলমাত্র শৌক্রত্ব-সংস্থাপনের সমর্থক মন্ত্রবিশেষ,—এই কথা আমরা কোন শাস্ত্রেই পাই না, তবে অনভিজ্ঞজনের জন্য যে-সকল বিধি প্রবর্ত্তিত আছে, কালে-কালে তাদৃশ বিধি-শাস্ত্রে অতিরিক্ত অপব্যবহার প্রবিষ্ট হইবে বলিয়া যে নিষেধ-বিধি উল্লিখিত আছে, তাহার সঙ্গে-সঙ্গেই তৎপ্রতিষেধক বিধির বিচারও অনুল্লিখিতই নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, "গৃহদ্বারে প্রবেশ নিষেধ" শব্দ অঙ্কিত থাকিলেও যাঁহাদিগের গৃহ, তাঁহাদিগেরও প্রবেশ যে উহাতে নিষিদ্ধ হইয়াছে—এরূপ বিচারাঙ্গীকার সঙ্গত নহে। অপস্বার্থমূলে আপনাদিগেরই পাতিত্য লক্ষ্য করিয়া তাদৃশ পাণ্ডিত্যসংরক্ষণকল্পে যদি কেহ পরের মুখাপেক্ষা করিয়া অনভিজ্ঞতার অনুমোদন করেন, তাহা হইলে তাঁহার ব্যক্তিগত অব্যক্ত অভিসন্ধি অচিরেই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। "সত্যমেব জয়তে নানৃতম্।"

জীব-সেবা ও জীবে-দয়া

"জীব-সেবা" ও "জীবে-দয়া"—এই বিষয় দুইটীর পার্থক্য বোধ হয় অনেকেই তলাইয়া দেখেন না। অধিকাংশ স্থলেই "জীব-সেবা" ও "জীবে-দয়া" —এই বিষয়-দ্বয়ের বৈশিষ্ট্য-বিচারের অভাবে আমরা এক করিতে আর এক করিয়া বসি—'শিব' গড়িতে 'বানর' গড়িয়া থাকি। জগতে অনেকে "মনীষী", "উদারচেতা", "পরোপকারী", "সমাজবন্ধু", "বিশ্ববন্ধু" নামে পরিচিত হইবার বাসনা করেন, কিন্তু বস্তু-বিচারের অভাবে তাঁহাদের যাবতীয় কার্য্য পণ্ডশ্রম মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। জগতের লোক যেরূপ আত্মদৈহিক সর্ব্বস্ববাদিত্বে মগ্ন, তাহাতে যদি কোন ব্যক্তিতে বিন্দুমাত্রও অপরের সেবা-প্রবৃত্তির চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে উহাই পরম-প্রশংসার বিষয় হইয়া থাকে। 'পর-সেবা' জিনিষটী উত্তম, কিন্তু পরসেবা না হইয়া যদি "পর-ছলনা" হইয়া পড়ে, তাহা কখনও প্রশংসনীয় হইতে পারে না। "ছলনা"র উপর "সেবা"র 'লেবেল' ও 'ট্রেডমার্ক' লাগাইয়া বাজারে কোনপ্রকারে চালাইতে পারিলেই যে তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে "সেবা"-শব্দ-বাচ্য হইবে, তাহা বিংশ-শতাব্দীর বিচারপরায়ণ সভ্য মানব- সমাজ কি একবার বিচার করিয়া দেখিবেন না?

"পরসেবা", "পর-উপকার" প্রভৃতি কথার "পর"-শব্দে "শ্রেষ্ঠ" বা "পরাত্মা বিষ্ণু" লক্ষিত হইলে পরাত্মার সেবা বা শ্রেষ্ঠের সেবাই জ্ঞাপিত হয়। জীব "পর" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হইলেও অনর্থযুক্তাবস্থায় ত্রিগুণে আবদ্ধ—

"যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে।।" (ভাঃ ১।৪।৫)

শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদ সর্ব্বজ্ঞসূক্তে বলেন,—

"স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ।।"

জীব অবিদ্যা-দ্বারা সমাবৃত, সুতরাং সংক্লেশসমূহের আকর। ত্রিগুণাত্মক মায়ার দ্বারা আবৃত ও বিক্ষিপ্ত সংক্লেশ নিকরাকর জীবের সেবা—অনর্থাবৃত অবস্থারই সেবা অর্থাৎ ভোগ-মাত্র। "সেবা"-শব্দের সহিত কএকটী বিষয় অবিচ্ছিন্নরূপে সংশ্লিষ্ট। প্রথমতঃ "সেবা" বলিতে আদৌ ইহাই বিবেচ্য যে, যে-বস্তুর প্রতি সেবা প্রযুক্ত হইবে, সেই বস্তুবিশেষ "সেব্য" বা "প্রভু"-তত্ত্ব কি না; দ্বিতীয়তঃ "সেবা" বলিতে সেব্যের অনুকূল সুখসাধন; তৃতীয়তঃ সেবকের অধিষ্ঠান।

ত্রিগুণাত্মক, সংক্লেশনিকরাকর জীব কি প্রভুতত্ত্ব? অনর্থযুক্তের সুখসাধন কি মঙ্গল প্রদায়ক? আর সুখসাধনকারী সেবকেরই বা ঐরূপ কার্য্যে কি লাভ? এ তিনটী প্রশ্নের নিরপেক্ষ উত্তর দিতে হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, "জীব-সেবা" বলিয়া কোন কথাই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। জীব কখনও প্রভুতত্ত্ব নহেন—"মায়াধীশ মায়াবশ, ঈশ্বরে জীবে ভেদ।" মায়াবশের সেবায় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-তর্পণে সেব্যাভিমানী, সেবকাভিমানী ও সেবাভিমান, কোনটিরই সার্থকতা নাই। লম্পট, দস্যু, জুয়াচোর, গাধা, ঘোড়া, বৃক্ষলতা প্রভৃতির সেবা-কল্পনা—মায়াবশ-জীবের ভোগমাত্র। সেইসকল বস্তু সেব্য বা প্রভুতত্ত্ব নহেন; মায়াবশ লম্পটকে পরস্ত্রী, দস্যুকে পরের অর্থাদি যোগাইতে পারিলে তাহাদের সুখসাধনরূপ সেবা বা 'ভোগ' হয় বটে, অর্থাৎ সেরূপ ভোগে দস্যু-লম্পটাদির প্রীতি হইলেও তাহাদের চিরকালের অকল্যাণ এবং তৎসঙ্গে অন্যান্য জীবের পীড়ন অনিবার্য্য। সুতরাং মায়াবশ জীবের সেবা বা ভোগ যতই মনোরম পোষাকে সুসজ্জিত থাকুক না কেন, তাহাতে জীবপীড়নই হইয়া থাকে। একটী মায়াবশ জীবের ইন্দ্রিয় তর্পণ করিতে গিয়া সেই জীববিশেষের অকল্যাণ এবং তৎসঙ্গে- সঙ্গে বহুজীবের পীড়ন হয়।

'জীব-সেবা' কথাটী সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, জীবের বদ্ধত্ববিচারে "জীবে দয়া" সম্ভব, এবং তাঁহার মুক্তত্ব-বিচারে "বৈষ্ণব-সেবা" সম্ভব। অনর্থযুক্ত বদ্ধাবস্থার প্রীতিসাধন প্রকৃতপক্ষে 'সেবা' শব্দবাচ্য হইতে পারে না; তাহার প্রতি 'দয়া' করাই কর্ত্তব্য। আবার মুক্তপুরুষের প্রতিও 'দয়া' শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না, তাঁহার 'সেবা' করাই কর্ত্তব্য। "জীব-সেবা" কথাটী যুক্তিযুক্ত হয় না, পরন্তু "শিব-সেবা", "গুরু-সেবা" বা "বৈষ্ণব-সেবা" কথাটীই যুক্তিযুক্ত। গুরু বৈষ্ণবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা সেবাই কর্ত্তব্য,—মুক্তকুলের সেবা ও বদ্ধকুলের প্রতি দয়াই জীবের শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম।

মায়াবদ্ধ জীব 'প্রভু' বা 'সেব্যতত্ত্ব' নহেন,—বিচার শ্রবণ করিয়া অনেকে কপটতাক্রমে জীবকে সেব্যতত্ত্বরূপে সজ্জিত করিবার জন্য বা বাউল-মতের সহিত ন্যূনাধিক মিত্রতা-স্থাপনপূর্ব্বক জীবকে 'নারায়ণ' বলিবার প্রয়াস করেন। জীব নারায়ণ, দরিদ্র-নারায়ণ, অশ্ব-নারায়ণ, মৃগ-নারায়ণ, মনুষ্য-নারায়ণ প্রভৃতি

নাম প্রদান করিয়া ঐসকল বাউল মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ জীবের মায়াবদ্ধতাকেই মায়াধীশ-নারায়ণত্ব মনে করেন, এবং দেহ ও মন—এই জড়বস্তুদ্বয়ের তোষণকেই 'নারায়ণ-সেবা' বলিয়া প্রচার করেন। দরিদ্র-নারায়ণ, মনুষ্য-নারায়ণ, মৃগ-নারায়ণ-শব্দগুলি—সোনার পাথরবাটীর ন্যায় অযৌক্তিক ও অবৈধ। জীবে 'নারায়ণ' বা 'ঈশ্বর' নাম সংযোগ করিলেই তিনি প্রভুতত্ত্ব হইতে পারেন না, বরং তাহাতে পাষণ্ডতাই হয়—

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্।।"

মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"যেই মূঢ় কহে, 'জীব' ঈশ্বর' হয় সম।
সেই ত' পাষণ্ডী হয়, দণ্ডে তারে যম।।"

দরিদ্রত্ব নারায়ণত্ব নহে, তাহা নারায়ণত্বের অভাব। মৃগত্ব বা মনুষ্যত্ব মায়াধীশত্ব নহে; তাহা মায়াবশ্যতা। দরিদ্রের অন্তর্যামী, পশুর অন্তর্যামী মানবের অন্তর্যামি সূত্রে নারায়ণের নিত্য অধিষ্ঠান আছে। কিন্তু দরিদ্রত্ব, পশুত্ব বা মানবত্বের প্রতীতিতে নারায়ণত্ব নাই। দরিদ্রত্ব, পশুত্ব ও মানবত্বরূপ মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তির বিক্রম দূরীভূত হইলেই অন্তর্যামী নারায়ণের বাস্তবসত্তা ও তদংশভূত শুদ্ধজীবাত্মাস্বরূপ পরিদৃষ্ট হয়। 'গুরু' বা বৈষ্ণব' নারায়ণের বহিরঙ্গা-শক্তির বিক্রমে অভিভূত নহেন বলিয়া তিনি মুক্ত, শুদ্ধ, নিত্য; তাঁহার নিত্য-সেবাই আমাদের নিত্য কর্ত্তব্য। তিনি সাধারণ জীব-শব্দ বাচ্য নহেন। যতক্ষণ বদ্ধজীব-দর্শন, ততক্ষণ তাঁহার প্রতি দয়াই কর্ত্তব্য, আর মুক্তদর্শনে সেবাই কর্ত্তব্য। মহাভাগবতের গো-অশ্ব-খর-চণ্ডালে সর্ব্বত্র সম বা বৈষ্ণব-দর্শন, তিনি সকলকেই 'বৈষ্ণব' জানিয়া সেবা করিতে ব্যস্ত। তাঁহার দর্শন মায়াবাদী বা বাউলের 'দরিদ্র-নারায়ণ', 'মনুষ্য-নারায়ণ', 'মৃগ-নারায়ণ'-প্রভৃতির ন্যায় জড়ে চিদারোপ বা কল্পনামাত্র নহে। তিনি জীবাত্মাকে নারায়ণ কল্পনা করিয়া মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপাত্মক-বিক্রম পরিণত ব্যাপারের অনিত্য সেবা করেন না। তাঁহার সেব্য—নিত্য, সেবা—নিত্য এবং সেবকাভিমানও নিত্য।

যাঁহারা "জীব-সেবা" বলিয়া চিৎকার করেন, যাঁহারা দরিদ্র-নারায়ণ, মনুষ্য-নারায়ণ, মৃগ-নারায়ণের সেবা কল্পনা করিয়া দুনিয়ার অনভিজ্ঞ-সম্প্রদায়ের নিকট মহা-পরোপকারী, ধর্ম্মবীর বা কর্ম্মবীর বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহেন,—তাঁহাদের বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড় কতদূর, তাহা একটুকু তলাইয়া দেখিলেই বিচারক সম্প্রদায় ধরিয়া ফেলিতে পারেন। কিন্তু বিচার পরায়ণ মানব-সমষ্টির মনীষাকেও গতানুগতিক-ন্যায় এরূপ নিস্তেজ করিয়া দেয় যে, তাঁহারাও ঐসকল সাধারণ বিচারে ভ্রান্ত হইয়া পড়েন।

শ্রীভাগবতধর্ম্ম জীব-সেবার কথা বলেন নাই; ভাগবতের বাণী—"শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের 'সেবা' কর এবং বদ্ধ জীবে 'দয়া' কর।" ভাগবত ভরতরাজার আদর্শের দ্বারা জানাইয়াছেন যে, মহর্ষি ভরত মৃগ-জীবের বদ্ধতার সেবা করিতে গিয়া আত্মমঙ্গল ও পরমঙ্গলের পথে অন্তরায় আনয়ন করিবার শিক্ষা প্রচার করিয়াছিলেন। ভাগবত ঐরূপ জীব-সেবা নিরাস করিয়া মধ্যম ও উত্তম ভাগবতের বিচার জানাইয়াছেন,—

"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ।।"

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মনেষ ভাগবতোত্তমঃ।।"

"স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে স্থাবর-জঙ্গমের মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র স্ফূরয়ে তাঁর ইষ্টদেব-মূর্ত্তি।।"

মধ্যমাধিকারী উত্তমাধিকারী বৈষ্ণবের 'সেবা' করিবেন, তাঁহার সুখ-সাধনার্থ 'শুশ্রূষা' করিবেন, বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয় তর্পণ করিতে যাইবেন না, তাহাতে নিজের বা পরের কাহারও নিত্য উপকার বা মঙ্গল হইবে না। অতএব আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত আত্মার নিত্য বৃত্তি যে সেবা, উহার একমাত্র পাত্র—শ্রীহরি, গুরু ও বৈষ্ণব অর্থাৎ মুক্ত, শুদ্ধ বৈকুণ্ঠ ভগবৎস্বরূপ ও তদ্রূপবৈভব; 'জীব' বা 'প্রধান' নহে। আর স্বরূপ বিস্মৃতি-জন্য বা দেহাত্মবুদ্ধি-নিবন্ধন দেহ ও মনের দ্বারা যে 'সেবা', উহা জড়েন্দ্রিয় তর্পণমূলক ভোগেরই নামান্তর; উহার পাত্র—ভগবান্ বা তদ্রূপবৈভবে বিমুখ বদ্ধজীব এবং 'প্রধান'; শুদ্ধচেতন বৈকুণ্ঠ বস্তু নহেন। তাদৃশ কৃষ্ণবিমুখ জীবগণকে কৃষ্ণোন্মুখীকরণই তাহাদের প্রতি পরম 'দয়া'।

পাঠক! এই পরম সত্যটী আমাদের অবহিতচিত্তে শুনিয়া রাখা কর্ত্তব্য। 'জীব-সেবা' কথাটী হইতে পারে না অর্থাৎ জীবের চিদিন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি অচিদাবৃত-চেতনের সুখ বা ভোগ-সাধনে কখনই নিয়োজ্যা নহে, পরন্তু নিখিল চিদচিদ্‌বস্তুর ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর সেবা-সুখ-সাধনেই উহাদের সর্ব্বক্ষণ নিয়োগ করিতে হইবে—ইহাই একমাত্র সত্য কথা। "জীবে দয়া" আর "বৈষ্ণব-সেবা" কথাই যুক্তিযুক্ত ও পরমমঙ্গলদায়ক। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই "জীবে দয়া" ও "বৈষ্ণব- সেবায়" আদর্শ দেখাইয়াছেন। ভগবৎ কথা-কীর্ত্তনেই অনন্তবদ্ধ জীবের প্রতি অমন্দোদয়া দয়া হয় এবং কীর্ত্তনকারী বৈষ্ণবগণের সর্ব্বতোভাবে আনুকূল্য বা সেবা বিধান করিলেই আমাদের আত্মার বৃত্তি পরিস্ফুট হইয়া থাকে। মহাপ্রভু স্বয়ং গ্রামে গ্রামে ভগবৎকথা প্রচার ও তাঁহার ভক্তগণকে প্রচারকরূপে সংস্থাপন করিয়া জীবের প্রতি অমন্দোদয়া দয়ার আদর্শ দেখাইয়াছেন। আবার অনুক্ষণ কীর্ত্তনপরায়ণ বৈষ্ণবগণের সেবার আদর্শও শিক্ষা দিয়াছেন। আমরা শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাপ্রভুর শিক্ষা উল্লঙ্ঘন করিয়া আধুনিক মনোধর্ম্মোত্থ মতবাদে প্রমত্ত হইয়া যেন ভগবৎসেবা হইতে বঞ্চিত না হই, —ইহাই সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে। জীব-সেবার লম্বা-চৌড়া বক্তৃতা শুনিয়া যেন মায়াবাদী, বাউল, প্রাকৃত-সহজিয়া, চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী হইয়া উৎপথগামী না হইয়া পড়ি। "জীবে দয়া" ও "বৈষ্ণব- সেবাই" আমাদের আদর্শ হউক,—'জীবে-দয়া', 'নামে-রুচি', 'বৈষ্ণব-সেবন'—ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র হউক।

কৃপা কি চাই?

আমি বঞ্চিত হইয়া মনে করি, আমি সাধু গুরুর কৃপার প্রার্থী; সাধু গুরুর কাছে কপটতা করিয়া বলিয়া থাকি,—"আমাকে কৃপা করুন্", "আমাকে রক্ষা করুন্", "আমাকে শান্তি প্রদান করুন্।" কিন্তু আমি কি সত্য সত্যই কৃপা চাই, সুরক্ষিত হইতে চাই, শাশ্বতী শান্তি চাই?

আমি মনে করি, আমি সত্য সত্যই কৃপা চাই, আমার দিকে আমি ষোল আনা ঠিক আছি; কিন্তু গুরু-বৈষ্ণব ভগবানের কৃপা বিতরণের শক্তির অভাব। আমি আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি ত', গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ কৃপা দিলে আমি কি সত্য সত্য গ্রহণ করিব?

সাধু-গুরুর কাছে কৃতাঞ্জলির অভিনয় করিয়া কৃপা-যাচ্ঞা করি, কোন সময় বৈষ্ণবগণকে বলিয়া থাকি, —আপনাদের কৃপা হইলেই সব হয়, আপনারা কৃপা করুন। প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য গুরুদেবের কাণে পৌছায়—এরূপ কৌশলে বলিয়া থাকি,—"গুরোঃ কৃপা হি কেবলম্"। সাধু-গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া কখনও বলি,—কই, আমার উপর ত' আপনাদের কৃপা হইতেছে না; কিন্তু সত্য সত্যই কি আমি কৃপা লইতে প্রস্তুত? সত্য সত্যই কি আমি কৃপা চাই, রক্ষা চাই, নিত্যানন্দ চাই?

বঞ্চক মন এ কথার উত্তর দিতে পারে না। অমুক্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গে যতদিন থাকি, ততদিন এ কথার উত্তর পাই না, কোন কালেই পাইতে পারিব না। মনে করি, আমি কৃপা চাই—মনে করি আমি ভক্ত হইতে চাই; কিন্তু চাই আর কিছু। ভগবান্ সেই কপটতা ধরাইয়া দেন, আমার কাছে বিপদ আপদ আনিয়া প্রমাণিত করিয়া দেন, সত্য সত্যই আমি তাঁহাকে চাই কি না—গুরু-বৈষ্ণবের সেবা কৃপা চাই কি না? বিপদ আপদগুলি সব ভগবানের কৃপা—ইহা বিপদ-আপদে পতিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মুখে বলি, কিন্তু কার্য্যকালে পরম কৃপা হইতে দূরে সরিয়া আপাত-দৃষ্টিতে সম্পদ্, পরিণামে মহাবিপদের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাই।

মুক্তগণের সঙ্গে আমি কিন্তু বুঝিতে পারিতেছি যে, গুরুদেবের কৃপা-কাদম্বিনী অবিশ্রান্ত-ধারায় বর্ষিত হইবার জন্য আমার মস্তকোপরি অনুকূল বায়ুর সহিত লম্বমান রহিয়াছে—যাহাকে আমি প্রতিকূল বায়ু মনে করিতেছি, তাহাও বস্তুতঃ পরম অনুকূলরূপেই ঐ গুরু-কৃপা-কাদম্বিনীকে আমার উপর বর্ষিত করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু আমি কি ঐ সঞ্জীবনী-ধারা চাই? না, ঐ কৃপা ধারা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য অন্ধকূপ, বিষয় প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ ও নানাপ্রকার ইতর চেষ্টার ওয়াটার প্রুফ (water proof) গায়ে জড়াইয়া থাকি? আমি নিত্যানন্দ-পদ-ছত্রের আশ্রয় আদৌ চাই না। যখন কিঞ্চিৎও সেবোন্মুখ থাকি, তখন কিন্তু প্রত্যক্ষ বুঝিতে পারি—নিয়ত অনুভব করিতে পারি, আমার উপর গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা—গুরু-বৈষ্ণবের প্রসাদ-দৃষ্টি এত প্রচুর, এত তীক্ষ্ণ যে, উহার এক কণা গ্রহণ করিতে পারিলেও আমি এত বড় হইতে পারি যে, দুনিয়ার সমস্ত ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ কাম্য পদার্থগুলিও তখন আমাকে লোভ ধরাইতে পারে না।

আমি কৃপা-সুধা-সঞ্জীবনী-ধারা হইতে পলাইয়া ভীষণ আমি-জ্বালাময় অন্ধকূপে—আবদ্ধ লৌহ-পিঞ্জরে লুকাইয়া থাকিতে চাহিলে সেখানেও অগ্নি- নির্ব্বাপণকারী গুরু-কৃপা প্রস্রবণ-দ্রুতগতিতে দমকলের ন্যায়

উপস্থিত হইয়া আমাকে রক্ষা করিতে চান; কিন্তু আমি কি তখনও ঐ জ্বালাময় অগ্নিপিঞ্জরের দুয়ারটী খুলিয়া দিতে চাই? না, তালার উপর তালা প্রদান করিয়া নিজের ইচ্ছায় নিজে আগুনে পুড়িয়া মরিতে চাই? সাধু গুরু ঐ তালা ভাঙ্গিয়া কৃপাপ্রসাদ দিতে উদ্যত হইলেও আমি শতমুখে তাহার বাধা দিয়া থাকি।

এমন এক গোলোকের দূত—এমন এক সর্ব্বাশ্রয়—এমন এক কৃপাঘন—এমন এক জগদ্গুরুর বাণী শুনিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি, যিনি আমাকে এই মুহূর্ত্তে—'মুহূর্ত্ত' বলিলেও যেন অনেক পরিমাণ কালের কথা বলা হইয়া যায়, সদ্য সদ্য মহাধন যাহা যুগ-যুগান্তরব্যাপী কঠোর তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মাদি দেবতাও পান নাই, অধিক কি, গৌরহরিও সহজে তাহা প্রদান করিলেও অনেকে তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছে, সেই সুদুর্ল্লভনিধি অ-মায়ায় দিতে প্রস্তুত। যিনি আমাকে এই মুহূর্ত্তে এত বড় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিতে প্রস্তুত—অনন্ত জীবনের জন্য এত বড় সম্পত্তি হাতে হাতে দিতে প্রস্তুত, অসংখ্য ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান জন্মের মাতা, পিতা, বন্ধু, বান্ধব তাহার কোট্যংশের এক অংশও কোন দিন দিতে পারেন না, পারিবেন না, পারিতেছেন না—পারিতে পারেন না। যিনি আমাকে এই মুহূর্ত্তে কৃষ্ণপাদ-পদ্ম-পরশমণির নিত্য অধিকারী করিতে প্রস্তুত— যিনি আমাকে এই মূহূর্ত্তে 'মহাভাগবত' করিতে প্রস্তুত, আমি কি সত্য সত্যই সেই ধনের অধিকারী হইতে চাই?—সেই পরশমণি চাই?—মহাভাগবত হইতে চাই?

মুখে বলি আমি চাই, সখ করিয়া কখনও কখনও চাই; কিন্তু আমার কৃপা চাওয়া সেই উপকথার বুড়ীর মত। এক বুড়ী রোজ বনে কাঠ আহরণ করিতে যাইত, সংসারের জ্বালায় সে আটভাজা হইয়া গিয়াছিল, তাহাকে দেখিবার আর কেহ ছিল না; নিজে নিজেই অত্যন্ত কষ্টে-সৃষ্টে উদরাগ্নির ইন্ধন সংগ্রহ করিত। এইরূপ কষ্টে কাতর হইয়া প্রত্যহই বলিত,—যম সকলকে কৃপা করে, আর আমাকে দেখিতে পায় না। বুড়ী একদিন বনের মধ্যে অনেক কাঠ সংগ্রহ করিয়া মাথায় উঠাইয়াছে, এমন সময় যম দেবতা আসিয়া উপস্থিত; যম বুড়ীকে ডাকিয়া বলিলেন,—তুমি রোজ আমাকে ডাক, আমার কৃপা চাও, আমার দৃষ্টি তোমার প্রতি নাই বলিয়া তুমি কত ওলাহন দাও, আজ তোমাকে আমি লইতে আসিয়াছি। বুড়ী তখন মাথার উপর কাঠের বোঝা উঠাইয়াছে। যম সত্য-সত্যই আসিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া ত' বুড়ি অবাক! যমকে দেখিয়া বুড়ী বলিতে লাগিল,—যম, তুমি সত্য সত্যই আসিয়া পড়িবে, আর সদ্য সদ্যই কৃপা দিবে জানিলে আমি কিছুতেই তোমাকে ডাকিতাম না—তোমার কৃপা চাহিতাম না। জগতের জ্বালা পোড়া সহ্য করিতে না পারিয়া একটা মুখের কথা বলিতে হয় বলিয়াছি, এইরূপ ত' সকলেই বলিয়া থাকে। তুমি ফিরিয়া যাও, আমি আরও বাঁচিয়া থাকিতে চাই। তখন যম বলিলেন,—তুমি যখন আমার কৃপা চাইয়াছ, তখন আর তোমাকে ছাড়াছাড়ি নাই, আমাকে ডাকিলে কেন? তখন বুড়ী বেগতিক দেখিয়া বলিল,—আচ্ছা, আমি আগে আমার হাতের কাজটুকু সারিয়া লই, আমার খড়ো ঘরে এই কুড়াণো কাঠগুলি রাখিয়া আসি, মরিতে হয়, না হয় তার পরে মরিব।

আমাদের কৃপা চাওয়াও ঐ বুড়ীরই মত। সংসারের তাপে জ্বলিয়া-পুড়িয়া সময় সময় মুখে বলিয়া থাকি, 'আমি কৃপা চাই, কৃপা চাই'; কিন্তু কৃপা-বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিলে নিকটে অট্টালিকা না থাকে,

ছাতা না থাকে, অন্ততঃ পশু-পক্ষীর বিবরে যাইয়াও কৃপা-বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিতে পশ্চাৎপদ হই না। কৃপা স্বয়ং আসিলে তখন ঐ বুড়ীরই মত কৃপাকে এড়াইবার চেষ্টা করি—কৃপা নাছোড়বান্দা হইলে ঐ বুড়ীরই মত বলিয়া থাকি, অন্ততঃ ভোগের ইন্ধনের আহৃত বোঝাটী ভাঙ্গা-কুটীরে রাখিয়া আসি।

আমরা কি স্বেচ্ছায় কখনও সত্য সত্য কৃপা চাই?—কখনই না। পেয়াদার গলা ধাক্কা না পাওয়া পর্য্যন্ত মুখেও কৃপাটুকু চাই না, সর্ব্বদা পাশ কাটাইয়া চলি, পাছে পেয়াদার সঙ্গে দেখা হয়—গলাধাক্কার চোটে কৃপা চাহিতে হয়। সংসারে আমাদের জীবনে যে সকল বিপাক আসে, সেইগুলিই পেয়াদার গলাধাক্কা। সেইগুলি আমাদিগকে কৃপা-প্রার্থনা শিক্ষা দিবার জন্য উপস্থিত হইয়া থাকে; কারণ পশু-নীতি ছাড়া আমার ন্যায় অশান্ত ব্যক্তিকে কিছুতেই কৃপার প্রার্থী করান' যায় না। পেয়াদার গলা ধাক্কারূপ সাংসারিক অভাব-অসুবিধা, বিপদ-আপদে জর্জ্জরিত না হইলে—দুর্ভিক্ষ, বন্যা বেকার-সমস্যা, ব্যবসায়ে অর্থনাশ প্রভৃতি জগতে অসংখ্য প্রকারের ত্রিতাপরূপ পেয়াদার গলা ধাক্কাগুলি না থাকিলে আমার মত মদমত্ত জানোয়ার কোন দিনই অনুগত হইত না—স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ছাড়িত না—বড়'র কাছে শরণাগত হইবার মূল্য বুঝিত না। কিন্তু এই পেয়াদার গলাধাক্কাগুলিকে কি আমরা কৃপা মনে করি? না আমাদের উপর অন্যায় অবিচার মনে করি? যদি প্রকৃত কৃপা চাহিতাম, তবে ত' ঐগুলিকে ভগবানের পরম অনুকম্পা জানিয়া ভগবানেই শরণাগত হইতাম। তাই বলিতেছিলাম, আমি কি কৃপা চাই?

আমার কৃপা চাওয়া কপটতা। আমার গুরুদেব আমাকে অনেকবার জানাইয়াছেন। তাঁহারই শ্রীমুখে শুনিয়াছি,—একবার ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর গোস্বামী মহারাজের নিকট বঙ্গদেশের কোন এক প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী কাতরভাবে পুনঃ পুনঃ কৃপাযাজ্ঞা করায় শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু সেই মহারাজকে তাঁহার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি গোমস্তাগণের হস্তে অর্পণ করিয়া তাঁহার (শ্রীগৌর- কিশোরের) সমীপে নবদ্বীপের গঙ্গাতীরে একটী পৃথক্ ছৈএর ভিতর বাস করিতে বলিয়াছিলেন এবং আরও বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনেরও কোন চিন্তা করিতে হইবে না, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুই ভিক্ষা করিয়া তণ্ডুলাদি সংগ্রহ করিয়া দিবেন। তিনি কেবল নিশ্চিন্তমনে হরি ভজন করিবেন। বৈষ্ণব ঠাকুর তাঁহাকে (রাজাকে) সদ্য সদ্য কৃপা দিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু যমদেব সাক্ষাৎ কৃপা করিতে আসিলে বুড়ীর যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল, উক্ত কৃপা প্রার্থীরও সেই অবস্থা হইল। তখন তাঁহার কৃপা চাওয়া ঘুচিয়া গেল। ঐরূপ কৃপার হস্ত হইতে কোন প্রকারে এড়াইয়া বিষয় বিবরে এবং যে সকল ভক্ত নামধারী বঞ্চক ব্যক্তি কৃপার নামে বঞ্চনায় প্রবীণ, আর তাঁহাদের ন্যায় অপরকেও অগ্নিজ্বালাময় লৌহ-পিঞ্জরে টানিয়া আনিয়া আবদ্ধ করিবার পরামর্শ দিতে পটু, সেই সকল ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের নিকটও কোন এক ব্যক্তি কৃপার জন্য পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করায় বাবাজী মহারাজ তাহাকে এক খণ্ড ছিন্ন কৌপীন দেখাইয়া বলিলেন,—'এই নাও কৃপা'। তখন কৃপাপ্রার্থী বেগতিক দেখিয়া নিজের চশমা ফেলিয়াই উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে দৌড়াইতে নৌকায় উঠিয়া পার পাইবার চেষ্টা করিলেন। সাক্ষাৎ কৃপালাভ পরিত্যাগ করিয়া আমারই ন্যায় উত্তাল-তরঙ্গায়িত ভবসাগরের তীরে সমূহ-বিপদের নৌকার নবীন যাত্রী হইল।

আমার কৃপা চাওয়া অর্থ—আমি যেরূপ আছি, আমার মনোধর্ম্ম আমার কাণে যে মন্ত্র দিয়াছে, সাধুর দ্বারা তাহার সমর্থন করাইয়া লইয়া নিজে সন্তুষ্ট থাকা—যে সকল কুপথ্যের প্রতি আমার রুচি, সেই কুপথ্যগুলিকে চিকিৎসকের দ্বারা সুপথ্য বলিয়া অনুমোদন করাইয়া লওয়া—আমি যে তিমিরে আছি, সেই তিমিরেই থাকিবার বা তাহা হইতেও অধিকতর তিমিরে প্রবিষ্ট হইবার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-পত্র পাইবার বাসনা। কিন্তু সদ্বৈদ্য ত' আমার রুচি অনুসারে কুপথ্য অনুমোদন করিয়া আমার হিংসা করিবেন না। তিনি যে সর্ব্বদা আমাকে কৃপা করিবার জন্য ব্যস্ত—তাঁহার প্রাণ যে আমার দুঃখে ব্যাকুল—আমার দুঃখে যে তাঁহার নিয়ত অশ্রুধারা বিগলিত হয়।

কৃপাবতার প্রভু আমার অসংখ্যবার বলিয়াছেন,—'আমি ত' এত নিষ্ঠুর হইতে পারিব না যে, আমার কৃষ্ণের ভোগের বস্তু সমূহকে আমি আমার কৃষ্ণসেবানিপুণা দৃষ্টির অন্তরালে রাখিব। কারণ, কৃষ্ণ-নৈবেদ্য দুষ্টুলোকের দৃষ্টিতে পতিত হইলে তাহা আর কৃষ্ণের ভোগে লাগিবে না। গুরুদেব যা'কে অত্যন্ত স্নেহ করেন, কৃপা করেন, তা'কেই ত' সাম্‌নে রাখেন, চোখের আড়ালে যাইতে দেখিলে তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যায়। কিন্তু উল্টো বুঝার লোক আমি, আমার প্রতি অত্যন্ত কৃপাকে—স্নেহ-প্রাচুর্য্যকে কঠোরতা, নিষ্ঠুরতা মনে করি। তাই বলিতেছিলাম, আমি কি সত্য সত্যই কৃপা চাই?

গুরুদেব বহুবার জানাইয়াছেন যে, মায়ার কবল হইতে উদ্ধার করিয়া একজনকে কৃষ্ণের ভোগের জন্য তৈয়ারী করিতে হইলে ২০০ গ্যালন চিদ্‌রক্ত ব্যয় করিতে হয়। এত ক্লেশ স্বীকার করিয়াও গুরুদেব কৃপা করিতে চান, তথাপি আমার মঙ্গল হউক্। আমার মঙ্গলের জন্য তাঁহার প্রয়াস, তাঁহার অহৈতুকী কৃপা বর্ষিত; আর আমি এত বড় হৈতুক যে, সেই কৃপাকে—সেই অজস্রধারে অনুক্ষণ বর্ষিত কৃপাবারিকে পা' দিয়া ঠেলিয়া দিবার পাষণ্ডতা ও দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করি। অকৃতজ্ঞ চামার আমি, আত্মবঞ্চক আমি, আত্মঘাতী আমি, কৃপাকে 'কৃপা' বুঝি না—বুঝিয়াও বুঝিতে চাই না।

গুরুদেব আমাকে বলিয়াছেন,—মানুষের কাপড়ে যদি হঠাৎ আগুন লাগিয়া যায়, তখন বুদ্ধিমান লোক কি করেন? তখন তিনি লোক-লজ্জা করেন না, হাতে যে কাজ করিতেছিলেন, সেই কাজগুলি করিতেও ব্যস্ত হন না; সব ফেলিয়া সর্ব্বগ্রে তাঁহার কাজ পড়িয়া যায়, আগুন হইতে নিস্তার পাওয়া। আমার কাপড়ে আগুন লাগিয়াছে, গুরুদেব কৃপাবারি লইয়া সমুপস্থিত, কিন্তু আমি কি করিতেছি? বলিতেছি,—কাপড়ের আগুন পরে নিভাইব। প্রথমে অন্যান্য কার্য্যগুলি শেষ করিয়া লই। কিন্তু আগুন কি তাহা মানিবে? আমাকে পোড়াইয়া ছারখার করিয়া দিবে। আমার প্রতি হিংসকগণ, দস্যুগণ, আমি পুড়িয়া মরি বা যাহাই হই না কেন, তাহা তাহারা দেখে না; কিন্তু আমার দুঃখে প্রকৃত দুঃখী যাঁহারা, সেই গুরু-বৈষ্ণব্যাদি স্বজনগণ আমাকে আগের কাজটা আগে করিতে বলেন; আমি কিন্তু সে কৃপা চাই না। তাই বলিতেছিলাম, আমি কি সত্য সত্যই কৃপা চাই?

অভক্ত সমাজে যুগান্তর

যাঁহারা ভগবানের সেবা করেন, তাঁহাদেরই 'ভক্ত'-সংজ্ঞা। পরমাত্মার সহিত যে আমিত্বের যোগ সাধন, তাদৃশ সাধনকারীই 'যোগী'। বাহ্যজগতের সীমা-বিশিষ্ট বস্তুগুলি দেখিয়া যাঁহারা অতৃপ্ত হইয়া পূর্ণের দিকে ধাবমান হইবার চেষ্টাবিশিষ্ট, সেই উন্নতমনা সর্ব্বোত্তমজনগণ ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়াসী হইয়া ব্রাহ্মণ-নামে অভিহিত। এই তিন শ্রেণীর সকলেই অদ্বয়জ্ঞানের সেবক হওয়ায় অজ্ঞান-গুরুর আশ্রিত অনাত্ম অবস্থায় অবস্থিত নহেন এবং তাঁহাদের নিত্য-বৃত্তি ভগবৎ-সেবা হইতে বঞ্চিত নহেন। যখনই তাঁহারা ভক্তের সহিত বিবাদ করিবার উদ্দেশে নিজ নিজ সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা-বর্দ্ধন-মানসে উদারতার ছলনা করিয়া ভগবৎ-সেবা তাৎপর্য্যরহিত হন, তখনই তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বা যোগী বলিয়া পরিচয় দিতে গেলে সঙ্কীর্ণতা বা সাম্প্রদায়িকতার অকিঞ্চিৎকর পাংশুরাশি নিজ নিজ স্বভাবকে আচ্ছাদন করে এবং তৎফলে ভগবদ্বৈমুখ্য লাভ করাইয়া যোগভ্রষ্ট ও ব্রহ্মজ্ঞতা হইতে ন্যূনাধিক পার্থক্য স্থাপন করে।

ভগবানের সেবা-পরায়ণ সুকৃতিমন্তজনগণ মর্য্যাদা-পথে সেবাবিধান করিতে গিয়া ভগবানের সহিত সার্দ্ধ দুইপ্রকার সম্বন্ধে আত্মপ্রতীতি স্থাপন করেন, মর্য্যাদা-সম্পন্ন বিচার যেখানে শ্লথ হইয়া মাধুর্য্যের স্বত্ত্বাধিকারীর সেবা ভক্তের উদ্দিষ্ট বিষয় হয়, তখন তিনি পঞ্চবিধ সেবাধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূর্ণ মধুরিমার আশ্রয় সেবা-পরাকাষ্ঠা জ্ঞানে ভগবদ্ গুণাধিক্য ঐশ্বর্য্যেও উদাসীন হইয়া ঐশ্বর্য্যবানের ঐশ্বর্য্য রহিত মাধুর্য্যের সন্ধান রাখেন। সেখানে পঞ্চবিধ সুনির্ম্মল সেবা ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি ভাবাধিক্যে মধুরিমার শৈথিল্য সম্পাদনে অসমর্থ হয়। এই সেবাই ভজনীয়বস্তু সম্বন্ধে উত্তমা সেবা বলিয়া প্রসিদ্ধ। মাধুর্য্য-বিরোধে যে প্রতিকূলতা বর্ত্তমান, তাহাতে সেবার বিপরীত বৃত্তি অবস্থান করায় উহা ভগবদনুশীলনের সর্ব্বোত্তমতার বিধায়ক নহে। এই উত্তমা সেবায় সেবা ব্যতীত অন্য কোন মিশ্রবৃত্তির অধিষ্ঠান দেখা যায় না। তজ্জন্য ইহাকে সেবকগণ সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিয়া সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করেন। যখনই সেবা-ধর্ম্মে বাহ্যমল প্রবেশ করে, তখনই সুবিমল আত্মা অনাত্মবস্তুর সহিত সংমিশ্রণে নিজাস্তিত্বের ধারণা-রক্ষণমানসে অভাব-রাজ্যে বিজাতীয় বস্তুর দ্বারা তাহার পূর্ত্তির আশা করেন। ইহাই কর্ম্মাবৃতা সেবা। যেকালে কর্ত্তা নিজের স্বরূপ-নির্দ্দেশে বঞ্চিত হইয়া বিজাতীয় ব্যাপার ঘটিত আত্মপ্রতীতিতে অবস্থিত হন, তখনই তাঁহার আত্মার নিত্য সেবা প্রবৃত্তি ন্যূনাধিক বিপন্ন হয়। যখন অবিমিশ্র আত্মা নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া জড়ভোগ জন্য অভাব-পূরণমানসে ব্যস্ত হইয়া পূর্ণতার দিকে ধাবমান হন, তখনই তিনি আত্মধর্ম্মে নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানপরতা অনুস্যূত —এইরূপ দুর্দ্দমনীয় কুমেধা পোষণ করেন। এইরূপ জ্ঞানাবরণ হইতে মুক্তি লাভ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহারা তামসী প্রকৃতি হইতে আত্মা প্রসূত এবং সেই আত্মা পুনরায় প্রসূতির গর্ভে নির্ব্বিশিষ্ট ভাব লাভ করিলে অভাবের পূর্ত্তি হইবে—এইরূপ ধারণা করেন। এই জ্ঞানমিশ্রা প্রবৃত্তি ভক্তিধর্ম্মে কোন দিনই থাকিতে পারে না। কর্ম্ম এবং জ্ঞান—এই উভয় মিশ্র ভাবই ভক্তির হন্তারক। কিন্তু তাহাও তথাকথিত যোগিগণের পরম আদরের বস্তু। আমরা বদ্ধ জীবের বিভিন্ন রুচিবিকার আলোচনা করিয়া তাহাতে মজিয়া যাইতে কাহাকেও পরামর্শ

দিতে পারি না। তত্তদ্ অনর্থে পরিপূর্ণ সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকগণ নিজ নিজ অমঙ্গলের মধ্যে বাসকেই শ্রেয়ো জ্ঞান করেন, কিন্তু উহা মনোধর্ম্ম প্রসূত সুতরাং অনর্থময় অনাত্ম প্রতীতিতে আবদ্ধমাত্র।

ফলভোগা কামিসম্প্রদায় অত্যাসক্তি প্রযুক্ত যোষিতের উপাসক। কর্ম্মিগণের আরাধ্য বাসনা-বিকাশিনী কামিনী তাহাদিগকে ক্রীড়নক সাজাইয়া বিভিন্নস্থানের যাত্রী করিয়া তুলে। যখন তাহারা যোষিৎসঙ্গি-সঙ্গীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের বাসনায় ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে থাকে, তখন তাহাদের সুদৃঢ় কর্ম্মালান নানাপ্রকার প্রবল আকর্ষণে তাহাদিগকে নিবৃত্তকাম হইতে নিরস্ত করে। ভগবন্মায়া স্বীয় বিক্ষেপাত্মিকা-বৃত্তির দ্বারা বদ্ধজীবকে ভগবৎসেবা বঞ্চিত করিয়া অকার্ষ্ণবৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করায় এবং তাহাকে কামদেব সাজাইয়া ক্ষুদ্রকামের দুর্ভিক্ষপ্রবণ রাজ্যে সংস্থাপন করে। যখন তাহার কর্ণ পর্য্যন্ত ভোগজলের বন্যায় প্লাবিত হইয়া যায়, তখন আর ভোগের প্রলোভনের কথা কর্ণে প্রবিষ্ট হইতে না পারিয়া তাহাকে তদ্‌বিপরীত দিকে দ্রুতগামী করে। অনিত্য ফল ভোগ-কামনায় বঞ্চিত জীব তাহার অমঙ্গল বুঝিতে পারিয়া নিত্য কাম পরিপূরণের নিমিত্ত ধাবন-কালে পথের বিভিন্ন দিক্ দেখিতে পায়। এই দুইটী দিকের অভ্যন্তরে তাহার রাজসী প্রবৃত্তি বর্ত্তমান। কখনও বা সে তামসী বৃত্তির বশে নির্ভেদব্রহ্মজ্ঞানকে কামনা হইতে অবসর লাভে উৎকৃষ্ট পরিত্রাণ ভূমিকা বলিয়া জানে, তখন সে ভক্তির গন্তব্যপথে ভজনীয় বস্তুর প্রতি অনাদর করায় তামসী প্রবৃত্তি চালিত হইয়া যে বিমলধ্রুব নির্ব্বাণ আকাঙ্ক্ষা করে সেই সাযুজ্যভাব তাহার নিত্য অস্মিতার নাশক, এই বিবেক হইতে বঞ্চিত হয়। তখন সে মনে করে যে, নিত্য অস্মিতা কখনই বিভিন্ন ব্রহ্মানুসন্ধান ব্যতীত অবস্থান করিতে পারে না। যাহাতে তাহার কোন দিনই অধিকার নাই বা হইতে পারে না,—এইরূপ ইন্দ্রাসন-সেবীর বৃত্তি গ্রহণ করিতে গিয়া তামসী প্রবৃত্তির অনুশীলনই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ বলিয়া মনন করে। তাদৃশ অনিত্য মনন-প্রবৃত্তিমূলে মায়াবাদ-ভজন হইতে উহাকে রক্ষা করিবার জন্য সাত্বতগণ যত্ন করিয়াও তাহার মঙ্গল সাধন করিতে পারেন না। পাঠক বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে, উক্ত পথের সম্পূর্ণ বিপরীত দিকেই ভক্তির নিত্যাবস্থান। সুতরাং ফলভোগী কর্ম্মী, ফলত্যাগী কথা-কথিত জ্ঞানী, উভয়ের মিশ্রণে উৎপন্ন অভক্ত যোগিসম্প্রদায় সমূহ, সকলেই অভক্ত।

'যুগ'-শব্দ কালের মূর্ত্তিবিশেষ। এই মূর্ত্তি অখণ্ড-কালের অন্তর্গত খণ্ডপ্রতীতি হইতে উৎপন্ন। মায়াবদ্ধ জীব যখন আপনাকে জড়েন্দ্রিয়ের পরিমিত বস্তুবিশেষ মনে করে, তখনই জড় পরিমিত অস্মিতা-বিবেকানন্দ অখণ্ড জড়ের মহাপাত্র হইবার জন্য অন্যাভিলাষী হয়। 'অন্যাভিলাষী' শব্দে যে অন্য-শব্দের প্রয়োগ, তাহা ভজনীয় বস্তু ব্যতীত ইতর প্রতীতির জ্ঞাপক। সেই ইতর প্রতীতিকেই শ্রীমদ্ভাগবত চতুঃশ্লোকীর দ্বিতীয় শ্লোকে পরমাত্মার মায়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মায়াবাদি-সম্প্রদায় মায়ার অধিষ্ঠানের প্রতীতিকে ভগবানের অহংপ্রতীতির সহিত সর্ব্বতোভাবে সমজ্ঞান করায় তাহারা মায়াবাদীর শিষ্যরূপে প্রচ্ছন্ন প্রকৃতিবাদী মাত্র। অনর্থযুক্ত ভোগপ্রবৃত্তিতে যে স্বরূপ ভ্রান্তিবশতঃ ভক্তির অভাব দেখা যায়, তাহাতেই জড় ভূতাকাশে জড়কালের প্রবেশ। মায়াবদ্ধ জীবের চিদাকাশ প্রতীতির অভাবে অচিদ্‌বস্তু সমূহের গর্ভবিশেষ ভূতাকাশকেই

চিদাকাশের প্রসূতি জ্ঞান হয়। কিন্তু পরব্যোমের আংশিক দর্শনহেতু মিশ্র-চেতনের আধার অচিৎপিণ্ড-ধারণা-ক্ষম ভূতাকাশ পরব্যোমকে স্থান দিতে অসমর্থ। পরব্যোম অনন্ত অচিদাকাশকে কি প্রকারে একপার্শ্বে স্থান দিতে সমর্থ, তাহা মায়াবদ্ধ জীবের প্রাকৃত ত্রিগুণান্তর্গত মাটীয়া উদরে জীর্ণ হইতে পারে না। চিদাকাশে যে চিন্ময় অখণ্ড কাল এবং চিন্ময় খণ্ডকাল যুগপৎ নবনবায়বান কৌতূহল বর্জ্জন করে, তাহা বুঝিবার শক্তি ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী জগজ্জননী প্রকৃতিতে ভগবান্ স্থাপন করেন নাই। তাই বলিয়া মহালম্বোদরীর বৃহত্ত্বে জড়বিচার দ্বারা আক্রমণ করিবার স্পৃহা ভগবদ্ভক্তের নাই। এই প্রকৃতি ভগবানের বহিরঙ্গাশক্তি প্রসূত রাজ্যের বিধাত্রী। কিন্তু এই বিধাত্রী শক্তিকে অন্তরঙ্গ পরব্যোমস্থিত গোলোকের বৈকুণ্ঠত্ববিনাশিনী শক্তি দেওয়া হয় নাই। বৈকুণ্ঠের দেশকাল পাত্রের মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের দেশ কালপাত্রের সহিত সৌসাদৃশ্য থাকিলেও বৈকুণ্ঠের বিকৃত প্রতিফলনসূত্রে মায়িক বৈচিত্র্যসমূহ অবস্থিত। মায়িক জগতের সৌসাদৃশ্য বৈকুণ্ঠ বৈচিত্র্যে নিত্যকাল পূর্ণ অদ্বয় জ্ঞানের সহিত নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে অবস্থিত। প্রাপঞ্চিক প্রতীতিতে দ্রষ্টৃবর্গের খণ্ডিত পরিচ্ছিন্ন সীমা-বিশিষ্ট ভাবসমূহের যে প্রতীতি অবস্থান করে, তাহার সাদৃশ্য গোলোকের দেশকালপাত্রে নিত্যাবস্থিত বলিয়া বৈকুণ্ঠের বিকৃত প্রতিফলনরূপে উহা প্রাপঞ্চিক জগতে বিষ্ণু শক্তির ক্রিয়া। প্রপঞ্চস্থ বিষ্ণুশক্তি বৈকুণ্ঠের বিকৃত ছায়ার উদাহরণে এই ব্রহ্মাণ্ড রচনা করেন বলিয়া এই রচিত ব্রহ্মাণ্ডের জীবের বিবর্ত্তে বৈকুণ্ঠপ্রতীতিকে জড় ভোগীর কল্পনাপ্রসূত দেশকালপাত্রাত্মক বৈচিত্র্যে নির্দ্দেশ করা সঙ্গত নহে, যেহেতু অনিত্য নিত্যেরই অংশবিশেষ, অনিত্যের অংশবিশেষে নিত্যত্ব কখনই স্থাপিত হইতে পারে না। বহু বিশেষ ধর্ম্ম সবিশেষ বস্তুতে নিত্যভাবে আহিত আছে। তাহারই পরিচ্ছিন্ন প্রতীতি বিশেষ নির্ব্বিশেষ বা অজ্ঞজন প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞন্মন্যতারই কৌশলমাত্র। চার্ব্বাকাদি নাস্তিক সম্প্রদায় যে কালের অভ্যন্তরে, দেশের অভ্যন্তরে, নিজস্বরূপ স্থাপন করিয়া দেশকালপাত্র বিচার আবাহন করেন এবং অজ্ঞেয়তা বাদী, সন্দেহ-বাদী প্রভৃতি যে সকল বৈতানিক মনোবিজ্ঞানবলে কালগত ধারণা করেন, সেই খণ্ডিতকালে তাহাদের বিচার পরিবর্ত্তিত না হওয়া পর্য্যন্ত সেই খণ্ডিত কালেই অবস্থিত। এই খণ্ডিত কালের গুণক সমূহ তাহাদিগকে বর্গ, ঘন, চতুর্থবর্গ, পঞ্চবর্গ প্রভৃতি অনন্তবর্গে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যুগান্তরে স্থান দিবে। কর্ম্মকাণ্ডীয়জনগণের নিজ নিজ ফেন-বুদ্বুদের সদৃশ ভোগ পিপাসোত্থ চেষ্টা সমূহ পরিবর্ত্তিত হইয়া যুগান্তর আনয়ন করে। কর্ম্মীর বিচারের যুগ পরিবর্ত্তিত হইয়া নৈষ্কর্ম্ম্যবিচার যুগ সেই স্থান দখল করে। নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানরত মায়াবাদী আপনাকে বিজ্ঞন্মন্য জানিয়া যে মুমুক্ষার চেষ্টাসমূহ প্রদর্শন করে, তাহাও কালাভ্যন্তরে অভ্যুদিত অজ্ঞানেরই অনুকূল অনুশীলন, কৃষ্ণানুশীলনের অনুকূল অনুশীলন নহে, সুতরাং তাহার প্রতিকূল চেষ্টামাত্র। অখণ্ড জড় জড়কালের মধ্যে খণ্ডিতকালের কোন নির্দ্দিষ্ট যুগে প্রাপঞ্চিক বিচার সংশ্লিষ্ট যোগিগণ একটু স্থান লাভ করেন, সুতরাং ব্রতিগণের যুগ, কর্ম্মিগণের যুগ, জ্ঞানিব্রুবগণের যুগ, অন্যাভিলাষিগণের যুগ পরিবর্ত্তিত হইয়া ভক্তি মহাযুগের প্রবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। ভক্তিযুগকে অভক্ত সমাজ তাহাদেরই ন্যায় খণ্ডিতকালাত্মক যুগধর্ম্মে অবস্থিত মনে করিতে পারেন, কিন্তু ভক্তিযুগ সামান্য সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ বা অন্যাভিলাষী কর্ম্মাবৃত ও জ্ঞানাবৃত মিশ্র আবৃত সাম্প্রদায়িক অভক্তগণের পরিমিত যুগ মাত্র নহে। ভক্তিযুগ নিত্য তবে

ভক্তিযুগের অভাব যেখানে বিষ্ণুমায়া কর্ত্তৃক আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা শক্তি পরিচালনে প্রাপঞ্চিক দেশকালপাত্ররূপে বিরাজমান, সেখানে ভক্তিযুগ রাহুগ্রস্ত রবি-চন্দ্রের ন্যায় অভক্তগণের হৃদাকাশে মলাবৃত মাত্র। অভক্ত বা অভক্তিমিশ্র ভক্তব্রুবগণ অভক্তসমাজেরই অন্তর্ভুক্ত, তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ অভক্ত যুগাভ্যন্তরে সাধিত হইবার সামর্থ্যবিশিষ্ট।

ভক্তিযুগ নিত্যকাল স্বীয় অধিষ্ঠান বিস্তার করিয়া ভক্ত সমাজের সেবা করিতেছেন। তবে যেরূপ কুজ্ঝটিকা আবৃত নয়নকে সূর্য্যালোক দেখাইতে গিয়া ছলনা করে, ও তাদৃশ ছলনানীতিতে শিশুগণই আবদ্ধ এবং তাহাদিগকে ক্রমনীতি অবলম্বন করিয়া যেরূপ সত্যযুগের অভিনয় করাইতে হয়, সেরূপ অজ্ঞানমিশ্র অনুচানমানীকে সত্যের উপলব্ধি করাইবার জন্য শিশুনীতি প্রভাবে উপদেশ দ্বারা যুগান্তর শব্দের সার্থকতা সাধন করিতে হয়। এককালে ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাস, মধ্ব, দামোদরস্বরূপ শিশুনীতি অবলম্বন পূর্ব্বক ভক্তিযুগের নিত্যত্ব স্থাপন করিয়া ছিলেন। কিন্তু খণ্ডিত যুগাশ্রিত সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায়সমূহ নিজ নিজ মতের প্রাবল্য সাধন করিয়া ভক্তিযুগের ধারণা করিতে সাধারণকে বঞ্চিত করিতেছেন, সেই বঞ্চনা হইতে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়েই ভক্তিযুগের পুনঃপ্রবর্ত্তক কার্ষ্ণ সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্য পদাশ্রিত হইয়া চেতন-জগতে চিন্ময় গৌড়ীয়ের লীলাভিনয় করিতেছেন। সুতরাং অভক্ত সমাজে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে।

গৌড়ীয় আধ্যক্ষিক বিচারে অচিদ্ অধিষ্ঠানে অবস্থিত বলিয়া যে জড়-বিচারপর নয়নে পরিগণিত হইতেছে, জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার দ্বারা সেই নয়নে কজ্জ্বলরূপ ভবৌষধি গৌড়ীয় কর্ত্তৃক বৈদ্যরূপে প্রদত্ত হইলে তাহারাও সকলে চিন্ময় গৌড়ীয়ের নিকট চিন্ময়ী দীক্ষা প্রভাবে স্ব-স্ব-চিন্ময়ী তনু দর্শন করিয়া স্বরূপোদ্বোধনে সিদ্ধ-মনোরথ ও ভগবৎসেবা-তাৎপর্য্যক্রমে আপনাদিগকে ভাগবত জানিতে পারিবেন। এই ভাগবতগণ গোলোকে নিত্যাবস্থিত হইয়া নিত্যকাল ভগবদ্ভক্তিতে সর্ব্বতোভাবে দেশ কাল ও পাত্রসবিশেষ জড়-নির্ব্বিশেষ-বিচার-প্রতিপাদ্য ভূমিকায় নিত্যাবস্থিত হইয়া জীবগণকে চিন্ময়ী দীক্ষায় দীক্ষিত করেন,—

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম।।
সেই দেহ করে তা'র চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়।।"

পাঠক, এখন বুঝিতে পারিলেন কি, কৃষ্ণ প্রাপ্তি কাহাকে বলে? 'এখন'-শব্দ যুগ-বাচক, সুতরাং অভক্তসমাজে গৌড়ীয় মঠের দ্বারা আময়-রহিত পাত্রান্তরিত খণ্ডকাল যুগ হইতে নিত্যযুগে যুগান্তরিত, জড় ভূতাকাশ হইতে চিদাকাশে স্থানান্তরিত হইলে যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অভক্ত সমাজ অল্পক্ষণের জন্যও কি বুঝিতে ইচ্ছা করিবেন? অর্থাৎ তাঁহারা ইহকাল ও পরকাল বুঝিবেন কি?

ভোগ ও ভক্তি

কর্ত্তৃত্বাভিমানী বদ্ধজীবে যে বৃত্তি দেখা যায়, তাহাকেই কর্ম্মপথের সাধন বলা হয়। সে স্থলে মূল কর্ত্তৃত্বে ভগবদধিষ্ঠান লক্ষিত হয় না। ত্রিগুণতাড়িত বদ্ধজীব তাৎকালিক কর্ত্তৃত্বে নিজসত্তা ভগবান্ হইতে পৃথক্ করাইয়া স্বীয় প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়া থাকেন। তাদৃশ কর্ত্তা শিশুকালে নিজ জড়সত্তার উপলব্ধিবিষয়ে সুষ্ঠুজ্ঞান লাভ না করায় তাঁহার নৈসর্গিকী বৃত্তি দৃশ্যজগতে বদ্ধ হইবার যোগ্যতা লাভ করে। ভূতাকাশে আবদ্ধ বস্তুসমূহ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়ায় খণ্ড তাৎপর্য্যপর হইয়া অহঙ্কার কার্য্য করিতে থাকে। দৃশ্যজগতের বোধনকার্য্যে অগ্রেই শিশুর নৈপুণ্য অস্ফুট থাকে। ক্রমশঃ সেই সকল খণ্ডিত বস্তুতে ইন্দ্রিয়সকল জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়। গুণত্রয়ের বিভিন্ন গতি-বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়া কর্ত্তৃত্বাভিমান উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আবার, শশিকলার ন্যায় উহা কালপ্রভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। কর্ম্মপথে চালিত বদ্ধজীব আপনাকে মাপিয়া লইবার অষ্টপাশে আবদ্ধ করে। তখন তাহার খণ্ডকাল-প্রতীতিই রুচিরূপে পরিণত হয়। রুচিবশে কর্ম্মবদ্ধ জীব উচ্চাবচ, ভালমন্দ, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি বৈষম্যপূর্ণ জ্ঞান লাভ করেন। কোন কোন বদ্ধজীব স্বীয় বিগত অভিজ্ঞতাক্রমে খণ্ডিত জগৎকে সুখময় জ্ঞান করেন। পক্ষান্তরে, কেহ বা ত্রিতাপদগ্ধ হইয়া পাংশুরাশির ন্যায় জগতের পরিহার বাসনা করেন। বদ্ধজীবের ভোগপরতা তাহাকে উত্তরোত্তর বিভিন্ন কর্ম্মকাণ্ডীয় পদ্ধতি অবলম্বনে রুচি প্রদান করে। যাঁহারা কর্ত্তৃত্বাভিমানে সফলতা-লাভে বঞ্চিত হন, সেই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ সুখদুঃখ ভোগ হইতে নিবৃত্তির কল্পনা করেন। ইঁহাদিগকে ভোগিকর্ম্মী বলা যায় না, পরন্তু ত্যাগি-কর্ম্মী বলা হয়। অনেকে ত্যাগি-কর্ম্মীকে নৈষ্কর্ম্মপর বা নিষ্কামপথের পথিক মনে করেন কিন্তু ঐ ত্যাগের মূলেও ভোগির অস্মিতা-সূত্রে তন্নিরসনাকাঙ্ক্ষা। ত্যাগী বদ্ধ- জীবগণ দুইটী ভিন্নস্তরে লক্ষিত হইলেও উভয়ের বাসনাই হৈতুকী। প্রাগুক্ত কর্ত্তৃত্বাভিমানী কর্ম্মবাদী বোধরহিত হইয়াই নিজ-বাসনার উন্মূলনে প্রবৃত্ত। তাঁহারা বলেন যে, বোধসাহিত্যাবস্থায় যে মুক্তি ঘটে, তাহাতে ন্যূনাধিক বাসনা বিজড়িত আছে অর্থাৎ বাসনাকারীর মুক্তি হয় না। তজ্জন্য প্রকৃতপ্রস্তাবে বাসনাকারীর মুক্তিলাভের আদর্শে বদ্ধবাসনা-রূপ চেতনের অভাব হওয়াই আবশ্যক। পক্ষান্তরে, কেবলজ্ঞানী চিন্মাত্র-বিচারপর অহংগ্রহোপাসকরূপে স্বীয় অবৈধ কর্ত্তৃত্ব-পোষণে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া যে বাসনা-মূলে মুক্তির আবাহন করেন, তাহাতে দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-দর্শন-ভাব রহিত নির্ম্মুক্তাভিলাষ প্রাক্তন বাসনাকেই বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছে, মনে করেন। অহঙ্কারবিমূঢ় কর্ত্তা চেতনরহিত হইয়া মুক্ত হন এবং অহঙ্কার-বিমূঢ়কর্ত্তা। অচেতনরহিত হইয়া তাঁহার হৈতুকী বাসনার ফল লাভ করিবেন, —আশা করিয়া নির্গুণ, সাক্ষী, কেবল ও চেতা প্রভৃতি নির্দ্দেশপূর্ব্বক যে চিন্মাত্র-বাসনায় অবস্থিত হইবার কল্পনা করেন, তাহা হইতেও ভোগ বিদূরিত হয় না। নিজেন্দ্রিয়তর্পণ-মূলে উন্নতিকাম ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও তদ্রাহিত্যে যে জড়নির্ব্বিশিষ্ট মুক্তি বা চিন্মাত্র সবিশিষ্ট নির্ব্বিশিষ্টব্রুবের মুক্তিখণ্ডহেতুগর্ভজাত বলিয়া ভক্তিপথের পথিক নিত্য জীবাত্মা বদ্ধাবস্থাতেও তদুভয় হৈতুক-জ্ঞানকে কর্ত্তৃত্বের অপব্যবহার বলিয়াই জানেন। স্বরূপের অননুভূতিতে "লাগে তাক্ না লাগে তুক্" সম্প্রদায় মুক্তিতে যে দ্বৈবিধ্যের কল্পনা

করেন, তাহা তাঁহাদের বাক্যানুসারে কেবল-জ্ঞান বলিয়াই দৃশ্যজগতের অজ্ঞান হইতে পৃথকরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় মাত্র। এই সকল কর্ত্তৃত্বাভিমানী স্ব-স্ব চেষ্টা দ্বারা ভক্তিবৃত্তির নিত্যত্ব বুঝিতে না পারিয়া কল্পনা-স্রোতে ভোগের অন্যতমতাকেই 'ভক্তি' বলিয়া নিয়ে ভ্রান্ত হন। অ-ব্রহ্মজ্ঞান বা অ-প্রকৃতি বিষয়সমূহ তাঁহাদিগকে মায়াবাদী ও প্রাকৃত-সহজিয়া করিয়া তুলে। ভগবদাশ্রিত ভক্তগণ এইপ্রকার মায়াবাদী ও প্রাকৃত-সাহজিক সম্প্রদায়কে গুরুরূপে বরণ না করায় তাঁহাদের পন্থা—'মুরারির উপাসনাময় তৃতীয় পথ'। অসৎপন্থী প্রাকৃত-সাহজিক নশ্বরতা-মূলে অচিৎ হইতে চিৎএর জন্ম এবং মায়াবাদী সম্প্রদায় চেতনের অভাব বা বিবর্ত্তবোধাভাব হইতে কাল্পনিক বৃত্তি পরিচালনা করিয়া অভক্ত অচিন্মাত্র ও চিন্মাত্রবাদী জ্ঞানিব্রুবদ্বয় নির্হেতুক-বস্তুকে সহেতুক-উপাদানে গঠন করিবার শিল্পনৈপুণ্যে দক্ষতা লাভ করিয়া বদ্ধজীবগণের ভোগপ্রবৃত্তি সম্বর্দ্ধন করেন। তজ্জন্য ইঁহারা উভয়েই প্রকৃতিবাদী বা প্রচ্ছন্ন প্রকৃতবাদী নামে কথিত হন। ভগবদ্ভক্তগণ এই দুই প্রকার প্রাকৃত-সাহজিকগণের বিচার-প্রণালী গ্রহণ করেন না বলিয়াই কর্ম্মপথ ও জ্ঞানপথকে ভক্তিপথের প্রারম্ভিক বর্ত্মদ্বয় বলিয়া মনে করেন না। কর্ম্মসরণী ও জ্ঞানসরণী হৈতুকজ্ঞানমূলে প্রাকৃত হেয় কাম-পিতার ঔরসে কামিনী-মাতার গর্ভজাত সন্তানদ্বয় বলিয়া নিত্যভক্তের উহাতে কোন রুচি নাই। তাঁহারা অন্যাভিলাষী কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও তপস্বী প্রভৃতির ভোগবাসনা-মূলাচেষ্টা হইতে আত্ম-সংরক্ষণে নিযুক্ত। ভোগি-সম্প্রদায়ের বা ত্যাগিব্রুব ভোগি-সম্প্রদায়ের সহিত ভক্তগণ সমস্তরে আত্মগণনা করেন না বলিয়া অভক্ত-সম্প্রদায় আপনাদিগকেও ভক্তের স্বভাববিশিষ্ট বলিয়া গণনা করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে অভক্তগণের নিকট ভক্তদর্শনের শক্তির অভাব-হেতু অবস্তু-বিচারের সহিত বস্তুবিচার সমপর্য্যায়ে গণিত হইয়া পড়ে। ভোগীর আত্মস্বরূপদর্শনে 'ভোক্তা', বলিয়া অভিমান। ত্যাগীর বা নির্ভোগিব্রুবের আত্মস্বরূপদর্শনে শূন্যবাদ বা বিবর্ত্তবাদ অধিষ্ঠিত। সুতরাং আত্মস্বরূপের অনিত্যত্ব বা ফল্গুত্ব অখণ্ডকাল, ব্রহ্ম ও অখণ্ড প্রকৃতির স্বরূপনির্দ্দেশে অসমর্থতা স্থাপন করে। অনর্থযুক্ত অবস্থায়, অসমর্থ-অবস্থায় ও দুর্ব্বলশক্তিক অবস্থায় বাসনার দাস হইয়া তাহারা যে 'অমৃতের সন্তান' ইহা ভুলিয়া যা'ন। বদ্ধভাবে পরিণতিই যদি মুক্তি হয়, তাহা হইলে তাহাও 'জড়' এবং অভিলষিত প্রার্থনাবিরোধি চেতনসৌখ্যবর্জ্জিত ভাবমাত্র। আর অনর্থযুক্ত মায়াবদ্ধ বিবর্ত্ত বুদ্ধি বাস্তববস্তুকে যে নির্ব্বিশিষ্টও নির্ব্বিকার ব্রহ্ম বলিয়া বিকৃতির পরিচয় প্রদান করে, তাদৃশ বিবর্ত্তবুদ্ধিমূলক ব্রহ্মধারণাও কালগত ব্যবধানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ভাগবত-চতুঃশ্লোকীর অহংতত্ত্ব-সংজ্ঞায় পরিগণিত হইবার যোগ্যতা লাভ করে না। বিশেষতঃ, বিবর্ত্তবাদ-ন্যায় বদ্ধজীব ও ব্রহ্মে প্রযুক্ত হইলে কালগত ব্যবধানের হস্ত হইতে তাহার পরিত্রাণ লাভ ঘটিতেছে না। কর্ত্তৃসত্তা-গত অধিষ্ঠানে বিবর্ত্ত নাই, তবে বিবর্ত্তবাদাশ্রিত ধারণাকারীর ধারণা কালের অভ্যন্তরে কখন্ প্রবেশ লাভ করিয়াছে—ইহাই জিজ্ঞাসা। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম কবে, কাহা-কর্ত্তৃক, কোথায় এবং কিরূপভাবে জড়বৈশিষ্ট্য-ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছে? মায়াবাদী তারস্বরে বলিবেন,—ঐ প্রশ্নত্রয়ের হস্ত হইতে তিনি বিবর্ত্তবাদ-ঔষধ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহা ব্রহ্মে প্রযুক্ত হইবার অবকাশ নাই; আময়গ্রস্ত খণ্ডিত-জগতে ইন্দ্রিয়- জ্ঞান-গ্রাহ্য ব্যাপারেই ঐসকল ব্যাপার কার্য্যকরী। অখণ্ড নির্ব্বিশিষ্ট প্রকৃতিস্থ ব্রহ্মে উহার বিক্রমপ্রকাশের অবকাশ নাই। এই ভোগজনিত বাক্যে

বিশ্বাসকারী ব্যক্তি কি বুদ্ধিমান-শব্দ বাচ্য? ফলতঃ, দেশ কাল পাত্রান্তর্গত বদ্ধজীব ইহ-জগতের খণ্ডজ্ঞান বহুগুণিত করিয়া যে কল্পনা-নদীতে ভাসমান হয়, তাহাই যে তাহার কর্ত্তৃত্বাধীন হইবে এবং ব্রহ্ম, পরমাত্মা প্রভৃতি ক্রীড়নকস্বরূপে তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে,—এইরূপ তাম্রশাসনবিধি বোধ হয় তাহার হস্তগত হইয়া থাকিবে!!

মোটের উপর, জাগতিক জ্ঞানের ভিত্তিতে ইন্দ্রিজজ্ঞানে যে অনুমিতি ও প্রমিতি-বিষয়ক ধারণা প্রবর্ত্তিত আছে, ঐগুলির সার্থকতা কি সকল অধিষ্ঠানে প্রযুক্ত হইবার যোগ্য? যথেচ্ছচারী মায়াবাদি-সম্প্রদায় (Idealists) বলিবেন, 'আমাদের যথেচ্ছাচারের রায়তি ও মালিগিরি করিবার জন্যই ত' আমরা নির্ব্বিশিষ্ট ব্রহ্ম (Impersonal God) বলিয়া একটী হজ্‌মী গুলা আমাদের অজীর্ণতারোগের নিমিত্ত নির্ম্মাণ করিয়াছি। বস্তুতঃ অধ্যারোপ ব্যতীত বিবর্ত্তবাদ- স্থাপনের আর গত্যন্তর নাই। মায়াবাদীর মতে—'শক্তিরহিত ব্রহ্মে প্রাপঞ্চিক শক্তি ক্রিয়া-বিশিষ্ট হইতে পারে না। প্রাপঞ্চিক শক্তি 'মায়া'-নামে অভিহিত। তদ্দ্বারাই ব্যবহারিক-জগতে অজ্ঞ-ব্রহ্মের বিজ্ঞতা সাধিত হয়। তিনি যাহা দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শ করেন, সেই বিষয়গুলি তাঁহার গ্রহণের উপযোগী করিয়া যে দর্শকাদিসূত্রে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করে, উহা ব্যবহারিকমাত্র; উহাতে বাস্তব-সত্তা নাই। ইন্দ্রিয়জ-বৃত্তির জ্ঞেয় পদার্থগুলি বহুত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতেই তাদৃশ দৃশ্য বিকার উৎপাদন করে; কিন্তু ব্রহ্ম নির্ব্বিকার। ব্রহ্মে অজ্ঞতা ও বিজ্ঞতার ভেদ কল্পনা করিতে হইবে না।' এইরূপ উক্তি হইতে জানা যায় যে শাক্যসিংহ ও কপিলের 'অজ্ঞব্রহ্ম প্রকৃতি' ও প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ-মায়াবাদীর 'বিজ্ঞব্রহ্ম অপ্রকৃতি', উভয়ই সমপর্য্যায়ে গণিত হওয়ায় পরস্পরের মধ্যে ব্যক্তাব্যক্ত বৌদ্ধবিচার অনুস্যূত আছে। প্রয়োজনতত্ত্বে অচিন্মাত্রবাদ বা চিন্মাত্রবাদের বিরোধ—ব্যবহারিক মাত্র; এতদুভয়ের অভ্যন্তরে কোন বাস্তব বিচার স্থান পায় নাই। তজ্জন্য চিদ্বিলাসময় নিত্যজগতের অধিষ্ঠানকে নশ্বর মায়াবদ্ধ প্রতীতিরূপা ব্যাঘ্রীর খাদ্যরূপে প্রদত্ত হইতে পারে না। চেতনে নিত্য-ধর্ম্ম অবস্থিত। অখণ্ড চেতন পরব্যোমে অবিচ্ছিন্ন আনন্দ ব্যতীত অবরবৃত্তি আনন্দাভাবটী প্রতিভাত হয় না।

চিদ্বিলাস অবিমিশ্র চিৎ হওয়ায় অচিৎএর সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট নহে। পরব্যোমে অচিৎ পরমাণুর, নশ্বর-ধর্ম্মের অথবা অজ্ঞতার প্রবেশাধিকার নাই। অসুখ, ত্রিতাপ-ক্লেশ প্রভৃতি পরব্যোমগমনে নিত্যবঞ্চিত। অন্ধকার যেরূপ স্বীয় স্বরূপ সংরক্ষণ পূর্ব্বক আলোকে প্রবিষ্ট হইয়া স্ব-স্বরূপ-প্রদর্শনে অসমর্থ হয়, তদ্রূপ গুণত্রয় ত্রিগুণরাজ্য অতিক্রম করিয়া সচ্চিদানন্দ পরব্যোমভূমিতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। অচিদ্‌বিলাস যেরূপ প্রাকৃত-রাজ্যে দোষ উৎপাদন করে এবং তাহা অপ্রার্থনীয় ও অনুপাদেয় বিচারে গৃহীত হয়, তদ্রূপ অপ্রাকৃত চিদ্‌বিলাসের বিচিত্রতায় সচ্চিদানন্দ অবস্থিত বলিয়া তাদৃশ অনুপাদেয়ত্ব অনুসন্ধান করিবার অবকাশ নাই। হৈতুকী প্রবৃত্তিবশে প্রাকৃত বিচারমুগ্ধ হইয়া তাহারা খণ্ডিতাভিজ্ঞানে অপ্রাকৃত বৈচিত্র্যের কোন সংবাদই রাখিতে পারে না। এজন্য তাহারা ভক্তির স্বরূপ-নির্ণয়ে বঞ্চিত।

অভক্তিপর জনগণের—খণ্ডিত বস্তু দ্বারা নিজের সেবা করিয়া লওয়া। ভক্তিপরের চেষ্টা অখণ্ড পরব্রহ্ম অপ্রাকৃত চিন্ময়-বিগ্রহের সর্ব্বতোভাবে সেবকাভিমান। অভক্তি পরের নিজেন্দ্রিয়-তোষণ-তাৎপর্য্যই

প্রয়োজন, ভক্তি পরের ভগবত্তোষণই একমাত্র ইন্দ্রিয়-পরিচালনার তাৎপর্য্য। অভক্তিপর নির্ভোগিব্রুব তটস্থস্বভাবে উপনীত হইবার জন্য যে সেব্য-সেবক-ভাব-রহিত হইয়া মধ্যবর্ত্তিস্থান লাভ করিতে চান, উহা ভক্তিপরও নহে, কর্ম্মপরও নহে। উহাকে জড়নির্ব্বিশিষ্ট ভাব বলা যাইতে পারে। চিন্নির্ব্বিশেষে জড়তারোপ অচিন্নির্ব্বিশেষবাদীর রুচিসঙ্গত হইলেও এবং চিদ্‌বস্তুতে অচিৎ এর অবরতা না থাকায় চিন্নির্ব্বিশেষ ও জড়-নির্ব্বিশেষর মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য, তাহা জড়বিচারে অনাদৃত হইলেও তাহার পৃথক্ অধিষ্ঠান আছে। চিদ্বিশেষের চমৎকারিতা, চিন্নির্ব্বিশেষের চমৎকারিতা হইতে বৈষম্যদর্শনে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু অচিদ্‌বিশেষের নির্ব্বিশেষত্ব অচিদ্‌বিশেষ হইতে পার্থক্য লাভ করিয়া বিপরীত ফল কালগত বৈষম্যে নিরূপণ করে। অচিদ্ বিশেষে এমন একটি শক্তি নিহিত দেখা যায়—যে শক্তি চেতনের বিচারকে আচ্ছন্ন করে। মধ্যে মধ্যে সেই আচ্ছাদন সূক্ষ্মতা লাভ করিলে নশ্বরতার পরিবর্ত্তে নিত্যত্বের উদ্দেশ সূচনা করে। চিচ্ছক্তি মুক্তজীবকে ভোগে প্রবর্ত্তিত করায় না, কিন্তু অচিচ্ছক্তি জীবকে ঈশ-সেবার পরিবর্ত্তে ভোগ্যের ভোক্তা করাইয়া বিপন্ন করে মাত্র। অচিৎ এর ভোগ প্রবৃত্তি জীবের অকল্যাণকরী ও পরিবর্তনশীলা এবং চিৎএর সেবা-প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে নিত্যসেব্যের প্রতি সেবনধর্ম্মে অবিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত। বদ্ধজীব চিৎ ও অচিৎ, উভয় শক্তিবিশিষ্ট উপাদানে গঠিত বলিয়া তাঁহার রুচি কোন-সময় সেবা-প্রবৃত্তিতেও প্রপঞ্চে অবস্থানকালে ভোগ প্রবৃত্তিতে আবদ্ধ থাকে। বৃত্তিনামক একলত্বের একদিকে ভোগ ও অপরদিকে সেবা অবস্থিত; মধ্যবর্ত্তিস্থানে ভোগ-ত্যাগ ও ভক্তিরাহিত্য-অবস্থা। ভোগে আশ্রয় ও বিষয় উভয়ের বহুত্ব আছে, ত্যাগে বিষয় ও আশ্রয়ের একত্ব বা অভাব অবস্থিত, আর ভক্তিতে বিষয়ের একত্ব ও আশ্রয়ের বহুত্ব বর্ত্তমান বলিয়া চিদ্বিলাস নিত্যসিদ্ধ। নিত্যসিদ্ধ চিদ্‌বিলাসের অচিদাবৃত ভাবই জড়জগৎ প্রতীতি। চেতনে উন্মেষণ-ধর্ম্ম এবং জড়ে নিমীলন-বৃত্তি অবস্থিত। প্রকৃতিবাদী বৌদ্ধ ও মায়াবাদী প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ, উভয়েই শুদ্ধজড়ত্ব ও বৈচিত্র্যরহিত জড়াভাবত্ব কল্পনা করেন।

চিদ্‌বিচারে বিভূচিৎ ও অণুচিৎ উভয় বস্তুর বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান থাকায়, উভয়েরই বৃত্তি সেবোন্মুখ-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সেবা-পরা। ভগবান্ ভক্তের সেবা করেন, আর ভক্ত ভগবানের সেবা করেন। ভক্ত নিজ-পরিমিত সেবোন্মুখতায় পূর্ণধর্ম্ম পূর্ণবিভুর সেবক। পূর্ণবিভুচেতন অণুচিৎভক্তের সেবা করিতে গিয়াই তাহার সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে কালে বিভুচিৎ এর সেবা-গ্রহণ প্রবৃত্তি অণুচিৎ এ উদয় হয়, সেইকালেই অণুচিৎ বদ্ধভাবাপন্ন হইয়া প্রপঞ্চে আসিয়া উপস্থিত হয়। বিভুচিৎ স্বীয় বরিহঙ্গা শক্তি দ্বারা বদ্ধজীবের সেবা করেন বলিয়া উহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ প্রপঞ্চে ত্রিতাপ তাহাকে দণ্ড বিধান করে। যে-কালে বদ্ধজীবের চিদ্‌ধর্ম্ম উন্মেষিত হয়, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি বুঝিতে পারেন যে,—অণুচিৎ এবং বিভুচিৎ এর সেবাই তাহার একমাত্র নিত্যধর্ম্ম। ভগবানের বহিরঙ্গা অচিৎচ্ছক্তিপ্রসূত জগতের উপর সেব্যভাববিশিষ্ট হওয়াই তাহার অমঙ্গলের হেতু। যাঁহারা একথা বুঝিতে পারেন, তাঁহারাই চেতনের ধর্ম্ম যে সেবা, তাহা বুঝিতে কুণ্ঠিত হন না। বৈকুণ্ঠ-বিচার চেতনধর্ম্মে প্রকাশমান হইলে মায়িক কুণ্ঠারূপ ভোগ-প্রবৃত্তির ক্রমশঃ অভাব হইয়া পড়ে, সুতরাং অভিধেয়-বিচারে অণুচিৎএর নিত্যধর্ম্ম ভক্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। ভজনায়-বস্তুর স্বরূপে

যাবতীয় কর্ত্তৃত্ব ও ইন্দ্রিয়ের পূর্ণ পরিচালন পরব্যোমে অপ্রতিহত। প্রপঞ্চে ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি তাঁহারই অচ্ছিক্তি-প্রসূত আবরণে আবদ্ধ। অচিৎ আবরণে ছিদ্র দেখা দিলেই চিন্ময়-রশ্মি প্রপঞ্চে ক্ষণকালের জন্য বিদ্যুৎ-প্রকাশের ন্যায় আবির্ভূত হয়। সেই আলোক কেবলমাত্র সেবোন্মুখ-জীবের নয়নে পতিত হইবার সুকৃতি আনয়ন করে। প্রপঞ্চে ভ্রমণকারীর ইন্দ্রিয়সমূহ যদি সৌভাগ্যবলে ভগবৎপ্রসাদজ ও ভক্তপ্রসাদজ সুকৃতির সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলেই তাঁহার বৈকুণ্ঠাভিযানে যোগ্যতা লাভ ঘটে। তিনি ভক্তিযোগ মায়ার আশ্রয়ে ভজনীয়-বস্তুর নিত্যসেবায় প্রতিষ্ঠিত হন। ভোগপ্রদায়িনী চিদ্বুদ্ধিনাশিনী অচিদ্ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী জগজ্জননী যেকালে বদ্ধজীবগণের মূঢ়তা বিচার করিয়া তাহাদিগকে দিয়া তাহাদের সসীম ইন্দ্রিয়বৃত্তি পরিচালনা করা'ন, তৎকালে যোগমায়া-দর্শনের অভাবক্রমে তাহারা ভোগে অভিভূত হইয়া পড়ে। এই বদ্ধ-জীবগণের চেষ্টায় যথেচ্ছাচার, কর্ম্মপথ ও জ্ঞানপথই লোভনীয় বস্তু হইয়া পড়ে। নিত্য-সেব্যবস্তুকে সেবক-জ্ঞানে অচিৎ এর প্রভুত্ব করিতে গিয়া ভোগীজীব আত্মম্ভরীও অহঙ্কারবিমূঢ় হয়। ইহাদের চিদ্বৃত্তি ভোগে আচ্ছাদিত হওয়ায় সেবোন্মুখতা-ধর্ম্মকে সম্পূর্ণ অপরিচিত বৃত্তি বলিয়া ধারণার বিষয় হয়। যাঁহাদের তত্ত্ববস্তুর সন্ধান করতলগত হয়, তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান ও পরমাত্মসান্নিধ্য লাভ করিয়াও বিষ্ণুসেবা-তৎপরতাকেই নিত্য আত্মাধিষ্ঠানের একমাত্র কৃত্য না জানিয়া বহির্জগৎ দর্শন করেন। তখন জাগতিক শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ তাহাদের অভাবগ্রস্ত সঙ্কীর্ণ ইন্দ্রিয়জজ্ঞানকে বঞ্চনা করে। বঞ্চিতজনগণ নিত্যানিত্য-বিবেকরহিত হইয়া—চিদচিদ্বিবেক-রহিত হইয়া—আনন্দ- নিরানন্দ বিবেকরহিত হইয়া—ত্রিগুণ-তাড়িত পদগোলকের ন্যায় বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। জাগতিক দুঃখসমূহ যেকালে বদ্ধজীবকে প্রপীড়িত করিয়া ক্লান্তি বোধ না করায়, তদবধি তাহার ভগবৎসেবার বিপরীত দুরাকাঙ্ক্ষা-মূলে ভোগ-বাসনা হইতে থাকে। আবার ভগবদ্ভক্তিপর-জনের বাক্যাবলীতে শ্রদ্ধা হইবা-মাত্রই তিনি নিজমঙ্গল অনুসন্ধান করেন। তখন তাঁহার উত্তম সঙ্গক্রমে মায়াবদ্ধ জীবও বৈকুণ্ঠ-সেবায় রুচিবিশিষ্ট হন। যাঁহার হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তি বৃদ্ধি লাভ করিবার সুযোগ পায়, সেই প্রেমিক মহাপুরুষ ভগবৎপ্রেমে সর্ব্বক্ষণ নিমগ্ন থাকিয়া নিজভোগ প্রবৃত্তি-বিষয়ে ক্রমশঃ উদাসীন হইয়া পড়েন। কিঞ্চিৎ অম্লের সংযোগেই বহুপরিমাণ দুগ্ধও যেরূপ দধি-ধর্ম্ম লাভ করে, তদ্রূপ ভগবদ্ভক্তের অল্পসঙ্গক্রমেই ভোগ প্রবৃত্তি নিরস্ত হইয়া জীব চিদ্বিলাসরাজ্যের পক্ষপাতী হন। তখন বিকারের হেয়ত্ব চিদ্বৈচিত্র্যকে সমধিক দূষিত করিতে সমর্থ হয় না। অচিচ্ছক্তিপরিণত জগতের বিকারবাদের অনুপাদেয়তা নিত্যচিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যে আরোপিত হইতে পারে না। প্রাপঞ্চিক-বৈচিত্র্যে নশ্বর ধর্ম্ম, অনুপাদেয়তার অভাব, সর্ব্বসম্ভবাভাব ও কেবল-সৌন্দর্য্য প্রভৃতি নাই, কিন্তু চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যে এইসকল গুণ অভাব-বর্জ্জিত হইয়া বাস্তবসত্যরূপে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। অপ্রাকৃতরাজ্য চেতনের বৃত্তিতে যে ভক্তি অবস্থিত, তাহা ভোগ-পরিণতি হইয়া প্রাপঞ্চিক-রাজ্য-ভ্রমণে আর মুক্তজীবের রুচি উৎপাদন করে না। সুতরাং ভোগীর ভোগ ও ভক্তের ভজন, পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীতদিকে অবস্থিত।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

মানব যখন এই জগৎ হইতে অভিজ্ঞতার প্রণালী লইয়া আকর্ষক-সত্ত্বা-আনন্দের অনুসন্ধান করেন, তখন এই জগতের মধ্যে একটা Energy, force বা শক্তি লক্ষ্য করেন। সেই শক্তিকে অধিকতরভাবে অনুভব করিবার জন্য তাঁহারা উহার বিভিন্ন মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া থাকেন এবং শক্তির এক একটী বিকাশ লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন, (ভাঃ ১০।২।১১-১২)—

"নামধেয়ানি কুর্ব্বন্তি স্থানানি চ নরা ভুবি।
দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি চ।।
কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্যকেতি চ।
মায়া নারায়ণীশানী শারদেত্যম্বিকেতি চ।।"

তাঁহারা শক্তির বলবত্তা-দর্শনে এতদূর অভিভূত হইয়া পড়েন যে, শক্তিকেই স্বতন্ত্রা মনে করিয়া থাকেন, (ভাঃ ১০।১।২৫)—

"বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সংমোহিতং জগৎ"।

আমরা তলবকার উপনিষদে দেখিতে পাই, একদা ব্রহ্ম দেব-হিতার্থে ঐশ্বরনিয়ম-লঙ্ঘনকারী অসুরদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু দেবগণ সেই ব্রহ্মকৃত জয়কে নিজেদের জয় মনে করিয়া আপনাদিগের গৌরব ঘোষণা করিতে থাকেন। ব্রহ্ম দেবগণের সেই অজ্ঞতা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন। দেবতাগণ ঐ প্রাদুর্ভূত রূপকে চিনিতে না পারিয়া অগ্নিকে সেই প্রাদুর্ভূত রূপের নিকট প্রেরণ করিলেন। ব্রহ্ম অগ্নির পরিচয় ও সামর্থ্য জিজ্ঞাসা করিলে অগ্নি বলিলেন যে, তাঁহার এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যে কিছু দগ্ধ করিবার ক্ষমতা আছে। ব্রহ্ম অগ্নির নিকট একটী তৃণ সংস্থাপন করিয়া দগ্ধ করিতে বলিলে অগ্নি তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও তৃণটীকে কোনরূপ বিকৃত করিতে পারিলেন না। দেবতাগণ পুনরায় ঐ প্রাদুর্ভূত পুরুষের স্বরূপ জানিবার জন্য তাঁহার নিকট বায়ুদেবকে প্রেরণ করিলেন। ব্রহ্মের জিজ্ঞাসামতে বায়ুদেব তাঁহার আত্মপরিচয় ও শক্তির কথা বর্ণন করিয়া বলিলেন যে, তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুকে গ্রহণ করিতে পারেন। ব্রহ্ম বায়ুর নিকট একটী তৃণ স্থাপন করিয়া উহাকে গ্রহণ করিতে বলিলে বায়ু তাহার সমস্ত সামর্থ্য প্রয়োগ করিয়াও উহাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারিলেন না। তদনন্তর দেবতাগণ ঐ আবির্ভূত পুরুষের পরিচয় জানিবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রেরণ করিলেন। ব্রহ্ম ইন্দ্রের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ইন্দ্র দেখিতে পাইলেন, সেই আকাশে স্ত্রীরূপা বহু শোভাসম্পন্না হিমালয়দুহিতা উমা আবির্ভূতা। দেবরাজ উমাদেবীকে ঐ পূজনীয় পুরুষের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে দেবী বলিলেন, সেই পূজনীয় পুরুষই পরব্রহ্ম। ইঁহার শক্তিতেই দেবতাগণ গৌরবলাভ করিয়াছেন। উমাদেবী আরও বলিলেন যে, তিনিও সেই ব্রহ্মেরই শক্তি, তাঁহারও স্বতন্ত্রতা নাই। শক্তি পুরুষাধীনা বলিয়া স্ত্রীরূপে কল্পিতা। যেমন ধনবানের অধীন ধন,

তেমনি শক্তিমানের অধীন শক্তি। বিদ্যাকে অর্থদায়িনী বলিলে যেরূপ বিদ্যার কর্ত্তৃত্ব রূপক-বোধক মাত্র অর্থাৎ পুরুষের অধীনা বলিয়া পুরুষের সম্বন্ধে বিদ্যা, অর্থদায়িনী শক্তি সম্বন্ধেও সেইরূপ। শক্তিমানের ইচ্ছায়ই শক্তি ক্রিয়াবতী হয়। বস্তুর গুণ বা স্বভাবের কখনও স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি থাকিতে পারে না। "কুন্তখড়্গধনুর্ব্বাণাঃ প্রবিশন্তি" বলিলে যেরূপ কুন্তখড়গ-ধনুর্ব্বাণধারী ব্যক্তির প্রবেশই বুঝাইয়া থাকে, সেইরূপ শক্তি গমন করিতেছে বলিলে শক্তিমানের কর্ত্তৃত্বই বুঝাইয়া থাকে।

যখনগণ মানব ইহ জগতের অভিজ্ঞান লইয়া শক্তির স্বতন্ত্রতা এবং শক্তিকে আকর্ষণকারিণী ও আনন্দদায়িনী মনে করেন, তখন তাঁহরা চতুর্ব্বর্গের অন্তর্গত কামের উপাসক হইয়া পড়েন, —

"অর্চ্চিষ্যন্তি মনুষ্যাস্ত্বাং সর্ব্বকামবরেশ্বরীম্।
ধুপোপহারবলিভিঃ সর্ব্বকামবরপ্রদাম্।।"

(ভাঃ ১০।২।১০)

পরাধীনাকে স্বাধীনা মনে করায়—কৃষ্ণমায়াকে 'কৃষ্ণ' মনে করায়, তাঁহাদের কৃষ্ণোপাসনা অবিধিপূর্ব্বক হইয়া যায়। কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি একটী, সেই পরাশক্তির পরত্ব হ্রাস হইতে হইতে যেখানে অপরত্বে পর্য্যবসিত হইয়াছে— চিচ্ছক্তি যোগমায়ার উপলব্ধি হ্রাস হইতে হইতে যেখানে অচিচ্ছক্তি মহামায়ার উপলব্ধি আসিয়াছে, ভুবনমোহন-মোহিনীত্ব দর্শন কমিতে কমিতে যেখানে ভুবনমোহিনীত্বে পর্য্যবসিত হইয়াছে, সেখানে কৃষ্ণের উপাসনা হইলেও উহা কৃষ্ণের উপাসনা নহে, উহা অবিধিপূর্ব্বক পূজা। যখন জীব স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হন—কৃষ্ণ মায়ায় বিমোহিত না হন—যোগমায়ার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন আদিগুরু ব্রহ্মার ন্যায় বিধিপূর্ব্বক পূজা করিতে করিতে বলেন,—

"সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়সাধনশক্তিরেকা ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।"

(ব্রহ্মসংহিতা ৫।৪৪)

স্বরূপশক্তি অর্থাৎ চিচ্ছক্তির ছায়া-স্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়সাধিনী মায়াশক্তিই ভুবন-পূজিতা দুর্গা। তিনি যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

দ্বিতীয় অধিকারে মানব যখন অভিজ্ঞানের প্রণালী সম্বল করিয়া ইহজগৎ হইতে বিচার করিতে থাকেন, তখন আর একটু অগ্রসর হইয়া বলেন যে, এই জড়ের মধ্যে উত্তাপশক্তিই শ্রেষ্ঠ ও আশ্চর্য্য ক্ষমতার নিদান। ঋতু সকলের নিয়মানুসারে সমুদ্র হইতে জলীয় বাষ্প সকল উঠিয়া মেঘরূপে বায়ু দ্বারা চালিত হয় এবং উত্তাপ উপস্থিত হইলে পুনরায় বৃষ্টি হইয়া পতিত হয়। গন্ধক-লৌহাদি ধাতুর উত্তাপশক্তির সংযোগের দ্বারা পর্ব্বত সকল ভগ্ন হয়, পৃথিবী কম্পিতা হয় এবং কামান বন্দুক হইতে অস্ত্র সকল নির্গত হইয়া বৃহৎ ব্যাপার সম্পাদন করে। বিদ্যুতের উত্তাপ-শক্তি জগতের কতই না মহৎকার্য্য করিতেছে। অগ্নি মুহূর্ত্তে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ভস্মসাৎ, আবার বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কত মহৎকার্য্য সম্পাদন করিতেছে। এই উত্তাপের মূলাধার—সূর্য্য, সূর্য্য

না থাকিলে আজ জগতের সমস্ত উত্তাপশক্তি রহিত হইয়া যাইত, সুতরাং এই সূর্য্যই উপাস্য। এইরূপ বিচারে যাঁহারা সূর্য্যে আকর্ষণী সত্ত্বা ও আনন্দসত্ত্বা অনুভব করিয়া সূর্য্যকেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলিয়া পূজা করেন, তাঁহারাও কৃষ্ণেরই উপাসনা করেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদের কৃষ্ণের উপাসনা হয় না—অবৈধ পূজা হইয়া যায়।

যদিও বাহ্য-অভিজ্ঞানে উত্তাপকেই সমস্ত সঞ্চালনের কারণ বলিয়া লক্ষ্য হয়, তথাপি চেতনা-প্রেরণা ব্যতীত কিছুই হইতে পারে না। যখন অন্তঃকরণে কোন বৃত্তির বিশেষ সঞ্চালন হয়, তখনই দেহে উত্তাপ প্রকাশ পাইয়া থাকে। সমস্ত প্রকার প্রাকৃত পদার্থে যে উত্তাপের উপলব্ধি হয়, তাহা কেবল চেতন- পদার্থের ক্রিয়ার ফল। যে-কালে পার্থিব পদার্থ সকল সৃষ্ট হয় নাই, তখন প্রকৃতির সাম্যাবস্থা ছিল; কিন্তু চিৎস্বরূপ ঈশ্বর-বীর্য্য তাহাতে নিক্ষিপ্ত হইলে ভবিতব্য শক্তিরূপা প্রকৃতির গুণ ক্ষুব্ধ হওয়ায় সৃষ্টি- প্রক্রিয়া আরম্ভ হইল। 'প্রকৃতি'-শব্দের অর্থ—প্রধান শরীর; এই শরীর চেতন-বিহীন হইলে শব হয় এবং চেতনের দ্বারা চালিত হইলে কার্য্য করে। পরমেশ্বরের ঈক্ষণের দ্বারা ঐ প্রকৃতিতে যে ক্রিয়া শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাই উত্তাপরূপে বর্ত্তমান। অতএব উত্তাপকে স্বীকার করিয়া চেতন-প্রেরণা অস্বীকার করা কেবল আত্মবঞ্চনা মাত্র। ঐ ঈক্ষণের আভাসমাত্র উত্তাপ ও আকর্যণ—যদ্দ্বারা সৌরজগতের যাবতীয় গতি ও ক্রিয়া নিয়মিত হইয়াছে। ঋতুদিগের গমনাগমনের দ্বারা মেঘাদির উৎপত্তি ও বর্ষণ, লৌহ প্রভৃতি ধাতুর জল সংযোগের দ্বারা পর্ব্বত বিদারণ ও ভূকম্প এবং তিথিযোগে জলের বৃদ্ধি ও হ্রাস—এ সকলেই ভগবানের ঈক্ষণজনিত নিয়ম বলিতে হইবে। আকর্ষণ বা উত্তাপ কদাচ স্বয়ংসিদ্ধ গুণ হইতে পারে না। চেতন স্বয়ং বিধাতা স্বরূপ এবং আকর্ষণাদি বিধিমাত্র, অতএব বিধাতাকে অস্বীকার-পূর্ব্বক বিধি স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত নহে।

কিন্তু যাঁহারা—"যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্। যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্।। (গীঃ ১৫।১২)—সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নির যে তেজ অখিল জগৎকে প্রকাশিত করে, সে তেজ আমারই জানিবে। —"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয় মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।।" (কঠ ২।১৫) প্রভৃতি কৃষ্ণের সাক্ষাদুপদেশ বা শ্রুতি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক চতুর্ব্বর্গের অন্তর্গত ধর্ম্মের কামনা লইয়া সূর্য্যের স্বতন্ত্রতা স্বীকার করেন; তাঁহারা কৃষ্ণপূজা করিলেও তাঁহাদের প্রকৃত কৃষ্ণপূজা হয় না—অবিধিপূর্ব্বক হইয়া যায়।

যখন জীব স্বরূপে অবস্থিত হইয়া ইহা বুঝিতে পারেন, তখন আদিগুরু ব্রহ্মার ন্যায় কৃষ্ণের বিধিপূর্ব্বক পূজা করিতে করিতে বলিতে থাকেন,—

"যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং রাজা সমস্ত সুরমূর্ত্তিরশেষতেজাঃ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সম্ভৃতকালচক্রো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।"

(ব্রহ্মসংহিতা ৫।৫২)

যিনি গ্রহগণের রাজা, অশেষ তেজোবিশিষ্ট, সুরমূর্ত্তি, জগতের চক্ষুস্বরূপ অথবা ভগবানের প্রাকৃত বিরাটরূপে কল্পিত চক্ষুরূপ, সেই সূর্য্যদেব যাঁহার আজ্ঞায় কালচক্রারূঢ় হইয়া ভ্রমণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

তৃতীয় অধিকারে মানব যখন ইহজগৎ হইতে অভিজ্ঞান পাথেয় লইয়া যাত্রা করেন, তখন ঐ উত্তাপকেও তাঁহার জড় বলিয়া বোধ হয় এবং আর একটুকু অগ্রসর হইয়া পশু চৈতন্যের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়া থাকেন। বিঘ্নরাশিদ্বারা সতত অভিভূত মানব-জগৎ এই জগতে ধনশক্তির ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়া বিঘ্ন- বিনাশার্থ চতুর্ব্বর্গান্তর্গত অর্থপাপ্তির লালসায় গণপতিকেই পরমেশ্বর বলিয়া বোধ করেন। কামনামূলে তাঁহাতেই শ্রদ্ধা হওয়ায় গণপতির স্বতন্ত্রতা বিচার করিয়া তাঁহার আরাধনায় নিযুক্ত হন। ইহা দ্বারা কৃষ্ণের উপাসনা হইলেও প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণ উপাসিত হন না, কারণ এইরূপ উপাসনা অবৈধ। জীব স্বরূপে অবস্থিত হইলে যখন ইহা বুঝিতে পারেন, তখন আদি-গুরু ব্রহ্মার অনুসরণে বিধিপূর্ব্বক কৃষ্ণের উপাসনা করিতে করিতে স্তব করিয়া বলেন,—

"যৎ পাদপল্লবযুগং বিনিধায় কুম্ভদ্বন্দ্বে প্রণামসময়ে সগণাধিরাজঃ।
বিঘ্নান্ বিহন্তুমলমস্তি জগত্রয়স্য গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।"

(ব্রহ্মসংহিতা ৫।৫০)

গণপতি ত্রিজগতের বিঘ্ন বিনাশ করিবার উদ্দেশে তৎ কার্য্যকালে শক্তি লাভের জন্য যাঁহার পাদপদ্ম স্বীয় মস্তকের কুম্ভ-যুগলের উপর নিয়ত ধারণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

ব্রহ্মা-শিবাদিপ্রমুখ নিখিল দেবতা যেরূপ কীর্ত্তনমুখে বৈধভাবে কৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছিলেন, সেই বৈধ-প্রণালীতে কৃষ্ণের কীর্ত্তনময়ী উপাসনা করিতে করিতে জীব বলেন,—

"তথা ন তে মাধব তাবকাঃ কচিদ্ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো।।" (ভাঃ ১০।২।৩৩)

ব্রহ্মাদি দেবতা শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্ব্বে দেবকীগর্ভস্তুতি করিয়া বলিতেছেন,—হে মাধব! হে প্রভো! আপনাতে প্রীতিসম্বন্ধযুক্ত ভবদীয় ভক্তগণ কখনই শ্রেয়ঃপথ হইতে ভ্রষ্ট হন না, বরং তাঁহারা আপনার দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে সকল বিঘ্নজনক দেবতাগণের মস্তকরূপ সোপান- সমূহে পাদন্যাসপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠপদে আরোহণ করে।

চতুর্থস্থূলাধিকারে মানব যখন ইহ-জগতের অভিজ্ঞান পাথেয়সহ পরম-পদবীতে আরূঢ় হইয়া ক্লেশ-নিবৃত্তির জন্য আত্মহত্যা বা ত্রিপুটীবিনাশরূপ মোক্ষকেই পরম প্রয়োজন বলিয়া বিচার করেন, তখন পশু-চৈতন্যের পরিবর্ত্তে নর-চৈতন্য তাঁহার আরাধ্য বস্তু হয়। মোক্ষকামী হইয়া নর-চৈতন্যরুদ্রের উপাসনায় ত্রিপুটীবিনাশ-চেষ্টা এবং তাহাতে আনন্দের অনুসন্ধান—অবিধি- পূর্ব্বক কৃষ্ণেরই উপাসনা। আনন্দের আস্বাদক ও আস্বাদ্যের নিত্যত্ব না থাকায় কেবলানন্দের সার্থকতা নাই। নপুংসক ও বন্ধ্যার নিকট যেমন

পুত্রস্নেহের পরিচয় নাই, আনন্দের আস্বাদক ও আস্বাদ্যের অভাবেও তদ্রূপ আনন্দত্বের উপলব্ধি নাই। কিন্তু যাঁহারা এইরূপ ত্রিপুটী-বিনাশরূপ মোক্ষধর্ম্ম বা আনন্দের অনুসন্ধানের জন্য নরচৈতন্য রুদ্রের উপাসনা করেন, তাঁহারাও বিপথে কৃষ্ণেরই অনুসন্ধান করিতেছেন—তাঁহারাও অবিধিপূর্ব্বক কৃষ্ণেরই উপাসনা করিতেছেন। তাই লোক-পিতামহ আদিগুরু-ব্রহ্মা আমাদিগকে বিপথ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বিধিপূর্ব্বক কৃষ্ণের উপাসনার কথা জানাইয়াছেন,—

"ক্ষীরং যথা দধি বিকার-বিশেষযোগাৎ সংজায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যদেগাবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।"

(ব্রহ্মসংহিতা ৫।৪৫)

দুগ্ধ যেরূপ বিকারবিশেষযোগে দধি হয়, তথাপি কারণরূপ দুগ্ধ হইতে পৃথক্ তত্ত্ব হয় না, সেইরূপ যিনি কার্য্যবশতঃ শম্ভুতা প্রাপ্ত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

দুগ্ধরূপ উপাদানে অম্লসংযোগ করিলেই দধি হয়, জল হইতে দধি হয় না, বা দুগ্ধের ন্যায় দেখিতে চুণগোলা বা চা-খড়িগোলায় অম্ল সংযোগ করিলে দধি হয় না, সেই রূপ কৃষ্ণ হইতেই রুদ্রতত্ত্ব আবির্ভূত হন। দুগ্ধ হইতে দধি হইলেও দধিকে যেরূপ 'দুগ্ধ' বলা চলে না, আবার দুগ্ধ হইতে পৃথক্ বস্তুও বলা চলে না অর্থাৎ দধিত্ব যেরূপ দুগ্ধত্ব নয়—দধিকে দুগ্ধের সহিত একাকার করা যায় না, তাহা হইলে দুগ্ধ আর 'দুগ্ধ' থাকে না, দুগ্ধ বিকারী হইয়া প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণ-উপাদান-কারণ হইতে শম্ভুতা প্রকাশিত হইলেও শম্ভুতাকে কৃষ্ণের সহিত সমন্বয় বা একাকার করিলে কৃষ্ণত্ব আর থাকিল না, কোন একটী বিকারী বস্তুরূপ প্রকাশিত হইল। তাৎপর্য্য এই যে, শম্ভু কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ আর একটী ঈশ্বর নহেন, শম্ভুর ঈশ্বরতা গোবিন্দের ঈশ্বরতার অধীন। দুগ্ধ যেরূপ বিকারবিশেষযোগে দধিত্ব লাভ করে, তদ্রূপ বিকার বিশেষযোগে ঈশ্বর পৃথক্ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াও পরতন্ত্র। সে স্বরূপের স্বতন্ত্রতা নাই। মায়ার তমোগুণ, তটস্থ শক্তির স্বল্পতাগুণ এবং চিচ্ছক্তির স্বল্প-হ্লাদিনীমিশ্রিত সম্বিদ্‌গুণ বিমিশ্রিত হইয়া একটী বিকারবিশেষ হয়। সেই বিকারবিশেষযুক্ত স্বাংশভাবাভাস-স্বরূপ ঈশ্বর জ্যোতির্ম্ময় শম্ভুলিঙ্গরূপ রুদ্রদেব প্রকটিত হন। সৃষ্টিকার্য্যে দ্রব্যব্যূহময় উপাদান, স্থিতিকার্য্যে কোন কোন অসুর নাশ এবং সংহার কার্য্যে সমস্ত ক্রিয়া- সম্পাদনার্থ স্বাংশভাবাপন্ন বিভিন্নাংশরূপ শম্ভুস্বরূপে গোবিন্দ গুণাবতার হন। শম্ভুর কাল-পুরুষত্ব নির্ণীত আছে। "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ" ইত্যাদি শাস্ত্র-বচনের তাৎপর্য্য এই যে, সেই শম্ভু স্বীয় কালশক্তি দ্বারা গোবিন্দের ইচ্ছানুরূপ দুর্গাদেবীর সহিত যুক্ত হইয়া কার্য্য করেন। তন্ত্রাদি বহুবিধশাস্ত্রে জীবদিগের অধিকারভেদে ভক্তি লাভের সোপানস্বরূপ ধর্ম্ম শিক্ষা দেন। গোবিন্দের ইচ্ছা মতে মায়াবাদ ও কল্পিত আগম প্রচারপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তিতত্ত্বের সংরক্ষণ ও পালন করেন। শম্ভুতে জীবের পঞ্চাশদ্‌গুণ প্রভূতরূপে এবং জীবের অপ্রাপ্ত আরও পাঁচটী মহাগুণ আংশিকরূপে আছে। সুতরাং শম্ভুকে জীব বলা যায় না। তিনি ঈশ্বর, তথাপি বিভিন্নাংশগত।

পঞ্চমাধিকারে অভিজ্ঞতাবাদী মানবের হৃদয়ে জীব চৈতন্যেতর পরম-চৈতন্যের উপাসনার আভাস হৃদয় অধিকার করে। মানব যখন স্বীয় অভিজ্ঞতাবাদের উপর একটুকু অধিক নির্ভর করে, তখন পরম-

চৈতন্যের উপাসনা বুদ্ধির আভাস-প্রতিবিম্ব ছায়াভাসরূপে তাহার হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়। পরমচৈতন্যের প্রতি এই প্রতিবিম্ব-ছায়াভক্ত্যাভাসই পঞ্চোপাসকগণের বিষ্ণুপূজা বা কৃষ্ণোপাসনা। ইহা কৃষ্ণের উপাসনা হইলেও ইহাতে প্রতিবিম্ব ছায়াভক্ত্যাভাস থাকায় ইহাকেও বৈধ কৃষ্ণোপাসনা বলা যায় না। ইহা সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক বিদ্ধ বিষ্ণু-আরাধনা বা বিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম নামে কথিত হইয়া থাকে। ইহাতে পরম- চৈতন্যের পরম স্বতন্ত্রতা, সর্ব্বশক্তিমত্তা, নিরঙ্কুশ ইচ্ছা, অবিচিন্ত্য শক্তিমত্তা, চিদ্‌বিলাসত্ব, নিত্যত্ব, অদ্বয়ত্ব স্বীকৃত না হওয়ায় এবং আরোহবাদমূলে পরম-চেতনের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ও নিত্যত্ব খর্ব্বীকৃত হওয়ায় এইরূপ বিষ্ণু বা কৃষ্ণ-উপাসনাকেও বৈধ কৃষ্ণোপাসনা বলা যায় না। সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক অভিজ্ঞতাবাদী, আরোহবাদী, নির্ব্বিশেষবাদী, মায়াবাদী, চিজ্জড়সমন্বয়বাদী পঞ্চোপাসকগণের যে বিষ্ণুপূজা বা কৃষ্ণোপাসনা, তাহাও বৈধ কৃষ্ণ আরাধনা নহে,—অবিধি পূর্ব্বক কৃষ্ণপূজা।

আরোহবাদ বা অভিজ্ঞতাবাদ লইয়া অচিন্ত্যবস্তুকে মাপিতে গেলে অবশেষে কূল-কিনারা না পাইয়া হয় বিরাটরূপের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের 'স্বকীয়রূপ' দর্শনে প্রতিহত হইতে হইবে, না হয় অবশেষে তুরীয়বস্তুকে তৃতীয়মানের (third dimension) বিচার লইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতে গিয়া তাঁহাকে 'নির্ব্বিশেষ' মাত্র বলিয়া হাপ ছাড়িতে হইবে এবং এই নির্ব্বিশেষরূপের প্রতীকস্বরূপ 'ব্রহ্মণোরূপ-কল্পনা' প্রভৃতি পৌত্তলিকতা-ন্যায়ের আশ্রয়ে বিষ্ণুর কল্পিত মূর্ত্তি গড়িবার চেষ্টা করা হইবে। এ সকলই অবৈধ উপাসনা। এই আরোহবাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ না পাইলে কৃষ্ণের স্বকীয়রূপ বা পরিপূর্ণ-চেতন বাস্তবসত্য কৃষ্ণের বৈধ উপাসনা হইতে পারে না। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।"

"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।।
পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ।
তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।"

যাঁহাকে সেই পরমচেতন বরণ করেন, তিনিই সেই পরমচেতনকে লাভ করিতে পারেন। সেই পরমচেতন তাঁহারই নিকট স্বকীয় তনু প্রকাশিত করিয়া থাকেন।

জ্যোতির্ম্ময় আবরণের দ্বারা পরমসত্যের মুখ আবৃত রহিয়াছে। এই জগৎ হইতে অভিজ্ঞতাবাদ লইয়া দর্শন করিতে গেলে সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠিয়া নির্ব্বিশেষ জোতিঃস্বরূপ ব্যতীত অন্য কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। নিজ চেষ্টায় কেহ সেই দুর্ভেদ্য জ্যোতির্ম্ময় পাত্র ভেদ করিয়া পরম সত্যস্বরূপ দর্শন করিতে পারেন না, তাই হে পূর্ণ! আপনি আপনার অঙ্গকান্তিস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় আবরণ সত্যধর্ম্মপিপাসুগণের জন্য উন্মোচন করুন্, তাহা হইলেই তাঁহারা আপনার দ্বিভুজমুরলীধর সত্যস্বরূপ দর্শন করিতে পারিবেন। হে পূর্ণ, হে সর্ব্বপ্রধান জ্ঞানি, হে সম্বিদ্বিগ্রহ, হে সর্ব্বনিয়ামক, হে সূরিগণপ্রাপ্য, হে আদিগুরু ব্রহ্মার আরাধ্য, আপনার

অঙ্গকান্তিচ্ছটাকে অপনয়ন করুন, আপনার তেজোরাশিকে উপসংহার করুন, যেন আপনার কল্যাণতমরূপ অর্থাৎ কল্যাণরূপ যে ব্রহ্মরূপ, কল্যাণতররূপ যে পরমাত্মনারায়ণাদিরূপ এবং তাহাদেরও মূলরূপ স্বয়ংরূপ দ্বিভুজমুরলীধরের রূপ দর্শন করিতে পারি।

এইরূপে জীব যখন আরোহবাদে আস্থা পরিত্যাগ করিয়া অবরোহবাদ বা ভগবৎকৃপার অপেক্ষা করেন, তখন কনিষ্ঠাধিকারে অর্থাৎ প্রতিবিম্ব-ছায়া-ভক্ত্যাভাস বিদূরিত হইয়া ছায়াভক্ত্যাভাসযুক্ত পুরুষের হৃদয়ে যে বিষ্ণুপূজার চেষ্টা লক্ষিত হয়, তাহা কৃষ্ণের বৈধ-উপাসনার সর্ব্বনিম্নস্তর মাত্র। মধ্যমাধিকারে কৃষ্ণের বৈধ উপাসক কার্ষ্ণগণের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারেন এবং তাঁহাদের পূজা করিতে শিখেন। তখনই প্রকৃত-প্রস্তাবে কৃষ্ণের বৈধ-উপাসনা আরম্ভ হয়, তখন ব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয় আম্নায়ের আদিগুরু ব্রহ্মার সিদ্ধান্ত শ্রীগুরুমুখে শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারেন যে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১১শ অধ্যায়োক্ত বিরাট রূপের উপাসনাও বৈধ উপাসনা নহে, তাহা নবীন উপাসকগণের জন্য কল্পিত। নরাকৃতি পরব্রহ্মই কৃষ্ণের স্বকীয় রূপ, তাঁহার উপাসনাই বৈধ-উপাসনা। তাই ভগবান বিশ্বরূপ উপসংহার করিয়া পরম মাধুর্য্যময় দ্বিভুজ স্বকীয় মূর্ত্তি প্রদর্শন করিলে অর্জ্জুনের চিত্ত স্থির হইয়াছিল।

জীব বৈধ কৃষ্ণোপাসকগণের কৃপায় স্বরূপে অবস্থিত হইলে বুঝিতে পারেন যে, আরোহপন্থী নির্ব্বিশেষবাদী ব্রহ্মোপাসকগণ কৃষ্ণকে অনুসন্ধান করিলেও তাঁহাদের পূজা চেষ্টা অবিধিপূর্ব্বক। যাঁহারা ব্রহ্মবাদী হইয়া বিধিপূর্ব্বক কৃষ্ণোপাসনা অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা আদিগুরু ব্রহ্মার ন্যায় স্তব করিতে করিতে বলেন,—

"যস্য প্রভাপ্রভবতো জগদণ্ড কোটি কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।"

যাঁহার প্রভা হইতে উৎপত্তি-নিবন্ধন উপনিষদুক্ত নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম কোটি- ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত বসুধাদি বিভূতি হইতে পৃথক্ হইয়া নিষ্কল অনন্ত অশেষ তত্ত্বরূপে প্রতীত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

একায়ন

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরূপগোস্বামীকে 'ভক্তি' সংজ্ঞার উপদেশে বলিয়াছেন—

"অন্যাভিলষিতা-শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের লেখক শ্রীকৃষ্ণদাস তাহার অনুবাদে বলেন,—

"অন্যবাঞ্ছা অন্যপূজা ছাড়ি' জ্ঞান-কর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন।।
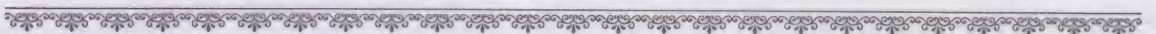
এই শুদ্ধভক্তি, ইহা হৈতে প্রেমা হয়।

পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়।।"

তাহার অনুভাষ্যে শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস বলেন,—"পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবত সম্প্রদায়, উভয় মতই একার্থ প্রতিপাদক। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব গরুড় পুরাণে লিখিয়াছেন,—

"ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।

সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ।।

সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।

বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে।।"

ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তগণ বহ্বয়ন-শাখা গ্রহণ না করিয়া একমাত্র সবিশিষ্ট-ব্রহ্ম- বস্তুরই উপাসক। বিশিষ্টাদ্বৈত শৈববাদে যে একল সবিশিষ্টরুদ্রের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহাও ন্যূনাধিক নির্ব্বিশেষ-পর্য্যায়ে পরিগণিত। শিবস্বামী বা লিঙ্গায়েৎ-সম্প্রদায়ের সবিশেষ শিবের একত্ব-বিচার কাল প্রভাবে পরিণত হইয়া নির্ব্বিশিষ্ট শঙ্করের বিশেষবাদ জড়বিকার-ধারণা নিরস্ত করিয়াছে। সবিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ নির্ব্বিশিষ্ট শৈববিচারের সহিত সর্ব্বতোভাবে পার্থক্য স্থাপন করিয়াছে। শিবার্কদিধীতি-লেখক অপ্যয়দীক্ষিত একায়ন-শ্রুতির কোন কথা শ্রুত না হওয়ায় তাঁহার পরিমলমধ্যে একায়ন-সম্বন্ধে স্বীয় অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। শিবস্বামী বা লিঙ্গায়েৎগণ পরিণত শঙ্করবাদে ন্যূনাধিক পর্য্যবসিত হওয়ায় তাঁহাদের বিচারে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" শ্রুতিবাক্য শূন্যবাদ বা প্রকৃতবাদ- তাৎপর্য্যেই বিলীন হইয়াছে। 'এক' শব্দের অর্থ কখনই শূন্যার্থ প্রতিপাদক নহে; পরন্তু নির্ব্বিশেষ' শব্দে যে জড়বহুত্ব নিরাকৃত হইয়াছে, তাহাকে জড়ৈকত্বে পরিণত করিবার জাড্য একায়ন-শ্রুতিবিহিত পদ্ধতি নহে। নিঃশক্তিক বিচার এক-সর্ব্বশক্তিত্ব বিচারের বিরোধী! 'এক'-শব্দে বহুত্ব ও শূন্যত্ব, উভয়ই নিরাকৃত হইয়াছে। যদি কেহ 'শূন্য' বা 'বহু'র সহিত 'এক' শব্দার্থের সমত্ব প্রয়াস করেন, তাহা হইলে 'এক'-শব্দের বিশিষ্টাদ্বৈতবিচার বিপন্ন হয়। যে নির্ব্বিশেষ-ভাব রুদ্রত্ব-জ্ঞাপক, তাহাতে শক্তিরহিত, বিশেষরহিত বিচার একায়ন পদ্ধতির প্রতিকূল আচরণ করে।

জ্ঞেয় বস্তুর সহিত জ্ঞাতার ও জ্ঞানের একত্ব-প্রয়াসরূপ অবর জড়ের বহুত্ব নিরাকরণকল্পে কল্পিত প্রণালী বা নিঃশক্তিকবাদ পারমার্থিক বাস্তবসত্য-নির্দ্ধারণে কখনই সমর্থ নহে। জড় শক্তির ক্রিয়ার জড়ের বিচিত্রতা সাধিত হয়, চিচ্ছক্তির ক্রিয়ায় চিদ্‌বিচিত্রতা সাধিত হয় এবং জড় ও চিৎ এর অন্তর প্রদেশস্থ শক্তি বিচিত্রতা-বিহীন হইয়া শক্তিমাত্রে অবস্থিত হয়। সেই তটস্থশক্তিপরিণত জীব নিত্যবৈকুণ্ঠ রাজ্যে ভগবৎ-সেবাপরতা এবং নশ্বর বিচিত্রতাপূর্ণ রাজ্যে প্রভুত্বধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া জড়ের ভোক্তৃত্ব গ্রহণ করে। যে স্থলে জড় রাজ্যের জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতৃত্ব-বিচারে একায়ন-পদ্ধতি বিপন্ন হয়, সেস্থলে নিঃশক্তিক জড়বিচার-রহিত তটস্থ বিচারকে লক্ষ্য করিয়াই নির্ব্বিশিষ্ট ব্রহ্ম, একব্রহ্মে চিদচিৎ সমন্বয় প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যরহিত ভাবের উল্লেখ দেখা

যায়। উহা মায়াবাদ বা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ মাত্র। ঐকান্তিক ভজনানন্দি-ভাগবতগণ নামাশ্রিতা ভক্তি অবলম্বন করিয়া প্রপঞ্চে বাস করেন, পাঞ্চরাত্রিক অর্চ্চনরত একায়নিগণ বহ্বয়নবিচার পরিহার করিয়া একমাত্র ভগবানের অর্চ্চনেই মায়াতীত বৈকুণ্ঠরাজ্যের পূজ্য-বোধে মর্য্যাদা স্থাপন করেন। একায়নশ্রুতি ভাগবত সম্প্রদায়ে ভজন ও পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ে অর্চ্চনাদি আনুষ্ঠানিক সাধনদ্বয়ভেদে ঐকায়ন-মত স্থাপন করেন। বহ্বয়ন-বেদ- শাখিগণ স্বরূপবিস্মৃতিফলে যে কর্ম্মকাণ্ডের আবাহন করেন, তাহা উপাসনা বা একায়ন-বিচারে প্রাধান্যলাভ করিতে পারে না।

সেই একমাত্র সবিশিষ্ট বস্তু সবিশেষ তাৎপর্য্যপর হইয়া ভজনীয়, ভক্ত ও ভজন-ভেদে তিনপ্রকারে অবস্থিত। ভগবদ্‌বস্তু নিত্যবৃত্তি ভক্তি-দ্বারাই আরাধ্য। ভগবানের রুদ্রভাব জড়াবস্থানকালে তদ্‌রাহিত্যাবস্থার জ্ঞাপক না হওয়ায় নশ্বর ধর্ম্মে অবস্থিত। জড়জগতে অপ্রকটিত অবস্থায় প্রাকট্যলাভরূপ প্রবৃত্ত ভাব রজোগুণাধিষ্ঠাতা বিরিঞ্চি বিচার রুদ্রে বিলীন হইবার হেতুমূলে প্রাকট্য লাভ করে। একায়ন-শ্রুতি কেবল বিষ্ণুতাৎপর্য্যময়ী। উহার আনুষ্ঠানিকগণ 'বৈষ্ণব' সংজ্ঞায় নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় ভাগবত ও পাঞ্চরাত্রিকগণ উভয়েই 'বৈষ্ণব'। বহু দেবযাজী বহুশাখিগণ একায়নশ্রুতি বিমুখ হইয়া পরস্পর বিবাদ-রত থাকেন। সংখ্যাগত অনেকধর্ম্মে বা শূন্যধর্ম্মে বিষ্ণুভক্তি নাই, সুতরাং তাঁহারা অবৈষ্ণব বলিয়া নিজ পরিচয় প্রদানে ব্যস্ত।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন কলিহত জীবগণের বিভিন্ন রুচিবশে প্রলাপসমূহ শ্রবণ করিলেন, তখন তিনি বদ্ধ জীবকে শ্রুতি তাৎপর্য্যের উপদেশ কালে অন্যাভিলাষিতা শূন্য কর্ম্ম ও জ্ঞানাদির দ্বারা অনাবৃত অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনের পদ্ধতিকেই একায়ন-শ্রুতিবিহিত বিচাররূপে প্রদর্শন করেন। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও কর্ম্মপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া যেরূপভাবে বৌদ্ধ ও চার্ব্বাক বিচারে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহা হইতে তিনি বাস্তব-সত্যকে সংরক্ষণ করিয়াছেন। প্রচ্ছন্নবৌদ্ধগণ মায়াবাদ অবলম্বনে বেদের তাৎপর্য্য যে উপাসনা, তাহা বর্জ্জনপূর্ব্বক আত্মম্ভরিতা করিতেছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐ বিপদ হইতে রক্ষা করিতে গিয়া জীবের নিত্যবৃত্তি ভক্তির কথা সুষ্ঠুভাবে জানাইলেন। যাহারা ব্যভিচার ও ঐকান্তিকতার মধ্যে পার্থক্য স্থাপন করে না, তাহাদিগের কখনই মঙ্গল লাভ হইতে পারে না। 'গোলে হরিবোল' ও 'গোঁজামিল' দিয়া যে সকল আপাত-সঙ্গতিপ্রদর্শক মতসমূহ আবির্ভূত হইয়াছে, সেই সকল মত একত্বের বিরোধ, সমত্ত্বের প্রতিপক্ষ এবং চিজ্জড়ের সমন্বয়বোধক ব্যভিচার মাত্র। অদ্বয়জ্ঞানই একায়নিগণের শ্রুতি; প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ কেবলাদ্বৈত বিচার মায়াবলে বলীয়ান্ হওয়ায় উহা অদ্বয়জ্ঞান- বিচারক বৈদান্তিকের সহিত বৈষম্য স্থাপন করিয়া শুদ্ধাদ্বৈতবিচারের বিনাশ করিয়াছে। শুদ্ধাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত বিচার—সকলগুলিই অচিন্ত্য-ভেদাভেদনামক অদ্বয়জ্ঞানাত্মক একায়নশ্রুতিসম্মত। কেবলাদ্বৈত বিচার একায়ন-পদ্ধতি বিরুদ্ধ হওয়ায় 'মায়াবাদ' নামে কথিত। উহা প্রাপঞ্চিক বিচার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মাত্র, তাহাতে শ্রৌতপথ ন্যূনাধিক বিপন্ন হইয়াছে।

কৃষ্ণের চাকরী ও মায়ার চাকরী

আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকল জীবই চাকরী করিতেছে। রাজাই বলুন, আর প্রজাই বলুন, ব্যবসায়ীই বলুন, আর কর্ম্মচারীই বলুন—সকলেই কোনও না কোনও চাকরী করিতেছেন। সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি যিনি, তিনিও কাহারও না কাহারও অধীন; অধিক কি, ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী জগজ্জননী—যাহার দুর্গে আমরা বাস করি, তিনিও স্বতন্ত্রা নহেন, অধীনা, আজ্ঞাবহা,—

"সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দূর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।"

(ব্রহ্মসংহিতা)

এই পরিদৃশ্যমান বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের বিধাতা যিনি, সেই ব্রহ্মাও স্বাধীন নহেন। দেবাদিদেব মহাদেবও আজ্ঞাবহনকারী,—

"গঙ্গা-দুর্গা—দাসী মোর, মহেশ—কিঙ্কর।"

(চৈঃ চঃ মহাপ্রভুর বাক্য)

কৃষ্ণই একমাত্র প্রভু, আর সব ভৃত্য—

"একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।"

সকলেই চাকর, সকলকেই চাকরী করিতে হইতেছে, চাকরী না করিয়া উপায় নাই—কথাগুলি ঠিক হইলেও কৃষ্ণের চাকরী আর মায়ার চাকরী, কৃষ্ণের গোলামী ও মায়ার গোলামীতে আকাশ পাতাল ভেদ আছে, শুধু ভেদ নহে, দুইটীর প্রাপ্য বস্তু সম্পূর্ণ পৃথক্।

সৌভাগ্যবান্ সুবুদ্ধিশালী ব্যক্তি কৃষ্ণের চাকরী করেন, আর দুর্ভাগা কুবুদ্ধিজন মায়ার চাকরী করিতে ধাবিত হয়। কৃষ্ণের চাকরী না করিলে মায়ার চাকরী করিতেই হইবে—মুহূর্ত্তকাল কেহ কৃষ্ণের চাকরীতে অন্যমনস্ক হইলেই অপাশ্রিতা মায়া ঘাড়ে ধরিয়া তাহার নিজ চাকরীতে নিযুক্ত করাইবে। কৃষ্ণের চাকরী স্বরূপের ধর্ম্ম—নিত্যধর্ম্ম—অমৃত-অশোক-অভয়প্রদ; আর মায়ার চাকরী ভূতের বেগার খাটা—তাহাতে মৃত্যু, ক্লেশ, শোক—উত্তরোত্তর শোক, ভয়, অভাব।

আমরা অভাব-নিবারণ বা অর্থ-প্রাপ্তির জন্য মায়ার দপ্তরে চাকরীর দরখাস্ত পেশ করিয়া থাকি; কিন্তু মায়ার চাকরীতে অভাব নিবারম হয় না, শত শত অভাব আরও বাড়িয়া যায়, নূতন তৈয়ারী হয়, ক্রমে অন্ধতমোরূপ ভীতি বিভীষিকাময় অভাবের রাজ্যে লইয়া গিয়া আমাদিগকে অনির্ব্বচনীয় ক্লেশ দিতে থাকে। মায়ার চাকরীতে মোটেই অর্থ লাভ হয় না। 'অর্থ' শব্দের অর্থ—'প্রয়োজন', যাহা আমাদিগের অভাব বিদূরিত করিয়া আমাদিগকে শান্ত করিতে পারে; কিন্তু মায়ার চাকরীতে যে অর্থ লাভ হয়, তাহাতে আমাদিগকে ক্রমশঃ অশান্ত, আরও অভাবযুক্ত করিয়া তুলে। মায়ার চাকরীর অর্থে ত্রিতাপ উন্মূলন করিতে

পারে না, ত্রিতাপ-মহীরুহের বীজ ক্রমশঃ আরও বিস্তার কিরয়া জন্ম-জন্মান্তরে ত্রিতাপ-ক্লেশ ভোগ করিবার জন্য পূর্ব্ব বন্দোবস্ত করিতে থাকে; কিন্তু কৃষ্ণের চাকরীতে অনায়াসে, আনুষঙ্গিকভাবে, না চাহিতেও সমস্ত জাগতিক অতৃপ্তি, অভাব, পিপাসা দূরীভূত হয়; কৃষ্ণের চাকরী আরম্ভ করিবার সর্ব্বপ্রথম ভূমিকায়ই হৃদয়ে শান্তভাব উপস্থিত হয়; ''ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি'', ''মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধিঃ''তে চিত্ত প্রশান্ত হয়। কৃষ্ণের চাকরী যত প্রৌঢ়তা ও পরিপক্কাবস্থা লাভ করিতে থাকে, ততই পরম অর্থ—পরম প্রয়োজন প্রাপ্তি হইতে থাকে, কৃষ্ণের চাকরী যখন প্রৌঢ়া দশা হইতে নির্ব্যূঢ়া হইয়া চরমকাষ্ঠা লাভ করে, তখন পরম প্রয়োজনের উৎস সহস্রধারে খুলিয়া যায়। কৃষ্ণের নির্ব্যূঢ় ভৃত্য তখন কৃষ্ণের চাকরী করিবার জন্য অনন্ত হস্ত, অনন্ত পদ, অনন্ত নেত্র, অনন্ত জিহ্বা, অনন্ত নাসিকা, অনন্ত ইন্দ্রিয় প্রার্থনা করেন। সেই স্বভাবের রাজ্যে যে অতৃপ্তি-অভাব—সেই শাশ্বত শান্তির রাজ্যে যে পিপাসা, তাহা মায়ার নফরের ধারণার অগোচর—তাহা বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, অনুমানের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না।

আমরা অনেক সময় মনে করি, যাঁহারা ব্যবসায়-বাণিজ্য করেন, তাঁহারা পরাধীন নহেন। অনেক সময় মনে করি, যাঁহারা স্বাধীন দেশে বাস করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনাদি করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই পরাধীন নহেন। কিন্তু মনুষ্যত্বের দাবী যেটুকুর জন্য, সেই বিচার শক্তিটী লইয়া যদি আমরা আলোচনা করি, তবে দেখি, আমরা কাহারও অধীনে বেতন গ্রহণ করিয়াই কার্য্য করি, ব্যবসায়-বাণিজ্যই করি, স্বাধীন দেশে বাস করিয়া শিল্প গবেষণাই করি, আর রাজাধিরাজ মহারাজই হই কিংবা সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়াছি মনে করিয়া রাবণের মত স্বর্গের সিঁড়িই প্রস্তুত করাইতে যাই, আমরা মায়ার ঘানিঘরের কলুর বলদ—কেবল ভূতের বেগার খাটিয়া মরিতেছি—পরম দয়াময় গৌরকৃষ্ণের নিজজন, পরদুঃখদুঃখী—দুর্গত-দরদীর বিরতির কল্যাণ-কল্পতরুর অমৃতফল মর্কট আমরা বদরী বা লোষ্ট্র ভাবিয়া দূরে ফেলিয়া দিয়াছি—শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভুর সেই সঙ্গীত কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে না, ভোগ প্রবণ-হৃদয়ে ঝঙ্কৃত, অঙ্কিত হয় নাই অথবা ঐ সকল উপদেশের উপরে উঠিয়া গিয়া বড় বড় কথার আলোচক, আস্বাদক হইয়া পড়িয়াছি, মনে করিয়াছি। শ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রভু আমাদের ন্যায় মায়ার চাকরী-লোলুপ গো-গর্দ্দভের জন্য গাহিয়াছেন,—

''দুর্লভ মানব জন্ম লভিয়া সংসারে।
কৃষ্ণ না ভজিনু দুঃখ কহিব কাহারে।।
সংসার সংসার ক'রে মিছে গেল কাল।
লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল।।
কিসের সংসার এই ছায়াবাজী প্রায়।
ইহাতে মমতা করি' বৃথা দিন যায়।।
এ দেহ পতন হ'লে কি রবে আমার।
কেহ সুখ নাহি দিবে পুত্র পরিবার।।

গৰ্দ্দভের মত আমি করি পরিশ্রম।
কার লাগি এত করি না ঘুচিল ভ্রম।।
দিন যায় মিছা কাজে, নিশা নিদ্রাবশে।
নাহি ভাবি মরণ নিকটে আছে ব'সে।।
ভাল মন্দ খাই, হেরি, পরি, চিন্তাহীন।
নাহি ভাবি এদেহ ছাড়িব কোন্ দিন।।
দেহ গেহ কলত্রাদি চিন্তা অবিরত।
জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করি হত।।
হায় হায় নাহি ভাবি অনিত্য এ সব।
জীবন বিগতে কোথা রহিবে বৈভব।।
শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে।
বিহঙ্গ পতঙ্গ তায় বিহার করিবে।।
কুক্কুর শৃগাল সব আনন্দিত হ'য়ে।
মহোৎসব করিবে আমার দেহ ল'য়ে।।
যে দেহের এই গতি তার অনুগত।
সংসার বৈভব আর বন্ধুজন যত।।
অতএব মায়া-মোহ ছাড়ি বুদ্ধিমান।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন্ সন্ধান।।"

পরদুঃখদুঃখী শ্রীল নরোত্তম প্রভুও গাহিয়াছেন,—

"গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু।
প্রেম-রতন-ধন হেলায় হারাইনু।।
অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু।
আপন করম-দোষে আপনি ডুবিনু।।
সৎসঙ্গ ছাড়ি' কৈনু অসতে বিলাস।
তে কারণে লাগিল যে কৰ্ম্মবন্ধ-ফাঁস।।
বিষয়-বিষম-বিষ সতত খাইনু।
গৌরকীৰ্ত্তনরসে মগন না হৈনু।।

কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়া।
নরোত্তম দাস কেন না গেল মরিয়া।।"

অনুক্ষণ হৃদয়-ফলকে দীপ্তিমান করিয়া রাখিবার জন্য যে সকল অমূল্য চিৎচিন্তামণি সঙ্গীতাকারে বিতরিত হইয়াছে, তাহা "আমাদের জানা আছে" মনে করায় সেই গুলি আমাদের দৃষ্টি ও বিচারের বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা অনেকে আবার মায়ার চাকরীতে অশেষ ক্লেশ দেখিয়া বিচার করি, যাহাতে স্বাধীনভাবে থাকিতে পারা যায়, বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া বেড়ান যায়, নিজেই নিজের প্রভু হইয়া স্বতন্ত্রভাবে বিচরণ করিতে পারা যায়, কাহারও অধীন না হইয়া বা বাহ্যে কাহারও অধীনতা স্বীকারের নাম করিয়া সেই সুপ্রতিষ্ঠিত পুরুষের নামের অবৈধ সুযোগে নিজের স্বতন্ত্রতা চরিতার্থরূপ ইন্দ্রিয়তর্পণ করা যায়, এরূপ কোন পন্থা গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ। তখন আমরা বাহ্যে চাকরী পরিত্যাগ করিয়া 'ত্যাগী', 'সন্ন্যাসী' প্রভৃতি সাজিয়া থাকি। কিন্তু 'ত্যাগীই' সাজি, আর "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ"—কৌপীনপঞ্চক স্তোত্র পাঠ করিয়া নিজেকে মুক্ত, স্বাধীনই বিচার করি, আমি কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মায়ার লফর, তখনও মায়ার চাকরী ছাড়িতে পারি নাই। অঘটনঘটনপটীয়সী বহুরূপিণী মায়াদেবী আমাকে 'মুক্ত', 'স্বাধীন' প্রভৃতি মনে করাইয়া—আমাকে বঞ্চনা করিয়া তাহার গোলামী করাইয়া লইতেছে। আমি 'মুক্ত' বিবেচনায় একমাত্র প্রভু কৃষ্ণ ও কৃষ্ণের নিজজনের অধীনতা হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করিয়া মায়ার গোলাম হইয়া পড়িয়াছি।

সকলকেই চাকরী করিতে হইতেছে—চাকরী ছাড়া উপায় নাই—উপায় নাই—উপায় নাই—"নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।" হয় কৃষ্ণের চাকরী করিতে হইতেছে, না হয় মায়ার চাকরী করিতে হইতেছে। যে ভূতের বেগার খাটিতে চায়, সে মায়ার চাকরী করিবে, আর যিনি অমৃত পান করিতে চাহেন, তিনি কৃষ্ণ ও কৃষ্ণজনের চাকরী করিবেন।

এখানে আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি, কৃষ্ণের চাকরীতে কি ক্লেশ নাই, দুঃখ নাই? অপরিনিষ্ঠিত জন অর্থাৎ যাঁহার কৃষ্ণের সেবায় স্বাভাবিক অনুরাগের উদয় হয় নাই, তাঁহার নিকট কৃষ্ণের চাকরীতে যে ক্লেশবোধ, সেই ক্লেশ বা দুঃখগুলিও ক্লেশ কাটিবারই হেতু। কিন্তু মায়ার চাকরীতে পরিনিষ্ঠিত অর্থাৎ মায়ার চাকরীতে অভ্যস্ত ও বিরূপের নিসর্গবশতঃ মায়ার সেই গোলামীগিরিতেই সুখ বা আমোদপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট মায়ার চাকুরীর 'ক্লেশ' ক্লেশরূপে অনুভূত না হইলেও তাহা অনন্ত ক্লেশের সেতু ও সোপন-পরম্পরা। কৃষ্ণের চাকরীর ক্লেশে (অপরিনিষ্ঠিত জনের নিকট প্রতীয়মান) ক্লেশ কাটে, আর মায়ার চাকরীর ক্লেশ বা অক্লেশে অনন্ত জন্মজন্মান্তরের জন্য অশেষ ক্লেশরাশি সঞ্চিত করায়। লোকে ভবিষ্যৎ সুখের জন্যই বর্ত্তমানে ক্লেশ অথবা ভূরি সুখের জন্যই অল্প ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকে—ইহাই লৌকিক বিচার এবং সাধারণ বুদ্ধিমত্তাও তাহাই অনুমোদন করে। কিন্তু যে ক্লেশ বা আপাত প্রতীয়মান সুখের ছায়া এ সময়েও ক্লেশ, পরবর্ত্তী অনন্ত-কালেও ক্লেশেরই সঞ্চয় এবং বিবৃদ্ধি সাধন করে, সেরূপ ক্লেশ কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্বীকার করিতে চায়?

বুদ্ধিমান মানবজাতি—তন্মধ্যে আবার সদসদ-বিচার-শ্রবণে অবকাশ প্রাপ্ত ব্যক্তির কি এ সকল কথা বিচার করা কর্ত্তব্য নহে? অহো! আমি কি করিতেছি! বর্ত্তমানে গাধার খাট্‌নী, ভূতের বেগার খাটিলাম, আবার ইহার ফল অনন্ত ক্লেশ!! ক্লেশের উত্তরফল সুখ—এই ধারার বিরুদ্ধে ক্লেশের উত্তরফল অধিকতর ক্লেশ—কেবল অশেষ ক্লেশপরম্পরা!!

কৃষ্ণের চাকরীর আভাসও ক্লেশ-মহীরুহের বীজ উৎপাটিত করিয়া দেয়, আর মায়ার চাকরী তৎপরিবর্ত্তে ক্লেশ-মহীরুহের শিকড় অধিকতর দৃঢ়ভাবে চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে বিস্তার করিয়া থাকে, যেন আর কোনদিন উহা বিনষ্ট না হইতে পারে। তাই প্রভু শ্রীল ভক্তিবিনোদ আমাদের শিক্ষার জন্য গাহিয়াছেন,—

"তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত,
সেও ত' পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ পরম সম্পদ
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ।"

মায়ার চাকরীর ক্লেশ বা আপাত প্রতীয়মান সুখ—অবিদ্যা-দুঃখবর্দ্ধনের হেতু, আর কৃষ্ণের চাকরীর আপাত প্রতীয়মান ক্লেশ বা সুখ—অবিদ্যা-দুঃখ চিরবিনাশের হেতু। চতুর যিনি—বুদ্ধিমান যিনি—পণ্ডিত যিনি—বিচারবান যিনি—প্রকৃত সুখ চান যিনি, তিনি কৃষ্ণের নিজজন, পরদুঃখদুঃখী গুরুদেব যে কৃষ্ণের চাকরী প্রদান করিতে আসেন, তাহা বরণ করেন; আর ক্লেশের উত্তরফল বা নশ্বর খণ্ডসুখের উত্তরফলস্বরূপ মহাদুঃখ-প্রাপ্তির জন্য কৃতসঙ্কল্প ব্যক্তি ময়ার নফরগিরী আপন ইচ্ছায় বরিয়া লয়—কৃষ্ণের নিজজনের অবাধ্য হইয়া—স্বতন্ত্র হইয়া—স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া মায়ার চাকরীর ফাঁস গলায় পরিধান করে। ময়ার চাকরীর ফাঁস বাড়িয়া বদ্ধজীবের আরও কিরূপ অধিকতর ঘনীভূত বদ্ধদশা উপস্থিত হয়, তাহার চিত্র গৌর-নিজজন প্রভু শ্রীল ভক্তিবিনোদ জীব শিক্ষার জন্য গীতিতুলিকায় অঙ্কিত করিয়াছেন,—

বিদ্যার গৌরবে, ভ্রমি দেশে দেশে
ধন উপার্জ্জন করি।
স্বজন পালন, করি এক মনে,
ভুলিনু তোমারে হরি।।

যিনি পরম আত্মীয়—যাঁহারা পরম বান্ধব, তাঁহারা কখনও আত্মীয়কে ক্লেশের উত্তরফলস্বরূপ অশেষ মহাক্লেশ পরম্পরা বা ক্ষণিক আপাত-সুখের পর অনন্ত দুঃখরাশির দাবদহন প্রদান করিতে চাহেন না। তাঁহারা দুরিতদরদী—ব্যথিতের ব্যথী—পরদুঃখদুঃখী। তাঁহারা জীবকে মুক্ত করিতে চাহেন, বন্ধনের পরামর্শ বা বন্ধন-বরণকামী ব্যক্তির রুচিতে ইন্ধন প্রদান করেন না; আর যাহারা প্রকৃত আত্মীয় নয়—কেবল দেহাত্মবোধাভিনিষ্ট ব্যক্তির নিকট আত্মীয় বলিয়া প্রতীয়মান—মহাদস্যু, আত্মানুশীলনের পরিপন্থী, অনাত্মীয় (অর্থাৎ অনাত্মস্বরূপ ভোগযান-দেহের সম্বন্ধে সম্বন্ধীয়), তাহারাই বলিয়া থাকে—পরামর্শ দিয়া থাকে,

—বর্ত্তমানে ক্লেশ স্বীকার কর বা সুখ ভোগ কর, তাহার উত্তরফলস্বরূপ সুখের আকাশ কুসুম, সুখের ছায়াবাজী বা সুখের মাকাল ফলের অপেক্ষা করিতে করিতে সুদুর্ল্লভ চঞ্চল মানবজীবনটা কাটাইয়া দাও অর্থাৎ তোমার ভাগ্যে যাহাতে কোনদিনই সুখলাভ না হয়, তাহারই পূর্ব্ব সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি। অখণ্ড, নিত্য নবনবায়মান, অবিমিশ্র উপাদেয় পরম সুখ-সংগ্রহের একমাত্র মূলস্বরূপ এই সুদুর্ল্লভ মানব-জীবনটীতে অতি প্রত্যক্ষ বাস্তব সুখ সাগরের যে সন্ধান পরদুঃখদুঃখী গুরুদেব তোমাকে দেখাইয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া নশ্বর সুখ-মরীচিকার বৃথা সন্ধানে সংসার-মরুতে শ্রান্ত হইয়া প্রাণ হারাও, আর সেই প্রাণপন ক্লেশসহ বাণিজ্যের লাভস্বরূপ পাইবে, অনন্ত জন্মজন্মান্তরের জন্য অনন্ত ক্লেশরাশি।

একমাত্র পরদুঃখদুঃখী দুরিতদরদী গুরুদেব ও তদ্‌গতাত্মগণই মায়ার চাকরীর ক্লেশে বহু ভূতকালে, বর্ত্তমানে ও অনন্ত ভবিষ্যতে প্রপীড়িত, পীড্যমান সমগ্র জগৎকে স্বাধীনতা—প্রকৃত স্বাধীনতা দিতে চাহেন, আর বাদবাকী সকলে কেবল মরীচিকার লুকোচুরী খেলা দেখাইয়া—স্বাধীনতার আকাশকুসুমের স্বপ্নে বিভোর করিয়া—অভাব বিদূরিত হইবার কল্পনার রঙ্গীন নেশায় প্রমত্ত করিয়া—অর্থ-প্রাপ্তির অলীক প্রলোভনে লুব্ধ করিয়া আমাদিগকে মধ্যপথে মহাদস্যুগণের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া পলাইয়া যায়। তখন তাহাদের আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না, চিৎকার করিয়া ডাকিলেও কেহ সাড়া দেয় না; কিন্তু অহো! এমন পরদুঃখদঃখী শ্রীগুরুদেব ও তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ যে সেরূপ অসময়েও, যে চিরকাল অকৃতজ্ঞতা করিয়াছে, নিমক্‌হারামী করিয়াছে, অবাধ্য হইয়াছে, তাঁহার কত সদুপদেশ পায়ে ঠেলিয়া ফেলিবার পাষণ্ডতা প্রদর্শন করিয়াছে, তাহাকেও সেই অসময়ে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে ছুটেন। অহো! যাহাদিগকে আত্মীয়- স্বজন মনে করিয়াছিলাম—যাহাদের জন্য কৃষ্ণভজন ছাড়িয়াছিলাম—কৃষ্ণের চাকরী, কার্ষ্ণের চাকরী ছাড়িয়া-ছিলাম, বিপদের সময় ত' তাহারা কেহই নাই—তাহারা কি প্রকারে থাকিবে, তাহারা নিজেরাই যে রক্ষিত হইতে পারে নাই, কি প্রকারে অপরকে রক্ষা করিবে? বিপদে বন্ধু, সম্পদে বন্ধু, সকল সময়ে বন্ধু একমাত্র আমার গুরুদেব ও তাঁহার চাকরীতে যাঁহারা পরিনিষ্ঠিত, তাঁহারা।

সকলের ভোগ্য 'গুরুদেব' মিলে না, এমন গুরুদেবের দুরিতদরদী সহচরগণও মিলে না। জগতে মায়াদেবীর রাজ্যে কেবল কপটতা, অপস্বার্থপরতা, বঞ্চনা। যে সকল ব্যক্তি গুরুবেশধারী কপট, পরের দুঃখে তাহাদের হৃদয় গলে না;কারণ তাহারা মায়ায় মুগ্ধ, তাহারা 'স্বাধীনতা' দিতে পারে না, 'অভাব' মোচন করিতে পারে না, 'অর্থদ' মানবজীবনের পরম প্রয়োজন যে 'অর্থ', তাহা দিতে পারে না—আর কেহ পারে না, পারেন—প্রত্যক্ষভাবে পারেন—হাতে হাতে দিতে পারেন—এই মুহূর্ত্তে দিতে পারেন, কেবল ''আমার গুরুদেব।"

অনেকে ভেল্কীবাজী দেখাইয়া কৃষ্ণপ্রাপ্তির ছলনায় মায়ার চাকরীতে, ভূতের বেগারে নিযুক্ত করে—বঞ্চনা করে। অহো! ভাগ্য বড় ভাল ছিল, এ সকল বহু বঞ্চকের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলাম—এমন এক পাদ-পদ্মের চেতনময়ী বাণী—সর্ব্বানর্থনাশিনী বাণী শুনিবার অবসর হইয়াছিল—যেখানে কপটতার কণিকা

নাই—কোন মিশ্রণ নাই—ভেজাল নাই—নিছক খাঁটি কৃষ্ণের চাকরী যিনি দিতে পারেন, এমন একজন, আর তাঁহার সঙ্গিগণও, যাঁহারা সেই কথারই সর্ব্বক্ষণ নিষ্কপট অনুশীলন করেন, বিতরণ করেন, সেই সকল পরম বান্ধব কোন প্রকারে আর এত কাল মায়ার চাকরীতে আবদ্ধ জীবকে পুনরায় মায়ার চাকরীর ফাঁস গলায় পরাইয়া বঞ্চনা করিতে পারেন না।

হে বলদেব গুরুদেব! হে বলদেবের বলবান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ! আবার কৃষ্ণের চাকরী করিবার নিষ্কপট অবিচ্যুত বল কবে আসিবে? মায়ার চাকরী গ্রহণ করিয়া ভোগী হওয়া বা মায়ার চাকরী পরিত্যাগের বাহ্য অভিনয় দেখাইয়া 'ত্যাগী' সাজিয়া প্রচ্ছন্ন মায়ার ফাঁস গলায় বন্ধন করা ত' আমার স্বধর্ম্ম নহে; তাহাতে আমার অভাব-নিবৃত্তি ও অর্থপ্রাপ্তি কোনও কালেই ত' হইতে পারে না, অধিকন্তু ক্লেশের উত্তরফল ক্লেশ, অভাবের উত্তরফল অভাব, অনর্থের উত্তরফল অনর্থই লাভ হয়। যেদিন স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ছাড়িয়া বলদেবের বল সঞ্চার করিয়া লইব, বলদেব-বলে বলীয়ান হইয়া যেদিন কৃষ্ণের চাকরী করিতে ধাবিত হইব, সেই দিন আমার সকল অভাব, সকল অনর্থ বিদূরিত হইবে—

"নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

মায়ার চাকরী পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের নিত্য চাকরী, যাহা জীবের নিত্য-স্বভাব—যাহা জীবের জীবাতু—অস্তিত্ব, সেই নিত্যচাকরী গ্রহণ না করিলে অভাব ও অনর্থের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া কেহই স্বভাব ও পরমার্থে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না—ইহা অনর্থময় জীবকুলকে শিক্ষা দিবার জন্যই ত' গৌর-কৃষ্ণের নিত্য অন্তরঙ্গ-সেবায় অভিষিক্ত শ্রীরূপ সনাতন প্রভু জড়জগতে বিধর্ম্মিরাজের চাকরীর অভিনয় এবং তাহা পরিত্যাগের লীলাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। জীবকুলকে ইহা শিক্ষা দিবার জন্যই ত' শ্রীরায় রামানন্দ প্রভু রাজার চাকরী পরিত্যাগের লীলা দেখাইয়াছিলেন। তাঁহাদের মত সম্মানের চাকরী—দ্বিতীয় সম্রাট বা রাজার পদবীতে আরূঢ় থাকিবার চাকরী আজকাল কয়জন পাইতে পারেন? কিন্তু লোকশিক্ষক শ্রীসনাতন প্রভু জানাইলেন,—

"রাজা মোরে প্রীতি করে, সে মোর বন্ধন।"

বিষয়ীর প্রীতি, রাজার প্রীতি—বন্ধনের কারণ, আর বৈষ্ণবের—গুরুর—কৃষ্ণের স্নেহ-ভালবাসা-আকর্ষণ—মুক্তির হেতু। গৌরপার্ষদ শ্রীসনাতন প্রভু বিষয়ীর চাকরী পরিত্যাগের অভিনয় করিয়া পরিপ্রশ্ন করিলেন,—

"কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়?"

প্রভু উত্তর দিলেন—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।"

শ্রীল সনাতন প্রভুর প্রশ্নের ভঙ্গী ও শ্রীগৌরসুন্দরের উত্তর কৃষ্ণের চাকরী ও মায়ার চাকরীর পার্থক্যের মীমাংসা করিয়াছে। শ্রীসনাতন প্রভু মায়ার নফর আমাদের জন্য জানাইলেন,—"মায়ার চাকরী করিলে

কোনও দিন তাপত্রয় হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না, অভাবের রাজ্য হইতে পরিত্রাণ পাইবে না।" মহাপ্রভুর শ্রীমুখ হইতেও শ্রীল সনাতন প্রভু এই শিক্ষাই দিলেন,—"জীব কৃষ্ণের নিত্য চাকর, কৃষ্ণের চাকরী করাই তাহার স্বধর্ম্ম, আর বাদ-বাকী— পরধর্ম্ম, ভয়াবহ।"

"কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল।।
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ।।"

শ্রীসনাতন-শিক্ষাতে মহাপ্রভু জানাইলেন,—

"কামদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষা জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়—মাং নিযুঙ্ক্ষাত্মদাস্যে।।

হে ভগবন্! আমি মায়ার দরবারে চাকরী করিতে গিয়া মায়াদেবীর নিযুক্ত কামাদি রিপুকে আমার প্রভুপদে বরণ করিয়া কত প্রকারেই না তাহাদের (অহংগ্রহোপাসনারূপ মায়াবাদ ভোগবাসনামূলে কর্ত্তৃপদ স্বীকাররূপ) দুষ্ট আদেশ পালন করিয়াছি, তথাপি আমার প্রতি ত' তাহাদের করুণা হইল না। অহো! ইহা দেখিয়াও আমার লজ্জা হয় না, বিরক্তির উদয় হয় না! আর না! আর না!! হে যদুপতে, সম্প্রতি আমি বুঝিতে পরিয়াছি। এখন মনিববেশী ঐ সকল (মায়াবাদ গুরু ও ফলভোগবাদ গুরু) রিপুকে পরিত্যাগ করিয়া—মায়ার চাকরী ছাড়িয়া তোমার অভয়চরণে শরণাগত হইলাম, তুমি এখন আমাকে আত্মদাস্যে নিযুক্ত কর।

অনেক সময় আমরা ভাবিতে পারি, কেন শ্রীরূপ-সনাতন যেমন চাকরী পরিত্যাগের অভিনয় দেখাইয়াছিলেন, তদ্রূপ ভক্তবর্গের মধ্যেও বিভিন্ন সময়ে অনেকে ব্যবসায়, চাকরী প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিয়াছেন! যেমন শ্রীমুরারী গুপ্ত কবিরাজী ব্যবসায় করিতেন, গোপীনাথ পট্টনায়কাদি রাজ-সরকারে কার্য্য করিতেন, মহাপ্রভু ত' তাহাদিগকে আদর করিয়াছেন! ভোগপ্রবণ মনোধর্ম্মিজীব! তোমার বুদ্ধির পরিসর, তোমার দর্শন খুব সীমাবদ্ধ, তাহা জান? তুমি আসল জিনিষটা বুঝিতে না পারিয়া বাহিরের খোসা দেখিয়া আনুকরণিক হইয়া পড়িলে ভীষণ অপরাধ ও তোমার সর্ব্বনাশ কুড়াইয়া লইবে। অধিক প্রমাণের আবশ্যক হইবে না, তুমি বাহ্যে সমস্ত ছাড়িয়া—নিয়ত সাধু- গুরু-সঙ্গে বাসের কপট অভিনয় করিয়াও কৃষ্ণের চাকরীতে মনঃসংযোগ করিতে পার না—মায়ার একটুকু প্রলোভনে অভিভূত হইয়া পড়; দেখ, তোমার বুকে হাত দিয়া বল, তুমি কতটুকু কৃষ্ণসেবা করিতেছ; আর দেখ, যাঁহারা মুক্ত— যাঁহারা তেজীয়ান্—যাঁহারা সমর্থ—যাঁহারা সুবুদ্ধি—সুচতুর, তাঁহারা বাহ্যে চাকরী বা গৃহস্থধর্ম্ম-যাজনের অভিনয় করিয়াও শতকরা শত-পরিমাণ কৃষ্ণসেবা করিতেছেন, গুরু-কৃষ্ণের সন্তোষ বিধান করিতেছেন, নিজে

কৃষ্ণসেবায় পূর্ণ মাত্রায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া জীবকুলকে কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করিতেছেন। তোমার চক্ষে ইতর সাধারণের ন্যায় যাহা চাকরী বা ব্যবসায়, তাহা ভজন-কুশলের নিকট কৃষ্ণসেবায়ই পর্য্যবসিত। তাঁহারা তোমার ন্যায় ফল্গুত্যাগী বা ভোগী নহেন। তাঁহারা এমন ওস্তাদ—সাপ লইয়া খেলা করিতে জানেন; কিন্তু তুমি তাহা অনুকরণ করিতে গেলে মায়ার চাকরীতে আরও অধিকতর ফাঁসিয়া পড়িবে। তোমার জন্যই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

অনাদি করম-ফলে, পড়ি' ভবার্ণব-জলে,
তরিবারে না দেখি উপায়।
এ বিষয়-হলাহলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
মন কভু সুখ নাহি পায়।।
আশা-পাশ শত শত, ক্লেশ দেয় অবিরত,
প্রবৃত্তি-উর্ম্মির তাহে খেলা।
কাম-ক্রোধ আদি ছয়, বাটপাড়ে দেয় ভয়,
অবসান হৈল আসি' বেলা।।
জ্ঞান কর্ম্ম ঠগ দুই, মোরে প্রতারিয়া লই',
অবশেষে ফেলে সিন্ধুজলে।
এ হেন সময়ে বন্ধু, তুমি কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু,
কৃপা করি' তোল মোরে বলে।।
পতিত কিঙ্করে ধরি' পাদপদ্ম-ধূলি করি',
দেহ ভক্তিবিনোদ আশ্রয়।
আমি তব নিত্যদাস, ভুলিয়া মায়ার পাশ,
বদ্ধ হ'য়ে আছি দয়াময়।।

তুমি তোমার নিজের দুর্ব্বুদ্ধি ও স্বতন্ত্রতা ছাড়িয়া দিয়া কৃষ্ণের চাকরী কর; নিজে নিজে ফল্গুত্যাগী বা ভোগী সাজিতে যাইও না। নিজে যাহা করিতে যাইবে, তোমার বিচারে তাহা যতই ভাল বা মন্দ হউক, সেই বিচার ভ্রমপরিপূর্ণ, তাহা কোন দিন তোমাকে মায়ার গোলামী হইতে ছুটী দিবে না। যদি মঙ্গল চাও, তবে শোন,—

"তাতে কৃষ্ণভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ।।"

অপস্বার্থ

'স্বা' শব্দের অর্থ—'নিজ' ও 'অর্থ'-শব্দের অর্থ—প্রয়োজন। নিজের ভ্রান্তিতে যে প্রয়োজনাপলব্ধি হয়, তাহা 'স্বার্থ' বলিয়া নিরূপিত হইলেও উহা নিজ প্রয়োজনের বিরোধী বলিয়া উহাকে 'অপস্বার্থ' বলে।

যাহারা স্বার্থান্বেষী হইয়া স্বার্থের ব্যাঘাত করে, তাহাদের অপস্বার্থপরতার প্রশংসা করিতে পারা যায় না। অনাত্মবস্তুতে আত্মভ্রমই অপস্বার্থানয়নের মূল কারণ। অনেকে কনককামিনী ও জড়প্রতিষ্ঠাশাকেই 'স্বার্থ' মনে করেন। যাঁহারা এরূপ মনে করেন, তাঁহাদের অপস্বার্থ জগতে নানা জঞ্জাল আনয়ন করে।

অপস্বার্থান্ধ জনগণ স্বার্থের স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া স্বার্থকেও তাহার অপস্বার্থের সহিত সমান জ্ঞান করে, কিন্তু নির্ব্বোধ ব্যতীত প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্বার্থ ও অপস্বার্থের বৈষম্য দেখিতে পান। যাহারা ষড়্রিপুর দাস হইয়া নির্ব্বুদ্ধিতাকে 'বিচক্ষণতা' বলিয়া মনে করে, তাহারা সামাজিক প্রীতি রহিত হইয়া অপস্বার্থান্ধ 'কৃপণ'-নামে অভিহিত হয়।

যদিও অপস্বার্থ স্বার্থের ন্যায় প্রতীত হয়, তথাপি স্বার্থ অনুকূলতা প্রসব করে; কিন্তু অপস্বার্থ প্রতিকূলতা আনয়ন করিয়া পরিশেষে অমঙ্গল-কূপে পাতিত করায়। মানুষ অপস্বার্থে পতিত হইলে কামাদি ষড়রিপুর দাস হইয়া ভগবৎ সেবা-বিমুখ হয়, তখন সে বুঝিতে পারে না যে, অপস্বার্থান্ধ হইয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশাযুক্ত ব্যক্তিগণ কিরূপ ভীষণ আত্মহননকার্য্যে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে! প্রকৃত স্বার্থপর জনগণ মহাজনের পথই অনুসরণ করেন। যিনি মহাজনের পথ অনুসরণ করেন, তিনিই 'ভক্ত'। মহতের অনুসরণ ছাড়িয়া যিনি নিজের স্বতন্ত্র মঙ্গললাভের যত্ন করেন, তিনি অপস্বার্থান্ধ। তাঁহার কোন মঙ্গল হয় না, পরন্তু জগতের মঙ্গলের পরিবর্ত্তে নিজেন্দ্রিয়-সুখকামী হইয়া বন্ধুবর্গের বিরাগ ভাজন হন। মাদকদ্রব্যসেবী যেরূপ নিজের অমঙ্গল কামনা করিয়া বন্ধুবর্গের বিরাগভাজন হয় এবং পরিশেষে আত্মবিনাশ কামনা করে, তদ্রূপ তিনি মহাজন অনুমোদিত পথ পরিত্যাগ করিয়া তর্কপথে হাম্বড়া হইবার যত্ন করেন।

শ্রীচৈতন্যদেব এই প্রকার অপস্বার্থান্ধ জনগণের দুঃখমোচনের প্রয়াস করিয়াছেন, কিন্তু যাহারা হাড়ে হাড়ে, অস্থিমজ্জায়, শিরায় শিরায় ঈশ্বরসেবা-বিমুখ হইয়া নিজ কাল্পনিক সুখতৎপর হয়, সেই সকল ব্যক্তিকে তাহাদের মূর্খতার নেশায় অভিভূত রাখেন। যেখানে জগতের সকলের প্রতি প্রীতির অভাব, সেখানে আত্মম্ভরিতা-ক্রমে মহাজন-বিদ্বেষ। কেবল মহাজনের উপর বিদ্বেষ নহে, মহাজনের উদ্দিষ্ট পরম বাস্তববস্তু পরমেশ্বরের প্রতিই প্রবল বিদ্বেষ উদয় হয়।

সাধারণ নীতিবাদী স্বীয় ইন্দ্রিয়সুখপরা নীতিকে বহুমানন করিয়া ধর্ম্মহীন হয়। পারমার্থিক ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া হীনস্বার্থ প্রণোদিত হইয়া তাহারা অপস্বার্থ অন্বেষণ করে। আমরা প্রপঞ্চে প্রত্যহই উত্তরে দক্ষিণে এই প্রকার অপস্বার্থান্ধ জনগণের অনুষ্ঠানিক ক্রিয়া দেখিয়া জগতের বিচার- প্রণালীর বহুমানন করিতে পারি না।

শ্রীচৈতন্যদেব কনককামিনী-প্রতিষ্ঠাশা-রত বিষয়োন্মত্ত জীবকে সত্যের উপদেশ করিয়াছেন বলিয়া তাহারা শ্রীচৈতন্যের প্রতি অত্যন্ত প্রতিকূল আচরণ করে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলে যে, শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশসমূহ—উন্মাদ, জনোচিত। জাপ্তলির মৃত ডাক্তার ভুবনেশ্বর মিত্র প্রকাশ্যভাবে শ্রীচৈতন্যদেবের বিদ্বেষী ছিলেন। এই বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হওয়ায় তাঁহার নিজের ত' কোন মঙ্গলই হয় নাই, পরন্তু স্বার্থজ্ঞানে অপস্বার্থের উদ্দেশে দৌড়িতে গিয়া তাঁহার ঐহিক সুখাদিও বিনষ্ট হইয়াছিল এবং তাঁহার রুচিবিষয়েও কেহই প্রশংসা করিতে পারেন না। এই মিত্র ডাক্তার বাবু ব্যতীত অনেকগুলি জীবিত ও মৃত ডাক্তার শ্রীচৈতন্যের মৌখিক স্তাবক বলিয়া আপনাদিগকে প্রতিপাদন করিতে গিয়াও অধিক সফল মনোরথ হইতে পারেন নাই। কনক-কামিনী ও প্রতিষ্ঠাশা তাহাদিগকে প্রকাশ্যে শ্রীচৈতন্যসেবোন্মুখ বলিয়া দাঁড় করাইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা নিজকৃত কর্ম্মানুষ্ঠানফলে স্ব পদে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। সুতরাং ঐ সকল চেষ্টা—অপস্বার্থ-প্রণোদিত।

কিছুদিন পূর্ব্বে সহর কুলিয়াবাসী কতিপয় মৎসরস্বভাব ব্যক্তি শ্রীচৈতন্য-বিদ্বেষকল্পে কোন কোন ব্যক্তি-বিশেষের কনক বর্দ্ধনের সুযোগ করিয়া দিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা অবৈধ কামরত জনগণের ইন্দ্রিয়পিপাসা সম্বর্দ্ধনের জন্যও গৌণভাবে যত্ন করিয়াছেন। প্রতিষ্ঠাশাকামী মিছা-ভক্ত সম্প্রদায়ের অসৎ উদ্দেশ্য সম্বর্দ্ধন-কামনায় কেবল কুলিয়াবাসী কেন, কলিকাতার কতিপয় অপস্বার্থান্ধ জনও তাহাদের ঐ সকল কার্য্যে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য করিয়াছেন।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, জড়প্রতিষ্ঠাশা-পরায়ণ জনগণের মনস্তুষ্টির জন্য কতিপয় স্তাবক ডাক্তার যে সকল স্তুতিবাদ দ্বারা ব্যক্তিবিশেষের উদ্দেশ্য সাধন করেন, সেই সকল চেষ্টা সাধারণ লোকে বুঝিয়া উঠিতে না পারিলেও যাঁহাদের পূর্ব্বাপর ঐহিত্য জ্ঞান আছে, তাঁহারা ধরিয়া ফেলিতে পারেন। আমরা সারুটিয়াবাসী ডাঃ শ্রীসুন্দরীমোহন দাস ও কাগ্‌মারী অধিবাসী ডাঃ শ্রীরসিকমোহন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ডাক্তারগণের বিচারপ্রণালী অনুমোদন করিতে না পারিয়া পৃথগ্‌ভাবে অবস্থানপ্রণালী অনুমোদন করিতে না পারিয়া পৃথগ্‌ভাবে অবস্থানপূর্ব্বক ভগবৎসেবার প্রয়োজনাধিক্য বিচার করি। মৃত ডাঃ প্রিয়নাথ নন্দী ও তাঁহার শিষ্যপ্রতিম সত্যেন্দ্রাথ বসুর আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপ শ্রীচৈতন্যদেবের পথের অনুগত নহে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। তাঁহারা ভক্তি প্রতিষ্ঠানের বিরোধকল্পে যে সকল প্রবৃত্তি প্রদর্শন করেন, সেই সকল প্রবৃত্তি দ্বারা মুখ্যভাবে জগতের কিরূপ মঙ্গল উদিত হয়, তাহার বিচার সকল সুধীসমাজ করুন্—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

যদি প্রতিষ্ঠাশা-মুগ্ধ কোন ব্যক্তিবিশেষের উপকারার্থ, কোন ব্যক্তিবিশেষের কনকোপার্জ্জনের সহায়তা করিবার জন্য, অথবা সাহায্যকারিসূত্রে তাহাদের অংশগ্রহণে যত্নবিশিষ্ট হইবার জন্য গুপ্ত সঙ্কল্প পোষণ করা যায়, তাহা হইলে উহাকে সরল চেষ্টা বলা যাইতে পারে না। নীতির আবরণে উহা দ্বারা দুর্নীতির পুষ্টিসাধিত হয়।

শ্রীচৈতন্যদেব অপস্বার্থান্ধ জীবহৃদয়ের উপাস্যবস্তু কখনই হইতে পারেন না। তিনি শ্রীগৌরস্বার্থ-সেবকগণেরই একমাত্র আরাধ্য, সুতরাং ভোগী বা ত্যাগীপক্ষি সম্প্রদায়ের আরাধ্য 'নিজের দাঁড়ে ছোলা'—লাভের উদ্দেশে উহারা যে সকল কার্য্য সৎকার্য্যের নামে আহ্বান করে, তাহা কখনই বিদ্বৎসমাজের অনুমোদিত হইতে পারে না।

যখন মুক্তজীবের স্বার্থের কথা বিচারিত হয়, তখন তাহাতে কাম-ক্রোধাদি ষড়্‌রিপুর দাস্য নাই। ইহাদের অনুগমন করিলে জীব কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাশা- মুক্ত হইতে পারে, নতুবা সে ঐ বস্তুত্রিতয়ের লাভোদ্দেশে যে প্রবৃত্তি প্রদর্শন করে, তাহাতে ক্যাঁকড়ার মাঠের জমিগুলি কোন ব্যক্তিবিশেষের বা তাহাদের ভাগিদার ভোগিগণের ক্ষণকালীন কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে; কিন্তু তাহাদের মঙ্গলকামি-জনগণ তাহাদিগকে ঐরূপ অসচ্চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইবার উপদেশ দিয়া থাকেন। তাহাদের মঙ্গলোদয় হইলে ক্যাঁকড়ার মাঠে অবৈধভাবে 'মিঞাপুর' স্থাপন করিতে যাওয়া এবং তদ্দ্বারা নিজে না বুঝিয়া পরোপদেশে পাণ্ডিত্য করিতে যাওয়াকে সুধীসমাজ জুগুপ্সা রতির বিষয় জ্ঞান করেন।

যে কোন উপায়ে কৃষ্ণে মনোনিবেশকারী তাদৃশ নিত্যসেবকগণের যোগ্যতার প্রশংসা করিয়া দর্শকগণও ধন্য হন, আর কৃষ্ণমায়ার দ্বারা বঞ্চিত হইবার উদ্দেশে ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য-প্রদর্শন কল্পে অহঙ্কারবিমূঢ় কনককামিনী প্রতিষ্ঠাশাযুক্ত ব্যক্তির সমষ্টি যে দিকে অগ্রসর হয়, তদ্দ্বারা জগতের অশান্তিই উৎপন্ন হয়। এখন কথা হইতেছে,—হে জীব, তুমি কি সত্যস্বার্থপরায়ণ হইতে গিয়া মহাজনের অনুসরণ করিবে, না অপস্বার্থান্ধ হইয়া কামক্রোধাদির সেবায় উৎকণ্ঠিত হইবে? তুমি স্বতন্ত্র পুরুষ, সুতরাং তোমার স্বতন্ত্রেচ্ছা হইতেই হরিজনসেবা জগতে মহত্ত্ব আনয়ন করিবে, আর তুমি বিপথগামী হইয়া কনক-কামিনী-সেবাপরায়ণ জনগণের সাহার্য্যার্থ যে প্রবৃত্তি দেখাইবে, তাহাতে তোমাকে ক্যাঁকড়ার মাঠে শ্রীচৈতন্যবিদ্বেষের রঙ্গমঞ্চ বাঁধিবার স্থপতিরূপে পরিণত করাইবে। অতএব নিজ স্বার্থপ্রার্থী হইয়া শ্রীধাম মায়াপুরে নিত্যবাস স্থাপন কর, বাহির দ্বীপে কর্কটস্বভাব শিক্ষার জন্য যত্ন ত্যাগ কর।

সুনীতি ও দুর্নীতি

সংসারে যাহা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া প্রতীত হয়, তদ্দ্বারা জগতের মঙ্গল হয় বলিয়া উহাকে 'সুনীতি' বলে। সুনীতি প্রভাবে সাংসারিক অমঙ্গলের কথা থাকে না; কিন্তু যাহাতে নিজের অপকার ও পরের অপকার হয়, তাহা ন্যায়পুষ্ট নহে। উহা অন্যায় ও অবৈধ বলিয়া 'দুর্নীতি' নামে কথিত হয়। যে নীতি বা নীতিবিগর্হিত ক্রিয়া সংসারের অমঙ্গল সাধন করে, তাহা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়—সমাজহিতৈষী সকলেই এই কথা সমস্বরে অভিব্যক্ত করেন। মিথ্যা কথা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিয়া লোককে বিপদে পাতিত করা সামাজিকের চক্ষে ন্যায়সঙ্গত নহে, সুতরাং উহা—দুর্নীতি। পরদ্রব্য অপহরণ, পরদার অপহরণ বা ঐ সকল
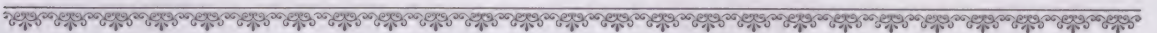
অপকার্য্যের সহায়তা করা, উৎকোচের আদান প্রদানের দ্বারা নিজেকে বা অপরকে লাভবান্ করা—এসকলই দুর্নীতি পর্য্যায়ে গণিত। নীতি-বিরোধী ক্রিয়াগুলি অপরাধ মধ্যে গণ্য হওয়াতে অপরাধীকে পাপী ও দণ্ডযোগ্য বলিয়া বিচার করা হয়, পরহিংসা, পরদ্রোহ স্থূলসূক্ষ্ম-ভেদে নানাপ্রকার পাপ আনয়ন করে। লৌকিক স্মার্ত্তগণ এই সকল পাপের হস্ত হইতে মুক্ত করাইবার জন্য পাশব-নীতি লগুড়ের ব্যবস্থা করেন। মানুষ ক্লেশ চায় না, সুতরাং অপর মানুষের বিবেচনায় তাহাকে ক্লেশের অন্তর্ভুক্ত করাইলে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য শিক্ষালাভ ঘটিবে।

ন্যায় পরায়ণ জনগণকে লোকে আদর করে এবং পুণ্যবান্ বলে। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিগণ পাপের সংসর্গে আত্মনিয়োগ করেন না। পাপী ও পুণ্যবানের কথা জগতে বহু অনাদর ও আদর লাভ করিয়াছে। ইহা কর্ম্মীদিগের কৃত্যের অন্তর্গত হওয়ায় একজন কুকর্ম্মী, অপর জন সৎকর্ম্মী নামে আখ্যাত হন। পাপের ফলে অধর্ম্মবশে জীবের দুর্গতি ও সমাজের অমঙ্গল ঘটে। পুণ্য-প্রভাবে আত্মমঙ্গল সাধিত হয় ও জগৎ পুণ্যবানের ক্রিয়ায় উপকৃত হয়। সুতরাং প্রপঞ্চে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও পুণ্যের সুখাপ্তি-বাঞ্ছা মানবের চিন্তা-স্রোত অধিকার করে। এইগুলি কর্ম্মীর নীতি মাত্র। নৈয়ায়িকগণ কর্ম্মীর নীতিতে আবদ্ধ হইয়া একপ্রকার তর্কহতবুদ্ধিবশে সৎকর্ম্মের পক্ষপাতী হন ও ভ্রান্তগণের প্রতিকূলে স্বীয় অভিপ্রায় জানাইতে সঙ্কোচবোধ করেন না। জীব যখন আপনাকে সংসারের, সমাজের অংশবিশেষ মনে করেন, তখন তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি উপকারকারীর সহিত সহযোগ ও অপকারকারীর সহিত অসহযোগ-নীতি অবলম্বন করে।

জ্ঞানিগণ জাগতিক কোন বস্তুর সহিত প্রীতি স্থাপন ও সৌহার্দ্দরহিত ভাবে আবদ্ধ হইবার বিচার করেন না; তাঁহারা প্রকৃতি সর্গের অতীত বিষয়ের জন্য অগ্রসর হন।

এই প্রকার কর্ম্মাগ্রহীর বিচারে সংসারে যোগপদ্ধতির আহ্বান লক্ষিত হয়। নিবৃত্তজীবনই পাপপুণ্য হইতে জীবকে রক্ষা করিয়া শান্তি দিবে,—এইরূপ ধারণা প্রবল করায়; তখন তিনি পূর্ব্বের পাপ হইতে নিবৃত হইয়া নির্জ্জনবাস ও জাগতিক কার্য্যে নিরুৎসাহিতা প্রদর্শন করেন। তাঁহার এতাদৃশ কার্য্য-সমর্থনের জন্য যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি প্রভৃতি আলোচ্য হইয়া পড়ে। কর্ম্মবীরসমূহ জাগতিক বিচারের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বহির্জগতের স্থূলসূক্ষ্ম বিষয় হইতে স্বীয় চিত্তকে নিবৃত্ত করিবার জন্য যত্নবন্ত হন। কখনও বা বিচারাশ্রয়ে লৌকিক ন্যায়ানুগমনে সকল বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া নির্ব্বিশেষ বা কৈবল্য-বিচারকে আদর করিতে থাকেন। বুভুক্ষু সম্প্রদায় যেরূপ ভোগ তাড়নায় আপনাকে ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগে নিযুক্ত করে, নিবৃত্তিপরা রুচি সেরূপভাবে জীবকে কর্ম্মবীর সাজাইবার পরিবর্ত্তে ফলভোগবাসনা-রহিত জ্ঞানবীর সাজাইবার উত্তেজনা-মূলা রুচি প্রদান করে। ইহাও কর্ম্মচেষ্টার রূপান্তর মাত্র। তজ্জন্য ইহাকে জ্ঞানচেষ্টা-বিচারে নৈষ্কর্ম্মবাদে প্রতিষ্ঠিত করাইয়া জাগতিক জাড্যই আরাধ্য বলিয়া প্রতিপাদন করে। নৈষ্কর্ম্মবাদের যে চিত্র নিবৃত্ত-জীবনে কর্ম্মীর নয়নে পরিদৃষ্ট হয়, তাহা প্রবৃত্ত- কর্ম্মি-সম্প্রদায় কেহ বা ভালচক্ষে, কেহ বা মন্দচক্ষে দেখিয়া থাকেন।

আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া যাঁহারা সঙ্গত বিবেচনা করেন না, তাঁহারা ভিক্ষা-জীবিগণকে আদর করিতে পারেন না। তাঁহারা জানেন যে, তাদৃশ নিশ্চেষ্ট জীবন জীবকে কুকর্ম্মে লইয়া যাইবে, সুতরাং কর্ম্মময় প্রবৃত্ত জীবনই জীবের পক্ষে বরণীয়-বিচারে নৈষ্কর্ম্মবাদের হেয়তা প্রতিপাদন করিতে রুচি পোষণ করেন। তাঁহারা জ্ঞানিগণকে নির্ব্বিশিষ্ট ও কর্ম্মজগৎ হইতে নিবৃত্ত মনে করিয়া তাহাদের সঙ্গের আদর করেন না। আবার বহির্জ্জগতের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ায় যাঁহারা ক্লান্ত হইয়া ''আর নারে বাপ্'' বলিয়া স্তব্ধ হন, তাঁহাদের রুচিও সুষুপ্তিপর নির্ব্বিশিষ্ট-বিচারের অনুমোদন করে। কর্ম্মফলভোগপরবিচার আত্মজ্ঞানরাহিত্যে প্রকৃতিতে লীন হইবার যত্ন দেখায়, আর কতিপয় ব্যক্তি মুক্ত অবস্থায় নির্ব্বিশিষ্টপর বিচারে নিমগ্ন হইয়া কেবল-চেতন নামক চিন্তা-স্রোতের প্রাধান্য দিয়া থাকেন। নৈষ্কর্ম্মবিচারে অচিন্মাত্রবাদ ও চিন্মাত্রবাদ নামক দুইটী বিচারই ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মন করেন, সেই জন্য তাঁহারা পরস্পরের বৈষম্য নিরাকরণপূর্ব্বক সমন্বয়বাদী হইয়া চেতনের নিত্যাধিষ্ঠানে রাহিত্য ও সাহিত্যের মধ্যে ভেদ অপসরণ করেন। এই অচিন্মাত্রবাদী ও চিন্মাত্রবাদী, উভয়ের অবস্থার বৈষম্য কর্ম্মবাদের অন্তরালে দৃষ্ট হইলেও উভয়েই যে নাস্তিক্য ও আস্তিক্য-বাদ স্থাপন করেন, তন্মধ্যে অনেক সময় পার্থক্য স্থাপনের আবশ্যকতা থাকে না বলিয়া চিদ্বিলাসপরায়ণ সম্প্রদায় এই বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু সম্প্রদায়কে আদর করিতে পারেন না। মানবের জাগতিক চিন্তা-প্রাচুর্য্যে অচিন্মাত্র ও চিন্মাত্রবাদে তাহাদের অপূর্ণতা পূর্ণতা লাভ করে; যেহেতু চিদ্‌বিলাসবাদের অবিমিশ্র অস্তিত্ব তাহাদের হৃদয় সিংহাসনাধিরূঢ় হয় না। চিদ্‌বিলাসবাদ চিন্মাত্রবাদের সহিত এক পর্য্যায়ে গণিত হইবার বিচারে অচিন্মাত্রবাদী কর্ম্মচেষ্টাপর জনগণের চক্ষে দৃষ্ট হন। কিন্তু উহাদের পরস্পরের বৈষম্যনিরূপণ করিতে প্রপঞ্চোন্মত্ত বুভুক্ষু জীবকুল সমর্থ হয় না। বুভুক্ষু ও মুমুক্ষা এবং এতদুভয়ের ন্যায় ও অন্যায়, বৈধ ও অবৈধ বিচার চিদ্‌বিলাস-ভূমিকায় যাইতে অসমর্থ। মুমুক্ষুর জ্ঞান-পদ্ধতির অনুকূলে যে সকল ন্যায় বর্ত্তমান, তাহার সহিত অচিন্মাত্রবাদী কর্ম্মীর বিচার-প্রণালীর সঙ্গতি নাই। বদ্ধের মোচন- চেষ্টা মুক্তের সেবন-চেষ্টা হইতে পৃথক, কিন্তু বুভুক্ষু তাহা বুঝিতে অসমর্থ চিদ্‌বিলাসবাদকে অচিন্মাত্রবিলাসবাদে পর্য্যবসিত করিবার জন্য ব্যগ্র হন। আমরা এই প্রকার ন্যায়ের অনুকূল স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতে পারি না। জাগতিক ভূমিকায় জাগতিক ভূতাকাশে যে সুনীতি ও কুনীতির বিভাগ পরিদৃষ্ট হয়, সেই বিভাগ চিদ্‌বিলাসময় পরব্যোমে লইয়া যাওয়া ক্ষীণবুদ্ধির পরিচয় মাত্র। চেতনের বিলাসে স্থূলতা নাই বা জাগতিক সূক্ষ্মতার প্রতীতির অভাব।

জীব যখন বুভুক্ষা-নীতি পরিহার করিয়া মুমুক্ষা-নীতির ঢক্কা-বাদক সাজেন, তখন তিনি অচিন্মাত্রবাদ পরিত্যাগ করিয়া চিন্মাত্রবাদের-সম্মান করিতে করিতে যে আত্মবিনাশ করেন, তাহাতে চিদ্‌বিলাস-বিচারের উপযোগিতা নাই। মুমুক্ষুর নীতি ও দুর্নীতি বিচার-পর্য্যায় বুভুক্ষুর পক্ষে সঙ্গত হয় না; আবার বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুর নীতির, বুভুক্ষা-মুমুক্ষাচাঞ্চল্য-রহিত জনগণের পক্ষে উপযোগিতা নাই। চিদ্‌বিলাসবাদের নীতি মুমুক্ষুর চিন্মাত্রবাদের নীতির সহিত প্রচুর ভাবে ভেদভাব জ্ঞাপন করে। মুমুক্ষু যেকালে মায়াবাদী সাজিয়া ব্রহ্মবাদ ও প্রকৃতিবাদের বৈষম্য অপসারিত করিয়া অদ্বয়তায় প্রতিষ্ঠিত করেন, তৎকালে চিদ্‌বিলাসের

বিচিত্রতা তাঁহার পক্ষে দুরারোহ হইয়া পড়ে। আধ্যক্ষিক জড়দর্শন ও আধ্যক্ষিক জ্ঞানপ্রমত্ত চিন্মাত্রদর্শন তাঁহাকে প্রপঞ্চের ধূলিতে লুটাইয়া দেয়। সুতরাং পরব্যোমের বিচিত্রতা তাঁহার দর্শনের অতীত ব্যাপার হইয়া পড়ে। বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা—এই বাসনা-পিশাচীদ্বয় তাঁহার অস্মিতার জননী বা ধাত্রী-বিচারে পরিদৃষ্ট না হইলে তিনি ভক্তিসুখ সমুদ্রের সন্ধান লাভ করেন; কিন্তু ভুক্তি ও মুক্তি, পিশাচীদ্বয়ে তাহার জননী বোধ থাকিলে ভক্তির নিরুপাধিক ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া চিদ্‌বিলাস-বৈচিত্র্যের মঙ্গলময়তায় অবস্থান তাঁহার পক্ষে দুর্ল্লভ হইয়া পড়ে।

জ্ঞানীর নীতিতে কর্ম্মপথ বা উপাসনা-পথের আদর নাই। তিনি চিদ্‌বিলাস- ময়ী উপাসনাকেও জড়ের বিলাসের সহিত সমস্তরে স্থাপন করায় তাঁহার ন্যায় নৈয়ায়িক চিদ্‌বিলাসের নিত্যাবৃত্তি ভক্তিকেও ক্ষণভঙ্গুর কামক্রোধাদি পর্য্যায়ে গণনা করেন। সুতরাং নির্ব্বিশিষ্ট জ্ঞানীর আত্মপ্রতারিত বোধের মধ্যে অনাত্মরূপ দুঃসঙ্গ থাকায় সৎসঙ্গাভাবে ভক্তি-সুনীতিকে দুর্নীতিপর্য্যায়ে গণনা করিবার ধৃষ্টতা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। জড়েন্দ্রিয়ের অসতী উত্তেজনা তাঁহার ধৈর্য্য বিলুপ্ত করিয়া চিদ্‌বিলাস বৈচিত্রের প্রতিকুলে ভক্তিবিচারে দুর্নীতিপুষ্ট জড়- নির্ব্বিশিষ্ট জ্ঞানাবলম্বী আসামীমাত্রে পরিণত করে; সুতরাং নির্ব্বেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসু জ্ঞানীর দুর্ব্বলতা ও কপটতা—ভগবদ্ভক্তি নীতিপরায়ণের দুর্নীতি মাত্র। ভক্তিপরের সুনীতি—কেবল ভগবৎ-সেবাময়ী; তাঁহার কেবলাভক্তিতে অবস্থান বিষ্ণু মায়ার সহিত সম্বন্ধরহিত হইয়া বিষ্ণুমায়া-রচিত নির্ব্বিশিষ্ট ভাবমাত্রের প্রতি সমাদর দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে না। তিনি কর্ম্মীর সুনীতি, জ্ঞানীর সুনীতি, কর্ম্মীর দুর্নীতি ও জ্ঞানীর দুর্নীতিকে সমপর্য্যায়ে দেখিবার নিরপেক্ষতা লাভ করায় তাঁহার সুনীতির পরমোচ্চ আসন দর্শন করিতে উন্নতিকামী জড়ভোগপর কর্ম্মী বা নির্ব্বেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসু প্রকৃতিবাদী প্রচ্ছন্ন মায়াবাদী নাস্তিক জ্ঞানী চিদ্বিলাসরাজ্যের সুনীতি ও দুর্নীতি বিচারসৌষ্ঠব দর্শন করিতে অসমর্থ।

কৃষ্ণতত্ত্ব

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কৃষ্ণতত্ত্বের প্রকৃত সন্ধান দিয়াছেন। কৃষ্ণতত্ত্ব হইতেই সমগ্র ব্যক্ত ও অব্যক্তভাব এবং স্থূল-সূক্ষ্ম উপাধি প্রকাশিত হইয়াছে।

কৃষ্ণ—পরমেশ্বর, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অনাদি, সর্ব্বাদি, গোবিন্দ ও সর্ব্বকারণকারণ।

কৃষ্ণ কাহারও অন্তর্গত, বশীভূত বস্তু নহেন। তাঁহারই বশীভূত—প্রকৃতি, কাল, কর্ম্ম ও ব্যোম। তিনি নিত্য অজ্ঞানাস্পৃষ্ট ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়। তিনি ক্ষণভঙ্গুর নহেন। কোন অজ্ঞানই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি পূর্ণ- জ্ঞানময় ও নিরানন্দের সহিত অসংপৃক্ত। দুঃখাদি তাঁহার নিকট হইতে পারে না।

কৃষ্ণ—পুরুষোত্তম। তিনি প্রাপঞ্চিক ধারণায় গুণ সাম্যবস্থ অব্যক্ত প্রকৃতি মাত্র নহেন। তিনি নির্ব্বিশিষ্ট না হইয়া বিগ্রহবিশিষ্ট; জড়ের ত্রিগুণ বা জীবের ইন্দ্রিয়জজ্ঞানোত্থ সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণ-চালিত স্থূলসূক্ষ্ম-

পরিচ্ছিন্ন বস্তুবিশেষ নহেন। অখণ্ডকাল তাঁহা হইতে সৃষ্ট, তাঁহাতেই অবস্থিত, তাঁহাতেই অখণ্ডত্বের প্রতিকূল খণ্ডত্বভাব প্রদর্শন করিয়া খণ্ডকালাতীত বস্তু। তিনি ভূতাকাশ ও পরব্যোমের সৃষ্টির ও প্রাকট্যের পূর্ব্বে আদি জনক পুরুষ।

দৃশ্যকার্য্যের কারণ অনুসন্ধান করিলে যে কারণ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অন্তর্গত হয়, সেই কারণরূপ কার্য্যের প্রাগ্ধারায় যে কারণ নির্ণীত হয়, তাহা কার্য্য-জ্ঞানে পুনরায় কারণের অনুসন্ধান হইতে পারে। এই ধারা পুনঃপুনঃ অনুসন্ধান করিয়া যেস্থলে কার্য্যকারণবাদ সমাপ্তি লাভ করিবে, তাহাই শ্রীকৃষ্ণ। ইতিহাসজ্ঞ তাঁহাকে দেশকালপাত্রের অন্তর্ভুক্ত করিতে সমর্থ হয় না, যেহেতু তিনি অজিত। তিনি প্রপঞ্চের অন্তর্গত বস্তুবিশেষ হইলে এবং তুরীয়বস্তু না হইলে তাঁহাকে 'পরতত্ত্ব' বলিবার পরিবর্ত্তে ইতরতত্ত্ব বলা যাইত। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণিত কৃষ্ণমাত্র নহেন। তিনি শ্রীচৈতন্যের 'নাম-নামী অভিন্ন'-বিচারের উদ্দিষ্টবস্তু। কৃষ্ণ—পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য, মুক্তধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তু। কৃষ্ণ—চিন্তামণি, তাঁহার নামও সর্ব্বকামদুঘ। তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলাময় ভাবসমূহ হইতে যাঁহার ভাব, সেই বস্তুসমূহ পৃথক্ নহেন; এজন্যই তিনি অদ্বয়জ্ঞান।

তিনি—অজ ও শাশ্বত। দ্বাপরান্তে যে তাঁহার আবির্ভাবের কথা বর্ণিত আছে, তাহা তাঁহার প্রপঞ্চে প্রাকট্য মাত্র। তৎকালে পৃথিবীতে অপ্রাকৃত তত্ত্বের প্রকাশযোগ্য অনুভূতি অবতরণ করিয়াছিল বলিয়া নিত্যকাল অজের কালাধীনত্বে জন্ম স্বীকার করিতে হইবে না। তাঁহার জন্ম ও বিক্রমসমূহ নিত্যকাল পরব্যোম-ভূমিকায় অবস্থিত। সেই চিন্ময়-আধার বা পরব্যোম অচিৎপ্রপঞ্চের স্থূলসূক্ষ্মাধারের অন্তর্ভূত ও বহির্ভূত—বহিরন্তের মধ্যে অনুস্যূত ও পরিস্ফুট। পরিস্ফুটাবস্থায় তাঁহার অনন্ত বৈচিত্র্য অব্যক্তাবস্থায় তাঁহার অত্যধিক সূক্ষ্মতা। তিনি অতি দূরে ও নিতান্ত অন্তিকে এবং সর্ব্বদা ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত। তিনি প্রকাশিত হইবার কেবলাযোগ্যতা লইয়া সুপ্ত, নিদ্রিত ও অপরিচিত থাকেন না। তাঁহার যখন ইচ্ছা হয়, তখনই তিনি প্রকাশিত হন যাঁহার প্রতি তাঁহার দয়া হয়, তাঁহাতে।

কৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি বর্ত্তমান। এই সকল শক্তির পূর্ণতা তাঁহাতেই আছে এবং অন্যত্র পূর্ণতা থাকিলেও তাদৃশ ধারণাকারীর পূর্ণতা-ধারণা অপূর্ণ হওয়ায় তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতার সহিত তদিতর বস্তুর বিজ্ঞতা সমান নহে বলিয়া তিনি অসমোর্দ্ধ। তিনি পুরুষোত্তম হইয়া অবস্থিত বলিয়া অখণ্ড ও খণ্ড-ভাবদ্বয় তাঁহার দুইপার্শ্বে অবস্থিত। খণ্ডিতজ্ঞানে যে পঞ্চাঙ্গন্যায় মানবের নৈতিকধর্ম্ম পুষ্টি করে, তিনি তন্মাত্রে অবস্থিত নহেন। তাঁহার অধিষ্ঠান দ্বারাই তন্মাত্রতাভাব ন্যায়-সঙ্গত বলিয়া ভাবের উদয় করাইয়াছে। মানবের ধারণায় যে দিব্যজ্ঞান লাভ ঘটে, তাহার সর্ব্বোচ্চ আরাধ্য-বিচারে তিনিই অবস্থিত। আরাধ্যবস্তু বিভিন্ন প্রকাশসমূহের মধ্যে কৃষ্ণতত্ত্বকে কেহই প্রকাশমাত্র জ্ঞান করেন না, যেহেতু তাঁহা হইতে সকল প্রকাশ উৎপত্তিলাভ করিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"

কৃষ্ণ—স্বয়ং কান্ত ও ঐকান্তিক একান্তিগণের কান্ত। কৃষ্ণ—বাল, বালগোপাল এবং যাবতীয় পিতৃ-মাতৃকুলে একমাত্র উপাস্য বালক। কৃষ্ণ—জগদ্বন্ধু, তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব না করিলে জীব শত্রুপুরীতে অরিগণকে 'মিত্র' বলিয়া গ্রহণ করায় বিপৎসঙ্কুল হয়। কৃষ্ণেতর বস্তুতে ঈশ্বরজ্ঞানে সেবা করিতে গেলে কিছুদিন পরে সেবক স্বীয় ক্ষণভঙ্গুর সেবা-ধর্ম্ম পরিহার করিয়া সেব্য হইয়া পড়ে। তখন তাহার ভূতশুদ্ধির পরিবর্ত্তে দুর্ব্বিপাক-বশতঃ সেব্যাভিমান হওয়ায় জাড্য আসিয়া তাহাকে পশু, উদ্ভিদ্ ও প্রস্তরধর্ম্মের আসামী করিয়া তোলে। কৃষ্ণের লীলায়, নীতিকথায়, বিচারকথায় বাধা দিতে গেলে তাঁহার পরিমিতিকার্য্যে দশ অঙ্গুলি কম পড়িয়া যায়।

কৃষ্ণ—সদানন্দময়। মায়িকবিচারে ময়ট্-প্রত্যয়-দ্বারা জীবজ্ঞানে প্রচুর বলিয়া গৃহীত হন, আবার বৈকুণ্ঠজ্ঞানে সর্ব্বব্যাপকতা ও তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না। ভাগ্যহীন জনগণ তাঁহাকে সঙ্কীর্ণ মানবনীতির দ্বারা মাপিতে গিয়া পাশবদ্ধ হইয়া পড়ে। তাহারা পরিচ্ছেদ প্রভৃতি সীমা-দ্বারা মাপিতে গিয়া পাত্রান্তরিত করিয়া বসে। তাহাদের জড়ীয় ভোগময়ী অভিজ্ঞতার ভোগ্যবস্তুরূপে কৃষ্ণকে কল্পনা পূর্ব্বক মায়িকবস্তু বিশেষরূপ অবজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত করায় তাহাদের সেবা-প্রবৃত্তি ভোগে পরিণত হয়। কৃষ্ণের সর্ব্বশক্তিমত্তা বিচার করিয়া, যাহার যেরূপ বিমুখকল্পনা, তদ্রূপ তাঁহাকে মনগড়া পুতুল করিতে চায়। কোন সময় বা তাঁহার নির্ব্বিশিষ্ট নামক মানবধারণার কারখানায় গড়া 'পুতুল' করিতে চায়। এই প্রকার কল্পনা সেবা-বিমুখতা হইতে দাম্ভিকতায় পরিণত করে বলিয়া দণ্ডস্বরূপে জীবধারণায় ব্রহ্ম ও পরমাত্মা-শব্দ দ্বারা কৃষ্ণজ্ঞান হইতে পার্থক্য কল্পনা করায়। কার্ষ্ণ বা ভাগবতের সেবা না করিলে কৃষ্ণানুশীলনে কাহারও অধিকার হয় না। সুতরাং অধিকার না পাইলে কৃষ্ণজ্ঞানের সম্ভাবনা নাই, কৃষ্ণের সান্নিধ্যলাভের সম্ভাবনা নাই অথবা কৃষ্ণশক্তির বিক্রমসমূহ শ্রবণ করিবার অধিকার নাই। সুতরাং অনধিকারিগণ কর্ম্মফল-বাধ্য হইয়া বিভিন্ন প্রতীতিযুক্ত জড়াবৃত স্থূলসূক্ষ্ম পরিচয়ে খণ্ডকালের আলিঙ্গন করেন।

বদ্ধ জীবের নিত্যসত্য, নিত্য-স্থিতি প্রভৃতি আধারলাভের সম্ভাবনা নাই। তিনি সর্ব্বদা বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া চতুর্দ্দশভুবন ভ্রমণ করিবার জন্য প্রাণিবিশেষ হইয়া পড়েন। ভোগ আসিয়া তাঁহাকে 'ভোগী' বা ভোগ ছাড়াইয়া 'ত্যাগী' করায়। ভালমন্দের বিচারে একদিক হইতে অপরদিকে তাড়িত হন, পুনঃ পুনঃ তাড়নায় তাঁহার মঙ্গলের উদয় হয়। এই সত্যানুভূতি তাঁহাকে ভজন-রাজ্যে প্রবেশ করায়। তজ্জন্য শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা বলেন,—

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তোজিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।।"

শ্রীধাম বিচার

শ্রীনবদ্বীপ নগর বহুদিন হইতে বঙ্গের পূর্ব্বগৌড়ের রাজধানীরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। শ্রীনবদ্বীপ পাণিনি-কথিত গৌড়পুরের প্রাচীন স্মৃতির ধারায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত নগর। সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে পালবংশীয় নরপতিগণ সুবর্ণ-বিহারে রাজধানী স্থাপন করেন। সুরবংশীয়গণ সুরডাঙ্গা বা সরডাঙ্গায় রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। শ্যেনবংশীয় রাজগণ শ্যেনডাঙ্গায় বাস করেন। তাঁহাদেরই বংশধরগণ মায়াপুরে যে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাই অদ্যাপি বল্লালের ঢিবি বা প্রাসাদ ভগ্নাবশেষরূপে বর্ত্তমান। এই বংশের দ্বিতীয় লাক্ষ্মণেয়ের অশীতিবর্ষ কালে বঙ্গের রাজধানীর গৌরবসূর্য্য অস্তমিত হইয়াছিল।

ভগীরথী-তীরে বহুদিন হইতে শিক্ষাকেন্দ্ররূপা ঋষিনীতির অভ্যুদয় লক্ষিত হয়। শ্যেনবংশীয় রাজগণের সভায় সেই বিদ্যা প্রতিভার চরম উন্নতি হইয়াছিল। সেই সভায় কবিবর শ্রীজয়দেব 'গীতগোবিন্দ' নামক অষ্টাধ্যায়ী গীতিকাব্য রচনা করিয়া শ্যেনবংশীয়গণের অভ্যুদয়-কালে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতিভালোক বিকীর্ণ করিয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন, শ্যেনবংশীয় রাজগণের বিষ্ণুভক্তির প্রাধান্য ছিল না, কিন্তু শ্রীগীতগোবিন্দ-লেখকের তাৎকালিক অবস্থা হইতে জানা যায় যে, শ্যেনবংশীয় ভূপতিগণ শ্রীরাধাগোবিন্দের দাস্যের পরমোৎকর্ষ আস্বাদনে নিরত ছিলেন। কাহারও মতে, ঋষি-নীতির চরমোৎকর্ষই বিষ্ণুভক্তি এবং বিষ্ণুভক্তির চরমোৎকর্ষ শ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবা-সাহিত্য—শাক্তেয় মতবাদের অন্তরায়।

গৌড়পুরের ব্রহ্মশোভা রাজশ্রীর দ্বারা পুনঃসম্বর্দ্ধিত হইয়া যে বিষ্ণুভক্তির প্রবল উৎস গীতগোবিন্দে স্থান লাভ করিয়াছে, তাহাই শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যায় প্রতিষ্ঠিত। বিশুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের উপাসনা-প্রণালী সুষ্ঠুনীতির উপর সম্বর্দ্ধিত, কিন্তু অপাত্রে পড়িয়া উহা বৌদ্ধমহাযান-সম্প্রদায়ের প্রাকৃত-সাহজিকতায় পরিণত হইতে চলিয়াছে। কেহ কেহ ভ্রান্তির বশবর্ত্তী হইয়া মনে করেন যে, বৌদ্ধগণের অশ্বঘোষীর বিচারানুসারে প্রাকৃতসহজিয়া মতই শ্রীচৈতন্যদেব বলেন,—

"প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর।।"

গৌড়দেশের ঐতিহ্য-পাঠক সকলেই জানেন যে, গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচারক শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি মহানুভব বৈষ্ণবগণের পশ্চাদ্দৃশ্যমধ্যে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি শুদ্ধভক্তগণের গীতি বর্ত্তমান। সেই গীতিসমূহের পূর্ব্বে বাংলা- ভাষার পরিচয় জানিতে হইলে সুললিত গীতগোবিন্দ কাব্যকেই আকরস্থানীয় জানা যায়। সেই অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থই শ্রীমদ্ভাগবতের পরিশিষ্ট বিচারে প্রচুর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। শ্রীবৃষভানুনন্দিনী-বিরোধি সম্প্রদায় শ্রীরাধাতত্ত্বকে কালাধীন করিতে গিয়া ঋক্-পরিশিষ্টবচনের অবহেলা করিয়া থাকেন। নিম্বগ্রামের বা মুঙ্গের পত্তনের ক্ষেত্রোৎপন্ন শ্রীনিম্বভাস্কর সর্ব্বাগ্রে শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনায় দীক্ষিত ছিলেন বলিয়া যে ধূয়া উঠিয়াছিল, উহা অকিঞ্চিৎকর ভিত্তিতে অবস্থিত।

প্রাকৃত সহজিয়া-কুল যেভাবে প্রাকৃত জগৎ হইতে অধিরোহপথে গমন করিয়া সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিবার প্রয়াস করে, সেইরূপ প্রয়াসের কোন উপযোগিতা আমরা অপ্রাকৃত মধুর-রতিতে লক্ষ্য করি না। যাহারা হরি- বিমুখ, তাহাদের গত্যন্তর না থাকায় সকল বিষয়ই প্রকৃতির অঙ্কে লালিত, পালিত ও সম্বর্দ্ধিত বলিয়া মনে করে। কিন্তু শব্দশক্তিতে বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি বর্ত্তমান থাকায় অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি দুর্ব্বল-হৃদয়ে শব্দ দ্বারা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-তর্পণের দিকে চালিত করায়, তজ্জন্যই সকলে দুঃসঙ্গ-পরিত্যক্ত ত্যক্তগৃহমেধযজ্ঞ কৃষ্ণসেবনোন্মুখের অনুসরণ করিতে গিয়া কেহ কেহ তাঁহার অনুকরণ করিয়া বসে, তাহার ফলেই নবরসিক-সম্প্রদায়ের চিন্ময়রসের বিকৃত তাণ্ডবনৃত্য।

নিম্বগ্রাম বা মুঙ্গেরপত্তনের অধিবাসী নিমানন্দ—গৌরসুন্দরের গৌণ পরিদর্শক মাত্র। বহু অনুসন্ধানেও মুঙ্গের পত্তন বা নিম্বগ্রামের সন্ধান পাওয়া যায় না। কেবল কিম্বদন্তী এই যে, উহা দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত। যদি কেহ প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান করিয়া থকেন, তাহা হইলে অবিসম্বাদিত সুন্দর ভট্টাদির সম্বন্ধে প্রকৃত প্রস্তাবে আলোচনা করাই সঙ্গত। ভাস্কর-ভাষ্য প্রভৃতি দ্বৈতাদ্বৈত বিচারপূর্ণ গ্রন্থ কোন্ সময় রচিত হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক। কেনই বা হরিব্যাস ও কেশব ভট্টাদি গৌড়ীয়ের গীতগোবিন্দ প্রভৃতি পাঠ করিয়া ভগবদ্- ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহার মূলানুসন্ধানে বিরত হওয়া গৌড়ীয়গণের কর্ত্তব্য নহে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের পশ্চাদ্‌দৃশ্যরূপে শ্রীঠাকুর বিল্বমঙ্গল, শ্রীল জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস প্রভৃতি বর্ণিত হন। তাঁহারা কি সকলেই অশ্বঘোষ-মতাবলম্বী প্রাকৃত সহজিয়া? প্রাকৃত সহজিয়াগণ বলেন,—তাঁহারা তাহাই, যেহেতু নবরসিক-সম্প্রদায় তাঁহাদের মত পোষণ করেন। কিন্তু গৌড়ীয়গণের আরাধ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ অভিন্নতনু শ্রীগৌরসুন্দর অপ্রাকৃত বৃন্দাবন-লীলায় যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতগোবিন্দের পূর্ণতম বিকাশ। তাহার অনুকরণে পুষ্টিমার্গের পুষ্টি ও নিম্বার্কের "দশশ্লোকী" প্রভৃতি পল্লবিত হইয়াছে।

শ্যেনবংশীয়গণের রাজকবি শ্রীজয়দেব কবিরাজ বঙ্গদেশীয় বহু কবিরাজগণের আকর-স্থানীয়। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যে সকল রাধাগোবিন্দ উপাসক গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের সহিত বিরোধ ও প্রীতি সংস্থাপন করিতেছেন, শত্রু-মিত্রভাবে তাঁহাদের উপযোগিতা আমরা একেবারে অস্বীকার করিতে পারি না।

সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা বেদে, রামায়ণে, মহাভারতে, উপনিষদে, ব্রাহ্মণে এবং নানাস্থানে পশ্চাদ্ দৃশ্যরূপে মনীষিগণের চিত্ত ন্যূনাধিক আকর্ষণ করিয়াছে। কেবল যে ভারতীয় ধর্ম্ম-বিকাশে এই চিন্তা-স্রোতের স্থান লক্ষিত হয়, এরূপ নহে। নজরথের ধর্ম্ম প্রচারকের চিত্তবৃত্তিতেও ভগবৎ সেবার কিয়ৎপরিমাণ দেশকাল-পাত্রোচিত ভাবের কথা অস্বীকার করা যাইতে পারে না। কিঞ্চিজ্‌জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তিতে যে জড়নীতি প্রাধান্য-মূলে চিন্নীতির গর্হণ দেখা যায়, তাহা পরবর্ত্তিকালে বিচার-ভ্রান্তি-মূলে উদ্ভূত। অপ্রাকৃত শ্রীরাধা-গোবিন্দলীলায় জড়নীতি-শ্রদ্ধ ধর্ম্মজগতের শৈশব-বিচার-ধারায় যে গর্হণ দেখা যায়, তাহার মূল্য কত, সুধীগণ তাহা নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবেন। প্রাকৃত সহজধর্ম্ম অপ্রাকৃত সহজধর্ম্মের কিরূপ বৈরিতা-সাধন

করিয়াছে, তাহার আলোচনা করিলেই জানা যায় যে, বস্তুর ভোগময়-দর্শন ও বাস্তব-বস্তুর নিত্যসেবোন্মুখ-দর্শনে আকাশ-পাতাল ভেদ বর্ত্তমান।

প্রাকৃত সাহজিকগণ তাঁহাদের পূর্ব্বে গুরুদিগের দুর্নীতিপূর্ণ শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়া অপ্রাকৃত সহজতত্ত্বে সাধারণের অধিকার বঞ্চিত করিয়াছেন। সাধারণ জনগণ দুইভাগে সৃষ্ট হইয়া আধ্যক্ষিক ও অধোক্ষজ বিচারমূলে পরস্পর পার্থক্য স্থাপন করেন। এই ভেদবাদ যে স্থলে অস্বীকৃত হইয়াছে, তথায়ই প্রাকৃত- সহজিয়া দুর্নীতি পোষণ করিবার পরম সুযোগ পাইয়াছেন। অপরদল ''সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মে কলঙ্ক আছে'' বিচার করিয়া আত্মবঞ্চিত হইয়াছেন। তাঁহারা প্রাকৃত সাহজিকগণকে বিষ্ণুভক্তির অধস্তন জানিয়া সত্যবিমুখ হইয়া পড়িয়াছেন।

প্রাচীন গৌরপুর শ্রীনবদ্বীপ-নগর ভাগীরথীর কুলে বিস্তৃত হইয়া অনেক গ্রাম-নগরাদির আবাহন করিয়াছে। কালপ্রভাবে রাজশ্রী ক্ষুণ্ণ হইলেও শ্রীমায়াপুর- নবদ্বীপে বিদ্যার প্রবল স্রোত বিপন্ন হয় নাই। নানাদিগ্‌দেশ হইতে বিদ্যার্থিগণ ও অধ্যাপকগণ আসিয়া প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরের শোভা সংবর্দ্ধন করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। গৌড়পুর-নবদ্বীপ নদীমাতৃক-দেশ বলিয়া পরিণামশীল ভূমিকায় অকিঞ্চিৎকরতা-প্রতিপাদনে কোনদিনই বিমুখ হয় নাই। সুতরাং বিদ্যার্থী অধিবাসিগণ স্রোতস্বতী জননীর বিভিন্ন ক্রোড়ে কালে কালে পালিত হইয়াছেন ও হইতেছেন।

বিংশ শতাব্দী ও ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গৌড়ীয় বিদ্যা-কেন্দ্র ও তীর্থবাসী যাত্রিগণের স্থান দিবার জন্য কোলদ্বীপে সহর নবদ্বীপ বসিয়াছে। অপরাবিদ্যার অনুশীলনে মুগ্ধ হইয়া চিরদিনই দেশ-বিদেশ হইতে বিদ্যার্থিগণ আসিয়া গৌড়পুরের ক্ষীণালোক-প্রদীপের স্নেহ প্রদান করিয়া আসিতেছেন। একদিন শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু, শ্রীজগন্নাথ মিশ্র-প্রমুখ পণ্ডিতগণ বিষ্ণুভক্তির কথায় শ্রীনবদ্বীপের আলোক বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, তাহাতেই শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীপুণ্ডরীক ও শ্রীঈশ্বরপুরী প্রভৃতি যতিরাজগণ বিষ্ণুভক্তি লাভেচ্ছায় নবদ্বীপ নগরে শুভাগমন করিয়াছিলেন। যে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদিগকে শ্রীগৌড়পুর শ্রীমায়াপুরে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই তাৎকালিক অপ্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে লোকাতীত বৈকুণ্ঠবাণী কীর্ত্তন করেন, তাহাও কাল প্রভাবে অপরাবিদ্যা-নিপুণ ভক্তিবিরোধিগণের আস্ফালনে ন্যূনাধিক বিপন্ন হইয়াছিল। শ্রীগৌরসুন্দরের অলৌকিক ন্যায়শাস্ত্রাধিকার বৈদিক বেদান্তমূলে প্রতিষ্ঠিত ন্যায়শাস্ত্রের প্রবর্ত্তনে নব্যন্যায়ের চাঞ্চল্য ক্ষীণপ্রভ হইয়া পরমার্থ-রাজ্যের দিকে যাইতেছিল। আবার তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়-তনয়ের হস্তে পারমার্থিক দর্শনস্পৃহা প্রাকৃত সাহজিক ধর্ম্মে পরবর্ত্তিকালে পরিণত হইয়াছিল। শ্রীঅদ্বৈতের অধস্তনসূত্রে রাধামোহন স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের ভক্তিবিরোধিনী চেষ্টার সহায়তা করিয়া ছিলেন। শ্রীনবদ্বীপ নগর ও নগরবাসিগণের বৃত্তি কালে-কালে বিকারযুক্ত হইয়া অপরা বিদ্যার মহিমা পরাবিদ্যাকে আচ্ছাদিত করিবার প্রয়াস করে, কিন্তু পরাবিদ্যার আদিপথিক শ্রীরাধাগোবিন্দোপাসক গৌড়ীয় সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রথমপুরুষরূপে শ্রীমায়াপুরে শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। সেই শোভাবর্দ্ধনকারীর বিদ্যাপীঠে আচার্য্য-মন্দিরে অপরাবিদ্যার

উন্নতস্তরে অবস্থিত পরবিদ্যাপীঠ পুনঃ সংস্থাপিত হইয়াছে। উহা পৃথুকুণ্ডতীরে ব্রহ্মার যজ্ঞস্থলী অন্তর্দ্বীপে অবস্থিত। শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে এই পৌরাণিক আখ্যানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সুতরাং শ্রীমায়াপুর অন্তর্দ্বীপ কখনই কোলদ্বীপ বা মোদদ্রুম দ্বীপের অংশবিশেষে পরিণত হইতে পারে না। ইহা শ্যেনবংশীয় রাজপ্রাসাদের সন্নিহিত প্রদেশে অবস্থিত।

পৌঢ়ামায়া ভাগীরথীর অপরকূলে বাস করিয়া হরিবিমুখ দেবানন্দাদি পণ্ডিতের দ্বারা পরমার্থবিচারের প্রতিকূল আচরণ করিয়া পরে অপরাধ-ক্ষমাপণের লীলা প্রকটিত করিয়াছেন। প্রৌঢ়ামায়া মায়াহত হইয়া প্রৌঢ়া-শব্দের পরিবর্ত্তে 'পোড়া' বা 'বিদগ্ধ' শব্দে অভিহিত হইতেছেন। তাঁহারই মায়াজাল বিস্তৃত হইয়া লোকনেত্র আবৃত করিবার জন্য কর্কটিকা পল্লীতে 'মিঞাপুর' স্থাপিত হইতেছে। 'মিঞা' শব্দটী যাবনিক-ভাষার অন্তর্গত বিলাসপর সামাজিকগণের উপাধি। তথায় অশ্বঘোষের মহাযানিক অনুষ্ঠান প্রাকৃত সাহজিকগণের আনন্দবর্দ্ধন করিবে—এই বিচারই কলিজনোচিত।

একায়নশ্রুতি ও তদ্বিধান

ছান্দোগ্যোপনিষদে একায়ন-শ্রুতির কথা উল্লিখিত আছে, কিন্তু লিঙ্গায়েৎ-সম্প্রদায়ের কোবিদবর অপ্যয়দীক্ষিত একায়নশ্রুতির কোন সন্ধানই পান নাই, অথচ তিনি ছান্দোগ্য পাঠ করিয়াছেন। শূন্যবাদ্যাশ্রিত প্রকৃতিবাদী বা প্রচ্ছন্ন মায়াবাদী ''পরিমলে''র লেখক মহাশয় কেবলাদ্বৈতবাদকেই শূন্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার দুরভিসন্ধিমূলে একায়নশ্রুতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন।

একায়নশ্রুতি 'শূন্যায়ন' ও 'বহ্বয়ন'-শ্রুতি হইতে বিশেষত্ব রক্ষা করিয়াছেন। কেবলাদ্বৈতবাদী আপনাদিগকে একায়নশ্রুতি-বিধানে বিহিত করিতে বিমুখ কর্ম্মকাণ্ডপর দশসংস্কার গ্রহণে তৎপর, একায়ন-শ্রুতি-বিহিত ভক্ত্যঙ্গ পালনে তাঁহার জ্বর রোগ উপস্থিত হয়। ভগবদনুশীলনে তাঁহার আদৌ ইচ্ছা নাই বলিয়া তিনি স্বকপোল কল্পিত আধ্যক্ষিক জ্ঞানলাভের প্রয়াসকে 'স্বাধ্যায়' বলিয়া বরণ করেন। অন্যাভিলাষ হইতে মুক্ত হইবার বাসনা করিলেও তিনি শূন্যাভিলাষ-শূন্য নহেন। এ জন্যই নির্ব্বেদ ব্রহ্মানুসন্ধানের জড়াকাশে তাঁহার জড়তা বিলীন করিবার প্রয়াস মুমুক্ষুত্বের ধর্ম্ম বলিয়া প্রতীত হয়। তিনি ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে যাবতীয় দৃশ্যবিষয়ের প্রভুত্ব করিতে ব্যস্ত থাকেন। ইহাই তাঁহার কর্ত্তৃত্বাভিমানে কর্ম্মাবরণ। তিনি অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনের পরিবর্ত্তের কৃষ্ণের প্রতিকূল ভাব পোষণ করেন বলিয়া তাঁহার কৃষ্ণেতর মায়া-শৃঙ্খল অতিক্রম করিবার সামর্থ্য নাই। তজ্জন্যই ফল্গুবৈরাগ্যের আশ্রয়ে তিনি কৃষ্ণবপুকে জড়জগতের অন্যতম-জ্ঞানে মায়িকতনু বলিয়া মনে করেন এবং তাদৃশ তনুর ধারকসূত্রে মায়া-প্রসূত কৃষ্ণকে কৃষ্ণের দেহ হইতে পৃথক জ্ঞান করেন। বৈকুণ্ঠ নাম, রূপ গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলাকে স্বীয় কর্ত্তৃত্বাভিমানময়ী বুদ্ধির দ্বারা স্বীয় ভোগ্য বলিয়া মনে করায় সবিশেষ বিষ্ণুবস্তুতে তাঁহার প্রাপঞ্চিক বুদ্ধির উদয় হয়। হরিসম্বন্ধি সকল বস্তুই
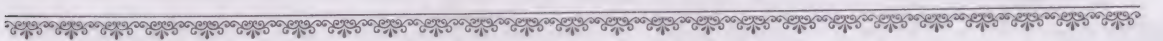
যে প্রকৃতির অতীত এবং হরিশক্তি যে মায়াপ্রসূত বস্তু নহে—এই প্রতীতির অভাবে তাঁহার কৃষ্ণানুশীলন অনুকূলভাবে না হইয়া মায়ার তাণ্ডব-নৃত্য হইয়া পড়ে। তাই একায়নশ্রুতি-মতে তিনি 'প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ' বা 'মায়াবাদী'-নামে কথিত হন। পুরুষোত্তমের সেবাভিলাষ ব্যতীত পুরুষহীন জড়া প্রকৃতির অব্যক্ত সেবকত্বে আপনাকে পরিণত করিয়া মহা-মায়ার পূজা করিতে থাকেন। তখন তাঁহার কর্ম্মফলভোগবাদ ও নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানই আরাধ্য বিষয় হইয়া পড়ে, কিন্তু—

বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ।
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ।।
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্ম্মো বাসুদেবপরা গতিঃ।।

"একো-নারায়ণ আসীৎ, ন ব্রহ্মা নেশানঃ" প্রভৃতি শ্রুতিসমূহ তাঁহার নিকট অদ্বৈতবাদের হন্তারক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। আবার সেই **'একায়ন' বা 'রামায়ণ'** বা অহৈতুকী ভক্তির ভজনীয় শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমুখ ঐকান্তিকদিগের সাত্বত একায়নস্মৃতিসমূহ তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইতে থাকিলেও তিনি জড়-নির্ব্বিশেষকেই নিরপেক্ষজ্ঞানে স্বাধ্যায়ানুষ্ঠানে বিপত্তি আনয়ন করেন। রাম-শব্দ —সংখ্যাগত 'এক' এরই পর্য্যায়-শব্দ। 'রাম' অনেক ভিন্ন ভিন্ন নহেন। আবার **দাশরথি রাম, জামদগ্ন্য রাম ও রোহিণেয় রাম—ত্রিমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইলেও রেবতীরমণ রাম ও সীতাপতি রাম তটস্থশক্তি গত জামদগ্ন্য রামের সহিত ভেদ প্রতিপাদন করিয়াও একবিষ্ণুগতি। সুতরাং রামত্রয়ের দ্বারাও একায়নপদ্ধতি আক্রান্ত হয় নাই।**

একায়নশ্রুতি-বিহিত সংস্কার সমূহে সাধারণ কর্ম্মপর গৃহ্যসূত্রাদি কল্পশাস্ত্রের আনুষ্ঠানিক ভেদ লক্ষিত হইলেও শুদ্ধ-বিদ্ধ-ভেদে কল্প বেদাঙ্গ-বিষয়ে এক-তাৎপর্য্যপর। বহ্বয়ন শ্রুতি ও বহ্বয়ন শ্রুতিবিধান, একায়ন শ্রুতি ও একায়ন শ্রুতিবিধানের মধ্যে ভেদ এই যে, একপক্ষে—বহুদেববাদ, নির্ব্বিশেষ বাদ এবং অপরপক্ষে—একমাত্র বিষ্ণু ও তাঁহার প্রকাশসমূহ। একপক্ষে—অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান প্রভৃতি বহ্বয়ন শ্রুতিবিধান, অপরপক্ষে—একায়ন শ্রুতিবিধান অর্থাৎ একলবিষ্ণুভক্তি। একান্ত বিষ্ণুভক্তের বৈশিষ্ট্য সহস্রবিদ্ধ বা মিশ্র-বৈষ্ণবে নাই; এক বিষ্ণুভক্ত—কোটি সর্ব্ববেদান্তবিৎ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; এক সর্ব্ববেদান্তবিৎ পণ্ডিত সহস্র সত্রযাজী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; এক সত্রসাজী—সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—একায়ন শ্রৌতপন্থিগণের এরূপ বিচার শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুনি গরুড়পুরাণে লিখিয়াছেন।

একায়ন শ্রুতিবিধানপর সমাজের বর্ণাশ্রম "দৈব-বর্ণাশ্রম" নামে বিদিত। উহাই সনাতন ধর্ম্ম; আর অদৈব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বা স্বফলভোগদায়িনী কর্ম্মপদ্ধতি যে বিষ্ণুপূজার ছলনা বিস্তার করেন, তদ্দ্বারা অন্যাভিলাষ ও কৃষ্ণেতর অন্যপূজা সাধিত হয়। সুতরাং **একায়ন শ্রুতিবিহিত চত্বারিংশ সংস্কার—সনাতন ধর্ম্ম-কৈতবাশ্রিত দশসংস্কারের চতুগুর্ণিত অর্থাৎ তুরীয়ধর্ম্মে অবস্থিত। চত্বারিংশ সংস্কারের অভ্যন্তরে দশ সংস্কার আবদ্ধ। সুতরাং একায়ন-বিহিত পদ্ধতি শুদ্ধ ব্রাহ্মণতাই সাধন করে।**

যাঁহারা প্রাক্তন অপরাধবশতঃ অজ্ঞানক্রমে ভাগবত ও পাঞ্চরাত্রগণকে তদংশভূত ব্রাহ্মণ পরিচয়ে জানিতে অসমর্থ, তাঁহাদের কোন দোষ নাই। কূপমণ্ডূক অপস্বার্থপর মূর্খ সমাজ সত্যের উপলব্ধি হইতে চিরদিনই বঞ্চিত বলিয়া সঙ্কীর্ণতা ও অজ্ঞান পোষণ করেন। পাঞ্চরাত্রিকগণ ব্রাহ্মণ জীবনে ভক্তিযোগাশ্রয়ে ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করিয়া নিত্যকাল ভগবানের সেবা বিধান করেন। এই **নিত্য ব্রাহ্মণগণ—'পাঞ্চরাত্র' ও 'ভাগবত'-নামে বিশেষরূপে কথিত হওয়ায় যাঁহারা তাঁহাদিগকে 'ব্রাহ্মণ' হইতে পৃথক বোধ করেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ-ব্রুব**। পক্ষান্তরে, একায়নাশ্রিত ভাগবত ও পাঞ্চরাত্রগণ অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবদাত্মক বস্তুর সেবানিরত হইয়া আপনাদিগকে সাধারণের নিকট দম্ভমুখে 'ব্রাহ্মণ' সংজ্ঞা-মাত্রে পরিচয় না দিয়া প্রকৃত ব্রাহ্মণরূপে নিত্যকাল ঈশ-সেবাভিষিক্ত থাকেন। একায়নপদ্ধতি প্রজল্পপরায়ণ একায়নবিরোধিগণের বাচালতা দ্বারা কখনই ক্ষুব্ধ হইতে পারে না। **যদি একায়নাশ্রিত ভাগবতগণের ব্রাহ্মণত্বের প্রতি শাখান্তরজীবী কর্ম্মনিপুণাভিমানি-ব্রাহ্মণের সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাদৃশ সন্দেহমূলক ঔষধ বৈদ্য নামক রোগীর প্রতি প্রযুক্ত হইলে তিনিও নিরাময় হইতে পারিবেন।**

দ্বীপ-দিগ্দর্শন

শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা-কাহিনী যেরূপ অনন্ত, অপার ও অতলস্পর্শ, তদ্রূপ, তদ্রূপবৈভব গৌরধাম নবধা-ভক্তির মহাপীঠ কৃপাবতার গৌরলীলাস্থলী নবদ্বীপের কাহিনীও অনন্ত, অপার ও অতলস্পর্শ। এই সকল বাস্তব-তথ্য গৌর-প্রণয়ি-জনের আনুগত্যে গৌরধাম-সেবাফলে স্বয়ং স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। শ্রীধাম-পরিক্রমাকারিগণের সহায়তা কল্পে নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপের অনন্ত তথ্যরাজির উদ্দেশে নিম্নে দিগ্দর্শন মাত্র করা হইল।

নবদ্বীপ

ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে নবদ্বীপ নগর। বহু পূর্ব্ব হইতেই তথায় সেনরাজগণের রাজধানী অবস্থিত ছিল। সেই স্থান সম্প্রতি 'নবদ্বীপ'-নামে পরিচিত না হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পল্লীনামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যে স্থলে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ, শ্রীবাসের অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত ভবন, শ্রীমুরারী গুপ্তের স্থান প্রভৃতি অবস্থিত ছিল, তাহা সম্প্রতি 'শ্রীমায়াপুর'-নামে খ্যাত। গঙ্গার বিভিন্ন গর্ভের পরিবর্ত্তনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালীয় নবদ্বীপ-নগরের অধিকাংশই জলমগ্ন হইয়াছিল, সুতরাং উহার অধিবাসিগণের অনেকেই নিকটবর্ত্তিস্থানে উঠিয়া যাইতে বাধ্য হয়। প্রভুর প্রকটকালীন কুলিয়াগ্রামে বা পাহাড়পুরেই আধুনিক নবদ্বীপ সহর বসিয়াছে এবং সেই স্থলেই বর্ত্তমান নবদ্বীপ-মিউনিসিপ্যালিটী স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু খৃষ্টীয় **অষ্টাদশ-শতাব্দীতে** নবদ্বীপনগর 'কুলিয়াদহ বা কালীয়-দহের বর্ত্তমান চড়ায় অবস্থিত ছিল। আবার খৃষ্টীয় **সপ্তদশ-শতাব্দীর** নদীয়া-নগর বর্ত্তমান 'নিদয়া', 'শঙ্করপুর', 'রুদ্রপাড়া' প্রভৃতি স্থানে লক্ষিত হয়। তৎপূর্ব্বে **ষোড়শ-শতাব্দী**

পর্য্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমকালীন নবদ্বীপ নগর শ্রীমায়াপুর, বল্লালদীঘি, বামনপুকুর, শ্রীনাথপুর, ভারুইডাঙ্গা, গঙ্গানগর, সিমুলিয়া, রুদ্রপাড়া, তারণবাস, করিয়াটী, রামজীবনপুর প্রভৃতি স্থানে ব্যাপ্ত ছিল। তখন বর্ত্তমান বামনপুকুর-পল্লীর নাম 'বেলপুকুর' ছিল, পরে 'মেঘার চড়া'য় প্রাচীন বিল্ব-পুষ্করিণী-গ্রাম স্থানান্তরিত হওয়ায় উহা সপ্তদশ-শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান 'বামনপুকুর' নাম লাভ করিয়াছে। রামচন্দ্রপুর, ক্যাঁকড়ার-মাঠ, শ্রীরামপুর, বাবলা-আড়ি, প্রভৃতি স্থান গঙ্গার পশ্চিম পারে অবস্থিত। উহার কিয়দংশ কোলদ্বীপ ও কতকটা মোদদ্রুমদ্বীপের অন্তর্গত ছিল। চিনাডাঙ্গা, পাহাড়পুর প্রভৃতি নাম সম্প্রতি বিলুপ্ত হইলেও 'তেঘরির কোল', 'কোল আমাদ', 'কুলিয়ার গঞ্জ' প্রভৃতি বর্ত্তমান নবদ্বীপ-সহরের স্থান সমূহ আজও সেই প্রাচীন কোলদ্বীপের সংস্থান নির্দ্দেশ করিতেছে। গঙ্গার পশ্চিম-পারে বিদ্যা-নগর, জান্নগর, মাম্‌গাছি, কোব্‌লা প্রভৃতি স্থান নবদ্বীপের উপকণ্ঠ বা সহরতলী রূপে অবস্থিত ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তি কালে প্রাচীন নবদ্বীপ সম্বন্ধে বহুবিধ যুক্তিহীন কুতর্কমূলক ধারণা এক্ষণে নানাকারণে ভীষণ-মূর্ত্তি ধারণ করিবার অবসর পাইলেও ঐগুলি প্রকৃতস্থান-নির্ণয়বিষয়ে কোন প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই বা করিবে না। চাঁদকাজীর সমাধির কিছু দূরে শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠেই শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ বা শচীর প্রাঙ্গন (প্রভুর জন্মভিটা) অবিসম্বাদিতভাবে দিব্যসূরি শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী প্রভৃতি সিদ্ধগণের নির্দ্দেশমতে পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। সমস্ত নিঃপেক্ষ যুক্তিপুষ্ট ঐতিহাসিক ও অলৌকিক প্রমাণাবলী অবিতর্কিত ভাবে শ্রীমায়াপুরের সন্নিহিত স্থানগুলিকেই প্রাচীন নবদ্বীপ বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করে।

নবদ্বীপের পরিধি

শ্রীনবদ্বীপধামের পরিধি যোলক্রোশ। 'যোলক্রোশ' বলিলে শ্রীধামের কিছু পরিছিন্নতা প্রমাণিত হয় না বা জড় জগতের মায়িক পরিমিত বস্তুর সহিত সমপর্য্যায়ে গণিত হইবার যোগ্যতাও নির্দ্ধারিত হয় না। শ্রীনবদ্বীপধাম স্বরূপশক্তির সন্ধিনী-প্রভাব দ্বারা প্রপঞ্চে প্রকটিত। প্রপঞ্চে উদিত হইয়াও শ্রীনবদ্বীপধাম প্রপঞ্চাতীত। কেবলমাত্র সেবোন্মুখ বৃত্তির দ্বারাই শ্রীধামের স্বরূপ গ্রাহ্য। শ্রীভগবান্ যেরূপ পরিচ্ছিন্ন বস্তু হইয়াও তাঁহার সেবোন্মুখ ভক্তবৃন্দের নিকট অচিন্ত্যশক্তিক্রমে নিত্য শ্রীবিগ্রহবান্, তদ্রূপ তদ্‌রূপবৈভব শ্রীধামাদিও অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও সেবোন্মুখ ভক্তগণের নিকট-পরিধিবিশিষ্ট। ইহা মায়িক পরিধিযুক্ত নহে। সেবোন্মুখ ব্যক্তিই এই কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ।

নবদ্বীপের বিভিন্ন দ্বীপ-সংস্থান

এই যোলক্রোশ নবদ্বীপের মূলগঙ্গার পূর্ব্বপারে চারিটী দ্বীপ ও পশ্চিমে পাঁচটী দ্বীপ। পূর্ব্বপারে চারিটী দ্বীপের নাম—(১) অন্তর্দ্বীপ মায়াপুর; তাহার উত্তরে (২) শ্রীমন্তদ্বীপ; মায়াপুরের দক্ষিণে (৩) শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ; এবং (৪) মধ্যদ্বীপ; গঙ্গার পশ্চিম পারে (১) কোলদ্বীপ; (২) ঋতুদ্বীপ, (৩) জহ্নুদ্বীপ; (৪) মোদদ্রুমদ্বীপ এবং (৫) রুদ্রদ্বীপ (সম্প্রতি পূর্ব্বপারে)—সর্ব্বসাকল্যে নয়টী দ্বীপ বা নবদ্বীপ।

নবদ্বীপের স্বরূপ

এই নবদ্বীপ বহুবিধ ভক্তিস্বরূপ অর্থাৎ অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর—আত্মনিবেদন; সীমন্তদ্বীপ—শ্রবণ; গোদ্রুমদ্বীপ—কীর্ত্তন; মধ্যদ্বীপ—স্মরণ; কোলদ্বীপ— পাদসেবন; ঋতুদ্বীপ—অর্চ্চন; জহ্নুদ্বীপ—বন্দন; মোদদ্রুমদ্বীপ—দাস্য ও রুদ্রদ্বীপ—সখ্যরূপা ভক্তির পীঠ। এই সকল স্থানে পরিক্রমা অর্থাৎ বিচরণ করিলে তত্তদ্ভক্তির উদয় হয়। নববিধা ভক্তির যে কোন একটী কৃষ্ণতোষণের সেতু হইলেও আত্মনিবেদনই সর্ব্বমূল। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

নবদ্বীপ-পরিক্রমা প্রণালী

পরিক্রমা-বিধি মহাজনগণের বাক্যে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"বিশেষতঃ মাকরী সপ্তমী তিথি গতে।
ফাল্গুনী পূর্ণিমাবধি শ্রেষ্ঠ ভালমতে।।
পরিক্রমা সমাধিয়া যেই মহাজন।
জন্মদিনে মায়াপুর করেন দর্শন।।
নিতাই গৌরাঙ্গ তা'রে কৃপা বিতরিয়া।
ভক্তি অধিকারী করে পদছায়া দিয়া।।"

—মহাজনগণের এইরূপ বিধানানুসারে প্রতি বৎসরই শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা হইয়া থাকে।

(১) অন্তর্দ্বীপ-শ্রীমায়াপুর

(ক) শ্রীচন্দ্রশেখর ভবন—শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য মহাপ্রভুর নিকট আত্মীয়। ইনি নবনিধির অন্যতম 'আচার্য্যরত্ন' নামে বিখ্যাত। এই চন্দ্রশেখরের গৃহই 'ব্রজপত্তন' নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থানেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিনয়কাচ ও দেবীভাবে নৃত্য হইয়াছিল। সেই মধুর লীলাকথা শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্য ১৮শ অধ্যায়ে (গৌড়ীয় সংস্করণ) সুবিস্তৃতভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। বঙ্গদেশে ইহাই প্রথম অভিনয়। এই স্থানেই গৌড়দেশের কৃষ্ণতোষণপর রঙ্গমঞ্চের সর্ব্বপ্রথম গৌরচন্দ্রিকা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

(খ) শ্রীচৈতন্য মঠ—শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্য মঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীচৈতন্য মঠ বর্ত্তমান যুগে সমগ্র বিশ্বে চৈতন্য কথা প্রচারের একমাত্র আকর-প্রতিষ্ঠান। বিশ্বের সর্ব্বত্র অচৈতন্য-ধর্ম্ম বা জড়-ধর্ম্মের প্রকারান্তর বিচিত্র মনোধর্ম্ম এবং দেহধর্ম্ম প্রচারিত ও প্রসারিত রহিয়াছে। এই অচৈতন্য বিশ্বে সর্ব্বতোভাবে চৈতন্যকথার মহাপ্লাবন আনয়ন করিবার জন্য পরকারুণিক গৌরজন এই শ্রীচৈতন্যমঠের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই স্থান হইতেই সমগ্র জগতে শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচারিত হইতেছে। এই আকর মঠরাজ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বহু বহু চৈতন্যপ্রতিষ্ঠান-সমূহ প্রকাশ করিয়া বিশ্বময় চৈতন্যকথা বিলাইতেছেন। এই চৈতন্যমঠ বাস্তববিজ্ঞান-বিদ্যামন্দির বা গৌরবাণী-বিনোদকুঞ্জ। বিশ্বের জীবকুলকে অচৈতন্য জগতের লক্ষ-লেলিহান জিহ্বা দাবাগ্নি

হইতে কল্যাণকল্পতরু সুশীতল শান্তিচ্ছায়ায় আনয়নের জন্য চৈতন্য-আবির্ভাব ভূমিতে এই মঠরাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। আচার্য্যের অনুক্ষণকীর্ত্তিত চেতনময়ী বাণী অচৈতন্য জাড্যগ্রস্ত জীব হৃদয়ে চেতনতার বিজলী সঞ্চার করিয়া চৈতন্যপ্রাণপুরুষের চিরপ্রতিষ্ঠা করিতেছে। "সমগ্র বিশ্বের চরমশ্রেয়ঃকামী ও বাস্তব সত্যানুসন্ধিৎসু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ সকলেই এই শ্রীচৈতন্যমঠের পাদপীঠে আসিয়া তাঁহাদের মস্তক অবনত করিবেন"—লোকোত্তর মহাপুরুষের এই ভবিষ্যদ্বাণী আজ সফল হইতে চলিয়াছে।

(গ) উনত্রিংশ চূড়ার মন্দির—এই মন্দিরের চারিদিকে সাত্বত-পুরাণশাস্ত্র- কথিত শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক—এই সেশ্বর সৎসম্প্রদায় চতুষ্টয়ের আচার্য্যবর্গের অর্থাৎ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীপাদ রামানুজ, শুদ্ধদ্বৈত বা তত্ত্ববাদাচার্য্য শ্রীপাদ আনন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্ব, শুদ্ধাদ্বৈত বাদাচার্য্য শ্রীপাদ বিষ্ণুস্বামী এবং দ্বৈতাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীপাদ নিম্বাদিত্যের শ্রীবিগ্রহ-সমন্বিত চতুষ্কোণবিশিষ্ট মন্দির এবং সকলের কেন্দ্রস্থলে উক্ত সেশ্বরবাদ চতুষ্টয়কে ক্রোড়ীভূত করিয়া ব্রহ্মসূত্রের যে একমাত্র প্রতিপাদ্য নিগমকল্পতরুর গলিত ফল, বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্দিষ্ট অচিন্ত্যভেদাভেদ সত্য—তৎপ্রবর্ত্তক সাবরণ বিষ্ণুপরত্ত্ব শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি এবং সজ্জন-নয়ন-মনোভিরাম শ্রীশ্রীবিনোদপ্রাণজীউর শ্রীমূর্ত্তি প্রকটিত রহিয়াছেন। এই মন্দিরের শিখরপ্রদেশে কলিযুগপাবন স্বভজন-বিভজন প্রয়োজনাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মহামহিমময়ী বিজয়বৈজয়ন্তী রূপানুগ সুসিদ্ধান্তসংরক্ষক সুদর্শন সুশোভিত থাকিয়া—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।"

—এই শ্রীচৈতন্যমুখনিঃসৃতবাণীর সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন।

(ঘ) পরবিদ্যাপীঠ বা সারস্বততীর্থ—শ্রীচৈতন্য সরস্বতীই—পরা বাণী বা পরা বিদ্যা। এই পরা বিদ্যা বা শুদ্ধা সরস্বতীর কৃপায় জীবকুল অক্ষর পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের বিজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর কৃপা ব্যতীত অক্ষর বস্তু জানিবার দ্বিতীয় উপায় নাই। ইহাই মুণ্ডকোপনিষদ্ তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপে দিগ্বিজয়ী-দর্প-দমন-লীলায় সরস্বতীপতি শ্রীগৌরসুন্দর জানাইয়াছেন যে, প্রাকৃতজন-পূজিত সরস্বতী সেই শুদ্ধা সরস্বতীরই বিকৃতা ছায়ামাত্র। তাঁহার অক্ষরবস্তু শ্রীচৈতন্যদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইবার সামর্থ্য নাই। প্রাকৃত সরস্বতীর দ্বারা মায়িক জীবসমূহ মোহিত হয়। বিশ্বে যত দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, কলা, সাহিত্যাদি প্রচারিত রহিয়াছে, তাহা শুদ্ধা সরস্বতীরই বিকৃত আংশিক খণ্ড প্রতিফলন মাত্র। বুদ্ধিমানগণ খণ্ড, প্রতিফলিত, ছায়াপ্রায় বস্তুর জন্য সুদুর্লভ মানবজীবনের শক্তি ও সময় ব্যয় না করিয়া আকর, পূর্ণ, পরমবাস্তববস্তুর সেবাতেই আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন। শ্রীমায়াপুরে শ্রীসারস্বত তীর্থে সেই পরবিদ্যার অনুশীলন হইয়া থাকে,—যে বিদ্যা সকল চৈতন্য-জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাতৃকা—যে বিদ্যা অবিদ্যাধ্বংসকারিণী—যে বিদ্যা কৃষ্ণসেবানুকূল্যময়ী—কৃষ্ণানুশীলনময়ী। এই বিদ্যাবধূর জীবন—অক্ষরাকৃতি পরমব্রহ্ম। এই সারস্বত তীর্থ বা পরবিদ্যাপীঠ সমগ্র বিশ্বে বিশ্বাতীত অমৃতের বার্ত্তা বিলাইবার জন্য প্রকটিত হইয়াছেন।

বিশ্বে অচৈতন্য বিশ্বভারতী প্রসারিত করিয়া অচৈতন্য বিশ্বকে আরও ভাল করিয়া ঘুম পাড়াইবার জন এই বিদ্যাপীঠ স্থাপিত হয় নাই, পরন্তু জাগরণের দিনে অচৈতন্য, নিদ্রামগ্ন বিশ্বকে মহাজাগরণের চেতনময়ী বাণী শুনাইয়া চির উদ্ধার করিবার জন্য এই বিশ্বম্ভর-বাণীর মহাপীঠ ভুবনমঙ্গলাবতাররূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। এই সারস্বততীর্থ কুরুক্ষেত্রে স্যমন্ত-পঞ্চকের সারস্বত কুঞ্জের সমীপে ভারত-পাঠশালা; নৈমিষক্ষেত্রে ভাগবত-পাঠশালা, মাথুরমণ্ডলে বিনোদ-বিদ্যালয়, প্রভৃতি আবিষ্কার করিতেছেন—শ্রীশ্রীল জীবপ্রভুর শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে পাঠার্থিগণকে শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি শিক্ষা প্রদান করিতেছেন এবং পরসাহিত্যাসন, ঐতিহ্যাসন, সম্প্রদায়-বৈভবাসন, ভক্তিশাস্ত্রাসন, তত্ত্বশাস্ত্রাসন, বেদান্তাসন, একায়নাসন প্রভৃতি সংস্থাপন করিয়া অচৈতন্যবিশ্বে চৈতন্যশব্দ-ব্রহ্মের প্লাবন আনয়ন করিতেছেন। ইহা সমগ্র বিশ্বে একটী মহাযুগান্তর। যে যুগে সানিন-সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যে মধ্যে সমাদৃত হইয়া, বিংশ শতাব্দীর গতিমুখর পথ বাহিয়া, নদ-নদী-কান্তার পার হইয়া জগৎ পরিভ্রমণে বাহির হইয়াছে—যে যুগে নীট্সের (Nietz) দর্শনবাদ ও সমসাময়িক য়ুরোপের সাহিত্যকে আশ্রয় করিয়া জড়ধর্ম্ম চরমসীমায় উপনীত হইতেছে এবং যে যুগের বাংলার অলস জীবনেও সেই সাহিত্য দৈনেশিক তাপ উঁকি ঝুঁকি মারিবার চেষ্টা করিতেছে, সেই অচৈতন্য-বিশ্বভারতীর যুগে—সমন্বয়ের নাম করিয়া চিজ্জড়ের গোঁজামিল দেওয়া যুগে শ্রীমায়াপুর-পরবিদ্যাপীঠ আবিষ্কৃত হইয়াছেন।

(ঙ) পরনাট্যমঞ্চ—জগতে ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক যে সকল নৃত্য-গীতবাদিত্রাদির অনুশীলন হয়, তাহা কৃষ্ণতোষণপর চিদনুশীলনের বিকৃত অপব্যবহার বলিয়া তৌর্য্যত্রিক ও ব্যসন নামে কথিত হইয়া থাকে। ঐ সকল তৌর্য্যত্রিক বা ব্যসন জগতের লোকের বিচারে কলাবিজ্ঞান বলিয়া বিবেচিত হইলেও উহা পরিনামে জগন্নাশকর কার্য্যের সোপান। আবার প্রাকৃত সহজিয়া-সমাজে কৃষ্ণ তোষণের ছলনা করিয়া যে বিপ্রলিপ্সাময় তৌর্য্যত্রিকের আব্বাহন করা হয়, তাহাও আত্মমঙ্গলের পরম পরিপন্থী। কৃষ্ণই সমস্ত কলার অধিনায়ক। তাঁহার অহৈতুকী সেবায় সেই সকল কলাকলাপ নিযুক্ত হইলেই তাহা পরমমঙ্গলের সেতু হইয়া থাকে। যাহারা অতত্ত্বজ্ঞ, অমুক্ত, ভজনে অনিপুণ, তাহারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে কোন বস্তুকেই নিযুক্ত করিতে পারে না। শ্রীল স্বরূপ গোস্বামীপ্রভু বঙ্গদেশীয় বিপ্র-কবির উদাহরণে দেখাইয়াছেন যে, সিদ্ধান্তবিরোধযুক্ত রসাভাসপূর্ণ নাটকাদি মহাপ্রভুর কর্ণোৎসব বিধান করিতে পারে না। শ্রীরূপের নাটকাদি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় পরিবেশিত হইতে পারে। পরবিদ্যাপীঠ শ্রীময়াপুরে শ্রীস্বরূপরূপানুগবর আচার্য্যের আনুগত্যে গৌরকৃষ্ণতোষণপর নাট্যমঞ্চ নির্ম্মিত হইতেছে। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা কেবল হরিগুরুবৈষ্ণবতোষণপর।

(চ) নদীয়াপ্রকাশ কার্য্যালয়—এই স্থান হইতে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ প্রতিষ্ঠিত দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ নিয়মিতরূপে সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকেন। মহামায়ার ধামে আপাত প্রেয়ঃকথা- প্রচারকারিণী গণতোষণী পত্রিকাসমূহের দৈনিক সংস্করণ কিছু বিস্ময়কর নহে, কিন্তু একান্ত শ্রেয়ঃকথা প্রচারকারিণী পত্রিকার দৈনিক সংস্করণ বঙ্গদেশে কেন, সমগ্র বিশ্বে অভিনব ও আশ্চর্য্যকর। বিশেযতঃ এই পত্রিকার সম্পাদক ও লেখকগণ বেতনভোগী ভৃতক নহেন বা আচারহীন প্রচারক নহেন।

এই নদীয়া-প্রকাশের সম্পাদক প্রত্নবিদ্যালঙ্কার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় একজন গুরু-গৌরাঙ্গসেবাপরায়ণ, কৃষ্ণার্থে সর্ব্বত্যাগী নৈষ্ঠিক আচারবান্ মহাপুরুষ এবং এই পত্রিকার বিভিন্ন লেখক ও সেবকগণও আদর্শ নিষ্কপট সেবাপ্রাণ ভাগবত। ইঁহারা সকলেই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবানুগত্যে এই অসামান্য সেবা-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন। এই দৈনিক সংবাদ-পত্রের ত্রৈহিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক সংস্করণও প্রকাশিত হইবার ব্যবস্থা হইতেছে।

(ছ) নদীয়াপ্রকাশ যন্ত্রালয়—চৈতন্যকথা-প্রচারাঙ্গ। জগতে মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে অচৈতন্য কথা, জড় কথা অথবা উহারই বিভিন্ন রূপান্তর বিভিন্ন মনোধর্ম্ম, মায়াবাদ, নাস্তিক্যবাদ প্রভৃতি প্রচারিত হইয়া থাকে। এই বৈশ্য জগতে শিল্পাদির স্বার্থকতা প্রাকৃত অর্থপরিণতি দ্বারাই পরিমাপ করা হয়। কিন্তু কেবল-পরমার্থ প্রচারের উদ্দেশ্যে শিল্প বিজ্ঞানের নিয়োগ কিরূপে হইতে পারে, তাঁহার আদর্শ নিদর্শনস্বরূপ এই নদীয়াপ্রকাশ যন্ত্রালয়। সম্প্রতি এই নদীয়া প্রকাশ যন্ত্রালয় হইতে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ শ্রীচৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছেন এবং শ্রীচৈতন্যভাগবত ও দৈনিক নদীয়া- প্রকাশ প্রকাশিত হইতেছেন।

(জ) ভারতী-কুটীর—এই গৃহেই নদীয়াপ্রকাশ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত। শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিবেক ভারতী মহারাজের নামানুসারে এই কুটীরটী সংস্থাপিত হইয়াছে অথবা এই স্থান হইতেই লেখ্যা অর্চ্চাকারে শ্রীচৈতন্যসরস্বতী বা বিশ্বম্ভর-ভারতী বিশ্বে প্রচারিত হইতেছেন বলিয়া এই স্থানের নাম 'ভারতী কুটীর'। এই কুটীরের গাত্রে সর্ব্বদা স্মরণীয় কতকগুলি মহাজন-গীতি অঙ্কিত থাকিয়া অনুক্ষণ নিষ্কপট হরিভজনের কথা সকলের চিত্তে দেদীপ্যমান করিয়া দিতেছে। এই সকল আচার্য্যের কৃপার নিদর্শন।

(ঝ) আশ্রম কুটীর—এই কুটীরটী শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজের নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কয়েকবৎসর কাল বহু ধাম-যাত্রীর আশ্রয় স্থল হইলেও দুইবৎসর যাবৎ বায়ুদেব কর্ত্তৃক স্থানান্তরিত হইয়াছেন; কিন্তু আশ্রম কুটীরের প্রশস্ত ভিত্তি আজিও বহু ধামযাত্রীর আশ্রয় স্থল রহিয়াছে। আমরা শুনিতে পাইলাম। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বিরাট চতুর্থ সংস্করণ-বিতরণকারী, বৈষ্ণবজগতের অকৃত্রিম বন্ধুবর পরমভাগবত শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয় এই আশ্রম কুটীরের সেবাকার্য্য শীঘ্রই আরম্ভ করিবেন।

(ঞ) তীর্থ-কুটীর—শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডী-অগ্রণীবর শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের নামানুসারে এই কুটীর সংস্থাপিত হইয়াছে। বহু ধামযাত্রী সর্ব্বতীর্থ সমাশ্রয় শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীচৈতন্যমঠে তীর্থকুটীরে ভক্তিপ্রদীপের নির্ম্মল আলোকে আলোকান্বিত হইয়া সারস্বত কুঞ্জসেবায় অধিকার পাইবার যোগ্যতা লাভ করেন।

(ট) শ্রীরাধাকুণ্ড—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্বার্ষভানবী পূর্ব্বক অনুক্ষণ নিষ্কপট কৃষ্ণসেবার চরম আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। যে সকল কথা একান্ত সেবোন্মুখ ভক্তজনবেদ্য। বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা মধুপুরী শ্রীমায়াপুর

যোগপীঠ শ্রেষ্ঠ। তাহা হইতে রাসস্থলী শ্রীবাস-অঙ্গন-শ্রেষ্ঠ। তাহা হইতে গোবর্দ্ধন শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রেষ্ঠ এবং তাহা হইতে রাধকুণ্ড-ব্রজপত্তন শ্রেষ্ঠ। কোন্ কৃতী শ্রীশ্রীবার্ষভানবী-দয়িত-দাস প্রভুবরের চরণ আশ্রয় পূর্ব্বক ব্রজ পত্তনে নিরন্তর অবস্থান করিয়া সেবা পরাকাষ্ঠা বরিয়া না লইবেন?

(ঠ) পৃথুকুণ্ড—অধুনা বল্লালদীঘি নামে প্রসিদ্ধ। সত্য যুগে শক্ত্যাবেশাবতার মহারাজ পৃথু পৃথ্বীর উচ্চনীচ-ভূমিখণ্ড সমূহ সমান করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যখন এই স্থানে মহারাজের কর্ম্মচারীবৃন্দ ভূমি-সমতল-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তখন চতুর্দ্দিক হইতে এক মহাজ্যোতির্ম্ময়ী প্রভা উত্থিত হইলে কর্ম্মচারীবৃন্দ সেই কথা পৃথু মহারাজকে জ্ঞাপন করিলেন। মহারাজ স্বয়ং এইস্থানে উপনীত হইয়া সেই আশ্চর্য্য জ্যোতিঃপুঞ্জ প্রত্যক্ষ করিলেন। শক্ত্যাবেশাবতার পৃথু মহারাজ ধ্যানযোগে জানিতে পারিলেন যে, এই স্থান নবদ্বীপ-মণ্ডলের অন্তর্গত সেই স্থান—যেখানে কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধার ভাবকান্তি লইয়া অবতীর্ণ হইবেন।

মহারাজ পৃথু স্থানের গুহ্য মাহাত্ম্য গুপ্ত রাখিবার জন্য ঐ স্থানে এক মনোহর সুবিস্তৃত কুণ্ড নির্ম্মাণ করাইলেন। এই কুণ্ডই নবদ্বীপমণ্ডলে 'পৃথুকুণ্ড' নামে বিখ্যাত হইল। গ্রামবাসিজন এই স্বচ্ছকুণ্ডের জলপান করিয়া বিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ করিতে থাকিলেন। পরবর্ত্তিকালে বাঙ্গালার নৃপতি লক্ষ্মণসেন স্বীয় পিতৃপুরুষের উদ্ধার-কল্পে এই স্থলে এক সুবিস্তৃতা দীর্ঘিকা খনন করাইলেন। এই দীর্ঘিকাই বল্লালদীর্ঘিকা নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। এখনও শ্রীমায়াপুরে এই বল্লালদীর্ঘিকা বিরাজিত থাকিয়া গৌড়পুরের অতীত স্মৃতি জাগরুক রাখিয়াছে। এখানে 'বল্লালটীবি' নামে একটী উচ্চ স্তূপও বল্লালসেনের আবাস-গৃহের শেষচিহ্ন বা ভগ্নাবশেষরূপে বিরাজিত আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ এই স্থানে অনুসন্ধান করিলে অনেক প্রাচীন তথ্য লাভ করিতে পারেন।

(ড) অদ্বৈত-ভবন—এই স্থান শ্রীবাস-অঙ্গন হইতে ১০ ধনু উত্তরে অবস্থিত। এই স্থানের আচার্য্য অদ্বৈত রায় জল-তুলসী মুখে পাঞ্চরাত্রিক বিধানানুসারে কৃষ্ণ আরাধনা করিয়াছিলেন। এই স্থানেই তিনি হুঙ্কার করিয়া কৃষ্ণকে জগতের দুঃখ জানাইয়াছিলেন। এই স্থানেই শ্রীল বিশ্বরূপ, ঠাকুর হরিদাস, শ্রীবাস, গঙ্গাদাস, শুক্লাম্বর, চন্দ্রশেখর, মুরারী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ মিলিত হইয়া অনুক্ষণ কৃষ্ণকথারসে মগ্ন থাকিতেন এবং সকলে একত্রিত হইয়া বহির্ম্মুখ জগতের কৃষ্ণবৈমুখ্যের কথা আলোচনা ও কিরূপে জগতের শুভোদয় হইতে পারে, তদ্বিষয়ে চিন্তা ও ইষ্টগোষ্ঠী করিতেন। এই স্থানটীকে 'শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের টোলগৃহ' বা 'অদ্বৈত সভা'ও বলিয়া থাকে।

(ঢ) শ্রীবাস-অঙ্গন—এই স্থান শ্রীযোগপীঠের শতধনু উত্তরে অবস্থিত। শ্রীবাস-অঙ্গন সপার্ষদ গৌর-সুন্দরের মহাসংকীর্ত্তনস্থলী। শ্রীবৃন্দাবন লীলার রাসস্থলী ও শ্রীবাস অঙ্গন একই বস্তু। এই স্থানে শ্রীগৌরসুন্দর পঞ্চতত্ত্বাত্মক হইয়া পূজিত হইতেছেন। শ্রীবাস আচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর গার্হস্থ্য-লীলাভিনয়-কালীন প্রধান সহায় ছিলেন। গয়াধামে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়া দীক্ষা গ্রহণ-লীলাভিনয়ান্তে নবদ্বীপে

প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক ভক্তপ্রবর শ্রীবাসের ভবনেই মহাপ্রভু প্রথম বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন ও তাঁহার রাজ-রাজেশ্বর ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীবাস ভবনেই ভক্তগণ মিলিত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিষেকক্রিয়া সম্পাদন করেন। লোকশিক্ষার্থ শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যের নিকট শচীদেবীর বৈষ্ণবাপরাধাভিনয়-ক্ষমাপন-লীলা প্রদর্শন করিয়া শচীদেবীকে প্রেমদান, অদ্বৈত প্রভুকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন, নিত্যানন্দ প্রভু কর্ত্তৃক শ্রীব্যাসপূজা, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে ষড়্‌ভুজ-মূর্ত্তি প্রদর্শন, সপ্ত-প্রহরব্যাপী ভগবদ্‌ভাবাবেশ, সম্বৎসরকাল দ্বার রুদ্ধ করিয়া সমস্তরাত্রব্যাপী সঙ্কীর্ত্তনানন্দ আস্বাদন, প্রভুর নৃসিংহ-ভাবাবেশ প্রভৃতি লীলা প্রভুর নিত্যপার্ষদ মহাভাগ্যবান ভক্তপ্রবর শ্রীবাসের ভবনে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে কীর্ত্তনানন্দে মগ্ন ছিলেন, এমন সময়ে শ্রীবাস আচার্য্যের এক পুত্র পরলোক গমন করিল। শ্রীবাস কীর্ত্তন-সেবার বিঘ্ন আশঙ্কা করিয়া সকলকে শোক প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন। মহাপ্রভু অধিকরাত্রি পর্য্যন্ত নৃত্যকীর্ত্তন করিলেন। কীর্ত্তন ভঙ্গ হইলে মহাপ্রভু বুঝিতে পারিলেন, শ্রীবাসের গৃহে কোন বিপদ ঘটিয়াছে। শ্রীবাসের পুত্রের পরলোকগমন সংবাদ পাইয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে পূর্ব্বে এ সংবাদ না দেওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং শিশুকে নিকটে আনাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ওহে বালক, তুমি শ্রীবাসকে কেন পরিত্যাগ করিতেছ? মৃতবালক উত্তর করিল—ইহার গৃহে যে কয়দিন আমার নির্ব্বন্ধ ছিল, তাহা অতীত হওয়ায় আপনার ইচ্ছাক্রমে অন্যত্র যাইতেছি। আমি আপনার নিত্যদাস—অস্বতন্ত্র জীব। আপনার ইচ্ছার বাহিরে আমার নিজের কিছুই করিবার নাই। মৃত শিশুর মুখে এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীবাসের পরিবারবর্গের দিব্যজ্ঞান লাভ হইল। প্রভু শ্রীবাসকে কহিলেন,—তোমার যে পুত্র ছিল, সে ত' ছাড়িয়া গেল। আমি ও নিত্যানন্দ তোমার নিত্যপুত্র, আমরা তোমাকে কখনই ছাড়িতে পারিব না। শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীকে মহাপ্রভু স্বীয় উচ্ছিষ্ট প্রদান করিয়া কৃপা করেন। এক দরজী শ্রীবাসের বস্ত্রাদি সেলাই করিয়া দিত, মহাপ্রভু তাহার প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া তাহাকে নিজরূপ দর্শন করাইলেন। দরজী প্রেমোন্মত্ত হইয়া অলৌকিক নৃত্য করিতে লাগিল। মহাপ্রভু একদিন ভাবাবেশে শ্রীবাসের মুখে ব্রজগোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মধুর-রসলীলা-কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীবাসকে আলিঙ্গন দান করিয়াছিলেন। আর একদিন মহাপভু ভগবদ্‌ভাবাবেশে শ্রীবাসকে স্তবপাঠ করিতে বলিলেন। মহাপণ্ডিত শ্রীবাস করযোড়ে অতীব ভক্তি সহকারে স্তুতি বন্দনা করিলেন। শ্রীবাসের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীবাসের পরিবারবর্গ, দাসদাসী সকলকেই স্বীয় রূপ প্রদর্শন করাইলেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণের পর নীলাচল হইতে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কয়েকদিন শ্রীবাসভবনে অবস্থান করিয়াছিলেন।

(ণ) **যোগপীঠ বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী**—এই স্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন। মিশ্র পুরন্দর এই স্থানে নিত্য বিষ্ণুপূজা ও অতিথিসেবা করিতেন। এই স্থানেই বালক নিমাই তৈর্থিক বিপ্র-অতিথিকে কৃপা করিয়াছিলেন। এই স্থানে অচ্ছেদ্য তুলসীবন বিরাজিত। এই স্থানে নিম্ববৃক্ষবর অদ্যাপি বালক নিমাই এর স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছেন। যোগপীঠে শ্রীগৌরসুন্দরের বামভাগে বিষ্ণুভক্তিস্বরূপিণী ভূশক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, দক্ষিণে শ্রীশক্তি শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া এবং লীলা বা দুর্গাশক্তি শ্রীধামরূপিণী হইয়া তাঁহার পাদপদ্মালিঙ্গিতা চিন্তামণি-

ভূমিরূপে বিরাজিতা। শ্রীমন্দিরের দ্বিতীয় কক্ষে মাধুর্য্য-মূর্ত্তি শ্রীরাধামাধব- যুগলমূর্ত্তি শোভিত রহিয়াছেন, তৃতীয় কক্ষে পঞ্চতত্ত্ব বিরাজ করিতেছেন। কিঞ্চিদ্দূরে নিম্ববৃক্ষরাজ; তন্মূলে একটী ক্ষুদ্র কুটীর—ইহাই শ্রীশচীমাতার সূতিকা-গৃহ। এই স্থানে শিশু নিমাই খট্টাঙ্গোপরি শয়ন করিয়া আছেন। পার্শ্বে শচীমাতা উপবিষ্ট।

(ত) ক্ষেত্রপাল-শিব—শ্রীযোগপীঠে ঈশান কোণে শ্রীধামরক্ষকরূপ শ্রীক্ষেত্রপাল-শিব নিত্য পূজিত হইতেছেন। শুদ্ধভক্তগণ এইস্থানে শ্রীরূপানুগ পদ্ধতিতে ক্ষেত্রপাল-শিবকে প্রণাম করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিততনু গৌর- সুন্দরের নিরুপাধিকা নিত্যসেবা যাচ্ঞা করিয়া থাকেন। ক্ষেত্রপাল শিবের প্রণাম-স্তোত্র এই,—

"বৃন্দাবনাবনীপতে জয় সোম-সোম মৌলে সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য।
গোপেশ্বর ব্রজবিলাসি-যুগাঙ্ঘ্রি পদ্মে প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে।।"

(থ) শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির—এইস্থানে ভক্তিবিঘ্ন বিনাশন শ্রীনৃসিংহদেব ও শ্রীগৌরগদাধর শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত। এই মন্দিরের দৃশ্য অতীব সুন্দর। এই মন্দিরের চূড়া গঙ্গার পশ্চিম-পার হইতেও লোকলোচনে পতিত হইয়া থাকে।

(দ) শ্রীগৌরকুণ্ড—মাথুরমণ্ডলে যেরূপ শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডের মহিমা, অভিন্নব্রজভূমি শ্রীনবদ্বীপ মণ্ডলেও সেইরূপ রাধাগোবিন্দমিলিততনু গৌরকুণ্ডের মহিমা ভক্তগণের বেদ্য। গৌরভক্তগণ এই কুণ্ডে নিত্যনিস্নাত থাকিয়া গৌরবনে ব্রজসেবার মাধুরী আস্বাদন করেন। গৌরকুণ্ডের জল মস্তকে ধারণ করিলে জীবের অনর্থরাশি বিদূরিত হইয়া গৌর, গৌরজন ও গৌরধামে সুনির্ম্মলা ভক্তির উদয় হয়। গৌরকুণ্ডের তীরে বাস ব্রহ্মাদি দেবতাগণও কামনা করেন। তাই বহু ভজনপিপাসু ভক্ত এই গৌরকুণ্ডের তীরে কুটীর নির্ম্মাণ করিতেছেন। কোন কোন মহৎ-হৃদয় বদান্য পুরুষ ধামযাত্রিগণের সেবাকল্পে ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন ও করিতেছেন। শ্রীগৌরকুণ্ডের তীরে 'ভক্তিসুহৃদ্ তোরণ', 'ইন্দ্রনারায়ণ ধর্ম্মশালা', 'চিন্তামণি-প্রান্তস্তম্ভযুগল' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(ধ) খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা—মহাপ্রভু নাম-প্রচার করিবার সময় শ্রীবাস- অঙ্গনের নিকটবর্ত্তী নগরবাসীদিগকে প্রথমে করতালির সহিত হরিনাম করিতে আজ্ঞা দেন। ক্রমশঃ নবদ্বীপের দ্বারে দ্বারে মৃদঙ্গ-করতালাদি বাদ্যের সহিত সংকীর্ত্তন প্রচারিত হইয়া পড়িল। বক্তিয়ার খিলিজীর আগমনের পর নবদ্বীপের শাসনকর্ত্তা ফৌজদার চাঁদকাজীর সময় পর্য্যন্ত নবদ্বীপে 'হিন্দুয়ানী' অত্যন্ত খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছিল। হিন্দুগণ ভয়ে কখনও ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে সাহস করিতেন না। কিন্তু মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর তাঁহার নির্দেশানুসারে যখন নবদ্বীপের ঘরে ঘরে মৃদঙ্গ করতালের সহিত উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন হইতে লাগিল, তখন নবদ্বীপের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা চাঁদকাজী ইহা জানিতে পারিয়া একদিন সন্ধ্যাকালে শ্রীমায়াপুরের শ্রীবাস-অঙ্গনের নিকটবর্ত্তী জনৈক কীর্ত্তনকারী নগরবাসীর গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং ভবিষ্যতে

কোন নগরবাসী এইরূপ কীর্ত্তনাদি করিলে তাঁহাকে বিশেষভাবে দণ্ডিত এবং তাঁহার জাতিভ্রষ্ট করা হইবে, —এইরূপ ভয় দেখাইয়া গেলেন। যেখানে চাঁদকাজী নগরবাসীর খোল ভাঙ্গিয়াছিলেন, সেই ভূখণ্ড তখন হইতেই 'খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা' নামে প্রসিদ্ধ হইয়া শ্রীমায়াপুরে বিরাজমান রহিয়াছে। এই খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা দর্শন ও বন্দনা করিলে শুদ্ধভক্তিকথা কীর্ত্তনে বিরোধ-প্রবৃত্তি বিদূরিত এবং অসৎসঙ্গ বর্জ্জনে বিপুল বল লাভ হয়।

(ন) বারকোণা ঘাট—এই ঘাটের উপর ছাত্রগণ সহ উপবিষ্ট সরস্বতীপতি শ্রীগৌরসুন্দর এক অপরাবিদ্যা-গর্ব্বিত দিগ্বিজয়ীর গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া তাঁহাকে কৃপা করিয়াছিলেন। যখন নিমাই পণ্ডিত নবদ্বীপে অধ্যাপক-শিরোরত্নরূপে বিরাজ করিতেছিলেন, তখন সরস্বতী দেবীর বরপ্রাপ্ত এক দিগ্বিজয়ী মহাপণ্ডিত সর্ব্বদেশ-রাজ্যের পণ্ডিতমণ্ডলীকে তর্কযুদ্ধে জয় করিবার পর তাৎকালিক নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতবর্গের ভারত-প্রসিদ্ধ পাণ্ডিত্য-মাহাত্ম্যের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকেও জয় করিবার জন্য মহা-দম্ভভরে তথায় আগমন করিলেন। মহাপ্রভু একদিন সন্ধ্যাকালে এই স্থানে সেই গর্ব্বিত দিগ্বিজয়ীর উদ্ধারের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় দিগ্বিজয়ী মহাপ্রভুর সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পড়ুয়াগণের নিকট হইতে অত্যদ্ভুত তেজঃকান্তিবিশিষ্ট নিমাই পণ্ডিতের পরিচয় জ্ঞাত হইলেন। প্রভু প্রথমতঃ দিগ্বিজয়ীর সহিত কয়েকটী কথা বলিয়া পরে যথোচিত শিষ্টাচার ও সুকৌশলের সহিত তাঁহাকে গঙ্গার মহিমা বর্ণন করিতে বলিলেন। দিগ্বিজয়ী তৎক্ষণাৎ দ্রুতগতিতে অনর্গল গঙ্গা-দেবীর মাহাত্ম্যবিষয়ক শ্লোক রচনা করিয়া শতমেঘ-গর্জ্জন-ধ্বনির ন্যায় আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। সকলেই দ্বিগ্বিজয়ীর ঐরূপ অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইলেন। দ্বিগ্বিজয়ী প্রহরকাল এইরূপ অনর্গল শ্লোক উচ্চারণ করিয়া নিরস্ত হইলে প্রভু তাঁহাকে সেই সকল শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। দ্বিগ্বিজয়ী ব্যাখ্যা আরম্ভ করিবামাত্রই প্রভু সেই বর্ণনার আদি, মধ্য ও অন্তে শব্দ, অলঙ্কার ও বিবিধ বিষয়ে অসংখ্য দোষ প্রদর্শন করিলেন। দিগ্বিজয়ী মহাপ্রভুর প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিলেন না; তাঁহার সমস্ত প্রতিভা পরিম্লান হইয়া পড়িল। ইহা দেখিয়া প্রভুর শিষ্যগণ হাস্য করিতে উদ্যত হইলে প্রভু তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেন এবং দিগ্বিজয়ীকে নানাভাবে আশ্বস্ত করিয়া সে রাত্রির জন্য বিশ্রাম করিতে ও রাত্রিতে গ্রন্থাদি দেখিয়া পরদিন পুনরায় আসিতে বলিলেন। দিগ্বিজয়ী অন্তরে অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"ষড়্‌দর্শনে অসামান্য পণ্ডিতগণকে আমি পরাজিত করিয়াছি, কিন্তু দৈব-দুর্ব্বিপাকবশতঃ শিশুশাস্ত্র সামান্য ব্যাকরণের একজন তরুণ অধ্যাপকের নিকট আজ আমাকে পরাভূত হইতে হইল!!—ইহার কারণ কি? হয়ত' বা সরস্বতী দেবীর নিকটই আমার কোন প্রকার দোষ ঘটিয়া থাকিবে।" এই ভাবিয়া সরস্বতী-মন্ত্র জপ করিতে করিতে পণ্ডিত নিদ্রিত হইয়া পড়িলে, সেই রাত্রিতেই স্বপ্নযোগে সরস্বতী দেবী দিগ্বিজয়ী কেশবভট্টের নিকট উপস্থিত হইয়া নিমাই পণ্ডিতের স্বরূপ জানাইলেন এবং বলিলেন,—"নিমাই পণ্ডিত সামান্য মর্ত্ত্য পণ্ডিত নহেন,—সাক্ষাৎ সর্ব্বশক্তিমান্ স্বয়ং ভগবান্; সরস্বতীদেবী তাঁহারই স্বরূপশক্তি পরবিদ্যার ছায়াশক্তিমাত্র, সেই ছায়াশক্তিরূপা

সরস্বতী নারায়ণের সম্মুখে উপস্থিত হইতে লজ্জা বোধ করেন,—তিনি শ্রীনারায়ণেরই অপাশ্রিতভাবে অবস্থান করেন মাত্র।" দেবী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে আরও বলিলেন যে, পণ্ডিত এতদিনে প্রকৃত প্রস্তাবে মন্ত্রজপের ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন, যেহেতু তিনি অনন্তব্রহ্মাণ্ডনাথের দর্শনসৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। অতঃপর দিগ্বিজয়ীকে শীঘ্রই প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। দিগ্বিজয়ী জাগরিত হইয়াই প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নানাবিধ কাকুক্তি করিয়া স্বীয় স্বপ্ন-বৃত্তান্ত ও সরস্বতীদেবীর উপদেশ জানাইলেন। সরস্বতীপতি প্রভুও দিগ্বিজয়ীকে ভগবদ্ভজনের অনুকূল পরবিদ্যারই উপাদেয়তা এবং দিগ্বিজয় বা জড় প্রতিষ্ঠাদি- মূলা অপরা বিদ্যার হেয়তা প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলেন। প্রভু বলিলেন,—কৃষ্ণপাদপদ্মে চিত্তবিত্ত সংলগ্ন রাখাই বিদ্যার্জ্জনের ফল এবং বিষ্ণুভক্তি বা পরবিদ্যাই একমাত্র সত্য ও কাম্যবস্তু। এই সকল কথা উপদেশ করিয়া প্রভু, সরস্বতী দেবী দিগ্বিজয়ীর নিকট যে বেদগুহ্যতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উদ্‌ঘাটন করিতে বিশেষভাবে নিষেধ করিলেন। প্রভুর কৃপায় দিগ্বিজয়ী কেশবভট্টের দেহে যুগপৎ ভক্তি, বিরক্তি ও বিজ্ঞানের অধিষ্ঠান হইল, —তিনি পরা ভক্তি লাভে কৃতকৃতার্থ হইয়া প্রকৃত "তৃণাদপি সুনীচ" হইলেন।

(প) মহাপ্রভুর ঘাট—যোগপীঠের নিকটবর্ত্তী ছাড়িগঙ্গার গর্ভে অদ্যাপি দৃষ্ট হয়, ঐ ঘাটই প্রভুর বাড়ীর অতি সন্নিকট। এই ঘাটে নিমাই বিবিধ জলক্রীড়া করিয়া গঙ্গাদেবীকে যমুনার সৌভাগ্য প্রাপ্ত করাইয়াছিলেন।

(ফ) মাধাইর ঘাট—পতিতপাবন শ্রীনিতাই-গৌরের অপার কৃপায় জগাই-মাধাই উদ্ধার হইলে মাধাই নিত্যানন্দের অঙ্গে কলসীর কাণা নিক্ষেপ করার অপরাধ স্মরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ কাকুতি, নিত্যানন্দ-চরণে ক্রন্দন ও স্তব করিতে থাকেন। মাধাই জীবহিংসা-পাপবিমোচন সম্বন্ধে উপদেশ প্রার্থনা করিলে নিত্যানন্দ প্রভু মাধাইকে নিত্য গঙ্গারঘাট পরিষ্কার করিতে আদেশ করেন। গঙ্গার সেবা অপরাধভঞ্জনের উপায়। নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে মাধাই গঙ্গা-স্নানাগত বৈষ্ণবগণের নিকট কাকুবাদে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেন। বৈষ্ণবগণ সকলেই মাধাইর প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার সেবাবৃত্তির প্রশংসা করিতেন। মাধাই এই গঙ্গার ঘাটে অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করায় তাঁহার 'ব্রহ্মচারী' খ্যাতি হইল। তিনি স্বহস্তে কোদালী লইয়া গঙ্গার ঘাট পরিষ্কার করিতেন। এই ঘাট 'মাধাইর ঘাট' নামে প্রসিদ্ধ হইল,—

"পরম কঠোর তপ করয়ে মাধাই।
'ব্রহ্মচারী' হেন খ্যাতি হইল তথাই।।
নিরবধি গঙ্গা দেখি' থাকে গঙ্গাঘাটে।
স্বহস্তে কোদালি লঞা আপনিই খাটে।।
অদ্যাপিহ চিহ্ন আছে চৈতন্য-কৃপায়।
'মাধাইর ঘাট' বলি' সর্ব্বলোকে গায়।।"

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৫শ অঃ)

(ব) প্রাচীন পল্লী—বর্ত্তমান বামনপুকুর গ্রামের যে অংশ আজও তাঁতীপাড়া নামে বিখ্যাত, মহাপ্রভুর সময়ে তথায় তন্তুবায় পল্লী ছিল। বারগোড়ার ঘাট ও কুলিয়ার তন্তুবায় সমাজের সহিত মহাপ্রভুর সমকালীন প্রাচীন তন্তুবায় সমাজ এক নহে। মহাপ্রভুর সমকালীন তন্তুবায়বংশ আজও মহাপ্রভুর বিরোধী নহেন, কিন্তু কুলিয়া-নিবাসী কোন কোন তন্তুরায়-বংশ মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া শাক্তেয় মতবাদ স্থাপনকল্পে বৃথা বিতর্ক উপস্থাপন করে। বর্ত্তমান স্বরূপগঞ্জ বা গাদিগাছা ও মহেশগঞ্জের একাংশে মহাপ্রভুর সময়ের গোপ-পল্লী ছিল। এই সকল স্থানে গৌরসুন্দর নগর-ভ্রমণকালে যে সকল লীলা ও রঙ্গরস করিতেন, তাহা শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবন অতীব সজীব ভাষায় আদি খণ্ড দ্বাদশ অধ্যায়ে (গৌড়ীয় সংস্করণ) বর্ণন করিয়াছেন।

(ভ) চাঁদকাজীর সমাধি—গৌরাঙ্গলীলার চাঁদকাজী শ্রীকৃষ্ণলীলার কংস ছিলেন। এই জন্যই মহাপ্রভু কাজীকে মাতুল বলিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের কীর্ত্তনারম্ভে এই চাঁদকাজী মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়াছিলেন এবং তদানীন্তন গৌড়রাজ্যেশ্বর হোসেন সাহের বলে নানাবিধ উৎপাত করিয়াছিলেন। এই হোসেন সাহ কৃষ্ণ-লীলায় জরাসন্ধ ছিলেন। ভক্ত চাঁদকাজীর সমাধির উপর চারিশত বৎসরের পুরাতন গোলোক চাঁপাবৃক্ষ শোভিত থাকিয়া এখনও ভক্তকে গৌরপাদপদ্মের অঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক অতীত স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। এই কাজির নগর অভিন্ন মথুরাধাম। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কাজী-উদ্ধার-লীলা এই স্থানে পঠিত হইয়া থাকে এবং ভক্তগণ এই স্থানের রজঃ গায়ে মাখিয়া থাকেন। চাঁদকাজী নবদ্বীপবাসীর খোল ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন,—এই কথা মহাপ্রভুর কর্ণগোচর হইলে মহাপ্রভু অত্যন্ত ক্রোধলীলা প্রকাশপূর্ব্বক সমস্ত নগরবাসীকে আরও প্রবলভাবে সংকীর্ত্তন করিতে আদেশ দিলেন। নগরিয়াগণের অন্তরে কাজীর ভয় রহিয়াছে জানিয়া মহাপ্রভু সেইদিনই সন্ধ্যাকালে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ও শ্রীহরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত মিলিত হইলেন এবং সমস্ত নগরবাসীকে আহ্বান করিয়া তিনটী বিভিন্ন সম্প্রদায়ে কীর্ত্তনমণ্ডলী বিভাগ পূর্ব্বক উচ্চ সংকীর্ত্তনমুখে নবদ্বীপ নগর ভ্রমণ করিতে করিতে কাজীর গৃহদ্বারে উপনীত হইলেন। কাজী ভয়ে স্বীয় গৃহের অভ্যন্তরে লুক্কায়িতভাবে অবস্থান করিলে মহাপ্রভু লোক দ্বারা কাজীকে বাহিরে আনাইয়া তাঁহাদের ধর্ম্মাচার সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। কাজী প্রভুর সিদ্ধান্ত শুনিয়া নিরুত্তর ও স্ব-শাস্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। কাজী প্রভুর সমীপে বলিলেন, যে দিন তিনি মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া নবদ্বীপ-বাসীদিগকে কীর্ত্তন করিতে নিষেধ করিয়াছেন, সেই রাত্রেই নরদেহ-সিংহমুখ এক মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি তাঁহার বক্ষের উপরে লম্ফ-প্রদানে আরোহণ পূর্ব্বক দন্ত কড়মড় করিতে করিতে তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া বলিতে-ছিলেন যে, মৃদঙ্গের পরিবর্ত্তে তিনি কাজীর হৃদয় বিদীর্ণ এবং তাঁহাকে সবংশ বিনাশ করিবেন। কাজী ইহা বর্ণন করিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ তাঁহার বক্ষের নখচিহ্ন দেখাইলেন। কাজী আরও বলিলেন যে, সেই দিন তাঁহার এক পেয়াদা—যাহাকে তিনি কীর্ত্তন নিষেধার্থ পাঠাইয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি তাঁহার (কাজীর) নিকট আসিয়া বলিল যে, হঠাৎ অগ্নি উল্কা কোথা হইতে আসিয়া তাঁহার মুখে পতিত হওয়ায় তাহার সমস্ত শ্মশ্রুরাজি দগ্ধ এবং মুখে ব্রণ উপস্থিত হইয়াছে। কাজী আরও বলিলেন যে, তাঁহার পেয়াদা তাঁহাকে

জানাইয়াছিল,—"আমি হিন্দুদিগকে বলিলাম, তোমরা কেহ কেহ কৃষ্ণদাস, রামদাস, হরিদাস—এই নাম পরিচয়ে 'হরি' 'হরি' বলিয়া থাক, 'হরি' 'হরি'—শব্দে 'চুরি করি', 'চুরি করি',—এই অর্থ হয়, তাহাতে বোধ হয় অপরের গৃহের ধন চুরি করিবার অভিপ্রায়েই তোমরা 'হরি' 'হরি' উচ্চারণ কর। যে দিন আমি তাঁহাদের সহিত এইরূপ পরিহাস করিয়াছি, সেই দিন হইতেই আমার জিহ্বা অনিচ্ছাসত্ত্বেও 'হরি হরি' বলিতেছে।" কাজী আরও জানাইলেন যে, ইহার পর একদিন কতকগুলি পাষণ্ডী হিন্দু তাঁহার নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিয়া বলিলেন,—নিমাই হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট করিতেছেন, পূর্ব্বে মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি পূজায় রাত্রি জাগরণ করা একটা ধর্ম্মের কার্য্য ছিল, কিন্তু নিমাই গয়া হইতে আসিয়া সমস্ত বিপরীত ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। মৃদঙ্গ করতালের সহিত উচ্চৈঃস্বরে সময়ে অসময়ে কীর্ত্তনে তাহাদের কাণে তালা লাগিতেছে, রাত্রে নিদ্রাদির ব্যাঘাত ও নগরের শান্তি ভঙ্গ হইতেছে। নিমাই নিজের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া এখন আবার আপনাকে গৌরহরি বলিয়া প্রচার করিতেছেন, ইহাতে হিন্দুর ধর্ম নষ্ট হইয়া গেল। নবদ্বীপ উচ্ছন্ন হইল। ইহার ফলে কেবল কতকগুলি নীচ ব্যক্তির আস্পর্দ্ধা মাত্র বাড়িয়া যাইতেছে। হিন্দুর ধর্ম্মে 'ঈশ্বরের নাম' মনে মনে লইবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু এই নিমাই বিপরীত মত প্রচলন করিয়া সমস্ত নবদ্বীপের শান্তি ভঙ্গ করিতেছেন। অতএব আপনি যখন গ্রামের শাসনকর্ত্তা, তখন ইহার ব্যবস্থা করুন। নিমাইকে ডাকাইয়া তাঁহাকে গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত করুন। মহাপ্রভু কাজীর মুখে হরিনাম উচ্চারণ শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন যে, যখন তিনি 'হরি' 'কৃষ্ণ', 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার সমস্ত অশুভ বিদূরিত হইয়াছে। কাজীও মহাপ্রভুর শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া প্রভুচরণে ভক্তি যাচ্ঞা করিলেন। যাহাতে নবদ্বীপে আর সংকীর্ত্তন বাধা প্রাপ্ত না হয়, মহাপ্রভু কাজীর নিকট এই ভিক্ষা চাহিলে কাজী প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন যে, আমার বংশের কেহই কোন দিন কীর্ত্তনে বাধা দিতে পারিবে না, আমি বংশে এই তালাক দিয়া যাইব। চাঁদকাজীর দ্বাদশ অধস্তনগণ এখনও এই গ্রামে বাস করিতেছেন।

(ম) শ্রীধর-অঙ্গন—শ্রীনবদ্বীপে কদলীকানন মধ্যে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের পরমপ্রিয় নিষ্কিঞ্চন ভক্তরাজ শ্রীধরের গৃহ ছিল। শরডাঙ্গা গ্রামের নিকট মায়াপুরের একপ্রান্তে এবং চাঁদকাজীর সমাধির এক মাইল পূর্ব্বদিকে ডেঙ্গামাঠের উপরে শ্রীধর অঙ্গন অবস্থিত। ইহার নিকটে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে। শ্রীধর দ্বাদশ গোপালের অন্যতম, ব্রজের কুসুমাসব গোপাল। বিষয়মদান্ধ নরকযাত্রী ব্যক্তিগণের চক্ষে ব্যবহারিক দুঃখে প্রপীড়িত বলিয়া প্রতিভাত বিশ্বম্ভর-ভক্তগণের অসমোর্দ্ধ মহত্ত্বের সাক্ষ্যস্বরূপ শ্রীধর নবদ্বীপমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর কাজীর প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কালে পরিশ্রান্ত হইবার লীলা অভিনয় করিয়া শ্রীধরের দ্বারে উপনীত হইলেন। শ্রীধরের ভাঙ্গা ঘর, চালে খড় নাই, গৃহে আসবাব পত্র কিছুই নাই। প্রভু শ্রীধরের অঙ্গনে সংকীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীধরের গৃহের ক্ষুদ্র বারান্দায় এক ভাঙ্গা-ফুটা লৌহপাত্র ছিল। উহার কতস্থানে যে তালি দেওয়া, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রভু তাহা দেখিতে পাইয়া হস্তে তুলিয়া লইলেন এবং তন্মধ্যস্থ জলপান করিতে লাগিলেন। শ্রীধর দুর হইতে দেখিয়া হায়! হায়! করিতে লাগিলেন এবং ম'লাম ম'লাম বলিয়া কাতরস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। প্রভু

আমাকে মারিবার জন্য আমার বাড়ীতে আসিয়া ছিলেন—এই বলিয়া শ্রীধর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভু তাঁহাকে হাতে ধরিয়া সান্ত্বনার স্বরে কহিলেন,—"শ্রীধরের জলপান করিয়া আমার দেহ পবিত্র হইল। কৃষ্ণের চরণে আজি আমার ভক্তিলাভ হইল।" বৈষ্ণবের জলপানে বিষ্ণু ভক্তি হয়—ভক্তবৎসল প্রভু। এই তথ্য জ্ঞাপন করিয়া সর্ব্বসাধারণ সমক্ষে বৈষ্ণবমাহাত্ম্য প্রচার করিলেন। শ্রীশ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট সংস্থাপক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশে শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দ এই শ্রীধর অঙ্গনে শ্রীগৌরপাদপীঠ সংস্থাপন করিবার যত্ন করিতেছেন।

(২) সীমন্তদ্বীপ

(ক) সীমুলিয়া—সীমন্ত দ্বীপকে সাধারণ ভাষায় সীমুলিয়া বলে। এই দ্বীপে অংশিনী স্বরূপশক্তি শ্রীমতী রাধিকার অংশ-স্বরূপিণী শ্রীপার্ব্বতী দেবী বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর কৃপা ও ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের মহাবদান্যতা উপলব্ধি এবং গৌরপাদপদ্ম দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেন। বৈষ্ণবীশক্তি শ্রীপার্ব্বতী দেবী এই স্থানে শ্রীগৌর-পাদপদ্মের ধূলি সীমন্তে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া বিজ্ঞজনগণ ইহাকে শ্রীসীমন্তদ্বীপ বলেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের বিভিন্ন স্থানে এই সীমুলিয়ার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,—

"বারকোণা ঘাটে নগরিয়া ঘাটে গিয়া।
গঙ্গার নগর দিয়া গেল সীমুলিয়া।।
* * * *
নদীয়ার একান্তে নগর 'সীমুলিয়া'।
নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিল গিয়া।।"

(চৈঃ ভাঃ ম ২৩।৩০০, ৩৪৭)

মহাপ্রভু কাজীকে উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে শোভাযাত্রা করিয়া মাধাইর ঘাট, বারকোণা ঘাট হইয়া পরে এই স্থানে উপস্থিত হন।

(খ) শরডাঙ্গা—এই স্থানে শ্রীজগন্নাথদেব শবরগণকে কৃপা করিবার জন্য বিরাজমান। এই স্থান অভিন্ন শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র। প্রাচীন একটী মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেব বলরাম ও সুভদ্রার সহিত বিরাজমান রহিয়াছেন। পূর্ব্বকালে রক্তাবাহু নামক জনৈক বিষ্ণুবিদ্বেষী ব্যক্তি দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলে অর্চ্চাবতার শ্রীজগন্নাথদেব পরম সমর্থ হইয়াও অসমর্থের লীলা আবিষ্কার পূর্ব্বক ভক্তগণের প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু মন্থন করিবার জন্য শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র হইতে এই স্থানে দয়িতার সহিত আগমন করেন এবং তদবধি এইস্থানের ভক্তগণের নিত্যপূজা গ্রহণ করিতে থাকেন।

(গ) শোন ডাঙ্গা মেঘার চর—একদিন মহাপ্রভু দূরভূমিতে সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন, সেই সময় অত্যন্ত মেঘাড়ম্বর হইল। প্রভু ইচ্ছা করিয়া সেই মেঘকে সরিয়া যাইতে আজ্ঞা করায় মেঘ তৎক্ষণাৎ অপসারিত

হইল। এই কারণে সেই গঙ্গা-চরভূমি মেঘের চর বা মেঘার চর বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সম্প্রতি গঙ্গার স্রোতের পরিবর্ত্তনক্রমে বেলুপুখুরিয়া গ্রাম সেই মেঘার চরে স্থানান্তরিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যেখানে বেলপুখুরিয়া ছিল, সে স্থানের বর্ত্তমান নাম 'তারণ বাস' ও 'টোটা' হইয়াছে।

"কীর্ত্তন করিতে প্রভু আইল মেঘগণ।
আপন ইচ্ছায় কৈল মেঘ নিবারণ।।"

(চৈঃ চঃ আ ১৭।৮৯)

(ঘ) বেলপুকুর—প্রাচীন নবদ্বীপ গঙ্গানগর হইতে শ্রীমায়াপুরের দক্ষিণাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উহাতেই শ্রীচৈতন্য ভাগবতোক্ত মহাপ্রভুর ঘাট, মাধাই-এর ঘাট, বারকোণা ঘাট, নগরিয়া ঘাট ও গঙ্গানগরের ঘাট—এই পাঁচটী ঘাট ছিল। ঐ গঙ্গানগর হইতেই তাৎকালিক নবদ্বীপ নগর গঙ্গা পরিত্যাগ করিয়া উত্তর ও পূর্ব্বদিকে কিয়দ্দূরে পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তন্মধ্যেই তারণবাস, সীমুলিয়া, বেলপুকুর, বামনুপুকুর, শঙ্খ-বণিকপল্লী, তন্তুবায়পল্লী ও খোলাবেচা শ্রীধরের বাড়ী ছিল।

বর্ত্তমান বামনপুকুর পল্লীর নাম তৎকালে 'বেলপুকুর' ছিল। পরে মেঘার চরায় প্রাচীন বিল্বপুষ্করিণী গ্রাম স্থানান্তরিত হওয়ায় উহা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান 'বামনপুকুর' নাম লাভ করিয়াছে। কারণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাকালে বেলপুকুর হইতে গঙ্গা দক্ষিণবাহিনী হইয়া শ্রীমায়াপুর ও গঙ্গানগরে আসে। কিন্তু দক্ষিণবাহিনী হইয়া পূর্ব্বস্থলীর পাশ দিয়া জান্নগর ও বিদ্যানগর পর্য্যন্ত গিয়াছিল, তথা হইতে পূর্ব্বোত্তর-বাহিনী হইয়া গঙ্গানগরে আসে এবং সেখান হইতে শ্রীমায়াপুর হইয়া পুনরায় দক্ষিণ-পশ্চিমে গতি ধারণ করিয়া বর্ত্তমান কুলিয়া নবদ্বীপ হইয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। গভর্ণমেন্ট অফিসের সার্ভে নক্সায় গঙ্গা ও জলঙ্গীর ধারা ঠিক দেখান হইয়াছে।

(৩) গোদ্রুম দ্বীপ

(ক) সুরভিকুঞ্জ—গোদ্রুমকে অপভ্রংশ-ভাষায় 'গাদিগাছা' বলে। এই স্থানে সুরভি-গাভীর কৃপায় মার্কণ্ডেয় মুনি গৌরভজনোপদেশ লাভ করিয়া শুদ্ধভক্তি আশ্রয় করেন। এই মার্কণ্ডেয় মুনিই কৃষ্ণলীলায় ব্রজে বারিবর্ষণকারী ইন্দ্র ছিলেন। এইস্থানে একটী বিস্তৃত অশ্বত্থ-দ্রুম ছিল। সুরভী গাভী এই দ্রুমতলে অবস্থান করিতেন বলিয়া এই স্থানের নাম 'গোদ্রুম'। এই স্থানে শ্রীশ্রীসুরভিকুঞ্জ বিরাজমান।

(খ) স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—এই স্থানটী সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পরমপ্রিয় ভজনস্থলী। ঠাকুরের অভিন্ন সুহৃৎ অবধূতাগ্রণী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরেরও একটী ভজন কুটীর এই কুঞ্জমধ্যে বিরাজমান রহিয়াছে। কুঞ্জের দ্বারদেশে ক্ষেত্রপাল শিব, মধ্যস্থানে ঠাকুরের ভজনগৃহ এবং একপার্শ্বে তাঁহার সমাধি মন্দির। এই সমাধি মন্দিরে ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীরাধা-গোবিন্দের নিত্যসেবা বিরাজমান। এতৎ-সংলগ্ন স্থানে ঠাকুরের প্রিয়সেবক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস

বাবাজী মহারাজের সমাধি-মন্দির বর্ত্তমান। ঠাকুরের ভজন-মন্দিরে ঠাকুরের ভক্তি-গ্রন্থাগার বিরাজিত রহিয়াছে।

(গ) সুবর্ণবিহার—সত্যযুগে শ্রীসুবর্ণসেন নামে এক বিশেষ প্রতিষ্ঠাশালী নৃপতি ছিলেন। তিনি অতি বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য-সিংহাসন ভোগ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কোন বিশেষ সুকৃতির ফলে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ নারদ সুবর্ণ-সেনের প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হন। মহারাজ সুবর্ণসেন বিষয়ী হইলেও অতিথি, বিশেষতঃ বৈষ্ণবসেবা পরায়ণ ছিলেন। তিনি নারদকে অতীব সমাদরের সহিত পুজা করিলেন। শ্রীনারদমুনি মহারাজকে কৃপা পূর্ব্বক যে সকল তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে রাজার মনে যথার্থ বৈরাগ্যের উদয় হইল। তিনি নারদের কৃপায় জানিতে পারিলেন, যে স্থানে তিনি বাস করিতেছেন, সেইস্থান নবদ্বীপ-মণ্ডলের অন্তর্গত। কলিকালে এইস্থানে রুক্মবর্ণ গৌরহরি সপার্ষদে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার অভুতপূর্ব্বা লীলা প্রকাশ করিবেন। শ্রীনারদ মুনি 'গৌর' নামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া বীণাযন্ত্রে গৌরনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমে বিহ্বল হইলেন, আর বলিতে লাগিলেন,—কবে সেই ধন্য কলি আগমন করিবে, যেদিন গৌরহরি সপার্ষদে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বময় প্রেমের বন্যা ছুটাইবেন? শ্রীনারদ অন্যত্র চলিয়া গেলে শ্রীনারদ-মুখনিঃসৃত গৌরনাম শ্রবণ করিয়া রাজার বিষয়-বাসনার বীজ নির্ম্মূলিত হইল। তিনি প্রেমে 'গৌরাঙ্গ' বলিয়া নাচিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ে দৈন্যের উদ্রেক হইল। একদিন মহারাজ সুবর্ণসেন নিদ্রাযোগে দেখিতে পাইলেন, গৌর-গদাধর সপার্ষদে মহারাজের অঙ্গনে 'হরেকৃষ্ণ' বলিয়া নৃত্য করিতেছেন, আর সকলকে আলিঙ্গন দ্বারা কৃতার্থ করিতেছেন। মহারাজ আরও দেখিলেন, গৌরহরি যেন একটী সাক্ষাৎ সুবর্ণের পুত্তলী; উপনিষদোক্ত সেই রুক্মবর্ণ পুরুষ অনর্পিতচর প্রেমা প্রদানের জন্য প্রেমের পসরা লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ইহা দেখিতে দেখিতে নৃপতির নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। নিদ্রাভঙ্গে অত্যন্ত বিরহকাতর হইয়া তিনি 'গৌর' 'গৌর' বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে দৈববাণী হইল,—"হে মহারাজ, আপনি আশ্বস্ত হউন, গৌরহরি যখন কলিকালে শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলে অবতীর্ণ হইবেন, তখন আপনি বুদ্ধিমন্ত খান নামে পরিচিত হইয়া তাঁহার পার্ষদে গণিত হইবেন এবং তাঁহার শ্রীচরণ-সেবায় অধিকার পাইবেন।" দৈববাণী শুনিয়া মহারাজ আশ্বস্ত হইলেন এবং একান্তভাবে গৌরভজনে মনোনিবেশ করিলেন। এই সুবর্ণ-বিহার সেই সুবর্ণসেন নৃপতির স্থান। গৌরজনের আনুগত্যে এই স্থানের সেবা করিলে অত্যন্ত বিষয়ীরও কুবিষয়ে বৈরাগ্য ও গৌরাঙ্গ-চরণে একান্ত ভক্তিলাভ হয়। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ নারদ শ্রীসুবর্ণসেনকে যে সকল তত্ত্বোপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যেকের শ্রবণের বিষয়। নিম্নে সেই উপদেশাসার উদ্ধৃত হইল,—

"নারদের দয়া হৈল, তত্ত্ব উপদেশ কৈল,
রাজারে ত লইয়া নির্জ্জনে।
নারদ কহেন রায়, বৃথা তব দিন যায়,
অর্থচিন্তা করি মনে মনে।।

অর্থকে 'অনর্থ' জান, পরমার্থ দিব্যজ্ঞান,
হৃদয়ে ভাবহ একবার।
দারাপুত্র বন্ধুজন, কেহ নহে নিজজন,
মরণেতে কেহ নহে কার।।
তোমার মরণ হ'লে দেহটী ভাসায়ে জলে,
সবে যাবে গৃহে আপনার।
তবে কেন মিথ্যা আশা, বিষয়জল-পিপাসা,
যদি কেহ নাহি হৈল কার।।
যদি বল লভি সুখ, জীবনে না পাই দুঃখ,
অতএব অর্থ চেষ্টা করি।
সেই মিথ্যা কথা রায়, জীবন অনিত্য হায়,
নাহি রহে শতবর্ষোপরি।।
অতএব জান সার, যেতে হবে মায়াপার,
যথা সুখে দুঃখ নাহি হয়।
কিসে বা সাধিব বল, সেই ত অপূর্ব্ব ফল,
যাহে নাহি শোক-দুঃখ-ভয়।।
কেবল বৈরাগ্য করি, তাহা না পাইতে পারি,
কেবল-জ্ঞানেতে তাহা নাই।
বৈরাগ্য জ্ঞানের বলে, বিষয়বন্ধন গলে,
জীবের কৈবল্য হয় ভাই।।
কৈবল্যে আনন্দ নাই, সর্ব্বনাশ বলি তাই,
কৈবল্যের নিতান্ত ধিক্কার।
এদিকে বিষয় গেল, শ্রেষ্ঠ কিছু না মিলিল,
কৈবল্যের করহ বিচার।।
অতএব জ্ঞানী জন, ভুক্তি মুক্তি নাহি লন,
কৃষ্ণভক্তি করেন সাধন।
বিষয়েতে অনাসক্তি, কৃষ্ণপদে আনুরক্তি,
সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন।।

জীব সে কৃষ্ণের দাস, ভক্তি বিনা সর্ব্বনাশ,
ভক্তিবৃক্ষে ফলে প্রেমফল।
সেই ফল প্রয়োজন, কৃষ্ণপ্রেম নিত্যধন,
ভুক্তি মুক্তি তুচ্ছ সে সকল।।
কৃষ্ণ চিদানন্দ-রবি, মায়া তার ছায়াছবি,
জীব তার কিরণানুকণ।
তটস্থ ধর্ম্মের বশে, জীব যদি মায়া স্পর্শে,
মায়া তারে করয়ে বন্ধন।।
কৃষ্ণবহির্ম্মুখ যেই, মায়াস্পর্শী জীব সেই,
মায়া স্পর্শে কর্ম্মসঙ্গ পায়।
মায়াজালে ভ্রমি' মরে, কর্ম্মজ্ঞানে নাহি তরে,
কষ্টনাশ মন্ত্রণা করায়।।
কভু কর্ম্ম আবরয়, অষ্টাঙ্গাদি যোগময়,
কভু ব্রহ্মজ্ঞান আলোচন।
কভু কভু তর্ক করে, অবশেষে নাহি তরে,
নাহি মানে আত্মতত্ত্ব-ধন।।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যবে, ভক্তজনসঙ্গ হবে,
তবে শ্রদ্ধা লভিবে নির্ম্মল।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ ভক্তি', হৃদয় অনর্থ ত্যজি,
নিষ্ঠালাভ করে সুবিমল।।
ভজিতে ভজিতে তবে, সেই নিষ্ঠা রুচি হবে,
ক্রমে রুচি হইবে আসক্তি।
আসক্তি হইবে ভাব, তাহে হবে প্রেমলাভ,
এই ক্রমে হয় শুদ্ধভক্তি।।
শ্রবণ, কীর্ত্তন-মতি, সেবা, কৃষ্ণার্চ্চন, নতি,
দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন।
নবধা সাধন এই, ভক্ত সঙ্গে করে যেই,
সেই লভে কৃষ্ণপ্রেমধন।।

তুমি রাজা ভাগ্যবান্, নবদ্বীপে তব স্থান,
ধামবাসে তব ভাগ্যোদয়।
সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধা প্রেয়ে, কৃষ্ণনাম-গুণ গেয়ে,
প্রেম-সূর্য্যে করাও উদয়।।
ধন্যকলি আগমনে, হেথা কৃষ্ণ লয়ে গণে,
শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা প্রকাশিবে।
যেই গৌরনাম লবে, তাতে কৃষ্ণকৃপা হবে,
ব্রজে বাস সেই ত' করিবে।।
গৌরনাম না লইয়া, যেই কৃষ্ণ ভজে গিয়া,
সেই কৃষ্ণ বহুকালে পায়।
গৌরনাম লয় যেই, সদ্য কৃষ্ণ পায় সেই,
অপরাধ নাহি রহে তায়।।

(ঘ) হরিহরক্ষেত্র—গণ্ডকী নদীর তীরে অলকানন্দার পূর্ব্বপারে শ্রীহরিহর-ক্ষেত্র। এই স্থানে ভগবান্ শ্রীহরি নিজ প্রিয়তম সখা মহাদেবের তত্ত্ব জীবকুলকে জানাইবার জন্য প্রকটিত রহিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীশিবের ভেদদৃষ্টি মহাদোষকরী বলিয়া গণিত হয়। যাঁহারা হরকে শ্রীহরির প্রিয়তম বলিয়া জানেন, তাঁহারাই শ্রীহরি ও হরে শুদ্ধভক্তিসম্পন্ন। মহাদেবের প্রসাদে দশ প্রচেতা প্রভৃতি বহু বহু ভক্ত শ্রীহরির প্রেমাস্পদতা লাভ করিয়াছেন। পার্ব্বতীর প্রসাদেও কতশত লোক শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তা প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীহরি ও হরে ভেদদর্শনকারিগণই হরকে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর হরির ন্যায় স্বতন্ত্র ঈশ্বর জ্ঞান বা সর্ব্বমূলাধার পরাৎপর শ্রীহরিকে হর হইতে ভিন্ন জ্ঞান করিয়া অপরাধে পতিত হয়।

(ঙ) মহাবারাণসী—অলকানন্দার পশ্চিমে এই বৈষ্ণবক্ষেত্র বিরাজিত। এস্থানে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শম্ভু বৈষ্ণবী শক্তি গৌরীসহ বিরাজিত থাকিয়া অনুক্ষণ গৌরকীর্ত্তন করিতেছেন। সহস্র বৎসর কাশীতে বাস করিয়া সন্ন্যাস ও জ্ঞানসিদ্ধি ফলে লোকে যে মুক্তি লাভ করে, সেই মুক্তিকে পিশাচীর মত পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে অনায়াসে জীব গৌর-নাম-কীর্ত্তন-নর্ত্তন-পরায়ণ বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর কৃপায় গৌরনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে উৎকৃষ্টা ভক্তি লাভ করেন। এই স্থানে শম্ভু নির্য্যাণ-সময়ে সকলের কর্ণে গৌরনাম প্রদান করেন। এস্থানে জীবের মরণে কোন ভয় নাই।

(চ) দেবপল্লী—ইহাকে সাধারণ ভাষায় 'দে' পাড়া, বলিয়া থাকে। এই স্থানে সত্যযুগে শ্রীনৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপু বধ ও প্রহ্লাদকে কৃপা করিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ এই স্থানে মন্দাকিনীতটে টিলার উপরে স্ব-স্ব-ভজনকুটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কালক্রমে ভাগীরথী এবং ভজনকুটিগুলি লুপ্ত হইলেও এখনও ঐ স্থানে বহু ভজনটীলা প্রাচীন নিদর্শনরূপে বিরাজমান রহিয়াছে। এখনও এই স্থলে সূর্য্যটীলা,

ব্রহ্মটীলা, ইন্দ্রটীলা প্রভৃতি উচ্চভূমিসমূহ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিছুকাল পরে শ্রীনৃসিংহকৃপাপ্রাপ্ত জনৈক ভক্তবর এই স্থানে বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীনৃসিংহসেবা প্রকাশ করেন। সেই মন্দির এখনও এই স্থানে বিরাজমান রহিয়াছেন।

(৪) মধ্যদ্বীপ

(ক) সপ্তর্ষি ভজনস্থলী—মধ্যদ্বীপকে অপভ্রংশ ভাষায় 'মাজিদা' বলে। এই স্থানে সপ্তর্ষি গৌরভজন করিয়া ছিলেন। সত্যযুগে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য বশিষ্ঠ ও ক্রতু—এই সপ্ত ঋষি ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া রুক্সবর্ণ গৌরহরির ভজন ও গৌর-প্রেমতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করেন। ব্রহ্মা বিশেষ আনন্দিত হইয়া তাঁহাদিগকে নবদ্বীপে গমন পূর্ব্বক গৌরনাম কীর্ত্তন করিতে আদেশ করেন এবং ধামকৃপায় তাঁহাদের হৃদয়ে গৌরপ্রেমের স্ফূর্ত্তি হইবে, জানান। ব্রহ্মা আরও বলেন যে, নবদ্বীপে যাঁহাদের প্রীতি, তাঁহারাই ব্রজবাস লাভ করেন। পিতৃদেবের শ্রীমুখে শ্রীনবদ্বীপের এতাদৃশ মহিমা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা নদ্বদ্বীপে আগমন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে গৌরনামগুণ কীর্ত্তন করিতে থাকেন এবং দৈন্যভরে গৌর- সুন্দরের কৃপা যাচ্ঞা করেন। তাঁহারা অনাহারে অনিদ্রায় গৌরনাম-সুধাপানে প্রমত্ত হইয়া এইরূপে গৌরনাম কীর্ত্তন করিতে থাকিলে একদিন মধ্যাহ্নসময়ে মাধ্যাহ্নিক শতসূর্য্য প্রভাসমন্বিত পঞ্চতত্ত্বাত্মক গৌরসুন্দর সপ্তর্ষিকে দর্শন দান করেন। সপ্তর্ষি গৌরসুন্দরের রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত তনু দর্শন করিয়া প্রভুর চরণে আত্মনিবেদনপূর্ব্বক বলিতে থাকেন যে, তাঁহারা অকৈতব প্রেমপ্রার্থী। শ্রীগৌরসুন্দর ঋষিগণকে অন্যাভিলাষ, জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ, তপাদির চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনের উপদেশ করেন এবং আরও বলেন যে, তিনি অল্প দিনের মধ্যেই নদীয়া নগরে প্রকটলীলা আবিষ্কার করিবেন। সেই সময় তাঁহারা তাঁহার নামসংকীর্ত্তনলীলা দর্শন করিতে পাইবেন। সপ্তর্ষি সপ্তটীলার উপরে অবস্থান করিয়া গৌরহরির আদেশে এস্থানে গৌরকৃষ্ণভজনে রত হইলেন।

(খ) নৈমিষারণ্য—এই সপ্তটীলার দক্ষিণে একটী সুপবিত্রা জলধারা গোমতী নদী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। গোমতীর পার্শ্ববর্ত্তী কাননগুলি নৈমিষারণ্য নামে খ্যাত। মহাজনগণ বলেন, এই স্থানে শ্রীসূত গোস্বামীর শ্রীমুখে শৌনকাদি ঋষিগণ গৌরভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন। পঞ্চানন বৃষাসন পরিত্যাগ করিয়া হংসবাহন হইয়া এই স্থানে স্বগণ সহিত গৌর-গুণগাথা শ্রবণ করেন।

(গ) শ্রীব্রাহ্মণ পুষ্কর—(বামন পৌখেরা বা বামনপুরা)—সর্ব্বতীর্থময় শ্রীনবদ্বীপ ধামের এই স্থানে সত্যযুগে দিবোদাস নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভ্রমণ করিতে করিতে উপস্থিত হন। তাঁহার পুষ্কর তীর্থে স্নান করিতে বড়ই আগ্রহ হয়। তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইলে শ্রীধামকৃপায় দিব্যচক্ষু লাভ করেন এবং এই স্থানে পুষ্কর তীর্থরাজের দর্শন পান। তখন তিনি অন্য তীর্থে ভ্রমণের বৃথা আশা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বতীর্থময় শ্রীনবদ্বীপধামের সেবায় নিযুক্ত হন।

(ঘ) উচ্চহট্ট—উচ্চহট্ট বা হাট-ডাঙ্গা গ্রাম সাক্ষাৎ কুরুক্ষেত্র। এইস্থানে দেবতাগণ হাট বসাইয়া অর্থাৎ সকলে একত্র মিলিয়া উচ্চকণ্ঠে গৌরকথা আলোচনা করিতেন। এই জন্য ইহার নাম উচ্চহট্ট বা হাটডাঙ্গা।

(৫) কোলদ্বীপ

(ক) অপরাধ ভঞ্জন পাট—কোলদ্বীপই বর্ত্তমানে মিউনিসিপাল সহর নবদ্বীপ নামে পরিচিত। গঙ্গার পূর্ব্বপারে শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ ও পরপারে কুলিয়া গ্রাম। শ্রীচৈতন্যভাগবতে ইহা স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে, —"গঙ্গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া। সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়।" এই কুলিয়াই 'অপরাধ ভঞ্জনের পাট' বলিয়া খ্যাত। এইস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসপণ্ডিতের চরণে অপরাধী চাপাল গোপাল নামক বিপ্র এবং ভাগবত বক্তা দেবানন্দ পণ্ডিতের অপরাধ ক্ষমা করেন। এই জন্যই ইহাকে অপরাধ ভঞ্জনের পাট বা দেবানন্দের পাট বলিয়া কুলিয়া বলিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি প্রামাণিক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। এই স্থান **'শ্রীকুলিয়া পাহাড়'** নামেও খ্যাত। সত্যযুগে বাসুদেব নামে একজন ব্রাহ্মণকুমার ভগবানের দর্শন পাইবার জন্য ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে থাকিলে শ্রীবিষ্ণু পর্ব্বতসমান উচ্চশরীরধারী কোল বা বরাহরূপে বাসুদেবকে দর্শন প্রদান করেন। এই স্থানে সত্যযুগে ব্রহ্মার যজ্ঞে ভগবান্ বিষ্ণু আবির্ভূত হইয়া দংষ্ট্রাগ্র দ্বারা হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে বিনাশ করেন। এইস্থানে এই সকল প্রাচীন শাস্ত্রীয় কথা শুদ্ধ ভাগবতগণের শ্রীমুখে শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করিলে হিরণ্য বা কনকের প্রতি অক্ষিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মঙ্গল হইতে পারে। কিন্তু সাধুগণের মুখবিগলিত কথায় বিমুখ হইলে ভাগবতোক্ত কলির স্থান হিরণ্যে অক্ষি অধিকতর সংলগ্ন হইয়া অনৃত, মদ, কাম, হিংসা ও বৈর—এই পঞ্চবিধ অনর্থ প্রবলরূপে উদিত হয় ইহা সাধুগণকে লঙ্ঘনরূপ অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড।

(খ) কুলিয়া সমাধি মঠ—অবধূতাগ্রণী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের সমাধি কুলিয়ার নূতন চড়ায় বিরাজমান। ইনি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রিয় নিত্যসুহৃদ এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ বার্ষভানবিদয়িত দাস প্রভুর শ্রীগুরুদেব। ১৩২২ সালের চাতুর্ম্মাস্যব্রত শেষে দামোদর মাসে উত্থানৈকাদশী দিবসে ইনি অপ্রকট লীলা প্রকাশিত করেন।

(গ) কুলিয়া ধর্ম্মশালা—অবধূত পরমহংসকুলচূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর ভজনস্থলে পরিণত হওয়ায় এই স্থানটী (ধর্ম্মশালা) শুদ্ধ ভক্তগণের নিত্য আরাধনার বস্তু হইয়াছে। অনেকে ভগবদ্ভক্তির ভাণ করিয়া লোকচক্ষে শাস্ত্রীয় সদাচার দেখাইয়া নিজ নিজ বিষয়-চেষ্টায় ব্যস্ত হন, তাঁহাদের সেই বিষয়-চেষ্টা গোস্বামী শাস্ত্রে বিষ্ঠার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ইহা প্রত্যক্ষ দেখাইবার জন্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু এই কুলিয়া-ধর্ম্মশালার সাধারণের পুরীষত্যাগের স্থানে প্রায় ছয়মাস কাল বাস করিয়াছিলেন।

(ঘ) ভজন কুটীর—ওঁ বিষ্ণুপাদ বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের ভজনস্থান। শ্রীল জগন্নাথ প্রভু শ্রীব্রজ ও নবদ্বীপমণ্ডলের একচ্ছত্র বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ছিলেন। এই মহাপুরুষই শ্রীগৌর-জন্মস্থানের নির্দ্দেশক শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার প্রাক্তন মূলপুরুষ। তাঁহার শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি অনুরাগ মানবজাতির কোন প্রতিভা বর্ণন করিতে পারেন না। বর্ত্তমান কালে যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত ও

গৌড়ীয় বৈষ্ণবের দাস বলিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন, তাঁহারা সকলেই এই মহাত্মার শ্রীচরণাশ্রিত। এই মহাপুরুষ ১৩০০ সালে শ্রীগৌরজন্মভূমি শ্রীধাম মায়াপুর নির্দ্দেশ করিয়া বর্ষদ্বয়ের মধ্যেই নিজ প্রকটলীলা সংগোপন করেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে জীবোদ্ধারকল্পে এই প্রপঞ্চে প্রেরণ করিয়া স্বীয় জন্মস্থান নির্দ্দেশ করাইয়া দিয়াছেন। এই মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যাব্দ ও বৈষ্ণবপর্ব্বব্রতাদি প্রচারের পৃষ্ঠপোষক, শ্রীনামভজনের একনিষ্ঠা প্রদর্শক এবং কায়মনোবাক্যে নিরন্তর হরিভজনের উপদেশক। ইনি ময়মনসিংহ জেলায় টাঙ্গাইল মহাকুমার কোন গণ্ডগ্রামে প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে প্রকটিত হন। ইঁহার অপ্রকট কাল ১৩০২ সাল। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ হরিভজনের নামে কপটতা বা আলস্য কখনও সহ্য করিতে পারেন নাই। তাঁহার কোন কোন শিষ্যত্বাভিলাষী ব্যক্তি কৌপীনধারী হইয়া মনে করিতেন যে, তাঁহারা যখন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, তাহাদিগকে আর গৃহস্থের ন্যায় শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা হরিভজন করিতে হইবে না, কেবল অনবহিত হইয়া মালা টানিয়া সংখ্যা রাখিলেই তাঁহাদের দৈনিক কৃত্য সাধিত হইবে। কিন্তু সিদ্ধ বাবাজী মহারাজ অহৈতুকী কৃপাপরবশ হইয়া ঐ সকল নামাপরাধিগণকে সর্ব্বক্ষণ 'ভজনকুটীরে'র পার্শ্ববর্ত্তী শাকসব্জীর ক্ষেত্র পরিষ্কারপূর্ব্বক কৃষ্ণসেবার্থে বিবিধ বীজরোপণাদি করাইয়া তাঁহাদের দৈহিক শ্রম কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করিতে বলিতেন। এই ভজনকুটীরে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত তাঁহার সদোপাস্য প্রভুবর শ্রীশ্রীল জগন্নাথের যে সকল প্রসঙ্গাদি হইত, তাহা গৌরজনগণের শ্রীমুখে শ্রবণ করিলে জীবের অনর্থ বিদূরিত ও ভজনে উৎসাহ পরিপুষ্ট হইতে পারে। পরিক্রমাকালে এই সকল লীলাপ্রসঙ্গ শুদ্ধভক্তগণের শ্রীমুখে শ্রবণীয়।

(৬) ঋতুদ্বীপ

এই স্থানে ছয় ঋতু সর্ব্বসময়ে বিরাজমান বলিয়া ইঁহার নাম ঋতুদ্বীপ। রাহুতপুর, চম্পকহট্ট বা চাঁপাহাটী এই দ্বীপের অন্তর্গত।

চম্পকহট্ট—বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বস্থলী থানা ও ই, আই, আর, লাইনে সমুদ্রগড় বা নবদ্বীপ ষ্টেশন হইতে দুই মাইল দূরে চাঁপাহাটী গ্রামে গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের গৃহ। দ্বিজ বাণীনাথ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর বিগ্রহ এই স্থানে বিরাজমান। এই প্রাচীন শ্রীপাটের সেবায় নিতান্ত বিশৃঙ্খলা দর্শন করিয়া ১৩২৮ বঙ্গাব্দে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরস্থিত শ্রীচৈতন্য মঠের সেবকগণ এই পাটবাটীর সংস্কার সাধন পূর্ব্বক একটী নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত প্রমাণাকার নয়নমনোভিরাম বিগ্রহদ্বয় যথাশাস্ত্র অর্চ্চিত হইতেছেন। এস্থানের পূর্ব্ব ইতিহাস ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি প্রাচীন-গ্রন্থে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে,—সত্যযুগে একবৃদ্ধ ভক্ত ব্রাহ্মণ এই স্থানে বাস করিতেন; তৎকালে তথায় প্রচুর পরিমাণে চাঁপাফুলের আমদানী হইত, এইজন্য এই গ্রাম চাঁপাহাটী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণ প্রতিদিন চম্পকহট্ট হইতে পুষ্প সংগ্রহ করিয়া মনের আনন্দে রাধাগোবিন্দের পূজা করিতেন। ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ বিপ্রের ঐকান্তিক ভক্তিতে প্রীত হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিতে ইচ্ছা করিলেন। বিপ্র একদিন পূজায় বসিয়া স্বীয় ইষ্টদেব শ্যামসুন্দরের

ধ্যান করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে চম্পকদ্যুতিতে দর্শন প্রদান করেন; বিপ্র শ্রীকৃষ্ণের এই গৌররূপ দর্শন করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন এবং কৃষ্ণের এই রূপ ধারণ করিবার কারণ স্থির করিতে না পারিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। কৃষ্ণ তাঁহার নিগূঢ় গৌরাবতারের রহস্য জ্ঞাপন করিলেন এবং এই রূপে তিনি কলিকালে অবতীর্ণ হইবেন—একথা ও বলিয়া দিলেন। কলিকালে শ্রীকৃষ্ণের গৌররূপে অবতার জানিতে পারিয়া বিপ্র আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

অত্যন্ত ব্যাকুল, ধৈর্য্য ধরিতে না পারে।
প্রভুর ইচ্ছায় নিদ্রা আকর্ষিল তাঁরে।।
স্বপ্নচ্ছলে দেখা দিল প্রভু গৌরহরি।
চম্পক কুসুম সম রূপের মাধুরী।।

গৌরহরি বিপ্রের মনোভাব জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—"ওহে বিপ্র, তুমি ব্যাকুল হইও না। আমি কলিযুগে মায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবনে তৎপুত্ররূপে অবতীর্ণ হইব। তৎকালে তুমিও চম্পকহট্ট গ্রামে আবির্ভূত হইবে এবং আমার এই রূপ নিরন্তর দর্শন করিতে পাইবে।" এই বিপ্রই গৌরলীলায় দ্বিজ বাণীনাথ। আবার ইনিই ব্রজলীলায় কামলেখা।

কথিত আছে, গীতগোবিন্দ-রচয়িতা কবিবর শ্রীজয়দেব ঠাকুর লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে এইস্থানে পদ্মাবতীর সহিত অবস্থান করিয়া রাগমার্গে শ্রীরাধাগোবিন্দের ভাবসেবা করিতে করিতে পুরটসুন্দরদ্যুতি শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন- সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। ভক্তগণ এই স্থানকে বৃন্দাবনের দ্বাদশ বনের অন্যতম খদির বনরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। পরমপ্রেষ্ঠা সখী-অষ্টকের অন্যতমা চম্পকলতা এই স্থানে চম্পক পুষ্পের মাল্য রচনা করিয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা করিয়া থাকেন বলিয়া এই স্থান মধুর রসাশ্রিত ভক্তগণের অতীব প্রিয় ভজনস্থলী; মহাভারতেও এই স্থানের উল্লেখ দেখা যায়,—

"তথা চম্পাং সমাসাদ্য ভাগীরথ্যাং কৃতোদকঃ।।"

এই চম্পহট্টে শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার সময় প্রতি বৎসর দিবসত্রয়-ব্যাপী মহামেলা যাত্রামহোৎসবাদি হইয়া থাকে। সহস্র সহস্র নরনারী এই মহামেলা দর্শনার্থ আগমন করিয়া বিনাভেটে শ্রীশ্রীগৌরগদাধরের দর্শন ও মহাপ্রসাদ সেবন সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জন করিবার সুযোগ লাভ করেন। যাত্রিগণের যাহাতে কোন প্রকার জলকষ্ট না হয়, তজ্জন্য শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভ্যবৃন্দ এখানে নলকূপাদি প্রোথিত করাইয়া দিয়াছেন।

সমুদ্রগড—এইস্থানে সমুদ্র গঙ্গার আশ্রয়ে আগমন করিয়া শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের লীলা সন্দর্শন করিয়াছিলেন। এইস্থানে সাক্ষাৎ গঙ্গাসাগর তীর্থ। এই স্থানের প্রাচীন ইতিহাস এই,—

দ্বাপর যুগে সমুদ্রসেন নামে এক কৃষ্ণভক্ত রাজা ছিলেন। কৃষ্ণৈকপ্রাণ মধ্যম পাণ্ডব ভীম বঙ্গদিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া সমুদ্রগড় আক্রমণ করিলে ভক্তপ্রবল সমুদ্রসেন মনে করিলেন,—"কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের অত্যন্ত

প্রিয়। পাণ্ডবগণ বিপদে পড়িলে কৃষ্ণ থাকিতে পারেন না। আমি যদি ভীমকে ভয় দেখাইতে পারি, তাহা হইলে অনায়াসেই কৃষ্ণদর্শন করিতে পারিব।" এইরূপ বিচার করিয়া সমুদ্রসেন শ্রীকৃষ্ণস্মরণ পূর্ব্বক ভীমের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। রাজার বাণে ভীম অত্যন্ত ভীত হইবার অভিনয় প্রদর্শন-পূর্ব্বক নিজ রক্ষার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব-সখা শ্রীকৃষ্ণ ভীমকে রক্ষা করিবার ছলে এইস্থলে আগমন পূর্ব্বক ভক্তপ্রবর সমুদ্রসেনকে দর্শন প্রদান করেন। সমুদ্রসেন স্বীয় ইষ্টদেবকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিরল ধারে প্রেমাশ্রু বর্ষিত হইতে লাগিল, কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইল। দেখিতে দেখিতে—

"ক্ষণেকে হইল সেই লীলা অদর্শন।
শ্রীগৌরাঙ্গরূপ হেরে ভরিয়া নয়ন।।
মহাসঙ্কীর্ত্তন-বেশ সঙ্গে ভক্তগণ।
নাচিয়া নাচিয়া প্রভু করেন কীর্ত্তন।।
পুরটসুন্দরকান্তি অতি মনোহর।
নয়ন মাতায় অতি কাঁপায় অন্তর।।
সেই রূপ হেরি' রাজা নিজে ধন্য মানে।
বহু স্তব করে তবে গৌরাঙ্গচরণে।।"

(৭) জহ্নুদ্বীপ

জহ্নুদ্বীপকে অপভ্রংশ ভাষায় 'জান্নগর' বলে। এই স্থান বৃন্দাবনলীলার দ্বাদশ বনের অন্যতম ভদ্রবন। এইস্থানে শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন পাইয়া জহ্নুমুনি তাঁহার তপস্যা সার্থক করিয়াছিলেন। এই স্থানের প্রাচীন ইতিহাস এইরূপ,—

এই স্থানে গঙ্গাতীরে বসিয়া জহ্নুমুনি একদিন সন্ধ্যা করিতেছিলেন, এমন সময়ে ভাগীরথী জহ্নুমুনির কোশাকুশি প্রভৃতি ভাসাইয়া লইয়া যান। তাহা দেখিয়া জহ্নুমুনির অত্যন্ত ক্রোধের উদ্রেক হয়। তিনি গণ্ডূষে সমগ্র গঙ্গাজল পান করিয়া ফেলেন। ভগীরথ তাঁহার পিতৃপুরুষের উদ্ধারার্থ বহু তপস্যা করিয়া গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করিতেছিলেন। গঙ্গাদেবীর অদর্শনে ভগীরথের চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। তিনি উহার কারণ স্থির করিতে না পারিয়া চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। পরে জহ্নুমুনিকে দর্শন করিয়া তাঁহার সেবা করিতে থাকিলে মুনি সন্তুষ্ট হইয়া নিজ অঙ্গ হইতে গঙ্গাকে বাহির করিয়া দেন। তদবধি গঙ্গার একটী নাম 'জাহ্নবী' হইয়াছে। কিছুকাল পরে দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম, গঙ্গাতনয় শ্রীভীষ্মদেব মাতামহ জহ্নুর নিকট অবস্থান করিয়া ভগবদ্ধর্ম্ম শিক্ষা করেন। এই ধর্ম্মতত্ত্বই আবার তিনি যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করেন। মহাভারত শান্তিপর্ব্বে বিষ্ণুসহস্র নাম স্তোত্রে কথিত হইয়াছে,—"একদিন

যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—হে ব্রহ্মন্, জগতে নানাপ্রকার ধর্ম্মের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে কোন্ ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ? কোন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই বা জীব সর্ব্বধর্ম্মানুষ্ঠানের ফল প্রাপ্ত হইতে পারে? আপনি ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ, এই সকল বিষয় সুষ্ঠুরূপে অবগত আছেন। নানা মতবাদে আমার চিত্ত বিভ্রান্ত হইয়াছে, আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে ধর্ম্মতত্ত্বসার উপদেশ করুন।" তদুত্তরে শ্রীভীষ্মদেব ভক্তির সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তের পূজাই একমাত্র ধর্ম্ম—ইহাই উপদেশ করিয়াছিলেন।

বিদ্যানগর—এই স্থান সর্ব্ববিদ্যার পীঠস্বরূপ। ইহা 'সারদা-পীঠ' নামেও কথিত হয়। ঋষিগণ এই স্থানের আশ্রয়ে অবিদ্যা জয় করেন। সর্ব্বযুগের সর্ব্ব ঋষি এই স্থান হইতেই বিবিধ বিদ্যা লাভ করিয়াছেন। এই স্থানে বাল্মীকি—কাব্যরস, ধন্বন্তরী—আয়ুর্ব্বেদ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন। এই স্থানে শৌনকাদি ঋষিগণ বেদমন্ত্র উদ্‌গান করেন, দেবাদিদেব মহাদেব তন্ত্রশাস্ত্র কীর্ত্তন করেন। এই স্থানে ঋষিগণের প্রার্থনায় চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বেদচতুষ্টয় প্রকাশিত করেন। এই স্থানেই কপিল—সাংখ্যশাস্ত্র, গৌতম—তর্কশাস্ত্র, কণাদ—বৈশেষিক শাস্ত্র, পতঞ্জলি—যোগশাস্ত্র, জৈমিনী—মীমাংসাশাস্ত্র, মহামুনি বেদব্যাস—পুরাণাদি শাস্ত্র, নারদাদি ঋষিগণ পঞ্চরাত্রশাস্ত্র প্রকাশ করিয়া জীবগণকে উপদেশ করেন। এই উপবনেই উপনিষদ্‌গণ দীর্ঘকালব্যাপী শ্রীগৌরাঙ্গের আরাধনা করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর অলক্ষ্যে শ্রুতিগণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন, যেহেতু নির্ব্বিশেষ-বুদ্ধিতে তাঁহাদের চিত্ত দূষিত হইয়াছে, সেই হেতু তাঁহারা শীঘ্র তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারিবেন না; তবে তিনি যখন কলিকালে এই নবদ্বীপমণ্ডলে প্রকট লীলা আবিষ্কার করিবেন, তখন তাঁহার প্রভুর পার্ষদরূপে অবতীর্ণ হইয়া উচ্চ-গৌরকীর্ত্তনে অধিকার পাইবেন এবং গৌরসুন্দরের নিত্যা চিদ্বিলাসলীলা দর্শন করিয়া ভগবানের নিত্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্যে শ্রদ্ধাযুক্ত হইবেন। শ্রীগৌরসুন্দর নবদ্বীপমণ্ডলে শ্রীমায়াপুরে অবতীর্ণ হইবেন জানিয়া দেবগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রসভা পরিত্যাগ করিয়া নিজগণ সঙ্গে শ্রীগৌরসেবার্থ নবদ্বীপমণ্ডলের অন্তর্গত বিদ্যানগরে বাসুদেব সার্ব্বভৌমরূপে অবতীর্ণ হন এবং তথায় বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পাছে বিদ্যাজালে পতিত হইয়া তিনি সর্ব্ববিদ্যাপতি গৌরসুন্দরের সেবা হইতে বিচ্যুত হন, এই আশঙ্কায় গৌরাবির্ভাবের পূর্ব্বেই শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম নীলাচলে গমন করেন এবং মনে মনে বিচার করেন যে, যদি আমি প্রকৃত গৌরাঙ্গদাস হইতে পারি, তাহা হইলে প্রভু নিশ্চয়ই আমাকে কৃপা করিয়া তাঁহার পাদপদ্ম-সন্নিধানে আকর্ষণ করিবেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম নীলাচলে মায়াবাদী-সন্ন্যাসিগণের গুরু ও অধ্যাপকরূপে মায়াবাদশাস্ত্র প্রচার করেন। এই বিদ্যানগরে বিদ্যাপতি শ্রীগৌরসুন্দর ন্যায়ের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিয়া সার্ব্বভৌম-শিষ্যগণকে হাস্য-পরিহাসে পরাজিত করেন। এই স্থানে বিদ্যাপতি-গৌরসুন্দরের পাদপঙ্কজপরাগের দ্বারা বিভূষিত হওয়ায় এই স্থানকে কেহ কেহ "বেদনগর" বা "ব্যাসপাঠ" বলিয়াও বন্দনা করেন। গৌরসুন্দরের নীলাচল-লীলাকালে শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় অবিদ্যাবিলাস পরিত্যাগ করিয়া পরবিদ্যা শুদ্ধভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন। সাংখ্য, তর্কবিদ্যা প্রভৃতি অনিত্য জগতে অমঙ্গল প্রসব করে; কিন্তু নবদ্বীপমণ্ডলের সারস্বত

তীর্থে সেই সকল বিদ্যাই পরমমঙ্গলের প্রসূতিস্বরূপা হইয়া বিরাজ করেন। জাগতিক অস্মিতায় যাহা হেয়তা আনয়ন করে, অতিমর্ত্ত্য গৌরধামে তাহাই আবার পরমমঙ্গলের কারণ হয়। এই স্থানে তর্ক-সাংখ্যাদি সমস্ত শাস্ত্রই ভক্তির অধীন হইয়া ভক্তিদাস্য করিয়া থাকে। এই স্থানে ভক্তিদেবীই সম্রাজ্ঞী, আর সকলেই তাঁহার দাস। সকলেই ভক্তিদেবীকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। নবদ্বীপে নবধা ভক্তির অধিষ্ঠান। এই স্থানে কর্ম্মজ্ঞানাদি ভক্তির সেবা করিয়া থাকে। মায়াদেবী কেবল ধামাপরাধী বহির্ম্মুখ জনের দুষ্টমতি উদয় করাইয়া কুতর্ক-স্পৃহা ও অপরাবিদ্যায় রতি জন্মাইয়া দেন। তৎফলে ইহাদের কৃষ্ণবৈমুখ্যরূপ ভীষণ দণ্ড লাভ হয়। এই স্থানের অধিষ্ঠাতৃদেবীরূপে গৌরদাসী প্রৌঢ়ামায়া সর্ব্বযুগে বিরাজিতা রহিয়াছেন,—

"প্রৌঢ়ামায়া গৌরীদাসী অধিষ্ঠাত্রী দেবী।
সর্ব্বযুগে এই স্থান থাকে গৌর সেবি'।।
অতি কর্ম্মদোষ যার বৈষ্ণবেতে দ্বেষ।
তারে মায়া অন্ধ করি দেয় নানা ক্লেশ।।
সর্ব্বপাপ সর্ব্বকর্ম্ম হেথা হয় ক্ষয়।
প্রৌঢ়ামায়া বিদ্যারূপে করে কর্ম্ম লয়।।
কিন্তু যদি শ্রীবৈষ্ণবে অপরাধ থাকে।
তবে দূর করে তারে কর্ম্মের বিপাকে।।
বিদ্যা পড়ি নদীয়ায় সে সব দুর্জ্জন।
কভু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন।।
বিদ্যার অবিদ্যা লাভ করে সেই সব।
নাহি দেখে শ্রীগৌরাঙ্গ নদীয়াবৈভব।।
অতএব বিদ্যা নহে অমঙ্গলময়।
বিদ্যার অবিদ্যা ছায়া অমঙ্গল হয়।।"

শ্রীচৈতন্য ভাগবত পাঠে জানা যায় যে, মহাপ্রভুর প্রকটকালে এই স্থানে যাইতে হইলে গঙ্গাতীরের পথদিয়া কাঁটাখোঁচা, বাঁশ ও জঙ্গলপূর্ণ ভূমি অতিক্রম করিয়া জান্নগরের নিকট গঙ্গাপার হইতে হইত। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন সার্ব্বভৌম- পিতা মহেশ্বর বিশারদের গৃহে বিদ্যানগরে আসেন, তখন নগরের লোক গঙ্গানগর হইতে তীরে তীরে বহু কাঁটা খোঁচা ও জঙ্গলভূমির উপর দিয়া জান্নগরের নিকট গঙ্গার এক ধারা পার হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়াছিলেন।

"নবদ্বীপ আদি সর্ব্বদিকে হৈল ধ্বনি।
বাচস্পতি ঘরে আইলা ন্যাসি-চূড়ামণি।।

শুনিয়া লোকের হৈল চিত্তের উল্লাস।
স্বশরীরে যেন হৈল বৈকুণ্ঠেতে বাস।
* * * *
বন ডাল ভাঙ্গি' লোক দশদিকে চলে।
* * * *
লোকের গহলে যত অরণ্য আছিল।
ক্ষণেকে সকল দিব্য পথময় হইল।।
চলিয়া যায়েন সভে পরানন্দ মন।
* * * *
ক্ষণেকে আইল সব লোক খেয়া-ঘাটে।।"

(৮) মোদদ্রুমদ্বীপ

মাউগাছি, অর্কটিলা বা একডালা মাতাপুর এই দ্বীপের অন্তর্গত। এই স্থান বৃন্দাবনের দ্বাদশবনের অন্যতম শ্রীভাণ্ডারী বন। এই স্থান দর্শনে ভক্তগণের সেবামোদ বৃদ্ধি হয় বলিয়া বিজ্ঞগণ ইহাকে 'মোদদ্রুম দ্বীপ' বলেন। রামলীলায় ভগবান্ যখন বনবাসী হইয়াছিলেন, তখন তিনি এইস্থানে একটী মহাবটবৃক্ষতলে কুটীর বাঁধিয়া বাস করিয়াছিলেন। এই স্থানের প্রাচীন ইতিহাস এইরূপ,—

মাউগাছি গ্রামে এক রাম-উপাসক বিপ্র বাস করিতেন। যেদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু জগন্নাথমিশ্রের গৃহে অবতীর্ণ হন, সেইদিন এই বিপ্র মিশ্রভবনে উপস্থিত ছিলেন। গৌরপ্রকটোৎসব দর্শনে বিপ্র স্থির করিলেন, নিশ্চয়ই আমার প্রভু রামচন্দ্র নিজ দুর্ব্বাদলশ্যামদ্যুতি আবৃত করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে জগন্নাথ মিশ্রের ভবনে তৎপুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই শিশু কখনই প্রাকৃত নহে; প্রাকৃত শিশুর অঙ্গে এরূপ অলৌকিক লক্ষণসমূহ থাকিতে পারে না। মিশ্র ও তৎপত্নী সামান্য মর্ত্ত্য জীবমাত্র নহেন। ইঁহারাও দশরথ-কৌশল্যার অনুরূপ সন্দেহ নাই। বিপ্র এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মিশ্রতনয়কে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়া নিজ ভবন মামগাছিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু স্বীয় প্রভুর এইরূপ প্রচ্ছন্নভাবে অবতীর্ণ হইবার কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া অতিশয় চিন্তান্বিত হইলেন এবং নিজ ইষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্রের দুর্ব্বাদলশ্যামমূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। স্বপ্নে গৌরসুন্দর তাঁহাকে দর্শন দান করিলেন। স্বপ্নে বিপ্র স্বীয় ইষ্টদেবকে গৌরমূর্ত্তিতে দর্শন করিতেছেন, এমন সময় আবার সেই মূর্ত্তিকে নবদুর্ব্বাদল শ্যামরূপে দর্শন করিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং গৌরচরণে নিগূঢ় রহস্য জানিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। গৌরসুন্দর স্বীয় ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া নিজ তত্ত্ব জ্ঞাপনপূর্ব্বক অন্যের নিকট এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে নিষেধ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

এই মোদদ্রুম-দ্বীপেই শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসাবতার শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবন আবির্ভূত হইয়াছিলেন; তাঁহার জন্মভিটা সেবাবুদ্ধির শিথিলতা-নিবন্ধন কিছুকাল যাবৎ তৃণগুল্মাচ্ছাদিত হইয়া লোকলোচনের নিকট অপ্রকাশিত ছিল। কিন্তু গৌর-গৌরজনের পদাঙ্কপূত লুপ্ততীর্থ সমূহের পুনঃ প্রকাশকারী গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রযত্নে তাহা লোকলোচনের নিকট পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। যেমন শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন-বেদব্যাস মহাভারত, ভাগবতাদি শাস্ত্র রচনা করিয়া জীবকুলকে হরিভক্তির কথা জানাইয়াছেন, ঠাকুর বৃন্দাবনও তদ্রূপ বঙ্গবাসী আপামর সকলকে সহজ সরল বাঙ্গালা-ছন্দে মহাপ্রভুর লীলাকথা জানাইয়াছেন। দ্বাপরযুগে ভগবান্ বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নরূপে যে করুণার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা কলিযুগে মোদদ্রুম দ্বীপে অবতরণ- পূর্ব্বক অধিক দয়ার পরিচয় দান করিয়াছেন; এবারকার দয়া নিষ্কপট দয়া। মহাভারতাদিতে যাহা গোপন করিয়া বলা হইয়াছিল, শ্রীচৈতন্যভাগবতে তাহা অমায়ায় সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন গ্রাম্যকথা অর্থাৎ গৃহিধর্ম্ম-কর্ত্তব্যাদি লক্ষণা ব্যবহারিকী মুষিক-বিড়াল-গৃধ্র-গোমায়ু-প্রভৃতি ইতর প্রাণীর দৃষ্টান্ত সংযুক্তা কথার দ্বারা প্রাকৃত লোকের চিত্ত হরিকথায় আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু এবার মোদদ্রুমদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া দ্বৈপায়ন-ব্যাস গৌরাঙ্গের পরম-মধুর-লীলাময়ী কথার দ্বারা সকল শ্রবণোন্মুখ জীবের হৃদয়ই নির্ম্মল করিয়াছেন। পতিতপাবন নিত্যানন্দ প্রভুর ভৃত্যসূত্রে নারায়ণীনন্দন ঠাকুর বৃন্দাবন নিত্যানন্দ নিন্দকগণকে পর্য্যন্ত তাহাদের শিরে পদাঘাত করিয়া কৃপা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। সর্ব্বপ্রথমে ঠাকুর বৃন্দাবনই বাঙ্গালা ভাষায় নবদ্বীপে যুগপৎসমুদিত অপ্রাকৃত চন্দ্রসূর্য্য নিতাই-গৌরাঙ্গের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালার আদি কবি। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব-মহাজনগণের পদাবলী এবং গুণরাজ খাঁর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' প্রভৃতি গ্রন্থে ভক্তিকথা কীর্ত্তিত হইলেও সেই সকল পদাবলী ও কবিতাদি আসল বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত নহে। অন্যের কি কথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার কবিরাজ গোস্বামী প্রভু পর্য্যন্ত আপনাকে ঠাকুর বৃন্দাবনেরই উচ্ছিষ্টচর্ব্বণকারী বা শেষামৃতপানকারী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

ঠাকুর বৃন্দাবনের আবির্ভাবভূমি কেবল বাঙ্গালার নহে, সমগ্র বিশ্বের অধিবাসীর গুরুপীঠ বা ব্যাসপীঠ। এই ভক্তিপীঠ হইতেই সমগ্র জগতে গৌরকৃষ্ণ-ভক্তি-মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। ইহা ঠাকুর বৃন্দাবনের লেখনীতে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখনিঃসৃতা ভবিষ্যদ্‌বাণী মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।।"

বাগেদবী-পতির বাণী মিথ্যা হইবার নহে। অদূর ভবিষ্যতেই সমগ্র জগতের লোক এই ব্যাসপীঠের পূজা করিবার জন্য ঠাকুরের আবির্ভাবভূমি এই মোদদ্রুম-দ্বীপে আগমন করিয় গৌরনিত্যানন্দের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এই চিন্ময় রজে সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিবে, তাহার পূর্ব্বাভাস এখন হইতেই পাওয়া যাইতেছে।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের কৃপায় সর্ব্ব প্রথমে শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতেই ঠাকুর বৃন্দাবনের মহাগ্রন্থ শ্রীচৈতন্যভাগবত ইংরাজী ভাষায় অনুদিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছেন। হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষায় ও শীঘ্র এই মহাগ্রন্থ অনুদিত হইবেন।

এই স্থান **গৌড়ের নৈমিষ**। এই ব্যাসপীঠ এবং ঠাকুর বৃন্দাবনের সেবিত শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-শ্রীবিগ্রহযুগলের সেবা এতদিন সেবাবৃত্তির লুপ্ততার সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক যুগাচার্য্যের কৃপায় এই স্থান ও ঠাকুর বৃন্দাবনের মনোঽভীষ্টের সেবার পুনরুদ্ধার হইতেছে। অচিরেই যাহাতে এই স্থানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তজ্জন্য একটী শ্রীমন্দির এবং তৎসংলগ্ন নাট্যমন্দির ও সেবক খণ্ড প্রভৃতি নির্ম্মিত হইবে। শ্রীশ্রীগৌরজন্মস্থলী যোগপীঠের সেবা অপেক্ষা এই ব্যাসপীঠের সেবা আরও বড়; ইহা ঠাকুর বৃন্দাবনই বেদভাগবতবাক্য উদ্ধার করিয়া তাঁহার গ্রন্থের উপক্রমে, উপসংহারে এবং মধ্যে পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।
সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দঢ়।।"

গত বৎসর (২০ শে ফাল্গুন ১৩৪৪) ধাম-পরিক্রমার সময় এই বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের স্থানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রী ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ ভক্তগণ সঙ্গে সংকীর্ত্তন মুখে শ্রীমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন। এই শ্রীমন্দিরে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ও তৎপূজিত শ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীবিগ্রহ নিত্য-সেবায় অধিষ্ঠিত হইবেন।

এই মোদদ্রুমদ্বীপেই শ্রীবাসগৃহিণী **মালিনী দেবীর পিত্রালয়** ছিল। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের জন্মভিটার অদূরেই চট্টগ্রামবাসী শ্রীল মুকুন্দ ঠাকুরের ভ্রাতা অশেষ পরদুঃখদুঃখী শ্রীগৌরপার্ষদ **শ্রীল বাসুদেব ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমদনগোপাল বিগ্রহ** বিরাজিত রহিয়াছেন। স্বধামগত হরেকৃষ্ণ কবিরাজান্ত অনেকেই এই সেবা পরিচালনা করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় সম্প্রতি সেবার বড়ই অযত্ন হইতেছে।

শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের মহিমা স্বয়ং মহাপ্রভু এইরূপভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"প্রভু বলে, আমি বাসুদেবের নিশ্চয়।
এ শরীর বাসুদেব দত্তের আমার।।
দত্ত আমায় যথা বেচে তথাই বিকাই।
সত্য সত্য ইহাতে অন্যথা কিছুই নাই।।
সত্য আমি কহি শুন বৈষ্ণবমণ্ডল।
এ দেহ আমার বাসুদেবের কেবল।।"

এই বাসুদেব দত্ত ঠাকুরেরই অনুগৃহীত শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য, যিনি শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর দীক্ষাগুরু বলিয়া কীর্ত্তিত। শ্রীবাসুদেবের বৈষ্ণবসেবার্থ ব্যয়-বাহুল্যপ্রবৃত্তি দেখিয়া মহাপ্রভু শ্রীশিবানন্দ সেনকে

ইঁহার 'সরখেল' হইয়া ব্যয় সমাধান করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। ইনি জীবের দুঃখ দর্শনে মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—

"জীবের দুঃখ দেখি' মোর হৃদয় বিদরে।
সর্ব্বজীবের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে।।
জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরক ভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাহ ভবরোগ।।"

এই মামগাছি গ্রামে গৌরপার্ষদ শার্ঙ্গঠাকুর (শার্ঙ্গ পাণি, শার্ঙ্গধর) প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধাগোবিন্দের একটী প্রাচীন সেবা রহিয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রীঠাকুরের একটী মন্দির একটী প্রাচীন বকুল বৃক্ষের সম্মুখে নির্ম্মিত হইয়াছে। সেবার বন্দোবস্ত ভাল হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। শ্রীল শার্ঙ্গ মুরারী প্রভু এই মোদদ্রুম দ্বীপে বাস করিয়া গঙ্গাতীরে নির্জ্জনে ভজন করিতেন। ভগবানের পুনঃ পুনঃ প্রেরণাক্রমে তিনি শিষ্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া স্থির করিলেন যে, যাঁহার সহিত আগামী কল্য প্রাতে দেখা হইবে, তাঁহাকেই তিনি শিষ্যত্বে গ্রহণ করিবেন। ঘটনাক্রমে পরদিবস প্রত্যুষে ভাগীরথী স্নানকালে তাঁহার পাদদেশে একটী মৃতদেহ সংলগ্ন হওয়ায় তাঁহাকেই পুনর্জীবন প্রদান করিয়া শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন। ইনিই 'শ্রীঠাকুর মুরারী' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইঁহার অনুগগণ বংশপরম্পরায় সম্প্রতি শর্ নামক গ্রামে বাস করিতেছেন।

বৈকুণ্ঠপুর বা নারায়ণ পীঠ—এই বৈকুণ্ঠপুরের প্রাচীন ইতিহাস এইরূপ—একদিন দেবর্ষি নারদ শ্রীবৈকুণ্ঠ হইতে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শম্ভুর নিকট কৈলাস পর্ব্বতে আগমন করিয়া দেখিতে পাইলেন, বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শম্ভু আসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণচরিত কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীনারদ দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনরত মহেশকে দেখিতে পাইয়াই প্রেমে বিহ্বল হইলেন এবং ভূতলে পতিত হইয়া শম্ভুকে প্রণাম করিলেন। শম্ভু নারদকে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া তাঁহার কোন স্থান হইতে বর্ত্তমানে আগমন হইয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ অতীব উল্লসিত হইয়া বলিলেন, তিনি শ্রীনারায়ণের দর্শনার্থ শ্রীবৈকুণ্ঠে গমন করিয়া ছিলেন। তথায় দেখিতে পাইলেন, শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নিজ প্রিয়গণ সঙ্গে নবদ্বীপ-প্রসঙ্গে নিমগ্ন রহিয়াছেন। ভারতবর্ষে পরম রম্য নবদ্বীপ নগরে গণসহ নারায়ণ অবতীর্ণ হইবেন। এই প্রসঙ্গ লইয়া বৈকুণ্ঠে মহারঙ্গ হইতেছিল। নারদ সেই আনন্দ-কোলাহল প্রত্যক্ষ করিয়া বৈকুণ্ঠ হইতে ফিরিতেছেন। নারদের মুখে এই সকল কথা শুনিতে পাইয়া শম্ভুর স্বাভাবিক ভগবৎপ্রেমসিন্ধু দ্বিগুণতর উদ্বেলিত হইয়া পড়িল। হুঙ্কার, অশ্রু, কম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকার শম্ভুতে সমকালে উদিত হইল। শ্রীনারদ মহেশকে এইরূপ নবদ্বীপ-লীলাগত দর্শন করিয়া নবদ্বীপাভিমুখে গমন করিলেন। বর্ত্তমানে যে স্থানে বৈকুণ্ঠপুর, সেই স্থানে দেবর্ষি নারদ আগমন করিয়া নবদ্বীপের শোভা দর্শন করিতে করিতে মনে মনে বিচার করিতে থাকিলেন,—"অহো! আমি বৈকুণ্ঠে যে শ্রীনারায়ণের দর্শন করিয়া আসিলাম, এই স্থানে কি সেই বৈকুণ্ঠনাথের দর্শন পাইব?" শ্রীনারদ মুনি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সপার্ষদ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ শ্রীনারদের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। শ্রীনারদমুনি

প্রেমে বিহ্বল হইলে তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে অনর্গল অশ্রুবন্যা প্রবাহিত হইতে লাগিল। শ্রীনারদমুনি শ্রীনবদ্বীপধামকে নানা বিচিত্র স্তবে বীণার মধুরতান সহযোগে বন্দনা করিয়া দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীরুক্মিণীনাথের দর্শন করিলেন। রুক্মিণীবল্লভ 'কোথা হইতে নারদের আগমন হইল'—ইহা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীনারদ নবদ্বীপের কথা বলিলেন। মুনির মনোবৃত্তি জানিয়া রুক্মিণীনাথ কৃষ্ণ নারদের নিকট গৌরমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইলেন। নারদ নবদ্বীপচন্দ্রকে দর্শন করিয়া প্রেমে অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। সেই সময় শ্রীগৌরমূর্ত্তি শ্যামসুন্দর কৃষ্ণরূপে প্রকাশিত হইয়া নারদের হৃদয়ে গৌরকৃষ্ণ-নামরূপ-গুণ-লীলার নিত্যত্ব ও নিত্যবৈশিষ্ট্য প্রকাশিত করিয়া দিলেন। দ্বারকানাথ অতীব সন্তুষ্ট হইয়া নারদকে কৈলাসপর্ব্বতে শিবের নিকট গমন করিয়া এই সকল বার্ত্তা জ্ঞাপনার্থ আদেশ করিলেন। নারদ বীণাযন্ত্রে গৌরকৃষ্ণের চরিত্র বর্ণন করিতে করিতে কৈলাস পর্ব্বতে উপনীত হইলেন এবং মহাদেবের নিকট সমস্ত কথা কীর্ত্তন করিলেন। মহাদেব প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া নারদকে ক্রোড়ে স্থাপনপূর্ব্বক অত্যদ্ভুত নৃত্য-কীর্ত্তন-ধ্বনি দ্বারা কৈলাস-ধাম মুখরিত করিলেন। নারদ পুনরায় এই নবদ্বীপ মণ্ডলান্তর্গত বৈকুণ্ঠপুরে আগমন করিলেন এবং মনে মনে বিচার করিতে থাকিলেন,—"আমি দ্বারকায় ভগবানের যেরূপ দর্শন করিয়াছি, এই স্থানে কি সেই রূপ দর্শন করিতে পাইব?" এইরূপ চিন্তা করিবামাত্রই নারদ এই স্থানে দ্বারকার সমস্তঐশ্বর্য্যবিলসিত গৌরসুন্দরকে রত্ন সিংহাসন মধ্যে দেখিতে পাইলেন। প্রভুর রূপ ও ঐশ্বর্য্যমাধুরী দেখিয়া নারদ আনন্দে বিহ্বল হইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর নারদকে সুমধুর বচনে বলিলেন যে, তিনি অল্পদিনের মধ্যেই এই স্থানে স্বপার্ষদে অবতীর্ণ হইয়া বিবিধা বেদগুহ্যা লীলা বিস্তার করিবেন। এইরূপ বাক্যে নারদকে তুষ্ট করিয়া মহাপ্রভু গৌরহরি অন্তর্হিত হইলেন। প্রভুর অদর্শনে শ্রীনারদ অত্যন্ত বিরহকাতর হইয়া এইস্থানে কিছুদিন গৌরনাম-কীর্ত্তন-নর্ত্তনে অতিবাহিত করিবার পর গৌরনাম গান করিতে করিতে বিবিধ স্থান পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। এই স্থানে বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া এই স্থান 'বৈকুণ্ঠপুর' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই স্থানে শ্রীনারদ শ্রীনারায়ণের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, এই জন্য এই স্থানকে বিজ্ঞগণ 'নারায়ণপীঠ' ও বলিয়া থাকেন। এই স্থানের তদানীন্তন সুযোগ্য রাজা এখানে শ্রীনারায়ণের সেবা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই স্থানে একজন পণ্ডিত ও প্রবীণ ব্রাহ্মণ ছিলেন, লক্ষ্মী-নারায়ণে তাঁহার অনন্যপ্রীতি ছিল। তিনি মধ্যে মধ্যে শ্রীবল্লভ মিশ্রের গৃহে গমন করিয়া নিভৃতে লক্ষ্মীনারায়ণের সেবা করিতেন। বল্লভ মিশ্রের প্রতি তাঁহার অতিশয় স্নেহ ছিল। মিশ্র মহাশয়ও এই বিপ্রকে গুরুবৎ ভক্তি করিতেন। যে দিবস লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর সহিত শ্রীগৌরসুন্দরের বিবাহ-লীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই দিবস এই বিপ্র বিবাহ-সময়ে উপস্থিত থাকিয়া শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও গৌরনারায়ণের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে অদ্ভুত নৃত্য রচনাপূর্ব্বক প্রেম পুলককদম্বে বিভূষিত হইয়াছিলেন। সেই রাত্রে বিপ্র নিজ জীর্ণ কুটীরে আগমন করিয়া মিশ্রগৃহে লক্ষ্মীগৌরচন্দ্রের লীলা স্মরণ করিতে করিতে প্রেমানন্দে বিভোর হইতেছিলেন এবং লক্ষ্মীপ্রাণনাথ শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা যাচ্ঞা করিতেছিলেন। বিপ্রের ঐ প্রকার অদ্ভুত আর্ত্তি দর্শন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রের কুটীরে বিপ্রকে দর্শন দান করেন। দরিদ্র বিপ্রের কুটীরে বৈকুণ্ঠের মহা-ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হইল। রত্নসিংহাসনে লক্ষ্মীসহ গৌরবিগ্রহ

প্রকাশিত হইলেন। সেই সময় গৌরসুন্দর চতুর্ভুজমূর্ত্তি প্রকাশ করায় বিপ্রের পরম বিস্ময় হইল। বিপ্র প্রভুপদে পতিত হইয়া বহু স্তুতি করিলেন। প্রভু বিপ্রকে তাঁহার নিত্যকিঙ্করত্বে স্বীকারপূর্ব্বক ঐ সকল কথা গুপ্ত রাখিতে আদেশ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এই বৈকুণ্ঠপুরেই ঐ ভক্তিমান্ বিপ্রের কুটীর ছিল।

মহৎপুর বা মাতাপুর—বনবাসকালে পাণ্ডবগণ ভ্রমণ করিতে করিতে গৌড়দেশে প্রবিষ্ট হইলেন এবং রাঢ়দেশের একচাকা গ্রামে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। একচক্রা প্রদেশে যে সকল অসুর ছিল, ভীমসেন তাহাদিগকে বধ করিয়া মহা সুযশ অর্জ্জন করিলেন। দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডব একচক্রার নির্জ্জন প্রদেশে অবস্থান করিয়া সর্ব্বদা বলদেব-কৃষ্ণচন্দ্রের স্মরণে নিযুক্ত থাকিলেন। একচক্রার শোভা দর্শন করিয়া মহৎশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির বিচার করিলেন,—"অনেক দেশ দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ চিত্তাকর্ষক স্থান ত' আর কোথায়ও দেখি নাই। মনে হয়, এই স্থান কৃষ্ণের কোন লীলাস্থান। যদি কৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক জানান, তাহা হইলেই এই স্থানের মহিমা জানিতে পারি।" এইরূপ বিচার করিতে করিতে রাত্রি প্রায় শেষ হইল, কৃষ্ণের ইচ্ছায় মহারাজ যুধিষ্ঠির কিঞ্চিৎ নিদ্রাগত হইলে স্বপ্নমধ্যে রোহিনীনন্দন বলরামের দর্শন পাইলেন। বলদেব মৃদুমন্দ হাসিতে হাসিতে অদ্ভুত স্নেহবশে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—"যুধিষ্ঠির, তোমার চিত্তে যাহা স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে, তাহা সত্য। এই স্থান হইতে অনতিদূরে সুরধুনী-বেষ্টিত শ্রীনবদ্বীপ নামক এক পরম রম্য স্থান আছে। তথায় কলির প্রথমে কৃষ্ণচন্দ্র প্রচ্ছন্নাবতারী হইয়া বিপ্রকুলে অবতীর্ণ হইবেন। তাঁহার প্রিয় পার্ষদগণ নানাদেশে জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহারই ইচ্ছামত এই একচক্রা নগরে আমার জন্ম হইবে।" বলদেব এই সকল কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলে মহারাজ যুধিষ্ঠির অতীব বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং একচক্রা গ্রামকে সাক্ষাৎ শ্বেতদ্বীপের মত দর্শন করিতে লাগিলেন। ভূমিশোভা দর্শন করিবা মাত্রই যুধিষ্ঠিরের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি ভ্রাতৃগণকে স্বপ্নবৃত্তান্ত জানাইলেন। একচক্রা গ্রাম হইতে পঞ্চপাণ্ডব নবদ্বীপে আসিয়া উপনীত হইলেন। নবদ্বীপের শোভা দর্শন করিয়া মহৎশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির মনে মনে চিন্তা করিলেন,—"একচক্রা গ্রামে যেরূপ স্বপ্নমধ্যে ভগবানের দর্শন পাইয়াছি, এখানেও কি সেইরূপ দর্শন পাইব? "কৃষ্ণের ইচ্ছায় এইরূপ চিন্তাযুক্ত যুধিষ্ঠির নিদ্রাগত হইলে স্বপ্নমধ্যে অনুপম লাবণ্যলহরীসিন্ধু কৃষ্ণ- বলদেব ভ্রাতৃদ্বয় যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"এই স্থান আমার জন্মভূমি নদীয়ানগর। এখানে আমি কলিযুগে গণসহ অবতীর্ণ হইয়া সঙ্কীর্ত্তন-বন্যায় সমগ্র জগৎ প্লাবিত করিব এবং তোমাদের সহিত রত্নাকরতটে বিবিধ বিলাস করিব।" যুধিষ্ঠিরের মনোবৃত্তি জানিয়া কৃষ্ণচন্দ্র পরমসুন্দর গৌরমূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন। যুধিষ্ঠির ঐ রূপ সন্দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পরমানন্দে বিহ্বল হইলেন এবং দুই প্রভুর পদতলে লুটাইতে লুটাইতে নেত্রজলে তাঁহাদের পাদ্য রচনা করিলেন। প্রভুদ্বয় যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন ও প্রবোধবাক্যে আশ্বস্ত করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। নিদ্রাভঙ্গের পর যুধিষ্ঠির সমস্ত স্বপ্নবৃত্তান্ত ভ্রাতৃগণকে জানাইলেন এবং এইস্থানে কয়েকদিন গৌর-নিত্যানন্দের নামরূপগুণলীলা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিতে করিতে মহানন্দে অবস্থান করিলেন। ব্যাসদেবকে আহ্বান করিয়া যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত গৌরপুরাণ শ্রবণ করিলেন। মহতের শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির মহাশয় এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া এই

স্থানের নাম 'মহৎপুর' হইয়াছে। এই স্থানে বিস্তীর্ণশাখা পঞ্চ-বটবৃক্ষ এবং যুধিষ্ঠির বেদী নামে এক উচ্চ টিলা বিরাজিত ছিল।

(৯) রুদ্রদ্বীপ

রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইদ্রাকপুর, গঞ্জের ডাঙ্গা প্রভৃতি এই দ্বীপের অন্তর্গত। এই রুদ্রদ্বীপকে অপভ্রংশ ভাষায় 'রাদুপুর'ও বলিয়া থাকে। এই রুদ্রদ্বীপের প্রাচীন ইতিহাস এইরূপ,—

রুক্মবর্ণ গৌরহরি নদীয়ায় প্রকটিত হইবেন জানিয়া শ্রীরুদ্রদেব মহা উল্লসিত চিত্তে পূর্ব্ব হইতেই এই স্থানে নিজ গণসঙ্গে আগমন করিয়া নানাবিধ বাদ্যাদি সংযোগ গৌরচরিত্র কীর্ত্তন করিতে থাকেন। গৌরনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া গণসহ রুদ্রদেব যে কালে এই স্থানে অত্যদ্ভুত নর্ত্তনলীলা আবিষ্কার করিতেন, তখন ধরিত্রীদেবীও অধৈর্য্যা হইয়া বৈষ্ণবের পাদস্পর্শে প্রেমভরে কম্পিতা ও পুলকিতা হইতে থাকিত। এই অদ্ভুত নর্ত্তন-কীর্ত্তন দর্শন করিয়া স্বর্গ হইতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে থাকিতেন। তাঁহাদের অন্তরে এই আনন্দের লহরী প্রবাহিত হইত,—এতদিনে বুঝি জীবের দুঃখভার খণ্ডিত হইল। নিশ্চয়ই নবদ্বীপমণ্ডলে শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হইবেন। আমরা প্রভুর জন্মলীলা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইব। রুদ্রদেব গৌরগুণগানে আত্মবিস্মৃত হইয়া যখন হুঙ্কার করিতেন, তখন পাষণ্ডগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইত। শ্রীগৌরসুন্দর রুদ্রদেবের এই প্রকার আর্ত্তি ও মনোবৃত্তি দর্শন করিয়া অন্যের অলক্ষিত রুদ্রদেবকে দর্শন প্রদান করিলেন এবং অবিলম্বেই এই নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরে শচীগর্ভসিন্ধুতে উদিত হইয়া রুদ্রদেবের মনোভিলাষ পূর্ণ করিবেন জানাইয়লেন। রুদ্রদেব শ্রীগৌরসুন্দরকে বিবিধ বিচিত্র স্তবে আরতি করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর রুদ্রদেবকে আলিঙ্গন করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। বিজ্ঞগণ বলেন, এই দ্বীপে নীললোহিতাদি একাদশ রুদ্র গৌরভজন করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম 'রুদ্রদ্বীপ' হইয়াছে। কৈলাসধাম এই রুদ্রদ্বীপেরই প্রভামাত্র। অষ্টাবক্র, দত্তাত্রেয়াদি যোগিগণ অপরাধময়ী অদ্বৈতবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম ধ্যানে রত হইয়াছেন। এই স্থানেই শুদ্ধাদ্বৈতবাদ গুরু শ্রীবিষ্ণুস্বামী রুদ্র-কৃপা লাভ করিয়া সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক আচার্য্য হইয়াছিলেন। শ্রীধরস্বামিপাদের হৃদয়ে এই স্থানেই অলক্ষ্যে গৌরকৃপা সঞ্চারিত হইয়াছিল। তাই তিনি শুদ্ধাদ্বৈত মতে ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের স্নেহভাজন হইয়াছিলেন।

—

ভক্তগণ রুদ্রদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া সঙ্কীর্ত্তনমুখে পুনরায় মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আত্মনিবেদন ক্ষেত্র শ্রীমায়াপুর হইতে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য ও সখ্যভক্তির পীঠস্বরূপ দ্বীপ সমূহ পরিক্রমা করিয়া পুনরায় আত্মনিবেদনক্ষেত্রে আগমন করেন। আদিতে আত্মনিবেদন, অন্তে আত্মনিবেদন। আদৌ আত্মনিবেদন করিয়া শ্রবণকীর্ত্তনাদি নবধাভক্তিযাজনে রত হন, আবার অন্তেও আত্মনিবেদন করিয়া নবধাভক্তি যাজনের সার্থকতা সম্পাদন করেন। এই আত্মনিবেদনই চেতনের ধর্ম্ম। আত্মনিবেদনকারী শ্রীচৈতন্যমঠের নিত্য অধিবাসী।

জড়াভিনিবেশ আসে কেন ?

শ্রীচৈতন্যদেবের ভজনপ্রণালী—চেতনময়ী, শ্রীচৈতন্যভজনস্থলী শ্রীচৈতন্যমঠাদি নির্গুণস্থান—চেতন প্রাণতাময়, শ্রীচৈতন্যপ্রকাশ-বিগ্রহ আচার্য্যের অবিশ্রান্ত উপদেশ—অনর্গল চেতন-সঞ্জীবন-ঘন-বর্ষণ, শ্রীচৈতন্যভাগবত গুরু বৈষ্ণবগণের সঙ্গ—অফুরন্ত চেতনবিজলীপ্রবাহ-সঞ্চার, এইরূপ সর্ব্বচেতনময় সংস্পর্শে থাকিয়াও আমার জড়াভিনিবেশ আসে কেন?

যখন গৃহে ছিলাম, তখন সন্তুষ্ট ছিলাম না; অর্থ থাকিলেও আরও অর্থ লাভের চেষ্টা করিয়াছি, বিদ্যা থাকিলেও আরও বিদ্যা অর্জ্জনে প্রয়াস করিয়াছি, জন থাকিলেও আরও অধিক জনের জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছি, কিন্তু মঠে হরিভজন করিতে আসিয়া "জড়ে অতৃপ্তি বা প্রবৃত্তি" পরিত্যাগের উপদেশ ভুলভাবে বুঝিতে যাইয়া হরিসেবার অতৃপ্তি ও প্রবৃত্তিকেও নির্ব্বাসিত করিয়াছি।

শ্রীগুরুদেব ও শ্রীগুরুর একান্ত শিষ্যদেবগণের যে আদর্শ প্রতিমুহূর্ত্তে দেখিতেছি, তাহাতে তাঁহাদের শ্রীচৈতন্যসেবার "আরও"-র স্পৃহা ও প্রয়াস অনুক্ষণ এত প্রবল হইতে প্রবলতর, বিপুল হইতে বিপুলতর, তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া বর্দ্ধমান যে,অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অখিল বস্তুর দ্বারা সেবা করিতে পারিলেও তাঁহাদের "সেবার আরও"র স্পৃহা শান্ত হয় না—শান্ত হওয়া দূরে থাকুক, অনন্তগুণে, অনন্ত প্রতিভায়, অনন্ত বিভূষণে সমুজ্জ্বলিত হইয়া উঠে।

দশাননের "আরও"র-স্পৃহা আর কতটুকু ছিল? তাহার "আরও"র স্পৃহা স্থাবরত্ব বা জড়ত্ব-প্রাপ্তিতেই নিবৃত্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু জড়ের ন্যায় চেতন পরিচ্ছিন্ন, পরিমিত বা গতিবাধক নহে বলিয়া শ্রীগুরুদেবের শ্রীচৈতন্যসেবার স্পৃহা অনন্ত চেতনরাজ্যের অনন্ত চেতন-বিভব-ভূমিকায় কোটি দ্রুত-অশ্বলম্ফ- গতিকেও পরাস্ত করিয়া নিত্য বর্দ্ধমান। ইহারই নাম—প্রগাঢ় চেতনাভিনিবেশ—অনন্তচিদিন্দ্রিয়ে চৈতন্যানুশীলন—নিত্যসিদ্ধ জীবন্মুক্তি।

যেখানে ঐরূপ চৈতন্যানুশীলনের সহজ ও অকৃত্রিম অনুগমনই নাই, যেখানে বদ্ধ ডোবার জলের ন্যায় চৈতন্যানুশীলন-প্রবাহ প্রতিহত বা স্তব্ধ, সেখানে সেই সঙ্কীর্ণ স্রোতটুকু পূতিগন্ধ প্রকাশ করিয়া কিছুকাল পরেই একেবারে শুকাইয়া যাইবেই যাইবে।

জীব তটস্থ–শক্তি–প্রসূত হইলেও তটে তাহার অবস্থান নাই; তটস্থবস্তু হয় জলে পড়িবে, না হয় স্থলের দিকে অভিযান করিবে। জীব হয় মায়ার রাজ্যে, না হয় কৃষ্ণের রাজ্যে অগ্রসর হইবে, মাঝামাঝি 'আপোষ' বা অবস্থান তাহার নাই।

আমি মাঝামাঝি আপোষ করিতে চাই বলিয়াই আমার জড়াভিনিবেশ আসিয়া পড়ে। মাঝামাঝি 'আপোষ' করিতে চাহিলেই তট হইতে ছট্‌কাইয়া গিয়া ভোগ-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে হয়, না হয় কৃত্রিমত্যাগী সাজিয়া কখনও বা অবৈধ ও প্রচ্ছন্ন ভোগ, কখনও প্রকৃতি-লয়, জড়নির্ব্বাণ প্রভৃতি বিনাশের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়।

যে যে দিকে আমার প্রয়াস-প্রবৃত্তি বা ইন্দ্রিয়পরিচালনার ভোগোন্মুখী বৃত্তিগুলির নৈসর্গিক গতি রহিয়াছে, আমার সেই গতির মোড় ফিরাইয়া নিত্যস্বরূপের নিত্য ধর্ম্মের প্রতি উন্মুখী বা ঐ সকল প্রবৃত্তির চিরস্বাভাবিক গতি প্রকট করিবার জন্যই আমার একান্ত শুভানুধ্যায়ী গুরুবৈষ্ণবগণ আমার যোগ্যতানুযায়ী সেবাসমূহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমি কিন্তু সেই সকল সেবাকে 'কর্ম্ম' মনে করিয়া অধিকাংশ সময়ই 'বেগার' বা দেনা শোধ দিবার চেষ্টা করি। 'বেগার'—এই অর্থে আমি মনে করি, এরূপ কার্য্যকরণে আমার কিছু (অপ) স্বার্থ নাই, যাহাদের জন্য কার্য্য করিতেছি, তাহাদেরই স্বার্থ; একান্ত বাধ্যবাধকতায়, চক্ষুলজ্জায় বা নানা কারণে পড়িয়া 'বেগার' খাটিয়া দিলেই আমি ছুটী পাইলাম। আর 'দেনা শোধ'—এই অর্থে আমি মনে করি, যেহেতু মঠ হইতে খাদ্যাদি আকারে আমার কিছু গ্রহণ করিতে হইতেছে, সেইজন্য বা তদ্‌বিনিময়ে আমার কিছু করিয়া দেওয়া উচিত।

আবার অনেক সময় খুব মন লাগাইয়াও কাজ করিয়া থাকি। সাধারণে আমার অভিনিবেশ দেখিয়া মনে করেন, ইঁহার যখন সেবাকার্য্যে এতদূর মন বসিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই ইঁহার জড়াভিনিবেশ নাই। কিন্তু আমার ঐরূপ "মন লাগা," আর পরমুহূর্ত্তেই মন অন্যত্র চলিয়া যাওয়ার কারণ কি? গৃহস্থের ঘরের বেতন-ভোগী ভৃত্য যে সকল সময়েই ফাঁকি দেয়, বেগার দেয়, তাহা নহে; অনেক ভৃত্য খুব মন লাগাইয়াও কাজ করে, অন্যান্য ভৃত্য অপেক্ষা অধিকতর নিপুণতা এবং অভিনিবেশও দেখাইয়া থাকে; তাহার উদ্দেশ্য কি? অন্তর্নিহিত অভিলাষ কি?—কোন না কোনও প্রকার শুল্ক বা পারিশ্রমিক প্রাপ্তি। কৃষ্ণই যাঁহাদের একমাত্র ধন, এইরূপ নিষ্কিঞ্চনগণের মঠে টাকা-পয়সার আকারে শুল্ক বা পারিশ্রমিক পাওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা অনেক সময়ে না থাকিলেও আমার বঞ্চিত হওয়ার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যজনিত ভাগ্য-দোষে অন্যরূপে পারিশ্রমিক প্রাপ্তির পথগুলি আমি আবিষ্কার করিয়া লই। আমার অন্তরের অন্তঃস্থল খুঁজিয়া দেখিলে দেখিতে পাই, আমি সেই পারিশ্রমিকের জন্যই এত পরিশ্রমী, এত কাজের লোক, এত অভিনিবিষ্টের অভিনয়কারী!

যেখানে অকৃত্রিম ও সহজ "আমার"-বুদ্ধি নাই, সেখানে পারিশ্রমিকের জন্য গুপ্ত বা ব্যক্ত অভিলাষ থাকিবেই। সেই পারিশ্রমিক—অনেক প্রকার। শ্রীরূপশিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু যাহাদিগকে ভক্তিলতার উপশাখা বলিয়াছেন অর্থাৎ যে সকল সেবার ন্যায় আকৃতি বা সৌসাদৃশ্যবিশিষ্ট হইলেও 'সেবা' নহে, সেইরূপ দ্রব্যসমূহই আমার কাম্য পারিশ্রমিক হয়—"লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ।" আমি দুর্ব্বুদ্ধিক্রমে বঞ্চিত হইতে চাহিলে মায়াদেবী আমার জন্য সেই সকল পারিশ্রমিকের পসরা সাজাইয়া লইয়া সমুপস্থিত হয়। নিষ্কপটে "কৃষ্ণ তোমার হঙ," "পড়েছি তোমার ঘরে" বলি না বলিয়াই, "অর্পিতৈব সতী যদি ক্রিয়েত ন তু কৃতা সতী পশ্চাদর্প্যেত" ভক্ত্যেকরক্ষক জগদ্‌গুরু এই উপদেশ, "যস্ত আশীষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্"—এই ভাগবত শিক্ষা হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখি না বলিয়াই মায়াদেবী লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠাদির সুসজ্জিত পসরা লইয়া আমার নিকটে হাস্যলাস্যে আসিতে সাহস করে, আর আমি সেই কাম্যডালি বরণ করিয়া হরিভজনের অভিনয়, মঠবাসের অভিনয় করিতে করিতে জড়াভিনিষ্ট হইয়া পড়ি।

আমি মঠে আসিয়া ভাবনারহিত হইয়াছি। এখানে সংসারের ন্যায় অর্থের ভাবনা, খাওয়া-পরার ভাবনা, অসংখ্য প্রকার ভাবনা ভাবিতে হয় না বা সংসারের অসংখ্য প্রকার ঝঞ্ঝাট ভোগ করিতে হয় না। সে সব ভাবনা ভাবিবার, সে সব ঝঞ্ঝাট ভুগিবার পালাটা গৃহকর্ত্তার ন্যায় মঠ-রক্ষা-কর্ত্তারই উপর। মায়ার সংসারের ভাবনা ভাবিবার, ঝঞ্ঝাট ভুগিবার ভাগ্যটা বিষ্ঠার কৃমি হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর মানুষ, স্বর্গের দেবতা পর্য্যন্ত সকলেরই ভাগ্যে হয়। কিন্তু কৃষ্ণ-সংসারের রক্ষাকর্ত্তা হওয়ার অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্য কোটিমুক্তের মধ্যে একটীরও হয় কিনা সন্দেহ। তাই অত বড় ঝঞ্ঝাট ভুগিবার অধিকারটা অন্যাভিলাষী-অবিশ্বস্ত আমার উপর সুদূরদর্শী গুরুদেব প্রদান করেন নাই। সময়ে সময়ে কৃষ্ণের সংসারের জন্য আমি যতটুকু অর্থাদি ভাবনার অভিনয় দেখাই, সেটা অকৃত্রিমভাবে বা পূর্ণরূপে কৃষ্ণের সংসারের আনুকূল্যের জন্য নহে, অন্তরাত্মায় খুঁজিয়া দেখিলে জানা যায়, সেটা আমার দেহমনোভূমিকায় পাতা একটা ব্যক্তিগত সংসারের পূর্ণ বা আংশিক আনুকূল্যের জন্য। আমি মনে করি, আমি যখন লোকদৃষ্টিতে সংসার ছাড়িয়াছি বা সংসার হইতে তফাৎ আছি, তখন গুরুবৈষ্ণবকে, কৃষ্ণের সংসারের রক্ষাকর্ত্তাকে আমার কপট-নিঃস্বার্থপরতা ও সেবাবুদ্ধির অভিনয় দেখাইয়া ভোগা দিতে পারিব। কিন্তু আমি যে আমার দেহ ও অন্তরে একটা গুপ্ত সংসার পাতিয়াছি, তাহা অনেক পূর্ব্বেই অন্তর্দর্শী গুরুবৈষ্ণবগণ ধরিয়া ফেলিয়াছেন। তথাপি কৃপা করিয়া যে আমাকে স্থান দিতেছেন, উৎসাহ দিতেছেন, ইহা আমার দুর্ব্বুদ্ধি সংশোধনের জন্য তাঁহাদের কৃপাপ্রদত্ত সুযোগমাত্র। নির্ম্মৎসর শুভানুধ্যায়ী তাঁহারা—পরদুঃখদুঃখী তাঁহারা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মাতাপিতার ন্যায় মারাত্মক অনর্থ-পীড়ায় শয্যাশায়ী আমার শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত সর্ব্ববিধ সুচিকিৎসার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিতেছেন না। আজ যদি আমার দেহ ও অন্তরে পাতা সংসারের ভাগে কিছু না থাকিত, তাহা হইলে আমাকে কেহ এতদিন মঠে রাখিতে পারিতেন না। আমার এই আত্মবঞ্চনা-রোগ আমি বৈদ্যের নিকট ব্যক্ত করিয়া আমার প্রতিষ্ঠার লাঘব করিতে চাই না; কিন্তু এই সকল আত্মবঞ্চনার মঞ্চ হইতে একটুকু সরিয়া গেলেই যে আমি 'ধপ্' করিয়া পড়িয়া যাইব।

বিশ্ব প্রাণীর মঙ্গলোদ্দেশ্যে মঠাদিতে আচার্য্যের প্রবর্ত্তিত কৃষ্ণ-যাত্রা মহোৎসবাদির তাৎপর্য্য গুরবৈষ্ণবের নিকট শ্রবণ ও হৃদয়ঙ্গম না করিয়া উৎসবাদির বাহ্যপ্রতীতির উত্তেজন্য ও ধুমধামে সংসারের কর্ম্মভার, অশান্তি, অভাব অভিযোগ বা সংসার-সেবার অক্ষমতা লাঘব ও আবরণ করিবার জন্য আমি অনেক সময় মঠবাস, কার্য্যনিপুণতা এবং মঠ সেবায় অভিনিবেশের অভিনয় দেখাইয়া থাকি। কিন্তু আমাকে ঐরূপ বাহ্যপ্রতীতিগত উত্তেজনা কতদিন ধরিয়া রাখিবে? আবার অন্য কোন উত্তেজনা তাহা হইতে প্রবলতররূপে উপস্থিত হইলে ঐ প্রবৃত্তি আমাকে তন্মুহূর্ত্তেই ঘাড়ে ধরিয়া মঠের প্রাঙ্গণ হইতে বাহির করিয়া দিবে।

নবদ্বীপ, কাশী, বৃন্দাবন, নৈমিষ, কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ, পুরী, ভুবনেশ্বর, হরিদ্বার, বদরিকা, আরও কত নূতন নূতন দেশ এমন কি বিলাত পর্য্যন্ত দর্শন ও ভ্রমণের সুযোগ ও আশা, গ্রহণ-স্নান, শিলংশৈলাদিতে বায়ু পরিবর্ত্তনের সুযোগ, সেবাপর গৃহস্থ গুরুভ্রাতৃগণের আদর-যত্ন, নীলাম্বুদ্ধির কূলে মুক্ত সমীরণ-সেবন,

প্রাসাদ-বাস, মোটর যানারোহণ, চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়, ঘড়ি, সুটকেশ, সার্চ্চলাইট, এণ্ডির চাদর, ভাল ভাল বাঁধান পুস্তক, উৎসবাদির ধুমধাম, বহুলোকের দণ্ডবৎ নমস্কার, প্রশংসা, অসুখ হইবামাত্র শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণের স্বেচ্ছায় সসম্মানে চিকিৎসা এবং নানাবিধ রুচিকর পথ্যাদির ব্যবস্থা প্রভৃতিই আমাকে এতদিন মঠে রাখিয়াছে। শ্রীগুরুদেব, শ্রীগুরুর নিষ্কপট সেবকগণ কৃষ্ণানুসন্ধান আচার প্রচারের জন্য নিজ কার্য্য না থাকিলেও দেশবিদেশে ভ্রমণ করিতেছেন, আর আমি দুর্ব্বুদ্ধি ও দুর্ভাগ্যবশে ভোগানুসন্ধানের জন্য তাঁহাদেরসঙ্গ ধরিয়াছি! কপাল মন্দ হইলে, আত্মবঞ্চিত হইবার অভিলাষ থাকিলে এমনই দুর্ব্বুদ্ধি হয়। কেহ আত্মমঙ্গল জিজ্ঞাসার জন্য মহাভাগবত সাধুর সঙ্গ করেন, কেহ বা ধান-চাল-কলা-মূলার গল্প, সংসারের গাধা-খাটুনীর পরিশ্রান্তির পর পাখার বাতাস উপভোগ বা আড্ডার জন্য সাধুর কাছে আসিয়া থাকেন।

একমাত্র নিষ্কপট হরিসেবকেরই হরিসেবার আনুকুল্যের জন্য অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণের জন্য সর্ব্ববিধ হরিভজনানুকূল বিষয় নির্ব্বন্ধিত করিয়া গ্রহণ করিবার অধিকার আছে, তাহাতে সেবকের কোন প্রকার আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের গন্ধলেশমাত্র থকে না, ফল্গু-বৈরাগীর ন্যায় কৃষ্ণসেবানুকূল বিষয়-সমূহ পরিত্যাগের অভিনয় করিয়া জড় প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের দুষ্ট-আশাও হৃদয় অধিকার করে না। উত্তম বসন-ভূষণ, স্রক্-চন্দন, রাজ্য-ঐশ্বর্য্য যেরূপ ক্ষুধানল সন্তপ্ত ব্যক্তির সুখোৎপাদনে সমর্থ হয় না, সেইরূপ বহির্ম্মু দৃষ্টিতে যাহা ভোগের উপকরণ, তাহা কৃষ্ণসেবানু সন্ধানকারীর দ্বারা যখন কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধিত হয় অর্থাৎ কৃষ্ণকথা-প্রচার বা কৃষ্ণসেবা-প্রচারাদির অনুকূল হয়, তখন ঐ সকল বস্তু সেই সতত-কৃষ্ণ-সেবানুসন্ধান-সংরত পুরুষের আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-স্পৃহার উদ্রেকে সমর্থ হয় না; কেন না, হৃষীকেশন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছা ব্যতীত যে তাঁহার পৃথক্ ইন্দ্রিয় পরিচালনা-বৃত্তির অধিষ্ঠান নাই।

যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রৌতপন্থী গুরুদেব "ঈদংসর্ব্বং"—যাহা প্রাণীজগৎ পরস্পর স্ব-স্ব ভোগার্থ গ্রহণ করিতেছিল, সেই 'সর্ব্বং ইদং'কে ঈশ-সেবায় নিযুক্ত করিবার আদর্শ-পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, যে রূপানুগবর গুরুদেব নিখিল বিষয়কে কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধিত করিবার পরমনিপুণতা প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই গুরুদেবের অকপট অহৈতুক অনুরাগ, আনুগত্য বা "আপনার বুদ্ধি" আমাকে মঠে রাখে নাই, এই দুর্ভাগ্যের কথা আমি কি দিনান্তেও একবার স্মরণ করি, আর সেই দুর্দ্দৈবের কথা নীরবে নিত্যানন্দ প্রভুর পাদপদ্মে অন্তরের অন্তরতমস্থল হইতে নিষ্কপটে কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাই?

মঠ-রক্ষাকর্ত্তা যে অন্যাভিলাষী আমার সেবা করিতেছেন, ইহা ত' তাঁহার গুরুদেবতাত্মতার পরিচয়। "কুষ্ঠি বিপ্রের রমণী, পতিব্রতাশিরোমণি, পতি লাগি' কৈল বেশ্যার সেবা"। তিনি পূর্ণ হরিভজন করিতেছেন, আর অন্যাভিলাষী আমি গুরুসেবকের দ্বারা আমার অন্যাভিলাষ চরিতার্থ করিয়া—আমার সদোপাস্য, সদামান্য গুরুসেবকের দ্বারা আমার চাকুরী করাইয়া আত্মবঞ্চিত হইতেছি। এই আত্মবঞ্চনা-কামনা, এই অপরাধের ফল, এই গুরুসেবা বিষয়ে অন্যমনস্কতা, এই আত্মমঙ্গলচিন্তার অভাব, আমাকে কিছুকাল মঠের সেবার অভিনয় করাইতে করাইতে জড়ের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

যদি আমার চৈতন্য-সরস্বতী-বিনোদেই আসক্তি জন্মিত তাহা হইলে মঠ- রক্ষাকর্ত্তা আমার জন্য কত সুবিধা করিয়া দিয়াছেন,—যে সকল সুবিধার সহস্রাংশের একাংশও কোন যুগে কোন হরিভজনেচ্ছুকে প্রদত্ত হয় নাই, আমি সেই সকল সুবিধা হরিভজনে নিযুক্ত না করিয়া নিজের ব্যক্তিগত অন্যাভিলাষ চরিতার্থতায় আত্মসাৎ করি কেন, আর চৈতন্য-সরস্বতী-বিনোদের সেবা ছাড়িয়া অচৈতন্যবাদী বিষ্ণুশর্ম্মার কথিত অচৈতন্য-সরস্বতী-বিনোদের জন্য আগ্রহবিশিষ্ট হই কেন ? চৈতন্য-সরস্বতী-সেবায় অকপটে নিযুক্ত থাকিলে কি আর অচৈতন্য-সরস্বতীর সেবার জন্য চিত্ত ধাবিত হয়? পরবিদ্যাপীঠের ছাত্র হইতে পারিলে কি আর অপরবিদ্যাপীঠের অগুরুকুলের বেত্রাঘাত গ্রহণের সাধ হয় ? পরবিদ্যারত্ন পাইলে কাহার অবিদ্যাকাচ অন্বেষণে স্পৃহা হয় ?

পরমকারুণিক আচার্য্য কি তাৎপর্য্য পরবিদ্যাপীঠ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা অন্যাভিলাষী আমার মস্তিষ্কে ত' ধারণার বিষয় হইবেই না, গুরুবৈষ্ণবগণের নিকট তাহার তাৎপর্য্য শ্রবণ করিয়াও আমার অন্যাভিলাষযুক্ত মস্তিষ্ক তাহা ধারণা করিতে পারে না। তাই বাহ্যদৃষ্টিতে আমাকে পরবিদ্যাপীঠের ছাত্র বলিয়া প্রদর্শন করিয়াও আমি অপরবিদ্যারই ছাত্র হইয়া পড়ি। পরবিদ্যাপীঠের তাৎপর্য্য—চৈতন্য-সরস্বতী বিনোদ, ইহা দুর্দ্দৈব-দোষে ভুলিয়া গিয়া আমি অনুস্বার বিসর্গ বা ডুকৃঙ্ করণের অর্থাৎ জড়ের বিনোদে আবদ্ধ হইয়া পড়ি। চৈতন্য সরস্বতী-বিনোদ করিলে ত' শ্রীচৈতন্য-সেবাধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যানুশীলনই প্রবল হইত। আমি আত্মেন্দ্রিয় তর্পণের অন্তর্নিহিত স্পৃহার সহিত পরবিদ্যাপীঠের ছাত্রের অভিনয় মাত্র করি বলিয়াই আমার জড়াভিলাষ বা অচৈতন্যানুশীলন-স্পৃহাই প্রবল হইয়াই উঠে। মহাপ্রভুর নবদ্বীপের পড়ুয়াগণকে সমগ্র-শব্দ-শাস্ত্র-সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, ধাতুপ্রত্যয়ের যে অর্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, শব্দশাস্ত্রের সেই বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি শ্রীগুরুদেব অসংখ্যবার আমার কর্ণের নিকট কীর্ত্তন করিয়া আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে পাষাণের রেখার ন্যায় আঁকিয়া দিতে চাহিলেও আমি অন্যাভিলাষ কর্ণমল দ্বারা আমার কর্ণদ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখি। আমি আচার্য্যের দ্বারা কর্ণবেধ-সংস্কারেই সংস্কৃত হইলাম না, সুতরাং কি করিয়া তৎপরবর্ত্তী কৃত্য বেদ-সরস্বতী-বিনোদের সেবায় উপনীত হইতে পারিব? আমাকে বৈষ্ণবগণ 'পণ্ডিত', 'আচার্য্য', 'গোস্বামী', 'ভাগবত', বৈষ্ণব', 'ব্রজবাসী' প্রভৃতি অভিধানে অভিহিত করেন, আমাকে বঞ্চনা বা হিংসা করিবার জন্য নহে। তাঁহারা আচার্য্যব্রুব বা প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায়ের ন্যায় মৎসর, হিংসক হইয়া-ঐসকল নামের একচেটিয়া চর্ম্মব্যবসা করেন না; তাই তাঁহারা চাহেন, সকলেই বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধিবিশিষ্ট পণ্ডিত হউক্—সকলেই আচরণশীল আচার্য্য হউক্,—সকলেই ষড়্বেগজয়ী গোস্বামী হউক্,—সকলেই ভগবৎ-সেবক ভাগবত হউক্—সকলেই একান্তবিষ্ণুসেবাপরবৈষ্ণব হউক্,—সকলেই ভবের পথ ছাড়িয়া ব্রজের পথে চলুক্। যদি আমার সেবোন্মুখণী সুবুদ্ধি হইত, তাহা হইলে আমি বিচার করিতাম, আমার একান্ত শুভানুধ্যায়ী গুরু-বৈষ্ণবগণ আমাকে পণ্ডিতাদি নামে বিভূষিত করিয়া আমাকে আমার নিত্যসিদ্ধা বেদোজ্জ্বলাবুদ্ধি প্রকট করাইবার জন্যই যত্নবান্ হইতে বলিতেছেন, আমাকে আচারবান্ হইতে উপদেশ দিতেছেন। আমার ইন্দ্রিয়সমূহকে ভোগোন্মুখতা হইতে উপদেশ দিতেছেন। আমার ইন্দ্রিয়সমূহকে

ভোগোন্মুখতা হইতে মোড় ফিরাইয়া কৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত করিবার স্নেহময় ইঙ্গিত করিতেছেন। কিন্তু আমি তাঁহাদের এই স্নেহময় স্নিগ্ধ উপদেশ ও অহৈতুকী দয়ার তাৎপর্য্য গ্রহণ না করিয়া আপনাকে 'পণ্ডিত', 'আচার্য্য', 'গোস্বামী', 'বৈষ্ণব', 'ব্রজবাসী' প্রভৃতি মনে করিয়া বঞ্চিত হইয়া পড়িতেছি। কোথায় বৈষ্ণবগণের ঐ অহৈতুকী করুণা প্রতিমুহূর্ত্তে আমার মর্ম্মে নিজ অযোগ্যতা স্মরণ করাইয়া আমাকে অকৃত্রিম "তৃণাদপি সুনীচধর্ম্ম" ও চৈতন্যানুসন্ধান শিক্ষাপ্রদান করিবে, আমাকে ভবের পথ ছাড়াইয়া ব্রজের পথে লইয়া যাইবে, আমার অন্যাভিলাষগুলির জন্য আমাকে অনুতপ্ত করাইয়া গাঢ় হরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবাভিলাষে প্রমত্ত করাইবে, তাহা না করিয়া আমার ভাগ্যদোষে কল্যাণ কল্পতরুর উপদেশটী পর্য্যন্ত বিস্মরণ করাইয়া দিতেছে,—

"আমি ত' বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে,
অমানী না হব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি, হৃদয় দুষিবে
হইব নিরয়গামী।।"

"কাককে গরুড় করে"—এই স্বভাবানুসারে শ্রীচৈতন্যভাগবত-গুরুবৈষ্ণবগণ তাঁহাদের নিজগুণে আমার ন্যায় বিষয়-বিষ্ঠা-ভোজনকামী গ্রাম্যকথার কদর্য্য-রবকারী কুৎসিৎ কাককেও বিষ্ণুবাহক ও বিষ্ণুকথা-কীর্ত্তনকারী সুদর্শন গরুড়ের অনুযায়ী পদবী প্রদান করিতে চাহেন, চণ্ডালকেও বৈকুণ্ঠে আরোহণ করাইতে চাহেন, কুকুরকেও তাহার কুক্কুরত্ব মোচন করাইয়া রাজসিংহাসন দিতে চাহেন, কিন্তু আমি আমার পূর্ব্ব ইতিহাস, সেই বিষয়-বিষ্ঠা-ভোজন-স্বভাব কিছুতেই ভুলিতে পারি না। আমি যদি নিষ্কপটে হরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবা-সুখ বরিয়া লইয়া আমার পূর্ব্ব ইতিহাস-সমূহ ভুলিতে পারিতাম, তাহা হইলে ঐ সকল পদবী আমাকে উত্তরোত্তর কৃষ্ণপদ-কমল-স্পর্শ করিবার অধিকার প্রদান করিত। কিন্তু আমি গুরুবৈষ্ণবগণের ঐ কৃপাকে—ঐ বৈকুণ্ঠ পদবীকে বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠারূপে গ্রহণ করিতে পারি নাই। বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠাই—প্রগাঢ় বৈকুণ্ঠ সেবকাভিমান, যাহা হইতে সার্ব্বভৌমপদ, ব্রহ্মপদ বা অন্যকোনও পদবীই সেই প্রতিষ্ঠার প্রতিষ্ঠিত পুরুষকে বিন্দুমাত্রও টলাইতে পারে না। আমি জড় প্রতিষ্ঠার ভিক্ষুক বলিয়া আমাকে গুরুবৈষ্ণবগণ সর্ব্বোত্তম পদবী প্রদান করিলেও আমি পূর্ব্ব ইতিহাস ভুলিতে পারি না।

"শ্বা যদি ক্রিয়তে রাজা স কিং নাশ্নাত্যুপানহম্।।"

যখন আমার জড়প্রতিষ্ঠা-পারিশ্রমিক-প্রাপ্তির প্রচ্ছন্ন প্রবল স্পৃহা কনক-কামিনী-স্পৃহা হইতে কিছু সময়ের জন্য অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে, তখন আমি প্রতিষ্ঠার জন্য খুব পরিশ্রমী সেবকের অভিনয় করি, আর যখন ঐ প্রতিষ্ঠা-স্পৃহা অপেক্ষা কনক-কামিনী স্পৃহাটা প্রবলতর হইয়া উঠে, তখন আমি মঠ হইতে পলাইয়া যাই।

আমি খুব কাজ করি, সেবা করি, ইহার বিজ্ঞাপন প্রচার করিবার জন্য অনেক সময়েই আমার প্রাণ আইঢাই করিতে থাকে। অনেক সময় গুরুবৈষ্ণবগণকে পাকে-প্রকারে জানাই, আমি এত সেবা করি যে,

বেলা ২টার পূর্ব্বে কিছুতেই স্নানাহার করিবার সময় পাই না, শরীরের প্রতি উদাসীন হইয়া সেবা করিতে করিতে আমার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া গেল, ইত্যাদি। এ সকল কথা কোন প্রকারে মঠ কর্ত্তৃপক্ষগণের গোচরে আসুক, ইহা আমার আন্তরিক অভিলাষ থাকিলেও 'আমি ঐ সকল কথা কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট লুকাইতে চাই' এরূপও একটা 'লোক-দেখান-লুকাইবার-চেষ্টা' কপটতা করিয়া প্রদর্শন করিয়া থাকি। অনেক সময় কপটতা করিয়া প্রদর্শন করিয়া থাকি। অনেক সময় কপটতা করিয়া ছিন্ন কাপড় পরিধানপূর্ব্বক আমার বৈরাগ্য, জড়ে উদাসীনতা ও অজগর-বৃত্তিত্বের বিজ্ঞাপন প্রচার করি। আমি অনেক সময় বলিয়া থাকি, আমার উপর এত হরিসেবার কার্য্যের ভার যে, আমি মোটেই গ্রন্থপাঠ বা হরিনামাদি করিবার সময় পাই না। হরিসেবায় কর্ম্মবুদ্ধি, হরিসেবা বা হরিনামে প্রাকৃত বুদ্ধি ও ভেদবুদ্ধি-নিবন্ধনই যে আমার ঐ দুর্গন্ধ উদ্‌গার নির্গত হইতেছে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। আমি গুরুদেবের পরম কৃপা গ্রহণ করি না। আমাকে সেবাকার্য্য হইতে একটুকু অবসর দিলেই যে আমার ঘাড়ে শয়তান চাপিবে, আমাকে হরিনামের বাহ্য আকৃতি দেখাইয়া অপরাধ করাইতে করাইতে ভক্তিগ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় আবৃত করিয়া ভক্তিগ্রন্থপাঠের নামে ইন্দ্রিয়সুখকর নাটক নভেল পড়াইতে পড়াইতে আমাকে নরকে লইয়া যাইবে, তাহা আপাতঃপ্রেয়ঃকামী, ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমি বুঝিয়াও বুঝি না। আমি চোখ থাকিতে দেখিনা যে প্রভুপাদ যাঁহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম স্নেহ করেন, তাঁহাদেরই উপর সেবা-কার্য্যভার সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম, তাঁহাদের নিঃশ্বাস ছাড়িবার পর্য্যন্ত সময় নাই। আমি যেরূপ দুর্ব্বুদ্ধি সম্পন্ন, তাহাতে আমার স্বতন্ত্রবুদ্ধিতে গ্রন্থ পড়িবার অবকাশ পাইলেই আমি বাড়ী পলাইব। সুদূরদর্শী পরদুঃখ-দুঃখী, পতিত অনর্থগ্রস্ত জীবের একমাত্র অকৃত্রিম শুভানুধ্যায়ী প্রভুপাদ অন্তর্দর্শি-সূত্রে আমার দুর্ব্বুদ্ধির কথা জানেন বলিয়াই হরিসেবা হইতে পৃথগ্‌ভাবে নূতন করিয়া কোনও প্রকার বিদ্যা বা নিপুণতা সংগ্রহ করাইবার পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার শ্রৌত উপদেশ—"তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যুযাবৎ", "স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভিঃ।" কারণ হরিসেবা হইতে পৃথক্ হইয়া নূতন করিয়া কিছু শিক্ষা বা সংগ্রহ করিতে করিতে যদি আমার ঘাড়ে দুর্ব্বুদ্ধি চাপিয়া বসে, "লাঠি কাটিয়া বনের বাঘ মারিব" বিচারে বৃক্ষ হইতে লাঠি কাটিতে কাটিতে যদি "রয়েল বেঙ্গল টাইগার" রূপ আধ্যক্ষিক জ্ঞান আমার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়ে, তবে যে আমার মৃত্যু অনিবার্য্য। তাই অহিংসক গুরুদেব আমাকে বলেন, "তুমি যেখানে আছ, যেরূপ অবস্থায় আছ, তোমার মৃত্যু পর্য্যন্ত হরিভজন ছাড়া আর কিছু তোমাকে করিতে দিব না।" গুরুদেবের এত বড় কৃপা গ্রহণ না করিয়া আমি স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিতে গেলেই জড়ে আসক্ত হইয়া পড়ি।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমি অনেক সময় মনে করি, গুরুবৈষ্ণবগণ বুঝি আমাকে বিশ্বাস করেন না, সন্দেহের চক্ষে দেখেন! গুরুবৈষ্ণবগণের একান্ত বিশ্রম্ভ-ভাজন হইতে না পারা যে আমারই দুর্দ্দৈব, তাহা কিন্তু আমি একবারও বিচার করি না। শত অনর্থ-দোষদুষ্ট আমার নিজদোষ আমার চক্ষে পড়ে না, মৎসর-বুদ্ধিতে অদোষদর্শী গুরুবৈষ্ণবগণের দোষ আছে কল্পনা করি! **অন্যাভিলাষীই—গুরু-বৈষ্ণবগণের অবিশ্বস্ত, আর কৃষ্ণসেবৈকাভিলাষীই পরম বিশ্বস্ত**। আমার যতটা অন্যাভিলাষ থাকিবে, আমি ততটা রূপানুগবর

গুরুদেবের নিকট অবিশ্বস্ত থাকিব, আর আমার যতটা কৃষ্ণসেবাভিলাষের নিষ্কপটতা প্রকাশিত হইবে, আমি শ্রীগুরুদেবের ততটা বিশ্রম্ভভাজন হইব। শ্রীগুরুদেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-সেবা-বিগ্রহের—মূল আশ্রয় বিগ্রহের পক্ষপাতী। সেই সেবাবিগ্রহের নিষ্কপট-অনুগমন যাঁহার যতটা অধিক, তিনি গুরুদেবের ততটা বিশ্রম্ভভাজন। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সেবাভিলাষী, তিনিই গুরুদেবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বস্ত, তাঁহাকে তিনি ঘরের সকল কথা বলেন, তাঁহাকে তিনি সিন্ধুকের গুপ্ত চাবিটী দেন, তাঁহার উপর সমগ্র গৌড়ীয়গণের ভার সমর্পণ করেন। দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ ইহা বিচার না করিয়া অদোষদর্শী-গুরুবৈষ্ণবগণের পক্ষপাতিত্ব ও দুর্ব্বুদ্ধিদোষদুষ্ট-নিজের দোষরাহিত্য বিচার করিয়া গুরুবৈষ্ণবচরণে জ্ঞাত বা অজ্ঞাত অপরাধ করিতে করিতে আমি জড়রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ি।

আমি কয়েকদিন, কয়েকদিন কেন, যুগপরিমিত বা ততোধিক কাল খুব সেবাবৃত্তির উজ্জ্বলতার অভিনয় দেখাইবার পরও হঠাৎ কোন্ প্রবলতর আকষর্ণে আবার জড়ের দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ি? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার যত কিছু সেবার অভিনয়, তাহা ঐ প্রতিষ্ঠা-পারিশ্রমিকের জন্য; তাই আমার হৃদয়ে পূর্ব্ব ইতিহাসের চাপা বহ্নি অনর্থের বাতাসে আবার জ্বলিয়া উঠে। যদি বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হইতাম, যদি অস্থায়িভাবে স্থিত না হইয়া স্থায়িভাবরতিতে অবস্থিত হইতাম, তাহা হইলে আমার ঐরূপ অবৈধ চাঞ্চল্য আসিত না। নানাপ্রকার অন্যাভিলাষ-রূপ অস্থায়ি-ভাবে আমার স্থিতি, জড় প্রতিষ্ঠাতে আমার প্রতিষ্ঠান রচনা করিয়াছিলাম বলিয়াই ঐ সকল ভূমিকা যেই উহাদের নিসর্গবশতঃ আমার নিকট নূতনত্বের আপাত-আকর্ষক চাকচিক্যটা হারাইয়া ফেলিল, অমনি পরিত্যক্ত ন্যক্কার, যাহার প্রতি একদিন অবৈধ ক্রোধ ও ঘৃণার ভাব দেখাইয়াছিলাম, সেই পরিত্যক্ত দ্রব্যই কালকামিনীর পরিবেশন-নৈপুণ্যে আমার নিকট এক পুনরাস্বাদনীয় মধুরতার উত্তেজনা জাগাইয়া দিল। তখন আমি আর স্থির থাকিতে পরিলাম না। অস্থায়ী ভাব রতির সামগ্রীগুলি আমাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না। আমি জড়ের দিকে ধাইয়া চলিলাম।

'আমার দুর্বৃত্তিগুলি দুর্ব্বলতা-জনিত, কপটতা-জনিত নহে' বলিয়া আমি অনেক সময় মনকে সান্ত্বনা দেই অর্থাৎ আত্মগ্লানির মুখটা চাপা দিয়া থাকি। কিন্তু আমার দুর্ব্বলতাই থাকুক, আর কপটতাই থাকুক, এই দুইটী বিশ্বাসঘাতিনী সাপিনীকেই নিশ্চিন্ত হইয়া পুষিতে থাকিলে আমার মৃত্যু অনিবার্য্য। দুর্ব্বলতাই—কপটতার জননী। দুর্ব্বলতা স্বীয় অবৈধ আত্মচরিত্রদোষ গোপন করিতে ইচ্ছুক হইয়া অনেক সময় লুক্কায়িত-ভাবে অর্থাৎ আমার অজ্ঞাতসারে কপটতা কন্যা প্রসব করে এবং কিছুকাল কপটতাকে লালন পালন করিয়া অন্তিম শয্যায়শায়িত হয়। কপটতা দুর্ব্বলতা জননীর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদনের পর স্বৈরিণী হইয়া আমার এবং বহুলোকের সর্ব্বনাশ করে। জগতে প্রাকৃত সহজিয়া ধর্ম্ম সমূহ প্রথমে দুর্ব্বলতা হইতে ক্রমে কপটতায় পরিণতির ফলেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। দুর্ব্বলতার অবৈধ কন্যা—কপটতা, কপটতা হইতে অসংখ্য অনর্থ ও অপরাধের জন্ম। সুতরাং আমি কপট নহি, অপরাধী নহি, দুর্ব্বল মাত্র—ইহা বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে পার পাইব না, আমাকে প্রবলবেগে জড়ের দিকে টানিয়া লইয়া যাইবে।

আমি দুর্ব্বলতাকে হৃদয়ে পুষিয়া কিরূপে কপটতায় অভ্যস্ত হই, তাহার একটী সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলিতেছি। দুর্ব্বলতার দরুণ কোন একটী কুকার্য্য করিয়া ফেলিলে আমার প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব হইবে ভাবিয়া আমি আমার ঐরূপ কার্য্যকে গোপন করি; কখনও বা গোপন করিতে একান্ত অসমর্থ হইয়া পড়িলে ঐরূপ কার্য্যকে 'সাধুকার্য্য' বলিয়া প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করি। তখন আমার ঐরূপ কপটতার সাহায্য করিবার জন্য শাস্ত্র হইতে "অপি চেৎ সুদুরাচারঃ" প্রভৃতি শ্লোক এবং পরমহংসগণের স্বতন্ত্র আচরণের নজির সংগ্রহ করিয়া থাকি। কখনও বা বৈষ্ণবের অসদাচারের বাহ্য অভিনয়ের সুযোগ লইয়া আমার সত্য সত্য অসদাচারকে সমর্থন করিতে চেষ্টা করি। প্রতিষ্ঠা-চণ্ডালী আমাকে এইরূপ নানাবিধ দুর্বুদ্ধি যোগাইয়া দেয়। আমি তখন মুক্ত বৈষ্ণবের সহিত অমুক্ত ও মহা-অনর্থযুক্ত আমার সাম্য-কল্পনারূপ অপরাধের ভীষণ আবর্ত্তে ঘুরপাক খাইয়া আমার কাপট্যনাট্য আরও বাড়াইয়া তুলি।

আমি পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম আমি অপরাধী নহি, দুর্ব্বল মাত্র; কিন্তু ঐ দুর্ব্বলতাই আমার ভীষণাদপি ভীষণ অপরাধের ভাবী প্রসূতি হইয়া দাঁড়ায় এবং আমাকে চিরতরে কল্যাণের পথ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। দুর্ব্বলতা বেশীদিন একাকিনী থাকিতে পারে না। সে সর্ব্বদাই অন্য সখীর সন্ধান করিয়া বেড়ায়। দুর্ব্বল আমি, আমার সর্ব্বদাই সন্ধান থাকে, কোথায় আমার ন্যায় দুর্ব্বল বা আমা অপেক্ষা অধিকতর দুর্ব্বল ব্যক্তি আছে। সেইরূপ ব্যক্তির সঙ্গ পাইয়া গেলে আমার দুর্ব্বলতার সহিত তাহার দুর্ব্বলতার একটা বেশ সখীত্ব পাতাইয়া দুর্ব্বলতার ঘরকন্না বিস্তার করিতে পারি এবং তখন আমরা একজাতীয় সকলে মিলিয়া আমার দুর্ব্বলতাবিনাশকারিণী সন্মুখরিতা হরিকথা বা আমার শুভানুধ্যায়িগণের শক্তিসঞ্চারিণী চেষ্টাকে সপত্নী বিচার করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে দূরে থাকিবার জন্য নানাপ্রকার কপটতার ষড়যন্ত্র পাকাইয়া ফেলিতে পারি। আর যদি আমার আরও দুর্দ্দৈববশে আমার শুভানুধ্যায়িগণের কেহ বঞ্চনা করিয়া কদাচারের কোন আপাত বাহ্য অভিনয় দেখান, তাহা হইলে আমি আমার যে দুর্ব্বলতা-বিষবল্লরীকে এতদিন গোপনে ও সভয়ে বর্দ্ধিত করিতেছিলাম, সেই ক্ষীণা দুর্ব্বলতা-লতাটীকে ভাল করিয়া ফলফুল-সুশোভিত মঞ্জুকুঞ্জে গড়িয়া তুলিবার জন্য খুব একটা বড় আদর্শ পাইয়া থাকি। তখন আমার ভয়ের পরিবর্ত্তে সাহস বাড়িয়া যায়, আমি পরমোৎসাহে আমার দুর্ব্বলতাকে সম্বর্দ্ধিত করিয়া আমার অনর্থের সহিত প্রণয় রজ্জুতে বদ্ধ করি। তাহার ফল- স্বরূপে যাবতীয় প্রাকৃত সহজিয়া ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। প্রাকৃত রস শতদূষণীকে আমার দুর্ব্বলতার সহিত অনর্থে প্রীতি-সঙ্গমের প্রতিবন্ধক জানিয়া আমি দোষ দিয়া কিংবা দূষণীর প্রতি বিমুখ হইয়া আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির তোষণীর সহিত মিলিত হই।

শ্রীগুরুদেব তাঁহার শত সহস্র গ্যালন চিদ্রক্ত ব্যয় করিয়া আমাকে যে চেতনময়ী শ্রৌত-সরস্বতী শ্রবণ করাইতেছেন, আর সেই সকল বাস্তব বাণী হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবজীবনে প্রতিফলিত করিবার জন্য আমাকে কীর্ত্তনে অধিকার দিয়াছেন, আমি শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখশ্রুত "তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহ-সুহৃন্নিমিত্তং শোকঃ স্পৃহাপরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ", "অলব্ধে বা বিনষ্টে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদন-সাধনে। অবিক্লবমতির্ভূত্বা

হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ", "যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে", "যন্মৈথুনাদি-গৃহমেধি সুখং হি তুচ্ছং", "ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা", "ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাৎ" ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র", "যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ", "তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো", "লব্ধা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে" প্রভৃতি বাণী চেতনের উন্মুক্ত কর্ণে শুনিয়াছি কিনা? চেতনময় জিহ্বাদ্বারা কীর্ত্তন করিতেছি কিনা? এবং আমার জিহ্বা অভ্যভিচারীণী কিনা, তাহা সর্ব্বসমক্ষে প্রমাণ করিয়া আমাকে জানাইয়া দিবার জন্য আমার নিকট নানা প্রকার সাময়িক বিপদ-আপদের অগ্নি-পরীক্ষা উপস্থিত হয়।

যদি আমি চেতনের কর্ণে, চেতনের জিহ্বায়, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম চেতন-শক্তি আচার্য্যের সেই চেতনবাণী শুনিয়া থাকি, কীর্ত্তন করিয়া থাকি, যদি আমি নির্ব্যলীক হই, তবে ঐ অগ্নিপরীক্ষায় আমার ঐ অকৃত্রিম সেবাবৃত্তি আরও কোটিগুণ সমুজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। আর যদি অন্যাভিলাষিতা-মলে অবরুদ্ধ আমার কর্ণে সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চেতনশক্তির চেতনবাণী প্রবিষ্ট না হইয়া কেবল চেতন-বাণীর আবৃত জড়ভাব আমার জড় কর্ণ ও জড় জিহ্বা স্পর্শ করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমার কৃত্রিম স্বর্ণোপম সেবাবৃত্তি সাময়িক বিপদ-আপদের অগ্নিপরীক্ষায় পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। গুরুকৃপামাত্রৈকগতি হইয়া সাময়িক বিপদ-আপদের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে যে রূপ আমাকে কোটিগুণ বলবান্, কোটিগুণ সৌভাগ্যমণ্ডিত এবং আমার সেবাবৃত্তিকে কোটিসুবর্ণসমুজ্জ্বলকান্তি করিয়া দেয়, অপর দিকে নিজ বাহাদুরীর উপর নির্ভরকারী আমার ঐ পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইলে আমাকে তদ্বিপরীত কোটিগণ দুর্ব্বল, কোটিগুণ দুর্ভাগা ও কোটিগুণ সেবাবিমুখ করিয়া দেয়।

সেবোন্মুখ চিৎকর্ণে চৈতন্যসরস্বতী শ্রবণ করিয়া সেবোন্মুখ চিজ্জিহ্বায় চৈতন্য-সরস্বতী কীর্ত্তন করিলে শত শত সাময়িক বিপদ-আপদের অগ্নিপরীক্ষা আমাকে কিছুতেই বিচলিত করিতে পারিত না। সামান্য সাময়িক দেবতাকৃত বিপদ-আপদ চৈতন্যসরস্বতীর নিত্য-সেবা হইতে বিচ্যুত করিবার শক্তি ধারণ করিতে পারে, ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা—মিথ্যা কথা—মিথ্যা কথা। যাঁহারা নিষ্কপটে চৈতন্য- সরস্বতীর সেবা করেন, জগতের ভীষণাদপি ভীষণ বিপদরাশি তাঁহাদের নিকট যেন পরমোপাসিত মহাত্মগণের ন্যায় আগমন করিয়া তাঁহাদিগকে আরও অধিকতর তীব্রতা ও অনুরাগের সহিত গুরুপাদপদ্মে সংলগ্ন করিয়া দেয়। ইহার প্রত্যক্ষ উদাহরণ নিষ্কপট গুরুসেবকগণের চরিত্রে দেখা যায়। আমার হৃদয়ে অন্তর্নিহিত ভোগাভিলাষ আছে বলিয়া আমি সাময়িক বিপদ-আপদের 'অছিলা' করিয়া স্বেচ্ছায় জড়পিশাচীর কোলে ঝাঁপাইয়া পড়ি। জনাভিনিবেশের আলেয়ার পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হইয়া যতই না কেন শান্তির আলোক খুঁজিয়া বেড়াই, জড়াভিনিবেশ আমাকে কখনও বাস্তব আলোক প্রদান করিবে না।

প্রতিষ্ঠার জন্য আমি 'বিরাগী' সাজিয়া থাকি। প্রকৃত প্রস্তাবে অসৎসঙ্গের সহিত আমার বিরাগ নাই। আমার বৈরাগ্য নিষ্কপটতার সঙ্গে, আমার বৈরাগ্য,—আত্মার সহজ অকৃত্রিম বৈরাগ্য যে কৃষ্ণানুসন্ধান, তাহার সঙ্গে আমি নিষ্কপটে অন্তরাত্মার সর্ব্বস্ব দিয়া—সমগ্র আত্মাখানা দিয়া হরিগুরুবৈষ্ণব সেবা করিতে

পারিলাম না। এই যে অন্তরাত্মার অকৃত্রিম আর্ত্তিরূপ আন্তর বৈরাগ্য, ইহার সহিতই আমি বৈরাগ্য করিয়াছি। তাই আমার বৈরাগ্য জড়ে বৈরাগ্য নহে, চেতনের প্রতি বৈরাগ্য। আমার বৈরাগ্য লোকদেখান মর্কটবৈরাগ্য। সেইজন্য আমি অধিকক্ষণ সহিষ্ণু থাকিতে পারি না। যতদিন প্রতিষ্ঠাশাধৃষ্টা শ্বপচ রমণীর আপাত সৌন্দর্য্য আমাকে মুগ্ধ করিয়া রাখে, ততদিন স্ত্রী-পুত্র-গৃহ-সংসারে প্রতি আমি উদাসীন বা বিরাগী থাকি। কিন্তু ঐ প্রতিষ্ঠাশাধৃষ্টা নারী যখন তাহার নৈসর্গিক স্বভাবনিবন্ধন আমার প্রতি একটুকু উদাসীন হইয়া অন্য পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন আমার শ্মশান-বৈরাগ্য ছুটিয়া যায়। ঐ হৈতুক, কৃত্রিম, অ-যুক্তবৈরাগ্যের প্রতিক্রিয়া আমাকে কোটিগুণ বিপরীত দিকে লইয়া গিয়া আমার সর্ব্বস্ব ভোগানলকুণ্ডে আহুতি দেয় এবং আমার শ্মশান-বৈরাগ্যের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পদান করিয়া থাকে। যাহা আমি একদিন লোক দেখাইয়াবার জন্য উদ্‌গার করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলাম, আমি তখন সেই পরিত্যক্ত নানা-মলই পায়সান্নের ন্যায় সুমধুর মনে করিয়া উহার ভুরিভোজন-লালসায় জড়ের দিকে দৌড়াইতে থাকি।

যে জিনিষটা যত শক্তি লইয়া উপরের দিকে উঠে, পতিত হইবার সময় সেই জিনিসটা তাহার দ্বিগুণিত শক্তির সহিত নীচের দিকে অতি দ্রুতবেগে অবতরণ করিতে থাকে এবং যে ভূমিকা হইতে উঠিয়াছিল, সে ভূমিকাটী পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া অতলরাজ্যে প্রবেশ করে। আমার প্রতিক্রিয়াশীল পতনোন্মুখতা আমাকে এমন একটা অবৈধ উত্তেজনায় উত্তেজিত করিয়া দেয় যে, তখন আমি মনে করি',—''নামিয়াছি ত' ভাল করিয়াই নামিব।" তখন আমি সেবায় উদীয়মান ব্যক্তিগণের আদর্শ ভুলিয়া যাই এবং পতনশীলগণের পতনোন্মুখতার সহিত প্রতিযোগিতা আরম্ভ করি। যে পর্য্যন্ত না আমার চিদভিনিবেশ সহজ হইবে, সে পর্য্যন্ত আমার কৃত্রিম বৈরাগ্য, কৃত্রিম ত্যাগ, কষ্টকল্পিত যাবতীয় চেষ্টা, লোকদেখান সেবার অভিনয়, লোকদেখান-গৃহস্থ-বৈষ্ণব বা মঠস্থ বৈষ্ণবের অভিনয় সকলই কয়েক মুহূর্ত্তের প্রহসনরূপে পর্য্যবসিত হইয়া পড়িবে। শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবকৃপা-বলে—অনুক্ষণ হরিগুরুবৈষ্ণব-চরণে নিষ্কপটে আর্ত্তি জ্ঞাপন, অনুক্ষণ নিষ্কপটে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে কার্পণ্যাবেদন, অনুক্ষণ কল্যাণকল্পতরুর নিঃশ্রেয়স্‌ফল লাভের জন্য তীব্রতম লৌল্য, অনুক্ষণ অন্তরাত্মা হইতে কৃত্রিমতা বিদূরিত করিয়া সহজতা লাভের জন্য বিরলে গুরুবৈষ্ণবের চরণে দুঃখ নিবেদন ও ক্রন্দন ফলে যেদিন সহজ চিদভিনিবেশ উদিত হইবে, সেইদিনই আমি জড়াভিনিবেশের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিব।

যে দিন আমি অনুক্ষণ বুঝিব, আমি নিষ্কপটে হরিভজন করিতে আসিয়াছি, আমি অন্যাভিলাষ ভজন করিতে আসি নাই, সার্ব্বভৌম সম্রাটের কাছে অন্ধকপর্দ্দক ভিক্ষা করিতে আসি নাই, গৌরকৃষ্ণপ্রিয়তম গুরুদেবের গৃহে কাচতুল্য কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা, জাগতিক সুখশান্তি সাময়িক সম্মান, উত্তম খাদ্যদ্রব্য, বসন, ভূষণ, নানাদেশ পরিভ্রমণ কিম্বা সংসারের দুর্ব্বিষহ যাতনার হস্ত হইতে সাময়িক বিস্মৃতিমাত্র প্রভৃতি তুচ্ছ ফল লাভ করিতে আসি নাই, আমাকে সত্য সত্য হরিভজন করিতে হইবে, আমাকে অপ্রাকৃত সহজ হইতে হইবে, আমার যাবতীয় কৃত্রিমতা, কষ্টকল্পিত ও লোকদেখান চেষ্টা বিদূরিত করিয়া আমার নিত্য সহজ ভাবটী জাগাইতে হইবে, আমাকে তীব্রতম আর্ত্তির সহিত গুরুপ্রসাদ- বলে সেই সিদ্ধি এখনই লাভ

করিতে হইবে, সেই সহজে সিদ্ধি লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন"—এই ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা হইতে কিছুতেই টলিব না, উদাসীন হইয়া কোন অন্যাভিলাষ বরণ করিব না, বহুরূপিণী মায়ার কোন পরামর্শ শুনিব না, কোন প্রকার জড়তৃপ্তি, শান্তভাব, এমন কি আত্মারামত্ব পর্য্যন্ত আসিয়াও আমার সহজ চিদ্‌ভিনিবেশ উদ্বোধনের তীব্রতম আকাঙ্ক্ষার অনলকে নিবাইতে পারিবে না, সেই দিনই আমার হৃদয়াকাশ হইতে জড়াভিনিবেশ-মেঘটী সরিয়া যাইবে এবং সে স্থানে গুরু প্রসাদ বলে চিদভিনিবেশ-সূর্য্য উদিত হইয়া আমার তনুবাঙ্মনের সকল চেষ্টাকে সহজ করিয়া দিবে।

প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত

আমরা বৈষ্ণবসাহিত্যে ও শুদ্ধবৈষ্ণবের মুখে 'অপ্রাকৃত' শব্দ শুনিতে পাই। ভক্তিগ্রন্থাদিতে 'প্রাকৃত'-শব্দেরও অনেক স্থলে উল্লেখ দেখা যায়। ঐ শব্দ দুইটী ব্যবহার করিয়া শাস্ত্রকার ও বক্তৃগণ কি লক্ষ্য করেন, তাহাই আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়।

প্রকৃতি—অব্যক্ত অর্থাৎ যাহা প্রকাশমান না হইয় সর্ব্বকারণ-কারণরূপে নিজ অস্মিতার অস্তিত্ব সম্পাদন করে। প্রকাশমান কোন কার্য্যের কারণ প্রকাশিত হইলে তাদৃশ প্রকাশিত কারণের কারণ জানিতে জ্ঞানবৃত্তির স্বাভাবিক কৌতূহল জন্মে। মানব জ্ঞান যেকালে কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া কারণকে প্রকাশমান দেখিতে না পান, তখন তাদৃশ কারণকে 'অপ্রকাশিত' বা 'অব্যক্ত প্রকৃতি'–সংজ্ঞা দেন।

প্রকৃতি হইতে জাত প্রকাশমান দ্রব্য বা দ্রব্য সম্বন্ধীয় ভাব—সমস্তই প্রাকৃত। জীব ঐগুলি জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিয়া ভোগ করেন। তাহাতে কোন সময় তাঁহার নিজেন্দ্রিয়ের প্রীতি হয়, কখনও বা অপ্রীতি অথবা বা দুঃখের উদয় হয়। প্রকৃতির অধীনে তিনটী গুণ প্রকাশমান আছে। তাহাদিগকে 'সত্ত্ব', 'রজঃ' ও 'তমঃ' আখ্যা দেওয়া হয়। রজোগুণের ধর্ম্ম অপ্রকাশিত বস্তুকে প্রকাশ করে। সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম প্রকাশসত্ত্বাকে রক্ষা করে। তমোগুণের ধর্ম্ম প্রকাশিত বস্তুসত্তার বিলোপ সাধন করে। সত্ত্বপ্রারম্ভে রজোগুণ এবং অপরপ্রান্তে তমোগুণ; সুতরাং ঐ অসদ্‌গুণদ্বয়ের সত্তা প্রাকৃত সত্ত্বে আবদ্ধ। এই তিনটী গুণের গুণী তিনজনকে ভগবানের 'পুরুষাবতার' বলা হয়। সত্ত্বগুণের ঈশ্বর—ভগবান্ বিষ্ণু; সত্ত্বগুণের অধীশ্বর হইলেও প্রকৃতি বা জড়ফলভোগ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। তবে তাঁহার আশ্রিত রজোগুণাধীশ্বর ব্রহ্মা এবং তমোগুণাধীশ্বর রুদ্র প্রকৃতিবাধ্য হইয়া পরমেশ্বর বিষ্ণুর সমধর্ম্মে অধিকারী হন না। বিষ্ণু— প্রকৃতির অধীশ্বর। ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রাকৃত ও প্রকৃতি পতি হইয়াও প্রকৃতির অধীন। ভগবান্ বিষ্ণু প্রাকৃত বিকার স্বীকার করেন না; কিন্তু ব্রহ্মা ও রুদ্র বিকার স্বীকার করিয়া বিষ্ণুর সর্ব্বশক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। সেইজন্যই কেহ কেহ ব্রহ্মা ও রুদ্রকে অঘটন-ঘটনপটীয়সী বিষ্ণু মায়ার 'পুত্র' বলিয়া অভিহিত করে। বিচাররহিত অবৈষ্ণবগণ বিষ্ণুকে অপর দুইটী গুণাধীশ্বরের সহিত সমজ্ঞানে অপরাধ করিয়া বসেন। শাস্ত্র বলেন,—

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডীভবেদ্ধ্রুবম্।।
"বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদীতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ।"

প্রাকৃত রাজ্যে ফলভোক্তা—বদ্ধজীব। তিনি কখনও বা ব্রহ্মার দেহ লাভ করিয়া দেবতা, কখনও বা রবিকিরণতপ্ত গতচেতন স্থাণু। এই সকল অবস্থায় জীবকে আমরা অনিত্য বদ্ধ ভোগকামনায় নিযুক্ত দেখিতে পাই। দেবীধামের অন্তর্গত প্রকাশমান চতুর্দ্দশ ভুবন সমস্তই—প্রাকৃত। এই চতুর্দ্দশ ভুবনে ভ্রমণকারী পথিকরূপে অন্যাভিলাষের দাস হইয়া জীব প্রাকৃতাভিমানে বিচরণ করেন। প্রাকৃত, অনিত্য, অনুপাদেয় জড়দ্রব্য ভোগ-বুদ্ধি লইয়া অপ্রাকৃত জীব প্রাকৃত ভোগের কঠোর নিগ্রহ ভোগ করিতে থাকেন। ইহাই তাঁহার স্বরূপবিভ্রান্তি বা মতিভ্রংশতা। আপেক্ষিক দুঃখভার লাঘব করিতে সমর্থ হইলে অপ্রাকৃত জীব প্রাকৃতাভিমানে আপনাকে 'সুখী' মনে করেন; আবার ভোগপিপাসার প্রাবল্যে ভোগ্যদ্রব্যের অপ্রাপ্তিতে সুখরহিত দরিদ্রতায় অবস্থিত হইয়া আপনাকে 'দুঃখী' জ্ঞান করেন। প্রাকৃত বস্তুসত্তার মূলশক্তি—প্রকৃতি। বদ্ধজীবের নির্ম্মল জড়ভোগ- রহিত নিজ স্বরূপানুভূতি তটস্থ ধর্ম্মে আবদ্ধ। গুণ প্রকৃতি ও জীব প্রকৃতি পরস্পর ভিন্ন। একটী—বিষ্ণুর বহিরঙ্গা শক্তি ও অপরটী—তটস্থা শক্তি। তটস্থাশক্তি পরিণত জীব বহিরঙ্গা-শক্তির গুণসমূহকে আহ্বান করিলেই জীবের বদ্ধাবস্থা বা প্রাকৃতাভিমান।

বিষ্ণুর অন্তরঙ্গাশক্তি—পরিণামই—অপ্রাকৃত চিজ্জগৎ। সেখানে জীবের প্রাকৃত ভোগবুদ্ধি নাই। ভগবান্ বিষ্ণুই তথাকার একমাত্র ভোক্তা, তদ্রূপবৈভবের আনুগত্যে শুদ্ধ জীব ভগবানের ভোগ্যরূপে সেবা বিধান করেন। জীব অপ্রাকৃত রাজ্যে নিজের সুখভোগাভিলাষে ব্যস্ত নহেন; পরন্তু হরিভজনই তথায় তাঁহার নিত্যকৃত্য। প্রাকৃত জগতে মায়ার সুখদুঃখ-ভোগের অন্তরালে জীব যেরূপ প্রাকৃত অভিমানে বদ্ধ হন, অপ্রাকৃত রাজ্যে ভগদ্দাস্যে তদ্রূপ নিত্যকাল ভগবানের সেবাকার্য্যে আনন্দ বিধান করিয়া থাকেন। নির্ব্বিশেষমতে প্রকৃতির অতীত রাজ্যে তটস্থভাবময় নির্গুণতা অবস্থিত। তথায় অপ্রাকৃত বিচিত্রতা নাই। তাঁহাদের মতে মায়াশক্তিতে বিচিত্রতা আবদ্ধ, সুতরাং তন্মতে 'অপ্রাকৃত' শব্দের অর্থ— নিত্যবিচিত্রতাহীন 'অধ্যাত্ম' শব্দ-বাচ্য। কিন্তু 'অধ্যাত্ম' শব্দে নির্ব্বিশেষবাদী শক্তিরহিত ব্রহ্মকেই বুঝিয়া থাকেন। প্রাকৃত ভোগময় রাজ্যে ত্রিবিধ তাপে প্রতপ্ত হইয়া প্রকৃতির অতীত রাজ্যে অপ্রাকৃত শক্তি নানা বিচিত্রতা প্রকাশ করিতে পারেন,—এরূপ তথ্যের কোন সংবাদই রাখে না। বৈকুণ্ঠ অপ্রাকৃত রাজ্যে প্রাকৃত গুণসমূহ নিষ্ক্রিয় হইলে অপ্রাকৃত পরম চমৎকার চিদ্বৈচিত্র্য প্রকাশনসমর্থা অন্তরঙ্গা শক্তি জড়ের হেয়তা, সসীমতা, কালনাশিতা প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ রহিত করিতে পারেন। বিশুদ্ধ ভগবৎসেবাপরতাই অপ্রাকৃত রাজ্যের বিশেষত্ব। সেখানে ব্রহ্মাণ্ডের মত জীবের প্রাকৃত ভোগ নাই। ভগবৎসেবাজনিত আনন্দও জীবকে ভোগ নিমগ্ন করাইতে পারে না। জীব বদ্ধরাজ্যে অনুভববিশিষ্ট হইয়াও তাহা পরিহারপূর্ব্বক অপ্রাকৃত রাজ্যের বিশেষত্ব বুঝিতে পারেন। কেবল জড় নিষ্ক্রিয়তার ও নিজের বদ্ধভোগাভিমান পোষণ করিয়া হরিসেবাবিমুখ তর্কজ্ঞানাদির বাধ্য হইলে

জীবকে কখনই প্রাকৃত অভিমান ছাড়িয়া দিবে না। বৈকুণ্ঠ বস্তুর অনুশীলনে জীবের ভোগবাসনা বিদূরিত হয়। পার্থিব মাটিয়া অনুভূতি বদ্ধজীবের ভোগপর কর্ম্মফল। অপ্রাকৃত শরীর দ্বারা অপ্রাকৃত ভগবদ্বিগ্রহের অপ্রাকৃত সেবাপর হইলে প্রাকৃত জড় বলের ফল্গুতা উপলব্ধি হয় এবং নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের ফল্গু গরিমার লঘুত্ব দৃষ্ট হয়। জ্ঞানীর 'অধ্যাত্ম'-শব্দে অপ্রাকৃততত্ত্বের খণ্ড চিত্র থাকিলেও উহা কখনই অপ্রাকৃত-শব্দোদ্দিষ্ট নির্ম্মলরাজ্য নহে। 'অপ্রাকৃত বৃন্দাবন' বলিলে প্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট ভোগপর নরগণ নিজবদ্ধভোগপর প্রদেশবিশেষকে বুঝেন। আবার নির্ব্বিশেষ মতাবলম্বী মুমুক্ষুগণ মায়াশক্তিরহিত চিদ্বিচিত্রতাহীন আধারকে বুঝিয়া থাকেন। তাহা তাহাদের উভয়ের মাটিয়া জ্ঞানের পরিচয় মাত্র। তাদৃশ জ্ঞানগম্য প্রদেশ অপ্রাকৃত নহে। মায়াশক্তির ক্রিয়ারহিত চিদ্বৈচিত্র-কৃষ্ণসেবাময় ত্রিপাদ-বিভূতিবিশিষ্ট ভূমি—অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃত বিচিত্রতার সহিত প্রাকৃতবিশেষের কোন কোন বিষয়ের অন্বয়তা আছে, আবার কোন কোন বিষয়ের ব্যতিরেকত্বও দৃষ্ট হয়। জ্ঞানিসম্প্রদায় মনে করেন যে, অপ্রাকৃত, লীলা ও তদ্রূপবৈভব তাঁহাদের জড়ভোগ চিন্তার অন্যতম অথবা মনোময় ক্ষণভঙ্গুর রাজ্যের আখ্যায়িকা বিশেষ, কিন্তু তাঁহাদের তাদৃশ ভাব প্রাকৃত-অপ্রাকৃতের সহিত বিরুদ্ধ ভাববিশিষ্ট। ভগবত্তাকে মায়াশক্তির অন্তর্গত মনে করায় অপরাধফলে তাঁহাদের এইরূপ ধারণা। ভোগময় ব্যাধি বা ত্যাগময় শান্তি, উভয়ই—প্রাকৃত ভোগের প্রকারভেদ। অপ্রাকৃত তাহা হইতে স্বতন্ত্র। উহা নিত্য হরিসেবাপর, অবিনাশীসম্বন্ধবিশিষ্ট ও নিত্য অধিষ্ঠিত।

শ্রীস্নানযাত্রা

জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম জগদীশের স্নানযাত্রা মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই সময়ে শ্রীশ্রীজগদীশ, শ্রীবলভদ্র, শ্রীসুভদ্রা দেবী স্নানবেদীতে 'পহান্তি' বিজয় করেন। রত্নবেদীতে সুদর্শন-সহিত শ্রীবিগ্রহত্রয়ের অষ্টোত্তরশত সুবর্ণকুম্ভপূর্ণ শীতলসলিলে মহাস্নান হইয়া থাকে। স্নানানন্তর ভগবান্ রত্নবেদীতে গণেশরূপ ধারণ করেন।

যে স্থনে নীলাম্বুধির কল্লোলমালা অবিশ্রান্ত ''জয়জগদীশ'' বলিয়া উদ্গান গাহিয়া নৃত্য করিতেছে, যেস্থান নব নব তৃণরাজির হরিদ্বর্ণে সুরঞ্জিত, যেস্থান দক্ষিণানিলসংস্পর্শে সুশীতল, যে স্থান বিচিত্র তরুরাজির শোভায় বিভূষিত, সেইরূপ সুপরিষ্কৃত প্রদেশে শ্রীজগদীশের স্নানপীঠ রচিত হইয়াছে। সমুদয় ব্রহ্মর্ষি, সমুদয় দেবতা জগদীশকে মহাস্নান করাইবার জন্য পারিজাত-সুবাসিত সুরতরঙ্গিণীর পূত সলিল শিরে বহন করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মার সহিত শ্রীপুরুষোত্তমে আগমন করেন এবং ব্রহ্মার আনুগত্যে মঞ্চস্থ ভগবানকে স্নাত ও 'জয়'-শব্দপূর্ণ বিচিত্র স্তুতিবাদ দ্বারা বন্দনা করিয়া থাকেন।

দেবতাগণ যাহাতে স্বচ্ছন্দে বিরাজিত হইয়া ভগবানের শ্রীস্নানযাত্রা দর্শন করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে স্নানযাত্রা-কালে মহাভাগবত মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন স্নানবেদীর পারিপার্শ্বিক স্নানসমূহ চন্দ্রাতপশোভিত ও
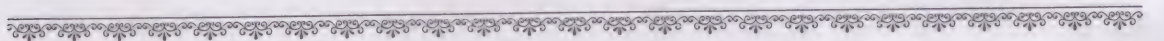
মহামরকতমণিখচিত সুবিস্তৃত আবরণ-বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিতেন। ঐ স্নানবেদী জীর্ণ হইয়া যাইবার পর মহারাজ অনঙ্গভীম বর্ত্তমান স্নানবেদী নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।

শ্রীস্নানযাত্রা-দিবসে শ্রীজগদীশের স্নানমঞ্চ নানাবিধ মণি, মুক্তা, মাল্য, চামর, পতাকা ও তোরণাদির দ্বারা বিমণ্ডিত, চন্দন-সংমিশ্র সুগন্ধ ও সুশীতল পবিত্র জলদ্বারা সংসিক্ত এবং সুগন্ধি ধূপগন্ধ দ্বারা সুরভিত করা হয়। তৎপরে জগদীশের সেবকগণ দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী কূপ হইতে স্নানীয় জল উত্তোলন পূর্ব্বক সেই জল সুগন্ধ দ্রব্যে সুবাসিত করিয়া 'পাবমানী' মন্ত্রের কীর্ত্তন করিতে করিতে সুবর্ণ কলসসমূহ পরিপূর্ণ করেন এবং শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে মন্দিরাভ্যন্তরে ভগবানের অধিবাস করিয়া থাকেন। অনন্তর হোলি দান পূর্ব্বক শ্রীজগদীশকে বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শনের সহিত স্নানমঞ্চে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হন।

রাজার নিকট সম্মান ও সমাদরপ্রাপ্ত সেবকগণ চামর ও তালবৃন্তের দ্বারা ভগবানের পহান্তিকালে বীজন করিতে থাকেন। শ্রীজগদীশের স্নানবেদীতে গমনকালে যখন রত্নখচিত ছত্র-নিচয় উত্তোলিত, কালাগুরু-গন্ধে দিঙ্‌মণ্ডল আমোদিত, নানাবিধ গম্ভীর বাদ্যধ্বনিতে স্বর্গমর্ত্ত্যের মধ্যবিবর পরিপূরিত এবং দীপ-মালিকার আলোকে অন্ধকার বিদূরিত হয়, যখন শ্রীজগদীশের চতুর্দ্দিকে চামর ব্যজন ও মধুর নৃত্যগীতাদি হইতে থাকে, সেই সময় কোন্ সেবোন্মুখের না মানস-মহোৎসব সম্বর্দ্ধিত হইয়া থাকে? শ্রীজগদীশকে যিনি বিশুদ্ধ চিত্তের রত্নবেদীতে নিত্যস্নান করাইতে পারেন, তিনিই বসুদেব। সেই বসুদেবের রত্ন- বেদীতে নিত্য স্নানযাত্রা-মহোৎসব হয়। যাঁহারা সেই ভাবে বিভাবিত অর্থাৎ বসুদেবগণের আনুগত্যে শ্রীজগন্নাথের স্নানযাত্রা দর্শন করিতে পারেন, তাঁহারাই ভাগ্যবান্।

শ্রীজগদীশকে স্নানমঞ্চে বিজয় করাইবার কালে, অনবধানতাপ্রযুক্ত পাছে কোন প্রকার দোষ ঘটে,—এই আশঙ্কায় সেবকগণ সুন্দর পট্টবস্ত্রাদি দ্বারা শ্রীপতির সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন পূর্ব্বক তাঁহাকে দূরবর্ত্তী স্নানমঞ্চে লইয়া যান। তৎকালে অখিল-জগৎ-পূজনীয় শ্রীজগদীশকে দূরগমন-নিমিত্ত উত্তানাস্য করিয়া লইয়া যাইতে হয় বলিয়া স্বর্গস্থিত দেবগণ মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া থাকেন, "শ্রীজগদীশ বোধ হয় স্বর্গধামে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন"—এই বিবেচনা করিয়া দেবতাগণ শ্রীপতির দিকে দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক, "হে রাম, হে কৃষ্ণ, আপনাদিগের জয় হউক! জয় হউক!" বলিতে থাকেন। এইরূপ লীলা সহকারে ভগবানের জন্ম-জ্যৈষ্ঠীতে রত্নবেদীতে বিজয় অভিষেক হইয়া থাকে।

ভগবান্ শ্রীজগদীশ বলিয়াছেন, স্বায়ম্ভুব মনুর সত্যাদি চতুর্যুগান্বিত দ্বিতীয় অংশে এবং সত্যযুগের ভগবদ্দর্শনপ্রদ এই প্রথমাংশে স্বায়ম্ভুব মনুর যজ্ঞপ্রভাবেই তাঁহার আবির্ভাব। তিনি জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমাতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এইজন্য ঐদিবসই শ্রীজগদীশের পুণ্য জন্মদিন। তাঁহারই আজ্ঞামতে ঐদিবস জগদীশকে অধিবাস পুরঃসর মহাস্নান বিধানানুসারে মহাসমারোহে রত্নবেদীর উপর তাঁহার স্নান অনুষ্ঠিত হয়।

মহাভাগবত ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ এইরূপ বিধানে জগদীশ জন্মতিথি জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমায় স্নানযাত্রা-মহোৎসব করিতেন। শ্রীজগদীশ মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকে বলিয়াছিলেন, সিন্ধুকূলে যে অক্ষয় বট আছে, তাহারই উত্তরে

সর্ব্বতীর্থময় এক কূপ বিরাজিত রহিয়াছে। কিন্তু উহা এক্ষণে বালুকারাশির দ্বারা আবৃত হইয়া গিয়াছে। স্নানার্থ পূর্ব্বে উহা নির্ম্মাণ করাইয়া পরে আমি অবতীর্ণ হইয়াছি। অতএব সেই কূপ আবিষ্কার করা কর্ত্তব্য। রক্ষক ক্ষেত্রপাল ও দিক্‌পালগণের উদ্দেশ্যে যথাবিধানে বলি প্রদান পূর্ব্বক শঙ্খ, কাহাল, মুরজাদি বাদ্যযন্ত্র বাদিত করিয়া চতুর্দ্দশীতে ঐ কূপের সংস্কার করিতে হইবে। দ্বিজগণ স্বর্ণকুম্ভ দ্বারা সেই সর্ব্বতীর্থময় কূপ হইতে পূত জল উত্তোলন করিবেন এবং সেই জল দ্বারা জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমার প্রাতঃকালে ব্রহ্মার সহিত শ্রীজগদীশ, বলভদ্র ও সুভদ্রার স্নান-সেবা করিতে হইবে। মহাভাগবত ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি সাক্ষাৎ ভগবানের এই আদেশানুসরণে আজিও শ্রীপুরুষোত্তমে এইরূপভাবে শ্রীস্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

স্নানযাত্রা-মহোৎসবের ফলশ্রুতি শাস্ত্রে ভূরি ভূরি দৃষ্ট হয়। ফলশ্রুতি পাঠকালে আমরা দেখিতে পাই, যাঁহারা শ্রীজগদীশের স্নানযাত্রা নিরীক্ষণ করেন, তাঁহাদিগকে পুনরায় জননীর গর্ভোদকে স্নান করিতে হয় না। ঔৎসুক্যপূর্ণ হৃদয়ে শ্রীভগবানের জ্যেষ্ঠ-স্নান সন্দর্শন করিলে জীবগণকে কখনই ভবসাগরের বিষবারিতে অবগাহন-স্নান করিতে হয় না। যাঁহারা সেবোন্মুখচিত্তে স্নানযাত্রা দর্শন করেন, যাঁহারা হৃদয়-স্নানমঞ্চে শ্রীজগদীশের স্নানসেবা করান, তাঁহারা নিশ্চয়ই জীবন্মুক্ত। মহাভাগবত মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি শ্রীজগদীশের আদেশ ছিল যে, এই মহাস্নান করাইয়া পঞ্চদশ দিবস আমাকে অঙ্গরাগবিহীন বিরূপাস্থায় কদাচ দর্শন করিবে না;—

"ততঃ পঞ্চদশাহানি স্নাপয়িত্বা তু মাং নৃপ।
অচিত্রমবিরূপং বা ন পশ্যেত কদাচন।।"

শ্রীজগদীশের আজ্ঞানুসারে এই পঞ্চদশ দিবসকাল শ্রীমন্দিরের পট বন্ধ থাকে। এই সময় শ্রীভগবানের দর্শন হয় না বলিয়া ইহাকে "অনবসর কাল" বলা হয়। এই অনবসরকালে বিপ্রলম্ভরসাশ্রিত গৌড়ীয় ভক্তগণ শ্রীগুরু- গৌরাঙ্গের লীলানুসরণে শ্রীআলালনাথ দর্শনার্থ গমন করেন। শ্রীআলালনাথ ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে এই সময় সঙ্কীর্ত্তন মহা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, অদ্য শ্রীপুরুষোত্তমদেবের স্নানযাত্রা ও তদুপলক্ষ্যে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে কীর্ত্তন মহা-মহোৎসব ও নগর-সংকীর্ত্তন-মুখে শ্রীস্নাযাত্রা দর্শনোৎসব। আগামী কল্য হইতে শ্রীআলালনাথ-ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে উৎসব আরম্ভ হইবে।

শান্তি-জিজ্ঞাসা

ধর্ম্ম-জগতে প্রবেশের মুখে আমাদের প্রায় সকলেরই প্রথম জিজ্ঞাসা,—"মনে শান্তি পাই কিরূপে?" এই অশান্তি বোধটুকু না থাকিলে জগতে অধিকাংশ লোকেরই যেন ধর্ম্মজগতের অস্তিত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা স্বীকারেরও আবশ্যকতা-বোধ পর্য্যন্ত থাকিত না; কিন্তু আমাদের অভিলষনীয়া এই শান্তির প্রাপক কে? আমরা বলিব, আমাদের 'মন'—প্রাপক, আমাদের "অহং"—প্রাপক বা আর একটুকু অগ্রসর হইয়া না হয় বলিব, আমাদের 'আত্মা'—প্রাপক।

তাহা হইলে—দাঁড়াইল, শান্তির ভোক্তা আমি, শান্তি আমার ব্যক্তিগত স্বার্থের (?) খাতায় জমা হওয়া চাই, শান্তি আমার জন্য। এখানে পরমেশ্বরের কোন স্বার্থের কথা নাই, পরমেশ্বরের খাতায় ''শান্তি' জমা হউক, পরমেশ্বর শান্তির ভোক্তা হউন, এইরূপ কোন অভিলাষ লইয়া আমি শান্তির অনুসন্ধানে ব্যতিব্যস্ত নাই, এই শান্তির জিজ্ঞাসা—আমার বক্তিগত স্বার্থের জিজ্ঞাসা,—ক্ষুদ্রের স্বার্থের জিজ্ঞাসা, স্বার্থগতি বিষ্ণুর জিজ্ঞাসা নহে—'অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা' নহে।

আমার—ক্ষুদ্রের দেহ-মনের এই শান্তির জিজ্ঞাসাটাকে একটুকু নিঃস্বার্থ-পরতার রঙে ছোপাইবার জন্য আমি আমাকে 'ব্রহ্ম', ক্ষুদ্রকেই 'বৃহৎ' বলিয়া গোঁজামিল দিতে চাই। অন্যাভিলাষ আমার মস্তিষ্কে এরূপ একটা কপটতার প্যাঁচ আঁটিয়া দেয়, যাহাতে 'ক্ষুদ্র আমি' যে 'বৃহৎ আমি', 'অণু আমি' যে 'পরম আমি' নহি, তাহা কিছুতেই বুঝিয়াও বুঝিতে পারি না।

আমাদের অন্যাভিলাষ-ব্যাধি অশেষ প্রকার, আমরা যতই কেননা শান্তির অনুসন্ধান করি, আমাদের শান্তি খোঁজা ও শান্তি-পাওয়া আল্‌নাস্কারের দিবাস্বপ্নের ন্যায়। অন্যাভিলাষই—অশান্তি, আর অন্যাভিলাষ-নির্ম্মুক্ত হইয়া কৃষ্ণানুসন্ধানই—শান্তি,—একথা রূপানুগবর আচার্য্য ছাড়া আর কেহ বলিয়া দিতে পারেন না।

'পরমে'র সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথগ্‌ভাবে 'ক্ষুদ্রে'র শান্তি হইতে পারে না। সর্ব্বস্বার্থগতি পরমের স্বার্থানুসন্ধান হইতে পৃথক্ থাকিয়া বা কপটতা করিয়া ক্ষুদ্র আমাদের শান্তিরূপ অপস্বার্থানুসন্ধান আমাদিগকে শাশ্বতী শান্তির বাস্তবরাজ্যে আনয়ন করিতে পারে না।

আমরা শান্তির অনুসন্ধিৎসু হইয়া অনেক সময় যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও অগত্যা ঈশ্বরের সম্পর্ক স্বীকার করিতে বাধ্য হই। এইরূপ 'অগত্যায় ঈশ্বর স্বীকার' পতঞ্জলীর 'ঈশ্বর প্রণিধানাদ্‌বা' অর্থাৎ বিকল্পে ঈশ্বর-স্বীকারের মৌখিকতার ন্যায় আমাদের কাপট্য-নাট্য মাত্র। পরমেশ্বরের সঙ্গে আমাদের ততটা দরকার নাই, যতটা শান্তির সঙ্গে দরকার; আর সেই শান্তির প্রাপক আমরা—শান্তির একচ্ছত্র ভোগদখলকারী আমি। পাছে ঈশ্বর আমার শান্তির অংশীদার বলিয়া দাবী করেন, এইজন্য আমি ঈশ্বরকে সমস্ত ইন্দ্রিয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে 'নিরাকার', 'নির্ব্বিশেষ' কখনও বা একেবারে 'শূন্য' করিয়া দিতে চাহি। পাছে ঈশ্বর শান্তির দাবী করেন, এইজন্য তাঁহার বাক্‌শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহি না, পাছে তিনি হস্ত প্রসারণ করিয়া আমার ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রের শান্তি- কল্পনারূপা ইন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছাটী কাড়িয়া লন, এই কল্পিত আশঙ্কায় মাৎসর্য্যযুক্ত মর্ত্ত্যবুদ্ধিতে ঈশ্বরকে হস্তবিহীন করিতে চাহি; কখনও বা বলিয়া থাকি, পৃথক্ ঈশ্বরের দরকার কি? আমিই—শান্তির ভোক্তা ঈশ্বর।

আমরা এইরূপ শান্তির অনুসন্ধিৎসা লইয়া অনেকেই ধর্ম্মজগতে প্রবেশ করি এবং দুই চারিদিনের মধ্যেই 'বড় ধার্ম্মিক', 'সাধু', 'মহারাজ', 'স্বামিজী', 'মহাত্মা', 'ভক্ত', বৈষ্ণব' প্রভৃতি নামে বিখ্যাত হইয়া পড়ি। প্রচলিত ধর্ম্ম-সাধনার বেচাকেনার হাটে সকল দলের এইরূপ অন্যাভিলাষ বা হৈতুক মনোধর্ম্ম 'ঈশ্বর-ভক্তি',

'সেবাধর্ম্ম', 'সাধনভজন' বলিয়া বিকাইলেও রূপানুগবর গুরুবরের নিকট ইহা আদৌ 'ভক্তি' বা 'সেবা' বলিয়া বিবেচিত হয় না; কারণ শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর দ্বারা জগতে যে পরমাশান্তির বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা এই,—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।"

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১।৯)

অনুকূলভবে কৃষ্ণ-বিষয়ের অনুশীলনই—উত্তমা ভক্তি; তাদৃশ ভক্তিতে কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ নাই; তাহা নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞান বা অষ্টাঙ্গ যোগাদিদ্বারা আবৃত নহে।

আমি চাই—অন্যাভিলাষ; আর সেই অন্যাভিলাষ প্রাপ্তি হইতে আমার বহির্ম্মুখতার যে একটুকু তৃপ্তি বোধ হয়, তাহাকেই 'শান্তি' বলিয়া মনে করি। জগতের শতকরা শতজন লোকই এইরূপ অন্যাভিলাষের তৃপ্তি তাৎপর্য্যময়ী শান্তির পিপাসু। অন্যাভিলাষের চাকচিক্যময় মনোহারী দ্রব্যের পসরা লইয়া এই জগতের হাটে দোকান পাতিবার পূর্ব্বেই, হাটে আসিতে আসিতে পথ হইতেই জিনিসগুলি আদরের সহিত বিক্রীত হইয়া যায়। আর দোকান খুলিলে ত' কথাই নাই। সে দোকানের কাছে লোকে লোকারণ্য।

কালে ভদ্রে যদি কোন পরাশান্তির রাজ্যের দূত শ্রীরূপের অন্যাভিলাষিতা- শূন্যা, জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতা, অনুকূল, কৃষ্ণানুশীলনময়ী শান্তির পসরা লইয়া এই ভবের হাটে প্রদর্শনী খুলিতে চাহেন, তাহা হইলে সেই শান্তির ক্রেতা মোটেই পাওয়া যায় না।

আধুনিক গোঁজামিল-দেওয়া-সমন্বয়-ধর্ম্মের ক্রেতা শতকরা প্রায় শতজন লোকই কেন? আর শ্রীচৈতন্যদেবের মহাচিৎসমন্বয়ের ধর্ম্ম—শ্রীরূপের পসরার পরাশান্তির ধর্ম্মের অকৃত্রিম গ্রাহক এই ভবের হাটে একটীও পাওয়া যায় না কেন? শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—এই অন্যাভিলাষরহিত ধর্ম্ম প্রত্যেক জীবের চরম পরম শান্তির একমাত্র নিদান হইলেও এই কৃষ্ণানুশীলনময়ী বাস্তব শান্তির গ্রাহক বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আপাত কৃত্রিম শান্তি বা অন্যাভিলাষের অনুসন্ধিৎসু অনন্তকোটী জীবের মধ্যে কালে ভদ্রে একটীও পাওয়া যাইবে কিনা, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে,—

'কোটি-মুক্ত মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।'

খাঁটি নিত্যাশান্তি সুদুর্ল্লভা বলিয়া সুলভা মেকী শান্তি গ্রহণ করিব, এরূপ সঙ্কীর্ণ-বুদ্ধি কখনই প্রশংসনীয় নহে। সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, যিনি কোন দুর্ল্লভ বস্তুর প্রাপক হইতে পারেন, তিনিই জগতে সর্ব্বপেক্ষা অধিক প্রতিষ্ঠা ও সুখশান্তি লাভ করিয়া থাকেন। সাধারণ বস্তুর প্রাপক কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণের বিষয় হন না বা নিজেও প্রচুর আনন্দিত হইতে পারেন না।

আধুনিক তথাকথিত সমন্বয়-ধর্ম্মের গ্রাহক জগদ্ভরা সকলেই অথবা অধিকাংশই হইবার কারণ এই, তাহাতে সকল প্রকার অন্যাভিলাষের প্রশ্রয় পাওয়া যায়। সদর দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়া ঠাকুর-ঘরে যাওয়া যায়, আর পায়খানার দরজা দিয়াও প্রবেশ করিয়া ঠাকুর-ঘরে যাওয়া যায়"—এইরূপ উক্তি অন্যাভিলাষময়ী কল্পিতা শান্তির অনুসন্ধিৎসুগণের দিক হইতে খুবই ঠিক। কারণ, ঠাকুরবাড়ীতে প্রবেশ যেখানে ঠাকুরের শান্তির জন্য নহে, কাহারও ব্যক্তিগত অন্যাভিলাষের জন্য; যেমন, ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়া শালগ্রামের পৈতা চুরি কিম্বা শালগ্রামের দ্বারা বাদাম ভাঙ্গিবার অভিলাষের জন্য, সে স্থানে কপট ভদ্রলোকের সজ্জায় কেহ সদর দরজা দিয়াই প্রবিষ্ট হউক, আর ধৃত হইবার ভয়ে পায়খানার দরজা দিয়াই প্রবেশ করুক, উভয়েই সমান। কারণ উভয়স্থলেই ঠাকুর ঘরে ঢুকিয়া ঠাকুরের স্বার্থহানি ও নিজ অপস্বার্থ পূরণ করাই উদ্দেশ্য, সর্ব্ব-স্বার্থগতি ঠাকুরের স্বার্থ উদ্দেশ্য নহে। যদি ঠাকুরের স্বার্থই উদ্দিষ্ট হইত, তাহা হইলে ঠাকুর যেরূপ-ভাবে তাঁহার স্বার্থপূরণের জন্য প্রবিষ্ট হইতে বলেন, যেরূপ কালে প্রবিষ্ট হইতে বলেন—যেরূপ পাত্রকে প্রবিষ্ট হইতে বলেন, সেইরূপ স্থান, সেইরূপ কাল ও সেইরূপ পাত্রের যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া ঠাকুরের ঘরে প্রবিষ্ট হইবার অভিলাষ থাকিত। ঠাকুরের প্রীতি—ঠাকুরের শান্তিই যাঁহাদের উদ্দেশ্য, তাহারা কখনও ঠাকুরের শান্তিভঙ্গ করেন না। পায়খানার দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে 'লযুক্ত গাত্রের দুর্গন্ধে যদি ঠাকুরের শান্তি ভঙ্গ হয় কিংবা কপট ভদ্রলোকের সজ্জায় সদর দরজা দিয়া ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ পূর্ব্বক ঠাকুরের সেবার নামে ঠাকুরের পৈতা চুরি করিলে যদি ঠাকুরের শান্তিভঙ্গ হয়, তাহা হইলে ঐরূপ গায়ের জোরের অপস্বার্থময়ী শান্তি, শ্রীরূপানুগবর গুরুদেবের নিকট যাঁহারা পরাশান্তির উপদেশ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কখনই কামনা করেন না। চৌর, অপস্বার্থপর, অন্যাভিলাষ-কর্ম্মজ্ঞান-যোগতপোব্রতাদি দ্বারা আবৃত কপট ব্যক্তিগণ সদর দরজা দিয়া ঠাকুর ঘরে প্রবিষ্ট হউন, অথবা পায়খানার দ্বার দিয়াই প্রবিষ্ট হউন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য নিজের অপস্বার্থময়ী শান্তি পোষণ করিয়া ঠাকুরের শান্তি ভঙ্গ করা। দুঃখের বিষয়, আজ এইরূপ অন্যাভিলাষময়ী কপট শান্তির দুর্দ্দমনীয়া পিপাসা, যাহাকে অপর ভাষায় প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা' বলা যাইতে পারে, সেইরূপ নাস্তিকতার অতপ্ত পিপাসাই 'শান্তির পিপাসা' নামে প্রচলিত হইয়া ধর্ম্মজগতের সকল দলেই ন্যূনাধিক প্রবেশ করিয়াছে।

শান্তি চায় না কে? মানবেতর পশুগুলির গাত্রে কণ্ডুয়ন করিয়া দিলে ঐ পশুও উহাতে শান্তি পায়। মানুষ কণ্ডুরসা রোগে পীড়িত হইলে আপাত কণ্ডুয়ন-সুখকে 'শান্তি' মনে করে, রোগী বিষম ব্যাধির মধ্যেও একটুকু কোঁকাইয়া শান্তি বোধ করে, আবার বৌদ্ধগণ নির্ব্বাণ পরিনির্ব্বাণকে 'শান্তি' মনে করে, সংসারের জ্বালাযন্ত্রণাময় ভারবহ জীবন আত্মহত্যার দ্বারা অবসান পূর্ব্বক শান্তিপিপাসু ব্যক্তির ন্যায় প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধগণ ত্রিপুটী বিনাশরূপ আত্মহত্যাকেই শান্তি মনে করেন। কিন্তু এইসকল শান্তির প্রস্তাব বা কল্পিত শান্তি কখনই শাশ্বতী শান্তি প্রদান করিতে পারে না। ঐসকল শান্তিরপ্রস্তাব ছলনাময়, কুহকময়, পরিণামে অশান্তিময়।

বড়ই পরিতাপের বিষয়, এইরূপ হিংসাময়ী ছলনাময়ী শান্তির আপাত উত্তেজনা যিনি এই বঞ্চনাকামী জগতে প্রদান করিতে না পারিবেন, অন্যাভিলাষের এইরূপ মনোহারী দোকান যিনি সাজাইয়া রাখিতে না

পারিবেন, তাঁহার কথা, তাঁহার দোকান এই জগতের হাটে বেশী দিন চলিবে না। তাঁহাকে অদ্বৈত প্রভুর ন্যায় 'হাটে না বিকায় চাউল' বলিয়া কয়েকদিনের মধ্যেই তল্পিতল্পা গুটাইতে হইবে।

যখন কেহ শান্তির জিজ্ঞাসা লইয়া উপস্থিত হন, তখন এই ভবের হাটের অসংখ্য মনোহারী বিপণির দালাল সেই ব্যক্তিকে তাহাদের নিজ নিজ অধিক দালালী প্রাপ্তির দোকানে টানিয়া লইয়া যায় এবং মানুষের বহির্ম্মুখ অন্তর, রোগীর রুচি, যাহা যাহা চায়, সেইসকল অন্যাভিলাষের মনোহারী জিনিষগুলি দেখাইয়া শান্তির সেই বোকা গ্রাহকগুলির বুদ্ধি ও প্রকৃত সদসদ্বিচার ক্ষমতা লোপ করিয়া দেয় এবং আপাত রুচিকর অথবা ছলনাময় রুচিকর বস্তুগুলিকে গ্রহণ করাইয়া তাহাদিগকে শান্তির ছলনায় পাতিত করে। সেইসকল ব্যক্তি তাহাদের রুচির অনুকূল সেই ছলনাময় পণ্যদ্রব্যগুলি কিনিয়া একটা জড়তৃপ্তি লাভ করে এবং ঐরূপ অন্যাভিলাষময়ী জড়তৃপ্তিকেই 'শান্তি' মনে করিয়া থাকে।

শ্রীচৈতন্যদেব, যিনি অচৈতন্য বিশ্বে শান্তিচেতনতার সঞ্চার করেন, শ্রীচৈতন্যের নিজজন রূপানুগবর আচার্য্য, যিনি অচৈতন্য বিশ্বের অচৈতন্য অভিলাষ বা আপাত প্রেমের সমর্থনকারী জীবহিংসক না হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের অনর্পিতচরী শান্তির বিতরণকারী অকৃত্রিম দয়াসিন্ধু, তাঁহারা বলেন,—

'কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তিমুক্তি সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত।।"

ভোগকামী, মোক্ষকামী, সিদ্ধিকামী, নির্ব্বাণ-পরি-নির্ব্বাণকামী, ত্রিপুটী বিনাশরূপ আত্মহত্যাকামী, ত্রিতাপ-পরিহারকামী, বিভূতিলাভকামী, বিভূতি-ত্যাগকামী, ইতর-দেবতা-ভোগকামী, স্বর্গকামী, সালোক্য-কামী, সারূপ্যকামী, সার্ষ্টিকামী, সামীপ্যকামী, সাযুজ্যকামী,—সকলেই ন্যূনাধিক অন্যাভিলাষযুক্ত। সুতরাং তাঁদের শাশ্বতী শান্তি নাই। তাঁহাদের সকলেরই ব্যক্তিগত সেভিংস্ ব্যাঙ্কের হিসাব খোলা আছে, তাঁহাদের সকলেরই ব্যক্তিগত কিছু চাই। তাঁহারা কৃষ্ণের কিছু চান না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, শ্রীরূপগোস্বামী এবং শ্রীরূপানুগবর গুরুদেব বলেন, শ্রীকৃষ্ণের জন্য পূর্ণতম মাত্রায় না চাওয়া পর্য্যন্ত পূর্ণতমা শান্তি কিছুতেই পাওয়া যাইবে না।

ভুক্তিকামী, মক্তিকামী, সিদ্ধিকামী, সালোক্য-সারূপ্যকামী প্রভৃতি জগতের সর্ব্ববিধ শান্তিকামি-সম্প্রদায়ই কৃষ্ণের সুখতাৎপর্য্যময়ী শান্তি কামনা করেন না। কৃষ্ণের সুখের অভিলাষ, কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ-মহামহোৎসব ইঁহাদের কাহারও কাম্য নহে, তাই তাঁহারা শান্তি পান না। প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত কখনও নিজের শান্তি চাহেন না, অশান্ত রাজ্য হইতে মুক্ত হইতে চাহেন না; তাঁহারা স্বাভাবিক শান্ত; তাঁহারা কৃষ্ণনিষ্ঠ। কৃষ্ণের শান্তি, কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের সুখ, কৃষ্ণের শান্তির জন্য কোটী কোটী অশান্তি বরণই তাঁহাদের কাম্যবস্তু, তাই কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে অখিল শান্তি সম্পত্তির অধিকারী করেন।

যাঁহারা শান্তির কামনা করিয়া জগতের বস্তু ভোগ করিবার জন্য ধাবিত হন, তাঁহারা যেমন শান্তি পান না, যাঁহারা ভোগ ত্যাগের অভিনয় করিয়া শান্তির আশায় মুক্তি বা সিদ্ধিকামী হইয়া পড়েন, ত্রিপুটী-বিনাশরূপা

আত্মহত্যা দ্বারা শান্তি লাভ করিবার বাসনা করেন, তাঁহাদেরও তেমনি অথবা ততোধিক অশান্তির রাজ্যে পতিত হন। তাই উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত তারস্বরে ঐরূপ শান্তি প্রয়াসিগণকে ধিক্কার করিয়াছেন;—

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।।" (ঈশোপনিষদৎ ৯)

যিনি অবিদ্যার সেবা করেন, তিনি অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন। আর যিনি নির্ব্বিশেষজ্ঞানরূপা বিদ্যাতে রত হন, তিনি তাহা অপেক্ষা অধিক অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করিয়া থাকেন।

"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতিদুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।।" (গীঃ ১২।৫)

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের অধিকতর দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে, কেননা দেহাভিমানী জীবের বাক্য ও মনের অগোচর অব্যক্ত-তত্ত্বে যে নিষ্ঠা, তাহাতে দুঃখ মাত্রই লাভ হয়।

"শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধ-লব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্।।" (ভাঃ ১০।১৪।৪)

হে বিভো, চরম-কল্যাণস্বরূপ আপনাকে লাভ করিতে হইলে ভক্তিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায়। যেরূপ জলাশয় হইতে নির্ঝর সমূহ প্রবাহিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভক্তি হইতে মোক্ষাদি চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়, ভক্তি হইলে জ্ঞান আপনা হইতেই হইয়া থাকে; তাহার জন্য পৃথক্ চেষ্টা করিতে হয় না। যাহারা ধান্য পরিত্যাগ করিয়া স্থূল ধান্যাভাস তুষ (আগ্‌ড়া) হইতে তণ্ডুল পাইবার জন্য তাহাতেই আঘাত করে, তাহাদের যেমন কেবল কষ্টই সার হয়, তেমনি বস্তু পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞান লাভের চেষ্টায় ক্লেশমাত্রই ফল হইয়া থাকে।

তবে শান্তি কাহাদের হস্তামলক হয়? কাহারা শান্তির অধিকারী? শ্রুতি বলেন, যে সকল নিত্যমুক্ত চেতন অনুক্ষণ কামদেবের সেবা কামনা করেন, তাঁহারাই শান্তি লাভ করিতে পরেন, অপরে কখনই শান্তি পায় না।

"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্।। (কঠ ২।২।১৬)

যিনি নিত্য বা বাস্তব বস্তু সমূহের মধ্যে পরম নিত্য ও পরম বাস্তব বস্তু, যিনি চেতনজীব সমূহের মুখ্য চেতন, যিনি এক হইয়াও বহু আশ্রিততত্ত্বের কামনা পরিপূরণ করেন, যে সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তি শ্রীগুরুদেবের অনুগত হইয়া সেই হৃদয়স্থ কামদেবকে সেবা করেন, তাঁহারাই নিত্যশান্তি লাভ করিয়া থাকেন, অপরে তাহা লাভ করিতে পারে না।

উপনিষৎ শান্তির পথের কথা আরও বলিয়াছেন;—

"সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোহ্যনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ।।"

(মুণ্ডক ৩।১।২, শ্বেতাশ্ব ৪।৬)

কর্ম্মফলের ভোক্তা জীব একই আত্মবৃক্ষে অবস্থান করিয়া মায়ার দ্বারা বিমোহিত হইয়া স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে আত্মবুদ্ধি জন্য শোক করেন। যখন আপনা হইতে ভিন্ন সেব্য পরমেশ্বরকে দেখিতে পান, তখন সমস্ত শোকনির্ম্মুক্ত হইয়া ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও মহিমার অনুশীলন করিয়া থাকেন।

শান্তি-জিজ্ঞাসার সহিত অশান্তিরূপ একটী হেতু বিজড়িত। ঐরূপ হেতু মূলেই শান্তির অনুসন্ধিৎসা উপস্থিত হয়। অশান্ত ব্যক্তিই শান্তি চাহেন, শান্ত ব্যক্তির সেইরূপ কোন অভিলাষের প্রয়োজন নাই। ঐরূপ হেতুমূলা জিজ্ঞাসা সম্বন্ধ- জ্ঞানাভাব হইতেই উদ্ভুত হয়। সম্বন্ধ-জ্ঞানযুক্ত ব্যক্তির ঐরূপ জিজ্ঞাসার অবকাশ নাই। যতক্ষণ ঐরূপ জিজ্ঞাসার বিন্দুমাত্র অবকাশ আছে, ততক্ষণ আমরা কৃষ্ণের শান্তি অনুসন্ধান হইতে অন্যমনস্ক অর্থাৎ আমরা ততক্ষণ অন্যাভিলাষী এই প্রকার শান্তির অভিলাষরূপ অন্যাভিলাষ চরিতার্থ করিবার প্রয়াস হইতেই জগতে সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব্বমীমাংসা, বেদান্তের অপব্যাখ্যা স্বরূপ নির্ব্বিশেষবাদ, সন্দেহবাদ, অজ্ঞেয়তাবাদ, শূন্যবাদ, অসম্ভববাদ, অভিজ্ঞতাবাদ, অভ্যুদয়বাদ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপঃ, ব্রত প্রভৃতি অসংখ্য মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

"গৃহবাস—অশান্তিপূর্ণ, পুত্র-পরিবার—-অশান্তির কারণ, সুতরাং 'দূর ছাই' ঐ সকলকে ত্যাগ করিয়া আমি শান্তির অনুসন্ধান করিব"—এইরূপ হেতুমূলে যে সকল ত্যাগবৈরাগ্যের অভিনয়, সে সকলই অন্যাভিলাষ এইরূপ অভিলাষে প্রমত্ত থাকা কাল পর্য্যন্ত আমরা কৃষ্ণের শান্তি চাহি না, আত্মেন্দ্রিয়-সুখই চাই।

অশান্তি কিরূপে বিদূরিত হইতে পারে অর্থাৎ কিরূপে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি লাভ হইতে পারে, উহার নানাবিধ উপায় কল্পনা করিতে গিয়া কেহ বিচার করেন, যখন বিচিত্রতাই অশান্তির কারণ, তখন বিচিত্রতার বিরোধী হইলেই শান্তি পাইতে পারিব, এইরূপ শান্তিকামী অচিদ্‌বিচিত্রতার অভিজ্ঞতাবাদ চিদ্‌-বিচিত্রতার রাজ্যে অভিব্যাপ্ত করিয়া চিদ্বিলাসের বিরোধী অর্থাৎ কৃষ্ণের শান্তি ভঙ্গ করিবার জন্য রাবণ, কুম্ভকর্ণ, জরাসন্ধ, শিশুপাল, দন্তবক্রাদি অসুরের পদাঙ্ক অনুসরণে উহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগণ্য সংস্করণস্বরূপ তপস্বী, যোগী, জ্ঞানী হইয়া পড়েন। এইরূপ হেতুমূলে শান্তির অনুসন্ধান করিতে যাইয়া কেহ বিচার করেন, যখন আসক্তিই অশান্তির জননী, তখন জড়াসক্তির বিচার চিদ্‌রাজ্যে অতিব্যাপ্ত করিয়া কৃষ্ণাসক্তির বিরোধী হইলেই শান্তি পাওয়া যাইবে, এইরূপ বিচারে তাঁহারা কৃষ্ণের সেবা-শান্তির বিরোধ করিয়া কখনও নির্ব্বিশেষবাদী, কখনও বা শূন্যবাদী হইয়া পড়িতেছেন, সুতরাং এইরূপ হেতুমূলা শান্তি-জিজ্ঞাসা বা 'অব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা' হইতেই—নানাপ্রকার মনোধর্ম্মমতযুক্ত সম্প্রদায় সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে। কৃষ্ণের—পরমের বৃহতের—পূর্ণের সেবাশান্তি-জিজ্ঞাসাই—'ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা' বা বেদান্তের ধর্ম্ম, তাহাই অধোক্ষজ সেবা বা ভাগবত-ধর্ম্ম।

শান্তি-জিজ্ঞাসার হৈতুক চক্ষু লইয়া বা অন্যাভিলাষের পরচক্ষু পরিধান করিয়া যাঁহারা শাস্ত্রবাক্য—শ্রুতিবাক্য—বেদান্তবাক্য—ভাগবতবাক্য—গীতাবাক্য প্রভৃতি দর্শন করেন, শাস্ত্র-বাক্য সমূহ তাঁহাদের নিকট সেইরূপ অন্যাভিলাষ বা হেতুর রঙে রঙিন হইয়া প্রতিভাত হয়, তাই শাস্ত্রবাক্যগুলিকে ঐ সকল মনোধর্ম্ম-সৃষ্ট হৈতুক সম্প্রদায় তাঁহাদের স্ব-স্ব হৈতুক-মত-সমর্থক বলিয়াই মনে করিয়া ল'ন, আবার কৃষ্ণসেবাভিলাষের সহজ সাদা স্বাভাবিক উন্মুক্ত চক্ষু দ্বারা যাঁহারা শাস্ত্র দর্শন করেন, শাস্ত্র তাঁহাদের নিকট সেইরূপ অনাবৃতস্বরূপে প্রকাশিত হন। কাজেই নানা প্রকার অন্যাভিলাষের—হৈতুকী শান্তি জিজ্ঞাসার নানারঙ্গের পরচক্ষুর সাহায্যে দৃষ্ট শাস্ত্র—বাক্যের সমন্বয় করিবার ধুয়া উঠাইয়া যাঁহারা মনোধর্ম্ম ও আত্মধর্ম্মে—চিৎ ও জড়ের মধ্যে একাকার করিতে চাহেন—যাঁহারা বহ্বায়ন অন্যাভিলাষ ও একায়ন কৃষ্ণসেবাভিলাষের সমন্বয় করিতে চাহেন, তাঁহাদের ঐ পরামর্শ অনাবৃত নির্ম্মল-চক্ষু একায়নপন্থী কখনই গ্রহণ করিতে পারেন না। সকল অন্যাভিলাষের মধ্যে একটা আপাত সমন্বয় হইতে পারে, কেননা তাহাদের মধ্যে পরস্পর যতই বিরোধ থাকুক না কেন, বস্তু-বিচারে সে সকলই এক অর্থাৎ অন্যাভিলাষ। কিন্তু কৃষ্ণ-সেবাভিলাষের সহিত অন্যাভিলাষ কখনই এক হইতে পারে না। প্রথম স্থানে ভোক্তা—কৃষ্ণ, আর দ্বিতীয় স্থানে ভোক্তাভিমানী কৃষ্ণেতর বস্তু। সুতরাং কৃষ্ণ-সেবা-বঞ্চিত হইয়া শান্তিজিজ্ঞাসা নাস্তিকতারই প্রকারভেদ। কিন্তু ধর্ম্ম-জগতে প্রায় সর্ব্বত্রই এই নাস্তিকতাই আস্তিকতা বলিয়া প্রচলিত।

যাঁহারা কৃষ্ণের সেবা কামনা করেন, তাঁহারা জ্ঞানী-যোগী-তপস্বিগণের পরম মৃগ্য আত্মারামতা-রূপ শান্তি পর্য্যন্ত অভিলাষ করেন না,—উহাকে নরকের ন্যায় গর্হণ করেন। কৃষ্ণভক্ত অশেষ অশান্তির নিকেতন নরক পর্য্যন্ত বাঞ্ছা করেন, তথাপি কর্ম্মিগণের কাম্য শান্তিনিকেতন সুরপুরী কিম্বা আত্মারামতা-রূপ শান্তির কামনা ভুলক্রমেও করেন না;—

"নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়।"

অনুক্ষন কৃষ্ণের সুখ-শান্তির অনুসন্ধানই পর-প্রেমের লক্ষণ—তৃপ্তির অভাবই পরপ্রেমের লক্ষণ। আত্মারামত্ব সমাগত হইলে পরিপূর্ণ তৃপ্তি উপস্থিত হয়, ঐ তৃপ্তি পরপ্রেম অর্থাৎ কৃষ্ণের নিরন্তর সুখ-শান্তি অনুসন্ধানের বিরোধী। পরপ্রেমে তৃপ্তি নাই। উহা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, তৃপ্তিস্বরূপ ও তৃপ্ত-ভাবস্বরূপ, এতদুভয়ের মধ্যে নিত্যসিদ্ধ বিরোধ। ভক্তির অবান্তর ফল সমূহের মধ্যে আত্মারামতাই সর্ব্বপেক্ষা হেয়। তাই শ্রীশুকদেব, নবযোগেন্দ্র, শ্রীশৌনকাদি মুনি আত্মারামত্বরূপ শান্তি লাভ করিয়াও সেই শান্তিকে দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক ভগবৎসেবা-লৌল্যে আকৃষ্ট হইয়াছেন।

জগতে অহৈতুক পরশান্তিসম্পদ্-বিতরণকারী আচার্য্যের লীলাভিনয়কারী কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর জীবকুলকে কৃষ্ণসেবার অতৃপ্তলালসারূপ অহৈতুকী শান্তি জিজ্ঞাসার শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন। একদিন শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদকে তদীয় শিষ্যব্রুব রামচন্দ্রপুরী মথুরানাথের জন্য আকুল ক্রন্দন করিতে দেখিয়া, লোকে পাছে তাঁহার গুরুকে ব্রহ্মানন্দে অপ্রতিষ্ঠ অশান্ত মনে করিয়া রামচন্দ্রপুরীর প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব

করে, এই আশঙ্কায় মাধবেন্দ্রপুরীপাদকে বলিয়াছিলেন,—“আপনি ব্রহ্মবিদের ন্যায় শান্ত না হইয়া কেন অশান্তভাবে ক্রন্দন করিতেছেন? আপনার ইহা শোভা পায় না। আপনি এই অশান্ত ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দে তৃপ্ত হউন।” রামচন্দ্রপুরীর এই দুর্ব্বুদ্ধি অনুক্ষণ প্রগাঢ় কৃষ্ণসেবানুসন্ধানলীলা-প্রদর্শনকারী অতিমর্ত্ত্য গুরুদেবের পাদপদ্মশোভার দর্শন-বিমুখতা ও নির্ব্বিশেষজ্ঞানী-যোগী-অন্যাভিলাষী গুরুব্রুবের কপট শান্ত-ভাবরূপ কৃষ্ণবিমুখতা কুরূপ দর্শনের উন্মুখতা হইতেই উদ্ভুত হইয়াছিলেন। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ তদবধি রামচন্দ্রপুরীকে ভগবদ্বিদ্বেষী জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে শান্তির বার্ত্তা জানাইয়াছেন, তাহাতে কৃষ্ণসেবার অতৃপ্ত লালসাই শান্তির ঘনসন্মিলনরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি যেন সেই কৃষ্ণসুখানু- সন্ধানের অতৃপ্ত-লালসার পূর্ণতম মূর্ত্তবিগ্রহরূপে অবতীর্ণ। বিপ্রলম্ভই—শান্তির সান্দ্রাবস্থা। ‘কাঁহা যাঙ, কাঁহা পাঙ, মুরলীবদন’—এই ভাবই শান্তি-প্রাচুর্য্য- পরাকাষ্ঠা। আত্মারামগণের হৈতুক শান্তভাবের পরিবর্ত্তে মহাপ্রভুর আদর্শে দেখিতে পাওয়া যায়,—

“উদ্বেগে দিবস না যায়, ‘ক্ষণ’ হৈল ‘যুগ’ সম!
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বর্ষে নয়ন!
গোবিন্দ-বিরহে শূন্য হৈল ত্রিভুবন!
তুষানলে পোড়ে,–যেন না যায় জীবন!
হর্ষ, উৎকণ্ঠ, দৈন্য, প্রৌঢ়ি, বিনয়।
এত ভাব এক ঠাঞি করিল উদয়।।”

শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ শান্তিজিজ্ঞাসারূপা আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাকে সর্ব্বতো- ভাবে ধিক্কার করিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছার পরাকাষ্ঠাকেই পরমা শান্তির চরমা কাষ্ঠা বলিয়া জানাইয়াছেন,—

“আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ।।”

শান্তির আশ্রয় একমাত্র কোটি-চন্দ্র-সুশীতল নিত্যানন্দ পাদপদ্মের ছায়া,—

নিতাইপদকমল কোটিচন্দ্র সশীতল
যে ছায়ায় জগত জুড়ায়।

জগতের অখিল লোক যতদিন পর্য্যন্ত ঐ নিত্যানন্দের কোটিচন্দ্র-সুশীতল পাদপদ্ম-ছত্রের আশ্রয়ে না আসিবে, ততদিন শান্তির আশা—মরীচিকায় পিপাসা-শান্তির লালসার ন্যায়। বিশ্ব-শান্তির আকর—ঐ নিত্যানন্দ পাদপদ্ম- ছত্র। বর্ত্তমান জগৎ বিশ্ব-শান্তির যতই প্রস্তাব, যতই উপায় স্থির করুন না কেন, তদ্দ্বারা কোন কালে শান্তি লাভ ত' হইবেই না, অধিকন্তু বিশ্বকে দিন দিন আরও অশান্তির পথে অগ্রসর করাইয়া চির অশান্তির রাজ্যে ঘূর্ণায়মান করাইবে। বিশ্ব-শান্তির অমোঘ উপায় ঠাকুর মহাশয় তাঁহার গীতিতে গাহিয়াছেন;—

নিতাইপদকমল, কোটীচন্দ্র সুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়।।

গৌড়ীয়

[১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দ, ১৩৩৬-৩৭ বঙ্গাব্দ]

শ্রীগঙ্গামাতা

শ্রীপুরুষোত্তম-ধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের দক্ষিণে শ্বেতগঙ্গা নাম্নী একটী দীর্ঘিকা অবস্থিত। এই দীর্ঘিকার তটে নবদ্বীপ বিদ্যানগরের মহেশ্বর বিশারদের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ক্ষেত্রবাস করিতেন। সন্ন্যাস-লীলাভিনয়ের পর শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা প্রদর্শন করিতে করিতে গৌড়দেশ হইতে শ্রীপুরুষোত্তমে উপস্থিত হইলেন এবং মহাভাববিমণ্ডিত হইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন, তখন প্রেমাবেশে শ্রীজগন্নাথকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়া মহাপ্রভু মন্দিরে মহাভাবমূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মন্দির রক্ষক পড়িছা মহাপ্রভুকে সাধারণ যাত্রিগণের অন্যতম বিবেচনা করিয়া বেত্রাঘাত করিতে অগ্রসর হইলে দর্শনার্থ সমাগত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পড়িছাকে নিবারণ করিলেন এবং মহাভাবমূর্চ্ছিত মহাপ্রভুকে পড়িছা দ্বারা বহন করাইয়া নিজ গৃহে লইয়া আসিলেন। পরে মহাপ্রভুর অনুগামী শ্রীনিত্যানন্দাদি আঠারনালা হইতে যখন পুরীতে প্রবিষ্ট হইয়া লোকমুখে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গৃহে মহাপ্রভুর অবস্থিতির কথা শ্রবণ করিলেন, তখন শ্রীমুকুন্দের পূর্ব্বপরিচিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভগ্নীপতি গোপীনাথ আচার্য্যের সহিত সকলে ভট্টাচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইয়া প্রভুকে দর্শন করিলেন। মহাপ্রভুর নিকট সকলে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন করিতে থাকিলে প্রভুর তৃতীয় প্রহরে বাহ্যদশা লাভ হইল। সার্ব্বভৌম ভক্তগণের সহিত মহাপ্রভুকে মহাপ্রসাদ দ্বারা ভিক্ষা করাইলেন। আপনাকে গৃহস্থ এবং মহাপ্রভুকে শঙ্কর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিজ্ঞানে ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে প্রভু 'কৃষ্ণে মতি রহু' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী বলিয়া জানিতে পারিয়া নিজ ভগ্নিপতি গোপীনাথ আচার্য্যের নিকট মহাপ্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের সকল পরিচয় লইলেন। সার্ব্বভৌম স্বীয় মাতৃস্বসা-গৃহে মহাপ্রভুর বাসাঘর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে সাধক-যুবাসন্ন্যাসি মাত্র মনে করিয়া তাঁহাকে নিরন্তর বেদান্ত শ্রবণ করাইবার এবং সংস্কার করিয়া উত্তম-সম্প্রদায়ে আনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, গোপীনাথ ও মুকুন্দ বিশেষ দুঃখিত হইয়া "মহাপ্রভু যে স্বয়ং ভগবান্"—ইহা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে জানাইলেন।

এ বিষয় লইয়া গোপীনাথ আচার্য্যের সহিত সার্ব্বভৌম ও তাঁহার শিষ্যগণের অনেক বিতর্ক হইল। একদিন গোপীনাথ ও মুকুন্দ, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বিরুদ্ধে মহাপ্রভুর নিকট অভিযোগ করিলে মহাপ্রভু আত্মদৈন্যলীলা প্রকাশপূর্ব্বক ভট্টাচার্য্যকে সম্মান দান করিলেন। অন্য একদিন মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথ-দর্শনান্তে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত তাঁহার শ্বেতগঙ্গা-তটস্থিত আবাস- মন্দিরে আগমন করিলে ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে বেদান্ত অধ্যাপনা ও উপদেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। অমানী- মানদ-ধর্ম্মের শিক্ষক-লীলাভিনয়কারী মহাপ্রভু তাহা স্বীকার পূর্ব্বক সাতদিন পর্য্যন্ত মৌনভাবে বেদান্ত শ্রবণ করিলেন। অষ্টম দিবসে সার্ব্বভৌম, মহাপ্রভুর মৌনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু দৈন্যমুখে মায়াবাদ-ভাষ্যকে উপেক্ষা করিলেন এবং ঐ ভাষ্যের দ্বারা ব্রহ্মসূত্র কিরূপ কদর্থিত ও আবৃত হইয়াছে, তাহা বিভিন্ন শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা প্রদর্শনপূর্ব্বক অচিন্ত্য- ভেদাভেদ সিদ্ধান্তকেই বেদ ও বেদান্তের মত বলিয়া স্থাপন করিলেন। ভট্টাচার্য্য নানাপ্রকার তর্কের পর পরাস্ত হইয়া গেলেন। মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্যের প্রার্থনা-মত 'আত্মারাম' শ্লোকের অষ্টাদশ প্রকার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিলেন। এই ব্যাখ্যা শুনিয়া সার্ব্বভৌম মহা-আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং মায়াবাদ ভাষ্য সমর্থনরূপ পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য তাঁহার আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। তিনি চিরতরে মায়াবাদ পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিলেন। মহাপ্রভু তখন সার্ব্বভৌমকে প্রথমে চতুর্ভুজ পরে শ্যাম বংশীমুখ দ্বিভুজ স্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। প্রভুর কৃপায় সার্ব্বভৌমের হৃদয়ে মহাপ্রভুর তত্ত্ব স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হওয়ায় সার্ব্বভৌম তন্মুহূর্ত্তেই শত শ্লোক রচনা করিয়া মহাপ্রভুকে স্তব করিলেন। আর একদিন সার্ব্বভৌমের এই গৃহেই মহাপ্রভু অরুণোদয়কালে স্বহস্তে শ্রীজগন্নাথের পাকাল- প্রসাদ লইয়া আগমন করিলেন এবং কর্ম্মজড়-স্মৃতিশাস্ত্রের নিগড় ছেদন না করিলে হরিভক্তির রাজ্যে প্রবিষ্ট হওয়া যায় না,—ইহা ভট্টাচার্য্যকে শিক্ষা দিলেন। অন্য একদিবস সার্ব্বভৌম ভক্তির শ্রেষ্ঠ সাধনাঙ্গ জানিতে ইচ্ছা করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে উপদেশ দিলেন। আর একদিন শ্রীমদ্ভাগবতের "তত্তেঽনুকম্পাং" শ্লোকের শেষাংশধৃত 'মুক্তিপদ' পাঠের সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিচার হইয়াছিল। তারপর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বৈষ্ণবরূপে প্রকাশিত হইবার পর মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমের ভবনে পাঁচদিন ভিক্ষা করিয়াছিলেন। যাঠির মাতা সার্ব্বভৌম-গৃহিণী মহাপ্রভুর জন্য বিবিধ সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া ভিক্ষা করাইলে যাঠির স্বামী অমোঘ মহাপ্রভুর প্রতি মাৎসর্য্য পোষণ করায় অমোঘের বিসূচিকা ব্যাধি হয়; মহাপ্রভুর ইচ্ছায় অমোঘ ব্যাধিনির্ম্মুক্ত হইয়া মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করেন।

শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের দক্ষিণে শ্বেতগঙ্গার তটস্থিত যেস্থানে মহাপ্রভুর এই সকল লীলা হইয়াছিল—যে স্থলে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর কৃপায় মায়াবাদ হইতে নিস্তার পাইয়াছিলেন, কালক্রমে সেই স্থান লুপ্ত হইল। কিন্তু ভক্ত ও ভগবানের লীলাস্থলী সমূহ লুপ্ত হইলেও লীলাময় ভগবান্ সর্ব্বদাই তাঁহার লীলা-সহচরগণকে জগতে প্রেরণ করিয়া সেই সকল লুপ্ত-লীলা স্থান পুনরুদ্ধার করাইয়া থাকেন। যাঁহারা যোষিৎসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্তগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব সদাচার আচার প্রচার শিক্ষা-দানের জন্য ভগবদিচ্ছায় জগতে আবির্ভূত হন, সেই নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতগণের দ্বারাই চিরকাল

লুপ্তলীলাস্থলী সমূহের পুনরুদ্ধার সাধিত হয়। যোষিৎসঙ্গী ব্যবসায়ী কৃষ্ণভক্তগণের দ্বারা হরিভক্তি প্রচার বা ভগবানের লীলাস্থলীর পুনঃ প্রকাশের কথা বৈষ্ণব জগতের ইতিহাসে হইতে পারে না।

মহাপ্রভুর শ্রীপুরুষোত্তম-লীলার আদি স্থান লুপ্ত হইলে মহাপ্রভুই তাঁহার কোন নিজ জনকে জগতে প্রেরণ করিলেন। ইনি একটী বৈষ্ণবী শক্তি—বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্যা শ্রীগঙ্গামাতা।

বঙ্গদেশের রাজসাহী জেলায় পুঁটিয়া রাজধানী অবস্থিত। পুঁটিয়া রাজবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী কিম্বদন্তী শ্রুত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে পুঁটিয়া নগরে বৎসাচার্য্য নামে এক ব্রাহ্মণ সংসারসুখে বীতস্পৃহ হইয়া বানপ্রস্থ-ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক ভগবৎচিন্তায় আত্মনিয়োগ করেন। এই সময়ে লস্কর খান দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে লস্করপুর-পরগণার জায়গীরের সনন্দ প্রাপ্ত হন। লস্করের মৃত্যু ঘটিলে ঐ স্থানের করসংগ্রহ কষ্টদায়ক হইয়া পড়িল। ক্রমে সুবাদারগণ ষড়যন্ত্র করিয়া দিল্লীর রাজকোষে করপ্রেরণ বন্ধ করিলেন। ইহা দেখিয়া দিল্লীশ্বর তাঁহার একজন সৈন্যাধ্যক্ষকে সুবাদারগণের অবাধ্যতা দমন করিবার জন্য বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁহার লোকজনসহ বৎসাচার্য্যের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হন। বৎসাচার্য্য তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা এবং অতিথিসৎকার করেন। যুদ্ধে সেনানীর জয় হইলে তিনি সম্রাটের নিকট হইতে লস্করপুরের অধিকার প্রার্থনা পূর্ব্বক বৎসাচার্য্যকে দান করেন। বৎসাচার্য্য জমিদারী প্রাপ্ত হইলেও আর বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না। তাঁহার পুত্র কৌশলক্রমে সম্রাটের তুষ্টিবিধান করিয়া রাজধানীর শ্রীবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। বৎসাচার্য্যের পৌত্র দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে 'রাজা'-উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

পুঁটিয়া-রাজবংশের রাজা নরেশনারায়ণের শচীদেবী নাম্নী এক কন্যা অতি শৈশবকাল হইতেই সংসারে উদাসীনতা এবং ভগবৎসেবায় নিষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। রাজা নরেশনারায়ণ শচীদেবীর বিবাহ প্রদানার্থ উপযুক্ত বরের সন্ধান করিতে লাগিলেন। শচীদেবী পিতাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া বলিলেন যে, কোনও মরণশীল পুরুষের সহিত যেন তাঁহার বিবাহ না দেওয়া হয়। কালক্রমে রাজা নরেশনারায়ণ ও তাঁহার পত্নীর পরলোক প্রাপ্তি ঘটিলে শচীদেবী শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন।

এই সময়ে শ্রীধাম-বৃন্দাবনে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর শিষ্য শ্রীল অনন্তাচার্য্যের প্রিয় শিষ্যবর শ্রীল হরিদাস পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু বৈষ্ণবমণ্ডলে বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। ইঁহার কথা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

"পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য—অনন্ত আচার্য্য।
কৃষ্ণপ্রেমময়-তনু, উদার, সর্ব্ব-আর্য্য।।
তাঁহার অনন্ত গুণ কে করু প্রকাশ।
তাঁর প্রিয় শিষ্য ইঁহা—পণ্ডিত হরিদাস।।
চৈতন্য-নিত্যানন্দে তাঁর পরম বিশ্বাস।
চৈতন্য-চরিতে তাঁর পরম উল্লাস।।

বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী, না দেখয়ে রোষ।
কায়মনোবাক্যে করে বৈষ্ণবে সন্তোষ।।
নিরন্তর শুনে তিঁহো 'চৈতন্যমঙ্গল'।
তাঁহার প্রসাদে শুনেন বৈষ্ণব সকল।।
কথায় সভা উজ্জ্বল করে যেন পূর্ণচন্দ্র।
নিজ গুণামৃতে বাড়ায় বৈষ্ণব-আনন্দ।।
তিঁহো অতি কৃপা করি' আজ্ঞা দিল মোরে।
গৌরাঙ্গের শেষলীলা বর্ণিবার তরে।।"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ৮ম অঃ)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বর্ণনানুসারে জানা যায়, শ্রীল হরিদাস পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীধাম বৃন্দাবনে বৈষ্ণব সভায় নিত্য শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিতেন এবং ইনি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুকে মহাপ্রভুর শেষ-লীলা বর্ণন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন।

পুঁটিয়া-রাজদুহিতা শচীদেবী শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার কৃপা যাচ্ঞা করিলেন। পণ্ডিত গোস্বামী শচীদেবীকে অন্যাভিলাষ শূন্যা নিষ্কপট-হরিসেবাভিলাষিণী দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে মন্ত্র- দীক্ষা প্রদান করিলেন। শচীদেবী শ্রীল হরিদাস পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর আদেশ গ্রহণপূর্ব্বক কিছুকাল আর একটী সমশীলা স্ত্রীভক্তের সহিত শ্রীরাধাকুণ্ডে ভগবদ্ভজন করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলেন, শ্রীশচীদেবীর সহিত যে স্ত্রী-ভক্তটী শ্রীরাধাকুণ্ডে একত্র ভজন করিয়াছিলেন, তিনি শচীদেবীরই পূর্ব্বাশ্রমের মাতুলানী; তাঁহার নাম—শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী। তিনিও শ্রীপণ্ডিত গোস্বামী প্রভুরই শিষ্যা ছিলেন।

শ্রীশচীদেবী কএক বৎসরকাল একান্তভাবে শ্রীরাধাকুণ্ডে ভজন করিয়া ভজনপ্রৌঢ়া হইলে শ্রীল হরিদাস পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু শচীদেবীকে শ্রীপুরুষোত্তমে গমন করিতে আদেশ করেন এবং তথায় ক্ষেত্রসন্ন্যাস গ্রহণ-পূর্ব্বক মহাপ্রভুর লুপ্ত-লীলাস্থলী—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভবনে নিত্য সেবাপ্রকাশ করিতে বলেন। শচীদেবী শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে শ্রীক্ষেত্রে আগমন করেন এবং শ্রীগুরুদেবের নির্দ্দেশমত শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের সন্নিকটস্থ যে স্থানে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের আবাস-ভবন ছিল, সেই স্থানের অনুসন্ধান করেন। তখন এই স্থানটী সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং কণ্টক ও জঙ্গলাদিপরিপূর্ণ জনমানবহীন পরিত্যক্ত স্থানরূপে প্রতিভাত হইতেছিল। কিংবদন্তী, তথায় কেবল একটী জরাজীর্ণ ক্ষুদ্র-মন্দিরে শ্রীরাধাদামোদর-শালগ্রাম ও একটী বালগোপাল-মূর্ত্তি অবস্থিত ছিলেন। কেহ কেহ এই বিগ্রহদ্বয়কে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পূজিত বিগ্রহ বলিয়া বলিতেন, আবার এ-বিষয়ে মতভেদও অনেক ছিল। যাহা হউক, ভগবদ্ভক্তগণের হৃদয়ে ভগবান্ স্বয়ং স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া যে প্রেরণা প্রদান করেন,

ভক্তগণ তদনুসারেই কার্য্য করিয়া থাকেন। তাই শচীদেবী স্বীয় গুরুদেবের নির্দ্দেশ ও মহাপ্রভুর প্রেরণানুসারে সেই স্থানে একটী ছত্র স্থাপন করিলেন।

শচীদেবী গৃহে অবস্থানকালেই শাস্ত্র-গ্রন্থের প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তারপর শ্রীরাধাকুণ্ডে বাসকালে তিনি নিত্য শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিতেন। সুতরাং ভাগবতে তাঁহার বিশেষ অধিকার জন্মিয়াছিল। তিনি শ্রীক্ষেত্রে নিজ ছত্রমধ্যে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন। শ্রীক্ষেত্রবাসিনী ভগবদ্ভক্তি পরায়ণাগণ প্রত্যহই শচীদেবীর ভাগবত-পাঠ শ্রবণার্থ উপস্থিত হইতেন এবং শচীদেবীর মুখে ভাগবতের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সেই সকল কথা গৃহে গিয়াও আলোচনা করিতেন। মহিলাগণের মুখে পুরুষগণ শচীদেবীর বৈরাগ্য ও ভাগবত-বাখ্যায় বিশেষ অধিকারের কথা শ্রবণ করিয়া ঐ ভাগবত-পাঠ শ্রবণ করিবার জন্য শচীদেবীর ছত্রের সম্মুখে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে শচীদেবীর ভাগবত-ব্যাখ্যার যশঃ-সৌরভ তদানীন্তন পুরীর রাজা শ্রীমুকুন্দদেবের কর্ণও স্পর্শ করিল।

মহারাজ প্রতাপরুদ্রের অপ্রকটের পর মুকুন্দদেব উৎকলের রাজসিংহাসনের অধিকারী হইয়াছিলেন। প্রতাপরুদ্রের বৈকুণ্ঠ-বিজয়ের পরে উৎকল রাজ্যে ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার মন্ত্রী ও সামন্তগণ প্রবল হইয়া ক্রমে ক্রমে সিংহাসন অধিকার করিতে থাকিল। এই সময়ে জগন্নাথদেবের সেবার বিশেষ বিশৃঙ্খলতা ঘটিয়াছিল। শ্রীমুকুন্দদেব যখন উৎকলের রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট, তখন দেব-দ্বেষী কালাপাহাড়ের রণঢক্কা উৎকল গগন নিনাদিত করিল। মুসলমান- সেনাপতি কালাপাহাড় বহু সংখ্যক সৈন্যসামন্ত সহ যাজপুরে উপস্থিত হইয়াছিল। কথিত হয়, কালাপাহাড়ের সহিত যুদ্ধেই রাজা মুকুন্দদেব নিহত হইয়াছিলেন।

যাহা হউক, যখন পুঁটিয়ার রাজদুহিতা শচীদেবী শ্রীপুরুষোত্তমে শ্বেতগঙ্গার তীরে ছত্র স্থাপন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণার্থ উৎকলাধিপতি মহারাজ মুকুন্দদেবও শচীদেবীর ছত্রে উপস্থিত হইলেন। তিনি একদিন স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইলেন, শ্রীজগন্নাথদেব যেন শ্বেতগঙ্গায় সন্নিকটস্থ স্থানটী ভাগবত-ব্যাখ্যাত্রী উদাসীন মহোদয়াকে অর্পণার্থ আদেশ করিতেছেন। পরদিবস প্রাতঃকালে রাজা শয্যা হইতে উঠিয়াই শচীদেবীর নিকট এই বার্ত্তা প্রেরণ করিলেন এবং শচীদেবী যে স্থানে ছত্র করিয়াছে, সেই স্থানটী শচীদেবীর নামে দানপত্র দ্বারা লিখিয়া দিবার প্রস্তাব জানাইলেন। বিষয়বিরক্তা শচীদেবী বিষয়ী রাজার নিকট হইতে ভূসম্পত্তি প্রভৃতি বিষয় গ্রহণ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক হইলেও শ্রীগুরুদেবের আদেশ স্মরণ করিয়া সেই স্থানে মহাপ্রভুর লুপ্ত-লীলা ও সেবা উদ্ধারার্থ রাজার প্রদত্ত স্থানটী গ্রহণ করিলেন। সেই স্থানে শচীদেবী ভিক্ষা দ্বারা ঠাকুরসেবা চালাইতে লাগিলেন।

এক সময়ে কৃষ্ণা-ত্রয়োদশী তিথিতে মহাবারুণী-স্নানের জন্য অনেকে গঙ্গার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন, কিন্তু ভগবৎ সেবাপরায়ণা শচীদেবী কর্ম্মমার্গীয় ব্যক্তিগণের ঐরূপ হুজুগে মত্ত না হইয়া একান্তমনে শ্রীগুরুদেবের আদিষ্ট ভগবৎসেবা ও ক্ষেত্র সন্ন্যাসকেই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত জানিয়া তাহাতে পরিনিষ্ঠিত থাকিলেন। শচীদেবী স্বপ্নযোগে শ্রীজগন্নাথের দ্বারা আদিষ্ট হইলেন,—"যেদিন গঙ্গার স্নানযোগ,

সেইদিন তুমি শ্বেতগঙ্গায় স্নান করিবে। গঙ্গাদেবী তোমার সঙ্গপ্রার্থিনী হইয়া শ্বেতগঙ্গায় উপস্থিত হইবেন।" শচীদেবী স্বপ্নে এরূপ আদিষ্ট হইয়া সকলের অজ্ঞাতসারে অর্দ্ধরাত্রে শ্বেতগঙ্গায় অবগাহন করিলেন। অবগাহন করিবামাত্র তিনি যেন গঙ্গাস্রোতের দ্বারা চালিত হইয়া ক্রমশঃ অন্য স্থানে নীত হইতে থাকিলেন এবং স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শ্রীক্ষেত্রবাসী নরনারী সকলেই গঙ্গাস্নান করিতেছেন; চতুর্দ্দিকে স্নানকোলাহল উপস্থিত হইয়াছে, তন্মধ্যে তিনিও সানন্দে স্নান করিতেছেন। এই কোলাহল দ্বার-রক্ষকগণের নিদ্রা ভঙ্গ করিল। দ্বার-রক্ষকগণ জাগরিত হইয়া পড়িছাগণকে জানাইল। পড়িছা এই সংবাদ রাজাকে জানাইলে রাজা শ্রীমন্দির খুলিবার জন্য আদেশ দিলেন। মন্দির খুলিয়া দেখা গেল, মন্দিরাভ্যন্তরে শচীদেবী দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় শচীদেবী বলিলেন,—"আমি কিছুই জানি না। আমি শ্বেতগঙ্গায় স্নান করিতেছিলাম, স্নান করিতে করিতে গঙ্গার প্লাবনে চালিতা হইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছি। ইহার পূর্ব্বে আমি স্বপ্নযোগে জগন্নাথদেবের নিকট হইতে শ্বেতগঙ্গায় স্নানার্থ আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং জগন্নাথদেব আমাকে জানাইয়াছিলেন যে, আমার স্নানের জন্য বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গাদেবী কৃপা পূর্ব্বক শ্বেতগঙ্গায় আবির্ভূতা হইবেন। ইহা ব্যতীত আমি আর কিছুই জানি না।" সকলে শচীদেবীর এই অদ্ভুত মহিমা শুনিয়া তাঁহাকে সেইদিন হইতে 'গঙ্গামাতা' নামে অভিহিত করিলেন। অপর বৃত্তান্ত অনুসারে প্রকাশ যে শ্রীজগন্নাথদেব রাজা মুকুন্দদেবকেই স্বপ্নে জানাইয়াছিলেন যে, জগন্নাথদেবের পাদসম্ভূতা গঙ্গা শচীদেবীর স্নানের জন্য শ্বেতগঙ্গায় আবির্ভূতা হইয়াছেন এবং শচীদেবীকে শ্রীমন্দিরে আনয়ন করিয়াছেন; সুতরাং তাহাতে কোনপ্রকার সেবাপরাধের আশঙ্কার কারণ নাই। শচীদেবীকে 'গঙ্গামাতা' নামে বিদিত করাইয়া তাঁহার নিকট হইতে রাজার কৃষ্ণদীক্ষা গ্রহণ করা উচিত। কিম্বদন্তী এই যে, এই ঘটনার পরেই মুকুন্দদেব গঙ্গামাতার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সেই সময় রাজপুতনার অন্তর্গত জয়পুর নগরীতে এক ব্রাহ্মণের ঘরে 'রসিকরায়' নামক শ্রীবিগ্রহ-সেবা ছিল। সেবাপরাধে ব্রাহ্মণ নির্ব্বংশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। একদিন ব্রাহ্মণ স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইলেন যে, শ্রীজগন্নাথদেব তাঁহাকে বলিতেছেন,—"তোমার গৃহদেবতা রসিকরায়কে শীঘ্রই তুমি শ্রীক্ষেত্রে শ্বেতগঙ্গার তটস্থিত গঙ্গামাতার নিকট পৌঁছাইয়া দাও, নতুবা তোমার কোনও দিন মঙ্গল হইবে না।" ব্রাহ্মণ নিঃসন্তান হইয়া এতদিন বিশেষ মনঃকষ্টে কালাতিপাত করিতেছিলেন। স্বপ্নে জগন্নাথদেবের এই আদেশ পাইয়া আরও ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া ব্রাহ্মণ একটী পেটিকার অভ্যন্তরে রাধারাণীর সহিত রসিকরায়-বিগ্রহকে স্থাপনপূর্ব্বক শ্রীক্ষেত্রাভি মুখে যাত্রা করিলেন এবং কিছুকালের মধ্যে গঙ্গামাতার আশ্রয়ে আসিয়া তাঁহাকে শ্রীবিগ্রহ প্রদানে উদ্যত হইলেন। গঙ্গামাতা শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া বলিলেন,— "এই শ্রীবিগ্রহ রাজ-সেবার মূর্ত্তি, আমি সামান্যমাত্র ভিক্ষা দ্বারা সেবা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি, এত বড় শ্রীবিগ্রহ কোথায় রাখিব? এই বিগ্রহ রাখিলে আমাকে সেবাপরাধিনী হইতে হইবে। আপনি গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, আপনার ঠাকুর আপনি লইয়া যান।" ব্রাহ্মণ বেগতিক দেখিয়া নিকটস্থ তুলসী-কাননে অলক্ষিত ভাবে শ্রীবিগ্রহ

রাখিয়া দিয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন। এদিকে রাত্রিকালে গঙ্গামাতা স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইলেন, রসিকরায় গঙ্গামাতাকে বলিতেছেন,—"আমি তোমার সেবা গ্রহণার্থ তোমার নিকট উপস্থিত হইব,—ইহা বহুদিন যাবৎ তোমাকে জানাইয়া রাখিয়াছি, অথচ তুমি আমাকে অনাদর করিতেছ কেন? ব্রাহ্মণ আমাকে তুলসীকাননে রাখিয়া গিয়াছেন, তুমি আমাকে সেইস্থান হইতে উঠাইয়া আনিয়া যথাস্থানে স্থাপন কর।"

গঙ্গামাতা এইরূপ স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া শ্রীবিগ্রহকে যথাস্থানে স্থাপন করিলেন। গঙ্গামাতার প্রভাবে অচিরেই রসিকরায়ের সেবার ঔজ্জ্বল্য প্রকটিত হইল। কেহ কেহ বলেন,—জয়পুরনিবাসী ঐ ব্রাহ্মণটীর নাম—শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র। ধরাকোটের রাজা শ্রীরামচন্দ্র সিংহ গঙ্গামাতার পঞ্চম অধস্তন বঙ্গবাসী শ্রীভগবান্ দাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বহুব্যয়ে বর্ত্তমান গঙ্গামাতা মঠের মন্দিরাদি নির্ম্মাণ, কূপখনন এবং ভগবৎসেবার্থ উড়িষ্যা প্রদেশে একটী গ্রাম প্রদান করেন। সেই গ্রামের নাম—রামচন্দ্রপুর। তদবধি এই গ্রাম গঙ্গামাতামঠের জমিদারীর অন্তর্গত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ দাস 'মোহনরায়' নামক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার প্রশিষ্য নীলাম্বর দাস 'বিনোদরায়' ও 'শ্যামরায়' নামক বিগ্রহদ্বয় প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীনীলাম্বর দাসের গুরুদেব শ্রীমধুসূদন দাস শ্রীগৌরাঙ্গবিগ্রহ এবং শ্রীরসিকরায়ের দক্ষিণে শ্রীললিতাদেবী প্রতিষ্ঠা করেন। গঙ্গামাতার শিষ্য শ্রীবনমালী দাস শ্রীরাধাকুণ্ডে ও শ্রীধাম বৃন্দাবনে গৌরগদাধর বিগ্রহ স্থাপন করেন। অধুনা গঙ্গামাতার মঠে ক্ষুদ্র রৌপ্য-সিংহাসনে যে শ্রীরাধাদামোদর-শালগ্রাম বিগ্রহ পূজিত হইতেছেন, ইহাই সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পূজিত বিগ্রহ বলিয়া গঙ্গামাতার মঠের সেবকগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

শ্রীগৌরগণোদ্দেশের নির্দ্দেশমতে অষ্ট সখীর অন্যতমা সুদেবী সখীই গৌর অবতারে শ্রীঅনন্তাচার্য্য। গঙ্গামাতামঠের গুরুপরম্পরায় ইনি 'বিনোদমঞ্জরী' বলিয়া উক্ত আছেন। শ্রীঅনন্তাচার্য্য শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য, অনন্তাচার্য্যের শিষ্য—পণ্ডিত হরিদাস; ইঁহার নাম রঘু গোপাল—শ্রীরাসমঞ্জরী। তাঁহারই শিষ্যা—শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া এবং শ্রীগঙ্গামাতা। গঙ্গামাতার শিষ্য—শ্রীবনমালী, তচ্ছিষ্য—শ্রীগোপাল দাস, তচ্ছিষ্য—শ্রীভগবান্ দাস। ভগবান্ দাসের শিষ্য—শ্রীমধুসূদন দাস, তাঁহার শিষ্য—শ্রীনীলাম্বর দাস, শ্রীনীলাম্বরের শিষ্য—শ্রীনরোত্তম দাস, তচ্ছিষ্য—শ্রীপীতাম্বর দাস, তচ্ছিষ্য—শ্রীমাধব দাস। শ্রীমাধব দাসের শিষ্য—শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাস। ইনি বর্ত্তমানে গঙ্গামাতা-মঠের মহান্ত। ইঁহারা সকলেই উদাসীন গৌড়ীয়-বৈষ্ণব বলিয়া প্রসিদ্ধ।

গঙ্গামাতা-মঠের প্রদত্ত বিবরণানুসারে প্রকাশ যে, বর্ত্তমানে মঠের বার্ষিক আয় ত্রিশ হাজার টাকা। পুরী জেলার রাহাং গ্রাম, গঞ্জাম, খুর্‌দা এবং বঙ্গদেশের পুঁটিয়া প্রভৃতি স্থানে এই মঠের ভূসম্পত্তি আছে। এই মঠের প্রদত্ত বিবরণানুসারে গঙ্গামাতা ষাট বৎসর বয়সে শ্রীক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন এবং এস্থানে আরও ষাট বৎসর কাল প্রকট ছিলেন অর্থাৎ ১২০ বৎসর বয়সে গঙ্গামাতা পৃথিবী পরিত্যাগ করেন। উক্ত মঠের প্রদত্ত বিবরণানুসারে ১৬০১ খৃষ্টাব্দে গঙ্গামাতার আবির্ভাব এবং ১৭২১ খৃষ্টাব্দে তিরোভাব। পুরীর লোকনাথের মন্দিরের নিকট 'সমাধি বাগিচা' নামক স্থানে গঙ্গামাতার সমাধি-মন্দির এবং তাঁহার শিষ্যানু-

শিষ্যগণের সমাধি বর্ত্তমান আছে। গঙ্গামাতামঠের বর্ত্তমান সেবাভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রীশ্যামসুন্দর দাস বলিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি প্রভুর সময় হইতেই গৌরমন্ত্র ও গৌরগায়ত্রী প্রচলিত আছে। গঙ্গামাতার পঠিত শ্রীমদ্ভাগবত অদ্যাবধি এই মঠে পূজিত হইতেছেন। মহান্তগণের লিখিত বঙ্গাক্ষরী বহু পুস্তক কীটদষ্ট হওয়ায় বর্ত্তমানে কিছুদিন হইল, শ্রীশ্যামসুন্দর দাস ঐ সকল পুস্তক শ্বেতগঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়া আমাদিগকে জানাইলেন। উড়িয়া অক্ষরের কিছু প্রাচীন পুঁথি এখনও গঙ্গামাতা মঠে সংরক্ষিত আছে, বলিলেন।

পুরীর রাজা মুকুন্দদেব গঙ্গামাতার নিকট প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতে আসিতেন। রাজা গঙ্গামাতার পাঠ শুনিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হওয়ায় ভাগবত-পাঠ শ্রবণের দক্ষিণাস্বরূপ গঙ্গামাতাকে প্রচুর সম্পত্তি প্রদানে উদ্যত হইলে গঙ্গামাতা 'শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ-ব্যাখ্যা পণ্যদ্রব্যের তুল্য নহে', রাজাকে বুঝাইয়া রাজার প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। পরে রাজা গঙ্গামাতার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া গঙ্গামাতাকে ভূসম্পত্তি প্রদানে ইচ্ছুক হইলেন। গঙ্গামাতা তাহাও প্রত্যাখ্যান করায় অবশেষে রাজা একভাণ্ড পরিমাণ মহাপ্রসাদ প্রত্যহ লইয়া আসিয়া গঙ্গামাতাকে প্রদান করিতেন। এখনও পুরীর রাজা জগন্নাথ মন্দির হইতে প্রত্যহ একভাণ্ড মহাপ্রসাদ গঙ্গামাতা-মঠে প্রেরণ করিয়া থাকেন। শ্রীবনমালী দাসের সময় হইতে গঙ্গামাতা মঠের ঠাকুর সেবার ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। এখানে পূর্ব্বে বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-বালকগণের জন্য একটী টোল ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে সেই টোল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

অতিবাড়ী জগন্নাথ দাস

মহাত্মা তোতারাম দাস বাবাজী মহারাজের কথিত ত্রয়োদশ প্রকার উপ-সম্প্রদায়ের * অন্যতম অতিবাড়ি সম্প্রদায়ের নাম বৈষ্ণব ইতিহাস-পাঠকগণের প্রায় সকলেই জানেন। এই অতিবাড়ি-সম্প্রদায়ের উৎকলের অধিনায়ক বা মূল প্রবর্ত্তক—প্রসিদ্ধ অতিবাড়ী জগন্নাথ দাস। বঙ্গের অতিবাড়ী-অধিনায়ক—শ্রীরূপ কবিরাজ।

অতিবাড়ী জগন্নাথ দাসের আমূল জীবন-চরিত্র বঙ্গভাষায় ত' প্রকাশিত হয়ই নাই, উৎকল ভাষায়ও অতিবাড়ী মহাশয়ের জীবনচরিত কিছুদিন পূর্ব্বে বহু অনুসন্ধান করিয়াও বিশেষ কিছু অবগত হইতে পারা যায় নাই। পাশ্চাত্যদেশীয় জনৈক ঐতিহাসিক অতিবাড়ী জগন্নাথ দাসের সম্বন্ধে সামান্য কিছু লিখিয়া-

* আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই।
সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাতগোসাঞি।।
অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী।
তোতা কহে, এই তেরর সঙ্গ নাহি করি।।
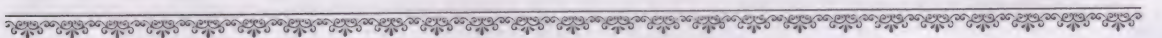
ছিলেন; একবার 'মুকুর' নামক একখানি মাসিক পত্রে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এক প্রবন্ধে অসম্পূর্ণভাবে জগন্নাথ দাসের সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। দুই একজন বঙ্গীয় সাহিত্যিক অতিবাড়ী জগন্নাথ দাসের সম্বন্ধে যে অসম্পূর্ণ ও বিকৃত সামান্য বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতেও অতিবাড়ী জগন্নাথ দাসের প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যায় নাই।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বহুদিবস উড়িষ্যা ও পুরুষোত্তমক্ষেত্রে ধর্ম্ম- প্রচারকালে বহু অনুসন্ধানের পর অতিবাড়ি সম্প্রদায়ের তথ্যসমূহ আহরণ করিয়াছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পুরীর মহারাজের প্রাচীন গ্রন্থাগার, মুক্তিমণ্ডপের গ্রন্থাগার এবং উড়িষ্যার বিভিন্নস্থান হইতে বহু প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি বহু ব্যয়ে ও বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়া বহু অনুদ্ঘাটিত তথ্যরাজি আবিষ্কার করিয়াছেন। বিশেষতঃ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যখন পুরুষোত্তমে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের পরিদর্শকের পদে সমাসীন ছিলেন, তখন তিনি অনেক তথ্য সমাহরণ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। উড়িষ্যার বিভিন্ন মঠের সম্বন্ধে আহৃত তথ্যসমূহ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের "Maths of Orissa" নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ১২৬৭ সালে ভদ্রকে অবস্থানকালে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যখন পুরীতে বিচারক-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন অতিবাড়ি-সম্প্রদায়ের অধস্তন 'বিষকিষণ' নামক একজন খণ্ডায়েৎ কিছু যোগবল লাভ করিয়া আপনাকে 'মহাবিষ্ণু' বলিয়া প্রচার করেন। উড়িষ্যার কমিশনার র‍্যাভেন্স সাহেব ও পুরীর কালেক্টর আর্ম্মষ্ট্রং সাহেব এতদ্বিষয়ের তদন্ত ও বিচারের ভার ঠাকুর ভক্তিবিনোদের হস্তে ন্যস্ত করেন। এই সময়ে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অতিবাড়ি সম্প্রদায়ের আমূল ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত অতিবাড়ি-সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে ইংরাজী প্রবন্ধও সজ্জনতোষণীতে ছাপা হইয়াছে। বৈষ্ণবমঞ্জুষার জন্য শ্রীল প্রভুপাদের উদ্‌যোগে অতিবাড়ি-সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান স্থান,—যেমন উড়িয়ামঠ, সাতলহরী মঠ, শিশুমঠ, যশোবন্ত দাসের গাদি, অচ্যুতানন্দ দাসের গাদি, বলরাম দাসের মঠ প্রভৃতি স্থান হইতে বহু চেষ্টায়, পরিশ্রমে ও অনুসন্ধানে কতকগুলি তথ্য ও কিম্বদন্তী সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত জগন্নাথ দাসের ভাষা-ভাগবত, নিত্যগুপ্ত চূড়ামণি, জগন্নাথ-চরিতামৃত এবং অতিবাড়ি-সম্প্রদায়ের কতকগুলি হস্তলিখিত পুঁথি হইতে জগন্নাথ দাসের চরিত্রের উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। তবে ঐ সকল পুঁথির মৌলিকতা কতদূর, তদ্বিষয়ে পাঠকগণের অবহিত থাকা আবশ্যক।

শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র হইতে প্রায় তিন ক্রোশ পশ্চিমে কপিলেশ্বরপুর নামক গ্রাম। উৎকলের সুপ্রসিদ্ধ রাজা কপিলেশ্বরচন্দ্র দেব এই গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা। কপিলেশ্বরপুর গ্রামটী চারিশত-ভাগে বিভক্ত ব্রাহ্মণ-শাসন। এই গ্রামের প্রথমাংশে কৌশিক-গোত্রীয় 'দাস'-উপাধিধারী এক ব্রাহ্মণবংশ ছিল। এই ব্রাহ্মণবংশে ভগবান্ দাস নামক এক পুরাণপাঠী বিপ্র উৎকল-ভাষায় পুরাণ ব্যাখ্যা করিয়া তদানীন্তন পুরী-রাজ পুরুষোত্তম দেবের শ্রবণ-মনোরঞ্জন করিতেন। তাহাতে তিনি রাজার নিকট হইতে 'পুরাণ পণ্ডা' উপাধি লাভ করেন। ভগবান্ দাসের পত্নীর নাম—পদ্মাবতী। অতিবাড়ি-সম্প্রদায়ের কোন কোন মতানুসারে ১৪১২ শকাব্দ,

খ্রীষ্টীয় ১৪৯০, ভাদ্র মাসে রাধাষ্টমীর দিবস ভগবান্ দাসের একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। পুরাণ-পণ্ডা ভগবান্ দাস ঐ শিশু পুত্রের নাম 'জগন্নাথ দাস' রাখেন।

পুত্র শৈশবাবস্থা অতিক্রম করিলেই ভগবান্ দাস স্বীয় পুত্রকে পুরাণাদির কথকতা শিক্ষা দিতে থাকেন। জগন্নাথ দাসের দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালেই ভগবান্ দাস বিবাহের উদ্যোগ করিলে জগন্নাথ দাস আরও কিছুকাল অধ্যয়নাদির পর বিবাহ করিবার অভিলাষ জানাইলেন। জগন্নাথ দাস পুরাণ-কথকতায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া স্বীয় পারদর্শিতার ফল সাধারণ্যে প্রচার করিবার জন্য বিভিন্ন দেশাগত ধর্ম্মপ্রবণ ব্যক্তির সম্মেলন-স্থল শ্রীপুরুষোত্তমের শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে উপস্থিত হইতে থাকেন এবং শ্রীমন্দিরের দক্ষিণভাগে বটগণেশের নিকট তাঁহার পুরাণ-পাঠের স্থান স্থির করেন। জগন্নাথ দাসের কণ্ঠস্বর সুললিত থাকায় বহু লোক, বিশেষতঃ ভাব-প্রবণা ও নিসর্গপিচ্ছিল-চিন্তা স্ত্রীগণ জগন্নাথ দাসের কথকতায় সহজেই আকৃষ্টা হইয়া পড়িতেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যখন সন্ন্যাস-লীলা আবিষ্কার করিয়া জীবকুলকে কৃষ্ণানু- সন্ধান শিক্ষা দিবার জন্য সপার্ষদে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন, অতিবাড়ি সম্প্রদায়ের কতিপয় বিবরণ হইতে জানা যায়, সেই সময় পুরাণ-পণ্ডা ভগবান্ দাসের পুত্র জগন্নাথদাসের বয়স অতি অল্প। তাঁহারা বলেন, শ্রীচৈতন্যদেব কোন এক সময়ে যখন শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া বটমূলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই সময় জগন্নাথ দাসের সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ইহাদের বর্ণনানুসারেই জানা যায় যে, জগন্নাথ দাস তখন শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ব্রহ্মস্তব পাঠ করিতেছিলেন। অতিবাড়িগণের পুঁথি হইতে আরও জানা যায় যে,—শ্রীজগন্নাথ দাস ঐ সময়ে শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগমনে শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণাদি করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের ব্রহ্মস্তুতি ব্যাখ্যাকালে জগন্নাথ দাস মায়াবাদ-মত-গন্ধযুক্ত তত্ত্ববিরুদ্ধ ব্যাখ্যা করায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর তাহাতে ভাব বিপর্য্যয় হইয়াছিল। শ্রীস্বরূপ-রূপাদি ভাগবত-সিদ্ধান্ত-সম্রাজগণ, মহাপ্রভু তত্ত্ববিরুদ্ধ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে পারেন না জানিয়া মহাপ্রভুকে সেই স্থান হইতে অন্যত্র আনয়ন করিলে জগন্নাথ দাসের অতাত্ত্বিক স্তাবক সম্প্রদায় মহাপ্রভুর একান্ত নির্ম্মৎসর ভক্তগণের সেবাকার্য্যকে মৎসরতা ভাবিয়া লইয়া গোস্বামীবর্গের চরণে যে অমার্জ্জনীয় অপরাধ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তৎফলে জগন্নাথ দাস পর্য্যন্ত লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি ভক্তিবৃক্ষের উপশাখাগুলি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

তথাপি অহৈতুকী অমন্দোদয়-দয়ার অবতার গৌরভক্তগণ অল্পবয়স্ক জগন্নাথ দাসের মঙ্গল ইচ্ছা করিয়া তাঁহার অন্তর শোধন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সর্ব্বজীবশুভাধ্যায়ী গৌর-ভক্তগণ জগন্নাথদাসের প্রতি উপদেশমুখে জানাইয়াছিলেন যে, গুরু-বৈষ্ণবের নিকট হইতে ভাগবতী দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত শ্রবণ এবং গুরু-বৈষ্ণব-সেবা ব্যতীত লৌকিক গুরুগণের নিকট হইতে অধীত ভাগবত-বিদ্যা কখনই পারমার্থিক প্রয়োজন প্রদান করিতে পারে না। বৈষ্ণবের নিকট সেবোন্মুখ-হৃদয়ে ভাগবত অধ্যয়ন না করিলে কাহারও

ভাগবতে প্রবেশাধিকার হয় না। ভাগবত অচিন্ত্যস্বরূপ সাক্ষাৎ অধোক্ষজ ভগবদবতার। লৌকিকী বিদ্যা-বুদ্ধিতে কেহ ভাগবত বুঝিতে ও বুঝাইতে গেলে তাহাতে নানা অনর্থ আসিয়া উপস্থিত হয়, চৈতন্য-ভাগবত, ভক্ত-ভাগবত ও গ্রন্থভাগবতে ভেদ-বুদ্ধি হয়, বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ, নানা প্রকার তত্ত্ববিরোধ ও রসাভাসদুষ্ট সিদ্ধান্তের প্রতি অনুরাগ হয়। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ অপেক্ষা হরি- গুরু-বৈষ্ণব-বিমুখ ইন্দ্রিয়-পরায়ণগণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা মনোরঞ্জনের দ্বারা তাহাদের নিকট হইতে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহই প্রয়োজন হইয়া পড়ে। তখন ধন-শিষ্যাদি দ্বারা উৎপন্ন ভক্ত্যাভাসকেই 'ভক্তি বলিয়া মনে হয়। প্রতি পদে পদে শুদ্ধ-ভক্তি-সিদ্ধান্ত ও শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তানুগগণের বিচারের প্রতি বিরোধ করিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। এই বলিয়া গোস্বামিগণ জগন্নাথ দাসকে উপদেশ-প্রদান এবং মহাভাগবতের চরণ আশ্রয়-পূর্ব্বক তাঁহার আনুগত্যে মহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তন করিবার পরামর্শ দিলেন।

জগন্নাথ দাস যখন মহাপ্রভুর ভক্তগণের নিকট হইতে শুনিতে পাইলেন যে, অদীক্ষিত-ব্যক্তি বা গুরু-পাদপদ্মে অনাশ্রিত ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠাদি প্রচারকের কার্য্য করিতে পারেন না, তখন তাঁহাতে ভাগবতী দীক্ষা-গ্রহণের জন্য ব্যস্ততা দেখা গেল। অতিবাড়ি-সম্প্রদায়ের বর্ণনানুসারে জানা যায়, এই সময়ে জগন্নাথদাস কাশীমিশ্রের ভবনে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নিকট কৃপা যাজ্ঞা করিলেন। মহাপ্রভু জগন্নাথ-দাসকে উৎকলদেশীয় মত্ত বলরামদাস নামক এক ব্যক্তির নিকট হইতে নাকি দীক্ষা-গ্রহণের আদেশ দিয়াছিলেন। এই দীক্ষা-কার্য্য কাশী মিশ্রের ভবনেই সম্পন্ন হইয়াছিল। অতিবাড়ি-সম্প্রদায়ের কোন মতানুসারে মত্ত বলরামদাসের পরিচয় এইরূপ—

শ্রীমচ্চৈতন্যদেবস্য গৌরীদাসাখ্য-পণ্ডিতঃ।
তস্য শিষ্যস্তু গোস্বামী হৃদয়ানন্দ পণ্ডিতঃ।।
তচ্ছিষ্যো মত্তপূর্ব্বস্তু বলরাম ইতি স্মৃতঃ।
মহানপি জগন্নাথদাসস্তৎপরিচারকঃ।।

(নিত্যগুপ্তমণি ১৯শ আস্বাদ ১৯শ শ্লোক)

অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগত গৌরীদাস পণ্ডিত, তৎশিষ্য—হৃদয়ানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী, হৃদয়ানন্দের শিষ্য—মত্ত বলরামদাস। এই বলরামদাসের শিষ্যই—জগন্নাথ দাস।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ও শ্রীচৈতন্যভাগবতে এক বলরাম দাসের কথা পাওয়া যায়, কিন্তু এই বলরামদাসের সহিত জগন্নাথ দাসের কোন সম্বন্ধ আছে কিনা এবং তিনি উৎকলবাসী কিনা, তদ্বিষয়ে প্রশ্নের অবকাশ আছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি ১১শ পরিচ্ছেদ ৩৪শ সংখ্যায় এইরূপ লিখিত আছে,—

"বলরামদাস—কৃষ্ণপ্রেমরসাস্বাদী।
নিত্যানন্দ-নামে হয় পরম উন্মাদী।।"

শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্য ৬ষ্ঠ অধ্যায়েও দেখা যায়,—

"প্রেমরসে মহামত্ত বলরামদাস।
যাঁহার বাতাসে সব পাপ যায় নাশ।।"

অপর বিবরণ হইতে জানা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা-প্রকাশানন্তর নীলাচলে গমনকালে যখন যাজপুরে উপস্থিত হন, সেই সময়ে জগন্নাথ দাসকে সঙ্গে করিয়া নীলাচলে লইয়া আসেন। তথায় জগন্নাথ দাস কিছুকাল অবস্থানের পর মহাপ্রভুর আদেশক্রমে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নিকট হইতে হরিনাম মহামন্ত্র প্রাপ্ত হন। জগন্নাথদাস যাজপুরে আসিয়া অল্পকাল মধ্যেই বহু শিষ্য সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়া পড়েন এবং উৎকল ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যানুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। জগন্নাথদাস নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস ও গৌড়ীয় ভক্তগণের আনুগত্য পরিহার করিয়া নিজেই একটী স্বতন্ত্র মতবাদ ও সেই মতবাদ সংরক্ষণ-কল্পে স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠন করিতে যত্নবান্ হন। শুনা যায়, জগন্নাথ দাস উৎকলীয় পদ্যে ভাগবত অনুবাদ করিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-ব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবত অপেক্ষা পাঁচ অধ্যায় ভাগবত বৃদ্ধি করিয়া ফেলেন এবং তাহাতে নানা প্রকার তত্ত্ববিরোধ ও মায়াবাদগন্ধ প্রবেশ করে। এমন কি, এই সময়ে তিনি মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভু—এই সঙ্কীর্ত্তন-পিতৃদ্বয় এবং নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের উপদিষ্ট তারকব্রহ্মনামের উচ্চারণ ও গ্রহণ প্রণালীর বিপর্য্যয় করিয়া স্বতন্ত্রমত প্রচার করিতে ব্যস্ত হন। কথিত হয়, জগদ্গুরু নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের আচার ও প্রচার এবং যাবতীয় শাস্ত্র-বিধির প্রতিকূলে হরিনাম করিবার কালে বস্ত্রের দ্বারা জিহ্বা এবং মুখ বন্ধন করিয়া রাখিতেন, পাছে হরিনাম স্ফুটস্বরে উচ্চারিত হইয়া পড়ে। একদিন নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস জগন্নাথ দাসের এই আচরণে বিস্মিত হইয়া জগন্নাথকে উচ্চৈস্বরে হরিনাম গ্রহণের অত্যধিক উপকারিতার কথা জানাইলে জগন্নাথদাস বলিলেন, হরিনাম যখন সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, তখন শৌচাদি কৃত্যকালে অপবিত্র স্থানে যদি জিহ্বা হরিনাম উচ্চারণ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে নামরূপী কৃষ্ণকে অপবিত্র স্থানে প্রকাশিত করার দরুণ কৃষ্ণচরণে অপরাধী হইতে হইবে। যাহাতে উচ্চৈঃস্বরে কোন প্রকারে নাম বহির্গত না হয়, তজ্জন্যই জগন্নাথদাস মুখে বস্ত্রাদি বন্ধন করিয়া সতর্ক থাকিতেন। আর একদিন জগন্নাথ দাস নিজ ইচ্ছায় তারক ব্রহ্ম-নামের ক্রম ভঙ্গ করিয়া আগে—"হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে" উচ্চারণ পূর্ব্বক পরে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে" এইরূপ ক্রমে নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। নামসঙ্কীর্ত্তন-পিতা শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু, নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস এবং মহাপ্রভুর ভক্ত আচার্য্য গোস্বামিগণের শাস্ত্রোক্ত নাম-গ্রহণের ক্রম—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।" জগন্নাথ দাসের মনঃপূত হইল না। তিনি বলিলেন,—কোন কোন শাস্ত্রে পূর্ব্বে 'হরে রাম', পরে 'হরে কৃষ্ণ'—এইরূপ ক্রম আছে।

শুনা যায় জগন্নাথ দাস স্বয়ং-পরতত্ত্ব নাম-সঙ্কীর্ত্তন-পিতা গৌর-নিত্যানন্দ, জগদ্গুরু নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস প্রভৃতি লোক-শিক্ষকগণ অপেক্ষাও আপনাকে অধিকতর শাস্ত্রদর্শী ও অধিকতর বিচারক এবং সিদ্ধান্তজ্ঞ বিচার করায় নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস জগন্নাথ দাসকে 'স্বতন্ত্র-স্বমত-কল্পনাকারী' বলিয়া সম্ভাষণাদি

ত্যাগ করিয়াছিলেন। আরও শুনা যায়, তাঁহার স্তাবকগণ নাকি এই সময়ে তাঁহাকে কখনও ভগবদবতার, কখনও বা শ্রীরাধিকার অবতার প্রভৃতি কল্পিত বিচারে প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হন। এই সকল কথা নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের কর্ণগোচর হইলে তাঁহারা জগন্নাথ দাসকে শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত হইতে বিচ্যুত ও গুরু-লঙ্ঘনকারী বিবেচনা করিয়া সর্ব্বতোভাবে দূরে রাখেন।

একদিন জগন্নাথদাস মহাপ্রভুর ভক্তগণকে লঙ্ঘন করিয়াই মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া নিজ প্রতিষ্ঠার পসরা প্রদর্শন করিতে ইচ্ছুক হইলেন এবং নিজ ভাগবতের অনুবাদ, মহামন্ত্রের স্বতন্ত্রমতে গ্রহণ-প্রণালী ও নিজ স্বরূপের পরিচয় প্রভৃতি ধন-সম্পত্তি লইয়া মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। অতিবাড়ি- সম্প্রদায়ের প্রাপ্ত-বিবরণ হইতে জানা যায়, এই সময়ে মহাপ্রভু জগন্নাথ দাসকে অতি দূরে রাখিবার জন্য তাঁহাকে বহু সম্মানাদি দ্বারা বঞ্চনা করেন এবং তাঁহার অতি বড়লোকের ন্যায় ভাগবতানুবাদ মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের ন্যায় দীনজনগণ শুনিবার যোগ্য নহেন,—ইহা জ্ঞাপন করেন। জগন্নাথ দাস মহাপ্রভুকে 'কৃষ্ণ' এবং আপনাকে 'রাধিকা' বলিয়া বর্ণন করিলে মহাপ্রভু বলেন,—"দাস মহাশয়, আপনি অতি বড় হইয়া পড়িয়াছেন, আমাদের ন্যায় দীন ও সামান্য ব্যক্তির সহিত আপনার কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না।"

জগন্নাথ দাসের স্তাবক-সম্প্রদায় মহাপ্রভুর এই কথা শুনিয়া জগন্নাথ দাসকে "অতি-অতি-বড়" করিয়া তুলিবার জন্য 'অতি বড় গোস্বামী' নামে প্রচার করিতে থাকেন। মহাপ্রভু জগন্নাথ দাসের লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-রূপ ভক্তি ধর্ম্মের বিপরীত ভাবগুলি দেখিতে পাইয়া এবং ব্যাসগুরু, শ্রীনামাচার্য্য ও জগদ্গুরু গৌড়ীয়-ভক্তগণের প্রতি জগন্নাথ দাসের অপরাধের মাত্রা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে "অতি বড়" অর্থাৎ কৃষ্ণ হইতে বড়—গুরু হইতে বড় বা তাৎপর্য্যান্তরে 'মায়া' বলিয়া জানাইয়া দিলেন। কিন্তু বিপ্রলিপ্সা-বিমোহিত-চিত্ত ব্যক্তিগণ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। ইহাই মায়ার মহিয়সী শক্তি!

এই লীলার দ্বারা মহাপ্রভু অনেক শিক্ষা দিয়াছেন। মহাপ্রভু জানাইলেন যে, হরিদাস ঠাকুরের ন্যায় নামাচার্য্য জগদ্গুরুর চরণাশ্রয়ের অভিনয় করিয়াও স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-বশে জীব বিপথগামী হইতে পারে। মহাপ্রভু রূপ-শিক্ষায় একদিন ভক্তিধর্ম্মের যে সার-নির্য্যাস প্রচার করিয়াছেন, তাহাও এই লীলা-দৃষ্টান্তে পরিব্যক্ত হইল,—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ।।
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন।।"

* * * *

উপজিয়া বাড়ে লতা 'ব্রহ্মাণ্ড' ভেদি' যায়।
'বিরজা', 'ব্রহ্মলোক' ভেদি' 'পরব্যোম' পায়।।

তবে যায় তদুপরি 'গোলাক-বৃন্দাবন'।
'কৃষ্ণ-চরণ'-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ।।
তাহাঁ বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেম-ফল।
ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণকীর্ত্তনাদি-জল।।
যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী-মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুখি যায় পাতা।।
তাতে মালী যত্ন করি' করে আবরণ।
অপরাধ-হস্তীর যৈছে না হয় উদ্গম।।
কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা।।
'নিষিদ্ধাচার', 'কুটীনাটী', জীবহিংসন।
'লাভ', 'পূজা' প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ।।
সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায়।।"

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯। ১৫১-১৬০)

যাঁহারা প্রতিষ্ঠার বশে আপনাদিগকে পরমেশ্বরকোটি ও পরমেশ্বরীকোটির সমান প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, সেই সকল অহংগ্রহোপাসক ব্যক্তিগণের চেষ্টাকে মহাপ্রভু "অতি বড় হইবার প্রবৃত্তি" বলিয়া সর্ব্বদাই নিরাস করিয়াছেন। মহাপ্রভুর চরিত্রে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। মহাপ্রভুর ভক্তগণকে উল্লঙ্ঘন করিয়া—চৈতন্যভাগবতগণকে অতিক্রম করিয়া কাহারও মহাপ্রভুর অনুগ, চৈতন্যানুগ বা ভক্তি-পথের পথিক বলিবার অধিকার নাই। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায়, একদিন এই নীলাচলেই মহাপ্রভু শ্রীবল্লভাচার্য্যের প্রতি শিক্ষা-লীলায় আমাদের ন্যায় অনর্থযুক্ত জীবকে অনেক শিক্ষা দিয়াছেন।

অতিবাড়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত অন্য এক প্রকার বিবরণ হইতে জানা যায় যে, এই জগন্নাথ দাসের হৃদয়ে অতি অল্পবয়সেই ভব-সংসার পার হইবার একটা অভিলাষের উদয় হয়। ঐরূপ হৈতুক-অভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া জগন্নাথ দাস ধর্ম্মে মনোনিবেশ করিতে সঙ্কল্প করেন এবং উৎকল-ছন্দোবন্ধে ভাগবত পুরাণের গীতি রচনা করিয়া সেই সকল গীতি উৎকলের গ্রামে গ্রামে গাহিয়া বেড়াইতে থাকেন। তাহাতে সর্ব্বসাধারণ বিশেষ মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হন। কোমল-চিত্তা রমণীগণ অধিক সঙ্গীতপ্রিয়া। তাঁহারা জগন্নাথ দাসের গীতি-শ্রবণে অধিকতর বিমোহিত হইয়া পড়েন। জগন্নাথ দাস যখন নানা রঙ্গে-ভঙ্গে সঙ্গীতের তরঙ্গ উঠাইয়া পথ দিয়া

চলিতে থাকিতেন, তখন বড় বড় ঘরের রমণীকুলও জগন্নাথের পিকনিন্দিত কণ্ঠস্বর ও ভাব বিমণ্ডিত অভিনয়ে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে কত আদর অভ্যর্থনার সহিত অন্দরমহলে লইয়া যাইতেন এবং সকলে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া তাঁহার গীতাভিনয় শ্রবণ-দর্শন করিতেন। রমণীকুল অর্থ, বসন, ভূষণ প্রভৃতি জগন্নাথ দাসের পদপ্রান্তে উপহার প্রদান করিয়া বলিতেন,—"ওগো, তুমি প্রত্যহ একটীবার করিয়া আমাদিগের আবাসে আসিয়া তোমার সুধা-সুমধুর- সঙ্গীত শ্রবণ করাইয়া যাইও।" কেহ বা জগন্নাথ দাসকে নানাভাবে সেবা করিবার জন্য ব্যাকুলিতা হইতেন। কোনও রমণী বা কেশদাম দ্বারা জগন্নাথ দাসের পদদ্বয় ব্যজন করিতেন। কেহ সঙ্গীত-শ্রবণে ভাবে গড়াগড়ি যাইতেন। অভিভাবকগণ রমণীগণের এই সকল ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া এই সকল কথা মহারাজ প্রতাপরুদ্রের কর্ণগোচর করিলেন। প্রতাপরুদ্র জগন্নাথ দাসকে ধরিয়া আনিবার জন্য দূতগণের প্রতি আদেশ দিলেন। জগন্নাথ দাস ধৃত হইয়া প্রতাপ- রুদ্রের সন্নিধানে উপস্থিত হইলে মহারাজ জগন্নাথ দাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হে জগন্নাথ দাস, তুমি নাকি রমণী-সমাজে নানাপ্রকার ভাব-ভঙ্গী ও অভিনয়াদি করিয়া গান গাহিয়া বেড়াও ও তাঁহাদের সহিত যথেচ্ছভাবে মেলামেশা কর?" রাজার বাক্যের প্রত্যুত্তরে জগন্নাথ দাস বলিলেন,—"মহারাজ, আমাকে যে কেহ ডাকেন, আমি তাঁহারই নিকট যাই, আমার স্ত্রী- পুরুষে ভেদ জ্ঞান নাই।" মহারাজ প্রতাপরুদ্র জগন্নাথ দাসের এই উক্তিতে মোটেই সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, বরং তাঁহার পূর্ব্বের অনুমান বাস্তব বলিয়াই বিশ্বাস হইল। তিনি জগন্নাথ দাসকে প্রহরীগণের দ্বারা কারাগৃহে আবদ্ধ করাইয়া রাখিলেন। ইহাতে রমণী-সমাজের কেহ কেহ নাকি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া অন্ন-জল পরিত্যাগ করিলেন। কেহ কেহ আত্মহত্যা করিবেন বলিয়া মহারাজের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন। কিংবদন্তী যে, একদিন জগন্নাথ দাস স্ত্রী-মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া কোন কোন রাজপুরুষের সাহায্যে কারাগৃহে হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। এতৎসম্পর্কে আরও কতকগুলি প্রকাশ অযোগ্য কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, যাহা বোধ হয় পরবর্ত্তি- কালের কর্ত্তাভজা, সখীভেকী, গৌরনাগরী, Khlystism (কালাচাঁদী) প্রভৃতি অপ-সম্প্রদায়ের ইন্দ্রিয়তর্পণপর মতের পুষ্টিবিধান করিয়াছে।

অতিবাড়ি-সম্প্রদায়ের অন্য এক কিংবদন্তী-মতে জগন্নাথ দাসের যে অলৌকিকতার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে এইরূপ বর্ণনা আছে,—'মেধা' ও 'সুমেধা' নাম্নী দুইটী সুন্দরী স্ত্রী প্রত্যহ মধ্যরাত্রে জগন্নাথ দাসের আবাসে আসিয়া তাঁহার সেবা করিত। মহারাজ প্রতাপরুদ্র নাকি ইহা শুনিতে পাইয়া জগন্নাথ দাসের চরিত্রে কলঙ্ক আশঙ্কা করেন। মহারাজ তাঁহার কোনও একটী বিশ্বস্ত চর পাঠাইয়া প্রত্যক্ষভাবে জানিতে পারেন যে, সত্যসত্যই দুইটী সুন্দরী স্ত্রীলোক প্রত্যহ মধ্যরাত্রে জগন্নাথ দাসের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকে। জগন্নাথ দাস রাজপুরুষগণকে বলেন,—"মহারাজ্ঞীগণের যেরূপ স্ত্রী-পরিচারিকা আছে, আমারও সেইরূপ দুইটী ভক্তিমতী (?) স্ত্রী-সেবিকা আছেন, তাহাতে দোষ কি? আমি ত' স্বরূপে স্ত্রী।" কিংবদন্তী অনুসারে জানা যায়, এই সময় ঐ দুইটী সুন্দরী রমণীকে হঠাৎ অদ্ভুতরূপে অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া রাজপুরুষগণের কেহ কেহ অত্যন্ত বিহ্বলিত হইয়া পড়েন। এই দৃষ্টান্তের দ্বারা অতিবাড়ি সম্প্রদায়ের কেহ কেহ পার্ষদনিত্যভক্ত রায় রামানন্দের ন্যায় জগন্নাথ দাসের অলৌকিকতা এবং পবিত্রতা প্রমাণিত করিতে চাহেন।

আমরা কিংবদন্তী-মাত্র উদ্ধৃত করিলাম। এবিষয়ে আমাদের ব্যক্তিগত মতামত কিছুই নাই। তবে শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের উপদেশ, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের আচার-প্রচার এবং নিখিল বৈষ্ণবগণের আচরণ-দর্শনে আমরা জানিতে পারি যে,—

দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ।
পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।

* * * *

অথৈতানি ন সেবেত বুভুষুঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ।
বিশেষতো ধর্ম্মশীলো রাজা লোকপতির্গুরুঃ।।

(ভাঃ ১।১৭।৩৮, ৩৯, ৪১)

রাজা পরীক্ষিৎ কলিকে তাহার বাসোপযোগী যেস্থানে দ্যুত (অবৈধক্রিয়া), পান (মদ্যাদি সেবন), স্ত্রী (অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বা অত্যন্ত স্ত্রী-আসক্তি) ও সূনা (জীব- হিংসা)—এই চতুর্ব্বিধ অধর্ম্মযুক্ত স্থান প্রদান করিলেন। কলি ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহার বাসোপযোগী একটীমাত্র স্থান প্রার্থনা করিলে পরীক্ষিৎ মহারাজ কনকে তাহার আবাসস্থান নির্দ্দেশ করিলেন। অতএব যে পুরুষ আপনার উন্নতি ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে ঐ সকলের সেবা করা কখনও উচিত নহে। বিশেষতঃ ধার্ম্মিক ব্যক্তি , রাজা, লোকনেতা, গুরুর পক্ষে ঐ সকলের সেবা করা সর্ব্বথা অনুচিত।

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো বসেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি।।

(ভাঃ ৯।১৯।১৫ ও মনুসংহিতা ২।২১৫)

মাতার সহিত, ভগ্নীর সহিত এবং দুহিতার সহিত পর্য্যন্ত কখনও নির্জ্জনে থাকিবে না; কেননা, বলবান্ ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্বান্ পুরুষেরও মন আকর্ষণ করিয়া থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই নীলাচলেই ছোট হরিদাসের প্রতি দণ্ড-লীলার দ্বারা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

"প্রভু কহে,—"বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন।।
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন।।"
প্রভু কহে,—"মোর বশ নহে মোর-মন।
প্রকৃতিসম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন।।"

* * * *

দেখি' ত্রাস উপজিল সব-ভক্তগণে।
স্বপ্নেহ ছাড়িল সবে স্ত্রী-সম্ভাষণে।।
(চৈঃ চঃ আঃ ২।১৮, ১২৪, ১৪৪)

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু।।
(চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৮।২৪)

(শ্রীচৈতন্যদেব খেদের সহিত কহিলেন,—হায়!) ভবসাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইবার যাঁহাদের ইচ্ছা—এরূপ ভগবদ্ভজনোন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তিগণের পক্ষে বিষয়ি-দর্শন, এবং স্ত্রী-সন্দর্শন বিষ ভক্ষণ অপেক্ষাও অসাধু।

"নীলাচলেই মহাপ্রভুর শিক্ষাদর্শে দেখিতে পাই;—

ধাঞা যায়েন প্রভু, স্ত্রী আছে অল্প দূরে।
'স্ত্রী-গান' বলি' গোবিন্দ প্রভুরে কৈলা কোলে।।
স্ত্রী-নাম শুনি' প্রভুর বাহ্য হইলা।
পুনরপি সেই পথে বাহুড়ি' চলিলা।।
প্রভু কহে, "গোবিন্দ, আজি রাখিলা জীবন।
স্ত্রী-পরশ হৈলে আমার হইত মরণ।।" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩।৮৩-৮৫)

অতিবাড়ী জগন্নাথ দাসের অলৌকিকত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য অতিবাড়ি- সম্প্রদায়ে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কথিত হয় যে, অতিবাড়ী জগন্নাথ দাস এক সময়ে শত শিষ্য-পরিবেষ্টিত ব্রহ্মানন্দ নামক জনৈক মায়াবাদী সন্ন্যাসীকে নীলাচলে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করিয়া মহারাজ প্রতাপরুদ্রের প্রশংসাভাজন হইয়া- ছিলেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্র জগন্নাথ দাসকে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের বায়ুকোণে এবং মার্কণ্ডেয় তীর্থের অনতিদূরে-দক্ষিণে একটী আবাস নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। বর্ত্তমানে সেই স্থানই "উড়িয়ামঠ"-নামে বিখ্যাত। ইহাই ত্যাগি-পরিচয়ে পরিচিত অতিবাড়ি সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রধান স্থান। কথিত হয় যে, মহারাজ প্রতাপরুদ্র কোন কারণে, কেহ কেহ বলেন, জগন্নাথদাস ঠাকুর-হরিদাসের আনুগত্য পরিহার করিয়া গৌরবিরোধী স্বতন্ত্র-মত কল্পনা করায় গৌরগতপ্রাণ মহারাজ প্রতাপরুদ্র অতিবাড়ী জগন্নাথ দাসকে রাজ-প্রদত্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে আদেশ করেন। তাহাতে জগন্নাথ দাস সমুদ্র-তীরে—যেখানে সমুদ্রের তরঙ্গ প্রবাহিত হইত, সেই স্থানে নিজ আবাস-স্থান নির্ম্মাণ করিবার ইচ্ছা করেন এবং যোগৈশ্বর্য্য-বলে সমুদ্র-লহরী সাত স্তর পরিমাণ দুরে অপসারিত করিয়া সেই স্থানে বাস করেন। কেহ কেহ বলেন, সমুদ্রের লহরীকে সাত স্তর পরিমাণ দূরে অপসারিত করিবার উদ্দেশ্য এই যে, জগন্নাথ দাস বিচার করিয়াছিলেন যে, তিনি মহারাজ প্রতাপরুদ্রের প্রদত্ত বা অধিকৃত কোন স্থানেই আর বাস করিবেন না, সমুদ্রপ্রদত্ত স্থানে

তাঁহার বাসস্থান নির্ম্মাণ করিবেন। বর্ত্তমানে এই স্থান "সাত লহরী মঠ" নামে বিখ্যাত। এই স্থানটী সমুদ্র-কুলে শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের সমাধির অনতিদূরে বিরাজিত। একটী ক্ষুদ্র ভগ্নপ্রায় মন্দিরে অতিবাড়ী জগন্নাথ দাসের সমাধি এবং তদুপরি জগন্নাথ দাসের প্রস্তর নির্ম্মিত একটী মূর্ত্তি রহিয়াছে। অতিবাড়িগণের মধ্যে অনেকে বলেন, জগন্নাথ দাসের সমাধি- প্রদানের দ্বাদশ দিবসে ঐ মূর্ত্তি স্বয়ংই আবির্ভূত হইয়াছে; কিন্তু সাতলহরীমঠের পূজক-সম্প্রদায়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে, ঐ মূর্ত্তি অধিক দিন স্থাপিত হয় নাই।

অতিবাড়ী সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণ তাঁহাদের সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক জগন্নাথ দাসের অলৌকিকত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য নানাপ্রকার গল্প রচনা করিয়াছেন; সেই সকল গল্পগুলি মহাপ্রভুর ও তদীয় উৎকলদেশীয় গৌড়ীয়গণের লীলার অবৈধ প্রতিযোগী অনুকরণ বলিয়াই মনে হয়। বাস্তব-সত্য স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমাদি ভক্তবৃন্দের নিকট ষড়্ভুজ-মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাস্তব-সত্যস্বরূপের সহিত অবৈধ প্রতিযোগিতার জন্য অতিবাড়ী জগন্নাথদাসের স্তাবকগণ মহারাজ প্রতাপরুদ্রের নিকট জগন্নাথদাসের অষ্টভুজ- মূর্ত্তি প্রকাশের কথা রচনা করিয়াছেন; মহাপ্রভু হইতে জগন্নাথ দাসের দুই ভুজ অধিক বাড়াইয়া তাঁহাকে 'অতিবাড়ী' করিয়া তুলিয়াছেন। আর একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই বর্ণনা তাঁহারা আচার্য্যবর্য্য শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের লেখনী-প্রসূত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু অতিবাড়ী জগন্নাথ দাসের সম্বন্ধে 'জগন্নাথ-চরিতসুধাত্রয়' নামক একখানি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই এই সকল কথা আছে। দুঃখের বিষয়, আমরা উড়িয়ামঠের মহান্ত মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর নামে কল্পিত এই পুস্তকখানা দেখিতে চাহিলে তিনি বলেন যে, বহুদিন পূর্বে গুণ্ডিচায় বাঁকমোহনে এক উদাসীন গৌড়ীয় সাধু আসিয়া বাস করেন। তাঁহার নিকট তিনখানা তালপত্রে বঙ্গাক্ষরে হস্তলিখিত ঐ পুস্তকখানা ছিল, তাঁহার নিকট হইতে তাঁহারা উড়িয়া অক্ষরে উহা নকল করিয়া লইয়াছেন। এই অজ্ঞাতকুলশীল বঙ্গদেশীয় সাধু কে? এবং কত দূর প্রামাণিক? আর তাঁহার প্রদত্ত পুস্তকই বা কোন্ অভিসন্ধিমূলে কাহার দ্বারা লিখিত? ইহা সুধীসমাজে প্রমাণিত না হইবার পূর্ব্বে আচার্য্যবর্য্য শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর নাম করিয়া কোন প্রকার অবৈধ কল্পনার প্রশ্রয় দেওয়ার ঔচিত্যানৌচিত্য সম্বন্ধে নিরপেক্ষ সাধুসমাজই বিচার করিবেন। আচার্য্যবর্য্য শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ কখনই বর্ত্তমান জাতিগোস্বামী ও তদনুগগণের ন্যায় জীবে 'পরমেশ্বর' ও পরমেশ্বরে 'জীব'-বুদ্ধিরূপ ভীষণ মায়াবাদের প্রশ্রয় দিতে পারেন না।

অতিবাড়ী-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের পাটরাণীকে অতিবাড়ী জগন্নাথ দাসের অনুগতা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এইরূপ কল্পনা ভিত্তিহীন ও অবৈধ। কেননা, অতিবাড়িগণের কথিত বিবরণানুসারেই—যে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যভক্তগণের অনুগ মহারাজ প্রতাপরুদ্র অতিবাড়ি জগন্নাথদাসকে নিজ রাজ্য হইতে অন্যত্র-গমনে আদেশ করিয়াছিলেন, সেই মহারাজ প্রতাপরুদ্রের মহিষীগণের মধ্যে কেহই প্রতাপরুদ্রের অপ্রীতিভাজন কোন ব্যক্তিকে আদর করিতে পারেন না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু

'প্রতাপরুদ্র- সংত্রাতা' মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের প্রতি মহিষীগণের সেবাবৃত্তির কথা এইরূপভাবে উল্লেখ করিয়াছেন,—

সন্ধ্যাতে চলিবে প্রভু,—নৃপতি শুনিল।
হস্তী উপর তাম্বুগৃহে স্ত্রীগণে চড়াইল।।
প্রভুর চলিবার পথে রহে সারি হঞা।
সন্ধ্যাতে চলিলা প্রভু নিজ গণ লঞা।।
চিত্রোৎপলানদী আসি' ঘাটে কৈলা স্নান।
মহিষী সকল দেখে, করয়ে প্রণাম।।
প্রভুর দরশনে সব হৈল প্রেমময়।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহে, নেত্রে অশ্রু বরিষয়।।

(চৈঃ চঃ মঃ ১৬শ অঃ)

শ্রীরাধার ভাবকান্তিবিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দরের আদর্শে দেখিতে পাওয়া যে, মহাপ্রভু সর্ব্বদাই স্ত্রীগণ হইতে দূরে থাকিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। মহাপ্রভুর নিজ ভক্তের বৈষ্ণবীশক্তিগণও নীলাচলে গমন করিয়া মহাপ্রভুকে দূর হইতে দর্শন করিতেন। প্রভুর মাতৃতুল্যা বয়স্কা মুকুন্দের মাতা নীলাচলে আসিয়াছেন, ইহা সরল বাৎসল্যভরে শ্রীপরমেশ্বর মোদক মহাশয় মহাপ্রভুকে জানাইলে জগদ্গুরু লোকশিক্ষক মহাপ্রভু সঙ্কোচ বোধ করিবার আদর্শ দেখাইয়াছিলেন। প্রতাপরুদ্রের মহিষীগণ মহাপ্রভুকে অতি দূর হইতে দর্শন করিতেন, ইহাই মহাপ্রভুর আদর্শে ও শিক্ষায় সকল সময়ই দেখিতে পাওয়া যায়। সেই মহাপ্রভু প্রতাপরুদ্রের পট্টমহিষীকে অতিবাড়ী জগন্নাথ দাসের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ এবং জগন্নাথ দাসকে স্ত্রীভাব গ্রহণ করিয়া পট্ট-মহিষীকে উপদেশ প্রদান প্রভৃতি কার্য্যে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন,—ইহা সম্পূর্ণ সঙ্গতিবিরুদ্ধ। বরং ইহা সখীভেকী প্রভৃতি প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়ের বিগর্হিত কল্পনাপ্রসূত গল্প বলিয়াই মনে হয়। এই সকল অবৈধ কথা স্থাপনের জন্য যে-সকল জাল পুঁথির সৃষ্টি হইয়াছে, সেইগুলি কোন নিরপেক্ষ সুধী ব্যক্তি কখনই অনুমোদন করিবেন না।

অতিবাড়ী-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ বলেন যে, অতিবাড়ী জগন্নাথদাস শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্যানুশিষ্য; সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত সাম্প্রদায়িক মতই অতিবাড়ী সম্প্রদায়ের মত। ভেদের মধ্যে কেবল তিলক ও মহামন্ত্রাদিতে মাত্র ভেদ দেখা যায়। এইরূপ উক্তি দ্বারা যদিও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ও অতিবাড়ী-সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা আপাত চিজ্জড়-সমন্বয়ের প্রয়াস কেহ দেখাইয়াছেন, তথাপি ভাগবতের নীতি—মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের নীতি,—

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।।"

"অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর।।"

মহাপ্রভুর ভক্তগণের কোন প্রকার অপসাম্প্রদায়িকতা নাই। বৈষ্ণবগণের সম্প্রদায়-স্বীকার কেবল আম্নায় পারম্পর্য্যগত বিশুদ্ধ আচারপ্রণালী-সংরক্ষণের জন্য। আর অপসাম্প্রদায়িকগণের সঙ্কীর্ণা সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্ম্মোন্মত্ততা কেবল মনোধর্ম্মময়ী কল্পনা, যথেচ্ছাচারিতা, অদৈব-ভাব এবং অসদ্‌বিষয়ে গোঁড়ামী-সংরক্ষণের জন্য। মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের আদর্শে সর্ব্বদাই অসৎসঙ্গ হইতে সুদূরে থাকিবার বা অসৎসঙ্গকে সুদূরে রাখিবার চেষ্টা হইয়াছে। ইহা কিছু পরস্পর হিংসা-দ্বেষ মূলক কলহ-প্রবৃত্তি বা মৎসরতা নহে। অনেকে ভুলক্রমে অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৎসঙ্গের প্রতি সমাদরকে হিংসা, দ্বেষ, মৎসরতা বা অপ-সাম্প্রদায়িকের গোঁড়ামী বা ধর্ম্মোন্মত্ততার মত একটা কিছু ব্যাপার মনে করেন; প্রকৃত প্রস্তাবে মহাপ্রভুর নির্ম্মৎসর ভক্তগণে সেরূপ অপসাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র ও নাই। তাঁহারা পরম সত্যকে পরম সত্যের অপাশ্রিতা মায়ার আবরণ বা দূষিত আবহাওয়া হইতে সত্যানুসন্ধিৎসু লোক সমক্ষে পরিমুক্ত রাখিবার জন্য অসৎসঙ্গ-ত্যাগ ও সৎসঙ্গ গ্রহণ বিষয়ে অবহিত থাকেন। মহাপ্রভুর অনুগত দাসানুদাসগণের সৎসাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের সহিত অতিবাড়ী সম্প্রদায়ের মনোধর্ম্মসৃষ্ট মত, বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের ভিত্তি যেস্থানে, সেখানে হইতেই পার্থক্য লাভ করিয়াছে। মহাপ্রভুর প্রদত্ত একমাত্র ভজন যে শ্রীনামভজন—যাহা শিক্ষাষ্টকে মহাপ্রভু জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন, সেই মহামন্ত্রের ভজনপ্রণালী হইতে যদি কোন মত পৃথক হইয়া পড়িল এবং যদি নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের আনুগত্য পরিহৃত হইল, তাহা হইলে সেখানে 'ভজন' বলিয়া কোন বাস্তব কথা নাই, কেবল ভজনের ছলনায় ভোগ বা মনোধর্ম্মের তাণ্ডব-নৃত্য আছে। দ্বিতীয়তঃ, মহাপ্রভু এবং মহাপ্রভুর ভক্তগণ কখনও আপনাদিগকে মনোধর্ম্মের বশে 'অবতার' প্রভৃতি বলিয়া ঘোষণা করেন না। "অবতার নাহি কহে—আমি অবতার।"—ইহাই প্রভুর বাণী। স্ত্রী-বেশাদি ধারণপূর্ব্বক রমণী-সমাজের বিহারাদি মহাপ্রভু বা মহাপ্রভুর ভক্তগণের চরিত্রে কিংবা কোন শুদ্ধ বৈষ্ণবের চরিত্রে দৃষ্ট হয় না। ইহা পরবর্ত্তিকালে সখীভেকিসমাজের মধ্যে ইন্দ্রিয়তাড়না মূলে কল্পিত হইয়াছে মাত্র। যেখানে কোন প্রকার মায়াবাদ-গন্ধ রহিয়াছে, সেখানে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত। মহাপ্রভুর ভক্তগণ কখনই মায়াবাদ ও ভক্তি, অন্যাভিলাষ ও ভক্তি, কর্ম্ম ও ভক্তি, নির্ব্বেদজ্ঞান ও ভক্তি, যোগ ও ভক্তি বা তপস্যাদির সহিত ভক্তির সমন্বয় করেন না। আমরা দূর হইতে দণ্ডবৎ করিয়া অতি বিনীতভাবে ঐ সকল মতের পক্ষপাতী মহাশয়গণকে জানাইতেছি যে, তাঁহারা অতিবড় সাধু; সুতরাং কৃপাপূর্ব্বক নিরপেক্ষভাবে মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত এবং আচার-প্রচার-প্রণালী আলোচনা পূর্ব্বক চৈতন্যচন্দ্রের চরণে একান্ত অনুরাগবিশিষ্ট হউন এবং আমাদিগকে শোধন করুন।

অতিবাড়ী জগন্নাথ দাস ১৬ জন প্রধান শিষ্য করিয়াছিলেন। উৎকল ভাষায় বিরচিত, দিবাকর দাস নামক জনৈক অতিবাড়ীর লিখিত 'জগন্নাথ-চরিতামৃত' নামক পুস্তকে এইরূপ উল্লেখ আছে,—

উদ্ধবো রামচন্দ্রশ্চ গোপীনাথশ্চ শ্রীহরিঃ।
নন্দনী বামনী গৌরা গোপালাখণ্ডলস্তথা।।
জনার্দ্দনপতিঃ কৃষ্ণদাসশ্চ বনমালিকঃ।
গোবর্দ্ধনস্তথা কাহ্ন খন্টিকা ন ক্রমং বদেৎ।
পুনঃ শিষ্যে জগন্নাথদাসশ্চ মধুসূদন।।

(জগন্নাথ-চরিতামৃত ১ম অঃ ৬ষ্ঠ শ্লোক)

(১) উদ্ধব, (২) রামচন্দ্র, (৩) গোপীনাথ, (৪) হরিদাস, (৫) নন্দন আচার্য্য, (৬) বামনী মহাপাত্র, (৭) শ্রীমতী গৌরা, (৮) গোপাল দাস, (৯) আখণ্ডল মেকাপ, (১০) জনার্দ্দন পতি, (১১) কৃষ্ণদাস, (১২) বনমালি দাস, (১৩) গোবর্দ্ধন দাস, (১৪) কাহ্নু খুঁটিয়া, (১৫) জগন্নাথ দাস ও (১৬) মধুসূদন দাস— এই ষোলজন অতিবাড়ী জগন্নাথ দাস মহাশয়ের প্রধান শিষ্য।

অতিবাড়ী সম্প্রদায়ের কোন কোন বিবরণ হইতে জানা যায়, জগন্নাথ দাস সমুদ্রের তীরবর্ত্তী সাতলহরী মঠে ৬০ বৎসর কাল অবস্থান করিবার পর একদিন তাঁহার সমস্ত শিষ্য ও ভক্তকে তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সর্ব্বপ্রধান শিষ্য হরিদাসকে নিজ কাষ্ঠপাদুকাদ্বয় প্রদান পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, —"ইহা পীঠোপরি অধিকারীস্বরূপে স্থাপন কর।" ইহা বলিয়া তিনি যোগাসনে উপবিষ্ট হইবার পর দেহত্যাগ করেন। তাঁহার দেহত্যাগ মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমীতে হইয়াছিল। অতিবাড়ী জগন্নাথ দাসের ভক্তগণ জগন্নাথ দাসের দেহকে সেই সমুদ্রতীরবর্ত্তী মঠেই (সাতলহরী মঠে) সমাহিত করিয়াছিলেন। এই সাত- লহরীমঠ এখন কটক জেলার তেলিয়াপাড়ার করণকুলোদ্ভূত মহান্তের অধীনে আছে। মহান্ত মহাশয় গৃহেই থাকেন।

অতিবাড়ী জগন্নাথ দাস যেস্থানে পূর্ব্বে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন, সেই উড়িয়া মঠের কথা পূর্ব্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি। জগন্নাথ দাসের ১৬ জন শিষ্যের অন্যতম গোপীনাথ দাস এই মঠের অধিকারী হইলেন। গোপীনাথ দাসের শিষ্য—মাধবানন্দ দাস, মাধবানন্দের শিষ্য—মুরারি, মাধবানন্দের অপর এক শিষ্যের নাম—দ্বারিকাবল্লভ দাস। ইনি ছোট উড়িয়ামঠের স্থাপয়িতা ও প্রথম অধিকারী। এই মঠের জনৈক শিষ্য চতুর্ভূজ দাস উড়িষ্যার বহু লোককে অতিবাড়ী করিয়াছিলেন। মুরারির শিষ্য—রামকৃষ্ণ দাস, রামকৃষ্ণের শিষ্য— পুরুষোত্তম দাস, তচ্ছিষ্য—মুকুন্দ দাস, মুকুন্দ দাসের শিষ্য—বংশীধর দাস, বংশীধর দাসের শিষ্য নীলাদ্রি দাস, নীলাদ্রি দাসের শিষ্য—রাসবিহারী দাস, রাসবিহারী দাসের শিষ্য—রামকৃষ্ণ দাস, রামকৃষ্ণ দাসের শিষ্য—বৃন্দাবন দাস।

উড়িয়া মঠের অধীনে আরও ৪টী মঠ আছে,— (১) সান উড়িয়া মঠ, (২) রামহরিদাস মঠ, (৩) বনমালি দাসের মঠ, (৪) ভাগবত দাসের মঠ। এতদ্ব্যতীত পুরী কুন্টাইবেন্টসাহী ও ডাণ্ডীমালসাহীতে আরও ১৫।১৬টী মঠ আছে। সেই সকল মঠের অধিকারিগণও উড়িয়া মঠের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া থাকেন। উক্ত মঠসমূহের মহান্তগণের দেহত্যাগে অন্য ব্যক্তি তাঁহাদের স্থলাভিষিক্ত হইবার আবশ্যক হইলে

বড় উড়িয়ামঠের অধিকারীই তাঁহাদের মস্তকে শাড়ী বাঁধিয়া দিয়া উত্তরাধিকারী স্থাপন করিয়া থাকেন। উড়িয়া মঠের মতাবলম্বিগণকে উৎকলের পুরী, কটক, বালেশ্বর জেলা এবং খণ্ডপাড়া, তিগিরিয়া, নীলগিরি, আটগড়, বড় আম্বা, নরসিংহপুর, দশপলা, তালচের, ঢেঙ্কানল, নোয়াগড়, ময়ূরভঞ্জ, গঞ্জাম ও মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। উড়িয়া মঠের মহান্ত স্ত্রী-বেশ ধারণ করিয়া গুণ্ডিচা-মার্জ্জন করেন। অতিবাড়ী জগন্নাথদাস নাকি ঐরূপ আচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। উড়িয়া মঠের একটী প্রকোষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু হইতে রামকৃষ্ণ দাস পর্য্যন্ত অঙ্কিত মূর্ত্তি শিষ্য-পারম্পর্য্যে ক্রমানুসারে সজ্জিত রহিয়াছে। রামকৃষ্ণ দাসের শিষ্য শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন দাস বর্ত্তমান উড়িয়া মঠের মহান্ত। ইনি 'গৌড়ীয়' পত্র ও 'শ্রীচৈতন্যভাগবতের গ্রাহক ও পাঠক বলিয়া আমাদিগকে জানাইলেন। উড়িয়া মঠে রাধাকৃষ্ণ, শ্রীজগন্নাথ এবং শ্রীলক্ষ্মীদেবী স্থাপিত আছেন। তথাকার পূজারী বলিলেন যে, জগন্নাথের সহিত বলভদ্র ও সুভদ্রা দেবী স্থাপিত নাই, কেবল লক্ষ্মীদেবী আছেন। শ্রীমন্দিরের জগমোহনে শ্যামরায়, গোপীনাথ ও মহাপ্রভুর ষড়্ভুজ শ্রীমূর্ত্তি আছেন। ইহারই ঠিক বিপরীত পার্শ্বে বৃহৎ ঝুলনমণ্ডপ, মধ্যস্থলে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। এই মঠে একটী টোল আছে, তাহাতে বর্ত্তমানে ১২ জন ছাত্র ব্যাকরণ, কাব্য ও মীমাংসা পড়েন। ইহাদের অধ্যাপনার জন্য একজন অধ্যাপক নিযুক্ত আছেন, তাঁহার নাম—মিশ্রোপাধিক পণ্ডিত রামচন্দ্র ন্যায়রত্ন। মহান্ত মহাশয়ের নিকট শুনিতে পাওয়া গেল, এই মঠের সেবার জন্য রাজপ্রদত্ত পঞ্চাশ হাজার টাকা আয়ের লাখরাজ সম্পত্তি আছে।

অতিবাড়ী জগন্নাথ দাসের নাম প্রচারিত কতকগুলি পুস্তক উৎকলের বিভিন্ন স্থানে দৃষ্ট হয়। জগন্নাথ দাসের উৎকল ভাষায় ভাগবতের পদ্যানুবাদই বিশেষ প্রসিদ্ধ। মেদিনীপুর জেলার কাঁথি হইতে ইহা বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত (১) ষোলচৌপদী, (২) শৈবাগম ভাগবত, (৩) গুণ্ডিচা বিজে, (৪) সৎসঙ্গ বর্ণনা, (৫) গোলোক সারোদ্ধার নামক কয়েকটী উড়িয়া ভাষায় লিখিত পুস্তক জগন্নাথ দাসের রচিত বলিয়া অতিবাড়ীগণ বলিয়া থাকেন। সংস্কৃত ভাষার কএকখানি পুস্তকও জগন্নাথ দাসের নামে দৃষ্ট হয়; কিন্তু তাহার মৌলিকতা-বিষয়ে অনেকে সংশয়যুক্ত আছেন শুনা যায়।

অভক্তিমার্গ

যে পথে কৃষ্ণসেবার কথা নাই, তাহাই 'অভক্তিমার্গ' বলিয়া পরিচিত। কৃষ্ণের উত্তমা সেবায় কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুর অভিলাষ, কর্ম্মের আবরণ, জ্ঞানের আবরণ ও শিথিলতার আবরণ নাই। তাহাতে কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন আছে। অনেকে ভক্ত হইবার অভিলাষ পোষণ করিয়াও অভক্তি-মার্গের আশ্রয় করেন। যাঁহারা কৃষ্ণভক্তির স্বরূপ জানিয়া উহাই জীবের একমাত্র বৃত্তি বুঝিয়াছেন, তাঁহারা ভক্তি-পথের পথিক। যাঁহারা নিজের প্রতিভায় বা অনভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া ভক্তির সংজ্ঞা নিজেই দিয়াছেন, তাঁহাদের হঠকারিতায়

অনেক সময় ভক্তির স্বরূপ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। কেহ কেহ আপনাকে 'ভক্ত' মনে করিয়া নিজের কল্পিত বৃত্তিকেই 'ভক্তি' বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর কলিহত দুর্ব্বল জীবের মঙ্গলের জন্য ভক্তির যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহাই শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়াছেন।

সচেতা সামাজিকগণ আপনাদিগকে ভক্তাভিধানে ভূষিত করিতে হইলে ভক্তির প্রকৃত স্বরূপ অনুসন্ধান করিবেন। ভক্তাগ্রণী শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীমহাপ্রভুর নিকট শুনিলেন যে, কৃষ্ণানুশীলনই—ভক্তি। 'অনুশীলন' শব্দে 'অনুক্ষণ সেবা' বুঝায়। 'অনু'-শব্দে—পশ্চাৎ পশ্চাৎ অর্থাৎ ব্যবধানরহিত। শীল-ধাতুর অর্থ—একান্ত প্রবৃত্ত হওয়া। প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যাত্মক কায়মনোবাক্য- সম্বন্ধীয় তত্তচেষ্টারূপ এবং প্রীতিবিষয়াত্মক মনঃসম্বন্ধীয় তত্তদ্ভাবরূপ কৃষ্ণের অনুশীলনদ্বয়।

'কৃষ্ণ' বলিলে পরমেশ্বর, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অনাদি, সর্ব্বাদি ও সকল-কারণের কারণকে নির্দ্দেশ করা হয়। ইঁহা হইতেই সবিশেষতত্ত্ব বলদেব ও শ্রীনারায়ণের প্রকাশ। গোলোকে মাধুর্য্যের পরমাশ্রয় ব্রজেন্দ্রনন্দন, মাধুর্য্য-দাতা ঔদার্য্যের পরমাশ্রয় শ্রীগৌরহরি স্বীয় প্রকাশ মূর্ত্তি নিত্যানন্দ রামের দ্বারা সবিশেষ ঐশ্বর্য্য-বিগ্রহের প্রকাশ করিয়া শ্রীবাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই ব্যূহচতুষ্টয় বৈকুণ্ঠে নিত্যকাল প্রকট করিয়াছেন। সেই অদ্বয়-তত্ত্ব-বস্তু হইতে ভগবানের মুখ্য নিত্য-অবতার-সমূহ প্রকটিত হইয়াছেন। ভগবানের পুরুষাবতার, নৈমিত্তিক অবতার, গুণাবতার প্রভৃতি বিষ্ণুতত্ত্ব জীবকে ভগবান্ ও তদিতর বস্তুর পার্থক্য উপলব্ধি করাইতেছেন। মায়াধীশ বিষ্ণু মায়াবশ জীবকে বিশুদ্ধভাবে স্বীয় অনুশীলন করাইয়া বিষ্ণু ব্যতীত অন্য প্রতীতিরূপ মায়ার কবল হইতে উদ্ধার করেন। জীব যে কৃপারজ্জু অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণপ্রেম-সেবা লাভ করিতেছেন, উহাই 'ভক্তি'। ভক্তি উদিত হইলে জীব 'ভক্ত'-সংজ্ঞা লাভ করেন। ভক্ত ভক্তি- দ্বারা ভগবান্ কৃষ্ণ চন্দ্রের ভজন করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-পুরুষার্থ লাভ করেন। ভক্তের ভক্তিবৃত্তি সুপ্ত হইলে নিজ বৃত্তির অভাবে অভক্তির কোন এক প্রকারের বৃত্তি গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বৃত্তি ভজনশূন্য হইয়া লক্ষ্য তত্ত্ববস্তুকে 'পরমাত্মা' কখনও বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম' বলিয়া সংজ্ঞা দেন। সুতরাং যোগিগণের পরমাত্মা ও জ্ঞানিগণের ব্রহ্ম—কৃষ্ণের আংশিক এবং ভেদাভেদ প্রকাশবিশেষ। কৃষ্ণেতর চিন্তা প্রবল হইলে জীব ভক্তিবৃত্তি হইতে চ্যুত হইয়া ভগবদ্দর্শন করিতে পারেন না। কখনও কখনও বা সহস্রারে পরমাত্মা, কখনও বা ঈশ্বরকে অজ্ঞানের প্রকাশক পঞ্চদেবতা, কখনও বা অজ্ঞান-সমষ্টির উৎকৃষ্টোপাধি বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রভৃতি ভক্তি- বিরোধিনী চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করেন। কৃষ্ণবিস্মৃত হইয়া—ভোগতাৎপর্য্যপর হইয়া কৃষ্ণকে জড়ের কর্ম্মফলদাতা, যজ্ঞের ঈশ্বর, গো-ব্রাহ্মণের হিতকারী প্রভৃতি ঈশ্বরত্বে বহুমানন করেন। আবার কোনও সময় স্বীয় বিভুত্বে ও প্রভুত্বে ব্যস্ত হইয়া যথেচ্ছাচার, ভোগপর জীবনই হরিত্ব বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু 'কৃষ্ণ' বলিতে ভক্ত ব্যতীত অন্যের যাবতীয় লক্ষ্যবস্তু এস্থলে গৃহীত হয় নাই জানিতে হইবে। ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা না করিয়া যাহারা 'কৃষ্ণ' শব্দে কৃষ্ণকে না বুঝিয়া নিজের কল্পিত অর্থে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের লক্ষ্যবস্তু কৃষ্ণকে নিজ কল্পনায় কলঙ্কিত করেন মাত্র; বস্তুতঃ নিজে বুঝিতে বা অপরকে বুঝাইতে পারেন না। সেই সকল বঞ্চক ও বঞ্চিতগণের প্রতি আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই।

কৃষ্ণের অনুশীলন অনুকূল ও প্রতিকূল—উভয়ভাবেই হইতে পারে। জরাসন্ধ, কংস, দন্তবক্র, শিশুপাল, পূতনা, অঘ, বক প্রভৃতি অসুরগণ এবং নির্ব্বিশেষবাদী জ্ঞানিগণ প্রতিকূল ভাবে কৃষ্ণানুশীলন করেন। প্রতিকূলভাবে সেবাবিপর্য্যয় ঘটে বলিয়া উহা ভক্তি নহে। 'অনুকূল' বলিয়া কৃষ্ণের উদ্দেশে রোচমানা প্রভৃতি বুঝায়। আনুকূল্য ঘটিলে সর্ব্বক্ষণ ব্যবধানরহিত ও সর্ব্বতোভাবে প্রবৃত্ত হইয়া ভজন সিদ্ধ হয়।

অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনে অন্যাভিলাষিতা আদৌ থাকিবে না কৃষ্ণের নিজ সেবা ও সেবাজন্য ভগবানের নিজের লভ্যফল ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ভক্ত সেবা করিবেন না। ভক্তের নিজফলবাঞ্ছা কিছু থাকিলে উহা ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষ চতুবর্গান্তভুর্ক্তা হৈতুকী বৃত্তি হইয়া যাইবে। উহাই কৃষ্ণসুখের উদ্দেশ ব্যতীত 'অন্যাভিলাষ'-শব্দবাচ্য। যথেচ্ছাচারী, কুকর্ম্মকারী বা অজ্ঞানসেবী কুজ্ঞানিগণ কৃষ্ণ-সুখ ছাড়িয়া নিজ নিজ কল্পিত প্রার্থনা অন্তরে পোষণপূর্ব্বক আনুকূল্য সহকারে কৃষ্ণানুশীলন করিলেও ভক্ত হইতে পারেন না। যাঁহাদের চিত্তে প্রতিষ্ঠাশা আছে, যাঁহারা ইন্দ্রিয়তর্পণাশা-সমন্বিত, যাঁহারা পার্থিব বা মোক্ষ- সম্বন্ধীয় পরোপকারে বা নিজোপকারে ব্যগ্র, পাণ্ডিত্য-প্রতিভা বিস্তারশীল, যাঁহারা রোগ-শান্তির জন্য উদ্‌গ্রীব, যাঁহারা উত্তম আচার্য্যবংশ বা বর্ণগত সম্মানলাভে তৎপর লাভ পূজা, প্রতিষ্ঠা, নিষিদ্ধাচার, কুটীনাটী, জীবহিংসা প্রভৃতি ঐহিক বা স্বর্গসুখ-ভোগরত, বেষ বা আশ্রমের মাহাত্ম্যলোলুপ, মুমুক্ষু, সিদ্ধিকামী প্রভৃতি অবান্তর উদ্দেশকের ন্যায় কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন করেন, তাঁহাদের কৃষ্ণানুষ্ঠান—কপটতাযুক্ত। সুতরাং কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট হইয়া অন্য অভিলাষ- যুক্ত ভগবদনুশীলনও অভক্তিপথে দেখা যায়।

জ্ঞানের আবরণে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। এস্থলে 'জ্ঞান'-শব্দে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানকে বুঝিতে হইবে। একমাত্র ভজনীয় বস্তুই কৃষ্ণ। কৃষ্ণবিষয়ক পরেশানুভূতি অর্থাৎ ভজনীয় বস্তুর স্বরূপজ্ঞান ভক্তিসহ যুগপৎ প্রয়োজনীয়। শ্রীমদ্ভাগবতের চরমশ্লোকে লিখিয়াছেন যে, ভক্ত-বৈষ্ণবগণের প্রিয় নির্ম্মল পুরাণশাস্ত্র শ্রীভাগবতে একমাত্র পারমহংস্য অমল-জ্ঞানই বিশিষ্টরূপে গীত হইয়াছে এবং এই শাস্ত্রেই জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তি একত্র আবির্ভূত হইয়া জীবের কর্ম্ম ভোগফল নিরস্ত করিয়াছে। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ, উত্তমরূপে পঠন ও নানাবিধ জ্ঞানাদি মতবাদের অকর্ম্মণ্যতা উপলব্ধি করিবার জন্য বিচার করিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তে উপনীত হইলে জীব ভক্তি অবলম্বন করিয়াই অন্যাভিলাষ, জ্ঞান, কর্ম্ম ও শিথিলতার হস্ত হইতে আপনাকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হন। শ্রীচৈতন্য- চরিতামৃতে আদি লীলায় (২।১১৭),—

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণ লাগে সুদৃঢ় মানস।।

ভক্তির প্রারম্ভেই শ্রদ্ধার উল্লেখ। প্রথমে সাধুসঙ্গে শাস্ত্র-শ্রবণ দ্বারা শ্রদ্ধা অর্থাৎ শাস্ত্রার্থ-বিশ্বাস। কৃষ্ণ-সম্বন্ধজ্ঞান হয় নাই, অভিধেয় ভক্তি মায়ায় অগ্রসর হইয়াছে, এরূপ কখনও হয় না। "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।" কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্য ও ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান—ভক্তির সহিত সমকালেই উদিত হয়। ভক্তি ব্যতীত উহাদের উদয়ের সম্ভাবনা নাই। তবে যাঁহারা মায়িক-জ্ঞান-সাহায্যে

জ্ঞানী হইবার জন্য নিষ্ফল মিথ্যা চেষ্টা করেন, তাঁহাদের সেই চেষ্টা ভক্তির অঙ্গ নহে। বদ্ধ জীবাভিমানে জ্ঞানীর চেষ্টার মধ্যে সর্ব্বতোভাবে মুমুক্ষুর ধর্ম্ম কৈতব অন্তর্নিহিত আছে। হৈতুক জ্ঞান কখনই শুদ্ধা ভক্তির পরিবার হইতে সমর্থ হয় না। ভক্তের অন্তরে পিশাচিনী মুক্তি বর্ত্তমান থাকিলে তাঁহাকে কৃষ্ণভক্তি হইতে নিশ্চয়ই বিপথগামী করিবে—শুদ্ধভক্তিকে তাহার বনিগ্‌বৃত্তির অন্যতম মনে করিয়া আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যাভিলাষী বা অহংগ্রহোপাসক করাইবে—ঐ প্রকার বৃথা তর্ক দ্বারা তত্ত্ববস্তুকে কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ করাইবে। এজন্য ভক্তি-বিরোধী জ্ঞানী আত্মবঞ্চনাক্রমে কেবল অহৈতুকী প্রেমলক্ষণা ভক্তিকে অজ্ঞানমিশ্রিত, অন্ধাখ্য, প্রাকৃত বলিয়া জানিয়া নিজের মূঢ়তা প্রকাশ করেন। বাস্তবিক জ্ঞানীর ফল্গুবৈরাগ্যে নির্ব্বেদ্‌জ্ঞানে ভক্তের ভক্তি যেন আবৃত না হয়। কৃষ্ণই—অদ্বয়জ্ঞান। তদিতর জ্ঞানে মায়াশক্তির সুপ্ত, গৌণ, জাগ্রত বা মুখ্য ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং জ্ঞানের আবরণের অন্তর্ভুক্ত হইলে ভক্তি, 'অভক্তি' নামেরই সার্থকতা সাধন করিবে। শুদ্ধভক্তি উদিত হইলে তাহাতে অপ্রাকৃত জ্ঞান সহায় ও দাসরূপে বর্ত্তমান থাকে। যে জ্ঞানের কৃষ্ণভক্তির উপর কর্ত্তৃত্ব, সে জ্ঞান কৃষ্ণেতর দ্বৈতজ্ঞান। মায়িক নির্ব্বেদব্রহ্মানুসন্ধান—জ্ঞানীর অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত জ্ঞানের আবরণে অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন-সম্ভাবনা নাই।

কর্ম্মের আবরণে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। স্মৃতিকথিত নিত্যনৈমিত্তিকাদি ফলপ্রসূ কর্ম্ম—জীবের ভক্ত্যাবরক। কর্ম্ম—কৃষ্ণের জীবাবরণাত্মিকা মায়াশক্তির একটী বিক্রম। কর্ম্মফলবাদী নিজ কর্ম্মবিপাকে পড়িয়া মনে করেন যে, সৎকর্ম্ম-প্রভাবে ভক্তি উৎপন্ন হইতে পারে। ভজনীয় পরিচর্য্যাদি—কর্ম্মাবরণ নহে। তাদৃশ পরিচর্য্যারই—ভজনীয় কৃষ্ণবস্তুর অনুশীলন। যাহাতে জীবের ফলভোগ সংশ্লিষ্ট উহাই কর্ম্ম। যে অনুষ্ঠানের ফল—জীবের প্রাপ্য কর্ম্মফল ভোগ নহে, ভগবানের নিজের, উহা ভক্ত্যনুষ্ঠান। ভুক্তি-পিশাচিনী ভক্তের অন্তরে স্থান পাইলে তাঁহাকে কৃষ্ণভক্তি হইতে নিশ্চয়ই বিপথগামী করিবে। পঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে যে, হে দেবর্ষে, হরিকে উদ্দেশ করিয়া শাস্ত্রীয় যাবতীয় অনুষ্ঠান 'বৈধীভক্তি' বলিয়া কথিত হয়। তদ্দ্বারা প্রেমভক্তি লভ্য হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য ২২);—

জ্ঞান বৈরাগ্যাদি ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।
অহিংসা-যম-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ।।

ঠাকুর বিল্বমঙ্গলও বলিয়াছেন,—

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাৎ দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোর মূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্ ধর্ম্মার্থ-কামগতয়ঃ সময় প্রতীক্ষাঃ।।

শিথিলতার আবরণে ভক্তির সম্ভাবনা নাই। ধন দ্বারা বা শিষ্য দ্বারা উত্তমা ভক্তি উৎপন্ন হয় না—বিবেকাদি হইতে ভক্তি হয় না, পরন্তু ভক্তিমান্ জনে বিবেকাদি লক্ষিত হয়। কৃষ্ণ ছাড়া জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই দুইটী চিত্তকাঠিন্যের হেতু, তজ্জন্য সুকোমলা ভক্তির উপযোগী নহে। ভক্তির অবিরোধী জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কিছু উপযোগিতা থাকিলেও তাহারা ভক্ত্যঙ্গে গৃহীত হয় নাই। ভক্তি থাকিলে কর্ম্ম ও জ্ঞানানুষ্ঠানরূপ তপস্যার

আবশ্যকতা নাই, ভক্তি না থাকিলেও কর্ম্ম ও জ্ঞান তপস্যার আবশ্যকতা নাই। হৃদয়ে ও অনুষ্ঠানে ভক্তি থাকিলে কর্ম্ম ও জ্ঞান-তপস্যার প্রয়োজন নাই। আবার হৃদয়ে ও অনুষ্ঠানে ভক্তি না থাকিলেও কর্ম্ম ও জ্ঞানতপস্যার আবশ্যকতা নাই। জীবের পরম আবশ্যকীয় ভক্তি থাকিলে অবান্তর মার্গদ্বয় না থাকিলেও কোন ক্ষতিনাই, আবার মূলবৃত্তি না থাকিলে ঐ জ্ঞান ও কর্ম্মজ অনুষ্ঠান দ্বারা ভক্তি হইতে পারে না—ইহাই পঞ্চরাত্রে সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। সুতরাং অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও শৈথিল্য প্রভৃতি ভক্তির প্রতিবন্ধক-মার্গ-সমূহই—অভক্তি-মার্গ।

সাত্বত ও অসাত্বত

অতি পূর্ব্বকাল হইতেই লোকের বিভিন্ন প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার রুচি দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি ব্যক্তি অনুগ্র, স্নিগ্ধ, রম্য স্বভাবের অস্তিত্ব-সংরক্ষণে ব্যস্ত, কতিপয়ের প্রবৃত্তিমূলে সদসদ্ব্যাপারে আগ্রহ, তাহাতে কখনও কখনও উগ্রতা ও রসাল্পতা এবং প্রারম্ভিক চেষ্টা লক্ষিত হয়। আবার কতকগুলির বিরোধকামী অস্তিত্বনাশিনী প্রবৃত্তিমূলে অধিষ্ঠানে ব্যাঘাত করিবার জন্য সঙ্কল্প, অত্যুগ্রতা প্রভৃতি লক্ষিত হয়। এই তিন শ্রেণীর মানবগণ পুরাকালে সাত্বত, রাজস ও তামস—ত্রিবিধ বিভাগে পরিলক্ষিত হন। সাত্বত-সম্প্রদায়ের সহিত রাজস ও তামস বিচারে ভেদ পরিলক্ষিত হওয়ায় তাঁহারা স্বভাবক্রমে ত্রিবিধস্তরে পরিদৃষ্ট হন। এমন কি, তাঁহাদিগের চিত্তবৃত্তি, বাহ্য ক্রিয়াসমূহ ও উদ্দেশ্য পরস্পর ভেদভাবাপন্ন হইয়া তিনটী বিভিন্ন পথে অগ্রসর হইয়াছে। সাত্বত-সম্প্রদায় সকল সদ্‌গুণাশ্রয় ভগবদ্‌বিষ্ণুকে লক্ষ্য করিয়াই সকল অনুষ্ঠানে যে বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেন, তামস-সম্প্রদায় বিচার-চাঞ্চল্যে সমন্বয়ের নামে যে একত্ব-প্রতিপাদন- কল্পে পরস্পর বিবদমান ভাবের সামঞ্জস্য করিতে গিয়া তামস বিচারকে 'নৈর্গুণ্য' নামে অভিহিত করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হন, সেই সকল ধারণা পরস্পর পৃথক্।

সাত্বত-সমন্বয়, রাজস-সমন্বয় ও তামস-সমন্বয় কেহ কেহ সত্ত্বতনু, বিষ্ণুকে কেহ বা ব্রহ্মাকে, আবার কেহ বা রুদ্রকে অবলম্বনপূর্ব্বক স্ব-স্ব-স্বভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন। বৈদিক যুগের সঙ্গে সঙ্গে শ্রৌত পথের বিভিন্ন বিচারধারা লক্ষ্য করিবার জন্য ঐতিহ্য সমূহের চেষ্টা পরস্পরের মধ্যে বেশ একটুকু পার্থক্য স্থাপন করে। প্রাপঞ্চিক সৃষ্টির মূলপুরুষ 'ব্রহ্মা' নামে কথিত হন। তাঁহাকে সর্ব্বলোকের পিতামহ এবং সংসার প্রবৃত্তির আদিপুরুষ বলা হয়। তাঁহার রাজ্য একটী অণ্ডাকৃতি, তজ্জনই জগৎকে পিতামহের অণ্ড বা 'ব্রহ্মাণ্ড' নামে অভিহিত করা হয়। যেখানে জড় পরমাণু সাত্বতগণের কেবল-চেতন-বৃত্তিকে আবরণ করিয়া জ্ঞেয়বস্তুর অনুসন্ধানের গতি রোধ করে, তাহাই পরমাণু-সমষ্টিপিণ্ড বলিয়া কথিত হয়। যে আকাশে তাদৃশ পিণ্ড বাধা দেয় না ও কেবল-চেতন-প্রকাশ-ধর্ম্মে অনুপাদেয়তা, অপ্রেয় পথের পরিচয় দেয় না, তাহাই ব্রহ্মাণ্ডবহির্ভূত 'বৈকুণ্ঠ' শব্দে উদ্দিষ্ট। আর ব্রহ্মাণ্ড ও বৈকুণ্ঠের ধারণার সঙ্কোচে যে 'অভাব' নামক বিচার ও অখণ্ড কালের বিচারের সমন্বয়তা লাভ করিয়াছে, তাহাই 'মহেশধাম' বা 'কৈলাস' শব্দে কথিত হয়।
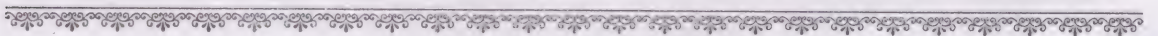
সাত্বতগণের বিচারের প্রতিকূলে যে তামস-সম্প্রদায় রাজস গুণ সংহারে প্রবৃত্ত, সেখানেও সাত্বত-বিচার ন্যূনাধিক বিপর্য্যস্ত হয়। সাত্বত সম্প্রদায় যে কালে আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' প্রভৃতি সংজ্ঞায় নিত্য চিদ্বৈচিত্র্য-স্থাপনে সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার রাহিত্য কল্পনায় যে বিচার ধারা উদ্ভূত হয়, তাহাতে রুদ্র-সম্প্রদায়ের বিপরীত গতি আমাদের লক্ষ্যের বিষয় হয়। সুতরাং শাস্ত্রসমূহের উদ্দেশ্য সাত্বত, রাজস ও তামস-ভেদে পরস্পর ন্যূনাধিক পার্থক্য স্থাপন করে। সাত্বত, রাজস ও তামস-ধর্ম্মত্রয় স্ব স্ব ধারণার অনুকূলে যে সকল আনুষ্ঠানিক ব্যাপারের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে প্রত্যেককে বিভিন্ন স্তরে দৃষ্ট হওয়ায় তাহাদের সমতা-প্রয়াসী তামস-স্বভাবে নির্ব্বিশেষবাদের প্রবর্ত্তন। সাত্বত ও তামস উভয়ের পরস্পর বিবদমান ভাবসমূহের সমাধানকল্পে প্রবৃত্তির আশ্রয়ে রাজস সম্প্রদায়ের উৎপত্তি তাহাতেও রাজসিক সমন্বয় বদ্ধ ও মুক্ত জীবের বিচারপ্রণালীকে পুনরায় প্রপঞ্চোন্মুখী করে। সমন্বয়বাদ সাত্বত, রাজস ও তামস ভেদে ত্রিবিধ আকারে পরিণত হওয়ায় তামস প্রবৃত্তির উদ্দাম নৃত্য, রাজসিকের চেষ্টায় কতকটা সমাদর লাভ করিলেও সাত্বত-সম্প্রদায় অসাত্বতগণের বিচারধারা অনুমোদন করেন না। কালে কালে কখনও বা রাজস প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া তামস-সম্প্রদায়কে বাধা দেয়, কখনও বা তামস-সম্প্রদায় প্রবল হইয়া রাজস-সম্প্রদায়কে বাধা দেয়। পার্থিব ঐতিহ্য ইহার বহুল প্রমাণ তাহাদিগের ভাণ্ডারে স্তূপীকৃত করিয়া রাখিয়াছে।

সাত্বত-সম্প্রদায়ের সহিত মতভেদ করিয়া রাজস প্রবৃত্তি তপস্যাবলে একদিন ভারতে যে নির্ব্বাণের তরঙ্গ মালা উঠাইয়াছিল, তাহাতে গোতম-শাক্য মুনি, মহাবীর, নেমী, ঋষভাদির অধস্তনগণের বঞ্চন-প্রবৃত্তিমূলে শান্তির ধারণাবিষয়িনী গবেষণা ভারতের খণ্ডকাল ধর্ম্মে নানা উল্কাপাতের আয়োজন করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যেও আমরা দেখিতে পাই যে, আজীবক-সম্প্রদায় নারায়ণের উপাসকসূত্রে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি অনাস্থা-স্থাপনে চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছে।

সূর্য্যচন্দ্রবংশে ধারাপালক-সম্প্রদায়ের মধ্যে নারায়ণোপাধি, (নৃসিংহোপাধি), ঠক্কুরোপাধি, রায়োপাধি, কর্ব্বরোপাধি, সেনাপতি-উপাধি, হাঞরা-(হাজরা) উপাধি প্রভৃতি নানা উপাধি-বিশিষ্ট বিভিন্ন জাতির কথা আজও প্রাচীন সাত্বত-হংস-সম্প্রদায়ের ন্যূনাধিক প্রতিকূলে অবস্থান করে।

সাত্বত-সমাজের সহিত রাজস-তামস-সম্প্রদায়ের সঙ্ঘর্ষ ক্রমে বিদ্ধবৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, সৌর-পঞ্চোপাসন এবং পঞ্চোপাসকগণ নিজ নিজ বিচার সংরক্ষণ করিয়া সাত্বত-সম্প্রদায়ের মিশ্রভাব প্রবর্ত্তন করেন। সুতরাং সাত্বত সম্প্রদায়ের বিদ্ধত্ব অপর চারিপ্রকার সম্প্রদায়ের বিদ্ধত্বপর্য্যায়ে পরিলক্ষিত হয়। এই তামস অপকৃষ্ট ধারণা হইত' পৃথক্ পর্য্যায়ে গণিত হইবার জন্য শুদ্ধ সাত্বত বা বাসুদেব নারায়ণোপাসক ঐকান্তিক সম্প্রদায় স্বীয় স্বতন্ত্রতা-সংরক্ষণে যে প্রয়াস করেন, তাহারাই ক্ষীণপ্রভা আদি সর্ব্বজ্ঞ বিষ্ণুস্বামিপাদ, শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীনিম্বভাস্করাচার্য্য ও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য উজ্জ্বলিত করিয়াছেন।

ক্ষিতিপাবন বৈষ্ণবাচার্য্যচতুষ্টয় বৌদ্ধবিচারসম্পুষ্ট প্রচ্ছন্ন প্রকৃতিবাদীর সহিত সামঞ্জস্য সাধনে ব্যস্ত না হইয়া তাদৃশ পঞ্চোপাসক-সম্প্রদায়ের সহিত মতবৈশিষ্ট্য স্থাপন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, তামস বিচার যে

সমন্বয় আকাঙ্ক্ষা করে, তাহাতে রাজস ও বিদ্ধ-সাত্বত-সম্প্রদায় পর্য্যবসিত হওয়ায় ঐকান্তিক শুদ্ধ সাত্বতগণের বিচারের সহিত ঐক্য মত স্থাপিত হয় না। সুতরাং বাধ্য হইয়া বলিতে হয় যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম হইতে শুদ্ধ সাত্বতধর্ম্ম বিকার লাভ করিয়া নানা প্রকার বৈকারিক রাজস ধর্ম্ম উদিত এবং তামস প্রভাবে বহুভেদ উৎপন্ন করিয়াছে। ঐকান্তিক শুদ্ধ সাত্বতগণ পঞ্চোপাসক বর্ণাশ্রমপালনপর অদৈব সমাজের সহিত কোন সন্ধি স্থাপিত করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। সাত্বত আচার্য্য-চতুষ্টয় কিন্তু প্রাপঞ্চিক বিচারে আধ্যক্ষিক সম্প্রদায় সমন্বয়তার নামে যে "গোলে হরিবোল দেওয়া" বিচার প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাতে মুড়ি মিছরির, বিষ্ঠা-চন্দনের সামঞ্জস্য যে সুফল প্রসব করিবে, ইহা প্রাকৃত বিচার মাত্র। অপ্রাকৃত বিচারে হেয়ত্বের আদর্শ কল্পিত না হওয়ায় রাজস-তামস-সমন্বয়বাদীর জুগুপ্সা রতির বিষয় সমূহকে মাধুর্য্যে পর্য্যবসিত করিবার ঔদার্য্য কখনই শুদ্ধ সাত্বত বা বাস্তবসত্যের প্রচারকগণ স্বীকার করেন না।

যেখানে 'নির্ব্বিশিষ্ট আধার চরম কল্যাণ স্থাপন করিতে পারে'—এই সিদ্ধান্ত-ভ্রান্ত মনীষিগণের আধ্যক্ষিক জ্ঞান নিরূপণ করিতে ব্যস্ত, সেখানে বাস্তব সত্যের সুষ্ঠুধারণা করিবার সহিষ্ণুতার অভাব মাত্র। তার্কিক-সম্প্রদায় অনুমানমুখে স্বীয় কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থতার জন্য বলেন যে, সাত্বতধর্ম্ম নাস্তিক্যপূর্ণ বৌদ্ধ বিচার হইতেই উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। যেকালে শাক্যসিংহ পরমোন্নত নৈতিক চরিত্রে অবস্থিত হইয়া নারায়ণ-উপাসনামুখে তপস্যার আবাহন করিয়াছিলেন, তাহার অধস্তনগণ সেই সকল কথা বুঝিতে না পারিয়া আপনাদিগকে বুদ্ধানুগত বৌদ্ধ বলিয়া সংজ্ঞা প্রদান পূর্ব্বক নিত্যসত্য বিষ্ণুর সেবা হইতে বিচ্যুত হন। সুতরাং বৌদ্ধগণ সাত্বত-সম্প্রদায়ের অনুগত বিবেচনা না করায় তাহারা আচার্য্যের পাদপদ্ম হইতে ভেদ বিচারে প্রতিষ্ঠিত।

বর্ত্তমানকালে শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যূনাধিক অনুসরণকল্পে যেরূপ ত্রয়োদশ প্রকার উপসম্প্রদায় বা অপ-সম্প্রদায় আপনাদিগকে গৌড়ীয় গৌরভক্ত বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা যেরূপ শ্রীচৈতন্যদেবের আনুগত্য পরিহার করিয়া, শ্রীচৈতন্যদেবকে তাঁহাদের প্রাকৃত সহজ বিচারের দ্বারা পরতত্ত্ব না জানিয়া দেশ-কাল-পাত্রাদির প্রাকৃতবস্তু-পরিণতি জানেন, তাহাতে শুদ্ধ সাত্বত একায়ন হংসাধস্তনগণের গৌড়াভিমান বিপর্য্যস্ত হয় মাত্র। শাক্যসিংহ ও তাঁহার পূর্ব্ব- গুরুবর্গের নারায়ণ উপাসনায় যে তপস্যা বিহিত ছিল, সেইগুলির বাস্তব দর্শনাভাবে বৌদ্ধনামধারী অধস্তনগণের মধ্যে একায়ন-পদ্ধতি পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং মহায়ন ও হীনায়ন পদ্ধতি স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতেই বর্ত্তমানকালের প্রাকৃত-সহজিয়াগণের চিন্তাস্রোতের আকর নিহিত আছে। বর্ত্তমান কালের প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায় সাহিত্যিক ও শুদ্ধ সাত্বত সম্প্রদায়ের সহিত অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য-ভাগবতগণের সহিত যে মতভেদ উপস্থাপিত করেন, উহা প্রকৃতির অতীত জ্ঞানের দর্শনে অণুতামাত্র। যাঁহারা বৈকুণ্ঠ দর্শনে পরাঙ্মুখ, তাঁহাদের বৌদ্ধবিচার বা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবিচার অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু শুদ্ধ সাত্বত-সম্প্রদায় ইহকালে ও জীবিতোত্তরকালে কোনদিনই ভগবদ্‌বিষ্ণুর সেবা পরিত্যাগ করেন না। প্রকৃতিমূঢ়-সম্প্রদায় অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠবস্তুর কোনপ্রকার সন্ধান না রাখায় তাহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণই আরাধ্য সাধনপথরূপে স্থিরীকৃত হয়।

মাৎস্য, কৌর্ম্ম্য, বারাহী, নারসিংহ, বামনীয়, রামাৎ, কার্ষ্ণ্য প্রভৃতি বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বিষ্ণুর বিভিন্ন প্রকাশ বিশেষের উপাসক বলিয়া আত্মপরিচয় দেন। কিন্তু দশপ্রকার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে অপ্রাকৃত বস্তুর অবতারগণের অনুসরণকারী সম্প্রদায়ের অন্যতম বৌদ্ধগণ কোন্ হেতুমূলে বৈষ্ণবসমাজ হইতে আত্মপার্থক্য স্থাপন করেন, বুঝা যায় না। সমঞ্জসবাদিগণের বিচারে তাঁহারা দশ প্রকার বৈষ্ণবসম্প্রদায়েরই অন্যতম। যেখানে নীতিরহিত কাম ক্রোধাদি রিপুষট্কের তাণ্ডব বিরাজমান, সেখানে সাত্বতধর্ম্ম বিপন্ন। সেখানে শ্রৌতপন্থার পরিবর্ত্তে তর্কপন্থা প্রবলা। বৌদ্ধবিচার ভগবদ্‌বিষ্ণু হইতে অর্থাৎ বিষ্ণুর নিঃশক্তিক শ্রুতিসমূহ হইতে পার্থক্য কামনা করায় তাঁহারা সাত্বতশ্রেণী হইতে চ্যুত হইয়াছেন। বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সাম্প্রদায়িকগণ ভগবদ্‌বিশ্বাসরহিত এবং কেবল নীতিমূলা ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাঁহাদের বাস্তবসত্যে আদর নাই। বৈকুণ্ঠভগবদ্ভাবরহিত মায়িক বিচারে তাহারা আস্থাসম্পন্ন।

আধুনিক নজরতবাদী খৃষ্টানুগত সম্প্রদায় শুদ্ধ সাত্বত-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশুদ্ধ ভগবৎপ্রেমাকেও জাগতিক অবর ভূমিকার কামের সহিত সমজ্ঞানে ন্যূনাধিক বৌদ্ধ-জৈনানুগত সম্প্রদায়ের বিচার পোষণ করায় তাহাদিগকেও আদর করিতে আমরা কুণ্ঠিত হইতেছি।

প্রাপঞ্চিকী নীতি প্রপঞ্চের জন্য অবস্থিত। প্রপঞ্চ কিছু বৈকুণ্ঠ নয়, কিন্তু আধুনিক খৃষ্টানগণ সত্য প্রতীতি বিপর্য্যয়ে যে শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের অপ্রাকৃত প্রেমধর্ম্মকে জাগতিক কামদুষ্ট বলিয়া অনাদর করেন, উহাতে তাহাদের অধিক বুদ্ধিমত্তা আমরা লক্ষ্য করি না। জাগতিক কামের পরিচয়ে যে সকল বীভৎস তাণ্ডব নৃত্য খৃষ্টানদিগের চক্ষে পতিত হইয়াছে, তাহার আদর্শ গ্রহণ করিয়া মেক্নিকল, কেনেডি প্রমুখ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ শুদ্ধ-সাত্বত-ধর্ম্মে-কামের অবকাশ লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা তাহাদের ক্ষিপ্রতা জন্য শুদ্ধ দর্শনাভাব বলিতে হইবে। তাঁহারা এবং ম্যাডাম ব্ল্যাভেস্কিপ্রবর্ত্তিত তথা মৌলবী রামমোহন রায় প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মানুসরণকারিগণ যে শুদ্ধ-সাত্বত ধর্ম্মের ধারণাদর্শ করিয়া নিজ নিজ প্রাপঞ্চিক অবরতায় সাত্বতধর্ম্মে দোষারোপ করেন, আমাদের ক্ষীণ আশা একদিন তাঁহাদের ভ্রান্তি অপনোদিত করিতে সমর্থ হইবে। তাঁহারাও স্ব-স্ব বিচার-বিভ্রান্তি পরিহার- পূর্ব্বক বাস্তব সত্যের পথে নিরপেক্ষ হইয়া চলিবার কালে শুদ্ধ-সাত্বতাকাশে গতিশীল বিমানে আরোহণ করিবেন।

ভারত ও পরমার্থ

অপ্রাকৃত জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ভাষায় যে 'ভারত' শব্দের প্রয়োগ, তাহা অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তির বিচারে দেশগত ব্যবধানের অন্তর্ভুক্ত। স্থিতি ও ভঙ্গ লক্ষ্য করিয়া যে 'মনুষ্যজন্ম' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাও অজ্ঞ রূঢ়িবৃত্তিতে পাত্রগত। বিগত কালের সাপেক্ষ ধর্ম্মেভাবী কালের উক্তিমুখে যে অজ্ঞরূঢ়ি বৃত্তির প্রকাশ, তাহা প্রাপঞ্চিক বদ্ধজীবের জন্য হইলেও নিত্য জগতে—কেবল চেতনময় পরব্যোমে অখণ্ডকাল বর্ত্তমান রাজ্যে অপ্রাকৃত শব্দের বিদ্বদ্‌রূঢ়িবৃত্তির দ্বারা উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

যাহারা আভিধানিক ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানোপযোগী শব্দার্থ তাৎপর্য্যে আশ্বস্ত এবং তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তুরীয় জগতের শব্দে বিদ্বদ্‌-রূঢ়ি বৃত্তির নিত্যাবকাশে শ্রদ্ধা রহিত হয়, তাহাদিগের দেশকালপাত্রজ্ঞানে যে প্রপঞ্চ পরিদৃষ্ট হয়, তদ্দ্বারা তাহারা নিত্য-লীলা-প্রবেশে প্রতিহতচেষ্ট হইয়া এখানেই জন্ম জন্মান্তরবাদে আবদ্ধ থাকে। কর্ম্মভূমি ভারতের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াসমূহ কালক্ষুব্ধ হওয়ায় নশ্বর ধর্ম্মে অবস্থিত। যে কাল পর্য্যন্ত বদ্ধ-জীবের লীলা-ভূমিকাকে কর্ম্ম-ভূমিকা বলিয়া বিবর্ত্ত উপস্থিত হয়, সেই কালেই তাহারা খণ্ডকালাধীন থাকে। কিন্তু লীলাময় পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ যখন জীববিশেষকে স্বীয় বংশীনিনাদে আকর্ষণ করিয়া পরব্যোমে লীলানুষ্ঠানবিষয়ে পারঙ্গত করেন, তখন তাঁহার দেশকালগত দোষ-দর্শনের অবকাশ ঘটে না। মায়াকৃষ্ট জীব বৈকুণ্ঠাকর্ষণের অযোগ্য বলিয়াই তিনি ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে ঐতিহাসিক পাত্রের কালাধীনে জন্ম স্বীকার করিয়া প্রপঞ্চাবতীর্ণ লীলা-প্রকাশদর্শনাভাবে আপনাকে কর্ম্মজগতের আনুষ্ঠানিক পথিক বিশেষ মনে করে।

এই সকল পথিকের অর্থশাস্ত্রের অধিকার, পরমার্থ শাস্ত্রে তাহাদিগের চিদিন্দ্রিয়ের উন্মেষণাভাবে তাহারা বদ্ধভাবেই রুচিবিশিষ্ট হওয়ায় তাহাদিগের জন্য বৈধী ভক্তির প্রয়োজনীয়তা সকল বেদানুগ-শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। অপ্রাকৃত নাম, অপ্রাকৃত রূপ, অপ্রাকৃত গুণ, অপ্রাকৃত পরিকরসমূহ ও অপ্রাকৃত লীলাকে যাহারা প্রাপঞ্চিক জগতের বিষয়ের ন্যায় ভেদ-দর্শনে দর্শন করিবার জন্য ব্যস্ত, তাহাদিগের ভাগ্যহীনতার পরিচয়ে ভূতাকাশোত্থ শব্দসমূহ অজ্ঞরূঢ়ি-বৃত্তির প্রকাশকসূত্রে ভোক্তৃগণের নিকট বিভিন্ন ভোগ্যভাবে অবস্থিত হইয়া রূপ- রস-গন্ধ-স্পর্শাত্মক অস্ত্রসমূহের দ্বারা উপচার আরম্ভে প্রবৃত্ত হয়। তখন বদ্ধজীব অত্যন্ত আর্ত্তির সহিত নিজ দুর্ভাগ্য বিচার করিয়া মায়াবদ্ধ রাজ্য হইতে বিশ্রাম লাভের নিষ্কপট প্রার্থনা করে। তখনই তাহার লীলানুভূতির সূত্রপাত হয়।

প্রপঞ্চাতীত অপ্রাকৃত শব্দ অপ্রাকৃত উপাদানের অবলম্বনে জীবের নিত্য পূর্ণজ্ঞানময়, নিত্যানন্দময় স্বরূপানুভূতিতে ক্রমে ক্রমে উন্মেষিত হইবার অবকাশ পায়। তজ্জন্যই ক্রমপদ্ধতি-বিচারে সিদ্ধির পথে সাধনকালে নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও সর্ব্বশেষে লীলার বিবরণ সমূহের শ্রবণ-যোগ্যতা হয়।

শব্দের অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি-চালিত হইয়া নাম-মহিমাত্মক বিষ্ণু-নিঃশ্বসিত বেদমন্ত্রসমূহের অর্থ যদি বিষ্ণু-পূজাপর না হয় এবং ইতরচেষ্টাপর হয় বা নিবৃত্তিপরা কাল্পনিকী চেষ্টার প্রকারভেদ হয়, তাহা হইলে কখনই ক্রিয়া হইতে লীলার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির বিষয় হয় না।

ভারতের এই কর্ম্মবাদের সহিত লীলা-বৈশিষ্ট্য-উদগাথার সামগান প্রভূতভাবে উদগীত হইয়াছে। যেখানে শব্দের অজ্ঞরূঢ়ি বৃত্তির আদরমুখে ভোগ-পিপাসা, সেই খানেই অপস্বার্থক্রমে জীবের স্বরূপ- বিভ্রান্তিবশতঃ কাল্পনিক অহংগ্রহোপাসনার চেষ্টা এবং শ্রুতিদ্রোহী, গুরুদ্রোহী, প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ, অধীর মায়াবাদিগণের উহাকেই 'পরমার্থ' বলিয়া স্থাপন-চেষ্টা লক্ষিত হয়।

এই শ্রেণীর পাঠকগণের নিকটে আমাদের জিজ্ঞাস্য বিষয় হওয়ায় আমরা তাহাদের বোধগম্য অনুকূল ভাষার সাহায্যে তাহাদের প্রতিকুল চেষ্টা বাঁচাইয়া সত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি অর্থাৎ ঈশ-বিমুখ-শব্দ-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া প্রপঞ্চাগত দেশগত পার্থক্যে নির্ণীত 'ভারত' ভারতেতর সংজ্ঞিত প্রদেশ হইতে ভিন্ন। 'ভারত' প্রমুখ প্রদেশসমূহ মুখ্য দেশের উল্লেখ দ্বারা পরিগণিত হয়। প্রপঞ্চাগত ভারতে লীলাগত পরোপকার-ধর্ম্ম অবতরণ করিতে সমর্থ।

প্রাপঞ্চিক ভূমিকায় ''উপকার'' শব্দে যাহা নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা লীলান্তর্গত- বিচারে পরিদৃষ্ট হইলেও অবরভূমিকাস্থিত ব্যাপারসমূহ প্রপঞ্চান্তর্গত। তাদৃশ প্রাপঞ্চিক অবরতা নিত্য-লীলার মধ্যে না থাকায় ভৌমলীলা-বর্ণনে যে সকল অবৈধচেষ্টামূলে অভিমুন্য, কংস, অঘ-বকাদির অবস্থান, তাহা পরব্যোমে অব্যক্তভাবে অবস্থিত থাকায় লীলার তত্তদংশ 'প্রতিকুল চেষ্টা' নামে অভিহিত হইয়া কেবল প্রপঞ্চে উহাদিগের তাণ্ডব-নৃত্যের অবকাশ আছে।

ক্রিয়ার অবসান আছে, লীলার অবসান নাই। ক্রিয়া নশ্বর—কালক্ষোভ্য, লীলা—অখণ্ডকালে নিত্য বর্ত্তমান। প্রাপঞ্চিক লীলাবতরণের দর্শনকারীর ভোগময়ী দৃষ্টির অবসান না হইলে নিত্য লীলা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু লীলাকে অনিত্যবোধ করিয়া অজ্ঞরূঢ়িশব্দবৃত্তির অধ্যাপকগণ যে ভ্রমে পতিত হন, তাহা তাঁহাদিগের সত্যবিস্মৃতির ফল মাত্র। নিত্যতার অবর্ত্তমান ভূমিকা হইতে অধিরোহবাদ অবলম্বনপূর্ব্বক অগ্রসর হইতে গেলে এইরূপ শব্দ-বিপর্য্যয় তাহাদের পরমার্থানুশীলনের দ্বার রুদ্ধ করিবে। অর্গল বদ্ধ-দ্বারের অভ্যন্তরে অবস্থিত জনগণের রচনাকে মিথ্যা বা কল্পনা প্রভৃতি বলা হয়। মায়াবাদী বা মিথ্যাবাদী সম্প্রদায় নিত্যসত্যের উপলব্ধি-রহিত হওয়ায় তাহারা ডিঙ্গাইয়া বড় হইয়া ভক্তের আসন অধিকারের চেষ্টা করিতে পারেন। কিন্তু তাহাদের অর্থশাস্ত্র পারমার্থিক অনুশীলনে সম্পূর্ণ অযোগ্য। তাহাদের প্রয়াস এরূপভাবে নিষ্ফলতা লাভ করিয়া লীলা-প্রবেশে বঞ্চিত হওয়ায় নামাপরাধ করিতে করিতে রূপশ্রবণ (?) দ্বারা রূপাপরাধ, গুণশ্রবণ (?) দ্বারা গুণাপরাধ, পরিকর শ্রবণ (?) হইতে পরিকরাপরাধ এবং লীলাশ্রবণ (?) করিতে করিতে নরক প্রবেশ অবশ্যম্ভাবী।

ভারতবর্ষ স্মরণাতীত কাল হইতে ধর্ম্মভূমি, কর্ম্মভূমি ও সভ্যগণের আবাসস্থল। অন্যান্য দেশবাসী ভারত হইতে ন্যূনাধিক সভ্যতা, আত্মমর্য্যাদা, বিদ্যাশিক্ষা, নীতি-শিক্ষা করিয়াছেন। এই জন্যই ভারতকে 'কর্ম্মভূমি' প্রভৃতি সংজ্ঞা দেওয়া হয়। তদুপলক্ষণে অন্যান্য দেশও পরিগণিত হইবার যোগ্য। মুখ্যভাবে ভারতকে লক্ষিত করিলে সকল দেশের সভ্য অধিবাসিগণ ভারতীয় কর্ম্মচতুরতা, ধর্ম্মনৈপুণ্য ও নীতিতে নিপুণতা লাভ করিবে।

ভারতে পরমার্থবিষয়ে যে ধারা পরিদৃষ্ট হয়, তাহারই আংশিক প্রতিফলন, কোথায়ও বা বিকৃত প্রতিফলন দৃষ্ট হইয়া থকে। অনেকস্থলে উহা অর্থশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইবারই যোগ্য। মানবজীবনের সাফল্য-বর্ণনে পরমার্থকেই লক্ষ্য করা হয়। পারমার্থিকগণের সৌভাগ্যের সহিত বিষয়দাবদগ্ধ ইন্দ্রিয়তর্পণপরায়ণ জনগণের আপেক্ষিক তুলনায় মর্য্যাদা সর্ব্বতোভাবে ন্যূন।

শ্রীগৌরসুন্দরের এই উক্তি পারমার্থিক রাজ্যে অগ্রসর হইবার জন্য সাধারণ শব্দে 'উপকার' শব্দে প্রযুক্ত হইয়াছে। মানবসভ্যতার অত্যুচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিলেই মানব-সমাজ পারমার্থিকতার সহিত অর্থশাস্ত্রের

উদ্দিষ্ট বিষয়ের পার্থক্য উপলব্ধি করিবেন। বিদ্যার উন্নত শৃঙ্গ, নীতির পরমোচ্চ সীমা, সভ্যতার চরম আদর্শ একমাত্র পারমার্থিক জীবনেই লক্ষিত হয়। জীবের পারমার্থিক জীবন-অভাবে অর্থ-শাস্ত্রের অধোগামী স্রোতে নিপতিত হইয়া বুদ্ধিবৃত্তির লাভ বিপর্য্যয়ক্রমে ক্ষণভঙ্গুর জীবনে ইন্দ্রিয়তৎপরা মাত্রই অবশেষ থাকে। যখন পরমার্থ-ভূমিকা হইতে নিম্নগামী হইয়া জীব মনোভূমিকার রাজ্যে অবতরণপূর্ব্বক পঞ্চমাত্রার অনুসন্ধানে নিজেন্দ্রিয় নিয়োগ করেন, তখনই তাহাকে পরম প্রয়োজন হইতে বিদায়গ্রহণ করিয়া তাৎকালিক প্রয়োজন-প্রতিম বিষয় সমূহে ধাবিত হইতে দেখা যায়। তাহার গন্তব্য পথে নানাপ্রকার স্থূল বিচার আসিয়া জড়-ভোগের মহিমা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে। তখন তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া অনাত্ম-প্রতীতিতে অবস্থিত হন। সেই কালে দার্শনিকগণের ভাষায় অনাত্মবোধে ভোগ-প্রবৃত্তির চিত্র কামক্রোধাদির বিকাশ প্রদর্শন করে।

এরূপ অপ্রীতিকর ও অসুবিধাজনক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়ার পরিবর্ত্তে প্রীতি-রাজ্যের অনুসন্ধানে পরোপকারী নিহিত। এই সকল কথা ভারতের উন্নত শ্রেণীর সমাজ মধ্যে বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। অন্যান্য দেশবাসীও তাহাদের অনুকরণ করিয়া নিজ স্বভাবকে ন্যূনাধিক উন্নত করিয়াছেন। আবার পাত্র বিশেষে ঐ সকল উচ্চ কথা সমধিক আদরপ্রাপ্ত না হওয়ায় যে আপাতসুখকর পরিণাম-বিষয়ফল আনয়ন করিয়াছে, তাহাতে মনোবৃত্তির ব্যবসায় সম্বর্দ্ধিত হইয়াছে। কোথাও বা স্থূলজগতে হিংসাবৃত্তির প্রবলতা লক্ষ্য করিবার অসুযোগ হয় নাই।

উন্নত ভারতীয় সমাজ ভারতেতর প্রদেশের অপবৃত্তিসমূহ গ্রহণ করিতে পশ্চাৎপদ না হইয়া পুণ্য ভূমির অমর্য্যাদা-সাধন দোষাবহ নহে বলিয়া বিবেচনা করেন। এই সকল কারণে পরমার্থের প্রচারকসূত্রে পরম-দয়ানিধি পরোপকার-ব্রতে দীক্ষিত হইবার জন্য ভারতবাসীকে অধিকারী নির্ণয় করিয়াছেন। ভারতের প্রদেশবাসিগণ প্রকৃত ভারতবাসীর ন্যায় সম-স্বভাব-সম্পন্ন হইলে তাহাদের জন্য এই উক্তির বিস্তার বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং 'পারমার্থিক ভারত' বলিতে আমরা সঙ্কীর্ণতা অবলম্বনপূর্ব্বক কোন দেশ বিশেষকেই লক্ষ্য করি নাই।

মনোধর্ম্মজীবী ও স্থূলদেহের উন্নতিকামী সম্প্রদায় যেরূপ অর্থশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, তাহাতে পারমার্থিকের বিরোধাচরণই অনেকক্ষেত্রে তাহাদের পৌরুষক্রিয়ার অন্যতমতা লাভ করে।

'পারমার্থিক' শব্দে আমরা কেবলমাত্র আত্মবিদ্‌গণের স্বভাবকে আশ্রয় করিয়া উন্নত মানবজাতির প্রসঙ্গই আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

অর্থশাস্ত্র-নিপুণ মনোধর্ম্মজীবী ষড়রিপুদাসগণের মধ্যে কেহ কেহ বিদ্যা- প্রতিভার ছলনায় ভারতবর্ষের সঙ্কীর্ণ দলাদলির সম্প্রদায় বিশেষের মতকে 'জনমত' বলিয়া প্রচার করিতে গিয়া যে পরমার্থ-বিরোধ করেন, তাদৃশ বিচারের পক্ষাশ্রয় করা উদার চিৎসমন্বয়বাদের বিরোধী বলিয়া মনে করি।

অহংগ্রহোপাসক মায়াবাদি-সম্প্রদায় আপনাদিগের কু-মতকে সুদৃষ্টিতে দেখিতে গিয়া যে মায়াবাদাতীত বিচারসমূহকে গ্রহণ করিবার বাসনায় অধিরোহবাদ ও ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করেন, তাহাতে কোনও

দিন কোনও সুফল হইতে পারে না, একথা মনোযোগ সহকারে আলোচনা করিতে আমাদিগের নিবেদন নিতান্ত অনুর্ব্বরক্ষেত্রে বীজ বপনের ন্যায় হইবে না।

ভারতেতর প্রদেশের সহিত বিদ্বেষমুখে ভারতবাসীর মঙ্গলকামনায় যে সকল নবোদ্ভাবিত প্রস্তাব রচিত হয়, তাহার অনেকগুলি মনঃকল্পিত ও ইন্দ্রিয়তর্পণ- ব্যাঘাতজনিত জানিতে হইবে। পারমার্থিক বিচার ঐ সকল বিষয়ে মৌনভাব অবলম্বন করেন। তাহাদের বিচারে ও হৃদয়গত-ভাবে মৎসরতার অভাব থাকায় কেবল পরমার্থই তাহাদের মৃগ্য বিষয়; সুতরাং লৌকিক অর্থশাস্ত্রবিদ্‌গণ তাহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার যে প্রয়াস করেন, তাহা ধৃতরাষ্ট্রের লৌহ-ভীম আলিঙ্গনের ন্যায় নিষ্ফলতা লাভ করে, উহা রাবণের সীতা হরণের ন্যায় অকিঞ্চিৎকরতায় পর্য্যবসিত হয়।

কেবল বহিঃপ্রজ্ঞা চালিত হইলে যে বিষময় ফলের উদয় হয়, তাহা গৃহব্রতগণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি মাত্র। পারমার্থিক বিচার ঐগুলিকে অপ্রয়োজনীয় জানিয়া তাহাদের সহিত সমরাভিযানে প্রবৃত্ত হন না।

আমরা অনেক সময় সুধীগণের মুখে শুনিতে পাই যে, ব্যবহারিক ও পারমার্থিকে ভেদ আছে। সুতরাং ইহা ভেদবাদীরই কথা। অতএব অভেদবাদীরাই ভেদবাদাবলম্বনে ''ব্যবহার'' ও ''পরমার্থের'' বিচার করেন।

নির্ভেদমায়াবাদী মায়িক বিচার অবলম্বনপূর্ব্বক উহাকে 'ব্যবহার' আর যেখানে নিরিন্দ্রিয়যজ্ঞের বস্তুর কথা নিরিন্দ্রয়জনগণের সেন্দ্রিয় বৃত্তিরোধ জ্ঞাপন করে, উহাই 'পরমার্থ' বলিয়া মনে করেন। 'ব্যবহার' শব্দে লোকদৃষ্ট ব্যাপারসমূহ। মায়াবাদীর মতে লোকাতীত ব্যাপারে বিচিত্রতা না থাকায় নিরিন্দ্রিয়ের অবস্থান-হেতু জীবের কেবল চিদিন্দ্রিয়ের অথবা ভগবানের কেবল চিদিন্দ্রিয়ের বৃত্তিসমূহ স্তব্ধ। যেন জড়জগতের নিখুঁত খাঁটী জড় বলিলে যাহা বুঝায়, তাহাতেই অবস্থান করা কেবল চেতনের ধর্ম্ম। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ঐরূপ জাড্য-সাধন কেবল- চেতনধর্ম্মের কতদুর সম্মতি প্রদান করিতে প্রস্তুত, তাহাই বিবেচ্য। জড়-ব্যবহার-রাহিত্যে 'প্রয়োজন' বুদ্ধি হওয়ায় তাদৃশী ক্ষণভঙ্গুরা চেষ্টা ব্যবহারোত্তর ভূমিকায় যে পরমার্থের কল্পনা করে, সেই কল্পনামাত্রটীই যে চিদ্‌বৈশিষ্ট্য-নিরসনে একমাত্র অস্ত্র, তাহা অনেকেই স্বীকার করেন না। ব্যবহার-রাজ্য লৌকিক হইলেও ইহাই পরমার্থের প্রারম্ভিক ভূমিকা হইতে পারে, যাহারা বিশ্বাস করেন না, তাহাদিগকে সুধীগণ বৈরাগ্যের অপব্যবহারকারী বলিয়া নির্ণয় করেন। প্রাপঞ্চিক নশ্বর বস্তু-বিচারে নিত্য হরির সহিত নিত্য সম্বন্ধবিশিষ্ট নিত্য বস্তুসমূহকে ভোগময় পর্য্যায়ে পরিগণিত করিবার অসদ্‌বাসনা আমাদিগের সেবোদ্দীপনী ক্রিয়া ও চিত্তবৃত্তিকে সত্য হইতে বঞ্চিত করে।

কাল্পনিক পরমার্থ ও প্রকৃত পরমার্থ অনেক স্থলে এক না হইয়া ভেদ উৎপন্ন করে। জড়ের আদর্শ দেখিয়া তাহার নশ্বরতা উপলব্ধি করতঃ যদি কেহ কেবল চেতনময় সবিশেষ রাজ্যে জড় জগতের ন্যায় বিচিত্রতা-রাহিত্য কল্পনা করিয়া তাহাতে 'পরমার্থ' জ্ঞান করেন, তাহা তাঁহার অনুমানমাত্র ব্যতীত অন্য কিছুই বলা যায় না। কেবল চেতন রাজ্যে প্রবিষ্ট হইলে তাঁহার মতে যখন বক্তা, শ্রোতা ও বক্তৃতার অভাব হয়, তখন মুক্ত অবস্থায় তাহার সকল কথাই মূকতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। যিনি চিদ্‌বৈচিত্র্যের অস্বীকার

করেন, চিদ্‌বিচিত্রতার বিবরণসমূহ শ্রুতিযোগে সমাগত হয় না, বলেন এবং শ্রবণকারীর কেবল-চেতনশ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা উহা শ্রুত হয় না, এরূপ দাম্ভিকতা প্রকাশ করেন, তাহাকে বিশুদ্ধ আধ্যক্ষিক জ্ঞানী ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? তিনি মুখে বেদ মানেন এবং মূর্খতা-থাকা-কালে অধিক মূর্খতাতে আবদ্ধ হইবার জন্য যে সকল উপদেশ বিধান করেন, তাহা অনভিজ্ঞজনোচিত বা অজ্ঞানোত্থ বিচার বিশেষ।

যাঁহার কেবল-চেতন-রাজ্যে পরমার্থের সন্ধান আছে, তিনিই কেবল চিচ্ছক্তি দ্বারা পারমার্থিক বিচিত্রতায় অবস্থিত হইয়া তাহারই অংশবিশেষরূপে প্রকাশিত। কিন্তু বর্ত্তমান কালে নানা প্রকারে আধ্যক্ষিক বিচারে আবদ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীকে চিদুদ্দীপনায় সাহায্য করিলে শ্রোতৃবর্গ অনর্থমুক্ত হইয়া চিদ্‌বৈচিত্র্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে।

চিদ্‌বিচিত্রতার অনুভূতিক্রমে তাঁহার জড়জগতের আধ্যক্ষিক জ্ঞানের দৃঢ়তা ক্রমশঃ নিবৃত্ত হইয়া বাস্তবসত্যে অবস্থিত হইবার বল লাভ করে। আধ্যক্ষিক ভাষা যে প্রাপঞ্চিক ন্যায়-অন্যায়ের বিচার লইয়া ব্যস্ত থাকে, যে প্রত্যক্ষবাদ অবলম্বন পূর্ব্বক চিত্ত জড়বিশ্লেষণ ও জড়ানুভূতির জড়েন্দ্রিয় তৎপরতা লাভ করে, তাহা হইতে ন্যূনাধিক পার্থক্য লাভ করিয়া কেবল বাস্তবসত্যরাজ্যে কেবল- জ্ঞানের বিচিত্রতার সহিত অবিমিশ্র সত্যের অখিল কল্যাণগুণ নিলয়ত্বে ক্রমশঃ আস্থা স্থাপিত হয়। যাঁহাদের এতাদৃশ সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে, তাঁহারা জড়- ভোগ রাজ্য হইতে ন্যূনাধিক বিদায় লইয়াছেন। এই অবস্থাকেই পারমার্থিকগণ স্বরূপবোধ বলিয়া থাকেন।

ব্যবহারিক যুক্তিচাঞ্চল্য ইন্দ্রিয়জ্ঞানযোগে জড়ের ভোগধর্ম্ম হইতে উৎপত্তি লাভ করে, কালধর্ম্মে খণ্ডিত হয়, পাত্রগত অধিষ্ঠানকে জড়াত্মক মনে করে। সত্বরজস্তমমিশ্র অবস্থা হইতে যে সত্তাজ্ঞানের অনুভূতি হয়, তাহা মিশ্র; উহা 'অবিমিশ্র কেবলজ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে। জড় রাজ্যে বিচরণশীল আধ্যক্ষিক-জ্ঞানদৃপ্ত অধ্যাপকমণ্ডলী পরমার্থের কোন সন্ধান না রাখায় জড়ের অধিকতর স্তব্ধতাকে নির্ব্বিশিষ্ট কেবল জ্ঞান বলিয়া বিচার-কৌশল প্রদর্শন করে। উহা আধ্যক্ষিকগণের ইন্দ্রিয়োপযোগী। তাহাতে 'পরমার্থ' শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না।

আধ্যক্ষিকগণ তাহাদের পরিভাষায় পরমার্থকেই ভ্রমজাত 'ব্যবহার' বিশেষ জ্ঞান করে। তজ্জন্য তাহারা প্রকৃত পরমার্থের সন্ধান পান না। নির্ব্বিশেষ-ঘন-জড়তাকে 'ব্রহ্ম' প্রভৃতি শব্দের সাহায্যে অভিহিত করিয়া 'বৈকুণ্ঠ' শব্দের শুদ্ধ প্রতীতি হইতে বঞ্চিত হন।

পারমার্থিক-শাস্ত্রাধীতী অভিমানী জনগণের বাক্যসমূহ অনভিজ্ঞ-সমাজে আদরণীয় হইতে পারে সত্য, কিন্তু তাহাদের প্রকৃত পরমার্থের কোন সন্ধান না থাকায় তাহারা চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যের কোন খবরই রাখেন না। যাঁহারা চিদ্‌বিলাস বৈচিত্র্যের কথা আধ্যক্ষিক জ্ঞানীর নিকট বলিবার প্রয়াস করেন, তাহারা দাম্পত্য-রসে অনভিজ্ঞ শিশুর নিকট প্রাপ্তবয়স্কের জড়রসবিচিত্রতার কথা জ্ঞাপন করিলে যেরূপ শিশুর কৌতূহল দেখা যায়, সে প্রকার চমৎকারিতা পোষণ করিলেও নির্ব্বিশেষবাদীর তৎকালেধারণার অবকাশ হয় না।

যেরূপ কাফ্রিবালকের লিপির কার্য্যকুশলতা দেখিয়া বিস্ময় উপস্থিত হয় এবং বিশ্বাস স্থাপন করিতে কিছু বিলম্ব হয়, সেইরূপ অমুক্ত-বদ্ধ-ভোগপর জীবের মায়াবাদ রাজ্যে বিচরণ কালে বৈকুণ্ঠের বিচিত্রতা ধারণা করিতে শক্তি হয় না।

পরমার্থরাজ্যের পারমার্থিক পরিভাষায় জীবের অনর্থময়ী ভোগ-প্রবৃত্তি নিরসন করিয়া তাহাকে বৈকুণ্ঠ-কথা বলাই শ্রেয়ঃ। যেহেতু ইন্দ্রিয়জ্ঞানে প্রমত্ত প্রেয়ঃপন্থী সর্ব্বদাই অজ্ঞতাবশে অভিনব নিত্য-সত্য-গ্রহণে পরাঙ্মুখতা প্রকাশ করে।

বিশুদ্ধ ভজন

"পড়িলে শুনিলে কভু কৃষ্ণপ্রাপ্তি নয়।
ভজিলে বিশুদ্ধভাবে তবে কৃষ্ণ পায়।।"

—কোন ভক্ত মহাজনের লেখনীতে এই উপদেশটী পাওয়া যায়। উপদেশটী নিগূঢ় সত্যমূলক। অনেকে অনেক পরিশ্রম করিয়া ভজন সাধন করেন, কিন্তু বহু আয়াসেও কোন সুফল উদয় হয় না। বিশুদ্ধ ভজন না হওয়াই ইহার একমাত্র কারণ বলিয়া বোধ হয়। কৃষ্ণ-ভজন-ব্যাপারে যে সমুদয় অশুদ্ধভাব এবং ক্রিয়া আছে, তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভজন করিতে পারিলেই বিশুদ্ধ ভজন হয়। অতএব সেই সমস্ত অশুদ্ধ ভাব ও ক্রিয়া বিচার করিয়া পরিত্যাগ করা সকল ভজন-প্রয়াসীর আবশ্যক। বিশুদ্ধরূপে ভজন করিলে তাহার ফলে শুদ্ধভক্তি লাভ হয় এবং শুদ্ধা ভক্তির ফলেই ভগবানের শ্রীচরণ-লাভ হয়। তদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে না। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবদ্বাক্য এইরূপ;—

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মপ্রিয়ঃ সতাম্।
ন সাধয়তি মাং যোগো না সাংখ্য ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা।।

শ্রীমদ্রূপগোস্বামী শুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ বলিয়াছেন,—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।

শ্রীকৃষ্ণ-সেবন ব্যতীত অন্য-অভিলাষশূন্য হইয়া এবং জ্ঞান-কর্ম্মাদির প্রতি স্বাধীন চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করাই শুদ্ধা ভক্তি। জ্ঞান ও কর্ম্ম যখন ভক্তির অনুগত হয়, তখন তাহার কোন দোষ থাকে না, কিন্তু তাহাদিগের প্রতি স্বাধীন চেষ্টা থাকিলে তাহারা ভক্তি-বিরোধী হইয়া পড়ে, তাহাতে ভজন বিশুদ্ধ হয় না। অতএব মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূংস্বাম্।।

বহু শাস্ত্রবচন অভ্যাস, বহু ধীশক্তি, শাস্ত্রবিচারে বহু পাণ্ডিত্য—এই সকল দ্বারা কেহ অখিলাত্মা ভগবানকে লাভ করিতে পারেন না, যাঁহারা ভগবানের শরণাপন্ন—তাঁহাকেই যাঁহারা স্বীয় প্রভু বলিয়া বরণ করেন, ভগবান ও তাঁহাদিগের নিকট আত্মবিক্রয় করেন। তাৎপর্য্য এই যে, কেবল শাস্ত্র পড়িয়া বা সিদ্ধান্ত শুনিয়া কেহ ভগবৎ প্রসাদ লাভ করিতে সক্ষম হয় না। তাদৃশ জ্ঞান-কর্ম্ম-প্রয়াস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবানের শরণাপন্ন হওয়াই বিশুদ্ধ ভজনের মূল। তাহাতেই কৃষ্ণপ্রেমরূপ পরম পুরুষার্থ লাভ হয়।

ভজন-কালে দুইটী অবস্থা আছে—অনর্থযুক্তাবস্থা এবং অনর্থমুক্তাবস্থা। যতদিন ভজনে অনর্থ-নাশ না হয়, ততদিন ভজন ন্যূনাধিক পরিমাণে অশুদ্ধ থাকে। সাধুসঙ্গে ভজন করিতে করিতে সাধুকৃপায় অনর্থ বিগত হইলে ভজন বিশুদ্ধ হয়। জীবের অনর্থ চারি প্রকার—স্বরূপভ্রম, অসতৃষ্ণা, হৃদয়দৌর্ব্বল্য এবং অপরাধ। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস, ইহা না জানাই স্বরূপভ্রমরূপ প্রথম অনর্থ। এই অনর্থ-ফলে নানারূপ উৎপাত জন্মিয়া ভজন বিশুদ্ধ হইতে দেয় না। জীব কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণ জীবের প্রভু, এই জগৎ ভগবৎশক্তিরূপা মায়া কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবের কারাগারস্বরূপ—এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের অভাব হেতু জীবে ব্রহ্মত্বের আরোপ, মায়া ব্রহ্মের ভ্রম এবং জগৎ মিথ্যা প্রভৃতি নানা প্রকার অসৎ সিদ্ধান্তের উদয় হয়। তাহাতে কেহ মায়াবাদী, কেহ নির্ব্বিশেষবাদী, কেহ জ্ঞানী, কেহ যোগী এবং কেহ বা কর্ম্মী—এইরূপ নানা মতবাদী হইয়া ভজন অশুদ্ধ করিয়া ফেলে। তাহাতে কোনক্রমে জীবের মঙ্গল লাভ হয় না, পরন্তু অমঙ্গলই হইয়া থাকে। এইজন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভু কহিয়াছেন,—

প্রভু, কহে—মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী।
'ব্রহ্ম', 'আত্মা', চৈতন্য' কেহ নিরবধি।।
অতএব কৃষ্ণনাম না আইসে তার মুখে।
মায়াবাদিগণ যাতে মহা-বহির্ম্মুখে।

নির্ব্বিশেষবাদিগণ বলেন,—"ঈশ্বর নিরাকার।" ভগবানের নিত্য সচ্চিদানন্দ- ঘন মূর্ত্তি তাঁহারা বিশ্বাস করেন না, কল্পিত মনে করেন। জীব ভজন-বলে অবশেষে ঈশ্বরে লীন হইয়া যাইবে, ইহাই তাঁহাদের আশা। তখন জীবে ঈশ্বরে কোন ভেদ থাকিবে না। তাঁহাদিগের সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য এই,—

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য সেই , হয় যমদণ্ড্য।।
যেই মূঢ় কহে, জীব ঈশ্বর হয় সম।
সেই ত' পাষণ্ডী হয়, দণ্ডে তারে যম। (চৈঃ চরিতামৃত)

জ্ঞানবাদিগণ শুষ্ক বৈরাগ্য, শাস্ত্রচর্চ্চা প্রভৃতি উপায় অবলম্বনে আত্মশুদ্ধির আশা করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

জ্ঞানী জীবন্মুক্ত-দশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি 'শুদ্ধ' নহে, কৃষ্ণ-ভক্তি বিনে।।
'শুষ্কজ্ঞানে জীবন্মুক্ত' অপরাধে অধো মজে। (চৈঃ চরিতামৃত)

যোগিগণ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম সহকারে আত্মা পরমাত্মার সংযোগ সাধন করেন, তাঁহারা অখিলাত্মা ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রকে লাভ করিতে পারেন না। ভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্র কহিয়াছেন,—

জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণবশ।
কৃষ্ণবশ-হেতু এক—কৃষ্ণপ্রেমরস।।

কর্ম্মিগণ কর্ম্মমার্গে নানা দেবদেবীর ভজন করেন, কিন্তু ভক্তি লাভ করিতে পারেন না। শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

কর্ম্মনিন্দা, কর্ম্মত্যাগ সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে প্রেম-ভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে।। (চৈতন্যচরিতামৃত)

এই সমস্ত দুষ্টমত পরিত্যাগ পূর্ব্বক সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত ভজন করিলেই বিশুদ্ধ ভজন হইতে পারে। জীব কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণজীবের প্রভু, প্রেমই জীবের প্রয়োজন, প্রেমবলে কৃষ্ণলাভ হয় এবং ভক্তি-ফলেই প্রেম উৎপন্ন হয়—এইরূপ জ্ঞানই বিশুদ্ধ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন জ্ঞান। এইরূপ জ্ঞানের সহিত ভজন করিলে ভজন বিশুদ্ধ হয় এবং বিশুদ্ধ ভজনের ফলস্বরূপ শুদ্ধাভক্তি লাভ হয়।

জীবের দ্বিতীয় অনর্থ অসতৃষ্ণা। তাহা বহুবিধ। ভগবানের সেবা ব্যতীত যত কিছু বাঞ্ছা জীবের থাকে, সে সকলই অসতৃষ্ণা। ইহলোকে সুখৈশ্বর্য্য ভোগ, পরলোকে স্বর্গভোগ, মোক্ষসুখে লোভ-এই সমস্তই অসতৃষ্ণা। অসতৃষ্ণা থাকিলে কোন ক্রমেই ভজন বিশুদ্ধ হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

ভুক্তি-মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়।। (চৈতন্য চরিতামৃত)

কৃষ্ণভক্তগণ কৃষ্ণ-সেবা ব্যতীত অন্য প্রার্থনা করেন না। স্বর্গ ও মোক্ষ কৃষ্ণ- ভক্তের নিকট নরকসদৃশ দুঃখপ্রদ বোধ হয়। পঞ্চবিধ মুক্তি ভগবান দিলেও ভক্তগণ তাহা স্বীকার করেন না। যথা,—

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন বিভ্যতি কুতশ্চন।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ।।
সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈ কত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।।

মোক্ষবাঞ্ছা জীবের অজ্ঞানতার চরম ফল। অজ্ঞ জীবের আপাত-মনোহর পরিণাম-ভয়ঙ্কর মোক্ষ ভক্তির নিতান্ত বিরোধী তত্ত্ব। মোক্ষবাঞ্ছা হৃদয়ে থাকিলে কোন ক্রমে ভক্তি লাভ হয় না। শ্রীরূপের শিক্ষা এই,—

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ।।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব।।
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান।।

সামান্য প্রতিষ্ঠাশা বা ভোগলালসার বশবর্ত্তী হইয়া জীব কপট ভক্ত হইয়া পড়ে, তাহাতে সেই সমস্ত দুরাশা ত্যাগ না করিলে কিরূপে বিশুদ্ধ ভজন হইবে? শ্রীমদ্দাস গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্ঠা শ্বপচরমণী মে হৃদি নটেৎ।
কথং সাধু প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্ননু মনঃ।।

প্রতিষ্ঠাশারূপিণী চণ্ডালিনী যতদিন হৃদয়-প্রাঙ্গণে নৃত্য করে, ততদিন পবিত্র-স্বভাবা প্রেমদেবী তথায় কিরূপে আসিবেন? অতএব বহু যত্নে এই দুষ্টাশা হৃদয় হইতে দূর করা কর্ত্তব্য। প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠা যত্ন সহকারে স্পর্শ না করাই ভাল। ইহাই সনাতন গোস্বামী প্রভুর উপদেশ,—

"কুর্য্যুঃ প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠায়া যত্নমস্পর্শনে বরম্।"

হৃদয়দৌর্ব্বল্য—জীবের তৃতীয় অনর্থ। অসতৃষ্ণা বৃদ্ধি হইতে হইতে অসদ্বিষয়ে জীবকে এরূপ অভিনিবিষ্ট করে যে, জীব কোনও ক্রমে ভক্তিসাধক কর্ম্মগুলির আদর করিতে পারে না, পক্ষান্তরে ভক্তিসাধক কর্ম্মগুলি স্বভাবস্বরূপে পরিণত হয়। ইহাই জীবের হৃদয়দৌর্ব্বল্য। এই অনর্থের ফলে অসৎসঙ্গ, কুটিনাটি, বহির্ম্মুখাপেক্ষা প্রভৃতি বহু উৎপাতের সৃষ্টি হয়, তাহাতে ভজন বিশুদ্ধ হইতে দেয় না, অসৎ সঙ্গে নানারূপ অসদালোচনা হয়, তাহাতে অসদ্বিষয়ে আসক্তি প্রবল হইয়া বিশুদ্ধ ভজনের অত্যন্ত বিঘ্ন জন্মায়; অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা এই,—

অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রী সঙ্গী—এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর।। (চৈঃ চরিতামৃত)

হৃদয়দৌর্ব্বল্যজাত কুটিনাটি হইতে আদৌ বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিরূপ মহান্ দোষ উপস্থিত হয়। আপনার জাতি; বিদ্যা বা সম্ভ্রমগত অভিমানের উদয় হয়, তাহাতে বৈষ্ণব অধরামৃত, চরণামৃত ও পদরজে শ্রদ্ধা হয় না। বৈষ্ণবে প্রীতির পরিবর্ত্তে অশ্রদ্ধা দিন দিন বৃদ্ধি হইয়া জীবকে অধঃপাতিত করে, তাহাতে ভজন-চেষ্টা একেবারেই বিনষ্ট হয়। তজ্জন্য প্রভুর আজ্ঞা,—

অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটিনাটি-পরিহরি' একান্ত হইয়া।। (চৈঃ ভাগবত)

শ্রীল দাস গোস্বামীও বলিয়াছেন,—

অরে চেতঃ প্রোদ্যৎকপটকুটিনাটিভরখর-
ক্ষরন্মূত্রে স্নাত্বা দহসি কথমাত্মানমপি মাম্।

ওরে মন, কপটতা এবং কুটিনাটিরূপ মূত্রে স্নান করিয়া কি জন্য আমাকে এবং আপনাকে দগ্ধ করিতেছ? কুটিনাটি ত্যাগ না করিলে কিছুতেই সুখ হয় না। হৃদয়দৌর্ব্বল্য বশতঃ অনেক সময়ে ভজন-প্রতিকূল-ক্রিয়া বা সঙ্গত্যাগ করা যায় না। অসৎকার্য্যে বা অসৎসঙ্গে ভক্তিদেবীর প্রতি অপরাধ জন্মে। তাহাতে ভজন অশুদ্ধ হয়। অতএব হৃদয়দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করিয়া ভজনে উৎসাহ প্রকাশ এবং নিরপেক্ষতা রক্ষা করাই বিশুদ্ধ ভজনের সহায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ এই,—

যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে।
'নিরপেক্ষ' না হৈলে 'ধর্ম্ম' না যায় রক্ষণে।। (চৈতন্যচরিতামৃত)

অপরাধই—চতুর্থ অনর্থ। স্বরূপভ্রম হইতে অসতৃষ্ণা এবং অসতৃষ্ণা ফলে হৃদয়দৌর্ব্বল্য জন্মে। হৃদয়দৌর্ব্বল্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অপরাধে পরিণত হয়। অপরাধ জন্মিলে বহু সাধনেও কোন ফল হয় না। যথা শ্রীচরিতামৃতে;—

হেন কৃষ্ণ-নাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার।।
তবে জানি, অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণ-নাম-বীজ তাহে না করে অঙ্কুর।।

অপরাধ বহুবিধ হইলেও প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত হয়—বৈষ্ণবাপরাধ, সেবাপরাধ ও নামাপরাধ। বৈষ্ণবাপরাধ—যথা স্কান্দে,—

হন্তি নিন্দন্তি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুদ্ধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্।।

বৈষ্ণবের হনন করা, নিন্দা করা, দ্বেষ করা, অভিনন্দন না করা, বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা এবং বৈষ্ণবদর্শনে হর্ষযুক্ত না হওয়া—এই ছয়টী অপরাধে জীবের মহাপতন হয়। কোন ভজন-প্রয়াসীর যেন এই অপরাধ না হয়। সেবাপরাধ শ্রীমূর্ত্তি-সেবা সম্বন্ধেই বিচার্য্য। নামাপরাধ দশবিধ। (১) সাধু-নিন্দা,—যাঁহারা একান্তভাবে নামাশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিন্দা বা দ্বেষ করা। তাঁহারা কেবল নাম-তত্ত্বই জানেন, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি কিছুই জানেন না, এরূপ মনে করিয়া তাঁহাদিগকে অবহেলা করিলেও অপরাধ

হয়। (২) দেবান্তরে স্বতন্ত্র-জ্ঞান অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, সর্ব্বেশ্বর অন্যান্য দেবদেবী তাঁহার বিধিকর, কৃষ্ণকে ভজন করিলেই অন্যান্য দেবদেবীর ভজন হয়—এইরূপ বিশ্বাস না করিয়া, কৃষ্ণ একজন ঈশ্বর, শিব অন্য এক ঈশ্বর—এইরূপ স্বতন্ত্র শক্তিসিদ্ধ বহু ঈশ্বর কল্পনা করিলে নামাপরাধ হয়। (৩) গুর্ব্ববজ্ঞা—যিনি নাম-তত্ত্বের সর্ব্বোৎকর্ষ শিক্ষা দেন, তিনি নামগুরু। যদি মনে করা যায়, তিনি নাম-শাস্ত্রেই বিশেষ ব্যুৎপন্ন, অন্য সাধন-বিষয়ে কিছুই জানেন না, তাহা হইলে অপরাধ হয়। সকল কর্ম্মের চরম ফল—নাম-তত্ত্বলাভ তাহা যাঁহার হইয়াছে, তাঁহার অন্য কিছুই প্রয়োজন নাই, কিছু জানিতেও তাঁহার বাকি নাই। (৪) শ্রুতিনিন্দা—বেদে নামের অনেক মাহাত্ম্য বলিয়াছেন, সেই সমস্ত নাম-মাহাত্ম্য-সূচক বেদবাক্যে অবিশ্বাসমূলক দ্বেষভাব বহন করিলে নামাপরাধ হয়। (৫) হরিনামে অর্থবাদ—অর্থাৎ রাম, কৃষ্ণ, হরি প্রভৃতি নাম কল্পিত, ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, কর্ম্ম নাই—এইরূপ মনে ভাবিলে অপরাধ হয়। (৬) নামবলে পাপ,—নাম করিলে পাপ থাকিবে না, অথবা নাম করিতে করিতে ক্রমশঃ চিত্ত শুদ্ধ হইয়া আর পাপে রুচি থাকিবে না, আপাততঃ স্বার্থের জন্য একটী পাপ করিয়া লই, এইরূপ নামের ভরসায় যে পাপ করা যায়, তাহা বড় কঠিন অপরাধ। (৭) শুভকর্ম্মসাম্য—অর্থাৎ ধর্ম্ম, ব্রত, তপঃ প্রভৃতি যেরূপ শুভকর্ম্ম, নামও তদ্রূপ একটী শুভকর্ম্মবিশেষ, অতএব যে কোন একটী শুভকর্ম্ম আশ্রয় করিলে আত্ম-শুদ্ধি হইতে পারে, এইরূপ মনে করিয়া নামাশ্রয় না করা অপরাধ। (৮) প্রমাদ—নামে অনবধান অর্থাৎ ঔদাসীন্য, জাড্য ও বিক্ষেপ থাকিলে প্রমাদাপরাধ হয়। নামগ্রহণকালে নামের প্রতি উদাসীন হইয়া মুখে নাম ও মনে নানারূপ বিষয় চিন্তা করাই ঔদাসীন্য, নামগ্রহণে অরুচি এবং কতক্ষণে সংখ্যা-নাম শেষ হইবে—এইরূপ মনে করিয়া বারম্বার জপমালার সুমেরু প্রতি কটাক্ষপাত প্রভৃতি জাড্যের লক্ষণ। প্রতিষ্ঠাশা বা শাঠ্যবশবর্ত্তী হইয়া নাম গ্রহণই বিক্ষেপ। (৯) অজ্ঞ অশ্রদ্ধ ব্যক্তিকে নাম মন্ত্রদান—অজ্ঞ ও অশ্রদ্ধজনের নিকট নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া নামে তাহার বিশ্বাস হইলে তবে তাহাকে নাম-মন্ত্র প্রদান করা উচিত। গুরু সামান্য অর্থলোভে অযোগ্য শিষ্যকে নাম দিলে অপরাধে অধঃপতিত হন। (১০) অহং-নাম-ভাব—নাম-মাহাত্ম্য জানিয়া শুনিয়াও বিষয়াসক্তির আধিক্যবশতঃ নাম-ভজনে প্রবৃত্ত না হওয়া বিশেষ অপরাধ। এই দশবিধ নামাপরাধ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে নামের ফলে প্রেম লাভ হয়। যথা, প্রভু-বাক্য—

"শ্রবণ কীর্ত্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা।"

"নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন।" (চৈঃ চরিতামৃত)

কৃষ্ণনামানুশীলন ব্যতীত বৈষ্ণবের অন্য ভজন নাই, অন্য অঙ্গগুলি নামেরই সহচররূপে গৃহীত হয়। অন্যাভিলাষ, অন্যদেব-পূজা এবং স্বাধীন জ্ঞান-কর্ম্ম-প্রয়াস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপরাধশূন্য হইয়া নাম করিতে পারিলেই ভজন বিশুদ্ধ হয় এবং বিশুদ্ধ ভজনের ফলস্বরূপ কৃষ্ণপ্রেম উদিত হয়। কৃষ্ণপ্রেম উদয় হইলেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে।

শিক্ষক ও শিক্ষিত

শিক্ষা-নীতিতে যাঁহারা দক্ষ, তাঁহারাই 'শিক্ষক'-শব্দবাচ্য। শিক্ষকের নিকট নিরুপদ্রবে শিক্ষা লাভ করিবার বাসনাবিশিষ্ট জনগণই শ্রবণের অধিকারী। যিনি অবিচলিত চিত্তে শ্রবণ করেন এবং শ্রুত বিষয় গ্রহণ করিয়া সকল ইন্দ্রিয়ের বিপরীত গতিকে রোধ করিতে সমর্থ হন, তিনিই 'শিক্ষিত'। শিক্ষিতের ভাগ্যে শিক্ষকের নিকট হইতে শিক্ষা-লাভে নানাপ্রকার ব্যাঘাত আসিয়া উপস্থিত হয়। যখন শ্রদ্ধারহিত শিক্ষালাভার্থী শিক্ষকের শিক্ষার নীতির প্রতি শ্রদ্ধধান থাকেন না, তৎকালে তাঁহার শিক্ষককে শিক্ষা-দানের অনুপযোগী জ্ঞান করায় শিক্ষক-পদে বরণ করেন না। যেস্থলে কপটতা দ্বারা ঐরূপ বরণের অভিনয় প্রদর্শিত হয়, সেস্থলে অনবধান-বশতঃ আর কিছু চিন্তা করেন, শিক্ষকের বাণী তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হয় না। যদিও শব্দাকারে শিক্ষকের কথিত শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়, তথাপি তাঁহার অনবধান-বশতঃ বিপরীত চিন্তাস্রোত পূর্ব্ব অনভিজ্ঞতার সাহায্য গ্রহণ করিয়া উপলব্ধির প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করে। আবার যেস্থলে কোন নূতন কথা অভিনব জ্ঞান উৎপাদন করিবার প্রয়াস করে, সেস্থলে পূর্ব্বসঞ্চিত বিরুদ্ধ জ্ঞান উহাকে বাধা দিয়া শিক্ষকের মর্য্যাদার লাঘব করে। এইরূপ শিক্ষার্থীর বাধাসমূহকে বিচারক-সম্প্রদায় 'অনর্থ' নামে অভিহিত করেন। উহা প্রযোজনীয় বিষয় মনে না করায় এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয়কেই 'অর্থ' জ্ঞান করায় প্রকৃত জ্ঞানের উপলব্ধিকে বাধা দেয়। বিপ্রলিপ্সা-নামক কপটতা অনেক সময় শিক্ষার্থীকে শিক্ষকের ভাষায় কিঞ্চিৎ প্রবেশাধিকার দিয়া তাঁহার প্রতিকূল ব্যাপারসমূহের অনুসন্ধানে নিযুক্ত করে।

শাস্ত্রে আমরা শিক্ষাগুরুর কথা শ্রবণ করি। সেই শিক্ষাগুরু অনভিজ্ঞ জনকে যে-সকল শিক্ষা প্রদান করেন, জড়-জগতের শিক্ষক সম্প্রদায় সেই সম্পত্তির অধিকারী নহে। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা ভোগীর অভিজ্ঞান-জন্য যে প্রাপ্তশিক্ষা, তাহাই জগতে 'শিক্ষক' নামধারি-জনগণ অপর অনভিজ্ঞ জনগণকে তাঁহাদের শিষ্য হইবার উপযোগী জানিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন। অনেকে শিক্ষার্থীর ভানে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জ্ঞাতসারে অশিক্ষিতকে শিক্ষাগুরু-পদে বরণ করেন। শিক্ষাগুরুব্রুবও তৎকালে তাদৃশ বঞ্চিত শিক্ষার্থীর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া তাহাকে ঠকাইতে থাকেন। এই শ্রেণীর বঞ্চক শিক্ষক ও বঞ্চিত শিক্ষার্থী—উভয়েরই যে দুর্গতি লাভ ঘটে, তাহা নিরপেক্ষ বিচারকমাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারেন। চৌর্য্যস্বভাবসম্পন্ন শিক্ষার্থী লাম্পট্যদোষে অভিহিত, তাদৃশ ইন্দ্রিয়সুখে প্রমত্ত হিতাহিত-বিবেকশূন্য জনগণ নিজ নিজ রুচির বশবর্ত্তী হইয়া তত্ত্ববিষয়ে পারদর্শী কপট গুরুব্রুবগণকে শিক্ষাগুরুপদে বরণ করিয়া বিষয়জালে আবদ্ধ হন। শ্রীচৈতন্য তজ্জন্য কৃষ্ণতত্ত্ববিৎকেই 'গুরু' বলিয়া জগতে উপদেশ দিয়াছেন। যাহারা কৃষ্ণসেবাবিমুখ হইয়া জড় জগতে প্রভুত্বকামী, সেই সকল ভোগিব্যক্তি কখনই শিক্ষাগুরু হইতে পারে না। তাহাদের নিকট শিক্ষা লাভ করিলে শিষ্যেরও কোন মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা নাই। জাগতিক ভোগজালে নিগড়িত হইবার প্রয়াস যাঁহারা করেন না, তাঁহারা ভোগজালের রজ্জুতে আত্মবন্ধন করিয়া 'মুক্তপুরুষ' বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। তাদৃশী মুক্তি ভোগেরই অন্যপ্রকার ভাব। যাঁহারা এই সকল সূক্ষ্ম কথার

মধ্যে প্রবেশ করিয়া আত্মস্বরূপের কিঞ্চিৎ পরিচয় লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ শিক্ষাগুরুর অনুসন্ধান করেন। অন্তর্য্যামিরূপে চৈত্ত-শিক্ষক, মহান্ত-শিক্ষককে বহু মানন করিতে শিক্ষা দেন। এস্থলে বলা বাহুল্য যে, চৈত্তশিক্ষক ভগবান্ গৌরসুন্দর বদ্ধজীবের যোগ্যতা অনুসারে অনর্থের হস্ত হইতে যে পরিমাণে যিনি মুক্ত, তাঁহাকে সেই পরিমাণে মহান্ত-শিক্ষকের নিকট উপদেশ লাভ করিবার সুযোগ প্রদান করেন—যিনি ভগবানকে বঞ্চনা করিবার উদ্দেশ্যে নিজ ভোগপ্রবণতার জন্য বা নিজের ত্যাগের বাহাদুরীতে নিজে শান্ত হইবার জন্য ব্যস্ত, ভুক্তি ও মুক্তি পিশাচীদ্বয়ের দ্বারা গ্রস্ত সেই বদ্ধজীবের চৈতন্য প্রদান করিয়া শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের উপদেশের প্রয়োজনীয়তা জানাইয়া দেন। প্রাকৃত-সাহজিক নিজ আত্মম্ভরিতাবশতঃ শ্রীচৈতন্যদেবের অমায়ায় করুণা-লাভে বঞ্চিত হইয়া অচৈতন্য প্রতিকুলবুদ্ধিকেই শ্রীচৈতন্যদেব মনে করিয়া শিক্ষক-নির্ব্বাচনে ভ্রম করিয়া বসেন। উহা তাঁহাদের সুকৃতির অভাব মাত্র। শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ ভক্তগণ একপ্রকার শিক্ষাগুরু লাভ করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের বহিরঙ্গাশক্তিপরিণত জগতের ভোগে প্রমত্ত জনগণ আধ্যক্ষিক জ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ জানিয়া প্রাকৃত সহজিয়াকে শিক্ষাগুরু জানেন এবং শুদ্ধভক্তির শিক্ষার্থীকে আক্রমণ করেন। ইহা তাঁহাদের স্বভাব জানিতে হইবে। পিত্তোপতপ্ত জিহ্বা যেরূপ মৎস্যণ্ডিকাকে স্বাদু মনে করে না এবং রোগ-নাশক জানে না, তদ্রূপ প্রাকৃত-সহজিয়া-গুরুর শিষ্যসম্প্রদায় আপনাদের বিদ্ধা ভক্তিকেই নিজ মঙ্গলের উপায় জ্ঞান করেন। প্রেয়ঃপন্থী প্রাকৃত সহজিয়াগণ শিক্ষাগুরুর শ্রেয়ঃপথকে আদর করেন না, তাহার ফলে জগতে হরিভক্তি অত্যন্ত দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষকের অভাব-হেতু কুশিক্ষক-সম্প্রদায় শিক্ষক-কৈতবে আত্মপরিচয় দিতে গিয়া জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত করিয়াছেন এবং তাহাতে তাঁহারা জগৎকে ভুক্তি-মুক্তি-পিশাচীর কবলে টানিয়া আনিয়া ফেলিয়াছেন। পরম করুণাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর জীবকুলকে উদ্ধার করিবার মানসে তাঁহার নিজ জনগণকে নিরপেক্ষভাবে শুদ্ধভক্তি প্রচারের জন্য জগতে প্রেরণ করেন। তৎকালে প্রকৃতি স্বীয় বিক্রম প্রকাশ করিয়া ভাগ্যহীন জীবের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে ও সদসৎ বিচারকে আবরণ করে। শিক্ষাগুরু জীবকুলকে বাস্তব শিক্ষা প্রদান করেন, আবার ভাগ্যহীন অসদ্ব্যক্তিগণ হরিবিমুখ জনগণকে বহুমানন করিয়া 'শিক্ষক'পদে বরণ করেন। সুতরাং শিক্ষকের নিকট শিক্ষার্থী কোন্ শিক্ষা গ্রহণ করিবেন, তাহার মীমাংসা না করিয়া যাঁহারা শিক্ষাগ্রহণের অভিনয় করেন, তাঁহারা হয় বঞ্চক, না হয় বঞ্চিত।

পিতা কাহাকে বলে?

ভারতীয় অধিবাসিগণের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের পরিচয়ে পিতার নাম ও জাতি নির্দ্দেশ করিতে হয়। একই নামে যেখানে বহুলোক আছে, সেখানে পিতার নামের নির্দ্দেশ থাকিলে পরস্পর বৈশিষ্ট্য স্থাপিত হইতে পারে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে এক নামের ব্যক্তি থাকিলে জাতির বৈষম্য-পরিচয়ে এক নামীর মানবের পার্থক্য স্থাপিত হয়।
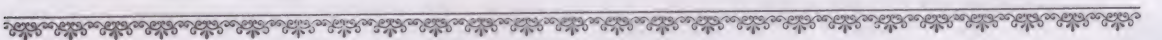
জন্ম ত্রিবিধ। পিতার ঔরসে মাতার গর্ভে যে শরীর উৎপন্ন হয়, তাহা 'শৌক্র' শরীর মাত্র। আচার্য্যের মৌঞ্জিবন্ধন-কার্য্যে গায়ত্রী মাতার উপদেশ-গর্ভে যে সংস্কৃত জন্ম হয়, তাহাকে দ্বিতীয় জন্ম বলে। ভারতীয় দ্বিজন্মাগণ একজন্ম-পরিচিত অসংস্কৃত শূদ্র হইতে পৃথক্ জন্ম লাভ করেন। দ্বিজ যখন গুরুপাদপদ্মে মন্ত্ররূপিণী মাতার গর্ভে অধীতবেদ হইয়া যাজ্ঞিক জন্ম লাভ করেন, তখন তাঁহার তৃতীয় জন্ম হয়। শৌক্রবিচারপর শূদ্রনীতি যেখানে প্রবল, সেখানে অনভিজ্ঞতাক্রমে দ্বিজত্ব ও ত্রিজত্বের কথা অজ্ঞাত। অনভিজ্ঞ মূর্খসমাজ সাধারণতঃ শৌক্র জন্মকেই জাতির পরিচয়ের একমাত্র নিদর্শন জানেন। তদপেক্ষা বিজ্ঞগণ সংস্কৃত দ্বিজাতির সহিত অসংস্কৃত জাতির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন। তাঁহাদের ভাষায় দ্বিতীয়জন্মের পরিচয় দ্বারাই জাতির পরিচয় হয়। আর পরমার্থ-যজ্ঞের যাজ্ঞিকগণ মঠের পরিচয়ে তৃতীয় দৈক্ষ্যজন্ম লাভ করেন।

দ্বিজাতি যেরূপ আপনাকে শূদ্র অভিমান করেন না, দীক্ষিত ভাগবত তদ্রূপ আপনাকে ব্রাহ্মণব্রুব বলিয়া অভিমান করেন না। কিন্তু অনভিজ্ঞজনগণ তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বুঝিতে পারেন না। মঠের পরিচয়ে আচার্য্য ও শৌক্র-জনকের পরিচয় নিরস্ত হয়—একথা বুঝিতে না পারায় অনধীতশাস্ত্র ব্যক্তিগণ শাস্ত্রশাসনের ও সজ্জনের প্রতি আক্রমণ করিয়া বসেন। যে রূপ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ উপাধিকারী তৎপূর্ব্বেই যে বি, এ উপাধি লাভ করিয়াছেন, ইহা পরিজ্ঞাত বিষয়, তদ্রূপ মঠে গুরুপাদপদ্মাশ্রিত জনগণ শৌক্র-জন্ম অথবা মৌঞ্জিবন্ধনকারী পিতৃদ্বয়ের পরিচয় না জানাইয়া শ্রীগুরু পিতার পরিচয়েই পরিচিত হন। মূর্খলোক এই সকল শাস্ত্রকথা বুঝিতে না পারায় ক্যাঁকড়ামেঠোদলের কাশিমপুর ও ওস্মানপুরকে অষ্টাদশ শতাব্দীর নবীনতায় অভিহিত না করিয়া উহাকেই পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রাচীনতা বলিয়া গো-গর্দ্দভ-মূর্খতা প্রকাশ করেন।

কোন হাকিম যেরূপ চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে কোন ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া চণ্ডীমণ্ডপকেই সাক্ষী-শ্রেণীভুক্ত করিয়া ছিলেন, তদ্রূপ মূর্খগণ বৃহদ্ব্রতী ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসিগণের পূর্ব্বপরিচয় বা ইতিহাসের দ্বারা বর্ত্তমানকালের ঘটনা নির্দ্দেশ করেন। এই সকল নগ্নমাতৃক-ন্যায়াবলম্বী জনগণ নিতান্ত শোচ্য। ইহাদিগকে পাঠশালায় ধর্ম্মশাস্ত্র ও সামাজিক ব্যবহারের কথা বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। রাজা বনবিহারী কপুর মহাশয়ের ঔরসজাত বর্ত্তমান বর্দ্ধমান-মহারাজাধিরাজ বাহাদুরকে যেমন কিছু কাগজ পত্রে, দলিল দস্তাবেজে কপুর মহাশয়ের পরিচয় দিতে হয় না, তদ্রূপ মঠাধিপ গুরুমহাশয়ের শিষ্যগণেরও এই প্রকার পূর্ব্ব শৌক্র পিতৃকুলের পরিচয় দিতে হয় না। অবশ্য যাহাদের ঐতিহ্য সংগ্রহ করা আবশ্যক, সেই সকল প্রত্নতত্ত্ববিৎ ঐ সকল লিখিয়া রাখিতে পারেন। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষকে পূর্ব্বজন্ম ও আশ্রমের দ্বারা পরিচিত হইবার জন্য বাধ্য করিতে গেলে ধর্ম্মভাবের প্রতি আক্রমণ ও সত্যের বিনাশ করা হয়।

মন্ত্রশিষ্য, পালকপুত্র ও পোষ্যপুত্র প্রভৃতি ব্যক্তিগণ পূর্ব্ব শৌক্রপিতার পরিচয় প্রদান বিষয়ে অনেকস্থলে আপত্তিজনক মনে করেন। নারিকেলের শষ্য ও জল বাদ দিয়া বাহিরের ছোব্‌ড়াকেই যদি নারিকেল বলিয়া জ্ঞান থাকে, অথবা বাহিরের খামখানিকেই যদি ভিতরের চিঠি বলিয়া ভ্রম হয়, তাহা হইলে আমরা নাচার।

বিষয়ীর কৃষ্ণপ্রেম

মায়াবদ্ধ জীব ইন্দ্রিয়সুখান্বষণে ব্যস্ত হইয়া বিষয়ের অনুসন্ধান করে। ইন্দ্রিয়ের পরিচালক পঞ্চেন্দ্রিয়ের পাঁচপ্রকার বিষয় প্রাপ্ত হইয়া সুখ লাভ করেন। সুখের স্বল্পতা বা সুখের বিপরীত দুঃখ ইন্দ্রিয়প্রীতিপর বদ্ধজীবের আদরণীয় হয় না। তিনি কৃষ্ণপ্রেমাকে 'বিষয়' বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। কৃষ্ণপ্রেমা তাঁহার আনন্দের উদয় করায় না। যাঁহারা কৃষ্ণপ্রেমের আদর করেন, তাঁহাদিগকে ইন্দ্রিয়পরায়ণ বিষয়ী কোনরূপেই আদর করিতে পারেন না।

বিষয়ী লোভের বশবর্ত্তী হইয়াই স্বীয় নশ্বর ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকায় কৃষ্ণপ্রেমার স্বরূপ উপলব্ধি করিবার বৃত্তিসমূহ রুদ্ধ হয়; কৃষ্ণপ্রেমাকে কোন জাগতিক জড়বিচারের ধ্যেয়বস্তু বলিয়া জ্ঞান হয় এবং নশ্বর ইন্দ্রিয়তর্পণই তাহার বিচারে কৃষ্ণপ্রেমার স্থান অধিকার করে। প্রাকৃত- সহজিয়া জড়েন্দ্রিয়তর্পণে রত থাকিয়া আপনাকে কৃষ্ণপ্রেমে ডগমগ মন করে এবং নিরুপাধিক কৃষ্ণপ্রেমার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারায় সাধুবৃত্তির বিদ্বেষই কৃষ্ণপ্রেমা বলিয়া তাহার অনুভূত হয়। কৃষ্ণপ্রেমা তাঁহার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী বৃত্তি-দ্বারা ভাগ্যহীন ইন্দ্রিয়তর্পণপর ব্যক্তির নিত্যানিত্য বিবেক স্তব্ধ করেন। ইন্দিয়তর্পণপর ভোগী তৎকালে ইন্দ্রিয়তর্পণ রহিত ত্যাগীর বিচারকে কোন স্থলে আবাহন ও কোন স্থলে বিসর্জ্জন করাই সুবিধাজনক মনে করেন। সেই জন্য শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণসেবোন্মুখ জনগণকে বিষয়ী ও যোষিৎলম্পট জনগণের সঙ্গপরিত্যাগের জন্য উপদেশ করিয়াছেন। জড়বস্তুতে আসক্ত জনগণ অপ্রাকৃত অনুভূতির সহিত ভোগপর অনুভবকে সমজাতীয় জ্ঞান করিয়া সুজনগণের চরণে অপরাধী হন—রাইকানুর গানের ব্যপদেশে আপনাকে প্রেমিক আখ্যায় অভিহিত করেন। তাই কবি গাহিয়াছেন,—

কি আর বলিব তোরে মন।
মুখে বল 'প্রেম প্রেম' বস্তুতঃ ত্যজিয়া হেম,
শূন্যগ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন।।
অভ্যাসিয়া অশ্রুপাত, লম্ফ ঝম্প অকস্মাৎ,
মূর্চ্ছাপ্রায় থাকহ পড়িয়া।
এ লোক বঞ্চিতে রঙ্গ প্রচারিয়া অসৎসঙ্গ
কামিনী কাঞ্চন লভ গিয়া।।
প্রেমের সাধন ভক্তি, তাতে নৈল আনুরক্তি
শুদ্ধপ্রেম কেমনে মিলিবে?
দশ অপরাধ ত্যজি' নিরন্তর নাম ভজি'
কৃপা হলে সুপ্রেম পাইবে।।

না মানিলে সুভজন, সাধুসঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন
না করিলে নির্জ্জনে স্মরণ।
না উঠিয়া বৃক্ষোপরি, টানাটানি ফল ধরি'
দুষ্ট ফল করিলে অর্জ্জন।।
অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন সুবিমল হেম,
এই ফল নৃলোকে দুর্ল্লভ।
কৈতবে বঞ্চনা মাত্র, হও আগে যোগ্য পাত্র,
তবে প্রেম হইবে সুলভ।।
কামে প্রেমে দেখ ভাই, লক্ষণেতে ভেদ নাই,
তবু কাম প্রেম নাহি হয়।
তুমি ত' বরিলে কাম, মিথ্যা তাহে 'প্রেম' নাম,
আরোপিলে কিসে শুভ হয়।।

বিষয়ীর কৃষ্ণপ্রেমা, আর শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তের কৃষ্ণপ্রেমা একজাতীয় পদার্থ নহে। অবিবেকিগণের প্রীতি কখনই 'কৃষ্ণপ্রেমা' শব্দ-বাচ্য হইতে পারে না। অবিবেকিগণ যে সখ্য, বাল্যলীলাত্মক বাৎসল্য ও মধুর রসের চিত্রসম্বলিত গীতির আবাহন করেন, সেইগুলি জড়েন্দ্রিয়-তর্পণপরতায় পর্য্যবসিত হয় বলিয়া অপ্রাকৃত কৃষ্ণ- প্রেমের অনুরাগিজনগণ উহাকে আদর করেন না। হাটে বাজারে রাইকানুর প্রেম বলিয়া যে কথা বিগীত ও শ্রুত হয়, তাহা কৃষ্ণানুরাগি-জনের নিকট 'মিছাভক্তি' নামে একটা ব্যাপারবিশেষ বলিয়া পরিত্যক্ত হয় মাত্র। মদ্যপ যেরূপ নিজ রুচিবশে শৌণ্ডিকের পণ্যগ্রহণে দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানরহিত হইয়া ব্যস্ত হয়,—কামুক যেরূপ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া উন্মত্ত হয়, প্রাকৃত সহজিয়া ও তদ্রূপ কৃষ্ণ-প্রেমের নামে লোক ঠকাইতে গিয়া, মহাজনের গীতির তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া নিজের ভোগের সন্ধান লইতে লইতে অমঙ্গলের দিকে ধাবিত হন, জনপ্রীতি ও নিজের হরিবৈমুখ্যকেই কৃষ্ণসেবা বলিয়া বোধ করায় কৃষ্ণেতর বিষয়ে প্রীতিরহিত সাধুজনগণকে অপ্রীতিময় বলিয়া ধারণা করিয়া বসেন। কখনও ম্যাজিক লণ্ঠনে, কখনও বা মহাজন কবিতার সঙ্কলন-কার্য্যে রত থাকিয়া অবিবেচনার উন্নত শিখায় আরোহণ করেন। এরূপ দণ্ডই প্রাকৃত সহজিয়াগণের অনিবার্য্য। ভজনানন্দী জনগণ ইহাদের দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করেন। "সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস। ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস।।"—প্রভৃতি বাক্য-বিরোধী জনগণ আত্মবঞ্চিত হইয়া অমঙ্গলের পথে ধাবমান হয়। তাহাদের কেশ আকর্ষণ পূর্ব্বক দুষ্প্রবৃত্তি দমন করাই শুদ্ধভক্তগণের একমাত্র কর্ত্তব্য।

জনসাধারণের দেখিবার ও বুঝিবার ভুল হয়, গ্লোব্ ভালক্যানাইজিং—কোম্পানীর স্বত্তাধিকারী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত ধীরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের ছায়াচিত্র-প্রদর্শন ও রাইকানুর গীতিসঙ্কলনকারী চিত্রে প্রদর্শনীয়

গোষ্ঠ বিহারাদি-বিষয়ক মহাজনগীতি-প্রকাশকারী ঘোষ মহাশয় প্রভৃতি ভদ্রগণ প্রাকৃতসহজিয়াগণের নিকট হইতে বহু দূরে অবস্থান করেন বলিয়াই আমরা জানি। সাহিত্যিক শ্রীযুত শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয়ের ছায়াচিত্রযোগে যে গৌরলীলা প্রদর্শনের বিরুদ্ধে মিছাভক্ত সম্প্রদায়ের পোষণকার্য্যরত কন্ট্রাক্টর সুবর্ণবণিকরত্ন দত্ত মহাশয় কেবল অর্থসাহায্যে জগতের মঙ্গল করিতে পারিবেন, এরূপ বোধ হয় না। ইহারা গৌড়ীয় মঠের প্রচার প্রণালীর অনুগমন করিলে নিশ্চয়ই জগতের মঙ্গল করিতে পারিতেন।

সত্যানুসন্ধিৎসা ও ছিদ্রানুসন্ধিৎসা

আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ বলিয়াছেন,—

* * মৃগয়তি খলো দোষং ন জাতু গুণম্।
মণিময়মন্দিরমধ্যে পশ্যতি পিপীলিকা ছিদ্রম্।।

স্ফাটিক-মন্দিরে যেরূপ পিপীলিকা ছিদ্রই অনুসন্ধান করিয়া থাকে, তদ্রূপ নিশ্ছিদ্র সাধুতার মধ্যে খল প্রকৃতির ব্যক্তিগণ দোষই অন্বেষণ করিয়া থাকে, কখনও গুণের অনুসন্ধান করিতে পারে না।

সত্যানুসন্ধিৎসা ও ছিদ্রানুসন্ধিৎসা দুইটী পৃথক্ ব্যাপার। সেবার আন্তরিকতা হইতে মানব-হৃদয়ে সত্যানু-সন্ধিৎসা-বৃত্তি জাগরিত হয়; আর ভোগের পিপাসা হইতে ছিদ্রানুসন্ধিৎসা-বৃত্তি জন্মগ্রহণ করে। সত্যানু-সন্ধিৎসা আমাদিগকে অমৃত-পথের যাত্রী করিয়া দেয়; আর ছিদ্রানুসন্ধিৎসা মৃত্যু-পথের পথিক করে।

মায়ার কার্য্যই—ছিদ্রানুসন্ধান। মায়াদেবী জগতের কোথায় ছিদ্র আছে, তাহার অনুসন্ধান করিয়া অবিরাম বেড়াইতেছে, ছিদ্র পাইলেই অমনি সেখানে প্রবিষ্ট হইয়া জীবের সদ্বৃত্তিগুলিকে অর্থাৎ ক্ষীণা সেবোন্মুখতাকে আবৃত ও বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। ছিদ্রই মায়ার বিশ্রামভূমিকা। কাজেকাজেই ছিদ্রানুসন্ধান ব্যতীত মায়া এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে পারে না।

মায়ার কার্য্য যেরূপ অনুক্ষণ ছিদ্রানুসন্ধান, সেবোন্মুখতার স্বভাবও তদ্রূপ অনুক্ষণ সত্যানুসন্ধান। সেবোন্মুখতা সত্যানুসন্ধিৎসা ব্যতীত অর্থাৎ পূর্ণ বাস্তব সত্যের পূর্ণ পাদপদ্ম স্পর্শ না করা পর্য্যন্ত কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না। কিন্তু "নিতাই চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য"—এই সত্যবাণীতে অন্যমনস্ক হইলে নিয়ত ছিদ্রানুসন্ধানপরায়ণা মায়াদেবী যে কোনও একটী ছিদ্র প্রাপ্ত হইয়া মানব-মতিকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়—ছিদ্রানুসন্ধিৎসার সহিত সত্যানুসন্ধিৎসার সমন্বয় ও বিবর্ত্ত উৎপাদনে প্ররোচিত করিয়া থাকে। অনেকে দুর্ভাগ্য-ফলে পরমার্থ পথে চলিবার সময় ছিদ্রানুসন্ধিৎসাকে 'সত্যানুসন্ধিৎসা' বলিয়া বিবর্ত্ত-বুদ্ধি করিয়া ফেলেন।

মানবমাত্রেই আদর্শের অনুসন্ধানকারী। এই আদর্শ অনুসন্ধিৎসা মানবের বা জীবের একটী স্বাভাবিকী বৃত্তি। সকল কার্য্যেই আমরা আদর্শ দেখিতে চাই, আদর্শ খুঁজিয়া লই কিম্বা আধ্যক্ষিক হইলে অনেক সময়

আদর্শ গড়িয়া লই। আদর্শ না থাকিলে মানব কি ব্যবহারিক, কি পারমার্থিক, কোন কার্য্যেই অগ্রসর হইতে পারে না। ভাল কার্য্যই হউক, আর মন্দকার্য্যই হউক, সত্যই হউক, আর অসত্যই হউক,—সকল কার্য্যেই মানুষ চায় একটা আদর্শ। আদর্শ পাইলে মানুষ অসাধ্য সাধন করিতে পারে—সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদান করিতে পারে।

এই আদর্শ-অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি যখন অত্যন্ত নিম্নগামিনী বা নীচতা প্রাপ্ত হয়, তখনই আমরা ছিদ্রানুসন্ধিৎসু হইয়া পড়ি। আদর্শ-অনুসন্ধিৎসা নিম্নগামিনী হইবার কারণ আবার ভোগোন্মুখতা। ভোগোন্মুখতা উদিত হইলেই আমরা উহা বিবর্দ্ধিত করিবার রুচিসম্পন্ন হইয়া তাহার সম্মুখে একটী আদর্শ স্থাপন করিতে চাই। যাহারা অত্যন্ত ব্যবহারিক বা জাগতিক লোক, তাহারা ভোগাসক্ত পাপী ব্যক্তিগণকেই তাহাদের আদর্শ স্থির করিয়া ভোগ-ক্ষেত্রের কর্ষণ-কার্য্য সমৃদ্ধ করিয়া থাকে; কিন্তু যাঁহারা ঐরূপ ব্যবহারিকের অপযশে অবমানিত হইতে চান না, অথচ পারমার্থিক পদবীর প্রতিষ্ঠা সংরক্ষণ করিয়া ভোগ, অন্যাভিলাষ বা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের কৃষ্টি সাধন করিতে চাহেন, তাঁহারা ছিদ্রানুসন্ধিৎসাকে সত্যানুসন্ধিৎসার আবরণে প্রচার করিয়া বৈষ্ণবাপরাধী 'প্রাকৃত-সহজিয়া' হইয়া পড়েন। পারমার্থিকের পদবীর সংরক্ষণটী চাই, অথচ অন্যাভিলাষ বা ভোগ চরিতার্থ করিয়াও লওয়া চাই—এইরূপ এক কপটতাময়ী দুর্ব্বুদ্ধি হইতে আদর্শকে গড়িয়া লইবার বা নিশ্ছিদ্র অতিমর্ত্ত্য অনাবিল আদর্শকে ভোগপিপাসুর ভোগানুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তানুসারে বাধ্য করিয়া বিকৃত করিবার চেষ্টা হইতে ছিদ্রানুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তির উদয় হয়। ভোগকামী এখন দেখিতে পান যে, তাঁহার ভোগ-বৃত্তিকে লোক লোচনের সম্মুখে অগর্হিতভাবে স্থাপন এবং তাঁহার সাময়িক বিবেককে সান্ত্বনা প্রদান করিতে হইলে অনাবিল আদর্শে আবিলতা আরোপ ব্যতীত কার্য্য-সিদ্ধি অসম্ভব, তখনই ঐ ভোগার্ত্ত ব্যক্তি মায়াদেবীর প্ররোচনাক্রমে মণিময়-মন্দিরে ছিদ্রানুসন্ধান করিবার জন্য ধাবিত হন। সুতরাং ভোগানুসন্ধিৎসা হইতেই ছিদ্রানুসন্ধান-বৃত্তির প্রবৃত্তি। দোষ কেবল আমার নাই; আমার ন্যায় অপরেরও আছে, অথবা আমা অপেক্ষা যাঁহারা 'শ্রেষ্ঠ' বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদেরও দোষ আছে; সুতরাং আমার দোষের প্রশ্রয়-দান কিছু অন্যায় নহে, বরং শ্রেষ্ঠ আদর্শের সহিত তুলনায় "আমার তথাকথিত দোষ" স্থাপিত ও নির্দ্দোষ বলিয়া প্রমাণিত হইবার যোগ্য—এইরূপ একপ্রকার কপটতাময়ী ভোগ-পিপাসা হইতে শ্রেষ্ঠ জনের প্রতি ছিদ্রানুসন্ধিৎসা-বৃত্তি উদিত হয়। ভোগার্ত্ত হইলে মানুষের এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হয়,—"জগতের সকলেই পারমার্থিকতাভ্রষ্ট হউক", অথবা "তাহারা পারমার্থিকতাভ্রষ্ট হইতে বাধ্য, তাহা হইলে ভোগকামী আমি আমার ভোগসমর্থনের অনেক নজির দেখাইতে পারিব।"

এইরূপ ভোগানুসন্ধিৎসা-বৃত্তিক্রমে আমরা ছিদ্রানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই এবং আমাদের ছিদ্রানুসন্ধিৎসা-বৃত্তির পরিপুষ্টির জন্য দ্বিবিধভাবে আদর্শ খুঁজিয়া বা গড়িয়া লই। আমার ভোগানুসন্ধিৎসা সমর্থনের জন্য কখনও বলি,—কালা-কৃষ্ণদাস, ছোট হরিদাস, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য, কমলাকান্ত বিশ্বাস, রামচন্দ্রপুরী প্রভৃতি বড় বড় লোকেরও যখন ছিদ্র ছিল, তখন আমার ছিদ্রকে দোষ বলিয়া সাব্যস্ত করা যাইতে পারে না। কখনও বা অনাবিল আদর্শকে বলপূর্ব্বক আমার ভোগ-বর্দ্ধনের আদর্শরূপে গড়িয়া বা সাজাইয়া লইবার জন্য সেই

সকল অতিমর্ত্ত্য শ্রেষ্ঠতম আদর্শের ছিদ্রানুসন্ধিৎসু হইয়া পড়ি এবং বলি,—যখন চৈতন্যদেব 'ঔদরিক' (!) ছিলেন, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভৃতি 'গৃহব্রত' (!) ছিলেন, তখন আমাকে 'ঔদরিক' বা 'গৃহব্রত' বলিয়া কষাঘাত করা কখনই উচিত নহে। অতিমর্ত্ত্য-আদর্শে ভোগ বুদ্ধিক্রমে এইরূপ ছিদ্রানুসন্ধিৎসু হইয়া আমি তখনই শ্রীরামচন্দ্রপুরীর আদর্শে—প্রাকৃত সহজিয়াগণের আদর্শে বিষ্ণু-বৈষ্ণবাপরাধী হইয়া পড়ি। আমার হৃদয়ে কোন কালে যে গুরুকৃপালব্ধ ভক্তিলতাবীজটী উপ্ত হইয়াছিল, তাহা ঐ অপরাধ-মত্তহস্তীর ভীষণ দৌরাত্ম্যে চিরতরে নির্ম্মূলিত হইয়া পড়ে।

ভোগোন্মুখ ও সেবোন্মুখে ইহাই পার্থক্য যে, একজনের ভোগোন্মুখতা অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে সে তাহার বিচারের অনধিগম্য অতিমর্ত্ত্য অনাবিল আদর্শেও ছিদ্র বা দোষ অনুসন্ধান করিতে ধাবিত হয়; আর এক জনের সেবোন্মুখতা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে তিনি আধ্যক্ষিকের দর্শনে যাহা দোষদুষ্ট বলিয়া প্রতিভাত, তন্মধ্যেও সত্যানুসন্ধান করিয়া থাকেন। অত্যন্ত ভোগবুদ্ধিপরায়ণ হইয়া পড়িলে আমরা রামচন্দ্রপুরীর আদর্শ গ্রহণ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবে ঔদরিকতা, শ্রীজাহ্নবাদেবীতে বিলাসিতা, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিতে বিষয়-ভোগ- চেষ্টা, শ্রীনিবাসাচার্য্যে গৃহাসক্তি প্রভৃতির ছিদ্র অনুসন্ধান করি; সেই সকল অতিমর্ত্ত্য আদর্শ যে আমাদের আধ্যক্ষিক জ্ঞানের অনধিগম্য, তাহা ভুলিয়া যাই। আমরা যাহাদিগের নাগাল পাই না, তাহাদিগকে হস্তামলক করিয়াছি, মনে করি। সেবোন্মুখের সঙ্গভ্রষ্ট হওয়ায় সেইসকল অতিমর্ত্ত্য আদর্শে যে যে কার্য্যগুলি আমার ভোগবুদ্ধির পরচক্ষু-পরিহিত চক্ষে 'ভোগ' বলিয়া প্রতিভাত, তাহাই সেইসকল আদর্শে কিরূপে সর্ব্ব উপাদেয়তার সহিত সমন্বিত, তাহা দেখিতে পাই না। অথবা প্রকৃত বৈষ্ণবের নিকট "অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্" শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্রবণ না করায় আমার আধ্যক্ষিকজ্ঞানে দুরাচার বলিয়া প্রতীয়মান অতিমর্ত্ত্যগণের 'অনন্যভজন' লক্ষ্য করিতে পারি না। কখনও বা ঐ শ্লোকের তাৎপর্য্য ভোগোন্মুখ কর্ণে আবৃতভাবে শ্রবণ করিয়াও ভোগার্ত্ত আমার ভোগের আদর্শ গড়িয়া লইবার জন্য মতলব করিয়াই যেন অতিমর্ত্ত্য পুরুষগণের অনন্যভজন-ব্যাপারটীর প্রতি না তাকাইয়া তাঁহার আপাত প্রতীয়মান দুরাচারের উপরেই আমার সকল দুষ্ট দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করি। ভোগার্ত্ত আমার আন্তরিক ইচ্ছা, যদি এইরূপ অনন্যভজনকারিগণের অনন্যভজন "চাপা দিয়া" তাঁহাদের আপাত প্রতীয়মান 'দুরাচার'কে আধ্যক্ষিক সমাজে প্রচার করিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে আমার সুবৃহৎ ছিদ্রগুলি আমি অনায়াসেই সংরক্ষণ ও বিবর্দ্ধন করিতে পারিব—অনায়াসেই নিষ্কপট ভজনপথ পরিত্যাগ করিয়া দুঃসঙ্গে চলিয়া যাইতে পারিব, —এইরূপ আত্ম-অমঙ্গল-বরণ-চেষ্টা হইতে আমাদের ছিদ্রানুসন্ধান-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

একদিকে যেমন আমরা অত্যন্ত ভোগোন্মুখ হইয়া পড়িলে নিশ্ছিদ্র আদর্শে ছিদ্রানুসন্ধান করি, অপরদিকে আবার অত্যন্ত সেবোন্মুখ হইলে স্বৈরিণী পিঙ্গলার মধ্যেও সত্যানুসন্ধান করিবার শিক্ষা পাই। জগতের প্রত্যেক বস্তু তখন ছিদ্রানুসন্ধানের পরিবর্ত্তে আমাদের সত্যানুসন্ধানের আদর্শ হয়। কালাকৃষ্ণদাস, ছোট হরিদাস, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য, কমলাকান্ত বিশ্বাস, রামচন্দ্রপুরী, ভগবানাচার্য্য প্রভৃতি পাত্রগণ সেবোন্মুখের নিকট ভোগানুসন্ধানের আদর্শ না হইয়া সত্যানুসন্ধান-শিক্ষার আদর্শ হন। শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীনিত্যানন্দ

প্রভু, শ্রীজাহ্নবাদেবী, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, রায় রামানন্দ, শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভৃতি পাত্রগণের আচার সেবোন্মুখের বিষয়াশ্রয়-বিবেকে পরমোপাস্য বস্তুর আদর্শরূপে গৃহীত হয়।

কেহ কেহ ছিদ্রানুসন্ধিৎসাকে 'সৎসাহস' বলিয়া স্থাপন করিতে চাহেন। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, সাধুকে 'সাধু' বলিয়া মানিয়া লওয়া বা কোন বৈষ্ণবে দুরাচার (?) দেখিলে তদ্বিষয়ে প্রতিবাদ না করা এবং কোন স্বার্থোদ্দেশ্যে সেইরূপ দুরাচারী বৈষ্ণবের প্রিয়ভাজন হইবার জন্য তাঁহাকে তোষামোদ করা প্রভৃতি ব্যাপার অন্ধবিশ্বাস, কপটতা ও সৎসাহসের অভাব মাত্র। এইরূপ যুক্তিতে এক সঙ্গে অনেকগুলি ভ্রম ও বিবর্ত্ত প্রবিষ্ট হইয়াছে। প্রথমেই আমাদের দেখা উচিত যে, যাঁহার সম্বন্ধে বিচার করিব, তিনি আমাদের বিচারের অধিগম্য কি না? যদি আমাদের বিচারের অধিগম্য বা অধীন হন, তাহা হইলে সেইরূপ বস্তুকে বিচার না করিয়া গ্রহণ করিলে সৎসাহসের অভাব, অন্ধ বিশ্বাস বা কপটতা হইবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যদি কোন অসাধু, কপট, অবৈষ্ণব ব্যক্তিকে তাহার দোষ-গুণ বিচার না করিয়াই সাধু-গুরু-বৈষ্ণব বলিয়া গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমি বিবর্ত্তে পতিত হইলাম এবং অন্ধ বিশ্বাস বা সৎসাহসহীনতা প্রদর্শন করিলাম।

অবশ্য সাধু ও অসাধু বিচার করিবার শক্তি আবার সেবোন্মুখতা হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি যতটা সেবোন্মুখ, তিনি ততটা অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ গ্রহণ করিতে পারেন এবং সাধু ও অসাধু পরীক্ষার কষ্টিপাথররূপ মেধাটীও লাভ করেন। তিনি অনন্যভজনকারীর আপাত প্রতীয়মান দুরাচার এবং ভজনবিমুখ বা ভজনত্যাগকারীর স্বভাবগত দুরাচারের মধ্যে পার্থক্যটী উপলব্ধি করিতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা সেইরূপ সেবোন্মুখতাজাত সুমেধা লাভ করেন নাই অর্থাৎ প্রকৃত মধ্যমাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হন নাই, তাঁহারা অনন্যভজনকারীর আপাত প্রতীয়মান দুরাচার এবং ভজনবিমুখের দুরাচার-বিমুখতাকে এক প্রকার মনে করেন; অধিকাংশ স্থলেই দৈবী-মায়া দ্বারা চালিত হইয়া ভজনবিমুখের নিত্য দুরাচারকে ''অপি চেৎ সুদুরাচারো'' শ্লোকের দ্বারা সমর্থনপূর্ব্বক অনন্যভজনকারীর ছিদ্রানুসন্ধানতৎপর হন এবং ভীষণ বৈষ্ণবাপরাধ করিয়া বসেন।

কোন এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভাগবত-ব্যবসায়ী জাতি গোস্বামী সান্বয়ক্রমে ঐরূপ বিচার-ভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছেন। তিনি বিচার করেন যে, যত লোক কপটতা করিয়া বৈষ্ণবের বেষ গ্রহণ পূর্ব্বক যত প্রকার ব্যভিচার, লাম্পট্য কিম্বা দুরাচারের বশীভূতই হউক বা কেন, তাহারা সকলেই ''অপি চেৎ সুদুরাচারো'' শ্লোকের দ্বারা সুরক্ষিত। জীবকে অসৎসঙ্গ পরিবর্জ্জন করাইবার জন্য যদি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি সম্প্রদায় সেই সকল কপটতা ও দুরাচারের চর্চ্চা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ''পরচর্চ্চকের গতি নাহি কোন কালে''—শ্রীচৈতন্যভাগবতোক্ত এই মহাজন-বাক্যের কোপে পতিত হইতে হইবে।

এইরূপ বিচারে প্রধাবিত হইয়া যাঁহারা সঙ্কল্পিত দুরাচারিগণের দুঃসঙ্গ বর্জ্জন করিতে ক্ষান্ত হন এবং দৈবী-মায়াদ্বারা চালিত হইয়া (আধ্যক্ষিক নেত্রে প্রতীয়মান 'সুদুরাচার', কিন্তু) অতিমর্ত্ত্য, নিষ্কপট, অনন্য-ভজনকারিগণের ছিদ্রানুসন্ধানে নিযুক্ত হন, আর সেই সময় ''পরচর্চ্চকের গতি নাহি কোনকালে'' বাক্যটী

ভুলিয়া যান, তাঁহারা নিতান্ত পাপাসক্ত, দুর্ভাগ্য ও অপরাধী। কারণ, যে সময় এবং যাহাদের সম্বন্ধে বিচারকালে ''অপি চেৎ সুদুরাচারো'' শ্লোক ও ''পরচর্চ্চকের গতি নাহি কোনকালে'' প্রভৃতি বাক্য কার্য্যকরী হইবে, সেইরূপ প্রকৃত অবসরেই ঐ সকল দুর্ভাগার বুদ্ধি-বিপর্য্যয় হয়। যদি আমরা ঠাকুর হরিদাস, রায়রামানন্দ, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতি অনন্যভজনকারিগণের চরিত্র আলোচনার সময় ''অপি চেৎ সুদুরাচারো'' শ্লোক কিম্বা ''পরচর্চ্চাকের গতি নাহি কোনকালে'' প্রভৃতি বাক্যগুলি ভুলিয়া যাই বা ঢাকা দিয়া রাখি, কিন্তু ঢঙ্গবিপ্রের চরিত্র, কপট প্রাকৃত সহজিয়া এবং প্রকৃত বৈষ্ণব-বিদ্বেষী বৈষ্ণব-ব্রুবগণের চরিত্র আলোচনার সময় ঐ সকল শ্লোক বা শাস্ত্রোপদেশ অস্ত্ররূপে বাহির করিয়া ব্যভিচার ও কপটতাকে রক্ষা করি, তাহা হইলে উহা দ্বারা সত্যসংহারেরেই চেষ্টা হইল। ইহাকেই 'ছিদ্রানুসন্ধিৎসা' বা 'পরচর্চ্চা' বলিয়া বৈষ্ণবগণ নিন্দা করিয়াছেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর প্রাকৃত সহজিয়াগণকে ঐরূপ ছিদ্রানুসন্ধিৎসা-বৃত্তি পরিবর্জ্জন করাইবার জন্যই ''অপিচেৎ সুদুরাচারো'' শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়াছেন; 'নাম-বলে পাপ প্রবৃত্তি' বা শাস্ত্রোপদেশ অথবা শাস্ত্রবাখ্যার বিকৃত তাৎপর্য্যোপলব্ধির অবৈধ সুযোগ গ্রহণ করিয়া নামাপরাধ, শাস্ত্রাপরাধ ও বৈষ্ণবাপরাধ বা ব্যভিচার-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করিতে বলেন নাই। ছিদ্রানুসন্ধিৎসা পরিত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া সত্যানুসন্ধিৎসা পরিত্যাগ করিতে হইবে না—ছিদ্রানুসন্ধান পরিত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া সৎসঙ্গানুসন্ধান পরিত্যাগ করিতে হইবে না—সত্যানুসন্ধান করিতে হইবে বলিয়া অতিমর্ত্ত্য অনন্য-ভজনকারীর ছিদ্রানুসন্ধিৎসায় প্রমত্ত হইতে হইবে না—সত্যানুসন্ধান করিতে হইবে বলিয়া অসৎসঙ্গকে 'সৎসঙ্গ' বলিয়া বরণ করিতে হইবে না।

সৎসাহসিকতা ও ছিদ্রানুসন্ধিৎসা—এক নহে। সেবাবিমুখিনী সৎসাহসিকতা ও সত্যানুসন্ধিৎসা নহে। সেবোন্মুখিনী সৎসাহসিকতা নিষ্কপট আত্মমঙ্গল-কামিগণেরই আছে। দুস্ত্যাজ্য দুঃসঙ্গত্যাগে যে সেবোন্মুখিনী সৎসাহসিকতা আছে, তাহার সহিত ছিদ্রানুসন্ধিৎসুর তথাকথিত সৎসাহসিকতার তুলনাই হইতে পারে না। প্রকৃত প্রস্তাবে ছিদ্রানুসন্ধিৎসুর আদৌ সৎসাহসিকতা নাই। অত্যন্ত হৃদয়দৌর্ব্বল্যযুক্ত, ভোগাসক্ত, মাৎসর্য্যপরায়ণ ও কপটতাযুক্ত হইলেই আমরা ছিদ্রানুসন্ধিৎসু হইয়া পড়ি। আর সেবা সবল থাকিলে আমরা সত্যানুসন্ধানে ও দুঃসঙ্গবর্জ্জনে অদম্য বল ধারণ করি। ছিদ্রানুসন্ধিৎসুগণ দুর্ব্বল, কপট ও ভোগহতচিত্ত মৎসর বলিয়াই পরোক্ষে পরচর্চ্চক হইয়া পড়ে। বৈষ্ণবের সুতীক্ষ্ণ বিচার ও সুযুক্তি দ্বারা তাহাদের মাৎসর্য্যপরা পরচর্চ্চা গুলি খণ্ডিত-বিখণ্ডিত হইবে জানিয়া তাহারা বৈষ্ণবের সম্মুখে আসিতে বা কথা বলিতে দুর্ব্বলতা প্রকাশ করে; কিন্তু সেবা-সৎসাহসিক সেইরূপ দুর্ব্বলতায় হতচিত্ত নহেন বলিয়া তিনি ঐরূপ পরোক্ষে কুৎসা প্রচার বা ছিদ্রানুসন্ধান করিয়া নিজ অমঙ্গল বরণ করেন না। ছিদ্রানুসন্ধিৎসু কখনই দুঃসঙ্গ বর্জ্জন করিবার বল প্রাপ্ত হয় না, অধিকন্তু নিশ্ছিদ্র সাধুতে ছিদ্র আরোপ বা অনুসন্ধান করিয়া নিজ কল্পিত ছিদ্রে নিজেই আরও অধিকতরভাবে পতিত হয়। নিজের কল্পিত ছিদ্রে—নিজের গড়া গর্ত্তে নিজেই স্বেচ্ছায় পতিত হইয়া অমঙ্গলের অতল সীমায় চলিয়া যায়।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, ভোগোন্মুখতা হইতেই ছিদ্রানুসন্ধিৎসার প্রবৃত্তি। ভোগ-চরিতার্থতায় বা ইন্দ্রিয়তর্পণে কেহ বাধা দিলেই আমরা তাহার ছিদ্রানুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতিহিংসায় প্রবৃত্ত হই। আমাদের শ্রেয়োবিধানকারী—আমাদের নিত্যশুভানুধ্যায়ী নির্ম্মৎসর গুরু-বৈষ্ণববর্গ যখনই আমাদের আপাত প্রেয়োরূপ ইন্দ্রিয়তর্পণে অর্থাৎ আমাদের আত্মবিনাশ-চেষ্টায় বাধা প্রদান করেন, তখনই আমরা পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিগণকে হিংসক কল্পনা করিয়া তাঁহাদের ছিদ্রানুসন্ধান দ্বারা অবৈধ প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য উন্মত্ত হইয়া পড়ি। কাম প্রতিহত হইলেই ক্রোধের উদ্রেক হয়। এই ছিদ্রানুসন্ধান-প্রবৃত্তিও কাম- প্রতিহত ক্রোধেরই বৈচিত্র্য মাত্র। ইহা এক প্রকার অবৈধ-হিংসা বা প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি।

ছিদ্রানুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তি হইতে অশেষ অনর্থ ও অশান্তির উদয় হয়। ছিদ্রানুসন্ধিৎসা—বিষ্ণু-বৈষ্ণবাপরাধের জননী, অতএব আত্মবিনাশের সেতু। ছিদ্রানুসন্ধিৎসু কখনই শান্তি লাভ করিতে পারেন না, অযথা অপরের ছিদ্রানুসন্ধান করিতে করিতে সারা রাত্রি নিদ্রাহীন অবস্থায় উদ্বেগগ্রস্ত হন; অথচ যাহার ছিদ্রানুসন্ধান করিয়া তিনি এতদূর অশান্তিগ্রস্ত হইতেছেন, সেই নিশ্ছিদ্র ভগবৎ-সেবক সারারাত্রি সেবা-সুখে বিশ্রাম করিতে থাকেন। ছিদ্রানুসন্ধিৎসু যেন কণ্ডূয়ন-ব্যাধি না থাকিলেও স্বেচ্ছায় চেষ্টা করিয়া স্বীয় কণ্ডূয়ন-ব্যাধি সৃষ্টি করেন। সেই কণ্ডূয়নের শান্তির জন্য অর্থাৎ ছিদ্রানুসন্ধিৎসা চরিতার্থের জন্য যতই অধিকতর ছিদ্রানুসন্ধান করিতে থাকেন, ততই তাঁহার রক্তপাত বা যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। সেইরূপ রক্তপাত হইবার সময়েও আরও অধিকতর কণ্ডূয়ন-প্রবৃত্তিক্রমে অধিকতরভাবে কণ্ডূয়ন করিতে থাকেন এবং সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত করিয়া নিজেই নিজের চেষ্টায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। কোন কার্য্য না থাকিলে যেমন লোকে ''খুড়ার গঙ্গা যাত্রা করে'' বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে, সেইরূপ ভগবৎ সেবাকার্য্যে নিবিষ্ট না থাকিলেই আমাদের ছিদ্রানুসন্ধিৎসা বা পরচর্চ্চা প্রবৃত্তি উদিত হয়।

যাঁহারা সত্যানুসন্ধিৎসু বা সেবানুসন্ধিৎসু, তাঁহারা ছিদ্রানুসন্ধিৎসায় প্রমত্ত হন না। ভোগোন্মুখগণ জগতের সকলের ছিদ্রানুসন্ধান করিতে করিতে নিশ্ছিদ্র সাধুকেও ছিদ্রযুক্ত দর্শন করে এবং তাহাদের মঙ্গল-লাভের সামান্য চেষ্টাটুকুও পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুর ছিদ্র-দর্শনে-সতত-উন্মুখ অসাধুগণের সমাজে আশ্রয় গ্রহণ করে। ছিদ্রানুসন্ধিৎসু অচিরকালেই তাহার সমস্ত স্বাভাবিক শ্রীহারাইয়া ফেলে এবং নানা প্রকার কপটতা, দুরাচার, মৎসরতা প্রভৃতিতে নিবিষ্ট হইয়া পড়ে। ছিদ্রানুসন্ধিৎসুর হৃদয় এতদূর অপরাধ কঠিন হইয়া যায় যে, কোনকালেই তাহার কর্ণে মঙ্গলোপদেশ প্রবিষ্ট হয় না।

সত্যানুসন্ধিৎসু সর্ব্বদাই সেবোন্মুখ। তিনি সর্ব্বত্রই তাঁহার সেবা-বিবর্দ্ধনের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ খুঁজিয়া লন; কারণ তাঁহার মুলমন্ত্র—আত্মমঙ্গল-বরণ বা ভগবৎসেবায় নিত্য অধিষ্ঠান। অপরকে বলপূর্ব্বক পাতিত করিয়া নিজে অধিকতর পতিত হইব—এইরূপ আত্মমঙ্গল বিনাশের উত্তেজনায় তিনি উত্তেজিত নহেন। এমন কি, যাঁহারা আত্মমঙ্গল বরণ করিতেছেন না—স্ব-স্ব-দুর্দ্দৈব-ফলে ভজন-পথ হইতে ভ্রষ্ট বা পতিত হইয়া যাইতেছেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করিয়াও তিনি অধিকতর সাবধান হন এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠতম আদর্শের

পাদপদ্ম আরও অধিকতর সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করেন। সত্যানুসন্ধিৎসু অচিরকাল-মধ্যেই সেবাশোভায় সমৃদ্ধ, দুর্ব্বলতা-কপটতা-নির্ম্মুক্ত এবং গুরু-বৈষ্ণবকৃপা-প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া অভীষ্ট লাভ করেন। ছিদ্রানুসন্ধিৎসুর ন্যায় পরছিদ্র ভাবিতে ভাবিতে স্বয়ং সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ছিদ্রে পতিত না হইয়া সত্যানুসন্ধিৎসু গুরু- বৈষ্ণবের কৃপায় দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনের সুমেধা প্রাপ্ত হন এবং মায়ার সকল ছিদ্র, সকল বিঘ্ন অতিক্রম পূর্ব্বক স্বীয় হৃদয়ে উপ্ত ভক্তিলতার বীজকে সাধুসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলসেকের দ্বারা ফল-ফুলে সমৃদ্ধ করিয়া কৃষ্ণচরণ- কল্পবৃক্ষে আরোহণ করাইতে সমর্থ হন।

সুতরাং যাঁহারা আত্মমঙ্গল ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অদোষদর্শী গুরু-বৈষ্ণবের দোষ-দর্শন বা ছিদ্রানুসন্ধান করিবার অপরাধময়ী দুষ্প্রবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুরুবৈষ্ণবের প্রসাদে দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গে নিরন্তর ভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিবেন। দুঃসঙ্গে ছিদ্রানুসন্ধানের যে-সকল প্রজল্প ও গ্রাম্যকথার আলোচনা হয়, তাহা হইতে দূরে থাকিয়া সাধুসঙ্গে নিষ্কপটে শ্রবণকীর্ত্তন করিলেই আমাদের সত্যানুসন্ধিৎসা বিবর্দ্ধিত হইবে।

আমরা উপসংহারে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদের বাক্যানুসরণ করিয়া বলি,—

যে মৎসরা হতধিয়ঃ খলু তে চ দোষং পশ্যন্তু নাগমনয়ন্তু গুণং গুণজ্ঞাঃ।
আলোকয়ন্তি কিল যে চ গুণং ন দোষং তে সাধবঃ পরমমী পরিতোষয়ন্তু।।

যাঁহারা মৎসরতাক্রমে হতবুদ্ধি, তাঁহারা অবশ্য দোষ দেখিয়া থাকেন এবং গুণজ্ঞ-সকল গুণই গণনা করেন। যাঁহারা দোষ না দেখিয়া কেবল গুণ আলোচনা করেন, তাঁহারাই পরম সাধু। তাঁহারা এই প্রবন্ধে পরিতোষ লাভ করুন।

মঠপ্রবেশ ও গৃহপ্রবেশ

আমরা শুনিতেছি যে, অতি সত্বরই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী সহ গৌড়ীয়গণ নব-নির্ম্মিত শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রবেশ করিবেন। গৌড়ীয়গণ নিত্যকালই মঠে প্রবিষ্ট—কুঞ্জে প্রবিষ্ট। অগৌড়ীয়গণকে “গৌড়ীয়”-গণে প্রবেশ করাইবার জন্যই তাঁহাদের মঠ-প্রবেশের আয়োজন। জগতে দেখা যায়, মানবাদি-প্রাণিগণ ভোগসাধক সংসার পত্তন ও সংসার বিস্তার করিবার জন্য নূতন গৃহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব-সহ সেই গৃহে প্রবেশ করে। গৃহমেধীয় যজ্ঞে ইন্দ্রিয়-ভোগের তর্পণার্থই ঐরূপ “গৃহপ্রবেশ” অনুষ্ঠিত হয়। বিষয়িগণের সহিত বিষয়-কথা, প্রণয়িনীর সহিত নির্জ্জন-সংসর্গে মনোহর আলাপ, বন্ধুবর্গের সহিত নানাপ্রকার প্রজল্প ও গ্রাম্যকথা, শিশুগণের কলভাষণ ও অর্দ্ধস্ফুটোক্তি, অপস্বার্থপর বাগ্‌বিতণ্ডা ও কোলাহলপূর্ণ গৃহকেই মানব ‘ধনজনসমৃদ্ধ গৃহ’ মনে করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হয় এবং আমরণ তাহার সেবায় অভিনিবিষ্ট থাকে।
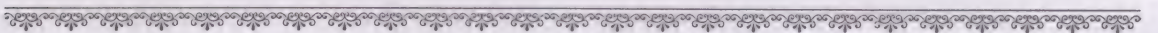
জীব যে কোন জন্মই লাভ করুক না কেন, সকল জন্মেই তাহার গৃহ-প্রবেশ- প্রবৃত্তি লক্ষিত হয়। প্রাণিগণ ব্যাঘ্রাদি-জন্মে গিরি-গহ্বরে প্রবেশ, সর্পমুষিকাদি-জন্মে মৃত্তিকা-বিবরে প্রবেশ, পক্ষ্যাদি-জন্মে কুলায়ে প্রবেশ, চটকাদি-জন্মে মানব-নির্ম্মিত সৌধাবলীর ছিদ্রে প্রবেশ, পেচকাদি-জন্মে বৃক্ষ-কোটরে প্রবেশ, পিপীলিকাদি-জন্মে ভূমি-মধ্যস্থ গর্ত্তেপ্রবেশ, কিঞ্চুলুক (কেঁচো) প্রভৃতি জন্মে মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবেশ, কুক্কুর-বিড়ালাদি-জন্মে মানবগৃহাভ্যন্তরে, চুল্লিকা-গহ্বরাদিতে প্রবেশ, মৎস্যাদি-জন্মে নদী-তড়াগাদিতে প্রবেশ, কীটাদি-জন্মে পুষ্পফলাদির অন্তরে, তণ্ডুল-গোময়াদির মধ্যে প্রবেশ, গ্রন্থবিবরে প্রবেশ, কৃমি প্রভৃতি জন্মে মানবের উদরে, শরীরে মল-মূত্রাদির অভ্যন্তরে বা আকাশের অন্তরে প্রবেশ করিয়া থাকে।

ভগবদ্‌বিমুখ প্রাণি-সকল বিভিন্ন কর্ম্মফলানুযায়ী বিভিন্ন গর্ভে প্রবেশ করে এবং কারাগার-সদৃশ বিভিন্ন গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় সুখদুঃখাদি-ত্রিতাপ ভোগ করে। কেহ সম্রাট্ হইয়া প্রাসাদেই প্রবেশ করুন, আর কেহ পিপীলিকা হইয়া মৃত্তিকাগহ্বরেই প্রবিষ্ট থাকুক, সকলেই কারাগৃহে প্রবিষ্ট বা নিক্ষিপ্ত। কর্ম্ম- ফলানুযায়ী "এ", "বি", "সি" যে শ্রেণীর কয়েদীই হউক না কেন, সকলেই কারাগৃহে প্রবিষ্ট, কেহই মুক্ত নহে। কত জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া প্রাণিগণ এইরূপ গর্ভ-প্রবেশ ও কারাগাররূপ গৃহে প্রবেশ করিতেছে, নির্দ্দিষ্ট সময় কারাগৃহ ভোগ করিবার পর আবার বর্ত্তমান ও অবশিষ্ট কর্ম্মের ফলভোগ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ কারাগৃহে নীত হইতেছে। এইরূপ একগৃহ হইতে গৃহান্তরে প্রবেশই বহির্ম্মুখ প্রাণিগণের নিত্য নিয়তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

চৌরাশী লক্ষ বা ততোধিকবার গর্ভপ্রবেশ ও গৃহপ্রবেশ করিবার পর জীবের গুরুগৃহে প্রবেশ বা মঠ-প্রবেশের বিশেষ অধিকার ও সুযোগ লাভ হয়। 'ঐ বিশেষ অধিকার ও সুযোগ' একবার হারাইলে আবার চৌরাশীলক্ষবার ক্লেশকর গর্ভপ্রবেশ ও ত্রিতাপবর্দ্ধক গৃহপ্রবেশের ঘূর্ণিপাকে পড়িতে হয়। একবার গর্ভ- প্রবেশেই জীবের কত ক্লেশ, তাহা সদ্য অনুভূতি থাকা-কালে জীব কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারে এবং আর যাহাতে পুনরায় গর্ভপ্রবেশ করিতে না হয়, তজ্জন্য প্রার্থনা করিয়া ভগবান্‌কে বলে,—"হে বিভো, অত্যন্ত দুঃখাবস্থায় এই গর্ভে প্রবিষ্ট থাকিয়াও আমার বহির্গত হইতে ইচ্ছা হইতেছে না। কেননা, বাহিরে ইহা অপেক্ষাও অন্ধকূপ গৃহ আছে। যে প্রাণীই সেখানে প্রবেশ করে, সে-ই মায়ায় আচ্ছন্ন হয়। সেই মায়ার পশ্চাৎ মিথ্যামতি অর্থাৎ দেহে অহং-বুদ্ধি এবং পুত্রকলত্রাদি-সম্বন্ধ-নিমিত্ত এই সংসার-চক্র তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। আমি এইখানেই থাকিয়া ব্যাকুলচিত্তে আপনার শরণ গ্রহণ পূর্ব্বক সংসার হইতে আত্মাকে উদ্ধার করিব। নানা গর্ভ প্রবেশ ও গৃহপ্রবেশরূপ দুঃখ পুনরায় যেন আমার না হয়। আমি নিত্যপ্রভু আপনার পাদদ্বয় সেবায় নিযুক্ত হইব।"

দশমাস-বয়স্ক জীবের সদ্য-প্রত্যক্ষ গর্ভপ্রবেশ-ক্লেশের অনুভূতি থাকায়, পাছে গর্ভ হইতে বহির্গত হইলে তাহাকে অন্ধকূপসদৃশ গৃহে প্রবেশ করিয়া বারংবার গর্ভ-প্রবেশের ঘূর্ণিপাকে পতিত হইতে হয়, এই আশঙ্কায় জীবের মাতৃকুক্ষি হইতে বহির্গত হইবার ইচ্ছাও হয় না। কিন্তু কর্ম্মফলবাধ্য জীব ভূমিষ্ঠ হইয়া 'একটু সুবিধা পাইয়াছি' মনে করায় তাহার ভগবৎস্মৃতি হারাইয়া ফেলে এবং যে কর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া তাহাকে

আবার সংসার প্রাপ্ত হইতে হইবে, দেহের জন্য সে সেই-সকল কর্ম্মেই অনুরক্ত হয়। নূতন করিয়া গৃহ-নির্ম্মাণ ও গৃহ-প্রবেশ দ্বারা সে নূতন সংসার পত্তন ও সংসার বিস্তার করিবার চেষ্টায় ধাবিত হয়। যোষিৎরূপা দেবনির্ম্মিতা মায়ার মৃগতৃষ্ণিকায় লুব্ধ হইয়া সে তৃণাবৃত অন্ধকূল- সদৃশ গৃহোপরি বিচরণ করিতে অভিলাষ করে এবং অন্ধকূপে পতিত হইয়া ত্রিতাপ ভোগ করিতে থাকে। তাপত্রয়োন্মূলক, একান্তশিবদ, বাস্তববস্তু শ্রীহরি- গুরু-ভাগবতপাদপদ্মে শরণাগতি ব্যতীত তাহার ত্রিতাপমোচনের অন্য উপায় নাই, ইহা সাধুগণের নিকট শ্রবণ না করায় অথবা ভোগোন্মুখতার সহিত শ্রবণের অভিনয় করিয়া মায়ার দ্বারা আবৃত ও বিক্ষিপ্তকর্ণ হওয়ায় জীব ত্রিতাপবর্দ্ধক দেহ-গেহকেই তাহার 'তাপশান্তিসদন' মনে করিয়া উহাদিগকেই আশ্রয় করে।

"ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে।।"

—গৃহকে "গৃহ" বলা যায় না, 'গৃহিণীই" 'গৃহ' নামে কথিত, গৃহিণীর সহিত সমস্ত পুরুষার্থ ভোগ করিবে—এই গৃহমেধীর স্মৃতির সুযোগ লইয়া গৃহপ্রবিষ্ট জীব গৃহিণী সেবা, কখনও বা অত্যধিক গৃহলাম্পট্যের পরিণাম-স্বরূপ বারনারীর নির্জ্জন-বিরচিত সম্ভোগাদিরূপ মায়া এবং কলভাষি-শিশুদিগের সুমধুর আলাপাদি দ্বারা ত্রিতাপসদন গৃহের ত্রিতাপ দূর করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু "হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়ো এবাভিবর্দ্ধতে" ন্যায়ানুসারে বিপরীতপথে ত্রিতাপ-উপশমের চেষ্টা করায় তাহার ত্রিতাপ আরও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। গৃহিণীর ভরণপোষণ প্রভৃতি চিন্তায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হয়। সেইজন্য সেই দুরাশয় মূঢ় নানা দুষ্ক্রিয়ায় আসক্ত হয় এবং তাহার মন ও ইন্দ্রিয় বিষয়ে আক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। যাহাদের পোষণে অধোগতি হয়— সাংসারিক ক্লেশ-দূরীকরণার্থ মোহান্ধ ব্যক্তি গুরুতর হিংসা দ্বারা নানাস্থান হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহাদেরই পোষণ করে। বলীবর্দ্দ বৃদ্ধ হইলে নির্দ্দয় কৃষকেরা যেরূপ আর তাহার যত্ন করে না, তদ্রূপ কলত্রাদির ভরণ-পোষণে অক্ষম হইলে পুত্রকলত্রাদিও পূর্ব্বের ন্যায় আর তাহাকে আদর করে না। কিন্তু তাহাতেও তাহার নির্ব্বেদ হয় না। তখনও পূর্ব্বপোষিত ব্যক্তিগণের কৃপাদৃষ্টির আশাবদ্ধ লইয়া গৃহেই অবস্থান করে— গৃহপালিত কুকুরের মত তাহাদের অবজ্ঞাপ্রদত্ত অবশেষ ভক্ষণের আশায় গৃহেই আবদ্ধ থাকে। যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে অশেষ যন্ত্রণা ও নরকপ্রবেশে অসহ্য ক্লেশ ভোগ করে এবং কর্ম্মফলানুসারে জন্মজন্মান্তর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ বার গর্ভপ্রবেশ ও গৃহপ্রবেশ করিয়া ঘুরিতে থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেবহূতিনন্দন ভগবান্ কপিলদেব গৃহপ্রবিষ্ট ব্যক্তির এইরূপ ক্লেশের কথা বলিয়াছেন।

এইজন্য প্রহ্লাদ অসুরগৃহে আবির্ভাবের লীলা প্রকাশ করিয়া যে-সকল বালক তখনও অসুরগৃহে প্রবিষ্ট হয় নাই, তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন,—"হে বালকগণ, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কৌমার-কালেই ভাগবত-ধর্ম্ম আচরণ করিবেন।" কেন না, তখনও তাহারা অদৈবগৃহে প্রবেশ করে নাই। তাহাদের মতি বিশেষ সুকুমার ও কমনীয় থাকায় সহজেই তাহারা ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইতে পারে। "কৌমারকালে গুরুগৃহে প্রবেশ করিয়া তোমরা অসুর-গৃহে প্রবেশ-প্রবৃত্তির ছেদন কর—ষণ্ডামর্কের ন্যায় অসুরগুরু

নামধারিগণের গৃহেও তোমাদের প্রবেশের আবশ্যকতা নাই। আমি যখন মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট ছিলাম, তখন জগদ্গুরু শ্রীনারদের নিকট এই উপদেশই পাইয়াছি যে, আত্মার অধঃপতনের কারণ অন্ধকূপ-সদৃশ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বনে প্রবেশপূর্ব্বক ভগবানে শ্রীহরির আশ্রয়- গ্রহণই সর্ব্বোত্তম। কারণ, কোষকার কীট যেরূপ নিজেই নিজের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া আপনার বহির্গমনের জন্যও দ্বার রাখে না, তদ্রূপ ভোগময় গৃহে প্রবিষ্ট পুরুষও আত্মার মুক্তির দ্বারটী চিরতরে অর্গলরুদ্ধ করিয়া দেয়। অধিক কি, বিদ্বান্ ব্যক্তিও গৃহাদিতে প্রবিষ্ট ও অভিনিবিষ্ট হইয়া কুটুম্বপালনে রত থাকিলে আত্মসাক্ষাৎকারে সমর্থ হন না। অতএব হে বালকগণ, তোমরা বিষয়াত্মক দৈত্যগণের দেহগেহসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নারায়ণ-পরায়ণ জনগণের গৃহে ও গণে প্রবেশ কর।"

আমাদিগকে অদৈব-গুরুগৃহ, অদৈব গৌড়ীয়ব্রুব-গৃহ অগৌড়ীয়-গৃহ, অদৈব-গণে প্রবেশ-প্রবৃত্তি হইতে উদ্ধার করিয়া গুরুগৃহে, গৌড়ীয়-গৃহে ও 'গৌড়ীয়'-গণে প্রবেশ করাইবার জন্যই পরম কারুণিক, অশেষ-পরদুঃখদুঃখী আচার্য্যবর্য্য শ্রীগৌড়ীয়-মঠ-প্রবেশের আয়োজন করিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, প্রত্যেক প্রাণীরই গৃহ প্রবেশ-প্রবৃত্তি নৈসর্গিক। চৌরাশি লক্ষ বার গর্ভ প্রবেশের পর জীবের প্রয়োজন-সাধক মানবগৃহে জন্ম হয়। অন্যান্য ইতর প্রাণী অপেক্ষা মানব সর্ব্বতোভাবে অধিকতর বুদ্ধিমান ও শ্রেষ্ঠ। গৃহ-প্রবেশ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই পক্ষী কূলায় নির্ম্মাণ করে, মুষিক গর্ত্ত খনন করে, ব্যাঘ্রাদি-প্রাণী গিরিগহ্বর আশ্রয় করে, পিপীলিকা ছিদ্র অনুসন্ধান করে। মানবের বুদ্ধি, বিচার, মেধা, প্রতিভা, নৈপুণ্য যখন ভোগোন্মুখ থাকে, তখন সে তাহার যাবতীয় শক্তিকে পরিণামে দুঃখদায়ক আত্মবিনাশকর সাময়িক ভোগাহরণেই নিযুক্ত করে। সুদৃঢ় গৃহে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সহিত প্রবিষ্ট থাকিয়া ভোগ আহরণ-জন্য মানবের প্রতিভা, বিদ্যা, বুদ্ধি কত প্রকারই না শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করে। তখন বনবাসে সন্তুষ্ট না থাকিয়া গ্রামবাস, গ্রামবাসেও সন্তুষ্ট না থাকিয়া মহানগরী প্রভৃতিতে দ্যুতসদনে বাস করিবার জন্য পর্ণকুটীর, মৃণ্ময় কুটীর প্রভৃতি পরিত্যাগপূর্ব্বক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করে, একতলা গৃহে সন্তুষ্ট না থাকিয়া, দ্বিতল, ত্রিতল, ক্রমে শত-শত-তল গৃহনির্ম্মাণের প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়া দেয়।

চৌরাশি লক্ষ বা ততোধিকবার গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াও জীবের গৃহনির্ম্মাণ ও গৃহ-প্রবেশের পিপাসার তৃপ্তি হয় নাই; তাই মানবজন্ম-প্রবেশে অন্যান্য জন্ম অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে অধিকতর বুদ্ধিমত্তা ও নৈপুণ্য লাভ করিয়া সেই বুদ্ধি ও নৈপুণ্যকে পুনরায় নিজ গৃহবাস-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই নিযুক্ত করে। স্থুল-তুষাবঘাতী ভোগী জীবের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়া ভগবান্ ১৮৯৭, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে প্রবল ভূমিকম্প প্রেরণ করেন, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে পেগুর ভূমিকম্পে শত শত সুদৃঢ় সৌধের পরিণতি প্রদর্শন করেন, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে বিভিন্ন স্থানে পুনঃ পুনঃ ভূমিকম্পের দ্বারা মানবের ভোগনৈপুণ্যের—মানবের গৃহবাস-চেষ্টার কতটুকু মূল্য, সুদৃঢ়ত্ব বা নিত্যত্ব আছে, তাহা "নাড়াচাড়া" দিয়া দেখাইয়া দেন। তথাপি মানবের গৃহ-প্রবেশ-প্রবৃত্তি বিদূরিত হয় না—ভোগোন্মুখ চিত্ত নব উদ্ভাসিত উপায়ে কিরূপে গৃহ-নির্ম্মাণ

ও গৃহপ্রবেশ করিবে, তজ্জনই কৌশল আবিষ্কার করিতে থাকে; কিন্তু আত্মভোগার্থ যাবতীয় কৌশলই যে স্থূল- তুষাবঘাত মাত্র, তাহা মায়া বিমোহিত চিত্ত বুঝিতে পারে না। কৃপাময় ভগবান্ আবার অন্য প্রকার উৎপাত দ্বারা তাহা স্মরণ করাইয়া দেন।

সাম্প্রদায়িক কলহে ঢাকার সুদৃশ্য ও সুদৃঢ় সৌধাবলীর অগ্ন্যুৎসব, গৃহপ্রবিষ্ট ব্যক্তিগণের নানাপ্রকার গৃহারামতা ও গৃহশান্তি ভঙ্গ প্রভৃতিও গৃহপ্রবেশে আত্যন্তিক নির্ব্বেদ আনয়ন করিয়া নিত্য গৃহ বা মঠ প্রবেশের রতি উদয় করায় না। ইহারই নাম দৈবী মায়া! "সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু, অনলে পুড়িয়া গেল।" কিন্তু মঠ-প্রবেশের প্রবৃত্তি কোথায়?

ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর অনেক লোকের মুখে শুনা যাইতেছে যে, তাঁহারা আর ঢাকায় গৃহ নির্ম্মাণ করিবেন না—ঢাকার গৃহে বাস করিবেন না, কিন্তু কৈ গৃহ-প্রবেশ প্রবৃত্তি ত' কাহারও দূর হইতেছে না—মঠ-প্রবেশ-প্রবৃত্তি ত' জাগরূক হইতেছে না। 'এস্থানে সাময়িক উৎপাত দেখিতেছি, সুতরাং এই স্থানের গৃহে প্রবেশ না করিয়া অন্য স্থানের গৃহে প্রবেশ করিব'—এই বুদ্ধির বিশেষ প্রশংসা করা যায় না। কারণ, যেখানেই যাই না কেন—যেস্থানের গৃহেই প্রবিষ্ট হই না কেন, "পলাইবার পথ নাই, যম আছে পিছে।" সুতরাং 'নিত্য-গৃহ- প্রবেশের শিক্ষা-মন্দির মঠে প্রবেশ করিব'—এই সঙ্কল্পই যথার্থ বুদ্ধিমত্তা।

যাহারা পদ্মার তীরে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে, তাহাদের বোধ হয় গৃহ-প্রবেশ-প্রবৃত্তি অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! 'কীর্ত্তিনাশা' পদ্মা যেমন তাঁহাদের এক গৃহ গ্রাস করিতেছেন, তাঁহারা অমনি দূরে সরিয়া গিয়া পদ্মারই পারে আবার নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছেন এবং গৃহে প্রবেশ করিতেছেন, এইরূপ ক্রমাগত গৃহ ভাঙ্গিতেছে, তাঁহারাও আবার নূতন করিয়া গড়িতেছেন, তথপি গৃহপ্রবেশ-প্রবৃত্তিতে আত্যন্তিক নির্ব্বেদ আসিতেছে না।

অনেকে মনে করেন, গৃহের ন্যায় 'মঠ ও ত' ধ্বংসশীল; ভূমিকম্পে মঠ ও ভূমিসাৎ হয়, মন্দিরও ভগ্ন হয়। সুতরাং গৃহ পরিত্যাগ করিয়া মঠ-প্রবেশের সার্থকতা কি?

মঠ ধ্বংসশীল নহে। মঠের বাহ্য দর্শন—ইট-পাটকেল দর্শন মঠ-দর্শন নহে—ইট-পাটকেলের অভ্যন্তরে প্রবেশও মঠপ্রবেশ নহে। যাহারা মঠকে ইট-পাটকেলের স্তূপ মনে করিযা গৃহের ন্যায় ভোগবুদ্ধিতে তাহাতে প্রবিষ্ট হয়, তাহারা ন্যূনাধিক গৃহেই প্রবেশ করিয়া থাকে। মঠ অনিত্য জগতে নিত্য বৈকুণ্ঠ-নিকেতন; গুণময় জগতে নির্গুণ বাস। মঠ সর্ব্বক্ষণ চেতন-কথায় মুখরিত। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর প্লাবন-ক্ষেত্র।

'গৃহ-প্রবেশ' ও 'মঠ-প্রবেশ' এক নহে। গৃহ-প্রবেশ করিলে জন্ম-প্রবেশের—অন্ধকূপ-প্রবেশের আবর্ত্তে পতিত হইতে হয়। আর মঠ প্রবেশ করিলে সৎসঙ্গে, সৎপ্রসঙ্গে প্রবেশ হয়, তাহা হইতে ক্রমে ভগবন্নামে প্রবেশ, ভগবদ্রূপে প্রবেশ, ভগবদ্‌গুণে-প্রবেশ, ভগবৎপরিকর-বৈশিষ্ট্যে প্রবেশ ও ভগবল্লীলায় প্রবেশাধিকার হয়। গৃহ-প্রবেশে 'আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা'—এই বিমূঢ় অভিমান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়—পুরুষাভিমান

পরিবর্দ্ধিত হয়, আর মঠ-প্রবেশে 'আমি গুরুদাস', 'আমি বৈষ্ণব-কিঙ্কর'—এই স্বরূপাভিমান পরিস্ফুট হয়। গৃহ-প্রবেশের অস্মিতায় আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ বা ভুক্তি, আর মঠ-প্রবেশের অস্মিতায় কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণ বা সেবা। গৃহ প্রবিষ্ট পুরুষের ইতরবিষয়-কথা, গ্রাম্যবার্ত্তায় রুচি বর্দ্ধিত হয়, ষড়বেগের কৈঙ্কর্য্য ও মৃত্যু লাভ হয়, আর মঠ-প্রবিষ্ট পুরুষের অদ্বিতীয় পরম বিষয় কৃষ্ণের কথা, কৃষ্ণের বার্ত্তায় রুচি সম্বর্দ্ধিত হয়, গোস্বামিত্ব ও অমরত্ব লাভ হয়। গৃহপ্রবেশে দেহ-দ্রবিণ-সুহৃৎ প্রভৃতির জন্য ভয়, শোক, স্পৃহা, পরিভব প্রভৃতিই কেবল বর্দ্ধিত হইতে থাকে, আর মঠ-প্রবেশে জীব অশোক-অভয়- অমৃতের সেবায় নিত্য নবনবায়মানভাবে লৌল্য-বিশিষ্ট হয়। গৃহপ্রবিষ্ট ব্যক্তি প্রকৃতির দ্বারা ক্রিয়মাণ হইয়া অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা, আর "সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" শিক্ষায় দীক্ষিত মঠপ্রবিষ্ট ব্যক্তি হরি-গুরু-বৈষ্ণবের শরণাগত। গৃহ-প্রবিষ্ট ব্যক্তি পাপপুণ্যের ফলভোগী, আর মঠ-প্রবিষ্ট ব্যক্তি পাপ-পুণ্যাতীত ভগবৎ-সেবক। গৃহ-প্রবেশে জড়-সম্ভোগপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি হয়, আর মঠ-প্রবেশে কৃষ্ণানুসন্ধান-বৃত্তি সমৃদ্ধ হইয়া থাকে। গৃহ-প্রবিষ্ট ব্যক্তি কর্ম্মফল বাধ্য অনিত্য 'গুরু' নাম ধারিগণের সেবকাভিমানী, আর মঠ-প্রবিষ্ট পুরুষ কর্ম্ম ফলাতীত পরম-মুক্ত নিত্য গুরুদেব ও নিত্য বৈষ্ণববর্গের বাস্তব সেবক। গৃহ-প্রবেশে হৃদয় সঙ্কীর্ণ, জড়তাচ্ছন্ন, মৎসরতাপূর্ণ, অশান্ত ও সংসারদাবানল দগ্ধ হয়, আর মঠ-প্রবেশে চেতন বিস্তৃত, পরমোদার, নির্ম্মৎসর, পরম সুশান্ত ও ভগবৎ সেবোৎসবময় হইতে থাকে। উহা ক্লাবে বা মিলন-মন্দিরে বসিয়া ক্ষণিক ইন্দ্রিয়-সুখলাভেচ্ছায় সঙ্গীত-শ্রবণমাত্র নহে। ঐ সকল মিলন-মন্দিরের চেষ্টা গৃহপ্রবেশ-বৃত্তিরই রুচিবর্দ্ধিণী বা গৃহব্রত-ধর্ম্মের একঘেয়ে ভাবের সাময়িক নিবৃত্তি করিয়া গৃহ প্রবেশেই অধিকতর নূতন উত্তেজনাদায়িনী।

আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি, গৃহ-প্রবেশ প্রবৃত্তি প্রাণি মাত্রেরই স্বাভাবিক। স্বভাবকে উচ্ছেদ করা যায় না, উচ্ছেদ করিলে বিপরীত ফল ফলে। যাহারা গৃহ প্রবেশকে কেবল নিষেধ করেন, তাঁহারা একদেশদর্শী। তাঁহাদের অতন্নিরসনপর একদেশীয় বিচারে প্রধাবিত হইয়া অনেকে গৃহাদি পরিত্যাগ করিয়া হিমালয়-গহ্বর আশ্রয় করে। গৃহ-পরিত্যাগের সহিত তাহাদের ভগবৎ-সেবা পরিত্যাগের দুর্ব্বুদ্ধি উদিত হওয়ায়, তাহারা হিমালয়-গহ্বরে প্রবেশ করিয়া দ্বিতীয় প্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণপর গৃহেই প্রবেশ করে, কেহ বা অচিরেই 'গীতার গৃহ' বা 'গীতার সংসার' পাতাইয়া বসে।

বিশ্বমানবের—বিশ্বপ্রাণীর এই নিসর্গকে অর্থাৎ গৃহ প্রবেশ প্রবৃত্তিকে স্বরূপে বা নিত্য-স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অহৈতুক-কৃপাময় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ভগবদ্‌গৃহ নির্ম্মাণ ও ভগবদ্ গৃহ প্রবেশের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মানব ভগবদ্‌গৃহে প্রবিষ্ট হইলে—ভগবদ্‌গৃহের প্রতি মানবের আসক্তি ও আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে অনায়াসেই মানবের ত্রিতাপক্লেশাগার অন্ধকূপ-সদৃশ ভোগময় গৃহ-প্রবেশের আসক্তি ও আকাঙ্ক্ষা বিদূরিত হইবে। মানবের যে-পর্য্যন্ত গুরুগৃহে—ভগবদ্‌গৃহে—ভাগবত-গৃহে আসক্তি না হয়, সে-পর্য্যন্তই মানব ক্লেশকর ভোগময়-গৃহে আবদ্ধ থাকে। ভগবদ্‌গৃহ—গুরুগৃহের প্রতি "আটা" বা আসক্তি জন্মিলে আর ভোগসদন-গৃহে প্রবেশ করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ-মালায়

প্রবেশ করিতে হয় না। গুরুগৃহ বা ভগবদ্-গৃহের একজন নিষ্কপট 'পাল্য' অভিমান উপস্থিত হইলে আমাদের আর অপর ভোগময় গৃহ প্রবেশের রুচি থাকে না।

মানব গৃহ-প্রবেশ করিয়া সংসার পত্তন ও সংসার বিস্তার করে, তাহাতে তাহার সংসারাসক্তিই বৃদ্ধি হয়। মদীয় আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিশ্বমানবকে শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রবেশে আহ্বান করিয়া কৃষ্ণ-সংসার পত্তন, কৃষ্ণ-সংসার বিস্তার ও কৃষ্ণ-সংসারাসক্তি পরিবর্দ্ধনের সহজ পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। কৃষ্ণ-সংসার পত্তনে ভগবৎসেবার আনুকূল্য-বিচারের ভিত্তি সংস্থাপিত হয়, কৃষ্ণ-সংসার-বিস্তারে ভগবৎ-সেবক সংখ্যা অর্থাৎ কীর্ত্তনকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়—বহুলোক একত্রে হরিকীর্ত্তন করিতে পারেন—"বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং তদেব সঙ্কীর্ত্তনম্"—এই গৌরবাণীর বিস্তার হয়, আর কৃষ্ণ-সংসারাসক্তি-পরিবর্দ্ধনে কৃষ্ণপ্রীতিরূপ প্রয়োজনের পথে জীব অগ্রসর হয়।

গৃহে প্রবেশ করিয়া মানব গৃহিনীর কর ধারণ-পূর্ব্বক গৃহমেধের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে গৃহব্রত হইয়া পড়ে, আর মঠ-প্রবেশ করিয়া মানব সাধুসঙ্গের চতুর্দ্দিকে—কীর্ত্তন-যজ্ঞদেবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে সুদৃঢ় কৃষ্ণব্রত হইয়া শ্রীধাম-পরিক্রমা করেন। কূপে প্রবিষ্ট হইয়া কূমণ্ডুক যেরূপ সঙ্কীর্ণ কূপকেই জগতের মধ্যে 'একমাত্র বস্তু' বলিয়া বিবেচনা করে, তদ্রূপ গৃহান্ধকূপে প্রবিষ্ট ব্যক্তিও গৃহ আশ্রয় করিয়া পরিণামে দুঃখকর সঙ্কীর্ণ গ্রাম্যসুখসাধক গৃহকেই জগতের মধ্যে 'সারাৎসার' বলিয়া কল্পনা করে। অশেষ সুকৃতি-ফলে সাধুকৃপায় জীব শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত হইয়া গৃহকূপ হইতে শ্রীগৌড়ীয়-মঠ-প্রবেশ করিলে যাবতীয় কুণ্ঠাধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠ-সম্পৎ দর্শন করিতে পারেন, সঙ্কীর্ণা স্ত্রীপুত্রাদি-কথা, তপস্যা ব্রত, নির্ব্বেদ-জ্ঞান, যোগাদির কথা পরিত্যাগপূর্ব্বক বিশ্বের যাবতীয় কথার সহিত তুলনামূলক বিচারে হরিকথার পরমৌদার্য্যময় স্থায়িভাব লক্ষ্য করিতে পারেন।

মঠ-মন্দির-নির্ম্মাণাড়ম্বর—ভক্তিপ্রতিকূল, যদি মঠমন্দিরাদি কেবল আত্মম্ভরিতা প্রদর্শন বা বিষয়ীর বিষয়প্রদর্শনী হয়; শ্রীগৌড়ীয় মঠ সেইরূপ বিষয়ীর কুবিষয়- স্তম্ভ নহে—শ্রীগৌড়ীয় মঠ বৈকুণ্ঠ-কীর্ত্তনের অবতার-পীঠ শ্রীচৈতন্য-বাণী-দ্বারা অনুক্ষণ মুখরিত।

যে অতিমর্ত্ত্যশক্তিশালী মহাপুরুষ কলিহত জীবগণের গৃহ-প্রবেশ-প্রবৃত্তি, গৃহবাস-প্রবৃত্তি, গৃহব্রত-বৃত্তি প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া তাহাদের ঐরূপ বিকৃত প্রবৃত্তিকে অবিকৃত স্বভাবে আনয়নের জন্য মঠাদি স্থাপন ও নির্ম্মাণ করাইয়া "এককার্য্যে কার্য্য পাঁচ সাত করেন"—একদিকে বিষয়ীর বিচারকে—বিষয়ীর নিজ ভোগাস্পদ-গৃহ-নির্ম্মাণ-প্রবৃত্তিকে সঙ্কীর্ত্তন-গৃহ নির্ম্মাণে নিয়োজিত করেন,—প্রাণিমাত্রের গৃহবাস-প্রবৃত্তি ও গৃহ-প্রবেশ-প্রবৃত্তিকে ভগবদ্গৃহ-প্রবেশ প্রবৃত্তিতে—স্বরূপগত স্বভাবে পরিবর্ত্তন করেন—মানবকে মৃত্যু-গহ্বরে প্রবেশ, জন্মজন্মান্তরের ত্রিতাপজনক কারাগৃহে প্রবেশ-চেষ্টা হইতে রক্ষা করিয়া তাহার নিত্য-গৃহে—গোলোক-গৃহে প্রবেশের পথ প্রদর্শন করেন—তাহাকে ভগবন্নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্যে প্রবেশের সুযোগ প্রদান করেন, সেই আচার্য্যবর্য্যের মঠ-মন্দিরাদি-স্থাপন জীবে কত বড় অহৈতুক-

দয়ার সাক্ষ্য—কত বড় পরদুঃখ কাতরতার নিদর্শন—জীবকুলকে চরম-স্বাধীনতা দান বিতরণের অবধি, তাহা স্বস্থচিত্তে আলোচ্য।

যাঁহারা মঠপ্রবেশ করিয়াছেন, করেন বা করিবেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে যে, জগতের যাবতীয় গৃহগুলিকে ঘৃণা করা। ঘৃণা করা বৈষ্ণবের ধর্ম্ম নহে, উহা ফল্গুত্যাগীর ধর্ম্ম। প্রত্যেক বিষয়কে স্বভাবে বা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করা—ভগবৎসেবার অনুকূল করাই বৈষ্ণবের ধর্ম্ম। প্রত্যেক গৃহ কিরূপে ভগবন্নিকেতন হইতে পারে, প্রত্যেক গৃহ কিরূপে আত্মভোগপর 'গৃহ' বিচার হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধ কৃষ্ণকীর্ত্তনগৃহ বা গোলোকের প্রতীতিপূর্ণ হইতে পারে, সেই বিজ্ঞান-বিস্তারের জন্যই গৌড়ীয়গণ মঠ প্রবেশ করেন। গৃহব্রতগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া গৃহকে কাম-ক্রোধাদি ষড়্‌রিপুর তাণ্ডব-নৃত্যের স্থানে পরিণত করে। তাহারা স্বয়ং ষড়্‌রিপুর ক্রীড়াগোলক হইয়া পড়ে—অপস্বার্থপীড়িত হইয়া অপর গৃহের সহিত নিজগৃহের ভেদ স্থাপন পূর্ব্বক পরস্পর হিংসা, দ্বেষ-বিদ্বেষ ও অশান্তির নিকেতন নির্ম্মাণ করে। তাহাদের আরোপিত 'শান্তি-নিকেতন' অশান্তি নিকেতনই হইয়া পড়ে, ''বীতশোক-বাটিকা'' শোকাগার হয়, 'বিশ্রাম-কুটীর' পণ্ডশ্রমের কারাগৃহ হয়, ''অমৃত-ধাম'' মৃতের আগার হইয়া পড়ে। এইরূপ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভোগময় বিচারপূর্ণ গৃহ লইয়া জগতে যে সমাজ সৃষ্টি হইয়াছে, হইতেছে বা হইবে, তাহাতে কেবল জগন্নাশকর কার্য্যই বিস্তৃত হইবে। জগতের যতগুলি মহাসমর অনুষ্ঠিত হইয়াছে, যেখানে যেখানে রাজা প্রজার মধ্যে বিবাদ সংঘর্ষ ও তথাকথিত সভ্যতার মধ্যে নানা প্রকার সমস্যা নিত্য নূতন আকারে দেখা যাইতেছে, তাহার মূলে ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহপ্রবেশ-প্রবৃত্তি। এই বিরাট্ সমষ্টিগত জগন্নাশকর প্লাবন হইতে লোকদিগকে উদ্ধার করিয়া অমৃতের রাজ্যে প্রবেশ—ভগবৎসেবায় প্রবেশ করাইবার জন্যই আজ পরদুঃখ-দুঃখী আচার্য্যবর্য্যের বিশ্বমানবকে শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রবেশের আহ্বান।

আমাদিগকে এই আহ্বানে সাড়া দিতে হইবে—গৌড়ীয়গণের অনুব্রজ্যায় শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রবেশ করিতে হইবে। মঠপ্রবেশের অভিনয় করিলে হইবে না—সত্য সত্য মঠে প্রবেশ করিতে হইবে। অভিনয় ও আন্তরিকতা এক নহে। যাঁহারা মঠ প্রবেশের অভিনয়মাত্র করেন—নিজ ভোগোন্মুখ স্বতন্ত্রতা সংরক্ষণ করিতে চাহেন—তাঁহারা আবার গৃহপ্রবেশ করিয়া ফেলিবেন। মঠ-প্রবেশ বা গুরু গৃহে প্রবেশ করিয়া নিরন্তর গুরুবৈষ্ণবানুগত্যে হরিগুরু বৈষ্ণবের সেবায়ই অভিনিবিষ্ট থাকিতে হইবে। মঠপ্রবেশের অভিনয় করিয়া নিজের অপস্বার্থের পৃথক্ তহবিল, পৃথক্ ভোগময় বিচার, পৃথক্ অস্মিতা, পৃথক্ গতি, পৃথক্ আশা-আকাঙ্ক্ষা রাখিলে মঠ প্রবেশ হইল না। গৌড়ীয়েশ্বর স্বরূপরূপানুগবর শ্রীশ্রীগুরুদেব—মঠাধীশ। সেই মঠাধীশবরের সেবা—আচার্য্যের সেবা মুহূর্ত্তের জন্য পরিত্যাগ করিলে যিনি যত বড়ই হউন না কেন—যত কৃচ্ছ্রসাধ্য সাধন করিয়াই উন্নত পদবী লাভ করুন না কেন—

আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ।।

কারণ—

"জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ।।"
"জীবন্মুক্তাঃ প্রপদ্যন্তে ক্বচিৎ সংসারবাসনাম্।।"

নিষ্কপট মঠ প্রবেশ না হইলে মায়াপ্রবেশ বা গৃহপ্রবেশ হইয়াই যাইবে। কপটগণের নিষ্কপট হইবার একমাত্র মহৌষধ—গুরুবৈষ্ণবের আজ্ঞানুবর্ত্তিতা। রোগীর সুস্থ হইবার একমাত্র উপায়—সদ্বৈদ্যের উপদেশানুসরণ, নিজের রুচির অনুকূলে ধাবিত হওয়া নহে।

যাঁহারা নিষ্কপটে শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রবেশ করেন অর্থাৎ শ্রীগুরুসেবায় প্রবিষ্ট হন—শ্রবণকীর্ত্তনে প্রবিষ্ট হন, তাঁহারা অচিরেই শ্রীনামে প্রবেশ, শ্রীরূপে প্রবেশ, শ্রীগুণে প্রবেশ, শ্রীপরিকরবৈশিষ্ট্যে প্রবেশ ও শ্রীলীলায় প্রবেশ করিয়া কৃতকৃতার্থ হন—ইহা সুনিশ্চিত ও একান্ত বাস্তব সত্য। এইরূপ ভাবে শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রবিষ্ট হইলে তিনি আর নিজ নিত্যনিকেতনের সেবা-সুখ ছাড়িয়া বৃথা পরিভ্রমণের জন্য—পণ্ড-পরিশ্রমের জন্য অন্য গৃহে প্রবেশ করিতে চাহেন না,—

"ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদ মূলং ন মুঞ্চতি।
মুক্তসর্ব্বপরিক্লেশঃ পান্থঃ স্বশরণং যথা।।"

পান্থ যেরূপ প্রবাস হইতে আগত হইয়া নিজগৃহে একবার প্রবিষ্ট হইলে আর নিজ গৃহসুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র যাইবার ইচ্ছা করে না, তদ্রূপ জন্ম জন্মান্তর-সংসার-ভ্রমণকারী পুরুষ বহু ভাগ্যফলে শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রবিষ্ট হইয়া নিরন্তর শ্রীচৈতন্য-বাণী শ্রবণ করিতে করিতে যখন ধৌতাত্মা ও সংস্কৃত হন, তখন আর কিছুতেই নিজ-নিত্যগৃহ মঠের সেবাসুখ অর্থাৎ কৃষ্ণপাদমূল পরিত্যাগ করেন না।

তিনি তখন স্বরূপরূপানুগবর শ্রীগুরুদেবে সেবাবিষ্টমতি ও তাঁহার কৃপায় সিদ্ধি লাভ করিয়া দশমস্কন্ধের গোপীগণের উক্তি অনুকীর্ত্তন করিতে করিতে বলিতে পারেন,—

"আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ।।"

হে কৃষ্ণ, আমরা গৃহপ্রবিষ্ট—আমরা সহজ গৃহধর্ম্ম পরায়ণ—তোমাকে লইয়াই আমাদের গৃহ-সংসার। কাজেই যোগিগণের ন্যায় কৃত্রিমভাবে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে কৃত্রিমধ্যানের বিষয় করিবার অভিলাষ আমাদের নাই। আমরা তোমার বিরহসিন্ধুতে নিমগ্ন, তোমার গৃহের সুখ ছাড়িয়া আমাদের অন্যত্র যাইবার আদৌ সাধ নাই—তুমি কেবল তোমার নিজ গৃহে তোমার পাদপদ্ম উদয় করাও।" মুক্ত ভগবৎসেবকগণ কৃষ্ণকে এইরূপ পূর্ণভাবে পাইয়াও অধিকতর গাঢ়প্রীতিতে অভিনিবিষ্ট হন। এইরূপ মুক্ত গৃহস্থগণের গৃহদেবতা—কৃষ্ণ; তিনিই একমাত্র পুরুষ। মুক্তগৃহিগণের পুরুষাভিমান নাই, তাঁহারা স্বরূপাভিমানে নিত্য নবনবায়মান প্রগাঢ়প্রীতিতে ভগবৎসেবায় নিবিষ্ট। শ্রীগৌড়ীয়মঠপ্রবেশ ও শ্রীগৌড়ীয়-মঠ-সেবাই আমাদের সহজ ধর্ম্ম। যতদিন পর্য্যন্ত না তাহা সহজ হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের পূর্ণ মঙ্গল নাই। মঠ- প্রবেশ ও মঠসেবাকে সহজ করবিার জন্যই আবার নূতন করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রবেশের আয়োজন। দশ-বার বৎসর

পূর্ব্বেই ত' শ্রীগৌড়ীয় মঠপ্রবেশ হইয়াছে—গৃহপ্রবেশ করিতে যাইয়া আচার্য্যের অতিমর্ত্ত্য কৃপায় তাহা মঠ-প্রবেশ হইয়া গিয়াছিল, এখন আর 'গৃহ' নাই—'গৃহ' মঠে পর্য্যবসিত। শ্রীগৌড়ীয়মঠের সূত্রপাতের ইতিহাসেই আমরা আচার্য্যের এইরূপ অহৈতুকী কৃপার সাক্ষ্য পাই।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ আজ বিস্তৃত বিশ্বে প্রচারিত। শ্রীমঠপ্রবেশের উদ্দেশ্য যাহাতে আমরা বিস্মৃত না হই—শ্রীমঠপ্রবেশকে যাহাতে আমরা ভোগময় গৃহ-প্রবেশের সহিত 'এক' মনে না করি, আর বিশ্বের সকলেই যাহাতে মঠ প্রবেশে রুচিবিশিষ্ট হয়, তজ্জন্যই বোধ হয় পরম কারুণিক আচার্য্যবর্য্য প্রভুপাদ আবার নূতন উৎসাহ—নূতন প্রেরণা—নূতন আশাবন্ধ সঞ্চারিত করিয়া 'নূতন করিয়া' মঠ-প্রবেশের জন্য সকলকে আহ্বান করিতেছেন।

আচার্য্যের আহ্বানে আমরা যেন নিষ্কপট সাড়া দিতে পারি। আমরা যেন গৌড়ীয়গণের সঙ্গে গুর্ব্বানুগত্যে মঠ প্রবেশ করিতে পারি। আমরা যেন গৌড়ীয়গণে প্রবিষ্ট ও গৌড়ীয়-মঠের পাল্য হইয়া গৌড়ীয়মঠের সেবাকেই জীবনমরণে ব্রত করিতে পারি। সকলে শ্রীগৌড়ীয়-মঠ প্রবেশোৎসবে যোগদান করুন।

গৌড়ীয়

[১৯৩০-৩১ খৃষ্টাব্দ, ১৩৩৭-৩৮ বঙ্গাব্দ]

আত্মার স্বাস্থ্যেই দেহ-মনের স্বাস্থ্য

—এই সত্য-বাণীটী আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়ের নিকট অভিনব মনে হয়। অনেক সময় তাঁহারা এ কথাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করেন। ইহা তাঁহাদের পক্ষে আশ্চর্য্য নহে; কারণ, দেহ ও মনরূপ কর্ম্মচারীদ্বয় যখন ঘুমন্ত মনিব আত্মাকে ঠকাইয়া নিজেরাই তাঁহার সকল সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করে, তখন তাহারা জগতের রঙ্গক্ষেত্রে কখনও বা আত্মার পাত্রত্বের নকল অভিনয় করে, কখনও বা আত্মার কথা একেবারে চাপা দিয়া অনাত্মার একচ্ছত্র-সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া ফেলে। তখন মনে হয়, দেহ-মনের পরিচর্য্যা—দেহ-মনের তর্পণ করিলেই আত্মার তর্পণ হইবে, কিম্বা দেহ-মনের তর্পণ পর্য্যন্তই মানবের আশা-আকাঙ্ক্ষার শেষ গতি।

পরমার্থ-পথের দ্বারে আসিয়াও আমরা অনেক সময় মনে করি, সর্ব্বাগ্রে দেহ-মনের পরিচর্য্যা করাই কর্ত্তব্য; বহির্ম্মুখ মনের যে দিকে রুচি অর্থাৎ যাহা প্রেয়ঃ, বহির্ম্মুখ দেহের যেদিকে গতি বা আকর্ষণ, তদনুকূলে না চলিলে কিছুতেই চিত্তের স্থৈর্য্য লাভ হইবে না। সুতরাং বহির্ম্মুখ মনের রুচির গোলামী করিয়া—বহির্ম্মুখ দেহের আকৃষ্টির কৃষ্টি সাধন করিয়া আমরা আত্মার পথে অগ্রসর হইব। এখানেও কিন্তু দেহ-মন মনিব-আত্মার স্বার্থে ব্যাঘাত উপস্থিত করিয়া তাহাদের পৃথক্ অপস্বার্থ সাধনের জন্য ঐরূপ ফাঁকি দিয়া থাকে।
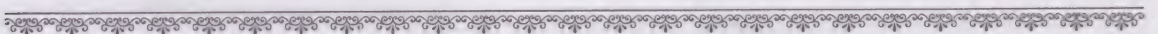
পরমার্থ-পথে চলিতে চলিতে অনেক সময় আমাদের মন বিমর্ষ, চঞ্চলতাগ্রস্ত, উৎসাহ-হীন, মৎসরতাপূর্ণ এবং দেহ ইতর-বিষয়ে ধাবিত কিম্বা অসুস্থ বলিয়া বিবেচিত হয়। অনেক সময়ই আমরা এই দেহ-মনের অস্বাস্থ্যের প্রকৃত নিদান অনুসন্ধান না করিয়া উহাদের বাহ্য-কারণকেই 'মূল কারণ' বলিয়া সাধারণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করি। কিন্তু যখন বৈষ্ণব-বৈদ্যরাজ—আমাদের অন্তর্দ্দর্শী চিকিৎসকরূপে আমাদের অনর্থময় শরীরের ব্যবচ্ছেদ করিয়া ঐরূপ প্রতীয়মান অস্বাস্থ্যের নিদানটী আমাদের নিকট ধরিয়া দেন, তখন আমরা দেখিতে পারি, দেহ-মন আত্মাকে বঞ্চনা করিবার জন্য ঐরূপ অস্বাস্থ্যের ছদ্ম গ্রহণ করিয়াছে। আত্মার অনুশীলনে—আত্মার উদ্যম ও উৎসাহে জাড্য আনিবার অভিসন্ধিমূলে ঐরূপ অস্বাস্থ্যের অবগুণ্ঠন আকৃষ্ট হইয়াছে। ঐ অস্বাস্থ্যের উপসর্গগুলি কেবল অনর্থের পতাকা মাত্র। উহা প্রকৃতপ্রস্তাবে দৈহিক অস্বাস্থ্য নহে, অনর্থময় জাড্য মাত্র। মন আত্মাকে বঞ্চনা করিবার জন্য ঐরূপ জাড্যের প্রসাধন মাখিয়া আপনাকে বা তদনুগত দেহকে বহুরূপী সাজাইয়াছে।

পরমার্থ-পথে চলিতে চলিতে অনেক সময় আমরা আত্মাকে বঞ্চনা করিবার জন্য 'দেহ ও মনের স্বাস্থ্যেই আত্মার স্বাস্থ্য'—এইরূপ প্রবচন বা মনগড়া শাস্ত্র কল্পনা এবং তৎসহ 'অনুকূল' পরিভাষার অবতারণা করিয়া অসুস্থ মনের রুচিকর পথ্যকেই ইষ্টতম 'পথ্য' বলিয়া প্রচার করি। পাছে বৈষ্ণব-বৈদ্যরাজের দ্বারা চিকিৎসিত হইলে তিনি আমার গুপ্ত ব্যাধিটী ধরিয়া ফেলেন কিম্বা আপাত অপ্রীতিকর তিক্ত ঔষধ ব্যবহারের ব্যবস্থা প্রদান করেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট গা-ঢাকা দিবার অভিপ্রায়ে দেহের অস্বাস্থ্যের ছলনা করি। অধিকাংশ সময়েই দেখিতে পাওয়া যায়, এইরূপ দেহের অস্বাস্থ্যের মধ্যে আত্মার প্রকৃত স্বার্থ যে ভগবৎসেবা, তাহার পথ রুদ্ধ করিবার অন্তর্নিহিত প্রবল চেষ্টা প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত রহিয়াছে।

আত্মা যাঁহার সুস্থ অর্থাৎ সেবোন্মুখ, দেহ-মনের সাময়িক অস্বাস্থ্য কখনই তাঁহাকে তাঁহার শরণাগতি-বুদ্ধি হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে না। সুস্থ আত্মা অর্থাৎ সেবোন্মুখ আত্মা সর্ব্বদাই শরণাগত, দেহ-মনের সাময়িক প্রতীয়মান অস্বাস্থ্যের মধ্যেও তিনি অন্তরে স্বীয় বিপ্রলম্ভময় ভগবদ্ভজনে অভিনিবিষ্ট এবং সাধারণ লোককে দেহ-মনের নশ্বরতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন-মুখে আদর্শ বৈরাগ্য-শিক্ষা-দাতা। এই জন্যই শ্রীচৈতন্যভাগবতকার বলিয়াছেন,—

> "যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
> নিশ্চয় জানিহ সেহ পরানন্দ সুখ।।"

আত্মাকে বঞ্চনা করিবার প্রবৃত্তি বহির্ম্মুখ দেহ-মনের একটী নিসর্গ। যে-কোন ছলে, যে-কোন ব্যাখ্যায়, যে-কোন দৃষ্টানে, যে-কোন আদর্শে আত্মাকে বঞ্চনা করাই যেন বহির্ম্মুখ দেহ-মনের কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। কখনও দৈহিক অস্বাস্থ্যের ছল করিয়া, কখনও আর্থিক অভাবাদির ছলনা দেখাইয়া, কখনও বা মানসিক অশান্তির কারণ প্রদর্শন করিয়া, কখনও আবার অবস্থা-বৈগুণ্যের অকাট্য ব্যাখ্যা-বিবৃতি করিয়া আত্মার

প্রকৃত স্বার্থে প্রতিবন্ধক আনাই দেহ-মনের নিসর্গ। এই নিসর্গ আবার বহির্ম্মুখ সমশীল ব্যক্তিগণের সঙ্গ ও পরামর্শে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হইয়া থাকে। তখন ঐরূপ আপাতঃ রুচির প্রতিবন্ধকরূপে প্রতীয়মান সৎসঙ্গকে দূরে রাখিবার জন্য প্রবল চেষ্টা উদিত হয় এবং ঐ চেষ্টাকে আবরণ করিবার জন্য অস্বাস্থ্যের মুখোস পরিধান করিতে দেখা যায়।

যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মমঙ্গল চাহেন—প্রকৃত প্রস্তাবে চির-স্বাস্থ্য লাভ করিতে চাহেন, তাঁহারা ঐরূপ সাময়িক অনর্থময় জাড্য সদ্‌বৈদ্যের কৃপায় দূরে নিক্ষেপ করিয়া সদ্‌বৈদ্যের ব্যবস্থিত ঔষধ ও পথ্য, সদ্‌বৈদ্যের ব্যবস্থিত স্বাস্থ্য- নিবাস অর্থাৎ সৎসঙ্ঘারামে বাস করিবেন। স্বাস্থ্যনিবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র অবস্থান করিয়া সদ্‌বৈদ্যের ব্যবস্থিত ঔষধ-পথ্য ব্যবহার করিবার একটা প্রবৃত্তি অনেক সময় বহির্ম্মুখ দেহ-মনের বঞ্চনাময়ী চেষ্টা ও রুচিতে লক্ষিত হয়। প্রকৃত স্বাস্থ্যকামী সেই সময়ে সাবধান থাকিবেন। স্বাস্থ্যনিবাসে বাস করিয়া নিরন্তর স্বাস্থ্যময় জলবায়ু সেবন না করিলে সদ্‌বৈদ্যের ব্যবস্থিত ঔষধ-পথ্যের মধ্যে কৃত্রিমতা বা প্রয়োগে অলসতা আসিয়া উপস্থিত হয়।

আমাদের সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে,—আত্মার স্বাস্থ্যেই দেহ-মনের স্বাস্থ্য। যাঁহার আত্মা সেবোন্মুখ, তাঁহার মন শান্ত। এজন্যই মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী—সকলই অশান্ত।।

যাঁহারা আত্মার স্বাস্থ্যান্বেষণ—আত্মার স্বরূপে অবস্থান—আত্মবৃত্তির অনুশীলন পরিত্যাগ করিয়া "কোথায় শান্তি, কোথায় শান্তি" বলিয়া চিৎকার করিয়া বেড়ান, তাঁহাদের শান্তির অন্বেষণ আলেয়ার বা মৃগতৃষ্ণিকার পশ্চাদ্ধাবন-চেষ্টার ন্যায় অধিকতর শ্রমার্জ্জন মাত্র। আত্মা যাঁহার সুস্থ অর্থাৎ হরিসেবাময়, তাঁহার মন—প্রসাদময়—উৎসাহময়—উৎসবময়—পরশান্তিময়। তাঁহার দেহ—স্নিগ্ধ—পূত—সৌম্য ও সুস্থ। তাঁহার মন আত্মার বিদ্রোহাচরণ করে না, দেহ আত্মাকে বঞ্চনা করে না, তাঁহার মন আত্মার প্রকৃতস্বার্থ অনুসন্ধান করে, দেহ তাঁহার আনুকূল্য করে। বাহ্যদৃষ্টিতে প্রবল বিপৎপাতেও,—দুর্ল্লঙ্ঘ্য দুর্ব্বিপাকেও দেহ-মন আত্মার স্বার্থেই আনুকূল্য করিয়া থাকে। এইরূপ দেহ-মনের প্রাকৃতত্ব অচিরেই দূরীভূত হইয়া যায়, তখন চিদানন্দময় সুদীক্ষিত, সমর্পিত-তনু, সেবা-স্বাস্থ্যে বিরাজিত থাকিয়া জীব জীবন্মুক্ত পদবীতে আরূঢ় হন। এরূপ দেহ-ধারণেই জীবের সার্থকতা, নতুবা কতকগুলি রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জা-পূয়-ক্লেদের বোঝা বহন করিয়া জন্মজন্মান্তর ত্রিতাপে তপ্ত হইবার পিপাসায় কোনই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নাই। সুতরাং সদ্‌বৈদ্যের পর্য্যবেক্ষিত স্বাস্থ্য-নিবাসে আত্মার স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য অনুক্ষণ চেষ্টাই আমাদের একমাত্র মনোযোগের বিষয় হওয়া আবশ্যক।

সাম্যবাদ ও সেবা বিচার

কর্ম্মকাণ্ডীয় বিশ্বে 'সাম্যবাদ' কথাটীর সৃষ্টি হইয়াছে। সাম্যবাদ জড়সুবিধাবাদের খনিজ সামগ্রীবিশেষ। বিভুচৈতন্যের নিখিল-সুখতাৎপর্য্যকে কেন্দ্রীভূত করিয়া যে চেতনপরা বৃত্তির স্বাভাবিকী গতির উল্লাস, তাহাই 'সেবা'। আর জড়ব্যষ্টি বা সমষ্টি-জগতের সুখ-সুবিধাকে কেন্দ্র করিয়া যে যুক্তি বা নীতির উদয় হয়, তাহাই 'সাম্যবাদ'।

সাম্যবাদের প্রস্তাব এই,—সকলকেই সমানচক্ষে দেখিতে হইবে। কাহারও প্রতি কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব বা কাহারও অধিকতর অভ্যুদয় সহ্য করা হইবে না। কারণ, উহা সমাজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিঘ্নকর। সাম্যবাদের প্রস্তাবকারিগণ বলেন,—একজনকে কেন ভাল খাইতে দেওয়া হইবে, আর একজন কেন খারাপ খাইবেন? একজন কেন শ্রমিক, আর একজন কেন ধনিক হইবেন? একজন কেন দাস, আর একজন কেন প্রভু হইবেন?

সাম্যবাদী যাহাই প্রস্তাব করুন না কেন এবং তাহা ভোগময় জগতের লোকের চক্ষে আপাততঃ যতই যুক্তিযুক্ত ও নীতিপুষ্ট বলিয়া প্রতীত হউক না কেন, এই কর্ম্মময় জগতের ধর্ম্মই এই, অথবা কর্ম্মের ধর্ম্মই এই, এখানে উচ্চাবচ-স্তরে অধিষ্ঠান থাকিবেই। এখানে একজন মনোরম পরিচ্ছদে বিভূষিত এবং বর্ষা ও আতপ-তাপ হইতে সংক্ষিত হইয়া নর-যানে আরোহণপূর্ব্বক ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন, আর এক বেচারা—যদিও উক্ত আরোহীর ন্যায়ই দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসা, জিহ্বা, ত্বগাদি ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট, তথাপি তাহাকে রৌদ্রে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া, নগ্নপদে, জীর্ণবসনে বিলাসী আরোহীর বোঝা টানিতে হইতেছে। এই কর্ম্মময় জগতে ভাঙ্গীর লাল্য-পাল্য-স্নেহময় বালক ভূমধ্যগত অসহ্য দুর্গন্ধ ক্লেদপরিপূর্ণ পয়ঃপ্রণালীতে জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া প্রবিষ্ট হইতেছে, আর ঐরূপই সমস্নেহনিদান ও সমবয়স্ক সন্তানগণের পিতা ভাগ্যক্রমে কতগুলি অর্থের অধিপতি হওয়ায় দ্বি-ত্রিতল প্রাসাদের সুরম্য গৃহে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ঐ মেথর-বালকের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিবার জন্য মহা-আরামে মল-মূত্রাদি উৎসর্গ করিতেছে। ইহারই নাম 'কর্ম্মরাজ্য'। কর্ম্মের নাগরদোলায় ঘুরিতে ঘুরিতে কতকগুলি আরোহী কিছুক্ষণের জন্য উপরের দিকে থাকে, আর কতকগুলি কিছুক্ষণের জন্য নিম্নদিকে যায়। আবার দোলা ঘুরিয়া নীচের দিকের আরোহীদিগকে উপরে উঠায়, উপরের আরোহীদিগকে নীচের দিকে নামায়। যে-মুহূর্ত্তে আমরা যাহাদিগকে উপরের দিকে দেখি, সেই মুহূর্ত্তটুকুর জন্য তাহাদিগকে 'উচ্চ' 'বড়', 'ভাগ্যবান্', 'পুণ্যবান্' প্রভৃতি বলি, আবার যে-মুহূর্ত্তে যাহাদিগকে নিম্নদিকে দেখি, সেই মুহূর্ত্তের জন্য তাহাদিগকে 'নীচ', 'ছোট', 'দুর্ভাগ্য', 'পাপী' প্রভৃতি বলিয়া থাকি। যিনি যতই প্রস্তাব করুন না কেন, এই কর্ম্মদোলায় আরোহীর কতগুলি লোক এক সময়ে ঊর্দ্ধদিকে এবং কতকগুলি নিম্নদিকে থাকিবেই থাকিবে।

কর্ম্মরাজ্যের এইরূপ উচ্চাবচ ভাব দেখিয়া কর্ম্মফলদাতা বিষ্ণুর শক্তি অপেক্ষা—স্ব-স্ব-অস্তিত্বের মূল পুরুষ বিষ্ণুর বল অপেক্ষা যাঁহারা তাৎকালিক প্রত্যক্ষলব্ধ দৈহিক বলকেই অধিকতর বিবেচনা করেন, সেই সম্প্রদায় 'সাম্যবাদ' নামে একপ্রকার ভোগময় মতবাদের প্রস্তাব করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান তথাকথিত সভ্য-

জগতের প্রায় সর্ব্বস্থানেই ন্যূনাধিক বিভিন্ন আকার-প্রকারে এই মতবাদের অভ্যর্থনা হইয়াছে ও হইতেছে।

এই সাম্যবাদি-সম্প্রদায়ের প্রস্তাবিত সৌধ বিষ্ণুর অস্তিত্ব অস্বীকাররূপ সিকতাস্তূপের উপর কল্পিত হইয়াছে। বিষ্ণুর নিরঙ্কুশ স্বতন্ত্রেচ্ছা এবং কর্ম্মফলের প্রযোজক-কর্ত্তা বিষ্ণুর ব্যবস্থাকে বল-যুদ্ধের দ্বারা বিপর্য্যস্ত করিবার বুদ্ধি হইতে এইরূপ সাম্যবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। সঙ্কীর্ণ-দৃষ্টি আধ্যক্ষিক সাম্যবাদী যেখানে প্রযোজক-কর্ত্তা বিষ্ণুর ব্যবস্থায় পক্ষপাত-দোষ দর্শন করিয়া বিষ্ণুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত এবং তাহার প্রতিশোধ-গ্রহণ-কল্পে সাম্যবাদের প্রস্তাব লইয়া আবির্ভূত, সেই স্থানে সেবার বিচারকগণ,—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্।।

—শ্লোক উচ্চারণ করিতে করিতে সত্ত্বতনু বিষ্ণুর—স্বরাট্ কৃষ্ণের নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতা-কামাগ্নির ইন্ধনরূপে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত। কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্ত বলিয়াই কর্ম্মের উচ্চাবচ-বিচার-রূপ বৈষম্য-ভাব হইতে মুক্তি তাঁহাদের করতলগত। তাঁহারাই প্রকৃত সাম্যবাদের ভূমিকায় আরোহণ করিয়া পরা শান্তির অধিকারী। তাঁহাদের পরা শান্তি জড়সাম্যবাদের প্রস্তাবিত সাম্য বা শান্তির আকাশকুসুম মাত্র নহে।

জগতে সাম্যবাদ সম্ভব নহে, জড়ের ধর্ম্মে তাহা সম্ভব হইতে পারে না। চেতনের ধর্ম্মে তাহা নাই। চেতন-রাজ্যে জড়ের হেয়তা নাই, কিন্তু তথায় কেবল জড়-বৈষম্যনিষেধক সাম্যভাব ব্যতীত নিত্য সেবাবিচিত্রতা ও সেবা- তারতম্য আছে। চেতন রাজ্যের উপাদেয় ও অখণ্ড বাস্তবতার প্রতিফলনই জড়রাজ্যে হেয় ও খণ্ডভাবে লক্ষিত হয়। সেবালতা বিরজার ত্রিগুণ-সাম্যভাব—ব্রহ্মলোকান্তর্গত নির্ব্বিশেষভাব অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠে ও বৈকুণ্ঠের ঊর্দ্ধ গোলোকে স্বরাটের স্বতন্ত্রেচ্ছায় পক্ষপাতিত্বের রাজ্য আবিষ্কার করে। জড়- সাম্যবাদী কোন দিন তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারে না।

বিষ্ণুর অস্তিত্ব অস্বীকারে যে সাম্যবাদের ভূমিকাপত্তন হইয়াছে, সেই সাম্যবাদ উহার অধিকার-বহির্ভূত সেবারাজ্যে কখনও কখনও হস্তপ্রসারণের ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে। সকলেরই সমব্যবস্থা হইবে, একজনকে কেন উৎকৃষ্ট আসন, উৎকৃষ্ট বসন, উৎকৃষ্ট ভোজন প্রদান করা হইবে, আর একজন কেনই বা তাহা হইতে বঞ্চিত হইবেন; সকলেরই সমান অধিকার, সকল জিনিষই সমষ্টির মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করিয়া দাও—এই জাগতিক নীতি ধর্ম্মরাজ্যেও প্রসারিত করিবার যত্ন সাম্যবাদী অদৈবগণের দ্বারা ন্যূনাধিক সকল যুগেই সাধিত হইয়াছে।

ভগবান্ ভক্তের পক্ষপাতিত্ব করিবেন কেন? যিনি পক্ষপাতিত্ব করেন, তাঁহাকে 'ভগবান্' বলা যাইবে কেন? ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব-বিচার থাকিবে কেন? আমরা তাঁহাকেই আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের কারখানায় 'ভগবান্' বলিয়া গড়িয়া তুলিব—যিনি সাম্যবাদের সমর্থক হইবেন—যিনি ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ—সকলই সমান বলিলেন—যিনি ভক্ত ও কর্ম্মীকে সমচক্ষে দেখিবেন।

সাম্যবাদী ধর্ম্মরাজ্যে হস্ত-প্রসারণের ধৃষ্টতা দেখাইয়া জীবের প্রাপ্য-স্থান-সম্বন্ধেও নানাপ্রকার ভোগময় মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—শিব, শক্তি, গণেশ, সূর্য্য, (কর্ম্মফলবাধ্য) বিষ্ণু, স্বতন্ত্র পরমেশ্বর-বুদ্ধিতে যিনি যাঁহারই ভজন করুন না কেন, সকলেই একস্থানে যাইবেন। সাম্যবাদের বলসেবীয় বিচারে সমতা প্রাপ্ত করাইতে হইলে কল্পিত শক্তি, শিব, গণেশ, সূর্য্য, কল্পিত বিষ্ণু—সকলকেই চরমে চুরমার করিয়া না ভাঙ্গিলে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সুতরাং বিকৃত সাম্যবাদের অবশ্যম্ভাবী বিপদ—নির্ব্বিশেষবাদ; অথবা নির্ব্বিশেষবাদেই সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা।

সাম্যবাদী এইরূপ সাম্যবাদ-ধর্ম্মের ধ্বজা প্রদর্শন করিয়া অনেক সময় শাস্ত্রের যথার্থ সিদ্ধান্তকে বিকৃত করিয়া থাকেন। সাম্যবাদী,—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্।।

—শ্লোকে কৃষ্ণের স্বতন্ত্র-পুরুষোত্তমত্ব না দেখিয়া সাম্যবাদের আদর্শ দেখিতে পান। সাম্যবাদী বলেন, —যাঁহারা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া অন্য দেবতার ভজন করেন, তাঁহারাও কৃষ্ণেরই ভজন করেন, সুতরাং অন্যান্য দেবতার ভজন এবং কৃষ্ণের ভজন—সমান। তাঁহারা 'অবিধি' কথাটী ছাড়িয়া দেন; কারণ, সাম্যবাদীর বিচারে 'বিধি', 'অবিধি'—সবই সমান। 'অবিধিপূর্ব্বক' কথাটী দ্বারা যে কৃষ্ণেরই স্বতন্ত্র পুরুষোত্তমত্ব প্রমাণিত হইতেছে, কৃষ্ণ-ব্যতীত যে অপর দেবতার স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান নাই এবং স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ভজনই যে একমাত্র বিধিপূর্ব্বক ভজন,—ইহা সাম্যবাদী বুঝিতে পারেন না।

সাম্যবাদী অনেক সময় বলেন, যখন—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিঽনোপি মাম্।।

অর্থাৎ যাঁহারা দেবব্রত, তাঁহারা দেবলোক, যাঁহারা পিতৃপূজক, তাঁহারা পিতৃলোক, যাঁহারা ভূতপূজক, তাঁহারা ভূত-লোক, আর যাঁহারা ভগবৎসেবক, তাঁহারা ভগবল্লোক লাভ করেন, তখন সকলেই নিজ নিজ অভীষ্ট প্রাপ্ত হওয়ায় সকলেই সমভাবে সুখী। সুতরাং সকল পূজাই সমান। জীবপূজা (?) ও পরমেশ্বর-পূজা, উভয়ই—সমান।

সাম্যবাদী,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

—শ্লোক উচ্চারণ করিয়া বলেন, যিনি ভগবানকে যে ভাবেই উপাসনা করুন না কেন, ভগবান্ সমান ফলই দেন। যত মত, তত পথ। প্রাপ্য স্থান সকলেরই এক।

সাম্যবাদীর এইরূপ ভ্রান্ত বিচার ও বিকৃত ব্যাখ্যা তাহাকে সাম্যবাদের অবশ্যম্ভাবী বিপদ নির্ব্বিশেষ-প্রহেলিকায় পাতিত করে। কিন্তু সেবার বিচারে ঐ সকল শ্লোকের যথার্থ ব্যাখ্যা নিরূপিত হইলে সাম্যবাদ

সম্পূর্ণভাবে বিপর্য্যস্ত হয়। ভগবান্ "যান্তি দেবব্রতা" শ্লোকে দেবপূজক, পিতৃপূজক ও ভূতপূজকগণের সহিত নিজ-সেবকগণের প্রাপ্য লোকের অসাম্য বা বৈষম্যই প্রদর্শন করিয়াছেন। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" শ্লোকেও ভগবান্ আধ্যক্ষিকের সাম্যবাদ নিরাস করিয়াছেন। যিনি যে রূপ ভাবে ভগবানে প্রপন্ন হন, ভগবান্ সেইরূপ ভাবেই প্রপন্ন ব্যক্তিকে ফল প্রদান করেন। যিনি ভোগের জন্য প্রপন্ন হন, তাঁহাকে তাঁহার ভোগ-প্রদাত্রী জড়শক্তির দ্বারা জড়ভোগ প্রদান করেন, যিনি আত্ম- বিনাশের জন্য প্রপন্ন হন, তাঁহাকে নির্ব্বিশেষপ্রাপ্তিরূপ আত্মবিনাশ প্রদান করেন, আর যিনি তাঁহার সেবার জন্য প্রপন্ন হন, তাঁহাকে সেবা-সুখ প্রদান করেন। ন্যায়পরায়ণ বিচারক চৌর্য্যাপরাধীকে যেরূপ ফল প্রদান করেন, সাধুকে সেরূপ- ভাবে ফল প্রদান করেন না। সাম্যবাদীর বিচারে 'চোর' ও 'সাধু', 'ধার্ম্মিক' ও 'অধার্ম্মিক', 'কর্ম্মী' ও 'ভক্ত'—সকলেই সমান বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় তাঁহারা ধর্ম্মের ধ্বজা হস্তে লইয়া নাস্তিকতার নির্ব্বিশেষ-সাগরে আত্মহত্যা করেন।

আধুনিক তথা-কথিত সমন্বয়বাদ একটা প্রবাহবিশেষ। আধুনিক তথাকথিত সমন্বয়বাদী মুখে যতই 'সমন্বয়' 'সমন্বয়' বলিয়া চিৎকার করুন না কেন, এদিকে তাঁহার তাঁহাদের কল্পিত ব্যক্তিবিশেষকে ঈশ্বর (!), তাঁহাদের মতকে সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন ও উদার, সেই মত প্রচারকারীকে সকল অবতারের সেবা-অবতার (!!) প্রভৃতি বলিয়া অবৈধ গোঁড়ামীর এভারেষ্টে আরোহণের যে দুঃসাহসিকতা দেখাইতেছেন, তাহা সাম্যবাদের ইন্দ্রজাল-বিদ্যায় প্রতারিত-নেত্র আ-নখ-কেশাগ্র বিষ্ণুবিরোধী দুনিয়ার লোক বুঝিতে পারে না।

সাম্যবাদী নাস্তিকতার নীতিপুষ্ট মাৎসর্য্য-দাবদগ্ধ হৃদয়ে বিচার করেন, কেন বৈষ্ণব বা গুরু 'প্রভু' হইবেন, আর আমরা তাঁহাদের 'দাস' হইতে যাইব? একজনকে বা এক সম্প্রদায়কে কেন উচ্চ আসন দেওয়া হইবে, আর একজন বা এক সম্প্রদায় কেনই বা নিম্ন আসনে আসীন থাকিবেন? জাগতিক নীতি-পরিপুষ্ট-বিচারে সাম্যবাদিগণ সেবক-সম্প্রদায়ের এইরূপ বৈষম্যবাদকে প্রাচীন রোমের পেট্রেসিয়ান্ ও প্লিবিয়ান্‌গণের আচারের ন্যায় বিচার বা 'অটোক্রেসি'র স্বেচ্ছাচারিতা মনে করিয়া 'ডেমোক্রেটিক্' বা সংখ্যাধিক্যের বিচারকেই সমীচীন মনে করেন। কেহ কেহ আবার ধর্ম্মধ্বজী সাজিয়া বলেন, সকলেই যখন ভগবানের সন্তান—ভক্তও যেরূপ ভগবানের সন্তান, অভক্তও সেইরূপই সন্তান, সুতরাং ভক্ত-সম্প্রদায় 'প্রভু' হইবেন, আর অভক্ত-সম্প্রদায় তাঁহাদের অধীন হইবেন—ইহা কিরূপ বিচার? কৃষ্ণকে একমাত্র প্রভু স্বীকার-পূর্ব্বক বাদবাকী সকলেই কৃষ্ণের দাস—এই নিত্য-স্বরূপ-সিদ্ধ বিচারের আবাহন করা সাম্যবাদীর মতে অযৌক্তিক ও অন্যায় হওয়ায় তাঁহারা সকলেই 'ব্রহ্ম' মনে করিয়া সাম্যবাদের নীতিপুষ্ট বিচারে প্রবিষ্ট হওয়াই সমীচীন বোধ করেন।

সাম্যবাদী মনে করেন,—ঈশ্বরও ত' কম তোষামোদপ্রিয় নন! যাঁহারা অধিক 'ধামাধরা', তাঁহাদের জন্য তিনি নীতি-লঙ্ঘন করেন—'দিনকে রাত করেন'; এইরূপ তোষামোদপ্রিয় ব্যক্তিকে কেন পরমেশ্বর বলিব? এইরূপ বিচার করিয়া সাম্যবাদী পরমেশ্বরকে একেবারে 'নাকচ' করিয়া দেন, 'কৃষ্ণভক্তের আনুগত্য'

কথাটীকে হাসিয়া উড়াইয়া দেন, কখনও কপটতা করিয়া মুখে না হাসিলেও আন্তরিক অস্বীকার করেন, কৃষ্ণভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা একান্ত অনাবশ্যক মনে করেন, কখনও বা সাম্যবাদি-মতের কৃষ্টি-সাধক কর্ম্মবাদকেই ভক্তি-ভানের অবগুণ্ঠনে আবৃত করিয়া কর্ম্মরাজ্যে ভ্রমণ করেন। সাম্যবাদের জন্ম—নাস্তিকতায়, স্থিতি—নাস্তিকতায় ও ভঙ্গ—নাস্তিকতায়। জড়সুবিধাবাদ বা ভোগবাদরূপ নাস্তিকতা হইতে সাম্যবাদের জন্ম; সত্ত্বতনু বিষ্ণুর নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতা, বিষ্ণুভক্তগণের সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতা অস্বীকার-রূপ নাস্তিকতায়—সাম্যবাদের সাময়িক স্থিতি; আর নির্ব্বিশেষবাদে—সাম্যবাদের লয়।

প্রাকৃত সাহজিক-সম্প্রদায়েও সাম্যবাদের ন্যূনাধিক আদর লক্ষিত হয়। আচার্য্যের পৃথক্ আসন—আচার্য্যের বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা—আচার্য্যের অভিনন্দন—আচার্য্য-পূজা প্রভৃতি দর্শনে প্রাকৃত-সহজিয়াগণ মাৎসর্য্য-দাবদগ্ধহৃদয় হইয়া সাম্যবাদের নীতি উদ্ধার করেন। এইরূপ প্রকৃতির কোন প্রাকৃত-সহজিয়া একবার গৌড়ীয়মঠে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার সাম্যবাদ-উদ্বেলিত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। মহাপ্রভুতে প্রীতির গাঢ়তার পরিচয় দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—"আমার স্ত্রীর জন্য যতটা বুকভরা প্রীতি, মহাপ্রভুর জন্য সেইরূপই প্রীতি, আমার স্ত্রীর জন্য যতটা চোখে জল আসে, মহাপ্রভুর জন্যও ততটাই চোখে জল ঝরে।" স্ত্রী ও মহাপ্রভুতে এইরূপ সাম্যভাবের আদর্শ প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ে অভিনন্দিত হইলেও উহাকে 'মহাপ্রভুর প্রীতি' বলিবার পরিবর্ত্তে প্রকৃত গৌরভক্তগণ কামোচ্ছ্বাসই বলিবেন। প্রাকৃত-সহজিয়ার ঐ সাম্যবাদে ভক্তির লেশ ত' নাই-ই, কেবল তাহাতে কামাচারেরই পরিচয় পূর্ণ- মাত্রায় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

যাঁহারা সাম্যবাদের বিদ্যালয় হইতে সেবাপীঠের দ্বারে উপনীত হন, এইরূপ অনেক প্রাথমিক প্রবেশার্থী অনেক সময় মনে করেন, ভগবানের সর্ব্বোত্তম সেবক ভগবান্ শ্রীগুরুদেব এবং সেই গুরুদেবের নিষ্কপট সেবক বৈষ্ণবগণকে কেনই বা তাঁহাদের (সমালোচনাকারিগণ) অপেক্ষা বা অন্যান্য লোক অপেক্ষা অধিকতর সুযোগ, সুবিধা বা স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করা হইবে? গুরুদেবের ভোগ কেন সর্ব্বাগ্রে বা শ্রেষ্ঠ উপচারে হইবে? বৈষ্ণবগণের জন্য কেনই বা পৃথক্ আসন, পৃথক্ ভোজ্যের বন্দোবস্ত হইবে? আর তাঁহাদের জন্যই বা কেন অন্যরূপ ব্যবস্থা হইবে? কোন উৎকৃষ্ট জিনিষের অগ্রভাগ কেন গুরু-বৈষ্ণবকে অধিক পরিমাণে দেওয়া হইবে? আর অপরকে কেনই বা তদ্রূপভাবে প্রদত্ত হইবে না? সকল জিনিষই সমষ্টির মধ্যে সমভাবে বিতরিত হওয়া আবশ্যক, নতুবা পক্ষপাতিত্বদোষ উপস্থিত হয়। ঐরূপ সাম্যবাদের বিদ্যালয়ের লোক সেবাপীঠের দ্বারে উপনীত হইবার অভিনয় দেখাইয়াও বলিলেন, যখন আমরা সকলেই হরিসেবা করিতে আসিয়াছি—সকলেই যখন মঠের সেবা করিতেছি, তখন একজন অধিক সেবা করিতে পারেন বলিয়া বা একজনের সেবার পরিমাণ অধিকরূপে গুরুদেবের দ্বারা আদৃত হয় বলিয়া তাঁহাকে ভাল আসন, ভাল ভোজন প্রদান বা তাঁহার অধিক পরিচর্য্যা করা হইবে, আমাকে কেন তদ্রূপ করা হইবে না? তাঁহাকে বহু লোকে কেন পরিচর্য্যা করিবে, আর আমার পরিচর্য্যার সময় কোন লোক পাওয়া যাইবে না কেন? এইরূপ আত্মভোগোন্মুখ ব্যক্তি নিজের ভোগবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা পরিপূরিত হইতেছে না দেখিয়া তাঁহার সমশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণের প্রতি

সমবেদনা প্রকাশ করিবার ছলে নিজের বুকভরা ভোগময় মাৎসর্য্যভাবটীর প্রতিশোধ লইবার জন্য—ব্যষ্টিগত ভোগ-প্রবৃত্তি সমষ্টিগত সংখ্যাধিক্যের বলে চরিতার্থ করিবার উত্তেজনায় সাম্যবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

সেবা-পীঠের দ্বারে আসিবার সুযোগ পাইয়াও যাঁহাদের কপাল খারাপ, তাঁহারা সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ভক্তাধীন ভগবানের ভক্তির রাজ্যেও এইরূপ সাম্যবাদের প্রচার ও প্রচলন করিতে চাহেন এবং তথায় সাম্যবাদের অভাব দেখিলে তথা হইতে সরিয়া পড়েন অর্থাৎ নিরয়ের পথই পুনরায় লোভনীয় বলিয়া বরণ করেন। ঐরূপ কপালপোড়া সাম্যবাদী মনে করেন,—বৈষ্ণবেরা একচোখো; কেহ বা বলেন—(কখনও মুখে কখনও বা অন্তরে বলিয়া থাকেন) ইঁহাদিগকে যিনি অধিক টাকা দেন, তাঁহাকেই ইঁহারা অধিক আদর করেন—যিনি ইঁহাদের অধিক কার্য্য করেন, ইঁহারা তাঁহাকেই অধিক সম্মান করেন। কেহ বা বলেন বা মনে করেন,—যখন আমি ইঁহাদিগকে অর্থ দিতে পারিতাম, ইঁহাদের অধিক কার্য্য করিতে পারিতাম, তখন ইঁহারা আমাকে অধিক আদর করিতেন, এখন সেইরূপ অর্থ দেই না বলিয়া বা সেইরূপ কার্য্য করি না বলিয়া ইঁহারা আমাকে আর সেরূপ আদর করেন না।

প্রথমেই বলা হইয়াছে, সাম্যবাদের ভিত্তি—ভোগোন্মুখতা ও নাস্তিকতা। সাম্যবাদীর ভক্তিমঠাদিতে প্রবেশের ছলনা বা সেবাপীঠের কোনপ্রকার আনুকূল্য করিবার ভান হরি-গুরু-বৈষ্ণবের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য নহে। অধিক সম্মান পাইব—আদর পাইব—'দাতা' বলিয়া প্রচারিত হইব কিম্বা কোন প্রকার সামাজিক ও সাংসারিক অপবাদ ঢাকা পড়িবার সুযোগ হইবে অথবা কোনপ্রকার দেহ-মনোগত সুখ-সুবিধা লাভ হইবে—এইরূপ ভোগোন্মুখ চিত্তবৃত্তি বা অন্যাভিলাষ লইয়া ভোগ-রাজ্যের ব্যক্তি সেবা-রাজ্যের দ্বারে আসিবার অভিনয় করেন। তাঁহার ঐরূপ ভোগোন্মুখতা বা অন্যাভিলাষ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া সেবা-প্রবৃত্তির উদয় হইতে পারে, যদি তিনি মনোযোগের সহিত—সেবা করিবার বুদ্ধির সহিত গুরু-বৈষ্ণবের মুখে সেবা-সিদ্ধান্ত শ্রবণ করেন। কিন্তু সাম্যবাদের বিচার তাঁহার হৃদয় অধিকার করিলে সেখানে গুরু-বৈষ্ণবে জাতিসামান্যবাদ অর্থাৎ ইতরমনুষ্য-সামান্যবাদরূপ একটী ভীষণ অপরাধ আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই অপরাধের ফলে ভক্তিমঠাদির দ্বারে উপনীত ব্যক্তিও সেবা-বিচার হইতে বিচ্যুত হন, নির্ম্মৎসর সাধুগণে তাঁহার মৎসরতা, অতিমর্ত্ত্য শ্রীগুরুদেবে তাঁহার মর্ত্ত্যবুদ্ধি প্রভৃতি অপরাধ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ক্রমে ক্রমে তিনি সাম্যবাদীর অসৎসঙ্গকেই অধিকতর নীতিপুষ্ট মনে করিয়া দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হন এবং নাস্তিকতার অতল গহ্বরে প্রবেশ করেন। যেখানে সাম্যবাদী সেবা-ধর্ম্মকে কর্ম্ম-রাজ্যের নীতি বা দুর্নীতির ন্যায়ই বৃত্তিবিশেষ এবং ভগবৎ-সেবককে কর্ম্মকাণ্ডী নৈতিক বা অনৈতিক ব্যক্তির ন্যায় কল্পনা করেন, সেখানে কর্ম্মরাজ্যের বিচার ভক্তিরাজ্যে চালনা করিবার দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হয়। সাম্যবাদী যেখানে মনে করেন,—সেবা, সেবাপীঠ বা সেবকগণের বিচার কর্ম্মরাজ্যের নৈতিক বিচারের অনুগমন করিয়া তাহার ইন্দ্রিয়তর্পণ করিবে; সেবাপীঠে সেবকগণের অধিক আদর, অপরের তদ্রূপ অভিনন্দন-অপ্রাপ্তি—নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য, একান্ত আস্তিক ভগবৎসেবক বা সেবোন্মুখগণের বিচার সেখানে অন্যরূপ। সেবোন্মুখগণের কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণই মূলমন্ত্র হওয়ায় তাঁহারা জানেন, যিনি ভগবৎ-সেবার জন্য অধিক আনুকূল্য করেন—ভগবদ্ভক্তের অধিক কার্য্য করেন,

তাঁহাকেই কৃষ্ণসেবার অধিকতর সহায়কারী বলিয়া অধিকতর আদর-অভ্যর্থনা করিতে হইবে, ইহাতে কৃষ্ণানুরক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। সাম্যবাদী যাহাকে প্রাকৃত নীতিবিরুদ্ধ মনে করেন—পক্ষপাত-দোষপুষ্ট মনে করেন, তাহা প্রকৃত সুসূক্ষ্ম বিচারকের নিকট কৃষ্ণানুরক্তিরই পরিচায়ক বলিয়া প্রমাণিত হয়। কৃষ্ণসেবক কর্ম্মীর ন্যায় তাঁহার ভোগের (?) ইন্ধন প্রদানকারী বা তাঁহার ভোগ-নিরপেক্ষ কোন জীববিশেষের ইন্দ্রিয়সেবা করিবার জন্য কাহারও আদর-অভ্যর্থনা বা সম্মান করেন না; যে-সকল জীব তাঁহার প্রাণপ্রিয়তম হরি-গুরু-বৈষ্ণবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ করেন, তাঁহাদের কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণ-বৃদ্ধি বর্দ্ধন করিবার জন্যই তাঁহাদিগের অধিক আদর-অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন। কর্ম্মী তাঁহার ভোগের ইন্ধনপ্রদানকারীকে যেরূপ আদর-অভ্যর্থনা করেন, কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানগুলি যেরূপ তাহাদের ভোগ বা ত্যাগময় কর্ম্ম বা ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধনপ্রদানকারিগণের ইন্দ্রিয়সেবা করিয়া জীবসেবার (?) নাস্তিকতা প্রদর্শন করেন, ভগবৎসেবকগণ, বিশেষতঃ একমাত্র পারমার্থিক-প্রতিষ্ঠান শ্রীগৌড়ীয়মঠ সেইপ্রকার নাস্তিকতার চিন্তাস্রোতে ধাবিত হন না। শ্রীভগবৎসেবার আনুকূল্যকারিগণকেই অধিকতর আদর-অভ্যর্থনা ও সেবা করায় এই পারমার্থিক প্রতিষ্ঠানের কৃষ্ণসেবানুরক্তির পরাকাষ্ঠাই প্রমাণিত হয়। ইহারই নাম প্রকৃত-প্রস্তাবে আস্তিকতা—ইষ্টে আত্মবুদ্ধি। আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতির বস্তুকে যাঁহারা সেবা করিবেন বা কোন প্রকারে সেবার সহায়তা করিবেন, আমি তাঁহাদেরই আদর অভ্যর্থনা, সম্মান ও সেবা করিব।

সেবোন্মুখ ব্যক্তি সাম্যবাদীর আদর্শ-গ্রহণকারীর ন্যায় কখনই মনে করেন না,—"আমি যখন ভগবৎ-সেবকগণকে অর্থ দিতে পারিতাম বা সেবা করিতে পারিতাম, তখন ইঁহারা আমার অধিক আদর-যত্ন করিতেন, এখন তদ্রূপ করিতে পারি না বলিয়া তাঁহারা আমাকে পূর্ব্ববৎ আদর-সম্মান করেন না; সুতরাং এইরূপ পক্ষপাতযুক্ত ব্যক্তিগণের দল হইতে অপস্বার্থপর নীতি বা দুর্নীতিপুষ্ট কর্ম্মীর দলে প্রবেশ বা নাস্তিকতায় প্রবেশই ভাল।" সেবাবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি সাধুগণের নিকট হইতে ঐরূপ প্রতিষ্ঠা বা ভোগমাত্র-প্রয়োজনপ্রার্থী ব্যক্তির আদর্শানুসরণের পরিবর্ত্তে নিজ দুর্দ্দৈবই স্মরণ করেন। তিনি বিচার করেন,— "আমার কি দুর্দ্দৈব! আমি সেবা হইতে পতিত ও ভ্রষ্ট হইয়াছি। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় ভগবৎসেবায় যতটুকু অধিকার পাইয়াছিলাম, বর্ত্তমানে সেটুকু হইতেও বিচ্যুত হইয়াছি। বৈষ্ণবগণ কৃপা করিয়া এখনও যে আমার ন্যায় ভোগময়- প্রয়োজন-প্রার্থী ব্যক্তিকে তাঁহাদের সেবামন্দির হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেছেন না, ইহাই তাঁহাদের যথেষ্ট কৃপা। সেবা-শিথিল হইয়া আমি কেনই বা প্রাণধারণ করিতেছি? আমি কি তাঁহাদের সম্ভাষণেরও যোগ্য? আমার ন্যায় সেবাবিমুখকে উপেক্ষা দেখাইয়া তাঁহারা আমার হৃদয়ে যে গ্লানি আনিয়া দিতেছেন, ইহাতে আমার অনুতপ্ত হইয়া ভগবৎসেবায় অধিকতর যত্ন করাই উচিত। ইহা তাঁহাদের অমন্দোদয়া-দয়ারই নিদর্শন। আমার ভোগোন্মুখতা বা সেবাশিথিলতাকে কখনই তাঁহারা আদর করিতে পারেন না; কেন না, তাঁহারা সেবাগতপ্রাণ। আর সেবা-শিথিলতাকে আদর করিলে (আমার আপাতরুচিতে তাহা প্রেয়ঃ মনে হইলেও) উহা দ্বারা আমার প্রতি হিংসাই করা হইবে। নির্ম্মৎসর সাধুগণ সাম্যবাদী কর্ম্মীর ন্যায় কখনই

সেরূপ হিংসক হইতে পারেন না।”—এইরূপ বিচার করিয়া সেবোন্মুখ ব্যক্তি সর্ব্বদাই গুরুবৈষ্ণবের কৃপার সৌন্দর্য্য দেখিতে পান এবং এইরূপ বিচার থাকিলে দুর্দ্দৈবক্রমে কাহারও সাময়িক সেবা-শিথিলতা আসিলেও তিনি আবার সেবারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাম্যবাদের নীতি নাস্তিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যেখানে যত আস্তিকতা, সেখানে তত অধিকতর পক্ষপাতিত্ব। স্বরাট্ পুরুষোত্তম তাঁহার সেবকের পক্ষপাতিত্ব নিত্যকালই করেন। ইহা ভগবানের পক্ষে দূষণ না হইয়া ভূষণস্বরূপই হইয়াছে। সেবকও তাঁহার অদ্বিতীয় সেব্য কৃষ্ণের সেবার জন্য জগতের সাম্যবাদিগণের নিকট হইতে পক্ষপাত-দোষের কলঙ্ক সাদরে বরণ করিয়া থাকেন। এই কলঙ্কের অলঙ্কার সেবক-সম্প্রদায়ের অধিকতর সেবাসৌন্দর্য্যই প্রকাশ করে। সাম্যবাদীর জন্য শ্রীভগবান্ গীতায় বলিতেছেন,—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্।।

—আমি সর্ব্বভূতের প্রতি সমতা আচরণ করি। আমার কেহ দ্বেষ্য নাই, কেহ প্রিয়ও নাই। কিন্তু যিনি আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজন করেন, তিনি আমাতে আসক্ত এবং তাহাতেও আমি অত্যাসক্ত থাকি।

সাম্যবাদী যাহাকে বৈষম্যভাব বা পক্ষপাত-দোষ মনে করেন, একান্ত আস্তিকগণের অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রীতি বা ইষ্টানুরাগের বিচারে অবস্থিত জনগণের তাহাই বরণীয়। গীতায় যেরূপ সাম্যবাদ নিরস্ত হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতেও তাহাই অধিকতর বিশ্লেষণ ও দৃষ্টান্তের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। সাম্যবাদী দুর্ব্বাসা যখন শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্ত অম্বরীষ মহারাজের চরণে অপরাধ-পূর্ব্বক ব্রহ্মা-শিবাদি-দেবতাগণের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইয়া সর্ব্বশেষে ভগবান্ নারায়ণের নিকট আত্মরক্ষার্থে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন ভগবান্ শ্রীহরি দুর্ব্বাসাকে এইরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন,—

অহং ভক্তপরাধিনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ।।

হে দ্বিজ! হে মুনে! আমি ভক্তের অধীন (রুদ্রাদি দেবতা যেরূপ আমার অধীন হইয়া তোমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই, আমিও তদ্রূপ ভক্তের অধীন, সুতরাং তোমাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ) সুতরাং অস্বতন্ত্রের ন্যায়। মুক্তি- পর্য্যন্ত-বাসনারহিত ভক্তগণ আমার হৃদয়কে গ্রাস করিয়াছে; ভক্তের কথা কি, ভক্তের পাল্য জনসমূহও আমার প্রিয়।

যে দারাগারপুত্রাপ্ত-প্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে।।

যে-সকল সাধু গৃহ, দারা, পুত্র, আত্মীয়-জন, ধন, প্রাণ, ইহ-পরলোকের যাবতীয় আশা-ভরসা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে কিরূপে পরিত্যাগ করিব?

মযি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা।।

সতী স্ত্রী যেরূপে সৎপতিকে বশীভূত করিয়া থাকে, আমাতে আসক্তচিত্ত সমদৃষ্টিসম্পন্ন সাধুগণও তদ্রূপ ভক্তিপ্রভাবে আমাকে বশীভূত করে।

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি।।

সাধুগণ আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুগণের হৃদয়। তাঁহারা আমা-ব্যতীত অন্য কাহাকেও জানেন না, আমিও তাঁহাদের ছাড়া আর কিছু জানি না।

সাম্যবাদীর হৃদয়ে ভগবানের এইরূপ বৈষম্য-বিচার শেল বিদ্ধ করে বলিয়া সাম্যবাদী (তাহাদের মতানুযায়ী) এইরূপ অবিচারক ভগবানকে কখনও মুখে, কখনও বা অন্তরে অস্বীকার-পূর্ব্বক নাস্তিক হইয়া পড়েন। কিন্তু যেখানে আস্তিকতার চরম সীমা, সেখানে সাম্যবাদের নাস্তিকতা সম্পূর্ণভাবে তিরস্কৃত। যে ধর্ম্মে আধ্যক্ষিক সাম্যবাদের প্রচার যতটা অধিক, সেই ধর্ম্ম ততটা নাস্তিকতা- ময়। আর যে ধর্ম্মে সাম্যবাদ যতটা শিথিল, সেই ধর্ম্ম ততটা আস্তিকতার অভিমুখে অভিগামী। একান্ত আস্তিকতায় আধ্যক্ষিক সাম্যবাদ রহিত হইয়া প্রীতির পাত্রে পক্ষপাতিত্বের পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হইয়াছে। ভগবান্ কাহাদের প্রতি কিরূপ পক্ষপাতিত্বের বিচার করেন, তাহার একটী তালিকা শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীলঘুভাগবতামৃত ও উপদেশামৃতে প্রদান করিয়াছেন,—

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তমা ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয় সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী।।

যথেচ্ছাচার-পরায়ণ জীবগণ অপেক্ষা সত্ত্বনিষ্ঠ সুকর্ম্মিগণ কৃষ্ণের প্রিয়; কর্ম্মী অপেক্ষা গুণত্রয়বর্জ্জিত ব্রহ্মজ্ঞ জ্ঞানী কৃষ্ণের প্রিয়; জ্ঞানী অপেক্ষা শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়; শুদ্ধভক্তগণ অপেক্ষা প্রেমৈকনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়; প্রেমৈকনিষ্ঠ ভক্ত অপেক্ষা ব্রজসুন্দরীগণ কৃষ্ণের প্রিয়, ব্রজসুন্দরীগণ অপেক্ষা শ্রীমতী বার্ষভানবী কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণের যেরূপ প্রিয়তমা, তাঁহার কুণ্ডও কৃষ্ণের তাদৃশ প্রিয়। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যবিশিষ্ট কৃষ্ণভক্ত অনন্য-ভাবে শ্রীরাধাকুণ্ডেই আশ্রয় করিবেন।

পরম-মুক্ত সুধীগণের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতে যে সেবার বিচার রহিয়াছে, তাহাতে সাম্যবাদের পরিবর্ত্তে কিরূপ বৈষম্য-বিচারের আদর্শ দৃষ্ট হয়। যখন শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে, রাসলীলায় সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা

গোপীগণের সহিত একত্রে প্রিয়তমা রাধিকার নিরপেক্ষ প্রেম প্রকটিত হইতে পারে না—অন্যাপেক্ষাবশতঃ প্রেমের গাঢ়তার স্ফূর্ত্তি হয় না, তখন তিনি রাধিকাকে রাসস্থলী হইতে চুরি করিয়া অন্য গোপীগণ হইতে পৃথক্ হইয়া গেলেন। শ্রীরাধিকা রাসমণ্ডলীতে গোপীগণের সাধারণ প্রেমসুলভ মমতা-দর্শনে কৌটিল্য-বামতা-প্রযুক্ত রাসমণ্ডলী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। শ্রীরাধিকার অভাবে শ্রীকৃষ্ণ খিন্নমনা হইয়া বিলাপ করিতে করিতে শ্রীমতীর অন্বেষণে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন,—

রাধা লাগি' গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ।
তবে জানি,—রাধায় কৃষ্ণের গাঢ়-অনুরাগ।।

* * *

গোপীগণের রাস-নৃত্য-মণ্ডলী ছাড়িয়া।
রাধা চাহি' বনে ফিরে বিলাপ করিয়া।।

* * *

শতকোটি গোপী-সঙ্গে রাস-বিলাস।
তার মধ্যে এক-মুর্ত্ত্যে রহে রাধাপাশ।।
সাধারণ প্রেমে দেখি সর্ব্বত্র 'সমতা'।।
রাধার কুটীল-প্রেম হইল 'বামতা'।।
ক্রোধ করি' রাস ছাড়ি' গেলা মান করি'।
তাঁরে না দেখিয়া ব্যাকুল হৈল হরি।।

* * *

তাঁহা বিনা রাসলীলা নাহি তাঁর চিত্তে।
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে।।

(চৈতন্যচরিতামৃত)

পরম-মুক্তগণের সেবার বিচারে আমরা ভক্ত ও ভগবানের এইরূপ পক্ষপাতিত্ব বা বৈষম্য বিচার দেখিতে পাই। সাম্যবাদের নীতি দেবীধামের নাস্তিকতার আবর্ত্তে পড়িয়া থাকে, আর এইরূপ সেবার বিচার—সেবক ও সেব্যের পক্ষপাতিত্বের বিচার দেবীধাম, সাম্যভাবের আদর্শ-লোক বিরজা, নির্ব্বিশেষধাম ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া বৈকুণ্ঠ এবং তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত সাম্যের মধ্যে যুগপৎ অপ্রাকৃত বৈষম্যভাবের সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করে।

ভীষ্ম-যুধিষ্ঠির সংবাদ

(কর্ম্মের প্রভাব)

(মহাভারত অনুশাসন-পর্ব্ব হইতে উদ্ধৃত)

কুরুকুলচূড়ামণি শান্তনুনন্দন শরশয্যাশায়ী হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভগবান্ হৃষীকেশ এবং ভ্রাতৃবৃন্দ সমভিব্যাহারে ভীষ্মের দর্শন-মানসে কুরুক্ষেত্রে গমন করেন। তাঁহারা ভীষ্ম-সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দেবগণ যেমন ইন্দ্রের চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট থাকেন, তদ্রূপ ব্যাসাদি মহর্ষিগণ ভীষ্মের চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিয়া আছেন। তাঁহারা ভীষ্মকে অবলোকন করিবামাত্র স্ব-স্ব-বাহন হইতে অবতীর্ণ হইয়া মহর্ষিগণকে অভিবাদনপূর্ব্বক ভীষ্মের চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন।

ভগবান্ বাসুদেব প্রশান্তপাবকসদৃশ ভীষ্মকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,—"হে শান্তনুতনয়, আপনার জ্ঞানসকল পূর্ব্বের ন্যায় প্রসন্ন আছে ত'? আপনার বুদ্ধি পর্য্যাকুল হয় নাই ত'? এবং শরাঘাত-নিবন্ধন আপনার গাত্র নিতান্ত অবসন্ন হইতেছে না ত'? মানসিক দুঃখাপেক্ষা শারীরিক দুঃখ সমধিক বলবান্। একটী সূক্ষ্মশল্য শরীর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে যারপরনাই ক্লেশ উপস্থিত হয়; কিন্তু আপনি শরসমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়াছেন, শর দ্বারা শরীর-ভেদ-নিবন্ধন আপনার কোন ক্লেশ হইতেছে না ত'? যাহা হউক আপনি যখন দেবগণকেও উপদেশ প্রদান করিতে পারেন, তখন আপনার নিকট প্রাণিগণের জন্মমৃত্যুর বিষয় কীর্ত্তন করা বাহুল্য মাত্র। আপনি জ্ঞানবৃদ্ধ; ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান আপনার কিছুই অবিদিত নাই। প্রাণিগণের মৃত্যু ও সৎকার্য্যের ফলোদয়ের বিষয় আপনি সবিশেষ অবগত আছেন। প্রাণিগণের মৃত্যু ও সৎকার্য্যের ফলোদয়ের বিষয় আপনি সবিশেষ অবগত আছেন। আপনি সত্যধর্ম্মপরায়ণ ও মহাবলাক্রান্ত। আপনি ব্যতীত ত্রিলোকমধ্যে তপঃপ্রভাবে মৃত্যু অতিক্রম করে, এমন আর কোন ব্যক্তিই আমার শ্রবণগোচর হয় নাই। আপনি বলবীর্য্য প্রভাবে স্বর্গলোকেও বিখ্যাত হইয়াছেন এবং স্বীয় গুণগ্রামপ্রভাবে দেবগণকেও অতিক্রম করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠপাণ্ডব রাজা যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিসংক্ষয়-নিবন্ধন অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত হইয়াছেন, অতএব আপনি উঁহার শোক অপনোদন করুন। ভবাদৃশ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ মোহাবিষ্ট মানবের সান্ত্বনার একমাত্র উপায়।

মহাত্মা ভীষ্ম বাসুদেবের বাক্য-শ্রবণে বদনমণ্ডল উন্নত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—হে বাসুদেব, আপনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কর্ত্তা। কেহই আপনাকে পরাজয় করিতে পারে না। আপনি নিত্যমুক্ত এবং ত্রিকাল বর্ত্তমান আছেন। আপনি সকলের আশ্রয়। হে কৃপাবারিধি পুরুষোত্তম, আমি আপনার ভক্ত এবং অভিলষিত গতিলাভার্থ আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, আপনি আমার শুভ বিধান করুন।

রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,—পিতামহ, অজ্ঞান-নিবন্ধন পাপানুষ্ঠান করিলে তদ্বিষয়ে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির শোক অকর্ত্তব্য; কিন্তু জ্ঞানপূর্ব্বক পাপাচরণ করিলে কিরূপে শান্তিলাভ হইতে

পারে? আপনার কলেবর শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া সলিলধারাবাহী অচলের ন্যায় অনবরত রুধির-প্রবাহ বর্ষণ পূর্ব্বক আমারই কুকর্ম্মের পরিচয় প্রদান করিতেছে। উহা দর্শন করিয়া আমি কোনক্রমেই শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না। আপনি যে আমার নিমিত্তই এইরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছেন, ইহা অপেক্ষা কষ্টকর আর কিছুই নাই। আমি আপনার এই অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া বর্ষাসলিলসিক্ত পদ্মের ন্যায় নিতান্ত মসৃণ-ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি। আর এই সমস্ত মহীপাল আমারই নিমিত্ত পুত্র ও মিত্রগণের সহিত সমরশায়ী হইয়াছেন। ইঁহাদের এতাদৃশ দুরবস্থা-দর্শনে শোকাবেগে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। হায়! আমরা উভয়পক্ষেই ক্রোধের বশীভূত হইয়া এই গর্হিতাচরণ করিয়াছি। না জানি, এই পাপপ্রভাবে আমাদিগকে কিপ্রকার দুর্গতি লাভ করিতে হইবে? আমিই আপনার ও সুহৃদ্গণের এইরূপ বিপৎপাতের কারণ। আমি আপনাকে বিষণ্ণবদনে শরশয্যায় শয়ান দেখিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইতেছি। দুর্য্যোধন কুরুকুলের কলঙ্কস্বরূপ হইয়াও ভ্রাতৃবর্গ ও সৈন্যগণের সহিত ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে সমর-শয্যায় শয়ন করিয়া আমাপেক্ষা অধিক সুখী হইয়াছে। আজ তাহাকে আপনার এই দুরবস্থা দর্শন করিতে হইল না। এক্ষণে আমার প্রাণধারণাপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। যদি আমিও ভ্রাতৃবর্গের সহিত শত্রুশরে প্রাণত্যাগ করিতাম, তাহা হইলে আমার আপনাকে এইরূপ শরনিপীড়িত ও দুঃখিত দেখিতে হইত না। এক্ষণে মনে হইতেছে, বিধাতা আমাদিগকে পাপানুষ্ঠান-জন্যই বোধ হয় সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা যাহাতে পরলোকে এই পাপের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি, আপনি তদ্বিষয়ে আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করুন।

ভীষ্ম বলিলেন,—হে ধর্ম্মরাজ, তুমি কাল, অদৃষ্ট ও ঈশ্বরের অধীন আত্মাকে কি নিমিত্ত পুণ্যপাপের কারণ বলিয়া অবগত হইতেছ? আত্মা কোন কার্য্যেরই কারণ হইতে পারে না। সম্প্রতি কাল, ব্যাধ ও পন্নগের সহিত গৌতমীর যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে গৌতমী নাম্নী শান্তিপরায়ণা এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ছিলেন। তাঁহার অন্ধের যষ্টির ন্যায় একটীমাত্র পুত্র ছিল। একদা এক ভুজঙ্গ সেই পুত্রকে দংশন করায় সে অবিলম্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ঐ সময় অর্জ্জুনক নামক ব্যাধ ঐ সর্পকে স্নায়ুপাশে বদ্ধ করিয়া গৌতমীর নিকট আগমনপূর্ব্বক গৌতমীকে বলিল, —ভদ্রে, এই পন্নগাধম আপনার পুত্রকে বিনাশ করিয়াছে। এক্ষণে আদেশ করুন, কি প্রকারে ইহাকে বিনাশ করিব? এই শিশুঘাতী পাপাত্মার প্রাণরক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। অতএব শীঘ্র বলুন, ইহাকে হুতাশনে নিক্ষপ করিব, না খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিয়া ফেলিব?

গৌতমী—অর্জ্জুনক, তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ, ইহাকে পরিত্যাগ কর। কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উৎকৃষ্ট লোক-লাভের প্রত্যাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাকে পাপভারে নিপীড়িত করিয়া থাকে? যাঁহারা ধার্ম্মিক, তাঁহারা অনায়াসেই দুঃখ-সাগর পার হইতে পারেন, কিন্তু যাহারা পাপভারে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহারা সলিল-নিক্ষিপ্ত শস্ত্রের ন্যায় দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়া যায়। দেখ, এই ভুজঙ্গকে বধ করিলে আমার পুত্র জীবিত হইবে না এবং ইহার জীবন রক্ষা করিলেও আমার কিছুমাত্র ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব এরূপস্থলে এই জীবিত জন্তুর প্রাণ বিনাশ করিয়া কে অনন্তকালের জন্য নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে?

ব্যাধ—দেবি, আমি আপনার গুণগ্রাম সবিশেষ অবগত আছি। মহদ্ব্যক্তিগণ স্বভাবতঃই পরদুঃখে দুঃখিত হইয়া থাকেন। আপনি যেরূপ বলিতেছেন, উহা শোকশূন্য ব্যক্তির উপযুক্ত উপদেশ। এক্ষণে আদেশ করুন, আমি এই দণ্ডে এই দুষ্ট সর্পকে বিনাশ করি। যাঁহারা শান্তগুণাবলম্বী, তাঁহারাই উপস্থিত অপ্রিয় ঘটনাকে কালকৃত বিবেচনা করিয়া শোক পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, কিন্তু যাহারা প্রতিকারপরায়ণ, তাহাদিগের শোকানল শত্রুনাশ দ্বারাই নির্ব্বাপিত হয়। আর যাহারা এই উভয়গুণ-বিরহিত, তাহারা মোহবশতঃ প্রতিনিয়ত অপ্রিয়ের অনুশোচনা করিয়া থাকে। অতএব আপনি এই ভুজঙ্গকে বিনাশ করিয়া অবিলম্বে পুত্রবিনাশজনিত দুঃখ পরিত্যাগ করুন।

গৌতমী—ব্যাধ, মাদৃশ ধর্ম্মাত্মাদিগের কদাপি কিছুমাত্র দুঃখ উপস্থিত হয় না। ধর্ম্মাত্মগণ সততই বিবেক অবলম্বন করিয়া থাকেন। আমার এই পুত্র মৃত্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল বলিয়াই এই সর্প উহাকে দংশন করিয়াছে। সুতরাং আমি কোন মতেই এই ভুজঙ্গের প্রাণ সংহার করিতে পারি না। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের ক্রোধ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। ক্রোধ হইতে মনঃপীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব আমার এ বিষয়ে কিছুমাত্র ক্রোধের কারণ জন্মে নাই। তুমি ক্ষমা অবলম্বনপূর্ব্বক অবিলম্বে এই ভুজঙ্গকে পরিত্যাগ কর।

ব্যাধ—ভদ্রে, শত্রু-বিনাশ দ্বারা যে-কীর্ত্ত্যাদি লাভ হয়, তাহা অক্ষয়। শত্রু-বিনাশে কাল বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। বলবান্ শত্রুকে সংহার করিয়া অচিরাৎ ধন-প্রতিষ্ঠাদি লাভ করাই প্রশস্ত। যদি এই সর্প কালবশে বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে আপনার শত্রুক্ষয়জনিত শ্রেয়োলাভ হইবে বটে, কিন্তু সেই লাভ কখনই প্রশংসনীয় হইতে পারে না।

গৌতমী—ব্যাধ, এই ভুজঙ্গকে বিনাশ করিয়া আমার কি প্রীতি ও ইহাকে দৃঢ়তর বন্ধন করিয়াই বা আমার কি ফল লাভ হইবে? অতএব এই সর্পকে ক্ষমা করাই কর্ত্তব্য।

ব্যাধ—শুভগে, এই একমাত্র সর্পকে বিনাশ করিলে বহুলোকের প্রাণরক্ষা হইবে। অতএব বহুপ্রাণীর জীবনরক্ষায় উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক ইহাকে রক্ষা করা কোন ক্রমেই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত নহে। ধনপরায়ণ মনুষ্যগণ অপরাধীর প্রাণদণ্ড করিয়া থাকেন। অতএব অবিলম্বে এই পাপিষ্ঠকে বিনাশ করা উচিত।

গৌতমী—অর্জ্জুনক, এই সর্পের প্রাণ সংহার করিলে আমার পুত্র কদাচ পুনর্জীবিত হইবে না, আর ঐ কার্য্য দ্বারা আমারও পুণ্যলাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব তুমি অচিরাৎ এই জীবিত সর্পকে পরিত্যাগ কর।

ব্যাধ—ভদ্রে, সুররাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন এবং রুদ্রদেবও দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করিয়া যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব আপনিও সুরগণের অনুসরণপূর্ব্বক নিঃশঙ্কচিত্তে এই সর্পকে বিনাশ করুন।

ব্যাধ সর্পকে বিনাশ করিবার মানসে এইরূপ বারংবার বলিলেও গৌতমীর মন কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। এই সময় সেই পাশ-নিপীড়িত ভুজঙ্গ কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক মৃদুস্বরে ব্যাধকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, ওরে মূর্খ, এ বিষয়ে আমার অপরাধ কি? আমি পরাধীন, মৃত্যু আমাকে প্রেরণ করাতেই

আমি এই শিশুকে দংশন করিয়াছি। অতএব এই শিশুর বিনাশ-নিবন্ধন যদি কাহাকেও দোষী হইতে হয়, তাহা হইলে মৃত্যুই এ বিষয়ে অপরাধী।

ব্যাধ—সর্প, যদিও তুমি অন্যের বশবর্ত্তী হইয়া এই পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ, তথাপি তুমিও ইহার একটী প্রধান কারণ বলিয়া তোমাকে দোষী হইতে হইবে। চক্র ও দণ্ডাদি যেমন মৃৎপাত্র-নির্ম্মাণের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, তদ্রূপ তুমিও এই বালক-বিনাশের কারণ। অতএব তুমি যখন দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছ, তখন তোমাকে বিনাশ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

সর্প—লুব্ধক, চক্র-দণ্ডাদি যেমন পরবশ, আমিও তদ্রূপ; সুতরাং আমাকেই দোষী বলিয়া নির্দ্দশ করিতেছ কিরূপে? আর যদিও তুমি আমাকে এ বিষয়ের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ কর, তাহা হইলেও আমাকে একাকী অপরাধী বিবেচনা করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। চক্র-দণ্ডাদি যেমন পরস্পর পরস্পরের প্রযোজক, তদ্রূপ আমি, কাল ও মৃত্যু প্রভৃতি আমরা সকলেই পরস্পর পরস্পরের প্রেরক। এইরূপ পরস্পর পরস্পরের প্রেরকত্ব-নিবন্ধন সকলের সহিত সকলেরই কার্য্য-কারণ-ভাব সংঘটন হইতে পারে; সুতরাং এস্থলে আমি একাকী কখনই দোষী ও বধার্হ বলিয়া গণ্য হইতে পারি না। অতএব যদি এ বিষয়ে দোষ স্বীকার কর, তাহা হইলে আমাদের সকলেরই দোষ হইতে পারে।

লুব্ধক—সর্প, মৃত্যু যদিও এই কার্য্যের প্রধান কারণ, তথাপি তিনি কখনও ইহার বিনাশকর্ত্তা নহেন। তুমিই ইহার বিনাশের প্রধান হেতু; সুতরাং তোমাকে সংহার করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। লোক যদি অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও পাপে লিপ্ত না হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রসমুদয় বৃথা হইয়া যায় এবং নরপতিরাও তস্করাদির দণ্ডবিধান করিতে পারেন না।

সর্প—লুব্ধক, প্রযোজক-কর্ত্তা বর্ত্তমান থাকিলেও প্রযোজ্য ব্যতীত ক্রিয়া-সাধন হয় না। এই নিমিত্ত প্রযোজ্যকে আপাততঃ কার্য্যের সাধক বলিয়া বোধ করা যায়। এই শিশু-বিনাশ-বিষয়ে আমি 'প্রযোজ্য' বলিয়াই তুমি আমাকে দোষী বিবেচনা করিতেছ। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ বিষয়ে আমাকে দোষী না বলিয়া বরং আমার প্রযোজক মৃত্যুকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করিতে পার।

লুব্ধক—ওরে পন্নগাধম, তুই নিতান্ত নির্ব্বোধ, নৃশংস ও শিশুঘ্ন; আর কেন বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার করিতেছিস্? আমি তোকে নিশ্চয়ই বধ করিব।

সর্প—হে ব্যাধ, যেমন ঋত্বিক্‌গণ যজমান কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন বলিয়া তাঁহারা ফললাভে অধিকারী হন না, তদ্রূপ আমিও মৃত্যু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া এই শিশুর প্রাণ সংহার করিয়াছি বলিয়া কখনই পাপের ফলভাগী হইব না। মৃত্যু আমাকে প্রেরণ করাতেই আমি বালককে বিনাশ করিয়াছি। সুতরাং আমি কি নিমিত্ত দোষী হইব?

সর্প ও ব্যাধ পরস্পর এইরূপ বিতণ্ডা করিতেছিল, এই সময় মৃত্যু তথায় উপস্থিত হইয়া সর্পকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,—ভুজঙ্গ, আমি কাল কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই তোমাকে বালকের প্রাণ-বিনাশে

প্রেরণ করিয়াছি। সুতরাং তুমি বা আমি কেহই এই শিশুর বিনাশের কারণ নহি। জলদজাল যেমন বায়ুর বশবর্ত্তী, আমিও তদ্রূপ কালের অধীন। এই ভূমণ্ডলে যে-সমুদয় সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক জন্তু বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহারা সকলেই কালের বশবর্ত্তী। স্বর্গ বা মর্ত্ত্যভূমিতে যে-সকল স্থাবর-জঙ্গমাত্মক পদার্থ বর্ত্তমান আছে, তৎসমুদয়ই কালের অধীন। ফলতঃ সমুদয় জগৎই কালের বশবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছে। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, এতদুভয়ই কালের বশীভূত। কাল বারংবার সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, পৃথিবী, মিত্র, অশ্বিনীকুমার, অদিতি, নদী, সমুদ্র, ঐশ্বর্য্য ও অনৈশ্বর্য্য—সবই সৃষ্টি এবং সংহার করিয়া থাকেন। হে ভুজঙ্গম, তুমি এই সমুদয় অবগত হইয়াও কি নিমিত্ত আমাকে দোষী বলিয়া স্থির করিতেছ? এক্ষণে যদি আমাকে দোষী বলিয়া বিবেচনা কর, তাহা হইলে তুমি যে নির্দ্দোষ, তাহার প্রমাণ কি?

সর্প—হে মৃত্যো, আমি আপনাকে দোষী বা নির্দ্দোষ বলিয়া উল্লেখ করিতেছি না। আমি এইমাত্র বলিতেছি যে, আপনিই আমাকে শিশু-বধার্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কালের দোষ থাকুক বা না থাকুক, আমি তাহার বিচারের কর্ত্তা নহি। এক্ষণে কেবল স্বদোষ প্রক্ষালন করা এবং আপনার প্রতি দোষারোপ না করাই আমার উদ্দেশ্য।

পাশ-নিবদ্ধ সর্প মৃত্যুকে এই কথা বলিয়া ব্যাধকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল, —হে বনচর, তুমি মৃত্যুর বাক্য শ্রবণ করিলে; অতএব বিনা অপরাধে আমাকে পাশবদ্ধ করা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

ব্যাধ—সর্প, আমি তোমার ও মৃত্যুর উভয়েরই বাক্য শ্রবণ করিলাম; কিন্তু তোমার নির্দ্দোষিতা কোনরূপেই সপ্রমাণ হইতেছে না। তোমরা উভয়েই এই বালক-বধের কারণ। সাধুদিগের দুঃখকর, দুরাত্মা ও ক্রূর তোমাদিগের তুল্য আর কেহই নাই। তোমাদিগকে ধিক্! আমি তোমাকে অবশ্যই নিপাত করিব।

মৃত্যু—নিষাদ, আমাদিগকে কালের বশীভূত হইয়া কার্য্য করিতে হয়। অতএব আমাদিগের প্রতি দোষারোপ করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে।

ব্যাধ—কৃতান্ত, যদি আমি তোমাদিগকে কালের বশবর্ত্তী বলিয়া তোমাদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ না করি, তাহা হইলে ত' কোন ব্যক্তিরই উপকারীর প্রশংসা ও অপকারীর নিন্দা করা বিধেয় নহে?

মৃত্যু—বনচর, আমি ত' পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, প্রাণিগণ যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, কালই তাহাদিগকে সেই কার্য্যে প্রেরণ করিয়া থাকেন। ইহলোকে কালপ্রভাবে সমুদয় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। অতএব উপকারীর স্তুতি ও অপকারকের নিন্দা করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। কাল-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই আমরা এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। সুতরাং অনর্থক আমাদিগকে অপরাধী করা তোমার কোনক্রমেই উচিত হইতেছে না।

মৃত্যু ব্যাধকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিতেছেন, এমন সময় কাল সেই স্থানে সমুপস্থিত হইয়া ব্যাধকে বলিলেন,—হে নিষাদ, কি আমি, কি মৃত্যু, কি সর্প—কেহই এই বালক-বিনাশ-বিষয়ে অপরাধী নহি।

উহার পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্মই আমাদিগকে উহার বিনাশ-সাধনে নিয়োগ করিয়াছে। ফলতঃ এই বালক স্বীয় কর্ম্মবশতঃই অকালে কাল-কবলে নিপতিত হইয়াছে। অতএব কর্ম্মকেই ইহার বিনাশের কারণ বলিতে হইবে। কর্ম্ম পুত্রের ন্যায় আচরণ-দ্বারা জীবগণকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে, আবার কর্ম্মই পরম শত্রুর ন্যায় আচরণ দ্বারা জীবকে মহাদুঃখ-সমুদ্রে নিমগ্ন করিয়া দেয়। কর্ম্মই মনুষ্যের পাপ-পুণ্যের প্রকাশক। মনুষ্য যেমন কর্ম্মসমুদয়ের বশীভূত, কর্ম্ম-সমুদয়ও তদ্রূপ মনুষ্যের আয়ত্ত। কুম্ভকার যেমন মৃৎপিণ্ড দ্বারা স্বেচ্ছানুসারে ঘট-শরাবাদি নির্ম্মাণ করে, তদ্রূপ মনুষ্যও স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পারে। ছায়া ও রৌদ্রের ন্যায় কর্ম্ম ও কর্ত্তা নিরন্তর পরস্পর সুসংবদ্ধ রহিয়াছে। অতএব কি আমি, কি মৃত্যু, কি সর্প, কি তুমি, কি ব্রাহ্মণী—আমাদিগের মধ্যে কাহাকেই এই শিশুর বিনাশের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। এই শিশু স্বয়ংই ইহার বিনাশের কারণ।

কাল এই বলিলে বৃদ্ধা গৌতমী লোক-সমুদয়কে কর্ম্মের বশবর্ত্তী জানিয়া ব্যাধকে বলিলেন,—অর্জ্জুনক! কাল, সর্প বা মৃত্যু আমার পুত্রের বিনাশের কারণ নহে। আমার সন্তান নিজ-কর্ম্ম-দোষেই নিহত হইয়াছে। আমিও আপনার কর্ম্মবশতঃ পুত্রশোক প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে কাল ও মৃত্যু যথাস্থানে গমন করুন, তুমিও সর্পকে পরিত্যাগ কর।

ভীষ্ম বলিলেন,—হে ধর্ম্মরাজ! মহানুভবা ব্রাহ্মণী এই কথা বলিলে কাল ও মৃত্যু যথাস্থানে গমন করিলেন। অর্জ্জুনক পাশবদ্ধ সর্পকে পরিত্যাগ করিল এবং গৌতমীও পুত্রশোক পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্তিলাভ করিলেন। অতএব তুমিও মনুষ্যগণকে কর্ম্মের বশীভূত জানিয়া শোকবিহীনচিত্তে শান্তিলাভ কর। ইহলোকে সকলেই স্ব-কার্য্য-নিবন্ধন প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। নরপতিগণ যে সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তদ্বিষয়ে তোমার অথবা দুর্য্যোধনের কিছুমাত্র দোষ নাই। স্ব-স্ব-কর্ম্মবশতঃই তাহাদিগকে কাল-প্রভাবে দেহত্যাগ করিতে হইয়াছে।

সঙ্গত্যাগ

শ্রীউপদেশামৃতে শ্রীরূপগোস্বামী বলিয়াছেন যে,—উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন, সঙ্গত্যাগ ও সৎবৃত্তি (সাধুজীবন ও সাধুপ্রবৃত্তি) হইতে ভক্তির উন্নতি হয়। তন্মধ্যে আমরা সম্প্রতি 'সঙ্গত্যাগ'-শব্দের তাৎপর্য্য আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সঙ্গ—দুই প্রকার অর্থাৎ সংসর্গ ও আসক্তি। সংসর্গ দুইপ্রকার অর্থাৎ অভক্ত- সংসর্গ ও যোষিৎ-সংসর্গ। আসক্তিও—দুইপ্রকার অর্থাৎ সংস্কারাসক্তি ও দ্রব্যাসক্তি। যে-সকল মহাত্মা ভক্তিসিদ্ধি লাভ করিবার আশা করেন, তাঁহারা বিশেষ যত্নসহকারে সংসর্গ ও আসক্তিরূপ সঙ্গকে বর্জ্জন করিবেন। সঙ্গ থাকিলে ক্রমশঃ সর্ব্বনাশ অবশ্য অবশ্য ঘটিয়া থাকে। যথা গীতায়,—
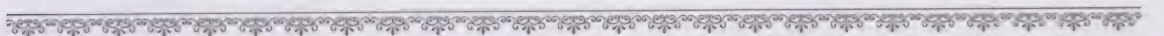
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্‌বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।।

এই ভগবদাজ্ঞা সর্ব্বদাই সাধারণকে স্মরণ রাখিতে হইবে। সাধক যদি নিষিদ্ধ সঙ্গ করেন, তাহা হইলে অতি অল্পে অল্পে তাঁহার আসক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। যতই আসক্তি বৃদ্ধি হইবে, ততই পরমার্থনিষ্ঠা খর্ব্ব হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, জীব চিন্ময়। মায়াবদ্ধ হইয়া অবিদ্যাদোষে জড়াভিমানে জীবের স্বরূপভ্রম হইয়াছে। শুদ্ধাবস্থায় জীবের মায়া সংসর্গ হয় না। সে-অবস্থায় তাঁহার কেবল চিৎপ্রসঙ্গই থাকে। চিজ্জগতে জীবের সমস্ত সংসর্গই চিন্ময়। অতএব তদবস্থায় জীবের যে নিত্যসঙ্গ, তাহা বাঞ্ছনীয়। মায়াবদ্ধাবস্থায় জীবের যে সঙ্গ হয়, তাহা দূষিত। সেই দূষিত অবিদ্যাসঙ্গ অর্থাৎ অভক্তসংসর্গ, যোষিৎ-সংসর্গ, সংস্কারাসক্তি ও দ্রব্যাসক্তি—সমস্তই জীবের মঙ্গলের প্রতিকূল। চিৎসঙ্গমাত্রই জীবের স্বজাতীয়-সঙ্গ এবং অচিৎসঙ্গই জীবের বিজাতীয়-সঙ্গ। বিজাতীয়-সঙ্গ হইতে মুক্ত হওয়াই জীবের মুক্তি। এখন আমরা বিজাতীয়-বিষয় বিচার করিতেছি।

প্রথমেই অভক্ত-সঙ্গের বিচার। অভক্ত কে? যাঁহারা ভগবানের অনুগত নহেন, তাঁহারাই অভক্ত। জ্ঞানবাদী পুরুষ কখনই ভগবানের অনুগত নহেন। তিনি মনে করেন যে, আমিও জ্ঞানবলে ভগবানের সমান হইব। জ্ঞানই সর্ব্বোত্তম বস্তু। জ্ঞানকে যে লাভ করে, তাঁহাকে আর ভগবান্ অধীন করিয়া রাখিতে পারেন না। জ্ঞানবলেই ভগবানের ব্রহ্মতা; এবং জ্ঞানবলে আমিও ব্রহ্ম হইব। অতএব জ্ঞানবাদীর সমস্ত চেষ্টাই—ভগবান্ হইতে স্বাধীন হওয়া। জ্ঞানে যে সাযুজ্যমুক্তি হয়, তাহাতে আর জীবের উপর ভগবানের বিক্রম থাকে না। এই ত' ব্রহ্মজ্ঞানীদের চেষ্টা। আত্মজ্ঞানী ও প্রাকৃতজ্ঞানিগণও ভগবানের কৃপা অপেক্ষা করেন না। তাঁহারা জ্ঞান ও মুক্তিবলে সমুদয় লাভ করিতে চেষ্টা করেন। ঈশ-প্রসাদের জন্য তাঁহারা বিশেষ যত্ন করেন না। সুতরাং জ্ঞানিমাত্রেই অভক্ত। যদিও কোন জ্ঞানী সাধনকালে ভক্তিকে স্বীকার করেন, তথাপি তিনি সিদ্ধিকালে ভক্তিকে বিসর্জ্জন দেন। তাঁহার সমস্ত কার্য্যেই নিত্যভক্তি বা ঈশানুগত্যের কোন প্রকার লক্ষণ দেখা যায় না। যাঁহারা জ্ঞানী বলিয়া একটী সম্প্রদায় গঠন করেন, তাঁহাদের সকলেরই এই লক্ষণ। তাঁহারা প্রকৃতজ্ঞানের আভাসমাত্র লাভ করেন। সেই প্রকৃত-জ্ঞান শুদ্ধভক্তির অবস্থা-ভেদমাত্র। তাহা কেবল ভগবৎপ্রসাদে শুদ্ধভক্তগণই লাভ করিয়া থাকেন; যথা শ্রীচরিতামৃতে সনাতনের প্রতি প্রভুর উপদেশ,—

জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে।।

অতএব যাঁহারা জ্ঞানবাদে আসক্ত, তাঁহাদিগকে অভক্ত মধ্যে গণনা করা হইয়াছে। 'মুক্তি' বলিয়া যে একটী সাধনফল আছে, তাহাই তাঁহাদের সাধনের চরম উদ্দেশ্য। ভগবৎসেবার দ্বারা ভগবৎপ্রসাদ লাভ তাঁহাদের জীবনের তাৎপর্য্য হয় না। কর্ম্মবাদী পুরুষগণও ভক্ত নহেন। অতএব তাঁহারাও অভক্ত। কৃষ্ণপ্রসাদ-

লাভের জন্য যদি কেহ কর্ম্ম করেন, তবে সে কর্ম্মের নাম 'ভক্তি'। যে-কর্ম্ম প্রাকৃত ফল বা বহির্ম্মুখজ্ঞান দান করে, সে-কর্ম্ম ভগবদ্বিমুখ। কর্ম্মিগণ কেবল কৃষ্ণপ্রসাদ অনুসন্ধান করেন না। যদিও কৃষ্ণকে সম্মান করেন, তথাপি তাঁহাদের মূল-তাৎপর্য্য এই যে, কোন প্রকার প্রাকৃত সুখ লাভ করা। স্বার্থপর কর্ম্মকেই 'কর্ম্ম' বলে। অতএব কর্ম্মি-ব্যক্তিকে অভক্ত বলা হয়। যোগিগণ কোন স্থলে জ্ঞানের ফল কৈবল্য মোক্ষ এবং কোন স্থলে কর্ম্মের ফল বিভূতি (ঐশ্বর্য্য) অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান। তাহাতে তাঁহাদিগকে অভক্তই বলা যায়। বহুদেব-পূজকগণের অনন্য-শরণাপত্তি না থাকায় তাঁহাদিগকেও অভক্ত বলা যায়। যাঁহারা কেবল শুষ্ক ন্যায়াদি-বিচারে আসক্ত, তাঁহারাও ভগবদ্বহির্ম্মুখ। যাঁহারা এরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, ভগবান্ একটী কাল্পনিক তত্ত্বমাত্র, তাঁহাদের ত' কথাই নাই, যাঁহারা বিষয়াসক্ত হইয়া ভগবানকে মনে করিতে অবকাশ পান না, তাঁহারাও অভক্তমধ্যে গণ্য। এই সকল অভক্তদিগের সংসর্গ করিলে অতি অল্পকালের মধ্যে বুদ্ধিনাশ হয় এবং তাঁহাদের সমান প্রবৃত্তি আসিয়া হৃদয়ে আসন গ্রহণ করে। যদি কাহারও শুদ্ধভক্তি পাইতে বাসনা থাকে, তাহা হইলে তিনি বিশেষ সতর্কতার সহিত অভক্ত-সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন।

দ্বিতীয়তঃ যোষিৎ-সংসর্গ। যোষিৎ-সংসর্গও বড় অনিষ্টকর। সনাতনের প্রতি প্রভুর উপদেশ এই,—

অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী—এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত—আর।।

গৃহস্থ ও গৃহত্যাগি-ভেদে বৈষ্ণব দুইপ্রকার। যাঁহারা গৃহত্যাগী, তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রীমাত্রই অসম্ভাষণীয়। সুতরাং 'যোষিৎসঙ্গ ত্যাগ' বলিলে তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রীলোকের সহিত কথোপকথনও নিষেধ হইয়াছে। যথা প্রভু-বাক্য,—

ক্ষুদ্র জীব-সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া।।

বৈষ্ণবী স্ত্রী সম্বন্ধে,—

পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু সবার মিলন।
স্ত্রী সব দূর হৈতে কৈল প্রভু দরশন।।

গৃহস্থ-বৈষ্ণব-সম্বন্ধে এইরূপ বিধি,—গৃহস্থ ব্যক্তি পরস্ত্রী বা বেশ্যা সংসর্গ করিবেন না। নিজ বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত সংসর্গ ব্যতীত অন্যপ্রকার সংসর্গ করিবেন না। স্ত্রৈণভাব একেবারে পরিত্যাগ করিবেন। স্মার্ত্তব্যক্তিগণ সম্বন্ধে এইরূপ শাস্ত্রোপদেশ,—

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতং সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে।।

গৃহস্থ ব্যক্তির গৃহিণী আবশ্যক। সেই গৃহিণীর সহিত একযোগে একমনে সমস্ত পুরুষার্থ সাধন করিবেন। সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে পুরুষার্থ চারি প্রকার অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। বর্ণাশ্রম-সম্বন্ধীয় শাস্ত্রে

যাহাকে বিধি বলিয়াছেন, তাহাই ধর্ম্ম। শাস্ত্রে যাহা নিষিদ্ধ বলিয়া উক্ত আছে, তাহা করার নাম—অধর্ম্ম; সেই সমস্ত বিধিপালন ও নিষেধ-পরিত্যাগের কার্য্যসমূহ গৃহস্থ ব্যক্তি স্বীয় গৃহিণীর সহিত বা সাহায্যে সাধন করিবেন। ধর্ম্মাচারের দ্বারা যে লাভ হয়, তাহার নাম—অর্থ। গৃহের দ্রব্য, পুত্র-কন্যা, গো-পশু ইত্যাদি সমস্তই অর্থ। সেই সমস্ত অর্থভোগের জন্য 'কাম'। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই তিনটীকে ত্রিবর্গ বলে। কর্ম্মচক্রে ভ্রাম্যমান মায়াবদ্ধ জীবের এই ত্রিবর্গ-সাধনই জীবন। গৃহিণীর সহিত একমনে ঐ ত্রিবর্গসাধন করাই স্মার্ত্ত গৃহস্থের কর্ত্তব্য। গৃহস্থ রাত্রদিন স্ত্রীর সহিত একমনে ত্রিবর্গ সাধন করিবেন। তীর্থযাত্রাদি-কার্য্যে গৃহিণী সঙ্গিণী থাকিতে পারেন। জীবের যে পর্য্যন্ত পরমার্থ-চেষ্টা না হয়, সে পর্য্যন্ত ত্রিবর্গচেষ্টা ব্যতীত ধর্ম্মজীবনের অন্য উপায় কি? মোক্ষই জীবের চতুর্থ পুরুষার্থ। মোক্ষ দুইপ্রকার অর্থাৎ অত্যন্তদুঃখ-নিবৃত্তি ও চিৎসুখপ্রাপ্তি। শুষ্কজ্ঞান বা মায়াবাদ যাঁহাদের ধর্ম্মজীবনকে নিয়মিত করে, তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত-দুঃখ-নিবৃত্তিই চরম উদ্দেশ্য। বিশুদ্ধজ্ঞান যাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায়, তাঁহারা চরমে চিৎসুখকে অন্বেষণ করেন। অত্যন্ত-দুঃখ-নিবৃত্তিতে আবদ্ধ থাকেন না। বৈষ্ণব গৃহী হউন বা গৃহত্যাগী হউন, তিনি চিৎসুখের অভিলাষী। গৃহস্থবৈষ্ণব সর্ব্বদাই চিৎসুখকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় গৃহিণীর সহিত একযোগে সকল কার্য্য করেন। সকল কার্য্য করিয়াও তিনি স্ত্রৈণ হন না। এরূপ জীবনে তাঁহার যোষিৎসংসর্গ হইতে পারে না। অবৈধ স্ত্রী সম্ভাষণ এবং বৈধ-স্ত্রীসঙ্গে অপারমার্থিক স্ত্রৈণভাব তিনি একেবারে পরিত্যাগ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে সূতগোস্বামী সংক্ষেপে বৈষ্ণব-গৃহস্থের নিয়মটীকে এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; যথা—

ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থোর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামলাভায় হি স্মৃতঃ।।
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ।।
অতঃ পুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্।।
তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা।।

তাৎপর্য্য এই যে, বিংশতি-ধর্ম্মশাস্ত্রে ত্রিবর্গধর্ম্মের প্রাধান্যরূপে উপদেশ। করুণাময় ঋষিগণ কর্ম্মাধিকারীর যাহাতে ভাল হয়, তজ্জন্য বিংশতি-ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। কর্ম্মিগণের তাহাতে অধিকার।

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।।

এই ভগবদ্বাক্যের উদ্দিষ্ট কর্ম্মাধিকারীর পক্ষে ত্রিবর্গই ধর্ম্ম। নির্ব্বেদ লাভ করিয়া যাঁহাদের জ্ঞানাধিকার হইয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে ত্রৈবর্গিক কর্ম্মাধিকার থাকে না। তাঁহারা তাহা ত্যাগ করিয়া শুষ্কজ্ঞানগত সন্ন্যাসের

অধিকারী হন। বহু-জন্মার্জ্জিত সুকৃতিবলে ভগবৎকৃপা লাভ করতঃ যাঁহাদের ভগবৎকথা শ্রবণ- কীর্ত্তনে শ্রদ্ধা হয়, তাঁহাদেরও কর্ম্মাধিকার থাকে না। তাঁহারাই বৈষ্ণব। তন্মধ্যে যাঁহারা গৃহস্থ, তাঁহারা আপবর্গ্য-ধর্ম্মাশ্রয়ে যে অর্থ লাভ করেন এবং সেই অর্থ-ভোগ-বিষয়ে যে কাম প্রাপ্ত হন, সে সমস্তই ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে হয় না, কিন্তু চিৎস্বরূপ জীবের ভক্ত্যনুকূল পবিত্র জীবনযাত্রার সহিত তত্ত্বজিজ্ঞাসার সহকারী হয়। এইস্থলে কর্ম্ম ও পরমার্থের ভেদ লক্ষিত হইবে। অতএব গৃহস্থ-বৈষ্ণব জীবনযাত্রার জন্য বর্ণাশ্রম-বিভাগের দ্বারা স্বীয় গৃহিণীর সহযোগে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ভগবৎপ্রসাদ-লাভের উদ্দেশ্যে গৃহস্থজীবনে সাধন করিবেন। যখন তাঁহার গৃহ তৎসাধনে প্রতিকূল হইবে, তখন তাহাতে বিরাগ জন্মিলে গৃহত্যাগ করিবেন। সুতরাং গৃহস্থ-বৈষ্ণবের পক্ষে উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত ত্রিবর্গ-ধর্ম্মলক্ষণ-ক্রিয়া তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র গঠন করে। সেই চরিত্রের সহিত তিনি অনন্যশরণ হইয়া ভগবানের নিত্য নাম-রূপ-গুণ-লীলা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি করিবেন। এইরূপ অহরহঃ গৃহিণীর সহযোগে পরমার্থ সাধন করিবেন। গৃহিণী ও তদনুগতা অন্যান্য স্ত্রীলোকের অর্থাৎ ভগিনী, কন্যা প্রভৃতির সাহায্যে তিনি সর্ব্বদা পরমার্থ চেষ্টা করিবেন। ইহাতে কোন প্রকার অবৈধ আচরণ না থাকায় যোষিৎসঙ্গ হইবে না। অতএব গৃহস্থ, কি গৃহত্যাগী—সকলপ্রকার সাধকের পক্ষেই যোষিৎ-সঙ্গ একেবারে পরিত্যাগ করা উচিত। ভক্তগণ বিশেষ যত্নসহকারে সংসর্গরূপ সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন।

এখন আসক্তিরূপ সঙ্গের বিচার করা যাউক। সংস্কারাসক্তি ও জড়দ্রব্যাসক্তি-ভেদে আসক্তি দুই প্রকার। প্রথমে সংস্কারাসক্তির বিষয় আলোচনা করি। প্রাক্তন-আধুনিক-ভেদে সংস্কার দুই প্রকার। জীব মায়াবদ্ধ হইয়া অনাদিকাল হইতে যে-সকল কর্ম্ম করিয়াছেন এবং যে-সকল জ্ঞান-চেষ্টা করিয়াছেন, সেই সমুদয় কর্ম্ম ও জ্ঞানের ফলে জীবের লিঙ্গশরীরগত যে সংস্কার জন্মিয়াছে, তাহাই প্রাক্তন সংস্কার। সেই সংস্কারকে 'স্বভাব' বলা যায়। যথা শ্রীগীতায়,—

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে।।

অনাদিপ্রবৃত্তা প্রধানবাসনা অত্র স্বভাবশব্দেনোক্তা। প্রাধানিক দেহাদিমান্ জীবঃ কারয়তি কর্ত্তা চেতি ন বিবিক্তস্য তত্ত্বমিতি ভাষ্যকারঃ (শ্রীবলদেবঃ)।।

পুনশ্চ,—

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ।।

জ্ঞানসংস্কার-বন্ধন-সম্বন্ধে গীতা এইরূপ বলিয়াছেন,—

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ।।

তত্র ভাষ্যকারঃ—জ্ঞান্যহং সুখ্যহমিতি অভিমানস্তেন পুরুষং নিবধ্নাতি।

এই প্রকার স্বভাবজনিত কর্ম্ম-জ্ঞানোদ্ভূত সংস্কারপ্রসূত আসক্তি হইতে মানবদিগের কর্ম্মসঙ্গ ও জ্ঞানসঙ্গ উদয় হয়। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে মায়াবাদীদিগের পক্ষে যে জ্ঞান-বন্ধন, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। কর্ম্মসঙ্গীদিগের কথা এইরূপে উক্ত আছে,—

> ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
> যোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্।।

প্রাক্তন সংস্কার হইতে কর্ম্মসঙ্গ ও জ্ঞানসঙ্গ হয়। এই সংস্কারসঙ্গ অত্যন্ত অপরিহার্য্য। বহুচেষ্টা, এমন কি, আত্মঘাত পর্য্যন্ত করিয়াও সংস্কার ত্যাগ করিতে পারা যায় না। এই জন্মে সঙ্গক্রমে যে সংস্কার বা গুণাসক্তি লাভ করা যায়, তাহাকে আধুনিক সংস্কার বলি। এই দুই প্রকার সংস্কারে জগজ্জীব বশীভূত। জীব মায়াতে যখন বদ্ধ থাকেন না, তখন তাঁহার যে স্বভাব, তাহা নির্ম্মল কৃষ্ণদাস্য। মায়াতে বদ্ধ হইয়া প্রাক্তন ও আধুনিক কুসংস্কারকে ত্যাগ করিতে পারেন না, তখন প্রাক্তনজনিত কুসংস্কার তাঁহার দ্বিতীয়-স্বভাব বা নিসর্গ হইয়া উঠে। সাধুসঙ্গই এই সংস্কারাসক্তিকে শোধন করিতে পারেন। সাধুসঙ্গই এই রোগের একমাত্র ঔষধি। সংস্কারসঙ্গ শোধন করিতে না পারিলে কোনক্রমেই ভক্তিসিদ্ধি হইতে পারে না। যথা তৃতীয় স্কন্ধে,—

> সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া।
> স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে।।

অসদ্ব্যক্তিতে যে সঙ্গ করা হয়, তাহাতেই জীবের সংসৃতি ঘটে। অসৎকে অজ্ঞানে সঙ্গ করিলেও সেই ফল অবশ্য হইবে। সেই সঙ্গ যদি প্রকৃত সাধুতে অজ্ঞানেও করা হয়, তদ্দ্বারা নিঃসঙ্গত্বের উদয় হয়। পুনশ্চঃ একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবদুক্তি,—

> ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
> ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা।।
> ব্রতানি যজ্ঞছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
> যথাঽবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্।।

সংস্কারসঙ্গ অতিশয় দুষ্ট। অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্যবিদ্যা, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, সন্ন্যাস, ইষ্টাপূর্ত্ত, দান, দক্ষিণা, ব্রতসমূহ, যজ্ঞ, তীর্থাটন, যম, নিয়ম—এই সকল সৎকর্ম্ম বহুকাল অনুষ্ঠিত হইলেও সঙ্গদোষ-শূন্য হইয়া জীব আমাকে পায় না। কিন্তু কেবল সৎসঙ্গক্রমে ঐ দোষ দূর হইলে আমি ভক্ত-হৃদয়ে শীঘ্র আবদ্ধ হই। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তদিগকে আদর করিয়া তাহাদের সঙ্গ করিলে কর্ম্মসঙ্গ ও জ্ঞানসঙ্গরূপ সংস্কার-সঙ্গদোষ দূর হয়। এই সংস্কার-সঙ্গদোষেই রাজস ও তামস-প্রবৃত্তি জীবে প্রবলা হয়। শয়ন, ভোজন, ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া-সম্বন্ধে মনুষ্যদিগের যে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক প্রবৃত্তি দেখা যায় সে সমস্তই সংস্কার-সঙ্গ। এই সংস্কারাসক্তি হইতেই কর্ম্মী ও জ্ঞানীদিগের বৈষ্ণবাবজ্ঞা উদয় হয়। যতদিন এই সংস্কারাসক্তি দূর না হয়,

ততদিন দশটী নামাপরাধ নির্ম্মূল হয় না। কর্ম্মাভিমান ও জ্ঞানাভিমান হইতেই সাধুদিগের চরণে অপরাধ হয়। সুতরাং সাধুনিন্দারূপ নামাপরাধ আসিয়া অভক্তের হৃদয়ে বাসা করে। কৃষ্ণে একেশ্বর-বুদ্ধির বিরোধী হইয়া সংস্কারাসক্তিই দুর্ভাগা জীবকে অনন্যশরণ হইতে দেয় না। গুর্ব্ববজ্ঞা, শ্রুতিনিন্দা, নামে অর্থবাদ, ভগবন্নামের সহিত অন্য শুভকর্ম্মের সাম্য-বুদ্ধি, নামবলে পাপাচরণ, অহংতামমতাজনিত বৈমুখ্য, নাম অপাত্রে বিক্রয়—এই সকল নামাপরাধ হইতে থাকে। সেই স্থলে আর জীবের মঙ্গল কিরূপে হইতে পারে? অতএব বলিয়াছেন,—

অসদ্ভিঃ সহ সঙ্গস্তু ন কর্ত্তব্যঃ কদাচন।
যস্মাৎ সর্ব্বার্থহানিঃ স্যাদধঃপাতশ্চ জায়তে।।

কিছুদিন বিশুদ্ধ বৈষ্ণবসঙ্গ করিতে করিতে সংস্কারাসক্তি দূর হয়, তাহা অনেক ভাগ্যবান্ ব্যক্তিতে দেখা গিয়াছে। নারদ-সঙ্গে ব্যাধ ও রত্নাকরের মঙ্গল হইয়াছিল, ইহা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। শ্রীরামানুজাচার্য্যের চরম উপদেশ এই,—'যদি তুমি আপনাকে কোন চেষ্টায় শুদ্ধ করিতে না পার, তবে বৈষ্ণবদিগের নিকটে গিয়া বসিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার সকল মঙ্গল হইবে।' বৈষ্ণবদিগের সংস্কৃত ভক্তচরিত্র দেখিতে দেখিতে অল্পদিনের মধ্যেই মন ফিরিয়া যায়, বিষয়া- সক্তি খর্ব্ব হয়, ভক্তির অঙ্কুর হৃদয়ে উদয় হয়; এমন কি, আহার-ব্যবহার সম্বন্ধেও ক্রমে ক্রমে বৈষ্ণব-রুচি হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব সঙ্গে থাকিতে থাকিতে অনেক লোকের স্ত্রীসঙ্গ-রুচি, অর্থ-পিপাসা, ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা, কর্ম্ম-জ্ঞানের প্রতি আদর, মৎস্য-মাংস-মদ্য-তামাক-ধূম্রপান ও তাম্বূলসেবন-স্পৃহা ইত্যাদি অনর্থ দূর হইয়াছে, ইহা আমরা দেখিয়াছি। বৈষ্ণবের অব্যর্থকালত্ব-ধর্ম্ম দেখিয়া অনেকে আলস্য, নিদ্রাধিক্য, বৃথা জল্পনা, বাক্যাদির বেগ প্রভৃতি অনর্থ-সকল অনায়াসে দূর করিয়াছেন। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, বৈষ্ণব-সংসর্গে কিছুদিন থাকিতে থাকিতে কাহারও কাহারও শাঠ্য ও প্রতিষ্ঠাশাও দূর হইয়াছে। একটু আদরের সহিত বৈষ্ণবসঙ্গ করিলে সংস্কার, আসক্তি প্রভৃতি সকল সঙ্গই দূর হয়, ইহাও আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। যুদ্ধে জয়-পিপাসায় আসক্ত, রাজ্যলাভের জন্য বিশেষ কুশল, প্রচুর ধন-সঞ্চয়ের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল ব্যক্তিগণের চিত্ত শুদ্ধ হইয়া বৈষ্ণব সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি লাভ হইয়াছে। এমন কি, বিতর্কে জগৎকে পরাজয় করিয়া দিগ্বিজয়ী হইব, এরূপ দুরভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তিদিগেরও চিত্ত স্থির হইয়াছে। বৈষ্ণব-সঙ্গ ব্যতীত সংস্কারাসক্তি শোধনের উপায়ান্তর দেখি না।

দ্রব্যাসক্তিগুলি পরিত্যাগ করিবার বিশেষ যত্ন করা উচিত। গৃহদ্বারে, ব্যবহার্য্য দ্রব্যে, অলঙ্কার-বস্ত্রে, অর্থে, স্ত্রী-পুত্রাদির শরীরে, নিজ শরীরে, ভোজ্যবস্তুতে, বৃক্ষ, পশু প্রভৃতিতে গৃহী লোকের নিসর্গ-সিদ্ধ আসক্তি আছে। কোন কোন লোকের ধূম্রপানে, তাম্বূল ভোজনে, মৎস্য-মাংসাদিতে এবং মাদক-বস্তুতে এতদূর আসক্তি হয় যে, পরমার্থ-সাধনে তাহা প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে। অনেক লোক মৎস্যাদির লোভে ভগবৎপ্রসাদাদিতে আদর করেন না। ধূম্রপানে মুহুর্মুহু স্পৃহা দ্বারা অনেকের ভক্তিগ্রন্থ পাঠ, শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি আস্বাদন, দেবমন্দিরে বহুক্ষণ অবস্থিতি নিবারিত হয়। নিরন্তর কৃষ্ণানুশীলনে ঐ সকল দ্রব্যাসক্তি বড়ই বিরোধী। বহু যত্নপূর্ব্বক সে-সকল আসক্তি ত্যাগ না করিলে ভজনসুখ পাওয়া যায় না। সাধুসঙ্গে ঐ সকল

দ্রব্যাসক্তি অনায়াসে দূর হয়। তথাপি ভক্তিপূর্ণ চেষ্টা দ্বারা ঐ সকল ক্ষুদ্রাসক্তিকে দূর করিতে চেষ্টা করা চাই। ভগবদ্ভক্তিসম্মত ব্রতাচরণ দ্বারা ঐ সকল দূরীভূত হইয়া থাকে।

হরিবাসরব্রত ও জয়ন্তীব্রত সুন্দররূপে পালন করিলে ঐ সকল আসক্তি যায়। ব্রত-নিয়ম-পালনেই আসক্তি-ক্ষয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। ঐ সকল ব্রতদিবসে সর্ব্বভোগ-বিবর্জ্জিত হইয়া ভজন করিবার বিধি আছে। ভক্ষ্যদ্রব্য দুই প্রকার অর্থাৎ প্রাণরক্ষক ও ইন্দ্রিয়তোষক। অন্ন-পানাদি দ্রব্য—প্রাণরক্ষক। মৎস্য, মাংস, তাম্বুল, মাদকদ্রব্য, তাম্রকূটাদি ধূম্রপান—এই সমস্ত ইন্দ্রিয়তোষক। ব্রতদিনে ইন্দ্রিয়তোষক দ্রব্য একেবারে পরিত্যাগ না করিলে ব্রত হয় না। যতদূর সাধ্য, প্রাণরক্ষক দ্রব্যসমূহও পরিত্যাগ করা উচিত। শরীরের অবস্থানুসারে যে অনুকল্পের বিধান, তাহাতে প্রাণরক্ষক দ্রব্যসকলের ব্যবহারে যতদূর সঙ্কোচ হইতে পারে, তাহা করা চাই। ইন্দ্রিয়তোষক দ্রব্যের অনুকল্পাদি নাই, পরিত্যাগই বিধি। ভক্ত-জীবের ভোগপ্রবৃত্তি-খর্ব্বাভ্যাসই ব্রতের একাঙ্গ। যদি এইরূপ মনে হয় যে, কষ্টেসৃষ্টে অদ্য ত্যাগ করি, আবার কল্য সেই দ্রব্য যথেষ্ট ভোগ করিব, তবে ব্রতের তাৎপর্য্য সিদ্ধি হইবে না। কেননা, ক্রম-অভ্যাসের দ্বারা ঐ সকল দ্রব্যসঙ্গ পরিত্যাগ করিবার জন্য ব্রতসকল নির্ণীত হইয়াছে। ব্রতগুলি প্রায় দিবসত্রয়ব্যাপী। এইরূপ দিবসত্রয় সঙ্গরোধ করিতে করিতে একমাসব্যাপী ও চাতুর্ম্মাস্যব্যাপী ব্রতের দ্বারা ক্রমশঃ সঙ্গকে নির্ম্মূল করিয়া সেই সেই দ্রব্য বা ব্যবহার হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইতে হইবে। ব্রতপালনে যাঁহাদের "ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা"—এই গীতাবচনের তাৎপর্য্য মনে থাকে না, তাঁহাদের বৈরাগ্য কেবল কুঞ্জরস্নানবৎ ক্ষণস্থায়ী।

যাঁহারা শুদ্ধভক্তি পাইবার আশা করেন, তাঁহাদের পক্ষে অভক্তসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গরূপ সংসর্গদ্বয় একেবারে বর্জ্জনীয়। তাঁহাদের পক্ষে সংস্কারাসক্তি পরিত্যাগ করিবার জন্য সাধুসঙ্গের নিতান্ত প্রয়োজন। দ্রব্যাসক্তি দূরীকরণের জন্য তাঁহাদের পক্ষে বৈষ্ণব-ব্রতসমুদয় পালন করা আবশ্যক। এই সকল কার্য্য হেলা-ফেলা করিয়া করা কর্ত্তব্য নয়। বিশেষ যত্নাগ্রহের সহিত আদরপূর্ব্বক করা আবশ্যক। আদরপূর্ব্বক না করিলে কুটিনাটিরূপ কপটতা আসিয়া কার্য্যসমুদয় নিষ্ফল করিয়া দেয়। এই বিষয়ে যাঁহাদের আদর নাই, তাঁহাদের পক্ষে অনেক জন্ম শ্রবণ করিয়াও হরিভক্তি সুদুর্ল্লভা হইয়া পড়েন।

কি করিলে সঙ্গত্যাগ ও সঙ্গ হয়, এই বিষয়ে অনেকের সংশয় হয়। সংশয় হইতে পারে; কেননা, কেবল অসদ্ব্যক্তির বা বস্তুর নিকটস্থ হইলেই যদি সঙ্গ হয়, তবে সঙ্গত্যাগের উপায় থাকে না। যে পর্য্যন্ত জড়শরীর আছে, ততদিন অসন্নৈকট্য কিরূপে ত্যাগ হইতে পারে? পারিবারিক ব্যক্তিগণকে গৃহস্থবৈষ্ণব কিরূপে ত্যাগ করিবেন? কপটবেশধারী ব্যক্তিকে গৃহত্যাগী হইলেও ত্যাগ করা যায় না। গৃহে থাকুন বা বনে থাকুন, জীবন-নির্ব্বাহের জন্য অবশ্যই অসদ্ব্যক্তির নিকট আসিতে হইবে। অতএব অসদ্ব্যক্তির সঙ্গত্যাগের সীমা-সম্বন্ধে উপদেশামৃতে এইরূপ বিধি হইয়াছে,—

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্।।

হে সাধকগণ! দেহযাত্রা-নির্ব্বাহে সৎ ও অসদ্ব্যক্তি উভয়ের নৈকট্য অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। ইহাতে গৃহী ও গৃহত্যাগী উভয়েরই সমানতা। নৈকট্য অবশ্যই ঘটিবে, তথাপি অসতের সঙ্গ করা হইবে না। দান, প্রতিগ্রহ, পরস্পর গূঢ় জল্পনা ও পরস্পর ভোজনাদি-স্বীকার-কার্য্যে যদি প্রীতি করা হয়, তবে সঙ্গ হয়। ক্ষুধিতাতুর ব্যক্তিকে যাহা কিছু দেওয়া যায় এবং ধার্ম্মিক দাতার নিকট হইতে যাহা কিছু লওয়া যায়, সে-সকল কর্ত্তব্য-বোধে করা মাত্র, প্রীতির সহিত করা যায় না। তাহারা অসৎ হইলেও তৎকার্য্যে তাহাদের সঙ্গ হয় না। তাহারা শুদ্ধবৈষ্ণব হইলে সেই কার্য্যে প্রীতি হয়, প্রীতি করিলে সঙ্গ হয়। সুতরাং শুদ্ধ- বৈষ্ণবের প্রতি দান ও তাঁহাদের নিকট হইতে দ্রব্য বা অর্থগ্রহণে সৎসঙ্গ হয়; অসতের প্রতি দান ও অসতের নিকট হইতে গ্রহণ যদি প্রীতিসহকারে হয়, তবে অসৎসঙ্গ হইয়া পড়ে। অসদ্ব্যক্তি নিকটে আসিয়াছে, তাহার সহিত যে কর্ত্তব্যকর্ম্ম আবশ্যক হয়, তাহা কেবল কর্ত্তব্য-বোধে করিবে। পরস্পরের গূঢ় কথার জল্পনা করিবে না। গূঢ় জল্পনায় প্রায়ই প্রীতি থাকে। তাহাতে সঙ্গ হয়। নিতান্ত সংসারী বান্ধবাদির মিলনে আবশ্যক বার্ত্তামাত্র করিবে, হৃদয়ের প্রীতি তখন না করাই ভাল। তবে যদি সেই বান্ধব সাধু-বৈষ্ণব হন, তবে সেই বার্ত্তা প্রীতিসহকারে করিয়া তাঁহার সঙ্গ স্বীকার করিবে। কুটুম্ব-বান্ধবের সহিত এইরূপ ব্যবহার করিলে কোন বিরোধ হইবে না। ব্যবহারিক বার্ত্তায় সঙ্গ হয়। বাজারে দ্রব্য ক্রয়-সময়ে যেরূপ নূতন ব্যক্তির সহিত কেবল বাহ্য-ব্যবহার করিতে হয়, সেইরূপ ব্যবহার সাধারণের সঙ্গে করিবে। শুদ্ধভক্তের সহিত সেই সেই ব্যবহারেও প্রীতি-প্রদর্শনপূর্ব্বক সঙ্গ করিবে। ক্ষুধিত, আতুর, বিদ্যাব্যবসায়ীদিগকে আবশ্যক ভোজন করাইতে হইলে অতিথি-ব্যবহারে তাহা সম্পন্ন করিবে। বিশেষ প্রীতি করিবার প্রয়োজন নাই। যত্ন কর, কিন্তু প্রীতি করিও না। শুদ্ধবৈষ্ণবগণকে প্রীতিসহকারে ভোজন করাইবে এবং আবশ্যক হইলে প্রীতি- সহকারে তাঁহাদের প্রদত্ত প্রসাদ-ভোজন গ্রহণ করিবে। স্ত্রী, পুত্র, দাস, দাসী, আগন্তুক ব্যক্তি এবং যাহার নিকট যাইতে হয়, সকলের সহিত দান, গ্রহণ, জল্পন ও ভোজনাদিতে এইরূপ ব্যবহার বিচার করিতে পারিলে অসৎসঙ্গ হইবে না, বরং সৎসঙ্গ হইবে। এইরূপ অসৎসঙ্গ ত্যাগ না করিলে কৃষ্ণভক্তিলাভের কোন আশা নাই। গৃহত্যাগী বৈষ্ণব সদ্গৃহস্থের গৃহে মাধুকরী যাহা পান, এই বিচারের সহিত তাহাই গ্রহণ করিবেন। মাধুকরী ও স্থূলভিক্ষায় যে ভেদ আছে, তাহা সর্ব্বদা মনে রাখিবেন। গৃহস্থবৈষ্ণব সচ্চরিত্র গৃহস্থের বাটীতে প্রসাদ-অন্ন- পান গ্রহণ করিবেন। অভক্ত ও অসচ্চরিত্র ব্যক্তির বাটীতে সর্ব্বদা সাবধানে প্রসাদ পাইবেন। এই বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহাদের সুকৃতি অনুসারে ভক্তিতে শ্রদ্ধা হইয়াছে, কৃষ্ণকৃপায় তাঁহাদের কিয়ৎপরিমাণে বুদ্ধিযোগ উদয় হয়। সেই বুদ্ধিক্রমে আচার্য্যদিগের উপদেশের মর্ম্ম অনায়াসে তাঁহারা বুঝিতে পারেন। সুতরাং স্বল্পাক্ষরে তাঁহাদের প্রতি উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন। যাঁহাদের সুকৃতি নাই, তাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই। অধিক করিয়া বলিলেও তাঁহারা কোনপ্রকারে বুঝিবেন না। অতএব শ্রীউপদেশামৃতে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু স্বল্পাক্ষরে ভজনের উপদেশ দিয়াছেন।

শ্রীভক্তিমার্গ

যাহা অভক্তিপথ নহে, যাহাতে অনুকূল অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবার কথা আছে, তাহাই শুদ্ধভক্তিপথ। 'অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন' বলিলে শুদ্ধজীবের কৃষ্ণেতরাভিলাষ নামক প্রতিকূল মায়িক ভোগের নিরাস করিয়া হরিসেবন অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত অপ্রাকৃত বস্তু জীব অপ্রাকৃত উপাদান দ্বারা অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ-কৃষ্ণের অপ্রাকৃত অনুশীলন করেন। সেই ভক্তিতে বৈকুণ্ঠেতর মায়ার কোন উপযোগিতা নাই।

নারদপঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে যে, শুদ্ধ জীবের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়পতি কৃষ্ণের তৎপরত্ব সহকারে অর্থাৎ অনুকূলভাবে সর্ব্বোপাধিমুক্ত সেবন বা অনুশীলনকে 'ভক্তি' বলে। মায়ার ধর্ম্ম জীবকে ভোগে প্রবৃত্ত করায়, বৈকুণ্ঠের ধর্ম্ম 'ভক্তি' জীবকে কৃষ্ণদাস্যে নিযুক্ত করে। মায়ার ধর্ম্ম প্রাকৃত অর্থাৎ ভোগী জীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণময়। মায়াতীত বৈকুণ্ঠধর্ম্ম—অপ্রাকৃত অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়ের বিষয়—অপ্রাকৃত রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শাদিতে শুদ্ধ জীবানুভূতি। শুদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয়সমূহ দুরাশাবশে ব্যতিরেকভাবে মায়ার বাহ্য অর্থে নিযুক্ত হইলে জীবের ভোক্তাভিমান প্রবল হয়, তখনই তাঁহার স্বরূপ-বিভ্রান্তি ঘটে। তিনি নিত্য কৃষ্ণদাস্য ভুলিয়া মায়ার আশ্রয়ে 'মা' শব্দে নহে বা নিন্দনীয়া, 'যা' শব্দে যাহা অর্থাৎ যাহা কৃষ্ণ নহে অথবা 'মীয়তে অনয়া' বাহ্য বস্তুর ভোক্তৃত্ব অবলম্বনে প্রকৃতিজাত বা প্রাকৃত অভিমানে নিত্য সংসার-ভোগের পথ গ্রহণ করিয়া নিজ ভোগ্য বিষয় প্রাকৃত রূপ-রসাদির পরিমাণ করিতে ব্যস্ত হন। শুদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয়-সমূহ অন্বয়ক্রমে কৃষ্ণাশাবশে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-সেবায় নিযুক্ত হইলে জীবের অপ্রাকৃত ভোগ্যাভিমান প্রবল হয়, যাহা ভোগীগণ নির্ব্বুদ্ধিতা বলিয়া নিতান্ত ঘৃণা করেন; যেহেতু উহাতে ভোক্তার আত্মম্ভরিতা আদৌ নাই। এই অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণ-সেবন-প্রবৃত্তিই জীবের স্বরূপ উপলব্ধি করায়। দাক্ষিণাত্যে নীলকণ্ঠীয় শৈব-বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে যে ভক্তির কথা কথিত হয়, তাহা কখনই কোন ভক্তের বা রামানুজীয় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের 'ভক্তি' শব্দবাচ্য নহে। অপবর্গ-লাভে শুদ্ধ জীবানুভূতি যেস্থলে বৈকুণ্ঠবস্তুকে স্বীয় ভোক্তা-জ্ঞানের পরিবর্ত্তে ভোগ্য জ্ঞান করে, তাহা—অন্য কথায় প্রাকৃত ভোগ বা অবৈষ্ণব ধর্ম্ম; সেখানে মায়াসহ এক ভগবান্-বস্তু সেব্য ও জীব—পুরুষ। অবৈষ্ণবের রুচির অনুকূলে মায়াকে 'কৃষ্ণ' সংজ্ঞা দিয়া মায়ার ভজন হইতেই প্রাকৃত সহজিয়া, থিয়সফি, বাউলাদির ধর্ম্ম উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। উহা বৈষ্ণবের ভক্তিধর্ম্ম নহে। শ্রীমহাপ্রভু প্রেমভক্তিতে যে দাস্যাদি রস উপদেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে অবৈষ্ণবগণের উপাস্য 'মাতৃত্ব' কৃষ্ণে কোথাও আরোপিত হয় নাই; কেন না, তাদৃশ সত্ত্বা ভক্তিধর্ম্মের প্রতিকূল বিষয়। মায়াবাদিগণ মুখে গৌরভক্ত হইয়া কৃষ্ণ-বস্তুতে মাতৃত্ব বা কৃষ্ণ-সহ মায়ৈকত্ব আরোপ করিতে গিয়া ভক্তিধর্ম্মের পথ হারাইয়াছেন। প্রাকৃত সহজিয়াগণ কৃষ্ণলীলার আদর্শে নিজ প্রাকৃত ভোগময় ইন্দ্রিয়তর্পণ-প্রবৃত্তিই 'ভক্তি' বলিয়া বুঝিয়া রাখিয়াছেন। প্রাকৃত সহজিয়া—দুইপ্রকার। যাহারা প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়-তর্পণ-রত হইয়া কর্ম্মফলবশে প্রাকৃত পুরুষ হইয়াও আপনাকে যোষিৎ কল্পনা মাত্র করিয়া স্থূলভোগে তৎপর এবং যোষিৎ গুরুকে 'কৃষ্ণ' আরোপ করিয়া রুচিমার্গে অবস্থিত মনে করে ও প্রাকৃত জড় সম্ভোগকে হরিলীলার প্রকার ভেদ মনে করে, তাহারা একপ্রকার

সহজিয়া। অন্যপ্রকার সহজিয়া বলেন যে, ভোগ্যা স্ত্রী মাত্রেই অপ্রাকৃত। ভোক্তা পুরুষ মাত্রই প্রাকৃত। স্ত্রৈণ ভাব পোষণ করিয়া গৃহব্রত-ধর্ম্ম যাজন করিলেই পুরুষের প্রাকৃতত্ব লাঘবে কৃষ্ণপ্রেম উদিত হয়। ইঁহাদের মতে, পরমহংস বৈষ্ণবগণ গৃহব্রত না হওয়ায় তাঁহারা বৈধী সাধনভক্ত্যাশ্রিত ন্যূনাধিকারী। গৃহব্রত না হইলে কৃষ্ণপ্রেমের উপলব্ধি হয় না। পবিত্র হরিসেবারত গৃহস্থ-বৈষ্ণবকে ইঁহারা তাঁহাদের ন্যায় গৃহব্রত মনে করেন। স্ত্রৈণ না হইয়া গৃহস্থ শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ হরিভজন কিরূপে করিতে পারেন, তাঁহারা বুঝিতে চাহেন না। কৃষ্ণের সংসারের যাবতীয় অর্থ কেবল নিজের বহির্ম্মুখী বিষয়-প্রবৃত্তি চরিতার্থের উদ্দেশ্যে ব্যয়িত করেন এবং স্ত্রীপুত্রাদির মায়া-মমতায় আত্মবলিদান দিয়া থাকেন। ঝড়ু ঠাকুরের বা শ্রীবাসাদির শুদ্ধভক্তি, রামানন্দ রায়ের সুতীব্র বৈরাগ্য, মহাপ্রভুর ভক্তগণের কৃষ্ণেতর বস্তুতে বৈরাগ্যপ্রধান ভাব ও প্রভুর সন্ন্যাস বুঝিতে অক্ষম হইয়া নিজ গৃহধর্ম্ম ও নিজ নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণে আনন্দ লাভ করেন। হরিভক্তির নামে ইন্দ্রিয়-তর্পণে খুব মজা মনে করিয়া স্ত্রৈণ বিষয়িগণ স্বজাতিতে, স্বদেশে, স্বদলে থাকিয়া, রসগান শুনিয়া ও ভক্তিকে পার্থিব মাটিয়া বা প্রাকৃত জ্ঞান করেন এবং শুদ্ধ গৃহস্থ বৈষ্ণবের চরণে অপরাধী হন। এ সকল কথা সুন্দরভাবে "মতির্ন কৃষ্ণে" "ন তে বিদুঃ" এবং "নৈষাং মতিস্তাবৎ" শ্লোকত্রয় দ্বারা আনন্দভরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সর্ব্বদা বুঝাইয়া বলিতেন। নিজ ভোগতাৎপর্য্যপর সম্ভোগ- রসের উদয় হইলেও তাদৃশ আনন্দের প্রতি ভক্তের মহাক্রোধ হয়।

নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে।।
অঙ্গস্তম্ভারম্ভমুত্তুঙ্গয়ন্তং প্রেমানন্দং দারুকো নাভ্যনন্দৎ।
কংসারাতের্বীজনে যেন সাক্ষাদ-ক্ষোদীয়ানন্তরায়ো ব্যধায়ি।।
আর শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণ প্রেমসেবা বিনে।
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে।।

(চৈঃ চঃ আ ৪।২০১, ২০২, ২০৪)

শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে বলিলেন, নির্হেতুক ব্যবধানরহিত কৃষ্ণভক্তি যাঁহাদের উদয় হইয়াছে, ইঁহারা আমার সহ সমলোক লাভ, সমরূপ লাভ, সমৈশ্বর্য্য লাভ ও আমার সামীপ্য লাভ—এই চারিপ্রকার মুক্তিসম্ভোগ দিলেও উহা গ্রহণ করেন না, তাঁহারা কেবল আমার সেবা প্রার্থনা করেন; —ইহাই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ।

ভক্তিরসের পরাকাষ্ঠা গোপীপ্রেম, তাহা প্রাকৃত কামগন্ধহীন। চরিতামৃতের কবিতা কয়েকটী এ-বিষয়ে রাগানুগীয় ভক্তিসাধকগণের নিদর্শন-স্বরূপ। এই অপূর্ব্ব ভাবসমূহ হইতে দূরে গিয়া কোন রাগানুগ-সাধক নিজমঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন না। তাঁহারা জড়রসে বিপ্রলম্ভের অনুপাদেয়ত্ব দর্শন করিয়া যেন প্রাকৃত রসের আহ্বান না করিয়া বসেন; তজ্জন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কতই না নিজাশ্রিত জনগণকে সাবধান

করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিয়া অন্য পথে গিয়াছেন, আমাদের তাদৃশ ভক্তগণের প্রতি কিছুই বক্তব্য নাই।

আত্মসুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখ-হেতু করে সব ব্যবহার।।
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত প্রবল।।
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম।।
সর্ব্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেম সেবন।।
অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম—অন্ধতমঃ, প্রেম—নির্ম্মল ভাস্কর।।
অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি' মাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ।।
এ দেহ দর্শন-স্পর্শে কৃষ্ণ-সন্তোষণ।
এই লাগি' করে অঙ্গের মার্জ্জন-ভূষণ।।
গোপীগণ করেন যবে কৃষ্ণ দরশন।
সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটিগুণ।।
তাঁ' সবার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ।
তথাপি বাড়য়ে সুখ, পড়িল বিরোধ।।
'আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।'
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গমুখ।।
অতএব সেই সুখ কৃষ্ণসুখ পোষে।
এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি কাম-দোষে।।
প্রীতি-বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ।
তাঁহা নাহি নিজ সুখবাঞ্ছার সম্বন্ধ।।
সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণ-সহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন।।

সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়া-সাম্যে তার কহি 'কাম' নাম।।
নিজেন্দ্রিয়-সুখহেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য গোপীভাববর্য্য।।
নিজেন্দ্রিয়-সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার।
কৃষ্ণসুখ দিতে করে সঙ্গম বিহার।।
সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদধর্ম্ম ত্যজি' সে কৃষ্ণকে ভজয়।।
রাগানুগা মার্গে তাঁরে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।।

না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিলে দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য।।
নিজ সুখে মানে লাভ, পড়ুক তার শিরে বাজ,
কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ।

যাঁহাদের নৈসর্গিক সম্বন্ধজ্ঞান উদয় হয় নাই, তাঁহারা ভগবৎপ্রিয় বস্তুর অলৌকিক সৌন্দর্য্য প্রথম-মুখে দেখিতে পান না; তজ্জন্যই তাঁহাদের বিধিমার্গে শাস্ত্রীয় বিচার ও গুরুর উপদেশের আবশ্যক। যাঁহারা শাস্ত্রার্থ শ্রদ্ধা সহকারে বিশ্বাস করিয়া গুরুর নিকট ভজন শিক্ষা করেন এবং ভজনপ্রভাবে অনর্থের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান, তাঁহাদের নিষ্ঠা নাম্নী অবস্থা সাধন-ভক্তিতে অবস্থিতিকালে পরিলক্ষিত হয়। তাহা হইতেই রুচি আসিয়া উপস্থিত হয়। বিধির অনুগত হইয়া ভজন করিবার জন্য শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ উপদেশামৃতে বলিয়াছেন,—

স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদি-সিতাপ্যবিদ্যাপিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী।।

আবার রুচির উদয় হইয়াছে, বিষয়প্রবৃত্তিরূপ অনর্থও প্রবল আছে, এরূপ ঘটনা নিষ্কপটতা বা নির্ব্যলীকত্বের ব্যাঘাত। "যেষাং স এষ ভগবান দয়য়েদনন্তঃ সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্। তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্ব-শৃগালভক্ষ্যে" শ্লোকটি এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকেও বলিয়াছেন,—

বাহ্যাভ্যন্তরয়োঃ সমং বত কদা বীক্ষামহে বৈষ্ণবান্।

যাঁহাদের কৃত্রিম রুচি, তাঁহারা অচিরেই বিষয়ে প্রমত্ত হইয়া যান, তখন অপরাধই বৈষ্ণবকৃত্য জানিয়া রাগানুগীয় বাহ্য সাধন শ্রবণ-কীর্ত্তনের আশ্রয়ে নিজ ভক্তিলতাকে অপরাধ দ্বারা উপড়াইয়া, ছিঁড়িয়া ও পাতা শুকাইয়া ফেলেন। সুতরাং অন্তশ্চিন্তিত তাঁহাদের সিদ্ধদেহ তৎকালে কৃষ্ণানুশীলনের বদলে কৃষ্ণেতর বস্তুর অনুশীলন করিয়া ফেলে। তখন বৈষ্ণবগণের বিদ্বেষ করিতে করিতে জীব অতিবাড়ীদিগের ন্যায় শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপরাধ করিয়া বসেন। ''শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। আত্যন্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কেবলং" হইয়া বিধিভক্তির যোগ্যতাকে গর্হণ করিতে ব্যস্ত হন।

সাধন ভক্তিতেই বৈধী ও রাগানুগা—মার্গদ্বয় অবস্থিত। ভাবোদয়ে বৈধী অধিকারীও রাগানুগা মার্গে ভজন করিতে আরম্ভ করেন। বৈধী ভক্ত ব্রজবাসীর ভাবে লুব্ধ হইবার পূর্ব্বেই তিনি শাস্ত্র ও যুক্তির অপেক্ষা করেন। তাঁহার সন্দেহ নিরসন হইলে বিচারপ্রধান মার্গের সিদ্ধান্তে অভিজ্ঞ হইয়া রুচিপ্রধান মার্গে প্রবেশ করেন। রুচিপ্রধান মার্গে অবস্থিত মনে করিয়া বৈধভক্তগণের সহ বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইলে তাদৃশ রুচিপ্রধান পরিচয়াকাঙ্ক্ষীর স্বরূপবিভ্রান্তি হইয়াছে, প্রতিপন্ন করাইবে। আবার রাগানুগামার্গীয় রূপানুগ আচার্য্য শ্রীজীবপাদের ভাগবতসন্দর্ভের সিদ্ধান্তে বিমুখ হইয়া নামশ্রবণ, অনর্থনিবৃত্তিতে ক্রমে রূপশ্রবণ, গুণ-শ্রবণ ও লীলা শ্রবণে অনাদর ঘটিলে রাগানুগা সাধনেরও ব্যাঘাত অবশ্যম্ভাবী। যেহেতু বাহ্যে হরিকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন উভয়ই রাগানুগামার্গীয় অত্যাজ্য কৃত্য-বিশেষ।

শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন; —''তদেবং নামাদিশ্রবণভক্ত্যঙ্গক্রমঃ। তথাপি প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণং অন্তঃকরণ-শুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যেত। সম্পন্নে চ গুণানাং স্ফুরণে পরিকরবৈশিষ্ট্যেন তদ্বৈশিষ্ট্যং সম্পদ্যতে। ততস্তেষু নামরূপ-গুণপরিকরেষু সম্যক্ স্ফুরিতেষু লীলানাং স্ফুরণং সুষ্ঠু ভবতীত্যভিপ্রেত্য সাধনক্রমো লিখিতঃ। এবং কীর্ত্তনস্মরণয়োশ্চ জ্ঞেয়ম্। ইদঞ্চ শ্রবণং শ্রীমহন্মুখরিতং সম্মাহাত্ম্যং জাতরুচানাং পরমসুখদম্।" যাঁহারা অনর্থময় জীবকে জাতরুচি জানিয়া কৃষ্ণনামরূপগুণ-বৈশিষ্ট্য লীলাময় রসগ্রন্থ শ্রবণ করান ও শ্রবণ করেন, তাঁহাদের যথেচ্ছাচারিতা অবশ্যই বিশৃঙ্খলতা উৎপাদন করিবে।

কৃষ্ণনাম করিতে করিতে সিদ্ধান্ত অবগত হইলেই শুদ্ধভক্ত নিজ পরিচয় সুষ্ঠুরূপে জানিতে পারেন। নামভজনে নামোচ্চারণকারীর অনুকূল-প্রতিকূল-বিচারে তাঁহার যুক্তবৈরাগ্যবিশিষ্ট গৃহস্থ বা পারমহংস্য—ধর্ম্মদ্বয় গ্রহণের যেটী সুবিধা, তাহাই তিনি গ্রহণ করিবেন। ইহাতে কাহারও বাধা দিবার নাই, তবে জড় গৃহাসক্ত বা স্ত্রৈণ হওয়া ভক্তের সুবিধাজনক নহে এবং পরমহংস হইয়াও ফল্গুবৈরাগ্যাশ্রয়েও ভজনের ব্যাঘাত ঘটে।

শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু ?

আধ্যক্ষিক ও অধোক্ষজ বিচারক-ভেদে দ্বিবিধ শ্রেণী

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা, অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিতে গিয়া মোটামুটি দুই শ্রেণীর ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। এক শ্রেণীর ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের আধ্যক্ষিক বিচারের অন্তর্গত করিয়া মাপিয়া লইতে চাহেন, আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি অধোক্ষজ, পরিপূর্ণ, বাস্তববস্তু শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা-দোষযুক্ত অসম্পূর্ণ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের আধারে মাপিতে পারা যায় না বিচার করিয়া স্বপ্রকাশ অধোক্ষজ যখন আপনাকে বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপাধারে প্রকাশিত করেন, তখন তাঁহার স্বরূপবিজ্ঞান তাঁহারই অনুকম্পা ও শক্তিতে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। এই দুই শ্রেণীর ব্যক্তির চেষ্টাকে একটী উপমা দ্বারা উপমিত করা যাইতে পারে। প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিগণ অন্ধকারে বা রাত্রিকালে বহু বৈদ্যুতিক আলোক, নানাপ্রকার কলা-কৌশল, অহমিকাময় গবেষণা ও নানাবিধ আরোহ চেষ্টা দ্বারা সূর্য্যের স্বরূপ দর্শন বা অধ্যয়ন করিতে চাহেন। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তি অরুণোদয়ে বা যথাসময়ে সূর্য্য যখন স্বয়ং প্রকাশিত হন, তখন সূর্য্যেরই স্বাভাবিক আলোকে বাস্তবসূর্য্যকে দর্শন এবং সূর্য্য-সম্বন্ধে যাবতীয় অভিজ্ঞান লাভ করেন।

আধ্যক্ষিক বিচারকের দ্বিবিধ শ্রেণী-বিভাগ

প্রথমোক্ত আধ্যক্ষিক বিচারকগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। একশ্রেণী প্রত্যক্ষ ও অনুমানকেই মূল প্রমাণ জ্ঞান করেন।

(১) প্রত্যক্ষ ও অনুমানে একান্ত বিশ্বাসী

তাঁহারা প্রত্যক্ষ ও অনুমানের প্রতি এতদূর বিশ্বাসযুক্ত যে, উহাদের দ্বারা প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতারিত হইবার সাক্ষ্য ও পূর্ব্বাভিজ্ঞতার আদর্শ-সমূহ থাকিলেও তাহারা প্রত্যক্ষ ও অনুমানকেই তাঁহাদের বিশ্বস্ত অবঞ্চক বন্ধু মনে করিয়া শব্দপ্রমাণকে বঞ্চক বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন।

(২) মুখে শ্রুতি স্বীকার-ছলনা, কার্য্যতঃ শ্রুতিকে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের কিঙ্করীতে স্থাপন-চেষ্টা

ইহাদেরই দ্বিতীয় শ্রেণীর আধ্যক্ষিকগণ শব্দ বা শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি প্রমাণকে মুখে 'বঞ্চক' না বলিলেও এবং তাহাদের সকলের সহিত মৌখিক অশিষ্টাচার বা অসামাজিকতা প্রদর্শন না করিলেও বাস্তব কার্য্যক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও অনুমানকেই অবঞ্চক ও একান্ত বিশ্বস্ত বন্ধু বলিয়া অন্তরে গ্রহণ-পূর্ব্বক শ্রুতি- মাতাকে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের কিঙ্করীত্বে স্থাপন করিবার চেষ্টা প্রদর্শন করেন। তাঁহারা সেই শ্রুতিকেই বিশ্বাস (?) করেন—যে শ্রুতি তাহাদের প্রত্যক্ষ ও অনুমানের চাকরী করিতে পারে। আর যে শ্রুতি নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার মূর্ত্তিরূপে ছলনাময় প্রত্যক্ষ ও অনুমানের চাকরী করিতে পারিল না, সেই শ্রুতির সঙ্গতিতে তাঁহারা গোঁজামিল দিয়া থাকেন।

ঐতিহাসিক কৃষ্ণ-কল্পনা

প্রথম শ্রেণীর আধ্যক্ষিকগণ অর্থাৎ যাঁহারা কেবল প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে বিশ্বস্ত আত্মীয় ও প্রামাণিক জ্ঞান করিয়াছেন, তাঁহারা যখন অতীন্দ্রিয় পরাৎপরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে মাপিতে যান, তখন তাঁহাদের ক্ষুদ্র ও অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয় অসমোর্দ্ধ ও সম্পূর্ণ কৃষ্ণকে স্পর্শ করিতে না পারায় শ্রীকৃষ্ণের যে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব তাঁহাদের দৃষ্টির ক্ষুদ্র সীমানায় উপস্থিত হয়, তাঁহারা সেইটুকু দেখিয়া কৃষ্ণকে জন্মমরণশীল **ঐতিহাসিক** নায়করূপে দর্শন করেন। যেমন ঘোড়দৌড় দেখিবার জন্য উপবিষ্ট কোন ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র গবাক্ষদ্বারের সম্মুখে উপস্থিত ধাবমান্ অশ্বকে দেখিতে পাইয়া যদি মনে করেন, তাঁহার দৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত হইবা- মাত্রই অশ্বের জন্ম এবং দৃষ্টির অন্তরালে গেলেই অশ্বের মৃত্যু হইয়াছে অর্থাৎ ঐ কয়েক সেকেণ্ডকাল পর্য্যন্ত অশ্বের জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গের ইতিহাস কিম্বা যদি কোন অজ্ঞ বালক অরুণোদয়কালে সূর্য্যের আবির্ভাব এবং অন্তরালে সূর্য্যের তিরোভাব লক্ষ্য করিয়া অরুণাচলে কোন বিশেষ মুহূর্ত্তে সূর্য্যের জন্ম এবং অস্তাচলে কোন বিশেষ মুহূর্ত্তে সূর্য্যের মৃত্যুর ইতিহাস করিয়া ফেলে, তাহা হইলে উহা যেরূপ উহাদের কল্পিত বিশ্বস্ত বন্ধু ইন্দ্রিয় এবং প্রত্যক্ষ ও অনুমানের কেবল বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা, তদ্রূপ প্রথম শ্রেণীর আধ্যক্ষিক— যাঁহারা কৃষ্ণকে ঐতিহাসিক নায়ক বিচার করেন, তাঁহাদের প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাক্ষ্যও প্রতারণাময়।

রূপক কৃষ্ণ-কল্পনা

প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় প্রকার আধ্যক্ষিকগণের মধ্যে একশ্রেণী শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্যের সহিত **রূপক** মনে করেন। এই শ্রেণীর আধ্যক্ষিক কখনও কখনও স্থূলভাবে ঐতিহাসিক কৃষ্ণকে স্বীকার করেন, আবার তাহাও সম্পূর্ণভাবে স্বীকার না করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে একটী রূপকের প্রতীক মাত্র বিচার করেন। ইহারা শ্রুতিকে শুধু প্রত্যক্ষ ও অনুমানের কিঙ্করী করিবার প্রয়াসমাত্র করিয়া ক্ষান্ত হন না, পরন্তু রাবণের ন্যায় মায়াসীতা-হরণের বৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া অপ্রাকৃত শ্রুতিসতীর প্রতি যথেচ্ছাচারিতা করিবার চেষ্টা দেখাইয়া থাকেন।

অধোক্ষজ লীলাপুরুষোত্তমে রূপকবাদের নিরর্থকত্ব

প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সঙ্গে 'মিত্রতা' পাতাইয়া শ্রুতির সহিত ছিনিমিনি খেলিবার ঐরূপ প্রয়াস হইতেই রূপকবাদ উত্থিত হইয়াছে। এই রূপকবাদে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত সবিশেষত্ব নাই, শ্রীকৃষ্ণ যথেচ্ছাচারী প্রাকৃত কাল্পনিকের কারখানার ছাঁচে রূপ দেওয়া ভাববিশেষ। এই রূপকবাদ অনেক প্রকার যৌগিক বিভূতি ও পরিভাষা দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। যেমন শাস্ত্র-বর্ণিত যমুনা তাহাদের মতে কোন অপ্রাকৃত বাস্তব বস্তু নহে, উহা মানবের দেহান্তর্গত সুষুম্না নাড়ী মাত্র, কালীয়দমন-লীলা দেহের রিপুগুলির দমন মাত্র ইত্যাদি। এই রূপকবাদ যৌগিক বিভূতি ও প্রাকৃত বাউলগণের দেহতত্ত্বের নানাপ্রকার জড় কল্পনার সহিত মিশ্রিত হইয়া ফলে-পুষ্পে সমৃদ্ধ হইয়াছে।

আধ্যাত্মিকবাদী বা নির্ব্বিশেষবাদীর নিরর্থকতা

দ্বিতীয় শ্রেণীর আধ্যক্ষিক অর্থাৎ যাঁহারা মৌখিকতায় বা সামাজিকতায় শ্রুতির অতিমাতৃভক্ত সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন, কিন্তু কার্য্যকালে যাহারা মাতার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা ও সতীত্বকে তাঁহাদের আপাত প্রতীয়মান মিত্র প্রত্যক্ষ ও অনুমানের নিকট বলি-দান করিতে দ্বিধা বোধ করেন না, তাহারাই আধ্যাত্মিক (নির্ব্বিশেষ)-বাদী। ইহারা শ্রীকৃষ্ণকে আধ্যাত্মিক বা মায়া-মিশ্রিত সগুণব্রহ্ম বিচার করেন। ইহাদের আধ্যক্ষিক অধ্যাত্ম বিচারে শ্রীকৃষ্ণের দেহ শুদ্ধ সত্ত্বের বিকার মাত্র! অর্থাৎ একান্ত নিত্য নহে! দেহ-দেহী, গুণ-গুণী, নাম-নামী, রূপ-রূপীতে জড়ভেদের ন্যায় ভেদ আছে! অল্পকথায় ভগবদ্বস্তু অনিত্য ও প্রপঞ্চের ন্যায় মিথ্যা! ইহাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান আধ্যক্ষিক জ্ঞানেরই পরিণতি। ইহারা যে মুখে কেবল শ্রুতির সহিত সামাজিকতা করেন, তাহার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য এই যে, যখন শ্রুতি ও শ্রুত্যনুগত শাস্ত্র-সমূহ সমস্বরে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া বলেন,—"পরাস্যশক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।" "নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ। মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্।।" "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত-মহেশ্বরম্।।" "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য।" "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্।।"—তখন ইঁহারা শ্রুতির সম্মান আর রক্ষা করিতে পারেন না। অবিচিন্ত্যশক্তিমান্ পরমেশ্বরের স্বাভাবিকী স্বতন্ত্রা শক্তিকে ইঁহারা অস্বীকার এবং ভগবানের নিত্য তনুতে 'অনিত্য' প্রভৃতির আরোপ করিয়া প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা শ্রুতির সতীত্ব-মর্য্যাদা লঙ্ঘন করান। যেহেতু এই হেয় প্রতিফলিত প্রতিবিম্বস্বরূপ জগতের যাবতীয় বস্তুর সত্তায় নশ্বরতা আছে, সেই হেতুকে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের কুমন্ত্রণায় বিশ্বাস স্থাপন-পূর্ব্বক অতীন্দ্রিয় তত্ত্বে তাহা ব্যাপ্ত করিবার চেষ্টা এবং শ্রুতির সুমন্ত্রণায় মুক্তপ্রগ্রহ-বৃত্তিকে অস্বীকার করেন। পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রভৃতি বাস্তব বস্তুসমূহ চরমে অসম্যক্ নির্ব্বিশেষ-ভাব মাত্রে বিলুপ্ত হইবে—এইরূপ আধ্যক্ষিকতা অবলম্বন করিয়া কল্যাণতম রূপের অঙ্গে অস্ত্র নিক্ষেপের চেষ্টা প্রদর্শন-পূর্ব্বক তাঁহাকে খণ্ড-বিখণ্ডিত এবং সত্যের মুখকে 'অপিহিত' (আবৃত) করিবার প্রয়াস করে, কিন্তু ইহা শ্রুতির বিরুদ্ধে কাপুরুষোচিত কপট বা প্রচ্ছন্ন অভিযান মাত্র। কল্যাণতম রূপ-দর্শনের প্রার্থনায় সত্যানুসন্ধিৎসুগণ শ্রুতির এই মন্ত্রটী আবৃত্তি-পূর্ব্বক অপ্রাকৃত সবিশেষ পুরুষোত্তমকে তাঁহার নির্ব্বিশেষ জ্যোতিঃসমূহ নীরজীকৃত করিয়া দর্শন করিতে চাহেন,—

অপিহিত সত্য—নির্ব্বিশেষব্রহ্ম-ধারণা কল্যাণতমরূপই—'জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপমতুলং শ্যামসুন্দরম্'

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।
পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজ্যপত্য ব্যূহ রশ্মান্ সমূহ।
তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।। (ঈশোপনিষৎ)

শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ—অধোক্ষজ

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা ও অনুশীলনকারী মূল দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিগণ **অধোক্ষজ** বিচার আশ্রয় করেন। "অধঃকৃতং অক্ষজং ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ অধোক্ষজঃ।"—যাহা যাবতীয় ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে অধঃকৃত করিয়া তাহার উপর নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব করিতে পারে, তাহাই কৃষ্ণস্বরূপের প্রথম প্রতিজ্ঞা। যাহা জীবের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দাসত্ব করিয়া জীবকে প্রতারণা করে, তাহাই অকৃষ্ণ বা কৃষ্ণের বিমুখ-বিমোহিনী বহিরঙ্গাশক্তি মায়া। অধোক্ষজ বিচারকগণ এরূপ অক্ষজ-কারাগারে কৃষ্ণকে নিক্ষেপ করিবার বৃথা প্রয়াস করিয়া আত্মপাত বরণ করেন না। কারণ কৃষ্ণকে বা অক্ষজ জ্ঞানের অতীত অধোক্ষজ ভূমিকারূপ বিশুদ্ধ-সত্ত্বে অবতীর্ণ বাসুদেবকে কেহ কারাগারে নিক্ষেপ করিতে পারে না—তাঁহারই যোগমায়া-প্রভাবে কারাগারের সমস্ত শৃঙ্খল স্বতঃই উন্মুক্ত হইয়া পড়ে এবং জড়মায়ার দ্বারা ঐরূপ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের "বজ্র আটন ফস্কা বাঁধন" বিনষ্ট হইয়া যায়।

অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের কপট উপাসক

যাঁহারা অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের আলোচনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে আবার কয়েকটী শ্রেণী-বিভাগ লক্ষিত হয়। এক শ্রেণী অধোক্ষজের প্রতিজ্ঞায় কতকটা মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করিলেও আধ্যক্ষিক নায়কগণের শ্রাদ্ধভোজে আকণ্ঠ নিমন্ত্রণ ভোজন করায় তাহাদের আধ্যক্ষিকতার উদ্গার অধোক্ষজের প্রসাদ-গ্রহণ সময়েও উপস্থিত হয়। এইরূপ মৌখিকতায় অধোক্ষজ ও কার্য্যতঃ আকণ্ঠ আধ্যক্ষিক আহার্য্যে পরিতৃপ্ত ব্যক্তিগণ যাঁহাকে 'মহাভারতের কৃষ্ণ', 'গীতার কৃষ্ণ', 'বিষ্ণুপুরাণের কৃষ্ণ', এমন কি, 'শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণ' মনে করেন, তাঁহাদের সেই মনঃকল্পনা হইতে প্রকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করিয়া অধোক্ষজত্বের মুক্তপ্রগ্রহ প্রকাশ করেন।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ধারণা

আর একপ্রকার অধোক্ষজ বিচারপরায়ণ ব্যক্তি সেইরূপ আধ্যক্ষিকতায় আত্মবিক্রয় না করিলেও তাঁহাদের বিচারও শ্রীকৃষ্ণের অধোক্ষজত্বের মুক্ত প্রগ্রহ- বৃত্তিতে প্রকাশিত হয় নাই। আচার্য্য শ্রীরামানুজ যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের ধারণা করেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণতা অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণ' শব্দের যাহা মুক্ত প্রগ্রহ-বৃত্তি বা একান্ত বিদ্বদ্রূঢ়ি, তাহা প্রকাশিত হয় নাই। "শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ, বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণেরই বিলাস, শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের বিলাস নহেন।"—এই শ্রুতিপর সিদ্ধান্ত আচার্য্য শ্রীরামানুজ ঐশ্বর্য্য-আবরণ উন্মোচন করিয়া জগতে প্রদর্শন করেন নাই। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীমদ্ভাগবতের মূর্ত্ত বিগ্রহের লীলাভিনয়- কারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তাহা জগতে প্রকাশ করিয়াছেন,—

শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া।। (ভাঃ ১০।১৪।১৪)

(ব্রহ্মা গোবৎস হরণ করিলে পর শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব অবগত হইয়া যে স্তুতি করেন, তাহা এই প্রকার)—হে অধীশ, তুমি অখিলোকসাক্ষী। তুমি যখন দেহি- মাত্রের আত্মা অর্থাৎ অত্যন্ত প্রিয় বস্তু, তখন কি তুমি আমার জনক নারায়ণ নহ? নরজাত জল শব্দে 'নার', তাহাতে যাঁহার 'অয়ন', তিনিই 'নারায়ণ'। তিনি তোমার অঙ্গ অর্থাৎ অংশ। তোমার অংশ-স্বরূপ কারণোদকশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী কেহই মায়ার অধীন নহেন, তাঁহারা মায়াধীশ—মায়াতীত পরম সত্য।

শ্রীব্রহ্মসংহিতার সিদ্ধান্ত

ব্রহ্মসংহিতা-মধ্যেও ব্রহ্মা ভগবানকে প্রণাম-পূর্ব্বক বলিতেছেন,—

রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্ নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

যে পরম-পুরুষ স্বাংশ-কলাদি-নিয়মে রামাদি-মূর্ত্তিতে স্থিত হইয়া ভুবনে নানা অবতার প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং কৃষ্ণরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

দেবর্ষি নারদের আচার

শ্রুতিগণ নিখিল বেদের সারস্বরূপ যে স্তব করিয়াছিলেন, তাহার তাৎপর্য্য- বেত্তা দেবর্ষি নারদ শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৮৭তম অধ্যায়ে নারায়ণাদিকেও পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই স্থানে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া বলিয়াছিলেন,—

নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণয়ামলকীর্ত্তনে।
যো ধত্তে সর্ব্বভূতানামভবায়োশতীঃ কলাঃ।।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর ব্যাখ্যা

এখানে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অভিমতানুসারিণী টীকায় বলিতেছেন,—"ননু কিং তমেব নমস্করোষি পুরঃসন্তং শ্রীনারায়ণং সগুরুং মাং নৈব প্রণমসি তত্রাহ য ইতি। অভবায় ভবনিবৃত্তয়ে উশতীঃ কমনীয়াঃ কলাঃ ভবদ্বিধানবতারান্ ধত্তে ইতি তন্নমস্কারেণৈব ত্বন্নমস্কারোঽপ্যভূদিতি ভাবঃ। শ্লোকেঽয়মশেষসমাম্নায়পুরাণোপনিষৎসমুদ্রমথনোত্থবেদস্তবামৃতাদপি সারভূত আকৃষ্টঃ শ্রীনারদেন তথা চ শ্রুতিঃ 'তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েত্তং রসেত্তং ভজেত্তং যজেদিত্যোন্তৎ সৎ' ইতি শ্রীগোপাল-তাপনী।।

—যদি প্রশ্ন হয়, কি জন্য নিজ-গুরু আমি শ্রীনারায়ণ সম্মুখে অবস্থান করা সত্ত্বেও আমাকে প্রণাম না করিয়া শ্রীকৃষ্ণকেই প্রণাম করিতেছ, তদুত্তরে শ্রীনারদ বলিতেছেন,—সংসার-নিবৃত্তির জন্য কমনীয় অংশ-কলা অর্থাৎ আপনাদের ন্যায় অবতার-সমূহকে যিনি ক্রোড়ীভূত করিয়া রাখিয়াছেন, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণকেই নমস্কার করিতেছি। তাঁহার নমস্কারে আপনি যে তাঁহার স্বাংশ নারায়ণ, তাঁহারও নমস্কার হইতেছে।

এই শ্লোকে অশেষ বেদ, পুরাণ, উপনিষৎ-সমুদ্রের মন্থনোত্থ বেদস্তবামৃত হইতেও সারভূত সিদ্ধান্ত শ্রীনারদের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছে। শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিও বলিয়াছেন, সেইহেতু কৃষ্ণই পরদেবতা, তাঁহাকেই ধ্যান করিবে, তিনিই সমস্ত রসের আশ্রয়, তাঁহাকেই ভজন করিবে, তাঁহারই যজ্ঞ করিবে; অতএব নিখিল শ্রুতি-পুরাণাদির সিদ্ধান্তে শ্রীকৃষ্ণ—অংশী ও নারায়ণ—অংশ, ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের এই গূঢ় উপদেশ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জগতে প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীরামানুজীয়গণের পূর্ব্বপক্ষ নিরাস

রামানুজীয়গণ বলেন যে, মহাবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ অনাদিসিদ্ধ, আর শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরযুগের অবসানে আবির্ভূত হইয়াছেন; সুতরাং 'নারায়ণ—শ্রীকৃষ্ণের বিলাস' —ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? শ্রীমদ্ভাগবত এই মতবাদ নিরাস করিয়া বলেন,—শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ অনাদি, তাঁহার জন্ম-লীলাও সেইরূপ অনাদি, তিনি কেবল স্বেচ্ছাবশতঃই পুনঃ পুনঃ তাঁহার জন্ম-লীলা প্রকট করিয়া থাকেন (ভাঃ ৩।২১।১৫),—

স্বশান্তরূপেম্বিতরৈঃ স্বরূপৈরভ্যর্দ্দ্যমানেম্বনুকম্পিতাত্মা।
পরাবরেশো মহদংশযুক্তো হ্যজোপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিঃ।।

যেরূপ পূর্ব্বসিদ্ধাগ্নি অরণি (অগ্নিমন্থন-কাষ্ঠ) হইতে অগ্নির প্রকাশ হয়, তদ্রূপ নিত্য পূর্ব্বসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-লীলাও প্রকাশিত হইয়া থাকে। স্বীয় শান্তরূপ বসুদেবাদি ভক্ত যখন বিকট ভয়ঙ্করাকার কংসাদি দৈত্যের দ্বারা নিপীড়িত হন, তখন দয়ার্দ্রান্তঃকরণ ভগবান্ প্রাকৃত-জন্ম-রহিত হইয়াও বৈকুণ্ঠনাথাদি, তদ্‌ব্যূহ, তদংশ পুরুষ তদংশ লীলাবতারগণের সহিত প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। সার্ব্বভৌম সম্রাট্ যেরূপ দিগ্বিজয়ে যাইবার সময় মণ্ডলাধিপগণের সহিত বহির্গত হন, তদ্রূপ জগতে অবতরণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া স্বয়ং প্রভু অবতারী শ্রীকৃষ্ণও তদ্‌বিলাসাদি স্বাংশগণের সহিত অবতীর্ণ হন। অতএব শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-লীলার অনাদিত্ব প্রদর্শন এবং শ্রীকৃষ্ণেরই স্বয়ংরূপতা প্রতিপাদনের দ্বারা নারায়ণ-ব্যূহ যে কৃষ্ণব্যূহের বিলাস,—ইহা প্রমাণিত হইল।

নারায়ণ-বক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মীর শ্রীকৃষ্ণ-বক্ষঃ-স্পৃহা

শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের পরিপূর্ণতার আরও শতসহস্র সাক্ষ্য পাওয়া যায়। রামানুজীয়গণের উপাস্য নারায়ণ-পত্নী লক্ষ্মী সর্ব্বদা বৈকুণ্ঠপতির বক্ষঃস্থিতা হইয়া শ্রীগোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলের স্পৃহা করিয়া থাকেন। কিন্তু নারায়ণ-পত্নী লক্ষ্মীর কৃষ্ণবক্ষঃস্থলের স্পৃহামাত্রই আছে, লক্ষ্মীস্বরূপে তাহা পাইবার যোগ্যতা নাই। ইহা দ্বারা লক্ষ্মী স্ব-পতি নারায়ণ অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন,—

ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণবীরুধস্ত্বৎপাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ।
নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈর্গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ।।

(ভাঃ ১০।১৫।৮)

এই পৃথিবী পূর্ব্বে বিবিধ অবতারের চরণস্পর্শ-সৌভাগ্য লাভ করিলেও আপনার স্বয়ংরূপ অবতারে সম্প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যবতী হইয়াছে। তৃণ-লতা-সকল আপনার পদযুগলস্পর্শে, বৃক্ষলতাগণ

আপনার নখসমূহের স্পর্শে, নদী, পর্ব্বত ও পশুপক্ষিগণ ভবদীয় সকরুণ কটাক্ষপাতে এবং শ্রীদেবীও যাঁহার জন্য লালায়িত, সেই বক্ষঃপ্রদেশ-লাভে গোপীগণ ধন্যা হইয়াছেন।

'শ্রীকৃষ্ণ' নামের মহিমাধিক্য

বিভিন্ন শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে যে, 'নারায়ণ' নাম অপেক্ষা 'শ্রীকৃষ্ণ' নামের মহিমা অধিক। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বলিতেছেন,—

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি।।

—বৈশম্পায়ন-কথিত অর্থাৎ মহাভারতোক্ত পরম পবিত্র বিষ্ণুসহস্রনামের তিনবার আবৃত্তিতে যে ফল হয়, কৃষ্ণের একটী নাম একবার কীর্ত্তিত হইলে সেই ফল প্রদান করিয়া থাকে।

আচার্য্য মধ্বের বিচার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দ্বারা পরিশিষ্টতা-প্রাপ্ত ও সম্প্রকাশিত

আচার্য্য শ্রীমধ্ব মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ বা রুক্মিণীশ দ্বারকেশ শ্রীকৃষ্ণের বিষয় অধিকতরভাবে কীর্ত্তন করিলেও দ্বাদশস্তোত্রে "গোপিকাপ্রণয়িনঃ", "মন্দহাসমৃদুসুন্দরাননং নন্দনন্দনমতীন্দ্রিয়াকৃতিং", "নন্দকুমারবৃন্দাবনাচঞ্চলগোকুলচন্দ্র" প্রভৃতি উক্তিমুখে এবং শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্যে গোপীজনবল্লভ ব্রজেন্দ্রনন্দনের বিষয় ইঙ্গিত দিয়াছেন। তবে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব আচার্য্যের সেই অপরিস্ফুট ইঙ্গিতকে পূর্ণভাবে পরিস্ফুট এবং পরিশিষ্টযুক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যসীমা প্রকাশ করিয়াছেন।

সাম্প্রদায়িক কৃষ্ণালোচনা শ্রীকৃষ্ণের বৈধ আকৃতি মাত্র

সাম্প্রদায়িক কৃষ্ণতত্ত্বালোচনা শ্রীকৃষ্ণের সহজ ও স্বাভাবিক স্বরূপ নহে। তাহা একটা বৈধ আকৃতি মাত্র। সাম্প্রদায়িক বিচারে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব নিরূপিত হয় না। উহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অবতারগণের পূজা হইতে পারে; তবে যে সাম্প্রদায়িক বিচার-মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের কথা আলোচিত হয়, তাহা শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের একটা দিগ্দর্শন মাত্র। বহু লোক সেই বিশিষ্ট দিগ্দর্শনের অনুমোদনকারী—ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই সাম্প্রদায়িক আলোচনা-প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু যাঁহারা সেই- রূপ সম্প্রদায়ের বহিরঙ্গ বিচারের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াও কেবলমাত্র শ্রীগুরুদেবের বিশিষ্ট কৃপাবলে ভজন-রাজ্যে আত্মবৃত্তিকে পরিস্ফুট করিতে পারেন, তাঁহারাই সম্প্রদায়াতীত অন্তরঙ্গ শ্রীকৃষ্ণভজনের কথা অবগত হইতে পারেন। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব—যিনি শ্রীকৃষ্ণ জানাইয়া বিশ্ব ধন্য করিতে অবতীর্ণ হইয়া- ছিলেন, তাঁহাকে সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক না বলিয়া গোস্বামিপাদগণ,—

"**সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক** শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।"

—প্রভৃতি বাক্যে আরতি করিয়াছেন। সঙ্কীর্ত্তন দ্বারাই অপ্রাকৃত নাম-রূপ-গুণ-লীলাময় স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব আত্মস্বরূপে উপলব্ধ হয়। সুবুদ্ধিগণ ইহার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভাষা বা সাহিত্যের দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্যগ্‌রূপে প্রকাশিত হয় না। ভাষা ও সাহিত্য 'শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু' বলিতে গিয়া

নিরস্ত হইয়া পড়ে। তবে ভাষা নিরস্ত হয় বলিয়া মনোধর্ম্মের কল্পনা বা যথেচ্ছাচারিতা সেখানে স্থান পায় না। শতকরা শত পরিমাণ সেবোন্মুখতা- পরিভাবিত আত্মস্বরূপে তাহা প্রকাশিত হয়।

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারের কথিত সিদ্ধান্ত হইতে যে মতবাদ যতটা পৃথক্, তাহা ততটা অসম্পূর্ণ ও দোষযুক্ত

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপদেষ্টা বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণুপুরাণের কথিত শ্রীকৃষ্ণ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদীর শ্রীকৃষ্ণ, আধুনিক আনুকরণিক নিম্বার্কানুগব্রুব সম্প্রদায়ের শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীবল্লভানুগগণের পুষ্টিমার্গের শ্রীকৃষ্ণ যে পরিমাণে স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্নতনু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের উপদিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের সহিত পার্থক্য লাভ করিয়াছেন, সেই পরিমাণে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণধারণায় অসম্পূর্ণতা আছে। সেই অসম্পূর্ণ ধারণা কখনই পূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণের মুক্তপ্রগ্রহবৃত্তি নহে। শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীধরস্বামিচরণ নৃপঞ্চাস্যের উপাসক এবং শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যাতৃ-সূত্রে শ্রীকৃষ্ণকেই পরম ধাম এবং দশম স্কন্ধের আশ্রিতগণের আশ্রয়বিগ্রহরূপে লক্ষ্য করিয়াছেন,—

শ্রীধরস্বামিপাদের সিদ্ধান্ত

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ।।

(১০।১—ভাবার্থদীপিকা)

বিশ্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ নহে, উহা প্রাকৃত

কেহ কেহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একাদশাধ্যায়োক্ত বিশ্বরূপকেই পরম স্বরূপ মনে করেন। বিশ্বরূপ যে পরম স্বরূপ নহে, ইহা শ্রীগীতায়ই প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ইহা বিশেষরূপে জানাইয়াছেন। অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলেন, বিশ্বরূপ শ্রীকৃষ্ণরূপের অধীন; অধীন বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছামাত্র বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। গীতার বিশ্বরূপ-অধ্যায়ে যখন অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অত্যন্ত অস্বাস্থ্য অনুভব করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ,—

"স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।" (গীঃ ১১।৫০)

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে পুনর্ব্বার স্বীয় রূপ দর্শন করাইলেন। এই 'স্বকং রূপং' শব্দে বিশ্বরূপ যে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ স্বরূপ নহে, ইহাই সূচিত হইতেছে। আর অর্জ্জুনও সেই দ্বিভুজ মূর্ত্তিধর শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়া নিজ স্বভাবে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন,—

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ।। (গীঃ ১১।৫১)

হে জনার্দ্দন, তোমার এই সৌম্য মনুষ্য মূর্ত্তি-দর্শন কবিয়া এখন আমার চিত্ত স্থির হইল এবং আমি প্রকৃতিস্থ হইলাম।

বিশ্বরূপ দর্শন করিবার জন্য অর্জ্জুনকে ভগবান্ দিব্যদৃষ্টি দান করিয়াছিলেন, সুতরাং বিশ্বরূপ—শ্রেষ্ঠরূপ, এরূপ অসঙ্গতিপূর্ণ বিচার শ্রীগীতায় খণ্ডিত হইয়াছে। অর্জ্জুন শ্রীভগবানের নিত্য সখা ও পার্ষদ; তিনি যে চক্ষু দ্বারা অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণকে নিত্যকাল দর্শন করেন, সেই চক্ষু যে নিত্য অপ্রাকৃত, এ-বিষয়ে কোন সংশয়ই থাকিতে পারে না, তবে বিশ্বরূপ-দর্শন সময়ে শ্রীকৃষ্ণের অর্জ্জুনকে যে দিব্যচক্ষু-প্রদানের কথা উল্লিখিত আছে, তাহা অর্জ্জুনের স্বাভাবিকী অপ্রাকৃত দৃষ্টি আবরণের আদর্শ প্রদর্শনপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে দেব-সম্বন্ধী অস্বাভাবিক দৃষ্টি দান মাত্র, উহা অর্জ্জুনের আকাঙ্ক্ষিত নহে। অধোক্ষজ-সেবা-বিমুখ দেবতাগণ বা জীবগণের যখন অপ্রাকৃত সহজ স্বভাব—অপ্রাকৃত আত্মচক্ষু আবৃত হয়, তখনই তাঁহাদের বিশ্বরূপ-দর্শনের যোগ্যতা বা আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহা প্রদর্শনের জন্যই ভগবান্ অর্জ্জুনের স্বাভাবিক অপ্রাকৃত দৃষ্টি আবরণের অভিনয় দেখাইয়া দিব্যদৃষ্টি দানের অবতারণা করিলেন।

বিশ্বরূপ-প্রদর্শন শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তার পরিচায়ক নহে, শ্রীকৃষ্ণ হইতে প্রকাশিত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড-অন্তর্য্যামীর যে কেহ বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিতে পারেন। নবীন উপাসকগণের জন্য পাতালাদিকে পাদাদিরূপে, বিশ্বকে পুরুষ- রূপে কল্পনা করিয়া বিরাট্‌রূপ উক্ত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোপদিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোপদিষ্ট উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ—অপ্রাকৃত লীলাবৈচিত্র্যময়। তিনি শ্রীরাধানাথ গোপীকুমুদবন্ধু রসিকশেখর। গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণই নিরঙ্কুশ স্বতন্ত্রেচ্ছাময় পূর্ণতম যথেচ্ছবিহারী।

অভিজ্ঞতাবাদ ও অপরোক্ষবাদের ক্রমবিকাশে আটটী মতবাদ ও বিচার

বিদ্বৎপ্রতীতিযুক্ত অধোক্ষজ বৈজ্ঞানিকগণ অভিজ্ঞতাবাদ ও অপরোক্ষবাদের চারিটী ক্রমে আটটি ক্রমবিকাশ নির্দ্দেশ করেন। অভিজ্ঞতাবাদের ক্রম-বিকাশে চারিটী সন্ততি জন্ম লাভ করিয়াছে। প্রথম—বিশুদ্ধ নাস্তিক্যবাদ, দ্বিতীয়— সন্দেহবাদ, তৃতীয়—অজ্ঞেয়তাবাদ এবং চতুর্থ—নির্ব্বিশেষবাদ বা মায়াবাদ। অভিজ্ঞতাবাদী প্রত্যক্ষ জড়কেই যথাসর্ব্বস্ব বিচার করিয়া—খাওয়া-দাওয়া-থাকাকেই জগতের সারাৎসার বিচার-পূর্ব্বক কখনও ভারতীয় চার্ব্বাক, কখনও পাশ্চাত্যদেশীয় এপিকিউরাস, কখনও চীনদেশীয় ইয়াংচু প্রভৃতির আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। সন্দেহবাদে পরম তত্ত্ব আছে কি নাই, সে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; অজ্ঞেয়তাবাদে ভগবান্ আছেন ধরিয়া নিলেও সেই বস্তু অজ্ঞেয়, লোকে উহা জানিতে পারে না—এইরূপ একটী বিমুখতার ভাববিশেষ মানব-চিত্ত অধিকার করিয়াছে। এই ভগবদ্‌বিমুখতা যখন অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন ও কপটতার আবরণে আবৃত হইয়া রূপ ধারণ করে, তখন উহা পরম তত্ত্বকে নপুংসকলিঙ্গ বা জড়নির্ব্বিশেষরূপে বিচার করিয়া থাকে অর্থাৎ পরম তত্ত্ব বলিয়া কোন বস্তু থাকিলেও তাঁহার কোন পুরুষত্ব, কোন নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্য কিছুই থাকিবে না। যেহেতু জড়ের নাম-রূপ-গুণ-ক্রিয়াযুক্ত বস্তুমাত্রেই অনিত্য, সুতরাং এই অভিজ্ঞতাকে অনুমাণ-প্রমাণ-বলে অপ্রাকৃত রাজ্যে ব্যাপ্ত করিবার অসীম সাহসিকতা হইতে

ভগবানকে নপুংসকলিঙ্গ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এই শ্রেণীর লোককে সাধারণ নাস্তিক হইতেও অধিকতর ভগবদ্বিমুখ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

পুং ও পুংমিশ্র বিচার

যখন আত্মার ভগবদুন্মুখতা বিকাশ হইতে থাকে, তখন বস্তুর ক্লীবত্ব-বিচার ক্রমে নিরস্ত হইয়া পুং ও পুংমিশ্র বিচারের দিকে ধাবিত হয়।

(১) একল বাসুদেব

ভগবদুন্মুখতার প্রথম বিকাশে একল পুরুষোত্তম বাসুদেবের উপাসনা ক্রম-বিকাশমুখে তদন্তর্গত মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ বামনাদির পঞ্চক্রম বিস্তৃতি। সাধারণ বিচারে তাহা স্ত্রীভাব-বর্জ্জিত, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদেরও নিজ নিজ লক্ষ্মী আছেন।

(২) শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ

ক্রম-বিকাশের দ্বিতীয় স্তরে পুং-স্ত্রী-মিশ্রভাবের উপাসনায় বৈকুণ্ঠস্থ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ও তদন্তর্গত জামদগ্ন্যাদি ক্রমাবতার।

(৩) শ্রীসীতারাম, (৪) শ্রীরাধাগোবিন্দ

তৃতীয়স্তরে সীতা-রামের উপাসনা এবং চতুর্থস্তরে শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনার ক্রমতারতম্যের উপলব্ধি।

আধ্যক্ষিকগণের স্থূল বিচার ও অনধিকার চর্চ্চা

অপরোক্ষবাদের আলোচনা করিতে গিয়াও যাঁহারা ন্যূনাধিক পরিমুক্ত বিচারের সম্মুখীন হইতে পারেন নাই কিম্বা যাঁহারা অভিজ্ঞতাবাদের গুণটানা-কার্য্যটী কল্পনা-প্রভাবে মুক্তাবস্থার পরও ব্যাপ্ত করিবার প্রয়াসী, তাঁহারা শ্রীরাধানাথ কৃষ্ণের উপাসনা হইতে সীতা-রামের উপাসনা অধিকতর নীতিমূলা বলিয়া বিচার করেন। ডাঃ রামগোপাল ভাণ্ডারকর, ডাঃ ম্যাক্‌নিকল, মিঃ কেনেডি প্রভৃতি এইরূপ ভ্রমে পতিত। কেন না, রাধানাথ—গোপবধূবিট; আর শ্রীরামচন্দ্র একপত্নী-ব্রতধর, আদর্শনীতিপরায়ণ, প্রজারঞ্জক রাজার আদর্শ। ইঁহাদের প্রাকৃত বিচারের অতি-সাহসিকতা মক্ষিকার কাচভাণ্ডের বহির্দ্দেশে থাকিয়া কাচ-ভাণ্ডান্তর্গত বস্তুর সমালোচনা ও স্পর্শাভিমানের ন্যায়। আবার কেহ কেহ সীতারামের উপাসনা হইতেও লক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসনা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিচার করেন। কারণ, শ্রীরামচন্দ্র দশরথ ও কৌশল্যার ঔরস ও গর্ভজাত পুত্র; কিন্তু শ্রীনারায়ণ—অজ বস্তু। আবার লক্ষ্মী-নারায়ণ-উপাসনা হইতেও কেহ কেহ স্ত্রী-ভাব-বর্জ্জিত একল বাসুদেবের উপাসনাকে শ্রেষ্ঠ বিচার করেন।

আধ্যক্ষিকতার শেষ সীমায় নির্ব্বিশেষ-সাগরে আত্মহত্যা

আধ্যক্ষিক বিচারে একল বাসুদেবের উপাসনায় ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্যাদির নিত্য অবস্থান থাকায় অভিজ্ঞতাবাদী নাম-রূপ-গুণ-লীলা-বর্জ্জিত নির্ব্বিশেষ ভাববিশেষ ব্রহ্মবিচারকেই

শ্রেষ্ঠ মনে করেন এবং সকল উপাসনা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অন্তিমে নির্ব্বিশেষবাদে উহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবার চেষ্টা করেন।

পরাৎপরবস্তু—পূর্ণতম স্বাধীন স্বরাট্

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ও তদ্দাসানুদাসগণ শ্রুতি, ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র হইতে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, তিনিই পরাৎপরবস্তু—যিনি নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় বা পরিপূর্ণ মুক্তপ্রগ্রহ যথেচ্ছবিহারী। নির্ব্বিশেষ বিচারে শ্রুতির একদেশের বিকৃত অর্থ দ্বারা পরাৎপরবস্তুকে বিপর্য্যস্ত (?) এবং শ্রুতির অপর দেশ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ক্ষুদ্র মানব-অভিজ্ঞানে অপরিসীম অধোক্ষজ বস্তুকে খণ্ড-বিখণ্ড করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

নির্ব্বিশেষ-বিচার—কংস-মনোভাবজ বিকার

পরাৎপর পূর্ণতম স্বাধীন তত্ত্বকে এরূপভাবে হস্ত-পদ বন্ধন করিয়া (?) কারাগারে নিক্ষেপ-পূর্ব্বক বিনাশ করিবার কংস-মনোভাবজ চেষ্টায় পরাৎপরতত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট হন নাই।

একল বাসুদেবের ধারণায় উপাস্যের পূর্ণতম স্বাধীনতা খর্ব্বিত

একল বাসুদেবে আস্তিক্য-বিচার আরব্ধ হইলেও সেখানে শক্তিমত্তত্ত্বকে শক্তি বা লক্ষ্মীহীন করিয়া দেখিবার চেষ্টায় পরাৎপরতত্ত্বের স্বাধীনতা অত্যন্ত খর্ব্বীকৃত হইয়া পড়িয়াছে।

লক্ষ্মী-নারায়ণের ধারণায় তদপেক্ষা কম খর্ব্বিত

লক্ষ্মী-নারায়ণে বাসুদেবের সহিত লক্ষ্মীর দর্শন করিবার স্পৃহা থাকিলেও সেখানে সম্ভ্রম ও ঐশ্বর্য্যেই পরাৎপরতত্ত্বের স্বরূপ হইতেও অধিকতর মর্য্যাদা বা গৌরবের পাত্র হইয়া উঠিয়াছে।

ঐশ্বর্য্যোপাসনা ও স্বরূপোপাসনা

লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজায় ঐশ্বর্য্য সম্ভ্রম বা গৌরবের পূজাই প্রবল, পরাৎপরতত্ত্বের স্বরূপ পূজা ম্লান। ঐশ্বর্য্য পালকহীন করিলে নারায়ণ-সেবকের আর প্রীতি নাই। ঐশ্বর্য্য আছে বলিয়াই পূজকের আকর্ষণ আছে; সুতরাং সে আকর্ষণ স্বরূপ অপেক্ষা ঐশ্বর্য্যে অধিকতর কেন্দ্রীভূত।

স্বরূপ-প্রীতিই কৃষ্ণসেবায় লক্ষিত

কিন্তু গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা তাহা নহে, সেখানে ঐশ্বর্য্যের সাজ-সজ্জা পূজকগণকে আকর্ষণ করে নাই।

সম্পূর্ণ অকৃত্রিমতা—স্বাধীনতা, অপ্রাকৃত সহজভাব

শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক স্বরূপ, তাঁহার সেই কুসুম-কিসলয়, সেই কালিন্দী-কূলে স্বচ্ছন্দ-বিহার, সেই গোধনসম্পৎ, সেই গ্রাম্য বেণুবাদন গোপীগণকে আকর্ষণ করিয়াছে।

শ্রীসীতা-রামের উপাসনার ধারণায় উপাস্যতত্ত্বের পূর্ণতম স্বাধীনতা ম্লান

সীতার রামচন্দ্রোপাসনায় লক্ষ্মী-নারায়ণ-উপাসনা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ স্বরূপ-প্রীতির পরিচয় প্রকাশিত হইলেও একপত্নীব্রতধর রামচন্দ্রকে আর কেহ সীতাদেবীর আদর্শে আরাধনা করিতে পারেন না, আরাধনা করিলে শ্রীরামচন্দ্রের এক পত্নীব্রতধরত্ব ভঙ্গ হয়, সুতরাং সীতা-রামের উপাসনা ঐশ্বর্য্যযুক্ত দাস্যরসের ভূমিকায়ই প্রতিষ্ঠিত। অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিসম্পন্ন ভগবানকে কেবলমাত্র একপত্নী-ব্রতধরত্বে আবদ্ধ করিয়া দেখিতে গেলে তাঁহার পূর্ণ স্বতন্ত্রতারও ব্যাঘাত হইয়া পড়ে। সীতারামের উপাসনা হইতে দ্বারকেশ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা অধোক্ষজ-সেবা-প্রগতির বিচারে শ্রেষ্ঠ হইলেও অর্থাৎ একপত্নীমাত্রব্রতধরত্ব হইতে আরাধ্য বস্তুর বহুবল্লভত্ব দর্শনে পরাৎপর বস্তুর অধিকতর স্বতন্ত্রতা পরিস্ফুট হইলেও সেখানে পূর্ণতমা স্বাধীনতা বিকশিত হয় নাই। গান্ধর্ব্ব-রীতিতে বিবাহিত শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণ্যাদি ষোড়শ সহস্র মহিষীগণের পতি-পত্নীভাব দাস্য-রসেরই প্রকারভেদ- মাত্র। সেখানে মাধুর্য্যরসের নিরঙ্কুশ সৌন্দর্য্য-বিচার প্রস্ফুটিত হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণে পূর্ণতম স্বাধীনতা, অবিচিন্ত্য শক্তিমত্তা, বিরুদ্ধগণের অপূর্ব্ব সমন্বয়

কিন্তু পরাৎপরতত্ত্ব পূর্ণতম স্বাধীন ও নিরঙ্কুশ যথেচ্ছবিহারী স্বরাট্। নন্দ-নন্দনত্বে তাহা পরিস্ফুট। শ্রীরামচন্দ্র রাবণের দ্বারা নিজ-পত্নী সীতাকে (অসুর- মোহনার্থ মায়াসীতাকে) হরণ করাইবার অভিনয়াদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আর শ্রীকৃষ্ণ নরোচিত নৈতিক চরিত্র উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক কেবল চিদ্‌বৈচিত্র্য-বিলাসে স্বয়ং পরনারী হরণ ও পরদারাভিমর্ষণ করিয়া স্বীয় নিরঙ্কুশ যথেচ্ছাচার, বিহার ও অবিচিন্ত্য-শক্তিমত্তা প্রদর্শন করিয়াছেন।

মায়াবশ্য জীব ও মায়াধীশগণেরও অধীশ শ্রীকৃষ্ণ সমভূমিকায় অবস্থিত নহেন

যাহা জড়বিচারপর অভিজ্ঞতাবাদের চক্ষে এবং বিকৃত প্রতিফলিত বিশ্বে শ্রীকৃষ্ণের গুণমায়াবশ্য জীব-মায়াশক্তির যোগ্যতায় অত্যন্ত হেয়, তাহাই একমাত্র অদ্বিতীয় পুরুষশেখর, সকল আশ্রয় বিচারের একমাত্র বিষয় মায়াধীশগণের সর্ব্বোত্তম আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেই অতীব শোভনীয় ও সুসমন্বিত।

একমাত্র বিষয়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণে প্রাকৃত অন্যতমতার আরোপ সিদ্ধ হয়

অখণ্ড পরমার্থ-নীতির নিকট খণ্ডিত জাগতিক নীতি পরাভূত, সর্ব্বতন্ত্র- স্বতন্ত্রের নিকট অস্বতন্ত্রের সকল বিচার তিরস্কৃত।

দৃষ্টান্ত

গোলার্দ্ধ ১৮০ অংশকে অংশবিশেষ বা গোলক ৩৬০ অংশকে অংশাত্মক বলা গেলেও সেখানে যেরূপ কোণজ অঋজু অন্য কোন অভাব বা সঙ্কীর্ণতা নাই, স্বরাট্ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণেও সেইরূপ কোন প্রকার হেয়তা নাই। নিরঙ্কুশ ইচ্ছার পূর্ণতম পর্য্যাপ্তির মূর্ত্তবিগ্রহ সেই পূর্ণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ।

দ্বারকেশ কৃষ্ণ—পূর্ণ, মথুরেশ কৃষ্ণ—পূর্ণতর, গোকুলেশ কৃষ্ণ—পূর্ণতম

ঐশ্বর্য্য-প্রধান মাধুর্য্যাংশমিশ্র দ্বারকেশ—পূর্ণ, মাধুর্য্যপ্রধান ঐশ্বর্য্যমিশ্র মথুরেশ—পূর্ণতর, আর কেবল মাধুর্য্যময় ব্রজেশ-তনয়—পূর্ণতম।

শাস্ত্র-প্রমাণ

হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা।
শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ শব্দৈর্নাট্যে যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।।
প্রকাশিতাখিলগুণঃ স্মৃতঃ পূর্ণতমো বুধৈঃ।
অসর্ব্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণোঽল্পদর্শকঃ।।
কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূৎ গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকা-মথুরাদিষু।।

(ভঃ রঃ সিঃ দঃ-বিঃ বিভাবলহরীতে ১১০-১১১ শ্লোক)

শ্রেষ্ঠ-মধ্যাদি-শব্দ-দ্বারা নাট্যশাস্ত্রে যাঁহার কীর্ত্তন আছে, সেই ভগবান্ হরি—পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম—এই তিন প্রকার। প্রকৃতির অতীত কেবল চিন্ময়রাজ্যে অল্প গুণের প্রকাশক হরি—পূর্ণ; সর্ব্বগুণের স্বল্পপ্রকাশক হরি—পূর্ণতর; আর যাঁহাতে অখিল গুণ প্রকাশিত, সেই হরি—পূর্ণতম; পণ্ডিতগণ ইহা কীর্ত্তন করেন। গোকুলে কৃষ্ণের পূর্ণতমতা, মথুরায় পূর্ণতরতা ও দ্বারকায় পূর্ণতা ব্যক্ত হইয়াছিল।

অজের জন্ম, বিরুদ্ধ গুণের অপূর্ব্ব সমন্বয়

শ্রীকৃষ্ণ অজ বস্তু হইয়াও জন্মের আবিষ্কার করিয়াছিলেন,—

"অজো জন্ম-বিহীনোঽপি জাতো জন্মাবিরাচরৎ।" (শ্রীলঘুভাগবতামৃত)

একই পুরুষের অজত্ব ও জন্মিত্ব—এই বিরুদ্ধ ব্যাপার কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তৎসম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন,—

প্রমাণ-যুক্তি

নন্বেকস্য কিলাজত্বং জন্মিত্বঞ্চ বিরুধ্যতে।
ইত্যাশঙ্ক্যাহ ভগবান্ অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যবৈভবঃ।।
তত্র তত্র যথা বহ্নিস্তেজোরূপেণ সন্নপি।
জায়তে মণি-কাষ্ঠাদের্হেতুং কঞ্চিদবাপ্য সঃ।।
অনাদিমেব জন্মাদিলীলামেব তথাদ্ভুতাম্।
হেতুনা কেনচিৎ কৃষ্ণঃ প্রাদুষ্কুর্য্যাৎ কদাচন।।

স্বলীলাকীর্ত্তিবিস্তারাৎ লোকেম্বনুজিঘৃক্ষুতা।
অস্য জন্মাদিলীলানাং প্রাকট্যে হেতুরুত্তমঃ।।
তথা ভয়ঙ্করতরৈঃ পীড্যমানেষু দানবৈঃ।
প্রিয়েষু করুণাপ্যত্র হেতুরিত্যুক্তমেব হি।।
ভূমিভারাপহারায় ব্রহ্মাদ্যৈস্ত্রিদশেশ্বরৈঃ।
অভ্যর্থনন্তু যৎ তস্য তদ্ভবেদানুষঙ্গিকম্।। (শ্রীলঘুভাগবতামৃত)

অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যশালী ভগবানে সমস্তই সম্ভব। তাহাতে মানব-চিন্তায় 'বিরুদ্ধ' বলিয়া প্রতিভাত ব্যাপার-সমূহের যদি অবিরোধ সমন্বয় না হইত, তাহা হইলে ভগবানের অবিচিন্ত্য শক্তিমত্তা বা পরাৎপরত্বের খর্ব্বত্ব সাধিত হয়। মানব- মনীষা যাহাকে মাপিয়া লইতে পারে, ভগবানের 'এই টুকু' সামর্থ্য, তদ্ব্যতীত তাঁহার কোন সামর্থ্য নাই—এইরূপ জাগতিক বিচারের সম্ভব অসম্ভবের গণ্ডী যাঁহার উপর প্রযুক্ত হইতে পারে অর্থাৎ মানব-চিন্তা যাঁহার উপর প্রভুত্ব করিতে পারে, তিনি কিরূপে পরম প্রভু ও পরাৎপরতত্ত্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হইবেন? অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য-বৈভব শ্রীকৃষ্ণে ঐরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ গুণ অর্থাৎ অজত্ব ও জন্মিত্ব যুগপৎ সমন্বিত হইয়াছে। অগ্নি যেমন তত্তৎ স্থানে তেজোরূপে নিত্য বর্ত্তমান থাকিয়াও কোন হেতু বশতঃ পাষাণবিশেষ বা কাষ্ঠাদি হইতে আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও কখনও কোন কারণবশতঃ অদ্ভুত ও অনাদি জন্ম-লীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন। স্বীয় লীলা-কীর্ত্তি-বিস্তার-জন্য, সাধক-মণ্ডলীকে কৃপা করিবার অভিলাষই শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদিলীলা প্রকাশের মুখ্য হেতু, আর ভয়ঙ্কর দাবানল কর্ত্তৃক পীড্যমান বসুদেবাদি প্রিয়তমগণের প্রতি কৃপাও তাঁহার আবির্ভাবের হেতু। পৃথিবীর ভার-হরণার্থ ব্রহ্মাদি দেবতাগণের প্রার্থনা—প্রাদুর্ভাবের আনুষঙ্গিক গৌণকারণ মাত্র। কারণ সাধু-পরিত্রাণ ও দুষ্কৃত-বিনাশ প্রভৃতি কার্য্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের নহে।

অবতারী শ্রীকৃষ্ণের দেহে অবতারগণের নিত্যস্থিতি

অবতারী কৃষ্ণের অবতরণ-কালে কৃষ্ণের সহিত অবতার বিষ্ণুর আবির্ভাব হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের দেহস্থিত অংশ বিষ্ণুর দ্বারা জগতের ভার-হরণ ও পালন-লীলা হইয়া থাকে, ইহাই ভাগবতের সিদ্ধান্ত।

পারকীয় নন্দনন্দনত্ব ও স্বকীয় বসুদেব-তনুজত্ব

পারকীয় নন্দ-যশোদানন্দনত্ব ঠিক স্বকীয় বসুদেবতনুজত্ব নহে। যে-কালে দেবকী স্বীয় তনুজের চতুর্ভুজরূপ সংবরণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেইকালে ভগবান্ চতুর্ভুজ রূপ আচ্ছাদন করিয়া যশোদার হৃদয়স্থ দ্বিভুজরূপে প্রকাশিত হন। শ্রীকৃষ্ণ দেবকীকে দ্বার করিয়া দেবকীর হৃদয়স্থিত চতুর্ভুজরূপে এবং যশোমতীকে দ্বার করিয়া যশোদার হৃদয়স্থ দ্বিভুজরূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। এই জন্য বসুদেব যশোমতীর হৃদয়ধন নরাকৃতি দ্বিভুজ-মূর্ত্তি পরব্রহ্মকে যশোদার শয্যায় স্থাপন করিয়া তদীয়া গর্ভাবির্ভূতা যোগমায়াকে কংস-বঞ্চনার্থ আনয়ন করিয়াছিলেন।

অহৈতুক বাৎসল্যপ্রেমবিশেষই শ্রীকৃষ্ণের পুত্রত্বের হেতু

যশোমতীর গর্ভ-প্রবেশাদি ব্যতীতও শ্রীকৃষ্ণ নন্দ-যশোদার পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। বাৎসল্যপ্রেমবিশেষের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ নন্দ-যশোমতীর নিত্য পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। সাধারণ ও ভক্তিবিশেষের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য আবির্ভাব প্রকটিত হইলেও তদ্দ্বারা বাৎসল্যপ্রেমের লাল্যপাল্য নন্দনন্দন- কৃষ্ণের আবির্ভাব হয় না। কাহারও দেহ হইতে নির্গত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ পুত্রত্ব প্রাপ্ত হন না। যদি দেহ হইতে নির্গত হইলেই ভগবানের পুত্রত্ব-বিচার প্রতিষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে হিরণ্যকশিপুর সভাস্তম্ভ হইতে আবির্ভূত নৃসিংহদেবের উক্ত স্তম্ভে এবং ব্রহ্মার নাসাদেশ হইতে প্রকটিত বরাহদেবের ব্রহ্মাতে পিতৃত্বের প্রয়োগ প্রসিদ্ধ থাকিত। অধিক কি, কাহারও গর্ভ হইতে আবির্ভূত হইলেও শ্রীকৃষ্ণে পুত্রত্বের আরোপ নাই; কারণ শ্রীকৃষ্ণ পরীক্ষিৎকে রক্ষা করিবার জন্য উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া উত্তরাতে শ্রীকৃষ্ণের মাতৃত্ব প্রযুক্ত হয় নাই। সুতরাং একমাত্র বাৎসল্যপ্রেমই শ্রীকৃষ্ণের পুত্ররূপে আবির্ভাবের হেতু, গর্ভ-প্রবেশাদি হেতু নহে। সেই বাৎসল্যপ্রেম একান্ত ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাদি-বিহীন পূর্ণ শুদ্ধরূপে ব্রজরাজ ও ব্রজরাজেশ্বরীতে নিত্যকাল উদিত। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ নিত্য নন্দ-যশোদাদুলাল।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবসুদেব-দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হইলেও প্রাকৃত ব্যক্তি যেরূপ চরম ধাতু প্রভৃতিতে প্রবিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করে, শ্রীকৃষ্ণ সেরূপভাবে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ দেবকী-বসুদেবের অপ্রাকৃত চিত্তে আবিষ্ট হইয়াই জন্ম-লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন;

> ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং সমাহিতং শূরসুতেন দেবী।
> দধার সর্ব্বাত্মকমাত্মভূতং কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ।। (ভাঃ ১০।২।১৮)

অর্থাৎ বসুদেব-কর্ত্তৃক সমাহিত জগতের মূর্ত্তিমান মঙ্গলস্বরূপ সর্ব্বাংশ- পরিপূর্ণ ভগবানকে দেবকীদেবী ধারণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বদিক যেরূপ চন্দ্রকে ধারণ করে, দেবকীদেবীও তদ্রূপ বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ চিত্ত দ্বারা সর্ব্বাত্মক আত্মভূত শ্রীহরিকে ধারণ করিয়াছিলেন।

পরাৎপরতত্ত্বের ঐশ্বর্য্যগন্ধলেশহীন পুত্রত্বের বিচার একমাত্র নন্দনন্দনেই সমন্বিত। দশরথাত্মজ রামে, এমন কি, বসুদেব-তনুজেও তাহা নাই। পরমেশ্বর-তত্ত্বের পুত্রত্ববিচার কিরূপে সমন্বিত হয়, তদ্বিষয়ে খৃষ্টীয় সম্প্রদায় স্বল্পবিচার-পরায়ণ।

শ্রীকৃষ্ণই—বেদ্য বাস্তব বস্তু অদ্বয়জ্ঞান; অদ্বয়বস্তুর ত্রিবিধ প্রতীতি— (১) ব্রহ্ম, (২) পরমাত্মা ও (৩) ভগবান্; বস্তুর অদ্বয়ত্ব থাকিলেও ত্রিবিধ প্রতীতি এক নহে

শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র বেদ্য বাস্তব বস্তু এবং অদ্বয়জ্ঞান। সেই অদ্বয়বস্তু ত্রিবিধ অভিধেয়ে ত্রিবিধ প্রতীতিতে প্রতীত হন; বস্তুতঃ কৃষ্ণপ্রতীতিই—অদ্বয় বাস্তব পূর্ণ প্রতীতি। নির্ব্বিশেষজ্ঞানে ব্রহ্মপ্রতীতি—কৃষ্ণের অসম্যক্ প্রতীতি, আর যোগমার্গে পরমাত্ম-প্রতীতি—কৃষ্ণের আংশিক প্রতীতি মাত্র, ইহা শাস্ত্রমূলা যুক্তি এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও ভাগবতাদি পুরাণ হইতেই জানা যায়।

দৃষ্টান্ত

যেরূপ একই হিমালয় পর্ব্বতকে ত্রিবিধ দ্রষ্টা ত্রিবিধ ভূমিকা হইতে দর্শন করিয়া ত্রিবিধ প্রতীতি লাভ করেন, যিনি অত্যন্ত দূর হইতে হিমালয়কে দর্শন করেন, তিনি বিচিত্রতা বা বিশেষহীনরূপেই হিমালয় দর্শন করিয়া থাকেন, যিনি আরও সমীপস্থ হন, তিনি একটী আকারিত বস্তুমাত্র দর্শন করেন, আর যিনি হিমালয়ের অত্যন্ত সম্মুখস্থ হইবার সামর্থ্য লাভ করেন, তিনি হিমালয়স্থ বনস্পতি-সমূহ, পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গের বিচিত্রতা, হিমালয়ের বিভিন্ন শৃঙ্গ, গহ্বর, প্রপাত প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করিতে পারেন, তদ্রূপ অদ্বয়বস্তুকে অত্যন্ত দূর হইতে দর্শন—ব্রহ্মদর্শন বা কৃষ্ণের অঙ্গকান্তি দর্শনাভাস মাত্র। আর যাঁহারা কৃষ্ণকে আর একটুকু অগ্রসর হইয়া দর্শন করেন, তাঁহারা অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ পুরুষ বা পরমাত্মা দর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা অত্যন্ত সন্নিকটস্থ হইয়া অদ্বয়বস্তু দর্শন করেন, তাঁহারা তত্ত্ববস্তুকে নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্যাদিযুক্ত বিচিত্র বিলাসময় অদ্বয়বস্তুরূপে দর্শন করিয়া থাকেন।

জড়নির্ব্বিশিষ্ট চিন্মাত্র, কিন্তু চিদ্বিলাসের অবিরোধী ব্রহ্মজ্ঞান—গুহ্য, পরমাত্মজ্ঞান—গুহ্যতর, নারায়ণাদি বিষয়ক জ্ঞান—গুহ্যতম, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক জ্ঞান—সর্ব্বগুহ্যতম

এই জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগীতায় হেয়তাযুক্ত জড়বিশেষ-তিরস্কৃত ব্রহ্মজ্ঞানকে—**গুহ্য**, পরমাত্মজ্ঞানকে—**গুহ্যতর** এবং নারায়ণ বা চতুর্ব্যূহাত্মক—**গুহ্যতম**, ভগবজ্-জ্ঞান অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক চরম জ্ঞানকে—**সর্ব্বগুহ্যতম** জ্ঞান বলিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মের পরমাশ্রয়, গীতা-প্রমাণ—

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ।। (গীতা ১৪।২৭)

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, তোমার সম্মুখস্থ আনন্দপূর্ণ চিদ্ঘন-বিগ্রহ আমি চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ পরমাশ্রয়। ঘনীভূত তেজবিগ্রহ সূর্য্য যেরূপ প্রভারাশির আশ্রয়, তদ্রূপ চিদ্ঘন-বিগ্রহ আমিও চিন্মাত্র-স্বরূপ প্রভামাত্র ব্রহ্মের পরমাশ্রয়। নিত্য মুক্তি, ভাগবতধর্ম্ম, মোক্ষসুখ-তিরস্কারী প্রেমভক্তি রসোৎসব আমার এই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপকেই আশ্রয় করিয়া নিত্য অবস্থিত। ব্রহ্মসংহিতাও এই সিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গপ্রভাই—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-কোটিষ্বশেষবসুধাদি বিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

যাঁহার প্রভা হইতে উৎপত্তি-নিবন্ধন নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম কোটি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত বসুধাদি বিভূতি হইতে পৃথক হইয়া নিষ্কল-অশেষ-অনন্ত তত্ত্বরূপে প্রতীত হন, সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। শ্রীমদ্ভাগবতে—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।।

—শ্লোকের সুষ্ঠু অর্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব প্রকাশ করিয়াছেন। অনেকে এই শ্লোকের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানকে একই তাৎপর্য্যপর প্রতিশব্দ মাত্র বলিয়া মনে করেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে।

'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা'দি—গৌণ নাম, 'শ্রীকৃষ্ণ' নামই—মুখ্য নাম

'ব্রহ্ম',—'পরমাত্মা'দি—গৌণ নাম। উহাতে স্বরূপের পরিচয় নাই। 'ব্রহ্ম' শব্দ—জড়তিরস্কৃত নির্ব্বিশেষভাববিশেষ। 'পরমাত্মা' শব্দ—জগতের সম্বন্ধগত জড়ানুপ্রবিষ্ট একদেশস্থিত চিদ্বিভূতি-বিশেষ। ''একাংশেন স্থিতো জগৎ'' প্রভৃতি গীতোক্ত বাক্যে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সূর্য্যের উপমা দ্বারা ইহা বুঝাইয়াছেন।

সূর্য্যের দৃষ্টান্তে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবৎ-প্রতীতি ব্যাখ্যা

চর্ম্মচক্ষে সূর্য্য যেরূপ নির্ব্বিশেষ বলিয়া প্রতিভাত হয়, জ্ঞানমার্গেও তদ্রূপ অদ্বয়তত্ত্বরূপে ভগবানের নির্ব্বিশেষ অসম্যক্ ভাব-মাত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি, সেই ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি মাত্র। অনন্ত স্ফটিক-খণ্ডে যেরূপ একমাত্র সূর্য্যই প্রতিফলিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্রূপ প্রকাশিত হয়, সেইরূপ এক অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের অংশই অনন্ত সংখ্যক ব্যষ্টি জীবে ও ব্যষ্টি জড় পরমাণুতে প্রতিফলিত হইয়া তদন্তর্য্যামী পরমাত্মারূপে প্রকাশিত হন। আর দেবতাগণ যেরূপ সূর্য্যকে সবিগ্রহরূপে দর্শন করেন, তদ্রূপ ভগবদ্ভক্তগণও শ্রীকৃষ্ণকে নিত্য-নাম-রূপ-গুণ-লীলাবিশিষ্ট ভগবানরূপে দর্শন করিয়া থাকেন।

শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভু-কথিত ভাগবতীয় সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া বলিতেছেন,—

ভক্তিযোগে ভগবানের ধারণাই সমগ্র ও সম্পূর্ণ ধারণা

যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথগ্দ্বারৈরর্থো বহুগুণাশ্রয়ঃ।
একো নানেয়তে তদ্বদ্ভগবান্ শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ।।

(ভাঃ ৩।৩২।৩৩)

তত্তৎ শ্রীভগবত্যেব স্বরূপং ভূরি বিদ্যতে।
উপাসনানুসারেণ ভাতি তত্তদুপাসকে।।
যথা রূপ-রসাদীনাং গুণানামাশ্রয়ঃ সদা।
ক্ষীরাদিরেক এবার্থো জ্ঞায়তে বহুধেন্দ্রিয়ৈঃ।।

দৃশা শুক্লো রসনয়া মধুরো ভগবাংস্তথা।
উপাসনাভির্ব্বহুধা স একোঽপি প্রতীয়তে।।
জিহ্বয়ৈব যথা গ্রাহ্যং মাধুর্য্যং তস্য নাপরৈঃ।
যথা চ চক্ষুরাদীনি গৃহ্নন্ত্যর্থং নিজং নিজম্।।
তথান্যা বাহ্যকরণস্থানীয়োপাসনাখিলা।
ভক্তিস্তু চেতঃস্থানীয়া তত্তৎসর্ব্বার্থলাভতঃ।।
ইতি প্রবরশাস্ত্রেষু তস্য ব্রহ্মস্বরূপতঃ।
মাধুর্য্যাদিগুণাধিক্যাৎ কৃষ্ণস্য শ্রেষ্ঠতোচ্যতে।।

(শ্রীলঘুভাগবতামৃত)

বহুগুণাশ্রয় এক দুগ্ধাদি দ্রব্য যে রূপ চক্ষু প্রভৃতি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিভিন্নরূপে গৃহীত হয়, তদ্রূপ একই ভগবান্ বিভিন্ন শাস্ত্রপথ-সমূহ দ্বারা নানা- রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। কিন্তু তাই বলিয়া সমস্ত শাস্ত্রপথই সমান বা এক তাৎপর্য্যপর নহে। ভগবানের সেবানুকূল ও ভগবৎসেবা-প্রতিকূল—উভয় পথ এক নহে এবং ইহাদের প্রাপ্তব্য বস্তুও এক নয়। যেরূপ রূপ-রসাদি বহুবিধ গুণের আশ্রয় এক দুগ্ধাদি দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হয়, অর্থাৎ চক্ষু দ্বারা শুক্ল, হস্তের দ্বারা তরল, নাসিকা দ্বারা কোন বিশিষ্ট ঘ্রাণযুক্ত, জিহ্বা দ্বারা মধুর ইত্যাদি রূপে প্রতীত হয়, আবার যেমন দুগ্ধাদির মাধুর্য্যে একমাত্র জিহ্বাই গ্রহণ করিতে সমর্থ,—কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি অন্য ইন্দ্রিয় সমর্থ নহে, আর যেরূপ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-সমূহ রূপ-রসাদির মধ্যে স্ব-স্ব বিষয় গ্রহণ করিতে সমর্থ, কিন্তু চিত্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ই গ্রহণে যোগ্য, তদ্রূপ বাহ্য ইন্দ্রিয়-স্থানীয় অন্যান্য উপাসনা-সমূহ বা পথ কেবল স্বস্বোপযোগী তত্তৎ স্বরূপে বিষয় গ্রহণ করিতেই সমর্থ; চিত্ত-স্থানীয় ভক্তি কিন্তু তত্তদুপাসনার বিষয় সমস্ত স্বরূপই সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিতে সমর্থ। অগৃহীত গুণক কৃষ্ণই—ব্রহ্ম, এখানে কোন বস্তুভেদ নাই, অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব ও ভগবত্তা দুইটীই পৃথক্ স্বরূপ নহে; কৃষ্ণই একমাত্র স্বরূপ, ব্রহ্ম একটী প্রতিহতদৃষ্টিযুক্ত অসম্যক্ প্রতীতি মাত্র। এজন্য প্রধান প্রধান শাস্ত্রে মাধুর্য্যাদি গুণের আধিক্য বশতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই উৎকর্ষ কথিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

'ব্রহ্ম' শব্দের মুখ্য অর্থ—ভগবানে পর্য্যবসিত

'ব্রহ্ম'-শব্দে মুখ্য অর্থে কহে 'ভগবান্'।
চিদৈশ্বর্য্য, পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ-সমান।।

নির্ব্বিশেষভাব—একদেশীয় অসম্যক্ বিচার মাত্র

তাঁরে 'নির্ব্বিশেষ' কহি, চিচ্ছক্তি না মানি'।
অর্দ্ধ স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি।।

শ্রীকৃষ্ণ—অন্য-নিরপেক্ষ স্বয়ংরূপ ভগবান্, তিনিই মূল পরাৎপর-তত্ত্ব; শ্রীকৃষ্ণ হইতেই যাবতীয় বিষ্ণুতত্ত্ব প্রকাশিত

শ্রীকৃষ্ণ নিরপেক্ষসত্তাক স্বয়ংরূপ ভগবান্ অর্থাৎ তিনি মূল প্রদীপ; তাঁহা হইতেই অন্যান্য যাবতীয় প্রাভবপ্রকাশ, বৈভবপ্রকাশ, তদেকাত্মরূপ এবং তদন্তর্গত বিলাস, স্বাংশ, তাঁহাদের প্রাভব-বিলাস, বৈভব-বিলাস-রূপে আদি চতুর্ব্যূহ ও আদি চতুর্ব্যূহ হইতে প্রকাশিত সমগ্র চতুর্ব্যূহরূপী বৈভববিলাসগণ, স্বাংশ ও শক্ত্যাবেশরূপ বিবিধ অবতার, কারণ-গর্ভ-ক্ষীরোদশায়ী পুরুষাবতার-ত্রয় প্রকাশিত। আদি পুরুষাবতার মহাবিষ্ণুরূপে প্রকৃতির ঈক্ষণকর্ত্তা বা প্রকৃতির মূল নিমিত্ত কারণ কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণুই আবার সমষ্টি জগতে প্রবিষ্টরূপে গর্ভোদকশায়ী এবং প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রত্যেক জীবে প্রবিষ্টরূপে ক্ষীরোদকশায়ী, সেই ক্ষীরোদকশায়ী পুরুষ প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে এক একটী বৈকুণ্ঠ প্রকট করিয়া তাহাতে বিষ্ণু, পরমাত্মা, ঈশ্বরাদিরূপে বিরাজমান এবং ব্রহ্মাণ্ডের জলাংশে শেষশায়ী। এই শেষশায়ী—ব্রহ্মার পিতা। তাঁহারই এক অংশ বিরাট্‌রূপে কল্পিত। সর্ব্বকারণকারণ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বয়ংপ্রকাশ বলদেব। কৃষ্ণলোকে—দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল, তথায় আদি চতুর্ব্যূহ—বাসুদেব, মূল সঙ্কর্ষণ—বলদেব, প্রদ্যুম্ন—কামদেব এবং অনিরুদ্ধ। কৃষ্ণলোকের অধোভাগে পরব্যোম নামক বৈকুণ্ঠ, তথায় কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি চতুর্ভুজ নারায়ণ বিরাজমান।

স্বয়ংপ্রকাশ বলদেব—মূল সঙ্কর্ষণ, তাঁহারই বিলাসমূর্ত্তি—বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ

কৃষ্ণলোকে যিনি বলদেব, তিনি—মূল সঙ্কর্ষণ, তাঁহারই বিলাসমূর্ত্তি—পরব্যোম বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ; সেই পরব্যোমের বাহিরে জ্যোতির্ম্ময় ধামরূপ ব্রহ্মলোক। তাহার বাহিরে চিন্ময় জলবিশিষ্ট কারণ-সমুদ্র—যে কারণ-সমুদ্রের এক কণ হইতে পতিতপাবনী গঙ্গা প্রকাশিতা হইয়াছেন। কারণ-সমুদ্রের অপর পারে এই দেবীধাম।

মহাসঙ্কর্ষণ হইতে আদি পুরুষাবতার—কারণার্ণবশায়ী, তাঁহা হইতে দ্বিতীয় পুরুষাবতার—গর্ভোদকশায়ী বা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার পিতা

কারণ-সমুদ্রে মূল সঙ্কর্ষণের কলা এবং মহাসঙ্কর্ষণের অংশরূপ আদি-পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু বা কারণার্ণবশায়ী। ইনি সমগ্র জীবশক্তি এবং প্রকৃতির কারণরূপে অনন্তকোটি ধামের মূল কর্ত্তা। কারণার্ণবশায়ী ব্রহ্মাণ্ডসংস্থিত হইয়া গর্ভোদকশায়ী; ইনি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার অন্তর্য্যামী এবং পিতা। তাঁহার নাভিপদ্মেই ব্রহ্মার জন্ম এবং সেই পদ্মনালে চৌদ্দ ভুবন।

গর্ভোদকশায়ী হইতে তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদকশায়ী—ব্যষ্টি জীবের অন্তর্য্যামী

গর্ভোদকশায়ী হইতে জগৎপালক অনিরুদ্ধ বিষ্ণুর প্রাকট্য। এই অনিরুদ্ধ বিষ্ণুই তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদকশায়ী বা গুণাবতার বিষ্ণু। তিনি সত্ত্বাধিষ্ঠাতৃদেব হইয়াও স্বয়ং গুণমায়াতীত। গর্ভোদকশায়ী হইতে জগৎ-সংহারক রুদ্রেরও উৎপত্তি অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিন গুণাবতার গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু

হইতেই প্রকাশিত। তবে বিশেষ এই যে, ব্রহ্মা ও শিবের ন্যায় জগৎপালক গুণাবতার বিষ্ণুকে বিষ্ণুমায়া আবরণ করিতে পারে না।

গুণাবতার সত্ত্বতনু বিষ্ণু—ব্রহ্মা ও রুদ্রের ন্যায় মায়াবশ-যোগ্য নহেন, তিনি—মায়াধীশ

গুণাবতার ব্রহ্মা ও শিব—মায়ার অধীন; কিন্তু বিষ্ণু সেরূপ নহেন। যাঁহাকে 'অন্তর্য্যামী', 'পরমাত্মা' কিম্বা 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ' প্রভৃতি বলা হয়, তিনি তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদকশায়ী। আর ঋক্সূক্ত যাঁহাকে সহস্রশীর্ষাদি বাক্যে স্তব করেন, তিনি হিরণ্যগর্ভ বা সমষ্টি জীবের অন্তর্য্যামী গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতার।

গর্ভোদকশায়ী হইতে মৎস্যাদি লীলাবতার

গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু হইতে মৎস্য-কূর্ম্মাদি অসংখ্য লীলাবতার জগতে প্রকাশিত।

শক্ত্যাবেশাবতার

তৃতীয় পুরুষাবতার অনিরুদ্ধ হইতে গৌণ ও মুখ্যভেদে দুই প্রকার শক্ত্যাবেশাবতার। যাঁহাতে সাক্ষাৎ শক্তির অবতার, তিনি মুখ্য শক্ত্যাবেশাবতার, আর যে-যে স্থলে শক্তির আভাস মাত্র বিভূতি দেখা যায়, সে-স্থলে গৌণ শক্ত্যাবেশাবতার। যেমন সনকাদিতে—জ্ঞানশক্তি, নারদে—ভক্তিপ্রচারশক্তি, ব্রহ্মায়—সৃষ্টিশক্তি, অনন্তে—ভূধারণশক্তি, শেষরূপী ভগবদবতারে—স্বীয় সেবারূপা শক্তি, পৃথুতে—পালনীশক্তি, পরশুরামে—দুষ্টনাশ ও বীর্য্যসঞ্চারিণীশক্তি অর্পিত হইয়াছে। আর যে-সকল জীব বিভূতিমান বা শ্রীমান্, সেই সকল জীব গৌণ শক্ত্যাবেশাবতাররূপে কল্পিত।

শ্রীকৃষ্ণ—সর্ব্বকারণ-কারণ, সর্ব্বাংশী

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ নিখিল কারণ-তত্ত্বগণেরও কারণস্বরূপ। তিনি ব্রহ্মার কারণের কারণের কারণ, রুদ্রের কারণের কারণের কারণ, ব্রহ্মের কারণের কারণ, নারায়ণের কারণের কারণ, সকলের আদি কারণ। তিনিই সকলের কারণ, তাঁহার আর কারণ নাই বলিয়া তিনি অকৃত্রিম বেদান্তভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে,—

ভাগবত-প্রমাণ

"কৃষ্ণস্তু" ভগবান্ স্বয়ম্"।

ব্রহ্মসংহিতা-প্রমাণ

তিনি সিদ্ধান্তগ্রন্থরাজ শ্রীব্রহ্মসংহিতায়,—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্।।

অখিল রসামৃতসিন্ধু—শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীকৃষ্ণ অখিল রসামৃতসিন্ধু। শ্রীকৃষ্ণ অখিল রসের আশ্রয় বলিয়াই যখন শ্রীবলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কংসের রঙ্গালয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন যাঁহার যেই রস, তিনি সেই রসে কৃষ্ণকে দেখিতে লাগিলেন।

বীর-রস-প্রিয় মল্লগণ দেখিলেন,—যেন কৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট সাক্ষাৎ বজ্রস্বরূপে উদিত হইয়াছেন, মধুর রসপ্রিয় স্ত্রীগণ তাঁহাকে—সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান মন্মথরূপে দর্শন করিতে লাগিলেন, নর-সমূহ—জগতের একমাত্র নরপতিরূপে এবং সখ্য-বাৎসল্যপ্রিয় গোপসকল শ্রীকৃষ্ণকে—স্বজনরূপে দেখিতে লাগিলেন; ভয়ার্ত্ত অসদ্-রাজগণ শ্রীকৃষ্ণকে—দণ্ডবিধাতৃরূপে দর্শন করিতে লাগিলেন, মাতা-পিতা শ্রীকৃষ্ণকে—সুন্দর শিশুরূপে দর্শন করিলেন, ভোজপতি কংস—সাক্ষাৎ মৃত্যু-রূপে, জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ—বিরাট্‌রূপে, পরম যোগীসকল—শান্তরসের আশ্রয় পরতত্ত্বরূপে এবং বৃষ্ণিবংশীয় পুরুষগণ—পরদেবতারূপে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিলেন,—

ভাগবত-প্রমাণ

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ।। (ভাঃ ১০।৪৩।১৭)

নিখিল ভগবদ্রূপ-মাহাত্ম্য শ্রীকৃষ্ণে বিরাজিত

নিখিল শ্রীভগবদ্রূপের অখিল মাহাত্ম্য একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই বিরাজিত আছে। কেহ বলেন,—বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণই শ্রীকৃষ্ণরূপে মথুরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, কেহ বলেন,—সহস্রশীর্ষ পুরুষ, কেহ বলেন,—নর-সখ নারায়ণ, কেহ বলেন,—ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুই মথুরায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; এইরূপে বিভিন্ন লোকে বিভিন্নভাবে উক্তি করিয়া থাকেন। এইরূপ পরস্পর মতভেদ হইবার কারণ—যাঁহারা যে-যে লোকের বৃত্তান্ত-গ্রহণে তৎপর, তাঁহারা সেই সেই লোকে লোকনাথকে দর্শন করিতে না পারিয়া নিজ-নিজ মতি অনুসারেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মথুরায় অবতীর্ণ সেই শ্রীকৃষ্ণেই ঈশ্বরোপযুক্ত মাহাত্ম্য, মাধুর্য্য, বিতর্কতা, দুর্ব্বিতর্ক্যভাব, বিরুদ্ধ গুণের অপূর্ব্ব সমন্বয় লক্ষ্য করিয়া সকলেই স্ব-স্ব মতানুযায়ী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই বলেন যে, আমাদেরই উপাস্য ভগবান্ মথুরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন।

নিখিল হতারিগতিদায়ক

একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সদ্বেশমাত্র অর্থাৎ ভক্তবেশ দেখিয়াই বালঘাতিনী পূতনাকে ধাত্র্যুচিতা গতি প্রদান করিয়াছিলেন; এমন কি, তিনি সেই বালঘাতিনীর বান্ধব বক এবং কংসাদিকেও পরম মধুর গোপবালকোচিত মধুর ক্রীড়া দ্বারা মুক্তিপদ প্রদান করিয়াছিলেন।

অন্য ভগবৎস্বরূপে—উর্দ্ধগতিমাত্র দান-সামর্থ্য

হতারিগতিকায়কত্ব গুণ অন্য ভগবৎস্বরূপে থাকিলেও তাঁহারা নিহত শত্রুকে স্বর্গাদি লোক-প্রাপ্তিরূপ সদ্গতি পর্য্যন্ত দান করিতে পারেন। কিন্তু একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই নিজ অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে নিহত শত্রুমাত্রকেই

মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। জয়-বিজয়, হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ প্রভৃতিরূপে বিষ্ণুহস্তে নিহত হইয়াও মুক্তি প্রাপ্ত হন নাই, কেবল ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন মাত্র; কিন্তু শিশুপাল ও দন্তবক্ররূপে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইয়া তাঁহারা মুক্তি পাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে না পাইলে অসুরগণেরও মুক্তি হয় না; তবে যে কোথায় কোথায়ও অন্য ভগবৎস্বরূপ কর্ত্তৃক ভগবদ্দ্বেষীর মুক্তিদান-প্রসঙ্গ শ্রবণ করা যায়, তাহার কারণ কেবল—ভগবদ্দ্বেষী কর্ত্তৃক বিদ্বেষ-সহকারে নিরন্তর ভগবচ্চিন্তন। কিন্তু নিখিল ভগবদ্দ্বেষীর মুক্তিদানের কথা কোন অবতার বা অবতারীতে শুনা যায় না, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ আপনার অচিন্ত্যস্বভাব বশতঃ ভগবদ্দ্বেষী অসুরগণকেও মুক্তি দান করেন, অসুরগণের মুক্তি দানের অন্য কোন কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না। পূতনাদির ধাত্র্যুচিতা গতিলাভই তাহার প্রমাণ। শ্রীকৃষ্ণের স্বভাবই এই,—তাঁহাকে যৎকিঞ্চিৎ স্মরণ করিলেও আপনার নিরতিশয় প্রভাব-দ্বারা স্মরণকারীর চিত্তকে সর্ব্বতোভাবে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। এই জন্যই তিনি সকলের মুক্তিদাতা। কিন্তু অন্য ভগবৎ-স্বরূপে কিঞ্চিৎ স্মরণমাত্রে স্মরণকারীর চিত্ত আকৃষ্ট করিবার স্বভাব নাই বলিয়া মুক্তিদাতৃত্বও নাই। বেণরাজা বিষ্ণু-বিদ্বেষী ছিলেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণের মত বিষ্ণুর সর্ব্বাকর্ষকত্ব ধর্ম্ম না থাকায় শ্রীকৃষ্ণদ্বেষিগণের আবেশের ন্যায় বেণরাজার শ্রীভগবানে আবেশের অভাব-হেতু মুক্তিলাভ হয় নাই। এই জন্য যেন কেন উপায়ে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই মনোনিবেশের কথা শাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন।

একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই আশ্চর্য্যতমা শক্তি বর্ত্তমান

নিখিল ভগবৎ-স্বরূপ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণেই আশ্চর্য্যতমা শক্তি আছে, ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বা সন্দর্ভকারের সিদ্ধান্ত,—

"সর্ব্বেষাং মুক্তিদত্বঞ্চ তস্য কৃষ্ণস্য নিজপ্রভাবাতিশয়েন যথা কথঞ্চিৎ স্মর্ত্তৃচিত্তাকর্ষণাতিশয়স্বভাবাৎ। অন্যত্র তু তথা স্বভাবো নাস্তীতি নাস্তি মুক্তিদত্বম্। অন্যত্র তু তথা স্বভাবো নাস্তীতি নাস্তি মুক্তিদত্বম্। অতএব বেণস্যাপি বিষ্ণুদ্বেষিণস্তদ্বদাবেশাভাবান্মুক্ত্যভাব ইতি। অতএবোক্তম্—তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েদিতি। তস্মাদস্ত্যেব সর্ব্বতোঽপ্যাশ্চর্য্যতমা শক্তিঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ইতি সিদ্ধম্।।"

শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চে অবতরণের মুখ্য কারণ

"বৈকুণ্ঠাদিতে যে যে লীলার প্রচার নাই, তত্তৎ লীলা এই কৃষ্ণাবতারে আমি প্রচার করিব, অধিক কি, এই লীলাতে আমিও স্বয়ং চমৎকৃত হইব। আমার যোগমায়া স্বরূপশক্তি অবিচিন্ত্য প্রভাবক্রমে আমার ইচ্ছায় সচ্চিদানন্দতনু, আমার নিত্যপ্রিয়া, সচ্চিদানন্দস্বরূপা গোপীদিগের হৃদয়ে উপপতির ভাব সঞ্চার করিবেন। আমিও তখন রসপুষ্টির জন্য তাহা জানিতে পারিব না অর্থাৎ আমার অবিচিন্ত্যশক্তি আমার সর্ব্বজ্ঞতাকে গোপন করিয়া তাহাতে একপ্রকার অদ্ভুত রস উৎপন্ন করিবে এবং সেই স্বরূপশক্তি-স্বরূপ হইয়াও গোপীগণ তাহা জানিতে পারিবেন না। আমি ও আমার গোপীগণের অদ্ভুত রূপ-গুণে পরস্পরের মন হরণ করিলে সামান্য ধর্ম্ম-পথ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ রাগমার্গে আমাদের পরস্পরের মিলন-সুখ উদিত হইবে; কখনও মিলন, কখনও বিচ্ছেদ দৈব ঘটনার ন্যায় উদিত হইবে। আমি এই সমস্ত রসের নির্য্যাস আস্বাদন করিব এবং

ভক্তগণকে প্রসন্ন হইয়া দান করিব। সর্ব্ব ভক্তকে এই রস-দান করিবার প্রক্রিয়া এই যে, আমি ব্রজে যে নির্ম্মল রাগ প্রকট করিব, তাহা শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ যাবতীয় আর্য্য-অনার্য্যধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আমাকে রাগমার্গে ভজন করিবেন।”—এইরূপ ইচ্ছা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোলোকের নরাকৃতি পরব্রহ্মস্বরূপ প্রপঞ্চে প্রকটিত করিয়াছিলেন। এই নিরুপাধিক প্রেম আস্বাদনের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ।

বিষয়াশ্রয়-বিচার ও আশ্রয়-আলম্বন-বর্ণন

শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র বিষয়, আর সমস্তই তাঁহার আশ্রিত তত্ত্ব। অলঙ্কার শাস্ত্রে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী—এই চতুর্ব্বিধ সামগ্রীর বিষয় উল্লিখিত আছে। ভরত মুনি কাব্যপ্রকাশকার বা সাহিত্যদর্পণকার প্রভৃতি যে-সকল ব্যক্তি বিষয়াশ্রয়-বিবেকের কথা জানেন না, তাহা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর দ্বারা প্রচার করাইয়াছেন। আলম্বন দুই প্রকার,—বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বন। বিষয়ালম্বন—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ; আশ্রয়ালম্বন—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসভেদে প্রধানতঃ পঞ্চ প্রকার। ব্রজলীলারূপ চিদ্রস-বর্ণনে অনেক সময় শান্তরস পরিলক্ষিত হয় না বলিয়া অর্থাৎ ভগবৎস্বরূপে যে মমতা—যাহা শুদ্ধারতিকে প্রেমরূপে পুষ্ট করাইয়া থাকে, সেই মমতা-গন্ধহীনতা বা নিরপেক্ষতা শান্তভাবে অবস্থিত থাকায় শান্তভাবকে অনেকে রসের অন্তর্গত করিতে চাহেন না। তথাপি ব্রজের গো-বেত্র-বিষাণ-বেণু-শৃঙ্গ-যামুনতট-কদম্ববৃক্ষ—ইঁহারা শান্তরসের আশ্রয়ালম্বনরূপে বিষয় শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। দাস্যরসের আশ্রয়ালম্বন ব্রহ্মা, শঙ্কর, ইন্দ্র প্রভৃতি দাসগণ কৃষ্ণ-কৃপায় অধিকার প্রাপ্ত হইয়া ‘অধিকৃত দাস’। শরণ্য, জ্ঞানিচর ও সেবানিষ্ঠ তিন প্রকার আশ্রিত দাসরূপ আশ্রয়ালম্বনের মধ্যে কালিয়, জরাসন্ধ ও বদ্ধ নৃপসকল ‘শরণ্য আশ্রিত দাস’। শৌনকাদি ঋষি মুক্তি ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া ‘জ্ঞানিচর আশ্রিত দাস’ হইয়াছিলেন। চন্দ্রধ্বজ, হরিহর, বহুলাশ্ব, ইক্ষ্বাকু, হৃতদেব, পুণ্ডরীক প্রভৃতি প্রথমাবধিই ভজনাসক্ত থাকায় ‘সেবানিষ্ঠ আশ্রিত দাস’। উদ্ধব, দারুক, নন্দ, উপনন্দ ও ভদ্র প্রভৃতি ‘পারিষদ দাস’। সুচন্দ্র, মণ্ডল, স্তম্ভ, সুতম্ব প্রভৃতি পুরস্থ ‘অনুগত দাস’। রক্তক, পত্রক, পত্রী, মধুকণ্ঠ, মধুব্রত, রসাল, সুবিলাস, প্রেমকন্দ, মকরন্দক, আনন্দ, চন্দ্রহাস, পায়োদ, বকুল প্রভৃতি ব্রজস্থ ‘অনুগদাস’। সখ্যরসের আশ্রয়ালম্বনের মধ্যে পুরবাসী ও ব্রজবাসী দুই প্রকার কৃষ্ণ-সখ্য। অর্জ্জুন, ভীমসেন, দ্রৌপদী, শ্রীদাম ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ‘পুরসম্বন্ধি সখা’। ইঁহাদের মধ্যে অর্জ্জুন শ্রেষ্ঠ। ব্রজবাসী সখাগণ কৃষ্ণের সকল বয়স্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কেন না, তাঁহারা ক্ষণকাল কৃষ্ণের সেবা-বিরহ সহ্য করিতে পারেন না। সুভদ্র, মণ্ডলীভদ্র, গোভট, ইন্দ্রভাট, বিজয় ও বলভদ্রাদি কৃষ্ণের ‘সুহৃদ্-সখা’। দেবপ্রস্থ, কুসুমাপীড়, মণিবন্ধ, করন্ধম প্রভৃতি কৃষ্ণের ‘কেবল-সখা’। শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, স্তোককৃষ্ণ প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের ‘প্রিয়সখা’। সুবল, অর্জ্জুন, গন্ধর্ব্ব, বসন্ত প্রভৃতি ‘প্রিয়নর্ম্মসখা’। বৎসল রসের আশ্রয়ালম্বনে কৃষ্ণের গুরুবর্গ প্রসিদ্ধ। ব্রজরাজেশ্বরী, ব্রজেশ্বর, রোহিণী; ব্রহ্মা যে পুত্রগণকে হরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের জননীগণ; দেবকী ও দেবকীর সপত্নীগণ, কুন্তী, বসুদেব, সান্দীপনি মুনি প্রভৃতি বৎসল রসের আশ্রয়ালম্বন। ইঁহাদের মধ্যে ব্রজেশ্বরী ও নন্দ মহারাজ সর্ব্বপ্রধান। মধুর রসের

আশ্রয়ালম্বনের মধ্যে স্বকীয় ও পরকীয় বিচার লক্ষিত হয়। কৃষ্ণের পুরবনিতাগণ—স্বকীয়া এবং ব্রজ-বনিতাগণ—প্রায়ই সোঢ়া অনূঢ়াভেদেও পারকীয়া।

এই জগৎ অপ্রাকৃত পরমোপাদেয় চিদ্ধামের হেয় প্রতিফলন। অনর্থময় ইহ জগতে যে রস যৎপরোনাস্তি হেয়, অর্থময় অবিকৃত বিম্বস্বরূপ চিদ্ধামে অর্থাৎ যথায় অনুপাদেয়তার অবকাশ দৃষ্ট হয় না, তথায় সেই রসের অবিকৃত আদর্শ যৎপরোনাস্তি উপাদেয়।

তটস্থ বিচারে অপ্রাকৃত পঞ্চরসের তারতম্য

ইহ জগতে যে রস সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিচারিত, অপ্রাকৃত চিন্ময় জগতে সেই রসের আদর্শ সর্ব্ব নিম্নে অবস্থিত। এই প্রতিফলিত জগৎ—জড়-বিশেষবহুল; সুতরাং এখানে যাবতীয় জড়বিশেষভাব হইতে নিরপেক্ষতা-বিরতি-স্বরূপ শান্তভাবই শ্রেষ্ঠ; কিন্তু অপ্রাকৃত জগতে স্বভাবতই নিত্য জড়-বিশেষতার হেয়তা না থাকায় সবিশেষভাবের পূর্ণতার অবিধি-স্বরূপ পারকীয় মধুর রস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শান্তরসে নিরপেক্ষতা আছে, মমতা উৎপত্তি হয় নাই। মমতাই কৃষ্ণপ্রীতির প্রথম অঙ্কুর; মমতাহীন শান্তরস এইজন্য সর্ব্ব নিম্নে। মমতাযুক্ত দাস্যরস তদ্‌পেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাতে শান্তরসের সমস্ত সম্পদই আছে, অথচ তাহা মমতা-সংযুক্ত। এখান হইতেই সম্বন্ধ জ্ঞানের ভূমিকা আরম্ভ হইয়াছে, কৃষ্ণের সহিত প্রভু ও দাস-সম্বন্ধ। মমতা-সম্বন্ধ না থাকিলে কোন বস্তুর জন্য বিশেষ ব্যস্ততা থাকে না। আবার দাস্যরসের মমতা ও সকল সম্পদের সহিত যখন বিশ্রম্ভভাবরূপ প্রধান অলঙ্কারটী সংযুক্ত হইয়াছে, তখন সখ্যরস দাস্যরস হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া অনুভূত। সখ্যরসে দাস্যরসের সম্ভ্রমকণ্টক নাই। সেখানে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতির মাত্রা ও অত্যন্ত বিশ্রম্ভভাব প্রকাশিত হওয়ায় সখাগণ শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশে আরোহণ ও শ্রীকৃষ্ণকে উচ্ছিষ্টাদি দ্রব্য প্রদানাদির দ্বারা প্রীতিসেবা করিতে পারেন। সখ্যরসের সকল সম্পদের সহিত যখন লাল্য- লালক-ভাবটী সংযুক্ত হইয়াছে, তখন রস আরও অধিকতর সম্পৎশালী হইয়া বাৎসল্যরসরূপে প্রকাশিত। নিখিল জগতের পালনকর্ত্তা ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতির পালনকারী শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজরাজ নন্দ ও ব্রজেশ্বরী যশোমতী নিজ অলিন্দে বন্ধন করিয়া স্ব-স্ব লাল্য-পাল্য-বোধ করিতেছেন। প্রীতির কিরূপ প্রগাঢ় পরিচয়!

অপ্রাকৃত মধুর রসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা

আবার শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যরসের সকল সম্পদের সহিত যখন সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা সেবাসক্তি সম্মিলিত হইয়াছে, তখন সেখানে মধুর রস প্রকাশিত। পিতা-পুত্রে অনেক বিষয়ে গোপন থাকে, কিন্তু স্ত্রী-পুরুষে তাহা থাকে না, প্রীতিবদ্ধ পুরুষ ও স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের নিকট আপনাদিগকে পরিমুক্তস্বরূপে ও স্বভাবে প্রকাশিত করিয়া থাকেন।

পারকীয় অপ্রাকৃত রসই—প্রকৃত মধুর রস; স্বকীয় মধুর রস—ন্যূনাধিক দাস্যরসের প্রকারভেদ

এই জন্য মধুর রস সকল রসের শিরোমণি। প্রকৃত বিচারে একমাত্র পারকীয় রসই মধুর রস বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। স্বকীয় মধুর রস দাস্যরসেরই উন্নত প্রকারভেদ-মাত্র। পুরমহিষীগণ শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা

পত্নী; তাঁহারা ধর্ম্ম-কর্ম্ম-পুত্র-পৌত্র-গৃহাদিতে ব্যগ্রচিত্তা হইয়াই গৌরবের সহিত পতিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। আর গোপীগণ ইহলোক ও পরলোকে সকল প্রকার সাধ্য ও সাধনে অপেক্ষারহিত হইয়া এবং অতিশয় ব্যগ্রতার সহিত পতি-পুত্রাদি পরিত্যাগের আদর্শ প্রদর্শন-পূর্ব্বক বৃন্দাবনে রাসক্রীড়াদি অনির্ব্বচনীয় বিলাসসমূহের দ্বারা সুগোপ্য রীতিতে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে যিনি যে-ভাবে ভজনা করেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে সেইরূপ ভাবেই ভজনা অর্থাৎ তাঁহাদের ভজনানুরূপ ফল প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট হন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলেন,—"আমি ব্রজবাসিগণের প্রত্যুপকার করিতে অসমর্থ, তাঁহাদের সেবা-প্রবৃত্তির নিকট আমার সমগ্র স্বরূপকে বিক্রয় করিয়াও আমি তাঁহাদের নিকট চিরঋণী।" শ্রীকৃষ্ণ বলেন,—রুক্মিণীকে দর্শন করিয়া তাঁহার রুক্মিণীর প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি হইবার পরিবর্ত্তে গোপীগণেরই স্মৃতি আরও উদ্দীপ্ত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ আরও বলেন,—"মৎপ্রাপ্তিকামনাময়ী কাত্যায়নীব্রতপরা অষ্টোত্তর- শতাধিক ষোড়শসহস্র গোপললনার সহিত পুরবনিতাগণের সংখ্যার সাদৃশ্য দেখিয়াই তদ্দ্বারা স্বীয় চিত্তকে কিয়ৎপরিমাণে সুস্থ করিবার জন্য আমি পুর- বনিতাগণকে বিবাহ করিয়াছি।"

আত্মারামতা ও লীলারামতা

আত্মা ও পর দুইটী তত্ত্ব। আত্মনিষ্ঠ ধর্ম্ম হইতে আত্মারামতা; তাহাতে রসের পৃথক্ সহায় না থাকায় রস নাই। কৃষ্ণের আত্মারামতাধর্ম্ম যেরূপ নিত্য, লীলারামতাধর্ম্মও তদ্রূপ নিত্য। বিরুদ্ধধর্ম্ম-সামঞ্জস্যময় পরমপুরুষের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম,—

অপ্রাকৃত বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমন্বয়

কৃত্বাতাবন্তমাত্মানং যাবতী ব্রজযোষিতঃ।
রারাম ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া।।

কৃষ্ণতত্ত্বের এক কেন্দ্রে আত্মারামতা, আর তদ্বিপরীত কেন্দ্রে লীলারামতার পরাকাষ্ঠারূপ পারকীয়তা। আত্মারামতার দিকে যতটা আকর্ষণ করা যায়, ক্রমশঃই রসের তত শুষ্কতা আসিয়া পড়ে। আর রসকে যত লীলারামতার দিকে আকর্ষণ করা যায়, রস ততই প্রফুল্ল হয়। সর্ব্বকারণকারণ, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অদ্বিতীয় পুরুষ, নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময়, স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই যেখানে একমাত্র নায়ক, সে-স্থলে পারকীয়তা কখনই ঘৃণাস্পদ হইতে পারে না। কোন জীব বা প্রতিফলিত জগতের কোন পুরুষাভিমানী যেখানে নায়ক পদবী গ্রহণ করেন, সেখানেই ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার আসিয়া পড়ে; সুতরাং পারকীয় ভাব সেখানে নিতান্ত হেয়।

শ্রীমতী রাধারাণী—সর্ব্বশ্রেষ্ঠা; তিনি আশ্রয়কৃষ্ণবিগ্রহ-স্বয়ংরূপা

মধুর রসের আশ্রয়ালম্বনের মধ্যে আশ্রয়শিরোমণি শ্রীরাধাই রূপে-গুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। তিনি যূথেশ্বরীর প্রধানা। তিনি আশ্রয়-কৃষ্ণবিগ্রহ-স্বয়ংরূপা। শ্রীরাধার কায়ব্যূহরূপে অষ্ট সখীর বিপ্রলব্ধাদি অষ্ট ভাব পৃথক্ পৃথক্ লক্ষিত হয়; কিন্তু শ্রীরাধায় যুগপৎ অষ্টভাব-সমষ্টি দেদীপ্যমান।

সর্ব্ব অংশিনী

শ্রীমতী রাধারাণী যাবতীয় কৃষ্ণকান্তার অংশিনী এবং কৃষ্ণেচ্ছা-পরিপূর্ত্তিময়ী। কৃষ্ণাকর্ষিণী বলিয়া তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা এবং সমগ্র ভক্ত ও ভক্তির পোষিকা ও মূল আকর। বিষয়-কৃষ্ণবিগ্রহ স্বয়ংরূপ অবতারী হইতে যে রূপ নিখিল ভগবদবতার বিস্তৃত হইয়াছেন, তদ্রূপ আশ্রয়-কৃষ্ণবিগ্রহ স্বয়ংরূপা অংশিনী হইতে ব্রজাঙ্গনা-গণ, দ্বারকার মহিষীগণ ও নারায়ণ-বাসুদেবাদির লক্ষ্মীগণ বিস্তৃত হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার সহিতই মূল বিলাস; শ্রীরাধার ভাবকান্তি-মণ্ডিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের গৌরাবতার

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার সহিতই মূল বিলাস, অন্য যাবতীয় বস্তু সেই মূল বিলাসের উপকরণ। সেই শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কিরূপ, শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত মধুরিমা—যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন, তাহাই বা কিরূপ এবং শ্রীকৃষ্ণের মধুরিমার অনুভূতি হইতে শ্রীরাধারই বা কিরূপ সুখের উদয় হয়—এই তিনটী বিষয় আস্বাদনে লোভপরবশ হইয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শচীগর্ভ-সমুদ্রে আবির্ভূত হন।

গৌরব-পথে বা প্রাকৃত-সাহজিক-পথে কৃষ্ণপ্রেম অসম্ভব ও স্পর্শাতীত

জগৎ বৈধী ভক্তি দ্বারা চালিত, কাজেই কৃষ্ণপ্রেমে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। গৌরবভাবে শুদ্ধরাগ-লভ্য কৃষ্ণপ্রেম, কিম্বা প্রাকৃত সাহজিক আনুকরণিক পথে অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেম একান্ত সুদুর্লভ ও স্পর্শাতীত। গৌরবভাবময়ী বৈধী ভক্তির ফলে জীবের চতুর্ব্বিধা মুক্তি এবং বৈকুণ্ঠে নারায়ণ-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত শেষ সীমা।

নিজ-ভজনমুদ্রা-প্রদানে ইচ্ছুক হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচৈতন্যাবতার

নিজ-ভজনমুদ্রা প্রদানার্থ স্বয়ং কৃষ্ণের ইচ্ছা হইলে তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হন। যুগধর্ম্ম প্রচারাদি বিষ্ণুর কার্য্য; কিন্তু কৃষ্ণ ব্যতীত অপর অংশবিষ্ণুতত্ত্বের কৃষ্ণপ্রেম-দান অসম্ভব। বিধিভক্তি প্রচারের জন্য বিষ্ণুর অবতার, আর রাগভক্তি প্রচারের জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতার। শ্রীরাধার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে শ্রীকৃষ্ণ নিজ-বাঞ্ছাত্রয় পরিপূরণ করিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আশ্রিত ব্যক্তিগণই শ্রীকৃষ্ণসেবা-মাধুরী-পরাকাষ্ঠা আস্বাদন করিতে সমর্থ।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

মাধুর্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্য্যবিগ্রহাবতারই—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব। শ্রীকৃষ্ণ- চৈতন্যে—মাধুর্য্যক্রোড়ীভূত ঔদার্য্য, আর শ্রীকৃষ্ণে—ঔদার্য্যক্রোড়ীভূত মাধুর্য্য।

শ্রীকৃষ্ণভজনে যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সেবা আবশ্যক

অনর্থযুক্ত জীবের শ্রীকৃষ্ণভজনে যোগ্যতা নাই, অনর্থযুক্ত জীবের শ্রীকৃষ্ণভজনের অভিনয় বা চেষ্টা—শ্রীকৃষ্ণের অংশাবতার বা বিষ্ণুর অর্চ্চন-মাত্র; অনর্থযুক্ত জীবের যোগ্যতায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব উদিত হইয়া জীবকে অনর্থ-নির্ম্মুক্ত করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিগূঢ় ভজন-সম্পদ্ অর্থাৎ নিজ ভজনমুদ্রা প্রদান করেন।

মহাবদান্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব

এ জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় 'মহাবদান্য' ও 'কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা' বলিয়া বন্দিত হইয়াছেন।

শ্রীগৌরকৃষ্ণ—সর্ব্ববিভু, সর্ব্বান্তর্যামী ও সর্ব্বভোক্তা

শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত বা নিমিত্ত ও উপাদানকারণ-দ্বয়েরও কারণ শ্রীগৌরকৃষ্ণ সমস্ত উপাদেয়তাকে ক্রোড়ীভূত করিয়া সর্ব্ববিভু, সর্ব্বান্তর্যামী ও সর্ব্বভোক্তৃস্বরূপে নিত্য বিরাজমান।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য

পঞ্চতত্ত্বরূপী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-বিগ্রহগণের বিচিত্রবিলাস-প্রদর্শনই ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য এবং সেই পঞ্চতত্ত্বরূপী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-বিগ্রহগণের বিচিত্র বিলাসসেবায়ই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপাদাশ্রয় লাভ ও শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যসীমার উপলব্ধি হয়। যিনি কৃষ্ণ জানাইয়া অচৈতন্য জগতের চৈতন্য-সম্পাদন ও জগৎকে ধন্যাতিধন্য করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পাদপঙ্কজভৃঙ্গগণের পাদাশ্রয় ব্যতীত 'শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু', তাহা কাহারও গোচরীভূত হয় না।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দাসানুদাসগণের সেবা ব্যতীত কৃষ্ণপ্রেম লাভ অসম্ভব

আচর্য্য ধর্ম্মং পরিচর্য্য বিষ্ণুং বিচর্য্য তীর্থানি বিচার্য্য বেদান্।
বিনা ন গৌরপ্রিয়পাদসেবাং বেদাদি-দুষ্প্রাপ্যপদং বিদন্তি।।

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্)

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পরিপালন, বিষ্ণুর অর্চ্চন, শত শত তীর্থপরিভ্রমণ, নিখিল বেদশাস্ত্র-বিচার প্রভৃতি করিয়াও গৌরপ্রিয়জনের পাদপদ্মসেবা-ব্যতীত কেহই বেদাদির দুর্ল্লভ পদ (শ্রীরাধাগোবিন্দের চিদ্বিলাসক্ষেত্র শ্রীধামবৃন্দাবনের সন্ধান) জানিতে পারেন না।

নৈয়ায়িক হেতুবাদী, কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত ও বৈদান্তিকব্রুবগণ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বাবধারণে অযোগ্য

নৈয়ায়িক হেতুবাদিগণ, কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণ, বৈদান্তিকব্রুব প্রচ্ছন্ন হেতুবাদিগণ শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু, তাহা কখনও উপলব্ধি করিতে পারেন না। কারণ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পদাশ্রিত নহেন। নৈয়ায়িক হেতুবাদিগণের সচ্চিদানন্দত্বের বিরোধ-বিচার নির্মূলিত করিয়া অকৃত্রিম বৈদান্তিক নৈয়ায়িকগণ অর্থাৎ ভাগবত-সেবকগণ শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দত্ব স্থাপন করিয়াছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণই নিখিল-বেদের একমাত্র বিষয়-তত্ত্ব,—

শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র বেদপ্রতিপাদ্য বস্তু

বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্। (গীঃ ১৫।১৫)

আমিই সর্ব্ববেদ-বেদ্য ভগবান্, সমস্ত বেদান্তকর্ত্তা এবং বেদান্তবিৎ।

বেদে শ্রীকৃষ্ণ-লীলার ইঙ্গিত

তা বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ।
অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি।।

(১।৫৪ সূক্ত ৬ ঋক্)

(ঋঙ্মন্ত্রে ভগবানের নিত্যলীলা এইরূপে কথিত হইয়াছে)—তোমাদের (রাধা ও কৃষ্ণের) সেই গৃহসকল প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করি—যেখানে শুভাবহ বিধিরূপ অর্থাৎ বাঞ্ছিতার্থ-প্রদানে সমর্থ কামধেনুসকল প্রশস্ত শৃঙ্গবিশিষ্ট। ভক্তেচ্ছা-পূর্ণকারী শ্রীকৃষ্ণের সেই পরমপদ প্রচুররূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানমা চ পরা চ পথিভিশ্চরন্তম্।
স সধ্রীচীঃ স বিষুচীর্বসান আবরীবর্ত্তিভুবনেম্বন্তঃ।।

(ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ২২ অনুবাক ১৬৪ সূক্ত ৩১ ঋক্)

দেখিলাম, এক গোগাল তাঁহার কখনও পতন নাই, কখন নিকটে, কখন দূরে—নানা-পথে ভ্রমণ করিতেছেন; তিনি কখনও বহুবিধ বস্ত্রাবৃত, কখনও বা পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত। এইরূপে তিনি বিশ্ব-সংসারে পুনঃ পুনঃ প্রকটাপ্রকটলীলা বিস্তার করিতেছেন।

নিত্য ও নৈমিত্তিক-ভেদে দ্বিবিধ কৃষ্ণ-চরিত্র

শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র দুই প্রকার—নিত্য ও নৈমিত্তিক। গোলোকে সর্ব্বকালে নিত্য চরিত্র ও অষ্টকালীয় লীলা বর্ত্তমান। ভৌমরূপে সেই অষ্টকালীয় লীলায় নৈমিত্তিক লীলা সংযুক্ত আছে। ব্রজ হইতে গতায়াত ও অসুর-মারণাদি—নৈমিত্তিক লীলা। নৈমিত্তিক লীলা ব্যতিরেকভাবরূপে গোলোকে আছে; কেবল প্রপঞ্চে সেই লীলা বস্তুতঃ প্রকাশিত।

প্রতিকূল ও অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন

সাধকগণের পক্ষে নিত্যলীলার প্রতিকূল হইয়া ঐ নৈমিত্তিক লীলা প্রতিভাত হইতেছে। অঘ-বকাদির প্রতিকূলানুশীলন—কৃষ্ণপ্রেমের পরিপন্থী; এইজন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব একমাত্র অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনকেই উত্তমা ভক্তি বলিয়াছেন,—

উত্তমা ভক্তি

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১।৯)

মূল আশ্রয়াভিমানে অহংগ্রহোপাসনাও ভীষণ অপরাধ

জীবস্বরূপ অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনের আদর্শ দেখাইতে গিয়াও কখনই আপনাকে মূল আশ্রয় অর্থাৎ শ্রীমতী, নন্দ-যশোদা, সুদাম-শ্রীদাম, রক্তক-পত্রকাদিরূপে বিচার করিবেন না। তাহা হইলে অহংগ্রহোপাসনার

আবাহনরূপ অনর্থ বা প্রচ্ছন্ন প্রতিকূলানুশীলন জীবস্বরূপকে শ্রীকৃষ্ণভজন হইতে চিরতরে পাতিত করিবে। জীবস্বরূপের আশ্রয়-ভেদাংশ-বিচার অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণোপাসকগণের অনুগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণোপাসনাই শ্রীকৃষ্ণানুশীলন।

শ্রীরূপানুগবর শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয়েই কৃষ্ণানুশীলন সম্ভব

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দাসানুদাসগণের পাদাশ্রয় অর্থাৎ একমাত্র রূপানুগগণের পাদপদ্মাশ্রয়েই শ্রীকৃষ্ণানুশীলন হইতে পারে। অনর্থনির্ম্মুক্তাবস্থায় জীবের উদ্বুদ্ধ নির্ম্মল সহজ স্বরূপে স্ব-স্ব সহজ সেবা-ভাব শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর গুরুদেবের কৃপায় উদিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণের দেহ-দেহীতে ভেদ নাই

শ্রীকৃষ্ণের দেহ-দেহীতে ভেদ নাই, গুণ-গুণীতে ভেদ নাই, রূপ-রূপীতে ভেদ নাই, নাম-নামীতে ভেদ নাই, লীলা ও লীলাপুরুষোত্তমে কোন ভেদ নাই।

শ্রীকৃষ্ণের যে কোন একটি ইন্দ্রিয়—পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীকৃষ্ণের যে-কোন একটী অঙ্গ—পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের পাদনখাঞ্চল—পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম কর্ণের ন্যায়ই শ্রবণ করিতে পারেন, কর্ণও পাদের ন্যায়ই গমন করিতে পারেন, হস্ত দর্শন করিতে পারেন, চক্ষু স্পর্শ করিতে পারেন, কোন ইন্দ্রিয়ে কোনপ্রকার অভাব নাই। শ্রীকৃষ্ণের গুণ abstract মাত্র নহে, উহা পূর্ণ Concrete Absolute.

শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ-মাধুরী

শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ-মাধুরী, লীলা-মাধুরী, অতুল্য সেবকমণ্ডল-মাধুরী—অসমোর্দ্ধ, নিত্যপ্রগতিশীল, নব-নবায়মান সৌন্দর্য্যময়। শ্রীকৃষ্ণের রূপ-মাধুরী তাঁহার নিজেরও চমৎকারিতা আনয়ন করে এবং নিজকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে। তাঁহার সেই শ্রীবিগ্রহমাধুর্য্য অবলোকন করিয়া গো, পক্ষী, দ্রুম, লতা ও তরুসকল পুলকাশ্রু এবং অষ্টসাত্ত্বিকভাবে পরিপ্লুত হয়। কোন পুরুষই পরম কুলস্ত্রীস্বরূপ গোপীবৃন্দের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ নহেন; এমন কি, তাঁহারা সৌন্দর্য্য, স্বভাব, ধৈর্য্য, লজ্জাদিরূপ গুণ, বিচার-ব্যবসায়, বৈদগ্ধ্যাদি কর্ম্ম—এই সকল দ্বারা মহালক্ষ্মীকেও অতিক্রম করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন করিয়া তাঁহারা সেই রূপ-দর্শনের প্রতিবন্ধক পক্ষসকলের রচনাকারী বিধাতার নিন্দা করিয়াছিলেন এবং বিবিধ অপরাধকারী ইন্দ্রকে পর্য্যন্ত 'সহস্রাক্ষ' বলিয়া স্তব করিয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহারা খেদ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, আমাদের যাবতীয় ইন্দ্রিয়গুলি কেন কেবল নয়নরূপে পরিণত হয় নাই? শ্রীকৃষ্ণ গোপ- ললনাগণের রূপ দর্শন করিয়া প্রীত হন, সেই রূপ-প্রদর্শনের পরস্পর প্রতিযোগিতায় অপ্রাকৃত রূপ-প্রদর্শনীর নব-নবায়মান রূপ-মাধুর্য্য-ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রীতি হয় বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের রূপ-মাধুরী গোপীকাগণের আকর্ষণের বিষয়। গোপীকা-শিরোমণি বৃষভানু- নন্দিনীর সৎপ্রেমদর্পণে নিরন্তর

প্রবৃদ্ধমান রূপ-মাধুরী দর্শন করিয়াই শ্রীকৃষ্ণের নিজ মাধুর্য্যের আস্বাদনের নিমিত্ত তদাস্বাদনকারিণী বৃষভানুনন্দিনীর রূপ-গ্রহণে অত্যন্ত লোভ, তাহা হইতেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দাসানুদাসগণের বা শ্রীরূপানুগ-গণের শ্রীচরণাশ্রয়েই শ্রীকৃষ্ণবস্তু-তত্ত্ব উপলব্ধির বিষয় হয়—শ্রীকৃষ্ণে সুদুর্ল্লভ প্রেম সঞ্জাত হয়।

আধ্যক্ষিকগণের মনঃকল্পিত কৃষ্ণ (?)—শ্রীকৃষ্ণ নহে, উহা মায়াময় পুত্তল

শ্রীরূপানুগগণের চরণাশ্রয় না করায় জগতে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অসংখ্য আধ্যক্ষিক মনঃকল্পনা-সমূহ উদিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণালোচনার নামে অত্যন্ত কৃষ্ণবহির্ম্মুখতার ভাব বৃদ্ধি পাইতেছে। এই জন্য শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন,—"যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়।" শ্রীল রায় রামানন্দ, শ্রীল স্বরূপ দামোদর, শ্রীল রূপ-সনাতন, শ্রীরঘুনাথ, শ্রীজীবাদি গোস্বামিবৃন্দের উপদিষ্ট শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব আলোচনা করিলে আধ্যক্ষিক মতবাদিগণের মনঃকল্পনার কারখানায় প্রস্তুত শ্রীকৃষ্ণের নামে শ্রীকৃষ্ণ-গুণমায়ার পুত্তলিকা-সমূহের কৃষ্ণবহির্ম্মুখ-মনোহারী চাক্‌চিক্যের মূল্য অন্ধকপর্দ্দক হইলেও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতিভাত হয়।

গ্রাম্য সাহিত্যিক ও কবিগণের কল্পিত শ্রীকৃষ্ণ—বাস্তব শ্রীকৃষ্ণ নহে

কোন কোন গ্রাম্য ঔপন্যাসিক, কোন কোন গ্রাম্য যদ্বা-তদ্বা কবি শ্রীকৃষ্ণ- চরিত্র, শ্রীকৃষ্ণ-লীলা প্রভৃতি লিখিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণের পদনখ হইতে কোটি যোজন দূরে শ্রীকৃষ্ণ-মহামায়ার রচিত অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। ইঁহারা বুঝিতে পারেন নাই যে, যেমন রাবণ চিচ্ছক্তি সীতাকে হরণ করিতে পারে না, মায়াসীতাকে হরণ করিয়াই সীতা হরণ করিয়াছি মনে করে, মক্ষিকা যেরূপ স্বচ্ছ কাচভাণ্ডস্থিত মধু স্পর্শ করিতে না পারিয়া কাচভাণ্ডের বহির্ভাগে অবস্থান করিয়াই মধু পাইয়াছি মনে করে, তদ্রূপ যাঁহারা শ্রীরূপানুগগণের চরণাশ্রয় করেন নাই, একান্তভাবে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া সর্ব্বাত্মায় শ্রীরূপানুগ-গণের পাদপঙ্কজ-পরাগ ভজন করেন নাই, সেই সকল গ্রাম্য কবি, গ্রাম্য সাহিত্যিক, গ্রাম্য ঔপন্যাসিক, দেশ-নেতা, সমাজ-নেতা, অনূচানমানী, জাগতিক রূপ-গুণ- কুলে-শীলে-পাণ্ডিত্যে শ্রেষ্ঠাভিমানী ব্যক্তি দুনিয়ার সকল লোকের নিকটও যদি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তথাপি তাঁহারা অপ্রাকৃত কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। তাঁহাদের কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা—আংশিক বা অসম্যক্ মাত্র নহে, পরন্তু সম্পূর্ণ বিকৃত ও বিপরীত।

প্রাকৃত ব্যক্তিগণের শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে নানাপ্রকার মনোধর্ম্মপর মতবাদ

এইরূপ শ্রেণীর ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণকে কখনও রাজনৈতিক নায়ক, কূটবুদ্ধি- সম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষ, কখনও জাগতিক লম্পটগণের আদর্শ, কখনও বা শ্রীকৃষ্ণের লাম্পট্য-কালিমার (?) অপনোদের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে রূপক তত্ত্ববিশেষ, কখনও শ্রীকৃষ্ণকে জাগতিক অভ্যুদয় ও উন্নতির উপদেশক প্রভৃতিরূপে কত কি বিচার করেন! অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত প্রাকৃত বিচারের সম্পূর্ণ অতীত। শ্রীকৃষ্ণ কেন, শ্রীকৃষ্ণের পদনখ হইতে প্রকাশিত অসংখ্য অবতার এবং তাঁহাদের সেবকানুসেবকমণ্ডলীতেও ঐ সকল লৌকিকতা আরোপিত হইতে পারে না।

জীবে কৃষ্ণ-বুদ্ধি বা আরোপ—কৃষ্ণচরণে অমাজ্জনীয় অপরাধ

আধুনিক কেহ কেহ কোন কোন লৌকিক দেশ-নেতা প্রভৃতিকে শ্রীকৃষ্ণ সাজাইবার চেষ্টা-মূলে জীবে পরমেশ্বর-বুদ্ধি করার দরুণ ভীষণ মায়াবাদহলাহল জগতে বিস্তার করিতেছে। এইরূপ অপরাধের দ্বারা জগজ্জঞ্জাল প্রবৃদ্ধ ও দেশ উচ্ছন্নের পথে উপনীত হইয়াছে। জীবে কৃষ্ণবুদ্ধির ন্যায় অপরাধ আর নাই। জীবে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান আছে, কিন্তু জীব কৃষ্ণ নহে। যাঁহারা নির্ব্বিশেষবাদকে চরমে লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-পূজার সাময়িক ছলনা প্রদর্শন করেন, তাঁহারা ত' শ্রীকৃষ্ণ-পূজক নহেনই, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণে সম্পূর্ণ বিমুখ ও অপরাধী। অভিন্ন-শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পদরেণুগণের পাদপদ্মাশ্রয় করিলে এই সকল কথার উপলব্ধি হয়।

'শ্রীকৃষ্ণ' শব্দ স্বয়ং পূর্ণ ও নিরপেক্ষ সত্তাক

'শ্রীকৃষ্ণ' শব্দ—পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য, মুক্ত, চিন্তামণিস্বরূপ। 'শ্রীকৃষ্ণ' শব্দ স্বয়ংসিদ্ধ ও স্বয়ং পূর্ণ বলিয়া তাঁহাকে পরিপূরণ করিতে অন্য কোন শব্দ বা নামান্তরের প্রয়োজন হয় না। 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা', 'অন্তর্য্যামী', 'জগৎস্রষ্টা', 'বিশ্ববিধাতা' প্রভৃতি শব্দকে পূর্ণ করিতে হইলে 'কৃষ্ণ' শব্দের প্রয়োজন হয়, কারণ, তত্তৎ শব্দে পূর্ণ পরাৎপর বস্তুর সকল ভাব প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু 'কৃষ্ণ' শব্দ কৃষ্ণেরই ন্যায় অখণ্ড স্থান, অখণ্ড কাল, অখণ্ড পাত্র এবং যাবতীয় অখণ্ড ভাবরাশির সমগ্রতা সাধন করিয়াছেন। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তরাজ শম্ভু বলিয়াছেন,—

মহাদেবের উক্তি

"তারকাজ্জায়তে মুক্তিঃ প্রেমভক্তিস্তু পারকাদিতি। পূর্ব্বমত্র মোচকত্ব- প্রেমদত্বাভ্যাং তারকপারকসংজ্ঞে রামকৃষ্ণনাম্নোর্হি বিহিতে। তত্র চ রামনাম্নি মোচকত্বশক্তিরেবাধিকা শ্রীকৃষ্ণনাম্নি তু মোক্ষসুখতিরস্কারি-প্রেমানন্দদাতৃত্বশক্তিঃ সমধিবেতি ভাবঃ। ইত্থমেবোক্তং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—যচ্ছক্তি নাম যৎ তস্য তস্মিন্নেব চ বস্তুনি সাধকং পুরুষব্যাঘ্র সৌম্যক্রূরেষু বস্তুষিতি। কিঞ্চ শ্রীকৃষ্ণেনাম্নো মাহাত্ম্যং নিগদেনৈব শ্রূয়তে প্রভাসপুরাণে শ্রীনারদকুশধ্বজ-সংবাদে শ্রীভগবদুক্তৌ—নাম্নাং মুখ্যতমং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপেতি। তদেবং গতিসামান্যেন নামমহিমদ্বারা তন্মহিমাতিশয়ঃ সাধিতঃ।" (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ)

'রাম'নাম—তারক, 'কৃষ্ণ'ন্াম—পারক

মুক্তিদাতৃত্ব-হেতু রাম-নামের 'তারক' সংজ্ঞা এবং প্রেমদাতৃত্ব-হেতু কৃষ্ণনামের 'পারক' সংজ্ঞা। 'তারক' হইতে মুক্তি এবং 'পারক' হইতে প্রেমভক্তি লাভ হয়। রাম-নামে মোচকতা-শক্তি অধিক, আর কৃষ্ণনামে মোক্ষসুখ-তিরস্কারি-প্রেমানন্দ-দাতৃত্ব-শক্তি সমধিক। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—হে পুরুষব্যাঘ্র, কেহ শান্ত হউন, আর খলই হউন, শ্রীভগবানের নামের শক্তি নিজশক্ত্যনুরূপ ফল দান করিয়া থাকেন। যে নামে প্রেমদানশক্তি প্রচুর, সেই নাম আশ্রিত ব্যক্তির অপরাধ বিদূরিত করিয়া প্রেম দান করিয়া থাকেন, আর যে নামে মোচকতা-শক্তি প্রচুর, সেই নাম মুক্তিমাত্র প্রদান করেন। কিন্তু মোক্ষ প্রেমের ন্যায় সাধ্য ফল নহে, আরোগ্য বা রোগরূপ দুঃখের অভাব-মাত্রই সুখ নহে। রোগ-নির্ম্মুক্তির পর স্বাস্থ্যবানের ন্যায় আহার-

বিহারাদি ক্রিয়াই সুখ-সাধক। আর শ্রীকৃষ্ণের নামাভাসেই অনায়াসে মুক্তি হয়। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণনামের মহিমাধিক্যের কথা সুস্পষ্ট উক্তিতে শুনা যায়। প্রভাসপুরাণে শ্রীনারদ-কুশধ্বজ-সংবাদে শ্রীভগবানের উক্তি,—'হে পরন্তপ, নামসকলের মধ্যে 'কৃষ্ণ' নামটী আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম।'

গতিসামান্যে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা

অতএব শ্রীকৃষ্ণনামের মাহাত্ম্যাধিক্য হইতে গতি-সামান্যে অর্থাৎ নামের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপত্তির ন্যায় স্বরূপের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপত্তি—এই সমানগতির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিমা সাধিত হইল। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকরবৈশিষ্ট্য প্রভৃতিতে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে হইলে সদ্‌গুরুপদাশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের প্রদর্শিত ভজন-পথ শ্রীকৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন গ্রহণ করাই জীবমাত্রের কর্ত্তব্য।

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্।।

(শ্রীশিক্ষাষ্টক)

আদর্শ

অসম্পূর্ণতা-পরিবেষ্টিত মনুষ্য আদর্শ ব্যতীত কোন কার্য্যই করিতে পারে না। আদর্শ অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণতার সোপানাভিমুখে আকর্ষণ করিয়া আত্মসাৎ করে। অক্ষজ আদর্শানুশীলন অনেকটা এইরূপ অনুকরণ-প্রণালী ও আরোহপথে প্রতিষ্ঠিত হইলেও অধোক্ষজ আদর্শানুশীলন তদ্রূপ নহে। একলব্যের আদর্শানুশীলন ঐরূপ অক্ষজ অনুকরণ-প্রণালী ও আরোহ-চেষ্টার আদর্শ। দ্রোণাচার্য্য একলব্যকে শিষ্যত্বের যোগ্যতা প্রকাশ না করিলেও একলব্য দ্রোণাচার্য্যের কৃত্রিম আদর্শ নির্ম্মাণ করিয়া সেই আদর্শের অনুকরণে আরোহপথে যে ধনুর্ব্বিদ্যায় পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহাতে শ্রীগুরু বা শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি হয় নাই—একলব্যের ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়তর্পণ বা তাহার মনগড়া কৃত্রিম আদর্শের অনুকরণ হইয়াছিল। একলব্যের এইরূপ আদর্শানুকরণ নিখিল অক্ষজ-আরোহপথের পথিকগণের অনুকরণীয় আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। সেবা-রাজ্যে এইরূপ আদর্শানুকরণ স্বীকৃত হয় না। শ্রীগুরুদেব, আচার্য্য, শিক্ষক, উপদেষ্টা ইচ্ছা করুন, আর নাই করুন, আমরা জোর করিয়া—(বলপূর্ব্বক প্রহার দ্বারা) তাঁহাকে আমাদের নিকট আদর্শ-প্রকাশ করিতে বাধ্য করাইব (?) বা তাঁহার কৃত্রিম আদর্শ আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের কারখানায় প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে আদর্শ- রূপে স্থাপন করিব (?)—এইরূপ বিচার প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের বা ন্যূনাধিক জগতের যাবতীয় কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ সমাজের মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে। প্রাকৃত-সহজিয়া-সমাজে গুরু-গোস্বামীকে এইরূপভাবে
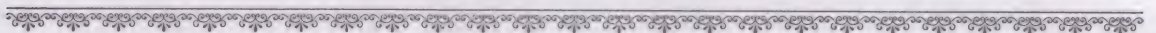
"দোরস্ত" করিয়া কৃত্রিম আদর্শের পূজা (?) করিতে করিতে কৃত্রিম সিদ্ধির যে-সকল কথা শুনা যায়, তাহা একলব্য-মনোভাবের ন্যূনাধিক পুনরাবৃত্তি।

আদর্শ-প্রদর্শন বা প্রকটন—আদর্শ-প্রদর্শনকারী গুরুবস্তুর অহৈতুক-কৃপা- সঞ্জাত ব্যাপার। যিনি আদর্শ প্রদর্শন করেন, তিনি গুরু; তাঁহার ওজন খুব বেশী, তাঁহাতে অসম্পূর্ণতা নাই, লঘুত্ব নাই; আর যাঁহার নিকট তাহা প্রদর্শিত হয় বা যিনি সেই আদর্শের অনুসরণ করেন, তিনি 'লঘু' অর্থাৎ তাঁহার ওজন কম, তিনি দুর্ব্বল, তিনি অসম্পূর্ণতায় আচ্ছন্ন, ভ্রম-প্রমাদাদিতে বশ-যোগ্য। লঘু গুরুকে নিয়মিত করিতে পারে না; যাঁহার ওজন কম, তিনি যাহার ওজন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, তাঁহাকে মাপিয়া লইতে পারেন না। কিন্তু ভারী জিনিষ পাতলা জিনিষকে মাপিতে পারে—নিয়মিত করিতে পারে। যেখানে লঘু গুরুকে মাপিতে যায়, লঘু গুরুকে লঘুর ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে আদর্শ প্রদর্শন করিতে বাধ্য করে বা গুরুর কৃত্রিম-আদর্শ নির্ম্মাণ করিয়া ফেলে, সেখানে জানিতে হইবে, সেই একলব্য- মনোভাব ন্যূনাধিক লঘুতে সংক্রামিত হইয়াছে। তবে যে সবল গুরু দুর্ব্বল লঘুর নিকট আদর্শ-প্রদর্শন করেন, তাহা গুরুর অহৈতুকী অসামান্য কৃপা। এইরূপ অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত দুর্ব্বল জীব মঙ্গল লাভ করিতে পারে না। লঘু গুরুর সেই অহৈতুকী অযাচিত কৃপার জন্য নিষ্কপটে অপেক্ষা করিতে পারে, কিন্তু গুরুকে বাধ্য করাইয়া বা গুরুর উপর যষ্ঠি প্রয়োগ করিয়া সেই কৃপা আদায় করিতে পারে না কিংবা "তুমি যদি কৃপা নাই কর, তাহাতেই বা কি? তোমাকে আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আদর্শ করিয়া গড়িবার সামর্থ্য কি আমার নাই? আমি কৃত্রিম আদর্শ সৃষ্টি করিয়াও তোমাকে "দোরস্ত" করিব।"—ঐরূপ মনোভাবে গুরুর কৃপাদর্শানুসরণ নাই, নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অনুসরণ মাত্র আছে; উহা গুরুসেবা—আচার্য্যসেবা বা আদর্শানুসরণ নহে, উহা গুরু-বিরোধ, আচার্য্য-বিরোধ বা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ। কিন্তু জগতে এইরূপ কপটতাই সর্ব্বাপেক্ষা অতীব গুরুভক্তি বা গুরুর আদর্শ-অনুকরণচেষ্টা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

শ্রীগুরুদেব বা আচার্য্য পরম কারুণিক—জীবে অহৈতুক দয়াময়। তাই কৃপা-পূর্ব্বক লঘু ও দুর্ব্বলের জন্য সর্ব্বদাই আদর্শ প্রকটিত করিয়া থাকেন। আচার্য্য- লীলাভিনয়কারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর জগজ্জীবের জন্য নিখিল আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগৌরপার্ষদগণের নিখিল জীবন-চরিত্র দুর্ব্বল জীবের জন্য যাবতীয় মঙ্গলময় আদর্শের খনি। শ্রীগৌরসুন্দর ছোট হরিদাস-বর্জ্জন-লীলায় "ভজনোন্মুখ ব্যক্তির স্ত্রীসম্ভাষণাদি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য" এই উপদেশের কঠোর ও পূর্ণ-নিরপেক্ষ আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, পুরুষোত্তমে প্রভু অর্দ্ধ বাহ্য দশায় প্রেমাবেশে অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবাবুদ্ধিতে দেবদাসীর গান শ্রবণে তৎসহ মিলনার্থ ধাবিত হইয়া গোবিন্দ কর্ত্তৃক রক্ষিত এবং বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলে মহাপ্রভু গোবিন্দকে আচার্য্যের আদর্শের বিষয়ে বলিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিখিল আচারে "অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর।।"—এই উপদেশ-আদর্শ প্রকটিত হইয়াছিল। কিন্তু যখন আবার ব্রহ্মচারী পণ্ডিত দামোদর (জীবকুলের শিক্ষার জন্য অর্থাৎ লঘু যেন কখনও গুরুকে লঘুর ইন্দ্রিয়-রোচক আচরণ বা আদর্শ প্রকাশ করিতে বাধ্য করাইয়া নিয়মিত করিতে না চাহেন, এই শিক্ষা স্থাপন-কল্পে)

শ্রীমন্মহাপ্রভুকে কোন বিধবা ব্রাহ্মণীর একটী সুন্দর পুত্রের প্রতি বিশেষ স্নেহপ্রকাশ করিতে দেখিয়া মহাপ্রভুর এই আচরণ বা আদর্শের সমালোচনাপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন,—

অন্যোপদেশে পণ্ডিত (কহে) গোসাঞির ঠাঞি।
'গোসাঞি' 'গোসাঞি' এবে জানিমু গোসাঞি।।
এবে গোসাঞি গুণ সব লোকে গাইবে।
গোসাঞি-প্রতিষ্ঠা সব পুরুষোত্তমে হইবে।।

* * * *

স্বচ্ছন্দে আচার কর, কে পারে বলিতে?
মুখর জগতের মুখ পার আচ্ছাদিতে।। (চৈঃ চঃ অঃ ৩য় পঃ)

তখন মহাপ্রভু ব্রহ্মচারী দামোদরের ঐরূপ অতি নিরপেক্ষতা এবং আচার্য্যলীল মহাপ্রভুর নিকট হইতে পর্য্যন্ত আচরণের সুষ্ঠুতা দাবীরূপ আদর্শ পাছে জগতে বিস্তারিত হইলে জগতের অক্ষয়-সম্প্রদায়ের ইন্দ্রিয়-তর্পণমূলক আদর্শই আচার্য্যের আচরণ বা আদর্শ বলিয়া কল্পিত হয়, শিষ্যের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর আদর্শই পাছে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তি হইতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তি পাছে নীতি-বিগর্হিত ব্যাপার বা আচারাভাব বলিয়া বিচারিত হয়, কিংবা মুখর জগতের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তি নিয়মিত, মুখর জগতের মতামত বা উপদেশানুসারে আচার্য্যের আচরণের আদর্শ নিরূপিত করিতে হয়—এই বিপদ আশঙ্কা করিয়া পণ্ডিত দামোদরকে ব্যাজ-স্তুতিমুখে শিক্ষাপ্রদান-পূর্ব্বক শচীমাতার রক্ষণাবেক্ষণের আবশ্যকতার ছলে নবদ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন,—

প্রভু কহে,—"দামোদর, চলহ নদীয়া।
মাতার সমীপে তুমি রহ তাহাঁ যাঞা।।
তোমা-বিনা তাঁহার রক্ষক নাহি আন।
আমাকেহ যা'তে তুমি কৈলা সাবধান।।
তোমা সম 'নিরপেক্ষ' নাহি মোর গণে।
'নিরপেক্ষ' নহিলে 'ধর্ম্ম' না যায় রক্ষণে।।
আমা হৈতে যে না হয়, সে তোমা হৈতে হয়।
আমারে করিলা দণ্ড, আন কেবা হয়।। (চৈঃ চঃ অঃ ৩য় পঃ)

আচার্য্য-লীল ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের এই শিক্ষালীলা দ্বারাও জানা যায় যে, আচার্য্য কৃপা-পূর্ব্বক দুর্ব্বল জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে দুর্ব্বল জীবের যোগ্যতার অনুসরণোপযোগী আচরণ প্রকাশ করেন বলিয়া সাধারণ জীব সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র আচার্য্য বা বৈষ্ণবকে কাহারও ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত

ইন্দ্রিয়- তর্পণানুযায়ী আচরণ বা কাহারও মনঃকল্পিত আদর্শ প্রকাশার্থ বাধ্য করিতে পারে না। গুরু কখনও লঘুর ইন্দ্রিয়তর্পণ বা বিচারের দ্বারা নিয়মিত হন না। ইহাই গুরুর গুরুত্ব।

আচার্য্য আচরণ দ্বারা শিক্ষা দেন বলিয়া তিনি 'আচার্য্য' পদবাচ্য,—

"আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারেস্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ।।" (বায়ুপুরাণ)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের "অনুভাষ্যে" বলিয়াছেন,— "আচার্য্যের অনন্যভজনই তাঁহার ভগবৎপ্রকাশত্বের পরিচায়ক। ভোগে অসন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণগণ আচার্য্যের সুষ্ঠু আচরণেও ঈর্ষা করেন।" (অনুভাষ্য, আদি ১ম পঃ ৪৬ সংখ্যা)

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স সৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে।। (গীঃ ৩।২১)

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জগতে উপদেশ দিয়াছেন,—শ্রেষ্ঠ লোক যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, অশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণও তাহাই আচরণ করেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, লোক তাহারই অনুবর্ত্তী হয়।

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌর-লীলার শিক্ষা হইতে আমরা জানিতে পারি, প্রচারমুখে আচারই জগদাচার্য্যত্ব,—

আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার।।
'আচার', 'প্রচার', নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি—সর্ব্বগুরু, তুমি—জগতের আর্য্য।। (চৈঃ চঃ অঃ ৪র্থ পঃ)

প্রচার জিনিষই—আচার। প্রচার ও আচার যেখানে পৃথক্, তাহা প্রচারও নহে, আচারেরও সুষ্ঠুতা নহে। আচারকে সুষ্ঠু, সুদৃঢ় ও সুবিস্তৃত করিবার জন্যই প্রচার।

শ্রীকৃষ্ণের গৌরাবতারের উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তনমুখে শ্রীকৃষ্ণ নিজ শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি' ভক্তি শিখামু সবারে।।
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
এই ত' সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায়।। (চৈঃ চঃ আঃ ৩য় পঃ)

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, আদর্শ ব্যতীত কখনও সাধারণ দুর্ব্বল জীব-কোটি শিক্ষা লাভ করিতে পারে না। কি কর্ম্মরাজ্য, কি ভক্তিরাজ্য—উভয় ক্ষেত্রেই আদর্শ আবশ্যক। জগতে প্রত্যেকেই কোনও না কোনও আদর্শের দ্বারা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে পরিচালিত হয়। কর্ম্মী পুণ্যকার্য্য করিতে গিয়া যেরূপ কোনও না

কোনও আদর্শ নিজ সম্মুখে স্থাপন করে, তদ্রূপ পাপকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াও কোনও একটী আদর্শ সম্মুখে স্থাপন করিয়া থাকে। পাপী ব্যক্তিও আদর্শ- ব্যতীত সুষ্ঠুভাবে পাপকার্য্য করিতে পারে না। পৃথিবীস্থ বারবনিতাগণ স্বর্বেশ্যাগণকে তাহাদিগের আদর্শ করিয়া অধিকতর পাপকার্য্যে লিপ্ত হইতে পারে। নরেন্দ্রগণ দেবেন্দ্রগণকে আদর্শত্বে স্থাপন করেন। চার্ব্বাকপন্থীর যেরূপ আদর্শ আছে, জৈমিনীর অনুগ-গণেরও তেমনি আদর্শ আছে। শিশু আদর্শ না পাইলে কোনও শিক্ষাই লাভ করিতে পারিত না—শিশু আদর্শ অনুকরণ করিয়াই বাক্যোচ্চারণ ও আহার-বিহারাদি করিতে শিক্ষা করে। নর-শিশুকে তাহার জন্মাবধি ব্যাঘ্রাদি জন্তুর আদর্শের মধ্যে পালিত হইবার দৃষ্টান্তে ব্যাঘ্র-শাবকের ন্যায় তাহাতে হিংস্র স্বভাব, শব্দানুকরণ, আহার-বিহার-প্রবৃত্তি লক্ষিত হইয়াছে। শিশুকে শব্দশাস্ত্রে বা লিপি-শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে হইলে আদর্শ-শব্দ বা আদর্শ-লিপির আবশ্যক হয়; নতুবা শিশু শিক্ষা করিতে পারে না। যখন আমরা সন্তরণ শিক্ষা করি, তখন আমাদের জলে নামিতে বা নদীর প্রবাহে বহু দূর গমন করিতে ভয় হয়; কিন্তু যদি আমরা কোন ব্যক্তিকে বা বহু ব্যক্তিকে সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত বা আমাদের নিকট আদর্শ স্থাপন করিতে দেখি, তখন আমাদের সাহসের সঞ্চার হয় এবং আমরা ক্রমে ক্রমে আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সন্তরণ-বিদ্যায় সুনিপুণ হইতে পারি। আমরা অক্ষজ রাজ্যে এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত নিয়তই প্রত্যক্ষ করিতেছি।

অধোক্ষজ সেবারাজ্যেও আদর্শের একান্ত আবশ্যকতা আছে। তবে সেখানে অন্তরনিষ্ঠা অন্য প্রকারের, এইমাত্র পার্থক্য।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"বৈষ্ণবগণকে 'জগদ্‌গুরু' বলা হয়। বৈষ্ণবগণ যেরূপ উচ্চপদস্থ, তাঁহাদের চরিত্র তদ্রূপ উচ্চ ও অনুকরণ-যোগ্য হওয়া আবশ্যক। বৈষ্ণবদিগের চরিত্র মন্দ হইলে, অন্যান্য দুর্ব্বল জীব কিরূপে সচ্চরিত্রতা শিক্ষা করিবে? শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন (চৈঃ চঃ মঃ ১২শ পঃ),—

শুক্ল বস্ত্রে মসিবিন্দু যৈছে না লুকায়।
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্বলোকে গায়।।
প্রভু কহে, পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস।
সুরাবিন্দু-পাতে কেহ না করে পরশ।।

সাধু-শিক্ষা দুই প্রকার অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা উপদেশ এবং চরিত্র দ্বারা অপরকে সাধু-চরিত্র শিক্ষা দেওয়া। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই উপদেশটী পাওয়া যায়—

"তুমি ভাল করিয়াছ শিখাও অন্যেরে।
এই মত ভাল কর্ম্ম সেও যেন করে।।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণবদিগকে বলিতেছেন,—"হে বৈষ্ণবগণ, তোমাদের সাধু- চরিত্র অপরকে শিক্ষা দেও। তুমি ভাল কার্য্য করিতেছ, উত্তম। কিন্তু জগজ্জীব তোমার ভ্রাতৃগণ। তাহাদের অসৎ কার্য্যের দ্বারা

পতন হইয়াছে। তোমার কর্ত্তব্য এই যে, **তোমার সাধু-চরিত্র দেখাইয়া তাহাদিগকে তোমার চরিত্র অনুসরণ করাও**। তুমি যদি গৃহত্যাগী বৈষ্ণব হও, তবে ত্যাগী বৈষ্ণবের সম্বন্ধে আমি যে-সকল উপদেশ দিয়াছি, তাহা আচরণপূর্ব্বক অন্য গৃহত্যাগী বৈষ্ণবকে শিক্ষা দেও। তুমি যদি বৈষ্ণবগৃহস্থ হও, তবে গৃহী বৈষ্ণবকে আমি যে-সকল উপদেশ দিয়াছি ও স্বীয় চরিত্রের দ্বারা দেখাইয়াছি, তাহা আচরণ কর এবং অন্যান্য গৃহীদিগকে শিক্ষা দেও। বৈষ্ণব-চরিত্র নিষ্পাপ। তাহার কোন অংশ গোপন করিবার যোগ্য নয়। সরলতাই বৈষ্ণবের জীবন। স্বীয় চরিত্র সর্ব্বত্র প্রকাশপূর্ব্বক শিক্ষা দেও। চরিত্র শুদ্ধ না হইলে কেহ 'বৈষ্ণব' পদবী পাইবার যোগ্য হন না। তোমরা শুদ্ধ চরিত্র, অতএব সর্ব্বদাই ভাল আচরণ করিয়া থাক। তাহা জগৎকে শিক্ষা দেও। সকল বৈষ্ণবই জগতের গুরুপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। **কেবল কথার দ্বারা শিক্ষা দিলে যথেষ্ট হয় না। চরিত্র দ্বারা শিক্ষা দেওয়াই প্রধান কার্য্য**। দেখ, আমার জন্য কোন বিধি নাই। আমি স্বেচ্ছাময় ঈশ্বর। যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করিতে পারি। তথাপি আমি দুরন্ত কলিকালে জীবের চরিত্র শোধন করিবার জন্য শ্রীশচীদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া শিক্ষা দিতেছি। আমার বাল্যচরিত্রের দ্বারা বালকদিগকে শিক্ষা দিয়াছি, গৃহস্থচরিত্রের দ্বারা গৃহিগণকে শিক্ষা দিয়াছি। সন্ন্যাসচরিত্রের দ্বারা গৃহত্যাগী জনগণকে শিক্ষা দিয়াছি। তোমরা আমার চরিত্র অনুকরণ-পূর্ব্বক অন্যান্য জীবগণকে শিক্ষা দেও। যখন যে-বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ হয়, তখন আমার চরিত্র আলোচনা করিয়া স্বীয় চরিত্র গঠন কর।" শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উপদেশটী সকল বৈষ্ণবের পালন করা উচিত। **যিনি এই উপদেশ পালন করিতে চান না, তিনি মহাপ্রভুর বিরোধী।**"

(শ্রীসজ্জনতোষণী ৫ম খণ্ড, ১৯৬-১৯৮ পৃষ্ঠা)

পরমার্থ শিক্ষামন্দিরের শিশুগণের জন্য পরমার্থ-প্রবীণগণ কৃপা-পূর্ব্বক আদর্শ প্রকটিত করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেব নিখিল সেবাদর্শের মূর্ত্তবিগ্রহস্বরূপ। অসদ্গুরু বা গুরুব্রুবের উপদেশ হইতে তাহার আচরণ ও আদর্শ পৃথক্ বলিয়া তাহার উপদেশ কার্য্যকরী হয় না—শিষ্যের মঙ্গলের জন্য সাধিত হয় না। কিন্তু পর-দুঃখদুঃখী সদ্গুরুর উপদেশ ও আদর্শ, প্রচার ও আচার সম্পূর্ণ একতাৎপর্য্যপর বলিয়া দুর্ব্বল জীবের পক্ষে তাহা পরম মঙ্গলদায়ক অনুসরণ-যোগ্য হয়। দুর্ব্বল জীবও সদ্গুরুর সেই আদর্শ আচারময় প্রচার উপেক্ষা করিতে পারে না—যখন উপেক্ষা করিবার কোন দুষ্প্রবৃত্তি উদিত হয়, তখন তাহার সম্মুখে আর শ্রীগুরুদেবের মহান্ আদর্শ থাকে না। জীব তখন আর একটী পতনোন্মুখের বা পতিতের আদর্শকে নিজ সম্মুখে স্থাপনপূর্ব্বক তবে পতিতপাবন সদ্গুরুর পরম পাবন আদর্শকে উপেক্ষা করিতে পারে। কিন্তু অসদ্গুরুর আদর্শে সর্ব্বদাই পতনোন্মুখতা থাকে বলিয়া জীব সহজেই তাহার পতনোন্মুখতা-প্রবৃত্তির মধ্যে আদর্শকে প্রেয়ঃ বলিয়া বরণ করে এবং অধিকতর সহজ পিচ্ছিল অন্ধতিমিরে পতিত হয়। পাশ্চাত্যদেশীয় একটী লৌকিক নীতিপূর্ণ পুস্তকে লিখিত আছে যে, কোনও বালকের গৃহের মধ্যে একটী আদর্শ পুরুষের মূর্ত্তি এবং কতগুলি পাপীর ছবি স্থাপিত ছিল। বালক যখন তাহার সেই গৃহাভ্যন্তরে কোন কুকর্ম্মে রত হইত, তখন সে প্রথমে সেই আদর্শ পুরুষের মূর্ত্তিটীকে আবরণ করিয়া রাখিত, তবে সে ঐরূপ কার্য্যে লিপ্ত হইতে পারিত। কিন্তু পাপী ব্যক্তিগণের ছবি উন্মুক্তই থাকিত, তাহাতে সে পাপকার্য্যে বাধা প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, অধিকতর প্রেরণাই

লাভ করিত। লৌকিক আদর্শেরই এইরূপ প্রভাব! অতিমর্ত্ত্য আদর্শের যে কত প্রভাব, তাহা ইয়ত্তাই করা যায় না। সদ্‌গুরুপাদপদ্মের সেবাময় আদর্শ ও অসদ্‌গুরু বা গুরুব্রুবের অসদাদর্শের রীতিও কতকটা উপরি উক্ত দৃষ্টান্তের ন্যায় দুর্ব্বল জীবের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। সদ্‌গুরুপাদপদ্মের আদর্শ দেখিয়াও যখন আমরা কোনও অপরাধময় কার্য্যে লিপ্ত হইতে যাই, তখন আমরা ঐরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদর্শকে আবরণ করিয়া আমাদের সম্মুখে অন্য অসদ্‌ব্যক্তির অসদাদর্শ স্থাপন-পূর্ব্বক ঐ সকল অসদাদর্শের সাময়িক প্রেরণা ও উত্তেজনায় ঐরূপ অপরাধময় কার্য্য করিয়া থাকি। ঐরূপ কার্য্যে আমাদের সদ্‌গুরুপাদপদ্মের আদর্শ পরিহারই লক্ষিত হয়। সুতরাং সদ্‌গুরুপাদপদ্মের আদর্শ সম্মুখে দেখিয়াও যদি কোন কোন দুর্ব্বল জীব বা অপরাধ-প্রবণ জীবের অন্যদিকে প্রবৃত্তি দেখা যায়, তবে তাহা কখনই সদ্‌গুরু-আদর্শানুসরণ বা তাহাতে গুরুদেবের দোষ আরোপিত হইতে পারে না। উহা সদ্‌গুরুর আদর্শ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অসদাদর্শ বরণের দ্বারা ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার। সুতরাং আদর্শ মাত্রেরই অসামান্য প্রভাব; সদাদর্শের যেরূপ প্রভাব, অসদাদর্শেরও তদ্রূপ প্রভাব। তবে অসদাদর্শ আমাদের বর্ত্তমান বিকৃত স্বভাবের অধিকতর রুচিপ্রদ বলিয়া উহার প্রভাব আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার উপর অধিকতর বিক্রম-প্রকাশে সমর্থ।

সাধক ও অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণের মঙ্গলের জন্য যে আদর্শের অত্যাবশ্যকতা স্বীকৃত, এ বিষয়ে সন্দেহ কি? তবে সাধকগণ 'আদর্শ'কে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ বা ব্যক্তিগত অনর্থের দ্বারা নিয়মিত বা মর্ত্ত্য-বুদ্ধিতে আদর্শের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিলে আদর্শ সেই স্থানে আত্মগোপন করিয়া বঞ্চনার আদর্শ প্রকাশ করিবেন। নিত্যসিদ্ধগণের কোনও বাহ্য আদর্শের অপেক্ষা নাই। দেখিতে পাওয়া যায়, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ প্রমুখ নিত্যসিদ্ধ পুরুষগণের বাহ্যে কোনও প্রকার আদর্শের প্রয়োজন প্রকাশিত হয় নাই। লৌকিক আচার্য্যব্রুবগণ তাঁহাদের আদর্শে ঐ সকল নিত্যসিদ্ধ মহাজনকে অন্বয়ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে পারেন নাই; তাঁহারাই ঐ সকল নিত্যসিদ্ধ মহাজনের আদর্শ দেখিয়া চমৎকৃত ও কেহ কেহ ধন্য হইয়াছেন। সেই সকল নিত্যসিদ্ধ মহাভাগবত সকল পাত্রের মধ্যেই তাঁহাদের নিজাভীষ্টের আদর্শ দেখিতে পাইয়া নিত্য অভীষ্ট-সেবায় নিযুক্ত। ঐ সকল স্বরূপরূপানুগবর আদর্শ-শিরোমণি শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর আদর্শেই নিত্য অনুপ্রাণিত। যাঁহাদের অন্তর ঐরূপ আদর্শে নিত্য অনুরঞ্জিত, তাঁহাদের বৈধ অনুশাসনরূপ বাহ্য আদর্শের আবশ্যকতা কি? নিত্যসিদ্ধ মহাভাগবতগণের কথা দূরে থাকুক্, যাঁহারা রাগাত্মিক ব্রজজনের আদর্শে লুব্ধ, সেই সৌভাগ্যবন্ত সাধকগণেরও আদর্শানুসরণ এইরূপ (চৈঃ চঃ ম ২২শ পঃ),—

নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্ম্মনা হঞা।।
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি।।

গৌড়ীয়

[১৯৩১-৩২ খৃষ্টাব্দ, ১৩৩৮-৩৯ বঙ্গাব্দ]

শুকরতল

ভূগোল ও ইতিহাস-প্রবীণ বহু ব্যক্তির নিকটই বোধ হয় উপরি-উক্ত শব্দটি অভিনব বলিয়া মনে হইবে। পারমার্থিক বিশ্বেরও অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই ঐ নামটির তথ্য অবগত আছেন। কিন্তু ঐ শব্দটি পারমার্থিক ভূগোল ও ইতিহাসের একটি চিরস্মরণীয়, চিরবন্দনীয় প্রসিদ্ধতম স্থানের নাম ও ঘটনার সহিত বিজড়িত।

শ্রীমদ্ভাগবতের নাম কে না শুনিয়াছেন? শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী কাহার হৃদয় স্পর্শ না করিয়াছে? পুরাণার্ক শ্রীমদ্ভাগবত কলিকল্মষ-বিনাশার্থ জগতে উদিত। শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় গ্রন্থ জগতে আর নাই—বিশ্বের ইতিহাসে এরূপ গ্রন্থচক্রবর্ত্তী আর দ্বিতীয় প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীমদ্ভাগবত—বেদান্তের সার, বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য, নিগমকল্পতরুর গলিত ফল। যে গ্রন্থের প্রশংসা পত্র স্বয়ং কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্যদেব প্রদান করিয়াছেন, সেই গ্রন্থ-সার্ব্বভৌমের প্রামাণিকতা অপ্রতিদ্বন্দ্বী, ইহা সর্ব্বসজ্জন-সম্মত। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রশংসাপত্রের কিয়দংশ এইরূপ,—

"গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার।

* * * *

চারিবেদ—দধি, ভাগবত—নবনীত।
মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিৎ।।"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ২১শ)

শ্রীমদ্ভাগবত রসামৃতমহোৎসবে রসিকগণকে যে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তাহাতে দেখিতে পাই,—

নিগমকল্পতরোর্গলিতংফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাকুকাঃ।।

পরমোচ্চ চূড়া শ্রীকৃষ্ণ হইতে ব্রহ্মার শাখায়, তাহা হইতে শ্রীনারদ-শাখায়, তাহা হইতে শ্রীব্যাস-শাখায় এবং তাহা হইতে শুকমুখস্পৃষ্ট ও আস্বাদিত হইয়া কেবল রস স্বরূপ ভাগবতফল শ্রীপরীক্ষিৎ-সূত প্রভৃতি শাখায় ক্রমে ক্রমে অখণ্ডিতভাবে অবতরণ করিয়াছে।

শ্রীব্যাস বৈয়াসকি শুকদেবকে সর্ব্বপ্রথমে এই শাস্ত্র পাঠ করাইয়াছিলেন। পরে শ্রীশুকদেব শ্রীপরীক্ষিতাদি ও লোমহর্ষণ-সূত শ্রীসূত গোস্বামীকে তাহাই শ্রবণ করাইয়াছিলেন এবং তাহাই তৃতীয়বার শ্রীসূত গোস্বামী শ্রীশৌনকাদি মহামুনিগণকে নৈমিষারণ্যে বলিয়াছিলেন। পুনরায় শ্রীব্যাস কলি-প্রারম্ভে গ্রন্থাকারে বর্ত্তমান গ্রন্থ নির্ম্মাণ করেন।

ভাগবতের প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল—সরস্বতী নদীর পশ্চিম তটে, শম্যাপ্রাস নামক স্থানে, বদরী বৃক্ষশোভিত ব্যাসাশ্রমে (ভাঃ ১।৭।২-৮)। এই সময়ে মহামুনি শ্রীব্যাস গুরুবর শ্রীনারদের আদেশে এই সাত্বত সংহিতা প্রকাশ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে আত্মজ শ্রীশুকদেবের নিকট অধ্যাপনা করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় অধিবেশন যেখানে হইয়াছিল, সেই স্থানের নামই আমাদের আলোচ্য "শুকরতল"। এখানে শ্রীশুকদেব বৈষ্ণব-মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট শ্রীলোমহর্ষণি শ্রীসূত গোস্বামী প্রমুখ বহু ঋষির সম্মুখে সাতদিন যাবৎ শ্রীমদ্ভাগবত-কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ভক্তগণ-সঙ্গে যখন আমাদের সতীর্থ ভ্রাতা বিজনৌর-প্রবাসী শ্রীমান্ ঠাকরসাহেব টিকমসিংজীর সকাতর-প্রার্থনা-পরিপূরণার্থ গত ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩০ তারিখে শ্রীনৈমিষারণ্য হইতে বালামৌ জংসন, তথা হইতে ডেরাদুন-এক্সপ্রেসে নাগিনা এবং নাগিনা হইতে প্রায় ১৯ মাইল মোটরযানে আরোহন করিয়া বিজনৌরে শুভ বিজয় করেন, তখন আমাদেরই জনৈক সতীর্থ ভ্রাতা বিজনৌরের কোর্ট-ইন্স্পেক্টর বাবু নারায়ণবিহারীলাল শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় অধিবেশন ক্ষেত্র—শুক-পরীক্ষিৎ-সংবাদের মহাতীর্থ "শুকরতলে"র সন্ধান প্রদান করেন।

"শুকরতল" গঙ্গার তটে অবস্থিত একটী একান্ত জনপ্রাণিহীন ক্ষেত্র; বর্ত্তমানে উহা ব্যাঘ্র-শিবাদির স্বচ্ছন্দ্রবিহারভূমি হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। এইরূপ একটা প্রসিদ্ধতম স্থানের প্রতি কাহারও দৃষ্টি করিবার অবসর নাই। ই, আই, আর রেলওয়ের 'মজঃফরনগর' নামক ষ্টেশন হইতে "শুকরতল" যাওয়া যাইতে পারে। মজঃফর নগর হইতে ১০ মাইল পাকা রাস্তা, তৎপর ৪ মাইল কাঁচা রাস্তার মধ্যে "ভোপা" নামক পুলিশ-থানা, তৎপরে 'শুকরতল' পাওয়া যায়। স্থানটী জলাভূমি। "ভোপা" থানার অধীন "ভুক্করহেড়ি" নামক একটী গ্রাম 'শুকরতলে'র নিকটবর্ত্তী পল্লী। উক্ত গ্রামে কিঞ্চিৎ সাধারণ খাদ্যাদি পাওয়া যায়—শুকরতলে কিছুই পাওয়া যায় না। স্থানটী সুবৃহৎ জঙ্গলাচ্ছাদিত, জঙ্গলে হিংস্র ব্যাঘ্রাদি স্বচ্ছন্দে বাস করে এবং গঙ্গাতটভূমিতেও বৃহৎ ফণাধৃক্ সর্প-সমূহ বিচরণ করিতে দেখা যায়। শুক-পরীক্ষিৎ সংবাদের পুণ্যতম ক্ষেত্রটী এইরূপে মানবের পাপ-পঙ্কিলতা হইতে সুরক্ষিত হইয়া একান্ত আর্ত্ত দুই একটি ব্যক্তির বিচরণ-ভূমিকারূপে অবস্থিত রহিয়াছে। যে-স্থানে শ্রীল শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই স্থানে কোনও মন্দির, স্তম্ভ বা প্রস্তরফলক কিছুই নাই; কেবল একটী বিস্তীর্ণশাখ, সুপল্লবিত পিপলবৃক্ষ শোভিত থাকিয়া যুগ-যুগান্তরের স্মৃতি সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে, বৃক্ষের পাদদেশে কয়েকটি ইষ্টকখণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে। স্থানটি হিংস্রজন্তুসঙ্কুল হইলেও নির্ম্মৎসরগণের হৃদয়ে এমন একটা প্রশান্ত অহিংস্যভাব উদ্দীপ্ত করিয়া দিতেছে—ভগবানের বাস্তব অস্তিত্বের এমন একটি আর্ত্ত-রাগিনী ঝঙ্কৃত করিতেছে যে, মনে হয়, এখনও যেন নিবৃত্তি-নিরত মহামুনি শুকদেব সেখানে থাকিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎকে ভাগবতামৃত ফল পান করাইতেছেন—এখনও যেন সেই অমৃতের প্রবাহ এই স্থানকে অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছে—এখনও যেন শ্রীচৈতন্যানুগ-সম্প্রদায় চেতনের তড়িদ্বার্ত্তা চালিত করিয়া এই স্থান হইতে

ভাগবতামৃত-প্রবাহ বিশ্বে বিলাইতেছেন। তাই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণের নিকট প্রকাশ করিলেন,—এই স্থানে শ্রীচৈতন্যমঠের একটী শাখামঠ প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক।

"শুকতরল" যাইবার আর একটী পথের বিষয় অবগত হইলাম। 'বিজনৌর' হইতে পাকা রাস্তায় লরি বা মোটরে ৭ সাত মাইল যাইয়া পদব্রজে বালির উপরে ১।।০ দেড় মাইল রাস্তা হাঁটিয়া গঙ্গা পাওয়া যায়। নৌকায় ১।।০ দেড় মাইল আন্দাজ গঙ্গা পার হইয়া পুনরায় ১।।০ দেড় মাইল হাঁটিলে 'শুকরতল' পাওয়া যাইবে। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, নিকটবর্ত্তী স্থানে জৈনগণ একটী ধর্ম্মশালা প্রস্তুত করিয়াছেন।

'শুকরতল' হইতে ৫ পাঁচ মাইল পূর্ব্বদিকে ভাগীরথীর অপর পারে "বিদুর-কুটীর" *। বিদুর-কুটীরের বিপরীত তটে মিরাট জিলায় "হস্তিনাপুর"। এখান হইতে ৫ মাইল দূরে মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন। হস্তিনাপুরেও একটী জৈনধর্ম্মশালা আছে।

অতএব শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম অধিবেশনের স্থান—সরস্বতী নদীর পশ্চিম তটস্থ শম্যাপ্রাস নামক স্থানের বদরীবৃক্ষ-মণ্ডিত ব্যাসাশ্রম; দ্বিতীয় অধিবেশনের স্থান—গঙ্গার তটস্থ "শুকরতল" নামক স্থান; তৃতীয় অধিবেশনের স্থান—গোমতি-তটস্থিত নৈমিষারণ্য—যেখানে শ্রীসূত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষির নিকট ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

গুরুসেবা

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্র সকল শাস্ত্রই তারস্বরে উর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিতে করিতে গুরু-সেবার গৌরব-গাথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শাস্ত্র বলেন,—সেই শাস্ত্র, 'শাস্ত্র' নহে, যাহাতে হরিভক্তি দৃষ্ট না হয়, এমন কি, তাহা "যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ"। কিন্তু সেই 'হরিভক্তি' আদৌ হরিভক্তিই নহে, যদি তাহা "আদৌ গুরুপূজাময়ী" না হয়। "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ", "তদ্বিজ্ঞানার্থৎ স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ", "যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ", "আচার্য্যদেবো ভব" প্রভৃতি অসংখ্য শ্রুতি গুরু-সেবা ব্যতীত যে হরিসেবার আভাসও সম্ভব হইতে পারে না, তাহা তারস্বরে কোটি কণ্ঠে জানাইয়াছেন। "তা'তে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ"।। প্রভৃতি মহাপ্রভুর উপদেশবাক্য আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাঠ করি।

কিন্তু "গুরু-সেবা" করিতে হইলে আমাদের দুইটী বিষয় স্মৃতি-পথে উজ্জ্বল রাখা আবশ্যক। "**গুরু**"**র** নামে "**লঘু**"**র** সেবা না হয়; আর '**সেবা**'**র** নামে 'ভোগবুদ্ধি'র আবাহন না হয় অর্থাৎ সেবার নামে কপটতা সেবা অপেক্ষা অধিকতর লোক-দেখাইবার বাসনা হৃদয়ে উদিত না হয় কিংবা গুরুদেবকে বস্তুতঃ

* বিদুর কুটীর সম্বন্ধে বিবরণ আমরা অন্য সময়ে গৌড়ীয়ে প্রকাশ করিব, ইচ্ছা থাকিল। ইহা ভক্ত বিদুরের স্থান—যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের খুদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা বিজনৌর জেলার অন্তর্গত। গৌঃ সঃ
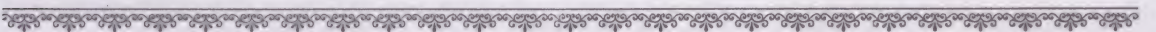
মর্ত্ত্যব্যক্তি-বিশেষ মনে করিয়া গুরুকে দেখাইয়া নিজের সেবার বিজ্ঞাপন প্রচার-বাসনা অর্থাৎ সাধারণ লোককে যেরূপ তোষামোদ করিলে বা তাহার ভোগের জন্য কিছু কার্য্য করিয়া দিলে তাহার নিকট হইতে 'বাহাবা' (জড়া প্রতিষ্ঠা) পাওয়া যায়, এইরূপ কপটতা, ভোগবুদ্ধি ও মর্ত্ত্যবুদ্ধি লইয়া যেন গুরু সেবার ছলনা প্রদর্শিত না হয়।

ঐরূপ কপটতা থাকিলে জানিতে হইবে, গুরু-সেবায় রুচি-মান্দ্য উপস্থিত হইয়াছে অথবা আমি বঞ্চিত বা বঞ্চনাকামী হইয়াছি। ভাগ্যমন্দ হইলে কিংবা কুচক্রী দেবতাগণের চক্রান্তে পতিত হইলে সদ্গুরুদেবের পাদপদ্মাশ্রয়ের অভিনয় করিয়াও ঐরূপ দুর্দ্দশা ঘটে। শ্রীহরিভক্তিবিলাস (৪র্থ বিঃ১৩৯)বলেন,—

সাধকস্য গুরৌ ভক্তিং মন্দীকুর্ব্বন্তি দেবতাঃ।
যন্নোঽতীত্য ব্রজেদ্বিষ্ণুং শিষ্যো ভক্ত্যা গুরৌ ধ্রবম্।।

দেবতাগণ সাধকের গুরুর প্রতি ভক্তি বা সেবা-বৃত্তি অনেক সময় মন্দীভূত করিয়া দেন, তাহার কারণ, ঐ সকল দেবতা মনে করেন, শিষ্য একমাত্র গুরুদেবে অচলা ভক্তি প্রভাবেই তাঁহাদিগকে (দেবতাগণকে) লঙ্ঘন করিয়াও নিশ্চিতরূপে হরিপাদপদ্ম লাভ করিবে।

যাঁহার নিষ্কপট-গুরু-সেবা-বৃত্তি আছে, তিনিই হরিভজন করেন, তিনিই বৈষ্ণব, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অমল সন্ন্যাসাশ্রমে অধিরূঢ় হইয়াছেন, ষড়্বেগজয়ী হইয়া ব্রহ্মে বিচরণ করিতেছন, নিরাহারে কঠোর তপস্যারত আছেন, এসকল কথার কোনও প্রত্যয় বা মূল্য নাই, হরিপাদপদ্ম তাঁহাদের নিকট সুদুর্ল্লভ। কিন্তু নিষ্কপট গুরু সেবক বাহ্যে যত সাময়িক অনর্থযুক্তরূপেই প্রতিভাত হউন, তাঁহার মঙ্গল সুনিশ্চিত—

কামক্রোধাদিকং যদ্যদাত্মনোঽনিষ্টকারণম্ ।
এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ।।
বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায় প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে।।

(শ্রীমদ্ভাগবত)

আত্ম-অহিতকর যে কাম-ক্রোধাদি অনর্থ, তাহা সকলই শ্রীগুরুপাদপদ্মে ভক্তি-প্রভাবে পুরুষ তৎক্ষণাৎ জয় করিতে পারেন।

যদিও আমার ভক্ত অজিতেন্দ্রিয় হইয়া বিষয়ের বশীভূত হন, তথাপি নিষ্কপট ভক্তির প্রভাবে তিনি কখনও বিষয়ে মগ্ন হন না।

সুতরাং শ্রীগুরু-সেবায় নিষ্কপটতাই সর্ব্ব মঙ্গল-জননী। নিষ্কপটতাই বৈষ্ণবতা—নিষ্কপটতাই সেবার বাহন-ভক্তির বাহন। সেবাদেবী নিষ্কপটতা- বাহনে আরোহণ করিয়া কৃষ্ণপ্রেম-বর প্রদান করিতে আগমন করেন। শ্রীমদ্ভাগবত পুনঃ পুনঃ শ্রীগুরু-সেবায় নিষ্কপটতার কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীগুরু-সেবায় (?)

কপটতা থাকিলে উহা ত' প্রোজ্ঝিতকৈতব ভাগবতধর্ম্মের বিরুদ্ধ কার্য্য বা কর্ম্মকাণ্ড-মাত্র হইল। কপটতাই শ্রীগুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধির মূল —কপট-গুরুসেবক (?) শ্রীগুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়া প্রাকৃত নায়ক-পূজার অধ্যাসে আত্মভোগ বা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ সাধন করিতে চাহিতেছেন। তাহা কি রূপে গুরুসেবা হইবে? এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপ-প্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ।।

যাহার সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রকাশ-স্বরূপ দিব্য জ্ঞানদীপ দাতা শ্রীগুরুদেবে অসতী মর্ত্ত্যবুদ্ধি, তাহার শ্রবণাদি সকলই হস্তিস্নানের ন্যায় নিরর্থক। অর্থাৎ ঐরূপ কপটব্যক্তি গুরুপাদসন্নিধানে শ্রবণের অভিনয় করিলেও এবং উহাতে সাময়িক পবিত্র হইলেও তাহার কপটতা-শুণ্ড বাহ্য জগতের ধূলি-কঙ্করাদি সংগ্রহ করিয়া পুনরায় মুহূর্ত্তমধ্যেই সকল শ্রবণরূপ স্নান-ফল ব্যর্থ করিয়া দেয়।

কপট ব্যক্তি উত্তম বস্তু ভোগ-দ্বারা জিহ্বা-লাম্পট্য বৃদ্ধির জন্য যে ''বিঘসাশী''র ছলনা প্রদর্শন করে, ভগবৎস্বরূপ নিত্যমুক্ত গুরুদেবের উত্তম যান-শয্যাসন প্রভৃতি উপভোগ কিংবা ঐ সকল বস্তু গ্রহণের অনুকরণ-বিদ্যায় দীক্ষা লাভ করিবার জন্য যে ''অন্তেবাসী''র অভিনয় করে, তাহাতে গুরুদেবে অতিমর্ত্ত্যবুদ্ধি বা নিষ্কপট গুরু-সেবার পরিচয় নাই। নিষ্কপট বিঘসাশী অচিরেই প্রপঞ্চ জয় করেন; নিষ্কপট অন্তেবাসী নিশ্চিতই ওঁ বিষ্ণুপাদ গুরুপাদপদ্ম সন্নিধানে বাস করিয়া বিষ্ণুময় হইয়া থাকেন।

যথা সিদ্ধরসস্পর্শাত্তাম্রং ভবতি কাঞ্চনম্।
সন্নিধানাদগুরোরেবং শিষ্যো বিষ্ণুময়ো ভবেৎ।।

(শ্রী হঃ ভঃ বিঃ ১৭শ বিঃ ১৩০)

যেরূপ সিদ্ধ পারদ-সংস্পর্শে তাম্র স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সদ্গুরুসমীপে বাস-ফলে শিষ্যও বিষ্ণুময় হইয়া উঠেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের নিষ্কপট বিষ্ণুময় সেবকগণের অহৈতুক কৃপা-প্রভাবে এই অনর্থযুক্ত পতিত দুরাচার কবে নিষ্কপট-রিঘসাশী ও নিষ্কপট-অন্তেবাসী হইতে পারিবে? সে দিন কবে হইবে?

তৎ শ্লাঘ্যং জন্ম ধন্যং তদ্ দিনং পুণ্যাথ নাড়িকা।
যস্যাং গুরু প্রণমতে সমুপাস্য তু ভক্তিতঃ।।
গুরুশুশ্রূষণং নাম সর্ব্বধর্ম্মোত্তমোত্তমম্।
তস্মাৎ যস্মাৎ পরো ধর্ম্মঃ পবিত্রং নৈব বিদ্যতে।।

গুরু-সেবক কুরেশ

আচার্য্য শ্রীরামানুজের চরিত্র-প্রসঙ্গে তদীয় শিষ্য-রত্ন শ্রীকুরেশের গুরুভক্তির আদর্শ-গাথা শুনিতে পাই। কাঞ্চিপুরের প্রায় একক্রোশ পশ্চিমে 'কুর-অগ্রহার' নামক স্থানের ভূস্বামী বলিয়া উক্ত ভক্তপ্রবর "কুরেশ" নামে খ্যাত ছিলেন। কুরেশ বাৎস্যগোত্রীয় ধনাঢ্য ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি অণ্ডাল-নাম্নী এক পরমা সুশীলা সহধর্ম্মিণীর পাণিগ্রহণ করেন। কুরেশের বিপুল ঐশ্বর্য্য অতিথি-সৎকারাদি সৎকার্য্যেই নিয়োজিত ছিল। কুরেশ বাল্য- কালেই শ্রীলক্ষ্মণদেশিকের (শ্রীরামানুজাচার্য্যের) দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করিয়া তাঁহাকে প্রগাঢ় ভক্তির পাত্ররূপে বরণ করিয়াছিলেন। শ্রীলক্ষ্মণদেশিক সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, কুরেশ সস্ত্রীক আচার্য্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন এবং প্রায় সর্ব্বদাই আচার্য্যের সন্নিধানে অবস্থান-পূর্ব্বক আচার্য্যের বাণী শ্রবণ ও আচার্য্যের প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিতেন। কুরেশের অতুলনীয় পাণ্ডিত্য-প্রতিভা ও অদ্ভুত স্মৃতি- শক্তি ছিল। এক কথায় জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী—এই চারিটী বিষয় একাধারে কুরেশে দেদীপ্যমান থাকিলেও ঐ সকল তাঁহার ভগবৎসেবার সম্পূর্ণ অনুকূল হইয়াছিল।

কুরেশ বিচার করিলেন, কেবল সাধারণ অতিথি সেবা, দীন-সেবা প্রভৃতিতে অর্থ নিযুক্ত হইলে তাহাতে অর্থের যথার্থ সদ্ব্যবহার সাধিত হয় না অর্থাৎ উহা দ্বারা একান্ত জগন্মঙ্গল বা পরমার্থ-লাভ ঘটে না। ঐরূপ কার্য্য বিষয়ী কর্ম্মিগণের চমৎকারিতা উৎপাদন করিতে পারে; কিন্তু ভগবৎসেবা, লক্ষ্মীপতির পূজা, বিশেষতঃ লক্ষ্মীপতির ভক্তগণের পূজায় অর্থ-নিয়োগই অর্থের যথার্থ সদ্ব্যবহার। ইহা বিচার-পূর্ব্বক কুরেশ কাঙ্গালের বেশে শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব- নিবেদনার্থ শ্রীরঙ্গমে যাত্রা করিলেন।

পারমার্থিক ইতিহাস-পাঠকগণ জানেন যে, শ্রীরামানুজাচার্য্য বোধায়ন- বৃত্ত্যনুসারী শ্রীভাষ্য রচনা করেন। কাশ্মীরদেশান্তর্গত সারদাপীঠে বোধায়নবৃত্তি গুপ্তভাবে সংরক্ষিত আছে সংবাদ পাইয়া শ্রীভাষ্য রচনা করিবার পূর্ব্বে আচার্য্য শ্রীরামানুজ প্রিয় শিষ্য কুরেশকে লইয়া সারদাপীঠে (বর্ত্তমান ব্রিজব্ররো) গমন করেন। মহর্ষি-বোধায়ন-রচিত বৃত্তি বা তদনুসারিণী ব্যাখ্যা প্রভৃতি প্রচারিত হইলে কেবলাদ্বৈতমতবাদ চিরতরে বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইবে বিচার করিয়া সারদাপীঠের তদানীন্তন কেবলাদ্বৈতবাদিগণ, ঐ পুঁথিটি কীটদষ্ট বিনষ্ট হইয়াছে,—শ্রীরামানুজের নিকট এরূপ অসত্যোক্তি প্রচার করেন।

শ্রীরামানুজ তিনমাসকাল পরিশ্রমের পর সারদাপীঠে উপনীত হইয়াছিলেন। বোধায়নবৃত্তি সংগৃহীত না হইলে তাঁহার ভাষ্য-রচনাই সম্ভব হইবে না, শ্রীল যামুনাচার্য্যের আজ্ঞা ও মনোঽভীষ্ট-পরিপালন অসম্ভব হইবে; সুতরাং তাঁহার (শ্রীরামানুজের) জীবনধারণ বৃথা,—এইরূপ বিচার করিতে করিতে ক্ষুণ্নমনা হইয়া শ্রীরামানুজ একদিন সারদাপীঠে শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় সারদাদেবী (শ্রীসরস্বতী) স্বয়ং বোধায়নবৃত্তি হস্তে গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীরামানুজের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং অবিলম্বে ঐ পুঁথি লইয়া শ্রীরামানুজ ও কুরেশকে স্থান পরিত্যাগের আদেশ করিলেন। শ্রীরামানুজ সারদাপীঠের পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট কোন কথা

প্রকাশ না করিয়া কেবলমাত্র তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ-পূর্ব্বক কুরেশের সহিত সারদা পীঠ পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন।

শ্রীরামানুজ ও কুরেশ চলিয়া যাইবার কয়েক দিবস পরে সারদাপীঠে কেবলাদ্বৈতবাদিগণ গ্রন্থাগারে বোধায়নবৃত্তি পুঁথিটি অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ঐ পুঁথিটি তথায় দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে কতিপয় দ্রুতগামী বলবান্ পুরুষ দিবারাত্র দ্রুতবেগে চলিতে চলিতে একমাস পরে পথিমধ্যে শ্রীরামানুজ ও কুরেশের সাক্ষাৎ পাইয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট হইতে পুঁথিটি কাড়িয়া লইলেন এবং সারদাপীঠে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হইলেন।

এবার শ্রীরামানুজের আর দুঃখের অবধি রহিল না। তাঁহার চিরাভীপ্সিত গুরু-সেবা—শ্রীযামুনাচার্য্যের মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণ—বুঝি চিরতরে ব্যর্থ হইল, ইহা ভাবিয়া আচার্য্য যতিরাজ অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। গুরুপ্রাণ কুরেশ তখন শ্রীগুরুদেবকে আশ্বাস প্রদান-পূর্ব্বক কহিলেন—"প্রভো! আপনি চিন্তা করিবেন না। কাশ্মীর হইতে যাত্রা করিয়া অবধি এই একমাসকাল প্রতিরাত্রে আপনার বিশ্রামের পর আমি বৃত্তিটি পাঠ করিতাম। ইহাতে সমগ্র বোধায়নবৃত্তিটি আমার কণ্ঠস্থ হইয়াছে। আমি কয়েক দিবসের মধ্যেই ইহা অটুট লিখিয়া ফেলিতেছি।"

যতিরাজ শ্রীরামানুজ কুরেশের-বাক্য শ্রবণে যেন নষ্ট সম্পত্তি পুনরায় ফিরিয়া পাইলেন এবং যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। বোধায়নবৃত্তি লেখা শেষ হইলে কুরেশের সহিত যতিরাজ শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক অন্যান্য শিষ্যগণের নিকট এইসকল বৃত্তান্ত বলিলেন এবং কুরেশের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অতঃপর আচার্য্য শ্রীরামানুজ প্রিয় শিষ্য কুরেশকে তাঁহার লেখক করিয়া শ্রীভাষ্য রচনা আরম্ভ করিলেন। কুরেশ গণেশের ন্যায় আচার্য্যের সমগ্র ভাষ্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়া সুবৃহৎ ভাষ্য লিখিয়া ফেলিলেন।

যে-সময়ে বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীমদ্রামানুজের বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইতেছিল, সেই সময় চোলরাজ্যের অধিপতি কৃমিকণ্ঠ নিজ রাজধানী কাঞ্চিপুরে অবস্থান করিয়া সমগ্র চোলরাজ্যকে শৈব-মতে আনয়নের প্রবল চেষ্টা করিতেছিল। চোলরাজ কৃমিকণ্ঠ সচ্ছাস্ত্র-পরিপন্থী ভবব্রতধর পাষণ্ডপন্থীর আদর্শ ছিল। যথার্থ দৈবপ্রকৃতি বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবোত্তম শিবকে বিষ্ণুর প্রিয়তম ও অভিন্নাত্মারূপে দর্শন করেন। আর অদৈব সম্প্রদায় সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র পরমেশ্বর বিষ্ণুর ন্যায় তদধীন শিবাদি দেবতাকেও স্বতন্ত্র পরমেশ্বররূপে কল্পনা-পূর্ব্বক গীতাভাগবতাদি সৎশাস্ত্রের পরিপন্থী পাষণ্ডমতাবলম্বী হইয়া থাকে। চোলাধিপতি কৃমিকণ্ঠ মনে করিল,—যদি কোন প্রকারে পরম প্রতিভাশালী রামানুজকে পাষণ্ডশৈবমতে (অর্থাৎ শিবকে স্বতন্ত্র পরমেশ্বররূপে কল্পনাকারীর মতে—শিবকে বৈষ্ণবোত্তমরূপে পূজা 'পাষণ্ডমত' নহে) আনয়ন করা যায়," তাহা হইলে সমগ্র চোলরাজ্য শৈবমতের স্বারাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহা সঙ্কল্প করিয়া কৃমিকণ্ঠ কতিপয় ক্রূরপ্রকৃতি বলিষ্ঠ ব্যক্তিকে রামানুজের নিকট প্রেরণ করিল। ঐ সকল রাজপুরুষ শ্রীরামানুজকে অবিলম্বে কাঞ্চিপুরে গমনার্থ রাজাদেশ জ্ঞাপন করিলেন।

গুরুপ্রাণ কুরেশ একান্তে শ্রীরামানুজাচার্য্যকে বলিলেন যে, তিনি (কুরেশ) বিশ্বস্ত লোকমুখে শুনিয়াছেন, কৃমিকণ্ঠ আচার্য্যের প্রাণ সংহার করিবার জন্যই আচার্য্যকে কাঞ্চিপুরে আহ্বান করিয়াছেন। কারণ, শ্রীরামানুজের প্রাণসংহার ব্যতীত চোলরাজ্যে পাষণ্ড-মত প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। অতএব আচার্য্যের কিছুতেই কাঞ্চিপুরে যাওয়া উচিত নহে। অথচ কাঞ্চিপুরে না গেলেও অসুরপ্রকৃতি নৃশংস চোলরাজের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া অসম্ভব। এরূপ সঙ্কটে গুরুসেবৈক- জীবাতু কুরেশ আচার্য্যের চরণে নিবেদন করিয়া বলিলেন,—"প্রভো! জগতে আপনার অবস্থান সমগ্র পৃথিবীর মঙ্গলসেতু; কারণ, আপনার শ্রীপাদপদ্মসেবাই ভগবৎপাদমূলে গমনের একমাত্র রাজকীয় পথ। অতএব আপনি অনুমতি করুন,—আপনার পরিবর্ত্তে এই নির্ঘৃণ্য নরাধম কৃমিকণ্ঠের রাজদরবারে গমন করুক। আপনি আমার শুভ্র বসন পরিধান-পূর্ব্বক অন্য দ্বার দিয়া শ্রীরঙ্গমে গমন করুন এবং আমি কাষায় বস্ত্র ও ত্রিদণ্ড গ্রহণ-পূর্ব্বক চোলরাজের প্রেরিত রাজপুরুষ-গণের অনুগমন করি। আর কালবিলম্বের অবসর নাই, নতুবা বিপদ অবশ্যম্ভাবী।" আচার্য্য শ্রীরামানুজ বিশেষ চিন্তা পূর্ব্বক অর্থাৎ তাঁহাকে শ্রীযামুনাচার্য্যের অনেক মনোঽভীষ্ট পরিপূরণ-সেবা সম্পন্ন করিতে হইবে চিন্তা করিয়া এবং ভবিষ্যতে কুরেশের গুরু-সেবার আরও উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত প্রকাশার্থ কুরেশের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া অনতিবিলম্বে তিনি কুরেশের বেশ ধারণ-পূর্ব্বক দ্রুতপদে মঠ হইতে পশ্চিমাভিমুখে বনোদ্দেশে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। গোবিন্দাদি শিষ্যবর্গও ক্রমে ক্রমে আচার্য্যের অনুগমন করিলেন।

এ দিকে কাষায়বস্ত্র-পরিহিত ত্রিদণ্ড-ধৃক্ কুরেশ রাজপুরুষগণের সহিত কাঞ্চিপুরে কৃমিকণ্ঠের নিকট উপস্থিত হইলে কৃমিকণ্ঠ ছদ্মবেশী কুরেশকে যতিরাজ রামানুজ বলিয়াই অবধারণ করিল এবং রামানুজ তাহার আট বৎসর বয়ঃক্রম- কালে কৃমিকণ্ঠের পিশাচগ্রস্তা ভগ্নীর আরোগ্য বিধান করিয়াছিলেন জানিয়া ও তাঁহার পাণ্ডিত্যপ্রতিভার কথা স্মরণ করিয়া রামানুজ-বেষী কুরেশকে অভ্যর্থন্যপূর্ব্বক তাঁহার সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গ আরম্ভ করিল। কৃমিকণ্ঠ জিজ্ঞাসা করিল,— 'মনুষ্যের কর্ত্তব্য কি?' রামানুজবেষী কুরেশ বলিলেন,—"মনুষ্য কেন, আব্রহ্মাস্তম্ব সকল জীবেরই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সেবাই একমাত্র কর্ত্তব্য"। ইহা শ্রবণমাত্রেই কৃমিকণ্ঠ ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িল এবং বলিতে লাগিল যে, "মহাকাল শিবের হস্তে কালক্রমে বিষ্ণুও বিনষ্ট (?) হয়। সেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর শিবকে পরিত্যাগ করিয়া যে-ব্যক্তি দুর্ব্বল বিষ্ণুর উপাসনা করে ও তাহার ভক্ত-নামধারী ভণ্ডদের সেবা করে, তাহার ন্যায় মূর্খ আর কেহ নাই। অতএব আপনি এখনই শৈবমতে দীক্ষিত হউন। আমার পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করুন; শৈবদীক্ষা গ্রহণ না করিলে আপনার নিস্তার নাই।"

রামানুজবেষী কুরেশকে একাকী প্রাপ্ত হইয়া শৈবমতাবলম্বী সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থী পণ্ডিতব্রুবগণ অনেক প্রকারে নির্য্যাতিত করিবার চেষ্টা করিলেও কুরেশের সুদার্শনিক সিদ্ধান্তে তাহারা শতসহস্রবার বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। অবশেষে কৃমিকণ্ঠ অসহিষ্ণু হইয়া কুরেশকে বলিল,—"ওহে কুতার্কিক, যদি প্রাণে বাঁচিতে চাও, তাহা হইলে বল, 'শিবাৎ পরতরো নাস্তি' অর্থাৎ শিব হইতে আর শ্রেষ্ঠ কেহ নাই।" কুরেশ নির্ভীক-হৃদয়ে

বলিলেন,—"দ্রোণমস্তি ততঃ পরম্" অর্থাৎ শিব হইতে দ্রোণ অধিক। এখানে 'শিব' ও 'দ্রোণ' পরিমাণ-বাচক শব্দ।

ইহা শুনিয়া চোলরাজ কৃমিকণ্ঠের ক্রোধাগ্নি আরও দ্বিগুণতর হইয়া জ্বলিয়া উঠিল। কৃমিকণ্ঠ রাজ-পুরুষদিগকে আজ্ঞা করিল,—"এখনই দুরাত্মার চক্ষু-দুইটি উৎপাটন কর। এই ব্যক্তি পূর্ব্বে আমার ভগ্নীর উপকার করিয়াছে বলিয়া কেবল ইহাকে প্রাণে সংহার করিও না।"

রাজাদেশে ক্রূরপ্রকৃতি রাজপুরুষগণ কুরেশের চক্ষু দুইটী উৎপাটন করিয়া ফেলিল। কুরেশ এইরূপ কঠোর পরীক্ষার মধ্যেও একান্ত সহিষ্ণুতার সহিত শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্মরণ করিতে লাগিলেন। কুরেশ এইরূপ বিপদের মধ্যে একটুকুও বিচলিত না হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের "তত্তেঽনুকম্পাং" শ্লোক বিচার করিতে করিতে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্মে অধিকতর গাঢ়ভাবে কায়মনোবাক্য সংলগ্ন করিলেন এবং রাজপুরুষগণকে বলিলেন,—"তোমারা আমার যথার্থ বান্ধব; যেহেতু যে চক্ষুর্দ্বয় সতত আমাকে জাগতিক-রূপজ মোহে প্রলুব্ধ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের সৌন্দর্য্য দর্শন হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিত, তোমরা আমার সেই ভোগময় চক্ষুকে নষ্ট করিলে। পরমেশ্বর বিষ্ণু তোমাদের মঙ্গল করুন, শ্রীগুরুপাদপদ্মের জ্ঞানাঞ্জনশলাকা আমার দিব্য নয়ন উন্মীলন করিয়া দিলেই আমি কৃতকৃতার্থ হইব।' রাজপুরুষগণ কুরেশের অত্যদ্ভুত সহিষ্ণুতা ও অহিংসা প্রকৃতি দর্শন করিয়া যুগপৎ আশ্চর্য্যান্বিত ও ভীত হইল। তাহারা পথস্থ একটি ভিক্ষুককে ডাকিয়া আদেশ করিল,—'তোকে কিছু অর্থ দিতেছি, তুই এই অন্ধ সাধুটির হাত ধরিয়া ইঁহাকে শ্রীরঙ্গমে লইয়া যা।' ভিক্ষুকের সহিত কুরেশ শ্রীরঙ্গমে আসিয়া পৌঁছিলেন। এদিকে কিছুদিনের মধ্যেই পাষণ্ড কৃমিকণ্ঠ এক উৎকট ভীষণ-যন্ত্রণাদায়ক, দীর্ঘকালস্থায়ী অস্পৃশ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া অকথ্য যন্ত্রণায় বিকট চীৎকার করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল।

আচার্য্য-সেবার মূর্ত্ত আদর্শ কুরেশ সহধর্ম্মিণী অণ্ডাল ও পুত্র পরাশরের সহিত শ্রীরঙ্গম্ হইতে 'কৃষ্ণাচল' নামক স্থানে আগমন-পূর্ব্বক কিছুকাল ভগবৎ-সেবার্থ তথায় বাস করিলেন এবং আচার্য্যের শ্রীপাদপদ্ম-ধূলি-গ্রহণার্থ 'কৃষ্ণাচল' হইতে 'যাদবাদ্রি'তে গমন করিলেন। আচার্য্য শ্রীরামানুজ স্বীয় পদপ্রান্তে ছিন্ন কদলীবৎ পতিত প্রিয়শিষ্য কুরেশকে ভূতল হইতে উঠাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন-পূর্ব্বক অশেষ আশীর্ব্বাদ ও তাঁহার জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শ্রীরামানুজ কুরেশকে বলিলেন,—'বৎস! তুমি কাঞ্চিপুরে গমন-পূর্ব্বক শ্রীবরদরাজের নিকট চক্ষুর জন্য প্রার্থনা কর, ইহা আমার একান্ত অভিলাষ।' কুরেশ শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞায় কাঞ্চিপুরে গমনপূর্ব্বক শ্রীবরদরাজ বিষ্ণুর নিকট নিজের দৈহিক চক্ষুর জন্য প্রার্থনা না করিয়া দিব্যচক্ষু প্রার্থনা এবং নিজ-চরণে অপরাধী অর্থাৎ তাঁহার চক্ষু উৎপাটন কারিগণের মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। যাদবাদ্রিস্থ আচার্য্য শ্রীরামানুজ যখন লোকমুখে শুনিতে পাইলেন যে, কুরেশ নিজচক্ষু প্রার্থনা না করিয়া নিজশত্রুকুলের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছেন, তখন তিনি জনৈক শিষ্য-দ্বারা কুরেশকে বিশেষভাবে আদেশ করিয়া পাঠাইলেন—'বৎস, কুরেশ। তুমি কেবল নিজ আনন্দলাভের জন্য শত্রুকুলের মঙ্গল প্রার্থনায়

কৃতকৃত্য হওয়ায় স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়াছ। তুমি জান,—তোমার দেহ, মন, আত্মা সকলই আমাতে সমর্পিত ও আমার সম্পত্তি; সুতরাং তুমি আমার সুখবিধানের জন্য শ্রীবরদরাজের নিকট তোমার নয়নদ্বয় প্রার্থনা কর। কারণ, হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সুখ-প্রার্থনাই যথার্থ সেবা।”

এবার আচার্য্যের আদেশে ও তাঁহার সুখেচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়াই কুরেশ শ্রীবরদরাজের নিকট নয়নদ্বয় ভিক্ষা করিবামাত্র পুনরায় পূর্ব্ববৎ চক্ষুর্দ্বয় লাভ করিলেন এবং হরিগুরুপাদপদ্ম সৌন্দর্য্য-দর্শনে চক্ষুকে নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন। আচার্য্য রামানুজের শিষ্যশ্রেষ্ঠ কুরেশের এই অত্যদ্ভুত গুরুসেবার কথা জগতে প্রকাশিত হইবামাত্র সমগ্র দাক্ষিণাত্যবাসী শ্রীরামানুজাচার্য্যের পাদপদ্মে অধিকতর আকৃষ্ট হইলেন। নিত্যমুক্ত ভগবৎপার্ষদ আচার্য্য শ্রীরামানুজ ও শিষ্য-গৌরব প্রচারার্থ সর্ব্বসমক্ষে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—“আমার শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ-শ্রীচরণযুগলপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভভাবী, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই; কারণ, কুরেশ যখন শত্রুগণকেও মুক্তিদানে সমর্থ হইয়াছেন, তখন তাঁহার সঙ্গ পাইয়া আমিও হরিভজনে কৃতার্থ হইব।” জগতে এইরূপ অকৃত্রিম গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধই কাম্য। নিরপেক্ষ চক্ষুষ্মান্ হইলে এই ঘোর তর্কযুগেও এইরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শ্রীগুরুসেবার আদর্শ প্রকটিত দেখিতে পাওয়া যায়।

মাংসদৃক্ ও বেদদৃক্

‘মাংসদৃক্’ ও ‘বেদদৃক্’ শব্দদ্বয়—শ্রীমদ্ভাগবতীয় পরিভাষা। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৩য় অধ্যায়ের ২৮শ সংখ্যক শ্লোকে ‘মাংসদৃক্’ * শব্দ এবং ৭ম স্কন্ধের ১১শ অধ্যায়ের ৩১শ সংখ্যক শ্লোকে ‘বেদদৃক্’ শব্দ দৃষ্ট হয়। † এই শব্দদ্বয় মানব-সঙ্গের মনো-বিজ্ঞান ও আত্মবিজ্ঞানের এরূপ সুন্দর বিশ্লেষক যে, এত স্বল্পপরিসর শব্দে এরূপ বিপুল বিচারময় সিদ্ধান্ত ও বাগ্মিতাপূর্ণ গবেষণার ভাণ্ডার খুব কম শব্দের দ্বারাই প্রকাশিত হইয়াছে। ‘মাংসদৃক্’ অর্থে যাহারা ভ্রম-প্রমাদাদি চর্ম্মচক্ষুর স্থূল প্রত্যক্ষকেই বহুমানন করেন, আর ‘বেদদৃক্’ অর্থে যাঁহারা শ্রৌত আত্মবিচারের অনুসরণ করেন, তাঁহাদিগকে বুঝায়।

* * *

ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরীর উদরস্থ বদ্ধ-জীবকোটি আমরা, সকলেই ন্যূনাধিক ‘মাংসদৃক্’ শব্দের বাচ্য বিষয়। আমরা মাংসের চক্ষু লইয়া সর্ব্বদা মাংসের রূপ দর্শন করিবার জন্য লালায়িত। মাংস ষড়্‌বিধ বিকারযুক্ত। মাংস পচিয়া যায়, গলিয়া যায়, শুষ্ক হয়, অগ্নিতে দগ্ধ হয়, তথাপি সেই পচা মাংস লইয়াই আমরা টানাটানি, কাড়াকাড়ি, মারামারি করিয়া থাকি। মাংসের রূপ ছাড়া, মাংসের স্থূলতা ছাড়া অন্য কোন বস্তু আমাদের

---

* রূপঞ্চেদং পৌরুষং ধ্যানধিষ্ণ্যং মা প্রত্যক্ষং মাং সদৃশাং কৃষীষ্ঠাঃ।।

† প্রায়ঃ স্বভাববিহিতো নৃণাং ধর্ম্মো যুগে যুগে।
বেদদৃগ্‌ভিঃ স্মৃতো রাজন্ প্রেত্য চেহ চ শর্ম্মকৃৎ।।
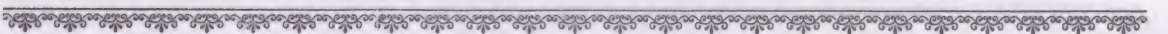
নিকট 'বাস্তব' বলিয়াই মনে হয় না। আমরা মাংসের নয়নে মাংসের ধ্যান করিতে করিতে মাংসের বিচারে এরূপ সমাধিগ্রস্ত হইয়াছি যে, মাংস ছাড়া আমাদের অন্য কোন বিষয়ে ইষ্ট-স্ফূর্ত্তিই হয় না। মাংসই আমাদের ইষ্ট, মাংসই আমাদের অভীষ্ট, মাংসই আমাদের ধ্যান, মাংসই আমাদের ধ্যেয়, মাংসই আমাদের ধ্যাতা, মাংসই আমাদের আশার আলোক, মাংসই আমাদের কেন্দ্র, মাংসই আমাদের বৃত্ত, মাংসই আমাদের পরিধি, মাংসই আমাদের মেধা, মাংসই আমাদের ব্রত, মাংসই আমাদের তপ—জপ। মাংস আমাদের হৃদয়ের দেবতা, মাংসই আমাদের নিত্য পরিক্রমার মন্দির। মাংস আমাদের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদনের বিষয়। মাংস আমাদের 'সম্বন্ধ', মাংস আমাদের 'অভিধেয়', মাংসই আমাদের 'প্রয়োজন'।

জগৎ 'মাংস চাই', 'মাংস চাই'—কোলাহলে পাগল। মাংসের প্রতি যাঁহার যতটা আসক্তি, তিনি এই বিশ্বে ততটা প্রেমিক। বিশ্বমাংস-প্রেমই বুঝি বিশ্বপ্রেম! মাংসের বিজ্ঞানে যিনি যতটা অভিজ্ঞ, তিনি ততটা শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। মাংস-দর্শনে যাঁহার দৃষ্টি যতটা লুব্ধ, তিনি ততটা দার্শনিক। মাংসের কাব্যে, মাংসের কথা-বিশ্লেষণে যিনি যতটা পারদর্শী, তিনি ততটা কবি, ততটা সাহিত্যিক, ততটা কথা-শিল্পী।

পাঠক! যদি আপনি 'বেদদৃক' হইয়া থাকেন, তাহা হইলে জগতে ঐ কথাগুলির সত্যতা বর্ণে বর্ণে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। জগৎ 'মাংস' লইয়া কিরূপ কাড়াকাড়ি, মারামারি করিতেছে, কিরূপ শ্ব-বৃত্তির কৃষ্টি-সাধনকেই জাগতিক অভ্যুদয় ও উন্নতির সীমা মনে করিতেছে, তাহা দর্শন করিতে পারিবেন।

মাংস-ব্যবসায় জগতে আজ নানা মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কর্ম্ম-রাজ্যের বিভিন্ন বিচার-আচার মাংস ব্যবসায়ের বিভিন্ন বিপণি মাত্র। 'বেদদৃক' হইলে এই কথাটী মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভবের বিষয় হয়। মাংসব্যসায়িগণ কেহ স্ত্রী-পুত্রাদি-কথার দোকান খুলিয়াছেন, কেহ স্ত্রী পুত্রাদি কথা পরিত্যাগের আপাত-ছলনার নামে ব্যভিচারের বিপণি উন্মুক্ত করিয়াছেন, কেহ সমাজ-সেবা, দেশ-সেবার ছলনা লইয়া মাংস-ব্যবসায় পাতিয়াছেন, আবার কেহ কেহ ধর্ম্মের পৌরোহিত্যের পোষাক পরিয়া মাংস-ব্যবসায় চালাইতেছেন!

পূর্ব্বে মাংস-ব্যবসায় ব্যাধ নিষাদাদি নীচ জাতির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, এখন সর্ব্বোচ্চ কুলাভিমানী ব্যক্তিগণও নাকি মাংসমোদিনী দেবতার 'আসন' স্থাপন করিয়া বাজারে মাংস ব্যবসায় চালাইতেছেন। ব্যবহারিক জগতে যে ব্যবহার বাধা-প্রাপ্ত হয় নাই, পারমার্থিক জগতের ছলনার মধ্যেও যে তাহা সহজে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? কাজেই ধর্ম্মের ভাবনা দিয়া মাংস-ব্যবসায়টী বৈশ্য-জগতের বাজারে ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরীর 'বলি' রূপে ক্রমশঃই বিস্তৃত হইয়া জগতের মাংসদৃক্-সম্প্রদায়ই বৃদ্ধি করিতেছে।

মাংসদৃক্সম্প্রদায় আজ গণ-শক্তির উপাসক, যে শক্তি মাংস-বুভুক্ষা—মাংস-লালসা—মাংস-স্পর্শের উত্তেজনা ক্রমশঃ বাড়াইয়া দেয়। মনীষী কুল্লুক বলেন, আমি যাহার মাংস খাইব, সেও পরজন্মে আমার মাংস খাইবে, ইহাই কর্ম্মফল।

যেখানে মাংস আমাদের বরণীয় দেবতা হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে আমরা নিশ্চয়ই এক মাংসদৃক্ অপর মাংসদৃকের সহিত খাদ্য-খাদক, ভোগ্য-ভোক্তৃ-সম্বন্ধে অবস্থিত; সেখানে বাহিরের মৌখিকতায় যতই কপট-প্রেমের মোহন বাক্য থাকুক্ না কেন, অন্তরে ফল্গু নদীর ন্যায় মাংসবুভুক্ষার পচা রুদ্ধ বাসনানিহিত রহিয়াছে; সেখানে প্রাকৃত-প্রসবিনী শক্তি প্রলয়ের রুদ্র মূর্ত্তির দিকে অভিসার করিতেছে। এক একটী যুদ্ধ মহাযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, দেশ-প্রেম ও জাতি-প্রেমের উন্মত্ততা মাংস-দৃগ্‌গণের প্রসবিনী-শক্তিকে কিরূপে প্রলয়মূর্ত্তি রুদ্রের সহিত রমণ করাইয়া মাংসদৃগ্‌গণের পরিণতি প্রকাশ করিয়া দিতেছে, তাহা দেখিবার বিষয় হইলেও 'কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্' বাক্যের বিষয়ীভূত মাংসদৃক্-সম্প্রদায়ের মাংসচক্ষুর নিকট তাহা দ্বিতীয় ইন্দ্রজালই সৃষ্টি করিতেছে।

বেদদৃক-সম্প্রদায়ের কোন কথা মাংসদৃক্-সম্প্রদায়ের মাংসময়ী মনীষার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে না। মাংস-মেধা, গৃহমেধা আমাদিগকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে; তাই বেদদৃক সম্প্রদায়ের কোন উপদেশই আমদের চিত্তে অবকাশ বা অবস্থান পাইতেছে না। আমাদের কথা—আগে মাংস রক্ষা, মাংস-সুখ-সম্বর্দ্ধন; তৎপরে মাংসাতিরিক্ত যদি কোন বস্তু থাকিয়া থাকে, অবসরমত তাহার কথা শুনা যাইবে। আর সেই শ্রবণীয়, কীর্ত্তনীয় বস্তুও যদি মাংসের কোন মেদ বৃদ্ধি করিতে না পারে, তাহা হইলে সেরূপ বস্তুর সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়াও কিছু অযৌক্তিক্ ও অধার্ম্মিক কার্য্য নহে। ইহাই যুগের প্রবল অভিমত।

জগতে দেশে দেশে, ঘরে ঘরে আমরা মাংস-প্রদর্শনী খুলিয়া মাংসের রূপ দর্শন ও প্রদর্শন করিতেছি, তাহাতে আমাদের আপত্তিকর বিশেষ কিছু নাই। মাংসের রূপমহোৎসবে অগণিত অর্থব্যয়, মাংস-মনীষার কৃষ্টি-সাধনের শিক্ষা-মন্দির-সংস্থাপনে দেশ ও জাতির অজস্র অর্থ-নিয়োগ, মাংস-মেধার পরিবর্দ্ধনে—মাংস-পুষ্টির সৌকর্য্যার্থে যে-সকল চেষ্টা, তাহাতে প্রতিবাদ-যোগ্য কোন কথা মাংসদৃক্ গণগড্ডলিকার মুখ হইতে নির্গত না হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু যখন বেদদৃক্-সম্প্রদায় মাংসাতিরিক্ত রাজ্যের কথা—শ্রৌতদৃষ্টির কথা, শ্রৌতদেশের নাম-রূপ-মহোৎসবের কথা কীর্ত্তনে প্রাণ, অর্থ, শক্তি নিয়োগ করেন, যখন বেদ দৃগ্‌গণ সুদর্শনের প্রদর্শনী উন্মুক্ত করেন, তখন মাংসদৃক্ সম্প্রদায় ভাগবতীয় শ্ব-বিড়্‌বরাহ-উষ্ট্র-খর অথবা 'যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে'-শ্লোক-কথিত 'গোখর'বৎ অথবা মহাভারতীয় শূকর-রূপী ইন্দ্রবৎ যে-সকল ভীষণ আর্ত্তনাদ উঠাইয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদের দৃষ্টির অভাব-জ্ঞাপক। বেদদৃক-সম্প্রদায় মাংসদৃগ্‌গণকে ক্রমে ক্রমে মাংস-দর্শনের সমাধি হইতে পরিত্রাণ করিয়া বেদ-দর্শনের কীর্ত্তনের পথে চালিত করিতে চাহেন।

শ্রীমদ্ভাগবত কিরূপ মাংস-দর্শনকে নিরাস করিয়া লোকের বেদ-দর্শন উন্মীলন করিয়াছেন, আমরা তৎসম্বন্ধে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না,—

ত্বক্‌শ্মশ্রুরোমনখকেশ-পিনদ্ধমন্তর্ম্মাংসাস্থিরক্তকৃমিবিট্ কফপিত্তবাতম্।
জীবচ্ছবং ভজতি কান্তমতির্বিমূঢ়া যা তে পদাব্জমকরন্দমজিঘ্রতী স্ত্রী।।

(ভাঃ ১০।৬০।৪৫)

যে বিমূঢ়া স্ত্রী আপনার (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) পাদপদ্মের মকরন্দ আঘ্রাণ করে নাই, সেই স্ত্রী উপরে ত্বক্, শ্মশ্রু, রোম, নখ ও কেশাচ্ছন্ন এবং অন্তরে মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, বিষ্ঠা, কফ, পিত্ত ও বায়ু পরিপূরিত জীবিত শবকে "এই আমার কান্ত" ইহা ভাবিয়াই ভজনা করিয়া থাকে।

অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্য্যা বালাত্মজাত্মজাঃ।
অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথা জীবন্তি দুঃখিতাঃ।।
এবং গৃহাশয়াক্ষিপ্তহৃদয়ো মূঢ়ধীরয়ম্।
অতৃপ্তস্তাননুধ্যায়ন্ মৃতোঽন্ধং বিশতে তমঃ।। (ভাঃ ১১।১৭।৫৮)

'হায়! আমার বৃদ্ধ মাতা-পিতা, শিশুসন্তান-বিশিষ্টা ভার্য্যা এবং সন্তানগুলি আমা বিনা অনাথ ও দুঃখিত হইয়া দীনভাবে কিরূপেই বা জীবনধারণ করিবে?' এই প্রকার গৃহাভিলাষে আক্ষিপ্তচিত্ত, অসন্তুষ্ট ও মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি পুত্রকন্যাদিগকে সর্ব্বদা ধ্যান করে এবং মৃত্যুর পর 'অন্ধ' নামক অতি তামসী যোনিতে প্রবেশ করে।

যন্মৈথুনাদি-গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছং কণ্ডুয়নেন করয়োরিব দুঃখ-দুঃখম্।
তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণা বহুদুঃখভাজঃ কণ্ডুতিবন্মনসিজং বিষহেত ধীরঃ।। (ভাঃ ৭।৯।৪৫)

গৃহমেধিগণের স্ত্রীসঙ্গাদিজনিত সুখ অতীব তুচ্ছ, উহাতে করদ্বয় সংঘর্ষণের ন্যায় দুঃখের পর দুঃখই দৃষ্ট হয়। কামুক ব্যক্তিগণ বহু দুঃখ ভোগ করিয়াও গৃহমেধসুখে পরিতৃপ্ত হয় না। (হে ভগবন্, আপনার কৃপায়) কণ্ডুতির (চুলকানির) ন্যায় ক্রমোত্তেজক ও পরিণামে যন্ত্রণাদায়ক কামকে কোন কোন ধীর ব্যক্তি ধারণ করিতে সমর্থ হন।

জিহ্বৈকতোঽচ্যুত বিকর্ষতিমাবিতৃপ্তা
শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি।। (ভাঃ ৭।৯।৪০)

হে অচ্যুত! জিহ্বা তৃপ্ত না হইয়া একদিকে অর্থাৎ যে দিকে মধুরাদি রস, সেই দিকে আমাকে আকর্ষণ করিতেছে। এইরূপ তোষণ-কুশল ইন্দ্রিয় অন্যদিকে, ত্বক্ আর একদিকে আকর্ষণ করিতেছে। উদর আহার্য্যের প্রতি এবং শ্রবণ, ঘ্রাণ ও চঞ্চল চক্ষু ভিন্ন বিষয়ের প্রতি, কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল বিভিন্ন কর্ম্মের প্রতি আকর্ষণ করিতেছে। সপত্নীগণ যেমন গৃহপতিকে আকর্ষণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করে, এই সকল ইন্দ্রিয় সেইরূপ ভিন্ন বিষয়ে আকর্ষণ করিয়া আমাকে বিব্রত করিতেছে।

মাংস-দর্শন-স্পৃহা কিরূপে প্রশমিত এবং পূর্ণসচ্চিদানন্দ কৃষ্ণপাদপদ্মের রূপ-দর্শন-স্পৃহায় চিত্ত কিরূপে প্রলুব্ধ হইতে পারে, তদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন প্রভু বলিয়াছেন,—

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ সর্ব্বাত্মনাশ্রিত পদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতি তরন্তি চ দেবমায়াং নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে।।

(ভাঃ ২।৭।৪২)

যদি কপটতা-রহিত হইয়া জীবকুল কায়মনোবাক্যে ভগবান্ অনন্তদেবের চরণে শরণাপন্ন হন, তাহা হইলে ভগবান তাঁহাদিগকে কৃপা করেন এবং তাঁহারা তাহা হইলেই অলৌকিকী মায়াসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারেন। ঐসকল কুক্কুর- শৃগাল-ভক্ষ্যদেহে "আমি ও আমার" বলিয়া শরণাগত ভক্তের অভিমান থাকে না।

যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণাপাদরবিন্দে নবনবরসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্য্যমানে ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ।।

(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিভাগ ৫।৩৯)

যে দিন হইতে আমার মন নব নব রসের আলয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, সেই দিন হইতে কদাপি নারীসঙ্গম স্মরণ হইলেও আমার অত্যন্ত মুখবিকার এবং তৎপ্রতি নিষ্ঠীবন (থুৎকার) নিক্ষেপরূপ জুগুপ্সা রতির উদয় হইয়াছে।

কৃষ্ণভক্তিসুধাপানাদ্দেহদৈহিক বিস্মৃতেঃ।
তেষাং ভৌতিকদেহেহপি সচ্চিদানন্দরূপতা।।

(বৃহঃ ভাঃ ২।৩।৪৫)

কৃষ্ণভক্তিরস-সুধা পান করিয়া দেহিজীবগণ স্থূল-সূক্ষ্ম দেহ ও তত্তদ্দেহ-সম্বন্ধীয় বস্তু বিস্মৃত হন। ঐরূপ কৃষ্ণভক্তের দেহ প্রাকৃত নহে, তাঁহাদের পাঞ্চভৌতিক দেহ স্মৃতি-বিলুপ্ত হইয়া আত্মদর্শনে সচ্চিদানন্দরূপতা প্রাপ্ত হয়।

কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্গুরুদেব জীবের মাংস-দৃষ্টি বিনষ্ট করিয়া বেদ-দর্শনের চক্ষু উন্মীলিত করেন। মাংস-দর্শনই অজ্ঞানতিমির। শ্রৌতবাণী—জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা; তদ্দ্বারা চক্ষুরুন্মীলন-কার্য্যই বেদদৃক্ গুরুদেব কর্ত্তৃক বেদ-চক্ষুপ্রদান-কার্য্য। এজন্য আমরা শ্রীগুরুদেবের প্রণামে—

'অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।"

—মন্ত্র পাঠ করি। হে গুরুদেব আমাদিগকে মাংস-দর্শন হইতে উদ্ধার করিয়া বেদ দর্শনের চক্ষু না দিলে, তিনি গুরুপদবাচ্য নহেন; আবার যে শিষ্যাভিমানী ব্যক্তি সর্ব্বোত্তম বেদ-দৃক্ শ্রীগুরুদেবে নিষ্কপটে প্রণত হইয়া বেদচক্ষু লাভ না করিলেন তিনিও শিষ্যপদবাচ্য নহেন। জগতের গণগড্ডলিকা যে মাটিয়া মাংস-দর্শনের মহাআবর্ত্তে পতিত, তাহা হইতে উদ্ধারকরিয়া বেদ-দর্শনের নেত্র প্রদান করেন বলিয়াই শ্রীগুরুদেব পরম করুণাময় ও পরদুঃখদুখী। আর জগতের কর্ম্মি-সম্প্রদায় আমাদের কাম্য আপাত প্রেয়ঃ মাংসদর্শন-পিপাসাকেই নানা আকারে সমৃদ্ধ করেন বলিয়া তাঁহারা মাংস দৃক্-সম্প্রদায়ের নিকট 'পরোপকারী' বলিয়া আপাত অভিনন্দিত হইলেও বস্তুতঃ তাহারাই সমাজের পরম শত্রু ও মহা হিংসক।

মাংস-দর্শন-পিপাসা প্রশমিত হইয়া শ্রীগুরুদেবের প্রদত্ত বেদ-দর্শনের চক্ষু বরণ না করিলে আমাদের কোন দিনই আত্মমঙ্গল লাভ হইতে পারে না। আমরা বেশে ও অভিমানে ব্রহ্মচারীই হই, গৃহস্থই হই, বানপ্রস্থই হই, কিম্বা সন্ন্যাসীই হই, মাংস-দর্শনই আমাদের কুগৃহান্ধকূপ; মাংসব্রতই—গৃহব্রত, মাংসমেধীই—গৃহমেধী। মাংসই—কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষার মূল। মাংস হইতেই জগৎ বা বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে, সুতরাং মাংসই মাটিয়া সংসার। ইট, পাথরের গৃহ-ত্যাগ কিম্বা পরিণীতা ভার্য্যা-ত্যাগ, অথবা জন্মভূমি, সমাজ, দেশ প্রভৃতির স্থূলতঃ ত্যাগ—সংসারত্যাগ নহে। মাংসদর্শন স্পৃহা পরিত্যাগই সংসার হইতে প্রকৃত মুক্তি বা জীবন্মুক্তি। জীবন্মুক্ত পুরুষগণের কায়মনোবাক্যের যাবতীয় চেষ্টা—পূর্ণ চিন্ময় বস্তুর সৌখ্য-বর্দ্ধনে নিযুক্ত। আর নিত্যবদ্ধগণের যাবতীয় চেষ্টা নিজের ও পরের মাংসের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-সাধনে নিযুক্ত।

মাংসদৃক্-সম্প্রদায় সমাজের মাংস-সম্বন্ধিনী আপাত তৃপ্তিকেই জগতের, সমাজের, দেশের বা জাতির প্রতি দয়া বা 'সেবা' (?) মনে করেন। আর বেদদৃক্-সম্প্রদায় আত্মার আবরণ উন্মোচনপূর্ব্বক আত্মানুশীলনের—কৃষ্ণানুশীলনের প্রেরণা-দানকেই সর্ব্বোত্তমা, নিত্যা অমন্দোদয়-দয়ার কার্য্যরূপে দর্শন করেন। মাংদৃক্-সম্প্রদায় সঙ্কীর্ণ ভ্রমপূর্ণদৃষ্টি ব্যক্তিগণের নিকট উদার বলিয়া খ্যাত হইলেও তাহারা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ; কেন না, শকুনীর ন্যায় তাহারা ঊর্দ্ধে বিচরণ করিবার ছলনা দেখাইলেও তাহাদের দৃষ্টি গো-ভাগারের দিকেই নিম্নে অবস্থিত। যাঁহাদের মাংসের রূপ-দর্শন-স্পৃহা স্বাভাবিকী উন্মুখতা লাভ করিয়াছে, তাঁহারাই জীবন্মুক্ত হইতে পারিবেন; নতুবা মাংস দর্শনের স্পৃহাকে অন্তরে লালন-পালন করিয়া বাহ্যে যতই বেশ ও কৃত্রিম আবেশের প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করি না কেন, তদ্দ্বারা কিছুতেই শ্রীরূপানুগ-গণের ভজনসন্ধান পাইব না। মাংসদৃকের ব্রহ্মচর্য্য নাই, গার্হস্থ্য নাই, সন্ন্যাস নাই, বানপ্রস্থের অভিনয় করিয়াও মাংসদৃক্—বান্তাশী। মাংসদৃক্ গৃহস্থাভিমানী হইয়াও—গৃহব্রত।

মহাবৈষ্ণবাপরাধ-মত্তহস্তী প্রবল হইলেই মাংস-দর্শন স্পৃহার মূল আমাদের হৃদয়ের গভীরতম স্থান পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। মাংস-দর্শনের মূলকে উৎপাটিতে করিতে হইলে নিষ্কপটে বেদদৃক শ্রীগুরুপাদপদ্মে আর্ত্তির সহিত শরণ গ্রহণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। মাংসদর্শনরূপ মহাসংসৃতির মহাদাবাগ্নি হইতে উদ্ধার-কর্ত্তা বেদদৃক্ গুরুদেবের পাদপদ্মে আত্মবিক্রয়ই মাংস-দর্শনের মূল ছেদনের অব্যর্থ মহৌষধি। কিন্তু তাহাতে কোনপ্রকার কপটতা বা জাড্য উপস্থিত হইলে মাংস-দর্শনের ফলভোগ হইতে আমাদের নিষ্কৃতি নাই। জগতে মাংস-দর্শনের যে ভীষণাদপিভীষণ ক্লেশ করুণাময় ভগবান্ স্তরে স্তরে সাজায়া রাখিয়া আমাদিগকে নিয়ত সতর্ক করিয়া দিতেছেন, সেই ক্লেশের যুপকাষ্ঠে মস্তক প্রদানে কাহার ইচ্ছা হয়? ভগবান্ বিষ্ণু মৎস্যাবতারে বেদ উদ্ধার করিয়াছেন অর্থাৎ ভগবানের আদ্যাবতার মাটিয়া জীবকে মাটিয়া বুদ্ধিতে মজিতে না দিয়া—মাংসদৃক্ হইবার পরিবর্ত্তে বেদদৃক্ করাইয়াছেন।

স্ত্রী-সঙ্গি-সঙ্গ

স্ত্রী সঙ্গীর সঙ্গ অপেক্ষা জগতে অনর্থকর আর কিছুই নাই। জগতে যত কিছু অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার মূলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ-প্রভাব অনুস্যূত বা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। স্ত্রী-সঙ্গ-স্পৃহা অতীব অনর্থকারিণী, তদপেক্ষা স্ত্রী-সঙ্গি-সঙ্গ-স্পৃহা আরও অনর্থসাধিনী। যযাতি, প্রিয়ব্রত, পুরূরবা প্রভৃতি স্ত্রীসঙ্গাসক্ত ব্যক্তিগণেরও কোন দিন নির্ব্বেদ উপস্থিত হওয়া সুকঠিন।

স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গকারী ব্যক্তিগণের দুর্দ্দশা যে কিরূপ ভয়াবহ, তাহা কপিলদেব মাতা ও স্ত্রীজাতি দেহহূতির নিকট লোক-মঙ্গলার্থ ব্যক্ত করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই—

যদ্যসদ্ভিঃ পথি পুনঃ শিশ্নোদরকৃতোদ্যমৈঃ।
আস্থিতো রমতে জন্তুস্তমো বিশতি পূর্ব্বপৎ।।
সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্যাতি সংক্ষয়ম্।।
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ।।
ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্য প্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ।।

(ভাঃ ৩।৩১৩২-৩৫)

কামজস্পৃহার ও উদরের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে উদ্যত অসাধুগণের সহিত অবস্থান করিয়া জীব যদি তাহাদের পথেই বিচরণ করে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই নরকে প্রবেশ করে। সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, যশঃ, ক্ষমা, শম, দম ও ঐশ্বর্য্যবৈভব ইত্যাদি যাবতীয় সদ্গুণরাশি সমস্তই অসৎসঙ্গ-প্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; ঐ সকল অশান্ত, মূঢ়, দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট, ক্রীড়ামৃগের ন্যায় কামিনীকুলের বশীভূত, ঘৃণ্য অসদ্ব্যক্তিগণের সঙ্গ জীবের কখনও কর্ত্তব্য নহে। যোষিৎ (ভোগ্যা স্ত্রী) ও যোষিৎসঙ্গী (ভোগ্যা-স্ত্রী-সঙ্গী) ব্যক্তির সংসর্গ-ফলে জীবের যেরূপ মোহ ও বন্ধন উপস্থিত হয়, অন্য কোন বস্তুর সংসর্গে সেইরূপ (সর্ব্বনাশ) হয় না।

স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গের কুফল শ্রীঋষভদেব আত্মজগণের প্রতি স্পষ্টভাবে বর্ণন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই—

মহৎ সেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্। (ভাঃ ৫।৫।২)

তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ শুদ্ধভক্ত বা মহাজনের সেবাকেই স্বরূপ-ব্যবস্থিতিরূপা মুক্তির দ্বার এবং স্ত্রীসঙ্গিগণের সঙ্গকেই তমোরূপ নরকের দ্বার বলিয়া অভিহিত করেন।

স্ত্রীসঙ্গিগণ বা স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গিগণ সুদুর্ল্লভ অকৃত্রিম মহতের পাদধূলিকণ-সমূহের অসমোর্দ্ধ বিমলত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। কেন না, তাহাদের কর্ণ স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গিগণের কামবার্ত্তায়—ভাষাসাহিত্যে-নাম-মন্ত্রে এতদূর ভরপুর—তাহাদের নয়ন কামিনী-কটাক্ষ ও কামিনী-সঙ্গিগণের বিবিধ মুদ্রার ধ্যানে এতদূর তন্ময়—তাহাদের হৃদয় স্ত্রীসঙ্গিগণের ভাব-ভাবনায়, বিচার-আচারে-এতদূর উদ্‌ভ্রান্ত যে, সর্ব্ববিধ যোষিৎসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গি-সঙ্গ-বর্জ্জিত, অনুক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে ও সর্ব্বোপকরণে কৃষ্ণ-সেবাময় অকৃত্রিম অনবদ্য মহদ্ ব্যক্তি এবং তাঁহার কৃষ্ণ- সেবার আনুকূল্যকারী পরম বিমল চরিত্র সঙ্গিগণ জগতে অবস্থান করিতে পারেন, ইহা ঐ সকল স্ত্রীসঙ্গ-সর্ব্বস্ব ব্যক্তিগণ কিছুতেই ধারণায় আনিতে পারে না। তৎফলে তাহারা জগতে অকৃত্রিম মহাজনের পাদপদ্মপরাগের অনুসন্ধান না পাইয়া যে সকল ব্যক্তি নানা কলে-কৌশলে স্ত্রী ও স্ত্রীসঙ্গিগণের সঙ্গ অনুমোদন করে, তাহাদিগকেই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করে। যাঁহারা স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ করিবার অনুমোদনের আদর্শ দেখাইয়া স্ত্রীসঙ্গিগণের ইন্দ্রিয়-তর্পণে বা প্রেয়োলিপ্সার চাকুরী করিতে পারিলেন না, সেই সকল সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণকারী সুদুর্ল্লভ মহদ্‌ব্যক্তিকে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গিগণই কল্পনা ও লোকপ্রবঞ্চনা-প্রবৃত্তিমূলে কখনও ‘‘যোষিৎসঙ্গী’’ বলিয়া স্থাপন করিবার কুচক্র পর্যন্ত সৃষ্টি করিয়া থাকে।

‘‘কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং—জগৎ’’ কামুকগণ জগৎময়—বিশ্বময় কামিনী ও কামিনীসঙ্গীই দর্শন করে। কারণ, বহির্ম্মুখ লোকের স্বভাবই এই যে, ‘‘আত্মবন্মন্যতে জগৎ’’ ন্যায়াবলম্বনে তাহারা নিজের চরিত্র-দ্বারা বিশ্বের চরিত্র নির্ণয় করিয়া থাকে। কিন্তু অকৃত্রিম মহদ্‌ব্যক্তির চরিত্র যে বিশ্ব চরিত্রের অন্তর্গত নহে—তিনি যে জগতের লোক সামান্য বা জাতিসামান্যের অধীন নহেন, ইহা অসদ্‌ব্যক্তিগণের অসতী ধারণায় কখনই আসে না। ইহার ফলে স্ত্রীসঙ্গিগণ সর্ব্বতোভাবে স্ত্রীসঙ্গবিমুখ, অকৃত্রিম, মহৎসঙ্গিগণের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া স্ত্রীসঙ্গিগণের কবলে ও সঙ্গেই অধিকতর ভাবে পতিত হইবার পথ পরিস্কৃত ও প্রশস্ত দেখিতে পায়।

আচার্য্য-লীলাভিনয়কারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের নবদ্বীপ-লীলার চরিত্র-সম্বন্ধে মহামহিমমুকুটমৌলি শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন লিখিয়াছেন (চৈঃ ভাঃ আদি ১৫শ অঃ),—

সবে স্ত্রীমাত্র না দেখেন দৃষ্টি-কোণে।।
স্ত্রী হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণেও না করিলা বিদিত সংসারে।।

কিন্তু তদানীন্তন নবদ্বীপের ‘‘পাষণ্ডী হিন্দু’’, ‘‘কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত’’, ‘‘বর্ণাশ্রমারূঢ়াভিমানী’’ ব্যক্তিগণ শ্রীগৌর-সুন্দরের সংকীর্ত্তনে দুর্দ্দৈবফলে প্রবেশাধিকার না পাইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সর্ব্বোত্তম আদর্শ বিমল চরিত্রে দোষারোপ করিয়া বলিয়াছেন,—

রাত্রি করি’ মন্ত্র, পড়ি’ পঞ্চ কন্যা আনে।
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা-সবার সনে।।

ভক্ষ্যঃ ভোজ্য, গন্ধ, মাল্য, বিবিধ বসন।
খাইয়া তা-সবা-সঙ্গে বিবিধ রমণ।।
ভিন্ন লোক দেখিলে না হয় তার সঙ্গ।
এতেক দুয়ার দিয়া করে নানা রঙ্গ।।

* * * *

চাল, কলা, দুগ্ধ, দধি একত্র করিয়া।
জাতি নাশ করি' খায় একত্র হইয়া।।

* * * *

পাষণ্ডী পাষণ্ডী যেই দুই দেখা হয়।
গলাগলি করি' সব হাসিয়া পড়য়।। (চৈঃ ভা মধ্য ৮ম অঃ)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু যাহাদিগকে ''পাষণ্ডী হিন্দু'' নাম প্রদান করিয়াছেন, উপরি-উক্ত উক্তিগুলি তাহাদেরই বা তাহাদের সমশীল বন্ধু ব্যক্তিগণেরই মুখনিঃসৃত।

অদৈব-বর্ণাশ্রম বা কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-মত জগতের বহির্ম্মুখ লোক-সমাজে যতই সুন্দর সজ্জায় ও রূপে লোকমনো মোহন করুক না কেন, উহা স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গি-সঙ্গের ধারাকে অক্ষুণ্ণরূপে প্রবাহিত রাখিবার একটি প্রকৃতি-সহজ প্রণালিকা। কাজেই ''বর্ণাশ্রমারূঢ়াভিমান'' করিয়া অদৈব বর্ণাশ্রমী কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-মতাবলম্বিগণ 'কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়—জগৎ'' ন্যায়ের যে উদ্‌ভ্রান্ত নৈয়ায়িক হইয়া পড়িবেন, ইহাতে আর আশ্চির্য্য কি? স্ত্রীসঙ্গ-লিপ্সাই শৌক্র- ধারার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, আর স্ত্রীসঙ্গিগণই তাহার বাহন। বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধী তথাকথিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ছলনা—সেই দেবীপূজার পীঠাবরণ দেবতা। অকৃত্রিম বৈষ্ণবের নিন্দা ও কৃত্রিমতার প্রশস্তি—সেই দেবতাপূজার কবচমন্ত্র, বর্ণাশ্রমের বেশধৃক্ বিশ্বশ্রবাপুত্রের ন্যায় বিষ্ণুযোষিৎকে হরণ করিবার প্রবৃত্তি-মূলে বিষ্ণুকে 'নপুংসক' করিবার চেষ্টা—সেই দেবীপূজার সঙ্কল্প, স্ত্রীসঙ্গি-সঙ্গ-প্রগতির যজ্ঞে বিশ্ব-দীক্ষা—সেই পূজার অমোঘ সিদ্ধি।

স্ত্রীসঙ্গি-সঙ্গ-প্রগতির প্রকৃতি-পিচ্ছিল প্রবাহকে রোধ করিয়া 'কৃষ্ণপ্রীতিতে ভোগত্যাগে'র দিকে চিত্তবৃত্তিকে পরিধাবিত করিবার জন্যই শ্রীগৌড়ীয় মঠ অকৈতব শ্রৌতপথানুসারে দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনঃ সংপ্রতিষ্ঠার উদ্বোধন করিয়াছেন। যে-সকল অদৈব বর্ণাশ্রমারূঢ়াভিমানী ব্যক্তি দৈব-বণাশ্রম পুনঃ প্রতিষ্ঠাকে স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গি-সঙ্গের বাধক আশঙ্কা করিয়া ''চোর বলে ঐ চোর'' নীতি অবলম্বনে নিজদিগের পশু অপেক্ষাও অধম কলুষিত চরিত্র গোপন এবং ''মণিময়-মন্দির-মধ্যে পিপীলিকা পশ্যতি ছিদ্রম্'' ন্যায়ানুসারে সম্পূর্ণ নিশ্ছিদ্র মহতের অল্পছিদ্র লোকপ্রতারণার চক্রান্ত-বলে অলীকতায় সৃষ্টি করিয়া 'বহুলোকে গাহিবার' দুরভিসন্ধি-দ্বারা আপনাদিগের স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গিসঙ্গের ধিকৃত, নকৃত, পশুঘৃণিত মুমূর্ষু জীবনকে আরও দুই এক মুহূর্ত্ত বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য গ্রাম্য কথা—গ্রাম্যবার্ত্তা—গ্রাম্য উপন্যাস—গ্রাম্য নবন্যাসের আশ্রয়

গ্রহণ করিতে চাহে, আর ঐরূপ অভিসন্ধিমূলে কল্পিত গ্রাম্য উপন্যাসের দ্বারা সমাজ- হিতৈষণার ছলনায় বেকার সমস্যার দিনে ঐরূপ বেকার বারবনিতার কবলে কবলিত, গ্রাম্য কল্পনার উর্ব্বর জন্মভূমিস্বরূপ যে-সকল ব্যক্তি বিশ্বসুলভ প্রতারণায় শত সহস্রবার প্রতারিত, প্রকৃতি-সুলভ প্রেয়ঃ পিপাসায় আর্ত্ত ব্যক্তিগণের লুব্ধকর্ণের নিকট গ্রাম্য উপন্যাসের মদিরার পাত্র সরবরাহ করিয়া ভাগবত-নিন্দিত নিজ উদর-উপস্থচারণের স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গি-সঙ্গের পথ আরও সুলভ এবং সমাজের তত্তদ্‌বিষয়ে সহজ উত্তেজনার কৌতুহল অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গের রসদ-সরবরাহ-কার্য্যকেই 'সমাজ-মঙ্গলে'র রূপে সাজাইতে চাহে, সেই সকল অবৈধ স্ত্রীসঙ্গি-সঙ্গীর রঙ্গাভিনয়—বারাঙ্গনা-প্রবৃত্তি নিষ্কপট সত্যানুসন্ধিৎসু, অকৃত্রিমতার আর্ত্ত-সেবকগণ চিরদিনই ধরিয়া লইতে পারেন।

'কালস্য কুটিলা গতিঃ'। মহাপ্রভু বৈষ্ণবের নিকট 'ভাগবত' পড়িবার উপদেশ দিয়াছেন—অকৈতব বৈষ্ণবের নিকট দেবদুরধিগম্য বৈষ্ণব-চরিত্র জানিবার পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু কলিকাল যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই বারবিলাসিনীর মুখে ভাগবতী গীতি, বৃষলীপতির মুখে—ব্যভিচারযুক্ত বর্ণাশ্রমের—ছদ্মবেশধারীর মুখে 'ভাগবত' (?) শুনিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিতেছে। এখন অকৈতব মহাভাগবতের নিকট বৈষ্ণব-চরিত্র বিচার বা শ্রবণ—প্রামাণিক ও নিরপেক্ষতা-ব্যঞ্জক নহে! বৈষ্ণবতার বক্তা এখন—অবৈধ স্ত্রীসঙ্গি-সম্প্রদায়, আর তাহাদের বিলাসিনী কুল।; ইহা কি ভাগবত শ্রবণ ও ভাগবত-চরিত্র—নির্ণয়ের নিদর্শন, না আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের অভিনন্দন—আত্মবঞ্চনার আবাহন? কথায় বলে,—'শুঁড়ির সাক্ষী—মাতাল'। তাই অবৈধ স্ত্রীসঙ্গীর সাক্ষী—কল্পিতা বারবিলাসিনী! কুলকলঙ্কিনীই কি যুগোচিত কুলহিতৈষিণী? ইহাই কি নারীপ্রগতির যুগসন্ধি?

কলিকাল অগ্রসরের সঙ্গে-সঙ্গে রামচন্দ্র খাঁ, রামচন্দ্র পুরীর প্রবৃত্তি হইতেও অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী ও অদৈব সম্প্রদায়ের কুপ্রবৃত্তি অধিকতর কলুষিত হইতেছে। স্ত্রীসঙ্গী রামচন্দ্র খাঁ মহাভাগবতবরেণ্য জগদ্‌গুরু ঠাকুর হরিদাসের নিকট সত্যই ব্যভিচারিণী প্রেরণ করিয়া বেশ্যার দ্বারা লোক-সমাজে বৈষ্ণব-চরিত্রের সাক্ষ্যপ্রদানের জন্য উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিল, আর রামচন্দ্রপুরী পিপীলিকাকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের জিহ্বা-লাম্পট্যের (?) সাক্ষী রাখিয়াছিলেন; কিন্তু অবৈধ স্ত্রীসঙ্গিগণের অবৈধ অধস্তনগণ অলীকতার কাল্পনিক কৃত্যাকে অকৃত্রিম বিষ্ণু-বৈষ্ণব-চরিত্রের পরিমাপক করিতে চাহিতেছেন।

'ধন্য কলিকাল! তেরি তমাসা, দুখ লাগে আউর হাসি!'

অত্যধিক স্ত্রীসঙ্গ ও অবৈধ স্ত্রীসঙ্গের কলা-কৌশলের যাহাতে অধিকতর কৃষ্টি-সাধন হয় এবং তদ্দ্বারা স্ত্রীসঙ্গ স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ-সাধক উদরের অন্ন-সংস্থান ও উদরের মেধ পরিবর্দ্ধিত হয়, তজ্জন্য এক শ্রেণীর গ্রাম্য সাহিত্যিক সমাজ-হিতৈষণার ছলনারূপ পূতনা-সুলভ ছদ্মবেশ পরিধান করিয়া সমাজের চির-সর্ব্বনাশ করিয়া দিতেছে। স্পষ্ট গ্রাম্য সাহিত্যিক অপেক্ষাও এই শ্রেণীর ছদ্মবেশী অসৎ-সাহিত্যকপুঙ্গবগণ ভয়াবহ। 'Realistic art' এর নামে সাহিত্যে যে-সকল স্ত্রীসঙ্গোদ্দীপক প্রেয়ো-গ্রাম্যকথা বিস্তারিত হইতেছে,

তাহা ঐরূপ ব্যক্তিগণেরই চরিত্রের সাক্ষী। অদৈব বর্ণাশ্রমের পুরোহিতগণের অবৈধ অধস্তনগণ চরিত্রভ্রষ্ট হইয়া তাহাদের চরিত্রভ্রষ্টা বিলাসিনীর মুখে যে-সকল চরিত্রহীনতার সাহিত্য সৃষ্টি করে, তাহা একদিকে যেমন চরিত্রভ্রষ্ট সাহিত্যিক- গণের চরিত্রহীনতার জীবনপঞ্জী, অপর দিকে তেমনি বর্ত্তমান ও ভাবী সমাজের চরিত্রহীন জীবনগঠনের প্রশস্ত রাজকীয় পথ। ঐ সকল অসতী সাহিত্যস্বৈরতা সংযমনের জন্য—নাটক-নভেল-চলচ্চিত্র-নিয়মনের জন্য নানাপ্রকার রাজকীয় আইন প্রস্তুত হইলেও কাপট্যমূলক স্ত্রীসঙ্গি-সঙ্গজ কামলাস্যই অধিকতর কৌতূহলময়ী উত্তেজনা সৃষ্টি করিতেছে।

শ্রীগৌরসুন্দরের নবদ্বীপ লীলা আলোচনা করিলে দেখা যায়, একদিকে যেমন পাপে পুণ্যে বিষয়ভোগী, হরিকীর্ত্তন,—বিরোধী "পাষণ্ডী হিন্দু"-সম্প্রদায় তাহাদের আত্মচরিত্রবিচারে মহাপ্রভুর সর্ব্বোত্তম বিমল চরিত্রে দোষারোপ করিতেছিলেন, অপরদিকে তেমন পরিবর্ত্তিকালে প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় 'মহা-মহিমগণে'র বিচার ও সিদ্ধান্ত-বিরোধ করিয়া মহাপ্রভুকে 'নাগর', 'লম্পট' বা 'পরস্ত্রী-সঙ্গী' সাজাইয়া অতিধর্ম্মোন্মত্ততার পরিচয় দিতে অগ্রসর হইয়া ছিলেন। প্রাকৃত-সহজিয়া সম্প্রদায় অধোক্ষজ স্বরাট্ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের লাম্পট্যের অবৈধ অনুকরণ করিয়া কেহ বাউল, কেহ আউল, কেহ সহজিয়া, কেহ কর্ত্তাভজা, কেহ নেড়া, কেহ দরবেশ, কেহ সখীভেকী, কেহ ভবানীভর্ত্তা স্মার্ত্ত, কেহ লৌকিক গোস্বামী, কেহ অবৈধ কৌপীনধারীর উন্মত্ততা প্রদর্শনপূর্ব্বক জগতে যোষিৎসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গি সঙ্গেরই প্রচার বিস্তারিত করিয়াছিলেন। শৌক্রধারায় আচার্য্য-সন্তানত্ব বা গোস্বামিত্ব প্রতিপাদন ও সংরক্ষণ-চেষ্টা—স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীঙ্গি-সঙ্গজ অদৈব স্মার্ত্ত মতেরই পুনরাবৃত্তি। আবার কেহ কেহ অতিনিরপেক্ষতার অক্ষজ আদর্শের দ্বারা ভোক্তৃত্ব ভগবান্‌কেও পরিমাপ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ-পূর্ব্বক মহাপ্রভুকে পর্য্যন্ত পাছে অপর লোকে 'যোষিৎসঙ্গী' বলেন, এই আশঙ্কায় শঙ্কিত হইবার অভিনয় দেখাইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐরূপ গণ-গড্ডলিকার ভ্রান্তমতের শঙ্কায় শঙ্কিত, অতিনিরপেক্ষতা প্রদর্শনের আদর্শলীল পণ্ডিত দামোদরকে অন্যত্র পাঠাইয়া দিয়া ঐরূপ ভ্রান্তলোক-মতে বা ভ্রান্তগণ-বিশ্বাসে বাস্তব বিমল চরিত্র কোনও দিনই সত্যানু-সন্ধিৎসুগণের নিকট পূর্ণ-আদর্শ স্থাপন করিতে লেশমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় না, ইহা জানাইয়াছিলেন।

আবার—

"মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে।।" (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৬।১২৩)

প্রভৃতির অর্থ জীবেন্দ্রিয়-তৃপ্তির আধারে বিচার করিয়া—

"যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি-বাড়ী যায়।
তথাপি জানিহ সেই নিত্যানন্দ রায়।।"

—প্রভৃতি যে-সকল বিকৃত পয়ার পরবর্ত্তিকালে সহজিয়া সাহিত্যে সৃষ্ট হইয়াছে, সেই সকল সাহিত্য হইতেও নানাপ্রকার যোষিৎসঙ্গ-প্রবৃত্তি জগতে প্রসারিত হইতেছে।

বদ্ধজীবকে—'গুরু' কিম্বা জীবতত্ত্বকে—'নিত্যানন্দ' সাজাইবার প্রবৃত্তি, অথবা মহাভাগবতের আচারকে অনর্থযুক্ত জীবের আচরণের সহিত সমস্তরে দর্শন ও তাহার অবৈধ অনুকরণ-প্রবৃত্তি যোষিৎসঙ্গি-সঙ্গিগণের মধ্যে যেরূপ বিস্তার লাভ করিতেছে, সেই সকল প্রচ্ছন্ন ও স্পষ্ট সর্ব্ববিধ যোষিৎসঙ্গি-সঙ্গজ কাম-কবল হইতে জীবকুলকে উদ্ধারের জন্যই শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় এরূপ ভীষণ যুগে 'গৌড়ীয় মঠে'র আবির্ভাব হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদগণের অপ্রকটের পরে শ্রীগৌড়ীয়মঠ ব্যতীত একসঙ্গে এত অধিক-সংখ্যক কায়-মনোবাক্যে অকৈতব আদর্শ, বিমল-চরিত্র, সুশিক্ষিত ব্যক্তি শুদ্ধ হরিভজনের কথা জগতে প্রচার করিয়াছেন কি না, আমাদের জানা নাই। তথাকথিত কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত বা ভক্তিবিদ্বেষী ''পাষণ্ডী হিন্দু" এবং তথাকথিত সভ্য ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের বৈষ্ণবধর্ম্ম-সম্বন্ধে নাসিকা-কুঞ্চনময়ী অসতী ধারণাকে একমাত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠই অসমোর্দ্ধ আদর্শ অনবদ্য চরিত্রের দ্বারা পরিবর্ত্তিত করিয়া বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ-নির্ণয়ের অকৃত্রিম প্রথম পথ-প্রদর্শক; এই সত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিজয়পতাকা আজ সজ্জন-বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীগৌড়ীয় মঠের কোনও নিষ্কপট সেবকের কখনও কলিস্থান-পঞ্চকের বিন্দুমাত্র সেবা করিবার অধিকার নাই; পান, তামাক, গাঁজা প্রভৃতি সেবন, তাস-পাশা খেলা, অবৈধ সিনেমা-যাত্রা থিয়েটার দর্শন, অবৈধ যোষিৎসঙ্গ ও গৃহস্থগণের বৈধ স্ত্রীসঙ্গে অত্যাসক্তি, বিবিধ কামুকতা, পশুবধ, নিজভোগার্থ অর্থ-সংগ্রহ—ইহার কোনটীই শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার্য্য কোন-প্রকারে শ্রীগৌড়ীয় মঠের অনুগত সেবকগণের মধ্যে অবশেও অনুষ্ঠিত হইবার জন্য অনুমোদন করেন না।

কালাকৃষ্ণদাসের ভট্টথারি-স্ত্রীর প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইবার মতি বা স্বতন্ত্রতা জীব-স্বরূপের যোগ্যতার পরিচায়ক হইলেও অর্থাৎ তটস্থা শক্তিজাত প্রত্যেক অণুচেতন জীবের ভগবৎসেবা হইতে স্বতন্ত্র হইবার যোগ্যতা আছে, ইহা কালাকৃষ্ণদাসের আদর্শে প্রদর্শিত হইলেও শ্রীমন্মহাপ্রভু কোনও দিনই বিপ্র কৃষ্ণদাসের ঐরূপ আচরণের অনুমোদন করেন না। পরম করুণাময় পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু কৃষ্ণদাসকে যোষিৎ-সঙ্গ এবং যোষিৎসঙ্গী ভট্টথারী হইতে পৃথক রাখিয়া কৃষ্ণদাসের অধিকারোপযোগি-সেবার অধিকার দ্বারা তাঁহার ভাবিমঙ্গলের পথ সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ করিবার পক্ষপাতী না হইলেও কালা-কৃষ্ণদাসের যোষিৎ দর্শন বা ছোট হরিদাসের ''প্রকৃতি দর্শন" কোনও দিনই অনুমোদন করেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা করিবার অভিনয় দেখাইতে গিয়া কালাকৃষ্ণদাসের বা ছোট হরিদাসের যোষিৎসঙ্গ স্পৃহা, কিম্বা বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের অন্যাভিলাষ, অদ্বৈতপ্রভুর সেবকাভিমানী কমলাকান্ত বিশ্বাসের অস্থির বিচার উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া কিম্বা শ্রীনিত্যানন্দাত্মজ বীরভদ্রের পাদপদ্মসেবা হইতে কেহ কেহ বিচ্যুত হইয়া অসৎসম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বা শ্রীবীরভদ্র প্রভুকে দোষারোপ করা—যোষিৎসঙ্গি-সঙ্গজের চিন্তাস্রোত ও বিচারমাত্র। কেননা, শ্রীমন্মহাপ্রভু গ্রাম্য সাহিত্যিক বা প্রাকৃত-সহজিয়া সম্প্রদায়ের ন্যায় কালাকৃষ্ণদাসের বা ছোট হরিদাসের ভগবদ্ বিমুখতাজাত যোষিৎসঙ্গ-স্পৃহার বিন্দুমাত্রও অনুমোদন করেন নাই। বর্ত্তমান যুগে একমাত্র শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার্য্যবর্য্যের অকৈতব অনুগত

সেবক-সম্প্রদায়ই স্ব-স্ব বিমল চরিত্রের আদর্শে ইহা সর্ব্বতোভাবে বাস্তবতায় প্রমাণিত করিয়াছেন।

নীলাচলে যখন সন্ন্যাসি-লীল শ্রীগৌরসুন্দর গরুড়স্তম্ভের নিকট হইতে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন, সেই সময় এক উড়িয়া স্ত্রীলোক অজ্ঞাতসারে মহাপ্রভুর স্কন্ধে পদার্পণ-পূর্ব্বক শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে উদ্যত হন। কৃষ্ণদর্শন দ্বারা কৃষ্ণের সেবাসুখ-বিধান-হেতু সন্ন্যাসি-লীল শ্রীগৌরসুন্দর স্ত্রীমূর্ত্তিকে অপ্রাকৃত কার্ষ্ণজ্ঞান করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু উড়িয়া স্ত্রীকে যোষিদ্- রূপে দর্শন বা ঐরূপ যোষিতের সঙ্গ করেন নাই। কিংবা অন্য সময় যখন দেবদাসীর গুর্জ্জরী রাগিণীতে গীতগোবিন্দের সঙ্গীত শুনিয়া অর্দ্ধবাহ্যদশায় শ্রীমন্মহাপ্রভু দেবদাসীর পশ্চাতে ধাবিত হইয়াছিলেন এবং গোবিন্দের মুখে 'স্ত্রী' নাম শ্রবণ করিয়া সাবধান হইবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারাও শ্রীমন্মহাপ্রভুর যোষিৎসঙ্গ হয় নাই বা তদ্দ্বারা গৌরনাগরবাদও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। খেয়া পার হইবার সময় পাটনীর সঙ্গে নৌকা আরোহণ—যোষিৎসঙ্গে নৌকাবিলাস নহে, ইহা "কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ" ন্যায়ের বিষয়ীভূত ব্যক্তিগণ যদি ধরিতে না পারিয়া "আত্মবন্মন্যতে জগৎ" ন্যায়াবলম্বনে অকৃত্রিম সাধুকেও তাহাদেরই মত অসৎ ও কামলুব্ধ মনে করে এবং সেইরূপ অনুমান ও অসৎ অভিসন্ধিতে লোকবঞ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে বঞ্চিত হইবে কে ও কাহারা, ইহা অস্থির যোষিৎসঙ্গিগণ বিচার করিতে না পারিলেও নিষ্কপট আত্মমঙ্গলকামিগণ বুঝিতে পারেন।

তাই আমরা শ্রীল রূপপাদ ও তদনুগত আদর্শ-চরিত্র ভক্তবৃন্দের পদরেণুসমূহ শিরোভূষণ করিয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর গীতি পুনরাবৃত্তি করিতেছি (ভঃ রঃ সিঃ উঃ বিঃ ৮।২২),—

স্মরন্ প্রভু পদাম্ভোজং নটন্নতি বৈষ্ণবঃ।
যস্তু দৃষ্ট্যা পদ্মিনীনামপি সুষ্ঠু হৃণীয়তে।।

যিনি সর্ব্বসুলক্ষণযুক্তা পদ্মিনী নারীগণকেও দেখিবামাত্র অত্যন্ত ঘৃণা করেন অর্থাৎ দুঃসঙ্গ জ্ঞান করেন, সেই বিষ্ণু ভক্ত সর্ব্বদা স্বীয় প্রভুর পাদপদ্ম-স্মরণ- পূর্ব্বক নৃত্য করিতে করিতে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

তনোতি মুখবিক্রিয়াং যুবতীসঙ্গরঙ্গোদয়ে
ন তৃপ্যতি ন সর্ব্বতঃ সুখময়ে সমাধাবপি।
ন সিদ্ধিষু চ লালসাং বহতি লভ্যমানাস্বপি
প্রভো তব পদার্চ্চনে পরমুপৈতি তৃষ্ণাং মনঃ।।

(ভঃ রঃ সিঃ উঃ বিঃ ৮।২৩)

যুবতী-সঙ্গ-রঙ্গের স্মৃতি উদয় হইবামাত্র আমার মন মুখবিকৃতি বিস্তার করে, নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-সমাধির নিমিত্ত যে-সব শ্রবণ-মননাদির অনুষ্ঠান, তাহাতেও আমার অতৃপ্তি (পুনরাগ্রহ) হইতেছে না অর্থাৎ উহাকে যথেষ্ট জ্ঞানে ঘৃণা করিতেছে এবং সিদ্ধি-সমূহের প্রতিও আমার আর লালসা হইতেছে না; হে প্রভো! (ভগবান্) কেবলমাত্র তোমার পাদপদ্মার্চ্চনেই আমার মন পরম তৃষ্ণা লাভ করিতেছে।

অজ্ঞ ও বিজ্ঞের নর্ম্ম-কথা

অজ্ঞ—আমি গৌড়ীয় মঠের কোন কথা জানি না। নানা লোকে নানা কথা বলে, তাহা শুনি। যখন যে যাহা বলে, আমি তখন উহা বিশ্বাস করিয়া ফেলিলেও পরক্ষণে অন্য কথা শুনিলে আমার বিচার তফাৎ হইয়া পড়ে।

বিজ্ঞ—গৌড়ীয় মঠের সম্বন্ধে কথা না শুনিলে নানা প্রকার লোকের নিজ নিজ চিত্তবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাতে গৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠানের কোন কথা বুঝিতে পারা যায় না। আবার, যিনি শুনেন, তাঁহার ব্যক্তিগত অধিকারের উপর সত্যগ্রহণের শক্তি থাকা আবশ্যক।

অ—গৌড়ীয় মঠের পরিচয়ে আমি অনভিজ্ঞ বলিয়াই আপনার নিকট কএকটি কথা জানিবার জন্য আসিয়াছি। আপনার উপর আমার শ্রদ্ধা আছে; কিন্তু যখন অন্য বিপরীত কথা শুনি, তখন সেই সব কথারও কিছু মূল্য আছে বলিয়া আমার মনে হয়। আপনি বলিলেন যে, আমার অধিকার ও শক্তি অনুসারে আমি কথাগুলি বুঝিতে পারিব। সুতরাং আপনি এরূপ কথা বলুন—আমি স্বীয় অধিকার ও শক্তি অনুযায়ী যাহাতে গৌড়ীয় মঠের সকল কথা জানিতে ও বুঝিতে পারি।

বি—অনেকে কথা জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর শুনিবার সময় অন্যমনস্ক হন, অধিকার কম থাকায় উত্তরের ভাষ্য বুঝিতে পারেন না এবং বিকৃত ধারণা করিয়া বসেন; সেজন্য কেবল অজ্ঞতা পোষণ করিলে গৌড়ীয় মঠের সকল কথা বুঝা যায় না। আপনার বর্ত্তমান শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস—অগৌড়ীয় কথায়, সুতরাং আমার প্রতি আপনার যে বিশ্বাসের কথা বলিতেছেন, সে বিশ্বাসটি ওজনে কম আছে বলিয়া বিপরীত কথা শুনিলে, আপনি সেই সকল কথার কিছু মূল্য আছে বলিয়া মনে করেন।

মানুষ যেরূপ সঙ্গে বাস করে, সেরূপ ধরণের বিপরীত কথা শুনিতে তাঁহার রুচি পরিবর্ত্তিত হয়। জন্ম-জন্মান্তরে যেরূপ সঙ্গ লাভ হইয়াছে, তজ্জনিত সংস্কার মানুষের সহিত কম বেশী দেখা যায়। আবার বর্ত্তমান জীবনে যে-সকল রুচি পরিবর্ত্তন করিবার কারণ হয়, তাহাও সঙ্গের প্রভাবে।

অ—আপনার কথা বুঝিলাম, এখন গৌড়ীয় মঠ কি ব্যাপার, তাহা বলুন।

বি—শিক্ষার্থিগণ শিক্ষা-লাভের জন্য যেখানে শিক্ষকের নিকট উপস্থিত হইয়া বাস করেন, সেই স্থানকে 'মঠ' বলে। অন্যাভিলাষীদিগের মঠ—গৃহব্রতের গৃহ, দেশ প্রভৃতিতে অবস্থিত; কর্ম্মিগণের মঠ—সুনীতি ও সুষ্ঠ ভোগের বিচারকদিগের শাসনে অবস্থিত; কর্ম্মি-মঠে গৃহব্রত আশ্রম, গৃহস্থ আশ্রম, ইন্দ্রিয়তর্পণ-মূলে সুখ-লাভ করিবার আশ্রম-সমূহ অবস্থিত। আবার, কর্ম্মিগণের মঠান্তরে পরোপকারের নামে মৃত দেহের সৎকার, শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্রের বিচার-দ্বারা ইহজীবনে উৎকৃষ্ট গৃহস্থালি করিতে করিতে পরলোকে ইন্দ্রিয় তর্পণমূলে সূক্ষ্ম ফল-লাভ, আবার, সত্য, তপ, জন ও মহর্লোক প্রভৃতি লোক লাভের আশায় কর্ম্মি-মঠের অনেক প্রকার ব্রত, হঠযোগ, বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্র, মিউনিসিপ্যাল আইন, সামাজিক নীতিমাত্র প্রভৃতি উপদিষ্ট হয়; তদ্দ্বারা সুষ্ঠুভাবে ইহ জগতে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি লাভ এবং নিজ পক্ষের লোকদিগের

ইন্দ্রিয়-তর্পণলাভ ঘটে। তামসিক, রাজসিক ও মিশ্র সাত্ত্বিক প্রবৃত্তির বশে যাহা যাহা ফলরূপে আশা করা যায়, উহাদিকের সিদ্ধির জন্য যত প্রকার কপটতা আছে, তাহা কুকর্ম্মকারী বা যথেচ্ছাচারীর মঠে পাওয়া গেলেও কর্ম্মিমঠে সেই গুলির কোন আবশ্যকতা থাকে না। কর্ম্মি-মঠ স্বদেশহিতৈষণা, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, আয়ুষ্কাম, দ্রবিণ-কাম প্রভৃতি নানা প্রকার চেষ্টার অনুকূলে যে-সকল প্রবৃত্তি দেখাইয়া থাকেন, উহাদিগকে তাঁহারা স্বাধ্যায়, ব্রত, তপস্যা, যোগ প্রভৃতি সংজ্ঞায় এবং কখনও কখনও নৈষ্কর্ম্ম্য-সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। মোটের উপর, ফলকাম এবং তাহার ঐহিক ও পারত্রিক প্রাপক-সূত্রে কামী হওয়াই কর্ম্মি-মঠের লক্ষণ। কর্ম্মিগণ গো-মাতা বধ করিয়া কর্ম্মনিপুণ ব্রাহ্মণগণকে জুতা দান করিয়া থাকেন; কখনও বা বটবৃক্ষের তলে ধ্যান-নিমগ্ন হইয়া মানবের দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় চিন্তা করেন এবং বাহিরের দিকে অহিংসা-নীতির কথা বলিয়া ফল-কালে হিংস্য-নীতিতেই পর্য্যবসান করেন। কর্ম্মি-মঠের সেবকগণ বন্যা-প্রপীড়িত লোকগণকে নানাপ্রকারে সাহায্য করেন, মূর্খদিগের বোধের জন্য কর্ম্মি-মঠ স্থাপন করেন; দেহ ও মনের যাহা যাহা প্রয়োজন, তাহাতে অপরের ক্ষতি যতদূর না হইতে পারে, এরূপ বাঁচাইয়া অন্যের বিত্ত-দারাদির প্রতি বাহিরে লোভ না দেখাইলেও উহার অপহরণের প্রবৃত্তি সঙ্কুচিত করিয়াছেন, প্রকাশ করেন। যখন কর্ত্তার ক্রিয়া-সমূহ অপব্যবহারে পরিণত হয়, তখন তিনি কর্ম্মি-মঠ ছাড়িয়া অন্যাভিলাষীর মঠে চলিয়া যান এবং কর্ম্মি-মঠের প্রচুর নিন্দাবাদ করেন।

অ—আপনার কথায় কর্ম্মি-মঠের সম্বন্ধে যে সকল বর্ণন করিলেন, তাহাতে আমার অনেক প্রশ্নের উদয় হইতেছে। একেবারে সকল কথা বুঝিয়া উঠিতে পারিব না, সুতরাং আপনার কথিত বিষয়ে যে-সকল প্রশ্ন উদিত হইতেছে, তাহা প্রথম-মুখে একেবারে না বলিয়া আপনাকে ক্রমে ক্রমে জানাইব। আপনার কথায় বাধা দিলাম বলিয়া আমার প্রতি প্রসন্নতার লাঘব করিবেন না। আমার নিকট অন্যাভিলাষ-মঠ ও কর্ম্মি-মঠ ছাড়া অন্য প্রকারের মঠের কথা বলুন। গৌড়ীয় মঠ কি কর্ম্মি-মঠ?—এ কথা জানিবার হঠাৎ ইচ্ছা হইতেছে।

বি—গৌড়ীয় মঠ অন্যাভিলাষীর বা কর্ম্মীর মঠ নহে। অন্যাভিলাষি-মঠের অধিবাসী ও কর্ম্মি-মঠের বাস্তব্য স্থাপনকারী ব্যক্তিগণের অর্ব্বাচীনতায় গৌড়ীয় মঠকে যদি অন্যাভিলাষী বা কর্ম্মিদিগের মঠের সমশ্রেণীতে গণ্য করিবার ভ্রমের সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে গৌড়ীয় মঠের কোন কথা আদৌ বুঝিতে পারা যাইবে না। কংসের অজ্ঞা মাতা পদ্মাবতী অন্যাভিলাষি মঠে বাস করায় এবং মধ্যে মধ্যে কর্ম্মি-মঠের উপদেশ লাভ করায় গৌড়ীয় মঠের একমাত্র উপাস্য শ্রীরাধাগোবিন্দের স্বরূপ তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন না। তাঁহার দলের লোকেরা কিন্তু গৌড়ীয় মঠের সমালোচনা করিতে ত্রুটি করেন না। অজ্ঞার দলের লোকেরা তাহার নিকট অজ্ঞতা শিক্ষা করেন বলিয়া গৌড়ীয় মঠের অনুভূতি তাহাদের দুষ্প্রাপ্য বিষয়। গৌড়ীয়মঠের পূর্ব্ব আচার্য্য শ্রীসনাতন গোস্বামী 'বৃহদ্ভাগবতামৃত' নামক গ্রন্থে এই অজ্ঞার কথা ও অজ্ঞার সম্প্রদায়ের বিচার-প্রণালীর কথা বিশেষভাবে লিখিয়াছেন। কথাপ্রসঙ্গে আমি সেই সকল কথা ক্রমশঃ বিস্তার করিব। এক্ষণে জ্ঞানি-মঠের কথা সংক্ষেপে বলিতেছি।

অ—উগ্রসেন-পত্নী পদ্মাবতী কেবল অপস্বার্থ-পোষক কংসকে প্রসব করিয়াছিলেন, শুনিয়াছি। সেই কংস কৃষ্ণবিরোধী ছিল। অজ্ঞা পদ্মাবতী কংসকে নিজ-মঙ্গল-সাধনের উপদেশ দিতে গিয়া কৃষ্ণের সম্বন্ধে যে ধারণা করিয়াছিল, আপনি কি তাহাই উদ্দেশ করিতেছেন?—না, কংস-বধের পর দ্বারকায় অবস্থান-কালে পদ্মাবতী কৃষ্ণ-ধারণায় বঞ্চিতা হইয়া তাঁহাকে সাধারণ মানব মনে করিয়া কৃষ্ণের নিকট ব্রজবাসী গোপ-গোপীগণের যে প্রাপ্য হিসাব নিকাশ করাইতেছিল, তাহাই উদ্দেশ করিতেছেন?

বি—ব্রজবাসিগণের ধারণা বুঝিতে অসমর্থা হইয়া মেপে নেওয়া ধর্ম্মে পদ্মা দ্বারকাবাসীদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন, আমি উহাকেই "পদ্মা-ন্যায়"-শব্দে বলিয়াছি। পদ্মা ইহলোকে আত্মসুখ-লাভ ও আত্মীয়-স্বজনের তাৎকালিক সুখ-লাভকেই ধর্ম্ম বলিয়া ধারণা করায় ঐরূপ হিসাব-নিকাশের প্রস্তাব করিয়া তাঁহার সেই ফল-লাভ করিবেন আশা করিয়াছিলেন। প্রেয়ঃপন্থীর অর্থাৎ "আমার যাহা ভাল লাগে" ইত্যাদি কূপমণ্ডুকের বিচার লোকে গ্রহণ করিয়া লাভবান্ হউক, অজ্ঞার দলের লোকেরা এরূপ চিন্তাস্রোতই পোষণ করে। গৌড়ীয় মঠের লোকেরা—ব্রজবাসীর অনুগত, সুতরাং অন্যাভিলাষী বা কর্ম্মি-মঠের সেবিকা পদ্মার ন্যায় উপদেশক নহেন। গৌড়ীয় মঠের সম্বন্ধে যে-সকল অর্ব্বাচীন নিজ-নিজ স্বভাবোচিত বিকৃত ধারণা পোষণ করে, সেই সকল অর্ব্বাচীনের দল গৌড়ীয় মঠকে যে উপদেশ দিতে আসে, তাহা দুরন্ত শিশুর কলভাষণ মাত্র। গৌড়ীয় মঠের লোকেরা তাহা অনায়াসেই হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন। কিন্তু সেই সকল অর্ব্বাচীনগণ ভীষণ বৈষ্ণবাপরাধ ও নামাপরাধে পতিত হইতেছে দেখিয়া গৌড়ীয় মঠ দয়া-পরবশ হইয়া যে শাসন-দণ্ড গ্রহণ করেন, তাহার মর্ম্ম অন্যাভিলাষী বা প্রেয়ঃপন্থীর বুঝিয়া উঠা সম্ভব হইবে না। গৌড়ীয় মঠ তাহাদের শিক্ষক-সূত্রে ইছাপুরের ভূতপূর্ব্ব হেড্ মাষ্টারের কথা জানিতে পারিয়া তাহার মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন। চাঁপাহাটিতে গৌড়ীয় মঠের পরিক্রমা-কালে কপটতাশ্রয়ে যে ব্যক্তি দুই ঘন্টা-কাল কর্ম্মের কারাগারে আবদ্ধ থাকিয়া গৌড়ীয়-মঠ-সেবক সাজিতে গিয়াছিল, যে-ব্যক্তি তাহার মাটিয়া চক্ষু দিয়া হরিকে (?) দেখিবার কল্পনার যাবতীয় দার্শনিক তথ্য জর্ডন-নদীর জলপানে পবিত্রীভূত ব্যক্তির নিকট অভিব্যক্ত করিয়াছিল, সে গৌড়ীয় মঠের কোন সংবাদই রাখিবার শক্তি ধরে না। সে-ব্যক্তি পদ্মান্যায়ের আশ্রয়ে বারবনিতার মুখে নিজেরই ঐরূপ বৃত্তির কথা উদ্ঘাটিত করিয়াছে। এই সকল প্রবন্ধ আমি সুষ্ঠুভবে ক্রমশঃ তোমাকে বলিব। অন্যাভিলাষী শ্রীরাধাগোবিন্দ লীলা বুঝিতে পারে না বলিয়া কপটতা-দ্বারা দশায় পড়িয়া যায় এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তি অবৈধভাবে পরিচালনা করে। সেই সকল লক্ষণ অন্যাভিলাষি মঠের কর্ম্ম-কর্ত্তৃগণের স্বভাব। ভক্তিমঠ—উহা হইতে অনন্ত যোজন দূরে অবস্থিত।

অ—আমি দেখিতেছি, আপনি গীতার পদ্ধতি অনুসারে আমাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিয়াছেন অর্থাৎ প্রথম ছয় অধ্যায়ে অন্যাভিলাষ ও কর্ম্মকাণ্ড, শেষ ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানকাণ্ড বা জ্ঞানিমঠের উপদেশ, আর মধ্য ছয় অধ্যায়ে ভক্তিকাণ্ডের কথা বুঝাইতেছেন।

বি—গীতার মধ্যে ছয় অধ্যায় ভগবদ্ভক্তির কথা বলিয়াছেন। প্রারম্ভ ও শেষ ছয় অধ্যায়—এই দুইটী আবরণের কার্য্য করিয়াছে—ইহা সত্য; কেহ যেন মনে না করেন—আবরণের একপ্রান্ত প্রারম্ভ ও অপর

প্রান্তই শেষ সীমা। বহির্দ্দর্শনে প্রারম্ভ ও শেষ আবরণদ্বয়ই অন্তঃস্থিত বস্তুকে নিত্যকাল রক্ষা করে। বস্তুর আবারণ—বস্তুর সহিত বৈশিষ্ট্যবিচারে পৃথক্। জন্ম ও নাশ তাৎকালিকতায় প্রতিষ্ঠিত; তজ্জন্য কর্ম্মি-মঠ ও জ্ঞানি-মঠ উভয়ই অনিত্য মঠ, কিন্তু ভক্তি-মঠ—নিত্য। ভক্তি-মঠের অধিবাসিগণ—নিত্য; তাঁহাদের ভগবৎসেবা-বৃত্তি নিত্যা। কর্ম্মি-মঠের সেবকগণ অনিত্য; কর্ম্মি-মঠের সেব্য ফল-লাভও—অনিত্য। জ্ঞানিমঠের অধিবাসিগণের প্রারম্ভ অনিত্য; মুখে তাঁহারা নিত্যের উদ্দেশ্যে প্রধাবিত হইলেও প্রাপ্যাবস্থা ও প্রাগবস্থার ভেদহেতু পূর্ণনিত্যতার অভাব-ধর্ম্মেই অবস্থিত। কালের অভ্যন্তরে তাঁহাদের বদ্ধপ্রতীতি এবং অবশিষ্ট কালে তাঁহাদের মুক্তপ্রতীতি নিত্যত্বের বিরোধী হইয়া পড়ে। ভগবদ্ভক্তগণ সেরূপ অনিত্য- বিচারে প্রতিষ্ঠিত নহেন। যদিও বিবর্ত্তবাদের আবাহন করিয়া জ্ঞানিমঠের আধিবাসিগণ স্বীয়নিত্যত্বের প্রতিপাদন করেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের জ্ঞান অদ্বয়জ্ঞানে অবস্থিত নহে; যেহেতু বিবর্ত্তাশ্রিত জ্ঞান ও বিবর্ত্তমুক্ত জ্ঞান স্বীকার করিতে গিয়া তাঁহারা ন্যূনাধিক অধ্যাসবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সচ্চিদানন্দময় ভগবদ্ ভক্তগণ সেরূপ বিবর্ত্তের পরিবর্ত্তে শক্তি-পরিণামের বিচার বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিচারে বস্তুবিকারবাদ স্বীকৃত হয় না।

ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার অধিকারী কে?

"গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি' মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্র-সুত-পাশ।
গৌড়মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তা'র হয় ব্রজভূমে বাস।।"

ভাগ্যহীন কলিজীব আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি ভাগবতের একটি বাণীতে—"কলিকালে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের মহদ্‌গুণ কলির সকল দোষ স্তব্ধ করিয়া দিয়াছে।" কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যে অবিকৃত কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের কথা জগৎকে জানাইয়াছেন, সেই কীর্ত্তনের যোগেই শ্রীবিগ্রহের সেবা, সেই কীর্ত্তনের যোগেই শ্রীহরি-জনগণের সেবা, সেই কীর্ত্তনের যোগেই শ্রীমদ্ভাগবত-কথার বিস্তৃতি ও আলোচনা এবং সেই কীর্ত্তন-যোগেই মাথুরমণ্ডলে নিত্য অবস্থান।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কৃষ্ণময় অধিষ্ঠানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ জনগণের দুর্ভাগ্যের সীমার পরিমাণ করিতে কেহই সমর্থ নহেন। পাঁচ প্রকার সাধনভক্তির অন্যতম "কীর্ত্তন" হইতেই আমরা জানিতে পারি যে, ঐ পাঁচটীর অল্প সঙ্গ হইতে জীবের নিত্যমঙ্গল লাভ হয় এবং কীর্ত্তনের যোগেই এই পাঁচ প্রকার সাধন সম্পন্ন হইতে পারে।
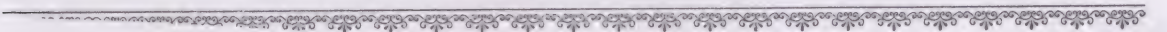
শ্রীমাথুর-মণ্ডল—শ্রীগৌড়-মণ্ডল হইতে অভিন্ন, শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন হইতে অভিন্ন, শ্রীগুরু-গৌর-কীর্ত্তন—শ্রীহরিজনকীর্ত্তন হইতে অভিন্ন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতসঙ্গ—শ্রীরূপ-সঙ্গ বা শ্রীমদ্ভাগবত-সঙ্গ হইতে অভিন্ন, শ্রীগৌরভক্ত সেবা—শ্রীহরিভক্ত-সেবা হইতে অভিন্ন।

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবা করিতে করিতেই শ্রীব্রজমণ্ডলের, শ্রীহরির, শ্রীমদ্ভাগবতের, শ্রীনাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্যলীলা-কীর্ত্তনের এবং শ্রীকৃষ্ণজনের সেবায় অধিকার লাভ ঘটে। যাঁহারা শ্রীগৌড়মণ্ডল, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলের সেবার অধিকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের শ্রীব্রজমণ্ডল-ভ্রমণে যোগ্যতা হইয়া থাকে। ভৌম-ব্রজ ও অপ্রকট-ব্রজ এক হইলেও ভৌম-ব্রজে শ্রীগুরু-গৌর-কৃপা পূর্ণমাত্রায় লাভ ঘটে। তখন ভৌম-ব্রজের অধিক উপকারিতা, শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহের অধিক উপকারিতা, শ্রীমদ্ভাগবতের স্বাধ্যায়—সেবার অধিক উপকারিতা, শ্রীগৌর-পার্ষদের আনুগত্যে ব্রজলীলার পার্ষদগণের সেবার অধিক উপকারিতা এবং শ্রীগৌরধামের আনুগত্যে শ্রীব্রজধামের স্ফূর্ত্তির অধিক উপকারিতা আমাদের নিত্য উপলব্ধির বিষয় হয়।

সাধকরূপে সেবা এবং সিদ্ধরূপে সেবা—বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগতাৎপর্য্যপর। সম্ভোগের পুষ্টির জন্যই বিপ্রলম্ভ, সুতরাং লালসাময়ী প্রার্থনা বিপ্রলম্ভেরই জ্ঞাপিকা।

ব্রজ-জনের অনুগমনে নিত্য ব্রজবাসের ভূমিকা লাভে কাহার না আগ্রহ হয়? অনুরাগের সেবা অনুরাগী জনের কৃপা-সাপেক্ষ; সুতরাং তাদৃশ সুযোগে অনাদর করা অভক্তগণের ধর্ম্ম। অভক্ত-সজ্জা, অভক্তোচিত ব্যবহার হরিসেবা বিমুখতার আনুষঙ্গিক ব্যাপার হইলেও তাহা পরিহার করিয়া সজ্জন-সঙ্গই বুদ্ধিমানের গ্রহণীয়।

শ্রীচৈতন্যদেব যাঁহাদের চিত্তবৃত্তিতে জড়ভোগ ও জড় ত্যাগের বাসনা পরিত্যাগের যোগ্যতা উদিত করেন, তাঁহারাই ব্রজ-জনে অনুরাগবিশিষ্ট হইয়া তাঁহাদের ভৌমাবস্থানের সাফল্য-বিধান করেন। শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং আদর্শ চরিত্রের অভিনয় করিয়া দেখাইয়াছেন, ভাগ্যবন্ত জনগণ তাহা অনুসরণ করিতে পারেন।

বন-ভ্রমণে ভজন-ব্যাপারের উদ্দীপন হয়। বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর এই বৃন্দাবন-ভ্রমণ-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

"গৌর আমার, যে-সব স্থানে,
করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান, হেরিব আমি,
প্রণয়ী ভকত-সঙ্গে।।"

এই মহাজনের পদানুকীর্ত্তন করিতে করিতে ভাগ্যবন্ত জনগণ শ্রীদ্বাদশবন-পরিক্রমায় যোগদান করুন।

দর্শন ও শ্রবণ

'দর্শন'-ব্যাপারটি দর্শকাভিমানীর নিজের দিকের ক্রিয়া, আর 'শ্রবণ' সেবায় সম্প্রতিষ্ঠিত অপরের দ্বারা অনর্থযুক্তের সেবোন্মুখতা উৎপাদনী ক্রিয়া। 'দর্শন'—দর্শকের নিজের চেষ্টা আর 'শ্রবণ'—শ্রাবয়িতা গুরুদেবের দ্বারা শিষ্যের সেবাগতিময়ী চেষ্টা। আমরা শ্রীগুরুপ্রণামে পাঠ করি,—

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।"

অজ্ঞানতিমিরান্ধ ব্যক্তি আপনাকে দ্রষ্টা অভিমান করিয়া যে দর্শন-চেষ্টা প্রদর্শন করে, তাহাতে দর্শন তিমিরময়—অনর্থময়; উহা দর্শনবাধ, অনধিকার বা মায়া-দর্শন, আর শ্রীগুরুদেব অজ্ঞানতিমিরান্ধকে সত্য শ্রবণ করাইয়া অর্থাৎ দিব্যজ্ঞানাঞ্জনশলাকা-দ্বারা অজ্ঞানতিমির বিনাশ করিয়া যে দর্শনের যোগ্যতা দেন, অর্থাৎ শ্রবণ-ফলে যে দর্শনাধিকার লাভ হয়, তাহাতে অনর্থযুক্তের আবরণ থাকে না। অনর্থযুক্তের দর্শনের বাধা রহিয়াছে, সুতরাং ঐ বাধা বাধকময় দর্শনের দ্বারা অপসারিত হয় না; কিন্তু শ্রবণের বাধা সাক্ষাৎ শ্রবণের দ্বারাই সাক্ষাদ্ভাবে অপসারিত হয়। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ নববিধা ভক্তির মধ্যে সর্ব্বাগ্রে শ্রবণের কথা বলিলেন,—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মানিবেদনম্।।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্।।

শ্রবণ-ফলে পরম পুরুষ বিষ্ণুতে আত্মসমর্পণ-বুদ্ধি উদিত হয় অর্থাৎ ক্ষুদ্রজীব আমি, আমার অনর্থময়, আবৃত ও বিক্ষিপ্ত অহমিকার কোন চেষ্টা-দ্বারা অধোক্ষজ বিষ্ণুর স্বরূপ নির্ণয় করা যাইতে পারে না। শ্রবণ-ফলে যখন আত্মসমর্পণ হয়, তখনই শ্রুতবিষয়ের অনুকীর্ত্তন, অনুকীর্ত্তিত বিষয়ের ধ্যান বা স্মরণ, শ্রবণমুখে অর্চ্চন, শ্রবণমুখে বন্দন, শ্রবণকারী চেতনে সখ্যাদি বিচার প্রকাশিত হয়।

শ্রুতবিষয়ের অনুকীর্ত্তন না করিয়া অনর্থযুক্ত দর্শকাভিমানী তাঁহার দর্শন বাধের অভিজ্ঞানের বিষয় বা কল্পনার বিষয় যদি কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে তাহা হরিকীর্ত্তন নহে, মায়িক কীর্ত্তন-মাত্র। কোন এক ব্যক্তি তাঁহার কল্পিত গুরুকে বলিলেন,—"আমাকে 'ভগবান্' দর্শন করাইয়া দিতে পারেন?" গুরু (?) বলিলেন, —"হাঁ আমাকে যেরূপ; দেখিতেছ, সেইরূপ প্রত্যক্ষভাবেই তোমাকে ভগবান্ দর্শন করাইয়া দিতে পারি।"

এখানে দর্শন করাইবার মালিক অভিমানকারী 'গুরু' ও দর্শনকামী শিষ্য উভয়েই অনর্থযুক্ত ও বিবর্ত্তে পতিত। এখানে শিষ্যের গুরু-দর্শন এবং গুরুর শিষ্য-দর্শন উভয় ব্যাপারই অনর্থময়। কারণ, কাহারাও "বিষ্ণোঃ শ্রবণম্" অর্থাৎ অধোক্ষজ বিষয় শ্রবণ হয় নাই। গুরুব্রুব শিষ্যব্রুবকে অক্ষজ দর্শন করাইবেন, এই

প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, আর অক্ষজ দর্শন-প্রতারিত শিষ্যব্রুব 'অক্ষজ দর্শন'কেই অধোক্ষজ দর্শন মানিয়া লইয়া অক্ষজ-দর্শন-বঞ্চিত লোক সংখ্যাধিক্যের নিকট—বহির্ম্মুখগণকোটির নিকট ঐরূপ প্রতারক ব্যক্তিকে বংশদণ্ডের অগ্রভাগে আরোহণ করাইয়া বিজয়পতাকারূপ ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়াছে। এখানে ঐরূপ প্রতারিত অনর্থময় শিষ্যের দর্শন যেরূপ ভ্রান্ত, অনর্থযুক্তগণকোটির দর্শনও তেমনি বিবর্ত্তাশ্রিত। শ্রবণাভাবে অনর্থময় শিষ্য অশ্রৌত অনর্থগণকোটিরই অন্যতম।

প্রত্যক্ষ নেত্রে অক্ষজ দর্শন হয়; কিন্তু বিষ্ণু—অধোক্ষজ, অতীন্দ্রিয়; তাঁহাকে প্রত্যক্ষ নেত্র কিরূপে দর্শন করিবে? যেখানে কোন আবরণ নাই, সেই অনাবৃত বস্তুরই দর্শন সম্ভব। কিন্তু 'যোগমায়া সমাবৃত' ভগবান্ বিষ্ণুর দর্শন মহামায়ার আবরণে আবৃত গণকোটি বা জীবের কিরূপে সম্ভব? সুতরাং অক্ষজ দর্শন-প্রতারিত জীব যখন পরমমুক্ত শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ-ফলে অক্ষজ দর্শনের হাত হইতে পরিমুক্ত হইয়া সেবোন্মুখ হন, তখনই স্ব-প্রকাশ অধোক্ষজ বস্তুর স্ব-প্রকাশিত রূপ তাঁহার সেবোন্মুখ নয়নের দর্শনের বিষয় হয়। শ্রবণ-ফলে মহামায়ার যবনিকা—আবরণ বিদূরিত হয়, তখনই 'যোগমায়া সমাবৃত' পুরুষোত্তম আত্মপ্রকাশ করেন।

শ্রীমন্ত্র-শ্রবণ, শ্রীনাম-শ্রবণ, আর রূপ-দর্শন। শ্রীমন্ত্র-শ্রবণ-ফলে মননধর্ম্ম অর্থাৎ জীবের নিজেন্দ্রিয়-তাৎপর্য্যরূপ যাবতীয় মনোধর্ম্ম নিরস্ত হয়, শ্রীনাম-শ্রবণ-ফলে অধোক্ষজ বস্তুতে অনাবৃত চেতনের প্রীতি উদিত হয়, তখন আকর্ষক ও আকৃষ্টের অনাবৃত নির্বাধ অবস্থানের মধ্যে সাক্ষাৎ দর্শন বা রূপ প্রকাশিত হয়।

"একবার হৃৎকমলে, বামে হেলে দাঁড়িয়ে বাজাও বাঁশরী।"

—প্রভৃতি মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায়ের গান নিজ-জড়েন্দ্রিয় তাৎপর্য্যপর। আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণকামি-সম্প্রদায় সর্ব্বাগ্রেই ফলটা চায়; কেন না, তাহা হইলেই তাহারা যাবতীয় কৃত্যের হস্ত হইতে অবসর লাভ করিতে পারে। সম্বন্ধ-জ্ঞান, অভিধেয়-যাজন, তৎপরে প্রেমফল লাভ; কিন্তু উহারা সাধন বা অভিধেয় যাজন না করিয়াই জোর করিয়া একেবারেই 'ফল' আদায় করিবার জন্য ব্যস্ত হয়। ফল লাভ হইয়া গেলে আর কোনও সাধন-ভজনাদি করিতে হইবে না—উহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ হইবে, ইহাই ঐ সকল ভোগোন্মুখ ব্যক্তিদের হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন অভিলাষ। যাহারা শ্রৌত সদ্গুরুর পাদপদ্ম হইতে শ্রবণ না করিয়াই ফল-লাভের জন্য ব্যস্ত, সেই সকল আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণকামী ব্যক্তিই সর্ব্বাগ্রে 'রূপদর্শন', 'রূপদর্শন' করিয়া ব্যস্ত হয়।

'দর্শন করিবেন কে? কাহাকেই বা দর্শন করিবেন? প্রকৃত দর্শনই বা কি?—এই সকল বিষয় সদ্গুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ না করিয়াই 'দর্শনে'র জন্য ব্যস্ত হওয়া আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-চেষ্টারূপ 'দর্শনবাধ'-ব্যাপারের আবাহন। পরন্তু 'শ্রবণ' এমনই ব্যাপার যে, তজ্জন্য পৃথগ্ভাবে 'দর্শনে'র জন্য চেষ্টা করিতে হয় না। 'শ্রবণ'ই 'দর্শন'রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া দর্শকের চক্ষুদান, দর্শকের অনাবিলতা- সাধন, দর্শক ও দৃশ্যবস্তুর মধ্যে যাবতীয় ব্যবধান ও প্রতিবন্ধকের অপসারণ করিয়া দেয় এবং স্বপ্রকাশ দৃশ্য ইষ্টবস্তুকে সহজ, স্বাভাবিক ও অব্যবহিতরূপে প্রকাশিত ও অবরুদ্ধ করে। শ্রুতিকে এজন্য দর্শন-শাস্ত্র বলে—শ্রুতির

অন্তরে দর্শন-শ্রুতির মধ্যে দর্শন' পাওয়া যায়। শ্রুতিকে বাদ দিয়া যে অশ্রৌত দর্শন, তাহাই কুদর্শন বা দর্শন-বাধ। শ্রীমদ্ভাগবত (ভাঃ ২।৮।৪) বলেন,—

শৃন্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ সচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি।।

যিনি শ্রীহরির সুমঙ্গলকথা শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক নিত্য শ্রবণ এবং তদনুকীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ভগবান্ অতিশীঘ্রই সেই শ্রবণ কীর্ত্তনকারীর হৃদয়ে স্বয়ং আবির্ভূত হন। তদ্‌বিষয়ে শ্রবণ-কীর্ত্তনকারী ভক্তের বিশেষ চেষ্টা বা কৃত্রিমভাবে অষ্টকাল লীলাস্মরণ অথবা রূপাদি দর্শনের প্রয়োজন হয় না।

সদ্য হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ। (ভাঃ ১।১।২)

শুশ্রূষুগণই তৎক্ষণাৎ অধোক্ষজ কৃষ্ণকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিয়া থকেন। একমাত্র শ্রবণকারী ব্যক্তিই তৎক্ষণাৎ ভগবানকে নিত্য হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিয়া দর্শন করিতে পারেন। যাঁহারা নিজেন্দ্রিয়তাৎপর্য্যার্থ শ্রবণবিমুখ হইয়া অনর্থময় "হৃদ্‌কমলে বামে হেলে দাঁড়িয়ে বাজাও বাঁশরী" প্রভৃতি ফক্কাকার' বাক্য-মাত্র প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাঁহারা অধিকতর দর্শনবাধের মধ্যে স্বয়ংই অবরুদ্ধ হইয়া পড়েন, অধোক্ষজ পরমস্বতন্ত্রাকৃষ্ণকে অবরুদ্ধ করিতে পারেন না। যাঁহারা জ্ঞানের অর্থাৎ অধিরোহ প্রণালীর যাবতীয় চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র সাধুগণের উচ্চারিত কথা শ্রবণ এবং কায়মনোবাক্যে উহার সৎকার করিয়া জীবন ধারণ করেন, অখিল লোকে অজিত ভগবান্ তাঁহাদের নিকটই জিত হইয়া থকেন—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয় বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।। (ভাঃ ১০।১৪।৩)

শ্রবণকারী পুরুষই শ্রীভগবানের পাদপদ্ম সাক্ষাৎকার পান—

পিবন্তি যে ভগবতঃ আত্মনঃ সতাং কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়বিদুষিতাশয়ং ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্।। (ভাঃ ২।২।৩৭)

যাঁহারা নিজ ইষ্ট ভগবান্ শ্রীহরির ও তদীয় ভক্তবৃন্দের কথামৃত শ্রবণপুটে সংস্থাপিত করিয়া পান করেন, তাঁহারা বিষয়-দূষিত অন্তঃকরণকে পবিত্র করেন এবং শ্রীভগবানের পাদপদ্মসমীপে উপনীত হন।

প্রত্যক্ষ দর্শন, ভ্রম-প্রমাদাদি শ্রবণ আমাদিগকে প্রতি মুহূর্ত্তেই ছলনা করিতে পারে। আত্মারাম সরকারের মন্ত্র প্রয়োগে কাহারও মস্তক কাটিয়া গেল দেখিলাম, কিন্তু বস্তুতঃ উক্ত ব্যক্তির মস্তক অটুটই রহিল, ঐন্দ্রজালিক একটি অশ্বকে অগ্নি-দ্বারা দগ্ধ করিয়া ফেলিল, আবার পরমুহূর্ত্তেই সেইরূপ একটি অশ্ব সেই স্থানেই আনিয়া দিল, একজন হয় ত' আমার প্রতি খুব প্রসন্ন, তাঁহাকে আমি ক্রুদ্ধ দর্শন করিলাম; একজন

প্রকৃত নিষ্কপট সাধুকে 'স্ত্রীসঙ্গী' বলিয়া দর্শন করিলাম, আর কপট স্ত্রীসঙ্গীকে 'সাধু' মনে করিলাম। নবদ্বীপের পড়ুয়া-সমাজ, পাষণ্ডী হিন্দুগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ''গোপী গোপী'' উচ্চারণ করিতে দেখিয়া স্ত্রী-চিন্তা-বিহ্বল এবং মহাপ্রভুর গোপীভাবে কৃষ্ণের প্রতি ক্রোধ ও দোষারোপের অপ্রাকৃতত্ব অবধারণাভাব, গোপীভাবময় মহাপ্রভুর পড়ুয়াকে কৃষ্ণপক্ষপাতী জ্ঞানে ক্রোধভরে তাহার পশ্চাদ্ধাবন, পড়ুয়ার পলায়ন তথা তদ্দর্শনে কর্ম্মজড় হরি-বিমুখ ব্রাহ্মণ ব্রুবগণের মহাপ্রভুকে অত্যন্ত ক্রোধী এবং ব্রাহ্মণ-হিংসকরূপে দর্শন—মহাপ্রভুর প্রকৃত স্বরূপ দর্শনের বাধক। সহিষ্ণু হইয়া মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ-ব্যতীতই মহাপ্রভুকে অক্ষজনেত্রে দর্শন (?) করিয়াছিল বলিয়া কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণ বঞ্চিত হইয়াছিল। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তির সহিত সাধুর কথা শ্রবণ না করিয়াই যাঁহারা 'সাধুকে দর্শন করিয়া ফেলিয়াছি' মনে করেন, তাঁহারা এইরূপেই বঞ্চিত হন। জগতে শতকরা প্রায় শতজন লোকই অধোক্ষজ তত্ত্বের শ্রবণব্যতীতই 'দর্শক' হইয়া পড়ায় তাঁহারা এইরূপ ভাবেই বঞ্চিত হইয়া থাকেন। কাহারও কল্পিত বুজরুক্ গুরু কোনও অনর্থযুক্ত ব্যক্তিকে হয় ত' 'ভূত' বা ইন্দ্রজাল দেখাইয়া দিলেন, আর অমনি শিষ্যব্রুব উহাকেই 'ভগবদ্দর্শন' বলিয়া মানিয়া লইল এবং তাহা প্রচার করিয়া বঞ্চিত গণগড্ডলিকার নিকট 'মহাসাধু'ও ভক্ত' বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে করিতে কেবল বঞ্চনা-বিষয়গর্ত্তেই পতিত হইতে থাকিল।

অকৈতব শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে এই সকল কথা নিয়ত শ্রবণ ফলে আমাদের ভগবদ্দর্শনের বাধক ঐ সকল প্রতি বন্ধক ও অনর্থময় ভ্রান্তিরাশি বিদূরিত হয়।

হিরণ্যকশিপুর বিষ্ণুর 'দর্শন'-চেষ্টা আর প্রহ্লাদের বিষ্ণুর 'দর্শন' সম্পূর্ণ পৃথক্। প্রহ্লাদ 'শ্রবণ' করিয়াছিলেন, আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ শ্রবণ-ফলে জানিয়াছিলেন,—আত্মনিবেদনকারীর নিকট অধোক্ষজ বিষ্ণু হিরণ্যকশিপুর রাজদরবারের ভোগ্য স্তম্ভেরও অন্তর্যামী ও নিয়ামক প্রভুতত্ত্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন—প্রহ্লাদ শ্রবণ-ফলে বুঝিয়াছিলেন—স্তম্ভকে 'দর্শন' করা যায় না, যতক্ষণ না স্তম্ভ তাঁহাকে দর্শন করাইয়া থাকেন। হিরণ্যকশিপু নিজ-চেষ্টায় স্তম্ভকে দর্শন করিতে চাহিয়াছিলেন—পদাঘাত করিয়া—স্বীয় অহমিকা ও বলপ্রয়োগে স্তম্ভ দর্শন করিতে চাহিয়াছিলেন, তাই স্তম্ভ তাঁহার দর্শনের বাধক অর্গলরূপে—'দর্শনে'র হন্তারকরূপে স্তম্ভান্তর্গত কশিপু-বিদারক মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছিলেন, আর শ্রবণ-শরণাগত প্রহ্লাদ 'স্তম্ভ তাঁহার স্বরূপ দর্শন করাইলে তিনি স্তম্ভকে দর্শন করিতে পারিবেন' শ্রবণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার নিকট স্তম্ভ হইতে অধোক্ষজ ভক্তিবিঘ্নবিনাশন প্রহ্লাদাহ্লাদ-দায়ক শ্রীনৃসিংহ বৈভবতত্ত্বের অবতরণ হইয়াছিল। যাহারা 'শ্রবণ' না করিয়াই দর্শন করিবার পক্ষপাতী—যেন অধোক্ষজ ভগবানের সহিত অক্ষজ নেত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া—পদাঘাত করিয়া দর্শন করিবার পক্ষপাতী, তাহাদের মনোভাব কশিপু-মনোভাবেরই প্রতিমূর্ত্তি। প্রহ্লাদ ঐরূপ 'দর্শন' চেষ্টাকে নিরাস করিয়াছেন। প্রহ্লাদ বলেন,—শ্রবণকারীই দর্শন করিতে পারেন—সেবোন্মুখ শ্রোতাই অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব-দর্শনের নেত্র। সেখানে শ্রোত্রের সহিত নেত্রের আর ব্যবধান থাকে না।

অতাত্ত্বিক প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় মনে করেন, শ্রীগৌরসুন্দর লোকদিগকে প্রথমে তাঁহার দর্শন অর্থাৎ রূপ-দ্বারা আকৃষ্ট করিয়া পরে তাহাদিগকে হরিনাম শ্রবণ করাইয়াছিলেন। লোক প্রথমে রূপ-দ্বারাই আকৃষ্ট হয়, পরে রূপাকৃষ্ট ব্যক্তি শ্রবণার্থ কর্ণ নিয়োগ করে। যেমন কাশীর মায়াবাদি-সন্ন্যাসিগণ প্রথমে মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করেন নাই, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর রূপাকৃষ্ট হইবার পরে তাঁহারা মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব-প্রধান।।

দর্শন-প্রভাবেই মুখে হরিনামকীর্ত্তন উপস্থিত হয়, শ্রবণ প্রভাবে 'হরিনাম' নহে—ইহাই মহাভাগবতের লক্ষণ।"

আপাতযুক্তিতে এরূপ ভ্রান্তি বা সাধারণ ভ্রম প্রেয়ঃকামী প্রাকৃত সহজিয়া- সমাজে প্রবলতা লাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ ইহাও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্গুরুর শ্রীমুখ হইতে যথার্থ তাৎপর্য্য শ্রবণের অভাব হেতুই বহুরূপী প্রচ্ছন্ন অনর্থের অন্যতম-রূপেই উদিত। এই সকল সুক্ষ্মসূক্ষ্ম ভ্রম "শ্রবণ"—ফলেই বিদূরিত হইতে পারে, নতুবা আপাত দর্শনে ঐ ভ্রম আরও পরিবর্দ্ধিত হইয়া আমাদিগকে শ্রীচৈতন্যচরণ হইতে 'দূরাৎ সুদূরে'ই নিক্ষেপ করিতে থাকে।

মহাপ্রভু প্রকাশানন্দ সরস্বতী বা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া জীবের অদৈব-প্রবৃত্তি মোহন করিয়াছিলেন, এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীমুখ-গাথা শ্রবণের পূর্ব্বে মহাপ্রভুর দর্শন (?) লাভ করিয়াও প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুর পরমেশ্বরত্ত্ব সম্বন্ধে যে ধারণা করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত স্বরূপ দর্শন হয় নাই। মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া প্রকাশানন্দ এইমাত্র বুঝিয়াছিলেন যে, মহাপ্রভু—"কেশবভারতীর শিষ্য", "সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী" "সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন-গায়ন। ভাবুক সব সঙ্গে লঞা করহ কীর্ত্তন।" "হীনচার কর কেনে, ইথে কি কারণ" ইত্যাদি। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-কথা "শ্রবণে'র পূর্ব্বে "দর্শন" (?) করিয়া মহাপ্রভুর সম্বন্ধে বিচার করিয়াছিলেন,—"ইহার প্রৌঢ় যৌবন। কেমনে সন্ন্যাসধর্ম্ম হইবে রক্ষণ।। নিরন্তর ইঁহাকে বেদান্ত শুনাইব। বৈরাগ্য-অদ্বৈত-মার্গে প্রবেশ করাইব।। কহেন যদি, পুনরপি যোগপট্ট দিয়া। সংস্কার করিয়ে উত্তম সম্প্রদায়ে আনিয়া।।" নবদ্বীপের পড়ুয়াপাষণ্ডিগণ মহাপ্রভুকে নিয়ত দর্শন করিয়াও শচী পিসির 'ছেলে' মাত্র মনে করিয়া মহাপ্রভুকে কাজীর শাসনাধীন প্রজামাত্র-জ্ঞানে কাজীর নিকট মহাপ্রভুকে নবদ্বীপ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াদিবার জন্য সকলে মিলিয়া আবেদন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিবার পূর্ব্বে মথুরা হইতে প্রয়াগের পথে বিজলীখাঁ প্রভৃতি পাঠানগণ মহাপ্রভুকে ও তদ্ভক্তগণকে দর্শন করিয়াও মহাপ্রভুর নিষ্কপট সেবক বৈষ্ণবগণকে "বাটোয়ার" এবং মহাপ্রভুকে বাটোয়ারগণের বিষপ্রয়োগে মুমূর্ষু জীব মনে করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশে ভ্রমণকালে জনৈক বৌদ্ধাচার্য্য মহাপ্রভুকে অক্ষজনেত্রে দর্শনের অভিনয় করিয়াও মহাপ্রভুর সহিত কুতর্ক এবং সকলে মিলিয়া কুমন্ত্রণা করিয়া অমেধ্য অন্ন-দ্বারা মহাপ্রভুকে বঞ্চনা করিবার চেষ্টা দেখাইয়াছিল। রামচন্দ্রপুরী মহাপ্রভুকে

দর্শন (?) করিয়াও শ্রবণের অভাবে মহাপ্রভুকে একজন জিহ্বালম্পট মনে করিয়াছিল। রামচন্দ্র খাঁ মহাভাগবত ঠাকুর হরিদাসকে দর্শন করিয়াও শ্রবণ বিমুখতার জন্য ঠাকুরের নিকট বেশ্যা প্রেরণ করিয়াছিল। যখন মহাপ্রভু তাঁহার ভৃত্য কৃষ্ণদাসকে কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক ভট্টথারির গৃহ হইতে আনিতে গিয়াছিলেন, তখন ভট্টথারি মহাপ্রভুকে দর্শন (?) করিয়াও শ্রবণ-বিমুখতা-নিবন্ধন মহাপ্রভুকে প্রাকৃত মনুষ্যমাত্র মনে করিয়া মহাপ্রভুর প্রতি অস্ত্রনিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু সেই প্রকাশানন্দ সরস্বতী, সেই সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, সেই বিজলী খাঁ প্রভৃতিই শ্রবণ করিবার পর মহাপ্রভুর স্বরূপ যথার্থ-রূপে 'দর্শন' করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বৌদ্ধগণ এবং বৌদ্ধাচার্য্যও শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখে পরবর্ত্তিকালে 'কৃষ্ণনাম' শ্রবণ করিবার পরই মহাপ্রভুর স্বরূপ দর্শন করিতে পারিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ মধ্য ৯।৬২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। মহাভাগবতলীল শ্রীচৈতন্যদেবকে 'দর্শন' করিয়াও পূর্ব্বে বৌদ্ধ ও বৌদ্ধাচার্য্যগণের মুখে 'কৃষ্ণ'-নাম বহির্গত হয় নাই। নামাচার্য্য মহাভাগবত শিরোমণি ঠাকুর হরিদাসকে দর্শন করিয়াও 'মুলুকের কাজী' প্রভৃতির মুখে 'কৃষ্ণ' নাম বহির্গত হয় নাই অথচ ঠাকুর হরিদাসের নিকট 'শ্রবণ'ফলে বেশ্যারও মঙ্গলোদয় বা ঠাকুর হরিদাসের পাদপদ্ম নখশোভা 'দর্শন' হইয়াছিল।

মহাভাগবত যদি কৃপা-পূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন করান, তবেই তাঁহার দর্শনে আমাদের মুখে 'হরিনামে'র উদয় হয়। সেখানে মহাভাগবতের কৃপা শক্তি সঞ্চারের 'অবতরণ', অনর্থযুক্ত জীবের দাম্ভিকতাপূর্ণ দর্শন-চেষ্টার আরোহণ' নহে। মহাভাগবতকে শ্রবণ-সেবোন্মুখতার দ্বারা যে দর্শন হয়, তৎফলেই আমাদের জিহ্বার প্রকৃত 'নাম' প্রকাশিত হইয়া থাকে।

মহাপ্রভু বহির্ম্মুখগণের মোহনার্থ কখনও কখনও ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেও তদ্দ্বারা বহির্ম্মুখদের আসুর ভাবের সাময়িক স্তব্ধ হইয়াছে মাত্র, কিন্তু 'শ্রবণ'-ফলেই বহির্ম্মুখগণের প্রকৃত স্বরূপ দর্শন ঘটিয়াছে। মহাপ্রভু সর্ব্বত্রই শ্রবণামৃত বিতরণ করিয়াছেন।

> যারে দেখে, তারে কহে,—কহ কৃষ্ণনাম।
> কৃষ্ণ-নামে ভাসাইল নবদ্বীপ-গ্রাম।। (চৈঃ চঃ আদি ১৩।৩০)
> যারে দেখ, তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
> আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ।। (চৈঃ চঃ মধ্য ৭।১২৮)

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছিলেন,—

"তচ্চ নামরূপ গুণপরিকরলীলাময়শব্দানাং শ্রোত্রস্পর্শঃ।

প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্। শুদ্ধেচান্তঃ করণে রূপশ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যেত, সম্পন্নে চ গুণানাং স্ফুরণে পরিকরবৈশিষ্ট্যেন তদ্বৈশিষ্টং সম্পদ্যতে। ততস্তেষু নামরূপগুণপরিকরেষু সম্যক্ স্ফুরিতেষু লীলানাং স্ফুরণং সুষ্ঠু ভবতি। তত্রাপি শ্রবণে শ্রীভাগবতশ্রবণস্তু পরমশ্রেষ্ঠম্।।" (শ্রীভগবান্ ও ভক্তের) নাম-রূপ-গুণ-লীলাময় শব্দ-সমূহ শ্রবণ পথগত

হইলে তাহাকে 'শ্রবণ' বলা যায়। সাধনের প্রারম্ভে অন্তঃকরণ শুদ্ধির নিমিত্ত ভগবন্নাম শ্রবণের অপেক্ষা থাকে। অন্তঃকরণ শুদ্ধ অর্থাৎ বিষয়মল মুক্ত হইলে, ভগবানের রূপসম্বন্ধিনী কথা শ্রবণ এবং তাহার ফলে অন্তরে ঐ রূপের উদয়হেতু যোগ্যতা লাভ হয়। রূপের কথা শ্রবণ-প্রভাবে রূপের সম্যক্ উদয় হইলে গুণের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। গুণের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইলে পরিকরবর্গের সেবাবৈচিত্র্য এবং তৎসহ তল্লীলাবৈশিষ্ট্যও স্ফুরিত হয়। এইরূপে তদীয় নাম-রূপাদির স্ফুরণে তাঁহার লীলা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না হইয়া সুন্দরভাবে স্ফুরিতা হন।

যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত ছিলেন, তখন মূঢ়গণ গড্ডলিকা রাত্রিকালে দূর হইতে কালীয়দহে কোন নৌকার উপরে জনৈক কৈবর্ত্তকে প্রদীপ জ্বালিয়া মৎস্য ধরিতে দেখিয়া কালীয়নাগের উপর কৃষ্ণের আবির্ভাব মনে করিয়াছিল। অভিন্ন কৃষ্ণচন্দ্র মহাপ্রভুকে দর্শন (?) করিয়াও তাহারা অপ্রাকৃত কৃষ্ণকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া 'দর্শন' না করিয়া কৈবর্ত্তে কৃষ্ণবিবর্ত্ত করিয়াছিল। এমন কি, যে বলভদ্র ভট্টাচার্য্য সাক্ষাৎ কৃষ্ণ মহাপ্রভুকে দর্শন (?) করিতেছেন, তিনিও বিবর্ত্তাশ্রিত "কৃষ্ণদর্শনের"র প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া-ছিলেন। মহাপ্রভু বলভদ্র ভট্টাচার্য্যকে "চাপড় মারিয়া" বলিয়াছিলেন,—

"মূর্খের বাক্যে 'মূর্খ' হইলা পণ্ডিত হঞা।"

সুতরাং শ্রবণবিমুখ বা শ্রবণদুর্ভিক্ষ-পীড়িত মূর্খ বা মূঢ় লোকের—

"নৌকাতে কালীয়-জ্ঞান, দীপে রত্ন-জ্ঞানে।
জালিয়ারে * * 'কৃষ্ণ' করি' মানে।।
* * * *
স্থাণু-পুরুষ যৈছে বিপরীত-জ্ঞানে।।"

—প্রভৃতি আপাত 'দর্শন' অধোক্ষজ 'কৃষ্ণদর্শন' নহে। কৃষ্ণতত্ত্ববিৎএর নিকট শ্রবণের দ্বারেই প্রকৃত দর্শন হয়। মহাপ্রভু উপরি-উক্ত লীলা প্রকাশ করিয়া এই শিক্ষাই প্রচার করিলেন।

যাঁহারা মৌনী সাধুর 'দর্শন'-মাত্র করিয়া নিজ-নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণ-মাত্র সাধন-পূর্ব্বক অনর্থময় হৃদয়গ্রন্থি-বিদারক সাধুমুখ-বিগলিত তীব্র শ্রেয়োপদেশ 'শ্রবণ' হইতে পলায়নের পথ আবিষ্কার করেন, তাঁহারা আত্মবঞ্চনাকামী। তাঁহারা সাধুর সঙ্গ-ফলে আত্মমঙ্গল চাহেন না, আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণপরা আত্মবঞ্চনাই পুরস্কাররূপে প্রাপ্ত হন। সাধুর কার্য্যই এই যে,—তিনি মনোব্যাসঙ্গছেদিকা উক্তি-সমূহ নিরন্তর 'শ্রবণ' করাইয়া থাকেন,—

"সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।।"

যে সাধু অনুক্ষণ শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে 'শ্রবণ' না করান, তিনি হয় আমাদিগকে অত্যন্ত পাষণ্ড দেখিয়া আত্মগোপন করিতেছেন, না হয় তিনি নিজে বঞ্চিত ও অপরকে বঞ্চনা করিতেছেন। কিন্তু

সেই সাধুই সর্ব্বাপেক্ষা মহামহাবদান্য, পরদুঃখদুঃখী—যিনি অনুক্ষণ অধোক্ষজ-কীর্ত্তন করেন এবং আমাদিগের কর্ণপুটে শ্রবণামৃত দান করিয়া আমাদের নিত্য চেতনতার পোষণ করিয়া থাকেন।

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ।।"

(ভাঃ ১০।৩১।৯)

শ্রবণ করি না কেন?

'শ্রবণে'র শ্রাবণী বাণী-বর্ষা সহস্রধারে শ্রীগুরুমুখাকাশ হইতে অবিরাম গতিতে বর্ষিত থাকা-সত্ত্বেও আমি শ্রবণ করি না কেন? দুর্ভিক্ষে মানুষ ক্লিষ্ট থাকে, অভাবগ্রস্ত থাকে, চক্ষু থাকা-সত্ত্বেও অন্ধকারে মানুষ বস্তু দেখিতে পায় না; কিন্তু শ্রীচৈতন্যবাণী-কীর্ত্তনের অভূতপূর্ব্ব সুভিক্ষ-সত্ত্বেও—কীর্ত্তন কিরণ-মালী মধ্যাহ্নগগনে উদীয়মান থাকিলেও আজ আমার 'শ্রবণে'র অভাব কেন?

'শ্রবণ' করি না বলিয়া "শ্রবণ করি না কেন"—এই প্রশ্নও ত' আমার হৃদয়ে আর্ত্ত ও ঐকান্তিক হইয়া উঠে না। শ্রবণ করি না বলিয়া "শ্রবণ করি না কেন" প্রশ্নের মামীংসাটাও ত' সুষ্ঠু হয় না।

না জানি কোন ভাগ্যফলে শ্রবণ-বিতরণের এক অশ্রুতপূর্ব্ব—অদৃষ্টপূর্ব্ব—অভূতপূর্ব্ব মহাকেন্দ্রশক্তি-সদন—শ্রবণদানের গোমুখীপ্রপাত আমার কর্ণের সম্মুখে কৃপা-পূর্ব্বক অবতরণ করিয়াছেন। পূর্ণতম চেতনের কীর্ত্তন-শক্তি মূর্ত্ত হইয়া কর্ণের দ্বারে অতিথি হইয়াছেন—কত ভাবেই না করাঘাত করিতেছেন—পুনঃ পুনঃ করাঘাত করিতেছেন—অবিশ্রান্ত করাঘত করিতেছেন; তথাপি সেই আঘাত 'শ্রবণ' করি না কেন?—বাণী শ্রবণ করি না কেন?—জাগরিত হই না কেন?

জাগরিত হইবে কে? আমি যে জাগিয়া ঘুমাইবার ভান করিতেছি—আমি যে শুনিয়াও শুনিতেছি না—কানের দুয়ারের অতিথিকে চেতনের অন্দরমহলে প্রবিষ্ট করাইলেই আমার আর আলস্য-লাস্য টিকিবে না; আমার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পাদ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের রাজা মন, আর মনের সহচর বুদ্ধি, অহঙ্কার সবগুলিকেই 'শ্রবণ' আত্মসাৎ করিয়া ফেলিবে; 'শ্রবণ'ই প্রভু—স্বরাট্ হইয়া পড়িবে; 'শ্রবণ' তা'র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবে; 'শ্রবণ' চক্ষু দান করিবে; 'শ্রবণ' কর্ণবেধ করিয়া সংস্কৃত নূতন কর্ণ প্রদান করিবে; 'শ্রবণ' নাসিকা, জিহ্বা, ত্বকের নিয়ামক হইবে; 'শ্রবণ' মনের গুণ্ডিচামার্জ্জন করিয়া 'শ্রবণে'র অমল, অচল আসন রচনা করিবে; 'শ্রবণ' আমার সর্ব্বনাশ করিবে—আমার সূক্ষ্ম শরীর ধ্বংস, আমার মনোবৃত্তি পর্য্যন্ত নাশ করিয়া দিবে—স্বরূপসিদ্ধি হইতে বস্তুসিদ্ধি করাইবে; আমার—'মাটিয়া' আমার কানা কড়ির প্রতিষ্ঠা—কানাকড়ির প্রভুত্ব—ছাইভস্ম, কৃমিকীট, বিষ্ঠামাটীর বৌদ্ধস্তূপের বাহাদুরী, বড়াই, স্মৃতিস্তম্ভ—স্মৃতিফলক, মাটিয়া আমার জন্ম, ঐশ্বর্য্য, রূপ, পাণ্ডিত্যের মাটিয়া চোক-ঝলসান তাসের

'পিরামিড্' 'শ্রবণ-আগ্নেরগিরির ভূমিকম্পে ধূলিসাৎ—অগ্নিসাৎ হইয়া যাইবে; এই জন্যই কি ''আমি শ্রবণ করি না?"

আমি পর-উপদেশে পণ্ডিত, পরের আচরণ-শিক্ষার আচার্য্য, পরের শ্রবণ-শিক্ষার গুরু; আমার কৈফিয়ৎ —আমি কীর্ত্তনকারী—গুরুর আদেশে প্রচারক। কিন্তু আমি 'শ্রবণ' করিবার পূর্ব্বেই ত' পণ্ডিত হইয়া পড়ি নাই? উপদেশক হই নাই? শ্রবণ না করিয়াই ত' আচার্য্য, কীর্ত্তনকারী, গুরু, শিক্ষক, প্রচারক হই নাই? শ্রবণের অনাবিল সজাগ দৃষ্টির দ্বারা ইহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি কি? 'শ্রবণ' কে প্রভু করিয়া দেখিয়াছি কি? না মাঝখানে আমার কর্ণের দ্বারে মাটিয়া প্রভুত্বের পর্দ্দা টানিয়া আবছায়া আলোর দ্বারা আমাকে 'কীর্ত্তনকারী', 'প্রচারক' প্রভৃতি দেখিতেছি? আমাকে পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, উত্তরোত্তর শ্রবণ, প্রতিনিয়িত শ্রবণ করাইবার জন্য—পদে-পদেও শ্রবণের পরীক্ষা প্রদান করাইবার জন্যই শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাকে কীর্ত্তন-প্রচারক করিয়াছেন, ইহা ভুলিয়া গিয়াছি কি? 'প্রতারক'-গণের বিরুদ্ধে 'প্রচারক' হইয়া নিজেই ত' 'আত্মপ্রতারক' হইয়া পড়িতেছি না? অনাচারিগণের আচার শিক্ষার আচার্য্য (?) হইয়া স্বয়ংই ত' আচারহীন হইতেছি না? সকল উপদেশ, সকল আচার, প্রচার, বিচার, সকল শিক্ষা, দীক্ষা কেবল পরস্মৈপদী করিয়া সেইগুলি আত্মনেপদী ধাতুর গণ হইতে একেবারে চিরনির্ব্বাসিত করিয়া ত' দিতেছি না? শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণকে উন্মুক্ত কর্ণের 'প্রভু' করিয়া ঐ সকল কথা শ্রবণ-শাসিত চিত্তে, শ্রবণ-শাসিত বিচারে ভাবিয়াছি কি?—বিচার করিয়াছি কি?—শ্রবণ-শাসিত চক্ষে দর্শন করিয়াছি কি? আমি সকল কার্য্যই শ্রীগুরুদেবের আদেশ লইয়া করিতেছি—এই কৈফিয়তে শ্রীগুরুদেবের নিকট ব্যবহারিকতার আত্মবঞ্চনা শ্রীগুরুপাদপদ্মের অকৈতব 'শ্রবণ'কে আবরণ করিয়া দেয় নাই ত'? শ্রীগুরুদেবের আদেশ চাহিবার নামে শ্রীগুরুদেবকে আমার আদেশে আদেশ দিবার জন্য আমিই আদেশ করি নাই ত'? শ্রীগুরুদেবের প্রতি আমার আদেশই 'শ্রীগুরু-আদেশ' বলিয়া প্রচার করিয়া শ্রীগুরু-শ্রবণকে 'প্রভু' করিবার পরিবর্ত্তে, আমার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি, আমার বিশেষ ঝোঁক, আমার আব্‌দার, আমার ইচ্ছা, আমার প্রভুত্বকেই 'প্রভু' করিয়া ফেলি নাই ত'? অনাবিল শ্রবণের কষ্টিপাথরে তাহা পরখ্ করিতেছি কি? আর পরখ্ করিবার সময় শ্রবণ-শাসিত চক্ষুকেই বা উন্মলিত রাখিয়াছি কি? আমার এ-সকল গুপ্ত কপটতা ধরিবার জন্য ''শ্রবণ করি না কেন?" কীর্ত্তন-সরস্বতী ত' কর্ণের দ্বারে নিত্য-প্রবাহিত। তথাপি তাঁহাকে শ্রবণাঞ্জলিতে পান করি না কেন?

আমি 'শ্রবণ' না করিয়াই আত্মবাহাদুরীর জন্য কীর্ত্তন (?) করি, আবার আত্মবাহাদুরী ছাড়িয়া প্রকৃত কীর্ত্তন করিতে হইবে বলিয়াই 'শ্রবণ' হইতে বিরত হই। 'কীর্ত্তন'-অর্থে—শ্রবণ-শাসিত জীবন যাপন—শ্রবণ ব্যাপ্ত হইলেই কীর্ত্তন হয়, আর শ্রবণ' সঙ্কুচিত ও স্তব্ধ হইলেই কীর্ত্তনবার বা মাটিয়া'র প্রভুত্ব, লাভ-পূজা কামনারূপ যবনিকার পতন হয়। গদমুখস্থ বলিতে পারা—বুলি আওড়াইয়া প্রেয়ঃপন্থী লোক ভুলাইতে পারা—লোকের বাস্তব নিত্যমঙ্গল করিবার পরিবর্ত্তে লোকে যাহা চাহে, তাহাই হরিকথার মুখস পরাইয়া লোকের কর্ণে ঢালিয়া দিবার কৌশল-বিজ্ঞানে নিপুণ হওয়া, আর বঞ্চিত লোকের দেওয়া 'বাহাবা'র মালা আপনার গলায় বরিয়া লইয়া নিশ্চিন্ত থাকা 'শ্রবণে'র ফল কি?

আমাকে ত' সকল কথাই বলা হইয়াছে, হইতেছে—হাজার বার—লক্ষ- বার—কোটী বার বলা হইয়াছে, হইতেছে—সহস্রদাগ বসাইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিয়ত বলিতেছেন; তথাপি আমি "শ্রবণ করি না কেন?" আমি মনে করি, আমি ঠিক আছি, আমার সব শুনা হইয়া গিয়াছে, একঘেয়ে কথা শুনিয়া আর লাভ কি? শ্রীগুরুপাদপদ্ম-প্রতিবারে চেতন রাজ্যের নূতন কথা শ্রবণ করান, এ কথা আমার মৌখিক মনরাখা কথা—গুরুপাদপদ্মকে (?) তোষামোদ (?) করিয়া আত্মতোষামোদ (?) আদায় করিবার কপটতা! শ্রবণ করি না বলিয়া— অন্যমনস্ক, অন্যভাবভাবিত অন্তরে জানি, ঐ সকল বস্তুতঃ একঘেয়ে কথার—পুরাণো পচা সংবাদের কেবল পিষ্টপেষণ! সুতরাং 'শ্রবণে'র পরিবর্ত্তে সেই সময়টা যদি আত্মবাহাদুরী অর্জ্জনের খুব একটা কর্ম্মঠ আড়ম্বর দেখাইতে পারি, তাহা হইলে 'আমার দাঁড়ে কিছু অধিক ছোলা পাওয়া যাইবে।' শ্রবণের পথে অর্গল দিয়া বিলাসিনী, বহুরূপিনী আত্মবঞ্চনাকে আলিঙ্গন করিতে যাওয়ায় শ্রীগুরুপাদপদ্মের 'বাণী-শ্রবণ'কে একঘেয়ে অলস-কৃত্য-বোধ, আর আমার জয়ঢাক পিটাইবার মহাআড়ম্বর ও হট্টগোলকেই শ্রীগুরুদেবের অনুমোদিত কার্য্যকলাপরূপে কল্পনা করিয়াছি। ইহা আমার শ্রবণের পথে আর একটি অর্গল। কর্ণবেধ-সংস্কার করাইবার কালে শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রাকৃত জন্মের অর্গল, ঐশ্বর্য্যের অর্গল, পাণ্ডিত্যের অর্গল, প্রাকৃত রূপের অর্গল খুলিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ প্রাকৃত অর্গলগুলি এখন 'প্রাকৃতের'র ছলনায় বার্ণিশে মাজা-ঘষা-চাকচিক্যযুক্ত হইয়া নূতন রকমের চারিটী দৃঢ়তর অর্গলরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

এখন জন্মের অর্গলটার আর পূর্ব্বের অসংস্কৃত মূর্ত্তি নাই—লোক-দেখানো ও নিজ-মন-ঠকানো অপ্রাকৃতের ভাবনা দিয়া আমি মনে করিতেছি, যেহেতু গুরুগৃহে আমার সাময়িক কোমল সেবোন্মুখতাকে উৎসাহিত করিবার জন্য বা প্রবল আত্মবঞ্চনাকামী আমাকে রক্ষা করিবার জন্য আমাকে তাঁহার সংকীর্ত্তন-মণ্ডলীতে স্থান দিয়াছেন, সুতরাং আমি অপ্রাকৃত (?) আভিজাত্যে, জন্মে—শ্রেষ্ঠ—জ্যেষ্ঠ; সেবক-কুলের মধ্যে কুলীন-প্রবীণ। কিংবা যেহেতু দীক্ষিতের অভিনয় করিয়া আমি দীক্ষাদাতার কুলে জন্ম লাভ করিবার অভিমান পোষণ করি, সেহেতু প্রকৃত সেবাজ্যেষ্ঠ, সেবা-শ্রেষ্ঠ, সেবা-কুলীন, সেবা-প্রবীণের সহিত আমি সাম্যবাদে প্রতিষ্ঠিত—এইরূপ সংস্কৃত (?) জন্মাভিমান কি আমার শ্রবণ-পথের আত্মছলনাময় অর্গল নহে?

ঐশ্বর্য্য-অহমিকার অর্গলটাও আমাতে তেমনি অপ্রাকৃতের অভিনেতার আকারে নূতন মূর্ত্তিতে উপস্থিত হইয়াছে। আমি অধিক অর্থ সংগ্রহ করিতে পারি—অর্থের পরিমাণের অনুপাতে সেবার পরিমাণের সমীকরণ অঙ্কপাত করিবার গণিতবিদ্যাবিশারদ হইতে পারি—অধিক অর্থ-উপার্জ্জনকারী আমি স্বয়ংই প্রণোদিত হইয়া আমার ভাগে অধিক সেবা, অধিক সুন্দর খাদ্য, সুন্দর বেশভূষা-শয্যা-সজ্জোপকরণে অধিক দাবী রাখিতে পারি—আমার মক্কেল রাজা-মহারাজা, রাণী-মহারাণী, জমিদার রাইয়া, বড় বড় ব্যবসায়ী-মহাজন, উচ্চ রাজকর্ম্মচারী—'এ' হইতে 'জেড্' পর্য্যন্ত উপাধিধারী, পেটমোটা, হোম্‌রা-চোম্‌রা ব্যক্তি, আর অপর

নিষ্কপট ঐকান্তিক নীরব সেবকের গুরু-সেবার আনুকূল্যকারী যত ফোতো লোক—গ্রাম্য সরল লোক; চতুর্ম্মন্য আমি ঐ সকল বড় বড় মক্কেল হইতে মাঝপথে আমার কিছু বর্ত্তমান বা ভাবী সুখ-সুবিধা করিয়া লইবার কৌশল জানি, আর আমার বিচারে বোকা, মূর্খ অপর সেবক সেরূপ কৌশলে অনভিজ্ঞ; সুতরাং আমার সম্মান, আমার প্রভুত্ব, আমার প্রাপ্যভাগ নিশ্চয়ই সেই অনুপাতে বেশী—এইরূপ অনুপাত-অঙ্ক আমি নিয়তই কষিতে পারি—গুরুপাদপদ্ম যেন ঐশ্বর্য্যাহীন—গুরুপাদপদ্ম যেন আমার উপার্জ্জিত ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যান্বিত ও প্রচুর উপকৃত হইবার বস্তু—শ্রবণ-প্রতিষ্ঠান আমারই (?) পরিশ্রমে—পরিশ্রমলব্ধ ও উপার্জ্জিত অর্থে প্রতিষ্ঠিত, প্রতিপালিত, পরিবর্দ্ধিত, পরিপুষ্ট; সুতরাং আমার আত্মপ্রতিষ্ঠার—আধিপত্যের ভাগ অধিক হইতে বাধ্য—এইরূপ কত কি ঐশ্বর্য্য—অহমিকা আমার শ্রবণ-পথে আরও একটি আত্ম ছলনাময় অর্গল আনয়ন করিয়াছে।

পাণ্ডিত্যের অর্গলটি ব্যাকরণের ব্যায়াম-চর্চ্চার মধ্যে দিয়া অনেক সময়ে স্বরূপ প্রকাশ না করিলেও বাগ্‌বৈখরীর 'ফুলঝরি' বাজীতে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কথারত্নগুলিকে পোড়াইয়া (?) না ফেলে—সাহিত্যের স্বৈরপ্লাবন গুরুমুখী গোমুখী-ধারাকে ভাসাইয়া দিবার অহমিকার 'বর্ণচোরা' অর্গল সৃষ্টি না করে, তাহাই ভাবিবার বিষয়। প্রতিবিম্বিত সাহিত্যের শব্দ-ঝঙ্কারকেই 'প্রভু' করিয়া তুলিয়া শ্রীচৈতন্যসারস্বত-সাহিত্যের নবনবায়মান অফুরন্ত ভাণ্ডারের শ্রেয়ঃ কুমুদ-বিকাশী শব্দাবতারকে 'একঘেয়ে', 'অপ্রিয়', 'তীব্র', কামরস-সাহিত্যহীন বিচারে বিদ্যাসুন্দরী সাহিত্যের স্রোতে 'ভাসাইয়া না দেয়, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। ঐরূপ গুরুশ্রবণ-রাহিত্যের সাহিত্য, ঐরূপ বাগ্মিতার ব্যায়াম, ঐরূপ পাণ্ডিত্য-প্রতিভার প্রতারণা আমার শ্রবণ-পথের লৌহ-অর্গল রচনা না করে! শ্রবণ—পুনঃ পুনঃ শ্রবণ—প্রতিমুহূর্ত্তে শ্রবণ না করার ফলে আমি ভুলিয়া যাই,—'ভাষা', গাত্রাবরণ, পোষাক কিংবা শরীরমাত্র—শরীরী নহে; তাই আমার স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা আমার নিজ-স্বরূপ আত্ম ও উপাস্য পরমাত্মাকে স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-বশে ঢাকিয়া ফেলিবার ন্যায় শ্রবণ-বিমুখ আমি শ্রীগুরুমুখ-বিগলিত নিত্যশরীরী স্থানীয় শ্রুতিকে—সাক্ষাৎ কৃষ্ণকে—পরম প্রভুকে উন্মার্গগামিনী ভাষার দ্বারা ঢাকিয়া ফেলিতে চাহি। বাহিরের পোষাক দ্বারা মূল তাৎপর্য্যটীকে ঢাকিয়া ফেলিয়া কুহক সৃষ্টি করিবার জ্ঞাত বা অজ্ঞাত প্রবৃত্তি আমার শ্রবণ-বিমুখতা হইতেই উদিত হয়। আমি শ্রুতিকে—শ্রৌত শ্রীচৈতন্যবাণীকে বিষ্ঠাভোজী আমার পচা ও পঙ্কিল পাণ্ডিত্যের পেষণে পিষিয়া ফেলিতে চাহি—মনে করি, শ্রুতিতে আমা অপেক্ষা পাণ্ডিত্য—সাহিত্য কম আছে—আমি শ্রুতিকে সংশোধিত (?) করিতে পারি—কর্ম্মি-জ্ঞানি-সম্প্রদায়ের উচ্ছিষ্ট, লালা-লব, বমন-সদৃশ আধ্যক্ষিক কুপাণ্ডিত্য বা "ডু কৃঞ, করণ" গলাধঃকরণ করিয়া শ্রুতির ভুল ধরিতে পারি। কখনও বা 'ডু, কৃঞ, করণা"দি আয়ত্ত করিবার শক্তির অভাবজনিত জাগতিক মূর্খতার বিষাদে মরমে মরিয়া 'আঙ্গুর ফল টক্' ন্যায়াবলম্বনে অন্তরে ঐরূপ পাণ্ডিত্যের জন্য আর্ত্ত, আকাঙ্ক্ষী থাকিয়া বাহ্যে ঐরূপ পাণ্ডিত্যের প্রতি মৌখিক উদাসীনতা প্রদর্শন-পূর্ব্বক প্রচ্ছন্ন কুপাণ্ডিত্যের স্পৃহার চাপে শ্রৌতবাক্যকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলি! এইরূপ নূতন সংস্করণের

শ্রুতাভিমান আমার শ্রুতিপথের কঠিন অর্গল-স্বরূপ হইয়াছে। আমার মাটিয়া রূপে—আমার কত সুন্দরতম স্বরূপে রূপের আবরণের মাংসময় কুরূপে মাটিয়া-সমাজ আকৃষ্ট; আবার তেমনি শ্রবণ-বিস্মৃতি আমার মাংসচক্ষুও তাহাদের 'মাটিয়া' রূপে আকৃষ্ট। কুরূপের এই পরস্পর সমবেদনা—পরস্পর উত্তর-প্রত্যুত্তর আমার পুরুষাভিমান বৃদ্ধি করিতেছে। এই পুরুষাভিমান হইতে অনর্থের অগণিত বংশধর-সমূহ সৃষ্টি হইতেছে। রূপাভিমান কখনও প্রতিষ্ঠা-কামিনীর সহিত লুকোচুরি খেলিতেছে, কখনও স্বয়ংসিদ্ধ নায়ক হইবার মালমসলা সংগ্রহ করিতেছে, কখনও প্রেয়ঃকামিগণের অভিনন্দনের আলিঙ্গন অনুসন্ধান করিতেছে, কখনও কৃষ্ণসেবার 'হিরণ্য'কে সেব্যপূজার পূর্ব্বেই স্বীয় আধিপত্যের উচ্ছিষ্ট করিয়া ফেলিতেছে, কখনও বা প্রভুতার বাসকসজ্জায় বিশ্রাম-সদন খুঁজিতেছে। তাহাতে শ্রীরূপানুগশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম বহু দূরে সরিয়া পড়িতেছেন। তাই বলিতেছিলাম, আমার কর্ণের দ্বার এইরূপ বহু অর্গলে অবরুদ্ধ করিয়া আমি রূপের, গন্ধের, আস্বাদনের, স্পর্শের, ধ্যানের, বিচারের, প্রচারের, আচারের গ্রাহক অনুগ্রাহক—ক্রেতা-বিক্রেতা হইয়া পড়িয়াছি। কাজেই আমার যত কিছু আচার, তাহা সমস্তই 'স্বৈরাচার', 'ব্যভিচারী' হইয়া পড়িতেছে। 'শ্রবণ-পথ'ই প্রভুর—পতির বিজয় পথ—রাজকীয় পথ—রথবর্ত্ম, আমারও অভিসারপথ তাহাই। যখন সেই শ্রবণ-পথে অর্গল লাগাইয়া রাখিয়া প্রভুর প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ করিয়াছি, আর রূপের সহিত গন্ধের সহিত, স্পর্শের সহিত, মনের সহিত আমি মিতালী করিতেছি, তখন আমাকে সজ্জন-সমাজ 'স্বৈরাচারী' 'ব্যভিচারী' বলিবেন, না ত' কি বলিবেন?

রূপের পথ, গন্ধের পথ, স্পর্শের পথ, আস্বাদনের পথ বা ভাবনার পথ আপাত প্রতীতিতে পুষ্পাস্তরণাচ্ছাদিত হইতে পারে—আমি সেখানে 'কুসুম বিছাইয়া রাখিবার' কল্পনাও করিতে পারি, কিন্তু আমার সেই পচা রূপের পথে, দুর্গন্ধের পথে, 'মাটিয়া' স্পর্শের পথে সচ্চিদানন্দ কান্ত আসিবেন না। শ্রবণের পথে গঙ্গোত্রীধারা আমার যত কুরূপ, দুর্গন্ধ, মাটিয়া কামজ স্পর্শ-স্পৃহা, মনোমল সকলগুলিকে বিধৌত করিয়া যখন চেতনের সুরূপের সুগন্ধি আসন প্রকট করিবে, তখনই নিত্য কান্ত শ্রবণের পথে প্রবিষ্ট হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

আমার ঘ্রাণের পথ নাসিকা, আস্বাদনের পথ জিহ্বা, স্পর্শের পথ ত্বক্—এক লাইনে, আর উহাদেরই রাজ্য সীমানার মধ্যে—নাসিকা-জিহ্বা-ত্বকের লাইনেরই দুইধারে থাকিয়া দুই চক্ষু দুইটি দালালরূপে ঘ্রাণের পথে, আস্বাদনের পথে, স্পর্শের পথে যত ক্রেতা-বিক্রেতা সকলকে প্রতি মুহূর্ত্তে ধরিয়া লইয়া আসিতেছে। চক্ষু ফুল দেখাইয়া দিলে নাসিকা ফুলের গন্ধ বরণ করিতেছে, জিহ্বা মধু পান করিতেছে, ত্বক্ কোমলতাকে আলিঙ্গন করিতেছে। বিধাতা কিন্তু ঐ চারটীর রাজ্য-সীমানা হইতে শ্রবণ-পথটিকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছেন— স্বতন্ত্র রাখিয়াছেন। চক্ষু দিয়া 'বৃত্তপাদ' (quadrant) দর্শন হয়—'একপাদ' দর্শন হয়—৯০ ডিগ্রি-মাত্র দর্শন হয়—৩৬০ ডিগ্রি দর্শন হয় না। চক্ষু-দ্বারা নাসিকা-ভাগ জিহ্বা-ভাগ, ত্বক্-ভাগ দর্শন হয়, কিন্তু কর্ণ দেখা যায় না; কেন না, উহা যে একপাদ সীমার বাহিরে। 'কর্ণ' একপাদ সীমার বাহিরে বলিয়াই একপাদের অতীত রাজ্য ত্রিপাদের কথা শ্রবণের পথ দিয়াই প্রবিষ্ট হইতে পারে—একপাদেব

অন্তর্গত চক্ষু নাসিকা, জিহ্বা ত্বকের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিতে পারে না; একচতুর্থাংশ-জ্ঞানের ইন্দ্রিয়-চতুষ্টয় হইতে স্বতন্ত্র পঞ্চম স্থানে অবস্থিত কর্ণের পথ দিয়াই পঞ্চম মানের মুরলীতান প্রবেশ করিতে পারে—শ্রবণের পথের দ্বারাই চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্, ইন্দ্রিয়ের রাজা মন অভিজ্ঞান লাভ করিতে পারে—চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মনের অতীত রাজ্যের সংবাদ শ্রবণের পথেই ঐ সকল ইন্দ্রিয়গুলির গ্রাহ্যবিষয় হয়। শ্রবণের পথ ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় পথ—'আমার প্রভুত্বের পথ';আর 'শ্রবণের পথ'—শ্রবণীয় শ্রীগুরু-কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পথ—প্রভুত্বের পথ। শ্রবণ-পথের—কৈঙ্কর্য্য করিলেই অন্যান্য পথগুলির মূল্য, আর উহারা স্বতন্ত্র হইলে ঐগুলিই নরক-পথ।

আমি কিন্তু 'শ্রবণ করি না' বলিয়া—'শ্রবণ করিতে চাহি না' বলিয়া—শ্রবণের পথ অপেক্ষা রূপের পথ, গন্ধের পথ, স্পর্শের পথ, আস্বাদনের পথ, মনের পথের কার্য্যগুলিকেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের অভীপ্সিত কার্য্যরূপে প্রচার করিতে চাহি—স্থাপন করিতে চাহি; অন্ততঃ 'শ্রবণের'র পথের অধিক মূল্য কপটতাপূর্ব্বক মৌখিক স্বীকার না করিলে আমার আত্মপ্রতিষ্ঠা সংরক্ষিত হয় না, এইজন্য "শ্রবণের" পথের মৌখিক মূল্য প্রদান-পূর্ব্বক রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শাদি পথেরই আন্তর-মূল্য ও আমার কল্পিত বাস্তবতা কার্য্যতঃ প্রদান" করি।

সর্ব্বত্র 'শ্রবণ'-দুর্ভিক্ষ-নিবারণ—শ্রবণ-সন্দেশ শ্রীচৈতন্য-কীর্ত্তনের বিতরণার্থই শ্রীচৈতন্য-কীর্ত্তন-সরস্বতীর মূর্ত্তাবতার শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাবতরণ; ইহাই ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গোস্বামী গৌরকিশোর প্রমুখ পূর্ব্বগুরু এবং শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাদ্ বাণীতে আমরা প্রতিনিয়ত 'শ্রবণ' করি। মঠ-মন্দির, মহোৎসব, ধর্ম্মশালা, সৌধ, স্মৃতি-স্তম্ভ, স্মৃতিফলক, পাঠশালা-বিদ্যালয়, বহির্ম্মুখলোক-সঙ্ঘের সহিত আলাপ ব্যবহার, অর্থসংগ্রহ, দেশ-পর্য্যটন, যানাদি আরোহণ, বর্ত্তমান উন্নত বিজ্ঞানের দানসমূহ স্বীকার, বৈদ্যুতিক আলোক, মুদ্রাযন্ত্র, গৃহত্যাগ, মঠবাস, বেষধারণ, পঞ্চসংস্কার, অর্চ্চন-পূজন সকলেরই মূল উদ্দেশ্য—মূল প্রয়োজন শ্রীচৈতন্য কীর্ত্তন—শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রতিষ্ঠা। যদি খুব উৎকৃষ্ট মর্ম্মরমণ্ডিত গগনভেদী উচ্চশীর্ষ মঠ-মন্দির নির্ম্মাণ কিংবা স্মৃতিস্তম্ভ, স্মৃতি-ফলক স্থাপন, খুব ঘটাপূর্ণ মহামহোৎসব, লোকভোজন, লোক-আপ্যায়ন হয়, আর ঐ মন্দিরের চূড়ায় যদি শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ কীর্ত্তনের বিজয়-বৈজয়ন্তী অনুক্ষণ উড্ডীন না থাকে—প্রত্যেক স্মৃতিফলক, প্রত্যেকটি কারুকার্য্য যদি শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন না করে, প্রত্যেকটির প্রগতি যদি কৃষ্ণ-শ্রবণ-কীর্ত্তনে পর্য্যবসিত না হয়—প্রতি সেবক খণ্ডে, রন্ধনশালায়, প্রসাদ-সেবন-শালায়—অলিন্দে, জগমোহনে, নাট্য- মন্দিরে, সেবাকার্য্যালয়ে, গ্রন্থাগারে, নহবতে, তোরণে, দ্বারে, অনুক্ষণ অনবদ্য, অকৈতব শ্রীচৈতন্যবাণীশ্রবণ ও তদনুকীর্ত্তন করিতে যদি না পারি, তবে আমার মঠ-দর্শন হইল কৈ?—মঠ-বাস হইল কৈ? আপনাকে শ্রীচৈতন্যমঠ—শ্রীগুরুপাদপদ্ম-শ্রবণানুকীর্ত্তন-পীঠ করিতে না পারিলে আমার গৃহব্রত-ধর্ম্ম ঘুচিল কৈ? অনুক্ষণ নিষ্কপটে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণকারীই—মঠব্রত বা শ্রীচৈতন্যমঠ; আর অচৈতন্য কথা—

চৈতন্য-কথার মুখোস পরা অধিকতর কাপট্যপূর্ণ আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-কথা—আমার আত্ম প্রভুত্বের কথা শ্রবণ কীর্ত্তনকারী আমিই গৃহব্রত বা অচৈতন্য গৃহান্ধকূপ।

পেগুর বৌদ্ধ প্যাগোডা, সারনাথের বৌদ্ধস্তূপ, অশোকের অসংখ্য স্মৃতিস্তম্ভ, স্মৃতিফলক জগতে অনেক হইয়াছে ও হইবে, আর সেগুলি জগতের শ্রবণবিমুখ লোকের শ্রবণস্বতন্ত্র চক্ষু, কর্ণের, মনের বিস্ময়োৎপাদনও করিবে। আর আমিও শ্রবণ-বিমুখ হইয়া কখনও উহাদের সহিত প্রতি যোগিতায় তদপেক্ষা বৃহৎ তাসের প্যাগোডা নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিব, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে প্যাগোডার পরিণামও দেখিতে পাইব, কখনও বা উহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় আপনাকে নিতান্ত অসমর্থ দেখিয়া মরমে মরিয়া যাইব। প্রতিভার বরপুত্র নিউটন,টলষ্টয়, সিলভেনো টম্‌সন্ প্রভৃতির প্রতিভার নিকট আমার ক্ষুদ্র মনীষা অসামান্য ভগবৎ-কৃপায় অপ্রতিভ হইয়া পড়িবে। কিন্তু শ্রীগুরু পাদপদ্ম হইতে শ্রবণ করিলে বুঝিতে পারিব, শ্রবণ-কীর্ত্তন-পীঠ জীবন্ত শ্রীচৈতন্যমঠরূপে আমাকে প্রকাশ করিবার ন্যায় অতি উচ্চতমশীর্ষ বাস্তব মন্দির-রচনা আর কিছুই নাই—শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রিয়তম সেবা আর কিছুই নাই। অর্চ্চন যদি 'শ্রবণে'র অধীন না হয়, 'শ্রবণফলে' যদি নিজ-ধর্ম্ম-ধ্যান-পূজাদির যত্ন পরিত্যাগ করিয়া অনুক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয় শ্রবণ-কীর্ত্তনের জয়ঘোষণা না করে, তাহা হইলে ঐরূপ অর্চ্চনাপরাধ শত শত জন্ম করিয়াও আমি 'মাটিয়াতে'ই আসক্ত থাকিলাম—নিজ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাতেই মুগ্ধ হইয়া রহিলাম। কারণ শ্রুতি বলেন,—"শত শত জন্ম নিরপরাধে বাসুদেবের সমর্চ্চন করিলে আমার মুখে অকপট কীর্ত্তন বাহির হইত—আমি শ্রীগুরু- পাদপদ্মের কৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রবণ করিবার জন্য অর্ব্বুদ কর্ণের স্পৃহা করিতাম।"

শ্রীগুরুপাদপদ্ম-গাথা শ্রবণ করিলে জানিতে পারি, শ্রীচৈতন্য-বাণী আসিয়াছেন—জীবন্ত শ্রীচৈতন্যমঠ প্রতিষ্ঠা করিতে—তাদের প্যাগোডা প্রস্তুত করিতে তিনি আসেন নাই; চৈতন্য-কীর্ত্তন 'শ্রবণ' করাইয়া অকপট কীর্ত্তনকারী প্রস্তুত করিতে তিনি আসিয়াছেন, আর কিছু করিতে তিনি আসেন নাই—আর কিছু করিতে তিনি আসেন নাই—আর কিছু করিতে তিনি আসেন নাই। শ্রবণ- বিমুখ আমি অনেক সময় শ্রীগুরুপাদপদ্ম কেন খুব পাকা গাথুনির গৃহ-মন্দির প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া উহায় স্থায়িত্ব সুদৃঢ় করিবার পরিবর্ত্তে মাটীর গাথুনী, অসার কাষ্ঠ প্রভৃতির দ্বারা অস্থায়ী আবাস নির্ম্মাণ করাইবার পক্ষপাতী, তাহা বুঝিতে পারি নাই; শ্রবণ-বিমুখ আমি শ্রীগুরু পাদপদ্মকে যুগপৎ অনেকগুলি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে দেখিয়া এবং উহাদের অসম্পূর্ণতায় অবস্থান দেখিতে পাইয়া শ্রবণ-স্বতন্ত্র মনে কতই না বিরুদ্ধ বিচার করিয়াছি, কিন্তু শ্রীচৈতন্য-বাণীর শ্রবণালোকে আমার সেই অজ্ঞান-অন্ধকার বিদূরিত হইবার যোগ্যতা দেখিতে পাইতেছি—শ্রবণ-ফলেই জানিতে পারিতেছি, যেমন সুদক্ষ স্থপতি কাদামাটি খড়কুটা প্রভৃতি অস্থায়ী দ্রব্য-দ্বারা অস্থায়ী 'কালবদ্' প্রস্তুত করাইয়া তাহার উপর চিরস্থায়ী খিলানের প্রতিষ্ঠা করান এবং যেমন গৃহের ছাদ-নির্ম্মাণশীল স্থপতি একই সঙ্গে সমভাবে চারিদিকের ভিত্তি খনন ও চতুর্দ্দিকের ভিত্তি হইতে সমভাবে প্রাচীর উঠাইবার আজ্ঞা প্রদান করিয়া থাকেন—এক একটি প্রাচীর ছাদের সীমানা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ করিয়া পরে আর একটি প্রাচীরের ভিত্তি খনন বা প্রাচীর নির্ম্মাণে হস্তক্ষেপ করেন না, তদ্রূপ

শ্রবণ-কীর্ত্তনের পাকা 'খিলান' এবং শ্রবণ-কীর্ত্তনের ভিত্তি সংস্থাপনই যাঁহার একমাত্র মূল কার্য্য বা প্রয়োজন, তিনি অস্থায়ী বহিরঙ্গ মাটিয়া 'কাল্‌বুদ' সদৃশ অন্যান্য কার্য্যের প্রতি বা 'মাটিয়া' জগতে যাহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া বাস করিবেন, কল্পনা করিয়াছেন, তাঁহাদের বিচারজাত "একটি কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া আর একটি কার্য্য আরম্ভ" করিবার প্রণালী গ্রহণের প্রতি দৃষ্টিপ্রদান করিবেন কেন? তাই বলিতেছিলাম,—"শ্রীচৈতন্যবাণী" বিশ্বজীবকে বিশ্বরূপের মোহ হইতে শ্রবণ-পথে উদ্ধার করিয়া নিয়ত 'শ্রবণ' করাইবার জন্যই আসিয়াছেন—"শ্রবণের পথে" শ্রীচৈতন্যবাণী-হট্টের ভিত্তি সংস্থাপন করিতে আসিয়াছেন—"আত্মনিবেদনে"র পথে জীবন্ত শ্রীচৈতন্যমঠ নির্ম্মাণ করিতে আসিয়াছেন। যদি ইহা ব্যতীত শ্রীচৈতন্যবাণী অবতরণের অন্য কোন উদ্দেশ্য আমার শ্রবণ-স্বতন্ত্র চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ বা মন কল্পনা করিয়া থাকে, তবে নিশ্চয়ই আমি বঞ্চিত হইয়াছি।

আমি সকল কাজে সময় পাই, স্ফূর্ত্তি পাই; কিন্তু শ্রবণের সময় পাই না—'হরিকথা' শ্রবণ (?) টা থামিলেই যেন হাপ ছাড়িয়া বাঁচি—'রক্ষা পাইলাম' বলিয়া বিধাতাকে মনে মনে ধন্যবাদ দেই—পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরিয়া গিয়াছিল, খাওয়ার সময় অতিক্রান্ত হইয়া পড়িতেছিল—বসিয়া বসিয়া ঘুমাইবার ক্লেশ আর সহ্য হইতে ছিল না—শয্যাশায়ী হইবার সময় অধিক হইয়া যাইতেছে বলিয়া অন্তর আর্ত্ত হইতে আর্ত্ততর হইতেছিল। হরিকথা শ্রবণের নামেই আমার যত জ্বর আসে—তখন পার্শ্বের গৃহে কিংবা কোন রহঃ প্রদেশে মন শয্যার অনুসন্ধান করে। 'শ্রবণ' করিতে গেলে আমার বাদাদুরীর প্রদর্শনী প্রবন্ধ লিখিবার সময় কমিয়া যাইবে, আমার বাহাদুরীর প্রদর্শনী ভিক্ষার (?) সময় কম হইয়া পড়িবে, স্নানাহার তারপর বিশ্রামের নির্দ্দিষ্ট সময় বেঠিক হইয়া যাইবে, বেড়াইবার সময় পাইব না—স্বাস্থ্য না থাকিলে আমার নিজের বাহাদুরীর সেবা করিব কিরূপে? হরিকথা 'শ্রবণ' করিতে করিতে 'আফিসে'র সময় অতিক্রান্ত হইয়া পড়িলে, বাড়ী যাইবার ট্রেণ ছাড়িয়া দিলে আমার যুক্তবৈরাগ্য রক্ষা হইবে কিরূপে— এরূপ শত সহস্র যুক্তি আমার হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। আমি 'শ্রবণ' করি না বলিয়া ভুলিয়া গিয়াছি, প্রবন্ধ-প্রবাহের গোমুখী ধারা কোথা হইতে আসিবে? প্রবন্ধের মূল কোথায়? প্রবন্ধের প্রাণবন্ত কোথায়? প্রবন্ধের মৌলিকতা কোথায়? প্রবন্ধের সূত্র কোথায়? প্রবন্ধের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা কোথায়? আর প্রবন্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাই বা কোথায়? 'শ্রৌতবাণী'—'শ্রৌতবাণী—শ্রৌতবাণী'—শ্রীগুরুমুখবিগলিতা শ্রুতিই প্রবন্ধের প্রাণবস্তু। 'শ্রবণ' ছাড়িয়া দিলে "প্রবন্ধের"র সাহিত্য সুন্দরী—মৃতা—কুরূপা—স্বৈরিণী।

তাই বলিতেছিলাম, আমি "শ্রবণ করি না কেন?" আমি শ্রবণ করিতে করিতে আমার সকল ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া পূর্ণতম গতিতে শ্রবণের অনুগমনে করিতে থাকিব—আমি তখন কেবল কর্ণ দিয়া শ্রবণ করিব না—পূর্ণতম ক্রিয়াশীল—সেবাশীল সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রবণ করিব—শ্রবণ করিতে করিতে কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রবণ করিব।

আমি ভজন করি না কেন ?

অপরে ভজন করুন, আর না-ই করুন, আমি ভজন করি না কেন? ভজন ব্যক্তিগত কল্যাণ-সাধক। জগতের যদি কেহই হরিভজন না করেন কিংবা হরিভজনের ছলনায় অন্যাভিলাষ পূরণ করেন, তাহাতে আমার হরিভজন পরিত্যাগের কি মঙ্গলময় কারণ আছে? হরিভজন না করিবার প্রবল প্রচ্ছন্ন পিপাসা থাকিলেই 'অপরে হরিভজন করে না'—ইহা অনুসন্ধানের মায়ামৃগ হয়। আর হরি ভজনের প্রবল অকপট পিপাসায়—

বৈষ্ণবের নিন্দ্যকর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে।
সবে কৃষ্ণভজন করে—এই মাত্র জানে।।

নিজে হরিভজন না করিলে অমঙ্গল কাহার? নিজে হরিভজন ছাড়িলে অভদ্র—অনর্থ কাহার?

তাঁহারই হরিভজন আরম্ভ হইয়াছে, যাঁহার নিকট জাগতিক অভাবনীয় অনন্ত অভাব-অসুবিধার পাহাড় পর্ব্বত, দুঃখ-দৈন্যের হিমালয় স্তরে স্তরে উপস্থিত হইয়াছে;আর তাঁহারই হরিভজনের নিষ্কপট পিপাসা উদিত হইয়াছে, যিনি মায়ামুগ্ধ মানবজাতীর দুরধিগম্য আত্মকর্ম্ম বিপাকের বৈচিত্র্যরূপ অভাব অসুবিধা, দৈন্য-দুঃখের পাহাড় পর্ব্বতকে কৃষ্ণানুকম্পার সোপান বলিয়া বরণ করিয়া তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, তৃণাপেক্ষা সুনীচ, অনিন্দক, অমানী, মানদ নির্ম্মৎসর হইয়া সৎসঙ্গে শ্রীগুরুপাদপদ্মমুখশ্রুত কীর্ত্তনের অনুকীর্ত্তন-পূর্ব্বক জীবন যাপন করিতে পারেন।

আমরা যেন আত্মকর্ম্মবিপাককে 'পরকৃত হিংসা' মনে করিয়া অসহিষ্ণু, দাম্ভিক, মৎসর, নিন্দক, অভিমানী, নিজ মান-লাভে লিপ্সু না হইয়া পড়ি। বৈষ্ণবাপরাধমত্ত হস্তী যেন আমাদের ভক্তিলতার বা নবাঙ্কুর উৎপাটন করিয়া কীর্ত্তনাপরাধের দ্বারা লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি উপশাখাগুলিই পরিবর্দ্ধিত করিয়া না তুলে।

আমরা শ্রীগুরু-মুখে ত' অনুক্ষণ ইহাই শুনিয়াছি; তাঁহার অতিমর্ত্ত্য, অভূতপূর্ব্ব, অদ্বিতীয় আদর্শে ত' ইহাই জাজ্জ্বল্যমান প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি যে, জগতে যদি কেহই হরিভজন না করে, শত শত বাধা-বিঘ্নের আগ্নেয়- গিরিগুলিও যদি অগ্নিপরীক্ষার জন্য উপস্থিত হয়, তথাপি আরও প্রবলতর বেগে, দ্বিগুণতর উৎসাহে হরিভজনই করা কর্ত্তব্য—আরও কোটিকণ্ঠে কৃষ্ণভজনের কীর্ত্তন-গৌরবই প্রচার করা কর্ত্তব্য। ইহাও আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি যে, আমার অসংখ্য অন্যাভিলাষের তাণ্ডবের মধ্যেও শ্রীগুরুপাদপদ্ম ''সবে কৃষ্ণভজন করে—এই মাত্র জানে''—বাক্যের মূর্ত্ত আদর্শ প্রকট করিয়া অন্যাভিলাষের যাবতীয় তাণ্ডব হইতে আপনাকে সম্পূর্ণভাবে দূরে—সম্পূর্ণভাবে গোলোকের অস্মিতায় আত্মভূমিকা সংরক্ষণ করিয়াছেন। হরিভজনের—হরিভজনকারীর আদর্শ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া ঐ আদর্শ আমার জড়চক্ষুর আবরণ অপসারিত করিয়া চেতনচক্ষুকে আত্মসাৎ করে না কেন?

কৃষ্ণ কি আমাকে বাজাইয়া লইবেন না? কৃষ্ণ কি আমাকে কষ্টিপাথরে কসিয়া লইবেন না? আমি মেকী না আসল? আমি জড় উপমণি না চিন্ময় সন্মণি? আমি কুরূপের হাটের মাটিয়া ভাণ্ড, না শ্রীরূপের হাটের মহাজনগণের পদাঙ্করেণু? কৃষ্ণ—পূর্ণতম বস্তু; অপূর্ণ বস্তু, অসম্যক বস্তু, আংশিক বস্তু, প্রতিবিম্বিত বস্তু নহেন। তাই তাঁহাকে দান করিবার পূর্ব্বে তিনি কি আমাকে পরীক্ষা করিয়া লইবেন না? আমি কি সত্য সত্য কৃষ্ণকে চাই, কৃষ্ণের সেবাসুখ চাই কৃষ্ণের অকপট কৃপা চাই, না কৃষ্ণমায়ার যুপকাষ্ঠের মায়ামৃগ হইতে চাই? দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ, স্বজন-তাড়ন-ভর্ৎসন, জাগতিক নশ্বর লোভ-লালসা—কর্ম্মি-জ্ঞানি- ধ্যানি-কুলের অহমিকা যাহারা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া প্রতি নিশ্বাস- প্রশ্বাসে, প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, আনখকেশাগ্রে কৃষ্ণসেবাময় হইয়াছেন, কৃষ্ণ তাঁহাদিগকেই ত' আত্মসাৎ করিয়াছেন—'আপন জন' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; আর আমি কি ফাঁক-তালে—সবদিক্ বজায় রখিয়া—সব সুবিধা সংরক্ষণ করিয়া 'হরিভজনকারী'র মৌখিকতা দেখাইতে চাই?

কৃষ্ণ ত' জগতের প্রতি ব্যাপারে আমার প্রতি কার্য্যের অকৃতকার্য্যতা ও তথাকথিত কৃতকার্য্যতার অপূর্ণতার মধ্যে জগতের অনিত্যতা, সম্ভোগবাদের হেয়তা অভ্রান্তরূপে প্রমাণিত করিতেছেন, আবার ঐদিকে সকল মনোধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মিগণের তাণ্ডব ছাপাইয়া শ্রীচৈতন্য-বাণীগঙ্গার প্রবাহ "লব্ধা সুদুর্ল্লভমিদং" শ্লোক কীর্ত্তনের তরঙ্গে ভাগবত মহামণিমরকত প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিতেছে, কই, তথাপি হরিভজনের জন্য আমার নিষ্কপট আর্ত্তি—লৌল্য উদিত হয় না কেন?

ইহার কারণ কি? আমার কি ভীষণ বৈষ্ণবাপরাধ সংঘটিত হইয়াছে? অথবা আমি গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়াছি? নামাপরাধ হইতে মুক্ত হইবার জন্য শ্রীনাম-প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে আর্ত্তির সহিত অনুক্ষণ প্রার্থনা জানাই কোথায়? নামে রুচি হয় না কেন? অর্চ্চনাপরাধে পতিত হইয়াছি কি? অর্চ্চনসিদ্ধি হইলে ত' মুখে নাম প্রকাশিত হইত। রোগ কোথায়? হৃদয় দৌর্ব্বল্য-অনর্থই কি আমার রোগ? কোথায়, সেই রোগ উপশমের যে ঔষধ সদ্বৈদ্যরাজ ব্যবস্থা করেন, তাহা গ্রহণ করি কোথায়? অনুক্ষণ অনাবিল সাধুসঙ্গ করি কোথায়? সাধুসঙ্গের' ছলনা করিতে করিতে অসৎসঙ্গে প্রধাবিত হই কেন? সাধু ব্যতীত অসাধুর সহিত ভুলক্রমে বা স্বেচ্ছাক্রমে কি ষড়্‌বিধ প্রীতি-বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছি? হৃদয়- দৌর্ব্বল্যকে মৃদুরোগ ভাবিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছি কি? হৃদয়দৌর্ব্বল্য না জন্মাইতে পারে, এইরূপ ব্যাধি নাই। হৃদয়দৌর্ব্বল্য কিন্তু যাবতীয় উৎকট অনর্থব্যাধির জনক—দুরারোগ্য রোগ—কপটতার জনক। হৃদয়দৌর্ব্বল্য উৎপাটিত না হইলে উহা তুষাগ্নির ন্যায় অন্তরে অন্তরে থাকিয়া ভীষণ অগ্নিকাণ্ড করিয়া ফেলে—বৈষ্ণবাপরাধ, নামাপরাধ, গুর্ব্বপরাধ সকলগুলিই হৃদয়দৌর্ব্বল্যের প্রশ্রয়ে ও প্রতি পালনে উদিত হয়।

তাহা হইলে ঔষধি কি? ভগবৎ- কৃপায় ঔষধির দুর্ভিক্ষ এ যুগে অন্ততঃ আমার নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছে, কিন্তু ঔষধ যত আমার সম্মুখে হাত বাড়াইয়া আসে, আমি ততই যে' দূরে পলায়ন করি। ইহার উপায় কি? উপায়—বৈষ্ণবের পরামর্শ গ্রহণ—অবৈষ্ণবের পুষ্পিত প্রলপিত বাক্য হইতে দূরে অবস্থান—অনুক্ষণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃষ্ণ-কীর্ত্তন শ্রবণ-কীর্ত্তন।

তাহা হইলেই কি সব হইবে? সব হইবে—হরিকথা শুনিলেই সব হইবে,নতুবা 'শব' হইতে হইবে। "**শুনিতে**" হইবে—আগে দেখিতে হইবে না,—বা আগে আর কিছু করিতে হইবে না। কাণের পথটি খোলা রাখিতে হইবে— জাগিয়া ঘুমাইতে হইবে না।

আমি যে কথা শুনিতেছি না, তাহার প্রমাণ কি? আমি যে জাগিয়া ঘুমাই, তাহারই বা প্রমাণ কি? প্রমাণ—আমার অবঞ্চক অন্তরই সাক্ষ্য দিবে। যদি হরিকথা সত্য সত্য কাণে লইতাম—কাণ দিয়া শুনিতাম, তবে শরীর সংক্রান্ত বিষয়গুলি বিস্মরণ হইত, আর কৃষ্ণ-সংক্রান্ত বিষয় সকল প্রয়োজনীয়তার কুল ছাপাইয়া উঠিত।

তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্ত্যং যে চান্বদঃ সুতসুহৃদ্গৃহবিত্তদারাঃ।
যে ত্বব্জনাভ ভবদীয়পদারবিন্দ সৌগন্ধ্যলুব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ।। (ভাঃ ৪।৯।১২)

হে ঈশ, হে পদ্মনাভ, যাঁহারা ভবদীয় পাদারবিন্দসৌগন্ধে লুব্ধহৃদয় সাধুগণের প্রসঙ্গ লাভ করেন অর্থাৎ তাঁহাদের শ্রীমুখে হরিকথা-প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া জীবন যাপন করেন, তাঁহারা এই অতিশয় প্রিয় দেহ এবং তৎসম্বন্ধি পুত্র, সুহৃৎ, গৃহ, বিত্ত এবং কলত্র ইহাদের কিছুই চিন্তা করেন না।

তাহা হইলে আমি 'হরিকথা' শুনি কই? হরিকথা অপেক্ষা যে আমার নশ্বর দেহ-গেহ-বিত্ত-পুত্র-কলত্র-মান প্রতিষ্ঠা 'বড়' হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তব কোন্‌টী? কল্যাণ কল্পলতিকা হরিকথা, না নিখিল অকল্যাণ-নিকেতন নশ্বর জড়বস্তুগুলি?

শ্রীগুরু-মুখবিগলিত হরিকথা শ্রবণকারীর—অনুকীর্ত্তনকারীর ত' কোনই অসুবিধা নাই—কোন অভাব নাই— গ্রহ-বৈগুণ্য নাই, কোন অকল্যাণ নাই—

রিপবস্তং ন হিংসন্তি ন বাধন্তে গ্রহাশ্চ তম্।
রাক্ষসাশ্চ ন খাদন্তি নরং বিষ্ণুপরায়ণম্।।
(হঃ ভঃ বিঃ ১০ম বিঃ ১০৩ সংখ্যাধৃত বৃহন্নাবদীয়পুরাণ বাক্য)

শত্রুগণ হরিভজনকারী ব্যক্তিকে হিংসা করিতে সমর্থ হয় না, গ্রহকুল বাধা প্রদান করিতে পারে না, রাক্ষসেরা ও তাঁহাকে গ্রাস করিবার যোগ্য হয় না।

অহো, যে ধন্যাতিধন্য অবসরে আমার নিকট শ্রীগুরুপাদপদ্ম অমায়ার অকৈতব কৃষ্ণকীর্ত্তন বিতরণ করিতে চাহিতেছেন, সেই কালে যেন আমি অন্য কিছু দান চাহিয়া বা তাঁহার অন্য কোনও দানের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া আত্মমঙ্গলের অনর্পিতচর মহাসুযোগ না হারাই—শেষে অপরিশোধ্য অনুতাপে তপ্ত হইতে হইবে।

ভবচ্ছিদমযাচেঽহং ভবং ভাগ্যবিবর্জ্জিতঃ।।
স্বারাজ্যং যচ্ছতো মৌঢ্যান্মানো মে ভিক্ষিতো বত।
ঈশ্বরাৎ ক্ষীণপুণ্যেন ফলীকারানিবাধনঃ।। (ভাঃ ৪।৯।৩৪-৩৫)

অহো, ভবচ্ছিদ্—সংসার-ছেদক শ্রীগুরুপাদপদ্মের সাক্ষাৎ পাইয়াও ভাগ্য-বিবর্জ্জিত আমি আবার সেই অসৎ সংসারই প্রার্থনা করিতেছি। হায়, যেমন নির্ধন ব্যক্তি চক্রবর্ত্তী ভূপতির নিকট সতুষ-তণ্ডুলকণা প্রার্থনা করে, তদ্রূপ আমিও এমন দুর্দ্দৈবগ্রস্ত যে, শ্রীহরির নিকট অকিঞ্চিৎকর অসদ্‌বস্তু প্রার্থনা করিলাম। শ্রীহরি—শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাকে সেবানন্দ প্রদান করিতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন আর আমি মূঢ়তা-বশতঃ তাঁহার নিকট অভিমানসেতু প্রার্থনা করিয়াছি।

আমার বধিরতা

যখন আমি শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শাস্ত্র হইতে ''শ্রবণে''র মুখ্যতার বিষয় শুনিয়াছিলাম, তখন মনে মনে একটি চিন্তার উদয় হইয়াছিল। মনে মনে ভাবিয়াছিলাম, এই যুগে যাঁহারা 'বধির' হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের ন্যায় দুর্ভাগা ও বঞ্চিত ব্যক্তি জগতে আর দ্বিতীয় কেহ নাই। কেন না, তাঁহারা একমাত্র মঙ্গল নিদান শ্রীচৈতন্য-বাণী—শ্রীচৈতন্য-সংকীর্ত্তন-'শ্রবণ' হইতে জন্মের মত বঞ্চিত হইয়াছেন।

কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমি ঐ সকল জন্মবধির অপেক্ষাও অধিকতর বঞ্চিত—আমি সৌভাগ্যের সর্ব্ববিধ সুযোগ লাভ করিয়াও দুর্ভাগ্য। যাঁহাদিগকে আমি 'বধির' মনে করিয়াছিলাম, তাঁহাদের কেহ হয় ত' এক জন্মের 'বধির', কেহ বা সাময়িক বধির; আবার শ্রীগুরু-পাদ্মপদ্মের কৃপায় ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, ঐ সকল আপাত দৃশ্যমান বধিরগণও শ্রীগুরুদেবের কৃপাবলে শ্রীগুরুমুখপদ্ম-বাক্য—শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণে যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন।

আমি যে অনাদিকালের বধির—কত চৌরাশি লক্ষ জন্মের বধির, তাহা তখনও ভাবিতে পারি নাই! পুরের হিতকামনার ছলনা দেখাইয়া পুরঞ্জনের পুরে প্রবেশের পিচ্ছিল পথ-প্রদর্শনকারিগণ 'পুরোহিত' নাম ধারণপূর্ব্বক যে কর্ণবেধ-সংস্কার (?) করাইয়াছিলেন, তাহাতে কর্ণমল সংস্কৃত হওয়া দূরে থাকুক, মলগুলি আরও বৃদ্ধিই পাইয়াছিল, কর্ম্মজড়তার কোলাহল কাণে এমন তালা লাগাইয়াছিল যে, তাহাতে হিতসাধক কোনও শব্দই আর কাণে যাইত না।

অনির্ব্বচনীয় মহা ভাগ্যফলে অপ্রত্যাশিত, অযাচিত ও অতর্কিতভাবে কোথা হইতে যেন এক অতিমর্ত্ত্য চেতনবাণীর শব্দাবতার সেই কাণের তালা খুলিয়া দিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু আমি সেখানে আমার স্বতন্ত্রতা প্রয়োগ করিলাম, আমি বলিলাম—'আমি বধিরই থাকিব—জন্ম জন্মান্তরের অভ্যাসটা পরিত্যাগ করিব না।' কারণ, ঐ অভ্যাস এমন একটি জাড্যের মোহ সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা পরিত্যাগ করিতে হইলে আমাকে আমার শ্রেয়ের প্রতি বিপ্লবী হইতে হইবে।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমার বধিরতার ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া 'বধিরতা' নিবারণের জন্য যে কত উপায়—কত কৌশল অবলম্বন ও আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া অসম্ভব। তথাপি একটা অসম্পূর্ণ তালিকার খসড়া প্রস্তুত করিতেছি।
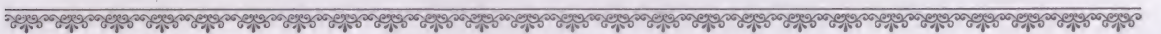
(১) বৎসরের সকল সময়েই কোনও না কোনও স্থানে কোনও না কোনও ভক্ত্যুদ্দীপিকা স্মৃতি উপলক্ষ করিয়া চেতন কীর্ত্তনময় উৎসবের অনুষ্ঠান।

(২) শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট কীর্ত্তনের প্রচারার্থ শ্রীচৈতন্যপদাঙ্কিত তীর্থসমূহে ও ভুমণ্ডলের বিভিন্ন স্থানে পর্য্যটন।

(৩)পর্য্যটন-কালে একদিকে যেমন পরিব্রাজকাচার্য্যগণকে ব্রহ্মচারি- বানপ্রস্থগণকে নিজ সঙ্গে গ্রহণ, অপর দিকে আমার ন্যায় গৃহ-দেহাসক্ত গৃহমেধী, গৃহব্রতকে ও পুনঃ পুনঃ পত্র প্রেরণ করিয়া—দূত প্রেরণ করিয়া গৃহান্ধকূপের অস্বাস্থ্যকর দূষিত বাষ্প ও অন্ধকার হইতে উদ্ধার-পূর্ব্বক সঙ্গে আনয়ন।

(৪) 'বৈষ্ণব-বন্দনা' পাঠ-কালে "দ্রব্য দিয়া শিশুরে লওয়ায় হরিনাম" একটি পদ কোনও বৈষ্ণবের সম্বন্ধে পাঠ করিয়াছিলাম; কিন্তু আমার শ্রীগুরু- পাদপদ্ম আমার ন্যায় অনাদি বধিরকে তাঁহার কীর্ত্তন-শ্রবণের যোগ্যতা দানের জন্য কতপ্রকার দ্রব্য, কতপ্রকার বিচিত্র প্রসাদ, কত বিচিত্র লোকের সহিত প্রসঙ্গ, বিচিত্র উৎসবাবলীর আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

(৫) লুপ্ত-তীর্থ-উদ্ধার—প্রাকৃত প্রত্নতাত্ত্বিকের ন্যায় ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক কার্য্য বা পৌত্তলিকতার উদ্ধার বা প্রচার নহে। পরন্তু শ্রীচৈতন্য-কীর্ত্তন-বিস্তারার্থ লুপ্ত কীর্ত্তন-পীঠ-সমূহের উদ্ধার-সাধন-পূর্ব্বক তথায় কীর্ত্তনের নিত্য স্মৃতি ও অনুষ্ঠান সংরক্ষণ।

(৬) শ্রীমূর্ত্তি-স্থাপন—কীর্ত্তনযজ্ঞের দ্বারা শ্রীমূর্ত্তির সেবা প্রচার-পূর্ব্বক স্থূলনিষ্ঠ, দেহাসক্ত, গৃহাসক্ত ব্যক্তিগণের সেবা-সুকৃতির উদ্বোধন, হরিকথা- শুশ্রূষা-বৃত্তির দ্বারোন্মোচন।

(৭) শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ-স্থাপন—লোকসঙ্ঘের শ্রীচৈতন্য-জিজ্ঞাসা ও শ্রীচৈতন্য-শুশ্রূষা-বৃত্তি উদ্বোধনের জন্য শ্রীচৈতন্য-পদাঙ্কিত ভূমি-সমূহে সপার্ষদে গমন-পূর্ব্বক সকলের নিকট আচার্য্যবর্য্যের শ্রীচৈতন্যবাণী বিস্তার ও সংকীর্ত্তন-সহযোগে শ্রীচৈতন্য-চরণচিহ্ন সংস্থাপন।

(৮) পারমার্থিক সাময়িক পত্র প্রচার—বধিরতা নিবারণের একটি মহাস্ত্র বা মহৌষধি। আমার ন্যায় অনাদি বধিরকেও অলৌকিক শ্রবণ-যোগ্যতা প্রদান- পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ তৎকর্ণে নবনবায়মান শ্রবণামৃত বর্ষণ ও সেই শ্রবণ-সন্দেশ পত্রিকা-মুকে জনসাধারণ্যে বিস্তার করাইয়া অনুকীর্ত্তনকারীকে শ্রুত-বিষয়ে অপ্রতিহত ধ্যানমগ্ন করণ এবং অপরকেও তৎসঙ্গে শ্রবণের অভূতপূর্ব্ব সুযোগ দান। গ্রাম্যকোলাহলে বিশ্বের কর্ণে যে তালা লাগিয়াছে, তাহা হইতে বিশ্বকে উন্মোচন-পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠসন্দেশ প্রদান।

(৯) মহাজন-শাস্ত্র-গ্রন্থাদি প্রচার—যাঁহারা মনোধর্ম্মী ভাক্ত-সম্প্রদায়ের মনোধর্ম্মের মাটিয়া মল কর্ণে বহন করিতে করিতে কর্ণকে শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণে সম্পূর্ণ বধির করিয়া ফেলিয়াছেন কিংবা যাঁহারা মহাজনগণের শাস্ত্র ও বাক্যরাজি ঐ সকল মনোধর্ম্মিগণের মলযুক্ত ধারণার সহিত সংমিশ্রিত করিয়া কর্ণে পূরণ করিতেছেন, তাঁহাদের বধিরতা নিবারণের মহৌধষি বিস্তার।

(১০) অভিভাষণ, আলোচনা, বক্তৃতা, পাঠ, কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা বধিরতা নিবারণ।

(১১) শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা, শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল-পরিক্রমা, শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা প্রভৃতি যাত্রামহোৎসব-ভক্ত্যঙ্গ আবিষ্কার ও প্রবর্ত্তনের দ্বারা বিপুল ভাবে শ্রবণানুশীলনের সুযোগ প্রদান পূর্ব্বক বধিরতা ব্যাধির দূরীকরণ।

(১২) বিভিন্ন স্থানে শ্রবণ-কীর্ত্তনানুশীলনপীঠ ভক্তসঙ্ঘারাম মঠাদি প্রতিষ্ঠান প্রকাশ-পূর্ব্বক সৎসঙ্গে হরিকথা শ্রবণের দুর্ভিক্ষ নিবারণ এবং অনাদি বধিরতা-মহাব্যাধির মূলোৎপাটন।

(১৩) শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন্ত মৃদঙ্গ-স্বরূপ ত্রিদণ্ডিগণের শ্রৌতবাণীর ধ্বনি এবং বৃহৎ মৃদঙ্গ মুদ্রাযন্ত্রের দ্বারা বিস্তারিত শাস্ত্রধ্বনির ঐকতান শব্দ দ্বারা বিশ্বের বধিরতা অপনোদন।

(১৪) অনাদি-বধির বিশ্বের রুদ্ধ দ্বারে প্রচারক প্রেরণ-পূর্ব্বক বধিরতা-ব্যাধির মহৌষধি শ্রীচৈতন্যবাণী বিতরণ প্রভৃতি।

অহো! আমি কি দুর্ভাগ্য! কি মন্দভাগ্য!! অহৈতুক কৃপাময় পরদুঃখদুঃখী শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমার জন্য এত প্রকার মহৌষধ আবিষ্কার করিলেও আমি বধিরতাব্যাধিকেই আদরের সহিত বরণ করিতেছি—পোষণ করিতেছি— সংরক্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছি। শ্রীগুরুদেবের ব্রত—আমাকে ঐ বধিরতা- ব্যাধি হইতে বিমুক্ত করিয়া হরিকথা শুনাইবেনই, আর আমার কি প্রতিজ্ঞা এই যে, বধিরতা নিবারণের যত প্রকার উপায় আবিষ্কৃত হবে, সেইগুলিকে আমি ব্যর্থ করিয়া দিব? শ্রীগুরুপাদপদ্ম—শ্রীচৈতন্যবাণী—শ্রীচৈতন্যের জীবন্ত মৃদঙ্গ ধ্বনি সমূহ যতই বজ্রনির্ঘোষে বলিতেছেন,—"**তুমি কৃষ্ণদাস**", আমি ততই আমাকে "**কালা কৃষ্ণদাস**" করিয়া ফেলিতে চাহিতেছি! শ্রীচৈতন্যবাণী আবার বলিতেছেন,— তুমি 'কালা' নও, তোমার কাণ আছে— সুন্দর সুতীক্ষ্ণ কর্ণ আছে; তুমি 'উৎকর্ণ কৃষ্ণদাস' হও।

অহো! শ্রীচৈতন্য-নিজ-জন শ্রীচৈতন্য-কীর্ত্তন শ্রবণ করাইবার জন্য অনুক্ষণ আমাকে তাঁহার কীর্ত্তনময়ী দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ-লীলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পদান্তিকে রাখিবার যত্ন করিতেছেন, আর আমি 'কালা কৃষ্ণদাসে'র ন্যায় সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎপাদপদ্মের—শ্রীগুরুপাদপদ্মের অন্তিক প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া—'শ্রবণ' পরিত্যাগ করিয়া—কর্ণদ্বারে সেবা পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বেই চক্ষুর সেবায়—রূপজ মোহের সেবায় ছুটিয়াছি! অহো! স্বতঃকর্ত্তৃত্বরূপা বৈকুণ্ঠবার্ত্তা শ্রবণ পরিত্যাগ করিয়া নিজ কর্ত্তৃত্বরূপ দর্শন-আস্বাদনাদির সেবা যে অনর্থযুক্ত আমার ব্যক্তিগত 'কাম'—আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ, তাহাতে যে কৃষ্ণদাস অবরুদ্ধ হইয়াছে! দর্শনেন্দ্রিয় আমাকে লুব্ধ করিয়া ভগবৎকর্ত্তৃত্বের ফলরূপ শ্রবণ-সেবা ব্যতীত ইতর কার্য্যে টানিয়া লইয়া যাইতেছে—আমাকে বধির করিয়া রূপজ মোহে আকৃষ্ট করিয়া ভোগভবনের প্রভু সাজাইয়া লইতেছে—আমাকে ভট্টথারীগণের প্রাকৃত রূপজ মোহে পাতিত করিতেছে।

শ্রীগুরুপাদপদ্মান্তিকে বাস করিয়া শ্রীহরিকথা-শ্রবণ ব্যতীত আমার ইতর বাসনা জাগিতেছে কেন? সর্ব্বতীর্থমূল শ্রীগুরুপদসেবা হইতে দূরে গিয়া অন্য তীর্থ দর্শনের লালসা কি আমার বধিরতা নহে? তাহা কি ধর্ম্মানুষ্ঠানের মুখোস-পরা প্রচ্ছন্ন রূপজ মোহ নহে? অমি যে 'উৎকর্ণ কৃষ্ণদাস', এই কথা ভুলিয়া গিয়া

আমি ত' 'কালা কৃষ্ণদাস' হইয়া পড়ি নাই? আমি ত' সাক্ষাৎ কৃষ্ণপাদপদ্ম পরিত্যাগ করিয়া ভ্রান্ত গণ-গড্ডলিকার বিবর্ত্তজাত কৃষ্ণ (?) দেখিবার জন্য বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের আদর্শে বধির হই নাই? 'শ্রবণ' ছাড়িয়া 'দর্শনে'র জন্য উন্মত্ত হইয়া পড়িলে এইরূপই দশা হয়—'কালা কৃষ্ণদাস' হইতে হয়, 'ছোট হরিদাস' হইতে হয়, 'বলভদ্র' ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির বধিরতার আদর্শ অনুসরণ করিতে ইচ্ছা হয়। তাই বলিতেছিলাম, আমি বধির হইয়াছি—বধিরতা বরণ করিয়াছি।

পূর্ব্বে একটা বধিরতা-ব্যাধির প্রতিষেধক ঔষধের তালিকা দিয়াছি, এখন আমার বধিরতা-ব্যাধির উপসর্গ ও বৈচিত্র্যের একটা অসম্পূর্ণ তালিকাও পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করি। পাঠকগণ দেখিতে পারিবেন, আমার এই বধিরতা-ব্যাধিটী কিরূপ ভয়ানক ও মারাত্মক। এই ব্যাধি হইতে বিশেষ সতর্ক না থাকিলে উহা চিরকালের জন্য আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে, এই জন্যই এই সকল কথার অবতারণা। গৌড়ীয় হাসপাতালের শ্রৌত সুবিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ এই বধিরতা-ব্যাধির অনেক সুসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন; তাঁহাদের উক্তিরই একটি অসম্পূর্ণ পুনরাবৃত্তি করিতেছি—

(১) মায়াতীত শ্রবণকে অবাস্তব (impractical) উপায় বলিয়া ধারণা।

(২) বৈকুণ্ঠ 'শ্রবণ' অপেক্ষা ইন্দ্রিয়তর্পণপর কর্ম্ম পদ্ধতিকে অধিকতর বাস্তব (practical) বলিয়া ধারণা।

(৩) শ্রীসদ্গুরুপাদপদ্ম হইতে 'শ্রবণ' করিবার পরিবর্ত্তে বহির্দ্দর্শনের অভিজ্ঞতা-প্রসূত প্রেয়োরুচির সমর্থনকারীকে অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়তর্পণকামকেই 'গুরু' বলিয়া উহার বাক্য শ্রবণ।

(৪) বাস্তব সদ্গুরুর পাদপদ্মাশ্রিত অকৈতব আত্মধর্ম্মে অকপটভাবে প্রতিষ্ঠিত 'শ্রবণ-গুরু'কে বিশ্বাস না করিয়া প্রেয়োরুচির সমর্থনকারী মনোধর্ম্মীকে 'শ্রবণ-গুরু'-রূপে বরণ কিংবা নিজের বিমুখদর্শনেন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতার প্রিয়তার দ্বারা গুরু-নির্ণয়।

(৫) আনুপূর্ব্বিক 'শ্রবণ' করিবার পূর্ব্বেই ভগবদ্ভক্ত বা ভগবদ্ভক্তির প্রকৃত স্বরূপ-সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ বা অনধিকারচর্চ্চারূপ অসহিষ্ণুতা।

(৬) অকৈতব শ্রীসদ্গুরুপাদপদ্ম হইতে যথাযোগ্য 'শ্রবণ' করিবার পূর্ব্বেই জড়প্রতিষ্ঠা-কামময়ী কীর্ত্তন ছলনার স্পৃহা।

(৭) শ্রবণকে দুর্ব্বল সাধন-জ্ঞান, উপায়-মাত্র জ্ঞান কিংবা দান-ধ্যানাদি বহুবিধ উপায়ের অন্যতম কল্পনা।

(৮) হরিকথা-শ্রবণ ও নৈতিক কথা শ্রবণকে সমস্তরে স্থাপন।

(৯) সন্ধ্যা-বন্দনাদি নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম কিংবা মাতা, পিতা, ভার্য্যা ও সন্তানাদির পরিচর্য্যা-লালন-পালনরূপ লৌকিক কর্ত্তব্যতা পরিত্যাগ করিয়া হরিকথা-শ্রবণকে অন্যায় বা অনাবশ্যক মনে করা।

(১০) অন্যমনস্ক হইয়া শ্রবণের অভিনয় করা অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের কীর্ত্তনকালে দেহসম্বন্ধীয় স্ত্রী-পুত্র-পরিবার পরিজন, সুনীতি, দুর্নীতি, লৌকিক কর্ত্তব্য, অকর্ত্তব্য, কর্ম্ম, বিকর্ম্মের বিষয় চিন্তা করিয়া হরিকথায়

অন্যমনস্ক থাকা, কিংবা শ্রীগুরুদেবের বাক্য কেবলমাত্র 'কথার কথা', ঐগুলি জীবনে পালন অসম্ভব ও অবাস্তব, এইরূপ ধারণা।

(১১) লোক দেখাইবার জন্য অর্থাৎ লোকের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠা-মাত্র পাইবার জন্য শ্রবণের অভিনয় বা ছলনা; বস্তুতঃ অন্তরের অন্তঃস্থলে ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র বিচার, স্বতন্ত্র স্পৃহা, ইতর কার্য্যের বাসনা দৃঢ়ভাবে পোষণ ও সংরক্ষণ করিবার সংকল্প।

(১২) শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান অথবা শ্রীগুরুদেবের সহিত হরিকথা শ্রবণার্থ দেশ-দেশান্তরে অনুগমনের অভিনয় করিয়াও গুরুর নিকট বাহ্যে প্রদর্শিত একটা 'হাজিরা' মাত্র দিয়া অন্তরে বাড়ী ঘর-বাজার-হাট বা নানা তীর্থাদি দেখিবার ইচ্ছা, 'মিনির' জন্য পুতুল, খেল্না 'টুকুর' জন্য কাপড়, জামা প্রভৃতি কিনিবার বাসনা, কিংবা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের কাম সংরক্ষণ।

(১৩) 'কীর্ত্তন' আরম্ভ হইবা-মাত্রই নয়ন-সরোবরে নিদ্রাসুন্দরীকে আলিঙ্গন অর্থাৎ শ্রবণের প্রতি সেবাবুদ্ধির অভাবজনিত জাড্যের অভ্যুদয়।

(১৪) 'শ্রবণ' করিবার পর তাহার অনুশীলন অর্থাৎ তত্তৎকার্য্য ও তত্তদুপদেশ জীবনে পরিপালন করিবার ঐকান্তিক আর্ত্তির অভাব।

(১৫) কেবল আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণপর শব্দ-ঝঙ্কার বা প্রাকৃত কাব্য, সাহিত্যের বাহ্য বেষে সজ্জিত বাক্যগুলিকে 'শ্রবণে'র বিষয়রূপে স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়া শ্রেয়ঃকীর্ত্তনকারী গুরু-বৈষ্ণবগণের মনোধর্ম্ম ও মনোগ্রন্থিছেদক তীব্র উপদেশরাজিকে শ্রবণীয় বিষয় হইতে বর্জ্জন।

(১৬) অনর্থযুক্তাবস্থায় অপ্রাকৃত রূপ-লীলাদি শ্রবণের অভিনয়রূপ ইন্দ্রিয়পরায়ণতা।

(১৭) ভক্তিবিবেক-বিচারমূলক 'শ্রবণ'কে তর্ক বা রসবর্জ্জিত বা বাক্যাড়ম্বর-ধারণা।

(১৮) কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগি-তপস্বি-ব্রতি-প্রাকৃত সহজিয়া প্রভৃতি মনোধর্ম্মিগণের আপাত প্রেয়ের উদগারকে শ্রবণীয় বিষয়রূপে কল্পনা।

(১৯) অপ্রাকৃত বাণী শ্রবণ করিবার পূর্ব্বেই প্রাকৃত বস্তু বা ভাবের স্মরণ বা দর্শনাদির চেষ্টা।

(২০) 'শ্রবণ' করিলে প্রেয়ঃ-পিপাসা বিনষ্ট হইবে আশঙ্কা করিয়া শ্রীসদ্- গুরুপাদপদ্ম হইতে দূরে দূরে অবস্থান।

(২১) অকপট শ্রবণোন্মুখতার সহিত নিত্যকাল শ্রীগুরুদেবের সর্ব্বতোভাবে সঙ্গ না করিয়াই শ্রীগুরুদেবের বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিয়া ফেলিয়াছি, মনে করা।

(২২) ''অত্যন্ত আত্মীয়তা পরিণামে তিক্তফল প্রবসব করে''—এই লৌকিক প্রবাদের বিচার অনুসরণ করিয়া ''দূরে থাকিয়াই গুরু-বৈষ্ণবের সঙ্গ করা ভাল, অধিক কথা শ্রবণ বা অধিক পরিমাণ সেবা করিতে

গেলে শেষে তিক্ত হইয়া যাইব"—এইরূপ প্রাকৃত বিচার অর্থাৎ গুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি সংরক্ষণ-পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠবাণী শ্রবণ হইতে দূরে অবস্থান।

(২৩) শ্রীগুরুদেবের বাক্যেও ভ্রম-প্রমাদ আছে, এইরূপ কল্পনা করিয়া গুরুদেবের নিকট শ্রবণের অভিনয় প্রদর্শন।

(২৪) "শ্রীগুরুদেব" ত আদর্শের কথা, চরম কথা বলেন, সকল কথাই কি সকলে পালন করিতে পারে?"—এইরূপ প্রবোধ-বাক্য দিয়া শ্রবণ-পিপাসা ও সেবা-প্রগতিকে স্তব্ধ করিবার চেষ্টা।

(২৫) "গুরুদেব যাহা বলিবেন, তাহা ত' শুনাই আছে, এক কথা বার বার না শুনিয়া, আলস্য করাই ভাল"—এইরূপ মনে মনে ধারণা।

বধিরতা-মহাব্যাধির এইরূপ অসংখ্য উপসর্গ ও বৈচিত্রগুলি আমাকে প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়া আমাকে 'কালা" কৃষ্ণদাস অর্থাৎ আবৃত কৃষ্ণদাস করিয়া ফেলিয়াছে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অতি নিকটে থাকিবার অভিনয়ের মধ্যেও শ্রবণের পরিবর্ত্তে বহির্বিষয়-দর্শন-লালসা ও ভোগের দৌরাত্ম্যই বৃদ্ধি পাইতেছে। আমি শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রতি বধির হইয়াছি, শ্রীভাগবতবাণীর প্রতি বধির হইয়াছি!

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্তে যৎ ক্ষণো নীত উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া।।

* * * *

গৃহেষ্বাবিশতাঞ্চাপি পুংসা—কুশলকর্ম্মণাম্।
মদ্বার্ত্তাযাতযামানাং ন বন্ধায় গৃহা মতাঃ।।
বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দ্দুরিকেব সূত ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ।।

* * * *

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোহভিরামাৎ।
ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ।।

* * * *

তান্ শোচ্যাশোচ্যানবিদোহনুশোচে হরেঃ কথায়াং বিমুখানঘেন।
ক্ষিণোতি দেবোহনিমিষস্তু যেযামার্য়ুর্বৃথাবাদগতিস্মৃতীনাম্।।

বৈষ্ণব-বংশ

এই প্রাকৃত জগতে আমরা বৈষ্ণবগণকে ত্রিবিধ অধিকারে দেখিতে পাই। এতদ্ব্যতীত চেতনময় বস্তুসমূহ—সকলেই কৃষ্ণদাস। যাহারা কৃষ্ণোন্মুখতার কোন পরিচয় দেয় না, তাহাদিগকে সাধারণ লোক, কনিষ্ঠাধিকারী ও মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণবগণ হরিবিমুখ বলিয়া জানেন। কিন্তু তাহারা অবৈষ্ণব হইলেও বিষ্ণুদাস। বাসুদেব সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত। প্রাকৃত রাজ্যে উচ্চাবচ সকল বস্তুতেই বিষ্ণুর অধিষ্ঠান না থাকিলে কোন বস্তুরই অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। কনিষ্ঠাধিকারগত বিষ্ণুদাস্যে আমরা দেখিতে পাই যে, বৈষ্ণব মহাশয়ের বিষ্ণু-বিগ্রহে বিশ্বাসের সহিত সেবা আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু বৈষ্ণবের স্বরূপোপলব্ধির অভাব আছে। সে জন্যই কনিষ্ঠাধিকারে বৈষ্ণবকে 'অপ্রাকৃত' আখ্যা দিবার পরিবর্ত্তে 'প্রাকৃত' বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছেন। পরম শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীভগবানের সেবা করিতে করিতে তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া কোমলশ্রদ্ধ বৈষ্ণব নিজ প্রাকৃত বুদ্ধি ক্রমশঃ ত্যাগ করিবার অবসর লাভ করেন—অন্যাভিলাষ, সৎকর্ম্মানুশীলন, এমন কি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ প্রাকৃত জ্ঞানের অভিমানকেও তুচ্ছ দর্শন করিয়া প্রাকৃত বিষয়ে বিরাগ লাভ করেন। তখন তাঁহার বর্ণমদ, প্রাকৃত ধনমদ, প্রাকৃত ইন্দ্রিয়চেষ্টা প্রভৃতি খর্ব্ব হইতে আরম্ভ করে। তৃণজলৌকার ন্যায় প্রাকৃত বৈষ্ণব অপ্রাকৃত রাজ্যের অনুসন্ধান করিতে গিয়া স্বীয় অধিকার পরিবর্ত্তন করেন। পরিবর্ত্তিত মধ্যম অধিকারে আমরা দেখিতে পাই যে, অপ্রাকৃত অনুসন্ধান-ফলে কনিষ্ঠ ভাগবত দর্শনের শ্রীমূর্ত্তি তাঁহার অপেক্ষাকৃত উন্নত দর্শনের বিষয় হন। তিনি সেই কালে শ্রীমূর্ত্তিকে কেবল প্রাকৃত বস্তু জ্ঞান করেন না। তাঁহার নিজ অস্তিত্বে সেইকালে অপ্রাকৃতের তরল অবস্থান লক্ষ্য করেন এবং অধিকারভেদে ভাগবতগণের তারতম্য পরিদর্শন করিবার চক্ষু লাভ করেন। তাদৃশ দৃষ্টি লাভ করিয়া ভগবদধিষ্ঠান-সমূহে প্রেম, কৃষ্ণোন্মুখজনে মিত্রতা, কৃষ্ণভক্তি-দ্বারা পরোপকার এবং অপ্রাকৃত বিরোধীবর্গের সঙ্গত্যাগরূপ অনুষ্ঠানসমূহে ব্যস্ত হন। এইকালে তাঁহার নানাপ্রকার বিঘ্ন উদয় হয়। কখনও মায়াবাদী অহংগ্রহোপাসক কর্ত্তৃক মর্দ্দিত, কখনও বা সৎকর্ম্মকারী মূর্খজন কর্ত্তৃক নিন্দিত এবং কখনও বা আহার-পানাদি মত্ত যথেচ্ছাচারী ব্যক্তির আক্রমণের বস্তু হন। এই সকল উপদ্রব অম্লান বদনে সহ্য করিতে করিতে তিনি হরিসেবা হইতে কৃষ্ণকৃপাক্রমে বিপথগামী হন না। কোমলশ্রদ্ধের যে-প্রকারে পতন সম্ভাবনা, মধ্যমাধিকারীর স্থান তাহা অপেক্ষা দৃঢ় হওয়ায় তাঁহাকেই হরিবিমুখ জনগণ বিপন্ন করিতে পারে না। মধ্যমাধিকারীর হৃদ্দেশে ভগবান্ যে অনেক সময় অধিষ্ঠিত আছেন, তিনি তাহা বুঝিতে পারেন। কৃষ্ণচন্দ্র চৈত্তগুরুরূপে ভক্তের হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া তাঁহাকেই নিজ-জন বলিয়া আকর্ষণ করেন। মধ্যম ভাগবত হরি-গুরু-বৈষ্ণব- কৃপাক্রমে সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত অনুভূতি লাভ করেন। সাধারণ ভাষায় ইহাকেই স্বরূপসিদ্ধি বলে। জ্ঞানিগণ যাঁহাকে জীবন্মুক্ত সংজ্ঞা দেন, তাদৃশ শুদ্ধাধিকার বৈষ্ণবের ভাষায় স্বরূপসিদ্ধি অর্থাৎ অবিমিশ্র অপ্রাকৃতে অবস্থিতি। এইকালে তাঁহার কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন চেষ্টা থাকে না। সেবার উপকরণ লইয়া যাঁহারা বিবাদ করেন, তাঁহারা উন্নতাধিকারের ধারণা করিতে পারেন না। শ্রীশ্রীমদ্ বিষ্ণুপাদ গৌরকিশোরের মৃৎভাণ্ড, অপক্ব বস্তু গ্রহণ,

সুতীব্র বৈরাগ্য, সহজিয়াগণকে উৎসাহ প্রদান—হরিসেবার উপকরণ জানিয়া তাহাতে প্রমত্ত হইলে মূল বস্তু ত্যাগ করিয়া খোসা লইয়া টানাটানি হইয়া যাইবে। যাঁহারা অপ্রাকৃত ছাড়িয়া প্রাকৃতে মত্ত, তাঁহারা কোন দিনই মহাভাগবতের চেষ্টা বুঝিতে সমর্থ হইবেন না। সেবার উপকরণগুলিকে নিজ নিজ প্রাকৃত ভোগ-যোগ্য উপকরণের সহ সমান জ্ঞান করিলে কখনই অপ্রাকৃত উপলব্ধি হইবে না।

উপরি-উক্ত তিন প্রকার বৈষ্ণবের বংশ এই জগতে দেখিতে পাওয়া যায়। 'বংশ' বলিলেই যে কেবল শৌক্র অধস্তনগণকে বুঝায়, এরূপ নয়। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আদরক্রমে বৈধ যোষিৎসঙ্গ-প্রভাবে পৃথিবীতে বংশের উৎপত্তি হয়। কিন্তু তাহাই যে কেবল সেই বস্তুর ধারাবাহিক অবিমিশ্র অধিষ্ঠান, তাহা বলা যায় না। পিতা-মাতা—এই উভয় বস্তুর সম্মিলনে সন্তানের উদ্ভব, প্রতি পুরুষেই ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রীর সহযোগে সেই বস্তু হইতে অপর বস্তুর সমাবেশ লক্ষিত হয়। সুতরাং অবিমিশ্র পিতৃ-সত্তা পুত্রে বা স্থূল শৌক্রবংশে আরোপণ—সূক্ষ্ম বিচার-পুষ্ট নহে।

পিতা-মাতা পুত্রের সর্ব্বপ্রধান সেবক। তাঁহারা পুত্রের জন্য নানাবিধ অনুষ্ঠান- দ্বারা কায়মনোবাক্যে, অপত্যের জন্মাবধি স্বতঃ পরতঃ সেবা করিয়া থাকেন। সেই ঋণ পরিশোধের জন্য কৃতজ্ঞ পুত্রের পিতৃমাতৃ-সেবা কর্ত্তব্যের প্রধানতম অনুষ্ঠান। পুত্র, জন্মের অব্যবহিত পর হইতে পিতা-মাতার সেবা করিতে যোগ্য হন না। অনেক দিন পরে পুত্রের নিজত্ব উপলব্ধি হইলে সেবাধর্ম্ম প্রকাশমান হয়। তখন তিনি পিতা-মাতার উত্তরাধিকারি-স্বরূপে পিতৃমাতৃ-সেবায় নিজ প্রধান কর্ত্তব্যতা উপলব্ধি করেন। এই প্রকার বংশ। ইহাতে পিতৃমাতৃ-প্রদর্শিত চিত্তের ধারণা-সমূহ প্রবল হয়।

আমি জানি যে, শৌক্রজন্ম ব্যতীত আচার্য্যকুলে জীবের দ্বিতীয় জন্ম হয়। দ্বিতীয় জন্ম হইলে জীব এক জন্ম অপবাদের হস্ত হইতে মুক্ত হন। আচার্য্য ও গায়ত্রী তাঁহাকে সাবিত্র্য জন্ম প্রদান করেন। এইকালে আচার্য্যকুলে জীবের দ্বিতীয় জন্ম লাভ হওয়ায় তিনি অপেক্ষাকৃত সেবাধর্ম্ম বুঝিতে পারেন। সন্তানের জন্মাবধি গৃহে বাসকাল পর্য্যন্ত পিতা-মাতা তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। পুত্রের জ্ঞান-বিকাশের প্রথমেই তিনি আচার্য্যকুলে প্রেরিত হন। সুতরাং পিতা-মাতার প্রতি কর্ত্তব্য-জ্ঞান আচার্য্যকুলে অবস্থানকালে তিনি বুঝিতে পারেন। পিতা-মাতার ন্যায় আচার্য্য, সন্তানের সেবক হন না। দ্বিজ, আচার্য্যের অনেকটা অধিক সেবা করিবার সুযোগ পান। আচার্য্যদাস দ্বিজ আচার্য্যের গৃহকে নিজ-গৃহ জানিতে পারেন। তিনি আচার্য্যের যাবতীয় দ্রব্যের সেবাভার গ্রহণ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে আচার্য্যের নিকট হইতে বেদাঙ্গের সহিত সমস্ত বেদশাস্ত্রে অধিকার লাভ করেন। বেদশাস্ত্র দুই প্রকার অনুষ্ঠানের উপদেশ করেন। প্রাকৃত জগতে সুশৃঙ্খলভাবে প্রাকৃত ধর্ম্মের সহিত অবস্থান—এক প্রকার ফল। অপর একপ্রকার—নিত্য পরমার্থ বিদ্যায় অধিকার। আচার্য্য অনিত্য ধর্ম্মের যাজক হইলে অন্তেবাসীকে অনিত্য উপাসনা—কর্ম্ম বা জ্ঞান উপদেশ করেন। আবার আচার্য্য স্মার্ত্ত না হইয়া পরমার্থী হইলে বেদ-কথিত পরম গোপনীয় পরমার্থ শিক্ষা দেন। যে অন্তেবাসী প্রাকৃত রুচিবিশিষ্ট, জড়ধর্ম্মে অভিনিবিষ্ট, তিনি আচার্য্যের নিকট হইতে বৈদিক অধিকারক্রমে গৃহব্রত ধর্ম্মই

মানবজীবনের ফল মনে করেন। আবার পরমার্থ-ধর্ম্মজ্ঞ বেদের প্রপক্ব ফল ভাগবত-সদ্ধর্ম্ম বেদশাস্ত্র হইতে শিক্ষা দিয়া জীবকে অনন্ত জীবনের পথে অগ্রসর করান—নিত্য জীবন হইতে নৈমিত্তিক জীবনের পার্থক্য বুঝাইয়া দেন। অন্তেবাসী ক্ষুদ্রার্থ-লোভে আচার্য্যের নিকট হইতে সমাবর্ত্তন-অনুষ্ঠান সমাপন করিয়া গৃহে প্রবেশ-পূর্ব্বক কর্ম্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। যিনি প্রাকৃত অর্থ পরমার্থের নিকট নিতান্ত ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর জানিয়া পরমার্থে আকৃষ্ট হন, তিনি সমাবর্ত্তনের পরিবর্ত্তে বৃহদ্ব্রত,অথবা যতিধর্ম্ম বা গৃহ স্বীকার করিয়া পারমার্থিকী দীক্ষা লাভ করেন।

পারমার্থিক আচার্য্যের নাম—গুরু, তিনি অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞান প্রদানরূপ দীক্ষানুষ্ঠান-দ্বারা জীবের তৃতীয় জন্ম প্রদান করেন। এই তৃতীয় জন্মে তিনি অপ্রাকৃত উপাসনায় প্রবৃত্ত হন এবং প্রাকৃত দর্শন হইতে বিমুক্তি লাভ করেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শৌক্রজন্মের বিস্তৃতি কেবল বংশাখ্য লাভ করিতে পারে না, পরন্তু সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্যজন্মের বিস্তারকেও 'বংশ' আখ্যা দেওয়া হয়। আচার্য্যকুলে অবস্থান বা অপ্রাকৃত গুরুগৃহে জন্মের সহিত শৌক্রজন্ম বিস্তৃতির পার্থক্য থাকিলেও উহাই (শৌক্রজন্ম) পারম্পর্য্যক্রমে 'বংশ' বলিয়া দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। শৌক্রজন্মে সন্তানের পক্ষে পিতার ভৃত্যত্ব অল্প, কিন্তু সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য জন্মে আচার্য্য ও গুরুর দাস্য উত্তরোত্তর অধিক। ভক্তিমার্গে সেবনের তারতম্যই উত্তরাধিকারের তারতম্য নির্ণয় করে। যেরূপ চিকিৎসকের পুত্রের চিকিৎসাশাস্ত্রে অধিকার পুত্রত্বে আবদ্ধ নহে, পরন্তু তদ্‌বিদ্যাধিকারে ব্যক্তিগত পারদর্শিতাই একমাত্র কারণ, তদ্রূপ বৈষ্ণব-গুরুর পুত্রত্বই কেবল আচার্য্য বা গুরুত্বের কারণ নহে। শৌক্রবংশে কেবল যে পারমার্থিক অধিকার ন্যস্ত হইবে, এরূপ কথা কোন শাস্ত্রে বা সদাচারে দেখিতে পাওয়া যায় না। উহা কেবলমাত্র গৃহস্থ অবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের কতিপয় স্বার্থান্ধ লেখকের কপটতার ফল-মাত্র। সৎসম্প্রদায়ের মধ্যে তুর্য্যাশ্রমী গুরুগণের বংশাবলী শিষ্যপরম্পরায় আবদ্ধ। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, সৎসম্প্রদায়জাত অর্থাৎ সৎসাম্প্রদায়িক গুরুপরম্পরা ব্যতীত মন্ত্রের নিষ্ফলতা; মূঢ় ব্যক্তিগণকে প্রতারিত করিবার মানসে কতই নূতন মত উদ্ভূত হইয়াছে। প্রাকৃত স্বার্থ-বিজড়িত সাধারণ লোক প্রাকৃত মদে মত্ত হইয়া সেই মতবাদগুলি নিরাস করতঃ সত্যের অনুসন্ধান করিতে পারে না। সুতরাং সত্য আচ্ছাদন করিয়া বঞ্চক-সম্প্রদায় জাল বিস্তার করে। অনেক দুর্ভাগা লোক তাহাদের কুহকে পড়িয়া পরম সত্য হইতে বিচ্যুত হয় এবং পরমার্থ দূরে থাকুক, কেবলমাত্র অনর্থজালে আবদ্ধ হইয়া পড়ে।

যদি ডাক্তারের পুত্র ডাক্তারী না শিখিয়া লোকের চিকিৎসা করে, রেলওয়ের ড্রাইভারের পুত্র ইঞ্জিনের যন্ত্রসমূহে জ্ঞান লাভ না করিয়াই যদি ট্রেন চালাইতে আরম্ভ করে, সন্তরণকুশল পিতার সন্তরণে অসমর্থ পুত্র যদি অপরকে অগাধ জলে সাঁতার শিখাইতে লইয়া যায়, তাহা হইলে যে কি বিষময় ফল উৎপন্ন করে, তাহা সহজে অনুমেয়। বিষ্ণু-বৈষ্ণবের শৌক্রবংশে জাত বলিয়া আমরা যতই কেননা আস্ফালন করি,

আমাদের হরিসেবায় দৃঢ় শ্রদ্ধা না থাকিলে—নির্জীব ভক্ত্যঙ্গসমূহ প্রদর্শন করিলে আত্মবঞ্চনা এবং সমাজের শত্রুতা ব্যতীত আর কিছু করা হইবে না। অচ্যুতগোত্র কখনই শৌক্রগোত্র নহে, সুতরাং 'বৈষ্ণব-বংশ' বলিলে কেবল বৈষ্ণবের শৌক্রবংশ বুঝায় না। অচ্যুতগোত্র-প্রবিষ্ট পরমার্থী বৈষ্ণব স্ব-স্ব অধিকার-সমূহ তাদৃশ নিতান্ত অনুরক্ত সেবকেই ন্যস্ত করেন। কুল-প্রসূত বলিয়া অযোগ্য অধস্তনগণ কখনই পূর্ব্ব পুরুষের উত্তরাধিকার লাভ করিতে পারেন না; লাভ করিলেও তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হন না। এই সকল কথা বৈষ্ণব-বংশের ন্যায় বিষ্ণু-বংশেরও সমধিক কার্য্যকারী। বিশেষতঃ ভগবান্ ও ভক্তগণ কালে কালে ভিন্ন ভিন্ন বংশে জন্মগ্রহণ করেন, আবার তত্তদ্বংশে অভক্ত বা অসুরগণের জন্মলাভ করিবার বাধা নাই। বিষ্ণুর সন্তান—বিষ্ণু নহেন, কিন্তু বৈষ্ণব; সুতরাং বিষ্ণুবংশ ও বৈষ্ণব-বংশে তৃতীয় পুরুষ হইতে ভেদ নাই।

স্বরূপ ও বিকার

বস্তুর স্বরূপের ও বিকারের দুই প্রকার দর্শন আছে। স্বরূপবিকৃত দর্শন মানবের কর্ম্মফলবাধ্য ইন্দ্রিয়ের উপরই নির্ভর করে। আমাদের যে ইন্দ্রিয়-পরিচালনা, তাহা সঙ্গ গুণে বা সঙ্গদোষে পৃথক্ পৃথক্। সঙ্গের প্রভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়-বৃত্তির সম্পত্তি হ্রাস-বৃদ্ধি লাভ করে। তাহার ফলে দ্রষ্টা সাজিয়া আমরা দৃশ্যমান্ বস্তু- সমূহের ধারণা করিয়া থাকি। বস্তুতে কি আছে, বা না আছে, তাহা দেখিবার সুযোগ আমাদের সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, তজ্জন্যই আমাদের মধ্যে মত-ভেদ ঘটে।

আমাদের শ্রেণীতে অনেক গুলি বুদ্ধিমান্ ছেলে আছে; আমাদের মত কতকগুলি কম-বুঝ্ ছেলেও আছে। আবার আমাদের ন্যায় কম-বুঝ্গণের মধ্যেও যা'র বুদ্ধি যেটুকু আছে, সেটুকু ধরিবার সামর্থ্যও অনেকের নাই। সেজন্য আমাদের ক্লাসের সকল ছেলের সহিত বন্ধুত্ব রাখাই আমাদের দরকার। বন্ধুত্ব না রাখিলে আমাদের প্রতি তাহাদের ভাল ব্যবহার থাকিবে না।

বন্ধুত্ব রাখিতে গিয়া আমরা আমাদের চেয়ে কম বুঝ্ বন্ধুগণের কথায় আস্থা স্থাপন করিব না। যদি তাহা করি, তাহা হইলে আমরাও বোকা হইয়া যাইব এবং আরও বিপদে পড়িব। সকলের সহিত বন্ধুত্ব রাখিতে হইলে নিজের ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। যদি ক্ষতি স্বীকার করিতে গিয়া আমরা আসলে ঠকি, তাহা হইলে সেরূপ বন্ধত্ব সংরক্ষণ করিতে গেলে আমাদের কি লাভ হইবে, বুঝি না। তাই আমরা আমাদের শুভানুধ্যায়ীর নিকট হইতে শুনিয়াছি যে, নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গ করিয়া তাঁহারই অনুগমন করা কর্ত্তব্য।

আমার যাহা প্রয়োজন, তাহাই যদি অন্যের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আমি আমার প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য, আমা হইতে অগ্রসর হইয়াছেন যিনি, তাঁহারই অনুসরণ করিব। তাহা হইলে আমি আমার প্রিয় রস অধিক পরিমাণে আস্বাদন করিতে সমর্থ হইব। আমা অপেক্ষা ভালর অনুগমন করিলে আমার নিজের বৃত্তি ভক্তি বা সেবা বাড়িয়া যাইবে এবং আমার সেব্যবস্তুকেও আমা-অপেক্ষা হীনচক্ষে দেখিব না।

যখন আমি কোন বস্তুকে আমা-অপেক্ষা হীন দেখি, তখন আমার সেবা-প্রবৃত্তিটি একটু রূপান্তরিত হয়—আমার স্বরূপ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া কম- বেশী বিরূপ আশ্রয় করে। তখন আমি ভক্তিধর্ম্ম হারাইয়া আমা-অপেক্ষা নিম্নস্তরে অবস্থিত জনগণের নিকট হইতে আমার সেবা প্রার্থনা করি—সেবা করাই যে আমার নিত্যধর্ম্ম, তাহা ভুলিয়া গিয়া অপরের দ্বারা আমার সেবা করাইয়া লইবার প্রবৃত্তিকে প্রবল করানই আমার ধর্ম্ম হইয়া পড়ে। তখনই কতকগুলি লোকের সহিত আমার বন্ধু-বিচ্ছেদ হয়। যখনই বন্ধুদ্বারা আমি বল-পূর্ব্বক আমার সেবা করাইয়া লইবার ইচ্ছা করি, তখনই বন্ধুবর্য্য আমার প্রতি সেবা-হীন ধর্ম্ম দেখাইতে থাকেন।

এইসকল বিরক্তিকর অভিজ্ঞান হইতে আমি শিখি যে, আমার নিত্যধর্ম্ম ভক্তি ছাড়িয়া দিয়া ভজনীয় বস্তু হইবার প্রয়াসই আমার অমঙ্গলের ও অপ্রীতি আনয়ন করিবার কারণ হইয়াছে। সুতরাং প্রেমিকের নিকট আমি ইহাই শিখি যে, প্রেমের বদলে আর কিছুর অনুশীলনই আমার অমঙ্গলের হেতু; অর্থাৎ আমার বোকামি হইতে যে ভোগ-বাসনা জন্মে, তাহার ফলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের পিপাসা আমাকে ভক্তিপথ হইতে নীচে নামাইয়া দিয়া ভোগের সমুদ্রে হাবুডুবু খাওয়ায়। তাহা আমার পক্ষে আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে।

আমি সেবা-বিমুখ হইয়াই ভোগের আবাহন করিয়াছি, সুতরাং ভোগ- পরিহার করা আমার কার্য্য হইলেও ভোগ পরিহার করিতে গিয়া আমি যখন আমার অস্তিত্ব লোপ করাইয়া আমার নিত্য সেব্যের সেবা হইতে বিচ্যুত হই, তখনই আমি আমাকে সেব্যের সহিত সম-জ্ঞান করিতে গিয়া আমার সেবকগণকে, সেব্যকে ও আমাকে এক শ্রেণীরই পড়ুয়া মনে করি। আমার এই ভাবটি এত বাড়িয়া যায় যে, সকল বস্তুর সমতা স্থাপন করিবার দুষ্প্রবৃত্তি আসিয়া সেবা-সেবকভাব ঘুচাইয়া দেয়। তখনই আমার বিনাশ হয়, তখনই আমি নির্ব্বাণ লাভ করি—আমার নিজত্ব আর থাকে না—স্বরূপ হারাইয়া ফেলি, তখনই স্বরূপের বদলে বিরূপ অবস্থায় সমতার আদর্শ আমাকে 'মায়াবাদী' করিয়া তোলে।

মেপে-নেওয়া-ধর্ম্ম কমাইয়া আনিতে আনিতে, পরিমেয়, পরিমাণ ও পরিমাতা—সর্ব্বতোভাবে এক, ইহা না জানা পর্য্যন্ত সমন্বয়বাদের শেষ সীমায় আমার যাওয়া হয় না। বৈষম্য, বিভেদ, সংখ্যা ও অবস্থা প্রভৃতি আমাকে তোলপাড় করাইতে থাকে, সুতরাং পরম শান্তিতে যে সমতা আছে, সেই সমতা আমাকে—আমার অস্তিত্বকে নাশ করুক, এরূপ বিকার আসিয়া আমার চিত্তে প্রাধান্য লাভ করে। তখনই আমার ক্লাসের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমন্ত ছেলেগুলিকে আমারই মত বোকা মনে করি। সুতরাং তাহাদের নিকট হইতে আমার যাহা গ্রহণীয় ছিল—যাহাতে আমার মঙ্গললাভ হইত, তাহা হারাইয়া ফেলিয়া, ভেজাল- বুদ্ধিতে যাহাদের সঙ্গফলে আমার অমঙ্গল হয়, আমা-অপেক্ষা সেই কম-বুঝ্ ছেলেগুলিকে আমার পূজ্য বন্ধবর্গের সহিত সমজ্ঞান করি এবং আমাকেও তাহাদের সহিত মিশাইয়া ফেলি! আমার এই যে বুদ্ধি-লোপ, তাহাই স্বরূপের বিরূপ-ধারণায় স্বরূপের বিনাশ।

হ্রাস-বৃদ্ধির দ্বারা স্বরূপের বিকার উৎপাদন করা আমার কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু আমার স্বরূপে কেন হ্রাস বৃদ্ধির যোগ করি—এরূপ অনুভূতি লাভ করি, তাহাও বুঝি না। সমৃদ্ধ ও ক্ষুণ্ণ অবস্থা-বৈষম্য আমার স্বরূপের

সমতাকে কেন বিকার-রাজ্যে লইয়া যায়? যেখানে সর্ব্বসংস্থা-ধারণা তাহাই ত' স্বরূপের পূর্ণ আদর্শ, কিন্তু আমি ত' সর্ব্বসংস্থা নহি; যদি তাহা হইতাম, তাহা হইলে আমার অভাব অভিলাষাদি পূরণ করিবার অভিলাষ কেন থাকিত?

যখন আমি বিকার-রাজ্যের দিকে আমার অভিলাষকে লইয়া দৌড়িতে থাকি, তখনই আমাতে নানা প্রকার অভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে ও উহাদের পূরণাকাঙ্ক্ষা প্রবল হইবার সঙ্গে-সঙ্গে উত্তরোত্তর অভাবের রাজ্যেই চলিতে থাকি। যখন আমি বুঝিতে পারি যে, এই প্রকার চালনা-প্রভাবে আমি আমার স্বরূপ হইতে ক্ষণভঙ্গুর বিকার রাজ্যে গিয়া পৌঁছিতেছি, তখন আমার স্বরূপে প্রত্যাবর্ত্তনেই যে আমার মঙ্গল, সেই দিঙ্ নির্ণয়ে ভুল হয়। তখনই বুঝিতে পারি যে, প্রতিফলিত বিকৃতিপূর্ণ জগৎ আমার স্বরূপকে বিকৃত করিয়াছে; কেন না, আমার স্বরূপে যে সত্তার অবস্থান ছিল, তাহা আজ জরা মরণ-ধর্ম্মে আক্রান্ত হইয়াছে।

পরিবর্ত্তনশীলতারূপ মরণ-ধর্ম্মের আবাহন করিবার অবকাশের মধ্যেই আমি অবস্থিত হইয়াছি, এই অবকাশের মধ্যেই আমি আমাকে পূরিয়া ফেলিয়াছি! এখন ইহা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া আমার স্বস্থানে আমি গমন করিব।

কিন্তু এখন আমাকে পথ দেখাইবে কে? আমি যাঁহাকে পূজ্য-বুদ্ধি করি, আমার প্রতি সকরুণ, প্রকৃত সমভাব-সম্পন্ন সেই ব্যক্তিই আমাকে পথ দেখাইতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি বিকার-রাজ্যে অবস্থানকেই বহুমানন করেন এবং স্বরূপে অবস্থিত না হইয়া বিকার-রাজ্যের ক্রীড়া-পুত্তলি হন, তাহা হইলে সেই সম-শ্রেণীস্থ কম-বুঝ বালকের পূজা করিয়া আমি প্রকৃত লাভবান্ হইব না। তাহার বিরক্তি উৎপাদন করিবার জন্য আমাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাহার নিকট প্রতিপাদনও করিব না, অথবা তাহার সহিত দান-প্রতিগ্রহ, তাহার সহিত গোপনীয় কথোপকথন, তাহার সহিত কোন ভোজ্যের আদান-প্রদান অর্থাৎ তাহার নিকট হইতে নিজে কিছু গ্রহণ করিয়া নিজমঙ্গলসাধন করিবার চেষ্টা বা তাহাকে কিছু উৎকৃষ্ট খাদ্য খাওয়াইবার যত্নও করিব না; কেন না, তৎফলে বৈকারিক বন্ধুগণ আমার স্বরূপে ফিরিয়া যাইতে কোন মতেই অনুমোদন করিবেন না।

পক্ষান্তরে আমি স্বরূপে ফিরিয়া গিয়া একেবারে বুঁদ হইয়া বসিয়া থাকিব বা চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া আমার জড়-ধারণার অন্যতমত্বে পর্য্যবসিত করিব—ইহাই যদি আমার স্বরূপ হয়, তাহা হইলে আমার বিরূপের প্রবৃত্তি আমাকে তদপেক্ষা অধিকতর রস আস্বাদন করাইবার যোগ্যতা দিবে।

প্রকৃতপক্ষে আমি কখনও রসাস্বাদনে বঞ্চিত হইতে চাহি না। রস-রহিত স্থৌল্য আমার স্বরূপের তরলতাকে অত্যন্ত নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিবে, এরূপ অসহিষ্ণুতাধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া আমি আমাকে চঞ্চল করিতে ইচ্ছা করি না; পরন্তু স্বরূপের নিত্যা প্রবৃত্তি বাধা প্রাপ্ত হয়,—এরূপ জড়-জগতের অসহিষ্ণুতা ধর্ম্মেও আমি দীক্ষিত হইতে চাহি না।

তাই সচ্চিদানন্দপূর্ণ স্বয়ংরূপ আমার স্বরূপ জানাইয়া দিবার জন্য আমারই ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়া তাঁহার নিজ-সৌন্দর্য্য দেখাইয়াছেন এবং আমার সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির জন্য অনুক্ষণ তাঁহার কিরূপ শুভানুধ্যান, তাহাও আমি বুঝিতে পারিয়াছি। সেজন্য তিনি তাঁহার আনুষঙ্গিকরূপে আমাকে মনিটারের কার্য্য করিবার জন্য শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুকে আমার স্বরূপ জানাইয়া দিবার উদ্দেশে তাঁহার নিকট হইতে উপদেশ লাভ করিতে বলিতেছেন। আমি তাহাই করিব।

বালক-ভাব

জগতে অনেক প্রকার মনোধর্ম্মজাত ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, উন্মত্ততা, বুজ্‌রুকী, আত্মবঞ্চনা কপটতা, অন্যাভিলাষ প্রভৃতি হরিবিমুখতাজাত উপসর্গ-সমূহ ধর্ম্মের বা পরমার্থের 'প্রতিমা' বলিয়া আহূত ও পূজিত হয়। আবাহনের পর বিসর্জ্জনই যাহাদের ধর্ম্মের মূলমন্ত্র, তাহাদের যে-কোনও 'মনোধর্ম্ম' আপাত ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার জন্য সাদরে বরণমাল্য গ্রহণ করিতে পারে। বলিতে কি, ঐ সকল মনোধর্ম্মের উচ্ছিষ্ট ও অবশেষ অনেক সময় ভাক্ত-সম্প্রদায়ের মধ্যেও সঞ্চারিত দেখা যায়, আবার বিদেশীয় ধর্ম্মের মধ্যেও উহার প্রতিধ্বনি শুনা যায়।

ঐরূপ শ্রেণীর মতবাদ 'বালক-ভাব' বা 'বালক-স্বভাব' বলিয়া এক প্রকার ইন্দ্রিয়পরায়ণতাকে 'ধর্ম্ম' বা ভক্তির উচ্চাঙ্গরূপে বরণ করে। ব্রহ্মজ্ঞগণের বালকবৎ, পিশাচবৎ, উন্মত্তবৎ, জড়বৎ অবস্থাসমূহ দৃষ্ট হয়। সুতরাং যদি কেহ ঢঙ্গবিপ্রের আদর্শে অবৈধ অনুকরণ-দ্বারা পরমহংস-শিখামণি শ্রীল গুরুদেব গোস্বামী, শ্রীঋষভদেব, শ্রীভরত, শ্রীবালখিল্য মুনিবৃন্দ বা শ্রীসনক-সনন্দনাদির প্রতিযোগিতা করেন, তাহা হইলে তিনিও 'ব্রহ্মজ্ঞ', 'পরমহংস', 'মহাভাগবত', 'মহাভক্ত' বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবেন—এইরূপ অন্যাভিলাষ হইতে এক শ্রেণীর হৃদয়ে ঐরূপ অনুকরণ-প্রবৃত্তি জাগরিত হয়।

'বালক-ভাব' বা 'বালক-স্বভাব' নামক মতবাদ বহুরূপী হইয়া বঞ্চিত ব্যক্তিগণের ইন্দ্রিয়-তোষণ করে। কোন কোন ধর্ম্মপ্রচারক নাকি বলিয়াছেন—"বালকদিগকে আমার নিকট আসিতে দাও, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই।" কেহ কেহ আবার বালক-ভাব অভ্যাস করিবার জন্য সর্ব্বদা বালকগণের সহিত অবস্থান ও তাহাদের যাবতীয় ক্রিয়া-কলাপ, এমন কি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন প্রভৃতির অনুকরণ করিয়া থাকেন।

শিশু-বালকগণের মত মাটী খাওয়া, আস্তাকুঁড়ে অবস্থান করা, লাফাইয়া চলা, ডিগ্‌বাজী খাওয়া, অপরের ঘাড়ে চড়া, খেলা করা প্রভৃতির অনুকরণ করিতে করিতে অনেক 'টন্‌টনে'-বুদ্ধি পরিপক্ক বৃদ্ধকেও অবশেষে অনেক অবৈধ, অকথ্য কুরুচি ও দুনীর্তিপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত দেখা গিয়াছে।

একবার কোনও একটি লোকবিশ্রুত তথাকথিত ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের কোনও পলিতকেশ মঠাধীশকে পুকুরে মৎস্য ধরিতে দেখা গিয়াছিল। মঠাধীশের এইরূপ পাপকার্য্যে নিযুক্ত থাকার কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে,
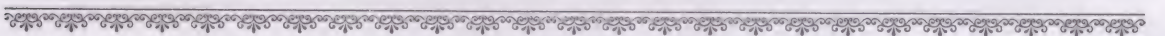
তাহার শিষ্যগণ উত্তর করিলেন,—'ইঁহার ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থা; বালকভাবে মৎস্য ধরিয়া ক্রীড়া করিতেছেন।' দুর্ভাগ্যের বিষয়, ঐরূপ 'বালক-ভাবে'র (!) অত্যাচার বহু দুর্ব্বল মৎস্যের উপর বর্ষিত হইলে মৎস্যগুলি অচিরেই উক্ত সপার্ষদ বালকভাবাপন্ন ব্যক্তির উদরপূর্ত্তির জন্য পাকশালায় প্রেরিত হইয়াছিল।

অনেক 'সাধু' নামধারী বালকভাবে—গোপালভাব খেলা করেন! ঐরূপ গোপালদের (!) এদিকে লম্বমান শ্মশ্রু স্বাভাবিক শ্বেতবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে, কেহ কেহ আবার চুলে কৃষ্ণবর্ণ 'কলপ' মাখিয়াও 'বালক-ভাব' প্রকাশ করেন—ঐরূপ 'গোলাপী' গোপালগণ (!) নাকি সর্ব্বত্র মাতৃদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐরূপ শ্রেণীর গোপালগণের দ্বারা জগতে এমন অনেক জগন্নাশকর কার্য্যের উদ্ভব হইয়াছে—যাহা সাধারণ দুর্নীতি পরায়ণ ব্যক্তিগণের দ্বারাও সংঘটিত হইতে দেখা যায় নাই।

এইরূপ বালকভাবের 'অছিলা' পরযোষিদ্‌গণের সহিত যথেচ্ছভাবে মিশিবার প্রতিবন্ধক সরাইয়া দেয় এবং সেই সুযোগে ঐ সকল দুষ্টবুদ্ধি ব্যক্তি স্বকার্য্য-সাধন তৎপর হইতে পারে। যেমন 'সখীভেক' প্রভৃতি অবৈধ ও কৃত্রিম সজ্জার আশ্রয়ে অনেক কপট ব্যক্তি পরযোষিৎগণের সহিত অবাধে মিশিবার উপায় আবিষ্কার করিয়া লইয়াছে, তদ্রূপ 'বালকভাব', 'গোপালভাব' প্রভৃতির নামেও অনেক কপট ও কামী ব্যক্তি তাহাদের ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার আর একটি অপ্রতিহত পথ আবিষ্কার করিয়াছে।

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের সময়ও এইরূপ পাষণ্ড গোপালবেষী ব্যক্তিগণ ছিল,—

রাঢ়ে আর এক মহা ব্রহ্মদৈত্য আছে।
অন্তরে রাক্ষস বিপ্র কাচ-মাত্র কাচে।।
সে পাপিষ্ঠ আপনারে বলায় গোপাল।
অতএব তারে সবে বলেন শিয়াল।।

(চৈঃ ভাঃ আদি ১৪শ)

কেহ কেহ বলেন, সকলেই যে বালক-ভাবের আশ্রয়ে যোষিৎসঙ্গাদি অবৈধ ব্যাপারে লিপ্ত হয়, তাহা নহে। এখনও অনেক লোক দেখা গিয়াছে, যাঁহারা অন্তরে ও বাহিরে প্রকৃত সংযমী, তাঁহারাও এই বালক ভাবটিকে ভালবাসেন এবং ইহাকে ভগবদ্‌রাজ্যের উন্নত সোপান বলিয়া বরণ করেন। খৃষ্টসম্প্রদায়ের অনেক মনীষী ধার্ম্মিক, সাধক এই বালক-ভাবকে খুব উচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন।

যাঁহারা এইরূপ বলেন, তাঁহাদের বাক্যের উত্তরে অনেক কথা বলিবার আছে। প্রথমে জিজ্ঞাসা—'ভগবদ্ভক্তি' বা 'পরমার্থ' কি মানুষের, জীবের বা ব্যক্তিবিশেষের কিংবা সমষ্টিবিশেষের 'ভালবাসা' বা 'ভাল-না-বাসা'র উপর নির্ভর করে? ভ্রান্ত—মোহমদিরায় মত্ত—লুপ্তজ্ঞান জীব কোটি—সাধক-কোটি কিংবা বিমুখ-সমাজে 'সিদ্ধ', 'সাধু' নামে প্রচলিত ব্যক্তির অনুভূতি বা সাঙ্ক্যরূপ ইন্দ্রিয়পরায়ণতাই কি সত্যের দিঙ্‌ নির্ণায়ক যন্ত্র? তাহাই সত্য—যাহা সত্যস্বরূপ শ্রীভগবানের প্রীতিকর, তাহাই ভাল—শ্রেয়ঃ যাহা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়সুখ-তাৎপর্য্যপর। এই গেল একদিকের কথা।

দ্বিতীয় কথা,—যাঁহারা অন্তরে ও বাহিরে তথাকথিত সংযত, পবিত্র, তাঁহাদিকের মধ্যেও যখন বালক-ভাবের আদর দেখা যায় এবং তাঁহারা উহাকে যত্নের সহিত অভ্যাস করেন, সাধন করেন, তখন তাঁহাদের সম্বন্ধে মীমাংসা করিতে হইলে বলিতে হইবে যে, যাঁহারা এই জন্মে বা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে অনেক পাপকার্য্য করিয়াছেন, অনেক বিষয়-কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন, অনেক লোকের সহিত বঞ্চনা, কপটতা করিয়াছেন, অনেক অবৈধ ও অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন কিংবা বাহ্যে কার্য্যতঃ না করিলেও মনে মনে ঐরূপ কার্য্য করিবার জন্য প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট, তাঁহাদের নিকটই তাঁহাদের ব্যবহারিক কার্য্যের বা মানসিক চিন্তার প্রতিযোগী 'বালকভাব'টী বড় আদরণীয় আদর্শ বলিয়া কল্পিত হয়। অর্থাৎ তাঁহারা মনে করেন,—"আমরা যখন অত্যন্ত পাপকার্য্যে লিপ্ত কিংবা মনে পাপ-বাসনায় প্রধাবিত, তখন শিশুগণ বা বালকগণ—যাহারা এখনও সংসার- ক্ষেত্রের অভিজ্ঞান লাভ করিয়া আমাদের ন্যায় কপট জুয়াচোর, ব্যভিচারী, লম্পট বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন বা সংসার-তাপে জর্জ্জরিত হইবার সামর্থ্য লাভ করে নাই, সেই সকল অবোধ ও অপরিণত বালকগণই আমাদের আদর্শ হউক।" ঐরূপ বালকভাবের আদরের মূলে অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তি বা ভগবৎ প্রীতির কোন লেশই নাই—আছে কেবল পাপ, সংসার যন্ত্রণা, কপটতা, ছল, ব্যভিচার, বিষয়বুদ্ধি, ক্রূরতা প্রভৃতি প্রাকৃত কার্য্যের ও চিন্তাস্রোতের বিষময় পরিণামের অনুভূতি এবং উহাদের জ্বালা-যন্ত্রণা হইতে আপনাকে সাময়িকভাবে পৃথক্ বা অসংস্পৃষ্ট রাখিবার পিপাসা অর্থাৎ আত্মভোগের একটা মৃগতৃষ্ণিকা। যাহারা জগতের কপটতাময়ী অভিজ্ঞতায় পরিপক্ক—যাহারা জগতের সহিত অধিক সংযুক্ত, তাহারা অসরল, কুটবুদ্ধিযুক্ত; সুতরাং যাঁহারা এই জগতে বেশীদিন বাস করেন নাই বা যাঁহারা "সেইরূপ অপরিণত ও অপ্রকাশিত দুষ্টবুদ্ধি বালকগণই আদর্শ হউক"—এরূপ আত্মভোগময় চিন্তাস্রোতে নিমগ্ন, তাহাদের ঐরূপ বালক ভাবের প্রতি আদর লক্ষিত হয়।

যাঁহারা ভগবানে প্রীতি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়সুখ তাৎপর্য্যকেই সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিচার করেন, তাঁহারা কখনও ঐরূপ প্রাকৃত পাপ বা জ্বালা-যন্ত্রণার অনুভূতির ভূমিকাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাদের সাধন বা সিদ্ধির লালসা করেন না।

যে বালকগণকে আমরা বর্ত্তমানে সরলতা, কমনীয়তা, নির্দ্দোষতা, অকপটতা ও জাগতিক বিষয়ে অনভিজ্ঞতা প্রভৃতির আদর্শ মনে করিতেছি, সেই বালকগণ প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে। তাহাদের ভিতরে জন্ম-জন্মান্তরের যাবতীয় জগজ্জঞ্জালের সংস্কার, অবিদ্যার বীজপুঞ্জ নিহিত রহিয়াছে; অতি বাল্যাবস্থায় তাহা অপ্রকাশিত মাত্র। তাহাদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে ঐ সকল অন্তর্নিহিত জগজ্জঞ্জাল জগতের জলবায়ুর দ্বারা অনুকূলতা লাভ করিয়া প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। এক বৎসর বয়স্ক শিশুতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার যোগ্যতা নাই বলিয়া কিংবা পঞ্চ বৎসরের বালকে স্ত্রী-পুরুষভেদ-জ্ঞান প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া যে মনে করিতে হইবে, তাহারা ভগবানের প্রিয় বা ভগবানের ভক্ত, তাহা নহে। যাহাকে এখন এক বৎসর বয়স্ক শিশু বা পঞ্চ বৎসরের বালক দেখিতেছি, সেই বালকই হয় ত' দশ বৎসর পরে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান ও ব্যভিচারে প্রমত্ত হইবে। ইহা প্রত্যক্ষ শতসহস্র দৃষ্টান্তেও দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং শিশুর অজ্ঞাত, অযোগ্যতা এবং

অপরিণতি নিবন্ধন অসদ্‌বৃত্তির সাময়িক স্তব্ধভাবগুলিই সনাতন সত্যের সনাতন শ্রেয়ের আদর্শ হইতে পারে না। বৈষ্ণবের চরিত্রে যে-সকল মহাগুণের কথা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, তাহা ঐরূপ অপরিণত অজ্ঞতা বা সাময়িক স্তব্ধভাবের সাময়িক ও অনিত্য বিকাশ নহে; তাহা নিত্য, চিরন্তন আত্মায়—চেতনে নিত্যকাল সম্প্রকাশ্যমানা বৃত্তি।

যাঁহার অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণ-চরণে অপ্রাকৃত আত্মার—চেতনের স্বাভাবিকী, অপ্রতিহতা, অহৈতুকী বৃত্তি উদিত হইয়াছে, তাঁহার অতি আনুষঙ্গিক-ভাবেই স্বতঃসিদ্ধ অনুগামী কিঙ্কররূপে সরলতা, অকপটতা, অক্রূরতা, কমনীয়তা প্রভৃতি গুণ সম্প্রকাশিত হইবে। তাঁহাকে আর পৃথক্ করিয়া প্রাকৃত বালকগণের প্রাকৃত স্তব্ধভাব, অজ্ঞতা, অযোগ্যতা, অপরিণত দুষ্ট ভাবগুলিকে আদর্শ করিয়া 'সাধুতা' অভ্যাস করিতে হইবে না—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথে নাসতি ধাবতো বহিঃ।। (শ্রীমদ্ভাগবত)

শ্রীকৃষ্ণে যাঁহার অহৈতুকী কেবলাভক্তি বর্ত্তমান, অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের সহিত নিখিল সদ্‌গুণরাজি তাঁহাতে অবস্থিত। যিনি হরিভক্তিবিহীন, তাঁহার মন সর্ব্বদা অসদ্ বহির্বিষয়ে ধাবিত হয়। তাঁহার পক্ষে মহদ্‌গুণ সকল অসম্ভব।

কাজেই আমরা ঐরূপ 'বালকভাব' ইত্যাদির আদর্শকে আদর করিতে পারি না। ঐ সকল আদর্শ প্রাকৃত পাপপুণ্যের অনুভূতিতে পরিতপ্ত ব্যক্তিগণের নিকট সাধুতার স্বপ্নপুরী রচনা করিতে পারে, কিন্তু তাহা প্রাকৃত এবং 'ভগবদ্ভক্তি'র পথ হইতে ভ্রষ্ট আরোহ-পথ-মাত্র।

অনেক সময়ে বৈষ্ণবব্রুব, ভক্তব্রুব প্রাকৃত-সহজিয়া সম্প্রদায় ঐরূপ বালক-ভাবের অভিনন্দন করিয়া থাকেন। কোন কোন পলিতকেশ বৃদ্ধ পর্য্যন্ত আসক্তি ও মোহে আচ্ছন্ন হইয়া নিজের পৌত্র,—প্রপৌত্র—দৌহিত্র প্রভৃতিকে ক্রোড়ে স্থাপন, স্কন্ধে স্থাপন করিতে করিতে ও নিজের ভক্ত প্রতিষ্ঠা-সংরক্ষণ করিবার জন্য বলেন—"এই বালকেরা 'গৌরাঙ্গের দল', 'কানাই-বলাইর দল', এইজন্যই ইহাদিগকে লইয়া সর্ব্বদা থাকি।" আবার কেহ কেহ নিজ পুত্র, পৌত্র, দুহিতা বা দৌহিত্রীর গুণপনা জাহির এবং তৎসঙ্গে নিজের ভক্তপ্রতিষ্ঠা প্রচারের জন্য তাহাদের দ্বারা কীর্ত্তন গান করাইয়া সকলকে শুনাইয়া থাকেন ও লোক-মুখ হইতে প্রশংসা কুড়াইয়া কর্ণের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করেন। কেহ কেহ বলেন, "অজ্ঞান ছেলে-পিলেরা কৃষ্ণের সঙ্গে কথা বলে; সুতরাং তাহাদের সঙ্গ করিলে কৃষ্ণের সঙ্গই করা হয়। ইহাদিগকে ছাড়িয়া বাহিরের সাধু-সন্ন্যাসী খুঁজিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। ইহাদের সেবা করিলেই কৃষ্ণের সেবা—গোপালের সেবা—কৃষ্ণভক্তের সেবা হয়, ইহাদিগকে প্রতিপালন করিলেই ভগবানের সেবা হয়।"

আমাদের এমনই দুর্দ্দৈব—বহুরূপিণী মায়ার এমনই মোহিনী শক্তি যে, আমরা কতরূপে আত্মবঞ্চনা করিতে শিখিয়াছি—কতভাবে কৃষ্ণসূর্য্যের কৃপালোক-প্রবেশের ছিদ্রগুলিকে পর্য্যন্ত বদ্ধ করিতে যত্নবান্

হইয়াছি! অহো! এ যুগে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী অবতীর্ণ না হইলে এ সকল কপটতা—এরূপ শত-শত বহুরূপী আত্মবঞ্চনার স্বরূপ আজ কে ধরাইয়া দিতেন? জগতের গণগড্ডলিকা, আর গণ-গড্ডলিকায় প্রমত্ত নায়কগণ সকলেই ত' সেই বহুরূপিণী অনাদি-বহির্ম্মুখতার এক ধূয়া গানই ধরিয়াছে, কিন্তু সেই ধূয়া গানে বিপ্লব আনিয়াছেন কে? স্রোত ফিরাইয়াছেন কে? বিশ্ব-প্রগতির প্রতিকূলে অভিযান আনিয়াছেন কে? জন্ম-বধিরগণের কর্ণের নিকট অবিচিন্ত্যশক্তি বৈকুণ্ঠদুন্দুভিনিনাদ করিতেছেন কে?—গৌরশক্তি শ্রীচৈতন্য-বাণী—মদাচার্য্য শ্রীজগদ্গুরু।

শ্রীশুকদেব বা বালখিল্যমুনিবৃন্দের স্বাভাবিক চেতনময়ী অবস্থাকে কৃত্রিমভাবে জড়ের মধ্যে অনুকরণ করিলে হিতে বিপরীত হইবে। তাঁহারা নির্গ্রন্থ, আত্মারাম, প্রাকৃত পাপ-পুণ্য—সুখ-দুঃখ-চিন্তা হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। কৃত্রিমভাবে যদি কেহ তাঁহাদের ন্যায় উলঙ্গ থাকিবার চেষ্টা করে, তাঁহাদের অগম্য ক্রিয়ামুদ্রার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহারা ঐসকল নিত্য স্বভাবসিদ্ধ—মহামুক্ত পুরুষগণের প্রতি বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া নিজের মঙ্গলপথে কণ্টকক্ষেপ করিবে মাত্র। এইরূপ অবৈধ অনুকরণ-বিদ্যা অভ্যাস করিতে গিয়া কলিকালে অনেকগুলি পাষণ্ড সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। তাহারা বহুরূপে ঐরূপ তথাকথিত বালকভাবের কুমত প্রকাশ করিয়া অজ্ঞ গণগড্ডলিকাকে বিপথ-চালিত করিয়াছে ও করিতেছে। কেহ কেহ ঐরূপ বালকভাব প্রভৃতি কৃত্রিম মুদ্রা-প্রদর্শনপূর্ব্বক বহির্ম্মুখ গণগড্ডলিকার দ্বারা 'হংস', 'পরমহংস' প্রভৃতি নামে পরিচয় লাভ করিয়া বংশদণ্ডের শীর্ষে উত্তোলিত হইতেছে। যাঁহারা সত্য-সত্য মঙ্গল চাহেন, তাঁহারা ঐসকল বুজরুকী দেখিয়া প্রতারিত হইবেন না। তাঁহারা গণমত দেখিবেন না—বুজরুকীর মোহে পড়িবেন না—অনুকরণের বিবর্ত্তে ভ্রান্ত হইবেন না; তাঁহারা বিচার করিবেন—অকপট ভগবদ্ভক্তের চরিত্র দেখিবেন—কৃত্রিমতাকে সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিবেন। কৃত্রিমতা কখনও সত্য নহে, ইহা হৃদয়ে সুদৃঢ়ভাবে সর্ব্বক্ষণ জ্বলন্ত অক্ষরে অঙ্কিত রাখিবেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের পদাঙ্কানুসরণ-কারিগণ বিন্দুমাত্রও কৃত্রিমতার প্রশ্রয় দেন না। ভক্তি—স্বাভাবিক বস্তু, সত্য—অকৃত্রিম। সত্য—আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত; দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মে সত্যের আভাসও নাই।

অর্চ্চন

'অর্চ্চন'-সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রসঙ্গ 'গৌড়ীয়'-স্তম্ভে বিভিন্ন সময়ে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। যাহারা কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্গুরুর পাদপদ্মাশ্রয় করে নাই বা যাহারা সদ্গুরুর আশ্রয়ের অভিনয় করিয়াও দুর্দ্দৈবফলে প্রকৃত বিষয়টীতে প্রবেশ করিতে অসমর্থ, তাহারা 'অর্চ্চন'-সম্বন্ধে প্রায়ই ভুল করিয়া থাকে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে শ্রৌত-প্রণালীর অনুসরণে সেই সকল বিষয়ই প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করিব।

সাধক মাত্রকেই অভিধেয়-যাজন-মুখে 'শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ'-রূপভজন ও অর্চ্চন-এই দুইটীর একটি গ্রহণ করিতেই হইবে। শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাত্মক ভজন এবং 'অর্চ্চন'—এই দুইটীর একটী বলিতে কেহ
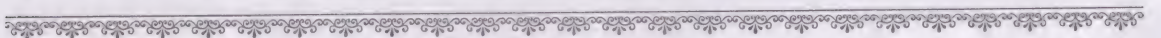
যেন ভুলক্রমে না বুঝেন যে, 'শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণে'র সর্ব্বাংশ বাদ দিয়াও 'অর্চ্চন' নামক একটি পথ গ্রহণ করা যাইতে পারে। যে 'অর্চ্চন' শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণের দ্বারা নিয়মিত নহে, যে অর্চ্চনের ফল শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণরূপভজন-প্রবৃত্তি নহে, সেই 'অর্চ্চন' অসম্পূর্ণ।

যাহারা অত্যন্ত ''মমাহমিতিধীঃ'' অর্থাৎ প্রাকৃত বিষয়ে 'আমি', 'আমার' বুদ্ধিবিশিষ্ট, ধন-পুত্রাদিতে অভিনিবিষ্ট, যাহারা স্থূলবুদ্ধি, যাহারা অনিয়মিত, যাহাদের চিত্ত সর্ব্বদা বহির্বিষয়ে প্রক্ষিপ্ত, যাহারা অত্যন্ত আসক্ত, 'বিষ্ণুর অর্চ্চন' তাহাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক—তাহাদের অর্চ্চন করিতেই হইবে—অর্চ্চন না করিলে তাহাদের 'নরকপাতঃ শ্রূয়তে'। 'অর্চ্চন'-ব্যাপারটা নিয়মন (regulation)। ভোগীর—বিলাসীর—গৃহসুখান্বেষী ব্যক্তির মাঘমাসের—শীতকালের ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে শয্যায় আলস্য করিয়া শুইয়া থাকিবার উপায় নাই, তাহাকে সেই সময় উঠিতেই হইবে, উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া, পবিত্র হইয়া, সংযত হইয়া 'ভগবৎপ্রবোধন' করিতেই হইবে—মন্দির-সংস্কারাদি করিতেই হইবে। দারুণ গ্রীষ্মকালে গৃহ-দেহাসক্ত সুখপ্রিয় ধনীর বৈদ্যুতিক বীজন-যন্ত্রের তলে বসিয়া তাম্রকুটপানসুখোপভোগ বা দার্জ্জিলিং-সিম্‌লা-শৈলে ভোগোপকরণসহ ভ্রমণ না করিয়া শ্রীবিগ্রহকে ব্যজন, মলয়জ চন্দন-সংঘর্ষণ পূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহের শ্রীঅঙ্গে লেপন ও শ্রীবিগ্রহের সৌখ্যবিধানের জন্য সর্ব্বদা তৎপর থাকিতে হইবে।

নিষিদ্ধ নৈবেদ্য-পরিত্যাগ, চাতুর্ম্মস্য ব্রতপালন, বিভিন্ন মাসের কৃত্য ও বিভিন্ন উৎসবাদির অনুষ্ঠানপর অর্চ্চনপ্রণালী দ্বারা আসক্ত ব্যক্তি ও গৃহস্থ অভিমানকারী যে কেবল একাকীই নিয়মিত (regulated) হন, তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সহযোগী বা সহধর্ম্মিনী-পুত্র-পরিবার—সকলকেই ভগবৎ-পূজার্থ নিয়মিত হইতে হয়। অর্চ্চনকারী গৃহস্থের অষ্টম বর্ষের পুত্রেরও একাদশীতে অন্ন এবং কখনও অনিবেদিত বস্তু গ্রহণের উপায় নাই, অর্চ্চনকারী ধনীর পুত্রেরও বহু অর্থ-ব্যয়ে অমেধ্য ক্রয় করিয়া ভোগ করিবার উপায় নাই। কারণ, বৈষ্ণব-গুরুপাদপদ্মে দীক্ষিত গৃহস্থ তাঁহার পুত্রকে সর্ব্বদা ভগবৎ-সেবার অনুকূল বিষয়েই শিক্ষাদান এবং অনুকূল হইলেই কৃষ্ণসেবা-সম্বন্ধে তাঁহাদের সম্পর্ক স্বীকার করেন।

সাধারণতঃ অর্চ্চন-ব্যাপারটি খুব প্রাথমিক ভক্ত্যনুকূল চেষ্টা। অর্চ্চন—কর্ম্ম ও ভক্তির তটরেখা (borderingline); 'অর্চ্চন'কে একটুকু ভুলভাবে বুঝিলেই কর্ম্মরাজ্যের সীমানায় পতিত হইতে হয়—অর্চ্চনে অত্যাগ্রহী, অতিবাড়ী, অত্যভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িলেই কর্ম্মী হইয়া যাইতে হয়—সেবোন্মুখতা কমিয়া যায়। আর অর্চ্চন সুষ্ঠুভাবে সাধিত হইলে ভক্তি বা কীর্ত্তনময় হইয়া পড়ে।

অর্চ্চন অনেক বাধা আছে, অর্চ্চন—'সাপেক্ষ'-ধর্ম্মযুক্ত; শ্রবণ-কীর্ত্তন- স্মরণের ন্যায় 'নিরপেক্ষ' নহে। অর্চ্চনে 'ভূতশুদ্ধি' আবশ্যক, ন্যাসাদি আবশ্যক। অর্চ্চন 'সদা' হয় না; কিন্তু শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ 'সদা' সাধিত হয়। অর্চ্চনে—নিজ-স্বার্থ, শ্রবণ-কীর্ত্তনে—স্বার্থ ও পরার্থ যুগপৎ সাধিত হয়।

'অর্চ্চন' কেবল ক্রিয়াযোগ-মিশ্রিত ধ্যান পরিণতি হওয়ায় '**অর্পণ**' মাত্র,সাক্ষাৎ অনুশীলন নহে; কিন্তু শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ—**সাক্ষাৎ অনুশীলন**—শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণে কৃষ্ণের সহিত—অধোক্ষজ বস্তুর সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শ আছে।

'অর্চ্চন'কে প্রাথমিক অনুশীলন মনে করিয়া আবার যদি কোনও কোনও অকালপক্ক ভোগি-বিলাসি-বিষয়ী বা তথাকথিত 'ত্যাগী' ব্যক্তি অর্চ্চনের প্রতি উদাসীন হইয়া 'ভজনে'র অভিনয় দেখায়, তাহা হইলেও তাহার ভীষণ বিপদের সম্ভাবনা।

শ্রীমদ্ভাগবত (ভাঃ ৭।১৫।৩৮, ৩৯) বলিতেছেন,—

গৃহস্থস্য ক্রিয়াত্যাগো ব্রতত্যাগো বটোরপি।
তপস্বিনো গ্রামসেবা ভিক্ষোরিন্দ্রিয়লোলতা।।
আশ্রমাপসদা হ্যেতে খল্বাশ্রমবিড়ম্বনাঃ।
দেবমায়াবিমূঢ়াংস্তানুপেক্ষেতানুকম্পয়া।।

গৃহস্থ ব্যক্তির সর্ব্বোত্তম মঙ্গলময়ী ক্রিয়া-ত্যাগ অর্থাৎ অর্চ্চন-পরিত্যাগ, ব্রহ্মচারীর গুরুকুলবাসাদি ব্রত-ত্যাগ, বানপ্রস্থের পুনরায় গ্রামে বাস এবং সন্ন্যাসীর ইন্দ্রিয়লালসা—এই সকল আশ্রম-বিড়ম্বনা-মাত্র। ঐ সকল ব্যক্তি নিকৃষ্টাশ্রমী। অতএব উহারা ভগবন্মায়াবিমূঢ় জানিয়া উপেক্ষণীয় অর্থাৎ উহাদিগের অনুবর্ত্তন করিতে হইবে না, উহাদিগকে উপেক্ষা-দ্বারা কৃপা করিতে হইবে।

ইহার দ্বারা গৃহস্থের অর্চ্চন-ত্যাগকে, ব্রহ্মচারীর গুরুকুলেবাসাদিপূর্ব্বক বেদান্তভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত-পঠনে আচার্য্য-চরণার্চ্চন প্রভৃতি ব্রত-পরিত্যাগকে সন্ন্যাসীর **'বান্তাশী'** হওয়ার সহিত সমান প্রতিপাদন করিলেন। শ্রীধরস্বামিপাদও টীকায় তাহাই উদ্দেশ করিতেছেন,—

"যতিমুপলক্ষণীকৃত্যান্যানপি স্বধর্ম্মত্যাগিনো নিন্দতি গৃহস্থস্যেতি দ্বাভ্যাম্"।

শ্রী শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর ভাগবত ৭।৫।২৩ শ্লোকের 'ক্রমসন্দর্ভ' 'গৌড়ীয়'-স্তম্ভে অনেকবারেই আলোচিত হইয়াছে, তাহাও সেই একই কথা বলিতেছেন,—

যেহেতু সম্পত্তিমন্তো গৃহস্থাস্তেষাং ত্বর্চ্চনমার্গ এব মুখ্যঃ। তদকৃত্বা হি নিষ্কিঞ্চনবৎ কেবলস্মরণাদি নিষ্ঠত্বে বিত্তশাঠ্য প্রতিপত্তিঃ স্যাৎ। পরদ্বারা সম্পাদনং—ব্যবহারনিষ্ঠত্বস্যালস্য বা প্রতিপাদকম্। ততোঽশ্রদ্ধাময়ত্বাদ্ধীনমেব তৎ। তথা গার্হস্থ্য ধর্ম্মস্য দেবতাযাগরূপস্য শাখাপল্লবাদিসেক স্থানীরস্য মূলসেকরূপং তদর্চ্চনমিত্যপি তদকরণে মহান্ দোষঃ। দীক্ষিতানাং চ সর্ব্বেষাং তদকরণে নরকপাতঃ শ্রূয়তে। ননু ভগবান্নামাত্মকা এব মন্ত্রাঃ তত্র বিশেষণ নমঃ শব্দাদ্যলঙ্কৃতাঃ। শ্রীভগবতা শ্রীমদৃষিভিশ্চাহিতশক্তিবিশেষাঃ শ্রীভগবতা সমমাত্মসম্বন্ধবিশেষ প্রতিপাদকাশ্চ। তত্র কেবলানি ভগবন্নামান্যপি নিরপেক্ষাণ্যেব পরম-পুরুষার্থফলপর্য্যন্তদান-সমর্থানি। ততো নামসু মন্ত্রতোঽপ্যধিক সামর্থ্যে লব্ধে কথং দীক্ষাদ্যপেক্ষা উচ্যতে। যদ্যপি স্বরূপতো নাস্তি তথাপি প্রায় স্বভাবতো দেহাদি সম্বন্ধেন কদর্য্যশীলানাং বিক্ষিপ্তচিত্তানাং জনানাং তৎসঙ্কোচীকরণায় শ্রীমদৃষি প্রভৃতিভিরত্রার্চ্চনমার্গে ক্বচিৎ ক্বচিৎ কাচিন্মর্য্যাদা স্থাপিতাস্তি।। (ভাঃ ৭।৫।২৩ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভটীকা)

যাঁহারা সম্পত্তিশালী গৃহস্থ, তাহাদের অর্চ্চনমার্গই প্রশস্ত। তাহা না করিয়া নিষ্কিঞ্চনের ন্যায় কেবল স্মরণাদিতে নিষ্ঠাবান্ হইলে বিত্তশাঠ্য বা অর্থকার্পণ্য প্রতিপাদিত হয়। অর্চ্চনাদি কার্য্য অপরের দ্বারা সম্পাদন—ব্যবহারিকনিষ্ঠা অথবা আলস্যের পরিচায়ক। অতএব শ্রদ্ধারাহিত্যহেতু তাদৃশ কার্য্য 'হীন' বলিয়া পরিগণিত। এই স্থলে দেবযজনরূপ যে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, তাহা মূল ত্যাগ করিয়া বৃক্ষের শাখা-পল্লবাদিতে জল-সেচনের ন্যায়; আর ভগবৎ পূজা—মূলে জল-সেচনরূপ। সুতরাং শ্রীভগবানের পূজা না করিলে মহান্ দোষ হইয়া থাকে। দীক্ষিত ব্যক্তি সকল ভগবৎ-পূজা না করিলে তাঁহাদিগকে নরকগামী হইতে হয়; শাস্ত্রে ইহা শুনা যায়। এই স্থলে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, মন্ত্র-সকল নিশ্চয়ই ভগবন্নামাত্মক। নাম হইতে মন্ত্রের বিশেষত্ব এই যে, মন্ত্র 'নমঃ' শব্দাদি-দ্বারা অলঙ্কৃত ভগবন্নাম। ঐ মন্ত্র-সমূহ শ্রীভগবান্ ও মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক কোন বিশেষ শক্তিতে আহিত এবং ভগবানের সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ-বিশেষের প্রতিপাদক। অতএব কেবল ভগবন্নামই যখন নিরপেক্ষভাবে পরম পুরুষার্থ পর্য্যন্ত প্রদান করিতে সমর্থ, তখন ঐরূপ বিশেষ শক্তিসমন্বিত ভগবন্নামাত্মক মন্ত্র যে কেবল নাম হইতে অশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ অনধিক শক্তি-সম্পন্ন, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং শাস্ত্রে আবার দীক্ষাদির অপেক্ষা কি জন্য কথিত হইল? তদুত্তরে বলিতেছেন, যদিও দীক্ষাদির অপেক্ষা স্বরূপতঃ নাই, তথাপি প্রায় স্বভাবতঃ দেহে আত্মবুদ্ধিহেতু অসদাচারে রত, বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তিগণের ঐ সকল বৃত্তি খর্ব্ব করিবার জন্য ঋষিগণ ঐরূপ অর্চ্চনমার্গে কোন কোন স্থলে অর্চ্চনের মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন।

শুদ্ধজীবাত্মা যে-কালে মনোময় ও স্থূল কোষকে অভিন্ন আত্মা বলিয়া বিবর্ত্ত-গর্ত্তে পাতিত করে এবং উৎক্রান্তাভিযান যে-কালে শ্রবণ-ফলে বরণীয় হয়, সেই কালের আনুষ্ঠানিক কৃত্যগুলি কর্ম্মমিশ্রাভক্তি বলিয়া অর্চ্চনাধিকারের প্রয়োজনীয়তা। এই অর্চ্চনাধিকার ক্রমশঃ ভজনোন্মুখতার উৎকর্ষ-দর্শন-লাভে যোগ্যতা পাইলেই কেবল অর্চ্চন ও ভজনের পার্থক্য দেখিতে সমর্থ হয়। অর্চ্চন- পরিপাকেই ভজন-যোগ্যতার কথা ক্রমশঃ আলোচিত হইতেছে।

বর্ত্তমানে এক শ্রেণীর ব্যক্তি অন্যান্য জাগতিক বিষয়ে অভিনিবিষ্ট—স্ত্রী-পুত্র-ধনাদিতে আসক্ত হইয়া আলস্য-ক্রমে সদ্গুরুর নিকট অভিগমনের অভাব-হেতু অর্চ্চন পরিত্যাগ করিয়াছে, আবার তদ্রূপ একশ্রেণীর অকালপক্ক কৃত্রিম ভজনকারী 'অর্চ্চন' ও 'ভজন' উভয়েরই অসদ্ব্যবহার করিতেছে। শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে আবার বিভিন্ন বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়। ইহাদের কেহ কেহ আত্মোদর ও ভোগসহচর আত্মীয়-স্বজনের পরিপালনের জন্য মাঘ মাসের শৈত্যাধিক্য স্বীকার করিয়াও গঙ্গার ঘাটে, তীর্থক্ষেত্রে অর্চ্চন-অভিনয়ের রঙ্গমঞ্চ খুলিয়া বসিয়াছে; কেহ কেহ আবার অর্চ্চন-মার্গের অধিকার হইতে নিজ উচ্চতর অধিকার সমপ্রমাণিত করিবার জন্য এবং অর্চ্চন অভিনয় মঞ্চের বাহুল্য-নিবন্ধন তাহাতে অর্থ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা অল্প বিবেচনা-পূর্ব্বক কপট ভজন-পরায়ণের বেশে গোপনে পরযোষিৎ-সঙ্গে প্রমত্ত থাকিয়া সেই মাঘমাসের শেষ রাত্রে দ্বারে দ্বারে পর্য্যটন করিতে করিতে ''রাই জাগ, রাই জাগ'' প্রভৃতি গানের ধুয়া ধরিয়া অকালপক্ক

বহুরূপী বা বঞ্চকবেষোপজীবী হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বাহ্যে পরমহংসের বেষ, কৌপীন, বহির্ব্বাস প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়াও গৃহব্রত, প্রাকৃত-সহজিয়া অসদ্‌গুরুর শিক্ষা-দীক্ষার অনুকরণে ঘন্টা বাজাইতেছে, ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিতেছে, অথচ কৃত্রিম-ভাবে অনুরাগ-মার্গের পথিক বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য সহস্রমুখে সমুৎকণ্ঠিত রহিয়াছে! এই সকল ব্যক্তির না হইবে অর্চ্চন-পথে ক্রমমঙ্গল, না হইবে কোন কালে ভজন-পথে প্রবেশাধিকার। কারণ, ইহারা উভয় প্রকার মঙ্গলের পথকেই বিকৃতভাবে ও কপটতার সহিত ভোগ করিবার জন্য উদ্যত।

সদ্‌গুরু-পাদপদ্ম কখনও 'অর্চ্চনে'র প্রতি তত্তদধিকারীকে বিরূপগ্রস্ত বা তাঁহাদিগকে বিকৃত অর্চ্চন-শিক্ষা প্রদান করেন না। কারণ 'অর্চ্চন' ব্যতীত অনুর্থযুক্ত সাধকের মঙ্গলের উপায় নাই। 'অর্চ্চন' ব্যতীত সদাচার প্রতিষ্ঠিত ও রক্ষিত হইতে পারে না। 'অর্চ্চন' ব্যতীত সৎকর্ম্ম ও অসৎকর্ম্ম-প্রবৃত্তিরূপ অনর্থের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া ভক্তির অনুকূল পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। 'অর্চ্চনের' নিত্যতা স্বীকার না করিলে, পরমেশ্বরের অপ্রাকৃত সবিশেষত্বের বিরুদ্ধবাদী, নির্ব্বিশেষবাদী বা অদৈব অসৎ সাম্প্রদায়িক হইতে হয়। 'কর্ম্মি-জ্ঞানি-সম্প্রদায় 'অর্চ্চনে'র নিত্যত্ব স্বীকার না করায় তাহারা ভগবদ্‌বিরোধী নাস্তিক।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাদিগের সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৬৭, ১৬৮),—

শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত' পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য, সেই হয় যমদণ্ড্য।।
বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয় নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক।।

এখানে শ্রীবিগ্রহ-শব্দে কেবল অর্চ্চাকে লক্ষ্য করা হয় নাই; যেহেতু অর্চ্চা, অন্তর্যামী, বৈভব, ব্যূহ ও পর—নিত্য বাস্তব বস্তু হইতে অভিন্ন; দর্শনে প্রকাশ-ভেদ মাত্র।

কর্ম্মি-জ্ঞানীর অর্চ্চনাভিনয়—পঞ্চোপাসকের অর্চ্চনাভিনয় অর্চ্চনবিরোধ মাত্র। সেইরূপ কোনও আনুষ্ঠানিক কর্ম্ম মাত্র আমাদের আলোচ্য নহে। 'অর্চ্চন' অন্যাভিলাষ কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-ব্রত-তপাদি অসচ্চেষ্টারূপ অনর্থময় বৃত্তি হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া থাকে। অর্চ্চক হরিপ্রীতির জন্য নানা উপকরণাদি সংগ্রহ করিতে করিতে নিজ ভোগবাসনারূপ অন্যাভিলাষ হইতে ক্রমে ক্রমে মুক্ত হন, সকল ক্রিয়া বিষ্ণুর পূজার জন্য নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করায় এবং সকল ব্যাপারই বিষ্ণুর পূজায় 'অর্পণ' করিতে আরম্ভ করায় কর্ম্মচেষ্টা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। অর্চ্চক শ্রীবিগ্রহের নিত্যত্ব, শ্রীবিগ্রহসেবার নিত্যত্ব, এবং শ্রীবিগ্রহ-সেবকের আত্ম-স্বরূপের উপলব্ধি-ক্রমে নির্ব্বেদজ্ঞানাদি চেষ্টারূপ পরমদুষ্কৃতির হস্ত হইতে রক্ষিত হন। অর্চ্চকের সকল ব্যাপার বিষ্ণু-পূজার ধ্যানপর, ব্রতপর তপঃপর হওয়ায় অর্চ্চক অষ্টাঙ্গযোগাদি নাস্তিকতাময় শারীর তপ-ব্রতাদি চেষ্টা হইতে পরিমুক্ত হন।

শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু 'অর্চ্চনে'র সংজ্ঞা এইরূপ প্রদান করিয়াছেন—

শুদ্ধিন্যাসাদি-পূর্ব্বাঙ্গ কর্ম্মনির্ব্বাহপূর্ব্বকম্।
অর্চ্চনন্তূপচারাণাং স্যান্মন্ত্রেণোপপাদনম্।।

(ভঃ রঃ সিঃ ২য় লঃ। ৫৯ সংখ্যা)

স্থান-কাল-পাত্রশুদ্ধি, অঙ্গ-ন্যাস, করন্যাসাদি অর্চ্চনের পূর্ব্ব অঙ্গ-সমূহ নির্ব্বাহ-পূর্ব্বক মন্ত্রের দ্বারা দ্রব্য-সমূহের অর্পণ 'অর্চ্চন'-পদবাচ্য।

এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীল রূপপাদ শাস্ত্র-বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন,—

স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসাং রসায়াং ভুবি সম্পদাম্।
সর্ব্বাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চ্চনম্।। (ভাঃ ১০।৮১।১৯)
শ্রীবিষ্ণোরর্চ্চনং যে তু প্রকুর্ব্বন্তি নরা ভুবি।
তে যান্তি শাশ্বতং বিষ্ণোরানন্দং পরমং পদম্।। (শ্রীবিষ্ণুরহস্যে)

সুতরাং শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণব বা গুরু কখনই অধিকারবিপর্য্যয় করাইবার জন্য অর্চ্চনের বিরুদ্ধবাদী হন না। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে ভগবান্ শ্রীগৌর- সুন্দর শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে গমন-লীলা প্রদর্শন করিতেন না, শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু শ্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহ-অর্চ্চা, শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীরাধা-মদনমোহন-শ্রীবিগ্রহ-অর্চ্চা, শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু শ্রীরাধাদামোদর-শ্রীবিগ্রহ-প্রতিমা প্রভৃতি প্রকাশ করিতেন না। তাঁহারা অর্চ্চনাধিকারী বা সাধকমাত্র ছিলেন না, তাঁহাদের অর্চ্চনাভিনয়—সাক্ষাৎ সেবা, সাক্ষাৎ কৃষ্ণানুশীলন, ভাবসেবা। যাহারা গোখরের অর্চ্চনচেষ্টা, ধনমদমত্ত বৈষ্ণবপ্রায়ের অর্চ্চন-চেষ্টা প্রভৃতি অনর্থযুক্ত চেষ্টার সহিত্ নিত্যসিদ্ধ মহাজনগণের অর্চ্চনাদর্শকে সমপর্য্যায়ে দর্শন করিবে, তাহারা বঞ্চিত হইবে—তাহারা মঙ্গলের হস্ত হইতে চিরতরে ভ্রষ্ট হইবে।

অর্চ্চনের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া অনেকে আবার অর্চ্চনকে 'ভোগ' ও 'গৃহব্রত-ধর্ম্মে'র পরিপাক এবং পরিবর্দ্ধনের যন্ত্র করিয়া তুলিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের কোনও কোনও নগরীতে দেখা যায়, প্রাকৃত-সহজিয়া, গৃহব্রত গুরুব্রুবের প্রত্যেক গৃহমেধি-শিষ্য-সম্প্রদায়ের গৃহ-মাত্রেই বিষ্ণু বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। কিন্তু ঠাকুরের সহিত অধিকাংশ স্থলেই গৃহস্বামী বা গৃহের কোনও পুরুষমূর্ত্তিধারীর কোনও সম্বন্ধই নাই, স্ত্রীমূর্ত্তিধারিগণই সংসারের সমস্ত কার্য্য পূর্ণ মাত্রায় সাধন করিবার পর ঠাকুরকে কোনও রূপে দুই বেলা শুষ্ক দ্রব্যাদি প্রদান করিয়া থাকেন; কোন কোনও সম্পত্তিমান ব্যক্তির বাড়ীর ঠাকুর ভাড়াটিয়া দেবল বর্ণব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণব্রুবের হস্তে চাল-কলা প্রাপ্ত হন মাত্র। শ্রীশাল গ্রাম কোনও অবরকুলোদ্ভূত দীক্ষিত (?) ব্যক্তির বাড়ীতে নাই, কোথায়ও ঠাকুরকে পক্কান্ন প্রদত্ত হইতে পারে না। 'অর্চ্চন'-ব্যাপারটা "লোকসংগ্রহার্থ", গৃহব্রতধর্ম্মের মঙ্গল বা পরিপুষ্টির জন্য মাত্র। ঐরূপ অর্চ্চনাভিনয় না করিলে সংসারের কি জানি কি অমঙ্গল হইবে, স্ত্রী-পুত্রাদি বিনষ্ট হইবে, এইরূপ ভয়ে একটা অভিনয় প্রদর্শিত হয় মাত্র। যাহারা মন্ত্র-প্রদানের ছলনা করিয়া অর্চ্চনাভিনয়ের উপদেশ দিয়াছেন, সেই সকল ব্যক্তি তাঁহাদের শিষ্য-সম্প্রদায়ের ঠাকুরকে 'শূদ্রের ঠাকুর

সুতরাং শূদ্রবৎ' জানিয়া কখনও ঠাকুরকে দণ্ডবৎ প্রণাম পর্য্যন্ত করেন না, ঠাকুরের প্রতি নিবেদিত প্রসাদান্ন গ্রহণ করা ত' দূরের কথা। এইরূপ অর্চ্চন-ব্যভিচার কখনও 'অর্চ্চন'-পদবাচ্য নহে।

'অর্চ্চন' ভোগ সাধক যন্ত্রবিশেষ নহে। কোন কোনও গুরুব্রুব, ব্রাহ্মণব্রুব, প্রাকৃত-সাহজিক সম্পত্তিমান ব্যক্তি অর্চ্চনের নাম করিয়া—ঠাকুর-সেবা ও ঠাকুরের ভোগ্য দ্রব্যের নাম করিয়া চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়াদি অর্থাৎ অন্যান্য ইন্দ্রিয়জিত হইলেও যে একমাত্র ইন্দ্রিয়কে জয় করা যায় না, সেই জিহ্বেন্দ্রিয়ের বিষয় ভোগ করিবার একটী সুগম পথ আবিষ্কার করিয়া থাকে। ইহাও 'অর্চ্চন'-পদবাচ্য নহে।

অর্চ্চনের উদ্দেশ্য নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ নহে, অর্চ্চনের ফল—বৈষ্ণব-সেবা-প্রবৃত্তির উদয়। ঠাকুরের উৎকৃষ্ট নৈবেদ্য অকপট বৈষ্ণবকে প্রদান করিতে হইবে—''আমার স্ত্রী, আমার পুত্রও বৈষ্ণব, আমি স্বয়ংই বৈষ্ণব, আমার বৈবাহিক মহাশয় বৈষ্ণব''—এইরূপ কপটতা করিয়া ভোগের কপটতা কৌশল আবিষ্কার করা 'অর্চ্চন' নহে। গৃহে সত্য সত্য অমল বৈষ্ণব আগমন করিলে বৈষ্ণবকে সকল ছাড়িয়া দিতে হইবে—বৈষ্ণবের অনুমতি গ্রহণ করিয়া অর্চ্চা- মূর্ত্তির পূজা করিতে হইবে—বৈষ্ণবকে জীবন্ত অর্চ্চ্যবিগ্রহ জানিতে হইবে। অকপট বৈষ্ণবের শ্রীমুখে কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে হইবে—তাঁহার কীর্ত্তন—শ্রবণানুশাসিত হইয়া তাঁহার প্রদর্শিত পথে অর্চ্চন করিতে হইবে। বৈষ্ণবকে লঙ্ঘন করিয়া—শ্রীগুরুদেবকে লঙ্ঘন করিয়া অর্চ্চন-চেষ্টা বিড়ম্বনা ও পাষণ্ডতা-মাত্র। আগে শ্রীগুরু-পূজা—বৈষ্ণব-পূজা, তৎপরে বিষ্ণু-পূজা। ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু বলিতেছেন,—

প্রথমন্তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্।
কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ।।

অতএব নারদপঞ্চরাত্রে,—

বৈষ্ণবং জ্ঞানবক্তারং যো বিদ্যাদ্ বিষ্ণুবদ্ গুরূম্।
পূজয়েদ্ বাঙ্মনঃ কায়ৈঃ স শাস্ত্রজ্ঞঃ স বৈষ্ণবঃ।।

শ্রীমদ্ভাগবতে (ভাঃ ৩।২৯।২১-২৭) শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনম্।।
যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ।
দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি।।
অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে।
নৈব তুষ্যেঽর্চ্চিতোঽর্চ্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ।।

অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভুতেষ্ববস্থিতম্।।
আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্।
তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্ব্বিদধে ভয়মুল্বণম্।।
অথ মাং সর্ব্বভুতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্হয়েদ্দানমানাব্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা।।

এখানে শ্রীস্বামিপাদের টীকা আলোচ্য—"চিত্তশুদ্ধিঃ সর্ব্বভুতাত্মদৃষ্ট্যৈব ভবতীতি বক্তুং কেবল-প্রতিমাদিনিষ্ঠাং নিন্দন্নাহ অহমিতি সপ্তভিঃ। অর্চ্চৈব বিড়ম্বনমনুকরণম্। অর্চ্চায়াং পূজাবিড়ম্বনমিতি বা। অবজ্ঞোপেক্ষাদ্বেষনিন্দাঃ ক্রমেণ চতুর্ভির্নিষিধ্যন্তে। তর্হি কিম্ অর্চ্চাদাবর্চ্চনমনর্থকমেব? নেত্যাহ—অর্চ্চাদাবিতি। **সর্ব্বভুতেষ্ব বস্থিতং মাং স্বহৃদি যাবন্ন বেদ**। স্বকর্ম্মকৃৎ কর্ম্মাবিরোধেন। যথাবকাশম্। অনেন কর্ম্মনিষ্ঠায়া অপি স এবাবধিরিত্যুক্তং ভবতি।"

অর্চ্চনের অসদ্ব্যবহার বা অর্চ্চনের ব্যভিচার দেখিয়া অর্চ্চন উঠাইয়া দিবার সঙ্কল্প তত্ত্বজ্ঞানান্ধতা মাত্র। অর্চ্চন সর্ব্বদাই কীর্ত্তনের অধীন হইবে, নতুবা কর্ম্মকাণ্ড হইয়া পড়িবেই। যাঁহারা মধ্যমাধিকারে অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিতেছেন অথচ বাহ্যে গৃহস্থের আশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদেরও বাহ্যে অর্চ্চনের আকার সংরক্ষণ করা আবশ্যক। "আমি অনুক্ষণ কীর্ত্তন-ব্যাপারেই ব্যস্ত, অর্চ্চনের ক্ষণ-মাত্র সময় নাই"—ইহা বলিয়া বাহ্যে গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করিলে, তৎসঙ্গে সঙ্গে বাহ্যে যদি অর্চ্চনের আদর্শ না থাকে, তবে অন্যান্য গৃহস্থগণ ক্রম-মঙ্গল-লাভ করিতে পারিবেন না—তাঁহারাও একেবারে অর্চ্চন পরিত্যাগ করিয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িবেন—কীর্ত্তনের মাহাত্ম্যও বুঝিতে পারিবেন না। সুতরাং অনুক্ষণ কীর্ত্তনকারী গৃহস্থাশ্রমীও অন্তরে পূর্ণভাবে কীর্ত্তন-প্রবৃত্তি সংরক্ষণ করিয়া বাহ্যে অর্চ্চনের আদর্শ প্রদর্শন করিবেন। 'অর্চ্চন' স্বীকার অর্থ—অপ্রাকৃতসবিশেষ ভগবত্তা স্বীকার—ইহা Personality of Godhead স্বীকারের প্রথম সোপান। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অর্চ্চনাধিকারী ছিলেন না—তিনি নিত্যসিদ্ধ গৌরজন, আচার্য্য, অনুক্ষণ অপতিত অকৈতব হরিকীর্ত্তনকারী হইয়াও গৃহস্থাশ্রম-স্বীকারের অভিনয়কালে 'ভক্তিভবনে' ও 'শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে' গিরিধারী শ্রীবিগ্রহের নিত্যপূজা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার হরিকীর্ত্তনের বিজ্ঞানে তাঁহাকে দর্শন করিতে না শিখিলে আবার প্রাকৃত-সহজিয়া গৃহমেধী হইয়া পড়িতে হইবে—আবার অর্চ্চন-ব্যভিচার উপস্থিত হইবে। সুতরাং সাধু সাবধান! হরিভজনের পথ বড় সুসূক্ষ্ম। বিশেষতঃ 'অর্চ্চন'-ব্যাপার সর্ব্বদা অর্চ্চন-গুরুপাদপদ্ম, সদ্গুরুপাদপদ্মের কীর্ত্তনের দ্বারা নিয়মিত না হইলে প্রতি পদেই বিপথগামী হইবার সম্ভবনা। কারণ, 'অর্চ্চন'—কর্ম্ম ও ভক্তির তটরেখা। কর্ম্মমিশ্রা রাজসেবা, কেবলার্চ্চনময়ীভক্তি ভাবসেবাঙ্গ- বিশেষ। এজন্য কীর্ত্তনকে ছাড়িয়া কখনও 'অর্চ্চন' সুষ্ঠু হইতে পারে না। আবার কীর্ত্তন 'শ্রবণ' ব্যতীত সুষ্ঠু হয় না। অর্চ্চনে যে মন্ত্র-ধ্যানের বৈশিষ্ট্য, তাহা স্মরণাভাস মাত্র, কেবল স্মরণ নহে। কেবল ভজনেই স্মরণ সম্ভব।

অন্তর্যামী

পরমার্থ-শাস্ত্রালোচনা-কালে—দর্শনশাস্ত্র-পাঠ-কালে—"অন্তর্যামী" শব্দ বা পরিভাষাটী প্রায়ই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। * বিভিন্ন ভূমিকা হইতে "অন্তর্যামী" শব্দটী বিভিন্নভাবে গৃহীত হয়।

"অন্তর্যামী" শব্দটী একটী সাম্বন্ধিক শব্দ (Relative term)। "বহির্যামী"র প্রতিযোগী বা বিপরীত শব্দ—"অন্তর্যামী"। বহির্যামিত্বের বিচারের সহিত অন্তর্যামিত্বের বিচারের সম্বন্ধ রহিয়াছে। যেখানে বহির্যামিত্বের বিচার হইতে অন্তর্যামিত্বের বিচার আরূঢ় অর্থাৎ আরোহ প্রণালীতে উদ্ভাবিত হইয়াছে বা যেখানে বহির্যামিত্বের সম্বন্ধ, গন্ধ, পারপার্শ্বিকতা অন্তর্যামিত্বে আরোপিত হইয়া মানবে-দেবারোপ বাদ-কল্পনার ন্যায় বিচার-আবাহন করা হইয়াছে, সেখানে আপাত অন্তর্যামিত্বের বিচার বহির্যামিত্ব বা বহিরাবরণের হেয়তা বর্জ্জন করিতে পারে নাই।

পরিদৃশ্যমান বহিরাবরণ বা প্রকৃতি এবং অতীন্দ্রিয় অপ্রাকৃত রাজ্য—এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অন্তর্যামী অবস্থিত—এরূপ কেহ কেহ বিচার করিয়া থাকেন। আবার নির্ব্বিশেষবাদী ও তাঁহাদের সমশীল ব্যক্তিগণ মনে করেন, বিভিন্ন কল্পিত আধারস্থ বস্তুর বহিরাবরণরূপ আধার অপসারিত করিলে যে আধেয়-রূপ অন্তর্যামী পাওয়া যায়, তাহা অন্য কল্পিত আধার বা বহিরাবরণের আধেয় কিংবা অন্তর্যামীর সহিত স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত ব্যাপার। নিরীশ্বর সাংখ্য অন্তর্যামি-নিরূপণে জড়া প্রকৃতির 'অব্যক্ত' নাম বিচার আবাহন করেন। বৌদ্ধ অন্তর্যামি-নিরূপণে 'শূন্য' কল্পনা করেন। বৈশেষিক অন্তর্যামি নিরূপণে পরমাণুর বহির্যামিত্ব বা আধ্যক্ষিকতা-দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পরমাণুর অন্তরে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হন। পতঞ্জলী অন্তর্যামি-নিরূপণে বিলাসহীন পরমাত্মার আংশিক বিকৃত বিচারে মুহ্যমান হইয়া পড়েন। অদৈব মোহনাবতার শ্রীশঙ্করের স্তাবক-সম্প্রদায় ঘটাকাশ-পটাকাশের বহিরাবরণ ভগ্ন করিয়াও প্রচ্ছন্নভাবে প্রকৃতিলয়বাদী ও শূন্যবাদীর মিত্র হইয়া অন্তর্যামীর ত্রিপুটী বিনাশ করিতে চাহেন। অন্তর্যামীকে অন্তরহীন, অন্তর্যামিত্বধর্ম্ম-হীন ও বিগ্রহ-হীন করিবার কল্পনা করেন। এই সকল বিচারের আবহাওয়া আবার যখন স্পিনোজা, সপেলহুয়ার, হেগেল প্রভৃতি বিদেশীয় মনীষিবৃন্দের বহির্ম্মুখতার তন্ত্রীকে বাজাইয়া তোলে, যখন তাঁহারাও "কেশব তুয়া জগৎ বিচিত্র"—এই মহাজন-গীতির সার্থকতা সাধনের জন্য তাঁহাদের মনীষার ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন করেন।

---

* যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য।
পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।
যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো যং।
সর্ব্বানি ভূতানি ন বিদুর্যস্য সর্ব্বানি ভূতানি শরীরং যঃ।
সর্ব্বানি ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।।

(বৃহদারণ্যক ৩য় অধ্যায় ৭ ব্রাহ্মণ ৩য় ও ৫ম মন্ত্র)

পুরুষোত্তম-বিচার প্রভৃতি আস্তিক্য-বিচার সেইরূপ নহে। পুরুষোত্তম-বিচারে যেখানে অমুক্ত অবস্থার কথা, সেখানেই অন্তর্যামিত্বে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য আক্রান্ত হইয়াছে। পুরুষোত্তম-বিচার যখন ব্রহ্মের ক্লীবত্ব-নিরূপণে আবদ্ধ না থাকিয়া চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য দর্শনে লক্ষিত হন, তখনই চিদচিচ্ছক্তি-বিচার নিঃশক্তিক ক্লীব-বিচারকে নির্ম্মমভাবে আঘাত করে, তখনই জড়ের একদেশ দৃষ্টিতে দোদুল্যমান ধর্ম্ম প্রতীয়মান হয়। শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ, তাঁহাদের সেবক ও সিংহাসনাদি বস্তু-সমূহ অন্তর্যামীর ভূমিকায় আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহার প্রতিভূ একদেশদৃষ্টি যখন বহিরাবরণ ধর্ম্ম লইয়া অর্চ্চারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই নৈমিত্তিক বিচার আসিয়া পুরুষোত্তম বিচারে বৈভবস্তরের প্রতীতি করায়। পরে নিমিত্ত বৈভবের অন্তর্যামি-সূত্রে ব্যূহবিচার ও তদন্তর্যামি-সূত্রে পরতত্ত্ব-বিচার পুরুষোত্তম-বিচারের সুষ্ঠুতা উৎপাদন করায়। অর্চ্চার অন্তর্যামী, অন্তর্যামীর বৈভব, বৈভবের ব্যূহ, ব্যূহের পরতত্ত্ব পরস্পর অন্তর্যামীর স্থলাভিষিক্ত হয়। আচার্য্য শ্রীরামানুজ বা তৎসম্প্রদায়ের শ্রীলোকাচার্য্যের এইরূপ বিচার। আচার্য্য শ্রীমধ্বেও অর্চ্চার অন্তর্যামী প্রভৃতি কতকটা বিচার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়।

কিন্তু এইসকল বিচার অপ্রাকৃত তত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রযুক্ত হওয়ায় এখানে বহিরাবরণ প্রকৃতিজাত আবারণ-বিশেষ নহে। অর্চ্চা অর্চ্চ্যের প্রাকৃত বহিরাবরণ নহে। যেখানে অর্চ্চা বহিরাবরণ-মাত্র, তদন্তর্যামী 'অর্চ্চ্য' বস্তুই সেব্য অর্থাৎ যেখানে অর্চ্চা ও অর্চ্চ্যের দেহ ও দেহীতে ভেদ-প্রতীতি, সেখানে প্রতীকোপাসনা, পৌত্তলিকতা বা ব্যুৎপরস্তের তাণ্ডব। সেখানে অন্তর্যামিত্বের মধ্যেও বহির্যামিত্ব- রূপ আধ্যক্ষিকতার Anthropomorphism টানিয়া আনা হইয়াছে।

অর্চ্চা প্রকৃতি-জাত আবরণ নহে, অর্চ্চা উন্মুক্ত বস্তু—আবরণ দ্রষ্টার প্রকৃতি- জাত অক্ষিগোলকে। যেমন চন্দ্রের আপাত দৃশ্য হ্রাস-বৃদ্ধি দেখিয়া অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি হ্রাস-বৃদ্ধি চন্দ্রে আরোপ করে, বস্তুতঃ হ্রাস-বৃদ্ধি চন্দ্রের নহে, দ্রষ্টার দৃষ্টির মধ্যে যে আবরণ আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার; সেইরূপ দ্রষ্টার বহির্যামিত্ব অর্চ্চার সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ-দর্শনের বাধক—অর্চ্চা ও অর্চ্চ্যের অভিন্নত্ব-দর্শনের বাধক। —অর্চ্চা ও অর্চ্চ্যের অভিন্নত্ব-দর্শনের বাধক।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, পুরুষোত্তম-বিচারে যেখানে মুক্ত অবস্থার কথা, সেখানেই অন্তর্যামীকে বিলাস-হীনের অন্তর্যামিরূপে দর্শন; কিন্তু মুক্তাবস্থায় অন্তর্যামিত্বে বিগ্রহ দর্শন, বিগ্রহ-দর্শনে সেবা—চিদ্‌বিলাস। শ্রুতি-মন্ত্রে ইহাই পরিস্ফুট।

দ্বা সুপর্ণা সযুজাসখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ।।

সর্ব্বদা সংযুক্ত, সখ্যভাবাপন্ন দুইটী পক্ষী একটী দেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন মায়াধীন অর্থাৎ 'জীব'; দেহকে দেহিজ্ঞানে নানাবিধ স্বাদযুক্ত সুখ-দুঃখরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। আর একজন মায়াধীশ অর্থাৎ পরমেশ্বর। তিনি সুখ-দুঃখরূপ কর্ম্মফলের ভোক্তা নহেন। জীবের কর্ম্মফল-ভোগের সাক্ষি-স্বরূপে দ্রষ্টা-মাত্র। সমান বৃক্ষে অর্থাৎ একই দেহবৃক্ষে অবস্থিত হইয়া জীব নিজ-যোগ্যতায় মায়ার দ্বারা বিমোহিত হইয়া স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে আত্মবুদ্ধির জন্য শোক করে। যখন জীব নিজ হইতে অন্য সেব্য পরমেশ্বরকে দেখিতে পান, তখন সমস্ত শোক-নির্ম্মুক্ত হইয়া ভগবানের (সেব্যের) নাম-রূপ-গুণ-লীলা ও মহিমার অনুশীলন করেন।

অন্তর্যামীর সহিত সমান বৃক্ষে অবস্থিত হওয়ার দরুণ জীব যদি আপনাকে অন্তর্যামীর ন্যায় ঈশ্বর বা মায়ার প্রভু জ্ঞান করে, তবে তাহার মায়ার কবলে পতিত হইয়া শোক করিতে হয়—সুখ-দুঃখরূপ নানা স্বাদযুক্ত কর্ম্মফলের আস্বাদন করিতে হয়। কিন্তু যখন জীব পরমাত্মার পূর্ণপ্রতীতি ভগবদ্‌বিগ্রহের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত, তদধীন ও তৎ-সেবা-স্বরূপময় বলিয়া আপনাকে জানিতে পারে, তখনই তিনি সমস্ত শোকনির্ম্মুক্ত হইয়া চিদ্‌বিলাস-রাজ্যে অবস্থান করিতে পারেন।

শ্রীগীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেন,—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।।

অন্তর্যামী ঈশ্বর বা অনিরুদ্ধ বিষ্ণু সর্ব্বভূতের হৃদ্দেশে অবস্থান করেন। সর্ব্বভূতের বহিরাবরণ অতিক্রম করিয়া যে অন্তর, তাহাই হৃদ্দেশ। বহিরাবরণ বা সূক্ষ্মাবরণকে যে সর্ব্বভূত দর্শন, তাহাতে অন্তর্যামি-দর্শন নাই। স্থূল বহিঃকরণ বা সূক্ষ্ম অন্তঃকরণের অতীত প্রদেশে জীবাত্মা ও তদন্তর্যামী ঈশ্বর একত্রে সেবক ও সেব্যরূপে বিরাজিত। যেখানে জীবাত্মা স্থূল ও সূক্ষ্ম আবরণে আবৃত হইয়া স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারে নিজকে কর্ম্মফলের ভোক্তা জ্ঞান করিতেছে, সেখানেই প্রয়োজক-কর্ত্তা ঈশ্বরের দ্বারা জীব সুখ-দুঃখে ভ্রামিত হইতেছে।

শ্রীগৌরসুন্দর-কথিত "কৃষ্ণ যদি তোমার হও, বলে একবার। মায়াবন্ধ হইতে কৃষ্ণ, তারে করে পার।।" শ্রুতিমন্ত্রোক্ত—"জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ" এবং শ্রীমদ্ভাগবতের— "অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদার-বিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি। সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং— জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্।।" প্রভৃতি শ্লোক একতাৎপর্য্যপর।

পরমেশ্বরকে জীব সমান বৃক্ষে দর্শন করিয়া যদি পরমেশ্বরকে জাতিসামান্যে বিচার না করে অর্থাৎ পরমেশ্বরকে জীববৎ মায়াধীন, কর্ম্মফলভোক্তা মনে না করে কিংবা জীব আপনাকে 'ব্রহ্ম' প্রভৃতি বলিয়া কল্পনা না করে, তবেই বীতশোক হয়; জীব যদি বিষয়-আশ্রয়-বিবেকে পরমেশ্বরের সমজাতীয়ত্ব দর্শন করিয়া পরমেশ্বরের শরণাগত, সেবাপর হয়, তবেই জীব মায়াবন্ধ হইতে উদ্ধার-লাভ করিতে পারে—তবেই তাহার সত্ত্বশুদ্ধি ও পরমাত্মভক্তি লাভ হয়—প্রকৃত কল্যণ করতলগত হয়।

সমবৃক্ষে নিমগ্ন হইয়া পুরুষাভিমানকারী জীব তাহার সাম্যবাদকে যখন ব্যাপ্ত করিয়া তোলে, তখনই তাহার পরমেশ্বরেরও বহিরাবরণ দর্শন হয়। শ্রীগৌরসুন্দরকে তখন জীব তাহারই ন্যায় দুই হস্ত, দুই পদবিশিষ্ট মনুষ্যাকৃতি ব্যক্তিবিশেষ মনে করে, তাহারই ন্যায় কালের অধীনে পরমেশ্বরেরও জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ বিচার করে, তাহারই ন্যায় পরমেশ্বরের নাম-রূপ-গুণ-পরিকর ও ক্রিয়া-সমূহকে অনিত্যরূপে কল্পনা করে। অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত অন্তর্যামী পুরুষ সমান বৃক্ষে নিমগ্ন, মুহ্যমান ও শোকপরায়ণ, অনীশ্বর, বদ্ধজীবগণের মঙ্গলবিধানের জন্য তদংশী স্বয়ংরূপে প্রবিষ্ট হইয়া ঔদার্য্যমূর্ত্তির মধ্যমাকারে শ্রীগৌরসুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। এজন্যই শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন ঐ সকল মুহ্যমান পুরুষগণের মঙ্গলার্থ স্বয়ংরূপ ঔদার্য্যবিগ্রহকে কখনও কখনও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা আবৃত-দর্শনের সমানাকৃতির বহিররাবরণে মুগ্ধ হন নাই, সেই সকল অধোক্ষজ দৃষ্টিসম্পন্ন, পরম বুদ্ধিমন্ত ব্যক্তিগণ শ্রীগৌর- সুন্দরকে—

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।।

—এই শ্লোকে স্তব করিয়াছেন।

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু সন্দর্ভে শ্রীগৌরসুন্দরকে প্রণাম করিয়া বলিতেছেন,—

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্।
কলৌ সংকীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ।।

শ্রীগৌরসুন্দর অন্তঃকৃষ্ণ অর্থাৎ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণস্বরূপ হইয়া বাহিরে স্বয়ংরূপিণী আশ্রয়স্বরূপিণী শ্রীমতীর ভাব-কান্তিতে আবৃত। এখানে শ্রীগৌরসুন্দরের বহিরাবরণ স্বয়ংরূপিণীর আবরণ অর্থাৎ ভাব-কান্তির বিগ্রহ হওয়ায়, তাহা বিভিন্নাংশ আশ্রয়ের দেহ বা বহিরাবণের ন্যায় অনিত্য কিংবা দেহী হইতে ভিন্ন নহে। শ্রীগৌরসুন্দর 'অন্তঃকৃষ্ণ' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ বা বিষয়স্বরূপ হইলেও তাঁহার অন্তর শ্রীমতীর ভাবে এতদূর বিমণ্ডিত ছিল যে, সেই ভাবটী বাহিরে পর্য্যন্ত ফুটিয়া উঠিয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গকে সেইভাব ও তদনুরূপ কান্তিতে সুবলিত করিয়াছিল।

শ্রীগৌরসুন্দরের লীলায় দেখা যায়, তিনি কখনও বিষয় জাতীয়ের লীলা, কখনও বা আশ্রয়-জাতীয়ের লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ, বরাহরূপ প্রদর্শন, নৃসিংহরূপ প্রদর্শন, শচীদেবীর নিকট গৌর-গোপাল-মূর্ত্তি প্রদর্শন প্রভৃতির দ্বারা তিনি বিষয়-জাতীয়ের লীলা, আবার কখনও সন্ন্যাস-লীলা, ঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ-লীলা প্রভৃতি লীলার দ্বারা আশ্রয়-জাতীয়ের লীলাসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর, ''আত্মানং কিশোরীং ধ্যায়েৎ'' বিচারে কখনও ''গোপী গোপী'' জপ করিতেছেন, আবার পড়ুয়াকে কৃষ্ণপক্ষপাতী জ্ঞানে তাড়না করিতেছেন। আশ্রয়ের যেমন বিষয়ের নাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে

অপ্রাকৃত মোহন-মাদনাদি ভাব উপস্থিত হয়, বিষয়স্বরূপেরও তদ্রূপ আশ্রয়-শিরোমণির নাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে মোহন-মাদনাদি ভাব উপস্থিত হইয়াছে। গৌরসুন্দর আপনাকে গোপীর কিঙ্করীভাবে সম্পূর্ণ বিভাবিত করিয়া "আশ্লিষ্য বা পাদরতাং" শ্লোক উচ্চারণ করিতেছেন।

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিত-তনু; কৃষ্ণের অন্তর্যামী রাধা, রাধার অন্তর্যামী কৃষ্ণ, তথাপি শ্রীরাধার প্রীতিই এখানে পরিচালক ও প্রবল। কেননা, শ্রীরাধারাণীতে সেবার পরাকাষ্ঠাময়ী প্রগতি। শ্রীগৌরসুন্দর যেরূপ শ্রীরাধা- গোবিন্দমিলিত-তনু, শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয়-স্বরূপ শ্রীল স্বরূপ-দামোদর তদ্রূপ শ্রীললিতা-গোবিন্দমিলিত-তনু, শ্রীরায় রামানন্দ তদ্রূপ শ্রীবিশাখা-গোবিন্দমিলিত-তনু। শ্রীললিতার অন্তর্যামী শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোবিন্দের অন্তর্যামী শ্রীললিতা, শ্রীবিশাখার অন্তর্যামী শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোবিন্দের অন্তর্যামী শ্রীবিশাখা। তদ্রূপ শ্রীগৌর-গদাধর, শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ। গুরুর অন্তর্যামী গৌর, গৌরের অন্তর্যামী গৌর। তদাশ্রিত গুরুসেবক জানেন, শ্রীগুরুদেব শ্রীগৌর-ব্যতীত কিছু জানেন না, শ্রীগৌরও তৎপ্রেষ্ঠমূর্ত্তি গুরুদেব ব্যতীত কিছু জানেন না। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ দুর্ব্বাসাকে বলিয়াছিলেন,—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি।।

সাধুসকল আমার হৃদয়, আর আমিও সাধুগণের হৃদয়। তাঁহারা আমা-ব্যতীত আর কাহাকেও জানেন না, আমিও তাঁহাদের ভিন্ন অন্য কাহাকেও আমার বলিয়া জানি না।

সুতরাং যাঁহারা বরিরাবরণের বিচার-প্রণালীর দৌর্ব্বল্য অন্তর্যামীতে আরোপ করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারাই সেই বস্তুকে আধ্যক্ষিকের অনুগত জ্ঞানের পরিবর্ত্তে 'অধোক্ষজ' সংজ্ঞায় নির্দ্দেশ করিবেন। যাহারা অন্তর্যামীর এই সুষ্ঠু বিচার জানে না অর্থাৎ যাহারা "দেহদেহিবিভাগোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ"—এই শ্রৌত-বিচার-বিরোধ করিয়া অন্তর্যামিত্বে বহির্যামিত্ব ও বহির্যামিত্বে অন্তর্যামিত্ব আরোপ করে, যাহারা জড়া প্রকৃতির 'অব্যক্ত' পর্য্যন্ত অন্তর্যামিত্ব বিচার করে, যাহারা অন্তর্যামিত্বকে মহাকাশ-বিচারে বা শূন্যবিচারে মাত্র ব্যাপ্ত করে, কিংবা যাহারা অন্তর্যামিত্বকে পরমাত্মার আংশিক-বিচার মাত্র আবদ্ধ করে, তাহারা মধ্যমাকৃতি পরাৎপরপুরুষ অবতারীকে হয় ঐতিহাসিক নায়ক, না হয় নেপোলিয়ন বোনাপার্ট প্রভৃতির ন্যায় কর্ম্মবীর, আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতির ন্যায় নৈমিত্তিক যুগবীর, না হয় দেহ-দেহি-ভিন্ন 'মায়া-উপহিত চৈতন্য' (!) জ্ঞান করিয়া তত্ত্ববস্তুর প্রকৃত স্বরূপ দর্শন হইতে চিরতরে বঞ্চিত থাকিবে এবং তৎফলে জন্ম-জন্মান্তর দেব, অদেব বা স্থাবর-দেহে ভ্রাম্যমান হইবে।

এইরূপ বিপদ মানবজাতিকে আক্রমণ করিলে গৌড়ের আদিকবি জীব- জগতের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া ভুবনমঙ্গল গৌর-লীলার অবতারণা করিয়াছিলেন। এই আদিকবিই—ঠাকুর বৃন্দাবন। বৃন্দাবন—শ্রীগৌরসুন্দরের হৃদয়। শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—

আনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি' মানি।

শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীনিত্যানন্দভৃত্য শ্রীবৃন্দাবনদাসসূত্রে শ্রীবৃন্দাবনের সেবা অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দরের হৃদয় বা মনোঽভীষ্টের সেবা করিয়াছেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনপর ভক্তিমহিমাপ্রচারই গৌর-মনোঽভীষ্ট। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্য ভগবানের সম্বন্ধীয় গ্রন্থে সেই শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের মহিমাকীর্ত্তনে অনন্তমুখ হইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতগণ সকলেই মহাভাগবত। তাঁহাদের লক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণন করিয়াছেন,—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেব ভাগবতোত্তমঃ।।
(ভাঃ ১১।২।৪৩)

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম।।
(ভাঃ ১০।৩৫।৯)

অর্থাৎ যিনি ভাগবতোত্তম, তিনি সর্ব্বভূতে আত্মার আত্মরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকেই দেখেন এবং আত্ম-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত ভূতকে দেখিতে পান।

পুষ্পফলাঢ্য বনলতা, তরুসকল ও ভাবদ্বারা অবনত, প্রেমপুলকিত শরীর- যুক্ত বনস্পতি-সকল আত্মগত কৃষ্ণকে প্রকট করিয়া মধু-ধারা বর্ষন করিয়াছিল।

শ্রীল গৌরসুন্দর শ্রীরামানন্দ রায়কে বলিয়াছিলেন,—

মহাভাগবত দেখে স্থাবর-জঙ্গম।
তাহাঁ তাহাঁ হয় তাঁ'র শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ।।
স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তা'র মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তাঁ'র ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি।।

মহাভাগবত বহিরাবরণ দর্শন করেন না, অপরের লোচনে যাহা স্থাবর-জঙ্গম অর্থাৎ আত্মভোগ্যবস্তু, মহাভাগবত সেইরূপ ভোগ্য বহিরাবরণ বা জগৎ দর্শন করেন না, সর্ব্বত্র তিনি চিদ্‌বিলাস দর্শন করেন—সকল বিচিত্রতায় কৃষ্ণবিলাস দর্শন করিয়া থাকেন।

যিনি সর্ব্বভূতে পরমাত্মার পূর্ণ প্রতীতি ভগবদ্‌বিগ্রহের চিদ্‌বিলাস দর্শন করেন এবং ভগবানে সর্ব্বভূত অর্থাৎ চিদ্ বিচিত্রতা দর্শন করেন, তিনিই মহাভাগবত।

কৃষ্ণবিরহসন্তপ্তা গোপীগণ বনলতা, বৃক্ষ প্রভৃতি বহিরাবরণ বা তদন্তর্যামী পরমাত্মা-মাত্র দর্শন করিতেছেন না। তাঁহারা প্রত্যেক বিচিত্রতায় কৃষ্ণের বিলাস দর্শন করিতেছেন। ''আত্মনি—স্বীয় বিগ্রহে বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্যঃ",

"সর্ব্বভূতেষু" শ্লোকেও আমরা "আত্মনঃ ভগবদ্ভাবম্" পদ দেখিতে পাই, এখানে ব্রহ্মভাব বা পরমাত্মভাব-মাত্র নহে। যিনি ভগবদ্ভাব দর্শন করেন, তিনিই মহাভাগবত।

সুতরাং কোন কোন আচার্য্যের পরতত্ত্ব-প্রতীতি তত্ত্ববিচারে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবতগণ তাঁহাকে কেবল অতন্নিরস্ত প্রতীতি-মাত্র-রূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন না। তদ্‌বস্তুর অনুসন্ধানে শ্রীচৈতন্য-দাসানুদাসগণ বহু আচার্য্য, ঋষি, মনীষিগণের বিবদমান বাক্যসমূহ শ্রবণ করিয়া তত্ত্ববাদে স্থির থাকিতে পারেন না। অনেক সময় উপদেশক আচার্য্য উপদিষ্ট শ্রোতৃবর্গের দুর্ব্বলতা বিচার করিয়া অনেক কথা অভিব্যক্ত করিতে সুযোগ পান না। কেহ বা কিয়ৎপরিমাণ সেই সকল বিচারের ন্যূনাধিক স্বীকারমাত্র করিয়া মর্য্যাদা-পথেরই পুষ্টি-বিধান করেন; মাধুর্য্য পুষ্টির দিকে তাঁহাদের লক্ষ্য অল্প হইয়া পড়ে। পুরুষোত্তম বস্তু যে-কালে কৃপাপরবশ হইয়া স্বীয় সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যের উন্নতাংশ প্রদর্শন করেন, সে-কালে অনেকেই তাহা ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়া আধ্যক্ষিকতায় বা জড় বিচারে পতিত হন। মাধুর্য্যের স্থান ঐশ্বর্য্যের স্থানাপেক্ষা মধুরতর ভূমিকায় অবস্থিত—এ কথা যাঁহাদের চিত্তে স্থান পায় না, তাঁহারা 'ঐশ্বর্য্য', 'বৃহত্ব' প্রভৃতি মর্য্যাদাপথের বিচারেই অবস্থিত হন। ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যের মূল কারণ পুরুষোত্তম বস্তু যে-কালে স্বীয় ঔদার্য্যলীলা প্রকাশ করেন, সেই সময়েই তাঁহার মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য এবং তদাবৃত পর্য্যায়-সমূহের তারতম্য নিষ্কপট জড়-বিচার-মুক্ত, ত্যাগ- ভোগ-বিচার রহিত সেবাপর পুরুষগণের আত্ম-প্রতীতি লাভ ও আত্মবৃত্তির বিচিত্রতা কেবল-মাত্র উপলব্ধির বিষয় হয় না, পরন্তু তাঁহাদের স্বরূপোপলব্ধিতে সুনির্ম্মল দৃষ্টিতে নিত্য-বিলাস-বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়।

নির্ব্বিশেষবাদিগণের অন্তর্যামীর বিকৃত ও সঙ্কীর্ণ বিচার আমাদের বক্তব্য নহে। ব্যষ্টি-অন্তর্যামী ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু বা সমষ্টি-অন্তর্যামী গর্ভোদকশায়ী, ভূমা-অন্তর্যামী প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যপর কথাও শ্রীগৌর-সুন্দরের বিচারের সমগ্রতা নহে উপনিষদুক্ত অন্তর্যামীর শান্তবিচার শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের বিচারে সম্পূর্ণ-ভাবে পরিস্ফুট হইয়া অপ্রাকৃত মধুর রসের ঔজ্জ্বল্য ও সেব্য-সেবকভাবের সৌন্দর্য্যসীমা প্রকাশ করিয়াছে।

ঠকিয়াছি, কি জিতিয়াছি?

'হরিভজন' ছাড়িয়া দিলেই 'ঠকা'-'জিতা'র 'খতিয়ান' খুলিয়া বসিতে হয়—আমারও তাহাই হইয়াছে। যিনি সত্য সত্য অকপটে হরিভজন করেন, তাঁহার কিন্তু 'খতিয়ান' অন্য রকমের—তিনি প্রতিমুহূর্ত্তে বিচার করেন, তাঁহার প্রত্যেক সেবাকার্য্যে **হরি-গুরু-বৈষ্ণবের** কতটা ইন্দ্রিয়তর্পণ হইতেছে; তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ না হইলে যেন তাঁহার প্রাণপতঙ্গ ধারণই বৃথা; তাঁহার এইরূপ অবিচ্ছিন্ন অকপট চিত্তবৃত্তি—লোক-দেখান বা 'ঢেঁরা' পিটাইয়া সাধারণ্যে উহার বিজ্ঞাপণ-প্রচারের চিত্তবৃত্তি নহে।

আমি যে 'খতিয়ান' প্রস্তুত করিয়াছি, তাহাতে আমি কৃষ্ণের (?) নিকট হইতে কতটা 'আমদানী' করিতে পারিতেছি, আমার ইন্দ্রিয়-সম্ভার কতটা 'জমা'র (?) ঘর বৃদ্ধি করিতেছে, তাহারই হিসাব নিকাশ করিয়া

থাকি। গুরু-পদাশ্রয়ের অভিনয় করিয়া—গুরুর প্রিয়সেবকাভিমানের পতাকা উঠাইয়া—হরিভজনকারীর মুখোস পরিয়া—গুরুর অনুক্ষণ সঙ্গকারী ও বিশ্রম্ভসেবকের লোক-চোখ্ ঝলসান রঙ্ গায়ে মাখিয়া আমি আমার 'খতিয়ানে'র পাতায় হিসাব-নিকাশ লিখিতে থাকি—"আমি যে হরিভজন করিতে আসিলাম, তাহাতে আমার কতগুলি নূতন নূতন দেশ দেখা হইল—কতগুলি চিড়িয়াখানা আমি দেখিতে পারিলাম—কতগুলি সহর দেখিলাম, রাজধানী দেখিলাম, প্রাসাদ দেখিলাম, নূতন নূতন রাস্তা-ঘাট, পাহাড়-পর্ব্বত, প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিলাম,—কতগুলি কল-কারখানা দেখিলাম—কতগুলি নূতন নূতন দ্রব্য রসনায় আস্বাদন করিতে পারিলাম—কতটা সম্মান পাইলাম—মুখস্থ 'বুলি' বলিয়া কতটা 'বাহাবা' কুড়াইলাম, কতগুলি রাজা-মহারাজা বড়লোকের প্রাসাদে ও অট্টালিকায় বাস করিতে পারিলাম—কতটা তাঁহাদের অন্দরমহলের অসূর্য্যম্পস্যাগণের দর্শন ও তাঁহাদের প্রদত্ত অর্ঘ্যলাভ করিলাম—রাজা-মহারাজার মত শয়নগৃহ, ভোজনগৃহ, বহির্দ্দেশ-গমনের স্থান—যাহা আমি আমার বিদ্যা, ধন, শক্তি, পূর্ব্বপুরুষগণের আভিজাত্য প্রভৃতি কোন বস্তুর বিনিময়ের দ্বারাই আমার সমগ্র জীবনে স্পর্শ দূরে থাকুক, চোখে দেখিবারও সুযোগ পাইতাম না, সেই সকল দেবভোগ্য দ্রব্যের কতটা স্পর্শানুভূতি বা ইন্দ্রিয়ানুভূতি লাভ করিতে পারিলাম?"

বিদ্যা-বুদ্ধির অপটুতার কারণেই হউক্ বা অন্য অসামর্থ্যজন্যই হউক, যদি আমার গুরু-বৈষ্ণবের সঙ্গে দেশ-দেশান্তর গমনের সুযোগ না হয়, বা ইন্দ্রিয়-যজ্ঞের ঘৃতাহুতি কোন প্রকারে কম হয়, তবে আমার ঠকা-জিতার হিসাব-নিকাশ তখন হইতে থাকে। আমি তখন ভাবি—আমি কম চতুর হইয়া কি 'আক্কেল-সেলামি'ই না পাইলাম—একটুকু চতুর হইতে পারিলে সেবাছলনার 'বহুরূপী সাজিয়া কত দেশ-দেশান্তর দেখিতে পারিতাম, কতভাবে আখেরের বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিতাম! সুতরাং এখন হইতে কোন আদর্শ চতুরের অনুকরণে চতুরতা আয়ত্ত করিতে হইবে। কারণ 'চতুর' হওয়াটাই যে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম—"যেই জন কৃষ্ণ-ভজে সে বড় চতুর।" যদি চতুর হইতে না পারিলাম—আখেরের বন্দোবস্তের সহিত নিজের বুঝ্‌টী সোয়াষোল আনা বুঝিয়া লইতে না পারিলাম, তাহা হইলে আমার হরিভজন হইল কৈ? 'কাকের মত অতি চতুর হইতেছি,—এইটীই যা ভয়!'

আমি গুরুর সঙ্গী, গুরুর সেবক কতক্ষণ?—যতক্ষণ 'ঠকা-জিতা'র 'নিক্তি' ঠিক আছে। আখেরের বন্দোবস্ত নেপথ্যের নিভৃত ও নিঃশব্দ অবগুণ্ঠনে ষোল- কলায় পূর্ণ রাখিয়া—আমার 'ফাজিল' (উদ্বৃত্ত) সময়টুকুর উপর শুভঙ্করী করিয়া যখন দেখিতে পাই,—বিনা ব্যয়ে, বিনা খাই করচে, অনেক সময় বিনা গাড়ী-ভাড়ায়, বিনা বাড়ী-ভাড়ায় ন্যূনাধিক আমার ইন্দ্রিয়ের জমার দিকে আনা যায়, তখন এরূপ সুযোগে সেবকের প্রতিষ্ঠাটুকু ছাড়ে কে?

এই 'ঠকা-জিতা'র শুভঙ্করীতে কতকগুলি লোক খুব 'তুখড়'—গণিতাচার্য্য শুভঙ্কর বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহাকেও হার মানাইয়া দিতে পারিতেন; আবার কতকগুলি লোক আমারই মত গো-গর্দ্দভ। অঙ্ক কষিতে তীক্ষ্ণবুদ্ধি নাই বলিয়াই মনে করি, আফিসের সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পরে সন্ধ্যার সময় অঞ্চলধৃক্ হইয়া বৈদ্যুতিক বীজন-যন্ত্রের বায়ু-সেবন ও বিশ্রামানুকূল নানাপ্রকার দুনিয়ার সংবাদ সংগ্রহ বা খোস গল্প

করিবার জন্য আমার হরিভজনের পোষাকী পতাকা 'মালার ঝোলা'টী নাচাইতে নাচাইতে হরিকথা শুনিবার বাহ্য আবরণের মধ্যে—'অপ্রাকৃত' ও 'অধোক্ষজ'-শব্দের আনুকরণিক মৌখিকতার রক্ষাকবচের মধ্যে যদি আরামাবাসের সকল সুযোগটী আমার ইন্দ্রিয়ের জমার ঘরে পরিপূরণ করিতে পারিলাম, তবেই ত' আমার 'জিৎ' হইল।

যাহারা 'ঠকা-জিতা'র অঙ্কে কুশল, তাঁহারা কিন্তু আমাকে 'গোখর', 'গৃহব্রত' প্রভৃতি বলিয়া আমার উপর টেক্কা দিয়াছেন। তাঁহারা মনে করিয়াছেন, 'আমি কি বোকা'! একটি নির্দ্দিষ্ট হাড়মাসের কামিনী-মূর্ত্তির পায়ে আত্মবিক্রয় করার দরুণ, আমি কত ভাল ভাল দেশ, বড় বড় লোক, বড় বড় কল-কারখানার দর্শন, মুক্ত পাখীর মত মুক্ত জীবন-যাপন, মুক্ত বায়ু সেবন, বিনা খরচে দেশ ভ্রমণ, নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধা, সম্মান, অর্থ ও প্রকৃতি দর্শন, সম্ভাষণ, কিছুই লাভ করিতে পারিতেছি না। কিন্তু জানি না, কে যেন চকিতের মত আমার কানে কানে বলিয়া দিয়াছেন—গো-গর্দ্দভ, তোমার বোকামীর মত, অতি চতুরেরাও শুভঙ্করীতে ভুল করিয়াছে! তুমি বোকা হইয়া ঠকিয়াছ, তাহারা অতি চতুর হইয়া 'জিতিয়াছি' মনে করিয়া ঠকিয়াছে। তোমরা উভয়েই "১" ছাড়িয়া 'ঠকাজিতা'র প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়াছ। যদি একের—অদ্বয়জ্ঞানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য অকপট হইতে, তবে সেই অজিতকেও জয় করিয়া সর্ব্বজয়ী হইতে পারিতে।

আমার 'ঠকা'-জিতা'র খতিয়ানটী এত বিস্তৃত যে, তাহা একটি মাত্র প্রবন্ধে সমাবেশ করা অসম্ভব।

অনেক সময় ভাবি, আমি স্ত্রী-পুত্র হইতে পৃথক্ হইয়া হরিসেবার চেষ্টা দেখাইতে গিয়া কি ঠকাটাই না ঠকিয়াছি। কখনও ভাবি, "সর্ব্বস্বং বিষ্ণবে দত্ত্বা মূঢ় বর্ত্তিষ্যসে কথং'—এই শুক্রনীতির বিদ্রূপকারী মায়াবী বৈষ্ণবগণের কথায় পড়িয়া যাবতীয় 'আখেরের বন্দোবস্তে'র প্রতি উদাসীন হওয়ায় আমি ভীষণ ঠকিয়াছি; কখনও বা মনে করি, আমি হঠাৎ ঝোঁকে পড়িয়া বানপ্রস্থের বেষ কাষায়-বস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া যারপরনাই ঠকিয়াছি; সাদা পোযাকে থাকিলে "পুনর্মুষিকো ভব" মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে তত বেগ পাইতে হইত না! কখনও ভাবি, আমি ব্রহ্মচারীর কাষায় বেষ পরিয়া ঠকিয়াছি; সাদা বেষ থাকিলে সমাবর্ত্তন করিবার কালে বেশী 'হৈ' চৈ' হইত না। আবার কখনও মনে করি,—সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচারীর সকল সুবিধা, সুযোগ ও সম্মান, এমন কি, তাঁহাদের অপেক্ষাও অধিক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা যদি তাঁহাদের মত বেষ ও কৃচ্ছ্রতা স্বীকার না করিয়াও প্রাপ্ত হইতে পারি, তবে আমার মত 'চতুর', 'জয়ী' কে?

আমার এসকল 'ঠকা-জিতা'র তৌলদণ্ডের পরিমাপ কি? আমি দেখি,—আমি স্ত্রী-পুত্র হইতে পৃথক্ থাকিয়া, সর্ব্বস্ব-সমর্পণের পোষাক পরিহিত হইয়াও যতটা অধিক আদর-আপ্যায়ন না পাই, তদপেক্ষা অনেকগুণে অধিক আদর-যত্ন স্ত্রী-পুত্র-পরিবেষ্টিত ব্যক্তি পাইয়া থাকেন। আমি লক্ষ্য করি, এত নির্ম্মম ত্যাগ করা সত্ত্বেও মাত্র আমার নিজের ভাগ্যেও আমার কৃত বাহাদুরীর উপযুক্ত প্রশংসা ও তজ্জন্য যথোচিত আদর-সম্মান-লাভ ঘটে না, আর স্ত্রী-পুত্রাসক্ত ব্যক্তি স্ত্রী পুত্র-পারম্পর্য্যে কিরূপ সমাদৃত ও সযত্নে পরিচর্য্যা-প্রাপ্ত হইয়া থাকেন! আমি সমস্ত বিসর্জ্জন করিয়াও প্রতিষ্ঠা পাই না; আর কোন কোন ব্যক্তি সমস্ত সংরক্ষণ করিয়াও আমা-অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক আদর-যত্ন পাইয়া থাকেন। ইহা লক্ষ্য করিতে করিতে আমার

কানে জল প্রবেশ করে—কুলক্রমাগত অনুর্ব্বর মস্তিকটীও তখন উর্ব্বরতা-শক্তি লাভ করে—তখন আমি চিন্তা করি—'আমি করিয়াছি কি?' আমি ত' ভাল কাজ করি নাই। আমিও ত' এরূপ সবদিক্ বজায় রাখিয়া—আখেরের সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া সাধুদিগের আদর-যত্ন পাইতে পারিতাম! আমি কৃষ্ণকে আমার কতটা পরিচর্য্যায় লাগাইতে পারিলাম! কৃষ্ণের জন, কৃষ্ণের ভাণ্ডার হইতে আমার সেবায়—আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণে—আমার প্রতিষ্ঠা-বর্দ্ধনে যতটা অধিক জমা হইল, সেই পরিমাণে আমি জিতিলাম, আর যে-পরিমাণ তাহা কম হইল, সেই পরিমাণে আমি হারিলাম—ইহাই আমার 'হারা-জিতা'র মাপ কাঠি।

আমি মনে করি—লক্ষ্য করি—অনুধাবন করি—আমি ব্রহ্মচারী হইয়া সমাবর্ত্তন করিবার সময়ই যত চিৎকার, আমি ব্রহ্মচারী হইয়া সাদা কাপড় পরিলেই যত আপত্তি, আমি গৃহে গেলেই যত শাস্ত্র-নিষেধ, আমি পড়া-শুনা করিলেই যত অসুবিধার আশঙ্কা, আমি চাকুরী বা ব্যবসায় বাণিজ্যের দ্বারা অর্থার্জ্জন করিতে গেলেই যত সহস্র-কণ্ঠে প্রতিবাদ—সকলের জন্য ত' সেরূপ নহে! আবার অন্য সময় বিনা বাধায় সমাবর্ত্তন করিতে পারিয়া—গৃহে প্রবেশ করিতে পারিয়া, আখেরের বন্দোবস্ত করিতে পারিয়া অপিচ বাহ্যে আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর কার্য্যে সাধু-গুরুবর্গের দ্বারা বঞ্চনাময় আনুকূল্য লাভ করিয়া আমি মনে করি, —"আমিই জিতিয়াছি; আমার অধিকার—উন্নতাধিকার, আমি অধিকতর গুরু-বৈষ্ণবের স্নেহভাজন।" কেননা, আমি যাহাই করি, তাহাতে বিশেষ কোন তীব্র প্রতিবাদ নাই আমি ঐ উভয় অবস্থায়—উভয় বিচারেই কিন্তু 'হারা জিতা'র ভুল বিচার করিয়াছি। একদিকে কৃষ্ণের নিকট হইতে আমার প্রেয়ঃ পরিবর্দ্ধনের ইন্ধন আকাঙ্ক্ষা করিতে গিয়া যেরূপ আমি বঞ্চিত, আর একদিকে আমার দুর্দ্দৈব ফলে গুরু-বৈষ্ণবের বঞ্চনাকে স্নেহ বা 'আমার উন্নতাধিকার' মনে করিয়া আমি ততোধিক বঞ্চিত হইয়াছি। আমি যাহাকে আমার প্রতি গুরু-বৈষ্ণবের প্রগাঢ় স্নেহ মনে করিয়াছি, তাহা তত প্রগাঢ়তর বঞ্চনা। ইহার স্বরূপ গুরু-বৈষ্ণবের অবঞ্চনাময়ী কথাকষ্ঠিপাথরে প্রতিফলিত। শ্রীগুরুদেব ইহাই পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করেন যে, কৃষ্ণ কখনও কাহারও ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিতে ধাবিত হন না, ইহাই কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব; যাহা ইন্দ্রিয়তর্পণ করে—আমার প্রেয়ঃ সাধন করে—আমার প্রেয়ের আনুকূল্য-বিধান করে, তাহা 'কৃষ্ণ' নহে,—'কৃষ্ণমায়া'; তাহা কৃষ্ণ-দর্শনের যবনিকা। সাধু সাবধান! গুরুবৈষ্ণবের স্নেহ-ভ্রমে যেন বঞ্চনাকে বরণ না করি। গুরুদেব বা বৈষ্ণব আমার জন্য যে চাকুরীটী (?) করেন, আমার বহির্ম্মুখ প্রেয়ের জন্য যে কোনও প্রকার সুপারিশ বা উদ্যমের আভাসও প্রদর্শন করেন, তাহা আমার প্রতি তাঁহার 'স্নেহ' নহে—ইহা তাঁহার অত্যন্ত অধিক বঞ্চনা, তাঁহার স্বরূপকে—তাঁহার ভজনপথকে আমার নিকট অত্যন্ত ঘনীভূত আবরণে আবৃত রাখিবার চেষ্টা—ইহা আমার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত নির্ম্মম দণ্ড। আমার উপর হইতে আমার নিত্য নিয়ামক যখন শাসনদণ্ড উঠাইয়া লইলেন বা সাক্ষাদ্ভাবে সেই শাসনদণ্ডের প্রয়োগ করিতে ক্ষান্ত হইলেন কিংবা আমার উপর পক্ষপাতিত্বের বাহ্য আদর্শ প্রদর্শন করিয়া আমাকে তাঁহার সেবা করিবার সুযোগ-দানের পরিবর্ত্তে তাঁহার নিকট হইতে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সেবা গ্রহণ করিবার অবসর দিলেন, তখন আমার ভাগ্য অত্যন্ত বিপর্য্যস্ত। এ বঞ্চনার ব্যূহ ভেদ করিয়া তাঁহার প্রকৃত অমন্দোদয়-দয়া-বিতরণকারি-স্বরূপ দর্শন করা তখন আমার পক্ষে সুদুষ্কর।

এরূপ 'ঠকা-জিতা'র হিসাব-নিকাশ করিয়া আমি যখন দেখি যে, আমি হরিভজন করিতে আসিয়া কোন কোন ব্যাপারে ঠকিয়াছি, তখন গুরুবৈষ্ণবের নিকট হইতে সুদে-আসলে সেই ঠকার ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে বদ্ধপরিকর হই। আমি গৃহ-সুখ ছাড়িয়া যে-পরিমাণ ঠকিয়াছি—ভার্য্যা ও পুত্রাদির সুখ দুঃখ-মিশ্রিত পরিচর্য্যা হইতে বিরত হইয়া যে-পরিমাণে ঠকিয়াছি—অর্থার্জ্জনের প্রভুত্ব ও নিয়ামকত্ব বর্জ্জন করিয়া যে-পরিমাণে ঠকিয়াছি, ঐ সকল মূলধন উচ্চতম হারের চক্রবৃদ্ধি সুদ-সমেত ততোঽধিক পরিমাণে আদায় করিয়া জয়ী হইতে চাই! তখন গুরুসেবকগণকে আমার পরিত্যক্ত ভোগ্য পদার্থের স্থানে আনয়ন করিয়া আমি আমার ক্ষতিপূরণ করিতে চাহি; তখন বহু পরিশ্রম করিয়া—মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যোষিৎসেবা করিবার ফলে যোষিতের নিকট হইতে যে দুঃখমিশ্রিত পরিচর্য্যাটুকু পাইতাম, তৎ পরিবর্ত্তে বহু সম্ভ্রান্ত বা সরলপ্রাণ আশ্রিতের (?) দ্বারা বিনা পরিশ্রমে—বিনা আয়াসে অনাবিল ভূরিসেবা লাভ করিবার চেষ্টা করি! অর্থার্জ্জনের প্রভূত ও নিয়ামকত্ব অন্যভাবে অধিকতর প্রবলপরাক্রমে পরিচালনা করিবার জন্য কৌশল আবিষ্কার করি! কখনও মনে করি, 'কামিনী' পরিত্যাগ করিয়া যে-পরিমাণ ঠকিয়াছি, তাহার সমস্ত সুদসহ ক্ষতিপূরণ উহারই অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী কনক ও প্রতিষ্ঠা দ্বারা সাধন করিব। যখন দেখি, 'কনক' পরিত্যাগ করিয়া ঠকিয়াছি, তখন 'কামিনী'র দ্বারা কনকের ক্ষতিপূরণ সাধন করিবার চেষ্টায় থাকি! কখনও বা 'কৃষ্ণের কনক' আমার উদ্বৃত্ত ধনকোষের খতিয়ানের জমার ঘর বৃদ্ধি করিয়া আমার 'আখেরের বন্দোবস্তে'র সাধক হয়, কখনও বা কৃষ্ণের কনকে অবৈধভাবে আমার হস্ত প্রসারিত হয়। ''ঠকা-জিতা''র খতিয়ান খুলিলেই এইরূপ কত কি উৎপাত উপস্থিত হয়। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা—ইহারা পরস্পর অবিচ্ছিন্ন সহচর; একটির অভাব আর একটির দ্বারা পূর্ণ করিতে গেলেই তৎক্ষণাৎ একটি বন্ধু আর একটি বন্ধুকে ডাকিয়া আনে।

''ঠকা-জিতা'র সমস্যা আমাকে যেন কংসের কৃষ্ণচিন্তার মত পাইয়া বসিয়াছে। এখন আর হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবার চিন্তা নাই—হরিকথা-শ্রবণ, কীর্ত্তন ও অনুস্মরণ নাই, সেগুলি সকল পচা সংবাদ (stale news) এর মত একঘেয়ে অথবা মুখস্থ গদ-মাত্র হইয়া পড়িয়াছে। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবার যে মুখোসটী আছে, হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের যে বাহ্য অভিনয়টুকু আছে, তাহাও ''আমার দাঁড়ে ছোলা''র জন্য—আমি যেখানে যেখানে ঠকিয়াছি, সে-সকল স্থানের ক্ষতিপূরণ করিয়া আমার ইন্দ্রিয়ের ভাণ্ডার পূর্ণ করিবার জন্য। আমার এখন হরিকথা শ্রবণাভিনয়-গুরুদেবকে, বৈষ্ণবগণকে ফাঁকি দিয়া অন্তরালে অন্য কার্য্য সাধনের জন্য; আমার কীর্ত্তন—শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মের শ্রবণানুশাসিত কীর্ত্তন বা আত্মোপকার ও পরোপকার চেষ্টা নহে; তাহা আমার 'কনক', 'কামিনী', 'প্রতিষ্ঠা' সংগ্রহের পুষ্পবান; আমার সেই কীর্ত্তনাভিনয়-কেবল আমার কণ্ঠস্বরের, আমার পল্লবগ্রাহিতার, আমার চৌদ্দপোয়ার রূপ-গৌরবের 'বাহবা' কুড়াইবার যন্ত্রবিশেষ। তোতা পাখীর মত কেবল কণ্ঠযন্ত্রমধ্যে ধারকরা কথা আবৃত্তি করিয়া আমি বলি—''দেহ কিছু না, মন কিছু না''; কিন্তু বহুরূপিণী মায়ার ভ্রূভঙ্গীবাণে যখনই বিদ্ধ হই, তখনই কার্য্যতঃ সেই বোলটীও থাকে না—তখন দেহই সারাৎসার, মনই পরাৎপরতত্ত্ব হইয়া পড়ে—তখন বাউলগণের দেহতত্ত্ব রস আস্বাদনের জন্য বাতুল

হইয়া পড়ি! চাঁদবাউলের গীত আর তখন মনে থাকে না; মন-বাউল যাহা চায়, তাহাতেই ঝাপাইয়া পড়ি। এই ত' আমার ঠকা-জিতার হিসাব নিকাশের দৌড়।

আবার যখন দেখি, গুরু-বৈষ্ণবগণের সুরক্ষিত দুর্গের অভ্যন্তরে থাকিয়া আমার 'ঠকা-জিতা'র হিসাব-নিকাশটী পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে না, তখন আমি বৈষ্ণব-দুর্গের বাহিরে সরিয়া গিয়া অবৈষ্ণব-দুর্গের মধ্যে আখেরের বন্দোবস্তের হাটপত্তন করি। বৈষ্ণব-দুর্গের মধ্য হইতে যে সকল অস্ত্র গোপনে সরাইতে পারিয়াছিলাম, এখন সেইগুলিই আমার আখেরের দিনের অবলম্বন হয়। আচার্য্যের সহিত কপটতা করায় অস্ত্রগুলির প্রয়োগ-সম্বন্ধে আচার্য্য আমাকে যে বঞ্চনা করিয়াছেন, তাহাতে আমার যথার্থ অস্ত্রকৌশল শিক্ষা হয় নাই; সুতরাং এখন ঐ সকল অস্ত্র প্রয়োগ করিতে গিয়া আমার নিক্ষিপ্ত অস্ত্রগুলি আমার উপরই প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আমাকে হনন করে। আমি আচার্য্যের সাক্ষাৎ অকপট কৃপা-লাভে বঞ্চিত হওয়ায় দূরে সরিয়া একলব্যের অনুকরণে যে 'গুরুনিষ্ঠা', 'গুরুভক্তি' প্রভৃতির নামে গুরুদ্রোহিতাচরণ বা আমার প্রতি গুরুর ব্যবহারের প্রতিশোধ লইবার অভিসন্ধিতে গুরু-বিমুখ সমাজের চোখ ঝলসাইয়া দেই, তাহাতে আমি বিষ্ণুমায়ার দ্বারা নিহত হই। আমি 'ঠকা-জিতা'র 'বুঝ' করিতে গিয়া অপ্রাকৃত কল্যাণকল্পতরু শ্রীজগদ্গুরুর কোটিচন্দ্র-সুশীতল পাদপদ্মাঙ্কিকে—গুরুগৃহে বাস করিতে না পারিয়া সেই একলব্যেরই আদর্শে গুরুবৈষ্ণবের সহিত পাল্লা দিবার জন্য আমার নিরয়প্রাপক গৃহে কখনও 'আশ্রম', কখনও 'সমিতি', কখনও 'মন্দির', কখনও 'মঠ' কত কি খুলিয়া বসি; কখনও প্রচারক সাজি, প্রচারকের বেশে 'প্রতারক' হইয়া অর্থসংগ্রহ করি, কখনও সেবাদাসীর সেবামুগ্ধ হইয়া ধাম-সেবার নামে গ্রাম্য-সেবা করি, কখনও অবৈধ অনুকরণ করিয়া জয়পুর হইতে বিগ্রহ আমদানী করি, কল্পনা করিয়া বিগ্রহের নাম রাখি, মহোৎসব করি, প্রকৃতিসম্ভাষণের সুবর্ণসুযোগ আবিষ্কারের জন্য পত্র ছাপাইয়া স্ত্রী-পুরুষ- নির্ব্বিশেষে সকলকে নিমন্ত্রণ করি। সকল কার্য্যই আমার অনুকরণ—গুরু- বৈষ্ণবের সহিত প্রতিযোগিতা। আচার্য্যের কীর্ত্তিত অনুকরণ ও অনুসরণের উদ্দেশগুলি আমার 'ঠকা-জিতা'র উত্তেজনার প্রবল বন্যায় কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, ঠিক নাই। এখন গুরুদেবের সহিত—বৈষ্ণবগণের সহিত আমার ইন্দ্রিয়রুচিকর সকল ব্যাপারে পাল্লা দেওয়াই আমার গুরু-গৃহ-বাসকালীন যাবতীয় ক্ষতিপূরণের একমাত্র অস্ত্র হইয়াছে। অবৈধ আনুকরণিক বা পাল্লাদার হইতে গিয়া বিশ্বশ্রবা পুত্রের উপবীত, দণ্ড, ঝুলি—যাহা কিছু অস্ত্ররূপ ব্যবহার করিতেছি, তাহাতে "রাবণের বিষ্ঠা" হইয়া পড়িতেছি। 'ঠকা-জিতা'র মেরুদণ্ড-স্বরূপ প্রতিষ্ঠা-শৌকরীবিষ্ঠা আমাকে কনক-কামিনীর পদতলে নিষ্পেষিত করিয়া অবশেষে 'রাবণের বিষ্ঠা'য় পরিণত করিতেছে!

'ঠকা-জিতা'র অঙ্ক করিতে গিয়া যখন দেখিতে পাই যে, আমার মনঃকল্পিত রায় রামানন্দের আদর্শের (?) অনুকরণেই লাভের ভাগ অধিক, তাহাতে 'যুক্ত বৈরাগ্যের' নামে সকল রসাস্বাদনই হয়, তখন আর শ্রীরূপ-সনাতনে "এক এক বৃক্ষের তলে এক এক রাত্রি শয়ন"—এই ফল্গু বৈরাগ্যের (?) আদর্শ গ্রহণ করিয়া ঠকিয়া লাভ কি? বিশেষতঃ "এক এক বৃক্ষের তলে এক এক দিন শয়নে"র 'রূপকথা' এখন পয়ারী পুঁথির ঠাকুরদাদাদের ঝুলির মধ্যে থাকাই ভাল— আজকালকার নবীনযুগে সে-সকল কথা চলে না।

আবার অন্য প্রণালীতে ''ঠকা-জিতা''র অঙ্গ কষিতে গিয়া দেখি, শ্রীরূপ-সনাতনের এক এক বৃক্ষের তলে এক এক দিন শয়ন, 'শুষ্ক চানা রুটী ভক্ষণে'র সহিত পাল্লা দেওয়া ত' মন্দ নহে,—শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের নবদ্বীপের ধর্ম্মশালার পায়খানায় প্রবেশ (?) বা মড়ার পরিত্যক্ত কাপড় (?) পরিধান কিংবা অপক্ব তণ্ডুল ভক্ষণের (?) সহিত পাল্লা দিলেও ত' আমার লভ্যাংশে অধিক থাকে—অনেক প্রতিষ্ঠা, গোপনে অনেক কামিনী, কনক সংগ্রহ করা যায়, তখন 'ঠকা-জিতা'র অঙ্ক-কষার ফল আমাকে শ্রীরূপ-সনাতন বা শ্রীল গৌরকিশোর প্রভৃতির প্রতি একটি মুখভঙ্গীকারী মর্কট করিয়া তোলে।

আমরা কেবল খাটিয়া দেই, আর যাঁ'রা সেয়ানা', তাঁ'রা যত অভিনন্দনের অগ্রভাগ আত্মসাৎ করেন। ইহা দেখিয়া দেখিয়া আমার আর 'উৎসাহ' থাকে না। 'উৎসাহ' থাকিবেই বা কেন? যে-জন্য উৎসাহ, তাহারই অভাব হইলে উৎসাহ কিরূপে থাকিবে? আমার উৎসাহ ও উদ্যম ছিল—আমার ''ঠকা-জিতা'র মূলধন লইয়া। আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণ—আমার সুখ-সুবিধা-প্রতিষ্ঠাই যদি এত কম হইল, তবে আর উৎসাহ থাকিবে কিরূপে? যদি প্রকৃত আত্মবস্তুর সেবায় উৎসাহী হইতাম, তাহা হইলে ত' অজস্র প্রতিবন্ধকে—বাধা-বিপত্তিতে মহীশূরের প্রতিহত স্রোতা কাবেরী হইতে সমুত্থিত কৃষ্ণরাজবাগরের ন্যায় আমার উৎসাহ-উৎস-বেগ আরও সহস্র অশ্ব-শক্তিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত।

আমি ত' আমার ইন্দ্রিয়ের লাভ-লোকসানের খতিয়ান লইয়াই প্রমত্ত থাকিলাম—অন্যমনস্ক রহিলাম—অভূতপূর্ব্ব অমন্দোদয়-দয়াবতার অতিমর্ত্ত্য আচার্য্যের কথা শুনিলাম কৈ? বুঝিলাম কৈ? তাঁহার গতিবিধি, অনুধাবন ও অনুসরণ করিলাম কৈ? আমি তাঁহার কীর্ত্তিত পথের ঠিক বিপরীত পথে চলিয়াছি, আর উহাকেই তাঁহার প্রদর্শিত পথ মনে করিয়া রাখিয়াছি। আমার হরিসেবার্থ চেতনের আত্মবৃত্তির প্রগতি কোথায়? হৃদয় একঘেয়ে, রুদ্ধ, পচা, দুর্গন্ধ পানা- পুকুরের মত শত শত অনর্থের বীজাণু পরিপূর্ণ—আমি আচার্য্যের কোন কথাই বুঝি নাই—তাঁহার প্রদর্শিত পথে এক পা'ও প্রদান করি নাই—তাঁহার মন্দিরের দ্বারেও আসিতে পারি নাই; আমি 'ঠকা-জিতা'র অর্থনীতি লইয়া ব্যস্ত আছি বলিয়া তিনি আমার নিকট একজন মস্ত বঞ্চক সাজিয়াছেন —পরমার্থ-নীতি হইতে আমি সম্পূর্ণ দূরে রহিয়াছি, এ কথা ইঙ্গিতে আচার্য্য খুলিয়া বলিলেও আমি ঠকা-জিতার গুটীই কাঁচা-পাকা করিতেছি।

ধারকরা কথায় কতক্ষণ 'দম' রাখা যায়? —ধার করা বুলিতে কতক্ষণ নিজের ধৈর্য্য স্থৈর্য্য রাখা যায়?—ধার করা কথায় কি কখনও আচরণ ও উপলব্ধির নিদর্শন পাওয়া যায়? শ্রৌত উপলব্ধির কথাই এক, আর ধার করা বুলিই এক। শ্রৌত উপলব্ধির বাণীর মধ্যে জড়ীয় ভাষা, ছন্দ, সাহিত্য, ব্যাকরণের রূপসী মূর্ত্তি না থাকিলেও তাহা সঞ্জীবনী শক্তিতে লক্ষ্য-ভেদ করিতে পারে—জীবনহীনকে 'জীবন' দান করিতে পারে— রুদ্ধচিত্ত-সরোবরে চৈতন্যসেবার স্রোত-সহস্রধারা প্রবাহিত করিতে পারে, লোককে নিজ-আচরণের অমোঘশক্তি-সঞ্চারে আচরণশীল করাইতে পারে। যেখানে 'আচরণ' ও 'বাণী' পৃথক্ নহে, সেখানে আচরণই—বাণী, বাণীই আচরণরূপে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া সেবা-গঙ্গোত্রী প্রকাশ করিয়াছে।

'আচরণ' নাই, কেবল বাক্যবাগীশতা, 'প্রাণ' নাই, কেবল অঙ্গভঙ্গী, আত্মবৃত্তির কোন উন্মেষ নাই, কেবল দেহ ও মনের ব্যায়াম-প্রদর্শন দ্বারা কখনও কি আত্মোপকার বা পরোপকার হইতে পারে? ঐ সকলের দ্বারা কেবল নিজে ঠকা যায় ও অপরকে ঠকান যায়। তাহা কখনই আচার্য্যের প্রদর্শিত পথ বা শিক্ষা নহে।

ইন্দ্রিয়ের 'ঠকা-জিতা', লইয়াই আমি ব্যস্ত থাকিলাম, কিন্তু প্রকৃত লাভের জন্য ব্যাকুল হইলাম কৈ? কৃষ্ণান্বেষণ, কৃষ্ণপ্রীতি অনুসন্ধানের পরিবর্ত্তে মাঝপথে আমার বিবিধ ভোগান্বেষণ; আমার ইন্দ্রিয়-প্রীতি অনুসন্ধানের বহুরূপীকে দেখিয়াই সকল কথা অন্তরাত্মায় ভুলিয়া গেলাম—বাহিরে কেবল বুলি ও অভিনয়-দোরস্ত রাখিলাম। অপরের ছিদ্রান্বেষণ করিতে গিয়া নিজের ছিদ্রের উপরে যবনিকা টানিলাম, ধারকরা বদহজমী বিচারের দ্বারা অপরের দোষ-গুণ বিচার করিতে গিয়া আত্মবিচারের মুখ আচ্ছাদন করিলাম। ধ্রুব কাচমণি অন্বেষণ করিতে আসিয়া চিন্তামণির খোঁজ পাওয়ায় কাচমণি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক চিন্তামণিরই চিরগ্রাহক হইয়াছিলেন, আর অধ্রুব আমি চিন্তামণির অন্বেষণের অভিনয় করিয়াও—চিন্তামণির খণির রাজকীয় পথের খোঁজ পাইয়াও কাচমণির মোহে আসল বস্তু হারাইলাম। আনুকরণিক বুলি-মাত্রে চাখড়ি-গোলা ও দুধ, শ্যামাঘাস ও ধান, সোনা ও ক্যামিকেলের দৃষ্টান্ত বলিতে বলিতে নিজেই দুধ ফেলিয়া চাখড়ির গ্রাহক হইলাম, ধান ছাড়িয়া শ্যামাঘাসকে বরণ করিলাম, সোনা ফেলিয়া ক্যামিকেলকে আঁচলে বাঁধিলাম। এই ত' আমার 'ঠকা জিতা'র হিসাব-নিকাশের ফলাফল।

আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বঞ্চিত দলের অপেক্ষা আমাকে অধিক 'চতুর' সাজাইতে গিয়া আমি ঐ সকল বঞ্চিতগণ অপেক্ষাও অধিকতর বঞ্চিত হইলাম। আত্মরক্ষার কবচগুলিকেই আত্মহত্যার অস্ত্র করিয়া ফেলিলাম। সর্ব্বোচ্চতম আদর্শের কথা শ্রবণের অভিনয় করিয়া সর্ব্বনিম্নতম—এমন কি, দুর্নৈতিক, বিগর্হিত আদর্শকে আমার বরণীয় বিষয় বলিয়া স্থির করিলাম। কৃষ্ণ ছাড়িয়া—শ্রীগুরুপাদপদ্মের অকপট অনুসরণ ছাড়িয়া নিজের 'হারা-জিতা'র হিসাব করিতে গেলে এইরূপই হয়। আর শ্রীকৃষ্ণের সহিত—শ্রীগুরু-বৈষ্ণব পাদপদ্মের সহিত পাল্লা দিয়া (আনুকরণিক হইয়া) নিজের লভ্যাংশ খুঁজিলে কৃষ্ণমায়া জীবকে ঐরূপ উপযুক্ত পুরস্কারই প্রদান করে—বিষ্ণুমায়া জীবকে প্রাকৃত বাউল করিয়া দেয়; আমিও তাহাই হইয়াছি—আমি আজ ইন্দ্রিয়ের হার-জিতের বাউল হইয়াছি। কখনও মনে করিতেছি, যখন হরিভজনের ছলনা করিতে আসিয়াছি, তখন আমার সমগ্র জীবনে আমার ব্যক্তিগত সমগ্র ক্ষুদ্র চেষ্টায় যে-সকল ভোগ পাইতাম না, তাহা যদি কৃষ্ণের সেবার্থ সঙ্ঘবদ্ধ ব্যক্তিগণের বিরাট্ ও প্রবল চেষ্টার দ্বারা অর্জ্জন করাইয়া আমার ভোগ-ভাণ্ডারে জমা করিয়া লইতে পারি, তাহা হইলেই ত' বাজি জিতিলাম। কৃষ্ণের প্রাপ্য, কৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহের প্রাপ্য প্রতিষ্ঠা, উপায়নগুলি যদি কৃষ্ণের সেবার ছলনায়—গুরু-পূজার ছলনায়—গুরু-কৃষ্ণের গৃহে প্রবেশের অভিনয় দেখাইয়া মেকী পূজকের শালগ্রামের পৈতা-চুরির ন্যায় আত্মসাৎ করিতে পারি, তবেই লাভের নিক্তিটী আমার দিকে ভারি থাকিল। ঠকা-জিতার সমস্যা সমাধান করিতে গিয়া সর্ব্বদাই ভাবি—কেন শ্রীগুরুদেব হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণসেবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ সকল সেবক আমার সুখ-সুবিধা লইয়াই সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত থাকেন না? এদিকে আমি অন্তরে সেবাগ্রহণের বিরাট্ প্রবৃত্তি লইয়া বাহ্যে ভোগস্পৃহা-হীনতা বা উদাসীনতার

অভিনয় প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ করিতে থাকি, আর শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ তাঁহাদের অন্যান্য সকল কৃত্য পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বক্ষণ আমার সুখ-সুবিধার মালমসলার সরবরাহ ও উহার অনুসন্ধানার্থই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকুন। যখন দেখি, তাঁহারা আমার সুখ- সুবিধার প্রতি তত মনোযোগী হইলেন না—তাঁহারা আমার দিকে তাকাইলেন না, তখন আমি অন্তরে তাঁহাদের বিরুদ্ধে লক্ষ শ্লোকের মহাভারত (?) রচনা করিয়া—"বুক ফাটে ত' মুখ ফাটে না" এই ভীষণ যন্ত্রণাময়ী অবস্থায় পতিত হইয়া নিজের বুঝ বুঝিবার জন্য—নিজের লাভের তৌলদণ্ডটী লইয়া সরিয়া পড়ি। দূর ছাই! তোমরা যখন আমার ইন্দ্রিয়যজ্ঞের ইন্ধনই যোগাইলে না, তখন তোমাদের দলে কে থাকে?—আমার আখেরের বন্দোবস্ত আমি নিজেই করিয়া লইব। আমার দাঁড়ে ছোলার জন্যই ত' তোমাদের দলে ঢুকিয়াছিলাম—তোমাদের ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলাম; যদি তাহাই না হইল, তখন আমার ভোগের ঘর ছাড়ি কেন?

আমি জানি, গুরুবৈষ্ণব আমার নিকট কোন্ কোন্ জায়গায় 'ঠেকা' আছেন। কাজেই সেই সকল জায়গায় আমাকে তাঁহাদের তোষামোদ করিতেই হইবে—সেই সময় আমিও আমার লভ্যাংশ আদায় করিয়া লইতে পারিব—আমি যত কিছুই অন্যায় করি না কেন, দায়ে পড়িলে তাঁহাদিগকে আমার পায়ে ধরিতেই হইবে! বঞ্চনার যুপকাষ্ঠে গলা পাতিতে চাহিলে এইরূপই বুদ্ধি হয়। ধন্য মায়াদেবী! তোমার বিশ্ববিস্তারিণী বঞ্চনা-বিদ্যা! অকৈতব হরিভজন এত গুহ্যতম সম্পুট-মধ্যে সংরক্ষিত বলিয়াই বুঝি তাঁহার এত মূল্য—কোটি মুক্ত-মধ্যে তাই কৃষ্ণভক্ত সুদুর্ল্লভ।

আমি আমার ইন্দ্রিয়ের হার-জিতের অঙ্ক কষিতে গিয়া আমার দুর্দ্দশার কথা সব ভুলিয়া গিয়াছি। আমার কি ভ্রম! মনে করিয়াছি, কৃষ্ণসেবায় আমার লাভ নাই—আমার সঞ্চয় নাই—কৃষ্ণেরই লাভ। কেবল ইন্দ্রিয়-সেবায়ই আমার লাভ! মুখে কিন্তু ঠিক আছি, কৃত্রিম মুদ্রায় বাহির-দোরস্ত আছি, কিন্তু কার্য্যকালে আমার ঐরূপ চিত্তবৃত্তির কার্য্য ব্যতীত আর কিছুই নাই।

আমি মনে করিয়াছি,—সম্ভোগময় চিন্তাস্রোত পরিপোষণেই লাভ, কিন্তু গৌরজনগণের চিন্তাস্রোত—"জীবের পক্ষে অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ বা কৃষ্ণানুসন্ধানে নিরন্তর অতৃপ্তিময়ী চিত্তবৃত্তিই পরম মঙ্গল-লাভের পথ।" আমি কর্ম্মবুদ্ধিতে অর্থাৎ অন্তরে ফল-কামনা শরীর ও মনকে নিয়োগ করি বলিয়াই যেন হরিসেবা-ছলনার চুক্তি-কাজ করিবার পর ধরাকে সরা-জ্ঞান করি, গুরু-সেবকগণকে আমার পরিচর্য্যার উপকরণ বিচার করি, তাঁহাদের উপর হুকুম চালাই, আমার সেবায় একটুকু ত্রুটী হইলে আর রক্ষা থাকে না। তখন আর আমাকে পায় কে? সকলে সভয়ে সকল উপকরণ লইয়া আমার সেবায় নিযুক্ত হউক্—আমি অন্তরে এই ভাব পোষণ করি। "আমার উপর বীজনযন্ত্র প্রবাহিত হউক্—আমার পদ-সেবায় পরের হস্ত প্রসারিত হউক্—আমার ভোগের জন্য উৎকৃষ্ট ও বিশিষ্ট নৈবেদ্য প্রস্তুত হউক"—এই সকল বহু প্রচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষা আগ্নেয়গিরির মত আমার অন্তরকে অধিকার করে। তখন যদি কেহ কোন প্রকার হরিসেবার বা হরি-কীর্ত্তনের অবসর উপস্থিত করেন, তখন আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠি—এত খাটুনির পর আবার হরিকথা! যাও

পারিব না—আর বকর বকর করিতে পারি না—আমার ক্রোধাগ্নির নিকট তখন আমার চতুস্পার্শ্বস্থিত সেবকগণ ক্ষুদ্র সলভপ্রায় হইয়া সভয়ে অবস্থান করে। আহা! আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রত্যক্ষ আদর্শ হইতে আমার এই চিত্তবৃত্তি কত তফাৎ, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিয়া লাভ-লোকসানের পরিমাপ করিয়াছি কি?

আমি আমার মক্কেলের তোষামোদে—পরিচর্য্যার—আদর-আপ্যায়নে যতটা ব্যস্ত, অপরের কোন ব্যক্তির জন্য অনেক সময় মতলব করিয়াই যেন ততটা উদাসীন। ইহার কারণ কি? এখানেও কি আমার লাভ-লোকসানের জমা-খরচ? আমি বুঝিয়া রাখিয়াছি এবং সেরূপভাবেই আমার প্রকৃতি গঠিত হইয়া পড়িয়াছে যে, যদি আমি আমার মক্কেলের জন্য সময় ও শক্তিপ্রদান করি, তাহাতে তাঁহার নিকট হইতে যে রসদ পাওয়া যাইবে, উহার লভ্যাংশ আমার—তাহাতে আমার প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি হইবে; কিন্তু অপরের কোনও ব্যক্তির জন্য সময় ও শক্তি প্রয়োগ করিলে অপরে আমার পরিশ্রমের দ্বারা ফলপ্রাপ্তি- কালে প্রতিষ্ঠার ভাগরূপ লভ্যাংশটী পাইলে আমার তাহাতে লোকসান ব্যতীত লাভ কিছুই নাই! অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণের সেবায় সকলেরই সমান স্বার্থ—কৃষ্ণই সকল ফলের প্রাপক—শ্রীগুরুপাদপদ্মের এই শিক্ষা হইতে বিচ্যুত হওয়ায় আমার ব্যক্তিগত ঠকা-জিতার হিসাব-নিকাশ করিতে গিয়া আমার এইরূপ যে সহস্র সহস্র চিত্তবৃত্তি হইয়াছে, তাহাকে 'সেবা' বলিব, না অত্যন্ত কপটতাপূর্ণ 'কর্ম্ম' ফলভোগবাদ' বলিব? এই জন্যই সে-দিন শ্রীগুরু-পাদপদ্ম আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আমার সকল কার্য্যই—সকল চেষ্টাই 'কর্ম্ম' হইয়া পড়িতেছে; আমি শ্রীগুরুদেবের কোনও কথাই শুনি নাই—বুঝি নাই— শ্রীগুরুদেবের পথ দিয়াই যাই নাই—কেবল আমার ইন্দ্রিয়ের পথ দিয়া ইন্দ্রিয়কে 'গুরু' করিয়া চলিয়াছি। তাই বলিতেছিলাম—আমি ত' একযুগ যাবৎ নানা প্রকার অভিনয় করিতেছি; সত্য সত্য ভাবিয়াছি কি—'আমি ঠকিলাম, না জিতিলাম'?

মহাভাগবত মুনিবাহন

ভগবদ্ ভক্ত ভগবানের অচ্ছেদ্য অঙ্গ-স্বরূপ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব মহারাজকে নিজ-মুখে বলিয়াছেন (ভাঃ ১১।১৪।১৫)—

> ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
> ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্।।

হে উদ্ধব, ব্রহ্মা পুত্র হইয়াও আমার সেরূপ প্রিয়তম নহে, শঙ্কর আমার স্বরূপ-ভূত হইয়াও সেরূপ প্রিয়তম নহে, সঙ্কর্ষণ ভ্রাতা হইয়াও সেরূপ প্রিয়তম নহে, লক্ষ্মী ভার্য্যা হইয়াও সেরূপ প্রিয়তম নহে, অধিক কি, আমার নিজ- শ্রীবিগ্রহও সেরূপ প্রিয়তম নহে—যেরূপ তুমি অর্থাৎ ভক্ত আমার প্রিয়তম।

এই ভক্ত বা বৈষ্ণব ভগবদিচ্ছায় যে-কোন কুলে, যে-কোন দেশে, যে-কোন রূপে, যে-কোনও অবস্থায় জগতে জগন্মঙ্গল-বিধানের জন্য অবতীর্ণ হইতে পারেন, তাহাতে তাঁহার বৈষ্ণবত্বের কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। ইহা সমস্ত শ্রৌতশাস্ত্র সমস্বরে কীর্ত্তন করেন।

যথা সৌমিত্রিভরতৌ যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ।
তথা তেনৈব জায়ন্তে মর্ত্ত্যলোকং যদৃচ্ছয়া।।

যিনি অকৈতব ভগবদ্ভক্ত ও অকৈতবা ভগবদ্ভক্তির এই নিরপেক্ষতা উপলব্ধি করিয়া অকৈতব ভক্তের আনুগত্যে অকৈতবা ভক্তির অনুশীলন করেন, তিনিই যথার্থ বৈষ্ণবতার পথে চলিয়াছেন।

এই উক্তির সার্থকতা প্রদর্শনের জন্য ভগবান্ বিভিন্ন সময়ে তাঁহার নিজ পার্ষদ-ভক্তকে বিভিন্ন অবরকুলে আবির্ভূত করাইয়া থাকেন। যাহারা সেই সকল ভক্তোত্তমকে জাতি-সামান্যে দর্শন করে, তাহারাই শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষায় "গোখর" বা "দৈবীমায়া-বিমোহিত মতি।" দেহ-গেহাসক্ত, কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত- সম্প্রদায় এই সুদার্শনিক আত্মবিচার ধারণা করিতে পারেন না বলিয়া তাহারা পাপ-পুণ্যের, স্বর্গ-নরকের নাগর-দোলায় সর্ব্বক্ষণ পরিভ্রমণ করিতে থাকেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ ভক্তের মধ্যে যবনকুলে আবির্ভূত ঠাকুর হরিদাস, ভুঁইমালিকুলে অবতীর্ণ ঝড়ঠাকুর প্রভৃতির প্রতি কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তের উপমান-স্বরূপ 'হরিনদী গ্রামের দুর্জ্জন ব্রাহ্মণ', ঢঙ্গবিপ্র, আরিন্দা ব্রাহ্মণ—গোপাল চক্রবর্ত্তী, রামচন্দ্রখান প্রভৃতির এবং অন্তরে অনেক ব্যক্তিরই জাতিসামান্যবুদ্ধিতে অপরাধ ছিল। দেহে আত্মবুদ্ধি এবং দেহগত প্রভুত্বের ইচ্ছা হইতেই অপ্রাকৃত বৈষ্ণবকে 'ছোট' বলিয়া মনে হয়।

বদ্ধজীব দেহকে মাপকাঠি করিয়াই ছোট-বড় মাপিয়া থাকে, আর মহামুক্ত পুরুষগণ আত্মার বিকাশ দেখিয়া অপরের উৎকর্ষের তারতম্য বিচার করেন। বদ্ধজীবের চক্ষু দেহ-মনকে অতিক্রম করিয়া আত্মার তটদেশ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে না।

বদ্ধজীবগণের নিকট দেহই সারাৎসারতত্ত্ব-সকল পুরুষার্থের মূলাধার—তাহাদের সর্ব্ব বাঞ্ছার কল্পতরু-সদৃশ। কোনও মহাদেশের সম্রাট্ তাঁহার দেহজাত পুত্রকে অর্থাৎ যুবরাজকে তাঁহার সমস্ত রাজ্য অভিষিক্ত করিলে তাহা সর্ব্বতো- ভাবে সমীচীন বলিয়াই গ্রাহ্য হইবে। কিন্তু সেই যুবরাজ অপেক্ষাও সর্ব্বপ্রকারে যোগ্য ব্যক্তি যদি সেই সময় আসিয়া রাজ-সিংহাসন দাবী করেন, তখন ঐরূপ ব্যক্তি নিশ্চয়ই রাজদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবে। এখানে উক্ত যুবরাজের একমাত্র যোগ্যতা দেহ সম্বন্ধ—যাহাকে ইংরেজী ভাষায় blood relation বলে। কৃষ্ণবিস্মৃত জগতের ইহাই নীতি। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণ দেহ ধর্ম্মাসক্ত হওয়ায় তাহারাও ঐ নীতিরই প্রচারক।

ঐ নীতি জাগতিক ক্ষেত্রে পরিচালিত হউক্, তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু যাহা জগতের অতীত ব্যাপার, সেই ভগবদভক্তিরাজ্যে এই প্রাকৃত নীতিকে অতি ব্যাপ্ত করিলে, অপ্রাকৃত নীতিবিশারদ ভগবদ্ভক্তের সুদর্শন তাহা নিশ্চয়ই প্রতিরোধ করিবে।

দ্রবিড়দেশ ভগবদ্ভক্তের লীলাভূমি। বাসুদেব-পরায়ণ অমলান্তঃকরণ ভক্তগণের নানাপ্রকার চরিত্র-প্রসূন সেখানে প্রস্ফুটিত হইয়া সমগ্র জগৎ সৌরভান্বিত করিয়াছে। এজন্যই ভাগবত (১১।৫।৩৯-৪০) গাহিয়াছেন;

ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ।
তাম্রপর্ণী নদী যথা কৃতমালা পয়স্বিনী।।
কারেবী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী।
যে পিবন্তি জলং তাসাং মনুজা মনুজেশ্বর।
প্রায়ো ভক্ত ভগবতি বাসুদেবেঽমলাশয়াঃ।।

অন্যূন খৃষ্টীয় শতশতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের নিচুলাপুরে (ওরাযুর) নামক স্থানে প্যারেয়া বা চণ্ডালকুলে তিরুপ্পান আলবর আবির্ভূত হন। তিনি বাল্যাবধি হরি- কীর্ত্তনে আসক্ত ছিলেন।

দাক্ষিণাত্যে প্যারেয়া বা চণ্ডালজাতি উচ্চজাতির নিকট অতি হীনচক্ষে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এমন কি, যে-সকল পথ দিয়া ব্রাহ্মণ-জাতি গমন করেন, সেই সকল পথে প্যারেয়াগণের গমনাগমন নিষিদ্ধ। যদিও এখন বৃহৎ সহরের রাজপথসমূহে এইরূপ বিধি প্রতিপালিত হইতে পারে না, তথাপি দাক্ষিণাত্যের অনেক গ্রামে—যেখানে সামাজিক রীতি-নীতির নিগড় খুব দৃঢ়, সে-সকল স্থানে 'প্যারেয়া' জাতি কখনও ব্রাহ্মণের ব্যবহৃত পুকুরে স্নান করিতে পারে না, এক রাস্তায় গমনাগমন করিতে পারে না—রাজপথ দিয়া চলিতে হইলে তাহাদিগকে বহু দূর হইতে 'প্যারেয়া আসিতেছে'—এইরূপ চিৎকার করিতে করিতে চলিতে হয়। যদি দৈবাৎ কোন প্যারেয়ার সঙ্গে কোনও উচ্চ-জাতির সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে প্যারেয়াকে উচ্চজাতির শুদ্ধির জন্য যাবতীয় ব্যয়-বহন করিতে হয় এবং নানাপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত বা দণ্ডভোগ করিতে হয়।

এইরূপ স্মার্ত্ত, সামাজিকগণের অস্পৃশ্য, অদৃশ্য অসম্ভাষ্য, এক অতি নিন্দিত কুলে তিরুপ্পান আলোয়ার প্রকটিত হন। ''আলোয়ার'' কথাটী তামিল ভাষায় একটী শব্দ। তামিল ভাষায় 'আল' অর্থে—শাসন করা 'ওয়ার' অর্থে—কর্ত্তা। সুতরাং ''আলোয়ার'' অর্থে—যিনি নিখিল জগৎ শাসন করিবার অধিকারী। ইহার সহিত 'গোস্বামী, বা শ্রীল রূপ-উপদেশামৃতের—

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ।।

—বাক্যটী সমজাতীয়। শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ে-আলোয়ারগণ নিত্য ভগবৎপার্ষদ, জগদ্গুরু ও পূর্ব্বাচার্য্য-রূপে বৃত হইয়াছেন। চণ্ডালকুলে অবতীর্ণ প্যারিয়া এই আলোয়রগণের অন্যতম হইয়া ব্রাহ্মণকুল-শিখামণি শ্রীলক্ষ্মণদেশিক বা যতীন্দ্র আচার্য্যাগ্রণী শ্রীরামানুজপাদের পূর্ব্বগুরুরূপে শ্রীসম্প্রদায়ের গুরু-পরম্পরায় বিরাজিত রহিয়াছেন।

মহাভাগবত তিরুপ্পান বীণাযন্ত্র-সহকারে অনুক্ষণ শ্রীবিষ্ণুর গুণকীর্ত্তন করিয়া তাঁহার কালক্ষেপণ করিতেন। হরিকীর্ত্তন ব্যতীত তাঁহার অন্য কোনও প্রকার ভজনরীতি ছিল না। তিনি কীর্ত্তনকেই একমাত্র চরম সাধ্য বা একায়ন ভজন-পথ বিচার করিয়াছিলেন। হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকিত না—তাঁহার শ্রীঅঙ্গে অকপট সাত্ত্বিক বিকার-সমূহ প্রকটিত হইত।

কাবেরীর তটে শ্রীরঙ্গনাথের সুবিশাল শ্রীমন্দর। একদিন শ্রীমন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী কাবেরীর তীর্থ-প্রদেশে নিবিষ্টচিত্তে হরিনাম করিতে করিতে তাঁহার বাহ্যদশা লুপ্ত হইল। এমন সময় শ্রীরঙ্গনাথের জনৈক পূজক শ্রীবিগ্রহের অভিষেকের জন্য মহাপুণ্যা কাবেরী হইতে জল আহরণপূর্ব্বক শ্রীমন্দিরের দিকে অগ্রসর হইবার উপক্রম করিয়া দেখিতে পাইলেন,—চণ্ডাল-জাতীয় (?) জনৈক ব্যক্তি পথি-মধ্যে বসিয়া বীণা-বাদন করিতে করিতে নিদ্রিত-প্রায় রহিয়াছে। শ্রীমন্দিরের ব্রাহ্মণ-সেবকটীর নাম—মুনি। মুনি উচ্চৈঃস্বরে ক্রমাগদ তিন চারিবার দূর হইতে পথমধ্যস্থিত ঐ ব্যক্তিটীকে আহ্বান করিলেন এবং সে-স্থান পরিত্যাগার্থ আদেশ দিলেন। কিন্তু তিরুপ্পান অন্তর্দশায় এতদূর নিবিষ্ট ছিলেন যে, পূজারী ব্রাহ্মণের কোনও বাহ্য শব্দই কর্ণে প্রবিষ্ট হইল না। ব্রাহ্মণ বিচার করিলেন,—"চণ্ডালের আস্পর্দ্ধাটা কিরূপ! একে ত' সে ব্রাহ্মণের গমনা-গমনের পথে বসিয়াছে, আবার বিষ্ণুর পূজার ব্যাঘাতকারক হইয়া নিদ্রিত রহিয়াছে! ব্রাহ্মণ ও নারায়ণের প্রতি নীচজাতির এইরূপ বিচার করিতে করিতে উক্ত ব্রাহ্মণ অন্তর্দশায় আবিষ্ট মহাভাগবত তিরুপ্পানের গাত্রে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া তিরুপ্পানের নিদ্রাভঙ্গ করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং একটী লোষ্ট্র নিক্ষেপপূর্ব্বক কঠোর ভাষায় তিরুপ্পানকে সাবধান করিয়া দিলেন। লোষ্ট্রের আঘাতে (?) বাহ্যদশা লাভ করিয়া তিরুপ্পান যখন দেখিলেন যে, তিনি শ্রীরঙ্গনাথ-সেবকের পথ অবরুদ্ধ করিয়া আছেন, তখনই তিনি আপনাকে শতধিক্কার এবং পূজকের নিকট স্বীয় অপরাধ-জন্য ক্ষমা-ভিক্ষা করিতে করিতে দ্রুতপদে সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

এদিকে মুনি শ্রীরঙ্গনাথের শ্রীমন্দিরের দ্বারদেশে আসিয়া যখন শ্রীমন্দির- দ্বারে প্রবেশ করিবেন, তখন দেখিলেন যে, মন্দির-দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ। মুনি একে একে প্রত্যেক সেবকের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন এবং দ্বার খুলিয়া দিবার জন্য বারংবার বলিতে লাগিলেন। কিন্তু দ্বার খুলিবে কে? মন্দিরের অভ্যন্তরে তখন কোনও পূজকই ছিলেন না, আর থাকিলেও বা তাঁহারা কি করিতে পারিতেন? এ দ্বার রুদ্ধ করিয়াছেন যে স্বয়ং শ্রীরঙ্গনাথ। তাঁহার ভক্তকে—তাঁহার নিজ-অঙ্গকে যাহারা সাধারণ মনুষ্য-সামান্য—জাতি- সামান্যে দর্শন করিয়া সেই ভক্তের প্রতি অবমাননা করে, সেইরূপ অপরাধীর 'দ্বারমানা'—সেইরূপ অপরাধী কখনই নারায়ণের অর্চ্চনের অধিকারী নহে।

অকস্মাৎ শ্রীমন্দিরের দ্বার কে এরূপভাবে রুদ্ধ করিল, কেহই ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। মুনির পুনঃ পুনঃ দ্বারে করাঘাত ও উচ্চ আহ্বানের শব্দে যাবতীয় সেবক তথায় আসিয়া সমবেত হইলেন। ভিতরে কোনও পূজক নাই, অথচ দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া সকলেই বিশেষ ভীত হইলেন। তাহা হইলে কি কোন

দস্যু অথবা বিধর্ম্মী শ্রীবিগ্রহের অলঙ্কারাদি অপহরণ বা শ্রীবিগ্রহের প্রতি অসম্মানার্থ মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিল? কি উপায় হইবে? এদিকে প্রভুর স্নানের সময় অতিক্রান্ত হইয়া যাইতেছে। কি করা যাইবে? দ্বার ভাঙ্গিয়া মন্দিরে প্রবেশ করা কি সমীচীন? মুনি তখন ভাবিতে লাগিলেন,—হয় ত' তাঁহারই কোনও বিশেষ অপরাধ হইয়া থাকিবে—যাহার জন্য শ্রীরঙ্গনাথই স্বয়ং দ্বাররুদ্ধ করিয়া থাকিবেন। তাঁহার এমন কি অপরাধ সম্ভাবনা? তিনি ত' অতি যত্নসহকারে, বিশেষ পবিত্রতা-সংরক্ষণ-পূর্ব্বক রঙ্গনাথের অর্চ্চন করিয়া থাকেন। রঙ্গনাথের চরণে তাহার ভক্তিশ্রদ্ধাও ত' যথেষ্ট রহিয়াছে। তবে কেনই বা রঙ্গনাথ রুষ্ট হইবেন? কি জানি যদি তাঁহার অজ্ঞাতসারে কোনও অপরাধ হইয়া থাকে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তিনি যুক্তকরে গললগ্নী-কৃতবাসে তাঁহার অজ্ঞাত অপরাধের জন্য শ্রীরঙ্গনাথের উদ্দেশ্যে ক্ষমা-ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। পূজকের দুই চক্ষু দিয়া অনুতাপাশ্রু নির্গত হইতে থাকিল। মুনি বলিতে লাগিলেন,—"শ্রীমন্দিরে দস্যুই প্রবিষ্ট হউক, আর বিধর্ম্মীই গমন করুক, নিশ্চয়ই আমার অপরাধের দরুণ হইবে। প্রভো, এমন কি অপরাধ করিলাম, যাহার জন্য আমার প্রতি শ্রীমন্দির দ্বার রুদ্ধ হইল? কি অপরাধ হইয়াছে, জানিতে পারিলে আমি যথাসাধ্য সংশোধন করিতে চেষ্টা করিব। কৃপা-পূর্ব্বক আমার অপরাধের কথা বলিয়া দিন। আপনি ত' অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে পুনরায় নিজ-পূজায় অধিকার দেন। আপনি ত' অদোষদর্শী, আমার কি অপরাধ হইয়াছে এবং তজ্জন্য কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, কৃপা-পূর্ব্বক বলুন।"

এইরূপভাবে মুনি বহুক্ষণ ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিন্তু মন্দিরের দ্বার সমভাবেই রুদ্ধ, ভিতর হইতে কোন উত্তর নাই। মুনি তখন আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং মন্দির-দ্বারে মস্তক-আঘাত করিতে করিতে ক্ষমা-ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। সমবেত অন্যান্য পূজকগণও শ্রীরঙ্গনাথের প্রসন্নতার নিমিত্ত বহুভাবে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপভাবে বহুক্ষণ অতিবাহিত হইলে শুনিতে পাওয়া গেল,—কে যেন মন্দিরের অভ্যন্তর হইতে বলিতেছেন,—"মুনি আজ আমার অঙ্গে লোষ্ট্রাঘাত করিয়াছে, সুতরাং আজ তাহার দ্বারমানা, আমি আর তাহাকে আমার নিকট কখনও আসিতে দিব না, সে আমার পূজার সম্পূর্ণ অনধিকারী।"

মুনি ইহা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—"প্রভো, আমি আপনাকে কখন লোষ্ট্রাঘাত করিয়াছি? এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি আমার জ্ঞান-থাকা-সত্ত্বে কখনই হইতে পারে না। প্রভো, আমি আপনার বাক্যের তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

রুদ্ধ মন্দিরের অভ্যন্তর হইতে তখন কেউ উত্তরে বলিলেন,—"কাবেরী-তীর্থে যে মহাপুরুষ বীণাহস্তে আমার নাম সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন, তুমি তাঁহাকে 'চণ্ডালজাতি' মনে করিয়াছ! তিনি আমার অঙ্গস্বরূপ। তাঁহাকে চণ্ডালজাতি মনে করায় আমাকেই চণ্ডাল বলা হইয়াছে, আর তাঁহাকে লোষ্ট্র-নিক্ষেপ করায় আমার প্রতিই লোষ্ট্র-নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তুমি আমার হস্তকে, মস্তককে, পাদদেশকে ছেদন করিয়া আমার পূজা করিতে চাহিতেছ। আমার সেরূপভাবে পূজা হয় না। আমার ভক্তকে স্নান করাইলে আমার স্নান হয়,

চণ্ডালকুলে আমারই ইচ্ছায় অবতীর্ণ আমার অকৈতব ভক্তকে স্নান করাইয়া তাঁহার পাদোদক পান করিলে আমার চরণামৃত সেবন করা হয়। যাহারা কেবল আমার পূজা-ছলনা দেখায়, কিন্তু আমার ভক্তগণের পূজা করে না, বা তাঁহাদের প্রতি জাতিবুদ্ধি প্রভৃতি করিয়া তাঁহাদের অবমাননা করে, তাহারা দাম্ভিক; তাহারা আমার পূজক নহে—আমার বিদ্বেষী। আমার সেবকের যিনি সেবক, তিনিই আমার প্রকৃত সেবক। আমার সেবককে আমি যে-কোনও কুলে অবতীর্ণ করাইয়া জগতে ভক্তের অসমোর্দ্ধ মহিমা প্রচার করিয়া থাকি। আমি হনুমানকে কপিকুলে; প্রহ্লাদ, বলিকে দৈত্যকুলে অবতীর্ণ করাইয়াছিলাম বলিয়া তাঁহারা বানর বা দৈত্য নহে। আমার ইচ্ছায় গুহক 'চণ্ডাল'-কুলে প্রকটিত হইয়াছিলেন বলিয়া গুহক 'চণ্ডাল' নহে। তাঁহাদিগকে আমি মস্তকে ও বক্ষে ধারণ করি। আমার প্রতি অপরাধ আমি সহজেই ক্ষমা করি, কিন্তু আমার ভক্তের প্রতি অপরাধ আমি কখনও ক্ষমা করিতে পারি না—তবে আমার অদোষদর্শী ভক্ত যদি কৃপা করিয়া ক্ষমা করেন, তবেই আমি তাঁহার অনুরোধে—তাঁহার জন্য ক্ষমা করিতে পারি। অতএব তুমি চণ্ডাল-কুলে অবতীর্ণ—আমার ভক্তকে ব্রাহ্মণকুলজাত তোমার অপেক্ষা নিকৃষ্ট বিচার করিয়া যে অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়াছ, তাহা হইতে যদি নিষ্কৃতি লাভ করিতে পার, তবেই আমি আমার মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিব, নতুবা অন্য কোন প্রকারে আমি প্রসন্ন হইব না। তুমি আমার উক্ত ভক্তকে তোমার স্কন্ধে বহন করিয়া তাঁহার চরণে ক্ষমা-ভিক্ষা করিতে করিতে মন্দির-প্রদক্ষিণ করিলে আমি মন্দির উন্মুক্ত করিব, নতুবা নহে।"

শ্রীরঙ্গনাথের এই আদেশ-বাণী শ্রবণ-মাত্র মুনি উন্মত্তের ন্যায় দ্রুতবেগে কাবেরী-তীর্থের দিকে ধাবিত হইলেন এবং তিরুপ্পানকে তথায় দেখিতে পাইলেন। মুনি তিরুপ্পানের নিকট যেই করযোড়ে গললগ্নীকৃতবাসে ক্ষমাভিক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন, অমনি তিরুপ্পান দূরে সরিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন, —"আমি অতি হীন চণ্ডাল, আমি যে অপরাধ করিয়াছি, তজ্জন্য আপনি দূর হইতেই লোষ্ট্রাদির দ্বারা আমার শাস্তি-বিধান করুন। চণ্ডালকে হস্তাদির দ্বারা স্পর্শ করিয়া আপনার পবিত্র ব্রাহ্মণদেহকে অপবিত্র করিবেন না।"

শ্রীরঙ্গনাথের আদেশ-প্রাপ্ত 'মুনি' নামক সেই ব্রাহ্মণ তিরুপ্পানের বাক্য শেষ হইতে না হইতেই তিরুপ্পানের শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে নিজ-স্কন্ধোপরি স্থাপন-পূর্ব্বক তিরুপ্পানের চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে করিতে শ্রীরঙ্গনাথের সপ্তপ্রাকার-বিশিষ্ট সমগ্র মন্দিরটী প্রদক্ষিণ করিলেন। তদবধি তিরুপ্পানের নাম হইল—"মুনিবাহন"। মুনিবাহন শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ে আলোয়ার বা জগদ্গুরুরূপে পূজিত। শ্রীরামানুজাচার্য্য স্বয়ং শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে অবতীর্ণ হইয়াও মুনিবাহনকে পূর্ব্বাচার্য্য গুরুপদে বরণ-পূর্ব্বক তচ্চরণে নিত্য প্রণতি ও ভক্তির নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণবৈষ্ণব মুনিবাহনকে ব্রাহ্মণগুরু বলিয়া তচ্চরণে ভক্ত্যঞ্জলি প্রদান করেন।
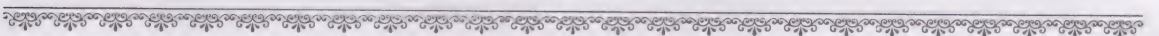
শক্তিতত্ত্ব

শক্তিতত্ত্বটী বড়ই জটিল। একমাত্র গৌরকৃষ্ণ-করুণাশক্তি শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা ব্যতীত বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, গ্রন্থাধ্যয়ন প্রভৃতি দ্বারা তাহাতে জীবের প্রবেশাধিকার ঘটে না। এ জন্য শ্রৌতসিদ্ধান্তই আমাদের অনুশীলনীয়।

শক্তিতত্ত্বের মধ্যে চিচ্ছক্তি ও জড়শক্তি—এই উভয়ের প্রকার শ্রুত হইয়া থাকে। চিচ্ছক্তির অপর নাম—যোগমায়া', জড়শক্তির নাম—'মহামায়া' বা 'জড়মায়া'।

যোগমায়া বদ্ধ-জীবের ভোক্তৃবুদ্ধি-প্রসূত আবরণ ও বিক্ষেপাত্মক উপাধি-দ্বয় অপসারণ করিয়া নিরুপাধি কৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তির সহায়তা করেন, আবার সেই যোগমায়াই অন্যমূর্ত্তিতে ঈশ-বিমুখ জীবগণের ভোগ্যারূপে উদ্দিষ্ট হইবা-মাত্রই তাহাদের মোহ উৎপাদন করিয়া তাহাদিগকে প্রপঞ্চে এই ভবদুর্গে ভ্রমণ করাইয়া শাস্তি প্রদান করেন। প্রাপঞ্চিক ভোগ্য জড়ব্যোমে বদ্ধজীবের তাৎকালিক ভোক্তৃবুদ্ধিজনিত মূঢ়তায় আবদ্ধ হইবার যোগ্যতা বর্ত্তমান। নিত্য-ভূমিকা পরব্যোমে অজ্ঞান, অনুপাদেয়তা, পরিচ্ছেদ প্রভৃতি ধর্ম্মের অনবস্থান-হেতু তথায় যোগমায়া ভগবৎ সেবানুকূলবৃত্তিযুক্তা হইলেও ঈশ-বিমুখ বদ্ধজীবগণের প্রাপঞ্চিক ভোক্তৃবিচারফলে তাহাদের ভগবৎসেবন প্রতিকূলা বিবর্ত্ত-বুদ্ধি উৎপাদন করিয়া বিমোহিত করিয়া থাকেন।

লক্ষ্মী ও সরস্বতী প্রভৃতি ভগবচ্ছক্তি-সমূহের ছায়ারূপিণী মায়া ও তদীয় বৈভবসমূহ ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণকারী ভগবদ্‌বিমুখ বদ্ধজীবগণকে জড় আধ্যক্ষিক-জ্ঞান প্রদানপূর্ব্বক বিজ্ঞানের বিপরীত অজ্ঞান-জাল বিস্তার করে। পরব্যোমস্থা স্বরূপশক্তি-স্বরূপিণী যে-সকল অন্তরঙ্গা মহালক্ষ্মীগণের ছায়া-রূপিণী বহিরঙ্গা মায়ার বৈভব-সমূহে বহির্ম্মুখ জীবগণ বিমুগ্ধ, তাঁহারাও ভগবানের পরমৈশ্বর্য্য দর্শন-বিমুগ্ধা হইয়া আপনাদিগকে ভগবৎকিঙ্করীজ্ঞানে নিত্য ভগবদিচ্ছা-পরতন্ত্রা ও নিরন্তর ভগবদ্দাস্যে নিরতা থাকেন। ভগবানের পরম সন্তোষের নিমিত্ত দাস্যরসেই তাঁহার সেবা করেন; আবার ভগবদ্‌বিমুখ জীবের অধিক পরিমাণে মোহ উৎপাদন করিবার জন্য প্রাপঞ্চিক-বিচারে তাহাদের কর্ম্মফল-প্রদাত্রী মায়ারূপেও দৃষ্ট হন। (ভাঃ ১।৭।৪-৫) 'অপশ্যৎ পুরুষং—পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রিতম্। যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্। পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে। অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্‌ভক্তিযোগমধোক্ষজে।।'

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে মহালক্ষ্মী শ্রীকৃষ্ণমহিষী ও ব্রজগোপীগণের তত্ত্ববর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীল জীবপ্রভুপাদ বলিয়াছেন, —"দ্বিতীয়ে ভগবৎ-সন্দর্ভে খলু পরমাত্মন শ্রীভগবন্তং নিরূপ্য তস্য শক্তিদ্বয়ী নিরূপিতা। তত্র প্রথমা শ্রীবৈষ্ণবানাং শ্রীভগদুপাস্যা তদীয়স্বরূপভূতা,—যন্ময্যেব খলু তস্য সা ভগবত্তা; দ্বিতীয়া চাথ তেক্ষং জগদ্বদুপেক্ষণীয়া মায়া-লক্ষণা,—যন্ময্যেব খলু তস্য সা জগত্তা। তত্র পূর্ব্বস্যাং শক্তৌ শক্তিমতি ভগবচ্ছব্দবল্লক্ষ্মীশব্দঃ প্রযুজ্যত ইত্যপি দ্বিতীয়ে এব দর্শিতম্। * * * তত্র দ্বয়োরপি পূর্য্যোঃ শ্রীমহিষাখ্যা জ্ঞেয়া। মথুরায়ামপ্য প্রকটলীলায়াং শ্রুতৌ রুক্মিণ্যাঃ প্রসিদ্ধেরন্যাসামুপলক্ষণাৎ। শ্রীমহিষীণাং তদীয়-স্বরূপ-শক্তিত্বং * * * স্বরূপভূতত্বং স্ফুটমেব দর্শিতম্। তদেবং তাসাং স্বরূপশক্তিত্বে লক্ষ্মীত্বং সিদ্ধ্যত্যেব। * * *

ইত্থং শ্রীপট্টমহিষীণাস্তু তৎস্বরূপশক্তিত্বং কৈমুত্যেনৈব সিদ্ধ্যতি। * * * তথা (ভাঃ ১০।৬০।৯—) 'তাং রূপিণীং শ্রিয়ম্' ইত্যাদৌ "যা লীলয়া ধৃততনোরনুরূপরূপা" ইতি,—স্পষ্টম্। অতঃ স্বয়ং ভগবতোঽনুরূপত্বেন স্বয়ং লক্ষ্মীত্বং সিদ্ধমেব। * * * ততশ্চ বৈকুণ্ঠপ্রসিদ্ধায়া লক্ষ্ম্যা অন্তর্ভাবাস্পদত্বাদেষৈব লক্ষ্মীঃ সর্ব্বতঃ পরিপূর্ণেত্যর্থ। * * * তস্মাচ্ছক্তি-শক্তি মতোরত্যন্ত ভেদাভাবাদেবোপমানোপমেয়ত্বাভাবে সাদৃশ্যাভাব ইতি ভাবঃ। (ভাগবত ১০।৬০।৪৪)—"আত্মন্ রতস্য ময়ি চানতিরিক্ত-দৃষ্টেঃ" ইতি রুক্মিণী-বাক্যে) —নন্বাত্মরতস্য মম কথং ত্বয়ি রতস্তত্রাহ,—অনতিরিক্তদৃষ্টেঃ—শক্তিমত্যাত্মনি শক্তৌ চ ময্যনতিরিক্তা পৃথক্‌ভাবশূন্যা দৃষ্টির্যস্য শক্তি শক্তি মতোরপৃথগ্বস্তুত্বাদ্ দ্বয়োরপি মিথো বিশিষ্টতয়ৈবাবগমাদ্ বা যুজ্যতে এব ময্যপি রতিরিরিতি ভাবঃ।" অর্থাৎ দ্বিতীয় (ভগবৎ) সন্দর্ভে শ্রীভগবান্‌কে পরম-তত্ত্বরূপে নিরূপণ করিয়া তাঁহার দুইটী শক্তি নিরুপিতা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমটি—শ্রীবৈষ্ণবগণের নিকট সাক্ষাৎ শ্রীভগবত্তুল্য উপাসনার যোগ্যা তদীয় (অর্থাৎ ভগবৎসম্বন্ধিনী) স্বরূপভূতা শক্তি; ভগবানের সাক্ষাদ্ ভগবত্তাও এই স্বরূপশক্তিময়ী। দ্বিতীয়টী— শ্রীবৈষ্ণবগণের নিকট জগতের ন্যায় উপেক্ষার যোগ্যা মায়া-লক্ষণা; ভগবানের শক্তি পরিণত জগদ্রূপতাও এই বরিহঙ্গা মায়াশক্তিময়ী। এই শক্তিদ্বয়ের মধ্যে শক্তিমদ্‌বস্তুতে যেমন 'ভগবৎ'-শব্দ প্রযুক্ত হয়, তদ্রূপ প্রথমা স্বরূপ- শক্তিতেও 'লক্ষ্মী'-শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে,—ইহাও দ্বিতীয় (ভগবৎ) সন্দর্ভে প্রদর্শিত হইয়াছে। পুরীদ্বয়ে (মথুরায় ও দ্বারকায়) সেই স্বরূপশক্তিরই 'শ্রীমহিষী' —সংজ্ঞা। তাপনী প্রভৃতি শ্রুতিতে অপ্রকট-লীলায় মথুরায় শ্রীরুক্মিণীর নিত্যাধিষ্ঠান প্রসিদ্ধ বলিয়া তদুপলক্ষণে অন্যান্য মহিষীগণেরও অধিষ্ঠান জানা যায় শ্রীমহিষীগণের তদীয় ভগবৎস্বরূপশক্তির অর্থাৎ স্বরূপভূতত্ত্ব স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে; সুতরাং তাহাদের স্বরূপ শক্তিত্বে লক্ষীত্ব নিশ্চিতরূপে সিদ্ধ হইতেছে। * * এইরূপে শ্রীপট্টমহিষীগণের তদীয় স্বরূপ-শক্তিত্ব স্বতঃই সিদ্ধ হইতেছে। * * ভাগবতে অন্যত্রও (১০।৬০।৯ শ্লোকেও) শ্রীশুকদেবের এরূপ বাক্য বর্ত্তমান; যথা—"লীলাক্রমে বিগ্রহধারী শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ-রূপ-ধারিণী মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীস্বরূপিণী "রুক্মিণীদেবীকে" ইত্যাদি। এই শ্লোকের অর্থ স্পষ্টই। অতএব স্বয়ং ভগবানের অনুরূপ-রূপা বলিয়া রুক্মিণীদেবীর স্বয়ং লক্ষ্মীত্ব নিশ্চতরূপে সিদ্ধ হইতেছে সুতরাং বৈকুণ্ঠেশ্বরীরূপে প্রসিদ্ধা লক্ষ্মীরও অন্তর্ভাবাধার (অর্থাৎ ঐ লক্ষ্মীও ইহাতে অন্তর্ভুক্ত) বলিয়া এই মহালক্ষ্মী রুক্মিণী— সর্ব্বভাবেই পরিপূর্ণা। * * সেই কারণে পরা অথবা স্বরূপশক্তি ও শক্তিমানের অত্যন্ত ভেদাভাব (অর্থাৎ অভেদ)-নিবন্ধন উভয়ের পরস্পরের মধ্যে উপমান ও উপমেয়-সম্বন্ধ থাকিতে পারে না; সুতরাং পরস্পরের মধ্যে (বাস্তব বস্তু ও ছায়া অথবা বিম্ব ও প্রতিবিম্ববৎ বস্তুগত পার্থক্য-জনিত) সাদৃশ্যের অভাব অর্থাৎ অভেদ বা ঐক্যই বর্ত্তমান। * * এইরূপ ভাগবতে অন্যত্রও (১০।৬০।৪৪ শ্লোকেও) স্বয়ং রুক্মিণীদেবীর উক্তি দেখা যায়; যথা—"আপনি—আত্মারাম, আমাতে অনতিরিক্ত (অভিন্ন) দৃষ্টি সম্পন্ন এতাদৃশ আপনার চরণে আমার অনুরাগ হউক।" (এই বাক্যে রুক্মিণী কৃষ্ণের আশঙ্কা বা আপত্তি নিরাস করিতেছেন,—) 'যদি আপনি বলেন,—আমি স্বয়ংই আত্মারাম, তোমার প্রতি আমার রতি কিরূপে সম্ভবে?' তদুত্তরে বলিতেছি, আপনি 'অনতিরিক্ত-দৃষ্টি অর্থাৎ শক্তিমান্ আপনি স্বয়ংই আপনার প্রতি এবং স্বরূপ শক্তিরূপা

আমার প্রতি পৃথগ্‌ভাব-রহিত-দৃষ্টি-সম্পন্ন; ভাবার্থ এই যে, স্বরূপ শক্তি ও শক্তিমদ্বস্তু, উভয়েই অপৃথক্ (অভিন্ন) বস্তু বলিয়া অর্থাৎ বস্তুত্বে অভিন্ন বলিয়া, অথবা উভয়কে পরস্পর বিষয় ও আশ্রয়-ভেদে বিশিষ্টরূপেই জানা যায় বলিয়া আমাতে আত্মারাম আপনার রতি সঙ্গতই বটে।'

(বিষ্ণু পুঃ ১ম অং ৮ম অঃ ১৫—) "নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী। যথা সর্ব্বগতো বিষ্ণুস্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম্।।" অর্থাৎ 'হে দ্বিজোত্তম, ভগবান্ বিষ্ণুর স্বরূপ শক্তি 'শ্রী'—অবিনশ্বরা, নিত্যা এবং জগন্মাতা (নিখিল আশ্রয়-কোটি-জগতের প্রসূতি বা মূল আকর-স্বরূপ)। ভগবান্ বিষ্ণু যেমন সর্ব্বগত, তাঁহার এই স্বরূপশক্তি মহালক্ষ্মী ও তদ্রূপা। (ঐ ১ম অং ৯ম অঃ ১৪৩—) "দেবত্বে দেবদেহয়ং মানুষত্বে চ মানুষী। বিষ্ণোর্দ্দেহানুরূপাং বৈ করোত্যেষাত্মনস্তনুম্।।" অর্থাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর এই স্বরূপশক্তি শ্রীও ভগবল্লীলার সহায়কারিণীরূপে ভগবত্তনুর অনুরূপ নিজ-তনু প্রকট করিয়া থাকেন,—কখনও বিষ্ণুর দেবরূপ ধারণের সঙ্গে দেব-দেহা দেবী, কখনও বা বিষ্ণুর মানবরূপ ধারণের সঙ্গে মানব-দেহা মানবীরূপে লীলা প্রকট করেন।' বঃ সূঃ ২।৩।১০ এর শ্রীমাধ্ব-ভাষ্য-ধৃত 'ভাগবত-তন্ত্র'-বচন,—"শক্তি-শক্তিমতোশ্চাপি ন বিভেদঃ কথঞ্চন। অবিভিন্নাপি স্বেচ্ছাদি-ভেদৈরপি বিভাব্যতে।।" বিষ্ণুসংহিতা-বাক্যও— "শক্তি-শক্তিমতোশ্চাপি ন ভেদঃ কশ্চিদ্যিতে।" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যে শক্তিমান্ বিষ্ণু ও তদীয় স্বরূপশক্তির অভেদত্ব জানা যায়।

বহিরঙ্গা মায়া বা প্রকৃতি—এই স্বরূপশক্তি লক্ষ্মীরই অপাশ্রিতা ছায়া- রূপিণী। (ভাঃ ১।৭।২৩ শ্লোকে কৃষ্ণের প্রতি অর্জ্জুনের উক্তি—) "মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি" অর্থাৎ ভগবান্ এই চিন্ময়ী স্বরূপ- শক্তিদ্বারা মায়াকে অভিভূত করিয়া নিত্যশুদ্ধ স্ব-স্বরূপে অবস্থিত। সুতরাং প্রাকৃত বা মায়িক রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণত্রয়ের ত্রিবিধ-বিকার সৃষ্টি (জন্ম), স্থিতি ও নাশ (ধ্বংস) প্রভৃতি ব্যাপার ভগবান বিষ্ণু, তদীয় স্বরূপ-শক্তি ও তদ্রূপবৈভব- ধাম-পরিকরদিগকে কখনও আক্রমণ করিতে পারে না,—ইহাদের ময়া-বশীভূত কর্ম্মফলবাধ্য-জীবের ন্যায় দেহদেহি-ভেদ নাই; ইঁহারা সকলেই অপ্রাকৃত, মায়াতীত, নির্গুণ, তুরীয় ও নিত্যশুদ্ধ চিন্ময়।

বিষ্ণুবংশ ও প্রভুবংশ

প্রাকৃত-সহজিয়া-সমাজে "বিষ্ণুবংশ" বা "প্রভুবংশ" কথাটী যেরূপ বিকৃত- ভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহা মহাজনগণের বিচার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। একদিকে বংশানুক্রমে গৃহব্রত জাতিয়তা-বাদী এক সম্প্রদায়, আর একদিকে প্রচ্ছন্ন প্রকৃতি-প্রতিষ্টাশাদি-লোলুপ, বিরক্ত বেযোপজীবী দ্বিতীয় সম্প্রদায় নিজ-নিজ অবৈধ চেষ্টা, নানা প্রকার অপরাধ ও পাপবৃত্তি প্রভৃতিকে সমর্থন ও পরিপোষণ করিবার জন্য ঐরূপ এক শ্রেণীর গুরুব্রুব সম্প্রদায়কে "বিষ্ণুবংশ"—"প্রভুবংশ" বলিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে চাহেন। এইরূপ শ্রেণীর শিষ্যব্রুব
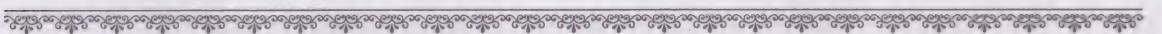
ও গুরুব্রুবের মধ্যে দৈবক্রমেই যেন উভয়ে উভয়ের পাপ-প্রবৃত্তি, অপরাধ, অনর্থ, দুনীর্তি, দুরাচার, ব্যভিচারাদি পরস্পর সমর্থন করিবার একটা গুপ্ত রফাদফা হইয়া রহিয়াছে। কখনও কখনও যদি অপস্বার্থের আহ্বানে এক পক্ষের বিষয়ী আর এক পক্ষের বিষয়ীকে আক্রমণ করে, তখন গুরুব্রুব-দলের পক্ষীয় ব্যক্তি বংশানুক্রমে শিষ্যব্রুব জাতীয় ব্যক্তির প্রতি বংশ-মহিমার অস্ত্রনিক্ষেপ করিয়া আত্মরক্ষা করিয়া থাকেন। বংশানুক্রমে গৃহব্রত ধর্ম্মের যদি কোনও প্রকার হানি হয়, এই আতঙ্কে ও আশঙ্কায় শিষ্যব্রুব-সম্প্রদায় গুরুব্রুব সম্প্রদায়কে কপট বা কৃত্রিম ভক্তির সজ্জা প্রদর্শন করে এবং দৈবী মায়ায় বিমোহিত হইয়া ঐরূপ কপটতাকেই তাহারা 'গুরুভক্তি' বলিয়া কল্পনা করে। শিষ্যের দিক্ হইতে যে অকৈতব ও অহৈতুক সেবালৌল্য এবং গুরুর দিক্ হইতে যে অকৃত্রিম, অমন্দোদয়দয়া-বিতরণরূপ কার্য্যে পরস্পর প্রীতি বন্ধন, তাহা সেখানে আদৌ নাই—আছে কেবল দৈহিক জাতীয়তার বিচার-মূলে পরস্পর পরস্পরকে ভোগ করিবার প্রচ্ছন্না প্রবৃত্তি ও তৎবৃত্তির প্রতিযোগিতায় এক পক্ষীয়ের স্থূলাভিমানোত্থ কৃত্যার প্রভুত্ব ও আর এক পক্ষীয়ের স্থূলাভিমানের পরাভব। এইরূপ দুই সংঘর্ষ হইতে আনুকরণিকতার এক পুষ্পিত পলাস-বৃক্ষ সৃষ্ট হইয়া নিয়তই অবিদ্যাবধূর চরণের অঞ্জলি রচনা করিতেছে।

কিন্তু শ্রীচৈতন্যপার্ষদগণের বিচার অন্যরূপ। তাঁহারা বলেন,—যাঁহারা আত্মবৃত্তি দ্বারা শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ বা শ্রীঅদ্বৈতাদি প্রভুত্রয়ের কিংবা তৎপার্ষদবৃন্দের অহৈতুক ও অকপট সেবক, তাঁহারাই শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত বা তৎপার্ষদগণের বংশ্য। শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—এই উভয় মহাগ্রন্থই শ্রীচৈতন্যলীলার পরম প্রামাণিক গ্রন্থরাজ বলিয়া সর্ব্ববাদি-ক্রমে স্বীকৃত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কিছু গাম্ভীর্য্যের সহিত এই সকল কথা আলোচনা করিলেও শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাসের সহজ, সরল, ও সর্ব্ববোধ্য লেখনী অতি স্পষ্টবাদিতা এবং সত্যানুরাগময়ী নির্ভীকতার সহিত এ-সকল কথা আলোচনা করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদি, মধ্য ও অন্ত্যে; উপক্রম, উপসংহার ও অভ্যাস—সর্ব্বত্রই বিষ্ণুবংশব্রুব ব্যক্তিগণের অসদভিসন্ধি নিরাকৃত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাসের এইরূপ সত্যনিষ্ঠামূলা স্পষ্টবাদিতা দেখিয়া অনভিজ্ঞ ও প্রাকৃত স্বার্থান্ধ ব্যক্তি-সমূহ মনে করিতে পারে যে, ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীনিত্যানন্দ-ভৃত্যসূত্রে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর দাসাভিমানী বা বংশ্যাভিমানিগণের প্রতি বুঝি অবিচার করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা ঠাকুরের লেখনী খুব ধৈর্য্য ও মুক্ত অন্তঃকরণে গুর্ব্বানুগত্যে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, ঠাকুর বৃন্দাবন অদ্বয়জ্ঞান শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতে কোনও প্রকার ভেদ- বিচার আবাহন করেন নাই। যাহারা শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতকে প্রাকৃত প্রতিযোগিগণের ন্যায় ভেদ-দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া অদ্বয়জ্ঞানে প্রাকৃত ভেদবাদ আনয়ন করে—মহাপ্রভু ও প্রভুদ্বয়ের চরণে অপরাধ করে, তাঁহাদের মঙ্গলের জন্যই ঠাকুর বৃন্দাবন অভূতপূর্ব্ব গুরুগৌরাঙ্গনিষ্ঠা ও লোক-হিতৈষণা-প্রবৃত্তির সহিত মুক্ত কণ্ঠে সত্যকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। অদ্বয়জ্ঞানে যে লীলা- বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে ঠাকুর তাহা ধ্বংস করিতে প্রস্তুত নহেন—ঐ বিচিত্রতা ও বৈশিষ্ট্য যেখানেই আক্রান্ত হইয়াছে, ঠাকুর সেখানেই সুদর্শনাস্ত্র ধরিয়াছেন সেখানেই বিরুদ্ধবাদীর জিহ্বা সত্য

সিদ্ধান্ত-কথা-কীর্ত্তনাস্ত্র-দ্বারা ছেদন করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

বিষ্ণুর বংশ্যব্রুব কোন কথা বলিয়াছেন বা কার্য্য করিয়াছেন, বিষ্ণুর শিষ্যব্রুব বলিয়াছেন বা করিয়াছেন বলিলেই তাহা অদ্বৈতপ্রভুর মহোঽভীষ্ট, সিদ্ধান্ত ও আচার প্রচারের বিরুদ্ধ হইলেও মানিয়া লইতে হইবে, এরূপ সত্য বিরোধের অনর্থময় আদর্শ কোনও মহাজনই কখনই প্রদর্শন করেন নাই। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বিচারেও তাহাই দেখিতে পাই। মহাবিষ্ণু-অবতার ঈশ্বর অদ্বৈতের শিষ্যব্রুব বলিয়াই কমলাকান্ত যে-কোনও প্রকার আচরণ বা শ্রীঅদ্বৈতের মনোঽভীষ্টের বিরুদ্ধ বিচার প্রদর্শন করিবেন, আর অমনি তাহা সকলকেই মানিয়া লইতে হইবে, এরূপ বিচার কবিরাজ গোস্বামী দেখান নাই। অসার বিষ্ণুবংশ্য ব্রুবগণের সহিত ভগবদ্ভক্তি-রাজ্যে প্রবেশকামী কোনও ব্যক্তিরই কোনও প্রয়োজন নাই, ইহা কবিরাজ গোস্বামী প্রভু 'পাতনা'র উদাহরণের দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি ঐ সকল অসারদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীঅচ্যুতানন্দাদি সারগ্রাহিগণকেই নমস্কার করিয়াছেন। সারের সহিত অসারের চিজ্জড়-সমন্বয় করিয়া আধুনিক-কালের প্রতিষ্ঠাশাকামী, অপস্বার্থপর, অনর্থময় ব্যক্তিগণের ন্যায় স্ব-স্ব অনাচারসমূহ চালাইবার কৌশল এবং জড় প্রতিষ্ঠা বা লোক-প্রিয়তা অর্জ্জনের যাদুকরী বিদ্যায় দীক্ষিত হন নাই। লোকশিক্ষা কল্পেই কবিরাজ গোস্বামী অসার-সমূহকে উৎপাটন করিয়া সারগ্রাহীর প্রতি নমস্কার-বিধান করিতেছেন,—

অদ্বৈতাঙ্‌ঘ্র্যাব্জভৃঙ্গাংস্তান্ সারাসারভৃতোঽখিলান্।
হিত্বাসারান্ সারভৃতো নৌমি চৈতন্যজীবনান্।।

অর্থাৎ অদ্বৈতপ্রভুর অনুগতজন দুই প্রকার—সারগ্রাহী ও অসারগ্রাহী; তন্মধ্যে অসারগ্রাহিদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত সারগ্রাহী শ্রীচৈতন্যদাসদিগকে নমস্কার বিধান করি।

আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

প্রথমে ত' আচার্য্যের একমত গণ।
পাছে দুই মত হৈল দৈবের কারণ।।
কেহ ত' আচার্য্যের আজ্ঞায়, কেহ ত' স্বতন্ত্র।
স্বমত কল্পনা করে দৈব-পরতন্ত্র।।
আচার্য্যের মত যেই, সেই মত সার।
তাঁ'র আজ্ঞা লঙ্ঘি' চলে, সেই ত' অসার।।
অসারের নামে ইহা নাহি প্রয়োজন।
ভেদ জানিবারে করি একত্র গণন।।
ধান্যরাশি মাপে যৈছে পাতনা সহিতে।
পশ্চাতে পাতনা উড়াঞা সংস্কার করিতে।।

*　*　*　*

ইহার মধ্যে মালি-পাছে কোন শাখাগণ।
না মানে চৈতন্যমালী দুর্দ্দৈব-কারণ।।
সৃজাইল, জীয়াইল, তাঁ'রে না মানিলা।
কৃতঘ্ন হইলা, তারে স্কন্ধ ক্রুদ্ধ হইলা।।
ক্রুদ্ধ হইয়া স্কন্ধ তারে জল না সঞ্চারে।
জলাভাবে কৃশ শাখা শুখাইয়া মরে।।
চৈতন্য-রহিত দেহ—শুষ্ককাষ্ঠ-সম।
জীবিতেই মৃত সেই, মৈলে দণ্ডে যম।।
কেবল এ গণ-প্রতি নহে এই দণ্ড।
চৈতন্য-বিমুখ যেই সেই ত' পাষণ্ড।।

* * * *

কি পণ্ডিত, কি তপস্বী, কিবা গৃহী, যতি।
চৈতন্য-বিমুখ যেই, তা'র এই গতি।।

(শ্রীচৈঃ চঃ আদি ১২শ পঃ)

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন—শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় যিনি "বৃন্দাবনদাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য", সেই ব্যাসাবতার তাঁহার মহাগ্রন্থের সর্ব্বত্র বিষ্ণুবংশ্যব্রুব ব্যক্তিগণের কুনাট্যসমূহ কিরূপভাবে নিরাস করিয়াছেন, প্রবন্ধ-কলেবর বৃদ্ধিভয়ে তাহার সকলগুলি উদ্ধৃত করিতে না পারিলেও আমরা তাহার কোন কোন অংশ আলোচনা করিয়া প্রকৃত সত্যানুসন্ধান করিব।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রারম্ভে ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন দাস ইঙ্গিতে অনেক কথা বলিয়াছেন,—

ভাগবত শুনি' যা'র রামে নাহি প্রীত।
বিষ্ণু-বৈষ্ণবের পথে সে-জন বর্জ্জিত।।
ভাগবত যে নাম মানে, সে যবন-সম।
তা'র শাস্তা আছে, জন্মে-জন্মে প্রভু যম।।
এবে কেহ কেহ নপুংসকবেশে নাচে।
বলে,—"বলরাম-রাস কোন্ শাস্ত্রে আছে?"
কোন পাপী শাস্ত্র দেখিলেও নাহি মানে।
এক অর্থ অন্য অর্থ করিয়া বাগানে।।

(চৈঃ ভাঃ আদি ১ম অঃ)

ঠাকুর বৃন্দাবন তাঁহার মহাগ্রন্থের প্রারম্ভে যে-সকল উক্তি ইঙ্গিতে করিয়াছেন, তাহাই গ্রন্থের অন্তর-কলেবরে ও উপসংহারে পুনঃ পুনঃ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

আধুনিক কুভজন-চতুর ব্যক্তিগণ তত্তদ্‌গ্রন্থের ঐ সকল স্থান দেখিয়া লোক- বঞ্চনাকারক একপ্রকার কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহারা অনুধাবন করিয়া দেখিয়াছেন ও বিচার করিয়াছেন,—যখন আমাদের স্বরূপ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিলে কবিরাজ গোস্বামী বা ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের নিন্দা ও গালি-গালাজের গতির মধ্যে পতিত হইতে হয়, তখন আমরা "চৈতন্যবিমুখ যেই, সেই ত' পাষণ্ড," "ভাগবত যে না মানে, সে যবন-সম"—এই সকল নিন্দাকর গালি হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য লোককে ভোগা দিয়া "মুখে চৈতন্য মানিব", "অন্তঃশাক্তঃ বহিঃশৈবঃ" হইয়াও "সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ" সাজিব, বাহিরে বরং ভাগবত-মানার ছলনা দেখাইয়া যুগপৎ অপরাধময় জীবিকা-অর্জ্জনের পথটি সুগম ও ভাগবত-মানার প্রতিষ্ঠাটা অর্জ্জন করিয়া লইব। ইহাতে সুদুর্ল্লভ, ভজন-নিপুণ এই একটি ব্যক্তি ব্যতীত আর বাদবাকী সকলকেই বঞ্চনা করিতে পারিব। কারণ গণগড্ডলিকা ত' আর সেই রাজ্যের লোক নয়—মেকী ও আসল বুঝিবার জহুরীও নয়; তাহারা অতি স্থূলভাবে কথাগুলি বোঝে। তাহারা মনে করে—"শ্রীচৈতন্যমানা" অর্থ—"শ্রীচৈতন্যের দোহাই দেওয়া বা বাহ্যে মালা-তিলকের সাজ-দেখান, কিংবা শ্রীচৈতন্যের সম্বন্ধে কয়েকটি গদ মুখস্থ বলা (অন্তরে, সিদ্ধান্তে, আন্তরিক নিষ্ঠায় ও আভ্যন্তরীণ আচারে যাহাই থাকুক্ না কেন এবং তদ্দ্বারা যে-কোনও আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ সাধন করিবার চেষ্টাই হক্ না কেন); প্রায় শতকরা শতজন সাধারণ লোকই মনে করে, —'ভাগবতমানা' অর্থে—ভাগবত-পাঠের অভিনয় প্রদর্শন করা,—এখন সেই পাঠ অর্থসংগ্রহের যন্ত্রই হউক, আর ভোগবৃদ্ধির পথবিশেষই হউক; সাধারণ লোকমাত্রেই মনে করে,—মুখে হরিনামাক্ষর গ্রহণের অভিনয়ই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রদর্শিত নামগ্রহণ বা নামভজন—এখন সেই নামাক্ষর উচ্চারণের অভিনয় যে কোন অভিসন্ধিমূলেই হউক্ না কেন; সাধারণ লোকের সকলেই মনে করে, 'সংকীর্ত্তনই করা' অর্থে—খোল-করতাল লইয়া সুর-তাল-মান-লয়-ভাজা ও তৎসঙ্গে কিছু রাইকানুর গানাদির অনুকরণ করা—এখন তাহা অর্থলাভের জন্যই হউক, প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্যই হউক, কামিনী-সংগ্রহের জন্যই হউক, জাগতিক কোন প্রকার লাভ-পূজার জন্যই হউক, কিংবা নিজ কলঙ্কিত চরিত্র ও পাপপরায়ণতার উপর লোকবঞ্চনাকারক একটি রঙিন অবগুণ্ঠন টানিয়া দিবার জন্যই হউক; এরূপ কুমতলবী কতকগুলি লোক শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বাক্যবানের লক্ষ্যভেদ হইতে আপনাদিগকে দূরে রাখিবার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে—বিষ্ণুবংশের দোহাই দিয়া ব্যভিচার, দুর্নীতি ও অপরের অর্থ আত্মসাৎ করিবার সুযোগ করিয়া লয়। এরূপ শ্রেণীর লোক অনভিজ্ঞ জন-সাধারণের নিকট ঐ সকল বঞ্চনাময় কৌশলবিস্তার করিয়া যতই ভক্তি-শাস্ত্রজ্ঞ, পরম শ্রীচৈতন্যভক্ত, শ্রীচৈতন্য-ধর্ম্ম-প্রচারক, শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতা, সংকীর্ত্তন-নিপুণ, বক্তৃতা-নিপুণ, ব্যাখ্যা-নিপুণ, আচার-নিপুণ প্রভৃতি বলিয়া লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে করিতে শ্রোতার সহিত যমপাশে ডুবিয়া মরুক না কেন, শ্রীচৈতন্য-নিজ-জনগণের অকৈতব

কৃপাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের নিকট তাহাদের স্বরূপ তখনই প্রকাশিত হইয়া পড়ে, যখনই তাহারা শ্রীচৈতন্য-নিজ-জনগণের সিদ্ধান্ত, নিরপেক্ষ সত্যবাক্য, সাক্ষাৎ আচরণময় জ্বলন্ত অকৃত্রিম জীবনের সহিত মতভেদ করিয়া আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণময়ী লোকপ্রিয়তার পথকেই অভিনন্দিত করিতে থাকে।

শ্রীচৈতন্যভাগবতকার ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে ঐ সকল বিষ্ণুবংশ্যব্রুবের যে চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা কয়েক শতাব্দীর অন্ধকারে আরও অধিকতর পরিপুষ্ট ও সহস্রমুখী কপটতার রঙে রঞ্জিত হইয়া বর্ত্তমানকালে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। আদিম অবস্থায় প্রত্যেক বস্তু বা ব্যাপারই অনেকটা 'সাদাসিদে' থাকে, যত দিন যায়, ততই তাহা নানাবিধ প্রতিবাদ ও বাধাবিঘ্নের সহিত যুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষা করিবার জন্য আপনাকে তদনুযায়ী কৌশলের জালে আবৃত করিয়া তুলিতে বাধ্য হয়। শ্রীচৈতন্যভাগবত বা শ্রীচরিতামৃতের সমসাময়িক যুগে শ্রীচৈতন্য-ভক্তির নামে কপটতা আদিম অবস্থায় থাকায় অনেকটা 'সাদাসিদে' ছিল, কিন্তু কয়েক শতাব্দীর পর তাহা নানাপ্রকার কপটতার জালে পরিপুষ্ট হইয়া আত্মরক্ষা করিবার দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়িয়া লইয়াছে। তাই সাধারণ লোকে উহার স্বরূপ ভেদ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ঠাকুর বৃন্দাবন প্রকৃত শ্রীচৈতন্যদাস মুরারি পণ্ডিত ও বিষ্ণুবংশ্য বা বিষ্ণু-শিষ্যবংশব্রুব কৃত্রিম চৈতন্যদাস-নামধারীর মধ্যে পার্থক্য কিরূপ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, পাঠকগণ তাহা শ্রবণ করুন,—

যোগ্য শ্রীচৈতন্যদাস মুরারি পণ্ডিত।
যাঁ'র বাতাসেও কৃষ্ণ পাই যে নিশ্চিত।।
এবে কেহ বলায় 'চৈতন্যদাস' নাম।
স্বপ্নে নাহি বলে শ্রীচৈতন্য-গুণগ্রাম।।
অদ্বৈতের প্রাণনাথ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যাঁ'র ভক্তি-প্রসাদে অদ্বৈত সত্য ধন্য।।
জয় জয় অদ্বৈতের যে চৈতন্য-ভক্তি।
যাঁহার প্রসাদে অদ্বৈতের সর্ব্বশক্তি।।
সাধুলোক অদ্বৈতের এ মহিমা ঘোষে।
কেহ ইহা অদ্বৈতের নিন্দা হেন বাসে।।
সেই ছার বলায় 'চৈতন্যদাস' নাম।
পাপী কেমনে যায় অদ্বৈতের স্থান।।
এ পাপীরে "অদ্বৈতের লোক" বলে যে।
অদ্বৈত-হৃদয় কভু নাহি জানে সে।।

রাক্ষসের নাম যেন কহে 'পুণ্যজন'।
এই মত এ-সব চৈতন্যদাসগণ।।

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫ম অঃ)

অদ্বৈত প্রভুর একজন কপটশিষ্য আপনাকে 'চৈতন্যদাস' নামে অভিহিত করিতেন। তাঁহার বিচার ছিল যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—রাধিকা, আর শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ; কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে শ্রীচৈতন্যই শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু—শ্রীচৈতন্যভক্ত। এই চৈতন্যদাসব্রুব মুখে শ্রীচৈতন্য-মানার ভাণ করিয়াও প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রীচৈতন্যবিরোধীই ছিলেন। 'শ্রীচৈতন্যের অনুগ্রহেই শ্রীঅদ্বৈত সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন'—এই কথা বিচার না করিয়া ঐ অতিবাড়ী অদ্বৈত-ভক্তাভিমানী ব্যক্তি ঐ প্রকার উক্তিতে শ্রীঅদ্বৈতের নিন্দা হয় বলিতেন।

ঠাকুর বৃন্দাবন বলেন যে, ঐ পাপিষ্ঠকে যে 'অদ্বৈতানুগ' বলিয়া মনে করে, সে অদ্বৈতপ্রভুর বিচার কখনই বুঝিতে পারে না বা পারে নাই।

সংস্কৃত ভাষায় রাক্ষসের পর্য্যায়ে 'পুণ্যজন'-শব্দ কথিত হয়। সুতরাং আপনাকে আপনি লোক-প্রতারণা করিয়া 'চৈতন্যদাস' বলিলে তদ্দ্বারা আপনাকে রাক্ষস-পর্য্যায়ে পরিগণিত করিবার চেষ্টাই হয়। যাঁহারা 'পুণ্যজন' শব্দের রূঢ় অর্থ বুঝেন না, তাঁহারা উহাকে ভাল অর্থেই বিচার করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা যেরূপ বিরুদ্ধ অর্থে প্রযুক্ত, তদ্রূপ 'চৈতন্যদাস' প্রভৃতি নাম প্রকৃত অর্থে সংজ্ঞিত না হইয়া শ্রীচৈতন্যের গ্লানিকারকের নামরূপে ব্যবহৃত হইলে উক্ত নামধারী কখনও প্রকৃত 'চৈতন্যদাস' হইতে পারে না।

বিষ্ণুবংশ্য প্রভৃতির পরিচয় দিয়াও কাহারাও কাহারাও মধ্যে এইরূপ নানাপ্রকার অপসিদ্ধান্ত ও আপনাকে 'চৈতন্যদাস' প্রভৃতি বলাইবার চেষ্টা কিছু আধুনিক কালেও বিরল নহে; বরং ঐ সকল বিচার ও ব্যবহার বংশানুক্রমিক খাতের মধ্যে দিয়া প্রবাহিত হইতে হইতে বর্ত্তমানকালে সহস্রমুখী অপসিদ্ধান্ত, অনর্থ ও কপটতায় প্রকাশিত হইয়াছে। এখনও ঐরূপ শ্রেণীর কেহ কেহ বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বলিয়া থাকেন যে, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও যখন অদ্বৈতপ্রভুর পূর্ব্ব পুরুষগণ বৈষ্ণব ছিলেন, তখন অদ্বৈত-বংশের বৈষ্ণবতা পুরাণ চাউলের ন্যায় অধিক দামী; কেহ কেহ ৫৬ পুরুষের বৈষ্ণবতার নজির দেখাইয়া বৈষ্ণবতার পেন্‌সেন ভোগ করিতে চাহেন; তাঁহারা কিছু না করিলেও এমন কি কপটতা করিয়া চৈতন্য-বিরোধ ও অনাচার-ব্যভিচার করিলেও কেহই তাঁহাদের প্রভুত্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইতে তাঁহাদিগকে বিচ্যুত করিতে পারিবে না।

কিছুদিন পূর্ব্বেও ইহাদের কেহ কেহ শ্রীচৈতন্যদেবকে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহ, কেহ কেহ বা অদ্বৈত প্রভুকে কৃষ্ণ, মহাপ্রভুকে রাধা, কেহ কেহ বা অদ্বৈত প্রভুর কৃপায়ই শ্রীচৈতন্যের এত প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কত কি সিদ্ধান্ত (?) করিয়া পণ্ডিতম্মন্য হইয়াছিলেন; কেহ কেহ ঐ বংশের কালিমা বিদূরিত করিবার জন্য কোন কোন গ্রন্থ, টীকাটিপ্পনীও প্রাচীনের নাম দিয়া কৌশলে প্রচারে যত্নবান হইয়াছিলেন।

কেহ কেহ অদ্বৈত প্রভুর পৌত্রাভিমান করিয়া বন্দ্যঘটীয় হরিহর ভট্টাচার্য্যের পুত্র স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের প্রতি প্রীতিবিশিষ্ট হইয়াছিলেন এবং স্মার্ত্তাচার অবলম্বন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেবের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা-বিহীন ছিলেন—'গোস্বামী ভট্টাচার্য্য' নাম গ্রহণ করিয়া ত্যক্ত গৃহের যোগ্য সংজ্ঞা "গোস্বামী"-শব্দের অবমাননা করিয়াছিলেন এবং স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের আনুগত্যে কুশপুত্তলিকা দগ্ধ করিয়া প্রেত বা রাক্ষস-শ্রাদ্ধ-কার্য্য সম্পাদন-পূর্ব্বক শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদি বিষ্ণুভক্তিপরা স্মৃতির বিরুদ্ধ আচরণ ও মহাপরাধ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন,—আধুনিক কল্পিত 'অদ্বৈত প্রকাশ' প্রভৃতি পুস্তকও এইরূপ নানাপ্রকার দুরভিসন্ধি এবং অসচ্চেষ্টার সমর্থন ও পরিপোষণ-কল্পেই নাকি সৃষ্ট হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শান্তিপুরস্থ শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবনে শ্রীল মাধবেন্দ্র- পুরীপাদের আরাধনা-তিথি উপলক্ষে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য কর্ত্তৃক উৎসবের বিপুল আয়োজন লক্ষ্য করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-বাক্যের প্রসঙ্গ অবলম্বনপূর্ব্বক বলিতেছেন,—

"বুঝিলাম আচার্য্য মহেশ-অবতার।
এই মত হাসি' প্রভু বলে বার বার।।
স্থলে অদ্বৈতের তত্ত্ব মহাপ্রভু কয়।
যে হয় সুকৃতি, সে পরমানন্দে লয়।।
তান বাক্যে অনাদর অনাস্থা যাহার।
তারে শ্রীঅদ্বৈত হয় অগ্নি-অবতার।।
যদ্যপি অদ্বৈত কোটিচন্দ্র সুশীতল।
তথাপি চৈতন্য-বিমুখের অনল কেবল।।"

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৪র্থ অঃ)

শ্রীচৈতন্যভাগবতকার মধ্য ১৯শ অধ্যায়ে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শ্রীমুখ-বাক্য উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, লোকে কিংবদন্তী আছে যে, ভগবান্ নারায়ণ ভৃগুকে নির্ব্বোধ প্রতিপাদন করাইবার জন্য এবং স্বীয় বাৎসল্য-প্রদর্শনার্থ ভৃগুপদচিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন। মূঢ় ব্যক্তিগণের অধিক প্রতারিত হইবার যোগ্যতা থাকায় তাহারা ভগবান্ অপেক্ষা ভৃগুর অধিক গৌরব বুঝিয়া থাকে। কিন্তু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু বৈষ্ণবাচার্য্য 'মহাবিষ্ণু' বলিয়া ভৃগুর নির্ব্বুদ্ধিতা ধরিয়া ফেলিয়াছেন। তজ্জন্য শ্রীঅদ্বৈত প্রভু বাহিরে দম্ভ-ক্রোধ প্রদর্শন করিয়া ভৃগুর ন্যায় তাঁহার (অদ্বৈত প্রভুর) শত শত শিষ্য আছে, ইহা প্রকাশ করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে গৌরববুদ্ধি করিয়া যে পদধূলি গ্রহণাদি করিয়া থাকেন, তাহাতে তিনি বিশেষ দুঃখিত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট হইতে শাস্তি লাভ করিবার বাসনায় নিজে পূজ্য হইবার বিচার পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে যত্ন করিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, 'যোগবাশিষ্ট' নামক ভক্তিবিরোধী মায়াবাদীর গ্রন্থ ব্যাখ্যা মূলে ভক্তিপথের গৌণত্ব-বিচারের ছলনা করিতে লাগিলেন। উদ্দেশ্য,—মহাপ্রভুর ভক্তি-প্রচার কার্য্যে বাধা

দিলে তিনি শ্রীঅদ্বৈতকে পূজা করিবার পরিবর্ত্তে 'সাজা' দিবেন। মহাপ্রভু একদিন পথে আসিবার কালে জনৈক বামাচারী সন্ন্যাসীকে কৃপা করিয়া শান্তিপুর অদ্বৈতভবনে উপস্থিত হইলেন। এমন সময় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু 'যোগবাশিষ্ঠ' ব্যাখ্যা-মুখে জ্ঞানযোগের অধিক মহিমা ও জ্ঞানের প্রাধান্য স্থাপন করায় মহাপ্রভু অদ্বৈতপ্রভুকে প্রহার ও তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া নিজতত্ত্ব প্রকাশ করিলেন এবং অদ্বৈতকে বর দিলেন। তখন অদ্বৈত প্রভু আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বলিলেন,—

"যদি মোর পুত্র হয়, হয় বা কিঙ্কর।
বৈষ্ণবাপরাধী" মুঞি না দেখোঁ গোচর।।"

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৯।১৭৫)

অনেকে বলেন,—শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে। অদ্বৈত প্রভুর অন্তরঙ্গ শিষ্য ও অধস্তন—সকলেই পণ্ডিত গদাধরের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের বিরোধী পুত্র ও শিষ্যগণ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর বিচার গ্রহণ করেন নাই ও তাঁহাকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম বলিয়া জানিতে পারেন নাই।

মহাপ্রভু ভক্তভাব অঙ্গীকার করায় বঞ্চিত অদ্বৈতবাদিগণ বিশ্বম্ভরকে বিষয়-বিগ্রহ মনে না করিয়া আশ্রয়বিগ্রহ মনে করে। উহাতে বিশ্বম্ভরের মর্য্যাদা লঙ্ঘন হয় এবং নিজ নির্ব্বুদ্ধিতা-ক্রমে বিষ্ণুবংশ্য হইবার অবৈধ চেষ্টা করিলে ত্যাজ্য বংশ ও শিষ্য পরিচয়-মাত্র অবশিষ্ট থাকে। যে-ব্যক্তি বিষয়-বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেবের সেবা পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় অপস্বার্থ-পোষণে অদ্বৈত-মহিমা নিযুক্ত করেন, তিনি ভগবানের অনুগ্রহ-লাভে চিরদিন বঞ্চিত হইয়া আত্মম্ভরী, দাম্ভিক ও প্রতিষ্ঠাশা-পরায়ণ হন। অদ্যাপি কেহ কেহ অদ্বৈত-বংশ্য পরিচয় দিয়া শুদ্ধভক্তের শুদ্ধা ভক্তির অনুষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠাশা বলিয়া স্থাপন করিতে যত্ন করেন। তাহাতে তাহাদের অবৈধ দাম্ভিকতা প্রকাশিত হয় মাত্র। ঐ প্রকার দাম্ভিকগণ ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া আপনাদিগকে বিষ্ণুবংশ্য ও তদ্- বংশের দাসাভিমানী 'বৈষ্ণব' মনে করিয়া প্রতিষ্ঠাশা-সাগরের অতল জলধিতে নিমগ্ন হন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তাঁহাদিগের অপরাধ ক্ষমা করিয়া সদ্বুদ্ধি দিউন্, ইহাই শুদ্ধ ভক্তজগতের একমাত্র প্রার্থনীয়।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর পুত্র বা শিষ্যব্রুব জনগণ শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শুদ্ধ দাসগণের প্রতি অপরাধ-বিশিষ্ট হইলে অদ্বৈত প্রভু তাহাদিগের সঙ্গ ও কৃপা বিচ্ছিন্ন করেন, ইহা শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর উক্তি উল্লেখ করিয়া ঠাকুর বৃন্দাবন সজীব ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন (চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৯।১৭৩),—

" যে তোমার পাদপদ্ম না করে ভজন।
তোরে না মানিলে কভু নহে মোর জন।।"

ঠাকুর বৃন্দাবনের লেখনীতে দেখা যায় যে, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য নিরন্তর গীতা-শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন এবং গীতার প্রত্যেক শ্লোক ভক্তিপর ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যা করিতেন। যে শ্লোকের আপাত অর্থে তিনি ভক্তিযোগ

না পাইতেন, সেই শ্লোকের দোষ না দিয়া নিজেরই উক্ত শ্লোকের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় নাই বিচারে তিনি মনের দুঃখে উপবাস করিয়া শুইয়া থাকিতেন। তখন ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-সম্মুখে স্বপ্নে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে ঐ শ্লোকের প্রকৃত অর্থ ও পাঠ বলিয়া দিতেন। একদিন মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে বলিলেন,—"অদ্বৈত, আমি তোমাকে গীতার সকল পাঠই বলিয়াছি, এক পাঠ কেবল বলি নাই। সম্প্রদায়-অনুরোধে "লোকে সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ" (গীতা ১৩।১৪) স্থানে "সর্ব্বত্র পাণিপাদন্তৎ" পাঠ হইবে। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন বলিতেছেন,—

চৈতন্যের গুপ্ত শিষ্য আচার্য্য গোসাঞি।
চৈতন্যের সর্ব্ব ব্যাখ্যা আচার্য্যের ঠাঞি।।
শুনিয়া আচার্য্য প্রেমে কান্দিতে লাগিলা।
পাইয়া মনের কথা মহানন্দে ভোলা।।
অদ্বৈত বলয়ে,—"আর কি বলিব মুঞি।
এই মোর মহত্ত্ব যে, মোর নাথ তুঞি।।

* * * *

এ সব কথায় যা'র নাহিক প্রতীত।
অধঃপাত হয় তা'র জানিহ নিশ্চিত।।
মহাভাগবতে বুঝে অদ্বৈতের ব্যাখ্যা।
আপনে চৈতন্য যা'রে করাইল শিক্ষা।।
বেদে যেন নানামত করয়ে কথন।
এই মত আচার্য্যের দুর্জ্ঞেয় বচন।।
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি কা'র ?
জানিহ ঈশ্বর-সঙ্গে ভেদ নাহি যাঁ'র।
শরতের মেঘ যেন পরভাগ্যে বর্ষে।
সর্ব্বত্র না করে বৃষ্টি, কোথাহ বরিষে।।
গিরয়ো মুমুচুস্তোয়ং কচিন্ন মুমুচুঃ শিবম্।
যথা জ্ঞানাঘৃতং কালে জ্ঞানিনো দদতে ন বা।।
(ভাঃ ১০।২০।৩৬)

এই মত অদ্বৈতের কিছু দোষ নাঞি।
ভাগ্যাভাগ্য বুঝি' ব্যাখ্যা করে সেই ঠাঞি।।

চৈতন্যের চরণ-সেবা অদ্বৈতের কাজ।
ইহাতে প্রমাণ সব বৈষ্ণব-সমাজ।।
সর্ব্ব ভাগবতের বচন অনাদরি'।
অদ্বৈতের সেবা করে, নহে প্রিয়কারী।।
চৈতন্যেতে মহামহেশ্বর বুদ্ধি যাঁ'র।
সেই সে—অদ্বৈত-ভক্ত, অদ্বৈত—তাঁহার।।
''সর্ব্ব-প্রভু গৌরচন্দ্র'—ইহা যে না লয়।
অক্ষয় অদ্বৈত-সেবা ব্যর্থ তা'র হয়।।
শিরচ্ছেদি' ভক্তি যেন করে দশানন।
না মানয়ে রঘুনাথ শিবের কারণ।।
অন্তরে ছাড়িল শিব, সে না জানে ইহা।
সেবা ব্যর্থ হেল, মৈল সবংশে পুড়িয়া।।
ভাল-মন্দ শিব কিছু ভাঙ্গিয়া না কয়।
যা'র বুদ্ধি থাকে, সেই চিত্তে বুঝি' লয়।।
এইমত অদ্বৈতের চিত্ত না বুঝিয়া।
বোলায় 'অদ্বৈত-ভক্ত' চৈতন্য নিন্দিয়া।।
না বলে অদ্বৈত কিছু স্বভাব-কারণে।
না ধরে বৈষ্ণব-বাক্য, মরে ভাল মনে।।
যাঁহার প্রসাদে অদ্বৈতের সর্ব্বসিদ্ধি।
হেন চৈতন্যের কিছু না জানয়ে শুদ্ধি।।
ইহা বলিতেই আইসে ধাঞা মারিবারে।
অহো! মায়া বলবতী,—কি বলিব তারে?
ভক্তরাজ অলঙ্কার,—ইহা নাহি জানে।
অদ্বৈতের প্রভু—গৌরচন্দ্র নাহি মানে।।
পূর্ব্বে যে আখ্যান হৈল, সেই সত্য হয়।
তাহাতে প্রতীত যা'র নাহি, তা'র ক্ষয়।।

যত যত শুন যা'র যতেক বড়াঞি।
চৈতন্যের সেবা হৈতে আর কিছু নাঞি।।
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু যারে কৃপা করে।
যা'র যেন ভাগ্য, ভক্তি সেই সে আদরে।।
অহর্নিশ লওয়ায় ঠাকুর নিত্যানন্দ।
'বল ভাই সব'—'মোর প্রভু গৌরচন্দ্র।।
চৈতন্য-স্মরণ করি' আচার্য্য গোসাঞি।
নিরবধি কান্দে, আর কিছু স্মৃতি নাই।।
ইহা দেখি' চৈতন্যেতে যা'র ভক্তি নয়।
তাহার আলাপে হয় সুকৃতির ক্ষয়।।
বৈষ্ণবাগ্রগণ্য-বুদ্ধ্যে যে অদ্বৈত গায়।
সেই সে বৈষ্ণব, জন্মে-জন্মে কৃষ্ণ পায়।।
অদ্বৈতের সেই সে একান্ত প্রিয়তর।
এ মর্ম্ম না জানে যত অধম কিঙ্কর।।

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০ম অঃ)

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাসের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বের কথিত দৃষ্টান্ত আধুনিক কালে আরও অধিকতর কপটতায় আচ্ছন্ন হইয়া প্রকাশিত রহিয়াছে। আধুনিক কালেও কোন কোন অদ্বৈতবংশ্যব্রুব সভা-সমিতিতে—কখনও বা প্রেতশ্রাদ্ধ বাসরে, মায়াবাদি-কর্ম্মজড়স্মার্ত্তসমাজ ও প্রাকৃত-সহজিয়াগণের আরাম-মন্দিরে গীতা-ব্যাখ্যার ছলনা করিয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট ও শিক্ষার বিরুদ্ধ গীতার কদর্থ করিয়া থাকেন—গীতাতে কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগের সহিত ভক্তির চিজ্জড়সমন্বয় করা হইয়াছে, ইহা প্রচার করিয়া থাকেন—'ভক্ত্যেকরক্ষক', 'জগদ্গুরু' শ্রীধরস্বামিপাদকে 'মায়াবাদী' বলেন; এমন কি, ভাগবত-শ্লোকের মধ্যেও মায়াবাদ প্রাপ্ত হন।

আচার্য্যের ঐ শ্রেণীর বংশধরব্রুবগণ তদীয় গীতা, ভাগবত ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য বঞ্চিত হইয়া ভক্তির প্রতিকূল বিচারকেই ভক্তের গ্রহণীয় বলিয়া প্রচার করায় আসামদেশে এবং বঙ্গদেশের নানাস্থানে পঞ্চোপাসনা আদর লাভ করিয়াছে। ঠাকুর বৃন্দাবন বলেন, যেরূপ বেদের বিভিন্ন মত আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর বিবদমান এবং তাহাতে কেবলাদ্বৈতবিচার, শুদ্ধাদ্বৈতবিচার ও দ্বৈতাদ্বৈতবিচার প্রভৃতি নানা মতবাদের উৎপত্তি ঘটিয়াছে, তদ্রূপ আচার্য্য শ্রীঅদ্বৈতের বাক্য ও ব্যবহারাবলীও তাঁহার অনুগতব্রুবগণ বুঝিতে না পারিয়া নানা প্রকার

অসৎ মত অপসিদ্ধান্তকে অদ্বৈতের মত বলিয়া পোষণ করেন; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষামাত্রকেই সম্বল করিয়া আচার্য্যত্ব শিক্ষা দিয়াছেন। সঙ্কোচিত সেবোন্মুখের নিকট পরস্পর বিবদমান প্রতীত হইলেও আচার্য্যের ব্যাখ্যাসমূহ শ্রীচৈতন্যানুমোদিত, একতাৎপর্য্যপর ও শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তপূর্ণ। শ্রীচৈতন্যের প্রকাশিত ব্যাখ্যা অচিন্ত্য-অভেদপর হইলেও উহাই যুগপৎ ভেদপর, তজ্জন্য প্রাপঞ্চিক চিন্তা ব্যাপার-বিশেষ নহে।

শরৎকালে একই সময়ে সকল স্থানে বৃষ্টি হয় না। যেখানে বৃষ্টি হয় ও যেখানে বৃষ্টি হয় না, সেই সকল স্থানের নিজ-নিজ ভাগ্য অপেক্ষা করে মাত্র। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বাক্যগুলিও স্থানবিশেষে সৌভাগ্য-আনয়ন ও ভাগ্য-বিপর্য্যয় উপস্থিত করিয়াছে।

পর্ব্বতসমূহ যেরূপ কোনস্থানে মঙ্গলজনক জলরাশি মোচন করে, আবার কোথায়ও করে না, তদ্রূপ জ্ঞানিগণ সেবোন্মুখ অকপট-যোগ্য শিষ্যকেই অমায়ার ভগবত্তত্ত্বোপদেশ জ্ঞানামৃত দান করেন; কপট, বঞ্চনাকামী অযোগ্য শিষ্যব্রুবকে তাহা দান করেন না।

গঙ্গার তটদেশে অবস্থিত নিম্ববৃক্ষ ও আম্রবৃক্ষ উভয়েই গঙ্গার জলে সমভাবে পুষ্ট হইলেও নিম্ববৃক্ষ গঙ্গার সুমিষ্টবারি হইতে তিক্তরসেই পরিপুষ্ট হয়; আর আম্র সুমধুর রসে সম্বর্দ্ধিত হইয়া অপরকেও সেই মধুর রস বিতরণ করে।

যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবকে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সেব্য-বিগ্রহ জানেন, তাঁহারাই অদ্বৈতপ্রভুর প্রকৃত ভক্ত, তাঁহাদেরই সেবা শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু গ্রহণ করেন। আর যাঁহারা অদ্বৈতের উদ্দেশে সেবা করিতে গিয়া অদ্বৈতকে 'বিষ্ণু' জ্ঞানপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে তদাশ্রিতা 'রাধা' জ্ঞান করিবার স্বকপোল কল্পিত মতবাদ পোষণ করেন, তাহাদিগকে কখনই অদ্বৈতের অনুগত সেবক বলা যায় না। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে শান্তিপুর গ্রামে ঐ প্রকার ঘৃণিত মতবাদের পুনঃ প্রচার হইয়াছিল। শুনা যায়, কালনায় এই মতবাদ গ্রন্থাকারে পরিণত না হইলেও তদ্দেশবাসিগণের কেহ কেহ ন্যূনাধিক এই মত পোষণ করিয়া নিরয়গামী হয়।

ঠাকুর বৃন্দাবন আরও বলিয়াছেন যে, দশানন রাবণ 'শিব-ভক্ত' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি শিবভক্ত হইলেও শিবের আরাধ্য শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহার সেবিকা সীতাদেবীকে হরণ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করেন। সেই রুদ্রভক্ত দশানন শ্রীরামচন্দ্রের বিদ্বেষজনক অপকার্য্যরূপ নিজ-বুদ্ধির দোষে নিজের মস্তকগুলিই বিনষ্ট করিয়াছিলেন শ্রীঅদ্বৈতবংশ্য- ব্রুবগণের শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যজন-বিরোধফলে সেই দশাই লাভ হইবে।

ব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবন লোক-কল্যাণের জন্য এইরূপ বহু বিচারের অবতারণা করিয়া আমাদিগকে সাবধান করিয়াছেন, আমরা যেন শ্রীনিত্যানন্দ-ভৃত্যের বিচারের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া অভক্তিরাজ্যের পুষ্পিত পিচ্ছিল-পথে পদার্পণ করিতে বিরত ও সাবহিত হই।

গৌড়ীয়

[১৯৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দ, ১৩৩৯-৪০ বঙ্গাব্দ]

‘দুঃখী’ না ‘সুখী’?

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীনিবাস-পণ্ডিতের ভবনে শুভ-পদার্পণ করিয়াছেন, প্রভুর সঙ্গে শ্রীনিত্যান্দও আসিয়াছেন, ক্রমে ক্রমে সেই সংকীর্ত্তন-রাসস্থলী শ্রীবাস-অঙ্গনে অন্যান্য ভক্তগণও আসিয়া মিলিত হইলেন।

আজ যেন মহাপ্রভু কি এক পরম ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ করিয়া চতুর্দ্দিকে তাকাইতেছেন। প্রভুর মর্ম্মজ্ঞ ভক্তগণ প্রভুর ইঙ্গিত উপলব্ধি করিয়া কীর্ত্তন ধরিলেন। অন্য দিন মহাপ্রভু দাস্য-লীলা প্রকাশ করিয়া নৃত্য করেন, কিছুকাল বা ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া পুনরায় আপনার ভগবৎস্বরূপ গোপন করেন, অন্য দিন যেন আবেশে অজ্ঞাতসারে বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ করেন, কিন্তু আজ পালা পরিবর্ত্তিত হইল। আজ প্রভু ভক্তগণকে ভগবৎ-সম্মুখে নৃত্যের অবসর দিবার জন্য সগৌরবে বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন করিলেন। মহাপ্রভু আজ আপনার ভগবৎস্বরূপ গোপন না করিয়া সাতপ্রহর-কাল বিষ্ণুখট্টায় উপবিষ্ট রহিলেন। ভক্তগণ প্রভুর সম্মুখে জোড়-হস্তে অবস্থান করিলেন। এমন সময় প্রভুর আজ্ঞা হইল,—“আমার অভিষেক-গীত কীর্ত্তন কর”।

মহাপ্রভুর অভিষেকের জন্য ভক্তগণ গঙ্গাজল বহন করিয়া আনিতে লাগিলেন। উৎকৃষ্ট সুন্দর বস্ত্র-দ্বারা উত্তমরূপে জল ছাঁকিয়া তাহাতে শ্রীকর্পূরাদি সুগন্ধ দ্রব্য প্রদান করিলেন। চতুর্দ্দিকে মহা জয়-জয়-ধ্বনি এবং সকলের মুখেই “অভিষেক-মন্ত্র”। সর্ব্বাগ্রে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু “জয় জয়” বলিতে বলিতে মহাপ্রভুর শিরে জলসেক করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তগণ বেদের পুরুষসূক্ত উচ্চারণ করিতে করিতে মহাপ্রভুকে স্নান করাইলেন, মুকুন্দ ‘অভিষেক-সুমঙ্গল’ গান করিতে লাগিলেন, কেহ বা আনন্দ-ক্রন্দন—কেহ বা আনন্দে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন; পতিব্রতাগণ “জয়-জয়কার” দিতে লাগিলেন।

অষ্টোত্তর-শত ঘটের জলে অভিষেক-বিধি কথিত আছে। কিন্তু কত অষ্টোত্তর-শতঘট জলের দ্বারা মহাপ্রভুর অভিষেক হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই—সহস্র ঘটেও অভিষেক পূর্ণ হইল না। সুকৃতি-সম্পন্ন দেবতাগণও যেন আজ মানবের আকার ধারণ-পূর্ব্বক অভিষেক করিতে লাগিলেন। যে ভগবানের পাদপদ্মের উদ্দেশ্যে মাত্র জলবিন্দু প্রদান করিতে পারিলে লোক কৃতকৃতার্থ হন, সেই ভগবদ্বস্তু আজ স্বয়ং প্রত্যক্ষ হইয়া জল গ্রহণ করিতেছেন।

শ্রীবাস-পণ্ডিতের দাস-দাসীগণ কলসী ভরিয়া জল আনিতেছেন, মহাপ্রভু সেই জলে স্নান করিতেছেন। শ্রীবাসের দাসীগণের মধ্যে একজনের নাম ছিল—“দুঃখী”। ‘দুঃখী’কে একান্তচিত্তে মহা আর্ত্তির সহিত জল আনিতে দেখিয়া মহাপ্রভু দুঃখীকে ডাকিয়া বলিতেছেন,—‘আন, আন, জল লইয়া আইস”।

শ্রীবাস-অঙ্গন মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন-বিহার-স্থলী—ঔদার্য্যলীলার নিত্যরাস- লীলা শ্রীবাস-ভবনে সংঘটিত হয়। মহাপ্রভু ভক্তগণ-সহ শ্রীবাস-অঙ্গনে নৃত্য-কীর্ত্তন করিবার পর বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া ভক্তগণ-সহ কোনদিন বা গঙ্গাকে যমুনার ভাগ্য প্রদান করেন—গঙ্গাতে জলকেলি-লীলাদি করিয়া থাকেন, কোনদিন বা নৃত্যাবসানে ভক্তগণ মহাপ্রভুকে শ্রীবাসের ঘরেই স্নান করান। যতক্ষণ প্রভুর আনন্দ-নৃত্য হইতে থাকে, ততক্ষণ শ্রীবাসের দাসী ''দুঃখী''র আর কোন কাজ নাই, ''দুঃখী'' কেবল মহাপ্রভুর স্নান ও অভিষেকের জন্য গঙ্গা হইতে ঘট ভরিয়া জল বহন করিতে থাকে—ক্ষণেক-কাল সজল-নয়নে মহাপ্রভুর নৃত্যদর্শন করে, আবার তাহার নিজ-নির্বন্ধিত সেবায় নিযুক্ত হয়। দুঃখীর ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই, হৃদয় আনন্দে ভরপুর—পুনঃ পুনঃ গঙ্গাজল বহন করিয়া আনিয়া ''দুঃখী'' জলের কুম্ভ সারি দিয়া রাখে।

''দুঃখী'র এই সেবা দেখিয়া শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট। একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—''শ্রীবাস, প্রত্যহ কে গঙ্গাজল বহন করিয়া আনে?''

শ্রীবাস—''প্রভো, সমস্ত জলই ''দুঃখী'' আনয়ন করে।''

মহাপ্রভু—''তোমরা আজ হইতে ইহাকে ''সুখী'' নামে ডাকিবে। এরূপ সেবা-বৃত্তি-সম্পন্না কখনও 'দুঃখী' নামের যোগ্যা নহে। এ সর্ব্বকালই 'সুখী'।''

মহাপ্রভুর শ্রীমুখে এইরূপ করুণাপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ প্রেমসুখে আনন্দ-ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং প্রভুর আজ্ঞানুসারে সে দিন হইতে শ্রীবাসের এই দাসীকে সকলেই ''সুখী'' নামে ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রতি শ্রীবাসও কোন-ক্রমেই দাসীবুদ্ধি না করিয়া মহাপ্রভুর সেবিকা-বুদ্ধিই করিতেন।

পাঠক! আমরাও এখন হইতে শ্রীগৌরজনগণের পদাঙ্কানুসরণে শ্রীবাসের দাসীরত্নকে ''সুখী'' নামেই অভিহিত করিব। সেই ''সুখী''র চরিত্র বর্ণন করিতে গিয়া শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস বলিতেছেন,—

প্রেমযোগে সেবা করিলেই কৃষ্ণ পাই।
মাথা মুড়াইলে যমদণ্ড না এড়াই।।
কুলে, রূপে, ধনে বা বিদ্যায় কিছু নয়।
প্রেমযোগে ভজিলে সে কৃষ্ণ তুষ্ট হয়।।
দাসী হই' যে প্রসাদ 'দুঃখী'রে হইল।
বৃথা-অভিমানী সব তাহা না দেখিল।।
কি কহিব শ্রীবাসের ভাগ্যের মহিমা।
যাঁ'র দাস-দাসীর ভাগ্যের নাহি সীমা।। (চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৫শ অঃ)

বহির্দৃষ্টিতে ''সুখী''র কি যোগ্যতা আছে? বাহ্যদৃষ্টিতে ''সুখী''কে সাধারণ লোক আমরা ''দুঃখী'' ছাড়া কি ভাবিতে পারি? ''সুখী'র অর্থ নাই, বিদ্যা নাই, আভিজাত্য নাই, সুখী পুরুষ-জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন নাই; শাস্ত্র বলেন,—স্ত্রী-শূদ্রাদির বেদে অধিকার নাই।

ব্যবহারিক জগতে দেখিতে পাই, কত লোক তাঁহাদের কত প্রকার প্রতিভা, রূপ, আভিজাত্য, বিদ্যা, পাণ্ডিত্য ও পৌরুষের গৌরবে জগতের লোকের বিস্ময় উৎপাদন করেন।

প্রচলিত পারমার্থিক জগতেও দেখা যায়, কত মস্তকমুণ্ডনকারী সন্ন্যাসী, কত বেদশাস্ত্র-পাঠী, কত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মপালনকারী ব্যক্তি তাঁহাদের সন্ন্যাস, স্বাধ্যায় ও বর্ণাশ্রয়ধর্ম্ম গৌরবের ধ্বজা উঠাইয়া মায়াদেবী ও শ্রীবৈষ্ণব-চরিত্র লিখিয়া লোকলোচন চমকিত করিয়া দেন; কিন্তু ''সুখী''র সে-সকল কিছুই ছিল না।

যে 'দাসী-বান্দী' আখ্যাটা অত্যন্ত নীচ, সেইরূপ একটা আখ্যায় আখ্যাত ছিলেন—আমাদের ''সুখী''। তাঁহার দুঃখপূর্ণ জীবন দেখিয়া সামাজিক লোকগণ তাঁহার উপযুক্ত ''দুঃখী'' নাম দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা শ্রীগৌরসুন্দরের মনঃপূত হইল না (শ্রীচৈতন্যভাগবত),—

এ জনের 'দুঃখ' নাম কভু যোগ্য নয়।
সর্ব্বকাল 'সুখী' হেন মোর চিত্তে লয়।।

বহির্ম্মুখ জগতের সামাজিকগণ তাঁহাকে ''দুঃখী'' বলিলেও—প্রকৃত ''সুখী''র আদর্শ তাঁহাতে দীপ্তিমান। বহির্ম্মুখ জগৎ অর্থশালীকে 'সুখী' মনে করেন—প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব- সম্পন্ন ব্যক্তিকে 'সুখী' মনে করেন—বিদ্বান্‌কে 'সুখী' মনে করেন—বিলাসীকে 'সুখী' মনে করেন—অঋণী, অপ্রবাসীকে 'সুখী' জ্ঞান করেন।

কেহ বা ধন-জন-সম্পন্ন গৃহস্থকে 'সুখী' মনে করেন, আবার কেহ বা সংসার- ত্যাগী সন্ন্যাসীকে 'সুখী' মনে করেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—শ্রীবাসের দাসীই ''প্রকৃত সুখী''। তাঁহার পাণ্ডিত্য, আভিজাত্য, পৌরুষ, ধন, প্রতিভা, সন্ন্যাস, স্বাধ্যায় প্রভৃতি প্রাকৃত গৌরবের কিছু না থাকিলেও তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গৌরবের যে সম্বল আছে, তাহা দেবেন্দ্র, নরেন্দ্রেও সম্ভব নহে; সে গৌরবের জন্য ব্রহ্মা, শিব পর্য্যন্ত পাগল—তাঁহার একমাত্র গৌরব এই যে, তিনি শ্রীবাসের ন্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর একান্ত ভৃত্যের ঘরের পরিচারিকা—বৈষ্ণবের ঘরের দাসী। বৈষ্ণবের ঘরের কুক্কুর হইবার জন্য ব্রহ্মাদি দেবতা পর্য্যন্ত প্রার্থনা করেন; দাসী হইয়াও ''সুখী''তে সেই ব্রহ্মার দুষ্প্রাপ্য পদটী অতি স্বাভাবিকভাবে ও স্বতঃসিদ্ধরূপে বিরাজিত ছিল।

মাথামুণ্ডনকারী সন্ন্যাসীর কৃত্রিমতার মত কেবলাদ্বৈতবাদীর বৈষ্ণবে মৎসরতা-প্রদর্শনাদি কোনও কৃত্রিমতা শ্রীবাস-দাসীর ছিল না—লোক-দেখান-ভাব ছিল না, সেবাবৃত্তির পরিবর্ত্তে নিজেকে জাহির করিবার প্রবৃত্তিই অধিক ছিল না। সন্ন্যাসী এত কৃচ্ছ্রতা সাধন করিয়া, জগৎকে কাকবিষ্ঠার ন্যায় ত্যাগ করিবার আদর্শ দেখাইয়া, কত বেদবেদান্ত অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করিয়া, নিজেকে কত রং বেরং-এ সাজাইয়া যে প্রসাদ পাইতে পারে নাই, 'সুখী' কেবলমাত্র বৈষ্ণবের ঘরে—যেখানে মহাপ্রভুর নিত্যসেবা হয়, সেই শুদ্ধ বৈষ্ণবের ঘরের দাসী হওয়ায় কোটি জন্মজন্মান্তর পরও সন্ন্যাসী যে প্রসাদ পাইবে কি না সন্দেহ, সেই কৃপা-প্রসাদ অনায়াসে প্রাপ্ত হইলেন।

মহাপ্রভুর সেবকের সেবা করিলে মহাপ্রভুর সেবায় অধিকার হয়—মহাপ্রভু সেরূপ সেবকের সেবাই গ্রহণ করেন। ''সুখী'' কেবলমাত্র সেবার একটি অঙ্গ সাধনফলে প্রেমানন্দ-সুখে সুখী হইতে পারিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সেবক শ্রীবাসের সেবা-ফলেই দুঃখী মহাপ্রভুর স্নান-জল—মহাপ্রভুর পদধৌত করিবার জল-আনয়ন-সেবা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

দাম্ভিক, অভিমানী ব্যক্তিগণ ভগবানের ভৃত্যের ভৃত্য হইবার পরিবর্ত্তে 'ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইবার চেষ্টা'র ন্যায় যে ভগবানের সেবক বা ধার্ম্মিকের অভিনয় করে, তাহা তাহাদের ত্রিতাপদুঃখ-বৃদ্ধিরই কারণ হইয়া থাকে। শ্রীবাসের দাসী সেরূপ ত্রিতাপে তপ্ত 'দুঃখী' ছিলেন না।

''যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেহ পরানন্দ সুখ।।''

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

—এই বিচারে 'দুঃখী' বহির্ম্মুখ লোকের বাহ্যদর্শনে যে স্থানেই স্থিত হউন না কেন, সেই স্থানে স্থির হইয়াই মহাপ্রভুর ভক্তের সেবায় ঐকান্তিক ছিলেন। এজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর দাসের দাসী লোকের বহির্দ্দর্শনে দুঃখী হইলেও মহাপ্রভু তাঁহাকে 'সুখী' বলিলেন।

এ জগতের লোক আমরা প্রাসাদবিলাসী রাজাই হই, আর কুটীরবাসী বা গৃহবিত্তহীন দরিদ্রই হই, আমরা সকলেই ন্যূনাধিক দুঃখী; আমরা যদি মহাপ্রভুর কোনও অন্তরঙ্গ ও অকৃত্রিম ভৃত্যের গৃহের ঐকান্তিক ও অকৃত্রিম দাস হইতে পারি, তাহা হইলে আমরাও 'সুখী' হইতে পারিব—অন্য উপায়ে নহে।

ভাদ্রকৃত্য

সদ্‌গুরু-পদাশ্রিতগণের সকল কালে, সর্ব্বত্র কৃত্য একমাত্র হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা। দিনকৃত্য, মাসকৃত্য, বর্ষকৃত্য—সকলগুলিই একান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিগণের একমাত্র হরিসেবানুশীলনময়। হরিসেবানুশীলন হরিজনের আনুগত্যেই সম্ভবপর হয়। কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের দিনকৃত্য, মাসকৃত্যাদি নিজ-নিজ দেহ-মনের তর্পণে বা তাহা অপর দেহ-মনে ব্যাপ্তির উদ্দেশ্যে। এমন কি, তাঁহাদের পারমার্থিক ব্রতাদি যাজনের অভিনয় ও আদর্শগুলি পর্য্যন্ত আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণনিষ্ঠ—তাঁহারা যাহাকে অনুকরণ করিয়া 'নিষ্কাম' বলেন বা বুঝেন, তাহাও প্রকৃতির অন্তর্গত বা পরোক্ষভাবে প্রকৃতির সহিতই সাম্বন্ধিক-বিচারে অবস্থিত।

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যগণ তাঁহাদের বিবিধ স্মৃতি-নিবন্ধে যে-সকল আচার, বিধি, ব্যবস্থা, প্রয়োগ প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাদের সকলেরই মেরুদণ্ড—পাপে বা পুণ্যে বিষয়-ভোগ; তাঁহাদের বিষয়-ত্যাগের কথা বা মৌখিক নিষ্কাম- বিচারের কথার অবগুণ্ঠনেও আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের মোহিনীমূর্ত্তি লুক্কায়িত আছে।

এ জন্যই ঐকান্তিক বৈষ্ণবগণ হরিসেবাপর স্মৃতির অবতারণা করিয়াছেন। হরিশ্রবণকে কীর্ত্তনময় অনুষ্ঠান বা অনুশীলনের দ্বারা সর্ব্বদা স্মৃতির মধ্যে জাগরূক রাখাই বৈষ্ণবস্মৃতির নিগূঢ় উদ্দেশ্য। সকল অনুষ্ঠানে—সকল বিচারে, আচারে ঐকান্তিক হরিজনগণের আনুগত্যে হরিস্মরণই বিধি, আর তৎবিস্মরণই নিষেধ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদি বৈষ্ণবস্মৃতিনিবন্ধেও ফলশ্রুতি পর বহু বহু শাস্ত্রবাক্যের সঙ্কলন দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল বহির্ম্মুখ কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের সংখ্যাধিক্যকে ক্রমে ক্রমে ঐকান্তিক হরিসেবায় আকর্ষণোদ্দেশ্যে। কারণ, সেই গ্রন্থে ঐকান্তিক হরিজনগণের জন্য একমাত্র হরিকীর্ত্তনময় অনুশীলনেরই সর্ব্বোত্তমতা স্বীকৃত হইয়াছে। ভাদ্রকৃত্য-বর্ণনে বৈষ্ণবস্মৃতিনিবন্ধ-সম্রাট্ শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস বলিতেছেন,—

ভাদ্রে ভগবতো জন্মদিনে কার্য্যো মহোৎসবঃ।
বিশেষেণ মহাপূজাং ব্রতপূর্ণেন বৈষ্ণবৈঃ।।

ভাদ্রমাসে ভগবানের জন্মলীলা-দিনে (রোহিণ্যষ্টমী ও শ্রবণা দ্বাদশীতে) ব্রত পূর্ণ করিয়া বিশেষ প্রকারে মহাপূজা সাধন-পূর্ব্বক মহোৎসব করা কর্ত্তব্য।

শ্রীগৌরসুন্দর জানাইয়াছেন,—বিবাদযুগে অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গ পালনীয় হইলেও সকলগুলিই কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিকে অগ্রণী ও তন্ময় করিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীগৌরজনের আনুগত্যে প্রতি বৎসর তাহাই সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হয়।

কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত-সম্প্রদায় সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমীতে উপবাস বা ব্রতপালনের বিধি প্রদান করিলেও তাহা প্রত্যেক ফলকামীর পরিত্যাজ্য।

বর্জ্জনীয়া প্রযত্নেন সপ্তমীসহিতাষ্টমী।
সঋক্ষাপি ন কর্ত্তব্যা সপ্তমীসংযুতাষ্টমী।।

সপ্তমী-বিদ্ধা অষ্টমী সযত্নে পরিত্যাজ্য, উহাতে নক্ষত্রের (রোহিণীর) যোগ থাকিলেও তদ্দিবসে ব্রত অকর্ত্তব্য।

পঞ্চগব্যং যথা শুদ্ধং ন গ্রাহ্যং মদ্যসংযুতম্।
রবিবিদ্ধা তথা ত্যাজ্যা রোহিণীসহিতা যদি।।
পূর্ব্ববিদ্ধা যথা নন্দা বর্জ্জিতা শ্রবণান্বিতা।
তথাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সঋক্ষাঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।।

বিশুদ্ধ পঞ্চগব্য যেরূপ সুরাসংযোগে অগ্রাহ্য হয়, সেইরূপ সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমীতে রোহিণীর যোগ থাকিলেও তদ্দিনে ব্রত পরিত্যাজ্য। শ্রবণার যোগ থাকিলেও যেরূপ দশমীবিদ্ধা একাদশী পরিত্যাজ্য, সেইরূপ নক্ষত্রের (রোহিণীর) যোগ থাকিলেও সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী অনাদরণীয়া।

তাহার কারণ,—

অবিদ্ধায়াং সঋক্ষায়াং জাতো দেবকীনন্দনঃ।
বাসরে বা নিশার্দ্ধে বা সপ্তম্যাঞ্চ যদাষ্টমী।
পূর্ব্বমিশ্রা তদা ত্যাজ্য প্রাজাপত্যর্ক্ষসংযুতা।।

দেবকী-নন্দন শ্রীহরি সপ্তমীবেধহীনা রোহিণীযুক্তা অষ্টমীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। দিবাভাগে বা নিশীথরাত্রে অষ্টমী হইলে এবং তাহাতে রোহিণীর যোগ থাকিলে পূর্ব্ববিদ্ধা পরিত্যাজ্য।

এমন কি,—

জন্মাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সঋক্ষাং সকলামপি।
বিহায় নবমীং শুদ্ধামুপোষ্য ব্রতমাচরেৎ।।

জন্মাষ্টমী যদি সম্পূর্ণ রোহিণী-নক্ষত্র-সংযুক্ত হয়, তাহা হইলেও সপ্তমীবিদ্ধা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কেবল নবমীতেই উপবাস-ব্রতাদি করণীয়।

তবে যে কোনও কোন শাস্ত্রে বিদ্ধা অষ্টমীতে ব্রতকরণের বিধি লিখিত আছে, তাহার কারণ কি? ‘‘বিদ্ধা অষ্টমী বর্জ্জনকে’’ ‘‘বৈষ্ণবপর’’ বলিয়া যদি অপরে বিদ্ধা অষ্টমীতেই অপর শাস্ত্রবাক্যানুসারে জন্মাষ্টমী ব্রত করেন, তাহাতে আপত্তি কি? তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র বলিতেছেন,—

যচ্চ বহ্নিপুরাণাদৌ প্রোক্তং বিদ্ধাষ্টমীব্রতম্।
অবৈষ্ণবপরং তচ্চ কৃতং তদ্দেবমায়য়া।।
পুরা দেবৈর্ঋষিগণৈঃ স্বপদচ্যুতিশঙ্কয়া।
সপ্তমীবেধজালেন গোপিতং হ্যষ্টমীব্রতম্।।

বহ্নিপুরাণাদিতে বিদ্ধাষ্টমীতে যে ব্রত-করণের বিধি লিখিত আছে, তাহা অবৈষ্ণবপর, তাহা দেবমায়াকৃত সন্দেহ নাই।

পুরাকালে দেবতাগণ ও ঋষিসমূহ পদচ্যুতির ভয়ে অর্থাৎ অপরে জন্মাষ্টমী- ব্রত-সাধন-পূর্ব্বক পাছে উৎকৃষ্ট দেবতা ও ঋষি-পদ লাভ করেন এবং পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত দেবতা ও ঋষিগণকে পদচ্যুত করিয়া দেন, এইরূপ মাৎসর্য্য বশতঃ সপ্তমীবেধরূপ জাল-দ্বারা অষ্টমীকে গুপ্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

অনেকে মনে করেন,—আমাদের যে বৈষ্ণবই হইতে হইবে, বৈষ্ণবগণের বিধি ও বিচারই অনুসরণ করিতে হইবে, এমন কি প্রয়োজন আছে? ‘অবৈষ্ণব’ হইলেই বা আপত্তি কি?

ইঁহারা দৈবীমায়া-বিমোহিত হইয়াই এই সকল কথা বলেন। ‘বৈষ্ণব’ ব্যতীত জীবের অন্য কোনও স্বরূপই হইতে পারে না। কেহ যেমন মনে করেন, আমাদিগকে যে ‘সুর’ই হইতে হইবে, এমন কি বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে, আমরা না হয় সুরগণের প্রতিযোগী ‘অসুর’ই হইলাম। এজন্য শাস্ত্র বলিতেছেন, জীবের অসুর হওয়ার স্বতন্ত্রতা আছে, অসুর-মোহনপর শাস্ত্র ও ঋষিগণও যথেষ্ট আছেন, ভগবানের অমলা ভক্তিকে গোপনে

রাখিবার জন্য দেবীমায়াও বহুরূপিণী হইয়া সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন; এজন্য টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুপাদ বলিতেছেন,—

"সর্ব্বেষামেব সামান্যতো বিদ্ধাবর্জ্জনং যুক্তম্। * * * এবঞ্চ সতি বিদ্ধা বচনানাং স্থানং কল্পয়িত্বা বিদ্ধাব্রতং যে ব্যবস্থাপয়ন্তি, তেঽপি দেবমায়া-বিমোহিতা ইতি জ্ঞেয়ম্।।"

বিদ্ধাবর্জ্জন সকলের পক্ষেই যুক্তিযুক্ত। কারণ, সকলেই স্বরূপতঃ বৈষ্ণব। বৈষ্ণব-ব্যতীত জীবের অপর অভিমান—কেবল আবরণ, আপনাকে আপনি বঞ্চনা করা মাত্র। বিদ্ধবচনসমূহের স্থান কল্পনা করিয়া যাঁহারা বিদ্ধব্রতের ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারাও দেবমায়া-বিমোহিতই জানিতে হইবে। জন্মাষ্টমী উপবাসের পারণ-কাল-নির্ণয়ে শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস-শাস্ত্র-বাক্য সংগ্রহ-পূর্ব্বক জানাইয়াছেন,—

যদ্বা তিথ্যৃক্ষয়োরেব দ্বয়োরন্তে তু পারণম্।
সমর্থনামশক্তানাং দ্বয়োরেক-বিয়োগতঃ।।

তিথি ও নক্ষত্র—এই উভয়ের অবসানেই পারণ করা উপবাসক্ষম ব্যক্তির পক্ষে কর্ত্তব্য। কিন্তু যে-সকল ব্যক্তি অক্ষম, তাঁহারা তিথি ও নক্ষত্র এই উভয়ের মধ্যে একটীর অন্তে পারণ করিতে পারেন।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,—

যাঃ কাশ্চিত্তিথয়ঃ প্রোক্তাঃ পুণ্যা নক্ষত্রসংযুতাঃ।
ঋক্ষান্তে পারণং কুর্য্যাদ্বিনা শ্রবণরোহিণীম্।।

যে-কোন নক্ষত্রযুক্ত পবিত্র তিথিই হউক না কেন, নক্ষত্রান্তেই পারণ বিধেয়; কিন্তু শ্রবণা ও রোহিণীতে সে ব্যবস্থা নহে; উক্ত শ্রবণ-দ্বাদশী ও রোহিণ্যষ্টমীতে নক্ষত্র ও তিথি; এই উভয়ের অন্তেই পারণ করিতে হয়।

(১) কৃষ্ণাষ্টমীর পরের গৌরাষ্টমীতে **শ্রীরাধাষ্টমীর ব্রতোপবাস**।

(২) ভাদ্রকৃত্যের অন্তর্গত **পার্শ্বপরিবর্ত্তনোৎসব** অন্যতম,—

ভাদ্রস্য শুক্লৈকাদশ্যাং শয়নোৎসববৎ প্রভোঃ।
কটিদানোৎসবং কুর্য্যাদ্বৈষ্ণবৈঃ সহ বৈষ্ণবঃ।।

বৈষ্ণবগণ ভাদ্রীয়া শুক্লা একাদশী তিথিতে বৈষ্ণবগণ-সহ মিলিত হইয়া ভগবানের কটিদানোৎসব সম্পাদন করিবেন। পূর্ব্বে বিষ্ণু বামাঙ্গে শয়ন করিয়া- ছিলেন, এখন দক্ষিণাঙ্গে শয়ন করিবেন।

(৩) **শ্রবণা দ্বাদশী-ব্রত**

মাসি ভাদ্রপদে শুক্লা দ্বাদশী শ্রবণান্বিতা।
মহতী দ্বাদশী জ্ঞেয়া উপবাসে মহাফলা।।

ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষীয়া দ্বাদশীতে শ্রবণার যোগ হইলেই তাহা মহাদ্বাদশী বলিয়া পরিজ্ঞাত হয়। তাহাতে উপবাসের মহাফল।

যদা তু শুক্লদ্বাদশ্যাং নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেৎ।
তদাসৌ তু মহাপুণ্যা দ্বাদশী বিজয়া স্মৃতা।।

শুক্লপক্ষীয়া দ্বাদশী তিথিতে শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ হইলে ঐ দ্বাদশী মহাপুণ্য 'বিজয়া' নামে কথিত হয়।

একাদশ্যা বিশুদ্ধত্বে দ্বাদশ্যান্তু পরেঽহনি।
শ্রবণে সতি শক্তস্য ব্রতযুগ্মং বিধীয়তে।।

পূর্ব্বদিবস একাদশী শুদ্ধা হইয়া পরদিবস দ্বাদশীতে শ্রবণা হইলে দুইটী ব্রত করাই সমর্থবানের পক্ষে কর্ত্তব্য।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলিতেছেন,—

অসমাপ্তে ব্রতে পূর্ব্বে নৈব কুর্য্যাদ্‌ব্রতান্তরম্।
ইত্যাদি বচনস্যাত্র বাধকত্বং ন বিদ্যতে।।

যথা ভবিষ্যোত্তরে—

একাদশীমুপোষ্যৈব দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ।
ন চাত্র বিধিলোপঃ স্যাদুভয়োর্দেবতা হরিঃ।।
অশক্তস্তু ব্রতদ্বন্দ্বে ভুঙ্‌ক্তে বৈকাদশীদিনে।
উপবাসং বুধঃ কুর্য্যাচ্ছ্রবণদ্বাদশী দিনে।।

"পূর্ব্বব্রত অসমাপ্ত থাকিতে অন্য ব্রত করিতে নাই" প্রভৃতি যে বাক্য আছে, এখানে তাহা বাধক হইবে না। ভবিষ্যোত্তর বলিতেছেন,—একাদশীতে উপবাস করিয়াও দ্বাদশীতে উপবাস করিতে হয়, তাহাতে বিধির হানি হয় না। কেন না, হরিকেই তিথিদ্বয়ের দেবতা জানিবে। যদি কেহ দুইটী উপবাসে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে একাদশীতে ভোজন করিয়াও শ্রবণা দ্বাদশীতে উপবাসী থাকিতেই হইবে।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলিতেছেন,—

একাদশী দ্বাদশী চ বৈষ্ণব্যমপি তদ্ভবেৎ।
তদ্বিষ্ণুশৃঙ্খলং নাম বিষ্ণুসাযুজ্যকৃদ্ভবেৎ।।
দ্বাদশ্যামুপবাসোঽত্র ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্।
নিষিদ্ধমপি কর্ত্তব্যমিত্যাজ্ঞা পারমেশ্বরী।।
যোগোঽয়মন্যো দ্বাদশ্যাঃ ক্ষয় এবেতি লক্ষ্যতে।
দ্বাদশ্যামুপবাসাচ্চ ত্রয়োদশ্যাঞ্চ পারণাৎ।
ত্রয়োদশ্যাং পারণং হি শ্রবণেঽপি নিষেৎস্যতে।।

একই দিনে একাদশী, দ্বাদশী ও শ্রবণা নক্ষত্র—এই তিনটী ঘটিলে তাহাকেই ''বিষ্ণুশৃঙ্খল-যোগ" কহে। উহাতে দ্বাদশী দিনে উপবাসী থাকিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিতে হয়। ত্রয়োদশীতে পারণ করিতে নাই বটে, তথাপি ভগবানের আদেশ-হেতু মহাদ্বাদশী-বৈষ্ণব-ব্রতে ত্রয়োদশীতে পারণ অবিহিত নহে। দ্বাদশীর অবসানে অপর একটি যোগ দৃষ্ট হইতেছে, উহাতে দ্বাদশীতে উপবাস করিতে হয় বলিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে; কিন্তু শ্রবণায় ত্রয়োদশীতে পারণ করিতে হইবে না।

খড়জাঠিয়া বেটা

একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাস-ভবনে ''মহাপ্রকাশ"-লীলা প্রকট করিয়া সমস্ত আশ্রিত ভক্তকে কৃপা-বিতরণার্থ সপ্তপ্রহর ব্যাপিয়া বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন করিলেন। যে যে ভক্ত অন্যত্র হরিসেবায় নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদিগকেও ডাকাইয়া আনাইলেন। খোলা-বেচা শ্রীধরকে ডাকাইয়া আনাইয়া সকলের নিকট শ্রীধরের মহত্ত্ব প্রকাশ করিলেন। শ্রীধরকে মহাপ্রভু বর দিতে চাহিলে শ্রীধর বলিলেন,—মহাপ্রভু যেন শ্রীধরের জন্মে জন্মে নিত্যপ্রভু হন, ইহাই শ্রীধরের একমাত্র অভিলাষ। মহাপ্রভু খোলাবেচা শ্রীধরকে রাজ্যেশ্বর হইবার বর দিতে চাহিলে শ্রীধর বলিলেন যে, তিনি নিরন্তর মহাপ্রভুর নাম-কীর্ত্তনাভিলাষ ব্যতীত অন্য কিছু চাহেন না।

মহাপ্রভু শ্রীভুজ তুলিয়া বলিলেন,—''তোমরা আমাকে দর্শন কর—যাহার যাহা অভিরুচি, সেই বর প্রার্থনা কর। তখন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য বলিলেন,—

— — ''প্রভু, মোর এই বর।
মূর্খ, নীচ, পতিতেরে অনুগ্রহ কর।।"

এইরূপ ভাবে বিভিন্ন ভক্ত মহাপ্রভুর নিকট বিভিন্ন বর প্রার্থনা করিলেন। কেহ বলিলেন,—''আমার পিতা আমাকে আপনার কীর্ত্তনে আসিতে দেন না, তাঁহার চিত্ত যাহাতে সংশোধিত হয়, এইরূপ বর প্রদান করুন।" কেহ বা বলিলেন,—''আমার পুত্র, আমার শিষ্য, আমার ভার্য্যা—ইহারা যাহাতে হরি-পাদপদ্মে রতিবিশিষ্ট হয়, এইরূপ বর প্রদান করুন।" কেহ বা বলিলেন,—''আমার যাহাতে গুরুভক্তি হয়, এইরূপ বর প্রদান করুন।" অচিন্ত্যশক্তিক্রমে স্বয়ংই ভক্তিকল্পবৃক্ষ ও তৎমালাকার মহাপ্রভু ভক্তগণের অভিলাষানুসারে সকলকেই তাঁহাদের প্রার্থিত বর প্রদান করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ-দর্শনে ও মহাপ্রভুর কৃপাপ্রসাদ-গ্রহণে সকল ভক্তেরই অধিকার হইল; কিন্তু একমাত্র মুকুন্দ 'অন্তঃপটে'র বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার অভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার বা মহাপ্রভুর কৃপা-লাভে যোগ্যতা হইল না।

পাঠকগণ! এই মুকুন্দ কে? আপনারা নিশ্চয়ই জানেন,—ইনি মহাপ্রভুর সেই প্রিয় কীর্ত্তনীয়া শ্রীমুকুন্দ দত্ত ঠাকুর। ইনি অনুক্ষণ মহাপ্রভুর নিকট কীর্ত্তন করেন, আর মহাপ্রভু সেই কীর্ত্তন শ্রবণ করেন। এই মুকুন্দ
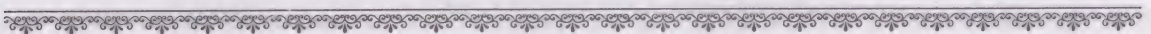
সকলের প্রিয় এবং পরম মহান্ত। লোকশিক্ষাকল্পে লোকশিক্ষক ঔদার্য্যলীলাতনু ভগবান্ শ্রীগৌর- সুন্দর নিজভক্তের দ্বারাই একটী মহতী শিক্ষা প্রচার করাইবার উদ্দেশ্যে এইরূপ ভক্তকেও নিজ-মহাপ্রকাশ-লীলায় দ্বারের বাহিরে রাখিলেন। মুকুন্দ অন্তঃপটের বাহিরে থাকিলেন, মুকুন্দের কি সাধ্য যে, মহাপ্রভুর সম্মুখ হন!

শ্রীমন্মহাপ্রভু মুরারিগুপ্তকে বলিলেন,—"আমার রূপ দর্শন কর।" মুরারি শ্রীরামচন্দ্রের একনিষ্ঠ-ভক্ত—শ্রীরামলীলার শ্রীবজ্রাঙ্গজীই শ্রীচৈতন্য-লীলায় শ্রীমুরারিগুপ্তরূপে অবতীর্ণ। শ্রীমুরারি সপার্ষদ মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ সপার্ষদ দূর্ব্বাদলশ্যাম শ্রীরামচন্দ্ররূপে দর্শন করিলেন। মুরারিকে মহাপ্রভু অভিলাষ অনুযায়ী বর প্রার্থনা করিতে বলিলে মুরারি বলিলেন,—"প্রভো, আমি আর কিছুই চাই না, আমি একমাত্র চাই, আমার যেখানে-সেখানে জন্ম হউক না কেন, তথায় তথায়ই যেন আপনার দাসগণের সঙ্গে আমার বাস হয়।" মহাপ্রভু মুরারির এই প্রার্থনা স্বীকার করিলেন।

মহাপ্রভু যবনকুলে অবতীর্ণ ঠাকুর হরিদাসকে ডাকিয়া বলিলেন,—

"এই মোর দেহ হৈতে তুমি মোর বড়।
তোমার যে জাতি, সেই জাতি মোর দঢ়।।"

মহাপ্রভু ঠাকুর হরিদাসকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে ঠাকুর নিজের যথেষ্ট অযোগ্যতা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,—

"তোমার চরণ ভজে যে-সকল দাস।
তাঁ'র অবশেষ যেন হয় মোর গ্রাস।।
সেই সে ভজন মোর হউক জন্ম জন্ম।
সেই অবশেষ মোর—ক্রিয়া-কুলধর্ম্ম।।"

ভক্তগণ আজ মুকুন্দের প্রতি প্রভুর এইরূপ দণ্ডের কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। মহাপ্রভু মুকুন্দকে ডাকিতেছেন না দেখিয়া মুকুন্দও প্রভুর সম্মুখে আসিতে পারিতেছেন না। প্রভু আজ কত লোককে কৃপা করিলেন—বর দিলেন, আর যিনি অনুক্ষণ প্রভুকে কীর্ত্তন শ্রবণ করান—যিনি পরম মহান্ত বলিয়া ভক্ত-জগতে খ্যাত, তাঁহার প্রতি আজ প্রভুর এইরূপ ভাব কেন? ইহা দেখিয়া সকল ভক্তেরই হৃদয় ব্যথিত হইল।

অবশেষে শ্রীবাস মহাপ্রভুকে বলিতে বাধ্য হইলেন,—"প্রভো, মুকুন্দ এমন কি অপরাধ করিয়াছে যে, তাহাকে তুমি আজ তোমার সম্মুখে আসিতে দিতেছ না? আমরা জানি, মুকুন্দ তোমার প্রিয়, আমাদের সকলের প্রাণ। মুকুন্দের গান শ্রবণ করিয়া কাহার চিত্ত না বিগলিত হয়? মুকুন্দ ভক্তিপরায়ণ ও সর্ব্বদিকে সাবধান। যদি মুকুন্দের কোন অপরাধ থাকে, তবে তাহাকে শাস্তি প্রদান কর। নিজের ভৃত্যকে কেন দূরে পরিত্যাগ করিতেছ? তুমি মুকুন্দকে না ডাকিলে মুকুন্দ তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইতে সাহস করিতেছে না। তুমি মুকুন্দকে তোমার সম্মুখে ডাক, মুকুন্দ তোমার ভক্ত, তোমার রূপ দর্শন করুক।"

শ্রীবাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু বলিলেন,—

—"হেন বাক্য কভু না বলিবা।
ও বেটার লাগি' মোরে কভু না সাধিবা।।
'খড় লয়, জাঠি লয়', পূর্ব্বে যে শুনিলা।
অই বেটা সেই হয়, কেহ না চিনিলা।।
ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়, ক্ষণে জাঠি মারে।
ও **খড়জাঠিয়া বেটা** না দেখিবে মোরে।।"

পাঠক! শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার নিজ-ভক্ত মুকুন্দকে উপলক্ষ্য করিয়া জগৎকে কি শিক্ষা দিলেন, অনুধাবন করুন। আধুনিক জগৎ যদি আত্মকল্যাণকামী হইয়া শ্রীচৈতন্যের এই পরম শিক্ষাময়ী বাণীটী শ্রবণ করেন, সুস্থচিত্তে যদি বিচার করেন, তবে বুঝিতে পারিবেন যে, তথাকথিত সমন্বয়বাদের নামে কিরূপ খড়- জাঠিয়াগিরি জগতে প্রচারিত হইয়াছে ও তাহার বিষাক্ত বাষ্প চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া ভুবনমঙ্গল আত্মধর্ম্মকে আবৃত করিয়া দিতেছে।

শ্রীবাস মহাপ্রভুর অত্যন্ত বিশ্রম্ভ ভক্ত, সেই শ্রীবাস শ্রীমুকুন্দের সম্বন্ধে নানাপ্রকার সুপারিশ করিলেও নিরপেক্ষ লীলাভিনয়কারী মহাপ্রভু জগতে প্রকৃত সত্যের মর্য্যাদা স্থাপনার্থ শ্রীবাসকে জানাইলেন যে, মুকুন্দের প্রতি প্রসন্ন হইবার জন্য শ্রীবাস যেন আর মহাপ্রভুকে অনুরোধ না করেন, শ্রীবাসের অনুরোধ ব্যর্থ হইল। কারণ, মুকুন্দের আদর্শ কোন সময় দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া স্বীয় দৈন্য প্রকাশ করা,—আবার কোন সময় মহাপ্রভুকে জাঠি মারা। উহা যেমন 'একহাত পায়, আর একহাত গলায়' দিবার আদর্শের ন্যায়। ইহাই সুবিধাবাদী বা সমন্বয়বাদীর আদর্শ। সমন্বয়বাদী যখন যাহাতে সুবিধা পায়, তখন সেই পথই অবলম্বন করে। যখন সুবিধা পায়, তখন মহাপ্রভুর আনুগত্যের অভিনয় করে, আবার অন্য সময় মহাপ্রভুর শিক্ষার বিরুদ্ধ মায়াবাদ, নির্ব্বিশেষবাদ, অচিৎপরিণামবাদ বা ভক্তি-অভক্তি সকলই সমানবাদে অনুমোদন করিয়া মহাপ্রভুর বক্ষে শেলবিদ্ধ করিবার চেষ্টা করে। মুকুন্দ আজ এইরূপ সমন্বয়বাদীর আদর্শই প্রকাশ করিতেছেন; কখনও দন্তে খড় অর্থাৎ তৃণ গ্রহণ, কখনও বা জাঠি অর্থাৎ যষ্টি লইয়া মারিতে উদ্যত হওয়ার ন্যায় সমন্বয়বাদীর আচার ও বিচার প্রদর্শন করিতেছেন। এই জন্য মহাপ্রভু এইরূপ সমন্বয়বাদিগণের নাম রাখিলেন,—**"খড়জাঠিয়া-বেটা।"**

পাঞ্জাবে 'জাঠ' নামক একপ্রকার লগুড়ধারী সম্প্রদায় ছিল। পরবর্ত্তিকালে তাহাদের মধ্যে অনেকে নানকের প্রবর্ত্তিত শিষ্য-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়াছে।

শ্রীবাস পণ্ডিত মুকুন্দের প্রতি প্রসাদ বিতরণের জন্য পুনরায় মহাপ্রভুকে অনুরোধ করিলে মহাপ্রভু বলিলেন,—

— — "ও বেটা যখন যথা যায়।
সেই মত কথা কহি' তথাই মিশায়।।
বাশিষ্ঠ পড়য়ে যবে অদ্বৈতের সঙ্গে।
ভক্তিযোগে নাচে গায় তৃণ করি' দন্তে।।
অন্য সম্প্রদায়ে গিয়া যখন সান্তায়।
নাহি মানে ভক্তি, জাঠি মারয়ে সদায়।।
"ভক্তি হইতে বড় আছে",—যে ইহা বাখানে।
নিরন্তর জাঠি মোরে মারে সেই জনে।।
ভক্তিস্থানে উহার হইল অপরাধ।
এতেকে উহার হৈল দরশন-বাধ।।" (চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০ম অঃ)

পাঠক! শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের কৃপা বিচার করুন—উত্তমরূপে পাঠ করুন—শ্রবণ করুন, দেখিবেন তাহাতে কত চমৎকারিতা—কত ঔদার্য্যসীমা রহিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে আমাদের চিত্ত এমন এক পারিপার্শ্বিকতার লঘু ভাবধারায় স্থৈর্য্য-ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিয়াছে যে, আমরা কোন বিষয়ের চরম ও নিত্যমঙ্গলামঙ্গল বিচার করিতে পারি না। যাঁহারা ধর্ম্মের বক্তা, ধর্ম্মনেতা, যুগপ্রবর্ত্তক প্রভৃতি স্বয়ংসিদ্ধ ও গণগড্ডলিকার ইন্দ্রিয়-তর্পণমূলে সিদ্ধ নাম লইয়া কোন বিচারের দোহাই দেন, সেখানেও কেবল আপাত উত্তেজনা ও লোকের আপাত বহির্ম্মুখ মনোবৃত্তির প্রতি আবেদন ব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্রীচৈতন্যদেবের পরম মঙ্গলময়ী—চরম নিঃশ্রেয়োবিধায়িনী কথার সহিত বর্ত্তমান যুগের গণদেবতার যুক্তিগুলি কত তফাৎ! আজকালের কথায় কোন বিচার নাই, আছে কেবল বক্তা ও শ্রোতার ইন্দ্রিয়তর্পণ ও উভয়ের আপাত উত্তেজনার একটা সুবিধা গ্রহণ। আজকাল অত্যন্ত ঘৃণ্য সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাই একটা বাক্যচাতুর্য্য ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণতার প্রলেপে 'মহা উদারতা' বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। আর একটা দেখিবার জিনিষ এই যে, সেই কথাগুলিতে যেন বাস্তব সত্যের কথার সহিত পাল্লা দিয়া বহির্ম্মুখতা-সংরক্ষণকেই গৌরব-বৃদ্ধির কারণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভক্তগণ ভগবানকে বলিয়া থাকেন,—"প্রভো, আমাদের যদি কোটি জন্ম-জন্মান্তর হয়, হউক, অথবা কুম্ভীপাক নরকেও পচ্যমান হইতে হয়, হউক, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু সর্ব্বত্র তোমার গুণকীর্ত্তনে যেন আমাদের অচলা রতি থাকে। অথবা শ্রীল বাসুদেবদত্ত ঠাকুর যখন জীবের হরিবিমুখতা দেখিয়া মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—

"জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরক-ভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ।।"

এই সকল কথায় লোকের নিকট হইতে বেশ প্রতিষ্ঠা-ভেট পাওয়া যায় লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর হরিদাসের প্রতিষ্ঠায় মাৎসর্য্যবুদ্ধি-সম্পন্ন ঢঙ্গ-বিপ্রের ন্যায় এক শ্রেণীর আধুনিক তথাকথিত ধর্ম্ম-বক্তা লোকের

বহির্ম্মুখতার প্রত্যক্ষ মনোভাবের অধিকতর ইন্দ্রিয়তর্পণ বিধান করিয়া বলিতে উদ্যত হইলেন,—“আমাদের দেশের নীচ, দরিদ্র জাতির জন্য যদি জন্ম-জন্মান্তরও আমাদিগকে এই পৃথিবীতে আসিতে হয়—তাহাদের ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল, পরিধানের বস্ত্রের জন্য যদি আমাদিগকে লাখ লাখ জন্মও মুক্তি হইতে দূরে থাকিতে হয়, আমরা তাহাই চাই; আমরা চাই না সেরূপ মুক্তি, যাহাতে আমাদের গরীব ভ্রাতাদের, গরীব জননীদের ক্ষুধা-মুক্তি, পিপাসা-মুক্তি, লজ্জা-মুক্তি নাই।”

সভাস্থলে দাঁড়াইয়া কেহ যদি এই কথাগুলি বাক্‌চাতুর্য্যের সহিত উচ্চারণ করেন, অমনি শত শত, সহস্র সহস্র করতালি-নিনাদ চতুর্দ্দিক হইতে বক্তার কর্ণের উপর বর্ষিত হইতে থাকে। শ্রোতৃবর্গ তখন বক্তার আপাত উত্তেজনাময়ী কথাগুলির দ্বারা এত উত্তেজিত হইয়া পড়ে যে, ঐ সকল কথা ছাড়া আর কিছু অধিক বিচারের কথা জগতে আছে, তাহার অস্তিত্বই তাহারা স্বীকার করিতে প্রস্তুত হয় না। এইরূপ বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়-তর্পণে সহানুভূতির উত্তেজনা যখন গণসমষ্টিকে পাইয়া বসে, তখন গণমত নিত্যানিত্য বিচারের মুখ আবৃত করিয়া নানাপ্রকার সঙ্কীর্ণতাকেও মহাউদারতা বলিয়া অভিনন্দন প্রদান করে। এক দেশ আর এক দেশের প্রতি, এক জাতি আর এক জাতির প্রতি আন্তরিক বিদ্বেষ পোষণ করিয়াও ‘মহা উদার’, ‘দেশপ্রেমিক’, ‘বিশ্বপ্রেমিক’ প্রভৃতি নামে বৃত হয়! তখন আত্মধর্ম্ম অপেক্ষা দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মেই অধিক উদারতা আছে এবং আত্মধর্ম্মের সহিত দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মের চিজ্জড়সমন্বয়-চেষ্টায় অধিক হৃদয়বত্তা আছে, ইহাই বিচারিত হয়।

শ্রীচৈতন্যদেবের কথা অপেক্ষাও আধুনিক কালের যে-কোনও চরিত্রের সাহিত্যিক বক্তার সর্ব্বভূতে অধিক সমদৃষ্টি, অধিক তত্ত্বজ্ঞান, সিদ্ধান্তজ্ঞান, উদারতা প্রভৃতি গুণ আছে বলিয়া অনেক সময়ই আমরা অন্তরে অন্তরে ভাব পোষণ করিয়া থাকি!

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীমুকুন্দকে উপলক্ষ করিয়া ঐরূপ সমন্বয়-চেষ্টাকে গর্হণ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

— — — “ও বেটা যখন যথা যায়।
সেই মত কথা কহি’ তথাই মিশায়।।”

আধুনিককালের সাহিত্যিক ও ইন্দ্রিয়তর্পণরত সম্প্রদায় ইহাকে সাম্প্রদায়িকতা বলিয়া উড়াইয়া দিবেন এবং তৎপরিবর্ত্তে বলিলেন,—

“হাঁ জি হাঁ জি কর্‌তে রহোঁ।”

“তুমি সকল সম্প্রদায়েই মিশিও, সকলের কথায়ই ‘সায়’ দিও, সকলকেই “হাঁ হাঁ” করিও; কিন্তু অন্তরে নিজের যাহা অভিরুচি, তাহাতে নিষ্ঠা রাখিও।” তথাকথিত সমন্বয়বাদীর এই কপটতাই আজকাল মহা উদারতা।

আজকাল রুচি-অনুরূপ ধর্ম্ম, রুচি-অনুরূপ ইষ্ট, রুচি-অনুরূপ গুরু-গ্রহণ- প্রথায় খুব উদারতা লক্ষিত হয়। রোগীকে তাহার রুচি-অনুরূপ ঔষধ ও পথ্য নির্ব্বাচন করিবার ভার দিবার ন্যায় এই প্রণালী। আর

রোগীরও ইহা ডাক্তার ডাকিয়া ডাক্তারকে রোগীর আদেশ ও উপদেশানুসারে ঔষধ ও ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিবার প্ররোচনার ন্যায়। রোগীর রুচি কুপথ্যে—রোগবৃদ্ধিকর বস্তুতে। বদ্ধজীবের রুচি দেহধর্ম্মে ও মনোধর্ম্মে, বদ্ধজীবের ইষ্ট তাহার ইন্দ্রিয়তর্পণ, বদ্ধজীবের গুরু (?) তাহার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির রসদ যোগাইবার দালাল জীব-বিশেষ; এখন তাহা যে কোনও প্রতীকেই আসুন না কেন।

একশ্রেণীর চতুর সমন্বয়বাদী বলেন,—সকল ধর্ম্মকেই মুখে ঠিক বল, কিন্তু হনুমানের ন্যায় 'তথাপি মম সর্ব্বস্বো রামঃ কমললোচনঃ'—এই ভাবটী রাখ। সমন্বয়বাদীর বহির্ম্মুখতা এই অনুকরণ-বিদ্যায় যে একটী মস্ত ভুল করিয়াছে, তাহা সে ধরিতে পারে নাই। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীমুকুন্দকে উপলক্ষ করিয়া জগতে যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাতে ভাবীকালের সমন্বয়বাদীর সেই অবৈধ যুক্তিও নিরাকৃত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণে আমরা দেখিতে পাই যে, মহাপ্রভু তাঁহার মহাপ্রকাশের দিনে শ্রীমুরারিগুপ্তকে শ্রীরামনিষ্ঠাই প্রদান করিলেন। যখন শ্রীল সনাতন ও শ্রীল রূপ তদীয় কনিষ্ঠভ্রাতা শ্রীঅনুপমকে কৃষ্ণভজনার্থ অনুরোধ করিয়াছিলেন, তখন শ্রীঅনুপম বলিয়াছিলেন,—

রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছোঁ মাথা।
কাড়িতে না পারোঁ মাথা, পাও বড় ব্যথা।।
কৃপা করি' মোরে আজ্ঞা দেহ দুই জন।
জন্মে জন্মে সেবোঁ রঘুনাথের চরণ।।

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে অধিকতর মাধুর্য্য থাকিলেও শ্রীরূপ-সনাতন বা শ্রীমন্মহাপ্রভু অনুপমের রামনিষ্ঠার হন্তারক হন নাই, বরং শ্রীমন্মহাপ্রভু অনুপমের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—

সেই ভক্ত ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজ-জন।।

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ পঃ)

আবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় ব্যেঙ্কট ভট্ট প্রভৃতি এবং দক্ষিণদেশের অনেক রামোপাসক অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি মাধুর্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের উপাসক হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু মুরারিগুপ্তকে লক্ষ্য করিয়া জানাইলেন যে, বিষ্ণু-উপাসনা ও বিষ্ণুমায়া-উপাসনা, মায়াবাদ ও হরিসেবায় কখনও সমন্বয় হইতে পারে না। যে ব্যক্তি মায়াবাদীর সভায় উপস্থিত হইয়া মায়াবাদে 'সায়' দেয়, আবার ভক্তের সভায় গিয়াও "হাঁ জি হাঁ জি" করে, সেই ব্যক্তিই মহাপ্রভুর ভাষায়,—

"খড়জাঠিয়া বেটা"।

সে ব্যক্তির ভক্তিদেবীর পায়ে এক হাত এবং গলায় আর এক হাত! সে ব্যক্তি কপট অধার্ম্মিক। সে কেবল সুবিধাবাদী, সমন্বয়বাদী কেবল তাহার সুবিধাবাদের লোকবঞ্চনাময় ধর্ম্মের মুখোসপরা একটা প্রতীক-মাত্র।

মহাপ্রভু শ্রীঅনুপম, শ্রীমুরারিগুপ্ত প্রভৃতি ভক্তবৃন্দকে যথেষ্ট আদর করিয়াছেন, কৃপা করিয়াছেন, নিজ-জন জ্ঞান করিয়াছেন। কিন্তু রঘুনাথ ভট্টের সহিত গৌড়- দেশ হইতে নীলাচলে আগত কাব্যপ্রকাশের অধ্যাপক রামোপাসক রামদাসকে আদর করেন নাই—তাঁহার রামোপাসনাকে রামনিষ্ঠা বলেন নাই; কেন না, সেই রামোপাসনার ছলনার অন্তরে মায়াবাদ ছিল—রামের নিত্য রূপ, গুণ, লীলা-বিনাশের চেষ্টা ছিল—তাহা রামভক্তির ''পায়ে এক হাত, আর গলায় এক হাত''—সেই 'খড়জাঠিয়া বেটা'র অপর সংস্করণের আদর্শ।

এরূপ 'খড়জাঠিয়া বেটার" আদর্শ-সমূহ কোন কোন সময় যতই 'তৃণাদপি সুনীচ' ভাব, ভক্তির নানাপ্রকার আনুকরণিক হাবভাব প্রদর্শন করুক না কেন, ইহাদের আদৌ আত্মধর্ম্মের প্রতি ঐকান্তিকতা নাই। যাঁহারা আত্মধর্ম্মকে অনাত্ম- ধর্ম্মের সহিত সমান বলেন, তাঁহারা কখনই আত্মধর্ম্মকে অন্তরে আদর করেন না, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অনাত্মধর্ম্মের দিকেই তাঁহাদের পাল্লার ঝোঁক সর্ব্বাপেক্ষা বেশী—তাঁহারা অনাত্মধর্ম্মেরই লোক। যাঁহারা পাতিব্রত্য ধর্ম্মকে ব্যভিচার-ধর্ম্মের সহিত সমান বলিয়া সমন্বয়বাদিরূপে পরিগণিত হন এবং ব্যভিচারীর সংখ্যাধিক্যই জগতে বর্ত্তমান থাকায় সেই সংখ্যাধিক্যের দ্বারা অভিনন্দিত হন, তাঁহাদের 'সব সমান' কথাটী যেমন অযৌক্তিক, তেমনি মৌখিক মাত্র। তাঁহাদের অন্তরে ব্যভিচারের প্রতিই অধিকতর প্রীতি, নিষ্ঠা, আসক্তি ও পক্ষপাতিত্ব আছে বলিয়া তাঁহারা ব্যভিচারকে অত্যধিক আক্রমণের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য পাতিত্য ধর্ম্মের সহিত অন্ততঃ সমান বলিবার কৌশলটী আবিষ্কার করিয়া রাখিয়াছেন। কারণ, চোর যদি সাধুকে অন্ততঃ চোরের সহিত সমান না বলে, তবে সাধু চোরকে খুব বেশী আক্রমণ করিবে। 'চোর' ও 'সাধু'—সমান, 'ভক্তি' ও 'অভক্তি'—সমান, 'হরিসেবা' ও 'মায়াবাদ'—সমান, 'বিষ্ণু-পূজা' ও 'বিষ্ণুর বহিরঙ্গা মায়া'র পূজা—সমান বলিলে অন্ততঃ চোরই শ্রেষ্ঠ, অভক্তিই শ্রেষ্ঠ, মায়াবাদই শ্রেষ্ঠ, আর সাধু, ভক্তি, হরিসেবা তদপেক্ষা লঘুই প্রচারিত হয় এবং তদ্দ্বারা প্রচ্ছন্ন কপটতাপূর্ণ সাম্প্রদায়িকতাই প্রমাণিত হয়। 'চোর' ও 'সাধু' সমান বলিলে সাধুর কিছু প্রশংসা হয় না, তদ্দ্বারা চোরের প্রশংসা হয় এবং সাধুর নিন্দা হইয়া পড়ে। সুতরাং কার্য্যতঃ একের বন্দনা ও অপরের নিন্দা অনিবার্য্য হইয়া সঙ্কীর্ণ ও কপট সাম্প্রদায়িকতাই প্রমাণিত হয়। তথাকথিত সমন্বয়বাদিগণ—যাঁহারা সকল ধর্ম্মই সমান, এরূপ মত প্রচার করেন, সকল উপাসনাই সমান বলেন, তাঁহারা ঐরূপ অত্যন্ত কপট ও সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর রাজ্যে—ভাগবতধর্ম্মে কপটতার কোনও স্থান নাই। মহাপ্রভু —সরল, চোর, দস্যুকে উদ্ধার করেন, জগাই মাধাইর মঙ্গল করেন, দারী সন্ন্যাসীকে কৃপা করিবার জন্য তাহার গৃহে পর্য্যন্ত গমন করেন; কিন্তু কপট মায়াবাদিগণ 'সন্ন্যাসী', 'বেদপাঠী', 'আচার-পরায়ণ', 'ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ' বলিয়া খ্যাত হইলেও তাঁহারা মহাপ্রভুর দর্শন পান না। সমন্বয়বাদী অভক্তিবাদ ও ভক্তিসিদ্ধান্তকে একাকার করিতে চাহেন বলিয়া মহাপ্রভু নিজ-ভক্ত মুকুন্দকে লক্ষ্য করিয়া ঐ সকল সমন্বয়বাদীকে 'খড়জাঠিয়া বেটা'র আদর্শ বলিয়া গর্হণ করিলেন এবং মহাপ্রভুর প্রসাদ ও বর হইতে তাঁহারা যে চিরদিন বঞ্চিত, তাহা জানাইলেন। তাঁহারা কোনদিন মহাপ্রভুর ঘরে প্রবেশ করিতে পারেন না—সমন্বয়বাদিগণের সাহস নাই যে, তাঁহারা মহাপ্রভুর সম্মুখে আসেন, কারণ, তাঁহারা কপট ও অপরাধী; তাঁহারা সর্ব্বদা অন্তঃপটের বাহিরেই থাকেন।

মহাপ্রভু মুকুন্দের আদর্শ-দ্বারা আরও শিক্ষা দিলেন। সমন্বয়বাদী যখন অসদ্-গুরু বা অসৎসঙ্গিগণের সঙ্গের কুফল হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহাদিগকে চিরতরে দুঃসঙ্গ বলিয়া বর্জ্জন করেন এবং তাহাদের তথাকথিত সমন্বয়বাদের প্রতিমাকে চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন করেন, তখন তাঁহাদের মঙ্গল হয়।

মুকুন্দ বাহিরে থাকিয়া মহাপ্রভুর সকল কথা শুনিতে পাইলেন। মহাপ্রভু মুকুন্দকে দর্শন-প্রদান করিবেন না শুনিয়া মুকুন্দ যারপরনাই ব্যথিত হইলেন। মুকুন্দ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—"আমি আমার পূর্ব্বগুরুর শিক্ষা ও সঙ্গ-ফলেই এইরূপ সমন্বয়বাদ স্বীকার করিয়া আত্মধর্ম্ম-ভক্তির অসমোর্দ্ধ মহত্ত্ব বুঝিতে পারি নাই। ভক্তিধর্ম্ম—আত্মধর্ম্ম, তাহা অসম ও অনূর্দ্ধ; তাহার সমান আর কোন ধর্ম্ম নাই, তাহা হইতে উর্দ্ধ কোন ধর্ম্ম বা বৃত্তি নাই, যেমন শ্রীচৈতন্য ভগবান্—অসমোর্দ্ধ, তেমনি শ্রীচৈতন্যের শক্তিস্বরূপিণী ভক্তিও অসমোর্দ্ধা। যখন আমি মহাপ্রভুর দর্শন পাইব না, তখন আমি এ শরীরও আর রাখিব না। অপরাধী শরীরকে আমি আজই পরিত্যাগ করিব।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া মুকুন্দ শ্রীবাসকে বলিলেন,—"শ্রীবাস, তুমি মহাপ্রভুর নিকট জিজ্ঞাসা কর, আমি কি কখনই প্রভুর দর্শন পাইব না?" ইহা বলিতে বলিতে মুকুন্দ অঝোর-নয়নে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণও মুকুন্দের দুঃখে দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিলেন।

মুকুন্দের কোনওকালে মহাপ্রভুর দর্শনে যোগ্যতা হইবে কি না, প্রভুর নিকট জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীবাস পণ্ডিতকে মহাপ্রভু বলিলেন,—"কোটি জন্মের পরে মুকুন্দের নিশ্চয় দর্শন-সৌভাগ্য লাভ হইবে।"

মহাপ্রভুর মুখে 'কোটি' জন্মের পরেও ভক্তি লাভ হইবে এবং প্রভুর দর্শন-লাভ ঘটিবে শুনিয়া মুকুন্দ পরমানন্দসুখে সিঞ্চিত হইলেন। মুকুন্দের আনন্দিত হইবার কারণ এই যে, মুকুন্দ সমন্বয়বাদী মায়াবাদীর পর্য্যায়ে গণিত হইলেন না। সমন্বয়বাদি-মায়াবাদিগণ নির্ব্বিশেষবাদ আঁচলে বাঁধিয়া যে সমন্বয়ের যথেচ্ছ খেলা খেলেন, তাহাতে চির-আত্মহত্যা হয় বলিয়া কোনদিনই তাঁহারা ভক্তির অধিকারী হইতে পারেন না। ভগবানের নিত্যস্বরূপ দর্শন করিতে পারা যায় না, এই অবস্থার অধীন হইতে হইল না জানিয়াই মুকুন্দের পরম আনন্দ হইল। নির্ব্বিশেষগতিলক্ষ্য সমন্বয়বাদীর নিত্যবৃত্তি ভক্তি চিরতরে বিলুপ্ত হয়। সমন্বয়- বাদীর ন্যায় মহাপ্রসাদ ও ডালভাতে সমানবুদ্ধিজনিত এবং ঐরূপ উপদেশের প্রদানকারী অসদ্গুরুর সঙ্গ-প্রভাবে যে,—

> "ব্রহ্মাবন্নির্ব্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ।
> বিকারং যে প্রকুর্ব্বন্তি ভক্ষণে তদ্দ্বিজাতয়ঃ।।
> কুষ্ঠব্যাধিসমাযুক্তাঃ পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ।
> নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রাস্তস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ।।"

এবং

> "যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
> তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্।।"

প্রভৃতি শ্লোকের বিচারও মুকুন্দের চিন্তাস্রোতের মধ্যে আগত হওয়ায় মুকুন্দের যে নৈরাশ্য উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা হইতে "কোটিজন্মের পর ভক্তিলাভ হইবে"—এই আশ্বাসবাণীতে উদ্ধার-লাভ করিয়া মুকুন্দ পরমানন্দ-সুখে মগ্ন হইলেন। মুকুন্দ শ্রীচৈতন্যের অপার করুণা স্মরণ করিয়া প্রেমবিহ্বলিত চিত্তে উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

ভগবান্—প্রেমবাধ্য। ভক্ত প্রেমের দ্বারা ভগবানকে এরূপ বাধ্য করিতে সমর্থ যে, তিনি ভগবানের অভিপ্রায় পরিবর্ত্তন করিতে সর্ব্বদাই যোগ্য। মহাপ্রভু বলিলেন,—"মুকুন্দ, আমার অসামান্য শক্তিও তোমার প্রীতি-সেবায় পরাজয় লাভ করিল। তুমি ভগবানের নিত্যদাস্য বিস্মৃত হইয়া তাৎকালিক দুঃসঙ্গবশে তোমার নিত্যবৃত্তি ভুলিয়া গিয়াছিলে, তোমার সঙ্গদোষ ঘটিয়াছিল। সমন্বয়বাদ ভগবৎসেবা-স্মৃতির পরম শত্রু। সমন্বয়বাদি-গুরুব্রুবের সঙ্গের ন্যায় আর দুঃসঙ্গ কিছু নাই। ভগবানের ঐকান্তিক ভক্তগণের সঙ্গ-প্রভাবে তোমার অভক্তিপথে অনিত্যরুচি পরিবর্ত্তিত হইয়া নিত্যরুচির উদয় হইয়াছে। সুতরাং তোমার আর কোন ভগবদ্-বিমুখতা থাকিতে পারে না। "তুমি ভগবদ্ভক্তি লাভ করিবে"—এই বর আমি তোমাকে দিলেও তোমার অপরাধানুসারে ভক্তির পুনঃ-প্রাপ্তির কাল 'কোটি জন্ম' অবধারিত করিয়াছিলাম। কিন্তু তোমার তীব্র সেবাপ্রবৃত্তিতে আমার নির্দ্দিষ্টকাল নিমেষমাত্রেই অতিক্রম করিবার শক্তি লাভ করিল—তোমার শক্তি- দ্বারা আমার শক্তি বিজিত হইল।

মুকুন্দ, তুমি সর্ব্বদা ভগবৎকীর্ত্তন করিয়া থাক। সে জন্য তোমার সহিত আমার নিত্যবসতি। তবে যে কোটি জন্ম পরে তোমাকে দর্শন দিব বলিয়াছি, উহা রহস্য-মাত্র জানিবে। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, সে জন্য তোমার সহিত পরিহাস করা আমার স্বভাব।"

এই লীলার দ্বারা মহাপ্রভু জানাইলেন যে, তথাকথিত সমন্বয়বাদী ভক্তির চরণে চির-অপরাধী। সমন্বয়বাদী কখনও শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনের অধিকারী নহে,—

"ভক্তিস্থানে অপরাধ কৈলে, ঘুচে ভক্তি।
ভক্তির অভাবে ঘুচে দরশন-শক্তি।।"

হিন্দোল-লীলা

কি অন্যাভিলাষী, কি কর্ম্মী, কি অর্চ্চনাধিকারী, কি তথাকথিত ভজনাভিনয়কারী—সকলেই এই সময়ে হিন্দোল-যাত্রা-উৎসবের আড়ম্বর করিয়া থাকেন। অযোধ্যায় শ্রীরামসীতার ঝুলন প্রত্যেক মন্দিরে মন্দিরে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ও তাহা দর্শন করিবার জন্য বিভিন্ন স্থান হইতে অসংখ্য লোকের সমাগম হয়। বৃন্দাবনে ত' ঝুলন-উৎসবের কথাই নাই,—প্রত্যেক কুঞ্জে, প্রত্যেক গৃহে ঝুলন হইয়া থাকে। তথায় একাদশীরও বহু পূর্ব্ব হইতে অনেক স্থানে ঝুলন আরম্ভ হয়। ঝুলন ও দোল-লীলা-উৎসবই শ্রীবৃন্দাবনে সর্ব্বাপেক্ষা বড়

উৎসব। এই সময় দেশ-বিদেশ হইতে অগণিত যাত্রী তথায় উপস্থিত হন। পূর্ব্ববঙ্গের কোনও কোনস্থানে ঝুলন-উৎসব একটা বিশেষ আমোদ-প্রমোদের ব্যাপার। গৃহের বালক বালিকাগণও এই উৎসবে উৎসাহ প্রকাশ করিয়া থাকে। সারা বৎসর ঠাকুরের সহিত কোনও সম্বন্ধ নাই, ঝুলনের কয়েক দিবস বালকগণ কেহ ঠাকুর ধার করিয়া, কেহ বা বৎসরের ৩৬০ দিনের সুপ্ত ঠাকুরকে ৫ দিনের জন্য জাগাইয়া তাঁহাকে লোকের রুচিকর নানাভাবে সজ্জিত করিয়া থাকে এবং দোলার মধ্যে স্থাপন-পূর্ব্বক ঝুলন-যাত্রা করে। পূর্ব্ববঙ্গের "সোণারগাঁও পানাম" নামক স্থান ঝুলনের জন্য প্রসিদ্ধ। সেখানে ঝুলনের জন্য কয়েক দিবস-ব্যাপী পাঠার্থিগণের বিদ্যালয়, ব্যবসায়িগণের ব্যবসায়-ক্ষেত্র এবং যাবতীয় কর্ম্মক্ষেত্র বন্ধ থাকে।

বিভিন্ন স্থানের ঝুলনযাত্রায় যে সর্ব্বত্রই শ্রীরাধাগোবিন্দকে হিন্দোলে অরোহণ করান হয়, তাহা নহে; কোথায়ও বলদেবকে, কোথায়ও শ্রীরামচন্দ্রকে, কোথায়ও রামকানাইকে, কোথায়ও বা গোপালদেবকে, কোথায়ও মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুকে, কোথায়ও শ্রীশালগ্রামকে, আবার আধুনিক-কালে আনুকরণিক নাগরীমতাবলম্বীর কেহ কেহ গৌরবিষ্ণুপ্রিয়াকে ঝুলনে আরোহণ করাইয়া থাকেন।

পূর্ব্ববঙ্গের কোনও কোনও ঝুলনবাড়ীতে এ জন্য অজস্র ব্যয় হয়, অনেক আখড়ায়, অনেক ধনাঢ্যের গৃহে শ্রীরাধাগোবিন্দের সম্মুখে বারবনিতার নৃত্য এবং সেই নৃত্যের আসরে নানাপ্রকার কুরুচি ও আসবাদির প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত ঢপগান, ভাড়াটিয়া পদাবলীগান, যাত্রাগান প্রভৃতি ত' আছেই।

সকলেই স্বতন্ত্র। কাহারও উপদেষ্টা নাই; যাঁহারা কুলক্রমাগত উপদেষ্টার অভিনয় করিতেছেন, তাঁহাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত-বোধ নাই, আচরণ নাই, প্রাণপূর্ণ জীবন নাই, শাসন করিবার সামর্থ্য নাই, তাঁহারাও ইন্দ্রিয়-তর্পণ- রোগগ্রস্ত। ঐরূপ আমোদ-প্রমোদ-দ্বারা ইন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত এবং অপরাধের মাত্রা বৃদ্ধি ব্যতীত অন্য কোনও সুফল হয় না।

হিন্দোল-লীলা মাধুর্য্যরসবিগ্রহ অধোক্ষজ শ্রীভগবানের সম্ভোগময়ী লীলা- বিশেষ। শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে পূর্ব্বাহ্নলীলাবর্ণনে ৭ম সর্গে হিন্দোল-লীলার বর্ণনা দৃষ্ট হয়,—

আগ্নেয্যাং ভাতি পদ্মাভরত্নহিন্দোলকুট্টিমম্।
পূর্ব্বাপরদিগুৎপন্ন-প্রবীণবকুলাগয়োঃ।।
সাচি কিঞ্চিদ্বিনির্গত্য গত্যা বক্রোর্দ্ধয়োপরি।
মিলিতাভ্যাং সুশাখাভ্যাং ছাদিতং মণ্ডপাকৃতিঃ।।
তচ্ছাখামূলসংনদ্ধৈঃ পট্টরজ্জু-চতুষ্টয়ৈঃ।
দৃঢ়ৈর্ব্বদ্ধচতুষ্কোণং নাভিমাত্রোচ্চসংস্থিতিঃ।।
পদ্মরাগাষ্টপট্টীভিঃ প্রবালজপদাষ্টকৈঃ।
ঘটিতং হস্তমাত্রোচ্চপট্টীবেষ্টনকেশরম্।।

অষ্টপত্রাম্বুজাকার-রত্নানি চিত্রিকর্ণিকম্।
দ্বিদ্বিপাদান্বিতাম্ভোজদলাভাষ্টদলৈর্বৃতম্।।
রত্নপট্টীকেশরান্তর্দ্বারাষ্টক সুসংযুতম্।
দক্ষিণে দলপার্শ্বস্থারোহদ্বারদ্বয়ান্বিতম্।।
লঘুস্তম্ভদ্বয়াসক্তপট্টীপৃষ্ঠাবলম্বকম্।
পট্টতুলী-লসন্মধ্যং পার্শ্বপৃষ্ঠোপধানকম্।।
নানাচিত্রাংশুকৈশ্ছন্নং স্বর্ণসূত্রাম্বরৈরপি।
লসচ্চন্দ্রাবলীমুক্তাদামগুচ্ছবিতানকম্।।
যত্রাষ্টদলগালীনাং মধ্যগৌ রাধিকাচ্যুতৌ।
গায়দন্য বয়স্যাভির্বৃন্দা দোলয়তীশ্বরৌ।।

(শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ৭ম।৫৫-৬৩)

অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবনের সকলেই চিন্তামণি-সদৃশ; যেখানে-কোনও প্রাকৃত বস্তু বা অস্মিতার অবসর নাই। সেখানে সকলেই স্বরূপবুদ্ধ ও পরম মুক্ত। সেখানে বিষয় একজন, আর সকলই আশ্রয়। আশ্রয়গণ আশ্রয়-শিরোমণির সহিত একমাত্র অদ্বিতীয় বিষয়ের মিলন করাইয়া তাঁহাদের সেবাসুখ-তাৎপর্য্যপর অপ্রাকৃত সম্ভোগলীলায় স্ব-স্ব সেবাফল নিয়োগ করেন। সেখানে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-সুখ-তাৎপর্য্য ব্যতীত কোনও প্রকার আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার লেশ-মাত্র নাই। সেইরূপ অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবনে অপ্রাকৃত হিন্দোলাম্বুজের অষ্টদলস্থ অপ্রাকৃত ললিতাদি অষ্টসখীগণের মধ্যে অবস্থিত শ্রীরাধাগোবিন্দকে শ্রীবৃন্দাদেবী দোলানিম্নস্থ অন্য অপ্রাকৃত গায়িকা সখীগণের সহিত দোলাইয়া থাকেন।

যশোদাদি প্রৌঢ়া গোপীগণ যে বালগোপালকে দোলায় দোলাইয়া থাকেন, তাহা বাৎসল্যরসময়, সেখানে মধুর রসের নায়ক-নায়িকার বিচার নাই। বিষয়-বিগ্রহ শ্রীরামচন্দ্র বা অন্যান্য বিষ্ণুবিগ্রহের সুখবিধানের জন্য যে তাঁহাদিগকে দোলায় সঞ্চারণ করান হয়, তাহাও মাধুর্য্যময়ী লীলা নহে, তাহা দাস্যরসের বিচারেই প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীকৃষ্ণের গৌরলীলাবৈশিষ্ট্যে সম্ভোগবাদ নাই; ঔদার্য্যলীলাতনু বিপ্রলম্ভ- বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরও নাগর নহেন। এজন্য গৌরপরিকরগণ কখনও আপনাকে অপ্রাকৃত ব্রজনাগরীর অনুকরণে 'নাগরী' কল্পনা করিয়া গৌরসুন্দরকে ঝুলনে আরোহণ করান না। তবে যে কোথায়ও কোথায়ও গৌর-গদাধরের ঝুলন-প্রসঙ্গ প্রাচীন গীতি প্রভৃতিতে শ্রুত হয়, তাহা পূর্ব্বাবতারের ঝুলন-লীলারই উদ্দীপক। সেখানে নদীয়া-নাগরীবাদের কোনও পূতিগন্ধ নাই।

শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ ও শিষ্যের পরিমুক্ত দৃষ্টিতে অভিন্ন বার্যভাবনী হইলেও মহান্ত শ্রীগুরুদেব উপদেশক-রূপে—বিপ্রলম্ভের মূর্ত্তি, তাঁহাতে সম্ভোগবাদের কোনও কথা নাই। জীবের অপ্রাকৃত সেবাবৃত্তির অভাব

থাকা-কালে বার্ষভাবনী মহান্ত শ্রীগুরুরূপে জীবের নিকট উপস্থিত হন। সুতরাং শ্রীগুরুদেবের, মহাপ্রভুর পার্ষদগণের, ভগবৎপার্ষদগণের শ্রীকৃষ্ণের সহিত ঝুলন নাই। তাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলনকালে দূরে অন্য আসনে থাকিবেন। শ্রীশালগ্রামের ঝুলন হইবে না, তবে শ্রীগিরিধারীর ঝুলন হইবে।

পর-পীড়ন

শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া যে শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন, তন্মধ্যে যে বৈধী সাধন-ভক্তির পর্য্যায় দৃষ্ট হয়, তাহাতে প্রাণি-মাত্রকেই মনোবাক্যে উদ্বেগ-প্রদান নিষিদ্ধ হইয়াছে,—

"প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব"। (চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ)

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেও শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিতেছেন,—

"ভূতানুদ্বেগদায়িতা" অর্থাৎ প্রাণিসমূহকে উদ্বেগ-প্রদান-বর্জ্জন ভক্তি-মন্দিরে প্রবেশের অন্যতম দ্বার-স্বরূপ। যাঁহারা প্রাণি-সমূহকে কায়মনোবাক্যে তাপ বা উদ্বেগ-প্রদানরূপ মৎসর ও আত্মেন্দ্রিয়পর কার্য্য পরিত্যাগ না করিয়াছেন, তাঁহারা কখনও ভজনমন্দিরের দ্বারেও প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

এই 'প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ প্রদান'কে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীগোস্বামিপাদগণ সেবাপরাধ, নামাপরাধ, অবৈষ্ণব-সঙ্গ, বিষ্ণুবৈষ্ণব-নিন্দা-শ্রবণাদির সহিত সমপর্য্যায়ে গণনা করিয়াছেন। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ব বিভাগ, ২য় লহরীর ৪২শ সংখ্যা ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২২শ পরিচ্ছেদের ১১৫-১১৭ সংখ্যা দেখিলেই এ বিষয়ের সত্যতা প্রমাণিত হইবে।

সেবাপরাধ, অবৈষ্ণব-সঙ্গ, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দা, গ্রাম্যবার্ত্তা-শ্রবণাদি যেরূপ ভক্তিপথের পরম হানিকর, প্রাণিমাত্রে কায়মনোবাক্যে উদ্বেগ-প্রদানও তেমনি হানিকর। সম্বন্ধজ্ঞান বা আত্মস্বরূপ ও পরস্বরূপের বিচারে শৈথিল্য হইতে পর-পীড়নের প্রবৃত্তি উদিত হয়। আপনাকে অপর প্রাণী বা ব্যক্তিবিশেষ হইতে শ্রেষ্ঠ-জ্ঞান, নিজের কাম, মৎসরতা, হিংসা প্রভৃতি চরিতার্থ করিবার গুপ্ত ইচ্ছা প্রভৃতি ভক্তিবিরোধী চিত্ত-বৃত্তি হইতেই প্রাণিসমূহকে কায়মনোবাক্যে পীড়ন করিবার প্রবৃত্তির উদয় হয়। ভক্তির বিরোধী কর্ম্মিসম্প্রদায় বৈষ্ণবনিন্দা, গ্রাম্যবার্ত্তা-কথা-শ্রবণ, অবৈষ্ণব-সঙ্গ প্রভৃতি করিয়া যেরূপ সুখানুভব করে, তদ্রূপ প্রাণি-সমূহকে কায়মনোবাক্যে পীড়ন করিয়াও সুখ পাইয়া থাকে। আমরা যাহাদিগকে পীড়ন, তাপ বা উদ্বেগ প্রদান করি, তাহাদের সহিত আমাদের ন্যূনাধিক সঙ্গ হইয়া যায়। যে বস্তুতে যাহার যত কাম-বৃত্তি অধিক, সে বস্তুর নিকট হইতে কামবৃত্তির অপ্রাপ্তিতে তত অধিক ক্রোধ ও তৎফলস্বরূপ তৎপীড়নের প্রবৃত্তি উদিত হয়। যে প্রভু ভৃত্যের নিকট যতটা অধিক সেবা আকাঙ্ক্ষা করে, যে স্বামী স্ত্রীর নিকট যতটা অধিক ভোগ আশা করিয়া থাকে, সেই প্রভু ও সেই স্বামীর ভৃত্য বা পত্নীর নিকট হইতে বাঞ্ছিত সেবা-প্রাপ্তির অভাব-জনিত
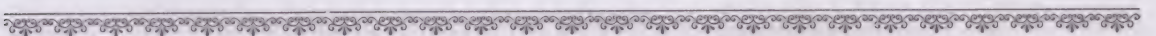
ততটা অধিক ক্রোধের উদয় ও তাহাদিগকে নানাভাবে পীড়ন বা উদ্বেগ-প্রদান-পূর্ব্বক কাম-চরিতার্থতার চেষ্টা লক্ষিত হয়।

অনেক সময় দেখা যায় যে, কেহ কেহ প্রত্যক্ষভাবে নিজ কাম-পরিপূরণের বশবর্ত্তী না হইয়াও পরপীড়ন করিতে উদ্যত হইয়া থাকে। কোন দুষ্ট-প্রকৃতির ব্যক্তিকে নারী-নির্য্যাতন বা স্ত্রীজাতির প্রতি অসম্মান করিতে দেখিয়া অনেক সহৃদয় ব্যক্তি ক্রোধান্ধ হইয়া ঐরূপ দুষ্ট-প্রকৃতির ব্যক্তিকে প্রহারাদি-দ্বারা পীড়ন করিয়া থাকেন। এইরূপ চিত্তবৃত্তি কর্ম্মিসম্প্রদায়ের ন্যূনাধিক প্রশংসিত হইলেও ইহা ভক্তিমন্দিরে প্রবেশার্থিগণের অনুকরণীয় ত' নহেই, পরন্তু যদি দৈবাৎ ঐরূপ প্রবৃত্তি কোন ব্যক্তিতে দৃষ্ট হয়, তবে জানিতে হইবে যে, ঐ ব্যক্তি ভক্তিবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মীর ভাবনায়, কর্ম্মীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। একজনকে পীড়ন করিয়া অপরের তোষণ, গরু মারিয়া ব্রাহ্মণকে জুতাদান কর্ম্মিসমাজে আদৃত হইতে পারে, পশু হত্যা করিয়া ভোগী মানুষের শরীর পুষ্টি করা—মনুষ্যজাতিকে বলবান্ করা কর্ম্মিসমাজের আদর্শ বটে, কিন্তু তাহা সমগ্র জগতের আত্যন্তিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পরমেশ্বর-সেবকগণের আদর্শ নহে। ভগবদ্ভক্তগণের উপকারের প্রণালীই ঐরূপ নহে। তাঁহারা জীবের পাপবীজ, অবিদ্যা বা ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতা উন্মূলন করিয়া থাকেন, লোকের প্রতি সাময়িক হিংসা বা ক্রোধ চরিতার্থ করিয়া আপনাদিগকে অসহিষ্ণু ও অপর ব্যক্তির অসৎ-প্রবৃত্তিকে নানা কপটতার সম্পুটে পরিবর্দ্ধিত হইবার সুযোগ প্রদান করেন না।

বর্ত্তমানযুগে যে হিন্দু ও অহিন্দুগণের মধ্যে সংঘর্ষ, দুর্বৃত্তগণের হস্ত হইতে নারীগণকে সংরক্ষণ করিবার চেষ্টার মুখোসে দ্বিতীয় প্রকার প্রচ্ছন্ন অবৈধাচার চলিয়াছে, তাহার দ্বারা কোনও দিন সমাজের বাস্তব ও আত্যন্তিক উপকার হইবে না। উহা কেবল পরম্পরায় প্রতিযোগি-দল সৃষ্টি করিয়া জগতে অতি হীন সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, হিংসা, ব্যভিচার, কপটতা ও ভণ্ডামি-গুণ্ডামির নানাপ্রকার তাণ্ডবের স্বারাজ্য সৃষ্টি করিবে।

ঐরূপ প্রণালী অভক্ত কর্ম্মিসম্প্রদায়ের নিকট বহুমানিত হইতে পারে; কারণ, তাঁহারা নৈসর্গিক অসহিষ্ণুতা-নিবন্ধন অত্যন্ত স্থূল প্রত্যক্ষের পক্ষপাতী। তাঁহারা স্থূল-জয়কেই "জয়" মনে করেন, কিন্তু স্থূল-জয় অত্যন্ত সাময়িক; উহা অন্তরে বিদ্রোহের সূক্ষ্ম বীজ সংরক্ষণ করে এবং সুযোগ পাইলেই স্থূল প্রতিক্রিয়া আরম্ভ করিয়া থাকে।

ভগবদ্ভক্তগণের প্রণালী "আত্মজয়ের প্রণালী"—কারণ-উন্মূলনের প্রণালী, উহা সাময়িকভাবে কার্য্য স্তব্ধ করিবার প্রণালী নহে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, যদি ভক্তির বিরুদ্ধ কোন কার্য্য বা ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের অভিনয় করিয়া কাহাকেও কোন নৈতিক দুরাচার করিতে দেখা যায়, তবে সেইস্থলে ঐরূপ দুষ্টাচারীকে পীড়ন বা শাসন করা কর্ম্মিসম্প্রদায়ের আদর্শানুসরণ হইল কৈ? বরং উহা ত' ভক্তির কার্য্যই হইল।

এরূপ বিচারও সংযত ও শাস্ত্রশাসিত হওয়া আবশ্যক; নতুবা কর্ম্মরাজ্যেরই একটা দিক্‌কে 'ভক্তির কার্য্য' বলিয়া ভ্রম করা হইবে। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৬।২৬) দেখিতে পাই,—

"সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।" সাধুগণের বহির্ম্মুখ লোকসমূহকে শাসন করিবার অন্য কোন অস্ত্র নাই, তাঁহাদের একমাত্র অস্ত্র— 'উক্তি'। 'উক্তি' বা উপদেশ-দ্বারা তাঁহারা শাসন করিয়া থাকেন। বাস্তবিকই 'উক্তি' এরূপই ক্ষমতাসম্পন্ন যে, তাহা অনেক সময়ই স্থূল অস্ত্রপ্রয়োগ বা লগুড়- প্রহারাদি অপেক্ষাও অধিকতর তীব্র, মর্ম্মস্পর্শী ও কার্য্যকরী। অকপট আচরণশীল সাধুগণ উক্তিদ্বারা যাহা ছেদন করিতে পারেন, সমগ্র অসাধুসম্প্রদায় আধুনিক বিজ্ঞানোদ্ভাবিত কামান, গুলিগোলার দ্বারাও তাহা করিতে সমর্থ হন নাই বা হইবেন না। কামান-বন্দুকের দ্বারা চিত্ত-শোধন হয় না, শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা যায় না, কিন্তু একমাত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-পর প্রেমের দ্বারাই সকলের হৃদয় শোধন ও আকর্ষণ করা যায়।

ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব বিধর্ম্মী গৌড়েশ্বর হুসেন সাহকে কামান-বন্দুকের দ্বারা জয় করেন নাই। কারণ, সেইরূপ জয় করার চেষ্টাই নিজের পূর্ব্ব-পরাজয়ের লক্ষণ। পূর্ব্ব-পরাজিত ব্যক্তিই অস্ত্র-শস্ত্র বা দৈহিক বলপ্রয়োগের দ্বারা অপরকে পরাজিত করিবার চেষ্টা করেন। শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমের দ্বারা মানুষ ত' দূরের কথা, বনের হিংস্র-ব্যাঘ্যাদিকে পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন—তাহাদিগকে প্রেমে জয় করিয়া প্রেম দিয়াছিলেন।

শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর চরিত্র-প্রসঙ্গে শুনা যায় যে, যখন তিনি বাণপুর-গ্রামে শত শত বিধর্ম্মীকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন, তখন আহম্মদ বেগ নামে এক প্রবল-পরাক্রান্ত ও দুর্ব্বৃত্ত অহিন্দু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া এক মত্ত বন্য হস্তীর দ্বারা রসিকানন্দকে পেষণ করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু শ্রীরসিক মুরারির মত্তহস্তীর প্রতি কোনও হিংসা বা পীড়নবুদ্ধি না থাকায় হস্তী শ্রীরসিকমুরারির শিষ্যত্ব গ্রহণ-পূর্ব্বক "শ্রীগোপালদাস"-আখ্যায় ভূষিত হইল; আহম্মদ বেগও নিজের দোষ হৃদয়ঙ্গম করিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরসিকানন্দের চরণে প্রণত হইলেন।

যখন শ্রীরামানুজাচার্য্যের শিষ্য কুরেশ শ্রীরামানুজের বেশ-ধারণ-পূর্ব্বক শৈব-নৃপতি কৃমিকণ্ঠের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ক্রূর কৃমিকণ্ঠের আদেশে কুরেশের চক্ষু উৎপাটিত হইতে লাগিল, তখনও কুরেশের কৃমিকণ্ঠের প্রতি প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি বা মনে মনেও তৎপ্রতি পীড়ন-প্রবৃত্তির উদয় হয় নাই। কুরেশ তখন উৎপীড়নকারিগণের মঙ্গলের জন্য সকাতরে ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কারণ, কুরেশ জানিতেন, সহিষ্ণুতার ধর্ম্মই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম; পরপীড়নের ধর্ম্ম বৈষ্ণব-ধর্ম্ম নহে।

যখন নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসকে বিধর্ম্মী "মুলুকের পতি" বহু পাইকের দ্বারা বাইশ বাজারে প্রহার করাইয়াছিল, তখনও নামাচার্য্যের ঐ সকল ব্যক্তির প্রতি মনোবাক্যে বিন্দুমাত্রও প্রতিহিংসা বা তাহাদিগকে পীড়ন করিবার প্রবৃত্তি লক্ষিত হয় নাই, বরং—

"সবে যে-সকল পাপিগণ তাঁ'রে মারে।
তা'র লাগি' দুঃখ-মাত্র ভাবেন অন্তরে।।
এ-সব জীবেরে কৃষ্ণ, করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহু এ-সবার অপরাধ।।" (শ্রীচৈতন্যভাগবত)

আবার ঠাকুর কখনও বলিয়াছেন,—

"আমি জীলে যদি তোমা-সবার মন্দ হয়।।
তবে আমি মরি, এই দেখ বিদ্যমান।" (চৈঃ ভাঃ ১৫শ)

"প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব"—মহাপ্রভুর এই শ্রীমুখ-বাণীর আদর্শ কি কেবল গ্রন্থেই মুদ্রাঙ্কিত থাকিবে? এই সকল কি অকৃত্রিমভাবে আংশিকরূপেও আমাদের চরিত্রে প্রস্ফুটিত হইবে না?

প্রহ্লাদ মহারাজ কি করিয়াছিলেন? যখন বিষ্ণুবিদ্বেষী হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে পর্ব্বত হইতে নিক্ষেপ—হস্তি-পদতলে, জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তখনও প্রহ্লাদের কশিপু বা কশিপুর দূতগণের প্রতি প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির কোন লক্ষণ প্রকাশিত হয় নাই, বরং প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুকে বিষ্ণুর পাদপদ্মনখ-শোভায় অজ্ঞ মনে করিয়া কশিপুর প্রতি কৃপাংশ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই জন্যই শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে (১৯০ সংখ্যায়) বলিয়াছেন,—

"শোচে ততো বিমুখচেতস ইন্দ্রিয়ার্থ-মায়াসুখায় ভবমুদ্বহতো বিমূঢ়ান্ (ভাঃ ৭।৯।৪৩) ইতি আত্মনো "দ্বিষৎসু উপেক্ষা" তদীয়দ্বেষে চিত্তাক্ষোভেনৌদাসীন্যমিত্যর্থঃ। তেষ্বপি **বালিশত্বেন কৃপাংশ-সদ্ভাবাৎ**—যথৈব শ্রীপ্রহ্লাদ-হিরণ্যকশিপৌ। ভগবতো ভাগবতস্য বা দ্বিষৎসু তু সত্যপি চিত্তক্ষোভে তত্রানভিনিবেশ-মিত্যর্থঃ।

শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছেন,—"হে ভগবন্, যে-সকল মূঢ় ব্যক্তি আপনার বীর্য্যকীর্ত্তনরূপ মহামৃত হইতে বিমুখ হইয়া ইন্দ্রিয়ের বিষয়-নিমিত্ত যে মায়াসুখ, তজ্জন্য কুটুম্বাদিভার বহন করে, তাহাদিগকে দেখিয়া আমার অতিশয় শোক হয়।"

"বিদ্বেষযুক্ত পুরুষগণের প্রতি উপেক্ষা"—এই বাক্যের অর্থ এই যে, **নিজের প্রতি উক্ত বিদ্বেষিগণের দ্বেষসত্ত্বেও চিত্তের ক্ষোভরাহিত্য**-হেতু তদ্‌বিষয়ে ঔদাসীন্য। যেহেতু **অজ্ঞ বলিয়া তাহাদের প্রতি কৃপাংশের সদ্ভাব আছে। যেরূপ হিরণ্যকশিপুর প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদের কৃপাংশের সদ্ভাব** ছিল। ভগবান্ বা ভাগবতগণের প্রতি যাহারা বিদ্বেষী, তাহাদের প্রতি চিত্তক্ষোভ থাকিলেও উক্ত স্থলে তাহাতে অনভিনিবেশই 'উপেক্ষা'-শব্দের তাৎপর্য্য।

মধ্যম ভাগবতের লক্ষণে আমরা এইরূপ বিচার দেখিতে পাই। আর আমরা যাহারা ভক্তির দ্বারে প্রবিষ্টই হই নাই, কেবল নিজের কামক্রোধাদিকেই—আত্মপ্রতিষ্ঠা ও অনর্থকেই পোষণ ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছি, তাহারা একজন বিষয়ী দেখিলে পরদুঃখদুঃখী ভাগবতের ন্যায়—প্রহ্লাদের আদর্শের ন্যায় বিষয়ীর দুঃখে দুঃখিত হওয়া দূরে থাকুক, আগে নিজেরাই ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া পড়ি, আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ, উচ্চ, নির্ব্বিষয়, মহাভক্ত ভাবিয়া বিষয়ীকে ঘৃণা করিতে করিতে অজ্ঞাতসারে বিষয়ীর মল ন্যূনাধিক আমরাও গায়ে অধিকতরভাবে মাখিয়া ফেলি! তখন বিষয়ীকে যেন আমাদের বাক্যবাণ বা কায়-পীড়নাদির একটী প্রধান লক্ষ্য বা "শিকার"-রূপে প্রাপ্ত হইয়া তাহার উপর আমাদের সমস্ত পাশবশক্তি নিয়োগ করি এবং তাহাকে

কায়মনোবাক্যে পীড়ন-পূর্ব্বক প্রতিহিংসারূপ ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া কোমর বাঁধিয়া লাগি। ইহা 'জীবে দয়া' বা 'বালিশে দয়া'র আদর্শ নহে—ইহা প্রকৃত পরদুঃখদুঃখী শ্রীচৈতন্য-জনের অনুসরণ নহে; ইহা বিকৃত, অবৈধ হিংসার অনুকরণ।

পরদুঃখদুঃখী আচার্য্যের যে বিষয়ী বা বিদ্বেষীর প্রতি ক্রোধাভিনয়, শ্রীল শুকদেবাদি মহাভাগবতগণের যে "ভোজানাং কুলপাংসনঃ" (ভোজবংশের কুলাঙ্গার) প্রভৃতি বাক্যে কংসের প্রতি তর্জ্জন-গর্জ্জন, তাহার তাৎপর্য্য অন্যরূপ।

শ্রীল জীবগোস্বামি-প্রভু ইহা তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীল জীবপাদ বলিতেছেন,—

"তেষান্তু (মধ্যমানাং) তত্রাপি তদ্বিধশাস্তৃত্বেন
নিজাভীষ্টদেবপরিস্ফূর্ত্তির্ন ব্যহিন্যত এব ইতি বিশেষঃ।"

অর্থাৎ মধ্যমভাগবতগণের কংসাদিতেও তাদৃশ শাসনকর্ত্তৃরূপে অব্যাহতভাবে স্বীয় ইষ্টদেবের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে।

ইহা পরে ব্যাখ্যায় আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতেছেন,—"তদ্দৃষ্ট্যৈব চ শ্রীমদুদ্ধবাদীনামপি দুর্য্যোধনাদৌ নমস্কারঃ—"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ" (ভাঃ ৪।৩।২৩) ইত্যাদি শ্রীশিব-বাক্য-বৎ। উক্তঞ্চ লক্ষ্মমাহরণে (ভাঃ ১০।৬৮।১৭) "সোঽভিবন্দ্যাম্বিকাপুত্রম্" ইত্যাদৌ দুর্য্যোধনং চেতি। যত্র পক্ষে চ স্বকীয়ভাবস্যৈব সর্ব্বত্রাপি স্ফূর্ত্তেঃ শ্রীভগবদাদিদ্বিষৎস্বপি সা পর্য্যবস্যতি। তত্র চ নাযুক্ততা; যতস্তে নিজপ্রাণকোটি-নির্মঞ্ছনীয়-তচ্চরণপঙ্কজপরাগলেশাস্তেষাং দুর্ব্যবহারদৃষ্ট্যা ক্ষুভ্যন্তি। স্বীয় ভাবানুসারেণ ত্বেবং মন্যন্তে—"অহো ঈদৃশশ্চেতনো বা কঃ স্যাদ্ যঃ পুনরস্মিন্ সর্ব্বানন্দকন্দকদম্বে নিরুপাধি-পরম-প্রেমাস্পদে সকললোকপ্রসাদক-সদ্‌গুণমধিভূষিতে সর্ব্বহিতপর্য্যবসায়িচর্য্যামৃত শ্রীপুরুষোত্তমে তৎপ্রিয়জনে বা প্রীতিং ন কুর্ব্বীত, তদ্দ্বেষকারণন্তু সুতরামেবাস্মদ্ বুদ্ধিপদ্ধতিমতীতম্। তস্মাদ্ ব্রহ্মাদিস্থাবরপর্য্যন্তা অদুষ্টা দুষ্টাশ্চ তস্মিন্ বাঢ়ং রজ্যন্ত এব।"

এইরূপ দৃষ্টি-হেতুই শ্রীউদ্ধব প্রভৃতি দুর্য্যোধনকে নমস্কার করিয়াছিলেন। দুর্য্যোর্ধন কৃষ্ণপ্রিয় পাণ্ডবের বিরোধী ছিল, কিন্তু উদ্ধব দুর্য্যোধনকে নমস্কার করিয়াছিলেন। ইহার কারণ কি? প্রাকৃত সহজিয়াগণের ন্যায় বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর পক্ষপাতিত্ব বা তৎপ্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিবার জন্য ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধব দুর্য্যোধনের প্রতি ঐরূপ আচরণ প্রদর্শন করেন নাই। পরন্তু ভগবান্ বা ভাগবতগণের প্রতিও যাহারা বিদ্বেষী, তাহাদের প্রতি চিত্তক্ষোভ থাকিলেও তদ্‌বিষয়ে অনভিনিবেশ দ্বারা এবং ঐ সকল বিদ্বেষী ব্যক্তিগণের প্রতি নানা-প্রকার শাসন-বাক্য-প্রয়োগ-দ্বারা শাসন-কর্ত্তৃরূপে অব্যাহতভাবে স্বীয় ইষ্টদেবের স্ফূর্ত্তিই হইয়া থাকে, এই আদর্শ প্রচারের জন্যই শ্রীউদ্ধব দুর্য্যোধনকে নমস্কার করিয়াছিলেন। দক্ষের প্রতি বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর যে ক্রোধাভিনয়, তাহা প্রতিহিংসামূলক বা দক্ষকে নির্য্যাতন করিয়া নিজে সুখী হইবার উদ্দেশ্যে নহে; বৈষ্ণবরাজ শম্ভু যে দক্ষকে পৃথগ্‌ভাবে নমস্কারাদির দ্বারা বন্দনা করেন নাই, তাহাও দক্ষের প্রতি শিবের প্রতিহিংসামূলক

ব্যাপার নহে। কারণ, বৈষ্ণবের শান্তচিত্ত প্রতি-হিংসার অভিনিবেশ দ্বারা কখনই উদ্বেলিত বা অশান্ত হয় না। শম্ভু সর্ব্বদাই বাসুদেবে প্রণত, তাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ বলিয়া 'বসুদেব', সেখানে সর্ব্বদাই বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশিত, সেই অদ্বয়-জ্ঞান বাসুদেবে যাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা বিনত, তাঁহার আর পৃথগ্‌ভাবে বাসুদেব-ব্যতীত অন্য অধিষ্ঠান বা দ্বিতীয় জ্ঞান না থাকায় ইচ্ছা-পূর্ব্বক দক্ষকে অবমাননা বা বন্দনা করিবার প্রবৃত্তির উদয় হইতে পারে না। দ্বিতীয়াভিনিবেশ-বিমূঢ় দক্ষ তাহা না বুঝিয়া মনে করিতে পারে যে, শিব বুঝি প্রতিহিংসা-পরায়ণ হইয়াই দক্ষের অবমাননা করিয়াছেন। বৈষ্ণবরাজ শম্ভু বা শ্রীউদ্ধবের সর্ব্বত্র স্বীয় ইষ্টদেব বাসুদেবের স্ফূর্ত্তি হওয়ায়, তাহাদের কাহারও প্রতি বিদ্বেষের অভিনিবেশ নাই।

দুর্য্যোধন-কন্যা লক্ষ্মণাকে যখন জাম্ববতী-নন্দন সাম্ব স্বয়ম্বর-সভা হইতে হরণ করিলেন, তখন কৌরবগণ একত্রিত হইয়া সাম্বকে বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে যাদবগণ কৌরবগণের প্রতি অসন্তুষ্ট হইলে যাহাতে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ-বিবাদ উপস্থিত না হয়, তজ্জন্য বলদেব হস্তিনাপুরীতে গমন এবং ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় জানবার জন্য উদ্ধবকে প্রেরণ করেন। উদ্ধব কুরুসভায় উপস্থিত হইয়া **ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধনাদিকে প্রণাম-পূর্ব্বক** বলদেবের আগমন-বার্ত্তা নিবেদন করিলেন।

এস্থানে শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ বলিতেছেন,—"যে স্থলে সর্ব্বত্র নিজের ভাব স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হওয়ায় ভগবদ্-বিদ্বেষিজনের প্রতিও সেই ভাবের স্ফুরণ হইতে থাকে, সেরূপ ক্ষেত্রে এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে। যেহেতু যাঁহারা স্বকীয় কোটি কোটি প্রাণদ্বারা ভগবানের একটিমাত্র পাদপদ্মরেণুর নির্ম্মঞ্ছন-ব্যাপারে সতত ইচ্ছুক, তাঁহারা ভগবানের প্রতি অন্যের দুর্ব্ব্যবহার-দর্শনে ক্ষুব্ধ হন এবং নিজ-হৃদয়ানুসারে বিচার করেন, এরূপ চেতন কে আছে যে, এই সর্ব্বানন্দকন্দকদম্ব-স্বরূপ, নিরুপাধিকপ্রেমরসাস্পদ, সর্ব্বানুগ্রহকারি-সদ্‌গুণমণি-বিভূষিত এবং সর্ব্ব-লোকের পরিণাম-হিতকারী সেই শ্রীপুরুষোত্তমের প্রতি অথবা তাঁহার প্রিয়জনের প্রতি প্রীতি না করে? পরন্তু তাঁহাদের প্রতি দুর্জ্জনগণের দ্বেষের কারণ কি, তাহাই আমাদের জ্ঞানের অগোচর। অতএব ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত দুষ্ট এবং অদুষ্ট সকলেই তাঁহাদের প্রতি সত্য সত্যই অনুরক্ত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের ঐ ১০ম স্কন্ধে ৬৮ অধ্যায়েই দেখিতে পাই, যখন কৌরবগণ শ্রীবলদেবের পরামর্শ গ্রহণ করিবার পরিবর্ত্তে কুপিত হইয়া বলিলেন যে, যাদবগণের পক্ষে কৌরবগণকে আদেশ যেন চর্ম্মপাদুকার শিরোদেশে আরোহণার্থ আগ্রহ-প্রকাশের ন্যায়। তখন বলদেব কৌরবদিগের এইরূপ মদমত্ত দুর্ব্বাক্য-শ্রবণে ক্রোধান্বিত হইয়া বারংবার হাস্য-সহকারে বলিয়াছিলেন,—

"ন্যূনং নানামদোন্নদ্ধাঃ শান্তিং নেচ্ছন্ত্যসাধবঃ।
তেষাং হি প্রশমো দণ্ডঃ **পশূনাং লগুড়ো যথা**।।"

(ভাঃ ১০।৬৮।৩১)

যাহারা ধনাদি বিবিধবস্তু-জনিত গর্ব্বে মত্ত, সেরূপ দুর্জ্জনগণ কখনও শান্তভাব ইচ্ছা করে না, পরন্তু পশুগণের পক্ষে লগুড়ের ন্যায় ঐরূপ অসাধুগণের পক্ষেও একমাত্র দণ্ডই শান্তভাব আনয়ন করিতে পারে।

শ্রীবলদেবের মুখে ''পশূনাং লগুড়ো যথা''—এই কথা শুনিয়া যদি কেহ কৃত্রিম অনুকরণে লগুড় লইয়া বিদ্বেষিগণকে প্রহার আরম্ভ করেন, কিংবা ঠাকুর বৃন্দাবনের মুখে ''তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে'' বাক্য শ্রবণ করিয়া যদি দুনিয়ার গুরুবৈষ্ণব-বিরোধি ব্যক্তিগণের মস্তকে সত্য সত্যই কেহ লাথি মারিয়া বসেন, অথবা কীর্ত্তনবিরোধী কাজীর প্রতি স্বয়ং 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকের মূলশিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভুর,—

— — ''আরে কাজি বেটা কোথা।
ঝাট আন ধরিয়া কাটিয়া ফেলোঁ মাথা।।
নির্যবন করোঁ আজ সকল ভুবন।
পূর্ব্বে যেন বধ কৈলুঁ সে কালযবন।।
অগ্নি দেহ' ঘরে তোরা, না করিহ ভয়।
আজি সব যবনের করিমু প্রলয়।।''

কিংবা ''কেহ ঘর ভাঙ্গে, কেহ ভাঙ্গয়ে দুয়ার।
কেহ লাথি মারে, কেহ করয়ে হুঙ্কার।।''

অথবা ''পুড়িয়া মরুক সর্ব্বগণের সহিতে।
সর্ব্ব বাড়ী বেড়ি' অগ্নি দেহ' চারিভিতে।
তপস্বী, সন্ন্যাসী, জ্ঞানী, যোগী যে যে জন।
সংহারিমু সবে যদি না করে কীর্ত্তন।।''

—প্রভৃতি বাক্য শুনিয়া যদি কেহ কীর্ত্তন-বিরোধী শাসনকর্ত্তার মাথা কাটিয়া ফেলিতে, তাহার ঘর-দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিতে বা শাসনকর্ত্তার প্রাসাদে অগ্নি প্রদান করিতে উদ্যত হন, কিংবা বিশ্বের অগণিত কীর্ত্তন-বিরোধী জ্ঞানী, যোগী, সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়কে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তিনি ঐ লোকশিক্ষকের বিচার ও শিক্ষার তাৎপর্য্য বুঝিতে ভুল করিলেন। শ্রীবাস তাঁহার কীর্ত্তন-বিরোধী শাশুড়ীকে চুল ধরিয়া ঘর হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন বলিয়া যদি কোন ব্যক্তি আনুকরণিক হইয়া ঐরূপভাবে নারীজাতির মর্য্যাদা নষ্ট করাই 'ভগবদ্ভক্তি' বিচার করেন বা যেখানে যত বৈষ্ণবনিন্দক আছে, সকলকে ধরিয়া ধরিয়া তাহাদের জিহ্বা কাটিয়া দিতে থাকেন, কিন্তু নিজের কর্ণে গালা ঢালিয়া দিবার আদেশ পালনটীর সময় পশ্চাৎপদ হন, তাহা হইলে তিনি শাস্ত্র ও মহাজনগণের আদেশ ও আচরণ বুঝিতে ভুল করিয়াছেন, তাঁহাদের শিক্ষার বিকৃত অনুকরণ করিয়াছেন মাত্র; বিন্দুমাত্রও অনুসরণ করিতে পারেন নাই।

লোকোত্তর লোকশিক্ষক আচার্য্যগণের আচরণ, আদর্শ ও শিক্ষা অনুসরণ করিবার পরিবর্ত্তে অনুকরণ করিতে গেলেই নানাপ্রকার অনর্থ ও জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত হয়। আচার্য্যের ব্যক্তিত্ব ও সাধারণের ব্যক্তিত্ব সমান নহে। লোকোত্তর আচার্য্য যে ক্রোধাভিনয় করেন, তাহার সহিত সাধারণ লোকের ক্রোধ বা আনুকরণিক আমার, তোমার ক্রোধ সমান নহে। যিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন করেন—যিনি প্রত্যেক

বৃত্তিদ্বারা কৃষ্ণানুশীলনের বিজ্ঞান সুষ্ঠুভাবে অবগত আছেন—যাঁহার কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, সকলই কৃষ্ণানুশীলনতৎপর—কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যময়, তাঁহার ব্যক্তিত্বের নিকট সমগ্র জগৎ একদিন না একদিন অবনত হইবেই হইবে, সাধারণে তাঁহার অনুকরণ করিতে পারে না। শ্রীগৌরসুন্দর নবদ্বীপের শাসনকর্ত্তা কাজীকে যেরূপভাবে যুগপৎ নিগ্রহ ও অনুগ্রহ করিবার আদর্শ দেখাইয়াছিলেন, সে সামর্থ্য আমার, তোমার বা সাধারণ লোকের নাই বলিয়াই আমি, তুমি বা সাধারণ লোক সেরূপ স্থূলনিগ্রহ ত' দূরে থাকুক, বাক্যের দ্বারাও সেরূপ কথার বিন্দুমাত্র প্রকাশ করিলে আমাদের সকলকেই তখনই রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হইবে—ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে। তাহাতে আমার হরিভজন হওয়া দূরে থাকুক, অপর ব্যক্তিকে অল্প পরিমাণ উদ্বেগ দিতে গিয়া আমাকে কোটিগুণ অধিক উদ্বেগপ্রাপ্ত এবং চিরতরে হরিভজন হইতে বিচ্যুত হইয়া সাধারণ কর্ম্মফল-বাধ্য জীববিশেষে পরিণত হইতে হইবে। আচার্য্য অতি কঠোর ভাষায় তীব্রভাবে শাসন করিলেও সমগ্র আত্মমঙ্গল-কামী জগৎ তাহা মাথায় বরণ করেন কেন, আর আমার একটি সামান্য কথাই বা লোকে শুনিতে চাহে না কেন? তাহার কারণ, আচার্য্য তাঁহার চরিত্রে তাঁহার অকৃত্রিম আচরণকে মূর্ত্ত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই মূর্ত্ত আচরণই তাঁহার ব্যক্তিত্ব, সেই ব্যক্তিত্বই জীবন্ত হইয়া নিয়ত এরূপভাবে অকৈতব কীর্ত্তন করিতেছেন যে, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী লোকমাত্রেই সেখানে তাঁহাদের দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়া আচার্য্যের তীব্র, কঠোর শাসনকে মঙ্গলজনকরূপে অনুক্ষণ মস্তকে বরণ করিতেছেন। আচার্য্যের অন্তর-বাহির পরদুঃখ-দুঃখে অকপটভাবে আর্দ্র, আর আমার অন্তর কপটতাপূর্ণ, আমি কেবল নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির কিংবা আমার অপূর্ণ প্রতিহিংসা বা কাম-চরিতার্থ করিবার জন্য অবৈধ অনুকরণ-বৃত্তি-দ্বারা অপরের প্রতি লগুড়-ধারণ বা শাসন-বাক্য প্রয়োগ করিতেছি, তাই আমার চেষ্টা—অভক্তিচেষ্টা; তাহা আমার ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার চেষ্টা-মাত্র, তাহা আমার অসহিষ্ণুতা, অসংযত ও রিপুতাণ্ডব-মাত্র। উহা মোটেই ভক্তি-রাজ্যের কোন কথা নহে। আমার অবৈধ আনুকরণিক চেষ্টায় কৃষ্ণের সন্তোষ হয় না; কিন্তু শ্রীবাসের চেষ্টায় (কীর্ত্তন-বিরোধী শাশুড়ীর কেষাকর্ষণে) শ্রীগৌরসুন্দরের সন্তোষ হইয়াছিল।

রাজা যদি রাজদণ্ড ধারণ করেন, তবেই তাহা শোভা পায়, কিন্তু একজন কয়েদী যদি কৃত্রিমভাবে রাজদণ্ড ধারণ করিতে যায়, তবে রাজার পক্ষে যাহা ভূষণ হইয়াছিল, অপরের পক্ষে তাহাই দূষিত হইয়া পড়িল, লোকে সে দণ্ড ত' স্বীকার করিবেই না, অপিচ ঐরূপ কৃত্রিম দণ্ডধারীকেই দণ্ডিত হইতে হইবে। মাতা-পিতা যে শাসন করেন, সুসন্তান সেই শাসন বরণে আপত্তি করেন না, কিন্তু ডাইনীর শাসন কেহই গ্রহণ করিতে স্বীকৃত নহে; কেন না, সেখানে অকৃত্রিম স্নেহ ও শুভানুধ্যান নাই। আচার্য্য তীব্র বাক্যে আমাদিগকে শাসন করেন, অসৎ-সঙ্গের কুফল বলেন; কিন্তু আচার্য্যের অকৃত্রিম হৃদয় ও স্নেহহীন, আচরণহীন, জীবের জন্য অকপট আন্তরিক শুভানুধ্যানহীন, সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণসেবাবুদ্ধিহীন ব্যক্তি যদি কেবল আচার্য্যের তীব্র শাসন-বাক্যের অনুকরণ করিয়া সেই সকল অপরের উপর প্রয়োগ করিতে যান, তাহা হইলে ত' মঙ্গল হইবেই না, পক্ষান্তরে উহার প্রবল প্রতিক্রিয়া ঐরূপ অনুকরণকারীর উপরই দ্বিগুণতর গতিবিশিষ্ট অস্ত্ররূপে প্রবর্ত্তিত হইবে।

"প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে"—এই বিচার যেন প্রাকৃত সহজিয়াগণের মত না হয়। আচার্য্য, গুরু বা বৈষ্ণব যে প্রেয়ঃপন্থী সমাজের মঙ্গল করিবেন না, তাহাদের নিকট যে অপ্রিয় শ্রেয়োবার্ত্তা কীর্ত্তন করিবেন না, তাহা নহে। সাধুগণ লোকের মঙ্গলের জন্য অপ্রিয় শ্রেয়োবাক্য—তীব্র বাক্য কীর্ত্তন করিয়া জীবের মনোব্যাসঙ্গ ছেদন করিবেন–ইহাই জীবের প্রতি সাধুর সর্ব্বাপেক্ষা কৃপার আদর্শ। সদ্‌বৈদ্য রোগীকে আপাত ক্লেশ প্রদান করিয়া—উদ্বেগ দিয়া যে পরিণামে নিত্যশান্তি প্রদান করেন, সেই আপাত উদ্বেগ—'উদ্বেগ'-পদবাচ্য নহে; তাহা নিত্যশান্তিরই সোপান।

মদ্যপেরে উদ্ধারিলা চৈতন্য গোসাঞি।
বৈষ্ণবনিন্দকে কুম্ভিপাকে দিলা ঠাঞি।।

(চৈতন্যভাগবত)

অনর্থযুক্ত দুর্ব্বল ব্যক্তি কৃপার পাত্র। কিন্তু বৈষ্ণবনিন্দক ও নির্ব্বিশেষবাদী কৃপা-গ্রহণে চিরবিমুখ। এ জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদ্দাসানুদাসগণ দুরাচারী পাপী ব্যক্তিগণকে পরিবর্ত্তিত হইবার পুনঃ পুনঃ সুযোগ প্রদান করেন, তাহাদিগের প্রতি কৃপার দ্বার সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দেন না। দুর্ব্বল, দুরাচারী ব্যক্তিগণকে সংযত বাক্যাদির দ্বারা শাসনই বিধি। তাহাদের প্রতি যষ্টি-প্রহার, লগুড়-প্রহার কিংবা অন্য কোনও প্রকার বলপ্রয়োগাদির দ্বারা তাহাদের দণ্ডবিধান বা পীড়ন বৈষ্ণবোচিত কার্য্য নহে।

জাগতিক সভ্যসমাজের নীতিতেও পিতার পুত্রকে, অভিভাবক বা শিক্ষকের ছাত্রকে গুরুতরভাবে প্রহার বা তাহাদের প্রাণবিনাশ করিবার অধিকার নাই। অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ করিলেও এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে লগুড়াঘাতে বা প্রাণে বিনাশ করিতে পারে না, দণ্ডপ্রদাতৃ পৃথক শাসক-সম্প্রদায়ই যখন আছেন, তখন সেরূপ কার্য্যে অপরের হস্তক্ষেপ করা ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ সর্ব্বতোভাবে অসমীচীন। যাহা কর্ম্মপর সামাজিকগণের মধ্যে পর্য্যন্ত বিগর্হিত, তাহা হরিভজন-পরায়ণগণের নিকট কোনওরূপে আদৃত হইতে পারে না। হরিভজনপরায়ণ ব্যক্তি একমাত্র হরিসেবাতাৎপর্য্যার্থ অপরের সংশোধনের জন্য যে বাক্য-দ্বারা শাসন করিতে পারেন, সেই বাক্যও সংযত বাক্য হওয়া দরকার। তাহা যাহাতে রিপুতাড়িত, নীচ, ক্রোধী ব্যক্তিগণের ন্যায় শ্লিলতা ও শিষ্টতা অতিক্রম না করে, গ্রাম্যবার্ত্তার অন্যতম না হইয়া পড়ে, তদ্‌বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যাঁহারা হরিভজনপরায়ণ, অবশেও তাঁহাদের বেতালে পা পড়ে না।

যদি উক্তি-দ্বারা কেহ সংশোধিত না হয়, তাহা হইলে ঐ অসদ্ ব্যক্তির প্রতি চরম দণ্ড তৎসঙ্গ-পরিত্যাগই হরিভজনকারীর একমাত্র অবলম্বনীয় পথ। হরিভজনকারী নিজে ঐরূপ অসদ্ ব্যক্তির সঙ্গ পরিত্যাগ ও তাহার বন্ধু-বান্ধবকে ঐরূপ অসতের সঙ্গ-পরিত্যাগে অনুরোধ করিতে পারেন, এইমাত্র। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন ইতর পন্থা ভজনপরায়ণের অবলম্বনীয় নহে।

অহিংসাদি গুণ হরিভক্তের চরিত্রে আনুষঙ্গিকভাবেই অনুস্যূত আছে, ইহা আমরা নারদের কৃপালব্ধ জনৈক ব্যাধের চরিত্রে মহাপ্রভুর উপদেশে দেখিতে পাই।

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্ত্যা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ।।

হে ব্যাধ, তোমার যে অহিংসাদি গুণ হইয়াছে, তাহা কিছু অদ্ভুত নয়। কেন না, যাঁহারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা কখনও পরপীড়ন করেন না।

এই পরপীড়ন অনেক প্রকারে হয়। কায়ের দ্বারা পরপীড়ন, বাক্যের দ্বারা পরপীড়ন, মনের দ্বারা পরপীড়ন। অপরের প্রতি ভোগবুদ্ধি এবং তদোত্থ বিচারই মনের দ্বারা পরপীড়ন; তাহাই ক্রমে ক্রমে ব্যাপ্ত হইয়া বাক্য ও কায়ের দ্বারা পরপীড়নের আকার ধারণ করে।

সেবাপর বৈষ্ণব-মাত্রেরই বিচার—"গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার।" পরপীড়নকারী কর্ম্মীর বিচার অন্যরূপ। কর্ম্মী জগতের সকল বস্তুকেই কৃষ্ণ-ভোগ্য না জানিয়া নিজে কৃষ্ণের ক্ষুদ্র সংস্করণ সাজিয়া জগৎকে তাঁহার ভোগ্য জ্ঞান করেন। এ জন্য অনেক স্থানেই কর্ম্মী ও জ্ঞানি-সম্প্রদায়ের তথাকথিত সাধু, সন্ন্যাসীর আখড়ায় প্রত্যেক সাধুরই একটী না একটী "খিদমদগার" থাকে, এই সকল "খিদমদগারে"র কার্য্য হয়,—সাধুর পদমর্দ্দন, কটিমর্দ্দন, উরুমর্দ্দন, সর্ব্বাঙ্গ-মর্দ্দনাদি সেবা। 'খিদমদগার' ক্রমে ক্রমে নরমূর্ত্তি হইতে নারীমূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হইয়া পড়ে। সূক্ষ্মভোগ একটু শিকড় গাড়িলেই স্থূলভোগে পল্লবিত হইতে থাকে। তখন সেবাদাস হইতে সেবাদাসী—ক্রমে ক্রমে স্বকীয় হইতে পারকীয় রসে উন্নতি লাভ করে। এ জন্যই লোকশিক্ষক জগদ্গুরুলীলাভিনয়কারী মহাপ্রভু সাধক বা আচার্য্যকে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণার্থ ভোগ-চেষ্টা হইতে বিরত থাকিবার উপদেশ-মুখে নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন,—

"শুনি' প্রভু কহে কিছু সক্রোধ বচন।
মর্দ্দনিয়া এক রাখ করিতে মর্দ্দন।।
এই সুখ লাগি' আমি করিলুঁ সন্ন্যাস।
আমার 'সর্ব্বনাশ'—তোমার পরিহাস।।"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১২।১১২-১১৩)

সাধু সাবধান! সাবহিত না হইলে—গুরু ও গৌরাঙ্গের বাণী, আচার্য্যের আদর্শ অনুসরণ না করিলে যে-সকল প্রাকৃত-সহজিয়াকে আমরা কায়মনোবাক্যে উদ্বেগ দিয়াছি, তাহাদেরই নিকৃষ্ট ঘৃণ্য সংস্করণরূপে আমরাই পুনরায় জগতের আবর্জ্জনা বৃদ্ধি করিব।

অনেক সময় আমরা মনে মনে ভাবি, কখনও বা বলিয়াও থাকি—যাঁহাদের শরীর সুস্থ, তাঁহারা অপরের পদমর্দ্দন, কটিমর্দ্দন প্রভৃতি দেখিয়া তাহাকে উপহাস করিতে পারেন; কিন্তু উপদেশকগণ ভুক্তভোগী হইলে অসুস্থ ব্যক্তির পদাদি মর্দ্দয়নের অপরিহার্য্য আবশ্যকতা অস্বীকার করিতে পারিতেন না। আমরা কিন্তু আচার্য্যের আদর্শে অন্যরূপ দেখিয়াছি এবং ভুক্তভোগি-সম্প্রদায়ের আদর্শ ইহাও প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত

করিয়াছে যে, আমাদের যত কিছু অনর্থ, তাহা সমস্তই এইরূপ অসুস্থতার নাম করিয়া তাহাদের বাসস্থানের ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া থাকে। অসুস্থতার জন্য মৎস্য-মাংস-ব্যবহার, নেশা-পান প্রভৃতির ছল করিয়া ঐ সকল অমেধ্য ও কলিসহচর বস্তুর পায়ে আমরা চিরদাসখত লিখিয়া থাকি, ইহার সাক্ষ্য বিরল নহে।

তাই ভক্তিপথের পথিকগণ কায়মনোবাক্যে প্রাণিমাত্রে উদ্বেগপ্রদান হইতে বিরত থাকেন; তাঁহারা সর্ব্বদা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের পরিচর্য্যায় আত্মনিয়োগ করিয়া জীবনধারণ করেন।

শ্রীমথুরামণ্ডলে কার্ত্তিক-ব্রত

কার্ত্তিক-ব্রতই 'দামোদর' বা 'ঊর্জ্জব্রত', 'নিয়ম-সেবা' প্রভৃতি বিভিন্ন নামে কথিত হয়। দ্বাদশটি মাসের বিষ্ণুর দ্বাদশটি নিত্যবিগ্রহ তত্তদধিষ্ঠাতৃ দেব-রূপে নিত্যকাল বিরাজিত আছেন। কার্ত্তিকের দেবতা—দামোদর। দামোদর কৃষ্ণের একটি নাম। যশোমতী বালকৃষ্ণের উদরে রজ্জুর একপ্রান্ত বন্ধন করিয়া অপর প্রান্ত একটি উদূখলে বাঁধিয়াছিলেন বলিয়া কৃষ্ণর নাম দামোদর হইয়াছে। 'দাম' অর্থাৎ রজ্জু উদরে যাঁহার—এই অর্থে দামোদর। কার্ত্তিক মাসকে 'দামোদর' মাসও বলে।

'ঊর্জ্জ' শব্দও কার্ত্তিক মাসের নামান্তর। সুতরাং 'ঊর্জ্জব্রত' বলিতেও কার্ত্তিক- ব্রতই বুঝায়। 'ঊর্জ্জ'-শব্দের অপর অর্থ—'উৎসাহ', 'বল' ইত্যাদি।

দ্বাদশ মাসের মধ্যে কার্ত্তিক মাসই হরির সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিপ্রদ,—

দ্বাদশস্বপি মাসেষু কার্ত্তিকঃ কৃষ্ণবল্লভঃ।
তস্মিন্ সংপূজিতো বিষ্ণুরল্পকৈরপ্যুপায়নৈঃ।।
দদাতি বৈষ্ণবং লোকমিত্যেবং নিশ্চিতং ময়া।
যথা দামোদরোভক্তবৎসলোবিদিতোজনৈঃ।।
তস্যায়ন্তাদৃশো মাসঃ স্বল্পমপ্যুরুকারকঃ।।
দুর্ল্লভোমানুষোদেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্ল্লভঃ কালঃ কার্ত্তিকো হরিবল্লভঃ।।

(শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ১৬শ বিঃ ২১ সংখ্যা-ধৃত পাদ্ম-বাক্য)

দ্বাদশ মাসের মধ্যে কার্ত্তিক মাসই কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। ঐ মাসে অল্প-মাত্র উপায়নে ভগবান্ সম্যগ্‌রূপে পূজিত হইয়াই পূজককে বৈষ্ণবধাম প্রদান করেন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

দামোদর শ্রীকৃষ্ণ যেমন সকলের নিকট ''ভক্তবৎসল''-নামে বিখ্যাত, তদীয় এই কার্ত্তিক মাসও তদ্রূপ; এই মাস স্বল্পসেবাকেও বহু করিয়া থাকে।
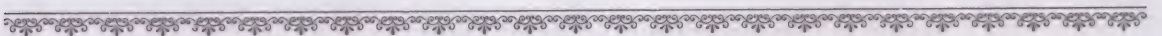
দেহিগণের মধ্যে ক্ষণভঙ্গুর মানব-দেহ দুর্ল্লভ, তন্মধ্যে আবার কৃষ্ণপ্রিয় কার্ত্তিকমাস অধিকতর দুর্ল্লভ। এই কার্ত্তিক মাসকে 'নিয়ম-মাস'ও বলিয়া থাকে এবং কার্ত্তিক-ব্রত 'নিয়ম-সেবা' নামে কথিত হয়।

নিয়মেন বিনা চৈব যো নয়েৎ কার্ত্তিকং মুনে।
চাতুর্ম্মাস্যং তথা চৈব ব্রহ্মহা স কুলাধমঃ।।

(হঃ ভঃ বিঃ ১৬শ ৮ম সংখ্যা)

হে মুনে, বিনা নিয়মে চাতুর্ম্মাস্য বা কার্ত্তিকমাস অতিবাহিত করিলে 'কুলাঙ্গার' বা 'ব্রহ্মঘ্ন' বলিযা অভিহিত হইতে হয়।

যাহারা চারিমাসকাল চাতুর্ম্মাস্য যাজন করিতে অসমর্থ, তাহাদের পক্ষে দামোদর বা উর্জ্জব্রতের অন্ততঃ একমাস নিয়মপালন—অনুকল্প-বিধি-তুল্য। সেই অনুকল্পের নিয়ম প্রত্যেককেই রক্ষা করিতে হইবে। যিনি অনুকল্পবিধিটুকুও রক্ষা করেন না, তিনি নিশ্চয়ই অতিমুক্ত, না হয় অতিবদ্ধ। তাই শ্রীনারদ শৌনকাদি ঋষিগণকে বলিতেছেন,—

মানুষঃ কর্ম্মভূমৌ যঃ কার্ত্তিকং নয়তে মুধা।
চিন্তামণিং করে প্রাপ্য ক্ষিপ্যতে কর্দ্দমাম্বুনি।।
নিয়মেন বিনা বিপ্রাঃ কার্ত্তিকং যঃ ক্ষিপেন্নরঃ।
কৃষ্ণঃ পরাঙ্মুখস্তস্য যস্মাদূর্জ্জোঽস্য বল্লভঃ।।

(হঃ ভঃ বিঃ ১৬শ বিঃ ১০ম সংখ্যা)

যে মনুষ্য কর্ম্মক্ষেত্রে কার্ত্তিকমাস বৃথা যাপন করে, সেই ব্যক্তি করস্থ চিন্তামণিকে কর্দ্দম-জলে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। বিনা-নিয়মে যে-সকল ব্যক্তি কার্ত্তিকমাস অতিবাহিত করে, তাহাদের প্রতি কৃষ্ণ বিমুখ থাকেন; কেন না, ঐ মাস শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয়।

কার্ত্তিক-মাসের বহুবিধ নিয়ম ও ফলশ্রুতি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। যেমন,—

গীতশাস্ত্রবিনোদেন কার্ত্তিকং যো নয়েন্নরঃ।
ন তস্য পুনরাবৃত্তির্ময়া দৃষ্টা কলিপ্রিয়।।
প্রদক্ষিণঞ্চ যঃ কুর্য্যাৎ কার্ত্তিকে বিষ্ণুসদ্মনি।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য ফলভাগী ভবেন্নরঃ।।
গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ কার্ত্তিকে পুরতো হরেঃ।
যঃ করোতি নরোভক্ত্যা লভতে চাক্ষয়ং পদম্।।
হরের্নামসহস্রাখ্যং গজেন্দ্রস্য চ মোক্ষণম্।
কার্ত্তিকে পঠতে যস্তু পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।।

(হঃ ভঃ বিঃ ১৬শ বিঃ ৩২শ সংখ্যা)

অর্থাৎ হরির প্রীতির উদ্দেশ্যে সঙ্গীত-চর্চ্চা দ্বারা কার্ত্তিকমাস যাপন করিলে আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

যিনি কার্ত্তিকমাসে হরিমন্দির পরিক্রমা করেন, পদে পদে তাঁহার অশ্বমেধযজ্ঞফল লাভ হয়।

কার্ত্তিকমাসে ভগবানের সম্মুখে ভক্তির সহিত নৃত্য, গীত ও বাদ্য করিলে অক্ষয় বিষ্ণুধামে গতি হয়।

কার্ত্তিকমাসে যিনি শ্রীহরির সহস্রনাম-স্তোত্র ও গজেন্দ্র-মুক্তি পাঠ করেন, তাঁহাকে আর সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না।

তবে কার্ত্তিকমাসে সকল নিয়মের উপর এক নিয়ম সকলকেই পালন করিতে হইবে এবং তাহাই সর্ব্বনিয়মের নিয়ামক হইবেন,—

সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য ইষ্টাপূর্ত্তাদিকান্নরঃ।
কার্ত্তিকে **পরয়া ভক্ত্যা বৈষ্ণবৈঃ সহ সংবসেৎ**।।
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য কার্ত্তিকে কেশবাগ্রতঃ।
শাস্ত্রাবতরণং পুণ্যং **শ্রোতব্যঞ্চ** মহামুনে।।

(হঃ ভঃ বিঃ ১৬শ বিঃ ৩৭, ৩৫ সংখ্যা)

ইষ্টাপূর্ত্তাদি অখিল ধর্ম্ম বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক কার্ত্তিকমাসে একান্ত ভক্তির সহিত অকপট বৈষ্ণবগণের সঙ্গে সম্যগ্রূপে বাস করিবে। সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কেশবের সম্মুখে সাধুগণের মুখে পূত শ্রৌতবাণী শ্রবণ করিবে।

'কেশব'-শব্দ-প্রয়োগের দ্বারা এখানে মথুরার অধিষ্ঠাতৃ দেবকে লক্ষ্য করিয়া মথুরায় অবস্থান-পূর্ব্বক হরিকথা-শ্রবণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাহাত্ম্য প্রকাশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌর-লীলার মথুরা শ্রীধাম-মায়াপুর আর শ্রীগৌরের শ্রীকৃষ্ণলীলার মথুরা অভিন্ন।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস কার্ত্তিক ব্রতের বহু প্রকার নিয়মের ভগবৎসেবাপর ফলসমূহ কীর্ত্তন-পূর্ব্বক বলিতেছেন,—

অন্যাঃ পুর্য্যস্তৎসমানা মুনয়ো **মথুরাং বিনা**।
দামোদরত্বং হি হরেস্তত্রৈবাসীদ্যতঃ কিল।।

(হঃ ভঃ বিঃ ১৬শ বিঃ ৬৮ সংখ্যা)

হে মুনিবর্গ, মথুরা-ব্যতীত অযোধ্যাদি অন্যান্য পুরীসমূহ উক্ত ফলের সমান ফল প্রদান করেন; কিন্তু মথুরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলদাত্রী; যেহেতু এই মথুরাতেই শ্রীহরির দামোদরত্ব প্রকাশিত হয়।

মথুরায়াং ততশ্চোর্জ্জে বৈকুণ্ঠপ্রীতিবর্দ্ধনঃ।
কার্ত্তিকে মথুরায়াং বৈ পরমাবধিরিষ্যতে।।

যথা মাঘে প্রয়াগঃ স্যাদ্বৈশাখে জাহ্নবী যথা।
কার্ত্তিকে মথুরা সেব্যা ততোৎকর্ষপরো ন হি।।
মথুরায়াং নরৈরূর্জ্জে স্নাত্বা দামোদরোঽর্চ্চিতঃ।
কৃষ্ণরূপা হি তে জ্ঞেয়া নাত্র কার্য্যা বিচারণা।।
দুর্ল্লভঃ কার্ত্তিকো বিপ্র মথুরায়াং নৃণামিহ।।

* * * *

ভুক্তিং মুক্তিং হরির্দদ্যাদর্চ্চিতোঽন্যত্র সেবিনাম্।
ভক্তিঞ্চ ন দদাত্যেষ যতো বশ্যকরী হরেঃ।।
সা ত্বঞ্জসা হরির্ভক্তির্লভ্যতে কার্ত্তিকে নরৈঃ।
মথুরায়াং সকৃদপি শ্রীদামোদরপূজনাৎ।।
মন্ত্রদ্রব্যবিহীনঞ্চ বিধিহীনঞ্চ পূজনম্।
মন্যতে কার্ত্তিকে দেবো মথুরায়াং সদর্চ্চনম্।।

* * * *

কার্ত্তিকে মথুরায়াং বৈ পূজনাদ্দর্শনাদ্ধ্রুবম্।
শীঘ্রং সংপ্রাপ্তবান্ বাল্যে দুর্ল্লভং যোগতৎপরৈঃ।।

(হঃ ভঃ বিঃ ১৬শ বিঃ ৬৯-৭৫ সংখ্যা)

ঊর্জ্জ অর্থাৎ কার্ত্তিকমাসে মথুরায় ভগবৎসেবা শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রীতিবর্দ্ধক। কার্ত্তিকমাসে মথুরা-পুরীতে হরিসেবার ফল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

যেরূপ মাঘমাসে প্রয়াগ ও বৈশাখে গঙ্গার পূজা, সেইরূপ কার্ত্তিকে মথুরার সেবা করিতে হয়, ইহার সমান আর উৎকৃষ্ট কিছু নাই।

যাঁহারা কার্ত্তিকমাসে মথুরা-নগরীতে স্নান-পূর্ব্বক দামোদরের পূজা করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে পারেন।

মথুরাতে কার্ত্তিক মাস মানবগণের পক্ষে পরম দুর্ল্লভ।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরা-ব্যতীত অন্যত্র পূজিত হইয়া সেবকগণকে ভুক্তি-মুক্তি-ফল প্রদান করেন সত্য; কিন্তু পরমা গুহ্যা ভক্তি বিতরণ করেন না; কেন না, ভক্তিই শ্রীহরির বশকারিণী। পরন্তু যাঁহারা কার্ত্তিকমাসে হরিজনগণের আনুগত্যে মথুরা- পুরীতে একবার-মাত্র শ্রীহরির পূজা করেন, তাঁহারাই অনায়াসে হরিভক্তি প্রাপ্ত হইতে পারেন।

হে বিপ্র, কার্ত্তিকে মথুরাতে মন্ত্রবর্জ্জিত, দ্রব্যবর্জ্জিত ও বিধিবর্জ্জিত পূজাকেও ভগবান্ 'মদর্চ্চন' বলিয়া গ্রহণ করেন।
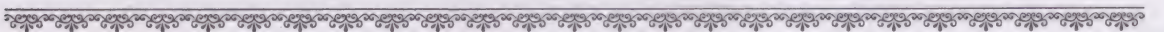
ধ্রুব শিশু হইয়াও কার্ত্তিক মাসে মথুরাপুরীতে শ্রীহরির পূজা করায় অতি অল্পকালের মধ্যে (পাঁচ মাসের মধ্যে) যোগাদিনিষ্ঠ সনকাদি মহর্ষিগণেরও দুর্ল্লভ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন।

সেই মথুরাপুরী ভূমণ্ডলে কৃপা-পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়াছেন, আর শীঘ্রই কার্ত্তিক মাসেরও আগমনী গীতির সুর শুনা যাইতেছে।

সুলভা মথুরা ভূমৌ প্রত্যব্দং কার্ত্তিকস্তথা।
তথাপি সংসরন্তীহ নরা মূঢ়া ভবাম্বুধৌ।।
কিং যজ্ঞৈঃ কিন্তপোভিশ্চ তীর্থৈরন্যৈশ্চ সেবিতৈঃ।
কার্ত্তিকে মথুরায়াঞ্চেদর্চ্চ্যতে রাধিকাপ্রিয়ঃ।।
যানি সর্ব্বাণি তীর্থানি নদা নদ্যঃ সরাংসি চ।
কার্ত্তিকে নিবসন্ত্যত্র মাথুরে সর্ব্বমণ্ডলে।।

(হঃ ভঃ বিঃ ১৬শ বিঃ ৭৬-৭৮ সংখ্যা)

অহো! প্রপঞ্চে মথুরা কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া সুলভ হইয়াছেন, প্রতি বর্ষে কার্ত্তিক মাসও সুলভ, কিন্তু হায়! মূঢ়তাপ্রযুক্ত মানবগণ সংসার-সমুদ্রে মগ্ন রহিয়াছে।

কার্ত্তিকমাসে মথুরাতে শ্রীরাধাপ্রিয় দামোদর পূজা করিলে আর যজ্ঞ, তপঃ ও অপরাপর তীর্থ-সেবনের আবশ্যকতা কি?

কার্ত্তিক মাসে মথুরার সকল মণ্ডলে যাবতীয় পুণ্যতীর্থ, নদ, নদী, কুণ্ড অবস্থান করিয়া থাকেন।

ভূমণ্ডলে মথুরা সুলভ এবং প্রতিবর্ষে কার্ত্তিক মাসও সুলভ হইলে কি হইবে? জগতে অকৃত্রিম আচার্য্য বড়ই দুর্ল্লভ। সেইরূপ পরদুঃখদুঃখী আচার্য্যের অকপট কৃপা ব্যতীত সংসার-সমুদ্রে নিমজ্জমান, মুগ্ধ মানবকোটি কি করিয়া মথুরায় শ্রীরাধাপ্রিয় দামোদরের সেবায় নিযুক্ত হইতে পারে? জগতে যদি সেই পর-দুঃখদুঃখী রাধানিত্যজন আচার্য্যের কৃপা-প্লাবন প্রবাহিত হয়, তবেই যে-সকল জীব উদরের দামে অর্থাৎ দগ্ধোদর-সেবা-রূপ শৃঙ্খলে যুগযুগান্তর-পরম্পরায় বদ্ধ হইয়া শ্রীরাধাপ্রিয় দামোদরের সেবা বিস্মৃত হইয়াছে, সেই সকল জীবের লুপ্ত সৌভাগ্য-রবি পুনরায় উদিত হইতে পারে। বিশ্বজনকে সেই সৌভাগ্য-তিলকে বিভূষিত করিবার জন্যই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সভ্যগণ আজ গৌরজনের আহ্বান জানাইতেছেন,—ওহে বিশ্ববাসিন্! দগ্ধোদরের দাম হইতে জীব জন্ম-জন্মান্তর কখনই নিষ্কৃতি পাইতে পারে না, ঐ দামের গ্রন্থি যত খুলিতে যাইবে, ততই গ্রন্থি আরও জটিল হইতে জটিলতর হইতে থাকিবে। তাই ঐ দামের মোহ পরিত্যাগ করিয়া—দগ্ধোদরের সেবার জন্য বিশ্ব-পরিক্রমা কিছুকাল স্থগিত রাখিয়া শ্রীরাধিকার প্রাণনাথ, নন্দের দুলাল, যশোদার যাদুমণি দামোদরের সেবার জন্য কার্ত্তিক মাসে মাথুরমণ্ডল পরিক্রমা কর।

যদি বল, মথুরায় গিয়া লাভ কি? —পরিক্রমার পরিশ্রম বরণ করিয়াই বা লাভ কি? আমরা আমাদের ভোগের বা ত্যাগের গৃহে বসিয়াই হরিসেবা করিব। শোন! শোন! রুক্মাঙ্গদ মোহিনীকে কি বলিয়াছিলেন?

বিশ্বমোহিনী মায়া ঐরূপ যুক্তি দিতে পারে সত্য, কিন্তু শাস্ত্রের কথা শোন,—

ন গৃহে কার্ত্তিকে কুর্য্যাদ্বিশেষেণ তু কার্ত্তিকম্।
তীর্থে তু কার্ত্তিকং কুর্য্যাৎ সর্ব্বযত্নেন ভাবিনি।।

(হঃ ভঃ বিঃ ১৬শ বিঃ ৯০ সংখ্যা)

হে ভাবিনি! বিশেষতঃ কার্ত্তিক মাসে গৃহে কার্ত্তিক ব্রত করিতে নাই, সর্ব্ব- প্রকারে সযত্নে তীর্থস্থলে অর্থাৎ যে-স্থানে অকপট আচার্য্য ও বৈষ্ণবগণ বাস করেন, সেইরূপ মথুরামণ্ডলাদি তীর্থস্থানেই উহার অনুষ্ঠান করিতে হয়।

কার্ত্তিক-ব্রতারম্ভের কাল

আশ্বিনের শুক্লা একাদশী, পূর্ণিমা বা তুলা-সংক্রমণে কার্ত্তিক-ব্রত আরম্ভ করিতে হয়,—

আশ্বিনস্য তু মাসস্য যা শুক্লৈকাদশী ভবেৎ।
কার্ত্তিকস্য ব্রতানীহ তস্যাং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ।।

(হঃ ভঃ বিঃ ১৬শ বিঃ ৮১ সংখ্যা)

আশ্বিন মাসের যে শুক্লা একাদশী, তাহাতে আলস্যহীন হইয়া কার্ত্তিক ব্রত ধারণ করিবে।

কার্ত্তিক-ব্রত-বিধি

নিত্যং জাগরণায়ান্ত্যে যামে রাত্রেঃ সমুত্থিতঃ।
শুচির্ভূত্বা প্রবোধ্যাথ স্তোত্রৈর্নীরাজয়েৎ প্রভুম্।।
নিশম্য বৈষ্ণবান্ ধর্ম্মান্ বৈষ্ণবৈঃ সহ হর্ষিতঃ।
কৃত্বা গীতাদিকং প্রাতর্দেবং নীরাজয়েৎ প্রভুম্।।
নিত্যং বৈষ্ণবসঙ্গত্যা সেবেত ভগবৎকথাম্।
দিনঞ্চ কৃষ্ণকথয়া বৈষ্ণবানাঞ্চ সঙ্গমৈঃ।
নীয়তাং কার্ত্তিকে মাসি সঙ্কল্পব্রতপালনম্।।
দীপদানমখণ্ডঞ্চ দদ্যাদ্বৈ বিষ্ণুসন্নিধৌ।
দেবালয়ে তুলস্যাং বা আকাশে বা তদুত্তমম্।।

(হঃ ভঃ বিঃ ১৬শ বিঃ)

অর্চ্চনকারী কার্ত্তিক মাসে প্রত্যহ রাত্রির শেষ যামে জাগরণ-পূর্ব্বক বিশুদ্ধ হইয়া স্তবপাঠ করিতে করিতে শ্রীবিগ্রহের প্রবোধন করিবে। পরে নীরাজন করিতে হইবে। বৈষ্ণবধর্ম্ম-শ্রবণ-পূর্ব্বক বৈষ্ণবগণের সহিত সানন্দে হরিকীর্ত্তনাদি করিয়া প্রভাত সময়ে শ্রীভগবানের আরাত্রিক করিবে।

কার্ত্তিক মাসে প্রত্যহ বৈষ্ণবগণের সহিত মিলিত হইয়া হরিকথা সেবন করিতে হইবে।

কার্ত্তিক মাসে বৈষ্ণবগণের সহিত মিলিত হইয়া হরিকথা-শ্রবণাদির দ্বারা দিনযাপন-পূর্ব্বক সঙ্কল্পিত ব্রত রক্ষা করিবে।

কার্ত্তিকে বর্জ্জনীয় বা নিষিদ্ধ দ্রব্য

কলমী শাক, পটোল, বেগুন, বরবটী, সিম ও যাবতীয় আসব পরিত্যাজ্য। ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি স্বভাবতঃই ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ করায় মৎস্য-মাংসাদি বর্জ্জনকারী। তাই,—

কার্ত্তিকে তু বিশেষেণ রাজমাষাংশ্চ ভক্ষয়ন্।
নিষ্পাবান্ মুনিশার্দ্দূল যাবদাহূতনারকী।।
কলিঙ্গানি পটোলানি বৃন্তাকং সন্ধিতানি চ।
ন ত্যজেৎ কার্ত্তিকে মাসি যাবদাহূতনারকী।।
ন মাৎস্যং ভক্ষয়েন্মাংস ন কৌর্ম্মং নান্যদেব হি।।

(হঃ ভঃ বিঃ ১৬শ বিঃ)

অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসে রাজমাষ বা বরবটী বা নিষ্পাব বা শিম্বী ভক্ষণ করিলে আপ্রলয় নরকে বাস করিতে হয়। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকে কলম্বীশাক, পটোল, বেগুন ও আসবাদি পরিত্যাগ না করে, তাহাকে আপ্রলয় নরকে অবস্থিতি করিতে হয়। মৎস্য এবং কূর্ম্মাদি সর্ব্বপ্রকারের মাংস সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

চাতুর্ম্মাস্যে বর্জ্জনীয় দ্রব্যের বিবরণ-প্রসঙ্গে আমরা শুনিয়াছি,—"কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ।"

টীকা—"স্বত এবামিষত্যাগনিবৃত্তিধর্ম্মনিরতশ্চামিষস্থানে মাষান্ ত্যজেৎ।" অর্থাৎ কার্ত্তিকে আমিষ পরিত্যাগ করিবে। যাঁহারা স্বতঃই আমিষত্যাগকারী নিবৃত্তিধর্ম্মনিরত, তাঁহাদের 'আমিষ'-স্থানে মাষকলাই বুঝিতে হইবে।

কার্ত্তিকে শ্রীরাধা-দামোদরের সেবা

কার্ত্তিকমাসে শ্রীরাধাজনের আনুগত্যে শ্রীরাধা-দামোদরের সেবা করিতে হইবে,—

ততঃ প্রিয়তমা বিষ্ণো রাধিকা গোপিকাসু চ।
কার্ত্তিকে পূজনীয়া চ শ্রীদামোদর-সন্নিধৌ।।

(হঃ ভঃ বিঃ ১৬শ বিঃ)

শ্রীরাধিকাই নিখিল গোপীগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা, সুতরাং কার্ত্তিক মাসে দামোদর-সমীপে শ্রীরাধিকার সেবাই কর্ত্তব্য।

দামোদরাষ্টকং নাম স্তোত্রং দামোদরার্চ্চনম্।
নিত্যং দামোদরাকর্ষি পঠেৎ সত্যব্রতোদিতম্।।

(হঃ ভঃ বিঃ ১৬শ বিঃ)

কার্ত্তিক মাসে দামোদরের পূজা করিয়া 'সত্যব্রত' নামক ঋষি-কথিত দামোদরাষ্টক-স্তোত্র প্রত্যহ অধ্যয়ন করিবে, তাহা দামোদর-দেবকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন।

স্থানান্তরে সানুবাদ দামোদরাষ্টক প্রকাশিত হইল।

গোবর্দ্ধন-সেবা

গোবর্দ্ধনগিরৌ রম্যে রাধাকুণ্ডং প্রিয়ং হরেঃ।
কার্ত্তিকে বহুলাষ্টম্যাং তত্র স্নাত্বা হরেঃ প্রিয়ঃ।
নরো ভক্তোভবেদ্বিপ্রাস্তদ্ধি তস্য প্রতোষণম্।।

(হঃ ভঃ বিঃ ১৬শ বিঃ)

রমণীয় গোবর্দ্ধন-গিরিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম রাধাকুণ্ড বিরাজমান। কার্ত্তিকী কৃষ্ণাষ্টমীতে ঐ কুণ্ডে স্নান করিলে হরিভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হওয়া যায়; কারণ, ঐ কুণ্ড-স্নানে শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রীতি হয়।

শ্রীকৃষ্ণদাসবর্য্যোঽয়ং শ্রীগোবর্দ্ধন-ভূধরঃ।
শুক্লপ্রতিপদি প্রাতঃ কার্ত্তিকেঽর্চ্চ্যোঽত্র বৈষ্ণবৈঃ।।

কৃষ্ণদাসগণের মধ্যে শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরিরাজই শ্রেষ্ঠ। কার্ত্তিকী শুক্লা প্রতিপদের প্রভাতে গোবর্দ্ধনের পূজা করা বৈষ্ণবগণের কর্ত্তব্য।

উত্থানৈকাদশীর সেবা

সর্ব্বকৃত্যং পরিত্যজ্য তুষ্ট্যর্থং চক্রপাণিনঃ।
উপোষ্যৈকাদশী সম্যক্ কার্ত্তিকে হরিবোধনী।।

কার্ত্তিক মাসে নিখিলকর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির জন্য সম্যগ্‌রূপে হরিবোধনী অর্থাৎ উত্থানৈকাদশীর উপবাস করিবে।

তাবদ্‌গর্জ্জন্তি তীর্থানি বাজিমেধাদয়ো মখাঃ।
মথুরায়াং প্রিয়া বিষ্ণোর্যাবন্নায়াতি বোধনী।।
সংসারদাবতপ্তানাং কামসৌখ্যে পিপাসিনাম্।
শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মস্য সান্নিধ্যং শীতলং গৃহম্।।
ভবপান্থজনানাং বৈ প্রাপিকেয়ং প্রবোধনী।
কথং ন সেব্যতে মূঢ় মথুরায়াং কিমন্যতঃ।। (শ্রীপদ্মপুরাণ)

যে-কাল পর্য্যন্ত মথুরাপুরীতে প্রবোধনী উপস্থিত না হয়, সে-কাল পর্য্যন্তই নিখিল তীর্থ ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞ স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে। সংসার-দাবানলে বিদগ্ধ, কামসুখের পিপাসায় তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিগণের শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের সান্নিধ্যই সুশীতল গৃহস্বরূপ। সংসারপথের পথিকগণ প্রবোধনীর প্রসাদে সেই শীতল নিকেতন

লাভ করিতে পারে। রে মূঢ়, তবে কেন মথুরার আরাধনা করিতেছ না? তোমার অন্যতীর্থ বা অন্য ক্রিয়ানুষ্ঠানে আর কি প্রয়োজন?

'শ্রীগুরুপাদাশ্রয়' হইতে আরম্ভ করিয়া **"কার্ত্তিকাদিব্রত"** পর্য্যন্ত চৌষট্টিটী ভক্ত্যঙ্গের কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর দ্বারা জগজ্জীবের মঙ্গলকর বলিয়া জানাইয়াছিলেন এবং তন্মধ্যে—

"সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন।।
সকল সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ।।"

—এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গ-পঞ্চক শ্রীরূপানুগপ্রবর আচার্য্যবর্য্য গৌরজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপায় যুগপৎ সর্ব্বতোভাবে অনুক্ষণ অনুশীলন করিবার সুযোগ আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীব্রজ- মণ্ডল-পরিক্রমাকালে অনুক্ষণ সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ, মথুরা-বাস ও শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন যুগপৎ অনুষ্ঠিত হইবে। শ্রীগুরুবৈষ্ণব-সঙ্গে মথুরা- মণ্ডলে কার্ত্তিকমাসে নিয়মসেবা, প্রবোধনীর সেবা, গোবর্দ্ধনগিরি, শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীবৃন্দাবনের দ্বাদশ বনের সেবায় সুযোগ ঘটিবে। প্রবোধনী তিথিতে আমাদের পরমগুরুদেব গৌরব্রজ-জন অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়া ঐ তিথিকে অধিকতর বিপ্রলম্ভময়ী মূর্ত্তিতে প্রকাশিত করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীরাধানিত্যজন শ্রীগুরু- পাদপদ্মের রেণুকণায় স্ব-স্বরূপকে প্রবোধিত করিতে পারিলে মথুরামণ্ডলে ঐ তিথির সুষ্ঠু-সেবা সাধিত হইতে পারিবে। এই অভূতপূর্ব্ব সুযোগ সকলে মস্তকে বরণ করুন। এবার গৌড়ীয়গণের ঊর্জ্জব্রত অন্য কিছু নয়—শ্রীহরি-গুরু- বৈষ্ণবের সর্ব্বতোভাবে অনুগমনে গৌরবিহিত কীর্ত্তনাখ্যে মাথুরমণ্ডল পরিক্রমা।

পরিক্রমা—আমাদের স্বরূপের ধর্ম্ম

ওঃ কোন্ দেশের লোক আমরা কোন্ দেশে এসে প'ড়েছি। এ ত' সাত সমুদ্র তের নদী মাত্র নয়, কত লক্ষ লক্ষ দেশ-দেশান্তর, যুগ-যুগান্তর ঘুরে' এখানে এসেছি! এখানেও ত' স্থির নই—কেবল চক্রের ন্যায় ঘুর্‌ছি! ছিলাম কোথায়, ঘুরে ঘুরে এলাম মা'র গর্ভে—দশ মাস দশ দিন ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে ভূমিষ্ঠ হ'লাম, তা'র সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীর-মন, আকৃতি-প্রকৃতি—সবই ঘুর্‌তে লাগ্‌ল। আমার ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে আমার সুখ-দুঃখও চক্রের ন্যায় ঘুর্‌তে থাক্‌ল।

কখনও পাখী হ'য়ে আকাশ-মণ্ডলে ঘুর্‌ছি, কখনও জলজন্তু হ'য়ে সাগরে- মহাসাগরে ঘুর্‌ছি, কখনও বা নানাপ্রাণী হ'য়ে পৃথিবী-মণ্ডলে ঘুর্‌ছি। মানুষ হ'য়ে কত প্রকারেই না দুনিয়াদারীতে ঘুর্‌ছি; কখনও বা পেটের চিন্তায় ঘুর্‌ছি, কখনও বা এক একটা খেয়াল চরিতার্থ কর্‌তে ঘুর্‌ছি। কখনও রূপের মোহ, কখনও

রসের মোহ, কখনও গন্ধের মোহ, কখনও স্পর্শের মোহ, কখনও বা শব্দের মোহের মায়ামৃগ হ'য়ে মায়ামরুর চতুর্দ্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছি!

পৃথিবীতে এত ঘুরেও ঘোরার সাধ না মিটায় চন্দ্রমণ্ডল, সূর্য্যমণ্ডল, নক্ষত্র- মণ্ডল, স্বর্গমণ্ডল ঘুর্‌বার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌ছি—নানা ব্রত-তপস্যা করছি! যাগ-যোগের নাগরদোলায় চড়ে' কত কত সূর্য্য-চন্দ্রমণ্ডল ঘুরেও ঘোরার অবসান হ'লো না—ঘোরার সাধ মিট্‌ল না!

চৌরাশী লক্ষ যোনি ঘুরে' ত' এসেছিলাম পৃথিবীতে মানুষের চেহারা নিয়ে। এই ঘুর্‌বার প্রবৃত্তি যখন পৃথিবী-পরিক্রমার জন্য আমাকে আবার নূতন ক'রে প্ররোচিত ক'রে তুল্‌ল, তখন গৃহিণী আমাকে পরিক্রমা কর্‌লেন, আমিও তাঁকে পরিক্রমা কর্‌লাম, গৃহিণী-পরিক্রমার পর গৃহ-পরিক্রমা ক'রে নবগৃহে প্রবেশ কর্‌লাম। মনে ক'রেছিলাম,—গৃহে বিশ্রাম পা'ব—শান্তি পা'ব। কিন্তু ঘুরে' ঘুরে' মাথার ঘাম পায় পড়ছে—মাথা ঘূর্ণিবায়ুর 'বল্' হ'য়ে যাচ্ছে, তথাপি কে যেন আমাকে চাবুক দিচ্ছে—পদাঘাত ক'রছে, আর ঘোরাচ্ছে।

ঐরূপ ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে ঘোরার শ্রম লাঘব কর্‌বার জন্য শ্রমিকের ন্যায় গান ধর্‌লাম,—

'মা, আমায় ঘুরাবি কত।
চোক্-ঢাকা বলদের মত।।'

ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী জগজ্জননী তাঁ'র ভাণ্ডে এ'নে চোক্-ঢাকা বলদের মত নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছেন, আর আমাকে দিয়ে তাঁ'র জেলখানার তেল পিষে নিচ্ছেন। আমি জগদম্বার জগৎকারাগারের কয়েদী। তাই আমি যতই তাঁ'র কাছে আব্‌দার করি, তিনিও ততই চুষিকাঠি দিয়ে আমাকে ভুলিয়ে দেন। আমার হাতে বিশ্বরূপের মোয়া দিয়ে বলদের মত ঘোরান, আর ''ফেল কড়ি মাখ তেলে''র হাটের তেল আদায় ক'রে নেন। প্রকৃতির কাছে যতটা প্রকৃতির দান চা'ব, প্রকৃতি ততটাই ভোগ্য দিয়ে তেল আদায় ক'রে নিবেন। এটাই প্রকৃতির প্রকৃতি।

তাই সময় সময় যখন ঘুরে' ঘুরে' চোক্ চড়কগাছ হ'য়ে যায়, তখন আমার শ্মশান-বৈরাগ্যের উদয় হয়। ঘোরার হাত হ'তে নিষ্কৃতি পেয়ে বুঁদ হয়ে বসে পড়্‌বার জন্য আপনাকে শ্মশানবাসী শিব কল্পনা করি—''শিবোঽহং'' ''শিবোঽহং'' বলিতে থাকি।

ঘোরার আবর্ত্তে পড়ে' আর বুদ্ধি-শুদ্ধি সব লোপ হ'য়ে গিয়েছে কি না, তাই একটা মস্তবড় ভুল ধর্‌তে পার্‌ছি না! যখন শিবানীকে একবার 'মা' ব'লেছি —'জগদম্বা' ব'লেছি, তখন আমি 'শিব' হ'য়ে পড়্‌লে আমার কতটা বেয়াদবী —শুধু বেয়াদবী নয়, কতটা রাজদ্বারে দণ্ডিত হ'বার মত অপরাধ হ'বে, তা' আমি ধর্‌তেই পার্‌ছি না! সেরূপ চরম অপরাধী ব্যক্তি হয় নিজে আত্মহত্যা কর্‌বে, না হয় তা'কে রাজ-পুরুষ সেরূপ চরম দণ্ড ভোগ করা'বে!

ভগবান্‌কে আমার বিভিন্ন বাসনা-পূরণকারিণী, আমার আপাত সুখের প্রতি স্নেহ-সুলভদৃষ্টি-সম্পন্না মা'র মূর্ত্তিতে গড়্‌তে চাইলে সেখানে 'জড়া প্রকৃতি' এসে' দাঁড়াবেন। ভগবান্‌কে 'মা' কর্‌তে চাইলে—

আমাদের আব্‌দারের যোগানদার কর্‌তে চাই বিশ্বঘোরা কম্‌বে না। পুনঃ পুনঃ গর্ভবাস-যন্ত্রণায় ঘুর্‌তে হ'বে, আর প্রকৃতিকে 'মা' ব'লে, তাঁ'র স্তন পান (বিশ্বের রূপ-রসাদি ভোগ) কর্‌তে কর্‌তে আবার অপর গর্ভবাসের দোলায় আরোহণ করতে হ'বে, কখনও বা শ্মশানবৈরাগী সেজে' 'মা' ডাক্‌টা উল্‌টে ফেলে দিতে হ'বে।

জীব যখন 'মা' ডাকে, তখন সেখানে **গর্ভবাস-সম্বন্ধ**, জগতের আদান-প্রদান-সম্বন্ধ; আর পূর্ণচেতন **ভগবান্ যখন** অবিমিশ্র বিশুদ্ধ সত্ত্ব চৈতন্যকে **'মা' ডাকেন**, ভগবান্ যখন **নিত্যপুত্র** রূপে প্রকাশিত হন, তখনই **সেখানে গর্ভবাস**-সম্বন্ধ বা **প্রকৃতির সম্বন্ধ নাই**, সেখানে প্রেমের ফোয়ারা ফুটে উঠেন; কেন না, ভগবান্ গর্ভবাস-ব্যতীতও জগতে প্রকাশিত হ'তে পারেন, কিন্তু বদ্ধজীব তা' পারে না।

জগতের অজ্ঞান শিশু-সম্প্রদায় যখন পরব্রহ্মকে (?) তা'দের আব্‌দার ও কামনার সরবরাহ-কারিণীর মূর্ত্তিতে কল্পনা ক'রে পুরাকালের রাজ্যভ্রষ্ট দেবতাগণের ন্যায় রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম বা শিবত্ব কামনা ক'রে 'মা' 'মা' ব'লে আবাহন করে, তখন কি তা'তে সত্য সত্য পরব্রহ্মের সেবা হয়? আমার সুখ, আমার সুখের সঙ্গে যা'দের সুখের শিকল বাঁধা, তা'দের সুখের কামনা—তা'দের স্বাধীনতা কামনা—রাজ্য, ঐশ্বর্য্য কামনা, কিংবা আমি এ দুঃখের দুনিয়া হ'তে উদ্ধার পা'ব—শান্তি পা'ব, এরূপ আত্মসুখ-কামনার জন্য 'মা'কে যোগানদার করা, গোমস্তা করা, দাসী বাঁদীর মত করাটা কি মায়ের পূজা,—না মাকে খাটিয়ে নেওয়া? পরব্রহ্মকে খাটিয়ে (?) নেওয়া ত' পরব্রহ্মের সেবা নয়—পরব্রহ্ম আমায় সুখে রাখুন্ বা দুঃখে রাখুন্, তা'তে ব্যতিব্যস্ত না হ'য়ে—তাঁ'র পায় চিরদাসখত লিখে দিয়ে তাঁ'র জন্য বিনা স্বার্থে অহৈতুকভাবে খাটা, তাঁ'কে সুখ দিবার জন্য নানা কৌশলে, নানাভাবে সর্ব্বক্ষণ লেগে থাকার নামই ত' সেবা বা প্রেম।

'মা আমায় ঘুরাবি কত' ব'লে মা'কে যেন ঘুষ দেওয়ার মত চাল-কলা-নৈবেদ্য দেওয়া, ঢাক-ঢোল-বাজান বা "শিব হ'য়ে গিয়ে আমি দুঃখ হ'তে উদ্ধার পা'ব —আর শেষকালে পরব্রহ্মের সেবা ছেড়ে' দিব"—এরূপ একটা অপস্বার্থকেই শ্রেষ্ঠ মানবজাতি কি 'পূজা' বল্‌তে পারেন? গতানুগতিক ভাবে বহু লোক একটা কাজ মোহের নেশায় অজ্ঞান হ'য়ে ক'রে আস্‌ছে ব'লে তা'তেই মেতে যেতে হ'বে, আর যাঁ'রা জগতে প্রকৃত অহৈতুকী সেবার কথা—প্রেমের কথা প্রচার কর্‌ছেন, তা'তে কান বন্ধ ক'রে রাখ্‌বে হ'বে,—এটা কি প্রকার যুক্তি?

আমরা আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ বল্‌বার দাবী ক'রেও এরূপ পুতুল-খেলার খেল্‌না নিয়ে মেতে উঠেছি—পুতুল-খেলার ঢাক-ঢোলে দুনিয়া সরগোল ক'রে নিয়েছি, দেহের আত্মীয়-স্বজনের জন্য আমাকে যাঁ'রা কোনও না কোনও ভাবে ভোগের সাহায্য করেন, তাঁ'দের জন্য নূতন কাপড়, নতুন অলঙ্কার, সুন্দর প্রসাধন, তাঁ'দের খেল্‌না, সাজ-সজ্জার উৎসব নিয়ে ব্যস্ত আছি; প্রকৃতির দান, প্রকৃতির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, প্রকৃতির সর্ব্বপ্রকার ভোগকেই মা'র বিগলিত করুণা- স্তন্যধারার মত জ্ঞান কর্‌ছি; অথবা ঐগুলি চিরকাল

আমার ইচ্ছা মতে আমার ভোগ যোগা'তে পারে না ব'লে ঐগুলির উপর রাগ ক'রে শ্মশানবৈরাগ্য শিব হ'তে যাচ্ছি—শিব হ'য়েও প্রকৃতিকে আমার উপর নাচাচ্ছি; কারণ, ভোগীই হই, আর ত্যাগীই হই, প্রকৃতি আমাকে ছাড়্বে না—ভোগে প্রকৃতি-ভোগ (?) কর্‌বার যত চেষ্টা করি, ততই প্রকৃতি আমার উপর চ'ড়ে বসেন; আমি যে অণুচেতন, মায়াকে ত' আমি ভোগ কর্‌তে চাইলেও ভোগ কর্‌তে পার্‌ব না, ত্যাগ কর্‌তে চাইলেও ত্যাগ কর্‌তে পার্‌ব না—প্রকৃতি বা মায়া আমার উপর উঠে নৃত্য কর্‌তে থাক্‌বেন—লোলজিহ্বা হ'য়ে নৃত্য কর্‌তে থাক্‌বেন—গণ-গড্ডলিকার মুণ্ডমালা প'রে নৃত্য কর্‌তে থাক্‌বেন। এ ত' পরব্রহ্মেরই কথা,—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।।

মায়া হ'তে উদ্ধার লাভ কর্‌তে হ'লে মায়ার পূজা কর্‌লে হ'বে না, মায়ার আশ্রয় নিলে হ'বে না; যাঁ'র মায়া (মম মায়া), একমাত্র তাঁ'রই (মামেব) শরণ নিতে হ'বে।

দশানন রাবণ তা'র বিশ মাথা, দশ হাত দিয়ে দুনিয়ার স্বাধীনতা, সাম্রাজ্য, যত কিছু ভোগ ত' আয়ত্ত ক'রেছিলই, এমন কি, স্বর্গের রাজা ইন্দ্রকে পর্য্যন্ত গোলাম ক'রেছিল, পৃথিবীর ক্লেশ লাঘব কর্‌বার জন্য ইচ্ছামাত্রই 'যা'তে স্বর্গে যেতে পারে, তজ্জন্য স্বর্গের সিঁড়ি পর্য্যন্ত তৈরী কর্‌বার চেষ্টা ক'রেছিল, আর ঐরূপ চেষ্টা দিয়ে তা'র গুরুর (শিবের) গুরু রামের স্বরূপশক্তি লক্ষ্মীকে হরণ কর্‌তে চেষ্টা ক'রেছিল। রাবণ মনে করেছিল যে, সে বুঝি ভগবান্ বিষ্ণুকে নিঃশক্তিক কর্‌তে পেরেছে, কিন্তু স্বরূপশক্তি সেখানে রাবণকে ভোগা দিয়ে- ছিলেন—ভগবানের শক্তি হরণ কর্‌বার শক্তি রাবণের নাই—রাবণ স্বরূপশক্তির ছায়াশক্তির একটু অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে কি কখনও স্বরূপশক্তিকে স্পর্শ কর্‌তে পারে? তাই মায়াশক্তিকে—ছায়াকে দেখেই মনে ক'রেছিল যে, সে নিত্য সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্‌কে নিঃশক্তিক কর্‌তে পেরেছে; তাই সর্ব্বশক্তিমান্ তা'কে চরম দণ্ড দান কর্‌লেন।

'ছায়াশক্তি'কে যাঁ'রা পূজা করেন, তাঁ'দের পূজাও ছায়ার ন্যায় অবাস্তব। ছায়ার যেরূপ বস্তুত্ব ও নিত্যত্ব নাই, তাঁ'রা এদিকে মুখে বলেন যে, তাঁ'রা শক্তিকে পূজা করেন, কিন্তু আর একদিকে তাঁ'রা শক্তিকে লোপ করেন—হরণ কর্‌বার চেষ্টা করেন—তাঁ'কে বিসর্জ্জন দেন—অন্তিমে—সকলের শেষে শক্তির অস্তিত্ব থাক্‌বে না, সব নিঃশক্তিক হ'য়ে যাবে—এরূপ কল্পনা করেন। আবার শিবানীর পূজা কর্‌তে কর্‌তে—শিবের পূজা কর্‌তে কর্‌তে নিজেরাই শিবের আসন কে'ড়ে নেন!

জগৎপ্রসবিনীকে 'মা' ডে'কে গর্ভবাসের ঘুরপাক—ত্রিতাপ-যন্ত্রণার ঘুরপাক হ'তে উদ্ধারের জন্য 'মা আমায় ঘুরাবি কত'—এরূপ না ব'লে যে দিন আমরা অনুক্ষণ আমাদিগকে পরব্রহ্মের বাগানের মালী ক'রে তাঁ'র সকল কাজে, তাঁ'র সকল ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য অনুক্ষণ—অবিরাম, এমন কি, জন্ম-জন্মান্তর

ঘুর্‌তে পারি,—এইরূপ অকপট আর্ত্ত প্রার্থনায় যে-দিন চেতনকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুল্‌ব, সে দিনই আমরা যাঁ'র বারান্দায় পরব্রহ্ম হামাগুড়ি দেন, সেই নন্দের ব্রজ পরিক্রমা কর্‌বার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌ব—সে দিনই বিশ্ব-পরিক্রমা ও ব্রজ-পরিক্রমা, গ্রাম-পরিক্রমা ও ধাম-পরিক্রমায় তফাৎ কোথায় বুঝ্‌তে পার্‌ব। তখন একমাত্র অদ্বিতীয়, অপ্রাকৃত কামদেবের কামের পরিপূরণের জন্য আমাদের স্বরূপের—চেতনের বৃত্তি প্রকাশিত হ'য়ে পড়্‌বে। যাঁ'রা সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণের কাম-চরিতার্থ কর্‌বার জন্য অনুক্ষণ ঘুর্‌ছেন, তাঁ'দের পেছন ধ'রে—পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে চেতনের কানে নন্দ-নন্দনের বাঁশীর সঙ্কেত শু'নে রাসমণ্ডলীতে ঘুর্‌বার জন্য সব কাজ ফে'লে দৌড়্‌ব—আবার যাঁ'রা নন্দনন্দনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবা করেন, তাঁ'রা যে কুণ্ডে সর্ব্বক্ষণ স্নান করেন, সেই রাধাকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে বার্ষভানবীর সেবকমণ্ডলীর চরণরেণুর আকাঙ্ক্ষা ক'রে ক'রে ঘুর্‌তে থাক্‌ব—তখনই শ্রীকৃষ্ণের গৃহস্থালী, আমাদের নিত্যস্বরূপে আমরা যাঁ'র একজন অংশীদার, সেই গৃহস্থালীর মূল বিষয় ও মূল আশ্রয়ের সেবার জন্য সকল কাজে, সকল চিন্তায়, সকল ভাবনায় আমাদের কেবল ঘুর্‌বার স্বাভাবিকী প্রবৃত্তির উদয় হ'বে। তখন বুঝ্‌তে পার্‌ব,—কৃষ্ণের গৃহস্থালীর জন্য তন্ময় হ'য়ে গোপীরা সর্ব্বদা গোকুলে-গোলোকে কেন ঘুর্‌ছেন্—দিব্য বিরহোন্মাদে কেন ঘুর্‌ছেন—সেরূপ ঘোরাই আমাদের সকলের স্বরূপের ধর্ম্ম—পরিক্রমা করাই আমাদের চেতনের স্বাভাবিকী বৃত্তি—ঘোরা হইতে নিবৃত্তি হওয়া—পরিক্রমা ছে'ড়ে দিয়ে বুঁদ হ'য়ে ব'সে যাওয়া অচেতনের ধর্ম্ম—পাহাড়-পর্ব্বতের ধর্ম্ম। চেতনের তা' অপেক্ষা আর যন্ত্রণাময় অবস্থা নাই, জড়শক্তি—জড়তড়িৎ আমাদিগকে রাত্রি-দিন 'কোথায় আমরা ইন্দ্রিয়-সুখ পা'ব,—এরূপ একটা মরীচিকায় বিভ্রান্ত ক'রে ঘূর্ণিবায়ুর মত, আবর্ত্তের মত ক্লেশের জাঁতাকলে ঘুরাচ্ছে দে'খে ঘরপোড়া গরুর সিঁদুরে মেঘ দে'খে ভয় পা'বার ন্যায় আমরা যদি মহামায়া জড়শক্তির প্রেরণায় ঘোরা, আর যোগমায়ার চিচ্ছক্তির প্রেরণায় ঘোরাকে—বিশ্ব-পরিক্রমা ও ব্রজ-পরিক্রমাকে সমান মনে করি, তবে ভুল বুঝ্‌লাম। জড়শক্তিকে যে ঘূর্ণিবায়ুর মত ঘুর্‌তে হয়, তা'তে জগতের অনেক ভাল জিনিষ নষ্ট হ'য়ে যায়—ঐরূপ আবর্ত্ত অনেক প্রাণীর প্রাণ হরণ করে—তা'তে জগন্নাশ-কার্য্য উপস্থিত হইয়া থাকে।

তাই মহাজন আমাদিগের ঐ বিশ্বগ্রাসী ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিবার জন্য ডাক্‌ছেন। তিনি আমাদের দুঃখে দুঃখী হ'য়ে ডে'কে ডে'কে বল্‌ছেন,—জড়শক্তির পদগোলক হ'য়ে কতকাল বিদেশে ঘুর্‌বে? সদ্‌গুরুকৃপা—চিচ্ছক্তি যোগমায়ার কৃপা-প্রসাদ মস্তকে বরণ ক'রে তোমাদের নিত্য-স্বদেশ নবদ্বীপ-বৃন্দাবন পরিক্রমা কর। নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে অভেদ দর্শন ক'রে পরিক্রমা কর। বৃন্দাবন পরিক্রমা কর্‌তে কর্‌তে নবদ্বীপের ঔদার্য্যসীমায় তোমাদের চেতনবৃত্তি পরিপ্লুত হ'য়ে উঠুক, আর নবদ্বীপ-পরিক্রমাকালে মহাবদান্য নবদ্বীপের কৃপায় তোমাদের হৃদয়ে ব্রজ-জনের মাধুরী প্রকাশিত হউক্।

শ্রীহরিজন

শ্রীমদ্ভাগবতানুগ সাহিত্যে "হরিজন" ও "প্রকৃতিজন"—এই দুইটী শব্দ দৃষ্ট হয়। যাঁহারা একমাত্র ভগবৎ-সেবায় প্রপন্ন, ভগবৎসেবা ব্যতীত যাঁহাদের অন্য কোন প্রকার কর্ত্তব্য বা প্রয়োজন-বিচার নাই এবং যাঁহারা নিখিল জীবকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তনরত, ভগবানের সেই সকল জনই শ্রীহরির নিজ-জন বা শ্রীহরিজন নামে খ্যাত।

শ্রীহরিজনের বিপরীত শব্দ "প্রকৃতিজন"। যাঁহারা শ্রীহরির বহিরঙ্গা ও তদ্বৈচিত্র্যের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া প্রকৃতির ভোগ বা দাস্যকে জীবনের প্রয়োজন ও কর্ত্তব্য বিচার করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃতিজন।

এই সকল প্রকৃতিজন বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহলোকের সুখ-সুবিধা-অভ্যুদয় বা পরলোকে ভোগ-মোক্ষাদি লাভের জন্য চেষ্টাপর ব্যক্তিগণ আর এক প্রকার প্রকৃতিজন। অসৎকর্ম্মি-সম্প্রদায় যেরূপ 'প্রকৃতিজন'-পদবাচ্য, সৎকর্ম্মিসম্প্রদায়ও তেম্‌নি 'প্রকৃতিজন'-পদবাচ্য। অসৎকর্ম্মি-ব্যক্তি কেবল নিজের সংকীর্ণ অপস্বার্থ, নিজের সংকীর্ণ ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার জন্য ব্যস্ত। সৎকর্ম্মী তাঁহার অপস্বার্থকে ও ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতাকে সংকীর্ণতার গণ্ডী হইতে প্রাকৃত ব্যাপকতা—যাহা প্রকৃতির ভাষায় উদারতা, তাহাতে বিস্তার করিয়াছেন মাত্র। একজন সঙ্কীর্ণ অপস্বার্থপর ও ইন্দ্রিয়পর, আর একজন উদারতার বিশেষণে বিশেষিত হইয়া নিজ-অপস্বার্থ-পর ও ইন্দ্রিয়পর কেহই কৃষ্ণসৈবৈকসুখস্বার্থপর নহে। ব্যাপকতার মোহ অপ-স্বার্থপরতা ও ইন্দ্রিয়পরতাকে সঙ্কীর্ণ স্বার্থপর ও ইন্দ্রিয়পর সমাজের নিকট এমনভাবে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে যে, তাহা সাধারণ-দৃষ্টি অপস্বার্থপরতা বলিয়া কিছুতেই ধরিতে পারিতেছে না। একজন আততায়ী যখন কোন ব্যক্তি-বিশেষকে হত্যা করে, তখন তাহা অত্যন্ত হীনকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয় এবং ঐরূপ হীনতাকে গোপন রাখিবার জন্য চেষ্টা করা হয়। কিন্তু যখন ঐ আততায়িতাই বিরাটের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মহাসমরের বিরাট্‌রূপে সজ্জিত হয়, তখন সেই আততায়িতাকেই তথাকথিত সভ্যতার বৈজ্ঞানিক চক্ষু ততটা হীনদৃষ্টিতে না দেখিয়া জয়মাল্যে বরণ ও যশোগানে অভ্যর্থিত করিয়া থাকে। যে আততায়ী একটী মনুষ্যকে হত্যা করিয়া একদিন লোকচক্ষে হীন বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল, সেই আততায়ীই বহুলোককে হত্যা করিয়া তখন 'বীর' বলিয়া পূজিত হয়। তফাৎ কেবল অপস্বার্থপরতা ও আত্মেন্দ্রিয়পরতার ক্ষুদ্রত্ব ও বৃহত্ত্বে। জগতে যে-কোন বিষয়ই হউক না কেন—ব্যাপক বা বিরাট্ হইলেই তাহা আমাদের ঐশ্বর্য্যলোলুপ বুদ্ধিকে সম্ভ্রমে অবনমিত করে। ইহাই প্রকৃতির ধর্ম্ম। মানুষ যখন ক্ষুদ্রের জন্য অপস্বার্থপর হয়, তখন আমরা তাহাকে আদর করি না, কিন্তু তাহার অপস্বার্থপরতাকে যখন ব্যাপক করিয়া তোলে, তখনই আমরা তাহাকে মহান্ ও উদার বলিয়া থাকি।

সৎকর্ম্মি-সম্প্রদায় শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত। মানুষ যখন কেবল নিজের চৌদ্দপোয়ার বা তাহার স্ত্রী-পুত্র ও নিজ-গৃহের জন্য আসক্ত হয়, তখন আমরা সেই সকল অনিত্য বস্তুতে আসক্তিকে 'মায়া', 'মোহ' প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করি। তখন কর্ম্মি-সম্প্রদায়ের গুরু এবং উপদেষ্টৃবর্গও "কা তব কান্তা কস্তে

পুত্রঃ” কিংবা “অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং” প্রভৃতি উপদেশের মুদ্‌গর লইয়া ঐরূপ মোহকে ভঙ্গ করিবার জন্য উপস্থিত হন। কিন্তু সেই মোহই যখন বিরাট্ মূর্ত্তির শতবাহু, শতপদ, শতমস্তক প্রকট করিয়া নিজ-সেবা বা নিজ-পুত্র-পরিজন-সেবার অপস্বার্থপরতাটাকে elastic-এর মত টানিয়া জন-সেবা বা নিজ-দেশের গণ-সেবার মোহিনীমূর্ত্তিতে আপনাকে সজ্জিত করে—নিজ গৃহসেবার সংকীর্ণ মোহকে নিজ-দেশ-সেবার বিরাট্ মোহের মোহিনীমূর্ত্তিতে প্রকাশ করে, তখনই আমরা ঐ বিরাটের রূপে মুগ্ধ হইয়া সেখানে মস্তক অবনত করি। এইরূপে ব্যভিচার, ইন্দ্রিয়পিপাসা এবং জগতের যাবতীয় হীনতম পাপগুলিও ক্ষুদ্র হইতে বিরাটের মূর্ত্তিতে সজ্জিত হইয়া কোনও একটী জনবিশেষের মত হইতে বিরাট্ গণমতের তলে আশ্রয় পাইয়া জগতের অভ্যর্থনা ও অভিনন্দনের অর্ঘ্য প্রাপ্ত হয়।

বিরাট্‌রূপ যে প্রাকৃত ও প্রকৃতিজনের প্রাকৃত শ্রদ্ধা-আকর্ষক, ইহা একমাত্র শ্রীহরিজনই বলিয়া দেন। এই জগতের সামান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোহের বিরাট্‌রূপ ত' দূরের কথা, ভগবান্ কৃষ্ণ গীতায় অর্জ্জুনকে যে বিরাট্‌রূপ দেখাইয়াছিলেন, তাহা পর্য্যন্ত প্রাকৃত। হইতে পারে,—দেবতাগণও সেই বিরাট্‌রূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষী; কিন্তু দেবতাগণ প্রাকৃতসর্গেরই অন্তর্গত। দেবতার দর্শনীয় রূপ ভগবানের নিত্যরূপ বা স্বরূপ নহে। এ জন্য শ্রীহরিজন-অর্জ্জুনকে বাসুদেব “স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ”—নিজস্ব রূপ বা নিজ-স্বরূপ পুনরায় প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সেই নিজ-স্বরূপ অর্থাৎ দ্বিভুজরূপ দর্শন করিয়াই অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন,—

“দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীম স্ম সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ।।”

কাজেই বিরাট্‌রূপ যে প্রাকৃত, এ কথা কেবল শ্রীহরিজনই ধরিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত গণগড্ডলিকা—যাহা প্রকৃতির বিরাট্ দেখিয়াই মুহ্যমান, তাহা কখনও বিরাটের প্রাকৃতত্ব ধরিয়া উঠিতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে অজামিল-উপাখ্যানে এই প্রকৃতিজন ও শ্রীহরিজনের বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। দ্বাদশজন হরিজনের অন্যতম শ্রীযমরাজ কর্ম্মি- সম্প্রদায়কে ‘প্রকৃতিজন’ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, জৈমিনী বা মনু প্রভৃতি ‘মহাজন’-নামে প্রচারিত মনীষিগণও হরিজনের স্বভাব বুঝিতে পারেন নাই; কেন না, তাঁহাদের বিবেকশক্তি মায়াদেবীর দ্বারা বিমোহিত। যমরাজ তাঁহার দূতগণকে আরও বলিয়াছেন,—“তোমরা হরিজনদিগকে প্রকৃতিজনের ধর্ম্মাধর্ম্ম বা ন্যায়ান্যায়ের বিচারাধীন করিতে অগ্রসর হইও না। যাঁহারা ভগবানের পাদপদ্ম-মকরন্দরস-স্বরূপ একমাত্র ভগবদ্ভক্তিবার্ত্তাকেই কর্ণাঞ্জলিতে পান এবং কীর্ত্তনমুখে অনুক্ষণ অবিরাম প্রস্ফুটিত করেন, তাঁহারাই শ্রীহরিজন। শ্রীযমরাজ কহিয়াছেন,—

অহমমরগণার্চ্চিতেন ধাত্রা যম ইতি লোকহিতাহিতে নিযুক্তঃ।
হরিগুরুবিমুখান্ প্রশাস্মি মর্ত্ত্যান্ হরিচরণপ্রণতান্ নমস্করোমি।।

আমি দেবপূজ্য বিধাতা-দ্বারা লোক-সমূহের হিতাহিত-বিচারকরূপে নিযুক্ত হইয়াছি। হরিগুরুবিমুখ মর্ত্ত্য কর্ম্মিগণকে আমি প্রকৃষ্টরূপে শাসন করিয়া থাকি। কিন্তু হরিচরণ-প্রণত হরিজনগণকে আমি নমস্কার করিয়া থাকি।

শ্রীমদ্ভাগবতে যমরাজ আরও বলিয়াছেন,—যাহারা নিষ্কিঞ্চন পরমহংস শ্রীহরিজনের সঙ্গরহিত হইয়া গৃহরূপ নরকপথের পিপাসু ও গ্রাম্যকথায় রত, সেই সকল দুর্জ্জন প্রকৃতিজনকে আমার নিকট আনয়ন করিও। যাহাদের জিহ্বা উত্তমশ্লোক বিষ্ণুর নাম এবং গুণ কীর্ত্তন না করে, যাহাদের চিত্ত শ্রীহরির চরণারবিন্দ স্মরণ না করে, যাহাদের মস্তক শ্রীহরি ও শ্রীহরিজনগণের চরণে বিলুণ্ঠিত না হয়, তাহারাই প্রকৃতিজন, তাহাদিগকেই আমার নিকট আনয়ন করিবে।

যাহারা নিজ বায়ুপিত্তকফাত্মক দেহ ও নশ্বর গেহাদিতে 'আমি' ও 'আমার'-বুদ্ধি-বিশিষ্ট, যাহারা ভৌম-বিচার প্রবল রাখিয়া তাহাতে পূজ্যবুদ্ধি আরোপ করে, যাহারা 'প্রাকৃত সলিল' বুদ্ধি করিয়া তাহাতে তীর্থত্ব আরোপ করে, কিন্তু যাহাদের হরিজনে অপ্রাকৃত পূজ্যবুদ্ধি নাই, তাহারাই—প্রকৃতিজন।

শ্রীহরিজনগণের অপর নাম,—বৈষ্ণব বা ভাগবত। যাঁহারা বৈষ্ণব, তাঁহারা আপনাদিগকে বৈষ্ণব না বলিয়া শ্রীহরিজনকিঙ্কর প্রভৃতি আখ্যায় পরিচিত করিয়া থাকেন। কারণ, যেখানে শ্রীহরির পূজার ছলনা অথচ শ্রীহরিজনের পূজার কথা নাই, সেখানে বৈষ্ণবতা নাই। ঐরূপ বিচারপর ভক্তাভাসকে 'প্রাকৃত' বলা হয়। তাহারা শ্রীহরিজন বা বৈষ্ণব-পর্য্যায়ে গণিত হয় নাই। যেখানে শ্রীহরিজনের কৈঙ্কর্য্যচেষ্টা প্রবল, যেখানে শ্রীহরিজনের আনুগত্যে হরিসেবার চেষ্টা, সেখানেই হরিসেবার আরম্ভ। এই জন্য শাস্ত্রে হরিপূজা অপেক্ষাও শ্রীহরিজন-পূজার শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে।

শ্রীহরিজনগণ বদ্ধজীব নহেন। বদ্ধজীবের পূজাও শ্রীহরিজন-পূজা নহে। পরম মুক্ত, পরম নির্ম্মল, শ্রেষ্ঠ, সদাচারী পুরুষগণই শ্রীহরিজন-পদবাচ্য। যাঁহারা প্রকৃতিজনকাম্য ধর্ম্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষের কামুকতাকে সর্ব্বতোভাবে বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক পরম মুক্ত হইয়া নিরন্তর নিখিল অবস্থায় কায়মনোবাক্যে শ্রীহরিসেবায় নিযুক্ত আছেন, তাঁহারাই শ্রীহরিজন। ব্রহ্মাদি দেবতা তাঁহাদের শ্রীচরণরেণু প্রার্থনা করেন, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ সেই শ্রীহরিজনগণের শ্রীচরণরজে বিলুণ্ঠিত হইয়া ব্রাহ্মণত্বপদটী সংরক্ষণ ও বৈষ্ণবতা লাভ করিতে পারেন। ইহাই হরিজন-শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি বা শাস্ত্রীয় অর্থ।

কিন্তু শুনা যায়, এই বিদ্বদ্রূঢ়ি পরিত্যাগ করিয়া কোথায়ও কোথায়ও 'হরিজন'-শব্দের নূতন অর্থ প্রচারিত হইতেছে। বঙ্গদেশে এক সম্প্রদায় ''দরিদ্রনারায়ণ'' নামক একটী কথা সৃষ্টি করিয়া বদ্ধজীবে নারায়ণত্ব আরোপরূপ ভীষণ হইতেও ভীষণ একটী অপরাধের হলাহল সমাজে ছড়াইয়াছেন। কোথায়ও বা কর্ম্মফল-বাধ্য জীবের প্রাকৃত জন্মতারিখকে একমাত্র স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাব-তিথিকে প্রযোজ্য পরিভাষায় অবৈধ অনুকরণে ''জয়ন্তী''-নামে প্রচার-পূর্ব্বক সমাজকে বিপথগামী করিতেছেন। শাস্ত্র বলেন,—শ্রীহরির চরণে অপরাধ শ্রীহরিজনগণের কৃপায় বিদূরিত হইতে পারে; কিন্তু শ্রীহরিজনের চরণে অপরাধ জীবের অনন্ত সংসার-ক্লেশের হেতু হয়, তাহা স্বয়ং হরিও ক্ষমা করিতে পারেন না।

কেহ বলিতে পারেন,—''ঐ সকল শব্দ যে শ্রীহরি এবং শ্রীহরির কতিপয় চিহ্নিত জনেরই একচেটিয়া নিজস্ব সম্পত্তি হইবে—এইরূপ গোঁড়ামি আমরা স্বীকার করিব কেন?'' দশাননও একদিন এইরূপ যুক্তি

দিয়া বলিয়াছিলেন—"সীতাদেবী যে একমাত্র শ্রীরামচন্দ্রেরই একচেটিয়া সম্পত্তি হইবে—তাহা আমি হইতে দিব কেন?" রাজকীয় ছত্র বা দণ্ড কেবল একমাত্র রাজাই ধারণ করিবেন, সকলেই তাহা ধারণ করিতে পারিবে না কেন?—এই সকল বিচারে সাধারণতন্ত্র-মনোভাবের উদারতা থাকিলেও অপ্রাকৃত স্বরাটের দেশে—যেখানে একমাত্র লীলা-পুরুষোত্তমই স্বরাট্ বস্তু, সেখানে এরূপ প্রেমাভাবের কথা নাই—সেখানে সকলেই অদ্বিতীয় অপ্রাকৃত স্বরাট্ পুরুষের নিত্য সেবক বা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-বিধানকারী।

সকলেই হরিজন বটে; কিন্তু যাহাদের 'হরিজন' বলিয়া স্বরূপানুভূতি ও স্বরূপবৃত্তি প্রকাশিত হয় নাই, তাহারা স্বরূপে হরিজন হইলেও তাহাদিগের তাৎকালিক অবস্থা-বিচারে তাহাদিগকে "হরিজন" বলা যাইতে পারে না। পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকায় জননীত্ব অনুস্যূত থাকিলেও তাহাকে তখন জননী বলা যায় না। যখন সে সন্তান প্রসব করে, তখনই সে জননী বলিয়া পরিচিত হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

নীচজাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য।।
যেই ভজে, সেই বড়—অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার।।
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান।।

সৎকুলবিপ্র হরিভজন না করিলে—শ্রীহরিজনের পদাশ্রয় না করিলে, তিনিও যেমন "হরিজন"-পদ-বাচ্য নহেন, তদ্রূপ নীচকুলে উদ্ভূত ব্যক্তিও যদি অনুক্ষণ হরিসেবারত শ্রীহরিজনের পদাশ্রয় না করিয়া জগতের খাওয়া-দাওয়ার সুবিধা বা জীবন-ধারণের সুবিধার কল-কৌশল-মাত্র আয়ত্ত করিবার জন্য সভ্য বা অসভ্যজীবন যাপন, মার্জ্জিত বা অমার্জ্জিত রুচিতে জীবনধারণ করে, তাহা হইলে তাহারাও কোনদিন শ্রীহরিজনের কৃপা পাইল না, প্রকৃতিজনই থাকিল। ঐকান্তিক শ্রীহরি ও শ্রীহরিজনপাদপদ্মৈক-আশ্রয় ব্যতীত কাহারও "হরিজন" পদবী-লাভের কোন প্রকারই যোগ্যতা নাই—তিনি প্রাকৃত সৎকুল বিপ্রই হউন, আর নীচকুলে উদ্ভূতই হউন। শ্রীহরিজন বা বৈষ্ণবগণ আত্মা দর্শন করেন, প্রকৃতিজনগণের ন্যায় জীবের বহির্ম্মুখ ঔপাধিক স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের ভোগময় দর্শনে প্রতারিত হন না—তাঁহারা জগতের অভ্যুদয়, বহির্ম্মুখ গণ-গড্ডলিকার সমৃদ্ধি, হ্রাস বা অন্য কোনও প্রকার হরিবিমুখ-বিচারে ব্যস্ত থাকেন না।

প্রকৃতিজনের চিন্তাস্রোত হইতে প্রাকৃত সাহিত্যে অনেক অপ-পরিভাষা প্রচারিত হইয়া আছে। প্রকৃতি-জনগণ শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বত্রই ভোগতাৎপর্য্যময় অজ্ঞরূঢ়িতে শব্দবৃত্তিকে প্রচার করিয়াছে। একদিন সমগ্র শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি প্রচারের জন্য ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর "সকল শব্দই কৃষ্ণ"—ইহা প্রচার করিয়াছিলেন। হরিজনগণের বিচারও তাহাই। আর প্রকৃতিজনগণের বিচার তদ্বিপরীত অর্থাৎ তাহাদের

বিচারে সমস্ত শব্দই ভোগতাৎপর্য্যময়। দুঃখের বিষয়,—এই সকল কথা বুঝিবার মত মস্তিষ্কও প্রকৃতিদেবী উহাদিগকে প্রদান করেন নাই। জগতে হরি ও হরিজনগণের বাক্য-ক্রিয়া-মুদ্রার অবৈধ অনুকরণ যাহাতে না হয়, তজ্জন্য প্রত্যেক সমাজহিতৈষীরই যত্ন করা উচিত। আশা করা যায়, শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে 'বৈষ্ণব-মঞ্জুষা' নামক বৈষ্ণব-পরিভাষা-কোষগ্রন্থ প্রকাশিত হইলে জগৎ হইতে এই সকল অজ্ঞতা অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইবে।

একমাত্র পরম নির্ম্মল, পরম শ্রেষ্ঠ, পরম সদাচারী শ্রীগৌরকৃষ্ণসেবকগণই শ্রীহরিজন। সমগ্র পৃথিবী—বিশ্ব তাঁহাদের কিঙ্করত্ব লাভ করিলে ধন্যাতিধন্য হইতে পারে। শ্রীহরিজনগণে সর্ব্বসদ্‌গুণ স্বতঃসিদ্ধভাবে নিত্য-বিরাজিত,—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ।।

কীর্ত্তনে অমানী-মানদ

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর হরিকীর্ত্তনকেই নিখিল জীবের একমাত্র সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বদেশিক ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। সকল সময়ে, সকল দেশে, সকলের নিকট শ্রীহরিকীর্ত্তন করিতে হইবে। ইহাই জীবের একমাত্র নিত্যকৃত্য।

'কীর্ত্তন' অনুষ্ঠিত হইলেই তথায় কীর্ত্তনকারী, কীর্ত্তন-শ্রবণকারী ও কীর্ত্তন—এই ত্রিবিধ ব্যাপারের নিত্য অধিষ্ঠান থাকে। কীর্ত্তন-শ্রোতা—দ্বিবিধ; স্বয়ং বিষয় ও তাঁহার আশ্রয়। কীর্ত্তনের বিষয়তত্ত্ব স্বয়ং কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া থাকেন, আবার কীর্ত্তনীয় বস্তুর কীর্ত্তন অপরে শ্রবণ করেন। কীর্ত্তনকারীর অনুষ্ঠিত ব্যাপার কীর্ত্তন, সেই কীর্ত্তনের শ্রোতা—স্বয়ং বিষয়তত্ত্ব কৃষ্ণ ও আশ্রয়তত্ত্ব কৃষ্ণসেবক-সম্প্রদায়।

এই কৃষ্ণসেবক-সম্প্রদায় বা কৃষ্ণকীর্ত্তনের শ্রোতা আবার দ্বিবিধ— (১) যাঁহাদের স্বরূপজ্ঞান উদিত হইয়াছে অর্থাৎ ''আমরা কৃষ্ণের নিত্যসেবক, কৃষ্ণকীর্ত্তন-শ্রবণই আমাদের নিত্যধর্ম্ম''—যাঁহাদের এইরূপ উপলব্ধি হইয়াছে, আর (২) যাঁহারা স্বরূপে কৃষ্ণসেবক হইলেও হরিকীর্ত্তন-শ্রবণই যে তাঁহাদের নিত্যধর্ম্ম—এইরূপ স্বরূপজ্ঞান যাঁহাদের লুপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

ঐ উভয় শ্রেণীই কীর্ত্তনের শ্রোতা। কিন্তু প্রথমোক্ত শ্রেণী কীর্ত্তন-শ্রবণে উদ্বুদ্ধ হয় নাই, তাঁহাদের স্বরূপের নিত্য স্বভাবের রুচি চারিটী আবরণে আবৃত হইয়া পড়িয়াছে,— (১) জন্ম, (২) ঐশ্বর্য্য, (৩) শ্রুত ও (৪) শ্রী। এই চারিটী আবরণ আবার অসংখ্য আবরণ-ব্যূহের সৃষ্টি করিয়াছে।

যাঁহারা ঐ চতুর্ব্বিধ আবরণে আবৃত হইয়া তাঁহাদের নিত্যস্বভাব বা ধর্ম্ম 'কীর্ত্তন-শ্রবণ' হইতে বঞ্চিতাবস্থায় ইতর বিষয়ে অভিনিবেশকেই তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় ব্যাপার বলিয়া ভ্রান্ত হইতেছেন,
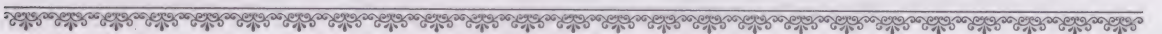
তাঁহাদিগকেও কীর্ত্তনে ক্রমে ক্রমে রুচিবিশিষ্ট করিবার জন্য ''সবারে করিবে গৌরসুন্দর উদ্ধার। বিনা বৈষ্ণব-নিন্দক দুরাচার।।''—এই ব্যাস-বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর কীর্ত্তনকারীকে ''মানদ'' হইবার আদেশ দিয়াছেন।

কীর্ত্তনকারী—'অমানী' মাত্র হইলে নিজে কীর্ত্তন করিবার যোগ্যতা লাভ করিবেন সত্য; কিন্তু 'কীর্ত্তন' 'জপ'-মাত্র নহে বলিয়া—কীর্ত্তনকারীও তৎসঙ্গে-সঙ্গে নিখিল জীবের মঙ্গলকারী বলিয়া কীর্ত্তনকারীকে 'মানদ' হইতে হইবে। 'মানদ' না হইলে জন্মৈশ্বর্য্যাদিমদমত্ত জীব কখনও শ্রোতার পদবী বা আসন গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইবে না।

কীর্ত্তনকারীর আসন—আচার্য্যের আসন, গুরুর আসন, উচ্চাসন; আর শ্রবণ- কারীর আসন—শিষ্যের আসন, ছাত্রের আসন, নিম্নাসন। একে ত' জীবের হরিকথা-শ্রবণের প্রয়োজনীয়তা-বোধ নাই, রুচি নাই, প্রবৃত্তি নাই, তাহার উপর জন্মৈশ্বর্য্যাদির অসংখ্য প্রকার মদমত্ততা জীবকে হরিকথা-শ্রোতার পদবী লাভের আকাঙ্ক্ষা হইতে বহুদূরে রাখিয়াছে। ''আমি উৎকৃষ্ট কুলীন, যদি কোনও অবরকুলে কৃপাপূর্ব্বক আবির্ভূত বৈষ্ণবকে উচ্চাসন-প্রদান-পূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে হরিকথা-শ্রবণের জন্য নিম্নাসনে বসি; আমি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, যদি অনুস্বার বিসর্গে জ্ঞানহীন কোন বৈষ্ণবের নিকট উপদেশ শ্রবণ করিতে বসি; আমি রাজা; আমার বিচারে যে ব্যক্তি প্রজা, সেইরূপ কোন ভগবৎ-সেবককে যদি আমার উপদেশকের উচ্চাসন দেই; আমি রূপবান, আমার দর্শনে বপুদোষযুক্ত কোন অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের নিকট যদি হরিকথা শুনিতে বসি, তবে লোকে বলিবে কি? সমাজ বলিবে কি? আমার সম্মান, প্রতিষ্ঠার তাহাতে লাঘব হইবে!'' এরূপ বিচারে অনেককে প্রকৃত বৈষ্ণবের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণরূপ একমাত্র নিত্যমঙ্গলের পথ হইতে দূরে অবস্থান করেন। এইরূপ শ্রেণীর কেহ আবার ''আমি এত বড় উচ্চ ব্যক্তি হইয়াও এরূপ জাতীয় নীচ (?) ব্যক্তিগণের নিকট হইতে হরিকথা শুনিতেছি, ইহাতে আমার মহত্ত্ব কত বড়; —লোকে এইরূপ প্রতিষ্ঠা প্রদান করিবে'' বিচার করিয়া কোথায় কোথায়ও অপরকে উপদেশকের ও নিজকে শ্রোতার পদবীতে মৌখিকভাবে গ্রহণে প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হন।

জন্মৈশ্বর্য্যাদিমদমত্ত বহির্ম্মুখ-সম্প্রদায়ের ঐরূপ চিত্তবৃত্তি জানিয়া শ্রীগৌর- সুন্দর কীর্ত্তনকারীকে একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফলপ্রদ কৌশল শিক্ষা দিয়াছেন। তাহাতে কীর্ত্তনকারীকে কেবলমাত্র ''অমানী'' হইলেই চলিবে না, সঙ্গে সঙ্গে ''মানদ'' হইতে হইবে। কেহ বৈষ্ণবতায় উন্নত হইয়া দৈন্যবশে আপনাকে অতি দীনহীন বিচার করিতে পারেন, ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত দৈন্য বটে এবং ইহা সাধারণকে সামান্য ও সাধারণভাবে আকর্ষণ করে মাত্র; কিন্তু যখন সেই অমানীপুরুষ অপর ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে মান প্রদান করেন, তখন মদমত্ত বহির্ম্মুখ ব্যক্তিও বক্তার প্রতি কর্ণ-প্রদানে অগ্রসর করিয়া দিয়া কখনও বা আকস্মিক সাধু-কৃপায় কর্ণে শুদ্ধ হরিকথাও শ্রবণ করিয়া ফেলেন। ঐরূপ সময়ে কখনও কখনও তাঁহাদের মঙ্গল উদিত হইয়া পড়ে।

শ্রেয়ঃকথা ইতর কথার ন্যায় আপাত কর্ণরসায়ন নহে বলিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে ঐরূপ নিরপেক্ষ সত্যবাণী ও আত্মমঙ্গলের একমাত্র মহৌষধি বিতরণের জন্য অপ্রাকৃত ভিষক্‌কুল-গুরুর লীলাভিনয়কারী স্ব-মুখে এই ব্যবস্থাটী প্রদান করিয়াছেন,—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।

এই "তৃণাদপি সুনীচ" শ্লোকই গৌরজন ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুরের শ্লোকে অপর ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে,—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য কৃত্বা চ কাকুশতং এতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ! সকলমেব বিহায় দূরাৎ চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্।।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার বা ত্রিদণ্ডি-প্রচারকগণের কীর্ত্তন-প্রণালী শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ঐ "তৃণাদপি সুনীচ" শ্লোক বা শ্রীল প্রবোধানন্দের "দন্তে নিধায় তৃণকং" শ্লোকেরই বাস্তব প্রকাশ-মূর্ত্তি। যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদ্‌ভক্তগণের আচরণের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রকৃত গৌরজনের প্রদত্ত দিব্যজ্ঞানের অভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রণালী বুঝিতে বিলম্ব করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ অভিজাত-সম্প্রদায়ের নিকট কেন হরিকথা কীর্ত্তন করেন, কি ভাবে হরিকথা কীর্ত্তন করেন, তাহা তাঁহারা নিজেদের ভোগবুদ্ধির সমতায় দর্শন করেন বলিয়া উহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন না। শ্রীগৌড়ীয়মঠ একমাত্র শ্রীগুরু, গৌর বা গৌরজনের পাদপদ্ম-ব্যতীত কোন বিষয়ী, মহারাজা, রাজা, রাজপুরুষ কাহাকেও হরিকীর্ত্তন বা হরিসেবার নিয়ামক-পদে বরণ করেন না। শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর উন্মোচনে কিংবা কোন কোন হরিকীর্ত্তনমন্দিরগৃহের ভিত্তি-স্থাপনাদি ব্যাপারে, অথবা কোন কোনও সভার সভাপতিত্ব করিবার জন্য অভিজাত-সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণকে আহ্বানের দ্বারা শ্রীগৌড়ীয়মঠ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদর্শিত পথে 'অমানী-মানদ' ধর্ম্ম আচরণ-পূর্ব্বক জাগতিক উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণকে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কীর্ত্তন শ্রবণ করাইবার সুযোগ প্রদান করেন। ঐরূপ মানদধর্ম্ম প্রদর্শন না করিলে অভিজাত-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ হইতে অধিকাংশ সময়ই বঞ্চিত হইতেন এবং তৎফলে তৎস্তাবক-সম্প্রদায় গণ-গড্ডলিকাও অধিকতর হরিকথা-শ্রবণ-বিমুখ হইয়া পড়িতেন। মায়ার টোপ জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীর মদে মত্ত হইয়া যাঁহারা আপনাদিগকে 'পূর্ণ' মনে করিতেছেন, কিংবা সাধু-বৈষ্ণবগণে অপ্রাকৃত গুরুত্ব-বোধের পরিবর্ত্তে যাঁহারা তাঁহাদিগকে অনুগৃহের পাত্র বা মুখাপেক্ষী দ্বারের ভিখারীমাত্র মনে করিতেছেন, সেই সমস্ত অভিজাত-সম্প্রদায় তাঁহাদের কথা কিছুতেই শুনিতেন না, যদি শ্রীগৌরসুন্দরের 'মানদ'-ধর্ম্মের উপদেশ আবিষ্কৃত না হইত—যদি প্রাকৃত মদমত্ত ব্যক্তিগণকে উচ্চাসন প্রদত্ত না হইত—যদি নিয়ামকত্বের পদবী বা আসন-প্রদানের ছলনায় তাঁহাদিগের অনভীপ্সু কর্ণে কলেকৌশলে হরিকথামৃত-

মহৌষধির একবিন্দু প্রবেশ করাইবার চেষ্টা না হইত। এইজন্যই শ্রীগৌরসুন্দর কত দয়াময়—গৌরজন কত পরদুঃখদুঃখী মহামহাবদান্য,—

"লোক নিস্তারিতে করে প্রভু চাতুরী অপার।"

যিনি ব্রহ্মা-মহেশ্বরাদির বন্দ্য—যিনি একমাত্র বেদান্তপ্রতিপাদ্য পরাৎপরতত্ত্ব —যিনি "মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ" বাক্যের উপদেষ্টা, তিনি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে উপদেষ্টা ও বেদান্ত-ব্যাখ্যা-কর্ত্তার উচ্চাসন প্রদান করিলেন কেন? —কাশীতে মায়াবাদি-সন্ন্যাসি-সভায় প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে উচ্চাসনে বসাইয়া নিজে নিম্নাসনে বসিলেন কেন? ইহা দ্বারা কি ইহাই প্রমাণিত হয় যে, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বা প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে শ্রীগৌরসুন্দর নিয়ামক- পদে বরণ করিয়াছিলেন? তাহা নহে; ঐ সকল ব্যক্তির মদমত্ততা মানদানের অঙ্কুশ-দ্বারা কৌশলে সংযত করিয়া তাঁহাদিগকে হরিকথা—তাঁহাদের প্রকৃত আত্মমঙ্গলের কথা শ্রবণ করাইবার জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর ঐ চাতুরী বিস্তার করিয়া- ছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের চেষ্টাও ঐ গৌরশিক্ষানুসরণ। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বা প্রকাশানন্দের মায়াবাদ, পাণ্ডিত্য, কৌলিন্যাদির সঙ্গ করিবার জন্য বা ঐ সকলের ঐশ্বর্য্যমুগ্ধ হইয়া ঐ সকল প্রাকৃত বস্তুর অংশের ভিখারী হইয়া গৌরসুন্দর তাঁহাদিগকে উচ্চাসন প্রদান করেন নাই, পরন্তু তাঁহাদিগকে হরিকথা শ্রবণ করাইয়া তাঁহাদের মঙ্গলের জন্যই ঐরূপ চাতুরী বিস্তার করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের চেষ্টাও তাহাই। অনভীপ্সু অভিজাত-সম্প্রদায়কে মানদান করিয়া হরিকথামৃতৌষধ পান করাইতে পারিলে তাঁহাদের অসংখ্য স্তাবক (জগতের প্রকৃতিজন-সম্প্রদায়) হরিকথা-শ্রবণে প্রলুব্ধ ও প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইবেন। যেমন কর্ণ ধরিয়া আকর্ষণ করিলে সর্ব্বাঙ্গ সঙ্গে-সঙ্গেই আকৃষ্ট হয়, তদ্রূপ সমাজের শিরঃস্থানীয় অভিজাত-সম্প্রদায়ের কর্ণ হরিকথায় আকৃষ্ট হইলে তৎসংলগ্ন অন্যান্য নিম্নাঙ্গ-রূপ সাধারণ ব্যক্তিগণও আত্মমঙ্গলের কথায় প্ররোচিত হইবেন। গণবাদই যেখানে সাধারণধর্ম্ম বা যুগধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেখানে গণগড্ডলিকার প্রধান প্রধান নায়কগণ যদি আকৃষ্ট হন, তবেই তাঁহাদের স্তাবকস্বরূপ গড্ডলিকা আকৃষ্ট হইবেন। জন্মৈশ্বর্য্যাদি বহির্ম্মুখতার ব্যূহকেই যাঁহারা তাঁহাদের রক্ষাকবচ করিয়া রাখিয়াছেন, সেই সকল অভিজাতসম্প্রদায়ান্তর্গত নায়কগণকে হরিকীর্ত্তন শ্রবণ বা সাধুসঙ্গ করাইতে হইলে তাঁহাদিগকে মানদান-ব্যতীত অন্য কোনও উৎকৃষ্ট কৌশল নাই। শ্রীগৌরসুন্দরের কীর্ত্তিত প্রণালীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়।

শুদ্ধহরিকীর্ত্তনকারীর মানদত্ব-ধর্ম্মই বহির্ম্মুখতার ব্যূহভেদ করিবার একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র। তাহা অসৎসঙ্গকে দূরে রাখিয়া অসৎসঙ্গীর অজ্ঞাতসারে তাহার মধ্যে সৎসঙ্গের প্রভাব সঞ্চারিত করিয়া দেয়। হেমিকী চিকিৎসায় যেরূপ খেচরান্ন, পুষ্পান্ন ও ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জনাদিপথ্যের ব্যবস্থা করিয়া উদরাময়ের চিকিৎসা করা হয়, অথবা পাশ্চাত্য ডাক্তারী-চিকিৎসায় যেরূপ ক্লোরোফর্ম্ম (Chloroform) করিয়া বিনা অনুভূতিতে যন্ত্রণাকর অস্ত্রোপচার করা হয়, তদ্রূপ হরিকথা-শ্রবণে অনভীপ্স জন্মৈশ্বর্য্যাদিমদমত্ত সম্প্রদায়কে মানদান করিয়া অপ্রেয়ঃ শ্রেয়ঃ সত্যকথা শ্রবণ করান হয়। ইহাতে কীর্ত্তনকারীর পরদুঃখদুঃখিতাই প্রকাশিত হইতেছে।

আধুনিক আরোহবাদী বা অভিজ্ঞতাবাদী অনেকের অভিমত,—সর্ব্বাগ্রে নিম্নতম সম্প্রদায়কে সত্যকথা শ্রবণ করাইলেই ঐ সকল ব্যক্তির সংখ্যাধিক্য-দ্বারা গঠিত মনুষ্য-সমাজ মঙ্গলপথে আরোহণ করিবে। কিন্তু ইহা আপাত অভিজ্ঞতার মনোহর আকাশকুসুম হইলেও বাস্তব সুদূরদর্শিতার দূরবীক্ষণ যে বৈজ্ঞানিক সুসত্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা মানবজাতি একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার নিজ-জনের বাণীর মধ্যেই শ্রবণ করিতে পাইয়াছেন।

যাঁহারা নীচু হইতে উঁচুতে উঠিবার আরোহ-প্রণালীর স্বর্গসোপান রচনা করিবার পরামর্শ দেন, তাঁহারা আপনাদিগকে আদৌ শ্রেয়ঃকথা হইতে এড়াইবার জন্যই ঐরূপ পরামর্শ-প্রদাতা, ইহা তাঁহাদের হরিকথা শ্রবণ হইতে আপনাদিগকে দূরে রাখিবার একটি অনর্থরোগ-লক্ষণ; দ্বিতীয়তঃ যাহা নীচ ব্যক্তিগণের আরাধ্য বা আদর্শ, তাহা পরম সত্য হইলেও নৈসর্গিক সংস্কার অভিজাত-সম্প্রদায়ের নিকট উহাকে আদর্শ বা আরাধ্য করিতে আরও কোটীগুণ প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে। রামা বাগ্দী যে পথে চলে, যাহাকে ভাল বলে, যাহা করে, শত ভাল কাজ হইলেও রামাবাগ্দীর জমিদার বাবু তাহা অনুসরণ করিতে লজ্জা ও ঘৃণা বোধ করেন; কেন না, লোকে বলিবে, জমিদারবাবু ভদ্রলোক হইয়া—ধনে-মানে-জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হইয়া ছোট লোকের অনুসরণ করিতেছেন। কিন্তু সেই জমিদারবাবুই যখন তদপেক্ষা ধনে-মানে-জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ রাজা মহারাজাকে কোনও কার্য্য করিতে দেখেন, তখন শ্রেষ্ঠ বা বড়লোকেরা অনুসরণ করিতেছেন বলিয়া তাঁহার লজ্জা ও ঘৃণা হওয়া দূরে থাকুক, তিনি অধিকতর গৌরবানুভব করেন। কি রাজনীতি, কি ধর্ম্মনীতি, কি সমাজনীতি, কি অর্থনীতি, সর্ব্বত্রই—

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।।

শ্রেষ্ঠ লোক যাহা অনুসরণ করেন, ইতর লোক তাহারই অনুসরণ করে, শ্রেষ্ঠ লোক যাহা সত্য বা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, যাবতীয় লোক তাহারই অনুবর্ত্তন করে।

অশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বা নীচ ব্যক্তি যাহা অনুষ্ঠান করে বা যাহাকে প্রমাণ বলে, উচ্চব্যক্তি তাহার অনুবর্ত্তন করিবেন, ইহা কোন নীতিতেই নাই।

অভিজাত-সম্প্রদায়ের অনেক স্তাবক লোক-সঙ্ঘ আছে। কোন সম্মানিত ব্যক্তি হরিকথা শ্রবণ করিলে বা মহাপ্রভুর পথে আকৃষ্ট হইলে হরিকথা বা মহাপ্রভু ধন্য হইয়া যান না, যিনি শ্রবণ করেন, তিনিই ধন্য হন, ধন্য হন তাঁহার স্তাবক-সম্প্রদায়—যাঁহারা সংসারপথে ঐ সম্মানিত ব্যক্তিকে তাঁহাদের আদর্শ মনে করিয়া তাঁহার ভাগ্যের অনুসরণ করিলে আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেন বা করেন।

আপাত বাহ্যদর্শনে অভিজাত-সম্প্রদায়কে যে শ্রীগৌড়ীয়মঠ অধিক মানদান করেন, তাহা একশ্রেণীর লোককে অধিক সম্মান-প্রদানপূর্ব্বক অপর শ্রেণীকে অবজ্ঞার চক্ষে দর্শন নহে। পরন্তু অভিজাত-সম্প্রদায়কে হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ-প্রদান-পূর্ব্বক তদনুগত স্তাবক-সম্প্রদায় লোকসঙ্ঘকে সহজে হরিকথা-শ্রবণে

আকর্ষণ-উদ্দেশ্যে। এইরূপ প্রণালীতে সকলের মঙ্গল সুকর হইয়া পড়ে। যাঁহারা এই প্রণালীর আপাত প্রতিবাদ করেন, তাঁহারাও অজ্ঞাতসারে অভিজাত-সম্প্রদায়ের পদাঙ্কিতপথে প্রলুব্ধ হইয়া পড়েন। যদিও এইরূপ সুদূরদর্শিতার বাস্তবপ্রণালী তথাকথিত সাম্যবাদের আপাত বিরোধী মনে হয়, তথাপি প্রকৃত সাম্যবাদের চরম ফল বা প্রয়োজন যে অখিললোক-কল্যাণ, তাহা এই প্রণালীতেই মন্ত্রমহৌষধের ন্যায় সাধিত হয়। ইহা বাস্তব ক্ষেত্রে প্রমাণিত ও পরিদৃষ্ট হইয়াছে।

গৌড়ীয়ের মাধুকরী

মাধুকরীই নিষ্কিঞ্চন গৌড়ীয়গণের নিত্যধর্ম্ম। মাধুকরীই হরিসেবায় কায়-মনোবাক্যে সংযমনকারী ত্রিদণ্ডিগণের নিত্যাবৃত্তি। গৃহস্থ ব্যক্তির ভগবদর্চ্চন ও শ্রীগুরু-বৈষ্ণবসেবা-পরিত্যাগ, ব্রহ্মচারীর গুরুকুলে বাসাদিব্রত পরিত্যাগ যেরূপ আশ্রম-বিড়ম্বনা, তদ্রূপ বানপ্রস্থ ও ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণের মাধুকরী পরিত্যাগও পতনোন্মুখতার সর্ব্বপ্রথম পিচ্ছিলপথ।

গুরুবৈষ্ণবসেবার্থ মাধুকরী বা ভিক্ষাধর্ম্ম-স্বীকার বিষয়ী ভোগী বা আত্মভোগ- কামী পশু-পক্ষী প্রভৃতির নিজ দগ্ধোদরের জন্য আহার্য্য আহরণের ন্যায় কোন বৃত্তি নহে। অবশ্য ভোগি-বিষয়ি-সমাজ গুরুবৈষ্ণবগণের ঐ সেবার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া নিজেদের উপমায় ভগবৎসেবকগণকেও তাহাদের ন্যায় উদর-পূজক মনে করিয়া ভ্রান্ত হইতে পারে। কিন্তু তাহাদের ঐ ভ্রান্তি বিদূরিত করিবার জন্য ভগবৎসেবক ও হরিকথা-প্রচারকগণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদেশে মাধুকরীবৃত্তি অবলম্বন করেন।

মধুকর যেরূপ বিভিন্ন পুষ্প হইতে মধুচয়ন করে, হরিসেবকগণও তদ্রূপ মানবের চেতনে যে সেবাকুসুম অনুস্যূত রহিয়াছে, তাহা প্রস্ফুটিত করাইবার জন্য অর্থাৎ তাহাদের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি উৎপাদনের জন্য তাহাদের নিকট হইতে হরিসেবার উপকরণ আহরণ করেন।

কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণের নিকট মাধুকরীর মহিমা প্রকাশিত হইতে পারে না। কর্ম্মী "ফেল কড়ি মাখ তেল" নীতির দোকানদার। স্থূল কড়ি না ফেলিলে কর্ম্মি-দোকানদার ঐ কড়ির বিনিময়ে প্রাপ্য মধু কিছুতেই প্রদান করিতে স্বীকৃত হইবে না। একবার কোন রাজধানীতে কোন স্বনামপ্রসিদ্ধ ধনীর নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিবার জন্য শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার কোন ত্রিদণ্ডিভিক্ষু উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই ধনকুবেরের মিনিটে নাকি ১্ এক টাকা করিয়া আয়। তিনি যখন শুনিলেন যে, তাঁহার মাত্র ৫ মিনিট সময় ত্রিদণ্ডিভিক্ষু ভিক্ষা চাহেন, তখন তিনি বলিলেন,—"আমার পাঁচ মিনিটে ৫্ পাঁচ টাকা নষ্ট হইবে, তাহা আমি দিতে পারি না। যাঁহার সহিত কথা বলিলে আমার পাঁচ মিনিটে ১০্ দশ টাকা আয় হয়, সেইরূপ লোকের কথাই আমি শুনিতে পারি।" ঐ ধনকুবেরের উক্তি ও বিচার খুবই ঠিক ও সমীচীন—এ-বিষয়ে কোন ভুল নাই। কাহারও মূল্যবান সময়ের এক- মুহূর্ত্তও বিনা অর্থে ব্যয় করা উচিত নহে। কিন্তু উপরি-উক্ত মনীষীর অর্থনীতি-জ্ঞান

কোথায় বিভ্রান্ত হইয়াছে, তাহা তিনি ধরিতে পারেন নাই বা তাহা ধরিবার উপযোগী কোন পাথেয় সংগ্রহ করিতেও তিনি সময় দেন নাই। এক লব-কাল অকৈতব সাধুর মুখে অকৃত্রিম ভগবৎকথা শ্রবণ যে কত অতুলনীয় অগণিত গুণে তাঁহাকে তাঁহার ৫ পাঁচ টাকা বা ১০ দশ টাকা অপেক্ষা অধিক সম্পত্তিশালী করিতে পারে, ইহা সেই প্রাকৃত অর্থনীতিজ্ঞ ব্যক্তি দুনিয়ার অভিজ্ঞতা, পারিপার্শ্বিকতা ও সঙ্গের মধ্যে শ্রবণ বা দর্শন করিতে পারেন নাই। আর তাঁহার প্রতি মিনিটে ভোগপর এক টাকা বা এক কোটি টাকা সংগ্রহ যে তাঁহাকে ঐ মিনিটের সঙ্গে সঙ্গে কতটা অনর্থের কারাগারের সশ্রম কারাদণ্ডভোগের আসামী করিয়া তুলিতেছে, ইহাও তিনি শ্রবণ করিবার অবসর করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এইরূপ বিষয়িগণের বান্ধবরূপে যে কর্ম্মিসম্প্রদায় নানাপ্রকার জাগতিক স্থূল হিতকর কার্য্যের ধ্বজা উড়াইয়া চাঁদার খাতা খুলিয়া থাকেন, তাহার সহিত হরিসেবকগণের মাধুকরী ভিক্ষা এক নহে। কর্ম্মিসম্প্রদায় ধনী বিষয়ীর বিষয়মলের চাঁদা সংগ্রহ করিয়া অপর অভাবগ্রস্ত বিষয়ীর শূন্যস্থান পূর্ণ করিতে চাহেন, তাহাতে এক বিষয়ীর দূষিত মলের বীজাণু অপর বিষয়ীর শরীরে সংক্রামিত হয় এবং যে কর্ম্মবীর মধ্যপথে ঐ দূষিত বীজ সংক্রামিত করিবার ঘটকালি করেন, তিনিও তাহাতে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। সেখানে দাতা, গ্রহীতা বা উভয়ের মধ্যবর্ত্তী ঘটক কোথায়ও কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-বিচার নাই; সেখানে বস্তুর প্রাপক কৃষ্ণ নহেন; যে কৃষ্ণেতর আগমাপায়ী স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর, তাহাই ঐ সকল বস্তুর গ্রাহক। কাজেই কর্ম্মীর চাঁদা মাধুকরীর ন্যায় সারগ্রহণ-ব্যাপার না হইয়া মলভার-বহন-কার্য্যের 'বাহন' হইয়া পড়ে।

যাঁহারা অর্থকে কাকবিষ্ঠা জ্ঞান করেন, প্রত্যেক বস্তুই প্রাপঞ্চিক-জ্ঞানে পরিত্যাগ করেন, সেই নির্ব্বেদ-জ্ঞানি-সম্প্রদায়েরও জৈন-বৌদ্ধমতাবলম্বিগণের প্রচ্ছন্ন বান্ধবরূপে অনাহারে আত্মহত্যা ব্যতীত অন্য কোন পথ নাই। তাঁহাদের 'মাধুকরী'-গ্রহণ বলিয়া কোন ব্যাপারই থাকিতে পারে না। তাঁহারা যাহা কিছু গ্রহণ করিবেন, সবই তাঁহাদেরই যুক্তি অনুসারে প্রাপঞ্চিক, অনিত্য, কাকবিষ্ঠা। কাজেই মাধুকরী-গ্রহণ-কথাটী তাঁহাদের নিকট অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক।

বৈষ্ণবগণই একমাত্র মাধুকরীর অধিকারী; কেন না, তাঁহারা বিশ্বের সকল বস্তুকেই হরিসেবার উপকরণরূপে নিবেদন করিবার প্রণালীতে বিশেষজ্ঞ। হংস ও পরমহংস-বৈষ্ণব ব্যতীত মধুকরের ন্যায় পুষ্পসার, রসসার বা হংসের ন্যায় চিদচিন্মিশ্র জগতের বিদ্ধ উপকরণ হইতে সার ও শুদ্ধ বস্তু গ্রহণ করিবার সামর্থ্য আর কাহারও নাই। এই পারমহংস্যধর্ম্ম শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়গণেই পরমোজ্জ্বলতা ও পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহারা শ্রীরূপের হংসগীতার উপদেশামৃতসার পান করিয়া রসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিয়াছেন এবং রসামৃতসিন্ধুতে তাঁহারা যে উজ্জ্বল নীলকান্তমণির সন্ধান পাইয়াছেন, তাহাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-সাগরে দীপ্তিমান্ হইয়া উঠিয়াছে।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যং উচ্যতে।।

—এই শ্লোকটিই শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতের সারগ্রাহিবৃত্তি বা মাধুকরীবৃত্তি প্রকাশ করিয়া গৌড়ীয়গণের নিত্যধর্ম্মরূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

গৌড়ীয়গণই সর্ব্ব-বিষয়ে সারগ্রাহী—মাধুকরীর অধিকারী। তাঁহারা "অনাসক্তস্য বিষয়ান্" এই শ্রীরূপ-শিক্ষা অনুসরণ করিয়া চিদচিন্মিশ্র জগৎ হইতে পূর্ণ চেতনের শুদ্ধমুক্ত সেবা-সম্ভার আহরণ করিতেছেন। তাঁহারা "সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ" শ্লোক অনুসরণ-পূর্ব্বক প্রপঞ্চে অবস্থান করিয়াও প্রপঞ্চে অবতীর্ণ অথচ প্রাপঞ্চিকতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত শ্রীকৃষ্ণনামের অনুশীলন করিতেছেন, শব্দের অজ্ঞরূঢ়ি পরিত্যাগ করিয়া বিদ্বদ্রূঢ়ির সার গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহারা নানামতবাদ পরিত্যাগ করিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে সর্ব্ব সৎসিদ্ধান্ত- সার আহরণ করিতেছেন; তাঁহারা বাহ্যে কর্ম্মবীরের ন্যায় বা তদপেক্ষা অধিক উদ্যম দেখাইয়াও এবং জ্ঞানবীরের ন্যায় বা তদপেক্ষা অধিক বিচারশীলতা প্রদর্শন করিয়াও ফল-ভোগবাদ বা ফলত্যাগ হইতে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত থাকিয়া সেবাসিদ্ধান্তসার সংগ্রহ করিতেছেন।

যাহারা সর্ব্বদাই বস্তুর স্থূলবাহ্য-দর্শনের দ্বারা প্রতারিত, তাহারা গৌড়ীয়গণের এই মাধুকরীর স্বরূপ ও মহিমা বুঝিতে পারে না। বাহ্যদর্শনে গৌড়ীয় ও কর্ম্মী উভয়েই ভিক্ষার ঝুলি লইয়া বিষয়ীর দ্বারে উপস্থিত হন, বাহ্যদর্শনে গৌড়ীয় ও কর্ম্মী উভয়েই প্রকৃতির বায়ু, জল ও সামগ্রী আহরণ করেন। কিন্তু অন্তরনিষ্ঠায় ও স্বরূপে উভয়ের বৃত্তি সম্পূর্ণ পৃথক্। কর্ম্মীর ভিক্ষার ঝুলির প্রাপক—কর্ম্মীর নশ্বর ভোগোন্মুখ ইন্দ্রিয়, আর গৌড়ীয়ের ভিক্ষার ঝুলির প্রাপক—স্বয়ং স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম কৃষ্ণের পূর্ণচিদানন্দ ইন্দ্রিয়। কৃষ্ণ কি জন্য ইন্দ্রের যজ্ঞ নিষেধ করিয়া তদুদ্দেশ্যে সমাহৃত যাবতীয় উপকরণের দ্বারা গোবর্দ্ধনের পূজা করিয়াছিলেন, এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে পারিলেই গৌড়ীয় বা ব্রজবাসিগণের মাধুকরীর তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যায়। তথাকথিত পরার্থিতার (altruism) নামে ইন্দ্রিয়ের বা ইন্দ্রের পূজার জন্য যে দ্রব্য আহরণ, তাহার নিরর্থকতা প্রদর্শন করিয়া সমস্ত দ্রব্য গোবর্দ্ধনের পূজার উদ্দেশ্যে আহরণই ব্রজবাসিগণের মাধুকরী, ইহা শ্রীকৃষ্ণ জগতে প্রচার করিয়াছেন। গোবর্দ্ধন অর্থাৎ কৃষ্ণের গো বা ইন্দ্রিয়, অথবা কৃষ্ণের গো অর্থাৎ বাণী-বিস্তারের জন্য যে পূজা, তাহাতেই ব্রজবাসিগণের সমস্ত সংগৃহীত দ্রব্য নিয়োজিত হওয়া উচিত। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-পূজা-লীলায় পরিস্ফুট হইয়াছে।

তথাকথিত পরার্থিতার প্রতীক সেখানে স্থূল যুক্তি দিয়া বলিতে পারে যে, গোবর্দ্ধন বাহ্যদর্শনে প্রস্তরস্তূপ-মাত্র, তাহার পূজা অপেক্ষা ইন্দ্রের পূজায় জগতের অধিক কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। কেন না, ইন্দ্র ভোগিসমাজের আরাধ্য দেবতাগণের প্রধান নায়ক। ইন্দ্র বৃষ্টির অধিপতি। বৃষ্টির দুর্ভিক্ষে জগতে ধান্য শস্য প্রভৃতির দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে। যাহা খাইয়া মানুষ প্রাণ ধারণ করিবে, সেই ধান্যাদির প্রাণস্বরূপ যে বৃষ্টি, তাহারই প্রাণ ইন্দ্র। কাজেই জগতের সমস্ত আহৃত দ্রব্য ইন্দ্রের পূজায় ব্যয়িত হইলে মানবজাতি ও ব্রীহি-যবাদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রাপ্ত হইবে এবং তৎফলে অধিকদিন বাঁচিয়া থাকিয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতে পারিবে। কিন্তু কৃষ্ণের বিচার অন্যরূপ। স্থূল ভোগ-বুদ্ধি যে ইন্দ্রকে তাহাদের আপাত প্রয়োজনের মালিক বিচার করিয়া রাখিয়াছে,

সেই ইন্দ্রের সমস্ত 'কেরামতি' ইন্দ্রের ইন্দ্র কৃষ্ণের নিকট পরাস্ত হইয়া যায়। কৃষ্ণের বাণীবর্দ্ধনের পূজা করিলেই মানবের যাবতীয় প্রয়োজনের মূল বস্তু অনায়াসে লভ্য হয়। সুতরাং সুবুদ্ধি ব্যক্তি কৃষ্ণার্থেই মাধুকরী করিয়া থাকেন। আর কর্ম্মিগণ পরার্থিতার নামে ইন্দ্রপূজা বা গণপূজার জন্য যে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন, তাহাতে তাঁহারা বিষয়ীকে অধিকতর কু-বিষয়ী করিয়া ফেলেন। যদি ভাগবতশাস্ত্রের সুশাসনে সভ্যজগৎ শাসিত হইত, যদি জীবের ঐকান্তিক মঙ্গলের শাসনতন্ত্র জগতে প্রচারিত থাকিত, তাহা হইলে সেখানে কৃষ্ণচন্দ্রের সেবকগণ কৃষ্ণচন্দ্রেরই আদর্শানুসারে জগতে ইন্দ্রিয়যজ্ঞের উদ্দেশ্যে আহৃত যাবতীয় সম্ভার শ্রীকৃষ্ণের বাণীবর্দ্ধনের পূজায় নিয়োজিত করিয়া জগতের জীবের মঙ্গলবিধান করিতেন। কাজেই গৌড়ীয়ের অকৃত্রিম মহাব্যাপক নিত্য পরার্থিতার সহিত কর্ম্মিগণের আপাত পরার্থিতার ছলনা তুলিতই হইতে পারে না। গৌড়ীয়গণের মাধুকরীর সহিত কর্ম্মিগণের ভিক্ষার তুলনা কিছুতেই সম্ভব নহে।

গৌড়ীয়গণের মাধুকরী—সাক্ষাৎ গোবর্দ্ধনের সেবা। আর কর্ম্মী বা জ্ঞানীর মাধুকরী গোবর্দ্ধনের সেবা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বদ্ধজীবের ভোগ বা নির্ভোগ-সাধনের প্রয়াস-মাত্র। জগৎ বদ্ধজীবের একটা বিরাট্ মেলা বলিয়া ঐ মেলার বহুলোক যাহা বলিবে, তাহাই যে তাহাদের মঙ্গলজনক হইবে, ইহা বলা যাইতে পারে না। বহু রোগী একত্রে মিলিত হইয়া নিজেদের ঔষধ-পথ্য নিজেরা ব্যবস্থা করিতে পারে না। আর যিনি তাহাদের দলের "চাঁই" বা দলপতি, তিনি হরি-বিমুখতার ধুরন্ধরত্ব লাভ করিতে পারেন বটে, কিন্তু রোগ-দূরীকরণের সামর্থ্যে তাঁহার কোন পারদর্শিতা নাই। কর্ম্মবীরগণের নায়ক-সম্প্রদায় যাহাকে তাঁহাদের ভোগ-প্রতারিত বিচারে পরার্থিতা বলেন, তাহা বাস্তব পরার্থিতা হইতে পারে না।

কর্ম্মিগণের মনোধর্ম্মের বিচারে যাহা যাহা ভাল, বিভিন্ন স্থান হইতে তত্তৎ বস্তুর সারভাগ-সংগ্রহের ন্যায় আরোহচেষ্টামূলে গৌড়ীয়গণের মাধুকরী বৃত্তি কল্পিত হয় নাই। নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে নিজের ভোগময় বিচারে বিভিন্ন বস্তু হইতে আমরা সার সংগ্রহের চেষ্টা করিয়া যে নূতন মত, নূতন পথ সৃষ্টি করি, তাহাতে সারগ্রাহিতা নাই। উহাও এক প্রকার ভারগ্রাহিতা মাত্র; গৌড়ীয়গণের মাধুকরী সেই জাতীয় নহে। গৌড়ীয়ের প্রপঞ্চের কোন প্রাপঞ্চিকতা গ্রহণ করেন না। প্রত্যেক বস্তু কৃষ্ণসেবার্থ-সংগ্রহের ও নিয়োগের কৌশল জানেন বলিয়াই তাঁহাদের বৃত্তিকে মাধুকরী বৃত্তি বলা হইয়াছে। ভোগী বিষয়ী গৃহস্থাভিমানী যে- রূপ কর্ম্ম-মিশ্র-বিচারে শ্রীবিগ্রহকে নিজ-ভোগ্য-সম্পত্তি-জ্ঞানে নিজ-বাহুবলে অর্জ্জিত বিত্তের দ্বারা পূজা করিবার ছলনা করেন, কিম্বা কর্ম্মী বিগ্রহের প্রদর্শনী খুলিয়া নিজ-দগ্ধোদর-পোষণার্থ যেরূপ অর্থ সঞ্চয় করেন, নির্ভেদজ্ঞানী যেরূপ মূলে শ্রীবিগ্রহের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া মধ্যপথে নিজ-ইন্দ্রিয়-ভোগ বা নিরিন্দ্রিয়-ভোগসাধনের জন্য বিগ্রহ-পূজার ছলনা করেন, ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীর ভিক্ষা বা শরণাগতের সেবা তদ্রূপ নহে। ত্রিদণ্ডী আত্মার সহিত সর্ব্বস্ব গুরুকৃষ্ণ-সেবায় সমর্পণ-পূর্ব্বক যে মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করেন, তাহা কৃষ্ণ সর্ব্বতো- ভাবে আত্মসাৎ করেন। মাধুকরীতে কোন মিশ্র বা বিদ্ধ ভাব নাই। হংসগণ যখন মিশ্রিত জল ও দুগ্ধ হইতে সারভাগ দুগ্ধ গ্রহণ করে, তখন তাহাতে আর কোন অসার জল থাকে না।

মধুকরের আহৃত অকৃত্রিম পুষ্পসারে দোকানদারের অপস্বার্থপরতার ভেজাল নাই। গৌড়ীয়গণের মাধুকরীতে চিদচিন্মিশ্র ভাব বা অস্মিতা না থাকায় তাহা কৃষ্ণের পূর্ণ ভোগের বস্তু হয়।

গৌড়ীয়ের নামে যে-সকল অগৌড়ীয় বা গৌড়ীয়ব্রুব ব্যক্তি ভিক্ষোপজীবী সাজিয়া মাধুকরী-বৃত্তি অবলম্বনের ছলনা করে, তাহাদিগকে সাবধান করিবার জন্য শ্রীল ঠাকুর মহাশয় একদিন গাহিয়াছিলেন,—

"অর্থ-লাভ এই আশে, কপট বৈষ্ণব-বেশে,
ভ্রমিয়া বুলয়ে ঘরে ঘরে।।"

যাঁহারা গোবর্দ্ধন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বাণী বিস্তারের জন্য মাধুকরী ভিক্ষা পরিত্যাগ করাকেই অধিকতর ভজনোন্নতি বিচার করিয়া নির্জ্জন ভজনানন্দীর ছলনায় উদরের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন, তাঁহাদের চেষ্টা শ্রীরূপানুগ ঠাকুর মহাশয়ের ঐ গানে গর্হিত হইয়াছে। গোবর্দ্ধনের পূজা ছাড়িয়া দিলে ব্রজবাস বা মাধুকরীবৃত্তি সংরক্ষিত হইতে পারে না। ত্রিদণ্ডিগণ গোবর্দ্ধনের পূজার জন্য মাধুকরীবৃত্তিতে অনুক্ষণ অবস্থিত না থাকিলে তাঁহাদের কায়মনোবাক্য দণ্ডিত হইতে পারে না। মাধুকরী বৃত্তি পরিত্যাগ করিলেই রাবণের ন্যায় সীতাহরণ করিবার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ বিষ্ণুর সম্পত্তি হরণের উদ্দেশ্যেই বেষ ও বেষোপজীবিকা কল্পিত হইয়া পড়ে। বানপ্রস্থগণ মাধুকরীবৃত্তি পরিত্যাগ করিলে গৌড়বন বা ব্রজবনে বাসের অধিকারী হইতে পারেন না, বনে প্রস্থানের অভিনয় করিয়াও তাঁহারা সংসার-কাননেই ভ্রাম্যমাণ থাকেন।

বানপ্রস্থাশ্রমপদেম্বভীক্ষ্ণং ভৈক্ষ্যমাচরেৎ।
সংসিদ্ধ্যত্যাশ্বসম্মোহঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ শিলান্ধসা।।

(ভাঃ ১১।১৮।২৫)

বানপ্রস্থাশ্রমে নিরন্তর ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করাই বিধেয়। কারণ, শিল-অন্ন অর্থাৎ ভিক্ষার-দ্বারা মোহরহিত ও শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া বানপ্রস্থ ব্যক্তি শীঘ্রই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মচারিগণ মাধুকরীবৃত্তি পরিত্যাগ করিলে গুরুগৃহে বাসের পরিবর্ত্তে ঘৃণ্য ভোগান্ধকূপবাসী হইয়া পড়েন। গৃহস্থগণ মাধুকরীর উপায়ন-বিতরণে বিমুখ হইলে গার্হস্থ্যধর্ম্ম হইতে পতিত হইয়া নরাধম গৃহব্রতী হইয়া পড়েন। অতএব সকল আশ্রমেই হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার্থ মাধুকরীবৃত্তি একান্ত অনুশীলনীয়া। আশ্রমাতীত নিষ্কিঞ্চন পরমহংসগণ কৃপাপূর্ব্বক নানাভাবে মাধুকরীবৃত্তির উপদেশ করেন। তাঁহাদের শিক্ষাই মাধুকরী। সর্ব্বদা অসৎসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎসঙ্গের সারভাগ-গ্রহণার্থ তাঁহারাই জীবের হৃদয়ে নিরন্তর প্রেরণা প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কৃপা ব্যতীত মানব সদসদ্-বিচার-পূর্ব্বক অসদ্ভাগ পরিত্যাগ করিয়া সৎ বা সার গ্রহণ করিতে পারে না। শ্রীরূপানুগ পরমহংসগণই প্রকৃত মাধুকরী-বৃত্তির উপদেশক।

মাধুকরীবৃত্তি—চেতনের নিত্যা বৃত্তি। মানুষ উদরের জন্য যে খাদ্য আহরণ বা সঞ্চয় করে, তাহা নিত্যা বৃত্তি নহে। সাময়িক ক্ষুধা-নিবৃত্তি হইলে তৎকালে আর খাদ্যের আবশ্যকতা থাকে না, কিম্বা সমগ্র দিবারাত্র মানুষ খাদ্য-আহরণের চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিতেও ক্লান্তি বোধ করে। পশু-পক্ষীও সেইরূপ চেষ্টা হইতে

কিছুক্ষণের জন্য নিবৃত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু মাধুকরীবৃত্তি স্থূল-দেহের খাদ্য আহরণ বা ভোগ-সংগ্রহের ন্যায় চেষ্টা-মাত্র না হওয়ায় তাহা অনুক্ষণ আচরণীয়। যে মুহূর্ত্তে আমরা মাধুকরী বা সারগ্রাহিতা ত্যাগ করি, সেই মুহূর্ত্তেই অসার বস্তুর আগ্রহ বা অসৎসঙ্গ আমাদের ঘাড়ে চাপিয়া বসে। এ জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম অনুক্ষণ সকলকে মাধুকরী অবলম্বনের জন্য প্রেরণা প্রদান করেন। মাধুকরী ও হরিকীর্ত্তন—ভিন্ন বস্তু নহে। যেখানে এইরূপ বিচার নাই, সেইখানে উহা আত্মভোগ বা নিজের কোন না কোন প্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণে পর্য্যবসিত হয়। গৌড়ীয়গণের মাধুকরী—গুরু-পাদপদ্মের বাণীকীর্ত্তনমুখে কায়মনোবাক্যে সারগ্রাহিতায় দীক্ষালাভ।

সদ্গুরু

শুদ্ধা কৃষ্ণভক্তি এমনই সুদুর্লভ বস্তু যে, ভগবানের ইচ্ছায় তাহা নানাপ্রকার আবরণে সাধারণের নিকট সুগুপ্ত থাকিয়া একমাত্র একান্ত, অকপট, পিপাসু ও অধিকারীর নিত্য প্রাপ্য বস্তুরূপে বিরাজমান রহিয়াছে। যখনই যে-স্থানে যে-শব্দ, যে-বিচার বহুরূপিণী মায়ার কপটতার ব্যূহ ভেদ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখনই সেই স্থানে মায়া আর একটী মেকি শব্দ, বিচার বা প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করিয়া সাধারণ লোকের নিকট একান্ত সত্যের উপর আর একটী অধিকতর গাঢ় যবনিকার আবরণ টানিয়া দিয়াছে।

অসাধু সমাজ হইতে প্রকৃত অপকট ভগবৎসেবকগণের সমাজকে পৃথক্ করিয়া লোকের মঙ্গলের জন্য 'সাধু' বা 'সৎ'—এই কথাটির আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু মায়ার এমনই চাতুরী যে, সেই 'সাধু' বা 'সৎ'-শব্দের অবৈধ সুযোগ লইয়া অসাধুগণ লোকদিগকে বঞ্চনা করিতেছে।

এই জগতে অসদ্গুরু বা গুরুব্রুব ব্যক্তিগণের অভাব নাই। যদিও 'গুরু'- শব্দের বিশেষণে 'অসৎ'-শব্দের প্রয়োগ যুক্তি-বিরুদ্ধ, তথাপি যাহাদের অসৎ অর্থাৎ অনিত্য বিষয়ে গুরুত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব লোকের নিকট বিদিত, তাহাদিগকে নির্দ্দেশ করিবার জন্যই 'অসৎ গুরু' শব্দের প্রয়োগ হয়। একান্ত নিরপেক্ষ হইয়া সত্যানুসন্ধান করিলে দেখা যায়,—একমাত্র ভগবদ্ভক্তি-ব্যতীত কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত, তপস্যা—সমস্তই অসৎ অর্থাৎ অনিত্য। 'অসৎ' বলিতে যে, সকল সময়েই চুরি, ডাকাতি, বদমায়েসি বুঝা যাইবে, তাহা নহে; যদিও সাধারণ লোকের নিকট ঐরূপ অর্থগুলিই 'অসৎ'-শব্দের প্রতিপাদ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কর্ম্ম-জ্ঞানাদি মতবাদিগণের বিচারেও কর্ম্ম-জ্ঞানাদির একান্ত নিত্যত্ব নাই। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি—কোন উদ্দেশ্য বা উপেয়-লাভের সাময়িক বা অনিত্য উপায় মাত্র। ঐ উপায়-সকলের নিত্যত্ব নাই। কর্ম্মের ফল—সুখ-ভোগ বা চিত্তশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধি আবার অন্য উদ্দেশ্যের উপায়। সুতরাং কর্ম্ম নিত্য নহে। জ্ঞানের চর্চ্চার ফল—নির্ব্বিশেষ-উপলব্ধি-রূপ উপেয়। অজ্ঞানের অভাব-পূরণের নামই জ্ঞান-সংগ্রহ। সুতরাং জ্ঞান-চর্চ্চা কিছু নিত্য নহে। যোগ—উপায় মাত্র। উহার প্রাপ্য ফল তাহা হইতে ভিন্ন। অতএব ঐ সকল উপায়কে অসৎ বা অনিত্য উপায় বলা খুবই যুক্তিযুক্ত।
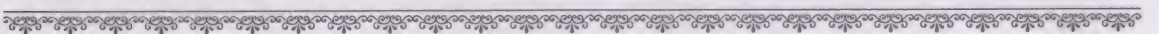
যাঁহারা ঐ কৰ্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত, তপস্যা প্রভৃতি অনিত্য উপায় লইয়া তাঁহাদের গুরুত্ব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগকে অসদ্‌গুরু বলা প্রথম-মুখে শুনিতে যতটা বিপ্লবী বলিয়া মনে হয়, সহিষ্ণু হইয়া বিচার শুনিবার পর সেরূপ নির্ব্বুদ্ধিতা আর থাকে না।

বর্ত্তমানে 'সৎসঙ্গ', 'সদ্‌গুরু' কথাগুলি ব্যবহার এবং প্রচার করাও বড় বিপজ্জনক। এমন কি, অনেক সময় যাঁহাদের উদ্দেশ্যে উহা বলা হয়, জগতের লোক তাঁহাদিগকে না বুঝিয়া তাঁহাদের ঠিক বিরুদ্ধ বস্তু বা ব্যাপারকেই বুঝিয়া ফেলে। তাহার কারণ এই যে, মানুষের মস্তিষ্ক সৎসম্বন্ধে এরূপ বিভ্রান্ত হইয়া রহিয়াছে যে, 'সৎ', 'অসৎ' কথাগুলি বলিবামাত্রই তাহাদের মনে তাহাদের মনঃকল্পিত ছবিটি জাগিয়া উঠে। যখনই 'সদ্‌গুরু' বলিয়া কোন শব্দ প্রয়োগ করা যায়, তখনই মানুষ বহির্ম্মুখ গণগড্ডলিকার দ্বারা বাঁশের আগায় উঁচু করিয়া ধরা এমন একজন অসৎ ব্যক্তির নাম করিয়া বসেন যে, বক্তা সদ্‌গুরু-শব্দে যাহা বুঝাইতে চাহেন, লোক তাহার ঠিক বিপরীত বস্তুকেই অর্থাৎ বক্তা যাহা নিরাস করিতে চাহেন, শ্রোতা তাহাকেই বক্তার লক্ষ্য বিষয় বলিয়া সাদরে বরণ করেন।

এস্থলে আমাদের একটী কথা স্মরণ হয়। একবার কৃষ্ণনগরের টাউনহলে আমাদের শ্রীশ্রীগুরুদেব বৈষ্ণব-দর্শন-সম্বন্ধে একটী বিশেষ গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। উহাতে কোন একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক সভাপতির সজ্জায় শ্রোতৃরূপে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বক্তৃতা শুনিবার পর সভাপতির অভিভাষণ- প্রদান-কালে বলিলেন,—"গোস্বামী প্রভুপাদ আজ যে-সকল কথা বলিলেন, তাহা শঙ্করাচার্য্যের বিচারের কথা!"

শ্রীল প্রভুপাদ এবং যাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের কথা অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা অধ্যাপকের ঐরূপ উক্তি শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। কারণ, শ্রীল প্রভুপাদ যে মতবাদকে তাঁহার সমগ্র বক্তৃতার মধ্যে সর্ব্বতোভাবে নিরাস করিয়া একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য শুদ্ধ বেদান্ত-বিচার-কীর্ত্তন করিয়া- ছিলেন, সেই মতবাদকেই শ্রোতা বক্তার প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া ধারণা করিয়া লইয়াছিলেন। জগতে অনেক স্থলেই এরূপ ব্যাপার দেখা যায়। যে দুঃসঙ্গ ও অসদ্‌গুরুব্রুবগণকে নিরাস করিয়া লোকেরা মঙ্গলের জন্য লোকদিগকে সৎসঙ্গ ও সদ্‌গুরুর কথা বলা যায়, লোকে তাহাদের অনাদি-বহির্ম্মুখতার চির-অভ্যাসবশতঃ ঠিক অসৎ-সমাজ ও অসদ্‌ব্যক্তিগণকেই 'সাধুসঙ্গ' বা 'সদ্‌গুরু' বলিয়া বুঝিয়া ফেলে; আর এইরূপভাবে বঞ্চিত হইতে পারিলেই আপনাদিগকে সুখী ও সৌভাগ্যবান্ মনে করে! বিশেষতঃ যাঁহারা এইরূপভাবে লোক-বঞ্চনা করিতে জানেন, তাঁহাদিগকেই অনিন্দক ও উদার সাধু মনে করিয়া তাঁহাদের গুণ গান করে! কিন্তু এই সমস্তই সত্যের পথের এক একটী লৌহ-অর্গল।

এক শ্রেণীর লোক লৌকিক ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণকেও আনুকরণিক প্রতিযোগিতা-মূলে 'সদ্‌গুরু' বলিয়া প্রচার করিবার পক্ষপাতী। আর এক শ্রেণী ইহা বুঝিতে পারেন যে, লৌকিক, সামাজিক বা ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণ সদ্‌গুরু নহেন; তাই ইঁহারা অনেক সময় লৌকিক কুলগুরু প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী বা ঐ সকল সমাজে দুই একটা বাহাদুরী দেখাইয়া যাঁহারা প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই 'সদ্‌গুরু'

বলিয়া মনে করেন। কেহ কেহ বা নিজে 'সৎ, অসৎ' এত বিচারের ধার মোটেই না ধারিয়া তথাকথিত লৌকিক শিক্ষিত ব্যক্তি বা ধনী লোক, কিম্বা বহুলোক যাঁহাকে 'সদ্গুরু' বলিয়া দাঁড় করাইয়াছেন, তাঁহাকেই ঐ সকল ধনী প্রভৃতি ব্যক্তির সঙ্গে মিশিবার সুযোগের জন্য 'সদ্গুরু' বলিয়া বরণ করে। বস্তুতঃ এখানেও একপ্রকার প্রচ্ছন্ন সামাজিকতার আবরণ আসিয়া গুরু-নির্ব্বাচনকারীকে গ্রাস করে এবং কার্য্যতঃ ঐরূপ ব্যক্তি লৌকিক কুলগুরু পরিত্যাগপূর্ব্বক আর এক প্রকার সামাজিক ব্যক্তিকেই সদ্গুরু মনে করিয়া আত্ম-বঞ্চিত হয়।

কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি যে অন্যান্য কু-বিষয়ের ন্যায় অথবা তাহা অপেক্ষাও অধিক অসৎ—ইহা সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে না। সাধারণ লোকের ধারণা,—যে ব্যক্তি চুরি করে, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ করে, এরূপ ব্যক্তিকে না হয় অসৎ ব্যক্তি বলিতে পারা যায়; কিন্তু যে ব্যক্তি পুষ্করিণী খনন করিয়া দেন, পান্থশালা নির্ম্মাণ করেন, কিম্বা ব্রত-তপস্যা করেন অথবা জগতের কামিনী-কাঞ্চনকে অনিত্যবস্তু বলিয়া প্রচার ও পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সন্ন্যাসী সাজেন, হিমালয়ে গমন করিয়া সেখানে জ্ঞান আলোচনা বা তপস্যা করেন, সেরূপ ব্যক্তি কিরূপে অসৎ হইতে পারেন? ঐরূপ ব্যক্তিকে কেহ অসৎ বলিতে গেলে জগতের লোক অমনি লক্ষকণ্ঠে প্রতিবাদ করিবেন,—এমন কি, কেহ কেহ লগুড় লইয়া উপস্থিত হইবে! কিন্তু একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহা মানবজাতিকে জানাইয়া মানবজাতির চিন্তাস্রোতে বিপ্লব আনয়ন করিয়াছেন যে, যাহা চুরি, ব্যভিচার প্রভৃতি স্থূল অসৎ বিষয়গুলি লইয়া ব্যস্ত আছে অর্থাৎ যাহাদের অসদ্-ব্যবহারগুলি অত্যন্ত মূর্খ, অনভিজ্ঞ লোকও ধরিতে পারে, তাহাদিগের অপেক্ষা যাহারা সূক্ষ্ম ও অতিসূক্ষ্ম অসদ্বিষয়ে অর্থাৎ সাধারণ স্থূলবুদ্ধি, এমন কি, জগতের শিক্ষিত পণ্ডিত-সম্প্রদায়ও যে-সকল বিষয়কে, যে-সকল কপটতাকে অসৎ বলিয়া ধারণা করিতে পারেন না, সেই সকল প্রচ্ছন্ন অসদ্বিষয়গুলি জগতের অধিকতর অমঙ্গলকারী। সাধারণ চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার প্রভৃতি স্থূল অসদ্-বিষয়-সমূহ হইতে ব্রত, তপস্যা, ধ্যান, জ্ঞান প্রভৃতির মনোরম আবরণে পরম সৎ-সবিশেষ লীলাপুরুষোত্তম ভগবানকে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য মানবজাতির যে চেষ্টা, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অসৎ চেষ্টা; আর ঐ সকল অসৎ চেষ্টার নায়কগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অসৎ। এইজন্য শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—জগাই-মাধাইর মত ব্যক্তিরও কোন কালে ভগবৎ-কৃপায় উদ্ধার আছে; কিন্তু মায়াবাদী অপরাধীর মঙ্গল সুদূর-পরাহত। মহাপ্রভু ললিতপুরে দারী সন্ন্যাসীর গৃহেও উপস্থিত হইয়াছিলেন; কিন্তু প্রকাশানন্দের ন্যায় মহা তপস্বী, মহা পণ্ডিত, কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী ব্যক্তির সহিত সম্ভাষণ করিতেও প্রস্তুত হন নাই। অতএব জাগতিক লোকের সদসদ্বিচার ও সত্যের দিক্ হইতে প্রকৃত সৎ-অসৎ সম্পূর্ণ পৃথক্।

জগতের লোক ঐরূপ ভ্রান্ত সৎ-অসৎ-এর বিচারের বশীভূত হইয়া সদ্গুরু নির্ণয় করে বা সদ্গুরু কথাটি বুঝিবার চেষ্টা করে। ঐ সকলই মনোধর্ম্ম। প্রকৃতপ্রস্তাবে একমাত্র শতকরা শতপরিমাণ পূর্ণতম পুরুষ কৃষ্ণের সেবায় যিনি সর্ব্বকাল সর্ব্বাবস্থায় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সকলকে সেইরূপ সার্ব্বকালিক সেবার আকর্ষণ এবং প্রেরণা প্রদান করেন, সেইরূপ মহাজীবন্মুক্ত, ভগবানের নিজ-জন-ব্যতীত আর কেহই

'সদ্‌গুরু'-পদবাচ্য নহেন। হিমালয়ের গহ্বরে যিনি যুগ-যুগান্তর বসিয়া থাকিতে পারেন; গঙ্গোত্রীর ধারায় যিনি ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিতে পারেন; নানাপ্রকার যোগ-আসনের প্রদর্শনী খুলিয়া যিনি লোককে চমৎকৃত করিয়া দিতে পারেন; যিনি বাক্যমাত্র দ্বারা মৃতব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ জীবিত করিতে পারেন; যিনি মৌনী থাকিয়া বাতাহারী হইয়া লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিতে পারেন; যিনি কাহারও কোন কার্য্যে বাধা না দিয়া সকলের সকল কার্য্যই অনুমোদন করেন; যিনি উচ্চ বংশ, মহা পাণ্ডিত্য, নধর কান্তি, বিপুল ঐশ্বর্য্যে লোককে মুগ্ধ করিয়া দিতে পারেন; যিনি কীর্ত্তনের তাল-মান-সুরে, ব্যাখ্যার ভঙ্গীতে শ্রোতৃবৃন্দকে চিত্রার্পিতের ন্যায় করিয়া রাখিতে পারেন; এরূপ কোন ব্যক্তি 'সদ্‌গুরু'-পদবাচ্য নহেন। ঐ সকল বাহাদুরী সদ্‌গুরুর লক্ষণ নহে। উহা সারকাস্, ম্যাজিক, জাগতিক প্রদর্শনী প্রভৃতির ন্যায় লোকের কৌতূহল বা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বিভিন্ন বিপণিমাত্র। মানুষ ঐ সকলের সাময়িক আড়ম্বরযুক্ত ঐশ্বর্য্যে বা আড়ম্বরহীন ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ ও বিপথগামী হইয়া অসত্যকে 'সত্য' বলিয়া ভ্রম করে। কপাল খারাপ থাকিলে সর্ব্বক্ষণ এরূপ নানাপ্রকার ছলনা আসিয়া অসদ্ ব্যক্তিকেই 'সদ্‌গুরু' বলিয়া ধারণা করায়।

এক শ্রেণীর লোক আছেন,—তাঁহারা জেদ করিয়া অসৎ ব্যক্তিগুলিকে সদ্‌গুরুরূপে দাঁড় করাইবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন। তাঁহারা মনে করেন, প্রকৃত সাধু ব্যক্তিগণ যখন পরম সত্যবস্তুকে সদ্‌গুরু বলিতেছেন, তখন আমরাও অন্ততঃ প্রতিযোগিতা এবং আমাদের লৌকিক মান বজায় রাখিবার জন্য জেদ করিয়া অসদ্ ব্যক্তিগুলিকে কেনই বা সদ্‌গুরু বলিব না? ইঁহারা মনে করেন, আমরা যদি অসদ্‌ব্যক্তিকে অসৎ বলি, তাহা হইলে আমরা পূর্ব্বে যে-সকল বোকামী করিয়াছি, তাহা ধরা পড়িয়া যায়। সুতরাং বোকামীকে বজায় রাখিবার জন্য আনুকরণিক প্রতিযোগিতামূলে জেদ করিয়া অসত্যকে 'সত্য' বলাই অর্থাৎ আত্মবঞ্চনা করাই সাময়িক জয়। এইরূপ বিচারে কতকগুলি কল্পিত সদ্‌গুরুর সংখ্যা বাজারে দেখিতে পাওয়া যায়।

আর এক শ্রেণী মনে করেন,—গুরুর পূর্ব্বে 'সৎ'-শব্দটি প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে কল্পনা করিয়া বসাইতে পারেন। রামবাবু তাঁহার কল্পিত গুরুকে সদ্‌গুরু, শ্যামবাবু তাঁহার কল্পিত গুরুকে সদ্‌গুরু, যদুবাবু তাঁহার কল্পিত গুরুকে সদ্‌গুরু পৃথক্ পৃথক্ বলিতে আরম্ভ করিলে—"যার যার গুরু তার তার কাছে" সদ্‌গুরু বলিয়া কল্পিত হইলেই মনকে বেশ ফাঁকি দেওয়া যায় এবং প্রকৃত সাধু ব্যক্তিগণ আমাদের মঙ্গলের জন্য যে একমাত্র সদ্‌গুরু নির্দ্দেশ করেন, তাঁহার কথা শুনিবার কাণে ভাল করিয়া তূলা দিয়া থাকা যায়।

কেহ কেহ মনে করেন,—ভগবানের ইচ্ছায় অবতীর্ণ কোন অদ্বিতীয় সদ্‌গুরু- পাদপদ্মকে 'অদ্বিতীয়' বলিলে সাম্প্রদায়িকতা, সঙ্কীর্ণতা এবং 'গুরু' নামে প্রচলিত অন্যান্য ব্যক্তিগণের প্রতি হিংসা ও নিন্দাদোষ আসিয়া উপস্থিত হয়! যখনই কোন একান্ত বাস্তব সত্যবস্তুকে সদ্‌গুরুপাদপদ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তখনই আত্মবঞ্চনাকামী ঐ সকল ব্যক্তি বলিয়া উঠেন,—রাজ্যভরা কোথায়ও গুরু নাই, কেবল আপনাদের গুরুই "সদ্‌গুরু"!

কথাটী আপাত বিচারে ও শ্রবণে জগতের বহু লোকের সমবেদনা আকর্ষণ করে এবং যিনি ঐরূপ কথা বলেন, তাঁহার পক্ষে ব্যারিষ্টারী, ওকালতি, মোক্তারি প্রভৃতি করিবার জন্য জগতের অসংখ্য লোকের অসংখ্য

মস্তিষ্কের অভাব হয় না। কেন না, বাস্তব সত্যের সমর্থক জগতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দ্বিতীয়তঃ বাস্তব সত্য প্রত্যক্ষভাবে লোকের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিয়া অসহিষ্ণু লোক-সংখ্যার নিকট সত্য প্রকাশ করেন না। বর্ত্তমানে এইরূপভাবে বাস্তব সত্যই সঙ্কীর্ণ ও সাম্প্রদায়িকতা-পূর্ণ এবং অসত্যই উদার মত বলিয়া বহুমানিত হয়!

একশ্রেণীর লোকের মস্তিষ্ক এতদূর মাটিয়া যে, তাঁহারা মনে করেন, বর্ত্তমানের যাহা কিছু, তাহাতে সত্য নাই। যাঁহাকে আমরা দেখি নাই বা যাহা অতীতের ঘটনা, এইরূপ বস্তু বা বিষয় যে একটা ঐশ্বর্য্যের মোহ সৃষ্টি করে, তাহাকেই অর্থাৎ ঐরূপ মাটিয়া ঐশ্বর্য্য-বুদ্ধিকেই গুরুরূপে বরণ করিলে বঞ্চিত হইতে হয় না! এইরূপ শ্রেণীর এক-প্রকার প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন,—"বর্ত্তমান জগতে কোথায়ও সদ্‌গুরু দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব এইমত অবস্থায় আমরা শাস্ত্রগ্রন্থে যে-সকল মহাজনের চরিত্র ও নাম দেখিতে পাই, তাঁহাদিগের মধ্য হইতে আমাদের মনোধর্ম্মে মাপিয়া লইবার বিচারের কোন একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে সদ্‌গুরু বলিয়া (মৌখিকভাবে) বরণ করিয়া লইলে আর আমাদিগকে বিপথগামী হইতে হইবে না!" এইরূপ শ্রেণীর কোন এক ব্যক্তি এক সময় বলিয়াছিলেন,—"বর্ত্তমান যুগে সদ্‌গুরু দেখা যায় না। মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে একমাত্র শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী মহাশয়কেই আমার বিচারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সদ্‌গুরুলক্ষণে বিভূষিত বলিয়া মনে হয়।" সেখানে আর একজন প্রাকৃত-সহজিয়া ছিলেন; তিনি বলিলেন,—"দাস-গোস্বামীতে মহাপ্রভুর অন্যান্য পার্ষদ অপেক্ষা সদ্‌গুরুর লক্ষণ অধিক আছে বটে, কিন্তু তাঁহার একটা দোষে একটা খট্‌কা বাধিয়াছে। তিনি ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হন নাই। নতুবা তাঁহার আর সবই ভাল ছিল।" এই মনোধর্ম্মের বিচারের দাসগোস্বামী মহাপ্রভুর পার্ষদ জগদ্‌গুরুগণের গুরু দাসগোস্বামী হইতে পৃথক্। আর ঐ সকল মনোধর্ম্মীর নির্ব্বাচিত সদ্‌গুরুলক্ষণ বা সদ্‌গুরুও মায়ার এক একটি ছলনাময়ী মূর্ত্তি-মাত্র। এই সকল মাটিয়াবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি কখনও সদ্‌গুরু-পাদপদ্ম দর্শন করিতে সমর্থ হইবে না।

জগতে যেরূপ ভগবান্ নিত্য অবস্থান করিয়া জগতের সমস্ত ব্যাপার বিধান করিতেছেন, জগতে যেরূপ তিনি যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, তেমনি তাঁহার নিজজনগণের অবস্থান এবং যুগে যুগে তাঁহাদের আবির্ভাবও নিত্য। জগতে যেরূপ কখনই সূর্য্যের অভাব হয় না, সূর্য্যের অভাব হইলে অগ্নি জ্বলিতে পারে না, প্রাণীর অস্তিত্বই থাকিতে পারে না, সেইরূপ কোনযুগেই সদ্‌গুরুর অভাব হয় না। আর সেই সদ্‌গুরু পূর্ব্বগুরুগণ হইতে পৃথক্ বা স্বতন্ত্র নশ্বর বস্তুও হন না। যিনি সদ্‌গুরু, তিনি নিত্যকালই সেই অদ্বয়-জ্ঞান পরমেশ্বরের প্রকাশবিগ্রহ। শ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথ হইতে আমার গুরুপাদপদ্ম ভিন্ন নহেন। সদ্‌গুরুপাদপদ্ম সকলেই অদ্বয়জ্ঞান। দাসগোস্বামী প্রভুর পাদপদ্ম, শ্রীরূপের পাদপদ্ম ও আমার গুরুদেবের পাদপদ্ম ভিন্ন নহেন। যেখানে ভিন্ন বিচার, সেখানেই মর্ত্ত্যবুদ্ধি। প্রাকৃত সহজিয়াগণের "যার যার গুরু, তার তার কাছে সৎ"—এই বিচার তাহাদের মাটিয়াবুদ্ধির বৌদ্ধস্তূপ।

মাধুকর ভৈক্ষ্য

ত্রিদণ্ডি-শ্রেষ্ঠ জগদ্‌গুরু শ্রীধরস্বামিচরণ ভাবার্থদীপিকায় পঞ্চবিধ ভিক্ষাসংখ্যা নিরূপণ করিয়াছেন,—

"মাধুকরমসংক্লিপ্তং প্রাক্‌প্রণীতমযাচিতম্।
তাৎকালিকোপপন্নঞ্চ ভৈক্ষ্যং পঞ্চবিধং স্মৃতম্।।"

ভিক্ষা পঞ্চবিধ— (১) মাধুকরী-ভিক্ষা, (২) অসংক্লিপ্ত-ভিক্ষা, (৩) অযাচিক-ভিক্ষা, (৪) প্রাক্‌প্রণীত-ভিক্ষা এবং (৫) তাৎকালিক-প্রাপ্ত-ভিক্ষা।

'মধুকর' বিভিন্ন পুষ্প হইতে পুষ্পসার (মধু) সংগ্রহ করিয়া থাকে। মধুকরের মধুর অধিকাংশ যেরূপ পরার্থেই নিয়োজিত হয়, তদ্রূপ বৈষ্ণব বিভিন্ন স্থান হইতে যে ভিক্ষা সংগ্রহ করেন, তাহা যদি হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবার্থ নিয়োজিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'মাধুকরী ভিক্ষা' বলা যায়। বহু পুষ্প হইতে মধু সংগৃহীত হওয়ায় ভিক্ষা-মধ্যে কোনও একটি বিশেষ স্থান-কাল-পাত্রের দোষস্পর্শ হয় না। মধুকর-সমূহ সারগ্রাহী, তাহারা সার গ্রহণ করে, আর গর্দ্দভসমূহ ভার বহন করে। বৈষ্ণবগণ মধুকরের ন্যায় হরিসেবার্থ 'মধু' আহরণ করেন, সেই 'মধু' ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হয়। শ্রীবলদেব-প্রভু 'মধু' পান করেন, মধুর দ্বারা বলদেবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ হয়, শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা হয়, এ-জন্য মাধুকরী ভিক্ষাই সারগ্রাহি-বৈষ্ণবগণের কৃত্য। যাহারা বহির্ম্মুখ সংসারে আসক্ত, কেবল দগ্ধোদর-পরিপূর্ত্তি ও বহির্ম্মুখ ভোগ্যগণের জন্য আহার্য্য-সংগ্রহে ও সঞ্চয়ে ব্যস্ত, তাহাদের বৃত্তি—ভারবাহী গর্দ্দভের বৃত্তি। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত তাহাদিগকে ঐরূপ আখ্যানেই আখ্যাত করিয়াছেন,—

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখর।।

(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

"যেই জন কৃষ্ণ ভজে, সে বড় চতুর।" 'চতুর' অর্থে—ধূর্ত্ত নহে,—সারগ্রাহী। ধূর্ত্ততা—সারগ্রাহিতা নহে; উহা একপ্রকার ভারবাহিতা বা আত্মবঞ্চনা। কিন্তু সারগ্রাহিগণ জগতের সমস্ত বস্তুর হেয়তার মধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া অনাসক্তভাবে সমস্ত বস্তুর সারভাগ বা উপাদেয়ত্ব চয়নপূর্ব্বক কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধিত করিবার কৌশল জানেন বলিয়াই তাঁহাদের উপায়ন-সমূহ মাধুকর ভৈক্ষ্য। জগতের বৈজ্ঞানিক-সম্প্রদায়, অর্থনৈতিক-সম্প্রদায় বহু পরিশ্রম, বহু অকৃতকার্য্যতা ও কৃতকার্য্যতার সহিত সংগ্রাম করিয়া যে ফল লাভ করেন, ভগবদ্ভক্ত সেই ফলের সার্থকতা সম্পাদন করিবার কৌশল জানেন। বাষ্পীয়-জগৎ, বৈদ্যুতিক-জগৎ, বেতার-জগৎ, চলচ্চিত্র-জগৎ, আলোকচিত্র-জগৎ প্রভৃতি যে-সকল বৈজ্ঞানিক জগতের আবিষ্কার হইয়াছে, একমাত্র ভগবদ্ভক্তই তদ্দ্বারা চরম ও নিত্য পরোপকারের বাস্তব ও ব্যবহারিক নিপুণতা প্রদর্শন করিয়া ঐ সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের চরম সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারেন। ঐ সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বা

ভাবিকালের বৈজ্ঞানিকগণ যে-সকল আবিষ্কার করিবেন, তাহা যদি কেবল জগতের ভোগ ও অনর্থের সেবায় নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা যে কিরূপ বিষময় ফল হইতে পারে, তাহা বিগত মহাযুদ্ধে এবং বিভিন্ন দেশের জাতীয়-সংঘর্ষের মধ্যে অনুক্ষণ দৃষ্ট ও পরিস্ফুট হইতেছে। বিজ্ঞানের ঐ সকল দান চরমে জগন্নাশকর কার্য্যের এক একটী সোপান নির্ম্মাণ করিতেছে। এজন্য সারগ্রাহী-শিরোমণি আচার্য্যবর্য্যের শ্রীমুখের আদেশানুসারে শ্রীগৌড়ীয়মঠ জড়- বিজ্ঞানের দানকে ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান চিদ্‌বিজ্ঞানের —শ্রীনাম-প্রেমপ্রচারের দাসত্বে নিযুক্ত করিয়া জড়বিজ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য পরিপূরণ ও যথার্থ সার্থকতা বিধান করিতেছেন। মানবজাতির—সমগ্র প্রাণি- জাতির নিত্য ও বাস্তব উপকার ইহা দ্বারা সাধিত হইতেছে ও হইবে। আর ভারবাহিসম্প্রদায় সাময়িক মত্ততায় উহার সার্থকতা না বুঝিয়া নিজের উদ্ভাবিত আগুণে নিজেরাই পুড়িয়া মরে। বিগত মহাযুদ্ধ কি তাহা প্রমাণ করে নাই? প্রাত্যহিক রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ঘটনাবলী কি তাহা প্রমাণ করিতেছে না? বিগত মহাযুদ্ধ কত উজ্জ্বল ও প্রতিভা-সম্পন্ন জীবন হরণ করিয়াছে! আজ যদি ঐ সকল জীবন হরিভজন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ও জগজ্জীবের কত উপকার সাধিত হইত! বিজ্ঞানের দান তাহাদিগকে কি করিয়াছে? তাহাদিগকে রক্ষা করিবার পরিবর্ত্তে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিতেছে! বিজ্ঞানের দানগুলি কি মানবের সাময়িক অর্থ ও কামসার্থক ইন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্ত হইলেই তদ্দ্বারা চরম সার্থকতা ও পরোপকার সাধিত হইতে পারে? বরং প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত তদ্‌বিপরীতই প্রমাণ করিয়াছে। ঐ সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মানবজাতিকে কামী, বিলাসী, ব্যভিচারী, উৎপথগামী, কপট, হিংসক, দেহসর্ব্বস্ব, জড়সর্ব্বস্ব করিয়া দিয়া তাহাদিগকে বধ্যভূমিতে টানিয়া আনিতেছে। সে দিন পাশ্চাত্যদেশের কোন শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক বলিয়াছেন যে, চলচ্চিত্রগুলিই জগতে ভীষণ উৎপাত ঘটাইয়াছে। চলচ্চিত্রের সাহায্যে বিদেশীয় ও স্বদেশীয় বহু লোক নানাপ্রকার পাপের চরম আদর্শ-সমূহে দীক্ষিত ও শিক্ষিত হইতেছে। সুতরাং যাহারা বা যে-জাত উহা আবিষ্কার করিয়াছে, ঐ আবিষ্কার কার্য্যতঃ তাহাদেরই বিনাশের জন্য পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। যদিও সাময়িক অর্থাগমের মাদকতা ঐ সকল জগন্নাশকর আদর্শকে উপলব্ধি করিতে দিতেছে না, তথাপি উহা 'নালিঘা'র মত সমাজ-শরীরকে দূষিত করিয়া ফেলিয়াছে।

আর দেখুন, শ্রীগৌড়ীয় মঠ কি করিতেছেন? যে-সকল অচৈতন্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মানবজাতিকে মৃত্যুর মুখে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, সারগ্রাহী মহাজনের ইঙ্গিতানুসারে ঐ সকলকে শ্রীচৈতন্যের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার শ্রীনাম- প্রচারের সেবায় নিযুক্ত করিয়া—সমগ্র বিশ্ববাসীকে মায়ার দাস্য হইতে মহামুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে পুনর্জ্জীবন প্রদান করিতেছেন। মানবজাতি! যদি তুমি সত্য সত্য বুদ্ধিমান হও—প্রকৃত rationalist হও, তাহা হইলে এ কথা এখনও বুঝিতেছ না কেন? —ধরিতে পারিতেছ না কেন? বিচার কর—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের কথা বিচার কর—আর তাহার আগে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের নিজ-জনের অপার দয়া —পরম দানের বিষয় একটু সহিষ্ণু হইয়া বিচার কর। এই হেয়তামিশ্রিত জগৎ হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠ কিরূপ সার গ্রহণ করিতেছেন, মাধুকরী ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেছেন, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ; তোমার জীবনের সকল সমস্যা ঘুচিয়া যাইবে।

ইন্দুরে গর্ত্ত করে, কিন্তু সর্প গর্ত্ত করিবার ক্লেশ স্বীকার না করিয়া ইন্দুরের পরিশ্রমলব্ধ গর্ত্তে নিজ বাসস্থান আবিষ্কার করিয়া থাকে। ইন্দুরের গর্ত্ত তাহার আপাত আরামদায়ক হইলেও তাহার মৃত্যুর দূত সেখান হইতে তাহাকে টানিয়া বাহির করে। সেইরূপ সারগ্রাহিগণ ভারবাহিগণের ন্যায় বৃথা কার্য্যে বহু সময় ও পরিশ্রম ব্যয় করেন না; কিন্তু ভারবাহিগণের বহু পরিশ্রম ও সময়-নিয়োগের ফলও বিশেষ সার্থকতা লাভ করিতে পারে, যদি সারগ্রাহিগণের সেবায় তাহা নিযুক্ত হইয়া পড়ে। গৃহস্থ মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া—বহু পরিশ্রম করিয়া সে অর্থ সঞ্চয় করেন, তাহা সর্ব্বক্ষণ যদি কেবল বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের দগ্ধোদর-পূর্ত্তি ও বিলাসের জন্য ব্যয়িত হয়, তবে তদ্দ্বারা ভারবহন-কার্য্যই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, উহা কোন শ্রেষ্ঠ বা মঙ্গলময় ফল প্রসব করিতে পারে না; আর ঐ অর্থ যদি সারগ্রাহিগণের হরিসেবায়—শ্রীহরির নাম, কাম ও ধাম-প্রচারের সেবায় নিযুক্ত হয়, তাহা হইলেই ঐরূপ মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, নানাপ্রকার পাপ-পুণ্যের দ্বারা অর্থ-সঞ্চয়ের ও সংগ্রহের সার্থকতা সাধিত হয়—উহার চরম ফল লাভ হয়—মানবজাতির শ্রেষ্ঠ উপকার হয়—পরম পরার্থিতা সাধিত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন লোকের প্রাণ, অর্থ, বাক্য, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতি লোকে স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়-তর্পণ-জন্য অর্থাৎ ভার-বহন-কার্য্যে নিযুক্ত করে, আর শ্রীগৌড়ীয়মঠ মানবজাতি হইতে ঐ সকল ভিক্ষা করিয়া ভগবৎ-নাম, কাম ও ধাম-সেবায় নিযুক্ত করেন বলিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের কার্য্য—সারগ্রাহিতা বা মাধুকরী ভিক্ষা।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অকপট সেবকগণ মধুকর—মাধুকরী ভিক্ষাই তাঁহাদের শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-সেবা। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—মধুচক্র-সদৃশ। তাহাতে বলদেবের সেবোপকরণ মধু সংগৃহীত হয়। বলদেব বা কৃষ্ণ Drone Bee সদৃশ। Drone Bee ও Queen Bee-এর মিলনকার্য্যে অর্থাৎ সেবাকার্য্যেই সমস্ত আহৃত মধু নিযুক্ত হইবে। মধুকরগণ তাঁহাদের আনুগত্যেই সর্ব্বদা মধু-আহরণ-কার্য্যে (মাধুকরী ভিক্ষায়) নিযুক্ত থাকিবেন। মৎসরতা-বশে যদি কেহ মনে করে, Drone Bee তাহাদেরই মত বাহ্যদৃষ্টিতে একজন worker bee নহে, অর্থাৎ কৃষ্ণকে যদি তাহারা পরম সেব্য ও স্বরাট্ বিচার করিবার পরিবর্ত্তে তাহাদেরই মত সেবকজাতীয় মনে করে, তাহা হইলে তাহাদের আর সারগ্রাহিতা থাকিবে না, তাহারা জাগতিক ভোগিবিচার-পরায়ণগণের ন্যায় ভারবাহী গর্দ্দভ হইয়া পড়িবে—মাধুকরী ভিক্ষায় আর তাহাদের অধিকার থাকিবে না। কোন মধুকরই নিজের জন্য পৃথগ্‌ভাবে মধু সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিবে না। সমস্ত মধুই Drone Bee অর্থাৎ কৃষ্ণের কামবর্দ্ধনার্থ নিযুক্ত হইবে। তাহা হইলেই মধুকর-সমূহ একজন সেব্যের সেবার উদ্দেশ্যে পরস্পর প্রীতিবদ্ধ হইয়া বাস করিতে পারিবে; আর যদি তাহারা পরস্পর স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে মধুর জন্য স্ব-স্ব reserved fund বা Savings Bank খুলিয়া Drone Bee-কে বঞ্চিত করিতে চাহে, তাহা হইলে তাহারা নিজেরাই বঞ্চিত হইবে—নিজেরা পরস্পর মারামারি করিয়া মধুচক্র-স্থলে বিষচক্র সৃষ্টি করিবে। অতএব একমাত্র স্বরাটের ও তৎপ্রকাশবিগ্রহ সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রের মনোঽভীষ্ট-পূর্ত্তির উদ্দেশ্যে ভারবাহি-সম্প্রদায়কে ভারবহন-কার্য্য হইতে মুক্তি-প্রদানের জন্য তাহাদের প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য প্রভৃতি আহরণই—মাধুকরী ভিক্ষা, আর ঐ সকল আহৃত উপকরণই—'মাধুকর ভৈক্ষ্য'।

যাহা ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়তর্পণার্থ বা পরমহংস গুরুজনের আনুগত্য-ব্যতীত আহৃত হয়, তাহাতে সারগ্রাহিতা নাই বলিয়া উহা ''মাধুকর ভৈক্ষ্য' নামে অভিহিত হইতে পারে না। মাধুকর ভৈক্ষ্যের ফল সমগ্র জগৎ প্রাপ্ত হন। মাধুকর ভৈক্ষ্যের ভোক্তা—স্বয়ং কৃষ্ণ, আর সেই কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট ব্রহ্মা, সূর্য্য ও সমস্ত ভূত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন—''বিষ্ণুব্রাহ্মার্কভূতেভ্যঃ।'' সারগ্রাহি-সম্প্রদায় জীবের যে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য ''মাধুকর ভৈক্ষ্য''-রূপে আহরণ করেন, তদ্দ্বারা বিষ্ণুর সেবা হয় এবং সেই বিষ্ণুসেবার ফল সমগ্র জগৎ প্রাপ্ত হন।

''শ্রীগৌড়ীয়মঠকে যে অর্থাদি প্রদান করা হয়, তদ্দ্বারা কেবল শ্রীগৌড়ীয়মঠেরই আহার্য্যের সংস্থান হয় —যেমন কোন ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুককে কিছু অর্থ প্রদান করিলে তদ্দ্বারা সেই ভিক্ষুকটীরই ক্ষুধা-নিবৃত্তি ও তাহার পরিতৃপ্তি হয়'',—যাঁহারা এইরূপ মনে করেন, তাঁহারা অতীব ভ্রান্ত ও ভারবাহী। কর্ম্মফল-বাধ্য, ক্ষুধাতাড়িত ভিক্ষুককে কর্ম্মি-সম্প্রদায় যে দান করে, তাহা ভারবাহিতা-মাত্র, তাহা সারগ্রাহিতা বা মাধুকরী নহে। কিন্তু শ্রীগৌড়ীয় মঠের কৃত্য বা ভিক্ষা তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। শ্রীগৌড়ীয় মঠ দগ্ধোদরপূরণের জন্য কর্ম্মী দাতার নিকট হইতে কোন মল আহরণ করেন না। ব্যক্তিগত বা বহু ব্যক্তির ইন্দ্রিয়তর্পণার্থ ভিক্ষাগ্রহণ—ঋণগ্রহণ-মাত্র; ঐ ঋণ কোনও না কোন প্রকারে এই জন্মে বা পরজন্মে ঐ কর্ম্মফলবাধ্য ভিক্ষুককে শোধ করিতেই হইবে। কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়মঠ শ্রীভগবানের নাম, কাম ও ধাম-প্রচারের জন্য জগতের নিকট হইতে সার গ্রহণ করেন,—মল-আহরণ বা ভার গ্রহণ করেন না। ভগবানের নাম, কাম, ধাম-সেবার জন্যই তাঁহাদের জীবন; তাঁহারা বিঘশাসী, শ্রীগুরু-কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট-ভোজী; কর্ম্মফল-বাধ্য ভিক্ষুকের ন্যায় তাঁহারা 'অর্থ' 'অর্থ' জপকারী বা 'অভাব' 'অভাব' ধ্যানকারী নহেন। তাঁহাদের 'মাধুকরী ভিক্ষা' বা 'মাধুকর ভৈক্ষ্য'—'মহামন্ত্র-জপ', 'মহামন্ত্র-কীর্ত্তন', 'হরিধ্যান' হইতে পৃথক্ নহে। ঐ ''মাধুকর ভৈক্ষ্য'' ব্যক্তি-বিশেষের দগ্ধোদর-সেবা বা ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির জন্য নহে,—উহা ভগবানের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি, শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্ট-প্রচার ও তদ্দ্বারা সমগ্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উপকার বা প্রকৃত পরার্থিতার জন্য উদ্দিষ্ট। কোনও অভাবগ্রস্ত ভিক্ষুক-বিশেষ বা তজ্জাতীয় বহু ভিক্ষুক যে দান গ্রহণ করে, বা দাতা তাহাকে ও তজ্জাতায় বহু কর্ম্মফলবাধ্য ভিক্ষুককে যে দান করে, তদ্দ্বারা ভিক্ষুক বা দাতার কোনও নিত্য উপকার হয় না—সেই দানের ফল সমগ্র মানবজাতি বা জীবজগৎ পাইতে পারে না। একজনকে জুতা দান করিতে গিয়া আর একটী প্রাণীকে হত্যা করিতে হয়। একজনকে অর্থ দান করিতে গিয়া আর একজনকে নিরাশ করিতে বা আর একজনের পকেটে হাত দিতে হয়। আর কোনও বিশেষ বা কতকগুলি ব্যক্তির সাময়িক অভাব-পরিপূরণে জগতেরও কোন প্রকৃত ও নিত্য হিত হয় না। কিন্তু সারগ্রাহি-সম্প্রদায় বা শ্রীগৌড়ীয়মঠ যে মাধুকরী ভিক্ষা গ্রহণ করেন, তাহা কোনও ব্যক্তিবিশেষ বা বহু ব্যক্তির ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, উদরপূর্ত্তি, সাময়িক অভাব-নিবৃত্তি প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত না হইয়া সকল জীবের সকল অভাবের নিদান ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতা-দূরীকরণে—ভগবানের সেবার দুর্ভিক্ষ-অপনোদনে নিয়োজিত হইয়া তদ্দ্বারা সমগ্র বিশ্বের মঙ্গল সাধিত হয়—যথার্থ পরার্থিতার শ্রেষ্ঠ ফল-লাভ হয়। ইহাই শ্রীগৌড়ীয় মঠের ''মাধুকর ভৈক্ষ্য''। এই মাধুকর ভৈক্ষ্য মুক্ত ও অমুক্ত—সকলেরই শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন-সাধক।

পারমার্থিক-প্রদর্শনী, গ্রন্থ-প্রচার, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা, ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের কীর্ত্তন-উৎসবাদির অনুষ্ঠান, শ্রীমূর্ত্তির সেবা-প্রকাশ, মঠস্থাপন, লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার, পরিক্রমা-মহোৎসবাদি, ভগবন্নাম, কাম ও ধাম-সেবার জন্য যে-সকল ভিক্ষা সংগৃহীত হয়, তাহা সকলই—"মাধুকর ভৈক্ষ্য"। ঐ মাধুকর ভৈক্ষ্যের ভোক্তা—স্বয়ংপ্রকাশ বলদেব, তিনিই সকল মধুর মালিক। জীব মধুর মালিক নহে,—আহরণকারী মাত্র; সেই আহরণের সার্থকতা হয়, যদি তাহা বলদেবের অর্থাৎ ভগবৎ-সেবা-প্রচারের সেবায় নিযুক্ত হয়।

"মাধুকর ভৈক্ষ্য" আর ভেট, দক্ষিণা, ব্যবসায়ীর দর্শনী, বস্তুর বিনিময়ে দেয় মূল্য—একজাতীয় বস্তু নহে। শ্রীগৌড়ীয়মঠ পারমার্থিকপত্র, পারমার্থিক গ্রন্থ প্রভৃতির জন্য যে ভিক্ষা গ্রহণ করেন, তাহা সকলই—"মাধুকর ভৈক্ষ্য"। গণমস্তিষ্ক "ফেল কড়ি মাখ তেলে"র নীতিতে এত ভারগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহারা নিজেদের উপমায় মাধুকর ভৈক্ষ্য ও ব্যবসায়ের পণ্যদ্রব্যে বিবর্ত্তগ্রস্ত হইয়া এককে আর একটী মনে করিয়া বসিয়াছেন। যাহা মানবের ইন্দ্রিয়-তোষণে কল্পিত হয়, তাহার বাহ্য আকার যাহাই থাকুক না কেন, তাহা ব্যবসায়ীর পণ্য, জীবের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির শুল্ক; আর যাহার মূল উদ্দেশ্যে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ, তাহার বাহ্য আকার যাহাই হউক না কেন, তাহা—"মাধুকর ভৈক্ষ্য"। ত্রিদণ্ডি- ভিক্ষুকগণ হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার্থ এই "মাধুকর ভৈক্ষ্য" সংগ্রহ করেন। যাঁহাদের কায়মনোবাক্য পরমহংস গুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে হরিসেবায় দণ্ডিত হইয়াছে, তাঁহারাই "মাধুকর ভৈক্ষ্য" গ্রহণের অধিকারী। অজিতেন্দ্রিয় গৃহব্রত- সম্প্রদায়ের তাহাতে অধিকার নাই। ভারবাহী কর্ম্মি-জ্ঞানি-সম্প্রদায়ও "মাধুকর ভৈক্ষ্যে"র মধুকর হইতে পারে না। তাহারা কাচভাণ্ডাবরণে আবৃত মধু স্পর্শ করিবার অভিনয় দেখাইলেও মধুস্পর্শ হইতে সর্ব্বদাই বঞ্চিত থাকে। একমাত্র বলদেবের সেবক, সারগ্রাহী, প্রকৃত ত্রিদণ্ডিভিক্ষুকগণই সকল বাক্য, সকল অঙ্গ ও সকল অন্তঃকরণে মাধুকরী-ভিক্ষা-সংগ্রহের যোগ্য। ইহা মানবজাতি যে-দিন বুঝিতে পারিবেন, সেদিন তাঁহাদের ভারবাহিতা বিদূরিত হইবে, তখন তাঁহারা সারগ্রাহী হইয়া "অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু"—এই শ্রুত্যুক্ত অখিল-রসামৃত-মূর্ত্তির সেবায় কায়মনোবাক্য, সর্ব্বস্ব নিয়োজিত করিয়া জীবনকে মধুময় অর্থাৎ মধুরস্বরূপ পরম পুরুষের সেবার উপকরণ করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় প্রকার ভৈক্ষ্যের নাম—"অসংক্লিপ্ত ভৈক্ষ্য"। শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন,—"অসংক্লিপ্তান্ অত্রায়ং লাভো ভবিষ্যতীতি পূর্ব্বমনুদ্দিষ্টান্" অর্থাৎ এখানে ইহা লাভ হইবে,—এইরূপ পূর্ব্বের অনুদ্দিষ্ট ভৈক্ষ্য-সামগ্রীকে "অসংক্লিপ্ত ভৈক্ষ্য" কহে।

তৃতীয় প্রকার ভৈক্ষ্য—"প্রাক্প্রণীত", পূর্ব্ব হইতে উদ্দিষ্ট বা নির্দ্ধারিত যে ভৈক্ষ্য। কোনও ব্যক্তিবিশেষের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি নিশ্চয়ই ভিক্ষা প্রদান করিবেন,—এইরূপ পূর্ব্বে জানিয়া তাঁহার নিকট হইতে যে ভিক্ষা গৃহীত হয়।

চতুর্থ প্রকার ভৈক্ষ্য—"অযাচিত"। অযাচিত ভিক্ষাবৃত্তিকে অজগর-বৃত্তি বলা যাইতে পারে। ভিক্ষার জন্য কোনও চেষ্টা না করিয়া স্ব-স্থানে বসিয়া যে ভিক্ষা পাওয়া যায়, তাহাই—"অযাচিত ভৈক্ষ্য"।

পঞ্চম প্রকার ভৈক্ষ্য—"তাৎকালিকোপপন্ন"। পূর্ব্বে কোনও বন্দোবস্ত, কথাবার্ত্তা বা প্রার্থনা নাই, উপস্থিত-ক্ষেত্রে কোনও স্থানবিশেষে অকস্মাৎ বা দৈবাৎ যে ভিক্ষা পাওয়া যায়, তাহাই—"তাৎকালিক ভৈক্ষ্য"।

এতদ্ব্যতীত কায়িক, বাচিক ও মানসিক—এই ত্রিবিধ ভৈক্ষ্য মানবজাতি সর্ব্বক্ষণই এই জগৎ হইতে আহরণ করিতেছেন। কায়িক ভৈক্ষ্য—স্থূল, আর বাচিক ভৈক্ষ্য—সূক্ষ্ম। এই উভয় ভৈক্ষ্য মানসিক ভৈক্ষ্যের অনুমোদন অপেক্ষা করিয়া থাকে। মানস ভৈক্ষ্য নিয়ন্তৃরূপে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ ভাবদ্বয়ের বিচার করে। কিন্তু যাঁহাদের মনোনিগ্রহ হইয়াছে, তাঁহারাই প্রকৃত-প্রস্তাবে "মাধুকর ভৈক্ষ্য" আহরণে যোগ্য হইতে পারেন।

এই পঞ্চবিধ ভৈক্ষ্যের মধ্যে "মাধুকর ভৈক্ষ্য" কোনও ভূতোদ্বেগ উৎপন্ন করে না অর্থাৎ সকলেই অল্প অল্প করিয়া ভগবৎসেবার্থ প্রদান করিতে সমর্থ হয় এবং সারগ্রাহী ভিক্ষুক বহুস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া বহুলোকের প্রদত্ত দ্রব্য ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিয়া বহু লোকের কল্যাণ বিধান করিতে পারেন। বহু লোকের একত্র উপকার করিতে হইলে মাধুকর ভৈক্ষ্যই শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ লোক মিলিয়া যেরূপ হরিকীর্ত্তন সাধিত হয়, সেরূপ বহু লোকের উপায়ন-দ্বারাও নাম-প্রচারে আনুকূল্য হয়। এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিকীর্ত্তনকারিগণকে মাধুকরী ভিক্ষা আহরণ করিতে বলিয়াছেন। "মাধুকর ভৈক্ষ্য" ও "নামসংকীর্ত্তন"—একই তাৎপর্য্যপর।

অসংক্লিপ্ত ভিক্ষায় অনেক সময় ভিক্ষুককে নির্য্যাতিত ও প্রত্যাখ্যাত হইতে হয়। কখনও বা ভিক্ষুকের বহু দ্রব্যও লাভ হইয়া থাকে। শ্রদ্ধাবান্ বা হরিসেবায় ঐকান্তিক গৃহস্থগণের নিকট হইতে প্রাক্প্রণীত ভৈক্ষ্য লাভ হইয়া থাকে। অযাচিত ভিক্ষা, আকাশবৃত্তি বা অজগরবৃত্তির দ্বারা ভজনানন্দিগণ জীবন নির্ব্বাহ করেন। কিন্তু হরিকীর্ত্তন-বিস্তারে পঞ্চবিধ ভৈক্ষ্যই যুগপৎ নিয়োজিত হইতে পারে। মাধুকর, অসংক্লিপ্ত, প্রাক্ প্রণীত, অযাচিত ও তাৎকালিক—এই পঞ্চবিধ ভৈক্ষ্যই যুগপৎ হরিকীর্ত্তন-প্রচারে—বিশ্বের পরম ও ঐকান্তিক মঙ্গলসাধনে নিযুক্ত হইতে পারে। শ্রীগৌড়ীয়মঠ এই পঞ্চবিধ ভিক্ষাকেই কৃষ্ণসম্বন্ধে নিযুক্ত করিবার আদর্শ প্রদর্শন-পূর্ব্বক পরম পরার্থিতা বা কৃষ্ণার্থিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতেছেন।

জীবের নিত্যধর্ম্মের পরমায়ুঃ

শেষাবধিক জীবিতকালকে 'পরমায়ুঃ' বলে। 'নিত্যধর্ম্মের পরমায়ুঃ' কথাটী যুগপৎ সম্পূর্ণ বিরোধী; কারণ, যেখানে নিত্যত্ব, সেখানে তাহার সমাপ্তি কথাটী প্রযুক্তই হইতে পারে না। এক শ্রেণীর লোক বলেন, —"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস—মহাপ্রভুর এই উক্তি আমরা স্বীকার করি। যতক্ষণ জীবত্ব, ততক্ষণ তাহার কৃষ্ণদাসত্ব ধর্ম্ম; এ-বিষয়ে আমরাও প্রতিবাদ করি না।" ইঁহাদের আন্তরিক অভিপ্রায় এই যে, "জীব নিত্যবস্তু নহে; কিন্তু যতক্ষণ জীব আছে, ততক্ষণ তাহাতে ভগবানের সেবাবৃত্তি আছে। জীবের আয়ুঃ পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার ধর্ম্ম কৃষ্ণদাস্যের আয়ুঃও শেষ হইয়া যায়।"
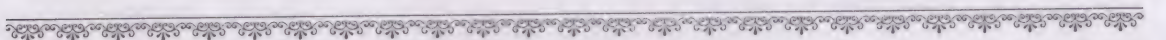
এই সকল ব্যক্তি হেত্বাভাস ও ছলের আশ্রয়-পূর্ব্বক স্থূলবুদ্ধি লোকদিগকে ঐরূপ ভ্রমাত্মিকা যুক্তিমূলে বঞ্চনা করিয়া থাকেন। ইঁহারা 'অশ্বত্থামা হতঃ' বলিয়া 'ইতি গজঃ' কথাটীর সময় শ্রোতার কর্ণ বধির করিয়া ফেলেন। ইঁহারা 'নিত্য' কথাটীর উপর অবগুণ্ঠন টানিয়া সভা জয় করিবার চেষ্টা করেন! মায়াবাদীর ভ্রান্ত ও দুরভিসন্ধিযুক্ত মতবাদ নিরসনের জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু 'নিত্য'-শব্দের প্রয়োগ করিলেন; কিন্তু দুরভি-সন্ধিযুক্ত ব্যক্তিগণ সেই নিত্য শব্দটীকেই ঢাকা দিয়া তাঁহাদের পূর্ব্ব গান গাহিতে থাকেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বৈষ্ণবগণ মায়াবাদীর মতকে খণ্ডন করিতে হইলে যাহা তাঁহাদের মত নহে, তাহাকেই 'মায়াবাদীর মত' বলিয়া উহা খণ্ডনের বাহ্য প্রদর্শনী খোলেন না। কিন্তু মায়াবাদি-সম্প্রদায় যাহা বৈষ্ণবের সিদ্ধান্ত নহে, তাহাকেই আধ্যক্ষিকতা-মূলে 'বৈষ্ণবের মত' কল্পনা করিয়া স্থাপন-পূর্ব্বক তাঁহাদের নিজেদের কল্পিত মতকে খণ্ডন করিতে আরম্ভ করিয়া 'বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত খণ্ডিত হইল' বলিয়া লোকের নিকট বাহাদুরী প্রদর্শন করেন।

অবৈষ্ণব মায়াবাদিগণ মনে করেন,—'শক্তি' বলিতে গেলেই 'অচিৎ শক্তি' হইবে; নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরের কথা বলিতে গেলেই ঐ সকলকে বাধ্য হইয়া সকল ক্ষেত্রে, সকল পাত্রেই 'অনিত্য' হইতে হইবে! ইহা তাঁহাদের প্রত্যক্ষ তিক্ত অভিজ্ঞতার ফল। ইঁহারা এই জগতের অভিজ্ঞতা পরজগতে বহন করিয়া লইবার পক্ষপাতী। ম্যালেরিয়ার রোগী যেমন উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্য-নিবাসে গিয়াও মনে করে যে, সেখানেও ম্যালেরিয়ার দূষিত বায়ু রহিয়াছে, সেইরূপ মায়াবাদী জগতের অনিত্যতার তিক্ত অভিজ্ঞতা-রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া এতদূর বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, তিনি মনে করেন, বৈকুণ্ঠেও বুঝি ঐরূপ অনর্থের ব্যাধি- সমূহ বর্ত্তমান আছে! জড়বিচিত্রতায় অনিত্যতা-ধর্ম্ম আছে বলিয়া চিদ্‌বিচিত্রতায়ও অনিত্যধর্ম্ম সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িবে, এই ভয়ে মায়াবাদী চিদ্‌বিচিত্রতাকে একেবারে স্তব্ধ করিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন!

মায়াবাদী অচিৎশক্তি-পরিণত বিশ্ব-ব্যতীত অন্য কোনও বিচিত্রতার বিষয় ভাবনাই করিতে পারেন না। চিৎশক্তি-পরিণত অপ্রাকৃত বিচিত্রতাকে কি করিয়াই বা জড়মস্তিষ্কে ও জড় অভিজ্ঞতায় মায়াবাদী ধারণা করিতে পারিবেন? জীব অচিৎশক্তি-পরিণত বস্তু নহে। জীব অচিৎশক্তি ও চিৎশক্তির মধ্যবর্ত্তিনী শক্তি তটস্থা-শক্তিপ্রসূত। 'জীব' অচিৎশক্তি-দ্বারা অভিভাব্য বটে; কিন্তু অচিৎশক্তি নহে।

যাঁহারা 'জীব' বলিতে গেলেই জীবের বদ্ধদশা বুঝিয়া ফেলেন, তাঁহারা নিজেরা বদ্ধ এবং তাঁহাদের দর্শন 'কূপমণ্ডূক'-ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত। বদ্ধজীব-সম্প্রদায় ধারণা করেন, বদ্ধদশা ব্যতীত জীবের আর কোনও পরিচয় নাই; ইহা তাঁহাদের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতাজাত মূর্খতা-মাত্র। বস্তুতঃ শুদ্ধা অবস্থাই জীবের প্রকৃত জীবত্ব। মুক্তজীবই অবিমিশ্র অণুচেতন; ঐরূপ নির্ম্মল জীবত্বেই নিত্যকৃষ্ণদাস্য প্রকাশিত। জীবের বদ্ধ-পরিচয়ে নিত্যা কৃষ্ণদাস্য-বৃত্তি সুপ্তা ও আবৃতা।

শুদ্ধ, মুক্ত জীবেই নিত্যকৃষ্ণদাস্য অপ্রতিহতভাবে সম্প্রকাশিত। কিন্তু মায়াবাদীর কল্পিত অনুমানে "জীবের বদ্ধদশাই জীবত্ব! জীবের কোনও মুক্ত পরিচয় নাই! মুক্তদশাই জীবত্বের পরিবর্ত্তে ব্রহ্মত্ব!"

মুক্তদশায় জীব ব্রহ্মের সহিত সমানধর্ম্ম বিশিষ্ট, সন্দেহ নাই। মুক্তদশায় জীবের পূর্ণ ভূতশুদ্ধি হইয়াছে। কারণ, 'অদেব' কখনও 'দেবে'র অর্চ্চনা করিতে পারে না। অব্রহ্ম, অনাত্মা কখনও পরব্রহ্ম, পরমাত্মার সেবা করিতে সমর্থ হয় না। পূর্ণকৃষ্ণ—অখিলরসামৃতসিন্ধু, আর জীবও—অণুরসামৃতমূর্ত্তি।

"জীব নিত্যবস্তু নহে, মুক্ত, শুদ্ধ, চেতন নহে",—এইরূপ অন্যথা বিচার হইতে পরিমুক্তির নামই—মুক্তি। শ্রীমদ্ভাগবত ইহাকেই মুক্তি বলিয়াছেন,—"মুক্তির্হিত্বা হি অন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।" জীবের এই নিত্যত্ব-উপলব্ধির বিনাশের নাম মুক্তি নহে। মায়াবাদীর স্বকপোল-কল্পিত ধারণায় "প্রকৃত মুক্তির পরিচয়-বিনাশের নামই মুক্তি—চেতনের বিনাশের নামই মুক্তি—নিত্যত্বের ধ্বংসের নামই মুক্তি—আত্মহত্যার নামই মুক্তি!" তাই মায়াবাদী ছলক্রমে বলিয়া থাকেন,–"যতক্ষণ জীবের জীবত্ব, ততক্ষণ তাহার কৃষ্ণদাসত্ব!"

বস্তুতঃ ঐ মতবাদ যেমন অযৌক্তিক, তেমনই শাস্ত্রবিরুদ্ধ। শ্রুতি বলিয়াছেন,—

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্।। (কঠ ২।২।১৩)

যিনি নিত্য জীবগণের মধ্যে পরম নিত্য, যিনি চেতন জীবগণের মধ্যে পরম চেতন, যিনি এক হইয়াও সকলের কামনা পূরণ করেন, যে-সকল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই আত্মস্থ ভগবানকে পরিদর্শন করেন, তাঁহারাই নিত্যশান্তি লাভ করিয়া থাকেন, অপরে তাহা লাভ করিতে পারে না।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ।। (মুণ্ডক ৩।১।১-২)

সর্ব্বদা সংযুক্ত, সখ্যভাবাপন্ন দুইটী পক্ষী একটী দেহিরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন মায়াধীন অর্থাৎ জীব দেহকে দেহিজ্ঞানে নানাবিধ স্বাদযুক্ত সুখ-দুঃখরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন। অন্যজন মায়াধীশ অর্থাৎ পরমেশ্বর সুখদুঃখরূপ দ্বন্দ্ব ভোগ না করিয়া সাক্ষি-স্বরূপে তাহা পরিদর্শন করেন। কর্ম্মফলের ভোক্তা জীব একই দেহ-বৃক্ষে অবস্থান-পূর্ব্বক নিজ যোগ্যতায় মায়ার দ্বারা বিমোহিত হইয়া স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে আত্মবুদ্ধি-জন্য শোক করেন। যখন তিনি আপনা হইতে ভিন্ন সেব্য পরমেশ্বরকে দেখিতে পান, তখন সমস্ত শোকনির্ম্মুক্ত হইয়া ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও মহিমার অনুশীলন করিয়া থাকেন।

প্রাণৈকাধীন-বৃত্তিত্বাদ্ বাগাদেঃ প্রাণতা যথা।
তথা ব্রহ্মাধীনবৃত্তের্জগতো ব্রহ্মতোচ্যতে।। (প্রমেয়রত্নাবলী ৪।৬)
ন বৈ বাচো ন চক্ষূংষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে।
প্রাণ ইত্যাচক্ষতে, প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্ব্বাণি ভবতি।। (ছাঃ ৫।১।১৫)

(শ্রুতিতে যে সকল অভেদ-সূচক মন্ত্র আছে, অর্থাৎ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", "তত্ত্বমসি"—এই সকল আপাত জীবব্রহ্মৈক্যপর বাক্যের সঙ্গতি কিরূপে হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন,—) বাগাদি ইন্দ্রিয়গণের যেমন একমাত্র মুখ্য প্রাণেরই অধীনতা-নিবন্ধন 'প্রাণ'-শব্দেই অভিধান ও প্রাণরূপত্ব, সেইরূপ চিজ্জড়াত্মক জগতেরও ব্রহ্মেরই অধীনতাহেতু 'ব্রহ্ম'-শব্দবাচ্যত্ব ও ব্রহ্মপরত্ব; বাগাদি ইন্দ্রিয় যেমন মুখ্যপ্রাণ নহে, জীব ও জগৎ তেমনই 'সাক্ষাৎ ব্রহ্ম' নহে।

ছান্দোগ্য বলেন,—বাক্য-সকল, নেত্রদ্বয়, ইন্দ্রিয়-সমূহ ও মন তত্তৎ নামে অভিহিত হয় না, উহারা সকলেই 'প্রাণ' এই নামেই আখ্যাত হয়, যেহেতু প্রাণই ঐ সকল বাগাদি ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা। তদ্রূপ জীবের নিয়ন্তা 'ব্রহ্ম' বলিয়া জীবকে কখনও 'ব্রহ্ম' বলা হয়। বস্তুতঃ জীবত্ব ব্রহ্মত্ব নহে, আর জীবত্ব 'অনিত্য'ও নহে।

শ্রুতি আরও বলেন,—

যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে।
প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।। (বৃহদাঃ ২।১।২০)

যেরূপ অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ-সমূহ বহির্গত হয়, সেইরূপ সমস্ত বাগাদি ইন্দ্রিয়, সমস্ত লোক, সমস্ত দেবতা, সমস্ত প্রাণী পরমাত্মা হইতে উদ্‌গত হইয়া থাকে।

শ্রীগীতায়ও জীবের নিত্যত্ব ও শুদ্ধত্ব উক্ত হইয়াছে,—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি।। (গীতা ১৫।৭)

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—আমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর পরম নিত্যবস্তু। জীব- সকল আমার বিভিন্নাংশ ও সনাতন (নিত্য) অর্থাৎ ঘটাকাশাদির ন্যায় কল্পিত নহে। কিন্তু জীব এই প্রপঞ্চে বদ্ধ হইয়া প্রকৃতিস্থিত মনঃ ও পঞ্চ বাহ্যেন্দ্রিয়—এই ছয়টী ইন্দ্রিয়কে স্বকীয় তত্ত্ববোধে বহন করিতেছে।

শ্রীগীতা জীবাত্মার নিত্যত্ব-সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন,—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।। (গীতা ২।২০)

জীবাত্মা ষড়্‌বিকার-রহিত, সুতরাং অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, নিত্য অর্থাৎ সকল কালেই বর্ত্তমান। তাঁহার জন্ম-মৃত্যু নাই। পুনঃ পুনঃ তাঁহার উৎপত্তি, কি বৃদ্ধি হয় নাই বা হইবে না। তাঁহার অপক্ষয় বা নাশ নাই। তিনি পুরাতন অথচ নিত্য নবীন। জন্ম-মরণশীল শরীরের বিয়োগে তিনি কখনও হত হন না।

এই জীবাত্মা—পরব্রহ্মের তটস্থশক্তি, অচিৎশক্তি নহেন। অচিৎশক্তি হইতে মায়িক জগতের উৎপত্তি বলিয়া তাহা অনিত্য ও জড়। কিন্তু অচিৎ ও চিৎশক্তির মধ্যবর্ত্তিনী তটস্থশক্তি হইতে জাত বলিয়া জীবের নিত্যত্ব, অজড়ত্ব অর্থাৎ চিন্ময়ত্ব। শ্রুতি বলিয়াছেন,—

তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতীদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ।। (বৃহদাঃ ৪।৩।৯)

এই পুরুষের অর্থাৎ জীবাত্মার দুইটী স্থান আছেন,—ইহলোক বা জড়রাজ্য এবং পরলোক বা চিন্ময়ধাম। জাগ্রৎ ও সুষুপ্তির সন্ধিরূপ তৃতীয়স্থানে থাকিয়া জীবাত্মা জাগ্রদ্রূপ পরলোক ও সুষুপ্তিরূপ ইহলোক—এই উভয়স্থানই অবলোকন করেন।

বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত তারস্বরে আমাদিগকে জানাইয়াছেন, জীব ও পরমেশ্বর উভয়ই নিত্য এবং তাঁহাদের সেবক ও সেব্য-সম্বন্ধ নিত্য।

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতাস্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া।।

(ভাঃ ১০।৮৭।৩০)

শ্রুতিগণ কহিলেন,—হে নিত্যস্বরূপ! শরীরধারী জীব-সংখ্যার অন্ত নাই। জীব 'অনন্ত'—এইরূপ শব্দপ্রাপ্ত হইয়া যদি কেহ বলেন যে, 'জীব ব্রহ্মের ন্যায় ব্যাপক অর্থাৎ সর্ব্বগত, তাহা হইলে সেইরূপ সিদ্ধান্ত মহা ভ্রমাত্মক। কেন না, শাস্ত্রে ইহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, 'জীব' ঈশিতব্য অর্থাৎ শাস্য এবং আপনি 'ঈশ্বর' তাহার শাসক। জীব ব্যাপক নহে, ব্যাপ্য বটে অর্থাৎ অণু-পরিমাণ। 'সর্ব্বগ' ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, জীব স্ব-স্বরূপে ব্যাপক এবং আপনি সর্ব্বব্যাপক। আপনি অগ্নিকুণ্ড বা সূর্য্য-সদৃশ, জীব স্ফুলিঙ্গ বা কিরণকণ- স্থলীয় বস্তু। চিন্ময়স্বরূপ জীবসমূহ আপনার বিভিন্নাংশরূপে নিত্যকাল আপনাতে অবস্থিত। জীবকে আপনার স্বতন্ত্র হইতে বহির্গত না করিলে আপনার নিয়ন্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না। অতএব যাহারা জীবাত্মাকে সর্ব্ববিষয়ে আপনার সহিত সমান জ্ঞান করে, তাহাদের মত মতবাদে দূষিত।

শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের আচার্য্যবর্য্য জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদের ভাষ্য হইতে উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।।"

মুক্ত পুরুষগণও স্বেচ্ছায় নিত্যশরীর পরিগ্রহ করিয়া ভগবানকে ভজন করিয়া থাকেন।

স্বামিপাদ আরও বলিয়াছেন,—

"পার্ষদতনূনামকর্ম্মারব্ধত্বং **নিত্যত্বং শুদ্ধত্বঞ্চ**" (ভাবার্থদীপিকা ১।৬।২৯)

ভগবৎ-পার্ষদ-শরীর-সমূহে জন্ম-মৃত্যুর মূল কারণ প্রারব্ধত্ব নাই; তাহা নিত্য ও শুদ্ধ অর্থাৎ নির্গুণ।

সুতরাং জীবাত্মার পরমায়ুঃ সনাতন অর্থাৎ নিত্য এবং তাহার ধর্ম্মের পরমায়ুও অনাদি, অনন্ত, নিত্য, অফুরন্ত, নব-নবায়মান। কৃষ্ণদাস আপেক্ষিক নিত্য নহে, তাহা ঐকান্তিক পরম নিত্য।

পাদ-বৈষ্ণব ও পূর্ণ-বৈষ্ণব

'পাদ'-শব্দের অর্থ—চতুর্থাংশ। অংশের কলা-সমূহের পরিপূরণে 'পূর্ণ'-শব্দ ব্যবহৃত হয়। যাঁহারা আপনাদিগকে বৈষ্ণব-পরিচয়ে পরিচিত করিতে অভিলাষী হইয়াও বৈষ্ণবের সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিতে পারেন না, তাঁহারাই পাদ-বৈষ্ণব। পাদ-বৈষ্ণব পূর্ণ-বৈষ্ণব-পরিচয়ের 'শ্রীহীন', আর পূর্ণ-বৈষ্ণব— 'শ্রীযুক্ত'; এইজন্য তাঁহারা 'শ্রীপাদ'-সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকেন। 'একপাদ'-বিভূতি-জাত প্রাকৃত জগতে সম্পূর্ণ ভরাভর করিয়া বৈষ্ণবতার অংশগ্রহণের পরিচয়ে পাদ-বৈষ্ণবতা সিদ্ধ হয় এবং তাহা হ্রাস হইলেই শূন্য বৈষ্ণবতা বা প্রাকৃত-সহজিয়াত্ব, বৌদ্ধত্ব অবশিষ্ট থাকে।

পাদ-বৈষ্ণবগণ একপাদ, দ্বিপাদ, ত্রিপাদ—এইরূপ বিভিন্ন শ্রেণীতে লক্ষিত হন। যাঁহারা 'বৈষ্ণব'-নামে পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন, অথচ অকৃত্রিম শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত সদ্গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয়-পূর্ব্বক বৈষ্ণব-পরিচয়ের সমগ্র সদাচার-গ্রহণে বিমুখ হইয়া লৌকিক ও কৌলিক গুরুর নিকট হইতে লোক-দেখান বৈষ্ণব-সদাচার-গ্রহণের নামে নানাপ্রকার লৌকিক আচার-ব্যবহারগুলি পালন করিয়া থাকেন, তাঁহারা একপাদ বৈষ্ণব। ইঁহারা অনেক সময়ে তাপ ও পুণ্ড্র প্রভৃতি গ্রহণের অভিনয় করিয়াও তৃতীয়-সংস্কার-স্বরূপ কৃষ্ণদাস্য-সূচক নাম, নিজের পূর্ব্ব লৌকিক জাত্যভিমান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পরমহংস-বৈষ্ণবের দাসাভিমান, প্রাপ্ত মন্ত্রের দ্বারা শ্রীশালগ্রামের অর্চ্চন প্রভৃতি সদাচার-গ্রহণে বিমুখ হন। এইজন্য ইঁহাদিগকে আচার্য্যগণ পাদ-বৈষ্ণব বা এক-চতুর্থাংশ বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত করেন। বস্তুতঃ ইঁহারা বৈষ্ণব নহেন,—বৈষ্ণব-প্রায়, বৈষ্ণবাভাস, সামান্য-বৈষ্ণব বা অবৈষ্ণবেরই সহযোগী মাত্র। যাঁহারা আপনাদিগকে বৈষ্ণব-পরিচয়ে পরিচিত করিতে ইচ্ছুক হইয়াও চ্যুত-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব (?), কায়স্থ-বৈষ্ণব (?), তেলী-বৈষ্ণব (?), মালী-বৈষ্ণব (?), নীচজাতি-বৈষ্ণব (?), উচ্চজাতি-বৈষ্ণব (?) প্রভৃতি মনে করেন অর্থাৎ বৈষ্ণবতা-বিমুখ ও বৈষ্ণব-বিরোধী লৌকিক স্মার্ত্ত-সমাজেরই কোন একজন সামাজিক বলিয়া আপনাকে পূর্ণমাত্রায় অন্তরে সংরক্ষণ করেন, তাঁহারা পরমহংস বৈষ্ণবগণকে সর্ব্বতোভাবে গুরুপাদপদ্ম বলিয়া হৃদয়ে ধারণ করিতে না পারায় তাঁহাদের বৈষ্ণব-পরিচয়ের আকাঙ্ক্ষা কেবল মৌখিকতা ও কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তের ধূরবাহিতামাত্র।

প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ে অনেক ব্যক্তিরই আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য বড়ই আগ্রহ দেখা যায়; কিন্তু তাঁহারা তৎসঙ্গে-সঙ্গে 'আমরা অমুকের পুত্র অমুক', 'আমরা অমুক জাতি', 'আমাদের বংশগত অমুক উপাধি ও নাম' ইত্যাদি পরিচয় অন্তরের অন্তঃস্থলে পোষণ করেন এবং তাঁহাদের বৈষ্ণব-পরিচয়ের সঙ্গে-সঙ্গে তাহা উল্লেখ করিতেও পশ্চাৎপদ হন না। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, তাঁহাদের ধমনীতে বৈষ্ণব-বংশের রক্ত প্রবাহিত-রহিয়াছে! ইঁহারা অত্যন্ত জড়বস্তু রক্ত-ধারার মধ্যে অবিমিশ্রি চিন্ময় বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবতার পরিচয় আবদ্ধ করেন! এমন কি, যাঁহারা আপনাদিগকে "এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম। অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ।।"—এই বাক্যানুসারে আপনাদিগকে বর্ণাশ্রমের অতীত পরমহংস-বেষে ভূষিত করিয়া 'বাবাজী' প্রভৃতি পরিচয়ে পরিচিত করেন, তাঁহারাও অন্তরে অন্তরে

আপনাদের পূর্ব্ব নীচ ও উচ্চ জাত্যভিমান-সংরক্ষণ-পূর্ব্বক বৈষ্ণব-পরিচয়ে আপনাদিগকে পরিচিত করিতে ইচ্ছা করেন! প্রকৃতপক্ষে ইঁহারা স্মার্ত্তের কিঙ্কর, পরমহংস বৈষ্ণবের কিঙ্কর নহেন। ইঁহারা যে অনেক সময়ে লৌকিক গোস্বামী বা লৌকিক ব্রাহ্মণাদিকে দণ্ডবৎ প্রণামাদি করেন, তাহা তাঁহাদের অন্তরের নীচজাত্যভিমান—'অমুক পিতার সন্তান', 'অমুক জাতির অন্তর্গত' প্রভৃতি বিচার হইতে পরিপুষ্ট হয়। এদিকে তাঁহারা 'বর্ণাশ্রম-পরিচয় পরিত্যাগ করিয়াছেন' মুখে বলিয়া থাকেন এবং তজ্জন্য দ্বিজত্বের সংস্কারাদিও গ্রহণে বিমুখ হন, কিন্তু অন্তরে শৌক্র ব্রাহ্মণাভিমান, কায়স্থ, বৈদ্য, তেলী, মালী, সাহা, যুগী প্রভৃতি নানাপ্রকার জাতির অভিমান পোষণ করিয়া তদনুসারে আচরণ করিয়া থাকেন। ইহা প্রত্যক্ষ ও অকপট সত্য। এইজন্য এরূপ শ্রেণীর ব্যক্তিকে **'একপাদ-বৈষ্ণব'** বলা হয়।

এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ অনেক সময়ে সদ্‌গুরু-পাদপদ্ম দীক্ষিত বৈষ্ণবগণের কৃষ্ণদাস্য-সূচক নাম শুনিয়া ও দেখিয়া বিদ্রূপ করেন এবং আপনাদিগকে স্মার্ত্তের উপাধিতে পরিচিত অথচ বৈষ্ণব-নামে প্রচারিত করিবার ইচ্ছাপোষণকেই বাহাদুরী মনে করেন! কোন দীক্ষিত বৈষ্ণবকে 'কৃষ্ণদাস', 'বিদ্যাভূষণ', কিম্বা 'হরিদাস', 'বিদ্যারত্ন' প্রভৃতি নামে বিভূষিত দেখিয়া স্মার্ত্ত-সমাজের বৈষ্ণব-বিরোধি-মস্তিষ্কের বিচারে একপাদ-বৈষ্ণব-নামধৃক্ বিদ্রূপ করিয়া বলেন,—"ঐ সকল ব্যক্তির প্রকৃত নাম কি? তাঁহাদের জাতিগত উপাধি কি? তাঁহারা কি ঘোষ, বোস, বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, মোদক, সাহা বা আর কিছু?" তাঁহারা আরও বলেন যে, 'কৃষ্ণদাস', 'বিদ্যাভূষণ', 'বিদ্যারত্ন' প্রভৃতি তৃতীয়-সংস্কার- সূচক নামগুলি লোক-সমাজে প্রকৃত জাতির পরিচয় গোপন করিবার জন্যই কল্পিত হয়!

অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাঁহারা আপনাদিগকে বৈষ্ণব-পরিচয়ে পরিচিত করতে মহা উৎসুক, তাঁহারাই স্মার্ত্তের অধিক ধূরবাহিত্ব দেখাইবার জন্য বৈষ্ণব-স্মৃতির, সাত্বত পঞ্চরাত্রের বিচার ও বিধিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া অবৈষ্ণব-গণগড্ডলিকার মধ্যে বহুল-প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণববিরোধী মতবাদকে বহুমানন করেন, অথচ বৈষ্ণব নামে পরিচয় দিবার আকাঙ্ক্ষা রাখেন! এইজন্য ইঁহাদিগকে পাদ-বৈষ্ণব বলা হয়। এই পাদ-বৈষ্ণবগণ ঐ আংশিক বৈষ্ণব-পরিচয় হইতে অচিরেই ছুটী পাইয়া শূন্য-বৈষ্ণব বা বৈষ্ণব-বিদ্বেষী হইয়া পড়েন। পাদ-বৈষ্ণব-পরিচয়ের অর্থই এই যে, উহা **শূন্য-বৈষ্ণব বা বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর** পরিচয়ের পিচ্ছিলপথের সীমানায় অবস্থিত।

দ্বিপাদ-বৈষ্ণব বা অৰ্দ্ধপাদ-বৈষ্ণব-পরিচয়ে যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারা সদ্‌গুরুর নিকট আসিবার অভিনয় করিলেও সদ্‌গুরু-পাদপদ্মের সমগ্র বিচার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা কেহ কেহ মহামন্ত্র গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রের দ্বিজত্ব-সংস্কার-গ্রহণ হইতে পৃথক্ রাখিবার অভিলাষী। পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র গ্রহণ করিলে পাছে আচার্য্যদেব শিষ্য-পুত্রদিগকে উপনয়নাদি সংস্কারে সংস্কৃত করেন এবং তাহাতে তাঁহাদিগকে স্মার্ত্তসমাজের দুষ্ট সঙ্গ হইতে পৃথক্ থাকিতে হয়,—এই ভয়ে যাঁহারা সদ্‌গুরু-পাদপদ্মের নিকটে আসিয়াও সম্পূর্ণভাবে সদাচার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারা অৰ্দ্ধবৈষ্ণব।

স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব হি মন্ত্রতঃ।
বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ।।

(নারদপঞ্চরাত্র—ভরদ্বাজসংহিতা ২য় অঃ ৩৪ শ্লোক)

আচার্য্য গুরু স্বয়ং পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র প্রদান করায় সেই মন্ত্র-প্রভাবে শিষ্যের পুনর্জ্জন্ম হয়। বিনীত শিষ্য-পুত্রদিগকে দশ-সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া আচার্য্য শিষ্যদিগকে ব্রহ্মচারী করাইয়া মন্ত্রের অর্থ শিক্ষা দিবেন। ইহাই দীক্ষা-বিধি।

পাদ-বৈষ্ণবগণ এই পাঞ্চরাত্রিক শাস্ত্রীয় বিচার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর 'দিগ্‌দর্শনী'র বিচার, 'তত্ত্বসাগর'-গ্রন্থের বিচার কিংবা শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমন্মহাভারত প্রভৃতির বিচার ও তদনুমোদিত সদাচার মৌখিকতায় স্বীকার করিলেও বাস্তব আচরণে পালন করিতে বিমুখ বলিয়া ইঁহারা অর্দ্ধবৈষ্ণব।

আর একশ্রেণীর ব্যক্তি আপনাদিগকে বৈষ্ণব-পরিচয়ে পরিচিত করিতে ইচ্ছুক হইলেও এবং কৃষ্ণ-দাস্য-সূচক নাম ও সংস্কারাদি গ্রহণ করিলেও স্মার্ত্তসমাজের অস্মিতা ও বন্ধনগুলি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিতে বলবান্ নহেন। ইঁহারা "সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ" ন্যায়-সদৃশ যখন বৈষ্ণবসমাজে আসেন, তখন আপনাদিগকে ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র, কৃষ্ণদাস্য-সূচক নাম, শালগ্রামাদির অর্চ্চন, দ্বিজত্বসংস্কার প্রভৃতি সদাচারে বিভূষিত বলিয়া প্রদর্শন করেন; কিন্তু যখন আবার অবৈষ্ণব- সমাজে বা স্ব-স্ব বহির্ম্মুখ আত্মীয়-স্বজনের সহিত আলাপ-ব্যবহারাদি করেন, তখন ঐ সমস্ত সদাচারকে তৎকালে নির্ব্বাসিত করিয়া রাখেন। কেহ কেহ বা স্কন্ধ হইতে উপবীত নামাইয়া কোমরে গুঁজিয়া রাখেন; কেহ কেহ বা কৃষ্ণদাস্য-সূচক নামের পরিবর্ত্তে জাতিগত নাম, উপাধি প্রভৃতি ব্যবহার করেন, শালগ্রাম-অর্চ্চনের পরিবর্ত্তে শ্রীবিগ্রহের সহিত শালগ্রামের ভেদ দর্শন করিয়া শ্রীশালগ্রাম-অর্চ্চন এবং ঠাকুরকে পক্কান্ন-নিবেদন পরিত্যাগ করেন। ইঁহারা বৈষ্ণব-পরিচয় ও বৈষ্ণব-ব্যবহারের বিষয়গুলি হৃদয়ঙ্গম করিলেও ইঁহাদের হৃদয়-দৌর্ব্বল্য অধিক থাকায় এবং ভগবদ্‌বহির্ম্মুখগণের সঙ্গ করায় ইঁহারা আপনাদিগকে সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থায় পূর্ণ-বৈষ্ণবের পরিচয়ে পরিচিত করিতে পারেন না।

যাঁহারা আপনাদিগকে সদ্‌গুরু-পাদপদ্মের এবং শাস্ত্রের বিচার ও নির্দ্দিষ্ট আচারের আদর্শে পূর্ণভাবে পরিচয় দিতে পারেন, তাঁহাদের পরিচয়ই পূর্ণ-বৈষ্ণবের পরিচয়। পূর্ণ-বৈষ্ণবের পরিচয়ে পরিচিত ব্যক্তিগণ তিলকাদির শীতল তাপ, ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র-ধারণ, কৃষ্ণদাস্য-সূচক নাম, পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র ও উপনয়নাদি পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষার সংস্কার-গ্রহণ, শালগ্রাম-অর্চ্চন এবং দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গুরু-বৈষ্ণবের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

এই পূর্ণ বৈষ্ণব আবার বৈষ্ণবতার পরিমাণ-অনুসারে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। **কনিষ্ঠ পূর্ণ-বৈষ্ণব, মধ্যম পূর্ণ-বৈষ্ণব** এবং **উত্তম পূর্ণ-বৈষ্ণব**। উত্তম পূর্ণ- বৈষ্ণবেই "এত সব ছাড়ি" আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ।" —এই বাক্য সার্থকতা লাভ করিয়াছে। ইঁহাদের সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে,—"রক্ত

বস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না যুয়ায়।" রাগমার্গীয় পরমহংসেরই সন্ন্যাস-আশ্রমের কাষায় বেষ কিংবা বর্ণের চিহ্ন উপবীতাদি ধারণের আবশ্যকতা নাই। ইঁহারা সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র, ইচ্ছা করিলে লোক-শিক্ষার্থ ঐ সকল চিহ্ন ধারণ করিতে পারেন, কিংবা সাধারণের অলক্ষ্যগতি হইয়া ঐ সকল পরিত্যাগ করিতেও পারেন। বস্তুতঃ ইঁহারা কোন শ্রেণীর বা গণের মধ্যে আবদ্ধ নহেন। ইঁহারা একায়নস্কন্ধী।

যাঁহারা "এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত এই রাগমার্গীয় বিচার অনুসরণ করিবার যোগ্যতা লাভ করেন নাই—যাঁহারা মর্য্যাদা- মার্গকেই বহুমানন করেন, সেইরূপ রামানুজীয় বৈষ্ণবগণ উত্তম পূর্ণ-বৈষ্ণব-পরিচয়ে পরিচিত হইতে পারেন না। তাঁহাদের প্রপত্তি বা শরণাগতির কথাগুলিও আংশিক ও অসম্পূর্ণ; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত শরণাগতি বা প্রপত্তির বিচার—পূর্ণতম। মহাপ্রভুর বিচারে পাদ বা অর্দ্ধের কোন কথা নাই। কি পরিচয়ে, কি ব্যবহারে, কি চেতনের বৃদ্ধির উন্মেষে—সর্ব্বত্রই পূর্ণ-বিচারের কথা শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও গোস্বামিগণের সিদ্ধান্তে অনুস্যূত রহিয়াছে।

'জাতি-বৈষ্ণব'-নামে যে একটী কথা প্রচলিত রহিয়াছে, তাহাতেও একপাদ- বৈষ্ণবের পরিচয়ই পাওয়া যায়। বৈষ্ণব-পরিচয়কে জাতি-মধ্যে আবদ্ধ করা—স্মার্ত্তবাদের আপাত-গর্হণ-মুখে স্মার্ত্তবাদেরই অত্যন্ত গর্হিত ব্যভিচার।

পাদ-বৈষ্ণবের পরিচয় যখন বৈষ্ণব-বিদ্বেষে বা আচার্য্য-বিদ্বেষের রাজ্যে পতিত হইয়া পড়ে, তখন তাহা শূন্য-বৈষ্ণব বা বৈষ্ণব-বিরোধী বলিয়া আপনাকে পরিচয় প্রদান করে। পূর্ণ-বৈষ্ণবের পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত না হইলে শূন্য-বৈষ্ণব বা বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর পরিচয় অবশ্যম্ভাবী। আধুনিক বাজারে যে-সকল বৈষ্ণবব্রুব আপনাদিগকে হোম্‌রা-চোম্‌রা-বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত করাইভার জন্য ব্যস্ত, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামিগণের আদর্শের তৌলদণ্ডে মাপিলে দেখা যায় যে, তাঁহাদের পরিচয় পাদ-বৈষ্ণব ও শূন্য-বৈষ্ণবের পরিচয় ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই সকল পাদ-বৈষ্ণব ও শূন্য-বৈষ্ণবের পরিচয়ের প্রবল বহির্ম্মুখী পিপাসা হইতে জীবকুলকে রক্ষা করিয়া পূর্ণ-বৈষ্ণবের পরিচয়ে পরিচিত করাইবার জন্যই শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার। দৈব বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপন দ্বারা শ্রীগৌড়ীয়মঠ জগৎকে এই পূর্ণ-বৈষ্ণবের পরিচয়ে পরিচিত করাইয়া ক্রমে ক্রমে উত্তম পূর্ণ-বৈষ্ণবের পদবীতে আরোহণ করাইবার রাজকীয় পথ প্রদর্শন করিতেছেন। লক্ষ্য সর্ব্বদাই পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। লক্ষ্যকেই পূর্ব্ব হইতে 'পাদ' করিয়া ফেলিলে পতন অবশ্যম্ভাবী। তাই যাঁহারা আপনাদিগকে পাদ-বৈষ্ণবের পরিচয়ে পরিচিত করিতে চাহেন, তাঁহারা তৎপরবর্ত্তী পট পরিবর্ত্তনেই আপনাদিগকে শূন্য-বৈষ্ণবের সজ্জার অভিনেতা করিয়া ফেলেন।

স্থূল-সূক্ষ্মদেহের অভিমানোত্থ জাত্যভিমান, বংশাভিমানে কখনও পূর্ণ-বৈষ্ণব-পরিচয় সিদ্ধ হয় না। একচতুর্থাংশ বৈষ্ণব, অর্দ্ধ বৈষ্ণব বা তৃতীয়াংশ বৈষ্ণবের পরিচয়,—বৈষ্ণবের নিত্য পরিচয় নহে। পূর্ণ-বৈষ্ণবের পরিচয়েই বৈষ্ণবতার প্রস্তাবনা হয়।

শ্রীধাম-নবদ্বীপ ও শ্রীধাম-পরিক্রমা

মহাবদান্যাবতার শ্রীধাম-নবদ্বীপ কলিহত জীবের প্রতি অত্যন্ত করুণ হইয়া জগতে উদিত হইয়াছেন। জগতে যত তীর্থ আছে, সমস্ত তীর্থ শ্রীধাম-নবদ্বীপে শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের চরণরজঃ লাভ করিবার জন্য সমুপস্থিত আছেন। জীবের চরম-প্রাপ্য যে শ্রীধাম-বৃন্দাবন, শ্রীগিরিগোবর্দ্ধন ও শ্রীরাধাকুণ্ড, তাহাও একমাত্র সর্ব্বাপেক্ষা অধিক করুণাময় অবতার শ্রীধাম-নবদ্বীপের অকপট সেবা-ফলেই লাভ হয়। শ্রীধাম-নবদ্বীপের কৃপায়ই নির্ম্মল জীব ঔদার্য্যের মধ্যে মাধুর্য্য এবং মাধুর্য্যের মধ্যে ঔদার্য্যের দর্শন লাভ করেন।

শ্রীধাম-নবদ্বীপে ও শ্রীধাম-বৃন্দাবনে অভিন্নবুদ্ধি উদিত হইলেই ধামের স্বরূপ দর্শন হয়। শ্রীধাম-প্রদর্শক শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায়ই শ্রীধাম-দর্শনের উপযোগী দিব্যচক্ষু লাভ হইয়া থাকে।

জগতের সমষ্টিগত অনাদিবহির্ম্মুখতা শ্রীধাম-প্রদর্শক গুরুপাদপদ্ম-নির্ণয়ে ভ্রান্ত এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপরাধ করিলে অধিকতর অন্ধ হইয়া পড়ে। তাই প্রকৃত শ্রীধাম তাঁহাদের দর্শন হয় না। কল্পনা ও অপস্বার্থাভি-সন্ধিমূলে গ্রামবুদ্ধি রাখিয়া পার্থিব ভোগ্যবস্তুতে তাহারা ধামের আরোপ করে, কখনও শ্রীধামে বাস করিবার ছলনায় কৃষ্ণকাম চরিতার্থ করিবার পরিবর্ত্তে নিজের ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়ের কামের তাড়নায় ব্যতিব্যস্ত হয়, গৌর-কৃষ্ণনাম-গ্রহণের ছলনায় নিজ নশ্বর ও জড়ীয়নাম-প্রচারে ব্যস্ত হয়।

জীবের এইরূপ দুরদৃষ্ট দেখিয়াই শ্রীধাম-প্রদর্শক শ্রীগুরুপাদপদ্ম বা শ্রীগৌরসুন্দরের নিজ-জন করুণার মূর্ত্ত-বিগ্রহরূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

এ কথা সকলকে স্বীকার করিতেই হইবে—অকপট হইয়া অবনত মস্তকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, বর্ত্তমান যুগে শ্রীধাম-নবদ্বীপের স্বরূপ ও শ্রীধামের অপ্রকাশিত মহিমার কথা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও তাঁহারই মনোঽভীষ্ট-পূরণকারিগণের অগ্রণী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ যেরূপ প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। আজ বহু দেশদেশান্তরের লোকও শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-স্থানের ধূলি শিরে ধারণ করিবার জন্য, সেই ধামের প্রভাবে আত্মশোধন করিবার জন্য, শ্রীধামবাসী আচার্য্যগণের মুখপদ্মবিনিঃসৃত শ্রৌতবাণী শ্রবণ করিবার জন্য, শ্রীধাম-পরিক্রমায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিভিন্ন লীলাস্থলী দর্শন করিবার জন্য, শ্রীধামে পরবিদ্যা অনুশীলন করিবার জন্য আগমন করিতেছেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অহৈতুকী কৃপায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের শ্রীধাম-মায়াপুর ভক্তগণের চক্ষে আবার জ্বলন্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছেন। নানা ভাবে শ্রীধামের শ্রী প্রকটিত হইয়াছেন।

শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপচন্দ্র পড়ুয়াগণকে একদিন সকল শব্দ, সকল সূত্র, সকল ধাতু 'কৃষ্ণবাচক' বলিয়া উপদেশ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই পরবিদ্যাবধূর জীবন-স্বরূপ জানাইয়াছিলেন, শ্রীরূপানুগবর শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর শ্রীল জীব-গোস্বামী প্রভু শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণ রচনা করিয়া

শ্রীগৌরসুন্দরের সেই মনোহভীষ্ট সংরক্ষণ করিয়াছিলেন; কিন্তু কাল-প্রভাবে লোকে তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল; গ্রাম্যকথা, গ্রাম্যশব্দ, গ্রাম্যসাহিত্য, গ্রাম্যশিক্ষাই জগতের স্বাভাবিক বহির্ম্মুখ অবস্থার সহিত খাপ খাইয়া মানবজাতির মস্তিষ্ক ও রুচিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল। গৌরজন জীবকুলকে তাহা হইতে রক্ষা করিবার জন্য গৌড়দেশের বিদ্যার আদি ও মূলকেন্দ্র গৌড়পুর শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌরসুন্দরের বাঞ্ছিত পরবিদ্যার পীঠ উন্মোচন করিলেন—শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণের আলোচনা সুলভ ও পরবিদ্যাপীঠে অনুশীলন করাইবার জন্য প্রেরণা প্রদান করিলেন। আবার পাশ্চাত্য-শিক্ষায় অনুরাগী শিশুগণের হৃদয়েও যাহাতে বাল্যকাল হইতে সেই "সৎশিক্ষার বীজ" অঙ্কুরিত হইতে পারে, তজ্জন্য শ্রীধাম-মায়াপুরে "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্" নামে একটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ও উন্মোচিত করিলেন।

বর্ত্তমানে আমরা বিভিন্নভাবে শ্রীধামের লুপ্তশোভা প্রকটিত ও অধিকতর উজ্জ্বল দেখিতে পাইতেছি। যাঁহারা শ্রীধাম-দর্শন ও শ্রীধাম-সেবার্থ আগমন করিবেন, তাঁহাদের সেবায় সুযোগ-প্রদানার্থ গৌরজন যে কতপ্রকারে বন্দোবস্ত করিয়াছেন ও কত নবনবায়মান উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বলিতে কি, যাঁহারা বার বৎসর পূর্ব্বে শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা বর্ত্তমানে শ্রীধাম-মায়াপুরের শ্রী দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইবেন।

জগতের সকল জিনিষ একমাত্র শ্রীভগবানের ধাম, নাম ও কাম-সেবায় নিযুক্ত হইলেই যে তাহাদের চরম সার্থকতা, এই পরম সত্যের বিজয়-পতাকা উড়াইয়াই যেন শ্রীধাম-মায়াপুর বর্ত্তমানে লোকলোচনে প্রকাশিত হইতেছেন।

শ্রীগৌরজন্মস্থলীতে শ্রীগৌরকুণ্ডের তীরে ভক্তিসুহৃৎ-তোরণ, চিন্তামণি- ধর্ম্মশালা, হরিপ্রসাদ-ধর্ম্মশালা, ইন্দ্রনারায়ণ ধর্ম্মশালা, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্ নির্ম্মিত হইয়াছেন। শ্রীবাস-অঙ্গনে সুন্দর তারিণীচরণ-ধর্ম্মশালা ও সেবকখণ্ড নির্ম্মিত হইয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈতসভায় শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর অতি সুন্দর মন্দির ও তোরণ এবং হরলাল-ধর্ম্মশালা নবনির্ম্মিত হইয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বাড়ী হইতে শ্রীচৈতন্যমঠ পর্য্যন্ত রাজপথ প্রস্তুত হইবার আয়োজন হইতেছে এবং চতুর্দ্দিকে ও পথের দুইপার্শ্বে বহু বৈষ্ণব-গৃহস্থের পল্লী বসিয়া গিয়াছে। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠের ঊনত্রিংশ চূড়ার মন্দির, তাঁহার চতুর্দ্দিকে চারিজন আচার্য্যের শ্রীমূর্ত্তি-সমন্বিত শ্রীমন্দির, গর্ভমন্দিরে শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দর এবং শ্রীগুরুবর্গের শ্রীমূর্ত্তিসমূহ ও পাদপীঠ নিত্য পূজিত হইতেছেন; পরবিদ্যাপীঠ বা সারস্বত-তীর্থে পরসাহিত্যাসন ঐতিহ্যাসন, সম্প্রদায়-বৈভবাসন, ভক্তিশাস্ত্রাসন, তত্ত্বশাস্ত্রাসন, বেদান্তাসন ও একায়নাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, চন্দ্রশেখর-ভবনে পরনাট্যমঞ্চ নির্ম্মিত হইতেছেন। শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে "দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ" নামক একটী দৈনিক-সংবাদ-পত্র প্রকাশিত হইতেছেন। এজন্য এইস্থানে নদীয়াপ্রকাশ-মুদ্রাযন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই যন্ত্রালয়ে বিবিধ ভক্তিগ্রন্থ ও "দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ"-পত্র মুদ্রিত হইয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের সংলগ্ন শ্রীরাধাকুণ্ডের ঘাটের সোপান-শ্রেণী অতি সুন্দর-ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে। শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের সমাধিরাজ বিরাজিত হইয়াছেন। অচিরেই এখানে শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইবেন। শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দিরের বরাবর শ্রীঅবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দির, শ্রীগরুড়স্তম্ভ, শ্রীতুলসীমঞ্চ প্রভৃতি রচিত হইয়াছেন। একদিকে শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকখণ্ড, আর একদিকে শ্রীভক্তিবিজয়-ভবন ও তোরণ শোভা পাইতেছেন। শ্রীচৈতন্যমঠের চূড়ায়, শ্রীনাট্যমন্দিরে, শ্রীভক্তিবিজয়-ভবনে ও সেবকখণ্ডে—সর্ব্বত্র বৈদ্যুতিক অলোকমালা সংযোজিত হইয়া বিজ্ঞানের যথার্থ সদ্ব্যবহার ও সার্থকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ঘোষণা করিতেছে। শ্রীচৈতন্যমঠের সুবিস্তৃত প্রাকার যেন সৎসঙ্গের গড় নির্ম্মাণ করিয়াছে। শ্রীচৈতন্যমঠের প্রাকারের মধ্যে ভক্তগণের আবাসের জন্য ধর্ম্মশালা ও কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছে।

এ বৎসর শ্রীধামের সেবা-প্রচারক ও শ্রীধাম-সেবকগণের সেবার জন্য একটী বাষ্পীয় যান ও দুইটী বাষ্পীয় জলযান সমাগত হইয়াছে। প্রতিবৎসরেই শ্রীধামের পথাদির উন্নতি, ধর্ম্মশালা, শ্রীমন্দির এবং বৈষ্ণবগৃহস্থগণের ভজনগৃহাদি নির্ম্মিত হইতেছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ঐ সকল হরিসম্বন্ধি-গৃহের ভিত্তি-সংস্থাপন করিতেছেন। বিশ্বম্ভরের বৈভব জগতে প্রকাশিত হইলেই কুকর্ম্মী, কুজ্ঞানী ও কুযোগী প্রভৃতির প্রাকৃত বৈভব—যাহা মানবজাতিকে বিপথগামী করিয়াছে ও করিতেছে, তাহা হইতে মানুষ ছুটি পাইতে পারে এবং নির্ম্মৎসর হইয়া বিশ্বম্ভরের সেবায় সর্ব্বস্ব সমর্পণ-পূর্ব্বক আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র শ্রীধাম-মায়াপুরের নিত্য-অধিবাসী হইতে পারেন।

শ্রীধামের বৈভব গ্রামের বৈভব বা শ্রীবৃদ্ধির ন্যায় জীবের ভোগের জন্য কল্পিত নহে। অনুক্ষণ হরিকথা-শ্রবণ ও আচরণমুখে অনুক্ষণ তাঁহার কীর্ত্তনই যে একমাত্র জীবের নিত্যধর্ম্ম, তাহা অনুশীলনের আনুকূল্য এবং গৌরকৃষ্ণের সেবাসৌষ্ঠব প্রকাশের জন্যই শ্রীধামের বৈভব। সুতরাং তাঁহার প্রতি যাহারা মৎসরতা ও হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা-বৃত্তি প্রকাশ করে, তাহারা ভাগ্যহীন। তাহাদের হৃদয় ভোগানলে জর্জ্জরিত, তাহারা কোনও দিন ত্রিতাপ-দহন হইতে মুক্ত হইয়া জীবের আত্মধর্ম্মে অভিষিক্ত হইতে পারিবে না।

শ্রীধামে নিত্যসিদ্ধভাবে সমস্ত বৈভবই পূর্ণমাত্রায় অবস্থিত আছেন। শ্রীগৌর-নিজ-জন সেই সকল বৈভবকে প্রকাশিত করিয়া বহু লোককে শ্রীগৌর-হরির সংকীর্ত্তন-রাসের মণ্ডলীতে যোগদানার্থ প্রেরণা প্রদান করিতেছেন। শ্রীধামের বৈভব-প্রকাশ-সেবা ও শ্রীগৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তন-রাস একই ব্যাপার। যাহারা সেই সংকীর্ত্তনরাস-মণ্ডলীতে যোগদান করিয়া আনন্দ-নৃত্য করিতে পারিল না, তাহারাই শ্রীধামের বৈভবদর্শনে মৎসর-ভাবযুক্ত। জগতের তাণ্ডবে তাহাদের রুচি। তাহারা কখনও ভোগী, কখনও বা ত্যাগী। তাহারা কখনও বিশ্বম্ভরের বৈভব স্ব-স্ব ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়ের তর্পণে নিযুক্ত করিবার জন্য ব্যস্ত, কখনও বা তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া ভগবানের ইন্দ্রিয়-সমূহ নাশ করিয়া ফেলিবার জন্য (?) ব্যতিব্যস্ত! ভক্তগণ ঐরূপ ইন্দ্রিয় ও নিরিন্দ্রিয়-ভোগের সেবক নহেন; তাঁহারা সকল ইন্দ্রিয়ের অধিপতি, সকল চেতন ইন্দ্রিয়ের পরিপূর্ণবৃত্তিযুক্ত

কামদেবের সেবক। এই কথা জগৎকে জানাইবার জন্যই পরম কারুণিক গৌরজন শ্রীধাম-মায়াপুরের বৈভব প্রকাশ করিতেছেন। যোগমায়াপুরের বৈভব বিস্তৃত হইলেই তাঁহার বিকৃত প্রতিফলনরূপ মহামায়াপুরের বৈভবরাশির নশ্বরতা ও হেয়তা লোকে ধরিতে পারিবে।

প্রতিবৎসর এ জন্য আচার্য্য প্রত্যেক গৃহবাসী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীকে শ্রীনবদ্বীপ-ধামের পরিক্রমায় আহ্বান করিতেছেন। কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত আমার ন্যায় গৃহমেধী গৃহপরিক্রমা করিতে করিতে নিত্যদেশের, নিত্যধামের পরিক্রমার কথা একেবারেই ভুলিয়া যায়, কত চৌরাশি-লক্ষ-যোনি ঐরূপ ভোগের গৃহান্ধকূপ পরিক্রমা করিতে করিতে এত আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়ি যে, নিত্যধামের পরিক্রমার যে কোন সার্থকতা বা প্রয়োজন আছে, তাহা উপলব্ধি করা দূরে থাকুক, কেহ তদ্‌বিষয়ে উপদেশ করিলে তাঁহার সহিত কুতর্ক করিয়া থাকি। আমাদের এই ঘুমঘোর ভাঙ্গাইবার জন্য প্রতিবৎসর আচার্য্যের শ্রীধাম- পরিক্রমায় আহ্বান। আচার্য্যের কৃপায় ও আনুগত্যে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করিতে করিতে সৌভাগ্যবন্ত ব্যক্তিগণ শ্রীগৌড়ীয়মণ্ডল-পরিক্রমা, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল-পরিক্রমা করিয়া শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রায় পর্য্যন্ত অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরজনের কৃপায় শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার মধ্যেও শ্রীগৌড়মণ্ডলের স্মৃতি অনুক্ষণ সঞ্জীবিত ছিল। শ্রীগৌরবন-পরিক্রমাকালে যেরূপ ঔদার্য্যের মধ্যে মাধুর্য্যের স্মৃতি শ্রীরূপানুগবর গৌরজন সর্ব্বক্ষণ উদ্দীপ্ত করিয়া দেন, তদ্রূপ শ্রীব্রজবন-পরিক্রমা-কালেও মাধুর্য্যের মধ্যে ঔদার্য্যের স্মৃতি শ্রীগৌরজন জাগরূক করিয়া দিয়া ''শ্রীগৌরব্রজবনে ভেদ না হেরিব, হইব রাধার দাসী''—মহাজনের এই উক্তির সার্থকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। চৌরাশিক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল- পরিক্রমার অগ্রণীরূপে সিংহাসনোপরি শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছিলেন, সকলেই শ্রীগুরু-গৌরসুন্দরের অনুব্রজ্যা করিয়া শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিয়াছিলেন। শ্রীব্রজমণ্ডলের স্থানসমূহ দর্শনকালে সকলকেই আচার্য্য শ্রীগৌরসুন্দরের পদাঙ্কিত স্থান-সমূহ দর্শন ও তত্তৎ স্থানে শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাগাথা ও শিক্ষার কথা শ্রবণ করাইয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও সেবকগণ কোথায় কোথায় অবস্থান করিয়াছেন, তাঁহারা কোথায় কি হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, কোথায় কি রূপ ভজন-লীলা প্রকট করিয়াছেন, তাহাও আচার্য্য কৃপাপূর্ব্বক সকলকে অনুক্ষণ শ্রবণ করাইয়াছিলেন।

''সিদ্ধ-ভূমিকা শ্রীবৃন্দাবন বা শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার পর প্রবর্ত্তক-ভূমিকা শ্রীনবদ্বীপ বা শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা করিবার আবশ্যকতা নাই; উচ্চসোপানে আরোহণ করিয়া আর নিম্নসোপানে অবতরণ করা উচিত নহে'',—এইরূপ ভ্রান্ত প্রাকৃত-সাহজিক-বিচার যেন আমাদিগকে গ্রাস না করে। শ্রীনবদ্বীপে ও শ্রীবৃন্দাবনে যাহাদের ভেদবুদ্ধি বর্ত্তমান, যাহাদের নিকট শ্রীধাম-বৃন্দাবন কখনও তাঁহার আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিবেন না, তাহারাই ঐরূপ অপরাধময়ী উক্তি করিয়া থাকে। শ্রীগৌরবন হইতে শ্রীব্রজবনের কোন তফাৎ নাই, কেবল শ্রীগৌরবন অধিকতর কৃপাময়। মহামুক্ত পুরুষগণেরই নিকট শ্রীব্রজবন আত্মপ্রকাশ করেন, কিন্তু শ্রীগৌরবন অত্যন্ত করুণাময় হইয়া অনর্থযুক্তগণেরও অনর্থমুক্তি করাইয়া শ্রীব্রজবনের শোভা প্রকাশ

করেন। শ্রীগৌরবনের মধ্যে শ্রীব্রজবনের পরিক্রমা হয়। শ্রীগৌরবনের পরে শ্রীব্রজবনের পরিক্রমা, আবার শ্রীগৌরবনের পরিক্রমা—এইরূপভাবে অদ্বয়জ্ঞানের পরিক্রমার চক্র ঘুরিতে থাকে। আর 'শ্রীব্রজবনে গিয়া সিদ্ধ হইয়া বসিয়া গিয়াছি'—এরূপ বিচার নির্ব্বিশেষবাদী অপরাধীর বিচার; তাহাতে অদ্বয়জ্ঞানের চক্র স্তব্ধ হইয়া পড়ে। অদ্বয়জ্ঞানের পরিক্রমার পথ সসীম নহে। তাহা শ্রীগৌরবন ও শ্রীব্রজবনের অদ্বয়তা বিধান করিয়া বর্ত্তমান। সেখানে প্রবর্ত্তক ও সিদ্ধ, ছোট ও বড়, নীচু ও উঁচু বিচার নাই। একধাম প্রবর্ত্তকের প্রতি অত্যন্ত করুণাময়, আর একধাম কেবল সিদ্ধের প্রতি আত্ম-প্রকাশক। এখানে ধামের ছোট বড় বিচার নাই। কেবল অধিকারীর যোগ্যতায় কারুণ্যের প্রকাশ-ভেদের বিচার-মাত্র প্রদর্শিত। এ-জন্যই বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও তৎপূর্ব্বে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি শ্রীরূপানুগবর আচার্য্যগণ শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার পর শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা, শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা এবং শ্রীনবদ্বীপ ও শ্রীগৌড়মণ্ডলে বাস করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ, যাঁহারা শ্রীরাধিকার গণে গণিত, সেই শ্রীস্বরূপ-গোস্বামী ও শ্রীরামানন্দ-রায়ের শ্রীব্রজমণ্ডলে গমনের কোনও কথা গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না; তাঁহারা সাধক-ক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্রেই বাস করিয়াছিলেন বলিয়া কিংবা শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ক্ষেত্র-সন্ন্যাস করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণব-গণাপেক্ষা যে ছোট, তাহা নহে। শ্রীগৌড়মণ্ডল, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল ও শ্রীব্রজমণ্ডল অভিন্নবস্তু অদ্বয়জ্ঞান। অদ্বয়-জ্ঞানে ভেদবুদ্ধিই পাষণ্ডতা।

কাজেই যাঁহারা শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় যোগদান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা করিয়া অদ্বয়জ্ঞানের পরিক্রমাকে পূর্ণ করিবেন। শ্রীনবদ্বীপের পর শ্রীব্রজ, শ্রীব্রজের পর শ্রীনবদ্বীপ, আবার শ্রীব্রজ, আবার শ্রীনবদ্বীপ—এইরূপ পরিক্রমাচক্র অনাদিকাল ভ্রমণ করিতে থাকিবে। এই পরিক্রমাই সংকীর্ত্তনরাস।

যাঁহারা 'শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শন হইয়া গিয়াছে, স্থান-দর্শনের কৌতূহল চরিতার্থ হইয়া গিয়াছে' বিচার করিয়া গৃহকূপ-পরিক্রমাকেই সারাৎসার বিচার-পূর্ব্বক হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ হারাইবেন, তাঁহারাও আত্মবঞ্চিত হইবেন। সদ্গুরু- মুখপদ্ম ও বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখ হইতে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীধামের নব-নবায়মান শোভা দর্শন হইবে; তখন আমরা শ্রীধাম, শ্রীনাম ও শ্রীকৃষ্ণকামের সেবায় ক্রমশঃ অধিক রুচি-বিশিষ্ট হইতে পারিব। অতএব সকলে শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমায় যোগদান করুন—যোগদান করিয়া হরিকথা শ্রবণ করুন। হরিকথা অনিত্য বস্তু নহে, একঘেয়ে ব্যাপার নহে, তাহা নিত্য নূতন, চরম ও পরম কল্যাণপ্রদ সন্দেশ।

গৌরনাম, গৌরধাম ও গৌরকাম

আজ শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মযাত্রা ফাল্গুন-পূর্ণিমা। আজ সকলের মুখেই গৌরাবির্ভাবের কথা শুনিতে পাই। কিন্তু মাংসদৃক্ আমার চক্ষুতে গৌরাবির্ভাবের দিনেও গৌরসুন্দরকে দেখিতে পাই না কেন? সূর্য্য আলোকমণি—স্বপ্রকাশ বস্তু। কিন্তু সূর্য্যকে দেখিবার মত সমজাতীয় বৃত্তি না থাকিলে চক্ষু থাকিতেও সূর্য্য দেখা যায় না। অন্ধের নিকট, উলূকের নিকট সূর্য্য অদৃশ্য ও অসহ্য।

রূপ দেখিবার সাধটা আমাদের হৃদয়ে সর্ব্বাগ্রেই উদিত হয়। কিন্তু এ জগতের রূপ হইলে মাংস-চক্ষু দিয়াও সেই রূপ দেখিয়া লইতে পারি। যে 'রূপ' ইহ- জগতের নয়, সেই রূপকে এই চক্ষু কিরূপে দেখিবে? সেই রূপ দেখিতে হইলে কাণের সহিত আমাদের চক্ষুদ্বয়ের যে একটা সমান্তরাল ব্যবধান-রেখা আছে, সেখানে ঐকতান সাধন করিতে হয়। কাণের সহিত চক্ষুর সুর সমানভাবে সাধিতে না পারিলে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের 'রূপ' দেখা যায় না। এ-জন্য গৌরাবির্ভাবের দিনে শ্রীগুরুপাদপদ্মই আমাদের কাণের কাছে গৌরনাম-সংকীর্ত্তন করেন।

এই গৌরনাম-সংকীর্ত্তনের মধ্যে আমরা গৌরসুন্দরের রূপ, গুণ ও মহাবদান্য- লীলা দর্শন করিতে পারি। শ্রীগৌরসুন্দর চন্দ্রগ্রহণের ছলে সকলের মুখে হরিনাম- কীর্ত্তন করাইয়া স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আর গৌরজন সকলের মুখে গৌরহরির নাম কীর্ত্তন করাইয়া অকলঙ্ক গৌরচন্দ্রের যোলকলা সকলের নির্ম্মল হৃদয়াকাশে প্রকাশিত করিতেছেন। আমাদের চক্ষু বহির্ম্মুখতা-রাহুর দ্বারা যতটা গ্রস্ত থাকে, আমরা পূর্ণ-গৌরচন্দ্রের পূর্ণ-পরিচয় প্রাপ্ত হইতে ততটা বঞ্চিত থাকি।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপ্রভু জানাইয়াছেন (চৈঃ চঃ আ ৮।২৪, ৩১),—

"কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার।।
চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।
নাম লইতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার।।"

কৃষ্ণ ও গৌরনাম উভয়েই নামীর সহিত অভিন্ন বটে; কিন্তু কৃষ্ণনামের উদারতা কেবল মুক্ত, সিদ্ধ ও একান্ত আশ্রিত জনগণের উপর। আর শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নামের ঔদার্য্যস্রোতে অনর্থযুক্ত অপরাধী জীবগণও ভোগময় অপরাধের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া গৌরকৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভ করেন। তাই শ্রীগৌর- নিত্যানন্দ নাম উদার এবং ঔদার্য্যের অভ্যন্তরে মধুর ও অনর্থযুক্ত জীবগণের যোগ্যতা-প্রদানে কৃপাময়। শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরের নামের নিকট সিদ্ধ অভিমানের ছলনা না রাখিয়া অনর্থযুক্ত অবস্থায়ও যদি আমরা উপস্থিত হই, তাহা হইলে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নাম আমাদিগকে অনর্থমুক্ত করাইয়া তাঁহাদিগের স্বয়ংরূপ ও স্বয়ং-প্রকাশের উপলব্ধি করান। তাহাতেই জীবের স্বরূপ-জ্ঞানের উদয় হয়। তাই ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

"যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তা'র হয় প্রেমোদয়,
তারে মুই যাঙ বলিহারি।
গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে,
সে-জন ভকতি-অধিকারী।।
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি' মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত-পাশ।
গৌড়মণ্ডল-ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তা'র হয় ব্রজভূমে বাস।।
গৌরপ্রেমে-রসার্ণবে, সে-তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ ব'লে ডাকে,
নরোত্তম মাগে তা'র সঙ্গ।।"

নিষ্কপটে গৌরনাম কীর্ত্তন করিলে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার রূপ-লীলা-ধাম-পরিকরাদি লইয়া জীবের নির্ম্মল চক্ষে প্রতিভাত হন। গৌরনাম-কীর্ত্তন-প্রভাবে আমরা আর তখন মাংসদৃক্ থাকি না। তখন শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমিকে চিন্তামণিরূপে দর্শন করি, তখনই আমাদের গৌরধাম দর্শন হয় এবং গৌরধামেই ব্রজধাম ও ব্রজধামেই গৌরধাম—এই অদ্বয়জ্ঞান প্রকাশিত হয়। এইরূপভাবে ধামদর্শনই —'শ্রীব্রজভূমে বাস'। ঔদার্য্যধামের মধ্যে মাধুর্য্যধাম এবং মাধুর্য্যধামের মধ্যে ঔদার্য্যধাম দর্শন হইলে প্রকৃত গৌরধাম দর্শন হইল। তখন ভোগময় গৃহ-বুদ্ধি বা ত্যাগময় বন-বুদ্ধি থাকে না। ভোগ্য গৃহবুদ্ধি বিদূরিত হইয়া "গৃহেতে গোলোক ভায়।" সর্ব্বত্র কৃষ্ণের কামসাধনপর গোলোকের অস্মিতায় চেতনের বৃত্তি ভরপুর হইয়া থাকে। সেইরূপ গৃহবাসী বা বনবাসীর অভিনয়কারী "হা গৌরাঙ্গ"—এই গৌরনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে গৌরকাম পরিপূরণ করেন।

পৃথিবীর সর্ব্বত্র গৌরনাম ও গৌরধাম প্রকট করাই গৌরকাম।

"একলা মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যা'ব।
একলা বা কতফল পাড়িয়া বিলাব।।
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায়, কেহ না পায় রহে মনে ভ্রম।।
অতএব আমি আজ্ঞা দলি সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যা'রে তা'রে।।

একলা মালাকার আমি কত ফল খাব।
না দিয়া বা এই ফল আর কি করিব।।
আত্ম-ইচ্ছামৃতে বৃক্ষ সিঞ্চি নিরন্তর।
তাহাতে অসংখ্য ফল বৃক্ষের উপর।।
অতএব সব ফল দেহ যারে তারে।
খাইয়া হউক লোক অজর অমরে।।
জগত ব্যাপিয়া মোর হবে পুণ্য খ্যাতি।
সুখী হইয়া লোক মোর গাহিবেক কীর্ত্তি।।
ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার।।" (চৈঃ চঃ আ ৯।৩৪-৪১)

গৌরকামই—কৃষ্ণকাম। হরিকীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন-ভজনের ছলনায় জীবের আত্মেন্দ্রিয়-কামের চরিতার্থতা হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে গৌরকাম বা কৃষ্ণকামের পরিপূরণ হয় না। গৌরকে নাগর সাজাইলে জীবের কামুকতার তৃপ্তি হইতে পারে, কিন্তু তাহা গৌরকাম নহে। প্রাকৃত-সহজিয়াগণের নানাপ্রকার তাণ্ডবের দ্বারা তাহাদের স্ব-স্ব ব্যক্তিগত কামের ইন্ধন সংগৃহীত হইতে পারে; কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর সংকীর্ত্তন-রাসে মহাপ্রভুর যে কামচরিতার্থ হয়, তৎপ্রতি বিমুখতাই ঐ সকল আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণময় তাণ্ডবের মধ্যে নৃত্য করিয়া থাকে। হরিকীর্ত্তনের পথের অর্গলসমূহ—হরিকীর্ত্তনের বিরোধী দুঃসঙ্গসমূহ নিরাস করিয়া শুদ্ধ হরিকীর্ত্তন-প্রচারই গৌরকাম। "অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব- আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর।।" —গৌরসুন্দরের কথিত এই দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগরূপ বৈষ্ণব-আচার-পালন-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনই শ্রীগৌর-কাম। শ্রীরূপানুগবর শ্রীগুরুপাদপদ্ম জগতে সেই গৌরকামের পরিপূরণকারী।

"শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ংরূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্।।"

শ্রীরূপ-পাদপদ্মের অভিন্নরূপ সেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম জয়যুক্ত হউন। তিনি সেই গৌরনাম, গৌরধাম ও গৌরকামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিপূরণকারীর মূর্ত্তবিগ্রহ। তাঁহার কৃপায় আমার ন্যায় বদ্ধজীব গৌরনাম, গৌরধাম ও গৌরকামের সেবায় সুদীক্ষিত হইতে না পারিলে বদ্ধজীবের অবশ্যম্ভাবী যে তিনটী বিপদ বহুরূপিণী মোহিনীমূর্ত্তি বিস্তার করিয়া জগতের সর্ব্বত্র রাহাজানি করিতেছে, তাহাতে আমরা অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িব। গুরুদেবের আনুগত্যে গৌরধামের সেবায় নিযুক্ত না হইলে নিজভোগার্থ ভূমি, রাজ্যাদি সম্পত্তি বা কনক-লাভের জন্য উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া দৌড়িব। আর গুরুদেবের আনুগত্যে গৌরকাম-পরিপূরণের সেবায় অভিনিবিষ্ট না হইলে স্ব-স্ব ব্যক্তিগত কামচরিতার্থ করিবার জন্য সমগ্র জগৎকে কামুকের দৃষ্টিতে কামিনীর ন্যায় দর্শন করিয়া তৎপ্রতি ধাবিত হইব। কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা-বাঞ্ছার মধ্যে প্রতিষ্ঠাবাঞ্ছাটাই সকলের অগ্রণী ও

প্রধান বলিয়া শ্রীগুরুদেব সর্ব্বাগ্রে আমাদের কর্ণে গৌরনাম প্রদান করেন। অনুক্ষণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবার সহিত সেই গৌরনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে আমরা তখন শ্রীচৈতন্যবাণীর তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি,—

জগৎ ব্যাপিয়া মোর হ'বে পুণ্য খ্যাতি।
সুখী হইয়া লোকে মোর গাহিবেক কীর্ত্তি।।

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কীর্ত্তির প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মাহুতিই শ্রীগৌরনাম-কীর্ত্তন এবং তৎসঙ্গে-সঙ্গেই শ্রীগৌরধাম ও শ্রীগৌরকামের সেবা।

ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব ও বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ

যে শ্রীল আনন্দতীর্থ মধ্বাচার্য্য বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যযুগীয় মূলপুরুষ, তাঁহার সদ্‌বৈষ্ণব-সম্প্রদায় আপনাদিগকে 'মাধ্ব' বলিয়া বিচার করেন। শ্রীমাধ্বগণের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমাধ্ব-আচার্য্যকুলকে পবিত্র করিয়াছেন। তাঁহার অনুগত মাধ্ব-গৌড়ীয়গণ সকলেই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণেতর কুলজাত পরিচয়ে যাঁহাদের শরীর লাভ হইয়াছে, তাঁহাদের গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে হইলে সর্ব্বাপেক্ষা দৈন্য-পরিচয়ে ব্রাহ্মণতা স্বতঃসিদ্ধ। মূঢ় অর্ব্বাচীন জনগণ কোন কোন পরমহংস গৌড়ীয়াচার্য্যকে সংস্কার-গ্রহণে বিরত দেখিলেও, অপরাধ পরিত্যাগ করিলে তাহারা জানিতে পারিবে যে, গৌড়ীয়-আচার্য্যগণ ব্রাহ্মণোত্তম। অদৈব-বর্ণাশ্রমবিচারে মূর্খ, অজ্ঞ, অশাস্ত্রীয়গণের ধারণা তাঁহাদের চরণে অপরাধ করায় বলিয়া হরিহোড়, ঠাকুর রঘুনন্দনের অধস্তনগণ ও শ্রীশ্যামানন্দ-রসিকানন্দ-বংশে তাৎকালিক-ভাবে সংস্কারের পদ্ধতি চিরদিন প্রচলিত আছে এবং পাঞ্চরাত্রিকী সাত্ত্বতদীক্ষায় ইহ-প্রাকট্যেই সংস্কার-বিধি পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত থাকায় অসংস্কৃত থাকিবার পরিবর্ত্তে সংস্কৃত হওয়া দৈন্যের পরিচয় মাত্র। সমাবর্ত্তন করিয়া যাঁহারা গৃহে প্রবেশ করিবার পর ভগবান্ বিষ্ণুর মন্ত্রে দীক্ষিত হন, তাঁহাদের বারাহী দীক্ষা, নারসিংহী দীক্ষা ও রামানন্দী দীক্ষা প্রভৃতি সংস্কার-পদ্ধতি-অনুসারে তাঁহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিবার পরিবর্ত্তে বিচক্ষণ কোবিদ্‌গণ কর্ত্তৃক বিপ্রাখ্যায় কথিত হন। ব্রাহ্মণাখ্যা সাধারণ লৌকিক-বিচারে ও বর্ণবিচারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে,—এবিষয়ে কাহারও আপত্তি উত্থাপিত হওয়া উচিত নহে। অনচ্যুত-গোত্রিয় ঋষিকুল বা বৈষ্ণব গৃহস্থ-সমাজ ব্রাহ্মণ-সমাজের বিচার মতে চিরদিনই জগতের অক্ষিতে ও ভাষায় ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত আছেন। কালপ্রভাবে কুশিক্ষার তাড়নায় কোন কোন স্থলে বৈষ্ণবনিন্দকগণেরর দ্বারা তাঁহাদের প্রাগ্ বর্ণের পরিচয় দিয়া বৈষ্ণবনিন্দকগণকে বৈষ্ণবাপরাধী করা হয়। উহাদিগকে অপরাধপঙ্ক হইতে মুক্ত করিবার জন্য গৃহীত-সংস্কার ঋষিকুল দৈন্যসূচক সংস্কারাদি গ্রহণ করেন। মূর্খ ও অর্ব্বাচীনের মধ্যে গৃহস্থ-জীবনের সংস্কার ত্যাগ করাও প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় উহারা বৈষ্ণব-মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিবার স্বভাব লাভ করিয়াছেন, তাহা দৈন্য নহে, শাস্ত্র ও গুরুদ্রোহ মাত্র। পরমহংসাধিকারে সংস্কারের আবশ্যকতা

নাই বলিয়া পরমহংসেতর অবস্থায় উহার প্রয়োজনীয়তা নাই—এরূপ বিচার মূর্খতা ও অদূরদর্শিতার অন্তর্গত। গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ যদি আপনাদিগকে বৈষ্ণবব্রুব বলিয়া অবৈষ্ণব-স্মার্ত্তের অনুকরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অশিক্ষিত বলিয়াই জানিতে হইবে।

অদৈব-বর্ণাশ্রমের বিধি-নিষেধসমূহ দৈব-বর্ণাশ্রমের বিধি-নিষেধের সহিত সমতা-প্রয়াসী জনগণ প্রকৃত-প্রস্তাবে অশিক্ষিত-পর্য্যায়ে গণিত হইবার যোগ্য। দৈব-বর্ণাশ্রম-বিচারটী পার্থিব রাজ্য হইতে অন্তরীক্ষ প্রদেশে অথবা অমরপুরীতে দেশান্তর লাভ করাইলে জগতে রজস্তমোগুণের প্রাধান্যই সাত্বত বিচারকে বিপন্ন করাইবে, সন্দেহ নাই। যাহারা গুরুদ্রোহ করিয়া আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া প্রসিদ্ধি-লাভের দুরাকাঙ্ক্ষা করে, তাহারা কখনও বৈষ্ণবসমাজের অন্তর্ভুক্ত নহে। এজন্যই খৃষ্টীয় বিংশ-শতাব্দীর প্রারম্ভে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনঃস্থাপনে ব্রতী হইয়াছেন।

বিষ্ণুভক্তিরহিত পঞ্চোপাসক বা নির্ব্বিশেষবাদী সেবকসম্প্রদায় আপনাদিগকে বিপ্রকুলজাত বলিয়া প্রচার করিতে সর্ব্বতোভাবে যোগ্য, কিন্তু যামল-পঞ্চরাত্র বলেন, কলিকালে ব্রাহ্মণব্রুবগণের সর্ব্ববাদিসম্মত ব্রাহ্মণতা নাই, উহাতে বিবাদ উপস্থাপিত হইয়াছে। তজ্জন্য সাত্বত পঞ্চরাত্রের বিধান মতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অবিচারিত বিধান অভক্তকুলে যে-প্রকার স্থান লাভ করিয়াছে, তাহা হইতে উহাদিগকে সংরক্ষণ করা পরম প্রয়োজনীয়। এই হেতু 'হরিভক্তিবিলাস' ৫ম বিলাসের প্রারম্ভে যামলবচন উদ্ধার করিয়া কর্ণাট-বিপ্রকুলেন্দ্র শ্রীমধ্বান্বয় শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু ও আন্ধ্র-বিপ্রকুলতিলক ত্রিদণ্ডিস্বামিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রভু শ্রীহরিভক্তিবিলাস-সঙ্কলনকালে এই বিচারের আবাহন করিয়াছেন; উহা বৈষ্ণবস্মৃতিপাঠকগণের বা পঞ্চরাত্রাচার্য্যগণের প্রকৃষ্ট সিদ্ধান্ত। নারদ-পঞ্চরাত্রে যে-প্রকার বিধান কথিত হইয়াছে, তাহা শুদ্ধগৌড়ীয়-বৈষ্ণব বা মাধ্বগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ চিরদিনই পালন করিয়া আসিতেছেন। শিক্ষার অভাবে শাস্ত্রালোচনার পরিবর্ত্তে আক্রীড়-ভূমিকায় বৈষ্ণব-স্মৃতির আদর ন্যূনাধিক লোপ পাওয়ায় কেবল বিষ্ণুভক্তিবিরোধী ও শাস্ত্রের একদেশদর্শী সমাজ বিভিন্ন ব্যবস্থা করিতেছেন জানিয়া মুষ্টিমেয় শুদ্ধমাধ্বগৌড়ীয়-ব্রাহ্মণ-সমাজ প্রপঞ্চে স্বধর্ম্ম-পালনবিধির আদর শিক্ষা দিতেছেন। বদ্ধজীবের অজ্ঞান-নাশের জন্য বিষ্ণু-ভক্তির প্রসার-কামনা তাঁহাদের আচার্য্য ও শাস্ত্র-সেবার অন্যতমতা লাভ করিয়াছে। অভক্ত স্মার্ত্তগণের বিচারে যে দোষ প্রবেশ করিয়াছে, তাহা হইতে পৃথক্ হইবার জন্য শুদ্ধবৈষ্ণবগণ বিদ্ধগৌড়ীয় ত্রয়োদশ প্রকার অপসম্প্রদায়ের সহিত তাঁহাদের নিজ পবিত্রতাকে স্বতন্ত্রভাবে রাখিতেছেন।

অদৈব-বর্ণধর্ম্মাশ্রিত বিচারাবলম্বনে যে-সকল চিন্তাস্রোত বৈষ্ণব-স্মৃতিকে ক্ষুণ্ণ করিতেছে, সেই সমস্ত বিচার পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বিশেষ শাঙ্কর-মতান্তর্গত পঞ্চোপাসক-সম্প্রদায়ের সহিত পৃথক্ হইয়া বৈষ্ণব-স্মার্ত্তগণ বিষ্ণুভক্তির চিরদিনই পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন। চতুর্ব্বেদীয় কাত্যায়ন গৃহ্যসূত্রাদি সংস্কারের কথা বলিয়া পাঞ্চরাত্রিক পঞ্চসংস্কারের যোগে পঞ্চদশ সংস্কারে সুষ্ঠু ব্রাহ্মণতার স্থাপন করিয়াছে, আর পাঞ্চরাত্রিক বিধান-মতে 'তত্ত্বসাগর' প্রভৃতি স্মৃতিনিবন্ধ, যাহা অভক্ত স্মার্ত্তাগ্রণীগণের দ্বারা পরমাদৃত

হইয়াছে, উহার বিধানও বৈষ্ণব-স্মৃতি হরিভক্তিবিলাসে স্থান পাইয়াছে। বৈষ্ণব-স্মৃতিরাজগণ সকলেই সমস্বরে বলিয়া থাকেন যে, বিষ্ণু-শিলাবতারের—যাঁহাকে গণ্ডকী ও গোমতী শিলা বলে, তাঁহার সেবা করিবার অধিকার একমাত্র বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত সাত্বত-সংস্কারে সংস্কৃত ব্যক্তি-মাত্রেরই আছে। অভক্ত স্মার্ত্তগণ ইঁহাদের সহিত মতভেদ করেন। শ্রীসনাতন গোস্বামীর সঙ্কলিত ও শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর সম্পাদিত শ্রীহরিভক্তি-বিলাস তত্ত্বসাগরোদ্ধৃত বচনানুসারে যে-কালে বৈধ- সংস্কারসমূহ গৌড়ীয়গণের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত করেন, তাহার অব্যবহিত ৫০ বৎসর পরে গৌড়ীয়-গগনে প্রবল ঝটিকায় অনেকস্থলে ভক্তিবিচার বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। কমলাকর-লিখিত 'নির্ণয়সিন্ধু' যদিও হরিভক্তিবিলাসের সম- সাময়িক বা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সঙ্কলিত হইয়া পাশ্চাত্যদেশে অভক্তির কথা সংরক্ষণ করিয়াছিল, তথাপি শ্রীল কবিরাজগোস্বামী পাশ্চাত্যদেশে-প্রচলিত কমলাকর-সঙ্কলিত পদ্ধতিকে অহঙ্কারবিমূঢ়াত্ম প্রাকৃতস্মৃতি বলিয়া অনাচার-শিক্ষাদান ও মূঢ়-বিমোহনের পদ্ধতি বলায় দৈব ও অদৈব-বিচারে পার্থক্য তৎকালাবধি চলিয়া আসিতেছে। বঙ্গদেশেও শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও তদনুগত শান্তিপুরের রাধামোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বৈষ্ণবধর্ম্মবিশ্বাসের প্রচুর পরিমাণ ব্যাঘাত করিয়াছেন। ইঁহারা ব্যাঘাত করিয়াও ব্রাহ্মণেতর বৈষ্ণবতা একেবারে নষ্ট করিতে পারেন নাই। তবে বৈষ্ণবের ব্রাহ্মণতা বিষয়ে মতভেদ স্থাপন করিয়াছেন। ঐ মতভেদের ফলে ভগবদ্ভক্তির প্রচার ভাগ্যহীন জনগণের মধ্যে যথাযথ কার্য্যকরী হয় নাই। বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণতায় সংস্কার-গ্রহণে বিমুখতা বশতঃ গৃহীতমন্ত্রে বিষ্ণুপূজাধিকার রহিত হওয়ায়—বিষ্ণুর সহিত অপর আধিকারিক দেবতাগণকে সমশ্রেণীতে স্থাপন প্রভৃতি অবিচার-সমূহ গ্রহণ করায় সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত শ্রীমদ্ভাগবত ও চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সুষ্ঠু বিচারপ্রণালী—ব্রহ্মসংহিতা ও পাঞ্চরাত্রিক-বিচার প্রণালী অনেক অনভিজ্ঞ ব্যক্তি জানেন না বলিয়া তাঁহারা বিষ্ণুভক্তিতে উদাসীন হইয়া আপনাদিগকে বৈষ্ণবব্রুবত্বে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন, তজ্জন্যই পরবিদ্যাপীঠ ও পরবিদ্যার চর্চ্চা—যাহা শ্রীগৌরসুন্দর একদিন শ্রীধাম-মায়াপুরে প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহার পুনরুজ্জীবিত হওয়াই সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছিত বলিয়া বিদ্বদ্রূঢ়ির স্থান সর্ব্বোপরি। বৈকুণ্ঠ ও ক্ষণভঙ্গুর তদিতর লোকাদির পরস্পর বৈশিষ্ট্য রূঢ়িবৃত্তিতেই চিদ্বিলাস আবাহন করিয়াছে। সেই চৈতন্যচরিত সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করিবার জন্যই পরবিদ্যাপীঠ।

যাঁহাতে ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব ও বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে প্রণয় বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য গৌড়ীয়গণ সর্ব্বক্ষণ প্রচুর পরিমাণে যত্ন করিতেছেন। তাঁহারা শিক্ষামন্দির স্থাপন, শিক্ষকের দ্বারা সাধারণ লোকের নিকট প্রচার, পারমার্থিক বা সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী উন্মোচন ও সদ্গ্রন্থ প্রচার এবং শাস্ত্রসমূহের ভক্তিপর ও অভক্তিপর ব্যাখ্যাদি বিশ্লেষণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। ইহাতে ভক্তিবিদ্বেষী ও সৎশিক্ষাবিরোধিগণ যতই আরক্তচক্ষু হউন না কেন, শিষ্ট শিক্ষক যেমন দুষ্ট বালকগণকে যেরূপেই হউক সর্ব্বদা সৎপথে আনয়ন করিতে চেষ্টা করেন, তদ্রূপ গৌড়ীয়গণও যেন সকলকে শিক্ষা দিতে পারেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

কুশিক্ষারত জনগণ নানা অজ্ঞতা ও ইন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যস্ত থাকিয়া মাধ্ব-গৌড়ীয়গণের প্রতি যতই অনাদর প্রদর্শন করুক না কেন, তাহাদের কুবিচার আর কতদিন রক্ষা করিতে পারিবে, আমরা জানি না। আমাদের সহৃদয় প্রার্থনা—'গৌড়ীয়'-পত্র প্রত্যহ তিনবার করিয়া প্রকাশিত হইলে এই সকল কথা সুষ্ঠুভাবে পঞ্চগৌড়ে ও পঞ্চদ্রাবিড়ে প্রচারিত হইবে। পঞ্চদ্রাবিড়ের অধিকাংশ লোকই বাঙ্গালা জানেন না। পঞ্চগৌড়ের চতুর্থ-পঞ্চমাংশ ব্যক্তিও বাঙ্গালা জানেন না। সুতরাং ইংরেজী, উর্দ্দু, গুজরাটি প্রভৃতি ভাষার সাহায্যে বেদবেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য, শ্রৌত ও গৃহ্য শাখাগণের প্রকৃত তাৎপর্য্য সুপ্রচারিত হওয়া আবশ্যক। শ্রীগৌরসুন্দর একদিন কর্ণাট-বিপ্রদ্বয়কে, তাঁহাদের ভ্রাতুস্পুত্রকে, দাক্ষিণাত্যে আন্ধ্র-দ্বিজকে ও শ্রীদাসগোস্বামীপ্রভুকে শ্রীধাম-বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন। তৎফলে তৎকালে প্রচার হইলেও কালধর্ম্মে লোকরুচি সেই সকল কথা আবার সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিয়াছে। সুতরাং নিখিল লোক-মঙ্গলের জন্য উহা পুনরুজ্জীবিত হওয়া আবশ্যক।

স্মার্ত্তকুল ও সদ্ধর্ম্ম-বিরোধী ব্যক্তিগণের পাদপদ্মে পতিত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের কথা যদি দৈন্যসহকারে জ্ঞাপন করা যায়, তাহা হইলে একেবারে সেই সকল কথায় বধির হইয়া থাকিবার জন্য এক শ্রেণীর লোক থাকিলেও অধিকাংশ লোক প্রীতির সহিত ভগবানের ভজন করিবেন। আমাদের ন্যায় লোক বুঝিয়া উঠিতে পারে না বলিয়াই কনিষ্ঠাধিকারোচিত ও মধ্যমাধিকারোচিত বিষ্ণুভক্তির কথা জগতে প্রচারিত হউক। তাহা হইলে—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ।।"—কথাটী বুঝিতে পারা যাইবে—ঢাকার সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর অতি মূল্যবান্ উপদেশের মধ্যে প্রবেশাধিকার হইবে। নতুবা মায়ার বিকার দর্শককে ত্রিগুণতাড়িত করিয়া বিপথগামী করিবে। এ-কথা প্রদর্শক শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণে জগৎ জানিতে পারিয়াছেন। আংশিক দ্রষ্টৃগণ বহু অংশের সমাবেশে পরমাত্মার যে চিত্র হৃদয়ে অঙ্কন করেন, অথবা নির্ব্বিশেষবাদিগণ জাগতিক যাবতীয় বিষয়ের খণ্ডধর্ম্ম পরিহার করিয়া যে নির্ব্বিশেষ কল্পনা করেন, ঐ নির্ব্বিশেষ চিৎসবিশেষ হইতে পৃথক্ মায়ার ক্রিয়া বলিয়া উহা মায়াবাদ-পদ্ধতিতেই অবস্থিত,—এ-কথা ভগবদ্ভক্তগণ বুঝিতে পারেন। সুতরাং তাঁহারা পঞ্চোপাসকের পদ্ধতি-গ্রহণের পরিবর্ত্তে পঞ্চোপাসনার সম্মান করিতে গিয়া বিষ্ণু-নৈবেদ্যের অবশেষ-দ্বারাই বিষ্ণুপ্রেরিত আধিকারিক দেবগণকে বিষ্ণুশক্তিগত পরিচয়ে বিষ্ণুকিঙ্কর-জ্ঞানে তাঁহাদের উপাসনা করিয়া থাকেন। কাত্যায়নীর পূজা ও সোমলৌলীর পূজা বঙ্গদেশে প্রবল, তদ্ব্যতীত গণপতির পূজাও প্রচলিত আছে। তিরুবত্তর হইতে সংগৃহীত শ্রীগৌরসুন্দরের মহাদান পঞ্চমাধ্যায় ব্রহ্মসংহিতা সূর্য্য ও গণেশাদি পঞ্চদেবতার ভগবদ্ভক্তির কথা সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং আশ্রয়- জাতীয় কৃষ্ণবিচারে পঞ্চোপাসকের অবিধিপূর্ব্বক সেবা পরিবর্ত্তিত হইয়া গুরু-জ্ঞানে আশ্রয়জাতীয় পূজায় দীক্ষিত হইতে পারিলে আমরা পুনরায় ভগবদ্ভক্তির পুনরাবাহন দেখিতে পাইব।

জাতি-বিচার

পরমার্থি-বৈষ্ণব বা পারমার্থিক বৈষ্ণব-সমাজের প্রতি জাতিবুদ্ধি করিতে নাই। জাতিবুদ্ধি করিলে অপরাধ হয়। পারমার্থিক বৈষ্ণব সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সুতরাং তিনি একায়ন স্কন্ধী। বেদ-শাখা-সমূহের ভেদময় বিভাগ তাঁহাকে স্পর্শ করে না। তিনি সত্যযুগে 'হংস'-নামধারীর অধস্তন বলিয়া পরিচিত।

সত্যযুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ ও শূদ্র—এই বর্ণচতুষ্টয়ের বিভাগ হয় নাই। ত্রেতার প্রারম্ভে সত্যধর্ম্মের একপাদ হানি হওয়ায় এই প্রকার জাতি-বিভাগ উৎপন্ন হইয়াছে। তাহা হইলেও পারমার্থিক হংসজাতি চিরদিনই একায়ন-পদ্ধতি- বিচারে বৈদিক ব্রাহ্মণোত্তম।

সত্যযুগ অতীত হইবার পরেও ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে বর্ণ-ধর্ম্মের বিচার পরিলক্ষিত হয়। শৌক্রবর্ণ-বিচার ব্যতীত বৃত্তগত ব্যক্তিগত বর্ণ-বিচার চিরদিনই ভারতবাসীর নিকট পরিচিত। মহাভারত ও পুরাণাদি ঐতিহ্য-শাস্ত্রসমূহ এই সকল কথা অতি বিশদভাবে প্রমাণিত করেন। তজ্জন্যই পারমার্থিক ব্যক্তি-বিশেষকে শৌক্র-বর্ণান্তর্গত করিবার বিচার কোন দিনই শাস্ত্র-শিক্ষিত-সম্প্রদায়ে স্থান পায় নাই।

শ্রীনারদ, শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস প্রভৃতি পারমার্থিক আচার্য্যগণের বিচারানুকূলে ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের পরবর্ত্তিকলিযুগে শ্রীশঠকোপদাস প্রমুখ আলোয়ার-চতুষ্টয় সংস্কৃত ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ না করিয়াও "সর্ব্বে ব্রহ্মজা ব্রাহ্মণাশ্চ" প্রভৃতি শ্রৌত বিচারে পরমোত্তম ব্রাহ্মণের শ্রেণীভুক্ত হইয়া "দিব্যসূরি" আখ্যা লাভ করিয়াছেন।

পরবর্ত্তিকালে সহস্র বৎসরের মধ্যে নানক, কবীর, দরিয়াদাস প্রভৃতি বিভিন্ন-কুলজাত মতবাদের আচার্য্য-নিচয়ও ন্যূনাধিক হংস-জাতির বিচার-পদ্ধতি-ক্রমে ভারতীয় অদৈব বর্ণাশ্রমেও পূজিত ও সম্মানিত হইয়াছেন। তাঁহাদের অনুকূল শাস্ত্র-সমূহও শিষ্ট-সমাজে চিরপরিচিত। উদার শিক্ষার অভাবে শ্রেণীবিভাগ-সমূহের মধ্যে বংশপরম্পরাগত বর্ণ-বিচার ন্যূনাধিক আদৃত হইলেও তাঁহারা প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ বর্ণোচিত সম্মানাদি প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হন না। শিষ্টাচার-বিগর্হিত বিচার যেকালে মৎসরতার করাল-কবলে কবলিত হয়, সেই কালেই নানাপ্রকার কুতর্ক আসিয়া কৃষ্ণের অধিষ্ঠান-বর্জ্জিত বদ্ধজীবে অনাদৃত ক্রিয়ার সন্দর্শনে উহাদিগকে যথাযোগ্য স্থান দিবার পক্ষে বিমুখতা দৃষ্ট হয়।

সনাতনধর্ম্মের শ্রুতি, স্মৃতি, পঞ্চরাত্র ও পুরাণ—এই চারিপ্রকার শাস্ত্র-মালায় ন্যূনাধিক হংসজাতীয় একায়ন-পদ্ধতির সম্মানমুখে বিচিত্র উপদেশ শুনিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রানুকূল পদ্ধতি-বিশেষ অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন শাখার বিভিন্ন বিচার প্রবর্ত্তিত আছে। এক শাখা অপর শাখার বিচার সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ না করিলেও বিবাদের ছলনায় পরস্পরের সামাজিক গৃহ্য ও শ্রৌত বিধিকে আক্রমণ করেন না এবং নিজ-নিজ বিধিও পরিত্যাগ করেন না। যে-সময়ে কোন শাখা নিজ-বিধির প্রতি উদাসীন হইয়া শ্লথভাব প্রদর্শন করেন বা অন্য বিধির অনুগমন করার যোগ্যতা বিচার করেন, সেইকালে উহার বিচার-পদ্ধতিতে ন্যূনাধিক ভেদ দৃষ্ট হয়।

বদ্ধদশায় জীবের তাৎকালিক বিচারে ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা অবস্থান করায় নিজ-নিজ বিচারপদ্ধতিকেই বদ্ধজীব সম্মান করিয়া থাকেন। মুক্তির লক্ষণ-বিচারে ঐহিক ও পারমার্থিক-বিচার-ভেদ থাকায় ঐহিক-বিচারে পারমার্থিক বিচারকে আক্রমণ না করিয়া যাঁহারা নিরপেক্ষ থাকেন—অবস্থা- বিশেষের বিচার মনে করেন, অপস্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা আত্ম-কলঙ্কিত করিবার অবকাশ পান না। পরন্তু এই গুণজাত জগতে স্ব স্ব প্রবল গুণাধিকারে নিযুক্ত থাকিয়া তামস প্রকৃতির ব্যক্তিসকল সদ্‌গুণ-বিনাশের বিচার আবাহন করেন এবং কখনও বা রাজস প্রকৃতি-বশে সাত্বতদিগের প্রতি অবিচার করিয়া বসেন। কখনও বা আত্ম-পরিচয়ে সাত্বতাভিমানে ভাগবত-বিরোধী-বিচার-প্রণালী দেখাইয়া এবং নিজ-সংশোধন প্রার্থনা না করিয়া অসৎগর্ব্বে স্ফীত হন। কিন্তু পারমার্থিকগণ বিশুদ্ধ সত্ত্বে সর্ব্বক্ষণ অবস্থিত থাকায় নির্ম্মৎসর এবং রজস্তমোগুণময় বিচার-পদ্ধতির আক্রমণকারী নহেন।

শ্রীগৌরসুন্দর অনুগত শুদ্ধ গৌড়ীয়গণ কোন ক্রমেই রজস্তমোগুণতাড়িত বিচারের পুষ্টি সাধন করেন না। তাঁহারা দুঃসঙ্গজ্ঞানে সাত্বত-বৈষ্ণব-ব্রুবগণের নিকট হইতে সতসহস্র যোজন দূরে থাকেন। সাত্বত সংহিতার মহিমা-বিস্তার-কল্পে তাঁহাদের চেষ্টা অনুক্ষণ প্রশংসনীয়া। তাঁহারা শাস্ত্রের তাৎপর্য্যোপলব্ধিতে পারঙ্গত হইয়াও, যাহাতে বদ্ধবিচার প্রবল হয় এবং ভগবদ্ভক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয়, সেই সকল ব্যাপারে যে শাস্ত্রের শাসন-সমূহ আছে, উহার মর্য্যাদা বুঝিতে পারেন।

শুদ্ধ আচার্য্যের অনুগমনই শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত একায়ন স্কন্ধী পারমার্থিক ভক্তগণের আসন। তাঁহারা জানেন যে, পদ্মপুরাণ বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিকারী জনগণের অসদ্‌গতি বর্ণন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা কোন দিনই বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করেন না—স্ত্রী-জাতি ও পুরুষ-জাতি এবং বিশুদ্ধসত্ত্বময় সদ্- গুণাবস্থিত সম্প্রদায়, শ্রৌত বা বৈদিক বেদজ্ঞ, সদাচার-সম্পন্ন ব্রাহ্মণজাতি, কেবল পুণ্যাচারযুক্ত ব্রহ্মজ্ঞ বিচার হইতে স্থানান্তরিত ক্ষাত্রজাতি, বৈশ্যজাতি ও শূদ্রজাতি, সঙ্কর অনুলোম, প্রতিলোম, অপসদ, অপধ্বংসজ জাতি-সমূহের বিচার শুদ্ধ পারমার্থিক বিচারের অনুকূল নহে বলিয়াই জানেন। তাই বলিয়া তাঁহারা পরমার্থ-বিরোধী, শাস্ত্র-বিদ্বেষী ও ভক্তি-বর্জ্জিত হইয়া উহাদের বিভিন্ন শ্রেণী-নির্দ্দেশেরও বিরোধী হন না। শুদ্ধ বৈষ্ণবকে অর্থাৎ কাপট্যরহিত বিশুদ্ধ পারমার্থিককে লৌকিক জাতি-বিভাগের মধ্যে বাধ্য করিতে তাঁহাদের যত্ন নাই। যাঁহাদের ঐরূপ যত্ন থাকে, তাঁহারা বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি করিয়া পরস্পর জটিল- বিবাদ-সূত্র পাকাইতে থাকেন এবং আপনাদিগকে তার্কিক-অভিমানে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির অবমাননা করিতেও পশ্চাৎপদ হন না।

শ্রীরূপানুগ মাধ্বগৌড়ীয়-বিচারপটু হইতে হইলে শুদ্ধভক্তের সঙ্গ করা আবশ্যক। নতুবা খর্ব্বদৃষ্ট ও জাগতিক আধ্যক্ষিক ইন্দ্রিয়-তাড়না জীবগণকে অধিকতর তিমিরে প্রবেশ করাইয়া চারিদিকে অন্ধকার দেখায় এবং দৃষ্টি-শক্তির ক্রিয়া স্তব্ধ হইলে বর্ত্তমান-কাল-প্রচলিত সমন্বয়বাদের বিকৃত বিচার তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে।

মূর্খ অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ নিজেদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির বিচার-গ্রহণে অসমর্থ বলিয়াই জাগতিক বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহ শ্রেণী-বিভাগ-ক্রমে শিক্ষার উচ্চাবচত্ব স্থাপন করিয়াছেন। তামসিকতার বা অপর-বিনাশবাদের অবলম্বনে যে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-সমূহ বদ্ধজীবের কায়মনোবাক্যকে বিনাশ করিবার যত্ন করে, ঐ প্রকার তথাকথিত সমন্বয়-বাদ হইতে যে একাকার-পদ্ধতির উদয় হয়, সমন্বয়ের পরিবর্ত্তে উহাকে নিরপেক্ষ বিচারকগণ ভগবদ্‌বিমুখতা-জনিত অপস্বার্থ বলিয়া নির্ণয় করেন।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়গণ বিশুদ্ধ পারমার্থিক। তাঁহারা শ্রীরূপানুগ কোবিদাগ্রগণ্য বৈষ্ণবগণের অনুবর্ত্তী এবং বন্ধ ও মোক্ষের সকল অবস্থার পরিদর্শক, সুতরাং প্রকৃত সৎ-পাণ্ডিত্যে বিভূষিত। জড়ভাষাগত পাণ্ডিত্য ও ব্যবহার তাঁহাদিগকে কখনই আবদ্ধ করিতে না পারায় তাঁহারা শ্রীপুরুষোত্তমের মুক্ত সেবক বা ভক্ত। পুরুষোত্তম বস্তু বিষয়-বিচারে আশ্রয়-পুরুষোত্তমের একমাত্র আরাধ্য। বিষয়াশ্রয়গত পুরুষোত্তম-মণ্ডলী "ভাগবত পরমহংস" নামে প্রসিদ্ধ পারমার্থিক। মাধ্বগৌড়ীয়গণ তাঁহাদেরই বিচার পোষণ ও অনুগমন-পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যের উপদিষ্ট সৎশিক্ষা খর্ব্বদৃষ্টিযুক্ত আধ্যক্ষিকগণের নিকট উপস্থাপিত করিয়া অপ্রাকৃত বিচারের দিঙ্ নির্ণয় করেন। বৈষ্ণব-দিগ্‌দর্শনী দৃষ্টি কখনও বদ্ধজীবের আরাধ্য বিষয় হয় না। যে-সকল মৎসর বদ্ধজীব ভাগবত-দিগ্‌দর্শনীতে দোষ দর্শন করেন, তাঁহারা পরমার্থ-বিরোধী বলিয়া ভাগবতগণ তাঁহাদের নিকট কোন ভিক্ষা লাভ করেন না। কুতর্কের আশ্রয়ে ভাগবত-ধর্ম্মের উৎসাদনই তাঁহাদের বিচারানুকূল। পুরুষোত্তমাশ্রয়ের ছলনায় বাহিরে আপনাদিগকে আশ্রিত পুরুষোত্তমের অনুগত বলিয়া প্রচার করিয়া তাঁহারা নিয়ত আশ্রয়-জাতীয় পুরুষোত্তমের ও শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের প্রতি আক্রমণ করিবার প্রবৃত্তিতে অবস্থিত। তাঁহাদের মঙ্গলের জন্যই যে মাধ্বগৌড়ীয়গণ সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী প্রকট করেন, তাহাতে অনুকূলভাবে গ্রহণ করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহারা আপনাদিগকে জড়বদ্ধ, গুণ-তাড়িত অবস্থা- বিশেষ-প্রাপ্ত জীবজ্ঞান করেন এবং পারমার্থিকগণকেও তাঁহাদের সমজাতীয় রজস্তমোমিশ্র-সত্ত্ব-প্রতিম ভাবযুক্ত জ্ঞান করেন। সুতরাং শুদ্ধবৈষ্ণবের প্রতি বিকার-বুদ্ধি-চালিত হইয়া তাঁহার স্কন্ধে অপারমার্থিক জাড্য চাপাইয়া দিবার অভিনয় তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকস্থলেই দেখা যায়।

ভগবদ্‌বিমুখ বদ্ধজীবগণের মধ্যে মৎসরতা বা হিংসা অতীব প্রবলা। এই ব্যাধির বিমোচনকারী শ্রীমদ্ভাগবত নামক গ্রন্থের ও তদ্‌বর্ণিত ভাগবতধর্ম্মের কীর্ত্তনকারিগণই শ্রীগৌরসুন্দরের আশ্রিত শ্রীচৈতন্যভাগবত; তাঁহারাই শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়। মাধ্বগণের মধ্যে একদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণ-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত আছে বলিয়া শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়গণ শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারানুকূলে শ্রীগৌরসুন্দরের আশ্রিত গোস্বামিষট্‌কের ও সপ্তম গোস্বামিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের অনুগমনে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের আশ্রয়ে দৈব-বর্ণাশ্রমের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত-জীবনের পরমোন্নত পদবী চিরদিনই কীর্ত্তন করিয়া আসিতেছেন। মাধ্বগৌড়ীয়-বিচারে নিত্য-বৃন্দাবনস্থ ষড়্‌গোস্বামীর বিচারপুষ্ট ও শ্রীমদ্ভাগবত- কথিত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অবস্থিত। এই ধর্ম্মের সুষ্ঠু পালনক্রমে সাধক জীবের ভাগবত পারমহংস্যধর্ম্ম লাভ ঘটে। কিন্তু তদ্‌বিষয়ে জড়সমন্বয়বাদী ভাগবত-বিরোধী অন্য সাম্প্রদায়িক পরমহংস-নামধারিগণের মধ্যে বিচার-ভেদ উপস্থিত হয়।

বর্ত্তমানকালে বঙ্গদেশে শ্রীমদ্ভাগবত-সাহিত্য-সেবায় প্রচুর দরিদ্রতা উপস্থিত হওয়ায় ভাগবত-পাঠক-সম্প্রদায়ের অনেকেই বৈশ্য-বৃত্তি-অবলম্বন-পূর্ব্বক গৃহব্রতের মনস্তুষ্টির জন্য ভাগবত-ব্যাখ্যাতা সাজিয়াছেন। বঙ্গদেশের এই অসুবিধা-বিদূরণ-কল্পে পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী-প্রতিম ঢাকানগরে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়- মঠের প্রতিষ্ঠান হইয়াছে। সুতরাং ইহা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অপূর্ব্ব দয়া-বিতরণের একটী অপ্রাকৃত অধিষ্ঠান। শ্রীমদ্ভাগবতের নিরপেক্ষ নিরঙ্কুশ-বিচার যাহাতে পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান নগরীর অধিবাসিগণ ও পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণ সকলেই জানিতে পারেন, তদ্বিষয়ে সুযোগ দিবার জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর আজ কএক বৎসর হইল ঢাকা-নগরীর কেন্দ্রস্থলে ৯০নং নবাবপুরে প্রকটিত হইয়াছেন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁহার নিজমঠ শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরকে আকর্ষণ-পূর্ব্বক ঢাকাবাসিগণের নিকট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত-গ্রন্থ দ্বারা ভাগবতগণের শুদ্ধ প্রণালীতে ভগবৎ-সেবা-বিধান করাইতেছেন। তৎপ্রভাবে অদৈব বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতা—যাহা শ্রীমদ্ভাগবত সুষ্ঠুভাবে প্রচার করিয়াছেন, তাহার হেয়তা জগতের নিকট প্রদর্শিত হইতেছে। কিন্তু উহাতে অদৈব-বর্ণাশ্রমের কতিপয় বিধি-নিষেধের ন্যূনাধিক স্বীকারে পরমার্থ-প্রচারে যে আংশিকতা দেখা যাইতেছিল, তাহার প্রতিবিধানের জন্য প্রথম সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী কুরুক্ষেত্রে প্রদর্শিত হয়। দ্বিতীয় সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে প্রদর্শিত হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ প্রদর্শনী শ্রীগৌড়ীয়- মঠের প্রাঙ্গনে ও সমীপে প্রদর্শিত হয়। পঞ্চম সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী সম্প্রতি পূর্ব্ব- বঙ্গের রাজধানী ঢাকানগরীতে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সেবক গৃহস্থ ভক্তগণের সমধিক সেবাফলে প্রদর্শিত হইয়াছিল।

পরলোকগত অক্ষয়কুমার দত্তের "ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়ে" বর্ণিত যে-সকল উপ বা অপ-সম্প্রদায়ের বিচারপ্রণালীতে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা বিকৃত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্জ্জিত হইয়াছে, সেই বিকৃত-চিত্তজনগণের চিত্ত-দর্পণমার্জ্জন ও একমাত্র ভবৌষধ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনকে জয়যুক্ত করাইয়াই শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সাত্বত পাঞ্চরাত্রিক বিধান ও ভাগবত-প্রদর্শনীর কীর্ত্তনের বিরুদ্ধে উন্নতাকাঙ্ক্ষী জাতিবিশেষ শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্মকে উৎসাদন করিবার মানসে নানাপ্রকার দুরভিসন্ধির পরিচয় দিয়াছে জানিয়া গৌড়ীয়-সমাজের অভিভাবকগণ এবং শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়েক-সংরক্ষক অভিভাবকগণ এবং শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়েক-সংরক্ষক মহোদয় জীবগণের কল্যাণের জন্য ও পরমার্থ-প্রবণ-চিত্ত জনগণের সেবা-বিধানের নিমিত্ত যে-সকল চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে সম্প্রতি একটী অমঙ্গল উপস্থিত হইয়াছে। একটী জাতি- বিশেষ তাহাদের জাগতিক বিচারটীকে পরমার্থের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া ষড়্গোস্বামীর অন্যতম মাধ্বগৌড়ীয়গণের পূর্ব্বগুরুদেব শ্রীল দাস-গোস্বামীর বিচারকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে।

ওঁ বিষ্ণুপাদ নিত্য ভূসুরবর্য্য শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুপাদ স্বীয় আশ্রিতবর্গের নিত্যমঙ্গলের জন্য যে 'মনঃশিক্ষা' রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীরূপানুগগণের জীবাতু। মনঃশিক্ষার অনুসরণে সর্ব্বদা

ভূসুরকুলের সম্মান প্রদান করিতে হইবে। সুজন বৈষ্ণব ভূসুরকুলের সহিত কোন বিরোধ করেন না। ভূসুরকুলে যে ফলত্যাগমূলক মায়াবাদ ও ফলভোগমূলক সৎকর্ম্ম প্রভৃতি নৈতিক কর্ম্মের নৈপুণ্য প্রদর্শিত হয়, তাহার অসম্মান করিবার কু-চিন্তা কোন দিন পারমার্থিককে বিব্রত না করে; এইজন্য সর্ব্বদা দম্ভ পরিত্যাগ করিয়া ভূসুরকুলের সম্মান দিতে হইবে। সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞ কেবল-ভক্তিযোগারূঢ় ভাগবতরাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল রঘুনাথ দাসের শ্রীচরণাশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া যাহারা বিপথগামী হয়, তাহাদের বিচারের সহিত মাধ্বগৌড়ীয়গণের বিচারের নিত্যকাল পার্থক্য আছে, যেহেতু মাধ্বগৌড়ীয়গণ জানেন যে,—"বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্।" সুতরাং মাধ্বগৌড়ীয়গণ পারমার্থিক-বিচারে নরকাভিযানের পক্ষপাতী নহেন।

সত্যাদি চারিযুগেই পারমার্থিকের প্রতি জাতিগত বিদ্বেষ চলিতেছে, এ-জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ বা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থ জগতে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া বিদ্বেষী আধ্যক্ষিকগণ-কর্ত্তৃক অদ্যাপি স্বীকৃত হয় নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ বিক্রয় করিয়া যদি কাহারও তত্তৎগ্রন্থজীবী, ভৃতক পাঠক, বক্তা বা দেবল হওয়ার যত্ন হয়, তাহা হইলে পারমার্থিক জীবনের উন্নতি হইল না, জানিতে হইবে।

পুনরাবৃত্তির বিষময় ফল উৎপন্ন হইবার প্রতিপক্ষে বেদান্ত-দর্শনের চরমসূত্র "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ", শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা—"কীর্ত্তনীয় সদা হরিঃ", শ্রীমদ্ভাগবতের পারমহংস্য-বিচার প্রভৃতি যে-সকল ভবৌষধ ইহ-জগতে বর্ত্তমানকালে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহার সমাদর করিতে না শিখিলে আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা লাভ করিতে পারিব না। শ্রীচৈতন্যানুগ সৎশিক্ষা- প্রদর্শনীর বিরুদ্ধে নতুন করিয়া কপটতা-বিস্তার ও ছিদ্রান্বেষণ প্রভৃতি ধর্ম্ম কখনও ভাগবতধর্ম্মের অনুকূল নহে। যে-দিন মাধ্বগৌড়ীয় মঠের বিচারকগণের সহিত জাতিবিশেষ পৃথক্ হইয়া তাঁহাদের প্রতিকূলাচরণ করিবেন, সেই দিন তত্তৎ জাতিবিশেষ নিজত্ব বা স্বীয় ওজন বুঝিতে না পারিয়া আত্মবিনাশ কামনা করিবেন মাত্র। এই জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং জাতি-বিশেষের চিন্তাস্রোতও পরিবর্ত্তনশীল। প্রকৃতিজনের অন্তর্গত জাতিগুলি পরিবর্ত্তিত হয়, ইহাই যুগ-চতুষ্টয়ের ইতিহাস প্রমাণ করে। সুতরাং আবার কেন পরমার্থ-বিষয়েও আধ্যক্ষিকতা? আমরা জানি, উহা ভগবদ্‌বিমুখ বদ্ধজীবের অনুকূল বিচার।

যে-দিন মাধ্বগৌড়ীয় মঠের সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর সর্ব্বতোভাবে আদর করিবার ইচ্ছা হইবে, সেই দিন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অমন্দোদয়া-দয়ার কথা—অপূর্ব্ব অপ্রাকৃত বিচারের কথা জানিতে পারিয়া প্রত্যেক পূর্ব্ববঙ্গবাসী, প্রত্যেক পশ্চিম- বঙ্গবাসী, প্রত্যেক ভারতবাসী, প্রত্যেক জম্বুদ্বীপবাসী এবং পার্থিব-বিচার-পরায়ণ সর্ব্বকালস্থিত লোকসমূহ—সকলেই সমস্বরে হরিকীর্ত্তন করিবার যোগ্যতা লাভ করিবেন—সে-দিন মাধ্বগৌড়ীয় মঠের অনুগতগণ চিৎসমন্বয়বাদের অতি সুমধুর রসময় ফলের সেবনে রসিক হইয়া অভিধেয়-প্রণালীর আস্বাদন-তারতম্য বুঝিতে পারিবেন। তখন—"আমরা 'প্রকৃতিজন', 'ব্রাহ্মণ জাতি', 'কায়স্থ জাতি', 'বৈদ্য জাতি', 'সচল জল নবশাখাস্থ বৈশ্যজাতি', 'অচল জল বৈশ্যজাতি', বর্ণত্রয়ের সেবক

পার্থিব পরোপকারী ‘শূদ্র জাতি’, ও তদ্‌বহির্ভূত চতুর্বর্ণাতীত ‘‘সঙ্কর জাতি’’—এরূপ বিচার-সম্পন্ন জাতি-সমূহ নিজ-নিজ জাতীয় গৌরবের দম্ভ- বশে পারমার্থিক মাধ্বগৌড়ীয়-মঠের প্রতি আক্রমণ করিবেন না।

ব্রহ্মজ্ঞ না হইলে ব্রাহ্মণেতর প্রতীতি বদ্ধজীবকে বিভিন্ন স্তরে স্থাপন করিয়া যেরূপ দেব-দ্বিজ-বিদ্বেষে নিযুক্ত করে, পারমার্থিক ভক্ত-সম্প্রদায় সেইরূপ বিচারকে কখনও নিজ-গুরুদেব ও ভগবানের সেবা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-জ্ঞানে আদর করেন না। এজন্যই শাস্ত্র এত উচ্চকণ্ঠে বৈষ্ণব-মহিমা গান করিয়াছেন। উহাই পঞ্চভক্ত্যাত্মক শ্রীহরিকীর্ত্তনের প্রধান অঙ্গ বলিয়া মাধ্বগৌড়ীয় মঠের একমাত্র আরাধ্য এবং তদনুগমনে ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গ বা সহস্র সহস্র প্রকার ভক্ত্যঙ্গ- যাজনের প্রকারভেদ-দ্বারা বদ্ধজীবের কল্যাণের উদ্দেশ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের অনুকম্পা বিস্তীর্ণ হইতেছেন।

এই সকল কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিবার মূল কারণ ও উপায় যে গৌরশক্তি—যাহা শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুবর তাঁহার অনুগত সম্প্রদায়ে সঞ্চার করিয়াছেন, সেই শক্তির বলেই শ্রীরূপানুগেতর বিচারযুক্ত সাম্প্রদায়িকগণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ব্যতীত তাঁহাদের উৎখাতোদ্দেশে কোন কল্পনা করিতে মাধ্বগৌড়ীয়গণ অসমর্থ। তাঁহারা জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ত্রিদণ্ডিপাদের প্রচার-বিচারানুকূলে নিত্যকাল যত্ন-বিশিষ্ট। সেইজন্য তাঁহারা আপনাদিগকে কেবল দ্বৈতবিচারপর মাধ্ব বলিয়া পরিচয় না দিয়া অচিন্ত্য-ভেদাভেদময় শুদ্ধ বিচারপর নিত্যমুক্ত ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম আচার্য্য শ্রীল জীবপাদের অনুবর্ত্তী হইয়া স্বকীয়-পারকীয়- বিচারবাদে অনভিজ্ঞ অর্ব্বাচীন মূঢ় জনগণের সুশিক্ষার জন্য শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ সংস্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং জাতিবিশেষের অন্তর্গত ব্যক্তিগণকে শ্রীগৌরসুন্দরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করায় বা মাধ্ব- গৌড়ীয়মঠের শিক্ষা-প্রণালীর বিরুদ্ধে অশিক্ষিতের ন্যায় আক্রমণ করায় যাহাদের অপরাধ উপস্থিত হইয়াছে, সেই অপরাধের মালিকগণকে দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া আমরা বলিতেছি যে, আপনারা জাতিবিশেষের প্রত্যেক ব্যক্তিই সাধু, কিন্তু নিজ-নিজ সাধুত্বের আদর্শে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের প্রতিপাদ্য শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের শ্রীচরণসেবা করুন—আপনাদের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল হইবে। আমরা ত' শ্রীমদ্ভাগবত- পাঠকালে পড়িয়াছি,—

চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্।
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্ কস্মাদ্ ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মদান্ধান্।।

(ভাগবত ২।২।৫)

সুতরাং ঢাকা ধনকুবেরের জাতি-বিশেষ সমবেত চেষ্টায় শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সেবকগণকে নির্য্যাতিত করিতে পারিবেন না। জাতি-বিশেষে অবস্থিত পরমভাগবত গৃহস্থভক্তগণের সম্পত্তি-বোধে প্রাকৃত দর্শন-যোগ্য মাধ্বগৌড়ীয়মঠের বর্ত্তমান সৌধটী ভোগী কর্ম্মীকুলের অধীন বা আয়ত্ত করিলেই যে মাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের অসুবিধা হইয়া যাইবে, তাহা নহে। তাঁহারা বৃক্ষতলবাসী শ্রীল রূপ-সনাতনের অনুগত।

তাঁহারা এক এক বৃক্ষতলে এক এক রাত্রি বাস করিতে পারেন। সুতরাং মাধ্বগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রতি জাতিবুদ্ধিকারিগণের নিজ-নিজ জাতীয় গৌরব-সমৃদ্ধির যে-সকল উপায় উদ্ভাবন-চেষ্টা, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত স্বীকার করেন না। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চতুর্ব্বর্গাভিলাষ মাধ্বগৌড়ীয়মঠের কোন সেবকের হৃদয়কে কোন দিন কলুষিত করে নাই বা করিবে না।

বিত্তৈষণা, পুত্রৈষণা, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি অবিচারিত বিধান কোন দিনই কোন মাধ্বগৌড়ীয় সেবককে আবরণ করিতে পারিবে না। যে-দিন যাঁহাকে তাহা আবরণ করিবে, সেই দিন তিনি আপনাকে শ্রীচৈতন্য-সেবা-বিমুখ বলিয়া অভিমান করিয়া ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, নবশাখ, সচলনীয় মাধ্যমিক জাতি, অচলনীয় বৈশ্যানুকুল জাতি বা শূদ্রজাতি-জ্ঞানে আপনাকে নিত্য মাধ্বগৌড়ীয়-মঠের বিচার হইতে পৃথক্ বোধ করিয়া নিজ-নিজ অমঙ্গল সাধন করিবেন।

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ কিছু কোন ব্যবসায়িগণের প্রতিযোগী ব্যবসায়ীর দোকান নহে, অথবা অদৈব বর্ণাশ্রমিগণের জাতিখানা নহে, অথবা আধ্যক্ষিক গোলামখানা নহে। এই সকল শব্দার্থে অভিজ্ঞান লাভ করতঃ বদ্ধ দশা হইতে মুক্ত হইয়া 'হরিজন'-শব্দ কোন্ বিচারে প্রতিষ্ঠিত জানিতে পারিলে প্রকৃতি- জনগণকে 'হরিজন', 'দরিদ্রনারায়ণ' বা নিকৃষ্ট অবর শ্রেণীস্থ জ্ঞানে হিংসা করিবার দৌরাত্ম্য করিতে হইবে না। জড়-সমন্বয়কারীর পরমার্থ-বিরোধ হইতেই 'দরিদ্রনারায়ণ' ও 'হরিজন' প্রভৃতি অপব্যবহৃত শব্দ জগতে প্রচারিত হইতেছে। নিম্নবর্ণের প্রতি নদীয়াপ্রকাশ শ্রীগৌরসুন্দরের বা তদনুগত নদীয়া-প্রকাশ- সংবাদপত্রের সম্পাদক ও লেখকগণের অসহযোগ নাই; কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের পূর্ণ পারমার্থিকতা না হওয়া পর্য্যন্ত বা পরমার্থের দিকে অগ্রসর হইবার বিচার না হওয়া পর্য্যন্ত উহাদিগের বদ্ধদশার আধ্যক্ষিকতাকেও 'পরমার্থ' বলিয়া গ্রহণ করেন না। ঐরূপ সমন্বয়-বিচার লৌকিকার্থ-মূলক ও জড়-তারতম্য-রহিত নির্ব্বিশেষ-বুদ্ধিজাত বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-মাত্র। আপাতদর্শনে উহা নানাপ্রকারে মানব-তর্ককে একদেশ দর্শন করাইয়া প্রলুব্ধ করাইতে পারে। কিন্তু শ্রীচৈতন্য-শিক্ষাষ্টকে লিখিত জনগণের নিকট ঐরূপ বিচার অন্ধকপর্দ্দক-মাত্র।

জাতি-বিশেষ যদি অযথা ও বিবর্ত্তবুদ্ধিতে অকিঞ্চন মাধ্বগৌড়ীয়গণকে আক্রমণ করেন, তাহা হইলে সেই জাতি-বিশেষের বিচারগত দুর্ব্বলতা তাঁহাদের উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, পথে ব্যাঘাত উৎপাদন করাইবে। সুতরাং আমরা বলি,—ভাগবতশিক্ষা-মন্দিরের যোগে শ্রীধাম-মায়াপুরের শ্রীভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ন্যায় আর একটি শাখা-বিদ্যালয় শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে স্থাপিত হউক এবং গভর্ণমেণ্ট-বোর্ডের অধীনতায় তাহা recognised হইলেই মাধ্বগৌড়ীয়ঠের বিচার-প্রণালী শিক্ষা করিবার সুযোগ লাভ করিয়া পূর্ব্ব-বঙ্গবাসী ধন্য হইবেন—বাস্তবিক শ্রীচৈতন্যকরুণা জাতি-বিশেষ, বিশেষতঃ ঢাকাবাসী ও পূর্ব্ববঙ্গবাসী সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

মহাপ্রভুকে মানি কি?

আমরা অনেকেই বলিয়া থাকি এবং মনে করিয়া থাকি যে, আমরা শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবকে মানি এবং ভক্তিশ্রদ্ধা করি। এমন কি, অনেক সময় যদি কোন সাধুবৈষ্ণব আমাদিগকে বন্ধুভাবে অকপটে বলেন যে, আমরা প্রকৃত- প্রস্তাবে মহাপ্রভুকে মানি না, তখন আমরা তাহার প্রতিবাদে সময়ে সময়ে ঐরূপ বক্তার বিরুদ্ধে যষ্টি ধারণ করিতেও উদ্যত হই। সাধারণ লোকেরও বিশ্বাস যে, মহাপ্রভু সর্ব্বজগন্মান্য, তাঁহাকে না মানেন,—এরূপ লোকই নাই। কিন্তু একটু গভীর অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে আমরা জানিতে পারিব যে, আমরা প্রকৃতপ্রস্তাবে খুব কম লোকেই মহাপ্রভুকে মানি। আমরা মাহপ্রভুকে মানি বলিয়া যেটুকু ধারণা বা কল্পনা করি, কিম্বা মৌলিক উক্তি প্রকাশ করি, তাহা মহাপ্রভুকে মানা নহে, আমাদিগের নিজ-সম্মান বজায় রাখা মাত্র। ঈশ্বর ও বেদকে না মানিলে লোকে নাস্তিক বলিয়া আমাদিগকে ঘৃণা করিবে, আমাদের সম্মান প্রতিষ্ঠা থাকিবে না, দশজনের সঙ্গে পাঁতি পাইব না,—এরূপ ভাবিয়াও আমরা অনেক সময়ে মহাপ্রভুকে মুখে মানিয়া থাকি।

আজকাল একশ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা মহাপ্রভুর নিজ-জনগণের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত নহেন। অধিকন্তু তাঁহাদের কথাকে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ কথা বলিয়া নিজেদের মনঃকল্পিত বহির্ম্মুখ ধারণায় ডিক্রী ডিশমিশ করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত! ঐ সকল ব্যক্তি তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনের আচারেও যথেচ্ছচারিতা, কখনও বা স্মার্ত্তধর্ম্মের কথঞ্চিৎ অসম্পূর্ণ আচার, কখনও বা সুবিধাবাদ এবং নানাপ্রকার স্বেচ্ছাচার আশ্রয় করিয়াও মুখে মহাপ্রভুকে মহাপ্রভুর নিজ-জনগণ অপেক্ষাও অধিক ভক্তি করেন বা মহাপ্রভুকে তাঁহারাই অধিক বুঝিয়াছেন মনে করিয়া থাকেন। অনেক সময় তাঁহারা লেখনীতে, বক্তৃতায়, প্রবন্ধ-রচনায়, গ্রন্থ-নির্ম্মাণে, সংবাদ-পত্রের সম্পাদকতায় মহাপ্রভুকে মহাপ্রভুর নিজজনগণ অপেক্ষাও অধিক বুঝিয়া ফেলিয়াছেন,—এরূপ দেখাইয়া থাকেন! যে-সকল অকৃত্রিম মহাপুরুষগণ মহাপ্রভুর অকৈতব সেবাকেই নিত্যব্রত করিয়াছেন,—তাহাকেই চরমসাধ্য ও জীবনের মূলমন্ত্র করিয়া মহাপ্রভুর অস্মিতায় বিচরণ করিতেছেন, তাঁহাদিগকেও ঐ ঐ সকল ব্যক্তি নানাপ্রকারে সমালোচনা এবং নিন্দা করিয়া মহাপ্রভুকে তাঁহারাই অধিক বুঝিয়াছেন, জানাইয়া থাকেন।

যাঁহারা নিরপেক্ষ হইয়া ঐ সকল ব্যক্তির দুর্ব্বলতা, কপটতা, অনর্থ ও আত্মবঞ্চনা-ব্যাধিকে ধরিতে পারেন, তাঁহারা জানেন যে, ঐ সকল ব্যক্তির ঐরূপ দাম্ভিকতা মহাপ্রভুকে মোটেই মানা নহে, কেবল তাহাদের নিজ-দাম্ভিকতা ও জড়ীয় সম্মান বা মনোধর্ম্মরূপ ইন্দ্রিয়তর্পণকে বহু মানন করার চেষ্টা মাত্র।

"আমরা মহাপ্রভুকে মানি কি"—এই প্রশ্নের উত্তর নিরপেক্ষভাবে দিতে হইলে আমাদিগকে বিচার করিতে হইবে, মহাপ্রভু যাহা স্বয়ং আচার ও প্রচার করিয়াছেন—মহাপ্রভু তাঁহার পার্ষদবর্গের দ্বারা যে-সকল সদাচার প্রচার করাইয়াছেন, তাহা আমরা যতটা স্বীকার করি—ব্যক্তিগত জীবনে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা-অসুবিধার

মধ্যে, সামাজিক নির্য্যাতনের নানাপ্রকার চেষ্টা-সত্ত্বেও আমরা সেই সকল আচার কতটা অকৃত্রিমভাবে বরণ ও পালন করিতে প্রস্তুত হই।

দুঃখের বিষয়,—একশ্রেণীর ব্যক্তি বলেন, শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন ও করিয়াছেন, আমরা কেবল সেইটুকুকেই মহাপ্রভুর মত বলিয়া স্বীকার করিব। মহাপ্রভুর ভক্তগণ অতিরঞ্জিত করিয়া মহাপ্রভুকে যেরূপ সাজাইয়াছেন বা মহাপ্রভুর আচার-বিচার-সম্বন্ধে যে-সকল উক্তি করিয়াছেন, সেই সকল অর্থবাদ ও সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি! এমন কি, অনেকে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, শ্রীকবিরাজ গোস্বামি-প্রভু, শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন প্রভৃতির সিদ্ধান্ত ও বিচার মহাপ্রভুর ব্যক্তিগত বিচার হইতে পৃথক্ ও অর্থবাদ-দোষে দুষ্ট বলিতেও কুণ্ঠিত হন না, অথচ তাঁহারা মহাপ্রভুকে মানেন বলিতে চাহেন এবং কেহ তাঁহাদের মহাপ্রভুকে মানা "কার্য্যতঃ মহাপ্রভুর বিরোধ"—এ কথা বলিতে আসিলে অকপট উপদেষ্টৃগণের প্রতি রক্তচক্ষু অথবা লগুড়হস্ত হইয়া উঠেন।

মহাপ্রভুর অঙ্গ-সমূহকে বাদ দিয়া, তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছেদন (?) করিয়া মহাপ্রভুর শিরোদেশের পূজা—মহাপ্রভুর (?) প্রতি খড়্গ-উত্তোলন বা অর্দ্ধকুক্কুটী ন্যায়,—এই সকল মহাজনগণের কথা বলিলে ঐ সকল মুখে মহাপ্রভু-মানা ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন,—ইহাই ত' ভক্ত-সম্প্রদায়ের গোঁড়ামী সঙ্কীর্ণতা। "এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে। তবে লাথি মারোঁ তা'র শিরের উপরে।।" —শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবন এইরূপ একটা বেফাঁস (?) কথা বলিয়া ঐ সকল মুখে মহাপ্রভু-মানা-সম্প্রদায়ের নিকট কি গোঁড়ামী ও সঙ্কীর্ণতাই না প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন!

অধিকাংশ স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়,—এই সকল মনঃকল্পিত মহাপ্রভু- মানা ব্যক্তিগণ মহাপ্রভুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গস্বরূপ তৎপার্ষদ ও ভগবদ্ভক্তকে অস্বীকার, কখনও বা তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক দ্বেষ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি পোষণ করিয়া আপনাদিগকে মহাপ্রভুর অনুমোদনকারী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা অন্তরে মনে করেন যে, মহাপ্রভুর ভক্তগণ ভক্তির আতিশয্যে (যেন ভক্তি জিনিষটী তাঁহাদেরই ধারণা ও কল্পনার অনুযায়ী একটী ভাব-প্রবণতা বা মনের উচ্ছ্বাস-মাত্র) মহাপ্রভুকে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে পারেন নাই! কিন্তু তাঁহারা তৃতীয় ব্যক্তি হইয়া মহাপ্রভুকে নিরপেক্ষভাবে ওজন করিয়া লইয়াছেন! ইহাতে তাঁহাদের যে আন্তরিক দাম্ভিকতা রহিয়াছে, তাহা ঐ সকল মৌখিক- মহাপ্রভু-মানা-সম্প্রদায় আদৌ বুঝিতে পারেন না। আজকাল জগতে এইরূপ এক সম্প্রদায় সংবাদ-পত্রাদির সম্পাদক বা বক্তৃতাবাগীশ ব্যক্তিরূপে মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া থাকেন।

আর এক প্রকার মহাপ্রভু-মানা (?)-সম্প্রদায় আজকাল দেখিতে পাওয়া যায়,—তাঁহারা মহাপ্রভুকে মানেন এবং তৎসঙ্গে তাঁহার পার্ষদগণকেও খুবই মানেন,—এইরূপ ভাব ও মুদ্রা প্রকাশ করিয়া থাকেন। অনেক সময় দেখা যায়, এই সকল ব্যক্তি ভিজা বিড়ালের মত হইয়া মায়াবাদী, কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত, তথাকথিত সমন্বয়বাদী, সুবিধাবাদী এবং গোলে-হরিবোল-দেওয়া সমস্ত ব্যক্তিরই অনর্থযুক্ত সংক্রামক মতে

আপনাদিগকে ন্যূনাধিক সংক্রামিত করিয়া মহাপ্রভুর গোঁড়া ভক্ত বলিয়া পরিচয় দেন। কিন্তু মহাপ্রভুর নিজ-জনগণ যখন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ- ভাবে অকৈতব ভগবদ্ভক্তির কথা সর্ব্বত্র প্রচার করেন, তখন তাঁহারা ভিজা- বিড়ালগিরি ছাড়িয়া কখনও আত্মগোপন করিয়া, কখনও কোন শিখণ্ডী দাঁড় করাইয়া, কখনও বা আত্মপ্রকাশ করিয়া ভগবদ্ভক্তের নিরপেক্ষ কথার বিরুদ্ধে—শুদ্ধভক্তির বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করেন। মায়াবাদী, কর্ম্মজড় পঞ্চোপাসক প্রভৃতির চাবুক ভিজা-বিড়াল হইয়া ইঁহারা সহ্য করিতে কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু অকৃত্রিম আচার্য্যের বাণী ইঁহাদের গায়ে বাণের মত বিদ্ধ হয়। ইঁহারা ইঁহাদের ভাবপ্রবণতা বা কামুকতার আতিশয্যে এতদূর অতিবাড়ী হইয়া পড়িয়াছেন যে, মহাপ্রভু যে সিদ্ধান্ত ও আদর্শের দ্বারা অসৎসঙ্গ নিরাস করিয়াছেন, সেই সিদ্ধান্ত ও আদর্শকে দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগের আদর্শ,—গ্রহণের আদর্শ নহে, ইহা বলিলে ঐ সকল প্রাকৃত-সাহজিয়া-সম্প্রদায়ের ভোগময় ভাবপ্রবণতায়, চির-পরিপুষ্ট মনোবৃত্তিগুলিতে আঘাত লাগে বলিয়া তাঁহারা প্রতিবাদ করিয়া উঠেন। ছোট হরিদাসের যে আদর্শ ও চরিত্রের যে-অংশ মহাপ্রভুর প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে নাই, সেই অংশটী কখনও ভগবৎসেবকগণের গ্রহণীয় নহে, তাহা মহাপ্রভুর পার্ষদত্ব নহে, সরলতা বা বৈষ্ণবতা নহে; কৃষ্ণদাস-বিপ্রের ভট্টথারি-স্ত্রীগণের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইবার আদর্শ, বা মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ সেবা ছাড়িয়া ভট্টথারি-স্ত্রীর গৃহে গমনের অংশটুকু—মহাপ্রভুর পার্ষদত্ব নহে, শ্রীচৈতন্য-কল্পবৃক্ষের শাখাত্বও নহে; মহাপ্রভুর সঙ্গী বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন মহাপ্রভুকে ছাড়িয়া কালিয়দহে মূর্খ-জনমতের বিবর্ত্ত কৃষ্ণ দেখিবার সাধের আদর্শটী মহাপ্রভুর সেবা বা পার্ষদত্ব নহে; সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মায়াবাদ ও কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবাদকে বহুমানন কিংবা মহাপ্রভুকে ভগবৎপাদপদ্ম বলিয়া অস্বীকার—শ্রীচৈতন্যকল্প- বৃক্ষের শাখাত্ব নহে; জগাই মাধাইর পূর্ব্ব-পাপময় জীবন, শ্রীনিত্যানন্দ-বিরোধ, শ্রীহরিদাস-বিরোধ, শ্রীহরিনাম-বিরোধ—শ্রীচৈতন্য-কল্পবৃক্ষের শাখাত্ব নহে; কিংবা গোপীনাথ পট্টনায়কের রাজ-তহবিল হইতে অর্থ তছরূপ করা ব্যাপারটী মহাপ্রভুর অনুমোদিত কার্য্য নহে; শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর কিঙ্কর কমলাকান্ত বিশ্বাসের শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য-প্রভুকে ঋণগ্রস্ত সাজাইবার চেষ্টা, কিম্বা ভক্তিকল্পবৃক্ষের অন্যতম মূল ব্রহ্মানন্দ ভারতীর মায়াবাদীর বেশ চর্ম্মাম্বর-ধারণের আদর্শ—মহাপ্রভুর অনুমোদিত ভগবদ্ভক্তি নহে; প্রচলিত গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় যিনি শুকদেবের অবতার বলিয়া কথিত, সেই বল্লভাচার্য্যের শ্রীধর-স্বামীর সিদ্ধান্ত অপেক্ষা নিজ-সিদ্ধান্তকে অধিক সমীচীন-জ্ঞান—শ্রীশুকদেবত্ব নহে; কিম্বা শ্রীচৈতন্যকল্পবৃক্ষের শাখার মধ্যে গণিত দেবানন্দ-পণ্ডিতের শ্রীবাসের চরণে অপরাধের প্রশ্রয়দান, মুমুক্ষা, শুদ্ধভক্তিবিরুদ্ধ ব্যাখ্যা প্রভৃতি কার্য্যগুলিও ভক্তি- কল্পবৃক্ষের শাখাত্ব নহে,—এইরূপ বলিলে ভাবপ্রবণ প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায় যদি ভোগময় মনে দুঃখ পান—অসৎ আসক্তি পরিত্যাগ, মনোব্যাসঙ্গচ্ছেদন, প্রেয়োবিচার দূরীকরণের পরামর্শে অনর্থযুক্ত ব্যক্তির যদি উদ্বেগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তজ্জন্য মহাজন বা সদ্‌বৈদ্য কপটতা করিয়া অমঙ্গলের উপদেশ প্রদান করিতে পারেন না। কামুককে স্ত্রী-আসক্তি-পরিত্যাগ করিতে বলিলে, পুত্রাসক্তকে পুত্রাসক্তি পরিত্যাগ করিবার মঙ্গলোপদেশ প্রদান করিলে তাহাদের হৃদয়ে তীব্র বেদনা হয় সত্য, কিন্তু শুভানুধ্যায়ী তদনুকূলে ইন্ধন প্রদান না করিয়া অপ্রিয়-সত্য কথাই বলিয়া থাকেন।

মুখে বলিব,—আমরা মহাপ্রভুকে মানি; কিন্তু মহাপ্রভু যখন বলিবেন,—"অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর।।" মহাপ্রভু যখন বলিবেন,—"ছোট হরিদাসের আদর্শে মর্কটবৈরাগ্য অর্থাৎ কাপট্য, প্রকৃতি-সম্ভাষণ প্রভৃতি অসদাচার প্রকাশিত হইয়াছে"; মহাপ্রভু যখন বলিবেন, —"ঐরূপ কপটতাপূর্ণ প্রকৃতিসম্ভাষণকারীর জলে ডুবিয়া মরাই প্রায়শ্চিত্ত", তখন আমরা মহাপ্রভুকে নিষ্ঠুর, ক্রূর, অথবা তাহা মহাপ্রভুর মত নহে বলিয়া আমাদের মতের সমর্থনকারী দুনিয়াদারীর লোকদিগকে লইয়া সভা-সমিতি বা প্রতিবাদ করিলে আমাদের এইপ্রকার মহাপ্রভু-মানা কপটতা-ব্যতীত আর কিছুই নহে প্রমাণিত হয় না কি?

আমরা মুখে বলি,—আমরা মহাপ্রভুকে মানি; কিন্তু যখন মহাপ্রভুর আচার ও প্রচার হইতে হাতে-কলমে দেখাইয়া দেওয়া হয় যে, মহাপ্রভু একমাত্র কীর্ত্তন- প্রধানা শুদ্ধা ভক্তিকেই ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় ও উপেয় বলিয়াছেন, কর্ম্ম-জ্ঞান- যোগাদির পথকে ভীমরুল-বরুলী-কৃষ্ণঅজগর-যক্ষ প্রভৃতি হিংস্রজন্তু-সঙ্কুল কুপথ ও বিপথ বলিয়াছেন, বিষভাণ্ড এমন কি, নরক হইতেও অপকৃষ্ট বলিয়াছেন, তখন আমরা বলিয়া উঠি, —ইহা ভক্তিকে বাড়াইয়া নিজ-মত- স্থাপনের জন্য পরমত দূষণ ও স্ব-মতের অতিস্তুতিমাত্র; প্রকৃতপ্রস্তাবে উহা সত্য নহে। এখানে আমরা মহাপ্রভুকে মানিলাম কি? মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তকে স্ব-স্ব মনোধর্ম্মের ছাঁচে ফেলিয়া নিজের খেয়াল বা জনমতের খেয়ালকে অধিক মানিয়া লইলাম না কি? ভক্তির সহিত কর্ম্ম-জ্ঞানকে সমান বলায় ভক্তিকে অস্বীকার করা হইল না কি? মহাপ্রভু বলিলেন,—যাহা কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির দ্বারা অনাবৃত অর্থাৎ যাহা ভোগ ও মোক্ষাকাঙ্ক্ষা নহে, তাহাই ভক্তি—যাহা ব্যভিচার নহে, তাহাই সতীত্ব। আমরা বলিলাম,—কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগেরই মত ভক্তি আর একটী উপায়-মাত্র—ব্যভিচারেরই মত সতীত্ব আর একটী জিনিষ! অবশ্য ব্যভিচারী সম্প্রদায় ইহাতে সন্তুষ্ট হইবেন। কেন না, তাহাদের তাহাতে আপাততঃ রক্ষা হয়। মর্য্যাদাজ্ঞানযুক্ত কেহই নিজ সতী-সাধ্বী জননীকে বারবনিতার সঙ্গে সমান বলিলে সুখী হন না। কিন্তু অসৎ ব্যক্তিগণের বা বারবনিতাগণের তাহাতে মনে কোন দুঃখ হয় না। কেননা, তাহারা মনে করে, —"আমাদের সহিত সমান ধর্ম্মী একজনকে পাইলাম।" কৃষ্ণবহির্ম্মুখতারূপ ব্যভিচারবৃত্তি জগতের গণ-গড্ডলিকাকে অন্তরে ও বাহিরে আত্মসাৎ করিয়াছে। কাজেই তাহারা ব্যভিচারের সহিত সতীত্বের সমন্বয় করিবার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা-বিশিষ্ট হইয়াছে। আর সেই প্রবণতা সংক্রামক ব্যাধির মত ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে সঞ্চারিত হইয়া মায়াদেবীর রঙ্গ-ক্ষেত্রকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের মহাপ্রভু-মানা এইরূপই। কার্য্যতঃ মহাপ্রভুর বিরুদ্ধাচরণকেই আমরা মহাপ্রভু-মানা বলিয়া কল্পনা করি, নতুবা আমাদের সম্মান বজায় থাকে না।

অনেকে আবার মনে করি যে, মহাপ্রভু মানিয়া আমরা নিজে কৃতার্থ হইবার পরিবর্ত্তে মহাপ্রভুকেই কৃতার্থ করিয়া দিলাম। আমি ব্রাহ্মণ হইয়া মহাপ্রভুকে মানি—অনেক দূর A, B, C, D পড়িয়া মহাপ্রভুকে মানি—বড় চাকুরী করিয়া মহাপ্রভুকে মানি—মহা ধনবান হইয়া মহাপ্রভুকে মানি; সুতরাং মহাপ্রভু

কৃতকৃতার্থ! আবার কেহ কেহ মনে করেন,—আমরা যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করি, পরোপকার জ্ঞান করি, সেবা বলিয়া কল্পনা করি, সত্য বলিয়া ধারণা করি, তাহা যদি মহাপ্রভু স্বীকার না করিয়া থাকেন বা মহাপ্রভুর ভক্তগণ তাঁহাদের শাস্ত্রে অন্যরূপ প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা সেইরূপ মহাপ্রভুকে 'বয়কট' করিব। তাহা হইলে দেখুন, আমাদের মহাপ্রভু মানা হয় কোথায়? আমরা কি সত্য সত্য মহাপ্রভুকে মানি? —না আমাদের ভাল-লাগা-মত বা ইন্দ্রিয়তর্পণকেই মানিয়া থাকি? মহাপ্রভু আমাদের কামের মূর্ত্তি নহেন।

মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ **নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব** গতিরন্যথা।।"—মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"**একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ**, আর সব ভৃত্য। যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য।।" মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"গঙ্গা-দুর্গা দাসী মোর, মহেশ কিঙ্কর।" মহাপ্রভু পরম-সিদ্ধান্তগ্রন্থ 'ব্রহ্মসংহিতা' হইতে উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন,—

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।। ৪৪।।

ক্ষীরং যথা দধিবিকারবিশেষযোগাৎ
সঞ্জায়তে ন হি ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাদ্-
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।। ৪৫।।

যৎপাদপল্লবযুগং বিনিধায় কুম্ভ-
দ্বন্দ্বে প্রণামসময়ে স গণাধিরাজঃ।
বিঘ্নান্ বিহন্তুমলমস্য জগত্ত্রয়স্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।। ৫০।।

যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং
রাজা সমস্তসুরমূর্ত্তিরশেষতেজাঃ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।। ৫২।।

ঐ সকল শ্লোকে মহাপ্রভু অতি স্পষ্টভাবে পঞ্চোপাসনা নিরাস করিয়াছেন; কিন্তু আমরা বলি,—"আমরা পঞ্চোপাসক থাকিয়াও মহাপ্রভুকে মানিয়া থাকি— ইহা বলিব ও বলিতে পারিব।" যখন হাতে-কলমে আমাদিগকে দেখাইয়া দেওয়া হয় যে, মহাপ্রভু পঞ্চোপাসনা স্বীকার করেন নাই, ব্রহ্মসংহিতায় পঞ্চোপাসনা নিরস্ত হইয়াছে, তখন আমরা যুক্তি দিয়া বলি,—"বেদে পঞ্চ- দেবতা ও পঞ্চোপাসনা স্বীকৃত হইয়াছে। মহাপ্রভুও শিব, দুর্গা প্রভৃতি মূর্ত্তি দর্শন এবং তত্তৎ স্থানে বন্দন-নৃত্যাদি করিয়াছেন। বেদানুমোদিত উপাসনা মহাপ্রভু মানেন নাই বলিলে বৈষ্ণবধর্ম্ম অবৈদিক হইয়া পড়ে।" কেহ কেহ অসীম সাহসের সহিত বলিয়াও ফেলেন,—"মহাপ্রভুর ধর্ম্ম অবৈদিক।"

প্রচলিত জনমতের অনুবর্ত্তী হইয়া আমরা এইরূপ নানাপ্রকার উদ্‌গার করিয়া থাকি। বেদে পঞ্চদেবতা কেন, বহু দেবতার কথা উল্লিখিত আছে বটে, কিন্তু স্বতন্ত্র পরমেশ্বরত্ব একমাত্র বিষ্ণুরই স্বীকৃত হইয়াছে। প্রাচীনতম ঋগ্বেদে বিষ্ণুই সর্ব্বোত্তম—এই কথা উচ্চকণ্ঠে বিঘোষিত হইয়াছে। "অগ্নির্বৈ দেবানামবমঃ, বিষ্ণুঃ পরমঃ, তদন্তরা অন্যদেবতাঃ"। শ্রীগীতা প্রভৃতি বেদানুগ শাস্ত্র পরমেশ্বর কৃষ্ণকে স্বতন্ত্র পরমেশ্বর বিচার না করিয়া অন্যদেবতার পূজা অবৈধ অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধ পূজা বলিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর যে শিব, দুর্গা প্রভৃতি মূর্ত্তি বিভিন্ন স্থানে দর্শন করিবার লীলাপ্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে কোথায়ও তিনি কৃষ্ণ ব্যতীত অপরকে স্বতন্ত্র পরমেশ্বর-বুদ্ধি করিবার আদর্শ দেখান নাই। "গঙ্গা, দুর্গা দাসী মোর, মহেশ কিঙ্কর"। অর্থাৎ সমস্ত দেবতাই পরমেশ্বর বিষ্ণুর 'কিঙ্কর', 'সেবক' বা 'বৈষ্ণব'—এই জ্ঞানে তাঁহাদের নিত্যস্বরূপে পূজনীয়,—এই প্রকার বিচারই প্রদর্শন করিয়াছেন। বৈষ্ণবের স্বরূপ নিত্য, তাহা ব্যবহারিক নহে। তথাকথিত পঞ্চোপাসনায় যে পঞ্চদেবতার মূর্ত্তি, তাহাতে দেবতাদের সগুণ কল্পিত রূপ ব্যবহারিক-মাত্র,—নিত্য নহে। সেই ব্যবহারিক কল্পিত রূপের এক একটীর সাময়িক প্রাধান্য স্বীকার করিয়া চরমে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মে বিলোপ- সাধনের চেষ্টাই দেখা যায়। ইহার দ্বারা পঞ্চদেবতাকে সম্মান বা রক্ষা করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগকে বিসর্জ্জন বা পরিত্যাগ করা হয়। মহাপ্রভু বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সচ্চিদানন্দ নিত্য অপ্রাকৃত কলেবর স্বীকার করিয়াছেন। মহাপ্রভু যে বৈষ্ণবী দুর্গা, বৈষ্ণবরাজ শম্ভু, বিষ্ণুর পীঠাবরণ গণেশ, বিষ্ণুর আজ্ঞাবাহক বৈষ্ণব সূর্য্যের মূর্ত্তির কথা স্বীকার করেন, তাহা নিত্য গোলোক-বৈকুণ্ঠস্থ বিষ্ণুর নিত্য-পার্ষদ-মূর্ত্তি। তাহা কখনও বিসর্জ্জন-যোগ্য ব্যবহারিক নহে। সুতরাং বৈষ্ণবগণ প্রকৃত বেদ স্বীকার করেন,—না মায়াবাদী ও পঞ্চোপাসকগণ বেদ স্বীকার করেন? বৈষ্ণবগণ দেবতাকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্মান করেন,—না মায়াবাদী পঞ্চোপাসকগণ বিষ্ণু ও তদ্‌ধীন দেবতাগণের অনিত্য ব্যবহারিক মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া—তাঁহাদিগকে হনন করিয়া অধিক সম্মান ও পূজা করেন? রাবণ শিবকে অধিক সম্মান করেন,—না প্রচেতোগণ শিবকে অধিক সম্মান ও ভক্তি করেন? তাই বলিতেছিলাম যে, আমরা মহাপ্রভুকে মানি কি?—না আমাদের মনঃকল্পিত রুচি ও সুবিধাবাদকেই অধিকতর মানিয়া থাকি?

প্রচার-সেবা ও নিজ-ভজন-ছলনা

বাহিরের লোক ত' দূরের কথা, অনেকে সদ্গুরুপাদপদ্মের নিকট আসিবার অভিনয় করিয়াও শ্রীগুরু-মনোঽভীষ্ট-প্রচার-সেবা এবং নিজ-মনোধর্ম্মের দাস্যের অনুবর্ত্তী ভজনাভিনয়ের মধ্যে কোন্‌টী প্রকৃত আত্ম-মঙ্গলকর, তাহা বুঝিতে না পারিয়া সদ্গুরু-পাদপদ্মের মহাদান হইতে বঞ্চিত এবং প্রাকৃত- সাহজিক-সম্প্রদায়ের চিত্তবৃত্তিতেই অধিক আক্রান্ত হইয়া পড়েন।

কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরু-পাদপদ্মের পদাঙ্কানুসরণে নিরন্তর অভীষ্ট-সেবাই—কৃষ্ণভজন। গৌর-জনগণ কৃষ্ণভজন ছাড়া আর কিছুই করেন না। তাই গৌরভজন—গৌরপার্ষদগণের "পাছেত' লাগিয়া" নিরন্তর গৌর-মনোঽভীষ্ট-সেবা। গৌরসুন্দর—মহাবদান্যাবতারী। কৃষ্ণপ্রেমবিতরণ-কার্য্যই তাঁহার মহাবদান্যতার পতাকা। সেই মহাবদান্য অবতারীর প্রিয়তম গুরুদেবের কৃত্য—অনুক্ষণ অব্যবহিত শ্রীহরিকীর্ত্তন-প্রচার। গুরুদেবের কীর্ত্তন-প্রচারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিরন্তর অনুগমনই গুরু-গৌরাঙ্গের সেবা বা গুরু-গৌরাঙ্গ- মনোঽভীষ্ট-প্রচার। প্রচারের সেবা—মিশনের (Mission-এর) সেবাই মহাবদান্যাবতারী প্রিয়তমের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন।

আচার্য্য অনুক্ষণ প্রচারের জন্য নিখিল চেষ্টায় ব্যস্ত; কিন্তু আমরা যদি মনে করি, প্রচারের জন্য যত 'হাঙ্গামা' আচার্য্য ভোগ করিতে থাকুন, আর আমরা ঐ সকল হাঙ্গামা ও গোলমাল হইতে দূরে সরিয়া আচার্য্যের শত গ্যালন চিদ্রক্ত-ব্যয়ের ফলস্বরূপ প্রচার-প্রতিষ্ঠানের সৌধের নির্জ্জন-কক্ষে বসিয়া ভজনানন্দী হইয়া পড়িব বা নির্জ্জনে পৃথক্ কুটীর বাঁধিয়া কীর্ত্তন-সঙ্ঘারাম ও সাধুসঙ্গ হইতে দূরে থাকিব, তাহা হইলে আমাদের সেইরূপ চেষ্টাকে "গৌরপ্রেষ্ঠ পাছেত' লাগিয়া" কার্য্যরূপ হরিভজন না বলিয়া "নিজ-প্রেয়ের পাছেত' লাগিয়া" কাম-চরিতার্থ করা ব্যতীত আর কি বলা যাইবে? হরিকথা-প্রচারে নানা হাঙ্গামা আছে দেখিয়া কেহ মঠের মধ্যেই নির্জ্জন কক্ষে প্রবেশ করিলাম, কেহ বা অন্যত্র গিয়া আত্মভোগের কুটীর বাঁধিলাম, কেহ বা গৃহস্থের অভিমান করিয়া মনে করিলাম,—যে পরিমাণ অর্থ আমি মঠের প্রচারের জন্য ব্যয় করি, সেই অর্থের দ্বারা মঠের অনুকরণে জয়পুর হইতে শ্রীরাধাগোবিন্দের মূর্ত্তি আনাইয়া নিজের গৃহই ত' সাজাইতে পারি, তাহা হইলে ঠাকুর-সেবাকে ঠাকুর-সেবা, মঠকে মঠ, গৃহকে গৃহ—একাধারে সবকুল রক্ষা হইতে পারে এবং স্ত্রী-পুত্রের আসক্তিতে বিজড়িত থাকিয়া কৃষ্ণের সংসারটাও খুব উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে পারে! এইরূপ চিত্তবৃত্তি "কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছেত' লাগিয়া" হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার চিত্তবৃত্তি নহে। শ্রীগুরুদেবের অনুষ্ঠিত প্রচার-সেবায় প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য, বিদ্যা প্রদান এবং সর্ব্বতোভাবে আনুকূল্য করিতে যাঁহাদের জাড্য উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহারা প্রাকৃত-সহজিয়ারই চিত্তবৃত্তিতে ন্যূনাধিক সংক্রামিত হইয়াছেন।

শ্রীগুরুদেবের প্রচারে সর্ব্বতোভাবে অকপটে আনুকূল্য করা কি সন্ন্যাসী, কি বানপ্রস্থ, কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহস্থ—সকলেরই সমভাবে কর্ত্তব্য। ইহারই নাম শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্কীর্ত্তনের সেবা। কিন্তু আলস্য-প্রধান-ধাতুগত-দোষ বা প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায়ের সহিত পূর্ব্ব-সংস্পর্শ-জনিত দোষ, কিম্বা অনর্থব্যাধির নানাপ্রকার দুরারোগ্য-দোষে দুষ্ট চিত্তবৃত্তি হইতেই মনে হয়,—শ্রীগুরুদেবের প্রচার-কার্য্যের দাস্য অপেক্ষা

নির্জ্জনতা-বরণ বা বিষয়-সংস্পর্শ পরিত্যাগের নামে অনর্থ-সয়তানের সঙ্গ ও অনর্থ-সন্ততিগণের বিষয়মলে ডুবিয়া যাওয়াই ভাল। যেমন প্রবৃত্ত বা কর্ম্মময় জীবনের কোলাহলের পর নিবৃত্তিপর শান্তভাবাপন্ন নির্জ্জন জীবন কাহারও কাহারও নিকট বহুমানিত হয়, তদ্রূপ যাঁহারা শ্রীহরিকথা-প্রচারের নিখিল চেষ্টাকে কর্ম্মবুদ্ধিতে পর্য্যবসিত করিয়াছেন, তাঁহারা প্রচার-কার্য্যের হাঙ্গামার বোঝা ফেলিয়া দিয়া নির্জ্জন-প্রকোষ্ঠে গিয়া হাঁপ ছাড়িতে চাহেন, উহা ত' হরিভজন নহেই, পরন্তু হরিভজনের রাজকীয় পথের যে এক মহান্ দ্বার তাঁহাদের নিকট উদ্ঘাটিত হইয়াছিল, তাঁহার সীমানা হইতে আপনাদিগকে শত সহস্র যোজন দূরে পিছাইয়া ফেলা।

গৃহস্থের অভিনয় করিয়া অনেক সময় আমরা দুর্ব্বুদ্ধিবশে মনে করি,—প্রচার প্রভৃতি কার্য্য কেবল মঠবাসী সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারীর কৃত্য; গৃহবাসী আমাদের ঐ সকল হাঙ্গামায় মাথা ঘামাইয়া কাজ কি? আমরা হয় ঠাকুরসেবা পাতিব, না হয় খুব জোর মঠের অনুকরণে বড় বড় মূর্ত্তি আমদানী করিয়া বাড়ী-ঘর সাজাইব, সময় সময় মঠের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারীদিগকে দুই একদিন উত্তম উপচারে ভোজন করাইয়া যাহাতে তাঁহাদের নিকট হইতে নিরপেক্ষ শ্রৌত শ্রেয়ঃ উপদেশ পাইবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের মুখ বন্ধ (?) করা যায়, তাহার বন্দোবস্ত করিব; যদি খুব বেশী কিছু করিতে হয়, বাড়ীর নিকটে বা বাসার নিকটে মঠ থাকিলে সারাদিনের সাংসারিক পরিশ্রমের পরে পাখার বাতাস-সেবন ও কৌতূহলের খাদ্য-স্বরূপ নানাপ্রকার সংবাদ-সংগ্রহের জন্য একবার করিয়া মঠে হাজিরা দিয়া আসিব!

গৃহস্থের পক্ষে অর্চ্চন নিষেধ করা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার নহে; কিন্তু অর্চ্চনের বাহ্যাড়ম্বরের ছলনায় বহুজন্ম- ব্যাপী অর্চ্চন বা অর্চ্চন-সিদ্ধির ফলস্বরূপ শ্রীগুরুদেবের কীর্ত্তনসেবার প্রতি উদাসীন কিম্বা বিন্দুমাত্রও অমনোযোগী হওয়া বৈষ্ণব-গৃহস্থের কর্ত্তব্য নহে। পরলোকগত শ্রেষ্ঠ্যার্য্য শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের স্ব-গৃহে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি ইচ্ছা করিলে সেই শ্রীবিগ্রহকেই সেবা-সমৃদ্ধির আড়ম্বর দেখাইয়া জগতের অনভিজ্ঞ লোকের নিকট বৈষ্ণব-নাম কিনিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া শ্রীগৌড়ীয়-মঠের কীর্ত্তন-শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণে উৎসাহ-বিশিষ্ট হইলেন কেন? শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শ্রীগুরুদেবের প্রেষ্ঠজনগণের কৃপায় তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, শ্রীগুরুদেবের কীর্ত্তন-প্রচারের সহায়তাই তাঁহার অর্চ্চন-সিদ্ধির ফল। নিজের ঠাকুর-বাড়ীর অভ্রভেদী উচ্চ চূড়া নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীগুরুদেবের প্রচার-কার্য্যে বিন্দুমাত্রও শৈথিল্য—নিজের বাহাদুরী-প্রদর্শন এবং আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-মাত্র। কাজেই গৃহস্থ-অভিমান করিয়া আমাদের সর্ব্বস্ব শ্রীগুরুদেবের প্রচারে নিযোগ না করিবার কোন যুক্তি বা মনোভাব উপস্থিত হইলে তাহা "গৌরপ্রেষ্ঠ পাছেত' লাগিয়া" ভজন বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

সন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ বা গার্হস্থ্য—এই সকল হরিভজনের অনুকূল বিভিন্ন অবস্থান-বৈচিত্র্য-মাত্র। প্রত্যেক বিচিত্রতাকেই পূর্ণভাবে শ্রীগুরু-মনোঽভীষ্ট-প্রচারে নিযুক্ত করিতে হইবে। যদি গার্হস্থ্য শ্রীগুরু-পাদপদ্মের প্রচারে পূর্ণভাবে নিযুক্ত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে গর্হণ করিতে হইবে। সন্ন্যাসও যদি গুরু-পাদপদ্মের মনোঽভীষ্ট- প্রচার অপেক্ষা নিজ-প্রচারেই অধিকতর মনোযোগী হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সেইরূপ সন্ন্যাসেরও কোন সার্থকতা নাই।

অকপট শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-পাদপদ্মবাণী প্রচারের জন্য বিলাস-ত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াও উৎকৃষ্টযানে আরোহণ, সর্ব্বপ্রকার লোকের দ্বারে গমন কোন প্রকার দোষাবহ নহে; কারণ, সেখানে আত্ম-সম্ভোগাভিসন্ধি নাই। আর শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবার অকৃত্রিম উদ্দেশ্য ছাড়িয়া দিয়া বা হরিসেবা-বিষয়ের কোন প্রকার বিষয়ী না হইয়া সাধারণ জাগতিক বিষয়ীর অভিমানে প্রকৃতির দান বায়ুটুকু পর্য্যন্ত উপভোগ করিয়া আমাদের বৃথা জীবন যাপন করিবার অধিকার নাই।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রভু 'অমৃতপ্রবাহভাষ্যে' ছোট হরিদাসের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—"বৈরাগী হইলে বাহ্যে কোন ভক্তিকার্য্য উদ্দেশ করিলেও স্ত্রীলোককে দর্শন বা স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণ করা কর্ত্তব্য নহে।" প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এই কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবেন না। ঠাকুরের এই কথার সহিত গৌড়ীয় মঠের প্রচারের কোনই বিরোধ নাই, বিরোধ—প্রাকৃত-সহজিয়াগণের হরিভজনহীন বুদ্ধির অজ্ঞতা বা কপটতার মধ্যে। ব্যক্তিগতভাবে কোন সাধক বৈরাগী ভক্তিকার্য্য উদ্দেশ করিযাও স্ত্রীলোক-দর্শন বা স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণ করিবেন না, কাহারও নিকট হইতে কোন প্রকার অর্থাদি গ্রহণ করিবেন না, * রাজদর্শন বা বিষয়িদর্শন করিবেন না। কিন্তু যেখানে আপামরে হরিকথা-প্রচারের উদ্দেশ্য রহিয়াছে, সেখানে মহাপ্রভুরই নিম্নোদ্ধৃত আজ্ঞার রক্ষাকবচ লইয়া "কৃষ্ণগৌরপ্রেষ্ঠের পাছেত' লাগিয়া" প্রচারক কীর্ত্তনমুখে সর্ব্বত্র গুরু দর্শন করিবেন—সেখানে প্রকৃতি-দর্শন, বিষয়িদর্শন বা রাজদর্শন নাই। যিনি ব্যক্তিগতভাবে স্বতন্ত্র হইয়া এই আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইবেন, তিনি তাঁহার স্বতন্ত্রতার জন্য দায়ী, সেইজন্য প্রচার-প্রতিষ্ঠান দায়ী নহেন। যাঁহার এইরূপ প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট হইবার যোগ্যতা রহিয়াছে, তাঁহাকে নির্জ্জনে স্থাপন করিলেও তিনি অন্তরের অনর্থ-সম্ভবা-স্বৈরিণী-প্রকৃতির সম্ভাষণ করিয়া বসিবেন। কাজেই প্রচার-প্রতিষ্ঠানের জন্য সাধক-জীবের আপামর সকলের নিকট হরিকীর্ত্তন-ব্যতীত মঙ্গলের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। ঐ মঙ্গলের পথে চলিতে চলিতে কোন ব্যক্তিবিশেষ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া উহার নজির দেখাইয়া মঙ্গলের পথে বিচরণে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন বা আলস্য প্রদর্শন করিলে তাহা হইতে কোন অধিকতর শুভজনক ফল উদিত হইবে না। আর প্রচার-কার্য্যের সহিত ব্যক্তিগত সাধক-জীবনের শিক্ষাকেও একাকার করিয়া ফেলিতে হইবে না। এইজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ,—

"যারে দেখ, তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ।।
ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ।।"

(চৈঃ চঃ ম ৭।১২৮, ১২৯)

---

* "অর্থ-লাভ এই আশে, কপট-বৈষ্ণব-বেশে,
ভ্রমিয়া বুলিয়ে ঘরে ঘরে।।" —ঠাকুর নরোত্তম

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে বিকট তপস্যা, তথাকথিত ধ্যান, নির্জ্জনে যম-নিয়ম-প্রাণায়ামাদি সাধনভজন প্রভৃতিই এ জগতে পরমধর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত ছিল; কারণ, কর্ম্মপ্রমত্ত সম্ভোগবাদী বিষয়ীর নিকট যখন কর্ম্মাড়ম্বরের তিক্ত অভিজ্ঞতা অশান্তিকর বলিয়া বিবেচিত হয়, তখন ঐ শ্রেণীর ব্যক্তি কর্ম্ম-কোলাহল হইতে নিবৃত্ত নির্জ্জন জীবন, মৌনধর্ম্মাবলম্বন, নির্জ্জনে জপ-ধ্যানাদি আত্মসম্ভোগের কার্য্যগুলিকেই পূর্ব্ব-সংস্কারের সংস্পর্শ-দোষে ধর্ম্মরূপে বরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু জগতে উদিত হইয়া জানাইলেন যে, হরিকীর্ত্তনই জীবের সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বজনীন পরম ধর্ম্ম। বহু ব্যক্তি একত্র মিলিয়া হরিকীর্ত্তনই—হরিসঙ্কীর্ত্তন; তাহাই "কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছেত' লাগিয়া" গৌর-মনোঽভীষ্ট-প্রচার—তাহাই শ্রীগৌর-সুন্দরের মহাবদান্য-লীলার পদাঙ্কানুসরণ এবং তাহাই প্রকৃত পরার্থিতার (Altruism) পরাকাষ্ঠা এবং প্রকৃত স্বার্থপরতা ও নিঃস্বার্থপরতার আদর্শ।

'অজানতঃ' (অনভিজ্ঞ) বলিয়া যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই কথাটী পুনঃ পুনঃ জানাইবার জন্যই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার। যেমন অনেক সময়ে আমাদেরর একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ কোথায় পাওয়া যায়, তাহার সন্ধান না জানায় আমরা প্রয়োজন-লাভে বঞ্চিত থাকি, আবার অনেক সময় আমাদের আবশ্যক দ্রব্য-গ্রহণের প্রতি তত রুচি না থাকিলেও বাড়ীর দ্বারে ফিরিওয়ালার ডাক শুনিয়া আমাদের রুচি উদিত হয়, সেইরূপ আমাদের হরিসেবার সন্ধান এবং একমাত্র প্রয়োজন হরিভক্তিতে রুচি না থাকিলেও প্রচারকগণের ডাক শুনিয়া আমাদের হরিভজনে রুচি উৎপাদিত হয়। প্রচার-কার্য্য বন্ধ করিয়া অনর্থযুক্ত নির্জ্জন ভজনানন্দীর দল বৃদ্ধি করিলে জগতে অপরকে ঐরূপ মঙ্গলের সন্ধান প্রদান করা দূরে থাকুক, নিজ-মঙ্গলও হইবে না। কারণ, শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলেন,—অপরের মঙ্গল-চেষ্টার সহিত জীবের ব্যক্তিগত মঙ্গল বিজড়িত। অপরের নিকট শ্রৌত বিষয় অনুকীর্ত্তন বা প্রচার করিলে নিজের সেই সকল কথা ভাল করিয়া শোনা হয় এবং তাহা হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে সুপ্রতিষ্ঠিত ও আচরণে সম্প্রকাশিত হইয়া পড়ে। অনর্থযুক্ত ব্যক্তির নির্জ্জন-ভজনে প্রকৃত কীর্ত্তন না হওয়ায় শ্রবণ হয় না; শ্রবণ না হওয়ায় মনোধর্ম্ম বিদূরিত এবং হৃদয়ে শ্রুত-বিষয় সুপ্রতিষ্ঠিত হয় না। কাজেই তাহাতে নানাপ্রকার অনর্থের উপসর্গ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

অনর্থযুক্ত নির্জ্জন-ভজনানন্দের পক্ষপাতী সম্প্রদায় যতই আপনাদিগকে ভক্তিপথের পথিক বলিয়া মনে করুন না কেন, তাঁহাদের ধাতে নির্ব্বিশেষ ভাবের দূষিত বীজাণু ও আলস্যপ্রধান সংস্পর্শ রহিয়াছে।

ব্যক্তিগত জীবনের সম্ভোগবাদের সহিত মিশনের প্রচারের উদ্দেশ্যের পার্থক্য নির্ণয় করিতে না পারিয়া কত লোক যে কত প্রকার ভ্রান্ত ধারণায় চালিত হইতেছেন এবং বহির্ম্মুখ মনোধর্ম্মের উদ্‌গার প্রকাশ করিতেছেন, তাহার অনেক নমুনাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের ইতিহাসে ভবিষ্যতের মঙ্গলের জন্য লিখিত থাকিবে। কেহ কেহ বলেন,—মঠের পরিচালনার জন্য স্থায়ী বিষয়-সম্পত্তি না করিয়া প্রচারকগণকে বহু বহু অর্থব্যয়ে বিলাতে প্রেরণ করিয়া লাভ কি? কোন চিকিৎসকাভিমানী অনর্থব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি বলেন,—আপনারা যখন বহু টাকা-পয়সা করিয়া বিলাতে প্রচারক পাঠাইতে পারেন, তখন আপনাদের সম্প্রদায়ের

কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে অধিক মূল্যের ঔষধ ও পথ্য প্রদান এবং তাহাকে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য ব্যয়-বহুলস্থানে প্রেরণে উদাসীনতা কেন? কেহ বলেন,—যখন আপনাদিগের প্রচারে প্রতিবৎসর বহুলক্ষ টাকা ব্যয় হয়, তখন আপনাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি সামান্য অর্থের জন্য অপরের চাকুরী বা দারিদ্রভোগ করেন কেন? কেহ বা বলেন,—মঠের মোটা চাউলের ভোগ ও অতি সামান্যভাবে সাধারণ প্রসাসাদি গ্রহণ করিবার কৃচ্ছ্রতার মধ্যে থাকিয়া য়ুরোপে প্রচারের জন্য রাশি রাশি মুদ্রা ব্যয় করিবার সার্থকতা কি?

এই সকল কুবিচার ব্যক্তিগত সম্ভোগকে হরিসেবায় প্রচার বা কৃষ্ণের সম্ভোগের সহিত একাকার করিবার কুমেধা হইতেই উদিত হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কাহারও ব্যক্তিগত সৌখ্যের জন্য শত শত গ্যালন রক্ত ব্যয় করিয়া দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া অর্থ সংগ্রহ করেন না, কিন্তু ব্যক্তিগত বা কৃষ্ণসম্বন্ধহীন সমষ্টিগত সম্ভোগের জন্যও বিষয়ীর অর্থ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন না। শ্রীহরিকীর্ত্তন-প্রচার বা শ্রীনাম-প্রভুর সম্ভোগের জন্য—বিষয়ীর মঙ্গল ও জীব-মঙ্গলের জন্যই তাঁহারা বিষয়ী হইতে অর্থগ্রহণ করেন। সুতরাং সেই অর্থ একমাত্র শ্রীনাম-প্রভুর সেবায় নিযুক্ত না হইয়া ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত সৌখ্যের জন্য নিযুক্ত হইবে। তদ্দ্বারা অর্থ-সংগ্রহকারী, অর্থদাতা ও অর্থ—সকলেরই অপকার ও অসদ্ব্যবহার করা হইবে এবং ব্যষ্টি বা সমষ্টিকে বহির্ম্মুখ বিষয়ী হইয়া পড়িতে হইবে। ইহা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের উদ্দেশ্য নহে।

প্রচার বন্ধ করিয়া মঠের বিষয়-সম্পত্তি বর্দ্ধন বা হরিকথা-প্রচার, শাস্ত্রপ্রচার বন্ধ করিয়া অর্থ-সঞ্চয়—শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যবর্য্যের বিচার-বিরুদ্ধ। তিনি বলেন,—যদি অকপট হরিকীর্ত্তন-প্রচাররূপ প্রাণ থাকে, তাহা হইলেই শত শত মঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত। আর যদি প্রচার-প্রাণ তিরোহিত হয়, তাহা হইলে ঐরূপ শত শত ইষ্টকস্তূপের কোন মূল্যই নাই, বরং ঐ স্তূপগুলি ও উহার সঞ্চিত রসদ ভবিষ্যতের আলস্য-পরায়ণ ব্যভিচার-প্রবণ তথাকথিত নির্জ্জন-ভজনানন্দিগণের অনর্থরাশিকে অধিকতর প্রশ্রয় দিবার আশ্রয়-গৃহরূপে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। কতকগুলি লোক জনসঙ্গ-পরিত্যাগের জন্য নির্জ্জন-ভজনের পক্ষপাতী হন এবং ঐরূপ আলস্য-পরায়ণ-ধাতুর লোকদিগকে চয়ন করিয়া নির্জ্জন কুটীরে ভজনকুঞ্জ নির্ম্মাণ করিবার যে চেষ্টা করেন, তাহাতে তাঁহাদিগের সজ্জনসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অনর্থপরায়ণ দুর্জ্জন-সঙ্গের সুযোগ উপস্থিত হয়। দুঃখের বিষয়,—প্রেয়ের পুষ্পিত পিচ্ছিল পথ তাহার বক্ষে পতনোন্মুখ বহু ব্যক্তিকে টানিয়া আনে এবং তাঁহাদিগকে রসাতলে প্রেরণ করিয়া নিজের বিজয়-ডঙ্কা বাজাইতে থাকে।

প্রচার ও ব্যক্তিগত সাধক-জীবনে বিবর্ত্ত

শ্রীমন্ মহাপ্রভু বিষয়ী, রাজা ও স্ত্রী-দর্শনকে সাধক-সন্ন্যাসীর পক্ষে বিষ-ভক্ষণ হইতেও অসাধু বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। "মায়াবাদীর ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ", "বহু গ্রন্থ-কলাভ্যাস-ব্যাখ্যান বর্জ্জিবে"—প্রভৃতি বাক্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ; কৃষ্ণাভক্ত বৌদ্ধ, নাস্তিক প্রভৃতির মুখ-দর্শনে সচেল-গঙ্গাস্নানের ব্যবস্থাও সনাতন-শাস্ত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু হরিকথা-প্রচারার্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণকে বিষয়ী, রাজা,

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, মায়াবাদী, বৌদ্ধ, নাস্তিক প্রভৃতি সকলের দ্বারেই গমন করিতে হয়—মায়াবাদীর ভাষ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিতে হয়—বহু অদৈব-ধর্ম্মের গ্রন্থ-সমূহও আলোচনা করিতে হয়। যাঁহারা একদেশ-দর্শী অর্থাৎ যাঁহারা চরম উদ্দেশ্যে না দেখিয়া কেবল-মাত্র প্রাথমিক বাহ্য আকার দর্শন করেন, তাঁহারা ঐ সকল দৃষ্টান্তের সমালোচক হইয়া বলিবেন, শ্রীগৌড়ীয়মঠ ঐ সকল আচারের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশের বিরুদ্ধপথে চলিয়াছেন। খর্ব্বদৃষ্টিতে এইরূপ সমালোচনা আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে; কিন্তু যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশের সার্ব্বদেশিক বিচার বরণ করিয়াছেন এবং তৎসঙ্গে শ্রীগৌড়ীয়মঠের আন্তরিক ও অন্তরঙ্গ চরম উদ্দেশ্য বিশেষভাবে শ্রৌতনেত্রের দ্বারা দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করিবার বিজ্ঞানে অকুশল বিশ্ববাসী প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায়ের খর্ব্ব ভোগদৃষ্টিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশের বিরুদ্ধপথে (?) চলিয়াও শ্রীগৌড়ীয়মঠ শ্রীমন্ মহাপ্রভুরই ঐকান্তিক মনোঽভীষ্ট-প্রচারক ও আনন্দবর্দ্ধক। প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায় গৌর-কৃষ্ণ-সেবার মূল উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য হইতে বিচ্যুত—কৃষ্ণ-সম্বন্ধে সকল বস্তু নির্ব্বন্ধ করিবার উপদেশে বঞ্চিত; তাঁহারা কেবলমাত্র কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-শূন্য লোক-দেখান-বাহ্যানুষ্ঠান-সর্ব্বস্ব হইয়া মহাপ্রভুর উপদেশের প্রকৃত তাৎপর্য্য আদৌ বুঝিতে পারেন নাই। **শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের সহিত ব্যক্তিগত সাধকের জীবনকে যাঁহারা ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহাদিগেরই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের প্রকৃত তাৎপর্য্য-দর্শনে প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়াছে**। সাধকের ব্যক্তিগত ভজনের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার—এক কথা, আর অসংখ্য মনোভাবে বিভাবিত বিভিন্ন অধিকারীকে "যেন কেন উপায়েন" ভগবৎ-সেবা-সুকৃতিতে আকৃষ্ট করিবার প্রণালী ও সাধারণ্যে প্রচার—আর এক কথা। শ্রীগৌড়ীয়মঠের কার্য্য—শ্রীহরিকথা-প্রচার। ব্যক্তিগত লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা বা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য বিষয়ি-দর্শন, রাজ-দর্শন বা স্ত্রী-দর্শন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, তাহা বিষভক্ষণ হইতেও অসাধু। ব্যক্তিগত সাধক মায়াবাদীর ভাষ্য বা বহুগ্রন্থ-কলাভ্যাস প্রভৃতি করিলে তাঁহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে, সন্দেহ নাই। ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য কেহ যদি শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকের পরিচয় দিয়া বিষয়ি-দর্শন, রাজ-দর্শন বা স্ত্রী-দর্শন করেন, মায়াবাদীর ভাষ্য শ্রবণ বা পাঠ করেন, বহু জন-সঙ্গ করেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয়মঠের কেহ নহেন; তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট, স্বতন্ত্র ব্যক্তি-মাত্র। কিন্তু শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন-প্রভুর বিপুল প্রকাশের জন্য—জগতে শ্রীকৃষ্ণ-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী ও স্বারাজ্য-সিংহাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বিষয়ী রাজা বা রাজপুরুষ, অভিজাত সম্প্রদায়ের বহু ব্যক্তি, স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা, মায়াবাদী, পাষণ্ডী—সকলকে শ্রীকৃষ্ণনামের সেবায় তাহাদের যোগ্যতানুযায়ী দীক্ষিত করিবার জন্য ঐ সকল লোকের দ্বারে গমনই মহাপ্রভুর উপদেশ। সেখানে বিষয়ি-দর্শন, রাজ-দর্শন, মায়াবাদি-দর্শন বা স্ত্রী-দর্শন নাই, সেখানে শ্রীনাম-প্রভুর সেবা-সর্ব্বস্বতা-দর্শনই প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদর্শেও দেখিতে পাওয়া যায়,—ব্যক্তিগত সাধকের চরিত্র শিক্ষা দিবার জন্য মহাপ্রভু পূর্ব্বে মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে দর্শন প্রদান করেন নাই। কিন্তু যখন সেই প্রতাপরুদ্রই শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট-স্বরূপ শ্রীনাম-প্রচার-সেবা ও তৎপ্রচারক

বৈষ্ণবগণের সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন, অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া যখন শ্রীনাম ও শ্রীনাম-প্রচারকারিগণের সেবার সহায়ক হইলেন, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই রাজার দর্শন ও সেবা অঙ্গীকার করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। শ্রীল সনাতন, শ্রীল রূপ, শ্রীল রঘুনাথ দাস, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট, শ্রীল জীব প্রভৃতি গোস্বামিপাদগণ ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য কোন বিষয়ীর দ্বারে উপনীত হন নাই। কিন্তু শ্রীবিগ্রহ-সেবা-প্রচার, শ্রীনাম-প্রচার, লুপ্ত-তীর্থ-উদ্ধার প্রভৃতি শ্রীগৌর-মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণ-সেবা-কার্য্যের জন্য বহু বিষয়ীকে হরিসেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীধাম-বৃন্দাবনে শ্রীমদনমোহনের মন্দির, শ্রীগোবিন্দের বিপুল মন্দির এবং অন্যান্য গোস্বামিগণের প্রকাশিত শ্রীবিগ্রহ-সেবা এখনও তাহার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

"মায়াবাদীর ভাষ্য পড়িলে সর্ব্বনাশ হয়",—এই বিচারে যদি শ্রীগৌড়ীয়মঠ মায়াবাদীর ভাষ্য, মায়াবাদীর অদৈব মত-খণ্ডনোদ্দেশ্যে ঐ সকল স্পর্শ না করেন, তাহা হইলে মায়াবাদিগণের যুক্তির অসারতা-প্রদর্শন সম্ভব হইবে না এবং মায়াবাদিগণকেও সত্য-পথে আনয়ন করা যাইবে না। কারণ, তাঁহাদের মত অন্য শ্রেষ্ঠ যুক্তি ও শাস্ত্র-প্রমাণ-বলে খণ্ডিত না দেখিলে তাঁহারা নিজেদের মতবাদ-নিষ্ঠা পরিত্যাগ করিবেন কেন? আর তাঁহাদের কথাগুলি উদ্ধার করিয়া তাঁহাদের মতের অসারতা দেখাইতে না পারিলে সত্যপ্রচারককে তাঁহাদের মত-সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া তাঁহারা উপেক্ষা করিবেন।

তবে ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য যদি কেহ মায়াবাদি-ভাষ্য-শ্রবণে রুচি ও আসক্তি প্রদর্শন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি-বিশেষকে গৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য-ভ্রষ্ঠ বলিতে হইবে।

একবার সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার স্বধামগত গিরিশচন্দ্র ঘোষ ষ্টার-থিয়েটারে শ্রীচৈতন্যলীলার অভিনয় দেখিবার জন্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ ও অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ব্যক্তিগত সাধকের প্রতি শিক্ষা-দান-কল্পে ঐরূপ অভিনয় দর্শন করিবার জন্য উক্ত অনুরোধ রক্ষা করেন নাই; কারণ, পাপ-চরিত্র ব্যক্তিগণের দ্বারা অভিনীত এবং লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির জন্য অনুষ্ঠিত অভিনয়ে অপ্রাকৃত শ্রীচৈতন্য-লীলার কোন সংস্পর্শ নাই; উহা অপরাধ ও ইন্দ্রিয়-তর্পণের তাণ্ডব-মাত্র; আধুনিককালে ব্যবসায়-উদ্দেশ্যে চলচ্চিত্র প্রভৃতিতেও কৃষ্ণ-লীলা, গৌরাঙ্গ-লীলা, প্রহ্লাদ-চরিত্র (?) প্রভৃতি অভিনয় দেখান হইতেছে, আর জগতের ইন্দ্রিয়-তর্পণামোদী বহির্ম্মুখ জন-সাধারণের অনেকে উহাদিগকে ধর্ম্ম-শিক্ষার উপায় বলিয়া দোহাই দিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যস্ত হইতেছেন। ঐ সকল চলচ্চিত্রাদির মধ্যে নানা-প্রকার অসৎ সিদ্ধান্ত, কুসিদ্ধান্ত এবং অনেক কল্পিত শাস্ত্র-বিরুদ্ধ হেয় কথা প্রচারিত হইতেছে। তাহাতে শাস্ত্রানভিজ্ঞ জন-সাধারণ শ্রীমন্মহাপ্রভু বা বৈষ্ণবতা-সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণায় দীক্ষিত হইয়া পড়িতেছেন। ঐ সকল চলচ্চিত্রের কুসিদ্ধান্ত ও ঐতিহাসিক বিপর্য্যয়ের দৃষ্টান্তগুলি নিরাসের জন্য যদি ভক্তি-প্রতিষ্ঠানের রক্ষক-সূত্রে কেহ ঐ সকল চলচ্চিত্র দর্শন করেন, তাহা হইলে তাঁহার কার্য্যটী বাহ্য-দৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়তর্পণামোদী জন-সাধারণের চেষ্টারই অন্যতম বলিয়া মনে হইলেও বা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শিক্ষার অর্থাৎ ব্যক্তিগত

সাধকের আচারের বিপরীত বলিয়া মনে হইলেও সার্ব্বদেশিক বিচারে তাহা শুভফলপ্রদ ও ঐ সকল আচার্য্যেরই অনুমোদিত। যাঁহারা এ কথাটী বুঝিতে পারেন না, তাঁহারা প্রচার ও ব্যক্তিগত ভজনের বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। তবে শ্রীগৌড়ীয় মঠের কোন ব্যক্তি বা বহু ব্যক্তি যদি কেবল ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়-পিপাসা মিটাইবার জন্য রুচি ও আসক্তির সহিত চলচ্চিত্র অথবা রঙ্গালয়ে গৌরাঙ্গ-লীলা বা প্রহ্লাদ-চরিত্র দর্শন করিতে যান, কিম্বা গ্রামোফোনের গান শোনেন, তাহা হইলে ব্যক্তিগতভাবে তাঁহারা গৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য হইতে স্বতন্ত্র।

একবার শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসবের সময় মহাপ্রভুর বাড়ীর মেলায় এক ব্যক্তি পাখীর নাচ দেখাইতে আসিয়াছিল। ঐ ব্যক্তি পাখীর নাচ দেখিবার জন্য বৈষ্ণবগণকে অনুরোধ করায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শিষ্যাভিমানী এক ব্যক্তির বিচার হইল যে, যখন ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উপদেশ ও আদর্শ আচরণে ঐ সকল ব্যাপারকে ব্যসন-দ্যূতাদি কলি-সহচর-বস্তু বলিয়া গর্হণ করা হইয়াছে, তখন তিনি কিছুতেই পাখীর নাচ দেখিবেন না। তিনি মনে করিলেন, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও ঐ পাখীর নাচওয়ালার অনুরোধ নাট্যাচার্য্য গিরিশ বাবুর অনুরোধের ন্যায় নিশ্চয়ই প্রত্যাখ্যান করিবেন; কিন্তু যখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার শিষ্যাভিমানী-বিশেষের ব্যক্তিগত সাধক-জীবনের শিক্ষার সহিত প্রচারের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছে, তখন তিনি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রমুখ কএকজনকে লইয়া স্বয়ং ঐ পাখীর নাচ দেখিতে গেলেন। তখনও তাঁহার ঐ শিষ্যাভিমানী ব্যক্তি ঠাকুরের এই কার্য্যের সমালোচনা করিলে ঠাকুর বলিলেন, এই পাখীর নাচ সাধারণ স্থানের পাখীর নাচ নহে,—মহাপ্রভুর বাড়ীর—মহাপ্রভুর মেলার পাখীর নাচ; সুতরাং ইহা কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় ব্যাপার। এইরূপ পাখীর নাচই দেখিতে হইবে। আমার প্রভুর বাড়ীতে, আমার প্রভুর জন্মোৎসবে যে-সকল মেলা, উৎসব, আনন্দ-নৃত্য হইতেছে, তাহাতে আমার প্রভুর কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছে। প্রভুর বৈভব যত প্রকারে প্রকাশিত হয়, তাহা দর্শনের জন্য রুচি থাকিলেই প্রভুর প্রতি আসক্তির সাক্ষ্য পাওয়া যায়। যাঁহাদের প্রভুতে আসক্তি নাই, তাঁহারা প্রভুর বাড়ীর নৃত্যের সহিত অন্যান্য নৃত্যোৎসবাদিকে সমান মনে করিয়া লোকদেখান বৈরাগ্য-প্রদর্শনের দ্বারা আত্ম-প্রতিষ্ঠা-কামনারূপ ইন্দ্রিয়-তর্পণের অনুসন্ধান করেন, করুন। দ্বিতীয়তঃ এখানে বহু প্রকার লোকের আগমন; কেহ হয় ত' পাখীর নাচ দেখিতে আসিয়া মহাপ্রভুর ভক্তগণের সেবা, মহাপ্রভুর নাম-প্রচারে সাহায্য, মহাপ্রভু-দর্শন ও মহাপ্রসাদ-সেবনের সুকৃতি সঞ্চয় করিবার সুযোগ পাইতে পারেন; সুতরাং মহাপ্রভুর বাড়ীর পাখীর নাচ বন্ধ করিয়া ব্যক্তিগত সাধক-জীবনের পালনীয় বৈরাগ্য-প্রদর্শন প্রচার-কার্য্যের সহায়ক নহে।

আবার মহদ্ ব্যক্তিগণ দীনচেতা বিষয়িগণের গৃহে তাঁহাদের মঙ্গল-বিধানের জন্য গমন করিয়া থাকেন, তাঁহারা বিষয়িগণের বিষয়মল বা দুঃসঙ্গের ভার বহন করিয়া আনিবার জন্য তাঁহাদের গৃহে গমন করেন না।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ আপাত-দৃষ্টিতে যে জন-সঙ্গ করেন, তাহা বহির্ম্মুখগণের সঙ্গের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবার জন্য নহে, পরন্তু বহির্ম্মুখগণের উপকারের জন্য; ইহা মহাবদান্যাবতারী শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপাশক্তির প্রভাবেই সম্ভব হয়। শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ তদীয় নিজ-প্রিয়জনকে মায়ার ব্রহ্মাণ্ড কলিকাতায় যাইতে নিষেধ করিতেন, জগতের লোকের সহিত একেবারে আলাপ-পরিত্যাগের উপদেশ দিতেন; কিন্তু কলিকাতায়ই শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং জগতের লোকের সহিতই আলাপ-ব্যবহার শ্রীগৌড়ীয়মঠের কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃত বিচারে দেখিতে গেলে শ্রীগৌড়ীয়মঠ কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই—শ্রীচৈতন্যবাণীহট্টের মধ্যে, অর্থাৎ যে-স্থান সর্ব্বদা শ্রীচৈতন্যের সঙ্কীর্ত্তন-বাণীতে মুখরিত, সেইরূপ স্থানেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রকাশ হইয়াছে, আর জগতের লোকের সঙ্গ করিবার জন্যও শ্রীগৌড়ীয়মঠ লালায়িত নহেন; জগতের লোকগণকে বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবের সেবার সহায়ক করিয়া বৈষ্ণবের সঙ্গে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন করিবার জন্যই শ্রীগৌড়ীয়মঠের জগতের লোকের সহিত আলাপ-পরিচয়। আচার্য্যগণের—লোক-শিক্ষকগণের আচরণের পরস্পর আপাত-বিরোধের সমন্বয় একদেশী বিচার বা মনোধর্ম্মের দ্বারা বুঝা যায় না। নিষ্কপট-আচার্য্য-সেবা-ফলেই সেই সকল মীমাংসা হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়।

কতকগুলি লোক মনে করেন, ব্যক্তিগত সাধকের কৃত্য ও প্রচার-প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কৃত্য একই শ্রেণীর অন্তর্গত হইবে। তাঁহাদের ধারণা,—ব্যক্তিগত সাধকজীবনে বিলাসপ্রচেষ্টার প্রতিষেধক যে-সকল অনুশাসন প্রদত্ত হইয়াছে, সেই সকল অনুশাসন প্রচার-প্রতিষ্ঠানের প্রতিও প্রযোগ করা উচিত; ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য মোটরযান, বিদ্যুতের ব্যবহার প্রভৃতি ব্যাপার বিলাসের কারণ, সন্দেহ নাই; ঐ সকল বিলাসে ব্যক্তিগত-ভাবে কোন অনর্থযুক্ত ব্যক্তি বা ভোগিসমাজের কাহারও অধিকার নাই। কিন্তু বিষয়ি-ভোগি-সমাজের ধারণা,—ঐ সকল জিনিষ ভোগ করিবার একমাত্র তাহারাই অধিকারী; তাহাতে তাঁহাদের কোন প্রকার দোষ বা নিন্দা হইতে পারে না। কিন্তু তাঁহারা সেইরূপ অন্যায় অধিকার পাইয়াছেন,—এইরূপ মনে করিবার তাঁহাদের কি নিদর্শন আছে? বিষয় তাঁহাদের নহে, বিষয় স্বরাট্ পুরুষোত্তমের। সুতরাং তাঁহারা পারমার্থিকগণের সমালোচক হইবার মোটেই অধিকারী নহেন। বিশেষতঃ হরিকীর্ত্তন-প্রচার-প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে ভ্রান্ত হইয়া তাঁহাদের ঐরূপ সমালোচনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য বিদ্যুতের ব্যবহার নিন্দনীয় হইতে পারে, কিন্তু শ্রীহরিনাম-প্রচারে বিদ্যুৎকে যদি নিযুক্ত না করা যায়, তাহা হইলে এমন সার্ব্বজনীন ভুবন-মঙ্গলকর আর কি কার্য্য আছে—যদ্দ্বারা এই বৈদ্যুতিক জগৎ আবিষ্কারের ও আবিষ্কর্ত্তার চরম ও শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে? জগতের অন্য যে-কোন কার্য্যে বিদ্যুৎ বা অন্য যে-কোন উপকরণ নিযুক্ত হউক না কেন, তাহা কতকগুলি লোকের সাময়িক উপকারের ছলনায় ভাবী অপকার এবং কতকগুলি লোকের প্রত্যক্ষ অপকার সাধন করিবেই করিবে। বিদ্যুৎজগৎ, বাষ্পজগৎ, শিল্পজগৎ প্রভৃতি হইতে সাধক সাধু-সন্ন্যাসী ব্যক্তিগতভাবে দূরে থাকিবেন বলিয়া যদি শ্রীনাম-প্রচারের জন্য অর্থাৎ নিখিল জীবের প্রকৃত

মঙ্গল-উদ্বোধনের জন্য যদি ঐ সকল ব্যবহার না করা হয়, তাহা হইলে কেবল বাহিরের সাধুত্ব-নাম কিনিবার জন্য কৃষ্ণসেবাকে নির্ব্বাসিত করিতে হয়। পদব্রজে হাঁটিয়া এবং সমুদ্র সাঁতারাইয়া প্রচারকগণকে যদি গৌর-নাম প্রচারের জন্য পাশ্চাত্যদেশে যাইতে হয় এবং ঐ সকল শীত-প্রধান-স্থানে নগ্নদেহে থাকিয়া বুজরুকী প্রদর্শনই সাধুত্ব বলিয়া প্রচার করা হয়, তাহা হইলে শ্রীহরি-কীর্ত্তনের বা জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল অপেক্ষা লোকের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিই বা জনমতের প্রশংসা-আহরণই অধিক প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রমাণিত হয়। মহাপ্রভুর সময় মুদ্রা-যন্ত্র, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বৈদ্যুতিক আলো বা বৈদ্যুতিক ট্রেন-এয়ারোপ্লেন প্রভৃতি ছিল না। সুতরাং মুদ্রাযন্ত্রে ভাগবত-কথা-প্রচার বা শ্রীগৌরসুন্দরের কথা প্রচার করিলে, বিমান-ডাকে সেই সকল কথা প্রেরণ করিলে, শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের জন্য তত্তৎ উপকরণগুলি ব্যবহার করিলে মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হইবে,—এইরূপ কুবিচার ভোগান্ধ ব্যক্তিগণের মস্তিষ্ক হইতেই প্রসূত হয়। যাহারা নিজেদের ভোগ-সাম্যে হরিসেবাকে দর্শন করে, তাহারা হরি-সেবা অপেক্ষা আত্মপ্রতিষ্ঠার বাহন কৃষ্ণপ্রীতিহীন ত্যাগের বাহাদুরীকেই বহুমানন করে। কত প্রকারে, কিরূপ নিখিল চেষ্টা-দ্বারা হরিসেবা হয়, তজ্জন্য অধ্যবসায় তাহাদের উদ্দেশ্য নয়, তাহাদের উদ্দেশ্য—নিজের বাহাদুরীর প্রদর্শনী উন্মোচন করিয়া স্থূল বা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির চেষ্টা।

যাঁহারা নিজেদের ভোগ বা ত্যাগের উদ্দেশ্যে সমুদ্রযাত্রা করেন, তাঁহারা কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তের বিধান-অনুসারে প্রায়শ্চিত্তার্হ; কিন্তু যাঁহারা শ্রীচৈতন্যের বাণী বা শ্রীহরিনামপ্রভুকে জিহ্বায় নৃত্য করাইতে করাইতে পৃথিবীর যে-কোন স্থানে গমন করেন, তাঁহাদের আগমনে সমস্ত অপবিত্র স্থান পবিত্র, অতীর্থস্থান তীর্থীভূত হইয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধ পাঠে জানা যায় যে, কর্ম্মজড়গণের প্রায়শ্চিত্ত হস্তিস্নানের ন্যায় সাময়িক। কিন্তু শ্রীহরিনামের আভাসেই সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত অনায়াসেই সাধিত হয়। কাজেই যাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের নাম-সংকীর্ত্তনের পতাকা লইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিচরণ করেন, আম্লেচ্ছ সর্ব্বদেশ তাঁহাদের দর্শন-মাত্র শুদ্ধ হইয়া থাকে এবং তাঁহাদের বাণী-শ্রবণে তদ্দেশীয় জীবগণ পরম মঙ্গল-লাভের সুকৃতি অর্জ্জন করেন। কাজেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারকগণের য়ুরোপাদি প্রদেশে অভিযান ও কর্ম্ম, জ্ঞান, অন্যাভিলাষ প্রভৃতি প্রচারকগণের সমুদ্রযাত্রা—একশ্রেণীর নহে। শ্রীহরিনাম-প্রচারকগণের পদাঙ্কানুসরণ অপেক্ষা করিয়া সকল পবিত্রতা বিরাজ করিতেছেন।

গৌড়ীয়

[১৯৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দ, ১৩৪০-৪১ বঙ্গাব্দ]

শ্রীবলদেব-আবির্ভাব

আজ "গৌড়ীয়ে"র নব-বর্ষারম্ভ—"গৌড়ীয়ে"র যুগপ্রবেশের প্রথম দিন। এই দিনে গৌড়ীয়ের সেবক-সম্প্রদায়ের পক্ষে বলের প্রয়োজন। শ্রুতি গাহিয়াছেন,—

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

পরমাত্মা পরমাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম বলহীন ব্যক্তির লভ্য নহে।

যাঁহারা শব্দের অজ্ঞরূঢ়ির উপাসনা করেন, তাঁহারা 'বল' বলিতে শারীরিক বা মানসিক বল বুঝেন। কিন্তু ঐ সব বল প্রাকৃত বল,—পাশবিক বা নৈতিক বল-মাত্র; নৈতিক বল অপেক্ষাও পরম নৈতিক বল আছে, তাহাই আত্মার বল—তাহাই আত্মার আত্মা—আত্মার আশ্রয়। সেই বলদেবের পাদপদ্মের করুণা-কটাক্ষ হইতেই সমস্ত জীবতত্ত্ব পরমেশ্বরের সেবায় বল লাভ করেন। তাই ভাগবত বলিয়াছেন,—

"রামেতি লোকরমণাদ্বলভদ্রং বলোচ্ছ্রয়াৎ"। (ভাঃ ১০।২।১৩)

লোকসমূহের আনন্দবিধায়ক বলিয়া 'রাম' এবং বলাধিক্য বলিয়া তিনি—'বলদেব'।

পরমেশ্বরের যে শক্তি "সত্তা" প্রকাশ করেন, তাঁহার নাম সন্ধিনীশক্তি। এই সন্ধিনী-শক্তির অধীশ্বর—শ্রীবলদেব। ইনি দশদেহে অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গে কৃষ্ণ-সেবা করেন। যে-সকল জীব দশ-দেহে মায়ার সেবা করিতে চাহে, তাহারা দশ কর্ম্ম করিবার জন্য বলদেবের অনুরূপ ছায়াময় দশভুজার আশ্রয় গ্রহণ করে। দশভুজার রাজ্য ভোগ করিবার প্রবল ইচ্ছা উদিত হইলে তাহার প্রতিযোগী দশ বদন ও বিংশভুজ গ্রহণ করিবার চেষ্টা হয়। তখন সেই দশানন শ্রীবলদেবেরই কলা-স্বরূপ শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক নিপাতিত হয়। এই শ্রীরামচন্দ্র দশদেহে কৃষ্ণ-সেবাকারী সঙ্কর্ষণেরই স্বাংশপ্রকাশস্বরূপ। এজন্য যিনি দশ ইন্দ্রিয়ে সঙ্কর্ষণের সেবা করেন, শ্রীরামচন্দ্র সেই দশরথে বাৎসল্য-সেবারস প্রকাশ করিয়া উদিত হন।

এই বলদেবের বলে বলীয়ান্ না হইলে কখনও অভীষ্টলাভ হয় না। বল-বিতরণকারী সর্ব্ব-বলের আকরদেবতা তাঁহার বল-মূর্ত্তিকে কত চিদ্বিচিত্রতায় প্রকাশ করিয়াছেন।

"**ভক্তপদধূলি** আর **ভক্তপদজল**।
ভক্ত-ভুক্তশেষ—এই তিন সাধনের বল।।
এই তিন-সেবা হ'তে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়।।"

শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু সেই বলদেব-তত্ত্ব। শ্রীগুরুপাদপদ্ম—এই শ্রীবলদেবের অভিন্ন-বিগ্রহ। গুরুকৃপাহীন ব্যক্তি কখনও আত্মবল লাভ করিতে পারে না। তাই শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পূর্ব্বে বলদেবের আবির্ভাব। কৃষ্ণসেবার, কৃষ্ণদর্শনের পূর্ব্বে শ্রীগুরুপাদপদ্মের দর্শন ও সেবা।

নববর্ষারম্ভে দৈবক্রমে এই শ্রীবলদেব-আবির্ভাব-তিথি অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীবলদেবাবির্ভাব না হইলে—শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাবল না পাইলে "গৌড়ীয়ে"র সেবা-চন্দ্রিকা প্রকাশিত হইতে পারে না। গৌড়ীয়কে শ্রীবলদেব- পূর্ণিমা—শ্রীগুরুপাদপদ্ম-কৃপা-পৌর্ণমাসী স্নিগ্ধ চন্দ্রিকায় অভিষেক করুন। সেই কৃপা বরণ করিয়া আমরা "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—এই শ্রুতির মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর মহাশয়ের গীতির ঝঙ্কার মিলাইয়া গান করি—

নিতাই-পদকমল কোটিচন্দ্রসুশীতল
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়।।

* * * *

আরও বলি,—

শ্রীগুরুচরণ-পদ্ম কেবল-ভকতি-সদ্ম
বন্দো মুই সাবধান মতে।
যাঁহার শরণে, ভাই, এ-ভব তরিয়া যাই
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাহা হ'তে।।

পরমেশ্বর কৃষ্ণ ও অসুর কৃষ্ণ

বিস্ময়ের কোন কারণ নাই; যাঁহারা উপনিষদ্ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই অভিমত প্রকাশ করেন যে, শ্রুতিতে কৃষ্ণের নাম নাই। প্রচলিত ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে "দেবকীপুত্র কৃষ্ণ"* বলিয়া একটি শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রসিদ্ধ দেবকীপুত্র স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নহেন, পরন্তু একজন জীব। ছান্দোগ্য-উপনিষদের ঐ "দেবকীপুত্র কৃষ্ণ" অঙ্গিরার পুত্র 'ঘোর' নামক ঋষির শিষ্য।

শ্রীব্যাসপ্রণীত বিভিন্ন শাস্ত্রে অসুর-কৃষ্ণের নাম দেখা যায়। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য শ্রীব্যাসের বাক্য হইতে দেখাইয়াছেন যে, পরমেশ্বরের যতগুলি প্রসিদ্ধ নাম প্রচলিত আছে, তত্তৎ-নামে পরিচিত অসুরও তৎসংখ্যক

* তদ্ধৈতদ্‌ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়োক্ত্বা বা চাপিপাস (ছান্দোগ্য ৩।১৭।৬)

আছে। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে (১০ম স্কন্ধ ৬৬ অধ্যায়ে) শৃগাল বাসুদেবের নাম দেখিতে পাই। কোন কোন ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যদেবের প্রায় সম-সাময়িক কালে আপনাদিগকে 'নারায়ণ', 'গোপাল', 'ব্রহ্ম' প্রভৃতি বলিয়া প্রচার করিয়াছিল, তাহারও সাক্ষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতে (আদিখণ্ডে ১৪শ অধ্যায়ে) পাওয়া যায়।

উপনিষদে পরাৎপরতত্ত্বকে ''রসো বৈ সঃ", 'অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু" প্রভৃতি মন্ত্রে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে অর্থাৎ পরাৎপরতত্ত্ব—রসস্বরূপ এবং তিনি 'সঃ' পদের প্রতিপাদ্য পুরুষ, ক্লীব অর্থাৎ কেবল 'তৎ'পদ-বাচ্য, আর তিনি সকল ভূতের মধুস্বরূপ। উপনিষদ্ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি রসময় রসিকশেখর মাধুর্য্যবিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথা এরূপভাবে ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন। কেন না, উপনিষদ্ শান্তরসের রসিকগণের অর্থাৎ জড়বিলাস হইতে নিবৃত্ত চেতন-বিলাসের প্রথম ভূমিকা অবলম্বনকারিগণের উপযোগী পাঠ্য গ্রন্থ; তাহা চিদ্বিলাসের প্রাথমিক পাঠ, কার্য্যেই উপনিষদ্ রসিকশেখর মাধুর্য্যমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে ''রসো বৈ সঃ", ''সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু" বলিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন।

যাঁহারা এইরূপ বর্ণপরিচয় শিক্ষার মধ্যে মহামহোপাধ্যায়গণের পাঠ দেখিতে চাহেন, তাঁহারা সে-স্থানে জীব-কোটি দেবকীপুত্র কৃষ্ণের নাম পাইয়া নিবৃত্ত হন। আবার কেহ কেহ বা তাহাতে বিমূঢ় হইয়া ''অহং ব্রহ্মাস্মি, ''তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" প্রভৃতি মন্ত্রের তাৎপর্য্যের অবধারণে বঞ্চিত হয় এবং শৃগাল- বাসুদেবের ন্যায় অসুর-কৃষ্ণের প্রবৃত্তির অনুকরণে আপনাকে পরমেশ্বরের একচ্ছত্র অধিকারের প্রতিযোগী করিয়া তুলিতে চাহে ও তৎফলে চরম দণ্ড লাভ করে। এইরূপ প্রকৃতির ব্যক্তিগণ যে বৃত্তি লইয়া কৃষ্ণের বা বিষ্ণুর প্রচ্ছন্ন উপাসক সাজে, তাহাদিগের নিকটই অসুর-কৃষ্ণ বা অসুর-বিষ্ণু উপস্থিত হইয়া থাকে; কেন না, কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এই যে, যাহারা তাঁহাকে যে যে ভাবে ভজিবেন, তিনি সেই সকল ব্যক্তির নিকট সেই সেই ভাবেই আত্মপ্রকাশ করিবেন।

যাহারা বিশ্বের কোন না কোন সম্বন্ধ-গন্ধ লইয়া ভগবানের উপাসনার ছলনা দেখায়, ভগবান্ তাহাদের নিকট তাঁহার বিশ্বরূপ প্রকাশ করিয়া বঞ্চিত করেন। আবার, যাঁহারা ভগবানের যোগমায়া স্বরূপশক্তির সন্ধান না পাইয়া ভগবানের চিন্ময়ী শক্তির উপাসনার দোহাই দিয়া প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্টভাবে কোন না কোনপ্রকার কামনার উপাসনা করিতে চাহেন, তাঁহাদের নিকট যোগমায়া তাঁহার মহামায়ারূপিণী ছায়াস্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

যাঁহারা সুমেধা, তাঁহারা প্রচলিত ছান্দোগ্য-উপনিষদের জীবকোটি দেবকীপুত্র কৃষ্ণের নাম পাইয়া তাহার আকর ও মূল কারণস্বরূপ বিশুদ্ধ-সত্ত্ব দেবকীর অপ্রাকৃত পুত্র, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, সর্ব্ব-কারণকারণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিষয় জানিতে পারেন। জীবের ঐ নামের যদি আকর না থাকিত, তবে এরূপ নাম কোথা হইতে আসিল? এই জগতে মঙ্গলময় ভগবানের নাম-অনুসারেই মাতা-পিতা সন্তানের নামকরণ করিয়া থাকেন; —ইহা সামাজিক-বিধির মধ্যেও দৃষ্ট হয়।

উপাসকগণের চিত্তবৃত্তি-অনুসারে উপাসনার বিধি ও রুচি ভিন্ন হইয়া পড়ে। শ্রীহরিভক্তিবিলাস

শ্রীজন্মাষ্টমী-তিথির কৃত্যবিচার-প্রসঙ্গে দুইপ্রকার রুচিবিশিষ্ট লোকের কথা প্রাচীন শাস্ত্রবাক্য হইতে উদ্ধার করিয়াছেন—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তিপরো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ।।

এই পৃথিবীতে দুইপ্রকার সৃষ্টি—দৈব ও অসুর। বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ দৈব এবং তদ্বিপরীত ব্যক্তিগণ অসুর।

শ্রীজন্মাষ্টমী-পালনের ব্যবস্থাও দৈব ও অদৈবগণ তাঁহাদের রুচি-অনুসারেই গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহাদের স্ব-স্ব-অধিকার প্রকাশ করিয়া ফেলেন। সপ্তমীবিদ্ধা জন্মাষ্টমী, দশমী-বিদ্ধা একাদশী প্রভৃতি বিদ্ধব্রত-পালনে বিদ্ধ-বৈষ্ণব বা অবৈষ্ণব-সম্প্রদায়েরই রুচি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের বিচার অদৈব।

যদি কেহ প্রশ্ন করেন,—যাহারা ঐরূপ সপ্তমী-বিদ্ধ জন্মাষ্টমী বা দশমী-বিদ্ধা একাদশী প্রভৃতি পালন করেন, তাহারাও ত' শাস্ত্রদর্শনেই ঐরূপ করিয়া থাকেন, সুতরাং কেবল "গোস্বামি-মতে পরাহে"—এরূপ গোস্বামি-বিচার স্বীকার করিব, আর অন্য স্মার্ত্তব্যবস্থাগুলির নিন্দা করিব—এরূপ গোঁড়ামী ও সঙ্কীর্ণতাই বা কেন? অতএব উভয়ই সমান—যাহার যেমন রুচি, তিনি তেমনই করুন; কারণ, উভয়ই শাস্ত্রের মত। ইহা আধুনিক তথা-কথিত সমন্বয়বাদিগণের যুক্তির ধারা। কিন্তু সর্ব্বত্রই ন্যায় এই যে, পূর্ব্ব বিধি হইতে পর-বিধি বলবান্। এজন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন,—

"যচ্চ বহ্নিপুরাণাদৌ প্রোক্তং বিদ্ধাষ্টমীব্রতম্।
অবৈষ্ণবপরং তচ্চ কৃতং তদ্দেবমায়য়া।।
পুরা দেবৈর্ঋষিগণৈঃ স্বপদচ্যুতিশঙ্কয়া।
সপ্তমী-বেধজালেন গোপিতং হ্যষ্টমীব্রতম্।।"

(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।১৭৮-১৭৯)

বহ্নিপুরাণাদিতে বিদ্ধাষ্টমীতে যে ব্রত-বিধি লিখিত আছে, তাহা অবৈষ্ণবপর ও দেবমায়াকৃত। স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—পুরাকালে সুরগণ ও ঋষিগণ তাঁহাদের পদচ্যুতির ভয়ে সপ্তমী-বেধরূপ জালদ্বারা অষ্টমীকে গুপ্ত রাখিয়াছিলেন।

অতএব আসুরভাব-মিশ্রিত ব্যবস্থা-সমূহ বিমুখ-মোহনের জন্যই কল্পিত হইয়াছে। মানব বাহ্যে বৈষ্ণব বা কৃষ্ণভক্ত বলিবার পরিচয় এবং জন্মাষ্টমী বা হরিবাসর-আদি বৈষ্ণবব্রত-সমূহের পালনের পরিচয়, এমন কি, কৃষ্ণনাম-গ্রহণ বা কৃষ্ণে স্তবস্তুতি করিবার পরিচয় প্রদান করিয়াও প্রকৃত কৃষ্ণস্বরূপের উপাসনার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণের অদৈব ছায়া-শক্ত্যংশের পূজা করিয়া ফেলেন। এ জন্যই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

"ধিক্ তা'র কৃষ্ণ-সেবা-শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন।।"

গানের অধিকারী কে?

নবধা ভক্তির মধ্যে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অপর আট প্রকার ভক্তি কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির যোগেই সাধিত হয়। কৃষ্ণকীর্ত্তন মলিন-চিত্ত জীবের হৃদয়- দর্পণকে মার্জ্জন করেন, ভবসমুদ্ররূপ মহাদাবাগ্নির নির্ব্বাপণ করেন, জীবের পরমমঙ্গলরূপ কল্যাণ-কিরণ বিস্তার করেন, তিনি অপ্রাকৃত অনুভূতির প্রাণ-স্বরূপ, জীবের কৃষ্ণসেবানন্দ বর্দ্ধন করেন, পদে পদে পূর্ণসুধা আস্বাদন করান এবং সর্ব্বাত্মার স্নিগ্ধতা সাধন করেন। এই কৃষ্ণকীর্ত্তন কৃত্রিমভাবে হয় না। কীর্ত্তনকারী আপনার শুদ্ধ অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে চিন্ময় কৃষ্ণনাম কেবল-মাত্র সেবোন্মুখ হইয়াই গান করিতে সমর্থ। যেকানে গায়কের বৃত্তি অন্যাভিলাষময়ী অথবা কর্ম্মজ্ঞানাচ্ছন্ন, তথায় কৃষ্ণকীর্ত্তন ফলানুসন্ধান করিয়া ভক্ত্যঙ্গ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন; তজ্জন্য শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু জীবকে যে একমাত্র উপদেশ করিয়াছেন, তাহা এই,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।"

প্রাকৃত সকলপ্রকার অহঙ্কার রহিত হইয়া, প্রাকৃত সুনিম্নস্তরে স্থাপিত তৃণ হইতে আপনাকে সুনীচজ্ঞানে, তরুর ন্যায় সহ্যগুণ-সম্পন্ন হইয়া, আপনাকে সকলপ্রকার প্রাকৃত অভিমান হইতে বিমুক্ত করিয়া অপরের প্রাকৃত অভিমানসমূহের সম্মান প্রদান করতঃ জীব নিরন্তর কৃষ্ণনাম গান করিবেন। প্রাকৃত অভিমানের বশবর্ত্তী হইলে, আপনাকে প্রাকৃত জ্ঞান করিলে, প্রাকৃত বস্তু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার যোগ্য মনে করিলে, প্রাকৃত সম্মান-লাভে লুব্ধ হইলে অথবা অপর প্রাকৃত বস্তুর অসম্মান করিলে অপ্রাকৃত হরিনাম সর্ব্বদা কীর্ত্তিত হন না।

যিনি প্রাকৃত জন্মমাহাত্ম্যে মহিমান্বিত হইয়া আত্মশ্লাঘা করেন, যিনি অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া আপনাকে ধনী জ্ঞান করেন, যিনি বেদশাস্ত্রে বিপুল পরিশ্রম করিয়া আপনাকে পণ্ডিত মনে করেন এবং যিনি কন্দর্প-সদৃশ সৌন্দর্য্য লাভ করিয়া নিজরূপ-গরিমার আস্ফালন করেন, তিনি পদে পদে প্রাকৃত মাহাত্ম্যে মত্ততাক্রমে মূঢ় হইয়া যান। তিনি কখনই অকিঞ্চনের ন্যায় নিষ্কপট চিত্তে কৃষ্ণনাম গান করিতে পারেন না।

যিনি সুর, লয়, তাল, মান প্রভৃতির সৌন্দর্য্যে আচ্ছন্ন হইয়া নামরসাস্বাদনে বঞ্চিত হন, তাঁহারও কৃষ্ণগানে অধিকার-লাভ ঘটে না। যিনি পরমাদরের সহিত কৃষ্ণগানে উৎসাহ-বিশিষ্ট হন না, তিনিও গানাধিকারী হইতে পারেন না। যিনি অবান্তর উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া প্রতিষ্ঠাবশে নামকীর্ত্তনে দম্ভ প্রকাশ করেন, তিনি নামগানে অধিকারী হন না। কেবলমাত্র যিনি জড়ে উদাসীন, অপ্রাকৃত সেবা-পরায়ণ এবং নিষ্কপট চিত্তে একমাত্র নামগানে রত, তিনিই প্রকৃত নাম-গানের অধিকারী। (সঃ তোঃ ১৯।১০)

দীক্ষা ও দীক্ষিতের কর্ত্তব্য

বেদ-বেদান্ত-পুরাণেতিহাসাদি নিখিল শাস্ত্র নিঃশ্রেয়সপ্রার্থী জীবমাত্রকেই সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে দিব্য জ্ঞান লাভের উপদেশ করিয়া থাকেন। সদ্গুরু শ্রীভগবানের অভিন্নপ্রকাশ-বিগ্রহ—নিজজন; স্বয়ং সেব্য ভগবানই তাঁহার ভজনের নিগূঢ় রহস্য জানাইবার নিমিত্ত সেবক-ভগবান্ গুরু-রূপে জগতে অবতীর্ণ। সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত কেবলমাত্র আধ্যক্ষিকতা-মূলে মনুষ্যের ভগবদ্বিষয়ে কোন অভিজ্ঞানই লাভ হইতে পারে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণমূলা শরণাগতি লাভ হইলেই কৃষ্ণ সেই শরণাগত ব্যক্তিকে আত্মসম করিয়া লন, তাহার গুণময় প্রাকৃত-স্বরূপ তাহার অজ্ঞাতসারেই অন্তর্হিত করিয়া স্বীয় পাদপদ্ম-ভজনোপযোগী শুদ্ধ অপ্রাকৃত চিদানন্দময় কলেবর প্রদান করেন—ইহারই নাম দিব্যজন্ম—দীক্ষাজন্ম বা দৈক্ষ্য সংস্কার। অচিন্ত্যশক্তি শ্রীভগবানের পক্ষে ইহা একটি অত্যন্ত বিস্ময়কর কোন কার্য্য নহে। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিতেছেন (ভাঃ ৫।১২।১১)—

"অচিন্ত্যশক্ত্যা ভক্ত্যুপদেশ কাল এব তস্য গুণাতীতানি দেহেন্দ্রিয়মনাংসি ময়া ভক্তিমাহাত্ম্য-দর্শনার্থমলক্ষিতমেব সৃজ্যন্তে মিথ্যাভূতানি তান্যত্যলক্ষিতমেব লয়ং যান্তি।"

"প্রভু কহে—ভক্তদেহ প্রাকৃত কভু নয়।"

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তা'রে করে আত্মসম।।
সেই দেহ করে তা'র চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়।।"

"প্রাকৃতদেহেন্দ্রিয়াদীনামেব ভক্তিসংসর্গেনাপ্রাকৃতত্বং স্পর্শমণি-ন্যায়েনৈব"—অর্থাৎ স্পর্শমণি-সংস্পর্শে যেমন লৌহও সেই মণি-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ গুরুপাদপদ্মে সমর্পিতাত্মা ব্যক্তিরও গুরুকৃপালব্ধ ভক্তিবীজ-সংস্পর্শেই প্রাকৃতাভিমান দূর হইয়া যায়। মায়াবাদিগণ বিবর্ত্তবাদ উত্থাপন করায় তাঁহাদের মতে কার্য্যমাত্রেরই অসত্ত্ব-হেতু দেহেন্দ্রিয়াদি-ব্যাপারও মিথ্যা; সুতরাং ভক্তির স্থিতিই নাই, এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহাদের গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা এবং পরিশেষে নির্গুণত্বাদি লাভ আকাশক্ষেত্রে বীজ-বপনাদির ন্যায় নিরর্থকই হইয়া থাকে। কথায় বলে—"মাথা নাই, তা'র মাথা ব্যথা!" তাঁহাদের মতে আদৌ জীবত্বই স্বীকৃত হইতেছে না, সুতরাং গুরূপদেশলাভাদির অপেক্ষা কোথায়? "লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যদাহৃতম্"—এস্থলে 'নির্গুণত্ব' বলিতে দেহেন্দ্রিয়াদি- ব্যাপারের মিথ্যাত্ব উপলক্ষিত হয় নাই, যেহেতু পরিণামবাদ স্বীকার করিবার সদ্বুদ্ধি হইলে কার্য্যমাত্রের অসত্ত্ব-প্রতিপাদনের যত্ন না হইয়া "দেহেন্দ্রিয়াদিব্যাপারঃ শ্রীকৃষ্ণস্যৈকনিষ্ঠো ভক্তিরিতি" বিচারানুগত্যে প্রাকৃতগুণসম্বন্ধ-নিষেধক অপ্রাকৃত ভক্তিগুণময়ত্বই উপলব্ধির বিষয় হয়।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—

"মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ।।"

অর্থাৎ যখন জীব শ্রীগুরুপাদপদ্মের দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান গ্রহণকালে নিজের বর্ণাশ্রমাদি-বিচার-সংরক্ষণমূলে ভদ্রাভদ্র বিচারাত্মক সর্ব্ববিধ দ্বৈতভাব বা স্বতন্ত্র বিচার সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীগুরুরূপ আমাতে অহংতামমতাস্পদ—যাহা কিছু 'সর্ব্বস্ব' নিবেদন করিয়া "যোঽহং মমাস্তি যৎকিঞ্চিদিহলোকে পরত্র চ। তৎ সর্ব্বং ভবতো নাথ চরণেষু সমর্পিতম্"—এই প্রকার বিচারবিশিষ্ট হয়, তখন সেই ব্যক্তিকে আমি আত্মসাৎ করায় তাহার উপর আর মায়িক গুণের কোন প্রভাব থাকিতে পারে না, সে অমৃতত্ব লাভ করে।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব-সমর্পণ-বিচারে ইতস্ততঃ করিয়া যে ব্যক্তি "Philistine" (সংকীর্ণচেতাঃ ব্যক্তি, যিনি কেবল নিজের লাভ খুঁজিয়া বেড়ান) হইতে যান এবং তজ্জন্য নিজেকে অধিক বুদ্ধিমান্ জ্ঞান করেন, তিনি দীক্ষার অভিনয় মাত্র করিয়াও—অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য ইত্যাদি মুখে বারম্বার উচ্চারণ করিয়াও যে তিমিরে সেই তিমিরেই অবস্থান করেন। এইজন্য আমাদেরই মঙ্গলোদ্দেশ্যে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ দেবর্ষি নারদের শ্রীমুখনিঃসৃত ভগবৎপ্রাপ্ত্যুপায়- বর্ণনমুখে সুস্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন—

"গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা সর্ব্বলাভার্পণেন চ।
সঙ্গেন সাধুভক্তানামীশ্বরারাধনেন চ।।"

অর্থাৎ সমস্ত লব্ধ বস্তু ভক্তিসহকারে গুরুপাদপদ্মে অর্পণপূর্ব্বক গুরুদেবতাত্ম সাধুভক্তসঙ্গে কায়মনো-বাক্যে শ্রীগুরুসেবা ও শ্রীগুর্ব্বানুগত্যে ভগবন্নামাদির অনুশীলন-ফলে শ্রীগুরুকৃপালাভ-ক্রমে ভগবৎকৃপা লভ্য হইয়া থাকে। শ্রীগুরু-সেবায় অবহেলা-প্রদর্শনকারী ব্যক্তি আত্মম্ভরী হইয়া গুরুপাদপদ্ম হইতে বহুদূরে অবস্থান করেন।

আগামী ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৩৪), ২১শে মাঘ (১৩৪০) শ্রীব্যাসপূজাবাসরে মদীয় আচার্য্যবর্য্যের ষষ্টিবর্ষ-পূর্ত্তি-আবির্ভাবোৎসবোপলক্ষে গুরুপাদাশ্রিতাভিমানী আমাদিগকে আমাদের নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী গুরুবর্গ শ্রীগুরুপাদপদ্ম-পূজোপকরণ- সংগ্রহ-ব্যপদেশে যে গুরুসেবার—বাস্তব দীক্ষালাভের শুভ অবসর প্রদান করিতেছেন, নিঃশ্রেয়সপ্রার্থী ব্যক্তি মাত্রেরই সেই শুভ অবসর অবহেলা করা কর্ত্তব্য নহে। সকলেই সকলের সর্ব্বস্ব কেবল মৌখিক-মাত্র নহে, কার্য্যতঃ সত্য সত্য সমর্পণ করিয়া যাহাতে সত্য সত্য দীক্ষা বা দিব্য-জ্ঞান লাভের যোগ্যতা লাভ হয়, তজ্জন্য শ্রীগুরুগৌরাঙ্গচরণে সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের কৃপা-বল প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য।

সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে কৃষ্ণারাধনই পরমোপায়

শ্রীভগবৎসেবা-বৈমুখ্য-হেতু জীবের প্রতি-মুহূর্ত্তে ভোগ বা ত্যাগ-বিচারের আবরণে যে কত অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, মায়া মোহ-মুগ্ধ অহংমমাতিমদমত্ত জীব তাহার হেতু নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া ভগবৎসেবোন্মুখতা-ব্যতীত অন্য উপায়ে সেই সকল অনর্থের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি-লাভের চেষ্টা করে, ফলে তাহাকে আরও অনর্থগ্রস্ত হইয়া অনন্ত দুঃখসমুদ্রে নিমজ্জিত হইতে হয়। ভগবৎসেবায় অনাদর করিয়া জীব যতই তাঁহার স্বদেশ, স্বগৃহ, স্বজন, স্বধন, স্বসুখ, স্ব-অভিলাষ, স্বজ্ঞান, স্বযোগ, স্বকর্ম্মাদি ভ্রমে নশ্বর বিষয়মোহে মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছেন, ততই তাঁহার আর দুঃখের অন্ত থাকিতেছে না। দেহাত্মবোধই এই সকল অনর্থের মূল; উহাই মানবমেধাকে নিঃশ্রেয়সচিন্তার সম্পূর্ণ অযোগ্য করিয়া ফেলিয়াছে। যে জড়-বিষয়মোহে আমরা ভগবৎসেবা বিস্মৃত হইয়া জড় নশ্বর বস্তুকেই আমাদের যথাসর্ব্বস্ব বিবেচনা করি, যাহার জন্য প্রাণ-পর্য্যন্ত পণ করিতেও পশ্চাৎপদ হই না, তাহা যে আমাদিগকে কিরূপ বঞ্চনা করিয়া—প্রেতের অট্টাহাস্য হাসিয়া আমাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া চলিয়া যায়—তাহার পরিণাম দেখাইয়া শিক্ষা দিয়া যায়, তাহা আমরা দেখিয়াও দেখি না, বুঝিয়াও বুঝি না, শুনিয়াও শুনি না—ইহাই আমাদের দুর্দ্দৈবের বিষময় ফল। যুধিষ্ঠির মহারাজ এই জন্যই বলিয়াছেন,—

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্।।"

জগৎকে ভোগ করিতে যাইবার পরিণাম দর্শনে এক শ্রেণীর লোক বিরক্ত হইয়া উহার মিথ্যাত্ব, ভোগকারী জীবেরও মিথ্যাত্ব-প্রতিপাদনে সচেষ্ট হন, 'নেতি', 'নেতি' বিচারোন্মত্ত হইয়া নশ্বর জগতের নাম-রূপ-গুণাদি নিরস্ত করিতে গিয়া একেবারে সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ ভগবানেরও নামাদি বৈশিষ্ট্য ধ্বংস করিতে প্রস্তুত হন এবং নিজেকেই 'ভগবান্' বলিয়া ঘোষণা করেন। মানুষ স্থূল ভোগবিচার হইতে ত্যাগ-বিচারাবরণে কিরূপ সূক্ষ্ম ভোগে প্রবৃত্ত হয়—আরও কত অধিকপরিমাণে সুকঠিন মায়া-নিগড়ে আবদ্ধ হয়, কিরূপ বিকারগ্রস্ত হইয়া কি উন্মাদের ন্যায় প্রলাপ বকিতে থাকে, তাহা না বুঝিয়া আপনাকে অত্যন্ত 'বিজ্ঞ' বলিয়া পরিচয় দেয়। মায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয়ই এইরূপ আমাদিগকে ভগবদ্ভজনের বিচার হইতে যে কত শত শত যোজন দূরে নিক্ষেপ করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমাদের এই প্রকার দুর্ম্মতি দেখিয়া শ্রীভগবান্ বা তাঁহার নিজজনগণ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে মায়ামোহান্ধকূপ হইতে কৃপা-রজ্জু-দ্বারা উদ্ধারার্থ কত যত্ন করেন। তাঁহাদের আদর্শ জীবন চরিতের প্রতি আমাদের যত শীঘ্র শ্রদ্ধার উদয় হয়, ততই মঙ্গল। তাই কোন মহাপুরুষ গাহিয়াছেন,—

"এ ঘোর সংসারে পড়িয়া মানব না পায় দুঃখের শেষ।
সাধুসঙ্গ করি' হরি ভজে যদি তবে অন্ত হয় ক্লেশ।।

বিষয়-অনলে জ্বলিছে হৃদয় অনলে বাড়ে অনল।।
অপরাধ ছাড়ি' লয় কৃষ্ণনাম, অনলে পড়য়ে' জল।।
নিতাই-চৈতন্য-চরণকমলে আশ্রয় লইল যেই।
কৃষ্ণদাস বলে, জীবনে মরণে, আমার আশ্রয় সেই।।"

ভোক্তা, প্রভু, কর্ত্তা—একমাত্র ভগবান্। শ্রীগীতায় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ"—এই শ্রীমুখবাক্যে স্বয়ংই তাঁহার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। জীবকেও "মামেব যে প্রপদ্যন্তে", "মামেকং শরণং ব্রজ", "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু", "ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যোঽহমেবংবিধোঽর্জ্জুন", "ভক্ত্যা মামভিজানাতি", "মত্তঃ পরতরং নান্যং কিঞ্চিদস্তি", "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" প্রভৃতি বাক্য-দ্বারা তাঁহার (ভগবানের) মনোঽভীষ্ট ও জীবের কর্ত্তব্য-বিচার স্পষ্টরূপে বলিয়া দিয়াছেন। তথাপি যাঁহারা শ্রীভগবানের এই শ্রীমুখ-নিঃসৃতা বাণী অবহেলা করিয়া নিজেরাই 'কর্ত্তা' বা 'প্রভু' সাজিতে যান, তাঁহাদের দুর্গতির কেবল এই জীবনমাত্রে নহে, অনন্ত জীবনেও অন্ত নাই। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে শরণাগতিই জীবের একমাত্র মঙ্গলোপায়, উহাই তাহার আত্মার প্রকৃত ধর্ম্ম। এই শরণাগতি শিক্ষা দিবার জন্যই যুগে যুগে কৃষ্ণভক্তগণ জীবের প্রতি অত্যন্ত কৃপা-পরবশ হইয়া তাঁহাদের নিজভজনমুদ্রা প্রকটিত করেন, তাঁহাদের আদর্শ যাহাতে আমরা স্ব-স্ব সেবোন্মুখতানুসারে ক্রমে ক্রমে অনুসরণ করিতে পারি, তাহারও সুযোগ প্রদান করেন। যদি আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, তবেই আমরা তর্কপন্থায় প্রবৃত্ত না হইয়া সদ্‌গুরুপাদপদ্মে শরণাপত্তি-মূলা সদ্‌বুদ্ধি বরণপূর্ব্বক কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন-মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া সেই যজ্ঞাগ্নিতে যজ্ঞেশ্বর শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপাদপদ্মে আত্মাহুতি প্রদান করি। মহাজনেরা বলেন—

সেই ত' সুমেধা, আর কলিহত জন।
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁ'রে করে আরাধন।।

সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণের সর্ব্বতোভাবে অনুশীলন-রূপ সংকীর্ত্তন-যজ্ঞ-দ্বারাই কৃষ্ণের সর্ব্বতোভাবে আনন্দ-বিধান হইতে পারে, যিনি এই প্রকারে কৃষ্ণসৌখ্য- বিধানের সুবুদ্ধি বরণ করেন, তিনিই কলিবৈরী মহারাজ পরীক্ষিতের আনুগত্যে অন্যবিষয়-তৃষ্ণা বর্জ্জিত হইয়া শ্রীশুখমুখবিগলিত ভাগবতামৃত-রসপানের অধিকারী, জগতে তাঁহা অপেক্ষা সুমেধা আর কেহই নহেন। জড় শিল্প-বিজ্ঞান-কলা-দর্শন-প্রত্নতত্ত্বাদিতে যিনি যত বড়ই পণ্ডিত হউন না কেন, তাঁহার সে পাণ্ডিত্যের মূল্য অন্ধ-কপর্দ্দক বলিয়াও স্বীকার্য্য নহে, যদি তিনি এই সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে আত্মাহুতি-প্রদানরূপ পাণ্ডিত্য বরণ করিতে না পারেন।

কলি সর্ব্বদোষের আকর হইলেও যে কলিতে স্বয়ং ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া এই সংকীর্ত্তনযজ্ঞের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, যে নামসঙ্কীর্ত্তনে জীবের সর্ব্বানর্থ দূর হইয়া পরম মঙ্গলের উদয় হয়, সেই কলিকে আজ গুণজ্ঞ সারগ্রাহী মহাপুরুষেরা সর্ব্বগুণাকর বলিয়া শতমুখে প্রশংসা করিতেছেন। সুতরাং "কলিতে ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব লুপ্ত হইয়াছে, মিথ্যা প্রবঞ্চনাই কলির ধর্ম্ম" ইত্যাদি উক্তির আবরণে যাঁহারা দোষাকর কলির অনুচর হইবার

জন্য প্রবৃত্ত, কৃষ্ণসংকীর্ত্তন পরিত্যাগপূর্ব্বক অথবা কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের নামে কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণের পরিবর্ত্তে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণরূপ আত্মবঞ্চনা ও তৎ সঙ্গে সঙ্গে পরবঞ্চনাকে যুগধর্ম্ম স্থির করিয়া নিজের সহিত বহু নিরীহ লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন, আপনাদিগকে 'মহাদক্ষ' বিবেচনা করিয়া শুদ্ধনামপ্রেমবন্যায় নিমজ্জিত হইবার বিচার হইতে দূরে সরিয়া গিয়া 'আত্মরক্ষা হইল' বিচার করিতেছেন, তাঁহাদের বুদ্ধির কোন মূল্যই নাই। তাই শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা উপযুক্ত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ দ্বারা বিশ্বের সর্ব্বত্র শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত নাম-সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। জগতের সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমন্ত জনগণ যাঁহারা, তাঁহারাই এই সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে আত্মাহুতি-প্রদানের সুমেধা বরণ করিয়া ধন্য হইতেছেন।

"পড়িয়া শুনিয়া লোক গেল ছারে খারে।
কৃষ্ণ মহামহোৎসব বঞ্চিল সবারে।।"

জগতে জড়বিদ্যার প্রভাব যত প্রবল হইতেছে, ততই কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-যজ্ঞ-মহোৎসবের বিচার জগজ্জীবের চিত্ত হইতে দ্রুতবেগে বিদায় লাভ করিতেছে। সর্ব্বত্রই জড়েন্দ্রিয়-তর্পণ যজ্ঞের বিরাট্ আয়োজন, বিরাট্ জনসমাগম, জড়ানন্দের উৎস প্রবলবেগে প্রবাহিত; কিন্তু হায়, যেখানে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-যজ্ঞের আয়োজন, যেখানে চিদানন্দের অনন্ত সমুদ্র উচ্ছলিত হইয়া দুকূল প্লাবিত করিতেছে, যেখানে আদি-মধ্য-অন্তরূপ পরিচ্ছেদশূন্য হইয়া অখণ্ড অসীম আনন্দ সমগ্র নিরানন্দকে সম্পূর্ণরূপে নিরাস করিতেছে, যেখানে জীবাত্মার সম্যক্ প্রসন্নতা বিদ্যমান, যেখানে শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখাদির ঘাত-প্রতিঘাতময় দ্বন্দ্ব-ধর্ম্মের প্রবেশাধিকার নাই, যেখানে ভোগ বা ত্যাগ-বিচারের তাড়নায় কাম-ক্রোধাদি রিপুগণ উত্তেজিত হইয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, সকলেই এক স্বরাট্ সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র পুরুষোত্তমের ইচ্ছার অনুবর্ত্তনে তাঁহার আনন্দ-বিধানে স্ব-স্ব স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহারে রত, যেখানে জন্ম-জরা-মৃত্যু-শোক-মোহ-অভাব-আকাঙ্ক্ষাদির প্রভাব পরাভূত, যেখানে সকলের স্বার্থগতি এক কৃষ্ণপাদপদ্ম হওয়ায় স্বার্থ-বিচারের বিভিন্নতা-হেতু বিবদমান ধারণাসমূহ স্ব স্ব বিক্রম প্রকাশে সর্ব্বতোভাবে অসমর্থ, সেই স্থানেই যোগদানে লোকের প্রীতির অভাব—এমনই অঘটনঘটন- পটীয়সী দৈবী—ত্রিগুণময়ী মহামায়ার প্রভাব! আমাদের এই দুরদৃষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে পরদুঃখদুঃখী কৃপাম্বুধি শ্রীভগবন্নিজজনগণ আমাদিগকে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-যজ্ঞ-মহোৎসবে যোগদান করিতে আহ্বান করিতেছেন। জড়বিচারের মোহে মুগ্ধ হইয়া আমাদিগের পক্ষে এই আহ্বান উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে।

শুদ্ধভক্তি-স্বরূপিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের আবির্ভাব, শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব, শ্রীব্যাসপূজা—শ্রীগুরুপাদপদ্মাবির্ভাব ও শ্রীগৌরাবির্ভাব-মহোৎসব সমাগত। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সভ্যগণ বিশ্ববাসী সকলকেই এই কৃষ্ণসংকীর্ত্তন-মহামহোৎসবে যোগদানের জন্য আহ্বান করিতেছেন। সকলেই এই মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া নিত্যমঙ্গল বরণ করুন, ইহাই তাঁহাদের প্রার্থনা।

ভক্তের সুখ ও দুঃখ

প্রাক্তন সুকৃতি বা দুষ্কৃতি-ফলে কর্ম্মফলবাধ্য জীব সুখ বা দুঃখ ভোগ করে। সুখের সময় দুঃখের কথা ভুলিয়া যায়, উত্তরোত্তর সুখবৃদ্ধির কামনায় উন্মত্ত হইয়া পড়ে; আবার দুঃখের সময় সুখের আশায় পাগলের মত হইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন চিত্তে কালযাপন করিতে থাকে। ভগবদ্ভক্ত কিন্তু সুখ-দুঃখের ঘাতপ্রতিঘাতে পড়িয়া ঐ প্রকারে আত্মশান্তি বিসর্জ্জন দেন না। তিনি তাঁহার সুখ-দুঃখের সমস্ত বিচার ভগবৎপাদপদ্মে নির্ভর করিয়া "যদ্ যদ্ ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্" বিচারেই সন্তুষ্ট থাকেন। ভক্ত গাহেন—

"এখন বুঝিনু প্রভু তোমার চরণ।
অশোক-অভয়ামৃত পূর্ণ সর্ব্বক্ষণ।।
সকল ছাড়িয়া তুয়া চরণ-কমলে।
পড়িয়াছি আমি নাথ তব পদতলে।।
তব পাদপদ্ম নাথ রক্ষিবে আমারে।
আর রক্ষাকর্ত্তা নাহি এভব-সংসারে।।
আমি তব নিত্যদাস জানিনু এবার।
আমার পালন-ভার এখন তোমার।।
বড়দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে।
সব দুঃখ দূরে গেল ও-পদ-বরণে।।"

কৃষ্ণও সমর্পিতাত্মা তাঁহাকে আত্মসম করিয়া লন—তাঁহার সুখ-দুঃখের সমস্ত চিন্তা নিজের বলিয়া জানেন। তাই ভক্তের হৃদয় জগতের কোন অবস্থায়ই ক্ষুব্ধ হয় না। "কৃষ্ণ মঙ্গলময়, তিনি সর্ব্বক্ষণই আমার মঙ্গলচিন্তা করিতেছেন, মঙ্গল- ময়ের কোন বিচারই অবিচার নহে; তিনি স্বেচ্ছাময়, স্বরাট্ সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র পুরুষোত্তম, প্রীতচিত্তে তাঁহার ইচ্ছার অনুবর্ত্তনই আমার কৃত্য"—এই বিচারে ভক্তহৃদয় সর্ব্বদাই পরানন্দময় থাকে, জগতের কোন ভোগী বা ত্যাগীর বিচার আসিয়া তাঁহার চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তুলিতে পারে না—ত্রিতাপ তাঁহার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। ভক্ত তাঁহার চিদানন্দময় কলেবরে সর্ব্বদা সেবানন্দে মগ্ন থাকেন। জগতের ভাবনাবর্ত্ম—সুখ-দুঃখ রূপ দ্বন্দ্বধর্ম্ম অতিক্রম পূর্ব্বক যিনি সর্ব্বদা ভগবৎ-সেবানন্দে বিভোর, কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণবাঞ্ছার পরিবর্ত্তে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণবাঞ্ছার লেশমাত্র যাঁহার নাই, জীবনে-মরণে, শয়নে-স্বপনে—সর্ব্বাবস্থায়ই তাঁহার শ্রীপাদপদ্মই আমাদের একমাত্র শরণ্য-বরেণ্য হউক, তাহা হইলেই আমাদের জীবন ধন্য হইবে, আমরা শ্রীভগবৎসেবায় আত্মনিয়োগ করিবার সুমেধা পাইয়া ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামনা-জন্য আর অশান্তিকে 'শান্তি' বলিয়া বরণ করিব না।

সুখ-দুঃখের বিচার-ভার নিজে লইতে গেলেই "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ"—বিচার-উল্লঙ্ঘন-জন্য ভগবৎকৃপা-লাভ হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইতে হইবে।

আমরা যাহাকে 'দুঃখ' বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে যাই, ভক্ত তাহাকেই 'ভগবৎ- কৃপা' বলিয়া পরমাদরে বরণ করেন; তাই তিনি অনন্ত দুঃখের মধ্যেও সুখে বিভোর, আর আমরা আমাদের পরিকল্পিত সুখের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়াও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন চিত্তে কালযাপন করিতে থাকি।

শ্রীকুন্তীদেবী কৃষ্ণ-সমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন (ভাঃ ১।৮।২৫),—

"বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্গুরো।
ভবতঃ দর্শনং যৎস্যাদপুনর্ভবদর্শনম্।।"

[হে জগদ্গুরো কৃষ্ণ, যে সকল বিপদ্ উপস্থিত হইলে আমাদের ভাগ্যে সংসারাসক্তি-নিবারক তোমার দুর্ল্লভ দর্শন-লাভ ঘটে, আমাদের সেই সমস্ত বিপদ্ পূর্ব্বোক্ত বিচিত্র অবস্থা-নিচয়ের মধ্যে চিরদিনই যেন উপস্থিত হয়।]

অর্থাৎ শ্রীকুন্তীদেবী যাহাতে ভগবদ্দর্শন নাই, তাহাকেই বিপদ্ বলিতেছেন আর যাহাতে ভগবদ্দর্শন বর্ত্তমান, তাহা শত-সহস্র বিঘ্ন-সঙ্কুল হইলেও পরম সম্পদ্ বলিয়া বরণের আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন। প্রাকৃত ভোগপরায়ণ ব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয়-তর্পণে বাধা-প্রাপ্ত হইলেই আপনাদিগকে বিপদ্গ্রস্ত মনে করেন; কিন্তু ভক্তের বিচার—

"তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত
সেও ত' পরমসুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ পরম সম্পদ
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ।।"

শ্রীরায় রামানন্দ-মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণ-ভক্ত-সঙ্গাভাবকেই 'গুরুতর দুঃখ' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। আবার যে সুখ কৃষ্ণসেবা-সুখে বাধা প্রদান করে, সে সুখের প্রতিও ভক্তের মহাক্রোধ উপস্থিত হইয়া থাকে, ভক্ত তাহাকে কখনও 'সুখ' বলেন না।

"নিজ-প্রেমানন্দে যদি কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে।।"

(চৈঃ চঃ আ ৪।২০১)

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা-মূলক সুখকে ভক্তগণ 'দুঃখ' বলিয়াই জ্ঞান করেন, পরন্তু কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলক সুখই তাঁহাদের একমাত্র বরণীয় 'সুখ'। যেখানে কৃষ্ণসেবারূপ স্বার্থগতি হইতে বিচ্যুত হইয়া দেহাত্মবোধ-মূলে আমরা সুখ বা দুঃখের বিচারক হইতে যাই, সেখানেই নানাপ্রকার অশান্তি আসিয়া আমাদিগকে গ্রাস করে।

কৃষ্ণ সর্ব্বতোভাবে আমাদের মঙ্গলবিধাতা; "যস্যাহং অনুগৃহ্লামি হরিষ্যেত্তদ্ধনং শনৈঃ" বিচার-মূলক কৃষ্ণানুগ্রহ উপলব্ধির সৌভাগ্য যাঁহার হইয়াছে, তিনি সম্পদে-বিপদে—জীবনে-মরণে সর্ব্বাবস্থায়ই কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাপন্ন হইয়া সর্ব্বদা সর্ব্বত্র এই গানকেই তাঁহার জীবনের সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিয়া থাকেন—

"মানস-দেহ-গেহ যো কিছু মোর।
অর্পিলুঁ তুয়া পদে নন্দকিশোর।।
সম্পদে বিপদে জীবনে মরণে।
দায় মম গেলা তুয়া ও-পদ বরণে।।
মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তোহারা।
নিত্যদাস-প্রতি তুয়া অধিকারা।।
জন্মাওবি মোএ ইচ্ছা যদি তোর।
ভক্তগৃহে জনি জন্ম হউ মোর।।
কীট-জন্ম হউ, যথা তুয়া দাস।
বহির্ম্মুখ ব্রহ্মজন্মে নাহি আশ।।
ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা-বিহীন যে ভক্ত।
লভইতে তাঁক সঙ্গ অনুরক্ত।।
জনক জননী দয়িত তনয়।
প্রভু গুরু পতি তুঁহু সর্ব্বময়।।
ভকতিবিনোদ কহে শুন কান।
রাধানাথ তুঁহু হামার পরাণ।।"

প্রাকৃত-সহজিয়া ও শুদ্ধবৈষ্ণব

যুগে যুগেই ধর্ম্মের গ্লানি একটি চিরন্তন ঐতিহাসিক সত্য। ইহা যে কেবল গীতার অভ্রান্ত বাণীর মধ্যে দেখিতে পাই, তাহা নহে; প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক প্রমাণ সমূহও ইহা সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করিয়া থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন ভগবান্ শ্রীবুদ্ধদেবের, শিবাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্যের শিক্ষা-দীক্ষা হইতে যাঁহারা ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, অথচ তাঁহাদেরই দোহাই দিয়া আপনাদিগকে তত্তৎ সম্প্রদায়ের এক একজন প্রধান পুরোহিত বা সভ্য বলিয়া পরিচয় দিতেছিলেন, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐ সকল ব্যক্তির মতবাদ এবং আচার-প্রচারের বিপথগমনের কথা তাঁহাদিগকে জানাইয়া দিয়াছিলেন। সাক্ষাৎ ভগবান্
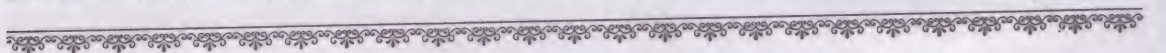
শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় সেই সকল বিপথগামী ব্যক্তির মধ্যেও কেহ কেহ সুকৃতিফলে মঙ্গল লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের অপ্রকট-লীলার পরে যখন গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দের প্রচারের যুগ আরম্ভ হইল, তখন যে-সকল আনুকরণিক অবতারবাদ ও নানাপ্রকার পাষণ্ডমতবাদ সৃষ্ট হইয়াছিল, আচার্য্যগণ তাহা নিরাস করিলেন। ইহার প্রমাণ শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর চরিত্র-প্রসঙ্গে আমরা দেখিতে পাই। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নামে আরোপিত "গৌরগণচন্দ্রিকা" গ্রন্থে, "ভক্তিরত্নাকরের" চতুর্দ্দশ তরঙ্গধৃত শ্রীবীরভদ্র প্রভুর লিখিত পত্রাবলীতে এবং তাহারও পূর্ব্বে ঠাকুর বৃন্দাবনের "শ্রীচৈতন্য ভাগবতের" আদি খণ্ড ১৪শ অধ্যায়ে, "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" আদি ১২শ পরিচ্ছেদে ঐ সকল ব্যক্তির সঙ্গ দুঃসঙ্গরূপে পরিত্যাগ করিবার স্পষ্ট আদেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহার পরে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের এক মহা ঘোর অন্ধকার যুগে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে কত কিছুই যে অপসিদ্ধান্ত ও অসদাচারের তাণ্ডব অবাধ স্বচ্ছন্দগতিতে পরিপুষ্ট হইবার সুযোগ পাইয়াছিল, তাহা রাজা রামমোহন রায়ের বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্যেই প্রমাণ পাওয়া যায়। তদানীন্তন নব্য শিক্ষার আব্‌হাওয়ার কর্ণধার রাজা রামমোহন গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের দোহাই-প্রদানকারী অশিক্ষিত ও অসদাচারী ব্যক্তিগণের আদর্শ দেখিয়া ঠিক করিয়া লইয়াছিলেন,—উহাই বুঝি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের আসল প্রতীক। তাই তিনি পৌত্তলিক ধর্ম্মের উৎসাদনকারীর নামে একজন প্রচ্ছন্ন সমর্থক হইয়া তাঁহার বিকৃত অভিজ্ঞতার বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতীককে ভাঙ্গিতে চাহিয়াছিলেন।

নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় একজন নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব সিংহ-হুঙ্কারে গাহিয়াছিলেন,—

আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই।
সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাতগোঁসাই।।
অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী।
তোতা কহে,—এই তের'র সঙ্গ নাহি করি।।

মহাত্মা তোতারামের এই বুলি শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরেরই আরও ব্যাপক প্রতিধ্বনি। কারণ চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছিলেন,—

উদ্ধারার্থং ক্ষিতিনিবসতাং শ্রীল নারায়ণোঽহং
সংপ্রাপ্তোঽস্মি ব্রজবনভুবো মূর্দ্ধ্নি চূড়াং নিধায়।
মন্দং হৃষ্যন্নিতি চ কথয়ন্ ব্রাহ্মণো মাধবাখ্য-
শ্চূড়াধারী ত্বিতি জনগণৈঃ কীর্ত্ত্যতে বঙ্গদেশে।।

কৃষ্ণলীলাং প্রকুর্ব্বাণঃ কামুকঃ শূদ্রযাজকঃ।
দেবলোঽসৌ পরিত্যক্তশ্চৈতন্যেনেতি বিশ্রুতঃ।।
অতিভব্যাদয়োঽপ্যন্যে পরিত্যক্তাস্তু বৈষ্ণবৈঃ।
তেষাং সঙ্গো ন কর্ত্তব্যঃ সঙ্গাদ্ধর্ম্মো বিনশ্যতি।।
আলাপাৎ গাত্রসংস্পর্শান্নিঃশ্বাসাৎ সহ ভোজনাৎ।
সঞ্চরন্তীহ পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি।।

(গৌরগণচন্দ্রিকা)

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের এই বাণী শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবনের ভাগবতীয় বাণীর প্রথম, কি দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রতিধ্বনি বলা যাইবে, তাহা পারমার্থিক ঐতিহাসিকগণ বিচার করিবেন। কিন্তু এই সকল হুঙ্কার অনেকেরই হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল। তাই কোন কোন আধুনিক সাহিত্যিক এই হুঙ্কার সহ্য করিতে পারেন নাই। তাঁহারা ''তৃণাদপি সুনীচ'' শ্লোকের শাসনদণ্ডটি শ্রীমন্মহাপ্রভুর হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া রাজার আইন রাজা ও রাজার গণের উপর চালনা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ''ঠাকুর বৃন্দাবন, শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির তৃণাদপি সুনীচতার অভাব হইয়াছিল, তাঁহারা ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া অসংযত ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন''—ইহা তাঁহারা নিরপেক্ষতার চশমায় দেখিয়া লইয়াছেন! লৌকিক সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের এই ছোঁয়াচ প্রাকৃত-সহজিয়াগণের গায়ে লাগিয়াছে। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু, ঠাকুর বৃন্দাবন, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু, এমন কি, শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐ সকল সাহিত্যিক শ্রেণীর নিকট যে তৃণাদপি সুনীচতার অভাব ও পরচর্চ্চার অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন, সেই অপরাধ বর্ত্তমান যুগে প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায় শ্রীগৌড়ীয় মঠের উপর চালনা করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

প্রাকৃত-সাহজিক সম্প্রদায়ের মতে,—শ্রীগৌড়ীয়মঠ গুরুনিন্দক এবং বৈষ্ণবনিন্দক। কিন্তু একটি অতীব আশ্চর্য্য বিষয় এই যে, যেগুলিকে তাঁহারা 'নিন্দা' বলেন, সেই নিন্দার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কোন যুক্তি তাঁহাদের নাই। যে নিন্দার প্রতিবাদ হয় না, তাহা নিন্দা—না সত্য? যদি সত্য হয়, তবে তাঁহাদের কথিত বা আরোপিত কিম্বা কল্পিত গুরু, বৈষ্ণব—নিশ্চয়ই অসত্য।

আধুনিক প্রাকৃত-সাহজিক সম্প্রদায় যখন তাঁহাদের বন্ধুর সংখ্যা ব্যাপক করিবার জন্য জগতের যাবতীয় অন্যাভিলাষীকে দলে টানিয়া আনেন, তখন সেই অধিকতর পরিপুষ্ট দল শ্রীগৌড়ীয়মঠকে গুরু ও বৈষ্ণব-নিন্দকমাত্র বলিয়া সন্তুষ্ট হন না, 'বিশ্বনিন্দক' আখ্যা দিয়া অভিনন্দিত করিয়া থাকেন। 'বিশ্বনিন্দক' বলিতে যে বিশ্বরূপের নিন্দক,—সরস্বতী এই সত্য কথাটি তাঁহাদের মুখে বলাইয়া থাকেন।

বিশ্বরূপই প্রাকৃত-সাহজিকগণের অভীষ্ট রূপ। প্রাকৃত-সহজিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবের প্রতিবিম্ব অথবা শুদ্ধবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রতি মুখ ভেঙ্চাইবার জন্য বৈষ্ণবের মূর্ত্তির অনুকরণে গঠিত অন্যাভিলাষী ও কপট-সম্প্রদায়ের

নির্ম্মিত কুশপুত্তলিকা বা প্রেতপুরুষ। যেখানে যতপ্রকার কপটতা থাকিতে পারে, তাহা তিল তিল পরিমাণে আহরণ করিয়া প্রাকৃত-সহজিয়ার তিলোত্তম মূর্ত্তি গঠিত এবং বাহ্য অনুষ্ঠান ও ধর্ম্মের মৌখিক মুদ্রা ও আচরণের ভুবনমোহন অবগুণ্ঠনে সজ্জিত হইয়াছে।

প্রাকৃত-সহজিয়ার ঐ প্রতীকের একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, উহাতে শুদ্ধ- বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা অনুকরণ করিবার যাবতীয় বৃত্তিগুলি খুব সতেজ। আনুকরণিক বিদ্যায় এরূপ দক্ষতা পৃথিবীর অন্য কোথায়ও আছে কি না, জানা যায় নাই। তাঁহারা আপনাদিগকে শুদ্ধবৈষ্ণব বলেন ও বলান এবং অকৃত্রিম শুদ্ধবৈষ্ণবগণকে বৈষ্ণবতার আখড়া হইতে নির্ব্বাসিত করেন। কেন না, শেযোক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনুকরণ-বিদ্যায় পারদর্শিতা আদৌ নাই।

প্রাকৃত-সহজিয়াগণ শুদ্ধ-বৈষ্ণবকে প্রতিষ্ঠাকামী এবং আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠাশাহীন বলিয়া থাকেন। কারণ, অকৃত্রিম বৈষ্ণবগণ নির্ভীক হরিকীর্ত্তন করেন এবং তৎফলে দুনিয়াশুদ্ধ বহির্ম্মুখ লোকের নিকট অধিকাংশ স্থলেই বিচিত্র নিন্দার ডালি উপঢৌকন পাইয়া থাকেন। আর প্রাকৃত-সহজিয়াগণ সত্যকথা কীর্ত্তন না করিয়া কখনও সূক্ষ্মবস্ত্র ও উত্তরীয়ের আড়ালে মালিকার আধারে মালাজপের প্রদর্শনী উন্মোচন করেন, কখনও বা ভাবের ঘরে চুরি করিয়া নির্জ্জনে গ্রাম্যচিন্তা করেন এবং তাহাতে কোন লোকেরই বিরাগভাজন হইতে না হওয়ায় প্রতিষ্ঠার ঝুড়ি অযাচিতভাবেই তাঁহাদের ভাগ্যে আসিয়া পড়ে বলিয়া তাঁহারা আপনাদিগকে মাধবেন্দ্রপুরীপাদের সমকক্ষ মনে করিয়া ''প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী যায় পলাঞা" বুলি আওড়াইতে আওড়াইতে শুদ্ধবৈষ্ণবগণকে প্রতিষ্ঠার ভিক্ষুক বলিয়া দেখাইয়া দিতে পারেন। বস্তুতঃ ''ঘোম্‌টার ভিতর খেম্‌টা নাচ'—এই মেয়েলি প্রবাদ কপটতার প্রতীক, প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষার বিরাট্ মূর্ত্তি প্রাকৃত-সহজিয়াগণকেই বরণ করে। যাঁহারা 'প্রতিষ্ঠা চাহি না বলেন, তাঁহাদের দুর্দ্দমনীয় প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা যে কিরূপ কপটতার মূর্ত্তিতে লোক-দেখান অসূর্য্যম্পশ্যা স্বৈরিণীর মত সাধারণ লোকলোচনের অন্তরালে পরিপুষ্ট হইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষের বিষয়। তাঁহাদের মালা-তিলক, নিয়ম-নিষ্ঠা, ভাগবত-শ্রবণের ছলনা, ভাবে ডগমগ হওয়া, দশায় পড়া, নির্জ্জন-ভজন, সংসার-বিরক্তির বাহ্যরূপ, ডিঙ্গাইয়া চলার ধর্ম্ম, মিহিসুরে কথা, মুচ্‌কি হাসি, গরুড় পক্ষীর ন্যায় করযোড়ে অবস্থান, তৃণাদপি সুনীচতার নানাপ্রকার কসরৎ সকলগুলিই তাঁহাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রজ্বলিত প্রতিষ্ঠাশা-আগ্নেয়গিরির অস্ফুট, অব্যক্ত, অতৃপ্ত মূর্ত্তি।

এক শ্রেণীর প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় কনক-কামিনীর প্রতি বড়ই লোক- দেখান নিস্পৃহতার ভাব-মুদ্রা প্রদর্শন করেন। যাঁহারা হরিকীর্ত্তনকারী, তাঁহারা কনক গ্রহণ করেন বলিয়া প্রাকৃত-সহজিয়াগণের বিচার-দরবারে অভিযুক্ত! প্রাকৃত-সহজিয়াগণের নিজেদের পাপ ও অপরাধগুলির সমর্থন করিবার যুক্তি নাই। তাঁহাদের একমাত্র অস্ত্র,—যখনই সত্যপথের পথিকগণ লোকহিতের জন্য প্রাকৃত-সহজিয়াগণের কোন গলদ দেখাইবেন, তখনই তাঁহারা জগতের অনভিজ্ঞ-সম্প্রদায়ের অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া সত্যপথের পথিকগণের যে-সকল আচার বাহ্যদৃষ্টিতে বিষয়ীর ন্যায়, সেইগুলিকে বিষয়ীরই পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ- রূপে

প্রচার করিয়া নিজেদের পাপরাশিকে ধামা চাপা দিতে প্রস্তুত হইবেন। তাই প্রাকৃত-সহজিয়া ভাগবত-পাঠক, প্রাকৃত-সহজিয়া মন্ত্রদাতার অভিনয়কারী, প্রাকৃত-সহজিয়া কীর্ত্তন-গায়ক, প্রাকৃত সহজিয়া বক্তা, প্রাকৃত-সহজিয়া দেবল যে-সকল অর্থ সংগ্রহ করে, তাহা শাস্ত্র-বিগর্হিত এবং অপরাধের আকর,—ইহা লোকহিতের জন্য জানাইলেও সত্যকথাকীর্ত্তনকারী ব্যক্তিগণের সত্যকথাকীর্ত্তন বা হরিনাম-প্রচারের জন্য যে সকল উপকরণ অর্থাৎ মাধবের ভোগ্য যে সকল কনক, তাহা তাহাদেরই ইন্দ্রিয়তর্পণের কনকের সহিত সমজাতীয়,—এইরূপ বলিবার এক কৌশল প্রাকৃত-সহজিয়া সম্প্রদায় অস্ত্ররূপে বাহির করিয়া থাকে। বস্তুতঃ যাহাদের রক্ত-মাংস হইতে আরম্ভ করিয়া অস্থি-মজ্জায় পর্য্যন্ত কপটতা ও অনুকরণ-বৃত্তি রহিয়াছে, তাঁহারা নিজেদের যত কিছু বালাই সমস্তই সত্য- প্রচারকগণের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিতে প্রস্তুত হন। বলিতে কি, অবৈষ্ণবধর্ম্মের বালাই যেরূপ নির্ব্বিশেষবাদ, বৈষ্ণবধর্ম্মের বালাইও তেমনি প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় শেষোক্ত বালাইটি অঙ্কুরাকারে ছোট হরিদাসের আদর্শে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু পল্লবিত হয় নাই। কএকশত বৎসরের অনর্থ ও অপরাধজল প্রাপ্ত হইয়া ইহা নানাভাবে পরিপুষ্ট, পল্লবিত ও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। ছোট হরিদাসের আদর্শে মহাপ্রভুর সেবার বাহ্য আকার দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কি উদ্দেশ্যে মহাপ্রভু ছোট হরিদাসের দণ্ড-লীলা প্রকাশ করিলেন, প্রাকৃত-সহজিয়াগণের মাথায় তাহা প্রবেশ করে না। প্রবেশ করিবেই বা কিরূপে? যাহারা স্বয়ং যে দোষের দোষী, তৎপ্রতি নিসর্গবশতঃই তাহারা অন্ধ হইয়া পড়ে। কেবলমাত্র পরম মুক্ত মহাপুরুষগণের নিকট হইতেই মহাপ্রভুর শিক্ষার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়।

প্রাকৃত-সহজিয়াগণের মহাপুরুষ-সংশ্রয় নাই। তাঁহারা পুঁথির শব্দ, বানান, অনুস্বার, বিসর্গ, আকার, ইকার, পুঁথির মলাট, কাগজ, কালি লইয়া মারামারি করিতে করিতেই শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি ও প্রকৃত তাৎপর্য্যকে আড়াল করিয়া ফেলেন। তাঁহাদিগের ধারণা,—সাক্ষাৎ মহান্তগুরুপাদপদ্ম ছাড়াও মহাজনের বাণীর তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা যায়, আর তাঁহাদের ধারণা,—তাঁহাদের নির্ব্বাচিত, তাঁহাদের ইন্দ্রিয়ের ইন্ধনযোগানদারগণই মহাজন। তাঁহারা মনে করেন,—সেরূপ জাতীয় লোক ও ঐ সকল লোকের মতানুবর্ত্তী গণগড্ডলিকার অনুকূল মত লইয়াই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত স্থির হইবে!

কিছুদিন পূর্ব্বে কোন প্রাকৃত-সহজিয়া বক্তা বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন,—নেড়া, নেড়ী, আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, সহজিয়া-সম্প্রদায়ই বৈষ্ণবধর্ম্মের কঙ্কাল ও ক্ষীণকণ্ঠস্বরকে বাঁচইয়া রাখিয়াছে! বক্তার ঐরূপ উক্তি সেইরূপ বৈষ্ণবধর্ম্মের কঙ্কালের সম্বন্ধেই খাটে—যে বৈষ্ণবধর্ম্মকে মনীষী মৌলবী রাজা রামমোহন রায় 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' বলিয়া মনে করিয়াছিলেন! বস্তুতঃ মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণব- ধর্ম্মকে নেড়া সহজিয়া বা কোন আউল, বাউল বাঁচাইয়া রাখিতে পারে নাই। মহাপ্রভু ও গোস্বামিপাদগণের বৈষ্ণবধর্ম্ম নিত্য সজীব ও পূর্ণচেতনময়। তাহা যুগে যুগে লোকের অন্যাভিলাষযুক্ত আবরণের নিকট আবৃত বোধ হইতে পারে; কিন্তু যখন মহাপ্রভুর নিজ-জনগণ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া দিব্যজ্ঞানাঞ্জনশলাকা দ্বারা লোকলোচনের

আবরণ উন্মুক্ত করিয়া দেন, তখনই বৈষ্ণবধর্ম্মের চিরন্তন নির্ম্মল জ্যোতিঃ সেবোন্মুখতার আধারে প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়।

একদল প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় সাহিত্যের আবর্জ্জনা নিরাকরণের নামে প্রাকৃত সাহিত্যিকগণের সঙ্গে পাল্লা দিয়া সাহিত্যে অনর্থরাশির দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্দ্ধিত করিয়া থাকে। ঐ সকল ব্যক্তিগণের সাহিত্য-সংস্কার কোন পরম মুক্ত মহাজনের নিয়ামকত্বে অনুষ্ঠিত না হওয়ায় কেবল কু-সিদ্ধান্ত সৃষ্টি করে। যাঁহারা সদ্গুরুপদাশ্রয় করিলেন না, যাঁহাদের আচার, অনুশীলন এবং প্রচার একতানে গ্রথিত নহে—যাঁহারা "সভায়াং বৈষ্ণবোমতঃ" ন্যায়ের আদর্শ—যাঁহারা কপট আঁকুপাঁকুভাবের কসরত দেখাইয়া লোকবঞ্চনাকারী—যাঁহারা নির্ভীককণ্ঠে প্রকৃত সত্য কথা বলিতে পারেন না—নিজেদের গলদ ঢাকিবার জন্য যাঁহারা অধিকাংশ স্থলেই "তুম্‌ভি চুপ্ হাম্‌ভি চুপ্" নীতি অবলম্বন করেন, কেবল সময় সময় আড়ালে থাকিয়া কৌশলে যেখানে তাঁহারা লোকমত সংগ্রহ করিতে পারেন, সেখানেই লোকের রুচির পূজা এবং নিজের প্রতিষ্ঠাশার তর্পণ-বিধানের জন্য যে সকল মনোধর্ম্মের বাহাদুরী দেখান, তাহাতে প্রাণ নাই, চেতনতা নাই, সুসিদ্ধান্ত নাই, অহৈতুক লোকোপকারচিকীর্ষা নাই, কিম্বা কোন মঙ্গলজনক আদর্শ নাই।

প্রাকৃত-সহজিয়াগণ মনে করেন,—তাঁহারা লোকের চক্ষুর অন্তরালে যাহাই করুন না কেন, তাঁহাদের আভ্যন্তরীণ জীবনে যত প্রকার দুরাচার, অনাচার, বিষয়াসক্তি, পাপ, অপরাধ, অনর্থ রাশি-রাশি সঞ্চিত থাকুক না, সভাসমিতিতে গিয়া বকধার্ম্মিক সাজিলেই এবং তাঁহাদের সমচরিত্র ব্যক্তিগণের সহিত কোন না কোন অপস্বার্থের চুক্তি করিয়া তদ্‌বিনিময়ে কিছু লৌকিক 'বাহাবা' কিনিয়া লইতে পারিলেই তাঁহাদের ঐরূপ কপটতা 'বৈষ্ণবতা' বলিয়া বিকাইবে!

প্রাকৃত-সহজিয়াগণের আর একটি লক্ষণ এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের পরম মঙ্গলের কথাকে "গুরুনিন্দা ও নিজনিন্দা" বলিয়া পরিত্যাগ করেন, অথচ যাঁহারা নির্ম্মৎসর ভুবনমঙ্গল বৈষ্ণব, তাঁহাদিগের মঙ্গলময়ী চেষ্টার প্রতি নিন্দা ও তাঁহাদের শ্রীচরণে অপরাধ না করিয়া মুহূর্ত্তকালও সুখে নিদ্রা যাইতে পারেন না।

বৈষ্ণবাপরাধ করিতে করিতে প্রাকৃত-সহজিয়াগণের হৃদয় কঠিন হইয়া পড়িয়াছে এবং কৃত্রিম ভাবপ্রবণতা অভ্যাস করিতে করিতে চক্ষু পিচ্ছিল হইয়াছে। হৃদয়ের কাঠিন্য ও কামুকতার তারল্য একত্র সম্মিলিত হইয়া তাহাদিগকে এক অপূর্ব্ব জন্তুতে পরিণত করিয়াছে। ইহাদের হৃদয়, একদিকে অপরাধ-কঠিন, আর একদিকে কামুকতা ও ভাবুকতা-পিচ্ছিল। প্রকৃত মঙ্গলজনক কথায় ইহাদের হৃদয় বিগলিত হয় না, কিন্তু ইন্দ্রিয়তর্পণপর বাক্য ও ক্রিয়া-মুদ্রায় ইঁহাদের চিত্ত বিহ্বল হইয়া পড়ে। অনভিজ্ঞ লোক ইহাদের এই কামবিহ্বলা অবস্থাকেই 'ভাব' বলিয়া মনে করিয়া থাকে। শ্রীচরিতামৃত মধ্য ১৯শ অধ্যায়ে শ্রীরূপশিক্ষায় ভক্তির ন্যায় আকৃতি বা সৌসাদৃশ্যযুক্ত যে-সকল লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি অসংখ্য উপশাখার কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা প্রাকৃত-সহজিয়াগণকে আশ্রয় করিয়া ধন্য হইয়াছে। অল্প কথায় বলিতে গেলে প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় যাবতীয় কৃত্রিমতাকে আত্মসাৎ করিয়াছে।

এই সকল ভাব-মুদ্রা একত্র সম্মিলিত হইয়া প্রাকৃত সহজিয়াগণের একটি বিশিষ্ট মূর্ত্তি বা মডেল সৃষ্টি করিয়াছে। তাই অকৃত্রিম বৈষ্ণবগণ প্রাকৃত-সহজিয়ার সেই বিশিষ্ট রূপ দেখিলেই জহুরীর ন্যায় তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলিতে পারেন। প্রাকৃত-সহজিয়া হইতে হইলেই যেন স্মার্ত্তের ডিঙ্গাইয়া চলা ধর্ম্মের সহিত নিসর্গগত সার্ব্বকালিক পাপাচারের সমন্বয় করিবার জন্য সর্ব্বদাই সঙ্গে একটি লাল বা অন্য কোন বর্ণের একতারি-বস্ত্র রাখিতে হইবে, বিশিষ্ট মালার ঝোলা সংগ্রহ করিতে হইবে এবং তাহা ঢাকিয়া রাখিয়া লোকের নিকট নিজেকে প্রতিষ্ঠাশাহীন নামভজনানন্দী বলিয়া অধিক প্রচার করিবার জন্য একটি সূক্ষ্ম উত্তরীয় বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে, কিম্বা অস্পৃশ্য হাড়ের বোতাম-বিহীন বৃন্দাবনী জামা, বৃন্দাবনী পাদুকা প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে হইবে, নাভির নীচে উদর ঝুলাইয়া বস্ত্র-পরিধান, কণ্ঠে লম্বমান মালা, হস্তে স্বর্ণ-তাবিজ, সঙ্গে একটি তামাক-সেবনের নল রাখিতে হইবে। অনেকে ঐ বেষগুলি বিশেষ রুচির সহিত আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করেন, যেন এ সকল না হইলে প্রাকৃত-সহজিয়ার মডেল প্রস্তুত হয় না!

যাহা হউক, ইঁহাদের বাহ্য আকৃতি ও আদর্শ যাহাই থাকুক না কেন, ইঁহারা যদি নিষ্কপট হইয়া আত্মমঙ্গল-বরণে ইচ্ছুক হইতেন—জগাই মাধাইর মত নিষ্কপটে "আর নারে বাপ" বলিতে পারিতেন, তবে ইঁহাদের মঙ্গল হইত। কিন্তু জগাই মাধাইর পাপমাত্র ছিল, কোন বৈষ্ণবাপরাধ ছিল না। সমগ্র বিষ্ণুতত্ত্বের মূল আকর শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর শ্রীঅঙ্গে আঘাত (?) করিয়াও জগাই মাধাই মঙ্গল লাভ করিয়াছিলেন; কেননা, তাহাতে বিষ্ণু-অপরাধ হইলেও সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বৈষ্ণব-অপরাধ হয় নাই। তাই আমরা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে প্রার্থনা করি, তিনি কি প্রাকৃত-সহজিয়াগণকে শুদ্ধবৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে অপরাধ হইতে মুক্ত হইবার সুবুদ্ধিযোগ দিবেন না? মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবেদনে জগাই মাধাইকে কৃপা করিয়াছিলেন, পতিতপাবন নিতাইচাঁদের আবেদনে মহাপ্রভু ভট্টথারির কবলে কবলিত কৃষ্ণদাস বিপ্রকেও ইহজন্মেই আবার সেবার সুযোগ দিয়াছিলেন, কিন্তু গুরুস্থানীয় পরমানন্দপুরী, অন্তরঙ্গ স্বরূপ-দামোদর প্রভৃতি ভক্তগণের অনুরোধেও কেন নিজ-ভক্ত ছোট হরিদাসকে সেই দেহে গ্রহণ করিবার আদর্শ দেখাইলেন না? ছোট হরিদাসের দ্বারা মহাপ্রভু যে লীলার আদর্শটি দেখাইলেন, তাহা কি প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়ের শিক্ষার আদর্শ বলিয়াই মহাপ্রভু প্রাকৃত-সহজিয়াগণের কপটতার প্রায়শ্চিত্ত একমাত্র পতিতপাবনী ত্রিবেণীর জলে ডুবিয়া মরা ব্যতীত আর কিছু নাই, জানাইলেন? প্রাকৃতসহজিয়াগণ যদি নিষ্কপটে অনুতপ্ত হইয়া গৌর-পাদপদ্মসেবিকা জাহ্নবী, কৃষ্ণপাদপদ্মসেবিকা যমুনা এবং গৌর ও কৃষ্ণের পাদপদ্মালিঙ্গিতা সরস্বতীর পতিতপাবন জল আশ্রয় করেন, তাহা হইলেই তাঁহারা এই অপরাধময় দেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন কলেবরে পুনরায় শ্রীগৌরসুন্দরের সেবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন।

শ্রেয়ঃ কথা

জীবের নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সাত্বতশাস্ত্র ও মহাজনগণ ভগবদ্‌ভক্ত-সঙ্গ-রাহিত্যকেই মানব-জীবনের সর্ব্ব অমঙ্গলের হেতু বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ভক্তসঙ্গহীনাবস্থায় আমাদের মন নানা কুবিষয়ে ধাবিত হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—"মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্" অর্থাৎ পণ্ডিতগণ ভগবদ্ভক্তের সেবাকে সংসার-মুক্তির এবং যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গকে তমোদ্বার বলিয়াছেন। গীতাতেও ভগবান্ নিজমুখে কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটিকে আত্মবিনাশী নরকের দ্বার-স্বরূপ বলিয়াছেন—(গীঃ ১৬।২১); অসৎ- সঙ্গ-প্রভাবে ঐ তিনটিই প্রবল হইয়া উঠে এবং তৎফলে জীবকে নিরয়গামী করায়। তাই উদ্ধারোপায় বলিতেছেন—

"এতৈর্ব্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্।।" (গীঃ ১৬।২২)

উক্ত তিন প্রকার তমোদ্বার হইতে মুক্ত হইয়া মনুষ্য আত্মার 'শ্রেয়ঃ' আচরণ করিবে। তাহা হইলেই পরা গতি লাভ হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় অধিবেশন- ক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ষষ্টিসহস্র ঋষি একদিন শ্রীসূতগোস্বামীর নিকট এই "শ্রেয়ঃ" জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রীসূতের উত্তর-দ্বারা আমাদিগকে সেই শ্রেয়ের সন্ধান প্রদান করিয়াছেন। মায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয়ের প্রভাবে আমরা দেহ-মনোধর্ম্ম-প্রসূত কল্পিত শ্রেয়ের অনেক প্রকার-ভেদ সৃষ্টি করিয়াছি; "শ্রেয়ঃ" সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত হইয়াছে। তাই ঋষিগণ আমাদিগকে নিঃসন্দেহ করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

"তত্র তত্রাঞ্জসায়ুষ্মন্ ভবতা যদ্বিনিশ্চিতম্।
পুংসামেকান্ততঃ শ্রেয়স্তন্নঃ শংসিতুমর্হসি।।" (ভাঃ ১।১।৯)

অর্থাৎ "হে অভিজ্ঞোত্তম, আপনি গুরুকৃপায় বেদ-বেদান্তেতিহাসপুরাণাদি নিখিল শাস্ত্রের সারমর্ম্ম অবগত হইয়াছেন। আপনার অধীত শাস্ত্রসমূহে মানবগণের সহজে একান্ত কল্যাণজনক বলিয়া যাহা নিশ্চয় করিয়াছেন, সেই নিশ্চিত শ্রেয়ঃ—নিঃশ্রেয়ঃ বা পরমমঙ্গল-রহস্য আপনি আমাদিগের নিকট কৃপাপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।" তখন শ্রীসূত তদুত্তরে বলিতেছেন,—

"স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি।।" (ভাঃ ১।২।৬।)

অর্থাৎ যাহা হইতে 'অধোক্ষজ' ভগবানে শ্রবণাদি-লক্ষণা ফলাভিসন্ধানরহিতা ঐকান্তিকী স্বাভাবিকী নিরপেক্ষা ভক্তি হয়, তাহাই মানবগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সেই ভক্তিবলে অনর্থ উপশান্ত হইয়া আত্মা প্রসন্নতা লাভ করে। অধোক্ষজ ভগবানে ভক্তিই জীবমাত্রের ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ। অক্ষজবাদী আমরা, আমাদের ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে অনেকে অনেক ভগবান্ কল্পনা করিয়া লইয়াছি। আমাদের দেহ- মনের তর্পণ যিনি করিয়া

উঠিতে পারেন, তিনিই আমাদের সেই কল্পিত ভগবান্। দরিদ্রকে অন্ন-বস্ত্রাদি দান করিয়া কিছু আত্মসন্তোষ লাভ হয়, অন্যের নিকট হইতে পূজা বা প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়, সুতরাং দরিদ্রই আমার 'নারায়ণ', ধনীর নিকট হইতে আমার কিছু স্বার্থ-সিদ্ধি হয়, সুতরাং সেই ধনীই আমার 'নারায়ণ', যে মূর্খ আমার পাণ্ডিত্যাভিমানের স্তাবক হতে পারে, আমার পক্ষে সে-ই 'ভগবান্', আবার কোন পণ্ডিতাভিমানী আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ করিয়া উঠিতে পারিলে তিনিই আমার ভগবান্—এই প্রকারে স্ত্রী-পুত্র-পরিজন-আত্মীয়-স্বজন- বন্ধু-বান্ধব, এমন কি পশু-পক্ষী-সরীসৃপ পর্য্যন্ত আমার ইন্দ্রিয়-মেধযজ্ঞের উপকরণ সরবরাহ করিয়া উঠিতে পারিলে তাহারা সকলেই আমার 'ভগবান্'! মানুষ পাছে এই প্রকারে তাহার স্বকপোল-কল্পিত—মনগড়া-বহ্বীশ্বরবাদের উপাসক হইয়া স্ব স্ব রুচির পথকেই 'শ্রেয়ঃ' মনে করিয়া ভ্রান্ত না হয়—এজন্য পরমভাগবত শ্রীসূত আমাদের প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের গরিমাকে অত্যন্ত হেয়—অপ্রয়োজনীয়—অমঙ্গলপ্রদ জানাইয়া "অধোক্ষজ" বলিয়া একটি শব্দ- দ্বারা শ্রীভগবানকে বিশিষ্ট করিলেন। ভগবানের এক নাম—অধোক্ষজ অর্থাৎ অধঃকৃতং তিরস্কৃতং অক্ষজং জীবানাং ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ — তিনিই অধোক্ষজ। আমাদের মনোধর্ম্মের কারখানায় আমরা যে, এক একজন এক একটি ভগবানকে গড়িয়া তুলি, তাহা এই 'অধোক্ষজ' শব্দব্রহ্মদ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হইয়াছে। অক্ষজে ভক্তি করিলে মঙ্গল হইবে না, অধোক্ষজে ভক্তি করিলেই মঙ্গল হইবে—শ্রীসূত ইহাই শ্রেয়ের রহস্য বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

'ভক্তি'ই নিত্যচেতন আত্মার নিত্যধর্ম; আমাদের অক্ষ বা ইন্দ্রিয়জাত কোন অনিত্য ধারণায়ই এই 'ভক্তি'-শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না। সদ্‌গুরুপাদপদ্মে সমর্পিতাত্মা হইয়া নিত্যানিত্যবিবেকোদয় না হইলে অনিত্য দেহ-মনোধর্ম্মোত্থ ভুক্তি বা মুক্তি-বিচারই বহুমানিত হইয়া জীবের সর্ব্বনাশ সাধন করে। মন তাহার স্বকপোলকল্পিত অনেক ধারণাকেই তাহার প্রসন্নতার উপায়-স্বরূপে স্থির করিয়া লয়, মনোধর্ম্মী জগৎ আমরাও মনের সেই হুকুম তামিল করাকেই শান্তির পথ বলিয়া বরণপূর্ব্বক যখন জড়বিদ্যা-ধন-কুল-তপস্যা-রূপাদির মদে অত্যন্ত উন্মত্ত হইয়া উঠি, মতিচ্ছন্ন হইয়া পড়ি, তখন দর্পহারী মধুসূদন আমাদিগকে সেই অতিমত্ততার পরিণাম সঙ্গে সঙ্গেই প্রদর্শন করেন; আবার শোক-মোহ-ভয়-তাপ-ক্লেশে হৃদয় অশান্তিময় হইয়া উঠে—দিবারাত্র হা-হুতাশ করিয়া দিন কাটাইতে হয়। শান্তি ও অশান্তির দ্বন্দ্বময় জীবন এমনি করিয়া একদিন অন্তিমশয্যায় শয়ন পূর্ব্বক চিরনিদ্রা বরণ করে। কিন্তু হায়! মরিলেই কি শান্তি? প্রাক্তন কর্ম্মফল-বাধ্য জীব অনাদিকর্ম্মালানে বদ্ধ হইয়া দুস্তর সংসার-সমুদ্রে ভাসমান হয়, অশান্তির তরঙ্গ-হিল্লোলে উঠা-নামা করিতে করিতে আবার তাহার দুঃখময় জীবনের অন্তকাল আসিয়া উপস্থিত হয়। এই প্রকারে জীবনের পর জীবন—কত জীবন আমরা এই সংসার-সমুদ্রে ভাসিয়া বেড়াইতেছি! আমাদিগের এই দুঃখ দেখিয়াই পরদুঃখ-দুঃখী কৃপাম্বুধি মহাজনেরা কৃপা করিয়া শ্রেয়ঃপথের সন্ধান দিয়া বলিতেছেন—

"এ ঘোর সংসারে পড়িয়া মানব না পায় দুঃখের শেষ।
সাধুসঙ্গ করি' হরি ভজে যদি তবে অন্ত হয় ক্লেশ।।"

অধোক্ষজ হরিভক্তিই জীবমাত্রের পরমধর্ম্ম বা ঐকান্তিক ধর্ম্ম। উহা কোন-প্রকার আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছামূলে যাজিত হইলেই উহার পরত্ব বা ঐকান্তিকত্ব প্রতিহত হয়। এই জন্যই উহার 'অহৈতুকী' ও 'অপ্রতিহতা' এই দুইটি বিশেষণ। অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-মিশ্রা ভক্তি আত্মাকে সার্ব্বকালিক সন্তোষ প্রদান করিতে পারে না। আত্মা চাহেন—অন্য-নিরপেক্ষা শুদ্ধা স্বাভাবিকী ভক্তি; তাহাতেই তাঁহার সম্যক্ প্রসন্নতা। সেই ভক্তি শ্রবণকীর্ত্তনাদি লক্ষণাত্মিকা।

"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্ম পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ।।"

ঐ শ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণা ভক্তির প্রথমাবস্থা—সাধন নাম্নী, মধ্যমাবস্থা—ভাব-নাম্নী এবং উত্তমাবস্থা বা পরিপক্বাবস্থা—প্রেমনাম্নী। শ্রীভগবানের ভক্ত-প্রেমাধীনত্ব-হেতু ভক্তের কৃপা-ব্যতীত ভগবৎকৃপা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। এজন্য সাত্বত-শাস্ত্র ভক্তসঙ্গের একান্ত আবশ্যকতা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। বহুজন্মের সুকৃতি-ফলে জীবের ভাগ্যে সেই ভক্তসঙ্গ লাভ হয়।

"ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গো জায়তে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ।।"

জীবদুঃখদুঃখী পরমকারুণিক শ্রীগৌরনিজজন শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে সেই সৌভাগ্য-প্রদানের জন্যই আজ শুদ্ধভক্তসঙ্ঘারামে আকর্ষণ করিতেছেন। অত্যন্ত জড়বিষয়-কোলাহল-মত্ত স্থানকে কৃষ্ণ-কোলাহল-মুখরিত করিয়া কলিহত আমাদিগকে শাশ্বতী শান্তির অনুসন্ধান প্রদানের জন্য—শুদ্ধভক্তসঙ্গে শ্রীচৈতন্য-বাণী-শ্রবণানুকীর্ত্তনে যোগদান পূর্ব্বক আত্মমঙ্গল বরণ করিয়া লইবার সৌভাগ্য-প্রদানের জন্যই মঙ্গলময় আচার্য্যবর্য্যের মঠ-মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা। গৌরকথা-শ্রবণে জীবের চিত্ত হইতে সম্ভোগ-পিপাসা অন্তর্হিত হইয়া চিত্ত শুদ্ধ হয়—গৌর-গুণাক্ষিপ্ত-মতি হইয়া জীব গৌরনাম, গৌরধাম ও গৌরকাম-সেবার চমৎকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিয়া ধন্য হন।

গৌড়োদয়াচলে যুগপৎ সূর্য্য-চন্দ্ররূপে উদিত গৌর-নিত্যানন্দের জীব-হৃদয়াকাশে শুভোদয় না হইলে জীবের হৃদয়-গুহার অন্ধকার আর কে দূর করিবে? অত্যন্ত অধম পতিত দুর্গত দুষ্কৃত জীবপ্রতি করুণা বিস্তার করিয়া বেদ-গোপ্য ব্রহ্মাদি-দেবতা-দুর্ল্লভ প্রেমনিধি বিতরণ করিতে এমন অহৈতুক কৃপাসিন্ধু আর কে আছেন? অযাচককে যাচিয়া প্রেম বিতরণ করিবার এত উদারতা আর কাহার আছে? তাই সেই গৌরশক্তি শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগের হৃদয়কে গৌরপ্রকট-পূর্ণিমার শুভ্র-জ্যোৎস্নায় সমুদ্ভাসিত—চিরশান্ত—চিরস্নিগ্ধ করিবার জন্য আমাদিগকে নবধাভক্তির পীঠস্বরূপ নবদ্বীপধাম-পরিক্রমায় প্রত্যব্দ আহ্বান করিয়া থাকেন। মহাবদান্য গৌরজন ব্যতীত জীবের দুঃখে এত ব্যাকুলতা আর কাহার হইতে পারে? জীবের মঙ্গলের জন্য আর কাহার হৃদয় হইতে এমন সহস্রমুখী কৃপার উৎস প্রবাহিত হইয়া থাকে? গৌরধাম-পরিক্রমা, গৌরমণ্ডল-পরিক্রমা এবং ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা প্রবর্ত্তন, স্থানে স্থানে মঠ-মন্দির স্থাপন করিয়া সর্ব্বসাধারণকে হরিকথা-

শ্রবণকীর্ত্তনের সুবিধা প্রদান, মহোৎসবাদির আয়োজন করিয়া লোককে হরিকথা শ্রবণ ও মহাপ্রসাদ-সেবা-দ্বারা প্রপঞ্চজয়ের সুযোগ প্রদান, উপযুক্ত ভক্তগণকে দেশে-দেশে, গ্রামে-গ্রামে পাঠাইয়া হরিকথামৃত বিতরণ, ভাগবতপ্রদর্শনী-দ্বারা ভাগবত-শিক্ষা প্রচার, সাময়িকপত্র-দ্বারা হরিকথা প্রচার, যে দেশ বা দেশবাসী স্মার্ত্তবিচারে অত্যন্ত অস্পৃশ্য অদৃশ্য বলিয়া বিবেচিত, যাঁহাদের ছায়া পর্য্যন্ত মাড়াইতেও শাস্ত্রের নিষেধ, তাঁহাদেরও নিকট গিয়া হরিকথা-প্রচারের ব্যবস্থা, লুপ্ততীর্থ ও লুপ্তগ্রন্থের উদ্ধার, শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত স্থানে শ্রীগৌরপাদপীঠ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কত বিভিন্ন উপায়ে শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে ভগবৎসেবোন্মুখ করিবার যত্ন করিতেছেন।

আচার্য্যের এই কৃপার কথা নিরপেক্ষ হইয়া ভাবিয়া দেখিবার সৌভাগ্য—শুভাবসর বরণ করিলে জীবের সমস্ত অনর্থ দূর হইয়া যায়, জীব ভগবানের কৃপা পাইবার যোগ্যতা লাভ করেন। জীব সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা-রঙ্গে নিখিল কালযাপনের সুবিচার বরণ করিয়া নিজ জীবনের সহিত বহু বহু জীবনকে ধন্য করিতে পারেন।

"সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লব মাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।।"
কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব, তাহা ভুলি' গেল।
এই দোষে মায়া তা'র গলায় বান্ধিল।।
তা'তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়া জাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ।।
কৃষ্ণ—সূর্য্যসম, মায়া হয় অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ, তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার।।

সমাপ্ত
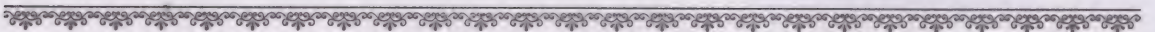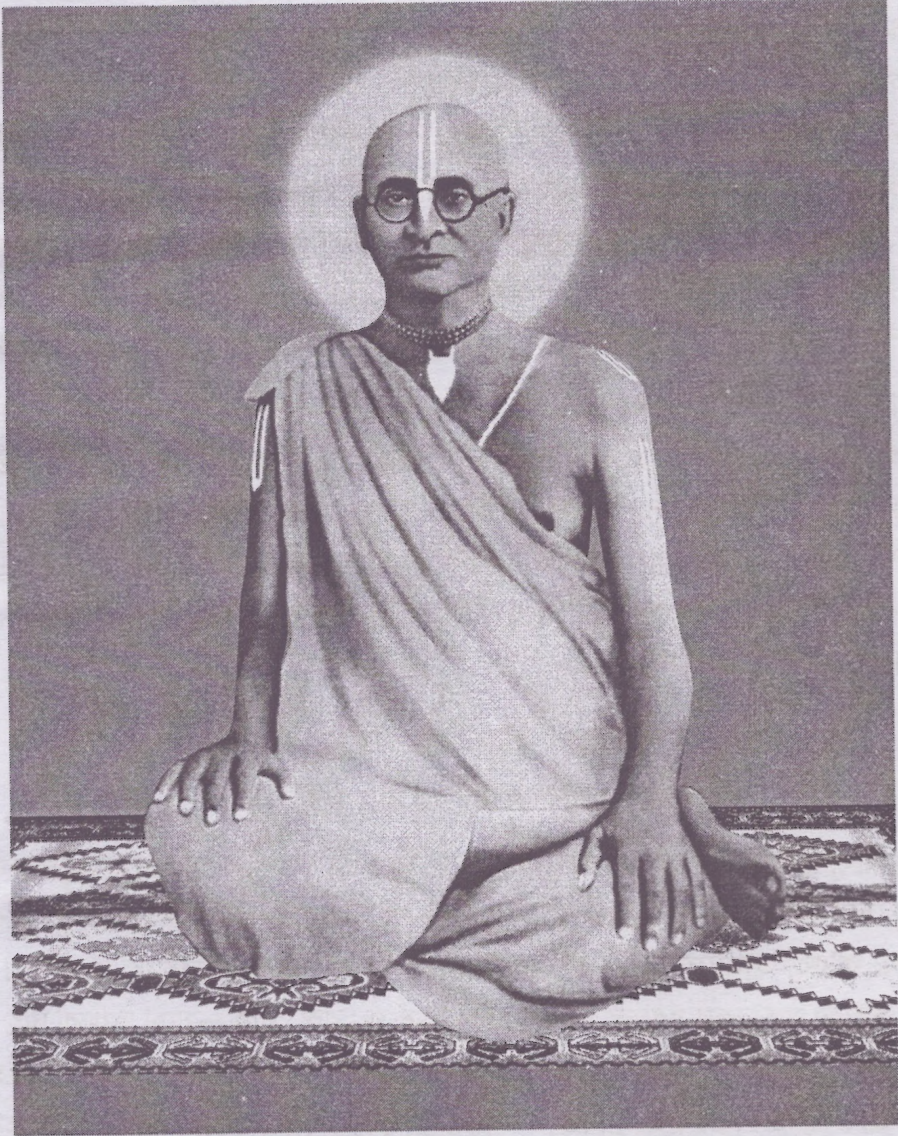
শ্রীচৈতন্য মঠ ও তচ্ছাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

অপ্রকট-লীলার প্রাক্কালে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ

আপনারা সকলে মিলিয়া মিশিয়া শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহের সহিত প্রচার করুন। শ্রীরূপানুগগণের পাদপদ্মধূলি হওয়াই আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়। আপনারা সকলেই এক অদ্বয়জ্ঞানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে আশ্রয় বিগ্রহের আনুগত্যে মিলে মিশে থাকবেন। সকলেই এক হরিভজনের উদ্দেশ্যে এই দু'দিনের অনিত্য সংসারে কোনরূপে জীবন নির্বাহ ক'রে চলবেন। শত বিপদ, শত গঞ্জনা ও শত লাঞ্ছনায়ও হরিভজন ছাড়্‌বেন না। জগতের অধিকাংশ লোক অকৈতব-কৃষ্ণসেবার কথা গ্রহণ করছে না দেখে নিরুৎসাহিত হ'বেন না; নিজ ভজন, নিজ-সর্বস্ব কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্তন ছাড়বেন না।'তৃণাদপি সুনীচ' ও 'তরুর ন্যায় সহিষ্ণু' হ'য়ে সর্বক্ষণ হরিকীর্তন কর্‌বেন।

আমাদের এই জরদ্‌গব-তুল্য দেহটাকে আমরা সপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সঙ্কীর্তন যজ্ঞে আহুতি দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ কর্‌ছি। আমরা কোন প্রকার কর্মবীরত্বের বা ধর্মবীরত্বের অভিলাষী নহি, কিন্তু জন্মে-জন্মে শ্রীরূপপ্রভুর পাদপদ্মের ধূলিই আমাদের স্বরূপ—আমাদের সর্বস্ব। ভক্তিবিনোদধারা কখনও রুদ্ধ হবে না। আপনারা আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত ভক্তিবিনোদ-মনোভীষ্ট-প্রচারে ব্রতী হ'বেন। আপনাদের মধ্যে বহু যোগ্য ও কৃতী ব্যক্তি রয়েছেন। আমাদের অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, আমাদের একমাত্র কথা এই—

"আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদরূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি।।"

সংসারে থাকাকালে নানাপ্রকার অসুবিধা আছে, কিন্তু সেই অসুবিধায় মুহ্যমান হওয়া বা অসুবিধা দূর কর্‌বার চেষ্টা করাই মাত্র আমাদের প্রয়োজন নয়। এই সকল অসুবিধা দূরীভূত হওয়ার পর আমরা কি বস্তু লাভ ক'রব, আমাদের নিত্য জীবন কি হ'বে, এখানে থাকাকালেই তা'র পরিচয় লাভ করা আবশ্যক। এখানে যত রকম ধরণের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের বস্তু আছে—যাহা আমরা চাই ও চাই না, এই উভয় প্রকারেরই মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। কৃষ্ণপাদপদ্ম হ'তে আমরা যতটা তফাৎ হ'ব, ততই এখানকার আকর্ষণ ও বিকর্ষণ আমাদিগকে আকৃষ্ট করবে। এই জগতের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ অতীত হ'য়ে অপ্রাকৃত নামাকৃষ্ট হ'লেই কৃষ্ণসেবারসের কথা বুঝ্‌তে পারা যায়। কৃষ্ণের কথা আপাত বড়ই Startling (চমকপ্রদ) ও Perplexing (হতবুদ্ধিকর)। যে আগন্তুক ব্যাপারসমূহ আমাদের নিত্য প্রয়োজনের অনুভূতিতে বাধা প্রদান করছে, তাহা Eliminate (অপসারণ) কর্‌বার জন্য
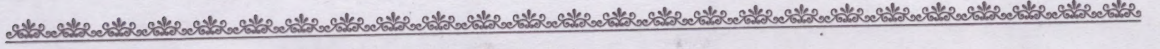
মনুষ্য-নামধারী সকলেই জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে ন্যূনাধিক Struggle (সংগ্রাম) কর্‌ছে। দ্বন্দ্বাতীত হ'য়ে সেই নিত্য প্রয়োজনের রাজ্যে প্রবেশই আমাদের একমাত্র প্রয়োজন। এ জগতে কাহারও প্রতি আমাদের অনুরাগ বা বিরাগ নাই। এ জগতের সকল বন্দোবস্তই ক্ষণস্থায়ী। প্রত্যেকের পক্ষেই সেই পরম প্রয়োজনের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা আছে। আপনারা একই উদ্দেশ্যে ঐক্যতানে অবস্থিত হ'য়ে মূল আশ্রয়বিগ্রহের সেবাধিকার লাভ করুন। জগতে শ্রীরূপানুগ চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হউক। সপ্তজিহ্ব শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তন যজ্ঞের প্রতি যেন কখনও আমরা কোন অবস্থায় বিরাগ প্রদর্শন না করি। তা'তে একান্ত বর্দ্ধমান অনুরাগ থাক্‌লেই সর্বার্থসিদ্ধি হ'বে। আপনারা শ্রীরূপানুগগণের একান্ত আনুগত্যে শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহে ও নির্ভীককণ্ঠে প্রচার করুন।"